সূচীপত্র

৪৪ বর্ষ ঃ ৪০শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় [illegible] প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ Thursday, 2nd April, 1970

রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হোক

যুক্তফ্রন্ট-শাসনের অবসান হয়েছে। ঐ শাসনের অবসানের দিন সেইদিনই ঘনিয়ে এসেছিল, যেদিন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সরকার অসভ্য এবং বর্বর।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো অসভ্য এবং বর্বর শাসক এক মুহূর্ত টিকে থাকতে পারে নি। তবু বর্তমান সভ্য যুগে যুক্তফ্রন্ট বেশ কিছুদিন টিকে ছিল। কারণ জনসাধারণ যে যুক্তফ্রন্টকে গদীতে বসিয়েছিল, তাদের পক্ষে বলা সহজ ছিল না, এ যুক্তফ্রন্ট সরকার চাই না। কারণ তারাই তো বহু আশা করে যুক্তফ্রন্টকে গদীনসীন করেছিল। অবশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকার তথা সি পি এম জনসাধারণকে দিয়েছিল চোখা চোখা বুলিতে অজস্র প্রতিশ্রুতিমূলক ধোঁকা।

যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি ও জনসাধারণের আশাভঙ্গের পরও কেন জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিপাত চায় নি?

নিপাত চায় নি—এমন কথা বলা যায় না। তবে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে তেমন কথা বলার মতো সাহস তাদের ছিল না শুধু প্রাণের ভয়ে।

সাহস না থাকার অন্য কারণ কি? প্রথম কারণ, দলবাজী। আর বড় দল সি পি এম-এর বড় বাড়। চারদিকে খুন, জখম, মারামারি, রাহাজানি, লুটপাট, শরিকী সংঘর্ষ—ঐ সব ব্যাপার যখন বল্গাহীনভাবে চলতে লাগলো, তখন জনসাধারণ বুঝলো যে-দেশে শাসন নেই, সে-দেশেই এমন ব্যাপার ঘটতে পারে। তখন কোনো কথা বললে তার জীবনহানির আশঙ্কা ঘটতে পারত। ভোট নেবার সময় যে ভোটদাতারা ছিল দেবতা, তারা যে তখন ছেঁড়া কাগজ। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহযাত্রীরা যেখানে অসহায় হয়ে পড়েন, সেখানে রাস্তার লোকের কার বুকের পাটা ছিল যে বলতে পারত, আমরা এ সরকার চাই না। এর চাইতে, যতো দোষ থাক না কেন, গত বাইশ বছরের কংগ্রেসের শাসন খুব ভাল ছিল।

যুক্তফ্রন্টের এক বছরের শাসনের অপকর্ম বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে গত একশ' বছরে অনুষ্ঠিত অপকর্মগুলির তুলনায় ওজনে ভারি। শ্রেণী সংগ্রামের নামে ভ্রাতৃহত্যা, যত্র তত্র অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার যারা করেছে, তাদের অপরাধের সীমা নেই। জনসাধারণ তাদের চিনে নিয়েছে।

গত এক বছরে বাংলা দেশের বুকে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, যুক্তফ্রন্টের পতনের পর তার অবসান হতে সুরু করেছে। এতোদিন জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের ভয়ে ও চাপে যে পুলিশ বিভাগ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, তারা এখন শান্তি-শৃঙ্খলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

এখন এটা দিবালোকের মতো সত্য, ভাঙা যুক্তফ্রন্ট জোড়া লাগার আর কোনো আশা নেই। যে দলগুলি সে-আশা করছেন, আমরা তাঁদের ধৈর্যের প্রতি ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু বার বার ঠকেও তো তাঁরা বুঝেছেন, কাদের সঙ্গে ঘর করা যায়, আর কাদের সঙ্গে ঘর করা যায় না। সুতরাং সেই ষোল আনা যুক্তফ্রন্টের আশা করা নিরর্থক। বিশেষত রাজনীতির চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা সেকথা ভালোভাবেই বোঝেন।

তবু যা হওয়া উচিত, তা সব সময় যথাসময়ে হয় না। তার পেছনেও ক্রিয়া করে নানা রকম কার্যকারণ।

এই রকম পরিস্থিতিতে পশ্চিম বাংলার মানুষ আর অঘটনের প্রত্যাশা না করে কামনা করে দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রপতির শাসন।

রাষ্ট্রপতির শাসনে দেশের ও সমাজের শত্রুরা ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং পশ্চিম বাংলার মানুষ এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বেঁচে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। এই শান্তি এবং শৃঙ্খলার খাতিরে দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রপতির শাসনের পক্ষেই আজ পশ্চিমবঙ্গে সর্বশ্রেণীর মানুষ। তাই সি পি এম আশু মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই বলে যতই চীৎকার করুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সে ধাপ্পাবাজী ও অসৎ প্রচারে আর বিভ্রান্ত হতে প্রস্তুত নন।

আজকের মানুষ

প্রিন্স নরোদম শিহানুক ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। তিনি যখন মস্কো সফররত তখন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন তাঁকে এ-দুঃসংবাদ দেন যে, যাঁদের ওপর দেশ ও জাতির ভার দিয়ে শিহানুক স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে বিদেশযাত্রা করেছেন, তাঁরাই তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধানকে পথে বসিয়েছেন। কাম্বোডিয়ার পার্লামেন্টও অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে শিহানুককে গদিচ্যুত করেছে।

বলা বাহুল্য এটা কোনো অঘটন নয়. স্বয়ং শিহানুকই লণ্ডনে সাংবাদিকদের কাছে এ-সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে কাম্বোডিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। কেন? প্রিন্স শিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করা হল কেন? জেনারেল লন নোল, প্রিন্স শিসোয়াথ সিরিক মাতাক এবং চেন হেঙ—অর্থাৎ যাঁরাই এ-অভ্যুত্থানের সংগঠক তাঁদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, শিহানুক দেশের সর্বনাশ করছিলেন, সেজন্যই জাতির মঙ্গলের দিকে চেয়ে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিহানুকের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ, তিনি দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন, সুন্দরী স্ত্রী প্রিন্সেস মনিকের কথামত চলতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য করে ফেলছিলেন সভাসদদের বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে থাকতে সহায়তা করে। দেশে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারি বাড়ছিল, দেশের অর্থনীতিতে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল ইত্যাদি। তার চেয়েও বড় অভিযোগ, প্রিন্স শিহানুকের দুর্বল ও কমিউনিস্ট তোষণনীতির ফলে উত্তর ভিয়েৎনামী ও ভিয়েৎকঙ সৈন্যরা কাম্বোডিয়ায় ঢুকে পড়ছিল। কাজেই তাঁর অপসারণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। মস্কো থেকে পিকিঙ পৌঁছে অবশ্য শিহানুক নিজে বলেছেন যে, সি আই-এর ষড়যন্ত্রের কারণেই তাঁকে ক্ষমতা হারাতে হয়েছে।

প্রিন্স নরোদম শিহানুক নিজেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একজন ঝানু রাজনীতিজ্ঞ তথা কূটনীতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলতেন, হাতে তাসের প্যাকেট নিয়ে তিনি চতুর খেলা দেখাচ্ছেন। কখনো তিনি বাঁ দিকে ঝুঁকেছেন, কখনো দক্ষিণ দিকে। হাতে যখন তাস থাকবে না, খেলা তখন বন্ধ হবে তাঁর। বাস্তবিক বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কখনো তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে, কখনো মস্কো-পিকিঙের দিকে হেলে অদ্ভুত কায়দায় কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন।

প্রিন্স শিহানুকের বয়স যখন মাত্র ১৮, স্কুলের ছাত্র তিনি, তখন ফরাসীরা তাঁকে কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে বসান। উপনিবেশবাদীরা চেয়েছিল শিহানুককে সাক্ষীগোপাল করে ইন্দোচীনে আরো কিছুকাল তাঁরা শোষণব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারবেন। কিন্তু গোড়ায় কিছুকাল ফরাসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেও দেশের হাওয়া বুঝতে বুদ্ধিমান রাজকুমারের দেরি হয় নি। শিহানুক ফরাসীদের হাতের পুতুল হয়ে রাজত্ব চালাতে রাজী হলেন না, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে তিনি আত্মনিবাসনের পথ বেছে নিলেন। ১৯৫৪ সালের বিখ্যাত ও চূড়ান্ত দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধের প্রাক্কালে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ শিহানুকের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

শিহানুক

গত ৩১ বছর ধরে প্রিন্স শিহানুক প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার সঙ্গে দেশ শাসন করেছেন। প্রথমত ১৯৫৫ সালে রাজসিংহাসন বর্জন করেই শিহানুক প্রজাকুলের অকুণ্ঠ আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। রাষ্ট্রপ্রধান শিহানুক কাম্বোডিয়ার ৭০ লক্ষ অধিবাসীকে নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন কাম্বোডিয়ার জনজীবনের আক্ষরিক অর্থেই শরিক। গত ১৫ বছর ধরে শিহানুককে দেখা গিয়েছে কাম্বোডিয়ার সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে, তরুণ-তরুণীর জন্যে কবিতা লিখতে, গান রচনা করতে, স্যাক্সোফোন বাজিয়ে তাদের আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে। শিহানুক হৈ হৈ করে খেলেছেন যুবকদের সঙ্গে, তাদের বাস্কেট বল টিমের ক্যাপ্টেন শিহানুক। ফিল্ম তুলেছেন, চিত্র পরিচালনা করেছেন।

আবার এই চপলচঞ্চল শিহানুককেই দেখা গিয়েছে বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বিনিময়ে ঝানু কূটনীতিকের মত ব্যবহার করতে। ১৯৬৩ সালে তিনি কাম্বোডিয়া থেকে মার্কিন অফিসারদের বহিষ্কারের আদেশ দেন, '৬৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কই ছেদ করে ফেলেন। শিহানুকের মিতালি তখন মস্কোর সঙ্গে, পিকিঙের সঙ্গে। কিন্তু আবার অনামুখেই বলেছেন, কাম্বোডিয়ায় মার্কিন সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নইলে চীনের পাল্লায় পড়ে দেশটা কমিউনিস্ট হয়ে যাবে।

মাত্র ৪৭ বছরের প্রিন্স শিহানুক যেন দড়ির খেলা দেখিয়ে এতকাল তাঁর পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেছেন। আজ যে দক্ষিণপন্থীরা তাঁকে হটিয়ে দিলেন, তাঁরা কিন্তু শিহানুকেরই সৃষ্ট জীব। অভ্যুত্থানের আশংকাও তিনি করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু দেখা গেল যে, পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেও, ঘর সামলাতে তিনি আপাতত ব্যর্থ হয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(৬)

না, জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরতাও গান্ধীজীর রাজভক্তিকে সম্পূর্ণ মারতে পারে নি, ইংরেজের গণতন্ত্রের জন্য সৈন্য সংগ্রহে ব্রতী সেই বিবেক আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ইংরেজের শুভমুখ দেখবার জন্য, কিন্তু যখন দেখা গেল, জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটিয়েও ইংরেজ এতটুকু অনুতপ্ত নয়, সেই পাপের ওপরে বীরত্বের বর্ণলেপন করছে পরমানন্দে, তখন গান্ধীজীর ধৈর্যও নষ্ট হল। তিনি হাত বাড়িয়ে মহম্মদ আলীর হাত টেনে নিলেন। মহম্মদ আলী ৪ বছরের বন্দিদশার পরে মুক্তি পেয়েছেন ১৯১৯-এর নভেম্বর মাসে।

মহম্মদ আলীর সঙ্গে গান্ধীজীর মিত্রতা আধ্যাত্মিক কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণেই—গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখল করবার জন্য সমর্থক খুঁজছিলেন, মহম্মদ আলীও খিলাফতের জন্য সহযোগী চাইছিলেন, ফলে উভয়ের বোঝাপড়া হয়ে গেল—সুভাষচন্দ্র লিখেছেন।১ আলী ভ্রাতারা যখন জেলে, তখন থেকেই গান্ধীজী তাঁদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগস্থাপন করেছিলেন। খিলাফত আন্দোলন গান্ধীজীর কাছে খুবই ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে তিনি যৎপরোনাস্তি বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন, এমন কি খিলাফত আন্দোলনকে ভারতের জন্য হোমরুল দাবির সমতুল করে উপস্থিত করলেন। ভাইসরয়কে লেখা চিঠিতে কার্যত তাই তিনি বলেছিলেন।২

ভাইসরয়কে লেখা ঐ চিঠি এবং আলী ভাইদের মুক্তির জন্য প্রবল হৈ-চৈ গান্ধীজীকে পয়লা নম্বর খিলাফতী করে তুলল, সুতরাং তিনি দিল্লীতে নভেম্বর, ১৯১৯-এ 'অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্সের' সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই অভিষেক খিলাফত-ব্যাপারে গান্ধীজীর সকল সংযম নষ্ট করে দিল। তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, অক্লেশে আনন্দে যত রাজ্যের অসংলগ্ন অবাস্তব অনুচিত কথা বলে যেতে লাগলেন। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় ২০ অক্টোবর, ১৯২১ তারিখে এক রচনায় তিনি লিখেছিলেনঃ

"আমি দাবি করি, আমাদের উভয়ের পক্ষে খিলাফত কেন্দ্রীয় ব্যাপার। মৌলানা মহম্মদ আলীর কাছে তা কেন্দ্রীয় ব্যাপার, কারণ এটা তাঁর ধর্মের বিষয়; আমার কাছে কেন্দ্রীয় ব্যাপার, কারণ খিলাফতের জন্য জীবন সমর্পণের দ্বারা আমি মুসলমানদের ছুরি থেকে গরুদের প্রাণ বাঁচাচ্ছি—ওটা আমার ধর্ম।"৩

কোনো বিদ্রূপের হাসি ঐ রকম বদ্ধপরিকর মূঢ়তাকে

---

১ He (Gandhi) only wanted more allies in order to be able to capture the leadership of the Indian National Congress. About this time the Ali Brothers and other Moslem leaders were preparing to launch Khilafat movement and they, too, were looking out for allies." (*Indian Struggle*).

খুবই বিস্ময়ের কথা সত্যাগ্রহের অহিংস ঋষি গান্ধীর সঙ্গে ইংরেজ-বিদ্বেষ-সম্বল মহম্মদ আলীর আঁতাত হয়েছিল।।

২ রমেশ মজুমদার—৩য়—৫৬।

৩ রমেশ মজুমদার, তৃতীয়, পৃঃ ৬৪।

বাজিবো-প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গান্ধীজী নাকি বলেছিলেন, হিন্দুরা খ্রীস্টান ও মুসলমানদের গোহত্যা ছাড়াবার জন্য তরবারি নিষ্কাশনেও দোষ দেখবে না।

গান্ধীজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তিনি কিছু মুসলমান নেতাকে গো-রক্ষা সমিতিতে পর্যন্ত ঢোকাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই গো-সেবার ভারতীয় রাজনীতির কতখানি সেবা হয়েছিল জানি না, কিন্তু বহু মুসলমানকে গান্ধীজীর কুমতলব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। ব্যাপারটা যদি আধ্যাত্মিক কিছু হয়, সেক্ষেত্রে বলার কিছু থাকে না, কারণ, গান্ধীর আধ্যাত্মিকতা যুক্তির উর্ধচারী। কিন্তু যদি তা রাজনৈতিক হয়, খুবই নিম্নস্তরের রাজনীতি—গোঁড়ামির দোকানদারি ছাড়া কিছু নয়।

ছাপিয়ে উঠতে পারবে না। কল্পনা করা শক্ত, ঐরকম কথা কোনো স্বাভাবিক-বুদ্ধি মানুষ কখনো বলেছে। অথচ বিস্ময়ের কথা, এই ধরনের উদ্ভট কথাই অন্তরের রঙে আলোয় মাখামাখি হয়ে মিস্টিক মহিমা লাভ করে অজ্ঞ মানুষকে পতঙ্গবৎ আকর্ষণ করেছিল।

১৯১৯ ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খিলাফত নেতাদের যৌথ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়। কংগ্রেস খিলাফতের পক্ষে নিজের প্রভাব প্রয়োগ করতে রাজি হয়। প্রধান প্রধান হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে[৪] খিলাফতী নেতারা মিলিত হয়ে ভাইসরয়ের দরবারে আর্জি জানাতে যান ১৯ জানুয়ারী, ১৯২০ তারিখে। ভাইসরয় যথেষ্ট সহানুভূতি জানাবার পরেও খোলাখুলি বলেন, যুদ্ধপূর্বে তুরস্কের যে-অবস্থা ছিল তাকে রক্ষা করা মিত্রপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। "জার্মানীর পক্ষে যারা তরবারি নিষ্কাশন করেছে তাদের একজন হয়ে তুরস্ক অনুরূপ অপর সকলের থেকে ভিন্ন ভাগ্য পেতে পারে না।" ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনার ব্যর্থতার পরে প্রতিনিধিদল আবার ইংলণ্ডে ও ইউরোপে গেল আবেদন জানাতে। সে দলের নেতৃত্ব করেছিলেন মহম্মদ আলী। লয়েড জর্জের সঙ্গে ১৭ই মার্চ তারিখে তাঁরা দেখা করেন, কিন্তু এখানেও ব্যর্থ হন। ১৫ই মে তারিখে ভারত সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণায় দেখা গেল, তুরস্ক কনস্টান্টিনোপল রাখতে পারে কিন্তু তার সাম্রাজ্য থাকবে না একেবারেই। লয়েড জর্জের সঙ্গে খিলাফতী দলের সাক্ষাতের আগেই গান্ধীজী ১০ই মার্চ ফতোয়া জারি করেছিলেন—যার মধ্যে খিলাফতীদের দাবি অগ্রাহ্য হলে কোন্ পথ নেওয়া হবে তা বলা ছিল। ডাঃ রমেশ মজুমদারের মতে, এই ফতোয়া ইতিহাসের দিক দিয়ে মূল্যবান, কারণ এর মধ্যে "গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের নীতি প্রথম সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল—যে নীতি অল্প পরেই ভারতীয় রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।" ঐ ফতোয়ার মধ্যে গান্ধী যথারীতি বিচিত্র কিছু কথা বললেন: "মুসলমানদের কাছে যে অধিকার জীবন-মরণের ব্যাপার, তাকে যদি ইংরেজ হরণ করে নেয় তাহলে ইংরেজ আশা করতে পারে না আমরা তাকে গোবেচারাভাবে মেনে নেব।" গান্ধীজীর এই সুমহান্ সর্বনাশা মনোভাব পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতির যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা না করে ঐতিহাসিকরা পারেন নি।[৫] গান্ধীজীকে যখন এই ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন, মুসলমানদের 'মূলগত স্বার্থের' ব্যাপারে হিন্দুরা উদাসীন থাকলে হিন্দু-মুসলমান মিলন ঘটতে পারে না। কিন্তু সেই মূলগত স্বার্থ যদি জাতীয়তাবাদের বিরোধী হয়—প্যান-ঐশ্লামিক খিলাফত আন্দোলন যা ছিল? ভারতের সমস্যা ও স্বার্থের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই, এমন এক ব্যাপারকে যদি ভারতীয় জনগণের একাংশ নিজেদের 'মূলগত স্বার্থ' বলে মনে করে এবং

৪ হিন্দু নেতাদের মধ্যে আবেদনপত্রে সই করেছিলেন—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা গান্ধী। আবেদনপত্রে বলা হয়েছিল, "হিন্দু ও মুসলমানেরা এখন পরম আনন্দে পুনশ্চ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, এই অবস্থায় তারা উভয়েই বিশেষ ক্ষুব্ধ হবে, যদি মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবি মেনে নেওয়া না হয়।" (রমেশ মজুমদার, তৃতীয়, ৫৬ পৃঃ)

৫ ডাঃ রমেশ মজুমদার লিখেছেন:

"It is no doubt a lofty sentiment, but it is pertinent to ask whether England's treatment of Turkey, even assuming that she was solely responsible for it, was a greater degradation and humiliation to India than England's treatment of the Indians during a century and a half, or even the recent atrocities in the Panjab. As to regarding the fate of Khilafat as matter of life and death to the Muslims, events were soon to prove that it was a rhetoric or hyperbole, and can hardly be regarded as a serious fact; for in less than five years the Muslims of Turkey usurped the rights of the Caliph to a far greater degree than the British ever did, and not a leaf stirred in the whole Muslim world outside India. Unless, therefore, we are prepared to believe that the Muslims of India were the only true followers of the Prophet, or the most genuine champions of the cause of Islam, it is difficult to understand or explain the weight they attached to the Khilafat question, save on the theory that it was a phase of that Pan-Islamic movement to which the Indian Muslims looked forward as the only guarantee against the influence of a Hindu majority with whom fate had linked them in India. But this aspect of the question certainly could not appeal to Gandhi, and it is therefore not easy to explain why Gandhi should have thought of treating the Khilafat question as more important than the larger issues of Indian politics." (R. C. Majumder, Vol. III, p.—58)

ভারতীয় জনগণের মধ্যে যদি তাকে ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে দেন, তাহলে তিনি বাস্তবিকপক্ষে ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন বলতে হবে। ডাঃ রমেশ মজুমদারের তীক্ষ্ণ বক্তব্য: "যদি দশ কোটি ভারতীয় মুসলমান আমাদের ভাগ্য নয়, ভারত-বহির্ভূত তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ে মূলগতভাবে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদের ভারতীয় জাতির অংশ বলে গণ্য করা যায় কি না সন্দেহ। খিলাফত-প্রশ্ন ভারতীয় মুসলমানদের কাছে মূলগত ব্যাপার—এই স্বীকৃতির দ্বারা গান্ধী নিজেই জানালেন, মুসলমানেরা পৃথক জাতি; তারা ভারতের মধ্যে রয়েছে কিন্তু ভারতীয় নয়।"

যাই হোক, খিলাফত ও অহিংস অসহযোগ ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তুলল। কিছুদিনের জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলনের স্মরণীয় ও বিরল দৃশ্য দেখা গেল; আলী ভ্রাতারা সর্বশ্রেণীর ভারতীয়ের কাছে অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন—গান্ধীজীর চেষ্টাতেই প্রধানত সে জনপ্রিয়তা তাঁরা পেলেন—তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজী সারা ভারত ভ্রমণ করলেন, বলতে লাগলেন, এঁরা আমার ডান হাত, বাম হাত, দিকে দিকে জয়ধ্বনি উঠল—মহাত্মা গান্ধী কি জয়, আলী ভাইও কি জয়![৬] মনে হল, ভারতীয় মহাজাতীয়তার অপরূপ আবির্ভাব বুঝি সত্যই হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলই গরল ভেল, কারণ মিথ্যা ভিত্তিতে সত্য প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না।

অসহযোগ আন্দোলনের এবং খিলাফত আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়, এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কী দাঁড়িয়েছিল তাই দেখাতে চাইছি। আলী-ভ্রাতারা কংগ্রেসে যোগদান করলেও পৃথক খিলাফত কমিটিকে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের মতে, এটি একটি প্রধান ভুল। ঐসব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য যথারীতি চলছিল। অহিংস গান্ধীর আলী-ভ্রাতারা কিন্তু তাঁদের বক্তৃতাদিতে কণ্ঠা পর্যন্ত ঠেলে-আসা হিংসাকে একেবারে ঠেকাতে পারেন নি। তাঁদের হিংসাত্মক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় গান্ধী বিব্রত হলেন, ভারত সরকার রুষ্ট। তখন গান্ধীজীর তাগিদে আলী-ভ্রাতারা ভারত সরকারের কাছে ক্ষমা চাইলেন, যদিও পরে মুখরক্ষার জন্য ও ব্যাপারটাকে চাপা দিতে যথেষ্ট অসংলগ্ন কথা বলতে লাগলেন, এবং স্বসমাজের কাছে সংকীর্ণ ও উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখিয়ে মর্যাদার নষ্ট-ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অতঃপর সবচেয়ে বড় মার খেল মালাবারের মোপ্‌লা বিদ্রোহে। মোপ্‌লারা দক্ষিণ ভারতের মালাবারের মুসলমান সম্প্রদায়, একেবারে ধর্মান্ধ, অশিক্ষিত ও দরিদ্র; সংখ্যায় দশ লক্ষের মত এবং ধর্মীয় অনুশাসনে যে-কোনো কুকার্যে তৎপর। আলী-ভ্রাতাদের আগুনে বক্তৃতা, ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আসছে, গান্ধীর এই ঘোষণা, খিলাফত কনফারেন্সের জুলাই-প্রস্তাব—মোপ্‌লাদের মাতিয়ে তুলেছিল। ১৯২১-এর গোড়া থেকেই মসজিদে মসজিদে, গ্রামে গ্রামে উত্তেজনাময় প্রচার চলছিল। ছুরি, তলোয়ার, বর্শা, লাঠি তৈরি হচ্ছিল গোপনে এবং সবাই প্রস্তুত হচ্ছিল ইসলাম-রাজের শুভ আবির্ভাবের জন্য। ১৯২১-এর ২০শে আগস্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিছু লোককে গ্রেপ্তার করতে গেলে কাণ্ডকারখানার সূত্রপাত হল, ২১শে থেকে পুরোপুরি বিদ্রোহ; কয়েকজন ইউরোপীয় খুন হল, বাকি সবাই পালাতে পারল, কিন্তু পালানো যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেই অগণিত হিন্দু অধিবাসীদের ওপর হিংস্র নেকড়ের মত মোপ্‌লারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। অগ্নিদাহ, ধর্মান্তর, ধর্ষণ, খুন—সেই ব্যাপক বর্বরতার ইতিহাস বিবৃত করার প্রয়োজন এখানে নেই। বহু চেষ্টায় তবে সরকার বিদ্রোহ দমন করতে পারল এবং সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে অনেক মোপ্‌লা প্রাণ হারাল।

মোপ্‌লাদের বীভৎস কাণ্ডকারখানার কথা যখন জানা গেল, তখন প্রথমে কংগ্রেস নেতাদের উচ্চচেতনার কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, সুতরাং ইংরেজ সরকারের প্রচারিত কুৎসা কাহিনী বলে মনে হল। ধর্মের জন্য মোপ্‌লারা মহাসমর করেছে—খিলাফত কমিটি প্রস্তাব নিল অভিনন্দন জানিয়ে। গান্ধী বললেন, "সাহসী ধর্মভীরু ঐ মোপ্‌লারা", "তারা যাকে ধর্ম বলে মনে করে, তার জন্য লড়েছে—ধর্মসঙ্গত পথ বলে যাকে মনে করে—সেই পথে।" যখন কিন্তু ব্যাপারটা সভ্য-বুদ্ধিতে আর ধর্মসঙ্গত রইল না, তখন কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়ে বলল, খিলাফত বা অসহযোগের সঙ্গে মোপ্‌লা বিদ্রোহের কোনো সম্পর্ক নেই, কিছু মোপ্‌লা হয়ত অন্যায় করেছে, কিন্তু সরকারও তাদের দমন করতে গিয়ে অন্যায় কিছু কম করে নি। খিলাফতীরা অপরপক্ষে তাদের ধর্মযোদ্ধাদের অন্যায় দেখতে একেবারেই চাইল না, হজরত মোহানী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা ব্যাপারটার গুণগান করলেন, মোপ্‌লা-শহীদদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল নানাদিকে, তাদের পরিবারবর্গের বিষয়ে দায়িত্ব-উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থ সংগ্রহের ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সৌকত আলী, আর জমিয়েত-উল-উলেমা লেগে গেল শহীদদের অমর স্মৃতির স্তম্ভ নির্মাণে।

মোপ্‌লা বিদ্রোহ সম্বন্ধে গান্ধী-চালিত কংগ্রেসের দুর্বল নরম ভাব, তাদের ঘৃণ্য অপরাধকে অন্ধ করে দেখানোর চেষ্টা—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কংগ্রেসের

৬ Iudian Struggle—P. 91.

কে তোরা ধরিস বাজী ?

অমিয়কুমার হাটি

কে তোরা ধরিস বাজী ?
লটারি খেলে না ইতিহাস।
একোনাইটের মতো বিষ ভরা
আঁধার ফুলের সাজি
যতই সাজাস তোরা,
ফিরে পাস শুধু পরিহাস।

পথ পড়ে আছে, চিনেছি সে পথ।
রুদ্রশতক
সায়াহ্নে তার ডমরু বাজায়।

এই অবেলায়
পিছনে ঘোরাবি চাকা?
মজদুরকি যতই ধরেই ফেলেছি
জয়
করবই
আঁধার
সড়ক
তোদের বুকের ভয়ের কাঁপনে
আগামীদিনের জয়ের চিহ্ন আঁকা।

প্রতিবাদের নৈতিক অধিকার নষ্ট করে দিয়েছিল—ঐতিহাসিক তিক্তভাবে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন।৭

খিলাফত আন্দোলন এর পরে বেশিদিন জোরের সঙ্গে চলে নি। অসহযোগও ইতিমধ্যে ঝিমিয়ে পড়েছিল। খিলাফত তারপরে একেবারে মরে গেল, যখন তুরস্কের মুস্তাফা কামাল পাশা মূল শিকড় কেটে দিলেন। ১৯২৩ খৃীস্টাব্দে কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করলেন। সেখানকার সুলতান আবদুল হামিদ পালাবার পরে তাঁর ভাইপোকে কামাল পাশা শুধু ধর্মের অংশে খলিফা নিয়োগ করলেন। "ভারতীয় মুসলমানেরা তখন উক্ত খলিফা সম্বন্ধে ভালো ব্যবহার দাবি করলে তা তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বহির্গত হস্তক্ষেপ, এই অজুহাত তুলে কামাল পাশা খলিফা-পদ একেবারে উঠিয়ে দিলেন।"৮ ইতিহাসের বিচিত্র বিধান—হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য গান্ধীর খিলাফত-সমর্থন—উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যের সবচেয়ে বড় ক্ষতি তার ফলেই হয়েছে; খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের অত আন্দোলন—তার ফলেই খলিফার শেষ চিহ্নটুকুও উঠে গিয়েছে! আরও মজার কথা, আতাতুর্ক খলিফা-পদ উঠিয়ে দেওয়ায় ভারতীয় মুসলমানেরা তাঁর বিরুদ্ধে কিন্তু আন্দোলনে নেমে পড়ে নি। অনতিরিক্ত সহানুভূতিসম্পন্ন ঐতিহাসিকের তাই বক্তব্য—খিলাফতের আসল লক্ষ্য ইংরাজ নয়, ভারতীয় হিন্দু।

খিলাফতের অন্তে দেখা গেল, সাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনার অন্তে ভারতীয় মুসলমানেরা আশাহত হয়ে আবার নিজেদের কোটরে ফিরে গেছে, সেখানে সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো আগুন নেই, শুধু আছে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষবাষ্প। নেহরু 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সিপাহী বিদ্রোহের পরে প্যান ইসলামের ধারণার ওপরে যে-স্বপ্নের কাঠামো মুসলমানেরা গড়ে তুলেছিল, কামাল আতাতুর্ক তাকে ভেঙে দিলে কিভাবে পুনশ্চ শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। বহির্ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যে জাতীয়তাকে গ্রহণ করেছে, সেখানে প্যান-ইসলাম ধারণার প্রশ্রয় নেই, অথচ হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে মনে-প্রাণে যোগ দেওয়াও শক্ত—এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান সন্দিগ্ধ মনে সরে দাঁড়াল বা গোঁড়ামির শিকার হল। খিলাফতের আগে মুসলিম নেতৃত্ব সামন্ততান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের করায়ত্ত ছিল, খিলাফতের গণ-আন্দোলন সে নেতৃত্বকে নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। শেষোক্ত আন্দোলনের মধ্যে যথেষ্ট মুসলিম গোঁড়ামি থাকলেও কিছু আধুনিক ধারণার সূচনাও হয়েছিল। কিন্তু ঐ আধুনিক ধারণার সঙ্গে অর্থনৈতিক ধারণা যুক্ত না হওয়ায় তার ভিত্তি ছিল দুর্বল। ফলে খিলাফতের যখন মৃত্যু হল, তখন সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব আবার ফিরে এল,—অর্থাৎ মুসলিম লীগের পুনরভ্যুদয় ঘটল, যার নেতারূপে হাজির হলেন মহম্মদ আলী জিন্না।

[ক্রমশ]

---

৭ গান্ধীর প্রভাবে আমেদাবাদ কংগ্রেস মোপলা-বর্বরতা সম্বন্ধে যে নিতান্ত দুর্বল প্রস্তাব নেয়, তার বিষয়ে ডাঃ রমেশ মজুমদার মন্তব্য করেছেন:

"This resolution is unworthy of a great national organisation, which launched the Non-co-operation movement as a protest against the Panjab atrocities. Its deliberate attempt to minimize the enormity of the crimes perpetrated by a band of fanatic Muslims upon thousands of helpless Hindus, betrays a mentality which is comparable to that of the Government of India in the case of Panjab atrocities in 1919." (Vol. III, P. 196)

৮ এ কে মজুমদার—পৃঃ ১৬।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] এসেছেন। প্রকাশ যে, তাঁনি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেন। রাজ্যের আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত পরিস্থিতিই আলোচনার মূখ্য বিষয় ছিল। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃংখলার প্রসঙ্গ নিয়ে লোকসভাতেও অনেক কথাবার্তা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বারবার এই প্রশ্ন উঠেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভীষিকার রাজত্ব চলছে, অতএব কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ করা হোক, আর কেন্দ্রীয় সরকার জবাবে বলেছেন যে, তাঁরা অবস্থার গতিপ্রকৃতি কি পর্যবেক্ষণ করেই চলেছেন, দরকার হলে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু কেউ একবারও এই প্রশ্ন তোলেন নি যে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এত অশান্ত কেন? কেউ প্রশ্ন করেন নি যে, কেন সেখানে কথায় কথায় ট্রাম-বাস পোড়ে, কেন মানুষ খুন হয়, কেন পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের মধ্যে হতাশা ও বিক্ষোভ, কেন কলকাতা মিছিল ও দুঃস্বপ্নের নগরী? পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা যে সর্বভারতীয় সমস্যা, এ কথাটা পর্যন্ত কেউ কি উপলব্ধি করার মত রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন? পশ্চিমবঙ্গের নিন্দা করতে মুখে আটকায় না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলীর দিকে কেউ কি দৃষ্টিপাত করেছেন? কেউ কি বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য এই এই ব্যবস্থার দরকার?

পশ্চিমবঙ্গে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ গত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। সমাজবিরোধীদের যে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, তার উদ্ভব ও বৃদ্ধি তো একদিনেই হয় নি। স্বাধীনতা লাভের মাশুল তো দেশবিভাগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাব ছাড়া আর কোন রাজ্যকে দিতে হয় নি? অন্য কোন রাজ্যকে কোন বিশেষ সমস্যা ঘাড়ে করে পথচলা শুরু করতে হয় নি। দেশবিভাগ জনিত পাঞ্জাবের যে ক্ষতি হয়েছে, তা সুদে আসলে পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ কথা নতুন করে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। পাঞ্জাবে অধিবাসী বিনিময় হয়েছে, ফলে সেখানে আগত উদ্বাস্তুরা এখানে এসে এখান থেকে চলে যাওয়া মানুষদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে। এ ছাড়া পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়াও মোটা টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে, এবং তা করা হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি হিসাবে অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কি
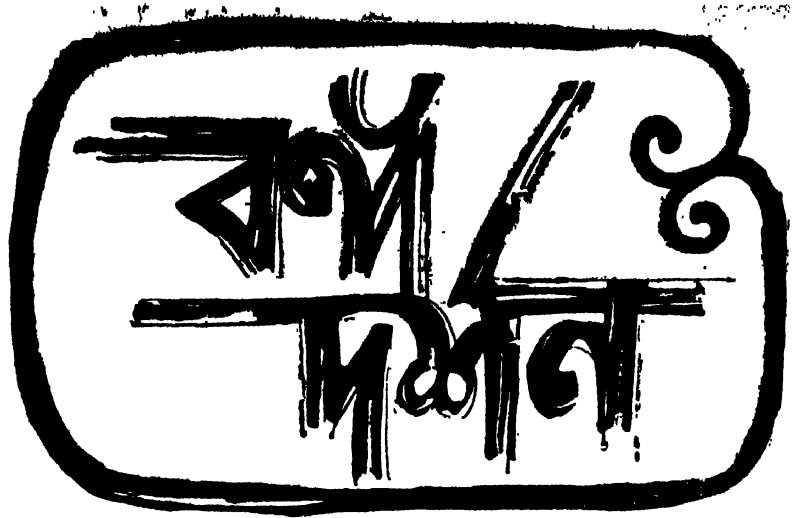
হয়েছে? পূর্ববঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য কতটুকু করা হয়েছে? একেই পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি, তা' ছাড়া প্রাক্-স্বাধীনতা আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্র কিছুটা বিস্তৃত থাকার দরুণ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকেও অজস্র মানুষ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় স্থায়ীভাবেই বাসা বেঁধেছে। কর্মসংস্থানের দিক থেকে এই শিল্পক্ষেত্রগুলি অবাঙালীদেরই যে করায়ত্ত, এই স্থলে সত্য কথাটা বললে বোধ হয় প্রাদেশিকতা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বাঙালীর কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম আর এই সব শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাগমের কোন উপায় নেই, সবটাই আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার হাতিয়ে নেন। শতাব্দীব্যাপী প্রাচীন কল-কারখানাগুলি যা বাঙালী পরিচালিত, যথাযোগ্য মূলধনের অভাবে পর্যাপ্ত আধুনিক হয় নি, ফলে পশ্চিমবাংলার কাপড়ের কল আমেদাবাদের হাতে মার খায়। এদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ক্ষেত্রে বরাদ্দের বেলাতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দাক্ষিণ্যের অভাবটা বড় বেশি প্রকট, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ফলে আজও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি পর্যন্ত সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি, ফলে ছোট ও মাঝারি শিল্পও গড়ে উঠতে পারে নি, কুটিরশিল্পগুলিরও বারোটা বাজতে চলেছে, গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। বৈদ্যুতিক শক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের কুটিরশিল্পগুলি যেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখাতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তম হয়েছে। এদিকে গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় দলে দলে লোক প্রতিনিয়ত শহরমুখী হচ্ছে। শহরমুখী বলতে কলকাতামুখী, কেন না কলকাতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর শহরই বা কোথায়?

ঘাড়ে বিপুল বোঝা, অথচ কিছু করার আর্থিক সামর্থ্যের অভাব অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশি এবং এই কারণেই সরকারের পক্ষে প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ব্যয়ের বদলে ব্যয় সংকোচ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে পর্যাপ্ত স্কুল-কলেজ নেই, সারা রাজ্যব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষারও প্রসার ঘটানো যায় নি। এই কারণে শিক্ষিত বেকারদের স্কুলে-কলেজে কাজ জোটে না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অ-বাঙালীদের করায়ত্ত হবার জন্য সেখানে বাঙালীর কাজ হওয়া শক্ত। যুক্তফ্রন্ট শাসনের গোড়ার দিকে একটি ঘটনার উল্লেখ করে দেখানো হয়েছিল যে, একটি ব্যাঙ্কে দশজন লোক নেওয়া হয়েছে, দশজনই অ-বাঙালী। প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল স্কুল-কলেজের অভাব থাকার ফলে চলতি স্কুল-কলেজগুলিতে ভিড় খুব বেশি আর তা ছাড়া যে ক'টি টেকনিকাল স্কুল-কলেজ আছে, সেখান থেকে পাশ করে বেরুলেও চাকরি মেলে না, তার উপযোগী কল-কারখানাও নেই আর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ বন্ধ থাকার ফলে কাজ পাবার সুযোগও বন্ধ। স্কুলস্তর থেকেই ছাত্রের জীবন শুরু হতাশার ভিতর দিয়ে, লেখা-পড়া করা না করা তার পক্ষে দুই-ই সমান, দুয়েরই ফল এক। স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই, ভর্তি হতে পারলে পাশ করা অনিশ্চিত, পাশ করলে চাকরি নেই, গৃহে শোচনীয় অর্থাভাব, ফলে অশান্তি, সব মিলিয়ে সমাজের কাছ থেকে যখন কিছুই আশা করা যায় না, রাষ্ট্র বা সরকার যখন কোন দায়িত্ব পালন করতেই অপারগ, তখন সমাজবিরোধী মনোভাব যে আপনা-

আপনিই গড়ে উঠবে, এতে আর সন্দেহ কি আছে?

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃংখলার অবনতির ক্ষেত্রে সমাজবিরোধীরা একটি প্রধান উপাদান হলেও, সবটাই তাদের সৃষ্ট নয়। আইন-শৃংখলার ধারণাটাও অনেকটা আপেক্ষিক। নিছক হিংসার বিস্তারই আইন-শৃংখলার অভাব বলে গণ্য হতে পারে না। এবারের চাষের মরশুমে ভূমি-শ্রমিকেরা কিছু বর্ধিত মজুরি পেয়েছে। সংঘর্ষ এড়িয়ে ভূমিহীনদের পক্ষে ভূমি দখল কি সম্ভবপর ছিল? বে-আইনী জমির মালিক শুধু যে আইনের কথা তুলে বাধা দিয়েছে তা নয়, নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্য তারা যে-কোনরকম হিংস্রতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে নি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ত্রুটি এখানে ছিল যে, ভূমি দখলের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, ফলে যাদের গায়ে হাত পড়া উচিত ছিল তাদের পরিবর্তে বহু ক্ষেত্রেই হয়েছে শরিকী সংঘর্ষ। ভুল হয়েছিল সরকারের নীতি নির্ণয়ের, যেখানটায় ভুল না হলে অনেক অবাঞ্ছিত রক্তপাত এড়ানো যেত।

ভূমি সংস্কারের কথা তো বলা হচ্ছে ১৯৩৫ সাল থেকে. সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারও দেখছি এই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন. মাঝে মাঝে বৈপ্লবিক বুলিও আওড়াচ্ছেন. কখনো কখনো বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকও করছেন। আসল সমস্যাটি হচ্ছে দেশে বহু ভেস্ট ল্যান্ড আছে। তা উদ্ধার করতে হবে এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। সোজা কথা হচ্ছে, বর্তমান আইন ও প্রশাসনের দ্বারা এ জিনিস করা সম্ভবপর নয়।

পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃংখলার অভাবের আরও নিদর্শন হচ্ছে নাকি শিল্পরাজ্যে অশান্তি। অর্থাৎ শ্রমিকেরা বেতন বৃদ্ধির দাবি তুলে আইন-শৃংখলার হানি ঘটাচ্ছে। দশ বছর আগের যা প্রাইস ইনডেক্স ছিল, আজ তার চতুর্গুণ বেড়ে গেছে, তবু শ্রমিক বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করলেই তা আইন-শৃংখলার প্রশ্ন হয়ে যায়। আবার কিছু তথাকথিত শ্রমিকদরদী বলেন যে, দিনকাল খারাপ, বাজারে মন্দা চলছে, কল-কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তোমরা তো তবু একটা চাকরি করছ, আমোকা বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করে অবস্থা খারাপ কর কেন বাপু? অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলোকেরই এই মনোভাব। তা হলে তো ভারতের সংবিধান থেকে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ধারাগুলি ও শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকারকে প্রত্যাহার করে নিলেই হয়।

কল-কারখানাগুলির ক্রমশ কয়েকটি যে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হচ্ছে তার কারণ কি শ্রমিকেরা? তার কারণ কি যুক্তফ্রন্ট সরকার? প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে এ কথা বলা হয়েছিল। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বন্ধ কারখানাগুলি পি. ডি. এফ-এর আমলে খোলে নি, ধর্মবীরের রাজত্বেও খোলে নি। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে যেগুলি বন্ধ হয়েছে, সেগুলিও বর্তমান রাষ্ট্রপতির শাসনে খুলবে না। তখনই খুলতে পারে যখনই মালিকপক্ষের যথেচ্ছাচার বন্ধ করার মত আইন এবং সেই আইনকে কার্যকরী করার মত প্রশাসন গড়ে উঠবে। সেই রকম আইন কি কেন্দ্রীয় সরকার তৈরী করতে রাজী আছেন? সংবিধানে "মৌলিক অধিকার" নামে যে ধারাটি আছে, তদনুযায়ী তখন মামলা হবে এবং বলাই বাহুল্য, সে রায় সরকারের পক্ষে যাবে না, যেতে পারে না।

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে, প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমরা সাফাই গাইছি। বস্তুত যুক্তফ্রন্ট যে অপদার্থতার চরম নিদর্শন দেখিয়েছে, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অপদার্থতা বলতে আমরা এ কথা বলছি না যে, যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গকে সোনার রাজ্যে পরিণত করতে পারে নি। অপদার্থ বলছি এই কারণে যে, যুক্তফ্রন্টকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে যে জন-জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকার দলীয় প্রেরণায় তাকে কাজে লাগাতে পারে নি, নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। যুক্তফ্রন্টের নেতাদের সবচেয়ে বড় যে অভাবটা দেখা গেছে তা হচ্ছে চরিত্রের অভাব, চরিত্র বলতে আমরা অবশ্যই নৈতিক চরিত্রের কথা বোঝাচ্ছি না, তাঁরা নিজেদের কাছেই সৎ হতে পারেন নি, কথায় ও কাজে অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সততা সন্দেহের অতীত, কিন্তু যে কথাটা আমরা প্রায়ই বলে এসেছি, সততার মধ্যে কোন সিলেক্টিভিটি থাকা উচিত নয়, স্বরাষ্ট্রদপ্তরের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সোচ্চার ছিলেন, অন্য দপ্তরগুলির ক্ষেত্রে নয় কেন? অনুরূপ চরিত্রের অভাব উপমুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও ফুটে উঠেছিল এবং তার সর্বাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে শেষ মুহূর্তে সরকার গঠনের জন্য অনাবশ্যক ব্যস্ততায়, যেখানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দলত্যাগের রাজনীতিকে উৎসাহ দিয়েছেন, অথচ তাঁরা এই নীতির বিরুদ্ধেই বরাবর সোচ্চার ছিলেন। বিভিন্ন দলের নেতারা বরাবর দায়িত্বহীন উক্তি করেছেন এবং সবচেয়ে মজার কথা যে-বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির নিন্দায় তাঁরা সর্বদাই পঞ্চমুখ, নিয়মিত প্রক… জন্য তাদের উপরই নির্ভর করেছেন … যেতে হয়নি।

বর্তমান রাজ্যপালের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অভাব নেই, বস্তুত অ্যাক্টিং রাজ্যপালদের ক্ষেত্রে তিনি গুণগত ভাবে উৎকৃষ্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাঁর দরদ আছে, এ কথাও স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, রাষ্ট্রপতি আমলে কি দেশে কোন হাঙ্গামা নেই? নাকি তা হবে না? সে কথা বাদ দিলেও রাষ্ট্রপতির শাসনে সত্যই পশ্চিমবঙ্গের কি কোন ভবিষ্যৎ আছে? রাষ্ট্রপতির শাসনে যে শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজকর্মই কোনক্রমে চলবে। এর থেকে বেশি কিছু করা বিশেষ করে উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সত্যই কিছু করা সাংবিধানিক অধিকার আছে কি? দু বছর রাষ্ট্রপতির শাসন চালানোর কো… অর্থই হয় না। সংবিধানে এই কথা বলা হয়েছে যে, কোন রাজ্যে সংবিধান সম্মত সরকার গঠনের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতির শাসন সাময়িক ভাবেই বহাল হবে এবং এই শাসন ছ মাসের বেশি চলবে না। সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠনের সংকট ভারতবর্ষে দেখা দেবে না এটা কি কথা? বরং বাইশ বছরের ইতিহাসে প্রয়োজনের তুলনায় এরকম সংকট খুব কমই দেখা দিয়েছে।

তবে যে সব দল অবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবি করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কোন দল কি নিঃসংশয়ে মনে করেন যে আর একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন হলে তাঁদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে? এত দল মনে হয়, মধ্যবর্তী নির্বাচন হলেও বর্তমান দলগত অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। এককভাবে একশো একটি আসন দখল করা যে-কোন দলের পক্ষেই অসম্ভব। যদি দুটো মোর্চাও হয় সে ক্ষেত্রে হয়ত একটি মোর্চার সংখ্যাধিক্য ঘটল, কিন্তু বর্তমান যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতার পরেও কি বলা যায়, সেই মোর্চা বরাবর অখণ্ড থাকবে? পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সত্যই করতে গেলে লোকায়ত্ত সরকার থাকার দরকার। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া পাকা হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যেটুকু বরাদ্দ হয়েছে, সেটাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করার জন্যই জনপ্রিয় সরকারের প্র…

[illegible]

তিন বছর টালবাহানার পর অবশেষে গত ২২শে মার্চ জাতীয় উন্নয়ন পর্যদের বৈঠকে ভারতের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপরেখা অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনায় মোট লগ্নী ধার্য হয়েছে ২৪,৮৮২ কোটি টাকা। তার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে লগ্নীর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ১৫,৯০২ কোটি টাকা এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রের জন্য ৮,৯৮০ কোটি টাকা। খসড়া পরিকল্পনায় উপরোক্ত দুই ক্ষেত্রের জন্য ধার্য হয়েছিল যথাক্রমে ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা এবং ১০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিকল্পনায় বে-সরকারী ক্ষেত্রের লগ্নী কিছুটা হ্রাস করে সরকারী ক্ষেত্রের লগ্নী কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৩২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই রাজ্যের জন্য ৩০৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। ইতিমধ্যে মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেই ৩০৫ কোটি টাকার মূল্য এখন প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মতই হবে। কাজেই চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক কার্য যদি তৃতীয় পরিকল্পনার স্তরেও রাখতে হয়, তাহলে ৪০০ কোটি টাকার দরকার হবে। কিন্তু সেখানে ধার্য হয়েছে মাত্র ৩২২ কোটি টাকা। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কার্যের অগ্রগতি একেবারেই শ্লথ হয়ে পড়বে। বেকার এবং উদ্বাস্তু সমস্যা জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ যে তাতে বেশ ঘায়েল হয়ে পড়বে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় অভিযোগ করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় তহবিলের ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অভিযোগ নতুন নয়। স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্র সেই অভিযোগের প্রতিকার করতে রাজী নয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা আশা করছেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। তাতে আমাদের আশ্বস্ত বোধ করবার কিছু নেই। ভারতের সকল অঞ্চলের অগ্রগতি সমানভাবে হচ্ছে না। প্রত্যেক রাজ্যের মাথাপিছু আয়ের গুরুতর অসঙ্গতিই তার মস্ত প্রমাণ। হয়ত দেখা যাবে উপেক্ষিত অঞ্চলগুলো এবারও উপেক্ষিত হয়েছে এবং তেলামাথায় নতুন করে তেল পড়েছে। অন্তত বাংলা দেশের মানুষের যে আশান্বিত হবার কিছু নেই, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

পাঞ্জাবে মন্ত্রিত্বের ভাঙাগড়া

পাঞ্জাবে আকালি দলে গুরুতর মতবিরোধের ফলে গত ২৫শে মার্চ সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে সর্দার গুরনাম সিং-এর নেতৃত্বাধীন আকালি-জনসঙ্ঘ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। গত শুক্রবার সেখানে আকালি দলের প্রকাশ সিং বাদলের নেতৃত্বে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।

সকলেই অবগত আছেন, অনেক আগেই আকালি দল কার্যত দু' ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এক দলের নেতা ছিলেন মাস্টার তারা সিং এবং অপর দলের নেতা সন্ত ফতে সিং। মাস্টার তারা সিং-এর মৃত্যুর পর দুই দলের মধ্যে আবার একটা মিটমাট হয় এবং তাঁরা একযোগে মধ্যকালীন নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। সন্তের অনুগামী বলে পরিচিত গুরনাম সিং পরিষদে আকালি দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং তিনি জনসঙ্ঘের সঙ্গে কোয়ালিশন করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সেই মন্ত্রিসভা প্রায় বছর দুই টিকে ছিল। ইতিমধ্যে কোন অপ্রকাশিত কারণে গুরনাম সিং সন্তের বিরাগভাজন হন এবং প্রকৃতপক্ষে সন্তই সেই গভর্নমেণ্ট উল্টে দিয়েছেন।

গত ২৫শে মার্চ বিধানসভায় ব্যয়-বরাদ্দ বিল তোলবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, অর্থমন্ত্রী বলবন্ত সিং সেটা তুলতে চাইছেন না। তখন মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং নিজেই সেই বিল উত্থাপন করেন এবং সেটা ৪৪—২২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। আকালিদের অনেকেই সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেন এবং জনসঙ্ঘ সদস্যরাও তাঁদের অনুসরণ করেন। ব্যয়-বরাদ্দের বিল বিধানসভায় অগ্রাহ্য হলে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং পদত্যাগ করেন নি। উল্টে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি পদত্যাগ করবেন না এবং নতন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। অবশ্য তার আগেই গুরনাম সিং আকালি দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

গুরনাম সিং ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সর্বপ্রথম পাঞ্জাব যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই মন্ত্রিসভা বেশিদিন টেকে নি। পরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তিনি আকালি-জনসঙ্ঘ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন।

পাঞ্জাবের নতুন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলদেও সিং-এর আত্মীয়। এঁর বয়স ৪৪ বছর। রাজনীতিতে ইনি নবাগত। আগে ছিলেন কংগ্রেস দলে। পরে আকালি দলে যোগ দেন। সন্ত ফতে সিং নতুন মন্ত্রিসভাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং নাকি আকালি দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সেটা কি ব্যাপার তা এখনও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

সন্ত ফতে সিং প্রবীণ আকালি নেতা মোহন সিং বাসী এবং বলবন্ত সিংকে বাদ দিয়ে বাদলের মত একজন প্রায় নবাগত ব্যক্তিকে কেন যে আকালি দলের নেতা বানালেন, সে রহস্য কেউই এখনও ভেদ করতে পারেন নি। তবে পাঞ্জাবের মোটামুটি স্থিতিশীল মন্ত্রিসভা যে রকম আকস্মিকভাবে উল্টে গেল, তাতে বাদলের মন্ত্রিসভা কতদিন টিকবে তা বলা শক্ত।

কেরালায় মেনন মন্ত্রিসভা টিকে গেল

কেরালায় অচ্যুত মেনন (কম্যুনিস্ট পার্টি) মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য দলত্যাগ করায় সেখানকার মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে মুখ্যমন্ত্রী গত সপ্তাহে বাজেট বরাদ্দের আলোচনা স্থগিত রেখে মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব তুলেছিলেন। গত ১৩শে মার্চ সেই আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব ৬৬-৫৮ ভোটে পাশ হয়েছে। পরদিন বিধানসভায় কেরালার ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটটিও পাশ হয়ে যায় এবং অপর কোন কাজ না থাকায় বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখা হয়। অর্থাৎ কেরালার ১৫০ দিনের মন্ত্রিসভার পরমায়ু আরও কিছু বেড়ে গেল।

যে ৪ জন সদস্যের দলত্যাগের ফলে মন্ত্রিসভা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে মাত্র একজন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। সি-পি-আই সমর্থিত এম-এল-এ জ্যাকে-

রিয়া ভোট দিতে আসেন নি। সিন্ডিকেটের ৪ জন সদস্য এবং একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন বলে ঘোষণা করলেও ভোটাভুটির সময় নিরপেক্ষ ছিলেন। কোন্ পক্ষে কারা ভোট দিয়েছিলেন তার হিসাব নিচে দেওয়া হল।

সরকার পক্ষে: সি পি-আই (১৯), মুসলিম লীগ (১৪), আই-এস-পি (১১), কেরালা কংগ্রেস (৫), আর-এস-পি (৬), [illegible] এ্যাকশন কমিটি (২), বিদ্রোহী এস-এস-পি (২), নির্দলীয় (২) এবং ইন্দিরা-কংগ্রেস (৫)।

সরকারের বিপক্ষে: সি-পি-এম (৪৯), এস-এস-পি (৬), কে-টি-পি (১), কমিঃ বিপ্লবী (২), নির্দলীয় (২)।

অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভার সঙ্কটত্রাণের পরদিনই এক সংবাদে বলা হয়েছিল যে, আর-এস-পি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাকি অতঃপর আর মন্ত্রিসভাকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কিন্তু কেরালা আর-এস-পি উপরোক্ত সংবাদ সত্য নয় বলে জানিয়েছেন। আর-এস-পি'র সেক্রেটারী বেবী জন জানিয়েছেন যে, পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভার ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। তবে তাঁরা এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছেন যে, মন্ত্রিসভাকে টিকে থাকবার জন্য যদি পুরোপুরি কংগ্রেসের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে তাঁদের পদত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পার্টির রাঁচী অধিবেশনে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভা প্রকৃতপক্ষে আর-এস-পি'র সমর্থনের ওপরই নির্ভরশীল। সেই সমর্থন যদি প্রত্যাহৃত হয়, তাহলে মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য। পশ্চিমবঙ্গে আর-এস-পি স্থানীয় সি-পি-এম দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। কেরালায় ঘটেছে তার উল্টোটা। সেখানকার আর-এস-পি হচ্ছে সি-পি-আই মন্ত্রিসভার প্রধান খুঁটি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, সি-পি-আই এবং সি-পি-এম দলের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে আর-এস-পি দলে গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সেই মতভেদ যেভাবে মীমাংসা হবে, তারই ওপর কেরালা মন্ত্রিসভার পরমায়ু নির্ভরশীল।

তবে কেরালা সরকার আর-এস-পি দলের প্রাক্তন মন্ত্রী পি. কে. কুঞ্জুর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাঁকে দলে টেনেছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, সেটা সত্য নয়। রাজ্য সরকার সেই দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের ভার দিয়েছেন হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শংকরনারায়ণ আয়ারের ওপর।

গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্প

গত ২৩শে মার্চ দোলযাত্রার দিন দক্ষিণ গুজরাটের ব্রোচে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে বহু লোক হতাহত হয়েছেন এবং বহু বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। একমাত্র ব্রোচ শহরেই মৃতের সংখ্যা ২৯ জন। নিহতদের মধ্যে ১৩টি শিশু এবং ৬ জন মহিলা আছেন। প্রায় দেড়শত গৃহ ধ্বংস হয়েছে এবং আরও বহু গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতীয় ভূ-পদার্থ গবেষণা মন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ হরিনারায়ণ বলেছেন যে, উত্তরে নর্মদা উপত্যকা এবং দক্ষিণে তাপ্তি নদীর মধ্যবর্তী সাতপুরা পর্বতমালায় প্রস্তরস্তূপের স্থান পরিবর্তন এই ভূমিকম্পের কারণ হতে পারে।

গুজরাটে এর আগে শেষ ভূমিকম্প হয়ে গেছে ১৯৫৬ সালে। সেবারের ভূমিকম্পে অঞ্জার শহরটি ধ্বংস হয় এবং তাতে শতাধিক লোক নিহত হয়েছিলেন।

এবারের ভূমিকম্পে অঙ্কলেশ্বর তৈলখনি এলাকার ক্ষতি হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত ভূমিকম্পের ধাক্কা সে পর্যন্ত পৌঁছোয় নি।

দোলযাত্রার দিন সকাল সওয়া ৭টার সময় পাঁচ মিনিটের মধ্যে পর পর তিনবার ব্রোচ শহর আর তার পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রচণ্ড বেগে নাড়া খায়। ভীত-সন্ত্রস্ত নাগরিকরা তখন হুড়োহুড়ি করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। ভাঙা ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েই বেশির ভাগ লোক হতাহত হয়েছেন। (২৯-৩-৭০)

উথান-পতন !
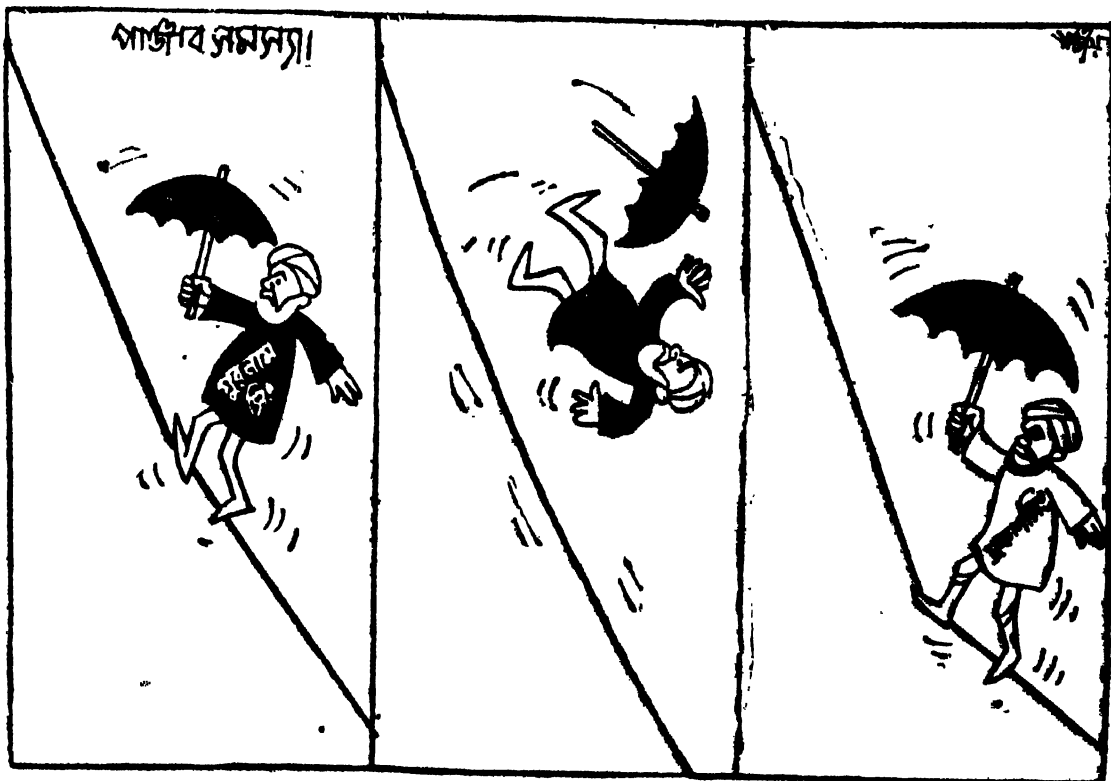
চৌ-এন-লাই—সিহানুক শুভেচ্ছা বিনিময়

ম্বোডিয়া ঃ

প্রিন্স নরোদম সিহানুক তাঁর পদ-চ্যুতিকে মেনে নেন নি। পিকিং থেকে তিনি ঘোষণা করেছেন, ক্ষমতা পুনর্দখলের জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের পূর্ণ সমর্থন তিনি পাবেন এ ব্যাপারে। দেশবাসীর প্রতিও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, লন নল-চেন হেং-সিরিক মাতাক গোষ্ঠীর সরকারকে স্বীকৃতি না দেবার জন্য এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকার জন্য। পিকিং থেকে নরোদম সিহানুক আরও জানিয়েছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগসাজসে দেশের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করার জন্য তিনি চেন হেং ও লন নলকে পদচ্যুত করেছেন এবং জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছেন।

নরোদম সিহানুক ক্ষমতাচ্যুত হবার পর নমপেনে যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে, উত্তর ভিয়েতনাম তাকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে। এই সরকারের সঙ্গে সীমান্ত প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা করতেও তারা রাজী হয় নি।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির সমর্থন ও সাহায্যের জোরে নরোদম সিহানুক এখন যে চেষ্টা করতে চান, তা হল, উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্য, দক্ষিণ ভিয়েতনাম বিপ্লবী সরকারের স্বেচ্ছাসেবক বা ভিয়েত কং গেরিলা এবং কম্বোডিয়ার বিদ্রোহীরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবে। নম্-পেনের নতুন শাসকগোষ্ঠীকে হঠিয়ে নরোদম সিহানুককে ক্ষমতায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করাই এদের উদ্দেশ্য। ইতি-মধ্যে এই কাজ সুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে গোলমালের খবর আসছে। বলা হচ্ছে, ভিয়েত কং গেরিলাদের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নম্পেনের কাছে একটি জায়গায় ভিয়েত কং-এর হামলায় আইনসভার দু'জন সদস্য মারা পর্যন্ত গেছেন। এ ছাড়াও বহু মানুষ হতাহত হয়েছে।

গ্রামের কৃষক ও শহরের ছাত্রদের মধ্যেই বিক্ষোভ বেশি। প্রভাবশালী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এখনও চুপচাপ। তাঁরা শেষ পর্যন্ত কোন্ পক্ষ নেন, তা লক্ষ্য করার বিষয়।

লন নলরাও অবশ্য চুপ করে বসে নেই। কম্বোডিয়ার রিজারভ সৈন্য-বাহিনীকে তলব করা হয়েছে ভিয়েত কং-দের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য। দেশ-বাসীকেও তাঁরা সংগঠিত করছেন। নরোদম সিহানুকের প্রত্যাবর্তন তাঁরা রুখবেনই।

কম্বোডিয়ার ঘটনায় ভারত খুব উদ্বিগ্ন। ভারত লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি। ভারতের

রয় কারণ, লাওসের মত এখানেও
যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। একদিকে
উনিস্ট দেশগুলোর সমর্থনপুষ্ট
নুকূলপন্থীরা আর অপরদিকে মার্কিন
সমর্থনপ্রাপ্ত দল নলপন্থী, এই দুইপক্ষের
চলবে লড়াই। কতদিনে এই লড়াই
ব, বলা শক্ত।

ম:

লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না
১৯৬২ সালের জেনেভা সম্মেলনের
সভাপতি সোভিয়েত য়ুনিয়ন ও
নের কাছে প্রস্তাব করেছেন, জেনেভা
লনে যোগদানকারী ১৬টি রাষ্ট্রের
নিধিদের একটি সম্মেলন ডেকে
সের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও
পক্ষতা রক্ষার প্রশ্নটি আবার
াচনা করা হোক। উত্তর ভিয়েতনামের
রা জারস সমতলভূমিতে অনুপ্রবেশ
এলাকাটি দখল করে রয়েছে এবং তার
লাওসের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন
ভয়েত প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি
সিগিনের কাছে এক চিঠিতে সুভান্না
র এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন এবং
েব এইরূপ একটি সম্মেলন
ন করার জন্য সোভিয়েত য়ুনিয়নকে
গ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন।
স উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদলের
থিতির বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ
রেছেন।

কোসিগিন নিকসনের চিঠির জবাব
ছেন। এই চিঠিতে প্রস্তাবিত
লন আহ্বানের ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে
কথা তিনি বলেন নি। কোসিগিন
ন, প্রথমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে
অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে।
ট লাও-এর প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স
নোভং লাওস সমস্যার সমাধানের
যে পাঁচ-দফা প্রস্তাব করেছেন,
িগিন তা সমর্থন করেছেন।
ফানোভং-এর প্রস্তাবিত পাঁচ-দফা

১) লাওসের সর্বত্র মার্কিন বোমা-বর্ষণ ও সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে;
২) লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে;
৩) নতন নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সকল পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে হবে;
৪) নিরাপদ এলাকায় (সিকিউরিটি জোন) সবাইকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং
৫) লাওসের ব্যাপারে অপর কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হবে না।

প্রিন্স সুভান্না ফুমা তাঁর প্রতি-দ্বন্দ্বী সুফানোভং-এর এই সব প্রস্তাবেই রাজী। তবে তাঁর বক্তব্য, সকল বিদেশী সৈন্যকেই লাওস ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, উত্তর ভিয়েতনামের যে-সব সৈন্য এখন লাওসে রয়েছে তাদেরও চলে যেতে হবে। এতে কি সুফানোভং বা তাঁর মুরুব্বীরা রাজী?

আসল কথা, লাওসের ব্যাপার লাওসের অধিবাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে—কমিউনিস্ট হামলাকারীদের হাত থেকে লাওস রক্ষার 'পবিত্র দায়িত্ব পালনে'র কাজ তাদের ছাড়তে হবে। অপর পক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কবল থেকে নিরপেক্ষ লাওসকে রক্ষার জন্য উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্য বা স্বেচ্ছাসেবক কিংবা দক্ষিণ ভিয়েত-নামের বিপ্লবী সরকারের স্বেচ্ছাসেবক, তাদেরও লাওসে আসার কোন প্রয়োজন নেই।

সাইপ্রাস :

সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। হত্যা প্রচেষ্টা সফল হয় নি, তিনি বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু বাঁচেন নি সাইপ্রাসের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পলিকারপোস

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় মনোরঞ্জন হাজরার 'সেই অভিশপ্ত জগৎ' প্রকাশ করা গেল না।

—সম্পাদিকা

ইয়রকাজিস। ম্যাকারিয়সের হেলি-কপ্টারে গুলী ছোড়ার কদিন পরে নিকোসিয়া থেকে কয়েক মাইল দূরে নিজের মোটরে গুলীবিদ্ধ ইয়রকাজিসের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

ম্যাকারিয়স ও ইয়রকাজিসের মধ্যে কিছুদিন ধরে সদ্ভাব ছিল না। উনচল্লিশ বৎসরের প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী নেতা ইয়রকাজিসকে ম্যাকারিয়সের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মজা করা হত। যেদিন ম্যাকারিয়সের হেলিকপ্টারে গুলীবর্ষণ হয়, সেদিন নাকি ম্যাকারিয়স বলে-ছিলেন, এ আসলে ইয়রকাজিসেরই কাজ!

এই ঘটনার পর ইয়রকাজিস দেশ-ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। বেইরুটগামী বিমান থেকে পুলিশ জোর করে তাঁকে নামায় এবং তারপর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ইয়রকাজিসকে হত্যা করা হয়।

সুতরাং, এমন সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, ম্যাকারিয়সের লোকেরাই ইয়রকাজিসকে খুন করেছে।

কিন্তু কেন? এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা কেন? এবং সমগ্র সাইপ্রাসে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টির কারণই বা কি? এ কি নেহাৎ ব্যক্তিত্বের লড়াই, না আর কিছু?

কেউ কেউ বলছেন, ইয়রকাজিস ও তাঁর সমর্থকরা দক্ষিণপন্থী এবং গ্রীসের বর্তমান দক্ষিণপন্থী সামরিক একনায়ক-তন্ত্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। ম্যাকারিয়স নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন এবং দেশে প্রগতিশীল কাজ করার চেষ্টা করেন বলে এঁরা ম্যাকারিয়সকে সরাতে চায়। এই চক্রান্তে গ্রীসের সামরিক শাসকদেরও হাত আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, তাই যদি হবে, তবে সতেরো মাস আগে গ্রীসের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাপাদোপোলসকে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এই পলিকারপোস ইয়রকাজিসকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হ'ল কেন? গ্রীসের বর্তমান সামরিক শাসন উচ্ছেদের জন্য যারা চেষ্টা করছে, ইয়রকাজিসের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে, এই কথা সেদিন বলা হয়েছিল। তাহলে তো ইয়রকাজিস বামপন্থী।

আসলে বিরোধ গ্রীসের সঙ্গে সাই-প্রাসের সংযুক্তি বা 'এনোসিসে'র প্রশ্নে। ম্যাকারিয়স নিজেও এক সময় মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি তার বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, গ্রীসের সঙ্গে মিলনের অর্থ সাইপ্রাসের নিরপেক্ষ নীতির বিসর্জন ও গ্রীসের অংশরূপে 'ন্যাটো'র সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, সাইপ্রাসের সংখ্যালঘু তুর্কীদের প্রশ্নে নতুন করে গোলমাল সৃষ্টি করা এবং গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে সাইপ্রাসকে বিভক্ত করে দেয়া। অপরদিকে ইয়রকাজিসের মত অনেকে গ্রীক জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ভাবছেন, একমাত্র গ্রীসের সঙ্গে মিলনের পথেই তাদের মুক্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। সাইপ্রাসের অধিকাংশ গ্রীকের অন্তরের কথা এই।

ইয়রকাজিস স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বীর। জেনারেল গ্রিভাসের 'ইয়োকা' ও অধুনা বেআইনী সন্ত্রাসবাদী 'ন্যাশনাল ফ্রন্টে'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সম্প্রতি তিনি 'য়ুনিফাইড ডেমোক্রাটিক পার্টি' নামে নতুন দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কিছুটা ব্যক্তিত্বের লড়াই ছিল নিশ্চয়ই ম্যাকারিয়স ও ইয়রকাজিসের মধ্যে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল রাজনীতির প্রশ্ন। সাইপ্রাসের পৃথক সত্তা, নিরপেক্ষতা, গ্রীক-তুর্কী সাম্প্র-দায়িক মৈত্রী এবং গ্রীক জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন।

[illegible] নদীর [illegible] নৌকো [illegible] [illegible] পর [illegible] [illegible] [illegible] সেত রজনী [illegible] [illegible] মানছে [illegible] [illegible] "রজনী ধীরে"। নৌকার [illegible] হাঁকিয়ে রজনীকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার হাত থেকে রেহাই পেতে রজনী যে ধীরে ধীরে নদীর [illegible]ড়া থেকে জলে নামছে—সেটাও কি বাঁচবার পথ? আমার শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান অতি সামান্য, তারপর রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল এঁদের বুঝবার জ্ঞান তো অনেক দূরের কথা; তবু অল্প বুদ্ধিতেও দেখতে পাই—এই সব মনীষীদের লেখার মধ্যে অনেক ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ আছে—যার সঙ্গে আজ-কের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও সর্বকলাপের বড় বেশি মিল আছে।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবার পরই বিভিন্ন মহলে যে ছট-ফটানি সুরু হয়েছে, যে উথলা-আলু-থালু ভাব সুরু হয়েছে অথবা যে [illegible]তৎপরতা সুরু হয়েছে, তা দেখে আমার ঐ রজনীর সংলাপই মনে পড়ছে বারে বারে "রজনী ধীরে, রজনী ধীরে"। রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হবার পর যে তৎপরতা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ছে, তা হল রাজ্যের সি. পি. এম দলের সরকার গড়া বা অবিলম্বে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা আর পুলিশের বোমা, বন্দুক, কার্তুজ উদ্ধারের চেষ্টা। এই দুই পক্ষেরই তৎপরতা দেখে যখনই এই দুই পক্ষের গত কয়েক মাসের হালচাল, কাজকর্ম সম্পর্কে ভাবছি, তখনই আবার [illegible]তে ইচ্ছে করছে 'রজনী ধীরে, ধীরে'।

প্রথমে পুলিশের কথাটা বলে নেওয়া ভাল, কারণ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হবার পর সবচেয়ে বেশি [illegible] ছেড়ে যদি কেউ বেঁচে থাকেন; কেউ যদি প্রাণভরে নিশ্বাস নেবার মত বায়ু পেয়ে থাকেন, তবে তাঁরা হলেন রাজ্যের পুলিশ। পুলিশ বলতে [illegible] শ্রেণীর পুলিশ সম্পর্কে এই [illegible] প্রযোজ্য নয়—পুলিশ বলতে [illegible]দের বোঝানো চাই, যাঁরা হলেন [illegible] নীতিনিয়ামক। এই কথা [illegible] পুলিশ রাজনীতি করে না, পুলিশের কাছে কিন্তু কংগ্রেস নেতারা [illegible], যুক্তফ্রন্ট নেতারা খারাপ—এমন [illegible] নেই; বরং পুলিশের বেশির ভাগের নিকট যুক্তফ্রন্ট নেতাদের [illegible] বাদিগত [illegible] ভাগ হত [illegible]। যুক্তফ্রন্ট আমলে পুলিশের [illegible]-উপার্জন কমে গিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছিল, [illegible] বা [illegible] পুলিশ বাজেটে টাকা [illegible] [illegible] [illegible], এই কথাও সত্য নয়। যুক্তফ্রন্ট শুধু [illegible]টি [illegible] [illegible] নির্দেশ [illegible] [illegible] দেখেছিল, সেটা হল—পুলিশ লাঠি, বন্দুকটা ব্যবহার [illegible] [illegible] করতে পারবে না, বড়লোকের বাড়ির [illegible] এলেই ডাণ্ডা নিয়ে মালিক-বড়লোকের স্বার্থনষ্টকারীদের [illegible] করতে পারবে না। কিন্তু এইটুকুও পুলিশ মেনে নিতে পারলো না, এরই ফল হল—পুলিশ কর্তব্যে শৈথিল্য দেখাতে লাগলো, কর্তব্য পালনে অক্ষমতা জানালো এবং [illegible] [illegible] সরকার চলে [illegible], সেটা দেখিয়ে দেবার জন্য নানা কৌশলের পথ নিল। এই কৌশলের অঙ্গ ছিল এই যে, কোথাও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া আবার কোথাও "বাবু যত বলে পারিষদ বলে শতগুণ" সেই নীতিতে চলা। গত ১৩ মাসের রাজ্যের শাসন-যন্ত্রে যে মরচে ধরেছে, তার মূলে আছে পুলিশের দ্বৈত ভূমিকা—কোথাও চোখ বুজে থেকে সমাজদ্রোহী-সমাজ-বিরোধীদের অবাধে কাজ করতে দেওয়া, খুন, জখম, রাহাজানি প্রভৃতি ঘটনায় নীরব দর্শক হয়ে থেকে পরোক্ষে অ-সামাজিক কাজের সুযোগ করে দেওয়া, [illegible] কোথাও ধরে আনতে বললে বেঁধে এনে বিপত্তি সৃষ্টি করা। এই পুলিশ গত কয়েক মাসে যে কাজ করেছে, সেটা হল যাদের মনস্তুষ্টি করলে নিরাপদে চাকরি বজায় থাকে তার জন্য পাত্রবিশেষে তৈল প্রদান, আবার যেখানে মানুষ পুলিশের কাছে আশ্রয় চেয়েছে, নিরাপত্তা চেয়েছে, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে সব সময় [illegible] বুঝতে দিয়েছে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাদের কি অক্লান্ত চেষ্টা! হুদো হুদো উড়ো-চিঠি এসেছে শ্রীজ্যোতি বসু আর শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার [illegible] নামে আর সেই চিঠির ভিত্তিতে শ্রীজ্যোতি বসুর ও পরে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নিরা-পত্তা জোরদার করা হয়েছে। শ্রীজ্যোতি বসু [illegible] চলাফেরা করেছেন, সঙ্গে চলেছে দেড় ডজন পুলিশ, সকলের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র, এমন কি টমসন গানও নিয়ে ছোটাছুটি করেছে শ্রীবসুর নিরাপত্তা রক্ষায়। শ্রীবসু ছুটি উপভোগ করতে ফ্রেজারগঞ্জ বা মাসাঞ্জোর গেছেন, পুলিশ থেকে আগু-পেছু বেতার-গাড়ি গেছে, বেতার কেন্দ্র বসেছে, শ্রীবসু বাড়িতে রয়েছেন—গাড়ি গাড়ি পুলিশ শ্রীবসুর বাড়ি পাহারা দিয়েছে, শ্রীবসু কোচবিহার গেছেন আর মুহূর্তের মধ্যে এক হোটেল থেকে কয়েকটি ছেলেকে ধরে গারদে পোরা হয়েছে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বর্ধমান-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া হয়ে শান্তিনিকেতন যাবেন—পুলিশ অতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দ্রুত কলকাতা থেকে গাড়ি করে টমসন গানের বাহিনী পাঠিয়ে কুলটিতে গিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পিছু নিল। পুলিশের এই তৎপরতার পাশে যদি হিসাব করেন, তখন দেখতে পাবেন অজস্র মানুষ থানায় ছুটে এসেছে—আশ্রয় চাই, নিরাপত্তা চাই, পুলিশ তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পুলিশ গত কয়েক মাসে শুধু থানায় ডায়েরী নিতে বা এজাহার নিতে অস্বীকার করেছে কত ঘটনার, তার হিসাব করলে ভাবতে অবাক লাগবে অজয়বাবু আর জ্যোতিবাবুর জন্য পুলিশের এই তৎপরতা আর সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে, রক্ষা করতে অথবা আগে-ভাগে খবর নিয়ে শরিকী সংঘর্ষ রোধ করতে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা—দুইয়ের মধ্যে কত তফাৎ।

এই তো সেই দিন বেলেঘাটায় অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি থেকে একজন মুমূর্ষুকে মস্তানরা কেড়ে নিয়ে গেল; তার পর সেই অ্যাম্বুলেন্স যখন থানায় ডায়েরী করতে গেল, সেই ডায়েরীটি পর্যন্ত নিতে অস্বীকার করা হয়েছিল। ডায়মণ্ডহারবারের একজন মহিলাকে নিগ্রহ করা হচ্ছে—এই সংবাদ নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে আর

। যখন আর্ত চিৎকারে আছড়ে তখনও পুলিশ সহজে খাওয়ার বেশি তৎপর

এই পুলিশই আবার কত হনা গাঙ্গুলীকে মারতে, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ ঠেঙাতে। হেনা গাঙ্গুলীকে বস্থায় কেন ধরা সম্ভব হল ফেলে দিয়ে কি কি সাফল্য দেখালো, সেটা প্রশ্ন করতে কি। জীবিত রেখে যদি অপরাধ প্রমাণ করে সাজা া যায়, তবে মরা মানুষের অতি জোরদার অভিযোগ র দ্বারা পুলিশের কর্তব্য-সাফল্যের প্রমাণ হয় না। পুলিশ তৎপর বিধানসভায় না করতে। কর্তব্যরত মৃত্যু নিশ্চয়ই দুঃখের, কিন্তু নন করতে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য কর্তব্য করতে গিয়ে মারা যান, আরো কত মানুষ আর পুলিশ কর্তব্য করতে লের জুলাই মাসে প্রথম মারা স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে হাতে কত পুলিশ, কত র্তা মারা গেছেন। এই ১৯৬৬ আন্দোলনে কৃষ্ণনগরে যতীন র একজন ১৯৬৭ সালে নক-পুলিশ অফিসার ওয়াংদি কিন্তু তার জন্য কোনদিন নিয়ে গিয়ে বিধানসভা বা বিল্ডিংস-এ হামলা করেছে? রে নি, কিন্তু করলো যুক্ত-আমলে। কেন করলো, হল এও একরকম তৎপরতা। যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকতে াধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃত-কারীরা অবাধে ঘোরাফেরা করেছে অথবা রাজ্যব্যাপী বোমা তৈরির কুটীর-শিল্প গড়ে উঠেছে, তখন কিন্তু পুলিশ আজকের মত রোজ এত বোমা, কার্তুজ, পাইপগানের সন্ধান পায় নি। যেদিন যুক্তফ্রন্ট সরকার চলে গেল, সেই দিন থেকে দেখা গেল বর্ষার জলে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিস মাছের মত শুধু বোমা, অস্ত্র ধরা পড়ছে। তাই তো পুলিশের এই অসাধারণ তৎপরতা দেখে সন্দেহ হয়—পুলিশ এতদিন যা করতে পারতো করে নি, কিন্তু আজ করছে, ভয়ানক তৎপরতার সংগেই করছে। রাজ্যব্যাপী গত কয়েক মাসে যে অজস্র শরিকী সংঘর্ষ হয়েছে—শরিকী সংঘর্ষ ও অন্যান্য কারণে প্রায় ৭০০ জন খুন হয়েছে, পুলিশ তার ক'টা খুনের কিনারা করেছে বা খুনের সংগে জড়িত কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে? বর্ধমানের ঘটনায় পুলিশ আজ কত গ্রেপ্তার করছে? অতীতের কোন খুনে এত দ্রুত মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? খুন প্রসাদপুরে হয়েছে, খুন ইথো-রাতে হয়েছে, খুন মধুসূদনপুরে হয়েছে—আরো অজস্র জায়গায় হয়েছে, কিন্তু কোন খুনের জন্য পুলিশের এত তৎপরতা ছিল? কোন শরিকী সংঘর্ষে পুলিশ এতজনকে গ্রেপ্তার করেছে? এই কথার জবাব পুলিশের কাছে আছে—আমরা কর্তব্য করতে পারি নি। কিন্তু সেই পারে নি আজ পারছে—সেইদিন না পারার জবাবে যত রঙ্ মাখানোই হোক না কেন, সেটাও যেমন জোলো আর আজ সব করতে পারছি, তাই করছি—এই বক্তব্যও জোলো। তাই যাঁরা জোলো দুধে সাত তাড়াতাড়ি রাবড়ী তৈরি করে মানুষের মুখে দিতে চাচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশে ঐ একই কথা বলতে চাই—রজনী ধীরে!

'রজনী ধীরে' এই একই কথা বলতে চাই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের উদ্দেশে। এই তিন নেতার উদ্দেশে কিছু বলবার আগে একটা কথা বলে নিতে চাই। সেটা হল রজনী ধীরে এই কথাটা শুধু সি. পি. এম-এর উদ্দেশে কেন বলছি অথবা বলা যেতে পারে আমি কেন কানু ছাড়া গীত নেই-এর মত সি. পি. এম প্রসংগেই প্রায় সব কথা টেনে আনি। এর অতি সংক্ষিপ্ত একটা জবাব দিতে চাই—তা হল যে কারণে ১৯৬৬ সালের আগে আর সব গীতের কানু ছিল কংগ্রেস, আজ সেই কারণেই সি. পি. এম। ১৯৬৬ সালে ও তার আগে রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের চাবি-কাঠি ছিল কংগ্রেসের হাতে। তাই সেই দিন আমার বেশির ভাগ বক্তব্য সীমিত থাকতো কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের উপর কেন্দ্র করে। কিন্তু আজ কংগ্রেসের কথা বড় বেশি মনে পড়ে না। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সেইদিন আমার মত নগণ্য মানুষকে কত স্নেহ করেছেন, আবার আমার লেখার বিরুদ্ধে কত নালিশ করেছেন, কিন্তু আজ রাজ্য রাজনীতি প্রসংগে লিখতে গিয়ে কালে-ভদ্রেও তাঁদের কথা মনে পড়ে না। আজ মনে পড়ে জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু, হরেকৃষ্ণবাবুর কথা। এর একটি মাত্রই কারণ সেইদিন কংগ্রেস যেমন ছিল রাজ্য রাজনীতির ভাগ্যনিয়ন্তা, আজ সেই স্থান দখল করেছে সি. পি. এম। তাই আজ পরিণতির পরিস্থিতিতে সব গীতের কানু হল সি. পি. এম।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবার পর সি. পি. এম দলের তৎপরতা সবচেয়ে বেশি। অবশ্য তৎপরতা আগেও ছিল না, এমন নয়। এই তৎ-পরতার মধ্যে আছে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে দাবীপত্র বা আর্জি পেশ।

শ্রীদাশগুপ্ত ১৯৬৭ সালে একবার মাত্র যুক্তফ্রন্টের সভায় গিয়ে একটি কথা বলা ছাড়া কোন দিন যুক্তফ্রন্টের কোন সভার গত তিন বৎসরে যান নি, রাজ্যে যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর সি. পি. এম দলের পৌণে এক ডজন মন্ত্রী রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে শ্রীদাশগুপ্তের নীতি, আদর্শ, কর্মসূচী রূপায়ণে দিবারাত্র কাজ করেছেন, কিন্তু সেই মহাকরণে কোন দিন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যান নি। আজ যুক্তফ্রন্টের সভা নয়, মহাকরণ নয়, গেলেন একেবারে ধর্মাবতার রাজ্যপাল সকাশে রাজভবনে।

শ্রীজ্যোতি বসু কি ছোটাছুটি না

[শেষাংশ ২৫১৫ পৃষ্ঠায়]

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাঃ একটি অভিমত

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক অধ্যাপক ‍র্মলকুমার সিংহের সঙ্গে সম্প্রতি ‍মাদের বিশেষ প্রতিনিধির একটি ‍ক্ষাৎকার ঘটে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ‍রিচালনা ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ‍পর্কে পর্ষদ সম্পাদকের মতামত জানাই ‍ল এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য। দরদী ‍কাব্রতী ও সুযোগ্য প্রশাসক হিসাবে ‍সিংহ স্বল্পকালের মধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি ‍র্জন করেছেন। আমাদের বিশেষ ‍তিনিধির সঙ্গে খোলাখুলিভাবে ‍লোচনাকালে তিনি নানা প্রশ্নের উত্তর ‍, তার কিছু কিছু বিবরণ নিচে প্রকাশ ‍ হলো।

প্রঃ—মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাজে যোগ ‍ওয়ার আগে আপনার পর্ষদ সম্পর্কে ‍ ধারণা ছিল? এখনকার ধারণাই বা ‍ রকম?

উঃ—বলতে কি পর্ষদে আসার আগে ‍ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোনই ধারণা ছিল ‍। ডেপুটি সেক্রেটারী হিসাবে আমি ‍ম এসেছিলাম। আমার কাজ ছিল ‍্যসূচীকে পুনর্বিন্যাস করা। কাজ ‍ত করতে দেখেছিলাম, ছাত্রদের যথার্থ ‍কাশের জন্য যা করা দরকার, ঠিক ‍কাটি হচ্ছে না। যে পাঠ্যপুস্তকের ‍রা আমরা ছেলেদের কাঁধে চাপিয়েছি ‍ার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে ‍ মনে করি না। আমাদের যুগে ‍র্ণ এত ভারী ছিল না। তখন ভাষা ‍বার জন্য শিক্ষকরা চেষ্টা করতেন। ‍ন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, বর্তমানে ‍রা ৭৫ জন ছাত্রেরই ভাষার ওপর ‍ নেই। স্কুলে এই বিষয়ের ওপর ‍ নজর দেওয়া উচিত তা হচ্ছে না। ‍নূন ইংরেজী শেখাবার পদ্ধতি। ‍দের ইংরেজী শেখার একটা ঐতিহ্য ‍। শিক্ষকচারাল অথচ ইংরেজী ‍ার যে প্রবণতা এখন দেখা যায়, ‍ ছাত্রদের কতটা উপকার হয় বলা ‍ ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে এই নতুন ‍ভক্ত ইংরেজী শেখাবার চেষ্টা চলে। ‍ দশম ও একাদশ শ্রেণীতে যে 'পাঠ্য-সূচী' আছে—তাতে বর্তমানের সাহিত্যিক-দের লেখা খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আমরা নিজেরাই বধ করতে বসেছি। এই ভাষা শেখার যে ঐতিহ্য আমাদের আছে, সেই পথেই ইংরেজী ভাল করে শেখা যায়। নিম্নশ্রেণীগুলিতে নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান ভাল বলে মনে করি না। ইংরেজী পাঠ্যসূচী ও ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

যা বলছিলাম, যে কাজ নিয়ে প্রথম এসেছিলাম—তা সম্পূর্ণ করতে পারি নি। নানারকম অসুবিধা বোধ করায় এখান থেকে চলে যাই।

প্রঃ—মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকৃতপক্ষেই কি একটি স্বশাসিত সংস্থা?

উঃ—অনেক বিষয়েই আমাদের সরকারের মতামত নিতে হয়। ১৯৬৩ সালের 'এ্যাক্ট' অনুসারেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারের মতামত একান্ত আবশ্যক। কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া কিছু আমরা মেটাতে পারি—আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারের মতামত প্রয়োজন।

আমি মনে-প্রাণে শিক্ষক। যতদিন এখানে থাকব—এই প্রতিষ্ঠানটিকে দেশের ও দশের উপকারে লাগাতে চেষ্টা করে যাব।

প্রঃ—শুনেছি এ বছর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্ষদের পরীক্ষার দায়িত্ব নিতে রাজী হন নি। কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করলেন?

উঃ—বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর অমতে বিদ্যালয়গুলিকে পর্ষদের পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা যায় না। যেসব বিদ্যালয় আপত্তি জানিয়েছে, তাদের সঙ্গে বিশেষভাবে কথা বলে রাজী করিয়েছি। কাজেই এখন এটা আর বড় সমস্যা নয়। শিক্ষকরাও যথাসম্ভব সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন, আশা করি।

প্রঃ—কতকগুলি স্কুল কমিটি আপনারা ভেঙে দিয়েছেন। এ কাজ করলেন কেন?

উঃ—এই সব বিদ্যালয়গুলিতে টাকা-পয়সা নিয়ে নানারকম দুনীতি চলেছে। শিক্ষকদের চাকুরীর কোনও নিরাপত্তাই ছিল না। এসব প্রতিষ্ঠানের কীর্তি আমি ফাইল খুলে সাংবাদিকদের দেখিয়েছি। কী ধরনের দুনীতি এই সব প্রতিষ্ঠান-গুলিতে চলছিল, সেগুলি তার প্রমাণ। যথার্থ শিক্ষা-দরদী বাঙালী এ কাজকে নিন্দা করবেন বলে মনে করি না। এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব শিক্ষকরা কর্মচ্যুত হয়েছেন, তাঁদের অনেককেই কাজে পুনর্বহাল করা গেছে। ১৯৬০ সালে যে শিক্ষকের চাকুরী গিয়েছিল, তাঁকেও আবার চাকুরীতে পুনর্বহাল করা গেছে।

প্রঃ—যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন এসেছে কি?

উঃ—মূল নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন আসে নি। রাজনৈতিক প্রভাব এখন ছাত্র-দের ওপর বড় বেশি। ছেলেরা লেখা-পড়াকে এখন খুব 'সিরিয়াসলি' নেয় না। কর্মসংস্থানের অভাবই এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী।

প্রঃ—শিক্ষকদের মধ্যে অশিক্ষকসুলভ আচরণ দেখতে পান কি?

উঃ—নৈতিক অবনতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। এ ছাড়া আর কিছু বলতে চাই না। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক সমিতির উচিত এদিকে দৃষ্টি দেওয়া। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের নৈতিক মান যে নেমে গেছে, একথা আমি বার বার বলব।

প্রঃ—শিক্ষার মান নেমে গেছে কি?

উঃ—শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরেই শিক্ষার মান ভীষণভাবে নেমে গেছে। তবে ভাল ছেলে যে নেই, তা নয়। সাধারণ মান যে নেমে গেছে, সে কথাই আমি বলতে চাই।

প্রঃ—ছাত্রদের সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে হলে কি করা দরকার?

উঃ—দেশ তৈরি হয় স্কুলের খেলার মাঠে ও বাড়িতে। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবেই আমি একথা বলছি। সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমি একথা ভেবে দেখতে বলব।

প্রঃ—পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে টোকাটুকি বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন? পুলিশ থাকবে কি?

উঃ—শুধু চোর-গুণ্ডা তৈরি করে দেশ বড় হয় না। মানুষ তৈরি করতে গেলে একটু শক্ত হতেই হবে। শিক্ষক সংস্থা-গুলি এখুনি বর্তমান অবস্থার পরি-বর্তন সাধন করতে পারবেন না। এখানে পুলিশকেও থাকতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলছি, প্রয়োজন হলে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। যে রকম অবস্থা, তেমন ব্যবস্থা করতেই হবে। একান্তভাবে দেশের স্বার্থেই একথা বলছি।

[পূর্বানুবৃত্তি]

আনন্দ বলেছিল নন্দিনীকে সে আমার নমস্কার জানাবে,—কিন্তু তার সেই প্রতিশ্রুতিতে কোনো উৎসাহ ছিল না,—সে একটা সংক্ষিপ্ত সৌজন্য মাত্র। বরং এমিয়েলের সেই উক্তিতে 'ইনস্টিংট' আর 'উইল'—এই দুটি শব্দের ইঙ্গিত আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি কি না, সেটাই ছিল তার সেদিনকার পরবর্তী আলোচনার প্রধান চিন্তা। পর পর অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল আমাকে। সেই প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই এক সময়ে সে বলেছিল—এমিয়েলের মনে বরাবরই গভীর ঈশ্বর-সন্ধান ছিল। এমিয়েলের আদর্শ দিয়ে মধুসূদনকে মাপা যায় না। এমিয়েল বলতেন, নিজের ভেতরকার দৈত্যটার সঙ্গে বাস করবার ভবিতব্য আমাদের,—আমাদের সে-কাজে এগুতে হবে সাহসের সঙ্গে—তাতেই সত্যিকার মুক্তি—in accepting with courage and prayer the task of living with one's own demon, and making it into a less and less rebellious instrument of God.' মধুসূদনও নিজের ভেতরকার 'ডেমনের' সঙ্গে বাস করেছিলেন, কিন্তু কখনোই কি তাঁর বিদ্রোহী-স্বভাব শান্ত হয়েছিল? তাঁর প্রতিটি রচনায় সেই অশান্ত প্রকৃতির আর্তনাদ শোনা যায়।

আমি বলেছিলুম—এ কথা যতোটা শুনতে ভাল লাগে, সে-পরিমাণে সরল বা বোধগম্য নয়। প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যিককেই নিজের 'ডেমনের' সঙ্গে বাস করতে হয়,—instinct এবং will-এর তাড়না মানতে হয়, কিংবা প্রতিরোধ করতে হয় এবং শুধু সাহিত্যিকদের জীবনেই যে এরকম ব্যাপার ঘটে থাকে, তাও নয়,—আমাদের জীবনের প্রকৃতিই এইরকম। যিনি যে বৃত্তিতেই থাকুন, এ খাজনা সকলকেই দিতে হয়।

—সে কথা মানি। কিন্তু এই যদি হয় জীবনের সাধারণ প্রকৃতি, তাহলে মধুসূদন আর রবীন্দ্রনাথ কিংবা মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের মধ্যে এই প্রকৃতির কি একই রকম অভিব্যক্তি ঘটেছিল? দ্যাখো, মধুসূদন সম্পর্কে স্বতন্ত্র এদিক থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সমতা বা সাদৃশ্য বোঝা যায়, কিন্তু মধুসূদন সারা জীবন কী যে ছটফট করেছেন!

মধুসূদন সম্বন্ধে অনেকের মুখে শোনা এই ধারণা আমি কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারি না। তিনি যে ছটফট করেছিলেন, সে-কথা মানতে বাধা নেই। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের যোগ ঠিক এভাবে আলোচিত হতে দিতে আমার অন্তরের সায় ছিল না। প্রমথনাথ বিশী মশায়ের 'মাইকেল মধুসূদন' নামে ছোটো বইখানিতে মেঘনাদবধ রচনার যে নাটকোচিত দৃশ্যটি দেখেছিলুম, মধুসূদনের অস্থিরতার কথা ভাবতে ভাবতে সেই দৃশ্যই আমার মনে এলো—সেই লোয়ার চিৎপুর রোডের (এখন যার নাম রবীন্দ্র সরণী) ছ-নম্বর বাড়ির দোতলায় সুসজ্জিত ঘরখানি,—মেঝেতে কার্পেট, আলমারিতে বই; টেবিলেও বই,—বই, কাগজ, কলম, পেন্সিল, ছুরি, মোমবাতিতে আলো আর বোতলে সুরা। বিশী লিখেছেন—'দেওয়ালে একটা গোলাকার ঘড়ি, তাহার কাঁটা দুইটিতে মহাকালের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি; রাত্রি এগারোটা; পথে শব্দ নাই, পথিক বিরল, এক-আধখানা ভাড়াটে গাড়ির চাকার শব্দ।'

দৃশ্যটি আমার প্রায়ই মনে পড়ে। মধুসূদনের বয়স তখন ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর। সেই রাত্রে সেই ঘরে পায়চারি করতে করতে তিনি মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করছেন।—

'ঘরের তিন কোণে তিন ব্যক্তি,—পরিচ্ছদ ও চেহারায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়, কাগজ-কলম লইয়া উপবিষ্ট; একজনের কাছে বেশির মধ্যে কয়েকখানা অভিধান—অধিকাংশই সংস্কৃত; তিনি শব্দ সংকলন করিয়া শোনান আর দুইজন আবৃত্তি শুনিয়া লিখিয়া যান—টোলের পড়ুয়ার মত হলদে কাগজে, প্রাচীন পুঁথির আকারে। ঘরের চতুর্থ কোণে আর এক ব্যক্তি, পাষাণ-কঠিন; নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিশ্চল; চোখের পাতাটি পর্যন্ত পড়ে না। আশ্চর্য লোকটির ধৈর্য; মনে হয়, এমনিভাবে দুই শতাব্দী ধরিয়া বসিয়া আছেন—একটি অবাক মর্মর মূর্তি—মিল্টনের।"

দৃশ্যটি চমৎকার দেখিয়েছেন প্রমথবাবু। মধুসূদনের অস্থিরতা ছিল বটে; কিন্তু সে কি তুচ্ছ কোনো অসংবৃত ভাব? হঠাৎ মনে পড়লো প্রমথবাবুর আর একটি উক্তি—মধুসূদনের সব কাব্যই বন্দিনী নারীর বিলাপধ্বনিতে পূর্ণ;—মনে পড়লো বিশী মশাই এই নারীর হাহাকার ব্যাপারটা ব্যাপক অর্থে জাতীয় জীবনে ব্যক্তিত্বের বন্ধন-মোচনের প্রতিমা' বলেছিলেন। ঠিক ব্যাখ্যা করেন নি তিনি। ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। একথা মনে পড়তেই আনন্দকে কথাটা মনে করিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলুম, কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

সে বললে—মধুসূদনের প্রত্যেক বই-ই আমাদের এই বাছাইয়ে গৃহীত হবে, একথা আমার সত্যিই মনে হয়,—তার কারণ

তিনিই বিভিন্ন দিকে নতুন পথ দেখিয়ে গেছেন এবং তাঁর প্রতিটি বই সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে অল্পবিস্তর স্বীকার্য বই। সমালোচকরা এমন অনেক কথা বলেন বটে, যা বোধহয় কতকটা তাক্-লাগানো কথা। বুদ্ধদেব বসু এবং প্রমথনাথ বিশী—একালের এই দুজনের আলোচনাতেই মধুসূদন সম্বন্ধে এরকম কিছু কিছু কথা আছে। কিন্তু সে সব প্রসঙ্গ যতোই চিত্তাকর্ষক হোক, এখানে সে-সব আর না তোলাই ভাল। সংক্ষেপে এই কথাটাই বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের আগে এবং ভারতচন্দ্রের পরে বড়ো মাপের কবি-প্রতিভা আমাদের সাহিত্যে একটিই দেখা দিয়েছিল। সে প্রতিভার নাম মধুসূদন দত্ত। ঈশ্বর গুপ্ত, হেম বাঁড়ুজ্যে, নবীন সেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রের গুণে বিপুল আলোচনার সামগ্রী বিহারীলালও সে পর্যায়ের কবি নন।

এই কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলে ফেলে সে আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলো।

কিন্তু আমি কোনো জবাব দিই নি। আমি তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কথা ভেবেছিলুম—যাতে কবিতার রূপ বা ছাঁদের দিকেই তাঁর বেশি নজর ছিল বলে আমার মনে হয়েছে" তাঁর প্রহসন দুখানি আমার খুবই ভাল লাগে; তাঁর মেঘনাদবধের কোনো কোনো জায়গা আমার কিছুতেই পছন্দ হয় না, যদিও পূর্ণ একখানি কাব্য হিসেবে তার স্বাদ বিশিষ্ট। তাঁর শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী আমার কখনোই খুব একটা ভাল লাগে নি—যদিও বাংলা কবিতা আর নাটকের ধারায় তাঁর নাম ঐতিহাসিক কারণেই চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এসব কথা অন্যক্ষেত্রে, অন্য আয়োজনে বিচার্য। আনন্দকে এই কারণেই সেদিন আর কোনো উত্তর দিই নি। সেকালের সাধারণ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল এবং আবহাওয়ার কথা মনে ছিল। যশের পিপাসা, অন্তরের সংঘর্ষ, অনুভূতির দংশন,—জীবন-নিরীক্ষার সুযোগ এবং সুযোগের অভাব দুই-ই ছিল। তারই মধ্যে হাল্কা এবং গম্ভীর দু'রকম ব্যাপারই বার বার ঘটেছে। আনন্দকে আমি মধুসূদন-প্রসঙ্গে ছেদ টানবার তাগিদ দিয়েছি কয়েকবার। অতঃপর অন্য কথায় এগিয়ে যাবার জন্যই রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' থেকে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত নিকুঞ্জে' অনুষ্ঠিত ১৮৭৫ খৃীস্টাব্দের হিন্দু কলেজের উদ্যান-সম্মিলনের উল্লেখটুকু শোনালুম। মধুসূদন তখন লোকান্তরিত। তারও কয়েক বছর আগে—মধুসূদন তখন জীবিত ছিলেন,—১৮৬৭ খৃীস্টাব্দে নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলায় বাংলাদেশের পূর্ব-মহিমার বিবরণ দিয়ে একটি কবিতা লিখে পাঠানো হয়েছিল রাজনারায়ণের বোড়াল গ্রাম থেকে। এইসব দৃশ্যের মধ্যে সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদনের উপস্থিতি প্রত্যাশিত নয়। মধুসূদনের প্রভাব বর্তেছে সমকালের কোনো কোনো কবির রচনায়,—নাট্যকারের প্রয়াসে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—এঁরা কেউই ঠিক মধুসূদনের সংকল্পের উত্তরাধিকারী নন।

আনন্দ বললে—সেকালের আবহাওয়াটার বিশেষত্ব ছিল বটে,—সব কালেরই কোনো-না-কোনো বিশেষত্ব থাকে। কিন্তু মধুসূদন যে অনন্যসাধারণ একজন কবি ছিলেন এবং তিনি যে শুধু তাঁর যুগের একজন মাত্র নন, নিজের কালকে তিনি যে অনেকটা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, সে তো তাঁর সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে তাঁর রচনার তুলনা করলেই বোঝা যায়।

[ক্রমশ]

॥ সপ্তাহের বোঝা ॥

[২৫১২ পৃষ্ঠার পর]

করলেন কয়েকদিন রাজভবনে রাজ্যপালের কাছে। এমন কি তিনি নাকি রাজ্যপালকে তাঁর কাজের বিচারক মানতেও লিখিতভাবে আর্জি পেশ করেছিলেন। শোনা যায়, শ্রীবসুর সেই লিখিত আর্জি রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান রাজ্যের অনেককে দেখানো ছাড়া দিল্লীতেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কি তৎপরতা! আবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে টেলিফোন করে দিল্লী থেকে সাধ্য-সাধনা করলেন শ্রীবসুকে অজয়বাবুর উপস্থিতিতে দিল্লী আসতে—যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার কয়েক সপ্তাহের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায়। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও একই আবেদন শ্রীবসু সহ রাজ্যের আরো মন্ত্রীদের কাছে করেছিলেন, কিন্তু সেই দিন শ্রীবসু জবাব দিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধীকে—আপনি চলে আসুন কলকাতায়, আমার যাওয়া সম্ভব নয়। কথাটা এইভাবে না হলেও মোদ্দা কথা এই ছিল। কিন্তু আজ সেই শ্রীবসু দিল্লীতে ছুটলেন, আর কার কাছে, না শ্রীগিরি, শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীচ্যবনের কাছে।

একই কথা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের উদ্দেশ্যে বলি। একদা তিনিই সব মন্ত্রীদের কাছে গোপন রিপোর্ট দিয়ে তিন মাসের শরিকী সংঘর্ষের হিসাব দিয়েছিলেন। সেই হিসাবে ছিল এই তিন মাসের সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে :

সি. পি. এম—	১০৯ ক্ষেত্রে
সি. পি. আই—	৪৯ "
এস. ইউ. সি—	১৬ "
ফরোয়ার্ড ব্লক—	১৩ "
আর. এস. পি—	১০ "
বাংলা কংগ্রেস—	৯ "
এম. এফ. বি—	৩ "
এস. এস. পি—	২ "
কংগ্রেস—	২ "

একবার কল্পনাটি করুন তিন মাসে সি. পি. এম ১০৯টি সংঘর্ষ করলো, অর্থাৎ একটিও ধান কাটার দিন যায় নি—যখন সি পি এম একটার বেশি সংঘর্ষ করে নি। এ যেন এমন যে যত বড় দল সে তত বেশি সংঘর্ষ করেছে। এই সংঘর্ষ যে শুধু এক দল এক দলের সঙ্গে করেছে তা নয়। এই তালিকা দেখলে দেখা যাবে কোচবিহার ও বর্ধমান জেলায় সি. পি. এম দল নিজের সঙ্গেই নিজে লড়াই করেছে চারটি ক্ষেত্রে।

তখন কিন্তু শ্রীকোঙার বর্ধমানের ঘটনায় বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে আজকের মত তৎপর, আজকের মত বিচলিত হন নি। কিন্তু আজ বর্ধমানের ঘটনায় শ্রীবিনয় চৌধুরী, শ্রীসুবোধ চৌধুরী, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার সকলেই বিবৃতি দিচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যের গত ১৩ মাসে হাজারখানেক শরিকী সংঘর্ষে এই তৎপরতা ছিল কোথায়? এই সব বিবৃতি, সত্য প্রকাশে আগ্রহ ছিল কোথায়? তাই বলি—রজনী ধীরে ধীরে।

[চলবে]

॥ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা ॥

[২৫১৩ পৃষ্ঠার পর]

প্রঃ—এখন গরমের দিনে পরীক্ষা হয়। এতে নানান অসুবিধা। পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করা যায় না কি?

উঃ—সময় পরিবর্তন খুবই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় পরিবর্তিত না হলে পর্ষদের পরীক্ষার সময় পরিবর্তিত হওয়ার অসুবিধা আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গ্রীষ্মকালে পরীক্ষা দিতে খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এখনি কিছু করা যাচ্ছে না। তবে যুক্তির দিক থেকে শীতকালেই এসব পরীক্ষা হওয়া উচিত,

ক্ষমা নেই
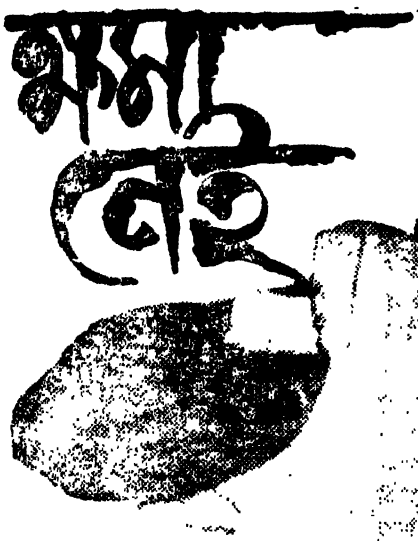
বর্ধমানের যে পরিবারটি আজ সমগ্র দেশের শোক[illegible] বেদনার সঙ্গী, যে পরিবারের অন্তহীন হাহাকার আজ নিঃসীম বেদনায় বাংলাদেশে ঝড় তুলেছে, সেই অন্তহীন হিংস্রতার ইতিবৃত্ত সর্বপ্রথম মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন বসুমতী পত্রিকা।

ইতিমধ্যে দামোদর নদ আর বাঁকা নদীতে [illegible] জল বয়ে গেছে, হয়ত রক্তের দাগও মুছে গেছে, কিন্তু অপরাধীরা শাস্তি পায় নি। গত ১৭ই মার্চ [illegible] যারা মধ্যযুগীয় বর্বরতায় [illegible] তাজা প্রাণের রক্ত পান করেছে পৈশাচিক আনন্দে, তারা এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। এর পরে এই প্রশাসনের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা থাকবে কেমন করে? যে শাসন-ব্যবস্থায় খুনী, নরহত্যাকারী ও লুঠেরারা শাস্তি পায় না, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না, ক্ষমা করা চলে না। গত এক বছরে বাংলাদেশের বুকে অনেক রক্তের ঢল নেমেছে: পশ্চিম দিনাজপুরের কাঁকি গ্রাম থেকে আরম্ভ করে মালদহ, কুচবিহার, ২৪-পরগনা আর বর্ধমান—সর্বত্রই খুনীদের তাণ্ডব। টাঙ্গি, বল্লম আর বোমা-বারুদের অবাধ রাজত্ব। প্রতিকার নেই, প্রতিবিধান নেই।

কিন্তু সকল ঘটনাকে হিংস্রতার মাপকাঠিতে ম্লান করে দিয়েছে সাই-

প্রণবেশ চক্রবর্তী

পরিবারের রক্তস্রোত। হরতালের নামে প্রশাসনযন্ত্রকে কুক্ষিগত করে, একটি বিশেষ দল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার যে জঘন্যতম রক্ত-নেশায় মেতে উঠেছিল, তার কোন তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। ত্রিবেণী আর দক্ষিণদাড়ির বুকে পিশাচদের যে ভয়ঙ্কর চেহারা আমরা দেখেছি, তা আমাদের মনুষ্যত্বের কাছে এক ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ। 'সর্বহারা'র নামে সর্বস্ব হরণ করার এই কুৎসিত চক্রান্তের কাছে আমরা মাথা নত করব, না এর বিরুদ্ধে নির্ভয় বীরত্বে রুখে দাঁড়াব—এই প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় একান্ত নিরুপায় হয়ে নিজের সরকারকে 'অসভ্য-বর্বর' আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে নারী নির্যাতন ও নরহত্যা বন্ধ করতে না পেরে তিনি নিঃসীম হতাশায় পদত্যাগ করেছেন।

এতদিন যাঁরা [illegible] পথকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের [illegible] হিংস্রতম চেহারা দেখে বাংলাদেশের মানুষ শিউরে উঠেছে। যে সরকার মানুষের সাধারণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়, যে সরকার বোমা-গুলী-বারুদের অবাধ ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষক, যে সরকার নারী নির্যাতন নীরবে সহ্য করে, যে সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দলীয় গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেয়, সে সরকারকে 'অসভ্য' আখ্যা দিয়ে অজয়বাবু কি ভুল করেছিলেন? যে সরকার বর্ধমানের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নীরব দর্শক হয়, যে সরকার মানুষের রক্ত নিয়ে 'হোলি' খেলায় মেতে ওঠে, যে সরকার অসহায় মাতৃত্বের বুকফাটা আর্তনাদকে লাল-ফিতার ফাঁসে চাপা দেয়, যে সরকার স্বামীহারা নারীর চোখের জলকে পদদলিত করে, সেই সরকারকে 'বর্বর' আখ্যা দিয়ে অজয়বাবু কি ভুল করেছিলেন? এই প্রশ্নের জবাব দেবে আগামীকালের ইতিহাস। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একদিনের ধর্মঘটে যেখানে চল্লিশ জন মানুষকে তথাকথিত বিপ্লবের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়, সেখানে অজয়বাবু পদত্যাগ করে যে এক মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন, সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই।

আস্থা রাখব কেমন করে?

যেখানে পুলিশ সময়মত পৌঁছতে পারে না, তেমন কোন সুদূর গ্রামাঞ্চলে এ ঘটনা ঘটলে ততটা বিস্মিত হতাম না, দু' দলের আকস্মিক সংঘর্ষে এ রকম হত্যাকাণ্ড ঘটলে তবু একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেত, হিংস্র জনতাকে দমন করতে গিয়ে পুলিশের গুলীতে নিহত হলে তবুও কোন কারণ দেখানো সম্ভব হত। কিন্তু এ ঘটনার ব্যাখ্যা কি? মহকুমা-শাসক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে যখন এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উপস্থিত, সামনেই যখন পুলিশ পিকেট, উপস্থিত রয়েছে যেখানে পুলিশের বেতার গাড়ি—সেখানে তিন ঘণ্টা ধরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটল কেমন করে? কে দেবে উত্তর? কেন জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার শহরের বুকে বসেও তিন ঘণ্টার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন সংবাদ রাখেন না, অথবা সংবাদ পেয়েও কেন উদাসীন থাকেন? কেবলমাত্র মহকুমা শাসক কিংবা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে লোকদেখানো শাস্তি দিলে এত বড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ১৭ই মার্চ এ ঘটনা ঘটল, আর ১৯শে মার্চ রাত্রে ঘোষিত হল রাষ্ট্রপতির শাসন। এই তিনদিন রক্তের বিভীষিকার

...টা বর্ধমান শহর বোমা হয়ে গিয়ে-ছিল, কিন্তু আমাদের নামী এবং দামী অফিসাররা ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব। যদি রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত না হত, যদি শ্রীঅশোক সেন প্রমুখ জননেতারা বিষয়টি নিয়ে দৃপ্ত প্রতিবাদ না জানাতেন, যদি বসুমতী পত্রিকা নির্ভীক সততার এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশ না করতেন, তবে বাংলাদেশের মানুষ জানতেই পারত না, প্রণব আর মলয়ের মা মৃগনয়না দেবীর বুকফাটা আর্ত-...দের কথা। জানতেই পারত না, জন-...গণের অর্থে যাঁদের পোষণ করা হচ্ছে, সেই বিরাট বিরাট অফিসারদের বিশ্বাস-ঘাতকতার কলঙ্কিত কাহিনী।

আজ সকলেই তৎপর হয়ে উঠেছেন। ...কলেই একটি করে রিপোর্ট তৈরি ...রে নিজেকে সাধু প্রমাণ করার জন্য ...ভন কর্মতৎপরতা দেখাচ্ছেন। ... প্রশ্ন দেখা দেয়, হত্যাকাণ্ডের পর ...দিনের মধ্যেও যাঁরা কোন রিপোর্ট ...রি করতে পারেন নি, তাঁরাই আজ ...াতি এত বড় বড় রিপোর্ট তৈরি ...লেন কেমন করে? যে মোসাহেবরা ...রপতির শাসন হওয়াতে আজ অপরাধ ...লনের জন্য রাতারাতি পোশাক বদল ...ছেন, তাঁরা শুধুমাত্র অপদার্থ নয়, ...রও অযোগ্য। সেদিন বর্ধমান শহরে ...লিফোন এক্সচেঞ্জে ধর্মঘট হয়েছিল ...ন? গোটা বাংলাদেশে জরুরী কাজ ...সেবে যখন টেলিফোনকে ধর্মঘটের ...ওতার বাইরে রাখা হয়, তখন বর্ধমানে ...র নির্দেশে এবং কি উদ্দেশ্যে টেলি-...ফোন ধর্মঘট হয়েছিল? আর এমন ...কটি জরুরী সংস্থায় ধর্মঘট হওয়া ...ত্ত্বেও জেলা শাসক বিকল্প কোন ব্যবস্থা ...র কোন চেষ্টা করেন নি কেন? ...রের বুকে যে ঘটনা ঘটল, সে ...নার সংবাদ জেলা শাসক তিন ঘণ্টার ...ধ্যও পেলেন না কেমন করে? ...লিশের গাড়ি ছিল, বেতার গাড়ি ...ল—তবুও সংবাদ পেলেন না কেন?

কর্তব্য-অবহেলার এমন মারাত্মক ...টান্ত সমগ্র সভ্য সমাজে বিরল। তাই ...ভাগীয় তদন্তের ওপর আর ভরসা ...া যায় না। খুনী দস্যুরা এই ...াকাণ্ডের জন্য যতখানি দায়ী, ঐসব ...পদস্থ অফিসারদের দায়িত্ব তার চাইতে ...নেক বেশি। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে কালো হাত চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছিল, যে ঘৃণ্যতম পাশবিক ষড়যন্ত্রে এমন জীবনপাত হল, তা আজ সাধারণ মানুষকে জানাতেই হবে। বিভাগীয় অফিসারদের যোগ্যতা, সততা এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যখন মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে, অপরাধীদের তালিকায় যখন অফিসারদের নামও সুস্পষ্ট, তখন একমাত্র উচ্চশক্তিসম্পন্ন 'বিচার বিভাগীয় তদন্তে'র মাধ্যমেই প্রকৃত অপরাধীদের চেনা যাবে।

অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে যে নেতারা আজ প্রণব আর মলয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছেন নিজেদের জঘন্যতম কুকীর্তিকে গোপন করার জন্য, যাঁরা নির্লজ্জ অসাধুতার পরিচয় দিচ্ছেন, ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র কিছুদিন আগে এঁদেরই হাতে ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব। তাঁদের দলের গুণ্ডারা যদি বোমা বাঁধতে গিয়ে প্রাণ দেয়, তবে সেই সমাজবিরোধীরা "শহীদে"র আসন পায় (মানবপুর গাঙ্গুলীবাগানের ঘটনা স্মরণীয়), আর তাঁদের দলীয় গুণ্ডাদের হাতে যদি প্রণব, মলয়, জিতেনের মত অসংখ্য যুবকও নিহত হয়, তবে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সেটা কোন অপরাধ নয়।

রাষ্ট্রপতি-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের রাজ্যপাল যে বেতার ভাষণ দিয়েছেন, তা' সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। শ্রীধাওয়ান জ্ঞানী ব্যক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি কেমন অনেক 'মহৎ বাণী'র সঙ্গে অসমতালে শ্রীজ্যোতি বসুকে উদার সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিক বোধগম্য হল না। কি এমন প্রমাণ রাজ্যপাল পেয়েছেন, যাতে জনসমক্ষে ঐ ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়া চলে? তবে কি বুঝতে হবে, রাজ্য-পালও কোন এক দল-বিশেষকে খুশি করার জন্য কিছু মনগড়া কথা আমাদের শুনিয়েছেন? আমাদের অস্বস্তি অনেকটা দূর হত, বর্ধমানের মানুষ অনেক আশ্বস্ত হত, সাঁই-পরিবারের ভেঙেপড়া জীবনে কিছুটা শান্তি ফিরে আসত, যদি দেখা যেত রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সেই বীভৎস ঘটনার জন্য সম-বেদনা জানিয়েছেন। রাজ্যপাল কি দেখছেন না, প্রতিদিন কি পরিমাণ বোমা, বোমার মশলা ও বেআইনী রাসায়নিক দ্রব্য পুলিশ উদ্ধার করছে! তবে এত-দিন কোন্ "দক্ষ প্রশাসকে"র নির্দেশে পুলিশ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিল? কোন্ দলের পৃষ্ঠপোষকতায় বোমা তৈরির 'কটেজ ইন্ডাস্ট্রি' গোটা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল? যে পুলিশ দশদিন আগে বোমা তৈরির গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পায় নি, আজ সেই পুলিশই সর্বত্র সন্ধান পাচ্ছে কেমন করে?

প্রণব-মলয়ের মায়ের কান্না রাজ্য-পালের অন্তরকে স্পর্শ করেছে কিনা জানি না ; কিন্তু বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিচলিত করে তুলেছে। কি আছে আশ্বাস? মানুষ আর কত সহ্য করবে? ঝড় শুরু হওয়ার আগে প্রকৃতি যেমন থমকে দাঁড়ায়, মানুষও আজ তেমনি থমকে দাঁড়িয়েছে। তাই অবি লম্বে প্রতিকার না হলে যে প্রলয়ের সৃষ্টি হবে, লক্ষ লক্ষ মৃগনয়না দেবীর চোখের আগুনে যে ভয়ঙ্কর দাবানলের জন্ম হবে, তা' থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য (১ম পর্ব)ঃ অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ। লেখাপড়া, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দামঃ আট টাকা।

একালের গবেষকরা অধিকাংশক্ষেত্রেই ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশের কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্থনের কাজই বেশি করেন এবং তদ্দ্বারা ঊনবিংশ শতকটা আরো কিছুটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ একমাত্র সে উদ্দেশ্য নিয়েই উপর্যুক্ত গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেন নি। অধ্যাপক ঘোষের বিশ্বাস, (যা তিনি পূর্বকথনে ব্যক্ত করেছেন) "ঊনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়াস আসলে আমাদের বিংশ শতাব্দীর সমস্যা ও সংকট সমাধানেই সবচেয়ে বেশি সহায়ক।"

অধ্যাপক ঘোষ আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য। বিষয়টি পাঠকদের কাছে যতোটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়, লেখকের লেখার সময় যে তা অত্যন্ত জটিল গুরুগম্ভীর বিষয় ছিল, সেকথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আনন্দের কথা, অধ্যাপক ঘোষ নিজস্ব চিন্তা, বুদ্ধি, মন ও মননের অদ্ভুত প্রয়োগ সাধনের ফলে বিষয়টিকে অত্যন্ত সহজগ্রাহ্য করে তুলতে পেরেছেন। তাঁর আলোচিত প্রসঙ্গগুলির মধ্যে রয়েছে নয়টি নিবন্ধ—(১) আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন, (২) ডিরোজিওঃ নবযুগের প্রবর্তক, (৩) প্যারীচাঁদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য, (৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ সার্ধ শতাব্দীর আলোকে, (৫) 'বিশ্বরূপ মূল গ্রন্থ' ও অক্ষয়কুমার দত্ত, (৬) স্বতন্ত্র পারিজাত বিদ্যাসাগর, (৭) রাজনারায়ণ বসু ও সমকালীন বাঙালী মানস, (৮) মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ স্বদেশ ও স্বধর্ম, (৯) নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ। লক্ষ্য করার ব্যাপার, সূচীপত্রটি এখানে উল্লেখের প্রথম কারণ এই যে, লেখক যেসব মনীষীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অজস্র নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিত হয়েছে; তবু লেখক কোন্ উদ্দেশ্যে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে পুনরালোচনায় সাহসী হলেন?

বলা বাহুল্য, অন্যান্য লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু তথ্যের উদ্ঘাটন করা, আর অধ্যাপক ঘোষ চেয়েছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর মননলোকে প্রবেশ করতে।

আলোচিত মনীষীরা প্রায় সবাই গদ্যশিল্পী। রামমোহন ঊনবিংশ শতকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ মননশক্তির সাহায্যে কিভাবে বিংশ শতকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে-ওঠা বনস্পতির বীজ বপন করেছিলেন, লেখক নির্ভরশীল যুক্তির সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করেছেন। ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মনীষার প্রকাশ দেখিয়ে সুস্পষ্ট যে অভিমত তিনি দিয়েছেন, তদ্দ্বারা লেখকের সৎ সাহসেরই পরিচয় মেলে। রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতামতগুলি পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে। বিদ্যাসাগরের আলোচনাতেও অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করে অধ্যাপক ঘোষ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অভিনব দিকগুলি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন মনীষীর চরিত্রের মধ্যে স্বকীয়তা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, আছে ব্যক্তিত্ব, তেমনি বৈষম্যও। তবু বাঙালীর জীবনধারায় তাঁদের দান সমানভাবে গৃহীত। তাই প্যারীচাঁদ ও অক্ষয়কুমার যেমন সাদরে গ্রহণীয়, তেমনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও সমাদরে গৃহীত তাঁর স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য। একদিকে বিদেশী প্রভাবজনিত পরিবর্তন, অন্যদিকে ধর্ম, সমাজ সম্বন্ধে যে [illegible] মনীষীদের চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সাহিত্যের মধ্যে আজো যার ছাপ সুস্পষ্ট গ্রন্থটিতে, তা অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন।

[illegible] (দীপান্বিতা, ১৩৭৬)—কালীপদ ভট্টাচার্য। সৈয়দ আমীর আলী এভেনিউ, কলকাতা-১৭। দামঃ বারো টাকা।

মহান রুশ বিপ্লবে একালের মহাকাব্যের উপাদান অবশ্যই নিহিত আছে। কবি ১৫টি সর্গে ৪০৮ পৃষ্ঠায় শোষণ ও শাসনমুক্তির সেই ইতিহাস লিখেছেন। এর জন্যে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

অনুভব (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন, ১ই মাঘ, ১৩৭৬)। সম্পাদক—শশধর রায়ঃ ৩০।৪, দিনু লেন, হাওড়া-১। দামঃ ত্রিশ পয়সা।

একটি অনু-পত্রিকা। বৈশিষ্ট্য—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রূপচর্চা, খেলার কথা, রাশিফল, চলচ্চিত্র। পূর্ববঙ্গের কবির একটি কবিতা এবং একটি প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক খবরাখবর স্থান পেয়েছে। অনেক বিজ্ঞাপনও রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ অনু-পত্রিকা বলতে বাধা নেই। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণ সংখ্যাটিতে দুই বাংলার লেখকদের লেখা থাকবে। বিজ্ঞাপন সমেত ৪৮ পৃষ্ঠার এই বইটি পড়তে বড় জোর ১৫ মিনিট সময় লাগবে।

রেখালেখা ঃ (সোদপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের মুখপত্র ১৯৬৯। সম্পাদনায়ঃ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, মিলনকুসুম ভট্টাচার্য, সত্যদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর রায়, হেমন্ত ভট্টাচার্য ও সুখেন্দুমোহন রায়।

শহরতলীর একটি বিদ্যালয়ের এই বার্ষিক মুখপত্রটি আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অলংকরণ অভিনন্দনযোগ্য। ঝকঝকে ছাপা, রঙ-বেরঙের স্কেচ, সুন্দর সুন্দর ছবি। রচনা অলংকরণে গোপাল পাল, নির্মল দাস ও সুকুমার চক্রবর্তীর ঐকান্তিক পরিশ্রম লক্ষ্য করার মত। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করেছেন, সাধন চক্রবর্তী। রচনাগুলিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সমাজসচেতনতার ছাপ রয়েছে। হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য, চন্দ্রশেখর রায়, অমিত রায়, সুশীল সরকার, বিমলেন্দু নাথ, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাশিস বসু, বিবেকানন্দ সরকার প্রমুখ ছাত্রদের এবং রাজেন্দ্রনারায়ণ সিন্‌হা, মিলনকুসুম ভট্টাচার্য, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতদ্রু চাকী, সত্যদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষকদের রচনা উল্লেখের দাবি রাখে। আমরা পত্রিকাটির প্রতি সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চৈত্রের চিন্তাঃ নরম-গরম

ঋতু বলতে কলকাতায় তিনটি। গ্রীষ্ম, দীর্ঘকাল স্থায়ী। বর্ষা সুদীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ী। এবং শীত। শীত স্বল্পস্থায়ী আর তার প্রভাব বিমিশ্র; পয়সাওয়ালার ওপর মিঠে, কপর্দকহীনের কাছে ভয়াবহ।

শীতের মরশুম বিদায় নিয়েছে, এখন পিচের রাস্তা ঘর্মাক্ত। পথিকের পাদুকা আঁকড়ে কোথাও কোথাও সে পথ বলছে, দাঁড়াও পথিকবর! তবু তো এই সবে শুরু। উত্তাপ বাড়লে এ টান যত্র তত্র। শেষ হবে বর্ষা সমাগমে, এক গোড়ালী কাদার কামড়ে। তখন পথ-ঘাটের আর চিহ্ন থাকবে না। ঠনঠনের এক বুক জলে উলঙ্গ ছেলেরা সাঁতরাবে, রিক্সার পাদানিতে জল ছলছল করবে। জনজীবন বিপর্যস্ত, অটোমোবাইল-জীবন বিলকুল বিকলাঙ্গ। এসব গ্রাহ্যে শীত বরং ভালো। কলকাতার শীত প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে না। কিন্তু গরমে করে। রোদের কামড়ে প্রাণবায়ু নির্গমনের খবর দু-চারটে দেখা যায়, ইতস্তত। তবু যখন আসে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ উত্তাপ বর্ষণ করে। কলকাতার রুক্ষ চেহারা আরও কাঠখোট্টা হয়ে পড়ে।

এই কলকাতায় গরম নামছে। ত্রিশজোড়ী 'বাবা তারকনাথের' সেবকরা দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছে চৈত্রের আগমন বার্তা।

গরমের দেশে গরম পড়লেই কিশোর-কিশোরীদের ওপর পরীক্ষার জুলুম চলে। শীতেই মাথা-গরম, কলকাতার পরীক্ষা গুলো যেন একেবারেই বে-মানান। কোন গরম দেশে পরীক্ষা শীতে শুরু হয় না? গ্রীষ্মকালের স্কুল কথাটা এ শহর তো ভুলতেই বসেছে। মর্নিং, ডে, আফটারনুন, ইভনিং, নাইট, সব সময় স্কুলিং-এর ব্যস্ততা। দিনের স্কুল ভোরে বসানোর সুযোগ নেই। দিনের অফিস-কাছারী ভোরে বসে আরও উত্তরে। বিহারে এ প্রথার চল আছে। কলকাতার শিফট চেঞ্জের সুযোগ হয় না। অবশ্য চেষ্টা হয় নি। হলে ভালো হত। কিন্তু তার আর চান্স নেই। আকাশ-মুখো অফিসবাড়িগুলোয় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত। অতএব দুপুরের স্বেদ পথের ওপরেই ঝলসায়। অফিসবাড়ি ও ধনী-মানীর বসতবাড়িতে গরমের প্রবেশ নিষেধ। অবাধ গরমের যত হুংকার এখন মেহনতী মানুষের ওপর।

তবু কী আশ্চর্য শীতল এই শহর। পৃথিবীর বুকে অনন্য একজাম্পল। কয়েকটি আশ্চর্যের অন্যতম।

নচেৎ যত গরম, সে অনুপাতে মাথা-গরম নেই। নয়ত গরমের আর 'গরম করা'র চক্রান্ত চোখ খুলতে খুলতেই শুরু। হরিণঘাটার দুধ থেকে ফিরতি ট্রামের চাপ পর্যন্ত।

দুধের কথাই ধরুন না কেন। সেই কবে শ্রীঅজয় মুখার্জী পদত্যাগ করলেন। চব্বিশ ঘণ্টার হরতাল। জিরিয়ে জুড়িয়ে দিনটা মন্দ কাটত না। কিন্তু মনটা খিঁচড়ে দিল হরিণঘাটা। দুধের ওপর হরতালের নোটিশ নেই। তবু দুধ এলো ডোজল। বোতল নিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে ফের শুধু হাতে বাড়ি ফেরা। বোতল রেখে ডেকচি নিয়ে ছুটতে হল। বোতলে দুধ আসে নি। বোতল ভরা হয় নি। খোলা দুধ নিয়ে যাও। বেশ তো, বেশ তো, তাই দিন। বত্রিশ পাটি দাঁত বন্ধ করে মানে মানে ডেকচি ভরে তাই সব লাইন বেঁধে নিয়ে গেলাম। দুগ্ধ-ভাণ্ডারে ব্যস্ত বোনেরা মগ মেপে দুধ দিলেন। তার অনন্ত মন। কিন্তু তবু বোতলের মাপ ভরে না। এক-পঞ্চমাংশ কম। কিন্তু ঠগের হাতে নির্বিবাদে ঠকাই শহুরে ভদ্রতা। ঢোক গিলে মাপে কম দুধ নিয়ে সবাই কৃতার্থ। অনেকে বিড়বিড় করে অবশ্য অদৃশ্য কোন কোন সরকারী আমলার বাপান্ত যে না করলেন এমন নয়, তবে সবাই প্রায় স্বকর্ণ তৃপ্তির জন্য স্বগত।

ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা বোধ হয় এক দিনকা ওয়াস্তে। কিন্তু আজ দেখলাম, তা তো নয়, মগ সিস্টেম চালু করার পুনশ্চ চেষ্টা হল আজই আবার। ২৭শে মার্চ। আজও খালি বোতল ফেরৎ। ডেকচি নিয়ে লাইন দিলাম মাপে কম দয়ার দানটুকু গ্রহণ করে কৃতার্থ হওয়ার জন্য। মাসের প্রথমে আবার টাকা গুণে কার্ড করাব। একবার সর্ট সাপ্লাই যখন নির্বিবাদে চালু হল, তখন আশা রাখি, হরিণঘাটা নিশ্চয় এই অভিনব দুগ্ধ বিতরণী সিস্টেম স্থায়িভাবে চালু করে দেবে। মিল্ক কমিশনার মহোদয় ঘাটতি দুধের জন্য বাড়তি কার্ড ছাড়বেন কি না জানা নেই। দাম না বাড়িয়ে খরিদ্দারদের ওপর 'সিস্টেম' চালু করে কার্ড বাড়িয়ে নিলেও মুনাফা। তবে সেটা সরকারের। এই সর্ট সাপ্লাই বেসরকারী কিনা, এখনও খবর নেওয়ার সুযোগ হয় নি।

দুধ দিয়ে শুরু। কলকাতার গরম ঠান্ডা বোতলের বদলে গরম হরিণঘাটাই-দুধ দিয়েই শুরু হল নাকি? হোক, ক্ষতি নেই। মানুষজন খুব ঠান্ডা মশায়! গাল পাড়া অভ্যাস, তাই কলকাতাকে গাল দেই আমরা। নয় তো এই গরমেও নরম মনে লিখতে পারি। চৈত্রদিনেও কতভাবে পৌষমাস সৃষ্টি করছে কত লোকে।

ভেবে দেখুন তো, হরিণঘাটার অধরদন্ত খোলা দুগ্ধ গলাধঃকরণের পরে ফুটন্ত বাজার সেরে, বাড়ন্ত হাঁড়ির ভাত চেটে, ঘর্মাক্ত মানুষের দেহবাসে কুবাসিত ট্রাম-বাস চেপে অফিস হাজিরার চ্যারাকাটা খাতায় সই মেরে, সারাদিন পরিশ্রমের পর টিউশন পার্ট টাইম ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরে আসে যে কলকাতা, সে দানব তো নয়ই, এমন কি ঠ্যাঙাড়েও নয়। কী, আশ্চর্য হচ্ছেন না শুনে? কলকাতা এমন কি আশ্চর্যও হয় না।

কলকাতার ট্র্যাফিক আর কলকাতার মানুষ দুই-ই অদ্ভুত। যত ট্র্যাফিক, সে তুলনায় কোনো দুর্ঘটনা নেই। যত সমস্যা, বঞ্চনা, বুজরুকি, জোচ্চুরি, জোর-জুলুম, সে তুলনায় কলকাতা আশ্চর্য নরম।

আপনারা যে যাই বলুন, আমি বলব, কলকাতা, আজব শহর কলকাতা, আশ্চর্য নরম মানুষের বাসভূম। মন্দ লোকে তাকে মন্দ বলে

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ দুই ॥

না—একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমোন না মুরারি হালদার।

বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে চাকর বললে, 'একটু বসতে হবে, বাবু পুজোয় বসেছেন।'

এটা একটা খবর। প্রবীর ঠিক তৈরি ছিল না এ জন্যে।

'পুজো করেন নাকি?'

'আগে করতেন না।'—চাকরটা একটু চাপা হাসি হাসল কি না ঠিক বোঝা গেল না : 'গত বছর হরিদ্বারে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এসেছেন। সেই থেকেই—'

'বুঝেছি।'

চাকর চলে গেল, মুরারি হালদারের বাইরের ঘরে পুজো শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল প্রবীর।

এ ভালো—এই সব পুজো-টুজো। মন-প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, ইষ্টদেবতা খুশি থাকেন, নিজের কাজ-কারবারের দায়িত্ব শ্রীশ্রীঅন্ত-র্যামীর ওপরে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। আমি কে? নিমিত্ত মাত্র। তোমরা ভালোই বলো আর মন্দই বলো—আমি তো কিছুই করছি না। স্বয়ং হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—

এখন যদি হৃষীকেশ বলেন, মুরারি, লেবারগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে—ওদের আর নাই দিয়ো না—দাও কারখানা বন্ধ করে—মুরারি হালদার দিতে বাধ্য; যদি শ্রীভগবান আদেশ করেন—দাও গুণ্ডা পাঠিয়ে ইউনিয়নের দু-চারটে পাণ্ডাকে ঠাণ্ডা করে—সে আদেশ না মেনে কী করতে পারেন তিনি? যদি অন্তরে এই দৈববাণী এলে যে কারখানার জন্যে যে সব কেমি-ক্যালসের লাইসেন্স আছে—ভুয়ো হিসেব দাখিল করে সেগুলোকে চোরাবাজারে চালান করো—তা হলে সে নির্দেশ না মানবার আমি কে? জানামি ধর্মং, জানাম্যধর্মং—কিন্তু কী করা যাবে, যথা-নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।

এবং গুরু।

এখন সেফটি-ভাল্ভ আর কোথায় পাওয়া যাবে? বড়ো মামার কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক মতি-গতি ছিল, গুরুর চরণে শরণ নিয়েছিলেন তিনি। বলতেন, 'বুঝলি, গুরু করবার দারুণ সুবিধে আছে একটা। একবার শিষ্য হয়ে যা—তারপর তোর যা কিছু পাপতাপ তিনিই নেবেন হাত পেতে, তোর গায়ে আঁচটিও লাগবে না।'

তার মানে, গুরু স্লেনেজ নাকি? কিন্তু প্রশ্নটা মামাকে করা যায় নি তখন। মামা অত্যন্ত সিরিয়াস লোক। সেই মামা যখন একতলা স্টেট বাসের হাতল ধরে ঝুলে ঝুলে অফিসে আসবার সময় ধাক্কা খেয়ে সোজা চলে গেলেন চাকার তলায়, তখন তাঁর হয়ে গুরুই কেন চাপা পড়লেন না—এই জিজ্ঞাসাটা প্রবীরের জেগেছিল। কিংবা সবই হয়তো গুরুর লীলা, তিনিই তাঁকে শর্টকাট করে নিয়ে চলে গেলেন দিব্যধামে।

অতএব মুরারি হালদার গুরু করলেন এবং পুজোয় বসে গেছেন—আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এতে। আর টাকা-পয়সা বেশি থাকলে পুজো-টুজোয় মন বেশ নিবিষ্ট হতে পারে, রেশন-বাজার-মাসের শেষ—এ সবের নিতান্ত বাজে ভাবনাগুলো আর বিরক্ত করতে পারে না তখন।

আধ্যাত্মিক চিন্তার ঘোর কাটিয়ে প্রবীর সামনের টেবিল থেকে ইংরিজি কাগজটা টেনে নিলে। এই কাগজটা এক সময়ে নির্লজ্জভাবে ইংরেজের তাঁবেদারি করত—এইটেই ছিল তখন ব্যুরোক্রেসির আদি এবং অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর। স্বাধীনতা পাওয়ার পর এ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইণ্টেলেক-চুয়ালদের মুখপত্র।

সম্প্রতি দেশের জন্যে কাগজটি অতি চিন্তিত। প্রায়ই নানারকম রোমহর্ষক সংবাদ পরিবেশণ করে যাচ্ছে। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার দরকার নেই, পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। গোটা বাংলা দেশ এখন আদিগন্ত নর-খাদকদের লীলাভূমি, এ কাগজ তিনদিন পড়লেই সে ব্যাপারে আর সন্দেহ থাকে না।

কাগজটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একবার ভুরু কোঁচকালো প্রবীর। ইয়েলো জর্নালিজম্ বলে একটা কথা আছে ইংরিজিতে। কিন্তু কাকে বলে? ঠিক মনে করতে পারল না।

ভারী পায়ের আওয়াজ নামছে সিঁড়ি দিয়ে। প্রবীর চকিত হল। কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখল যথাস্থানে। তারপরে অপেক্ষা করতে লাগল।

গাড়িটা বের করতে বল্। একটু পরেই আমি বেরুব।'

এবং ঘরে মুরারি হালদার ঢুকলেন।

'আরে ভুলু যে! কী মনে করে?'

ছেলেবেলা থেকেই চেনেন—পাড়ার লোক। তা ছাড়া ভালো ইংরিজিগর্বিত পুরোনো গ্র্যাজুয়েট বাবার ধারণা ছিল, মুরারিবাবুকে আইডিয়াল ভাবা উচিত। সেলফম্যাড ম্যান। ছিলেন কোন্ লিটকে-

তোর ফার্মের কেরানী—সেখান থেকে ধাপে ধাপে—কোথায় উঠেছেন!

অবশ্য এই উত্থানটা প্রবীরের খুব ভালো লাগে নি। কিন্তু তার বাবা তাঁকে ভক্তি করতেন, দেখা হলেই একগাল হাসিতে নুয়ে পড়ে নমস্কার করতেন—এ কথাটা মুরারিবাবুর মনে আছে।

'কী খবর হে ভুলু?'—প্রসন্ন চোখ মেলে চাইলেন তিনি: 'আরে দাঁড়িয়ে পড়েছ কেন, বোসো—বোসো।'

বসবার আগে কয়েক সেকেন্ড দোটানায় দুলল প্রবীর। সন্দেহ নেই—এ সময় মুরারিবাবুকে দেখলে কেমন শির শির করে ওঠে গায়ের ভেতর, ফস করে একটা প্রণাম করে ফেলাও অসম্ভব নয়। খালি গায়ে নেমে এসেছেন, শ্যামবর্ণ রোমশ বুকে ধবধব করছে শাদা পৈতে, কপালে বেশ বড়ো একটি শাদা চন্দনের ফোঁটা। হঠাৎ মনে হয়, মুখখানা বেশ জ্যোতির্ময়, এখনো একটা ঐশ্বরিক ভাবের মধ্যে ধ্যানস্থ।

কিন্তু সেই বেয়াড়া বিরূপতা। একথা কিছুতেই মনে না হয়ে যায় না যে এই লোকটার মুখ দেখলেও সকালটা—

সামনা-সামনি ভারী চেয়ারটায় বসে পড়ে মুরারি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু কথা আছে নাকি?'

'আজ্ঞে—' বলতে আত্মগ্লানিতে জিভ জড়িয়ে এল। মা যদি সারাটা জীবন ধরে ভাত না খেতেন, যদি কান্না সমস্ত রাত জেগে চোখের জল না ফেলতেন, তা হলে—তা হলে! থানায় টুলুকে কম্বল ধোলাই দিলেও তার ভাবনার কিছু ছিল না, বরং মনে হত ওটা টুলুর পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে। কিন্তু মা—

'আজ্ঞে, টুলুকে ধরে নিয়ে গেছে, শুনেছেন বোধ হয়।'

'ও, সেই পানের দোকানে মারামারি? টুলুও ছিল নাকি তাতে?'

আত্মগ্লানিটা যন্ত্রণার মতো মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকল একটু।

'কী আর বলব বলুন।'

'আশ্চর্য!'—মুরারি ভুরু কোঁচকালেন: 'আশ্চর্য! তোমার বাবা কত যে আশা করতেন ওর ওপরে। ছেলেটা যে কী করে এমন বয়ে গেল!'

ঠিক কথা—কী করে এমন বয়ে গেল টুলু! তার তো কোনো দরকার ছিল না। সে তো সেই সব পরিবার থেকে আসে নি—যেখানে ছিন্নমূল কতগুলো অগোছালো সংসারে প্রত্যেক দিন ক্ষোভ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, প্রতিবাদ আর নৈরাজ্য চেতনা জন্ম নেয়—যেখানে ইতিহাস দিনের পর দিন উশুল করতে থাকে তার দেনা। তারা তো উদ্বাস্তু নয়। যত ছোটই হোক, এ তাদের পৈতৃক বাড়ি। বাবা যা চাকরি করতেন, তাতে একটু টানাটানি হয়েও এশিয়ার সম্ভাব্য বেস্ট স্কলারের জন্যে এম-এ, এম-এসসি পর্যন্ত খরচ চালাতে পারতেন তিনি। অথচ—

অথচ।

আসলে, বাতাসটাই কালো হয়ে যাচ্ছে। কারো নিস্তার নেই। বস্তিতে এপিডেমিক লাগলে পাশের প্রাসাদের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিয়েও ব্যাকটেরিয়াকে ঠেকানো যায় না।

প্রবীর জবাব দিতে পারল না। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল।

'ভারী দুঃখের কথা!'—মুরারিবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করলেন।

'মা বলছিলেন—' প্রবীর গলাটা পরিষ্কার করল একটু: 'আপনি যদি থানার ও-সি গৌরবাবুকে একটা চিঠি দেন—'

মুরারির চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে এল।

'কেন হে, তোমাদের লোক্যাল এম-এল-এ—'

ছোট্ট খোঁচা একটা। এই এম-এল-এটিকে মুরারিবাবুর পছন্দ নয়। তাঁর কারখানার বেয়াড়া শ্রমিকগুলোর সঙ্গে সে ভদ্রলোকের রাজনৈতিক আঁতাত আছে। এবং—গত ইলেকশনের সময় প্রবীর তাঁর পোলিং এজেন্টের কাজ করেছিল, ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও মনে আছে মুরারিবাবুর। তাঁকে এ-সব অনেক খুঁটিনাটি মনে রাখতে হয়—না হলে এমনভাবে ওপরে উঠতে পারতেন না।

প্রবীর একবার ভাবল, এর পরে উঠে পড়া যেতে পারে। কিন্তু মা! কী আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়েই মেয়েরা জন্মায়!

'আজ্ঞে আপনিই তো পাড়ার মুরুব্বি'—গলার স্বরটা নিজের কানেই নির্লজ্জ চাটুকারের মতো ঠেকল: 'মা বললেন, আর কাউকে দিয়ে কিছু হবে না। আপনিই যদি—'

মা এতটা বলেন নি। কিন্তু চারদিকে বাতাসটা কালো হয়ে যাচ্ছে। টুলু কী হয়ে গেল! তাকেও নিচে নামতে হচ্ছে।

'আপনি যদি একটা চিঠি—'

'চিঠির দরকার নেই, ফোনে বলে দেব এখন।'

'তা হলে তো আরো ভালো হয়।'

বলতে ইচ্ছে করল, দয়া করে ফোনটা যদি এখনি করেন! কিন্তু অনুগ্রহের ওপর অতটা চাপ দেওয়া যায় না।

কিন্তু অনুগ্রহ মুরারি হালদার নিজেই করলেন।

'কিছু ভেবো না হে। তুমি বললে, আমি শুনলুম। এর পরে যা করবার আমিই করব। তা ছাড়া পাড়ার লোক। এ তো আমাদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।' মুরারি গলা তুলে ডাকলেন: 'গাড়ি বের করেছে?'

চাকরটা এসে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়।

'আজ্ঞে।'

তার মানে মুরারি হালদার এখুনি বেরুবেন। আর তাঁর সময় নষ্ট করা যাবে না। মা তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে ভালোই করেছেন দেখা যাচ্ছে। আর একটু দেরি হলেই ধরা যেত না ত্রাণকর্তাকে।

কিন্তু ফিরে গিয়ে মা-কে কোনো একটা ভরসা দেওয়া দরকার। নইলে সারাদিন না খেয়ে বসে থাকবেন হয়তো। পাখিবীজুড়ে মায়েদের এত মমতা, এত চোখের জল। তাতেও চারদিকের সব কালো ধুয়ে-মুছে কেন নির্মল, উজ্জ্বল হয়ে যায় না?

উঠে পড়ে প্রবীর বললে, 'আমি কি আর একবার খবর নেব?'

'দরকার হবে না। বললুম তো, শুনে রেখেছি, এর পরে যা করবার আমিই করব। তবে—' একবার থামল: 'ইচ্ছে করো তো একবার আসতে পারো সন্ধ্যের দিকে।'

'আজ্ঞে, আচ্ছা।'

বেরিয়ে যেতে যেতে একবার মনে হল, এরপরে একটা প্রণাম করা উচিত ছিল কি না মুরারি হালদারকে, ভক্তির জন্যে না হোক, অন্তত কৃতজ্ঞতার খাতিরেও! আর মুরারি হালদার সেটা প্রত্যাশা করে-ছিলেন কি না?

কিন্তু নাঃ, কিছুতেই প্রবৃত্তি হল না।

অতএব বাড়ি ফেরা এবং মা-কে বিশদ বিবরণ জানানো।

আবার ছায়ায় ভরে গেল মা-র মুখ। হতাশ চোখ মেলে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

'তার মানে, ছেলেটাকে আজো ছাড়বে না?'

'আমি কী করে বলব?'

'হাজতে হয়তো মারধোর করছে, হয়তো খেতেও দেয় না—'

না—মা-র ওপরে বেশিক্ষণ কোমল হয়ে থাকা শক্ত। মুরারি হালদারের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার গ্লানিটা মনের ভেতরে জ্বালা

[illegible] [illegible]। আর এই [illegible] জন্যে।

'দ্যাখো মা, সব জিনিসের লিমিট আছে একটা। মস্তানি করবার সময় খেয়াল ছিল না? [illegible] তো আর [illegible] নয়। পেটে আসুক না বাবা[illegible], ওর পক্ষে সেটা জানাই হবে।'

মা একেবারে চুপ।

এখন বাড়িতে বসে থাকবে দম আটকে আসতে চাইবে। মা আর কথা বলবেন না, একটা কথাও জিজ্ঞেস করবেন না আর, শুধু বুদ্ধিহীন স্নেহ আর বোবা দুঃখের ভার নিয়ে বাড়ির সব আবহাওয়াটাকে ভারী করে তুলবেন আরো। অসম্ভব, সহ্য করা যাবে না। তার চেয়ে বেরিয়ে পড়া ভালো।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো একবার।

'এখন সাড়ে নটা। আমি একটু বেরুচ্ছি মা। ঘণ্টা দুই পরে ফিরে আসব।'

মা সেই হতাশ গলায় বললেন, 'আচ্ছা।'

রবিবারের পথ। কলকাতা ফাঁকা। বাইরে থেকে কত মানুষ পেটের দায়ে বাকী ছটা দিন পথে পথে ভিড় জমায়, এই ছুটির দিনে খানিকটা আন্দাজ করা যায় তার।

বাসের দরকার ছিল না। ঢাকুরিয়া থেকে রেল লাইন পেরিয়ে একটু সোজা পথে এলেই বালিগঞ্জ। তারপর সাদার্ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] পাতায় ঝিরঝিরে।

এই রাস্তায় দিদির ফ্ল্যাট। পুব-দক্ষিণ খোলা। 'খুব একটা বেশি নয়—ভাড়া মোটে সাড়ে পাঁচশো—' মনীশদা বলেছিল একবার। মনীশদা তাদের ভগ্নীপতি।

ভাই-বোনদের ভেতরে দিদিই বুদ্ধিমতী সবচাইতে। কলেজে পড়বার সময় এক বছরের সিনিয়ার মনীশদাকে বিয়ে করেছিল ভালোবেসে। দিদির হিসেবী চোখ। সে দেখেছিল, মনীশদা-র বাবা বেশ নামকরা অ্যাটর্নি, মনীশদা নিজেই একটা গাড়ি ড্রাইভ করে কলেজে আসে। চেহারা মোটা, গোলগাল, বেঁটে, তখনই মাথায় টাকের আভাস। তা ছাড়া দিদির চেহারা ভালো, বেশ ভালো। এক-আধটু নাচও শিখেছিল।

কাজেই সে মনীশদাকে বিয়ে করে এসেছিল। বাবা তখন অফিস থেকে ফিরে, চা খেয়ে, খবরের কাগজ খুলে, অ থেকে [illegible] ভুল ইংরিজি বের করবার [illegible] চর্চায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় দিদি মোটর থেকে নামল মনীশদার সঙ্গে।

'আশীর্বাদ করুন বাবা, আমরা বিয়ে করেছি।'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] সন্তানের [illegible] [illegible] দিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা।

ইন্টেলেকচুয়াল বাবাও এতটার জন্যে তৈরি ছিলেন না। প্রথমে গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুল তাঁর। তারপর বললেন, 'ও! তা বেশ—বেশ!'

অন্তঃপুরে 'ইডিয়ট' মা একটু কেঁদে ফেলেছিলেন।

[illegible] [illegible] ছিল, এ যে একেবারে—'

বাবা বললেন, 'তোমরাও!'

কাঁটা যে তাঁরও বিঁধছিল না তা নয়, কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল হওয়ার ল্যাঠা অনেক। সমস্ত কুসংস্কার সম্পর্কে কঠিন ভাষায় ধিক্কার দেওয়া যায়, কিন্তু নিজের ওপর ঘা-টা এসে পড়লে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা লাগে প্রথমটায়।

দিদির হিসেবে ভুল হয় নি। মনীশদা-ও অ্যাটর্নি। উত্তর কলকাতার সেকেলে বনেদী বাড়িতে লোকের খিচির-মিচির, ব্যাকডেটেড্ চাল-চলন বেশিদিন ভালো লাগল না। দিদিই ভালো লাগতে দিল না খুব সম্ভব।

তারপর দক্ষিণ কলকাতার এই ফ্ল্যাট। বেশি নয়—ভাড়া মাত্র "সাড়ে পাঁচশো!" মনীশদার মতে 'র‍্যাদার চাপ।' নতুন গাছের সতেজ পাতায় ঝিরঝির শব্দ। ছিমছাম পথ, সঠাম বাড়ির সার। দু' পা বাড়ালে সাদার্ন অ্যাভিনিউ। তারপর লেক।

কী তফাৎ ওদের ঢাকুরিয়ার সঙ্গে! সেখানে কাঁচা ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ঘরবাড়িগুলো যেন এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। গাছগুলো পর্যন্ত বুড়োটে, তাদের ড

আজ দিদির ফ্ল্যাটে ওঠবার আগে সামনের সাদা দেওয়ালে একবার চোখ পড়ল তার। কতগুলো কালো কালো প্রকাণ্ড অক্ষর। নিষ্কৃতি নেই—এখানেও না।

"নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও—"

"শ্রীকাকুলম্ জিন্দাবাদ—"

প্রবীর একটু হাসল। উঠে গেল তেতলায়।

মস্তবড়ো সিটিং রুমে তখন রেডিওগ্রামে বাজছিল 'অলিভারের' গান। আর তার তালে তালে নাচছিল দিদির বড়ো মেয়ে টিনটিন।

[ক্রমশঃ]

গোর্কি, নিশানানির্দেশ ও বাংলা সাহিত্য

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

"আমরা এ-সব মানব না, ধিক্কার দিই এসবকে।"

একদিন কল্লোলীয় সাহিত্যিকদের কণ্ঠে এই ধ্বনিই সোচ্চার শোনা গিয়েছিল এই বাংলা দেশে। একদিন বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা যে অগ্রজের অটল বিশ্বাসকে অনায়াসে দূরে ঠেলে ফেলে রেখে, অপসর স্বপ্নকল্পনার যবনিকাপাত করে, তথাকথিত জীবনযাপনের শ্রেয়োবোধকে পরিত্যাগ করে নেমে এসেছিলেন পথে, সাধারণ মেহনতী মানুষের মুখর মিছিলে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কণ্টকিত বেদীতে; লিখেছিলেন কয়লাকুঠির কাহিনী, শুধু কেরানী, ভুখা ভগবান, যেদিন তারা কথা "বলবে"র মতন সব রচনা, তার পেছনে যে নির্দেশিকা শক্তি কাজ করেছিল—তা হলো গোর্কির রচনা। মহান গোর্কি সেদিনকার তরুণ বাঙালী লেখকদের কাছে ছিলেন এক অন্যতম প্রেরণা।

কল্লোল এসেছিল "অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতার, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তের সংসারে, কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাথে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।" বলা বাহুল্য, এই এলাকায় সেদিনের তরুণ বাঙালী লেখক প্রবেশ করেছিলেন গোর্কিরই হাত ধরে। যুবনাশ্বের চোখে যে জ্বলেছিল তিরস্কারের বহ্নি, নজরুলের রচনায় সাম্যবাদী সুর, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্পে যে সমাজসচেতনতার আভাস দেখা গিয়েছিল সেইদিন তার নিশানা নির্দেশ এসেছিল গোর্কিরই কাছ থেকে।

শ্রীসরোজ আচার্য বলেছেন,—"যাকে বলা হয় সমাজসচেতনতা, সে কেবল একটা বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রকাশ পদ্ধতি নয়, গোটা জীবনদর্শনের গতি নির্দেশক। এ নির্দেশ স্বভাবতই শুধু রাজনীতিতে নয়, সাহিত্য-শিল্পকর্মেও নতুন ভাবনা, নতুন দায়িত্ববোধের প্রেরণা দিয়েছিল।"

ভারতী গোষ্ঠীর ভাবালুতা, ...কারজনক কর্তাভজা মনোভাব ও মানুষের বাঁচার লড়াইকে অস্বীকার ...ন বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত প্রচেষ্টা ...খন কল্লোল এলো বাংলা সাহিত্যের ...দ্ধ দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত হেনে ...ই সব জীবনযাত্রার মিছিল ও নরনারীর ভিড় সঙ্গে নিয়ে যাদের দেখেছি ...র্কির রচনায়।

"কারখানার সিটি বেজেছে আর আমার আখ্যানও শুরু হল।"

শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির গল্পের এই সূচনার নেপথ্য নির্দেশ কি গোর্কির কাছ থেকে আসে নি?

নির্দেশ অনেক রকমের হতে পারে। সরাসরি গোর্কির গ্রন্থ অনুবাদের মধ্যেও এ ধরনের নির্দেশের আভাস পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোর্কির "মাদার" উপন্যাস এবং অন্যান্য অনেক রচনা অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদকর্মে বিমল সেনের নামও পাওয়া যায়। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও নিষ্ঠার সঙ্গে গোর্কির মানুষের জন্ম, চেলকাশ, বুড়ি ইজেরগিল ইত্যাদি গল্পের অনুবাদ করেছিলেন।

আর অনুবাদকে যদি কোন ভাষার

গোর্কি

সাহিত্য সৃষ্টির স্থায়ী অধ্যায়ের সূচক বলে স্বীকার করতে আপত্তি না থাকে—থাকা উচিত নয় অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কেন না ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য তো মূলত অনুবাদ সাহিত্যই তাহলে গোর্কি অনুবাদকেও বাংলা সাহিত্যেরই একটি অক্ষয়সম্পদ বলে মানতে হবে।

একালে অবশ্য গোর্কি বাংলা সাহিত্যের নানা দিকে নানাভাবে নিশানা নির্দেশ করেছেন। সে আলোচনায় আমরা পরে আসছি। তবে কল্লোলীয় জীবনবোধের সঞ্জীবিতা বলে যদি কাউকে আখ্যাত করতেই হয় তিনি হলেন গোর্কি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আর অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ছিলেন কল্লোলীয়দের পুরোধা। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের মধ্যে ন্যুট হামসুনের প্রভাবের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন! তাহলেও বেদেনীর অনুপ্রেরণার নেপথ্য রাগ যে গোর্কিরও হতে পারে এমন একটা সংশয়কে পুরোপুরিভাবে বর্জন করা যায় না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে গোর্কির প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে সুধী সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই লিখেছেন,—"প্রেমেন্দ্র মিত্রের পীড়িত প্রবঞ্চিত যুগব্রাত্যদের প্রতি সহানুভূতি "শুধু কেরানী" রচনার পূর্বেই সংকেতিত হয়েছিল তাঁর "পাঁক" উপন্যাসে। নিম্নমধ্যবিত্তদের বেদনাভূমিতে পৌঁছুবার আগেই আরো নীচের দিকে—আরো "Lower Depths"-এ তিনি অবতরণ করেছিলেন। বস্তিবাসী, নিম্নশ্রেণীর গণিকা, চোর, হিন্দুস্থানী গৈধাওয়ালী, ঘমণ্ডী এবং তার ছাগলের দুধ-ব্যবসায়িনী স্ত্রী ('মোটবারো')—এরা প্রত্যেকেই তাঁর সাহিত্যে সহানুভূতির নৈকট্যেও পর্যবেক্ষণের নৈপুণ্যে আপনি স্বার্থক হয়ে উঠেছে।

এই নীচের তলার সঙ্গে মর্মসম্বন্ধ কল্লোলীয়দের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ।... এর পেছনে তাঁদের যুগমানস এবং হামসুন-গোর্কির প্রভাব সহজভাবে উপস্থিত ছিল।"

এরও আগে গোর্কির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যে মানব প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে তিনি গোর্কির মতন আরও নিম্নতর ক্রন্দনের সান্নিধ্যে নেমে আসতেই নির্দেশ করেছিলেন তাঁর উত্তরসূরীদের।

গোর্কির প্রতি আনুগত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও ধরা পড়বে। "সাহিত্য করার আগে" গ্রন্থের এক স্থানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—"হ্যামসুনের দু-একখানা বই পড়েছিলাম। প্রেমেনবাবুর এই চিঠি পড়ে গোর্কির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করতে যাই। মনে আছে, 'মাদার' পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—।"

কল্লোলীয়রা ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রগতিবাদী সকল সাহিত্যিকরাই বেশি-কম গোর্কির নিশানা নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং গ্রহণও করেছিলেন।

একালের বাংলা ভাষার লেখক এবং বাঙালী লেখকদের উপরেও তাঁর প্রভাব রীতিমতভাবে পড়েছে। নাট্যকার উমানাথ ভট্টাচার্য গোর্কির "লোয়ার ডেপথস"-এর

স্মৃতির ভেতরে

জয়ন্ত সাহা

গলিয়ায় কেনা এক ফালি ম্যাপ
পালানের পাশে বসে আমি ও পীযূষ
ভাগ করে নিয়েছি দুজনে।
যেতে যেতে পেছনে তাকালে
ঘুরে যায় চোখের চাহনি
আঁকাবাঁকা পথ
কুমার নদীর বাঁকে ছোট ছোট ডাঙা
পদ্মার উজান ঠেলে ইলিশের ঝাঁক
মেঘনার কালো জল, ঢেউগুলো
পাহাড়ের মত।
আরো দূরে স্মৃতির ভেতরে
ছুটোছুটি তাতাপোড়া রোদে
লুকোচুরি খেলা
কতবার দীঘি পাড় করেছি সাঁতারে;

নুনে ভেজা পিরানের জেবে
কসি আম চাছার ঝিনুক
ডাংগুলি জাম্বুবার বল
বেখুনের ঝোপে বসে আমি ও পীযূষ
নীল নাচ কালী কাচ গল্পে সারা দিন।

এখন শহরে ছোপ ছোপ তেলকালি।
পিরাণের জেবে
গেটপাস, জবকার্ড
.......................আরেক বাংলা।
বেলা যত বাড়ে তত কালবেলা
দুচোখে কুয়াশা
স্মৃতির ভেতরে ম্যাপ
.......................শুধু ধুলো জমে।

প্রেরণাতে রচনা করেছেন তাঁর নিচের মহল নাটকটি। 'মাদার' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আরও গল্প ও উপন্যাসের অনুবাদ এবং নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা চলতে দেখেছি বাংলা ভাষায়।

সম্ভবত সুখের কথা।

গোর্কির প্রভাব ও অনুপ্রেরণা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বাঙালী লেখক, সুপরিচিত ঔপন্যাসিক ডঃ ভবানী ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন—"ম্যাক্সিম গোর্কি ছিলেন গণসাহিত্যের পথিকৃৎ। বহু ভারতীয় লেখকের কাছে তিনি হলেন মহান পথ-নির্দেশক। যে আবেগদীপ্ত মানবতাবাদ নিয়ে তিনি তাঁর চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন, তা আমাদের সাহিত্যিক রীতি-কৌশল গঠনের পক্ষে অর্থপূর্ণ। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।"

এখানে "সাহিত্যিক রীতিকৌশল গঠন"—সম্পর্কিত অভীপ্সাটিকে গুরুত্বপূর্ণ নিশানা নির্দেশ বলে স্বীকার করতে হবে।

বাংলা সাহিত্যে যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী লেখকদের রচনার মধ্যে—যে সহানুভূতিশীল দৃষ্টি পংক্তিহীন ব্রাত্যদের জন্যে কল্লোলীয়দের পরবর্তী লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল মিত্র, বিমল কর এবং প্রধানত সমরেশ বসুর মধ্যে একদা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তা গোর্কিরই নিদর্শনা প্রসূত ফলশ্রুতি বলে চিন্তা করা বোধহয় অসঙ্গত নয়।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক এবং রমাপদ চৌধুরীর কিছু কিছু রচনাতে গোর্কির নিশানা নির্দেশ দেখতে পেয়ে যখনই খুশি হওয়া যায় তখনই তাঁরা সহসা বাঁক ফিরে দাঁড়ান মনোরম কুয়াশার দিকে—তাতে মানুষের হীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কতটা সম্ভব, তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারেরা আজ প্রগতি লেখকদের দলে নাম লিখিয়েছেন যদিও বা, তথাপি যথেষ্ট অনুশীলন ছাড়া তাঁরা যে কোনদিনই সফল হতে পারবেন না, সংগ্রামের হাতিয়ার তুলে ধরতে পারবেন না সর্বহারাদের হয়ে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কল্লোল থেকে নবকল্লোল-এ হাজার যোজন ব্যবধান। দীক্ষিতের ধন ছিল কল্লোল। আর নবকল্লোল জাতীয় পত্র-পত্রিকায় কিছু সফরী এবং ঐতিহ্যভ্রষ্ট, স্বধর্মচ্যুত জড় সাহিত্যিকদেরই মাতা-মাতি। তাঁদের কাছ থেকে মহৎ কিছু আশা করাই অন্যায়।

কি লাভ তাঁদের বলে,—

"We appear as the Judges of the world condemned to perish, and as men who affirm a real humanism, a humanism of the revolutionary working class, a humanism of the people surrounded by history to liberate the whole world of those who toil from envy, venality and all those vices which have for centuries distorted men who live by their labour.

We are the enemies of property, the base and terrible goddess of the capitalist world, we are the enemies of all the zoological individualism which is the declared religion of that Goddess ?"

বর্তমানের বাংলাভাষার লেখকেরা বোধহয় উপরের কোন কথাই শুনতে রাজী নন। তাহলে যে মুশকিল হবে উঠবে লেক টাউন, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স ইত্যাদি অভিজাত পল্লীতে বসবাস।

জনতার কথা বলতে হয়তো আপত্তি নেই তাঁদের। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ঐক্যমত হওয়া, একত্রে সামিল হওয়া—সে কি কথা মশাই? এ কি আবদার?

গোর্কির "মাদার" এককালে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে পাওয়া যেত; সন্ত্রাস-বাদীরা সন্ধান করতেন প্যাভেলের মা নিলোভনার মত সর্বংসহা বৈপ্লবিক সাধনায় উদ্বুদ্ধ সর্বসমর্পিতা বীরজননীকে। কিন্তু এখন সে সবে কি লাভ?

হয়তো এমন কথাই ভেবে থাকবেন বাংলা সাহিত্যের পুরোধা সাহিত্যিক শিল্পীরা। অসম্ভব নয় কোন কিছু। কিন্তু নতুন দিনের যাঁরা বার্তাবহ—যাঁরা ভবিষ্যতের লেখক বাংলাভাষার তাঁরাও কি গোর্কির এই নিশানা নির্দেশকে অগ্রাহ্য করবেন?

অবস্থা পাল্টাবে। অবশ্যই। কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে গোর্কি অপরিহার্য তাকে স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে যাবেন না সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং দায়িত্বশীল বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা।

জানি, তাঁরা তেমন শক্তিশালী নন। জানি হাতে তাঁদের তেমন পত্র-পত্রিকা নেই। আর দুর্ভিক্ষের দিনে অভুক্ত পাঠক প্রকৃত সার্থক রচনার অভাবে, নামী লেখকের হাতের কতাপচা অখাদ্য কুখাদ্য খাবার জন্যই পাকস্থলীকে [illegible] করে নিয়েছেন। তবুও সুখাদ্য [illegible] এবং নতুনদের হাতেই একমাত্র [illegible] পারেন তাঁরা; তাকেও গ্রহণ করবেন না এমন ভাবনাই আত্মঘাতী। ঠিক [illegible] গোর্কি আমাদের [illegible] [illegible] আশা রাখতে শিক্ষা দিয়েছেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ উপক্রমণ ॥
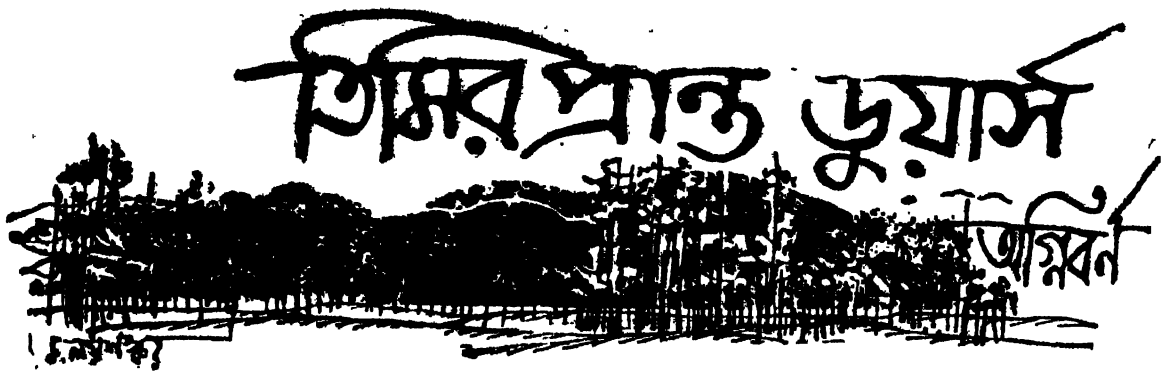
সভ্যতার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বনভূমির আছে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা। ডুয়ার্সের মাটিতে পা দিয়ে থেকে কথাটা গভীরভাবে অনুধাবন করি। মানুষ নিজের প্রয়োজনে গড়ে নি তাকে, সে প্রকৃতিপ্রদত্ত দান। এই সমস্তটা অঞ্চলের প্রান্ত জুড়ে সৃষ্টির প্রথম উষালগ্নে কবে যে সে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তারপর থেকে দাঁড়িয়েই আছে। তার ভয়ঙ্কর বুক জুড়ে হিংস্র জীবজন্তুদের মাতামাতি, আদিম আরণ্য-উল্লাসের ভয়াবহ বিভীষিকার মারণ-মাতন আজো অব্যাহতভাবেই আছে। নিষ্ঠুর পরিত্যক্ত প্রান্তর ছিল জায়গাটা। বলা চলে মানুষ-বাসের উপযুক্ত ছিল না। তবু অসহায় নিভ্রান্ত যারা সেদিন এসব অঞ্চলে বাস করত, মৃত্যুর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তেই ছিল তাদের ভয়াবহ মোকাবিলা। আর এই সব অরণ্যের দুর্জয় পাহাড়ী-প্রান্তরে ছিল ভুটিয়াদের অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা ও নির্যাতন। এমন কি কুচবিহার রাজ্যও তাদের আক্রমণের তীব্রতা থেকে মুক্তি পায় নি।

সেসব কথা আছে ইতিহাসে।

কিন্তু ইতিহাস তো শুধু বই-এর পাতায় নয়, এ অঞ্চলের ইতিহাস ফেরে নানা দলিলপত্রে, নানা লোকের মুখে মুখে। নানা প্রাচীন মানুষের রক্ত-জমানো অভিজ্ঞতার কাহিনীতে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে এখানকার নতুন আগন্তুকের চোখে বিস্ময়ের পলক পড়ে না। শহুরে মানুষ কিন্তু কখনো কচিৎ বেড়াতে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আকাশে-বাতাসে নানা সৌন্দর্য ও প্রাণের লীলা দেখে মুগ্ধ হয়। এত সবুজ, এত সহজ, তাজা প্রাণের উচ্ছলতা দেখা যায় চোখে। বনভূমির বাইরে দাঁড়িয়ে সে ক্ষণে ক্ষণে দেখে সৃষ্টির নানা রূপায়ণ। ঋতুতে-ঋতুতে নানা রূপবদলের লীলা!

কিন্তু বিষয়ী মানুষও আছে। আছে বাস্তব মানুষের প্রতিভা। সভ্যতার ক্রমোন্নতির উজ্জ্বল্য ও সমৃদ্ধি বিস্তারের প্রয়োজন। চাই কাঠ। সভ্যতা মানেই তো ইট আর কাঠ। মাথা গোঁজার আস্তানা। গোলা-বাড়ি, ফ্যাক্টরী-বাড়ি, কল-কারখানা, অফিস-কাছারী। আদিম মানুষ অসহায় হয়েই পৃথিবীতে এসেছিল। বানরের মত সত্যি সত্যি বৃক্ষে আরোহণ করতে হত কি না জানি না। কিন্তু গাছের কোটরে আত্মগোপন করতে হত। বৃক্ষচ্ছেদন করে আর কাঠের সাহায্যে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হত। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছিল কাঠ। আগুন জ্বালাতে শিখেও কাঠের অন্য প্রয়োজন জেনে গেল। শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচবার জন্যে জ্বলতে লাগল অরণ্যের কাঠ। আগুনের আলো দেখে পালাতে লাগল বুনো হাতী, জংলি বাঘের মত জানোয়ার।

ততদিনে কিন্তু সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছে মানুষ। পা বাড়াচ্ছে। সভ্যতার সেই শৈশব। ঘর বাঁধছে মানুষ। আঙিনা ঘিরছে। বাড়ছে সংসার ও সমাজ। আর সেই প্রয়োজন মিটিয়েছে অরণ্যের বৃক্ষরাজি। তার ডালপালা।

এমনি করে গড়ে উঠতে লাগল বস্তি। মানুষের বসতি। ছোট ছোট গ্রাম। ক্রমে তা থেকে বড়। আরো বড়। কৃষি ও বাণিজ্যসূত্রে অর্থবৃদ্ধি ঘটল। সমৃদ্ধি আসল। কিছু কিছু মানুষের প্রয়োজনে দেখা দিল শহর, বন্দর ও নগর। সেখানেও মানুষের প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে নিত্যসঙ্গী কাঠ।

লিখতে বসে দৃষ্টি ফেরাচ্ছি সংখ্যাতত্ত্বের দিকে। ভারতবর্ষের বনসম্পদ সম্পর্কে কি লিখেছেন সংখ্যাতত্ত্ববিদরা? বাস্তবিক, অরণ্য-সম্পদ তার আগ্রহ ও গর্বের বস্তু। সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ভারত নামক বিশাল দেশের মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ ২·৬৯ লক্ষ বর্গ মাইল। দেখা যাচ্ছে তাহলে তার মোট স্থলভূমির শতকরা ২১·৩ ভাগ।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের তরাই আর ডুয়ার্স তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

সেই প্রয়োজনে ডুয়ার্সকে ভালো করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। আগেই বলেছি, ডুয়ার্সের উত্তরে হচ্ছে দার্জিলিং জেলা ও ভুটান। সংকোশ নদী এর পূর্ব সীমায়। এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণের দিকে কুচবিহার ও অতীতের বৈকুণ্ঠপুর পরগনা, অর্থাৎ বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলা। পশ্চিমে তার সীমা তিস্তা নদী।

এরই মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলে ডুয়ার্স। জলপাইগুড়ি জেলার মাল, নাগ্রাকাটা, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, মাদারীহাট, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার এবং কুমারগ্রামের বিস্তৃত এলাকায় প্রসারিত এই অঞ্চল।

এর সবটাই অবশ্য বনভূমি নয়। তবে বনভূমির অপভ্রংশ বলা চলে। আদিতে

যাই থাক, বর্তমানে এর অনেকটা অংশ জুড়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ ও তার লোকালয়ের বিস্তার। দোকান-বাজার, হাট-গঞ্জ, কোর্ট কাছারী, ইস্কুল-কলেজ, পথঘাট আর বসতবাড়ি মধ্যে মধ্যে। তার পিঠে লেগে আছে সবুজ অরণ্য। অরণ্য আর পাহাড়। ট্রেনে যেতে যেতে চোখে পড়ে অরণ্য। অরণ্য কেটে কেটে পথ। রেলওয়ে লাইন, ব্রীজ। পাহাড়ী পথ। চড়াই-উৎরাই। পাহাড়ী নদীগুলির পাড়ে পাড়ে নেমে-আসা অরণ্যভূমি। অরণ্যের ভিতরে প্রবাহিত হিংস্র নদীগুলি। কত দূর-দূর বনভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সারা বছরই প্রায় নদী-গুলির জলহীন চেহারা। শুধু বালুকা-ভূমির বিস্তার। বালু চিক্‌চিক্‌ করে রোদে। যতদূর চোখ যায়। মধ্যাহ্নের খর-রৌদ্রে বড় বেশি চোখ ধাঁধায়। কদাচিৎ চিলের ডাক তন্দ্রা ভঙ্গ করে জনপদের। নদীর তীরে তীরে দাঁড়ানো জংলি ফুল-গাছের সভা। কত কাঁটাবনের ঘনসংবদ্ধ ব্যূহ। দূরে দূরে শাল-সেগুনের বন। দেবদারু, কদম, শিরীষ, সীজা, গামারি, শিমুল, পিপুল, হরীতকী, অর্জুন, খয়ের —কত বিচিত্র গাছের মিছিল।

বর্ষায় খরক্ষিপ্রা হয় নদীগুলি। পাহাড়ের বৃষ্টির জলে ফুলে-ফেঁপে অগ্নিমূর্তি হয়ে ধেয়ে আসে। তখন তার চেহারা দেখে ভয় হয়। বুকের ভিতরেও আলুথালু মাথা কোটে রক্তের নদী। জংলি নদীর বন্য দুর্বার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে আসে বড় বড় গাছ। উড়িয়ে নিয়ে যায় ক্ষিপ্র খরস্রোত। কংক্রীটের ব্রীজকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধার গ্রাস কেড়ে নেয় নির্মম হাতে। ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-জমি রাক্ষসী ক্ষুধায় গিলে খেয়ে নিয়েও তার খাঁই মিটতে চায় না।

ডুয়ার্সের উত্তরভাগের বিস্তৃত অঞ্চল হচ্ছে তিস্তা ও তোর্সা নদীর মধ্যবর্তী এলাকা। ভুটান-হিমালয়ের সর্বদক্ষিণ পাদদেশে এই অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত। তোর্সার পূর্বদিকে দাঁড়ানো সিঞ্চুলা পাহাড়।

হিন্দুস্থান ও ভুটানের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে দু'দেশের সীমা নির্ধারণ করেছে। তিস্তা ও তোর্সার মধ্যভাগবর্তী ডুয়ার্সের উত্তরাঞ্চল একদা ছিল দুর্জয় ঘন ঘাস ও জংলি লতা-পাতার রাজত্ব। শিল্পপ্রয়াসী মানুষের হাত নিষ্ঠুর তাগিদে বন-অরণ্যভূমিকে কেটে কেটে করেছে পরিষ্কার। জঙ্গল সরিয়েছে, আগাছা সরিয়েছে। ঘাস-লতা-পাতা ও নানা কীট-কীটানুদের ধ্বংস করেছে। সবল হাতে। ছিল হিংস্র মশক-কুলের সুতীব্র দংশন। আর দিনরাত্রি অন্ধকার হয়ে থাকা আকাশ থেকে মাসের পর মাস অজস্র বৃষ্টিধারার বর্ষণ। গড়ে উঠল সেখানে চা-বাগানগুলি।

আজ যেদিকেই তাকাও, ছবির মত সরল ও সুন্দর রাস্তাগুলি নানাদিকে। পীচের চকচকে রাস্তাগুলির ধারে ধারে জ্বলে আলো। চলেছে ঝকঝকে গাড়ি-গুলি। আকাশে দাঁড়িয়ে পাহাড়। বাগানের পাশে-পাশে বন। আম, কাঁঠাল থেকে শুরু করে সবরকমের গাছ। বনের মাঝে মাঝে লোকালয়। আদিবাসীদের বস্তি। বস্তির সামনে মুর্গী ছুটে বেড়াচ্ছে, মোরগ ডাকছে। খানিকটা পরিষ্কৃত কর্ষিত জমিতে উৎপাদিত হয়েছে ধান। তামাকের বড় বড় পাতাগুলি। মাটি থেকে লতিয়ে উঠেছে সিমগাছ। সরষের হলুদফুল-বিছানো প্রান্তর। ছোট ছোট আদিবাসী শিশুগুলি খেলে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে। কচিৎ-কচিৎ ছোট ছোট ঝোরার জলের সংকীর্ণ স্রোতোরেখা।

ডুয়ার্সের বনাঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে যুগের সমীক্ষক মুক্তকণ্ঠঃ "The chief characteristic of the Duars is the numerous rivers and hill-streams which intersect it in every direction, and the large tracts of Sal forests, heavy grass, and reed jungle, mixed with wild cardamom that lie on the north, principally between the Toarsa and Sonkos rivers. ....The grandeur of the scenary is enhanced by the blue hills of Bhutan, which form a splendid background."

কৃষিক্ষেত্র ও পাহাড়ের মাঝামাঝি ডুয়ার্সের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির অবস্থান। এই সব বনভূমিগুলির সৌন্দর্য যে-কোন মানুষকে মুগ্ধ করে। Mr. D. H. E. Sunders-এর নিম্ন-লিখিত উক্তিগুলি এ প্রসঙ্গে পঁচাত্তর বছর পরেও স্মরণ করতে বলিঃ "Here high Sal, Saj, Champ, Sida and the other trees grow luxuriantly and line both sides of the road while their branches produce a delightful shade when the sun is powerful. Loiter on this road, and you see red jungle fowl feeding on whatever it can find on the open ground, while during the months of April to September, butterflies, with gorgeous colours, float all over the road and forest and round about you."

এই সৌন্দর্যের রমণীয়তা বৃদ্ধি করেছে ভুটান পাহাড়। যত উত্তরের দিকে এগোবে, ততই বনের চেহারা পাল্টাবে। মার্চ-এপ্রিল মাসের দিকে বনে বনে ফোটে নানা রকমারী অর্কিড ফুলেরা। গাছে গাছে কত কী নাম না-জানা ফুল। ফুলে ফুলে ভরে। গাছের পাতা আর দেখা যায় না। পাতাদের রঙ হয় আরো গভীর গাঢ় সবুজ। আরো উত্তরে বক্সার দিকে চিরশীতল ঝিরঝিরে হাওয়া বুইয়ে দিচ্ছে অঞ্চলকে। মাথার ওপরে দাঁড়ানো সিঞ্চুলা পাহাড়ের শ্রেণী। এই পাহাড়শ্রেণী উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ক্রমশ পূর্ব-দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত।

লাটুদা বলেছিলেন, এই বক্সা পাহাড়ের কথা। তখনও বক্সা যাওয়া হয় নি। এসে থেকেই অবশ্য শুনছি বক্সা পাহাড়ের কথা। সিঞ্চুলা পর্বতের পাদদেশে দাঁড়ানো বক্সা পাহাড়।

খুব উঁচু পাহাড় বুঝি?

না, তত উঁচু না।

কত উঁচু হবে?

পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে তিনি আমার কৌতূহল নিরসন করেছিলেন. The Sinchula range has an average height of from 4,000 to 6,222 feet, the highest peak being called Renigungo.

আপনার পকেটে কি বন-জঙ্গলের সব-কিছুই লেখা থাকে, লাটুদা?

লাটুদা নির্বিকার। বললেন, এই সব জিনিস তন্ন-তন্ন করে কে লিখে রেখে গিয়েছেন জানো?

না।

এর প্রাথমিক কৃতিত্ব একজন ইংরাজের।

D. H. E. Sunder সাহেব বুঝি?

রাইট যু আর। আমার হাতখানা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলেছিলেন লাটুদা। Sunder সাহেবের নাম আমি জানি দেখে তাঁর চোখ দু'টি আনন্দোজ্জ্বল বড় বড় হয়ে উঠেছিল। আবেগোদ্বেল কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, Settlement Report লিখতে এসে এমন অসম সাহসী
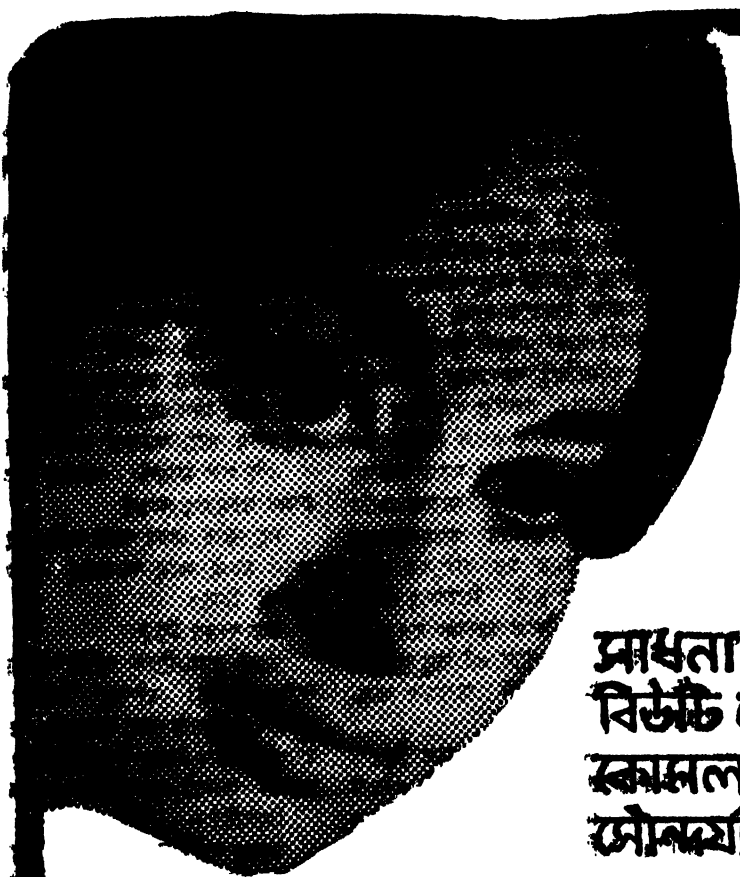
কাণ্ড যে করতে পারে, তার তুলনা হয় না। সত্যি, এইখানেই এদের কর্মশক্তির প্রাচুর্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। শুধু চাকরির জন্যে চাকরি করা নয়, সত্যিকার বড়কিছু করার প্রেরণা ছিল ওঁদের মধ্যে। আর এ'দেরই জন্যে ছোট্ট একটা দ্বীপের অধিবাসী হয়েও সারা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল ইংরাজ।

বন-পাহাড় আর গাছপালার কথা বলতে পাগল হন লাটুদা। এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে। সংসার লোকালয়ের চাইতে বনই তাঁকে টানে বেশি। ডুয়ার্সের কোন্ ঋতুতে কি পাখি ডাকে, সে পাখি শীতে কোথায় থাকে এবং কোথা থেকে উড়ে আসে, কেমন সুরে ডাকে, তাদের বাসা বাঁধবার রীতিটি কি, কোন্ বনের ধারে কোন্ নদীর পারে কোন্ জাতীয় পাখি বাসা বাঁধতে খুবই ভালবাসে, সেই সব কথা তাঁর নখদর্পণে। পাছে ভুলে যান তাই নোটবুকটি সঙ্গেই থাকে।

লাটুদা বলেন, ডুয়ার্সের সত্যিকার সৌন্দর্য, যদি দেখতে চাও তো চলে এসো একদিন 'কাউকে না বলে—

লাটুদার কথায় চুপ করে থাকি। তাঁর চেলা হবার মত মনের জোর খুব কমই আছে। ঠিক জানি, লাটুদার মত ক্ষ্যাপা হতে না পারলে সে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য উপভোগ করা সহজসাধ্য নয়।

দুপুরে গেছি একদিন আপালচাঁদ ফরেস্টের ধারে। ফাল্গুনের শেষাশেষি বনের মধ্যে চালতে পেকে আছে। নিচে গভীর বন। ঢিল দিয়ে কটি চালতে তাক করা গেল। পড়বি তো পড় বনের মধ্যে। এ সময় আবার সারা বনে ছাতিম-ফুলের গন্ধ। আর সে যে কী উগ্র গন্ধ, বলে বোঝানো যায় না। প্রাণবাড়ি ফরেস্ট গেছ কোনদিন? বলতে বলতে লাটুদা হাসেন সরল ছেলেমানুষিতে। —এত প্রজাপতি, আর এত নানা রকমারী দেখা যায় না। বনের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে লাটুদার কথা ভাবি। বনকে কী ভালোই যে বেসেছেন! ডুয়ার্সের প্রতিটি অরণ্যের প্রতিটি ঋতুর রূপবদল রঙ-বদলের চিত্র আছে তাঁর নখদর্পণে। কত রকমারী গাছের নাম তিনি একটুও না থেমে একনাগাড়ে বলে যেতে পারেন দেখে

অবাক হত হয়। বহেড়া, বোগ্ঝি, ভু, চাপ, চেলাউনি, চেস্টনাট, ছাতিম, জব-ভবি, গাব, গাম্বারি, গামারি, ঝাউ, খয়ের, খামারি, কিম্বু, লামপাতিয়া, মাদার, ময়না, মহুয়া, নিম, নিশিন্দা, জলপাই, পাকুড়, পানিসাজ, পলাশ, পিপল, সাজ, শাল, সিদা, শিমুল, শিরীষ, সজনা, শিশু, সিন্দুরিয়া, তাল, তেঁতুল, তুন, কদম, আম, জাম। সব রকম গাছের নাম জানেন উনি। জানেন তাদের কথা।

কত মূল্যবান গাছ এইসব বনের মধ্যে আছে, কেউ তাদের খবরই রাখে না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন লাটুদা। —কেউ খোঁজও করে না। কাঠের প্রয়োজনে মানুষ টুকরো টুকরো করে কাটছে তাকে। ইন্ধনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে অর্জুনের মত মূল্যবান গাছ। অথচ অর্জুনের ছাল আমাদের কবিরাজী শাস্ত্রমতে এক মহা-মূল্যবান জিনিস। হার্টের দুর্বলতা দূর করবার এক অসাধারণ ওষুধ তৈরি হতে পারে এ থেকে। তা ছাড়া আছে কত যে রকমারী লতাপাতা, কে তাদের খোঁজ রাখে। নিজের দেশের গাছ-গাছড়ার অনুসন্ধান করবার মত মানুষের আজ একান্ত অভাব। তাই বিদেশের দিকে কাঙালের মত তাকিয়ে থাকতে হয়।

লাটুদাকে বলেছিলাম, এই সব ব্যাপারে স্বদেশী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন?

রাগ করে লাটুদা জবাব দেন নি।

বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অবাক হয়ে তাকাই। মাইলের পর মাইল প্রসারিত বনভূমি। ক্বচিৎ এক-আধটি নোটিশ বোর্ডে সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অস্তিত্ব ঘোষণা। **Protected Area. Hunting, shooting and fishing are prohibited.**

প্রশ্নটা চমকে উঠেছিল মনের মধ্যে। এই বনের ভিতরেও তাহলে সভ্য মানুষের লুণ্ঠনবৃত্তির আর অন্ত নেই। শুধু কাঠ কাটতে নয়, শিকার করতে আসছে মানুষ। শিকার—মানব-সভ্যতার প্রাচীন বৃত্তি। কিন্তু 'ফিশিং'? এতদূরে বনের ভিতরেও কি আছে মাছ? সে মাছ মারতে আসে মানুষ? লাটুদাকে পাই নি, শুধিয়ে-ছিলাম বিরসা ভকতকে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোক। বিরসা বলেছিল, তা তার আসে না, বাবু? চুরি করে মাছ ধরতে আসে শহরে বাবুরা। তাদের জন্যেই এ সাবধানতা।

কিন্তু এতকরেও শেষরক্ষা করা যায় না। চৌর্যবৃত্তি দমন করবার জন্যে ফরেস্ট গার্ড, বীট অফিসাররা থাকেন তৎপর। শুধু বনের পশু বা মৎস্য শিকার না, কাঠ কেটে পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায় প্রকাশ্য দিবালোকে।

ডুয়ার্সের এক বীট অফিসারকে শুধিয়েছিলাম, কেমন লাগে এখানকার চাকরি?

মন্দ না। তবে খুব—

খুব কি?

খুবই নির্জন।

নির্জনতা ভালো লাগে না?

লাগে। কখনো কখনো। তবে সব সময় ভালো লাগে না।

বীট অফিসারের কাছে পরের প্রশ্নটি রেখেছিলাম, খুব খাটতে হয় কি?

না।

খুব ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয় কি?

তা এক-আধটু থাকতে হয় বৈকি।

আজকাল তো আপনাদের অনেক সুযোগ-সুবিধে হচ্ছে—

তা হচ্ছে। একটু থেমেই তিনি তৎক্ষণাৎ আবার বললেন, সুযোগ-সুবিধে তো সারা দেশ জুড়েই চাকুরেদের হচ্ছে। আমাদের আর আলাদা কী আছে!

এই সব ফরেস্ট গার্ডরা আপনাদের কেমন মান্যগণ্য করে?

না, স্যার, এসব আর নেই। আজকাল এসব ক্রমেই কমে আসছে। আগে খুব বেশিই ছিল।

এর কারণ কি?

নানা রাজনৈতিক পার্টি তাদের চোখ খুলে দিচ্ছে। বস্তির ভিতরে যান, সেখানেও সাতটা দল দেখবেন। তা ছাড়া তাদের অভাব-টভাব বিশেষ নেই। কৃষি আছে। চোলাই-এর কাজও মন্দ চলে না।

চোলাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মদ-চোলাই, স্যার।

শুনে অবাক হয়ে থাকি। এসব অঞ্চলের বস্তির বাসিন্দা প্রায়ই আদিবাসীদের দল। তাদের ছেলেরা আসে। হাসি-খুশি স্বভাব। চঞ্চল উসখুস চোখ। কিন্তু দারিদ্র্য ও অপুষ্টির ছাপ সর্বাঙ্গে। দূরে বস্তি। ভুট্টাগাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। মুরগীগুলি ছোটাছুটি করে। একটা শিকারী কুকুর।

সাইকেলে চৌকিদার কিছু দূর বন্দর থেকে ফিরল। পাশেই পীচের রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই দূরের শহরে যায় গাড়ি। ফরেস্ট স্কুল বাস। মস্তবড় গাড়ি। যায় বেলা দশটায়। আবার ফিরিয়ে নিতে যায় বিকেল চারটেয়। সে গাড়িতে বস্তির নেপালী বা ও'রাও ছেলে যেমন থাকে, বাঙালীবাবুদের ছেলেরাও থাকে। কোলের উপরে থাকে নিজের নিজের বই-দপ্তর। বাইরে বন-জঙ্গল। গাছপালা। অরণ্যের জটিলতা পেরিয়ে সভ্য শহর। ড্রাইভারের হাতে স্টিয়ারিং। সেও বন বিভাগের কর্মী।

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সব স্রোত আজ এইখানে। ঘরের ছায়া পথের পাশে পড়ে রইলো। আজ দূরের আকাশ ওদের ডেকেছে। কার্তিকের খররোদ্রে কালো কালো মানুষ পিঁপড়ের সারির মত লাইনবন্দি চলেছে। আঁকাবাঁকা দীর্ঘ রেখায় অফুরন্ত এই চলা। মধ্যে মধ্যে এক-একখানি গো-গাড়ি। ঘণ্টা বাজছে ঠুনঠুন। কতক সাইকেলে আর বাকি সব বাসে ঝুলতে ঝুলতে। ড্রাইভার মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। ভেঁপু বাজাচ্ছে কিন্তু কে শোনে কার কথা। কিছু কিছু মজাও করা হচ্ছে। না, বাসকে যেতে দোব নি আগে। আমরাও 'টেশনে' যাবো, বাসও 'টেশনে' যাবে। মন্তরকে কখনো এগুতে দোব নি। হৈ হৈ করে কোথাও উঠছে কল-ধ্বনি। রাস্তার দুপাশ থেকে বাঁশঝাড় পথ অবরোধ করেছে। বাধা হঠাও। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা মিছিল। আসছে মাঠের ওপর আলের পথ দিয়ে দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজাতে বাজাতে। ওরা এই স্রোতে ঢুকে পড়বে বেনোজলের মত। মিছিল কোথাও কোথাও আটকে যাচ্ছে। সেখানে তৈরি হচ্ছে আবর্ত। কেন মশাই ওরা আগে যেতে চাইছে? নিয়মটা যখন আছে, তখন নিয়ম মেনে চলো। ইটা কেমন ধারা? কেউ কেউ গান ধরেছে, সামনে জোর তুফান......। ঠাট্টা করে গানের ফাঁকে ফাঁকেই কেউ কেউ গুঁজে দিচ্ছে কথা, 'আমরা জাত পাটনী হে', ও সব তুফান-টুফানে আমাদের কিছু হবেক নাই, আমরা ঠিক উজোনে যাবো। কোন কিছুতেই ডরাই না আমরা দেশ-গাঁয়ের মানুষ।' দুপাশে পড়ে রয়েছে ধানবোঝাই মাঠ। সোনায় সবুজে ভরা। বুকটা একটু কড় কড় করে বাপু। যেন আজকের জন্যে সাঙাতের সংগে কথা বলা বন্ধ। সব ধান এখনো ত' ফুলোয় নি। সব মাঠের খোঁজও নেওয়া হয় নি। গোছগুলো আলের ওপর পড়লে আজ বিকেলে কে তাদের সরিয়ে দেবে আল থেকে? কোথায় কোন্ জমির জন্যে 'জাল' করতে হবে, ছেঁচ দিতে হবে—আজ আর সে সব হলু নি। তা ছাড়া মনে কর, আছে গরু। খুঁটোয় ঠিকই বাঁধা কিন্তু দড়িটা পল্‌কা হয়ে গেছে। হয়তো দড়ি ছিঁড়ে পরের ক্ষেতে মুখ দেবে। সে ব্যাটা দিয়ে আসবে পান্ডোলে। তারপর একবেলা কাজের 'খেতি' আর পয়সার ছেরাদ্দ শুদুমুদু, সে সব পড়ে রইলো। মাগ-ছেলেরাও কতক রৈল বৈকি, নইলে ঘর-দুয়ার কে দেখবে? কে গোয়ালে সাঁজাল দেবে? সন্ধ্যে দেবে ভিটেতে? এসব ত' মেয়েদের কাজ, বটে কিনা! কে আকাশের দিকে মুখ তুলে শাঁখ বাজাবে! 'আর জল যেখানে মরা?' যে জোর তুফানের গান গাইছিলো সে এবার বলল। জবাব দেবার লোকও তৈরি, 'সেখানে পাল তুলে দুব। গুন খাটাবো', 'আর যেখানে পচা পাঁক পক পক করছে?' এর উত্তরও যেন আগে থেকে বাঁধিয়ে রাখা, 'সেখানে লগি মারবো হে, এই ধ্বজাখানা কি করতে আছে, মুখ দেখাতে?' বলে হাতের ঝাণ্ডাখানা দেখিয়ে দিচ্ছে বুক চিতিয়ে। খসে খসে পড়ছে গাছের পাতা। গাছের কোটর থেকে গলাফোলা গিরগিটি একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে এক-একটা ঘোমটা-খসা সচকিত মুখ। তেল চুপচুপে খোঁপা-বাঁধা আদি রমণীর কাঁচ গা। দূরে রেলের বাঁশি বাজছে। হঠাৎ মেঘের মত এক-একটা গাঁ সামনে ভেসে উঠলে। সেখানে লোকজন ভীড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে। শূন্য আকাশে কাঁপছে চিল। পথের একপ্রান্তে থমকে আছে জল। ছাতারেরা তাই নিয়ে ওদের মধ্যে ডাকাডাকি করছে। ছায়াতে-আলোতে কম্পমান এই মিছিল ঢেউ খেলতে খেলতে, দুধারে জল ছিটোতে ছিটোতে, যেন এক নোতুন মুক্তির সংকেত চিহ্ন আঁকতে আঁকতে চলেছে।

কোথায় চলেছে এরা? আমি জানি না। ওরা জানে। শুধু এইটুকু দেখছি আমার বুকে এই চলা কাঁপন তুলেছে। ওদের সংগেই আছি। ওদের খুশি আমাকে ডাক দিয়েছে। অন্তহীন, অফুরন্ত এই চলাতে আজকে যে আমিও আছি, এ আমি ভুলতে পারছি না।

সব স্রোত আজ এইখানে। স্টেশনে। এর আগে এ স্টেশনখানি আমি দেখেছি।

সব স্টেশনই একই রকম দেখতে। এ স্টেশনও তার ব্যতিক্রম নয়।

অসংখ্য লাইনের হিজিবিজির মাঝ-খানে এক একখানি কেবিন। একপাশে ভূতের মত দাঁড়ানো জবুথবু কতকগুলো মালগাড়ি। এক প্ল্যাটফর্ম যদি বা ফাঁকা, আর একটায় গমগম করছে লোক। ঘণ্টি বাজছে ঢং ঢং। গার্ড সবুজ পতাকা ওড়াচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে দুদ্দার করে এসে পড়ছে মারমুখী ইঞ্জিন। ছুটে ছুটে উঠছে ডেলি প্যাসেঞ্জার। কামরার একটা কোণ বেছে নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি। মোটা, লাল উর্দিপরা কুলিদের হয় একমনে বসে বসে খৈনি ডলা, মুখের ওপর পৌরুষের সংগে দাঁড়ানো জমকালো গোঁফ থেকে সাদা সাদা মাছি তাড়িয়ে দেওয়া, নয়তো হুড়োহুড়ি পড়ি-কি-মরি হয়ে মালের জন্যে একজনের জায়গায় দশজন ভীড় করে থাকা, অনেক দূরের ট্রেন এসে হয়তো সাদা বাষ্প ছাড়ছে হাঁফাতে

হাঁফাতে, যে ট্রেনটা স্টেশন ছাড়বে সে কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, কালো বা সাদা কোটপরা চেকারদের সঙ্গে স্কুল-কলেজের বিনাটিকিটের ছাত্রদের চোর-পুলিশ খেলা, চাল-ধরা হোমগার্ড, এদের সংগে আবার মহিলাও আছেন, তাঁদের সংগে ট্রেন থেকে পুঁটলি হয়ে চাল-বওয়া লোকদের কানামাছি, এসব নিয়েই ত' স্টেশন।

এসব হয়তো আজও আছে। যাবে আর কোথায়? কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না। তার বদলে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃশ্য। সমস্ত স্টেশনে তিল ধারণের জায়গা নেই। মানুষ আর মানুষ, পৃথিবীতে এতো মানুষও আছে, কিন্তু আশ্চর্য, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, দেখতে কিন্তু এক।

আমরাও ত' স্টেশনে ভীড় করি। গাড়িতে উঠি। আমাদের কি কখনো এক রকম দেখতে? না। চেহারায়, বেশ-ভূষায়, কথাবার্তায় আপনার আমার সংগে কতো পার্থক্য। আপনি প্যান্ট পরেন, আমি পা-জামা পছন্দ করি, সার্টের সংগে 'টাই' আপনার অবশ্যম্ভাবী, আমি 'টাই'টা বরদাস্ত করতে পারি না, কটকটে লাল এক ধরনের নতুন জামা উঠেছে। আপনি সেটাই পরলেন মানাক বা না মানাক। আমি পাঞ্জাবী ছাড়া কিছুই পরতে পারি না। অন্য রকমের জামা পরলে আয়নায় নিজেকেই কিরকম অচেনা লাগে। আপনি ঝর ঝর করে ইংরেজী বলেন যেন মেল ট্রেন, থামার নাম নেই। আমিও ইংরেজী বলি, বাংলার সংগে মিশিয়ে; হোঁচট খেতে খেতে প্রত্যেক স্টেশনে দাঁড়ানো লোকালের মত। আপনি ইংরেজী সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন। যান সেই বিশেষ বিশেষ দৃশ্য দেখবার জন্যে আর বাইরে বেরিয়ে এসে বলেন, রাবিশ, আমিও হিন্দী সিনেমা যাই, যাই সেই বিশেষ বিশেষ দৃশ্য দেখতে, দেখে বাইরে এসে বলি, এই সব বই বন্ধ করতে হবে, এ নিয়ে একটা আন্দোলন.... দেখছেন ত', নোংরামিতে; মহত্ত্বে, সাজ-পোষাকে, আচার-ব্যবহারে আমাদের কতো তফাৎ অথচ আমরা ত' একটাই শ্রেণীতে 'বিলং' করি, ঐ দেখুন, অনর্গল বাংলার সংগে কেমন সহজে ইংরেজীর এক একটি টুকরো মিশে যাচ্ছে: কি যেন শ্রেণীটার নাম, আমি বলবো মধ্যবিত্ত, আপনি বলবেন মিডল ক্লাস, আপনি রাজনীতি করেন? ও সিরিয়াস। তাহলে বলবেন পেটি-বুর্জোয়া। দেখেছেন একই শ্রেণীতে আছি, তবু সামান্য একটা শব্দ উচ্চারণেও আমাদের কতো জটিলতা, অন্য জটিলতাগুলোর কথা বলবো না দোহাই মাফ করুন। আচ্ছা, আচ্ছা। তা শুধু আপনার নয়। আমারও। ভেতরের কথা ফাঁস করে লাভ কি? যা ভেতরে আছে তা থাক। এতে আমাদের দুজনারই অসুবিধে, নয় কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনি বুদ্ধিমান। একদিন আসুন না পার্ক স্ট্রীটে, অফিস থেকে বেরিয়ে একটু নির্দোষ আনন্দ করা যাবে, আমার মনটাই একা একা ও জিনিষটা জমে না।

কি জানেন, এই একটা জিনিষ আছে, যাতে দুজনে খুব কাছাকাছি আসা যায়। এরা কিন্তু অনেকটা এক, অনেক অভিন্ন।

আশ্চর্য, মিল কি সবেতেই হতে হয়? চেহারা সেই একই মার্কামারা আঁধার-জড়ানো। চকচকে কালো। কালো যেন গা থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। কালোর কি বাহার!

মালকোঁচা করে পরা ধুতি। ভরা-ভরতি কার্তিক, তাই গায়ে একটা কিছু চড়ানো। একটা সার্ট, কাঁধে একটা গামছা, পায়ে খড়ি, বলতে গেলে সকলের পা-ই খালি, একজনকে ত' দেখলাম সে বেচারী নতুন জুতো নিয়ে খুব মুসকিলে পড়েছে। হাতে মুখ চাপা দিয়ে তাই নিয়ে সকলের কি হাসি! কি দরকার ছেল জুতো পরার বাবুদের মত, এখন ঠ্যালা বোঝো। আগের দিন রাতে বসে বসে পায়ে, পায়ের আঙুলে বেশ চুবিয়ে চুবিয়ে তেল মাখিয়েছে। বছরখানেক আগে একবার কুটুমবাড়ি গিয়েছিলো 'কবি' শুনতে, সেই পারে ছেল, আর তারপর এই এখন, এ শালার জুতো এখন কাঁধে তোলো, নতুন 'কবি' শুনতে এসেই ই কি ফ্যাসাদ গা?

একটা অদ্ভুত তরংগে দুলছে সমস্ত স্টেশন। ড্রাম বাজছে। বিউগল বাজছে। বাজছে জগঝম্প। খোল। করতাল। হাতে হাতে ঘুরছে লাঠি। গলায়-গলায় লাল রুমাল। কাঁধে কাঁধে লাল 'ধ্বজা'। যেদিকে তাকাই, সেদিকে ঢেউ! একটা নয়। অনেক। কতগুলো বলা কঠিন। কে যে চুপ করে আছে বোঝা কঠিন। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলছে। বলছে আর চোখে চোখে খেলে যাচ্ছে চকমকি। চোখ থেকে ছিটকে পড়ছে আগুন। আর উঠছে শ্লোগান, অনেকটা তারের সেই শেষ ঝংকারের মত। রেশ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। যেই শেষ হবো হবো, অমনি আর একজন আর একটা শ্লোগান তুলে দিচ্ছে আকাশে। সেটা মিলোতে না মিলোতে আবার, আবার শ্লোগান। আবার দ্রিমি দ্রিমি বাজছে ড্রাম। বন্যার মত ছুটছে মানুষ। কাতারে কাতারে লোক উঠে আসছে প্ল্যাটফর্মে। কথা বলার আগেই হেসে খুন হচ্ছে। কথা বলে হাসছে। হাই মাঁ, ওদিক পানে কি হচ্ছে গা, নাচ নাচছে বটে; কেমুন সাঁওতাল মেয়ে ছেলে-দুলে অংগভরে নাচছে।

কঠিন চিত্ত, উদাসীন আমি। কিছুতেই আমার মনে কোন কিছু দাগ কাটে না।

কিন্তু নেই আমিও, আমার পাও চঞ্চল হয়ে উঠছে। আমি চাইছি নাচতে। কোন লজ্জা নেই আমার। আমি এখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে পারি। মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজাতে পারি। আমি ঐ মেয়েদের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে এখখুনি নাচতে পারি। দূরে শালা ভদ্দরলোক। তুমি খালি খালি দূরে দাঁড়িয়ে প্যাঁচ কষবে? কতোটা মানুষ সচেতন হয়েছে, কতোটা হয়নি, তার চুলচেরা হিসেব কষবে? এসব ব্যাপার স্বতঃস্ফূর্ত, না এর পেছনে সাংগঠনিক কৃতিত্ব আছে তা' নিয়ে বসে বসে চিন্তার চোঁয়া ঢেকুর তুলবে? আমি এ সব পারছি না। আমার গলা ফাটিয়ে এখন গান আসছে। যা খুশি আমি গাইবো। আমার গানে এখন কোন গাধুনি থাকবে না। কাঁচা কাঁচা প্রায় আদিম শব্দ। স্টেশনের এই অদ্ভুত ভুবনের দিকে আমি চেয়ে আছি, আমার এই চেয়ে থাকাটাই গান, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না?

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। কার একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে আমি ঘুরছি। এটা আবার আমার হাতে কে গুঁজে দিলো? কে এর বাপ? মা-টাই বা কোথায় গেল? এই যে কমরেড, আমাকে দিন, যে এগিয়ে এল সে 'খরা'র একজন সাঁওতাল, এই তাহলে 'একে এটুস ধরুন ত' বলে জল খেতে গিয়েছিলো! 'এই যে কমরেড।' আমাকে বলছে? বলছে একজন সাঁওতাল? আমাকে কমরেড বলছে? অনায়াসে বলছে? কই, আমি ত' বলতে পারছি না। আমার কেন আটকাচ্ছে? আমি কি কারুর কমরেড নই?

ইতিমধ্যেই একজন আমাকে গ্রেপ্তার করেছে। 'হ্যাঁ মশাই, ক'দিন থেকে আপনাকে খুঁজছি। আপনি কারুর সংগে যোগাযোগ না করে একা একা এদিক-ওদিক ঘুরছেন। এটা ভালো করছেন না। সব তেতে আছে। কে কখন মাথায় ডান্ডা মেরে দেবে, তার ঠিক কি?'

বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কেন?'

'কেন জানেন না? নিজের এলাকার বাইরের লোককে কে এ্যালাউ করবে?'

'আমাকে করবে না কেন?' আমি

র আর কোন 'পকেট' তৈরী করতে পারছি না।'

'কি করে বিশ্বাস করবে? আপনার চোখেমুখে কি লেখা আছে? দু'দিন ধরে আমাদের কাছে লোক আসছে।' বলে রোগামত একজন লোক, 'চোখে চশমা, মাথার চুল এলোমেলো, গলায় সাদা মাফলার, খালি এটা-ওটা জিগ্যেস করে, তোমাদের এখানে এবার ধান কেমন হয়েছে, কি কি পরব হয়, তোমাদের এখানে সমিতির কাজকর্ম কেমন, মনে হচ্ছে বাবু যেন বাংলা কংগ্রেসের লোক, ঘাঁতঘোঁত বুঝতে এয়েচে।'

'আমি ত' কোন কংগ্রেসেরই লোক না। আমি এসেছি দেখতে। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।'

'আপনাকে আমরা জানি। আমরা না হয় বুঝলাম। সবাই ত' বুঝবে না।'

'ঠিক আছে। এবার থেকে যেখানে যাবো, আপনাদের সংগে যোগাযোগ করে যাবো।'

'ব্যস ব্যস।' বলে হাতে হাত মিলিয়ে সেই লোকটা কাঁধে ঝাণ্ডা নিয়ে দ্রুত মিলিয়ে গেল তরংগে।

মনে পড়েছে। পরশু এখান থেকে দশ মাইল দূরে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। রাত তখন ন'টা আন্দাজ হবে। মুদিখানার দোকানটা, বাইরে থেকে ঝাঁপবন্ধ কিন্তু ভেতরটা খোলা, ঐখানে গিয়েই একটু বসেছিলাম। ঠাণ্ডাও একটু একটু পড়েছে। হাওয়া দিচ্ছিলো এলোমেলো। বসে বসে নানা কথা ভাবছিলাম। ওদের মধ্যেই একজন, আমি ভাবছিলুম তা সে অখণ্ড মনোযোগ, না ঠিক তা' নয়, বলে উঠলো, 'কি মশাই, এদিকে কি মনে করে?'

হেসে উঠলাম। বললাম, 'কই এখন ত' তেমন কিছু মনে করিনি।'

'আপনি কোন্ দলের?' আবার সেই তির্যক প্রশ্ন।

'কোন একটা দলের হতেই হবে? আমার কোন দল নেই।'

'তা' কখনো হয়!' লোকটা কিছুতেই বিশ্বাস করলো না।

গ্রামেতে এই এক নতুন হাওয়া ঢুকেছে। রাজনীতির হাওয়া। এ হাওয়ার বাইরে বোধহয় কেউ নেই এখন। এদিক থেকে গ্রামও দ্রুত শহর হয়ে যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় শহরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সমস্ত গোলমাল স্তব্ধ করে স্টেশনের লাউড স্পীকার বেজে উঠলো।

...'কমরেডস, যে ট্রেন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছে সেই ট্রেনে আপনারা যাবেন না। আমরা স্টেশন মাস্টারের সংগে কথা বলে দেখছি, কোন স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করা যায় কি না। ইতিমধ্যেই ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়ে উঠেছে। আমরা শুনেছি, তারা আপনাদের প্ররোচনা দিচ্ছে, স্টেশন মাস্টারের ঘরে চড়াও হতে। এটা করবেন না। স্টেশন মাস্টারের ঘর থেকে সরে যান। কমরেডস, মনে রাখবেন আপনারা প্রত্যেকে শৃংখলাবদ্ধ সৈনিক। দলের নেতাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা নিজের নিজের অঞ্চলের লোকদের কাছে কাছে থাকুন। এখখুনি আমাদের ট্রেন আসছে। আপনারা আগে যাঁরা নাববেন তাঁদের নাবতে দেবেন। তারপর উঠবেন। এ ট্রেনে যদি উঠতে না পারেন, পরের ট্রেন আছে।'

বলতে না বলতেই গোঁ গোঁ দুর্বোধ্য গর্জন করতে করতে বিশাল ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন স্টেশনে এসে ঢুকলো। সমস্ত কামরায় ঠাসাঠাসি ভীড়। দুই কামরার মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গায় অদ্ভুত কৌশলে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টারে আর ব্যানারে ছেয়ে গেছে। মুহূর্তে একটা তরংগ যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো কামরাগুলোর ওপর। কেউ শক্ত করে হ্যাণ্ডেল ধরে কিন্তু দু'খানা পা-ই শূন্যে। কারুর জানলা দিয়ে মাথাটা কোনক্রমে ঢুকেছে, ধরটা তখনো বাইরে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আর একজন ধরটাকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে জানলার ভেতরে ঢোকাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যেই ড্রাম বাজছে। বাজছে বিউগল। শ্লোগানের ঝড় বইছে। মানুষ এদিক-ওদিক দিকপ্রান্ত হারিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে।

ওদিকে আবার লাউড স্পীকারের ঘোষণা,...'কমরেডস, আপনারা কোন রকম শৃংখলা'......

ইঞ্জিনের বিকট শব্দে বাকি কথাগুলো আর শোনা গেল না।

উঠেছি দ্বিতীয় ট্রেনে কোনরকমে। আমার সংগে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র অসীমবাবুর প্ল্যাটফর্মে দেখা হয়েছিলো। কথা ছিল দু'জন এক কামরাতেই উঠবো। কিভাবে যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, কে জানে!

ট্রেন চলেছে হু-হু শব্দে। মাঝে একবার কোথায় থেমে গেল। কে বা কারা 'চেন' টেনেছে। এই এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কেউ না কেউ টানবেই। এমন একদিনও বোধহয় বাদ যায় না, যেদিন ট্রেনে চেন টানা না হয়। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ফুটবল খেলার একটা টিম। জনা কুড়ি ছাত্রের একটা দল। মাঝখানে ট্রেন থামিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাসতে হাসতে নেবে গেল। এখন আর তোরা মিনিট পনেরো ধরে ট্রেনের কামরার মধ্যে জড়াজড়ি, ঠাসাঠাসি করে দমবন্ধ হয়ে। ওদের কাজ ত' ওরা করে নিয়েছে।

লাল স্কার্ফপরা একজন যুবক বলল, 'জানলার ধারে যাঁরা বসে আছেন, আপনারা ভাই একটু লক্ষ্য রাখবেন ত', কারা এসব করছে, কোন্ কামরা থেকে কারা নাবছে! তারপর আচ্ছা করে ধোলাই দোব চাঁদা তুলে। যতোসব উইদাউট টিকিটের প্যাসেঞ্জার।'

আমি হেসে উঠলাম সশব্দে। লাল স্কার্ফপরা যুবক কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় গর্জন করে বলল, 'হাসছেন যে!'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম 'এমনি।'

তাছাড়া আর কী বলতে পারি। টিকিট কেটে একমাত্র আমিই বেকুব বনে গেছি যে।

হ্যাঁ। এসে গেছি।

ঐ যে ওরা সব দলে দলে যাচ্ছে। দু'পাশে ধানক্ষেত। মাঝখানে পথ। চার-চারটে দীর্ঘ লাইন চলেছে। পাশে পাশে ছুটকো লোক যে যাবে তার আর উপায় নেই। থমকে দাঁড়ালাম। আমি কি করি? যেতে গেলে চারটে দলের কোন একটার মিছিলে যোগ দিতে হয়। কিন্তু আমি ত' কোনদিন কোন মিছিলে যোগ দিই নি। থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু বিউগল বাজছে। মাদল বাজছে। খোল, করতাল, কাঁসর বাজছে। দুম্-দাম্ বোমা ফাটছে ইতস্তত। পায়ে পায়ে ধুলো উঠছে। শ্লোগান উঠছে আকাশে। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে। ঢেউ জড়িয়ে ধরেছে ঢেউকে। একটা উদ্দাম গর্জন
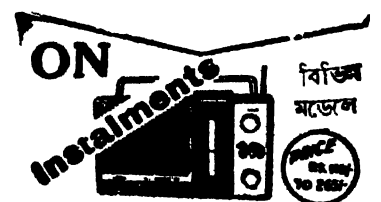
আর অফুরন্ত এই চলা,... হঠাৎ কে যেন আমাকে হাত ধরে টেনে নাবিয়ে দিলো মিছিলে।

তারপর থেকে শুধু চলছি। এ যে কি চলা, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

কখনো হাসছি, চেঁচিয়ে গল্প করছি, হাঁ গা, সকাল থেকে আজ আর কিছু জোটাতে পারিনি বুঝলে, হাতের আঁজলায় এই আড়াই চুমুক পানি টেনে আসছি, ছোট মল্লিক চলে গেছে গা, আমার শউরের ভিটের ডেয়াল পড়ে গেছে। নোনা ধরেছেল। হ্যাদে, কাত্তিক মাসটো বুঝি যায়, জলটা হোলনি, এখন খালি ছেঁচ দাও, খালি শালা ছেঁচ দাও, পয়সার বাপের ছেরাদ্দ, এই দেশপতি (নেতাকে ঠাট্টা করে বলা), কি খাওয়াবে বাপধন, মানিকের কলা, না অ্যাঠার কলা, এক পো গুড় ঢাললে নিমগাছে অমনি নিমপাতা মিঠেপাতা হয়ে যাবে, ক্যাটা মারি সেপাটে তোমার এই লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষের মুখে, কি বল নকাড়ি, উ বেটা ইদিকে খুব শোলোক-মোলোক ঝাড়ে, আবার শেওড়াফুলিতে একটা রাঁড় রেখেছে হে'... চলতে চলতে হচ্ছে গান, আশ্চর্য তার সুর, আশ্চর্য তার ভাষা, একটা মেয়ে, ঢেউ-এর মত চেহারা, কাঁচ গলায় গাইছে, 'এই বুড়োটা দিলে দুখ হে, দিলে বড় দুখ, ধান বুনিলে ধ্যান্না পানি, এই বুড়াটা বড়ই শনি, সদাই রয় মোদের পেটে ভুখছে, দ্যামড়ার উপুরে চড়্যা বেড়ায় কুচলী পাড়ায় ঘুর‍্যা, বুড়ো ঠাটকুনুরো জানে কতই, কর‍্যা বেড়ায় তুক হে, করে কতোই তুক'...

তাকিয়ে তাকিয়ে যে দেখছি এক-জন মেয়ে আর একজনকে টানছে, কথায় ক্যার অদ্ভুত টান, বলছে, ওগো গোপো-নারী, তুমি ভাই কিছু বলো। কি বলবো, মেয়েটা হেসে বলল, যইবুন বয়েসের গান, এই ত' গান হচ্ছে রে, এই যে, এই মিছিলটা যাচ্ছে, ওলো, এটাই ত' গান, এর চে' আর কি গান, এসবি হচ্ছে কিন্তু চলতে চলতে। থামা নেই। থামতে চাইলেও থামা যাবে না। পেছন থেকে ঢেউ তেড়ে আসছে। তার ধাক্কায় ধাক্কায় চলো। যেমন করে পারো চলো। হ্যাঁ, অদ্ভুত লাগছে এই চলাটা। কখন আরম্ভ হয়েছিলো ভুলে গেছি। কখন শেষ হবে জানি না। চিরদিন দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখেছি। মিছিলে কখনো নাবিনি। এই প্রথম সকলের সঙ্গে গায়ে গা দিয়ে, সকলের পাশে-পাশে। এ একটা সাগরের মত, খালি ঢেউ, অনবরত ঢেউ, দুলছে, ফুঁসছে, গর্জন করছে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে, মেদিনীপুর থেকে যে দল চলেছে তারা গাইছে গরুর বিয়ের গান। গরুর বিয়ে? ভালো করে জিগ্যেস করলাম। সে চোখ বড় বড় করে ট্যারাবাঁকা বাংলায় বলল, কেনে? মানুষের বে' হতে পারে, গরুর কেনে হবোন? ঠিক, ব্যস, এর বেশি বলার সময় নেই, ঠেলাঠেলি করে চলো। তাড়াতাড়ি চলো। এঁকে-বেঁকে চলো। থামার উপায় নেই। জিরেন নেই। খিদে পেলে খেতে খেতে চলো। চলো মুড়ি চিবোতে চিবোতে। পাঁপরভাজা খেতে খেতে। মেলা নাকি? হাঁ ত'। মেলাই ত' হে। লক্ষ মানুষের মেলা। পিথিমী কাঁপাইছেন হে'। কে যেন বলল। চিনতে পারলাম না। সব মুখ এক। ফেস্টুনটাও দেখতে পাচ্ছি না। শুধু জিগ্যেস করলাম, কে, ও বুকে চাপড় মেরে বলল এই মিছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। পৃথিবী কাঁপছে, দু'পাশে ধানক্ষেত। পোয়াতি বোয়ের মত নুয়ে পড়েছে ধানের গোছ। চলতে চলতেও সেই জমির গল্প। ধানের গান। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বিশাল বাঁশবনের ওপাশে। সিঁদুর, সিঁদুর ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। হাজার হাজার লাল স্কার্ফ উড়ছে। লাল ধ্বজা উড়ছে। আর ওদিকে ঘন লাল রক্ত ছিটিয়ে সোনার সূর্য অস্ত যায়। এ চলা দেখবার জন্যে কোন শালা জোতদার দাঁড়িয়ে নেই, কি বলেন, একজন, চিনি না, আমাকে ধাক্কা দিয়ে শুধোলো, আপনি ঠিক বলেছেন, সব ক'টা ভেগেছে, জবাব দিয়ে তাকালাম অন্য দিকে। বুড়ী পিসনি বলছে তার জোয়ান নাতিকে, মানুষ কি খাবে সেটা ক', আমার চোহের মধ্যে খালি জল ঝরে, কাঁচ পোলাবানটারে আমি কি দিয়ে বুঝাই, ক', আঃ, তুমি থামবে, নাকি খালি গজর-গজর, দেখছো একটা ভালো কাজে যাচ্ছি, নাতিটা বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে, বুড়ী আমলই দিচ্ছে না ওকে, সে কেমন একঘেয়ে সুরে মুখের কোঁচ-কানো চামড়া নিয়ে, অনেকটা নামতা পড়ার মত বলছে, আমার চোহের মধ্যে খালি জল ঝরে, মানুষ কি খাবে সেটা ক', এ-ও মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড আকাশে শেষ কাক ডেকে যাচ্ছে। রক্ত আরো ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ধানগাছগুলো একটু আগেও যা' ছিল সবুজ সোনায় জড়ানো, এখন ধূসর হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে নাবছে অন্ধকার। মিছিলটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। পথের মধ্যে কারা লরি থামিয়েছে। দ্যাখো কাণ্ড। হঠাৎ ব্রেক, এরকম জায়গায় মশাই কেউ করে? বলিহারী যাই নেতাদের আক্কেল, করতে পারতিস...শোনা গেল না। হুড়-মুড় করে পেছন দিক থেকে বিশাল দু'-তিনটে ঢেউ ছিটকে এলো। চশমা, আমার চশমা? এই যে মশাই, আপনার চশমা, চশমাটা পেয়েছি। কিন্তু পকেট থেকে পেনটা খসেছে, কেবল আলগা হয়ে ঝুলছে বুকপকেটে ক্লিপ। ওটা আর কি হবে, ছুড়ে ফেলে দিলাম। এনেই ভুল করেছি, কি হবে এসব লিখে? এ কি কোনদিন লেখা যাবে, না লেখা যায়। এতো মানুষই কি কোনদিন দেখেছি। এর কতোটুকু অক্ষরে ধরবে। অন্ধকার, অন্ধকার নেবে আসছে। সভার কাছাকাছি এসে গেছি। দুম্-দাম্ বোমা ফাটছে। ঢোল, ঝাঁঝর, করতাল বাজছে। বিউগল, ফ্লুট বাজছে। কেউ থেমে নেই। সবাই বাজছে। আমিও, না ত' কি। বাজবে না এমন কে আছে? মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। কোন ক্লান্তি নেই। এ এক অদ্ভুত ধরনের বাজনা, যাতে আমরা সবাই বাজি। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম কালো কালো মাথা। সামনে তাকিয়ে দেখলাম কালো কালো মাথা। আশেপাশে তাকিয়ে দেখছি বন-ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে সেখানেও কালো কালো মাথা। মেয়েরা, বোধহয় শহরের, কেন না এখন চোখে গগলস্ দেবার দরকার নেই, চোখে গগলস্ এক জায়গায় গোল হয়ে বসে খেতে বসেছে। যাবেন না, যাবেন না, একদল যুবক হাত তুলে ভীড় ভেঙে সামনে আসতে আসতে বলল, ভেতরে ঢুকতে পারবেন না, মরে যাবেন, অসম্ভব ভীড়। কথা শেষ করতে না করতে বিশাল একটা স্রোত সামনে থেকে এসে আমাদের চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে ভেসে গেল। আর একটা স্রোত এগিয়ে যাচ্ছে। একটা আসছে, কোনটার ধারাও ক্ষীণ নয়। মাঝখানে গোল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে ভীড়। লাঠিতে লাঠিতে ঠোকা-ঠুকি। এই মারামারি লাগে লাগে কিন্তু লাগছে না। কমরেড, এ কি করছেন, ব্যস, মন্ত্রের মত কাজ হচ্ছে। আমি সভাতে ঢুকতে পারলাম না। সামনে থেকে প্রবল একটা স্রোত আমাকে টেনে নিয়ে চলল। যেদিকে হোক চলো, সামনে যদি না-ও হয়, পেছনে চলো, থেমো না, থামলে মারা পড়বে, চেপ্টে যাবে, বিউগল বাজছে, ড্রাম বাজছে, ক্ল্যারিওনেট বাজছে, মাদল বাজছে, চলো চলো......এবার ফেরার পালা।

ধাক্কায়, গুঁতোগুঁতিতে ক্লান্ত সবাই। আমিও ধাক্কা মেরেছি, গুঁতোগুঁতি

[illegible] [illegible] পালা। [illegible] [illegible] পথ। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] তা', পথ একটাই। [illegible] [illegible] [illegible] মাঝে [illegible] [illegible] [illegible] ডে-লাইট বসিয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] হবে বলে। আমি [illegible] [illegible] [illegible] পারিনি তার জন্যে [illegible] কোন দুঃখ নেই। বক্তৃতা কি আর শুনেছো, এসব শুনে শুনে মুখস্থ। [illegible] কি আর দেখবো, দেখে দেখে পচে গেছে। আমি দেখতে এসেছিলাম মানুষ। সে দেখা আমার সার্থক। গোটা দেশটাকে আমি বুকের ভেতরে পেয়েছি!

আমরা ফিরে চলেছি স্টেশনের দিকে। স্টেশন থেকে তখনো আসছে কাতারে কাতারে লোক। ডে-লাইটের আলোর জন্যেই বোধ হয় আমাদের কালো কালো প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে ধানক্ষেতে। সে সব চলন্ত কালো কালো ছায়াকে অদ্ভুত মনে হচ্ছিলো। মাথার ওপর কালো, নিঃসীম আকাশ। দু'পাশে নিবিড় ধানক্ষেত। মাঝখানে আমাদের এই বিশাল প্রস্থান। অদ্ভুত লেগেছে এই চলাটা। এ জন্মের এই চলাটা কবে শেষ হবে জানি না। এমনি চলে চলে কতো গ্রাম, কতো জনপদ ছাড়িয়ে যাবো। তখনো চলার শেষ নেই। আরও কতো গ্রাম, কতো জনপদ চলতে হবে। আমরা চলছি আর আমাদের পায়ের ধ্বনি চলার বেগে ফেটে ফেটে পড়ছে।

আজ নিদ্রাহারা এই রাত্রে, নক্ষত্র-খচিত বিশাল আকাশের নিচে আমি এক নগণ্য লেখক মৃত্যুহীন এই আশ্চর্য পদধ্বনির কথা লিখে রেখে গেলাম।

এ কথা আমি আর কিছুতেই ভুলতে পারছি না, আমি এখানে এসেছিলাম, আমি এখানে দেখে গেলাম, কার্তিকের পড়ন্ত রোদ্রে যেমন-তেমন একটা পথের ওপর আমি তরঙ্গে দুলে গেলাম। এ দোলা আমার থামবে না।

এখানে, এই পথে হয়তো আরো কিছুক্ষণ পর এ সবই নীরব হয়ে যাবে, দু'পাশে বাঁশবনের অন্ধকার হবে নিবিড়, আর সেই সনাতন ঝিঁঝি তার দীর্ঘ, পুরাতন অনিশেষ পুঁথিখানি পড়তে শুরু করবে অদৃশ্য আলোতে, তখনো আমি নিশ্চিত, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রান্তে, অন্য এক আকাশের নীচে তখন ব্যস্ত দুই শাবল হাতে অন্ধকার মোছার আয়োজন হচ্ছে, আর সেই আশ্চর্য পদধ্বনি বেজে বেজে উঠছে, ...'সামনে জোর তুফান..., আমরা জাত পাটনী হে, ঊ সব তুফান-টুফানে ডরাই না'......

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ইউরোপীয়ানদের এদেশে আসার আগে মদ চোলাই করার পদ্ধতি আমাদের অজানা ছিল। তাদের সঙ্গে আগত সুদানের সৈন্যরা (নুবিয়ান) এই পদ্ধতি সারা দেশময় ছড়িয়ে দেয়। চোলাই করা মদের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি ও কম খরচে নেশা করা যায় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর প্রচারের ফলে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও রীতিনীতির বহু ক্ষতি হয়েছে। আমাদের বয়োবৃদ্ধরা এই নুবিয়ান জিনের আবির্ভাবের আগে কেবলমাত্র হাল্কা ও অল্প উত্তেজক কিকুয়ু বীয়ার পান করতেন। আমার মা এই নুবিয়ান জিন চোলাইতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন এবং তাঁর তৈরি জিনের সুনাম অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে, ফলে অনেক জায়গা থেকে লোক আসত আমাদের কুঁড়েঘরে এই চোলাই মদ পান করতে। এই উপরি আয় আমাদের কিছু আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়, যার জন্য আমার স্কুলের পড়াশোনারও অনেক সুবিধা হয়। বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে অনেক সৈন্য নিকটবর্তী "ল্যানেট" শিবির থেকে আসত মদ্য পানের উদ্দেশ্যে—তার মধ্যে থাকত ইউরোপীয়ান, আফ্রিকান ও মিশ্রিত দক্ষিণ আফ্রিকান সৈন্যরা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে করত ঝগড়া আর মারামারি। একবার এই মারামারি এতদূর গড়ায় যে, একজন সৈনিক রীতিমত আহত হয় ও তিনদিন অজ্ঞান থাকে এবং আমাদের তাকে লুকিয়ে রাখতে হয় নিকটবর্তী জঙ্গলে সেই অবস্থায়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একটি গ্রামোফোন ও অন্যান্য সৌখিন জিনিসের অধিকারী হয়ে উঠি। রাতের পর রাত মদ্যপায়ীদের এই অমানুষিক ব্যবহার আমাকে খুব বড় এক শিক্ষা দেয়, যার ফলে মদের ওপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে এবং আমি জীবনে কখনও মদ্যপান না করবার প্রতিজ্ঞা করি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আজও আমি সে প্রতিজ্ঞা অটুট রেখেছি। কিছুদিন পর এব্রাহাম নামক এক ব্যক্তি আমাদের এই স্বচ্ছল অবস্থায় ঈর্ষান্বিত হয়ে লুকিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে আমাদের ধরিয়ে দেয়; ফলে ১৯৪২ সালে আমার মার দু বছরের জেল হয়। যদিও আমার পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী গাথোনী, আমার দেখাশোনা করতেন, তবু মার জেল হওয়ায় আমার মনে খুবই আঘাত লাগে এবং এর ফলে আমি শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়ি। নেয়েরী জেলে আমি একবার মাকে দেখতে যাই, তখন তিনি সুস্থই ছিলেন কিন্তু তাঁকে সাদা পোষাকে দেখে আমি খুবই কাতর হয়ে পড়ি এবং একজন সুদান দেশের জেলরক্ষিকাকে উৎকোচ ১২০ শিলিং দিই আমার মার সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখবার জন্য। তখনকার দিনে এইভাবে উৎকোচ দেওয়াটাই ছিল প্রচলিত রীতি, যদিও জেলের অভিভাবকরা এ বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

১৯৪৪ সালে মুটুরী কেনিয়া ছেড়ে তাঁর স্বদেশ ইংলণ্ডে ফিরে যান ও তারপর আমরা দু মাইল দূরে ট্রাইরন * নামক আর এক ইউরোপীয়ান চাষার ফার্মে স্কোয়াটার রূপে বাস করতে যাই। তাকে আমার দেশের লোকেরা ডাকত "কারি-মিরামিথি" বলে যার অর্থ হল কাঁটা গাছের প্রতিপালক। ট্রাইরন তাঁর ফার্মে কোন কাঁটা গাছ কাটতে দিতেন না, কারণ তাঁর মতে নাকি সেগুলো ভারি চমৎকার; আমাদের কাছে অবশ্যই এটা খুব অদ্ভুত মনে হতো। ট্রাইরনের ফার্মে স্টারিনো ও গিয়ুসেপ্পী নামক দুজন ইতালীয়ান যুদ্ধবন্দী কাজ করত। তারা ছিল খুব মিশুকে ও অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রি। স্টারিনো সব সময় হাতে একটা লাঠি রাখত, যার ভেতর জড়ানো থাকত একটা পৃথিবীর মানচিত্র। প্রায়ই এই মানচিত্রটি খুলে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপুড় হয়ে তার ওপর পড়ে থাকতাম। তারা দুজনেই অবসর সময় তৈরি করত টিনের বাঁশী আর আমি সেগুলো বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে পেতাম কিছু কমিশন। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা তারা আমাদের নানাভাবে সাইকেল চালানোর কসরৎ দেখাত ও গান শোনাত। অন্যান্য ইউরোপীয়ানদের মত তাদের ভেতর কোন হামবড়াই ভাব ছিল না, আর তাদের প্রাণখোলা হাসি ও সহৃদয় ব্যবহার আমাদের মেয়েদেরও আকৃষ্ট করত। গিয়ুসেপ্পীর সঙ্গে ক্রমশ আমার খুব ভাব হয়ে যায় এবং আমাদের ছাড়াছাড়ির সময় সে তার হাতঘড়িটি আমায় দিয়ে যায় প্রীতি চিহ্নস্বরূপ।

আমার মার কারাবাসকালে আমার ও দুই বোনের বড়ই দুরবস্থায় দিন কাটছিল। উদয়াস্ত পাইরিথ্রাম চয়নের কঠিন পরিশ্রম করেও হপ্তায় তিন শিলিং-এর বেশি আমাদের রোজগার হত না। কিন্তু এ কাজও জুটতো তখনই, যখন পাইরিথ্রাম ফুল পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুটতো। অবশেষে আমি ট্রাইরনকে একটি পাকাপোক্ত চাকরির জন্য আবেদন জানাই। তিনি মুটুরীর দেওয়া প্রশংসাপত্র দেখে আমাকে হপ্তায় তিরিশ শিলিং মাইনেতে ক্লার্কের কাজে বহাল করেন। এই চাকরি পাওয়ায় ফলে অতি দুঃখের সঙ্গেই আমি স্কুল ছাড়তে বাধ্য হই, যদিও স্কুলে যেতে আমার খুবই ভাল লাগতো।

আমার বাবা ঐ ফার্মে উৎপাদিত দুধের ও মুরগীর হিসাব রাখত, যাতে মজুরেরা কোথাও চুরি না করবার সুযোগ পায়। সম্পূর্ণভাবে একাজ করা আমার পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য, কারণ আমার জেলের লোকেরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট সামান্য একটুকরা জমি থেকে জীবিকার সংস্থান করতে না পেরে প্রায়ই তাদের অভাবযুক্ত দিনগুলিতে এই ফার্মের উৎপাদিত জিনিস দিয়ে নিজেদের ক্ষুধা মেটাতে চেষ্টা করত এবং আমি তাতে বাধা দিতে পারতুম না। এ ছাড়া আমাদের কিকুয়ু ভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, যার অর্থ হল "যে ক্ষেতে কাজ করে সে সেখানেই খায়।" এই সমস্ত কারণে আমি তাদের সবাইকে সাবধান করে দিই যে, কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন কোন জিনিস না নেয়। একবার ওয়ায়রো ওয়ানজেরী নামক এক গয়লা দুধ দুইবার পর বালতিতেই মুখ দিয়ে খানিকটা কাঁচা দুধে চুমুক মারে। ট্রাইয়ানের ব্যাপারটা চোখে পড়ে ও তিনি ওয়ায়রোকে ডেকে এই অপরাধের জন্য বকুনি দেন। সে তখন এই অপরাধ অস্বীকার করায় ট্রাইয়ন তাকে একটি আয়নার সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে তার গোঁফজোড়া দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহলে সেখানে কাঁচা দুধের দাগ এলো কোথা থেকে? বেচারা তার গোঁফের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল, কাজেই হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে গোঁফ মুছে ফেলা ছাড়া তার আর কিছুই করার উপায় ছিল না। ট্রাইয়ন তাকে বিদায় করে দেন নি, কেবল বলেছিলেন যে, যদি তার এতই দুধ খাবার দরকার হয়, তাহলে সে যেন অন্তত একটা কাপ ব্যবহার করে। এবং আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, গরুর মালিক হচ্ছেন তিনি, ওয়ায়রো নয়।

আমার নিজের দুরবস্থা দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আমি শুয়োরদের জন্য নির্ধারিত মাখনতোলা দুধের আধেক অংশ আত্মসাৎ করতাম ও সামান্য দামে ফার্মের মজুরদের কাছে বিক্রি করতাম। বড়দিন বা ঐরকম কোন উৎসবের সময় আমি বন্ধুবান্ধবদের উপহারস্বরূপ কয়েক বোতল করে মালিকের দুধ দিতাম। তিনি অবশ্য এসব ব্যাপার কোনদিন জানতে পারেন নি।

আমার মা ১৯৪৪ সালের জুন মাসে জেল থেকে ছাড়া পান। আমাদের কুঁড়ে-ঘরে সেরাত্রে অনেক লোক আসে এই শুভরাত্রি উদ্‌যাপন করতে। আমি একটি মস্তবড় ছাগলকে (মেষকে) জবাই করে তাদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করি। আর কাছ থেকে জানতে পারি কিকুয়ুদের উপজাতির কয়েকটি জেলের বন্দী তাঁর উপর ঈর্ষান্বিত হয়, কারণ জেলরক্ষিণীরা তাঁকে আমার জানতম ১২০ শিলিং-এর বদলে বহু অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা দেবেন যা তারা পেত না। এমন কি তারা একদিন মাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবারও চেষ্টা করেছিল। এ ছাড়া অবশ্য মার জেলে খুব বেশি কষ্ট হয় নি এবং জেলের রক্ষীরা তাঁর সঙ্গে সাধারণত ভালই ব্যবহার করত। শুধু আমাদের চিন্তাই তাঁকে সর্বদা উৎকণ্ঠিত করে রাখত।

মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরও আমি আমার চাকরি বজায় রাখি। আমার মা সব সময় আমাকে লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিতেন, কিন্তু সাংসারিক অভাব মেটাবার জন্য আমি কিছুদিন পর্যন্ত আমার উপার্জন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখি। ১৯৪৬ সালে আমি একদিন নাকুরু শহরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাই—সেইটাই কিন্তু আমার প্রথম ও শেষ রেস খেলতে যাওয়া। আমার সঙ্গে ছিল আমার সঞ্চিত ৪০ শিলিং, যা থেকে ২ শিলিং খরচ করে ১২৪৮৭৬ নম্বরের একটা টিকিট কিনি বাজী ধরার জন্য। অতি যত্নে টিকিটটা হাতে ধরে রেখে খানিকক্ষণ প্রার্থনা করি, তারপর আস্তে আস্তে যে বোর্ডে জেতা টিকিটের নম্বর লেখা হচ্ছিল, তার দিকে এগোতে থাকি। হঠাৎ একি দেখি! এ যে ১২৪৮৭৬ নম্বরটাই লেখা রয়েছে। ভাল করে চোখ রগড়ে আবার দেখলুম—হ্যাঁ, ঠিক ঐ নম্বরটাই বটে। অসহায়ভাবে মাটিতে বসে পড়ে আমি আমাদের দেশীয় প্রথা অনুযায়ী নিজের মাথায় নিজে বাড়ি মেরে নিঃসন্দেহ হলুম যে, আমি স্বপ্ন দেখছি না। ইউরোপীয়ানরা এই সময় নিজেদের গায়ে চিমটি কাটে, আমিও তাই করলুম এবং আর একবার নিঃসন্দেহ হলুম যে, আমার নম্বরটাই লেখা রয়েছে। তখন আমি এগিয়ে গিয়ে আমার টিকিটটা একজন পরিচালকের হাতে দিলুম, যার বদলে তিনি আমাকে ১৬০০ শিলিং দিলেন। ১৬০০ শিলিং......আমার মাথা ঘুরতে লাগল, এই দিয়ে ৮টা নতুন সাইকেল কিনতে পারি আমি......১৬০০ শিলিং...সব ক'টা নতুন, আর প্রত্যেকটির গায়ে একটা করে ঘণ্টি আর আলো লাগান।

নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি প্রস্রাবাগারের ভেতর লুকিয়ে পড়লুম, যাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারি আমার কর্তব্য কি। আমার তখন মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবী সুদ্ধ লোক আমার এই হঠাৎ লব্ধ বিরাট ধনের কথা জানতে পেরেছে, আর তারা সকলেই হয়ত ওৎ পেতে আছে আমার এই সম্পত্তি চুরি করবার জন্য। আমি নোটের তাড়া রুমালে বেঁধে তাকে আমার কোমরের বেল্টের সঙ্গে বাঁধলাম, তারপর বেল্টটা আমার প্যান্টের ভেতর পরে নিলাম। তখন কিছুটা সাহস ফিরে আসে মনেও আমি বাড়ির দিকে পাড়ি দিই অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে, যদিও বাড়ি না পৌঁছান অবধি একটা ভাবনা বরাবরই উঁকি মারছিল মনের কোণে। বাড়ি থেকে আনা চল্লিশ শিলিং-এর বত্রিশ শিলিং আমার কাছে তখনও ছিল, তা দিয়ে আমি আমার বোনের জন্য একটা ড্রেস ও মার জন্য চাদর, কম্বল, খাবার ইত্যাদি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরি। দীর্ঘ আট মাইল রাস্তা একা হেঁটেই পার করে দি, তবু ভয়ে কারুর সাথে কথা বলি নি বা কোন গাড়ির কাছ থেকে লিফ্‌ট্ চাই নি। অবশেষে সন্ধ্যের মুখে বাড়ি পৌঁছে আমি বাড়ির সকলকে আমার সৌভাগ্যের কথা বলি ও উপহারগুলো দিই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি মাকে একথাও জানাই যে, এবার ওবাদিয়ার মত আমিও একটা সাইকেল কিনব। মা কোন কথা না বলে দুশো শিলিং আমার হাতে দেন ও বাকি চোদ্দশ' শিলিং তুলে রাখেন তাঁর কাছে। অনেকদিন পরে তিনি এক-দিন আমাকে বলেন যে, বাড়তি টাকা-পয়সা তিনি সর্বদা তার কোমরের সঙ্গে বাঁধা একটা চামড়ার থলের ভেতর রাখতেন। আমরা সে রাত্রে কোন ভোজ বা আনন্দ-উৎসব করি নি, কারণ মার মতে, তাতে ফার্মের অন্য লোকেদের মনে সন্দেহ হবার আশঙ্কা ছিল। তারা হয়ত আমাদের নবলব্ধ সম্পত্তি চুরিও করতে পারত।

তার পরদিন সকালে মা আমাকে বলেন যে, এবার আমায় আবার স্কুলে ভর্তি হতে হবে, আর তখুনি সাইকেল কেনা হবে না। ঠিক সেই সময়ই জেমস থুকু মাংগেথি নামক এক আফ্রিকান যুবক নেয়েরী জেলার কিপুরি গ্রাম থেকে ফার্মে থাকতে আসে। তার ট্রাইয়নের সঙ্গে নিখুঁতভাবে ইংরাজীতে কথা বলার ক্ষমতা দেখে আমার মনেও আবার লেখাপড়া শেখার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। যদিও

আমি এখন বুঝতে পারি যে, তার ইংরাজীতে অনেক ভুল ছিল। তবু সে সময় আমাদের অজ্ঞতা তাকে বিদ্বানের অনেক উচ্চ গদিতে আসন দিয়েছিল। জেমস্ এখন নাইরোবি শহরে একজন পাচকের কাজ করে। যাক, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি আবার নাকুরু আফ্রিকান স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই।

কিছুদিন পরে আমি শুনলাম যে, নযেরো শহরে আফ্রিকানদের এক বিরাট সভা হবে, তাতে একজন আফ্রিকান বক্তৃতা দেবেন। ইনি বহুদিন বিলাতে ছিলেন। সভার দিন ছিল রবিবার। যেদিন কিনা রিফট্ ভ্যালি অঞ্চলের সব শ্রমিকরা বাজারে যায়। ঐ অঞ্চলের লোকেদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা প্রেরণা আগে ছিল না, কিন্তু পনেরো বছর ইংলণ্ড প্রবাসী এক আফ্রিকানের ভাষণ শোনার ও তাকে চোখে দেখার জন্য সকলেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এ ধারণাও সকলের মনে হয়েছিল যে, বিদেশে থেকে তিনি হয়তো সোয়াহিলি বা কিকুয়ু কোন ভাষাটাই ভালভাবে বলতে পারবেন না। আমাদের স্কুল থেকে অনেকেই যেতে চেয়েছিল, কাজেই স্কুলের কমিটির তরফ থেকে একটি লরি ভাড়া করে আমরা চল্লিশজন ছাত্র একসঙ্গে যাই। সভাস্থলের কাছে আসতে দেখলাম আরও অনেক লরি ঐ পথে চলেছে, তা ছাড়া সারবন্দী লোক পায়ে হেঁটেও চলেছে। সভা আরম্ভ হবার সময় অন্তত চার থেকে পাঁচ হাজার লোক জমায়েৎ হয়েছিল, তার ভেতর অনেক বাচ্চা ও মেয়েরাও ছিল।

দু'জন লোক জোমো কেনিয়াট্টাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সভার প্রারম্ভে ছোটখাট বক্তৃতা দেয়। তাদের ভাষণ মোটেই ভাল হয় নি, কারণ, তখনও আমাদের দেশের লোকেরা বক্তৃতা দিয়ে জনতাকে আকৃষ্ট করবার কায়দা আয়ত্ত করতে পারে নি। ফলে আমরা অধৈর্য হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু এই সময় কেনিয়াট্টা স্বয়ং সভামঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর গলার গম্ভীর আওয়াজ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেটা তাঁর চেহারায় প্রকট হয়ে উঠে, সকলের উপরেই এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং ছেলে-বুড়ো সকলে গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। তিনি তাঁর বিলেতের অভিজ্ঞতার বর্ণনা যেন আর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর কিকুয়ু ও সোয়াহিলি দুটো ভাষারই অদ্ভুত দখল সবাইকে মোহিত করেছিল, এমন কি তিনি এমন সমস্ত পূর্ব প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, যা নাকি জনতার অনেকেই আগে কখনও শোনে নি।

তিনি বলেছিলেন যে, ইউরোপীয়ানদের আমাদের দেশ থেকে তাড়াবার কোন ইচ্ছাই তাঁর নেই, কিন্তু তাদের এখন বোঝা উচিত যে, তারা আমাদের দেশে অতিথি এবং তাদের এখন মালিকের বদলে অতিথির মতই ব্যবহার করা উচিত। মাত্র কয়েক বছর আগেও তারা ছিল আমাদের দেশে একেবারে নতুন এবং সে জায়গায় আমরা তাদের অতিথির আদরে বসিয়েছি, সেই জায়গায়ই এখন তারা নিজেদের বলে দাবি করছে। আমরা তখন তাদের বাচ্চাদের কাঁধে করে নিয়ে ঘুরেছি এবং মোম্বাসা থেকে নাইরোবি—এই সুদীর্ঘ তিনশত মাইল পথ রিক্সায় করে বয়ে এনেছি, যাতে কিনা তাদের পা কাঁটাপথে বিচরণ করে ক্ষতবিক্ষত না হয়ে যায়। তাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যে মাটির ওপর তারা বিচরণ করছে, তা আমাদেরই। তিনি এও বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এক আফ্রিকান সরকারের কাছে ইউরোপীয়ানদের ভয় পাবার কোনই কারণ নেই, যেমন কিনা তিনি নিজে একজন আফ্রিকান হয়েও বিলেতে ইউরোপীয়ানদের রাজত্বে থাকতে বিন্দুমাত্র ভয় পান নি। বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমরা হাজারে হাজারে আফ্রিকান যুবকদের ইংরেজ সরকারকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য পাঠিয়েছি, তাদের মধ্যে অনেকে নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়েছে ইংরাজকে সাহায্য করতে। যুদ্ধের ... প্রতিদানস্বরূপ সরকার পুনর্বাসের জন্য জমি অর্থ ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে শুধুমাত্র নিজেদের দেশের লোকের জন্য আর আফ্রিকানদের জন্য প্রভেদ নীতি তাদের কাল চামড়ার ওপর ভিত্তি করে, যার ফলে তারা নিজের দেশেই সম অধিকার থেকে বঞ্চিত: বেকার সমস্যা আর "কিপাণ্ডে"ই (পরিচয়পত্র)*

আজ তাদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু মজা এই যে, নিজেদের দুর্দিনে মরবার জন্য কোন প্রভেদ নীতির দরকার হয় নি।

এর পর জোমো কেনিয়াট্টা জনতার কাছে তাঁর আবেদন পেশ করলেন: তারা যেন ভুলে যায় গৃহবিবাদ, ভুলে যায় উপজাতি ও জাতি বিবাদ, শুধু এই কথাই সদা-সর্বদা যেন মনে করে যে, তারা সবাই আফ্রিকান নিগ্রো, আর তাদের একত্র হওয়া প্রয়োজন দেশ থেকে এই প্রভেদ নীতি, দুর্নীতি ও বিদেশী শাসন দূর করার জন্য। তিনি আরও বলেন যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকারই উচিত লেখাপড়া শেখার, যাতে তারা সবাই মানুষের মত হয়ে বাঁচতে পারে, আর প্রয়োজনমত দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। কেনিয়াট্টার ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠল তুমুল হর্ষধ্বনি জনতার মধ্য থেকে, আর সমবেত কিকুয়ু নারী সকল কিকুয়ু প্রথা অনুযায়ী তাকে পাঁচবার "নাগেমীর" দ্বারা সম্বর্ধনা জানাল। নাগেমী হল বিশেষ রকমের তীক্ষ্ণ এক আওয়াজ—যা কেবল পুত্রসন্তানের আবির্ভাবেই করা হয়, আর করা হয় কোন বিশেষ বক্তার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে। ধীরে ধীরে সভা ভঙ্গ হল, যদিও তার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমবেত জনমণ্ডলী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে সেদিনকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিল। এইভাবে কেনিয়াট্টা সেদিন সর্বপ্রথম আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি, দেশভক্তি ইত্যাদির প্রেরণা জাগিয়ে তোলেন। যারা বরাবর হতাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তারাও যেন আলোর সন্ধান পেয়ে জেগে উঠল। সেদিন গভীর রাত্রি অবধি রিফট্ ভ্যালির প্রতিটি কুঁড়ে ঘরে, পান্থশালায়, রাস্তায় ও লরিতে আফ্রিকানরা তাদের লণ্ডন থেকে সদ্য প্রত্যাগত নেতার ও তাঁর প্রদত্ত আশ্বাসবাণীর কথাই আলোচনা করেছিল।

জোমো কেনিয়াট্টার আদর্শবাদ, মহান ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় বাচনভঙ্গি আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সভাস্থলেই আমি শপথ গ্রহণ

*এটি হচ্ছে একটি বাধ্যতামূলক দলিল, যা প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত আফ্রিকানকে সর্বদা সঙ্গে রাখতে হত। এই দলিলে থাকত তার একটি ফটো, একটি সরকারী নম্বর এবং তার বাপ, পিতামহ ও গ্রামের পরিচয়। এই দলিলপত্র ছাড়া কোন আফ্রিকান চাকরি পাবার অধিকারী ছিল না এবং যে-কোন সময় জিজ্ঞাসা মাত্র এই পরিচয়পত্র পুলিশকে না দেখাতে পারলে তার বিনা বিচারে হাজত বাস হত।

করি যে, তাঁর সঙ্গে নিজে দেশের স্বাধীনতার জন্য, অন্ধকার মোচনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। জীবনের সে এক মহান্ অভিজ্ঞতা; যখন কিনা আমার সম্মুখে দেখা দিল এমন এক আদর্শের, এমন এক প্রেরণার উৎস, যার জন্য আমি সমস্ত কিছুই, এমন কি আমার জীবন পর্যন্ত বলিদান করতে প্রস্তুত হই।

এর পরের চার বছর ধরে আমার জীবনের সর্বোচ্চ কাম্য ছিল লেখাপড়া শেখা ও তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে আমি ফিরে গিয়েছিলাম নেয়েরী রিসার্ভে, অর্থাৎ আমার পিতার দেশে। আমার মতে, সেখানকার লোকেরা ছিল অগ্রগতিশীল, আর রাজনৈতিক আবহাওয়াও সেখানকার ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের চাষবাসের ধারাও ছিল সেই পরিমাণে অনুন্নত—ভুট্টা, কলা, সিম, বেগুন ইত্যাদি সব কিছুই তারা একসঙ্গে মিশিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিত, ফলে কোনটাই যথাযথভাবে বাড়বার সুযোগ পেত না। খুব কম লোকের মধ্যেই রাজনীতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল। যারা আমার পিতার জমিজমা চাষ করে যাচ্ছিল, তারা অবশ্যই আমাকে ফিরতে দেখে খুশি হতে পারে নি। তারা মনেপ্রাণে এই আশাই করেছিল যে, আমার পিতার সঙ্গে তাদের জমিজমা সংক্রান্ত কোন লেনদেনের খবরই আমি জানব না বা বন্ধকী জমি ছাড়াবার মত গরু, ছাগল, ভেড়া বা আর্থিক ক্ষমতা আমার হবে না। যাক, ধীরে ধীরে এই রকম সমস্ত জমিই আমি ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং তাবই কিছু অংশে আমি তাদের কয়েকজনকে আমার "আহই" অর্থাৎ ভাড়াটিয়া হিসাবে চাষবাস করতে দিয়েছিলাম। এ সময় আমার লেখাপড়া শেখা প্রথমে চিঙ্গাতে কারিকো প্রাইমারী স্কুলে ও পরে ওথায়াতে কারেমা স্কুলে বহাল থাকে। এর পর আমি এম্বু জেলায় কেরুগয়া ইন্টারমিডিয়েট স্কুলে ভর্তি হই। এই সব কটা স্কুলই রোমান ক্যাথলিক চার্চের দ্বারা পরিচালিত হত এবং ঐ সময় আমি নিজেকেও রোমান ক্যাথলিক বলে মনে করতাম। ১৯৫০ সালে কেরুগয়ার প্রধান শিক্ষকের আশীর্বাদে আমি উগান্ডার বুডো অঞ্চলের বিখ্যাত কিংস কলেজে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে ভর্তি হই। সেখানে আমি বাইশ বছর বয়স অবধি লেখাপড়া শিখি। এই কলেজের পরিচালনার ভার ছিল প্রটেস্টাণ্ট চার্চ মিশনারী সংস্থার হাতে এবং সেখানে উচ্চমানের শিক্ষাদান করা হত।

উগান্ডায় থাকাকালীন আমার সময় খুব ভালভাবেই কেটেছিল। যদিও সেখানকার অধিবাসীদের (বাগান্ডা-প্রধান উপজাতি) সংরক্ষণশীলতার বর্ম ভেদ করা প্রায় অসম্ভব, তবু আমি সেখানকার লোকেদের ভেতরও বন্ধুত্বের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, যা পরে দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেখানকার লোকেরা লেখাপড়া শেখায় অত্যন্ত উৎসাহী এবং তাদের যুবদলের মধ্যে ভবিষ্যতের অনেক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ নেতার অঙ্কুর দেখতে পাই। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, বাগান্ডার কেবল নিজেদের স্বল্পপরিসর রাজত্ব (যা নাকি উগান্ডার খানিকটা অংশমাত্র) রক্ষা করা নিয়ে এমনভাবে মেতে ওঠে যে, তার ফলস্বরূপ উগান্ডার স্বাধীনতার পথ অনর্থকভাবে বিলম্বিত হতে থাকে। প্রায় সব বাগান্ডারই সাইকেল আছে দেখি এবং এও দেখে আশ্চর্য হই যে, তারা কি অদ্ভুত উপায়ে এর ব্যবহার করে। তারা এই সাইকেলের উপর জীবন্ত গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি চাপিয়ে বাজারে নিয়ে যায় এবং যে পরিমাণ মাল তারা সাইকেলে বহন করতে পারে, তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। একদিন বুডোর কাছে আমি এক সাইকেল আরোহীকে জ্বলন্ত স্টোভ নিয়ে যেতে দেখি। সে নির্বিকার চিত্তে সাইকেল চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে খাচ্ছিল!

বুগান্ডায় থাকাকালীন আমার কেনিয়ার স্বদেশী ভাই-বোনেদের উপর ইউরোপীয়ান চাষাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের সংবাদ আমার কাছে পৌঁছয় এবং আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। প্রায় প্রত্যেক কিকুয়ু যাত্রীর কাছ থেকে আমি উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায় খবর পেতাম কেনিয়ার এই দুর্দিনের কথার। আর তার সঙ্গে তাদের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষের খবরও আসত। সব থেকে পীড়া দিত আমাকে প্রভেদ নীতির ফলাফল, যা নাকি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে অসহ্য করে তুলেছিল। এর উপর ছিল চাষবাসের জমির অকুলান, লেখাপড়া শেখার সুযোগ-সুবিধার অভাব ও সরকারের দমননীতি। বৃটিশ সরকার কোনমতেই শিক্ষিত ও প্রগতিশীল আফ্রিকানদের বিধানসভার সদস্য হতে দিচ্ছিলেন না। অবশ্য আমি এই সময় আমার পরীক্ষার পড়া নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, এই রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় পাই নি। আমার বদ্ধপরিকর ধারণা হয়েছিল যে, আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে লেখাপড়ার দ্বারা নিজেকে আগে সংগ্রামের জন্য তৈরি করা—যাতে নাকি আমি দেশের অজ্ঞ ভাই-বোনেদের জোমো কেনিয়াট্টার আদর্শে আলোকের সন্ধান দিতে পারি। কিন্তু ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, বৃটিশ সরকার শীঘ্রই তাদের দমননীতির কিছুটা উপশম না করলে কেনিয়া দারুণ সংঘাতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, যার ফলস্বরূপ সারা দেশ আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা আছে। ১৯৫২ সালের ২২শে অক্টোবর আমি আমার পরীক্ষার ফলাফল বেরোবার আগেই কেনিয়ায় ফিরে যাই এবং শুনে আশ্চর্য হই যে, তার দুদিন আগেই কেনিয়ার নতুন গভর্নর স্যার এভিলিন বেরিং সারা দেশে "ইমার্জেন্সী" বা সংকটকালীন অবস্থার হুকুম জারী করেছেন।

[ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

কী সেই নিজস্ব রীতি? কোথায় তাঁদের বৈশিষ্ট্য? সেই বৈশিষ্ট্যটুকু খুঁজে পেতে হলে গান্ধার রীতির প্রথম যুগের নিদর্শন ও পরবর্তীকালের নিদর্শনগুলির মধ্যে পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করতে হবে। গান্ধার রীতির জন্ম গ্রীক-প্রভাবে। তাই প্রথম যুগের গান্ধার রীতির বুদ্ধমূর্তিতে গ্রীক দেবতার আভাস। এই মূর্তি একটা চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ মূর্তি। মূর্তির মধ্যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলাই ছিল এ রীতির প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ যে সকলের মধ্যে বিশিষ্ট একজন, তিনি যে একজন-মাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, এই কথাটাই যেন এই গ্রীক প্রভাবাচ্ছন্ন গান্ধার মূর্তি বলতে চায়। কিন্তু পরবর্তী যুগে এ মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছিল। পরবর্তী গান্ধার রীতিতে এল বহু পরিবর্তন। গ্রীকদের প্রভাবকে পরবর্তী শিল্পীরা ভারতীয় আদর্শে ঢেলে সেজেছেন। তাঁরা বললেন, বুদ্ধকে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করা চলবে না। অহং ভাব বর্জন ও আত্মসুখ ত্যাগের মধ্য দিয়ে, আত্মার দেহান্তর গমনের সুদীর্ঘকালের প্রক্রিয়ার মারফৎ সকল জীবকেই যে চরম উৎকর্ষে উপনীত হতে হবে, বুদ্ধ তারই প্রতীক। গ্রীক প্রভাবমণ্ডিত বুদ্ধের মধ্যে যে একক ব্যক্তিত্ব ছিল, ভারতীয় শিল্পীরা ক্রমে তার মধ্যে আনলেন একটা নমনীয়তা, একটা প্রশান্তি। তখন সেই মূর্তির সার্বভৌম ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হল, তার পরিবর্তে এল এমন এক অতীন্দ্রিয় ভাব, যা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে বিচরণ করে। যিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, তাঁর মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে চরম প্রশান্তি, তাঁকে করে তুলতে হবে অতিমানবের প্রতীক। যে মূর্তি ছিল এক দৃপ্ত নেতার প্রতিরূপ, যিনি বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর পদতলে পৃথিবীর প্রতি যেন করুণার দৃষ্টি নিয়ে, সেই মূর্তি পরিবর্তিত হয়ে তার মধ্যে এল এক প্রশান্ত নিশ্চিন্ততা, প্রকৃত শান্তি, ঐহিক বন্ধন ছিন্ন করার পরম জ্ঞান। এইখানেই গান্ধার-শিল্পের বৈশিষ্ট্য।

কুশানদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল মথুরায়। মথুরা রীতির শিল্পেও অবশ্য প্রথম দিকে গান্ধার রীতির প্রভাব, এমন কি গ্রীক-প্রভাব দেখা দিয়েছিল। কারণ, মথুরার শিল্পীরা বহু পূর্বেই গান্ধারের শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু গান্ধার রীতির সঙ্গে এর পার্থক্যও লক্ষণীয়। মথুরা রীতিতেই প্রথম অঙ্গের জীবন্ত প্রাণ দেখা গেল ও একটা বাস্তবতার ছাপ লক্ষ্য করা গেল।

মানুষের দেহের পূর্ণাঙ্গ রূপ আর নারীদেহের সৌন্দর্য তার খুঁটিনাটি নিয়ে অত্যন্ত প্রকট বাস্তবতার প্রলেপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কুশান যুগের মথুরা রীতির মূর্তিশিল্পে। কুশান শিল্পীদের মধ্যে দুটি বিদেশী প্রভাব সহজেই কাজ করেছিল। একটি হল মঙ্গোলীয় প্রভাব। কুশান রাজারা মঙ্গোলীয় কাজেই মথুরা-রীতিতে এ প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। রাজপরিবার সংশ্লিষ্টদের প্রতিকৃতি-মূর্তির মধ্যে এ প্রভাব পরিস্ফুট। দ্বিতীয় প্রভাবটি হল গ্রীক-রোমক প্রভাব। গান্ধার শিল্পীদের সংস্পর্শে এটি সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় খৃস্টাব্দে নির্মিত বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের মূর্তির মধ্যে এ প্রভাব লক্ষণীয়। এর দৃপ্ত ভঙ্গি আর বাস্তবতার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে।

গ্রীক-গান্ধার শিল্পে বুদ্ধমূর্তিতে একটা প্রশান্ত উজ্জ্বলতা, একটা লোকোত্তর ভাব দেখা যায়। কিন্তু মথুরার শিল্পে বুদ্ধমূর্তিতে একটা সজীব প্রাণের স্পর্শ। বুদ্ধ এখানে দেবতা ও মানুষের শিক্ষক। তিনি যেন জীবন্ত মানুষ। এ রীতির বহু বুদ্ধমূর্তিতেই দেখা যাবে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বুদ্ধ তাঁর একখানা হাত তুলে উপদেশ দিচ্ছেন। এখানে তাঁর প্রজ্ঞাপারমিতা রূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নি, এখানে তিনি নিতান্তই এ জগতের মানুষ। শিক্ষাদানের এই বিশেষ ভঙ্গিটি তাঁকে এনে দিয়েছে একেবারে পার্থিব পরিবেশের মাঝখানে। এই জীবন্ত বাস্তবতাই কুশান-মথুরা রীতির বৈশিষ্ট্য। শিল্পে এই মানবতার আরোপ ও বাস্তবতার ছাপ মথুরা-রীতিতে এনেছে একটা নমনীয়তা। কিন্তু জীবন্ত বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী-কালে গুপ্ত আমলের বুদ্ধমূর্তির ঐতিহ্যে রক্ষিত হয় নি। গুপ্তযুগে আবার বুদ্ধের ঐশী লোকোত্তর চরিত্রটিই বড় হয়ে উঠল।

গুপ্তযুগে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে কুশানদের পতনের পর উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল সর্বপ্রথম একদেশীয় রাজশক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ হল। এই সময়েই এই দেশীয় রাজশক্তি, অর্থাৎ গুপ্ত রাজাদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতার ভারতীয় ভাস্কর্য—হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য উভয়েই চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

মথুরা ও কুশান রীতির বাস্তবতা ছিল বড়ই স্থূল ও প্রকট। উক্ত শিল্প-সুলভ শোভনতা ও চারুত্ব ছিল না তার মধ্যে। গুপ্তযুগের শিল্পে এই বাস্তবতা

দেখা দিল একটা পরিমার্জিত রূপ নিয়েই। আবার গান্ধার রীতির গ্রীক বৈশিষ্ট্যটুকুও বিলুপ্ত হল ভারতীয় আদর্শের মধ্যে। সুতরাং গান্ধার রীতি ও কুশান রীতির একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ পাই গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তিতে।

গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তিতে প্রজ্ঞার আন্তর আলোকের ছটায় বুদ্ধের অপার্থিব চরিত্র দীপ্যমান। তিনি মানুষ ও দেবতাদের রক্ষাকর্তা। মূর্তির মধ্যে এই পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে এক তুরীয় মার্গের সন্ধান মেলে। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তিতে এই ঐহিক সীমার বাইরেও একটা শক্তির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এ যুগের শিল্পীর হাতে পাথর যেন ধরা-ছোঁয়ার অতীত একটা আধ্যাত্মিক মাধ্যম, এ যুগের শিল্পীর তৈরি বুদ্ধমূর্তি যেন প্রস্তরীভূত আধ্যাত্মিক আলোক। মূর্তির দেহ থেকেও যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক আলোক।

গুপ্তযুগে স্থাপত্যকলার আলোচনা করতে গিয়ে দেখি এ যুগে স্থাপত্যের প্রথম বিকাশ ঘটেছিল চৈত্যগুলিকে কেন্দ্র করে। তারপর এসেছে মন্দির।

গুপ্তযুগের মন্দিরগুলি প্রায় মধ্যভারতেই সীমাবদ্ধ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জব্বলপুরের বিষ্ণুমন্দির, নাগোদ রাজ্যের শিবমন্দির, অজয়গড়ের পার্বতী মন্দির, সাঁচীর বৌদ্ধমন্দির, বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধমন্দির আর ঝাঁসী জেলার দেবগড়ের একটি ছোট শিবমন্দির।

হিন্দু ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যশিল্পের সূচনা হয়েছিল গুপ্তযুগের একেবারে আদিতে।

গুপ্তযুগে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত চৈত্য বা পূজাকক্ষগুলিই পরবর্তীকালে মন্দিরে রূপ গ্রহণ করেছিল। গুন্টুরে এরকম একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। চৈত্যগুলি নির্মিত হয়েছিল অতি প্রাচীনকালে। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত এইরকম একটি মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে তক্ষশিলায়। অনুরূপ আর একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে সাঁচীতে। এটি অত্যন্ত প্রাচীন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুন্টুরের মন্দিরটি আগাগোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি এবং এর গঠনভঙ্গির মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য আছে। খিলানাকৃতি অর্ধবৃত্তাকার ছাদটি এর বৈশিষ্ট্য। গুপ্তযুগে দেওয়াল পরিবেষ্টিত মণ্ডপ নির্মাণেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় রীতিতে নির্মিত দেবালয়ের ক্ষেত্রেই এর যথেষ্ট প্রচলন হয়েছিল।

সাঁচীতে বৌদ্ধরীতিতে গঠিত ক্ষুদ্র কক্ষ ও স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপসমন্বিত মন্দির পরবর্তীকালে ভারতে মন্দির নির্মাণে আদর্শস্বরূপ হয়েছিল। গুপ্তযুগে মন্দির-স্থাপত্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল মন্দিরের সমতল ছাদ ও চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরভাগ সরল ও অনাড়ম্বর। মন্দির তৈরির সময় একটার পর আর একটা পাথর বসানো হয়েছে শিল্পসম্মত ও রুচিসম্মতভাবে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কোথাও গৃহনির্মাণ মসলা ব্যবহৃত হয় নি। মন্দিরের দ্বারপথে অনিন্দ্য খোদাই এবং দ্বারললাটে কল্পলতা, পত্রলতা প্রভৃতি নক্সা গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্য। গঙ্গা-যমুনা মূর্তি স্থাপন এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গুপ্তযুগে মন্দিরের শিখর অনুপস্থিত ছিল। উত্তর ভারতীয় আর্য স্থাপত্যরীতিতে শিখরের সূচনা হয়েছে আরও পরবর্তীকালে। এ ছাড়া গুপ্তযুগের মন্দিরাদির আর একটি বৈশিষ্ট্য, এর স্তম্ভগুলির ভিত্তি (বেস্) অংশটি সরল চতুষ্কোণাকৃতি, আর শীর্ষদেশে পূর্ণকলস।

গুপ্তযুগের অবসানের পর ছয় শত বৎসর পর্যন্ত স্থাপত্যশিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ যুগ। এই সময়ের মধ্যেই স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতির উদ্ভব হয়েছিল এবং আজ আমরা সারা ভারতে নয়নবিমোহন যে সকল মন্দির দেখতে পাচ্ছি সেগুলি নির্মিত হয়েছিল এই সকল রীতির অনুসরণে।

পূজার্চনার জন্য আদি যে সকল মন্দিরের কথা আমরা জানতে পারি, তার সন্ধান পাই বিভিন্ন রূপে—কখনও স্তূপের আকারে, কখনও চৈত্য, কখনও বা বিহার, আবার কখনও সমতল ছাদ মন্দির, কখনও বা শিখর রীতির মন্দির রূপে। 'বিহার' হল বৌদ্ধদের গুহামঠ, আর 'চৈত্য' বৌদ্ধদের পূজার্চনা কক্ষ।

অতি উন্নত চিত্রকলার কথা উল্লেখ না করলে গুপ্তযুগের শিল্পের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গুপ্তযুগের চিত্রকলার উৎকর্ষের উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে অজন্তা গুহামন্দিরে। সমকালীন সাহিত্যেও চিত্রকলার উৎকর্ষের প্রমাণ পাই প্রচুর। কালিদাস ও বাণভট্টের রচনায় উপমার ব্যবহারে, বর্ণনায় চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের উল্লেখ পাই। অজন্তার কথা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পৃথক প্রবন্ধে।

॥ সাত ॥

মোটামুটিভাবে বলা যায়, গুপ্তযুগের পর স্থাপত্যশিল্পে দুটি প্রধান রীতি গড়ে উঠেছিল—একটি ভারতীয় আর্য বা উত্তর ভারতীয় রীতি, অপরটি দ্রাবিড়ীয় বা দক্ষিণ ভারতীয় রীতি। এদের মধ্যে পার্থক্য প্রধানত মন্দিরের 'বিমান' ও শিখরের গঠনভঙ্গিতে। উত্তর ভারতীয় রীতির মন্দিরগুলির বিমান বা মন্দিরের প্রধান অংশটি খানিকটা গোলাকৃতি, মাঝখানটি অপেক্ষাকৃত স্থূল, শীর্ষদেশে সমান পরিধির চক্রাকার বস্তু এবং তারও ঊর্ধ্বে একেবারে শীর্ষে 'কলস' আকৃতির বস্তু শোভা পায়। দ্রাবিড়ীয় রীতির মন্দিরের 'বিমান' পিরামিড-সদৃশ এবং শিখর পঞ্চভুজ, কখনও বা অষ্টভুজাকৃতি এবং তা ক্রমে ধাপে ধাপে সরু হয়ে গিয়েছে।

উভয় রীতির মধ্যে আর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। দ্রাবিড়ীয় রীতির মন্দিরগুলিতে স্তম্ভ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু উত্তর ভারতীয় রীতিতে নির্মিত মন্দিরগুলিতে স্তম্ভ প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে।

দ্রাবিড়ীয় রীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মন্দিরের 'গোপুরম' বা প্রবেশদ্বার। মূল দেউলের চারপাশে থাকে চারটি বা পাঁচটি গোপুরম। এই গোপুরমগুলি নির্মিত হয় মণ্ডপের ওপর। গোপুরমগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনন্যসাধারণ নিদর্শন। এই গোপুরমগুলি উচ্চতায় মূল মন্দিরকে ছাড়িয়ে ওঠে। বস্তুত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও গঠনসৌকর্যের দিক থেকে দ্রাবিড়ীয় রীতিতে মূল মন্দির অপেক্ষা গোপুরমগুলিই প্রাধান্য লাভ করে। উত্তর ভারতীয় রীতির মন্দিরে গোপুরমের অস্তিত্ব নেই এবং সেখানে 'গর্ভগৃহে'র ওপরে নির্মিত শিখরই প্রাধান্য লাভ করে।

উত্তর ভারতীয় শিখররীতির সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল পুরী, ভুবনেশ্বর ও খাজুরাহোর মন্দিরগুলি।

এই রীতির আর একটি নাম 'নগর-রীতি'। নগররীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, আর এই রীতি আরও পূর্ণতা লাভ করেছে খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে।

ভারতীয় আর্য নগররীতি পরবর্তীকালে আরও প্রসারিত হয়েছিল পশ্চিমে রাজস্থান ও গুজরাট পর্যন্ত। কিন্তু এই অঞ্চলে এসে নগর-রীতির মন্দিরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এ অঞ্চলের মন্দিরে অনেক ক্ষেত্রেই শিখর অনুপস্থিত বলা চলে, আর থাকলেও তা অনুল্লেখ্য। শিখর অপেক্ষা মন্দিরের সভামণ্ডপ নির্মাণে জোর দেওয়া হয়েছে এ অঞ্চলের মন্দিরে। এখানকার মন্দিরে সভামণ্ডপ নির্মাণে প্রভূত যত্ন নেওয়া হয়েছে আর সভামণ্ডপ নির্মাণে প্রধান অবলম্বন হয়েছে স্তম্ভ। সুপ্রশস্ত সভামণ্ডপ ও তার স্তম্ভগুলির অলংকরণ দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

রাজস্থানের আবু পাহাড়ের জৈন-মন্দিরগুলিতে শিখর আদৌ গুরুত্বলাভ করে নি। এখানে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যা কিছু নৈপুণ্য, তা প্রকাশ পেয়েছে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ গঠনে।

তবে এই সমস্ত বহিরঙ্গ পার্থক্যের কথা ছেড়ে দিলে অন্তরঙ্গ দিক থেকে সকল মন্দিরের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা এক। মন্দিরগুলি ভগবানের বাসভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর শিল্পকলা ও ভাস্কর্য সাধনার যে পরিচয় ভারতীয় মন্দিরগুলির অঙ্গে অঙ্গে পরিস্ফুট, তার মধ্য দিয়েও ভগবানের চরণে পূজাঞ্জলিই দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় মন্দিরগুলির গঠনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে একটা মূলগত ঐক্য স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় মন্দিরগুলি সাধারণভাবে কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি হল মূল মন্দিরটি। একে বলা হয় "বিমান" বা "দেউল"। বিমানের ওপরই গড়ে ওঠে মন্দিরের প্রধান শিখর। বিমানের অভ্যন্তরে থাকে একটি প্রকোষ্ঠ। একে বলা হয় "গর্ভগৃহ"। এই গর্ভগৃহের মধ্যেই বিগ্রহের অধিষ্ঠান। এটি মন্দিরের দ্বিতীয় অংশ। বিমানের সম্মুখের অংশটিকে বলা হয় "অন্তরাল"। এটি গর্ভগৃহে প্রবেশের অলিন্দ বিশেষ। এটি মন্দিরের তৃতীয় অংশ। বিমানের সঙ্গে "জগমোহন" বা "মণ্ডপ"কে সংযুক্ত করেছে এই অন্তরাল। মন্দিরের চতুর্থ অংশ এই জগমোহন হল মন্দিরে পুজো নিবেদনের জন্য আগতদের সমাবেশ কক্ষ। এই চারটি ছাড়া মন্দিরের আরও দুটি অংশ আছে। একটি হল "প্রদক্ষিণ পথ", যা বিমানকে ঘিরে আছে, আর অপরটি "প্রাকার", যা মন্দিরের এই সব কটি অংশকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

॥ আট ॥

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিবেচনা করলে গুপ্তযুগের অবসানের পর সপ্তম শতক থেকে বিভিন্ন রাজাদের শাসনকালে হিন্দু স্থাপত্যের উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজবংশের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে সপ্তম শতক সম্পূর্ণ এবং অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেড়শ বছর পহ্লব রাজারা রাজত্ব করেন। এই সকল স্থানে হিন্দু রাজাদের শাসন বজায় থাকার ও শিল্পের প্রতি তাঁদের প্রবল অনুরাগের জন্য হিন্দু স্থাপত্যের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়েছিল। একমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে পাল ও সেন রাজবংশের আমলে বৌদ্ধশিল্প কিছুটা সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করেছিল।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান আক্রমণের বলি হয়েছিল উত্তর ভারতের বহু প্রাচীন দেব-দেউল। এই সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে হয় গড়ে উঠেছিল মসজিদ, নতুবা দুর্গ। বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে বর্তমানে যে সকল মন্দির দেখা যায়, সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। দিল্লী, আজমীঢ় ও জৌনপুরে হিন্দু স্থাপত্য যে কতখানি উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল, হিন্দু মন্দিরগুলির খিলান ও স্তম্ভ-গুলির মধ্যে তার পরিচয় রয়েছে। পরবর্তীকালে মুসলমান স্থাপত্যরীতির ওপরও এর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই সকল স্থানে মুসলমানদের তৈরি গৃহাদির মধ্যেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে।

উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় রাজস্থানের উদয়-পুরে ও চিতোরে, মধ্যভারতের গোয়ালিয়রে মথুরা-বৃন্দাবনে ও খাজুরাহোতে, পশ্চিম ভারতের গুজরাটে ও কাথিয়াবাড়ে এবং পূর্ব ভারতের উড়িষ্যায়, ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোণারকের মন্দির-গুলিতে। সবশেষে বাংলাদেশের নাম না করলে ভারতীয় আর্য স্থাপত্যরীতির দৃষ্টান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অনেকগুলি সভ্যতার ঢেউ বাংলা-দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। তবে এই সব সভ্যতার দান মন্দিরগুলি এখন খুব স্বাভাবিক কারণেই কোথাও সম্পূর্ণ লুপ্ত, কোথাও বা অর্ধলুপ্ত। একদিকে যেমন জলবায়ু ও আবহাওয়ার গুণে বাংলাদেশে জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে সময়েই একদিকে যেমন ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে প্রাচীন দেবালয়-গুলিকে, অন্যদিকে তেমনি অবার শত্রুর আক্রমণের হাত থেকেও রেহাই পায় নি এই সব মন্দির। কিন্তু তবুও বাংলা-দেশের কোন কোন স্থানে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পর্যালোচনা করলে ভারতীয় আর্য-রীতির স্থাপত্য আন্দোলনের সঙ্গে এর একটা স্পষ্ট যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের স্থাপত্য-রীতির সঙ্গে বাঁকুড়া-বর্ধমানের মন্দির স্থাপত্যের একাত্মতা লক্ষ্য করবার মত।

পাল রাজাদের আমলে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের বরাকরে একটি মন্দিরগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় লোকেরা এই মন্দিরগুলির নাম দিয়েছে বেগুনিয়া মন্দির। বেগুনের আকৃতির সঙ্গে মন্দিরগুলির গঠনভঙ্গির সাদৃশ্যের জন্যই এগুলি এই নামে অভিহিত হয়েছে।

বাংলার মন্দিরধারার একটা উল্লেখ-যোগ্য শ্রেণী হল চালাঘর আকৃতির মন্দির। এগুলির গঠনপ্রণালীতে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য প্রকাশ পেয়েছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজাদের আমলে এই ধরনের কতকগুলি মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

বাংলার মন্দিরধারায় আর একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হল জোড়বাংলা মন্দির। এ ক্ষেত্রে চালাঘর আকৃতির দুটি মন্দির একত্র যুক্ত। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে এবং হুগলীতে এর দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

পাল ও সেন বংশের রাজাদের আমলে মালদহের সন্নিকটে একটি স্থাপত্যধারার সূচনা হয়েছিল। সে যুগে ঐ অঞ্চলে এই ধারার মন্দিরগুলি একটা বিশেষ স্থাপত্য আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের কোপদৃষ্টি এই মন্দিরগুলির প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশকে গৌড়ে মুসলমানদের রাজধানী গড়ে উঠল, আর তাতে কাজে লাগানো হল এই সব মন্দিরের নানা অংশ। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মসজিদগুলিতে মন্দিরের বহু লুণ্ঠিত অংশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই সব মসজিদের খোদাই করা পাথরগুলির কারুকার্য পরীক্ষা করলে সেন রাজাদের আমলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য যে কতখানি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা অনুধাবন করা যায়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির-শিল্পের এক-একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সন্দেহ নেই। এই বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে স্থানীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে। তবে

এই সমস্ত মন্দিরের গঠনরীতি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে পরিকল্পনায় ঐক্য, স্থাপত্যরীতি ও দেহসৌষ্ঠবের দিক থেকে সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটা মোটামুটি ধারা লক্ষ্য করা যায় মন্দিরগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতি অনুধাবন করলে। পরিকল্পনায় এই ঐক্য সেই ভারতীয় সভ্যতারই দান। বস্তুত ভারতীয় মন্দির-শিল্পের ইতিহাস ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতারই ইতিহাস।

ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও অজস্র অলংকরণে সমৃদ্ধ ভারতীয় মন্দিরগুলি এই কথাই প্রমাণ করে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা প্রাণের স্পন্দন রয়েছে; প্রাণময় জীবনের একটা লীলাক্ষেত্র এই নিখিল বিশ্ব। সমগ্র বিশ্বচরাচরের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা জীবনের সুসমঞ্জস রূপটি এক স্বর্গীয় সুষমায় সংহত রূপ লাভ করেছে ভারতীয় মন্দিরসমূহের স্তম্ভে স্তম্ভে, দেওয়াল গাত্রে ভারতীয় সমাজজীবনের জীবন্ত চিত্র রচনায়।

॥ সমাপ্ত ॥

সেই পদ্মধরা হাতটার দিকে রাণা একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। ওর চোখের পাতা কাঁপছিল না, চোখ টনটন করছিল না, ফুদ্‌কি এসে মুখচোখের সামনে গুন-গুন করলেও ও ঠায় তাকিয়ে ছিল।

থৈ-থৈ জল! পদ্মপাতাগুলো দুলছিল, পদ্মর কুঁড়িগুলো দুলছিল। পাতায়-পাপ্‌ড়িতে দু'-এক ফোঁটা জল টলটল করছিল। পাখী পদ্ম ছুঁয়ে ছুঁয়ে বলছিল, কোন্‌টা, কোন্‌টা? কেমন হাঁসের মতো পদ্মপানার দঙ্গল দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে যাচ্ছিল পাখী। সেই আধফোঁটা নিটোল পদ্মটা তুলে স্থির সাঁতারে ঝকঝক চোখে হাসতে হাসতে বলল, এ্যাই, এখানে জল কী ঠাণ্ডা! পদ্মধরা হাতটা পানা বাত্‌রাজের আওতা ছাড়িয়ে জলের অনেক উঁচুতে দুলছিল। পদ্মর নালটা আঙুলের ডগায় নেতিয়ে পড়েছে। পদ্ম-ধরা হাতটাকে আর আলাদা মনে হচ্ছে না। রাণা পাড়ে দুব্বোঘাসে বসে সেই পদ্মধরা হাতটার দিকে ঠায় তাকিয়ে ছিল।

পদ্মর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাণা পাখীকে দেখল। কালচে জলে পাখীর সাদা মসৃণ শরীরটা একটা মস্ত খয়রা মাছের মতো ঝিলমিল করছিল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসছিল। ওর জলপরীদের কথা মনে পড়ছিল। পাখী যেন পাতালপুরীর রাজকন্যে হয়ে জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। পদ্ম-শালুক দুলে দুলে ওর সংগে গল্প করছে। একটা মাছরাঙা জিওল ডালে বসে খেলা দেখছে। একঠেঙে বকটা রাজকন্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গল্প শুনছে। জুল জুল করে ব্যাঙ্‌ তাকিয়ে আছে, হাঁস তাকিয়ে আছে, রাণা তাকিয়ে আছে। ওরা সবাই গল্প শুনছে, খেলা দেখছে। একটু শব্দ হলেই বুঝি সবটা কাঁচ ভাঙার মতো ঝন্‌ ঝন্‌ করে ভেঙে পড়বে। ব্যাঙ লাফাবে, হাঁস ডুব দেবে, মাছরাঙা উড়বে, বক উড়বে। আর টুপ্‌ করে রাজকন্যে জলের তলে পাতাল-পুরীতে হারিয়ে যাবে।

রাণা কোন শব্দ করছিল না। পাড়ে বসে বসে স্থির সাঁতারে দুলে দুলে রাজ-কন্যেকে দেখছিল। রাজকন্যের চোখের পাতায় জল, নাকনোলকে জল, কানের লতিতে জল, চুলে জলের জলছাট। পিঠভর্তি চুল তাকে ঘিরে মস্ত পদ্ম-পাতার মতো ভাসছে। অসংখ্য শালুকে পদ্মের মাঝে রাজকন্যেকে একটা মস্ত শ্বেতপদ্ম ভেবে রাণা সুখ পেল। তারও ইচ্ছে করল রাজকন্যের মতো পদ্মবনে দোদুলে শালুক হয়ে সাঁতার কাটে এবং সেই মুহূর্তে রাণা পাখীর আর্ত চিৎকার শুনতে পেল, রাণা, রাণা! রাণারও চোখে পড়েছিল, ও-ও ভীষণ-ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, পাখী পাখী!

শেষ চেষ্টার মতো পাখী হাতের পদ্মচাকি দিয়ে বাধা দিল, ছুড়ে ছুড়ে মারল, পানা-শালুক দঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল কিন্তু তার মধ্যেই যা হবার হয়ে গেছে। সির্‌ সির্‌ তীব্রবেগে এঁকে-বেঁকে জলে ঢেউ তুলে পাখীর পদ্মনালের মতো ঘাড়ে ছোবল দিয়ে কেমন দুল্‌কি চালে দামের জঙ্গলে ওটা ডুব দিল। সে-মুহূর্তে রাণা পুনর্বার কান্নার মতো স্বরে চিৎ-কার করে উঠেছিল, পাখী পাখী!

পাখী অনেকটা কাছাকাছি এসে ওর দিকে হাসি হাসি মুখ তুলে বলল, দূর, ওটা তো জলহেলে, ও তো অনেক দেখেছি, ও কিছু না। প্রথমে এত ভয় লেগেছিল না! আমার পদ্মচাকি-গুলোই গেল। তোর পদ্মটা কিন্তু ফেলি নি, একটু জলও লাগে নি। তুই কত্তোদিন এনে দিয়েছিস, আর তোর অসুখে আমি একটা এনে দিতে পারব না!

পাখীর হাসি দেখে রাণা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। অতদূর থেকে দেখেছে, হয়ত তা-ই জলহেলেই হবে, অমনভাবে এঁকে-বেঁকে ছুটে আসতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। কার না ভয় হয়? অন্যদিন হলে ও ঠিক লাফিয়ে পড়ত। কিন্তু ও কি করবে, ওর হাত যে বাঁধা। হাতটার ওপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে কারুর হাত ভাঙে?

ততক্ষণ পাখী বাত্‌রাজ সরিয়ে সরিয়ে পাড়ে উঠেছে। ওর ছোট্ট ইজেরটা ভিজে সপ্‌ সপ্‌ করছে। ওর সাদা পা দুটো জলে ভিজে কেমন ফ্যাকাশে লাগছে। আঙুলগুলো কেমন কুঁকড়ে কুঁকড়ে হেজে গেছে। ওর মসৃণ ধবধবে বুকটায় এধার-ওধারে দাম-শ্যাওলা জড়িয়ে আছে। শরীরে সবুজ

[illegible] পড়েছে। [illegible] ফেনা ফুরফুরির মালা। [illegible] বেয়ে জল ঝরছে টুপটাপ। ওর চোখ দুটো কেমন ঘোলা ঘোলা, লাল!

পাড়ে উঠতেই রাণা ওর কাছে এগিয়ে আসে। বুক-পিঠ থেকে ঘাম সরাতে সরাতে বলে, কোন্‌খানটায় চুকেছে রে? পাখীর গা দিয়ে কেমন পদ্ম-শালুকের গন্ধ বেরুচ্ছিল। ও হাঁপাচ্ছিল, একটু কাঁপছিলও।

পাখী ফ্রকটা দিয়ে গা মুছতে মুছতে বলল, ঐ তো, গলায়!

রাণা ফু' দিয়ে দিয়ে ফেনা সরিয়ে গলার কাছটায় ঝুঁকে পড়ে দেখল, কানের লতির নিচ বরাবর ঘাড়ের কাছটায় দু' বিন্দু টুকটুকে রক্ত কেমন দলা মেরে আছে। ভিজে ঘাড়ের অনেকটা রক্তজলে লালচে হয়ে গেছে। রক্ত দেখে ওর গা-টা কেমন করে ওঠে। ও পাখীর হাত ধরে বলে, না রে, জলঢোঁড়াই হোক, আর যা-ই হোক, মাসীকে বলা ভাল।

ওর কথা শুনে পাখী কেমন এক মজা-পাওয়া চোখ নিয়ে তাকাল। তারপর হাসি হাসি মুখে বলল, রাণা, তোর হাত ভাল থাকলে তুই ঝাঁপিয়ে পড়তিস না? আমি কি বোকা, তোকে ডাক দিয়েছিলাম। তোকেও যদি কামড়ে দিত? সাপটাকে দেখে আমি কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, না রে? আমার না, তখন সেই নাগকন্যের গল্পটা মনে পড়েছিল। সেই যে পদ্ম-শালুক বনে যে সাপ হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর নীল-পদ্ম আগলায়, কেউ জলে নামলেই ছুটে এসে কামড়ায়! তোর পদ্মটা কিরকম ভাল, না রে? গোটা পদ্মবনটায় অমন আর একটিও নেই।

ওরা গল্প করতে করতে হাঁটছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে একটু থেমে পাখী ফিস্‌ ফিস করে বলে, আমায় সাপে কেটেছে, কাউকে বলিস্‌ না যেন। পদ্মবনে গিয়েছিলাম শুনলে মা আমায় ভীষণ মারবে। আর ও তো জলঢোঁড়া। ওতে কিচ্ছু হয় না। এই নে, পদ্মটা নিয়ে পালা। হাতে পদ্ম দেখলে মা ঠিক ধরে ফেলবে।

কিন্তু রাণা বাড়িতে ঢোকার প্রায় সংগে সংগে পুবপাড়া থেকে লোক এল। বাবার বেরুতেই যা দেরী। ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে বেরুতে বেরুতে সেই লোকটা পাখীর কথা বলল, পাখী কেমন নেতিয়ে পড়ছে।

বাবা বেরিয়ে গেল। রাণা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পাখীর কথা, পদ্মর কথা ভাবছিল। পাখী বলেছিল, পদ্মটা কি রকম ভাল, না রে? পদ্মবনে অমনটি আর একটিও নেই। পদ্মটার [illegible]

[illegible] নীল মনে হল। ও নিজেকেই প্রশ্ন করল, কেমন নীলচে না? সেই নাগকন্যের গল্পটা ওকে ভীষণ নাড়া দিয়ে গেল। সাপটা কেমন এঁকে-বেঁকে জল কেটে ছুটে এসে কামড়াল। পাখীর পদ্ম-ধরা হাতে সেই চিৎকারটা তখনো কানে বাজছিল। লোকটা বলল না, পাখী কেমন নেতিয়ে পড়েছে?

ইস্‌ পাখী যদি পদ্মর কথা বলে দেয়? রাণা ওকে নামতে বলেছিল, এ কথা শুনলে বাবা, মাসী কেউ ওর সংগে কথাই বলবে না। রাণার কেমন মন খারাপ করে। কেন যে ও বলতে গিয়েছিল। এই তো আর ক'টা দিন, হাতের বাঁধনটা খুললেই ও নিজে নিয়ে আসতে পারত। পদ্মটা ওর আর ভাল লাগে না। ও পদ্মটা পুরানো তোরংগের পেছনটায় লুকিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ে।

একটু ঘুরে হিজলতলায় গিয়ে বসে। কেমন আঁধার আঁধার, ঝোপ ঝোপ। চালতা, ফলসা, জারুল, বওলার ছায়ায় জায়গাটা কেমন জংগলা জংগলা। কোথা থেকে একটা কাঁচপোকা বুঁই বুঁ বুঁ করে ডাকছিল, হিজল গাছটার পাতার আড়ালে একটা কাঠ-বিড়ালী টিকিন টিক টিক করে ডাক দিয়ে ছুটছিল।

পাখী আজ আর ঘর নিকোয় নি। হিজলতলায় দুবলা ঘাসের ওপর বসে রাণা পাখীর ঘর দেখছিল। পাখী বলেছে, ওকে একটা ভারি সুন্দর ঘর করে দেবে। গেরিমাটির দেয়াল, শাঁখীচুনের দোর-জানলা, বাবুই খড়ের চাল। রাণা সুগন্ধীর ঝাড় লাগাবে, চিতির বেড়া করবে, রঙ্গনের চারা পুঁতবে। আশ্‌শ্যাওড়া, আকন্দ ঝোপ খুঁজে জোনাকি এনে গোবরে গুঁজে দেবে, ঘর আলো হবে। পাখী কি বোকা, ওকে ব'লে বনবাদাড় হাতড়ে জোনাকি ধরে আনতে হয় আর ও রোজ রোজ কাঠবিড়ালীকে জোনাকি দিয়ে দেবে। কাঠবিড়ালীটাও তেমনি, ওকে দেখে দেখে টিকিন টিক টিক করে খালি হাসে। দাঁড়াও না, আমার ঘর হোক, সেব[illegible] করে। পাখীটা কি, কিচ্ছু ওর মনে থাকে না। কবে থেকে বলছি, গেরিমাটি এনে দিয়েছিল কিন্তু ওর খেয়ালই থাকে না। বললেই বলে, আচ্ছা কাল, কাল ঠিক। ও ভাল হয়ে উঠুক, কাল কাল বললে আর শুনছে না। তারপর কি ভেবে রাণা মনে মনে বলল, আমার আর তিতিরের ঘর ঘিরে চতুর্দিকে ঈশ্বরমূলের ঝাড় লাগাবে। সাপ [illegible] কিছুতেই ঢুকতে পারবে না।

[illegible] কাজলকের দাগগুলো পাখী মুছে দেয় নি। [illegible] খেলার পর ফেরার সময় পাখী দু' পা দিয়ে কেমন ঘুরে ঘুরে দাগগুলো মুছে দেয়। গিন্নী-বান্নীর মতো মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, কক্ষণো মাটিতে কি এঁটো থালায় দাগ কেটো না, কাটতে নেই।

রাণা ঠাট্টা করে বলে, ধুস্‌, বাজে কথা।

পাখী কেমন থমকে যায়। চোখটা ম্লান করে টেনে টেনে বলে, সব কিছু ইয়ার্কি নয়, অমন ক'রো না, হ্যাঁ।

রাণা মজা করার জন্যে বলে, কেন রে, কি হয়?

পাখী অন্য দিকে ফিরে বলে, মরে যায়। তাই দাগ মুছে দিতে হয়। তারপর খুব দ্রুত ঘুরে ঘুরে দাগগুলো মুছে দিয়ে হাঁটতে থাকে।

সেই পাখী দাগ মুছতে ভুলে গেছে। এক্কা-দোক্কার দাগগুলো কেমন স্পষ্ট। ঐ তো ঐটা তিরেন, ইটে দুপা, শেষ ঘরটায় পাখীর খোলাংটা পড়ে আছে। পাখী চার-চারটে ঘর কিনে নিয়েছিল। সত্যি, পাখীকে রাগিয়ে বেশ মজা। খেলতে খেলতে রাণা প্রায়ই ভুল করে আর পাখী খিলখিল করে হাসিতে ভেঙে পড়ে। ওর একমাথা চুল, ঝকঝকে চোখ, হাসিতে ঝলমলে মুখ দেখে রাণার দুষ্টুমি চাপে, ইচ্ছে করে ভুল করে আর পাখী পাকা খেলুড়ের মতো ভ্রূকুটি করে, রাণা 'আচ্ছা আচ্ছা, এবার এবার' বলে ওকে থামায় কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই ভুল। পাখী হাসিতে ভেঙে পড়ে, 'তুই কিচ্ছু না, কিচ্ছু না'

বলে ধমক দিতে চেষ্টা করে। রাণা বোকার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

পাখী বলে, তুই পারছিস্ না ব'লে তোর একটু লজ্জাও হয় না, তুই একটা কি যেন!

রাণা বলে, আমি পারছি না তো কি, তুই তো পারছিস্. তাহলেই হল।

হলই তো, আমার চারটে ঘর কেনা হয়ে গেছে। আর তিনটে কেনা হলেই তোকে দূর করে দেব।

তাতে আমার কি, আমার ভারি বয়েই গেছে। আমি এই হিজলতলায় থাকব, এখানে কেমন গোলপাতা, বাবুইঘাস, জিয়ন্তীর ডাল দিয়ে ঘর করব। এঁটেল মাটির দেয়াল, গেরিমাটির উঠান। দুই পাশে দুই রঙ্গনের ঝাড়, সুগন্ধীর বেড়া—

থাক্ থাক্, তোর দৌড় জানা আছে। কত্তোবার বললাম, ডাকবাংলো থেকে আমাকে একটা রঙ্গনের চারা এনে দে, তাই পারে না, উনি আবার দুই ঝাড় এনে লাগাবে। হুঁ জানা আছে। তখন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলবে, পাখী পাখী, আমার উঠানটা নিকিয়ে দিবি, ঘরে আলপনা দিয়ে দিবি—দেব ভাল করে। একদিন ইস্কুল থেকে এসে দেখবি, ঘরে জল থৈ-থৈ করছে, দেয়াল ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে। নিজে খেলতে পারে না. আবার কথা—আমি হিজলতলায় থাকব, ঘর করব, এঁটেল মাটির দেয়াল, তা যাও না, আমার ভারি বয়েই গেল। বলে পাখী দুম্ দুম্ করে ঘাটের দিকে চলল।

রাণার বেশ মজা লাগছিল। পাখী রেগে গেলে বেশ হয়। ওর চোখ-মুখ কেমন রাঙা হয়ে ওঠে। ওকে চলে যেতে দেখে রাণা ছুটে ওর হাত ধরল, এ্যাই, এ্যাই, রাগ করলি ?

পাখী কোন কথা বলে না। ওর চোখ-মুখ কেমন টস্ টস্ করছে।

এ্যাই, খেলবি না ?

পাখীর কোন সাড়া নেই। ও ঘাটের দিকে হেঁটে চলে।

তবে রে, বলেই রাণা তার ঐ ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাত নিয়েই পাখীকে কোলে তুলে নেয়।

এই ছাড় ছাড়, এ মা, ইস্, ছাড় ছাড়, পাখী ছটফট করতে লাগল।

তাহলে বল, আড়ি না ভাব. আমার সংগে খেলবি ?

খেলবে না ছাই, তুই তোর হিজলতলায় থাক গে।

দূরে বোকা, আমার ঘর কি তোর ঘর নয়, আমি তো তোর মতো নই, আমার চারটে ঘর, পাঁচটা ঘর বলি না। আমার ঘরে তুইও থাকবি. আমিও থাকব।

আমি বুঝি কেবল আমার আমার করি ? তাহলে আমার ঘরে তোকে দু' পা দিতে দিয়েছিলাম কি কত্তে ?

ওহে, আমি কি বোকা, তাই তো ?

বোকাই তো, বোকা হাঁদা গঙ্গাপদ।

তাহলে বল, আমার সংগে খেলবি।

হুঁ।

পাখীকে রাণা কোল থেকে নামিয়ে দিতেই পাখী ছুটতে ছুটতে মুখ ভেঙচে বলল, হুঁ খেলবে না ছাই, ঝগড়ুটের সংগে খেলবে !

তবে রে, বলেই রাণা ওর পেছন পেছন ছুটেছিল। তাই দাগ মোছার কথা কারুর খেয়াল ছিল না।

পাখী অল্পেতে রেগে গেলেও ভারি ভাল। এ গাঁয়ে অমন একটিও মেয়ে নেই। সেই ছোটবেলা থেকে রাণাকে পাখীর এক মাথা চুল আর গায়ের ধবধবে রঙটা টানে। এখনো ও মাঝে মাঝে পাখীর গায়ে আচমকা হাত বুলিয়ে দেখে। আজকাল পাখী বুঝতে পারে, তাই ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। আগে ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত, কি রে ? রাণা গা থেকে হাতটা সরিয়ে নিতে নিতে বলত, তোর গাটা মাখনের মতো, না রে ? পাখীর চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠত, ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলত, যাঃ।

আজ দামপানা পদ্ম থেকে ও যখন উঠে এল, ওর সেই মাখন মাখন গায়ে কেমন সবুজ সবুজ সর পড়েছিল। দাম শ্যাওলা সরাতে সরাতে রাণা সেই সরে আঙুল বুলিয়ে দেখেছে। ওর আঙুলের ডগায় কেমন সবুজে দাগ পড়েছে। ইস্, সাপটা যদি না কামড়াত, ভাল হোত। পদ্মহাতে ওর সেই চিৎকারটা রাণার কানে এখনো লেগে আছে। রাণার হাত ভাল থাকলে ঠিক সাপটাকে মারতো। লোকটা বলল না, পাখী কেমন নেতিয়ে পড়েছে ? রাণার মনটা কেমন আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে আসে। ও ঠায় চুপচাপ বসে থাকে। পাখী পদ্মবনে গিয়েছিল, যদি জানতে পারে ? বাবাকে যদি বলে দেয় ? রাণা ধুলোতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটে আর মোছে। ওর ভাল লাগছিল না কিচ্ছু। ও এক সময় উঠে পড়ে। সত্যি যদি সাপটা জলহেলে না হয় ? কেমন একটা দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। ও ক'পা এগিয়েই ফিরে আসে। পাখীর কাটা দাগগুলো দ্রুত মুছে ফেলে পাখীদের বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

দূরে থেকে জমায়েতটা লক্ষ্য পড়েছিল। তালগাছগুলোর ফাঁক দিয়ে খোলেন বাড়িতে ভীড় জমেছে। ভীড়টা লক্ষ্য পড়ার সাথে সাথে রাণার গতি বেড়েছিল। দরজাটার কাছে এসে থমকে থামল। তারপর পায়ে পায়ে ভীড়টার মাঝে মুখ বাড়াল। ইস্, পাখীকে আর চেনাই যায় না। কেমন পদ্মনালের মতো নেতিয়ে পড়েছে। তার মাখন মাখন শরীরটা কেমন শালুক ... ক রঙ ধরেছে। চোখের কোলে জিরে জিরে পাতার বুনুনি। নাকের পাটা দুটো

পাশে বসে ফেলা ক্ষেপা। হাত চালছে। সেই শালুক শালুক গা বেয়ে হাত নামাচ্ছে। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে—ঢ্যাবে, এ কুন বিষে, করলি কি মা বল। মন্ত্র পড়ছে আর দাগ কাটছে,

মাথা নাড়ছে, বিষ ঝাড়ছে। বাবা অন্দরে বসে। মাসী পাখীর দিকে আলুথালু বেশে চেয়ে আছে। সকলের চোখেই কেমন কাতরতা, উৎকণ্ঠা। রাণার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, মাসী না, বাবা না, কেউ না। সকলেই পাখীকে নিয়ে ব্যস্ত। একটু তফাতে দুলু ওঝা মাথা নেড়ে আপন-মনে বকে চলেছে। সবটাই কেমন যেন।

রাণাও বুঝতে পারছিল, এ জলহেলে নয়। তেমন বাহন না হলে ফেলা ক্ষেপাকে ডাক পড়ে না। তবে ফেলা ক্ষেপা যখন এসেছে তখন ভাবনার কিছু নেই। ও তো দিনরাত মনসার বাহন নিয়ে ঘর করছে। কোথায় কোথায় থাকে ঠিক নেই। ওর ঘরটাই তো একটা আড়ত। কতদিন দেখেছে, ফেলা চলেছে, লেংটি হাওয়ায় উড়ছে, এই গাবদা গাবদা পায়ের তালে-তালে কাঁধেরটা দুলছে। ইয়া বড় এক শাঁখামুঠি ওর গলা জড়িয়ে আদুরে পুষিমণির মতো শুয়ে আছে। তাই তেমন তেমন বাহন হলে ফেলার ডাক পড়ে, ফেলাকে দেখে অনেক ভরসা। তবু ফেলার হাত চালা, দুলু ওঝার মাথা নাড়া, মাসীর আলুথালু বেশ—রাণার কেন যেন ভাল লাগে না। ভীষণ মন খারাপ করতে থাকে। অমন ফুট-ফুটে মেয়েটা কেমন হয়ে গেছে। ওর জন্যেই তো হ'ল। ও যদি ফুল আনতে না বলতো, কিছুই হোত না। এতক্ষণে পাখী এক মাথা চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঝকঝকে চোখে পালক খুঁজতে যাবার জন্যে আব্দার করতো কিংবা রান্নাবাড়ি কি বৌ-বৌ খেলতে বসতো। আজ রাণা ঠিক ওকে দিয়ে ঘরটা করিয়ে নিত—গেরিমাটির দেয়াল, বাবুই ঘাসের চাল, সুগন্ধীর ঝাড়। পাখী যদি আর ভাল না হয়? ইস্, রাণা আর ভাবতে পারে না।

ও মনে মনে ভগবানকে ডাকে। পাখীকে সারিয়ে দাও, সারিয়ে দাও। ওরা আবার হাত ধরাধরি করে বন-বাদাড়ে পালক খুঁজে বেড়াবে। পালক নিয়ে আর কখনো ঝগড়া করবে না। পাখীকে একটুও কাঁদাবে না। ও খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে, রাণা ভাবল। তা না হলে কেউ পাখীর সংগে ঝগড়া করে, ওকে কাঁদায়, রাগায়?

পাখীর মাছরাঙা আর বসন্তবাউরীর পালক ভীষণ পছন্দ। ও গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে কি আলোকলতায় বকুল-ফুল গাঁথতে গাঁথতে কেমন ঠোঁট কাঁপিয়ে বলে, আমি বড় হলে না দেখ্বি, মাছরাঙা, বসন্তবাউরীর পালক দিয়ে খোঁপা বাঁধবো। কি মোলায়েম আর বাহারের পালক! খোঁপা বাঁধলে আমাকে খুউব ভাল লাগবে, না রে? মা বলেছে, আমার মস্ত খোঁপা হবে।

ও পালক পেলেই ঠোঁটে বোলাবে, চোখের পাতায় বোলাবে। রাণার হাত ধরে টানবে, আয় না, আয় না, দেখ্ কি আরাম! এক হাতে ওর মুখটা নিচু করে পালকটা ধীরে ধীরে বুলিয়ে দেয়। রাণার শরীরটা শুড়্ শুড়্ করে ওঠে। ওর তখন খুব ইচ্ছে করে, কাঁচ-বৌদির মতো পাখীকে জড়িয়ে তোন্না মোন্না মোন্তি মোন্না বলে খুব আদর করে। ওর ফোলা ফোলা গাল টিপে দেয়, টলটলে চোখে ফু দিয়ে দেয়, ওর লাল লাল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মস্ মস্ আওয়াজ তোলে।

পাখী কতদিন ওর কাছে একটুকুর জন্যে মাছরাঙা কি বসন্তবাউরীর পালক চেয়েছে। কত্তো বলেছে, দে ভাই, এক-টুকুনের জন্যে, আমি একটু হাতে নিয়েই দিয়ে দেব। তোর তো কত্তো!

রাণা দেয় নি। ভেংচে বলেছে, ইস একটুকুনের জন্যে, বললেই হ'ল! আমি বলে কোথায় কোথায় থেকে নিয়ে আসি।

না পেয়ে পাখী কী করুণভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁটটা ফুলে ফুলে ওঠে। নাকের পাটা দুটো তির্ তির্ করে কাঁপে কিন্তু রাণা দেয় না। পাখী না কাঁদলেও রাণা বুঝতে পারে, পাখী কাঁদছে। রাণা তবু দেয় নি।

আজ পাখীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাণার ভীষণ মন খারাপ করতে লাগল। ও মনে মনে বলল, পাখী, পাখী, তুই ভাল হয়ে ওঠ, তোকে সব পালক দেব। ও তো তোরই জন্যে, তুই বড় হলে তোর মস্ত খোঁপা হবে, তুই খোঁপায় মাছরাঙা, বসন্তবাউরীর পালক গুঁজবি। আমি তো তোর জন্যেই পালক জমাচ্ছিলাম। মস্ত খোঁপায় যে অনেক পালক লাগবে। তা হোক, তুই ভাল হয়ে যা, তোকে সব পালক দিয়ে দেব। তোকে সব দেব। আমার রাংতার খাতা, খাতাবোঝাই ঝিলমিল রঙ-বেরঙের রাংতা। রাংতা দেখতে দেখতে তোর চোখ দুটো কেমন জ্বল জ্বল করে ওঠে। তোকে রাংতার খাতাটাও দিয়ে দেব। লাল-নীল পেন্সিলগুলো, বাহারে টিপ্পিগুলোও। তুই যা চাইবি তোকে সব দেব, সব। পাখী, তুই ভালো হয়ে যা, তোর শরীর আবার মাখন মাখন হোক, আমি আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে দেখব আর তুই ঠোঁট ফেটে হাসবি। পাখী, পাখী!

পাখীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই রকম মন কেমন-করা ভাবনার রাণা [illegible] নড়ে বসতে দেখে সজাগ হ'ল। ফেলা ক্ষেপা হাত চালা বন্ধ রেখে ঘন ঘন মাথা নাড়তে থাকে। তার রুক্ষু রুক্ষু ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে কিরকম ঝটাপট ঝটপট শব্দ ওঠে, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ওঠে, চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসে। ও বিড়বিড় করে বকেই চলে। তারপর এক সময় থামে, হাঁপায়, শেষে গড় করে উঠে দাঁড়ায়, না গো হবে নি, মা'র মতি নাই। খুকিরে গঙ্গাজল খাওয়াও। স্বয়ং কালে লিয়েছে, বেহ্ম-তালুতে যে ঠেকেচে, লামানো কার সাধ্যি! কথা শেষ হতে-না-হতে পাখীর মা কঁকিয়ে কেঁদে পাখীর ওপর ভেঙে পড়ে।

মাসী কাঁদছে, বাবা দু'হাতে মুখ ঢেকেছে, বাকীরা হা-হুতাশ করছে। এই সব হাহাকারের মধ্যে রাণা বুঝতে পারল, পাখী আর খেলবে না, কথা বলবে না, ঠোঁট টিপে হাসবে না। সেই কবে মা মরে গেছে। সবাই বলতো, মা স্বর্গে গেছে। আকাশের ওপাশে স্বর্গ। রাণা বুঝত না, ও ঠায় জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত, মা কখন আসবে, কখন? মা আর আসে নি। পরে একটু বয়স হতে বুঝেছে, স্বর্গে গেলে কেউ আর ফেরে না, কেউ না, কোনদিনও না। স্বর্গে যাওয়া মানে হারিয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া। পাখী মরে গেছে। পাখী আর কোনদিন ফিরবে না, কোনদিন আর ওর সংগে খেলবে না, ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে পালক, রাংতা কিচ্ছু চাইবে না।

ইস্, খেলার পর ও-ও যদি দাগ-গুলো মুছে দিত! পাখী বলেছিল, তার জন্যে একটা ঘর করে দেবে, গেরিমাটির দেয়াল, বাবুই খড়ের চাল, সুগন্ধীর বেড়া! রাণার ঘর হল না, কেউ আর ঘর করে দেবে না। অত যে মাছরাঙা, বসন্তবাউরীর পালক, রাণা কি করবে? রাণার বড় সাধ ছিল, পাখীর মস্ত বড় খোঁপায় তার পালকগুলো একটা একটা করে গেঁথে দেবে। পাখীকে কেমন সত্যিকারের পাখী বলে মনে হবে। পাখীকে কিচ্ছু দেওয়া হল না, কিচ্ছু না। রাণার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, পাখী, পাখী! পাখীর জন্যে একটা আর্তি গুমড়ে গুমড়ে উঠতে থাকে।

একসময় বাবা এসে ওর হাত ধরে। বাবার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে পিছন ফিরে শেষ দেখার মতো রাণা তাকিয়ে দেখে, ইস্, পাখীর মুখটা কেমন টল-টল করছে, ঠিক নীলপদ্মটি! রাণার সেই নাগকন্যের কথা ভীষণ মনে পড়ে যায়। রাণা আর থাকতে পারে না। বাবার হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে

"যৌবন মাহুত শিকার যার
নারীর মন কান্দিয়া রয় রে।"

সাধারণ মানুষের এক অসাধারণ শিল্পী বর্তমানে আছেন, কলকাতায়। নাম তাঁর প্রতিমা বড়ুয়া। সারা ভারতের অনেক লোকশিল্পীর সঙ্গে মুরশিদের মোলাকাত হয়েছে—দোস্তীও আছে অনেকের সাথে, কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কয়জনকে দেহে-মনে-প্রাণে লোকসংগীতেরই প্রতিমূর্তি বলে মুরশিদ ভাবেন—প্রতিমা বড়ুয়া তার অন্যতম।

অনেকেই মুরশিদের উপর খাপ্পা—ভাবেন সে দুর্মুখ, কারণ নেতিবাচক কথাই তাঁকে বেশি বলতে হচ্ছে; লোকসঙ্গীতের এমনি দশা। কিন্তু বালুচরের লোকসংগীতকে ভালবাসি বলেই, বেতারের 'অলৌকিক' গায়ক ও গবেষকদের অপ্রিয়ভাজন হয়েছি। যা হোক শত বিতর্কের চেয়েও বড়ো একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। সেই সার্থক দৃষ্টান্তটিই আজকে পাঠক সাধারণের কাছে উপস্থিত করতে চাই। জানি গানের পরিচয় গানেই—কথায় নয়। মাঝে মাঝে আকাশবাণীর ছায়াছবির গানের 'স্টারমার্কা' সুললিত কণ্ঠের ধারায় মাঝখানে হঠাৎ একটি 'বনকণ্ঠ' শুনে অনেক সমঝদার ব্যক্তিকে চমকে উঠতে দেখেছি- "গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে।"—জিজ্ঞেস করেছেন, কি জানি নামটা? ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে যে মহিলাটি মাহুতের গানটি গেয়েছেন? উত্তরে বলেছি, ভুল করেছেন মশাই, বলুন, যে মহিলাটির সঙ্গে ভূপেন হাজারিকা গেয়েছেন। নাম প্রতিমা বড়ুয়া। প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাইঝি।

আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় গৌরীপুর। আসামের সবচেয়ে পশ্চাদপদ জেলা গোয়ালপাড়া। কোমরের মেখলার মতো মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। বৃটিশ শাসকদের খেয়ালখুশি-মাফিক—১৯১২ ইংরাজী পর্যন্ত গোয়ালপাড়া জেলাগতভাবে স্থিতিলাভ করতে পারে নি। ১৭৬৫ সনে এই জেলার ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাংশ আসে কোম্পানীর কবলে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৭ সনে ভুটান যুদ্ধের পর—অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দী পর গোয়ালপাড়ার উত্তরাংশ বৃটিশ শাসনের অধীনে আসে। ১৭৭৫ থেকে ১৮২২ সন পর্যন্ত গোয়ালপাড়া, ধুবরী ও কোকরাজার থানা রংপুর জেলার অন্তর্গত করা হয়। ১৮২২ সনে এই ৩টি থানাকে গারোপাহাড়ের সংগে জোট বাঁধিয়ে উত্তর-পূর্ব রংপুর নামে এক নতুন জেলা গঠন করা হয়। ১৮২৬ সনে বাংলা দেশ থেকে সেই জেলাকে আসামে আনা হয়। কিন্তু ১৮৬৭ সনে ঐ ৩টি থানাকে আবার কুচবিহার কমিশনারশিপের অধীন করে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। ১৮৭৪ সনে আবার ঐ থানাগুলিকে আসামে এনে গোয়ালপাড়া জেলা পত্তন করা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর আবার পূর্ববঙ্গের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। কিন্তু ১৯১২ সন থেকেই স্থায়িভাবে ঐ জেলা আসামেরই অন্তর্গত হয়ে আছে। আসাম উপত্যকার একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলায়ই জমিদারী প্রথা ছিল। ১৯৫১ সনে জমিদারী প্রথা রদ হওয়ার পরেও গোয়ালপাড়ায় জনসাধারণের জীবনের কোনো পরিবর্তন আসে নি।

এই টানা-হ্যাঁচড়ায় জনজীবন দুর্ভোগ এলেও গোয়ালপাড়া জেলা নিজের লোকসংস্কৃতির ধনে ধনী। এই লোকসংস্কৃতির আবার প্রধান দুটি ধারা। একটি গৌরীপুরকে কেন্দ্র করে কোচ-রাজবংশী ধারা—আরেকটি কোকরাজারকে কেন্দ্র করে বড়ো সংস্কৃতির ধারা। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় গৌরীপুরের লোকসংগীত।

কুচবিহারকে কেন্দ্র করে কুচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে কোচরাজবংশী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে—গৌরীপুর সেই সংস্কৃতিরই অঙ্গীভূত। বিশেষ করে তার ভাষা। এ ভাষা বাংলাও নয়, অসমীয়াও নয়—যদিও অসমীয়ার সাথে এর সাদৃশ্য বেশি।

ভাষাতত্ত্ববিদরা তার জাতিগোত্র নিয়ে যাই বলুন, আজ এই আঞ্চলিক ভাষাটি ভাওয়াইয়া সুরের মাধ্যমে, তার ধ্বনি-মাধুর্যে, বাক্যবিন্যাসে, শব্দ-গঠনে ও প্রকাশভঙ্গিতে, অপূর্ব জীবন-ঘনিষ্ঠতায় ও গণমনসের আকুতিতে এমনি ভরপুর যে, উপভাষা বলে তার মর্যাদা খাটো করতে ইচ্ছে হয় না। বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের সাথে সাথে অনেক অবহেলিত উপভাষাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষার মর্যাদা অর্জন করেছে—আমাদের দেশেও ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়মেই অসংখ্য অবজ্ঞাত উপজাতি ও উপভাষা জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

গৌরীপুরের গান যদি কোচরাজবংশীর গান—ভাওয়াইয়ারই অংগীভূত হয়ে থাকে তবে তাকে গৌরীপুরের গান বলে আলাদা করছি কেন? আমি এর আগে আলোচনা করেছি যে, লোকসঙ্গীতের 'ঘরানা' নেই আছে 'আঞ্চলিকানা'। মোটামুটি ভাষার ঐক্য থাকলেও সুরের দিক দিয়ে ও ভঙ্গীর দিক দিয়ে এই আঞ্চলিকানাকে কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চলে বিভাগ করা যায়—যদিও কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা টানা মুস্কিল। গৌরীপুরের ভাওয়াইয়ার সুর শুনলেই কুচবিহারী ভাওয়াইয়ার সাথে তার পার্থক্য ধরা পড়ে। অবশ্য কিছু কিছু ভাওয়াইয়া গান আছে যা এর কোন্ বিশেষ অঞ্চলের তা বলা মুস্কিল। যেমন:

দীঘল শিমলারে গগনে ম্যালে ডাল
নারী হয়া রসের যৌবন রাইখবো
কতকাল
বিরিক্ষ শিমলারে—

এই গানটির সুরে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়ার অতিপরিচিত রূপটিই ফুটে ওঠে। গৌরীপুরের তেমন বিশেষত্ব পাইনা।

কিন্তু যখন শুনি—

"আজি আউলাইলেন মোর বান্দা মযাল্লরে"

—তখনই ধরা পড়ে গৌরীপুরী ভাওয়াইয়ার বিশিষ্ট চেহারাটি। সম্ভব এই আঞ্চলিক ঢঙটিই লোকসংগীতের প্রাণভোমরা। আর গৌরীপুরের লোকগীতিরই প্রাণভোমরাটিকে প্রতিমা নিজের কণ্ঠে বন্দী করতে পেরেছেন। এখানেই তাঁর সাফল্য। এর সংগে তাঁর কণ্ঠে মিশেছে সামন্ত সমাজ নিগৃহীত মেয়েজীবনের বেদনা-বোধ। গৌরীপুর তথা উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের অন্তর্লীন অন্তর্দন্দী মেয়েজীবনের রুদ্ধ আকুতির। আদি কৌম ট্রাইবেল সমাজে সামন্তবাদের প্রচারক এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত হিন্দুধর্মের সাথে সাথে এলো সিঁদুর, ঘোমটা, বাল্য-বিবাহ, পণপ্রথা, সামাজিক উৎপীড়ন।

পুরুষের বহুবিবাহ—স্ত্রীর চিরবৈধব্য প্রভৃতি মনকে বিধান। ভাওয়াইয়া হলো দুর্লভ সামাজিক দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমাদের দেশের লোক-সঙ্গীতের সারিতে একে পাশ্চাত্য "প্রটেস্ট সঙগস"-এর পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে পারি। সেজন্যই ভাওয়াইয়া গানে বিয়েকে বলে 'বেচেয়া খাওয়া'। "বাপে মায়ে বেচেয়া খাইছে সোয়ামী পাগলারে।"

ভাওয়াইয়ার আন্দোলায়িত বিলম্বিত আর্তি যেমন প্রতিমার গলায় মূর্ত তেমনি আবার গৌরীপুরের অন্য বৈশিষ্ট্য, মেয়েদের গান বিশেষত বিয়ের গান কিংবা কার্তিকপূজোর নৃত্য-সম্বলিত গীতও সমানভাবেই সার্থক। চট্‌কার শাণিত ব্যঙ্গও প্রতিমার পরিবেশনায় যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

কার্তিকপূজো উপলক্ষে চট্‌কার ছন্দে মেয়েদের গান—

"ঢেংরা বন্ধুরে, মোর সোনার বন্ধুরে,
মোর ভাবের বন্ধুরে
আমার বাড়ীত কার্তিকপূজো ঢাকের
বায়না নে।
দশা পড়া সোয়ামীটা মোর
মরিয়াও না যায়,
তবে সেনে মনটা মোর চল্‌চলা হয়;
ছেকায় খইলায় মাথা ঘসিনু হয়
পানিয়া মরা যদি এ্যালায় মরিল
হয়"...

প্রতিমার গলার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে এই গান শুনলে যুবতী স্ত্রীর বুড়ো স্বামীটির যেমন হবে গঙ্গাযাত্রা, সমাজ-পতিদের বুকেও বিঁধবে তেমনি সুর-শাণানো ছুরি।

মুসলমানী বিয়ের গীত আমরা প্রায় শুনিই না। মোল্লা-মৌলবীর শরিয়তী শাসনে শ্বাসরুদ্ধ মুসলিমসমাজের মেয়েরাও তাদের গানে পুরুষশাসিত সমাজের বিধিনিষেধকে নানাভাবে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন।

প্রতিমার কাছেই শুনেছি:

দুমবদন্তর পারে, কি পারে মাও
কেওয়া বা কেঁঘটর ফুল
মোর বাবার সেনে আনলো
কি আনলে মাও, ঘেঘা না
চাইয়া পাওর;
মাঁএর ঘেঘার ভিতি দেখং
ও কি দেখং মাও কান্দং না মনে মনে
ও মাঁএর হাসং বা চিতে চিতে॥

মেয়ের বাবা, চাচা, মামা নানারকম প্রস্তাব নিয়ে আসছেন—মেয়ে তাদের বর্ণনা করছে একটা ঘেঘা (গলার [illegible]), কানাটি খোঁড়া আধকটা কালা ইত্যাদি। কী নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান।

কিন্তু তথাপি গৌরীপুরকে তাব গানকে বাংলাদেশের লোকে জানে তার মাহুতের গানে। অনন্যসাধারণ মাহুতের গানগুলিই যেন গৌরীপুরের হৃদ্‌স্পন্দন। আর তারো সার্থক প্রবক্তা হলেন প্রতিমা। একজন মেয়ে কি করে মাহুতের গীতকে এমন আত্মস্থ করতে পারলেন? সেটা তার পারিবারিক ঐতিহ্যের দান।

অনেকদিন আগে গণনাট্য সঙ্ঘের কয়েকজন গায়ক-গায়িকাকে নিয়ে ধুবড়ি থেকে গিয়েছিলাম গৌরীপুরে। আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল পরলোকগত প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়ি, আর "মুক্তি" ছায়াছবির একজন মুখ্য অভিনেতা তাঁর সেই হাতীটি। পরিবারের অতি আপনজন হাতীটি আর জীবিত নেই, তবে তার স্মৃতিকে নাকি জীবন্ত করে রাখা হয়েছে। মাটিয়াবাগের সেই স্মৃতিজড়িত ভবনটির সামনেই দেখা হলো প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই প্রকৃতীশ বড়ুয়ার সাথে। 'লালজী' বললেই তিনি সারা আসামে বিখ্যাত। বন্য হাতীর সাথে তাঁর আত্মীয়তা, বাঘের সাথে বন্ধুত্ব। ঝিঁঝি ডাকা সন্ধ্যায় মাটিয়া-বাগের খোলা সবুজ ঘাসের গালিচায় বসে তিনি আমাদের শিকারের গল্পে জমিয়ে রাখলেন। বন্য হাতী ধরা তাঁর ব্যবসায়। জঙ্গলেই জীবন কাটাতে হয়। গল্পের মাঝখানে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা তো গায়ক, বলুন তো সবচেয়ে ভাল, ভরাট, সুরেলা ও জোরালো গলা—পৃথিবীতে কোন্ শিল্পীর? আমরা হক-চকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে, কঠিন প্রশ্নে পরাভূত ছাত্রদের কাছে প্রধান শিক্ষকের মত নিজেই উত্তর দিয়ে বললেন, গায়ক হবেন কি করে? সেই গলাটি না শুনলে—সেই গলায় গলা না সাধলে? চলুন আমার সঙ্গে অন্তত ছ'মাস থাকুন আমার তাঁবুতে। গভীর রাতে ঘন অরণ্যে কখনো শুনেছেন বাঘের ডাক? ভারত-বর্ষের কতো বড়ো বড়ো ওস্তাদের গান শুনলাম, কিন্তু এমন দরদী, দরাজ গলার আওয়াজ কারও শুনলাম না।

পিতা প্রকৃতীশ বড়ুয়ার সাথে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে এই বাঘের 'ঘরানায়' সুর সেধেছেন প্রতিমা। তার গলার দরদটা সেখানকার। বড়ুয়া পরিবারের ঐতিহ্যের কথা বলতে হলে প্রমথেশের পিতা প্রভাত বড়ুয়ার কথা না বললে চলে না। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। অধ্যয়ন ছিল গভীর। আমার বন্ধু "মাহুত বন্ধুরে"র লেখক, প্রমথেশ পুত্র অলকেশ বড়ুয়ার কাছে প্রথম শুনেছিলাম এই অসাধারণ মানুষটির কথা। তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল ব্যাপক। তাঁর অমূল্য গৃহ-গ্রন্থাগারে পাতায় পাতায় নিজ হাতের টীকাটিপ্পনি সহ কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটেল' তার সাক্ষ্য বহন করছে। সঙ্গীতে তত্ত্বগত পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর লিখিত 'সঙ্গীত সোপান' গ্রন্থে। আসামের রাগ-সঙ্গীতের অন্যতম পথিকৃৎ লক্ষ্মীরাম বড়ুয়ার সঙ্গীত সাধনায় হাতেখড়ি তাঁর কাছেই। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গভীরেও তিনি ডুব দিয়েছিলেন। আবার তিনিই প্রথম সে অঞ্চলের গ্রাম্যজীবনে ছড়ানো ধূলিমাখা সোনাদানা—লোক-সঙ্গীতের দিকে শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি ফেরান। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁর মেয়ে নীহার বড়ুয়া, নীলিমা বড়ুয়া প্রমুখ পরিবারের অনেকে রাজপরিবারের আভিজাত্য ছেড়ে ফেলে গৌরীপুরের সাধক নিরক্ষর গরীব মানুষের ঘরে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় মোড়া লোক-সঙ্গীতের রত্ন আহরণে লেগে যান। নীহার বড়ুয়ার কাছেই প্রথম আমি গৌরীপুরের লোকগীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি এবং নীলিমা বড়ুয়ার নেতৃত্বে গঠিত একটি দলের নৃত্য-গীতে শিলং-এ প্রথম গৌরীপুরের লোকনৃত্যের সহজ, সুন্দর, প্রাণবন্ত রূপটি দেখতে পাই। আর গৌরীপুরের অবিস্মরণীয় লোক-শিল্পী বয়ান শেখের কণ্ঠে পাই প্রথম সেই অঞ্চলের সুরের স্বতঃস্ফূর্ত ফোয়ারাটিকে। কিন্তু গৌরীপুরের লোক-গীতির পরিপূর্ণ রসঘড়াটির সন্ধান পাই প্রতিমার কাছেই।

"হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা বামুনের নারী"

আসামের চিরন্তন সবুজ পরিধানের আঁচলে বাঁধা গৌরীপুর। বর্ষা শেষে শরতের সোনালী রোদে ভুটান পাহাড়ের হাতছানিতে বেরিয়ে পড়ে পোষা হাতীর পিঠে মাহুত ও ফান্দীর দল। অন্তত ছয় মাসের রসদ ওদের সঙ্গে। আর আছে সাথে চিরসাথী সেই দোতারাটি। 'মনাস', 'সংকোশ' ও 'চম্পা' নদীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা জেনালী, জাকাতী প্রভৃতি পার হয়ে ওরা সমবেত হয় ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে মহলদারের খড়ের তৈরি ক্যাম্পে 'খেদায়'। সন্ধ্যায় অরণ্যের পরিবেশে জেগে ওঠে "আগুনের" ধ্বনি। এই ধ্বনির চারপাশে বসে আরণ্যক সুরায় ওরা বিভোর হয়। টুংটাং করে সুরে-বাঁধা দোতারার তারে আঙুল নড়ে ওঠে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষার জীবিকা। একটি অসতর্ক মুহূর্তে যাবে পরপারে। বীরের জাত। তবু মনটা ঘরে ফেলে-আসা নতুন বৌটির কাছে, আপনজনের কাছে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে চায়:

"বালু টীলটীল পঙ্খীরা কান্দে
বালুতে পড়িয়া
আরে গৌরীপুরীয়া মাহুত কান্দে—ও
রখী ঘরবাড়ী ছাড়িয়া—"

ও মোর দান্তাল হাতীর মাহুত রে
যেদিন মাহুত শিকার যায়
নারীর মন ঝুরিয়া রয় রে।"

হাতী ধরার দুটো পদ্ধতি, মেলা ও খেদা। বন্য হাতীকে ধরে আনার পর তাকে বশ মানানোর প্রচেষ্টা, কী কঠোর অথচ কী মমতামাখা। একদিকে অঙ্কুশের ঘা, অন্যদিকে সুরের পরশ বুলানো পাতার চামর। সেই ঐন্দ্রজালিক যুগেরই রেশ। সংগ্রাম ও সাযুজ্যের কী অপূর্ব সমন্বয়।

"হস্তীর কন্যা, হস্তীর কন্যা
বামুনের নারী
মাথায় নিয়া তাম্ কলসী ও সখি
হস্তে সোনার ঝারি।
সখিও—ও মোর হায় হস্তীর কন্যারে
খানিকো দয়া নাই
মাহুতকে লাগিয়া—রে"

হস্তীর কন্যা কি করে হলো বামুনের নারী? গল্পটা সংক্ষেপে কিছু বলতে হয়। গরীব-দুঃখী বামুন, 'জয়নাথ ও তার পত্নী জয়মালার কাহিনী।' এক বিত্তবান ব্রাহ্মণের বাড়িতে যজমানী করতে গেলে তার কুরূপা কন্যাকে বিয়ে করতে জয়নাথকে বাধ্য করা হয়। প্রচুর অর্থ, সোনা-রূপা, দাসী ও নতুন স্ত্রী নিয়ে জয়নাথ ঘরে ফিরলো। ধনের গৌরবে উদ্ধত, স্বার্থপর সপত্নীর কাছে শুরু হলো জয়মালার নিগ্রহ। মাথায় তামার কলসী ও হাতে সোনার ঝারি নিয়ে সপত্নীর জন্য রোজই জল আনতে যেতো জয়মালা। পাড়ে বসে একদিন নদীর জলে তার চোখের জল মিশেছিল। সেই পথে তখন যাচ্ছিল যূথ-বাঁধা একদল হাতী......জয়মালার দুঃখ দেখে তাকে তারা তুলে নিয়ে গেলো। পাহাড়ের ওপর এক ঝর্ণার সাতরঙা ধারায় তাকে স্নান করতে বললো। ঝর্ণার জলে জয়মালা রূপান্তরিত হলো এক রূপসী হস্তীকন্যায়। ...সেই থেকে হস্তিযূথের প্রধান পরিচালক হলো একটি মেয়ে হাতী।

"পাত্তিরা করিয়া কন্যা
বাড়েয়া দিলেম পাও
মাথার উপর কাল-জ্যেষ্ঠী
ও সখি করে পঞ্চরাও।"

(দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করেছিলো, কিন্তু রওয়ানা হবার সময় টিকটিকি অমঙ্গলের ধ্বনি করলো—তাই তুমি বন্দিনী হলে।)

আকাশেতে নাইরে চন্দ্র
কি করে তোর তারা
যেখা নারীর পুরুষ নাইরে
ও তার দিনে আন্ধিহারা;
পুখুরীতে নাইরে পাবি নৌকা
ক্যামনে চলে
যেথা নারীর সোয়ামী নাই
ও তার রূপে কি কাম করে।

বন্যতার সরল মানবিকতার সংঘর্ষ ও সমন্বয়। বন্যতাকে জয় করার মানুষে—আর সেই জয়েরই গানেই মানুষে মনোজয়ার অগ্রগতির ছন্দ মিলিয়ে চলেছে। কিন্তু শ্রেণীসমাজে সেই শ্রমজীবী বীর মানুষও যে বঞ্চিত, নিঃস্ব, গৃহহারা। বিরহিণী যূথভ্রষ্ট হস্তিকন্যাকে অপহরণ করে এনে তারই কানে কানে তার মর্মব্যথার কাহিনী শুনিয়ে মাহুত ও ফান্দী তার অন্তর জয় করতে চাইছে:

"আই ছাড়িলং, ভাই ছাড়িলং,
ছাড়িলং সোনার পুরী
বিয়া করিয়া ছাড়িয়া আসিলং
ও সখি অল্প বয়সের নারী।
ও মোর 'সারিন' হাতীর মাহুত রে—
যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।"

অন্যদিকে যে মেয়েরা একবার মাহুতের প্রেমে পড়েছে—তাদের তো এই বুনো-চরিত্রকে ধরে রাখার কোনো উপায় নেই। মাহুত বা ফান্দীর প্রেমের জীবনে প্রতিফলিত এদের জীবিকার্জনের—শ্রমজীবনের চিরবঞ্চনার রূপটি। তাই মেয়েদের উক্তিতে শুনি:

"হাতীর পিঠিত থাকিহারে মাহুত
হাতীর মায়া জানো
নারীর মনের কথা তোমরা
কিবা জানোরে।"

কিম্বা—

আজি গেইলে কি আসিবেন মোর
মাহুত বন্ধুরে।
হস্তী নড়ান হস্তীরে চরান
কোকোয়া বাঁশের তলে
কি ওরে, কি কি কালনাগে দংশিল
মাহুতক রে কয়া যাও বা মোরে! রে
রোজার ঝাড়ে, গুণীনে ঝাড়ে
ফৌকিয়ার আগাল দিয়া
কি ওরে মুই-এ নারী ঝাড়িবম
মাহুতক ক্যাশের আগাল দিয়া রে।

"গদাধরের পারে পারে"

প্রতিমার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে, বলেছি বোন, হুগলীর পারে বসতি ক'রো না। গদাধরের পারেই থাক। আজকের কলকাতা, লোকসঙ্গীত শ্রবণ করে না, চর্বণ করে। কিন্ত তবু অন্তত মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেই হয়। মৌচাকে মধু থাক বা না থাক—এই মহানগরী শুধু বঙ্গদেশের নয়, সমস্ত পূর্বাঞ্চলের মক্ষিরাণী। শিল্পী-ভ্রমরদের এখানে না এলে উপায় নেই। এর পাসপোর্ট ছাড়া কোনো শিল্পী—শিল্পী হতে পারে না। আকাশবাণীর ইথার তরঙ্গে, গ্রামোফোনের ডিস্কে, কিংবা ছায়াছবির 'প্লেব্যাকে' যদি কণ্ঠ ছড়াতে পারে, তবে শিল্পিজগতে সে অমর। কিন্তু কণ্ঠের জোরে তা হয় না—একচেটিয়া অধিকার এই বৃত্ত জোর করায় কান্না-কাটিতেও আসতে হয়। অতীতে গ্রাম থেকে আসা অনেক পল্লী-শিল্পী নিজের কণ্ঠের গুণেই রেকর্ড কোম্পানীর মুনাফা লাভ করেছে—কিন্তু সে ছিল দু'দিনের গড়া। কলকাতার যন্ত্র আধুনিক গায়ক ও গায়িকাদের দিয়ে 'বং প্রেরিং' রেকর্ড করানো হয়—লোকসঙ্গীতের,—যা এদেশে ও বিদেশে "ফোক্ সং ও বেঙ্গল" বলে চালান হয়। তবু কলকাতায় আসতে হয়।

মুষ্টিমেয় হলেও সত্যিকারের গুণী সমঝদারও আছেন এখানে, যাঁদের ওপর ভরসা রেখেই মুর্শিদ কলম ধরেছেন। প্রতিমার কণ্ঠ এখানকার সমঝদারদের ইতিমধ্যেই মুগ্ধ করেছে। কেউ কেউ রীতিমতো নতুন আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছেন। কোনো অঙ্গ সঞ্চালন নেই, গলার শির ফুলানো নেই—হারমোনিয়মের দাপাদাপি নেই, তবলার রেলা নেই—একটি দোতারার তারের কম্পাসের সাথে যেন বন-ভোমরার গুন্‌গুনানি। নিচের সপ্তকেই প্রধানত গলা ঘোরাফেরা করছে—চড়া পর্দার চমক নেই। অথচ মন কেড়ে নেয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রতিমা আমাকে বলেছিল, কলকাতাতে বসে গান করলেও—যখন আমি গাই, আমার চোখের পর্দায় কিন্তু ভাসতে থাকে, সেই দুরন্ত ঘরছাড়া মাহুত ফান্দী—হাতী খেদা—বনবনানী—নিশুতি বন্য পশু-পাখীর ডাক—কত কিছু। প্রতিমা যখন গান করেন, তখন শহুরে শ্রোতাদের অশ্রুত এবং অদৃশ্য জনপদের ছন্দ ও অরণ্যের অর্কেস্ট্রা বাজতে থাকে বহুদূর থেকে আবহসঙ্গীতের মত। 'ভিস্যুয়াল ইমেজ' বা মনশ্চক্ষুর চিত্রাবলী। লোকসঙ্গীতের প্রধান পশ্চাদপট।

কয়েকদিন আগে কলকাতায় লেনিন যুব-উৎসবে প্রতিমা বড়ুয়া ও নীহার বড়ুয়া মঞ্চে প্রথম কলকাতার জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হন। এর আগে আমরা অবশ্য কয়েকবারই এঁদের ঘরোয়াভাবে পেয়েছি। প্রতিমার নাচের গানের সাথে নাচলেন ষাট বছর অতিক্রম করা শ্রীনীহার বড়ুয়া, দোতারা বাজালেন গৌরীপুরের গুণী দোতারা-বাদক মুন্সুৎ মাণ্ডল—সঙ্গত করলেন কলকাতার গুণী সঙ্গতী বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিচঢালা পথের কালো দাগ এখানকার যৌবনের গায়ে খানিকক্ষণের জন্য হলেও আসামের সবুজ পরশ যেন বুলিয়ে দিল। কয়েকজন রসিক শ্রোতা অনুষ্ঠানের শেষে আমাকে বললেন—এঁ'র গানগুলি কেন আমরা রেকর্ডে পাই না। শুধু বললাম জিজ্ঞেস করুন গ্রামোফোন কোম্পানীকে।

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্ট্যানিসলাভস্কির আমন্ত্রণে মস্কো আর্ট থিয়েটারের হয়ে একটি নাটক প্রডিউস করবার জন্য ক্রেগ রাশিয়াতে চলে গেলেন। তিনি ঠিক করলেন ওদের দিয়ে হ্যামলেট মঞ্চস্থ করাবেন। হ্যামলেটের সমস্ত মডেলও তিনি তৈরি করে ফেললেন। এ নাটক যে ক্রেগের প্রিয় নাটক হবে, সে কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ নিজেও তো বাস্তব জীবনে এবং রঙ্গজগতে এই একটি ভূমিকারই রূপায়ণ করে আসছিলেন। অনেক কিছু অভিনবত্ব দেখা গিয়েছিল ক্রেগের হ্যামলেট প্রডাকসনে। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। দর্শক এবং সমালোচকের দল অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন এই প্রডাকসনটির। চারশো রজনী হ্যামলেটের অভিনয় হয়েছিল ক্রমান্বয়ে—তখনকার সময়ের এটি একটি রেকর্ড। অবশ্য ক্রেগ বা স্ট্যানিসলাভস্কি নিজেরা কিন্তু ততোটা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। স্ট্যানিসলাভস্কি তাঁর 'মাই লাইফ ইন আর্ট' বইতে বেশ খোলাখুলিভাবেই লিখেছেন যে, ক্রেগের প্রতি তিনি যথার্থ সুবিচার করতে পারেন নি—কয়েক জায়গাতেই ব্যর্থ হয়েছেন। প্রডাকসনের সময় তিনি এবং তাঁর সহকারী সুলার-জিটস্কি ক্রেগের সংগে কাজ করতে গিয়ে যে সব রোমাঞ্চকর অনুভূতির আস্বাদ পেয়েছেন, সে কথাও ঐ বইতে স্ট্যানিসলাভস্কি লিখেছেন। যদিও তাঁদের মধ্যে মতামত বিনিময়ের যথেষ্ট অসুবিধা ছিল ভাষাবৈষম্য এবং অন্যান্য কারণের দরুণ। স্ট্যানিসলাভস্কির মতে : In the theatre Craig is a dynamo of energy and practical understanding, knowing exactly what he wants and determined to get it. Not even a Russian Winter could cool his ceaseless activity and enthusiasm। হ্যামলেটের দরবার দৃশ্যের জন্য ক্রেগ পরিকল্পনা করলেন একটি সোনার সমুদ্রের অভ্যাগম ঘটাবেন। স্ট্যানিসলাভস্কি-ফ্যাক্টরি থেকে তৈরি হয়ে এল একটি সোনালী রং-এর বিরাট ক্লোক—রাজারাণীর সিংহাসনের স্টেপসের কাছ থেকে এটিকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্টেজের প্রান্ত অবধি—সোনালী আভা বিচ্ছুরিত হয়ে যেন সবার চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছিল। ক্রেগ লিখেছেন : Under this gold cloak stood two pupils who were later to prove of worth in the theatre of Russia, Vakhtangov and Miss Bierman. The two young people understood (perhaps even better than did Stanislavsky) my aims for a Theatre to serve drama greatly and they were most faithful and remembered and carried on the ideas I gave and thus they became famous and made famous their theatres। ভাখতানগভই পরে বিখ্যাত হাবিমা কম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন।
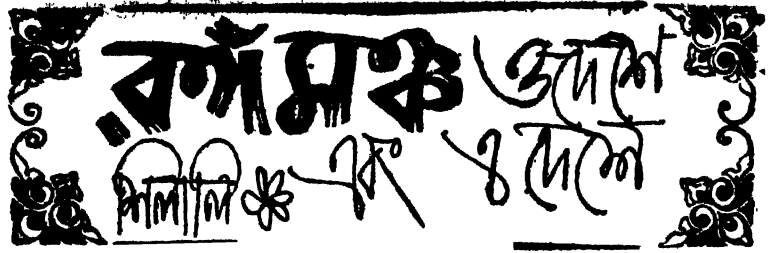
... .

১৯১১ সাল থেকেই সারা ইউরোপে ক্রেগ স্বীকৃতি পেয়ে আসছিলেন 'লিডার অফ দি থিয়েটার' হিসাবে। ঐ বছরই তাঁর সম্মানে লন্ডনে একটি পাবলিক ব্যাঙ্কোয়েটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুশো প্রখ্যাত শিল্পী, সংগীতজ্ঞ এবং সাহিত্যিক এখানে হাজির ছিলেন ক্রেগের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য। প্রফেসর রুদেনস্টাইন ছিলেন চেয়ারে—এলেন টেরীও তাঁর ছেলের প্রতিভার এই স্বীকৃতি-সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবেই কবি ইয়েটস বলেছিলেন—"a great age was an age that employed its men of genius, and a poor age one that could not do so. This age found it difficult to employ men of genius like Mr. Craig.

ইয়েটসের এই উক্তির প্রায় বার বছর বাদে স্যাটারডে রিভিউতে ক্রেগ সম্বন্ধে কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা হয়েছিল যে, ইংলিশ থিয়েটারই ক্রেগের আসল কাজ করবার জায়গা—অথচ এখানে ক্রেগকে তখন পর্যন্ত তাঁর যোগ্য স্থান দেওয়া হয় নি—কোন সাহায্য দেওয়া হয় নি যখন ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে তাঁর স্কুলটি একরকম সমূলে উৎপাটিত হল।

১৯১৩ সালের মার্চ মাসে ফ্লোরেন্সে ক্রেগ তাঁর 'স্কুল ফর দি আর্ট অফ দি থিয়েটারের' উদ্বোধন করেন। দি এরিনা গোলডোনী বা মুক্ত আকাশের থিয়েটার-এর সংগে ওয়ার্করুমস, স্টোররুমস এবং কয়েকটি অফিস ঘর ছিল—এটি ছিল ১৯০৮ সাল থেকে 'দি মাস্ক' পত্রিকা প্রকাশ করবার প্রধান কার্যালয়। ভাড়া

'মার্চেন্ট অব ভেনিস' : ইয়ং যোদ্ধা

দি ষ্টেপস: ১৯১১

ছিল বছরে একশো পাউন্ড। তিরিশজন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল এবং সবে মাত্র কাজ শুরু করা হয়েছিল। এখানে যে সব কাজ সম্পন্ন হোত তার তিনটি প্রদর্শনী করা হয়। যুদ্ধ বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা স্কুল ছেড়ে দিল; ইংলন্ড থেকে টাকা আসা বন্ধ হল, স্কুল বন্ধ করে দিতে হল বাধ্য হয়ে। ১৯১৬ সালে সরকারের তরফ থেকে বাড়িগুলো রেকুইজিশন করা হোল। এ স্কুলে পাঁচটি বড় মডেল থিয়েটার ছিল। মডেল থিয়েটার এবং তার জিনিসপত্র কিনতে ক্রেগের খরচ হয়েছিল চার হাজার পাউন্ড। ক্রেগ রোমের বৃটিশ এম্বেসীতে লিখলেন: "The destruction of these models means the complete ruin of my career; they represent the visible exposition of my ideas on which depands my entire future.' Three months too late he was informed that he could remain on at the Arena Goldoni. But in the meantime it had been let by the proprietors to three different tenants and part to the military as a hospital, and the models had all been broken up by Craig. It became a barracks and was afterwards destroyed.

এর পর ক্রেগ সম্পূর্ণভাবে থিয়েট্রিক্যাল রিসার্চে মনোনিবেশ করলেন।

'দি মাস্ক' পত্রিকায় 'দি আর্টিস্টস অফ দি থিয়েটার অফ দি ফিউচার' প্রবন্ধে ক্রেগ একটি অত্যন্ত সারগর্ভ কথা বলেছেন: মনে রেখ, মাত্র দু' ইঞ্চি স্কোয়ার একটি কাগজের টুকরোয় এমন একটি সরল রেখা আঁকা যায়, যেটা দেখে মনে হবে রেখাটা একেবারে গগনস্পর্শী। স্টেজের ওপরও এই জাতীয় জিনিসের সৃষ্টি করা যায়—কারণ, সবটাই নির্ভর করে সঙ্গতিপূর্ণ আয়তন সৃষ্টির ওপর—আসল বাস্তব আয়তনের সঙ্গে স্টেজের বস্তুর আয়তনের ঐক্য থাকার কোনই আবশ্যকতা নেই। ঠিকমত প্রপোরশন দিয়ে দেখাতে পারলেই নকলকেও আসল বলে দর্শকদের মনে হবে।

মানুষের চিন্তা-ভাবনা দেশের গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। সেগুলো আপনা থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্রেগের বেলাতেও তাই ঘটেছিল। ইংলণ্ডের থিয়েটারে তিনি পাত্তা পান নি, কিন্তু তিনি যে থিয়েটার গড়তে চেয়েছিলেন, তা প্রতিষ্ঠিত হল রাশিয়া, স্ক্যান্ডেনেভিয়া, ভিয়েনা, বার্লিন, মিউনিখ, মানহাইম, বুডাপেস্ট, ওয়ারশ, প্রাহা, আমস্টার্ডাম, টেল আভিভ এবং জ্যাঁ লুই ডেক্রোয়া প্রভৃতির সাহায্যে প্যারিসে।

এরপর ক্রেগ আর একটি মাত্র প্রডাকসন করেছিলেন—ইবসেনের 'দি ক্রাউন প্রিটেন্ডার্স'। এ প্রডাকসনে তাঁর সহকারী ছিলেন ড্যানিস অভিনেতা এ্যাডাম ও জোহানস পলসেন। কোপেনহেগেনের 'রয়াল আর্ট থিয়েটারে'। তাঁর কাজের স্বীকৃতি দিয়ে সে বছরই 'কিং অফ ডেনমার্ক' ক্রেগকে অর্ডার অফ দি নাইটস অফ দি ডানেবর্গ উপাধিতে ভূষিত করেন।

এইবার মার্টিন শ'র 'আপ টু নাউ' বইটি থেকে ক্রেগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে দেব। গর্ডন ক্রেগের বেশির ভাগ বইতে মিউজিক কম্পোজার ছিলেন মার্টিন শ। তাঁর উপরোক্ত রেয়ার বইটি ১৯৫৬ সালে বেশ সস্তায় কিনেছিলাম চেয়ারিং ক্রশের ফয়েলসের [illegible] থেকে। বইটিতে লেখকের অটোগ্রাফ করা ছিল। সাধারণত অটোগ্রাফকরা বইয়ের দাম হয় বেশি। এ ধরনের ক্রেগের অটোগ্রাফকরা হেনরী আরভিং-এর লাইফ আমি তিন পাউন্ড দিয়ে কিনেছিলাম ফয়েলস থেকে। তা ছাড়া লরেন্স আরভিং ও তাঁর স্ত্রীর আঁকা গিফট কার্ড সহ আরভিং-এর লেকচারসও কিনেছিলাম বেশি দামে। মার্টিন শ'র বইটি যে অটোগ্রাফ করা, এ কথা কিন্তু দোকানদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছিল, সুতরাং বইটি পেয়ে যাই খুব সস্তায়, অর্থাৎ এক শিলিং-এ।

শ লিখেছেন—"আমার দুটি দীর্ঘকাল-স্থায়ী বন্ধুত্বের শুরু হয় সাউথওল্ড-এ। এখানেই প্রথম এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ এবং জেমস প্রাইডের সঙ্গে আলাপ হয়। পিয়্যারো বা ভাঁড়দের জন্য ক্রেগ একটি বেনিফিট পারফরমেন্স করেন—আমি ছিলাম অর্কেস্ট্রার চার্জ-এ। জিমি প্রাইড এক সময় সমুদ্রের তীরে পিয়্যারো সেজে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল, তখন আমি তাকে জানতাম না; সে বলে, আমি নাকি তাকে এক শিলিং ভিক্ষে দিয়েছিলাম। ঘটনাটা আমার মনে আছে বটে কিন্তু শিলিং-এর ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। ছ' পেনী হলেও কথা ছিল। আমার তখন এক শিলিং দেবার মত অবস্থা কোথায়!"

ক্রেগকে নিয়ে এত বিস্তৃত আলোচনা করছি কেন, এ প্রশ্ন অনেকের মনে উঠতে পারে। এর কারণ—ক্রেগই হচ্ছেন আধুনিক ইওরোপীয়ান থিয়েটারের গুরু। এখনও ইওরো-আমেরিকায় ক্রেগের কাজের ওপর বহু রিসার্চ চলছে। এক সময় কনভেনশ্যনাল নাট্যপরিচালকেরা ক্রেগের কাজকে অত্যন্ত দুঃসাহসিক এবং অবাস্তব বলে মনে করতেন এবং সেই কারণেই ক্রেগকে প্রফেশ্যনাল মঞ্চে কাজ করবার সুযোগ দেন নি। কিন্তু সত্যিকার মহৎ কাজকে কেউ কখনও চিরকালের জন্য দূরে ঠেলে রাখতে পারে না। তাই ক্রেগের প্রভাব ঠেকিয়ে রাখাও ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

আরভিং-এর এ্যাকটিং নিয়ে এক সময় বার্নার্ড শ' এবং গর্ডন ক্রেগের ভেতর বহু বাদানুবাদ হয়। সে সময় শ' ক্রেগকে 'এলেন টেরিজ বেবী' বলে উপহাস করতেও ছাড়েন নি। তবে ক্রমশ যা দেখতে পাচ্ছি, পরিচালক এবং মঞ্চসজ্জাকর হিসাবে ক্রেগের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীব্যাপী—আর নাট্যকার হিসাবে শ-এর জনপ্রিয়তা কিন্ত অনেক কমে এসেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য এর দ্বারা শ-এর প্রতিভাকে আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাইছি না। আমি বলতে চাই, নাট্যপরিচালক হিসাবে গর্ডন ক্রেগ একমেবাদ্বিতীয়ম্। নাট্যকার হিসাবে বার্নার্ড শ' তা নন—অবশ্য একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, হি ইজ সার্টেনলি ওয়ান অফ দি গ্রেটস।

[ক্রমশ]

নতুন বাংলা ছবি নেই কেন?

বাংলা ছবির রিলিজ-চেন নিয়ে আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ সপ্তাহে নতুন বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করে নি। নতুন ছবির পরিবর্তে কোন কোন সিনেমায় দেখা যাচ্ছে পুরনো ছবি—বাংলা এবং হিন্দী। কেন এই অবস্থা? মুক্তিলাভের যোগ্য বাংলা ছবির কি অভাব ঘটেছে?

আমরা খবর নিয়ে দেখেছি সেন্সার হয়ে রয়েছে, এমন ছবির অভাব নেই। কিন্তু সিনেমা মালিকরা নানাভাবে নতুন ছবির মুক্তির ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিচ্ছে। নতুন করে চক্রান্ত শুরু হয়েছে যাতে সেন্সার তারিখভিত্তিক বাংলা ছবির মুক্তির যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা ভেঙে যায়, তার পরিবর্তে আগের অবস্থা ফিরে আসে। যে ব্যবস্থায় বড় প্রযোজকের এবং নামী তারকাভিত্তিক ছবি ছাড়া অন্য ছবির মুক্তির পথ দুরূহ হয়ে থাকবে। ছোট প্রযোজকদের ছবি মুক্তির জন্য যা কাঠখড় পোড়াতে হবে, তাতে সর্বস্বান্ত হয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফেরা ছাড়া উপায় থাকবে না।

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের ফলে সেন্সর তারিখভিত্তিক ছবি মুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং সরকারের চাপে সিনেমা মালিকরা এই নিয়ম মেনে নিয়েছিলেন। তার ফলে গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে ছত্রিশটি ছবি নির্মিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরের তুলনায় এই সংখ্যা বেশী। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে দীর্ঘকাল পর্যন্ত যেভাবে সংকট চলছিল তার সমাধান হতে চলেছে মনে করে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরানো অশুভ শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। পর পর দুই সপ্তাহ বাংলা ছবির রিলিজ-চেনে নতুন ছবি দেখা যাচ্ছে না।

এই পরিস্থিতির জন্য প্রযোজকদের একাংশেরও দায়িত্ব আছে। প্রযোজকদের এক একাংশ ছবি তৈরী হবার পরও সেন্সারের জন্য উপস্থিত না হয়ে অপেক্ষা করছেন; কেউ কেউ সেন্সার হবার পরও ছবির মুক্তিতে অনিচ্ছা জানাচ্ছেন। অনেকে নানা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ছবির মুক্তিকে বিলম্বিত করছেন। এই ধরনের প্রযোজকরা নিজেদের পছন্দ-মত রিলিজ-চেনে যাবার জন্য এই পথ ধরেছেন। যে প্রযোজকরা এই ভুল পথে চলেছেন তাঁদের মধ্যে সিনেমার মালিক, ফিল্ম ফাইনান্সিয়ার ইত্যাদি রয়েছেন এবং এই শ্রেণীর প্রযোজকরা গোড়া থেকেই সেন্সর তারিখভিত্তিক ছবি রিলিজের বিরুদ্ধে ছিলেন। এই শ্রেণীর প্রযোজকদের কেউ কেউ বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেন্সর তারিখভিত্তিক ছবি মুক্তির ব্যবস্থাটাকে বানচাল করে দিতে চান!

বাংলা ছবির সমস্যা গত এক বছরে যতদূর সমাধানের পথে এগিয়েছিল তা যাতে বাধা না পায়, সে বিষয়ে গতবার আমরা মন্তব্য করেছিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহ অতিক্রম না করতেই দেখা যাচ্ছে, ছবিমুক্তির ব্যাপারটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি শাসনে এই সমস্যা সমাধানে সরকার কি ব্যবস্থা করবেন জানি না; উপদেষ্টা বোর্ডকে এ কথা মনে রেখে কাজ করা দরকার। নতুবা বাংলা ছবির সমস্যা আবার তীব্র হয়ে উঠবে। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি আন্দোলন করে যে ফললাভ করেছিল তা রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী না হলে আবার বিশৃংখল অবস্থা দেখা দিতে পারে। গত দুই সপ্তাহে বাংলা রিলিজ-চেনে নতুন ছবি না দেখে আমরা আশংকিত হয়ে উঠেছি। সেন্সার তারিখভিত্তিক ছবির রিলিজ ব্যবস্থা বজায় থাকুক, চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলেরই এই ইচ্ছাই। —সুজন।

অমল দত্তের 'আবিরে রাঙানো'র নায়িকা সুচন্দ্রা

পিপলস ভয়েসে'র তিনটি নাটক

গত ২১শে মার্চ থিয়েটার সেন্টার হলে তিনটি একাঙ্ক উপহার দিয়ে মহান নেতা ভি. আই লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পিপলস ভয়েসে'র সভ্যবৃন্দ। উৎপল দত্তের 'দ্বীপ', কিরণ মৈত্রের 'তারা যা পারেনি' এবং পিপলস ভয়েসের অন্যতম উদ্যোক্তা জয়ন্ত ভট্টাচার্যের 'ভ্যান ত্রয়ী' এই সংস্থার প্রথম নিবেদন। প্রথমোক্ত নাটকে প্রস্তুতির অভাব, দ্বিতীয়ে দুটি চরিত্র-সম্বল নাটকে জয়ন্ত ভট্টাচার্যের একক মুন্সীয়ানা এবং শেষোক্তের চমৎকার টিম-ওয়ার্ক প্রশংসনীয়। 'ভ্যান ত্রয়ী'র দৃশ্য পরিকল্পনায়ও উদ্ভাবনী কৌশল

উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ে তরুণ অভিনেতা জয়ন্ত দাশ 'ভ্যান গগ'র চরিত্রটি চমৎকার বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল ভট্টাচার্য। শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন কাউন্সিলার শ্রীবারীন চ্যাটার্জী। সংস্থা ও অনুষ্ঠানের সভাপতি সংবাদিক ও কথাকার শ্রীবীরেন্দ্র মিত্র সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে বলেন: মহান নেতা ভি. আই লেনিন সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে বলেছেন, সাহিত্য, শিল্প, নাট্যকলার বিশেষ সামাজিক দায়িত্ব আছে। তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিপীড়ন, বেদনার কথাই বলবো। সমাজে বাসা করব আর সামাজিক দায়িত্ব পালন করব না, এমন স্বেচ্ছাচার বুর্জোয়া শিল্পী-সাহিত্যিকেরই অভিপ্রেত। প্রত্যেক জীবিত মানুষই কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বনে বাধ্য। গণ-সাহিত্য জনগণের পক্ষাবলম্বী।

শ্রীমিত্র বলেন: 'পিপলস ভয়েস'ও এই পথেরই পথিক।

'পিপলস ভয়েস'র নাটক তিনটি পরিচালনা করেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও নির্মল ভট্টাচার্য। জয়ন্ত ভট্টাচার্যের 'ভ্যান গগ' উল্লেখযোগ্য উপহার।

সীমান্তিক-এর 'অক্টোবর বিপ্লব'

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সীমান্তিক শাখার "অক্টোবর বিপ্লব" নাটকের ১৭ই মার্চ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নির্ধারিত অনুষ্ঠান ঐ তারিখে হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘটের জন্য বন্ধ ছিল। উক্ত অনুষ্ঠান আগামী ৩রা এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে।

আর্নস্ট বুশ ও বের্টোল্ট ব্রেখট

চলচ্চিত্রে "দি ক্রেমলিন চাইমস"

এখন মসফিল্ম স্টুডিওতে নিকোলাই পগোদিনের বিখ্যাত নাটক "দি ক্রেমলিন চাইমস"-এর চিত্ররূপ গ্রহণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মস্কো থেকে এ খবর দিচ্ছে এ-পি-এন।

তরুণ পরিচালক ভিক্টর জর্জিয়েভ এই নাটকের ভিত্তিতে ছবিটি তুলছেন। ইতিপূর্বে তিনি "স্ট্রং ইন স্পিরিট" নামে একটি ছবিতে সাফল্যলাভ করেন।

নাটকের মত "দি ক্রেমলিন চাইমস"-এর চলচ্চিত্ররূপেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লেনিনের ভাবমূর্তি রূপায়ণ। রাশিয়ার বৈদ্যুতীকরণের জন্য লেনিনের পরিকল্পনা আহ্বানের প্রস্তুতিতে লেনিনের কর্মোদ্যোগ, ছবির অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। ছবিতে লেনিনকে দেখা যাবে এমন একজন মানুষ, যিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখেন ও তাঁর ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিপুল সম্ভাবনার বিষয়টি দেখতে পান।

ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় রূপদান করেছেন রুশ ফেডারেশনের সম্মানিত শিল্পী ইউরি কায়ুরোভ। ইতিপূর্বে তিনি "এট দি বিগিনিং অব দি সেঞ্চুরী", "থ্রু দি আইসি স্টর্ম", "দি সিক্সথ জুলাই" প্রভৃতি ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

'মঞ্জিল' চিত্রে ললিতা চ্যাটার্জী.

মঞ্জরী অপেরা

অগ্রদূত গোষ্ঠী 'মঞ্জরী অপেরা'র ইউনিট নিয়ে বরাকরের কয়লা খনি অঞ্চলে চিত্রগ্রহণ করলেন। প্রায় বাইশ দিন স্টুডিওর মধ্যে কাজের পর তারা বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য বেরিয়েছিলেন। আবার এখন স্টুডিওর মধ্যে কাজ হচ্ছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি যাত্রার পটভূমিতে রচিত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অরুণকুমার, সন্ধ্যা

সঙ্গীতকথা

'কলঙ্কিত নায়ক' ছবিতে জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

ব্যানার্জী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বনানী চৌধুরী, সরযূ দেবী, বেবী গুপ্তা, গীতা দে, ভানু ব্যানার্জী, বাসন্তী চ্যাটার্জী প্রমুখ।

প্রতিদ্বন্দ্বী

স্টুডিওর ভিতরের কাজ শেষ করেছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে শ্রীরায় নিজে চিত্রনাট্য লিখেছেন। নিউ মার্কেট ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। এই ছবিতে নবাগতা জয়শ্রী রায় একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

প্রতিবাদ

আর্ট গিল্ডের 'প্রতিবাদ' ছবির চিত্র গ্রহণ করছেন তপেশ্বর প্রসাদ। সত্যজিৎ রায় ও তরুণ মজুমদারের সহকারীরূপে তিনি চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন বিশ্বজিৎ, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, জুঁই ব্যানার্জী, অজয় গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, রবি ঘোষ, লতা চৌধুরী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হর রায় প্রমুখ।

সংগ্রামী মানুষের সুরপ্রধান আনস্ট বুশ

আর্নস্ট বুশের বয়স সত্তর বছর। বিশ্বের বহু ভাষায় তাঁর গানের উদ্দেশে যে সব প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছে তার একটি তালিকা করলে এই রকমটি দাঁড়ায় ঃ মনোগ্রাহী, প্রদীপ্ত, অ-ভাবপ্রবণ, ঝোড়ো, শৃংখলাবদ্ধ, শুদ্ধ, বিপ্লবী, তীক্ষ্মধার, প্রশান্ত, জনপ্রিয়, বাস্তববাদী, যথাযথ, ধাতব, সার্বভৌম, সতেজ, সংগ্রামী ইত্যাদি। তাঁর গান শুনে কী মনে হয়, তার বর্ণনা দিতে যদি বিশেষণের এই তালিকাও যথেষ্ট না হয় এবং নতুন বিশেষণ খুঁজতে হয়, তাহলেও তাঁর গানের প্রকৃত শক্তিকে ঠিক বোঝানো যাবে না। বার্লিন, মস্কো, মাদ্রিদ, আমস্টারডমে তাঁর গান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

সঙ্গত কারণেই নাৎসীরা তাঁর গানকে ভয় পেত। তাই তাঁকে অন্তরীণ করেছিল, তাঁর ওপরে অত্যাচার চালিয়েছিল, তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ "গান দিয়ে তিনি ইউরোপে কমিউনিজম প্রচার করছেন।"

বুশ যে-সব গান শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করতেন তা নেওয়া হত ব্রেখট, মায়াকোভস্কি, ভাইনার্ট, টুকোলস্কি—পুঁজিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কবিদের বিপ্লবী রচনা থেকে। অধিকাংশ গানের সুর দিতেন হানস্ আইসলার। সংগ্রামী গান হিসেবে সারা বিশ্বে সেগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন "তৃতীয় আন্তর্জাতিকের গায়ক, আন্দোলনকারী ও প্রচারক", স্পেনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম "বজ্রকঠিন কণ্ঠ।"

১৯০০ সালের ২২শে জানুয়ারী বুশের জন্ম। শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যাত্রা শুরু, চলেছেন শতাব্দীর আগে আগে, যে শ্রেণী থেকে তিনি এসেছেন, সেই শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে।

রাজমিস্ত্রীর ছেলে, পেশায় কারিগর, কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন শ্রমিকদের সঙ্গীতকার। অভিনেতা হিসাবে সেই অল্পসংখ্যক মহান জার্মান শিল্পীদলের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা মঞ্চে সমাজতন্ত্রের বাণীকে রূপ দেবার জন্য ভাষা ও সুরের অস্ত্র শানিয়েছেন।

২১শ আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সদস্য হিসাবে আর্নস্ট বুশ স্পেনের গৃহযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পরিখায় লড়াই করতে করতে সৈন্যরা তাঁর দু'টি গান গাইত—'থেলম্যান ব্যাটালিয়ন' ও "আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের গান"।

বুশের গাওয়া অধিকাংশ গানের সুর রচনা করেছেন হান্স আইসলার। তিনি বলেছেন "বুশ শ্রমিকদের বোঝে, তাই শ্রমিকদের গান এত জোরের সঙ্গে গাইতে পারে।"

তিরিশের দশক থেকেই আর্নস্ট বুশ হয়ে উঠেছিলেন ব্রেখটের ভাষায় "জনগণের শিল্পী"। অভিনয় করতেন বার্লিনের পিসকাটর থিয়েটারে, বের্টোল্ট ব্রেখটের "মাদার কারেজ", 'মা', 'ককেশীয় চক সার্কল' ও 'গ্যালিলিও গ্যালিলীর জীবন' নাটকে। যে সব চরিত্রে অভিনয় করতেন তাতে থাকত তাঁর নিজস্ব একটি প্রতিকৃতিও। কেন না মঞ্চে এই মানুষগুলো ছিল সদাচঞ্চল, তারা হয়ে উঠত প্রলিতারিয়েতের প্রতিকৃতি, দর্শকদের কাছে দৃষ্টান্ত—কেমনভাবে তারা চলবে, কেমনভাবে কাজ করবে। বুশের ধারণায়, অভিনেতার কাছে শিল্প সব সময়েই এমন এক শক্তি, যা এই দুনিয়াটাকে বদলাতে মানুষকে সাহায্য করে।

বয়স হয়ে যাবার পরে অভিনেতার জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি আবার পুরনো গানগুলোকে—যে গানগুলো তাঁকে বিখ্যাত করেছিল—নতুন করে উপস্থিত করার কাজটি হাতে নিয়েছেন।

এই পর্যায়ে 'অরোরা' নামে ১৭টি রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে, যাতে আছে "গানে ও গীতিতে বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিবৃত্ত", তাঁর ও কবিদের ও সঙ্গীতকারদের তৎকালের সেই সংগ্রাম।

সুভাষচন্দ্রের জীবনীচিত্র

বেতার ও তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ লোকসভায় জানিয়েছেন যে, সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ ও কর্মজীবন নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তোলার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন। এই ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মৃণাল সেনকে। তার জন্য ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এখন ছবির স্ক্রিপ্ট তৈরীর কাজ চলছে। এই ছবি তোলার ব্যাপারে টোকিও, লণ্ডন, ওয়াশিংটন, বন ও পূর্ব বার্লিনস্থ ভারতীয় দূতাবাসগুলির সহযোগিতা নেওয়া হবে।

নন্দিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনীর স্মৃতি রক্ষার্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতে (দ্বিতীয় বার্ষিক) নন্দিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ৫০০, ৩০০ ও ২০০ টাকা।

কেবলমাত্র ১৪ থেকে ১৮ বৎসর বয়স্কা মেয়েদের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের নির্ধারিত আবেদনপত্র প্রতি বৃহস্পতিবার এবং রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে বৈতানিক কার্যালয়ে, ৪নং এলগিন রোড, কলিকাতা ২০ হতে পাওয়া যাবে। নাম, ঠিকানা সহ ২০ পয়সার ডাক টিকিটযুক্ত খাম পাঠালে আবেদনপত্র পাঠানো হবে। খামের ওপর "নন্দিতা পুরস্কার" কথাটি লিখে দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭০।

সুপ্রকাশ চাকী
আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের শিল্পী সম্প্রতি হিজ মাস্টার্স ভয়েজ-এ আধুনিক গানের দু'টি রেকর্ড করেছেন।

'মীরাবাঈ' নৃত্যনাট্য

নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিল্পীরা মীরাবাঈ নৃত্যনাট্য পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রযোজনাটি ছায়া ও কায়ার মাধ্যমে পরিবেশিত হবে। সংগীত পরিচালনায় থাকবেন শ্রীবিমল ঘোষ। বলদেব সিংহ ও শ্রীমতী মায়া সেনগুপ্তা নৃত্য নির্দেশনায় সহকারিত্ব করবেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান' ছবিতে নন্দিনী মালেয়া ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার মৃত্যু

পুজো শেষ হয়েছিল অনেক আগেই। ...রোধ ছিল প্রতিমা বিসর্জনের দিনক্ষণ ...রে। পণ্ডিতেরা প্রচুর পুঁথিপত্র ঘেঁটে ...মত হলেও শুভদিন স্থির করলেন ১৬ই ...র্চ সোমবার ১৯৭০। যে প্রতিমা লক্ষ ...ক মানুষের আনন্দ-উদ্দীপনার আবির ...ঙানো পথে আবির্ভূত হয়ে জনমানসে ...ায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার ...কাল বিসর্জন ঘটল সন্ধ্যার অন্ধকারে ...সংখ্য শোকার্ত মানুষের চোখের সামনে ...ামবার ১৬ই মার্চ, ১৯৭০।

অথচ এমনটা হবার কোন কথা ছিল ...। বাংলা দেশের মানুষ যুক্তফ্রন্ট ...রকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল ...নেক রক্ত আর নির্যাতনের বিনিময়ে ...ভূতপূর্ব গরিষ্ঠতা দিয়ে। যুক্তফ্রন্ট ...রকার প্রতিষ্ঠার সেই আবেগ জড়ান ...দীপনাময় দিনগুলির কথা এত ...ীঘ্র ভুলে যাওয়ার কথা নয়। আশা ...ল বত্রিশ দফা কর্মসূচীর সফল ...পায়ণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকার জন-...ধারণকে একটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ...পহার দেবে। দেশের লাঞ্ছিত ও ...পীড়িত মানুষের জীবনে আশার ...লো এনে দেবে। দুর্বল শ্রেণী পাবে ...াধীনতার স্বাদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলা ...শের, প্রথম দিকে কয়েকটি চমকপ্রদ ...জ করবার পর সরকারে এলো জটিলতা, ...লো শরিকী সংঘর্ষ, এলো ক্ষমতার ...ালুপতা ও দলবৃদ্ধির অশুভ প্রচেষ্টা। ...লোচনা, বৈঠক কোন কিছুতেই এ ...ন্দ্বের অবসান হল না এবং বিভেদ দীর্ঘ ...কে দীর্ঘতর হলো। বত্রিশ দফা কর্ম-...চীর কথা দলগুলি ভুলে গেলো। জন-...ণের সরকার জনগণ থেকে মুখ ফিরিয়ে ...লেন। এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার খতম ...বার যে হীন ষড়যন্ত্র তার প্রতিষ্ঠার ...ন থেকে শুরু হয়েছিল, সরকারের ...ভিজ্ঞ ও বহু পরীক্ষিত কর্ণধারগণ ...র শিকার হয়ে ধীরে ধীরে অন্তিমের ...কে এগিয়ে গেলেন। একটি উজ্জ্বল ...ভাবনার মৃত্যু ঘটল। আশাতীত ...রিষ্ঠতা নিয়ে একটি জনপ্রিয় সরকারের ...তন হল।

আমরা সাধারণ মানুষ তবে এবার ...র দিকে তাকাব? এ রাজনৈতিক ...নাত্তো বোধে বাংলা দেশের মানুষকে ...ষ চেষ্টা হিসাবে একটি দলকে খুঁজে ...তে হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বল্পায়ু ...সনে জনজীবনে যে জাগরণের জোয়ার ...সেছে, তারই আলোকে আমি বিশ্বাস ...র সঠিক দল খুঁজে নিতে বাংলা দেশের ...জনীতিসচেতন মানুষ আর ভুল করবে ...। যদি করে, তবে আজকের ঘটনারই ...পুনরাবৃত্তি হবে এবং অনেকগুলি উদ্দীপ্ত

প্রাণের মূল্যে দীর্ঘায়িত আমলাতান্ত্রিক শাসনই হবে আমাদের বিধিলিপি।

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহরায়
আরামবাগ, হুগলী

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতী'র আমি নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাখানির নিরপেক্ষ, নির্ভীক এবং প্রগতিশীল ভূমিকার জন্য আমি আমার বন্ধুবান্ধবকেও পড়িতে বলিতাম। তাঁহারাও নিয়মিত পত্রিকাখানি কিনিতেন এবং পড়িতেন। মোটামুটি আপনার পত্রিকার একটি ভাবমূর্তি আমাদের মনে গড়িয়া ওঠে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হইবার পূর্বে সাপ্তাহিক বসুমতী জনমতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য যেমন আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হইবার পর বিভিন্ন দলের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতেও দ্বিধা করেন নাই।

২৬শে মার্চের সংখ্যার সম্পাদকীয় পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। এই ধরনের সম্পাদকীয় সাপ্তাহিক বসুমতীতে কখনও পড়ি নাই। মনে হইল সাপ্তাহিক বসুমতীর পরিচালনাভার বোধ হয় রাতারাতি অন্য কোন সংস্থার উপর চলিয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই।

বর্ধমানের ঘটনা লইয়া যে সম্পাদকীয় লেখা হইয়াছে, তাহা আপনার লেখা কি না জানি না। তবে নিয়ম-মাফিক দায়িত্ব আপনারই। সম্পাদকীয়তে লেখা হইয়াছে "সি-পি-এম'এর সমর্থকরা তিনজন কংগ্রেস কর্মীকে হত্যা করে"। হত্যা সকল সময়েই নিন্দনীয়। সে বিষয়ে আপনার উপর কোন দোষারোপ করিতে অন্তত আমি পারিব না। কিন্তু আপনাকে আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিব—নিহত ব্যক্তিরা "কংগ্রেস কর্মী" আপনি কিভাবে জানিলেন? বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসন, যুক্তফ্রন্ট নাই—তথাপি সরকার পক্ষ হইতে ইহাদের নিবর্তন-মূলক আটক আইনে সমাজবিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। আপনি নিজে নারী—আপনি ভাবিয়া দেখুন, কিছুদিন পূর্বে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে বাড়ি চড়াও হইয়া ইহারা নির্যাতন করিয়াছিল; তাহার জন্য ইহাদের বিরুদ্ধে মামলাও হইয়াছে। জানি না, কোন সুস্থ ব্যক্তি নারীজাতির উপর এই অত্যাচারীদের কংগ্রেসকর্মী বলিয়া দাবী করিতে পারেন কি না?

ইহা ছাড়া আপনার সম্পাদকীয়তে লোমহর্ষক বিবরণ দিয়া তারপর উল্লেখ করা হইয়াছে "শুধু তাই নয়, ঐ পরিবারের বড়ভাই নবকুমার সাঁই-এর চোখ দুইটি 'সি-পি-এম'এর জহ্লাদেরা উপড়ে ফেলে এসিড দেয়।" একাধিক সংবাদপত্রে এবং সরেজমিনে দেখিলে এ কথার যথার্থতা আপনি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অথচ এই অসত্য ঘটনাটি আপনার সম্পাদকীয়তে ছাপা হইয়া গেল। ইহারও পর ঘটনাকে কিভাবে মর্মান্তিক করিবার চেষ্টা হইয়াছে, আপনি নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন।

আপনার সম্পাদকীয়তে আপনি প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রীভূপাল বসুর বিবৃতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। বিবৃতি দিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। তবে তিনি সি-পি-এম নেতা ও জ্যোতি বসুকে দায়ী করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে তাঁহাদের বিচার চাহিলেন কোন্ অধি-কারে? তাঁহারা কি হত্যাকাণ্ডের জন্য সেখানে নেতৃত্ব দিতে গিয়াছিলেন? প্রথমত সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের "কংগ্রেস কর্মী" বলিয়া অভিহিত করায় সাপ্তাহিক বসুমতীর ভাবমূর্তি যা ছিল, তা নষ্ট হইল। দ্বিতীয়ত প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসুর বিচার চাহিতে গিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আপনার কাগজকে ব্যবহৃত হইতে দিয়া ভাব-মূর্তির অবসান ঘটাইলেন। অথচ সি-পি-এম জহ্লাদদের প্রতি সাঁই পরি-বার কি করিয়াছিল তাহা একবারও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। যখন বর্ধমানের ব্যাপার লইয়া হৈ-চৈ করা হইতেছে, তখন হুগলী জেলার সি-পি-এম দলের লোকদের যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে, নব-কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আপনিও বোধ করি সে বিষয়ে কোন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ইহাকেই বল নিরপেক্ষতা!

আমি পাঠক হিসাবে আপনার সম্পাদকীয়তে এই নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা আশা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, সহসা এই নীতি পরিবর্তনে যাহারই যে কিছু ক্ষতি হউক: ক্ষতি সাপ্তাহিক বসুমতীরই হইল বেশি। কেন না সাপ্তাহিক বসুমতীর পূর্বের সে ভাব-মূর্তি নিজেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

—পরেশ দত্ত
জলোহরপুর, চন্ডীতলা
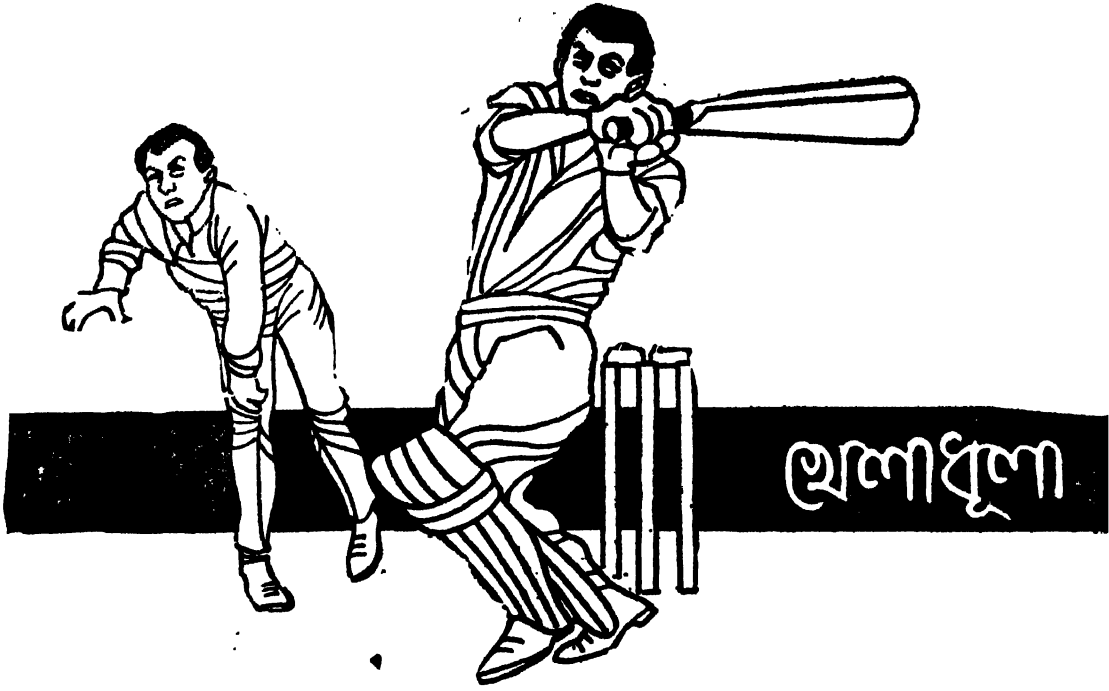
পরাজয়

রণজি ট্রফির সেমি-ফাইন্যালে বাংলা যেভাবে রাজস্থানের কাছে হারলো, তার তুলনা মেলা ভার। বাংলার খেলোয়াড়দের এমন শোচনীয় ব্যর্থতার কথা ছিল আমাদের কল্পনার অতীত। কারণ আর যাই হোক, বাংলা দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের ওপর আমাদের যথেষ্ট ভরসা ছিল। কিন্তু খেলার প্রথম দিনেই বাংলার প্রথম ইনিংস যখন মাত্র চুয়াত্তর রানে শেষ হয়ে গেলো, তখনই আমাদের সমস্ত আশার মূলে পড়েছিল ছাই। আর এও ঠিক যে বাংলা তাদের খেলা শুরু করার সংগে সংগেই খেলার ফলাফলও মোটামুটিভাবে বোঝা গিয়েছিল। খেলা চারদিনের ছিল বটে, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি জয়-পরাজয় মীমাংসা না হ'লে প্রথম ইনিংসের ফলাফলের ওপরই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হবে। তাই প্রথম ইনিংসে চুয়াত্তর রান করা মানেই পরাজয়ের মুঠোর মধ্যে চলে যাওয়া। কিন্তু এই পরাজয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ করতে গেলে শুধু অবাকই হতে হয় না, বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলার হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের দূরদর্শিতার বড় অভাব আমাদের চোখের সামনে বিশ্রীভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। কারণ আর যাই হোক, দলগত শক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাজস্থান দল এমন কিছু আর শক্তিশালী নয়। দলে হনুমন্ত সিং কিংবা সেলিম দুরানীর মতো খেলোয়াড় আছেন বটে—কিন্তু কে না জানে, ওঁদের দু'জনের খেলাই আজ পড়তিমুখী। সেদিক দিয়ে তরুণ খেলোয়াড় সম্বলিত বাংলা দলটি সব দিক দিয়ে ভালো। অবশ্য এ-কথা এখন না বলাই বাঞ্ছনীয়। কারণ চার দিনের খেলায় যে দল দু'দিনের মধ্যেই ইনিংসে পরাজিত হয়—সেই দলের হয়ে সাফাই না গাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তা হলে এই পরাজয়ের কারণ কি? আমাদের মনে হয় বাংলা দলের এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ হলো 'ম্যাটিং উইকেটে' খেলা। বাংলার খেলোয়াড়রা সাধারণত মাটির অর্থাৎ 'টার্ফ' উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত। তাই 'ম্যাটিং উইকেটে' খেলতে নেমে বাংলার খেলোয়াড়রা বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেটাই কি এই পরাজয়ের একমাত্র কারণ? যদি তাই হয়, তা হলে ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতার অভাবের কথা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য এ কিছু আর নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু আজকের এই পরাজয়, আজকের এই লজ্জার সান্ত্বনা কোথায়? গতকয়েক বছরের খেলার ধারা দেখে মনে হয়েছিল যে ক্রিকেট খেলায় বাংলা বোধহয় কিছুটা উন্নতি করেছে—তার ওপর বাংলার অধিনায়ক অম্বর রায় ও পেস বোলার সুব্রত গুহ ভারতীয় দলে স্থান লাভ করায় আমাদের সে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা আশা করেছিলাম যে বাংলা দল এবারও রণজি ট্রফির ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠবেই। কিন্তু তার আগেই এই বিপত্তি। রাজস্থানের বিরুদ্ধে চার দিনের সেমি-ফাইন্যাল খেলাটা মাত্র দু'দিনেই শেষ হলো আর বাংলা হারলো ইনিংসে। আজ তাই আবার নতুন করে সব কিছু ভেবে দেখা দরকার—কোথায় আমরা আছি, আর যেখানে আছি, চিরকাল কি আমাদের সেইখানেই থাকতে হবে? সেই তিরিশের দশকে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো আমরা একবার মাত্র লাভ করেছিলাম রণজি ট্রফি! সেই জয়ের পুনরাবৃত্তি আর কি কখনো হবে না......?

—শান্তিময়

রণজি ট্রফির সেমি-ফাইন্যালে বাংলাকে হারিয়ে রাজস্থান আর মহীশূরকে হারিয়ে বোম্বাই উঠেছে ফাইন্যালে। চৈত্র মাসের চড়া রোদে মনে হয় এবারও রণজি ট্রফি জিতবে বোম্বাই দলই। দলগত শক্তির দিক থেকে রাজস্থানের চেয়ে বোম্বাই অনেক শক্তিশালী। রাজস্থান দলে আছেন দু'জন মাত্র টেস্ট খেলোয়াড় —হনুমন্ত সিং আর সেলিম ডুরানী। কিন্তু এ'দের দু'জনের খেলাই এখন পড়তিমুখে। সেদিক দিয়ে বোম্বাই-এর পোয়াবারো। কারণ বোম্বাই দলে আছেন দিলীপ সারদেশাই, অজিত ওয়াদেকার, অশোক মানকাদ, একনাথ সোলকারের মতো খেলোয়াড়েরা। তাই চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় যে, রণজি ট্রফি এবারও গিয়ে উঠবে বোম্বাই-এর ঘরে।

যা হোক, সেমি-ফাইন্যালে বাংলা বড় অসহায়ের মতো হেরে গেলো রাজস্থানের কাছে। বাংলার এই এক ইনিংস ও ৩৪ রানে পরাজয় সত্যি কথা বলতে কি একেবারেই অস্বাভাবিক ছিল।

॥ অম্বর রায় ॥

বাংলার শোচনীয় পরাজয়ের কারণ কি অম্বর রায় জানতে পারেন না?

প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে প্রথম ইনিংসে বাংলা মাত্র ৭৪ রান করে। এর মধ্যে ছিল গোপাল বসুর ৩২ ও অম্বর রায়ের ১৪ রান। বোলিংয়ে সাফল্য-লাভ করে কৈলাস ঘাটানি ২৪ রানে ৩টি, সেলিম ডুরানী ২২ রানে ৩টি ও সি যোশী ৫ রানে ২টি উইকেট পান।

রাজস্থান তাদের প্রথম ইনিংসে ২৪৩ রান করে। লক্ষ্মণ সিং ৮৮ ও ডুরানী ৬১ রান করেন। সুব্রত গুহ ৭৮ রানের বিনিময়ে লাভ করেন ৫টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসেও বাংলা বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। মাত্র ১৩৫ রানে শেষ হয়ে গেল বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস। অম্বর রায় ৪৯ ও পি চেল ২১ রান ছাড়া আর কেউ ভালোভাবে ব্যাট করতে পারেন নি। ঘাটানী ৬১ রানের বিনিময়ে ৪টি ও ডুরানী ৪২ রান দিয়ে লাভ করেন ৩টি উইকেট।

অপর সেমি-ফাইন্যাল খেলাটিতে বোম্বাই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সূত্রে মহীশূরকে পরাজিত করে সেমি-ফাইন্যালে উঠেছে।

প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মহীশূর প্রথম ইনিংসে ৩০৯ রান করে। উত্তরে বোম্বাই দল ৮টি উইকেট হারিয়ে ৫২০ রান করে। এর মধ্যে সারদেশাই করলেন ১৫৪, সোলকার ১০৫, ওয়াদেকার ৯১ ও অশোক মানকাদ ৬০ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে মহীশূর ৮টি উইকেট হারিয়ে ৩৪৬ রান করার পর ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলো। বি পি প্যাটেল ১০৫ রান করে অপরাজিত থাকলেন আর বিশ্বনাথ করলেন ৯৫ রান। বোম্বাই-এর নতুন ফাস্ট বোলার হাতিয়া ৮৮ রানের বিনিময়ে পেলেন ৩টি উইকেট। দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করে বোম্বাই কোন উইকেট না হারিয়ে ৫৭ রান করার পর খেলার নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ফলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে জয়লাভ করে বোম্বাই ফাইন্যালে ওঠে।

সমাচার দর্পণ

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব এখন প্রতিবাদে সোচ্চার। কালা আদমীর সংগে যারা খেলতে ঘৃণা বোধ করে, তাদের সংগে কি করে যে সভ্য দেশগুলি খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে তা ভেবে পাওয়া যায় না। গত বছর ইংলণ্ডের বর্ণসংকর খেলোয়াড় ডালিভেরাকে নিয়ে কি কাণ্ডই না হলো! এ বছরও দক্ষিণ আফ্রিকার ইংলণ্ড সফর নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে।

আর ঠিক সেই সময়েই ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হলো দক্ষিণ আফ্রিকাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার তীব্র বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিবাদের যে ঝড় উঠেছে, এই সিদ্ধান্ত তারই কাছে নতি-স্বীকার মাত্র।

ইংলণ্ড

১৯৩৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গিয়েছিল ইংলণ্ড সফরে। ওভালে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচ। দু'পক্ষেরই উজ্জ্বল ব্যাটিংয়ের জন্য এই টেস্ট ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মোট তিন দিনে ১২১৬ রান সংগৃহীত হয়েছিল কিন্তু উইকেট পড়েছিল মোটে ২৩টি। ইংলণ্ডের অধিনায়ক ওয়ালি হ্যামণ্ড টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন। কিন্তু দলের মাত্র ২ রানের মাথায় কেটন জনসনের বলে বোল্ড আউট হলেন। এইভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাঁহাতি বোলার জনসন তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম ওভারের প্রথম বলেই উইকেট পেলেন।

ইংলণ্ডের ৩৫২ রানের প্রথম ইনিংসের জবাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যথেচ্ছভাবে বোলারদের পিটিয়ে খেলে মোট ৪৯৮ রান করে ১৪৬ রানে এগিয়ে গেল। বিশ্বখ্যাত উইক্‌স্ মাত্র ১১০ মিনিটে ১৩৭ রান করে তাঁর টেস্ট জীবনের প্রথম সেঞ্চুরি করলেন।

ইংলণ্ড ২য় ইনিংস শুরু করে কেটন ও ওল্ডফিল্ডকে মাত্র ৭৭ রানের মধ্যেই হারালো। এর পর হাটন ও হ্যামণ্ড জুটি তিন ঘণ্টায় ২৬৪ রান ৩য় উইকেটে যোগ করে তৎকালীন নতুন বিশ্বরেকর্ড করলেন। হাটন করলেন ১৬৫ (অপরাজিত) এবং হ্যামণ্ড ১৩৮ রান।

তিন উইকেটে ৩৬৬ রান করার পর খেলা ড্র হলো।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের শেষ চারটি উইকেট ১০৯ রানের মধ্যে পড়ে যায়। ইংলণ্ডের বোলার নিকলস্ ও পার্কস্ ৯২টি বল দিয়ে উইকেটগুলি সমান ভাগে ভাগ করে নিলেন এবং লিয়ারি কনস্টান্টাইন এই ৯২টি বলের মধ্যে অধিকাংশগুলি খেলে ৭৯ রান করলেন ১১টি চার ও একটি ছয়ের মার মেরে। তিনি এত জোরে বল মারতেন যে, হ্যামণ্ড স্লিপে কোন ফিল্ডসম্যান রাখেন নি। তিনি আউট হন শেষে পার্কসের বলে উইকেটকিপার উডের হাতে। অবশ্য উডকে ক্যাচটি ধরতে প্রায় প্যাভেলিয়ানের কাছ বরাবর ছুটতে হয়েছিল।

মজার কথা এই যে, উড ইংলণ্ডের পক্ষে প্রথম টেস্ট খেলেন প্রায় ৪০ বছর বয়সে।

বায়রন ভট্টাচার্য,
৬ঃ এম. এন. সাহা রোড,
আসানসোল।
১২।৩।১৯৭০

দঃ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া, '১৯৭০'

শুকদেব মুখোপাধ্যায় ও
দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়

অবশেষে লরী সাহেবের "দিগ্বিজয়ী" ক্রিকেট দল "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" করে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষ করলো। চারটি টেস্টে জিতে (এমন কি টসেও) আলি বাচারের দক্ষিণ আফ্রিকা দল করলেন একটি রেকর্ড (স্বদেশের); আর অস্ট্রেলিয়া? তাঁরাও হারার দিকে গড়লেন একটি জাতীয় রেকর্ড।

৪টি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে যথাক্রমে :—১৭০ রানে, এক ইনিংস ১২৯ রানে, ৩০৭ ও ৩২৩ রানে।

এই সফরে মোট ৫টি সেঞ্চুরী ও ১টি ডাবল সেঞ্চুরী হয়েছে এবং সবগুলিই করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা। এ'রা হলেন বি· রিচার্ডস্ (২টি সেঞ্চুরী ১৪১ ও ১২৬), ই· বার্লো (২টি—১২৭ ও ১১০), জি· পোলক (২৭৪) ও এল· আরভিন (১০৯)। অস্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড়ের ভাগ্যে সেঞ্চুরী জোটে নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন এম· প্রক্টর। ৩৫৩ রানে ২৬টি। যার গড় ১৩·৫৭। ব্যাটিং-এ সর্বোচ্চ গ্রাহাম পোলক (৭ ইনিংসে ৫১৭। গড় ৭৩·৮৫)।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন এ্যালেন কনোলী, ৫২২ রানে ২০টি উইকেট। যার গড় ২৬·১০।

উইকেটরক্ষক হিসাবে ব্রায়ান টেবার (অস্ট্রেলিয়া) সুন্দর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উনি ৪টি টেস্টের ৭টি ইনিংসে ১৬ জনকে কট্ ও ২ জনকে স্টাম্পড্ আউট করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫ জন খেলোয়াড়কে তাঁর কট আউট করা।

['আমার মতে' পাঠক-পাঠিকাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব বিভাগ। অনেক সময় আমাদের মনে নানা রকম ভাবনা-চিন্তা কিম্বা প্রশ্নের উদ্রেক হয়। 'আমার মতে' বিভাগে পাঠক-পাঠিকাদের সেই বক্তব্যগুলোই মাঝে মাঝে প্রকাশ করা হবে। লেখা সব সময় ছোট করে লিখে পাঠাতে হবে, আর লেখায় যেন কোন রকম ব্যক্তিগত আক্রমণ না থাকে। —ক্রীড়া সম্পাদক]

আমি মোহনবাগানের সমর্থক। গোঁড়া সমর্থকদের সঙ্গে আমার একটু পার্থক্য আছে। গোঁড়া সমর্থকরা সুষ্ঠু-ভাবে বিচার না করে স্বীয় দলের যে কোন ব্যাপারে কখনো খুব আনন্দিত, কখনো উল্লসিত হন। আমি এ'দের থেকে একটু ভিন্ন।

সন্দেহ নেই মালয়েশিয়ার অলিম্পিক-খ্যাত লেফট্ আউট এস্ জিভার আগমনে সমর্থকরা খুব খুশি। ভাল খেলোয়াড়ের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ছাপ সকলেই মনে গেঁথে রাখতে চায় স্বীকার করি এবং সেটার জন্যে প্রতি বছরই তো বহু বিদেশী দল তাঁদের উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। ইচ্ছা করলে তো সেখান থেকেই খেলার টেক্‌নিকগুলি শেখা যায়, তার জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করে খেলোয়াড়কে দলে আনবার কোন প্রয়োজন আছে কি? আমাদের দেশে কি কোন খ্যাতনামা খেলোয়াড় নেই? জিভারের মত খ্যাতির তুঙ্গে হয়ত তাঁরা না উঠতে পারেন, তবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু খেলোয়াড়ই আমাদের দেশে আছেন।

এতদিন যখন দেশের খেলোয়াড়দের সহায়তায় স্বীয় দলের গৌরব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তখন আমার তো মনে হয়, সেই গৌরব এবারও অর্জন করা সম্ভব হোত সকল খেলোয়াড়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

স্বীয় দলের গৌরব অর্জনের প্রচেষ্টায় বিদেশী খেলোয়াড়দের আমদানি করলে দেশের তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়রা খেলার সুযোগ পাবে কি? তাতে দেশের খেলার মান ভবিষ্যতে বাড়বে?

তাই দেশের নামী ক্লাবগুলির কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—যেন স্বীয় দলের গৌরবের প্রচেষ্টায় বিদেশী খেলোয়াড়দের আমদানি না করে দেশের তরুণ ও উঠতি খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ করে দেন। তাতে শুধু দলেরই মান বাড়বে না, দেশেরও মান বাড়বে।

—দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য,
১০৪ ডি, দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড,
কলিকাতা—১৫

প্রশ্ন-উত্তর

অনুরাধা পালিত (কৈলাস কলোনী, নিউ দিল্লী—৪৮)

উত্তর : আপনি সোলকারকে C/o. ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বম্বে, ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম, বম্বে ও বিশ্বনাথকে C/o. মহীশূর ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন, হায়দ্রাবাদ—এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

'খেলার রাজার রাজা' আপনাদের ভালো লাগছে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

অরুন্ধতী বিশ্বাস (বালিগঞ্জ) ও **মধুছন্দা চক্রবর্তী** (বালিগঞ্জ)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যায় পাবেন। আশা করি দেখে নেবেন।

স্বরূপকান্তি সরকার (বলরামদিহি, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)

উত্তর : এ বছর যে সব খেলোয়াড় দল বদল করেছেন, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। আর যদি সম্ভব হয় অর্থাৎ জায়গা পাওয়া যায়, তাহলে হকি খেলার আইন-কানুনও প্রকাশ করা হবে।

প্রদীপ বিশ্বাস (গুলমা টি এস্টেট, গুলমা, দার্জিলিং)

উত্তর : আপনি যাঁদের বোলিং এভারেজ জানতে চান, তাঁদের এভারেজ আমাদের ক্রিকেট সংখ্যায় পাবেন। তার সংগে শুধু এই মরশুমের এভারেজটা যোগ করে নিতে হবে। তাও সাপ্তাহিকের পাতাতেই পাবেন।

[শেষাংশ ২৫৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সম্পাদকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহেমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৪১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৬শে চৈত্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 9th April, 1970

হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের প্রয়োজন

গত ৩১শে মার্চ সকাল আটটা নাগাদ পাটনা স্টেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে রিভলবারের গুলীর আঘাতে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ঘটনাচক্রে সেই গুলী তাঁকে বিদ্ধ করে নি এবং তিনি দৈবাৎ প্রাণরক্ষা পেয়ে গেছেন। তবে রিভলবার থেকে যে গুলী ছোঁড়া হয়, তাতে নিহত হন এল আই সি-র একজন স্থানীয় এজেন্ট—নাম শ্রীআলী ইমাম।

সমস্ত দেশবাসী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ জাতীয় হিংসামূলক প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং শ্রীজ্যোতি বসুকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও এই ঘটনার নিন্দা করে জ্যোতিবাবুর প্রাণরক্ষা পাওয়ায় গভীর স্বস্তি-বোধ করেছেন।

অজ্ঞাতনামা আততায়ীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় যে কোন সৎ, বিবেকসম্পন্ন দেশবাসীর মত আমরাও আনন্দিত। সঙ্গে সঙ্গে আমরা শোক নিবেদন করি শ্রীআলী ইমামের পরিবারবর্গকে, যাদের গভীর শোকে সান্ত্বনা জানাবার মতো ভাষা আমাদের নেই।

শ্রীবসু বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে কেউ তাঁর শত্রু নন, সুতরাং তাঁকে হত্যার পেছনে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

আমরা মনে করি, যে-কোন ধরনের হত্যাই ঘৃণ্য। দলীয় স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় অপচেষ্টা কোনমতেই সমর্থন-যোগ্য নয়। হিংসার পথে পা বাড়ালে পরিণাম আশঙ্কাজনক হতে পারে, এই কথা যে-কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করেছেন। অনেকের ধারণা—সুদূর ভবিষ্যতে হিংসা এবং প্রতিহিংসা-মূলক মনোবৃত্তি নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দকে হত্যার চক্রান্ত এবং চেষ্টা চলতে পারে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মহাত্মা গান্ধীকেও রাজনৈতিক কারণেই প্রাণ হারাতে হয়েছিলো। হিংসাবাদকে যে সব দল প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করে—তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি, কোন বিচ্ছিন্ন কর্মীকে হত্যা করে কোন দলের রাজনৈতিক আদর্শের কণ্ঠরোধ করা যায় না।

আমাদের দেশ এখন রাজনৈতিক মত-বাদে অস্থির ও চঞ্চল। এই চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা দূরীকরণের জন্য যদি কেউ বা কোন দল ভেবে থাকেন যে, তাঁরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন, তাহলে তাঁরা নিঃসন্দেহে ভুল করবেন। কারণ, এদেশের জনমানসে উগ্রতার স্থান নেই। এদেশের মানুষ শত ঝঞ্ঝা-বাত্যাতেও সরল এবং শান্ত। অভাব এবং অভিযোগ যথেষ্ট থাকলেও তারা সেই অভাব দূর করার জন্য শান্তিপূর্ণ পথেই অভিযোগ নিবেদন করে। সুতরাং কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক হত্যা-কাণ্ড ঘটিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করতে অভিলাষী হন, তাহলে তাঁরা জন-গণের কাছে ধিকৃত হবেন।

এ জাতীয় রাজনৈতিক হত্যার চেষ্টার মধ্যে এই কারণই থাকতে পারে যে, কোন এক মতের ও পথের পরিপোষক দলের বিরুদ্ধে অপর এক দলের বিকৃত চক্রান্ত এবং অভিলাষ চরিতার্থ করার নিন্দনীয় প্রয়াস। শ্রীজ্যোতি বসুকে হত্যা করার চেষ্টা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও আমরা মনে করি, এ জাতীয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট জনমত সংগঠনের প্রয়োজন রয়েছে। না হলে দেশ এক শ্রেণীর সন্ত্রাসবাদীদের কৃপার ওপর নির্ভর করবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা যেন হিংসাত্মক কার্য-কলাপকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হলেও কোনমতে প্রশ্রয় না দেন।

পাটনা স্টেশনে সেদিন হত্যাকারীকে ধরা সম্ভব হয় নি। শোনা যাচ্ছে, হত্যা-কারীকে ধরার জন্য কোনো চেষ্টার অবহেলা করা হয় নি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ ও কলকাতার পুলিশ বিভাগ হত্যাকারীকে সনাক্ত করার সব রকম কৌশলই অবলম্বন করেছে। আশা করা যায়, শেষ পর্যন্ত প্রকৃত দোষী ধরা পড়বে এবং উপযুক্ত শাস্তিও তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন—হত্যাকারী কি কোন একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি? তাকে শাস্তি দিলেই কি সমস্ত সমস্যার সহজ সমাধান ঘটানো সম্ভব? তাহলে নাথুরাম গডসের ফাঁসির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে হিংসার অব-সান ঘটতো।

আমরা আশা করি, দলের স্বার্থের কথা ভুলে নেতৃবৃন্দ দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করবেন। দেশের জনগণও সুস্থ আবহাওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কামনা করে, অতএব, ভারতবর্ষের মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করাই রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম কর্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রাজ্যের মধ্যে রাজ্য। পূরোদস্তুর আসামের মধ্যে স্বশাসিত মেঘালয়। পার্বত্য উপজাতিদের নবীন যাত্রা শুরু হলো। আর তাঁদের কাণ্ডারীর দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা। মেঘালয়ের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

পাতলা গড়নের বেঁটেখাটো লোক সাংমা। চোখেমুখে বুদ্ধি বা প্রতিভার ছাপ খোঁজা বৃথা। কিন্তু পার্বত্য অধিবাসীদের ওপর ক্যাপ্টেন সাংমার আধিপত্য ও প্রভাব প্রচণ্ড। সমতলবাসী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংগে আপোষহীন সংগ্রামে গত ১৫-২০ বছর ধরে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। একদিকে স্বশাসিত রাজ্য আদায়ের দাবিতে পার্বত্য উপজাতিদের কঠোর আন্দোলনের জন্যে তৈরি করেছেন, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সংগে লড়াই করেছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস বা আসাম রাজ্য সরকারের ঔদাসীন্য, অনিচ্ছা এবং অবহেলাই নিরীহ অথচ অল্পেতে খুশি পার্বত্য উপজাতীয়দের সংগ্রামের পথে, স্বাধিকার অর্জনে লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পার্বত্য অধিবাসীরা ছিল আসামের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

কিন্তু পার্বত্য অধিবাসীরা ক্রমে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলো। এ চেতনাবোধ জাগার জন্যে বোধ হয় খৃস্টান মিশনারীরা পরোক্ষে দায়ী ছিলেন। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে মিশনারীরা বহু চার্চ এবং তার সংগে স্কুল তৈরি করে। ধর্মপ্রচারের সংগে সংগে শিক্ষারও বিস্তার ঘটে। খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো পার্বত্যভূমির অধিবাসীরা খৃস্টধর্ম নিলো বটে, কিন্তু সেই সংগে শিক্ষার আলোকবর্তিকাও দেখতে পেলো। দরিদ্র যদি শিক্ষিত হয়, তবে আপন অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সে প্রাণ বাজি রাখবেই। ক্যাপ্টেন সাংমার জীবনদর্শনও তাই।

গারো পার্বত্য অঞ্চলের বাঘমারা গ্রামে আজ থেকে ৫১ বছর আগে উইলিয়ামসন সাংমার জন্ম। লেখাপড়া শেখার দিকে ঝোঁক ছিল দারুণ। তারই তাগিদে তিনি রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন॥ প্রথমে আসামেরই গৌহাটি-পাড়ায়। সেখান থেকে পূর্ববঙ্গের ঢাকায়। সর্বশেষে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজে। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হলো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন ঘোরতরভাবে চলছে। একে সাহসী, তার ওপর মিশনারী শিক্ষা—সাংমা সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। শীগগিরই তাঁকে দায়িত্বভার দিয়ে আসাম-বার্মা ফ্রন্টে পাঠানো হলো। এখানে পাইওনিয়র ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বপদও জুটে গেলো তাঁর। সেই থেকে তিনি ক্যাপ্টেন। মানে ক্যাপ্টেন উইলিয়মসন সাংমা।

যুদ্ধ শেষ হলো। ১৯৪৬ সালে তাঁর ব্যাটালিয়নও ভেঙে দেওয়া হলো। তা

ক্যাপ্টেন উইলিয়মসন সাংমা

হোক, ক্যাপ্টেন সাংমা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, তাই হয়ে রইলো তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পুঁজি। সেনাবাহিনীতে অধস্তন সৈন্যদের ওপর খবরদারি নেতৃত্ব করার ফলে ক্যাপ্টেন সাংমার মনে লীডারশিপের বীজ প্রোথিত হলো।

সাফল্য আসতে দেরি হলো না মোটেই। দু' বছরের মধ্যে গারো জাতীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]াধিকার [illegible] [illegible] [illegible]। ক্যাপ্টেন তাঁর [illegible] উন্নীত করতে [illegible] [illegible] [illegible] অর্জনের জন্যে। একদিকে [illegible], অন্যদিকে কর্তব্যনিষ্ঠা। জেলা পরিষদের প্রধান হিসেবে তিনি যে কর্মতৎপরতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছিলেন, তাতে তাঁর প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়লো, তেমনি জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থাও অর্জন করলেন। কেবল দল পাকানো রাজনৈতিক স্লোগান আওড়ানো নয়, প্রয়োজনের মুহূর্তে যে গুরুদায়িত্ব পালন করতে সক্ষম, তাই প্রমাণ করলেন গারো জাতীয় পর্ষদের চেয়ারম্যান সাংমা।

স্বভাবতই ব্যাপক গণ-সংযোগ যেন আপনা থেকেই গড়ে উঠলো। ক্যাপ্টেন সাংমাকে ঘিরে পার্বত্য অধিবাসীরা আশার স্বপ্ন বুনতে লাগলো। তাঁর ঘরে দিবারাত্র কলকাকলি। রাজনৈতিক আলোচনা। তারই ফলশ্রুতি ঘটলো ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে। ক্যাপ্টেন সাংমা নির্বাচনপ্রার্থী হলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্ধর্ষ কংগ্রেস দলের প্রার্থী। কিন্তু পার্বত্য অধিবাসীরা সংগঠিত, তারা প্রতিপক্ষের সংগে শক্তি পরীক্ষায় তৈরি। জয় হলো সাংমার। আসাম বিধানসভার সদস্য হিসেবে ক্যাপ্টেন সাংমা পার্বত্য উপজাতীয়দের দাবিদাওয়া আদায়ে কঠোর সংগ্রাম করেছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন বিধানসভায় বিরোধী পূর্ব-ভারত উপজাতি ইউনিয়ন দলের নেতা। কিছুকাল পরে ক্যাপ্টেন সাংমা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সহযোগী সদস্য, সেই সুবাদে তাঁকে চালিহা সরকারেও মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সংগে সাংমার সে মধুযামিনী স্থায়িত্ব লাভ করে নি!

অল পিপলস্ হিল লীডার্স কনফারেন্স গঠন করে ক্যাপ্টেন সাংমা, অধ্যাপক সায়েল, স্ট্যানলি নিকলস রায় প্রমুখ নেতারা শিগগিরই পার্বত্য উপজাতিদের স্বশাসিত রাজ্যের দাবি-আন্দোলনে নেমে পড়লেন। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পক্ষে সে-আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় নি। নেহরু নিজে স্কটল্যাণ্ডের কায়দায় পার্বত্য উপজাতিদের স্বাধিকার দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। গঠিত হলো পাটাস্কর কমিশন, অশোক মেহতা কমিটি। শেষ পর্যন্ত আসাম রাজ্য পুনর্গঠন প্রস্তাবই খুশি করলো পার্বত্য নেতৃবৃন্দকে। মেঘালয় রাজ্যের সূচনা হলো।

ক্যাপ্টেন সাংমা পাঁচজনের মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এখন দেখা যাক, এই প্রবীণ জননেতা নতুন দায়িত্ব পালনে

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(৭)

মহম্মদ আলি জিন্নার বিষয়ে কিছু সংবাদ এই অধ্যায়ে ইঙ্গিতে দিয়ে এসেছি। তাতে মোটামুটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির উদাররনৈতিক এক নেতারূপেই তাঁকে দেখা গেছে, যিনি এক সময়ে, ঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে লখনৌ প্যাক্টের উদ্যোক্তা হিসাবে হিন্দু-মুসলমান মিলন-প্রয়াসের অগ্রদূত বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসে জিন্নার শেষ পরিচয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের—চরম প্রতিক্রিয়াশীল, উগ্র অহঙ্কারী এক নেতা, যিনি সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কাছে যে কোনো জিনিসকে বলি দিতে পারেন—যিনি 'পাকিস্তানের জনক'—এই কলঙ্কজনক গৌরবের অধিকারী। জিন্না যদি সত্যই তা হয়ে থাকেন—কখন থেকে হয়েছিলেন, কেন হয়েছিলেন এবং কী হয়েছিলেন—সে কাহিনী আমাদের রচনা বিষয়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

জিন্নাভাইয়ের[১] জন্ম করাচীতে, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনি গুজরাটি বৈশ্য পরিবারের সন্তান, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। জিন্নার পিতা-মাতাই মুসলমান হন। তাঁরা খোজা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জিন্নার পিতার নাম জিন্না-পুঞ্জা। তিনি পশুচর্মের ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ৭টি পুত্র-কন্যা। মহম্মদ আলি জিন্নাই সর্বজ্যেষ্ঠ। জিন্নার বাল্যকাল স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাটে নি, কারণ পিতার অবস্থা পড়ে গিয়েছিল। জিন্নার পাঠানুরাগ ছিল প্রচণ্ড, গভীর রাত্রি পর্যন্ত তেলের আলো জ্বালিয়ে পড়তেন। পনের বছর বয়সে অমাই বাঈ নামক খোজা সম্প্রদায়ের এগার বছর বয়সের একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ১৬ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করার পরেই তিনি ইংলণ্ডে আইন পড়তে চলে যান। তার ফলে জিন্নার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ঘটে নি। জিন্না পিতার পয়সায় বিলাত যান নি, জনৈক ধনী ইংরাজের নেকনজরে পড়ার ফলেই তাঁর পক্ষে ইংলণ্ডে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

"উদ্ভট হলদে রঙের কোট-পরা রোগা লম্বা" বালকটি ইংলণ্ডে গিয়ে যে রুচি, আদর্শ এবং শিক্ষা পেয়েছিল, তা বহুলাংশে বজায় ছিল জীবনের শেষ অবধি। পোষাক-পরিচ্ছদে, জীবনযাত্রায় জিন্না খাঁটি ইংরেজ থেকে গিয়েছিলেন। ও ব্যাপারে কোনো নড়চড় সহ্য করতেন না। জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে, যখন তাঁর ফুসফুসে যক্ষ্মা ধরা পড়েছে, জিয়ারত থেকে তাঁকে কোয়েটায় আনা হবে স্ট্রেচারে করে, ক্ষীণ শরীর পাজামায় ও হাল্কা জামায় ঢাকা, এই অবস্থায় যখন তাঁকে বলা হল—সব প্রস্তুত, এবার আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'না, ঠিকভাবে সজ্জিত না হয়ে আমি যাব না—পায়জামা পরে আমি যাচ্ছি না।' সুতরাং নতুন কোট আনা হয়েছিল, তাঁর সুপরিচিত 'পাম্প' জুতো, মনোকল্ চশমাও, তাতে ছাই রঙের সিল্কের সুতো, পঞ্চাশ বছর আগে কেনসিংটনে পাদচারণার গৌরবস্মৃতি যা তাঁর অর্ধশতাব্দীর সহচর। নরম রুমাল, সব কিছুই যা তাঁর অর্ধশতাব্দীর সহচর। ইংরেজ তাঁকে হাত ধরে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিল, ইংরেজই তাঁকে কার্যত হাতে ধরে পাকিস্তানের সিংহাসনের বসিয়ে দিয়েছিল, জিন্না কখনো তা ভুলতে পারেন নি।[২]

১ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত 'জিন্নাভাই' নামই ছিল। ১৮৯৪-এর ১৪ এপ্রিল থেকে তিনি 'মিঃ জিন্না' নাম নেন।

২ ইংরেজের কাছে ঋণ জিন্না অপরিশোধ্য মনে করতেন। একটি ঘটনার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন করাচী থেকে চলে যাবার পরে জনৈক উৎসাহী পাকিস্তানী জিন্নাকে বলেন, 'আর তো ভাইসরয় পাকিস্তানের মাটিতে নেই, সুতরাং ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ফেলা যাক', "জিন্না তাতে নীরসতম, শীতলতম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, পতাকা নামাবার সঠিক সময় সূর্যাস্ত-কাল; তার আগে তা করলে (ইংলণ্ডের) রাজার অসম্মান করা হবে; তিনিই আমাকে গভর্নর করেছেন এবং তাঁর প্রেরিত বাহিনী পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে।" (বোলিথো)

অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে, দু' বছরের মধ্যে, জিন্না আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁর বয়স তখন আঠারোও নয়। আরও দু' বছর কাটার আগে তাঁকে বারে যোগদান করতে দেওয়া হয় নি বিধিগত অসুবিধার জন্য। জিন্না সগর্বে বলেছিলেন, 'বারে যোগদানকারী ভারতীয়দের মধ্যে আমিই সর্বকনিষ্ঠ!' লিনকন্‌স ইন-এ কেন যোগদান করেছিলেন তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিন্না ১৯৪৭ সালে করাচী বার অ্যাসোসিয়েশনে বলেছিলেন—'লিনকন্‌স ইন-এর মূল গেটে পৃথিবীর মহান্ আইন-প্রণেতাদের তালিকায় প্রফেট মহম্মদের নাম ছিল।" জিন্নার কাছে মহম্মদ 'এ গ্রেট স্টেটস্‌ম্যান অ্যান্ড এ গ্রেট সভারেন।' জিন্নার জীবনীকার আহ্লাদে বলতে চেয়েছেন, প্রফেটের অনুগামী জিন্না আইনজীবী রাজনৈতিকরূপেই 'গ্রেট সভারেন' হয়ে উঠেছিলেন।

ইংলন্ডে থাকাকালে জিন্না গ্ল্যাডস্টোন, মর্লি প্রমুখ উদারনৈতিক ইংরাজ রাজনৈতিকদের প্রভাবে পড়েন। উদারনৈতিক দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং বৃটিশ পার্লামেন্টে নৌরজীর সফল নির্বাচন-সংগ্রামে সাহায্য করেছিলেন। ভারতে ফিরে জিন্না কিন্তু অবিলম্বে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন নি। বোম্বাইয়ে বসতি করে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর খুবই কষ্টে কেটেছিল, যার স্মৃতি কখনো ভোলেন নি, কিন্তু পরে বিশেষ খ্যাতি ও অর্থলাভ করেন। এই খ্যাতির মূলেও কয়েকজন ইংরাজের আনুকূল্য ছিল। ঔদ্ধত্য এবং সাধুতা—এই দুই 'গুণের' জন্য জিন্না এইকালে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।৩

তিরিশ বছর বয়সে যথেষ্ট সম্পত্তিসম্পন্ন হয়ে জিন্না কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে তিনি প্রথম আসেন সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আলোড়িত। জিন্না দেখলেন, তাঁর 'বৃদ্ধ আচার্য' বৃটিশের 'ন্যায় ও উদারতার' স্তুতি ত্যাগ করে ৮১ বছর বয়সে যোদ্ধা হয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন 'স্বরাজের' জন্য। "গত শতাব্দীগুলিতে আমাদের উপর নিক্ষিপ্ত সকল লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ঈশ্বর ও মানুষের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে...... ভারতের উপর দেড় শতাব্দী ধরে যে-অস্বাভাবিক শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে রকম শাসনকে ইংরেজরা একদিনের জন্যও সহ্য করত না।...আমরা অনুগ্রহ চাই না, ন্যায়বিচার চাই। বৃটিশ নাগরিক হিসাবে আমাদের অধিকার সংক্রান্ত দাবিদাওয়ার খুঁটিনাটিতে যাওয়ার পরিবর্তে সমস্ত দাবিকে একটি শব্দে ধরে দেওয়া যায়—স্বরাজ'।"৪

ভারতীয় রাজনীতিতে জিন্না ধীর সুনিশ্চিতভাবে নিজের আসন করে নিতে থাকেন। তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি বোম্বাইয়ের মুসলমানগণ কর্তৃক 'নির্বাচিত' হয়ে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। কলকাতায় ২৫শে জানুয়ারী, ১৯১০-এ যখন কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন বসল—জিন্না সূচনাতেই ছোটখাট ইতিহাস তৈরি করে বসলেন—ভাইসরয়ের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা নিয়ে। বিস্ময়ের—পরম বিস্ময়ের কথা—গান্ধীর আন্দোলন ক্ষেত্র নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে জিন্নার প্রথম লড়াই ঘটেছিল। জিন্না

৩ জিন্নার জীবনীকার জিন্নার ব্যবসায়িক সাধুতার পক্ষে কিছু কিছু সাক্ষ্যের উল্লেখ করেছেন। জিন্না কম ফি-এ কাজ করতেন না, আবার প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু দিতে চাইলেও নিতেন না। জিন্নার ঔদ্ধত্য বা আত্মমর্যাদার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। জনৈক বিচারপতি জিন্নার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "মিঃ জিন্না, মনে রাখবেন আপনি কোনো থার্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলছেন না।" উত্তরে জিন্না বলেছিলেন, "মাই লর্ড, আমাকে এই বলে সতর্ক করতে অনুমতি করুন, আপনি কোনো থার্ড ক্লাস প্লীডারের সঙ্গেও কথা বলছেন না।"

জিন্না আইন ব্যবসায়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন করলেও অনেকে তাঁর আইনজ্ঞানের গভীরতায় সন্দেহ করেছেন। জিন্নার প্রশংসাকারী জনৈক অ্যাডভোকেট বলেছেন, প্লীডার হিসাবে তিনি যত বড়, ল'ইয়ার হিসাবে তত বড় নন। অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মতের উল্লেখও জিন্নার জীবনীকার করেছেন।

৪ জিন্না সাহেব জীবনীকারের রচনা থেকে পাঠক যেন অশীতিউত্তীর্ণ 'সুমহান বৃদ্ধ' দাদাভাই নৌরজীকে প্রচন্ড এক বিদ্রোহী বলে ধরে না নেন। এ কথা সত্য, 'স্বরাজ' শব্দটি নৌরজীই কংগ্রেসে প্রথম উপস্থিত করেন, যদিও তিলক অনেক আগে অন্যত্র কথাটি বলেছিলেন। দাদাভাই 'স্বরাজ' শব্দের দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা নিয়েও তর্ক উঠেছিল এবং চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা ইচ্ছামত শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। নৌরজীকে কলকাতা কংগ্রেসে সভাপতি করার পিছনেও মডারেটদের চক্রান্ত ছিল। চরমপন্থীরা তিলককে সভাপতি করতে চাইছিলেন এবং তাঁদের শক্তি অনুযায়ী তা করতে পারতেনও। তাকে ঠেকাবার জন্য মডারেটরা নৌরজীর নাম প্রস্তাব করেন, যাঁকে তাঁর বয়স এবং পুরনো কার্যকলাপের মহিমার জন্য অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। দাদাভাই স্বরাজের কথা বললেও সে স্বরাজ 'ইংরাজবর্জিত' নয়, ফলে চরমপন্থীরা মোটেই খুশি হন নি। দাদাভাই তৎকালীন জাতীয়তার মর্মস্পন্দন থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি আবেদন-নিবেদনকেই আদর্শ পন্থা বলে মনে করতেন।

"Agitation is the civilised peaceful weapon of moral force, and infinitely prefarable to brute, physical force."

—তিনি বলেছিলেন।

(গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ', এবং রমেশ মজুমদার ২য়)

বলেছিলেন—"এই অত্যন্ত বেদনাদায়ক সমস্যাটি এদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি যে কঠোর ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হচ্ছে তার বীভৎস রূপ সম্বন্ধে এদেশে জেগেছে সর্বোচ্চ ধিক্কার।" এই কথা শুনে ভাইসরয় লর্ড মিন্টো ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললেন—"মাননীয় সদস্য মহাশয়কে সংযত হবার জন্য অনুরোধ করছি। 'নিষ্ঠুর' শব্দটি বড়ই কঠিন। মাননীয় সদস্য যেন মনে রাখেন, তিনি সাম্রাজ্যের বন্ধুভাবাপন্ন একটি অংশ সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন—তদনুযায়ী যেন তিনি নিজের ভাষাকে দুরস্ত করেন।" জিন্না উত্তর দিলেন, "মাই লর্ড, আরও কড়া ভাষা প্রয়োগ করাই আমার অভিপ্রায়। তবে আমি কাউন্সিলের বিধি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন, তাকে এক মুহূর্তের জন্য লঙ্ঘন করতে আমার অভিপ্রায় নেই। কিন্তু এ কথা আমাকে বলতেই হবে, ভারতীয়দের প্রতি যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার থেকে কঠোর ব্যবহার সম্ভব নয় এবং এ বিষয়ে আমি আগেই বলেছি, দেশবাসীর মধ্যে মনোভাবে কোনো পার্থক্য নেই।"

জিন্নার এই বক্তৃতা থেকে কেউ যেন কদাপি না মনে করেন তিনি রাজদ্রোহী দলে নাম লিখিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি যদি বিদ্রোহী হয়ে থাকেন, সে বিদ্রোহ নৌরজী-জাতীয়। গোখলেজাতীয়ও বলা চলে (কিংবা ফিরোজ শা মেহতাজাতীয়)—যে গোখলের প্রতি জিন্না অতিশয় শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। বীরপূজা জিন্নার ধাতে ছিল না, তাঁর নিজের ছায়া অন্য মূর্তিকে ঢেকে ফেলত, কিন্তু যদি কখনো বীরপূজার দুর্বলতা বোধ করে থাকেন, সে গোখলে সম্বন্ধেই। "আমার একটি উচ্চাশা—যদি কোনোদিন মুসলমান-গোখলে হতে পারি"—একথাও জিন্না বলেছিলেন। গোখলে ও জিন্না উভয়ের মধ্যে ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা। জিন্না সম্বন্ধে গোখলের ধারণা : "একেবারে খাঁটি পদার্থ; সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত: এজন্য ভবিষ্যতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের শ্রেষ্ঠ দূত হয়ে উঠবেন।"৫ জিন্না গোখলেকে খুব নিকট থেকে জানতে পেরেছিলেন—যখন তিনি ১৯১৩-র এপ্রিল মাসে গোখলের সঙ্গে ইংলণ্ড যাত্রা করে সেখানে কয়েক মাস কাটিয়ে, বছরের শেষে একই সঙ্গে ভারতে ফিরেছিলেন। ফেরার পরেই করাচী কংগ্রেসে গিয়েছিলেন উভয়ে। গোখলে-কথিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যদূত হবার প্রচেষ্টায় তখন জিন্না উদ্‌গ্রীব। ইংলণ্ডে থাকতেই তিনি মুসলিম লীগে যোগ-দান করেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে থেকেও তখন লীগে যোগদানে কোনো বাধা ছিল না। মৌলানা মহম্মদ আলী এবং সৈয়দ ওয়াজির হাসান তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, লীগ যখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে, তখন জিন্নার আর লীগে যোগদানে কোনো মানসিক বাধা থাকা উচিত নয়। জিন্না বোধহয় তাঁর আকাঙ্ক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান স্বার্থকে সমন্বিত করার অভিপ্রায়েই লীগে যোগ দিয়েছিলেন। মুসলিম লীগ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে লক্ষ্য বলে গ্রহণ করলে করাচী কংগ্রেস অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব নিয়েছিল—জিন্না অবশ্যই তাতে খুশি হয়েছিলেন।৬

করাচী কংগ্রেসের আট মাস পরে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। জিন্না ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন একটি ভারতীয় প্রতি-নিধি দলের নেতৃত্ব নিয়ে; উদ্দেশ্য—ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে 'কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া বিল' এলে, সে বিষয়ে কংগ্রেসের বক্তব্য তাঁরা তুলে ধরবেন। হাউস অব লর্ডসে ঐ বিলের প্রথম পাঠ হবার পরে জিন্না 'গভীর নৈরাশ্য' প্রকাশ করে লণ্ডন টাইমসে নিজের মত জানিয়েছিলেনঃ "বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতই সম্ভবত একমাত্র দেশ, যেখানে কোনো যথার্থ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নেই; পৃথিবীতে ভারতই সম্ভবত একমাত্র সভ্য দেশ, যেখানে প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার বর্তমান নেই।"

৫ এখানেও গোখলে-সূত্রেও, গান্ধী-জিন্না মিলিত হচ্ছেন। গান্ধীও গোখলেকে নিজের রাজনৈতিক গুরু বিবেচনা করতেন, অপরদিকে গান্ধী-বন্দনায় গুরু গোখলের রচনা প্রথম পর্বে সর্বোত্তম।

গোখলে সম্বন্ধে অপরপক্ষে জিন্নার যথেষ্ট ভাবাবেগ ছিল। 'ভাবাবেগ' বস্তুটা জিন্নার ধাতে সয় না; তাই গোখলের মৃত্যুর তিন মাস পরে জিন্না যখন নিজের 'শোক ও দুঃখের' কথা জানিয়েছিলেন, তখন তাঁর 'শীতল শব্দ-সঞ্চয়ের' মধ্যে কথাগুলিকে বেশি উত্তপ্ত, সুতরাং অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল, অন্তত জিন্নার জীবনীকারের কাছে। জিন্নার কাছে গোখলে তাঁর 'উদারনৈতিক, প্রশস্তমনা রাজনীতিবুদ্ধির' জন্য শ্রদ্ধেয়। সেই 'মহান্ হিন্দুর মনস্বিতা সমুচ্চ শিখরতুল্য'—জিন্নার মনে হয়েছিল। জিন্নার অপর বিখ্যাত শিষ্য গান্ধী সম্বন্ধে জিন্নার মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন জনগণকে 'ভ্রান্ত পথে' চালিত করছে, এ বিষয়ে জিন্না 'স্থির-নিশ্চয়' হয়েছিলেন এবং বিষাদের সঙ্গে ভেবেছিলেন, 'এই সংকটক্ষণে গোখলের মত খুব কম লোকই আমাদের সঙ্গে আছেন।'

এখানে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, জিন্না যতদিন ন্যাশন্যালিস্ট ছিলেন, ততদিন তিনি গান্ধীর চেয়েও গোখলের অধিক শিষ্য ছিলেন। সাপ্তাহিক বসুমতীতে কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে আমি গোখলে-গান্ধী সম্পর্কের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি।

৬ "The (Congress) members 'placed on record' their 'warm appreciation of the adoption by the All. India Muslim League of the ideal of Self-Government for India, within the British Empire; and of the belief which the League had so emphatically declared at its last session 'that the political future of the country depends upon the harmonious working and Co-operation of the two great communities."

হঠাৎ-হঠাৎ

[illegible] দাশগুপ্ত

হুট্‌হাট করে কখন কী যে হয়ে যায়
হঠাৎ দমকা ঝড়ে সব তছনছ
উল্টোপাল্টা হাওয়া, ধূলিঝড়
এবং বৃষ্টি

বৃষ্টি ইত্যাদি কখনো কখনো সুখকর
স্মৃতির সুতোয় সোনালী অনুভব আয়োজিত পরিবেশে
রক্তে আবেশ ছড়িয়ে উধাও,
কিন্তু উল্টোপাল্টা হাওয়ার প্রতিকূলতায়
এই মুহূর্তে সব তছনছ;

দমকা ঝড়ের সওয়ারী গাড়ি
মেঘে মেঘে সাইরেন বাজালে -
বুকের ভেতর কেমন আন্দোলিত;
এবং পাশাপাশি ঝড়ে আন্দোলন, বাতাসে আন্দোলন
ঘরে-বাইরে-প্রবাসে আন্দোলন
হঠাৎ-ই দমকা হাওয়ার আন্দোলনে সব তছনছ
হুটহাট করে কখন কী যে হয়ে যায়:
উল্টোপাল্টা হাওয়া, ধূলিঝড় এবং আশ্চর্য
হঠাৎ-হঠাৎ
কখন কী যে হয়ে যায়॥

প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জিন্নার আবেগময় চেষ্টা বাড়তে লাগল। লীগের নেতৃত্ব জিন্না অনেকাংশে গ্রহণ করে ফেলেছেন, লড়াই করছেন লীগের রক্ষণশীল সদস্যদের সঙ্গে। যাঁরা বলছিলেন—ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে লক্ষ্য বলে লীগ যখন মেনে নিয়েছে, তখন আর ইংরাজ-বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার দরকার কী? অনেকে উল্টোদিকে আবার লীগকে ভেঙে দেবার কথাও বলতে আরম্ভ করেছিলেন, কারণ ইংরেজের সঙ্গে বোঝাপড়ার দিন গেছে, মুসলিম জগতের ধর্মপ্রধান তুরস্কের খলিফা এখন ইংরেজের শত্রু, জার্মানীর মিত্র। জিন্না এই পরিস্থিতিতে শাসনতন্ত্রের প্রতি 'শ্রদ্ধা ও আনুগত্য' বজায় রাখার জন্য মুসলমানদের কাছে আবেদন করলেন; তা করলেই তবে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রমাণ করা যাবে। "এই সংকটক্ষণে কেবল ভারত নয়, সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।" "আমরা কি আমাদের ভেদবুদ্ধিকে চাপা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ রূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারি না?..... তা করতে পারলে তবে হিন্দু-ভাইরা অনুভব করবে, যে রকম তারা আগে কখনো করে নি—আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য।" বোম্বাইয়ে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯১৫-তে যখন লীগের অধিবেশন বসল, তখন জিন্নার কিছু 'হিন্দু ভাই-বোন' মঞ্চে এসে বসলেন—যেমন, ডাঃ অ্যানী বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু এবং এম কে গান্ধী। এই সভা যে গুণ্ডার দ্বারা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তার উল্লেখ আগেই করেছি। জিন্না তখন যে সাহস দেখিয়েছিলেন, তার রূপ-বর্ণনায় শ্রীমতী নাইডু তাঁর কবিকণ্ঠ ধার দিয়েছিলেন—"ঐক্যের অদম্য সৈনিক, উত্থিত হয়েছেন দুর্ভেদ্য জাতীয়তার সমুচ্চ শিখরে, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও ত্যাগের মূল্য সম্বন্ধে অপূর্বভাবে উদাসীন যিনি।" জিন্না আরও অগ্রসর হলেন, ১৯১৬-র লখনৌ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পুনশ্চ জাতীয়তার বাণী শোনালেন: "বিরোধী স্বার্থসমূহের সংঘর্ষের মধ্যে, নির্বোধ বুলির নির্ঘোষের মধ্যে, ভারতীয় পরিস্থিতির কোনো শান্তমস্তিষ্ক অনুধাবনকারীর কাছে একথা স্পষ্ট না হয়ে পারবে না যে, ভারতই ভারতবাসীর প্রথম ও শেষ আশ্রয়।" তাহলেও জিন্নার কাছে কিন্তু মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল,৭ এবং সে কথা তিনি কংগ্রেসকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন, লীগকেও কিছুটা নমনীয় করতে পেরেছিলেন, যার ফলে পূর্বোক্ত লখনৌ প্যাক্ট হয়েছিল, যাতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার স্বীকৃতিই শুধু নয়, যে সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেখানে তাদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতের বেশি আসনও দেওয়া হয়েছিল। 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত' জিন্না একই সঙ্গে মুসলিম স্বার্থরক্ষার অগ্রদূতও হতে পেরেছিলেন।৮

[ক্রমশ]

---

৭ ১৯১৬ অক্টোবরে আমেদাবাদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জিন্না পৃথক নির্বাচন দাবি করে বলেন:

"Is far as I understand, the demand for seperate electorates is not a matter of policy but a matter of necessity to the Mus lims, who require to be roused from the coma and torpor into which they have fallen, for so long. I would therefore appeal to my Hindu brethren that in the present State of position they should try to win the confidence and trust of the Muslims, who are, after all, in the minority in the country. If they are determined to have seperate ele ctorates, no resistence should be shown to their demands." (বলিথো'র গ্রন্থে উদ্ধৃত)

৮ জিন্না লখনৌ-এ লীগ সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, "We want no favours, and crave for no partial treatment. That is demoralising to the community and injurious to the State. The Mussalmans must learn to have self-respect."

তাহলেও অল্প পরে যে লখনৌ প্যাক্ট করেন, তাতে জিন্না মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।
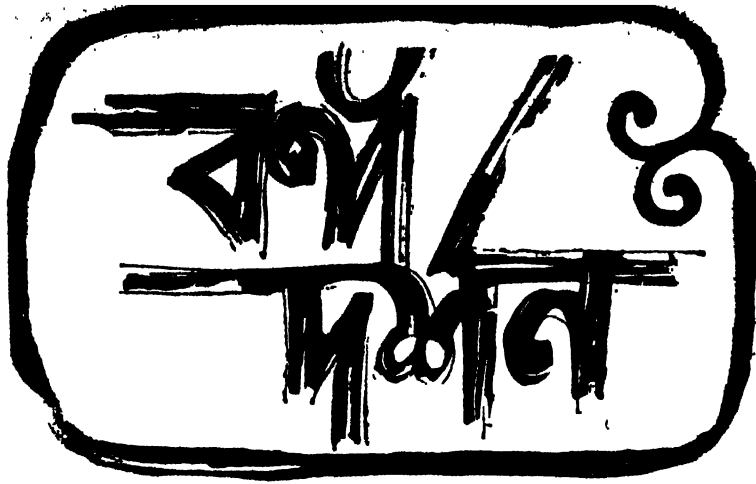
পাটনা স্টেশনে আততায়ীর গুলীর আঘাত থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পাওয়ায় আমরা সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গেই গভীর স্বস্তিবোধ করছি, এবং সেই সঙ্গে আকস্মিকভাবে নিহত শ্রীআলি ইমামের জন্যও গভীর দুঃখ বোধ করছি। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি, এবং তাঁর পরিবারবর্গের আকস্মিক দুর্ভাগ্যের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করি। জ্যোতিবাবুকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়ে দেশবাসী সত্যই আনন্দিত হয়েছেন, এবং সারা ভারতে তাঁর জনপ্রিয়তা যে অসীম, এবং তাঁর নিকট দেশেরও যে প্রত্যাশা অনেক, সেটা আরো একবার প্রমাণিত হল।

জ্যোতিবাবুকে হত্যার এই অপচেষ্টা যে নিছক রাজনৈতিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং বোধ করি তেমন সন্দেহ কেউ করেনও নি। রাজনৈতিক হত্যা ভারতবর্ষে খুব ব্যাপক নয়, কিন্তু সম্প্রতি এদিকে যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে সেটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কর্মী ও সমর্থক স্তরে পরস্পরকে হত্যার প্রতিযোগিতা এ দেশে কিছুকাল যাবৎ লেগেই আছে। নেতারা ক্যাডারদের সংযত করার পরিবর্তে তো প্রকাশেই রক্তের বদলে রক্তের শ্লোগান দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় শ্লোগানই দাঁড়িয়েছে 'প্রাণ দিতে ও প্রাণ নিতে হবে।' বলা বাহুল্য এই শ্লোগান আজ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের, কি বামপন্থী, কি মধ্যপন্থী, কি দক্ষিণপন্থী। রাষ্ট্রশক্তি যখন যাদের অনুকূলে, তারাই তখন আপার হ্যান্ড পায়। হত্যা এবার কর্মীদের ছেড়ে নেতাদের পিছনে ধাওয়া করেছে। এটা বোধ হয় শেষ নয়, শুরু।

পাটনা, কলকাতা ও বর্ধমানের ময়দানে বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে জননেতা জ্যোতিবাবু যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি নানা প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাঁর সকল ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই, তবে একটি বিষয়ে একমত যে নেতাকে বা কর্মীকে হত্যা করে কোন রাজনৈতিক দল বা তার আদর্শকে হত্যা করা যায় না। একটি দল বা আদর্শ ততদিনই টিকে থাকে, যতদিন তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন থাকে। চরম বিপ্লবের সময় হয়ত রক্তপাত অনিবার্য, কিন্তু সেই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তটি তো আর নেতাদের ইচ্ছানুযায়ী তৈরি হয় না। বিচক্ষণ নেতা অনেক দূরের বিষয়কে দেখতে পান, এবং সেই অনুযায়ী তিনি দেশকে নেতৃত্ব দেবার উপযোগী করে দলকে তৈরি করেন, দলবাজির জন্য অনাবশ্যক রক্তপাতকে উৎসাহ দেন না। সারা ভারতেই আজ রাজনীতি কলুষিত হয়েছে, আদর্শের নাম করে যা চলছে তাকে বলা যায় ফ্যাকশনালিজম, আর তার বলি হয়েছে দেশবাসী।

শ্রীবসুকে যে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল সে আসলে এই নোংরা দলবাজিরই শিকার, এবং এই ধরনের বিপথগামী মানুষ তৈরি করার দায়িত্ব ভারতের কোন রাজনৈতিক দলই আজ অস্বীকার করতে পারে না, হোক কংগ্রেস, হোক কমিউনিস্ট।

বর্ধমানে রাজ্যপাল ঃ ধাওয়ান-কোঙার পত্রালাপ

১৭ই মার্চ হরতালের দিন বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান ৩০শে মার্চ বর্ধমান গমন করেন। তিনি সস্ত্রীক সাঁই-বাড়িতে যান এবং সেখানে ৪৫ মিনিট সমস্ত কিছু পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল বিজয়চাঁদ হাসপাতালে গিয়ে নিহত মলয়-প্রণবের মা মৃগনয়না দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। আহতদের সঙ্গেও তিনি বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। রাজ্যপালের উপস্থিতিতেই, বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে বর্ধমানের [illegible] শ্রীতরুণ দত্ত প্রহৃত হন। ঐদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান জানান যে, ১৭ই মার্চের ঘটনার সম্পর্কে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া-না-দেওয়া সম্বন্ধে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। একথাও তিনি বলেছেন যে, উচ্চপদস্থ অফিসারদের বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যত্র বদলি করে দিলে তদন্ত কাজের অসুবিধা হবে। নিগৃহীত জেলা শাসক শ্রীতরুণ দত্ত সম্প্রতি ছুটি নিয়েছেন।

বর্ধমানের ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের একটি ময়দান বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান সফররত রাজ্যপাল কয়েকটি মন্তব্য করেন। তার উত্তরে শ্রীকোঙার রাজ্যপালকে একটি চিঠিতে বলেছেন, "আমাদের (সি পি এম) বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিরাট ধরনের কুৎসা রটনার অভিযান চলছে। দুঃখের কথা, আপনি এই কুৎসা রটনায় কণ্ঠ মিলিয়েছেন।" শ্রীকোঙার তাঁর চিঠিতে বর্ধমানের সাঁই ভ্রাতাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখ করে বলেছেন যে, "তারা যদি আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর আক্রমণ চালায়, তবে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা জবাব দেবার কি অধিকার নেই?" শ্রীকোঙার তাঁর চিঠিতে আরও বলেছেন যে, বর্ধমানের ঘটনা বিচারাধীন। তাই এ ব্যাপারে রাজ্যপালের বর্ধমান সফর সংগত হয় নি।

এই পত্রের জবাবে রাজ্যপাল লিখেছেন, "আপনি লিখেছেন—আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগকালে যদি আক্রমণকারীদের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু ঘটে, তাহলে তা নিশ্চয়ই অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হবে না, আমি গর্বিত যে, আমাদের লোকেরা আক্রমণের মুখে পালিয়ে আসে নি—তারা আত্মরক্ষার জন্য লড়েছে।...আপনার মন্তব্যের তাৎপর্য আপনি অনুধাবন করুন। আপনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, যারা হত্যা করেছে তারা আপনাদের লোক। এভাবে আপনি অজ্ঞাতসারে, আপনার দলের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন: যদিও আপনি আত্মরক্ষার যুক্তি দেখিয়েছেন। এই সর্বপ্রথম সি পি এম-এর একজন উচ্চপর্যায়ের নেতা প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন যে, তাঁর দলের লোকেরাই হত্যাকারী। আমি যদি অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী হতাম (তাঁরা যাঁরাই হোন না কেন) তাহলে আমি এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতাম। আপনি আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনার দলকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এই ধরনের মন্তব্য করার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই।...একদিকে আপনি বলছেন বর্ধমানের মামলা বিচারাধীন,

অন্যদিকে সেই মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে মন্তব্য করে আপনি তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন।...আমায় এমন একটি রাজ্য পরিচালনা করতে হচ্ছে, যা কিছুদিন আগেও চোদ্দটি দলের মিলিত যুক্তফ্রন্টের শাসনাধীন ছিল। শরিক দলগুলির তীব্রতর আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে সেই সরকার ভেঙে গেছে। আমার এখন এই রাজ্যের সকল অংশের স্বার্থ দেখতে হচ্ছে। এ কাজ করতে গিয়ে আমাকে মাঝে মধ্যে কোন-না-কোন পক্ষের অসন্তোষভাজন হতে হচ্ছে।"

রাজ্যপালের এই চিঠির উত্তরে শ্রীকোঙার পুনরায় একটি চিঠি লিখেছেন। সে চিঠির বক্তব্য হচ্ছে উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি একই সঙ্গে প্রশাসনের সর্বময় কর্তা ও নীতি প্রচারকের ভূমিকা নিতে পারেন না। রাজ্যপাল যেভাবে বর্ধমান পরিদর্শন করেছেন, তা সি পি এম-এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ঘৃণ্য প্রচারের অভিযানকে আরও উসকিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। হরতালের দিন তিরিশজন নিহত হয়েছেন, কিন্তু মাত্র একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকীয়তা দেখালে তা বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ করে বলেই মনে করিয়ে দেয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে, যুক্তফ্রন্টের আমলে কোন মন্ত্রীর সামনে কোন অফিসার নিগৃহীত হন নি। কেউ যদি বলেন যে জেলা শাসককে তাড়াবার জন্য এবং অন্যান্য অফিসারদের কংগ্রেসের মতানুযায়ী চালানোর জন্য নিগ্রহের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাহলে কি তাকে দোষ দেওয়া যায়? শ্রীকোঙার লিখেছেন যে, রাজ্যপাল তাঁর চিঠিতে নানা অসঙ্গতি দেখিয়েছেন। এই অসঙ্গতি দেখানোর জন্য বর্ধমান জেলার মত দুটি মাত্র পৃথক ধরণের চিঠি থেকে নিয়ে রাজ্যপাল লিখেছেন যে অপরাধীরা আমাদের লোক। এ ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। রাজ্যপালের মন্তব্য থেকে কংগ্রেস পক্ষের আইনজ্ঞরাই শিক্ষা নিক। আমি জানি, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এবং তাঁদের আইনজ্ঞরা নিজেদের মামলা সমর্থনে যথাযথ যোগ্যতা রাখেন।

জ্যোতিবাবুর বক্তব্য ঃ কলকাতায় ও বর্ধমানে

পাটনায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে হত্যা করার চক্রান্তের প্রতিবাদে বুধবার কলকাতায় শহীদ মিনার ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় পাটনা থেকে সদ্য প্রত্যাগত শ্রীবসু বলেন যে, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে, চক্রান্ত করে কিংবা কুৎসা রটনা করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন যে, আমরা তো জীবন দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত আছি, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলরা কি এর জন্যে প্রস্তুত আছে? পাটনা রেল স্টেশনে সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে শ্রীবসু অভিযোগ করেন যে, যারা দীর্ঘদিন ধরে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছে, যারা অনবরত চক্রান্ত করে মানুষ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছে, এই হত্যাকাণ্ড ঘটাবার জন্যে তারাই একজন প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিল। এটা একটি ব্যক্তিগত হত্যার চক্রান্ত মাত্র নয়—পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল।

সাম্প্রতিককালের রাজনীতির বহু বিতর্কিত ঘটনাস্থল বর্ধমান শহরে এক বিরাট জনসমাবেশে প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু কৃষক, মজুর এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেহনতী মানুষকে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে আহ্বান জানিয়ে বলেন—আজ এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে দেশের মানুষ। রাষ্ট্রপতির শাসনের নামে খিড়কি-দোর দিয়ে জনগণের পরিত্যক্ত কংগ্রেসী শাসনের আমদানী, সংবাদপত্রের সাহায্যে হিটলারী কায়দায় নিরবচ্ছিন্ন কুৎসা রটানো, জনগণ ... যাদুঘরে রক্ষিত এবং ইঁদুরের গর্তে অনুপ্রবিষ্ট কংগ্রেসীদের পুলিশের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ, জনসাধারণের অর্জিত অধিকার অপহরণ, তাদের উপর সন্ত্রাস চালানো আজ প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত। মেহনতী মানুষের সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শ্রীবসু তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় যুক্তফ্রন্টের গঠন ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, বাংলা কংগ্রেস পশ্চিম বাংলার মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে জনগণের চেতনার কথা তো শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কখনো বলেন নি। মানুষের জয়যাত্রা দেখেই বাংলা কংগ্রেস শিউরে উঠলো। তাঁরা গোপনে কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেন। আর তাঁদের উস্কানি দেয় "দক্ষিণপন্থী" কম্যুনিস্ট পার্টি। কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পরই বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করলেন না। তাঁরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসকে প্রগতিশীল অভিহিত করে তাদের সঙ্গে সরকার গঠনের নীতি গ্রহণ করেছেন। আমরা কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে লড়াই করে ক্ষমতা আনতে চাই, কিন্তু বাংলা কংগ্রেস আর সি পি আই ইন্দিরা কংগ্রেসের লেজুড়ে পরিণত। তাঁরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারেন না। তাই যুক্তফ্রন্টকে ভাঙা প্রয়োজন।

শ্রীবসু বলেন, এখনো কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে মিনিফ্রন্ট সরকার গঠনের চেষ্টা চলছে। বাংলা কংগ্রেস একতরফাভাবে ফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার পর আমরা বাকী সব দল নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠনের কথা বলেছিলাম। সেটা মিনিফ্রন্ট নয়। আমরা তো কংগ্রেসের সাহায্য চাই নি—আমরা সি পি আই এবং ফ্রন্টের অন্যান্য দলের সাহায্য চেয়েছিলাম। সি পি আই ইন্দিরা কংগ্রেস আর জনসংঘের মন্ত্রিত্বকে মদৎ দিতে পারে কিন্তু সি পি এম-এর মন্ত্রিসভা নৈব নৈব চ।

শ্রীবসু বলেন, এখন বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের দাবীই তো একমাত্র গণতান্ত্রিক দাবী। তাতে ওঁরা ভয় পাচ্ছেন কেন? বাংলা দেশের মানুষ বাংলা দেশকে এভাবে দিল্লীর উপনিবেশ করে রাখতে দেবে না। দিল্লীর কংগ্রেস সরকার ভাবছেন, খিড়কি দোর দিয়ে শাসন ক্ষমতায় থেকে, নির্যাতন আর অত্যাচার এবং কুৎসা রটনা করে সি পি এম এবং মেহনতী মানুষকে দমিয়ে রেখে কংগ্রেসীরা ক্ষমতায় থাকবেন। বাংলা দেশের মানুষ আন্দোলনের আঘাতে কংগ্রেসীদের ধূলিসাৎ করে দেবে।

সংবাদপত্রের প্রচারের কথা উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেন, সম্পাদকীয়তে যে-কোন সমালোচনা করার অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু মিথ্যা সংবাদ ছড়ানোর অধিকার তাঁদের নেই। শ্রীবসু বলেন, তিনি সংবাদপত্রের মালিকদের কাছে এ-বিষয়ে চিঠি দেবেন। শ্রীবসু অভিযোগ করেন যে, রাজ্যপাল এখন কংগ্রেসের পরামর্শ নিয়ে চলছেন। কংগ্রেস যা দাবী করছে রাজ্যপাল তাই মেনে নিচ্ছেন।

বর্ধমান টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বিপুল জনসমাগম হয়। বর্ধমান প্লেনামের পর আর এত বড় সমাবেশ বর্ধমানে হয় নি বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। গ্রাম শহর থেকে দলে দলে মানুষ লাল-ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে এসে সমাবেশে যোগ দেয়। ছাত্র পরিষদ ও কংগ্রেস এই সভা বর্জন করার আহ্বান দিয়েছিল। কিন্তু টাউন হলের সামনে আর পিছনের ময়দান পূর্ণ হয়ে জি টি রোড পর্যন্ত জনতার ভীড় ছাপিয়ে যায়। জি টি রোড থেকে স্টেশন পর্যন্ত যানবাহন চলাচল দীর্ঘ সময় বন্ধ হয়ে যায়। এই সমাবেশে

[illegible] সঙ্গে লাঠি ছোরা বোমা হাতে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সকাল থেকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সি পি এম নেতৃবৃন্দ হাজির থেকে মিছিলগুলো শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনা করেন।

দখল করা জমি

পয়লা এপ্রিল থেকে বারাসতে সারা ভারত কিষাণ সভার বিংশতিতম সম্মেলন। এই সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতায় শ্রীতেজা সিং স্বতন্ত্র বলেছেন যে, গরীব ভূমিহীন কৃষকেরা যদি নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত না থাকেন, তবে কোন আইনই তাঁদের বাঁচাতে পারবে না। যদি তাঁরা সংগঠিত শক্তির দ্বারা জমি দখল না করেন, তবে কোন আইনই তাঁদের জমি দিতে পারবে না।

বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট শাসন কায়েম হবার পর ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কৃষক সরকারী অনুপ্রেরণায় বে-আইনী জমি দখলের কাজে নেমে পড়েছিল এবং কয়েক লক্ষ জমি এভাবে উদ্ধার ও দখল করা হয়েছে। কিন্তু এখন রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হবার পর সেই দখল করা জমি নিয়ে সমস্যা দেখা গেছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার জমি দখলের উৎসাহ দিয়েছিলেন, জমি দখল করাও হয়েছে, কিন্তু যারা জমি দখল করেছে সরকারের তরফ থেকে তাদের কোন অধিকারপত্র দেওয়া হয় নি। ফলে যে কোন মুহূর্তে তাদের উচ্ছেদ করা চলে। কেরলে অচ্যুত মেনন সরকার ভূমিহীন কৃষকদের দখল করা জমির উপর পাট্টা বা অধিকারপত্র দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু সেরকম কিছু করা হয় নি।

এদিকে বাংলা কংগ্রেস দাবি করেছে যে যে সব ছোট ছোট জমির মালিকদের জমি অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছে, তা আগামী চাষের মরশুমের আগে ফেরৎ দিতে হবে। আজ এই দাবি উঠেছে, কাল সমস্ত দখল করা জমি প্রত্যর্পণ করারই দাবি উঠবে। এবং বর্তমান আইনের সাহায্যে প্রাক্তন মালিকেরা অতি সহজেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেবে। রাজ্যপাল যদি সত্যই প্রগতিশীল হন, তাহলে অবিলম্বে কেরলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভূমিকৃষকেরা যারা কিছুটা করে জমি দখল করেছে, তারা যাতে বৈধ অধিকারপত্র পায় সেই রকম ব্যবস্থা করুন। আবার যাতে জমিগুলি পুনরায় বেআইনী মালিকদের হাতে গিয়ে না পড়ে, তার জন্য এই মুহূর্তেই একটা অর্ডিনান্স জারির প্রয়োজন আছে।

লাম্প গ্রান্ট স্কুল শিক্ষকদের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে এমন ১৭০০ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, যেগুলিতে কর্মরত মোট ৩০,০০০ শিক্ষক বছরের পর বছর অর্ধবেতন পেয়ে আসছেন এবং বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁদের পূর্ণ বেতন পাবারও কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। এই স্কুলগুলি না ঘরকা না ঘাটকা এবং এগুলির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাদপ্তর যেমন নারাজ, তেমনি নারাজ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে।

বিষয়টি একটু খুলেই বলা যাক। গত কয়েক বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের একাংশের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কিছু বেতন ও মহার্ঘভাতা বর্ধিত হয়েছে, এবং এই বর্ধিত বেতন ও মহার্ঘভাতা মেটাতে গিয়ে স্কুলের যা ঘাটতি হয়, সরকারী তরফ থেকে ডেফিসিট গ্রাণ্ট মারফৎ তা পূরণ করে দেওয়া হয়। এই সুযোগ মাত্র সেই সব বিদ্যালয়ই পায়, যেগুলি ১৯৬৩ সালের আগে মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগ্য বিদ্যালয়গুলি ১৯৬২ সালের পর থেকে মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, সেই সকল বিদ্যালয়ের জন্য বিন্দুমাত্র কোন ব্যবস্থাই রাখা হয় নি। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সরকার অনুমোদিত বেতন বা মহার্ঘভাতা পান না। পাবার কোন উপায় বা সম্ভাবনা দেখা যায় না, এমন কি সুদূর ভবিষ্যতেও এ সম্ভাবনা দেখা দেবে কিনা বলা শক্ত, কেন না সরকারী নীতি অনুযায়ী এই সকল বিদ্যালয়কে ডেফিসিট গ্রাণ্ট দেওয়া হয় না। তবে একান্ত চক্ষুলজ্জার বশেই হোক, অথবা যে কোন কারণেই হোক, মুষ্টিভিক্ষা হিসাবে মাঝে মাঝে দু'-এক হাজার টাকা এই সব বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই লামপ গ্রাণ্ট!

কিছুকাল যাবৎ এমন একটা ধ্বনি তোলা হয়েছে যে, শিক্ষক মহাশয়দের নাকি বেতনপত্র খুব ভাল হয়ে গেছে। কতটা বেড়েছে, সেই বৃদ্ধিটা আদৌ উল্লেখযোগ্য কিনা, সে আলোচনার স্থান এখানে নয়। কিন্তু এখন চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে এই সব বেটক ছিটেফোঁটা সুযোগ-সুবিধা শিক্ষক মহাশয়দের কপালে জুটেছে, তাতে শিক্ষক সমাজের একটা অংশই কিছুটা উপকৃত হয়েছেন নাকি অংশটা যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেছেন। আজও পশ্চিমবঙ্গের ১৭০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩০,০০০ শিক্ষকের বেতন মাসিক একশো টাকার বেশি নয়, যাঁরা শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে কেউ বি এ/বি এস সি-র কম নন, অনেকেই এম এ/এম এস সি, তদুপরি বি টি ডিগ্রীর অধিকারী!

এর পিছনকার পরিকল্পনাটি গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। যে নীতির ভিত্তিতে এই সকল বিদ্যালয়কে ডেফিসিট গ্রাণ্টের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তা হচ্ছে ১৯৬২-এর পর থেকে যে সব বিদ্যালয় মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে তাদের ডেফিসিট গ্রাণ্ট দেওয়া হবে না। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭০ মধ্যে এই রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭০০, আগামী বছরগুলিতে এই সংখ্যা আরও বাড়বে এবং ক্রমাগত তা বেড়েই চলবে স্বাভাবিক নিয়মে, যেহেতু দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবৃদ্ধির চাহিদা আছে। অর্থাৎ আরও পাঁচ বছর পরে যে চিত্রটি দেখা যাবে তা হচ্ছে এই যে কিছু কুলীন স্কুল সরকারী স্নেহচ্ছায়ায় থাকবে, বেশিরভাগ থাকবে অবহেলিত অসহায় অবস্থায় এবং যেহেতু শিক্ষিত বেকারের সীমা পরিসীমা নেই, সে হেতু অনেকেই নিছক পেটের তাগিদে আশি টাকা একশো টাকা বেতনের শিক্ষকতা নিয়েই দিন কাটাতে বাধ্য হবে।

অর্থাৎ আগেকার দিনে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের যে পার্থক্য ছিল, যে জাতিভেদ ছিল, সেই প্রথাটাই আবার নতুনভাবে কায়েম হতে চলেছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষকদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা। কংগ্রেস এই প্রক্রিয়ার পথ দেখিয়েছে এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকার তা অন্ধের মত অনুসরণ করেছে। এই সব হতভাগ্য আপগ্রেডেড বিদ্যালয়সমূহ এবং তাদের শিক্ষকদের প্রতি কোন দায়িত্বই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পালন করেন নি। একবার তিনি একটি দায়সারা ঘোষণা করেছিলেন যে, এই ধরনের স্কুলগুলির কয়েকটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেগুলি ১৯৬৪-র মধ্যে আপগ্রেডেড হয়েছে (এ বিচারবোধের তুলনা নেই!) তাদের ক্ষেত্রে কিছু ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু এক্ষেত্রেও কার্যত সত্যপ্রিয়বাবু এঁদের অপক্ক কদলী প্রদর্শন করেছেন।

শুধু প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীই নন, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই স্কুলগুলির জন্য কতটুকু করেছেন? ১৯৬৩ সাল থেকে যে সব স্কুল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, সেই সব স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অপরাপর বিদ্যালয়ের

[শেষাংশ ২৫৭৩ পৃষ্ঠায়]

মেঘালয় রাজ্যের উদ্বোধন

গত ২রা এপ্রিল ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মেঘালয় নামে একটি নতুন স্বায়ত্তশাসিত উপরাজ্যের জন্ম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই উপরাজ্যের উদ্বোধন করেছেন। আসামের খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং গারো পাহাড় জেলা নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছে। এর আয়তন ৮,৬৬৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার। মেঘালয়ে তিনটি ছোট-বড় শহর (শিলং, জাওয়াই এবং টুরা) আছে। বাকী সবই গ্রাম। উপরোক্ত দুটি জেলাতেই তপশীলী উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী খাসি ও জয়ন্তিয়া পর্বতের মোট ৪ লক্ষ ৬২ হাজার লোকের মধ্যে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার লোক খাসী ভাষায় কথা বলেন। আর গারো পাহাড়ের ৩ লক্ষ ৭ হাজার লোকের মধ্যে ৩ লক্ষ ১ হাজার গারো ভাষায় কথা বলেন। উভয় জেলাতেই ইংরাজী ভাষার যথেষ্ট প্রচলন আছে। তার প্রধান কারণ বৃটিশ এবং খৃস্টান মিশনারীরা বহুকাল আগেই এই এলাকায় তাঁদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে পাহাড়ী উপজাতিগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে খৃস্টধর্মের প্রসার ঘটান এবং ইংরাজী ভাষা প্রচারে ব্রতী হন। তাই এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অপেক্ষা এককভাবে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশি। গারো পাহাড়ে খৃস্টানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৮·৪২ শতাংশ এবং খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে তাঁদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৯·৭৩ শতাংশ। পাহাড়ী ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। গারো পাহাড়ে তারা মোট জনসংখ্যার ৫·১৬ শতাংশ মাত্র এবং খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ৭·৬২ শতাংশ। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে খৃস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ৭০·৭ শতাংশ এবং গারো পাহাড়ে ১২২·২১ শতাংশ।

গড়পড়তা বারিপাতের দেশ গারো পাহাড় খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়, কিন্তু খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা। সেখানকার মসিনরাম এলাকায় বছরে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বারিপাত (৭০০ ইঞ্চি) হয়। আগে চেরাপুঞ্জিই পৃথিবীর সর্বাধিক বারিপাতের জায়গা (৫০০ ইঞ্চি) বলে গণ্য হত। মসিনরামে যাতায়াতের সুব্যবস্থা হবার পর দেখা গেল আসলে বারিপাতের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে মসিনরাম।

[illegible] উত্তরাধিকারের শর্ত আছে। কিন্তু খাসি পাহাড়ে সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় না। সে সম্পত্তির রক্ষী মাত্র। সম্পত্তির মালিক গোষ্ঠী। আগে জামাইরা শ্বশুরের পরিবারের সদস্য হয়ে যেতো কিন্তু হাল আমলের যুবকরা ঘর-জামাই থাকতে চায় না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পৃথক সংসার পাততেই তারা ভালবাসে। তাই মেঘালয়ে ছেলের চেয়ে মেয়ের কদরই বেশি।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। গারো পাহাড়ে প্রতি ১ হাজার পুরুষে মেয়ের সংখ্যা ৯৬০ জন এবং খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে প্রতি ১ হাজার পুরুষে মেয়ের সংখ্যা ৯২১ জন।

বন এবং বনসম্ভারই মেঘালয়ের প্রধান সম্পদ। সামান্য কিছু কয়লা এবং চুনা পাথরও এখানে পাওয়া যায়।

গারো পাহাড়ে মোটামুটি লিখতে-পড়তে জানা লোকের হার শতকরা ২০ জন আর খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে শতকরা সাড়ে ৩১ জন। কাজেই ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের তুলনায় মেঘালয়ের শিক্ষার হার অনেক বেশি।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁরা [illegible] নির্বাচনে [illegible] নির্বাচিত হয়ে গেছেন। খাসি এবং গারো পাহাড় ও জয়ন্তিয়া পর্বতের স্বায়ত্তশাসিত জেলা পর্ষদের ৫৬ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি বিধানসভার নির্বাচনে ভোটার ছিলেন। বিধানসভায় সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন এবং দলের নেতা উইলিয়ামসন সাংমা মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন। ক্যাপ্টেন সাংমা ৫জন সদস্য নিয়ে একটি মন্ত্রিসভাও গঠন করেছেন।

সংবিধানে রাজ্যের এক্তিয়ারে যে ৬৫টি বিষয় ছাড়া হয়েছে, তার মধ্যে মেঘালয় কর্তৃপক্ষ ৬১টি বিষয়ের ভার পেয়েছেন। রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব আসাম সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকলেও গ্রাম ও শহরের পুলিশ মেঘালয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানেই থাকবে। আসামের গভর্নর এবং হাইকোর্ট মেঘালয়েরও গভর্নর এবং হাইকোর্ট হিসাবে গণ্য হবে। নতুন রাজ্যের রাজধানী হয়েছে শিলং-এ। বলা বাহুল্য, আসামের রাজধানীও শিলং-এ।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মেঘালয়ের উদ্বোধন করে শিলং-এ এক বিরাট জনসভায় বলেছিলেন যে, অতি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যে কিভাবে আলাপ-আলোচনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করা যায়, ভারতীয় গণতন্ত্র তার এক নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।

মেঘালয়ের মন্ত্রিসভায় আছেন ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা (মুখ্যমন্ত্রী), স্ট্যানলি নিকলস রয়, বি বি লিংদো, ই বারে এবং সানফোর্ড মারাক।

বিচারকদের বিচার

সুপ্রীম কোর্টের যে বিচারপতিমণ্ডলী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মামলা বিচার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন ব্যক্তি [illegible] ব্যাঙ্কের শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। মামলাকারীদের কোন পক্ষের স্বার্থের সঙ্গে বিচারকের স্বার্থ জড়িত [illegible] থাকলে তিনি সেই মামলা বিচার করেন না। সেই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে কম্যুনিস্ট পার্টি সেই দুইজন বিচারপতিকে "ইমপীচ" করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতীয় সংবিধানে বিচারপতিদের 'ইমপীচ' করবার বিধান আছে। সেই হিসাবে তাঁরা কোন সংবিধানবিরোধী কাজ করেন নি। কিন্তু বিষয়টা কোন কোন মহলে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। তাঁরা বলছেন, বিচারপতিদের এইভাবে 'ইমপীচ' করার প্রচেষ্টা আদালতকে ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। বিষয়টা নিয়ে গত সপ্তাহে পার্লামেন্টেও বেশ তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন জানিয়েছেন যে, উপরোক্ত বিচারপতিদ্বয় ব্যাঙ্কে তাঁদের শেয়ার থাকার কথা প্রধান বিচারপতিকে আগেই জানিয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতি বিষয়টা এটর্নী জেনারেলের কাছে প্রকাশ করেন। কিন্তু এটর্নী জেনারেল তাঁদের সম্বন্ধে কোন আপত্তি তোলেন নি এবং গভর্নমেন্টও কোন আপত্তি করেন নি। বিরোধী পক্ষ চাবনের এই জবাবে খুশি হতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন সংশ্লিষ্ট বিচারপতিদের স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানো উচিত ছিল। যাই হোক, পার্লামেন্টের আলোচনা ওখানে শেষ হলেও কোন কোন বামপন্থী রাজনৈতিক দল উক্ত বিচারপতিদের 'ইমপীচ' করার আয়োজন করছেন বলে জানিয়েছেন। কাজেই জল অনেক দূর গড়াবে বলেই মনে হয়।

[illegible]

[২৫৭১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সমান করতে হবে এবং এ বাবদে ঘাটতি সরকারকে বহণ করতে হবে—এই দাবিতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কি কোনদিন সোচ্চার হয়েছেন? অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানটি সমস্ত কিছুই বিচার করেন রাজনীতির নিরিখে, বোধহয় মনে করেন যে, বর্তমানে এই তিরিশ হাজার শিক্ষককে তাঁদের সঙ্গে না পেলেও চলবে। বস্তুত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি শিক্ষক ও শিক্ষার স্বার্থের চেয়ে রাজনীতির স্বার্থই বেশি দেখেন, তাই এমনও হতে পারে সমিতি মনে করছেন যে, এঁদের পেটে আরও একটু টান পড়া দরকার, তবেই তাঁরা অধিকতর বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন হবেন, পুরোদস্তুর জঙ্গী কমরেড বনে যাবেন!

যাই হোক, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মোটিভ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। আমাদের বক্তব্য, গ্রাণ্ট-ইন-এডের সমস্ত নিয়মগুলি এই সকল বিদ্যালয়ের প্রতিও সমভাবে সম্প্রসারিত করা হোক। কিছু স্কুল থাকবে সুয়োরাণী আর কিছু দুয়োরাণী, সেটা হতে পারে না। ১৯৬২-এর পর থেকে যে সব স্কুল আপগ্রেডেড হয়েছে, প্রত্যেকটিকে ডেফিসিট গ্রান্ট দেওয়া হোক এবং অন্যান্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন হারের সঙ্গে এই সকল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বেতনের হার সমান করে দেওয়া হোক, আমাদেরও এই দাবি।

৩রা এপ্রিল, ১৯৭০

কম্বোডিয়াঃ

লন নলের নেতৃত্বাধীন কম্বোডিয়ার নতুন সরকার খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে। লন নলরা ভেবেছিলেন বিতাড়িত রাষ্ট্র-প্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের আহ্বানে দেশের বিশেষ কেউ সাড়া দেবে না। কিন্তু তাঁদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। হাজার হাজার ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক সিহানুকের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে।

পিকিং থেকে সিহানুক খেমের জাতির সকল অংশের কাছে লন নল-চেন হেং-সিরিক মাতাক গোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দেশে ফিরে এসে তিনি আর রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করবেন না। প্রগতিশীল যুবক ও শ্রমিকেরাই দেশের কাজ চালাবে। পিকিং থেকে সিহানুক এখন হ্যানয় এসেছেন বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

নতুন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। ৫টি প্রদেশে বিদ্রোহীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজধানী নমপেনের ত্রিশ মাইলের মধ্যে বিদ্রোহীরা এসে পড়েছে। নমপেন ও অন্যান্য শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে। সৈন্যবাহিনীকে সর্বত্র বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। এদিকে আবার সৈন্যবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক লোক বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দিয়েছে।

সিহানুকের সমর্থকরা আশান্বিত যে, অল্পদিনের মধ্যেই তারা 'মার্কিন দালালদের' হটিয়ে দিয়ে কম্বোডিয়াকে মুক্ত করতে পারবে। সিহানুকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে।

কম্বোডিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান চেন হেং ও প্রধানমন্ত্রী লন নল বলছেন, যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, কিংবা দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করছে, তাদের মধ্যে দু' চারজন সিহানুক সমর্থক কম্বোডিয়ান থাকতে পারে, কিন্তু এদের অধিকাংশই ভিয়েতকং গেরিলা ও উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্য। বাইরে থেকে এরা এসে দেশের মধ্যে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তার ফলে কম্বোডিয়ার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিপন্ন হয়েছে।

কম্বোডিয়া সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উত্তর ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকংদের আক্রমণের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রের একটি সম্মেলন ডাকার জন্য তাঁরা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি বৃটেন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের কাছে অনুরোধ করেছেন। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে কম্বোডিয়ায় ফিরিয়ে আনার জন্যও তাঁরা প্রস্তাব করেছেন। আর্থিক কারণে প্রায় এক বৎসর পূর্বে সিহানুকের অনুরোধে কমিশনকে কম্বোডিয়া থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। ভারত এই কমিশনের সভাপতি, অপর দুই সদস্য হল ক্যানাডা ও পোল্যান্ড।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টের কাছেও লন নল সরকার আবেদন করেছেন। রাষ্ট্রসংঘে কম্বোডিয়ার প্রতিনিধি ওর কোসালাক নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। কম্বোডিয়ায় রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষক পাঠাবার জন্যও তাঁরা অনুরোধ করেছেন। উ থান্ট ইতিমধ্যে জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতিরূপে বৃটেন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রতিনিধিদের সংগে কথা বলেছেন। আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য ভারতের রাষ্ট্রসংঘ প্রতিনিধি শ্রীসমর সেনের সংগেও তাঁর আলোচনা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রসংঘ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের ভরসা কম। কারণ, চীন ও উত্তর ভিয়েতনাম, কেউই রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য চুপ করে বসে নেই। তারা ইতিমধ্যেই কম্বোডিয়ায় বিদ্রোহীদের বিভিন্ন এলাকায় বোমা বর্ষণ

লন নল

[illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] অন্যদিকে ব্যাংক মার্কিন [illegible] হোয়াইট হাউস ওয়াশিংটনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের নিউজ সেক্রেটারী রোনাল্ড সিগলার স্পষ্টভাবেই বলেছেন, প্রয়োজন হলে এবং ফিল্ড কম্যান্ডাররা উচিত মনে করলে কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য অবশ্যই প্রবেশ করবে।

লন নল নিজেও বলেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ কম্বোডিয়ার গুরুতর পরিস্থিতির কথা স্বীকার করার পর তাঁরা নিজেরাই মার্কিন সাহায্য চাইবেন।

১৮ই মার্চের 'রক্তহীন বিপ্লব' অর্থাৎ সিহানুকের ক্ষমতাচ্যুতির পেছনে মার্কিন সি-আই-এ চক্রের হাত থাকুক আর নাই থাকুক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মার্কিন সৈন্য এখন কম্বোডিয়ায় ঢুকে পড়েছে এবং 'বিদ্রোহীদের দমনের জন্য' তারা আক্রমণাত্মক কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। বিপরীত দিকে এ কথাও ঠিক, সিহানুকপন্থী হাজার হাজার কম্বোডিয়ানের পাশে প্রকাশ্যে আজ বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-আক্রমণে অংশগ্রহণ করছে উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্য ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভিয়েতকং গেরিলারা।

পাকিস্তান :

৫ই অক্টোবর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন হবে। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁ আবার ঘোষণা করেছেন, এই তারিখেই নির্বাচন হবে। যদি সত্যি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই হবে দেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন।

২৯শে মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ 'সাধারণ নির্বাচনের জন্য সংবিধানের খসড়া কাঠামো' (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর জেনারেল ইলেকশনস) সংক্রান্ত আদেশ জারী করেছেন।

এই আদেশ অনুসারে ৫ই অক্টোবর জাতীয় আইনসভা বা 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী' ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন হবে। নবগঠিত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী ১২০ দিনের মধ্যে পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান প্রস্তুত করবে। যদি কোন কারণে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা সম্পন্ন না হয়, তবে, অ্যাসেম্বলী ভেঙে দিয়ে আবার নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর হাতে সংবিধান রচনার ক্ষমতা দেয়া হলেও, ইয়াহিয়া খাঁ সাংবিধানিক কাঠামোতে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন পাকিস্তান হবে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র, মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না, এবং ইসলামিক আদর্শ ও ভাবধারা রক্ষা করাই হবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তিনি একথাও বলে দিয়েছেন, পাকিস্তানের মূল আদর্শের বিরোধী কোন আইন বা সংবিধানে তিনি স্বাক্ষর করবেন না। জমিয়েত ওলামায়ে ইসলামের নেতা মৌলানা মাওদুদি, মুসলিম লীগ নেতা আবদুল কোয়াউম খাঁ প্রমুখ এখন থেকেই বলছেন, সমাজতন্ত্র বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতির কথা বলা ইসলামবিরোধী।

ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর সাংবিধানিক কাঠামোর আদেশে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কিছু বলেন নি। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর ওপর এ দায়িত্ব ছেড়েছেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের

ইয়াহিয়া খাঁ

অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ। ঢাকায় আওয়ামী লীগের সভার পর শেখ মুজিবর রহমান এই আদেশের সমালোচনা করে বলেছেন, তাঁরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সংবিধান রচনার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির 'ভেটো' ক্ষমতারও তাঁরা তীব্র নিন্দা করেছেন।

তবে দুটি ভাল কাজ ইয়াহিয়া খাঁ করেছেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রথা ভেঙে দিয়ে তার জায়গায় পুরনো ৪টি প্রদেশ, অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও করাচী, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আবার চালু করেছেন। জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি এটি।

আর, সাংবিধানিক কাঠামোর আদেশে প্রস্তাবিত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬৯টি বরাদ্দ করেছেন। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬জন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। সেই হিসাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ মিলিয়ে মোট সদস্য-সংখ্যা হবে ১৪৪। এর ফলে এবার সংবিধান রচনার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাধান্য থাকবে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। সিন্ধুর প্রগতিশীল নেতা বি এম সৈয়দ ঢাকায় এসে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে গেছেন। মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম—উভয় অংশের প্রগতিশীল দলগুলির একটা যুক্তফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। সীমান্ত গান্ধীর পুত্র খান ওয়ালি খানের নেতৃত্বে পরিচালিত রুশপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও এই জোটে যোগ দিতে পারেন। মৌলানা ভাসানীর আওয়ামী পার্টি চীন-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করছে। জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস পার্টি কট্টর ভারতবিরোধী বক্তব্য নিয়ে চলছে। এদের সঙ্গে মুজিবর, ওয়ালি খানের একত্র চলা শক্ত। আবার উগ্র ধর্মান্ধ জমিয়েতের মত দলের সঙ্গেও এঁরা চলতে পারবেন না।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি—এর ভিত্তিতে পাকিস্তানের মধ্যপন্থী দলগুলির একটি নির্বাচনী জোট গড়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে।
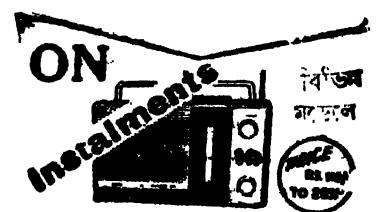
[৫-৪-৭০]

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা। ভঙ্গ বঙ্গের রঙ্গ কথার পরিমাণ দিনে দিনে এত বাড়ছে যে, তার কিছু কিছু পাঠকদের পেশ ক... সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলবে না। রঙ্গ তাকেই বলা যায়—যখন দেখা যায় যা হবার নয়, তাই হচ্ছে, যা বলার নয় তাই বলছে, যা দেখার নয়, তাই দেখা যাচ্ছে। চিন্তা করুন সেই রঙ্গসৃষ্টিকারীদের কথা—যারা মনে করে শ্রীজ্যোতি বসুর প্রাণ নিলেই প্রগতির রথের চাকা ভেঙে যাবে বা শ্রীবসু যে মত ও চিন্তার পথিকৃৎ, সেই মতবাদ বা চিন্তাধারার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু বঙ্গের পাশে আরো একটা বঙ্গও সমান কৌতূহল সৃষ্টি করে, যখন দেখা যায় আততায়ীর গুলী নিয়েও মানুষ রাজনীতি করে। শ্রীবসুকে হত্যা করার চেষ্টা প্রসঙ্গে সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের মন্তব্যটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। সিণ্ডিকেট কংগ্রেস এই হত্যা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করে, তার সার কথা হল: পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রদপ্তরের (শ্রীবসুর দপ্তর) কাজই শ্রীবসুকে হত্যার প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক প্ররোচনা সৃষ্টি করেছে। এই কথা পরোক্ষে হত্যা-প্রচেষ্টারই সাফাই গাওয়া। জানি না, যাঁরা এইভাবে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণকে কোন সরকারের মন্ত্রী হিসাবে নির্দিষ্ট নীতি রূপায়ণকে হত্যার প্ররোচনা মনে করেন, তাঁরা গান্ধীজী থেকে সুরু করে আরো অনেক মহান্ ব্যক্তির কাজকেও তো তাঁদের হত্যার প্ররোচনা বলতে পারেন। গান্ধীজীকে নাথুরাম গডসে হত্যা করেছিল। গান্ধীজীর সব কাজকে কোন কোন ব্যক্তি পছন্দ করতো না—গডসের দল তার অন্যতম ছিল। তাই বলে কি বলা হবে গান্ধীজীর কাজই গডসের দলকে গান্ধীজীকে হত্যার প্ররোচনা যুগিয়েছিল? শ্রীজ্যোতি বসু গান্ধীজী নন এবং শ্রীবসু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। সেটাকে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা বলবেন, এ ঈশ্বরের অপার করুণায় আর নিরীশ্বরবাদীরা বলবেন, ঘটনাচক্রে। কিন্তু এই যে প্রবণতা, এটা একটা ভয়ঙ্কর প্রবণতা এবং এই প্রবণতার সাফাই যাঁরা গাইবেন, তাঁরা রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ও ব্যক্তিগত প্রাণনাশ করার নতুন পাগলামী আমদানী করতে চাইছেন। অবশ্য এই পাগলামী নতুন কিছু নয়।

সম্প্রতি দেশে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে এবং যাদের সৃষ্টি সি· পি· এম দলেরই দেহ থেকে। এই দল প্রকাশ্যে মুণ্ডু কেটে নেওয়া, শ্রেণীশত্রু খতম করা পবিত্র কর্তব্য বলেও মনে করে আর তাদের দলীয় মুখপত্রে সেটা ফলাও করে প্রকাশ করাও হয়। শ্রেণীশত্রুর মুণ্ডু কেটে নেওয়া হয়েছে, গলা কেটে ফেলা হয়েছে, শিরশ্ছেদ করা হয়েছে, খতম করা হয়েছে—এমনি সব ভাষায় সেই শ্রেণীশত্রুর নিধন-কাহিনী প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আজ কি সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের লাইন এবং সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের লাইন এক হয়ে যাবে? যাবে না, এই কথা আমি জানি, কিন্তু মামার ঘরে আগুন লেগেছে বলে যদি ভাগনে বাবাজি শুধু মজা দেখেন আর চুপ করে থাকেন, তবে সেই আগুন তো একদিন ভাগনের ঘরেও লাগবে। এই প্রসঙ্গে কিন্তু আরো একটা কথা বলা বা উল্লেখ করা দরকার। সেটা অবশ্য ভঙ্গ বঙ্গের কথা নয়—সেটা হল আর এক রঙ্গে ভরা দেশ কেরলের কথা! যে কথা আজ পশ্চিমবঙ্গে সিণ্ডিকেটপন্থীরা কেউ কেউ বলছেন, সেই ঢং-এর কথা কিন্তু কিছুদিন আগে কেরলে সি· পি· এম দলনেতারা একটু ভিন্ন সুরে বলেছিলেন। সেইদিন কেরলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ কয়াকে হত্যার চেষ্টা হয়, তখন সি· পি· এম সেই হত্যা চেষ্টার খুবই নিন্দা করেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছিল জনগণের ওপর পুলিশের (স্বরাষ্ট্রদপ্তরের) অত্যাচারই কয়াকে আক্রমণের প্ররোচনা সৃষ্টি করেছে। সেই দিন কেরলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে

এম যে কথা বলেছিল, আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টার পর সেই কথাই বলা হচ্ছে। এই দুই-ই হল হতাশ রাজনীতির ফসল। হতাশ রাজনীতি যেমন ব্যক্তিবিশেষকে হত্যা করে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বা প্রতিপক্ষের নীতি হত্যা করছি বলে সান্ত্বনা পায়, তেমনি পরোক্ষে সাফাই গেয়ে সান্ত্বনা পায়।

এই সব দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যটিও খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যাঁরা রাজনীতির দর্শন দিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের পথ রচনা করে বললেন—এই হত্যার চেষ্টা প্ররোচনার ফল, তেমনি দুর্ভাগ্যজনক হল একজন কাপুরুষ চরিত্রের ব্যক্তিকে দিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের চেষ্টা। ময়দানের সভায় শ্রীবসু বললেন—যারা আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছে, তাদের একজনকে পাঠানো হয়েছিল আমায় হত্যা করতে।

শ্রীবসু নিরাপদে বাংলা দেশে ফিরে এসেছেন, হত্যাকারীর গুলী ব্যর্থ হয়েছে—এই সংবাদ আনন্দের সৃষ্টি করে নি, এমন কোন মহল নেই। শ্রীবসুর বা তাঁর দলের নীতির যাঁরা ঘোরতর শত্রু, তাঁরাও এই প্রাণনাশ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় খুশি হয়েছেন, এমন দৃশ্যও বহু দেখেছি। কিন্তু শ্রীবসু যদি এই জঘন্য প্রচেষ্টাকেও তাঁর প্রতিপক্ষের কাজ বলে প্রতিপক্ষ দলনেতাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান, তবে মূল সমস্যার কোন সমাধানই হবে না, বরং আরো জট পাকিয়ে যাবে। তর্কে তর্ক বাড়বে, শ্রীবসুর বাক্যবাণ অন্য পক্ষের বাক্যবাণ শাণিত করারই পথ প্রশস্ত করবে। এর মধ্যে প্রকৃত পথ ও মত কি সেটাও শ্রীবসুর অজানা নয়, কারণ তিনি তো সর্বাগ্রে সেই কথা বলেছেন। শ্রীবসু পাটনায় বলেছিলেন—'গণতান্ত্রিক পন্থায় হিংসা কোন পথের সমাধান করতে পারে না'। এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে? ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে অহিংসায় বিশ্বাসী দলের সংখ্যা মাত্র দুই-একটি। কিন্তু সব দলই যাঁরা হিংসা বা অহিংসা যে কোন পথে বিশ্বাস করেন, তাঁরা হিংসা ও অহিংসার মধ্যে একটা লাইন অফ ডিমারকেশন মেনে নিয়েছেন। এই দলগুলির কথা হল বিপ্লবের প্রয়োজনে হিংসার দরকার হলে হবে, কিন্তু গণতান্ত্রিক পথে যেখানে কাজ হাসিল হবে—সেখানে তাঁরা হিংসা আমদানী করতে চান না। যাঁরা গণতান্ত্রিক কোন পথে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা সরকার গড়তে, মন্ত্রী হতে বা নির্বাচনে দাঁড়াতে মোটেই আগ্রহী বা লালায়িত নন্। সেরকম দলও পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে—তারা

প্রতি সপ্তাহে শ্রেণীশত্রুর মুণ্ডু কাটছে এবং সেই কথা সদর্পে প্রকাশ্যে বলছে। কিন্তু যাঁরা বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক পন্থা—দুয়েই বিশ্বাস করেন, তাঁদের কথাই তো হল সেই কথা, যে কথা শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন। সেই কথা হল গণতন্ত্রের পথে হিংসা আমদানী করা চলবে না, সেই হিংসা তীর, বল্লম নিয়ে জোতদার আক্রমণে হোক আর শ্রীজ্যোতি বসু, মহম্মদ কয়াকে হত্যা-প্রচেষ্টায় হোক। ভাবের ঘরে চুরি রাজনীতিতে অচল। কিন্তু রাজ্য-রাজনীতিতে এই ভাবের ঘরে চুরি চলছে, ফলে ভঙ্গ বঙ্গের রাজনীতিতে নতুন রঙ্গ আমদানী হচ্ছে।

শ্রীজ্যোতি বসুকে হত্যা করে যেমন শ্রীবসুর দলের প্রভাব হ্রাস করা যায় না, যাবে না—এই কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য হল সাংবাদিকদের হাত কেটে নেবার হুমকি দিয়ে সংবাদপত্র অফিসে শোভাযাত্রা করে গিয়ে সংবাদপত্রের নীতি (সেই নীতি ভুল হতে পারে, কুৎসার হতে পারে, অসৎ মতলবের হতে পারে) পরিবর্তন করা যায় না। গুলী করে মানুষ মেরে অথবা হামলা করে কলম বন্ধ করা যদি এই যুগের স্বীকৃত নীতি [illegible] ও শিষ্ট পথ বলে বিবেচিত হয়, তবে সে তো জঙ্গলের আইন ও রাজত্ব হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শ্রীজ্যোতি বসু সঠিক পথের কথাই বলেছেন। শ্রীবসু বলেছেন—তিনি সংবাদপত্র মালিকদের সঙ্গে কথা বলবেন, তাঁদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে পত্র দেবেন। এই ক্ষেত্রেও শ্রীবসু গণতান্ত্রিক পন্থারই হদিশ দিয়েছেন। কিন্তু ভঙ্গ বঙ্গের রঙ্গ হল এই: আমরা মুখে বলি—'জ্যোতি বসু যুগ যুগ জিয়ো, কিন্তু কাজে করি তাঁর মতের উল্টো।'

আর এক রঙ্গের কথাও সম্প্রতি নজর এড়িয়ে যায় নি। বর্ধমানের সাঁই বাড়ির হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানা হৈ-চৈ হয়েছে, তা নিয়ে কথা বলতে চাই না। কিন্তু সেদিন রাজ্যপাল সাঁইবাড়িতে গেলে যারা জেলা শাসকের মাথায় গাঁট্টা মারলো, তারা কোন পথে চলেছে সেটা একটু ভেবে দেখা দরকার। মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে গিয়ে যদি জেলা শাসক নিগৃহীত হন এবং তার যদি প্রতিকার না হয়, তবে সেটাও তো জঙ্গলের রাজত্বের বাড়া হয়ে যায়। আরো মজার ঘটনা হল—একদিন আরামবাগে এস-ডি-ও'কে এইভাবে নিগ্রহ করায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন—এই সরকার সভ্য নয়, বর্বর আর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বা তাঁর দল চুপ করেছিলেন, আর আজ বর্ধমানের ঘটনায় শ্রীমুখোপাধ্যায় চুপ করে আছেন, সোচ্চার হয়ে উঠছেন শ্রীজ্যোতি বসু ও তাঁর দলের লোকেরা। এও হল ভঙ্গ বঙ্গের আর এক রঙ্গ। চাঁচির ডাল জায়গায় জায়গায় ঝাল-এর মত রাজনৈতিক নেতাদের কোথাও হিংসার কোন অনীহা নেই, আবার কোথাও হিংসায় বড় বেশি বিরক্তি। কিন্তু এই সবের মধ্যে প্রাণ যায় শুধু উলুখড়ের।

নেতাদের নীতি সঠিক না হলে অথবা এক এক নেতার ব্যাখ্যায় দলের নীতি যখন যেমন তখন তেমন হলে কর্মীরা কোন কিছুর পরোয়া না করে এগিয়ে চলেন নিজেদের পছন্দমত নীতি নিয়ে। আর পছন্দমত, খুশিমত নীতির শিকার হয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হন সাধারণ মানুষ। আমরা সাধারণ মানুষ আজ সেই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছি, এই দুর্ভাগ্যের সব রূপ এখনও ধরা পড়ে নি, কিন্তু পড়তে সুরু করেছে। এই যখন যেমন তখন তেমন নীতি যত বেশি ছড়িয়ে পড়বে, ভঙ্গ বঙ্গের রঙ্গ তত বেশি চোখে পড়বে। তাই এখন শুধু দেখে যাবার পালা। রঙ্গে ভরা বঙ্গদেশের রঙ্গ শুধু দেখে যেতে হবে।

আরও কয়েকটি কঙ্কাল !

॥ এগারো ॥

সেই যে সেদিন রাণীদির ওখান থেকে পালিয়ে এলুম, ব্যস্‌, বহুদিন আমি আর সেমুখো হলাম না। রাণীদিও কেন কি জানি, আমাকে কোনভাবে আর খুঁজল না। এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত আর আসে না আমার কাছে। যা হোক, ইতিমধ্যে কেমন যেন এক দায়িত্বপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল। এতদিন মায়া ও তার মা ছিলেন আমার জগতের দুটি মানুষ—যাঁদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এরপর যেন আমার ওপর আরও কিছু ভার এসে পড়ল। সে ভার আমি নিজে নিয়েছিলাম কিনা জানি না, তবে এসে পড়েছিল—এসে পড়েছিল মায়ের অশ্রুজলের উদ্দাম স্রোতে। শংকরের ওপর পুলিশের পরোয়ানা, তার আশঙ্কা মায়ের পক্ষে যেন অসহনীয়। দিন-রাত তাঁর সেই একই ভাবনা। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি কেমন করে যেন জেনে নিয়েছেন—এক দল পুলিশ যদি বা শংকরের প্রতি মমতাসম্পন্ন, কিন্তু অন্য দল পুলিশ তা নয়। পুলিশের মধ্যে সবাই যদি প্রথমোক্ত দলের মত হত, তাহলে শংকরের জন্য হয়তো তাঁর অতো ভাবনা হত না। কিন্তু উপায় কি?

আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন ছিল গ্রীষ্মের শেষ। তারপর বর্ষা গেছে, শরৎ গেছে, গেছে হেমন্ত, এখন এসেছে শীত। দেখি শংকর মাঝে মাঝে আসে। বাড়িতে টাকা দিয়ে যায়, খেয়ে যায়। আবার কোথায় যে উধাও হয়ে যায় বেশ কিছুদিন আর তার দেখা মেলে না। অনেকদিন পর যখন সে আসে, তখন মা তাকে চেপে ধরেন আর বলেন, 'কোথায় হঠাৎ-হঠাৎ চলে যাস—আমি যে কোন কূলকিনারা পাই না রে!'

'অতো ভাবো কেন তুমি?' শংকর বলে, 'আমরা বয়েযাওয়া ছেলে—আমরা কখনো মরব না!'

'না না ওকথা বলিস নি—ওকথা ভাবলেও আমি শিউরে উঠি', মা বলেন, 'কিন্তু এইভাবেই তোকে চিরকাল দেখব বলে কি আমি আশা করেছিলুম শংকর?'

'কেন', শংকর বলে, 'আর কি আশা করো তুমি? টাকা পাচ্ছ, পয়সা পাচ্ছ, দু' বেলা খেতে পাচ্ছ, মাথা গোঁজারও কোন অভাব নেই। এরপর মানুষের আর কি দরকার?'

এরপর আর কি দরকার, মা'র চোখ ফেটে যেন জল আসে। তিনি বলে ওঠেন, 'এই কি তোর কাছে আমার সব আশা রে?'

'তাহলে কি আশা করো তুমি?'

মায়ের আশা যদি শংকর বুঝতে পারত, তবে সে ওভাবে প্রশ্ন করত না। সন্তানের কাছে মা কি আশা করেন? মা আশা করেন সন্তান তাঁর দশজনের একজন হবে, সৎ, সামাজিক জীবনযাপন করবে, সংসার-ধর্ম পালন করবে—এই তো মায়ের সবচেয়ে বড় আশা। তাই মা আহত-ভাবে বলেন, 'তুই তো আমার কথা কোন-দিন শুনলি না বাবা!'

'কি বলছ মা', শংকর বলে, 'আমি তোমার কথা শুনি নি? তোমাদের জন্যে ওস্তাদের কাছে আমি কি না বলেছি, কিভাবে না তাঁর কাছে বলে-কয়ে তোমা-দের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছি—তা কি তুমি জানো? জানলে বুঝতে পারতে আমি তোমার কথা শুনেছি কি না-শুনেছি!'

'আমি ওকথা বলি নি শংকর', হঠাৎ যেন যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে মা বলে ওঠেন, 'আমার মনের কথা তুই বুঝবি না রে, বুঝবি না!'

'কেন কি, মা, [illegible] [illegible] [illegible] তুই—[illegible] [illegible] ওপর থেকে তুই-সদ্য আনতিস্। পারবি সে কথা বুঝতে? তাহলে চল এখান থেকে চলে যাই অন্য কোথাও। আমি চাই না এই পাপের অন্ন, এর জন্যে কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা কিম্বা মাথাগোঁজার এতটুকু ঠাঁই! এই পাপের জগৎ থেকে দূরে, অনেক দূরে পালিয়ে যেতে পারলে আমি যেন বাঁচি। এখানে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে!'

এরপর শংকর আর বাদানুবাদ করে না। খেয়েদেয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়।

কিন্তু মায়ের যন্ত্রণার তো শেষ নেই। ছেলের জন্য কোথায় তাঁর মর্মবেদনা—শংকর তা না বুঝুক, আমি বুঝেছিলাম। আর বুঝেছিলাম বলেই আমার হয়েছিল মুশকিল। ভেতরটা মায়ের যেন জ্বলে-পুড়ে যেত শংকরের কথা ভেবে ভেবে। তাই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁকে খুঁজতে হত কি করে সেই নিরন্তর অগ্নিদাহ থেকে তিনি অব্যাহতি পান, কি করে তাঁর মনের ক্ষতকে তিনি উপশম করেন! এক-একদিন আমাকে বলতেন, 'বাবা বিজন, আমি আর পারছি না—এবার আমি পাগল হয়ে যাব শংকরের জন্যে। আমার এক ছেলে ও—ও আমার বংশের শিবরাত্রির সলতে। নিভে গেলে আমার সব যাবে বাবা, সব যাবে। তুমি ওকে একটু বোঝাও বাবা!'

শংকরকে আমি বোঝাব—এ আমার সাধ্যের অতীত। যে ছেলেকে খাবারের মধ্যে আফিম গিলিয়ে গিলিয়ে ওস্তাদ তাকে নেশায় বশীভূত করেছে, খেলাচ্ছলে যাকে কেমন করে লোকের পকেট থেকে টাকা-পয়সা তুলে নিতে হবে, কেমন করে হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিতে হবে, আর কেমন করে ট্রেন-যাত্রীদের বাক্সপাঁটরা সরাতে হবে শিখিয়েছে, যে ছেলেকে শিখিয়েছে চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম করতে, যাকে ছোট ওস্তাদ বলে সম্মান আর মর্যাদা দিয়েছে ওস্তাদ, তাকে বুঝিয়ে ঠিক পথে আনতে পারব আমি, এ বিশ্বাস মায়ের থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আমার নেই। তবু মায়ের আগ্রহ দেখে বললাম, 'দেখব চেষ্টা করে, কতদূর কি করতে পারি।'

মা বললেন, 'তুমি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, তোমার কথা শুনলেও শুনতে পারে।'

আমি হাসলাম মায়ের কথায়। কিন্তু তাহলেও সত্যি-সত্যিই একদিন ধরলাম শংকরকে দুপুরবেলায়। শীতের দুপুর। অল্প অল্প বাতাসও বইছিল। ঠাণ্ডার প্রকোপ একটু বেশিই। মায়ের কাছে খেয়েদেয়ে সে চলে যাচ্ছিল, 'শংকর দাঁড়াও একটু—আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

আমার সঙ্গে—[illegible] শংকর ঘুরে দাঁড়ালো।

বললাম, 'হ্যাঁ।' তারপর চাদরখানা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তার সঙ্গে। মাধুর ঘরের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম দু'জনে। তাকে বললাম, 'একটা কথা বলব আমি তোমায়!'

'কি কথা, তাড়াতাড়ি বলুন।'

'ভয় নেই তোমার। এ তো আমরা দাঁড়িয়ে আছি দুর্গে।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমার কাজ আছে।'

'কি এত কাজ?'

'আমাদের কাজ জানেন তো!'

'তবু?'

'আপনাকে বলতে কোন দোষ নেই। রেলের বড় কর্তারা খবর দিয়েছে, খুব একটা দামী মেটাল আসছে পার্শেল এক্সপ্রেসে। কেবিনের সঙ্গে কথা হয়ে রাখতে হবে, যাতে সিগনাল ডাউন না করে। তারপর আজ রাতের মধ্যেই কাজ সাফ করতে হবে। এ সমস্ত অপারেশন-টার দায়িত্ব আমার ওপর।'

'কেন, তোমাদের আর কেউ নেই?'

'থাকবে না কেন? কিন্তু তাদেরও তো কাজ আছে।'

'তারা কেউ থাকবে না তোমার সঙ্গে?'

'কেউ কেউ থাকবে—যেমন মন্টু, ভানু, জগদীশ—'

'মন্টু!' আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা মন্টুকে আজকাল আর দেখি না কেন বলো ত'?'

'ও তো এতদিন জেলে ছিল। আজই এসেছে মাত্র।'

'আজ?'

'হ্যাঁ। নেপালে আফিম আনতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।'

তাই মন্টু আমার কাছে আসে নি। ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারলাম। যাই হোক, আমি আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, 'একটা কথা শংকর—ঐ দামী মেটাল ওয়াগন থেকে লুঠ করে তোমরা করবে কি?'

শংকর বললে, 'আপনি কি মনে করেন ওসব জিনিস বিক্রি করার আমাদের কোন আর্স নেই?'

'আমি তো তাই মনে করি—'

শংকর একটু হাসল। হেসে বললে, 'না, না, ওসব ভাবনা নেই। অনেক শেঠ আছে, যাদের ভাই-ভাতিজা দিল্লীতে মন্ত্রী, নয়তো বড় বড় অফিসার। ঐ মালই ঘুরিয়ে আবার চালান দেবে তারা, মাঝখান থেকে শুধু লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়ে যাবে, এই হচ্ছে মজা।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম শংকরের কথায়। ইতিপূর্বে শুনেছি বড় পুলিশ অফিসার আছে তাদের সঙ্গে, এখন জানলাম রেলের বড় কর্তারা এবং মন্ত্রী, আমলাদের আর তাদের আত্মীয়স্বজনও আছে। কে জানে, গোটা ভারতবর্ষকে আজ ওরাই হয়তো এমনিভাবে চক্র রচনা করে লুঠ করছে। মাঝখান থেকে আমরা দেখি শুধু গোটা-কতক সমাজবিরোধী মানুষই বুঝি এজন্য দায়ী। আমাকে চিন্তান্বিত দেখে শংকর বললে, 'এসব কথা ভাবতে যাবেন না আপনি। ভেবে কূলকিনারা করতে পারবেন না। তার চেয়ে বলুন আপনি কি বলবেন বলছিলেন—সত্যিই আমার সময় নেই।'

আমি শংকরকে যা বলতে চেয়েছিলাম, এই সব কথা উঠে পড়ায় তা কি ভাল করে তাকে বলা সম্ভব হবে? না, সে শুনবে মন দিয়ে? তবু আমাকে বলতেই হবে, কারণ মায়ের আকুল মিনতি। তাই চট্ করে এই সব কথার সূত্র ধরেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দ্যাখো শংকর, তোমাকে আমি যে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম, সেটা একটু বেসুরো শোনাবে হয়তো, কিন্তু তোমাকে না বললেই বা আমি বলব কাকে? তাই'—

'বলুন।'

'আচ্ছা এই সব কাজে সত্যিই কি তুমি কোন আনন্দ পাও?'

'আনন্দ—আনন্দ আপনি কাকে বলেন?'

'ধরো এই সব কাজের মধ্যে যখন সফল হও, তখন তোমার কি মনে হয়?'

'খুব ভাল লাগে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি—'

'ধরো টাকাকড়ির লেনদেন হল, নেশা-ফূর্তি চলল, কিন্ত অবসাদ আসে তো?'

'হ্যাঁ তা আসে।'

'তখন কি মনে হয় বলো তো?'

'তখন—তখন আর কি মনে হবে। মনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। কিছুই ভাল লাগে না।'

'অন্য কোন কথা মনে পড়ে না?'

'কি রকম?'

'এই ধরো মায়ের কথা, মায়ার কথা, আর তা ছাড়া আমি তো জানি মাধুকে তুমি ভালবাসো, সেও তোমার ভালবাসে —এদের কথা তোমার মনে পড়ে না?'

'খুব পড়ে।'

'এদের নিয়ে তোমার একটা কিছু ঘর বা সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে ইচ্ছে করে না?'

'একেবারে যে ইচ্ছা করে না তা নয়, কিন্তু পথ কোথায়?'

'কেন?'

'কেন কি—ওসব করলে তো এখান থেকে চলে যেতে হয়। আর চলে গিয়েই বা থাকব কোথায়? পুলিশ বা দলের নজর এড়িয়ে তো থাকতে পারব না। ওরা ঠিক আমাকে টেনে নিয়ে আসবে এখানে।' [illegible] পড়ে গেল—আরও একবার ওরা পালিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে, কিন্তু দলের নজর এড়িয়ে থাকতে পারে নি। পুলিশ আর দল একত্র ওদের ধরে এনে-ছিল। কাজেই মা বললেও শংকরের সামনে পথ কই? উপলব্ধি করলাম ব্যাপারটা। শংকর আর দেরি করল না। সে শুধু বললে, 'আমি জানি, মা মনে মনে আমার ওপর খুবই রাগ করেন। কিন্তু আমি করবটা কি। আমার কোন উপায় নেই। যা হোক, আমি চললুম, কিছু মনে করবেন না।'

সেইদিনই ফিরে এসে দেখলাম মা আকুল আগ্রহে মাধুকে দাওয়ায় দাঁড় করিয়ে কিসব বলছিলেন। কাছে থেকেই শুনতে পেলাম মা বলছেন, 'কেন এক পাপের গহ্বরে এসে বাসা নিয়েছি মা যে, আমার সব আশা, সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তা না হলে তুই আমার কে তা জেনেও আমি তোকে বরণ করে ঘরে তুলতে পারলুম নারে। এ কি আমার কম দুঃখ। কিন্তু মা তোকে আমার একটি কথা—'

মাধু নিরুত্তরভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মা বলতে লাগলেন, 'তোর কি ভাল লাগে মা এই জীবন? তোর কি একটু ঘর বাঁধবার ইচ্ছা হয় না। বলতো মা আমায় খুলে।'

দেখলাম মাধুর চোখ ছলছল করে উঠল। আমি তার দাওয়ায় দাঁড়ালাম না। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর চলে এলাম। কারণ আমি তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সব সময়েই মানুষের আবেগকে অবরুদ্ধ করে দেয়। তা ছাড়া মায়ের কথাগুলো আমার এত ভাল লাগছিল যে, সেগুলো আরও দুর্বার হয়ে বেরিয়ে আসুক তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে আর আমি সেই কথাগুলি গভীর মনযোগ সহকারে শুনে যাই।

ঘরে পা দিতেই দেখি মায়া মাদুরে

বসে বসে আমার খবরের কাগজখানা ওল্টাচ্ছে।

বললাম, 'কি খবর মায়া?'

মায়া খবরের কাগজের পাতায় এক-খানা ছবি দেখিয়ে বলল, 'এই লোকটাকে চিনতে পারেন?'

মাদুরে বসে পড়ে আমি ছবিখানা দেখে চমকে উঠলাম। এ কি ব্যাপার! বললাম, 'এ তো তোমাদের ওস্তাদের ছবি।'

'হ্যাঁ তাহলে ঠিক ধরেছেন দেখছি।'

'ধরতে পারব না কেন', কথাটা আমি মায়াকে বললাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মন চলে গেল উধাও হয়ে যন্ত্রণা-কর এক বিস্ময়ের রাজ্যে। একটা শেকল-ছেঁড়া সদ্য স্বাধীন দেশে এ ঘটনা ঘটতে পারে, এ যেন আমার কল্পনার অতীত। আমাদের জাতীয় নেতাদের এবং তার সঙ্গে দেশের কোটি কোটি মানুষের ত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্যে দিয়ে যে মানসিক সম্পদ আমরা লাভ করেছি, ওস্তাদের ছবি যাদের সাথে একত্র ছাপা হয়েছে, তাতে কি সেই সম্পদ অটুট থাকে? কংগ্রেসমন্ত্রীরা নির্বাচন অভিযানে বেরিয়ে-ছেন ছবিখানা তারই। কিন্তু সঙ্গে তাঁদের ওস্তাদ কেন? তবে কি মন্ত্রীরা জাতির দর্শন, আদর্শ, ঐতিহ্য সব কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে, এমন কি রাজনীতিকে পর্যন্ত বর্জন করে শুধুমাত্র ক্ষমতার আসীন হবার জন্য ওস্তাদের মত লোককে নিয়ে অনন্ত নোংরা রাজনীতিতে নেমে-ছেন? না ওস্তাদই জাতে ওঠবার জন্য এই সব নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? কোনটা সত্য? কিম্বা ঘটনাটা এমনই কিনা যে, জাতীয় নেতা-দের মহাযাত্রা আর ওস্তাদের জীবনযাত্রা গঙ্গা-যমুনার মত একই ধারায় এসে মিশে গেছে বর্তমানে? ছবিখানা দেখামাত্র আমাকে অবাক হয়ে যেতে দেখে মায়াও বিস্মিত কম হল না। সে বলল, 'ওস্তাদের ছবি এই সব লোকেদের সঙ্গে কেন?'

'আমি ছবিখানার ওপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'এই সব লোক কারা তুমি জানো?'

'না তো।'

'এঁরা সব বড় বড় মন্ত্রী—ভোটের ব্যাপারে বেরিয়েছেন।'

'তা ওস্তাদ কেন ওঁদের সঙ্গে?'

'সেই কথাটা তো আমিও ভাবছি।'

মায়া বললে, 'বোধহয় ওস্তাদকে সঙ্গে নিলে ওঁরা ভোট বেশি যোগাড় করতে পারবেন, না দাদা?'

'বোধহয় ঠিক কথাই বলেছ মায়া। নেতারা নিজেদের আদর্শের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন আর তাই এবার নেমেছেন নোংরা কাজে।'

'কিন্তু এতে মন্ত্রীদের কি সুবিধা হবে বলুন তো? এরপর ওস্তাদ যখন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করাবে, কিম্বা মালগাড়ি ভাঙবে, তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে ওস্তাদের আলাপ-পরিচয় দহরম-মহরম আছে বলে পুলিশ তো লোকটাকে কিছুই বলবে না।'

'তাই তো।'

'তাহলে যে রক্ষক সেই হবে ভক্ষক?'

হতে পারে মায়া একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। কিন্তু আসলে সে তো বস্তিতেই বাস করে এবং এখানকার আব-হাওয়াতেই সে মানুষ। কিন্তু তার চিন্তা-ধারায় যে কথা ফুটে উঠছে সেই সহজ কথাটা কি নেতাদের মাথায় আসে নি, কিম্বা আসে নি কি তাঁদের কর্মীদের মাথায়? নিশ্চয়ই এসেছে, কিন্তু এসবের পর তাঁরা করছেন কি? তাঁদের মনে, বিবেকে বা যে মহান ব্রতে তাঁরা আত্মোৎ-সর্গ করেছেন বলে দিন-রাত্রি তারস্বরে চিৎকার করেন, সেখানে কি এর ভয়ংকর রূপটা একটিবারও তাঁদের মনে উদয় হয় না? মায়া বুঝতে পেরেছে এরপর পুলিশ ওস্তাদকে ধরতে গেলে, মন্ত্রীদের সঙ্গে পরিচয় আছে বলে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে এবং নিষ্কৃতি পাওয়ার অর্থই হচ্ছে তার পিছনে শক্তিমানদের সমর্থন, আর সে সমর্থনের প্রকৃত যে চেহারা হবে, সে হবে রক্ষকের ভক্ষকরূপেই আবির্ভাব।

কে জানে দেশকে এই নেতারা কোন্-দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আসা অবধি অনেক খবরই জেনেছি। সমাজবিরোধী মানুষগুলোকে দিয়ে একদল ওপরতলার লোক, কোর্ট, পুলিশ অফিসার, রেলের কর্তাব্যক্তিরা, কংগ্রেস নেতা সবাই যে-যার কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। আদর্শ, নীতি-কথা, মহাত্মা গান্ধীর বাণী প্রচার এদের জীবনদর্শনের পথে শুধু একটা সুকৌশলী ক্যামোফ্লেজ। আসলে এরা হিপোক্রিট, ভণ্ড, বিড়াল-তপস্বী। কোন নীতির এরা ধার ধারে না। কিন্তু দুঃখ আমার এখানে নয়—জাহান্নামে যান ওরা, জাহান্নমে যাক কংগ্রেস। কিছু এসে যায় না তাতে আমার। কিন্তু গোটা দেশটাতে এসব যদি ছড়িয়ে পড়ে, তবে আমার দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তা থেকে উঠে দাঁড়াতে যে দীর্ঘ একটা শতাব্দী লেগে যাবে।

আমি ভেতরে ভেতরে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মা তখনও মাথার সঙ্গে পাগলের মত ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিলেন। তাঁকে চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছা হল, 'লাভ কি হতভাগিনী—তোমার ছেলে তো ছেলে, সারা দেশটাকে ওরা তোমার ছেলের মত করে দেবে। এই দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো, সমাজবিরোধী খুনী, ডাকাত, চোর-বাটপাড়দের নিয়ে তোমার দেশের নেতারা দেশব্যাপী [illegible] [illegible], তোমার ছেলেটুকু পাঁচ জায়গায় [illegible] এই মাতৃজঠরের মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন [illegible] বিরুদ্ধে তুমি সংগ্রাম করবে? তুমি খান খান টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে এই সর্বনাশা শাসনতন্ত্রের হৃদয়হীন অভিকায় জন্তুদের চাপে।'

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলাম। কেন না, একটা সাধারণ মা তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য যদি দিনের পর দিন অশ্রুজলের মাধ্যমে সাধনা করে যেতে পারে, তবে সে-ও তো কম নয়। মা তো আমাকেও তাঁর এ কাজে সাহায্য করতে বলেছেন। যে কোন প্রকারে দেশের এই দূষিত আবহাওয়াকে দূর করার চেষ্টায় আমারও তো কিছু করার আছে। সত্যিই কথাটা মনে হতে কেমন যেন একটা জোর পেলাম আমি মনে।

মায়া বললে, 'দাদা কি ভাবছেন বলুন তো?'

বললাম, 'মায়া নেহাৎই দৈবক্রমে আমি এতদিন এখানে এসে আছি—কাজের মত কাজ কিছু করতে পারি নি। এবার হয়তো আমার সেই কাজ করার সময় এল।'

'কি সে কাজ দাদা?'

'সময় এলে বলব।'

মায়া বললে, 'না—আমি বুঝেছি দাদা। নেতাদের সঙ্গে ওস্তাদের এই ছবি বেরুনোতে আপনি যেন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আর এতে করে দেশে ঐ যে একটু আগে বললুম, রক্ষকই ভক্ষক হবে, সে সবই বেড়ে যাবে। তাই আপনি চাইছেন এর একটা বিহিত করতে।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম মায়ার কথায়। মেয়েটা আমার মনের কথা এমন সুন্দর-ভাবে কি করে বললে। সত্যিই মেয়েটা আমাকে আপন করে নিয়েছে। মানুষ মানুষকে আপন করে না নিলে তো এমন করে মনের কথা টেনে বলতে পারে না। আমি অভিভূতের মত তাকে বললাম, 'মায়া সত্যিই তুই আমার বোন। এমনি-ভাবে তুই আমার মনের কথা বলে ফেললি?'

মায়া বললে, 'এ আর এমন কি কথা —এই অভিশপ্ত বস্তিতে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি দেখেছি, মা বা আপনারও ভাল লাগে না। কিন্তু তাই বলে মানুষগুলোকে তো আমরা কেউই পর মনে করি না। বরং ভালই বাসি। কাজেই এদের ফিরিয়ে আনার কথা ছাড়া আমার আপনার বা মায়ের—এ ছাড়া আর কি কাজ হতে পারে? তাই সেই ভেবেই আমি বলেছি কথাটা।'

'কিন্তু তোর কথাটা যে কত সত্যি রে জানিস, সে আজ আমি বুঝলাম'। তারপর বললাম, 'দেখা যাক কদ্দূর কি করতে পারি।'

কথাটা [illegible] মাধু এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই সে বললে, দাদা—।'

'কেন রে?'

'একটা প্রণাম করে যাই।'

'প্রণাম করে কি হয় বল তো?'

'তবু একটা সান্ত্বনা।'

'যা সান্ত্বনা আমি তোকে দিচ্ছি', বললাম, আর অতো প্রণাম করতে হবে না।'

মাধু অনুযোগের ভঙ্গিতে বললে, 'কেন বলুন তো?'

'কেন কি—আমি কি এখানে কারো গুরুঠাকুর হয়ে এসেছি!'

'গুরুঠাকুর না হয়ে আসতে পারেন', মাধু বললে, 'কিন্তু এসে যে গুরুঠাকুর হয়েছেন সে বিষয়ে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কি রে মায়া, তুই কি বলিস?'

মায়া বললে, 'ঐ জন্যেই তো আমি দাদাকে এখান থেকে যেতে দোবো না।'

'তবে', মাধু বললে, 'দিন দাদা পায়ের ধুলো দিন—ঘর ফেলে এসেছি!'

'তোর হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নারা কোথায়?'

'তাদের দু'খানা কুড়ি চাপা দিয়ে ইট চাপিয়ে এসেছি।'

বললাম 'আহা-হা বেচারাদের তাহ'লে তো কষ্ট হচ্ছে খুব!'

তারপর একরকম জোর করেই পায়ের ধুলো নিয়ে মাধু চলে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে হঠাৎ কেন কি জানি আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস আছাড় খেয়ে পড়ল। এরকম তো আমার বড় একটা হয় না—আমি কেমন যেন হাতড়াতে লাগলাম, সত্যিই আমি কিছু হারালাম কিনা। সহসা আমার মনে পড়ে গেল মাধুকে বলা মায়ের কথাটা, "তা না হ'লে তুই আমার কে তা জেনেও আমি তোকে বরণ করে ঘরে তুলতে পারলাম না রে। এ কি আমার কম দুঃখ!"—হয়তো সেই কথাটার মধ্যেই মাধুর জীবনের দুঃখটা মায়ের মত আমারও অনুভূতিতে অনুরণিত হয়ে উঠেছিল। আর সেই জন্যেই হয়তো আমার দীর্ঘশ্বাস।

সেদিন সারাদিনটা আমার কেমন যেন এক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটল। আমার নিজের একটা জীবনদর্শন আছে। বলা বাহুল্য সে জীবনদর্শন আমার গেরুয়া নয়। গেরুয়াও যেন আমার কাছে এক যন্ত্রণার সাজিম হয়ে উঠেছে। পরিচয় গোপন, আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে আমি গেরুয়া পরেছিলাম, কিন্তু কি আর পরিচয় গোপন করলাম আমি এখানে এসে? রাণীদি জেনে গেল আমাকে। মায়া, মণ্টু, মা—এমন কি ওস্তাদও জেনে গেল আমি রাণীদির [illegible] এখানে সকলের কাছে নতুন পরিচয়ও যা আমার হয়ে গেল, সেও তো এক অনাবৃত্ত সাধারণ মানব-চরিত্র। কাজেই গোপনটা আর নিজেকে করতে পারলাম কই? সত্যি সত্যি আমি এবার স্থির করলাম আর গেরুয়া নয়—গেরুয়ার খোলস আমার 'বাসাংসি জীর্ণানি' হয়ে থাক্—এবার আমি আমার ঝুলিতে রক্ষিত সাদা জামা-কাপড় আর কেডস জুতোই পরব। তা না হলে হয়তো আমিও একদিন মিথ্যে গেরুয়া দিয়ে সত্যিকারের হিপোক্রাট হয়ে উঠব। আর লোকে বলবে 'মন না রাঙায়ে কি ভুল করিলে, কাপড় রাঙালে যোগী।'

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। মা হঠাৎ আমার কাছে এসে বসলেন। তাঁর বসার ভঙ্গিটা এমনই ছিল যে, তাতে আমি ধরে নিয়েছিলাম তিনি কোন গোপন কথাই আমাকে বলবেন। মা কণ্ঠস্বর বেশ নিচু করেই আমাকে বললেন, 'বাবা, বলছিলুম কি জানো—'

'কি?'

'তোমার সঙ্গে তো মণ্টুর মাসির বেশ জানাশোনা।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ও আসলে এখানে কিভাবে থাকে জানো তো?'

'ঠিক জানি না তো!'

'ও হল ওস্তাদের রক্ষিতা—'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি জানেন ঠিক?'

'আমি আর জানি না!'

'তারপর?'

'বড় বড় সায়েবসুবো, অফিসার, নেতা—সব ওস্তাদের বাড়িতে আসে। মণ্টুর মাসিকে ওস্তাদ এগিয়ে দেয়, মণ্টুর মাসি নেশা করে, ফুর্তি করে নেচে গেয়ে তাদের আপ্যায়িত করে—তাতে সব লোক ওর বশীভূত হয়ে থাকে'—

ওঃ, যেন আর শুনতে পারছিলাম না রাণীদির এই পরিচয়। আমি নিজে চোখে রাণীদির এ মূর্তি দেখেছি, কিন্তু সে তো শুধু ওস্তাদের ঘরেই। রাণীদি কি মায়ের কথামত একেবারেই বারবধূ হয়ে গেছে? সারা শরীরে কেমন যেন একটা তীব্র শিহরণ বয়ে গেল আমার। চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছা হল, 'রাণীদি, ঘৃণা করি—ঘৃণা করি আমি তোমাকে!' কিন্তু আপাতত মা যেন কি বলতে চাইছেন। তাঁর কথাটা আমার শোনা দরকার, অন্তরের অপরিমেয় জ্বালাকে চেপে রেখে।

মা বললেন, 'তুমি যদি মণ্টুর মাসিকে একটু বলো বাবা ওস্তাদকে বোঝাবার জন্যে তাহলে হয়তো শংকরকে আমার ছেড়ে দিলেও দিতে পারে।'

'মণ্টুর মাসিকে বললে ওস্তাদকে কি বলবেন উনি?'

'তুমি বললে নিশ্চয়ই বলবে।'

আমার কিন্তু তা মনে হল না। মণ্টুকে রাণীদি সত্যিই খুব ভালবাসেন আমি দেখেছি। তার মত ছেলেকে এই অভিশপ্ত জগৎ থেকে বাইরে রাখার জন্যে কি রাণীদি কখনও চেষ্টা করেন নি? নিশ্চয়ই করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। তবু মণ্টু এখানে রয়েছে কি করে? নিশ্চয়ই ওস্তাদ রাণীদির কথা রাখে নি। তাই এ অবস্থায় শংকরের কথা রাণীদি বললে কি ওস্তাদ শুনবে? আমার তো তা মনে হয় না। তবু আমি মায়ের আগ্রহ দেখে তাঁকে বললাম, 'আচ্ছা আমি সুযোগ পেলে মণ্টুর মাসিকে বলে দেখব।'

'সুযোগ পেলে নয় বাবা—সুযোগ একটু করে নিতে হবে তোমায়!'

'আচ্ছা তাই দেখব।'

মা এবার আরও কাছে ঘেঁসে এসে বললেন, 'শংকরকেও যেমন আমি বাঁচাতে চাইছি, তেমনি বাঁচাতে চাইছি আমার এই ফুলের মত মেয়েটাকে। ওকে আর এখানে রাখা যাবে না। বসন্তর নজর পড়েছে ওর দিকে।'

'সে কি কথা!' আমি চমকে উঠলাম।

ভানু এসেছিল। চুপি চুপি সে আমায় খবর দিয়ে গেছে।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম একথা শুনে। মনের মধ্যে রাণীদিকে আমার না বলার জন্য যে একটা জড়তা ছিল, সেটা যেন মায়ের এই শেষ খবরটায় কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই যদি ঘটনা হয়, তাহলে তা তো আমাকে বলতেই হবে রাণীদিকে। তা না হলে মেয়েটাকে আমি বাঁচাবো কি করে?

বাস্তবিক অদ্ভুত এক জগতে আমি এসে পড়েছি। এরা সমাজের নিম্নস্তরে নেমে গেছে। খুনজখম সবই এরা করে, নারীনিগ্রহও করে, আবার নারীকেও ভালবাসে, মর্যাদা দেয়। এরাও আর পাঁচজনের মত বাঁচতে চায়, বাঁচাতেও পারে। এই প্রথম আমি সেদিন সন্ধ্যায় গেরুয়া ছাড়লাম। মালকোঁচা মেরে পরলাম সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবী, আস্তিন দুটো গুটিয়ে কেডস জুতোর ফিতে বেঁধে সঙ্গে নিলাম একটি জিনিস, যার কথা আমি আগেই বলেছি। তারপর টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়লাম বস্তির সেই গোলকধাঁধা-রূপী পথে। এখন আমার সব চেনা হয়ে গেছে।

মণ্টু দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বললে, 'ভারি সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু আপনাকে।'

'হ্যাঁ, তা মানিয়েছে। কিন্তু যাব কোথায়? রাণীদির বাড়িতে, না ওস্তাদের আড্ডায়?

[ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

মধুসূদন তাঁর আপন কালের প্রতিনিধি ছিলেন, একথাও যেমন স্বীকার্য,—নিজের কালকে অতিক্রম করে অনেক দূরবর্তী ভবিষ্যৎকেও তিনি যে স্পর্শ করেছিলেন—এ কথাটাও তেমনি সত্য।—কি বলো আনন্দ?

প্রশ্ন শুনে সে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে ছোটো একটি 'হাঁ' বলে নিয়ে একটু খাপছাড়াভাবেই বললে—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, একালের 'ইন্দ্রনাথে'র লেখা পড়েছ? ১৩৬২ সালে 'মিহি ও মোটা' নামে তাঁর একখানি প্রবন্ধের বই বেরিয়েছিল। ঠিক 'প্রবন্ধ' না 'রম্যরচনা' বলা যাবে সেই লেখাগুলিকে, সে বিষয়ে অযথা এখানে কথা বাড়িও না।

বললুম—আমি একটাও অবান্তর কথা বলতে চাই না।

—বেশ, শোনো তাহলে। ইন্দ্রনাথের সেই বইয়ে 'মনের কথা' নামে একটি রচনার শেষ দিকের কয়েক ছত্র শোনাতে চাই তোমাকে।

—শোনাও।

আমি যে 'অযথা কথা বাড়াবার' খোঁটা শুনে ভেতরে ভেতরে বেশ একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলুম, আনন্দর সেটা বুঝতে বাধা ছিল না। সে ভাবের মানুষ,—আমাদের মতন ঘড়ি-বাঁধা. চালচলন নয় তার। বাঁধা-সময়ে নির্দিষ্ট কোনো প্রসঙ্গ শেষ করবার দায় নেই তার। মনে মনে নিজেকে সে যে না চেনে, একথাও আমি মানি না। মাঝে মাঝে তার কোনো কোনো মন্তব্যে খুব সহনশীল শ্রোতারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। কিন্তু আমি নিজে তার কাছে ধৈর্য হারাবো না,—শুধু পাঠকের সময়ের দাম মনে রেখে আমি তাকে বেশি সময় নষ্ট করতে দেবো না, এই অঙ্গীকার ছিল আমার। আমি তাই নিজে যথাসম্ভব চুপ করে থেকে তাকেই বলবার সুযোগ দিলুম।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথের বই খুঁজে এনে জানলার সামনে বসে আনন্দ পড়তে আরম্ভ করেছে—

'আমাদের জাতীয় মনের সবচেয়ে বড় আনন্দ বোধহয় শব্দে। আকাশ-বিদারী কড়া নিনাদে ও চড়া হট্টগোলে আমাদের চরম পরিতৃপ্তি। এই চড়া ও কড়ার প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য অপরকে নিজের আনন্দের অংশ দেওয়া। আমরা রেডিও কিনি প্রধানত প্রতিবেশীকে শোনাবার জন্য এবং সেজন্যই ঘরে কেউ না থাকলেও যন্ত্রটা এমন ধাপে সর্বক্ষণ চালিয়ে রাখি, যাতে এক মাইল দূরের লোকও সেদিনের বাজার-দর স্পষ্ট শুনতে পায়। জগতের আর সব জাত পুজো করে শান্ত নিঃশব্দ পরিবেশে. আমাদের কাঁসি-ঘণ্টার কর্কশ ঝঙ্কারে ভূত পর্যন্ত পালায়।'

মধুসূদন এবং সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনার প্রসঙ্গ থেকে হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ উঠতে দেখে আমার ভেতরকার সহিষ্ণু কিন্তু সতর্ক সেই প্রহরী উসখুস করতে লাগলো।

আনন্দ তার কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি না, আমার সেই অনুচ্চারিত আপত্তি বুঝতে পারলো। যেখানটা পড়ছিল, তার কয়েক ছত্র পরের অংশে এগিয়ে গেল সে—

'সেদিন কি একটা পুজোর তারিখ ছিল, যার ফলে পাড়ার সব নিষ্ঠাবান ছেলেরা স্থির করল সে গোটা কয়েক ভাঙা রেকর্ড লাউডস্পীকারের সবচেয়ে চড়া ধাপে সারা রাত না বাজালে পুজোর যথাযোগ্য মর্যাদা হবে না।'

আবার কয়েক ছত্র ডিঙিয়ে গিয়ে পাঠ চলতে লাগলো—

'একটা রেকর্ড শেষ হতেই ক্লান্ত দেহ ঘুমে ঢলে পড়ছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী গান চুরমার করে ভেঙে দিচ্ছে ঘুম। গানের সংখ্যা কম এবং সবগুলি মুখস্থ হয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না—অবশ্য শুধু সুরটুকু. কথা অনেকদিন আগেই অবোধ্য হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণ সে [লেখকের একজন বন্ধু, যিনি সেই শব্দব্রহ্ম বা শব্দাসুরের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলেন] খেলে চলল কোন্‌টার পর কোন্‌টা আসবে তা অনুমান করার খেলা। কিন্তু কর্কশ চীৎকার এক-একবার রাত্রির নিস্তব্ধতা নতুন করে বিদীর্ণ করে আর তার দেহের স্নায়ুগুলিও যেন ঝনঝন করে বেজে ওঠে। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে বাইরে এসে সে অনুষ্ঠান-কর্তাদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না, এমন কি লাউডস্পীকার দু'ধাপ নামিয়ে দিতেও তাদের আপত্তি।'

আমি বললুম—এসব আমাদের জাতিগত বিশেষত্ব বোধ হয়,—ইন্দ্রনাথ এই মোটা কথাটা ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু মধুসূদন এবং তাঁর সমকালের বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বলতে বলতে তুমি হঠাৎ এ-প্রসঙ্গে এলে কেন?

আনন্দ বললে—'গরুত্মতী তরী' কাকে বলে জানো?

—মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে আছে ও-শব্দটা; দীননাথ সান্যাল ও-কথার ব্যাখ্যায় লিখেছেন—পাল-তোলা নৌকো।

—'ফড়ে রড়ে' মানে কি?

—বোধহয় দ্রুততা এবং দৃঢ়তা এক-

[শেষাংশ ২৫৮৪ পৃষ্ঠায়]

পৃথিবীতে যেমন, সৌরজগতেও তেমনি অভিসারিকারা বসে নেই; যে যার দয়িতকে খুঁজে পাবার আশায় ছুটছে, তবে তফাৎ এই যে, পৃথিবীর অভিসারিকারা ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়াতে পারে কখনও, বাঞ্ছিতের সান্নিধ্য কখনও পেলেও পেতে পারে; কিন্তু মহাকাশ ধরে ছুটে-চলা সৌরজগতের নিরাশ্রিতা ও নিরাভরণা অভিসারিকারা সে সুযোগ থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিতা। গৌণ-গ্রহ বা গ্রহিকার লেবেল গায়ে এঁটে সৌর-পরিবারে ওরা চির-উপেক্ষিতা।

এই সেদিনও ওদের কথা কেউ জানত না এবং এমন কি আজও হয়তো ওদের নিয়ে কেউ এত ভাবত না, যদি-না গ্রহান্তরে যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত ওরা: ওদের ছোঁয়-বাঁচাবার ভাবনাটা যদি-না মানুষকে পেয়ে বসতো।

মানুষ দূরের গ্রহগুলোতেও পাড়ি দেবে একদিন: কিন্ত গৌণগ্রহ বা গ্রহিকাদের এড়িয়ে চলবে। গ্রহান্তর-যাত্রার সময় ওরা পথ বেছে নেবে এমন-ভাবে, যাতে অভিসারিকা গ্রহিকারা কোনোমতেই না নাগাল পায় ওদের।

কিন্তু তবু, এখনও বলা যায় না কিছুই। নাগাল পাওয়া-না-পাওয়া সম্বন্ধে শেষ-কথা বলতে বিজ্ঞানীরা এখনও নারাজ।

এখন গবেষণা চলছে। অবগুণ্ঠিতা সৌর-সহচরীদের তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে!

অবশ্য খোঁজাখুঁজি আগে যে একেবারেই হয় নি তা নয়: অনেক হয়েছে। নতুন নতুন খবরও মিলছে অনেক। ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারী 'পালের্মো' অবজারভেটরীর ডিরেক্টর খবর দিয়েছেন— নক্ষত্রের মতো কী যেন একটা পদার্থ দেখছি। বড় বেশি ঝাপসা আর অস্পষ্ট দেখছি যেন। পদার্থটা নক্ষত্রের পটভূমিতে ধীরে ধীরে যেন চলছে।

—কী ওটা? ওই চলমান রহস্য-জনটা?...নক্ষত্র? ধূমকেতু? গ্রহ?—ডিরেক্টর নিজেকেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

আর জবাবও দিলেন নিজেই,—ওর ধরন-ধারণ দেখে তো মনে হয়, গ্রহ। মনে হয়, সৌর-পরিবারেরই একজন ও।

—একজন? সৌর-পরিবারের একজন? —দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের অনেকেই সেদিন স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার করতে পারলেন না।

এদিকে দেখতে দেখতে খুঁজে-পাওয়া নতুনটির নামকরণ হল সিরেজ। বলা হল, ব্যাস ওর ৭৭০ কিলোমিটার বা ৪৮০ মাইল। চাঁদের তুলনায় অনেক ছোট ও। চাঁদ পৃথিবীর তুলনায় যত গুণ ছোট, ও চাঁদের তুলনায় ছোট ঠিক তত গুণ।

১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ওর চেয়েও ছোট আর একটিকে খুঁজে পাওয়া গেল। প্যালাস নাম দেয়া হল ওর। দেখা গেল, ব্যাস ওর ৩০০ মাইল।

কয়েক বছরের মধ্যেই এইরকম আরও দুটি সৌর-সহচরীর সন্ধান মিলল। জুনো এবং ভেস্টা নামে পরিচিত হল ওরা। কিন্তু গ্রহের মর্যাদা ওদেরও কেউই পেল না। বিশেষজ্ঞরা বললেন,—ওরা তো নয়ই, ওদের চেয়ে বড় যে দুটিকে এর আগে খুঁজে পাওয়া গেছে, গ্রহ আখ্যা তাদেরকেও দেয়া যায় না। বরং গ্রহের তুলনায় বড় বেশি ছোট তারা,—এই কথা যদি মনে রাখি তো তাদের আখ্যা দেয়া যায় গ্রহিকা বা এস্টিরয়েড।

সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মোট ৪০০টি গ্রহিকার সন্ধান মিলল এবং বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের শুরুতে এই সংখ্যা ২০০০কেও ছাড়িয়ে গেল।

গ্রহিকাদের বেশির ভাগেরই আস্তানা মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝামাঝি জায়গায়। তবে এ-জায়গার বাইরেও মাঝে মাঝে থাকে ওরা। উদাহরণ হিসেবে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত ইরোজ এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে খুঁজে-পাওয়া হিডালগো নামক গ্রহিকা দুটির কথা বলা যায়।

ইরোজ-এর চলার পথটুকুর বেশির ভাগই মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের মধ্যে: অর্থাৎ, মঙ্গল ও পৃথিবীর মাঝামাঝি এলাকায়। আবার হিডালগোর পথটি বৃহস্পতির কক্ষপথ ছেদ করে শনিগ্রহের একেবারে কাছাকাছি এলাকা অবধি চলে গেছে।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে হিডালগোর চেয়েও বেশি কেন্দ্রাপসারী গ্রহিকার সন্ধান পাওয়া গেল। অর্থাৎ, পাওয়া গেল এমন একটি গ্রহিকার সন্ধান, যা কেন্দ্র ছেড়ে হিডালগোর তুলনায় আরও অনেক বেশি দূরে যায়।

সৌরজগতের এই নতুন খুঁজে-পাওয়া বিস্ময়টির নাম দেয়া হল এদোনিস।

এই এদোনিস সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে যখন, বুধগ্রহের কক্ষপথকে তখন সে প্রায় স্পর্শ করে; আর যখন থাকে দূরে, তখন অতিকায় গ্রহ বৃহস্পতির সঙ্গে সে পাল্লা দেয়।

এই পাল্লা অন্য কোনো দিক দিয়ে নয়, অবশ্যই দূরত্বের দিক দিয়ে। কেন না, একদিকে বুধগ্রহ থেকে সূর্যের দূরত্ব ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ কিলোমিটার, আর অপরদিকে বৃহস্পতি আছে সূর্য থেকে ৭৭ কোটি ৭৮ লক্ষ কিলোমিটার দূরে।

এখানেই শেষ নয়। সূর্যের কাছে-আসা এবং সূর্য থেকে দূরে-সরবার দিক দিয়ে এদোনিসকে ছাড়িয়ে যায়, এমন গ্রহিকার সন্ধানও কালক্রমে পাওয়া গেল। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত হল অদ্ভূত-আশ্চর্য ইকেরাস। জানা গেল, বুধগ্রহের চেয়েও সূর্যের অনেক কাছে যায় সে। অর্থাৎ, এতটা কাছে সে যায়, আমাদের পরিচিত কোনো গ্রহের যেখানে যাওয়ার নাকি প্রশ্নই ওঠে না।

—কিন্তু তবু, ক'টা আর গ্রহিকাকে আমরা জানি! চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের ভিড় যেখানে, দু'এক হাজারকে মাত্র জেনে সেখানে কতটুকুই বা লাভবান হই!—অনেকেই বললেন।

এ ছাড়া, যাদের আমরা জানি, তাদেরও আকার-প্রকারে মিল নেই মোটে। কয়েকটি মোটে গ্রহিকা আছে, যাদের ব্যাস ৪৯০ কিলোমিটার ব্যাসওয়ালার

প্যালাস-এর কাছাকাছি। প্রায় ৭০টি গ্রহিকার ব্যাস ১০০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি। তবে ২০ থেকে ৪০ কিলোমিটার মাত্র ব্যাস,—এমন গ্রহিকাও নেহাৎ কম নেই সৌরজগতে। ২ থেকে ৩ কিলোমিটার ব্যাসের গ্রহিকাও আছে শত শত।

সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে, গ্রহিকাদের ওজন কত? সব মিলিয়ে ভর কত ওদের? পৃথিবীর চেয়ে বেশি? বিশেষজ্ঞরা বলছেন,—না, মোটেই তা' নয়। আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত সব রকম গ্রহিকার সম্মিলিত ভর হবে পৃথিবীর এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

পৃথিবীর মতো আবহাওয়া নেই গ্রহিকাদের দেশে। খুবই ছোট বলে বায়ুমণ্ডলকে ওরা ধরে রাখতে পারে নি। কিন্তু বিস্ময় লাগে ভাবতে, কোনো কোনো দিক দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে ওদের আবার মিলও আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বড় দু'টি গ্রহিকা সিরেজ এবং প্যালাস আলোক প্রতিফলন করে থাকে ঠিক পৃথিবীরই শিলার অনুকরণে। জুনোর আলোক-প্রতিফলন দেখেও পৃথিবীরই শিলার কথা মনে আসে। আর ভেস্টার হালচাল দেখে মনে হয়, সে যেন সাদা মেঘে আবৃত।

—কিন্তু তা কী করে হবে? বায়ুমণ্ডলই নেই যেখানে, মেঘ সেখানে কী করে আসবে?—প্রশ্ন তোলেন বিশেষজ্ঞরা। বলেন,—তবে কি আলোক-প্রতিফলনের ক্ষমতা গ্রহিকাদের বেলায় অন্য রকম?

—কে জানে! হবে হয়তো!—আসল সমস্যাটা এখনও এড়িয়ে যান কেউ কেউ; গ্রহিকাদের অন্য সব খেয়ালীপনার ওপর জোর দেন। এদোনিস নামক গ্রহিকাটির প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন,—ধূমকেতুর মতো বিরাট ওর কক্ষপথ। কিন্তু পৃথিবীর টানে এখনও ও দিশেহারা। তাই পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার অবধি দূরে এক এক সময় ও আসে।

অ্যাপোলো এই একই জাতের আর একটি গ্রহিকা। যে বছর একে আবিষ্কার করা হয়, সে বছর পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ কিলোমিটার।

মাত্র কেন না, গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় এ কিছুই নয়। এমন কি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি এলে প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলের সঙ্গেও তার দূরত্ব দাঁড়ায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোমিটার। শুক্রগ্রহ অবিশ্যি আরও কাছে আসে আমাদের। পৃথিবী থেকে ৪ কোটি কিলোমিটার অবধি দূরে আসে। অপরদিকে অ্যাপোলো আসে শুক্রগ্রহ থেকে মাত্র ২ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। বলা বাহুল্য, এ দূরত্ব পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্বেরও প্রায় অর্ধেক।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, গ্রহিকারা এক এক সময় উপগ্রহের চেয়েও বেশি কাছে এগোয় গ্রহদের এবং অ্যাপোলো শুক্রের যতটা কাছে এগোয় ঠিক ততটা এগোবার সাধ্যি সৌরজগতের কোনো সভ্যেরই নেই।

কিন্তু তবু, এমন অন্তত একটি গ্রহিকার খবর আমরা রাখি, চরিত্রের দিক থেকে অ্যাপোলোর সঙ্গে যা'র আশ্চর্য মিল। এই গ্রহিকাটির নাম হারমেস। এর ব্যাস ১ কিলোমিটার: অর্থাৎ, অ্যাপোলোর প্রায় অর্ধেক। পৃথিবী থেকে এ ৫ লক্ষ কিলোমিটার অবধি দূরে আসে এক এক সময়। অর্থাৎ, চাঁদ যতটা দূরে আছে পৃথিবীর, এই হারমেসও কালেভদ্রে পৃথিবী থেকে ঠিক ততটা দূরেই আসে।

কিন্তু হারমেস তো খুদে গ্রহিকা! ওর আসা-যাওয়া নিয়ে এত কিছু মাথা ঘামিয়ে লাভ?

বিশেষজ্ঞরা বলেন,—খুদে সে নামেই। আসলে তা'র তুলনায় অর্ধেক কোনো গ্রহিকাতেও গ্যানিট-পাথর যদি থাকে তো তা' দিয়ে ৩০০টি পিরামিড গড়া যাবে।

—পিরামিড!—স্তব্ধ বিস্ময়ে আবার আকাশের দিকে তাকাই আমরা। অপার-রহস্যময়ী, অনন্ত-চঞ্চলা অভিসারিকা গ্রহিকাদের খুঁজে বেড়াই।

॥ বই বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা ॥

[২৫৮২ পৃষ্ঠার পর]

সঙ্গে বোঝাবার জন্যেই মধুসূদন ও-দু'টি ব্যবহার করেছিলেন।

—চতুর্থ সর্গে এক জায়গায় আছে—'অনম্বর-পথে চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি'—সেখানে 'অনম্বর' শব্দটা কি অনিবার্য ছিল?

আনন্দর উদ্দেশ্য আমার বোধগম্য হোলো। মধুসূদনের শব্দাড়ম্বর সম্বন্ধে তার কিছু বক্তব্য আছে। তাঁর সমকালীন কবিদের সম্বন্ধেও একই সূত্রে সে কিছু উদাহরণ দেখাবে বোধ হয়। আমি বললুম—মধুসূদন যে আমাদের একালের আমোদপ্রিয় ছেলেদের মতন প্রতিবেশীর কান ঝালাপালা-করা শব্দের স্ফূর্তি দেখিয়ে গেছেন, তা আমি কখনই মনে করি না।

আনন্দ বললে—আমিও তা মনে করি না। কিন্তু শব্দের সূক্ষ্ম কারুকার্য,—ধ্বনির মিহি আবেদন সে-কালের বাংলা রচনায় কতোটুকুই বা পাওয়া যায় বলো? তবে, নিজের কালের অন্যান্য কবিদের লেখায় মধুসূদন এ-জিনিস একেবারেই পান নি। একমাত্র তাঁর নিজের কবিতাতেই এ-ব্যাপারের কিছু কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। একথা ঠিকই। তবে, 'পয়ুষতী' শব্দটার কোনো শিল্পগত কারণ ছিল না। 'গগন ছাইয়া উড়িল কলম্বকুল'—কথাটা অন্যায়ভাবেও বলা যেতো বোধ হয়।

বললুম—এসব তর্কসাপেক্ষ প্রসঙ্গ।

—সব প্রসঙ্গই তো তর্ক জাগাতে পারে।

—তা হয়তো পারে, কিন্তু থাক্ ও-কথা।

আনন্দ চুপ করলো।

বললুম—মধুসূদনের নায়ক-নায়িকারা জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করে অমর হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহী। অনেকেই প্রবল প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল। কিন্তু যে জগতে তাঁরা বাস করে গেছেন, সে-জগৎ বিশ্বাস করতো—'সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে'—বিধাতা যা ব্যবস্থা করেছেন, পরিণামে তা মঙ্গলজনক। সে-কাল একালের মতো ছিন্নমূল ছিল না।

—অষ্টম সর্গের কথা।

—হাঁ, কিন্তু কথাটা এইদিক থেকে বিবেচ্য যে, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং এঁদের সমসাময়িক বা পরবর্তী যাঁরা, তাঁদেরও অনেকেই ছিলেন সমবিশ্বাসী মানুষ।

এ-কথায় আপত্তি হবে কেন? কিন্তু হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের কবিতা মধুসূদনের সঙ্গে একই আসরে আলোচনার যোগ্য নয়।

বললুম—কেউ কেউ চড়া সুরে কথা বলতে ভালবাসেন বটে, কিন্তু তুমি তো অন্য স্বভাবের মানুষ, আনন্দ! তুমি এই কথা বলছো শুনে আজ আমার আর একজনের কথা মনে এলো।

—কার কথা?

—'এলো-মেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য' নামে একখানি বইয়ে কবি বিষ্ণু দে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—শহীদ সুরাওআর্দি আর মনোমোহন ঘোষ ছাড়া আর কোনো ভারতীয় কবিই 'ইংরেজি গদ্য বা পদ্যকাব্যে' তখন দক্ষ ছিলেন না। সরোজিনী নাইডু, ইকবাল, শ্রীঅরবিন্দ, কাশীপ্রসাদ—কাউকেই তিনি পাত্তা দেন নি।

আনন্দ বেশ খুশি হয়ে, মজা পেয়ে হেসে উঠলো। তারপর বললে—আমি চড়া সুরে কিছুই বলতে চাই না। কিন্তু মধুসূদনের কবিতা পড়বার পরমুহূর্তেই তুমি নবীন সেন ছুঁতে পারো?

বললুম—একেই বলে চড়া কথা।

সে বললে—আজ তাহলে এখানেই আলোচনা স্থগিত থাক। [ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ তিন ॥

দরজার গোড়ায় একটু দাঁড়িয়ে পড়ল প্রবীর।

দিদির মেয়ে 'অলিভারের' নাচ নাচছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু বেছে বেছে ফ্যাগিনের নাচটা কেন? সোনার চামচে মুখে করে যে জন্মেছে, তার তো পকেট মারতে শেখাটা খুব জরুরি কাজ নয়।

মনীশদা তখনো সকালের কাগজটা পড়ছিল, দিদি একটা সচিত্র মহিলা পত্রিকা কোলের ওপর রেখে বেশ মনোযোগের সঙ্গে নাচ দেখে যাচ্ছিল টিনটিনের। দিদির চোখে বেশ উৎসাহ প্রকাশ পাচ্ছিল, পায়ের চটিতে তাল পড়ছিল, বোঝা যাচ্ছিল দিদিরও মনে মনে নাচটা চলছে।

ছুটির সকাল। বেশ একটি পরিতৃপ্ত স্বচ্ছন্দ দিন। খোলা জানলা দিয়ে দক্ষিণের হাওয়া সাঁতার কাটছে ঘরে। একফালি রোদ এসে পড়েছে দেওয়ালের একখানা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্‌ আর্টের ছবির ওপর। ছবিটা প্রবীর বোঝে না—দিদি কিংবা মনীশদা যে বোঝে তা-ও নয়। তবু ও-সব এক-আধখানা রাখতে হয় ঘরে—নইলে ঠিক রুচির পরিচয় দেওয়া যায় না। দেওয়ালের আর একদিকে রবীন্দ্রনাথ—বিষণ্ণ এবং গম্ভীর।

এমন একটি রমণীয় পারিবারিক আসরে—এই সংস্কৃতি-চর্চার ভেতরে, দাড়ি না-কামানো মুখ, আধ-ময়লা জামা-কাপড় এবং যে জুতোটাকে আর কিছুতেই পরা উচিত নয়, সেটা পায়ে গলিয়ে ঢুকে পড়াটা ঠিক হবে কি না প্রবীর একবারের জন্যে তা ভাবল। কিন্তু তার আগে দিদির চোখ পড়ল তার ওপর।

'কে. তুলু? আর—তুলু—'

হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলে রেডিয়োগ্রামটা।

মনীশদা কাগজ সরিয়ে তাকালো; অনিচ্ছায় পা থামল টিনটিনের।

'এসো হে—এসো। খবর-টবর কী?' —মনীশদা ডাকল।

আসরটা নিশ্চয় মাটি হয়ে গেল, কিন্তু এখন আর করবার কিছুই নেই। সাক্ষাৎ রসভঙ্গের মতো বেয়াড়া জুতোটা পায়ে দিয়ে এবং দাড়ি না-কামানো মুখ নিয়ে প্রবীর ঢুকে পড়ল। তারপর সামনের সোফায়।

'খবর আর কী—এমনিই দেখা করতে এলুম।'

'মা ভালো আছে?'—দিদির জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ, ভালোই আছেন।'

'টুলু?'

এক পলকের জন্যে নরম সোফার ভেতরে শক্ত হয়ে গেল প্রবীর। বলা উচিত হবে? এই পুব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাটের এমন সাংস্কৃতিক নির্মল আবহাওয়ার মধ্যে বলা যায় কথাটা? বলা যায় যে, মস্তান প্রতুল একটা পানের দোকানে মারামারি করে এখন হাজতে? এবং সে এক্ষুণি এল মুরারি হালদারের কাছে তদ্বির করে—যাতে সে ছাড়া পায়, নেহাৎ পক্ষে থানার ও-সি তাকে কম্বল ধোলাই না দেন?

কী লাভ বলে? এদের কিছু আসে-যায় না। সেই বিজয়ার সময় একবার মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। তারপর এই ক' মাসের মধ্যে কোনো খবর নেয় নি আর।

'টুলু?'—আস্তে আস্তে জবাব দিলে: 'হাঁ, সেও ভালো আছে।'

মনীশদা বললে, 'পড়াশোনা তো আর করল না।'

'না। বলে, যে দেশে হাজার হাজার এন্‌জিনীয়র বেকার, সেখানে এডুকেশনের কোনো মানেই হয় না।'

'হুঁ, চরম জ্ঞানের বাক্য—' চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করল মনীশদা, তারপর টেবিল থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে ঠোঁটে পুরল: 'এ-সব জ্ঞান লাভ হলেই পরীক্ষা দিতে গিয়ে চেয়ার-ডেস্‌ক ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়, তারপর সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ।'

'তুমি থামো—' দিদি ঝনঝন করে উঠল: 'এগুলো পড়াশুনো না করবার ফন্দী ছাড়া কিছু নয়। আগে বেরিয়েই আসুক না এন্‌জিনীয়র হয়ে—তারপর যদি চাকরি না পায়, তখন আন্দোলন করুক।'

না—টুলুর জন্যে ওকালতির কিছু নেই। চাকরি পাব না—এ কথা ভেবে সে পড়াশুনো ছেড়ে দেয় নি। তাকে ডেকে নিয়েছে সেই অন্ধকার—যাকে আমরা কেউ চাই নি, অথচ ইতিহাসের দেনা যাকে আপনিই ঘনিয়ে এনেছে। কিন্তু সে প্রশ্ন নয়। দিদির বলার ঢংটাই খারাপ লাগল!

'যারা আন্দোলন করছে—মানে যে-সব এন্‌জিনীয়র এখনো বেকার, তাদেরই কি খুব সুবিধে হচ্ছে দিদি?'

একটু অস্বস্তি বোধ করল দিদি। ঠিক এইরকম একটা পাল্‌টা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না।

চুরুটটাকে গালের এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিলে মনীশদা।

'লেট মী আনসার দিস্‌ কোয়েশ্চেন অন হার বিহাফ। আই নো প্রবীর, তোমার একটা লেফটিস্ট টেনডেন্সি আছে। তুমি আগে আমার এই প্রশ্নটার জবাব দাও। চাকরির সোর্সগুলো যদি নিজেরাই বন্ধ করে দাও—এমপ্লয়মেন্ট সমস্যার সমাধান কী করে হবে বলতে পারো?'

'খুলে বললে।'

এই অতি বিরস আলোচনায় টিনটিনের বিরক্ত লাগছিল। সে বাক্স নিয়ে ব্যস্ত খানটায়।

'আইসক্রীম খাবে বড়ো মামা?'

আইসক্রীম! সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল টিনটিনের দিকে। প্রবীর হাসল।

'হঠাৎ আইসক্রীম কেন রে?'

'আমি নিজে তৈরি করেছি যে। নিয়ে আসব ফ্রীজ থেকে?'

'ও তোরাই খা। আমার একটা দাঁত কনকন করছে ক'দিন ধরে, ওতে অসুবিধে হবে না? [illegible]'

দিদি বললে, 'মঙ্গলকে একটু চা করতে বলে দাও টিনটিন।'

'বলছি'—এমন উচ্ছল মাছের ভঙ্গিতে টিনটিন বেরিয়ে গেল।

একটু অন্যমনস্ক হল প্রবীর। একটা অস্বস্তিকর স্মৃতি যেন। দিন চারেক আগে—রাত নটা নাগাদ—পার্ক স্ট্রীটে? তখন তার ভাবনা অন্যদিকে ছিল; একটা ছায়া যেন পড়েছিল চোখের ওপর, মনে পড়ে নি। এখন সবটা যেন হঠাৎ তীক্ষ্ম রেখায় ফুটে উঠল, সব বিস্বাদ হয়ে গেল; অত্যন্ত বিশ্রীভাবে সে অনুভব করল, সেই মেয়েটি টিনটিনই বটে। কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটা—

মনীশদা আবার শুরু করল: 'তোমরা রাতদিন ঘেরাও করবে—কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, কনস্ট্যান্ট লেবার-ট্রাবল্। ফ্যাক্টরীগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে অন্য স্টেটে। মহারাষ্ট্র তো আছেই, পঞ্জাব-হরিয়ানা কিভাবে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ডেকে নিচ্ছে, দেখছ তো? ফার্মগুলো বন্ধ করে দেবে—অথচ বেকার এন্‌জিনীয়ারের চাকরি চাই—এ তো মন্দ রসিকতা নয় হে!'

'মনীশদা—বাংলা দেশে না হয় ঘেরাও শুরু হয়েছে সেদিন। কিন্তু প্রব্লেমটা যে তার অনেক আগেই জট পাকিয়েছে—একথা আপনি ভুলে গেছেন বোধ হয়।'

দিদি বিরক্ত হয়ে উঠল: 'থাম্ তো বাপু, কী কচকচি আরম্ভ করলি তোরা। রাতদিন এসব শুনছি কানের কাছে, মাথা ধরে গেল। হ্যাঁ রে, টুলুর কি এইভাবেই চলবে নাকি?'

মনীশদা একটু হেসে আবার তুলে নিলে কাগজটা। প্রবীর বললে, 'আমি জানি না। তুই-ই জিজ্ঞেস করিস ওকে।'

'জিজ্ঞেস করব যে, পাচ্ছি কোথায় ওকে?'

প্রবীর চুপ করে রইল।

দিদির ভুরু দুটো জুড়ে এল এক জায়গায়: 'ভাবতেই পারা যায় নি, ওটা হয়ে যাবে এভাবে। অথচ, বাবা কত আশা করতেন ওর ওপরে। লেখাপড়ায় এমন ভাল ছিল—'

হয় তো ছিল। কিন্তু বাবা যে ভাবতেন প্রতুল একেবারে আইনস্টাইন হয়ে উঠবে, স্কুলের নীচু ক্লাশের রেজাল্ট থেকে সেটা প্রমাণ হয় কিনা বলা শক্ত। আসলে যে-বাবা নিজেকে ইন্টেলেকচুয়াল ভাবতেন, ইংরিজি খবরের কাগজ খুঁজে তা থেকে ভুল বের করবার চেষ্টা করতেন, তিনি যে শুধুই এ-জি বেঙ্গলের একজন সিনিয়র ডিভিশন ক্লার্ক—এই গ্লানিটা তাঁর মন থেকে কিছুতেই যেত না। তাই প্রতুল লেখাপড়ায় একটু ভালো—এই সম্ভাবনাটাকে তিনি নিজের মনের মধ্যে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বেলুনের মতো গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু স্বভাব বেলুনটা টিকল না। যেশিক্ষণ—বাবার অতিরিক্ত প্রত্যাশাই ফেটে গেল সেটা।

প্রবীরের চটকা ভাঙল। ঝাঁকালো গলায় দিদি কিছু বলছিল।

'বাবা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মা এমন হোপ্‌লেস্—'

প্রবীরের বুকে ব্যথা চিনচিন করে উঠল একটা। বাবার আর একটি দান। রাতদিন নিরীহ নির্জীব মা-কে শুনিয়েছেন: 'তুমি কিচ্ছু বোঝো না—তুমি একটি ইডিয়ট।' সেই শিক্ষাটা পুরো নিয়েছে দিদি—মাকে চিরকাল অবজ্ঞা আর অনুকম্পা করে এসেছে; সেই জন্যেই বাবার মৃত্যুর পর টুলু এত বেপরোয়া। আর দাদা—বাবার ভাষ্যে সে তো ডালার্ড—কে তাকে আর গ্রাহ্য করে?

বাবা আর একটু কম ইন্টেলেকচুয়াল হলে ভালো করতেন।

দিদি বলে যাচ্ছিল, 'মা এমন হোপ্‌-লেস্ যে ছেলেটাকে একটু কণ্ট্রোল পর্যন্ত করতে পারল না।'

বিরসভাবে প্রবীরের বলতে ইচ্ছে করল: মা তো সংসারে চিরদিন ছায়ার মতো আড়ালে থাকলেন—তাঁকে মিথ্যে টেনে আনছিস কেন? টুলুর কণ্ট্রোল বিগড়ে দেবার পক্ষে বাবা আর তুই-ই যথেষ্ট। কিন্তু বললেই দিদির মুখ ছুটবে, আরো একরাশ গালাগাল করবে মা-কে। কখনো কখনো দিদি আশ্চর্য রকমের নিষ্ঠুর হতে পারে। কী লাভ মা-র অপমানের বোঝা বাড়িয়ে?

মনীশদার যে আলাদা কোনো মত এ ব্যাপারে আছে তা নয়। সে বুদ্ধিমান মানুষ—এ্যাটর্নি—লাভ-ম্যারেজের মূঢ়তা নিয়ে দিদিকে আগে ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি। কিন্তু বিয়ের পরে নিশ্চয় বুঝেছে যে, দিদির সঙ্গে যত বেশি একমত হওয়া যায়, সংসার এবং শান্তি ততই বেশি নিরাপদ।

কিন্তু শ্যালকের সামনে—গলা খুলে শাশুড়ীর এই নিন্দা—তার চক্ষুলজ্জায় বোধ হয় একটু বাধল।

'আঃ উমা, কী বলছ! এভাবে বলা ঠিক নয়।'

দিদি [illegible] 'তুমি চুপ করো। এগুলো আমাদের বাড়ির ব্যাপার, তোমার কন্‌সার্ন নয়।'

মনীশদা থমকে, 'কিন্তু—'

'কথা না। আমার কথা কী জানো? [illegible] দিতে হয়। আর সে [illegible] দোষেগ মুর্খামি—[illegible]।'

[illegible] কিন্তু—[illegible] হয়, কিন্তু—প্রবীরের কপাল কুঁচকে এল: রাত ন'টার পরে—পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁ থেকে—একটা ছোকরার হাত জড়িয়ে—কিংবা কে জানে এ-ও হয়তো দিদির ট্রেনিং-এর অংশ!

মঙ্গলের হাতে ট্রে এল। দিদির বক্তৃতা থামল।

চা তৈরি করে এগিয়ে দিয়ে দিদি বললে, 'কিছু খাবি? ভালো কেক আছে।'

'না দিদি, খিদে নেই।'

মনীশদা আবার কাগজ নামালো কোলের ওপর।

'তারপর ব্রাদার, তোমাদের যুক্তফ্রন্ট গভর্নমেন্টের খবর কী?'

'তোমাদের বলছেন কেন? ফ্রন্ট যাদেরই হোক, গভর্নমেন্ট তো সকলেরই।'

'না হে, সকলের গভর্নমেন্ট নয়। এঁরা কৃষক আর শ্রমিক নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন, বাকী সবাই এদের হিসেবে একেবারে আগাছা।'

আবার খানিক বিরস তর্কের সূচনা।

চুরুট নিবে গিয়েছিল, ধরাতে ধরাতে মনীশদা বলে চলল: 'তোমরা তো আমার স্বর্গ-দিগন্ত দেখেছিলে হে! ভেবেছিলে তিন মাসের ভেতরেই দেশ একেবারে আলোতে ঝলমল করে উঠবে। এখন তো দেখছি নিজের কামড়াকামড়ি ছাড়া আর কোনো প্রোগ্রাম নেই তোমাদের।'

'আমাকে টানছেন কেন? দেশের অধিকাংশ লোকই আশা করেছিল।'

'আশা মিটেছে?'—চশমার ফাঁক দিয়ে মনীশদার চোখে বিদ্রূপ ঝিকমিক করতে লাগল: 'যা শুরু করেছ তোমরা—তোমাদের যৌথ দেশসেবা তো গঙ্গাযাত্রা করল বলে।'

'অন্যেরা তো অনেকদিন চালালেন মনীশদা! তাঁরা নির্ভুল ছিলেন না—এঁদেরও ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে।'

'সব ভেস্তে গেলে?'

'হয়তো তারও দরকার আছে। ভুলের ভেতর দিয়ে নির্ভুলের চেষ্টা করা।'

কিন্তু ভুলগুলো বড্ড কস্টলি, বোনাও। দেশ জুড়ে যা চলছে, স্রেফ খুনোখুনি। সাধে কি তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন—'

'মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা ব্যক্তিগত, কিংবা তাঁর দলের। ও থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।'—ভেতরে ভেতরে উত্তাপ বোধ করতে লাগল প্রবীরঃ 'মনীশদা—সময়ের চেহারাটা বড্ড তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। সমস্যাগুলো নিষ্ঠুর আর বাস্তব হয়ে উঠছে, তাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে সব, পথ জটিল হচ্ছে—যারা নেতৃত্ব নিচ্ছে তারাও সমস্তটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না। অনেক অন্যায় তো জমে গিয়েছিল, তার দাম দিতে হবে, ঠেকে শিখতে হবে বার বার।'

'বার বার?'—মনীশদা কুটিলভাবে হাসলঃ 'ভাবছ এবার ফ্রন্ট ভাঙলে আবার এরা ভোট পাবে?'

'ফ্রন্ট যে ভাঙবেই, আপনি কী করে জানলেন?'

'আমাদের জানবার দরকার কী—তোমাদের লীডাররাই তো গলা খুলে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। এই তো স্বয়ং তোমাদের'—

দিদি আবার বাধা দিলে বিরক্ত হয়ে।

'উঃ, আবার সেই পলিটিকসের কিচির-মিচির। ও-সব কিছু হবে না। দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তাই যাবে। নে ভুলু, মুখ বন্ধ করে চা খা এখন। একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।'

এই দাক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে যাওয়া, নিশ্চিন্ত বসবার ঘরটিতে দিদিই সভাপতি, তার কথাই চূড়ান্ত। মনীশদা আবার একটু হেসে খবরের কাগজটা তুলে নিলে। খুব সম্ভব শরিকী-সংঘর্ষের কোনো বিবরণ পড়তে লাগল প্রসন্ন মনে। চা-টা নিশ্চয় ভালো, কিন্তু কোনো স্বাদ পাচ্ছিল না প্রবীর। আজকের সকালটাই বিস্বাদ হয়ে গেছে।

মণীশদা স্বগতোক্তির মতো একবার পড়লঃ 'ওয়ান স্পীয়ার্ড টু ডেথ—হাউসেস গাটেড—'

দিদি কান দিলে না সেদিকে।

'টুলুকে একবার আসতে বলিস তো আমার কাছে।'

'আচ্ছা—ফিরে এলে বলব।'

'ফিরে এলে মানে?'—দিদি কৌতূহলী হল: 'গেছে নাকি কোথাও?'

সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিতে হল প্রবীরকে।

'মানে বাড়ি ফিরে এলে বলব।'

'বলিস। বেশ তো ছিল, কিন্তু কী যে হল লক্ষ্মীছাড়াটার—এভাবে বয়ে যাবে ভাবাই যায় নি। আসলে মা-র যদি ব্রেন কিছু না থাকে—'

চায়ের পেয়ালা সরিয়ে দিয়ে প্রবীর বললে, 'দিদি, আজ উঠি। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

পথে রোদের ধার বাড়ছে। দুধারে অ্যাভিন্যুর বাড়িগুলোরও নিস্তার নেই—'নকশালবাড়ির লাল আগুন', 'শ্রীকাকুলম', 'চেয়ারম্যান মাও', 'সশস্ত্র বিপ্লব।' রোদে লেখাগুলো ক্রোধের মতো জ্বলছে।

দেশ। অনেক ঋণ জমে উঠেছিল, অনেক দুঃখের ভেতর দিয়ে শোধ করবার পালা। সেদিন আসছে—আসবেই। কিন্তু কী হবে সেই ঋণশোধের চেহারাটা? কাদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ? কী ভাবে?

চলতে চলতে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু। একটা ছোট শোভাযাত্রা।

'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ—'

'যুক্তফ্রন্ট চলছে—চলবে—'

চলছে—চলবে? ঠিক কথা, চারদিকে ভাঙনের রেখা। অতি বড়ো আশাবাদী সমর্থকদেরও মন জুড়ে ছায়া। তবু আশা ধরে রাখতে হয় শক্ত মুঠোতে। জীবন তাই। হার মানতে সে জানে না।

কী থাকবে—কী যাবে কে বলতে পারে এই কাল-সন্ধিতে দাঁড়িয়ে? কিন্তু সব দুঃখ, সব ক্রোধ, সমস্ত যন্ত্রণা—আর—আর হয়তো অনেক অপচয়ের রক্ত—একদিন কোথাও না কোথাও এসে সংহত হবে। অনেক নেতৃত্ব উড়ে যাবে ঝড়ের পাতার মতো, এই কঠিন—অতি কঠিন কালটাকে যারা মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না—যারা দিশেহারা—ইতিহাস তাদের কোন্ অন্ধকারে যে ঠেলে দেবে, কেউ জানে না। খুব বড়ো একটা কিছুকে পেতে গিয়ে অনেক কিছু হারাতে হবে—কিন্তু না হারিয়ে কারা কী পেয়েছে কোনদিন?

রোদ বাড়ছে, পায়ের জুতোটায় অস্বস্তি, জ্বালা করছে মাথার ভেতরে। আচ্ছা—টুলু তো রাজনীতি করতে পারত? যদি সব কিছুর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জেগে থাকে, বেশ তো—নিজের জায়গা করে নিতে পারত যে-কোন একটা দলে? বলতে পারত—এ চলবে না, একে বদলাব?

কিংবা তারও চেয়ে সোজা নৈরাজ্যের রাস্তা। তার আকর্ষণ বেশি, প্রলোভন বেশি। হয় লড়ো, নইলে ডুবে যাও অবক্ষয়ের অন্ধকারে। অন্ধকারটাই সহজে হাতছানি দেয়। বিপ্লবের বিকল্প বিকার।

'প্রবীরদা?'

প্রবীর দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের বাস স্টপে স্বপ্না।

'কিরে—এ সময় এখানে?'

'একটু কাজে এসেছিলুম এদিকে। তুমি কোথায় চললে?'

'দিদির বাসায় এসেছিলুম। বাড়ি ফিরব এবার।'

'সবাই ভালো?'

'চলছে—' বলতে গিয়ে প্রবীর এক-বারের জন্যে ঠোঁট কামড়ালো: 'তোদের খবর কী?'

'একরকম—' একটু বিষণ্ণ হল স্বপ্না: 'তবে ছোটদা অ্যাবসকন্ড করে আছে।'

'বুঝেছি।'

ছোটদা—অর্থাৎ আনন্দ রাজনীতিতে চরমপন্থী। সে জানে, পার্লামেন্টারী পলিটিকসে কিছু হবে না—ওগুলো সব ভাঁওতা। সে কলেজ ছেড়ে চলে গেছে গ্রামে।

স্বপ্না আস্তে আস্তে বললে, 'মার্ডার চার্জ আছে ওর নামে।'

'বুঝেছি।'

'আমাদের জন্যে ভাবছি না—,' স্বপ্না আবার আবছা স্বরে বললে, 'কষ্ট হয় বাবার জন্যে।'

সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই—কী বলা যাবে? অনেক দাম অনেককে দিতে হবে—কে জানে কোন্ পথে, কীভাবে একদিন শোধ হবে এতকালের সমস্ত দেনাগুলো।

রোদ ধারালো। সামনের দেওয়ালে আধছেঁড়া একটা পোস্টার উড়ছে হাওয়ায়। ময়দানে কবে যেন বিরাট জনসমাবেশ ছিল, তারই ঘোষণা। স্বপ্নার কপালে কয়েকটা ঘামের বিন্দু।

'যাব একদিন তোদের বাসায়।'

'নিশ্চয় যেয়ো।'

স্বপ্নার বাস এসে পড়ল।

'চলি প্রবীরদা—'

'আয়।'

বাস চলে গেলে আরো কিছুক্ষণ ধারালো রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল প্রবীর, তার মাথাটা আরো বেশি জ্বালা করছিল। সে জানে। এই মেয়েটা টুলুকে ভালো-বেসেছিল।

রাস্কেল! দাঁতে দাঁত ঘষে স্বগতোক্তি করল প্রবীর: 'রাস্কেল! এই রকম এক টুকরো উজ্জ্বল ভালোবাসাই তো যে-কোনো জীবনকে বদলে দিতে পারে—তুই কি অন্ধকার ছাড়া পথ খুঁজে পেলি না আর?' [ক্রমশ]

দেওয়ালের লিখন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় মাইল-স্টোন দেখে ইংরেজি ফিগার শিখেছিলেন। জানবার সেই অদম্য ইচ্ছা এবং গ্রহণ করবার সেই ঐশ্বরিক ক্ষমতা অবশ্য তাঁর পর আর কারও মধ্যে অমন তীব্র ছিল বলে শোনা যায় নি। বিদ্যাসাগর মশায় দারিদ্রের সন্তান। অবিশ্বাস্য মেধার অধিকারী। ল্যাম্প পোস্টের তলে দাঁড়িয়ে এ'রা অনায়াসেই বিদ্যাভ্যাস করতে পারেন। কিন্তু এই অত্যল্প চাহিদাও সে যুগে মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত না শহর কলকাতা। কোঠা-বাড়ির সংখ্যা ছিল স্বল্প। বিজ্ঞাপনের বহর ছিল কম। সুলভ সংবাদপত্র তখনও মাতৃগর্ভে।

আজ শহরের প্রতি বড় বড় কোঠা-বাড়ির ছাদে, বুকে, পেটে, কানে সর্বত্র বিজ্ঞাপনী অক্ষরমালা ইংরেজি-বাংলা বর্ণমালাকে ছত্রাকারে ছড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় কোনও বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করলে পাঠশালার পাঠে আর প্রয়োজন হত না তাঁর। শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ধীরে ধীরে মাসখানেক হেঁটে বেড়ালেই প্রবেশিকার জ্ঞান তিনি আপনিই আহরণ করে নিতে পারতেন। শুধু বর্ণমালা নয়, বিজ্ঞাপনী লিখন তাঁকে ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মায় রাজনীতি, প্রায় সব কটা জ্ঞাতব্য শাখা সম্পর্কেই প্রাথমিক ইঙ্গিতালোক দানে বঞ্চিত করত না। রাত্রিকালে ল্যাম্প পোস্টের সাহায্যও নিষ্প্রয়োজন, নিয়নের লিখন আকাশের বুকে ভাসমান।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় আর একটি মিলবে না। মনে মনে এজন্য কেমন একটা কৌতুককর ক্ষোভ ছিল আমার। সম্প্রতি এক ব্যক্তির উদ্বুদ্ধ সামাজিক দায়িত্ববোধে সে ক্ষোভের পুনরুজ্জীবন ঘটায় শহর কলকাতার জন্য এহেন সাব-জেক্ট আপনি এসে পড়ল।

শহরের প্রাচীরগাত্রগুলি ইদানীং ব্ল্যাক বোর্ডের কাজ করছে। ফিল্মী পোস্টার থেকে রাজনৈতিক বক্তব্যের ঠাসা-ঠাসি। চোখ পাতলেও দৃষ্টি ক্লান্তি বোধ করে। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস উদ্যানের পশ্চিমে একটি দামী দেওয়ালে নজরবন্দী হলাম সেদিন। প্রখ্যাত জনৈক ডাক্তার ভদ্রলোকের প্রাসাদ-তুল্য বাড়ির দেওয়ালে জনৈক মহানুভব ব্যক্তি যে-কোন রাজনৈতিক বক্তৃতার বদলে বাংলা বর্ণমালা কালো কালিতে সাজিয়ে দিয়েছেন। 'অ' থেকে অনুস্বর পর পর সারিবন্ধ। লিখনের পরিশেষে নিজের নামটি এবং ঠিকানা (অবশ্য দুরকম) অজস্র ভুল বানানে প্রচারও করেছেন। এ দৃশ্য বিদ্যাসাগর মশায়ের বিদ্যার্জন পিপাসার ইতিহাসটুকু মনে করায়। উৎসুক নিরক্ষর বিদ্যার্থী তেমন কেউ থাকলে ঐ মাগনা পাঠশালায় পাঠগ্রহণ করতে পারে।

এই দেওয়াল ব্ল্যাক বোর্ডটি, কী আশ্চর্য, স্যার আশুতোষের নামাঙ্কিত মহাবিদ্যালয়ের দিকেই ড্যাবডেবে চোখ তুলে আছে। এমন ভয়ঙ্কর রসিকতার জনক সম্পর্কে স্বভাবতই কৌতূহল জাগে। ভদ্রলোক মহাবিদ্যালয়কে বর্ণমালা পাঠের প্রস্তাব জানান। বাস্তবিক রসিক সুজন।

অবশ্য বাংলা বর্ণমালা ছোট্ট কয়েক ডিগ্রী বাক্সে পোরার পরও আমরা যে সঠিক জানি এমন দাবি না রাখাই ভালো। 'হ্ন' এবং 'হ্ণ'-এর পার্থক্য লিখবার সময় অনেকেই সঠিক বজায় রাখতে পারে না। বানানের কথা তো বাতিল। যদিও বাংলা ভাষায় তৎসম তদ্ভব শব্দের বানান একটা নির্ধারিত রীতি মেনে চলে। বর্ণমালাও যে আমাদের মনে যথাযথ পারম্পর্য বজায় রেখে সাজানো আছে, এমন দাবি করাও হয়ত সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ইংরেজি অভিধানে বানান খুঁজে নিতে যত কম সময় লাগে, আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি, আমরা বাঙালী সন্তানরা তত সহজে বাংলা বানান এক উদ্যমে অভিধান খুঁজে বার করতে অক্ষম। জানি না, যে রসিক ব্যক্তি প্রাচীরগাত্রে বর্ণমালা সাজিয়ে দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে তাঁর কোনও বিশিষ্ট বক্তব্য আছে কিনা। কিম্বা বেওয়ারিশ শহুরে দেওয়ালের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার লক্ষ করে কোনও নিদাঘতপ্ত দুপুরে ইনি মগজের 'স্কু' হাল্কা করার জন্যই উপলক্ষ কীর্তি রেখে গেছেন হয়ত বা।

শহর কলকাতার দেওয়ালসমূহ এক-কালে গৃহস্বামীর মনোমত সৌন্দর্য সাধনার ক্ষেত্র ছিল। তিনি পলেস্তারা করাতেন, রঙ করাতেন। কিন্তু শহুরে দেওয়াল ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে থাকে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স কোম্পানী-দের কল্যাণে। তাঁদের বিজ্ঞাপনী পোস্টারের বেওয়ারিশ জায়গা হয়ে ওঠে পরগৃহ-প্রাচীর। আর সেই সব কুৎসিত পোস্টার মদের গ্লাসে নর্তকীর ছবিকে এমনভাবে ধরে রাখতে শুরু করে যে, দেওয়াল পোস্টারিং-এর ওপর সেন্সর বোর্ড থাকলে নির্ঘাৎ অশ্লীলতার অভিযোগে ঐ লজ্জাকর-জনক কীর্তিকলাপ বন্ধের আয়োজন করা হত, নগরকে সত্যই ভদ্রস্থ রাখার জন্য। ট্যাক্স-আদায়ী কর্পোরেশনও নৈতিকভাবে অন্তত সে দায়িত্ব পালন করতে অগ্রসর হতেন। তবে এদেশে দায়িত্বের বোঝা কেউ বড় একটা কাঁধে তুলতে চান না। কর্পোরেশন তো ও বালাই বহন করাকে প্রফেশন-গত অপরাধ বলেই গণ্য করেন।

বর্তমানে, তবু ভালো, শহুরে দেওয়াল-গুলি বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক প্রচারের রঙিন বোর্ডে রূপান্তরিত হচ্ছে।

কুৎসিত পোস্টারের চেয়ে শহরের সমস্ত দেওয়াল যদি রাজনৈতিক প্রচারের রঙিন বোর্ডে রূপান্তরিত হয়, অন্তত একটি সামাজিক উপকার তার দ্বারা সম্ভব।

রাজনৈতিক বক্তব্য তাঁদের কাছেই পৌঁছয়, গ্রহণ-বর্জনের মতো মানসিকতা

[[illegible]]

কৃষক আন্দোলনের নামে দলবাজী

প্রণবেশ চক্রবর্তী

[মতামত লেখকের]

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির ভাব দেখা দিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ার পর জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, যে অসীম প্রত্যাশার জন্ম হয়েছিল, বলতে দ্বিধা নেই, এক বছরের মধ্যেই তার অবসান ঘটেছে। সন্ত্রাস ও আতঙ্কের যে পরিবেশ বাংলা দেশকে গ্রাস করেছিল, তা থেকে মানুষ মুক্তির দিন গুণেছে। প্রত্যাশার এমন অপ্রত্যাশিত অপমৃত্যুতে মানুষের আশাভঙ্গ হয়েছে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এক বছরে যুক্তফ্রন্ট সরকার জনকল্যাণে কি করেছে? শরিকী সংঘর্ষ, রক্তপাত এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ছাড়া যুক্তফ্রন্টের আমলে মানুষ আর কি পেয়েছে?

ফ্রন্টের শরিক দলগুলিই এ-ব্যাপারে একমত নয়। কোন কোন দল ব্যর্থতার যে ছবি তুলে ধরেছেন, তাতে জনমনে বিপুল হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "জমি দখলের নামে লুটতরাজ এবং নারীনির্যাতন হয়েছে।" আসল কথা, কোন কোন শরিক দল যখন 'ভূমি দখলে'র আন্দোলনকেই সব থেকে বড় সাফল্য বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, শরিকী সংঘর্ষকে "শ্রেণী সংগ্রাম" বলে চালিয়ে দেবার আপ্রাণ প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন।

একটু খোঁজ-খবর নিলেই আসল ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে এ সম্পর্কে যে সকল তথ্য ও বিবরণ পাওয়া গেছে, তা থেকেই আসল ঘটনার আঁচ পাওয়া যাবে। সোনারপুর থানার কোন কোন এলাকায় ভেড়ী দখল ও জমি উদ্ধারের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে। এখানে এবং ভাঙড় থানায় এমন অনেক ভেড়ী আছে, যেগুলি বে-আইনীভাবে দখল করা হয়েছে, চাষের জমিতে লোণা জল ঢুকিয়ে চাষীর জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সব ভেড়ী দখলের নামে কম্যুনিস্ট পার্টির দুই শরিক প্রকাশ্য সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়। একদল দখল করতে গেলে অপর দল বাধা দেয়। ফলে, রক্তপাত আর প্রাণহানি। এমন ঘটনাও অসংখ্য ঘটেছে, যেখানে মাছ লুঠ, ধান লুঠ এমন কি হাঁস-মুরগী পর্যন্ত চুরি হয়েছে। অথচ, চাষীরা জমি ফিরে পায় নি। বাঁধ কেটে চাষের জমিতে লোণা জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে সে সকল জমিতে আর চাষ হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে: এর কি কোন প্রয়োজন ছিল?

যে সকল ভেড়ীর মালিক অন্যায়ভাবে ভেড়ী করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে নিশ্চয়ই আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু সেজন্য 'জনগণের সরকার' আইনের আশ্রয় নিলেন না কেন? কেন এক বছরের মধ্যেও এ সম্পর্কে কোন সংশোধিত আইন পাশ হল না? প্রচলিত আইন যদি চাষীদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তবে নতুন আইন রচনায় অসুবিধা কি ছিল?

একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে, ভেড়ী লুঠ হয়েছে অনেক, কিন্তু চাষীরা কোনদিক থেকেই লাভবান হয় নি। দল বৃদ্ধির চক্রান্ত হয়ত সফল হয়েছে, কিন্তু কৃষি-শ্রমিকরা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই রয়ে গেছেন। সভাসমিতি করে অনেক গরমগরম বুলি ছড়ানো হয়েছে, কিন্তু চাষীরা ন্যস্ত জমির ওপর আইন-সংগত অধিকার পায় নি। অনেক ভেড়ীর মালিকই আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন সত্যি, কিন্তু আইন পরিবর্তন করে চাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হলে তাঁরা আদালতের আশ্রয় নিতে পারতেন না। আইনের মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে যে কাজটা সহজ হত, সেটাই এমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল কেন? এ সব প্রশ্নের উত্তর জনগণ নিশ্চয়ই দাবি করবে।

কংগ্রেসের অবর্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে 'ভ্যাকুয়ামের' সৃষ্টি হয়েছিল, প্রত্যেকটি দল তার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। মানুষের 'ভূমি-ক্ষুধাকে' মূলধন করে প্রত্যেকেই কিছুটা সুবিধা আদায় করার জন্য অশোভন তৎপরতা দেখান। সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রকে জনকল্যাণে নিয়োজিত না করে 'দলকল্যাণে' ব্যবহার করা হয়। জয়নগর, মথুরাপুর, ক্যানিং, বাসন্তী প্রভৃতি থানা এলাকায় যে বিপুল শরিকী সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল, তার মূল কারণ দল সম্প্রসারণের প্রয়াস। প্রত্যেক দলই প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন: ওরা জোতদারের দালাল। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি এলাকাতেই জোতদাররা আত্মরক্ষার তাগিদে কোন-না-কোন দলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে, জমি দখলের লড়াই শেষ পর্যন্ত জোতদারদের স্পর্শ করে নি, পরিবর্তে দলীয় সংঘাতের রূপ নিয়েছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, জোতদাররা যখন 'কমন এনিমি', তখন ফ্রন্টের শরিক দলগুলি (বিশেষত যাঁরা মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী) 'কমন প্রোগ্রামে' ঐক্যবদ্ধ হতে পারলেন না কেন?

সন্দেহ দেখা দিয়েছিল: জোতদারের সংজ্ঞা কি? প্রত্যেক দলই দলীয় দর্পণে জোতদারের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। অর্থাৎ একটি বিশেষ দলের সংগে যুক্ত হলেই সে দল আর জোতদারের 'শ্রেণীচরিত্র' নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু অন্য দল সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে দেখা দিয়েছে

সংঘাত। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে : বঞ্চিত কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং জোতদারের হাত থেকে বে-আইনী জমি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ফ্রণ্ট সরকার কোন আইন পাশ করেন নি কেন? প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে ৭৫ বিঘার সিলিং ছিল, তা কমিয়ে এনে ভাগচাষী বা ভূমিহীনদের অধিকতর সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নি কেন? এক বছরে যুক্তফ্রণ্ট সরকার অনেক আইন করেছেন, অনেক 'অর্ডিন্যান্স' জারি করেছেন, কিন্তু ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন নি কেন?

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা সংবিধান কোন বাধার সৃষ্টি করে নি। আসল কথা, ফ্রণ্টের বৃহত্তম শরিক দল আইনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চান নি তিনটি কারণে। প্রথমত, আইন করে জোতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে জোতদারদের ওপর দলীয় প্রভাব বিস্তার করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, আইনের মাধ্যমে জমি বণ্টিত হলে দলীয় কর্মীরা কেবলমাত্র এর সুবিধা পাবেন না। অন্যান্য দল এবং দল-নিরপেক্ষ মানুষও এর সুবিধা পাবে। তাতে দলের কোন লাভ হবে না। তৃতীয়ত, মানুষের 'ভূমিক্ষুধা'কে মূলধন করে অন্যান্য দলকে খতম করা সহজগতিতে সম্ভব না হতেও পারে। তাই চাষীদের হাতে আইনের অস্ত্র তুলে না দিয়ে তাঁরা অত্যন্ত সুচতুরভাবে টাঙি, বল্লম আর বর্শা তুলে দিয়েছেন। এক জোতদারকে আরেক জোতদারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। এ কাজে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ফলে, কৃষকের রক্তে মাটি ভিজে গেছে, কিন্তু কৃষক জমি ফিরে পায় নি।

কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী খাস জমি বা বেনামী জমি উদ্ধার করে চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে সত্যি। কিন্তু একটু খোঁজ-খবর নিলেই জানা যাবে, এ কাজেও দলীয় রাজনীতি কতখানি সক্রিয় ছিল। এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে, দখলীকৃত জমি স্থানীয় লোকদের মধ্যে বণ্টন না করে বহিরাগত পার্টি-কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। অথচ, মানুষের জাগ্রত চেতনা এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকারের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ফ্রণ্ট সরকার এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে পারতেন। কেবলমাত্র সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বন্দী হয়ে তাঁরা তা করতে পারেন নি।

'বেনামী জমি' উদ্ধারের ব্যাপারে ফ্রণ্টের এক বিশেষ গোষ্ঠীর নেতৃবর্গ খুবই সোচ্চার। তাঁরা পরস্পর-বিরোধী পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, এক বছরে তাঁরা 'বৈপ্লবিক' পরিবর্তন এনেছেন। প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য এক বছরের কৃতিত্বের খতিয়ান দিতে গিয়ে বলেছেন : ৩ লক্ষ একর বেনামী জমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঐ জমিতে ৫০ লক্ষ মণ ফসল উৎপাদিত হয়েছে। তাঁর হিসেব যদি সঠিক হয়, তবে উদ্ধারপ্রাপ্ত জমিতে বিঘা প্রতি ফসল হয়েছে ৫·৫ মণ। এটা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ নয়। কারণ বাংলা দেশে আমন ধানের গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৬ থেকে ৭ মণ। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক্তন সহকারী মুখ্যমন্ত্রী বোলপুরের এক জনসভায় ভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন (২৫শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত), ঐ ফসলের পরিমাণ ৬০ লক্ষ মণ। অর্থাৎ ফসলের গড় উৎপাদনহার বিঘাপ্রতি প্রায় সাড়ে ৬ মণ। বেনামী জমি উদ্ধারের আগে এবং পরে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এই দুই মন্ত্রীর মধ্যে কার তথ্য ঠিক, তা কেমন করে জানা যাবে?

এখানেই শেষ নয়। এ ব্যাপারে আরো গরমিলের ঘটনা রয়েছে। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির এম. এল. এ শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বাজেট বক্তৃতা সমর্থন করতে গিয়ে আরেক নতুন তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তিন লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঐ জমিতে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ২০ লক্ষ মণ (২৪শে ফেব্রুয়ারীর 'যুগান্তর' পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সরকার পক্ষের একজন দায়িত্বশীল সদস্য যে তথ্য দিলেন, তা দুই মন্ত্রীর তথ্যকে নস্যাৎ করে দিল। শ্রীমুখার্জীর তথ্য অনুসারে দখলীকৃত জমিতে বিঘাপ্রতি উৎপাদনের হার আড়াই মণ। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কার তথ্য সঠিক, অথবা সঠিক তথ্য পাওয়ার উপায় কি? সবথেকে অবাক করেছেন প্রাক্তন ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার। তিনি বলেছেন, ৩ লক্ষ একর দখলীকৃত জমিতে ৬ থেকে ৭ লক্ষ টন ফসল উৎপাদিত হয়েছে। অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ১৬৩—১৯০ লক্ষ মণ। কি বিচিত্র উপহার! শ্রীকোঙার নাকি গ্রামের মানুষ এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত। তিনি কেমন করে ভাবলেন যে, বাংলা দেশের মানুষ বিশ্বাস করবে যে, এ দেশের মাটিতে যুক্তফ্রণ্টের কল্যাণে বিঘা প্রতি ১৮ থেকে ২১ মণ ধান উৎপাদিত হয়েছে? উচ্চ ফলনশীল ধানের কথা বাদ দিলে, এমন আজগুবি তথ্য কোন সুস্থ মানুষই মানতে পারেন না। দেখা যাচ্ছে, জমি দখলের ব্যাপারে যে ফাঁক ছিল, তা বিভিন্ন মন্ত্রী ও নেতার জবানীতেই ধরা পড়ে গেছে।

গ্রামাঞ্চলে যে অসহনীয় পরিবেশ ও যে অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এই ঘাটতি রাজ্যে ফসল উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। পতিত জমি বা অনাবাদী জমি উদ্ধার করে যদি চাষের কাজে লাগানো হত, তবু তাতে কিছুটা উপকার হত সন্দেহ নেই। কিন্তু তা কি হয়েছে? বরং চাষযোগ্য জমিতে রক্তের দাগ লেগেছে, ফলে সেখানেও চাষ হয় নি। কৃষক আন্দোলনে তা হলে লাভ কার হয়েছে?

শহর কলকাতা

[২৫৮৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যাঁরা অর্জন করছেন। কিন্তু ফিল্মী পোস্টারের অশ্লীল যৌনাচার সমগ্র সুস্থ মনকে পীড়িত করে।

শহুরে দেওয়াল যখন বেওয়ারিশ, তখন তা রঙিন বোর্ডই হোক। সে তবু মানুষের বোধের রাজ্যে কয়েকটি সুস্থ প্রশ্ন উত্থাপন করে, গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে পাঠকের স্বাধিকার হরণ করে না। কিন্তু বিজ্ঞাপনী প্রচার মনের ওপর একতরফা প্রভাবের জঞ্জাল স্তূপীকৃত করে, মনকে ভাবায় না, অসুস্থ করে।

ফিল্মী পোস্টারের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও অন্যতম সাপ্তাহিক পত্রে প্রবন্ধ ফেঁদে হতাশ হয়েছি। অত্যাচার থামে নি। তবে ল্যাম্প পোস্ট পোস্টারিং শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে তার পরই।

আজ নতুন করে আশা জাগছে, দেওয়ালের লিখন যদি দেওয়ালগাত্রের সমস্ত ফিল্মী পোস্টারের এবং ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনের আবর্জনা হটিয়ে দিতে পারে, তবে আজকের ক্ষুদে বিদ্যাসাগরদের চঞ্চল আঁখি বিজ্ঞাপনের বিশ্রী প্রভাব থেকে মুক্তি পায়।

ফিল্মী পোস্টারের ত্রিভঙ্গ মুরারি বীভৎস দৃশ্যগুলি সুকুমার শিশুমন হননে অদ্বিতীয়। প্রশ্নাতুর শিশুমন সেক্সের আক্রমণে অসুস্থ হচ্ছে।

দেওয়াল-লিখন সেই দুষ্ট প্রচারের অবসান ঘটালেও শহুরে মানুষের উপকার বৈ অপকার নেই।

[illegible] প্রসঙ্গে

[illegible] সাপ্তাহিক বসুমতীর [illegible] "সপ্তাহের [illegible]" পর্যায়ে। [illegible] এই সপ্তাহের লেখাটি [illegible] জয়ী। অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে [illegible] করেছেন, তুলে ধরেছেন [illegible] একটি [illegible], সেই মুখের সত্য [illegible], [illegible] ১৯৪৭ সালের ইংরেজ দেশ [illegible] সময় থেকে ১৯৭০ সালের ১৬ই [illegible] রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত। সাধু! [illegible]!! কৃত্তিবাসকে ধন্যবাদ!!!

[illegible] সাংবাদিকের কাজ সত্যকে সহজ-[illegible] করে জনগণে পরিবেশন করা, তা সংবাদ যত [illegible] হোক না [illegible]। এবারকার "[illegible]" কৃত্তিবাসের [illegible] ইঙ্গিত কিন্তু দুর্বোধ্য রয়ে গেল। [illegible] কৃত্তিবাস মুখ্য-[illegible] শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে [illegible]ফোন করেছেন, কোন কথা বলেছেন, মুখোপাধ্যায়ের কাছ হতে শুনেছেন, [illegible] ইত্যাদি। এগুলো কৃত্তিবাসের [illegible]প্রচার, একথা বলছি না, তবে এই [illegible] যখন পাঠকসমাজে তথা জন-[illegible]ধারণের জন্য প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় বলে [illegible] করলেন এবং প্রকাশও করলেন, তখন [illegible] প্রখ্যাত যে নেতার বাড়ি হতে [illegible] শ্রীমুখোপাধ্যায়কে টেলিফোন [illegible]লেন, তার নাম প্রকাশ করতে বিরত [illegible] কেন? এই অস্বাভাবিক অপ্রকাশের [illegible] কি কোন রাজনৈতিক বাধা [illegible]? সে বাধা অতিক্রম করা কি কৃত্তি-[illegible]সর সাধ্যাতীত ছিল? আমাদের উত্তর, কখনও না। তা যদি হয়, তবে [illegible]বাসের কলমে আমরা এরূপ আশা [illegible] নি।

—শ্রীঅমিয়কুমার [illegible]
গঙ্গানারায়ণ মিত্র রোড, বর্ধমান

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক [illegible] শ্রীকৃত্তিবাস ওঝার পশ্চিমবঙ্গের [illegible]নীতি সম্পর্কীয় প্রবন্ধ 'সপ্তাহের [illegible]' বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকি। তাঁর গত কয়েকের লেখা [illegible], [illegible] তিনি সুচতুরভাবে নিরপেক্ষতার [illegible] করে সেটা চেপে রাখতে চেষ্টা [illegible]। তিনি সি-পি-এম-এর দোষ [illegible] আঙুল দিয়ে বার বার দেখিয়ে[illegible]ছেন, কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের অন্যায়ের [illegible] দু-এক লাইনে সেরে দিয়েছেন। [illegible] সংখ্যায় তিনি দুই হেড মাস্টারের [illegible] উল্লেখ করে সত্যপ্রিয় রায় ও [illegible] সরকারকে একই র‍্যাকেটে [illegible] চরম নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়ে-[illegible] তর্কাতর্কির সময় "মুখ সামলে বলুন"—এই উক্তি কতখানি গর্হিত [illegible] নয়। কিন্তু, "চাড়িয়ে তোর দাঁত [illegible] ফেলবো হারামজাদা"—চারুবাবুর

এই উক্তি কি সত্যপ্রিয় রায়ের আগের উক্তির সংগে সত্যিই তুলনা করা যায়? তবে প্রথম উক্তি বর্বর সি-পি-এম মন্ত্রীর, দ্বিতীয়টি সভ্য বাংলা কংগ্রেস মন্ত্রীর।

সি-পি-এম যখন একা উপনির্বাচনে লড়ছে, তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অজয়-বাবু নিজের সরকারকে অসভ্য, বর্বর প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করছেন এবং সি-পি-এম'কে গুণ্ডা, ধর্ষণকারীদের পার্টি বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। সেই প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্যেও সি-পি-এম টালিগঞ্জ ও রায়দা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী হল। তখন ওঝা মহাশয় বললেন এই জয় প্রকৃত-পক্ষে বিশেষ সাফল্য নির্দেশ করছে না—ভাঙা কংগ্রেসের সংগে লড়াই। আবার যখন সি-পি-এম ছাড়া সবার সমর্থনে মেদিনীপুর ও বসিরহাটে সি-পি-আই ও বাংলা কংগ্রেস জিতলেন, তখন কিন্তু তিনি মন্তব্য করলেন (৩৭শ সংখ্যা)—প্রমোদ দাশগুপ্তের রাজনীতি ব্যর্থ হয়ে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এই ক্ষেত্রে বাংলা কংগ্রেস ও সি-পি-আই-এর বিরাট সাফল্য হল কি করে? তখন কি ভাঙা কংগ্রেস জোড়া লেগে গেছে? বসিরহাটের জেতাটা কি বড় জয় হয়েছিল?

এ ক্ষেত্রে যদি শ্রীদাশগুপ্তের রাজনীতি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে আগের বার অজয়-বাবুর রাজনীতিও নিশ্চয় ব্যর্থ হয়েছিল—কিন্তু তখন কৃত্তিবাস ওঝা অন্য কথা বলেছিলেন। ঐ একই সংখ্যায় শ্রীওঝা লিখেছেন—সি-পি-এম মাস দুই আগে থাকতে চিৎকার ও হল্লা শুরু করে-ছিল, আজই সরকার ভেঙে যাচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু হল্লাটা কি অকারণ ছিল? বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ ও পরে অনশন, সি-পি-আই, ফরোয়ার্ড ব্লকের তাতে সমর্থন—এই সব ঘটনা থেকে কি বোঝা যাচ্ছিল না, তলে তলে কিছু একটা ঘটতে চলেছে? নানা কারণে সরকারের পতন তখন ঘটে নি—প্রমোদবাবুর শেষ হল্লাটাও কি মিথ্যে হল?

এরপর ভণ্ডামীতন্ত্রের কথা। শ্রীকৃত্তিবাস ওঝাকে ধন্যবাদ যে, তিনি কথাটা তুলে-ছেন। ভারতবর্ষে চিরকালই ভণ্ডদের প্রাধান্য—তাবড় তাবড় মহাপুরুষদের কথা আর তুললাম না। বর্তমান রাজ-নীতিতে নকশাল ও [illegible] দল ছাড়া আর সবাই ভণ্ড। কিন্তু বর্তমানে যে ভণ্ডামী-তন্ত্রের বাড়াবাড়ি চলছে তার জন্যে কি কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধী এবং পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয় মুখার্জী দায়ী নন? কৃত্তিবাস-বাবু ভক্তির আতিশয্যবশত অজয়বাবুর ভণ্ডামীকেও বোধ হয় মহত্ত্ব বলেই মনে করেন। ১৯৫৯ সালে যখন খাদ্য আন্দোলনে বাংলাদেশে ৮০ জন মানুষ মারা গেলেন, তখন অজয়বাবুর বিবেক জাগ্রত হয় নি। মন্ত্রিত্ব ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে বিতাড়িত হবার পর তাঁর বিবেক জাগ্রত হল। তিনি বুঝতে পারলেন অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেন বাংলা ও বাঙালীর দুর্দশার জন্যে দায়ী। তিনি দলত্যাগ করলেন। যে কম্যুনিস্ট-দের তিনি '৬২ সালে দেশদ্রোহী বলে-ছিলেন তাদের সঙ্গে জোট করে '৬৭ ও '৬৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী হতে তাঁর বিবেকে আটকাল না। আবার যেখানে তাঁর খুঁটি বাঁধা, সেখান থেকে টান পড়তেই উন্মাদের মত আচরণ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি কি কম্যুনিস্টদের রীতিনীতি জানতেন না, অন্তত '৬৭ সালেও কি বুঝতে পারেন নি? তাহলে আবার সুবিধা-বাদীর মত তাদের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আবার তাদেরই হটাতে চাইছেন কেন? তিনি নাকি মহৎ, ভালমানুষ—স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষাদপ্তরের প্রতিটি কাজেই তিনি দুর্নীতি দেখতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর ডান হাত শ্রীসুশীল ধাড়ার দপ্তরের দুর্নীতি সবার কাছে স্পষ্ট হলেও তিনি দেখলেন না। একে বোধহয় শেয়ানা সততা বলা যায়। বছরের পর বছর ভূমিহীন কৃষকের ওপর জোতদারের এবং শ্রমিকের ওপর মালিকের সহিংস ও অহিংস অত্যাচারের তিনি নীরব দর্শক—কিন্তু যেই উল্টোদিক থেকে কিছু প্রতি-রোধ ও প্রতিশোধ নেওয়া আরম্ভ হল, অমনি তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠল, তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এর চেয়ে বেশি ভণ্ডামী আর কি হতে পারে?

—অধ্যাপক [illegible],
সেন্ট্রাল গোটানগর,
গৌহাটি-১১

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

'সাপ্তাহিক বসুমতীর' নিয়মিত পাঠক হয়েছিলাম অন্য কোনো কারণে নয়—বঙ্গদর্শন, ভারতদর্শন, সপ্তাহের বোবা প্রভৃতি ফীচারে যে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ থাকে, তারই আকর্ষণে। আপনাদের সম্পাদকীয় রচনার মধ্যেও বহু সময়ে যে যুক্তিনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ পেয়েছি তাতেও সুস্থ চিন্তার সামগ্রিকতার পাঠের আনন্দ নিহিত থাকত। গত ১৯৬৭ সাল থেকে আপনাদের পত্রিকা

রাজ্য-রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণে আমার মতো অনেক পাঠকেরই মন টেনেছে। অনেক সময়েই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে আপনাদের পত্রিকার মন্তব্য ও বিশ্লেষণ সোৎসাহে উল্লেখ করে আপন-বক্তব্যকে জোরালো করার প্রয়াস পেয়েছি—এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু হালে কয়েক সপ্তাহে আপনাদের পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনায় পূর্ব-নীতির প্রচণ্ডরকম পরিবর্তন দেখে বিস্ময়বোধ না করে পারছি না। এ প্রসঙ্গে গত ২·৪·৭০ তারিখের 'সাপ্তাহিক বসুমতী' যেন সকলের ওপর টেক্কা দিচ্ছে। বিভিন্ন ফীচার বা সম্পাদকীয় রচনায় আপনারা এতাবৎ কোনো বিশেষ দলীয় রাজনীতির পক্ষাবলম্বন করেন নি বলেই আমার ধারণা এবং সেজন্যেই সেই সব বিচার-বিশ্লেষণে সর্বদাই একমত না-হতে পারলেও আপনাদের নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারিনি। কিন্তু ২·৪·৭০ তারিখের পত্রিকার সম্পাদকীয় "রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হোক" কি সেই নিরপেক্ষ ভূমিকার দাবী করতে পারে? এ কার কণ্ঠস্বর? নব কংগ্রেসের, আদি কংগ্রেসের, বাংলা কংগ্রেসের বা তার সহযোগী বন্ধু দলের?

রচনার মধ্যে গাম্ভীর্যহীনতাজনিত পাঠশালার পড়ুয়াসুলভ লিপি-শৈথিল্যকে বাদ দিলেও যে মতবাদের এখানে পরি-পোষকতা করা হয়েছে, তাতে আপনাদের পত্রিকা সম্পর্কে এতদিন যে মনোভাবকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে, তার সমাধি রচিত হবে।

আপনাদের ঐ সম্পাদকীয় পড়ে জানলাম যে, যুক্তফ্রন্ট মানেই সি· পি· এম·, শরিকী সংঘর্ষ মানেই সি· পি· এম-এর বড় বাড় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কথা কী পরিমাণ সত্য তা আলোচনা করতে গেলে এক বিরাট প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন। কিন্তু এই কথাগুলো যে সর্বথা সত্য নয় বরং বহুলাংশেই বিদ্বেষপ্রসূত প্রচার, তা জোর দিয়েই বলতে পারি।

যুক্তফ্রন্টের আমলে জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট তথা সি· পি· এম-এর চোখা-চোখা বুলিতে অজস্র প্রতিশ্রুতিমূলক ধোঁকা পেয়েছিল', এই অতিবড় মিথ্যা কথাটা লিখতে আপনাদের সম্পাদকীয় কলম একবারও কেঁপে উঠল না? "রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হোক" সম্পাদকীয় রচনায় সময়ে এতদিন ধরে সযত্নে বোনা নিরপেক্ষতার নামাবলীখানা কি গা থেকে খুলে আসল কংগ্রেসী চেহারাটাই প্রকাশ করে ফেলেন নি? রাষ্ট্রপতির শাসনও যে আসলে কংগ্রেসেরই শাসন—যে কংগ্রেসের আর বাংলা দেশের মানুষকে শাসন করার হক নেই, রাষ্ট্রপতির শাসনের মাধ্যমে যে সেই কংগ্রেসেরই বেনামী শাসন কায়েম করা হল, এ কথা তো রাজনীতির ছাত্র-মাত্রেই বোঝে। আনন্দের আতিশয্যে আপনারাও আর তা' ঢেকে রাখতে পারেন নি। তাছাড়া, 'জনসাধারণ' এই নৈর্ব্যক্তিক শব্দটাকে আপনারা যে অর্থে প্রয়োগ করেন, সেটাই যে একমাত্র ধ্রুব সত্য নয়, বোধকরি, রাষ্ট্রপতির শাসন হওয়ার মত বিরাট জয়োল্লাসে তা-ও বেমালুম বিস্মৃত হয়েছেন। সম্ভবত সি· পি· এম এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানগুলির আহ্বানে গত ১৭ই মার্চের সফল ধর্মঘটের যে প্রচণ্ড অভিব্যক্তি আপনারা লক্ষ্য না করে পারেন নি, তারই আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হয়ে আপনাদের এমন বেসামাল অবস্থা!

—অমলেন্দু দত্ত,
বেহালা, কলিকাতা-৩৪

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতীর (১৯শে চৈত্র, ১৩৭৬) সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করে অবাক হলাম। সংবাদ-সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে সাপ্তাহিক বসুমতী এতদিন নিরপেক্ষভাবে সত্যের সাধনায় যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রবন্ধ অকল্পনীয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, আলোচ্য প্রবন্ধটি সাপ্তাহিক বসুমতীর মান ক্ষুণ্ণ করেছে। বক্তব্য ও ভাষা উভয়ই নীচু মানের পরিচয় দেয় এবং ছত্রে ছত্রে দেখা যায় সংযমের অভাব। আপনিও কি শেষ পর্যন্ত সত্যের সাধনা ছেড়ে অন্যান্য কায়েমী স্বার্থান্বেষী পার্টি-মুখপত্র ও পার্টি নেতাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একটি পার্টিবিশেষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় নামলেন? জানি না, কেমন করে এই ধরনের প্রবন্ধ আপনার লেখনী থেকে প্রকাশ পেল।

পঃ বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান-সভায় দাঁড়িয়ে তাঁরই নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলে বর্ণনা করে শুধুমাত্র নিজেকে বা নিজের দলকে ছোট করেন নি, তিনি জন-সাধারণের রায়ে যে সরকার গঠিত হয়েছিল তার প্রতিও অসম্মান দেখিয়ে-ছেন এবং পরবর্তীকালে নিছক পার্টি স্বার্থে জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিলেন। এই প্রকার জঘন্য কার্যকলাপের সমর্থনে যে সমস্ত দল সি· পি· এম-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে নেমেছে, আপনি সেই সমস্ত জোতদার-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষক দলগুলির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে এগিয়ে চলার জন্যে পথে নেমেছেন। সি· পি· এম-এর বহু দোষ। কিন্তু কোন যুক্তফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দল এই সি· পি· এম-এর দোষগুলির ব্যাপারে সঠিক বিবরণ দিতে সক্ষম হয় নি। এমন কি যুক্তফ্রন্টের সভায় ঐ সম্পর্কে কোনরকম আলোচনাও করে নি। শুধু-মাত্র কুৎসা শোনা যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর কাগজপত্রে এবং প্রগতির নামাবলী পরিহিত রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-দের মুখে। খুবই পরিতাপের বিষয়, এই ধরনের ছেলেমানুষীর দ্বারা জন-সাধারণের রায়কে ধূলিসাৎ করে বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যে ঘোরতর অন্যায় করলেন, আজ তাঁরই পক্ষে দাঁড়িয়ে আপনিও সি· পি· এম-বিরোধী অপপ্রচারে নেমেছেন, এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। যে এস· ইউ· সি পার্টি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, সেই পার্টিরই অন্যতম নেতা শ্রীনীহার মুখার্জী বলেছেন যে, এমন কোন ঘটনা ঘটেনি—যার জন্যে যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে পারে (দৈনিক বসুমতী, ২-৪-৭০)। সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার!

আপনি এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "যুক্তফ্রন্টের এক বছরের শাসনের অপকর্ম বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে গত একশ' বছরে অনুষ্ঠিত অপকর্মগুলির তুলনায় ওজনে ভারি।" কিন্তু গত ২২ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে বাংলা দেশের খেটেখাওয়া মানুষের দুর্গতি যে স্তরে পৌঁছেছিল, বিচার করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। কিন্তু সেই কোটি কোটি মানুষের দুর্গতির মূলে যে অপকর্মের চক্রান্ত, তা সাধিত হয়েছে নীরবে, তথাকথিত "আইন-শৃঙ্খলার" আড়ালে। আর যুক্তফ্রন্ট আমলে যে অপকর্মের নামে ঢাক-ঢোল পেটান হচ্ছে তা মোটেই মানুষের জীবন-সমস্যা নয়। পরন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের গত কয়েক মাসের শাসনকালে মেহনতী মানুষ যে সুখের আলো দেখতে পেয়ে-ছিল তা অকল্পনীয়। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রাম যখনই তীব্র হয়ে ওঠে, তখনই কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে—যার প্রতিফলন দেখা যায় আলোচ্য প্রবন্ধের মত সমস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এর জন্যে মেহনতী মানুষ মোটেই বিচলিত নয়। তবে আপনি যাতে এরূপ মিথ্যা প্রচারের শরিক হওয়া থেকে বিরত থাকেন, তার জন্যে লেখা এই প্রতিবাদ-পত্র। জানি না, এ চিঠি আপনার কাগজে স্থান পাবে কি না। তা সত্ত্বেও লিখলাম আপনার সাধু মনোবৃত্তির পরিচয় পাবার আশায় এবং আমাদের প্রিয় একটি পত্রিকার নৈতিক অধঃপতন রোধের আশায়।

—অভিজিৎ রায়,
সোনারপুর, চব্বিশ পরগনা

সমালোচনার একদেশদর্শিতা

ইতিহাসের একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালী স্যার ও ডক্টর একদা এক প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা-সাহিত্যে শুধু ঘাস জন্মেছে।

তাঁর চাইতে নবীনতর বয়সের এক গান্ধীবাদী সর্বোদয়ী সাহিত্য-সমালোচক বাংলাসাহিত্যে আড়াইজনকে প্রকৃত কথা-সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে রাজী আছেন: বঙ্কিমচন্দ্র পুরো, রবীন্দ্রনাথ পুরো, শরৎচন্দ্র অর্ধেক।

এ'র চাইতেও উদারতর এক কম্যুনিস্ট-রাজনৈতিক ও অধ্যাপক বলেছেন: বাংলাসাহিত্য তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ে এসে নিঃশেষ হয়েছে। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাসের ডক্টর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঠিক "সাহিত্য ব্যবসায়ী" নন। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ছিল আশ্চর্য প্যাসান, অনুকরণীয় অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্যের জহুরী। তাঁকে ঐতিহাসিক ঘটনাস্থলে বার বার যেতে হয়েছে এবং ডাক এসেছে তাঁর বড় বড় জায়গা থেকে। তিনি দীর্ঘায়ু এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বাংলাসাহিত্যও তিনি এমনি আবেগের সঙ্গে, এমনি জিজ্ঞাসা ও বিচারের আতস কাঁচ নিয়ে দেখেছেন বা পড়েছেন তা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। তাঁর বক্তব্যর মর্মার্থ হচ্ছে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথে তিনি যে মহীরূহ দেখেছেন, উত্তরকালীন সাহিত্যে তা তিনি দেখেন নি। এমন হতে পারে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহও ঐ দুই ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছল। কেন না, নানা কারণে, বিশেষ এক পটভূমিকায়, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলাসাহিত্য পাঠকদের মধ্যে এক অসাধারণ চাঞ্চল্যের ও অভূতপূর্ব স্বাদের সৃষ্টি করেছিল। ইংরাজী সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত ও বিমোহিত ইংরাজী শিক্ষিতেরা অনীহা ও কৌতূহলের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ সুরু করলেও এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' স্কটের 'আইভ্যানহো' কিনা এই বিতর্কের ধূলি-জাল তুলে ও'কে সমাচ্ছন্ন করতে সচেষ্ট হলেও, তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই ধূলি-জালমুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> "যেকালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনা সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।
>
> "সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।"

আমাদের সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথও দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং চলমান বাংলা-সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিও ছিল নিরবচ্ছিন্ন। সুতরাং, পরবর্তী "আধুনিককালে" বঙ্কিমচন্দ্রকে কি দৃষ্টিতে দেখা হত তাও তিনি লক্ষ্য করে বলেছেন:

> "আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। বঙ্কিমের নিকটে যে তাঁহারা কত রূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।"

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই কথা ক'টি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথও সহসা স্বীকৃত হন নি। যখন অকস্মাৎ বিদেশে স্বীকৃতি পেলেন তখনও তাঁর মনে স্বদেশে-অস্বীকৃতির স্বাভাবিক অভিমান ছিল। প্রাচীন ভাবনা-চিন্তা ও ছন্দে অভ্যস্ত সাহিত্যবিচারপণ্ডিতগণ যেমন মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্যের উপহাসে 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্য লিখিয়েছিলেন এবং যার বেদনা বিষয়-নির্লিপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল, তেমন উপহাস বিদ্রূপ এবং বিশেষণ শরজাল রবীন্দ্রনাথকেও সহ্য করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পরেও বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত পিতৃহৃদয় খুব বেশি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ও বাংলাসাহিত্যের সৌভাগ্য, সাহিত্যিক বঙ্কিমের পিতৃহৃদয় সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবিকে অকুণ্ঠ স্নেহ সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে জানিয়েছেন:

> "পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতি-দাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব ক'টি একে একে গাহিতে বলিলেন।......
>
> "গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।"

আর বঙ্কিমচন্দ্র? ঐ জীবনস্মৃতিতেই আছে:

> "সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই, তাহা নহে।.... রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা

বর্জন খোলা [illegible] গোষ্ঠী-বহির্ভূত সাহিত্যকীর্তি অনুপ্রবেশের ছিদ্রপথেও প্রহরী মোতায়েন। গুরুদেবদের ফর্মান না পেলে তাঁরা অন্য কোন বইয়ের দিকে দৃকপাত করবেন না, শুনলেও কানে আঙুল দেবেন, সে বই বেচবেন না, কাউকে সাঁড়াশিতে তুলেও দেবেন না; পক্ষান্তরে, না দেখে না পড়েই অপপ্রচার করবেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় খুবই জোর দিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি যে, এই রাজনৈতিক বক্তারা বা নেতারা সব চাইতে কম পড়েন, অনুচরদেরও পড়াটা পছন্দ করেন না। ফলে, এঁরা শুধু বাংলা-সাহিত্য কেন, যে-কোন সাহিত্য সম্পর্কে অশিক্ষিত, অজ্ঞ এবং বোধশূন্য। বলার প্রতি এঁদের যত বেশি আগ্রহ পড়ার প্রতি তত অনীহা; এঁরা আর সব কিছু করতে সময় পান শুধু পড়তে সময় পান না। সুতরাং, এই জাতীয় অবোধ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতে পড়ে দেশমাতৃকার এত যে লাঞ্ছনা এতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

সাধারণ পাঠকই হচ্ছেন বাংলা-সাহিত্যের মূল ভিত্তি। এঁরা পড়তে চান, জানতে চান, বুঝতে চান। কিন্তু সাধারণ দারিদ্র্যবশত এঁদের এক ভগ্নাংশেরও বই কিনে পড়বার সাধ্য নেই। লাইব্রেরীতে গিয়ে, নয়তো কারও কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ওঁরা পড়েন। আমার তরুণ বয়সে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কোচবিহার সাহিত্যসভায় দেখতাম। রোজ আসতেন, রোজই বই ফেরৎ দিয়ে আর একখানি বই নিতেন। মাঝারি-গোছের লাইব্রেরী। শীগগিরই লাইব্রেরী হার মানল: তাঁকে নতুন দেবার মতো কথাসাহিত্য আর নেই। তিনি বই বেছে পড়তেন না। যা পেতেন তাই পড়তেন। কোনদিন কোন মন্তব্য করতে শুনি নি। নীরবে আসতেন, নীরবেই একখানি বই নিয়ে চলে যেতেন। এমন গোগ্রাসী পাঠক আরও আছেন; গোমাতা-গ্রাসীদের সংখ্যাই নাকি বেশি। চিরাচরিত প্রথামতো, যেমন কোন বিষয়েই আমরা পরিসংখ্যান রাখিনে এবং এ ব্যাপারে সরকারী-বেসরকারী সব উদ্যোগই সমান, তেমনি নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই পাঠক-পাঠিকার আনুপাতিক সংখ্যা কত; কিন্তু কোন কোন মহলে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, পাঠিকার সংখ্যাই বেশি এবং পাঠের লক্ষ্যটা প্রায়ই দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাসুখের নিমিত্ত। আমি একথা সর্বাংশে বিশ্বাস করি নে; কেন না, উপহারের ক্ষেত্রে মেয়েদের শাড়ির বদলে বই দিলে কি প্রতিক্রিয়া হয় আন্দাজী পরিসংখ্যান-বিদদের তার একটা কার্ডিয়োগ্রাফ নিতে বলি। আর কার্ডিয়োগ্রাফে যদি ওঁদের স্পন্দনে রেখাঙ্কন পড়ে তবে বলতে হয়, বাংলাসাহিত্যের সিরিয়াস পাঠক কম।

ক্ষতি ছিল না, কেন না, সিরিয়াস পাঠকের সংখ্যা, শুনেছি, এ বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান আমার নেই, যে, সব সাহিত্যেই কম। যাঁরা অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে বই পড়েন, তাঁরাও সিরিয়াস পাঠক সব সময় নন। সরকারী কাজ-কর্মের এই এক সুবিধে যে, কাজ ফেলে রেখে বইয়ে মনোযোগ দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সবই যে বাংলাসাহিত্য তাও নয়, মিনিসাইজের অসংখ্য রঙিন মলাটের ইংরাজী তর্জমার বই আছে, বাসে দাঁড়িয়ে পড়ার মতো অফিসের দরাজ অবকাশেও তা পড়া যায়। তবু ধরে নিই, মাতৃভাষার সহৃদয় পাঠকও কিছু এঁদের মধ্যে আছেন।

পক্ষান্তরে, সিরিয়াস পাঠকেরা দিনে একখানা বই শেষ করতে পারেন না, সপ্তাহেও একখানা পড়েন কিনা সন্দেহ। আগে যাওবা পড়তেন এখন কড়ি আর দড়ি ছাড়িয়ে পাঠমুক্ত হওয়া কঠিন। তাঁকে শুধু প্রথম পাতা আর শেষ পাতা দেখলে হয় না; তাঁকে কেবল কাহিনী অনুসরণ করলে হয় না। তাঁকে লেখকের রচনাশৈলী, কাহিনী বিস্তারের প্যাটার্ন, রচনার রস-বিচার, তার সামাজিক তাৎপর্য, লেখক ও তাঁর সৃষ্টির পটভূমিকা এবং সমগ্র সাহিত্যের সঙ্গে এই সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক বিষয় বুঝে নিতে হয়। এ শুধু পেশাদার সমালোচকের কাজ নয়, সিরিয়াস পাঠকেরও কাজ। সিরিয়াস পাঠকদের মধ্য থেকেই সমালোচকের উদ্ভব হয়। যে সব অধ্যাপক ডক্টরেট সমালোচনা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষ একটা ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করবেন তাঁদের ঐ ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ। সমালোচকের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়, লক্ষ্যও সীমাবদ্ধ নয়। সমালোচককে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ডক্টরেট করতে হয় এবং তাঁর লক্ষ্য এই কারণেই একটি বিষয় আয়ত্ত করলেই চলে না। সমালোচককে অবিরাম পড়তে হয়, সমানে বুঝতে হয়। সাধারণ সিরিয়াস পাঠকদের অবশ্য তা করতে হয় না।

কিন্তু এই সাধারণ সিরিয়াস পাঠক-দের বই বাছার কাজটা কি করে হবে? প্রতিদিন বইয়ের ব্যবসায়ীরা যে তাঁদের পণ্য হেঁকে চলেছেন, তাঁদের কি সেই হাঁকাহাঁকিতে সাড়া দিয়েই বই বাছতে হবে? নতুবা বিভিন্ন সাময়িকীতে যে তথাকথিত পুস্তক-পরিচয় বেরোয় তার ওপর নির্ভর করতে হবে? অথবা লাইব্রেরীতে গিয়ে তার পুস্তক-তালিকা অথবা কার্ড ঘাঁটতে হবে?

বইয়ের ব্যবসায়ীরা কার্তিত বুকে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেন। যেসব সাময়িক পত্রে বইয়ের বিজ্ঞাপন দিলে সাড়া পাওয়া যায় তার সংখ্যা কম; ফলে, তাদের বিজ্ঞাপনের রেটও এত চড়া যে, সম্পন্ন প্রকাশকেরা ছাড়া বিজ্ঞাপন দিতে পারেন না। তাঁরাও এক সঙ্গে সব বইয়ের বিজ্ঞাপন দেন না বা দিতে পারেন না। সিরিয়াস পাঠকের সব সাময়িকী উত্তীর্ণ হয়ে ঐ সাময়িকীতে পৌঁছোতে হবে এবং প্রকাশিত বইয়ের খবর পেতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপনই কি নির্ভরযোগ্য? দ্বিতীয়ত যাঁরা বইয়ের ব্যবসা করেন বা প্রকাশ করেন তাঁদের ঝোঁক নতুন বই সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেবার। খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যে বই পুরোনো অথচ পড়বার মত বই, তার অনেক কটির যে পুনর্মুদ্রণ হয় নি এ যদি আপনি লাইব্রেরীর তালিকা বা কার্ড দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। ফলে, সেকালের পাঠকেরা যে-বইয়ের খবর পেতেন এখনকার পাঠকেরা তার খবর রাখেন না, রাখতে পারেন না এবং নতুন নতুন বই নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতারা এমন হৈ-চৈ করেন যে, সে ভিড় ঠেলে পেছনের খবর নেওয়া অসম্ভব।

ঐ সাময়িকীতে পয়সার বদলে হরেক সম্পন্ন প্রকাশকের বিজ্ঞাপন মারফৎ হয়তো একটা সীমাবদ্ধ সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সাময়িকীরই যদি নিজস্ব একটি বা একাধিক প্রকাশনার সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক থাকে, তবে অন্যান্য প্রকাশকের বিজ্ঞাপনের জায়গাও সঙ্কুচিত হয়। দ্বিতীয়ত, ঐ সাময়িকীতে যে পুস্তক-পরিচিতি হয় বা বই নিয়ে আলোচনা হয় তাও সাময়িকী-সংশ্লিষ্ট লেখকদেরই, ঐ চৌহদ্দির মধ্যে যাঁরা নেই তাঁরা আলোচনার বিজ্ঞাপন পান না। সুতরাং, যে সব পাঠকের ঐ সাময়িকীর পুস্তক-পরিচিতিই বই-নির্বাচনের এক-মাত্র অবলম্বন তাঁদের পক্ষে সকল বইয়ের খবর রাখা সম্ভব হয় না; ফলে তাঁর বই বাছাই ও কেনা একপেশে হয়ে যায়।

কোন কোন প্রকাশক এই কারণে প্রকাশিত বইয়ের আদৌ কোনো বিজ্ঞাপনই দেন না বা সমালোচনার জন্য বই পাঠান না। তাঁরা নিজেদের এক-একটি তালিকা বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পৌঁছে দেন, কখনো-সখনো এক শ্রেণীর ক্যানভাসারও বেরিয়ে পড়ে এবং কোথাও কোথাও প্রতিযোগিতা জেতবার অভাবনীয় কনসেসানে বই ছেড়ে আসেন। সেখানে সস্তা দামটাই বেশি আকর্ষণীয় হয়, বইটা নয়। এর একটা বিষময় ফল এই হয় যে, ব্যক্তিগতভাবে কোন আগ্রহী পাঠক সরাসরি বহু বইয়ের খবর পান না এবং কোন কোন প্রকাশকের

ম্লানহীন ও অব্যবসায়িক কার্পণ্যদোষেও অবিজ্ঞাপিত বইয়ের সমাদর সম্ভব হয় না। এই বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্যের যুগে তাঁরা কুণ্ঠিত থেকেও এই অভিযোগ করে থাকেন যে, বই বিক্রী হয় না। অর্থাৎ গরজটা এক্ষেত্রে প্রকাশকের নয়, খদ্দের-পাঠকের; পাঠক কেন তাঁর ভাল বইটি খুঁজে কেনেন না এই তাঁদের অভিমান এবং এই অভিমানবশেই তাঁরা লেখককে অমর্যাদা করতে দ্বিধা করেন না। অর্থাৎ, লেখকের বাজে মাল বলেই খদ্দের-পাঠকেরা নেন না।

লাইব্রেরীতে গিয়ে পুস্তক-তালিকা বা মডার্ন পদ্ধতির কার্ড ঘাটাও সামান্য কাজ নয়। রীতিমত সময়-সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, বইয়ের শিরোনামা সব সময় সুনিশ্চিত পরিচয় নয়। কোনো গল্প-সঞ্চয়নের নাম যেমন একটি গোটা উপন্যাসের ইঙ্গিত দিতে পারে, তেমনি আগেকার 'স্তবক' বা 'পুষ্পাঞ্জলি' জাতীয় নামগুলোও বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে; ওগুলো কবিতারও সঙ্কলন হতে পারে, অথবা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধসমষ্টিও হতে পারে।' কিন্তু আমি যা খুঁজছি তার হদিস কে দেবে? এককালে এমন ছিল যখন যার কোন কাজ নেই তাঁকেই লাইব্রেরীয়ান করা হত; যেন কাজটা এতই তুচ্ছ এবং পারিশ্রমিকও ছিল তেমনি মর্মান্তিক। আজকাল লাইব্রেরী আন্দোলন ও লাইব্রেরিয়ানদিগের প্রসাদে অবস্থার আকাশ-পাতাল পরিবর্তন ঘটেছে। তবু অবস্থাটা আদর্শ-স্থানীয় হয়েছে বলা চলে না।

যে-সর্বোদয়ী সাহিত্য সমালোচকের কথা বলেছি, তিনি বই পড়েন না, এমন অভিযোগ কেউ করতে পারবেন না; তিনি বিস্তর পড়েন; কিন্তু তিনি কি কারণে বাংলাসাহিত্যে আড়াইটির বেশি সর্বজয়ী বা সর্বজনীন প্রতিভা দেখতে পেলেন না তা বলা দুরূহ। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপারেও একটা সংস্কার থাকে। তাঁর বিচারে এইরকম একটা কিছু ঘটে থাকবে বলে আমার আশঙ্কা। তিনি আমার বন্ধুস্থানীয়, অত্যন্ত সজ্জন, নিঃসংশয়ে সুনীতিপরায়ণ। কোন মতলবে, অভি-সন্ধিতে অথবা স্বার্থসাধনে তিনি অভিমত পোষণ করেন এমন দুর্নাম আমি দুরুস্থান তাঁর শত্রুও দিতে পারেন না। তবু যে তিনি এত বড় একটা রায় দিলেন তার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকাটি কি, তা আমি ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছি।

কিছুকাল আগে প্রধানত একশ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যপাঠক নিজেদের প্রগতি-বাদী পরিচয়ে একদিকে মাইকেলকে অন্যদিকে শরৎচন্দ্রকে স্বীকারের কুণ্ঠামাত্র নয়, নিদারুণ উন্নাসিকতা ব্যাধিতে ভুগ-ছিলেন। ভাবটা এই, বিশ্বসাহিত্য তাঁরা যেমনটি উপলব্ধি করেছেন এবং বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁদের, কেন না, তাঁরা আবার লেখকও বটেন, যেটুকু স্থান আছে কবি হিসেবে, মাইকেলের বা কথাসাহিত্যিক হিসেবে শরৎচন্দ্রের সেটুকু স্থানও নেই। মাইকেল বা শরৎচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে আমি তাঁদের ছোট করতে পারব না: কেন না, তাঁদের পক্ষ সমর্থনে তাঁদের সাহিত্যই সজীব। যথাযথ মূল্যায়নের সাধ্য বা সামর্থ্যও সকলের নেই এবং একশ্রেণীর এমন ভেজাল সমালোচক আছেন যাঁদের লেখা দেখলে বুঝতে দেরি হয় না যে, তাঁরা সদ্য যে বইখানা পড়েছেন তাতে এমনই প্রভাবিত হয়েছেন যে আর কিছু ভাবতেই পারছেন না। অবসেসান পাগলামিরই নামান্তর। এ থেকে মুক্ত থাকা, কোন একটি বিষয়ে মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন হতে না দেওয়া খুবই কঠিন কাজ, কিন্ত অসম্ভব নয়। এই জাতীয় সমা-লোচকেরা যে তা হতে পারেন না তা তাঁদের পাণ্ডিত্য জাহিরের কোটেশনগুলো বা বিদেশী নামের রেফারেন্স দিয়ে লেখা পূর্বোক্তদের কথায় [illegible] স্বীকার করতেই হবে, এঁরা যদিও এক-কালে রবীন্দ্র-উত্তরদের অভিযান চালিয়ে নতুন সত্তার কবরঃ হতে চেয়েছিলেন, তথাপি এঁরা সুবিধে মত রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই, স্বতন্ত্র মূল্যায়নের চেষ্টা না করে মাইকেল-বধ করেছেন এবং শরৎচন্দ্রকে অতি গ্রাম্য ও স্বায়ত্তশাসনের ছোট্ট এলাকা-টুকুতে বন্দী করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র-নাথ মেঘনাদ বধ সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কখনও উচ্ছ্বাসিত হন নি, বরং, পথের দাবী প্রসঙ্গে (তাঁর চার অধ্যায়ের পরি-প্রেক্ষিতে) যা বলেছেন তা তাঁর নির্ভীক মতের প্রকাশ হয়েছে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তি সম্পর্কে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। এতেই পরবর্তী প্রগতিবাদীরা প্রমথ-নৃত্য করেছে।

একথা আমার বুদ্ধির দুরধিগম্য যে, কোন্ লেখক—হ্যাঁ, মহৎ লেখক, আপেক্ষিক দৃষ্টিতে লোকাল বা গ্রাম্য নন? কোন লেখক কালেও সীমাবদ্ধ নন। সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথে ডাইনীদের কীর্তি বা হ্যামলেটে ভূতের কাণ্ড কি নিতান্ত তাৎকালিক বা সমসাময়িক সংস্কারের প্রতিফলন নয়। তবে সে কবে কালাতীত হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া আজ নেই; তাই বলে কি ইতিহাসও নেই; ইতিহাসের পটভূমিকা নেই, পারসপেকটিভ, কনটেকসট বলে কোন কথা নেই। যথাযথ মূল্যায়নের অভাবেই ভ্রান্তি ঘটে থাকে এবং সে ভ্রান্তি থেকে বড় ছোট প্রায় কেউই মুক্ত নন।

নিঃসন্দেহে এই যথাযথ মূল্যায়নের অভাবেই সেই কম্যুনিস্ট অধ্যাপক তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে আর বাংলা কথা-সাহিত্যে এগোতে পারেন নি। এর মধ্যে সত্য নেই তা নয়, তা সর্বাংশে সত্য নয়। যে মাটি থেকে সাহিত্য রস সংগ্রহ করে থাকে, সেই মাটির সঙ্গে দৃঢ়মূল যোগ রয়েছে বলেই তিন বন্দ্যো'র সাহিত্য বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্যানুসারী হয়েছে, মহৎ হয়েছে। আমি এখানে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রকে পুরো ধরেই একথা বলছি। যেখানেই যে-লেখক এই মাটি থেকে বিমুক্ত হয়ে আকাশ-চারী বা নিরবলম্ব হয়েছেন সেখানেই সে-লেখক এই অর্থে ব্যর্থ হয়েছেন যে, ওটা একটা ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের উপকরণ মাত্র। তার কোনো কালাতীত দাবি নেই। আসলে বাংলাসাহিত্যের সব চাইতে বড় দৈন্য এই যে, নিরপেক্ষ নির্ভীক মূল্যায়ন করবার যোগ্য সমালোচক বিরল। কোনো স্বার্থরজ্জুতে বাঁধা না থাকলে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন; পাঠকসমাজ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

[পূর্বানুবৃত্ত]

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

'কিকুয়ু সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন, কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ন ও মাউ মাউ"

গত কয়েক বছরের ভেতর বিভিন্ন লোকের লেখা কয়েকটি কেনিয়ার ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে, যাতে ১৮৯০ সালে লর্ড লুগার্ডের আগমনের পর থেকে কেনিয়ায় ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারের বিষয় জানা যায়। আফ্রিকানদের ভেতর শিক্ষিতের সংখ্যা কম থাকায় এই ইতিহাস বেশির ভাগই ইউরোপীয়ানদের লেখা, ফলে তাতে লর্ড ডেলামেয়ার প্রমুখ অগ্রণীদের নির্ভীকতা ও কঠিন পরিশ্রম, নেটিভ আফ্রিকানদের নিবুদ্ধিতা ও এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনাই আছে বেশি। এই ইতিহাসের নামে যে অসত্য, অজ্ঞতা ও ভুল বোঝাবুঝির ভার আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীর ওপর চাপান হয় শিক্ষার নাম ক'রে তা আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করে, আর এই অজ্ঞতার ফলস্বরূপ ১৯৫২ সালে যে দাবানল কেনিয়ার বুকে জ্বলে ওঠে তা সত্যিই ভয়াবহ।

এই দানবিক ঘটনার ঠিক আগের চার বছর আমি ছিলাম কেনিয়ার বাইরে: কিন্তু একাধিক রাত্রিতে নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার আলোতে আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যতের যে আলোচনা হ'ত, তাতেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা জানতে পারি। প্রথম যখন ব্রিটিশরা তাদের মিশনারী, ব্যবসায়ী ও শাসকদের দল নিয়ে আমাদের দেশে এসেছিল তখন এই ধারণাই হয়েছিল আমাদের যে, তাদের কাছ থেকে আমরা এমন কিছু পেতে পারি যা হবে আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর। শিক্ষাপ্রণালী, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ঔষধপত্র, নতুন বৈজ্ঞানিক চাষপ্রণালী ও নানান রকম কলকব্জার ব্যবহার ইত্যাদি সবাই নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু একটা জাতি হিসেবে ইউরোপীয়ানদের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে যা মোটেই ভাল নয়। বদমেজাজ, সামান্য কারণে রাগ, দয়া-দাক্ষিণ্য ও সমবেদনার অভাব আর সবার উপর তাদের হামবড়াই ভাব কারু পক্ষেই ভাল লাগা সম্ভব নয়। তাদের ব্যবহারে সব সময়ই এমন একটা ভাব প্রকাশ পায় যাতে মনে হয়, ভগবান কেনিয়া ও তার আফ্রিকান অধিবাসীদের যেন শুধু ইউরোপীয়ানদেরই সুখ-সুবিধার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা মানুষের মনুষ্যত্ব শুধু তার গায়ের চামড়ার রংয়ের ওপরই ভিত্তি করে স্বীকার করত। অবশ্য আমার এই পর্যবেক্ষণ সাধারণভাবেই খাটে, কারণ তাদের মধ্যেও এমন কয়েকজনকে দেখেছি বা জেনেছি, যারা এই সমস্ত নীচতার ও অভদ্রতার অনেক ঊর্ধ্বে।

১৯০০ সাল ও তার পরের কয়েক বছর ধরে যদি কেনিয়ার তদানীন্তন বিবেকহীন গভর্নর ও বিলেতের ক্ষমতা-সম্পন্ন লোকেরা তখনকার ব্রিটিশ সরকারকে এখানকার মত ভাল চাষের জমি জোর করে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র সাদা চামড়ার লোকেদের জন্যে নির্ধারিত করাতে বাধ্য না করত, তাহলে এই সমস্ত ব্যক্তিগত বদ্গুণের বিশেষ কোন খারাপ প্রভাব দেখা দিত না। এই জোর দখল নীতির ফলেই পরবর্তীকালে কেনিয়ার এত হাঙ্গামা, বিদ্রোহ ও রক্তপাত হয়। সে সময় আমাদের বেশির ভাগ লোকের কাছেই যথেষ্ট চাষের জমি ছিল না। আর তার পরের কয়েক বছর ধরে আমাদের জনসংখ্যা ক্রমাগতই বাড়তে থাকে, ফলে চাষের জমির স্বল্পতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। আমাদের যুবকরা সেই সময় বিরাট বিরাট ফার্মে ইউরোপীয়ান চাষাদের কাছে যৎসামান্য মাহিনায় কাজ করতে বাধ্য হয় সেই জমিতে, যে জমি একদিন তাদেরই পূর্বপুরুষদের ছিল! এই সব ফার্মের বিদেশী মালিকদের প্রভূত সম্পত্তি, বিরাট বিরাট অট্টালিকা ও বহুমূল্যবান মোটরগাড়ী যে আফ্রিকান যুবকদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করবে, তাতে আর অন্যায় কি!

এর পর যখন ইউরোপীয়ানরা তাদের নবলব্ধ ক্ষমতা রাজনীতির ওপরও খাটাতে আরম্ভ করল, তখন থেকেই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। তারা ছলে, বলে ও কৌশলে আমাদের আইনসম্মত দাবিগুলি না মেনে নিতে চেষ্টা করে। দেশের জনসংখ্যা তখন প্রায় সত্তর লক্ষ, যার ভেতর ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা কোন দিনই ষাট হাজারের বেশি হয় নি, অর্থাৎ প্রত্যেক ১০০ জনের বেশি আফ্রিকানের সঙ্গে একজন ইউরোপীয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু তখনকার ইউরোপীয়ান শাসকবৃন্দ এমনই নিয়মকানুন তৈরী করেছিল এখানে যে, সত্তর লক্ষ আফ্রিকানের ভেতর এক-জনেরও এ দেশের শাসনক্ষমতায় বা

বিধানসভায় কোন অধিকার ছিল না। এ দেশের সমস্ত আফ্রিকানের জীবন-ধারা এমনভাবে পরিচালিত হ'ত, যাতে তারা শুধু এই ইউরোপীয়ান চাষী-সম্প্রদায়েরই কাজে লাগতে পারে ও তাদের ধনবৃদ্ধির সহায় হতে পারে। এ দেশের শ্রমিক পরিচালনা, শুল্ক, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই ইউরোপীয়ানদের ইচ্ছা ও সুবিধার জন্য পরিচালিত হত। এর ভেতরেই কয়েকজন উচ্চভাবাপন্ন ইউরোপীয়ান কেনিয়ায় ও বিলেতে এই ভয়াবহ দুর্নীতির কিছুটা প্রশমনের চেষ্টা করেন, যার ফলে আদর্শ ঔপনিবেশিক রাজত্বের মুখোশের অন্তরালবর্তী বৃটিশ সরকার আফ্রিকান-দের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যৎসামান্য বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হয়। শিক্ষালাভই ছিল আমাদের সর্বোচ্চ অস্ত্র, কারণ এর দ্বারাই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সমতালে লড়াই করা সম্ভব। কয়েকজন শিক্ষিত আফ্রিকান আমাদের পথ দেখাতে সক্ষম হন এবং ১৯২০ সালের প্রথম দিকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়াপত্তন হয়। এই কণ্টকিত পথযাত্রার শেষ হয় ১৯৬৩ সালের শেষে এবং এই সুদীর্ঘ যাত্রার সঙ্গে মিশে আছে অনেক বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন, ছড়িয়ে আছে অনেক রক্তাক্ত আফ্রিকান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দেহাবশেষ, আর আছে জর্জরিত ও ক্রোধোন্মত্ত আফ্রিকানের পাঙ্গার (ভারতে প্রচলিত 'দা'র মত এক প্রকার অস্ত্র যা আফ্রিকানরা ব্যবহার করে) দ্বারা শতচ্ছিন্ন ভূলুণ্ঠিত সাদা মানুষের ধ্বংসাবশেষ। এই পথের প্রথম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো : ১৯২৩ সালের ডেভনশায়ার নামক ইউরোপীয়ানের "হোয়াইট পেপার" (সরকারি খোঁজখবরের ফলে প্রচারিত রিপোর্ট), যাতে স্বীকার করা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সুখ-সুবিধার প্রাধান্য; ইউরোপীয়ান প্রভাবিত ও আরোপিত এক সংযুক্ত পূর্ব আফ্রিকান ফেডারেশন, যার বিরুদ্ধে আফ্রিকানরা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে ও তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে আপত্তি জানায়। কারটার নামক ইউরোপীয়ানের অধীনে পরিচালিত এক জমি সংক্রান্ত কমিশন ও জোমো কেনিয়াটার একাধিকবার বিলেত যাত্রা এবং সেখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতাদের কাছে আফ্রিকার সমস্যার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা। প্রথমেই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে-কোনভাবেই হোক না কেন, ইউরোপীয়ানদের হাতে সর্বপ্রকার ক্ষমতার একত্রীকরণে বাধা দেওয়া ও সেই সঙ্গে নিজেদের ভেতর এমন একদল শিক্ষিত ও দেশপ্রেমে অনু-প্রাণিত আফ্রিকান গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা, যারা যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিতে সক্ষম হবে।

১৯৩৯ ও '৪৫-এর দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর যখন আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় স্বাধীনতার হাওয়া গরম হয়ে উঠেছিল, সেই সময় কেনিয়ার ইউরোপীয়ানরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের ওপর বিশেষ চাপ দিতে আরম্ভ করে। ১৯৪৬ ও ১৯৫৩-র ভেতর তারা সম্ভব-অসম্ভব সব রকম উপায়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে, যার ফলে দেশ শাসনের ক্ষমতা চিরকালের জন্য তাদের হস্তগত হয়ে যায়। আফ্রিকান নেতারাও বুঝতে পারেন যে, অবস্থার পরিণতি এমন এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, যেখানে এক সর্বজনমিলিত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে সার্থকতা অসম্ভব। তাঁরা চেষ্টা করেন যে-কোন উপায়েই হোক, দেশের বিধান-সভায় আফ্রিকান সদস্যের অধিকার-প্রাপ্তি; কিন্তু ১৯৫১ সালে যখন তাঁদের এই অতি ন্যায়সংগত চাহিদাও তদানীন্তন বৃটিশ লেবার সরকার নাকচ করে দেন, তখন থেকেই আফ্রিকান রাজ-নৈতিক মতবাদ মরিয়া হয়ে ওঠে ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয় যে, জোর-জুলুম ব্যতিরেকে অবস্থার উন্নতি ও স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। এই সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আফ্রিকান নেতারা তাঁদের জীবনসর্বস্ব পণ করে শেষ প্রচেষ্টার জন্য তৈরি হতে থাকেন, যাতে নাকি স্বাধীনতার দীপশিখা তাঁদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য কেড়ে না নেওয়া হয়। আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ ছিল দেশের সমস্ত লোককে একত্রীকরণ করা এবং সেই জনাই এই সময় শপথ গ্রহণের দ্বারা সবাইকে একসূত্রে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করা হয়। এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সময় বৃটিশ সরকার যদি এ দেশের নেতাদের মনে এতটুকু বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারতেন যে, তাঁরা সত্যই একদিন দেশের শাসনভার এ দেশের আফ্রিকান সংখ্যা-গরিষ্ঠদের হাতে তুলে দেবার কথা ভাবছেন বা তার জন্য কোনরকম চেষ্টা করছেন, তাহলে যে ভয়াবহ রক্তপ্রবাহ কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের কণ্টকিত পথকে চিরকালের জন্য রাঙিয়ে দিয়ে গেছে তা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয়ে যেত। বৃটিশ সরকার এ বিষয় হয় সম্পূর্ণ ভুল খবরের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে-ছিলেন, কিম্বা স্বেচ্ছায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন। দেশের এই অবস্থায় ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে আমি লেখাপড়া শেষ করে উগান্ডা থেকে কেনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করি।

উগান্ডা থেকে ট্রেনে নেয়েরি যাবার পথে এলডোরেট স্টেশনে আমি "বারাজা" নামক সোয়াহিলি সংবাদপত্রে প্রথম কেনিয়ায় "সংকট" আইন জারির খবর পড়ি। নাকুরু স্টেশনে গার্ডের ন্যায় আমার এক বন্ধু রেলে কাজ করত, সেই আমার রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করে দেয়। গার্ডেরও পরে সংকট আইনে ধৃত হয়ে-ছিল। নাকুরুতে তখনও কেউ সংকটের খবর টের পায় নি জেনে আমার খুবই আশ্চর্য লেগেছিল, কারণ এরকম খবর সচরাচর রেলওয়ে ট্রেনের চেয়ে দ্রুত-গতিতে যাতায়াত করে। তার পরদিন সকালে নেয়েরি থেকে সদ্য আগত কয়েক-জন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয় ও তাদের কাছ থেকেই নেয়েরির দুরবস্থার সব খবর পাই। তারা এও জানায় যে, আমার মত যুবকদের এই সময় সেখানে যাওয়া নেহাৎই বোকামি, কারণ ব্রিটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জেলে বন্ধ করে রাখবে; আরও শুনলাম যে, সেখানকার অনেক লোকই ধরা পড়ার ভয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এই সমস্ত শুনে আমি নেয়েরিতে আমার মা'র কাছে না গিয়ে নাকুরুতে তাঁর বোন ওয়ানগুরীর কাছে কিছুদিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলুম। তাঁর জামাতা নাকুরুর কাছেই বাহাটিতে বন-বিভাগে শ্রমিকের কাজ করছিল, ও ওয়ানগুরী তার কাছেই ছিলেন।

এদের সঙ্গে আমি মাসখানেক থেকে বন-বিভাগের কিছু জমি পরিষ্কার করার কাজ করি। বন-বিভাগ থেকে শ্রমিকদের একটু করে জমি তিন বছরের জন্য দেওয়া হত বনের এলাকার ভেতরই, যেটা তারা পরিষ্কার করে চাষ-আবাদ করত ও যার ফলে বনের চারাগাছগুলো তাড়াতাড়ি বাড়তে সক্ষম হত। তিন বছর পর তাদের সে জমি থেকে তুলে এনে আরেক নতুন জমিতে বসান হত, যেখানে তাদের আবার গোড়া থেকে পরিষ্কার করতে হত নতুন চারাগাছ লাগানর জমি তৈরি করে দেবার জন্য। এই সমস্ত লোকেরা "বাফুনির" গভীর বনে ছড়িয়ে থাকত। মানুষের শরীর থেকে পাঁজরা যেমন উঁচু হয়ে বেরিয়ে থাকে, এই জায়গাটাও পাহাড় থেকে উঁচু হয়ে ছিল বলেই একে বাফুনি বলা হত। রিফ্ট ভ্যালির এই অংশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল অতি মনোরম। রাত্রে আমি খোলা আকাশের তলায় শুয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখতাম, আর কখনও নিচের দিকে তাকিয়ে শহরতলীর ছোট ছোট আলোক-মালার খেলা দেখতাম।

শপথগ্রহণ [illegible] কৃষ্ণকায় লোকজনের মধ্যে দেশের কানাডা [illegible] এবং কিছুদিন পরেই আমি তৎকালীন অবশিষ্ট কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য হবার জন্য চেষ্টা করি। ১৯৪৭ সালে নজোরো শহরে জোমো কেনিয়াটার ভাষণ আমার বুকে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তা তখনও জ্বলছিল এবং অল্পদিনে আমি আমার পথ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছিলাম। আমি মনস্থির করে ফেলেছিলুম যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাকে জীবনপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের নাকুরু শাখার সভাপতি ছিলেন জন কামোনজো নামক এক বিখ্যাত কিকুয়ু ব্যবসায়ী, যাঁর সঙ্গে আমার অনেক আগে থেকেই মৌখিক আলাপ ছিল। তাঁর কাছে আমার আবেদন পেশ করায় তিনি স্নেহভরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এমন [illegible] রাজনৈতিক দলে [illegible] কি?" এই সময় পুলিশের বি[illegible] বিভাগের লোকেরা [illegible] পরিমাণে উৎকোচ [illegible] ঘর-শত্রু বিভীষণ বাহিনী তৈরি [illegible] চেষ্টা [illegible] যাতে তারা [illegible] নেতাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে [illegible] থাকতে পারে। তাই জন কামোনজো আমাকে বাজিয়ে দেখে [illegible]। আমি তাঁর কাছে আমার [illegible] সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উজাড় [illegible] ফেলি। তিনি আমার কথা বিশ্বাস [illegible] আর নিয়মানুসারে পাঁচ শিলিং [illegible] দেবার পর আমাকে সভ্য করে নিয়ে [illegible] কার্ড দেন, যার সংখ্যা ছিল [illegible]৪৫। আমি বাড়ি ফিরে এসে কার্ডটি [illegible] কাছে রেখে দিই, যাতে নাকি অসাবধানতাবশত এটি আমার কাছ থেকে হারিয়ে না যায়। একটা সবুজ [illegible] লবণের শিশি খালি করে মাসি কার্ডটি তার মধ্যে রেখে শিশিটি তাঁর [illegible] ক্ষেতে পুঁতে রাখেন সাবধানে।

আমি এর পর রাহাটিতে কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা আরম্ভ করি ও কিছু[illegible] ভেতরেই ১৬জন পুরুষ ও ১৯জন [illegible] সদস্য হতে রাজী করাই। [illegible] অনেকেই পরে একতার শপথ [illegible] করেন। কেনিয়া সেন্ট্রাল এসো[illegible] ও কেনিয়া আফ্রিকান [illegible] সঙ্গে "মাউ মাউ" বিদ্রোহের [illegible] নিয়ে গত দশ বছরে ব্রিটেন ও [illegible] অনেক আলোচনা ও সমা[illegible] হয়েছে এবং অনেকের যুক্তিহীন [illegible] মাউ মাউ বিদ্রোহের সঙ্গে অন্য [illegible] সংস্থার সম্পর্ককে সম্পূর্ণ উল্টো [illegible] কোয়েল [illegible] সরকারী রিপোর্ট [illegible] "করফিল্ড রিপোর্ট"।১

করফিল্ড তাঁর রিপোর্টে এ কথা কোথাও লেখেন নি যে, তিনি তাঁর প্রমাণাদি এই তিনটি সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে প্রত্যক্ষরূপে যোগাড় করেছিলেন। আমি নিজে এ বিষয় যতটা জানি তা পরিষ্কার ও খোলাখুলিভাবে বলতে চাই এখানে।

কিকুয়ু সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন (কে. সি. এ.) হলো—ইয়াং কিকুয়ু এসোসিয়েশনের প্রত্যক্ষ বংশধর, যার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ সালে। এর প্রতিষ্ঠাতা হ্যারি থুকু নির্বাসনে যেতে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে নির্বাসন দেবার ফলে নাইরোবিতে কিছু বিক্ষোভ ও মারামারি হয়। (এখানে বলে রাখা দরকার যে, ১৯৩০ সালে নির্বাসন থেকে ফেরবার পর হ্যারি থুকু অনেক জমিজমার অধিকারী হয়ে তাতে উন্নত ধরনের চাষবাস আরম্ভ করেন ও মধ্যপন্থাবলম্বী হন। এবং এই সংকটের সময় তিনি তথাকথিত "লয়্যালিস্ট" অর্থাৎ রাজভক্তদের অন্যতম নেতা ছিলেন।) এর পর নতুন নেতা-[illegible] জেসেক কাংগেথে ও জোসি কারিয়ুকি ইয়াং কিকুয়ু এসোসিয়েশন নামটি অযথা গণ্ডীবদ্ধ ভেবে ও-থেকে "ইয়াং" কথাটি তুলে "সেন্ট্রাল" কথাটি যোগ করেন। যার ফলে এই সংস্থাটির দ্বার সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সমস্ত আফ্রিকান, এমন কি অ-কিকুয়ু, যথা মেরু ও কাম্বা উপজাতীয়দের জন্যও খুলে রাখা হয়। কে· সি· এ· ছিল একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম যার উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকানদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জমিজমার উদ্ধার সাধন, বিধানসভায় আফ্রিকান-দের আরও সদস্যপদ লাভ, অধিক পরি-মাণে শিক্ষার সুযোগের চেষ্টা, ইউরোপীয়ান ফার্মে আফ্রিকান শ্রমিকদের ব্যাপার খাটা নিরোধ এবং কুঁড়েঘরের ওপর আরোপিত করের রোধ সাধন করা। জোমো কেনিয়াটা ১৯২৮ সালে কে. সি. এ-র সাধারণ সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন ও এই এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ব্রিটেনে গিয়ে কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কাছে তাঁর মতামত পেশ করেন। ১৯৪০ সালের ৩০শে মে কেনিয়া সরকার এই এসোসিয়েশনকে ইতালীয়ান রাজদ্রোহী-দের সঙ্গে মিলিত এক চক্রান্ত হিসাবে ধার্য করেন ও একে বন্ধ করে দেবার আদেশ জারী করেন। সেই সঙ্গে এই এসোসিয়েশনের হর্তাকর্তাদের কাপেন-গুরিয়া জেলে নির্বাসিত করেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কোন এক সময় কে· সি· এ-ও ইয়াং কিকুয়ু এসোসিয়ে-শনের পদানুসরণ করে তাদের সদস্যদের জন্য এক শপথ গ্রহণ প্রথা চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল কে. সি. এ-র প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকার করানো। এই শপথের নাম ছিল "মুমা য়্যা চু বা", অর্থাৎ বোতলের শপথ। এই শপথ বাঁ-হাতে বাইবেল ও ডান হাতে একমুঠো ধুলি নিয়ে গ্রহণ করতে হতো। পৃথিবী-র নেওয়া আর সমস্ত শপথের মত এই শপথও গোপনে নেওয়া হত। পরে নির্বাসনে বাল্যকালে আমরা প্রায়ই ফ্রি ম্যাসনদের (ফ্রি ম্যাসনস্) অনুষ্ঠিত গোপনে রাত্রিকালে নেওয়া শপথের কথা আলোচনা করেছি এবং তাদের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের শপথকেই বা কেন লোকে খারাপ বলে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব মহা-যুদ্ধের পর জেমস গিচুরু ও এলিউড মাথু প্রমুখ আফ্রিকান রাজনৈতিক নেতারা কে· সি·এ-র মত আর একটি দল গঠন করতে মনস্থ করেন। দুটি কারণের জন্য তাঁরা কে· সি· এ-কে পুনরায় চালু করা অযুক্তিকর মনে করেন। প্রথমটি হচ্ছে : কে· সি· এ-র বিরুদ্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা বাতিল করানর থেকে একটি নতুন সংস্থার সরকারী স্বীকৃতি লাভ করা সহজ বলে মনে হয়েছিল, কারণ সরকারী মহলে কে· সি· এ-র দুর্নাম ছিল যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত তাঁদের মনে হয়েছিল যে, সে সময় এমন একটি সংস্থার দরকার, যা কেনিয়ার সমগ্র উপজাতিসমূহকে সদস্য-রূপে নিতে পারবে, কিন্তু কে· সি·

[১ "Historical Survey of the Origins & Growth of Mau Mau."—By F. O. Corfild (1960) cmnd 1036.]

এ-র "কিকুয়ু" নামের করে তা করা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। কেনিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আলোড়নের সময় কে· সি· এ-র উপকারিতা ছিল অবিসংবাদিত; কিন্তু এখন দরকার হয়ে পড়েছিল জাতিভেদাভেদশূন্য ও আরও বলিষ্ঠ একটি সংস্থার। ১৯৪৪ সালে এলিউড মাথু কেনিয়ার বিধানসভায় সরকারীভাবে মনোনীত হন এবং তাঁরও বিধানসভায় মত প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি রাজনৈতিক দলের। জোমো কেনিয়াট্টা ১৯৪৪ সালে বিলেত থেকে কেনিয়ায় ফিরে আসেন ও তিনিও এই-রকম একটি সংস্থার অনুমোদন করেন। কয়েকজন ঈর্ষান্বিত লোক কেনিয়াট্টার দুর্নাম করার জন্য তাঁকে "উপজাতি-পরায়ণ" বলে আখ্যা দিয়েছিল, কিন্তু আসলে তাঁর মত জাতীয়তাবাদী বা আন্তর্জাতীয়তাবাদী লোক আফ্রিকায় বোধ হয় আর কেউ নেই। কেনিয়াট্টার বিচারের সময় ১৯৪৮ সালে লিখিত এক চিঠি নিয়ে সরকারী তরফ থেকে অনেক হৈ চৈ করা হয়েছিল, যাতে সমস্ত কে· সি· এ-র নেতাদের এক সম্মেলনে যোগ-দান করার আমন্ত্রণ ছিল। করফিল্ড (২) তাঁর পূর্বলিখিত রিপোর্টে লিখে-ছেন, "মাউ মাউ-এর উৎপত্তি হয় সোজা কে সি· এ· থেকে এবং এর সাহায্যে কেনিয়াট্টা ও তাঁর সহচরবৃন্দ সমস্ত কিকুয়ুদের তার অধীনস্থ করতে চেয়ে-ছিল"। বিচারের সময় সরকারপক্ষ এবং করফিল্ড তাঁর রিপোর্টে যতদূর সম্ভব এই মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন এবং সমস্ত ঘটনাবলীকে এই মতের উপযোগী করে সাজাতে চেষ্টা করেছেন, যাতে কেনিয়াট্টাকে বন্দী করে রাখাকে তাঁরা ন্যায়োচিত কাজ বলে চালাতে পারেন। কেনিয়াট্টাকে বন্দী করে সরকার সেই সময়কার একমাত্র লোককে জনগণের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলেন, যিনি কিনা তাঁর ঔদার্য ও প্রতি-ভার দ্বারা জনমতকে বিশেষ করে একগুঁয়ে নেতাদের উচিত পথে চালিত করতে পারতেন। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁকে লোকচক্ষুর অন্ত-রাল করার ফলেই পরবর্তী দিনের বিদ্রোহে দু'পক্ষই মরিয়া ও বেপরোয়া-ভাবে বাড়াবাড়ি করেছিল, যার ফলে বহু অযাচিত ও অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। আসল কথা এই যে, উপরোক্ত চিঠি মূলে কারুর কাছে পাঠানোই হয় নি। যদিও বা পাঠান হত, তাহলেও কিছু এসে যেত না, কারণ এর কদর্থ করা হয় কেবল সরকারী আচরণকে সমর্থন করার জন্য।

এই চিঠিতে উল্লিখিত সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রাক্তন কে· সি· এ-র নেতাদের সামনে নতুন কর্মপন্থা তুলে ধরা ও তাদের সকলকে এই পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে নেয়েরি শহরে কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়নের প্রচেষ্টায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সমস্ত প্রাক্তন কে. সি. এ. নেতাদের কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতাদের, প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের ও সরকারী লয়ালিস্টদের আহবান করা হয়। এই সমস্ত লোককে ডাকবার উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রাক্তন সংস্থাগুলিকে পুনর্জীবিত করা নয়, শুধু তাদের সকলকে নতুন সংস্থাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা এবং এই সংস্থাটির ভেতরেই সকলকে একত্রীকরণ করা। এ ছাড়া করফিল্ড তাঁর রিপোর্টে এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন নি, যার সাহায্যে তিনি বলতে পারেন যে, মাউ মাউ-এর উৎপত্তি কে· সি· এ· থেকে। যদিও এ-কথা সত্য যে, কয়েকজন প্রাক্তন কে· সি· এ-র পরিচালক পরে মাউ মাউ শপথ নিয়েছিলেন, তাই থেকেই কিন্তু এ প্রমাণ হয় না যে, এই দুই সংস্থা আসলে একই ছিল। আসলে যতজন প্রাক্তন কে· সি· এ-র পরিচালক এই শপথ গ্রহণ করেন, তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বাইরের অর্থাৎ যাঁরা কে· সি· এ-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, এই রকম লোকও এই শপথ গ্রহণ করেন। আরও বলা যেতে পারে যে, যদিও কিছু পরিমাণ প্রাক্তন কে· সি· এ-র পরিচালক পরে কে· এ· ইউ-এরও পরিচালক হয়েছিলেন, তবে তার মানে এই নয় যে, এই দুই সংস্থা আসলে একই। এর থেকে বোধ হয় এইটুকুমাত্র অনুশীলন করা যেতে পারে যে, কেনিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের সংখ্যা খুব কম এবং এই সমস্ত নেতাদের ওপর জনগণের আস্থাও ছিল অনেক দিন।

১৯৪৫ সালে জেমস্ গিচুরু ও এলিয়ড মাথু প্রথমে কেনিয়া আফ্রিকান স্টাডি ইউনিয়নের স্থাপনা করেন, কিন্তু এক বছরের ভেতরেই "স্টাডি" কথাটা বাদ দিয়ে তার নতুন নামকরণ হয় কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ন (কে. এ. ইউ)। এর আগেই বলেছি কেন এই সময় প্রাক্তন কে· সি· এ-কে পুনরায় চালু করা হয় নি। কে·এ·ইউ-র সদস্যদের কোনরকম গোপন শপথ নিতে হত না, আর প্রথম থেকেই একে কেনিয়াব্যাপী রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ অবধি কে· এ· ইউ· তার মধ্যপন্থী মতের দ্বারা কোন ভাল ফল পায় নি, কারণ তার নম্র মতবাদের জন্য সরকার তাকে কোন রকমের আমলই দেন নি। কেনিয়ার গভর্নর নিজে জোমো কেনিয়াট্টাকে বলেন যে, তিনি যেন বিধানসভার সদস্য হবার উচ্চাশা না করে কোন ছোটখাট শহরের রাজনীতিতে ভিড়ে কিছু করে খাবার চেষ্টা করেন। শুধুমাত্র এই অপমানই একজন সাধারণ লোককে চরমপন্থী করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু কেনিয়াট্টা তাঁর অসাধারণ মনোবলের ফলেই নিজেকে সংযমের বাইরে যেতে দেন নি। এই রকম অবস্থায় যত দিন যেতে লাগল ততই দলের ভেতরে ও বাইরে চরমপন্থীরা অস্থির ও মরিয়া হয়ে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রভাবও বিস্তার লাভ করল। ফলে মধ্যপন্থীরাও দেশের শান্তিরক্ষার্থে চরমপন্থার দিকে কিছুটা এগিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের দুই বিপমগামী নীতি—একদিকে ইউরোপীয়ান প্রভাব বিস্তার ও অন্যদিকে আফ্রিকানদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রতি কেবল মৌখিক আশ্বাস—কেনিয়ার রাজনৈতিক আব-হাওয়াকে কেবলই জটিল করে তুলতে লাগল।

এখানে তথাকথিত "মাউ মাউ" নামক আন্দোলনের উৎপত্তির বিষয় কিছু বলা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অন্যান্য দেশের মত কেনিয়ারও রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারায় অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। আমাদের ওপর তখনকার ব্রিটিশ সরকার যে সামাজিক ও আর্থিক তোষণনীতি চালাচ্ছিলেন, তা ক্রমশই সকলের চোখে পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল এবং অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষিত আফ্রিকান অবস্থার আশু পরিবর্তনের প্রয়ো-জনীয়তা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হয়ে উঠছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রণক্ষেত্র থেকে "কিংস আফ্রিকান রাইফেলস্"-এর আফ্রিকান সৈন্যরা ঐ সময় হাজারে হাজারে দেশে ফিরছিলেন আর অন্যান্য দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের স্বদেশের অবস্থার তুলনা করে খুবই মর্মাহত হয়ে উঠেছিলেন। তা ছাড়া এই সময়েই ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে, ঘানার (গোল্ডকোস্ট) স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে আর এই সমস্ত দেশ সম্বন্ধে রাজনৈতিক আলোচনা রেডিও ও খবরের কাগজ মারফৎ অধিক-তর লোককে প্রভাবিত করতে থাকে। আমাদের দেশ, বিশেষ করে কিকুয়ু উপজাতির ভেতর এই সমস্ত কারণে রাজনৈতিক চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

[ক্রমশ]

---

(২) পূর্বলিখিত রিপোর্টের ২৬৭ পৃষ্ঠায়।

বহু শতাব্দীর প্রাচীন এই জ্ঞানমন্দির।

রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে অনেক—অনেক দূরে মথুরা রোডের শান্ত নির্জন পরিবেশে তুঘলগবাদ, হুমায়ুনের সমাধি ছাড়িয়ে পুরনো কিল্লার পাশে এই বিশাল গ্রন্থাগার।

এখানে আসে ছাত্র-ছাত্রী, আসে দেশী-বিদেশী জ্ঞানান্বেষীর দল, পৃথিবীর দূর-দূরান্তর থেকে টুরিস্টরা আসে, আসে সাংবাদিক, অধ্যাপক, স্কলার আর—

আরও আসে একদল। তারা ঠিক 'রিডার' নয়। তাদের জীবনের চারিদিকে হতাশার অন্ধকার নেমেছে, সংসার হয়ে উঠেছে ধু-ধু নিস্তৃণ মরুভূমির মত। ঘরে শান্তি নেই। মনে শান্তি নেই। তারাও এখানে আসে।

এরা হয় দর্শন, না হয় ধর্ম, কিম্বা যে-কোন একটা বিষয়ের বই নিয়ে বসে থাকে। অলসভাবে পাতা ওলটায়। ভাল না লাগলে চারিদিকে নানা রঙের ডালিয়া, ক্রসান্থিমাম আর কলাবতী ফুলে ফুলে ভরা বাগানের সবুজ মাঠে মন্থর পায়ে পায়চারী করে।

একদিন এল একজন। একমুখ কালো কুচকুচে চাপ দাড়ি। বেঁটেখাটো শক্ত-সামর্থ চেহারা। পায়ে জুতো নেই। গায়ে জামা নেই। শুধু মোটা খদ্দরের একটা চাদর জড়ানো রয়েছে গায়ে।

কি চাই?

আন্দামান-নিকোবর আইল্যান্ড সম্বন্ধে কোন ভাল বই আছে?

হ্যাঁ, মাউন্টাট ফ্রেডারিক জন পোর্টম্যান, জেমস হাওয়ার্ড, সিপ্রিন্যাল গাডিরো ইত্যাদি আরও কত লোকের লেখা অনেক রকমের বই আছে।

খানপাঁচেক বেশ মোটা মোটা বাঁধানো বই টেবিলের ওপরে জড় করে রাখল। ... চুলকোলো। চোখ দুটোকে কুঞ্চিত করে রাশি রাশি গ্রন্থের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ওসব বই-টই দিয়ে কিছু হবে না। গভর্নমেণ্ট রিপোর্ট আছে। গেজেট, সেন্সাস এসব কিছু আছে?

আছে। তার আগে বলুন তো আপনি কি লিখবেন। বললে আমার একটু সুবিধা হবে রেফারেন্স দিতে—

আমি আন্দামনের অরণ্যচারী আদি-বাসীদের ওপরে বই লিখবো।

বেশ। আন্দামানিজদের ওপরেও অনেক বই আছে, গেজেটিয়ার আছে—সেন্সাস আছে। কিন্তু আপনি এই খাতায় নাম-ধাম এবং আপনার সাবজেক্টের কথা লিখুন।

অস্ফুটস্বরে যেন নিজের মনেই বলল, এখানেও এত নিয়ম—

এখানকার বই পড়তে হলেই এইসব ফরম্যালিটি মানতে হয়—

চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল। মনে হল,

সুভাষ সমাজদার

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে যেন কোন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করছে। চাপা গলায় বলল—

কোথায় লিখতে হবে?

কোমরের সঙ্গে সরু সুতো দিয়ে বাঁধা একটা পেন্সিল বের করল। খুব চেপে যেন রেগে রেগেই লিখল—

সত্যকদম পাগলাচারী।

বাঁধাঘাট মায়াবাদী আশ্রম।

৯নং তাঁতিপাড়া লেন।

হরিদ্বার।

কোথায় বসবো?

কেন, এতবড় রিডিং রুম পড়ে রয়েছে। আপনি যে-কোন জায়গায় বসতে পারেন—

একটি কথা বলল না পাগলাচারী। রিডিং রুমের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো। বিশাল টেবিলে পাশাপাশি মহিলা, পুরুষ বসে নিবিড় মনোযোগে পড়াশুনো করছে।

মনের ভেতরে কিসের যেন যন্ত্রণা চেপে নিজেকে একটু সংযত করায় চেষ্টা করে আস্তে আস্তে বলল, স্যার, মেহেরবাণী করে আমাকে এমন একটা জায়গা দিন, যেখানে এই জেনানালোক আসবে না—পাশে বসবে না—চারিদিকের জমাট স্তব্ধতার ভেতরে তার কথাগুলো কান্নার কান্নার মত শোনালো।

আমি কোন কথা বললাম না। বললাম না—এই নিয়ম। বহু বছর ধরে পড়ুয়াদের পড়ায় সহায়তা করছি। আমি দেখেছি অনেক মানুষ। বিচিত্র তাদের মন। বিচিত্রতর তাদের জিজ্ঞাসা।

সুদূর বার্লিন থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে এখানে বাইশ বছরের ছোকরা এরউইন জুইন। এসেছে যোগের রহস্য জানতে। দাম্পত্য জীবনের চরম অশান্তিতে জ্বলতে জ্বলতে এসেছে খীলন। সে দেখতে চায়—কি আছে ডাইভোর্স অ্যাক্টে! এসেছে আরও কত—কত লোক। কিন্তু—

মায়াবাদী সাধু ব্রহ্মচারী সত্যকদম কেন মেয়েদের পাশে বসতে চায় না; কেন—কিসের আক্ষেপে সে ছুটে এসেছে এই জ্ঞানমন্দিরে। আর কেনই বা এত বিষয় থাকতে আন্দামানের আদিবাসী নিয়ে বই লিখতে মনস্থ করেছে!

আমি তাকে আমার সামনে একটা ছোট্ট চেয়ার-টেবিল দিয়ে একটা আলাদা বসবার জায়গা করে দিলাম।

সত্যকদম পড়ছে। নোট করছে। আর মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি যেন বকছে। হয়তো মনে রাখার জন্য উচ্চারণ করে পড়ছে।

বেলা বাড়ে। সত্যকদমের পড়ার গতি বাড়ে। বাইরে সবুজ মাঠে রোদ বাঁকা হয়ে পড়ে। পেটা ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যায়। সত্যকদমের কোনদিকে খেয়াল নেই। পড়া ছেড়ে একবারও ওঠে না, এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে যায় না।

পর পর কয়েকদিন সমানে পড়ে গেল সে।

বই তো প্রায় সব পড়া হয়ে গেল বাবুজী।

এইবার লিখতে শুরু করুন।

দু' চোখ চিন্তার ছায়া নামল। আস্তে আস্তে বলল, ব্যাপারটা কি জানেন বাবুজী, আন্দামানের বিশেষ করে এক ধরণের আদিবাসীর বিবাহ ও যৌন-জীবনের ওপরে জোর দিয়ে কেতাবটা লিখতে চাই। একটু থেমে নিজের মনেই বলল, দেখি হাউ টু স্টার্ট -

একদিন লক্ষ্য করলাম, সত্যকদম পড়ছে না। ছবি দেখছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম, বিপুলব্যাপ্ত সমুদ্রের পাশে নারিকেল বীথি। সাগরের হু-হু হাওয়ায় নারিকেলকুঞ্জ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে একদল মেয়ে। একেবারে নিরাবরণ চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে পাগলাচারীজীর।

কি দেখছেন পাগলাচারীজী?

দেখেছেন ওঙ্গী জারোয়াদের মেয়েগুলো কি অসভ্য! ফিস ফিস করে চাপা গলায় বলল, আপনি জানেন না বাবুজী, শুধু এরা নয়—সভ্য জগতের মেয়েরা জামা-কাপড় পরলে কি হবে, তারাও আসলে এমনি আদিম আর এমনি হিংস্র, আর। হঠাৎ থেমে গেল।

ওয়ার্ল্ড বিউটি কম্পিটিশান সম্বন্ধে কোন লিটারেচার দিতে পারেন?

গলার স্বর শুনেই পিছনে তাকালো পাগলাচারী। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় একেবারে দড়ির মত পাকিয়ে উঠল মুখখানা।

মেমসাহেব তো বটেই। তার ওপর আবার যথেষ্ট সুন্দরী।

বিউটি কম্পিটিশানের ওপরে কোন বই লেখা হয় নি ম্যাডাম—তবে লণ্ডনের 'টাইমস' ডেলী নিউজ পেপারের ইন্ডেক্স একবার দেখতে পারেন—

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো পাগলাচারী। চলে গেল একেবারে রিডিং রুমের এলাকা ছাড়িয়ে ভিজিটরদের হলঘরের দিকে।

কিছুক্ষণ পর।

ফিরে এল পাগলাচারী। খুব ক্লান্ত এবং অবসন্ন মনে হল তাকে। অবশ হাতে বইয়ের পাতা উল্টে যেতে লাগল।

লক্ষ্য করলাম কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারছে না। আস্তে আস্তে বলল, আমি মাঝে মাঝে ভাবি বাবুজী, অভিশপ্ত পৃথিবীটা রসাতলে যায় না কেন?

কেন?

যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে আস্তে আস্তে বলল বিধির দান যে দৈহিক সৌন্দর্য—তাই নিয়ে আবার কম্পিটিশান [illegible]? বিউটি প্যারেড—বিউটি কম্পিটিশান [illegible] বাই বন্দুক না কেন আসলে আড়ালে এটাও আন্দামানের আদিবাসী ওঙ্গী জারোয়াদের মত এক [illegible] আদিমতা—

কেটে গেল আরও কয়েকদিন। আন্দামান-নিকোবর আইল্যাণ্ডের ওপরে যত বই ছিল সব পড়ে ফেলল সত্যকদম। তারপর একদিন শুরু করল লেখা।

খস খস করে দ্রুত—অতি দ্রুত লিখে চলল। এক-একদিনে দশ-বারো পাতা করে লিখতে লাগলো।

কিন্তু আন্দামানের লোকাল গেজেটিয়ারে সরু ইটালিক্সে লেখা কোন কোন দেশজ শব্দ যেমন 'ঘড়া', সানাই ইত্যাদি বুঝতে না পারলেই সে অস্থির হয়ে উঠতো। লাইব্রেরীর বিভিন্ন কর্মীর কাছে ছুটে ছুটে গিয়ে শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞাসা করতো!

জিজ্ঞাসাবাদ করে এসে আবার লিখতে শুরু করতো: ঘড়া, সানাই ইত্যাদি অনেক শব্দই এখানকার আদিবাসীরা ব্যবহার করে। তাদের ভাষা, তাদের জীবনধারা খুব ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে! নৃতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন—সুদূর এই দ্বীপপুঞ্জের অরণ্যচারী আদিবাসীদের দেহের প্রবহমান রক্তধারায় বৃহৎ আর্যাবর্তের—

পাগলাচারীজী! এত খেটে যে লিখছেন। কে ছাপবে, পাবলিশার কে হবে, এসব ঠিক করেছেন কিছু?

পাবলিশার! একটু হাসল। হেসে বলল, আমার লেখার কথা লিখছি—কে ছাপবে তার আমি কি জানি বাবুজী, নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, এই যে গাছের পাতা নড়ছে, বাগান আলো করে ফুল ফুটে রয়েছে—এসব—সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। তা না হলে আমার তো এসব করাব কথা নয়। তীব্র যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল।

ঢং-ঢং-ঢ। ছুটির ঘণ্টা পড়ল। পড়ুয়ারা সবাই চলে গেল। পাগলাচারীজী অনেক—অনেক আগেই চলে গেছে। তার এসব করার কথা নয়। একথা কেন বলল পাগলাচারীজী? কোথায় যেন পড়েছিলাম জীবনটা একটা আকস্মিকতার মালা। কোন্ বিপর্যয়ে—কোন পরিস্থিতিতে পড়ে সত্যকদম পাগলাচারী মায়াবাদী সন্ন্যাসের দীক্ষা নিয়েছে। কেনই বা আন্দামানের আদিবাসীদের যৌনজীবন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

পরদিন লেখাপড়া শেষ করার পর কথায় কথায় বলল: শুনুন বাবুজী, প্ল্যান করে প্রোগ্রাম করে কিছু হয়—একথা আমি বিশ্বাস করি না। চোখ দুটো জলে জলে করছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে চলল: জীবনের সব—সব কিছুই প্রি-ডিটারমিণ্ড করা।

[illegible] কিছু আছে। কিন্তু পুরুষকার—

চুপ করুন, গর্জে উঠল সত্যকদম। ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বলল, পুরুষকার—মানুষের করবার যদি কিছু থাকতো তাহলে আমি জীপসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরতাম না, সাধু হয়ে পথে পথে বেড়াতাম না। এতদিন অক্সফোর্ড কি কেম্ব্রিজের এম-এ হয়ে—হঠাৎ থেমে গেল সে। সমস্ত উত্তেজনা, আক্রোশ মুছে গিয়ে তার মুখে বিষাদের ছায়া নামল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, ক্যান ইউ ইমাজিন, আই এ্যাম এ সান অফ এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট! বলেই মুখ নীচু করল।

আপনি তাহ'লে মায়াবাদী সন্ন্যাসী হতে গেলেন কেন?

অনেক প্রশ্ন। অনেক কৌতূহল। কিন্তু সেদিন বই বন্ধ করে চলে গেল পাগলাচারীজী আর একটা কথাও বলল না।

তবে কয়েকদিন পর সত্যকদম বলেছিল। বলেছিল তার বিচিত্র ও বিস্ময়কর জীবনের ইতিহাস।

সত্যকদম পাগলাচারীর আসল নাম সুন্দরলাল ওঝা। গোরক্ষপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের একমাত্র ছেলে।

ধনীর সন্তান। আবাল্য ঐশ্বর্যলালিত। সুখেই জীবন কেটে যেত। বিলেত থেকে ডাক্তারী কি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এদেশে এসে হোমরাচোমরা হয়ে বসতো। তারপর অর্ধেক রাজত্ব আর পরমাসুন্দরী কোন রাজকন্যা। বাঁধা ছকে জীবন চলতো। এতটুকু হেরফের হতো না। কিন্তু—

একদিন এক গণৎকার হঠাৎ রবাহুত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের বাংলোয় এসে ভবিষ্যদ্বাণী করল। দারুণ সেই ভবিষ্যদ্বাণী—জাতক পরিস্থিতিতে পড়ে সন্ন্যাসী হবে। পিতা-মাতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না—থাকতে পারে না—

ভয়ঙ্কর সেই ভবিষ্যদ্বাণী ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানজীর শান্তির সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিল।

একমাত্র ছেলে। সদাসর্বদা তাকে সতর্ক প্রহরায় আগলে রাখা হতো। কর্তা-গিন্নীর মনে একটা নিদারুণ ভয় বাসা বেঁধেছিল—

একদিন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর সামনে সবুজ মাঠে তাঁবু পড়ল। এল একদল যাযাবরী। পরনে খাটো লাল রঙের ঘাঘরা। ছোট ছোট দুটো চোখে তীক্ষ্ণ ছুরির মত দৃষ্টি। তারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ছুরি-কাঁচি বিক্রি করে। আর দলের পুরুষেরা সাপ খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, পশুপাখী শিকার করে।

চার বছরের ছেলে সত্যকদম তাদের বাংলোর সামনে মাঠে খেলা করছিল।

ছুরি লিবে গো—ছুরি—খুব বাঢ়িয়া কাঁচি আছে—ছুরি আছে—

বেদেনী হাঁকতে হাঁকতে এসে দাঁড়ালো বাংলোর সামনে। ওর নজর পড়লো ছোট ফুটফুটে ছেলেটির দিকে! দারোয়ান তাকে তাড়িয়ে দিল।

পরদিনই ঘটে গেল কাণ্ডটা। সেদিন বাংলার মাঠে খাদ্যের দাবী নিয়ে বিক্ষোভকারী জনতা এসেছিল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। সেই গোলমালের ভেতরে কোথায় যে বাচ্চা অদৃশ্য হয়ে গেল তা কেউ জানতে পারল না।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভেতরে আসতেই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নী—খোকাকে পাওয়া যাচ্ছে না—

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ছেলে চুরি! সারা জেলা তোলপাড় করে ফেলা হলো। কিন্তু—

আশ্চর্য! কোথাও ছেলেকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল আট বছর। সত্যকদম এখন বারো বছরের দামাল ছেলে। কিন্তু—

এই দীর্ঘ আট বছরেও এতটুকু পোষ মানল না ছেলেটি। সে শেয়াল-[illegible] মাংস খায় না। সাপ দেখলে ভয় পায়। যাযাবররা তার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে যায়। সত্যকদমকে অহেতুক বোঝা বলে মনে হয়। তাই একদিন তাকে কুম্ভমেলায় ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

এই পর্যন্ত বলে সেদিন থেমেছিল সে। চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমেছিল দূরকালের স্মৃতি। বাইরে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল। উতোল হাওয়ায় মাথা কুটছিল ডালিয়া, ক্রিসান্থিমাম ফুলগুলো। জানালার বাইরে মেঘে ছেয়ে-থাকা আকাশের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, সন্ন্যাসীরা আমাকে দলে টেনে নিয়েছিল—বলতে বলতে তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে। অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে আবার বলল, এদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কী ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা যে হয়েছিল সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে। হঠাৎ থেমে গেল সত্যকদম। খাতাপত্র গুটিয়ে নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল সত্যকদম।

পরদিন সত্যকদম এল না। এল না তার পরদিনও। আমার মনে হল, উত্তেজনার বশে হয়তো নিজের বিচিত্র জীবন-কাহিনী বলে ফেলে লজ্জা পেয়েছে, তাই আসছে না।

সত্যকদম সন্ন্যাসী। কিন্তু সাধুসন্তদের সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আছে বলছে। আর তার সঙ্গে আন্দামানের আদিবাসীদের কি যোগাযোগ থাকতে পারে।

বেশ কয়েকদিন পর হঠাৎ একদিন সত্যকদম এসে উপস্থিত হলো।

কি হয়েছে—শরীর খারাপ?

মাথা ঝাঁকালো সত্যকদম। একটিও কথা না বলে লিখতে বসল। একটু পরে হঠাৎ উঠে এল আমার কাছে। আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেইস' আছে?

আছে। দেবো? কিন্তু "থেইস" তো হলো সন্ন্যাসী পাফনুশিয়াস আর রূপসী এক পতিতার গল্প। একটু থেমে বললাম, আনাতোল বলতে চেয়েছেন, মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণার আড়ালে কত বাসনা, কামনা—

বিলকুল—বিলকুল ঠিক হ্যায় স্যার—সেই কেতাবে যা আছে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি, হাসল সত্যকদম। ম্লান বিষণ্ণ সেই হাসি। অস্ফুটস্বরে বলল, কে যেন বলেছিল, Deadly war waged with Apostolic desperation between flesh and spirit—আস্তে আস্তে বলল এই যে 'এ্যাপস্টলিক ডেসপারেশন' অর্থাৎ সাধু-সন্ত হয়ে শাস্ত্র যৌনকামনার তাড়নায় যে কী [illegible] হয়ে ওঠে, এমন কি হোমো-সেক্সুয়ালিটির মত ঘৃণ্য জঘন্য কাজ পর্যন্ত করতে এতটুকু দ্বিধা করে না, লজ্জার ছায়া পড়ল সত্যকদমের মুখে।

আবার বলল, বারো-তেরো বছর বয়সে আমার চেহারাটা ভাল ছিল। কোঁকড়ানো ঘন চুল। গোলগাল নাদুস-নুদুস শরীরের গঠন। যে দেখতো সেই কাছে ডেকে নিত—থাক সেসব কথা—

সন্ন্যাসীদের যে দলটা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা যে ঠিক কি, কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, তা আমি আজও বুঝতে পারি নি। কখনো তাদের কাউকে একটা

আধ্যাত্মিক কথা বলতে শুনি নি, কখনো কোন শাস্ত্র আলোচনা করতে দেখি নি—

মধ্যপ্রদেশের কয়েকটা মেলায় ঘুরে আমরা গেলাম হরিদ্বারে মাঘীপূর্ণিমার মেলায়। গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছে আমাদের ডেরা পড়ল। কিছুদূরে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের আশ্রম।

একদিন। গঙ্গার ঘাটে ঘুরছি। আমাকে দেখে মায়াবাদী এই সন্ন্যাসীদের দলভুক্ত একজন মধ্যবয়সী সন্ন্যাসী বলল, খোকা তুমি কি করে এই ভ্রাম্যমাণ সাধুদের দলে এলে?

আমার বৃত্তান্ত খুলে বললাম—

কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, যাযাবর এই সাধুরা তোমাকে যে কেন ধরে নিয়ে এসেছে পরে বুঝতে পারবে—

ডেরায় ফিরে আসতেই আমার ওপরে অত্যাচার শুরু করল। আমার অপরাধ—অন্য দলের সাধুর সঙ্গে কথা বলেছি।

এই ঘটনার পর ডেরা ছেড়ে বাইরে যাওয়া নিষেধ হয়ে গেল। দলের পাণ্ডা আমাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখত।

এই লোকটাকে আমার একটু কেমন কেমন মনে হতো। কারণে-অকারণে আমাকে জড়িয়ে ধরতো। বলতো, তুই ব্যাটা বহুত খাপসুরৎ আছিস—দেওতা কা মাফিক তেরা বদন—ইত্যাদি—

কাণ্ডটা ঘটে গেল সেইদিন।

সেইদিন—সেইদিন রাত্রে ডেরায় যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমিও ঘুমিয়েছি, এমন সময় প্রচণ্ড একটা চাপের চোটে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। দলের পাণ্ডা তার সেই দরজার কপাটের মত চওড়া বুকের ভেতরে আমাকে জাপটে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিষ্পেষণ করতে লাগল। নাক-মুখ দিয়ে আগুনের মত গরম নিশ্বাস পড়ছে। অন্ধকারে চোখ-দুটো হিংস্র জন্তুর মত জ্বল জ্বল করছে—

আপনি কি করছেন—কি করছেন আপনি? চিৎকার করে উঠতেই বাঘের থাবার মত শক্ত হাতে আমার মুখ চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল—তোকে আমি বহুত পেয়ার করি রে বেটা—বহুত পেয়ার করি—বলতে বলতে টান মেরে খুলে ফেলল আমার কৌপীন...তারপর—

তারপর? না—না, সে আমি আপনাকে—আমি আপনাকে আর কিছু বলতে পারবো না বাবুজী—থর থর করে কাঁপতে লাগল সত্যকদম পাগলাচারী।

আমার মুখের দিকে আর তাকাতে পারল না। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

হাওয়ায় উড়তে লাগল ফরফর করে তার পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো। ছোট ছোট দেবনাগরী হরফে ঠাসা লেখা। অস্থির ও দ্রুত লেখা যেমন হয়—সে লেখার অবিকল বঙ্গানুবাদ দেয়া হলোঃ—

সুদূর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের এক বিচিত্র জাতি জারোয়া। শত শত শতাব্দী ধরে তারা গভীর অরণ্যের ভেতরে লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করছে। আধুনিক সভ্যতাকে তারা ঘৃণা করে। শত্রু বলে মনে করে সভ্য মানুষকে!

মেয়ে-পুরুষ প্রত্যেকে একেবারে নগ্ন। এদের যৌনজীবন আদিম এবং অবারিত। —গভীর জঙ্গলে একটা বারোয়ারী ঘরের ভেতরে তারা মেয়ে-পুরুষ পাশাপাশি শয়ন করে। সে ঘরের মধ্যে পর্দা বা আব্রুর কোন ব্যবস্থা নেই!

নৃতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস এই জারোয়ারা পৃথিবীর আদিমতম আদিবাসী......এরা দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে—

শুধু কি এই জারোয়ারাই আদিম? জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত দুঃসাধ্য সাধনশরী সভ্য মানুষের মনের ভেতরে যে কামনার অগ্নিগোলক উগ্র ক্ষুধায় জ্বলছে .... যখন সমস্ত নীতি-ধর্ম-ভদ্রতা-সৌজন্যের আবরণ ভেদ করে সেই আদিম কামনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন?

জানি, মানুষ রেডিও, টেলিভিশান, রকেট আরও বিচিত্র অনেক কিছু আবিষ্কার করছে...কিন্তু এই সব তো সভ্যতার বহিরঙ্গ। সভ্য মানুষের মনের ভেতরটায় যেখানে তার কামনা-বাসনার আগুন জ্বলছে, যেখানে তার স্বার্থ-পরতা, নীচতা থরে থরে জমেছে—মনের সেই জায়গাটা কি পৃথিবীর আদিমতম আদিবাসী জারোয়াদের মতই নয়.. দেখতে হবে মানুষ কতটুকু, কতটুকু সভ্য হয়েছে মনের দিক থেকে......তার মুখোশ খুলে ফেলে দেখতে হবে......সেই পাণ্ডু-লিপির পাতাগুলো আমার কাছে আজও রয়েছে। সত্যকদম পাগলাচারী আর একদিনও আসে নি।

কনট সার্কাসের চারিদিকে বিড়লা কালীমন্দিরে, পুরনো কিল্লার আশেপাশে যেখানে সন্ন্যাসীরা হাত দেখে, সেখানে অনেক খুঁজেছি। আজও খুঁজি। কিন্তু—

আর তাকে দেখি নি কখনও।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পঞ্চাশ ॥

কণ্ট্রাক্টর যশরাজ সিংহ।

আন্দাজ বছর চল্লিশেক বয়সের বাঙালী যুবক। যদিও নামটি মোটেই বাঙালী-জনোচিত নয়। এ অঞ্চলে আসবার পর থেকে অনেকেরই মুখে নামটি এত বেশি শুনেছি যে, ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু ভদ্রলোক যে বাঙালী তা জানতাম না এবং কোনো কৌতূহল প্রকাশ করিনি বলেই ব্যাপারটি অজানা ছিল।

কণ্ট্রাক্টর যশরাজ সিংহের সাথে পরিচিত হওয়া গেল এবং সে পরিচয়-সূত্রেই এমন একটি সংবাদ অবগত হওয়া গেল—যা এ অঞ্চলের মানুষদের জানা থাকবার কথা নয়।

সংসারে কত রকমের অঘটন যে ঘটে! তাই আজো অবাক হয়ে ভাবি। যশ-রাজের বাড়ির দরজায় নামের ফলকে কণ্ট্রাক্টর কথাটি এত বেশি জমকালো ও জ্বলজ্বলে যে, তা' যে-কোন মানুষের চোখে পড়তে বাধ্য। বাইরে গাড়িবারান্দার ধারে প্রায় সময়েই পাঁচটা-ছ'টা-সাতটা গাড়ি পার্ক করা থাকে। ওদিকে একটা শেডের আড়ালে দাঁড়ানো গোটা দশ-বারো ট্রাক। মস্ত একটা জায়গা প্রাচীর ও তদুপরি কাঁটাতারে ঘেরা। রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে। জোরালো উজ্জ্বল আলো। প্রায় জনাদশেক লোককে ব্যস্ত হয়ে সর্বক্ষণ নানা রকম কাজ করতে দেখা যায়। গ্যারেজের কাজ দিবাভাগে তো চলেই, রাতে পর্যন্ত কাজের বিরাম হতে চায় না। মিস্তিরীদের হাঁকডাকে সর্বক্ষণ গ্যারেজ গরম থাকে।

এদিকটায় সদর দরজা। কাঁচের টুকরো-বসানো দেয়াল। সদর দরজার মাথায় বোগেনভিলাইয়ের দল। সাদা, লাল ও বেগুনী—তিন রঙই আছে। এরই মধ্যে ঢুকবার মুখে বাঁ-হাতি সাদা পাথরের ফলকে লেখা নামটা উৎকীর্ণ। যশরাজ সিংহ। বলা বাহুল্য ইংরাজিতেই, এবং তার ঠিক নিচেই নামের চাইতে বড় বড় অক্ষরে খোদিত কণ্ট্রাক্টর শব্দটি।

কণ্ট্রাক্টরই বটে। তবে প্রশ্ন এই যে, কিসের কণ্ট্রাক্টর? বস্তুতপক্ষে এ যুগ কণ্ট্রাক্টরেরই যুগ। কণ্ট্রাক্ট মানে চুক্তি। চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করে যে, তাকেই কণ্ট্রাক্টর বলা হয়। সভ্যতা তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে একটির পর একটি চুক্তি করছে। বাড়ি-ঘর, ফ্যাক্টরি-বাড়ি, নদীর ওপরে পোল, উড়োজাহাজের ঘাঁটি, ইস্কুল-কলেজ-পার্ক। সর্বত্রই চুক্তির জয়-জয়কার। প্রকৃতপক্ষে এ যুগ কণ্ট্রাক্টরদেরই যুগ। যে যত সফল কণ্ট্রাক্টর, তার হাতে তত টাকা। তার বাড়ি-গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, তার তত বিষয়-সম্পত্তি।

স্বাভাবিকভাবে কণ্ট্রাক্টর যশরাজ সিংহও নিশ্চয়ই এমনি একজন সফলকাম কৃতী ব্যক্তি হবেন। লোকজনের হরদম আনা-গোনা ও ব্যস্ততার ভিড় দেখেই যশরাজের খ্যাতির বিস্তৃতি অনুমান করা চলে। বলা বাহুল্য, ডুয়ার্সের এই খ্যাতনামা কণ্ট্রাক্টর সাহেবের জীবনের বৈচিত্র্যটুকু আবিষ্কার করতে আমার খুব বেশি একটা সময় লাগে নি।

কণ্ট্রাক্টর সাহেবের মাথায় অল্প-অল্প চুল, গায়ে একটা গরম নক্সাদার ভুটিয়া পুলোভার। আলাপ হতেই আমাকে বলে-ছিলেন কথা প্রসঙ্গে, ইদানীং ভুটানের দিকেই কাজ বেশি। দেখতে পাচ্ছেন তো গায়ের এই জিনিসখানা!

অবাক হয়ে দেখছিলাম। যদিও অবশ্য দেখবার কি ছিল তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। পুলোভারটির বৈশিষ্ট্য বলতে এখানির রঙ গাঢ় কমলালেবু বর্ণের, তার ওপরে পেট ও বুকের দিকে অনেক-গুলি জংলিগাছের লতাপাতা আঁকার চিহ্ন।

কথা বলতে বলতে একটা বল-পয়েন্ট কলমে কাগজের উপরে আঁকিবুকি কাট-ছিলেন যশরাজ সিংহ। সারা টেবিল জুড়ে মস্ত একখানা কাঁচ। সৌখিন সেক্রেটারিয়েট টেবিল অবশ্য। তাতে টেবল-ক্যালেন্ডার। একপাশে লাল ও নীল কালির দোয়াত। অন্যদিকে টেলিফোন ও তার পাশেই রক্ষিত একখানা টেলিফোন ডাইরেক্টরি এবং খানকয় ডায়েরী। পিছন দিকের দেয়ালে মস্ত একটা দেয়াল-ঘড়ি ও দেয়াল-আলমারীর তাকে রক্ষিত একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত নটরাজ মূর্তি। তাঁর কথার উত্তরে আমি বললাম, ভুটিয়া পোষাক খুব গরম হয় বুঝি?

যশরাজ সিংহ বললেন, সাধারণত কলকাতার বাজারে ভুটিয়াদের হাতে ভুটানী মাল বলে যে-পোষাক চলছে, তার অধিকাংশই ভুটানী নয়। আমি নিজে দেখে এসেছি মশায় কলকাতার গিয়ে। ভুটানী জিনিস বলে কলকাতার পথে-পথে এসব জিনিসের কী চাহিদা! দেখে অবাক হতে হয়। পার্কে-পার্কে কী ভিড় মশাই ওদের কাছে।

ওসব ভুটানী নয়?

ভুটানে থেকে থেকে ভুটানী হয়ে গেছি মশাই! আমাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া চাট্টিখানি কর্ম নয়।

তবে?

ও-সবের অধিকাংশই খাঁটি লুধিয়ানার মাল। ভুটিয়াদের ভালো হারে কমিশন দিয়ে তাদের হাতে বিক্রি করাচ্ছে মশাই!

শুনে চোখ কপালে তুলেছিলাম।

খাঁটি ভুটিয়া জিনিস কিনতে চান তো চলে আসুন আমাদের কাছে।

ভুটানেই কি আপনার ব্যবসা?

আমার ব্যবসা আসলে কাঠের। সারা ডুয়ার্স জুড়ে নানা জায়গায় কাঠের ব্যবসা আছে আমাদের। গভর্মেন্টকে কাঠ সাপ্লাই করে থাকি। বলতে গেলে বাবার আমল থেকেই এ ব্যবসা আমাদের। ইদানীং রাস্তাঘাট আর বাড়ি-ঘরের ব্যবসাও কিছু কিছু করছি। ওই যাকে বলে গিয়ে কণ্ট্রাক্ট বিজনেস।

কথা-সূত্রে আলাপ জমে উঠেছিল। এবং সেই সূত্রেই উদ্ঘাটিত হল ব্যাপারটা।

চন্দ্রলোক নিজেই বলেছিলেন। শুধু বলা নয়, আমাকে একটু বেশি উৎসাহ দিয়ে বলেছ [illegible] গোড়ার দিকটার কাহিনী।

যশোরাজ সিংহ একসময়ে কবিতা লিখত। এবং যেমন-তেমন যা-সে কবিতা নয়, সে সব কবিতা প্রকাশিত হত, তাকে নিয়ে বেশ একটা হৈ-চৈ। আলোচনা-[illegible] উঠেছিল।

তখন তিনি কলকাতার ছাত্র। ম্যাট্রিকের ক্লাস থেকে ইউনিভার্সিটি পাশ দিয়ে গিয়েছি [illegible] কলকাতায়। [illegible] মুখচোরা [illegible] যশরাজ।

বাবা ছিলেন বিক্রমরাজ সিংহ। প্রথম জীবনে [illegible] লিপ্ত ছিলেন অনুশীলন সমিতির গুপ্ত আখড়ায়। তখন দেশময় [illegible] আন্দোলন খুব জোরালো। বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকরা সক্রিয়। নানাস্থানে [illegible], গুপ্তসমিতিগুলির মাধ্যমে আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি। [illegible]।

[illegible]। [illegible] লেগেছিল বিক্রমরাজের দীক্ষা। কিন্তু শাসকেরাই বুঝতে পেরেছিল এ জীবন তাঁর জন্যে নয়। পুলিশের [illegible] তাড়ায় তিনি তখন [illegible]। গুপ্তচরের দল ছায়ার মত ঘুরত তাঁর পিছন পিছন।

লালমণিরহাট হয়ে তিনি পালিয়ে এলেন ময়নাগুড়ি। দিনকতক ছিলেন পাটগ্রাম। এদিকে মুজনাই মাদারীহাট। কে চেনে কোন এসব এলাকা! কে জানে এদের নাম! দিনরাত্রির বৃষ্টি, আকাশ অন্ধকার ঘোর মেঘ। মশকের দংশন। তার সঙ্গে অনিবার্য ব্ল্যাক ফিভারও ছিল। স্বয়ং যমের দক্ষিণদুয়ার যাকে বলে তাই ছিল এদিকে। মাদারীহাট থেকে হাসিমারা ছ' মাইল ছিল গভীর জঙ্গল। যাই হোক, এখানে এসে কাঠের ব্যবসা ফাঁদলেন বিক্রমরাজ। সে কী আজ দু'একদিনের কথা! ব্রাউন সাহেব সাহায্য করেছিলেন তাঁকে।

নিজের লেখাপড়া হয় নি, তাই ছেলে যশরাজকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার আগ্রহের অন্ত ছিল না তাঁর। পাঠালেন কলকাতা। পড়তে গেল বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যশরাজ নাম লেখাল কবির দলে।

তারপর সে কাব্যকটা বছর গেছে ঝড়ের মত। বি-এ ক্লাশের শেষের দিকেই যশরাজ লিখতে আরম্ভ করল কবিতা। যশরাজ সিংহ নামটা আর যাই হোক কবির পক্ষে উপযুক্ত নাম নয়, কিন্তু সে নামেই বাংলা সাহিত্যে একটা অদ্ভুত প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা বয়ে এনেছিল সে-যুগে। তখন কাগজে কাগজে কবিতা লিখছে যশরাজ। সে-সব কবিতার মধ্যে জোরালো প্রতিভার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে বাংলা সাহিত্যের একদল পাঠক ও সমালোচকের দল যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

কে এই যশরাজ? পত্র-পত্রিকায় তখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার আর অন্ত নেই। যশরাজ সবেমাত্র বি-এ পাশ দিয়েছে। ভর্তি হয়েছে এম-এ ক্লাশে। মুখচোরা লাজুক কৈশোরের ভীরু-ভীরু ভাবটা কাটিয়ে আত্মপরিচয় ও আত্মবিকাশের সাধনার দিকে পা বাড়িয়েছে।

এই পর্যায়ে হঠাৎ আত্মগোপন ও অজ্ঞাতবাস।

যশরাজকে দেখা গেল ডুয়ার্সের পথে-পথে। হ্যাঁ, পড়া ছেড়ে দিয়েছে সে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম কাটিয়ে দিয়েছে। লেখায় ভাটি পড়ল না, একেবারেই ছাড়ল। যারা কাগজে কাগজে তার কবিতা ও নাম দেখতে অভ্যস্ত ছিল, প্রথমে তারা খোঁজাখুঁজি চালাল নিজেদের মধ্যে। পরে এদিক-ওদিক কোথাও খুঁজে না পেয়ে ধীরে ধীরে ভুলতে চলল নাম।

হাসতে হাসতে যশরাজ বলেছিল তার জীবনের এই ইতিহাস। বলেছিলাম, হঠাৎ ছেড়ে দিলেন সব?

তুলিতে টানা একজোড়া পাতলা ভ্রূ যেন বলাকা-পক্ষের মত আকাশে উড়ল। হাসল যশরাজ। বলল, তাই তো দেখছি।

কেন ছাড়লেন?

আবার এক ঝলক হাসির শব্দ। বলল, এমনি এমনি। ধরা যাক, কোন কারণই ছিল না। নেহাৎই খেয়ালখুশি।

কাব্যের সুবর্ণমন্দির থেকে ফিরে এল যশরাজ সিংহ। সুনিশ্চিত যশের প্রাকার ভেঙে ভেঙে আবার নিচের দিকে যাত্রা। একান্ত অভাবিত প্রতিষ্ঠা এসেছিল জীবনে। মানুষের জীবনে কতই বা আসে! নিজের খুশিতে সব কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আবার ডুয়ার্সের পথে পথে।

ইতোদিনে বিগত হয়েছেন পিতা। বিক্রমরাজ যাঁর নাম, বিধাতার বিক্রমের কাছে পরাজয় মেনে ইতোদিনে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন স্বর্গরাজ্যের উদ্যানে।

পিতার ছেড়ে-যাওয়া সিংহাসনে বসল যশরাজ। অর্থাৎ বাপের কাঠের ব্যবসা উত্তরাধিকারসূত্রে এল তার জীবনে। সেই থেকে চলেছে একই ধারায়। ডুয়ার্সের বনে বনে ফাল্গুন আসে। প্রথম ফাল্গুনের পরশ পেয়ে বনে বনে উতলা হয় বাতাস। ফুলের লতায় জেগে ওঠে কুঁড়িগুলি। মালঞ্চে জাগে নব উন্মাদনা। পাহাড়ে পাহাড়ে ফোটে নানারঙা ফুলের যৌবন। শালের বনে বনে দেখা দেয় গন্ধের উল্লাস। ফুল ফোটে, রাশি রাশি ফুল ঝরে পড়ে। ফোটে দারুচিনি ফুলের দল। আসে মৌমাছিরা। প্রজাপতিরাও জলসায় যোগ দেয়। জলঢাকা-রায়ডাকের বনে বনে চঞ্চল হয়ে ফেরে হরিণী। কালজানি নদীর পাড়ে পাড়ে কঠিন মাটির রস শোষণ করে ফোটে বকুল। ডিমা-তোর্সা নদীর ধারে-ধারে ধুতুরো ও ভাটফুলের ঝোপে-ঝাড়ে ওড়ে নানারঙা প্রজাপতির দল। বর্ষায় ফোটে কদম ও চাঁপা। গ্রীষ্মের পথে পথে আকাশ রাঙা করে ফোটে কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া-গুলমোরের দল।

সব কিছু ভুলে গেছে যশরাজ। ডুয়ার্সের কাঠের ব্যবসায়ীর চোখে প্রকৃতি আজ আর ধরা দেয় না তার রূপসৌন্দর্য নিয়ে। গাছের ফুল-পাতা-পল্লবে রোমাঞ্চিত হয় না দেহ। চঞ্চল হয় না মন-প্রাণ। বসন্ত-বর্ষায় সমান উদাসীন। গাছপালাকে বিচার করে গজ-ফিতে দিয়ে। যশরাজের টেণ্ডার নিয়ে সরকারী অফিসে জমা দিতে যায় তার মাইনে-করা কর্মচারীর দল।

ইতিমধ্যেই চুলে দুটো-একটা পাক ধরেছে। রূপো-চকচকে তার রঙ। দেহেও খানিকটা মেদ বেড়েছে। মুখ-চোখ ভরাট হয়েছে খানিকটা। কপালের দিকটা চওড়া হয়েছে অনেক।

বয়স বেড়েছে। কাজের চাপও বেড়েছে। নিজের ওপরে নির্ভরতাও বেড়েছে অনেক। কবিতা রচনার কথা মনে হয় আজ। ভাবতে হাসি পায়। ছেলেমানুষী মনে হয় সে-দিন কটা। কী ভুলই যে করেছিল।

ভাবতে গেলে এখন কত সুখে আছে। এখন অবশ্য কাজ অনেক বেশি। প্রায় সারা দিনরাত্রিই কাজে-অকাজের ঝামেলায় থাকতে হয়। ব্যবসা বেড়েছে আজ। বাপের আমলের সেই কাঠের ব্যবসাই নয়, উদ্যোগী পুরুষসিংহের মত অনেক দিকে পা বাড়িয়েছে যশরাজ। প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। কাঠের ব্যবসা আছেই। তা ছাড়াও করেছে দু'-তিনটে পেট্রল এজেন্সী। রাত্রিদিন ডুয়ার্সের পথে পথে ছুটছে গাড়ি-ঘোড়া। অন্ধকার অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে পীচ চকচকে রাস্তা। ভারী টায়ারের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে অরণ্য-মাটি-ঘাস। পেট্রলের এজেন্সীগুলি সারারাত আছে জেগে। আলো জ্বালিয়ে। শুধু পেট্রল নয়, মবিল অয়েলও আছে তার সঙ্গে।

ব্যবসার জন্যে তার নিজেরও আছে ট্রাক-জীপ প্রভৃতি। একটা গোটা গ্যারেজই চলেছে তার নিজের প্রয়োজনে। মাইনে দিয়ে এনেছে ভালো ভালো মেকানিকদের। এ ছাড়া তার নিজের ব্যবহারেরও আছে গাড়ি। অ্যাম্বাসাডর আছে, ছোট ফিয়েট গাড়িও আছে একটা।

উৎসাহের আতিশয্যে জ্বলজ্বল করছে যশরাজ। বেরিয়ে পড়ছে যখন খুশি তখন। নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করতেই ভালো লাগে। প্রয়োজনের তাগিদে বসে পড়ে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে। ছুটানেও

হচ্ছে কাজ। সে-কাজ নিজেই দেখা-শোনা করে যশরাজ। নতুন কাজ। তা ছাড়া বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে সুনাম-দুর্নামের প্রশ্ন আছে। এই অল্প কয়েকটি বছরেই নিজের সুনাম বাড়িয়েছে অনেক গুণ। সেই প্রতিষ্ঠাকে আরো দৃঢ় করতে চায়। শক্ত বনিয়াদের ওপর স্থাপন করতে চায়।

যশরাজকে বলেছিলাম, এ জীবন আপনার ভালো লাগে?

খারাপই বা কিসে? একটা সিগারেট ধরিয়ে এক কাপ চায়ে চুমুক দিয়ে যশরাজ বলেছিল, আমার তো কিছুরই অভাব নেই।

সে-কথা একশ'বার সত্যি। কন্ট্রাক্টর যশরাজের কথায় ভুল ছিল না। হয়তো কোনদিন তার মধ্যে জেগে উঠেছিল এক কবি। জলস্রোতের প্লাবনের মত। ডুয়ার্সের ক্ষ্যাপা নদীগুলির মত প্রবল জলের তোড়ে ছুটেছিল অবাধ মুক্ত গতির তরঙ্গ-ভঙ্গে। তারপর তাদেরই মত আবার সব জলস্রোতের অবসান। দু'-এক ঘণ্টা পরেই আবার সেই ঝকঝকে বালুর বিস্তার। একদা পাগল কবি জেগেছিল যশরাজের বুকে। নিশ্চয়ই সে কোনো অভাব থেকে। অভাবের অপূর্ণতা থেকেই তো কবির সৃষ্টি। যন্ত্রণার গভীরতা থেকে।

ডুয়ার্সের লক্ষপতি বাঙালী ব্যবসায়ী যশরাজ আর সেদিনকার পাগল কবি যশরাজ সিংহের মধ্যে তফাৎ তো সেইখানেই। বাড়ি গাড়ি-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কিছুরই আজ অভাব নেই যশরাজের। কোথাও এতটুকু ফাঁকা নেই। অপূর্ণতা নেই।

বলেছিলাম, নিত্যকালের সিংহাসনে চিরজ্যোতি বসতে পারতেন আপনি। কি পেলেনই বা তার পরিবর্তে? কন্ট্রাক্টর যশরাজকে কজনেই বা মনে রাখবে! ডুয়ার্সের পথে পথে শীত-গ্রীষ্মে-বসন্তে-বর্ষায় শুকনো পাতার মত কত কী ঝড়ে উড়িয়ে নিচ্ছে কে তার খবর রাখে।

এক মুহূর্তের জন্য কি করুণ দেখিয়েছিল যশরাজের মুখ? পেন-স্টাণ্ড থেকে কলমটা তুলে নিয়ে গেল অন্যমনে। আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল কাগজে। হয়তো বিহ্বল হয়েছিল ক' মুহূর্তের জন্য। খানিক পরে মুখ তুলে বলল, কি জানি কেমন করে যে খাস সরস্বতীর ও-লাইনটার চুকে পড়েছিলাম আজ তা মনেও পড়ে না। কেন ফিরে এলাম তাও ঠিক বলতে পারবো না। তবে হয়তো এমন হতে পারে, ব্যবসার কাজ একলাই চালাতে গিয়ে বাবার শরীর ভেঙে পড়েছিল। চিরকাল খুবই চাপা-মানুষ ছিলেন বাবা। আমি একই ছেলে। তাই ছোটবেলা থেকে একটু বেশি ভালোবাসা-স্নেহ পেয়ে পেয়েই বড় হয়েছিলাম। আমার মা ছিলেন না। ছোটবেলাতেই তাঁকে হারিয়েছিলাম। তাই বাবাকে আমার মায়ের অভাবটাও পূর্ণ করতে হয়েছিল। এত কাজের মধ্যেও, এত বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরেও কী করে যে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। তারপর বড় হয়ে পড়তে গেলাম কলকাতায়। পড়াশুনো হল আর কোথায়? এম-এ ক্লাশে ভর্তি হবার পর থেকে তো শুধু দলবল নিয়ে হৈ-হৈ করেই কাটল। এক ছুটিতে হঠাৎ টাকার তাগিদে বাড়িতে ফিরে এসে বাবার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। তখন তাঁর প্রায় শেষ স্টেজ। লিভারের পচন ধরেছিল, লিভারেরই বা দোষ কী। অনিয়মিত খাটুনীতে তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল। কি জানি মনটা দমে গেল হঠাৎ। ঠিক করলাম, কলকাতায় আর যাব না। আমি ছেলে। এইখানে থেকেই তাঁর কাজ দেখাশোনা করব।

একটু থামল যশরাজ। গলা ভারী হয়ে উঠেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবার ছল করে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ওদিকে একটা কাঞ্চনফুলের গাছ। ফুলে ফুলে রাঙা হয়ে উঠেছে। ডুয়ার্সের রাস্তায় এখন চৈত্র মাস। বাসে আসতে আসতে দেখেছি কৃষ্ণচূড়ারা ফুটেছে দু'ধারে। একটা গাড়ি চলে গেল ভারী চাকার শব্দ তুলে। ঘরের ভিতরটাও কাঁপল। আবার কথা বলতে শুরু করবার আগে-আগেই টেলিফোন বাজল। বাঁ-হাত বাড়িয়ে তুলে নিল যশরাজ। —কে, পরশুরামবাবু? জলপাইগুড়ি যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? আসুন চলে, আমি আছি।

টেলিফোন রেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল যশরাজ, গুড হেভেন্স! দেখতেই পাচ্ছেন কী ভীষণ ব্যস্ত। দু' সেকেণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলব তার জো নেই। গলার সুরটা হঠাৎ পাল্টে নিল যশরাজ। —বাবা মারা গেলেন সেবারেই। সময় মত কলকাতা নিয়ে চিকিৎসা করালে হয়তো আরো ক'টা দিন বাঁচতেন। এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন বাবা। বিশ্রাম বলে কোনো বস্তু তাঁর জীবনে ছিল না। সেই থেকে দায়িত্ব সব আমার কাঁধেই এসে পড়ল। ব্যবসা করছি আজও। বিয়ে-থা করেছি, সংসারী হয়েছি। ডুয়ার্সের মানুষ আমরা। জঙ্গল, কাঠ আর মুটে-মজুর নিয়েই কেটে গেল জীবনটা।

ক্রীং ক্রীং......। টেলিফোনটা আবার বাজল।

(ক্রমশ)

ক'দিন আগে হাসিমুখে লক্ষ্মী এসে খবরটা দিয়েছিল। সেদিন থেকে বুকের ভেতর এক অশান্ত দাপাদাপি শুরু হ'য়েছে। দ্রুত লয়ে বাজতে বাজতে সেই দাপাদাপিটা যেন শমে পৌঁছুতে চাইছিলো। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, অথচ চোখ বুজলেই মনে হ'চ্ছে না ঘুমোনোই ভালো। কাল ভোর থেকে কত কাজের তাগিদ। উঠতে বেলা হ'লে সব কাজ ভণ্ডুল হবে। তার চেয়ে এই ভালো। চুপচাপ শুয়ে নেংটি ইঁদুরের ঘরময় ছুটোছুটি, আরশুলার খড়খড়ানি আর পাশের ঘুমন্ত লোকটার নাক ডাকানি শোনা। পচা ভাদ্রের দমআটকানো রাত। হাতপাখা টেনে টেনে টনটনিয়ে উঠলো হাত, জ্বালা ধরলো ঘাড়ের শিরায়। একসময় মনে হলো অন্ধকার ফিকে হ'য়ে আসছে। দু'-একটা দলছুট কাকের ডাকও শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ এক ঝলক কড়া বিড়ির গন্ধ নাকে এলো। পাশের মেঠো গলি দিয়ে লোক চলাচল শুরু হয়েছে। এ-পাশে লোকটা কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। একটা রাতও যে না ঘুমিয়ে কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকবে আর তাঁর দুর্ভাবনার ভাগীদার হবে এ তেমন লোক নয়। গা ধরে কয়েকবার নাড়া দিলেন, চুল ধরে টানলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। উঃ বলে আড়ামোড়া ভেঙে পাশ ফিরে শুলো লোকটা। কোটরগত বোজা চোখ দু'টো গর্তের ভেতর কোথায় যে সেঁধিয়ে গেছে দেখাই যায় না। ভাঙা দু'টো গাল কাঁচাপাকা দাড়িতে আচ্ছন্ন (সপ্তাহে একবারও দাড়ি কামায় না নাকি)। পুরু ঠোঁট নিশ্বাসের তালে তালে ছুঁচলো হয়ে ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে। ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে—অন্ধকারেও সুরবালা দেখতে পেলেন। ঘুমন্ত লোকটার দিকে এক পলক তাকিয়ে বিরক্ত মনে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পাশের ঘরের পরমেশ বিকট আওয়াজ করে মুখ ধুচ্ছে। ধোঁয়া দেখে বুঝলেন নির্মলাও উঠে পড়েছে। আঁচ দিয়েছে উনুনে। এখনি রান্নাবান্না শুরু করবে। বারো মাস, তিরিশ দিন একই নিয়মে রাত থাকতেই উঠে পড়ে ওরা। সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে পড়ে পরমেশ। চটের থলিতে ভরে নেয় এ্যালুমিনিয়ামের দু'টো কৌটো—একটায় ভাতেভাত আর একটায় খান আষ্টেক রুটি আর এক থাবড়া গুড়। তারপর দৌড়য় ছ'টা পাঁচের ট্রেন ধরতে।

আর এদিকে তাঁর সোয়ামী মানুষটা। একটা নিরেট ঘুম-কাতুরে কুম্ভকর্ণ। কাজটাও পেয়েছে তেমনি। যা জোটে দু'টো মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ে আটটা না বাজতেই। তারপর গিয়ে বসে গজাননলালের কাপড়ের দোকানে। খদ্দের থাকলে বসে বসে কিছু কেনাবেচা চলে। না থাকলে ফর্সা চাদরের ওপর বসে বসেই ঢুলবে। দোকান বন্ধ করে ফিরবে সেই রাত ন'টায়। ফিরে শুধু ক'টা রুটি চিবোবার ওয়াস্তা। তার পরেই বিছানা। মুহূর্তের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করবে। প্রথম প্রথম মুখ ঝামটা কম দেন নি সুরবালা। লোকটা কিন্তু নির্বিকার। কোনদিন মুখে রা কাটে নি আর সংসারের কোন কিছুর মধ্যে থাকে নি। কেমন ক'রে ক'টা টাকায় চালাচ্ছেন সুরবালা তা'র কোন খোঁজও রাখে নি। বকেছেন, ধমকেছেন, মুখ বুজিয়ে হুকুম তামিল ক'রেছে। পঁচিশ বছর ধরে এই একরকম চলে আসছে। রাগারাগি ক'রে যখন কিছু হলো না তখন কিছুদিন কিছু বলতেন না। ভাবতেন ছেলেপুলে হ'লে, দায়-দায়িত্ব বাড়লে একটু

নড়বে-চড়বে। চেষ্টা-চরিত্তির করে আরও ক'টা টাকা আনবে ঘরে। কিন্তু কোথায় কি! কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই লোকটার। তারপর মেয়ে জন্মালো, সে বড় হলো। কিন্তু লোকটার কোন পরিবর্তন হলো না। অতবড় বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে গলায় ঝুলছে, তবু দিব্যি ক'রে খাচ্ছে-দাচ্ছে, কাঁসি বাজাচ্ছে। টাকা না হয় নেই, কার বা হাতে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা থাকে এ-রকম ঘরে। তবু তো ধার-দেনা ক'রে টাকা যোগাড় করে মানুষ। মেয়ে যখন হ'য়েছে তখন তার বিয়ে তো একটা চাই।

পাশে ঘুমন্ত মেয়ে লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। বড় সাধ করে, আশা নিয়ে নাম রেখেছিলেন লক্ষ্মী। অভাবের সংসারে মেয়ে যদি স্বাচ্ছন্দ্য আনে কোন-দিন, বড় আশা করেছিলেন। আজ তাঁর সে-আশা পূর্ণ হতে চলেছে। ঘরের কোণে রাংতা-লক্ষ্মীর পটের দিকে ফিরে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বেরিয়ে এলেন সুরবালা। উনুনে আঁচ দেওয়া, কাপড় কাচা, লক্ষ্মীকে তুলে কলতলায় পাঠানো পর পর সারলেন। তারপর কেটলিটা উনুনে চাপিয়ে ঘরে ফিরে হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল সুরবালার। লোকটা তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। একটা চাপা আক্রোশে ফুঁসে উঠে মাথার তলা থেকে তেল-চিট্‌চিটে ঘেমো বালিসটা টান দিয়ে সরিয়ে নিলেন। লোকটা তবুও মড়ার মত ঘুমুচ্ছে। শেষে না পেরে এক ঘটি জল এনে ছিটিয়ে দিলেন মুখে-চোখে। বিছানাটা ভিজে গেল। তা যাক্‌গে। উঠোনে ফেলে দিলে হবে। রোদ্দুরে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু এতে কাজ হলো। লোকটা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। তারপর পিচুটি-বোজা চোখে পিটপিটিয়ে তাকালো। —বলি কি বে-আক্কেলে লোক রে বাবা! আজকের দিনটাও যে একটু ভোর-ভোর উঠবে তার গা নেই।—সুরবালার ঝঙ্কারে ছেঁড়া লুঙ্গিটা সামলাতে সামলাতে লোকটা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর হন্তদন্ত হ'য়ে দৌড়ুলো বারোয়ারী কলতলার দিকে। উঠোনের কোণে জড়ো করা উনু-নের ছাই থেকে এক চিমটে তুলে দাঁতে ঘষতে ঘষতে কলতলার চটের দরজা ঠেলে দিল।

দালানের একপাশে তোলা-উনুনে রান্না করেন সুরবালা। কেটলি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলটা দিয়ে ধরে কেটলিটা নামিয়ে ফেললেন। তারপর কী মনে হতে দৌড়ে এলেন ঘরে। কেটলিতে চা দিতে ভুলেই গেলেন। ঘরে পা দিতে-না-দিতেই মনে পড়লো চা দেওয়া হয় নি। তখনি আবার ছুটলেন। কেটলিতে চা দিয়ে ও-ঘরে গেলেন। লক্ষ্মী টিউশনিতে বেরুবার উদ্যোগ করছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। মেয়েটা খেটে খেটে আর না খেতে পেয়ে হাড়সার হয়ে গেছে। বয়সের চেয়ে ছোট দেখায়। বাড়-বাড়ন্তও তেমন হয় নি। যদি এবার একটু আরাম পায়। —একটু দাঁড়িয়ে যা মা! চা-টা খেয়ে যা। শিলপায়ে পা গলাচ্ছিল লক্ষ্মী। মা'র কথায় এদিকে ফিরলো। সুরবালা কিন্তু উনুনের দিকে গেলেন না। এখন মনে পড়লো তখন কেন দৌড়ে ঘরে এসেছিলেন। আজকাল যা ভুলো মন হয়েছে। একটা কাজ করতে সাতবার দৌড়োদৌড়ি করেন। লক্ষ্মীঠাকুরের পটে দুটো ফুল দিয়েছিলেন ভোরে। একটা ফুল লক্ষ্মীর মাথায়-বুকে ছুঁইয়ে আঁচলে বেঁধে দিলেন। তারপর কেরোসিন কাঠের বাক্সটা টেনে এনে মেয়েকে ডাকলেন। কতদিন চা না খেয়ে লক্ষ্মী বেরিয়ে গেছে। একদিনও দাঁড়িয়ে যেতে বলেন নি। আজ মেয়েকে যত্ন করতে ইচ্ছে হলো সুরবালার। —একটু বোস্ মা! চা ছাঁকবো আর দোব। চায়ের বাদামি কষ-ধরা একটা ন্যাকড়া কাপের মুখে মেলে দিয়ে কেটলিটা তুলে নিলেন সুরবালা। লক্ষ্মী মায়ের যত্নে খুশি হলো। শাড়ির পাটগুলো সামলে সাবধানে বসলো। কয়েক ঘন্টা পরে এই শাড়িটা পরেই বেরুতে হবে। চা খাওয়া শেষ করে লক্ষ্মী বেরিয়ে গেল। সুরবালা তার পেছন ফিরে চলে যাওয়া দেখলেন। তার ঈষৎ কুঁজো হ'য়ে ধীর-পায়ে চলা দেখে সুরবালার মনে হলো লক্ষ্মীর একটা বিয়ে দিতে পারলে বেশ হতো। মেয়েটা তা হলে মন-মরা হ'য়ে শুকিয়ে যেতো না এমন। পরক্ষণেই শিউরে উঠলেন। লক্ষ্মীকে এখন পরের ঘরে যেতে দিতে পারেন না। তাতে লক্ষ্মীর স্থিতি হবে, এ-চিন্তা মনে এলো না সুরবালার। এ-মুহূর্তে মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি নিজের সুখের চিন্তা করছিলেন।

চা শেষ ক'রে উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে সুরবালা এলেন পাশের ঘরে। নির্মলা তখন একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলো [illegible] —[illegible] আর আধ কাপ ডাল দিবি রে, নির্মলা!—কিছু চাইতে এলে সুরবালার কথায় চট্‌ ক'রে কিছু বলে না নির্মলা। আজ ঠোঁট উল্টে মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে,

বললো—এবার থেকে তো দিদির পাল্লা ভারী। আমাদের দিকে কি দিদির আর নজর পড়বে! —না রে, নিমি, না। তোর সুরোদি সেরকম মানুষই না। সুরবালা সাফাই গাইলেন। —তা' দে মা বোন, দু'টো আলু আর আধ কাপ ডাল, মেয়েটাকে একটু রেঁধে দি। অন্যদিন হলে নির্মলা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে নিজে হাতে গুণে গুণে মেপে মেপে বের করে দিতো জিনিস। তারপর বকেয়া পাওনার সংগে জুড়ে শুনিয়ে দিতো। আজ কিন্তু নির্মলা একেবারে অন্য মানুষ। বিছানা ছেড়ে উঠলোই না। সুরোদির এখন বেস্পতি তুংগী। এখন চটালে বোকামি হবে। হাতে রাখতে হবে সুরোদিকে। কার কখন কি সময় আসে এই বস্তিতে বলা যায় না। সকলেরই তালিমারা নৌকো নিয়ে কারবার। কখন কে ভরাডুবি হয় কিছুই বলা যায় না। এখানে রোজগার বাড়লে সমীহ করে সবাই, বন্ধ হলে চিনতে পারে না কেউ।—নাও না দিদি, তক্তার তলা থেকে বের করে। আমার ভাঁড়ারে তুমি কি বাইরের লোক? সুরবালা একবার তাকালেন নির্মলার দিকে। বিশ্বাস হলো না যেন নির্মলার এই ভালোমানুষি। তবু কথা বাড়ালেন না। বুঝলেন আজ নির্মলা কেন এতো সমীহ করছে, মনে মনে খুশি হলেন। আলু, ডাল বের করে নির্মলার কাছে সরে এলেন সুরবালা। —এই দেখে নে নিমি! আজকেরটা নিয়ে আলু হলো পাঁচটা আর ডাল দু' কাপ। মাস-কাবার হলেই সব শোধ ক'রে যাবো। সুরবালা নিজেই আজ পাওনা-গণ্ডার হিসেব-নিকেশ সারলেন। তারপর লেগে গেলেন রান্নায়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো লক্ষ্মী বাবার অপেক্ষায়। যতীনবাবু একটা সেফ্‌টিপিন দিয়ে পরনের ফতুয়ার একটা নাতিক্ষুদ্র গর্ত সামলাতে ব্যস্ত ছিলেন। ত্রস্তপদে এসে সুরবালা মেয়ের কপালে দই-এর টিপ পরিয়ে দিলেন।

—হ্যাঁরে, মাইনে থেকে কিছু আগাম দেবে না, বললে। বলে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকালেন সুরবালা। যতীনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন—চাকরি আরম্ভ করার আগেই আগাম! স্বামীর কথায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন সুরবালা—তুমি থামো দিকিনি। পঞ্চাশ বছর বয়সে বিরাশি টাকা মাইনে পাও। তুমি আর কথা বলো না।

একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। বস্তির জনাচারেক ছেলে ঝড়ের মত দৌড়ে একেবারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

—লক্ষ্মীদি, পুলিশ এসেছে, তোমায় খুঁজছে। বলে হাঁফাতে লাগলো তারা।

—পুলিশ, এ্যাঁ! কী অলুক্ষুণে কথা মাগো! সুরবালা চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন—হ্যাঁগো, দেখ না। পুলিশ এলো কেন আবার।

দেখতে হলো না। ভারী বুটের আওয়াজ তুলে দুজন সিপাই হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় একটা লোককে এনে হাজির করলো।—লক্ষ্মীসোনা দাস এ বাড়িতে থাকেন? সংগের অফিসারটি দরজায় যতীনবাবুকে দেখে প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ হুজুর, আমার মেয়ে। যতীনবাবুর কথা কান্নার মত শোনালো। গোলমাল শুনে লক্ষ্মী ও সুরবালা দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। হাতকড়া-বন্ধ অবস্থায় লক্ষ্মী তার নতুন চাকরির নিয়োগ-কর্তাকে দেখলো। অফিসার বললেন যে, ভুয়া চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে জাল নিয়োগ-পত্রের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করার অভিযোগে লোকটিকে অভিযুক্ত করা হবে। লক্ষ্মীর একটা জবানবন্দী নিয়ে অফিসার দলবল নিয়ে প্রস্থান করলেন।

পুলিশ চলে যেতে সুরবালা বোধ হয় কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—এবার তোমরা বেরিয়ে পড়ো, দুর্গা, দুর্গা।—লক্ষ্মীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিলো। ক'দিন ধরে যে রঙিন বুদ্বুদগুলো নিরন্তর চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিলো, সেগুলো এই মুহূর্তে বিদীর্ণ হ'য়ে ঝরে পড়ছিলো দু'চোখ বেয়ে।

পার্ক স্ট্রীটের স্ট্যাচু ও অন্যান্য কবিতা—জগন্নাথ চক্রবর্তী (গান্ধী জন্ম-শতবার্ষিকী ১৯৬৯) দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ; ৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ঃ চার টাকা।

একালের অগ্রগণ্য যেসব বাঙালী কবির মধ্যে বিশিষ্টতার বর্ণোজ্জ্বলতা দেখা যায়, স্বরূপ লক্ষণ যাঁদের চিনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, স্বভাবে অধিষ্ঠিত থেকেও আপন সৃষ্টির প্রাচুর্য বৈচিত্র্য ও মাধুর্য দিয়ে কাব্যভারতীকে যাঁরা নিত্য নতুন অলংকারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলছেন, জগন্নাথ চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'পার্ক স্ট্রীটের স্ট্যাচু ও অন্যান্য কবিতা' পড়তে পড়তে বারবার মনে হল, এই কবি আমাদের আরও অনেক কিছু দেবার সামর্থ্য রাখেন।

গান্ধী জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথমেই গান্ধীজীর সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা আছে—'পার্ক স্ট্রীটের স্ট্যাচু।' তিনি যা চেয়েছিলেন। তাও কি হয়েছে? আর এসব দেখে তিনি কি শুধু স্থির হয়েই থাকবেন?

এই কাব্যগ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য, আধুনিক কবিরা দীর্ঘ কবিতা লিখতে যখন ক্লান্ত, তখন কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী আমাদের কয়েকগুলি দীর্ঘ কবিতা উপহার দিয়েছেন।

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির পটভূমিতে পরিমানস বিশ্লেষণ করতে গেলে কবির অনুভূতিতে, চিন্তায় ও চেতনায় কিছু কিছু বৈপরীত্য দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, 'সবনারু ও কলকাতার লোক' কবি বলছেন, সুস্থ আমি, নিতান্ত অসুখী আমি/আমি আজ অফিসে যাবো না।' এরপরেই, 'ক্ষুদিনিতে সারা দুপুর' কবিতায় কবির মনোভাব—'ক্ষুদিনিতে ধান পাকছে মাটিতে রোদ ছবি আঁকছে/ভালো লাগছে ভালো লাগছে ভালো লাগছে।' 'পেরেকের শব্দে' কবিতায় যে গভীর হতাশা ব্যঞ্জক অনুভূতি, তার পাশেই রয়েছে 'ঋতুবদল'—অবিশ্বাসে এমনি কাটবে/এ-বেলাটা?/এমনি থাকবে অসম্পূর্ণ/এ-খেলাটা?/রম্ভা, মন্থী, ঘোড়ার আড়াই/যেমনি আছে তেমনি থাকবে/খেলা চলবে বোড়ে ছাড়াই? না—না।'

কবি ভয়ানকভাবে যন্ত্রণা পীড়িত। একালে কিম্বা কোনকালেই কি কেউ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে? নিদারুণ ফাজিল সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন,—'যারা আমায় নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে এক থালা পাথর সামনে ধরেছে,/ফিল্ম শূন্য ক্যামেরায় চোখে চোখ রাখতে বলে আড়ালে গিয়ে গলা ফাটিয়ে হেসেছে/' (পেরেকের শব্দে)। এই অসহনীয় যন্ত্রণার থেকে মুক্তির জন্যেই বুঝি বারে বারে মৃত্যুর কথা এসেছে? অনেক সময় যেন আমরা মৃতের ডায়েরী পড়ছি মনে হয়। মাটির সমুদ্রে, পেরেকের শব্দে, আমার মৃত্যুর জন্য, পরদিন প্রভৃতি কবিতায় কবি তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী-কালের কথা বলছেন যেন। তিনি কি মৃত্যু-পীড়িত? মনে হয় না। এই-ই তাঁর মনে হয়েছে, এবং এইটাই তাঁর আসল রূপ—'মরে যে কী ভুল করেছি কী বোঝাবো।' কারণ তিনি মরতে চেয়েছিলেন সেই অসুন্দর, হিংস্র ক্ষুধার্ত, যন্ত্রণা-কাতর, দুঃখজর্জর, দুঃস্বপ্ন আকীর্ণ পৃথিবী থেকে। তাই তাঁর শেষ কবিতা-টিতে স্বীকারোক্তি—'আমার মৃত্যুর পর-দিন/পৃথিবীর এই ভোল পালটানো এ যেন আমাকেই জব্দ করার জন্যে।/আমার সেই পোড় খাওয়া জীবনটার জন্য এখন মায়া হয়।/সেই সব কালশিটের দাগ, পায়ে বেড়ি, পথে একশো চুয়াল্লিশ,/ফুটপাথে কম্বলমুড়ি রাত এবং ফ্যান চেয়ে না পাওয়ার জন্মলা/সেই অসহ্য পৃথিবীকে যেন কারা রাতারাতি গড়ে করেছে/আমাকেই জব্দ করবে বলে।/এখন উর্বর বিষে আবার মরি এই তো ওদের কাম্য?/মরে ভুল করেছি, এখন/বেঁচে আরেকবার [illegible] বাঁচার জন্যেই মনে হয় কবির এই পরবর্তীকালের মৃত্যু বিভ্রান্তি।

কয়েকটি সুন্দর কাব্যকল্পনা রূপ পেয়েছে 'সরলরেখার জন্য', 'অন্য কারো যেন', 'আমিও বন্দনাকে' প্রভৃতি কবিতায়। প্রথমোক্ত কবিতায় কবি কোথাও সরলরেখা খুঁজে পাচ্ছেন না—এমন কি—'তোমার চোখের ঈষৎ ভাবাও/আমার বুকের মধ্যে এসে কেমন যেন বেঁকে যাচ্ছে/আর আমার সোজা ইচ্ছাটাও তোমার দ্বিধার মধ্যে/কেবল কৌণিক/সামান্য একটা সরলরেখার জন্য আমরা বসে আছি।' দ্বিতীয় কবিতায় কবি বড়ই হতাশা—অন্য কেউ আগেভাগে এসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুরই নাম দিয়ে গেছে, নতুন নাম দেবার আর কিছুই রেখে যায় নি? তৃতীয় কবিতায় কবি কি যন্ত্রণাকেও মুচড়ে যন্ত্রণা দিতে চেয়েছেন?

আমাদের কবি নগর জীবনের কবি। তাহলেও গ্রামের প্রতি তাঁর একটি আসক্তি আছে এবং গ্রামের জন্যে তাঁর মন-কেমন করা ভাবটাও লক্ষ্য করার মতো। 'ময়না-পাড়া' পিসীমা, আণ্ডারগ্রাউণ্ড, সাত মাইলের পাঁকে প্রভৃতি কবিতায় এইরকম আকুলতা দেখতে পাই।

অজস্র সুন্দর চিত্রকল্প, সমাসোক্তি, অনুপ্রাস, উপমা ও অন্যান্য অলঙ্কার কাব্যগ্রন্থটিতে মণিমুক্তোর মতো ছড়ানো। অজস্রানো, সূর্য অস্তানো, গরম মশলানো ইত্যাদি নাম ধাতুর ব্যবহার যথাযথ, কাবাক। 'ফর্সার' সঙ্গে 'বিমর্ষা' অন্ত্য-মিলটি চমকপ্রদ। (দীপ্তি ও বিআফ্রিচে)।

বইটির বহিরঙ্গের রূপসজ্জা মনোমুগ্ধকর। প্রচ্ছদশিল্পী সুবন্ত চক্রবর্তী ধন্যবাদার্হ।

ত্রৈমাসিক বাংলা কবিতা (১ম বর্ষ, সম্পাদক—উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম ঃ ২৫ পয়সা।

কবিতা যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের কাছে নতুন কবিতা-পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া আনন্দ-সংবাদ নিশ্চয়ই। প্রবীণ এবং নবীন বহু কবির কবিতা নিয়ে 'ত্রৈমাসিক বাংলা কবিতার' আত্মপ্রকাশকে আমরা তাই স্বাগত জানাচ্ছি এবং এর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

সময়-অসময়ে কোলাহল (মে, ১৯৬৯) —সঞ্জীব সেন। ৩৮, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৩। দাম ঃ এক টাকা।

সঞ্জীব সেন তাঁর আলোচ্য কাব্যে বিভিন্ন স্বাদ এবং অনুভূতির কতকগুলি কবিতা উপহার দিয়েছেন। ছন্দে এবং বাঁধুনীতে কোন কোন কবিতায় অনভ্যাসের ছাপ থাকলেও জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছেন, যুগের যাতনায় স্বাভাবিকভাবেই ছটফট করেছেন। ভালবাসা, নদী ও বাঁশি, অন্বেষণ প্রভৃতি কবিতা তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মার্টিন শ' লিখেছেন: ক্রেগের সঙ্গে ...ঠাৎ দেখা হল সাউথওয়েল্ডে—তার থেকে ...লে নিবিড় বন্ধুত্ব। শেষে দু'জনে ...নিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করেছি। প্রথম ...খন আমাদের পরিচয় হয়, তখনও ক্রেগ ...জেকে ঠিকমত আবিষ্কার করতে পারেন ...। এর আগে তিনি ছিলেন আরভিং-...র লাইসিয়ামে। কিন্তু তিনি অন্তর ...থকে উপলব্ধি করছিলেন যে, রঙ্গমঞ্চে ...ভিনয় করা ছাড়াও তাঁকে স্টেজের জন্য ...রও কিছু করতে হবে। সঙ্গীতের ...ক্ষেত্রে আমি যেমন অনুভব করছিলাম, ...তিনিও মঞ্চশিল্পের ব্যাপারে গভীরভাবে ...পলব্ধি করছিলেন—নতুন সৃষ্টির পথে ...গিয়ে যেতে হবে। আমার থেকে তিনি ...ছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি ভাগ্যবান, তাই ...মার অনেক আগেই তিনি নিজের পথ ...বিষ্কার করে ফেলেছিলেন।

...লাইসিয়াম থিয়েটারে একটিমাত্র ...ক্তিরই আত্মপ্রস্ফুটনের সুযোগ-সুবিধা ...ল—ঐ ব্যক্তিটি ছিলেন স্যার হেনরী ...রভিং। ক্রেগ তখনও ঠিক বুঝতে ...রছিলেন না, রঙ্গমঞ্চ শুধুমাত্র নট-নটী ...র অভিনয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় ...না। লাইসিয়াম ছেড়ে দিয়ে তিনি ...শ ছিলেন সুবিধামত দলে উপযুক্ত ...মিকা গ্রহণ করবার জন্য। হ্যান্স কৃশ্চান ...ডারসনের 'হোয়াট দি মুনস স্টোরিজ'-...' একটি কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে ...া একটি দৃশ্যের পরিকল্পনা করলেন—...মি এর সঙ্গীতাংশের কিছুটা কম্পোজ ...ছিলাম। এ কাহিনীগুলো ছেলেবেলা ...কই আমার খুব প্রিয় ছিল—আজকেও ...র সে ভালবাসা একটুও কমে নি। ...জন্যই ঐ দৃশ্যটিতে সঙ্গীত সংযোগ ...ত পেরে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। ...স মর্টন ছিলেন ট্রিনিটি-হল কলেজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়—ক্যামব্রিজ ...সের প্লেয়ারসের তিনি তখন ডিরেক্টর। ...ই ক্রেগ ঐ দৃশ্যটির পরীক্ষামূলক ...নীর ব্যবস্থা করলেন। অর্কেস্ট্রা ...ভাল হয়েছিল—একটি স্তরের ...কায় ক্রেগকে বড় সুন্দর লাগতো ...তে। কিন্তু মর্টন মত প্রকাশ করলেন

এ যে চলবে না। আজ আমারও মনে হয় সত্যিই ও স্ক্রেটি চলতো না—ক্রেগও নিশ্চয় ঐ মতই পোষণ করতেন পরবর্তী কালে।

১৮৯৮—৯৯তে মিসেস হোইহার্স্টের প্রস্তাবে আমি দি পার্সেল অপরেটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করি—ক্রেগকে আমি আহবান করলাম এখানকার স্টেজ ডিরেক্টর হবার জন্য। তখন আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি আমাদের প্রথম প্রডাকশন 'ডিডো এ্যান্ড এনিয়াস' পৃথিবীর সামনে এনে উপস্থিত করবে তাঁকে, যিনি উদাহরণ এবং উপদেশের সাহায্যে আধুনিক রঙ্গমঞ্চে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবেন। আমি এবং ক্রেগ দু'জনেই অনতিবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলাম যে, সেরা জাতের প্রডাকশন করতে হলে অন্য সব কাজ ছেড়ে প্রডাকশন সম্বন্ধেই মনঃসংযোগ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই ক্রেগ হ্যাম্প-স্টেডে আমার ফিন্‌স্‌লে রোডের ফ্ল্যাটে এসে উঠলেন—পরে দু'জনে ডাউনসিরোর হিলে চলে যাই।

হ্যাম্পস্টেড কনসারভেটয়ারে 'ডিডো এ্যান্ড এনিয়াস'-এর প্রডাকশনের পর থিয়েটার শিল্পে নবযুগের শুরু হল। The absence of footlights, wings, and flies, though momentous, was after all a technical matter. It was in the simplicity, imagination, and directness of the stage-setting that Gordon Craig showed his unique genius. অভিনেতাদের ভেতর সব থেকে আকর্ষণীয় হয়েছিল কোরাসের ভূমিকাভিনেতারা। এই সব অপেশাদারী নটেদের মত উৎসাহ এবং নেতার প্রতি শ্রদ্ধা আর কখনও কোন নট-নটীর ভেতর দেখতে পাই নি। এ'দের ভেতর ট্রেইন্ড অভিনেতার কেউ ছিলেন না। শুধু গলার সুর আছে দেখেই কোরাসের ভূমিকাভিনেতাদের নেওয়া হয়েছিল। কখনও হামা-গুড়ি দিয়ে, কখনও লাফিয়ে লাফিয়ে, কখনও দুলতে দুলতে এবং কখনও দৌড়িয়ে এদের কোরাসের গান গাইতে হত—অর্থাৎ সমস্তটাই নির্ভর করতো ক্রেগের পরিকল্পনার ওপর। কিভাবে তারা এসব করতে পেরেছিল জানি না—তাদের বেশির ভাগেরই স্টেজের অভিজ্ঞতা ছিল

...। ...ভাল হয়েছিল। কারণ কভেন্ট গার্ডেনের কোরাসকে দিয়ে একাজ করাতে গেলে প্রথম রিহার্সালেই তারা অকৃতকার্য হয়ে সরে পড়তো। কনসারভেটয়ারের প্রডাকশনকে খবরের কাগজগুলো অভিনবত্বের জন্য প্রশংসা জানালো। শিল্প-সৃষ্টির দিক দিয়ে সত্যিই এটি হয়েছিল অভূতপূর্ব। এ প্রদর্শনীতে আর্থিক সাফল্য হয়েছিল কিনা স্মরণ নেই, তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আমার মনে আছে, এর অল্পদিন বাদেই আমার বেশির ভাগ বই বেচে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে এই সব স্থূল কারণে নিজেদের কাজ বন্ধ করে দেব, এমন কথা আমরা ভাবতেই পারি নি। নটিং হিল গেটের করোনেট থিয়েটারটা এক সিজনের জন্য ভাড়া নিলাম। এখানে আমরা আবার ডিডো এবং পার্সেলের ওপেরার ডাও-ক্লিশিয়েনের মাস্ক অংশটি মঞ্চস্থ করলাম। এ দুটিরই লিব্রেটো বা সংলাপ অংশ ছিল অত্যন্ত দুর্বল—ভাবতেও অবাক লাগে পার্সেল কি করে wrote such inspired music to much of it.

'ডিডো এ্যান্ড এনিয়াসে' বহু উদ্ভট বাক্যাংশ আছে—যেমন, 'Let Dido die' এবং

Thus, on the fatal
banks of Nile,
Weeps the deceitful crocodile.

এ কি গান গাইবার ভাষা! এর থেকেও খারাপ ছিল একমাত্র হ্যান্ডেলের স্যামসন—এটি ছিল একটি ওরেটোরিও (oratorio—sacred opera performed without action, scenery, or costume)। এই ওরেটোরিওটি মিড্‌লসেক্স কোরেল ইউনিয়ন গাইত সেন্ট জেমস্‌ হলে ১৮৯৩ সালে। এই কোরেল ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমার বাবা এবং রবার্ট নিউম্যান। এতে এক জায়গায় ছিল:

To man God's universal law
Gave power to keep
his wife in awe.
Thus shall his life
be ne'er disarrayed,
By female usurpation swayed.

১৮৯৩ সালেও কিন্তু আমার মনে হয়েছিল পংক্তিগুলো অত্যন্ত সেকেলে, যদিও কোরাস নিবিষ্ট মনে পদটি গেয়ে যাচ্ছিল। এর পর বহুদিন আমার মনে ধারণা ছিল, কোন অবিবাহিত পুরুষই পদটির রচয়িতা। এই কিছুদিন আগে জানতে পারলাম, স্যামসন অলস-কাল কবে মিলটনের 'স্যামসন এ্যাগনিস্টিস' থেকে

লাইনগুলো নেওয়া হয়েছে। মিলটনের মূল রচনায় আছে—

Theretore God's universal law
Gave to the man
despotic power
Over his female in due awe,
Nor from that right
to part an hour,
Smile she or lour
So shall he least
confusion draw
On his whole life, not swayed
By female usurpation,
or disarayed.

এই লাইনগুলো কোরাস আবৃত্তি করতো। এর পরের লাইনটি হচ্ছেঃ

But had we best retire?
I see a storm.

আমার মনে হয়—বলেছেন মার্টিন শ' —যে মিলটনের পংক্তিগুলো আরও স্থূলে লাগে। হ্যান্ডেল বরং লাইনগুলোকে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে সাজিয়েছেন।

এর পর মার্টিন শ' লিখেছেন—আবার করোনেট থিয়েটারের আলোচনায় ফিরে আসি। এর পর ক্রেগের মা এলেন টেরী —যাঁর মাধুর্য, সৌন্দর্য এবং প্রতিভাদীপ্ত অভিনয় তাঁকে ইংলণ্ডের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছিল—আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাঁর দল নিয়ে এসে তিনি করোনেটে কার্টেন রেজার হিসাবে "ন্যান্স ওল্ডফিল্ড"-এ অভিনয় করলেন। আমাদের এই সিজনে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল। ক্রেগের কালার-স্কীমের সহজ সারল্য এবং অভিনবত্ব, তাঁর পারপ্‌ল্‌-ব্লু রং-এর বিরাট ব্যাকক্লথ এমন একটা নতুনত্বের আস্বাদ দিল দর্শকদের যে সবাই মোহিত হয়ে গেল!

এই সময়েই ডব্লিউ এস্ পেনলে গ্রেট কুইন স্ট্রীট থিয়েটারের লেসী নিযুক্ত হন। আমার অনুরোধে তিনি তাঁর থিয়েটার আমাদের খুব অল্প টাকায় ভাড়া দিলেন—অর্থাৎ আমাদের সপ্তাহে দিতে হত মাত্র চল্লিশ পাউন্ড। আজকের দিনে চারশো পাউন্ড সপ্তাহে দিলেও এ থিয়েটার ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়।

এখানে আমাদের প্রথম প্রডাকশনটি হল হ্যান্ডেলের 'এসিস এ্যান্ড গ্যালেসিয়া'। আবার কোরাসের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য—কোরাসের অভিনেতারা পরিশ্রমও করেছিল গ্যালী-স্লেভসের মতন। প্রধান ভূমিকার নট-নটীরাও আপ্রাণ পরিশ্রম করতেন। ড্রেস রিহার্সালের একটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে।

দৃশ্যসজ্জার মডেলের একটি ছবি—হ্যামলেট : ১৯১২
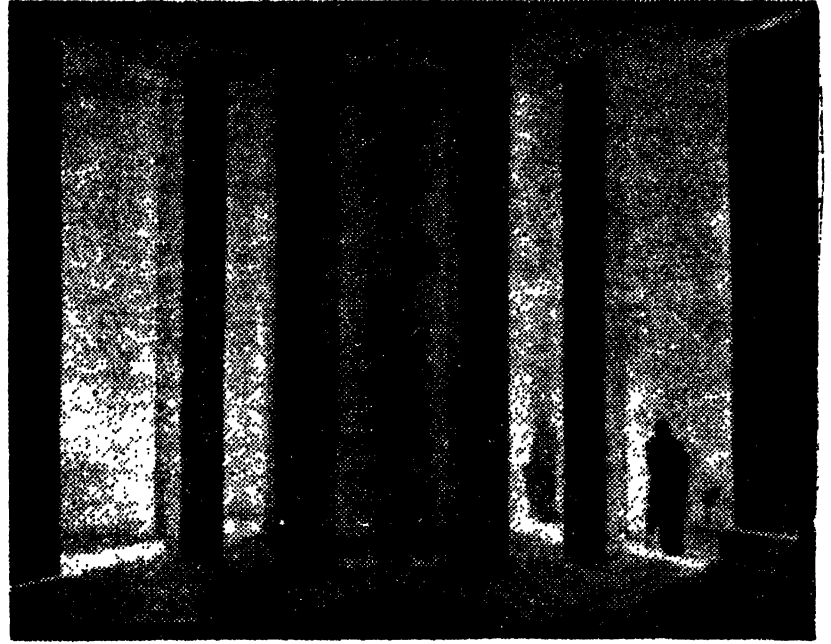
এতে বোঝা যাবে অভিনেতাদের তাঁদের শিল্পের প্রতি কি নিবিড় অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। বেশ কয়েক ঘন্টা একটানা পরিশ্রমের পর প্রায় সকাল একটায় (ইংরাজী ওয়ান এ-এম্-এ) রবার্ট মেইটল্যান্ড অর্থাৎ যিনি পলিফিমাসের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, অনুমতি চাইলেন যে, তাঁকে ছুটি দেওয়া হোক—কারণ তাঁর নাকি খুব জরুরি কাজ আছে। ক্রেগ উত্তরে বললেন,—'অসম্ভব'। রিহার্সাল চলতে লাগল। ঘন্টাখানেক বাদে আবার ছুটির আবেদন করে, একই উত্তর পেলেন। শেষ পর্যন্ত ভোর তিনটের তিনি বললেন—মিস্টার ক্রেগ। আমার খুব জরুরি দরকার না থাকলে আমি এভাবে রিহার্সাল ফেলে চলে যেতে চাইতাম না। মাত্র কাল সকালে আমি বিয়ে করেছি।

ক্রেগ এবং আমার কোন ব্যাকিং ছিল না। কিন্ত সে নিয়ে আমরা কখন চিন্তাও করি নি। এই সব কারণেই 'এসিস এ্যান্ড গ্যালেসিয়া' নিয়ে যখন সবাই আলোচনা করতে শুরু করেছে, সে সময়েই আমাদের এটিকে বন্ধ [illegible] হল। পার্সেল্স অপেরেটিক সোসাইটিও উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে শেষটায় জ্বলে ছাই হয়ে গেল। অনেক বিলের পেমেন্ট করতে হবে—পরিত্রাতা হিসাবে এলেন—এলেন টেরী। আমিই ছিলাম পার্সেল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান উদ্যোক্তা, সুতরাং এ ব্যাপারে আমার যতোটা স্বার্থ জড়িত ছিল, ক্রেগের তা ছিল না। তা সত্ত্বেও কেন যে এলেন টেরী এভাবে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন জানি না—এর থেকে এটুকুই বুঝি যে, তাঁর অন্তরটা ছিল করুণা এবং মমতায় ভরা। আমাদের পাওনাদাররাও সবাই আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। এমন কি ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানী আমাদের মিটার রিড করেছিলেন অনেক কম করে —এমনটা এঁদের ইতিহাসে আগে কখনও ঘটে নি।

লরেন্স হাউসম্যান এই সময়টায় তাঁর 'দি লাভ লেটার্স অভ এ্যান ইংলিশওম্যান' বই থেকে অনেক টাকা করেছিলেন। তিনি ক্রেগের কাছে এসে তাঁর মর‍্যালিটি প্লে 'বেথলেহ্যাম' প্রডিয়ুস করবার অনুরোধ জানালেন—মিউজিক দেবেন যোশেফ মুরাট। আমাকে অনুরোধ করলেন গায়কদের শিখিয়ে নেবার জন্য এবং অর্কেস্ট্রা কন্ডাক্ট করবার ভার নিতে। এ দলেও সবাই ছিল অপেশাদারী। এদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে ক্রেগকে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এ প্লেটি ছিল সত্যিকার একজন ভাল কবির রচনা।

[ক্রমশ]
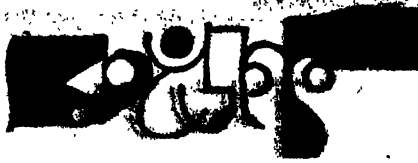
'চারজন' ছবি প্রসঙ্গে

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে যদি চলচ্চিত্রকে জড়ানো হয়, তবে শিল্পের পক্ষে তা বিপদের কারণ হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের যদি রাজনৈতিক রোষে পড়তে হয় এবং অসাধু সাংবাদিকতার শিকার হতে হয়, তবে চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে বহু লোকের রুজি-রুটির সম্পর্ক, তাঁরা বিপন্ন হবেন। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় তাই হয়েছে। অনেক সাধ্যসাধনায় একটা (সরকারী) ছবি তৈরি করা হয়েছিল সরকারী নির্দেশে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটির দ্বারা চিত্রনাট্য পরীক্ষিত ও গৃহীত হয়েছিল। তারপর সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবির বিরুদ্ধে যদি আক্রমণাত্মক সংবাদ প্রকাশ করা হয়, তা হলে চলচ্চিত্র নির্মাতারা কোন্ সাহসে খোলা মন নিয়ে ছবি করতে পারেন?

আমি 'চারজন' নামের একটি সরকারী ছবির কথা বলছি। এই ছবিতে দেখান হয়েছে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গের শাসনযন্ত্রের এই কেন্দ্র থেকে কিভাবে ভেতরে এবং বাইরে কাজ হয়। তা দেখাবার জন্য চারজন কর্মচারীর কাজকর্ম দেখান হয়েছে। এই চারজনের মধ্যে একজন রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী, একজন ভূমিরাজস্ব বিভাগের অফিসার, একজন ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসার এবং একজন জেলার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ছবিতে এই চারজন অফিসারের সকালে বাড়ির দায়-দায়িত্ব পালন থেকে অফিসের কাজ এবং বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত দেখিয়ে এঁদের যে কত পরিশ্রম, কত বুদ্ধি করে কাজ করা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্করক্ষা এবং বিভিন্ন দিক রক্ষা করে চলতে হয়, ছবিতে তা দেখিয়ে সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত করে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের কার্যকরী রূপ দেওয়ার দায়িত্ব কর্মচারীদের। এই কর্মচারীরা যদি গণতান্ত্রিক [illegible] হন, তা হলে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে কার্যকরী হতে পারে। ছবিটির উপসংহারে রয়েছে— ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারী বেনামী উদ্ধার জমি কৃষকদের ভাগ করে দিয়েছেন, যে সব জমিতে বিবাদ রয়েছে সেই জমির ধান কেটে সরকারী গোলা হয়েছে, কৃষকরা তা পাহারা দিচ্ছে জঙ্গী অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ছবিতে শিবানী বসু

এই 'চারজন' ছবিটির চিত্রনাট্য সরকারী উপদেষ্টা পরিষদের চিত্রনাট্য সাব-কমিটি মঞ্জুর করেছিলেন। ছবি তৈরি হবার পরে রাজ্যপাল নিয়োজিত চলচ্চিত্র উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যরা এই ছবিটি দেখে প্রদর্শনযোগ্য বলে লিখিতভাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত, রাজ্য সরকারের প্রচার অধিকর্তা শ্রী পি এস মাথুর এবং সহ-প্রচার অধিকর্তা শ্রীঅজিত গুপ্ত। এই ছবির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালে।

আশ্চর্যের কথা, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে যাওয়ার পরে এই ছবিটিই আক্রমণের লক্ষ্য হল। আর এই আক্রমণ সেই পত্রিকাতেই প্রকাশ করা হল, যে পত্রিকার বার্তা সম্পাদক উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য এবং তিনি এই ছবিটি দেখাবার যোগ্য বলে সুপারিশ করেছিলেন। সংবাদে ছবিটিতে বর্ধমানের জেলা শাসকের উপস্থিতি দেখানোতেই আপত্তি। অথচ ছবিটি দেখে এই উপস্থিতি কোন ব্যতিক্রমমূলক ঘটনা মনে হয় নি। চিত্র নির্মাতারা হয়তো শিল্প ও কৃষির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই জেলা শাসককে বেছে নিয়েছিলেন, নতুবা যে-কোন জেলা শাসককে ছবিতে দেখান যেতে পারত।

আশ্চর্যের কথা, [illegible] পরিবর্তনের লক্ষণ। এই আক্রমণে কার কি উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে জানি না।

জাতির নির্মাতারা যে হতাশ হয়ে পড়েছেন, সে সংবাদ পেয়েছি। সরকারী ছবি নির্মাতাদের একমাস আগে তোলা ছবি কেটে বাদ দিয়ে আর্থিক খেসারত দিতে হচ্ছে—কখনো কর্মচারীদের নির্দেশে, কখনো আতঙ্কে। সরকারী ছবিতে যে বলিষ্ঠতা ও কারিগরি নৈপুণ্য দেখা গেছিল, এবার বোধ হয় তার শেষ হল। কারণ আদর্শ প্রেরণা ছাড়া ভাল ছবি হয় না, আতঙ্কের মধ্যে শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। —সুজন।
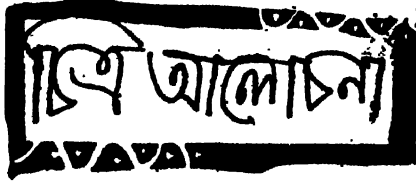
দিবা রাত্রির কাব্য

'দিবা রাত্রির কাব্য' ছবিটি যেরূপ প্রচারলাভ করা উচিত ছিল, সেরূপ করে নি। ফলে বড তাড়াতাড়ি ছবিটি সিনেমা হল থেকে উঠে গেল—আসলে তা হওয়া আকাঙ্ক্ষিত নয়। ছবিটি চিরাচরিত ছবির ঊর্ধ্বে, বাস্তবিকই ভাল ছবি। বেনে বুদ্ধির পরিবেশকের হাতে পড়ে ভাল ছবি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এই ছবির ক্ষেত্রে তা দেখা গেছে। সংবাদপত্রে রিভিউর জন্য প্রেস শো পর্যন্ত করা হয় নি।

[illegible] ছবিতে [illegible]

বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তীর এটি প্রথম ছবি। কিন্তু প্রথম ছবির ক্ষেত্রে তাঁরা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তাতে মনে হয়েছে অনেকদিন থেকে তাঁদের ছবি তৈরির মন তৈরি হয়েছিল। বহিদৃশ্যে কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ প্রশংসনীয়, এতে ছবির প্রতি দর্শকদের আগ্রহ সব সময় বজায় থেকেছে। এই ছবির একটি বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্র সংগীত। তিমিরবরণ পরিচালিত সংগীতে মেজাজ ও পরিবেশ সৃষ্টি যেভাবে করেছে, তা যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি ভাবময়। এই সংগীতকে দর্শক-শ্রোতাদের কাছে তুলে দিয়েছেন বাহাদুর খান তাঁর যাদুকরী সেতারের সুর ঝঙ্কারে। অপূর্ব সেই সুর-তরঙ্গ। এই ছবির সর্বাধিক আকর্ষণীয় দিক—প্রগতি সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস "দিবা রাত্রির কাব্য" চিত্র-নাট্যের অবলম্বন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্প, উপন্যাসগুলিতে চিত্ররূপের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও তার যথার্থ বিশ্লেষণ করার মত প্রগতিশীল মনের শক্তিশালী পরিচালক কমই আছেন। যদি বা কোন পরিচালক এগিয়ে আসেন—প্রযোজকের অভাব ঘটে কমার্শিয়াল সম্ভাবনা আছে কি নেই চিন্তা করে। মানিকবাবুর 'পদ্মা নদীর মাঝি' পাকিস্তানে চিত্ররূপ পেয়েছে—'জাগা হুয়ে সবেরা' নামে বৃটেনের পরিচালক এবং পাকিস্তান ও ভারতের শিল্পী সমন্বয়ে। পশ্চিমবঙ্গে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ১৯৪৯ সালে চিত্ররূপ পেয়েছিল। তার পরে দীর্ঘকাল পরে 'দিবা রাত্রির কাব্য' চলচ্চিত্র রূপ লাভ করে।

'দিবা রাত্রির কাব্য'-র চরিত্রগুলি হেরম্ব, সুপ্রিয়া, মাস্টার মশাই, বিমলা, আনন্দ সকলেই কক্ষচ্যুত মানুষ। ওদের মনের মধ্যে রয়েছে প্রেমের তৃষ্ণা। সে তৃষ্ণা অতৃপ্ত। এই অতৃপ্তি নিয়ে ওরা কক্ষচ্যুত হয়েছে, প্রেম আর দেহগত মোহতে একাকার হয়ে গেছে। তাই ওরা কামনার কাপালিকের মত ঘর ভেঙেছে, তিলে তিলে দহন জ্বালা সয়েছে। সুখের মায়াহরিণের পেছনে ছুটেছে—কিন্তু সুখ যে কি জিনিস—প্রেমের তৃপ্তি যে কোথায়, তার সমাধানে পৌঁছতে পারে নি। হেরম্ব অধ্যাপক, স্ত্রীকে ভালবেসেও ভালবাসার বিশ্বাস দিতে পারে নি, সে গলায় দড়ি দিয়েছে। সুপ্রিয়া কিশোরী বয়স থেকে হেরম্বের প্রতি আকর্ষণে বিবাহিত জীবনেও অতৃপ্ত থেকেছে, তার অতৃপ্তি দারোগা স্বামীকে রোগাক্রান্ত করে মৃত্যুতে এগিয়ে দিয়েছে। মাস্টার মশাই যৌবনে বিমলাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন নীড় বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু জীবনের প্রান্তে এসে উপলব্ধি করছেন সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না: ধর্ম না মান সমাজকে মানতে হবে। প্রেমের উত্তাপ নিভে যেতে এসেছে তীব্র বিতৃষ্ণা; আর বিমলা পরাজয়কে ঢাকবার জন্য মাস্টার মশাইকে পাহারা দিয়ে প্রায় বন্দী করে রেখেছে। তাদের প্রেমের সন্তান চঞ্চলা যৌবনবতী আনন্দ আগুনের মত আকর্ষণ করেছে চিরঅতৃপ্ত হেরম্বকে। সেই আগুনে আনন্দও পুড়ে মরেছে। এরা সকলেই প্রেমের অতৃপ্তির বলি। মধ্যবিত্ত জীবনের পরিধির মধ্যে এরা কিছু মানি না বলেও মনে আর বাইরে গরমিল নিয়ে বাস করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের পরিধির বাইরের অশিক্ষিত মানুষটি যখন দেখলো স্ত্রীর স্বতন্ত্র এক যৌনজীবন বা ভালবাসার মানুষ আছে, সে তখন স্ত্রীকে খুন করে বসল। মনের বাসনাগুলিকে পোকার মত কুরে কুরে খেতে সে দিল না। এরা সকলেই মেনে নিয়েছে প্রেম স্থায়ী নয়, ফুল ফোটা ফুল ঝরে পড়ার মত। কিন্তু প্রেমে মিলনের জন্য যেমন যত্ন নিতে হয়, সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, চিরসজীব রাখার জন্য সব সময় সতর্কভাবে সাধ্য-সাধনা করতে হয় দুজনকেই। আপাত-দৃষ্টিতে যদিও মনে হয়েছে এরা অন্ধ-শক্তিতে চালিত হবার মত কক্ষচ্যুত হয়েছে, কিন্তু তার পেছনে একটি কার্য-কারণ আছে। সে কার্য-কারণের কথা দর্শককে জেনে নিতে হবে, বুঝতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার মত, চিন্তাকে প্রসারিত করার মত [illegible] নিয়ে এই ছবি।

বসন্ত চৌধুরী

কথাচিত্রের 'কস্তুরী মৃগ' ছবিতে গীতা দে ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

পরিচালকরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই-এর মূল ধ্বনিকে যদি আরো স্পষ্ট করে তুলতে পারতেন, যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারতেন, তাহলে দর্শকদের সুবিধা হত। আপাত-দৃষ্টিতে এখানে মানিকবাবুকে যত ফ্রয়েডীয় মনে হয়, মানিকবাবু আসলে তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মার্কসবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যিক। একথা সকলের জানা আছে।

ছবিটিতে অভিনয়ে হেরম্বের চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী এবং সুপ্রিয়ার ভূমিকায় মাধবী মুখার্জী চমৎকার অভিনয় করেছেন। তাঁদের অনবদ্য অভিনয়ে বিশ্বাস্য ঘটনাবলীর স্পষ্ট চিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁদের সঙ্গে সমভাবে অভিনয় করেছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা দেবী এবং অঞ্জনা ভৌমিক। তবে অঞ্জনা ভৌমিকের যৌবনোচ্ছলা অভিব্যক্তি সুন্দর হলেও ওড়িশী নাচে তাঁর স্থূল কটি দেহ উপযুক্ত ছন্দ জাগায় নি। দারোগার চরিত্রে স্বপন রায় ব্যর্থ। ছবির ফটোগ্রাফি ও সম্পাদনা প্রশংসনীয়।

'দিবা রাত্রির কাব্য' বাংলা চলচ্চিত্রের সুন্দর সংযোজনরূপে গণ্য হবে।

রবোট
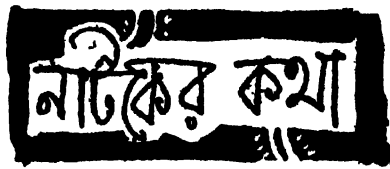
গত ৮ই মার্চ হিল্লোল নাট্যসংস্থা ফ্যান্টাসী নাটক 'রবোট' মঞ্চস্থ করে। নাটকটি এযাবৎ চারবার মঞ্চস্থ হয়েছে। আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর পরে মানুষের বিজ্ঞান বুদ্ধিতে তৈরি রবোট কি করে মানুষের চিহ্ন নিঃশেষ করে দিতে চায়, নাটকের মূল বক্তব্য তাই। অমলেন্দু চক্রবর্তীর নির্দেশনায় নাটকটি অভিনীত হয়েছে।

সংস্কৃতি'র বিশ্বরঙ্গমঞ্চ দিবস

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতি' গত ২৭শে মার্চ সংস্থা প্রাঙ্গণে বিশেষ আড়ম্বর ও উদ্দীপনার সাথে 'বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ দিবস' উদ্‌যাপিত করে। উৎসবে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগুণধর মাজী।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (আমতা শাখা) আন্তর্জাতিক চেতনা সমৃদ্ধ সংগীত দিয়ে সভার উদ্বোধন হয়। এক বিশেষ ধরনের ধূপবাতি জ্বালিয়ে সভাপতি মহাশয় সভার কার্য সুরু করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে 'আন্তর্জাতিক নাট্যধারার বিবর্তন', 'নাটক, সমাজ ও মানুষ', 'গণনাট্য' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে নিমাই মান্না, ইন্দ্রজিৎ পাত্র, নির্মল পাত্র ও আরও অনেকে। নিমাই মান্নার আন্তর্জাতিক ভাবসমৃদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীকালী বেরাগী ও বাবলু চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা বিভিন্ন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে সংস্থার সদস্যরা উর্দু নাট্যকার জনাব কুদ্‌রতুল্লাহ সাহাব রচিত উর্দু নাটক 'লাল ফিতা' (বাংলা ভাষান্তর) মঞ্চস্থ করেন। নাটকে সর্বশ্রী দিলীপ মান্না, ফেলু দোয়ারী, সমীর পাথীরা, শচীন মান্না, শ্রীকুমার খাড়া, রণজিৎ দোয়ারী তাঁদের নিজের নিজের অংশ কৃতিত্বের সাথে অভিনয় করেন। নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন কবি ও নাট্যসমালোচক নিমাই মান্না। এই উপলক্ষে নাট্য সংক্রান্ত এক পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 'ইন্টারন্যাশনাল' সংগীত- পরিবেশনের সাথে সভার কাজ শেষ হয়।

গীতিআলা-এর অনুষ্ঠান

২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় গীতিআলোর মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পীযূষ গাঙ্গুলী পরিচালিত 'সোনাবৌদি' ছবিতে শিবানী বসু, সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও সুখেন দাস

সংবাদ-কনা

নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়ো-ত তৃতীয় বার্ষিক আবৃত্তি ও সঙ্গীত তযোগিতা আগামী মে মাসের ২, ৩, তারিখ মহাজাতি সদনের সেমিনারে অনুষ্ঠিত হবে।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে থেকে ৪০ বছর বয়স্ক পুরুষ ও জো যোগ দিতে পারেন। 'খ' বিভাগে থেকে ১৬ বছরের কিশোর-কিশোরীরা দেবেন। প্রতিযোগিতার বিষয় দীনিক, রাগপ্রধান, গজল, পল্লী ও ভক্তিমূলক এবং দেশাত্মবোধক নজরুল সঙ্গীত।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় (১) সাধারণ বিভাগ: ১৫ বছরের উর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা। কবিতা—বিদ্রোহীর বাণী এবং যৌবন জল তরঙ্গ। (২) পুরুষ বিভাগ: ১৫ বছরের উর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ; কবিতা—সব্যসাচী, প্রলয়োল্লাস। (৩) কিশোর বিভাগ: ১০ থেকে ১৫ বছরের নিম্ন বয়স্ক কিশোর-কিশোরী; কবিতা—প্যাক্ট, মানুষ। (৪) মহিলা বিভাগ: ১৫ বছরের উর্দ্ধ বয়স্ক—সর্বহারা, আমি গাই তারি গান।

২০শে এপ্রিলের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। নাম তালিকাভুক্তির ফি ২ টাকা, প্রতি বিষয়ের জন্য ১ টাকা। সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি, ৬, এন্টনী বাগান লেন, কলকাতা-৯।

তশিল্পী আশিস মুখার্জী। বিভিন্ন গান গান গেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

কৌতুক ও হরবোলা শিল্পী শুভেন্দু বিশ্বাস

তরুণ হরবোলা শুভেন্দু বিশ্বাস বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আসরে হরবোলা ও হাস্যকৌতুক পরিবেশন করে জনমনকে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর ফিচারগুলি চমৎকার। নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ, পশু-পক্ষীর ডাক, জনৈক বাউল গায়কের ও গায়কীর অনুকরণ ইত্যাদি প্রশংসনীয়। জন্তু-জানোয়ারের গলায় কথা বলা, উত্তরবঙ্গের বন্যা, দক্ষিণ ভারতীয়ের ভাষণ, বিয়েবাড়ি, হকার ইত্যাদিতে প্রচুর হাস্যরস রয়েছে। শিশুমনকে আনন্দ দেবার মত আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে এই শিল্পীর। এই তরুণ হরবোলা প্রবীণ হরবোলা রবীন ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

ভারতে হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসব

ভারতে হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়েছে। আগামী ৬ই এপ্রিল দিল্লীতে এই উৎসব শুরু হবে—বিজ্ঞান ভবনে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ উৎসব উদ্বোধন করবেন। দিল্লীর পরে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম এবং লখনৌতে হাঙ্গেরীয় ছবিগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে দেখান হবে।

এই উৎসব উপলক্ষে হাঙ্গেরী থেকে এক প্রতিনিধি দল ভারতে আসছেন। এই প্রতিনিধি দলে আছেন অভিনেত্রী আইওনা কল্লাই, পরিচালক জানেস হেস্কো এবং ফ্রিগেস বার্নে।

দি হোপলেস ওয়ালস, আইরন ফ্লাওয়ার, হেলো ভেরা, দি স্টোরী অব মাই স্টুপিডিটি, সয়েল আণ্ডার ইওর ফিট, লাস্ট হাঙ্গারিয়ান নবোবস প্রভৃতি কাহিনী-চিত্র দেখান হবে।

কলকাতা, কলকাতা, কলকাতা

লোকায়নের নবতম প্রযোজনা লোকনাথ ভট্টাচার্যের "কলকাতা, কলকাতা, কলকাতা" মঞ্চস্থ হচ্ছে আগামী ১০ই এপ্রিল '৭০ মিনার্ভা থিয়েটারে সন্ধ্যা সাতটায়। নির্দেশনায় অরুণ রায়, মঞ্চসজ্জায় রণেন তরফদার।

কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক 'লীলাবসান' যাত্রাভিনয়

সম্প্রতি প্রসাদপুর কল্যাণ পরিষদের শিল্পিগণের উদ্যোগে 'লীলাবসান' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন: বিমল নন্দী, শম্ভুনাথ নন্দী, ভদ্রেশ্বর নন্দী, বংশী নন্দী, সুনীল নন্দী, বলরাম কুণ্ডু, কপিলচন্দ্র নন্দী, সূর্যকান্ত নন্দী, ফকির দত্ত, অলোক নন্দী ও রামমোহন নন্দী।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশ্চর্য! ভাবতেও অবাক লাগে। যাঁকে নিয়ে সমস্ত ইংলণ্ড পাগল, যাঁর খেলা দেখার জন্যে ইংলণ্ডের রাজা থেকে তাঁর সামান্যতম প্রজা পর্যন্ত ছুটে যেতেন, যিনি ছিলেন ইংরেজদের নয়নের মণি, সেই রণজিকেই কি না গুটিকয়েক প্রবাসী ইংরেজের অপমান সইতে হলো রণজিরই দেশ ভারতবর্ষে!

বোম্বাই-এর জিমখানা ক্লাব রণজিকে তাঁদের ক্লাবের সদস্যপদ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো।

কিন্তু এ অপমান রণজির গায়ে লাগে নি। লেগেছিল তাঁদেরই গায়ে—যাঁরা গায়ের রঙয়ের গর্বে আর আত্ম-গরিমায় হারিয়ে ফেলেছিলেন সামান্যতম কাণ্ডজ্ঞানটুকুও। কারণ ইংলণ্ডের যে রাজার কর্মচারী হিসেবে তাঁরা ভারতে এসেছেন, সেই রাজারই নয়নের মণি ছিলেন রণজি। ইংলণ্ডের রাজা শুধু তাঁর খেলা দেখতেই ছুটতেন না, কিম্বা রণজির সংগে একাধিক দিন ভোজনে বসেই ক্ষান্ত ছিলেন না, ব্যক্তিগতভাবেও তিনি নিতেন রণজির খোঁজ-খবর। শিকার করতে গিয়ে গুলীর আঘাতে আহত হয়ে রণজি যখন তাঁর চোখটি হারালেন, তখন ইংলণ্ডের রাজা নিজে ব্যক্তিগতভাবে সমবেদনা জানিয়েছিলেন জামসাহেব রণজিৎ সিংজীকে।

বোম্বাই জিমখানা ক্লাবের কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী সেই রণজিকেই অপমান করলেন!

এ ঘটনা রণজিকে এতোটুকুও বিচলিত করতে পারে নি। এই ঘটনার কথা মনে করে হাসতেন তিনি—হাসতে হাসতেই বলতেন সকলকে।

বোম্বাই জিমখানা ক্লাব পরে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের ভুল। তখন তাঁরা নিজেরাই এগিয়ে এসেছিলেন রণজিকে তাঁদের ক্লাবের সদস্য করার জন্যে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। রণজি আর সাড়া দিলেন না তাঁদের সেই আমন্ত্রণে। দৃঢ়তার সংগে রণজি প্রত্যাখ্যান করলেন সেই আমন্ত্রণ।

ক্রিকেট খেলাকে যেমন ভালো-বাসতেন রণজি, তেমনি ভালোবাসতেন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের। ক্লাবগুলোও বঞ্চিত ছিল না তাঁর ভালোবাসার ছোঁয়া থেকে।

১৯৩০ সালের কথা। কাউন্টি দল সাসেক্সের তখন খুবই দুরবস্থা। অভাব-অনটন চলছে তো চলছেই। অর্থাভাবে সাসেক্স সেবার শক্তিশালী দলই গঠন করতে পারছে না। রণজিৎ সিংজীর কানে গেল সে কথা। প্রিয় দল সাসেক্সের দুরবস্থার কথা শুনে রণজি পারলেন না চুপ করে বসে থাকতে। তখনই হাজার পাউণ্ডের একটা চেক তিনি পাঠিয়ে দিলেন আর এও জানালেন যে, ক্লাবের চারজন পেশাদার খেলোয়াড়ের মাইনে থেকে আরম্ভ করে সমস্ত খরচ-পত্তর তিনি নিজেই বহন করবেন।

রণজির এই মহানুভবতার পরিচয় ইংরেজরা এর আগেও অনেকবার পেয়ে-ছিলেন। তাই সাসেক্স কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় এতোটুকুও অবাক হলেন না, বরঞ্চ রণজিকে নিজেদের বড় কাছাকাছি পেয়ে যেন বর্তে গেলেন। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা তাই রণজিকে মনোনীত করলেন তাঁদের ক্লাবের সভাপতি হিসেবে।

খোদ ইংলণ্ডের নামী কাউন্টি ক্লাব সাসেক্সের সভাপতি হলেন জামসাহেব রণজিৎ সিংজী। বোম্বাই-এর জিমখানা ক্লাবের কর্তৃপক্ষের কানেও এ খবর পৌঁছুতে মোটেই দেরি হলো না।

ক্রিকেট খেলা ছেড়েছেন রণজি অনেকদিন আগেই—এবার সময় হয়ে এলো তাঁর জীবন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের পালা শেষ করার। তবে তাঁর জীবনের পরম সান্ত্বনা তাঁরই হাতে তৈরি দলীপ সিংজী।

দলীপ সিংজীর উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের কথা তখনই ইংলণ্ডের ক্রিকেট অনুরাগীদের মুখে মুখে। শুনে খুশি হন রণজি। নিজের প্রিয় ভাইপোর খেলা দেখে আনন্দে তিনি বিভোর। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে দলীপ। তারপর দলীপের অজান্তে দর্শকদের আসনে বসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচে দেখলেন দলীপকে শতরান করতে।

রণজির মতো দলীপও তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচে করলেন শতরান। রণজির পর ইংলণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে শুরু হলো আর একটি নতুন অধ্যায়—সেই কাহিনীর নায়ক জাম-সাহেব রণজিৎ সিংজীর ভাইপো, তাঁর নিজের হাতে তৈরি ক্রিকেটার দলীপ সিংজী। তবে সে আরো অনেক পরের কথা।

আগেই বলেছি যে, রণজি তখন এসে পৌঁচেছেন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে।

১৯৩২ সালের বড়দিনের সময় রণজি ভারতে ফিরে আসছেন। আসার আগে তিনি ইংলণ্ডে তাঁর বন্ধু-বান্ধব থেকে আরম্ভ করে সকলের সংগে দেখা করে, গল্প করে আর সবশেষে হাসি-মুখে বিদায় নিয়ে এলেন তাঁদের কাছ থেকে।

অসুস্থ রণজি। দুর্বল তাঁর শরীর। তিনি যেন নিজের মধ্যেই অনুভব করছেন সেই পরম মুহূর্তকে। মনে মনে যেন তিনি বুঝতে পেরেছেন, এসেছে সময়, কারবারে জম—মৃত্যুঞ্জয়।

তাই বুঝি বাকী কাজ চটপট সেরে ফেললেন তিনি। দিল্লী গিয়ে মিটিয়ে এলেন রাজকাজ। তাঁর রাজ্যের কাজ-কর্মের নির্দেশ দিলেন, একে একে বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে, না হবে। তারপর আত্মীয়-স্বজন সকলকে ডেকে

পালিয়ে যেতে আপ্রাণ করলেন রণজিৎ [illegible]

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের শেষ। সব কাজ সেরে, সকলের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করে পরম নিশ্চিন্তমনে বিছানা নিলেন জামসাহেব রণজিৎ সিংজী।

তারপর [illegible] টানাটানি। কিন্তু [illegible] জানা—যাঁকে নিয়ে [illegible] এতো কাণ্ড।

দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯৩৩ সালের ওরা এপ্রিল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো দেশে-বিদেশে।

জামসাহেব আর নেই! রাত তিনটের সময় মারা গেছেন রণজিৎ সিংজী।

জামনগর কাঁদছে, কাঁদছে সমস্ত ভারতবর্ষ, ইংলেণ্ডের প্রতিটি মানুষ সেই শোকে মুহ্যমান, [illegible] ঘরে ঘরে দীর্ঘনিশ্বাস—সকলের প্রিয়, একান্ত আপনার জন রণজিৎ সিংজী আর নেই।

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা সেই সংবাদ সমস্ত পৃথিবীকে যেন তোলপাড় করে তুললো।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান লিখলো :

"...Modern lovers of the game, jealous of their own heroes will no doubt tell us that Ranji, like all other masters, was a creation of our fancy in a world old fashioned and young. We who saw him will keep silence as the sceptics commit their blasphemy. We have seen what we have seen. We can feel the spell yet..."

দি মর্নিং পোস্ট লিখলো :

"..East and West met in him; what a glorious innings life has been! In the present crisis in the fortunes of India the loss of his statesmanship first of all will be lament-ed...."

ডেলী এক্সপ্রেস লিখলো :

"..He will be mourned as the greatest cricketer India ever produced, and as a good example of his country-men...."

নিউজ ক্রনিকলে ছাপা হলো :

"..The generosity he showed in the field only equalled his munificent charity which distinguished him an Indian

[illegible]

সাল	ইনিংস	রান	সব থেকে বেশি	শতরান সংখ্যা	নঃ আঃ	এ্যাভারেজ
১৮৯৩	১৯	[illegible]	৫৮		২	২৫'৮২
১৮৯৪	৩৬	[illegible]	৯৪		৪	৩২'৬৫
১৮৯৫	[illegible]	১,৭৭৫	১৫০	৪	৩	৪৯' ০
১৮৯৬	৫৫	২,৭৮০	১৭১*	১০	৭	৫৭' ১
১৮৯৭	৪৮	১,৯৪০	২৬০	৫	৫	৪৫' ১
১৮৯৭-৯৮ (অস্ট্রেলিয়া)	২২	১,১৫৭	১৮৯	৩	৩	৬০'৮৯
১৮৯৯	৫৮	৩,১৫৯	১৯৭	৮	৮	৬৩'১৮
১৮৯৯ (আমেরিকা)	২	১২৫	৬৮			৬২'৫০
১৯০০	৪০	৩,০৬৫	২৭৫	১১	৫	৮৭'৫৬
১৯০১	৪০	২,৪৬৮	২৮৫*	৮	৫	৭০'৫১
১৯০২	২৬	১,১০৬	২৩৪*	৩	২	৪৬'০৮
১৯০৩	৪১	১,৯২৪	২০৪	৫	৭	৫৬'৫৮
১৯০৪	৩৪	২,০৭৭	২০৭	৮	৬	৭৪'১৭
১৯০৮	২৮	১,১৩৮	২০০	৩	৩	৪৫'৫২
১৯১২	২৮	১,১১৩	১৭৬	৩	২	৪২'৮০
১৯২০	৪	৩৯	১৬	—	—	৯'৭৫
মোট :	৫০০	২৪,৬৯২	২৮৫*	৭২	৬২	৫৬'৩৭

ভারতের টাইমস অফ ইণ্ডিয়া লিখলো :

"He was the first Indian who touched the imagination of the British people as a whole, and for that reason it may be said of him that few men did more to bring about a sympathetic understanding between East and West...."

রণজির মৃত্যুতে সারা বিশ্বে যে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু আমরা যারা রণজিকে কোনদিন দেখি নি, রণজির রানসংখ্যার হিসেবের মধ্যে দিয়ে আমরা অতি সহজেই পেতে পারি খেলোয়াড় হিসেবে রণজির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

[সংক্ষিপ্তভাবে সেই পরিচয় ওপরে দেওয়া হল]

১৮৯৬, ১৯০০ ও ১৯০৪ সালে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাটিং এ্যাভারেজে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন রণজিৎ সিংজী।

এক নজরে রণজির বোলিং হিসেব :

রান — উইকেট — এ্যাভারেজ

৪,৫৬৭ — ১৩৩ — ৩৪·৩৩

রণজি আর নেই।

কিন্তু রণজির স্মৃতি চিরকাল আমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবে। যতোদিন এই পৃথিবীতে ক্রিকেট খেলা চালু থাকবে, ততদিন ক্রিকেট জগতের কাছে

ভ্রম সংশোধন

সাপ্তাহিক বসুমতীর গত ২২শে জানুয়ারীর সংখ্যায় খেলার পাতায় "আপনি আচরি ধর্ম" শিরোনামায় শান্তিপ্রিয় যা লিখেছেন, তাতে একটা গুরুতর ভুল থেকে গেছে। জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান উপলক্ষে কটক গমনোদ্যত দুজন রেলের "ক্রীড়া কর্তার" আচরণ সম্পর্কে স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টের ভিত্তিতে সেই মন্তব্য লেখা হয়েছিল। কিন্তু লেখক রিপোর্টটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। তিনি ভ্রান্তিবশত উক্ত ক্রীড়া কর্তাদের এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশনের ক্রীড়াকর্তা বলে মনে করেছিলেন এবং সেইভাবে তাঁদের "আচরণে"র সমালোচনা করেন। আমরা এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তাঁরা এই ভুলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—সম্পাদক

আর যতোদিন সভ্যতা বজায় থাকবে, ততোদিন জামসাহেব রণজিৎ সিংজী জামনগরের প্রতিটি লোকের কাছে হয়ে থাকবেন অমর।

[ক্রমশঃ]

ক্রীড়া-বৃত্তি

কৃতী এবং উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থাটা শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় ক্রীড়াজগতের একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঘটনাকে আমরা খেলাধুলার উন্নতির বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলেও উল্লেখ করতে পারি। কারণ এই বৃত্তির প্রয়োজন যে কতো বেশি, তা সকলেই উপলব্ধি করেছেন এবং এখনো করছেন। এই বৃত্তি যদি ঠিক জায়গায় আর ঠিক সময় দেওয়া হয়, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তটিকে আমরা স্বাগত জানাবো আর এর জন্যে কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে পাবেন সকলের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। লোকসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের নাম পৃথিবীর অধিকাংশ দেশগুলির ওপরে থাকলেও, খেলাধুলায় আজও কিন্তু ভারত একেবারেই পেছনের সারিতে। অবশ্য তার জন্যে কেউ দুঃখ প্রকাশ করেন না, করলে দিনের পর দিন আমরা এইভাবে পেছনে পড়ে পড়ে মার খেতাম না। খেলাধুলোর উন্নতির জন্যে সত্যিকারের কিছুই আজ পর্যন্ত বোধ হয় করা হয় নি। প্রতিযোগিতার আসর বসানো আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করাই সব নয়। সত্যিকারের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন আরো অনেক কিছুর। কিন্তু সেই কিছুটার দিকে নজর আমাদের কোনদিনও গেলো না। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই ক্রীড়া-বৃত্তি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক।

সে যাই হোক, ভারতীয় ক্রীড়াজগতের আসরে এক সময় যাঁরা সত্যিকারের ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তাঁদের কথা কিন্তু আমরা মনেই করি না। বোধ হয় সে প্রয়োজনের কথা আমরা উপলব্ধি করি না। আজ যখন উদীয়মান ক্রীড়াবিদ—অর্থের প্রয়োজন যাঁদের খুবই বেশি, তাঁদের জন্যে ক্রীড়া-বৃত্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তখন আমাদের মনে পড়ছে সেই সব দিকপাল প্রাক্তন খেলোয়াড়দের কথা, যাঁরা আজ অর্থের অনটনে সংগীন অবস্থার সম্মুখীন। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। শ্রীহেমেন মজুমদারের কথাই ধরা যাক। প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় হেমেন মজুমদার সেই গোরা আর সাহেবদের যুগে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের যে নজীর স্থাপন করেছিলেন শুধু সে যুগে নয়, এ যুগেও তার তুলনা মেলা ভার। শ্রীমজুমদার ছিলেন বাংলার গৌরব, ছিলেন ভারতের গৌরব। কিন্তু তাঁর নিজের গৌরবের দিনগুলো গত হবার সংগে সংগে ক্রীড়াঙ্গন তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে না দিলেও সমাজের কাছ থেকে পান নি তিনি তাঁর সামান্যতম পাওনাটুকুও। তাই অসহনীয় দৈন্যের সংগে সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে তাঁকে। শুধু তাঁকেই নয়—তাঁর মতো অনেকেই আছেন এই তালিকায়। দুস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্যে সাহায্য তহবিল আছে শুনেছি। কিন্তু যাঁরা সত্যিই দুস্থ তাঁরা সাহায্য পান কিনা জানি নে। তাই আজ সরকার, স্পোর্টস কাউন্সিল এবং বিভিন্ন খেলার কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ—এবার আপনারা এগিয়ে আসুন, আগেও যদি কিছু করে থাকেন তাহলে আরো বেশি কিছু করে সত্যিকারের একটা কাজের মতো কাজ করুন। আজ সে কাজেরই প্রয়োজন সব থেকে বেশি—কথার নয়। —[illegible]

টেনিসের মাঠে

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব অঞ্চলের খেলায় ভারত সহজেই ৩—১ খেলায় পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে। পরের রাউন্ডে ভারত খেলবে সিংহলের বিরুদ্ধে।

যাই হোক, ভারত বনাম পাকিস্তানের খেলায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন রকম প্রশ্নই ওঠে না। টেনিস খেলায় ভারত আজো এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দল। তবে এই শ্রেষ্ঠত্ব কতোদিন থাকবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কৃষ্ণনের খেলা ছেড়ে দেবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর স্থান পূরণ করার মতো কেউই নেই। শুধু তাই নয়—কৃষ্ণনের পর ভারতীয় টেনিস জগতকে মাতিয়ে রেখেছিলেন জয়দীপ মুখার্জী আর প্রেমজিৎ লাল। ওঁদেরও খেলা ছাড়ার সময় হয়ে আসছে। হয়তো আর বড় জোর দু-চার বছর ওঁরা খেললেও খেলতে পারেন। কিন্তু তারপর? ওঁদের স্থানও হয়তো থেকে যাবে অপূর্ণ। ফলে ভারতীয় টেনিস জগৎ সম্মুখীন হবে বড়ই অসহায় অবস্থার। কারণ এখনকার তরুণদের মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বাক্ষর বিশেষ কেউই রাখতে পারছেন না। জানিনে এ বিষয়ে ভারতীয় টেনিস

॥ জয়দীপ মুখার্জী ॥
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের খেলায় জয়দীপ মুখার্জীই ভারতের জয়ের সূচনা করেন।

কর্তৃপক্ষের কি মত। কারণ শুধু বর্তমানকে সামনে রেখে চললে তো চলবে না—ভবিষ্যৎকে সব সময়ই রাখতে হবে আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু আজ তো আমাদের চোখের সামনে আছে শুধু অন্ধকারই।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি সিঙ্গলসে জেতার পর ভারত যখন ডাবলসের খেলাতেও জিতলো, তখনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার অত্যন্ত ফলাফল নির্ণয় হয়ে গেল। তাই রিভার্স সিঙ্গলসে জয়দীপ আর প্রেমজিৎ খেললেন না। খেললেন দুজন তরুণ খেলোয়াড়। কিন্তু ভারতের শশী মেনন পরাজিত হলেন পাকিস্তানের মুনাব্বর ইকবালের কাছে। অপর খেলাটি শেষ পর্যন্ত আর শেষ হলো না। তবে খেলার সময় যখন শেষ হয়ে গেলো তখন বিজয় অমৃতরাজ পাকিস্তানের আজিম ইলাহির চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন।

কিন্তু কি অমৃতরাজ, কি মেনন—কেউই দর্শকদের চাহিদা মিটিয়ে পারেন নি যেমন তাঁদের অনাবিল আনন্দ দিতে, তেমনি নিজের খেলার প্রদর্শনের সুযোগকে পারেন নি একেবারেই কাজে লাগাতে।

সাধারণ দর্শক আসনে বসে আছেন শুধুমাত্র একজন দর্শক। এবং তাঁর সামনেই শুরু এবং শেষ হয়েছিল ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মত দুই দেশের একদিনের টেস্ট খেলা। এ অবশ্য অনেকদিন আগেকার কথা। ১৯৩২-৩৩ সালে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেকার প্রথম টেস্টের শেষ দিনের আগেকার দিনের খেলা খেলা যখন শেষ হল তখন ইংলণ্ডের জয়ের জন্য দরকার মাত্র ১ রানের। হাতে ১০টি উইকেট। এবং ঐ একটি রানের জন্যই পরবর্তী দিনে ব্যাট করতে নামলে দর্শক আসনে মাত্র একজন লোকই হাজির ছিলেন।

*

১৮৮২ সালের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। সে টেস্টে একসময় এমন অবস্থা হল যে, মাত্র ৮৫ রান করতে পারলেই ইংলণ্ডের জয়লাভ নিশ্চিত। এবং তাদের হাতেও রয়েছে ১০টি উইকেট। কিন্তু ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা অস্ট্রেলিয়ান "দানব" স্পফোর্থ মারাত্মক বোলিং করে মাত্র ৭৭ রানেই ইংলণ্ডকে ডুবিয়ে দিলেন। এইরকম মারাত্মক বিপর্যয়ে অনেক ইংলণ্ড-সমর্থক দর্শক মাঠের মধ্যেই শোকাভিভূত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে মারা যান॥

—পবিত্র মজুমদার,

কলকাতার হকি মরশুম এখন পুরোপুরিভাবে আরম্ভ হয়ে গেছে আর প্রত্যেক দলের খেলাও এখন প্রায় মাঝপথে। কলকাতার নিরুত্তাপ হকি মরশুম এবার কিন্তু মাঝে মাঝেই নানা

॥ ইনামুর রহমান ॥
যদিও প্রতিষ্ঠ সকলেই স্বীকার করলেও বাতিল করার কথা তাঁরা করছেন না তাই ইনামুর বাদ পড়েছেন ভারতীয় দল গঠনের আগের শিক্ষা শিবিরের তালিকা থেকে।

কারণে গরম হয়ে উঠছে। হকি খেলার সময় খেলার মাঠে গোলমালের সংখ্যাও এবার কিন্তু কম নয়।

এরই মধ্যে অনেক কিছুই এবার ঘটে গেছে। মাঠে দর্শকদের হামলার

[শেষাংশ ২৬২৪ পৃষ্ঠায়]

এশীয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে বাংলা দল তেহরানে চলে গেছে। শান্ত মিত্রের জায়গায় দলের নেতৃত্ব করছেন অশোক চ্যাটার্জী। বাংলা দলের অন্যতম খেলোয়াড় হাবিবকে নিয়ে মাঝে কদিন জল বেশ ঘোলা হয়েছিল। দল বদলের পালায় হাবিব মোহনবাগান ক্লাব ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলে। তারপর ক্লাবের টাকা শোধ না থাকা নিয়ে একটু গোলমাল বেধেছিল আর সেই অজুহাতে হাবিব তাঁর পুরোন দল

[শেষাংশ ২৬২৪ পৃষ্ঠায়]
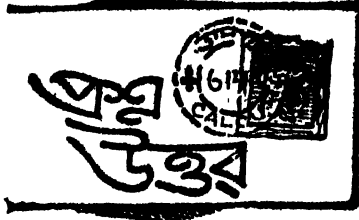
হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : তোমার চিঠির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো—

৭৪ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যায় সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রসন্ন ও বেদীর যে বোলিং এভারেজ দিয়েছেন তাতে একটু ভুল আছে। ভুল সংশোধন করে দিলাম।

	বল	মেডেন	রান	৫টি উইঃ	উইঃ	এভারেজ
প্রসন্ন	৭৫৪৬	৩৩৪	৩০৬৫	৮ বার	১১৩	২৭·১২
বেদী	৫৫৪৪	৩৩১	১৮০০	৪ "	৭০	২৫·৭১।

অলোক ব্যানার্জী (ঝাড়িয়া, কাতরাস মোড়, ধানবাদ)

উত্তর : স্থানীয় খেলোয়াড়দের বেশি সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে আপনার সংগে আমরাও একমত। তবে বাংলার বাইরে থেকে ভালো খেলোয়াড় আনার এখন নানা অসুবিধে। তাই স্থানীয় নামী আর দামী খেলোয়াড়দের দিকেই নজর সকলের। উঠতি তরুণ খেলোয়াড়দের শিখিয়ে-পড়িয়ে দল গঠন করার কথা হয়তো ওঁরা মুখেই বলছেন। খেলার সময় মাঠে দেখবেন সেই নামী আর দামীরাই নেমেছেন। তবে ওঁরা যদি শুধুমাত্র চেনা-জানা লোকের আত্মীয়-স্বজনের দিকে না তাকিয়ে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ভালো খেলোয়াড় এনে তালিম দিয়ে তৈরি করে নিতেন, তাহলেই কাজের কাজ হতো।

বারিদবরণ মণ্ডল (শিরুন, দুর্গাদোলিয়া)

উত্তর : দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষী খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রচার না করাই ভালো। ওঁরা যতোদিন না ওঁদের নীতি বদলাবেন, ততোদিন ওঁদের একঘরে হয়ে থাকাই উচিত। তবে সাপ্তাহিক বসুমতীতে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

সোমনাথ, উপেন্দ্রনাথ, লোকনাথ, কাশীনাথ, ভাস্কর ও পঙ্কজ (নেতাজী কলোনী, বরানগর)

উত্তর : ওপরের উত্তরটি দেখুন। আর রণজিৎ সিংজী, দলীপ সিংজী ও পাতৌদির নবাবের (বড়) ব্যাটিং এভারেজ 'খেলার রাজার রাজা' লেখায় প্রকাশ করা হবে।

শম্ভু রক্ষিত (গ য়ে র কা টা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : খেলা আর খেলোয়াড়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর : পুকুর আর মাছের পার্থক্য যেখানে......অর্থাৎ পুকুর আছে বলেই মাছের অস্তিত্ব, সেইরকম খেলা আছে বলেই খেলোয়াড়রাও আছেন। সুতরাং......

সমরকুমার দত্ত (নিবাধুই, দত্তপুকুর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ব্রেক বল, স্পিন বল ও সুইং বলের মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : ব্রেক আর স্পিন বল একই জিনিষ—স্লো বোলারদের বল করার পর যে বলগুলো পিচ খাবার পর উইকেট লক্ষ্য করে ঘুরে যায়, তাকেই ব্রেক বা স্পিন বল বলে। স্পিন বল দু রকম। যে বলগুলো পিচ খাবার পর অফের দিকে অর্থাৎ বোলারের বাঁদিকে ঘুরে যায়, সেগুলিকে লেগ ব্রেক আর যেগুলো লেগের দিকে ঘুরে যায় সেগুলোকে অফ ব্রেক বলা হয়। আর যে সুইং বলগুলো ফাস্ট বোলারদের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর ধনুকের মতো বাতাসেই বেঁকে উইকেটের দিকে ধেয়ে যায়, তাকে সুইং বল বলে। সুইং বলও দু রকম—ইন আর আউট সুইংগার।

এল· বি· ডাব্লিউ এবং তার নতুন সংযোজন নিয়ে দু-এক সংখ্যা আগেই সাপ্তাহিকে লেখা হয়েছে। আশা করি আপনিও দেখেছেন।

॥ হকির মাঠে ॥

[২৬২৩ পৃষ্ঠার পর]

জন্যে কয়েকটি খেলা শেষমুখে পরিত্যক্ত হয়েছে। উগ্র দর্শকদের হাতে আম্পায়ারও একাধিকবার নাজেহাল হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার অভাবে আম্পায়াররা খেলা পরিচালনা করতেও অস্বীকার করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত আবার সব মিটমাট হয়ে যায়। ফলে কলকাতার হকি মরশুম এখন পুরোদমে চলছে।

জয়-পরাজয়ের খতিয়ানে মোহনবাগান ক্লাব এখনো সবার ওপরে। তারপরে ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি দলগুলো। দেখা যাক, লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের শিকে শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে ছেঁড়ে।

কলকাতার হকি মরশুম কিন্তু কোন মতেই বাংলা দেশের দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারে না। ঢিমে-তে-তালে চলে খেলা। অথচ হকি খেলাই বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনের দরবারে ভারতের একমাত্র আশার বস্তু। কিন্তু বাংলা দেশে হকি খেলা একেবারেই উপেক্ষিত।

আর সেই উপেক্ষা যে কতো বেশি তার পরিচয় যে কোনদিন ময়দানী হকির আসরে গিয়ে হাজির হলেই উপলব্ধি করা যাবে!

॥ সমাচার দর্পণ ॥

[২৬২৩ পৃষ্ঠার পর]

মোহনবাগানের পক্ষে খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর দেখা গেল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জনৈক কর্মকর্তার সংগে আই· এফ· এ অফিসে গিয়ে হাবিব তাঁর সেই আবেদনপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন আর সেই সংগে শোধ করে দিলেন মোহনবাগান ক্লাবের পাওনা চাঁদা। ফলে তেহরানে যেতে হাবিবের ক'দিন দেরি হয়ে গেল।

পরিতোষ সিংহরায় (বেড়ম, কোটালপুকুর, সাঁওতাল পরগনা)

উত্তর : আপনি 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগের জন্যে আর একটা লেখা পাঠাবেন। কারণ আপনি যে লেখাটা পাঠিয়েছেন—সেটা এর আগেই একবার ঐ বিভাগেই প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসদ্‌কুমার গহেজমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২৬২৭
আজকের মানুষ	...	২৬২৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৬২৯
নরম জল (কবিতা)	— শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়	২৬৩০
বঙ্গদর্শন	...	২৬৩৪
ভারতদর্শন	...	২৬৩৬
আন্তর্জাতিক	...	২৬৩৮
সপ্তাহের বোকা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২৬৪০
সেই অভিশপ্ত জগৎ	— মনোরঞ্জন হাজরা	২৬৪২
শহর কলকাতা	— মিত্রেন	২৬৪৩
শিক্ষা সংস্কার, না দলবাজী?	— প্রণবেশ চক্রবর্তী	২৬৪৮
স্রোতের সঙ্গে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৬৫০
অ্যাপোলো-১৩	— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২৬৫৩
পাঠকমন	...	২৬৫৫
দৃষ্টি-পরিক্রমা	— পুলকেশ দে সরকার	২৬৫৭
সুউ-মাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	— বিশ্বনাথ ঘোষ	২৬৬১
বাংলার বৈপ্লবিক সংগঠন : তখন ও এখন	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৬৬৩
তিমিরপ্রান্ত [illegible]	— অগ্নিবর্ণ	২৬৬৭

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৪২শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২রা বৈশাখ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ | Thursday, 16th April, 1970

প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কেলেঙ্কারী

আজ থেকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা সুরু হচ্ছে। দিন কয়েক আগে উচ্চ মাধ্যমিকের লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আনন্দের কথা, পরীক্ষার হলে এবার পরীক্ষা পণ্ড হবার মতো রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা হয় নি। বরং বহু পরীক্ষার্থী মৃদু হাস্যে অদৃশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে করতে শান্ত ছেলের মতো ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করা উচিত, আর একদল ছাত্র ঐ সব শান্ত ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে-শুনে নিরুপায় অবস্থায় শুধু হা-পিত্যেশ করেছে। বছরের পর বছর খেটে যে পরিশ্রম ও মেধার সাহায্যে তারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তা তাদের কাছে মনে হয়েছে বিরাট এক প্রহসন। যদি পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হয়ে যায় এবং সেই পরিস্থিতিতে সুযোগসন্ধানী একদল পরীক্ষার্থী ক্ষচে-বারো করে বেরিয়ে আসে, তাহলে সত্যিকারের ভালো ছেলেদের কাছে পরীক্ষা শুধু প্রহসনই মনে হয় না, তাদের মন ভবিষ্যতের কথা ভেবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে এবং সমস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হয়ে ওঠে চরম বিদ্রোহী।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে এবার 'লে লে বাবু দু' আনা'—এই রেটে নাকি বিক্রয় করা হয়েছিল কোনো কোনো প্রশ্নপত্র। যে যে বিষয়ের প্রশ্ন প্রকাশ পেয়েছিল এবং আমরা যা দেখেছিলাম, তার মধ্যে ছিল অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের ১০০%, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পত্রের ৫০% এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় পত্রের ১০০%। অভিযোগে প্রকাশ যে, অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথমেই এ কথা আমরা জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, প্রশ্নপত্র অগ্রিম প্রকাশ হয়ে পড়ার ব্যাপারটি নতুন কিছু নয়। একমাত্র গত বছরই কোনো প্রশ্ন প্রকাশ হয়ে যাওয়ার কথা শোনা যায় নি। কিন্তু প্রায় দেড় দশক ধরে প্রশ্নপত্র অগ্রিম বের হয়ে পড়ার ঘটনা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর প্রশ্নপত্র শুধু মধ্য পর্ষদের স্ট্রং রুম থেকেই বের হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাগুলির প্রশ্নপত্র ইতিপূর্বে বহুবার অগ্রিম প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অলীক ব্যাপার বলে প্রতিবাদও করেছেন। তবে প্রশ্নপত্র যারা অগ্রিম পায়, তারা ঐ বিবৃতি পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি করুণা প্রকাশ করে, কেউ কেউ বা হেসে বলে, এঁরাই দেবেন পবিত্রতম ডিগ্রী উপাধি! এবারও গুজব উঠেছে বি· এসসি পার্ট ওয়ানের কোনো কোনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। গুজব বেশ কিছু আগেই উঠেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে গুজব দৃঢ় কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর সে ঘটনা নিবারণ করার হয়তো একমাত্র উপায় ছিল সাময়িকভাবে পরীক্ষা বন্ধ রাখা। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তবে প্রশ্নপত্র অগ্রিম প্রকাশ হয়ে যায় কেন, সে সম্বন্ধে এই মুহূর্তে নতুন ভাবনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আসা উচিত।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার মূলে এক শ্রেণীর অর্থগৃধ্নু সংস্থা রয়েছে বলে কারো কারো বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস সত্য, না অসত্য তা বিচার করার আগে দেখা দরকার, প্রশ্নপত্র কোন্ পথ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। কারো কারো মতে—মফস্বলে প্রশ্নপত্র পাঠানো হলে সেখান থেকে তা বের হওয়া অসম্ভব নয়, আর একদল বলেন—প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র বের হয়ে যায়, অন্য মতাবলম্বীরা বলেন—উপরে উক্ত দুই স্থল থেকে বের না হলে প্রশ্নকর্তা কিংবা মডারেটরকে প্রশ্নপত্র বের হয়ে পড়ার জন্য দায়ী মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সবার বড়ো প্রশ্ন, ম্যাও ধরবে কে?

সুতরাং তদন্ত হলেও কি সমস্যার সমাধান হবে?

সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন। আমাদের মনে হয়, পরীক্ষার ব্যাপারে একমাত্র মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রায়ের ওপর নির্ভর করা অনুচিত। পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি পাল্টাতে হবেই। উপরন্তু নির্বাচনী পরীক্ষা ও শেষ পরীক্ষা, সেই সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষা—এই তিনটি পরীক্ষার গড় নম্বরের সাহায্যে ছাত্রদের ফলাফল বিবেচনা করতে হবে। আমরা মোটামুটি একটা প্রস্তাব রাখলাম। আশা করি, বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে নতুন পথের সন্ধান দেবেন। তা নইলে যা ঘটছে, তাতে পরীক্ষা গ্রহণ করা নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে।

আজকের মানুষ

ইহুদি মেনুহিন ১৯৬৮ সালের নেহরু পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত এই মার্কিন বেহালা-বাদক শুধু সংগীত চর্চার কারণেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র নন, বস্তুত গভীর মানবতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতা গড়ে তোলার জন্যেও মেনুহিন সারা দুনিয়ার চোখে এক সম্মানিত ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আরো তিনজন—রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট, বিখ্যাত নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং (মরণোত্তর) এবং সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খান এ-পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পুরস্কার-প্রাপ্তের তালিকায় মেনুহিনের স্থান চতুর্থ।

নেহরু পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক লাখ টাকা। ইচ্ছেমত এ টাকাকে বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যাবে এবং তা আয়করমুক্ত। সঙ্গে পাবেন একখানা প্রশস্তিপত্রও। কিন্তু কোনো পুরস্কারই কি ইহুদি মেনুহিনের পক্ষে বেশি কিছু—যা পাবার যোগ্যতা তাঁর নেই? ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মেনুহিনকে সম্মানজনক নাইট খেতাবে ভূষিত করেছেন, যদিও ব্রিটিশ নাগরিক নন বলে মেনুহিন তাঁর নামের আগে 'স্যার' লিখতে পারবেন না। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মানে মেনুহিনকে সম্মানিত করেছে। অন্তত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক 'ডক্টরেট' উপাধি দিয়ে বরণ করেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মেনুহিনকে সংগীতের ডক্টরেট হিসাবে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে।

বাস্তবিক বিঠোফেন, মোজার্ট, বাখ ব্রাহ্‌মস-এর পর পৃথিবীতে এত বড় সংগীতপ্রতিভা আর জন্মেছেন কি না সন্দেহ। অতি ছোটবেলাতেই মেনুহিনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ছেলে-খেলার—বয়স যখন মাত্র চার, তখন খেলনার বেহালা বাজাতেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে প্রথম শ্রোতৃবর্গকে বেহালা বাজিয়ে শোনান। এগারো বছর বয়সে নিউ ইয়র্কের এক অভিজাত হল-এ মেনুহিন এত নিখুঁত অথচ মর্মস্পর্শী ছন্দে বিঠোফেনের কনসার্ট বাজিয়ে শোনান যে, এই অবিশ্বাস্য কিশোর-প্রতিভার সুরের মূর্ছনা শুনে বৃদ্ধ ও প্রবীণ সংগীতজ্ঞরা পর্যন্ত কেঁদে ফেলেছিলেন। বার্লিনে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মনীষী আইনস্টাইন মেনুহিনের বেহালার সুরের ঝংকার শুনে তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে আবেগে জড়িয়ে ধরেছিলেন। নিউ ইয়র্কে আজ থেকে ঠিক ৫৪ বছর আগে ইহুদি মেনুহিনের জন্ম। তাঁর বাবা-মা—মোশে আর মার্থা মেনুহিনের আদি নিবাস ছিল রাশিয়ায়। মেনুহিন এক সংগীতপিয়াসী পরিবারে জন্মেছিলেন, তাই ছোটবেলা থেকে এদিকেই স্বাভাবিক
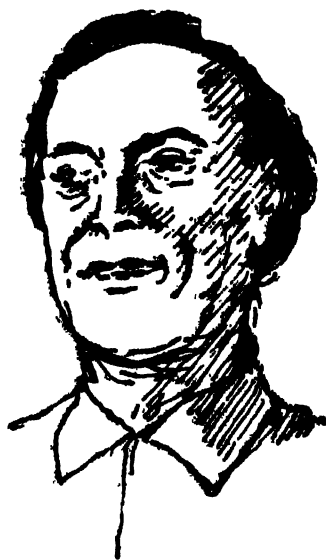
ইহুদি মেনুহিন

ঝোঁক যায়। সিগমণ্ড অ্যাঙ্কার, লুই পার্সিঙ্গার, অ্যাডলফ বাশ্‌স্ প্রমুখ প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞের কাছে সংগীতশিক্ষা ও অনুশীলনের দুর্লভ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ইহুদি মেনুহিন বিশ্ব সফরে বেরোন। বেহালার কনসার্ট শুনিয়ে বিশ্ববাসীকে জয় করলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যুবক মেনুহিন সেনাবাহিনী ও রেড ক্রস ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে পাঁচশ কনসার্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

[illegible] ভারতে এসেছিলেন [illegible] নেহরুরই আমন্ত্রণে [illegible] তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ-সংগ্রহের জন্য ভারতে ১৪টি অনুষ্ঠানে বেহালা বাজিয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক বিস্ময়ে এই প্রতিভাশালী শিল্পীর উদ্দেশে নমস্কার জানিয়েছেন। তারপরেও মেনুহিন আরো তিনবার ভারতের মাটিতে পা রেখেছেন, এ রাজ্য থেকে সে রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৯৫৪ ও '৬৪ এবং চলতি বছরের গোড়ার দিকেও মেনুহিন একবার ভারতে ঘুরে গিয়েছেন। বস্তুত ভারতের সঙ্গে ইহুদি মেনুহিনের এক নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠেছে। অচ্ছেদ্য এক বন্ধনে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। মার্গ বা শাস্ত্রীয় সংগীতের বিষয় পড়তে গিয়ে তিনি ভারতের সংগীত সাধনা, তার নিজস্ব সংগীতশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মেনুহিন ভারতীয় দর্শন এবং যোগ-বিদ্যার একজন আগ্রহী পাঠক ও অনুগ্রাহী। এমন দিনও তাঁর কাটে, যখন বেহালায় একবারও হাত দেন নি, তন্ত্রীগুলো একবারও তাঁর হাতের আঙুলস্পর্শ লাভ করে নি। কিন্তু যোগাভ্যাস করেন নি—এমন নিষ্ফলা দিন তাঁর কখনই কাটে নি। এখানে এসে বিখ্যাত সেতারী পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গে মেনুহিনের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। পশ্চিমী দুনিয়ায় রবিশংকরকে মেনুহিনই পরিচিত করেছেন। দুজনের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা একসঙ্গে বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন, যুগল-বন্দি হলো গ্রামোফোন রেকর্ডও করেছেন।

ইহুদি মেনুহিন এখনও প্রধানত বৃটিশ যুক্তরাজ্যেই থাকেন, যদিও মার্কিন নাগরিকত্ব তিনি ত্যাগ করেন নি। সারেতে তিনি এক ছোটদের জন্য গানের স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া তিনি 'ইহুদি মেনুহিন ফাউণ্ডেশন' নামে এক ফাউণ্ডেশন বা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িটা এ বাবদে তিনি দান করেছেন। তাঁর লক্ষ্য—উদ্দেশ্য-সাধনে সাড়ে চার কোটি টাকার এক ফাণ্ড গড়ে তোলা।

মেনুহিন যে সফল হবেন, এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ বিশ্বের [illegible] প্রধান [illegible] যিনি অল্পদিনের মধ্যে শিখে ফেলেছেন এবং বছরে ২০টা দেশ সফর করে যিনি ১৫০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন [illegible], তাঁর পকেটে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য তো বটেই।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(৮)

লখনৌ প্যাক্টে উৎসাহিত জিন্না বোম্বাইয়ের তৎকালীন গভর্নর লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পর্যন্ত নেমে পড়লেন—অবশ্য জিন্নার পক্ষে যতখানি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব। কেবল দায়িত্বশীল সরকার পাবার প্রতিশ্রুতি পেলেই তবে ভারতবাসীর পক্ষে মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষায় সাহায্য করা সম্ভব—একথা এক ম্যানিফেস্টো-যোগে অন্যান্যদের সঙ্গে জিন্না জানিয়েছিলেন।১ জিন্নার এই ধরনের কথাবার্তা লর্ড উইলিংডনের পছন্দ হয় নি এবং তিনি প্রকাশ্যে সেজন্য জিন্না প্রমুখের সমালোচনা করেছিলেন। জিন্না যথাসম্ভব কড়া উত্তর দিয়েছিলেন, ফলে তাঁর সঙ্গে উইলিংডনের সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তার পিছনে কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারও ছিল। এক সরকারী ভোজসভায় লেডী উইলিংডন নববিবাহিত জিন্নার সুন্দরী পত্নীর অতিরিক্ত খাটো পোষাকের বিরুদ্ধে আপত্তি করায়২ জিন্না রাগে ভোজসভা ছেড়ে চলে এসেছিলেন। উইলিংডনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে, জিন্না হিন্দু মিডিলনের প্রতি অনুরক্তি পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন। উইলিংডনের কার্যকাল শেষ হলে যখন তাঁকে বোম্বাইয়ের টাউন হলে বিদায়-অভিনন্দন জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তখন জিন্না ও তাঁর তরুণী পত্নী বিদ্রোহী দল জুটিয়ে সেই সভা ভেঙে দিতে পেরেছিলেন, যে ঐতিহাসিক ঘটনা'র স্মরণে বোম্বাইয়ের কৃতজ্ঞ নাগরিকেরা তাঁর নামে একটি হল নির্মাণ করেন।৩

---

১ আলোচ্য ম্যানিফেস্টোয় স্বায়ত্তশাসনের প্রচণ্ড দাবি এবং প্রচণ্ড রাজানুগত্য একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল:

"Let England pledge herself definitely to redeem the promise by accepting here, as in Ireland, that which our leaders have asked for in the Congress and League Pact, and we will work heart and soul to save Britain, India and the Empire. We will triumph with her or we will go down with her in world ruin..We cannot forget the ties of many years...

"But, if Britain refuses us our place in the Empire, we shall try as leading a forlorn hope; whereas, if Britain welcomes us as a nation whose freedom depends upon the issue of the war, the popular enthusiasm will rise to fighting point...Trust us and we will not fail you..But let us fight under the banner of liberty, for nothing less than that will nerve our men to fight and our women to sacrifice." (Balitho)

২ আপত্তি অবশ্য খুবই শিষ্টভাবে করা হয়েছিল। লেডী উইলিংডন মিসেস জিন্নার পাছে ঠাণ্ডা লাগে, সেজন্য সহানুভূতিময় অভিভাবকত্ব প্রকাশ করে এ ডি সি-কে উপযুক্ত আচ্ছাদনী আনতে বলেছিলেন।

৩ জিন্নার জীবনীকার বলেছেন, জিন্না এই ঘটনায় প্রথম 'জনপ্রিয় চরিত্র' হলেন। উক্ত হল-এর স্মারকপট্টে লেখা আছে: মহম্মদ আলি জিন্নার সাহসী ও অসাধারণ নেতৃত্বের দ্বারা সংঘটিত ঐতিহাসিক বিজয়ের স্মরণে এই হল নির্মিত হয়েছে।

সভাভঙ্গে সফল হবার পরে জিন্না যে বিজয়-ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ:

"Gentlemen, you are the citizens of Bombay. You have to-day scored a great victory for democracy. Your triumph has made it clear that even the combined forces of bureaucracy and autocracy could not overawe you.. December 11th is Red-letter

১৯১৩-১৯১৮—এই পাঁচ বছর ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে জিন্নার শ্রেষ্ঠ ভূমিকাকাল। জিন্নার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও সুখশান্তির দিক দিয়েও এই কাল-পর্ব স্মরণীয়। ১৯১৮ সালের ১৯শে এপ্রিল জিন্না দ্বিতীয়-বার বিয়ে করেন। তাঁর প্রথমা পত্নী তাঁর ইংলেন্ড-বাসকালেই মারা গিয়েছিলেন। জিন্না পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সাফল্যের মধ্যে ক্রমপ্রতিষ্ঠালাভ করলেও প্রেমের ব্যাপারে হৃদয় অক্ষত রেখেছিলেন, যদিও তাঁর শীর্ণ-তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যের প্রতি পক্ষপাত বোধ করবার মত নারীর অভাব হয় নি, তাঁদের একজন সরোজিনী নাইডু, কবিতার অগ্নিশর যথেষ্ট নিক্ষেপ করেছিলেন।৪ জিন্না কিন্তু সরোজিনীর কবিতায় নয়, শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছিলেন এক সুন্দরী পার্শী তরুণীর সৌন্দর্যে, মেয়েটিও এগিয়ে এসেছিলেন, কন্যার পিতামাতার অমত ছিল বলে পালিয়ে গিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন। ৪১ বছরের পাত্র, অর্ধেকেরও কম বয়সের—১৮ বছরের পাত্রী।৫ জিন্না ঘর সাজিয়ে বসেছিলেন এবং সুখের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলেন।

স্বপ্ন সফল হয় নি, হওয়া সম্ভব ছিল না। "উত্তেজনার প্রথম সপ্তাহগুলি সুখে ও সমন্বয়ে কেটে গেল। ৪১ বছরের স্বামী সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতেন ল'-কোর্টের কাহিনীতে পূর্ণ হয়ে; আঠারো বছরের পত্নী অপেক্ষা করে থাকতেন, [illegible] বিকেলে যে পুতুলটি তিনি কিনে এনে জানলার তাকে বসিয়ে রেখেছেন, বাগানের পথে সূর্যালোক এসে তার ওপর পড়ে কি রকম বহু বর্ণালীর সৃষ্টি করেছে—স্বামী যাতে সেটি দেখেন সেই অধীর প্রত্যাশায়—কিন্তু স্বামীর পুরনো বন্ধুরা এসে হাজির হতেন, রাজনীতির গল্প আরম্ভ হত, যাতে পত্নীর কোনো আমোদই ছিল না; তবু সেইসব সুদীর্ঘ কাহিনী তাঁকে শুনতে হত, যখন তিনি চাইতেন বাইরে যাবেন, গাইবেন, নাচবেন।"

পারিবারিক জীবনে ট্র্যাজেডী এক্ষেত্রে অনিবার্য। রাজনৈতিক জীবনে ট্র্যাজেডিও ঘনাল। জিন্নার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা প্রচণ্ড মার খেল। 'নিখুঁতভাবে কাটের স্যুট-পরা' মানুষটি হেরে গেলেন এক 'অর্ধনগ্ন রাজদ্রোহী ফকিরের' কাছে। গান্ধী ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন কংগ্রেসকে, যে কংগ্রেসের সঙ্গে জিন্না চুক্তি করেছিলেন। গান্ধী, চাষাভুষো নিয়ে তার কারবার, তাদের ক্ষেপায়, জঘন্য ধরনের হিন্দু সংস্কার জাগিয়ে তোলে, উত্তম পোষাকের পরিবর্তে মোটা খদ্দর পরতে শেখায়, আবার ভড়ং করে প্রশ্ন করে—'এ ধরনের পোষাক কি আপনি পছন্দ করেন না?' প্রবল বিতৃষ্ণায় জিন্না উত্তর দিয়েছিলেন, 'আপনি যতখানি করেন, ততখানি নয়।'

গোড়াতেই জিন্না কিন্তু গান্ধীর পথে দাঁড়ান নি।

Day in the history of Bombay. Gentlemen, go and rejoice over the day that has secured us the triumph of democracy."

জিন্না ব্যুরোক্র্যাসি এবং অটোক্র্যাসির বিরুদ্ধে আগুন ছোটাচ্ছেন!! জিন্নার ভক্ত জীবনীকার বলেছেন—ও ব্যাপারটা জিন্নার জীবনে প্রথম ও শেষ।

৪ সরোজিনী ঘোরতর প্রেমে পড়ে যেসব কবিতা পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল :

"মধ্যরাত্রির নিঃসঙ্গ প্রহরে
যখন স্তব্ধ পর্বত আর শব্দহীন গভীরের উপরে
ঘুমিয়ে লুটিয়ে আছে তারকাখচিত রসাবেশের
নীরব আচ্ছন্নতা—
তখন আমার তৃষিত আত্মা
ব্যাকুল হয়ে থাকে তোমার কণ্ঠস্বরের জন্য।"

'বোম্বাইয়ের নাইটিংগেল' জিন্নার জন্য বৃথাই গান গেয়েছিলেন, কারণ জিন্নার কাছে নিজের কেরিয়ারের চেয়ে বড় কিছু ছিল না, কবিতা পড়ার চেয়ে ল'-কোর্টের ব্রিফ নিয়ে সন্ধ্যা কাটানো পছন্দ করতেন। জিন্নার কাছ থেকে সাড়া না পেয়েও সরোজিনীর অনুরাগ নষ্ট হয় নি। তিনিই প্রথম জিন্নার জীবনচিত্র অঙ্কন করেছিলেন এবং হৃদয় উজাড় করে দিয়ে যেসব বর্ণনাদি করেছিলেন, তাতে জিন্না নিতান্ত রাজপুত্র ছাড়া আর কিছু হন নি। অনুবাদ-অসাধ্য সেই বর্ণনার দু'-এক লাইন :

"Tall and stably, but thin to the point of emaciation, languid and luxurious of habit. Mohomed Ali Jinnah's attenuated form is the deceptive sheath of a spirit of exceptional vital.ty and endurance. Somewhat formal and fastidious, and a little aloof and imperious of manner, the calm hauteur of his accustomed reserve but masks—for those who know him—a naive and eager humanity, and intuition quick and tender as a woman's, a humour gay and winning as a child's."

ভাগ্যে সরোজিনী ভালবেসেছিলেন, তাই জিন্না এহেন একটি বর্ণনা লাভ করতে পেরেছিলেন।

৫ জিন্নার দ্বিতীয় পত্নীর নাম রতনবাঈ পেটিট। তাঁর পিতার নাম স্যার দিনশা পেটিট। এই ব্যক্তি জিন্নার বন্ধু ছিলেন।
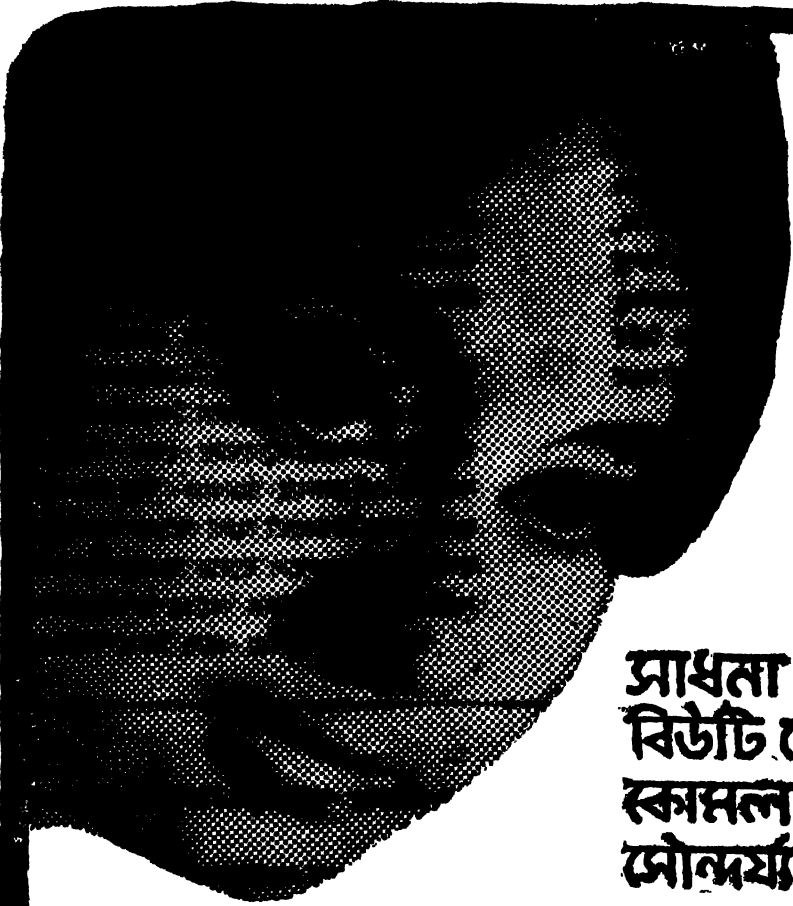
১৯১৫-র লীগ-অধিবেশনে গান্ধীর উপস্থিতির কথা আগেই বলেছি। জিন্নার সক্রিয় সমর্থনেই গান্ধী অ্যানী বেশান্তের পরে অল ইণ্ডিয়া হোম রুল লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি হয়েই গান্ধীজী যথারীতি নিজের ধারণা অপরের ওপরে চাপাতে উদ্যোগী হন। ব্যাপারটা চূড়ান্তে ওঠে ২ অক্টোবর, ১৯২০ তারিখে হোম রুল লীগের এক সভায়, গান্ধীজী যখন প্রতিষ্ঠানটির নাম বদলে 'স্বরাজ্য সভা' করতে চান এবং 'নিয়মতান্ত্রিক' উপায়ে আন্দোলন করবে বলে প্রতিষ্ঠানটির যে ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল তার বদলে 'শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত' করতে চান। জিন্না তখন পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক রীতির সমর্থক, সুতরাং জয়াকরের সহযোগিতায় যথেষ্ট বাধা দিলেন, কিন্তু হেরে গেলেন সামান্য ভোটে। তখন তিনি বললেন, প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী তিন-চতুর্থ ভোটের কমে বিধি বদলানো যায় না। গান্ধীজী জিন্নার আইনসঙ্গত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলেন।৬

এই একমাত্র নয়। স্বয়ং অহঙ্কারী, একগুঁয়ে জিন্না দেখলেন, গান্ধীর আপাতশান্ত ঋষিভাবের মধ্যে কি ধরনের জেদী স্বভাব ও গোঁড়ামি ঢাকা রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিন্নার তখনো অটুট আস্থা, তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের চেহারা দেখে, যা অহিংসা থেকে হিংসায় পরিবর্তিত হতে বিলম্ব করে না। "গান্ধীর পথ আমার পথ নয়", জিন্না অনুভব করলেন এবং সেই মনোভাব জানাতে ১৯২০-র ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে হাজির হলেন। আবেদন জানালেন কংগ্রেসের কাছে—জিন্নার পক্ষে যতখানি উত্তাপ সম্ভব সেই উত্তাপ দিয়ে—"অসহযোগের মারাত্মক পথ আপনারা নেবেন না, ও পথ ঠিক নয়, নিয়মতান্ত্রিক পথে ইংরেজের কাছ থেকে দাবি আদায় করুন"—শুনেই লাফিয়ে উঠলেন কোনো হিন্দু নন, একজন মুসলমান—মহম্মদ আলী—প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রবলতর বিদ্রূপের সঙ্গে সেই ব্যক্তি একটি রসিকতা-গল্প শোনালেন—জিন্নার সুবিবেচনার বচন ডুবে গেল হাস্যস্রোতে। "জিন্না বসে পড়লেন কঠিন আঘাতের চিহ্ন মুখে নিয়ে—একেবারে নীরব—তাতেই ডুবে রইলেন।"৭

গান্ধীর ধর্মীয় আবেদনের কাছে কিভাবে কংগ্রেসীরা যুক্তি ও বুদ্ধি সমর্পণ করে দিয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিরোধ এনে জিন্না কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, তার উল্লেখ স্বয়ং সুভাষচন্দ্র করে গেছেন। "নাগপুর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯২০) মিঃ এম এ জিন্না, যিনি তখনো জাতীয়তাবাদী নেতা মহাত্মা গান্ধীকে 'মিঃ গান্ধী' বলে সম্বোধন করলে হাজার হাজার লোক চেঁচিয়ে তাঁকে থামিয়ে দেয়, দাবী করে 'মহাত্মা গান্ধী' বলতে হবে।"৮

গান্ধীর ঔদ্ধত্যের কাছে জিন্না ম্লান হয়ে গেলেন।

৬ অশোক মজুমদার। ৯৩ পৃঃ।

হোমরুল লীগে ফেরবার জন্য এবং দেশের সামনে যে 'নতুন জীবনের দ্বার' খুলে গেছে, সেখানে অংশ নেবার জন্য গান্ধী জিন্নাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। জিন্না উত্তরে লেখেন:

" 'দেশের সামনে যে নতুন জীবনের দ্বার খুলে গেছে তাতে অংশ গ্রহণের জন্য' অনুগ্রহ করে আপনি অনুরোধ জানিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। 'নতুন জীবন' বলতে যদি আপনি আপনার মত ও পথের কথা বলতে চান, তাহলে আমার আশঙ্কা হয়, আমি তাকে গ্রহণ করতে পারি না, কারণ আমি সর্বাংশে এই ধারণায় পৌঁছেছি—ঐ মত ও পথ সর্বনাশ আনবে।......এ পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠানকে আপনি আপনার পথ নিয়ে ছুঁয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিতেই ইতিমধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ এসে গেছে। ...সারা দেশের মানুষ মরিয়া। আপনার চরমপন্থা কিছুকালের জন্য যাদের মনোহরণ করেছে, তারা অধিকাংশই হয় অনভিজ্ঞ তরুণ বা অজ্ঞান ও অশিক্ষিত মানুষ। এ সকলের পরিণতিতে রয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা, বিনাশ। ভবিষ্যৎ কী, ভাবতেও আতঙ্কে শিউরে উঠি।" (বলিথো)

৭ দেওয়ান চমনলালের স্মৃতিকথা থেকে। বলিথো'র গ্রন্থে উদ্ধৃত।

মহম্মদ আলী বলেছিলেন: "আপনি বড় বেশী নিয়মতান্ত্রিকতার বুলি কপচাচ্ছেন। আপনার কথা শুনে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। একজন তরুণ টোরী (ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের সদস্য) এক সন্ধ্যায় কার্লটন ক্লাব থেকে বেরিয়ে পিকাডিলী সার্কাসে গিয়ে দেখেন সেখানে স্যালভেশন আর্মির (এক খ্রীস্টান সম্প্রদায়) সভা চলছে। বক্তা বলছিলেন, "এই পথে আপনারা সবাই আসুন, কারণ এই হল ঈশ্বরের পথ।" টোরী-ছোকরা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—"আপনি কতদিন এই প্রচার চালাচ্ছেন?" "কুড়ি বছর হবে"—স্যালভেশন-প্রচারক উত্তর দিলেন। শুনে টোরী-ছোকরা বললেন—"বেশ, বেশ, কুড়ি বছরে তাহলে আপনি পিকাডিলী সার্কাস পর্যন্ত এসেছেন! এক্ষেত্রে আপনার পথ সম্বন্ধে বড়-কিছু ভাবি কি করে?"

৮ ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল।

গান্ধীজী ১৯২০ সালে কংগ্রেস অধিকার করার কালে যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্য কিভাবে আকর্ষণ করেছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী আমাকে দিয়েছেন। ১৯২০, সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। গান্ধীজী চিন্তিত ছিলেন, এখানে তাঁর অসহযোগ প্রস্তাব পাস করিয়ে নিতে পারবেন কি না, কারণ চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, বেশান্ত, মালব্য প্রমুখের মত শক্তিশালী বিরোধী ছিলেন। গান্ধীজী জয়লাভের জন্য খিলাফতী মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আগেই আঁতাত করে ফেলেছিলেন। তার ওপর রাতারাতি বড়বাজার থেকে

নরম জল

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি তুমি চাও এমন একটি দিন
যেদিন আকাশে ঘন ঘোর ঘটা—
কাজলের মত চিকণ কৃষ্ণ মেঘ ;
জল ঝরে যাবে যেদিকে তাকাবে তুমি,
রুপোলী ছুরির মতই তীক্ষ্ণ জল,
অকারণে বসে জলাশয়ে আনমনে
মেঘের লুকানো কান্না রাঙানো মনে
ভেবে যাবে তুমি করুণ বিরহ ব্যথা—
জলের কুয়াশা, ঝাপসা নরম জল—

কোন শ্রাবণেই পাবে না তেমন দিন
চোখে তো মেঘের মাধুরী তেমন নেই—
মেঘদূত আর যায় না আকাশে ভেসে
শ্রাবণ সন্ধ্যা অশ্রু-অগ্নি চোখে
তীক্ষ্ণ তড়িৎ এ'কে যায় দিকে দিকে
আজ শোন শুধু শ্রাবণের ক্রন্দন
আর চেয়ে দেখো চিকণ নরম জল ॥

যে তিন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন—সেই তিন সংস্থার সঙ্গেই সংযোগ ছিন্ন করলেন। সেগুলি হল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, হোম রুল লীগ এবং কংগ্রেস। মুসলিম লীগের সঙ্গেই মাত্র তাঁর যোগ রইল, খিলাফতের ধাক্কায় যে লীগ তখন টলমল। জিন্নার জীবনীকার স্বীকার করেছেন, গান্ধী-নেতৃত্বে চরমপন্থী দল কংগ্রেস অধিকার করায় জিন্না কংগ্রেস ছেড়েছিলেন।১

জিন্না একদিকে গান্ধীর অসহযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন, অন্যদিকে আর্তনাদ করতে লাগলেন ইংরেজের সহানুভূতিহীন সংকীর্ণ নীতির বিরুদ্ধে। জিন্না বলেছিলেন, তিনি যে রাজনীতি করেন, সেখানে পায়ের তলায় কোনো জমি থাকবে না, যদি ইংরেজ কিছু সুবিধা সরবরাহ না করে। রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে বললেন, "যদি আপনারা এই আইন পাশ করেন তাহলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এমন অসন্তোষ ও আন্দোলনের প্রবাহ বয়ে যাবে, যার অনুরূপ কিছু আপনারা দেখেন নি। এর ফলে, বিশ্বাস করুন, সরকার ও জনগণের মধ্যে যে ভালো সম্পর্ক রয়েছে তার ওপরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আসবে।"

কলকাতায় মুসলিম লীগ সম্মেলনে তিনি 'আত্মসন্তুষ্ট ভাইসরয়কে' আক্রমণ করলেন, যিনি 'সিমলার অলিম্পীয় উচ্চতায়' অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন আর এধারে রাউলাট অ্যাক্ট পাশ হচ্ছে, পাঞ্জাবে অত্যাচার চলেছে এবং খিলাফতের ধর্মনাশ ঘটছে। এর ফল কী? বিপ্লব! আর্তনাদ করে জিন্না বললেন : "একের পর এক জঘন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ক্রমান্বয়ে হতাশা ছড়াচ্ছে, আঘাতের পর আঘাত নামছে—একটি মাত্র পরিণতির দিকে তা ঠেলে দিচ্ছে। এই ধরনের অবস্থা রাশিয়াকে বলশেভিক মতের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, আয়ারল্যাণ্ডকে সিনফিন মতে।" [ক্রমশ]

অতিরিক্ত ডেলিগেট সংগ্রহ করা হয়েছিল। গান্ধীজী হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে সভায় প্রবেশ করতে সে কী প্রচণ্ড উল্লাস আর জয়ধ্বনি। অর্ধেক জয় ঐ হাঁটুর ওপরে কাপড়ের, বাকি অর্ধেক জয়—সত্যরঞ্জন জানালেন, 'হিন্দী মে বলিয়ে'-র। অর্থাৎ অন্যান্য নেতারা যখন তাঁদের অভ্যাস অনুযায়ী ইংরাজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, তখন প্রচণ্ড চীৎকার—'হিন্দী মে বলিয়ে।' তাঁদের কথা তখন শুনেবে কে!

১ "Jinnah had to look close at his political chess-board : for many years he had enjoyed the increasing support of the Moderates in Congress, in his idealistic policy of Hindu-Muslim unity. They had applauded all his peaceful intentions, but they were now outnumbered by the Nationalists, with their demand for immediate self-government. Jinnah was among the outnumbered. Gandhi—in prison or out—was to catch the eye and raise the fervour of the people, with his gift for emotional leadership, which Jinnah lacked." (Blitho p. 79)
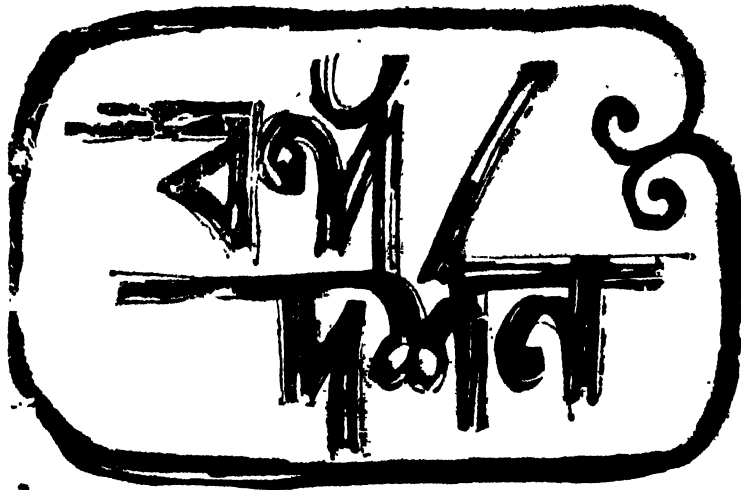
পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রায় একমাস পূর্ণ হতে চলল এবং এই শাসন যে কতকাল চলবে তা এখনই বলা যায় না। রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান কিছুকাল আগে মন্তব্য করেছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ যতদূর সম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং ইতিমধ্যে যদি জনপ্রিয় কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভবপর হয়, তাহলেই তিনি দায়িত্ব-ভার মুক্ত হতে পারবেন। বলাই বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে এখনও পর্যন্ত বিধানসভাকে জীইয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি শাসন যে দীর্ঘস্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, সে কথা আমরা পূর্বে বহু-বার বলেছি। যদিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও ব্যক্তির কণ্ঠে এই রকম কথা ধ্বনিত হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি শাসনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গিয়েছে, সর্বত্রই স্বস্তির আবহাওয়া বইছে। বলাই বাহুল্য, স্বস্তি-অস্বস্তি ইত্যাদি আপেক্ষিক ধারণা নিয়ে থাকতে গেলে এবং সেগুলির চুলচেরা বিচার করতে গেলে কাজের কাজ কিছুই হয় না, একের চোখে যা অশান্তি, অপরের চোখে তা শান্তি হতে কোন বাধা নেই। সমস্ত কিছুই দলীয় চশমা চোখে এ'টে দেখে দেখে এমন হয়ে গেছে যে, আজকের দিনে স্বাধীনভাবে কোন মত ব্যক্ত করাই শক্ত।

কাজেই ওসব বিতর্কের পথে না গিয়ে নিছক সংবিধানকে অনুসরণ করেই একথা বলা চলে যে, নানা কারণে রাষ্ট্রপতি শাসন দীর্ঘস্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। রাষ্ট্রপতি শাসনে রাজ্যপালের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা নিছক প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। প্রশাসন যন্ত্রটিকে কোন-ক্রমে চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্বই কার্যত সংবিধান রাজ্যপালকে দেয় না। বৈষয়িক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কোন মৌলিক পরিকল্পনা গঠন বা তাকে রূপদান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি শাসনে রাজ্যপালের হাতে কার্যত থাকে না। এই কারণেই কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হলে সেখানে সরকারী অফিস-গুলিতে রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া আর কিছুই হয় না।

রাষ্ট্রপতি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা কাজ চালানোর বাজেট কেন্দ্রীয় লোকসভা পাশ করিয়ে নিয়েছে। এতে বিভিন্ন খাতে যে যে ব্যয় ধরা হয়েছে, তা বিভাগ প্রশাসনিক ব্যয় চালাতেই খরচ হয়ে যাবে, কোন রকম উন্নয়নকার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হবে না এবং তার উপায়ও নেই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বিধানসভায় যে বাজেট উত্থাপন করেছিলেন তাতে বিভিন্ন খাতে অনেক বেশি করে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার বজায় থাকলে প্রশাসনিক ব্যয়ের অতিরিক্ত অন্যান্য ব্যয় করা সম্ভবপর হত এবং তার ফলে প্রতিটি বিভাগের কর্মোদ্যোগের পরিসর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেত। বিধান-সভায় বাজেট এনে তা পাশ না করিয়ে মাঝপথে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের মধ্য দিয়ে আর যে-কোন মনোভাবেরই প্রকাশ পাক, দায়িত্বশীল মনোভাবের যে কোন প্রকাশ পায় নি, একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

সে যাই হোক, রাজ্যপালের কাজ একান্তই রুটিন-বাঁধা, সেখানে কোন চিন্তাশীলতা বা কর্মোদ্যোগের স্থান থাকতে পারে না। রাজ্যপালের উপদেষ্টারা প্রত্যেকেই সিভিলিয়ান, যাঁরা কোনদিনই বাঁধা গণ্ডীর বাইরে যেতে পারবেন না। অর্থাৎ যদি দু' বছর রাষ্ট্রপতি শাসন বহাল থাকে, কার্যত এই দু' বছর পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষে নিষ্ফল যাবে, সেখানে অপরা-পর রাজ্যগুলি দু' বছর এগিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাকা খসড়াটি মঞ্জুর হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ভাগে যেটুকু পড়েছে, তা অকিঞ্চিৎকর হলেও, সেটুকুও পর্যন্ত সদ্ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনে সম্ভবপর নয়। এই কারণেই জনপ্রিয় মন্ত্রিসভার প্রয়োজন।

কিন্তু সে হালটা ধরবে কে? পশ্চিম-বঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি ভাঙার কাজে যত বেশি উৎসাহী, গড়ার কাজে তার সিকি ভাগেরও এক ভাগ নয়। বাংলা কংগ্রেস এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এবং উভয়ের মধ্যে এমন একটা তিক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, কোন রকম সমঝোতাই বোধহয় আর সম্ভবপর নয়। বাংলা কংগ্রেস সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, সি-পি-এম'এর সঙ্গে তারা কোন সম্পর্ক রাখবে না। পক্ষান্তরে সি-পি-এম-'এর কথা হচ্ছে, বাংলা কংগ্রেস যদি নিঃশর্তে আসে, তাহলে যুক্তফ্রন্টকে জাগিয়ে তোলা যেতে পারে না এলে যদি তারা সরকার গঠন করতে পারে তো করবে, না হয় অনতিবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচন। পক্ষান্তরে সি-পি-আই সহ আটটি দল পুরাতন যুক্তফ্রন্ট জীইয়ে তোলার পক্ষপাতী, যদিও বাংলা কংগ্রেস ও সি-পি-এম সম্পর্কে এদের প্রত্যেকের মনোভাবের পার্থক্য আছে।

ঘটনাচক্র যে কোন দিকে যাবে, তা বর্তমানে বলা অসম্ভব। সম্প্রতিতম সংবাদ হচ্ছে যে, সি-পি-আই'এর নেতৃত্বে আটটি দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এবং তারা শীঘ্রই সি-পি-এম'এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার-যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তাদের মধ্যে একটি বিষয়ে সার্বিক ঐক্য হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট ভাঙার জন্য সি-পি-এমই মূলত দায়ী। এই আটটি দল একসঙ্গে পুরাতন যুক্তফ্রন্টকে জীইয়ে তোলার কথাও চিন্তা করছে। আগামী পরিস্থিতি নির্ভর করছে এই আট পার্টির ফ্রন্টের সঙ্গে সি-পি-এম ও বাংলা কংগ্রেসের সম্পর্ক কি রকম হবে, তার ওপর। মোটামুটি সব দলগুলি নিজেদের স্ট্যান্ড, হয় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে, না হয় আগামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঠিক করে ফেলেছে, শুধু আর-এস-পি'র ভূমিকা সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায় নি।

অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহে ধর্মঘট

বেলগাছিয়ার সেন্ট্রাল ডেয়ারীর ৩০০ কর্মী গত ৭ই এপ্রিল হঠাৎ ধর্মঘট করার ফলে একদিকে দেড় লক্ষ টাকার দুধ নষ্ট হয়েছে, আর অন্যদিকে হাসপাতাল ও গৃহস্থ পরিবারগুলি ওইদিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সকালে দুধের সরবরাহ হতে বঞ্চিত হয়েছেন। হাসপাতালের রোগী এবং গৃহস্থ পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধেরা সরকারী দুধের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর-শীল। হঠাৎ দুধ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায়

তাঁদের পক্ষে বিকল্প কোন ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় নি। শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি যতই ন্যায়সঙ্গত হোক, এইভাবে হঠাৎ শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীদের জব্দ করা অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি জনসাধারণকে বিরূপ করে তোলা ছাড়া আর কোন সদুদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে না। শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের যে বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বও আছে, এই সহজ সত্যটা তাঁরা আর কবে উপলব্ধি করবেন? বিশেষ করে রাজ্যপাল যখন সেন্ট্রাল ডেয়ারীর কর্মীদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত, তখন এইভাবে শহরবাসীকে জব্দ করার চেষ্টা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অপরাধমূলক, তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। আমাদের স্মরণে আছে, কিছুকাল আগে যুক্তফ্রন্টের আমলে এই প্রতিষ্ঠানটি আরও একবার বিনা নোটিশে ধর্মঘট করে জনসাধারণকে অসীম দুর্গতির মধ্যে ফেলেছিল, এমন কি সেই ধর্মঘটের ঢেউ বেলগাছিয়া পার হয়ে হরিণঘাটা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহে, অর্থাৎ হাসপাতাল, পরিবহণ, দুগ্ধ সরবরাহ—এই সকল ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কথায় কথায় ট্রাম-বাস, ট্যাক্সি বন্ধ, হাসপাতাল বন্ধ, দুগ্ধ সরবরাহ বন্ধ, এ যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোন সরকারেরই পক্ষেই তা বরদাস্ত করা উচিত নয়!

রাষ্ট্রপতি শাসনে পুলিশ

রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলপি, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর এবং পাথরপ্রতিমা—এই চারটি জায়গায় পুলিশী জুলুম সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত করার জন্য চব্বিশ পরগনার জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন। এস-ইউ-সি নেতৃবৃন্দ এই পুলিশী বাড়াবাড়ির অভিযোগ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি শাসনের এই কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যের সি-পি-এম'এর পক্ষ থেকে পুলিশী বাড়াবাড়ির অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু অতঃপর দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলও পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কে প্রায় একই সুরে অভিযোগ দায়ের করতে শুরু করেছেন। যদিও রাজ্যপাল গোড়াতেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপতির শাসনে পুলিশ কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করবে না, তথাপি এই প্রতিশ্রুতি ভাল ছেলের মত পুলিশ সর্বত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে—নিশ্চয়ই এটা আশা করা যায় না। কাঁচা আমল থেকে পার্লামেন্টের সামনে এদেশের পুলিশ যে কাণ্ড করেছে, তাতেই বোঝা যায় তারা কি চীজ। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গ্রামান্তরে পুলিশ যে-কোন অজুহাতে নিরীহ মানুষে ঠেঙাতে শুরু করলে অবাক হবার কিছু নেই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অন্ততঃ একটি ক্ষেত্র হলেও পুলিশী বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দান করে রাজ্যপাল সঙ্গত কাজই করেছেন।

প্রশাসন বনাম রাজনীতি

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর বিভিন্ন মহল হতে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা বড় রকমের রদবদলের কথা প্রচার করা হচ্ছিল। এই রদবদলের ব্যাপারটা অফিসারদের নিয়ে। এই অফিসারদের মধ্যে কে কে যুক্তফ্রন্টের আমলে কোন্ কোন্ দলের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে নানা রকম কাহিনীও সবিস্তারে প্রচার করা হচ্ছিল।

১৯শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয় এবং তারপরই লোকসভায় কমিউনিস্ট-বিরোধী সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ পার্লামেন্টে দাবি জানান যে, পশ্চিমবঙ্গে অমুক অমুক অফিসার নাকি অমুক অমুক রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করেছেন এবং তাঁদের সরানো হোক। বলা বাহুল্য, গত বাইশ বছরে হাজার হাজার অফিসারই সারা ভারত জুড়ে শাসকদলের অনুকূলেই কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আচরণবিধি নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন ইতিপূর্বে কেউই বোধ করে নি এবং আজও কোন অফিসার যদি দক্ষিণপন্থী কোন পার্টির হয়ে কাজ করেন, তাতেও কোন প্রশ্ন উঠবে না। এই দাবির জবাবে শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা রাজ্যসভায় ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের, অর্থাৎ যাঁরা বামপন্থী অথবা প্রগতিশীল মনোভাবসম্পন্ন, তাঁদের আগাছার মত উৎপাটিত করা হবে।

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান অবশ্য বলেছেন যে, সরকারী অফিসারদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে আগাছা উচ্ছেদের নীতিতে তিনি আদৌ বিশ্বাসী নন এবং সে ধরনের কোন চেষ্টাও তিনি করবেন না। শ্রীশুক্লার বক্তব্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, ওই বক্তব্য শ্রীশুক্লার, আমার নয়। শ্রীধাওয়ানের বক্তব্য: সরকারী কর্মচারীদের কাজের বিচার করতে হবে তাঁদের যোগ্যতার ভিত্তিতে, কোন রাজনৈতিক বিশ্বাসের মাপকাঠি দিয়ে নয়। সরকারী অফিসারেরাও দেশের নাগরিক এবং অন্য পাঁচজন নাগরিকের মত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করার অধিকার তাঁদেরও আছে। গণতন্ত্রে মন্ত্রিত্ব বদল অস্বাভাবিক নয়, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু মন্ত্রিত্বের বদল হলেই যদি কর্মচারীদের ওপর দলীয় দৃষ্টিকোণে হামলা চালানো হয়, তার চেয়ে অযৌক্তিক আর কি হতে পারে? এটা মোটেই গণতন্ত্রসম্মত নয়।

১০-৪-৭০

ইন্দিরা সরকার কোনক্রমে রক্ষা পেলেন

গত ৬ই এপ্রিল এস-এস-পি'র এক-দল স্বেচ্ছাসেবক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠি এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে। তার ফলে পার্লামেন্টের সদস্য জর্জ ফার্নাণ্ডেজ, মধু লিমায়ে, রাজনারায়ণ, অর্জুন সিং ভাদোরিয়া ও বিহারের এম-এল-এ রামানন্দ তেওয়ারী প্রমুখ প্রায় ৫০ জন গুরুতর আহত হন। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন মহিলা সহ প্রায় ১০২ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। আহতদের মধ্যে পরে একজন মারাও গেছেন।

ঘটনার বিবরণে দেখা যাচ্ছে, এস-এস-পি কর্মীরা লালকেল্লা থেকে সংসদের দিকে রওনা হলে পুলিশ প্যাটেল চকে তাদের পথরোধ করে ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। সেই অনুরোধে কোন কাজ না হওয়ায় কাঁদানে গ্যাস ছাড়া হয়। পুলিশ অভিযোগ করে যে, বিক্ষোভকারীরা উচ্ছৃংখল হয়ে পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে পার্লামেন্টের দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল।

এস-এস-পি'র এই শোভাযাত্রায় তীর-ধনুকধারী শ'খানেক আদিবাসীও ছিল।

সেইদিনই লোকসভায় বিষয়টির ওপর আলোচনা করবার জন্য সিণ্ডিকেটী নেতা ডঃ রামসুভগ সিং একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন ঘটনাটির জন্য সদস্যদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, বিষয়টি তদন্তের জন্য হাই-কোর্টের একজন বিচারকের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হবে।

মুলতবী প্রস্তাবের ওপর যে ভোটা-ভুটি হয়েছিল, তাতে গভর্নমেণ্ট কোনক্রমে ৩১ ভোটে জয়লাভ করেন। সমস্ত বিরোধী দলই মুলতবী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট ভোটে জয়লাভ করেছেন, সেটা সরকারের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। সদস্যরা অনেকেই ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত থাকার এটা সম্ভব হয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধীকে আগামী দু'বছর টিকে থাকতে হলে যথেষ্ট ভার-সাম্য রেখে চলতে হবে। কারণ পাঁচ শতাধিক সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেণ্টে ৩১ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থিতিশীল গভর্ন-মেন্টের পক্ষে যথেষ্ট মজবুত ভিত্তি বলে গণ্য হতে পারে না। দিল্লীতে পার্লামেণ্ট ভবনের কাছে গো-রক্ষা আন্দোলনকারী সাধুদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্ঘর্ষের ফলে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এবার এস-এস-পি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ফলে যে সে রকম কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি, সেটাই ইন্দিরা সরকারের মস্ত সান্ত্বনা।

নির্বাচনে টাকার খেলা

সম্প্রতি রাজ্যসভার একটি দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্যরা ছিলেন সেই নির্বাচনের ভোটার। সংখ্যানু-পাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক হস্তান্তর-যোগ্য ভোটের মাধ্যমে এই নির্বাচনের ফলাফল নির্ণয় করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি আসনে জয়লাভের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটের দরকার হয়। কোন প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি ভোট পেলে তাঁর বাড়তি ভোট ব্যালট পেপারে দ্বিতীয় অগ্রাধি-কারপ্রাপ্ত প্রার্থীর ভাগে চলে যায়। এই নির্বাচন পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে, সংখ্যালঘু দল অথবা গোষ্ঠীও তাঁদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হন না। কিন্তু এবারের নির্বাচনে দেখা গেল কয়েকটি দল, বিশেষ করে কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) তাঁদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন নি। অর্থাৎ দলের অনেক সদস্য দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে অন্য প্রার্থীদের জিতিয়ে দিয়েছেন। নির্বাচনে দলীয় শৃংখলা-[illegible] এই [illegible] পেছনে টাকার খেলা আছে বলে অনেকেই সন্দেহ করছেন। গত ৫ই এপ্রিল রাজ্যসভায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। বিভিন্ন সদস্য বলেছিলেন, নির্বাচনে এইভাবে টাকার খেলা চললে ভারতীয় গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়বে। তখন আইনমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ মেনন বলেন যে, রাজ্যসভার নির্বাচনে টাকার খেলা চলেছে বলে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ কেউ নির্বাচন কমি-শনার অথবা গভর্নমেন্টের কাছে পেশ করেন নি। সেরকম নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে গভর্নমেন্ট তদন্ত করে দেখতে পারেন। রাজনৈতিক পার্টি অথবা নির্বাচনপ্রার্থীর সহযোগিতা ছাড়া নির্বাচনে এই ধরনের দুর্নীতির ঘটনা প্রমাণ করা বড় কঠিন।

আলোচনার সময় শ্রীকৃষ্ণকান্ত অভি-যোগ করেন যে, বাজারে গুজব রটেছে, পার্লামেন্টের উভয় সভা দখল করবার জন্য শ্রী এস কে পাতিল ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করছেন। তাঁর এই মন্তব্যে সভায় দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শ্রীপাতিলের নাম এভাবে উত্থাপিত হওয়ায় অন্যান্য সদস্যরা আপত্তি জানান।

রাজ্যসভায় ওখানেই এই আলোচনার সমাপ্তি ঘটলেও বাইরে কিন্তু আলোচনাটা থামে নি। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলো এবং বিধানসভার কংগ্রেস দলীয় নেতারা কংগ্রেস (ইন্দিরা) পার্লামেন্টারী বোর্ডের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে টাকার খেলা এবং জাতিভেদ একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তার ফলেই দলীয় শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

রাজ্যসভার নির্বাচনে টাকার খেলা নতুন ঘটনা নয়। কয়েক বছর আগে বিহারে অনুরূপ একটি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীশীলভদ্র যাজীকে হারিয়ে একজন বৃহৎ শিল্পপতি রাজ্য-সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। শ্রীযাজী তখন সেই নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করেন এবং বলেন যে, উক্ত শিল্পপতি টাকা দিয়ে ভোট কিনেছেন। আদালতে ব্যালট বাক্স খুলে দেখা যায় যে, বহু কংগ্রেসী সদস্য দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ করে উক্ত শিল্পপতিকে ভোট দিয়েছেন। আদালত শ্রীযাজীর অভিযোগ গ্রহণ করে নির্বাচন বাতিল করে দেন। এবারের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনেও শিল্প ও বাণিজ্য জগতের দুই-একজন মুখপাত্র যেভাবে জয়লাভ করেছেন, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, নির্বাচনে টাকার খেলা চলেছিল। আর জাতির ভিত্তিতে ভোট দেওয়া আমাদের সমাজ জীবনে একটি দুরপনেয় পুঁজে পরিণত হয়েছে। যে দেশে এম-এল-এ, এম-পি কেনা-বেচার ব্যাপার

প্রায় [illegible] ক্ষমতাভোগের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, সে দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা বোধ না করে উপায় নেই। কিন্তু এই গণতন্ত্রের নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার সঠিক পন্থা কেউই নির্দেশ করতে পারছেন না। যাঁরা এম-এল-এ কেনা-বেচার নিন্দায় পঞ্চমুখ, তাঁরাই আবার আশু সুবিধা লাভের আশায় সেই কারবারের কারবারী বনে যাচ্ছেন। যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করছেন, তাঁরাই আবার মুসলিম লীগ এবং জনসংঘের সঙ্গে আঁতাত করবার জন্য লালায়িত। নিজলিঙ্গাপ্পার কংগ্রেস জনসংঘের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করতে চান। অপরদিকে বাম এবং দক্ষিণ কম্যুনিস্টরা মুসলিম লীগের সঙ্গে হরিহর আত্মা। কথায় এবং কাজে এই পরস্পরবিরোধিতা পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক দলগুলোর এই ধরনের নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপের ফলে সাম্প্রদায়িকতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং দেশ ভাগাভাগির পর কবরস্থ মুসলিম লীগ আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে নতুন শক্তির [illegible] উঠেছে। সম্প্রতি বসিরহাটের উপনির্বাচনে তারই প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলোর এই অসাধুতা প্রতিরোধ করা সৎ নাগরিকদের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। এর পরিণাম যে অতিশয় বিপজ্জনক সেকথা বলাই বাহুল্য।

গম চলাচলের বাধা অপসারণ

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের রেশনভুক্ত এলাকা ছাড়া বাকি ভারত একটিমাত্র গম এলাকা বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সারা ভারতে রেশন বহির্ভূত এলাকায় আন্তঃরাজ্য গম চলাচলের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হবে।

পর পর দু'বছর আবহাওয়া অনুকূল থাকার ফলে ভারতে খাদ্যশস্যের ফলন ভালই হয়েছে। ১৯৬৮ সালে খাদ্যশস্যের ফলন সাড়ে ৯ কোটি টনের মত হয়েছিল। এবং ১০ কোটি টন হবে বলে আশা করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য অধিকাংশ দেশেও খাদ্যশস্যের রেকর্ড ফলন হয়েছে। বিশেষ করে গমের উৎপাদন এত বেড়ে গেছে যে, বিশ্বের বাজারে গমের দর অত্যন্ত নিম্নগামী। তাতে গম রপ্তানিকারক দেশগুলোর মাথায় হাত পড়ে গেছে। কানাডায় ক্ষেতের গম নষ্ট করবার জন্য গভর্নমেন্ট কয়েক শ' কোটি ডলার কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছেন। ভারতবর্ষে এই ধরনের প্রাচুর্য সৃষ্টি হয় নি এবং কোনদিনই হয়ত হবে না, কিন্তু ফলন ভাল হওয়ায় মজুতদারী এবং মুনাফাবাজীর সম্ভাবনা কিছুটা কমে গেছে। কিন্তু এদেশে কালো টাকা এবং চোরাকারবারীদের প্রাবল্য এত বেশী যে, দেশে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সেটা কোণঠাসা করা তাদের পক্ষে কঠিন না-ও হতে পারে। সুতরাং সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্তের আগে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য সরকারী গুদামে মজুত করার প্রয়োজন আছে। কৃষি মূল্য কমিশন এ বছর ৩৭ লক্ষ টন গম মজুত রাখবার সুপারিশ করেছেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। করা হলেই মঙ্গল।

—১১/৪/৭০
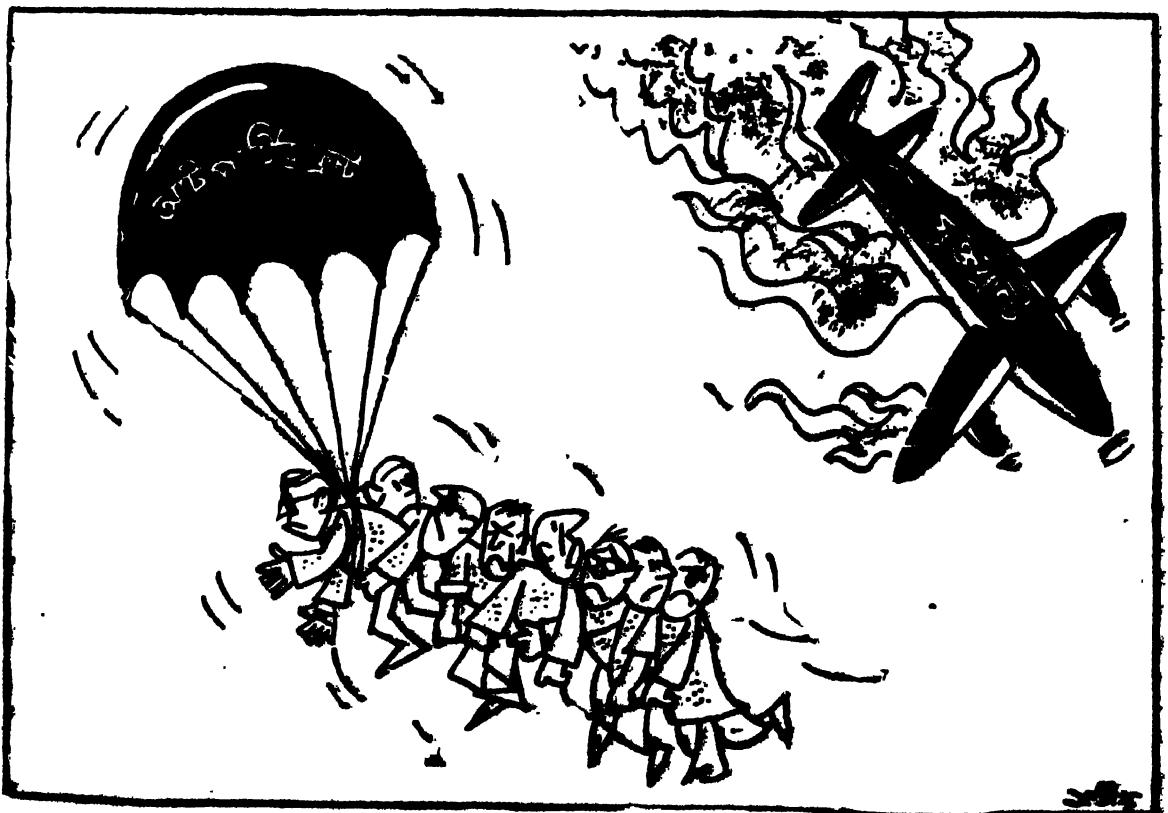
গুয়াতেমালায় নিহত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কার্ল ভন স্প্রেটির শবাধারের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট জুলিও মেন্ডেজ মোন্টে নিগ্রো (বাঁদিকে—অসামরিক বেশে)

গুয়াতেমালা ঃ

পশ্চিম জার্মানী গুয়াতেমালার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। কদিন আগে এখানকার বামপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্রদূত কার্ল ভন স্প্রেটি নিহত হন।

কূটনীতিকের নিরাপত্তাবিধানে ব্যর্থ অপদার্থ গুয়াতেমালা সরকারের আচরণের প্রতিবাদেই পশ্চিম জার্মানী কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিহত কূটনীতিক কিংবা তাঁর দেশের কোন বিরোধ ছিল না। বিরোধ তাদের নিজেদের সরকারের সঙ্গে। ধৃত ২৫ জন রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তির জন্য মুক্তিপণ হিসাবে সন্ত্রাসবাদীরা জার্মান দূতকে আটক করে রেখেছিল। সন্ত্রাসবাদীদের হুমকীমত সরকার বন্দীদের ছেড়ে দিলেই তারাও রাষ্ট্রদূতকে ছেড়ে দিত। কিন্তু গুয়াতেমালা সরকার এই হুমকীর কাছে মাথা নত করতে রাজী হয় নি। সাধ্যমত রাষ্ট্রদূতকে উদ্ধার করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সাত দিনের মাথায় রাষ্ট্রদূত স্প্রেটির গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

মুক্তিপণ হিসাবে বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের আটক করে রেখে তারপর তাঁদের হত্যা করা গুয়াতেমালার এই প্রথম নয়। গত তিন বৎসর এইভাবে গুয়াতেমালার বিদ্রোহী বামপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে দশজন কূটনীতিক মারা গেছেন। ১৯৬৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত গর্ডন মেইন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন। মাত্র কদিন আগে, ৫ই এপ্রিল মার্কিন কন্সাল কারটিস কাটারকে গুলী করা হয়েছিল। তবে তিনি মরেন নি, তাঁর কাঁধে গুলী লেগেছে।

রাষ্ট্রদূতের মৃত্যুতে পশ্চিম জার্মানী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ডট্ এই ঘটনাকে 'জঘন্য হত্যাকাণ্ড' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সব জিনিস যদি বন্ধ না করা যায়, তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে।

জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াল্টার শিলও অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। তিনি সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য বিশেষ দূতরূপে হান্স্ উইলহেল্ম হপ্‌কে গুয়াতেমালা পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজেও সেখানে যাবেন মৃত রাষ্ট্রদূতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

কূটনীতিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সকলকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়ে ওয়াল্টার শিল আন্তর্জাতিক আবেদন করেছেন।

বিশ্বের সর্বত্র গুয়াতেমালার ঘটনায় ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে নিরাপত্তা রক্ষা করা যায়, এ আজ সবাই-এর চিন্তা।

পাশাপাশি আর একটি ঘটনা ঘটেছে আর্জেন্টিনায়। সেখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত যুরি পিভোভারভকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে গিয়েছেন।

হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার জন্য যাদের ধরা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আর্জেন্টিনা ফেডারেল পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর—কার্লো বেনিগনো বালবুনা। দক্ষিণপন্থী 'আর্জেন্টিনা ন্যাশনাল অরগানাইজড্ মুভ্মেন্ট' বা মার্নোর সঙ্গে তিনি যুক্ত।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষ থেকেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

কম্বোডিয়া ঃ

কম্বোডিয়া নিজেকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করেছে। ১১ই এপ্রিল রাজধানী নমপেনে এক বিরাট জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী লন নল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এর আগে নমপেনে সিহানুক-বিরোধী বিক্ষোভে প্রজাতন্ত্রের দাবি জানানো হয়েছিল।

১৮ই মার্চ প্রিন্স নরোদম সিহানুকের ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, নতুন শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত কম্বোডিয়া থেকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করবেন। রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে সিংহাসনের প্রতীক রাজমাতার ক্ষমতাও গেল।

সিহানুক অবশ্য এই পরিবর্তনকে মেনে নেবেন না। তিনি বলেছেন, লন নলের সরকার কম্বোডিয়ার আইনানুগ সরকার নয়। মার্কিন চক্রান্তের ফলে চেন হেঙ লন নল সিরিক মাতাক অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন—এঁরা জাতির

[illegible] জনতা আর কিছু নয়। এদের কোন সিদ্ধান্ত মানা হবে না।

সিহানুক এখনও নিজেকে কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরূপে দাবি করেন। দেশবাসীর কাছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন লন নল গোষ্ঠীকে হটাবার জন্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিহানুক-সমর্থকরা বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে। বিদ্রোহীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী সরকারের সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবকের দল।

সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সিহানুক নিজেই কম্বোডিয়ায় প্রবেশ করবেন। লন নল কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, সিহানুক কম্বোডিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করলে তার ফল মারাত্মক হবে।

কম্বোডিয়া সংকট প্রসঙ্গে ফ্রান্স প্রস্তাব করেছে, কেবল কম্বোডিয়া নয়, কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনাম, অর্থাৎ সমগ্র ইন্দোচীনের সমস্যা আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের এক সম্মেলন ডাকা হোক।

অনেকেই ফ্রান্সের এই প্রস্তাবকে গঠনমূলক বলে মনে করছেন। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনাম ফ্রান্সের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উত্তর ভিয়েৎনামের বক্তব্যঃ ইন্দোচীন এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান সর্ত হল, সব কটি দেশ থেকে মার্কিন সৈন্য ফিরিয়ে নিতে হবে। মার্কিন সৈন্য অপসারণের পূর্বে কোন আলোচনা চলবে না। প্রিন্স নরোদম সিহানুক হলেন নিরপেক্ষতার প্রতীক। ১৮ই মার্চের অভ্যুত্থানের দ্বারা সিহানুকের অপসারণের ফলে নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়েছে। সিহানুককে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনাই এখন প্রধান কাজ। উত্তর ভিয়েৎনামের নেতাদের মনে এই সন্দেহও দেখা দিয়েছে, সম্মেলনের নাম করে লন নলদের [illegible] আইনানুগ সরকাররূপে সব পক্ষকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়াই হল ফ্রান্সের আসল মতলব।

কম্বোডিয়াকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই সাজো-সাজো রব পড়ে গিয়েছে। [illegible] উত্তর ভিয়েৎনামের দূতাবাসে উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী সরকার, প্যাথেট লাও ও কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেছে। কম্বোডিয়ার ব্যাপারে সবাই একযোগে কি করতে পারেন, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, এই কয়টি দেশের প্রধান, অর্থাৎ, উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী [illegible] দক্ষিণ ভিয়েৎনামের [illegible]
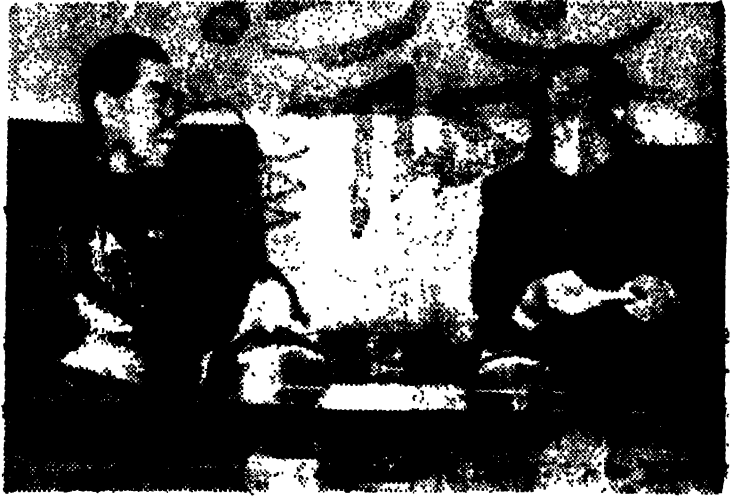
চৌ এন-লাই ও কিম ইল সুং (ডান দিকে) সিহানুককে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ফ্রন্টের সভাপতি নুয়েন হু থো, প্যাথেট লাও-এর প্রধান সুফানো ভং ও কম্বোডিয়ার বিতাড়িত রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক শীগ্‌গিরই একটি শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। আবার, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ও উত্তর কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিম ইল সুং উত্তর কোরিয়া থেকে এক যুক্ত বিবৃতিতে সিহানুককে সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অপর দিকে তৈরি হচ্ছে 'সিয়াটো' জোট। 'সিয়াটো' বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত দেশগুলির সেনাধ্যক্ষ ও সামরিক পরামর্শদাতাদের বৈঠক বসেছিল ফিলিপাইনসে। এই সেনাবাহিনীর প্রধান চীফ এয়ার মার্শাল দউই চন্দ্রনাথ [illegible] ফিরে এসেছেন, কম্বোডিয়ার ব্যাপারে তাঁরা আলোচনা করেছেন এবং একটা কর্মসূচীও তাঁরা গ্রহণ করেছেন। 'সিয়াটো' মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন পেলেই তাঁরা এই কর্মসূচী নিয়ে কাজ শুরু করে দেবেন। মনে হচ্ছে, কম্বোডিয়া থেকে দুই ভিয়েৎনাম ও লাওসের অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা সৈন্যসামন্ত সহ কম্বোডিয়া প্রবেশ করবেন।

সোভিয়েট পুনর্গঠন :

[illegible] ধরেই জোর গুজব রটছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্ব [illegible] হচ্ছে। সোভিয়েট নেতাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ দেখা দিয়েছিল, এমন সন্দেহ করার কারণ আছে। পূর্ব য়ুরোপের বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশের সূত্র থেকে এই বিরোধের নানা খবর বেরিয়েছে।

সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি নিকোলাই পদগর্নি, কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন—এঁরা একদিকে। আর এঁদের বিরুদ্ধে নাকি বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ মিখাইল সুসলভ, আলেকজান্ডার শেলেপিন, কিরিল মাজুরভ প্রমুখ। বর্তমান নেতৃত্বের বিরোধীরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে আরও কঠোর নীতি গ্রহণ করতে চান এবং পার্টির কাজে আরও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা অনুসরণ করতে চান।

শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে, নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে লিওনিদ ব্রেজনেভ জয়লাভ করেছেন তবে হয়তো আলেক্সি কোসিগিনকে বিদায় নিতে হবে। তাঁর জায়গায় নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন বর্তমান সহকারী প্রধানমন্ত্রী ডিমিট্রি পোলিয়ানস্কি, এমন খবর শোনা যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যঃ মস্কো থেকে সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে, নিকোলাই পদগর্নি, আলেক্সি কোসিগিন ও মিখাইল সুসলভ বর্তমানে অসুস্থ।

'ফেলিয়ে ফেলি বুঝবি দিন গেলি'—কোন এক ফেলির মা তার মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু ফেলার বাপদের সম্পর্কে এমন সতর্কবাণী কিছু আছে কি না জানি না, তবে আমাদের রাজ্য-রাজনীতির ফেলার বাপদের সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। কোন প্রকার উপদেশ বা জ্ঞান বিতরণ-জাতীয় কাজে 'আমি বিশ্বাসী নই, আর আমি এই কথাও জানি, যাঁদের সম্পর্কে কথা বলা তাঁরা আমাদের চেয়ে কিছু কম বোঝেন এমন নয়, তবে আমাদের কাজ হল রেকর্ড করা অর্থাৎ ইভেন্টস্, যা ঘটছে, তার রেকর্ড রক্ষা করা। এই রেকর্ড দেখেই আবার অনেকে ক্ষেপে যান, বলেন—আমি একচোখো, আমি অমুকের প্রতি পক্ষপাতি, আমি অমুকের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণ। আসলে আমার লেখা ও দেখা ঘটনাগুলি নিতান্তই রেকর্ড অফ ইভেন্টস্, সেই কথা অনেকে মনে রাখেন না। এই কথা কে অস্বীকার করতে পারেন যে, জীবনে সুযোগ বার বার আসে না এবং সুযোগকে বারে বারে নষ্ট করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। আজ যদি বলি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট এই প্রকৃতির প্রতিশোধের সম্মুখীন হবে, তাহলে সেটা কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা কারো প্রতি কটাক্ষ করে কথা বলা নয়। এটা হল রেকর্ড অফ ইভেন্টস্।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে ভালবাসা, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ লাভ করে যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছিল, তার কোন তুলনা হতে পারে বলে মনে করি না। সেই অধিকারকে যাঁরা পদদলিত করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ-দুঃখ-বেদনার চিত্র তুলে ধরা কি অপরাধ? আবার এই কথা যদি কেউ বলেন যে, এই অপরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্ত অনেক চোখের জলে অনেককে করতে হয়েছে, সেই কথা বলা কি অপরাধ? অথচ এই সত্য তুলে ধরাকেই অনেকে দোষের চোখে বিচার করে থাকেন। কিন্তু কালের আসনে যাঁরা বিচারপতি, সেই পাঠকগণ কেন উদার হবেন না, রাজ্যের সাড়ে চার কোটি মানুষের সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে কেন সমস্যার বিচার করবেন না। এই কথাগুলি লিখতে হল আমার উদ্দেশ্যে লেখা অজস্র চিঠির কথা মনে ক'রে। পাঠকমনে তার কিছু পত্র প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বহু পত্রই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। সেই সব পত্র-লেখকদের উদ্দেশ্য করেই এই কথাগুলি বলা।

রাজ্য-রাজনীতি এখন এক যুগসন্ধিক্ষণে এসেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণটি সম্পর্কে সঠিকভাবে অনুধাবন করা দরকার। কারণ আজকের রাজ্য-রাজনীতির যে সংঘাত, সেটা যুগসন্ধিক্ষণে যুগযন্ত্রণারই ফল। রাজ্য-রাজনীতিতে আজ যে উল্টো-পাল্টা, অস্থির ও আত্মদ্বন্দ্বের রূপ ফুটে উঠছে, তার মূলে আছে এই যুগযন্ত্রণা। কংগ্রেস-বিরোধিতা-সর্বস্ব রাজনীতি আজ কংগ্রেসের অবসানে খেই হারিয়ে ফেলেছে। পশ্চিম বাংলার আজকের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ব্যক্তি হয়তো অনেক আছেন, কিন্তু দল খুবই কম আছে, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশ-বিরোধিতার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। সেই রকম দলের মধ্যে প্রধান ছিল কংগ্রেস। বৃটিশ চলে যাবার পর শুধু বিরোধিতার রাজনীতি করে বড় হয়ে-ওঠা পার্টি কংগ্রেস যেমন নীতিহারা, আদর্শহারা হয়ে পড়েছিল, আজ কংগ্রেস-বিরোধিতায় গড়ে-ওঠা পার্টি-গুলিরও সেই একই অবস্থা। কংগ্রেসকে শেষ করো, খতম করো, কংগ্রেস শেষ হলেই সব হবে—এই স্লোগানসর্বস্ব রাজনীতি করে যাঁরা বিশ বৎসর দল পুষ্ট করেছেন, আজ কংগ্রেস চলে যাবার পর তাঁরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের শত্রুকে হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে কে কার বিরুদ্ধে, কে কার আক্রমণের লক্ষ্য হবে, সেটা গোলমাল হয়ে গেছে। আজকের রাজনীতির এটাই হল মূল কথা। কংগ্রস গেলেই সব হবে বলে রাজনীতি করে কংগ্রেস যাবার পর আর তাঁরা কোন কাজ পাচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যারা প্রধান দল—এটাই হল তাদের প্রধান সমস্যা। কংগ্রেস শেষ হলেই সব শত্রু শেষ হবে এবং সব অভীষ্ট লাভ হবে ভেবে রাজনীতি করে এবং একনাগাড়ে শুধু বক্তৃতাবাজী করে এই ফল লাভ হয়েছে।

১৯৬৭ সালের আগে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীসুশীল ধাড়া, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন পাল, শ্রীনীহার মুখোপাধ্যায়—সকলেরই শত্রু ছিল কংগ্রেস তথা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং শ্রীঘোষ ও শ্রীসেনের শেষ করতে সকলেই এক সঙ্গে কোমর বাঁধতে পেরেছেন, সেখানে কারো কোন অসুবিধা হয় নি। ১৯৬৭ সালের পর ও '৬৯ সালের মধ্যে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ থেকে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তখনও দিল্লীতে ছিল কংগ্রেসের একাধিপত্য। কাজেই তখনও বলা চলছিল, দিল্লীতে কংগ্রেস শেষ না হলে কিছু কিন্তু হবে না। '৬৯ সালে যখন দিল্লীতেও কংগ্রেস ভাঙলো ও চিরদিনের মত অবসানের মুখে এল, তখন দেখা গেল, কংগ্রেস-বিরোধীরা ক্রমেই শত্রু হারিয়ে ফেলছেন। কংগ্রেস নেই—তাই প্রথমে শত্রু হল কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যে যে বড় দল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সি-পি-আই সি-পি-এম থেকে বড় দল, তাই সি-পি-এম-এর কাছে সি-পি-আই শত্রু। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সি-পি-এম সবচেয়ে বড় দল, তাই সব ছোট দলের কাছে সি-পি-এম শত্রু। সি-পি-এম-এর কাছে সি-পি-আই শত্রু, তাই সি-পি-আই-এর সঙ্গে যারা আছে তারাও সকলে সি-পি-এম-শত্রু। নইলে দেখেন না—বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে সি-পি-এম কে

কোন অভিযোগ করার আগে সংগ-সাঙ্গকে গালি দিয়ে নেয়। এরই ফল হলো রাজ্যের রাজনীতির মধ্য নিয়ামক হলো সেই দলগুলি, যারা কংগ্রেস আমলে কোথাও কোনরকম কল্কে পেত না, আজ কংগ্রেস চলে যাবার পর হাতে কল্কে পেয়ে সকলেই কুলীন হয়ে বসেছে এবং কোন কুলীনই আর নিজের হুঁকো অন্যকে ছুঁতে দেবে না।

গত বিশ বৎসর কিন্তু এই দৃশ্য ছিল না। এক হুঁকোতে সকলে প্রায় এক আসনে বসে তামাকু সেবন করতেন। বিচার করার প্রয়োজন হত না, কে জল-চল আর কে অচ্ছুৎ। কে রাঢ়ী, কে বৈদিক, কে বারেন্দ্র, কে শ্রোত্রীয়, কে বৈদ্য, কে কায়স্থ, কে নমঃশূদ্র। তাইতো আজ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "সি-পি-এম'এর সংগে স্বর্গবাস অপেক্ষা নরকবাস শ্রেয়" আর শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, "ওরা বিশ্বাসঘাতক, ঐ বিশ্বাসঘাতকদের আর আমাদের সংগে ঠাঁই হবে না"। যদি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা যায় সি-পি-এম অচ্ছুৎ হলো কবে এবং কেমন করে, তার জবাব পাওয়া গেলেও কাউকে খুশি করবে না। কারণ গত কয়েক মাস বাদ দিলে গত দুই-তিন বৎসরের ইতিহাস তো অন্য কথাই বলবে। সেই কথা হল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসুর মধ্যে অমিল অপেক্ষা মিলই তো বেশি। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সর্বোদয় সমাজ আর শ্রীজ্যোতি বসুর সর্বহারারাজ—দুই লক্ষ্যই তো অনেক কাছাকাছি এসে গেছে, এমন দৃশ্যই তো গত দুই-তিন বৎসর দেখা গেছে। এই তো সেইদিনও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, না, কম্যুনিস্টদের তিনি দেশদ্রোহী মনে করেন না। ওরা দেশপ্রেমিক, তবে হ্যাঁ, কাজে ভুল থাকতে পারে। আর এই-তো দু'মাস আগেও শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ, শ্রীবি টি রণদিভে, শ্রীবাসব পুন্নিয়া সহ শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত পলিট ব্যুরোর সভায় বসে প্রস্তাব নিলেন—বাংলা কংগ্রেসের অবদান রাজ্যে কংগ্রেসরাজ অবসানে কম নয় এবং পলিট ব্যুরো এখনও মনে করে যে, বাংলা কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা রাজ্য-রাজনীতিতে শেষ হয় নি। এই বার প্রশ্ন করি—শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কবে বুঝলেন যে, জ্যোতি বসুর সংগে স্বর্গে বাস অপেক্ষা নরকবাস শ্রেয় আর শ্রীজ্যোতি বসুও বা কবে আবিষ্কার করলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বিশ্বাসঘাতক। সাম্প্রতিক কালে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু দু'জনে দু'জন সম্পর্কে যে সব ভাষা প্রয়োগ করছেন, সেইগুলি আর উল্লেখ করে পাঠকদের লজ্জা দিতে চাই না, তবে ক্ষমা চেয়ে এইটুকু বলছি রাজ্য-রাজনীতির তাবড় তাবড় আদর্শবান নেতারা অনেকে অনেকের কাছে "গাড়োল", "ঢ্যামনা" পর্যায়ে পর্যন্ত নেমে এসেছেন।

এই যে অধঃপতন অথবা তত্ত্বজ্ঞানলাভ, যে যাই বলুন না কেন, তার একমাত্র কারণ হল শত্রু সম্পর্কে খেই হারিয়ে ফেলা, আর কিছু পাওয়া বা আদায় করার জন্য সংগ্রামের রাজনীতি করে বক্তৃতা আর শ্লোগান, গালিগালাজ ও ধিক্কার ছাড়া অন্য কোন পথের হদিস কেউ দিতে পারছেন না। একটা নতুন কথা, একটা নতুন চিন্তাধারা কোথাও কি নজরে পড়ে? এই চাই চাই, জিন্দাবাদ, মুর্দাবাদ, বক্তৃতা-বিক্ষোভ-সর্বস্ব রাজনীতির ফল হল এই—কংগ্রেস প্রধান শত্রু, তাকে নিধন করেও দলগুলি ঐ চাই, দিতে হবে, মুর্দাবাদ—এর বেশি কিছু বলতে পারল না। নেই ঘরে খাই বেশি, ঠ্যাটা ঢেঁকির বাদ্যি বেশি— পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির এই হল সঠিক রূপ। কিছু নেই, নেই শিক্ষার প্রসার, নেই শিল্পের প্রসার, নেই চাকরির সম্ভাবনা, নেই বাস্তু—তাই খাই খাই শব্দ বেশি, আর রাজনৈতিক দলগুলি নতুন কিছু বলার না পেয়ে ঠ্যাটা ঢেঁকি হয়ে বাজছে।

এই যে বাংলা কংগ্রেসের এত হুঙ্কার—সি-পি-এম'এর সংগে আর কোন ফ্রন্ট নয়, সি-পি-এম'এর হুঙ্কার—বাংলা কংগ্রেসকে আর কোন স্থান নয় এবং সি-পি-এম, বাংলা কংগ্রেস বাদে আটটি দলের এক নতুন ফ্রন্ট সৃষ্টি করে এগিয়ে আসবার চেষ্টা, আবার আর-এস-পি, লোকসেবক সংঘ, যারা এখনও না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়ে রয়েছেন—সবই হল এই সম্মুখে শত্রু না পেয়ে অথবা একুশি কারো বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে দেশ ও দশের মঙ্গল হবে, সেটা ধরতে না পারায় খেই-হারা রাজনীতির ফল। কারণ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি ব্যূহভেদের একটি মাত্র পথই জানেন। যে পথ হল বক্তৃতাবাজী করে শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। কিন্তু আজ যে সেই শত্রু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর যে যাকে শত্রু মনে করেছেন, সাধারণ মানুষ দেখছে ও তো মশা মারতে কামান দাগা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে এই রাজনীতি মোটেই গ্রহণীয় হচ্ছে না যে, অজয়বাবু সংগ্রাম করবেন জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে, আর জ্যোতিবাবু সংগ্রাম করবেন অজয়বাবুর বিরুদ্ধে এবং জনগণকে সেই সংগ্রামে জান-প্রাণ কবুল করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—এই ঘটনা কোনক্রমেই বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। আর এরই ফল হল জনগণ দেখছে অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু, সুশীলবাবু, নির্মলবাবু, নীহারবাবু, বিশ্বনাথবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু জোর লড়াই করছেন, কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে রাজত্ব চালাচ্ছেন পাঁচজন আমলা, মহাকরণে অতিথি আপ্যায়নে পরিবেশিত হচ্ছে বিলেতি মদ, শ্রীআশু ঘোষ, শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক, শ্রীসেকেন্দার আলি মোল্লা বলছেন—রাজত্ব চালাবার ভার আগামী দিনে আমাদেরই নিতে হবে। অবিরম্ভা ভবিষ্যতি আরো কিছু আছে বাকি। কেলির সেই বুধবার দিন এখনও আসে নি।

—১০ই এপ্রিল, ১৯৭০

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বারো ॥

অন্ধকার পথে ঘুরে-ঘারে সর্বপ্রথম আমি এলাম রাণীদির আস্তানার সন্ধানে। ফাঁকা দাওয়া। দাওয়ার ওপরে ঘরের দরজা—সেখানে উঠে এসে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা তালা লাগানো। বেশ বুঝতে পারলাম রাণীদি নেই। তবু এদিক ওদিক টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে লাগলাম। মনের মধ্যে রাণীদিকে পাবারই আমার আশা। তাই এভাবে দেখতে দেখতেও যদি মিলে যান তিনি। কিন্তু যে মানুষ এখানে নেই এবং ঘরে যাঁর তালা ঝুলছে, সে মানুষকে যে পাওয়া যাবে না, সে কথা আমার আদৌ অজানা নয়। তবু আশার পিছনে মন হয়তো এমনি করেই ছুটেছিল আমার। মণ্টুও নেই যে তাকে ডাকব, পাশেও কারোকে দেখছি না যে, একবার খোঁজ নেবো।

দাওয়া থেকে তাই নেমে পড়লাম। এর পর আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, রাণীদি কোথায়। আমি পা ফেলতে লাগলাম সেদিকেই। পথে যেতে যেতে একসঙ্গে অনেক কথা আমার মনে ভিড় করে এল। নিজে চোখে রাণীদিকে আমি দেখেছি যে মূর্তিতে, সেই মূর্তি সমর্থিত হয়েছে শংকরের মায়ের কথায়। একদিকে রাণীদির প্রতি আমার অকুণ্ঠ বিশ্বাস, আরেকদিকে প্রচণ্ড ঘৃণা কিন্তু তার পরও রয়েছে কেমন যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর প্রতি। এ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আমার মনে। আমি এই দ্বন্দ্বেরই দোলায় ধাক্কা খেতে খেতে পথ চলতে লাগলাম।

একদিকে আশা আর ভয়, আরেকদিকে ঘৃণা আর জ্বালা,—যন্ত্রণাদায়ক এই পরিস্থিতির মধ্যে মনে হতে লাগল, কে জানে রাণীদিকে আজ আবার আমি কোন মূর্তিতে দেখব! এই প্রসংগে মনে পড়ে গেল শংকরের কথাগুলো। তারা আজ দামী মেটালের ওয়াগন লুঠ করবে—সেই লুঠের পর কোন-না-কোন ধরনের মহফিল তাদের চলবেই এবং সেই মহফিলে থাকতে পারে অনেকেই—পুলিশের কর্তাব্যক্তি, রেলের কোন বড়কর্তা, পাগড়ী থেকে গান্ধী-টুপি, সবরকমই। আর রাণীদি? রাণীদি সেখানে মক্ষীরাণীর মত সকলের কামনার বহ্নিশিখায় শোভা পাবেন উজ্জ্বল। ছিঃ, ভাবতেও আমার যেন কেমন লাগে।

এগিয়ে চললাম পথে। আজ রাণীদিকে আমার পেতে হবে—পেতে হবে এইজন্য নয় যে, তাঁর প্রতি আমার মনের দুর্বলতা দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে

হবে বলে, বরং আজ তাঁকে আমি পেতে চাই একটি মাতৃহৃদয়ের আকুল প্রচেষ্টার সাহায্যার্থিনীরূপে। তাঁর ছেলে গেছে। মেয়েও যাবার পথে। আমার আজ তারই জন্য এই অন্ধকার পথে এগিয়ে যাওয়া। জানি না, আমার এই মিলন সার্থক হবে কি না, তবে আমার মনের কাছে এই সান্ত্বনা থাকবে আমি তো শংকরের মায়ের জন্য, শংকর আর তার বোন মায়ার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি।

কিছুক্ষণ পরে এসে দাঁড়ালাম ওস্তাদের সেই আস্তানার সামনে। আজ জগদীশ নেই। সে হেঁড়ে গলায় টেমটুনিকে ডেকে বলবে না—'জলকুসুমটা নিয়ে আয়তো।' এ যেন আমার একটা মস্তবড় স্বস্তি। কিন্তু কি বীভৎস না এই ব্যাপারটা। বলা নেই, কওয়া নেই, চট করে একটা লোককে ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করে দেবে, তারপর তার ভাগ্যে যে কি ঘটবে তা সে জানতেও

পারবে না। আমি, নিজেদের [illegible] এই ব্যবস্থাটা [illegible] করে রয়েছে কিন্তু ওদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এই নির্দয় ব্যবস্থা কি কোনরকমেও সমর্থন করা যায়? তাই ব্যাপারটার প্রতি আমার মনে ভয়ানক একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বিশেষ করে শংকরের মাকে, যেই শংকরের জেল থেকে পালিয়ে আসার দিনটাতে যেভাবে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল এবং আমার জীবনকেও যেভাবে প্রায় বিপন্ন করে তোলা হয়েছিল, সেদিনকার সেই ঘটনাগুলো আমি কোনরকমেই ভুলতে পারি নি। আস্তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একবার এদিক-ওদিকে দেখলাম। টর্চ জ্বালব, কি জ্বালব না এই কথাও ভাবলাম। হঠাৎ দেখলাম, খচ্ করে সুইচ টেপার শব্দ হল। মুহূর্তে জানালার ধারে দেখতে পেলাম একজোড়া সন্ধানী চোখ।

ঐ সন্ধানী চোখ দুটোকে আমি চিনি। কিন্তু আপাতত আমার এর কাছে কোন প্রয়োজন নেই। আমি দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। দুদিকের বারান্দায় সেই হাসপাতালের দৃশ্য। আলো জ্বলছে, তীব্র আলো। তিন-চারটে বেডে তিন-চারজন পেসেন্ট। বাকি বেডগুলো শূন্য। একদিকে সেই ডাক্তার আর নার্স সাধারণ পোশাকে দুখানা চেয়ারে বসে বসে গল্প করছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই ওরা সচকিত হয়ে উঠল।

ডাক্তার বলে উঠল, 'কে—এ?'

নার্সের মুখেও সেই একই ভাব। সেই যেদিন আমি প্রথম এখানে এসেছিলাম, সেদিন ডাক্তার ছিল অ্যাপ্রন আর মুখোশে আচ্ছাদিত, তাকে আমি সম্পূর্ণ চিনতে পারি নি, কেবল মনে হয়েছিল লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি-দেখেছি। আজ তাকে সাধারণ পোশাকে দেখে আমার আর চিনতে বাকি রইল না।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'ডাক্তার মুখার্জী?'

ডাক্তার মুখার্জী চমকে উঠলেন। নার্সটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তার মুখার্জীর দিকে তাকালো। মুখার্জী আমার দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি আমায় চেনেন?'

'চিনি বৈকি!'

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'কি করে বলুন তো?'

বললাম, 'আপনি তো আমাদের সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল থেকে বদলি

হাসপাতালে গেলেন—তারপর সেখান থেকে এলেন রাইটার্সে—'

ডাক্তার চিন্তিতভাবে নিজের অতীতকে হাতড়াতে লাগলেন বোধকরি। আমি তাঁর সংকটাপন্ন ভাবখানা দেখে বলে উঠলাম, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনার অনেক কথাই আমি জানি।'

ডাক্তার চাপাগলায় বলে উঠলেন, 'আপনি কি গোয়েন্দা বিভাগের লোক?'

'না।'

'তবে—'

'ও সব কথা রাখুন,' আমি বললাম, 'আমার একটা কথার আপনি জবাব দেবেন কি?'

ডাক্তার বিরক্তিভরে বললেন, 'কি কথা?'

'আচ্ছা এই মেয়েটির নাম কি বনানী?'

'সে খোঁজে আপনার দরকার কি?'

'দরকার কিছুতেই নেই, তবে আমি জানি না বলেই জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে।'

কোন গভীর রহস্যে অভিভূত হয়ে গেলে মানুষ যেমন অস্ফুট স্বরে সত্যি কথাটা বলে ফেলে, ঠিক তেমনি করে ডাক্তার কিছু বলার আগে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ।'

সবকিছু আমার হিসাবে মিলে গেল। ডাক্তার বললেন, 'বনানীকেও তাহলে আপনি চেনেন?'

বললাম, 'সে কথার আগে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার সম্বন্ধে আমার কিছুই অজানা নেই।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'আমি যা বলতে চাই তা আপনি জানেন।'

এবার ডাক্তার আমাকে ভয় দেখাতে সুরু করলেন। বললেন, 'জানেন আপনি কোথায় এসেছেন?'

'জানি।'

রীতিমত উত্তেজিতভাবে ডাক্তার বললেন, 'জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'ঠাট্টা কাকে বলছেন? আপনি মনে করছেন ডক্টর যে, আমি এখানে কোনদিন আসি নি?'

'এসেছেন?'

'হ্যাঁ—মনে করে দেখুন না?'

'মনে করে দেখব', ডাক্তার চটে উঠে বললেন, 'গুল মারবার জায়গা পান নি?'

আমি একটু হাসলাম। ডাক্তার আরও চটে গেলেন। চটে গিয়ে বললেন, 'আপনি সত্যি করে বলুন আপনি কে—আপনি গোয়েন্দা, না অন্য কিছু। জানতে পারলে কোথায় এসেছেন তা আপনাকে একবার বুঝিয়ে দিই।'

'কি করে বোঝাবেন?'

'আপনাকে আমি গুলী করব', ডাক্তার ছুটে একটা টেবিলের কাছে গেলেন। আমিও আমার ছ'-ঘরা রিভলভারটা বের করে বললাম, 'তার আগে আমার ট্রিগার শুধু একটিবার ক্লিক্ করে উঠবে, ক্যামেরার একটা ক্লোজ-শটের মত।'

ডাক্তার ঘুরে আমার দিকে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন। ভয়ে বনানীরও চোখ দুটো একেবারে স্থির অচঞ্চল। তারপর আমি বললাম, 'ডক্টর উত্তেজিত হবেন না। এর আগে আমি এখানে এসেছি। সেদিন আমি এসেছিলাম গেরুয়া পরে। তাই হয়তো আমায় চিনতে পারেন নি। এখানকার নাড়ী-নক্ষত্র সবই আমার জানা—আর আপনি হয়তো জানেন না, এখানে যিনি কুইন অফ দি ডেন তিনি আমার কে?'

'কে তিনি?'

'তিনি আমার অত্যন্ত আপনজন।'

আবার ডাক্তার ও বনানী মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন। তারপর যেন হাঁফ ছেড়ে ডাক্তার বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে আপনি একদিন এসেছিলেন বটে, সেদিন ছিল আপনার সাধুর বেশ—পিস্তলও হাতে ছিল আপনার। যাক্, এখন আপনি বাঁচালেন—এখন আপনাকে আমরা মনে করতে পারি you are one of us—31'.

'ঠিক যত সহজে আপনি আমাকে ওয়ান অফ আস্ বললেন', বললাম, 'ঠিক তত সহজে মেনে নেবেন না, তাতে বিপদ হতে পারে?'

ডাক্তার বললেন, 'হঠাৎ এখানে কি মনে করে এলেন—'

'কাজ আছে।'

'বসবেন এখানে?'

'পরে আসি, তারপর।'

অতঃপর আমি উঠানমত জায়গা-টুকু পার হয়ে সোজা সামনের সিঁড়ি ধরলাম। ওপরে উঠতেই নানারকম কণ্ঠস্বর শুনতে লাগলাম। মাতালের হুল্লোড়। দরজা খুলতে আমার সাহস হল না। যদি রাণীদিকে সেইরকম বেহেড অবস্থায় দেখি—যদি দেখি সেই নর্তকীর বেশে সকলের মন খুশিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই চেতনার মধ্য দিয়ে বুঝলাম কোন বাদ্য-যন্ত্র বা ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না এবং তা যখন হচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই নাচ-গানে রাণীদি মত্ত নেই। তা হলে? তা হলে—আমার বুকখানা কেমন যেন কেঁপে উঠল। তবে কি আয়ীদের লোভী সমাজের কর্তারা

সব মদের পিপের মত রাণীদিকে নিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে? ছিঃ, ছিঃ, এসব কথাও আমাকে এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে? এই অভিশপ্ত জগতে এসে পড়ে আমারও মানসিক স্তর কি এই বিকৃত রুচির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাবে? এর থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আমি কি অন্য কিছু ভাবতে পারব না? সেই মানসিক স্বাস্থ্য কি আমি এমনি করে চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলব?

মাতালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বাব্বা, ফেয়ারলি প্রেস হলেও তো দু-একটা কাঁধকাটা ব্লাউজের সঙ্গে ইণ্টারভিউ হত! এ-যে একেবারে সা-হা-রা.....'

আরও কণ্ঠস্বর, 'সা-হা-রা কি বাব্বাঃ, এ যে স-র্ব-হা-রা!'

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, পদস্থ পুলিশ-অফিসারের পোষাকে একটা লোক। পাশে তার বুশসার্ট পরিহিত আরেকটা লোক। বুশসার্ট বলছে, 'খামোকাই লাহিড়ী তুমি ডি-সি—'

'খামোকাই, তুমি শালা জি-এমের পি-ও।'

'ক্যা—নো?'

'তুমি শা-লা স্টেনো রাখো না?'

'গ্যাংগলি, পাখী উড়ে যাবে, তা কি জানতাম? তা হলে শালা না হয় অন্য ব্যবস্থা করতাম.....'

দরজা আরেকটু ফাঁক করে দেখলাম, ওস্তাদ সেই সেদিনকার সোফাটায় বসে রয়েছে। সামনের ছোট্ট টেবিলটায় মদের বোতল আর গ্লাস। সেখান থেকে সে বলে উঠল, 'এই শালা শাট আপ!'

[illegible]-এমের পি-ও বলে উঠল, 'ফেয়ারলি প্রেস হলে শালা শাট আপ কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম। সিকিউরিটির দুই রুস্তম গর্দান তোমার একেবারে চিচিং ফাঁক হয়ে যেত।'

লাহিড়ী বললে, 'আর লালবাজার হলে—'

মেঝেয় শায়িত গান্ধীটুপি পরিহিত একটি লোক মত্ত অবস্থায় উঠে বসে বললে, 'তোমরা রুলের গুঁতো দি-তে বা-ওয়া। তিরিশ সালের সি-ডি'র সময়ে—বাওয়া মনে আছে। বোল্ শালা গ্যাণ্ডি বোল্ বলে পাছায় সার্জেণ্টের রুলের গোঁত্তা...'

পদস্থ পুলিশ অফিসার বললে, 'তাই তো স্যার, আজ রাইটার্সে বসতে পেরেছেন—না, স্যার?'

'তা বটে, কিন্তু এ যে সব ডা-রা-ই মেরে যাচ্ছে। এর কি করবে তোমরা? শালার নাচ নেই, গান নেই, গাঙ্গুলীর সে মেয়েমানুষ নেই—'

অবাক হয়ে শুনছিলাম ওদের কথা। আমি এই নরককুণ্ড দেখতে আসি নি। দেশের প্রকৃত এই চেহারার একদিকে যেমন নিদারুণ আঘাত পেলাম মনে মনে, তেমনি খুশিও হলাম অপরিমেয় আনন্দে। রাণীদি নেই—আমার স্বপ্ন দিয়ে গড়া রাণীদি, আমার শৈশব জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে স্পর্শে, ঘ্রাণে, স্নেহে, মমতায় যে রাণীদিকে আমি পেয়েছি, সেই রাণীদি নেই এই নরককুণ্ডে। এ যে আমার

[illegible] ভা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। মনে মনে বলে উঠলাম, রাণীদি, তুমি আমায় বাঁচালে আজ। সেদিন তোমাকে যে মূর্তিতে দেখে গিয়েছি আজ তারপর কত ভয়ে ভয়ে তোমার ওপর সব ভরসা ছেড়ে দিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। তোমাকে চিরদিনের মত হারিয়েছি—এ জেনেই তোমাকে আরও একবার হারাতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি নেই এখানে—এই না-থাকাই তোমার জীবনে যেন সত্যি হয়।

ওস্তাদের ঘরের দরজা খুলে আমার ভিতরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ফিরে দাঁড়ালাম আমি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে এসে পড়তেই ডাক্তার এগিয়ে এসে বললেন, 'বসবেন নাকি একটু?'

বললাম, 'না ডক্টর, আমাকে যেতে হবে।'

'কিন্তু একটা কথা ছিল।'

'কি বলুন?'

'আপনি কি আমার সব ঘটনা জানেন, সেই যখন আমি সাব-ডিভিশনাল হসপিটালে ছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি মনে করেন সে সব সত্যি?'

'কি বলছেন ডক্টর,' রীতিমত উত্তেজিতভাবে আমি বললাম, 'সে ঘটনা কি ভোলা যায়?'

বস্তুত ডাক্তার মুখার্জীর সে কাহিনী শুধু আমি কেন, অনেকেই ভুলে যান নি। ভুলতে কেউ কোনদিন পারবেও না। লোকটা কতবড় ক্রিমিন্যাল তা তাঁকে এখানে দেখলে তো যে কেউই বুঝতে পারবে—তা ছাড়াও যে কতখানি ভয়াবহ ক্রিমিন্যাল, তা তাঁর অতীত যে জানে, সেই বলতে পারবে। সাব-ডিভিশনাল হসপিটালের চার্জ নিয়ে যেদিন লোকটা এলেন সেই দিনই তিনি অপাংগে একবার শুধু দেখে নিয়েছিলেন শান্তাকে। শান্তা দরিদ্রঘরের স্বামীহারা মেয়ে, সংগে তার বছর পাঁচেকের একটি কন্যা সন্তান ছাড়া আর কেউ ছিল না। ডাক্তার মুখার্জীর আগে যিনি এই হাসপাতালের চার্জে ছিলেন, সেই ডক্তার ঘর ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ। শান্তাকে দয়াপরবশ হয়ে তিনি নার্সিং শেখান। একটু-আধটু লেখাপড়া জানতো শান্তা—তাতেই তিনি তাকে ধরে ধরে ওষুধ-পত্র, প্রেসক্রিপশন প্রভৃতি পড়িয়ে-সড়িয়ে তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং হাসপাতালে তাকে তিনি একটা চাকরিও দিয়েছিলেন। তিনি চলে যাবার পর ডাক্তার মুখার্জীর হাতে পড়ল শান্তা।

হাসপাতালেরই একটা [illegible]

পাঁচ বছরের শিশুকন্যাটিকে নিয়ে থাকত শান্তা। ডাক্তার মুখার্জী ক্রমশ ক্রমশ শান্তাকে ফাঁদে ফেলতে লাগলেন। শেষকালে এমন হল যে, শান্তার আর কোন পথ রইল না মুক্তির। শান্তা সাব-ডিভিশন্যাল টাউনেরই মেয়ে। পরিচিত সবারই কাছে। শিশুকন্যার পরবর্তী ধাপে তার জীবনে নেমে আসবে বোধকরি আবার কোন সন্তান। চারদিকে কানাকানি, চাপা গুঞ্জন। শান্তার মনে হল পৃথিবীর সবাই বুঝি তার দিকে আঙুল দেখিয়ে কি সব বলছে। প্রথম দিকে ছিল ভয়, তারপর তার নিজের ওপর এল ধিক্কার।

ডাক্তার মুখার্জীকে শান্তা বললে, 'অন্তত তুমি বিয়ে করে আমাকে এ লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দাও।'

ডাক্তার নিজে বিবাহিত। তখনও দেশে একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ডাক্তারের সাহসে কুলোল না। তিনি হচ্ছে-হবে করে স্তোক দিতে লাগলেন শান্তাকে। কিন্তু শান্তা অস্থির হয়ে পড়ল। সবচেয়ে তার জীবনে তখন বাধা হয়ে দাঁড়ালো তার শিশুকন্যা। মেয়েটা যদি না থাকত তা হলে সে জীবনটাকে নিস্তব্ধ করে দিতো ঘরের কড়িতে ঝুলে কিংবা আফিম বা কোন ডাক্তারী ওষুধ খেয়ে। কিন্ত মেয়েটা হয়েছিল তার পায়ের বেড়ি। তার জন্যে তার মরার পথও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

অবশেষে মাস পাঁচেক যেতে-না-যেতে একদিন দেখা গেল তার কোয়ার্টারে সে মরে পড়ে আছে। ডাক্তার মুখার্জী যথারীতি পুলিশে রিপোর্ট করলেন। পোস্ট মর্টেম হল তাঁর হাতেই। পাকস্থলী থেকে পাওয়া গেল পটাসিয়াম সাইনাইড।

কি সাঙ্ঘাতিক ঘটনা! যে তার শিশুকন্যার জন্য মরতে পারে না, সে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে মরতে যাবে কেন? তা ছাড়া ঐ মারাত্মক দ্রব্যটি সে পাবেই বা কোথায়? সে তো থাকে ডাক্তারের নিজস্ব জিম্মায়। তা হলে... তা হলে আর কি—যে লোক নিজের আত্মজ ভ্রূণকে নিজের হাতে পোস্ট মর্টেম করতে পারেন, যে লোক সেই রিপোর্ট পুলিশকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নির্দোষ সাজতে পারেন, সে লোক কোন ওষুধের সংগে যে সাইনাইড খাওয়াতে পারেন না শান্তাকে, এ কথা কেমন করে লোকে মেনে নেবে? তাই গুঞ্জন উঠেছিল শহরময়. চাঞ্চল্যও দেখা দিয়েছিল কিছু কিছু, কিন্তু ডিপার্টমেন্টই বলু তাঁকে রক্ষা করেছিলেন যে যাত্রা।

তবে বলতে হবে ডাক্তার মুখার্জী নিষ্কণ্টক হলেন। শান্তার সেই শিশু-কন্যাকে আজ বছর [illegible] ধরে তিনিই তাঁর [illegible] দিয়েছেন। এখন সে মেয়ে পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারিণী। সেই মেয়েকে বদান্যতাপূর্ণ স্নেহ-মমতা দেখানোর এবং তার দায়িত্বভার বহন করার বাহিক আত্মের যে স্বীকৃতি, তাতে ডাক্তার মুখার্জী যে একজন মহৎ ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

হয়তো এই মহত্ত্বের জন্যই তিনি সাব-ডিভিশন্যাল হাসপাতাল থেকে সদর হাসপাতাল, তার পর সেখান থেকে রাইটার্সে উন্নীত হয়েছেন কিন্তু আমি তো জানি কি রকম মহৎ এবং এখানে এই সন্তানের আড়ালে কি মহৎ কাজই না তিনি করছেন। রাইটার্সে আমি অনেক মহৎ ডাক্তারকে দেখেছি, প্রাণভরে তাঁদের আমি প্রণাম জানাই কিন্তু পাশাপাশি সেখানে ডাক্তার মুখার্জীর মত একজন ক্রিমিন্যালকেও দেখি এবং তাতেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—ভগবান, এদিকে কি কেউ নজর দেবে না?

আমাকে খানিকটা ক্ষুব্ধ ও চিন্তান্বিত দেখে ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'তা হলে কনানীর সম্বন্ধেও আপনি অনেক কিছু ধারণা করেন, বলুন?'

'হ্যাঁ, করি,' বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

কি আশ্চর্য! হঠাৎ দেখি তার ঘরের একফালি আলোতে পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে টুনটুনি—সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়ে টুনটুনি। সে বললে, 'শুনুন—'

বললাম, 'কি ব্যাপার, জবাকুসুম দেবে নাকি?'

'না না,' টুনটুনি বললে, 'ওটা আমার কাজ নয়। আমি নেহাৎ দায়ে পড়েই দাঁড়িয়ে আছি—'

'বলো কি বলবে?'

'আপনি তো সেই সন্ন্যাসী?'

'কই, না তো!'

'হ্যাঁ, আজ আপনি শাদা কাপড়-জামা পড়লেও সেদিন আপনি সন্ন্যাসী সেজেই এসেছিলেন।'

'তোমার মনে আছে দেখছি—যাক, এখন কি বলবে বলো।'

'আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'কি উপকার?'

'আমার ভাই গুলীতে জখম হয়ে এখানেই কোথায় আছে। আপনাকে একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।'

'তোমার ভাই? কে তোমার ভাই—নাম কি ভায়ের?'

'মণ্টু—'

'মণ্টু তোমার ভাই? আমি বিস্মিত হয়ে বললাম।

'আমিও নেই এখানে।'

'আর তোমার মাসি?'

'ঐ যে ভাই যেখানে থাকত—বৈষ্ণবী-মাসি। তিনিই আমার মাসি।'

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এখানে কোথা দিয়ে কার সংগে কি সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ছে। আগেই এ-কথা জানি যে মণ্টু আজ শংকরদের সংগে যাবে ওয়াগান লুঠ করতে। তবে কি সেখানেই সে গুলীবিদ্ধ হয়েছে? হবেও বা। নইলে টুনটুনি এ-কথা বলবে কেন? [ক্রমশ]

॥ স্রোতের সংগে ॥

[২৬৫২ পৃষ্ঠার পর]

সম্পর্কে ভাবতে চান না। ওদের পথ—ওদের আদর্শ—সব তাঁর চিন্তার সীমা থেকে অনেক দূরে। আনন্দ কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে তাঁর সংগে তর্ক করতে আসে নি স্বরাজের মতো। স্বরাজের জানত তাঁরা প্রতিপক্ষ, তাই তর্ক তুলেছে; আনন্দেরা জানে তাঁরা মৃত-দেহ—শবের সংগে আলোচনা নিরর্থক।

কিন্তু—

না—আনন্দের সম্বন্ধে তিনি কিছু ভাববেন না। এই বাড়ির কেউ আর ভাবে না। অন্তত তাঁর সামনে ভাববে সাহস নেই কারুর।

শুধু স্বরাজ একবার বলেছিল, 'এ্যাডভেনচারিজম্। কিন্তু এ্যাডভেনচার আর বিপ্লব কি এক?'

কে জানে। কে বলবে।

'বাবা, এত বেলায় বইস্যা বইস্যা ঝিমাইতাছ? উঠবা না—চান করবা না?'

চেয়ে দেখলেন মেয়ে স্বপ্না। অনেক দূর থেকে এল। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে এখন। মেয়েটার মুখে-কপালে ঘামের ফোঁটা।

'গেছিলি কই মা?'

'গরচা লেনে। এ্যাকজনে এম-এ'র কিছু নোট দিবে কইছিল।'

'পাইলি নোট?'

'না—বাড়িতে নাই। কই গেছে। দেড় ঘণ্টা বইস্যা থাইকাও দেখা হইল না। কাইল ইস্কুল থিক্যা আসনের কালে আর একবার যামু অখন।'

রোদে মেয়েটার মুখ লাল। ঘাম ঝরছে। প্রাইভেটে এম-এ'টা দিতে পারলে স্কুলের চাকরিতে গ্রেড বাড়বে। সেই আশাতেই ঘুরছে স্বপ্না।

'নোট পরে হইবো।'—কোমল গলায় বিশ্বনাথ বললেন, 'তুই জিরা দিয়া।'

'জিরামু। আগে তুমি ওঠো দেখি—চান কইর‍্যা লও।'

[ক্রমশ]

হারানো প্রাপ্তি প্রত্যর্পণ

কলকাতা শহরে একবার কোনও কিছু কারও খপ্পরে খপ্পরস্থ হলে সচরাচর তা আর ফেরত গেছে প্রকৃত মালিক বা মালিকানির কাছে, এমন সংবাদ হামেশা মেলে না। বিরল সংবাদ বলেই 'ফেরত', 'প্রদান' সংক্রান্ত ঘটনা সংবাদপত্রে বাহুল্য-প্রচার পায় বা বক্স নিউজ হয়। আমি তো 'শহর কলকাতা'র সমস্ত ফীচারটাই খরচা করে বসতাম যদি বর্ষার আগে আমার হারানো রেন কোটটা ফিরে পাওয়া যেত। ওটা খোয়া গেছে এবং ভৈরব হরষে ঘর্ঘর বর্ষা সমাগত হলে তা যে অন্যতর কোনও ব্যক্তির গাত্র-মুড়নি হিসেবে ব্যবহৃত হবে এতেও সন্দেহ নেই। রেন কোটটা সনাক্তকরণেরও উপায় নেই কারণ সেটা আর পাঁচটি খয়ের রঙের অপ্রকৃত রাসায়নিক সুতোয়-বোনা স্বল্পমূল্যের গাত্রাবরণীর মতই। অবশ্য বিশেষ চিহ্ন, দুই পকেটই সেলাইবিহীন। কিন্তু মনে করুন, ঠিক অনুরূপ একটাই নজরে এলো, তবু কি আমি সেটার পেছনে ধাওয়া করতে পারব ?

শহর কলকাতার ওপর থেকে নাম্বার প্লেট লাগানো মোটর গাড়ি আর কড়কড়ে ইস্ত্রী করা মাড়-দেওয়া কারেন্সি নোটই দিনে দুপুরে উবে যাচ্ছে (রাজ্যপালদের আমলেও ডাকাতির বিরাম নেই, তা সে ধর্মবীরই হোন, আর ধাওয়ানই হোন, চোরে ডাকাতে তো আর পলিটিক্স করে না, কাজ সমভাবেই চালিয়ে যায়।), এতো সামান্য একটা রেন কোট। ফেরতের কথা দূরস্থান, কাড়াকাড়ি, ছিনতাই শহরের বুকে কোনো নিউজই নয়। শুনেছি, ভারতের বাইরে নাকি এমন সব বড় বড় শহরও আছে, যেখানে এয়ার-পোর্টে, দোকানে, স্টেশনে পার্স পিছলে মিসিং হলেও মালিক সচরাচরই তা ফিরে পেয়ে থাকেন। ঘুমন্ত শহরবাসীর বন্ধ দোর-গোড়ায় ভোরের হকার খবরকাগজ, দুধের বোতল, মাখনের প্যাকেট রেখে গেলে নাকি বেড়াল-কুকুরেও তার গন্ধ গ্রহণ পর্যন্ত করে না। গল্প গাথা কিনা জানি না, তবে বিদেশ-ফেরতাদের মুখের বিবরণ।

কয়েকদিন আগে জনৈক ভদ্রলোক বললেন, কাছে-পিঠে কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েও এমনই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। কোন এক হাউজ বোটে তাঁর পার্স পিছলে যায়। কিন্তু যথাসর্বস্ব সমেত তা সঠিক মালিকের হাতে ঘুরে আসে পুনশ্চ। জনান্তিকে জানাই, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেই সেদিন ২৫নং ট্রামের জন্য রফি আহমেদ-ইলিয়ট রোডের সংযোগস্থলে অপেক্ষা করছি, আমার কাঁধের পাশ থেকে জনৈক ব্যক্তি রাস্তার ওপর একটি পঁচিশ পয়সাকে মালিক-বিহীন অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে আমাদের নজর আকর্ষণ করলেন। কাশ্মীরী-সততা-অভিজ্ঞ ভদ্রলোক মুদ্রাটি স্বচ্ছন্দে পকেটস্থ করে নিম্নকণ্ঠে বললেন, যাক, ট্রাম ভাড়াটা উঠে এলো! বলতে পারেন, অগত্যা উপায় কি ? মুদ্রাটির মালিককে এতোবড় শহরে আমরা কোথায় খোঁজ করতাম। তা বটে, কিন্তু তাঁকে না পেলেও কাশ্মীর-অভিজ্ঞ ভদ্রলোক তো মুদ্রাটি সেই ভদ্রলোকের হাতেই সঁপে দিতে পারতেন, যিনি তা আমাদের দেখিয়েছিলেন।

তবে হ্যাঁ, অনেকক্ষেত্রে খোয়া-যাওয়া মাল ফেরতও আসে। দু'-একটি সৎ ট্যাক্সী ড্রাইভারের এহেন চাঞ্চল্যকর বিবরণ ইতি-পূর্বে সংবাদ হয়েছে, তবে সে হয়ত লাখ দু' লাখে একটা-আধটা।

সেদিন রবিবার। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ হরিশ মুখার্জ্যে-কালিঘাট রোডের মুখে আমরা দুই বন্ধু রোয়াক-আড্ডায় বসেছি, একটি শ্যামাঙ্গী তরুণীকে নাকের ডগের ঘাম মুছতে মুছতে শশব্যস্তে একটি বিশেষ ঠিকানার খোঁজে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম পরিচয়ে জানলাম, তরুণীর নাম কৃষ্ণা চ্যাটার্জী। নিবাস কখনো দিল্লী, কখনো বালীগঞ্জের স্টেশন রোড। উদ্দেশ্য, বাসে কুড়িয়ে পাওয়া একটি সংস্কৃত কিতাব তিনি আসল মালিকের হাতে, প্রত্যর্পণ করতে চান। ঠিকানা যা বললেন, হিসেব করে দেখলাম সেটা কলকাতা-৬। আমরা কলকাতা-২৬-এ দাঁড়িয়ে, কিতাব প্রত্যর্পণের সম্ভাব্য সব উপায় কিছুক্ষণ গভীরভাবে ভেবে দেখে-ছিলাম। কিন্তু কৃষ্ণা চ্যাটার্জীকে সংবাদ করার জন্য সংবাদ-সন্ধিৎসুর মতো আমরা যখন তাঁকে প্রশ্নবাণে আবিদ্ধ করেছি, তখন আবিষ্কৃত হল শ্রীমতী চ্যাটার্জী এক প্রচন্ড গোলমেলে অস্তিত্ব, ভুয়া কিতাব কাঁধে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যাঁর অন্যতর উদ্দেশ্য, অবশ্যই রহস্যময়, বর্তমান। কৃষ্ণা চ্যাটার্জীকেও তাই নিউজ করতে না পেরে সেদিন বাস্তবিক দুঃখ পেয়ে-ছিলাম। এবং যে সাংবাদিকরা কিছু কিছু সৎ ট্যাক্সী পরিচালককে চাক্ষুষ করেছেন, তাঁদের মনে মনে ঈর্ষাও করেছি। তরুণীটির একটা সচিত্র নিউজ ফসকে গেছে, যা চাঞ্চল্য সৃষ্ট করতে পারত।

আজ সকালে (৯।৪।৭০) কাগজ খুলেই আলো। অবাক হয়ে দেখলাম, কিছু পেয়েও ফেরত দিতে পারেন এমন মানুষ বাস্তবিকই দু'-চারজন বর্তমান। আমি, বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ মশায়ের কথা বলছি, যিনি রাজ্যপালের উপদেষ্টার পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন।

পশ্চিমবঙ্গে যে মার্কিনী ছাঁচের প্রেসিডেন্ট শাসন চালু হয়েছে, তাতে

শিক্ষা সংস্কার, না দলবাজী ?

প্রণবেশ চক্রবর্তী

যুক্তফ্রন্টের তের মাসের শাসনকালে চারটি দপ্তরকে কেন্দ্র করে সব থেকে বেশি বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। স্বরাষ্ট্র (পুলিশ), শিক্ষা, শ্রম এবং ভূমিরাজস্ব দপ্তরের বিরুদ্ধেই অসংখ্য অভিযোগ। লক্ষ্য করার বিষয়, উল্লিখিত চারটি দপ্তরই বৃহত্তম শরিক দলের কুক্ষিগত ছিল। যখন ফ্রন্টের দপ্তর বণ্টন হয়, তখনই অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল বিভিন্ন শরিক দলের মধ্যে। একটি বিশেষ দলের হাতে দু'-তিনটি বাদে সমস্ত প্রধান দপ্তরগুলি চলে যাওয়াতে অধিকাংশ দলই একযোগে অসন্তোষ এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সংখ্যার জোরে সবল দল দুর্বল শরিকদের উপেক্ষা করেন, বিশেষত, মুখ্যমন্ত্রিত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবার পর প্রধান দপ্তরগুলি কব্জা করার জন্য সি· পি· এম জেদ ধরে। শেষ পর্যন্ত একটা অন্যায় সমঝোতা করে অন্যান্য দলগুলি কিছুটা বশ্যতার মনোভাবই দেখায়।

১৯৬৭ সালের 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না। কিন্তু ১৯৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সে রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। শরিকী সংঘর্ষ, দলবাজী এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টিতে এবার যুক্তফ্রন্ট সরকার যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন (?) তা কেবলমাত্র তুলনারহিত নয়, একেবারে নতুন।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট আশাবাদী ছিল। কারণ, শ্রীরায় ব্যক্তিগত জীবনে যেমন একজন দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক, তেমনি তিনি শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আশা করা গিয়েছিল, তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এবং আন্দোলনের নেতারূপে শিক্ষাক্ষেত্রের অচলায়তন ভেঙে এক নতুন পথের সন্ধান দিতে সক্ষম হবেন। এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই কিছুমাত্র অতিরিক্ত ছিল না। বিশেষত, গত পনের বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষ যে মানুষটিকে শিক্ষা-সংস্কার এবং শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে অতিমাত্রায় সোচ্চার দেখেছে, তিনিই যখন শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন নতুন প্রত্যাশার জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজ প্রশ্ন উঠেছে : সেই বহু-ব্যাপ্ত প্রত্যাশা কতটুকু পূর্ণ হয়েছে? অথবা সেই প্রত্যাশার অপমৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

যে 'জনগণের' দোহাই দিয়ে ছোট-বড় সকল দলই 'নির্বাচনী বৈতরণী' পার হওয়ার জন্য উদ্গ্রীব, সেই জনগণই আজ সামগ্রিক পরিস্থিতির 'পোস্টমর্টেম' করবে। গত বাইশ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে এক চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে বাংলাদেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে ভারতবর্ষে পথিকৃৎ ছিল, সেই বাঙালীই আজ ক্রমশ পেছিয়ে পড়ছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের দুরবস্থা অত্যন্ত প্রকট। সমগ্র ভারতবর্ষে অষ্টম স্থানের অধিকারী। এ লজ্জা এবং এ কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করার কোন বাস্তবসম্মত প্রয়াস কংগ্রেস আমলেও দেখা যায় নি, যুক্তফ্রন্টের আমলেও ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কংগ্রেস আমলে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের বিস্তার ঘটেছে গোটা রাজ্যে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা' অতি সামান্য। সাত-আটটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, কিন্তু সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি। আসল কথা, যে শিক্ষার মাধ্যমে ভেঙে-পড়া জাতির মেরুদণ্ডকে সবল ও সুস্থ করে তোলা সম্ভব হত, তেমন কোন প্রচেষ্টা ছিল না।

এ ব্যাপারে দায়িত্ব সকলেরই সমান। যেমন সরকার যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেননি, তেমনি শিক্ষক-সম্প্রদায়ও কর্তব্য পালনে এক অনভিপ্রেত শৈথিল্য দেখিয়েছেন। শিক্ষকদের বেতনহারের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে কংগ্রেস আমলে, কিন্তু শিক্ষার মান উন্নীত হয় নি। এজন্য কেবলমাত্র শিক্ষকদের দোষ দিয়ে লাভ [illegible]। আমরা যে [illegible] সৃষ্টি করেছি তা থেকে শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকরা কিছুতেই মুক্তি পেতে পারেন না। শিক্ষার অঙ্গনকে জ্ঞানচর্চার করার পরিবর্তে রাজনীতির পঙ্কিলতার টেনে এনেছি। ফলে, শিক্ষাদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ জমেছে।

কলকাতার বুকে যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি অনেকটা কল-কারখানার মত ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলি জীর্ণতায় আজ আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকালে গা শিউরে ওঠে। ভাবতে কষ্ট হয়, এখানেই নাকি জাতির ভবিষ্যৎ জন্ম নেবে। যে ভয়াবহ পরিবেশে 'ভবিষ্যতের নায়করা' শিক্ষা পাচ্ছে, তা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক। কিন্তু এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন কে? মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকালেও সেই একই ছবি ফুটে উঠবে। বিজ্ঞান-শাখা আছে কিন্তু ল্যাবরেটরী নেই, শিক্ষক নেই। আর্থিক সংকটের দোহাই দিয়ে একযোগে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং সরকার রেহাই পেতে চান। এ এক অসহ্য অবস্থা।

আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, সমাজবাদের বুলি ছড়াই। কিন্তু যে বাংলাদেশে শতকরা ২০ জন মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, সেখানে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র সফল হবে কেমন করে? এও ত' এক ধরনের শোষণ! মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত মানুষকে খেয়াল-খুশিমত রাজনীতির জুয়াখেলার শিকারে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশে শতকরা ৭৭ জন মানুষ এখনও রবীন্দ্রনাথের সম্যক পরিচয় পায় নি, এত বড় দুঃখ ও বেদনার কথা আর কি হতে পারে?

তাই প্রত্যাশার জন্ম হয়েছিল তখনি, যখন এই লক্ষ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলেন। ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীতে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করল। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বেতনহার পরিবর্তন ইত্যাদি অনেক লোভনীয় কথাই ফ্রন্ট ঘোষণা করেছিলেন। বিশেষত, সেই কর্মসূচীকে রূপায়িত করার দায়িত্ব যখন একজন "শিক্ষাব্রতী" তথা শিক্ষক-নেতার ওপর অর্পিত হল, তখন মানুষ আশান্বিত হয়েছিল। কিন্তু আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে, তের মাস সময়ের মধ্যে কোন [illegible] কোন [illegible]

না কেন? ... নীতির ... এমন বিরাট পরিবর্তনের পরেও কার অনুমতি নেবেন? শিক্ষা-সংস্কারের নামে এমন ধ্বংস কায়েমী করার প্রয়োজন কি ছিল?

আজ চারদিক থেকে অসংখ্য অভিযোগ দেখা দিয়েছে। দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, বেআইনী কার্যকলাপ, দলবাজী এবং অযোগ্যতার অভিযোগ উঠেছে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে। দলীয় স্বার্থে তিনশোর বেশি স্কুল কমিটিকে বাতিল করা হয় কেন? কেন একজন গ্রামের প্রধান শিক্ষককে প্রাণ দিতে হয়েছে? কেন দলীয় গুণ্ডারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জোর করে পদত্যাগপত্র দিতে বাধ্য করেছে? যেখানে জোর করে পদত্যাগপত্র নেওয়া হয়েছে, সেখানে সরকার প্রধান শিক্ষককে রক্ষা করার পরিবর্তে অশোভন দ্রুততায় সে "পদত্যাগপত্রগুলি" গ্রহণ করেছেন কেন? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন আজ জনমনে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত একটা স্কুল কমিটিকে বাতিল করে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে কেন স্কুলের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়? এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে বিশেষ দলের কর্মীদের দিয়ে পূরণ করা হয় কেন?

অভিযোগ শুধুমাত্র আজ দেখা দেয় নি। অভিযোগ উঠেছে অনেকদিন। ফ্রন্টের ভেতরে এবং বাইরে এ নিয়ে অনেক বিতর্কের সূচনা হয়েছে। কিন্তু 'শিক্ষামন্ত্রী' স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে অটল। সি· পি· আই-এর পক্ষ থেকে অধ্যাপিকা ইলা মিত্র এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অধ্যাপক নির্মল বসু ফ্রন্টের সভায় এ নিয়ে অসংখ্য অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি-মিছিল মহাকরণে গেলে সেখানে শিক্ষামন্ত্রী যে আচরণ করেছিলেন, তা নিন্দনীয়।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মত সাধারণ মানুষ যদি গত তের মাসের একটা হিসেব নিয়ে বসেন, তা হলে দেখবেন, শিক্ষক-নেতা শিক্ষামন্ত্রী শুধুমাত্র নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকেই প্রবর্তিত করেন নি, সেই সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ... কায়েম করেছেন। 'প্রাথমিক পর্ষদকে' তাঁর হুকুম তামিল করার যন্ত্রে পরিণত করে এক স্ব-শাসিত সংস্থাকে ধূলিসাৎ করেছেন নিপুণভাবে। স্কুল বোর্ডগুলিকে বাতিল করে প্রাথমিক শিক্ষাকে আমলাতন্ত্রের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। নেপথ্যের কার্যকলাপ কাহিনী আজ জনসমক্ষে তুলে ধরার সময় এসেছে। কারণ, যে জনগণ যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিলেন, তাঁরাই শেষ বিচারক। আগামী কয়েকটি সংখ্যায় এ সম্পর্কে লেখার আগ্রহ আছে।

সন্তান—আট বছরের নীলাঞ্জন মন দিয়ে স্কুলের পড়া করছে। শিবপ্রসাদ ডাকলেন, 'নীলু!'

'আস্‌তাছি দাদু।'

ছেলেটা বেরিয়ে এল। নাম নীলাঞ্জন। কিন্তু গায়ের রঙ ফর্সা, চাঁপা ফুলের মতো রঙ। অপুষ্ট রোগা চেহারা, চোখ দুটো ভীরু আর কোমল। আস্তে আস্তে দাদুর ইজি-চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'দাদু—ডাক্‌লা আমারে?'

একদা জেলখাটা স্বদেশী, দু' বছর আগেও সরকারী স্কুলের হেডমাস্টার ঠাকুর্দাকে সে তুমিই বলে। এই সম্পর্কটাই গড়ে উঠেছে প্রথম থেকে।

দাদুর অদ্ভুত একটা মমতা হয় বাচ্চাটার দিকে তাকালে। রোগা, শান্ত, ভালোমানুষ। সামান্য দোষে মা-বাপের কাছে এক-আধটা চড়-চাপড় খেলে চুপ করে এক কোণায় গিয়ে বসে থাকে। জ্বরে গা পুড়ে যায়, মুখ টকটকে লাল, তবু একটা শব্দ করে না কখনো। এই শান্ত, নিরীহ ছেলেটা চারদিকের এই জীবনের মধ্যে কোথায় দাঁড়াবার জায়গা পাবে—যেখানে জীবন ক্রমশ আরো নিষ্ঠুর, আরো কঠোর, আরো জটিল হয়ে উঠছে?

একটু চুপ করে থেকে শিবপ্রসাদ বললেন, 'জানোস, গন্ধরাজ ফুল দুইটারে ছিড়া লইয়া গ্যাছে। ডালটারেও ভাইঙা নিছে।'

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল নীলু। এই ফুলের পরিচর্যায় সে-ই দাদুর প্রধান সহকারী। জল জুগিয়ে দেয়, খুরপি এনে দেয়, মধ্যে মধ্যে পরম আনন্দে এসে জানায়ঃ 'দাদু, দেইখ্যা যাও—আট-দশটা দো-পাটির গাছ উঠছে।' শিবপ্রসাদ জানেন, নীলুই তাঁর সমব্যথী।

নীলু ম্লান গলায় বললে, 'জানি দাদু। ভোরে উইঠাই আমি দেখছি। তুমি তখন পূজা করতাছিলা, তোমারে কই নাই, শুনলে তো তুমি দুঃখু পাইবা।'

'নাঃ, দুঃখ পাওনের আর কিছু নাই—' শিবপ্রসাদ একবার দাঁতে দাঁত চাপলেনঃ 'আর খামাখা করুম না এই সমস্ত। কাইটা, মুড়াইয়া, ব্যাবাক গাছগুলিন ফ্যালাইয়া দিমু বাইরে। অরাও শান্তি পাইবো, আমারও হাড় জুড়াইবো।'

চুপ করে রইল নীলু। দাদুর রাগের কথা।

কত ফুল আছিল দেশের বাড়িতে। নতুন পুকুর কাটা হইছিল অ্যাকটা—সেই মাটিতে যে কী ফুল হইত! গোলাপে ভইর্যা যাইত। আর স্থলপদ্ম। পুকুরের চাইরদিক ঘিরা গাছ লাগানো হইছিল, হাজারে হাজারে ফুল ফুটত—জলে ছায়া পোড়ত্তো, মনে হইত, পুকুর ভইরা পদ্ম ফুটছে। সংস্কৃত কাব্যে পড়াইলাম সজলজলদাঙ্গীঃ স্থলপদ্মহাসে—আজও সেই ছবি।'

শিবপ্রসাদ চুপ করে রইলেন আবার। খেয়াল হল, এসব তিনি নীলুকে বলছেন না, তারই স্বগতোক্তি। সেই স্থলপদ্ম, সে-সব গোলাপ কেউ কোনোদিন চুরি করতে আসে নি; কারণ তখনো ভারতমাতার ছবিটা আলোয়-আশায়-বিশ্বাসে ঝলমল করত—মাথায় তাঁর হিমালয়ের মুকুট—পায়ের তলায় সিংহলের কমল পীঠ।

শিবপ্রসাদ বললেনঃ 'কারা ফুল ছিড়া নিছে, জানোস তুই?'

'কেমনে কমু? দেখি নাই তো। কাইল বিকালে পঙ্কজ, রতনা আর দেবু ঘুরতাছিল বাগানের ধার দিয়া—কী য্যান কইতাছিল। অরাই নিছে।'

'ডাইক্যা আনতে পারোস?'

'আইবো না। গাইল দিবো।'

'আমি তো কিছু কমু না। খালি জিগামু, চাইয়া লয় না ক্যান? গাছ ভাইঙা—সর্বনাশ কইর্যা কী লাভ হয়?'

'অরা আইবো না দাদু। কইবো, আমরা ফুল নিছি—দ্যাখছস তোরা?'—নীলুর স্বর আরো বিমর্ষ হলঃ 'জানো দাদু, অরা ইস্কুল থিক্যা পলাইয়া বায়োস্কোপে যায়। পঙ্কজ পরশু বাস স্টপের সামনে খাড়াইয়া খাড়াইয়া সিগারেট খাইতাছিল, আমি দেখছি।'

'বুঝছি।'

এ আমার, এ তোমার পাপ। কী বলবেন শিবপ্রসাদ, কাকে বলবেন?

'আইচ্ছা যা তুই, পড় গিয়া।'

নীলু আবার চলে গেল পড়ার ঘরে। শিবপ্রসাদ চোখ বুজলেন।

গন্ধরাজের কুঁড়ি থেকে অনেক দূরে। সেই রাতটার। স্বাধীনতার রাত্রে।

শহর কলকাতা—তার শহরতলী উত্তাল উতরোল। যুদ্ধ, দাঙ্গা—সব কিছুর শেষ। পলাশীর যুদ্ধের পরে—একশো নব্বুই বছরের শৃঙ্খল মোচন। মধ্য রাতের বেতারে দিল্লীর প্রাণ-তরঙ্গ। কলকাতা—তার শহরতলী—আনন্দে, আবেগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। আলোর দীপালী। জাতীয় পতাকার আকাশ দেখা যায় না, মাইক্রোফোনে জাতীয় সঙ্গীত—যেন শিউরে উঠছে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত।

আর ভিড়। এত মানুষ—এত উত্তেজনা—কেউ কখনো দেখে নি।

এই আনন্দিত কোজাগরীর মধ্যে কোথাও এতটুকু ছায়া নেই আজকে। সেদিনও মুসলিম এলাকায় হিন্দু পা বাড়াতে পারত না—হিন্দু অঞ্চলের কাছাকাছি কোনো মুসলমান হঠাৎ এসে পড়লে প্রাণভয়ে ঈশ্বরের নাম জপ করতে হত তাকে। আজ কোথাও বাধা নেই—কোথাও আশঙ্কা নেই—এ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছে। একজন আর একজনকে বলছে—চল যাই জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে, নাখোদা মসজিদের পাশে সেই রেস্তোরাঁটার বিরিয়ানি পোলাও কতদিন খাই নি!' এক দল পাঠান পুলিশ—সেদিন পর্যন্তও যারা হিন্দুদের বিভীষিকা ছিল, একটা লরীতে যেতে যেতে তারা জয়ধ্বনি করে গেলঃ 'আজাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ!' তাদের পেছনে পেছনে একটা জীপে একদল যুবক নাচানাচি করে হিন্দী ফিল্মের গান গাইছেঃ 'দূর হটো সব দুনিয়াবালে—হিন্দোস্তান হামারা হ্যায়! দূর হটো—দূর হটো—'

মনে হয় সব বদলে গেছে একটা যাদুমন্ত্রে। কোথাও পড়ে নেই মন্বন্তরের একটা কঙ্কাল—গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের একটা রক্তের বিন্দু নেই কোথাও—যুদ্ধের সময়কার ব্ল্যাক আউটে বীভৎস সেই তামসী রাত্রিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়েছে চিরকালের মতো। হিমালয়ের তুষার গলে নেমে এসেছে নির্মল জলধারা—উত্তাল হয়ে উঠে এসেছে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ, সব ধুয়ে-মুছে নিষ্কলঙ্ক হয়ে গেছে।

'তোমার দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে—'

সেই সোনার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়েছিল শিবপ্রসাদের।

কে একজন তার মধ্যে বলেছিল, 'তবু দেশটা ভাগ হয়ে যাবে? গান্ধীজী চাইলেন না—তবুও?'

'তা হোক। শান্তি আসুক।'

'আসবে?'

'নিশ্চয়। জিন্না যা চেয়েছেন, তা তো পেয়েছেন। তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিও তো সাপোর্ট করছে।'

'হুঁ। কিন্তু—'

'কিন্তু নেই এর ভেতরে। দেখছ না অবস্থা? ভারতবর্ষ ভাগ না হলে থামবে এই হেট্রেড্ ক্যাম্পেন, এই সিভিল ওয়ার? দাঙ্গায় কলকাতায় অন্তত

হাজার পঞ্চাশেক নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, তোমরা কি চাও তাই চলুক? আর পাঞ্জাবের নরক? যা সমস্ত প্রিমিটিভ বর্বরতাকে হাজার গুণে ছাড়িয়ে চলে গেছে? চাও এ-সব?'

'না—তা কেউ চায় না।'

'তা হলে শান্তি আসুক। ওরা ওদের অধিকার নিয়ে খুশি হোক, আমরা আমাদের সীমায় নতুন ভারতবর্ষ গড়তে থাকি। খাড়-খাড়ুক্ত হোক আজাদ পাকিস্তানের, আজাদ হিন্দুস্তান ফুলে-ফসলে ভরে উঠুক।'

তখন এই পর্যন্তই। এর বেশি ভাববার ক্ষমতা ছিল না তার। তা ছাড়া সমাধানের পথই বা কোথায়? ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্ব তখন দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে—মাঝখানে ঘৃণা আর ভ্রাতৃহত্যার রক্ত-সমুদ্র। কী করা যেত এ ছাড়া? কী করতে পারতেন মাউন্ট-ব্যাটেন?

হাঁ, শান্তি আসুক। যে-কোন মূল্যে।

কিন্তু সে মূল্য যে কতখানি দিতে হবে তা তখন কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিলেন?

কোন অশান্তি আর থাকবে না। একটু সুঁচকেও আর ফুটতে দেবে না কেউ।

'পশ্চিম বাংলা—পশ্চিম বাংলা। পূর্ব-দিকে আসাম ও পূর্ব পাকিস্তান—' নীলু পড়ছে।

শিবপ্রসাদ চমকে উঠলেন। পশ্চিম বাংলা—পূর্ব পাকিস্তান।

'নীলু?'

'কি কও দাদু?'

'আর কিছু পড়নের নাই তর্? এখন থিক্যা ভূগোল নিয়া চ্যাঁচামেচি কোরতে আছস?'

'আমি তো অখনি ভূগোল পড়ত্যাছি দাদু।'

'তা হউক, আর কিছু পড়্।'

নীলাঞ্জন কী বুঝল কে জানে। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তাইলে অঙ্ক কষ্ত্যাছি।'

'হ, তাই কষ্।'

বড়ো ছেলে স্বরাজ বাজার করে ফিরল। সাইকেলটা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে রেখে, বাড়ির ভেতর যেতে যেতে ব্যাজার মুখে বলল, 'আর আর খাওন যাইবো না। অত টাকার কমে কথা কয় না।'

ভেতর থেকে স্ত্রীর গলা শুনলেন শিবপ্রসাদ।

'রেশনে কী চাউল দিছে যে স্বরাজ? দুইটা উঠতে না উঠতেই পিন্ড পাকাইয়া গেল।'

'ওই [illegible] দিবে [illegible] হইবো। [illegible] খোলা বাজারের চাউল আনতে হইব্যা দুই টাকা কে-জি—পয়সা নেই রাজভোগ খাইতে?'—স্বরাজ গজগজ করতে লাগল: 'দেশ তো চিরকালের মতোই ডুবছে—গেইয়া শেষ হইছে। অখন ওই র‍্যাশনের চাউল দিয়াই দেশের প্রাণে পিন্ড দেওন লাগবো।'

শিবপ্রসাদ একবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। বড়ো ছেলের জন্মের সময় স্বাধীনতার সৈনিক তার নাম দিয়েছিলেন স্বরাজপ্রসাদ। রাজনীতির বাড়ি। অল্প বয়েস থেকে স্বরাজও রাজনীতি করত। শিবপ্রসাদ বাধা দেন নি—কেন দেবেন? কলেজে পড়বার সময় সে পুরোদস্তুর একজন ছাত্রনেতা—বামপন্থী চিন্তা তার, কংগ্রেসী সোস্যালিজমের নির্মম সমালোচক। অনেক উত্তপ্ত তর্ক চলেছে বাপ-ছেলের ভেতরে—কেউ কাউকে বশীভূত করতে পারেন নি।

পাশ করবার পরে স্বরাজ চাকরি নিল, তখনো পুরো বামপন্থী। তারপর কী যে হল। নিজেদের শিবিরেই ভাঙন ধরল তাদের। কিছুদিন পাগলের মতো ছুটোছুটি করল স্বরাজ, শেষে একদিন বাড়ি ফিরে বিস্বাদ বিরূপ গলায় ঘোষণা করল: 'চুলোয় যাউক পলিটিক্স—এই সমস্ত আবর্জনার মধ্যে আমি আর নাই।'

আর একবার ধাক্কা লেগেছিল শিবপ্রসাদের।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি তখন একটা সরকারী স্কুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। ছেলের বামপন্থী রাজনীতিতে তাঁর অবস্থা যে খুব স্বস্তিজনক ছিল তা নয়; মধ্যে মধ্যেই নানা অপ্রীতিকর কথা তাঁকে শুনতে হয়েছে। এমনও ভেবেছেন, না হয় দেবেনই চাকরি ছেড়ে, [illegible] করবেন তার চাইতে। ছেলের সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই, পথেরও না। কিন্তু চাকরির খাতিরে তাঁর ছেলের স্বাধীন রাজনৈতিক মতামতে তিনি বাধা দিতে পারেন না। ইংরেজ সরকারকেই জীবনে কখনো ভয় করলেন না—মাথা নীচু করবেন স্বদেশী সরকারের চোখ রাঙানিতে?

সেই ছেলে বলছে—চুলোয় যাক্ পলিটিক্স! শিবপ্রসাদের আনন্দ জাগে নি। যেন নিজেকেই পরাভূত মনে হয়েছে তাঁর। যে পথ ধরে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন, সে পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু হয়েছে: এই কি চেয়েছিলুম আমরা—এই কি আমাদের সোনার স্বপ্নের স্বাদ পূর্ণ হওয়া? [illegible] নতুন [illegible] তীক্ষ্ণ চোখে এবং [illegible] একবার [illegible] তাঁর মনে যে [illegible] নেই [illegible] এই নতুন [illegible] ফুরে যাবে?

'দাদু—এই অঙ্কটা একটু দেইখ্যা দাও। এই প্রশ্নের অঙ্কটা।'

নীলাঞ্জন।

চিন্তাটাকে ফিরিয়ে আনলেন, হাতে নিলেন অঙ্কের বইটা।

'অ। এইটা। কিছু শক্ত না। ত্রৈরাশিকে করতে হইবো। একটু বুঝাইয়া দিছে।'

নীলু চলে গেল। অঙ্ক কষতে আর একজন খুব ভালোবাসত। একটা অঙ্কও ভুল হত না তার। স্কুল-ফাইন্যালে পুরো একশো পেয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে তার জন্ম। তখনো আকাশে ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ অম্লান। তখনো আশায় বিশ্বাসে জ্বলজ্বলে মন। ছেলের নাম রেখেছিলেন আনন্দপ্রসাদ।

আনন্দ।

একবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন শিবপ্রসাদ। বরাবর ভালো ছাত্র। এই নীলুর সঙ্গে অনেক মিল ছিল তার ছেলেবেলায়। এমনি শান্ত, নরম, ফুটফুটে চেহারা। কথা কম বলে, তলিয়ে থাকে নিজের ভেতরে। স্বরাজ যখন উদীয়মান নেতা, তখন টেবিলে সরস্বতীর ছবিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে সে অঙ্কের পর অঙ্ক কষে যায়।

তিনটে লেটার নিয়ে পাশ করল। একটা স্কলারশিপ।

'আমি এন্‌জিনীয়ারিং পড়ব, বাবা।'

'খুব ভালো—খুব ভালো। উই নীড্ এন্‌জিনীয়ার্স টু বিল্ড্ আপ আওয়ার কান্‌ট্রি।'

আনন্দ ভর্তি হল এন্‌জিনিয়ারিংএ। এক বছর—দু' বছর। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তারপর—

না—এই শান্ত নিরীহ ছেলেগুলোকেই বিশ্বাস নেই। এরাই বুকের ভেতরে সব চেয়ে ভয়ংকর আগুনকে নিঃশব্দে বয়ে বেড়ায়—বাইরে থেকে বুঝতেও পারা যায় না। সাধে কি ইংরেজ আমলের আই-বি'রা সব চেয়ে ভালো ছাত্রদেরই বিপ্লববাদী বলে সন্দেহ করত?

সেই ইতিহাস যেন ফিরে এসেছে আবার। মরণ নিয়ে খেলা। সর্বাত্মক বিপ্লব। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজী ধ্বংস হোক। সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম। রাইফেলই শক্তির উৎস।

আনন্দ চলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আগুনে। এখন পুলিশ তাকে খুঁজছে। মার্ডার চার্জ তার নামে।

ঠোঁট চেপে বসে রইলেন শিবপ্রসাদ। না—একটা কথাও তিনি ভাববেন [illegible]

[[illegible] ১৩৭৫ [illegible]]

বার বার তিনবার। অ্যাপোলো-১১ এবং ১২-র সাফল্যের পর ১৩ চাঁদে নামছে। ফুটবল বা ক্রিকেট নয়, চাঁদ নিয়ে খেলায় হ্যাট্রিক করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

অ্যাপোলো-১৩ কলকা-কসরৎ এবং চমকের দিক দিয়ে তার পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যাবে, সৌরজগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু নতুন তথ্য জানিয়ে দেবে।

১৩-র তিন আরোহীর মধ্যে দুজন—লোভেল এবং হেইজ চাঁদের পাহাড়ী এলাকায় নামছেন।

এর আগে প্রতিবেশী উপগ্রহটির সমতল এলাকা নিয়েই তুষ্ট ছিলেন অভিযাত্রীরা। চাঁদের ঝঞ্ঝা বা শান্তসাগরে ও'রা নেমে-ছিলেন।

কিন্তু এবারে নামার জায়গাটা অন্যরকম; দারুণ বন্ধুর ও ভীষণ পর্বতসংকুল বলতে গেলে।

অবশ্য পর্বতের গায়ে ও'রা নামছেন না, নামছেন ঠিক তার পাদদেশে, অসমতল ফ্রা মাওরো এলাকায়।

এই ফ্রা মাওরো আসলে একটা বিরাট গহবর, ১৫০ ফুট এর গভীরতা। আর চওড়ায় এ হল ৯০০ ফুট। চারিদিক থেকে পর্বত একে ঘিরে রেখেছে এবং সেই পর্বত এর পার্শ্ববর্তী বেড়াটিকে ছাপিয়ে ২৫০ থেকে ৪০০ ফুট অবধি উঠে গেছে।

চান্দ্র-বিজ্ঞানীদের ধারণা, চাঁদের পাহাড়-পাদদেশের এই ফ্রা মাওরো এলাকাতে রাশি রাশি পাথর ইতস্তত ছড়ানো। দীর্ঘ-দিন আগে চাঁদের গর্ভ থেকে ওরা উৎক্ষিপ্ত হয়। বিরাট এক উল্কা প্রতিবেশী-উপগ্রহটিকে আঘাত করেছিল সেদিন। উপগ্রহের বুকে বিরাটকায় 'ইমব্রিয়াম্ বেসিন' সৃষ্টি করেছিল।

এই 'ইমব্রিয়াম্ বেসিন্'-এরই কিছু নুড়ি আর পাথর সংগ্রহ করা হচ্ছে এইবার। এ ছাড়া, চাঁদের খানিকটা ভেতর থেকেও মালমশলা আনা হচ্ছে।

চাঁদের মাটি খোঁড়ার জন্যে অভিযাত্রীরা আগে থাকতেই প্রস্তুত। 'ইলেকট্রিক ড্রিল' সঙ্গে থাকছে ও'দের। ওদেশের ১০ ফুট তলদেশের মাটি সহজেই যাতে ও'রা পেতে পারেন, সে ব্যবস্থা হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, চাঁদ-অভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত এসব মাটি আর পাথর খুবই মূল্যবান হয়ে উঠবে আমাদের কাছে। কারণ, ওদের থেকেই হয়তো বা আমরা জানতে পারবো চাঁদের বয়স, সৌরজগতের জন্মরহস্য ইত্যাদি।

চাঁদের বয়স জানার চেষ্টা অ্যাপোলো-১১ এবং ১২-র বেলাতেও হয়েছিল, কিন্তু এই ১৩ সব দিক দিয়েই পূর্বসূরীদের টেক্কা দিচ্ছে।

[illegible]

[illegible]

	অ্যাপোলো-১১	অ্যাপোলো-১২	* অ্যাপোলো-১৩
নভশ্চররা মোট যে পরিমাণ সময় চাঁদে ছিলেন	২১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট	৩১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট	প্রায় ৩৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
নভশ্চররা যতক্ষণ চাঁদে হেঁটেছেন	২ ঘণ্টা ৩১ মিনিট	প্রথম দফায় ৩ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট এবং পরের দফায় ৩ ঘণ্টা ৫০ মিঃ	দু' দফায় মোট ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা। এক এক দফায় ৪ থেকে ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট করে
অবতরণস্থল	শান্তসাগর (সমতল এলাকা)	ঝঞ্ঝাসাগর (সমতল এলাকা)	পাহাড়ী এলাকা ফ্রা মাওরো
চান্দ্রযান থেকে হেঁটে নভশ্চররা যে দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন	প্রায় ২০০ ফুট (৬০ মিটার)	প্রায় ১,৩০০ ফুট (৪০০ মিটার)	৩,৩০০ ফুট (১ কিলোমিটার)
চাঁদে অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য	পরিচালনার এবং যন্ত্রপাতির ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে চান্দ্রযান পূর্বনির্দিষ্ট অবতরণস্থল থেকে ৪ মাইলেরও বেশি দূরে (৬·৫ কিলোমিটার) অবতরণ করে।	চান্দ্রযান পূর্বনির্দিষ্ট অবতরণস্থলের ১০০ ফুটের (৩০ মিটার) মধ্যে অবতরণ করে এবং এটা সম্ভব হয় চান্দ্রযানটি মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় অল্প গতিবেগে অ্যাপোলো-১২'র প্রভাব না-পড়ার ফলেই।	মূল মহাকাশযান চান্দ্রযানটিকে নিয়ে চাঁদ থেকে ৮ মাইলেরও কম (১২·৮ কিলোমিটার) দূরে এগিয়ে আসছে। এর আগে চাঁদের এত কাছে মূল মহাকাশযানগুলোর কোনোটিই আসেনি। এটা করা হচ্ছে চান্দ্রযানের জ্বালানি বাঁচাবার জন্যে
চাঁদের মাটিতে কতটা গর্ত খুঁড়ে পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে	প্রায় ৮ ইঞ্চি (২০ সেণ্টিমিটার)	প্রায় ৩২ ইঞ্চি (প্রায় ৮০ সেণ্টিমিটার)	প্রায় ১০ ফুট (৩ মিটার)
চাঁদ থেকে যে-পরিমাণ মাটি এবং পাথর পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে	৪৭·৬ পাউণ্ড (২১·৪ কিলোগ্রাম)	প্রায় ৭৫ পাউণ্ড (প্রায় ৩৫ কিলোগ্রাম)	প্রায় ১০০ পাউণ্ড (৪৫ কিলোগ্রাম)
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে চাঁদে স্বয়ংক্রিয় যে-সব যন্ত্রপাতি রেখে আসা হয়েছে	(১) সিস্‌মোমিটার বা চাঁদের কম্পন-পরিমাপক যন্ত্র (২) লেসার মিরার বা চাঁদ-পৃথিবীর দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র (৩) সৌরবায়ুর গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে পরীক্ষা। (নভশ্চররা পরীক্ষার মালমশলাগুলো সংগ্রহ করে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। ফলে, ওঁরা চাঁদের দেশ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এ পরীক্ষাটিরও পরিসমাপ্তি ঘটে)	(১) সিস্‌মোমিটার বা চাঁদের কম্পন-পরিমাপক যন্ত্র (২) 'লুনার ডাস্ট্ কালেক্টার' বা চান্দ্রধূলা সংগ্রাহক যন্ত্র (৩) ম্যাগনেটোমিটার বা চৌম্বক-শক্তি নির্ধারক যন্ত্র (৪) 'সোলার উইণ্ড স্পেক্‌ট্রোমিটার' বা সূর্য থেকে আগত পারমাণবিক বস্তু-পরিমাপক যন্ত্র (৫) আয়ন ডিটেক্‌টার বা আয়ন-পরিমাপক যন্ত্র (৬) কোল্ড্ ক্যাথোড্ আয়ন-গেইজ্ (চাঁদের ভেতর থেকে বেরিয়ে-আসা গ্যাস-বিশ্লেষক যন্ত্র) (৭) সৌরবায়ুর গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে পরীক্ষা	(১) সিস্‌মোমিটার বা চাঁদের কম্পন-পরিমাপক যন্ত্র (২) 'লুনার ডাস্ট্ কালেক্টার' চান্দ্রধূলা সংগ্রাহক যন্ত্র (৩) 'লুনার হিট্ ফ্লো ডিটেক্টার' বা চাঁদের তাপ-পরিচালন নির্ধারক যন্ত্র (৪) চান্দ্র-পরিবেশ সম্পর্কে পরীক্ষা (সূর্য থেকে চাঁদে আগত বস্তুসমূহের পরীক্ষা) (৫) কোল্ড্ ক্যাথোড্ আয়ন গেইজ্ (চাঁদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস-বিশ্লেষক যন্ত্র) (৬) সৌরবায়ুর গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে পরীক্ষা

* অ্যাপোলো-১৩ সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যগুলো এখনও পরিবর্তন-সাপেক্ষ।

কঠোরভ নিষেধ করেছিলেন। তাঁর এই আদেশ দিয়ে গুরুতর ভুল করেছিলেন সন্দেহ নেই। কারণ, সমাজবিরোধী লোকেরা এই সুযোগে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণ এইটুকুই নয়—একথা সকলেই জানে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন মহল যারা মনে-প্রাণে যুক্তফ্রন্টের বিরোধী ছিল, তারা এই ভুলের সুযোগ পুরোপুরি নিয়েছিল। তারা এমন নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করল, যাতে সমাজ-শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়ে এবং দেশের লোক যুক্তফ্রন্টের শাসনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাই হল মুখ্য কারণ।

জানি না বর্তমানে সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগ এখন কোন্ পথে চলবেন। কিন্তু একথা ঠিক যে, তাঁরা যে পথে সেদিনও চলছিলেন, সেটাই যথার্থ সংবাদিকতার পথ।

—ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী
রায়গঞ্জ,
পশ্চিম দিনাজপুর।

* * * *

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহক। পত্রিকাটির নিরপেক্ষতা এবং নির্ভীকতায় আমার কোন সন্দেহ নাই। ২রা এপ্রিলের সংখ্যায় 'পাঠকমন' বিভাগে পরেশ সুর (মনোহরপুর, চণ্ডীতলা) মহাশয়ের লেখাটি পড়িলাম। তাঁহার মতে ২৬শে মার্চের সম্পাদকীয় মন্তব্যের ফলে বসুমতী পত্রিকা (সাপ্তাহিক) তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে। সুর মহাশয় কোন্ যুক্তিতে এই কথা বলিলেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন, "আপনি ভাবিয়া দেখুন কিছুদিন পূর্বে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে বাড়ি চড়াও হইয়া ইহারা নির্যাতন করিয়াছিল।" তাঁহার উক্তির যথার্থতা প্রমাণ সাপেক্ষ। যাহা হউক, তাঁহার মত একজন নারী-দরদী ব্যক্তি কিভাবে একজন মায়ের নির্যাতনে চুপ করিয়া রহিলেন? মৃগনয়না দেবীকে কি তিনি পুরুষের পর্যায়ে ফেলিতে চান?

ছেলের রক্ত যাহারা মায়ের গায়ে ছিটাইতে পারে, আমি তাহাদের নর-পশুরও অধম বলিয়া মনে করি। আর যাহারা তাহাদের সমর্থন করে, তাহারাও ঐ পর্যায়েরই মানুষ। দুর্বৃত্তরা কেবল ছেলের রক্ত মায়ের গায়ে দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উপরন্তু তাঁহাকে মাথায় আঘাত পর্যন্ত করিয়াছে। সুর মহাশয় যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে তাঁহাকে দৈনিক বসুমতী পড়িতে বা দেখিতে অনুরোধ করি। দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় সেই ছবিও ছাপা হইয়াছিল। বর্ধমানের হত্যাকাণ্ড জ্যোতি বসু যে দৃষ্টি দিয়ে দিয়াছিলেন একথা বলিতে পারি না। তবে দুর্বৃত্তরা যে মার্কসবাদী, সে-কথা কাহারো অজানা নয়। তবে চিন্তার বিষয় এই যে, এইভাবে এতগুলি নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সাহস তাহাদের কে দিল? সম্মুখেই যেখানে পুলিশ পিকেট, সেখানে পুলিশই বা আসিল না কেন? পুলিশ সুপার কি পূর্বেই এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন? অথবা সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাইয়াছিলেন? সুর মহাশয়ের আদর্শ যদি "নারী নির্যাতনের বদলে নারী নির্যাতন" হয়, তবে আমি আর কিছু বলিতে চাহি না।

—শম্ভু রক্ষিত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি

* * *

২রা এপ্রিলের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তীর "ক্ষমা নেই" রচনাটি পড়লাম।

বর্ধমানের ঘটনা মর্মন্তুদ এবং জঘন্য, এ কথা একবাক্যে সবাই স্বীকার করবে। কিন্তু তার চেয়েও জঘন্য এই ঘটনাকে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে বিকৃত, অতিরঞ্জিত এবং সাজানো তথ্য সংযোজিত করে প্রচার করা। চক্রবর্তী মশায়ের "আগামীকালের ইতিহাস"ই বলে দেবে বর্ধমানের ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ কি—যেমন "সে" বলে দিয়েছিল রবীন্দ্র সরোবরের প্রকৃত তথ্য। তবে ঐ সব প্রচারকেরা ইতিহাসের তোয়াক্কা বড় একটা করে না; তারা জানে, সাধারণ জনতার মধ্যে সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারলেই কাজ তাদের হাসিল হয়ে যায়। পরের ইতিহাস যা-ই বলুক, জনতাও তা মনে করে বসে থাকে না, নতুবা, রবীন্দ্র সরোবরের তথ্য ফাঁস হওয়ার পর, "চতুর্দশী শুক্লার" গোয়েবল্‌স্-বিনিন্দ্য অবদানের পর ঐ সব তথাকথিত নিউজ পেপারগুলোকে টয়লেট-পেপারের চেয়ে বেশি মূল্য জনসাধারণ দিতো না। তাই তো বিস্মৃত একটি লিমারিকের দু'টি ছত্রকে ঐ সব প্রচারকেরা বীজমন্ত্র করেছে—ফন্দি এঁটেছি ভালো গো, আমরা ফন্দি এঁটেছি ভালো/ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতে পারিলে ঘোর লাল হয় কালো।

শ্রীচক্রবর্তী বর্ধমানের ঘটনা থেকে সুরু করে যাবতীয় খুন-জখম-রাহাজানির জন্য একটিমাত্র দলকে অপরাধী করেছেন—যার ত্রিবেণীর হত্যাকাণ্ডও সেই দলই করেছে! জ্ঞানের পরিধি এবং তথ্যের ভিত্তি যাঁদের ঐ সব সংবাদপত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ, এমন বেসামাল উক্তি তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। সেই কংগ্রেসী শাসনের আমল থেকে আজ পর্যন্ত এই পশ্চিম বাংলায় অপরাধ [illegible] হয়েছে, হচ্ছে বাংলার বাইরেও; তবু কিন্তু শোনা যায় নি, মানবদরদী এই 'আধুনিক বাল্মীকির' আবির্ভাবের কথা। বেলঘরিয়ায় সন্ত্রাসের রাজত্ব, কালোবাজারীদের অবাধ অপকর্ম, খাদ্যে ওষুধে প্রাণঘাতী ভেজাল দেওয়া কারবারীদের নিঃশঙ্ক স্বাধীনতা, যত্রতত্র রেল-ওয়াগন লুঠেরাদের শিবির, এ সবের মধ্যে কিন্তু শ্রীচক্রবর্তীর দল অসামাজিকতা দেখতে পান নি, দেখতে পান নি আইন-শৃঙ্খলার অভাব—কারণ, এ নিয়ে তো ঐ সব কাগজে গগনভেদী চীৎকার ছিল না, চীৎকার ছিল না যখন বিজয় ব্যানার্জীর বাড়িতে কিংবা লালবাজার থানায় বোমা ফেটেছিল। কিন্তু থাক্, প্রাক্-যুক্তফ্রন্ট আমলের অপরাধমূলক অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের, পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার এবং পুলিশী অত্যাচারের খতিয়ান দিতে গেলে মহাভারতের মতো খানকয়েক বই হয়ে যাবে, কিন্তু তা দিয়েও শ্রীচক্রবর্তীদের চোখ খোলান যাবে না। তিনি রাজ্যপালের ভাষণের তাৎপর্য বোঝেন না, যেহেতু তার মধ্যে জ্যোতি বসুর যোগ্যতার কিছু স্বীকৃতি আছে—এ থেকেই পাঠক সাধারণ বুঝতে পারবেন কী তিনি বুঝতে ইচ্ছুক, আর কী বুঝতে তাঁর রুচি নেই।

শ্রীচক্রবর্তীর চোখ ফোটানোর স্পর্ধা নিয়ে এ চিঠি লিখছি না—তার প্রয়োজনও নেই; বঙ্গ সাহিত্যে অনেক জঞ্জাল অতীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আবার কালের স্রোতে তা ধুয়েও গেছে; "ক্ষমা নেই"-এর মত ইদানীংকালের জঞ্জালগুলোরও পরিণতি তাই। কিন্তু আমার চিঠি লেখার প্রেরণা হচ্ছে—আমাদের প্রিয় সাপ্তাহিক বসুমতীর এ কি হল! আমার মত হাজার হাজার পাঠকের অনেক প্রত্যাশার বর্তিকা হাতে সাপ্তাহিক বসুমতীর আত্মপ্রকাশ। কংগ্রেস থেকে শুরু করে সি-পি-এম অবধি দলমত-নির্বিশেষে সকলের গঠনমূলক সমালোচনা করে সাপ্তাহিক বসুমতী আমাদের সত্যদর্শনে সহায়তা করে—প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-সমস্যার মর্মকথা। কিন্তু আলোচ্য রচনা এবং পর পর দু'টি সংখ্যার সম্পাদকীয় পড়ে আমরা মর্মাহত। আমাদের প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীর এ কি দৃষ্টিভঙ্গীর অধঃপতন, রচনাভঙ্গীর দৈন্যদশা! আশঙ্কা করছি, অচিরে সাপ্তাহিক বসুমতীকে সম্বোধন করে সখেদে আমাদের বলতে হবে—হে বন্ধু, বিদায়!

—[illegible]
[illegible]

চশমা বদলে দেখুন ঃ

বাংলা সাহিত্যে 'কিছু নেই' 'কিছু নেই' বলে যাঁরা রব তোলেন, আমার আশংকা, তাঁরা বাংলাসাহিত্যের বিস্তার বা গভীরতার কোন খবরই রাখেন না। সন্দেহ করি, তাঁরা কখনো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া লাইব্রেরীর মতো কোনো একটা গ্রন্থাগারের অন্ততঃ একটি পুস্তক তালিকাও চোখ বুলিয়ে দেখেছেন কি না। শহর ও মফস্বলের কোন কোন লাইব্রেরীতে মুদ্রিত অবস্থায় অথবা পান্ডুলিপির আকারে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। অসুবিধে এই যে, যত গ্রন্থাগার আছে তার একটি শ্রেণী-বিন্যস্ত সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ তালিকা রচনার কোন উদ্যোগ হয় নি এযাবৎ। এ বিষয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'বাংলাদেশের গ্রন্থাগার' বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; বহু পরিশ্রম করে তিনি কলকাতার ৪০টি ও হাওড়ার ১৬টি লাইব্রেরীর ইতিবৃত্ত সংকলন করেছেন তার প্রথম খণ্ডে। স্বভাবতই এতে তাদের ইতিহাস ও সংগঠনের দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং তার মূল্যও অসামান্য। কিন্তু বিচিত্রগামী বাংলাসাহিত্যের একটা নির্ভুল পুরো ছবি তা থেকে আঁকা যায় না। এমন একটি ছবি পাওয়া গেলে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে অনেকের বহু অকারণ সংশয় ঘুচিয়ে দেওয়া যেত।

তবু, আপাতত, বাংলাসাহিত্যকে তার যোগ্য মর্যাদাদানে কৃপণ ও কুণ্ঠিত পণ্ডিতবর্গের অভিযোগ যদি মেনেও নি, প্রশ্ন জাগবে, এজন্য দায়ী করা যাবে কাকে? তাঁদের কাছে সবিনয়ে জানতে চাইব এমন অন্য কোন একটি সাহিত্যের নাম তাঁরা করুন, যেটি রাষ্ট্রের বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সমৃদ্ধ এবং তাদের চিত্ত ও দৃষ্টিকে [illegible] করতে [illegible] [illegible]। আমরা বাংলাভাষাকে শিক্ষার বা রাষ্ট্র-কার্যের সকল স্তরে স্বীকার করে নিই নি; ওর যে ব্যবহারপযোগী কোন যোগ্যতা আছে, তা-ই মানি নি। এ যেন কোন অনাথ বালকের কারও অনাদর-কারুণ্যে আশ্রিত থেকে আপন প্রতিভাবলে বিদ্যা ও অর্থসামর্থ্যে সম্পন্ন হয়ে ওঠার মতো। কে অস্বীকার করবেন, বাংলাসাহিত্যের আজ যাই কিছু হোক তা কেবল বেসর-কারী দরিদ্র পাঠক-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা কোন জমিদার-বিত্তবানের অর্থানু-কূল্যে এবং বিদ্রোহী বাংলার সৃজনী প্রতিভাবলে হয়েছে? অবহেলা তো বটেই, বহুক্ষেত্রে সরকারী বিরোধিতাও অতিক্রম করতে হয়েছে আত্মশক্তি প্রয়োগে? একথা হলফ করে বলতে ইচ্ছে করে, আজ যদি বাংলাভাষা ও সাহিত্য রাজ-প্রশাসনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুশাসনে তার যোগ্য আসন ও আদর পেত, তবে বাংলা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য বহু সাহিত্যকে ম্লান করে দিত।

আর একটি প্রশ্ন ঃ যাঁরা এই নালিশ করেন, তাঁরা বাংলাসাহিত্যের অভাব-পূরণে সচেতন প্রয়াস করেছেন কতটুকু এবং করে না থাকলে কেন করেন নি? অতএব, অনায়াসেই এই রায় দেওয়া যায় যে, এসব নালিশ হয় অজ্ঞতাপ্রসূত, নতুবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এদিকে এটি গৌরবেরও বটে এবং ন্যায়শাস্ত্রের একটা ফাঁকিও বটে, যখন বাংলাসাহিত্যের দারিদ্র্য দেখাবার জন্য ঐ পণ্ডিতেরা বাংলাসাহিত্যকে ইংরাজী-ফরাসী - জার্মান - রুশ-চীন - আমেরিকা মিলিয়ে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করেন। বাংলাসাহিত্যের এমন অপণ্ডিত পাঠক কেউ নেই, যিনি নাট্যকারদের মধ্যে সেক্সপীয়র খুঁজতে বেরোবেন। কিন্তু বিদেশী শাসন-সংযত বাংলাদেশে নিতান্ত মুষ্টিমেয় স্বল্প ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর [illegible] অনাদৃত বাংলাভাষারই এক কবি বিশ্বনন্দিত নোবেল-প্রাইজ পেলেন, এর অসামান্যতাও তাঁর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। মহাদেশতুল্য পরাধীন ভারতবর্ষেরই এক অনাদৃত প্রান্তের কবি জগত-বরেণ্য হলেন, বাংলাসাহিত্য অন্ত-র্জাতিক আসন করে নিল ইংরেজ-শাসনের ছায়াতলে থেকেও। ভারতবর্ষের এক খণ্ডিত অংশ ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চৌত্রিশ বছর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের বাংলা-সাহিত্যের জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। একান্তভাবে বেসরকারী মুষ্টিমেয় পাঠক-সমাদৃত কোন সাহিত্যের এই রকম প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত কেবল বিরল নয়, অনন্যসাধারণ।

ইংরাজী, ফরাসী, রুশ, জার্মান, জাপানী, চীনা ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার নির্বিচার তুলনা হতে পারে না। কেননা বাংলাদেশের মতো কোথাও ভাষার এই বর্ণবৈষম্য নেই। জাপানী, চীনা, জার্মান, রুশ কি ফরাসীদের আমাদের মতো ইংরাজী ভাষাকে ব্রাহ্মণ করে তাঁদের ভাষাকে ব্রাহ্মণেতর বলে ঘোষণা করার দুর্ভাগ্য অথবা হীনস্পর্ধা হয় নি। ইংলন্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, জার্মানী, জাপান, চীনের রাজভাষা, কাজের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা একাকার এবং এই অভিন্নতাই সারা দেহে হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তপ্রবাহের মতো তাদের সাহিত্যের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র সবল, সুস্থ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বাংলাসাহিত্যের সে অবাধ অবকাশ কোথায়? এর অগ্রগতির চারদিকে এখন কৃত্রিম পাঁচিলে অবরুদ্ধ কানাগলিই বেশি; বাংলাদেশের সামগ্রিক মানসিকতার মধ্যেও একদেশদর্শিতার প্রাবল্য। সুবিধাবাদী রাজনীতির দলীয় চক্রে আবর্তিত একদল তথাকথিত শিক্ষার্থীকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে-বাইরে মাঝে মাঝে অগ্নিগর্ভ হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু—'আমার মায়ের ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা করতে হবে'—এই দাবীতে উদ্দীপিত হয়ে নয়; সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের বাইরে দীন-ভিখারিণী বাংলা মা যে হতাদরে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের আড়ালে এনা-মেলের ফুটো পাত্রটি নিয়ে ভুলুণ্ঠিতা তা এই 'সুদূর-দর্শীদের' দৃষ্টিতে পড়ে না। ইংরাজীই ওদের মুখ্য পাঠ্য, ইংরাজী বই-ই ওদের ভোগ্যপণ্য, কফির ধোঁয়ায় বসে ওরা ইংরাজী বইয়ে লেখা রাজনীতি বা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে। এমন একটা কাল গেল, যার দিবালোকে এমন মুহূর্ত দেখি নি, যে মুহূর্ত দাবী-দাওয়ার চীৎকারে সংক্ষুব্ধ নয়, কিন্তু একবারও কাউকে বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীতে ক্ষোভ করতে দেখলাম না। নানা বৈষয়িক দাবীদারদের রুদ্ধ আর্তনাদে ঐ বিরাট হর্ম্যের ভিতটা কেঁপে কেঁপে উঠেছে, কিন্তু আহা মরি বাংলাভাষা, মোদের গরব মোদের

ভাষা সঙ্গীতটি কখনো এ গৃহটিতে প্রতিষ্ঠা করেনি, শাসকগোষ্ঠীও এই মৌলিক কর্তব্যচ্যুতির জন্য [illegible] উদ্বুদ্ধ হন নি। এঁরা অবশ্য প্রয়োজনেই বাংলা শ্লোগান বা বাংলা বক্তৃতা দেন। কিন্তু একটা—বন্ধ্যা প্রতিশ্রুতির অতিরিক্ত বাংলাভাষার অগ্রাধিকার কিছু নেই। ওটা আধুনিককালের আন্তর্জাতিক-দৃষ্টি-সমাচ্ছন্ন বৃটিশ দফতরে একটা সরম-জড়িত রফা মাত্র।

সেদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সাধারণ সভায় চাঁদা বাড়াবার প্রস্তাব তুলে এক মর্মান্তিক আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দিলেন সম্পাদক মশাই। অর্থাভাবে নতুন বই কেনা দূরস্থান, পরিষদ পরিচালনার ব্যয়-সংস্থানও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অর্থাভাবে যেখানে গ্রন্থাগার [illegible] যাবার উপক্রম, সেখানে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাও অকল্পনীয়; দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশনা তো বড় কথা, বই সংগ্রহ রাখবার আলমারিও কেনা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি বাঙালী বাঙালীদের প্রাধান্যে গঠিত; কিন্তু ঐ নির্বাচিত বাঙালীদের বাংলাভাষা সাহিত্যের প্রতি কোনরূপ মমতা নেই। এ যে বাঙালী জাতির পরম লজ্জা; এ বোধও তাঁদের নেই। এই সব ব্যক্তিকে জাগাতে চেষ্টা করা মানে মৃত মানুষকে জাগানোর চেষ্টা। ওটা নির্বাচনের ব্যাপার হতে পারে কিন্তু দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ওঁরা কিছুই করবেন না এবং তখন কি করবেন তাও অনিশ্চিত। তাঁদের একথা স্মরণ করিয়ে দেবে কে যে, এ তাঁদের কারুণ্য নয়, এ তাঁদের দায়, তাঁদের কর্তব্য? বাঙালী সাহিত্যিক, বাঙালী পাঠক নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত; সংঘবদ্ধ হয়ে পালিটিক্যাল ব্ল্যাকমেল করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এই শ্রেণীর নিস্পৃহ গণতান্ত্রিক সরকারের কপালে [illegible] করে পিস্তল না তুললে ওঁরা কর্তব্য-সচেতন হন না মৌলিক মাতৃদায়েও। সুতরাং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যদি আরও কিছুকাল টিকে থাকে তো টিকবে ঐ [illegible] দয়াদাক্ষিণ্য বদান্যতায়ই। ক্ষমতালোভী রাজনীতিকেরা পাছে তাঁদের অবাঙালী নির্বাচন কেন্দ্রগুলো চটে, এজন্য বাংলাভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজভাষা করতে সাহস পায় না; এমন কি, [illegible] পত্রের মতো জীর্ণ ভিটেবাড়ী আগলানো মুমূর্ষু পিতামাতার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অনুদানেও হাত ওঠে না। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী বা বাঙালী সরকার যদি থাকত, আর কিছু না হোক, অন্তত [illegible] কীর্তিরক্ষার মতো; যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, [illegible] সাহিত্য [illegible] বিনিময় [illegible]।

পুরোনো শহরগুলোর প্রাণরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবার পরিবর্তে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কল্যাণী শহর নির্মাণ [illegible] মতো নতুন নতুন লাইব্রেরী ভবন তুলে দেশোদ্ধারের তালিকা পেশ করাও একরকম বিলাস। যেখানে আদৌ লাইব্রেরী নেই, সেখানে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার যুক্তি আছে, কিন্তু পুরোনো মুমূর্ষু লাইব্রেরী-গুলোকে উপেক্ষা করা অব্যবস্থিতচিত্ততারই লক্ষণ।

সুতরাং, এটি প্রমাণের জন্য কোন সুদক্ষ কৌঁসুলীর প্রয়োজন করে না যে, বাংলাসাহিত্য আজ যা তা সরকার-উপেক্ষিত আবহাওয়ার মধ্যেই, বঙ্গভাষী-দের মাত্র শতকরা ছাব্বিশজন শিক্ষিতেরও এক শতাংশ অথবা তারও ভগ্নাংশ সংখ্যক পাঠকের [illegible] পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট হয়েছে। আজ যে বাংলাসাহিত্য গল্প-উপন্যাস-চটুল সাহিত্যের আধিক্যে টাল সামলাতে পারছে না বলে অভিযোগ শুনতে পাই, তার কারণও এর আত্মরক্ষার অর্থসংস্থানে তড়িৎ অর্থাগমের পন্থা-বিস্তার। সে যে কাজের ভাষা হতে পারছে না, এও তার এক কারণ। চিত্ত-বিনোদনের উপজীবিকা হবার দুর্ভাগ্য এই কারণেই যে, কাজের সভায় তার ডাক পড়ে নি। একটি সিগারেট, এক পেগ..., এক পেয়ালা চা কি কফি, চারটি পট্যাটো চিপস; এক খণ্ড কবিতা; একটি মিনি গল্প; গল্প টেনে আবার খুলে উপন্যাস এবং শেষ পর্যন্ত পলাতকের বিবরে পালিয়ে সুখনিদ্রা—বাংলাসাহিত্যের কপালে তো এর বেশি কিছু হবার কথা নয়।

অবাক আশ্চর্য হতে হয়, ঐ সিগারেট-ডিক্যান্টার ধরার ঝোঁক আভিজাত্যের স্টাইল, মিনি-গল্প-উপন্যাস-পর্ণোগ্রাফি উত্তীর্ণ হয়েও অনুপ্রাণিত অনুপ্রেরিত লেখকের এক অব্যাহত সারি বাংলাসাহিত্যে কল্যাণব্রতে অম্লান জ্যোতির বর্তিকা প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেছেন। একেবারে হাল আমলের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন যে, [illegible]-কিউবা-আফ্রিকা [illegible] করে কিছু [illegible] লেখকের নকল রোমাঞ্চ সিরিজের ব্যবসার বাজারে একদল সত্যিকার সাহিত্যসাধক রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ প্রমুখের নব-মূল্যায়ন করছেন; স্বার্থসর্বস্বদের সচেতন-সঞ্চিত অসত্যের আবর্জনা সরিয়ে বাংলাদেশের স্বদেশপ্রাণ বিপ্লবীদের এবং ভারত-নায়কশ্রেষ্ঠ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুনরাবিষ্কার করছেন। এই সৃষ্টিধর্ম আরও এই কারণে বেশি প্রীতিপ্রদ হয়েছে যে, এই সময়েই একদল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] শংকর [illegible] [illegible]; [illegible] পয়ঃনালার অব্যাহত প্রবাহ উপেক্ষা করে প্রকৃত সৃষ্টি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং জাতির আত্মপরিচয় সহজলভ্য ও সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। পাঠকদেরও ধন্যবাদ, তারা এসব বই সাগ্রহে কিনে পড়ে সমাজজীবনের স্বাস্থ্যরক্ষা করছেন। রুচির ধাঁচে কিছু নতুনের [illegible] [illegible] শৈলেশ দের 'আমি সুভাষ বলছি' কয়েকটি সংস্করণের আশীর্বাদ পেয়েছে। লক্ষণীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ সীমার বাইরে, পাঠ্যপুস্তক হবার প্রত্যাশা না রেখেই, এঁরা যে এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন এতেই বাংলাসাহিত্যে প্রাণশক্তির লক্ষণ প্রকট। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষিত দেশকল্যাণব্রতী প্রকাশকের সংখ্যা বিরল; জাতির রক্ষার নামে সহজ-মুনাফার লটারীই খেলেন অনেকে; তাদের মধ্যেও যাঁরা অর্থাগমকে গৌণ করার ঝুঁকি নিয়ে এসব বই প্রকাশনায় অবতীর্ণ হন, তাঁরাও অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এই শ্রেণীর পাঠকও যে বিস্তর এবং লোকসানের আশঙ্কা নেই, সংস্কার মর্যাদাবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধির পুরস্কার পেয়ে তাঁরা তা বুঝতে পারেন। বাংলাসাহিত্য সর্বদাই মহত্ত্বের সৃষ্টিতে সম্ভাবনায় কম্পমান। হিন্দী প্রসার ও প্রচারের জন্য যে কোটি কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব থেকে অথবা বিভিন্ন ভাষাভাষী সকল ভারতীয়ের টাকা একটি মাত্র ভাষার [illegible] পুষ্টিসাধনে খরচ করা হচ্ছে, তার একটা ভগ্নাংশও যদি এই সব সাহিত্যসাধকের হাতে [illegible] পৌঁছোতো, তবে বাংলাভাষা-সাহিত্যে এক অসাধারণ কাণ্ড হতে পারত। অনেকেই রোমহর্ষক খবরও রাখেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বাংলার যে 'অমরকোষ' বের করা হচ্ছে, তার দুটি-বিচ্যুতি যাই থাক, তা কি বিষম আর্থিক সঙ্কটে পড়ে আছে, অথচ মহানুভব বেসরকারী ব্যক্তি বাংলা-সাহিত্যকে সাহায্য করতে প্রস্তুত তাঁদের কাছেও এ সংবাদ যথাযথ পৌঁছোয় না; কেননা, বিজ্ঞাপন দেবার অর্থসামর্থ্য এই সংস্থার নেই।

একবার কল্পনা করুন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপানের মতো পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্যের যাবতীয় সরকারী-বেসরকারী কাজ চলছে বাংলায়; রাজ্যের শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী [illegible] ও অন্যান্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বাংলায়, অধস্তন কনস্টেবল-সিপাহীরাও বলছেন বাংলায়, বিধানসভায় বিতর্ক বাংলায়, আইনের খসড়া, বিল, বিধি-বিধান, দণ্ডবিধি কার্যবিধি আইন বাংলায়, সূত্রলিপি, অনুলিপি বাংলায়। শিবপুরে, যাদবপুরে প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষা-শিক্ষণ চলছে বাংলায়। বিচারপতি রায় লিখছেন বাংলায়।

অথবা কল্পনা করুন, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিচ্ছেন ফরাসীতে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জার্মানে, জাপানের বিচারপতি রায় লিখছেন চীনাভাষায়, চীনের চেয়ারম্যান কথা কইছেন মার্কিনী ইংরাজীতে, ব্রেজনেভ বলছেন জাপানী ভাষায়।

কল্পনা করুন, প্রথমটা হলে বাংলা-সাহিত্য ও ভাষা কি হতে পারত এবং দ্বিতীয়টা হলে ইংরাজী-ফরাসী-জার্মান-জাপ-চীনাভাষার কি দুর্গতি হত।

অথবা কল্পনা করুন, বাংলাদেশে (হ্যাঁ, বাংলাদেশ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়) শতকরা একজনই কি আটানব্বইজনই বাংলা লেখাপড়া জানে, বেসরকারী সওদাগরী অফিসেও চলছে বাংলা এবং

বাংলা বই বিক্রি হচ্ছে হাজারে নয়, লক্ষ সংখ্যায়। পশ্চিমবাংলায় ৩॥ কোটি লোকের মধ্যে কম করে ধরলেও, পৌনে দু' কোটি লোকের ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ পাঠক বই কিনছেন কল্পনা করা যেতে পারে। এ কি নিছক আকাশকুসুম কল্পনা? কিন্তু বাস্তব সম্ভাবনা যেখানে বিরাজমান, সেখানে এ আকাশকুসুম হবে কেন? আজও যারা লেখাপড়া শেখে নি, তারা কোনকালেই লেখাপড়া শিখবে না? যদি তাই হয়, তবে সখেদে বলব, অধিকাংশ লোককে অশিক্ষিত রাখবার ষড়যন্ত্র চলছে—যে কারণে, দেশ স্বাধীন হবার পরও, বাইশ বছরেও শিক্ষার প্রসার ঘটল না; যাঁদের হাতে দায়িত্ব ছিল তাঁরা চান না শিক্ষা পেয়ে লোক সচেতন হয়ে তাঁদের নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

আবার কল্পনা করুন, ইংলণ্ডের শিক্ষিতের সংখ্যা আমাদের মতো মাত্র ২৬ শতাংশ এবং তাদেরও এক শতাংশ মাত্র ইংরাজী সাহিত্য পড়ে; ঐ এক শতাংশেরও ৯৯ ভাগ চিত্তবিনোদনের লঘু রচনা পড়ে। এই ইংরাজী পাঠকদের মধ্যে আবার বেশির ভাগই ফরাসী কিম্বা জার্মাণ কিম্বা বাংলা বই পড়তে ভালোবাসে। সেক্সপীয়ার সম্পর্কে বাঙালী শিক্ষিতদের যে ভাবালুতা, ইংরাজী শিক্ষিতদেরও টেগোর সম্পর্কে সেই ভাবাবেগ। দুঃস্বপ্ন? অথবা হাস্যকর কল্পনা? তবে বাংলাদেশে যা চলছে তা দুঃস্বপ্ন অথবা হাস্যকর নয় কেন? আসামের শিলচরে এবং পূর্বের বাংলায় বাংলাভাষা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিতে হয় কেন?

বাংলা যদি তার যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা পেত, তবে বাংলাসাহিত্যে কিছু নেই বলে যাঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করেন, তাঁদের মুখ বন্ধ করা যেত। তেমনি ইংরাজী ভাষা যদি তার যোগ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারত, তবে কি হত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, পাঠকমাত্রেই তা জানেন। বাংলা যেমন সংস্কৃত-প্রাকৃতের বন্ধুর ভূমি অতিক্রম করে আপন স্বাচ্ছন্দ্যের সমতলে এসে পড়েছে, ইংরাজীও তেমনি ল্যাটিন-ফরাসীর প্রতিবন্ধক ডিঙিয়ে আপন সত্তায় বিকশিত হয়েছে। পার্থক্য এই, বাংলাকে যেখানে রাষ্ট্রানুকূল্য না পেয়ে স্বতঃস্ফূর্তিতে এগোতে হয়েছে সেখানে ইংরাজী পেয়েছে রাজভাষার মুকুট। [illegible] সংস্কৃত যেমন ছিল একদা শিক্ষিত [illegible] [illegible] বা বর্ণশ্রেষ্ঠের [illegible], ইংলণ্ডেও তেমনি শিক্ষিত অভিজাতদের ছিল ল্যাটিন অথবা ফরাসী।

রবীন্দ্রনাথ [illegible] [illegible] বলেছেন ঃ

"[illegible] [illegible] [illegible] যিনি আমাকে (কোন মহিমায়) এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙালির যে কী মহৎ, কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধা সহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি-পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বঙ্গভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে, সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পূর্বতন এনট্রান্স পাঠ্য বাংলা গ্রন্থ দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য, কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

"এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।"

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসও দেখি ঃ "The only literature other than Latin which was known to whosoever had any knowledge of letters was the literature of France. ....Complete ignorance of anglo-saxon poetry is no barrier to understanding Chaucer but to be ignorant of French medieval poetry is to be entirely unacquainted with Chaucer's literary origins.*

এই বর্ণোচ্ছ নিরসনের পূর্ণায়ত রূপ আসতে সময় লেগেছিল। ফরাসী ও ইংরাজী স্বভাবতই ছিল পৃথক। বিজয়ী শাসকেরা বলতেন ফরাসী, বিজিতেরা বলত য়্যাংলো-স্যাকসন, যার সরকারী মর্যাদা ছিল না, সাহিত্যিক স্বীকৃতিও ছিল না। রাজদরবারের ভাষা ছিল ফরাসী, স্কুলের ভাষা ছিল ফরাসী, আদালতের ভাষা ছিল ফরাসী। আর ধর্মোপাসনা ও বিজ্ঞানের বিকল্প ভাষা ছিল ল্যাটিন। শহর-বাবুদের এবং জমিদারদের মধ্যেও এরই প্রভাব বিস্তার করেছিল, কেননা, তাঁরা প্রধানত ছিলেন নর্মান। ১২০৪-এ নর্মাণ্ডি হারিয়ে যখন সীমাবদ্ধ হতে হল গ্রেট বৃটেনে, তখনই বিজয়ীদের দৃষ্টি পড়ল নেটিভ ভাষার ওপর।

আমরা এ পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিজিত আদিবাসীদের প্রতি সমব্যথী; কিন্তু ঈর্ষা করি তার পরবর্তী অধ্যায়, যে অধ্যায়ে

> "..the English reigned alone; in 1350 it took place of French as the language of the schools; in 1362 it became that of the law-courts; and in 1399 it was used in Parliament for the first time Henry IV."**

সুতরাং, ইংরাজী সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে যাঁরা বাংলাসাহিত্যের দৈন্যে হাহাকার করে থাকেন, তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন, জিওফ্রে চসারকে ধরলে আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের বয়স ছ'শ বছর; আর আমাদের আধুনিক বাংলাসাহিত্যের আরম্ভ রামমোহনকে ধরলে দু'শ বছরও হয় না। এই মৌলিক বিচার্য বিষয়টির সঙ্গে এই মৌলিক বিষয়টিও বিচার্য যে, ইংরাজী ভাষা ১৩৫০ খৃস্টাব্দ থেকে রাষ্ট্রানুকূল্য পেয়েছে, আর বাংলাভাষা? আজও পায় নি। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেউড়ি পার না করে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নস্তরেও ঠাঁই পেত না।

ইনিস্টিটর কচি বদলে দুই চোখে এই দুটি জোল চশমা লাগিয়ে পণ্ডিতদের বাংলাসাহিত্যকে দেখতে বলব।

---

* A History of English Literature by Emile Legouis and Louis Cazamian, p. 14.

** ঐ, পৃঃ [illegible]।

(পূর্বানুবৃত্তি)

কিকুয়ুরা অন্যান্য উপজাতদের তুলনায় অবশ্য বরাবরই বেশি পরিমাণে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের রিসার্ভগুলির অবস্থা অনেকদিন থেকেই লোকাধিক্যের ফলে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল ; কয়েক জায়গায় প্রতি বর্গমাইলে এক হাজারেরও বেশি লোক একসংগে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের ক্ষোভের প্রধান কারণ : একদিকে তারা এই রকম দুরবস্থার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে আর অন্যদিকে তাদের কাছ থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া জমিতে ইউরোপীয়ান চাষারা কেউ ৫০০, কেউ ১০০০ একরেরও বেশি জমির একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে সুখে দিনযাপন করছে। ইউরোপীয়ানরা যখন প্রথম কেনিয়ায় পাকাপোক্তভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে, তখনই ওয়াইআকি হিংগার নেতৃত্বে কিকুয়ুরা নিজেদের জমি সংরক্ষণের উদ্দেশে যুদ্ধ ক'রে তাদের পরাস্ত করার চেষ্টা করে ; কিন্তু বিদেশীদের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিকুয়ুদের ভেতর ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর, আর তখনই তাদের বয়োবৃদ্ধরা ঐ যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হবার জন্য উপদেশ দেন। এ বিষয়ে এক বিখ্যাত কিকুয়ু-প্রবাদ তাঁরা ব্যবহার করেন : "মুন্থু টি ম্যাচু ওয়া ইরিগু ওয়াগাগো ওয়ো উমওয়ে উমওয়ে", অর্থাৎ মানুষজাতি একগোছা কলার মত নয় যে তাদের একটি একটি করে ছেড়ে ফেলা যায়। ওয়াইআকি, যাঁর সংগে লর্ড লুগার্ড "রক্ত-ভাই" অর্থাৎ বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, পরে কেনিয়ার সমুদ্রতীরে নির্বাসনে যাবার পথে কিবওয়েজিতে [illegible] মারা যান। ইউরোপীয়ানরা যে দখল করেছেন এবং সে হেতু ঐ সমস্ত জমিতে তাঁদের দখলকারিতা বর্তেছে—এর ভেতর নেই কোন সততা। কিকুয়ু নেতারা মনে করেন যে, তাঁদের অশিক্ষিত পূর্বপুরুষেরা সে সময় ইউরোপীয়ান শাসকদের যে সমস্ত অনুরোধ-উপরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝবার বা ইউরোপীয়ানদের মতের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এই সময় যদি ইউরোপীয়ানরা এদেশে বসবাস করতে না আসতেন, তাহলে কিকুয়ুরাই কালক্রমে কেনিয়ার জংগল ও অনাবাদী উচ্চভূমি, যা পরে 'White highlands' নামে কুখ্যাত হয়েছিল, সমূহতে চাষবাস আরম্ভ করতেন এবং সেখানকার সমস্ত জমিতে চাষাবাদ হবার পর ভবিষ্যতে আরও কি করতে হবে তাঁদের, তা তখন ভেবে দেখতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইউরোপীয়ান শাসকেরা তখনকার কিকুয়ু নেতাদের ধোঁকা দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা আমাদের সংগে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহারও করেছিলেন, যার অন্যতম একটি প্রকাশপন্থা ছিল তাঁদের বর্ণ-বিভেদ নীতি। ইউরোপীয়ানদের অনেকে শিক্ষিত আফ্রিকানদের সংগেও "সোয়াহিলি" ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাতেই কথা বলতেন না, যদিও এই ভাষায় তাঁদের দখল ছিল অতি সামান্য আর আফ্রিকানরা বেশ ভালই ইংরাজী বলতে পারতেন। বয়োবৃদ্ধ আফ্রিকানদেরও তাঁরা বালক বা বাঁদর বলে সম্বোধন করতেন। আফ্রিকানদের হোটেলে বা ক্লাবে প্রবেশের কোন অনুমতি ছিল না। ইউরোপীয়ান চালকের নিকট অশিক্ষিত আফ্রিকান [illegible] দাম কাল চামড়ার আফ্রিকানদের প্রাপ্য ছিল অশ্রদ্ধা ও অবহেলা।

কে এ ইউ-র দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক পদ্ধতিতে বিশেষ কোন ফল হচ্ছিল না। কিকুয়ুদের ভেতর অল্পবয়স্ক যুবকেরা বুঝতে পারেন যে, এমন এক দুর্দিন এগিয়ে আসছে, যখন তাঁদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভ করতে হলে আরও অনেক বেশি দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে। আপনারা, যাঁরা আমার উপজাতি কিকুয়ুদের সামান্য মাত্রও জানেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, এই রকম অবস্থায় একমাত্র শপথ গ্রহণের দ্বারাই সমস্ত উপজাতিকে একত্র করা সম্ভব এবং সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে নেতৃস্থানীয়দের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নি। আমি যতদূর জানি, এই অহিংস শপথের জন্ম হয় কিকুয়ু জেলার কিয়ামবু অঞ্চলে এবং এই শপথ গ্রহণের পিছনে কোন জোরজুলুম বা কে এ ইউ-র পরিচালনা কাজ করত না। এই শপথ গোড়ার দিকে নেওয়া হত সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন ও অনাপত্তিজনকভাবে। প্রথমে এর বিস্তার খুব আস্তেই ঘটে, হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্তই আস্তে এবং এর উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত কিকুয়ু উপজাতিকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ও চাষজমি দখলের জন্য একজোট করা। অবশ্য এই শপথ ক্রমশই সমস্ত দেশময় জাতি, উপজাতি ও ধর্মনির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ, তখন সমগ্র কেনিয়াবাসীর প্রয়োজন ছিল এই রকমই এক অস্ত্রের, যার দ্বারা তারা সকলে একজোট হয়ে নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারে ও ইউরোপীয়ানদের অধীনতা থেকে দেশকে আবার স্বাধীন করতে পারে। যদিও ১৯৫২ সালের অক্টোবর

জঙ্গলহীন ছিল, তবু, সেই সময়ও যদি বৃটিশ সরকার কয়েকটি ছোটখাট রাজনৈতিক অধিকার ও সুখ-সুবিধা, যা নাকি আজ মাত্র দশ-পনের বছর পরে নেহাৎই সামান্য বলে মনে হয়, আফ্রিকানদের হাতে তুলে দিতেন, তাহলে পরবর্তী দিনগুলিতে ভয়াবহ মাউ-মাউ বিদ্রোহের অগ্নিশিখা সমস্ত কেনিয়াকে এইভাবে গ্রাস করত না। গোড়ার দিকে এই বিদ্রোহকে সমূলে উৎপাটন করা ছিল খুবই সোজা, কিন্তু তখনকার বৃটিশ সরকার তা না করে এমন এক জঘন্য প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অসহায় বিক্ষিপ্ত আফ্রিকানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, যা বিংশ শতাব্দীতে আর অন্য কোন দেশে তাদের লোকেদের ওপর করা হয় নি এবং এইভাবেই মাউ-মাউ হিংসা ও প্রতিহিংসার দাবানল দেশের সমস্ত লোককে গ্রাস করতে সক্ষম হয়।

আগেকার দিনের কে সি এ-র প্রায় প্রত্যেক সদস্য ও কর্মচারীই এই শপথ গ্রহণ করেন, কিন্তু এর সঙ্গে কে সি এ প্রতিষ্ঠানের বা তাদের সমরকার শপথের কোন যোগাযোগ নেই। এখানে আমি আরও বলে নিতে চাই যে, যে হাজার হাজার আফ্রিকান পরে কেনিয়ার চোদ্দটি বন্দী-শিবিরে সরকারের কাছে সাক্ষ্যদান করেন, তার ভেতর একজনও কোনদিন শপথ গ্রহণের ব্যাপারে জোমো কেনিয়াট্টার কোন হাত আছে বলে বলেন নি। "মুজে" (সোয়াহিলি ভাষায় এর অর্থ হল এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং আমরা সকলে জোমো কেনিয়াট্টাকে সম্মান দেবার জন্য ঐ নামে অভিহিত করতাম) কেনিয়াট্টাকে তখনও তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করছিলেন, যাতে বৃটিশ সরকার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে আফ্রিকানদের শান্ত করেন। এখানে আর একবার বললেও অতিভাষণ হবে না যে, এই বিদ্রোহ কোন কেন্দ্রিক পরিচালনা ব্যতিরেকেই সাধারণ কিকুয়ুর মনে জেগে উঠেছিল ও আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সংকটের সময়, ১৯৫২-৫৪ সালে, বিদ্রোহ পরিচালনের জন্য একপ্রকার আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল নাইরোবি, কিকুয়ু প্রদেশ ও রিফ্‌টভ্যালিতে, যাদের প্রধান কাজ ছিল জঙ্গলে আত্মগোপনকারী বিদ্রোহীদের সাহায্য করা ও প্রয়োজনীয় রসদের যোগান দেওয়া। প্রথম দিকে এই সংস্থাগুলির কেন্দ্রিক পরিচালনার অভাবে একদল হিংসাপরায়ণ ও বদমায়েস লোক এগুলিকে নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতেও পেছপা হয় নি। দুর্ভাগ্যবশত এই রকম সুবিধাবাদীর দল পৃথিবীর সব দেশেই বর্তমান এবং কেনিয়াও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নয়। যদি বৃটিশ সরকার ঐ সময় রাজনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতির জন্য তৎপর হতেন, তাহলে হয়তো কেনিয়াট্টা ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা কিকুয়ু জনমতকে সুষ্ঠু পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন। এমন কি কেনিয়াট্টায় সরকার তোষণ-নীতির ফলে অনেক কিকুয়ু তাঁর নেতৃত্বকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করে এবং এ বিষয় যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, নাইরোবির কালোলেনী হলে মিটিং-এর সময় ও প্রবীণ চিফ ওয়ারুহিউর শবদেহ (এর মৃত্যু ঘটে ১৯৫২-র ৭ই অক্টোবর এক অজানা আততায়ীর গুলীতে) যাত্রার সময় কেনিয়াট্টাকে হত্যা করার জন্য কিছু লোক সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

মাউ-মাউ শব্দের ব্যবহার কোথায় এবং কিভাবে আরম্ভ হয়, এ বিষয়ে আজ অবধি ঐতিহাসিকরা নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। মুজে কেনিয়াট্টা বারবার এ-কথা বলেছেন যে, তিনি বা তাঁর লোকেরা এ শব্দ ব্যবহার করেন নি এবং তাঁরা এর উৎপত্তির মূলও জানেন না। কুখ্যাত "করফিল্ড রিপোর্টে" যদিও বলা হয়েছে যে, কেনিয়াট্টা এ বিষয়ে খুব ওস্তাদী চাল চেলেছেন ও কথার প্যাঁচে নিজেকে বাঁচিয়েছেন, তবু কেনিয়াট্টার জবানবন্দী শুধু এই কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি এ বিষয় সম্পর্কে সত্য কথাই বলেছেন।

নিম্নে কিভাবে এই বিদ্রোহ মাউ-মাউ নামে কুখ্যাত হয়ে ওঠে, তার বিবরণ দেওয়া গেল। কিকুয়ু বালক-বালিকারা খেলা করবার সময় প্রায়ই কোন কোন শব্দকে উল্টে-পাল্টে ব্যবহার করে ঃ যেমন ছোটবেলায় আমি নিজেই অনেক সময় "থিই-থিই"র (অর্থাৎ যাও, যাওর) বদলে বলেছি ইথি-ইথি, বা উমা-উমার বদলে "মাউ-মাউ"। একদিন সন্ধ্যাবেলা নাইভাষা অঞ্চলে এক বাড়িতে শপথদানের বন্দোবস্ত করা হয়। শপথ পরিচালকেরা সব সময়ই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন যে, ঐ সময় যেন কোন শত্রুপক্ষীয় বা পুলিশের লোক সেখানে না আসে এবং সেজন্য তাঁরা বাড়ির বাইরে পাহারার বন্দোবস্ত রাখতেন। ঐদিন রাত্রে প্রহরীকে বলা হয়েছিল যে, কোন বিপদের আভাষ দেখলে সে যেন "মাউ-মাউ" শব্দটি উচ্চারণ করে, যাতে শপথ পরিচালকেরা সাবধান হতে পারে অথচ পুলিশ বা শত্রুপক্ষ কিছু বুঝতে না পারে।

ঘটনাচক্রে সেইদিন রাত্রেই শপথদানের সময় পুলিশের আবির্ভাব ঘটে ও তারা "মাউ-মাউ" শব্দটি শুনে ফেলে। বাড়ির মধ্যে যাঁরা জমায়েত হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই পলায়নে সক্ষম হন, কিন্তু শপথদানের বিবিধ সামগ্রীগুলি (যথা ঃ জল, হাঁড়ি, গোবর, দুধ ইত্যাদি) থেকে যায়, যা পুলিশেরা বাজেয়াপ্ত করে। পরে পুলিশের রিপোর্টে বলা হয় যে, তারা "মাউ-মাউ" শব্দটি শুনেছিল, কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঐ সমস্ত সামগ্রী ছাড়া আর কিছু বা কোন লোক পায় নি। জিনিসগুলি থেকে তারা অনুমান করে যে, সেখানে কোন শপথ নেবার বন্দোবস্ত ছিল এবং এই থেকেই কিকুয়ুদের একত্রীকরণের শপথকে বৃটিশ সরকার "মাউ-মাউ" নামে অভিহিত করেন। কিন্তু বিদ্রোহের নায়কেরা তাঁদের কর্মপন্থাকে এই নামে কখনই অভিহিত করেন নি।

আমি পরে জেনেছি যে, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রিফ্‌টভ্যালির পারমিনাস কিরিটু নামক এক কিকুয়ু এই "মাউ-মাউ" শব্দের উল্লেখ করেন তাঁর 'সারমনস্'-এ (ধর্মপ্রচারের জন্য দেওয়া বাণীতে)। তিনি ছিলেন কিজাবে অঞ্চলের আমেরিকান প্রটেস্টাণ্ট মিশনের একজন ধর্মনেতা এবং ইনি পরে নাইভাষার ইউরোপীয়ানদের দ্বারা সংগঠিত "দীপ বাহিনীর" ("Torch Bearers") এক নেতারূপে কাজ করেন। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল সরকার পক্ষকে বিদ্রোহ দমনে নানাভাবে সাহায্য করা। পারমিনাস কিকুয়ু শপথের কথা অবগত হবার পর ধর্মযাজক হিসাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন ও এ বিষয়ে তাঁর সারমনসে এর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি জানতেন কিভাবে কিকুয়ু বালক-বালিকারা উমা-উমা শব্দকে উল্টে-পাল্টে মাউ-মাউ ভাবে ব্যবহার করে। তাই তিনি তাঁর বাণীতে এই শব্দের উল্লেখ করে সকলকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই বিদ্রোহও কিকুয়ু বালক-বালিকার খেলার মত নেহাৎই ছেলেমানুষী এবং বুদ্ধিমান ও কর্মঠ কিকুয়ু উপজাতির এ থেকে নিরস্ত হওয়া উচিত। পারমিনাসের বাণী থেকে এ শব্দ অনেক দূর অবধি পৌঁছয় এবং কালক্রমে কেনিয়ার রাজনৈতিক বিদ্রোহের নাম হয় "মাউ-মাউ"।

আমি কেবল বলতে চাই যে, এ নামের নেই কোন অর্থ, কিন্তু আজ পৃথিবীর লোক "মাউ-মাউ" শব্দকে জানে হীন, নীচ ও প্রতিহিংসার প্রতীকরূপে। পারমিনাস কিরিটুকে পরে বৃটিশ সরকার তাঁর সাহায্যের জন্য বি ই এম (British Empire Medal) পদবীতে ভূষিত করেন। ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, এই নামের সঙ্গে জড়িত সংস্থাকে পরিচালনা করার অভিযোগে সেই বৃটিশ সরকারই জোমো কেনিয়াট্টাকে তাঁদের কোর্টে অভিযুক্তও করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশের বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের মধ্যে একটা প্রবল উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই উদ্দেশে তাঁরা প্রধানত ছাত্রদের মাধ্যমেই কাজ চালাতেন। জানা যায়, তখনকার প্রথম স্থায়ী বৈপ্লবিক সমিতি (আত্মোন্নতি সমিতি) প্রতিষ্ঠার পূর্বে খেলাৎচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশনের শিক্ষকদের মাধ্যমে পাঠচক্র ইত্যাদি আয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছিল। বর্তমান আলোচনা উক্ত বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সীমিত রাখা হলেও, সেদিন এই জাতীয় কাজের আয়োজন ছিল সুদূরপ্রসারী। অনুরূপ একাধিক বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষকরা যে তাঁদের ছাত্রদের মনে দেশসেবার ইঙ্গিত নানাভাবে যুগিয়ে যেতেন, সেই আভাষ ইতিহাসের পাতায় স্পষ্ট পাওয়া যায়। তরুণ মনের এই খাঁচা বনিয়াদকে সুদৃঢ় করার পরিকল্পে সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। সেই কারণেই সম্ভবত তাঁর রিপন কলেজের প্রতিষ্ঠা। তরুণ মন নবযৌবনে পা বাড়িয়ে কলেজে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শুনতেন সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা। সুরেন্দ্রনাথ তখন ম্যাট্‌সিনির 'ডিউটিজ অফ ম্যান' নিয়ে ছাত্রদের কাছে পড়ে, শুনিয়ে, বুঝিয়ে, সেই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে উদ্‌বুদ্ধপ্রাণ। এই সকল বক্তৃতা যদিও সেদিন প্রধানত চলত রিপন কলেজের ক্লাসে, সেই বক্তৃতা শোনবার জন্যে অপর কলেজের ছাত্রসমাগমেরও অন্ত থাকত না।(ক) সুরেন্দ্রনাথ সেদিন কেবল ঐ জাতীয় বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন না। নিয়ে আসতেন অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন্‌ সোসাইটি) প্রমুখ মনীষীদের, তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিতেন উপস্থিত ছাত্রদের সংগে, আর তাদের শোনাবার ব্যবস্থা করে দিতেন উক্ত নায়কদের বাণী, স্বদেশ সেবার আহ্বান।

এইভাবে সেদিন একদিকে যখন বাংলার নব-যৌবন(খ) একাধিক পবিত্র ও বলিষ্ঠ আকর্ষণে উৎসাহিত ও উদ্ভাসিত হয়ে দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, অনেকটা সেই সময় ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই এসে উপস্থিত হয়। এই দিনে ভারতসচিব বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দেন এবং ১৬ই অক্টোবর সেই প্রস্তাব কাজে পরিণত করার জন্যে দিন স্থির হয়। এটি ছিল বাংলার জাতীয় ঐক্য নষ্ট করার এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তি দমন করার জন্যে লর্ড কার্জনের একটি জঘন্য কূটনৈতিক চাল(গ) বাঙ্গালীর সেদিন এই কথা বুঝতে দেরি হয় নি। ফলে প্রবল বিক্ষোভের ভিতর দিয়ে এক তুমুল আন্দোলনের ঢেউ দেশের প্রাণ-প্রবাহকে উদ্বেলিত করে তোলে সঙ্গে সংগে। —"বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল, তাহা ক্রমশ একটা নির্দিষ্ট রূপ লইয়া জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইতে লাগিল। বিপ্লবীদেরও ইহাতে অনেকটা সুবিধা হইল। দ্রুত নিজেদের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন।"*

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে উপরোক্ত হীন রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বিরাট সভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব ও সংকল্প গৃহীত হয়। বাংলায় তথা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সময় হয়েছিল সঙ্ঘবদ্ধভাবে বয়কট আন্দোলনের প্রথম ঘোষণা, আর বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গ-বিভাগ রোধ করার জন্যে আপোষ নিষ্পত্তিহীন এক প্রচণ্ড আন্দোলনের সূচনা। এর ফল সকলেরই জানা আছে।(ঘ) এই বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে বিপ্লবীরা সেদিন

(ক) বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ছাড়াও লেখকের এই বিষয়ে জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের কাছে। তিনি তখন ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র। আর স্বাধীন ভারতে বাংলার প্রথম গভর্নর স্বর্গত হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ছিলেন তাঁর সহপাঠী। তাঁরাও যেতেন উক্ত বক্তৃতা শুনতে রিপন কলেজে।

(খ) ১৯০২-১৯০৩ সালে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন রিপন কলেজের ছাত্র। ('লোকসেবক'—১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫৪) তিনিও এই সময় অরবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন।

(গ) শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী, শ্রীসর্বপল্লী গোপাল প্রমুখ বর্তমান গবেষকদের অভিমত—উক্ত কূটনৈতিক চালের জন্যে 'কার্জন' ব্যক্তিগত দায়ী ছিলেন না। তখনকার বিচক্ষণ ইউরোপীয়ান্‌ সিভিলিয়ান চক্রের বাঙালী-বিদ্বেষী মনোভাবের একটা বলিষ্ঠ প্রভাবই কার্জনকে ঐ কাজে বাধ্য করেছিল।

(*বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী—পৃঃ ৩৭)।

(ঘ) প্রসঙ্গত মনে পড়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আর ১৫ই আগস্টের কথা। ১৪ই আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন করাচীতে গেলেন পাকিস্তান ডোমিনিয়ন উদ্বোধন করার জন্যে, আর ১৫ই আগস্টের মধ্য রাত্রে ফিরে এসে জন্ম দিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের। মার্চ ১৯৪২ সাল থেকে সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারীর স্বারায় তদানীন্তন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশে একাধিক বেতার ভাষণ ও পত্র প্রেরণ শূন্যে মিলিয়ে গেল। আর সুদীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অখণ্ড-ভারতের জন্যে স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসও ব্যর্থ হল। প্রকাশ, এইভাবে দেশ বিভাজনের প্রধান সমর্থক ছিলেন

সুরু করে দেন সংগঠনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে। সেই সময়, প্রধানত 'আত্মোন্নতি সমিতি'র চেষ্টায় বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি শাখা সমিতি সংস্থাপিত হয়, এই কথা জানা যায় প্রখ্যাত বিপ্লবী গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। নিকসন্ সাহেবের ১৯১৭ সালের গুপ্ত রিপোর্টেও এই সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করা আছে। তিনি লিখেছেন—"১৯০৬ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় ছিল পি মিত্র ও সতীশ বসু পরিচালিত 'কলকাতা অনুশীলন সমিতি', ২৭নং কানাই ধর লেনের আলাদা মেসে 'ছাত্র ভাণ্ডার', আর প্রভাস দে(ঙ) পরিচালিত 'আত্মোন্নতি সমিতি'। অনুশীলন সমিতি অপর সংস্থাগুলি থেকে এক-প্রকার স্বতন্ত্র ছিল এবং এইভাবেই তার অস্তিত্ব বজায় ছিল, যদিও সকল দলগুলির মধ্যেই একটা সুস্পষ্ট যোগাযোগ বিদ্যমান থাকত। অনেকটা এই সময় সমগ্র বাংলায় একটা সমিতির জাল প্রকট হয়ে উঠেছিল, আর প্রত্যেকটি দল উক্ত এক বা একাধিক দলের কাছে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ থাকত।"

অপরদিকে ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঘোষিত হয় যে, ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) ১৯০৬ সালে বঙ্গ-বিভাগের কাজ সুরু হবে। প্রতিবাদে ঐ দিন বাঙালীরা পালন করেন অরন্ধন ও রাখিবন্ধন। অন্যদিকে বারীন্দ্রকুমার, হরিশচন্দ্র, বিপিন-বিহারী(চ) প্রমুখ বিপ্লবপন্থীরা এই সময়কার জাতীয়তাবোধের সুযোগ নিতে ভুল করেন নি। তাঁরা উক্ত বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত ও পরিপুষ্ট করে সারা বাংলায় ঘুরে ঘুরে সঙ্ঘ-সমিতি স্থাপন করার কাজে সচেষ্ট হন, আর সেই সঙ্গে গুপ্ত-সমিতির মতবাদ গুপ্তভাবেই প্রচার করার সচেষ্ট হন। ফলে গুপ্ত-সমিতির সংখ্যা বাংলা দেশে এই সময় থেকেই বাড়তে আরম্ভ করে। তবে এই সকল প্রচেষ্টা সেদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় প্রচেষ্টা অপেক্ষা উন্নততর আর কোন পন্থা সেদিন সম্ভব হোত কি না, সেই বিষয়ে বর্তমানে সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমানে তথাকথিত স্বাধীন দেশে এই জাতীয় মানসিক প্রস্তুতির চেষ্টার অভাব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রকট। দল-গত ক্ষমতার মোহ, মানুষের ক্ষণিক সমন্বয় বিধানের শক্তিকেও বিলুপ্ত করে দেশের ভবিষ্যৎকে যে কোথায় নিয়ে চলেছে, সেই কথা এখন বোঝা কঠিন। প্রকৃষ্টভাবে গণ-সংযোগের মাধ্যমে সেদিনকার বিপ্লবীরা প্রয়োজনীয় সংগঠনের কাজ চালাতে হয়তো সক্ষম হন নি, এই কথা যেমন সত্য—পর্বতপ্রায় দুরধিগম্য নানাপ্রকার বাধাও যে তাঁদের ঐ প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়েছিল, ঐ কথাও তেমনই সত্য। কিন্তু বর্তমানে সেই পরিস্থিতির যে বহুল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় কোথায়? কিন্তু বর্তমান অবস্থাতেও আজ পর্যন্ত দেশসেবকরা প্রকৃত জ্ঞানের বার্তা গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে পরিবেশন করার কাজে আন্তরিক ব্রতী হয়েছেন বলে তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার পরিচয় এই সেদিনেও পাওয়া গেছে সুদূর পল্লীবাসীদের কাছ থেকে, যাঁদের অনেকেই হয়তো ঐ দিনে কলকাতায় পদার্পণ করেছিলেন জীবনের সর্ব-প্রথম। তা' ছাড়া ১৪।১৫ বছরের কিশোর যারা ডেলি-প্যাসেঞ্জার হিসেবে কল-কারখানায় কাজ ক'রে নিজেদের দরিদ্র পরিবারের জীবনধারণের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকতে বাধ্য হয়, তাদের সঙ্গেও একটু আলাপ করলেই উপরোক্ত আন্দাজ বদ্ধমূল হ'তে পারে। এই সকল প্রত্যক্ষ করলে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—"আমি একজন সোস্যালিস্ট্ বা সমাজতন্ত্রবাদী। এই পদ্ধতিটিকে যে নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ মনে করি এমন নয়, তবে অভুক্ত থাকা অপেক্ষা অর্ধভক্ষণ ভাল, এই কারণে"।* (*ওয়ার্কস্ অফ্ স্বামী বিবেকানন্দ, পার্ট ৪র্থ, পৃঃ ৩৫৩—মায়াবতী

সর্দার প্যাটেল। এই সম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উক্তি—"কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে দেশ বিভাগের প্রধান সমর্থক সর্দার প্যাটেল......আহত অহমিকা আর উত্তেজনার বশে তিনি দেশ বিভাগের সমর্থনে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন......নিছক ক্রোধের বশেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, বিকল্প না থাকলে দেশ বিভাগ প্রস্তাবই গ্রহণ করা উচিত" ইত্যাদি।* (*ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম্—পৃঃ ২০৭)। বিপ্লবী-দের অধিকাংশই তখন কারাগারে আবদ্ধ। তাঁদের প্রাণের কথা—"হাঁ, স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্যে আমরা সর্বস্ব পণ করেছিলাম, সেই স্বাধীনতা নয়।"* (*নীরব কর্মী হ রি শ চ ন্দ্র শিকদার—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১০)। আজও তার রেশ চলেছে কাশ্মীর সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা, আরো কত সমস্যা নিয়ে।

(ঙ) প্রশ্নের শ্রীকালীপদ বাগচী বলেন (৬।১০।৬৫ তারিখে আলোচনা প্রসঙ্গে শোনা)—১৯০৬ সালে বাংলা দেশে রংপুর অঞ্চলে যখন প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, প্রভাস দে বিপ্লবী দল সংগঠনের উদ্দেশে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। এই স্থানেই প্রফুল্ল চাকী ও প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাঁর সংস্পর্শে আসেন সর্বপ্রথম। আর এইভাবেই আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়।

(চ) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চিরবিপ্লবী-বীর বিপিনদা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—"নিজে আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য হিসাবে থাকিলেও সকল দল, সকল কর্মকে নিজের মধ্যে স্থান দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন, সশস্ত্র-বিপ্লব, নিরুপদ্রব আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক তিক্ততা আপনাকে কঠোর করিয়া স্বাধীনতার নির্ভীক বার্তা হইতে টলাইতে পারে নাই।......বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে প্রকাশ্য সভা-সমিতি, প্রতিবাদ ও প্রতিকার প্রচেষ্টার পার্শ্বে জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য আত্মোন্নতি গুপ্তভাবে চলিতেছিল"। বর্তমান উদ্ধৃতি ব্যক্তিগত হলেও আলোচ্য সময়ে ব্যক্তিগত ও দলগত সংগঠন প্রচেষ্টা, উভয়ের ওপরেই যথেষ্ট আলোকপাত করে।

জীবন)—। তিনি অন্যত্র বলেছেন—"আর অনুকম্পা অধিক শক্তি কোথাও আছে কি? তোমরা কি তাদের জ্ঞান দান করতে পার? এমন কোন দেশের নাম করতে পার, যেখানে ধনীরা সত্যই কোন লোককে সাহায্য করেছে! সর্বত্রই মহৎ কাজ অনুষ্ঠিত হয় মধ্যবিত্তের দ্বারায়।"* (*পূর্বোক্ত পুস্তক—পৃঃ ২৯৩)। অতঃপর সংগঠনকে জীবন্ত রূপ দেবার ইঙ্গিত—"তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি 'ফণ্ড' করিবার চেষ্টা কর।......সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর, গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব ও কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীবদিগকে, এমন কি চণ্ডালদিগক পর্যন্ত জড় কর, তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম-উপদেশ দাও, তারপরে ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ্ক, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর।...... পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পরিচালনা [illegible]......কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা হইতে প্রকৃত কর্ম, যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল।... নেতা হইতে যাইও না। সেবা [illegible]। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে...।"* (*'যুগ-ভরী'—ব্রহ্মচারী মাধবচৈতন্য সঙ্কলিত, পৃঃ ৩৫,৩৬)। এখন থেকে ছয়-সাত যুগ আগের কথা, ১৮৮৫ সালের উক্তি—"লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় বারাণসী কিংবা বৃন্দাবনে দেবমন্দিরে প্রবেশদ্বারের অভিনব সংস্কার সাধনে! সেই সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির জাঁক-জমক বাড়ানোর প্রকল্পে।......কিন্তু এই সকল সংঘটিত হয়ে থাকে, যখন জীবন্ত ভগবান অন্নাভাবে মৃতপ্রায়।" কিন্তু অবস্থার আজও প্রতিকার হয় নি, বরং আরো অবনতি ঘটেছে।

প্রতিকার? প্রতিকারের আভাষ দিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। তিনি বলতেন, এই সকল গরীব-দুঃখীদের, তথা ভারতীয় গণ-সমাজের যে জাতীয় সেবার প্রয়োজন, তা' হচ্ছে তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার, শিক্ষার বিস্তার। আর সেই শিক্ষা তাঁদের মধ্যে ছড়াতে হবে প্রধানত মুখে মুখে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হয়, বর্তমানে পৃথিবীর যে সকল দেশ শিক্ষিত, [illegible], তার প্রায় সকল দেশেই প্রধান [illegible] কাজ ছিল শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজনীয় উপযুক্ত পন্থায়। এই ক্ষেত্রে রাজনীতির মাধ্যমে দলগত প্রচার কখনই উপযুক্ত নয়। প্রকৃত শিক্ষা ও তদুদ্ভূত জ্ঞানের ছোঁয়াচ মানুষের মনে একবার যথাযথভাবে লাগলে, মানুষ নিজের কর্তব্য নির্ধারণ নিজেই করে নেয়। তখন আর নির্বাচনের জন্যে মাঠে-ঘাটে বক্তৃতা করে বেড়াতে হয় না, দলীয় পরিকল্পনায় ধোঁকা দিয়ে, কিংবা পয়সার সাহায্যে ভোট ক্রয় করা, অথবা ঐ জাতীয় অপর কোন উপায়ে দলীয় শক্তির প্রদর্শনী ইত্যাদি সহজসাধ্য হয় না। তবে আলোচ্য কাজে

[illegible], জয়, যশ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির স্থান [illegible]। প্রশ্ন ত্যাগের [illegible])

আজ কিন্তু প্রতি পদে পদে প্রত্যক্ষ হয়, অপেক্ষাকৃত শক্তি সঞ্চয় করতে না করতেই চলে দল গঠন, আপন আপন মতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সে যে উপায়েই হোক। এর নিরক্ষর গণ-সমাজকে যৎসামান্য বুঝিয়ে পড়িয়ে, নানাভাবে মানুষকে প্রলুব্ধ করে, দলীয় সভ্য সংগ্রহ এবং তারই মাধ্যমে দল ও উপদলের সৃষ্টি। অতঃপর নির্বাচনের মাধ্যমে শক্তির লড়াই গণ-তন্ত্রের অভিশাপ।

প্রকৃত দেশসেবকের প্রতি তাইতো স্বামীজীর নির্দেশ—"রা জ নী তি ইত্যাদির সঙ্গে মিশে যেও না, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখ না।" তার কারণ, আমাদের মনে হয়, রাজনীতির চর্চা ক্রমে নিয়ে আসে মানুষের মনে শক্তির মোহ, ফলে সুরু হয় দল গঠন, পরে দলীয় সংঘর্ষ ইত্যাদি। এইভাবে মানুষ আন্তরিক সেবার আদর্শ থেকে ক্রমে সরে যায় দূরে, বহু দূরে। এই

(ছ) আবার এইরূপ চেষ্টার সাহায্যে গণ-শিক্ষার বিস্তার যতদিন না সম্ভব হয়, ততদিন পর্যন্ত গণতন্ত্র অপেক্ষা যতদূর সম্ভব নির্দোষ একনায়কত্ব অনেক ভাল। তাই সুভাষচন্দ্রের উক্তি—১৯৪১ সাল, অন্তর্ধানের সময়, কাবুলে অবস্থানকালে প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছিলেন, "ভারতে বৃটিশ শাসনের পরিসমাপ্তির পরে, কয়েক বছরের জন্যে অন্তত দেশে একনায়কত্বের প্রয়োজন।"*
(* স্প্রিইং টাইগার : হিউ টয়. পৃঃ ৬০)।

[illegible] সমস্যা [illegible] হস্তান্তরের পরে, কংগ্রেসসেবীদের প্রতি গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল রাজনীতি থেকে অবসর-গ্রহণ করে সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্যে। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। তার ফল আজ সুপরিস্ফুট।

কর্মী সংগ্রহের জন্যেও স্বামীজীর নির্দেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি চেয়ে-ছিলেন—স্কুলের ছাত্র ইত্যাদিকে সজাগ করতে, ঐ অসহায়, গরীব, অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে, তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারের কাজে। তাই তিনি বলতেন, "কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী মৃতকল্প হয়ে আছে। ধনী ও অবস্থা-পন্নকে, তাদের সেই জীবনীশক্তি সতেজ করে তোলার কাজে সাহায্য করতে হবে, আর কিছু নয়। তারপরে তাদের ব্যবস্থা তারাই করে নেবে। কিন্তু ধনী-দরিদ্র-চাষী ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম যাতে না বাধে, সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। অবস্থাপন্ন বা ধনীকে যাতে গালিগালাজ না করা হয় সেই বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন—স্বকার্যমুদ্ধরেৎপ্রাজ্ঞঃ—জ্ঞানী নি জে র কার্য উদ্ধারেই কেবল ব্রতী হবে।" উক্ত নির্দেশ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যে কোন প্রকার উগ্রপন্থার পরি-সমাপ্তি সাধারণত উগ্রপন্থার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই-তো আজ চতুর্দিকে 'লক্-আউট' ইত্যাদি ব্যাপার চলছে। কল-কারখানা দেশ থেকে দেশান্তরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। সেই কারণেই বোধহয় স্বামীজীর নির্দেশের সঙ্গে সকল দিক বিবেচনা করে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণে ব্রতী হওয়াই এখনও যুক্তিসঙ্গত হবে। বিগত বিশ বছর

[illegible] এই বিষয়ে [illegible] পাওয়ার পরেও আমরা যে [illegible] প্রকৃত ও প্রধান করণীয় কাজে অনেক পিছিয়ে আছি, সেই বিষয়ে সন্দেহ কোথায়।(জ) বহুদিন আগের কথা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ খৃঃ ক্যালি-ফোর্নিয়া থেকে লিখিত স্বামীজীর এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"আজ-কালকার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ, মহামারীর দিনে বলতে পার, কংগ্রেসের লোকেরা কোথায়। কেবল রাজ্যব্যবস্থাকে হস্তান্তর কর, এই দাবিই কি সকল কিছু? মানুষ যদি সত্যই কাজ করে, তাকে দাবি হিসেবে চিৎকার করতে হয় না।......'অকারণাবিষ্কৃতবৈরদারুণঃ'—অকারণে দারুণ শত্রুকে উত্তেজিত করার প্রয়োজন থাকে না।" বিংশ শতকের প্রারম্ভে উচ্চারিত স্বামীজীর এই সতর্কবাণী আজও একই বার্তা বহন করে আসতে দেখা যায়। বর্তমানে দেশের অবস্থা সকল দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে স্বামীজীর ঐ একই নির্দেশ প্রতিধ্বনিত হয়—দেশের সর্বাপেক্ষা বড় অভাব হচ্ছে শিক্ষার, কেবল শিক্ষা, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে শিক্ষার বিস্তারে ব্রতী হবে, এ' ছাড়া আর কোন পথ নেই। তবেই গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গণ-শিক্ষা বাদে গণতন্ত্র, প্রহসনের নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। যার ফলস্বরূপ বিরাট নিরক্ষর গণ-সমাজ মুষ্টিমেয় রাজনীতিকের হাতে কেবল যে ক্রীড়নকে পরিণত হয়, এমন নয়, মত ও দলগত প্রভাবে পড়ে নিজেদের মধ্যে প্রকৃত বিচার-শক্তির অভাবে রাজনীতিক বলিতে রূপান্তরিত হয়। প্রমাণ—বর্তমানে দেশের চতুর্দিকে সুপরিস্ফুট।

(জ) সহস্র সহস্র নিরক্ষর কৃষক, মজুর ইত্যাদির সমাগম, যেভাবেই হোক, সেদিন কলকাতায় দেখা গিয়েছিল সত্য এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়ত জীবনে সর্বপ্রথম সেদিন কলকাতায় পদার্পণ করেছিলেন, এ কথাও তেমনই সত্য। কিন্তু তাঁরা যে কোথায় এসেছেন, তুলনামূলকভাবে কি দেখছেন ইত্যাদি তাঁদের জানিয়ে দেবার জন্যে যদি কোন ব্যবস্থা থাকত, তা' হ'লে স্বল্প-পরিমাণে হলেও, তাঁদের কিছু জ্ঞান-দান করা হ'ত এবং তাঁদের [illegible] রাজধানীতে আসা [illegible] হ'ত।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একান্ন ॥

ডুয়ার্স! ভয়ঙ্কর ডুয়ার্স। বন আর জঙ্গলে ঘেরা বিচিত্র জগৎ।

ভয়ে বুক দুরু দুরু করে দুর্গামণির। সারাক্ষণ এক ভয়, অস্থির অশান্ত ভয় লেগেই আছে। ভয়ে চোখের পাতা দুটিও বুঝি ফোলা-ফোলা। বনের কাছাকাছি নতুন লোকালয় গড়ে উঠেছে। জানালা খোলো, অল্প দূরেই দেখা যাবে বন। দুপুরে শূন্য বাড়িতে সর্বক্ষণ হু-হু করছে হাওয়া। যেন হাওয়া বাড়িখানাকে পর্যন্ত উড়িয়ে ফেলবে। রাগে গ্রী-গ্রী করছে অষ্টপ্রহর। দাঁতে দাঁত চেপে ছুটে ছুটে আসছে তীব্র রাগে। রাত্রে এই হাওয়ার শব্দই যেন আরো জীবন্ত। যেন লক্ষ লক্ষ লোক মিলে ষড়যন্ত্র করছে চারদিকে। ফুলছে ফুঁসছে।

যতক্ষণ ঘুম না আসে, ভয়ে বুক দুরু দুরু করে দুর্গামণির। এমন কি স্বামীর পাশে মস্তবড়ো খাটখানায় শুয়েও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। বাতাসের শব্দ শোনে দুর্গামণি।

এমন না হোক, হাওয়ার শব্দ আগেও আরো শুনেছে। তাদের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরে পদ্মাপারে। সারারাত কী অশান্ত বাতাসের মাতামাতি! তাছাড়া সে রাক্ষসী পদ্মা নদী। কিন্তু তবু ভয় ছিল না ছোটবেলায়। একটুও ভয় ছিল না।

তারপর তার বিয়ে হল। সে আজ তিরিশ বছরের কথা। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। সে-ও যেন হয়ে গেল জন্ম-জন্মান্তরের কথা। মা-র ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিয়েছিল ঠাকুমা। বুড়ির দাপট ছিল খুব। পাকা চুল ছিল শনের দড়ির মত। নাকে সোনার নথ চিকচিক করত। বাপের একমাত্র মেয়ে ছিল ঠাকুমা। স্বামীর বিষয়-আশয়ও তাঁর নামেই লিখে দিয়ে গিয়েছিল। সেই সুবাদে বুড়ি ছিল জবরজ্যান্ত। তার কথায় প্রতিবাদ করতে পারেনি কেউ। বাবা তো বাবা। মা পর্যন্ত না।

তেরো বছরের মেয়ে দুর্গামণি পুতুল খেলার ঘর থেকে একেবারেই স্বামীর ঘরে আসল। কত দিনেরই বা কথা। আজ মনে হয়, এই তো সেদিন। অথচ কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেল তিরিশটা বছর। মা নেই আজ। বাবা নেই। ঠাকুমা তো বহুকাল বিগত। ভাবতে গেলে কান্না পায় দুর্গামণির। এখন সে একা। তার আর ভাই নেই। কেউ নেই। পার্টিশানের পর আত্মীয়-স্বজনেরা কে কোথায় গিয়েছে।

তারা নিজেরাও ভাসতে ভাসতে এল। এল এই জঙ্গলের রাজ্যে।

এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এখানে এলে শেষ পর্যন্ত? স্বামীকে প্রশ্নটা করেছিল।

শুনে বেকুবের মত তাকিয়েছিল পঞ্চানন। পরে বুঝতে পেরে অট্টহাস্য করে উঠেছিল।

নতুন জায়গায় এলাম বলেই তো বাড়ি হল, গাড়ি হল, এটা বুঝলে না গিন্নী? সোতার পানার মত ভাসছিলাম—

বাস্তবিক কথাটা সত্যি। পিছনের দিকে তাকিয়ে ভাববার মত। ভাবে সে কখনো। কিন্তু ভয় তার কিছুতেই যায় না। দিন-রাত্রি লেগে আছে। এই তো মোষের মত তার পাশেই শুয়ে ঘুম লাগাচ্ছে মানুষটা, তবু ভয় যায় না কেন? অথচ তার চোখের সামনেই তো বন-জঙ্গল পরিষ্কার হল। দেখতে দেখতে লোকজন এল। বাড়ি-ঘর। এখন তো জোর জমেছে ব্যবসা-বাণিজ্য।

তবু ভয়ে বুকে দুরু দুরু করে দুর্গামণির। সুন্দর ঝকঝকে দোতলা বাড়ির মধ্যে থেকেও ভয় যায় না। রাগ হয় দুর্গামণির। স্বামী পঞ্চাননের ওপরে। টাকা রোজগারের নেশায় পেয়েছে লোকটাকে। তাই ডুয়ার্সের এই বন-জঙ্গলে ঘেরা জায়গায় বাসা করে আছে। এখানে সঙ্গী-সাথী নেই দুর্গামণির। সেদিকে নজর নেই স্বামীর। আসলে একখানা আস্ত পুরুষমানুষ বটে। তিরিশ বছর দেখল দুর্গামণি। লোকটা খাটতে পারে মোষের মত। এক সেকেণ্ডের জন্যেও বলবে না, ক্লান্ত হল। ডুয়ার্সে এসে যেন লোকটার নতুন চেহারা দেখল।

তা বলে টাকা রোজগারের জন্যে না-খাটলে চলবে কেন? স্বামী পঞ্চানন অবাক। বেটে-খাটো দোহারা গড়নের মানুষটা। মাঝ দিয়ে সিঁথা করে। খাটো কাপড় পরে থাকে। সারা বছরে একখানা সার্ট। তাতেও যে কত দাগ লেগে থাকে, তার ঠিক নেই। বলে, বন-জঙ্গল নিয়ে কারবার করতে হয়, এক-আধটু দাগ লাগবে না? বলে আর হো হো করে হাসে।

খুব পান খায় পঞ্চানন। এই এক নেশা। একটার পর একটা পান চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। দাঁতগুলি লাল হয়ে গেছে তরমুজের বীচির মত। সর্বক্ষণ কষ গড়াচ্ছে ঠোঁটে। পানের বোঁটায় চুন নিচ্ছে জিভে লাগিয়ে।

আসলে একখানা আস্ত কাঠের ব্যবসায়ী পঞ্চানন। কাঠের ব্যবসায় দু' পয়সা রোজগার করেছে সে। আগে ঢাকায় ছিল। নারায়ণগঞ্জের বাজারে একটা সোডার দোকান ছিল তার। মেসিন ছিল। তারপর সেটা লাটে উঠল। সেখান থেকে ময়মনসিং। অলকা সিনেমার কাছে পানের দোকান খুলেছিল। তা-ও গেল। তারপর ধরল মাংসের ব্যবসা। মাংস ছেড়ে ফুল-ছড়ি ঘাটে কণ্ট্রাক্টের ব্যবসা। অনেক কাজ করেছে জীবনে। লালমণিরহাটে নিয়ে এল রসিকবাবু। লোকটার বড় বড় চাউনী ছিল। তার দিকে তাকাতো। দেখে কেমন ভয় করত দুর্গামণির। বুকের ভিতরটা গুমরে-মুচড়ে উঠত থেকে থেকে।

কিন্তু খারাপ ছিল না মানুষটা। সেই নিয়ে এল পঞ্চাননকে ডুয়ার্সের এই বাজারে। তারপর ধীরে ধীরে ঢুকল কাঠের ব্যবসায়। আজ কাঠের ব্যবসায় এত টাকা কামিয়েছে পঞ্চানন।

ডুয়ার্সে তার কাঠের ব্যবসায় তিন-চারটে ঘাঁটি। সারাদিন নিশ্বাস ফেলার সময় নেই পঞ্চাননের। সকালে উঠেই স্নান সেরে বেরোচ্ছে বাড়ি থেকে দই-চিঁড়ে খেয়ে। কপালে চন্দনের একটি ফোঁটা নিয়ে।

আটা চামড়ার [illegible] জুতোর মাল [illegible] শিলিগুড়িতে। [illegible] মুখে। ততক্ষণে [illegible] হয়ে গেছে [illegible] জাপিরও। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে দুর্গা-মণি। লোকটা গাড়িতে উঠল। জীপ কিনেছে একটা। বলাকওয়া নেই, বালুরঘাটে গিয়েছিল, কিনে নিয়ে এল একদিন।

গাড়ি তুমি কিনলে? শুনে গালে হাত দেয় দুর্গামণি। চোখে পলক পড়ে না।

খিক্‌খিক্ করে হাসে পঞ্চানন।

গাড়ি তো গাড়ি, ডুয়ার্সে সোনা ছড়িয়ে আছে, হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিতে পারলে সোনার বাড়ি করব।

বলে কি লোকটা। ভয়ে গুরু-গুরিয়ে ওঠে বুকটা। না, না—অত ভালো না। কী জানি কী আছে তাদের ভাগ্যে! অত টাকা কামিয়েই বা কি হবে? তাদের দু-জনের সংসার!

শুনে হাসে পঞ্চানন। বলে, যৌবন-কালে এখানে আসলে আরো দশটা বিয়ে করতাম—

এখনই বা করতে বাধা কী! রেগে অগ্নিমূর্তি দুর্গামণি। দু পয়সা রোজ-গারের সঙ্গে সঙ্গে লোকটার স্বভাব-চরিত্তির পাল্টাচ্ছে পর্যন্ত। কে জানে কী করে কোথায়। রকম-সকম ভালো লাগে না।

ঠাকুরের কাছে দশবার মাথা ঠোকে দুর্গামণি। দোহাই মা-লক্ষ্মী, মুখ রেখো মা আমার। লোকটা যেন বিপথে না যায়। অত টাকা-পয়সা আমার চাই না ঠাকুর। ঠাকুমার কথা মনে হয়। বলত, খুব করে বেঁধে রাখবি। কোনোদিকে তাকাতে দিবি না।

হি হি করে হাসত দুর্গামণি মজা পেয়ে। ঠাকুরমাটা যেন কী!

ঠাকুমার সঙ্গে আসতেন সান্যাল বাড়ির মেজ ঠাকুমা। বলতেন, তাতে কি হয়েছে? পুরুষ মানুষ হীরের তরোয়াল, ওতে দাগ লাগে না।

দাগ লাগে না বটে! লোকটার সংসারে একচুল যদি মায়া বসল। সারাদিন টাকা রোজগারের নেশায় পেয়েছে। আর টাকা রোজগারের জন্যে কী-ই যে না করতে হয়।

গাড়িতে করে নিয়ে এসে উপস্থিত একদিন নেপালী এক বৌ-কে। বলে, আমার দোস্ত জং বাহাদুরের বৌ। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে আনলাম।

শুনে মুখ ছাই হয় দুর্গামণির। দেখেই বুক কাঁপতে শুরু করেছিল। ফর্সা মুখখানা। চোখ দুটি শুধু ছোট ছোট। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। পরনে ওয়াস এ্যান্ড ওয়ার শাড়ি। হাতে ভ্যানিটি না কি বলে. ওই এক রকমের ব্যাগ হয়েছে আজকাল।

[illegible] কী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধুটিকে তো হাতের তাস বানিয়ে [illegible]।

[illegible] আর হাসে পঞ্চানন। [illegible] উঠে দিয়ে পানের পিক [illegible] [illegible] [illegible]।

আপনার কি খবর দিদি? [illegible] বলে নিন্দুকে সরল হাসিতে, এই কর্তাটিকে একেবারে হাতের বাইরে ছেড়ে দিয়েছেন?

দুর্গামণি বলে, আপনি বসুন, আমি চা-র ব্যবস্থা করি।

শুধু কি চা? বৌঠানকে আজ এখানে রেখে তবে ছাড়ছি! ওরে কে আছিস ওখানে? বলে হাঁক ছাড়ে পঞ্চানন।

চাকর একটা ছুটে আসে। —দাসবাবু কন্ট্রাক্টর দিয়েছে হরিণের মাংস। কাল গিয়েছিল শিকারে। হরিণ মেরে এনেছে। দেখ দিকি সামনের দিকে গাড়িতে কোথায় আছে—

হরিণের মাংসের কথায় দুর্গামণির একটি ছবি মনে আসে। জোর করে এক-দিন জীপে চড়িয়ে পঞ্চানন দুর্গামণিকে কাঠামবাড়ি ফরেস্টে নিয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার, দুর্গামণি আর পঞ্চানন। বনের ভিতরে ঢুকে এক জায়গায় জীপের আলোতে চোখে পড়ল দুটো হরিণ। আলোর চোখ ধাঁধিয়েছে তাদের। আর তার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের ট্রিগার টানল নিবারণ। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কাছে গিয়ে দেখা গেল হরিণটা মাটিতে লুটোচ্ছে। একটি অবশ্য পালিয়েছে। পঞ্চানন কী খুশি! সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য মনে আসে। দাসবাবু আসে মাঝে মাঝে। মস্ত কন্ট্রাক্টর। মালবাজারে বাড়ি আছে, নাগরাকাটায়, ধুপগুড়িতে বাড়ি হচ্ছে। শিলিগুড়ির রাস্তায় আছে গ্যারেজ। বলে, খবর কী বৌদি। চলুন দাদাকে নিয়ে লাটাগুড়ি থেকে ঘুরে আসি।

কেন, সেখানে আবার কী?

কী আবার! শিকার। ক্যাপস্টানের ছাই ঝাড়ে দাসবাবু। বসেছে একটা কাঠের টুলের ওপরে। দু'হাতের আঙুলে সব মিলিয়ে গোটা ছ'-সাতেক আংটি। চুলেও বুঝি কলপ চালাচ্ছে আজকাল। মাঝে ক'দিন দেখেছিল সাদা। এখন আবার কালো চকচক করছে। জবরদস্ত পোষাক।

সেদিন হয়েছে কী, পানবাড়ি হয়ে আসছি, দাসবাবু সিগারেটে টান দেন ঘন ঘন, সামনে পড়বি তো পড় এসে পড়ল ইয়া এক বাঘ। চোখের পলক পড়ে না দুর্গামণির। ভয়ে থমথম করে চোখ। এই কিছুদিন আগেই দাসবাবু মেরে এনেছিল মস্ত এক বাঘ। নিকটবর্তী কোন বস্তিতে হামলা

[illegible]। রোজই গরু-বাছুর [illegible] [illegible]। আর এমন শয়তান বাঘ [illegible] [illegible] কিছুতেই তাকে কাবু করতে পারছিল না। দাসবাবু খবর পেল কোথায়। ব্যাস, আর যায় কোথায়। সারা-রাত [illegible] ওপরে [illegible] বসে থেকে [illegible] করে মারল বাঘ।

বস্তি থেকে [illegible] একখানা ট্রাকের ওপরে শুইয়ে। কতলোক ভিড় করেছিল চারদিকে। [illegible] [illegible] ভেঙে পড়েছিল। শুধু একা দুর্গামণি যায় নি।

পঞ্চানন খবর পাঠিয়েছিল, দাসবাবু বাঘ মেরে আনল। যদি দেখতে চাও তো দেখে এসো। শুনে দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে পালিয়ে বাঁচল দুর্গামণি।

সেই দাসবাবুকে দেখেই চোখের পলক পড়ে না তার। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা। প্রায় চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। দেখে ভয় করে। চোখ লাল থাকে সর্বক্ষণ।

কী করে যে শিকার করেন আপনারা!

দুর্গামণি চা করে দেয় দাসবাবুকে। দাসবাবু একটার পর একটা সিগারেট খায়। একটা প্যাকেট খালি করে ফেলল।

রাত্রে পঞ্চানন বাড়ি ফেরে। অনেক রাতে। ওদিকে মস্ত একটা হর্তুকী গাছে রাত হতে-না-হতে কর্কশ শব্দে প্যাঁচা ডাকে। ডুয়ার্সের রাতবিরেত ভালো না। সেদিন আশুবাবুর বাড়ির সামনের রাস্তাতেই ভালুক দেখলেন ওঁরা। ফালা-কাটায় কাছাকাছি থাকেন ওঁরা। বেড়াতে এসে বলে গেলেন।

তা অমন আশ্চর্যেরও কিছু নেই। শালকুমার যে ওদিকে, শুনে পঞ্চানন বলল দুর্গামণিকে।

শালকুমার আবার কি? দুর্গামণি তাকায়। জীবনে নাম শুনল এই প্রথম।

ওদিকে শালকুমার বলে ফরেস্ট আছে একটা। ওখানে ভালুক বেশ আছে।

দুর্গামণি কিছু অবাক হয়। অমন সুন্দর নাম যার, সে আবার ভয়ংকর বন হতে পারে বুঝি এই প্রথম শুনল।—তা তুমি বাপু, রাত-বিরেতে ঘোরাফেরা একটু কমাও তো।

শালকুমারের ভালুক এখানে আসছে না কি? পঞ্চানন হেসেই বাঁচে না।

তা বাপু ভালুক না হোক—বন এখানে কতটুকুই বা দূরে।

সঙ্গে আবার এই জিনিসটা থাকে, জানে তো! পঞ্চানন বার করে দেখায় কোমরের খাপে গোঁজা ছোট্ট একটুকু একটা পিস্তল।

এ দিয়ে কি হবে?

কিছু এগোতে চাইলে গুলী করব।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে দুর্গামণি। মানুষটা সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমোয় অকাতরে। নাক [illegible]

সেকালের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু একালের অবহেলিত ক্যানিং টাউন

শ্রীমাখনলাল ঘোষ

প্রায় ১০০ বছর আগে কলকাতা বন্দরের এক প্রতিদ্বন্দ্বী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল কলকাতা থেকে মাত্র ২৮ মাইল দূরে। বাদা অঞ্চলের সেই গ্রামটিতে তখন যেতে হত নদীপথে। এখন সেই বিদ্যাধরী নদী মজে গেছে, এখন আর নদীপথে এখানে কেউ আসে না, আসে শিয়ালদহ সাউথ সেকশন থেকে ট্রেনে কিংবা গড়িয়া থেকে বাসে। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী আজো সুন্দরবনের এক মস্ত সিংদরজা। মাতলা নদীর ধারে সেই মৌজাটির নাম এখনো মাতলাই আছে, কিন্তু তার বহুপ্রচলিত নাম ক্যানিং টাউন বা পোর্ট ক্যানিং। লর্ড ক্যানিং-এর নামেই জায়গাটির নাম ক্যানিং হয় গত শতাব্দীতে। তিনি নিজে ওখানে বন্দর তৈরির প্রস্তাব সমর্থন না করলেও, তাঁর সময়েই ক্যানিং-এ বন্দর তৈরির পাকা বন্দোবস্ত হয়।

"১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে মাতলার রেলওয়ে খোলে। মাতলা বা পোর্ট ক্যানিং একটা প্রধান বন্দর হইবে, গভর্নমেন্টের মনে এই আশা ছিল। গঙ্গার মুখে চড়া পড়িয়া বড় বড় জাহাজ কলিকাতাতে আসা দুঃসাধ্য হওয়াতে, মাতলাতে একটা বন্দর করিবার কথা চলিতেছিল এবং পোর্ট ক্যানিং কোম্পানী নামে এক কোম্পানী করিয়া টাকা তোলা হইয়াছিল। শেষে মাতলাকে অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করা হইল। গভর্নমেন্টের রেলওয়ে খোলাই সার হইল।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৫৭)।

১৮৬৭ খৃঃ সাইক্লোনে পোর্ট ক্যানিং ভেসে যায়। এই সময় নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়েও জল ৬ ফুট উর্দ্ধে উঠেছিল। তারপর জার্মান বিশেষজ্ঞের মতে নদীর গতি বিপরীত দিকে ধাবিত হবার ভয়ে কোন জাহাজ এই বন্দরে প্রবেশ করে নি। মিউনিসিপ্যালিটিও ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন ছোট লর্ড মেয়ো ১৮৭১ খৃঃ বন্দর বন্ধ করে দিলেন।

মাতলা গ্রাম পুনরায় খাসমহলের অধীন হল। একবার ঝড়ের ফলে, দ্বিতীয়বার মানুষের অবহেলায় ক্রমে গৃহাদি ধ্বংস হয়ে পোর্ট ক্যানিং আবার জঙ্গলে পরিণত হতে থাকে।

ক্যানিং মিউনিসিপ্যালিটি তার স্বল্পায়ু জীবনে দশ লাখ টাকারও বেশি খরচ করে। ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে রেলপথ তৈরি করা ছাড়া সরকারও ২০ লাখ টাকা খরচ করেন সেই 'মাতলা উন্নয়ন প্রকল্পে'। ক্যানিং-এর উল্টোদিকে মাতলার অপর পাড়ে পাঁচটি, আর বিদ্যাধরীর ওপর দুটি জেটি তৈরি করা হয় তখন। এখনো ক্যানিং-এর উল্টোদিকের গ্রামটির নাম 'ডক'। তখন গ্রামরাস্তা ও একটি খানাকুলও তৈরি করা হয় এখানে। পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর বাড়িগুলি (যা এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি) ও পুরনো রাস্তার (এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড) ভগ্নাবশেষ দেখলে একটি নিষ্ফল প্রকল্পের কথা ভেবে দুঃখ হয়। নদীর ধারের এই ছোট ৫ বর্গ মাইলের শহরটি (?) আজও সাপ্তাহিক ভ্রমণের আদর্শ জায়গা।

এর পরের ইতিহাস আরও দুঃখবহ। শুধু শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। যারা দীর্ঘ পরিশ্রমে নিজের জীবন দান করে ক্যানিং বা সুন্দরবন বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে, তারাই হয়েছে এতদিন ধরে শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত।

তাই আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং টাউন (বর্তমানে পঞ্চায়েতের অধীন) যা সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার ক্যানিং আজ হিন্টার ল্যান্ড বা পশ্চাদ্ভূমি। অথচ এর অবস্থান শহর কলকাতার কাছেই। আবার এখানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রয়েছে, দুজন বি-ডি-ও, দুজন জে-এল-আর-ও, এস-ডি-ও (পি-ডব্লু-ডি), তিনটি ব্যাঙ্ক, থানা, হেলথ সেন্টার, পোস্ট অফিস, সিনেমা হল, চাউল কল ইত্যাদি ইত্যাদি। শহরের যাবতীয় উপাদান বর্তমান, তবুও গ্রাম্য এলাকা। সর্বাঙ্গে গ্রামের ছাপ নিয়ে দণ্ডায়মান। ধুঁকছে। (নিদেনপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে যাবার যোগ্যতা রাখে)। অথচ এর কী দৈনন্দিন, কী অর্থনীতি আষ্টেপৃষ্ঠে কলকাতার সঙ্গে বাঁধা। স্বাভাবিকভাবেই এই রকম না-শহর, না-গ্রামের আধি-ব্যাধি, সমস্যা, যাতনা, বেদনা যেমন, তেমনি তার আশা-আকাঙ্ক্ষাও নগর-প্রভাবিত।

তাই 'আবাদী শহর' ক্যানিং-এর পোর্ট ক্যানিং বা ক্যানিং টাউন নাম কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নামের মতই হাস্যকর বলে মনে হয়। যেখানে বর্ষায় হাঁটু পর্যন্ত কাদা আর ম্যালেরিয়া, গ্রীষ্মে প্রচণ্ড দহনে (জলের অভাবে) কলেরা ও অনিবার্য মৃত্যু; যেখানে বালকদের বিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রহ হয় না, হলেও রীতিমত বেতন দিয়ে পড়াবার যোগ্যতা অনেকেরই নেই; যেখানে আর একটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের স্বপ্নও সুদূরপরাহত; সেখানে একটা কলেজ, কি একটা সিনেমা থাকলে বা টেলিফোনে কথা বললে বা সরকারী তিনটা-চারটা অফিস বসালে, অথবা ঘটা করে বিদ্যুতালোকের ছটায় দেয়ালী সাজালেও, পোর্ট ক্যানিং নামটা পরিহাসের মতই শোনায়। শিল্পের সম্ভাবনা থাকতেও অবজ্ঞায়-অবহেলায় যা এখনও এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তাই এখনও কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু এরকম হওয়ার কথা ছিল না। একদিন অতীতের গর্ভে একটা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ লুকিয়েছিল।

ক্যানিং টাউনের বাজার এ অঞ্চলের মানুষের অবস্থার দর্পণ। শিল্পাঞ্চল না থাকার জন্যে লোকের হাতে পয়সা নেই। অথচ শহরের মত নানা উপকরণের চলনও বেশি। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের সে ছোঁয়া থেকে রক্ষা করবেন কি করে। কাজেই ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারও বাড়ছে। সাধারণ মধ্যবিত্তের এই রকম সামাল অবস্থা চলছেই। গরীব মানুষের জন্য কোনটাই
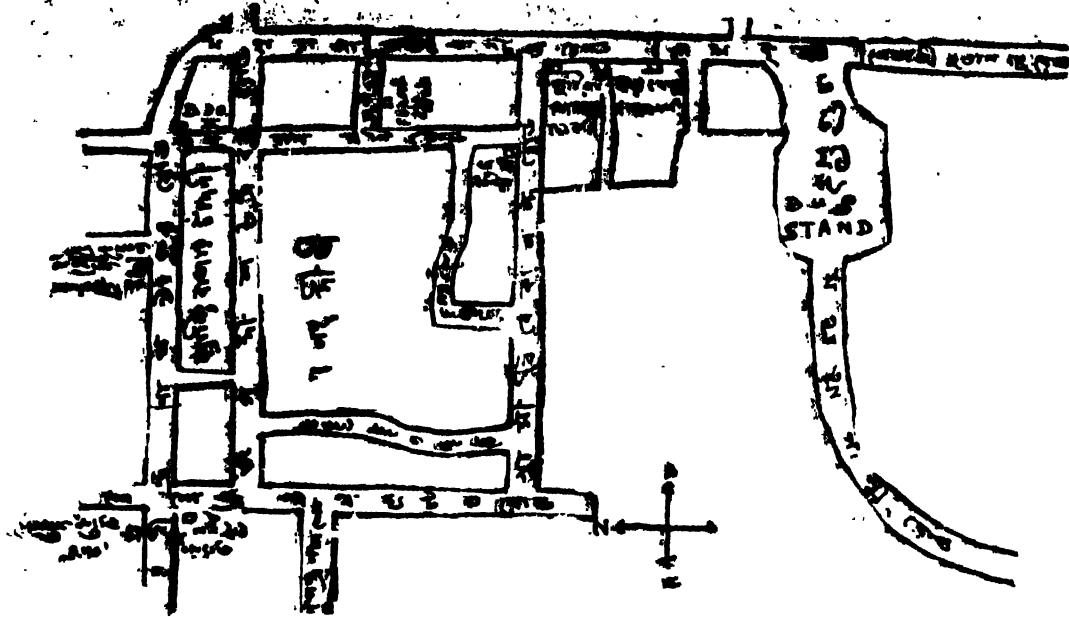
নেই। এর ওপর ধর্মঘট, মিছিল, মারপিট লেগেই আছে ক্যানিং-এ। কারণে-অকারণে হরতাল, বন্ধ, ঘেরাও এবং সমাবেশে সামিল হবার আহবান ক্যানিং-এর আকাশ-মাটি আলোড়িত করে তোলে।

ক্যানিং থেকে কলকাতা শহর ও শহরতলীতে প্রতিদিনই নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যের এক বিপুল অংশ—যথা, ধান, চাল, মাছ, ডিম, হাঁস-মুরগী, শাকসব্জী ইত্যাদি রপ্তানি হয়ে থাকে এবং বাজার এলাকা থেকে সরকারের বাৎসরিক আয় হয় প্রায় লক্ষ টাকা। বাজারটি চব্বিশ পরগনা জেলা কালেক্টরের অধীন। অথচ ক্রমাগত সরকারী ঔদাসীন্যে এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

তাই, এই অতি প্রাচীন শহর-বন্দরের অব্যবস্থা বর্ণনার অতীত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্কুল-কলেজের সংখ্যাও বেড়েছে, প্রয়োজনের তাগে নানা বিভাগীয় সরকারী অফিস খোলা হয়েছে। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্যানিং বাজারের রাস্তাঘাটের কোন উন্নতি তো হয় নি, বরং মেরামতির অভাবে এবং রাস্তাঘাট বে-দখল হতে থাকায় বর্তমানে রাস্তা-ঘাটের হাল আরও চরমে এসে পৌঁছেছে। বর্ষায় অগম্য এবং অন্য সময়েও জনসাধারণ যানবাহনের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক॥ এমন কি ড্রেন, বাজার সংলগ্ন স্লুইস গেট, বাজার চাঁদনীর স্টলের ছাউনি প্রভৃতি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। বাজার সংলগ্ন স্লুইস গেট দিয়ে প্রতি কোটালে নদীর নোনা জল প্রবেশ করে বাজার চাঁদনী প্লাবিত করে, ফলে চটিদার, দোকানদাররা ঐ সময়ে তাদের দোকান গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বর্ষার সময় চাঁদনীর স্টল-এর চাল ভেদ করে বৃষ্টির জল পড়ে। তাই স্টলহোল্ডাররা যদি খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তবে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

প্রতিদিন অর্ধলক্ষাধিক লোক বাজারে আসেন এবং বাজারের ওপর দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু বাজার এলাকায় সর্বজনীন কোন প্রস্রাবাগার ও পায়খানা নেই। তাই জনসাধারণ যেখানে-সেখানে (বিশেষ করে নদী-বাঁধের ওপর) মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে আরও নোংরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং নানা রকম রোগের ডিপো তৈরি হচ্ছে। এই সঙ্গে আবর্জনাময় নর্দমার দূষিত পরিবেশের মধ্যে অধিবাসীদের জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

রোজ রাতের সেই মাছের বাজার, যেখানে শেষ রাতে করে সুন্দরবনের চারিদিক থেকে মাছ এসে জমা হয় আমাদের ও কলকাতা শহর ও শহরতলীর মানুষদের শুভ সকালের জন্যে, সেই সরকারী মাছের বাজারটি দেখলে মনে হবে, কোন নরককুণ্ডে প্রবেশ করেছি। প্রতি রাতের মাছ ও বরফগলা জলে মাছঘাট এবং ঘাট-সংলগ্ন রাস্তার কাদা (কালো রঙের) প্যাচ্-প্যাচ্ করে, পা ফেলতেও ঘৃণাবোধ হয়। বর্ষার সময় তো কথাই নেই। ওখানে কোন সুপ্রশস্ত নর্দমা না থাকায় সেই জলরাশি বেরিয়ে যেতে পারে না।

এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের অভ্যন্তরে কোন পাকা রাস্তা নেই। অথচ কলকাতা কর্পোরেশনের মত মাতলা অঞ্চল পঞ্চায়েতও রাস্তাঘাটের নামকরণে সুনাম অর্জন করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ দুটি রাস্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড ও শৈলেন্দ্র-নাথ ঘটক রোড-এ কোনদিন যে সরকারী হাত (গত দশ বছরে) পড়েছিল, তা কেউ স্মরণ করতে পারছেন না। অথচ এই রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোক প্রতি-দিন যাতায়াত করেন এবং এই রবীন্দ্র-

নাথ ঠাকুর রোড-এর পাশেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিস রয়েছে। শত-বর্ষ পর্বের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে এই রাস্তা আজও ধুঁকছে। বর্তমানে এর চেহারা দেখে কুষ্ঠরোগীর কথা মনে করিয়ে দেয়।
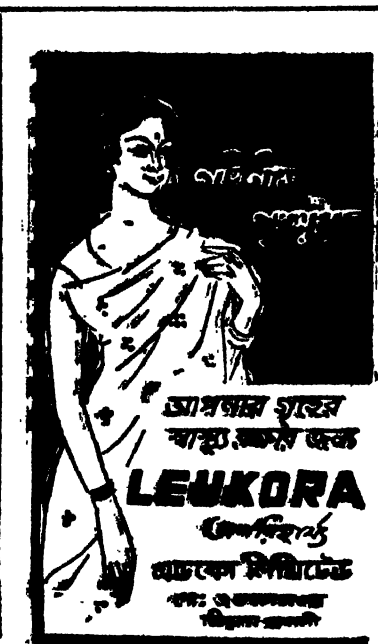
আবার ঐ রাস্তার (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড) দুপাশের জায়গায় বে-আইনী ঘর উঠছে সরকারী জায়গা আত্মসাৎ করে, ফলে দিন দিন ঐ রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই রাস্তার সংগেই একটি জলনিকাশী খাল আছে, কিন্তু সংস্কারের অভাবে সেখানে রোগের জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটছে ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর স্বামী বিবেকানন্দ রোডে (কাঁচা রাস্তা) ঢুকতেই নাকে কাপড় দিতে হবে এবং বর্ষাকালে কাপড় তুলে হাটতে হবে। এই রাস্তার সংগে একটি জলনিকাশী চওড়া নর্দমা (কাঁচা) নামেই রয়েছে। ওখানকার অধিবাসীদের অনেকেই (বিশেষভাবে শিশুরা) ঐ নর্দমার মধ্যেই মল-মূত্র ত্যাগ করে, অথচ সংস্কার হয় না, ফলে সব সময় দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ও-থেকে। এর ওপর একাধিক ভদ্রলোকের খাটা পায়খানার মল-মূত্র ঐ রাস্তার ওপর এসে পড়ে থাকে। একে ওখান থেকে হাটতে গেলে নাকে কাপড় চাপা দিতে হবে, তার ওপর মল-মূত্রও মাড়িয়ে যেতে হবে। বর্ষাকালে (বিশেষভাবে) ঐ স্থানটি নরককুণ্ডে পরিণত হয়।

গ্রীষ্মকালে শহরবাসীরা পানীয় জলের অভাবে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। প্রয়োজনের তুলনায় এখানে নলকূপের সংখ্যা অতি অল্প। ফলে ঐ সময়ে অধিবাসীদের প্রায়ই পুকুরের নোংরা জল খেতে হয়। তাই প্রতি গ্রীষ্মকালে কলেরা রোগে মরতে হয় অনেক হতভাগ্যকে। এতবড় যে পুকুর ৭নং দীঘি, তার জল কিন্তু অপেয়। এখনই ঐ পুকুরের জল থেকে একরকম পচা ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে, আর জলের ওপর একপ্রকার সবুজ রংয়ের সর পড়তে আরম্ভ করেছে। ঐ সর থেকেই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। যত গরম পড়তে থাকবে, ততই দুর্গন্ধ ও সরের মাত্রা বাড়তে থাকবে। কিন্তু আজও ঐ পুকুরটি আইনত জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয় নি।

ক্যানিং টাউনের লোকসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ এবং সেই সংগে আরও ১৫,০০০ বহিরাগত বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে এখানে বসবাস করছেন। তাই ১৯৬৭ সালে রাজ্য সরকার ৬৭,২০০ টাকা ব্যয়ে ক্যানিং-এ পাইপ ওয়াটার সরবরাহের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এখানকার জনসাধারণের দুর্ভাগ্য যে, এই পরিকল্পনা আজও রাজ্য সরকারের সম্পাদনের (এক্সিকিউশন) অপেক্ষায় আছে।

সরকারী ঔদাসীন্যের সুযোগে জবরদখল (রাজ্য সরকারের ও রেলওয়ের জায়গা) এত ব্যাপক যে শহরটি পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও ক্রমে অন্তর্হিত হচ্ছে। জবরদখলের উপযুক্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকায় লোকের মনে সাহস বেড়ে গেছে। স্বভাবতই জনসাধারণের মনে ধারণা জন্মেছে যে, সরকারী জায়গা যে কোনোভাবে একবার দখল করে সেখানে ঘর তুলতে পারলেই নিজের হয়ে গেল। ফলে রাস্তাঘাট সংকীর্ণ হয়ে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে।

জেটি-ঘাট একটি প্রহসন, নামেই আছে। এত যে গুরুত্বপূর্ণ মাতলা নদী—জলপথ ও মাছের সরবরাহক—সেটিও মজে যাচ্ছে, ফলে জেটিতে আর লঞ্চ ভিড়তে পারে না। এখন যেখানে লঞ্চ ভিড়ে, সেখানে কোন জেটি নেই। আছে সাধারণ একটি কাঠের সিঁড়ি। ফলে মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে ওঠা-নামার অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। শুধু তাই নয়, নতুন লঞ্চঘাটে যেতে হলে নদী-বাঁধই একমাত্র অবলম্বন। এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। বর্ষাকালে ঐ নদী-বাঁধ-কাম-রাস্তা দিয়ে হাটা, আর দড়ির ওপর দিয়ে হাটা সমান। ফলে বর্ষাকালে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

আবার, ক্যানিং জেটিঘাট সংলগ্ন—পূর্বদিকে প্রসারিত—মাতলা নদীর জেগে-ওঠা চরটি ভরাট করে শহরটি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। বস্তুত রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের অধীন ক্যানিং-এর পাইকারী মাছ-ঘাট এবং সেই সংগে বাজারের সম্প্রসারণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্থানের অভাবে সরকারী রাস্তাঘাট দখল করে জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে প্রতিদিন স্থায়ী-অস্থায়ী নানারকম বাজার বসে। প্রসংগত রেলের জমিতে সম্প্রতি গড়ে-ওঠা চালের বাজারটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ওতে সরকারী রাজস্বের এক মোটা টাকার অংক মার খাচ্ছে। কাজেই চরের জমিতে এই সব অস্থায়ী দোকানগুলির সম্প্রসারণ সম্ভব।

সরকারী প্রচেষ্টায় চর ভরাট হলে দোকানদাররা এখানে-সেখানে না বসে চরের জমিতে বসে বেচা-কেনা করতে পারবেন অথচ তারা স্থায়ী ঘর নির্মাণের সুযোগ পাবেন না। ফলে একদিকে যেমন ভবিষ্যতে শহর পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি হবে না, অপরদিকে সরকারের রাজস্বে মোটা টাকার অংক জমা পড়বে ও জনসাধারণও রাস্তায় চলাচলের অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

বিশাল সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এর আরণ্যক ভয়াবহতা যেমন প্রাণে শিহরণ জাগায়, এর নদীতীরবর্তী শ্যামল অরণ্যের মোহিনী মায়া সেইরূপ এক বিশেষ শ্রেণীর অরণ্য-প্রেমিকদের বারে বারে হাতছানি দেয়। তাই শীতের মরশুমে টুরিস্টদের ক্যানিং টাউনে আসতেই হবে। কারণ, নদীপথে সুন্দরবনে যাওয়া এখান থেকেই সুবিধা-জনক। তাই শীতের আগমনের সংগে সংগে রং-বেরংয়ের পোষাক-পরা পর্যটকদের আগমনে ক্যানিং শহরের পরিবেশ কিছু সময়ের জন্য রীতিমত জমজমাট হয়ে ওঠে। অথচ এইসব পর্যটকদের জন্যে ক্যানিং শহরের ওপরে কোন পর্যটক ভবন নেই এবং তাঁদের যানবাহন রাখার জন্যও কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ফলে পর্যটকদের নানা অসুবিধা ও হয়রানি ভোগ করতে হয়। মাতলা নদীর জোয়ার-ভাটার সংগে লঞ্চ সার্ভিসের সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে পর্যটকদের অনেক সময় কাটাতে হয় ক্যানিং শহরেই। অথচ তাঁদের অবস্থানের জন্য কোন সুব্যবস্থা নেই। সুতরাং ক্যানিং শহরের ওপরে 'পর্যটক ভবন' স্থাপনের দাবি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই শহরে, শীতের রাতে, সাড়ে ন'টারও পরে, লোক চলাচল বিরল হয়ে এলেও, এখানে, এই চারমাথার মোড়ে জনতা না থাকলেও জন ছিল। পানের দোকানে আলো জ্বলছিল, ক্রেতা ছিল। ফুচ্‌কোওয়ালাকে ঘিরে তিনটে মেয়ে, বয়সে যুবতী কি না বোঝা যাচ্ছিল না এখান থেকে, ফুচ্‌কো খাচ্ছিল। আর গাড়িবারান্দার নিচে সারবন্দী নানা-বয়সের ছেলে-বুড়ো-যুবতী কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল এবং গুটিকতক মস্তানগোষ্ঠের যুবক রাস্তার পাশে রেলিঙে ভর দিয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে হিন্দী গানের কলি ছুঁড়ে দিচ্ছিল সেইদিকে—যেদিকে তিনটে মেয়ে তখনও হাসছে, গড়িয়ে পড়ছে আর ফুচ্‌কো খাচ্ছে।

অমলেশবাবু সেদিকেই তাকিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, আমাকেও এসব দৃশ্য দেখে সময় নষ্ট করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও দেখতে হচ্ছিল। অথচ উঠতে পারছিলাম না।

যদিও এসব পথ আমার পরিচিত, তবে আজকাল আর এ পথে সাধারণত হাঁটি না। আজই কেন যে এ পথে এসেছিলাম, তার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল না। তবু এসেছি এবং অমলেশবাবুর ডাকে সাড়া দিয়েছি। দাঁড়িয়ে দু'কথা বলেছি। আর তিনি যখন নিজের হাতে টেবিলটার পাশে একটা নড়বড়ে টুল টেনে এনে বসবার আহ্বান জানিয়েছেন, তখন না বসে পারি নি। অথচ বাড়িতে দেরী করে ফিরলে শমিতা রাগ করবে। রাগ করবারই কথা। বেচারার মর্নিং স্কুল। অনেক ভোরে উঠতে হয়।

অথচ এই অমলেশবাবুর সঙ্গে বছর পাঁচেক তাস খেলেছি। জমিয়ে আড্ডা দিয়েছি আপিসের টিফিন ক্লাবে। তেলেভাজা, ঘুঘুনি, মুড়ি-পেঁয়াজ আর চায়ের শ্রাদ্ধ করেছি। সেই অমলেশবাবু যখন আজ এতদিন পরে এই শহরে, শীতের রাতে সাড়ে ন'টারও পরে ফুট-পাথের কোণায় নিজের হাতে টুল টেনে দিয়ে বললেন, আরে সমরেন্দ্র, বসো, বসো, কতকাল পরে দেখা। তারপর! কেমন? সব ভাল চলছে তো?

থমকে দাঁড়াতে হল। সেই কিস্তৃত ললাটের বলিরেখা, সেলের চশমা, সদাহাস্যময় মুখমণ্ডল। বললাম, আরে, অমলদা, কেমন আছেন?

—কেমন দেখছ? বুকটা চওড়া করে টানটান হয়ে দাঁড়ালেন অমলেশ।

—একই রকম। সেই দশ বছর আগে যেমন দেখেছিলুম, ঠিক তেমনি!

বলছ। মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল অমলেশের।

বলছি। হাসতে হাসতে বললাম—অবিকল একরকম চেহারা রেখেছেন। একটুও বদলায় নি।

—আই অ্যাম সেভেন্টি। বেশ জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন অমলেশ। তারপর আমার হাতটা ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, দশ বছর তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি—এইটেই আশ্চর্য। কিন্তু তুমি বলছ, আমি বদলাইনি

[illegible]

[illegible] বাসনার। [illegible] বললেন—

—সামান্য? বেশ কৌতুক বোধ করলেন অমলেশ—কিরকম শুনি।

যখন রিটায়ার করেন, তখন সামনের একটা দাঁত ছিল না, এখন দেখছি দুটো নেই—

কথা শেষ হবার আগেই হো হো করে হেসে উঠলেন অমলেশ। আর সেই হাসির রেশ ফুরোবার আগেই কয়েকটি নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি একসঙ্গে বেজে উঠল। সেদিকে তাকালেন অমলেশ। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। না। তারা সত্তর বছরের অমলেশের দুটো দাঁত নেই শুনে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। তারা তাদেরই কথাবার্তার কোনো প্রসঙ্গে হেসেছে এবং এখনও হাসছে।

—বিয়ে-থা করেছ—অমলেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

—তা করেছি। সহাস্যে উত্তর দিলাম।

আমার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজলেন তিনি। আর একবার ওই ফুচকো খাচ্ছে যে মেয়েগুলো, তাদের দিকে তাকালেন। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপল কয়েক মুহূর্ত, বললেন, বুড়ো হলে কৌতূহল বাড়ে, জানো তো—

একথার কোনো জবাব নেই। সুতরাং চুপ করেই রইলাম।

এবার মৃদু হাসলেন অমলেশ।—ছেলেপুলে হয়েছে?

—হয়েছে।

—ক'টি?

—একটি ছেলে।

—বা! বেশ বেশ। তা এখন আছো কোথায়?

—যেখানে ছিলাম সেখানেই।

—সেই কসবায়।

—হ্যাঁ অমলদা, সেই কসবায়।

—গুড! মাথা নাড়লেন অমলেশ। তারপর আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজলেন কয়েক মুহূর্ত ধরে। বেশ বড়গোছের একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার রাত করিয়ে দিচ্ছি! না?

সভ্যতার নাকি অনেক দণ্ড। আমাকে বলতে হল, না এমন আর কি! এখনও তো দশটা বাজেনি।

শীতের রাত দশটার কাছাকাছি এই চারমাথার মোড়ে ফুচকোওয়ালার শেষ খরিদ্দাররা এখন পানের দোকানে পান কিনছে। ব্যাগ হাতড়ে পয়সা বার করছে একজন। [illegible]

[illegible] পরিবারের [illegible] কাছে [illegible] দিলেন [illegible]

মুখোমুখি, [illegible], [illegible] আমিও দেখেছি [illegible]। কত [illegible] উড়িয়েছি। [illegible] কিন্তু—

থামলেন অমলেশ। সামনের [illegible] কেশ মস্তককে বেশ সন্তর্পণে হাত বুলালেন একবার। শূন্য দৃষ্টিতে ওপাশের পার্কের অন্ধকার জমে থাকা গাছগুলোর দিকে চেয়ে যে কয় কথাগুলো বললেন, সেগুলোকে গুছিয়ে বললে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে—

ওই যে মেয়েটার কাঁধ থেকে বার বার আঁচল খসে পড়ছে, ওই হচ্ছে হৈমন্তী, অমলদার ছোট মেয়ে।

বেশিদিনের নয়, মাত্র বছর পনের আগেকার কথা। সেই সময় হঠাৎ কি খেয়াল হল, একটা রেডিও কিনে ফেললেন অমলেশ। বাড়িতে এসে ছোট মেয়ে হৈমন্তীকে ডেকে বললেন, তোর জন্য একটা রেডিও আনলাম। গান শুনে শুনে গান গাইতে শিখে ফেলবি।

রূপরা হৈমন্তী সেদিন জানত না গান শিখতে গেলে রেডিওয় হয় না—দরকার আরও অনেক কিছুর। বছরে বছরে তার দেহ বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও। এরপর এল হারমোনিয়ম। তারপর গানের স্কুলে ভর্তি হল সে।

হ্যাঁ, অমলেশের সায় ছিল বৈকি। সন্ধেবেলায় মেয়ে যখন গান গাইতে বসত, বাড়ি থাকলে, তিনি কাছে এসে বসতেন। খুশিতে তাঁর মন ভরপুর হয়ে উঠত।

শুধু কি হৈমন্তীর গান শুনেই তিনি তৃপ্ত হতেন! যেদিন অমিল ডাক্তারী পরীক্ষার ফাইন্যালে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল, সেদিন বুকটা তাঁর ভরে উঠেছিল। কে জানত, কাউকেই তিনি জানান নি, এমন কি তাঁর স্ত্রীকেও নয়, এর জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করেছিলেন; অপিসের ছুটির পর দশ বছরে একনাগাড়ে দু'দুটো টিউশনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাধা দিয়েছিলেন তাঁর দু'-একজন শুভানুধ্যায়ী। আপার ডিভিশন ক্লার্ক হয়ে ছেলের শিক্ষার জন্য এতখানি ঝুঁকি নিতে তাঁরা নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু দমেননি অমলেশ। দমতে তিনি জানেন না—এ বিশ্বাস তাঁর আগাগোড়া ছিল।

মেজ ছেলেকে যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়েছেন। সুনীল যখন ফার্স্ট ক্লাশ পেল, তখন আর একবার নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন অমলেশ। [illegible] [illegible] হয়েও [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] থেকে [illegible], [illegible]তেও। আমিও দু'-একবার দেখেছি, বর্ষার দিনে ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছেন অমলদা।

এবং নিজে কতদিন গল্প করেছেন, বাজারে গেলে তার বড্ড খরচ হয়ে যায়। ভালো জিনিস দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে—খেতেও।

অনেক দেখে-শুনে অমিলের বিয়ে দিলেন অমলদা। আমরা, হ্যাঁ আমরা, অমলদার আপিসের যুবকরা ও বুড়োরা সকলেই বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, এরকম খাওয়া কখনও খাই নি।

তোমরা কেউ কেউ সেদিন আমায় ভর্ৎসনা করেছিলে—ভারী হয়ে এল অমলদার কণ্ঠস্বর। ছেলের বিয়েতে শুধু খাওয়ানোতে চার হাজার টাকা খরচ করার জন্য আমায় বাড়িতে কিন্তু কেউ কোনো তিরস্কার করে নি। বরং সবাই খুশি হয়েছিল। আর হৈমন্তী, এই হৈমন্তী, যে একটু আগে ফুচকো খাচ্ছিল, সে বলেছিল, বাবা মেজদার বৌভাতে রাবড়ি করতে হবে—না হলে মানায় না।

আর আমি, হৈমন্তীর পিতা, কনিষ্ঠা কন্যার পিঠে হাত রেখে বলেছিলাম, তোর বিয়েতে করব।

মেয়ে সেদিন লজ্জা পায় নি। একটু হেসে বলেছিল, আমার আগে তো মেজদার বিয়ে হবে—তাতে তোমায় রাবড়ি করতেই হবে।

মনে আছে কি তোমার সমরেন্দ্র, আমাদের রাখালদাস, পান চিবুতে চিবুতে প্রশ্ন করেছিল, তারপর ভায়া, নগদের সবটাই কি খরচ করে ফেললে নাকি?

তোমার কি মনে আছে সমরেন্দ্র, আমি বলেছিলাম, রাখালবাবু, নগদ নিলে তো খরচ—

সে কি?—কোনো কথা বলতে গিয়ে থেমে পড়েছিলেন রাখালবাবু।

আর তুমি, হ্যাঁ তুমিই, আমার বেশ মনে আছে কথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলে।

কিন্তু আমি জানি, শুধু রাখালদাস নয়, এ তোমাদের প্রায় সকলেরই মনের কথা।

আমার কিন্তু ভাবনা ছিল না। নিজের থলি উজাড় করেছি, কর্জ করেছি। সঞ্চয়ের স্পৃহা ছিল না কোনোদিন, ছিল ছেলেদের মানুষ করবার আকাঙ্ক্ষা। তুমিই বলো, সমরেন্দ্র, তুমি তো পিতা। পিতার [illegible] [illegible] কারি [illegible]

এ কথার কী জবাব দেব! শীতার্ত [illegible] নির্জন হয়ে আসা পথের মোড়ে সত্তর বছরের একজন বৃদ্ধের এই কথার উত্তর দেবার মতন কোনো কথা আমার মুখে এল না।

কয়েকটি অস্বস্তিকর মুহূর্ত! উঠতে ইচ্ছে করলেও উঠতে পারলাম না। মনে হল অমলদার চোখের কোণে জলের চিক্‌চিকানি। কিন্তু তা বুঝতে না বুঝতেই অমলদা বললেন, ইয়ংম্যান। তোমরা সমর্থন করো আর নাই করো, আমি জানি, আমি ভুল করি নি। না হলে দেখো না, সুনীল যেদিন তার পছন্দকরা বউকে নিয়ে যাদবপুরে গিয়ে বাসা বাঁধল, আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, দুঃখ পাচ্ছ কেন, ছেলেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছ, সে সুখে থাকতে পারবে—এইটাই তো বড় কথা। আর এই সুখে থাকবার জন্যই না আমার ডাক্তার ছেলে বালীগঞ্জে ফ্ল্যাট নিয়ে চলে গেছে।

বুঝলে সমরেন্দ্র, তোমাদের বউদি তো সেকালের, তাছাড়া মেয়েমানুষ—বড় বেশি দুঃখ পায় এসবে। বড় বেশি ভাবে।

আমার কী মনে হয় জানো সমরেন্দ্র, আমাদের সংসারটা অনেকটা লটারীর টিকিটের মতন। কেবল টিকিট কিনেই যাও। কারুর বরাতে জীবনভোর খেসারৎ দিয়েই যাওয়া অর্থাৎ আশাভঙ্গ আর আশার পালা। কারুর বা বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। পেয়ে গেল আচমকা। ওটা, একটু হাসলেন অমলদা, তারপর দুটো দাঁতের ফাঁক দিয়ে টেনে টেনে বললেন, ওটা ফালতু।

কী বলো! তাই নয়। এইটাই বুঝতে চায় না বাড়ির মেয়েরা। কেবল বলে, কত আশা করেছিলাম, কী করে বোঝাই বল তো?

আমার তখন মনে পড়ল অমলদার তৃতীয় পুত্রের কথা। বোধহয় সংসারের ভেতরের খবর শুনতে পেলে মানুষের কৌতূহল বাড়ে। আমারও বাড়ল। অথচ, আমিই, অপছন্দ করি পারিবারিক ব্যাপার সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করাকে। সে কথা আমার একবারও মনে এল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ছোট ছেলে এখন কোথায়?

নিখিল? নিখিল এখন কসবায়। আমি আগে যে বাড়িতে থাকতাম, সেই বাড়ির বাড়িওয়ালার একটা মেয়েকে নিয়ে কসবায় চলে গেছে। শুনেছি, কালীঘাটে তার যথারীতি মালাবদলও হয়েছে—নির্লিপ্তভাবেই কথাগুলি বল- [illegible] একটু থামলেন। [illegible] একবার। বললেন, হৈমন্তীর ইচ্ছে ছিল তার মেজদার বিয়েতে রাবড়ি খাবার—তা আর হয়ে ওঠে নি। সুনীল বিবাহ-আপিসে গিয়েই ও কাজটা সেরে ফেলেছে। আর নিখিল তো পাণ্ডার ঘরে। কাজে-কাজেই—হঠাৎ বেশ জোরে জোরেই হেসে উঠলেন অমলদা—আমার দুঃখ কোথায় জানো সমরেন্দ্র, যে সব কাজগুলো আমার দাঁড়িয়ে থেকে করবার কথা, সেগুলো আমি করতে পারলাম না—ওরা ভয় পেয়ে অন্যায় করছি ভেবে—গোপনে করে ফেলল বলে।

দশটা নিশ্চয় বেজে গেছে। হাত-ঘড়ির দিকে তাকাতে ভরসা পেলাম না। মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু তখনও কৌতূহলের বাকি ছিল। যেন, অনেকদিন পরে যখন দেখাই হয়েছে, তখন, শেষ জেনে নেব অমলদার। বললাম, হৈমন্তী এখন কী করছে।

গান করে। থিয়েটারে পার্টও করে—প্রায় নিত্যকর্ম ওটি—তবে—একটু থামলেন অমলদা—, সমরেন্দ্র, মেয়েটা বোধ হয় অসম্ভব চাপা, এই যে গান গায়, থিয়েটার করে—সে বোধ হয় তার দুঃখকে ভোলবার জন্য।

কী দুঃখ হৈমন্তীর, তা আমার জানা নেই, অমলদা বললেনও না। কিন্তু কিছু আগে হৈমন্তীকে দেখেছি—দুঃখ ভোলবার জন্য সে থিয়েটার করে, রাত দশটার সময় কলকাতার পথে ফুচকো খায়, পান চিবোয়—এ-কথা বিশ্বাস করি কেমন করে!

যার দাদারা বিয়ে করে বউ নিয়ে ছেড়ে গেছে বাপ-মাকে, বোনকে,—তাদের স্বার্থপরতায় সে দুঃখ পেতে পারে—কিন্তু অমলদার কথাটার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারলাম না। আর পারলাম না বলেই অমলদার মুখের দিকে চেয়ে রই-লাম নিঃশব্দে।

অমলদা বললেন, আমি আশাবাদী সমরেন্দ্র, আমি ভাগ্য বিশ্বাস করি সমরেন্দ্র, আমি ভগবান মানি সমরেন্দ্র। আমার ধারণা, আমি নিশ্চয় সুখী করতে পারব হৈমন্তীকে। কি বলো তুমি?

আমি কি বলব! কী-ই বা আমার বলবার থাকতে পারে। এবার আমার বাড়ির কথা মনে পড়ল। শমিতা জান-লার ধারে ঘুমকাতর চোখে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি সব, কিন্তু উঠতে পারছি কই!

দুবেলা ভালো মতন আহার জোটে না এখন অমলদার। খেতে ভালোবাসতেন চিরদিন—তা কেবল এখন মনে রেখেছে হৈমন্তী। সে এখন প্রায়ই বাবার জন্য কিনে আনে এটা-ওটা-সেটা। সেটা, তার মায় মতে, বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়—ওটা মূর্খতা, পাগলামি। এই নিয়ে মায়ে মেয়েতে কথাকাটাকাটি। মেয়ে শোনে না।

অথচ মেয়ের এখন ভরা যৌবন। অভাবের ঘরে তার যৌবনকে রোধ করা যায় নি। অত কম খেয়েও, এত পরিশ্রম করেও, কেমন করে যে হৈমন্তীর দেহে এমন জোয়ার এল, তা বুঝে উঠতে পারেন না অমলেশ।

সমরেন্দ্র, অমলদার গলার স্বরটা যেন একটু অন্যরকম শোনাল, আমার দেহে এখনও শক্তি আছে সমরেন্দ্র, এখনও আমি সকাল থেকে রাত দশটা অবধি এই পথের ধারে বসে থাকি—সব ছেলেরা আমার সুখে আছে—মেয়েটাই বা থাকবে না কেন বলো। —

হ্যাঁ, এই কর্তব্যটাই এখন বাকি অমলেশের। দুই ছেলে ফাঁকি দিয়েছে। মেয়ে যেন তাকে ফাঁকি না দেয়, এইটাই চান অমলেশ। তোমায় নেমতন্ন করব সমরেন্দ, হৈমন্তীর সাধও পূরণ করব, রাবড়ি করবই। দেখে নিও—আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসলেন অমলেশ।

তিনি ভাগ্য মানেন, ভগবান মানেন—নিজের মনের জোরও তাঁর অনেক। তিনি আশা করে আছেন পিতার কর্তব্য তিনি করবার সুযোগ পাবেন। অমলেশ কি ভুলে গেছেন, দিনরাত লটারীর টিকিট বেচে তিনি একজনেরও বরাত ফেরাতে পারেন নি। হয়তো জেনেও নিজের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা।

* * *

সেদিন রাত প্রায় এগারোটার কাছা-কাছি সময়ে, যখন ট্রামের জানলাগুলো বন্ধ আর বাসের সার্সিগুলো নামানো, তখন তারই কোনো একটার কোনো এক কোণে বসে থাকতে থাকতে অমলদার শেষ কথাটাই বারবার মনে পড়ছিল, সমরেন্দ্র, জীবনটা একটা লটারী ; আমার বরাতে, এই সত্তর বছরে লটারী পাওয়ার যোগ আছে। আমি নিশ্চয় পাব লটারীর টাকা, কি বল সমরেন্দ্র, পাব না!

খাড়া পাহাড় বেয়ে—সম্পাদনা ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উচ্চারণ, ১৪ স্টেশন রোড, কলকাতা-৩১। দাম ঃ তিন টাকা।

লেনিন জন্মশতবর্ষে বাংলাদেশের কবিরা লেনিনকে নিবেদন করে কবিতা লিখছেন। লেনিনের ভাবাদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস থাকলেই তাঁকে অবলম্বন করে কবিতা লেখা সম্ভব। উপরন্তু ঐ কবিতায় এ দেশের কবিদের চিন্তা কি ভাবে ও কোন্ দিকে প্রতিফলিত তাও অনুল্লেখ্য নয়। যা হোক, উপরি উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক ভূমিকায় বলেছেন, 'এক আশ্চর্য স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের সঙ্গে লেনিন-নাম কবির চেতনায় একাকার হতে পারে, এবং কোনো বিশেষ মুহূর্তে তা হয়তো বা মন্ত্র হয়।'

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থটির আগে লেনিনকে নিবেদিত আর একটি সংকলন গ্রন্থ বের হয়েছে বলে জানা গেল। শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, উক্ত সংকলন গ্রন্থের কোনো কবিতাই তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয় নি। তবে এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্বয়ং এক-জন খ্যাতিমান প্রগতিশীল কবি হওয়ায় তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ পাঠকদের অধিকতর কৌতূহলী করে তুলবে। এবং আমরা গভীর আনন্দের সঙ্গে এ-কথা স্বীকার করি যে, তাঁর সম্পাদিত 'খাড়া পাহাড় বেয়ে' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কারণ—

(১) লেনিনকে নিয়ে, এক যুগ আগে, বাংলাদেশে নগণ্য সংখ্যক যে সব কবি কবিতা লিখেছিলেন, তিনি সেই সব কবির কবিতা খুঁজে এনে পাঠকদের কাছে হাজির করেছেন। ঐসব কবির মধ্যে আছেন যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে ও বিমলচন্দ্র ঘোষ।

(২) লেনিনের একমাত্র কবিতা অনুবাদ করে অরুণ মিত্র ১৯৩৭ সালে প্রকাশ করেছিলেন। ঐ কবিতার অনুবাদ প্রকাশ—অরুণবাবুর মতো প্রতিষ্ঠিত কবির এক দুঃসাধ্য সার্থক প্রয়াস হিসেবে অনেকেই এখন তা স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্তমান আলোচ্য সংকলনটিতে অরুণবাবুর হুবহু সেই অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি। তিনি এটিকে পুনরায় নতুন করে লিখে দিয়েছেন। বর্তমান বছরে ঐ কবিতাটিকে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় একইভাবে দেখেছিলাম, এই সংকলনে ঐ কবিতাটিকে মনে হ'ল আরো নিটোল, বাগ্‌ভঙ্গিতে ঋজু এবং ভাষায় ও বক্তব্যে দৃঢ়সংবদ্ধ।

(৩) খাড়া পাহাড় বেয়ে-তে যাঁদের কবিতা সংকলিত হয়েছে তাঁদের অনেকেই খুব প্রতিষ্ঠিত না হলেও প্রবীণ কবিদের সঙ্গে নবীন কবিদের কবিতা প্রকাশ করে সম্পাদক প্রবীণ ও নবীন কবিদের চিন্তা-ভাবনাকে পাশা-পাশি উপস্থিত করতে পেরেছেন। যেমন, বিষ্ণু দে, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়-এর কবিতার পাশাপাশি রাজা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা বিশেষ-ভাবে আকর্ষক।

(৪) সংকলনটিতে আছে মোট ৪২টি কবিতা। এতোজন কবির এক-সঙ্গে এতোগুলি কবিতা পড়া নিঃসন্দেহে সার্থক—যদিও সবাই বিশ্বস্ত আমরা সে কথা মনে করি না। তবে সম্পাদকের কৃতিত্ব এই যে, লেনিনের নামে কাউকে কাউকে তিনি কলম ধরতে বাধ্য করেছেন।

সংকলনটির কয়েকটি কবিতার কিছু কিছু পঙক্তি উদ্ধার করলে হয়তো ন্যায়সঙ্গত কাজ হোত, তবু সে দায়িত্ব পাঠকদের ওপর ন্যস্ত থাকলো; তাঁরা সংকলনগ্রন্থ থেকেই সে কাজ করুন। আপাতত লেনিনের কবিতার কয়েকটি পঙক্তি তুলে দেওয়ার লোভ আমরা সংবরণ করতে পারলাম না। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

[illegible] /... ছাপিয়ে গেল আশায় আর স্বপ্নে/সবাই বিশ্বাস করল আসন্ন মুক্তিতে/কিন্তু দুঃখ থেকে ছিনিয়ে ... সবাই।/ কিন্তু বিপ্লব পরেই আসে আবার/ নাগপাশ নিষ্করুণ,/স্বর আর প্রতিক্রিয়ার ... পরেই আসে/প্রবঞ্চনার তিক্ত স্বাদ।/অন্ধকারের শক্তিরা ছায়ায় গুঁড়ি মেরে ছিল,/ধুলোর উপর হেঁটে ফোঁস ফোঁস করছিল;/ওৎ পেতে ছিল তারা।/ হঠাৎ তাদের দাঁত আর ছুরি তারা বসিয়ে দিল/বীরদের পিঠে আর পায়ে।/ জনগণের শত্রুরা বোবা মুখ দিয়ে/পান করে নিল উষ্ণ নির্মল রক্ত,/মুক্তির অসংখ্য বন্ধুরা তখন কঠিন পথশ্রমে অবসন্ন"...ইত্যাদি।

পুনর্লিখিত লেনিনের কবিতাটি পড়লে পাঠকদের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে, এ কথা অনস্বীকার্য। সর্বমহলে সংকলন গ্রন্থটি আদৃত হবে বলে মনে করি।

মিনি পত্রিকা

এখন (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, ১৯৭০) সম্পাদক নন্দদুলাল ভট্টাচার্য। ৫৪ পিয়ারীমোহন সুর গার্ডেন লেন, কলকাতা-১০। দাম প্রতি সংখ্যা ২০ পয়সা।

অনুত্তম (২য় সংকলন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০) সম্পাদক শশধর রায়। ৩৩।৪ বিন্দু লেন, হাওড়া-১। দাম তিরিশ পয়সা।

মিনি (ফেব্রুয়ারী '৭০) সম্পাদক বরুণ মজুমদার ও কুমারেশ চক্রবর্তী। ১০২।২ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া। দাম ২০ পয়সা।

স্রোতস্বিনী (২১শে, ২২শে, ২৩শে, ২৬শে, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ও ৬ই মার্চ, ১৯৭০) সম্পাদক লক্ষ্মণ বন্দ্যো-পাধ্যায়। ১৩ এ পি সি রোড, কলকাতা-৯। দাম প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

কণ্ঠস্বর (২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণ সংখ্যা, ১৯৭০) সম্পাদক সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ৪১।এল।৭ নারকেলডাঙা নর্থ রোড, কলকাতা-১১। দাম পঁচিশ পয়সা।

কনিষ্ঠা (ফাল্গুনী সংকলন, ১৩৭৬) সম্পাদক অজয়কুমার মল্লিক ও স্বপন-কুমার ঘোষ। ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৯। দাম ২০ পয়সা।

মিনি-স্টার (১ম বর্ষ, ১ম সংকলন, চৈত্র, '৭৬) সম্পাদক চন্দন ভট্টাচার্য ও মলয় পাহাড়ী। কলকাতা-১০। দাম দশ পয়সা।

কলকাতা এখন মিনি পত্রিকায় ছেয়ে গেছে। বেশ একটু অভিনবত্বের আমেজ নিয়ে এসেছে। বাঙালী কত যে হুজুগপ্রিয়, গত কয়েক মাস ধরে মিনি পত্রিকা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে। এর মধ্যে [illegible] [illegible] নেহাৎ কম বলে মনে হয় না। [illegible] মিনি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। নামী অনামী সাহিত্যিক ও সাহিত্যযশপ্রার্থী অনেকেই লিখছেন। অধিকাংশ সম্পাদকই নিজ পত্রিকা সম্পর্কে কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য দাবী করছেন। প্রথম হবার সখ প্রচণ্ড। এক-একজন এক-একদিকে বিশ্বের প্রথম বলে প্রতিষ্ঠা চাইছেন। এ নিয়ে প্রতিবাদও চোখে পড়ছে মিনি পত্রিকাতেই।

মিনি বই-এর চলন অনেকদিন আগে থেকেই আছে। পকেট ডিক্সনারী, পকেট বাইবেল, পকেট গীতা এসব তো ছিলই। দাম কম, পড়তে সময় কম লাগে, প্রচারের সুবিধা। শহর ছাড়িয়ে শহরতলী ও গ্রামে যদি ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে অনেক কাজ হতে পারে বৈকি। বিশেষ করে ছোট-দের কাছে এ জিনিসটি চিরকালের আদরণীয় না হবার কোন কারণ নেই। তবে, এ যদি শুধু ফ্যাসন হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। কারণ ফ্যাসনের আয়ু তো কোন কালেই বেশি দিন হয় না। মিনি পত্রিকা হলেও এদের অনেকগুলিই কিন্তু মিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

'এখন' বলেছেন, এটি বাংলার ক্ষুদ্রতম সাংস্কৃতিক পত্রিকা। জীবনের সপক্ষে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এঁরা লিখবেন। আলোচ্য তিনটি সংখ্যার কতকগুলি আলোকিত, প্রগতিশীল রচনা রয়েছে। ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতা ও একটি গল্প বিশেষ আকর্ষণ দাবী করে। লেখকগোষ্ঠীতে আছেন তপতী সেন, ভবতোষ আচার্য, রাখালদাস চক্রবর্তী, কনক মুখোপাধ্যায়, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, শ্যামসুন্দর দে, প্রলয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ। পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে লিখেছেন বেগম সুফিয়া কামাল, দিলওয়ার, শঙ্কর বিশ্বাস, আল মাহমুদ, মাহমুদ আল জামান ও আবেদ খান।

প্রথম সংখ্যায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনু-যায়ী 'অন্তম'-এর দ্বিতীয় সঙ্কলনটি ২১শে ফেব্রুয়ারী [illegible] সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। রুচিশীল, পূর্ণাঙ্গ এই [illegible]পত্রিকাটি পাঠকের [illegible] [illegible] আকর্ষণ করবে। লিখেছেন এপার-ওপারের বাংলার কয়েকজন নামকরা সাহিত্যিক। পূর্ববঙ্গে নিষিদ্ধ বদরুদ্দীন ওমর-এর লেখা 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' বই থেকে একটি প্রবন্ধ [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সঙ্কলনটি যে ছোটদের মনোরঞ্জন [illegible], [illegible] কোনই সন্দেহ নেই। মিনি ছড়া, মিনি গোয়েন্দা কাহিনী, মজার মিনি ক্রিকেট [illegible] এসব ছোটদের ভালই লাগবে। লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারেশ চক্রবর্তী, শান্তি-প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] মজুমদার, প্রমুখ। ছবি, কার্টুন প্রভৃতি থাকলে আরও চিত্তাকর্ষক হত।

'স্রোতস্বিনী' বিশ্বের প্রথম দৈনিক মিনি সাহিত্য পত্রিকার মর্যাদায় ভূষিত। এঁরা প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন যে, এদেশে প্রথম মিনি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ২০ বছর আগে, নাম 'অভিব্যক্তি'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশাপূর্ণা দেবীর মিনি গল্পদুটি চমৎকারিত্বে ও বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। এ দুটি সার্থক মিনি গল্প বলতে বাধা নেই। আর যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস সরকার প্রমুখ। রেবতী-ভূষণ অঙ্কিত ২১শে ফেব্রুয়ারীর একটি মিনি কার্টুন চমৎকার হয়েছে।

'কণ্ঠস্বর' পত্রিকাটিতে পূর্ববঙ্গের ১৩ জন কবির কবিতা আছে। তা ছাড়া বৈশিষ্ট্যহীন।

'কনিষ্ঠা' কয়েকজন নামকরা লেখকের লেখা দিয়ে সজ্জিত হলেও বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ল না।

'মিনি-স্টার' আর একটি মিনি সাহিত্যপ্রয়াস। উদ্দেশ্যহীন অনুকৃতি। চারিত্রিক গঠন অবোধ্য।

Betrayal of Bengal by Congress: Khagen Kar: Published by Upendra Mohan Biswas, 173, Ramesh Dutt Street, Calcutta 6: Price Rs. 2/- inland—Foreign 3 sh.

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ড সারা ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের যে সর্বনাশ সাধন করেছিলেন, খগেনবাবু তাঁর গ্রন্থে তারই এক মূল্যবান সমীক্ষা করেছেন। দেশ বিভাগের ফলে বাংলা, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, সেকথা আজ কারুর অজ্ঞাত নয়। সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফফর খানের সেই বিলাপঃ "তোমরা আমাদের পরিত্যাগ করে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিয়েছ", কি কেউ ভুলতে পারে?

কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তথিক সাম্প্রদায়িক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে [illegible] [illegible]। সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible]। [illegible], আঞ্চলিক, ভাষা সংক্রান্ত বিরোধ এবং অন্যান্য নানা প্রকার আত্মকলহের [illegible] [illegible], মীমাংসা কর-বার মত কাজগুলিতে আমরা আজও হাত লাগাতে পারি নি। দেশে শিক্ষার বিস্তার তেমন কিছুই হয় নি; পুঁজিবাদীরা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করেন নি। নির্দিষ্ট সময়ে গদির লোভে জন-সাধারণের কাছে ভোট পাবার জন্য নেতারা একবার করে উপস্থিত হচ্ছেন। নির্বাচনে জয়লাভ করে নিশ্চিন্ত আলস্যে কালক্ষয় করে চলেছেন। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্য ধরনের সমাজ-বিরোধী কর্মে দেশ ভরে গেছে। এরই মাঝে বাংলা দেশের মানুষকে কেমন করে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার প্রচেষ্টা চলেছে, তারই বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

গ্রন্থটিতে ছ'টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে লেখক বলেছেন, কংগ্রেসই পাকি-স্তানের জন্মের জন্য দায়ী। দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে কেমন করে বাংলা দেশের মানুষ প্রতারিত হয়েছে, সে সম্পর্কিত তথ্যগুলি পরিবেশন করা হয়েছে। অধ্যায়গুলির মধ্যে **Linguism and Hindi Imperialism, Refugee Problem** ও **Anti Bengalee Crusade** বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আজকের সমস্যাগুলি সমাধানের সূত্রাবলী উল্লেখ করে এই গ্রন্থটি শেষ করা হয়েছে।

উল্টাডাঙা লাইব্রেরী সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯৭০) স্মারক সঙ্কলন। ১৭, উল্টা-ডাঙা মেন রোড, কলকাতা। সম্পাদক: গোরা বসু।

আলোচ্য স্মারক সঙ্কলনটি সুগ্রথিত। রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরী' ও 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য'—এই এই দুটি পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ ছাড়াও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই সঙ্কলনটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'কলকাতার নাগরিক রূপায়ণ'। 'গ্রন্থাগার আইন প্রসঙ্গে' সৌরীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। 'ভাববার কথায়' সুনীল [illegible] অত্যন্ত সুন্দরভাবে বই ও পত্র-পত্রিকার [illegible] বাঙালী [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] সমস্যা সমাধানের [illegible] [illegible]। উল্টাডাঙার পরিচিতি [illegible] [illegible] [illegible]

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[প‍ূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"মিসেস ল্যাংট্রি এই সময় ইম্পিরিয়াল থিয়েটার তৈরি করান, পরে অবশ্য এ রঙ্গমঞ্চটি ভেঙে ফেলে সে জায়গায় ওয়েস্ট-মিন্‌স্টার সেণ্ট্রাল হলের প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ইম্পিরিয়াল থিয়েটারটি মিসেস ল্যাংট্রির পক্ষে একটি শ্বেতহস্তীর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি এলেন টেরীকে এক সিজনের জন্য রঙ্গালয়টি ভাড়া দিলেন। এখানে প্রথম প্রডাকশন হল ইবসেনের 'দি ভাইকিংস্'। গর্ডন ক্রেগ ছিলেন 'স্টেজ ডিরেক্টর, তাঁর বোন ইডিথ ক্রেগ কস্টিউমিয়ার আর সঙ্গীত রচনা করলাম আমি (অর্থাৎ মার্টিন শ')।

এইটিই ছিল ক্রেগের প্রথম ওয়েস্ট এণ্ড প্রডাকশন—অনেক বিরাট বাধা এসে দেখা দিল তাঁর সামনে। প্রথমেই বলতে হয় যে, হিওরডিজের ভূমিকাটি এলেন টেরীর পক্ষে যুতসই হয় নি। তাঁকে কি কেউ পুরুষালী মেয়ে হিসাবে কল্পনা করতে পেরেছে কখনও? কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে যে, তাঁর স্বভাবের মেয়ে, বাড়িতে শেকল দিয়ে বেঁধে তামুক পুষবেন? তারপর ধরুন স্টেজের ওপরকার ঢিপিটা—যেটার ওপর দাঁড়িয়ে এ্যাসকে এবং হলম্যান ক্লার্ককে ডুয়েল লড়তে হোত। দুজনেই বললেন, ঢিপিটা এত হেলানো যে, তার ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যায় না। তরবারি চালালেই দুজনে ঐ ঢিপি থেকে গাড়িয়ে পড়তেন। শেষটায় অবশ্য অভ্যাসের সাহায্যে দুজনেই নিজেদের ব্যালেন্স রাখতে সমর্থ হতেন—দুজনের ডুয়েলটাও হত অত্যন্ত রিয়ালিস্টিক। রিহার্সালের সময় অভিনেতারা খুবেই গোলমাল করতেন নানা বিষয় নিয়ে। এই গণ্ডগোলের মূলে ছিল আলোকসম্পাতের ব্যাপারটা। অভিনেতারা তিক্তভাবে আপত্তি জানিয়ে বলতেন যে, দর্শকেরা তাঁদের দেখতে পাবেন না। এই কঠিন এবং ভয়াবহ ভবিতব্যের প্রাধান্য-তয় নাটকে উজ্জ্বল আলোকসম্পাতের কথা অবশ্য চিন্তা করাও যায় না। আজকের দিনে ঐ প্লেতে সেরকমের লাইটিং-এর কথা কেউ ভাবতেও পারবে না। কিন্তু যে সময়ে 'ভাইকিংস' মঞ্চস্থ করা হয়, তখন অভিনেতারা বুঝতে শেখেন নি রিয়ালিজমকে কোন্ পর্যায়ে উঠিয়ে নেওয়া যায়, অভিনেতাকে নাটকের জন্য কতোটা স্বার্থত্যাগ করতে হতে পারে। তারা মনে করতো নাটকের প্রডাকশনের ব্যাপারে নট-নটীদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেসনের দিকটাই সব থেকে বড় জিনিস।

'ভাইকিংস' দর্শকদের খুশি করতে পারে নি—সেইজনাই অনতিবিলম্বে নাটকটি তুলে নেওয়া হল। কিন্তু এই প্লেটি ক্রেগকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেল। ইবসেনের এই শক্তিশালী এবং বিপদে ভরা নাটকে ক্রেগের কল্পনাশক্তি পূর্ণভাবে নিজেকে বিস্তৃত করবার সুযোগ পেল। বাস্তবতাকে বর্জন করেও ক্রেগের সেটিং-এ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়েন স্পিরিটের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য এবং স্পর্শ অনুভব করা গিয়েছিল। এর কয়েক বছর বাদে আমি এবং ক্রেগ যখন প্রথমবার সুইডেনে যাই, তখন কতকগুলো বোল্ডার্স আমার চোখে পড়ে। ক্রেগকে সেগুলো দেখিয়ে বলেছিলাম যে, এগুলোর সাহায্যে 'দি ভাইকিংস'-এর প্রথম অঙ্কের চমৎকার সেটিং তৈরি করা যায়। দ্বিতীয় অঙ্কে ব্যাঙ্কোয়েটিং-এর দৃশ্যটিও অতি সুন্দরভাবে তৈরি করেছিলেন ক্রেগ। ক্রেগের প্রত্যেকটি নতুন প্রডাকশনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল।

ভাইকিংস-এর পর 'ম্যাচ্ এ্যাডো এবাউট নাথিং' মঞ্চস্থ করা হল। এরও সঙ্গীত পরিচালনা করি আমি। ক্রেগ সেটিং-এর ভার নেন। তাছাড়া অভিনেতাদেরও দায়িত্ব তাঁরই ওপর দেওয়া হয়—এ নিয়েও তাঁকে আগের মতই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তারা চাইছিল দৃশ্যসজ্জা হবে আলমা টাডেমার স্টাইলে, প্লানসের অনুকরণে কস্টিউম করতে হবে, মুভমেণ্ট এবং পজিশন ঠিক করা হবে গতানুগতিক রীতিতে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কোন কিছু নতুনত্ব থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা মনে আসছে। সেইণ্ট মার্টিন ইন্ দি ফিল্ডস-এ এক রবিবার এক মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন—"মিস্টার শ', আজ সকালে 'কর অল দি সেইণ্টস'-এ আপনি যে নতুন টিউন দিয়েছেন, তার সম্পর্কে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে।"

প্রশ্ন করলাম—"কেন বলুন তো? [illegible] আপনার কি এ টিউন ভাল লাগে নি?"

মহিলা উত্তর দিলেন—"না, ভালই লেগেছে—সেজন্য বলছি না—"

"তবে? তাহলে কি জন্য আপনি আপত্তি করছেন?"

"এটা নতুন টিউন—সেইখানেই আমার আপত্তি।" —বিজয়িনীর মত ভঙ্গিতে কথাটা বলে মহিলা চলে গেলেন। এলেন টেরী কিন্তু ক্রেগের কাজে কোনরকম আপত্তি দেখান নি। ইংলণ্ডে ক্রেগের এই শেষ প্রডাকশন। ফ্রেড টেরী এবং জুলিয়া নিলসনের অতি অখ্যাত 'সোর্ড এ্যাণ্ড সং' নাটকের জন্য যে একটি দৃশ্য ক্রেগ করে দিয়েছিলেন, সেটির ওপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। এ নাটকের একটি ভৌতিক দৃশ্য ক্রেগকে করতে দেওয়া হয়। দৃশ্যটির যে পরিকল্পনা ক্রেগ করেছিলেন এবং যেভাবে সেটি প্রদর্শিত হয়, তার ভেতর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। দৃশ্যটিকে এডিট করা হয়েছিল এবং ফলে তার সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

ইংলিশ থিয়েটারে ক্রেগ কোনদিনই কাজ করবার সুযোগ পান নি। এর কারণ দেখাতে গিয়ে মার্টিন শ' বলেছেন:

The English Theatre had, and even now still has to some extent, the herd-instinct towards Craig. He would not join the herd, so they thought him mad. The Germans, however, thought differently; and Dr. Brahm of the Deutsches Theatre invited him to Berlin, to produce plays in the new manner. So, saying 'Perfidious Albion', off he went, leaving me in the studio with my brother Jules to keep me company.

[১৯৬৮ সালে ব্রেশট্ ডায়লগে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বহু জার্মান নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। বার্লিনের আসেম্বলের দ্বারা মঞ্চস্থ ব্রেশটের নাটকগুলোর অভিনয় যেমন অনবদ্য, তেমনি ডয়েটসে থিয়েটারের ট্রাডিশনাল অভিনয়ও অভিনয়কলার চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক বলেই আমার মনে হয়েছে। ডয়েটসে থিয়েটারে লেসিং-এর বিখ্যাত নাটক 'নাথান দি ওয়াইজ'-এর মঞ্চরূপ দেখেছিলাম। এখানকার স্টার এ্যাক্টর ছিলেন ভোল্‌ফগ্যাঙ্গ হাইনজ—ইনিই নাটকটির পরিচালনা এবং নাথানের

দৃশ্য (উডকাট)।

ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এঁর অভিনয় দেখতে দেখতে বারবার আমার [illegible] শিশিরকুমারের [illegible] ভূমিকায় অভিনয়ের কথা মনে হচ্ছিল। সত্যিকার বড় জাত-অভিনেতাদের অভিনয়ে কোথায় যেন একটা আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। স্তানিস্লাভস্কি এই ঐক্যেরই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন: "রসি, ইয়েরমোলোভা, ফেদোতোভা, সাভিনা, সালভিনি, চালিয়াপিন, ক্রগ্ এবং আমাদের নিজস্ব থিয়েটারের অভিনেতারা (যেমন তাঁরা অভিনয়ের [illegible] অভিনয় করতেন)—এঁদের সব দেখে একটা কথা আমি বারবার অনুভব করেছি। [illegible] একটা [illegible] আছে। এঁদেরকে দেখতে দেখতে অনন্যের কথা মনে হোত। I felt the presence of something that was common to them all, something by which they reminded of each other. কিন্তু এই বিশেষ গুণটি কি? যা সবার মধ্যেই বিরাজমান এবং যা দেখার ফলে একের অভিনয় অন্যের কথা স্মরণে এনে দিত? এই প্রশ্নগুলো সবার আগে যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা হচ্ছে এই যে, এঁদের সবার অভিনয়েই ছিল একটা ফিজিক্যাল ফ্রিডমের ভাব—এঁদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর স্ট্রেইন করবার কোনও চিহ্ন কখনও দেখা যেত না। অঙ্গের তাগিদ এবং ইচ্ছা অনুসারে সব অংশকে এঁরা সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজে লাগাতে পারতেন।"

শিশিরকুমারের অভিনয়ে এই ফিজিক্যাল ফ্রিডমের ভাবটাই ছিল সবার আগে লক্ষণীয়। আর এই গুণটি সম্পূর্ণ অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে একেবারেই ছিল না। তাই আকবর বা সাজাহান করতে গিয়ে অহীন্দ্রবাবু যে অভিনয় করতেন, তার ভেতর সত্যিকার পরিচ্ছন্নতার এত অভাব দেখা যেত। যে-কোন বড় শিল্পের মত অভিনয়শিল্পেও সবার আগে দরকার পরিচ্ছন্নতাবোধ, ভাবসংযম, কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণ এবং রসবোধ। তাছাড়া গ্রেট অ্যাক্টর হতে গেলে বিরাট পরিমাণ পড়াশুনা থাকারও দরকার। এইসব গুণে ছিল বলেই আজও শিশিরকুমার ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে অতুলনীয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম। কবি বা শিল্পীর কল্পনাশক্তি বলতে কি বোঝায়? এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শিশিরকুমার প্রায়ই ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই বিখ্যাত লাইনগুলো কোট করতেন—

> To add the gleam
> The light that never was
> on sea or land,
> The consecration and the
> poet's dream.

এর ভাবার্থ হচ্ছে—কবি বা শিল্পীর একটি বিশেষ শক্তি আছে। আমরা বাইরের প্রকৃতিতে যে সব সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে পাই, কবি বা শিল্পী ঐ সব দৃশ্যাবলীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টির অতীত অপরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। যে সব ভাব এবং আবেগ আমরা মনে-প্রাণে অনুভব করি, কবি বা শিল্পী তা আরো নিবিড়ভাবে এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করে থাকেন। যে শক্তি শিল্পীকে এই সব অপার্থিব সৌন্দর্য দেখতে এবং অনুভব করতে সাহায্য করে, তারই নাম কল্পনাশক্তি। নাইটিঙ্গেলের গানে মোহিত হয়ে কিট্স এই কল্পনার সাহায্যেই তার কাছে ছুটে যেতে চেয়েছেন—

> Away! away! For
> I will fly to thee,
> Not charioted by Bacchus
> and his pards,
> But on the viewless wings
> of poesy,
> Though the dull brain
> perplexes and retards.

কবির জড়বুদ্ধি বা ইন্টালেক্ট তাঁকে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু কল্পনাশক্তিই তাঁকে আনন্দ এবং সৌন্দর্যের উৎসস্থলে নিয়ে যাবে।]

[ক্রমশঃ]

'মেরা প্যার' ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর

ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণ বৃদ্ধি

১৯৬৯ সালে ভারতে ৩৬৩টি কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটি রেকর্ড। এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ দক্ষিণ ভারতে গত বছর সর্বাধিক বেশি ছবি নির্মিত হয়েছে। মালয়ালম, তামিল ইত্যাদি ভাষার ছবির সংখ্যা বেড়েছে। দক্ষিণ ভারতে মোট ছবি নির্মিত হয়েছে ২০৮টি। বোম্বাইতে নির্মিত হয়েছে ১১৯টি ছবি। কাজের দিক থেকে মাদ্রাজের স্টুডিওগুলি খুব বেশি ব্যস্ত ছিল। বোম্বাইর স্টুডিওতে ১৯৬৮ সালে ৮৮টি ছবি নির্মিত হয়েছিল, আর গত বছর হয়েছে ১১৯টি। সুতরাং সেখানেও কাজের তৎপরতার অভাব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গেও গত কয়েক বছরের তুলনায় ১৯৬৯ সালটি ভাল বছর ছিল। গত বছর ৩৬টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়েছে। চারটি স্টুডিও মোটামুটি সারা বছর কর্মব্যস্ত ছিল। তার ফলে স্টুডিও কর্মী ও সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ানরা কাজ পেয়েছিলেন। পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র ছাড়াও সরকারী তথ্য ও সংবাদ-চিত্রের সংখ্যাবৃদ্ধিতেও বেশ কিছু সংখ্যক লোকের কিছুটা আয় হয়েছিল।

ছবির সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকারী তহবিলেও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর টিকিট বিক্রি হয়েছে ১৩০ কোটি টাকার। আর বিদেশে ছবি রপ্তানি করে পাওয়া গেছে ৮ কোটি টাকা। সুতরাং প্রমোদকর বাবদ সরকারী তহবিলে যে টাকা এসেছে সে অঙ্কটি বেশ বড়। প্রমোদকরের আগে নির্মাণের সময় থেকে নানারকমের কর-এ চলচ্চিত্র শিল্প থেকে সরকারের ভালরকমের প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

ছবি নির্মাণের এই সংখ্যাবৃদ্ধির পাশে দেখা যাচ্ছে রঙিন ছবির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬৮ সালে যেখানে রঙিন ছবি নির্মিত হয়েছিল ৫১টি, ১৯৬৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮টি। রঙিন ছবি নির্মাণ বৃদ্ধির অর্থ দাঁড়ায় ছবিতে মোটা অঙ্কের টাকা লগ্নী বৃদ্ধি। আর তারই বিপরীতে আর একটি চিত্র হল চলচ্চিত্র শিল্পে বৃহৎ পুঁজির আধিপত্য। তার পরে সাদায়-কালোয় যারা ছবি করে, তাদের কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়তে হয় এবং মোটা অঙ্কের টাকার এই দাপাদাপির বাজারে চলচ্চিত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অথবা শুধুমাত্র পণ্য-চিত্র করার উদ্দেশ্য না রেখে নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করার সুযোগ ক্রমেই কমে আসবে। সুতরাং রঙিন ছবির সংখ্যাবৃদ্ধি ভারতের মত দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের সমৃদ্ধির লক্ষণ নয়, বরং সংকটের লক্ষণ বলা যায়। এই সংকটে ছোট প্রযোজকরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অল্প পুঁজি নিয়ে ছবি তৈরির সুযোগ প্রায় থাকবে না বলা চলে।

ছবির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, ৩৬৩টি ছবি নির্মাণ করে ভারত বিশ্বে প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানাধিকারীও হতে পারে। কিন্তু এই সংখ্যাবৃদ্ধি আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের পরিচায়ক নয়। প্রথম কথা ৩৬৩টি ছবিতে কি বক্তব্য আছে, তার কারিগরী কুশলতা কোন মানের এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কি-না। হিসাব করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ ছবি শিল্পমানের দিক থেকে নিম্নমানের। স্থূলতা ও রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণা এসব ছবির অবলম্বন। তা হলে সংখ্যাবৃদ্ধিতে কিছু টেকনিশিয়ানের কাজের ব্যবস্থা হওয়া ছাড়া চলচ্চিত্র জগতে ভারতের মর্যাদা তেমন বাড়াতে পারে নি। অথচ ইউরোপের দেশগুলি বার্ষিক ৫০।৬০ ছবি করেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কারগুলি অর্জন করছে। আর সারা বিশ্বময় সে সব ছবির ব্যবসা চলছে। কোটি কোটি টাকা ওরা তা থেকে আয় করে ঘরে তুলছে। সে তুলনায় আমাদের ৩৬৩টি ছবির স্থান কোথায়?

—সুজন।
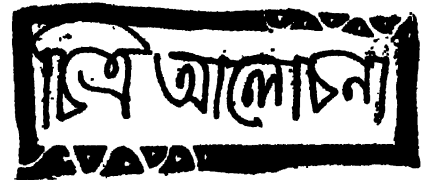
হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন

১০ই এপ্রিল থেকে লাইট হাউস সিনেমায় হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করা হয়েছে। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী-দপ্তরের উদ্যোগে ভারত-হাঙ্গেরী সংস্কৃতি বিনিময় চুক্তি অনুসারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উৎসব উপলক্ষে হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল কলকাতা এসেছেন। তাঁরা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লাইট হাউস সিনেমায় সাতদিনব্যাপী সাতটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী ও সাতটি স্বল্প-দৈর্ঘের ছবি দেখান হবে। প্রথম দিন দেখান হয়েছে 'দি আয়রন ফ্লাওয়ার'।

'আয়রন ফ্লাওয়ার' এক স্বাধীনচেতা [illegible] পিটারসেন ও [illegible]

কাহিনীর পটভূমি ১৯৩৩ সাল, যখন হ্যাংগেরী ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাধীন ছিল। মানুষের রুজির নিশ্চয়তা ছিল না। স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে কোন মিল ছিল না।

পিটারসেন স্নেহনত মানুষ, জীবনের সংগে আপোষ করে চলার পক্ষপাতী সে ছিল না। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে বাস করত। কাজ করতে গিয়ে তরুণী ভেরার সাথে তার পরিচয়। ভেরার স্বপ্ন ছিল নর্তকী হবার, নর্তকী হয়ে নাম করার, কিন্তু আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নয়। কিন্তু বাস্তবে তাকে ধোপাখানার কাজ নিয়ে জীবিকা চালাতে হয়, বাড়িতে সে অনাদৃতা, ধোপাখানার মালিক তাকে বাধ্য করতে চায় শয্যাসঙ্গিনী হবার, নতুবা চাকরী যাবে। বাস্তব আর কল্পনার এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পিটারসনের সঙ্গে তার পরিচয়। পিটারসনের জীর্ণ কুটিরে সে রাত্রিবাস করে। পিটারসনের কাছে মনে হয় সে যেন পরী কাহিনীর রাজ্যে বাস করছে. ভেরা যেন পরী। দু-জনে মিলে আগামী দিনের সুখের চিন্তা করে। কিন্তু রূঢ় বাস্তব ভেরাকে টেনে নেয় দূরে, মালিকের পয়সায় সে দামী পোষাক পরে: ওদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। নির্মম বাস্তবের চাপে তাদের প্রেম মিলনে পরিণত হতে পারে না।

আকস্মিকভাবে পিটারসেন একটা কাজ পেয়ে যায়। এবার ভেরা তার কাছে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু পিটারসেন কোন-রকম জোরাতালি দিয়ে প্রেম করতে চায় না। জীবনের সংগে সে আপোষ করে চলতে চায় না। কিন্তু ভেরাকে সে ভালবাসে, সে ভালবাসা অটুট থাকবে। মানুষ যখন স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তখনই প্রেম সার্থক হয়, শোষণ আর অপমানের মধ্যে প্রেম সার্থক হয় না। পিটারসেনের আশা আছে—ভেরা একদিন ফিরে আসবে—ফিরে আসবে শোষণমুক্ত সমাজে।

'দুস্তিন্দান' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অজিতা চট্টোপাধ্যায়

[illegible]

নাটকের কথা

বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলন

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে আগামী ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বিশ্বরূপা প্রাঙ্গণে বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। চতুর্দিনব্যাপী (২০শে—২৩শে এপ্রিল প্রত্যহ সাড়ে ছটায়) এই সম্মেলনের প্রতিদিনের অধিবেশনে নাটকের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হবে এবং নাট্যের সকল [illegible] আলোচনায় যোগদান করবেন ও ভাষণ দেবেন বলে জানা গেছে। এই সম্মেলনের প্রতিটি অধিবেশনেই সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে।

'ডানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট' ছবিতে লিলি চক্রবর্তী ও জহর রায়

সঙ্গীতকথা

সুরসভার বসন্তোৎসব

গত ৫ই এপ্রিল বিড়লা একাডেমী হলে সুরসভা পরিবেশিত "বসন্তোৎসব" এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অনুষ্ঠানটির সব ক'টি গানই সুগীত। বিশেষ করে লক্ষ্মী গুপ্তের "ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে", মণিদীপা শ্যামের "বসন্ত তার গান", সুস্মিতা রায়চৌধুরীর "নীল দিগন্তে" ও রবীন মুখোপাধ্যায়ের "ও চাঁদ তোমায় দোলা" উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দীপ্তি রায়, রঞ্জিতা চক্রবর্তী, মমতা ঘোষ, আলো বসু, রুমা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সুনন্দা ঘোষ, অরুন্ধতী সরকার, সুমিতা দাশগুপ্তা, গৌর বসাক ও তুষার ভঞ্জ। নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন রীতা সেনগুপ্তা ও শান্তা বসুরায়। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন রথীন চৌধুরী। এই দিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল সুচিত্রা মিত্রর একক সঙ্গীত। তিনি পর পর কয়েকটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দদান করেন। অনুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীতে ও সঙ্গতে সহযোগিতা করেন চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন মুখোপাধ্যায়, কিশোর নন্দী, দুলাল ভট্টাচার্য ও উমা দে-শীল।

...মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী।

সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী প্রথমে ঝিঁঝিট রাগে ধামার ও পরে দুর্গা রাগে ও বাহার রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন, পরে কাফি ঠুংরি দিয়ে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ হয়। সংযত লয় ও সুষ্ঠু সুরের প্রয়োগ অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়েছিল। তবলা সঙ্গতে ছিলেন শ্রীপঙ্কজ চক্রবর্তী ও সারেঙ্গীতে ছিলেন শ্রীরামনাথ মিশ্র।

সংবাদ-কনা

কলকাতায় পশ্চিম জার্মানীর ব্যালে দল

পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ব্যালে নৃত্য দল জার্মান অপেরা হাউস জাপান পরিভ্রমণ করে ভারতে আসছে। ২৫ জন শিল্পীর এই দল কলকাতার কলামন্দিরে দু'দিন নৃত্য প্রদর্শন করবে। পশ্চিম জার্মানীর আধুনিক নৃত্যকলা দেখা যাবে এই দলের শিল্পীদের কাছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রণজিৎ সিংজীর মানসপুত্র দলীপ সিংজী।

দলীপের যখন মাত্র আট বছর বয়স, তখন থেকেই রণজি তাঁকে হাতে-কলমে শিখিয়েছেন ক্রিকেট খেলা। তাই দলীপ সিংজীর ওপর ছিল তাঁর পরম নির্ভরতা। রণজি ভাবতেন, তাঁর এবং ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্যকে বহন করে রাখবেন দলীপ। ইংলণ্ড তথা বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে রণজি যেমন নিজেই একটা আলাদা অধ্যায়—তেমনি দলীপ সিংজীকে নিয়েও যেন ক্রিকেট জগতে সৃষ্টি হয় স্বতন্ত্র ইতিহাস।

রণজির সে আশা অপূর্ণ ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, দলীপকে আমরা বেশিদিন খেলার মাঠে আর জীবনের রঙ্গমঞ্চে ধরে রাখতে পারি নি। অসুখে-অসুখে ভুগে দলীপ অসহায় অবস্থায় ক্রিকেট মাঠ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র আটাশ বছর বয়সেই।

জীবনের [illegible] তখনো হয় নি সারা। তখনো যে [illegible] মেলে নি পাপড়ি—শুধু তারই সৌরভে জগৎ তখন দিশাহারা।

ততোদিনে দলীপ ক্রিকেট ইতিহাসে সৃষ্টি করেছেন একটা নতুন অধ্যায়। খেলার মাঠে তিনি তখন অদ্বিতীয় আর মাঠের বাইরে [illegible] নায়ক।

রণজি-প্রতিভার ইংলণ্ডের ক্রীড়াঙ্গন-গুলো তখন [illegible]; রণজি যখন বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি [illegible]—ঠিক তখনই দলীপ সিংজীর আবির্ভাব। একজন এগিয়ে এলেন বিদায় নিতে, আর একজনের আগমন-বার্তা [illegible] গেল দিকে দিকে।

রণজির ভাইপো, রণজিরই মানস-পুত্র দলীপ—তাই ইংলণ্ডের ক্রিকেট-[illegible] [illegible] জন্য [illegible] তাঁর ওপর। সবাই যেন তাঁকে যাচাই করে নিতে চায়—দেখতে চায় রণজির পদাঙ্ক তিনি অনুসরণ করতে পারেন কি না—পারেন কি না বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে রণজির অবিস্মরণীয় ধারাকে ধরে রাখতে।

ঠিক রণজির মতোই দলীপ [illegible], দলীপ খেললেন, দলীপ জয় করলেন [illegible] মন। একবাক্যে সকলেই স্বীকার করলেন যে, দলীপ রণজি সিংজীর যথার্থ উত্তরসূরী।

রণজির মতো দলীপের খেলাতেও ছিল অভাবনীয় আকর্ষণী ক্ষমতা। তাই ইংলণ্ডের সেরা ব্যাটস্ম্যানদের খেলা ফেলে দর্শকরা ছুটে যেতেন দলীপের খেলা দেখতে। দলীপ ধাড়ি ধাড়ি রান করতেন না—[illegible] বা [illegible] ভালোও বাসতেন না। কিন্তু তাঁর খেলায় কেমন যেন একটা [illegible] ছিল; ছিল দর্শক-দের খুশি করার, [illegible] মন ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা। [illegible] কিন্তু অনাবিল আনন্দ আর নিপুণতায় দলীপের ব্যাটিং দর্শকদের আনন্দ-হাসি-গানে [illegible] তুলতো।

দলীপের খেলার খ্যাতি তখন সব জায়গায়। রণজি শুনে খুশি হন। দলীপ যে তাঁরই হাতে তৈরি, তাঁরই পরম আত্মীয়। তাই রণজি চান যে, তাঁর খেলায় [illegible] [illegible] দলীপই।

কিন্তু রণজিৎ সিংজীর সামনে [illegible] [illegible] দলীপ। [illegible] খেলতে পারতেন না। অসহায়ের মতো অবস্থা হতো তাঁর। দলীপ ভাবতেই পারতেন না যে, তিনি রণজির চোখের সামনে [illegible]।

[illegible] খেলা—কি [illegible] কথা! দলীপের চোখে ক্রিকেট খেলার সবকিছু তো রণজি—তিনিই তো [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] খেলেছেন! কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যেতেন তিনি। কোথায় যেন হারিয়ে যেত তাঁর সেই স্বভাবলব্ধ নিপুণতা, সেই ভঙ্গিমা। নিজেকে বুঝি হারিয়ে ফেলতেন দলীপ।

এ কথা মনে হলে হাসতেন রণজি। তাঁর [illegible] পাতুতো ফ্রাঙ্ক উলীর সংগে সেবারে সেই দলীপের খেলা দেখতে যাবার কথা। কাকাকে দেখে নার্ভাস হয়ে গেলেন দলীপ। বড্ড তাড়াতাড়ি [illegible] অসহায়ের মতো আউট হয়ে গেলেন। মোটে খেলতেই পারলেন না দলীপ সিংজী।

আশাভঙ্গ হলো রণজিৎ সিংজীর। দলীপের মনের ভাবটা তিনি বুঝলেন না। একটু শ্লেষের সংগেই ফ্রাঙ্ক উলীকে বললেন, "এই তোমাদের দলীপ—একে নিয়েই তোমাদের এতো বাড়াবাড়ি!"

ফ্রাঙ্ক উলী কিন্তু দলীপের মনের অবস্থাটা বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন যে, রণজি তাঁর খেলা দেখছেন এ কথা জানতে পারলে দলীপ কিছুতেই খেলতে পারবেন না। আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে যাবেন দলীপ সিংজী।

তাই একদিন চুপি চুপি এসে রণজিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন মাঠের এক কোণে। দলীপ তাঁদের খেলা দেখতে আসার কথা জানতেই পারলেন না। মনের আনন্দে হাত খুলে খেলতে লাগলেন তিনি।

খুশি হয়ে উঠলেন রণজি। [illegible] [illegible] তিনি [illegible]। [illegible], [illegible] উলীর কথাই সত্যি। তাঁর সামনে দলীপ [illegible] খেলতে পারবেন না। আড়ষ্ট হয়ে [illegible] রণজিকে হারিয়ে পাছে এ কথা মনে করে [illegible]।

কিন্তু দলীপের [illegible] [illegible] জগতে খেলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] দলীপ [illegible] খেলা ইংলণ্ডেই। [illegible] টেস্ট খেলার খবরে রীতিমত [illegible] হয়ে উঠলেন রণজি। তাঁর মনে তখন নানা চিন্তা। অনেকদিন তিনি দলীপকে হাতে-কলমে খেলা শিখান নি—তাই কেমন খেলবে সে কে জানে। শুধু তাই নয়, জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় রণজি লাভ করেছিলেন শতরান করার কৃতিত্ব। দলীপও কি পারবে সেই কৃতিত্ব অর্জন করতে?

খেলার দিন যতো এগিয়ে আসে, রণজি ততো অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর সেই মনোভাবের কথা কেউই জানতে পারেন না। তারপর দেখতে দেখতে এসে গেলো ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার সেই দিনটি। দলীপ সিংজী প্রথম টেস্ট খেলবেন সেদিন।

খেলা আরম্ভ হবার অনেক আগেই মাঠে গিয়ে হাজির হলেন রণজিৎ সিংজী।

তারপর এক সময় ব্যাট করতে নামলেন দলীপ সিংজী। অসীম আগ্রহে রণজি দেখছেন দলীপের খেলা। সুন্দর খেলছেন দলীপ। রান বাড়ছে ধীরে ধীরে। দলীপের রান যতো বাড়ে ততো বেশি বিচলিত হয়ে ওঠেন রণজি। এক সময় দলীপের রান-সংখ্যা সেঞ্চুরীর কাছাকাছি এসে পৌঁছয়।

রণজি তখন শুধু বিচলিতই নন, অস্থিরও হয়ে ওঠেন। নিজের খেলোয়াড়-জীবনে সেঞ্চুরী যেন ছিল তাঁর মুঠোর মধ্যে। কোনদিন যিনি শত রানের মুখে এসে এতটুকুও বিচলিত হন নি—সেই রণজি দলীপের প্রথম টেস্টে শতরান করার আগের মুহূর্ত-গুলোতে ভীষণভাবে অস্থির হয়ে ওঠেন।

তারপর এলো সেই চরম মুহূর্তটি।

একটা মারার মতো বল পেয়ে সজোরে মারলেন দলীপ সিংজী। সেই রানগুলোর সংগেই পূর্ণ হয়ে গেল শতরানের জন্যে প্রয়োজনীয় রানগুলি। রণজির মতোই দলীপ সিংজীও জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় শতরান করলেন। শতরান করলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই।

দলীপের শতরান পূর্ণ হবার সংগে সংগে আসনে লাফিয়ে উঠলেন রণজিৎ সিংজী সমবেত দর্শকের সংগে তাল দিয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন [illegible] দলীপকে।

দলীপের জীবনে যে [illegible] পাওয়া [illegible] [illegible] রণজির [illegible] [illegible] ছিল না। [illegible] প্রথম [illegible] খেলার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্বও যেন সেদিন দলীপের কাছে কিছুই নয়।

সাংবাদিকদের কাছে রণজি সেদিন বলেছিলেন:

"....I am the proudest man in England. I have realised one of my greatest ambitions, and am basking in reflected glory. I watched every stroke of his play with the enthusiasm of a school boy; but I felt nervous for him, as I had coached him when he was eight years old, and until he went to Cheltenham. ...."

রণজির মতামতের মূল্য ছিল দলীপের কাছে সবার ওপরে। কিন্তু রণজির মতামত যে কি বস্তু, তা দলীপ ভালোভাবেই জানতেন। তাই তাঁর খেলা দেখে কিম্বা খেলার রিপোর্ট কাগজে পড়ে রণজি কি বলেন, তা জানার জন্যে দলীপ যেমন ভয়ে ভয়ে থাকতেন তেমনি সে বিষয়ে তার কৌতূহলও ছিল অপরিসীম। তবে দলীপ জানতেন যে, রণজি যা বলেন সবই তাঁর ভালোর জন্যে। ভাইপোর ওপর অপত্যস্নেহ ও দুর্বলতা রণজির যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ক্রিকেট খেলা এবং খেলার বিষয়ে ও সব তোয়াক্কা করতেন না তিনি।

১৯২৭ সালের কথা।

অনেকদিন ধরে অসুখে ভুগছেন দলীপ। শরীর বেশ খারাপ, অসম্ভব দুর্বল তিনি। অনেকদিন ক্রিকেটের সংগে কোন সম্পর্কই ছিল না তাঁর। তবু একটু সুস্থ হতেই তিনি গিয়ে নামলেন মাঠে। ব্রাইটন মাঠে রণজিও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এক-দম খেলতে পারলেন না দলীপ। শূন্য রানে আউট হয়ে গেলেন।

খেলার পর দলীপকে নিয়ে রণজি ফিরছেন। দলীপ তখন ভয়ে কাঁটা। কে জানে, কি বলবেন রণজি। গাড়ির মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলেন দলীপ।

রণজি কিন্তু কোন কথাই বলছেন না। একদম চুপ তিনি। মুখ দেখলেই

[শেষাংশ ২৬৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

॥ দলীপ সিংজী ॥

নিবদাহ

আবার ঘুরে এলো বৈশাখ। শুরু হ'লো আর একটা নতুন বছর। রোদে তাতা চৈত্র-বৈশাখের দিনগুলি এখন শুধু পড়ে পড়ে হাঁপায়। দুপুর বেলায় খোলা আকাশের তলায় অসহ্য গরমে প্রাণ যেন আই-ঢাই করে। শীত তার পসরা গুটিয়ে অনেকদিন আগেই চলে গেলেও, শীতের খেলা ক্রিকেট চোত-বোশেখের ভরা-দুপুরে কলকাতার ময়দান আলো করে আছে। এ তো খেলা নয়—খেলার নামে অসহ্য জ্বালা আর যন্ত্রণা সহ্য করা। এখন সারা দুপুর কড়া রোদে আর তাতা মাঠে ক্রিকেট খেলা যে কত কষ্টের, তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। বাংলাদেশের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষেরও এ সংবাদ অজানা নয়। তবু তাঁরা এই বিষয়ে এতটুকুও নজর দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না। জানি নে, ক্লাব-কর্তৃপক্ষরাও কেন এই বিষয়ে চুপ করে থাকেন! তাই এই বিষয়টির প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা চাই, ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হোক। ব্যাপারটা এমন কিছু আর অসম্ভবও নয়। এর জন্যে চাই একটু তৎপরতার সংগে দ্রুত খেলাগুলো পরিচালনা করা। এ ছাড়া অযথা সময় নষ্ট না করে এবং আরো আগে ক্রিকেট মরশুম শুরু করে চোত-বোশেখের প্রচন্ড দাবদাহের হাত থেকে খেলোয়াড়দের রক্ষা করা যেতে পারে। শুধু এই নয়, ইচ্ছে করলেই ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ আরো অনেকভাবে ব্যবস্থা করে শীতের রেশ থাকতে থাকতেই ক্রিকেট মরশুম শেষ করে ফেলতে পারেন। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন বোধ হয় তাঁরা আজো অনুভব করেন নি। তাই বছরের পর বছর কলকাতার ময়দানে কাঠ-ফাটা-রোদ্দুরে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের হাঁস-ফাঁস করে স্থানীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাগুলোর অংশ গ্রহণ করতে হয়। আমরা চাই, খেলোয়াড়দের দিকে চেয়ে অন্তত এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হোক।

—খান্ডার

ক্রিকেটের খবর

ছত্রিশ বারের মধ্যে শুধু একুশ বারই নয়—এইবার নিয়ে পর পর মোট বারো বার রণজি ট্রফি জিতে বোম্বাই দল শুধু রেকর্ডই স্থাপন করলো না, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে স্থাপন করলো একটা নতুন অধ্যায়।

যাই হোক, বোম্বাই যে খুব সহজেই রাজস্থান দলকে হারিয়ে এবারও রণজি ট্রফি লাভ করবে—এ-কথা আমরা আগেই লিখেছিলাম। দু'দলের দলগত শক্তির দিকটা বিচার করলে এই কথাই মনে হবে। তাই বোম্বাই দলের রণজি ট্রফি বিজয়ে বিশেষ কেউ অবাক হন নি। হয়েছেন শুধু রাজস্থান দলের ইনিংসে পরাজয়ে।

রণজি ট্রফির ফাইন্যালে বোম্বাই এবার এক ইনিংস ও ৫১ রানে রাজস্থান দলকে হারিয়ে দিয়েছে। পাঁচ দিনব্যাপী

॥ রণজি ট্রফি ॥

খেলার চতুর্থ দিনেই খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়।

যাই হোক, প্রথম ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে রাজস্থান প্রথম ইনিংসে করলো ২১৭ রান। এর মধ্যে পি শর্মার ৬৭, অরবিন্দ আপ্তের ৪৭ ও সেলিম দুরানীর ৪১ রানই একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য। বোলিং-এ ইসমাইল ৫৮ রানে ৪টি ও সোলকার ৫৩ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেছেন।

এর উত্তরে বোম্বাই প্রথম ইনিংসে করলো ৫৩১ রান। অশোক মানকাদের ১৭১, সুনীল গাভাস্কারের ১১৪, সোল-কারের ৮২ ও অজিত পাই-এর ৫৮ রানই একমাত্র উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় ইনিংসে রাজস্থান খুব একটা সুবিধে করতে পারলো না। মাত্র ২৫ রানে শেষ হয়ে গেল রাজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংস। দ্বিতীয় দফার রাজ-স্থানের পক্ষে সুরবীর সিং ৬১, পি শর্মা ৪৪, এ আপ্তে ৫৬ ও হনুমন্ত সিং-এর অপরাজিত ৬২ রানই একমাত্র ভালো এবং উল্লেখ করার মতো রান।

এক সময় রাজস্থান দলের খেলা দেখে মনে হয়েছিল যে, তারা সম্ভবত ইনিংসে পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজস্থান দলের অন্য ব্যাটস্ম্যানরা ব্যর্থতার পরি-চয় দেওয়ায়, তাদের ইনিংসেই পরাজয় [illegible]।

ডেভিস কাপ

পাকিস্তানকে সহজেই পরাজিত করার পর, ভারত পূর্বাঞ্চলের পরবর্তী খেলায় সিংহলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে। এই প্রতিযোগিতার আসর বসবে বোম্বাই-এ, এপ্রিল মাসের ১৮ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত।

সিংহলের বিরুদ্ধেও ভারতীয় দল পরিচালনা করার ভার পড়েছে ভারতের ১নং খেলোয়াড় ৩০ বছরের প্রেমজিৎ-লালের ওপর। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারতের যে সব খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তাঁরাই সিংহলের বিরুদ্ধে খেলবেন।

দলের অধিনায়ক তিরিশ বছরের প্রেমজিৎলাল ছাড়া অন্য খেলোয়াড়রা হলেন আঠাশ বছরের জয়দীপ মুখার্জী,

[২৬৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অজানা খবর

সম্প্রতি হামবুর্গে বিশ্ব কাপের যোগ্যতামূলক খেলায় পশ্চিম জার্মানীর ফরোয়ার্ড হেলমেট হ্যালারকে ফাউল করার অপরাধে স্কটিশ ফুলব্যাক টমি গেমেলকে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। "স্কটিশ ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের রেফারীজ কমিটি" গেমেলকে ৬০ স্টার্লিং জরিমানা করেছেন।

"ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন" গেমে-লকে তিনটি আন্তর্জাতিক খেলা থেকে বহিষ্কৃত করেন। শেষ পর্যন্ত গেমেল নিজের ক্লাব থেকেও সাময়িকভাবে খেলার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছেন। এ রকম ঘটনা হয়ত ফুটবল ইতিহাসে প্রথম।

* * *

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ রিচি বেনোর সহোদর জন বেনোকে সাসপেন্ড করে দিয়েছে। জন বেনোর অপরাধ—তিনি সাদা স্পাইক আঁটা শক্ত বুট না পরে এক নতুন ধরনের নরম জুতো পরে মাঠে নেমেছিলেন। ফলে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বেনো তাঁর দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন নি।

—[illegible]

ক্রিকেটের ব্যাটিং অথবা বোলিং-এ যথাক্রমে শতরান অথবা হ্যাট্‌ট্রিক করা যেমন খেলোয়াড়দের কাছে একটি দুর্লভ সম্মান, তেমনি ফুট-বলে হ্যাট্‌ট্রিক করা অর্থাৎ পর পর তিনটি গোল দেওয়াও ফুটবলারদের কাছে একটি দুর্লভ সম্মান। এই রকম একটি ঘটনা জড়িয়ে আছে কলকাতার ফুটবল আঙ্গিনায়।

মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনা। সময়টা ১৯৬৬ সাল। কলকাতার মাঠ তখন ফুটবলানন্দে সরগরম। ফিরতি লীগের খেলা হচ্ছে, মোহন-বাগান ও হাওড়া ইউনিয়নের মধ্যে। সেই খেলায় মোহনবাগান গুনে গুনে ছটি গোল দিল। তার মধ্যে করলেন দু'জন হ্যাট্‌ট্রিক। একজন চুণী গোস্বামী, আর অপর জন হলেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক। অর্থাৎ সেই খেলায় ডবল হ্যাট্‌ট্রিক হল। অসীম মৌলিক সেই [illegible] [illegible] গোল [illegible] ২১টি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

—শেখরনাথ ব্যানার্জী

প্রশ্ন-উত্তর

তপনকুমার রায়চৌধুরী (পানিহাটী, ২৪ পরগণা)

প্রশ্ন : ইংলণ্ড সফরকালে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তর : সম্ভবত অম্বর রায়?

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : তোমার অনেকগুলো চিঠি পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে শীঘ্রই উত্তর দেব। হ্যাঁ, প্রকাশকের নামে টাকা পাঠালেই ওরা বই পাঠিয়ে দেবে।

হীরেন্দ্রমোহন চন্দ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একজন খেলোয়াড় একটা বল উঁচু করে মারলেন। বলটা জনৈক ফিল্ডারের হাতে লেগে বাউণ্ডারী লাইন পার হয়ে গেল। বলটা মাটি স্পর্শ করে নি। এ ক্ষেত্রে কি হবে—বাউণ্ডারী, না ওভার বাউণ্ডারী?

উত্তর : ওভার বাউণ্ডারী।

দিলীপকুমার নাগ (চুয়াডাঙা, চাকদহ, নদীয়া)

প্রশ্ন : পাতৌদির নবাব কোন্ দলের বিপক্ষে সর্বপ্রথম ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন?

উত্তর : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় কনট্রাক্টর আহত হবার পরই পাতৌদির ওপর পড়ে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার।

শর্মিলা ও শ্রীমতী মৈত্র (নিউ দিল্লী)

উত্তর : সোলকারের ঠিকানা আগেই প্রকাশ করা হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই। ভেঙ্কট রাঘবনকে C/o. মাদ্রাজ ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন, মাদ্রাজ—এই ঠিকানায় লিখতে পারেন। তবে ফিরোজ-শা-কোটলার ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনে ফোন করে ওদের বাড়ির ঠিকানা আপনারা জেনে নিতে পারেন।

এখন তেহেরানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এশিয়ার জাতীয় চাম্পিয়ানদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। বাংলা দল যাবে কি যাবে না করেও শেষ পর্যন্ত গিয়ে তেহেরানে পৌঁচেছেন। সাধারণত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যে দল অর্থাৎ যে খেলোয়াড়রা খেলেন, তাঁদেরই তেহেরানে যাওয়ার কথা। কিন্তু তেহেরানগামী বাংলা দলে পুরনো দু'-একজনের স্থলে নতুন দু'-একজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সত্যিই এরকম একটা দল নির্বাচনের জন্য বাংলার নির্বাচকমণ্ডলী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই প্রশংসার মধ্যেও একটা কিন্তু রয়ে গেল। সেটা হল অধিনায়ক নির্বাচনের বিষয়টি। আমার মনে হয় অধিনায়ক নির্বাচনের বেলায় পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। তা না হলে, অধিনায়ক বদলানোর যুক্তি কি? যে অধিনায়কের দৌলতে জাতীয় চাম্পিয়ানের স্বীকৃতি ঘরে এল, তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরানোর যুক্তি খুঁজে পেলাম না। যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জী। জাতীয় চাম্পিয়ানের অধিনায়ক ছিলেন শান্ত-জ্যোতি মিত্র। দু'জনেই স্বনামধন্য খেলোয়াড় সন্দেহ নেই। নিজ নিজ স্থানে উভয়েই অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। দু'জনেই ভারতীয় দলে একাধিকবার খেলেছেন। তবু......। তার মানে বলছি না যে, শ্রীঅশোক চ্যাটার্জী অধিনায়ক হবার যোগ্য নন। নিশ্চয়ই যোগ্য। তিনিই বা শান্ত মিত্রের চেয়ে কিসে কম যান। তবুও এখানে অধিনায়ক হবার সম্মান শান্ত মিত্রের প্রাপ্য। কারণ, যেখানে জাতীয় চাম্পিয়ান দলের প্রশিক্ষক পর্যন্ত (শ্রীঅচ্যুৎ ব্যানার্জী) ঠিকই আছেন, সেখানে পুরনো অধিনায়ক কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ করেছিলেন? তাই বাংলার নির্বাচকমণ্ডলীকে আমার বিশেষ অনুরোধ যে, তাঁরা এবার যা করেছেন তা-তো করেছেনই, আগামী দিনে যেন এ রকম ভুল করে ক্রীড়ামোদীদের দোষের ভাগী না হন। এরকম ভুলের ফলে অনেক সময় দলীয় খেলোয়াড়দের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
ডাংগাপাড়া, পোঃ কাঁচরাপাড়া।

॥ রাজার রাজা ॥

[২৬৮৫ পৃষ্ঠার পর]

বোঝা যায় যে, গভীর চিন্তায় মগ্ন তিনি। কি ভাবছেন তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর পাশে-বসা দলীপের অবস্থা তখন কাহিল। শূন্য রান করার জ্বালার চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক হলো রণজির এইভাবে চুপ করে বসে থাকা।

অনেকক্ষণ বাদে রণজি মুখ খুললেন। বললেন যে, দলীপের খেলার প্রতিটি মুহূর্ত তিনি লক্ষ্য করেছেন। দলীপ তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। অন্য কোন খেলোয়াড় অমন শরীর নিয়ে মাঠে নামতে সাহস করতেন না। তাই দলীপের সাহস দেখে তিনি আনন্দিত। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দলীপ একদিন না একদিন ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলার সুযোগ পাবেই পাবে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন দলীপ। ঘাম দিয়ে যেন তাঁর জ্বর ছাড়লো...।

[চলবে]

॥ ডেভিস কাপ ॥

[২৬৮৭ পৃষ্ঠার পর]

সতেরো বছরের শশী মেনন ও ষোল বছরের বিজয় অমৃতরাজ।

বোম্বাই-এর আর· ডি· দেশাই ভারত-সিংহল ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রধান রেফারীর দায়িত্ব বহন করবেন।

এই বিভাগের বিজয়ী দলকে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ানশীপের জন্যে এই অঞ্চলের সেক্সন 'এ'-র বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

এই বছর অস্ট্রেলিয়া সর্বপ্রথম এশিয়ান জোনে খেলছে। জাপান প্রভৃতি দলগুলির সংগে অস্ট্রেলিয়া আলাদা গ্রুপে খেলছে। যদি অস্ট্রেলিয়া এই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয় আর ভারতও অন্য গ্রুপ বিজয়ী হয়, তাহলে মে মাসের গোড়ার দিকে বাঙ্গালোরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২,
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ ঃ ৪৩শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৯ই বৈশাখ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ Thursday, 23rd April, 1970

লেনিনের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব

লেনিনের চরিত্রের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য কি?

সরলতা। তিনি ছিলেন সত্যের মতোই সরল।

সেই সত্যের মতো সরল মানুষটির জন্ম হয় ১৮৭০ সালের ১০ই (২২শে) এপ্রিল, রাশিয়ার মহানদী ভলগার তীরে সিমবির্স্ক শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভস্ক)।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (লেনিন) ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। তাঁর সংগ্রাম ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। নির্যাতিত, নিগৃহীত, শোষিত ও শাসিত মানুষকে দেখিয়েছিলেন তিনি মুক্তির পথ।

লেনিনের জন্মের ছ' মাস আগে এই ভারতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রাম ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে—যারা শাসনে ও শোষণে ভারতবর্ষকে তিলে তিলে গ্রাস করছিল। লেনিনের সংগ্রাম ছিল প্রবল পরাক্রমশালী জারের বিরুদ্ধে। বিদেশাগত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নয়, দেশের গণশত্রু রাজশক্তির বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অক্টোবর বিপ্লবের কঠিন সংগ্রামের মধ্যে লেনিন জারশক্তিকে চিরকালের জন্য উচ্ছেদ করেন।

তারপর লেনিনের অন্যতম পরিচয়—দেশনির্মাতা হিসেবে। ঐ কাজে তিনি দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেন। সে এক কঠিন সময়। একদিকে ষড়যন্ত্রকারীর দল, আরেকদিকে দেশময় দুর্ভিক্ষ, অভাব ও অনটন। তবু লেনিন পরাস্ত হন নি। নির্যাতিত দেশবাসীর মর্মমূলে তিনি পৌঁচেছিলেন। তাঁর গঠনমূলক কাজ বিদ্যুতের গতিতে যেভাবে সাফল্যলাভ করেছিল, তার মূলে ছিল তাঁর [illegible] একনিষ্ঠ কর্মৈষণা এবং সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। এইচ, জি, ওয়েলস্ লেনিনের আশাবাদ সম্বন্ধে প্রথম দিকে অবিশ্বাস পোষণ করলেও, পরে তিনি লেনিনের সাফল্য দেখে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে লেনিনকে 'মহামানব' বলে অভিহিত করেছিলেন।

এতদসত্ত্বেও লেনিন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে চরম ভীতির ব্যাপার। তাই লেনিনের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল দেশ-বিদেশে অপপ্রচার। ভারতবর্ষেও তখন লেনিন এবং রাশিয়া সম্বন্ধে কম অপপ্রচার হয় নি। সেই অপপ্রচারের মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়ে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে লেনিনের সংগ্রামের ফলে কিভাবে এসেছিল রুশদেশে নির্যাতিত মানুষের মুক্তি এবং কিভাবেই বা দেশটা গণতীর্থে পরিণত হয়। লেনিন এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু বলেছেন, "We admired Lenin, whose example influenced us greatly."

সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে রামগড়-ভাষণে বলেছিলেন ঃ

"When the October Revolution broke out in Russia in 1917, nobody had a clear conception as to how the revolution should be directed. Most of the Bolsheviks were then thinking in terms of a coalition with other parties. It was left to Lenin to denounce all coalitions and give out the slogan—'All power to Soviets.' Who knows what turn Russian history would have taken but for this timely lead of Lenin's during a period of doubt and vacilation."

আমাদের দেশের বরেণ্য নেতারা বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েও লেনিনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করতে পেরেছিলেন। দেশে দেশে নির্যাতিত মানব-মুক্তির প্রতীক মহামানব লেনিন।

লেনিনের জন্ম-শতবর্ষপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যথার্থই বলেছেন ঃ

Of very few persons can it truly be said that they changed the course of human history. Lenin is one of them. He founded the Soviet State and changed the face of Russia, and at the same time made a powerful impact on the minds of people throughout the world.

তাই বিশ্বের সমস্ত মানুষ আজ লেনিনের প্রতি অনুরাগবিজড়িত পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সারা বিশ্ব দম বন্ধ করে প্রহর গুণেছিল।

ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সকলেরই মুখে-চোখে গভীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ছাপ। এক ছবি, এক ভব। একই ধুকপুকুনি।

গির্জায় গির্জায়, স্কুলে স্কুলে, ঘরে ঘরে একই প্রার্থনা, একই কামনা। ওরা ফিরে আসুক। ঠাকুর, ওদের ফিরিয়ে দাও ঠাকুর! মানুষ তিনটি যেন নিরাপদে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে!

মাটির দেবতা সে প্রার্থনা শুনেছেন। যমের হাত থেকে তিন মার্কিন মহাকাশচারীকে মা বসুন্ধরার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফিরে এসেছেন অধিনায়ক লোভেল, এসেছেন তাঁর দুই সাথী, ফিরেছেন ফ্রেড হেজ আর জন সুইগার্টও।

মন্দভাগ্য, অ্যাপোলো-১৩ মহাকাশযানে চেপে চন্দ্র অভিযানে চলেছিলেন তিন নভশ্চর। তাঁদের নায়ক ছিলেন জেমস লোভেল। কিন্তু তাঁরা যখন পৃথিবী থেকে দু' লক্ষ মাইল দূরে—চাঁদের আকাশে—তখন এক গুরুতর অভাবনীয় বিভ্রাট ঘটে। চাঁদের মূলযান সার্ভিস মড্যুলটির একটা পাশ ফেটে যায় আর ফুটো দিয়ে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যেতে থাকে মহামূল্যবান অক্সিজেন গ্যাস। বিদ্যুৎও বন্ধ। ফলে চাঁদে নামার, চাঁদ বা সৌরজগতের উৎস সন্ধান করার কর্মসূচী বাতিল করে দিতে হয়। তখন থেকে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলে কী করে মহাকাশচারীদের নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায়।

আরো কয়েকটি দুস্তর বাধা ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত মহাকাশচারীরা উৎকণ্ঠিত পৃথিবীর মানুষের মাঝে ফিরে এসেছেন।

অ্যাপোলো-১৩-র মিশন ব্যর্থ হয়েছে সেদিক থেকে। মন্দভাগ্য অ্যাপোলো-১৩। কিন্তু তারও চেয়ে মন্দভাগ্য বোধ হয় মিশনের অধিনায়ক জেমস লোভেলের। গত আট বছরে লোভেল এই নিয়ে চারবার চাঁদের মাটিতে পা দেবার চেষ্টা করলেন। প্রতিবারই বিফল হলেন তিনি।

জেমস লোভেল

অ্যাপোলো-১৩ ছিল চাঁদে মানুষের তৃতীয় অভিযানের প্রচেষ্টা। যদিও ১৯৬৯ সালে জুলাই ও নভেম্বর মাসে মার্কিন মহাকাশচারীরা দু-দু'বার চাঁদে নামার সাফল্য অর্জন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তবুও এবারকার অভিযান ছিল স্বতন্ত্র এবং ঝুঁকি ছিল সবচেয়ে বেশি। এই সব পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য তাই অভিযানের নায়ক মনোনীত হয়েছিলেন জেমস লোভেল—মহাকাশযাত্রার বিষয়ে সারা দুনিয়ায় যাঁর অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি।

এই নিয়ে জেমস লোভেল চারবার মহাকাশ যাত্রা করলেন এবং চাঁদে পাড়ি দিলেন দ্বিতীয় বার। এবার কথা ছিল লোভেল আগে চাঁদে নামবেন, তাঁকে অনুসরণ করবেন হেজ। লোভেল ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে জেমিনি-৭ মহাকাশযানে বোরম্যানের সঙ্গে ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট (১৪ দিন) মহাকাশে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করেছেন। পরের বছর নভেম্বরে জেমিনি-১২ মহাকাশযানে চার দিন মহাশূন্যে পরিক্রমা করেছিলেন। চাঁদকে যে মহাকাশযান প্রথম পরিক্রমা করে, সেই ভাগ্যবান অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানের মূল যান পরিচালনার কৃতিত্ব ছিল জেমস লোভেলের। অ্যাপোলো-১৩ অভিযানে অংশগ্রহণের আগেই লোভেলের মহাকাশ পরিক্রমায় দীর্ঘতম সময় প্রায় ১৪ দিন অতিবাহিত করার রেকর্ড রয়েছে।

জেমস লোভেল জন্মেছিলেন ওহিও রাজ্যে। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৯৫২ সালে নৌ-শিক্ষায়তনে যোগ দেন। লোভেলের স্ত্রী মেরিলিন। তাঁদের চারটি ছেলে-মেয়ে।

যাবার আগে লোভেল মন্তব্য করেছিলেন, এটাই তাঁর শেষ মহাকাশযাত্রা। তিনি হয়তো ধরে নিয়েছিলেন তাঁর স্বপ্ন—চাঁদে নামার আশা সার্থক হবে। কিন্তু বাস্তবে যখন তা হলো না, তখন কি তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন?

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বসু ও জিন্না—(৯)

জিন্না রাজনীতি থেকে সরে গেলেন—অসহযোগের প্রাবল্য কিছু কমলে আবার ফিরলেন। ১৯২৩-এর নভেম্বরে বোম্বাইয়ের মুসলমানগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে গেলেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের বন্যায় যে মুসলিম লীগ সাময়িকভাবে ডুবে গিয়েছিল, বন্যা সরে যাবার পরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ক্লেদের মধ্য থেকে তা আবার মাথা তুলল।১ চার বছর বন্ধ থাকার পরে ১৯২৪-এর ২৪শে মে তার অধিবেশন বসল লাহোরে। জিন্না সভাপতি। সভাপতির ভাষণে তিনি পূর্বের চার বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করার কালে অসহযোগের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পূর্ণ নিন্দা করলেন না, বরং দায়িত্বশীল ডোমিনিয়ান সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে 'নির্ভর' সংগ্রাম হয়েছে, তার প্রশংসাই করলেন।২ সেই সঙ্গে তিনি স্বরাজ-সাধনায় মুসলমানদের যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু শর্তের উল্লেখ করলেন যথা—

১। ভারতের জন্য চাই ফেডারেল কনস্টিটিউশন; প্রদেশগুলিতে থাকবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার; সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুলিই মাত্র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন হবে।

২। প্রত্যেক প্রদেশের আইনসভার এবং নির্বাচন-মূলক যে কোনো সংস্থার নির্বাচন পদ্ধতি এমন হবে, যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের উপযুক্ত এবং কার্যকর প্রতিনিধিত্ব থাকবে, তবে দেখতে হবে, সংখ্যাগুরুরা যেন সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয়, এমন কি সংখ্যাসমতাও না ঘটে। বর্তমানের মত পৃথক নির্বাচন রীতি ভবিষ্যতেও থাকবে।

৩। কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি সংস্থায় কোনো বিল বা প্রস্তাব পাশ হতে পারবে না, যদি দেখা যায়, কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থ সংখ্যক প্রতিনিধি নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষতিকর বলে তাদের অগ্রাহ্য করেছে।

৪। ১৯১৯-এর শাসন সংস্কার অসন্তোষকর এবং অনুপযোগী। তার পরিবর্তে অচিরে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে।৩

লীগের এই অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিন্দা করা হয়েছিল, যদিও "মুসলমানেরা দরিদ্র বলেই ধনী হিন্দুদের ধনসম্পত্তি সামান্য উস্কানিতেই হরণ করতে ছোটে"—এহেন অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল!! ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাঁরা, সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবে হিন্দুদের সহজেই যাঁরা পরাভূত করতে পারতেন।

মুসলমানেরা শিক্ষায় এবং আর্থিক সামর্থ্যে পশ্চাদপদ,

১ অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ লেগেই ছিল। তার মধ্যে বৃহত্তম সংঘর্ষ ১৯২৬-এর মে ও জুলাই মাসে কলকাতায় ঘটে।

২ জিন্না বলেছিলেন:

"There is an open movement for the achievement of *Swaraj* for India. There is fearless and persistent demand that steps must be taken for the immediate establishment of Dominion Responsible Government in India. The ordinary man in the street has found his political consciousness and realised that self-respect and honour of the country demand that the government of the country should not be in the hands of any one else except the people of the country." (রমেশ মজুমদার, তৃতীয়, ২৭১-৭২)

৩ রমেশ মজুমদার, তৃতীয়, পৃঃ ২৭২।

সম্বন্ধে কংগ্রেসীরা সচেতন ছিলেন না তা নয়, অন্তত এই আশ্চর্য হৃদয়বান মানুষটি, যাঁকে হৃদয়ের অবতার বলা হত, সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে তা দিলেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। একই সঙ্গে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধির অধিকারীও তিনি ছিলেন। জানতেন যে, ভালবাসার সমানে-সমানে, অনগ্রসরতার পিছুটান নিয়ে মুসলমান-সমাজ জাতীয় আন্দোলনে মনপ্রাণ নিয়ে এগিয়ে আসবে না। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের বোঝাপড়ার জন্য প্যাক্ট করেছিলেন,৪ সে প্যাক্টের শর্ত কোকনদ কংগ্রেসে "বাতিল হয়ে যায়, এই অজুহাতে যে, এর মধ্যে মুসলমানদের সম্বন্ধে অতিরিক্ত পক্ষপাত দেখিয়ে জাতীয়তার নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।"৫ কোকনদ কংগ্রেস অগ্রাহ্য করলেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যে, ১৯২৪-এ এটি অনুমোদিত হয়, তার প্রভাব উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই ভাল হয়েছিল, "মুসলমানেরা বুঝেছিল যে, দেশবন্ধু তাদের যথার্থ বন্ধু এবং এই রকম একজন মানুষ স্বরাজ্য দলের মাথায় আছেন, এই হেতু ঐ দলের পক্ষে মুসলমান-সমর্থন সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছিল এবং বাস্তবপক্ষে দেখা গেল, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে স্বরাজ্য পার্টিতে বহু সংখ্যক মুসলমান সদস্য আছেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে মুসলমান সম্প্রদায় স্বরাজ্য পার্টির ওপরে পূর্বের আস্থা বজায় রাখতে পারে নি।" (সুভাষচন্দ্র)৬ দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট এবং পঞ্জাবে লাজপৎ রায় ও ডাঃ এম এ আনসারীর প্যাক্টের উল্লেখ করার পরে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: "এই প্যাক্ট-গুলি দেখিয়ে দেয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে উন্নত বুদ্ধি-সম্পন্নরা সাম্প্রদায়িক বিভেদের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে-ছিলেন এবং সেই ভেদ আরও বেড়ে যাবার আগে একটা কিছু বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট দ্রুতভাবে জোরালো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, তার ফলে বিভেদ ক্রমশ তীব্র ও মারাত্মক হয়েছে এবং ১৯২৫-এর জুন মাসে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক সৃষ্ট রাজ-নৈতিক ভাবতরঙ্গ মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আবর্তের মধ্যে পড়তে হল।"৭

৪ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দেশবন্ধুর প্রেরণায় বাংলা দেশের জন্য হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট গ্রহণ করে। মূল শর্তগুলি এই প্রকার:

ক। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে, জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন হবে।

খ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রতি জেলায় সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৬০ এবং সংখ্যালঘুদের জন্য শতকরা ৪০—এই অনুপাতে আসন নির্দিষ্ট থাকবে।

গ। সরকারী পদের শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমানেরা পাবে।

ঘ। মন্দিরের সামনে কোনো গীতবাদ্য চলবে না।

ঙ। ধর্মীয় কারণে গোহত্যা করলে বাধা দেওয়া চলবে না। কিন্তু এমনভাবে গোহত্যা করতে হবে যাতে হিন্দুর ধর্মানুভূতি আঘাত না পায়। (রমেশ মজুমদার, তৃতীয়, পৃঃ ২৮১-৮২)

৫ বেঙ্গল প্যাক্ট কোকনদ কংগ্রেস কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার বিষয়ে সুভাষচন্দ্র 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ লিখেছেন:

"Deshabandhu Das had drawn up a Hindu-Moslem Pact for settlement of the communal question in Bengal and he desired the Congress to put the seal of approval on it. The Coconada Congress, however, did not do so and the Pact was rejected on the alleged ground that it showed partiality for the Moslems and violated the principles of Nationalism."

৬ ১৯২৫ সালের শেষের দিকে পূর্বতন স্বরাজ্য-সদস্য এম আর জয়াকর এবং এন সি কেলকার 'রেসপনসিভিস্ট পার্টি' গঠন করেন। স্বরাজ্য দলের সঙ্গে এঁদের মতভেদ দুটি ক্ষেত্রে, প্রথমত স্বরাজ্য দল যেমন নির্বিচার বাধাদানের নীতি নিয়েছিলেন, এঁরা তাকে যুক্তিযুক্ত মনে করছিলেন না, কারণ মুসলমানেরা অপরপক্ষে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধি করছিল, দ্বিতীয়ত স্বরাজ্য দলের মুসলিম-প্রীতিও এঁদের পছন্দ ছিল না। ক্রমে দেখা গেল রেস-পনসিভিস্ট পার্টি হিন্দু মহাসভা ঘেঁষা হয়ে পড়ছে। লাজপৎ রায় স্বরাজ্য দলে ১৯২৫-এর শেষদিকে যোগ দিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে তার ডেপুটি লীডার হয়েছিলেন এবং ১৯২৬-এর নির্বাচনের সময়েও তিনি মূল স্বরাজ্য নীতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন, কিন্তু বছরখানেক পরে স্বরাজ্য দল ত্যাগ করে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে মিলে 'ইন্ডি-পেন্ডেন্ট পার্টি' গঠন করেন। "মধ্য ও পশ্চিম ভারতে রেসপনসিভিস্ট পার্টির যে ভূমিকা, উত্তর ভারতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির সেই একই ভূমিকা।" (সুভাষচন্দ্র)

৭ ১৯২৩ থেকেই হিন্দু ও মুসলমান সমাজ সাম্প্রদায়িক সংগঠন জোরদার করার চেষ্টা করে। মুসলমানদের শক্তিশালী জাতিরূপে গঠিত করার জন্য 'তানজিম্' ও 'তাবলিগ্' আন্দোলন আরম্ভ করা হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'সংগঠন' ও 'শুদ্ধি' আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। 'শুদ্ধি' আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধর্মান্তরিত হিন্দুদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা। এই আন্দোলনে মুসলমানেরা আতঙ্কিত হয়। ১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জমিয়েত-উল-উলেমার সম্মেলনে সভাপতি বলেন, শুদ্ধি আন্দোলন 'ভারতের জঘন্যতম শত্রু।' এঁদের কাছে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক স্বামী

শুদ্ধিহত্যার পর থেকেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। ১৯২৬ সালের শোচনীয় কতকগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কে দারুণ ফাটল এনে দিয়েছিল। অবস্থার শোচনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯২৭-এর নভেম্বরে কলকাতায় ঐক্য সম্মেলন ডাকা হয় এবং তার সাফল্যময় অধিবেশন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে অনেকটা সহজ করে।

আর একটি ঘটনা শুভ সংকেত আনে। ভারতীয় শাসন সংস্কারের ব্যাপারে কি করা যায়, সে বিষয়ে অনুধাবনের জন্য ৭ জন ইংরাজকে নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়, যার চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার জন সাইমন। ভারতবাসীর ভাগ্য নির্ণয় করবে যে কমিটি, তাতে ভারতীয় কেউ নেই—ভারতবাসীর পক্ষে এর থেকে অমর্যাদাকর আর কী হতে পারে? সমস্ত ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে এগিয়ে এল, কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগও, ১৯২৭-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় মুসলিম লীগ সম্মেলনে পূর্বোক্ত ঐক্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমর্থিত হল এবং সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত করা হল। জিন্না ও আলী ভ্রাতারা সিদ্ধান্ত দুটি গ্রহণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।৮ ধারালো ভাষায় জিন্না বলেছিলেন, "জালিয়ানওয়ালাবাগে কসাইয়ের ছুরি পড়েছিল আমাদের শরীরে, সাইমন কমিশনে তা বিঁধেছে আমাদের আত্মায়।"৯

১৯২৮ সাল জিন্নার জীবনের চরম দুর্দশার কাল—রাজনৈতিক এবং পারিবারিক উভয় দিক থেকেই। আবার এই ঘনতম অন্ধকার ঠেলেই ভারতীয় মুসলমানদের কায়েদে আজমের আবির্ভাব। জিন্নার দ্বিতীয় বিবাহ সুখের হয় নি—হওয়া সম্ভব ছিল না, একথা আগেই বলেছি। জিন্নার সঙ্গে তাঁর পত্নীর সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে উঠেছিল, যাতে জিন্না মাউণ্ট প্লেজেণ্ট রোডের বাসভবন ছেড়ে তাজমহল হোটেলে থাকবার জন্য গিয়েছিলেন। মিসেস জিন্না তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে চলে গিয়েছিল ইয়োরোপে। ১৯২৮-এর এপ্রিল মাসে জিন্নাও ইয়োরোপে চললেন—তাঁর রাজনৈতিক জীবন তখন উদভ্রান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পারিবারিক সুখ-শান্তির সম্ভাবনা আপাতত একেবারে চূর্ণ।" ইংলণ্ডে পৌঁছে জিন্না গেলেন আয়ারল্যাণ্ডে, আর তাঁর বন্ধু ও জাহাজে সহযাত্রী দেওয়ান চমনলাল চললেন প্যারিসে—যেখানে মিসেস জিন্না রয়েছেন একাকী। ঠিকভাবে বলতে গেলে মিসেস জিন্না গুরুতর পীড়িত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। অসাধারণ সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া সেই নারীকে দেওয়ান চমনলাল পূর্ব থেকেই চিনতেন, গিয়ে দেখলেন ১০৬ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে শয্যাশায়ী, তাঁর হাতে ধরা আছে অস্কার ওয়াইল্ডের কবিতার বই—সেটি এগিয়ে দিয়ে মিসেস জিন্না চমনলালকে কবিতা পড়তে অনুরোধ করলেন। তখন তাঁর কোমা'র অবস্থা।

মিসেস জিন্না সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন, আয়ারল্যাণ্ড থেকে মিঃ জিন্না এসে গিয়েছিলেন, উভয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, কিন্তু নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার তা, আবার ফাড়া বাধতে দেরি হয় নি। মিসেস জিন্না বোম্বাইয়ে ফিরে তাজমহল হোটেলে বাস করতে থাকেন, সেখানে অসুখে পড়েন এবং মোসলের উক্তি অনুযায়ী, রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মারা যান—তখন তাঁর বয়স ২৯ বছরও নয়। মিসেস জিন্নার সমাধিকালে মিঃ জিন্না উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু শোককারীদের একেবারে পিছনে, সেখানেও রাজনৈতিক বিষয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মিসেস জিন্নাকে যখন মাটির ভিতরে শেষ শয়নে শোয়ানো হয়েছিল, তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর মালাবার হিলের প্রাসাদভবনে ফিরেছিলেন, মিসেস জিন্নার সর্বপ্রকার স্মৃতিচিহ্ন, ফটোগ্রাফ পর্যন্ত বাড়ি থেকে সমূলে উৎখাত করেছিলেন। সমবেদনা জানাতে এসে এক বন্ধু যখন মিসেস জিন্নার শেষ সময়ের কথা উত্থাপন করেছিলেন, মিঃ জিন্না তাঁর দিকে কঠিনতম দৃষ্টিতে তাকিয়ে একেবারে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধানন্দ যে জঘন্যতম শত্রু ছিলেন, তা না বললেও চলবে। সুতরাং শ্রদ্ধানন্দকে যখন ধর্মান্ধ এক মুসলমান খুন করে, তখন দুঃখ প্রকাশে মুসলমানেরা এগিয়ে আসে নি।

৮ ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল।

৯ মাইকেল এডওয়ার্ডস লিখিত 'দি লাস্ট ইয়ারস্ অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া' দ্রষ্টব্য।

সাইমন কমিশনের ব্যাপারে মুসলিম লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়। কমিশন বয়কটের পক্ষে নেতৃত্ব করেছিলেন জিন্না, উল্টো পক্ষের নেতা শফি। বৃটিশ সরকার এক্ষেত্রে কমিশনসমর্থক মুসলমানদের ওপর খুবই নির্ভর করেছিল। ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড তদানীন্তন ভাইসরয়কে এই বিষয়ে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, তার থেকে এ কে মজুমদার দুটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বৃটিশ কূটবুদ্ধির চমৎকার নমুনা তার থেকে পাওয়া যাবে। জিন্না বয়কটের পক্ষে ছিলেন বলে তাঁকে কিভাবে কোণঠাসা করা যাবে, সে কথাও বলা হয়েছিল। একটি চিঠিতে বার্কেনহেড লিখেছিলেন :

"I should advise Simon to see at all stages important people who are not boycotting the Commission, particularly Muslims and the depressed classes. I should widely advertise all his interviews with representative Muslims. The whole policy is now obvious. It is to terrify the immense Hindu population by the apprehension that the Commission having been got of by the Muslims, may present a report altogether destructive of the Hindu position, thereby securing solid Muslim support and leaving Jinnah high and dry."

জিন্নার ব্যক্তিগত জীবনের ট্রাজেডি নিশ্চয়ই তাঁর রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। নিঃসঙ্গ শূন্য যে জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তা বহুলাংশে তাঁকে হৃদয়বাষ্পশূন্য দমনীয় চরিত্র করে তুলেছিল। যে সুবিচার তিনি ভাগ্যের হাতে পান নি, তাকে অপরের ভাগ্যে তুলে দেবার ইচ্ছা তিনি হারিয়েছিলেন।১০

এই ১৯২৮ সালেই জিন্না হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশাহারা হন। কিছু আগে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মিলিত প্রতিবাদের কথা বলেছি। প্রতিবাদীদের মধ্যেও জিন্নাও ছিলেন, তা দেখেছি। ১৯২৭-এর নভেম্বরে সাইমন কমিশন গঠিত হয়। ভারতবর্ষে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগলে ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড বিদ্রুপতিক্তভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, ভারতবাসীরা পারে তো ঐক্যবদ্ধভাবে শাসনতন্ত্র তৈরি করুক।১১ চ্যালেঞ্জের উত্তর দেবার জন্য মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সেই কমিটি ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে-রিপোর্ট দেয়, তা লখনৌয়ে সর্বদলীয় সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই রিপোর্টের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। রিপোর্টের একটি বড় কৃতিত্বের অংশ ছিল, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য মীমাংসাসূত্র রচনা করতে পেরেছিল। রিপোর্টে একদিকে সকল সম্প্রদায়ের জন্য যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছিল, অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে আসন নির্দিষ্ট থাকবে, তাও বলা হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সংরক্ষিত আসনের বাইরে সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে, স্থির হয়েছিল। মুসলমানেরা বাংলা ও পাঞ্জাবে সংখ্যাগুরু—ঐ দুই প্রদেশে আসন সংরক্ষণের কোনই ব্যবস্থা থাকবে না। নেহরু-রিপোর্টের অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন—মুসলমান সম্প্রদায়কে রিপোর্টে কতখানি বিশেষ সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পূর্বের চুক্তিতে বাংলা দেশে মুসলমানেরা যেখানে সংখ্যায় শতকরা ৫৪ ভাগ সেখানে তাদের আসনসংখ্যা ছিল শতকরা ৪০ ভাগ এবং হিন্দুদের শতকরা ৬০ ভাগ, পাঞ্জাবে মুসলমানেরা যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ, তাদের আসন শতকরা ৫০ ভাগ। এরকম হবার কারণ, ভারতের অন্যান্য অংশে যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেখানে তাদের প্রতিনিধি আনুপাতিক হারের অনেক বেশি ছিল। ঐক্যের খাতিরে হিন্দুরা এখন একদিকে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বকে মেনে নিল, অন্যদিকে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে নিজেদের জন্য আনুপাতিক সদস্যসংখ্যা দাবি করল না।

নেহরু কমিটির রিপোর্ট যখন ১৯২৮-এর আগস্ট মাসে সর্বদলীয় সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল, জিন্না তখন ছিলেন ইয়োরোপে—পারিবারিক ট্রাজেডিতে মন তাঁর একেবারে বিধ্বস্ত। কয়েকমাস আগে অর্থাৎ ১৯২৭-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় লীগ সম্মেলনে ঐক্য প্রস্তাব নেওয়ানোর এবং সাইমন কমিশন বয়কট করানোর জিন্না বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কয়েক মাস রাজনীতিতে তাঁর যেন কোনো স্থানই ছিল না। নেহরু কমিটির মধ্যে তিনি ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের ইঙ্গিত—জিন্না সেই জন্য নেহরু-কমিটির রিপোর্টকে সুচক্ষে দেখেন নি। আগস্ট মাসে লখনৌয়ে ঐক্য-সম্মেলনে যখন নেহরু-রিপোর্ট মেনে নেওয়া হল, জিন্না তখন ইয়োরোপ থেকে জাহাজে ভারতে ফিরছেন—বোম্বাইয়ে অবতরণ করার পরে নেহরু-রিপোর্ট সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করা হলে রীতিমত কূটনৈতিক উক্তি

১০ জিন্নার জীবনীকার জিন্নার পারিবারিক জীবনের ট্রাজেডির কথা আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জিন্নার দ্বিতীয় বিবাহের একটি মাত্র সন্তান ছিল—এক কন্যা। তিনি তাঁর মায়ের পার্শী আত্মীয়দের সঙ্গে থাকতেই ভালবাসতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন খৃস্টানকে বিয়ে করেছিলেন।

জিন্নার শূন্য জীবনের দীর্ঘশ্বাস তাঁর জীবনীকার একটি ঘটনায় ফুটিয়েছেন। জিন্নার এক বন্ধুর বালক-পুত্র তার সমবয়সী বন্ধুকে নিয়ে জিন্নার বাড়িতে থেকেছিল। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জিন্না তাদের সঙ্গে গল্প করেন—নিজের ইংলন্ড-জীবন সম্বন্ধে। তারা বিদায় নেবার আগে জিন্না বলেন, "আহা, আমার যদি তোমাদের মত একটি ছেলে থাকত!"

প্রাণোত্তপ্ত লিয়াকত আলী এবং তাঁর সুন্দরী বুদ্ধিমতী পত্নী রাণা জিন্নার জীবনের শেষ পর্যায়ে অনেকখানি সাহচর্য দিয়েছিলেন। লিয়াকত, জিন্নার মনের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। একদিন এমন কি তিনি সাহস করে জিন্নার নিঃসঙ্গ জীবনের প্রসঙ্গও তুলেছিলেন। জিন্না বেগম লিয়াকতের দিকে তাকিয়ে হেসে সস্নেহে বলেছিলেন, "হাঁ, আমি আবার বিয়ে করতে পারতাম, যদি আর একজন রাণা'র সাক্ষাৎ পেতাম।"

১১ বিখ্যাত আইনজীবী লর্ড বার্কেনহেড অন্ধ মনোভাবের এবং তিক্ত ভাষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর ভারতসচিবত্বের কালে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা তাঁকে মর্মান্তিক চটিয়েছিল। ভারতবাসী সম্বন্ধে বার্কেনহেডের আর যাই থাক, অশ্রদ্ধার অভাব ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য কোনোদিন ঘুচবার নয়—এই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস এবং ১৯২৪-এর ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড রীডিংকে লিখেছিলেনঃ "খোলাখুলি বলছি, ভারত কোনোদিন স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য হবে, এ জিনিস আমার পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত।" পরম পরিতোষের সঙ্গে তিনি ভেবেছেনঃ "শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে—ভারতের হিতের জন্যই আমরা ভারতে আছি।" (বোলিথো)

[illegible], যার মধ্যে কতখানি [illegible], না-বলা অংশ আরও বেশি ছিল—সেই না-বলা অংশ খুলে বললেন ২৮শে ডিসেম্বর কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে। জাতীয়তাবাদী জিন্নার সমাধির ওপরে সেই বক্তৃতার কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল।

মুসলিম লীগের পক্ষে জিন্না দাবি করলেন: কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং 'residuary powers' থাকবে প্রদেশের হাতে, কেন্দ্রের হাতে নয়, যার ফলে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলি কার্যত স্বায়ত্তশাসিত হবে—কেন্দ্রীয় হিন্দু সংখ্যাগুরুদের অধীন হবে না।

এ দাবি মুসলমান ছাড়া আর কারো পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নেহরু-কমিটি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের বেশি যেতে রাজী ছিল না। কিন্তু জিন্নার মনে হয়েছিল তিনি খুবই ন্যায়সংগত কথা বলছেন: তাঁর বক্তব্য মেনে নিলেই তবে 'উৎপীড়ক এবং অত্যাচারী হতে উন্মুখ' সংখ্যাগুরুর কবল থেকে সংখ্যালঘুরা মুক্তি পেতে পারে। যদি তাঁর কথা না শোনা হয়, তাহলে পরিণতি 'বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ।'

জিন্নার কথা অন্য দূরে থাক, মহা-মডারেট তেজ-বাহাদুর সপ্রুর কাছে পর্যন্ত অসহ্য ঠেকল। পূর্বতন ন্যাশনালিস্টের শোচনীয় পরিবর্তন দেখে তিনি তিরস্কার করে বললেন, জিন্না 'নষ্ট দুষ্ট ছেলের মত' কথা বলছেন। জিন্নার জীবনীকার জানিয়েছেন, 'নষ্ট দুষ্ট' ব্যক্তিটি, যিনি সদ্য ইংলণ্ড থেকে ফিরেছেন এবং 'ফ্যাশনমাফিক পোষাক পরে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য ওকালতি করছিলেন' তিনি [illegible] খুবই আন্তরিক ছিলেন, মহানও ছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানকে এক করা যাবে সে বিশ্বাস তাঁর ছিল, কোনো ঘৃণা ছিল না তাঁর মহান্ হৃদয়ে,—সর্বদলীয় সম্মেলনে যখন তাঁর দাবি অগ্রাহ্য হল, যখন বলা হল, মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার অধিকার তাঁর নেই, তখন তিনি বেদনা ও অসম্মানের ভার মাথায় নিয়ে হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন।

"পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় মিঃ জিন্না ট্রেনে করে কলকাতা ত্যাগ করলেন"—জামসেদ নাসেরওয়ানজি তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—"আমি তাঁকে বিদায় দিতে স্টেশনে গিয়েছিলাম। তিনি তাঁর ফার্স্টক্লাশ কুপের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন, যখন কথা বললেন, তখন চোখে জল: 'জামসেদ, পথ এবার আলাদা হয়ে গেল।'[১২]

জিন্না আর পিছন ফিরে তাকালেন না। তাঁর একমাত্র মূল অতঃপর মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি করা এবং সেই চেষ্টার নায়করূপে নিজেকে স্থাপন করা। এই প্রয়াসে তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত, তার প্রমাণ কুড়ি বছরের মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য জিন্না মুসলিম লীগকে সংগঠিত করে একটি অন্ধ শক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন এবং সেই কাজে সর্বদা ইংরেজের সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজ জিন্নার প্রয়োজনে নয়, নিজ স্বার্থের প্রয়োজনেই জিন্নাকে সাহায্য করেছিল। [ক্রমশ]

১২। জিন্নার আর একটি মহান্ অশ্রুপাতের উল্লেখ একই ব্যক্তি করেছেন। পাকিস্তান হয়ে যাবার পরে ১৯৪৮ জানুয়ারীতে শিবিরবাসী হিন্দুদের অবস্থা দেখে নাকি তাঁর শীর্ণ গণ্ড বেয়ে চোখের জল ঝরেছিল।

লেনিন: তোমার দেশে

বিষ্ণু দে

বহুদিন যেন আসি নি এদেশে—আপন দেশেই:
পরদেশী, নাকি পরবাসী শুধু পরগাছা সৌভাগ্যে?
অথচ নেহাৎ দেশজ, মূলত গ্রাম্য,
বড় জোর কলকাত্তাই আধা-শহুরে বেশে—

চিরপরিচিত দৃশ্য কেন বা এমন অচেনা লাগবে?
স্মৃতিতেও নেই চেনা সেই শতসহস্র মহীরুহ?
আরণ্যক সে মহিমা প্রাকৃত সুখী-দুখী জনপদে,
আলোয়-ছায়ায় নিয়মিত মেঘে-রৌদ্রে কম্প্র কাম্য?

শুধুই কি চোখে, হাতে, পায়ে, আর মনের শরীরেতে,
ফোটে যে দুঃখ মাটির ঢেলায় হঠাৎ-হঠাৎ ব্যূহ।
শুধুই আগাছা চোর বিষকাঁটা ঘোচাবে গণ্ডি-ক্ষতে?
অন্ধ মুহূর্ত পাশার দুরাশা বাঁধাবে জোগাবে শক্তি?

সারা দেশ তারই মস্তিতে হল অন্ধ নগ্ন বিবশ,
দুঃশাসনেরা কীচকেরা গাঁথে কত অপচেতা চক্রে:
দুস্থ প্রকৃতি, ক্লান্ত মনীষা, দুস্থ বিশ্ববিরাজ।

পরদেশী পরবাসী কত ছিল লেনিন, তোমার দেশে?

সমস্ত রাত লেনিন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেনিন ঘুমায় না,
ঘুমুতে দেয় না।

কবরে শুয়ে লেনিন
তবু হাজার লেনিন
পাহাড়ে মাঠে হাটে
সমস্ত রাত হাঁটে।

লেনিন ঘুমায় না,
ঘুমুতে দেয় না।

যেখানে মায়েরা
চোখের জল চাপে
যেখানে কুয়াশা
শিশুর মত কাঁপে,
জাগে হাজার লেনিন।

সমস্ত রাত লেনিন
ঘুমুতে দেয় না।

আমার ভূমিকা

জয়ন্তী সেন

তোমার স্বপ্নের ভিড়ে আমিও ছিলাম
এবং আমার নাম
তুমি ভোল নাই,
প্রতিশ্রুত সূর্যোদয় বিলম্বিত, মীরার সানাই
নৈঃশব্দে অভ্যস্ত মৌন পৃথিবীর রাত্রি অন্তরে।
আমাকে আশ্বাস দাও—হবে, ভোর হবে।
তোমার প্রেমের গল্পে, হে লেনিন, আমার ভূমিকা
চিরায়ত আগুনের শিখা।
আমার উজ্জ্বল মুখ সময়ের কঠিন পাথরে
আশ্চর্য [illegible]
যত তীব্র [illegible] প্রত্যাশিত [illegible]
তোমার প্রাণের [illegible]

১৩৭৬ সাল অবশেষে পার হল অনেক ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে ১৩৭৬ সালের গুরুত্ব অত্যধিক। এই বছরটি অনেক ভাঙাগড়ার সাক্ষী হয়েছে। শেষ একটি মাস বাদ দিয়ে গোটা ১৩৭৬-ই যুক্তফ্রন্টের শাসনে ছিল। শুধু রাজ্য ভাঙাগড়ার ইতিহাসেই এই সালটির গুরুত্ব নয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বছর হিসাবেও ১৩৭৬ চিহ্নিত। ১৩৭৬-এই গ্রামবাংলার নতুন করে যাত্রা শুরু হয়েছিল। ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভূমি সংস্কারের কার্যত প্রথম প্রচেষ্টা এই বছরেই হয়েছিল, যে কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। রাজনীতিক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট নামক ধারণাটির সার্থকতার মূল্যায়ন এই বছরেই সম্ভবপর হয়েছে। ১৩৭৬-এর বিস্তৃত ঘটনাপঞ্জীর উল্লেখ করা এখানে বাহুল্যমাত্র। ১৩৭৭ সালকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, বাঙালীর জীবনে ১৩৭৭ সাল শুভময় হোক এই প্রার্থনা সহ। একটি জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মুখে ১৩৭৭ সালের সূত্রপাত ঘটছে, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ভারতবর্ষের সবচেয়ে সমস্যাজর্জরিত রাজ্য আজ কার্যত কাণ্ডারীহীন, বকেয়া সমস্যা অমীমাংসিত, প্রতিদিনই নব নব সমস্যার সংযোজন হচ্ছে। তাই ১৩৭৭ সাল পশ্চিমবঙ্গের রূপ বদলে দেবে, দিন পাল্টে দেবে, সেটা আশা করাই দুরাশা। সে যাই হোক, নববর্ষকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে আমরা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

ভূগর্ভ রেল

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দা তাঁর কলকাতা সফরকালে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কলকাতায় চক্ররেলের কোন পরিকল্পনা তাঁদের নেই, সরকার এখন না-কি ভূগর্ভ রেলের কথা ভাবছেন। এ হেন রসিকতার মর্ম উপলব্ধি করতেই আমাদের বেশ সময় লেগেছে। শ্রীপরিমল ঘোষ যখন রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেছিলেন যে, কলকাতা ও শহরতলীর যাত্রীদের দুর্ভোগ-লাঘবের জন্য অর্ধচক্র রেল স্থাপন করা হবে। দমদম থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত অর্ধচক্র রেল স্থাপন করার

শ্রীপরিমল ঘোষ

সিদ্ধান্ত নাকি পাকা হয়ে গিয়েছিল এবং চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যেই চক্ররেল চালু হবে এই ছিল শ্রীপরিমল ঘোষের বক্তব্য।

অথচ শ্রীনন্দা বলছেন যে, গত দশ বছর ধরে সার্কুলার বা চক্ররেলের কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নেই। কিন্তু আমরা জানি যে, এই রকম পরিকল্পনা কেন্দ্রের হাতে ছিল এবং অর্ধচক্র রেলের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা চালাতে ৪০ লক্ষ টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশ যে, স্বয়ং শ্রীপরিমল ঘোষ শ্রীনন্দার এই উক্তিতে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং একটি বিবৃতি মারফৎ শ্রীনন্দার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উভয় তরফের বক্তব্য থেকে যে বিষয়টা প্রতীয়মান হয়, তা হচ্ছে এই যে, শ্রীপরিমল ঘোষের মন্ত্রিত্ব

[illegible] কল্যাণব্রতী ঘটেছে। তবে মন্ত্রী বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁর অসমাপ্ত কাজকর্মগুলিকেও ডকে তোলা হয়, এটা সাংবাদিক বদ নজীর হবে।

এ-কথা থাক্। শ্রীনন্দা ঝুলি থেকে আরও একটি বিড়াল বার করেছেন, তা হচ্ছে ভূগর্ভ রেল। বলা বাহুল্য, এটিও বহু আলোচিত বস্তু, এমন কিছু নতুন বিষয় নয় যা শুনে আহামরি করতে হবে। শ্রীনন্দা নিম্নরূপ প্রস্তাব রেখেছেন। এই ভূগর্ভ রেল তিনটি কি চারটি পর্যায়ে সমাপ্ত হবে। প্রথম পর্যায়ে কালীঘাট থেকে বৌবাজারের মোড়, দ্বিতীয় পর্যায়ে শিয়ালদহ থেকে ডালহৌসী, তৃতীয় পর্যায়ে ডালহৌসী থেকে দমদম। এ ছাড়া গঙ্গার দ্বিতীয় সেতুর ওপরও রেললাইন করার প্রস্তাব দেওয়া হবে। এই ভূগর্ভ রেলের প্রথম পর্যায়ের জন্য চল্লিশ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য কুড়ি কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। বাকি দুটি পর্যায় সম্পর্কে শ্রীনন্দা কিছু বলেন নি।

এই ভূগর্ভ রেলের গুণাগুণ ও সম্ভাব্যতার কথা আলোচনা করার আগে উপযোগিতার ভিত্তিতে চক্ররেলের সঙ্গে ভূগর্ভ রেলের একটা তুলনা করা দরকার। শ্রীপরিমল ঘোষ যে পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, তা পুরোপুরি চক্ররেল নয়, অর্ধচক্র রেল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শহরতলীর যাত্রীদের ট্রেনে করে কর্মস্থলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা। ট্রাম-বাসের ওপর ভিড়ের অসম্ভব চাপ হ্রাস করাই ছিল চক্ররেলের লক্ষ্য এবং বাস্তবতার দিক থেকে চক্ররেল স্থাপন অনেক কম ঝামেলার ব্যাপার, যা সহজেই করা সম্ভব। এ ছাড়া যেহেতু চক্ররেল ভূগর্ভ রেলের পরিপূরক নয়, সেই হেতু তা হবার পর ভূগর্ভ রেল বা আকাশ রেল করতে কোন অসুবিধা ছিল না। চক্ররেলের কাজটা তাড়াতাড়ি অল্প ব্যয়ে করা সম্ভবপর ছিল এবং যাত্রীরা এর ফলে আপাতত কিছুটা হাঁপ ছাড়ার অবকাশ পেতেন।

পক্ষান্তরে ভূগর্ভ রেল নিয়ে সমস্যা অনেক। এক নম্বর, এ বিষয় সমীক্ষা করতেই বেশ কিছুকাল যাবে এবং এ বাবদে প্রচুর অর্থ তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের উদর গহ্বরে যাবে। দ্বিতীয়ত, কলকাতার নরম মাটি ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপনের পক্ষে উপযোগী কিনা সেটাও দেখতে হবে। শ্রীনন্দা বলেছেন যে, কলকাতার ভূগর্ভস্থ অঞ্চল সুড়ঙ্গ করার উপযোগী নয় এমন রিপোর্ট তাঁর হাতে আসে নি। কিন্তু যদি বিপরীতটা সত্য হয়? তৃতীয়ত ভূগর্ভ রেল স্থাপন সময়সাপেক্ষ। স্ট্র্যান্ড রোডে জলের পাইপ বসানো হচ্ছে এতেই ছ'মাস ধরে ঐ রাস্তা

কার্যত অচল, ডালহৌসী থেকে হাওড়া পৌঁছতে দু' ঘণ্টা কাবার হয়ে যায়। ভূগর্ভ রেলের মত একটা এলাহী ব্যাপারে হাত দিতে গেলে কলকাতার জীবনযাত্রাই রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা বেশি। চতুর্থত, ভূগর্ভ রেল পরিকল্পনা সার্থক করতে গেলে শ্রীনন্দার আরও বহুকাল মন্ত্রী হিসাবে থাকার প্রয়োজন আছে ; নতুবা ভাগ্যচক্রে শ্রীনন্দা যদি মন্ত্রী না থাকেন তাহলে পরবর্তী রেলমন্ত্রীও তো বলতে পারেন, ভূগর্ভ রেলের কোন পরিকল্পনা গত বিশ বছর ধরে সরকারের হাতে নেই।

যাই হোক, এই মুহূর্তেই কিছু একটা করা দরকার, কেন না কলকাতার নাভিশ্বাস উঠেছে, রেলমন্ত্রী তৎপর হোন। আমরা সত্যই বুঝতে অপারগ যে, এ বাবদে যে ব্যয়টা হবে, সেটা উঠে আসতে যখন বেশি দিন সময় লাগার কথা নয় তখন গত বিশ বছর ধরে কলকাতা ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে প্রতিদিন বিড়ম্বিত করার সার্থকতা কোথায়?

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে ভাঙন

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি আজ স্পষ্টতই দুভাগ হতে চলেছে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি যাবৎ দেখে শুধু সদস্যদেরই অধিকারী হয় নি, শিক্ষকদের ন্যায়সংগত দাবিদাওয়া আদায়ের কাজেও তার বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। আমরা এই ভাঙনে, বলাই বাহুল্য খুশি হই নি। তার কারণ এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা করার জিনিস ছিল প্রচুর। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ· বি· টি· এ-র করণীয় অনেক কিছুই ছিল। সিলেবাসের সংস্কার, পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার রূপান্তর, শিক্ষা ও শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সংস্থান, শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি অনেক কিছুই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির করণীয় ছিল।

চন্দননগরে অনুষ্ঠিত এবারকার বাৎসরিক অধিবেশনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অন্তর্বিরোধ বিস্ফোরণের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। অসংখ্য শিক্ষক প্রতিনিধি সমিতি বর্জন করে বেরিয়ে গেছেন। শোনা যাচ্ছে তাঁরা নাকি পাল্টা সংগঠন তৈরি করবেন। এর পরিণতি প্রতিটি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই মারাত্মক হবে। যেভাবে আজ পরস্পর-বিরোধী ইউনিয়নের কোন্দল সমস্ত অফিস, কল-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, সেই একই জিনিস আসবে বিদ্যালয়ে। এখানেও শুরু হবে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের হানাহানি, শিক্ষকে শিক্ষকে বাধবে বিরোধ এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হবে ছাত্রদের। হয়ত তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সমিতির বিরোধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে, যেটা কল্পনা করতেই ভয় হয়, অথচ তাই ঘটতে চলেছে।

যাঁরা সমিতি বর্জন করে বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের অভিযোগ এই যে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাছে শিক্ষা ও শিক্ষকের স্বার্থ আজ গৌণ। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তাঁবেদার হয়ে পড়েছে এবং তা পরিচালিত হচ্ছে উক্ত পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচী অনুসারে। এ অভিযোগটা মিথ্যা হলে হয়ত খুশি হওয়া যেত, কিন্তু নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব এ কথা খোলাখুলিভাবেই বলেছেন। বর্তমান অধিবেশনে তাঁদের গৃহীত প্রস্তাবগুলিই হচ্ছে অবিলম্বে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি। অধিবেশনে বক্তারা সকলেই বিশুদ্ধ রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও যুক্তফ্রন্টের অপরাপর সি· পি· এম-বিরোধী দলগুলির মুণ্ডপাত করেছেন, শিক্ষাসংক্রান্ত কোন কিছু বিষয়ই সেখানে স্থান পায় নি। যাঁরা কেউ একথা বলেন যে, এই বক্তব্যের ... অতিরঞ্জন আছে তাহলে তাঁকে অধিবেশনের স্মারক গ্রন্থটির এক থেকে আট পৃষ্ঠা পড়তে অনুরোধ করি। মুখ্য প্রস্তাবগুলি হচ্ছে (১) অবিলম্বে বিধানসভা বাতিল ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন, (২) আগামী মে মাসের মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে রাজ্যপালের নিকট গণ-প্রতিনিধি দল প্রেরণ, (৩) পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং (৪) সেই উদ্দেশ্যে জেলা ও (৫) কেন্দ্রীয়-ভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং (৬) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা প্রভৃতির দাবিতে প্রতীক কর্মবিরতি, শোভাযাত্রা ইত্যাদি।

শিক্ষক সমাজের একটা বড় অংশই এই প্রকট রাজনীতির মধ্যে স্বভাবতই স্বাভাবিকভাবে নারাজ এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্ল্যাটফর্মে নিজেদের সামিল করতে অনিচ্ছুক। সংগঠনের ক্ষেত্রে মোট একাত্তরটি প্রস্তাব ছিল, অধিকাংশই বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, কিন্তু তা নিয়ে কোন আলোচনা এই অধিবেশনে হয় নি (সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির জন্য উক্ত স্মারক-গ্রন্থের ৯ থেকে ১৬ শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। শিক্ষা সংক্রান্ত ১২২টি প্রস্তাব (পৃঃ ১৭—৩০), বেতন হার ও চাকরির সর্তাবলী সংক্রান্ত ১৯২টি প্রস্তাব (পৃঃ ৩১—৫১), সরকারী অনুদান সংক্রান্ত ৮১টি প্রস্তাব (পৃঃ ৫১—৬০), প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন সংক্রান্ত ১৫টি প্রস্তাব (পৃঃ ৬১—৬৪), শিক্ষণ-শিক্ষক সংক্রান্ত ৭টি প্রস্তাব (পৃঃ ৬৪—৬৫), অশিক্ষক কর্মচারী সংক্রান্ত ৩১টি প্রস্তাব (পৃঃ ৬৬—৬৮) ও আরও নানাবিধ প্রস্তাব ওই স্মারকগ্রন্থে (পৃঃ ৬৮—১০৮) স্থান পাওয়া সত্ত্বেও সে সব নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি। বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দাবি-দাওয়ার কথা তোলা বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবান্তর এবং সেই অনাগত রাষ্ট্রবিপ্লব না আসা পর্যন্ত শিক্ষক মহাশয়দের অপেক্ষা করতেই হবে এবং সেই অনাগত বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যই শিক্ষকদের রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সেই কর্মসূচী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী হওয়া দরকার এবং তা রূপায়নের জন্য এ· বি· টি· এ-র বর্তমান নেতৃত্বকেই ক্ষমতা বজায় রাখতে হবে।

এ· বি· টি· এ'র ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ জানতেন যে, তাঁদের বিরুদ্ধে যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ জমে উঠেছে

[illegible] তাঁদের নেতৃত্ব থাকবে না। [illegible] এ· বি· টি· এ'র গঠনতন্ত্রকে এমন-ভাবে সংশোধন করা দরকার যাতে নেতৃত্ব বর্তমান গোষ্ঠীর হাতেই বজায় থাকে। এইটাই ছিল চন্দননগর অধি-বেশনের মূখ্য বিষয়। বিশেষ চিন্তা করেই অধিবেশনের স্থান চন্দননগরে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কেন না, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ঘাঁটি হিসাবে চন্দননগর সুপরিচিত। স্বেচ্ছা-সেবকদের জন্য স্থানীয় পার্টি কর্মীদেরই নিয়োগ করা হয়েছিল. স্থানীয় স্কুল শিক্ষকদের এ ব্যাপারে আহ্বান করা হয় নি, আবার এই পার্টি কর্মীরাই দরকার মত প্রতিনিধি সেজেছেন। সমগ্র আবহাওয়াটাই টের-রাইজ করা হয়েছিল, সূচনা থেকেই বিশ্বাসঘাতকদের কালো হাত পুড়িয়ে দেবার শ্লোগান তোলা হয়েছিল, অর্থাৎ যাঁরা ভিন্নধর্মী বক্তব্য রাখবেন তাঁরা বিশ্বাসঘাতক। যাঁরা বর্তমান নেতৃত্ব-বিরোধী কিছু বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন তাঁদের জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা কমিটিগুলির নির্বাচনে ব্যালটের দাবি উঠেছিল তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে অন্যান্য সকল প্রস্তাব শিকেয় তুলে এ· বি· টি· এ-র গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব অগণতান্ত্রিক [illegible] [illegible] পাশ করিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়। গঠনতন্ত্র সংশোধন করার জন্য ১৪ দিন আগে নোটিশ দেবার নির্দেশ গঠনতন্ত্রে আছে, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করেই সংশো-ধনী প্রস্তাব আনা হয়। প্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ গঠনতন্ত্র সংশোধনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচারের ব্যবস্থা করে বিশেষ সম্মেলনের মাধ্যমে তা গ্রহণ করার দাবি জানান। কিন্তু নেতৃত্ব শুধু তা অগ্রাহ্যই করেন না, প্রতিনিধি-দের দাবি মত ভোট নেবার প্রস্তাবও বাতিল করে দেওয়া হয়।

নেতৃত্বের এই স্বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদ করে অসংখ্য প্রতিনিধি অধিবেশন মণ্ডপ পরিত্যাগ করে অন্য একটি মাঠে গিয়ে পৃথক সভা করেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে যে এরকম ভাঙন ধরবেই, বর্তমান নেতৃত্ব সেটা আগে থেকেই জানতেন এবং এ বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরেই হুইসপারিং ক্যাম্পেন চলেছিল। এ· বি· টি· এ-র ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ বোধ হয় আশা করেন যে, একটা অংশ বেরিয়ে গেলে নিখাদ সি· পি· এম অংশের ওপর নির্ভর করে তাঁরা হয়ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্যলাভ করবেন, নতুবা তাঁরা এতবড় ঝুঁকি নিতেন না, বা অধিবেশনে এত নগ্নভাবে রাজনীতি আমদানী করতেন না।

এ· বি· টি· এ-র এই দ্বিখণ্ডী-করণ আমরা চাই না। কেন না, তার দ্বারা সামগ্রিকভাবে শিক্ষকসমাজ ও প্রগতিশীল আন্দোলন সমূহের ক্ষতি হবে। আমরা চাই যে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদের পদগুলি বাংলা দেশের সমগ্র শিক্ষকসমাজ গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের দ্বারা নির্বাচন করুন। সভামণ্ডপে একদল পছন্দ করা প্রতিনিধি নিয়ে কর্মকর্তাদের রক্তচক্ষুর সামনে নির্বাচনের প্রহসন না করে, গোপন ব্যালট মারফৎ ভোটাভুটি হোক, যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য তাঁরা ভোট দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করুন। যতই প্রগতিশীলতা ও আদর্শের ছাপ মারা থাক, একই নেতৃত্ব দীর্ঘকাল তখতে থাকলে স্বৈরাচার ও ক্ষমতার অপ-ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। আশা করি তা আর উদাহরণ দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন নেই। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভাগ হয়ে যাওয়াটা দুঃখজনক, কিন্তু তা অপ্রত্যাশিত ছিল না এবং একান্তই রাজনীতির রঙীন চশমা চোখে না দিয়ে, যুক্তি-আশ্রয়ী নীতিসমূহের দ্বারা এই ভাঙা প্রতিষ্ঠানটিকে আবার জোড়া লাগানো যেতে পারে। (১১।৪।৭০)
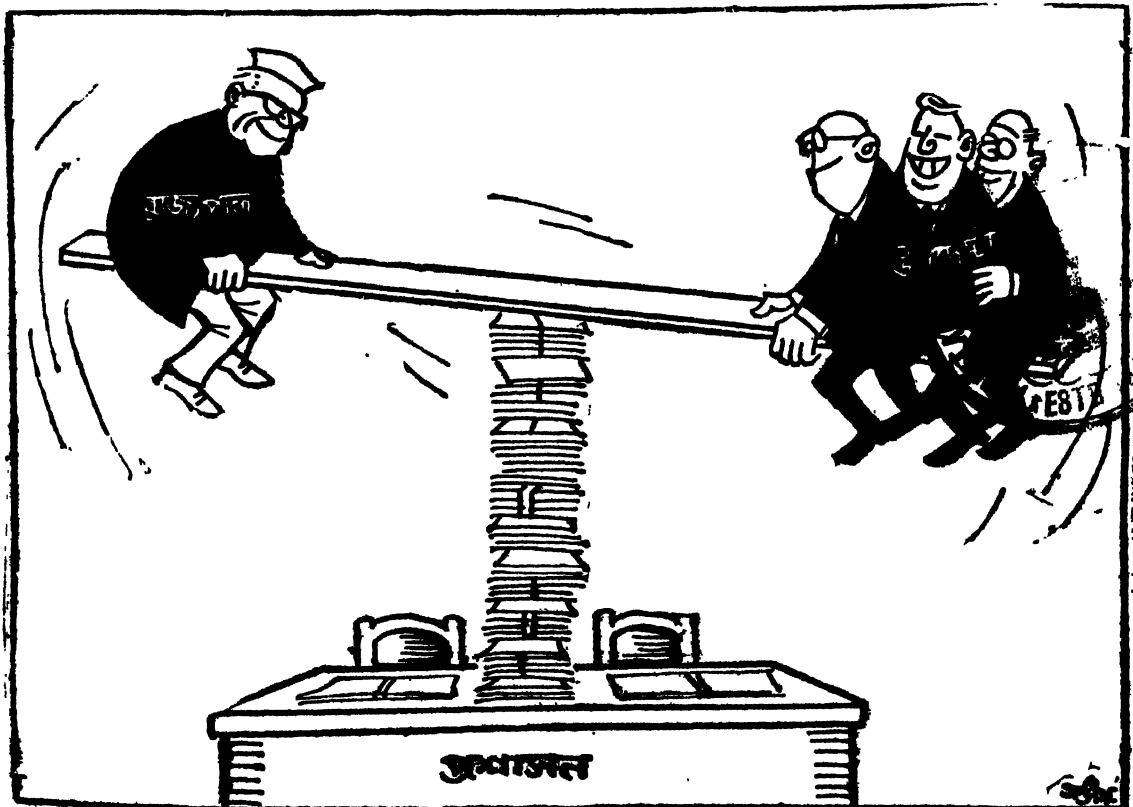
স্বতন্ত্র পার্টিতে ভাঙন

সম্প্রতি দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে স্বতন্ত্র দলের পার্লামেন্ট সদস্য সি. সি. দেশাই দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। শ্রীদেশাই আগে আই-সি-এস ছিলেন এবং স্বতন্ত্র পার্টির একজন জনকও বটে। দলের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি গুজরাটে সি. সি. দেশাই যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু স্বতন্ত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বিশেষ করে দলের প্রেসিডেন্ট মিনু মাসানীর সঙ্গে বহুকাল ধরে তাঁর মন-কষাকষি চলছিল। কিছুকাল আগে দলের নেতৃত্ব দেশাইকে একটি চার্জশীট দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, (১) দেশাই পার্টির মূল নীতির (statism) অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্য নীতির সঙ্গে একমত নন। (২) ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা লোকসভায় যে নিন্দা প্রস্তাব এনেছিলেন, পার্টি তার বিরুদ্ধে ভোট দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও দেশাই তার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। (৩) ১৯৬৮ সালে দেশাই রাজ্যসভার নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। (৪) বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোট সঞ্জীব রেড্ডীকে দেবার দলীয় নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দেশাই এক বিবৃতিতে দেশমুখ ছাড়া আর কাউকে ভোট দিতে নিষেধ করেছিলেন এবং (৫) গুজরাট গভর্নমেন্ট এবং ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সম্বন্ধে সম্প্রতি দেশাই যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা পার্টি-নীতির পরিপন্থী।

নিরপেক্ষ বিচারে অভিযোগগুলো যে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দৃষ্টান্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সেই হিসাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হয়ত অযৌক্তিক নয়। কিন্তু "অপরাধ"গুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে। তা সত্ত্বেও এতদিন স্বতন্ত্র দলের নেতারা এই শৃঙ্খলাভঙ্গ সম্বন্ধে নীরব হয়ে ছিলেন কেন? সেই প্রশ্নের জবাব বিশ্লেষণ করলেই স্বতন্ত্র দলের প্রকৃত অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যেতে পারে।

স্বর্গত জওহরলাল নেহরু প্রবর্তিত মিশ্র অর্থনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই রাজাগোপালাচারী, মাসানী, রঙ্গ প্রমুখ নেতারা স্বতন্ত্র দল গঠন করেছিলেন। দলের ঘোষিত নীতি ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্য এবং পারমিট লাইসেন্স প্রথার বিরোধিতা করা। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যপতিদের ক্রিয়াকলাপের অবাধ স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের প্রধান কাম্য। কাজেই গ্রাম ও শহরের রক্ষণশীল বিত্তবান শ্রেণীই ছিলেন এই দলের প্রধান সমর্থক। প্রাক্তন দেশীয় নৃপতিদের এক বিরাট অংশ এই দলের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কিছু প্রাক্তন আই-সি-এসও দলের শক্তিবৃদ্ধি করেন। কিন্তু দেশের বিত্তবান শ্রেণীর মধ্যেও নানা শ্রেণী-বিভাগ আছে। ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের মধ্যে মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠী হচ্ছে একচেটিয়া কারবারী এবং তাদের নিচেই আছে মাঝারী এবং ছোট কারবারীরা। বিত্তবান কৃষকদের মধ্যেও একদিকে রয়েছে বড় বড় জোতদার, অপরদিকে ছোট ছোট ভূস্বামী। এদের সকলের স্বার্থ যে একাকার হতে পারে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। স্বতন্ত্র পার্টির বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্ব সেই বিত্তবান শ্রেণীর বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সংঘাত বলেই মনে হয়। দেশাই-বিতাড়ন পর্বেই সেই সংঘাত পরিস্ফুট। বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত শোনবার পর দেশাই মন্তব্য করেছেন, "পুঁজিপতি, একচেটিয়া কারবারী এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের (দেশাই বিতাড়ন) প্রেরণা যুগিয়েছে।" দেশাই বিতাড়ন পালার প্রধান নায়ক ছিলেন স্বতন্ত্র পার্টির প্রেসিডেন্ট মিনু মাসানী। তিনি ভারতের বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক টাটাদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। কাজেই দেশাইয়ের আক্রমণের লক্ষ্য যে কি, তা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। শ্রীদেশাই [illegible] জবাব দিয়েছেন, তাতে তিনি নাকি বলেছেন যে, স্বতন্ত্র পার্টি দুই ধরনের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের পরিপোষক। একদিকে রয়েছে শহরের শেয়ারহোল্ডার (শিল্পে অর্থ লগ্নীকারক) এবং ধনী ও মাঝারী কৃষক। অপরদিকে রয়েছে একচেটিয়া কারবারীরা। গুজরাটে স্বতন্ত্র পার্টির প্রধান ঘাঁটি হচ্ছে ধনী ও মাঝারী কৃষকরা। দেশাই সম্ভবত নিজেকে শেয়ারহোল্ডার এবং ধনী কৃষকদের মুখপাত্র বলে মনে করেন। মাসানী সিণ্ডিকেট এবং জনসংঘের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলবার পক্ষপাতী। কিন্তু স্বতন্ত্র পার্টির গুজরাট শাখা স্থানীয় সিণ্ডিকেটী রাজ্য সরকার উচ্ছেদ করে নিজেরা ক্ষমতা লাভের প্রয়াসী। সেটা মাসানী আদৌ বরদাস্ত করতে পারছেন না। তাই নিয়েই আসলে মাসানীর সঙ্গে দেশাইয়ের বিরোধ। এই বিরোধ দলের মধ্যে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে, দলের জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতি মাত্র ১৭—৫ ভোটে সি সি দেশাইকে বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পেরেছেন। দলের গুজরাট শাখার সভাপতি এইচ· এম· প্যাটেল এবং দয়াভাই প্যাটেল এম-পি ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত ছিলেন। গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট সদস্যরা নাকি দেশাই বহিষ্কারের বিরোধী ছিলেন। পার্টির অন্যতম জনক এন· জি· রঙ্গও নাকি এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান নি। তিনিও বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। এইচ· এম· প্যাটেল নাকি বলেছেন যে, দেশাইকে দল থেকে বার করে দিলে দলের গুজরাট শাখার ওপর দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু দেশাই কর্তৃক "একচেটিয়া কারবারীদের চ্যাম্পিয়ান" বলে অভিহিত মাসানী-প্যাটেলের সতর্কবাণী গ্রাহ্য করেন নি। হাওয়া যেদিকে বইছে তাতে মনে হয় দেশাইয়ের বিদ্রোহের ফলে স্বতন্ত্র দলের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি গুজরাট দলের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এস-এস-পি দলের কয়েকজন নেতা ইন্দিরা গান্ধীর সরকার উল্টে দেবার জন্য স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে আঁতাত করবার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মাসানী সেটা সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি ওল্টাবার জন্যই ওল্টানোর পক্ষপাতী। ইন্দিরা সরকারকে উল্টে সেই জায়গায় একটা দক্ষ বিকল্প সরকার গঠন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কাজেই আঁতাত করতে হলে একটা সাধারণ কার্যক্রমের ভিত্তিতেই সেটা করা যেতে পারে।

ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলো সবই উত্তর ভারতে অবস্থিত। তার প্রধান কারণ, দেশের সমৃদ্ধ লৌহ খনিগুলির অবস্থানও উত্তর ভারতে। দক্ষিণ ভারতে কেন ইস্পাত কারখানা হয় নি বলে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ ছিল। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই ক্ষোভ দূর করেছেন। গত ১৭ই এপ্রিল ইস্পাত মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দ আলোচনাকালে লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেন যে, অন্ধ্রের বিশাখাপত্তম, তামিলনাড়ুর সালেম এবং মহীশূরের হসপেটে একটি করে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হবে। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা সেই কারখানার নক্সা তৈরি করবেন এবং তার সারঞ্জামও তৈরি হবে ভারতে। বিশাখাপত্তম এবং হসপেটের প্রস্তাবিত কারখানায় ২০ লক্ষ টন করে ইস্পাত উৎপন্ন হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সালেমের কারখানায় হবে পাঁচ লক্ষ টন। অবিলম্বেই এই কারখানা তৈরির কাজে হাত দেওয়া হবে বলে শ্রীমতী গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সংশোধিত চতুর্থ পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা দ্বিগুণ করে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে। কাজেই প্রস্তাবিত তিনটি ইস্পাত কারখানা ছাড়া আরও ইস্পাত কারখানা তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

আমাদের দেশে গত বিশ বছরে ইস্পাত উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই অপ্রতুল। ৫৫ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ ইস্পাত উৎপাদনী দেশগুলোর তালিকায় একেবারে সর্বনিম্ন স্থানের অধিকারী। কোন্ দেশ মাথাপিছু কত ইস্পাত ব্যবহার করে, তাই দিয়ে তার বৈষয়িক সমৃদ্ধির বিচার করা হয়। ইস্পাত উৎপাদনের চার্ট দেখলেই আমাদের দৈন্য-দশার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত সম্প্রতি বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদনের অভাবে আমাদের ক্রমবর্ধমান ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প যথেষ্ট মার খেতে বসেছে। বিদেশের বাজারে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়তে আরম্ভ করেছে, কিন্তু ইস্পাতের অভাবে সেই চাহিদা তাড়াতাড়ি পূরণ করা যাচ্ছে না। সুতরাং নতুন ইস্পাত কারখানা খোলার এই সরকারী সিদ্ধান্তকে সকলেই [illegible] বাহুল্য।

—[illegible]
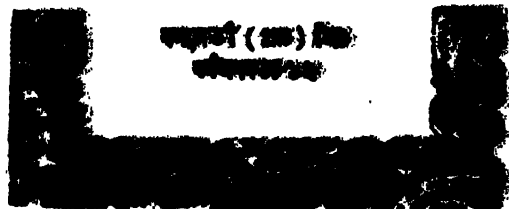
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন আর একবার সেনেটের হাতে গলাধাক্কা খেলেন।

সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি পদে নিকসন ফ্লোরিডার পঞ্চম সার্কিট কোর্টের বিচারপতি হ্যারল্ড কারসওয়েলকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু গত ৮ই এপ্রিল সেনেট ৪৫—৫১ ভোটে এই মনোনয়নকে বাতিল করে দিয়েছে।

মার্কিন সংবিধানের ২ ধারার ২ উপধারা মতে, রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মনোনয়ন করবেন এবং সেনেটের 'পরামর্শ' ও সম্মতিক্রমে' তাঁকে নিয়োগ করবেন। নিকসন দাবি করেছিলেন, রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন বাতিল করার কোন ক্ষমতা সেনেটের নেই। সেনেট কেবল পরামর্শ ও সম্মতি জানাবে। কিন্তু নিকসনের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই 'সম্মতি' দিতে সেনেট অস্বীকার করতে পারে। অতীতে বহুবার সেনেট তা করেছেও। বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মার্কিন সংবিধান সেনেটের হাতে দিয়েছে। সেনেট এই ক্ষমতাপ্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ।

আবে ফর্টাস বিচারপতি পদ ছেড়ে দেবার পর যে পদ শূন্য হয়েছে, সেখানে নিয়োগ নিয়েই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে নভেম্বর মাসে সেনেট আর একবার এই পদে নিকসনের মনোনয়ন বাতিল করে দিয়েছিল। সেবার নিকসনের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ক্লিমেন্ট হেনস-ওয়ার্থ। তিনিও দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

কারসওয়েলের মনোনয়নে সম্মতি দিতে সেনেটের আপত্তি হল কেন? প্রথম কথা, কারসওয়েল এমন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি নন। বারো বছর ধরে তিনি নিম্ন আদালতে বিচারপতি রয়েছেন। সেখানে তিনি তাঁর কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। দেশে এত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি থাকতে সর্বোচ্চ আদালত ক্ষমতাশালী সুপ্রীম কোর্টে এহেন লোককে বসানো কেন? আইনবিদ মহলে কারসওয়েলের মনোনয়নের বিরুদ্ধে তীব্র [illegible] হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কারসওয়েল নিগ্রো-বিরোধী, বর্ণবৈষম্যবাদী ও রক্ষণশীল। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে উদারনীতিবিদদের প্রাধান্য রয়েছে। তাদের একটু কোণঠাসা করার জন্য নিকসন ইচ্ছে করেই এমন একজনকে বেছেছেন। সেনেট সদস্যরা এর বিরোধী। তৃতীয়ত, সেনেটের বহু সদস্য—যাঁরা হয়তো আপত্তি সত্ত্বেও নিকসনের মর্যাদা রক্ষার জন্য মনোনয়নকে সমর্থন করতেন, তাঁরাও বিরুদ্ধে গিয়েছেন, নিকসন সেনেটের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করায়। সেনেটের ক্ষমতা যে আছে, সেটা দেখাবার জন্যই তাঁরা এই কাজ করেছেন। রিপাবলিকান পার্টির ১৩ জন ও দক্ষিণাঞ্চলের ৪ জন শেষ পর্যন্ত মনোনয়নের বিরুদ্ধে ভোট না দিলে নিকসনকে জব্দ করা যেত না।

নিকসন খুবই চটেছেন। তিনি হুমকী দিয়েছেন, আগামী নভেম্বর মাসে সেনেটের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে বেয়াড়া সদস্যরা কি করে পুনর্নির্বাচিত হন, তিনি দেখে নেবেন। তবে ভরসার কথা, অধিকাংশ সদস্যই তাঁদের জয়ের জন্য নিকসনের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল নন।

তানজানিয়া:

এ বছরের শেষের দিকে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে গত সপ্তাহে তানজানিয়ার রাজধানী দার-এস-সালামে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠক হয়।

সেনেটের সিদ্ধান্তে দারুণ বিচলিত ও ক্ষুব্ধ নিকসন এটর্নী জেনারেলের সঙ্গে আলোচনা করছেন

তানজানিয়া বৈঠকে ঠিক হয়েছে, জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকাতে এই শীর্ষ সম্মেলন হবে। আলজিরিয়ার ইচ্ছা ছিল, এই সম্মেলন আলজিয়ার্সে হোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলজিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা জাম্বিয়ার অনুকূলে নিজেদের দাবি ছেড়ে দেওয়াতে সর্বসম্মতিক্রমে লুসাকায় সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দার-এস-সালামে উপস্থিত পররাষ্ট্র-মন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

পাকিস্তান জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীতে প্রবেশের জন্য যে চেষ্টা করেছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য পাকিস্তান এবার নানাভাবে তদ্বির করেছিল।

প্রথমে যুগোশ্লাভিয়াই প্রস্তাব করেছিল, জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য-সংখ্যা বাড়ানো হোক এবং যুগোশ্লাভিয়া, ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতিকে নতুন সদস্যরূপে গ্রহণের কথা বলে।

জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীতে পাকিস্তানের যোগদানের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে ভারত। পাকিস্তান জোটনিরপেক্ষ নয়। সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পশ্চিমী জোটের সঙ্গে যুক্ত। মার্কিন সামরিক সংস্থা 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো'র সদস্য পাকিস্তান। এই অবস্থায় পাকিস্তানকে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে প্রবেশাধিকার দেওয়া যায় না। পাকিস্তানের বক্তব্যঃ 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো'র সঙ্গে তার সম্পর্ক নিতান্তই আনুষ্ঠানিক—কাজের দিক দিয়ে তার নীতি আসলে জোটনিরপেক্ষ। তার উত্তরে ভারতের বক্তব্য ঃ বেশ তো! তাহলে 'সিয়াটো', 'সেন্টো' থেকে বেরিয়ে এসো। তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করব। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং বলেছেন, পাকিস্তান, সামরিক জোট ছেড়ে এলে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে পাকিস্তানকে গ্রহণের প্রস্তাব তিনি নিজে উত্থাপন করবেন।

শেষ পর্যন্ত দার-এস-সালাম বৈঠকে যোগদানকারী প্রায় সবাই পাকিস্তানকে গ্রহণের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। সবাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য যোগদানকারী রাষ্ট্রের যে 'মান' স্থির করা হয়েছে, তা পরিবর্তন করার কোন অধিকার প্রস্তুতি বৈঠকের নেই এবং বর্তমান 'মান' অনুযায়ী পাকিস্তান সম্মেলনে যোগ দিতে পারে না।

তা সত্ত্বেও জর্ডানের প্রতিনিধি বৈঠকে পাকিস্তানের যোগদানের প্রশ্নটি তুলেছিলেন। কিন্তু বৈঠকের সভাপতি তানজানিয়ার উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ রসিদি কাওয়াওয়া এই বিষয়ের ওপর কোন আলোচনা করতে দেন নি।

দার-এস-সালাম বৈঠক সুরু হবার অনেক আগে থেকেই এবার ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা আরম্ভ হয়েছিল। ভারত পাকিস্তানকে আটকাতে পেরেছে। এদিক দিয়ে একে ভারতের কূটনৈতিক জয়ই বলা চলে। মরোক্কোয় বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনে ভারত যেভাবে অপমানিত হয়েছিল, সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতের এই জয় সামান্য হলেও উল্লেখযোগ্য।

অস্ট্রিয়াঃ

গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের দুই প্রধান পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আবার বৈঠক শুরু হয়েছে।

'সল্ট' বা 'স্ট্র্যাটেজিক আর্মস্ লিমিটেশন টক্স' নামে অভিহিত এই আলোচনার প্রথম বৈঠক বসেছিল গত ডিসেম্বরে হেলসিঙ্কিতে। এবার বৈঠক বসেছে ভিয়েনায়।

হেলসিঙ্কি বৈঠকের ব্যাপারে প্রচার ও ঢক্কানিনাদ কম হলেও এই বৈঠকে কাজের কাজ কিছু হয়েছিল। উভয় দেশের প্রতিনিধিরাই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। উভয়ে উভয়ের মন বুঝেছিলেন এবং এ ব্যাপারে উভয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটা সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে উভয়েরই মনে হয়েছিল।

বিশ্ব রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র বিরোধ রয়েছে, পরস্পরের মধ্যে সন্দেহও প্রচুর। এই কারণে দুপক্ষই সমানে অস্ত্র উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে। উভয়ের হাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই জানে, পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ফলে তারা সকলেই বিপন্ন হবে—হয়তো সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। তা ছাড়া অস্ত্র উৎপাদনের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় হচ্ছে, তাতে উভয় পক্ষই চিন্তিত ও বিচলিত এবং এই ব্যয় প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। গত ছ' বছরে মোট দশ লক্ষ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে অস্ত্র উৎপাদনের জন্য। তার মধ্যে 'ন্যাটো' গোষ্ঠী করেছে ১০৮ বিলিয়ন ডলার, আর 'ওয়ারশ গোষ্ঠী' ৬৩ বিলিয়ন ডলার।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন ভিয়েনা বৈঠক উপলক্ষে প্রেরিত বাণীতে বলেছেন, এবারের আলোচনায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের 'নির্দিষ্ট প্রস্তাব' নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বৈঠক উদ্বোধনের দিন অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ট ওয়াল্ডহাইম উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই বৈঠককে 'ঐতিহাসিক বৈঠক' বলে অভিহিত করেছেন। যদি সত্যি এই বৈঠকে উভয়পক্ষ অস্ত্রনির্মাণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোন মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন, তবে এই বৈঠক ঐতিহাসিক মর্যাদা পাবে।

হেলসিঙ্কিতে যাঁরা দুই দেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন, এবারও তাঁরাই আছেন। মার্কিন পক্ষের নেতা হলেন গেরার্ড স্মিথ, আর সোভিয়েত পক্ষের নেতা সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যাদিমির সেমিনভ।

(১১-৪-৭০)

ব্যাড মানি ড্রাইভস্ আউট গুড মানি। অর্থনীতির এই তথ্যটা সামনে রেখে রাজ্য-রাজনীতির এই সপ্তাহের হিসাব-নিকাশ করছি। রাজ্য রাজনীতিতে একটা পট পরিবর্তন সুরু হয়েছে। এই পট পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে, রাজ্যে এক্ষুণি একটা সরকার গঠিত হচ্ছে, তবে সরকার গঠনের প্রসেস সুরু হয়েছে বলা যায়। এখন মন দেওয়া-নেওয়া চলছে—কার সঙ্গে কার মন মজবে, এক্ষুণি বলা যায় না। একজনের সঙ্গে একটু মন দেওয়া-নেওয়া হলে—একটু মোটরে চড়ে হাওয়া খেলে বা একটু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, একটু গড়ের মাঠ বা গঙ্গার ধারে ঘুরলেই বোঝা যায় না—মন দেওয়া-নেওয়া শেষ হয়ে গেছে বা এক্ষুণি সাতপাকে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। তবে এই পর্যায়কে সাতপাকে বাঁধা পড়ার উপক্রমণিকা বলা যায়। কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীগুলজারীলাল নন্দা। এসেছিলেন নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম। শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে দেখা করেছেন শ্রীসুশীল ধাড়া আর শ্রীগুলজারীলাল নন্দার সঙ্গে দেখা করেছেন শ্রীআশু ঘোষ।

শ্রীজগজীবন রাম কলকাতায় এসে তাঁর দলের নেতাদের কারো সঙ্গে দেখা করেন নি। কনক বিল্ডিংসে একটি ঘরে চুপচাপ সমস্ত দিন ছিলেন। ঠিক দুপুরবেলায় এসেছিলেন শ্রীসুশীল ধাড়া শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে দেখা করতে। ভরদুপুরে কনক বিল্ডিংসের ডাইনিং টেবিলে বসেছিলেন শ্রী[illegible] ও শ্রীরাম। আমি যখন শ্রীরামের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখনও দেখি টেবিলের পাশে একটা ঝুড়িতে সাজানো রয়েছে আঙুর, কলা, আপেল সহ অনেক রকম ফল। শ্রীনন্দার সঙ্গে শ্রীআশু ঘোষ দেখা করতে গিয়েছিলেন রাত চারটের। রাত চারটেয় শ্রীঘোষ শ্রীনন্দার ক্যামাক স্ট্রীটের অতিথিনিবাসে গেলেন। শ্রীরামের সঙ্গে শ্রীধাড়া আলোচনা করেন এক ঘন্টার বেশি, শ্রীনন্দার সঙ্গে শ্রীঘোষ আলোচনা করলেন এক ঘন্টার বেশি। এই উভয়ের সাক্ষাতের সময় রাস্তা ছিল জনশূন্য—একটা প্রখর রৌদ্র তেজের কারণে আর একটা রাত্রি শেষ না হবার কারণে।

এই চার নেতার মধ্যে কি আলোচনা হয়েছে সেই কথা নেতৃবৃন্দ কেউ বলেন নি, তবে শ্রীজগজীবন রাম আমাকে শুধু বললেন—তিনি দেখতে পাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে একটা সরকার গঠিত হতে দেরি নেই। কাদের সরকার, কারা করবে এই সরকার, সেই কথা শ্রীরাম বলেন নি। আর শ্রীআশুতোষ ঘোষ এই কথাটা আরো একটু খোলাখুলি বলে দিয়েছেন। সেটা হল তিনি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছেন, আগামী মে মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে একটা সরকার হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে শ্রীঘোষও বলেন নি কারা সরকার করবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, শ্রীআশুতোষ ঘোষ—যাঁর নিজের দলে মাত্র একজন এম-এল-এ, (যে এম-এল-এ আবার [illegible] বিধানসভায় যোগদান করেন নি [illegible] [illegible] [illegible] রাজ্যসভা নির্বাচনের সময় পি-এস-এল দলের শ্রীসেকেন্দার আলি মোল্লার গাড়ি করে কলকাতা এসেছিলেন) আর নব কংগ্রেস—যার সদস্যসংখ্যা হল ৩৮ জন এবং যে দলকে যুক্তফ্রন্টের কোন শরিক দলই এখন পর্যন্ত বন্ধু দল হিসাবে গ্রহণ করেন নি, পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনে তাঁরা কতটা সহায়ক হতে পারেন? ২১৮ জনের যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেল, ২১৮ জন সদস্য সরকার গড়া নিয়ে উদ্যোগহীন আর একজন এম-এল-এ এবং ৩৮ জন এম-এল-এ'র দল বলছে সরকার হল বলে। কুকুরে লেজ নাড়ে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু যেখানে লেজে কুকুর নাড়ে, সেই ঘটনাকে স্বাভাবিক মনে করা যায় না; অথচ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেই লেজে কুকুর নাড়ছে বা নাড়তে চাইছে।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ নামটা অনেকদিন বাজারে শোনা যেত না। চুপচাপ ছিলেন শ্রীঘোষ। অনেক খেলা খেলেছেন ১৯৬৭-৬৮ সালে। শ্রীঘোষ যে খেলা খেলেছেন, সে খেলার ধারে-কাছে আসতে পারে এমন খেলোয়াড় পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে কি না ঠিক নেই। কিন্তু শ্রীঘোষ কি চান আর কি করতে পারেন অথবা শ্রীসুশীল ধাড়া কি চান ও কি করতে পারেন এটা একটু হিসাব করা যেতে পারে। শ্রীআশু ঘোষ গত সোমবার একটা কথা বলেছেন। সেটা হল, কংগ্রেসের সাহায্য না নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে একটা সরকার হতে পারে। [illegible]

কম্যুনিস্ট পার্টি থাকবে না, এমন একটা সরকার কি কোন প্রকারে সম্ভব? শ্রীআশুতোষ ঘোষের অঙ্কে সেটা সম্ভব। কিছুই না—নব কংগ্রেস থেকে বেশ কয়েকজন বেরিয়ে আসুক, আশ্রয় নিক শ্রীঘোষের বাড়ির ছাদের গোলঘরিতে, সেই সঙ্গে শ্রীসেকেন্দার আলি কয়েকজন মুসলমান সদস্যকে নিয়ে আসুন নিজের দলে—তখন দিব্যি সুন্দর মেজরিটি হয়ে যাবে সি-পি-এম ও নব কংগ্রেস বাদ দিয়ে। এই একই চিন্তার পাশে কিন্তু শ্রীসুশীল ধাড়ার চিন্তাটা সমান্তরাল হয়ে চলেছে, যদিও কেউ কখনও শোনে নি যে, শ্রীসুশীল ধাড়ার সঙ্গে শ্রীআশু ঘোষের কোন আলোচনা কোনদিন হয়েছে বা দুজনের মধ্যে কোন বৈঠক কোন দিন হয়েছে। শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে শ্রীধাড়ার যে কথা হয়েছে, তার মধ্যেও তো রয়েছে প্রায় একই কথার সুর। সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার করতে হবে। তার জন্য অনেক পথই আছে, এর মধ্যে কোন্ পথটা সুগম এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু কথার সুরে কিছু কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। শ্রীনন্দা একদিন খুব খেদ করে বললেন—১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে যাদের কংগ্রেস ত্যাগ করে যাবার কথা ছিল, তারাই কংগ্রেসে রয়ে গেল আবার যাদের থাকবার কথা তারা চলে গেল। শ্রীনন্দা আরো বললেন—সেইদিন পশ্চিমবঙ্গে এ্যাড হক কংগ্রেস গঠন করতে শ্রীকামরাজ, শ্রীঅতুল্য ঘোষ বাধা দিয়েছিলেন, সেই কারণে শ্রীকামরাজের সঙ্গে তিনি কথা বলেন না। শ্রীকামরাজের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ বন্ধ।

শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীনন্দা দুইদিন কলকাতায় থেকে যে কথাটা পরিষ্কার করে বলে গেলেন, সেই কথাটা তো আর কিছু নয়—সেটা হল শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাংলা কংগ্রেস রাজ্য কংগ্রেসে ফিরে আসুক। শ্রীঅজয় মুখার্জী রাজ্যের কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। তারপর শ্রীমুখোপাধ্যায় নব কংগ্রেসকে নিয়ে সরকার গড়তে চান, নির্বাচন লড়তে চান—যা চান তাই করুন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মত উত্তরপ্রদেশের শ্রীচরণ সিং-ও একজন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী। সেখানেও এখানকার শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত শ্রী সি বি গুপ্তের সঙ্গে ঝগড়া করে শ্রীচরণ সিং কংগ্রেস ছেড়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশে শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিং-ও একজন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী। উড়িষ্যার শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান একজন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর পর এই নেতারা যাঁদের ওপর ক্ষোভে, দুঃখ, অভিমানে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন, সেই অভিযোগের কারণস্বরূপ ব্যক্তিরা নব কংগ্রেসে নেই বা নতুন সিণ্ডিকেট কংগ্রেসে রয়ে গেছেন। কাজেই একদা যে সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সিণ্ডিকেটকে ধ্বংস করতে শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীচরণ সিং শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ, শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান প্রমুখ নব কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন, অথবা মিলে যান, তবে সেটাই তো হবে সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ্য ফ্রণ্ট। কম্যুনিস্ট বা জনসংঘ বা স্বতন্ত্র সকলের সঙ্গে আঁতাত করে গত তিন বৎসর এঁরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাতে এই নেতাদের কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যাবার বা সমঝোতা করবার বাধা কোথাও নেই। আর বাধা আজ নেই বলেই উত্তরপ্রদেশে পট পরিবর্তন ঘটে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে তারই পূর্বরাগ সুরু হয়েছে।

পূর্বরাগের আরো উপকরণ পাওয়া গেছে। যেমন রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোন আশা নেই এটা সকলে বুঝে ফেলেছেন। বুঝে ফেলা শুধু নয়, মধ্যবর্তী নির্বাচন চায় এমন দল বা সদস্য সংখ্যাও খুব কম। এক কথা নির্বাচন মানে অর্থ ব্যয়—সেই ঝুঁকি নিতে পারছেন না। দ্বিতীয় কথা হল নির্বাচন হলেও বর্তমান অবস্থার কতটা পরিবর্তন হবে? কাজেই নির্বাচন করেও যদি দেখা যায় ফল প্রায় একই রকম হচ্ছে, তবে নির্বাচন করে কি লাভ হবে? এই সব ছাড়া আর একটা কথা আছে। সেটা হল সকলেই চায়—তাদের হাতে সরকার থাকাকালেই নির্বাচন হোক। সি-পি-এম সরকার গড়তে যে এতটা তৎপর হয়েছিল, তার কারণ কিন্তু এই নয় যে, সি-পি-এম মনে করেছিল তারা সরকার গড়ে সেই সরকার নিয়ে খুব নিরাপদে দিন কাটাবে। সি-পি-এম সরকার গড়লেও তারা নতুন নির্বাচনের আহ্বানই জানাতো। তফাৎটা হত শুধু এই যে, হাতে সরকার পেয়ে সি-পি-এম নির্বাচন মোকাবেলা করতে পারতো। অন্য পার্টি যে সি-পি-এমকে সরকার গড়তে দিল না, তারও অন্তর্নিহিত কারণ এইটাই।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র কৃষ্ণনগরে এক জনসভায় বলেছেন, নির্বাচন পরিচালনার ভার সামরিক বাহিনীকে দেওয়া হোক। বন্যা হলে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে সামরিক বাহিনী তলব করা যদি যায়, তবে নির্বাচন পরিচালনায় কেন ডাকা যাবে না? গণতন্ত্র তথা পরিষদীয় গণতন্ত্রের কি অপমৃত্যুই না আগামী দিনে ঘটবে, এই কথাতেই তার আভাস পাওয়া যায়। সামরিক বাহিনীর মানুষ বেয়নেট আর মর্টার ছেড়ে ভোটপত্র গুণবে। যদি সুষ্ঠুভাবে ভোটের আশা না থাকে বা ভোটের কাজ পরিচালনার ব্যক্তিরা যদি বিশ্বাস ও গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা না করতে পারেন, তবে গণতন্ত্র বেঁচে থাকবে কি নির্ভর করে? এমনি করেই তো সামরিক বাহিনীর মানুষরা ভাবতে পারে—দেশের অভ্যন্তরে শান্তি রক্ষায় আমরা যদি হই ভরসা, শত্রুর আক্রমণে দেশরক্ষায় যদি হই আমরা ভরসা, আবার ভোটের বাক্সেও যদি হই আমরা ভরসা, তবে ঐ সংবিধানের নামাবলী আঁটা অকর্মা মানুষগুলির প্রয়োজনটা কোথায়? সবই করবো আমরা, আর ওঁরা শুধু নৈবেদ্যের কলা হয়ে শোভা পাবেন এই ব্যাপার চলতে পারে না। এইভাবেই তো এগিয়ে আসেন ইসকান্দার মির্জা, তার পর আয়ুব খাঁ, তার পর ইয়াহিয়া খাঁ-দের দল।

আর আমি এইজন্যই বলেছি শ্রীঅজয় মুখার্জী আর শ্রীজ্যোতি বসু যখন ঝগড়া করেন, তখন শ্রীআশু ঘোষ এগিয়ে আসেন ত্রাতারূপে। এইভাবেই ব্যালট বাক্সে যখন আস্থা রাখা যায় না বা যাঁরা ব্যালট বাক্স নিয়ে দলবাজী করেন বা কারচুপি করেন, তখন ডাক পড়ে ম্যানেকশ'র। এই ভাবেই ব্যাড মানি ড্রাইভস্ আউট গুড মানি। অচল টাকা সচল টাকার স্থান দখল করে—মেকিরা আসলকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ইতিহাসের নতুন অধ্যায় এই পথেই সৃষ্টি হয়।

॥ তের ॥

কিন্তু এত সকাল সকাল অর্থাৎ প্রথম রাতের দিকেই যে পার্শেল এক্সপ্রেস থেকে দামী মেটালের ওয়াগন লুঠ হবে, এরকম তো কোন স্থির ছিল না। শংকর আমাকে বলে গিয়েছিল আজ রাতের মধ্যেই কাজ সাফ করতে হবে। এ সমস্ত অপারেশনের দায়িত্ব নাকি তারই ওপর বিশেষ করে ছিল। তাই যদি হয় তাহলে এখন বড়জোর রাত ন'টা হবে, এরই মধ্যে কি করে সেই অপারেশনের কাজ শুরু হতে পারে?

যাই হোক, টুনটুনি যখন খবর জেনেছে যে, তার ভাই মণ্টু আহত হয়েছে তখন নিশ্চয়ই সেই অপারেশন হয়েছে এবং সেখানে গোলাগুলী কিছু চলেছে—যার ফলে মণ্টু আহত হয়েছে।

আমি টুনটুনিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু মণ্টু যে গুলীতে আহত হয়েছে—এ খবর তুমি পেলে কার কাছ থেকে?'

'বসন্তকাকার কাছ থেকে।'

'বসন্তকে তোমরা কাকা বলো?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বলো তো?'

'কেন তা বলতে পারব না, তবে ছেলেবেলা থেকেই বলে আসছি।'

'তোমাকে সোজাসুজি সে খবরটা দিলে?'

'হ্যাঁ এদিক দিয়ে যেতে যেতে আমাকে রাস্তা থেকে ডেকে বলে গেল।'

'কিন্তু মণ্টু কোথায় আছে তা ঠিক করে বলে গেল না?'

'না! বললো শুধু—দ্যাখ গিয়ে মণ্টু ওখানে গুলী খেয়ে ছটফট করছে।'

'ওখানে বলতে বসন্ত কোন্ জায়গাটাকে বোঝাতে চাইল আর তোমারই বা জায়গা সম্বন্ধে কি ধারণা হল?'

'আমার মনে হল বসন্তকাকার ওখানেই হবে।'

'তাহলে ওখানটা দেখে আসি আগে', বললাম, 'কি বলো?'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

বললাম, 'ওখানে গিয়ে আমি আগে দেখেই আসি না—তারপর তুমি যাবে? এখন ধরো যদি মণ্টু ওখানে না থাকে তাহলে তো ফিরে আসতে হবে?'

'কিন্তু আমার মন বলছে যে ওখানেই তাকে পাবো', বলে টুনটুনি আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালো। ভাইয়ের জন্য উদ্বেগ এই করুণ দৃষ্টির আবেদন আমাকে মানতেই হল। বললাম, 'তোমার মন যখন বলছে তখন আমি আর তোমাকে বাধা দেবো না তুমি চল তাহলে—'

খানিকটা গিয়েছি কি না গিয়েছি হঠাৎ দেখলাম শংকর আর ভানু দু'জনে একটা স্ট্রেচারে করে কাকে যেন এদিকেই

নিয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে নিয়ে যাচ্ছো তোমরা?'

শংকর বলে উঠল, 'ও আপনি?' সম্ভবত সে আমার সাদা পোষাক দেখে বিস্মিত হয়েছিল। ঠিক সেইরকম বিস্মিত হয়ে ভানুও বললে, 'দাদামণি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কে ভাই স্ট্রেচারে—'

'মণ্টু!'

টুনটুনি চীৎকার করে উঠল, 'মণ্টু!'

মণ্টু স্ট্রেচার থেকে গোঙাতে গোঙাতে বলে উঠল, 'দি—দি, দি—দি?'

শংকর বললে, 'চুপ কর মণ্টু। আমাদের আস্তানার হাসপাতালে আমরা এসে পড়েছি। অপারেশন করে বুলেটটা বের করে ফেললেই বেঁচে যাবি।'

টুনটুনি বলে উঠল, 'বেঁচে যাবে মণ্টু, বেঁচে যাবে শংকরদা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচবে, নিশ্চয়ই বাঁচবে।'

ভানু বললে, 'শালারা যে অমন সন্ধ্যে থেকে ওৎপেতে বসে থাকবে তা তো ভাবি নি—তা না হলে একটু সাবধান হয়েই যেতুম আমরা।'

[illegible]
আমাদের এই বিপদটা ঘটল।'

পরক্ষণেই ওস্তাদের আস্তানায় ডাক্তার মুখার্জীর হেপাজতে মণ্টুকে নিয়ে আসা হল। আমি ও টুনটুনি দুজনে সেখানে এলাম। স্ট্রেচার নামাতেই দেখলাম মণ্টুর ডান পায়ের উরুর কাছ থেকে চাপ চাপ রক্ত বেরিয়ে আসছে। টুনটুনি মণ্টুর ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলে উঠল, 'মণ্টু—ওরে মণ্টু, তোর একি হল রে?'

মণ্টু বলে উঠল, 'দিদি—আমি আর বাঁচব না রে!'

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'কেন বাঁচবে না? নিশ্চয়ই বাঁচবে। বনানী—'

বনানী ডাক্তারের কথায় বুঝতে পারল এর পর কি করতে হবে। সে অস্ত্রোপচারের জন্যে ব্যবস্থা করতে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মণ্টুকে ধরাধরি করে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। সেই ক্লোরোফর্ম—টুনটুনি এতদিন ধরে যে ক্লোরোফর্ম জগদীশকে এনে দিয়েছে আর যা দিয়ে জগদীশ শত শত মানুষকে সংজ্ঞাহীন করে তার করণীয় কাজগুলি সম্পন্ন করেছে—সেই ক্লোরোফর্ম দিয়ে অভিজ্ঞ এ্যানাস্থিস্টের মত বনানী মণ্টুকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলল! ডাক্তার মুখার্জী মণ্টুর ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করতে লাগলেন।

টুনটুনি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে সেখানে বসে রইল। সেখান থেকে বেরুলেই পাশে তার ঘর। ইচ্ছে করলেই সে ঘরে বসে সব কিছু জানতে পারত, কিন্তু তার মনে কেমন যেন একটা বিশ্বাস। এখানে থাকলেই সে মণ্টুর সম্পর্কে সবকিছু ভালভাবে জানতে পারবে। তাছাড়া তার আরও কেমন যেন বিশ্বাস—সে এখানে থাকলে তবেই হয়তো মণ্টু বেঁচে উঠবে। কাজেই সে গেল না।

শংকরকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেই তুমি আমায় বলে গেলে—তারপর কি করে এরকম ঘটনা ঘটল?'

শংকর কেমন যেন চিন্তিত হয়ে বললে, 'যদ্দুর মনে হচ্ছে জগদীশের জন্যেই এরকমটা ঘটেছে।'

'মানে?'

'মানে আর কি', শংকর বলতে লাগল, 'সম্ভবত শালা একরার করেছে পুলিশের কাছে।'

'সে কোথায়?'

'শালা পালিয়েছে।'

'ওস্তাদের সাগরেদ সেখানে ছিল না?'

'ছিল, কিন্তু তাকে তো পালিয়ে আসতে হবে। সময় পায় নি সে—তা না হলে জগদীশ সেইখানেই শেষ হয়ে যেত।'

টুনটুনি দুচোখ বিস্ফারিত করে জগদীশের কথা শুনছিল। সেই জগদীশ—তার জগদীশের হেপাজতে টুনটুনি
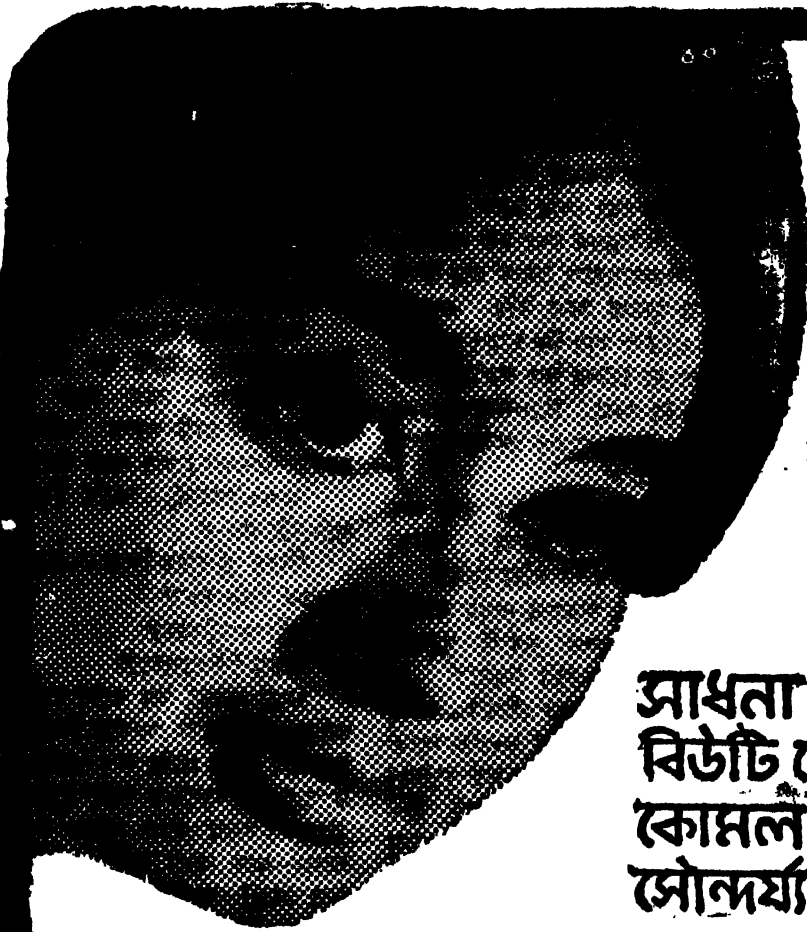
ছেলেবেলা থেকে কাটিয়েছে—সেই জগদীশ মণ্টুর গুলী লাগার কারণ। ভাবতেও যেন সে কেমন শিউরে উঠল। জগদীশ এমনিতেই লোক মন্দ নয়। অজস্র রূপ আর দুরন্ত আশা নিয়ে টুনটুনি এই নরককুণ্ডে জগদীশের কাছে বাস করেছে—জগদীশ কিন্তু ভুলেও কোনদিন কোনরকম লালসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় নি বরং বলা যেতে পারে ছোট-বোনকে মানুষ যেমন সস্নেহে লালনপালন করে ঠিক তেমনি করেই সে তাকে লালন-পালন করেছে। সেজন্য জগদীশের ওপর তার মনে কেমন একটা বিশ্বাসও আছে। কিন্তু যখন সে শুনল যে, সেই জগদীশ একরার করেছে পুলিশের কাছে তখন মনটা তার এক রকম ঘৃণা ও বিরক্তিতে ভরে উঠল। সেই ঘৃণা ও বিরক্তি আরও তীব্র হয়ে উঠল তার মনে—যখন নাকি তারই জন্যে মণ্টুর এই অবস্থা হয়েছে একথা সে বুঝতে পারল।

কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার মুখার্জী বেরিয়ে এলেন অপারেশন থিয়েটার থেকে। হাতে তাঁর একটা এক্সপ্লোডেড বুলেট। তিনি এসে সবাইকে দেখালেন।

শংকর বললে, 'শালারা যদি আরেকটু ওপরে তাক করত মণ্টুর তাহলে—'

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'একেবারে স্পটডেথ হত ছেলেটার!'

টুনটুনি শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেললে। শংকর বললে, 'শালারা অন্ধকারে বোধহয় ঠাওর করতে পারে নি"

ভানু বললে কিন্তু ওৎটা পেতেছিল সাংঘাতিক জায়গায়।'

'হ্যাঁ রেলওয়ে ব্রীজের ঠিক পাশেই। আমরা সবাই যদি ব্রীজ পার হয়ে যেতুম তাহলে আর ফেরার রাস্তা থাকত না। হয়তো খেলে হয় আমরা ব্রীজের তলার রাস্তায় পড়ে মরতুম, নয়তো ঝাঁক ঝাঁক গুলীর মুখে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতুম।'

ডাক্তার মুখার্জী এবার বললেন, 'মণ্টু বুঝি এগিয়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ', শংকর বললে, 'সেইজন্যেই তো ওর ওপর দিয়েই ঝড়টা গেল—'

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তোমাদের ইনফরমেশনের সোর্স তো যা বলেছিলে তাতে তো ওপর থেকে এরকমভাবে ফোর্স পাঠানোর কথা নয় শংকর।'

'দাদা', শংকর বললে, 'সোর্স তো ঠিকই ছিল কিন্তু ভেতর থেকে যদি একরার করে কেউ তাহলে আর কি হবে। তাছাড়া সব পুলিশ বা রেলের সব কর্তারাই তো আর আমাদের বন্ধু নয়—অন্য লোকও তো আছে। তারা এতবড় একটা সুযোগ ছেড়ে দেবে কেন?'

আমি বললাম, 'ওস্তাদের ঘরে তো দেখলাম সব কর্তারাই রয়েছে। তাদের গিয়ে বলো এসব ঘটনা ঘটল কেন?

শংকর বললে, 'শালারা এখন হয়তো বেহেড মাতাল—কোন কথাই বুঝতে পারবে না, খামোকা হাল্লা করবে।'

বাস্তবিক এই ওদের চরিত্র। ওদের কাছে দেশ নেই, জাতি নেই, জাতীয় স্বার্থ নেই—ওরা দেশের মন্ত্রী, বড় পুলিশ অফিসার, রেলের বড়কর্তা—লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করা, মদ আর মেয়েমানুষে ডুবে থাকাই ওদের কাছে স্বদেশপ্রেম হয়ে দাঁড়িয়েছে! প্রশাসনযন্ত্রকে ওরা স্ব-স্ব চক্রের স্বার্থে ব্যবহার করে গোটা দেশকে রসাতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রে ওদেরই ছবি ছাপা হয়, ওদেরই কর্মদক্ষতার বিবরণ প্রকাশ করা হয়—কত মহৎ ব্যক্তি ওরা নানারকম ভাষার কারসাজিতে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়। অথচ আইন-আদালতে কমিশনে, তদন্তে অনেক সময়েই প্রকাশিত হয়েছে—ওরা কোন ধরনের মানুষ। তাছাড়া ওস্তাদের ঘরে তো ওদের স্বরূপ দেখতে আমার বাকি নেই।

টুনটুনি বলে উঠল, 'ডাক্তারবাবু মণ্টুকে এখন কেমন দেখলেন—বাঁচবে তো মণ্টু আমার?'

'মণ্টুর তো আর কোন ভয় নেই, সে বাঁচবে না কেন', ডাক্তার মুখার্জী আরও যেন কি বলতে গিয়ে বলে উঠলেন, 'তবে—'

ভয়চকিত কণ্ঠস্বরে টুনটুনি বলে উঠল 'তবে কি ডাক্তারবাবু?'

'তবে', ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'কিছু রক্ত দিতে হবে পেসেন্টকে—কেন না, অনেকক্ষণ ধরে অনেক রক্ত ওর শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে।

শংকর বললে, 'ও আড্ডা থেকে রক্ত কিনে আনলেই চলবে।'

'তাহলে যাও না শংকরদা', টুনটুনি বলে উঠল।

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, 'এমনি গেলে তো হবে না। মেডিকেল কলেজে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে, তাকে আমি চিঠি লিখে দেবো, তবে পাবে।'

শংকর বললে, 'তাহলে লিখে দিন—'

'দেবো', ডাক্তার চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না। কেন না, তাতে দেরি হবে কিছু। অথচ রক্তটা আমার এখনই দরকার।'

শংকর বললে, 'এখনই দরকার?'

'হ্যাঁ,' ডাক্তার মুখার্জী কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'বেস্ট হয় কি জানো—রক্তটা আনতেও যাও আর ইতিমধ্যে তোমরা যদি কেউ পারো খানিকটা রক্ত দাও। এখনকার মত কাজ চলুক।'

শংকর বললে, 'আমি দিতে পারি খানিকটা রক্ত—'

'কিন্তু তুমি রক্ত দিতে গেলে মেডিকেল কলেজে যাবে কে?'

'যদি ভানু যায়।'

'ভানু কি পারবে?'

ভানু বললে, 'না আমি পারব না—মেডিকেল কলেজে কোথায় কিভাবে যেতে হয় তাই আমি জানি না। আর ও শালা ডাক্তার আর নার্সদের সবই প্রায় একরকম দেখতে। তখন কাকে বলতে কাকে বলে ফেলব—ব্যস শালা অমনি জেরা শুরু করে দেবে! তারপর যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে শালা একেবারে হিতে বিপরীত।'

শংকর বললে, 'তাহলে?'

'আমি তখন সব সমস্যার সমাধান করে দিলাম। ওস্তাদের আড্ডা থেকে বাইরে এসে যখন আমি টুনটুনির কাছে প্রথম মণ্টুর কথা শুনি তখনই মনটা আমার হুহু করে উঠেছিল। প্রথমত এই অভিশপ্ত জগতে এসে মণ্টুকে দেখেই আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল তার ওপর। অমন ভদ্র, সহবৎ শেখা ছেলে এখানে সত্যিই দুর্লভ। তার ওপর তারই জন্যে রাণীদিকে আমি খুঁজে পাই। সেই সূত্রে সে আমাকে মামাও বলে। সেই মণ্টু যখন আবার টুনটুনির ভাই তখন কেমন যেন একটা রহস্যময় মমতায় মনটা আমার ভরে ওঠে। মানে আমার আরও একটা প্রশ্ন ঘনিয়ে উঠেছিল, টুনটুনি আর মণ্টু যদি ভাই-বোন, তবে তারা দু'জনে দু'জায়গায় থাকে কেন? মণ্টু থাকে রাণীদির ওখানে আর টুনটুনি থাকে জগদীশের কাছে। কিন্তু কেন? এদের জীবনধারায় কে জানে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে—যা এখনও আমার কাছে অজ্ঞাত। মণ্টুর সঙ্গে সহসাই আমার

পড়লাম, টুনটুনির অনেক পরিচয় আমি আজও জানি না। কিন্তু দুজনেই আমাকে আকর্ষণ করেছে তীব্রভাবে। ভাই-বোন দুজনেরই স্বভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা অপূর্ব মিল রয়েছে। গুলীবিদ্ধ মণ্টুর শরীর থেকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বুলেট বেরিয়েছে। ডাক্তার মুখার্জী বলেছেন ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর এবং তা বহুক্ষণ ধরেই হয়েছে। বিপদ আসতে পারে এইদিক থেকেই। তাই এখনই যখন রক্তের প্রয়োজন তখন সে রক্ত তাকে তো দিতেই হবে। কিন্তু দেবে কে? শংকর রাজী রক্ত দিতে কিন্তু সে থাকলে আরও রক্তের যেখানে প্রয়োজন হবে তা আনতে যাবে কে? আমতে আমতে এই সমস্যা দেখা দিতেই আমি বলে উঠলাম, 'শংকর, তুমি যাও রক্তের বোতল আনতে—এখন যে রক্তের প্রয়োজন তা আমি দিচ্ছি।'

আমি এ কথা বলতে টুনটুনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠল, 'আপনি দেবেন রক্ত?'

'হ্যাঁ', বললাম, 'মণ্টু যে আমাকে মামা বলে—'

'মণ্টু আপনাকে মামা বলে!' টুনটুনি আরও বিস্মিতভাবে বলতে গেল, 'তাহলে—'

বাকিটুকু আমি বলে দিলাম, 'তাহলে আমিও তোমার মামা হবো।'

'আশ্চর্য!' বলে টুনটুনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সেদিন আমি রক্ত দিতে কৃতজ্ঞতায় টুনটুনির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। শুধু তাই নয়, মণ্টুর সম্বন্ধে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে সে আমাকে তার ঘরে এনে বলে উঠল, 'মামাবাবু, আপনি যা করলেন তা আমরা আমাদের মা-বাবার কাছ থেকেও কোনদিন পাই নি।'

'তোমাদের মা-বাবা আছেন?'

'না।'

'কেউ নেই?'

'নেই কি—কোনদিন ছিলও না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি, মা-বাবা কোনদিনই ছিল না?'

'হ্যাঁ মামাবাবু।'

'বলো কি—এ কখনো হয় নাকি?'

কথাটা বলেই সহসা মনে হল কে জানে এতখানি প্রশ্ন করে আমার বোধহয় উচিত হয় নি। হয়তো ওদের তাই বোধহয় জন্মরহস্য এমন কিছু আছে যা ওরা লোকসমাজে বলতে পারে না। আর তার জন্য আছে ওদের মনে লজ্জা, জ্বালা কিম্বা গভীর বেদনা। ঠিক সেই কারণেই টুনটুনি বলে গেলো—

'নেই কি—কোনদিন ছিলও না। ...

এ কি সম্ভব? তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বল তো টুনটুনি, তুমি এ কথা বললে কেন?'

'সত্যিই আমাদের মা-বাবা ছিল না কোনদিন মামাবাবু।'

বললাম, 'বার বার এই একটা কথা তুমি বলছ টুনটুনি, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে কি বলো তো?'

'মামাবাবু, হয়তো এ কথা আর কাউকে কোনদিন বলতাম না কিন্তু আপনাকে দেখে আর আপনার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন করে পেয়ে আজ সব কথা খুলে বলতে ইচ্ছে করছে।'

'যদি ইচ্ছে করে তবে বলো।'

'আমাদের মাও নেই, বাবাও নেই। অথচ আমরা ভাই-বোনে জন্মগ্রহণ করেছি—এ কথা বললে লোকে অবাক হয়ে যাবে। শুনেছি মান্ধাতার নাকি মা-বাবা ছিল না, আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনিই। শুনুন মামাবাবু—কিন্তু শোনার পর ঘৃণায় শিউরে উঠবেন না। কেন না, আমরা ঠিক আমাদের জন্মের জন্য দায়ী নই।'

'বলো তুমি। তুমি যা বলবে তাই আমি শুনব। তা ছাড়া ইতিমধ্যে আমার পরিচয় নিশ্চয়ই পেয়েছ। মানুষকে আমি ঘৃণা কোনদিন করি নি আর করতেও পারব না।'

টুনটুনি বলতে লাগল, 'মামাবাবু, আমরা যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি তিনি আমাদের মা নন। আর মা আমাদের যিনি হতে পারতেন তাঁর গর্ভে আমরা হই নি। অন্যদিকে যিনি বাবা, যাঁর গর্ভে হয়েছি তিনি তাঁর স্ত্রী নন। তাই আমাদের মা-ও নেই, বাবাও নেই।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? এইভাবে আমাদের জীবনধারা চলে আসছে।'

'কিন্তু ঠিক সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নি।'

'আপনি যা জিজ্ঞাসা করছেন মামাবাবু, তাও আমি বলব। কিন্তু বলুন যে আমাদের জন্মবৃত্তান্ত কত ভয়ংকর! রাণীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন জগদীপতি—আমরা তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি।'

'বলো কি!' আমি যেন চমকে উঠলাম। অনেকদিনের অর্থাৎ আমার সেই শৈশবের হারানো সূত্র যেন খুঁজে পাবার পথে এগিয়ে আসছি। আরও একটা ঘটনা—ঠিক এমনি করেই তো রাণীদির বর রাণীদির বোন বাণীদিকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এর জন্য আমি কতদিন কত চিঠি লিখে দিয়েছি রাণীদির বাবামশাই কে জানে টুনটুনি আর মণ্টুর জন্মরহস্য কি সেই হারানো সূত্রকে কেন্দ্র করে এখনই আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে? আমি কেমন যেন উতলা হয়ে উঠলাম। প্রচণ্ড একটা ভাবনার স্রোত আমার ভেতরটাকে যেন নাড়িয়ে কাঁপিয়ে দুলিয়ে একেবারে একাকার করে দিল। ঘন ঘন নিশ্বাস আমার সর্ব শরীর যেন থরথর করে উঠতে লাগল। আমি এবার আবেগে অভিভূতের মত বলে উঠলাম, 'তোমার গর্ভধারিণী যিনি, তুমি তাঁর নাম জানো কি মা?'

'একবার শুনেছিলুম। সত্যি-মিথ্যে ঠিক জানি না।'

'কি বল তো?'

'বা—ণী।'

ও! আমি আর সেখানে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। বজ্রাহত মানুষের মত আমি যেন মুহূর্তে নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ হয়ে গেলাম। আমি এসেছিলাম শংকরের মায়ের তাগিদে, শংকরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানাতে, মায়াকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এই রাতে আজ আমি যে উদ্ঘাটিত রহস্যের ততোধিক রহস্যময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলাম, সেখান থেকে আমি বেরিয়ে যাব কি করে? এ যে অদ্ভুত জটিল জট। এ জট খুলতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব।

টুনটুনি বললে, 'মামাবাবু!'

বললাম, 'মা—'

'আপনি অমন চমকে উঠলেন কেন?'

'এর উত্তর আমি আরেকদিন দেবো মা,' তারপর আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারি নি। নেমে পড়েছিলাম অন্ধকারময় কৃষ্ণকালো সর্পিল পথে।

হায়, এও ঘটে মানুষের জীবনে!

[চলবে]

কলকাতায় লেনিন

লেনিন সরণি ধরে হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গী ট্রাম টার্মিনাসে এসে রুশীয়-শুভেচ্ছায়-প্রেরিত লেনিন-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ভাবতে বসেন, এমন করে লেনিন তো ইতিপূর্বে কলকাতায় কখনো পদার্পণ করেন নি, তবে সে ভাবনা যথার্থ হবে না। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই শহর কলকাতা তার অন্তস্থলে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিল, নিপীড়িত মানুষের মহান ত্রাতা ঋষি দার্শনিক বিপ্লবী লেনিনকে।

বিশের দশকের যে সাম্রাজ্যবাদ-শোষিত ভারতবর্ষ লেনিনকে বিশ্বনেতা বলে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি জানিয়েছে বৃটিশ বুটের আঘাত অনিবার্য জেনেও, লেনিন-বরণে তার সাহসিকতা ও একনিষ্ঠতা ছিল বাস্তবিক প্রশংসার্হ।

আজ লেনিন ভাঙিয়ে যেমন রাজনীতি, সে-দিনটি সেই চাতুর্য থেকে মুক্ত ছিল। আজ সি পি আই-এর লেনিন, সি পি এম-এর লেনিন, ভাঙা ভাঙা তথাকথিত আরও কিছু মার্কসবাদী দলের লেনিন—লেনিনকে নিয়ে এক রাজনৈতিক টাগ অব ওয়ার। লেনিন রাশিয়ার, লেনিন রেড চীনের। অথচ লেনিনবাদ একটাই ! ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাতার অভিরুচি এবং স্বার্থপুষ্টির অনুসারী। আগের দশকে এ বালাই ছিল না।

সমগ্র দুনিয়ায় লেনিনকে নিয়ে উৎসব আজ আপসে ঘটে, নির্বিবাদে ঘটে, সেদিন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা লেনিনের দুষ্প্রাপ্য রচনা পাঠও অপরাধ বলে গণ্য করতেন। আজও করেন, তবে ক্ষমতা নেই কোটি লেনিন-এর বুক ছিঁড়ে নিকোলাস লেনিনকে কেড়ে নেওয়ার। এই প্রকাণ্ড পরাভব শোষণবাদী সমাজকেও লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে জমায়েত হতে বাধ্য করে। লেনিনকে ঢোক গিলে হজম করতে হয় সেই লেনিন-বিরোধী দুনিয়াকেও।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারে ঘোরতর কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের গদি থাকা সত্ত্বেও কলকাতার একটা কর্মবহুল পথ অনায়াসে লেনিনের নামাঙ্কিত হতে পারল।

[illegible] মাল্যদান করবেন এমন অনেকেই, [illegible] ভীতি যাদের রাত্রের দুঃস্বপ্ন। এই সব কর্মীতিকদনের সহাবস্থান, বিশেষত কলকাতায়, বড় চমকপ্রদ।

নয় তারিখ থেকে পনের তারিখ অব্দি স্টেডিয়ামে লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলেন সি পি এম। ষোল তারিখ থেকে শুরু হল লেনিন শতবার্ষিকী কমিটির সপ্তাহব্যাপী উৎসব। সি পি আই স্বতন্ত্র মণ্ডপে লেনিন বন্দনা করেছেন। তারও আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাজী প্রদর্শনীতে লেনিন মণ্ডপ ছিল বিশেষ আকর্ষণ। কিন্তু একদিকে লেনিন নিয়ে রাজনীতি আর অন্যদিকে ছোট ছোট সংস্থার লেনিনের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদনে ঢের তফাৎ। এমন বহু সংস্থা কেবলমাত্র অন্তরের তাগিদে সেই মহান্ নেতার প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। মার্চ মাস থেকে কলকাতা লেনিনময় হয়ে উঠেছে।

১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের আবির্ভাব। আজ তাঁর জন্ম-শতবর্ষের উৎসবে কলকাতা মহানগরী স্পন্দিত, মুখরিত। রাজ স্টেডিয়ামের উৎসব শেষ রাতের প্রাইভেট বাসগুলিকে সরাসরি গঙ্গার ধার থেকে বোঝাই করে চৌরঙ্গীতে ফেরত পাঠিয়েছে। কবি সুকান্তের 'হাজার লেনিন' আর স্বল্পদক্ষায়ারা সারাদিনের খাটুনির পর সমুদ্রাভিমুখী নদীর মতো মিশে গেছে স্টেডিয়ামের জনস্রোতে। তারপর শেষ রাতের ফেরত-বাসে ফিরে গেছে তারা সুদূর উত্তরে, দক্ষিণে, কিম্বা পূবে। কেউ একচিলতে গৃহকোণে, কেউ বা কলোনীতে, কেউ আবার কেয়ারী করা ফ্ল্যাটে। কৃষক শ্রমিক, মধ্যবিত্ত দু' টাকার সীজন টিকেটে

[illegible] পাঠরত লেনিন

জমায়েত সুযোগ ভোগ করেছেন। আর অভূতপূর্ব। একাধিক মত থাকা সত্ত্বেও যোগদির জন্য জমায়েত ছিল বক্তৃতা. মঞ্চের সামনের গ্যালারিতে অথবা মঞ্চের পাদদেশে উন্মুক্ত মাঠে। পয়সা দিয়ে মানুষ যে বক্তৃতা শোনে, রঞ্জি স্টেডিয়াম সেই অবিশ্বাসের এক অভূতপূর্ব প্রমাণ। যেহেতু সে জমায়েত কোনো সাংস্কৃতিক অথবা মামুলি জয়ন্তী উৎসব কিম্বা মেলা বা সার্কাস প্রদর্শনী ছিল না, সে কারণ সেখানে ঠান্ডা পানীয়ের ক্যানটিনও ছিল না, আইসক্রীমের আয়োজন ছিল না; ছিল না কোনো কফি কর্নার বা চপ-কাটলেটের কাউন্টার। ছিল বিড়ি আর সস্তা সিগারেটের উগ্রতা, ভাঁড়ের চা, ধামা ধামা তৈলসিক্ত সেদ্ধ ছোলা, আলুর-দম আর শুকনো রুটি। তাই সে কি ভিড়! সেল্ফ সার্ভিসের প্রয়োজন হয়েছে। বেঞ্চে জায়গা অকুলান। অমন সুশৃঙ্খল শ্রোতৃবৃন্দ সচরাচর দুর্লভ।

কিন্তু যা বলছিলাম: আজ বলে নয়, কলকাতার হৃদয়ে লেনিনের পদার্পণ সেই বিশের দশকে। বাংলার বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় লেনিন-বন্দনা বহু পুরনো। বাংলা দেশে যেমন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আলোচনাই বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির একদিক, লেনিনকে ঘিরে কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, ব্যাখ্যা, জীবনীগ্রন্থও তেমনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেক আলোচনী সাহিত্য গড়ে তুলেছে। সে যুগের সংবাদ-পত্র 'ক্লিপ' করলেও ফর্মা বিশেকের পুস্তক অনায়াসে নামানো যায়। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকে মার্কস-লেনিনকে গ্রহণ করা হয় নি। আজকের কলকাতার প্রভাবশালী প্রচারসমৃদ্ধ সংবাদপত্রগুলির সংবাদস্তম্ভে সেদিন মার্কস-লেনিন ব্যাখ্যা ছিল সোচ্চার। একমাত্র বৃটিশ পুঁজি-লালিত তদানীন্তন 'দি স্টেটসম্যানই' মার্ক্সবাদের বাস্তব রূপকার লেনিনকে 'উৎপীড়ক মিস্টার লেনিন' বলে বর্ণনা করেছিল। কিন্তু সেকালের অমৃতবাজার, আনন্দ-বাজার পত্রিকা লেনিনবিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে দ্বিধা করে নি। সেদিন দেশের মানসিকতা দলীয় স্বার্থের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত না থাকায় শূদ্র-যুগের মহাঋষির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে কলকাতার পত্র-পত্রিকায় কূটচক্রান্ত সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভ স্থান অধিকার করে নি। বরং সাধারণ শত্রু ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী লালসার মুখোশ খুলে ধরবার জন্য, এমন কি কায়েমী-স্বার্থের মুখপত্রগুলিও লেনিনকে সামনে রেখে বৃটিশ বিরোধিতার উদ্দেশ্যকে সফল করেছিল।

এটা হয়ত খুবই বিস্ময়কর যে, প্রথম যে বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলি লেনিনের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে শুরু করে তার মধ্যে একটি ধর্মীয় পত্রিকাও ছিল। অবশ্য ধর্মীয় পত্রিকা বলেই লেনিনের সঙ্গে বিরোধ থাকার কোনো কারণ নেই, যদি না সে ভাবনা কুসংস্কারের মৌতাতে মুক্তিকামী জনগণকে মেরুদণ্ডহীন করে শোষণের যূপকাষ্ঠে বলির পাঁঠা করতে চায়। লেনিনের জীবনী ছাপে এমনিই এক ধর্মীয় পত্রিকা নাম 'সৎসঙ্গী'।

বাংলার তদানীন্তন বিপ্লবী পত্র-পত্রিকাগুলি তো একাদিক্রমে প্রবন্ধমালা প্রকাশ করে যান। অনুশীলন যুগান্তর দলের তাত্ত্বিকরা সেই সব প্রবন্ধের রচয়িতা। 'বিজলী', 'শঙ্খ', 'আত্মশক্তি' মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ব্যাখ্যায়ও ব্রতী হয়েছে।

কলকাতার তদানীন্তন একটি প্রভাব-শালী পত্রিকা, 'নায়ক' ১৯২২ সালের ২১শে জুলাই লেখে: বর্তমান জগতে আর কোন্ দেশে তাঁর মতো ঋষিপুরুষ, প্রতিভা এবং দার্শনিক আছে? বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ জনগণ একবাক্যে লেনিনকে মহানায়ক বলে স্বীকার করেছে।

'দৈনিক বসুমতী' ১৯২৩ লেনিনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারের মূলে যে মিথ্যা তাকে উদ্‌ঘাটিত করে বলে: ইংরাজের চোখে বলশেভিক সরকার জগতের সমস্ত রকম অন্যায় এবং অত্যা-চারের অপরাধে অপরাধী। তথাপি বর্তমানে বলা হইতেছে যে, সোভিয়েত সরকারের প্রধান লেনিন একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ। কাজেই বোঝা শক্ত কিরূপে তাঁহার সরকার অত খারাপ হইতে পারে। প্রত্যেকেই জানেন, প্রচারের জোরে সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করা যায়।

'দৈনিক বসুমতী'র এ বিশ্লেষণ আজো একই রকম সত্য।

১৯২৩-এর 'যুগবার্তা' ১২ই এপ্রিল

জনমনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে জানিয়েছিল অজ্ঞান বিপ্লবী নেতা লেনিনের মৃত্যু সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীরা কীভাবে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। বলেছিল : আমরা দেশবাসীকে এই মিথ্যাচার থেকে সাবধান থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি।

"ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর বিরুদ্ধে কত যে মিথ্যা ছড়ানো হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। স্বার্থান্বেষী দলগুলির কর্ণধার এবং লেখকরা তাঁকে এমন কালিমালিপ্ত করে অঙ্কিত করেন যে, বিশ্বের চোখে তাঁকে একটা ভয়ঙ্কর শয়তান বলে মনে হয়।"—একথা লেখে 'যুগবার্তা' তার ১৯২৩ সালের ১২ই এপ্রিল সংখ্যায়।

কলকাতার তদানীন্তন আর একটি সংবাদপত্র 'স্ট্যান্ডার্ড-বিয়ারা' ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এই বলে যে, লেনিন-শত্রুরা তাঁর মানবদরদী মহান কীর্তিকে যতই ছোট আর কালিমালিপ্ত করে দেখাক, সমগ্র জগদ্বাসী একদিন তাঁর কীর্তিকে মহৎ মানবিক প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা গর্বের স্মারকস্তম্ভরূপে রক্ষা করবে।

লেনিনের মৃত্যুর বহু মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে জনমনে হতাশা সৃষ্টির বারংবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই কাপুরুষেরা অবশেষে সত্যিই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন যেদিন "অগ্রযুগের" ত্রাতা সত্য সত্যিই দেহ রাখলেন।

'অমৃতবাজার (১৯২৪) লিখল : এই মহা-প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট মানুষটির চেয়ে আর কাউকে এতো বেশি ভুলভাবে বোঝা ও চিত্রিত করা হয় নি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা (১৯২৪) বললে : শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়ে লেনিন চির-জাগ্রত। তাদের জয়ই লেনিনের নাম ও কীর্তিকে উজ্জ্বল করে রাখছে।

১৯২৭ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে লেনিন জন্মোৎসব পালিত হয়ে আসছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বিশ শতকের এই বিস্ময়কর বিপ্লবী ঋষির বন্দনা গীত হচ্ছে।

> লেনিন, লেনিন, লেনিন
> "বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে,
> আজকেও অযুত লেনিন
> ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে
> বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষার দিন।"
> (সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪৩)

কবির প্রতীক্ষার দিন কবে অবসিত হবে কেউ সঠিক বলতে পারে না। লেনিন যে সুবিধাবাদের প্রতি জনগণকে সাবধান করেছিলেন, রাজনৈতিক চক্রা-বর্তনে সেই সুবিধাবাদই মানুষের ওপর পুনঃপ্রভাব বিস্তার করছে। ব্যাখ্যার দ্বারা লেনিনকে জনসমক্ষে বিভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

তবু কলকাতার হৃদ্‌কেন্দ্রে লেনিন মূর্তি আর লেনিন সরণি সমস্ত রকম কুটিল রাজনীতির ঊর্ধ্বে ও একটি অকপট স্বীকৃতির স্মারক হয়ে রইল, যা বলছে : পৃথিবীতে রাজনৈতিক নেতা আর রাজ-নৈতিক দর্শন ঢের হয়েছে ; কিন্তু মার্ক্সবাদের রূপকার যে মহান নেতা ভি আই লেনিন একদিন শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর গুরু মার্ক্সের রাজনৈতিক দর্শন হাতে নিয়ে সমগ্র দুনিয়ার শোষিত মানুষের নেতৃপদ দখল করেছিলেন, এমনটি ইতিহাসের পাতায় আর ঘটে নি।

কলকাতা সেই বিশ্বনেতার মূর্তিকে শহরের হৃদ্‌কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এমন এক সন্ধিক্ষণে, যখন সুবিধাবাদের রাজ-নীতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে সমুদ্যত।

তবু মহান লেনিনের আশীর্বাদ অসহায় সাধারণ মানুষকে স্বচ্ছ দৃষ্টি-দান করুক, শোষকের কুটিল চাতুর্য থেকে তাকে সাবধানে রক্ষা করুক! লেনিন মূর্তিও যেন আর পাঁচটি মূর্তির মতো ইতিহাসের সাক্ষ্যরূপে শহরের শোভা-বর্ধনকারী পুতুলমাত্র না হয়। শহর কলকাতার এটুকুই কাম্য।

ছদ্মবেশে লেনিন

[illegible]

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ পাঁচ ॥

দুপুরে মা কী খেয়েছেন অথবা আদৌ কিছু খেয়েছেন কিনা, প্রবীর জানবার চেষ্টা করল না। মাকে কোনো কথা বলা অনর্থক। টুলু না আসা পর্যন্ত মা-র মুখে কিছুই রুচবে না।

সেই যুক্তিহীন অন্ধ মমতা। মা বাবার মতো বুদ্ধিজীবী নন। অবশ্য বাবা বেঁচে থাকলে এই মুহূর্তে বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ করে নিতে পারতেন কিনা কিংবা এশিয়ার সম্ভাব্য বেস্ট স্কলারের এই সামারসল্ট তাঁর কী রকম লাগত সে কথা এখন জোর করে বলা শক্ত। যে মা চিরদিন ছায়ার মতো রইলেন, একান্ত নির্বোধের মতো ভার টেনে নিলেন, যে মা-র অপদার্থতা সম্বন্ধে বাবা, দিদি এবং টুলুর কোনো সন্দেহ জাগে নি—টুলু ফিরে না আসা পর্যন্ত আড়ালে সে মা-র চোখের জল পড়তেই থাকবে!

কাজেই—যে মুরারি হালদারের মুখ দেখলেও সকালটা মাটি হয়ে যায়, সন্ধ্যেবেলায় আবার যেতে হল তাঁর কাছে।

মুরারি বসবার ঘরেই ছিলেন। আরো দু'জন কারা ছিল। তাদের তিনি বলছিলেন, 'ঠিক আছে, ওই সেভেন পার্সেন্টেই সেটল করে নাও।'—তারপর প্রবীরকে বললেন, 'এই যে!'

'টুলুর কী হল জানবার জন্যে—'

মুরারির ভুরু কুঁচকে এল।

'কেন, টুলু বাড়ি যায় নি?'

'ছাড়া পেয়েছে?'

'হাঁ, তিনটে নাগাদ। গৌরবাবু বললেন, একটা বন্ড লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। আর—' একটু হাসলেন: 'আর বলেছেন এই দলটা সম্পর্কে নানা কমপ্লেন আছে। ভবিষ্যতে হাতে পেলে আর সহজে ছাড়বেন না। একটু সামলে চলতে বলে দিয়ো।'

ঘরের বাকী দু'জন লোকের চোখে কৌতূহল। সরু গোঁফের নীচে একজনের বাঁকা হাসি দেখা দিল একটু।

'মস্তান বুঝি?'

'আর বলো কেন? ভদ্রলোকের ছেলেরা যে কী রাস্তায় যাচ্ছে—'

প্রবীরের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

'আচ্ছা কাকা, আসি আজকে। অনেক উপকার করলেন।'

'না—না, উপকারের আর কী আছে! এ তো সামান্য ব্যাপার। কিছু ভেবো না—টুলু একটু পরেই বাড়ি ফিরে আসবে। হয়তো একটু লজ্জা হয়েছে—তাই—আচ্ছা এসো—হাঁ, টুলুকে একবার দেখা করতে বোলো তো আমার সঙ্গে।'

'আজ্ঞে বলব।'

প্রবীর বেরিয়ে এল। মুরারি হালদারের গলা শোনা গেল ভেতর থেকে: 'না—না, সেভেন পার্সেন্টের বেশি হলে'—

টুলু ছাড়া পেয়েছে। আর ভাববার কিছু নেই—করবারও না। কিন্তু কী আশ্চর্য হতভাগা হয়ে গেছে ছেলেটা। তিনটের বেরিয়েছে হাজত থেকে, এখন আটটা বাজে। এর মধ্যে একবার বাড়িতে আসবার কথা ভাবতে পারল না! নাকি ইডিয়ট মা-র ও-সব বাজে সেন্টিমেন্টের কোনো দামই নেই তার কাছে?

ইচ্ছে করল, কান ধরে টেনে নিয়ে আসে।

কোথায় পাওয়া যাবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে লেকের ধারে একটা ফুচকা আর আলুর দমের দোকানের পাশে রেলিঙে হেলান দিয়ে সে বন্ধুদের কাছে বক্তৃতা করছে—সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে বাসে আসতে আসতে এই দৃশ্যটা ক'বারই চোখে পড়েছে প্রবীরের।

যাব তাকে খুঁজতে? কিংবা মাকে আগে দিয়ে আসব খবরটা?

নিশ্চিত কিছু ভেবে নেবার আগে প্রবীর রাস্তার একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল একটু। মুরারি হালদার থানার ও-সি গৌরবাবুকে বলে দিয়েছেন, সেই খাতিরে এ যাত্রা একটা মুচলেকা নিয়েই ছেড়ে দেওয়া গেছে প্রতুলকে। এখন তাকে ভালো করবার পালা।

বাবার মতোই, নিজের বুদ্ধিতে অসীম বিশ্বাসী দিদির ধারণা: প্রতুল একবার কাছে এলে তার উপদেশে সম্পূর্ণ বদলে যাবে, কারণ দিদির ট্রেনিং দেবার ক্ষমতা অসাধারণ—নিজের মেয়ে টিনটিনকে তো চমৎকারভাবে মানুষ করছে সে! উপদেশ মুরারি হালদারও দিতে চান—দেবার রাইট আছে তাঁর—নইলে হয়তো আরো ক'দিন থানার হাজতে ভালোরকম ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হত প্রতুলের, চাই কি গৌরবাবু একটা কেসেই ফাঁসিয়ে দিতেন তাকে।

কিন্তু উপদেশ তাঁরা দিতে চাইলেও প্রতুলকে পাঠানো যাবে কিনা, ঘোরতর সন্দেহ আছে এ ব্যাপারে। সে স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ, কারো মতামতেরই তোয়াক্কা করে না। যদি করত, সব অন্যরকম হয়ে যেত তা হলে।

প্রতুলের যা হওয়ার হোক। কিন্তু মুরারি হালদার। ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রবীরের মনে প্রশ্ন জাগল—জিনিসটা এখন কিরকম দাঁড়াল?

'এই সব লোকেরাই শত্রু। এরাই বুর্জোয়া—শ্রমিকের রক্ত শুষে নিয়ে এদেরই বাড়-বাড়ন্ত। ইতিহাসে এদের জন্যে কোনো ক্ষমা নেই—' এই সমস্ত মৌলিক তত্ত্ব প্রবীরও ঘোষণা করেছে ইলেকশ্যানের সময়। কিন্তু কী আশ্চর্য কনট্রাডিকশ্যন থিয়োরী আর প্র্যাকটিসের

ভেতরে। প্রতিদিনের জীবনে সামান্য বিপদে পড়লেই এরা ছাড়া যেন ত্রাণকর্তা কেউ নেই। স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন উঠলে এদের কাছে গিয়েই ধরনা দিতে হয়: 'আপনার তো দিল্লীতে অনেক জানাশোনা সোর্স আছে—যদি আমার জন্যে—'

না—দাবি-দাওয়া নয়। এ আমার ন্যায্য পাওনা—আমাকে দিতেই হবে, একথা বলবার মতো জোর তো গলায় কোথাও নেই! তখন স্রেফ ভিক্ষুকের ভূমিকা, চাটুকারের ব্রত। সভায় দাঁড়িয়ে মুরারি হালদারের মুণ্ডপাত করা—আর বাড়ি গিয়ে হাত কচলে বলা: 'আমার ভাই গুণ্ডামি করে হাজতে আছে—সুতরাং যদিও কাজটা সম্পূর্ণই বে-আইনি, তবু অনুগ্রহ করে—আপনার ইনফ্লুয়েন্সে তাকে আপনি ছাড়িয়ে আনুন!'

খাসা!

এর পরে প্রবীর ব্যানার্জি কোনো ইলেকশান মীটিঙে বলতে পারবে: আপনারা জনগণের শত্রু শোষক মুরারি হালদারকে ভোট দেবেন না?'

যারা ইউনিয়নের নেতাদের ওপর হামলাবাজি করে, মালিকের টাকা খায়, কোলিয়ারী অঞ্চলের যে পেশাদার খুনেরা দিন-দুপুরে শ্রমিকদের বল্লম-কৃপাণ দিয়ে খুন করে—তারপর ফেলে দেয় কোনো পোড়ো খাদের ভেতর—তারাও এর চেয়ে ভালো, তাদের কোনো মুখোশ নেই। অথচ প্রবীর ব্যানার্জি বামপন্থী ক্যাণ্ডিডেটের জন্যে প্রাণপণে লড়ে থাকে।

সব—সব ওই স্কাউনড্রেল টুলুর জন্যে। পারিবারিক সম্পর্ক—আপন ছোট ভাই! চুলোয় যাক ছোট ভাই! উল্লুকটা বছর পাঁচেক জেল খেটে এলেও এই বিশ্ব-সংসারে কার কী আসত-যেত?

আর মা।

সেই অন্ধ অর্থহীন স্নেহ। কেন—মা কি একথা ভাবতে পারেন না—যে ফলটা পচে গেছে, তার গাছ থেকে ঝরে যাওয়াই ভালো? মা-র কি এমন মনে হতে পারে না—টুলু বলে যে ছেলে তাঁর ছিল অনেকদিন আগেই মরে গেছে সে, কিংবা আদৌ তার জন্মই হয় নি?

ডান হাতের মুঠোটাকে শক্ত করে চেপে ধরল প্রবীর। বাবা-দিদি-টুলুর কথাই হয়তো ঠিক। মা কেবল কতকগুলো ইনস্টিংক্ট দিয়ে তৈরি—ব্রেন বলে, লজিক বলে তাঁর কিছু নেই। নইলে আজ নিজের মনের কাছে এমনভাবে ছোট হয়ে যেতে হত না প্রবীরকে।

চিন্তাটা থমকে গেল। একটু দূরে থেকে দুটি ছেলের কথা কানে আসছে। একটির বয়েস চৌদ্দ-পনেরো, আর একটির কুড়ি-বাইশ বছর হবে।

কথা ছোটটাই বলছিল।

'অতটা ছোট—স্কুলে পড়ে না? এমন সেজে-ছিল না—'

চৌদ্দ বছরের ছেলের মুখে কী অপরূপ ভাষা!

বড়ো ছেলেটা বললে, 'ছোটটা খাসা দেখতে মাইরি। চাকু চালিয়ে দেয়।'

'সেই জন্যেই তো আমি একটু ইয়ার্কি মেরেছিলুম। তা বলে কিনা—এক চড় মারব। আমি বললুম, দু' চড় মারব—'

'খিক খিক খিক'—

বড়ো ছেলেটা শেয়ালের মতো শব্দ করে হাসল: 'তাপ্পর শালা?'

'তাপ্পর' কী হল, সেটা শোনবার জন্যে আর দাঁড়ালো না প্রবীর। এ এমন একটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়—পৃথিবীর প্রথম দিন থেকেই এগুলো ঘটে আসছে। কিন্তু আজ যেন চারদিকে সব কিছুই কদাকার হয়ে উঠেছে, এখন একটা ছোট ঘামাচিও বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দেয়।

প্রতুলের দোষ নেই। এবার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেই হল। তারপর যে রসাতলের দিকে যেতে চাও।

বাড়ির দিকে চলতে চলতে রেডিওর খবর। স্থানীয় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়।

'যুক্তফ্রন্টের সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে বলে তাঁরা মনে করেন। বাংলা কংগ্রেসের যে ক'জন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন—'

না—কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। পায়ের তলায় যেটাকে পাথরের শক্ত ভিত বলে মনে হয়েছিল, তার তলায় এতখানি চোরাবালি জমে আছে কে জানত?

দোষ কারুর নয়। দলটাই পয়লা এবং চরম।

'তোর জন্যে আমি একদিন গলায় দড়ি দেব। তুইও বাঁচবি—আমিও বাঁচব।'

'সত্যি বলছি মা, আমার কোনো দোষ ছিল না। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম কেবল।'

বাড়িতে পা দিতে গিয়ে প্রবীর দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মানে, টুলু ফিরে এসেছে। খুব সম্ভব ইডিয়টিক ইমোশন্যাল মা-টাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চায় কিংবা বন্ধু-বান্ধবগুলো হাজতে আটকে আছে বলে কোথাও আড্ডা দেবার জায়গা নেই এখন।

'কেন দাঁড়িয়ে থাকলি? গণ্ডগোল হচ্ছিল—কেন ওখান থেকে চলে গেলি না তখন?'

প্রবীর উঠোনে এসে দাঁড়ালো। বারান্দায় একটা মোড়া পেতে প্রতুল বসে, দাদার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। বাস্তবিক, চক্ষুলজ্জার বালাইটা তা হলে এখনো আছে তার!

দিয়ে। একটু আগেই মা কেঁদেছেন, গলার স্বর এখনো ধরা: 'হ্যাঁ রে, [illegible] কি একটু মায়াও হয় না আমার জন্যে?'

'টুলু!'

প্রবীর ডাকল। মা ফিরে তাকালেন।

'কে রে, তুলু? টুলু এসেছে?'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি—' প্রবীরের স্বর শক্ত হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললে, 'তুই আমার ঘরে একটু আয় টুলু—তোর সংগে ক'টা কথা আছে আমার।'

শুনেই মা ছটফট করে উঠলেন।

'তুই আর ওকে এখন কিছু বলিস নি তুলু, বাড়িতে আসবামাত্রই তো আমি—'

'মা, তুমি চুপ করো তো!'—কর্কশ গলায় প্রবীর ধমক দিলে একটা। বিস্বাদ বিরক্ত মনটা দপ করে তার জ্বলে উঠল বারুদের মতো—বেরিয়ে এল একেবারে দিদির প্রতিধ্বনি: 'তুমিই আদর দিয়ে ওর মাথাটা খেয়ে দিয়েছ।'

মা চুপ করেই গেলেন। দুটো ভিজে ভিজে চোখ ভরে উঠল ভয়ে—যন্ত্রণায়।

সেদিকে তাকালে মায়া হয়। প্রবীর তাকালো না। অন্ধ মমতার সময় নয় এখন।

'টুলু—আয় আমার ঘরে—'

টুলু উঠে এল। দু'-ভাই বসল ঘরে এসে। মুখোমুখি। টুলু একটা চেয়ারে, প্রবীর খাটের কোণায়।

মিনিটখানেক স্তব্ধতা। ঘরের টাইম-পীসটার শব্দ। তারপর:

'তোর জন্যে আমাকে মুরারি হালদারের কাছে তদ্বির করতে যেতে হয়েছিল।'

মাথা নীচু করে বসে ছিল প্রতুল, চোখ তুলল।

'কেন গেলে?'

'নইলে আরো আটকে রাখত। কেসে জড়িয়ে দিত। শুধু নিজেই ডুবছিস না টুলু—আমাদেরও ডোবাচ্ছিস এক সঙ্গে।'

'কী কেস করত?'—প্রতুল এবার পিঠ সোজা করল: 'আমি ও-সবের ভেতরে ছিলুম না।'

'মিথ্যেই জড়িয়ে নিয়েছে তোকে?'

'তাই।'

'মারামারির ভেতরে তোর বন্ধু-বান্ধবেরা ছিল না? ছোরা বের করে নি?'

'আমি বলতে পারব না—দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।'

'এ—তাই বুঝি?'—একটু চুপ করে থেকে প্রবীর জিজ্ঞেস করল: 'কখন ছাড়ল তোকে থানা থেকে?'

'এই সন্ধ্যের সময়।'

'না—বেলা তিনটেতে।'

প্রতুল একবার তাকালো।

'[illegible]?'

যে মুখখানির দিকে
সবাই তাকিয়ে আছে
তিনিই বলবেন

কারণটা ঃ
হেজলীন স্নো

হেজলীন স্নো-র মোলায়েম হাল্কা পরশ সেরা বিউটি ক্রীমেরই মতন। আপনার মুখখানিকে দিব্যি সুন্দর মিহিন লাবণ্যে ভ'রে দেয়। অপরূপ তরুণ কোমল কান্তিতে আপনার মুখখানি নির্মল হয়ে ওঠে। ছোটোখাটো দাগ অতি সহজেই ঢাকা পড়ে যায়…আপনার মুখে ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আভা।

আজই আপনার হেজলীন স্নো-র সঙ্গে পরিচয় হোক…দিনের পর দিন সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে ফুলের মত সহজ সুন্দর ক'রে তুলবে।

সামলে নিলে।

এই বেরিয়ে—আসতে আসতে—'

বাধা দিয়ে প্রবীর বললে, 'টুলু, কী লাভ এ-সব বলে? একটা মিথ্যেকে ঢাকতে গিয়ে আরো দশটাকে টেনে আনতে হয়। তোর সঙ্গে কথা বাড়াতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। শুধু একটা কথার জবাব দে আমার। এইভাবেই চলবে?'

গোঁজ হয়ে প্রতুল বললে, 'যা ভাবছ তা নয়। আমি কাজ খুঁজছি।'

'সে তো খুব সুখের কথা। কিন্তু সকালবেলা মেয়েদের কলেজটার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে, সন্ধ্যায় লেকের কাছে জুলেতানি করলে, এখানে-ওখানে মারামারি করে বেড়ালে কাজ পাওয়া যাবে? না কি এইটেই কাজ?'

'দাদা, বড্ড বাড়িয়ে বলছ।'

নির্লজ্জতার মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল প্রবীরের। ইচ্ছে করল, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে। কিন্তু তেইশ বছরের ভাইকে শাসন করবার রাস্তা নয় ওটা। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'আমি বলছি না, পুলিশে বলে।'

'পুলিশে ও-রকম বলেই থাকে।'

'তা হবে, ওরা মিথ্যে শত্রুতা করছে তোর সঙ্গে।'—প্রবীর একবার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল: 'কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারীও যে পাশ করল না—কেউ তাকে চাকরি দেবে? টুলু, এখনো তো সময় যায় নি। তুই পরীক্ষা দিতে পারিস, পাশ করতে পারিস—'

'পাশ করে কি হবে দাদা? হাজার হাজার বেকার এন্‌জিনীয়ারই তো চাকরি পায় না।'

মোক্ষম যুক্তি। জবাব মুখে তৈরিই আছে।

'তাতে তোর কী আসে-যায়? তুই তো চেষ্টা করে দেখিস নি।'

'এম-এ, এম-এস্‌সি পাশ করব, অথচ কাজ একটা কোথাও জুটবে না—অতখানি এনার্জি আমি অকারণে নষ্ট করতে চাই না দাদা।'

না, কলেজের মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে এনার্জির সাশ্রয় হয়। অনেক এনার্জি বেঁচে যায় পথে-ঘাটে মস্তানি করে বেড়ালে। আবার একটা জিঘাংসা ফুটে উঠল মনের ভেতরে। কিন্তু তেইশ বছরের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা যায় না। তা ছাড়া পকেট থেকে যে একটা ছোরা বেরিয়ে আসবে না, তাই বা কে বলতে পারে!

'তুই কী করতে চাস তা হলে?'

'বললুম তো—কাজের ব্যবস্থা করছি একটা।'

'কী কাজ—জানতে পারি?'

'ভাবছি, এজেন্সি নেব কিছু কিছু।' —টুলু যেন প্ল্যান গুছিয়ে নিতে চাইল একটা: 'ধরো, স্কুলে-কলেজে এটা-ওটা সাপ্লাই দেব। কিংবা কলেজ ল্যাবরেটারিতে তো অনেক কিছু লাগে—সেগুলোও যোগান দিতে পারি ওদের। এই সব ভাবছি।'

'তা হলে ভাবনাটা কাজে লাগালে হয়।'

'কিছু ক্যাপিটাল দরকার। অন্তত শ'-পাঁচেক টাকা।'

প্রবীর টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুই সিরীয়াস?'

'তুমি আমাকে কী ভাবো দাদা?'

আমি কিছুই ভাবতে চাই না—কিছু না ভাবতে হলেই বেঁচে যাই। টুলু ব্যবসা করবে—রোজগার করবে—দায়িত্ব নেবে—এমন আশ্চর্য শুভ ঘটনা ঘটে গেলে ভাববার আর কিছুই থাকে না। কিন্তু—

টুলু আবার বললে, 'তুমি টাকাটার ব্যবস্থা করে দাও—আমি লেগে পড়ব।'—বলতে বলতে একটু উজ্জ্বল হল তার চোখ।

মিনিটখানেক চুপ করে রইল প্রবীর।

'আচ্ছা দেব টাকা। তোর আমার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে বাবা যে সামান্য কিছু রেখে গেছেন, তাই থেকেই তুলে দেব। কিন্তু তার আগে এক মাস আমি তোমায় দেখব। আর তোমার ওই অ্যাসোসিয়েশনটি ছাড়তে হবে।'

টুলু বললে, 'তুমি মিথ্যে অবিচার করছ। আমার বন্ধুরা কেউই মস্তান নয়। কাজ-কর্ম নেই বলে—। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি জনতিনেকে মিলে পার্টনারশিপে ব্যবসাটা আরম্ভ করব।'

'ও—পার্টনারশিপ?'—প্রবীর যেটুকু কোমল হয়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেটা শক্ত হয়ে গেল।

'হাঁ। মাণিক আর প্রমোদ—'

'ওরাও নিশ্চয় পাঁচশো করে টাকা দেবে?'

টুলু একটু থামল।

'হাঁ—তা—তা দেবে বই কি।'

'খুব ভালো কথা। ওদের টাকা যোগাড় করতে বলো তা হলে। এক মাস পরে পার্টনারশিপ ডীড রেজিস্ট্রি করিয়ে দেব। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—আইন-কানুনের ব্যাপারগুলো আমিই দেখব এখন।'

ব্যবসায়ের উৎসাহে কোথায় যেন ভাটা পড়ে গেল টুলুর।

'অল্প থেকে আরম্ভ করব, তার জন্যে এত সবের দরকার আছে দাদা?'

কঠোর মুখে প্রবীর বললে, 'আছে। তোমার পাঁচশো টাকা নিয়ে দুই বন্ধুতে সেটা পরম আনন্দে উড়িয়ে দেবে, টাকা এত সস্তা নয়।'

'ওরা এত ইরেস্‌পন্‌সিব্‌ল্ নয়, দাদা।'

'কতখানি রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্ তার প্রমাণ তো এখনো পাওয়া যায় নি।' তীক্ষ্ণ চোখে প্রবীর টুলুর দিকে তাকিয়ে রইল: 'আইনসম্মতভাবে না হলে একটা পয়সাও আমি দেব না।'

'আচ্ছা, আমি কথা বলব ওদের সঙ্গে—' টুলু নির্জীব হয়ে গেল।

প্রবীর আবার তাকিয়ে রইল টুলুর দিকে। ব্যবসা করবে! আসলে শ'-পাঁচেক টাকা হাতে পেলে কিছুদিন চমৎকার কেটে যায় বোধ হয়। তারপর বললেই চলে: 'সুবিধে হল না দাদা—বিজ্‌নেস ফেল করেছে। আরো শ'-পাঁচেক হলে—'

প্ল্যানটা ভালো। খুব ইন্টেলিজেন্ট। কোনো প্রাণের বন্ধুই যোগান দিয়েছে খুব সম্ভব।

একবার ইচ্ছে হল, বলে—'রাস্কেল, তোর পয়সা-কড়ি বাড়ি-ঘরের অংশ যা আছে সব ভাগ করে নে—তারপর ঝাঁপিয়ে পড় যে নরকে তোর খুশি।' কিন্তু মা! একটা যুক্তিহীন, অন্ধ, অবিবেচক মমতার দেওয়াল রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কিছুই করা যায় না—কেবল নীলকণ্ঠ হওয়া ছাড়া।

কিংবা—কিংবা এমন হতে পারে, নিজের মনটাই সংকীর্ণ হয়ে গেছে তার। নিজের ভাইকে সে আর বিশ্বাস করতে পারছে না—সে ভালো হতে চাইলেও না।

একটু চুপ করে থেকে, ক্লান্ত একটা নিশ্বাস ফেলে প্রবীর বললে, 'টুলু, আজ স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

আর একবার চমকালো টুলু। এবার মুখটা একটু বিবর্ণ হল তার।

প্রবীর আস্তে আস্তে বললে, 'মেয়েটা কোনো স্কুলে চাকরি করছে বোধ হয়। টুলু, তোর জন্যে ও কতখানি করেছিল, মনে আছে? ওই মেয়েটার জন্যেও কি তুই ভালো হতে পারিস না?'

টুলু উঠে দাঁড়ালো।

মাথা নামিয়ে বললে, 'আমি এখন একটু শুয়ে পড়ব দাদা, শরীরটা ভালো লাগছে না।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে প্রবীরের মনে হল, হয়তো এখনো সব শেষ হয়ে যায় নি, হয়তো এখনো আশা আছে। কাল-পরশু একবার যেতে হবে স্বপ্নাদের বাড়িতে।

আর মনে পড়ল—আজ দু' মাস, না—তারো বেশি—সাবিত্রীর সঙ্গে তার দেখা হয় না।

[ক্রমশ]

বহুভাষার দেশ আমাদের ভারত। ভাষা-সমস্যাটি হল এখানকার জাতীয় জীবনের একটি জটিলতম গ্রন্থি। ভাষাগত দ্বন্দ্ব নানাভাবে নানারূপে আমাদের জাতীয় সংহতিবোধকে ক্ষুন্ন করছে বলে অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু সমস্যাটিকে সঠিক ও সামগ্রিকভাবে বোঝার চেষ্টা হয়েছে খুবই কম।

আমাদের দেশে ভাষা-সমস্যার কয়েকটি দিক আছে, (১) কেন্দ্রে সরকারী ভাষা কি হবে তাই নিয়ে বিতর্ক—এই বিতর্ক চলছে একদিকে হিন্দী এবং অন্যদিকে অ-হিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যে, (২) সংবিধানের অষ্টম তপশীলে যে ১৫টি ভাষার উল্লেখ আছে, তার বাইরে কয়েকটি ভাষার যথা মৈথিলী, নেপালী, মণিপুরী প্রভৃতির উক্ত তপশীলভুক্তি তথা সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে, (৩) যে সব ভাষা কিছুদিন আগে অত্যন্ত পশ্চাদপদ বলে বিবেচিত হত এবং এখনও হয়ে থাকে, সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্রিয়াশীল পথে এগিয়ে চলেছে। এই ভাষাগুলির প্রধানত এদেশের বিভিন্ন উপজাতির ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মত ছিল যে, এগুলির বিলুপ্তি অবধারিত। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকটি উপজাতির ভাষা নিজস্ব বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠছে এবং ঐ সব ভাষার সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা হচ্ছে। এদের মধ্যে আছে সাঁওতালী, খাসি, গারো, নাগা প্রভৃতি ভাষা।

ওপরে যে দিকগুলির কথা উল্লেখ করা হল, সেগুলিকে মিলিয়ে ভাষা-সমস্যাকে দুটি মূল প্রশ্নরূপে উত্থাপন করা যায়, (১) বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে? সমস্ত ভাষাকে বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ, সমান মর্যাদা এবং অধিকার দান অথবা এদের মধ্যে একটি বা কয়েকটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে অন্যগুলির প্রতি অবহেলা?

(২) বহুভাষিক দেশে রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে আদান ও প্রদানের যোগসূত্ররূপে একটি ভাষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেই যোগসূত্র-ভাষা (ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'link-language') নির্বাচন এবং বিকাশ এবং অন্যান্য ভাষার মধ্যে তার সম্পর্কই বা হবে কিরকম?

আমাদেরই প্রতিবেশী সোভিয়েট ইউনিয়নও বহুজাতি ও ভাষার দেশ। সোভিয়েট ইউনিয়নের অতিবড় সমালোচকও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সেখানে জাতিগত বা ভাষাগত দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের লেশমাত্র নেই। ছোট বড় সমস্ত জাতির ভাষাই সেখানে সমান মর্যাদা, অধিকার ও বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ ভোগ করে। প্রাক্-বিপ্লব যুগে অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থায় পড়েছিল এমন বহু জনসমষ্টির ভাষা মাত্র পঞ্চাশ বৎসর সময়ের মধ্যে ফলেফুলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সেখানে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার পরিবেশে সোভিয়েট সাহিত্য আজ প্রকৃত অর্থে বহুজাতিক, বহুভাষিক সাহিত্য, অথচ একই সমাজতান্ত্রিক প্রাণবস্তুর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে গড়ে উঠেছে। রুশ ভাষা সেখানকার ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ, উন্নত ভাষা, কিন্তু এই ভাষাকে অন্য ভাষাভাষীদের ওপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। অ-রুশীয় ভাষাভাষীরা স্বেচ্ছায় এই ভাষাকে পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্রের ভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছে। আজও সোভিয়েট ইউনিয়নে রুশ ভাষাকে সাংবিধানিক দিক থেকে সরকারী ভাষারূপে ঘোষণা করা হয় নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ভাষা-সমস্যার এই সহজ প্রীতিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়েছে লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে। সোভিয়েট ইউনিয়নে ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে লেনিনীয় নীতি বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে সমাজতন্ত্রের পরিবেশে। কিন্তু লেনিন এই সমস্যা সমাধানের মূলনীতিটিকে সূত্রায়িত করেন বহু বৎসর পূর্বে, ১৯১৩ সালে।

তখন জারশাসিত রুশ সাম্রাজ্যে অ-রুশীয় জাতি ও ভাষাভাষী জনসমষ্টির ভাষা-সংস্কৃতিকে জোর ক'রে দাবিয়ে রাখার এবং বলপূর্বক রুশীকরণের নীতি অনুসৃত হচ্ছে। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে

ছিল তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লব কত শীঘ্র সমাজতান্ত্রিক স্তরে উত্তরিত হবে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ছিল না।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে কিভাবে ও কতদূর পর্যন্ত ভাষা এবং জাতি-সমস্যার সমাধান হতে পারে, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই লেনিন তাঁর সূত্রটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জাতি ও ভাষা-সমস্যার সমাধান তথা বিভিন্ন জাতি এবং ভাষা-ভাষী জনসমষ্টির মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব একমাত্র consistent democratism বা সুসংগত গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে। আলোচ্য সমস্যার ক্ষেত্রে সুসংগত গণতান্ত্রিকতার অর্থ হল জাতি এবং ভাষাগত সমস্ত রকম বিশেষ সুবিধা ও বৈষম্যের অবসান, সকলকে বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগদান।

বহুভাষিক রাশিয়াতে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে যোগসূত্র-ভাষা স্থির হবে কিভাবে এই বিষয়ে লেনিনের বক্তব্যের মধ্যেই তাঁর দ্বারা সূত্রায়িত মূল-নীতির প্রাণবস্তুটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন: "If all privileges fall away, if the enforcing of one of the languages ceases, all Slavs will easily and quickly learn to understand each other and will not be scared by the "horrible" idea that speeches in different languages will be heard in the common parliament. And the requirements of economic intercourse will of themselves determine which language in the given country it is advantageous for the majority to know in the interests of commercial intercourse. And this will be determined more firmly by the fact that the population of the different nations will accept it voluntarily, and it will be determined more rapidly and widely, the more consistently democratism is applied and the more rapidly capitalism develops as a consequence."

(Critical Remarks on the National Question—Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1951, p. 11-12).

অর্থাৎ যদি সমস্ত সুবিধার বিলোপ ঘটে, যদি একটি ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অবসান হয়, তাহলে সমস্ত শ্লাভেরা সহজে এবং দ্রুত পরস্পরকে বুঝতে শিখবে। তখন আর তারা সাধারণ পার্লামেণ্টে বিভিন্ন ভাষার বক্তৃতা শোনা যাবে এই "ভয়াবহ" ধারণার দ্বারা আতঙ্কিত হবে না। আর অর্থ-নৈতিক আদানপ্রদানের প্রয়োজন নিজে থেকেই ঠিক করে দেবে যে, সংশ্লিষ্ট দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কোন্ ভাষাটি বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের পক্ষে সুবিধা-জনক হবে। এই জিনিসটি আরো দৃঢ়-ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে, কেন না, বিভিন্ন জাতির জনসাধারণ ঐ ভাষাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে। গণতন্ত্র যতই সুসংগতভাবে প্রযুক্ত হবে এবং তার ফলস্বরূপ পুঁজি-বাদের বিকাশ যত ত্বরান্বিত হবে ততই দ্রুত ও ব্যাপকভাবে এই প্রশ্নটি মীমাংসিত হবে।

এই প্রসঙ্গে লেনিন সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, "সেখানে সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একটির বদলে তিনটি, জার্মান, ফরাসী এবং ইটালীয়ান, সরকারী ভাষা থাকায় ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ডের লোক-সানের বদলে লাভই হয়েছে। সেখানে পার্লামেণ্টে ইটালীয়ানরা ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করে। তার কারণ এই নয় যে, উক্ত ভাষায় বক্তৃতা করতে তাদের বাধ্য করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা নিজেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে বোধগম্য ভাষা ব্যবহার সুবিধাজনক মনে করে। ফরাসী ভাষা ইটালীদের ওপর বল-পূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয় নি বলেই তা ইটালীয়দের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে না।

অন্যত্র তিনি বলেন যে, সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি সরকারী ভাষা আছে বটে, কিন্তু কোন আইন যখন জনমত জানার জন্য রেফারেণ্ডামে দেওয়া হয়, তখন সেটি মুদ্রিত হয় পাঁচটি ভাষায়, অর্থাৎ উক্ত তিনটি সরকারী ভাষা ছাড়া আরো দুটি "লাতিন" উপভাষায়। সুইজারল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা এক ভাগে সামান্য কিছু বেশি লোক ঐ উপভাষ দুটি ব্যবহার করে। সৈন্যবাহিনীতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সাধারণ সৈনিকদে সঙ্গে কথা বলে তাদের মাতৃভাষায়। গ্রাউ বয়েন্দেন এবং ওয়ালিস নামে দুটি ক্যাণ্টনমেণ্টে (প্রত্যেকটির মোট জনসংখ এক লক্ষের সামান্য অধিক) দুটি উপ ভাষাই সমান মর্যাদার অধিকারী।

লেনিন রাশিয়ার গণতন্ত্রীদের প্রতি একটি উন্নত দেশের এই জীবন্ত উদ হরণকে অনুসরণের আহ্বান জানান লেনিনের প্রদর্শিত একমাত্র এই পথ আমাদের দেশে ভাষা-সমস্যা সমাধানে এবং বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সঃ যোগিতা ও মৈত্রীর নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করতে পা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

মাউ মাউ শপথ

আমি নিজে দু'বার মাউ মাউ শপথ গ্রহণ করেছি। ১৯৫৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর আমার স্কুলের সহপাঠী কানিওনি গিথেনজি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ও আমাকে তার বাড়িতে বৈকালিক চা-পানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। চা-পানের সময় সে কয়েকবার উঠে ঘরের বাইরে যায় ও একবার আমার কানে আসে সে কাউকে জিজ্ঞেস করছে যে, তার কাছে "মুকুহা" আছে কি না! মুকুহা হল একটি ছুঁচের মত সরু লম্বা অস্ত্র, যার দ্বারা পায়ের তলার চামড়া ভেদ করে ঢুকে যাওয়া পোকাকে টেনে বার করা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারের পর কানিওনি আমাকে ভ্রমণে যেতে আহ্বান করে ও একটি সরু রাস্তা ধরে প্রায় ৩ শত গজ যাবার পর আমরা এক ভুট্টা ক্ষেতে পৌঁছই ও সেখানে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষকে বসে থাকতে দেখি। নিকটেই ক্ষেতের মধ্যে এক জায়গায় কলাগাছ দিয়ে একটি তোরণের মত করা ছিল—যার ওপর-ভাগটি একজাতীয় লতা দিয়ে জড়ান।

ঐখানে কলাগাছ দেখে আমি খুব অবাক হই, কারণ আমি যতদূর জানি, রিফ্‌ট ভ্যালির এই অংশে কোন কলার চাষ করা হয় না। কিন্তু কানিওনি পরে আমায় বলে যে, নিকটেই কাবাটিনি জঙ্গলে 'কারুর' বলে যে অঞ্চল আছে, তার চাষা চেগের বাগান থেকে ঐ কলা-গাছ আনা হয়েছে। কারুর চেগেকে আমি জানতাম, সে অনেকদিনের বাসিন্দা ওখানে। সেদিন প্রথম থেকেই কানিওনির আচার-ব্যবহার আমার একটু অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল এবং এই নির্জন ভুট্টা ক্ষেতের মাঝে কয়েকজন লোক, কলাগাছের তোরণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম দেখে আমি ক্রমশ নিঃসন্দেহ হই যে, ঐখানে শপথ দেওয়া হবে; যদিও সে মুখে কিছু বলে নি। একটু পরে আমাকে এক জায়গায় আরও তিনজন লোকের সঙ্গে দাঁড়াতে বলা হল, তাদের সকলকেই আগে থেকে আমি অল্প-বিস্তর চিনতাম। বুঝলাম যে, আমাদের চারজনকে একসঙ্গে শপথ দেওয়া হবে। তারপর আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয় জুতা খুলতে ও সবরকম ধাতব পদার্থ, যেমন—ঘড়ি, কলম ইত্যাদি আমাদের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে রাখতে। কানিওনি অন্য লোকদের আমাকে দেখিয়ে বলল যে, আমি একজন স্কুলের ছাত্র আর আমার দেশের জন্য কাজ করার খুব উৎসাহ আছে এবং আমি এর মধ্যেই বেশ অনেক লোককে কেনিয়া-আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে ভর্তি করেছি। তার মতে : এই সমস্ত গুণাবলির জন্য আমাকে কেনিয়ার ঐক্যের শপথ "নেডেমওয়া ইথাটু" দিলে দেশের মঙ্গল হবে, কারণ দেশের স্বাধীনতার জন্য যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব, সে বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ। আমার সঙ্গে দণ্ডায়মান অন্য তিনজন লোককে শপথ-দানের পূর্বে বেশ কয়েক ঘা মারা হয়—বোধহয় ভয় দেখানর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কানিওনির উপরোক্ত উক্তির পর আমাকে কোনরকম শারীরিক নিপীড়ন সহ্য করতে হয় নি। শপথদাতার নির্দেশ অনুসারে আমরা চারজনে সারিবদ্ধভাবে ঐ তোরণের তলা দিয়ে সাতবার যাই, সেইভাবেই তার পরের ক্রিয়াকর্মের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি। আমাদের পরিচালকের নাম ছিল বিনিয়াথি।

বিনিয়াথির ডান হাতে একটি ছাগলের হৃৎপিণ্ড ও বাঁ হাতে এক টুকরো মাংস ছিল। সে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ঐ মাংসখণ্ডটি সাতবার ঘোরায় ও সে সময় আমাদের মাথা নিচু করে শ্রদ্ধাভরে থাকতে বলা হয়। তারপর সে আমাদের প্রত্যেকের হাতে এক-এক করে হৃৎপিণ্ডটি দেয় ও তাতে একবার করে কামড় দিতে বলে। তারপর সে আমাদের তার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে বলে :—

আমি ধীর সত্যমনে ভগবানের সামনে এবং এই আন্দোলনের কাছে প্রতিজ্ঞা করি,
যা নাকি আমাদের দেশ একীকরণের আন্দোলন,
এবং যে আন্দোলন আজ জগতের কাছে এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন
আর যে আন্দোলনকে বিদেশী শাসকেরা "মাউ-মাউ"র নামে বিদ্রূপ করছে
যে আমি দেশের চাষজমির উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করব,
সেই উর্বর কিরিনয়াগার চাষজমি যাতে আমার পূর্বপুরুষেরা চাষ-বাস করেছেন
কিন্তু সে জমি ইউরোপীয়ানরা ছলে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে
এবং যদি আমি এই মহান্ কার্যে নিরস্ত হই

তবে যেন এই শপথ আমাকে হত্যা করে
তবে যেন এই সাতবার প্রদক্ষিণ-করা শপথ
আমাকে হত্যা করে
তবে যেন এই মন্ত্রপূত মাংস আমাকে হত্যা করে।

আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, এই আন্দোলনের প্রতিটি
যোদ্ধার সাথে একজোটে কাজ করব
এবং এই কাজে আমাকে যে ভাবে
বলা হবে সেই ভাবেই [illegible] করব

আমি এই আন্দোলনে যোদ্ধাদের জন্য—
মাসে বারটি শিলিং ও একটি [illegible]
(মোট ১২. টাকা)
এবং যদি এগুলো না দিতে পারি তবে ধরে নেব।
এবং যদি আমি এই মহান্ কার্যে নিরস্ত হই
তবে যেন এই শপথ আমাকে হত্যা করে
তবে যেন এই সাতবার প্রদক্ষিণ-করা শপথ
আমাকে হত্যা করে
তবে যেন এই মন্ত্রপূত মাংস আমাকে হত্যা করে।

উপরোক্ত একটি লাইন ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারার জন্য আমার কান মলে একটি থাপ্পড় মারা হয়েছিল। শপথ-পরিচালকের এক সাগরেদ আমাকে মারে—সে শপথদানের সময় পরিচালকের পাশে একটি ভাণ্ডে শপথে ব্যবহৃত ছাগলের রক্ত নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিনিয়াথি আমাদের প্রত্যেকের কপালে ঐ ভাণ্ড থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে জয়টিকা এঁকে দেন এবং বলেন যে, আমরা দেশের জমি উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছি ও যেন কখনও ঐ মহান্ কার্যে দেশকে প্রতারণা না করি। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই ঐ জয়টিকা দেওয়া হয়।

এরপর বিনিয়াথি আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে বাঁ হাতের কব্জিতে তিনটে ছোট ছোট দাগ কেটে দেয়। যেমন আমি আগে বলেছি আমাদের শপথের নাম "নেডেমেওয়া ইথাটু যার অর্থ হল তিনটা দাগ" এবং দাগ কাটার জন্যই কানিওনি বিকেল-বেলায় 'মুমুথার' খোঁজ করছিল। আমাদের হাতে দাগ কাটার পর বিনিয়াথি তার হাতেধরা অন্য মাংসের টুকরাটি আমাদের ক্ষতস্থানের নিচে ধরেন, যাতে কয়েক ফোঁটা রক্ত আমাদের হাত থেকে তার ওপর গিয়ে পড়ে। এইভাবে প্রত্যেকের হাতের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে গেলে পর আমাদের চার-জনকেই ঐ মাংসের টুকরাটিতে কামড় দিতে বলা হয় এবং যখন আমরা তা করতে থাকি, তখন বিনিয়াথি বলেন, "এইভাবে তোমাদের সকলের রক্তমিশ্রিত মাংসের টুকরায় কামড় দিয়ে তোমরা সকলে নিজেদের মধ্যে ও আমাদের সঙ্গে একত্র হয়ে গেলে।" শপথ গ্রহণের কার্যক্রম এইভাবে শেষ হবার পর আমরা চারজনই কানিওনির কাছে গিয়ে বসি ও সে আমাদের নাম একটি খাতায় লিখে নেয়। প্রত্যেকের কাছে থেকে শপথ গ্রহণের খরচাবাবদ ৫ শিলিং আদায় করে নেয়। সবশেষে আমরা অন্যান্য দর্শকবৃন্দের সঙ্গে গিয়ে বসি এবং তখন আমাদের জুতো, ঘড়ি ইত্যাদি ফেরত দেওয়া হয়।

শপথ গ্রহণের সময় আমার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভয় ও আনন্দের দ্বৈত অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর যখন সব কার্যপ্রক্রিয়া শেষে মিলিত জনতার ভিতর গিয়ে বসলাম, তখন এক অসাধারণ ক্ষমতার শিহরণ মনকে দোলা দিচ্ছিল, আর খালি মনে হচ্ছিল, আমার এর আগেকার জীবন বৃথা কালক্ষয় করারই সামিল। এমন কি, আমার এত কষ্টলালিত লেখাপড়া, যার জন্য আমি এতদিন মনে মনে এত গর্ব অনুভব করেছি, তাও এই নবলব্ধ শক্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছি এবং প্রথম যেদিন মায়ের কাছে বসে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করি, ঠিক সেদিনের মতই আবার আমার মন আনন্দোচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছিল। আমার অন্য তিন সঙ্গীও চুপচাপ আমাদের সঙ্গে বসেছিল এবং ঐ একই মহান্ ভাবে বিভোর হয়েছিল।

বিনিয়াথির বয়স প্রায় ৪০-এর কাছাকাছি আর চেহারা মাঝারি ধরনের। সামনের চারটি দাঁত তার ভাঙা, ফলে কথা বলবার সময় তার মুখের ভাব কিরকম অদ্ভুত দেখতে লাগত। সেদিন শপথদানের সময় তার পরনে ছিল এক গ্রে ফ্ল্যানেলের প্যান্ট ও কালো একটি কোট, কিন্তু চেক সার্টের সঙ্গে গলায় কোন টাই ছিল না। আমাদের বাহাটি অঞ্চলের কেউই ঐ শপথদানের নিয়মাবলী ঠিকমত জানত না এবং এই জন্যই বিনিয়াথিকে বিশেষ করে "কিয়াম্বু" অঞ্চল থেকে আনা হয়েছিল। প্রত্যেকের শপথদানের পর আমাদের আঞ্চলিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিনিয়াথির পৌরো-হিত্যের মূল্য ধার্য করা হতো। তার শপথদানের ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত এবং স্বভাবত সে ছিল নম্র ও বিনয়ী। প্রত্যেকের অভিযোগ-অনুযোগের প্রতি-কার করবার জন্য সে সর্বদা প্রচেষ্ট ছিল।

আমি বিনিয়াথিকে জিজ্ঞাসা করে-জেনেছিলাম যে, শপথ গ্রহণের পরও আমার কে· এ· ইউর (কেনিয়া-আফ্রিকান ইউনিয়ান) জন্য সদস্য সংগ্রহের কাজ করা উচিত হবে কি না। সে উত্তরে আমাকে বলে যে, কে· এ· ইউ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্থা, যদিচ তার অনেক সদস্যরাই সেদিনকার শপথদানের সময় উপস্থিত ছিল এবং তারা সকলেই ইতিপূর্বে ঐ শপথ গ্রহণ করেছিল। কে· এ· ইউ-র জন্য আমার সদস্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাওয়ায় তার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে আমাকে সাবধান করে দেয় যে, আমি যেন কে. এ. ইউ-র কোন সদস্যকে বা অন্য কোন লোককে এই শপথ গ্রহণের বিষয়ে কোন কথা না বলি ; কারণ এই শপথ সম্পূর্ণ গুপ্ত রাখা প্রয়োজন। কানিওনি, যাকে তখন আমি আমার শিক্ষকের মত মেনে নিয়েছিলাম, আমাদের আরও বলে যে, শপথ গ্রহণের পর ৭ রাত্রি আমরা যেন কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস না করি। সে আরও জানায় যে, কোন লোক এই শপথ গ্রহণ করেছে কি না জানতে হলে তাকে যেন জিজ্ঞাসা করি—"তোমার circumcision কোথায় হয়েছে?" এর উত্তর যদি সে স্বাভাবিকভাবেই দেয় তবে বুঝে নিতে হবে যে, সে শপথ গ্রহণ করে নি। কিন্তু যদি সে বলে "আমার circumcision হয়েছিল কারিমানিয়াতে কারিমানিয়ার সঙ্গে" তা হলে জানবে যে, সে লোক শপথ গ্রহণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এর আগে আমি 'কারিমানিয়া' শব্দটি কখনও নাম হিসেবে ব্যবহার হতে শুনি নি—আর এর অর্থ হল জমির চাষ করার মত মাটিকে বার বার উল্টে-পাল্টে নেওয়া এবং এই সূত্রেই শব্দটি শপথ গ্রহণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

সে রাত্রি আমি কানিয়ানির বাড়িতেই কাটিয়ে আসি—আমার মাথায় তখনও শপথের বাণী ঘুরছিল, কাজেই আমি আমার সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি প্রাতরাশের পর [illegible] বাড়িতে ফিরে যাই। [illegible]

জানাই যে, আমার নাকুরুতে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন এবং সে আমাকে যাবার আগের রবিবারে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। সেখানে আমার শপথদাতা বিনিয়াথি ও মুথি নামে আরও একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। মুথি এর কিছুদিন পরেই গুপ্ত সন্ত্রাসবাহিনীর তরফে জঙ্গল থেকে লড়াই করবার কাজে যোগদান করে ও একদিন খাদ্যান্বেষণের সময় King's African Rifle's-এর এক সৈন্যের গুলীতে মারা যায়। সেদিন কানিওনির বাড়িতে সারাদিন আমাদের গল্পগুজব করেই কাটে, যদিও তার সঙ্গে রাজনীতি ও আমাদের জমি-সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগের আলোচনাও হয়েছিল। আর বিশেষ করে "White Highland"*-এ আফ্রিকানদের জমি কেনা সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা খুবই জমে উঠেছিল। এ বিষয়ে আমাদের রাগ বা দুঃখ ছিল সেই গল্পের গৃহস্বামীর মতই, যে নাকি তারই আমন্ত্রিত অতিথির দ্বারা নিজ গৃহ হতে বহিষ্কৃত হয়। সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই একসঙ্গে নিকটবর্তী আর একটি বাড়িতে যাই, সেখানে তখন একটি ছাগলকে জবাই করে তার গায়ের ছাল ছাড়ান হচ্ছিল। এখানে পৌঁছবার পর আমি বুঝতে পারি যে, সেদিন আবার শপথ দেওয়া হবে। বিনিয়াথি আমাদের কেবল প্যাণ্ট ছাড়া আর সব জামা-কাপড় খুলে ফেলতে বলে ও আমরা তার ডাকের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে বসে থাকি। প্রথমে কানিওনি ও তারপর আমার ডাক পড়ে। সেই ডাক অবজ্ঞা করবার কোন প্রশ্নই আমাদের মনে ওঠে নি।

আমি বিনিয়াথির নির্দেশ অনুসারে আমার প্যাণ্টটিও খুলে ফেলি ও তার দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসি। সে আমাকে সদ্যকাটা ছাগলের কণ্ঠনালীর ভিতর আমার পুরুষাঙ্গটি প্রবেশ করিয়ে দিতে বলে ও বাঁ হাত দিয়ে নালীটাকে ধরে থাকতে আদেশ করে। নালীর অন্য অংশটা আমার সামনে মাটিতে পোঁতা দুটো কাঠের খুঁটির মাঝে বাঁধা ছিল। আমার ডান হাতের কাছে মাটিতে সাতটা ছোট ছোট কাঠি রাখা ছিল—প্রত্যেকটি লম্বায় প্রায় ৪ ইঞ্চির মত। বিনিয়াথি আমাকে একটি করে কাঠি তুলে নিয়ে অন্ন-নালীর ওপর আস্তে আস্তে ঘষতে বলে ও সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত ৭টি শপথ তার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। প্রত্যেকটি শপথ গ্রহণের সময় একটি করে কাঠি ব্যবহার করি ও তার পর কাঁচা মাংসতে একটি করে কামড় দিয়ে কাঠিটিকে আমার বাঁ দিকে মাটিতে ফেলে দি।

৭টি শপথ :—

(১) আমি নিষ্ঠাভরে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করি
আর আমার দেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের
শপথ গ্রহণ করে প্রতিজ্ঞা করি যে—
আমার দেশের জমি রক্ষার জন্য যদি আমায় নরহত্যা
করতে হয়
বা যদি আমার নিজের জীবন দান করতে হয়
আমি যেন বিনা দ্বিধায় সেই আজ্ঞা পালন করি
আর যদি আমি তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, তাহলে যেন
"এই শপথ আমাকে হত্যা করে
এই মৃত ছাগল আমাকে হত্যা করে
এই মন্ত্রপূত সপ্ত-শপথ আমাকে হত্যা করে
এই মন্ত্রপূত মাংস আমাকে হত্যা করে।"

(২) আমি নিষ্ঠাভরে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করি
আর আমার দেশের সমস্ত লোকের কাছে
প্রতিজ্ঞা করি যে,
আমি আমার দেশের সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা
করবো না
আমি এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত কোন লোকের সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষের কাছে তাকে
প্রকাশ করব না
সে শত্রুপক্ষ ইউরোপীয়ান বা আফ্রিকান যেই
হোক না কেন
আর যদি আমি তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, তাহলে যেন
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"

(৩) আমি নিষ্ঠাভরে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে,
রাত্রি বা দিন, যে কোন সময়ই যদি
আমাকে দেশের শত্রু কোন ইউরোপীয়ানের ফার্ম
জ্বালাতে বলা হয়
আমি দ্বিধাহীনচিত্তে ঐ কর্তব্য করে যাব এবং
কোনমতেই তার হাতে ধরা দেব না
আর যদি আমি তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, তাহলে যেন
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"

(৪) আমি নিষ্ঠাভরে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে
আমাকে যদি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে যেতে
বা তাকে হত্যা করতে বলা হয়—আমি সে আদেশ
পালন করব
সে শত্রু আমার বাবা, মা, ভাই বা বোন
যেই হোক না কেন
আর যদি আমি তাতে অস্বীকৃত হই, তাহলে যেন
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"

(৫) আমি নিষ্ঠাভরে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে,
এই সংগ্রামের কোন কর্মী যদি আমার কাছে রাত্রে বা
দিনে কোন সময়ই আসে
ও তাকে লুকিয়ে রাখতে বলে
আমি বিনাদ্বিধায় তাদের সাহায্য করব
আর যদি আমি তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হই তাহলে যেন
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"
"এই শপথ...........হত্যা করে"

(৬) আমি নিষ্ঠাভরে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে
আমি কোনদিন পরস্ত্রীর ওপর লোভ করবো না
বা কখনও পতিতাদের স্পর্শ করবো না

* White Highlands হচ্ছে কেনিয়ার সব থেকে উর্বর জমি। নাকুরু অঞ্চলে একটু উঁচুতে অবস্থিত ইউরোপীয়ানরা এই জমি থেকে সমস্ত আফ্রিকানদের উচ্ছেদ করে নিজেদের চাষ-আবাদের জন্য রাখে এবং নিয়ম বেঁধে দেয় যে, কোন অ-ইউরোপীয়ান লোকই ওখানে জমি কিনতে বা তার মালিক হতে পারবে না।

এই সংগ্রামের কোনো কার্যকলাপ কোন বিদেশীকে
জানাব না
বা তাদের থেকে কাজের জন্যই অর্থের লেনদেন করব না
আর যদি আমি উপরোক্ত যে কোন কাজই করি
তাহলে যেন
"এই শপথ..........হত্যা করে"
"এই শপথ..........হত্যা করে"
"এই শপথ..........হত্যা করে"
"এই শপথ..........হত্যা করে"

(৭) আমি মিন্ঠান্তরে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করি
আর আমার দেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের
শপথ গ্রহণ করে প্রতিজ্ঞা করি যে,
আমার দেশের সম্মান কখনো কারুর কাছে
নত হতে দেব না,

আমি আমার সব সময় সকলের প্রতি সংগ্রাম করব,
আমাদের সংগ্রামের কোন গুপ্ত কথাই আমি
অনুপযুক্ত বা
এর সংগে যুক্ত নয়, এমন কোন লোকের কাছে
প্রকাশ করব না,
আর যদি উপরোক্ত শপথের কোনটিই
যেভাবেই হোক অবমাননা করি
তাহলে আমি যে কোন শাস্তিই মাথা পেতে নেব
আর যদি আমি তাতে অস্বীকৃত হই, তাহলে যেন
"এই শপথ..........হত্যা করে"
"এই শপথ..........হত্যা করে"
"এই শপথ..........হত্যা করে"
"এই শপথ..........হত্যা করে"

উপরোক্ত ৭টি শপথ গ্রহণের পর আমি ছাগলের কণ্ঠনালীটি মাটিতে নামিয়ে রেখে ঘি ও কাপড়-জামা পরবার পর কানিওনিকে শপথের দক্ষিণা-স্বরূপ ৬৷৷ শিলিং দি। এই দ্বিতীয় বারের শপথের নাম ছিল "বাটুনি" শপথ, এবং কথাটি ইংরাজী শব্দ "platoon"-এর অপভ্রংশ বলে মনে হয়। কারণ আমাদের ভেতর যারা শপথ সংগ্রামের জন্য তৈরি ছিল, কেবল তাদেরই এই শপথ গ্রহণ করতে বলা হয়।

প্রথমটির থেকে দ্বিতীয় শপথটি ছিল অনেক বেশি কঠিন, এবং এর ফলে আমার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এই শপথ গ্রহণের পর আর আমার মনে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কোন প্রশ্নই জাগেনি এবং আমার ভবিষ্যৎ কার্য-পন্থা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। "বাটুনি" শপথের গোপনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে সচেতন করে দেওয়া হয়, এমন কি, প্রথম শপথের অনেক পরিচালকরাও তখনো অবধি দ্বিতীয় শপথ গ্রহণ করে নি। শপথ গ্রহণের পর আমি আমার খুড়িমার বাড়ি ফিরে যাই এবং তার তিন দিন পর নাকুরু শহরে ওবাড়িয়া মোয়ানিকির বাড়িতে গিয়ে উঠি। ওবাড়িয়াই অনেক বছর আগে আমার বাল্যকালে তার নতুন সাইকেল চেপে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। ওবাড়িয়া বরাবরই ভীষণ ধর্মভীরু ছিল এবং তখন সে নাকুরুর আফ্রিকান জেলা কোর্টের সভাপতিও ছিল, কাজেই তাকে আমি শপথ গ্রহণের বিষয় কোন কথাই বলি নি। আমাদের শপথে যদিও খৃস্টধর্মের বা গির্জার উপাসনার জন্য যাওয়ায় কোন বাধা ছিল না, তবু প্রথমবার শপথ গ্রহণের পর থেকেই খৃস্টানধর্ম সম্বন্ধে আমার মনে বিরূপ ভাব জাগ্রত হয় তাই বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না থাকলে আমি গির্জায় যেতাম না। তথাপি ওবাড়িয়ার কাছে থাকাকালীন আমি প্রতি রবিবারই গির্জায় যেতাম, যাতে তার মনে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ না জাগে।

"মুয়া ওয়া থেগে" (ছাগল শপথ) আমাদের 'কিকুয়ু' সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ এবং বিবাহবন্ধনে পুরুষ ও নারীকে একত্র করার সময় বা চষ জমির লেনদেনের ব্যাপারে (ইউরোপীয়ানরা আসার পূর্বে আমাদের দেশে কখনোও জমি বিক্রি করা হয় নি, কারণ এ প্রথা তখন চালু ছিল না এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি থাকার এর প্রয়োজনও হয় নি) বা গরু-ছাগল লেনদেনের সময় এই শপথের দ্বারাই ঐ সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো। আমাদের বীরেরা এ ছাড়া আরও একটি শপথ গ্রহণ করতো, যার নাম "মুয়া ওয়া আআনাকে" (বীরের বা যোদ্ধার শপথ) এবং এর ফলে সবাই এক-জোট হয়ে কাজ করবার সুযোগ পেত। এই সমস্ত শপথের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ভেতর একতা, দ্বেষহীনতা ও বৈরীহীনতার উদ্রেক করা এবং তার চেয়েও গভীর উদ্দেশ্য ছিল যাতে নিজেদের ভেতর কেউ কারুর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা না করে বা গুপ্ত যাদুকরের সাহায্যে কারুর অনিষ্ট করতে চেষ্টা না করে। গুপ্ত যাদুকরের হাতে মৃত্যুকে বড় ভয় করে আমাদের লোকেরা এবং একই শপথ গ্রহণকারী দুজনের ভেতর আর এই ভয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, এই বিশেষ সম্বন্ধের পর হিংসা, দ্বেষ বা শত্রুতার আর কোন কথাই উঠতে পারে না।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একতার শপথ (যাকে "মাউ-মাউ" নামে কলঙ্কিত করা হয়েছে চাতুর্যের সংগে)-এর উদ্দেশ্য ছিল এটাই। আমাদের আশা ছিল যে, এর দ্বারাই আমরা কিকুয়ু, এম্বু ও মেরু উপজাতিদের তো বটেই, উপরন্তু অন্যান্য কেনিয়ার উপজাতিদেরও একত্রিত করতে পারব স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। যদিও তাদের শপথের ধারা ছিল বিভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেক উপজাতির ভেতরেই ঐ রকম একতার শপথ বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ব্যবহৃত একতার শপথ যে কিকুয়ুদের ভেতরই প্রথম চালু হয়, তার জন্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অবনতির সর্বপ্রথম চাপ তারাই অনুভব করে। নাইরোবী শহরে অবস্থিত ইংরেজ সরকারের সবচেয়ে কাছে থাকত কিকুয়ুরাই এবং অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় তারাই সবচেয়ে বেশি লেখাপড়া শিখেছিল। কাজেই সরকারী বাধা-নিষেধের প্রতিক্রিয়াও অনুভব করেছিল তারাই সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য উপজাতির চেয়ে তারাই সবচেয়ে বেশি অনুভব করত, কি করে প্রতিদিন তাদের চিরকালের অধিকার-সমূহ এক বিদেশী উপনিবেশকারী সরকার ছিনিয়ে নিচ্ছে একটু একটু করে।

যদিও এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কিছু লোককে জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শপথ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল, তবু ইংরাজ সরকার মিথ্যামিথ্যি যত সংখ্যার উল্লেখ করেছেন, আসল সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। সরকারী প্রচারকার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে কেনিয়ার বাইরের লোকেরা এখনকার আসল রাজনৈতিক অবস্থা ও তার বিদ্রোহের কারণ বুঝতে না পারে এবং সেজন্য তারা মিথ্যে প্রচার করে যে, এই বিদ্রোহের পিছনে জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা নেই। অন্যদিকে এ-কথাও সত্য যে, ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুদণ্ড ও অন্যান্য শাস্তির

শাস্তি দেওয়া [illegible] হয়েছিল—[illegible] মনে বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই রকম শাস্তির ব্যবহার আমাদের দেশই প্রথম করে নি, আর অন্যান্য পরাধীন দেশেও যে করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মোট কথা এই যে, আমরা সংগ্রামের তরফ থেকে কেনিয়ার ঔপনিবেশিক সরকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলাম এবং আমাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলাম। কাজেই গোড়ার দিকে আমাদের আধিপত্য জনসাধারণকে মানতে বাধ্য করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কড়া ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কারণ সে সময় আমাদের বিপক্ষে মতামত ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। আমাদের নেতারা ও [illegible] প্রথম থেকেই দলগত ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং অবাধ্যতার জন্য কঠিন শাস্তির প্রচলন করেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ এ ছাড়া অন্য কোন উপায়েই স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফলতার দিকে চালনা করা সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল আমাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং এর বিফলতা ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে; কাজেই আমরা জীবনপণ করেছিলাম একে সফল করবার জন্য।

সরকারী প্রচারকার্যের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের শপথগুলির বিষয়ে নানারকম মিথ্যা গুজব আজ পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। শোনা যায় যে, বৃটেনের হাউস অফ্ কমন্স গ্রন্থাগারে এমন একটি পুস্তিকা সংরক্ষিত করা হয়েছে, যাতে এই শপথ সংক্রান্ত নানা রকম তথ্য এবং তার সঙ্গে জড়িত কয়েকটি বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া আছে। এই বইতে আরও বলা হয়েছে যে, কেনিয়ায় অনেক লোককে নাকি চোদ্দটি অবধি বিভিন্ন শপথ দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি তার আগেরটিকে বীভৎসতায় ছাড়িয়ে গেছে। আমি একথা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, উপরোক্ত দুটি শপথমাত্রই ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেওয়া হয়েছিল; অবশ্য এও সম্ভব যে কেন্দ্রীয় সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শপথদানের অনুষ্ঠানাদি ঠিক একইভাবে [illegible] হয় নি, যার ফলে সরকারী অনুসন্ধানের [illegible] বিভিন্ন প্রকারের শপথের অস্তিত্ব [illegible] প্রত্যক্ষ ছিল। এই শপথদানের প্রত্যেকটি বীভৎস আচারের [illegible] উল্লেখ করা হয়েছে সরকারী [illegible], যেমন—স্ত্রীলোকের মাসিক স্রাবের ব্যবহার, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সহবাস, গর্ভধারিণীর গর্ভ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অজাত সন্তানের মাংসভক্ষণ ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, আমার সহকর্মীদের জ্ঞানত ঐ সমস্ত কদাচার কখনও করা হয় নি এবং আজ অবধি এ বিষয়ে কেউ কোন সঠিক প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে নি। যদি বা কোথাও ঐ কদাচার ব্যবহৃত হয়েও থাকে, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তার সংখ্যা নিতান্তই তুচ্ছ এবং এর উদ্ভব এমন কোন মস্তিষ্ক থেকে হয়েছে, যে দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস একা জঙ্গলের ভেতর থেকে বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গিয়েছে। সমস্ত কিকুয়ু উপজাতির নামে ঐ সমস্ত আচার-ব্যবহারের বদনাম দেওয়া ততটাই অন্যায় হবে, যতটা হয় কয়েকজন মাত্র ইংরাজ বালিকা ধর্ষণ করে বলে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ঐ অভ্যাসের বশবর্তী বলে অভিযুক্ত করা।

কিকুয়ু উপজাতির সামাজিক ও ধারাবাহিক নিয়মাবলীর ভেতর স্ত্রীলোকের মাসিক স্রাবকে অত্যন্ত ঘৃণার ও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় এবং ঐ সময় যে কোন প্রকারেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস বা তার শারীরিক অবমাননা করা হলে তার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের ফল যে অতি ভীষণ এবং এইভাবে যে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব বা অন্য কোন শারীরিক বিপদ উপস্থিত হতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কবাণী বালক-বালিকাদের যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হয়। এবং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সুস্থমস্তিষ্ক কোন কিকুয়ু নেতাই এর ব্যতিরেক অনুমোদন করবেন না বা করেন নি।

যে সমস্ত "প্রমাণসমূহ" সরকারীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো বেশির ভাগই ধৃত ব্যক্তির ওপর অমানবিক শারীরিক অত্যাচারের পর বা তার সম্ভাবনার পর গৃহীত, কাজেই এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না এবং পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন বিচারালয়ই এই প্রকারে গৃহীত প্রমাণকে স্বীকার করবে কিনা তাতে মতভেদ আছে।

বন্দী অবস্থায় সবশুদ্ধ ৬ বার আমার কাছ থেকে জোর করে "স্বীকৃতি" নেওয়ার হয়েছিল এবং কোনবারই আমি এমন কি বলছি তা বলবার সুযোগ পাই নি। কিকুয়ু ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "গজিটা মুরুমে", যার অর্থ হল যে, জোর করে কারুর কাছে এও স্বীকার করিয়ে নেওয়া যায় যে, সে-ই সাক্ষাৎ ভগবান এবং তার ফলেই সে ভগবানে রূপান্তরিত হয় না।

[ক্রমশ]

[illegible]

গত ২৬শে মার্চ ১৯৭০ সংখ্যায় 'পাঠকমন' বিভাগে প্রকাশিত 'জনৈক চিকিৎসক' লিখিত 'স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য' প্রসঙ্গে শ্রীসুনীল ঘোষ মহাশয়ের রচনায় যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা বিকৃত তথ্যসম্বলিত।

(১) ৯ নং সারিতে কাহারও পদোন্নতির যোগ্যতা নাই—এমন অভিযোগ করা হয় নাই। উক্ত ডাক্তারদের নামের স্থানে হাইফেন চিহ্ন আছে। যাহার অর্থ হইল যে, তাঁহারা সেই সময় এ্যাকাডেমিক এ্যাডভাইসারি কমিটির বিবেচনায় যোগ্যতা অর্জন করেন নাই। সুতরাং এই ব্যাপারে শ্রীসুনীল ঘোষের তথ্য ভ্রান্ত নয়।

(২) প্রথমত, যে সরকারী আদেশের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন সেই আদেশেই কেবলমাত্র এ্যানাটমী, ফিজিওলজী, ফারমাকোলজী ও বায়োকেমিস্ট্রী—এই চারটি নন-ক্লিনিক্যাল বিভাগকে বাধ্যতামূলক গ্রাম্য সার্ভিস হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, 'জনৈক চিকিৎসক' যদি সত্যই চিকিৎসক হন তাহা হইলে তাঁহার জানা উচিত যে ডাক্তারী বিষয়সমূহের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে গ্রাম্য সার্ভিসের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে একমাত্র প্রিভেনটিভ ও সোস্যাল মেডিসিন বিভাগেই উহা অত্যাবশ্যক এবং আই-এম-সি একমাত্র এই বিষয়েই গ্রাম্য সার্ভিসের বদলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা শিথিল করিয়াছেন।

(৩) সিনিয়রিটি প্রসঙ্গে—গ্রেডেশন লিস্টের ক্রমিক সংখ্যা হইতে সিনিয়রিটির বিচার করা নিরর্থক। উদাহরণস্বরূপ—৫৮৮ ক্রমিক সংখ্যায় ডাঃ তরুণদেব মল্লিক (চাকরিতে যোগদান—নভেম্বর, ১৯৬২)-এর নাম ৭৯১ ক্রমিক সংখ্যায় ডাঃ ভৌমিক (যোগদান—নভেম্বর, ১৯৬১)-এর উপরে অধিষ্ঠিত। তদ্রূপ, ডাঃ মাধুরী বোস (চাকরিতে যোগদান—ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯) ডাঃ রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের (চাকরিতে যোগদান—নভেম্বর, ১৯৫৯, দশ মাস পরে) নামের অনেক নীচে রহিয়াছেন। ডাঃ রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য এ্যাণ্টিডেট পাওয়ার জন্য চাকরিতে ডাঃ মাধুরী বোস অপেক্ষা সিনিয়র। একই কারণে অর্থাৎ এ্যাণ্টিডেট-এর জন্য ডাঃ গুরুদাস রায় ডাঃ মাধুরী বোস অপেক্ষা সিনিয়র।

এছাড়া, সরকারী আদেশে মৌলিক গবেষণা অথবা বৈজ্ঞানিক রচনা—যে কোন একটি প্রমোশনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে। ডাঃ গুরুদাস রায়ের ১২টি বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। একমাত্র ডাঃ মণিময়
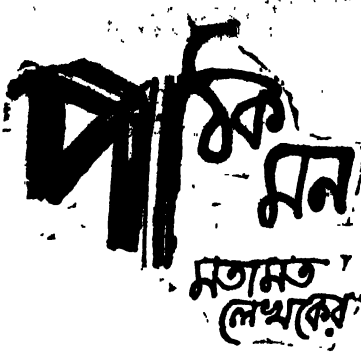
গাঙ্গুলী ব্যতীত আর কাহারও শিক্ষকতাকালীন কোন বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের কৃতিত্ব নাই। ডাঃ অশ্বিনী মণ্ডল ও ডাঃ মাধুরী বোসের ডি-ফিল ও পি-এইচ-ডি ডিগ্রী কোনটিই সরকারী আদেশানুযায়ী প্রিভেণ্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিনের স্বীকৃত নহে।

ডাঃ গুরুদাস রায় মার্চ, ১৯৫৮ সাল হইতে নিরবচ্ছিন্ন চাকরি করিতেছেন। সুতরাং 'জনৈক চিকিৎসক'-এর বর্ণিত হিসাব ঠিক নহে।

(৪) ডাঃ গৌরহরি সেনের উদাহরণ অনুযায়ী ডাঃ অমর পালের প্রফেসর পদে প্রমোশনের বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নাই।

'জনৈক চিকিৎসক' তাঁহার অন্যান্য বক্তব্যে শ্রীসুনীল ঘোষের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহার সহিত একমত।

পরিশেষে 'জনৈক চিকিৎসক'-এর বক্তব্য অনুযায়ী যেখানে ডাঃ মাধুরী বোস ও ডাঃ গুরুদাস রায় উভয়েই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসার পদে উন্নীত হওয়ার যোগ্য এবং যেখানে ডাঃ রায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় ও গ্রাম্য সার্ভিসে ডাঃ বোস অপেক্ষা সিনিয়র এবং এ্যাকাডেমিক এ্যাডভাইসারি কমিটি কর্তৃক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসার পদে মনোনীত, সেই স্থলে কাহার অদৃশ্য ইঙ্গিতে কেবলমাত্র ডাঃ বোস অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসার পদে মনোনীত হইলেন। অথচ ডাঃ রায় লেকচারার পদে নামিয়া গেলেন! এছাড়া, শিক্ষকতা ও চাকরিক্ষেত্রে মেডিক্যাল কেরিয়ার বিবেচনা হয়। তাহা বিবেচিত হইলে ডাঃ রায় যোগ্যতর ব্যক্তি প্রমাণিত হইবেন।

—জনৈক পাঠক,
কলিকাতা-৩

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন একনিষ্ঠ পাঠক। সাপ্তাহিক বসুমতী আমার অত্যন্ত প্রিয়, কেন না, বাংলা দেশ হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ভিতর এই একটি মাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকারের রচনাতে নির্ভীক-নিরপেক্ষতার নীতি [illegible] করা হয়। বাংলা দেশ হইতে প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকাই, তাহাদের প্রচারের সুবিধার্থে—"নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদ-জগতে সর্বাধিক ঐতিহ্যপূর্ণ" বা "প্রগতিশীল সাপ্তাহিক"-রূপে জনসমক্ষে নিজেদের জাহির করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল নামধেয় পত্র-পত্রিকাগুলির সংস্পর্শে আসিলে বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হয় না যে উপরে বর্ণিত কথাগুলি কিরূপ ভ্রান্ত। প্রগতিশীলতার নামাবলী গায়ে চাপাইয়া চরম প্রতিক্রিয়াশীলতারই প্রচার চালানো ঐ সকল পত্র-পত্রিকাগুলির একমাত্র কর্ম। সরকার পরিবর্তনের সাথে তাহাদের স্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা কী ধরনের প্রগতিপন্থী। বিভিন্ন দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা তাহাদের চক্ষুঃশূল কোনও এক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এরূপ প্রচার চালায় যে, জনসাধারণ সত্য ঘটনা আন্দাজ করিতে না পারিয়া দিশেহারা হইয়া পড়েন। নানাপ্রকার ভুল-ভ্রান্তির ভিত্তিতে সুসজ্জিত সংবাদ পরিবেশনে তাহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। এমন কি নানাপ্রকার আজগুবি ও নিতান্তই আষাঢ়ে গল্পের ন্যায় সংবাদ পরিবেশনেও তাহারা পিছপা হয় না। এ বিষয়ে কিছুদিন আগে বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত জনৈকা শুক্লা মুখার্জীর নামে প্রচারিত আষাঢ়ে গল্পই আমার এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত করিবে। এ ব্যাপারে দৈনিক বসুমতীর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় রচনাটি (রবিবার ১৫ই চৈত্র) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐ সম্পাদকীয় রচনার শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন, "কলিকাতার জার্নালিজম এখন মার্ডার, কিডন্যাপিং ও মেসম্যারিজমের দিকে চলিয়াছে।" ইহা হইতে বোঝা যায় সাংবাদিকরা আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সংবাদ পরিবেশনার প্রাথমিক দায়িত্বটুকু পালনে আজ তাঁহারা অক্ষম। ইহাই কি সৎ সাংবাদিকতা, প্রগতিশীলতা! বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমার মত বহু লোক আছেন যাঁহারা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা পড়িয়া থাকি কিন্তু সেই সকল পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন ঘটনা বা প্রতিঘটনার সংবাদ আদৌ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতে পারি না, কেন না যে কোন দৈনিকের সংগে অপর কোন দৈনিকে প্রকাশিত কোন ঘটনার মিল খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার থাকাকালীন ঐ সকল পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য ছিল আজগুবি ও ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশন-

[illegible] মুখার্জীর [illegible] মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। [illegible] [illegible] সরকারের [illegible] পর, রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালীন তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে [illegible] কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে একনাগাড়ে অপপ্রচার চালানো। তাহা না হইলে [illegible] মুখার্জীর কাহিনীর মত আষাঢ়ে গল্পই বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্থান পায় কেন এবং আগের দিনে প্রকাশিত কুৎসামূলক বিভিন্ন সংবাদের অজস্র প্রতিবাদপত্রই বা ছাপা হয় কেন। আমি উপর্যুক্ত কথাগুলি লিখিলাম এই কারণেই যে, আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীও অতি সম্প্রতি কুৎসা রটনাকারী পত্র-পত্রিকার দলে এসে ভিড়িয়াছে। সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকা তাহার নির্ভীকতা এবং নিরপেক্ষতার জন্য আমার নিকট প্রিয়। সৎ-সাংবাদিকতার এক কথায় একমাত্র নিদর্শন সাপ্তাহিক বসুমতী। বিভিন্ন সময়ে আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণও পাইয়াছি। কিন্তু এ হেন প্রিয় পত্রিকাটিকে তাহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত অবস্থায় দেখিলে অন্তরে ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। ক্ষোভের কারণ হঠাৎ গত দুই সংখ্যা হইতে (২৫।৩ ও ১।৪।৭০) সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয় কণ্ঠে আশ্চর্য রকমের স্বর-পরিবর্তন। উক্ত সম্পাদকীয় রচনা পড়িয়া মনে হইতেছে পশ্চিমবঙ্গ যেন রসাতলে গিয়াছে এবং যাবতীয় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, নারীহরণ প্রভৃতি সত্য-অর্ধসত্য, অসত্য ঘটনা-বলীর জন্য একটিমাত্র দলই দায়ী আর বাকী অন্যান্যেরা যেন একেবারে নির্দোষ—ধোয়া 'তুলসীপাতা' সদৃশ। বিশ্বাস করাই আমাদের মত পাঠকের পক্ষে কঠিন যে, গত দুই সংখ্যায় সম্পাদকীয় রচনা আপনারই লেখনী নিঃসৃত। রাষ্ট্রপতি শাসন এবং পরবর্তী নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যদি আপনারা নীতি পরিবর্তন করিয়া থাকেন বা আপনার স্বাধীন লেখনীর উপর যদি পত্রিকা পরিচালনা কর্তৃপক্ষের অশুভ হস্তক্ষেপ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আমার বলিবার কিছু নাই; কেন না যে কোন পত্র-পত্রিকারই স্বাধীন মত পরিবেশনের ক্ষমতা বা অধিকার সর্বজনস্বীকৃত, তবে এইটুকু নির্দ্বিধায় বলিতে পারি যে, আমরা [illegible] সাপ্তাহিক বসুমতীর ভাবমূর্তি [illegible] আসন হইতে বাদ এবং [illegible] এই [illegible] [illegible]। নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি হইবে না যে, আমার মত বহু পাঠকের [illegible] সাপ্তাহিক বসুমতী বঞ্চিত হইবেন।

—শ্রী[illegible],
নিবারণপুর, রাঁচী—২

* * *

২-৪-৭০ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় "রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হোক" পাঠ করে বেহালার শ্রীঅমলেন্দু দত্ত পরম বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন : "এ কার কণ্ঠস্বর? নব কংগ্রেসের, আদি কংগ্রেসের, বাংলা কংগ্রেসের বা তার সহযোগী বন্ধু দলের?" (বসুমতী ৪১শ সংখ্যা)

"খ্যাপা খুঁজে মরে পরশপাথর!" ঐ সম্পাদকীয় নিবন্ধের শেষ স্তবকেই ত' রয়েছে সন্দেহাতীত উত্তর। সম্পাদিকা লিখেছেন : "...শান্তি এবং শৃঙ্খলার খাতিরে দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রপতির শাসনের পক্ষেই আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেণীর মানুষ...পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ধাপ্পাবাজি ও অসৎ প্রচারে আর বিভ্রান্ত হতে প্রস্তুত নন।"

গণতন্ত্রের নামে ভণ্ডতন্ত্র আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সাধারণ মানুষকে করেছে বিভ্রান্ত। তাবড় তাবড় নেতাদের কথা বাদই দিলাম। গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদে নেতাদের ভাষণে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার এক কণাও রূপায়িত হতে না দেখে গ্রামের মানুষরাও বিচলিত, বিভ্রান্ত। গ্রামের অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরাও ধরে ফেলেছেন এই চতুরালী। পরিবর্তে তাঁরা পেয়েছেন এমন জিনিস, যা এনে দিয়েছে তাঁদের মনে ভীতি ও সন্ত্রাস। শহরের মানুষ শ্রীদত্ত। গ্রামের লোকের সঙ্গে মিশলে, গ্রামীণ রূপ দেখলে শ্রীদত্ত বুঝতে পারতেন কী সমস্যার মধ্যে এ'রা কাটিয়েছেন দীর্ঘ তের মাস।

বাংলাদেশের অনেক দল, উপদল গত ২৩ বছর ধরে জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। "জনগণ" শব্দটিকে "পুঁজি" করে অনেক অনেক কথার তুবড়ী ফুটিয়েছেন অনেকে। আর না, জনগণ সেবা গ্রহণে আজ ক্লান্ত। দীর্ঘদিন খেটেছেন দেশসেবকরা, তাঁরাও ক্লান্ত। নিতান্ত প্রয়োজনে তাঁরা কিছু-দিন না হয় বিশ্রামই নিলেন। চলুক না রাষ্ট্রপতির শাসন ১৯৭২ পর্যন্ত। লাভ-লোকসানের হিসাব করা যাবে সাল-তামামীর পর। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের মানুষ আজ তাই চান। তাই ত' সাধারণ মানুষের একান্ত আপন জন "বসুমতী" পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের "কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া" বলিষ্ঠ ভাষায় [illegible] পেরেছেন "রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হোক।" "বসুমতী" কোন দলের হয়ে ওকালতি করেন নি। "বসুমতী" সত্যকে প্রকাশ করেছেন। অপ্রিয় সত্যকে কঠিনতর ভাষায় ছেপেছেন—"বসুমতীর" দোষ বোধহয় এইখানেই।

"বসুমতীর" আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কামনা করি।

—শ্রী[illegible]কুমার সাই
সিনিয়র অ্যাডভোকেট,
বর্ধমান আদালত

* * *

গত তিন বছর ধরে সাপ্তাহিক বসুমতীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রতি সপ্তাহে অধীর আগ্রহে পত্রিকাটির জন্য অপেক্ষা করেছি। এই আগ্রহের একমাত্র কারণ পত্রিকাটির নিরপেক্ষতা। আজকের দিনে যখন প্রতিটি পত্র-পত্রিকাই পক্ষপাতদুষ্ট, তখন এই পত্রিকার নিরপেক্ষ আলোচনাসমূহে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। বিশেষ কারণে কলকাতায় প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি পত্রিকাই আমার পড়ার সুযোগ হয়, কিন্তু একমাত্র সাপ্তাহিক বসুমতীই আমার নিজের সংগ্রহের জন্য কিনে রেখেছি।

কিন্তু আজ সাপ্তাহিক বসুমতীর এ কী রূপ? অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি পত্রিকাটি তার নিজস্ব গুণ সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে। সি পি এম-এর সমালোচনা পত্রিকায় করা হচ্ছে বলেই আমি একথা লিখছি না। বরং আমি মনে করি, আজ নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে সি পি এম-এর সমালোচনা করতে হবেই। এই দলের কিছু সমর্থকের কার্যকলাপ, এমন কি নেতৃবৃন্দের উক্তিও তীব্র সমালোচনাযোগ্য। কিন্তু অন্য দলগুলো? নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গেলে কি তাদের কার্য-কলাপেরও সমালোচনা করতে হয় না? আপনি হয়তো পত্রিকা থেকে দু'-একটি লাইন তুলে দেখাবেন যে, তাদেরও সমা-লোচনা করা হয়েছে—কিন্তু তা কি সত্যিই 'সমালোচনা'?

আপনারা যখনই শ্রীঅজয়কুমার মুখো-পাধ্যায় সম্বন্ধে লিখেছেন, তখনই এটা ধরে নিয়েই লিখেছেন যে, তিনি 'সৎ, মহৎ, নির্ভীক' ইত্যাদি। এটা কি নিরপেক্ষ সমালোচনার সহায়ক? শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য ভণ্ডামী সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু আমি আজ তাঁর একটি ভণ্ডামীর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীমুখোপাধ্যায় তথা বাংলা কংগ্রেস যখন অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে, তখন আপনারা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

আমি মার্কসিজম্-এর গভীর তত্ত্ব বুঝি না, কিন্তু গান্ধীজীর বাণী, অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব ভালভাবেই জানি এবং উপলব্ধি করতে পারি। এটা বুঝি যে, প্রকৃত সত্যাগ্রহী হতে হলে সত্যাকারের মনের জোরের প্রয়োজন হয় এবং মনকে পবিত্র ও বিদ্বেষহীন রাখতে হয়। গান্ধীজীও যখনই অনশন সত্যাগ্রহ করেছেন, এইভাবেই করেছেন। বলতে পারেন 'রিলে ফাস্টিং' কি ধরনের সত্যাগ্রহ? অনশন সত্যাগ্রহের সময় তাঁর হিংসা এবং বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতা—যা শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রতিদিন করেছেন—গান্ধীজী কোনদিন করেছেন কি না? হিংসা বলতে কি কেবল 'দৈহিক আক্রমণই' বোঝায়? তাঁর ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ গালাগালি কি হিংসার পর্যায়ে পড়ে না? আপনাদেরই দৈনিক বসুমতীর পুরনো সংখ্যায় বাংলা কংগ্রেস সত্যাগ্রহীদের ফটো দেখবেন। দেখবেন পাঁচ থেকে দশ বছরের বহু বালক-কও কী রকম সি পি এম-এর নারীধর্ষণ, খুন ইত্যাদির প্রতিবাদে অনশন সত্যাগ্রহে নামানো হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে অনশন তা 'সফল না হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজী কোনদিন অনশন ভঙ্গ করেছেন কি? অন্য কেউ এসব করলে প্রশ্নগুলো তুলতাম না। কিন্তু শ্রীমুখোপাধ্যায় 'সৎ, মহৎ ও নির্ভীক' গান্ধী-শিষ্য বলেই এ প্রশ্নগুলো তুলছি। এই সব কাজ যদি চূড়ান্ত ভণ্ডামীর পরিচায়ক না হয়, তবে ভণ্ডামী কাকে বলে? গান্ধীজীর এক পরমভক্ত সাধারণ লোককে গুলী ক'রে হত্যা করে গুরুভক্তির চরম নমুনা দেখিয়েছিলেন, আর আজ তাঁর অপর এক পরমশিষ্য 'শত-বার্ষিকী'-তে বোধহয় গুরুদক্ষিণা দিচ্ছেন। ১৯৪২ সালের অজয় মুখোপাধ্যায় নমস্য নিশ্চয়ই, কিন্তু আজকের অজয় মুখোপাধ্যায়? আপনাদের সমালোচনায় এটাই এড়িয়ে গিয়েছেন, তা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের।

—শ্রীঅরুণকুমার সান্যাল
যাদবপুর, কলকাতা-৩২

* * *

গত ২৬শে মার্চের সংখ্যার সম্পাদকীয় আমায় হতবাক করে দিয়েছিল। তারই প্রতিবাদে শ্রীপরেশ সুরের লেখা চিঠি পড়লাম ২রা এপ্রিলের সংখ্যায়। বোধ হয় ২রা এপ্রিলের সম্পাদকীয় পড়ে শ্রীপরেশ সুর মহাশয় ধিক্কার দেবেন নিজেকে, এমন একটা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা তিনি দীর্ঘকাল ধরে করে এসেছেন বলে। বিশেষ করে এই লাইনটা একেবারেই অসহ্য—"যুক্তফ্রন্টের এক বছরের শাসনের অপকর্ম বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে যত একশ বছরে অনুষ্ঠিত অপকর্মগুলির তুলনায় ওজনে ভারি।" আমার প্রশ্ন, তবে কি গত এক বছরের (যতদিন যুক্তফ্রন্ট সরকার বেঁচে ছিলো) সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয়গুলো প্রগতিশীল চিন্তাধারার মুখোশ?আটা এক ধুরন্ধর প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীর লেখা? কথায় বলে, সৈনিকের শক্তির পরীক্ষা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। মার্কসবাদী বিপ্লবে বিশ্বাসী পার্টিগুলোর স্বরূপ কিছুটা উদ্ঘাটিত হয়েছে গত এক বছরের যুক্তফ্রন্ট রাজত্বকালে। নাটক, অভিনয় হয় তিন ঘন্টার। কিন্তু তার প্রস্তুতি চলে দীর্ঘ দিন ধরে। বিপ্লবে বিশ্বাসী, বিপ্লবে উৎসাহী পার্টিগুলো তার পটভূমিকা তৈরি করতে নারাজ, যদি তাতে তাদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয় শ্রমিক নেতৃত্ব। ঠিক যে কারণে গান্ধীজী ইংরাজের বিরুদ্ধে বার বার আন্দোলনের ডাক দিয়েও শেষ মুহূর্তে কোথাও বা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, আর কোন কোন ক্ষেত্রে সেই আন্দোলন অহিংসার পথে পরিচালনা করেছিলেন। যাই হোক, আপনাদের কাগজেরও স্বরূপ উদ্ঘাটন হচ্ছে! এর চেয়ে সাম্রাজ্যবাদে, ধনতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী "আনন্দবাজার" ভালো। সে তার মতবাদ প্রচার করে প্রকাশ্যে এবং তার বিরোধীপক্ষও সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে। কিন্তু আপনাদের মত পত্রিকা প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক।

গত ২০ বছর ধরে আপনাদের মত বুর্জোয়ারা যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তারই ফল ভারতের তথা বাংলাদেশের এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা, তথাকথিত সমাজবিরোধী সৃষ্টি, ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি। গত এক বছরের যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে এই পচা গলিত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পটভূমি তৈরি করার চেষ্টা করায় আপনারা আতংকিত।

সবশেষে বলি, আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর একজন পাঠক। প্রথম প্রকাশিত সংখ্যা থেকে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা আমার বাড়িতে কেনা হয়েছে। আগেরগুলো বাঁধানো অবস্থায় ছিল। গতকাল ছোট ভাই সবগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছে। আমি তাকে বলেছিলাম, বসুমতীর সম্পাদিকা জানতে পারলে বর্তমানের ঘটনায় ওপরে লেখা সম্পাদকীয়র মতো আরো একটা সম্পাদকীয় লিখবেন, "সাংবাদিকের স্বাধীনতায় বর্বরদের অগ্নিসংযোগ"। তাই উত্তরে বললো—তুমি লিখে দাও, তার বাড়ির সব ময়লার আবর্জনা থাকলে তিনি তা পাশ কাটিয়ে রাস্তায় ফেলেন, যা আগে সেই আবর্জনা দূরে নিক্ষেপ করে তাঁর সামনের পথ পরিষ্কার করেন। আমি আমার মনের রাস্তায়, যে রাস্তায় আমার চিন্তা বিপ্লবের দিকে প্রসারিত হতে চায়, সেখানে কোনও আবর্জনা বরদাস্ত করবো না। ইচ্ছে ছিল ওই বইগুলোর আগুনে পোড়া ছাই আপনাকে পাঠাবো। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই ২রা এপ্রিলের সম্পাদকীয় লেখা পাতার ছাই-এর কিছু অংশ আপনাকে পাঠালাম। পারেন তো আপনাদের প্রিয় নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে জানিয়ে দেবেন। ওনার বাংলাদেশ পরিক্রমার প্রচারে সাহায্য হবে এবং আপনাদের প্রেমিক পাঠকদের পড়ার জন এটা প্রকাশ করবেন।

—সমর সেন
২নং আর, এন, গুই রোড
দমদম, কলিকাতা-২৮

'ক্ষমা নেই' প্রসঙ্গে

গত ২রা এপ্রিল (৭৪ বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা) 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রণবেশ চক্রবর্তীর লেখা 'ক্ষমা নেই' লেখাটি পড়লাম। নিঃসন্দেহে বেশ আবেগ দিয়ে বর্ধমানের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এটা লেখা হয়েছে। অনেক কথাই লেখক লিখেছেন। শুধু একটা কথা অতি সন্তর্পণে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। সেটা হল যারা মারা গেল তাদের পরিচয় কি? তারা কি ছিল? প্রণবেশবাবুর সে কথা জানা আছে কি না জানি না। তবে এত কথা যখন জানেন, লিখেছেন, সে কথাটাও লিখতে পারতেন।

আশা করেছিলাম অন্য পত্র-পত্রিকার মত 'সাপ্তাহিক বসুমতী' হবে না, সাঁই ভ্রাতাদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা অন্তত লিখবে। তাই হতাশ হলাম।

যেভাবে তারা নিহত হয়েছে, হয়তো সেটা দুঃখের, কিন্তু তাদের কর্মফল তাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে—এটা বাস্তব সত্য।

হয়তো এ চিঠি প্রকাশ করবেন না। তবুও আমিক তাগিদেই লিখলাম। প্রকাশিত হলে "সাপ্তাহিক বসুমতী" সম্বন্ধে ধারণা বদলাতে বাধ্য থাকব।

—সরোজ বণিক,
দুর্গাপুর—৫
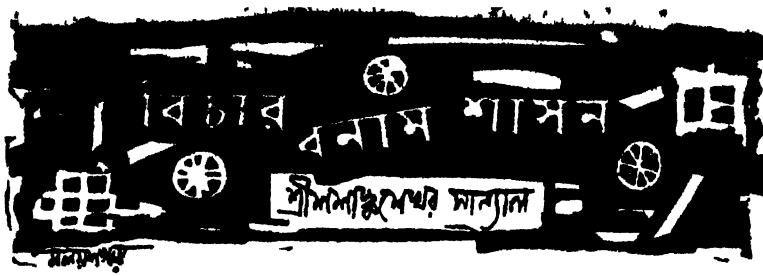
দাঠাকুর শরৎ পণ্ডিত বিদ্যালয় মজলিসে আহূত হয়ে ব্যঙ্গবিন্যাসে একটা কথা প্রায় বলতেন, "বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বলে, যেখানে বিশ্বের বিদ্যা লয়-প্রাপ্ত হয়।"

পঞ্চাশ বছরের কিছু কম কাল কোট ঝুলিয়ে গাছতলায় ঘুরছি। দিল্লীর শীর্ষে সুপ্রীম কোর্ট, কলকাতায় হাই-কোর্ট। বাঙলা ও বাঙলার বাইরের জেলা ও অন্যান্য কোর্ট: এ ছাড়া রেভেনিউ, রেজিস্ট্রেশন—সব দরজার ধুলো আমার পেটে আছে। জীবন ও জীবিকার প্রায় শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে অনেক সময় মনে হয় (মনের কথা বলেও ফেলি) বিচারালয় অর্থে যেখানে বিচারের লয়; এটা অবশ্য ফৌঃ বিচার সম্বন্ধে—যেখানে নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিদিন কবেকার খেলা চলছে।

সঙ্গত উৎসাহ, উচ্ছ্বাস ও প্রচার-মাধ্যমে বিচার ও শাসনের গাঁটছড়ার বাঁধন কাটা হচ্ছে। বেশ কিছু জেলাতে পঃ বঙ্গ উভয় বিভাগ এখন আনুষ্ঠানিক ছাড়াছাড়ি, দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পৃথকীকরণ রূপায়িত হচ্ছে, হবে। কিন্তু সতিই কি বিচারাসন সম্পূর্ণ প্রশাসন-মুক্ত হতে পারছে বা পারবে? এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন সামনে রেখে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। গণতন্ত্রের দুইটি মৌলিক সংজ্ঞা বহুদেশে বহুকালে স্বীকৃতঃ—(ক) Democracy is rule of law (গণতন্ত্র মানে আইনের শাসন); (খ) গণ-সরকার আলোচনাভিত্তিক।

ইংরাজ আমল থেকে ক্রমবিকশিত শাসন সংস্কার আমাদের অন্তরে ন্যায়-বোধ জাগিয়েছে। কিন্তু এই বোধের আধার আইনের শাসন নয়, ধোয়ামোছা সেটা শাসনের আইন। অবশ্য বিশিষ্ট ধীমান ইংরাজ বিচারক—বিশেষ করে কলকাতার উচ্চ আদালতে বৃটিশ ফৌঃ আইনের প্রাণ প্রয়োগে উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রবাহ আহরণ করেছেন। উত্তরকালে আমাদের দেশী জজেরাও আইন ও ন্যায়কে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু আসলে সেটা ত' বিচারকের নিজস্ব উৎকর্ষ ও দরদ। বিচার-ব্যবস্থা কখনও বিচারাধীন ব্যক্তিকে মমতা দিয়ে আলিঙ্গন করে নি। ১৯৪৭ সালে [illegible]

স্বাধীন হয়েছি। ১৯৪৯ ২৬শে নভেম্বর ব্যাধিমুক্তির জন্য সংবিধানের মাদুলি গলায় ঝুলিয়েছি। তাতেও সুস্থ হই নি। ১৯৬৯ সালের প্রাঙ্গণে বন্টন-নামা মূলে বিচার ও শাসন বিভাগের হাঁড়ি ভাগ হল। তবু সংশয় থেকেই যাচ্ছে। বিচার সংস্থা কি সত্যই সাবালক হতে চলেছে! প্রশাসনিক অছিয়ৎনামা কি এখন ছেঁড়া পাতার ঝুড়িতে? একটু থানায় যাওয়া যাক, খুন, রাহাজানি, ঘর-জ্বালানি, ডাকাতি এই রকম কোন অভি-যোগ নিয়ে কেউ উপস্থিত। অভিযোগ লেখা হল—যাকে বলে প্রথম এত্তেলা—তথাকথিত অপরাধীর নাম দেওয়া। সেই সঙ্গে আরও অনেকের উহ্য উল্লেখ থাকল। দারোগাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া অভিযোগ-কারীর আর কোন কর্তব্য দায়িত্ব থাকল না। ধরে নেওয়া হল অভিযোগের বিবরণ সত্য, অর্থাৎ বাদী সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, সেই সঙ্গে আরও ধরে নেওয়া হল যে, উক্ত ও অনুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অসৎ ও অপরাধী। তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে, পুলিশ ফাটকে রাখতে হবে, তারপর বিনা জামিনে হাকিমের দরজায় পাঠিয়ে সেখানেও জামিনে বাধা দিয়ে তাকে জেল হাজতে চালান করতে হবে। অবশ্য গ্রেপ্তার-পূর্ব একটি ছোট অধ্যায় থেকেই যায়—সেটা হচ্ছে ও পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি-বিধান। গ্রামসুদ্ধ তোলপাড়। শাঁসাল লোক-দের ভয় দেখান হচ্ছে—তাদেরও নাম হয়েছে। তারাও তেলভাণ্ড হাতে হাজির। এরপর গ্রেপ্তার-কার্য সুরু—হাতে হাত-কড়া, আসামী যতক্ষণ দোষী সাব্যস্ত না হয়েছে, ততক্ষণ সে ত' পুলিশ, বাদী ও হাকিমের মতই নিরপরাধ। তবে স্বাধীন নাগরিকের হাতে সুরুতেই হাতকড়া পড়ে কেন? সংবিধানের কোথাও ত' হাতে হাতকড়া ও মাজায় দড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ফৌজদারী কার্যবিধিও সে কথা বলে না। পুলিশ অফিসার, মন্ত্রী মহাশয়রা ও বিচারক নিজেকে অপরাধীর পর্যায়ে নিয়ে যান। ধরুন, বিদ্বেষ-প্রসূত কোন গুরুতর নোংরা মোকদ্দমায় মিথ্যাভাবে তিনি অভিযুক্ত এবং তাঁকে দড়িকড়া সমেত রাস্তা হাঁটিয়ে প্যারেড করানো হল। পরে তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি পেলেন। কিন্তু এই মর্মান্তিক গ্লানির ধাক্কা কাটাতে পারবেন?

তার আত্মার-[illegible] এবং [illegible] কাটিয়ে উঠতে পারবেন? কখনই না।

আদালতের ঘরে-বাইরে প্রতিদিন অসহায় হয়ে দেখছি জেল হাজত ও পুলিশ গারদ থেকে একপাল লোক হাতে হাতকড়া ও মাজায় দড়ির সমষ্টি বন্ধনে পুলিশ পাহারায় আসছে-যাচ্ছে। স্বাধীন দেশের পুলিশ যেন কষাই; স্বাধীন নাগরিক যেন ছাগল, ভেড়া। আসামীর কাঠগড়া যেন বধ্যভূমি, হাকিমরাও বোধ করি ভুলেও মনে করেন না যে, এরা তাঁদেরই আপনজন। স্বাধীনতার আগে একথা ওঠে নি। পরেও না। কিন্তু আজ ত' সময় এসেছে। শাসনোত্তীর্ণ বিচারক আজ কেন প্রত্যয়ে ভর দিয়ে বলছেন না, "এসব চলবে না—চলতে দেব না।" বাদীকে ত' হাতকড়া দিয়ে আনতে হয় না। দেওয়ানী আদালতের বিবাদীও শমন পেয়ে নিজেই হাজির হয়। ফৌজ-দারীতেও শত-সহস্র মোকদ্দমায় শমন বা ওয়ারেন্ট পেয়ে আসামীরা হাজির হয় এবং বিচার মোকাবেলা করে। অন্যান্য মোকদ্দমায় আসামীরা তা করবে না, এ অনুমান করার অধিকার কোন্ আইন দিয়েছে? সাময়িকভাবে যারা আত্মগোপন করে, তারা তা করে পুলিশের লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের ভয়ে। এই ভয় অব্যাহত থাকলে সাধারণত কেউ পালাবে না। গ্রেপ্তারের কোন প্রয়োজন নেই। যদি বা তাকে ধরা হল, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে জামিনে কেন মুক্তি দেওয়া হবে না? জনতাই ত' সব। গ্রামের জনতার মধ্যে যদি কেউ আসামীকে আদালতে হাজির করবার অঙ্গীকারে উপযুক্ত জামিনদার দেন, তবে তাকে কেন ছাড়া হবে না? জামিনযোগ্য ও জামিনের অযোগ্য—পার্থক্য অবৈধ ও সংবিধান ব্যতিক্রম। আসামীকে আদালতে হাজির করা হলে সে পর্যায়ে জামিন পাওয়া-না-পাওয়া তার নিজস্ব দাবির ওপর নির্ভর করে না—সে ত' জানেই না, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? কেবল আইনের ধারাটা তাকে জানান হয়। সে যেন কোন পক্ষই নয়। পুলিশই একমাত্র পক্ষ। পুলিশের সনাতন মন্তব্যলিপি—"আসামী দুর্ধর্ষ, অপরাধ সাংঘাতিক, ছাড়া পেলেই প্রমাণ নষ্ট হবে। তা ছাড়া পালিয়ে যাবে।" রায় হল আপাতত জামিন অগ্রাহ্য, আসামীর জেল হাজতবাস। অর্থাৎ বিচারকের প্রাপ্য মমতা পুলিশের কাছে রেহানাবন্ধ; অর্থাৎ আপাতত বিচার পুলিশনির্ভর, পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত। আইন কিন্তু অন্য পর্যায়ে পুলিশকে নির্ভরযোগ্য করে নি। পুলিশের কাছে বা উপস্থিতিতে অপরাধীর স্বীকারোক্তি প্রমাণে প্রয়োগ হয় না। তদন্তকালে পুলিশের কাছে সাক্ষী-দের উক্তিও প্রমাণবহির্ভূত। অথচ সেই পুলিশের এই সব অপ্রমাণ অজুহাত-

[illegible]দেশ আপত্তির অধীনতার মতো। ওপর পর্যন্ত এই অবস্থা, ব্যবস্থা। তাই আসামীকে বাধ্য হয়ে অনুকূল পুলিশ রিপোর্ট পূর্বাহ্ণেই রদ্দ করতে হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ প্রথম পর্বেই এত নিঃস্ব হয়ে পড়ে যে, আসল বিচারের সময় মোকদ্দমা পরিচালনা তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, একে বলে বেঁধে মারা। এরূপ হয় কেন? ফৌঃ আইনের যাকে বলা হয় স্বর্ণসূত্র, সেটা হচ্ছে আসামীকে সূত্র থেকেই নিরপরাধ ধরে নেওয়া—এই ধরে নেওয়া ধারণা ততক্ষণ অটুট বহাল থাকবে, যতক্ষণ না দোষ সাব্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কি হয়, গোড়াতেই ধরে নেওয়া হয় সে দোষী—না হলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় কেন? হাজতবাস, জামিন-পর্ব অতঃকর বিভ্রাট হয় কেন? বলা হয় আসামী পালিয়ে যাবে। জামিন থাকা অবস্থায় হাজারে বা পাঁচ হাজারে কটা পালিয়েছে? সংখ্যা গৃহীত হলে দেখা যাবে এই অজুহাতের পায়ের তলায় মাটি নেই। নির্দোষ ব্যক্তির মনে কোন বালাই নেই, তাই আত্মপ্রত্যয় ও ন্যায়বিচারের আশায় ধর্মাধিকরণে সম্পূর্ণ আস্থাভাজন। সত্যকারের অপরাধীও লড়ে খালাস হতে চায়। সাজা হলেও মেয়াদ-অন্তে ফিরে আসবে। স্ত্রী-পরিবার নিয়ে আবার সংসার করবে। এটাই জৈবিক প্রেরণার সনাতন হিসাব। যদি কেউ পালিয়ে যায়, তবে ত' জামিন জব্দ হবে এবং তার নিজের জীবন বিষময় হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে যে অশান্তি ও আপদ তার দৈনিক খোরাক অবধারিত হচ্ছে, তা আদালতের সাজা অপেক্ষা বেশি শাস্তি। এ কথাও বলা হয় যে, আসামী বাইরে থাকলে প্রমাণ নষ্ট হবে। সে ভেতরে থাকলে তার প্রমাণ সংগ্রহ করবে কে? তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাদী-পক্ষ পুলিশের সাহায্যে পেটোয়া লোক দিয়ে মিথ্যা প্রমাণ প্রণয়নের খোলা মাঠে একতরফা বিচরণ করবে এবং স্বাভাবিক দৈনন্দিন, সামাজিক ও পারিবারিক বার্তা-বরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসামীর ঘরের প্রমাণ ঘরেই থাকল, আদালত সমীপে আসতে পেল না। ভীত, ত্রস্ত পরিবারের লোক অন্যত্র হয়ত পালিয়েছে, সেই সুযোগে আসামীর বাড়ি তছনছ হল এবং মূল্যবান দলিলী প্রমাণ লোপাট হয়ে গেল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আসামী স্বাধীন থাকলে তার প্রচেষ্টায় অপরাধ ও অপরাধীর প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

এইবার সংবিধানে আসা যাক।

১৪ প্রকরণ বলে, "the state shall not deny to any person equality before the law or the [illegible] অর্থাৎ আইনের [illegible] সমতা এবং আইনের [illegible] সর্বজনীন নয়। প্রকৃতি [illegible] কিন্তু ভিন্নমুখী। পুলিশী স্নেহপুষ্ট বন্দী যেন বিচারের জামাই এবং বিরাগভাজন আসামী যেন চির অবাঞ্ছিত। one way traffic অর্থাৎ একমুখী রাস্তা।

২১ প্রকরণ বলে, "No person shall be deprived of his personal liberty except according to procedure established by law."

অর্থাৎ আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা হবে না। এর সরল তাৎপর্য হচ্ছে আইনানুসারে সাক্ষী-প্রমাণ প্রয়োগমূলে অপরাধ সাব্যস্ত না হলে কারও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে না। অবশ্য বৃটিশ যুগের কার্যবিধি আইনে যে ব্যবস্থা আছে তাতে বিচারকালেও স্বাধীনতা হরণ হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সে আইন প্রণয়ন প্রচলনকালে আমরা স্বাধীন ছিলাম না। আমাদের সংবিধান ছিল না, আমাদের মৌলিক বলে কোন অধিকার ছিল না। আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধ দেখলেই দেখতে পাব যে, আমাদের গোড়ার শপথ ও স্বীকৃতি সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের বেদীতে। এর মধ্যমণি ব্যক্তিস্বাধীনতা।

১৯ প্রকরণ দ্রষ্টব্যঃ—এতে প্রতি নাগরিকের অবাধ স্বাধীন বিচরণ মৌলিকতার অঙ্গীকার। সঙ্গত কারণে এই দাবি খর্ব বা ক্ষুণ্ণ করা যেতে পারে। বিচারাধীন আসামীকে আটক ও বিব্রত রাখা সঙ্গত কারণের আওতায় আনলে সংবিধানই ব্যর্থ ও বন্দী হয়ে যাবে। অপরাধী জানে না কিংবা তার অপরাধ অথচ অন্তর্বর্তী বিচারে অন্তর্বর্তী সাজা হয়ে গেল।

২০ প্রকরণের ঘোষণাঃ—

(১) No person shall be convicted of an offence except for violation of law...

অর্থাৎ আইন ভঙ্গ হলে তবেই সাজা হবে, নচেৎ নয়।

(২) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.

অর্থাৎ একই অপরাধের জন্য একাধিকবার সোপর্দ সাজাপ্রাপ্ত হবে না।

এখানে and/or একই অর্থ, এ ক্ষেত্রে বিচারাধীন আসামী যদি হাজতে থাকা অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সাজা পায়, তবে দুইবার সাজা হল, একবার অন্তর্বর্তী আর একবার চূড়ান্ত বিচারে। যদি [illegible]

২২ প্রকরণের নির্দেশ বলা হয়ঃ—

(১) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as, may be of the grounds for such arrest.

অর্থাৎ গ্রেপ্তার আসামীকে বিনা বিলম্বে জানাতে হবে, কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু ফৌঃ বিঃ আইনের ১৭৩ ধারামতে তাকে যখন অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষীর বিবরণ দেওয়া হয়, তখন সাধারণত ৬ মাস কেটে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বা দুই বৎসর।

ঐ ধারার অপর অংশ বলে যে, সে তার নিজের পছন্দমত যে কোন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবে এবং তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে। যে কোন উকিলের অভিজ্ঞতা বলবে যে, গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমায় বার বার কতবার আসামীকে নিয়ে নিজের চেম্বারে বসে আলোচনা না হলে খালাসের পথ সার হয় না।

আমি ত' দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে বহুবার আলোচনার পর অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পাওয়া যায়। প্রহরাধীন আসামীর সঙ্গে হাজতে এ কাজ কখনই সম্ভব নয়। তা ছাড়া উকিল কতবার সেখানে যাবে, কেনই বা যাবে এবং এই যাওয়ার ভার বহন করবে কে?

আসামীকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, সম্পত্তি বিক্রি—সে ত' নিজে খরিদ্দার না খুঁজলে ১০০্ টাকার সম্পত্তি থেকে ৫০্ টাকাও পাওয়া যায় না। যদি কারও কাছে পাওনা থাকে, সে ত' এই সুযোগে হাত গুটাবে। অনেক ক্ষেত্রে ধার ও ভিক্ষাও করতে হয়। তার হয়ে এসব কে করবে? অথচ আসামীকে আটকে রেখে সরকারও তার মুক্তি প্রচেষ্টায় আর্থিক সাহায্য করে না।

এটা লক্ষণীয় যে, সংবিধানের মৌলিক অধিকার রক্ষার বিষয়ে নবজীবনের নতুন সূচনা দেখলে এক হাত যা দিতে চায়, অন্য হাতে তার সংকোচ ঘটছে। ফলে old wine in new bottle—বিচারের নতুন সুধা প্রশাসনের পুরাতন বোতলে বন্দী। ১৯৭০ সালের প্রকাশ পথে দাঁড়িয়ে অনুশ চোখে দেখছি, বিচার এখনও একপথে প্রশাসনের কারাগারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার নিজ এক্তিয়ারে ফৌঃ কাঃ বিঃ আইন সংবিধান-সঙ্গত করে সংশোধন করুক এবং কেন্দ্রের ওপর দাবি রাখুক—এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে [illegible]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বাহান্ন ॥

জোরালো হাওয়া দিয়েছে ডুয়ার্সে।

প্রবল হাওয়ার তোড়ে ফুঁসছে। বন-জঙ্গল থেকে উড়িয়ে আনছে শুকনো পাতার আবর্জনা। ধুলোর ঝড় দিয়েছে।

গগল্‌সটা ঠিক করে নিল দাসবাবু কণ্ট্রাক্টর। মোটর বাইক চালিয়ে ফিরছে জলপাইগুড়ি থেকে। ডি-এফ-ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নিজের প্রয়োজনে। ফিরতে ফিরতে একটু বেশিই দেরি হয়ে গেল।

তা হোক। তা নিয়ে ভাবে নি দাস-বাবু কণ্ট্রাক্টর। তিরিশ বছরের বেশি হয়ে গেল এসেছে ডুয়ার্সে। দক্ষিণবঙ্গের লোক। বাড়ি ছিল মেদিনীপুর জেলায়। সমুদ্রের ধারে। যদিও তারা বাঙালী হয়ে গেছে, খুঁজতে গেলে পাবে উড়িয়া রক্তের উৎস। পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন উড়িষ্যা থেকে। হয়তো বা জীবিকার প্রয়োজনে। নয়তো বিস্তৃত অঞ্চলে চাষবাসের আকাঙ্ক্ষায়। না, চাকরির জন্যে নয়। চাকরি করে নি পূর্বপুরুষেরা।

সমুদ্রের ধারের অধিবাসী। সমুদ্র ডাকত তাদের। হাতছানি দিত। চঞ্চল রক্ত। সমুদ্রের হাওয়ার হাতছানিই তাদের ডেকে এনেছিল সমুদ্রতীরবর্তী এই প্রান্তরে। এখনো অতীতের দিকে তাকালে সে দিনগুলো দেখতে পায় দাসবাবু কণ্ট্রাক্টর। তখন দাসবাবু ছিল না সে। তার একটা নাম ছিল। কণ্ট্রাক্টর পরিচয়ে চিহ্নিত হত না সে। সেই সুকুমার কৈশোরে তার একটা নাম ছিল। বাপ-মায়ের দেওয়া নাম। শ্যামাপদ।

শ্যামাপদ! ভাবতে হাসি পায় আজ। সমুদ্রের ধারে জন্ম। সমুদ্রের ধারে কাটল শৈশব। যৌবনের দিনগুলি পর্যন্ত। সেই সামুদ্রিক হাওয়ার হাতছানিতেই অবশেষে ঘুরি বিদেশে ভাসল।

চলে এল মেদিনীপুর ছেড়ে উত্তর-বঙ্গে। সে এক ইতিহাস। আঠারো-উনিশ বছর বয়স তখন। আজ?

আজ তার পরিচয় কণ্ট্রাক্টর। জীবিকার নামে নাম। দাসবাবু পদবীটা অবশ্য আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে-ও ভুলেই গেছে নামটাকে। অন্যান্য অনেকের মত। দাসবাবুই হয়েছে তার পরিচয়।

সারা ডুয়ার্স চষে খাচ্ছে সে তিরিশ বছর ধরে। তিরিশ বছরের কিছু বেশিই হবে। ডুয়ার্সের হাট-ঘাট-মাঠ কোনকিছুই অজানা নেই তার কাছে। প্রথম যখন এসে-ছিল, কণ্ট্রাক্টর ছিল না সে। কণ্ট্রাক্টর কথাটা লোভীর মত ফেরে লোকের মুখে-মুখে। একটা যুগ ছিল, অন্তত যখন কণ্ট্রাক্টর বললে বোঝা যেত রাতারাতি বড়লোক-হওয়া মানুষ। একেবারে জাতে ওঠা।

সেই যুগটা যতদূর মনে হয় এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমল থেকে। যুদ্ধের অভিঘাতে তখন নড়ে উঠছে সারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। ভারতবর্ষে আমরা অবশ্য যুদ্ধ করি নি। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ছিল না। বিজয়ী জাতির জন্যে যুদ্ধ করতে হয়েছে আমাদের।

সেই যুদ্ধে দেখা গেল কণ্ট্রাক্টর নামক শ্রেণীর। অন্তত এই দেশে। যুদ্ধের কল্যাণে কণ্ট্রাক্টের রসদ চালিয়ে রাতারাতি বড় হয়ে গেল কিছু লোক। যাদের ছিল না কিছু। যতদূর মনে পড়ে জীপ গাড়ির চলনও সেই যুগে।

জাপান আক্রমণ করেছে তখন জোর। ইংরাজকে হঠতে হচ্ছে ঘাঁটির পর ঘাঁটি হারিয়ে। সেই সময় এসেছিল শ্যামাপদ নামক শ্যামবর্ণ একহারা যুবকটি তার দেশ থেকে। সুদূর মেদিনীপুর থেকে। এসেছিল নেহাতই খেয়ালের বশে। বাড়ি থেকে পালিয়ে। রাগ করে এসেছিল।

সে আজ কতদিনের কথা। ডুয়ার্সেও তখন আতঙ্ক। যুদ্ধের উদ্বেগ লোকালয়ে, গ্রাম-বন্দরে এবং বাজারগুলিতে। বড় বড় রাস্তাগুলি দিয়ে চলেছে ফৌজী ভারী ভারী গাড়িগুলি। জিনিসপত্রের দাম আক্রা। যুদ্ধের দৌলতে সব আগুন।

দেশটা ভাগ হয় নি তখনো। এত মানুষ আসে নি ডুয়ার্সে। পূব-বাংলা থেকে যারা। ও'রাও-মুণ্ডা-সাঁওতাল আদি-বাসীরাই বেশি ছিল চা-বাগানে। ছিল মেচ, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি এ অঞ্চলের মানুষেরাও। আর নানা অঞ্চলে থেকে এনেছিল খৃস্টান মিশনারীরা। সীমান্তে সেই হামলার ক্ষণে বাড়ি থেকে পালিয়ে এল যুবকটি। এদিকে কেন এসেছিল আজ নিজেও তা বলতে পারবে না। তবে যতদূর মনে হয়, বাঘ-ভালুকের কাছে বিদেশ-বিভুঁইয়ে জীবনটা দিয়ে দিতে এসেছিল এমনি এমনি। জীবনে উৎসাহ ছিল না তার। নেহাৎ একটা ছেলেমানুষি খেয়ালে ভাসতে ভাসতে এসেছিল।

তারপর বল্গাছাড়া জীবন কিছুদিন অনিশ্চয়তার দোলায় দোলায়। আজ এখানে, কাল ওখানে। ডুয়ার্সের হাটে ঘাটে পথে-প্রান্তরে কোথায় না গিয়েছে। ময়নাগুড়ির তহশীলদার সিকদারবাবুর অধীনে ছিল কিছুদিন। হাটে-হাটে ঘুরেছে বিস্তর। আলতাডাঙার হাট হুচলুর ডাঙা, ভোট হাট, রাখাল হাট জল্পেশ হাট, লাটাগুড়ি, আফালচাঁদ চালমা। একের পর এক নাম মনে আসে তারপর হাটে-হাটে নিয়ে ঘুরল ছোট একটি দোকান। কারবাইড লাইট ছিল ছোট। কাঁধের বাক্সে থাকত সেফ্‌টিপিন আলতার শিশি, জলে-ভাসা সাবান, সস্তা গন্ধদ্রব্য, নানা রকমারী পুঁতির মালা, ঝুম-ঝুমি, সস্তা চায়ের প্যাকেট, আরো কত কী। ফালাকাটার হাট, ডাউকিমারি, কলা-বাড়ি, বকরিবাড়ি, দুদুয়া, মাদারি, লঙ্কা-পাড়া, বান্দাপানির হাট, শুক্কাপাড়া—এ-সব নানা হাটের নাম ছিল মুখস্থ। রবি-বারে রবিবারে হাট বসত চামুর্চিতে। বেশ মনে আছে সাহেব দোকানদাররাও আসত

চালমার হাটে পরিচয় হল এক সাহেবের সঙ্গে। চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজার। দুর্দান্ত লোক একেবারে। সেকালে তার নামে বাঘে-গরুতে জল খেত। সেই সাহেবের চোখে পড়ল কী করে। না সাহেব না। তার মেমসাহেবই তাকে প্রথম পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। চা-বাগানে

গয়েরকাটায় একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। থাকত সেখানে। নিজে হাতে রান্না করে খেত। সেই সময় নামল কাঠের ব্যবসায়। পুঁজি কিছু জমেছিল হাতে। যদিও সামান্য। তবু ধীরে ধীরে লেগে গেল কাঠের ব্যবসায়।

বিচিত্র এক জীবন!

সে-সব দিনগুলি ভোলবার নয়। আজ এগিয়ে গেছে সে। জীবনযুদ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ আর কোনো ভাবনা ভাবে না সে। এখন তার চেহারা আলাদা। কে আজ তাকে দেখলে বিশ্বাস করবে, সেদিন মাত্র কয়েকটি তামার পয়সা সম্বল করে ডুয়ার্সে এসে নেমেছিল।

আজ সারা ডুয়ার্সের পথঘাট লোকালয়-খন্দরের সংবাদ তার নখদর্পণে। কোথায় কোন্ রাস্তা গেছে কোন্ দিকে, কোন্ ঋতুতে কোন্ পাখির ঝাঁক নামে কোথায়, কোন্ মাসে উড়ান্ত পাখির ডানার ছন্দে আকাশ-গাঙে জাগে কাঁপন, কোথায় কোন্ ঝিলের বুকে স্বচ্ছন্দে নামে ডিম পাড়তে গাঙ-তিতিরের দল—সব সংবাদ তার হাতের মুঠোয়। শুধু যে বনজঙ্গলের কাঠের সংবাদ তা নয়, ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক গভীরতর। নিজের গাড়ি আছে তার। ট্রাক আছে বেশ কয়েকটা. তবু যখন খুশি মোটর বাইক চড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। ভালোবাসে এমন একা একা চলতেই।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল দাসবাবু। বাইকটা যেন উড়ে যেতে চায়। খুবই নির্ভরযোগ্য গাড়ি। চারদিকে পাগলা হাওয়া দিয়েছে। হাওয়া উড়িয়ে আনছে রাশি রাশি শুকনো পাতা। দু' ধারে গাছে গাছে এই ক'দিন আগেও দেখল পোড়া তামাটে মাটির রঙ। যেদিকে চোখ তুলে তাকাও সেদিকেই বনে বনে যেন ধূসরতার ছোঁয়া লেগেছে। যেন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব।

অথচ সবুজের উচ্ছলতাই ডুয়ার্সের বিশেষত্ব। বিশেষ করে এই সময়টাতেই—ফাল্গুনের মাঝামাঝি বন-জারে আর ঘেনট্রী গাছগুলির সব পাতা ঝরে যায়। গাছগুলির চেহারা হয় কঙ্কালসার। যেন বা রিক্ততা জাগিয়ে রাখছে। পলাশের ডাল কেটে নিয়েছে কেউ। পলাশ আসে নি এবারে গাছটায়। রাস্তায় একটা রোলার দাঁড়িয়ে। প্রকাণ্ড আর ভারী রোলার। পীচ জ্বলছে ড্রামে। নিচে আগুনে জ্বাল হচ্ছে। গরম. ভীষণ গরম জায়গাটা। নুড়িপাথর ঢালাই হয়েছে কিছুদিন আগে। ক'টি মদেশীয় কুলি-কামিন দাঁড়িয়ে আছে। স্বাচ্ছন্দ সতেজ। কালোর মধ্যে যে এত চেকনাই হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। চোখ দুটিই সবচাইতে সুন্দর। নিটোল সুঠাম দেহ। এত জ্ব আগুনে-গরম, পাশে পীচ গলছে, তবু তাদের লাবণ্যের এতটুকু ব্যতিক্রম নেই।

ঝিকমিক ঝিলিমিল যাচ্ছে। গগলসটা খুলে নিল দাসবাবু চোখ থেকে বাঁ হাতে। চারদিক ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। একটু দেরিই হয়ে গেল জলপাইগুড়িতে। ডি-এফ-ও সাহেবের কাছে।

তা হোক। রাস্তাঘাটের এখন আর তত ঝক্কি-ঝামেলা নেই। রাস্তা সুন্দর। সুসমান। কালো চকচকে। নতুন মোটর বাইকটার চাকা যেন ঠিক গড়িয়ে যাচ্ছে না। ছুঁয়েই উড়ে পালাচ্ছে। এ গতিতেই পেরিয়ে যাবে সময়। তবে একটু সাবধান থাকতে হচ্ছে বটে। আজকাল আর আগেকার দিন নেই। হরদম রাস্তায় চলেছে বাস আর ট্রাক। নানা সুন্দর নাম বাসগুলির। গৌতম, বাসন্তী, বলাকা, দীপক, বেণু। আরো কত নাম। ট্রাকও চলেছে অজস্র। দিবারাত্রির জন্য এই পথ খোলা। সারা ডুয়ার্স জুড়ে সারা রাত্রি-দিন চলেছে গাড়ি। রাস্তার কমতি নেই এখন। শুধু মাঝে মাঝে রেলওয়ে গুমটি-গুলি একটু অসুবিধে করে বৈকি।

এত রাত্রে আর কোথায় জেগে আছে গুমটিম্যান তার চৌকিতে। গেট বন্ধ করে হয়তো ঘুম লাগাচ্ছে পরমানন্দে।

ড্রাইভার হর্ন লাগাচ্ছে প্রাণপণে। তীব্র শব্দে। হয়তো ট্রাক নয়, জীপ। জরুরী কাজে বেরোতে হয়েছে সরকারী অফিসারকে। ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে তিনি। কড়া সিগারেট জ্বালিয়ে। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে জোর টান দিচ্ছেন সিগারেটে।

হতভাগাগুলি করে কী। বিরক্তিতে সাহেবের কপালে ভাঁজ পড়ল। মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। কান পর্যন্ত ঢাকা উলের টুপীও পরেন অনেকে। এ সময়টা আরো শীতের কাল। বাতাস যেন হিমশীতল জল ছুঁইয়ে দিচ্ছে। যেন বা বরফের ছুরিতে চেঁছে তুলে ফেলল কিছু চামড়া। গায়ে গরম কোট চাপানো। কিন্তু শীতের হাত রক্ষে নেই। তীব্র শব্দে হর্ন বাজাচ্ছে ড্রাইভার। বাজিয়েই চলেছে!

ড্রাইভারের মুখ স্বাভাবিক। বিরক্ত নয় সে। খানিক বাদে গুমটিম্যান এসে গেট খুলে দিয়ে গেল। এ দৃশ্য একান্ত পরিচিত।

বাইকে হর্ন বাজাল দাসবাবু।

একটা মোষের গাড়ি পড়েছে সামনে। গাড়োয়ান পাশ কাটাচ্ছে। তার আগেই দ্রুতগতিতে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল দাসবাবু। ধুলোর ঝড় উঠছে একটা। গাড়ির চাকায়। সন্ধ্যার মধ্যেই ফেরবার কথা ছিল। ফেরা আর হল না দেখছি। চালসাদুয়ারে কাজ আছে একটু। সেটাও জরুরী। ওদলাবাড়িতেও খবর পাঠাতে হবে একটা। আজ রাতেই চালসা-দুয়ারে গিয়ে খবর দিতে হবে। সেখানে ফেরার কথা তার ড্রাইভার শঙ্করের। ট্রাক নিয়ে যাচ্ছে সে সাম্‌সিতে। ভুটানের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও শহর। সরকারী মাল নিয়ে যাচ্ছে ট্রাক।

শঙ্করকে দিতে হবে কিছু টাকা। ফেরবার পথে সে শিলিগুড়ি ঘুরে আসবে। আসবার সময় নিয়ে আসবে লোহার কিছু ভারী ভারী মাল। অবশ্য শঙ্করকে ফোনে কথা বলা চলে। কিন্তু ফোনে টাকা দেওয়া চলে না। অবশ্য ওখানকার বন্ধু-ব্যবসায়ীদের কাউকে অনুরোধ করা চলে। না, ভালো দেখায় না সেটা। যেতেই হবে তাকে। চালসাদুয়ারে ঘুরে ফিরে আসতে হবে নিজের ডেরায়। তা যত রাত্রি-ই হোক।

রাতবিরেতে ভয় করে না দাসবাবু কন্ট্রাক্টর। তার সঙ্গেই থাকে হাজার হাজার টাকা। নানাদিকে নানা কাজ হচ্ছে তার। তৈরি হচ্ছে বড় বড় দুটো ব্রীজ। শ্রমিক-দের পেমেন্ট আছে। আছে নালাকাটার তাগিদ। তাই টাকা হরদম সঙ্গে রাখতেই হয়। এখনো তার কোমরের কাছে চামড়ার থলিতে বাঁধা আছে হাজার দশেক টাকা। অবশ্য সবই একশ' টাকার নোট। খুচরো দু'-চার-পাঁচ টাকা আছে বুক পকেটের মনিব্যাগে।

শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ষায় একই বাঁধা রুটিন। এর আর পরিবর্তন নেই। কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেল এমনিভাবে। আজ দ্রুত বয়স এগোচ্ছে পঞ্চাশের দিকে। কানের ওপরে এখানে-ওখানে রুপালী রঙ লেগেছে দু'-একটি চুলে। তবু আজো যুবকের মত দাসবাবু। অমানুষের মত খাটতে পারে।

তবু বৈচিত্র্যের অভাব জীবনে। বাড়ি-গাড়ি-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁকা লাগে বৈকি জীবন। তার জন্যে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তে হয় বাইক নিয়ে। শিকার সন্ধানে। দু'দিন-একদিন কেটে যায় কিসের নেশায়! আবার ফেরা ক্লান্ত হয়ে।

আর সেই ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে আছে ঢালাও ব্যবস্থা। দামী বোতলের ছিপি খুলে গলায় ঢাললেই হল। বুকের ভিতরে গলার কাছাকাছি একটু বিস্বাদ-যুক্ত জ্বালা-জ্বালা ঠেকে বৈকি. তবু সে আর কতক্ষণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তনুমনে উদ্দীপনায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে। জেগে ওঠে অভিজ্ঞ অনাবশ্যক। ঠোঁটের কষ চেটে-চেটে ভিজিয়ে নেয় দাসবাবু। অ্যাপ-স্টেনের প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে নেয় তারপর। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার রাশ ছড়ায় হাওয়া।

অথচ কিছু [illegible] দিন না [illegible]

আরেক আলোয় দেখা

হলদে বাড়িটা থেকে কবি প্রভাত সেন প্রায় মাতালের মত টলতে টলতে যখন বেরিয়ে এলেন—তখন কলকাতার পথে-পথে আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু তিনি চারিদিকে অন্ধকারই দেখলেন।

এবং পথে পা রেখেও মনে হল তাঁর, পথ নয়—জল, ঠান্ডা নোংরা কালো জলের মধ্যে তিনি ছপ ছপ করে হেঁটে চলেছেন। এবং কুৎসিত একটা দুর্গন্ধও যেন বাতাসকে ভারী করে রেখেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

সব সন্ধ্যা।

তাব ওপর কলকাতার রাস্তা। পথে জন-চলাচলও স্বাভাবিক ও অব্যাহত। কিন্তু তাঁর সব কিছুই এ মুহূর্তে উল্টো-পাল্টা মনে হতে লাগল। বোধশক্তিতে একটা বড় রকমের ওলোট-পালট হয়ে গেলে যেমন হয়।

মনে হল—রাস্তাটা ভয়ানক নির্জন। লোকজন নেই, আলো নেই, পায়ের পাতার ওপর দিয়ে নোংরা কালো জল বয়ে যাচ্ছে এবং বাতাসে কটু গন্ধ। পেছন ফিরে হলদে বাড়িটা আরেকবার দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না, দেখতে পেলেন না।

অপরিচিত অন্ধকারে সেটাও এখন কেমন কালো হয়ে গেছে।

এমন সময় কেউ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কুশল প্রশ্ন করল: আরে, আপনি? কোথায় গিয়েছিলেন? 'সূর্যশিখা'য় নিশ্চয়ই!

যার কণ্ঠস্বর, খানিকটা অপ্রস্তুত-ভাবেই, তার প্রতি মনোযোগী হতে চেষ্টা করলেন প্রভাত। চিনতে পারলেন। উঠ্‌তি গল্প লেখক অবনী সান্যাল। সময়ে-অসময়ে তাঁর কাছে অবনী প্রায়ই আসে। কিন্তু তেমন সহজ হতে পারলেন কই?

অনেকটা যেন তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়ার ভংগীতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন: অনেকদিনের পুরোনো এক বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলাম। তার সংগে যোগাযোগ ছিল না। তাই একবার—

'সূর্যশিখা' সাপ্তাহিকের সংগে তাঁর সম্পর্কে কোথাও যে চওড়া একটা ফাঁক থেকে গেছে—এটা আরও অনেকের মত অবনীরও অনুমান।

অবনী ছেলেটি ভাল। তাঁকে কিছু আঘাত বা আহত করার উদ্দেশ্যে এমন কথা সে যে বলে নি, এটাও তিনি জানেন। হয়ত ভেবেছে—লেখক-সম্পাদকে এমন একটু এদিক-ওদিক হয়ই। আবার যেমন মিটেও যায় একদিন, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এবং প্রভাতবাবু সে কারণেই হয়ত 'সূর্যশিখা' অফিসে স্বাভাবিকভাবে আজ বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু সদ্য একাডেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি প্রভাত সেন যে উপযাচকভাবেই 'সূর্য-শিখায়' এসেছিলেন, সে কথা কে বিশ্বাস করবে? এবং তারপর আরও যা যা ঘটেছে—

প্রভাতবাবু ইচ্ছে করেই তাই প্রসংগান্তরে যেতে চাইলেন। স্পষ্ট একটি মিথ্যা উক্তি করতেও ইতস্তত করলেন না: অনেকদিনের পুরোনো এক বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ভাবলেন আরেকবার—না, মিথ্যেই বা কি! তিনি ত' সত্যিই তাঁর এক বন্ধুর [illegible]

ছিলেন, সম্পাদকদের সঙ্গে আর [illegible] প্রয়োজন [illegible] করতে গেলে কিছুই ছিল না।

তাঁর এই অপ্রাসঙ্গিকতায়, মুখে-চোখে এই বিষণ্ণ বিমর্ষতা—অবনীর চোখ এড়াল না।

গমনোদ্যত প্রভাত সেনকে তাই সহানুভূতির স্বরেই জিজ্ঞাসা করল অবনী—যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে বড় বেশি ক্লান্ত, অনেকটা শোকার্ত মনে হচ্ছে আমার।

অবনী ভাল লেখক হবে ভবিষ্যতে। অন্তর্দৃষ্টি আছে। মনে মনে তারিফ করলেও মুখে-চোখে বেদনা ও গাম্ভীর্য দুই-ই অটুট রেখে সেই নিস্তেজ, বিষণ্ণ গলায় উত্তর দিলেন প্রভাত—হ্যাঁ; তুমি ঠিকই ধরেছ। আমার সেই বন্ধুর, আজই জানতে পারলাম, মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যু! মৃত্যুর সংবাদ চিরদিনই মানুষের কাছে পরম শোকের, চরম দুঃখের। তারপর আর কোনো কথা থাকে না। অবনীও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। তাই নাকি? তাহলে ত' বড়ই মর্মান্তিক। আচ্ছা, আসুন আপনি। আমি দেখা করব পরে—

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন প্রভাত সেন। এখন তিনি একটু একা থাকতে চান। একা, নিঃসঙ্গ, তাঁর আপন সত্তার একক। কাউকেই যেন ভাল লাগছে না এখন। কখনো কখনো এরকম অবস্থা হয় যখন খুব সামান্য ঘটনা-সংঘাতই জীবনে অত্যন্ত অসামান্য হয়ে দেখা দেয়। তখন সব কিছুই কেমন বিস্বাদ, বিবর্ণ, অর্থহীন ও বিকৃত মনে হয়। এখন প্রভাত সেনেরও ঠিক সেইরকমই একটি মুহূর্ত। এখন তাই তিনি চারিদিকেই শুধু সন্ধ্যা, সন্ধ্যার প্রগাঢ় অন্ধকার দেখলেন। আলো নেই, লোকজন নেই। ড্রেনের পচা জলে ডুবে আছে পথ এবং বাতাসে দুর্গন্ধ।

অথচ এই পথ দিয়েই ঘন্টা দুই আগেও—যখন অনিন্দ্য মিত্রের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে দেখা করতে যাচ্ছিলেন; তখন সব কিছুই সুন্দর, স্বাভাবিক এবং একটি বিস্মিত প্রতীক্ষার তাৎপর্যে যেন বাঙ্ময় ছিল।

হঠাৎ এই অঞ্চলটাকেই তাঁর খুব বেয়াড়া জায়গা মনে হল। উঃ, হাঁটছেন ত' হাঁটছেনই। পথ যেন আর ফুরোয় না। এখনও কত দূরে সেই ট্রাম লাইন! বাসও এ রাস্তায় চলে না। না চলুক, একটা ট্যাক্সি, নিদেনে একটা রিক্সাও ত' মিলতে পারে। কিন্তু না। মানসিক ক্লান্তির এই তীব্র [illegible] মুহূর্তে [illegible] আর [illegible] দ্রুত হাঁটাও যেন দুর্বহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পথে—এমন একটি সহৃদয় রিক্সাওয়ালাকেও ধারে-কাছে কোথাও খুঁজে পেলেন না।

ঠিক আছে।—উচ্চারণ করলেন আপন মনে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার সুরু করলেন হাঁটা। আর পথ ও স্মৃতি—দুই-ই নাগাল ধরে চলতে সুরু করল সমান্তরাল।

আর এ সব স্মৃতি তিনি কিছুতে ভুলতে পারেন না বলেই; সাফল্যের চূড়ায় উঠে অনেকেই যা অনায়াসে ভুলে যায়; অনিন্দ্য মিত্রের আজকের এই ব্যবহারটা তাঁর কাছে এত বেশি করে বাজল! জানেন তিনি; অন্য কেউ হলে—কে অনিন্দ্য মিত্রের জন্য তিনি এত সব [illegible] বোধ করছেন, সেই অনিন্দ্যকেই কবে ভুলে যেতে হয়ে যেত। কারণ, 'সুরশিখা'র সম্পাদক অনিন্দ্য মিত্রের চেয়ে সদ্য একাডেমিসম্মান প্রভাত সেনের পরিচয় বাংলাদেশের মানুষের কাছে আজ অনেক বড়! কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা অন্য প্রকার। মানসিক গঠনও স্বতন্ত্র। মনুষ্যত্ববোধ ও মানবপ্রীতি তাঁর কাছে শুধু একটা ফাঁপা আইডিয়া নয়, বড় রকমের একটা আইডিয়াল। পাপপুণ্য ইত্যাদির চুলচেরা হিসেব-নিকেশও তিনি করেন না, কিন্তু অকৃতজ্ঞতা—তাঁর ধারণায় মনুষ্য চরিত্রের সব চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ।

কেউ জানুক না জানুক—তিনি কি করে অস্বীকার করবেন—অনিন্দ্য মিত্রের এক অনিন্দ্য আগ্রহ ছাড়া সাহিত্যের আঙিনায় আদৌ তিনি এসে দাঁড়াতেন কিনা! কে চিনত তাঁকে তখন? সেই বিশ-পঁচিশ বছর আগে যখন বড় কাগজে ছোট লেখকের কোনো পাত্তা ছিল না এবং মফস্বল থেকে সামান্য দু'চারটে লিটল ম্যাগাজিনে উৎসুক তিনি গল্প-কবিতা লিখতেন! লিটল ম্যাগাজিনের লিটল লেখকদের জনারণ্যে আরেকজন লিলিপুটিয়ান প্রভাত সেনের কে রাখত খবর! আর কে কার খবর রাখেই বা?

তবে হ্যাঁ, পরিচিত মহলে পরিচিত মাথের কিছু-কিছু প্রশস্তি এসে পৌঁছচ্ছিল বটে! ছোট ছোট কাগজ থেকে তাঁর লেখার প্রতি আগ্রহও প্রকাশ পাচ্ছিল। সেটা সিরিয়াসলি নেওয়ার মত এমন কিছু না। নেনও নি। না নেওয়ার আরও কারণ ছিল। এর মধ্যেই মফস্বলে এক-আধটা নাম-করা কাগজে কলকাতা নিজেকে যাচাই করার তাগিদেই তিনি লেখা পাঠাতেন। [illegible] [illegible] কোনোটারই হত না রমণীর। [illegible] [illegible] প্রচণ্ড আঘাত [illegible] [illegible] [illegible] লেখকের [illegible] [illegible] [illegible] ফিরে আসত। [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছে এক পরম নিষেধ বলেই যেন প্রতিভাত হত। অর্থাৎ সম্পাদকেরা বার বার যেন তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছেন—এদিকে আসবেন না, মশাই। এটা আপনার এলাকা নয়। অন্য কিছু দেখুন।

এতক্ষণে বড় রাস্তায় এসে পড়লেন প্রভাতবাবু। ট্রাম, বাস, জনারণ্য। এবার খানিকটা হাল্কাও বোধ করতে লাগলেন। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। মোটে সাতটা। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেই বা করবেন কি? তার চেয়ে—পাশের পার্কটা ফাঁকা দেখে, সেখানে একটা খালি বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়লেন। এই ভাল। বাড়ি গিয়ে আজ আর কোনো কাজকর্ম করতে পারবেন না। মনের সে অবস্থা আজ নেই। নতুন উপন্যাসটা মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে আছে। ভেবেছিলেন—আজই আরেকটা অধ্যায় শেষ করে ফেলবেন। তা আর হল না। আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

অনিন্দ্য মিত্রের চিন্তাটা আবার মনের মধ্যে বৃষ্টির মত ছেয়ে এল। আশ্চর্য, আশ্চর্য! আজ বিকালের এই অনিন্দ্য মিত্র আর সেদিনের সেই মহৎ, উদার, তখনই প্রায়-খ্যাতনামা অনিন্দ্য মিত্রের মধ্যে কি দুস্তর ব্যবধান!

'সারথি' সাপ্তাহিক পত্রের পূজাসংখ্যায় তখন তাঁর 'আগ্নেয়' নামের ছোট গল্পটি, উত্তরকালে যা বহু-আলোচিত ছোট গল্পের মর্যাদা পেয়েছিল, সবে বেরিয়েছে। সেই সংখ্যাতেই অনিন্দ্য লিখছেন এক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। বলতে গেলে, সেই কাগজের সেই সংখ্যার সেইটেই প্রধান আকর্ষণ। কমপ্লিমেন্টারী কপি পেতেও তর সয় নি—একখানি শারদীয় 'সারথি' নিজের পয়সায় কিনে তিনিও এক আগ্রহী পাঠকের মত রুদ্ধশ্বাসে পড়তে সুরু করেছেন উপন্যাসটি, তৎক্ষণাৎ। এবং যা প্রত্যাশার অতীত, পরদিনের ডাকে পেলেন স্বয়ং ঔপন্যাসিকেরই এক অতি অপ্রত্যাশিত

উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন-পত্র তাঁর নিজের গল্প 'আগ্নেয়'র জন্য।

ব্যস, আর কিছু দেখতে হল না। বরং দেখতে-দেখতে, প্রায় সকল অভিজাত কাগজের নিষিদ্ধ সিংহদ্বার সশব্দে তাঁর কাছে খুলে গেল। অর্থাৎ অনিন্দ্য মিত্রই, একের পর এক, তাঁকে অনেক অপরিচিত ভূখণ্ডের ছাড়পত্র জোগাড় করে দিলেন। অগ্রজ সাহিত্যিকের এই সাগ্রহ করমর্দন ও অকুণ্ঠ সমর্থন অনুজের জীবনে কী অমোঘ বিশল্যকরণীর কাজ করে—যাঁরা জানেন, তা তাঁরাই বুঝি একমাত্র জানেন।

তারপর, দ্রুত কয়েকটি বৎসর মাত্র। ততদিনে তিনি কলকাতায় বেশ গুছিয়ে বসেছেন, ভাল হোটেলে একাকী একখানি ঘর নিয়ে আছেন এবং দু' হাতে নিত্য নব সৃষ্টির পুষ্পবৃষ্টি করে চলেছেন। কবিতা-গল্প-উপন্যাস। উপন্যাস-গল্প-কবিতা। মাঝে-মিশেলে নিজের উপন্যাসের নাট্যরূপও দিচ্ছেন এক-আধটা। অনিন্দ্যও বসে নেই। তিনিও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ত' তখন রীতিমত প্রথম-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। তবু প্রভাত সম্পর্কে অনিন্দ্য যেন আরও বেশি আগ্রহ-শীল। বার বার নাড়া দেন: আমি জানি, তোমার উপন্যাস ও ছোট গল্পের চাহিদা এখন বিলক্ষণ। আমার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়! কিন্তু হুঁশিয়ার, তোমার দায়িত্ব আমার চেয়েও বেশি। তুমি অন্যতম প্রধান কবি। অথচ কবিতা লিখছ ভয়ানক কম। যদিও কাব্যের ক্ষেত্রে স্বমহিমায় এখনো তুমি একক—

কি একটা মনে পড়ে যেতে, হঠাৎ ফোলিও ব্যাগটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন। বের করলেন ডায়েরিখানা। কয়েকটা পাতা উল্টে সেদিনের তারিখটায় এসে থামলেন। এবং নিশ্চিন্ত হলেন। না, আজ কোনো এনগেজমেন্ট ছিল না। ভাগিস ছিল না। সভা-সমিতি, সাধারণত প্রভাত এড়িয়েই চলেন, বড় একটা যান না কোথাও। তাই বলে সবাইকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যায়? সেই কারণে, কথা দিয়েও যদি না যাওয়া হয় কোথাও—তার জন্য খুব শংকিত থাকেন। কথা দিয়ে কথা না রাখা—সেটা একটা বিশ্রী ব্যাপার। তা সে যে কিছুতেই হোক।

কিন্তু না। সে শংকার কোনো কারণ নেই। অতএব, অতএব এখনো অনেক-ক্ষণ এই নির্জন পার্কে, পার্কের এই সুন্দর পরিবেশে খুশিমত বসে থাকা যায়। এবং অবকাশ যাপন করা যায় যতক্ষণ ইচ্ছা। আর স্মৃতির নির্বিচার নিপীড়নের হাত থেকে আজ বুঝি সহজে রেহাইও নেই। একটা খালি ট্যাক্সি ভোঁ করে বেরিয়ে গেল না বড় রাস্তায়? যাক গে।

ভাবনাগুলো, আকন্দ ফুলে ভীমরুলের মত, কেমন যেন ঝাঁক বেঁধে নামছে।

এর পরই জীবনে এক অভাবনীয় পট-পরিবর্তন।

তাঁর উপন্যাস পেল একাডেমি-র আর কাব্যগ্রন্থ পেল রবীন্দ্র-পুরস্কার। একই সঙ্গে, পর পর, দু' দুটো ঘটনা—হঠাৎ সকালের খবরের কাগজ খুলে কোনো সরকারী লটারীর প্রথম পুরস্কার পাওয়ার মত—অকস্মাৎ তাঁকে খ্যাতির এক উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে দিয়ে গেল। অভিনন্দন, মানপত্র লাভ ইত্যাদি—এ সব ক্ষেত্রে ধারাবাহিক যা যা ঘটে, সেগুলিও ঘটে গেল নিয়মমাফিক। কিন্তু অবাক, আশ্চর্য—এল না এগিয়ে শুধু একজন, যার সকলের আগে আসার কথা। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, সব থেকে বড় শুভানুধ্যায়ী এবং এ জীবনে যে তাঁকে প্রায় হাত ধরে টেনে এনেছিল, সেই অনিন্দ্য মিত্রই শুধু রয়ে গেল নেপথ্যে, অন্তরালে। আর, আরও যা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়, যে 'সূর্যশিখা'র তিনি নিয়মিত একজন সম্মানিত লেখক—সেখানে তাঁর এই সম্মাননার সংবাদ দু'টিও ছাপা হল অত্যন্ত নিস্পৃহ, অবহেলিতভাবে।

ছয়, সাত—তারপর এই ক'মাস।

কয়েকবার টেলিফোন করেও পান নি অনিন্দ্যকে এবং 'সূর্যশিখা' থেকেও পান নি কোনো লেখার আমন্ত্রণ। অথচ, এই সেদিনও ঐ কাগজেরই ছিলেন তিনি প্রধান লেখক। আর এই ঘটনাগুলোই না অনুমানের ভিত্তিতে, পাঠক ও সাহিত্যিক-মহলে গুঞ্জনের এমন একটা ইন্ধন জুগিয়েছে যে, অনিন্দ্য মিত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বেশ বড় রকমের একটা চিড় ধরেছে এতকাল পরে! ধরেছে কিনা, সেইটেই ত' তিনি আবিষ্কার করতে চান। কোথায়, কেন এবং কি জন্য?

কিন্তু কোনো কিনারাই করতে পারেন নি প্রভাত। গেছে আরও কিছুদিন। তারপর এই আজ, আজ প্রথম, আজই এসেছিলেন 'সূর্যশিখা' অফিসে, সেই হলদে বাড়িতে। না, সম্পাদকের কাছে নয়, ব্যক্তিগতভাবে অনিন্দ্য মিত্রের কাছে।

কোনো মোকাবিলা নয়, এসেছিলেন বন্ধুর কাছে এক বুক বেদনা নিয়ে আরেকজন বন্ধু, এই একটা কথাই জেনে নিতে—কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে, কি আমার অপরাধ? কিন্তু কি হল, কি পেলেন, কি দেখলেন শেষ পর্যন্ত!

দারোয়ান যথারীতি তাঁকে সেলাম বাজিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকতে কেরানীরাও জানাল অভিনন্দন। তারপর, সম্পাদকীয় কক্ষে এসে পৌঁছুতেই আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন।

সহকারী প্রমথবাবু কেমন অর্থপূর্ণ, একটু মৃদু হাসলেন—'আসুন।'

প্রভাতও সম্পাদকের ঘরের দিকে অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি তুলে ধরলেন। সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়লেন প্রমথবাবু। অর্থাৎ অনিন্দ্য আছেন।

সুইংডোর ঠেলে ঘরে ঢুকতেই, দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেন একেবারে নিভে গেলেন।

প্রভাত নিভে গেলেন পরিবেশের রুক্ষতায়, অনিন্দ্য ঘটনার আকস্মিকতায়। এ জন্য আদৌ প্রস্তুত না থাকায়। ইস্, লোকটা কি নির্বোধ আর নির্লজ্জ—যাকে এইভাবে আমি য়্যাভয়েড করে চলেছি, যাকে সহ্য করতে পারছি না কিছুতেই—সে আবার অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করল কোন্ বিবেচনায়?

তবু নিজে থেকেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন প্রভাত। হাসিমুখেই প্রশ্ন করলেন: কি ব্যাপার?

একটা পাণ্ডুলিপিতে নিবদ্ধ দৃষ্টি, খুব শীতল গলায় উত্তর এল: কিসের?

: কিসের আবার! তোমার।

: আমার কোনো ব্যাপার-ট্যাপার নেই।

এতৎ সত্ত্বেও, স্বভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় গলায় স্বাচ্ছন্দ্য আনলেন প্রভাত: আরে, তা কে বলছে? হঠাৎ এমনভাবে পরিত্যাগ করলে কেন আমাকে? মানে, কোনো খবরাখবর নেই, চিঠিপত্তর নেই, এমন কি টেলিফোনে পর্যন্ত সর্বদা শুনি—নেই উনি—

: না থাকলে, বলবে কি, আছে?

: কি আশ্চর্য, আমি কি তাই বলছি? হঠাৎ আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠার কারণটা কি? আমার লেখা-টেখাও ত' আর চাও না!

অনিন্দ্য মিত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে: আমি একটু বাইরে যাব, তাড়া আছে। আর হ্যাঁ, আমার ব্যক্তিগত কথা ছেড়ে দাও, তবে সম্পাদক হিসেবে কোনো মৃত লেখকের লেখা আমি ছাপি না।

আচমকা চাবুক-খাওয়া কুকুরের মত, প্রভাতও ককিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে: কি বললে? আমি মৃত, মানে মারা গেছি!

অনিন্দ্য মিত্র বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, শেষ শ্লেষটুকু ছুড়ে দিয়ে: হ্যাঁ, পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক মানেই মৃত আমার কাছে। আর তার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না।

হলদে বাড়িটা থেকে, তারপরই, সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে, মাতালের মত টলতে টলতে পথে নেমে এসেছেন প্রভাত সেন। আর—

না, আর বসা চলে না। রাত সাড়ে ন'টা। পার্ক থেকে রাস্তায় নামলেন। শুধু মাথার মধ্যে একটা কথাই ক্রমাগত তালগোল পাকাচ্ছে—কে মৃত? আমি, না অনিন্দ্য? অনিন্দ্য, না আমি?

নতুন যে উপন্যাসটা মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে আছে, সেটার কথা আবার মনে পড়ল। সামনে ট্রাম। উঠে পড়লেন। না, বাড়ি পৌঁছেই বসবেন পাণ্ডুলিপি নিয়ে। যত রাতই হোক, আরেকটা অধ্যায় আজই শেষ করবেন। অন্য কিছু নয়, নিজেকেই তিনি আরেকবার আবিষ্কার করতে চান। তাঁর ছায়া তাঁকে আড়াল করছে অথবা টপ্‌কে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা—সৃষ্টির আলোয় দাঁড়িয়ে, পাকা বিজ্ঞানীর চোখে, সেইটেই পরখ করবেন। তাঁর মন হঠাৎ একটা গ্যাস-বেলুনের মত খুব লঘু মনে হল। একটা নতুন চিন্তা, চিন্তার আরেক-রকমের আস্বাদ। মনে-মনে অনিন্দ্য মিত্রের প্রতি ব্যগ্র এক বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন প্রভাত সেন।

জার্মান লোকসঙ্গীতের ধারা

সুশীলকুমার ভট্টাচার্য

প্রাচীন জার্মান গ্রাম্য কবিতাই পরবর্তীকালে জোতদার ও গায়কদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে লোকসংগীতে পরিণত হয়েছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সব জার্মান লোকসংগীত পাওয়া যায়, তার মধ্য দিয়ে প্রাচীন 'কোর্টলি লিরিক'-এর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মান লোকসংগীত অধিকাংশই 'মিন্নে সঙ' বা প্রেমসংগীত। জার্মান লোকসংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য হল অত্যন্ত সুমিত ও সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে সমস্ত বক্তব্য ও পরিবেশের সার্থক পরিস্ফুটন।

বাংলা প্রেমসংগীতে প্রেমিকার মর্মোচ্ছ্বাসেরই কত কথা, প্রেমের প্রকাশ সেখানে নিরাভরণ ও সাবলীল, অপর পক্ষে জার্মান প্রেমসংগীতে উপমা ও রূপকের প্রাধান্যই তার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য।

যেমন:

High upon yonder mountain
A mill wheel goes around
By which from night till
morning
True love is ever ground.

এখানে প্রেমকে 'মিল হুইল'-এর সংগে তুলনা করা হয়েছে। যতক্ষণ এই কারখানা চলে, ততক্ষণ প্রকৃত প্রেম থাকে। আর যখন এই কারখানা ভেঙে পড়ে, তখনই প্রেমের হয় সমাধি। এই কথা প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী কয়েকটি লাইনে—

The wheel house is now
broken,
Our love has reached its end,
God bless you, my fine
sweet heart
I go to another land.

(Translated by Rose in 'A History of German Literature,' p. 71).

এ ছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের জার্মান লোকসংগীত পাওয়া যায়। দস্যু ও ডাকাতদের নিয়েও কিছু কিছু সংগীত আছে। এক সংগে বসে খাওয়ার সময় এক ধরনের সংগীত রয়েছে, যাকে বলা হয় জার্মানীর 'ফিস্টিং অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং সঙ্'। ঠিক এ ধরনের গান বাংলা লোকসংগীতে বিরল। তার কারণ উভয় দেশের সামাজিক সংস্কারগত পার্থক্য। জার্মান 'ফিস্টিং অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং সঙ্'-এর মধ্য দিয়ে একটি অনাবিল আনন্দ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুন্দরী তরুণী খাদ্য পরিবেশন করছে। সুন্দরী তন্বী কুমারীকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই গায়ক গেয়ে ওঠে মনের আনন্দে:

Let's put the deity chicken,
The pork roust on the spik,
And then bring in cool liquids
And let us drink a bit.

আসলে সুরাপানের সমস্ত সৌন্দর্য এবং মাধুর্যই ঐ তন্বী লাকীর রূপকে ঘিরেই—

Move up, my pretty lass!
Under roses in the grass
Gladden the heart in my body.
The feast time with me pass!
(Do—P. 71)

জার্মান লোকসংগীতের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু অধ্যাত্মসংগীত পাওয়া যায়। বাংলা বাউল সংগীতের পেছনেও বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাসের বিশেষ একটা ধারা যে প্রবাহিত—একথা অনস্বীকার্য। বাউল সংগীতে রূপকের সাহায্যে ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং সংগে সংগে এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু পার্থিব বস্তু ও জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য একটা গোপন বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। বৈরাগী বাউল বাংলার ঘরে ঘরে একতারা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষের মনে পরপারের (অর্থাৎ পরলোকের) জন্য আকাংক্ষা জাগিয়ে তোলে। বাউলের মতে এই সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা বাজার, বেচাকেনার পর সবাইকে কানাকড়ি সমস্ত হিসাব মিটিয়ে ঘরে ফিরতে হবে—অর্থাৎ পরপারের ডাকে সাড়া দিতে হবে। কিন্তু সংসারের বিবিধ ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণের মোহে আবদ্ধ মানুষ পরপারের চিন্তা করতে ভুলে যায়। বাউল বৈরাগী তাই সেই সব উদাসীন আত্মাদের যেন সাবধান করে দেওয়ার জন্য একতারার সুরে গেয়ে ওঠে:

দোকানি ভাই দোকান সার না।
কত করবি আর বেচাকেনা॥

ঠিক এমনি রূপকের মধ্য দিয়ে জার্মান-সংগীতেও খৃস্টের মহিমা কীর্তন লক্ষ্য করা যায়। জার্মান অধ্যাত্মসংগীতের পেছনে খৃস্টধর্মের প্রচারধর্মিতাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; বাংলা অধ্যাত্ম-সংগীতের পেছনে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধর্মের প্রভাব হয়ত আছে। কিন্তু তা যখন গানের সুরে ঝরে, তখন কিছুতেই প্রচারসর্বস্বতার লেবেল তাকে এ'টে দেওয়া যায় না। ব্যক্তিহৃদয়ের বেদনা এখানে সবমানবের বেদনার সংগে মিশে শেষ পর্যন্ত চিরন্তন বিরহগীতিতে পরিণত হয়। জার্মান অধ্যাত্ম-সংগীতের এই প্রচারই মুখ্য—বাংলায় হৃদয় মুখ্য। একটি জার্মান অধ্যাত্মসংগীত উদ্ধৃত করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

Es Kommt in Schiff, geladen
bis an seinn hochs ten Bord;
es tragt Gotts Sohn
Voll Gnaden
des vaters ewigs hort
Das Schiff geht still in Triebe
es tragt ein teure Last
der segt ist die hie be,
der heelge Geist der Mast.

অর্থাৎ—

There comes a ship
well ladder
Upto its highest board;

God's son and grace it carries,
The Bible's precious hoard
The ship is calmly sailing
It bears a noble host :
Love in the sails in blowing,
The most is the Holy ghost.
(Translated by Ernst Rose in A History of German Literature P. 72).

এখানে পৃথিবীর জীবনপ্রবাহকে জাহাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই চিরন্তন জীবন-তরীর মাঝি ভগবানের 'বাইবেল'। সবচেয়ে বড় কথা 'লভ ইন দি সেলস ইন ব্লোইং'।

ভালবাসা জীবন-তরীর মূল প্রেরণা। এখানে খৃস্ট ধর্মের প্রচারই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই দিক দিয়ে একে জার্মানীর আদিম বিশ্বাস ও সংস্কারজাত লোকসংগীত বলা যায় কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ রয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, জার্মানীর মিনেসঙ'-এর অর্থ হল প্রেমসঙ্গীত। এই মিনেসঙ' আগে গীতি কবিতারূপেই জার্মানীতে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে এদের পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই। আগে যা 'লিরিক পোয়েট্রি' হিসেবে ব্যবহৃত হত তাই পরে সঙ্গীতের রূপ নিয়েছে। যেমন, একটি অপূর্ব প্রেমসঙ্গীত নেওয়া যেতে পারে।

"Thou art mine, I am thine."

এ সব দেশের প্রেমের মূল কথা
ওগো তুমি আমার আমি তোমার—

"Of that thou shalt be certain
Enclosed thou art.
Within my heart.
Lost thereof is now the key
And thou within must ever be !

অর্থাৎ প্রেমিক বলছে প্রেমিকাকে— তুমি এখন আমার হৃদয়ে আবদ্ধ,—তুমি কোথাও যেতে পারো না।

যেহেতু হৃদয়দ্বারের চাবিকাঠিটি হারিয়ে গেছে, মূলকথা প্রেমিকাকে চিরদিনের মত প্রেমের বাঁধনে বেঁধে রাখবে প্রেমিকের-বক্ষ সুখে।

এই সমস্ত প্রেমসঙ্গীত বা 'মিনেসঙ' রচয়িতাদের জার্মানীতে বলা হয় 'মিনেসিঙ্গার'। জার্মানীর প্রথম 'মিনেসিঙ্গার' অস্ট্রিয়ার কবি ভন্ কুরেনবার্গ। ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিছু প্রেমসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। প্রাচীন লোক গাথা 'নিবেলুঙ্গেন'-এর রচনারীতি দীর্ঘ কবিতা গঠনই তিনি তাঁর সঙ্গীতের আঙ্গিক হিসেবে গ্রহণ করতেন। তবে তাঁর সঙ্গীত প্রায়ই 'নাইট'দের অর্থাৎ বীরদের ভালবাসাকে কেন্দ্র করেই রচিত। পরবর্তীকালে 'মিনেসে' এই শব্দের মধ্যে যে প্রেমের আত্মোচ্ছ্বাসের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। ঠিক সেই গভীর অন্তর্মুখীন প্রেমের কোন পরিচয় তাঁর সঙ্গীতে পাওয়া যায় না।

অবিবাহিতা কুমারী নারী চায় কোন 'নাইট'-এর সাথে প্রেম করতে। তার বিছানায় 'নাইট' আসবে প্রেম সম্ভোগের জন্য, অবিবাহিতা কোন নারী তার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে সঙ্গীতের মধ্যে।

এখানে প্রেমের চেয়ে মোহ অর্থাৎ এক ধরনের যৌনক্ষুধা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাইটের প্রেম—এ ছাড়া আর কী হতে পারে? এই দিক দিয়ে দ্বাদশ শতাব্দীর চেয়ে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর জার্মান প্রেমবিষয়ক লোকসঙ্গীত অনেকাংশে খাঁটি প্রেমসঙ্গীত।

পরবর্তীকালে জার্মান কবিতা অনেকাংশে প্রাচীন লোকসঙ্গীতে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল।

আইচেনডর্ফ্‌ট্-এর কবিতা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন লোকসঙ্গীতের মূল সুরের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিষয়-মর্যাদা কমাকিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ভিন্ন আকর্ষণ নিবিড়ম পাঠাচ্ছে। গ্রন্থের লেখক যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা তাঁর ব্যাপক অনুশীলনেরই পরিচায়ক। যদিও সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে আমাদের একমত হবার কারণ নেই, তবু নিঃসন্দেহ যে, গ্রন্থটি লোকবৃত্তবিষয়ক পাঠকের যথেষ্ট উপকারে আসবে। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের নাতিদীর্ঘ ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের শোভন ছাপা ও মনোরম বাঁধাই নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, তবে মূল্য আরও অনেক কম করা যেতো।

মানুষের মাঝে এভারেস্ট। রচনা—এল, ভি, মিত্রোখিন। সম্পাদনা—গিরিজাকুমার সিনহা। সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী। ১।১, উড স্ট্রীট, কলকাতা-১৬। দামঃ পঁচাত্তর পয়সা।

১২৮ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান গ্রন্থটিতে লেনিন সম্পর্কে গোড়ার দিকের ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক নোট লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

লেনিন শতবার্ষিকীতে বইটি এদেশের পাঠকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে। ১৯১৭ সালে তামিলনাদের কবি সুব্রহ্মণ্যম ভারতী লেনিনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সমর্থন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। সে যুগের জাতীয় নেতাদের কাছে মহান রুশ বিপ্লব অনুপ্রেরণার জোয়ার এনে দিয়েছিল, বালগঙ্গাধর তিলক, কৃষ্ণকান্ত মালব্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ লেনিনের মত ও পথ সম্বন্ধে আগ্রহ পোষণ করতেন। বাংলা ভাষায় লেনিনের জীবনী প্রথম লেখেন ফণিভূষণ ঘোষ। ঢাকার অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেনের একটি বই 'বিপ্লবের পথে রাশিয়ার রূপান্তরের' ভূমিকা লিখেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইংরাজী, হিন্দী, তামিল, মালয়ালম, কানাড়ী উর্দু, মারাঠী বাংলা প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেনিন সম্পর্কে সেকালে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। ১৯১৯ সালে তাসখন্দ থেকে উদ্ধৃত মৌলভী বরকতুল্লার 'বলশেভিজম ও ইসলাম' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। সবশেষে রয়েছে লেনিন সম্পর্কে প্রকাশিত ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী। মনে হল এটি অসম্পূর্ণ।

লেনিনের জীবনকথা (১৯৬৯)—নিকোলাই মিখাইলোভ। সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী। ১।১, উড স্ট্রীট কলকাতা-১৬। দামঃ এক টাকা।

লেনিন শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত বইটিতে সহজভাবে মহান লেনিনের জীবনকথা বলা হয়েছে ১৫টি পরিচ্ছেদে। এই গ্রন্থে স্ট্যালিনের নামোল্লেখ করা হয় নি। বিভিন্ন অবস্থায় লেনিনের কতকগুলি ছবি বইটিকে শ্রীসম্পন্ন করেছে।

লোকায়ত বাংলা : শ্রীসুনীল চক্রবর্তী। কল্যাণী প্রকাশন : ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম—৮ টাকা।

বাংলার লোকবৃত্ত বিষয়টি যদিও সুপ্রাচীন, কিন্তু তার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা খুব বেশিদিনের নয়। ফলে লোকসংস্কৃতি, লোকচর্চা, লোকযান শব্দগুলি শিক্ষিত মহলে চালু থাকলেও তার যথাযথ পরিশীলন বা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অনেকেরই খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। হাল আমলে বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্যে লোকবৃত্ত অংশভুক্ত হওয়ায় এ সম্পর্কে কিছু ব্যাপক গবেষণা সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। এই গবেষণালব্ধ অনুশীলনের মাধ্যমে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক নিজের মতকে একটা সুস্পষ্ট ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন এবং স্বকীয় ভাবনাকে আত্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার অবকাশ পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য স্বচ্ছ। নিজের মনন-বিষয়কে তিনি এখানে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—লোকসংস্কৃতি, লোকসংগীত, লোকচর্চা ও লোকচিত্রকলা। আলোচনাসূত্রে তিনি দেখিয়েছেন—কৃষিভিত্তিক জীবনের মধ্যেই প্রধানত লোকসংস্কৃতির উৎপত্তি। কিন্তু ইতিহাসের আদিম স্তর থেকে শুরু করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্থান-পতন-বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভাবীকালের শ্রেণীহীন সমাজে তার অপরাজেয় অভিযান। কেবল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ওপরেই লোকসংস্কৃতির ভিত্তি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়। লোকসংস্কৃতি লোকসাধারণের সামগ্রিক জীবনপ্রয়াসের অন্য নাম এবং লোকসঙ্গীত লোকসাধারণেরই সংগ্রামী জীবনের রসভাষ্য। বিভিন্ন সংজ্ঞাকারের ভাষ্য ও কিছু শব্দের বাংলা

মাও সে তুং : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—আট টাকা।

চীনের ৭০ কোটি জনগণমনের অধিনায়ক মাও সে তুং। তাঁর জীবনালেখ্য অঙ্কন খুব যে দুরূহ, সন্দেহ নেই। মাও সে তুং-এর জীবনচিত্রটি সহজ-সরল ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করে লেখক এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে মাও-এর জীবনদর্শন, রাজনৈতিক মতবাদ ও কবিসত্তাটিকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সুধাংশুবাবুর বর্ণনারীতিতে গল্পের আমেজ আছে, উপন্যাসোচিত আকর্ষণী-গুণে আছে: অথচ অসতর্ক বা অসাধু তথ্যবিকৃতি নেই।

তথ্যের মিছিল এখানে শৃঙ্খলা-শাসিত সৈন্যদের মতো অগ্রসরমান। সৈন্যরা লড়ছেন, এগোচ্ছেন, নির্দেশ নিচ্ছেন সর্বাধিনায়ক মাও-এর কাছ থেকে।

মাও হুনানের রাজধানী চাংশার চূড়ায় কখনও, কখনও কলোচ্ছ্বাসা উ নদীর বুকে; লুতিং শহরের সামনে কখনও, কখনও আবার শেনসি-কিয়াংসি সীমান্তে, লং-মার্চ-এর সাফল্যে আনন্দোজ্জ্বল কখনও, কখনও কুয়োমিণ্টাং ও জাপানী সৈন্যদের হটাতে তৎপর। এ ছাড়া নতুন চীনকে কী করে গড়লেন মাও, কী করে দেশকে স্বাবলম্বী করে তুললেন, তারও চমকপ্রদ বিবরণ এখানে আছে।

আলোচ্য গ্রন্থে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের বিরোধ-বর্ণনায় লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন: কিন্তু ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধের প্রশ্নটি তিনি এড়িয়ে গেছেন, মনে হল। আর মনে হল মাও সে তুং-এর দুজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী চৌ এন লাই ও লিন পিয়াও-এর কথা এখানে একেবারেই নমো নমো করে সারা হয়েছে।

অবশ্য এই সামান্য কিছু দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'মাও সে তুং' যে একটি সুলিখিত জীবনী গ্রন্থ, জনপ্রিয়তা লাভে বিলম্ব হবে না, সন্দেহ নেই আমাদের।

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ক্রেগ জার্মানী চলে যাবার পর কিছুকাল বেশ অনিশ্চয়তা এবং দারিদ্র্যের ভেতর মার্টিন শ'র দিন কাটছিল। তারপর ক্রেগের কাছ থেকে একটি চিঠি এল। সাইড লাইন হিসাবে গর্ডন ক্রেগ এই সময়টায় বিখ্যাত নর্তকী ইসাডোরা ডান্‌কানের স্টেজ ডেকরের দিকটা দেখে দিচ্ছিলেন। ইসাডোরা তখন সারা ইওরোপে নাচের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর নাচের সঙ্গে গ্লুক্, সুবার্ট এবং ফরাসী রামো এবং কুপেরাঁ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের মিউজিক থাকতো। ক্রেগ লিখেছিলেন ইসাডোরার একজন কণ্ডাক্টরের প্রয়োজন। সে কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য মার্টিন শ' আসবেন কিনা? তারপর শ' বলেছেন: "রেলভ্রমণের খরচা এবং সেই সঙ্গে আর কিছু বেশি টাকা আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম—এর তিনদিন বাদেই বার্লিনের বান্‌হফ্ স্টেশনে পৌঁছিয়ে প্রথমেই অপেক্ষারত ক্রেগের সঙ্গে দেখা হল।

সেখান থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম থিয়েটারে—কোন্ থিয়েটার তা এখন ঠিক মনে নেই। সে রাত্রেই ঐ থিয়েটারে ইসাডোরার নাচের প্রদর্শনী ছিল। এটা ছিল গ্লুক্ প্রোগ্রাম। আমি আগে কখনও ইসাডোরা ডান্‌কানের নাচ দেখি নি—স্টেজের ওপর তাঁর মুভমেন্টের সহজ-সারল্য এবং সৌন্দর্য আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করলো। লাফঝাঁপ বা টো-র ওপর দাঁড়িয়ে ব্যালে ডান্সারদের মত চক্কর খাওয়া, এসব না থাকাতে নাচটা খুবই মনোমুগ্ধকর লাগছিল—তাঁর নৃত্যগতির ভেতর একটা হাল্কা ভেসে যাওয়ার ভাব ছিল—অঙ্গসঞ্চারে ছিল মাধুর্যময় সংকেত। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। ইসাডোরাই একা সমস্তক্ষণ নেচে গেলেন—এর জন্যও তো কম ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আর কোন ডান্সার এভাবে একা একটি সারা সন্ধ্যার প্রদর্শনীতে দর্শকদের এই-ভাবে এন্টারটেইন করতে পারতেন কিনা।

ক্রেগের দৃশ্যসজ্জার বর্ণনায় শুধু একটি কথাই বলবো। দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে নৃত্যের যেন অঙ্গাঙ্গিভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। একেকে বাদ দিয়ে অন্যকে যেন কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

ইসাডোরার নাচের সময় সমস্তক্ষণ আমাকেই মিউজিক কণ্ডাক্ট করতে হয়েছিল। প্রদর্শনীর পর আমাকে এই রহস্যময়ী শিল্পীর ড্রেসিং রুমে নিয়ে যাওয়া হোল। কয়েকটি সহজ-সরল কথায় তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল শিশুর সারল্য। কথার টানে আমেরিকান এ্যাকসেন্ট থাকলেও তার ভেতর কোনরকমের রুক্ষভাব ছিল না।"

All her movements were deliberate, reposeful, never for an instant hurried or nervous. One simply could not imagine her catching a train.

অরচুয়োসো ডান্সিং এবং এ্যাক্রোব্যাটিক্‌সের মধ্যে তফাৎ কোথায়? ইসাডোরা ডান্‌কান ছিলেন ব্যালে নৃত্যের বিরুদ্ধবাদীদের দলে। এঁরা ব্যালেকে এ্যাক্রোব্যাটিক্‌স্ ছাড়া অন্যভাবে দেখতে রাজী ছিলেন না। এ দুইয়ের তফাৎটাও খুবই সূক্ষ্ম পর্যায়ের।

The difference between dancing and acrobatics lies not so much in technique as in a state of mind.

মনে রাখতে হবে টেকনিক আর পারফরমেন্স এক জিনিস নয়—টেকনিক যত নির্ভুলই হোক, পৃথক পৃথক নির্ভুল পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করে তা গড়ে ওঠে না—সত্যিকার কুশলী নৃত্যবিদ্ সমগ্র নৃত্যটিকে এককভাবে দেখতে চান—তাঁদের দৃষ্টিতে "সফল-নৃত্যে" একটি পদক্ষেপ পরের পদক্ষেপের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

The dancer who reveals the join between the steps, the staccato dancer—and ninety percent are—is as bad as the actor who stammers.

আর এক কথা, এ্যাক্রোব্যাট মিউজিককে অতিক্রম করতে চায়। প্রকৃত নৃত্যশিল্পী—"তোমাদের একটা কিছু দেখাবার কথা"—মন থেকে এই ভাব বাদ দিয়ে, সমগ্র নৃত্যের মধ্যে সমতা বোধ, মিউজিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে এক সৃষ্টি করেন। বিগত রবিবার অর্থাৎ বারই ডিসেম্বর জার্মান মডার্ন ব্যালে দেখতে গিয়েছিলাম। এঁদের ঐদিনের প্রোগ্রামে ছিল (১) সিম্ফনি ইন সি—মিউজিক: জর্জেস বিজেট, কোরিওগ্রাফী: জর্জ ব্যালানসিন। (২) দি টেম্পটেশন অভ ইসাবো (এ্যাক্ট টু অভ দি ব্যালে "জোন ফন জারিসা")—মিউজিক: ভার্নার এক্, কোরিওগ্রাফী ও স্ট্যাটজানা গোভস্কি। (৩) কনসার্টো ইন এফ মাইনর: মিউজিক: জোহান সেবাস্টিয়ান বাখ্, কোরিওগ্রাফী: ব্রায়ান ম্যাকডোনাল্ড। (৪) হ্যামলেট—মিউজিক: বোরিস ব্লাশের, কোরিওগ্রাফী: টাট্‌জানা গোভস্কি। বেশ ভালই লাগল এই সব ব্যালে নৃত্য। বিশেষত ব্যালেরিনা সিলভিয়া কেসেলহাইমের নাচগুলো। ডি ডি কারলিনের নাচও মনোমুগ্ধকর। এদের সমগ্র-নৃত্যও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আজের দিন শনিবার এঁদের ডিরেক্টর গার্ট রাইনহোল্ডের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছিল। ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, গারট্রুডের সঙ্গে হ্যামলেটের দৃশ্যে কোনরকম ঈডিপাস কমপ্লেক্সে টাচ্ দিয়েছেন কিনা। উনি বললেন যে ফ্রয়েডিয়ান টাচ আছে। নাচের সময়ও ব্যাপারটা চোখে পড়লো—জিনিসটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দেওয়াতে মোটেই দৃষ্টিকটু লাগে নি—উপভোগ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডে বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেতা জন ব্যারিমোরের হ্যামলেট অভিনয়ের কথা মনে পড়লো। ব্যারিমোরই প্রথম গারট্রুডের সঙ্গে হ্যামলেটের ঐ বিখ্যাত দৃশ্যে (এই দৃশ্যেই হ্যামলেট ভ্রমক্রমে পোলোনিয়াসকে হত্যা করেন।) ঈডিপাস-কমপ্লেক্সের অবতারণা করেন। বার্নার্ড শ' এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন—ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগে নি। কিন্তু শ'র ভাল লাগুক বা না লাগুক এই নতুন ভাষ্য দর্শকদের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। আসলে নতুন ভাষ্য দিয়ে চরিত্রের রূপায়ণ করাটা চরিত্রচিত্রকের মৌলিক মনোভাব এবং শিল্পী-মনেরই পরিচয় দেয়। তা ছাড়া সব সময়েই গতানুগতিকভাবে চরিত্রচিত্রণ করলে দর্শকদের কাছে চরিত্রটিও একঘেয়ে মনে হবে। বড় বড় অভিনেতা চিরদিনই বিখ্যাত চরিত্রগুলোকে নিজস্ব ধরণে স্মরণীয় করে তোলেন। এক হ্যামলেট চরিত্রকেই বড় বড় শিল্পীরা কত বিভিন্নরূপে সৃষ্টি করেছেন দর্শকদের সামনে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে দেখেছি এক চাণক্য চরিত্রকে বিভিন্ন রজনীতে বৈচিত্র্যভাবে উপস্থিত করেছেন দর্শকদের কাছে।

১৯৫৬ সালে লণ্ডনের কিংস থিয়েটারে পল স্কোফিল্ডও ব্যারিমোরের

ব্যালে গিজেলের একটি দৃশ্যে ম্যাক্সিমো বারা এবং মনিকা রাডাস

মত হ্যামলেট গারট্রুড দৃশ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্সের সাজেসন দিয়েছিলেন—এ অভিনয় আমি দেখেছিলাম—অতি মর্মস্পর্শী অভিনয়। লণ্ডনের কয়েকজন বাঙালী ছাত্রও আমার সঙ্গে হ্যামলেট অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। অভিনয়ের পর এঁদের অভিযোগ শুনলাম—স্কোফিল্ডের অভিনয় তাঁদের ভাল লাগে নি। কারণ তাঁরা দেশে থাকতে অলিভিয়রের হ্যামলেট ছবিতে অভিনয় দেখেছিলেন—স্কোফিল্ড সে ধরনের অভিনয় করেন নি। বললাম—তাতে আপত্তিটা কোথায়? স্কোফিল্ড নতুনভাবে হ্যামলেট চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমারও আর বিশেষ ধৈর্য বা উৎসাহ ছিল না। এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার। আসলে অভিনয়কলাকে উপভোগ করবার জন্যেও অভিনয়-শিল্প সম্পর্কে খানিকটা জানা দরকার। এ্যাকটিং এবং হ্যাম-এ্যাকটিংয়ের পার্থক্য কোথায় এ কথা আমাদের বাংলাদেশেও অনেক দর্শকই সম্যকরূপে বুঝতে পারেন না। আর সেই কারণেই এক শ্রেণীর দর্শক নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সঙ্গে অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়কে এক সারিতে ফেলতে চান।

পশ্চিম জার্মানীর মডার্ন ব্যালের ডিরেক্টর গার্ট রাইনহোমের সঙ্গে আর একটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম দেখুন নাচ যতই উচ্চশ্রেণীর হোক, চরিত্রের সঙ্গে শিল্পীর বয়সের বিরাট পার্থক্য থাকলে দর্শকের চোখে কেমন জানি বেখাপ্পা লাগে। উদাহরণ হিসাবে রোমিও জুলিয়েট ব্যালেতে উলানোভার জুলিয়েটের ভূমিকায় ছায়াচিত্রের অভিনয়ের কথা তুললাম। গার্ট রাইনহোম বললেন, ব্যাপারটা ব্যালে এক্সপার্টদের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে না—তবে চরিত্রের সঙ্গে শিল্পীর বয়সের বিরাট ব্যবধান থাকলে ব্যালে নর্তক বা নর্তকীর নিজের খুবই অসুবিধা হয়। রাইনহোম নিজেও আগে বহুদিন ব্যালেতে প্রধান নর্তকের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর তেত্রিশ বছর বয়সের সময় তাঁকে রোমিওর ভূমিকায় নাচতে হোত—কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য মনে হোত।

কথা প্রসঙ্গে অনা পাভলোভার কথা তুললাম। বললাম, শুনেছি পাভলোভার বয়স বোঝা যেতো না। রাইনহোম বললেন—ঠিকই শুনেছেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত নিজেকে সুন্দর করে তুলতে পারতেন। যৌবন চলে যাবার পরও, স্টেজে নেমে নিজেকে যুবতী এবং কিশোরী হিসাবেও প্রতিপন্ন করতে তাঁকে কষ্ট পেতে হোত না। অথচ এর জন্য তাঁকে মেক-আপের সাহায্য নিতে হোত না। নাচতে শুরু করলে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ছন্দের হিল্লোল বইতো। আমার মনে তখন ভেসে উঠছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার সেই অপূর্ব নারী দেহের বর্ণনা। আদর্শ সৌন্দর্য সমন্বিতা এই নারীদেহকে যৌবন যেন তরঙ্গায়িত করে তুলেছে—কিন্তু সেই উজ্জ্বল তরঙ্গরাশি লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চলভাবে এই নারীদেহে বন্দীভাবে আবদ্ধ। পাভলোভার ভেতরেও ছিল সেই সৌন্দর্য ও মাধুরী।

[Her head was beautiful placed on her shoulders. She moved with a natural grace which teaching had accentuated, and many of her dances were dances of grace rather than show pieces. —লেখক

ইসাডোরার ড্রেসিং-রুম থেকে স্টেজ ডোর দিয়ে সবাই বেরিয়ে এলাম। অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত ইসাডোরার গাড়ির কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইসাডোরা হেঁটে গাড়িতে এসে উঠলেন। বললাম বটে যে, তিনি হেঁটে এলেন—কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এলেন। তাঁর গভীর শান্ত ভাব, আমার মনে অতল-স্তব্ধ একটি হ্রদের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল—যে হ্রদের জল বাতাসের শিহরণে পর্যন্ত সামান্যভাবেও হিল্লোলিত হচ্ছে না।

ইসাডোরা আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন সাপার খাবার জন্য। চেলসীতে যে অবস্থায় ছিলাম, তারপর এই সাপার খাওয়াটা একটা বিরাট ভোজের মত মনে হয়েছিল আমার।

বার্লিনে একটি খুব উঁচু বাড়ির ওপরতলায় ক্রেগের একটি স্টুডিও-ফ্ল্যাটের মত ছিল—আমিও এখানে এসে ক্রেগেরই সঙ্গে থাকতে লাগলাম। জার্মানীতে একটা ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। ওখানে মিউজিক কম্পোজারকে অনেক বেশি সম্মান দেওয়া হোত—ইংলণ্ডে কিন্তু নিজেকে এভাবে শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে দেখবার সুযোগ পাই নি।

জার্মানীর সরকারী কর্মচারীরা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হৃদয় এবং কর্তব্যপরায়ণ। ক্রেগের কাছে একজন ট্রেডসম্যান কিছু টাকা পেতেন। কয়েক সপ্তাহ চলে গেল—ক্রেগ ভুলে গেছিলেন ঐ টাকাটা শোধ দিতে। একজন গম্ভীর ধরণের জার্মান অফিসার এসে একদিন আমাদের স্টুডিওতে হাজির—চারদিকটা এক নজরে দেখে নিয়ে লোকটি আমাদের স্টুডিওতে রাখা ছবি এবং ফার্নিচারের ওপর কয়েকটি লেবেল সেঁটে দিল। বিল পে করতে সামান্য দেরি হলে এরকমটাই ওরা করে থাকে। এরপর আরও সামান্য দেরি হলে, আর কোনো নোটিশ না দিয়ে ওরা জিনিষগুলোও বেচে দেয়। এই সব দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি জার্মানীর স্থায়ী বাসিন্দা নই।

[ক্রমশ]

বাংলা গানে ও নাটকে লেনিন

লেনিনের জন্মশতবর্ষ পালনে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জগৎ তৎপর হয়ে উঠেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিগান, তর্জা ও কীর্তনাঙ্গ গান রচিত হয়েছে গাওয়া হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের লোকসংস্কৃতির আসরে। কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে বহু গান রচিত হয়েছে। গানগুলি প্রায় প্রতিদিন সভা-সমিতিতে গাওয়াও হচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় ইতিমধ্যে শুনেছি কয়েকটি গান ছেলেদের মুখে মুখে। এ পর্যন্ত লেনিনকে নিয়ে ছটি নাটক অভিনীত হয়েছে। শুনেছি আরো একটি নাটক শীঘ্রই মঞ্চস্থ হবে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে সাতটি লেনিন নাটক, আর সাতজন লেনিনের ভূমিকায় অভিনেতা। ভাবতে কিরকম বিস্ময় জাগে। বাংলা দেশের মানুষের জীবনে, সাংস্কৃতিক জগতে লেনিনের স্থান এত গভীরে। নতুবা এত গান, এত নাটক রচিত হয় কি করে: এত অভিনেতা আসেন কোথা থেকে: লক্ষ লক্ষ মানুষ নাটকগুলি দেখেছে এবং দেখছে।

যে গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরছে, তার একটি হল—"at the call of Comrade Lenin..." তার বাংলা অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত সুরশিল্পী ও গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস। "...কমরেড লে নি নে র আহ্বানে/চলে মুক্তি সেনা দল।" কখনো ইংরেজীতে, কখনো বাংলায় যুবকরা গেয়ে চলেছে, সমবেত অথবা একক কণ্ঠে। গণনাট্য সঙ্ঘের দিলীপ সেনগুপ্ত সুর দিয়েছেন আটটির বেশি গানে, কয়েকটি গান তিনি রচনাও করেছেন। ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের গান থেকে সুর নিয়ে, বাংলার লোক-সঙ্গীতের সুরে তার সুরের কয়েকটি গান আমি শুনেছি। অপূর্ব সেই গানগুলি। একজন নিরুৎসাহী মানুষও সেই গান শুনে তাজা হয়ে উঠবে। মাথা সোজা করে তাকাতে চাইবে সেই মানুষের উদ্দেশ্যে, যিনি লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এই গান এখনো কানে বাজছে সুরের ঢেউ তুলে—"তোমার পতাকা তুলেছি ঊর্ধ্বে/লক্ষ কোটি জনগণ;" আর একটি গান প্রকাশ করে দিচ্ছে কর্তব্য—"লেনিনের আহ্বান/শোন আজ অবিরাম/শোষণের শেষ ত' আজো হয় নি॥" সুকুমার ভট্টাচার্য, অমল চক্রবর্তী, পরান ব্যানার্জী, সুপ্রিয় অধিকারী প্রমুখ বাংলা ও হিন্দী গান লিখেছেন। এই গানগুলি পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গাওয়া হচ্ছে। অবাঙালী শ্রমিকদের বস্তিতে, জলসায় গাওয়া হচ্ছে "এয় মেরে মজদুর কিষাণো কমরেডো/ইয়াদ করো আজ লেনিন কী"। ক্রান্তি শিল্পী সংঘ গেয়ে থাকে আরো কয়েকটি গান। সেই গানগুলিরও সুর-বৈচিত্র্যের কথা শুনেছি। এ তো শুধু আমার শোনা গানের কথা বলছি। শহরতলীতে জেলায় জেলায় লোকশিল্পীদের কণ্ঠে আরো কত গান যে গাওয়া হচ্ছে কে জানে।

নাচের জগৎও তাল মিলিয়ে চলছে। সঙ্গীতা নামের একটি সংস্থা ছোটদের নিয়ে লেনিনের জীবনকে কেন্দ্র করে একটি ব্যালে নাচ রচনা করেছে। কলকাতা ও মফস্বলে কয়েক-বার মঞ্চস্থ হয়েছে এই ছোট্ট ব্যালে।

গানে, নাচে, অভিনয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক জগৎ আজ চঞ্চল। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শিল্পী ও শিল্পকর্মীরা ভূমিকা গ্রহণ করেছে লেনিন জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপনে। এমন উদ্দীপনা, এই উৎসাহ শিল্প সৃষ্টির আবেগ দেখে মনে হয়—লেনিন বাঙালীর বড় কাছের মানুষ, প্রাণের মানুষ। —সুজন।

'রেড স্কোয়ার' ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় ইয়াকভলেভ এবং শ্বেতরক্ষীর ভূমিকায় আলেকজান্দার কুটেপভ।
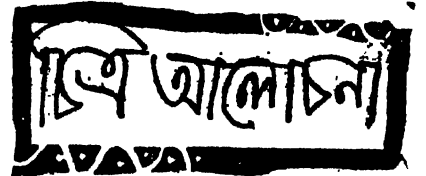
হাঙ্গেরীর উপভোগ্য ছবি

কলকাতার লাইটহাউস সিনেমায় গত ৯ই থেকে ১৫ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসবে সাতটি পূর্ণাঙ্গ ও সাতটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হয়েছে। হাঙ্গেরীর কাহিনী-চিত্রগুলির স্বতন্ত্র শিল্পচিন্তা এবং সামাজিক শিল্পরীতি এক নতুন বৈশিষ্ট্যরূপে দর্শকদের চোখে পড়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পূর্ব জার্মানীর ছবিতেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য দেখে-ছিলাম। চেকোশ্লোভাকিয়ার বুর্জোয়া শিল্পরীতি প্রভাবিত ছবি দেখে আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বুঝি ধনতান্ত্রিক জগতের কলুষ চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। হাঙ্গেরীর ছবি দেখে বোঝা গেল গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র নির্মাতারা যৌনসর্বস্বতার বিরুদ্ধে ও সমাজে শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে দুটি ছবির ঘটনাকাল ত্রিশ দশক, দুটি ছবি ঊনবিংশ শতাব্দীর পট-ভূমিতে, বাকি ছবিগুলি সমসাময়িক কাল ও ভাববস্তু নিয়ে। এই উৎসবে এভাবে ছবি বাছাই করার মধ্যে পরিকল্পিত লক্ষ্য রয়েছে। ঊনবিংশ

শতকের সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যে সমাজের অবস্থা; ত্রিশ দশকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হাঙ্গেরীর অনিশ্চিত ও শোষণে মুমূর্ষু সমাজজীবন; সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর সমাজের রূপ; অক্লান্ত কর্মোদ্যম, সুখী নিশ্চিন্ত সমাজ, যুবমানস। ছবিগুলি দেখলে ধারণা হবে ত্রিশ দশকে হাঙ্গেরীর জীবন কি রকম ছিল, সে জীবন ছিল আমাদেরই বর্তমান বঞ্চিত ও শোষিত জীবন। বিপ্লবের পরে সে জীবনের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে—তার চিহ্নমাত্র নেই। হাঙ্গেরীর আজকের নাগরিকদের কাছে তাই ত্রিশ বছর আগেকার সমাজজীবনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কোন্ অবস্থা থেকে তারা বর্তমান নিশ্চিন্ত অবস্থায় এসেছে। ১৯৪৫ সালের পরে হাঙ্গেরীতে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, বর্তমানে যারা ২০-২৫ বছরের যুবক তারা জানে না তাদের পিতা-ঠাকুর্দা কি অনিশ্চিত জীবনযাপন করেছিলেন। বর্তমান জীবন মূল্যায়নের জন্য এই তুলনামূলক চিত্র দেখানোর প্রয়োজন ছিল।

প্রদর্শিত কাহিনী-চিত্রগুলির মধ্যে 'সয়েল আণ্ডার ইয়োর ফিট' আমার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। ত্রিশ দশকের হাঙ্গেরীর গ্রামের জীবন ও কৃষি সমস্যা এই ছবির চিত্রনাট্যের ভিত্তি। এই সঙ্গে সমাজে নারীর স্থান, নর-নারীর ইচ্ছামত বিবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা, প্রকৃতি খেয়াল-নির্ভর কৃষি, মহাজনী ব্যবসার নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির মধ্যে কিভাবে কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করল তাই দেখান হয়েছে। কাহিনীর নায়ক ভালবেসেছিল তার গ্রামের এক তরুণীকে। কিন্তু তরুণীর পিতা ছিল মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে আবদ্ধ। ঋণ মুক্তির জন্য মহাজনের ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়। বিয়ের উৎসবে তরুণী যেমন মর্মপীড়ায় মরে যাচ্ছিল, তেমনি তার প্রেমিক যুবকটিরও অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল। মরিয়া হয়ে সে একটা পথ বার করে, মুখোসনাচের দলে ভিড়ে সে আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তার প্রেমিকাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। এবার তার জীবনে শুরু হল সংগ্রাম, মহাজনের ঋণ শোধ করে তার শ্বশুরের সম্মান রক্ষার। ...

'জবাব' ছবিতে লীনা চন্দ্রভারকর

শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'উত্তরণ' ছবিতে পার্থ মুখার্জী ও শক্তি নাগ

জীবনসংগ্রামের মধ্যে তার যে অভিজ্ঞতা তা দেখতে দেখতে মনে হবে একালের বাংলার কোন গ্রামের কাহিনী দেখছি। ছবির কাহিনী এবং মানুষগুলি যেন আমাদের একান্ত চেনা। পরিচালক ফ্রিগেস বান অপূর্ব দক্ষতায় সহজ সরল গতিতে কাহিনী ও বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তুলেছেন। সমবক্তব্যের ছবি 'দি আয়রন ফ্লাউয়ার'। এই ছবির পটভূমি ত্রিশ দশকের বুদাপেস্ট শহরের শহরতলীর গরীবদের জীবন। শহরের অভিশপ্ত বেকারী, অনিশ্চিত জীবন আর তার সুযোগ গ্রহণ করছে একদল বিত্তবান শয়তান। তারা কেবল কম দামে মানুষের মেহনত কিনছে না, একই দামে নারীর দেহও কিনে নিচ্ছে। মান-মর্যাদা বিকিয়ে নর-নারী বাঁচবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে। এই ছবির নায়ক বেকার যুবক পিটারসন, গরীব হলেও আত্ম-সম্মানজ্ঞানসম্পন্ন। শহরতলীতে এক জীর্ণ কুটিরে সে রাত্রিবাস করে। ভেরার স্বপ্ন ছিল নর্তকী হবার—নাম ও সম্মান পাবার। কিন্তু বাস্তবে সে হল ধোবী-খানার কর্মী। সেখান থেকে কোন রকমেই সে বেরিয়ে আসতে পারল না, উপরন্তু মালিকের লাম্পট্যের শিকার হতে হল। পিটারসন আর ভেরা পরস্পরকে ভালবেসেছিল। পিটারসনের জীবনে ভেরা যেন স্বপ্নে আসা পরী। কিন্তু সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুরতায় তাদের মিলন হল না। পিটারসন বিশ্বাস করে ভেরার ভালবাসা অফুরন্ত, তার জীবনে সে পরীর মতই সুন্দর এবং স্বপ্ন। একদিন ভেরা তার কাছে আসবে যখন পবিত্র প্রেমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার কেউ থাকবে না, যখন নারী দেহকে বেচা-কেনার জিনিস করতে কেউ পারবে না। শোষণহীন সমাজেই প্রেমের পূর্ণতা সম্ভব। ছবির পরিচালক জানোস হের্স্কো একজন শক্তিমান পরিচালক—ছবিতে তিনি সেই পরিচয় রেখেছেন।

জানোস হের্স্কোর আর একটি ছবি 'হ্যালো ভেরা' সমসাময়িক সমাজ নির্ভর। হের্স্কো এই ছবিতে নির্মাণ কৌশলে গদারের রীতি অনুসরণ করেছেন। বর্তমান হাঙ্গেরীর যুব-মানসের চিত্র। নিরুদ্বেগ জীবন, নারী-পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা, স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে কাজ করছে, পরস্পরকে ভালবাসছে, ভালবাসা আর বন্ধুত্বকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যাচ্ছে। এত প্রাণোচ্ছ্বাসের মধ্যে সেবাব্রত এবং সমাজবোধ থেকে ওরা বিচ্যুত নয়। ভেরা যাচ্ছিল গ্রীষ্মকালীন শিবিরে, প্রণয়ী এসেছে বিদায় দিতে। ভেরা এখনো সম্পূর্ণভাবে তার প্রণয়ীর কাছে নির্ভর করতে পারে না, তার [illegible] কর্মস্থলের সহকর্মিণীর [illegible] ভেরা ভাল চোখে দেখে না। [illegible] জীবনেও অসুস্থতা মাঝে [illegible] যায়, যেমন গ্রামের গীটারবাদক [illegible]কটি তাকে একলা পেয়ে জোর করতে চেয়েছিল। এই অভিজ্ঞতায় সে [illegible] সিদ্ধান্তে এসেছিল। ছবির শেষে পরিচালক সুখী যুবকদের স্মরণ করে দিয়েছেন—মনে রেখো, পৃথিবীতে এখনো ভিয়েৎনাম রয়েছে। গতানুগতিক কাহিনীর ছকে ছবিটি নয়, গ্রীষ্ম-কালীন শিবিরে যাত্রা করা থেকে নানা ঘটনার মধ্যে ফিরে আসার মধ্যে পরিচালক তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। মার্টিন কালেট পরিচালিত "দি স্টোরী অব মাই স্টুপিডিটি" যথেষ্ট শ্লেষাত্মক ও কৌতুক রসের ছবি। এই কৌতুক কোথাও স্থূল নয়। বুদ্ধি-দীপ্ত সংলাপ ও আঙ্গিক রচনায় সংযম ছবিটিকে পশ্চিমী ছবি থেকে আলাদা করেছে। প্রধান চরিত্র একজন নামকরা অভিনেতার, তার বিপরীতে এমন এক তরুণী যে অভিনেত্রী হবার বাসনায় তার স্ত্রী হয়েছে। অনেক প্রতীক্ষার পরে এক নাট্যকারের অনুগ্রহে সে এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছে যাতে সাফল্যলাভ করলে রাতারাতি তার খ্যাতি হবে।

অভিনেতা স্বামী এ ব্যাপারে উদাসীন। তাকে দেখছে, তখন সে এক কল্যাণী অভিনেত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই সঙ্গে তার ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ারের জন্য [illegible] সঙ্গেও সে সময় সময় বেশ খোসামদ দিয়ে চলে। সন্ধ্যায় অভিনয় শুরু হবে—তার আগের কয়েক ঘণ্টা—কেটির মানসিক অবস্থা ছবির প্রধান বিষয়। অভিনয়ে কেটি চমৎকার সার্থকতা লাভ করল—বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী নারীর ভূমিকা অভিনয়ে। সকলে যখন তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তখন অভিনেতা স্বামীর মতে সে সর্বাপেক্ষা নির্বোধ নারী। কারণ নাটকটিতে তাদের ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশিত হয়েছে এবং কেটি বুঝতে পারে নি যে, সে নিজেদের কথাই দর্শকদের সামনে উপস্থিত করছে। কিন্তু স্বামী মহোদয় জানেন না যে, তিনি যতই উচ্চদরের শিল্পী হিসাবে বড়াই করুন, তিনিও আসলে নাট্যকারের সৃষ্টি। নাট্যকার তাঁকে সুবিধামত করে চরিত্র দেন বলেই তাঁর নামডাক।

হাঙ্গেরীর বিখ্যাত পরিচালক জোলটান ভার্কোনীর অনবদ্য সৃষ্টি 'লাস্ট হাঙ্গেরিয়ান নবোবস্'। ছবিটি দুই খণ্ডে দু' দিনে দেখান হয়েছে। রঙিন সিনেমাস্কোপের ছবি। ঊনবিংশ শতকের হাঙ্গেরীতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, পরস্পর হানাহানি, ঈর্ষা, আরামপ্রিয়তা ও সাধারণ মানুষের প্রতি উপেক্ষার মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে ইতিহাসের চাকা ঘুরে যাচ্ছিল। এই চরম অমানবিক গোষ্ঠীর মধ্যে থেকেও একটা মানবিক অনুভূতির অঙ্কুর দেখা যাচ্ছিল। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই মানবিকতা কোন [illegible] দিকে নিল। ছবিতে [illegible] ক্যামেরার কারচুরী ও সম্পাদনা নৈপুণ্যে দৃশ্যগুলি চমৎকার।

কিন্তু এই সুন্দর ছবিটিকে আমরা যথার্থভাবে উপভোগ করতে পারি নি 'অপেরা' সিনেমার প্রোজেকশনের দোষে। যে সিনেমায় সিনেমাস্কোপ দেখান যায় না, সেখানে এই ছবিটি দেখিয়ে আনন্দের পরিবর্তে দর্শকদের চোখ পীড়িত করেছে। উদ্যোক্তাদের এ ব্যাপারে আগে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

বেট্যার্ট

ফিল্ম ও পাব নামক নবগঠিত এক সংস্থার প্রযোজনায় দুই রীলের ছবি 'বেট্যার্ট' গত ৭ই এপ্রিল সংবাদপত্রের চলচ্চিত্র পর্যালোচকদের দেখান হয়েছে। ছবিটি পরীক্ষামূলক এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এক শিশুর চোখ দিয়ে ছবিতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে—সমাজের বৈষম্য ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে। এক ভিক্ষাজীবী মায়ের প্রাণোচ্ছল শিশু, সারি সারি মোটরের মধ্যে যার আনন্দ, সেই গাড়ি যারা চালায় তাদের নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে এই সরল শিশুমনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার মনে প্রশ্ন জাগে—কেন, কেন এই নিষ্ঠুরতা?

ছবিটি উদার মানবিক আবেদনের। এতে আছে প্রশ্ন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে এই প্রশ্নের উত্তরণ খুঁজে প্রকাশ পায় নি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিজয় রায়চৌধুরী।

মুক্তিস্নান

কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ নিবেদন "মুক্তিস্নান" শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরায় আসন্ন মুক্তি-প্রতীক্ষায়। শক্তিপদ রাজগুরু রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। সুর দিয়েছেন—রাজেন সরকার। গীত রচনা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। চরিত্রলিপিতে আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, কালী ব্যানার্জী, পাহাড়ী সান্যাল, ললিতা চ্যাটার্জী, ছায়া দেবী, জহর রায়, হরিধন, শ্যামল ঘোষাল, গীতা দে, মাঃ মলয় প্রমুখ। রাধারাণী পিকচার্সের শ্রেয়সী, নতুন জীবন, বালুচরী দর্শকদের প্রশংসালাভ করেছিল। কাহিনী-বৈচিত্র্যে ও সামগ্রিক সাফল্যে "মুক্তিস্নান" পূর্ব জনপ্রিয়তা রক্ষা করবে আশা করা যায়। ছবিটির পরিবেশনা দায়িত্ব নিয়েছেন নর্মদা চিত্র।

"রূপসী"র চিত্রগ্রহণ শেষ

গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত এ আর সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি নৃত্য-গীত-বহুল "রূপসী"র চিত্রগ্রহণের কাজ অজিত গাঙ্গুলীর পরিচালনায় শেষ হয়ে গেছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। অনিল বাগচীর সুরসৃষ্টি ছবিতে এক মাদকতা সৃষ্টি করবে। গীত রচনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, রামানন্দ সেনগুপ্ত ও শিবসাধন ভট্টাচার্য। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সন্ধ্যা রায়, কালী ব্যানার্জী, অনুভা ঘোষ, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, জহর রায়, সুতপা চক্রবর্তী, খুই ব্যানার্জী, চিন্ময় রায়, মণি শ্রীমানী, চুমকী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোঃ, নৃপতি চট্টোঃ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, গুপী গাইন বাঘা বাইন-খ্যাত তপেন চ্যাটার্জী ও শক্তিপদ প্রমুখ। রূপসীর প্রায় অংশই স্টুডিও চত্বরের বাইরে বীরভূমের

'মুক্তিস্নান' ছবিতে অনিল চ্যাটার্জী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

'রূপসী' ছবিতে কৃষ্ণ ভজ ও সন্ধ্যা রায়

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তোলা হয়েছে। কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু হল চাষ আর চাষীকে নিয়ে। এরই মধ্যে আছে নাচ-গান-প্রেম প্রীতি। ঝুমুর নাচ-গান, বীরভূমের বাউল, কবির লড়াই। এজ-এ ফিল্মস ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

নববর্ষ উৎসব

নিখিল বঙ্গ উৎসব সমিতির 'গার্ডেন-রীচ' কেন্দ্রের বর্ষবরণ উৎসব গার্ডেন-রীচ তরুণ তীর্থের পরিচালনায় গার্ডেন-রীচের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্মিলিতভাবে পালন করা হয়। গাম্ভীর্য-পূর্ণ পরিবেশে সমবেত পাঁচ শতাধিক বালক-বালিকা নববর্ষের সংকল্প গ্রহণ করে। পতাকা অভিবাদন, সমবেত ব্যায়াম, দেশবরেণ্য মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়। সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীদুর্গাদাস সরকার মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীনীহারবিধি পাল।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে এই উৎসবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন যে, সুখের কথা ভাবলে চিরন্তনকে পাওয়া যায় না। যে সংকল্প আজ গ্রহণ করা হল তা পালন করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

রবীন্দ্রসদন আগামী ৭ই থেকে ১৯শে মে '৭০ পর্যন্ত এগার দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদযাপনের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। ৯ই মে সকালে রবীন্দ্র-সদন প্রাঙ্গণে বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী ও বিশিষ্ট গুণিজনের কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হবে। সদনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে কলকাতার প্রতিষ্ঠ সংস্থা রঙ্গসভা, রবীন্দ্রভারতী, বৈতানিক, মাস থিয়েটার্স, সুর মন্দির, সঙ্গীতচক্র, রবীন্দ্র কলাকেন্দ্র, মল্লার, সৃজন, গীতমালিকা, সুর সপ্তরন ও উদয়শঙ্কর ব্যালে ট্রুপ প্রমুখের অংশগ্রহণে এই উৎসব সংগঠিত হচ্ছে, তার মধ্যে একদিন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত-শিল্পি সমন্বয়ে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত আসরের বিশেষ ব্যবস্থাও থাকছে।

হাঙ্গেরীয়ান চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল সম্বর্ধিত

হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে যে চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসেছিলেন, ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ স্মল নিউজ পেপার এ্যাসসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্বর্ধনা জানান হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি দলের মিস ইলোনা কাল্লাই, মিঃ ক্রিগীস্ বানে ভাষণ দান করেন।

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের পক্ষ থেকে হাঙ্গেরীয়ান চলচ্চিত্র প্রতি-নিধি দলকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানান হয়।

'মস্কোর রেড স্কোয়ার

"মস্কোর রেড স্কোয়ার"—এই নামে এক নতুন ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক চলচ্চিত্র সম্প্রতি ভাসিলি ওর্দিনস্কির পরিচালনায় তোলা হচ্ছে। ছবির চিত্র-নাট্যকার ইউলি দানস্কি ও ভালেরি ফ্রিদ তাঁদের এই রচনার জন্য চলচ্চিত্রে লেনিন স্মৃতি প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন।

ভি আই লেনিনের স্মৃতি-সৌধ-যুক্ত রেড স্কোয়ার আজ সোভিয়েট ক্ষমতার অবিনাশী প্রতীকে পরিণত। স্বভাবতই ছবিতে রেড স্কোয়ারের দৃশ্যাবলী মুখ্য স্থান অধিকার করেছে।

ছবিতে বর্ণিত হয়েছে লেনিনের নেতৃত্বে কিভাবে নিয়মিত লালফৌজ সংগঠিত হয়েছিল। অতীতে বসন্তের একটি দিনে এই স্কোয়ারেই লেনিন নব-গঠিত লালফৌজের সৈনিকদের সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে এই শপথবাক্য গ্রহণ করান : "রুশ সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের জন্য, সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক সংহতির জন্য আমার সমস্ত শক্তি ও জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার আমি নিচ্ছি।"

ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিশিষ্ট শিল্পী সের্গেই ইয়াকভ্লেভ। ইনি বহু বছর পূর্বে লেনিনস্কি কমসোমল থিয়েটারের "ফ্যামিলি" নাটকে লেনিনের ভূমিকায় রূপ দেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের "দি ক্রেমলিন চাইমস" নাটকেও তিনি লেনিন চরিত্রে রূপ দেন।

ছবিটি এখন দ্রুত সমাপ্তির ও মুক্তির পথে রয়েছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

খ্যাতনামা ক্রিকেট লেখক নেভিল কার্ডাস একবার স্কোর বোর্ডকে গাধার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল স্কোর বোর্ডে শুধু রানটাই লেখা থাকে। কিন্তু সেই রানের পেছনে যে রোমাঞ্চকর অথচ মোহময় দৃশ্যের অবতারণা হয়, ক্রিকেটামোদে ভরপুর যে অভাবনীয় এবং উত্তেজনা ও উন্মাদনায় ভরা সময়টা দর্শকরা প্রতি পলে পলে উপলব্ধি করেন—তার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না স্কোর বোর্ডে লেখা-থাকা রানগুলির মধ্যে। তাই স্কোর বোর্ড গাধাই।

দলীপ সিংজীর খেলা দেখার সৌভাগ্য এ দেশের খুব কম লোকেরই ভাগ্যে জুটেছে। যাঁরা দলীপের খেলা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন, দলীপ কি বস্তু। ক্রিকেটের মহানায়ক রণজিৎ সিংজীর যথার্থই উত্তরসূরী প্রিন্স দলীপ সিংজী। তাঁরা জানেন দলীপের 'ব্যাটিং' দেখার আনন্দ কি। অমন তৃপ্তিদায়ক, অমন আনন্দঘন খেলা আর কেউ খেলেন নি—আর তো কেউ খেলতে পারেন নি।

দলীপের খেলার মেজাজ ছিল যে আলাদা। পঞ্চাশ কিম্বা একশ' রান করা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। মধ্যাহ্ন-ভোজের আগে শতরান করতে তাঁর একটুকুও বাধে নি। শুধু তাই নয়, একদিনে তিন শ'রও বেশি রান করে দলীপ ক্রিকেট খেলায় তাঁর দক্ষতার যে নজীর রেখেছেন, তার তুলনা মেলা ভার।

কিন্তু আমরা যারা দলীপ সিংজীর খেলা কখনো দেখি নি, আমরা যারা ব্যাট-হাতে দলীপ সিংজীর সেই মোহময় মূর্তি দেখি নি—সেই আমরা যদি দলীপের রানসংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাই, তা হলে আমাদেরও নেভিল কার্ডাসের মতোই চোখ বুজে বলতে হবে 'স্কোর বোর্ড গাধাই....।

অদৃষ্টের জন্যে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে ক্রিকেট মাঠ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন দলীপ। সকালের সূর্য তখন মধ্যাহ্নের আকাশেও পৌঁছয় নি, তখনো সে ফুল মেলে নি পাপড়ি। অথচ তারই গন্ধে, তারই বর্ণে, তারই মাদকতায় সমস্ত ক্রিকেট-জগৎ তখন মাতোয়ারা।

তাই দলীপ সিংজীর অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তটি ছিল পেয়ে হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ, সেই জ্বালা, সেই অপরিসীম যন্ত্রণাবোধের পরিচয় কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়ার্নার সাহেবের হাহাকারে।

আঠাশ কি অবসর গ্রহণের একটা বয়েস নাকি? কিন্তু অসুখ তো বয়েস মানে না। অকালে ঝরা-ফুলের মতো দলীপকে তাই অসহায়ের মতো সরে দাঁড়াতে হলো ক্রিকেট মাঠ থেকে।

কিন্তু এ দুঃখ স্যর পেলহাম ওয়ার্নার রাখবেন কোথায়? তাই তিনি বলেছিলেন—

"...দলীপকে ক্রিকেট মাঠে দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপ যে কতো বড় তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। মহান রনজির যোগ্য উত্তরসূরী দলীপ ব্যাটস-ম্যান হিসেবেও যেমন বড় ফিল্ডসম্যান হিসেবেও তাই। গুগলি বল খেলার কৌশল দলীপের চেয়ে আর কেউই ভালভাবে আয়ত্তে আনতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি না। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দলীপের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। মানুষ হিসেবেও তাঁকে আমরা চিরদিন মনে রাখবো। অমায়িক চরিত্র ও মার্জিত স্বভাবগুণে দলীপ সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়...।"

দলীপ চরিত্রের স্বরূপ মাত্র কয়েকটি কথায় ওয়ার্নার সাহেব যেভাবে উদ্ঘাটন করে গেছেন—ঠিক তেমনটি আর কেউ করতে পারেন নি। খেলোয়াড় দলীপ এবং মানুষ দলীপকে কতো সহজেই না চিনিয়ে দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু খেলোয়াড় দলীপের পরিচয় খুঁজতে আমরা যদি রানসংখ্যার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিই তা হলে কিন্তু আমাদের ঠকতে হবে।

কারণ তাঁর সংক্ষিপ্ত খেলোয়াড় জীবনে দলীপ অংশগ্রহণ করেছেন মাত্র ১২টি টেস্ট খেলার ১৯টি ইনিংসে। প্রথম আবির্ভাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী সহ মোট তিনবার শতরান করার গৌরব অর্জন করেছেন। পঞ্চাশ রানের বেশি করেছেন পাঁচবার। টেস্ট খেলায় করেছেন মোট ৯৯৫ রান— ইনিংস প্রতি যার গড় হিসেব দাঁড়ায় ৫৮·৫২।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় দলীপের সংগ্রহ মোট ১৫,৩৩৫ রান। তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান একদিনেই করেছিলেন

অবনমন

এবারের হকি লীগের পালা প্রায় শেষ হয়ে এলো। চ্যাম্পিয়ানশীপ কিম্বা রানার্স আপের প্রশ্ন মোটামুটি মিটেছে। কিন্তু অবনমনের প্রশ্নে এখন অনেকগুলি দলের অনেক রকমের তৎপরতা প্রকট হয়ে বড় বিশ্রীভাবে যেন সকলের চোখে পড়ছে। এ অবশ্য কলকাতা ময়দানের কিছু আর নতুন জিনিষ নয়। পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়া, পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি কলকাতার ময়দানী খেলাধুলার একটি অত্যন্ত পুরোন রোগ। এই রোগের প্রকোপে খেলাগুলো অনেক সময় ছেলে-খেলায় পর্যবসিত হয়। আর এরই জের টেনে নেপথ্যে যে আরো অনেক কিছুর কারবার চলে, সে কথা আজ ক্রীড়ারসিক-মাত্রেরই জানা। এই রোগটা কিন্তু বড়ই সংক্রামক। এতে আক্রান্ত হন যেমন ক্লাব কর্তৃপক্ষরা, তেমনি খেলোয়াড়রা; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আরো কেউ কেউ—যাঁরা খেলাধুলোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফুটবল খেলার ক্ষেত্রেই এই রোগের আক্রমণ যস থেকে বেশি। ফুটবল মাঠে চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্ন থেকে আরম্ভ করে অবনমনের সম্ভাবনা ঘিরে চলে এই কারবার। শুধু মাত্র বিষদৃশ নয়, এই ব্যাপারটা খেলাধুলোর মান নিম্নমুখীই করে দেয়। তাই মনে হয়, খেলাধুলোর স্বার্থেই এই দিকটার দিকে এখন নজর দেওয়া দরকার। কারণ আমাদের দেশে খেলাধুলোর মান দিনের পর দিন নেমেই চলেছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি থেকে আরম্ভ করে সব খেলারই অবস্থা এখন সঙ্গীন। সব খেলাতেই আমরা পিছিয়ে পড়ছি। ফুটবলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো মান আজো আমরা অর্জন করতে পারি নি। ক্রিকেটে আমাদের অবস্থা শোচনীয়। অস্ট্রেলিয়া যে সত্যিকারের দুর্বল দল, তার প্রমাণ সাউথ আফ্রিকারই দিয়েছে—কিন্তু সেই দুর্বল দলের বিরুদ্ধেও আমরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারি নি। হকি খেলায় এতোদিনের কৌলিন্যও আমরা হারাতে বসেছি। অথচ সেদিকে আমাদের কারোরই নজর নেই। আমরা যাঁরা নিজেদের ক্রীড়ারসিক বলি, তাঁরাও এই ব্যাপারে উদাসীন—তা না হলে আমরা কি আর দিনের পর দিন দেশের মান-সম্মান ডুবিয়ে খেলাধুলো নিয়ে যে ছেলেখেলা চলছে তাকে মেনে নিতে পারতাম, না, প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতাম আমরা? কিন্তু তা আমরা হই নি। আমাদের নজর ঐ ক্লাবটুকু পর্যন্তই। আমাদের ক্লাব ট্রফি পেলেই আমরা সন্তুষ্ট। ক্লাবের ওপরে দেশের স্থান আজো আমরা দিতে পারি নি। তাই আজো চলেছে এই অরাজকতা, চলেছে মাঠ-ময়দানে খেলার নামে ছেলেখেলার কারবার। সত্যিই কি এর কোন প্রতিকার নেই? আমরাও কি এই ব্যাপারে এগিয়ে যেতে পারি না......? —শান্তিপ্রিয় ॥

অনেক উত্তাপ, অনেক উত্তেজনা আর অনেক গোলমালের পালা চুকিয়ে এ বছরের প্রথম ডিভিশন হকি লীগের খেলা এখন শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে। মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরেই লীগ খেলার ওপর পড়বে ইতির দাঁড়ি। তবে বেটন কাপের খেলা তখন আবার আসর জাঁকিয়ে বসবে।

যাই হোক, এ বছরের প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্ন অনেকদিন আগেই মিটেছে। রানার্স আপের প্রশ্নও। তাদের খেলাও প্রায় শেষ। এ বছরের মত তারা সন্তুষ্ট। তবে বেটন কাপ আরম্ভ হলো বলে, তাই চলেছে বড় বড় শিবিরে ভারতের

॥ ইনামুর রহমান ॥
এবারের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা বেটন কাপের খেলায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি।

কিন্তু কোন্ দল প্রথম বিভাগ থেকে নেমে যাবে? এই প্রশ্ন ঘিরেই হকির মাঠগুলোতে এখন যা কিছু আকর্ষণ আর উত্তেজনা বজায় আছে। কিন্তু পয়েন্ট নিয়ে যে রকম চোরা-গোপ্তা লেন-দেন চলেছে তাতে খেলার আকর্ষণ এবং উত্তেজনা বিন্দু-বিসর্গও থাকছে না।

ফলে হকি লীগের শেষের দিককার খেলাগুলো এখন অনেকটা ছেলে-খেলায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই ছেলে-খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। এবার বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গেই অবনমনের প্রশ্ন জড়িত।

তাই কলকাতার হকি লীগের বাজার এখন বেশ সরগরম। নরম হতে এখনো লাগবে কয়েকদিন সময়। আর খেয়াল করলে তখন হঠাৎই বোঝা যাবে যে, হকি লীগের আসর এবারের মত শেষ। ময়দানী হকির শেষ অনুষ্ঠান বেটন কাপ তখন বিবি আসর জমিয়ে বসেছে।

তবু চ্যাম্পিয়ানশীপের পরেই অবনমনের বিষয়টিই আজ হকি-উৎসাহীদের কাছে একমাত্র আকর্ষণীয় বিষয়।

গল্প হলেও সত্যি

১৯২৭ সাল। ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়েছে ব্রিসবেনে। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক চ্যাপম্যান টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে করলেন ৫২১ রান। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার রানের জন্যে কোন ভাবনা নেই। কেন না, দলে রয়েছেন উডফুল, পন্সফোর্ড-এর মত খেলোয়াড়। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। প্রথম ওভারেই উডফুল লারউড-এর একটি বলে খোঁচা লাগালেন। সেকেণ্ড শ্লিপ এবং গালীর মধ্য দিয়ে বলটা চলে যাচ্ছিল। চ্যাপম্যান তখন গালীতে ফিল্ডিং করছিলেন। তিনি মাটিতে শুয়ে পড়ে কিছুটা শ্লিপ করে সেকেণ্ড শ্লিপের কাছাকাছি এসে ক্যাচটি ধরে ফেলেন। ফলে উডফুল শূন্য রানে বিদায় নিলেন। আর পরের ওভারেই লারউড পন্স-ফোর্থকে মাত্র দু' রানের মাথায় বোল্ড আউট করে দিলেন। ফলে অস্ট্রেলিয়ার আশা নিরাশায় পরিণত হলো।

দলের সবাই আউট হয়ে গেলেন মাত্র ১২২ রানে।

কিন্তু চ্যাপম্যান অস্ট্রেলিয়াকে ফলো-অন না করিয়ে আবার নিজেরা ব্যাট করলেন এবং আট উইকেটে করলেন ৩৪২ রান।

দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া করলো মাত্র ৬৬ রান। ফলে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরে গেল ৬৭৫ রানে।

এই মরশুমের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া হারে ৮ উইকেটে, তৃতীয় টেস্টে ৩ উইকেটে ও চতুর্থ টেস্টে ১২ রানে। —[illegible]

[illegible], [illegible]।

সমাচার দর্পণ

ভারতীয় টেনিস জগতে আর কৃষ্ণাণের জুড়ি অর্থাৎ কৃষ্ণাণের মত ক্ষমতাধারী খেলোয়াড় আর কেউ নেই। কৃষ্ণাণ ছাড়া আজো যে ভারতীয় দল কানা, তার প্রমাণ আবার নতুন করে পাওয়া গেল। পাকিস্তানের পর ভারত এবার খেলবে সিংহলের বিরুদ্ধে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে ভারত সে খেলায় জিতবে। আর এও ধরে নেওয়া হয়েছে যে অন্য গ্রুপটি থেকে অস্ট্রেলিয়া উঠবে ফাইন্যালে। তখন ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রতি-দ্বন্দ্বিতার আসর বসবে। আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্যেই রমানাথন কৃষ্ণাণ আবার ফিরে এসেছেন ভারতীয় দলে। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণাণের ওপরেই

॥ ভেঙ্কটরাঘবন ॥
তামিলনাড়ুর 'স্পোর্টসম্যান অফ দি ইয়ার' মনোনীত হয়েছেন।

ঐ খেলায় পড়বে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার।

* * *

এ বছরের 'ভারত-কেশরী' ও 'ভারত-কুমার' কুস্তি প্রতিযোগিতা এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে দিল্লীর করপোরেশন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। গত বছরের আসল লড়াইটা হয়েছিল মহারাষ্ট্র-কেশরী চম্পা মুটনেল ও ভারত-কেশরী চান্দিরামের সঙ্গে। লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত গত বছরের সেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ বোধহয় এবারও এঁরা দু'জনেই টানবেন। এই প্রতিযোগিতায় এবার মেহেরদিনও উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এ ছাড়া আছেন হরিয়ানা-কেশরী রামধন, উত্তর-প্রদেশ-কেশরী জনার্দন, রাজস্থান-কেশরী তেজ সিং, হিন্দ-কেশরী সোকং সিং (সি আর পি), আগ্রার তেজ সিং, [illegible] বাবা হরি সিং ও [illegible] নির্মল সিং। যাই হোক, ভারত-কেশরী চান্দিরাম এবারও তাঁর আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন কিনা, সেইটাই দেখার বিষয়।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিশহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

উত্তর : কম বয়সে টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন তো অনেক খেলোয়াড়ই। এর মধ্যে বিজয় মেহেরা, মুস্তাক মহম্মদ, নসিমুল গণি, নীল হার্ভে প্রমুখ খেলোয়াড়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এই তালিকায় আরো অনেকেই আছেন,

অমল দত্তরায় (লাবান, শিলং)

প্রশ্ন : চাঁদু বোরদের টেস্ট সেঞ্চুরী ক'টা?

উত্তর : পাঁচটা।

এম সওকত জমান (রুশমোনা, রায়না, বর্দ্ধমান)

উত্তর : ফুটবল খেলার সময়ই ফুটবলের ওপর বিশেষ আলোচনা থাকে। যে ঠিকানায় দিয়েছেন ঐ ঠিকানায় চিঠি দিলেই চলবে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলো বিভাগটা আপনাদের ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

প্রবীর সর্বজ্ঞ, পঙ্কজ মুখোটী, ভাস্কর ভট্টাচার্য ও হরিনাথ মুখোটী (বরাহনগর, নেতাজী কলোনী, কলকাতা—৫০)

প্রশ্ন : অস্ট্রেলিয়ার ক্লিমহিল, ইংলণ্ডের ডেক্সটার, এডরিচ, ভারতের উমরিগড় ও সি· কে· নাইডুর ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেস্ট	রান	সর্বোচ্চ	শতরান	গড়
ক্লিমহিল	৪৯	৩৪১২	১৯১	৭	৩৯·২১
ডেক্সটার	৫৩	৩৮৬২	২০৫	৮	৪৭·০৯
এডরিচ	৩৯	২৪৪০	২১৯	৬	৪০·০০
উমরিগড়	৫৯	৩৬৩১	২২৩	১২	৪২·২২

সি· কে· নাইডুর এ্যাভারেজ 'খেলার রাজার রাজা' লেখায় পাবেন।

অমিয় সরকার (বি ১/৩৬ কল্যাণী, নদীয়া)

উত্তর : রান নেবার জন্যে যদি ব্যাটসম্যান তাঁর ক্রীজ ছেড়ে দিয়ে অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছোন এবং নন-স্ট্রাইকার বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে থান এবং সেই সময় ব্যাটসম্যানের দিককার উইকেট বল মেরে ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানই আউট হবেন।

জ্যোতি দত্ত (বনগ্রাম, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনার চিঠি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

কৃষ্ণা দাস, রেণুকা দাস, অশোক, প্রবীর, সুজিৎ, কাশীনাথ ও মঞ্জু দাস (শহীদনগর, কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর এর আগে বেশ কয়েকবার সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশ করা হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

পূর্ণেন্দুকান্তি দাস (ধর্মনগর, ত্রিপুরা)

প্রশ্ন : বোলার বল করলেন, ব্যাটস্‌ম্যান বলটাকে খুব উঁচু করে মারলেন, তারপর রান নিতে শুরু করলেন। দু'টি রান সম্পূর্ণ হবার পর একজন ফিল্ডার বলটা লুফে নিলেন। ব্যাটসম্যানরাও আউট হলেন। এক্ষেত্রে ঐ রান দু'টি কি ব্যাটস্‌ম্যানের সংগে যোগ হবে?

উত্তর : না, হবে না।

...রঞ্জিৎ ও রবীন্দ্রজ্যোতি ... বি রোড, জোড়হাট-১)

উত্তর : ব্যাটস্‌ম্যানরা—তা তিনি স্ট্রাইকারই হোন কিম্বা নন-স্ট্রাইকারই হোন—কোন সময়েই তাঁরা ফিল্ডারদের বিরক্ত কিম্বা অসুবিধা সৃষ্টি করে তাঁদের বিরত করতে পারবেন না। করলে 'আনফেয়ার খেলা' হবে আর ক্যাচ ধরার সময় অসুবিধে সৃষ্টি করলে তো 'অসুবিধে সৃষ্টির জন্যে আউট' নিয়ম অনুসারে 'আউট'ও হয়ে যেতে পারেন ঐ ব্যাটস্‌ম্যানটি।

সেন্টু ও অলক (লামডিং, আসাম)

প্রশ্ন : এবারের বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোন্ দল ভালো? আমাদের মনে হয় এবার ব্রাজিল দলই ভালো।

উত্তর : ব্রাজিল তো নিশ্চয়ই ভালো—তবে আরো ক'য়েকটি ভালো দল আছে।

সুব্রতা চ্যাটার্জী (ডিফেন্স কলোনী, নিউ দিল্লী)

উত্তর : ভেংকটরাঘবনের ঠিকানা আগেই প্রকাশ করা হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই। ওয়ালটারস্ আর ম্যাকেঞ্জির ঠিকানা আপনি দিল্লীর অস্ট্রেলিয়ান এ্যাম্ব্যাসিতে ফোন করে কিম্বা চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন যে কোন সময়ে।

টুনু, পিন্টু, ধ্রুব ও প্রবীর (নস্করপাড়া রোড, কলকাতা-৪১)

উত্তর : অনেক খেলোয়াড় আহত ছিলেন বলে মোহনবাগান ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

সম্পাদিকা—[illegible] সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

এ. সরকার এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 30th April, 1970

আইনের শাসন

সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান যে সব কথা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাজ্যপালের ঐ সব কথা বিচার-বিবেচনা করলে বোঝা যায়, জনসাধারণের কল্যাণ আনয়নে তিনি যেমন সজাগ, তেমনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাতে কল্যাণ আসে সে ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট।

রাষ্ট্রপতি-শাসনের ফলে এক শ্রেণীর জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জনকল্যাণের কাজ যেটুকু এগিয়েছিল, তা বজায় থাকবে কি না? ঐ প্রসঙ্গে শ্রীধাওয়ান বলেছেন, বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে সুনির্দিষ্ট অধিকারাদি পেয়েছে, তা রক্ষা করা হবে। উপরন্তু অপরদিকে এই রাজ্যে আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠা করতে তিনি বদ্ধপরিকর, সে কথা জানিয়েছেন।

ভূমি-সমস্যাটি নিঃসন্দেহে একটি কঠিন সমস্যা। প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার অনেক বেআইনী জমি উদ্ধার করেছে এবং তা বিলিবণ্টনও করা হয়েছে। জমি উদ্ধার প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের মধ্যে গভীর মতানৈক্য না থাকলেও, তা সর্বত্রই আইনানুগ ও যথোচিত হয়েছে কি না, সে সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন ছিল। ইদানীং এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, উদ্ধার করা বহু জমি আবার পুরাতন মালিক কেড়ে নিতে সুরু করেছে। এমন হওয়ার কারণ একটিই হতে পারে যে, ঐ জমি আইনসম্মত উপায়ে উদ্ধার করা হয় নি।

ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য উপদেষ্টাদের সঙ্গে রাজ্যপালের প্রথম বৈঠকে ছ'টি বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ঐ সিদ্ধান্তগুলি হল (১) [illegible] বেআইনী খাস জমি-গুলি দখল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (২) যেখানে একতরফা আদালতের ইনজাংশন ইত্যাদির জন্য খাস জমি দখলে সরকার বাধা পাবেন, সেখানে সরকার আদালতের ইনজাংশন তুলে নেবার জন্য আইন-সম্মতভাবে আদালতেই লড়বেন। (৩) এ পর্যন্ত যে খাস জমি সরকারের দখলে এসেছে, তা যথার্থ প্রাপককে অর্থাৎ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও দু' একরের কম জমির মালিক চাষীকে বিলি করা হবে। (৪) বেনামী ও সিলিংবহির্ভূত জমি খুঁজে বের করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হবে। (৫) বর্গাদারের স্বার্থ রক্ষায় সরকার সচেষ্ট থাকবেন। বর্গাদার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম সরকারী সাহায্য বর্গাদারকে দেওয়া হবে। (৬) খাস জমি এতদিন বাৎসরিক লাইসেন্সের ভিত্তিতে বিলি দেওয়া হ'ত। এইবারেই প্রথম ভূমিহীন কৃষক বা দু' একরের কম জমির মালিক চাষীকে খাস জমি স্থায়ী ও উত্তরাধিকার স্বত্ব সহ রায়তী স্বত্বে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

এই ছয়টি সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সহজ ব্যাপার নয়, কারণ আইনগত বাধাগুলি অতিক্রম করা প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে অতি দ্রুত সম্ভব হয় নি। বর্তমানে যে ছ' দফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তা কার্যকর হলে বর্গাদাররা উপকৃত হবেন এবং প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার যে কাজে হাত দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করা হবে। উপরন্তু আইনানুগ পন্থায় ভূমি সমস্যার সমাধান হলে বর্গাদাররা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। তা ছাড়া এই ধারণা জন-মানসে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেই রাজ্যপাল জন-কল্যাণমূলক কাজ করতে অগ্রসর হয়েছেন।

আর একটি সমস্যার কথাও শ্রীধাওয়ান উল্লেখ করেছেন,—তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে উৎপাদন-সমস্যা।

পশ্চিমবঙ্গে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নতিই কাম্য। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, পরস্পর দু' পক্ষই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। শ্রীধাওয়ান বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, সংবিধান এবং আইনে শিল্পের মালিককে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তিনি মালিক। আজ এই অধিকারের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের এবং মালিকদের একই শিল্পের অংশীদারের মনোভাব নিয়ে কাজ করা আবশ্যক।

ভূমি ও শিল্প-সমস্যা সমাধানে শ্রীধাওয়ান যে আইনানুগ পথেই চলতে চান—তা উপরে উক্ত তাঁর কথাগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। এবং তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তার জন্যে জনসাধারণের কাছে সাধুবাদ লাভ করবেন।

তবু দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। দেশব্যাপী আজ নানা দিকে নানারকম সমস্যা। যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, ঘরে ঘরে বেকার সমস্যা ইত্যাদি। এ কালে এক শ্রেণীর নৈরাশ্যপীড়িত যুবক প্রায় সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়েই বিশৃঙ্খলার পথ বেছে নিয়েছেন। সুতরাং ঐ সব সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যও দ্রুত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং তাদের মনে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আইনের শাসনের মাধ্যমেই সকলের সুখ শান্তি সম্ভব।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

প্রধানমন্ত্রী এরিক উইলিয়ামস্-এর পদত্যাগের দাবি ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে। ত্রিনিদাদের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ামস্ গদি নিয়ে গাড্ডায় পড়েছেন। দেশে ব্ল্যাক পাওয়ার আন্দোলন এমন তীব্র হয়েছে যে, তাকে আর আয়ত্তে আনা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ামস্ তাই ব্রিটেন, আমেরিকা, ভেনেজুয়েলা ইত্যাদি সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। নিজেদেরই স্বার্থে মার্কিনী নৌ-বাহিনী কিম্বা ইংরেজ সৈন্যদের হয়তো শিগ্গিরই পাঠানো হবে, যদিও প্যান-আফ্রিকান সেক্রেটারিয়েট প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে অনুরোধবার্তা পাঠিয়েছে যে কৃষ্ণাঙ্গ দমনে যেন তাঁরা কোন ভূমিকা না নেন।

একদা উইলিয়ামস্-এর প্রগতিশীল ভাবধারার পরিচয় পেয়ে দেশবাসী তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। সে ভাবধারা অভ্রান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর 'ক্যাপিটালিজম এ্যান্ড শ্লেভারী'—ধনতন্ত্রবাদ ও দাসপ্রথা বইটিতে। এ-বইয়ে উইলিয়ামস্ চমৎকারভাবে দেখিয়েছিলেন কীভাবে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ ও প্রসারের স্বার্থে দাসপ্রথাকে জীইয়ে রাখা হচ্ছে। আর সেই কট্টর ধনতন্ত্রবাদ ও দাসপ্রথাবিরোধীকেই কালক্রমে দেখা গেল তার স্তাবকের ভূমিকায়। এবং তাও আবার পরের শক্তির ওপর ভরসা করে।

উইলিয়মস-এর অদ্ভুত মতান্তরের কারণ কী? রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রবেশ অবশ্য সরল ছিল না, তিনি নানা ঘাট ঘুরে বহু ঘাট ছুঁয়ে তবে রাজনীতিতে এসেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এরিক উইলিয়ামস্ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা-বৈঠকেই অংশ গ্রহণ করেছেন, যেখানে ত্রিনিদাদ-টোবাগোর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে।

তবে উইলিয়ামস্ সেই 'আদর্শ' শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যা ভাঙিয়ে তিনি যে-কোন পেশায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন। ১৯১১ সালে তাঁর জন্ম, ত্রিনিদাদে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উইলিয়ামস্ উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। লেখাপড়ায় বরাবরই তিনি ভালো ছিলেন, প্রতিটি পরীক্ষায়ও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কাজেই অক্সফোর্ডে পড়ার দুর্লভ সুযোগ উপনিবেশবাসী এরিকের জুটতে দেরি হল না। অক্সফোর্ড থেকে ইতিহাসে ডক্টরেট লাভ করার পর ডঃ উইলিয়ামস্ আমেরিকা যাত্রা করেন। ওয়াশিংটনের হাওার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের পদ নিয়ে তিনি কর্মজীবন সুরু করেন ১৯৩৯ সালে। একটানা চললো ন' বছর, '৪৭

এরিক উইলিয়ামস্

সালে ডঃ উইলিয়ামস্ ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ পেলেন।

অধ্যাপনা, প্রচুর পড়াশুনো করে পাণ্ডিত্য অর্জনই হয়তো এরিক উইলিয়ামস্-এর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। যথেষ্ট পাণ্ডিত্য তিনি অর্জনও করেছিলেন, অধ্যাপনার কারণে খ্যাতিও। কিন্তু দেশের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনা করলে ত্রিনিদাদ-টোবাগোর কী কাজে তিনি লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা ছাড়ার ঝুঁকি অবশ্য ডঃ উইলিয়ামস্ নিলেন না, যখন তাঁকে অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যারিবিয়ান কমিশনের সদস্যপদ দেওয়া হলো। কিন্তু যেহেতু উপনিবেশে শিক্ষিত ব্যক্তির [illegible] সংখ্যা বেশি ছিল না, যেহেতু জনসাধারণকে পথ দেখাবার অভাব রয়েছে, সেহেতু উইলিয়ামস্‌কেই বার বার [illegible] গিয়েছে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে। কখনো তিনি উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, কখনো কৃষি কমিটির সেক্রেটারি, ক্যারিবিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

কিন্তু তাও নয়। অধ্যাপনা ছেড়ে প্রশাসন। এখানে না আছে শান্তি, না সোয়াস্তি। বরং বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ডঃ উইলিয়ামস্ যেন বদ্ধ জলাভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি পুরোপুরি রাজনীতির রণক্ষেত্রে এসে। পিপলস্ ন্যাশনাল মুভমেণ্ট বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নামে দেশে একটি রাজনৈতিক দলের পত্তন করলেন তিনি। বস্তুত পরাধীন নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মানুষের শাসনে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের জীবনচিত্র রেখেই তো জনতার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করতে হয়। এরিক ছিলেন সেদিন হাজার হাজার নিপীড়িত মানুষের মুক্তির প্রতীক। একই বছরে ('৫৬) ডঃ উইলিয়ামস্ দেশের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী হলেন, যদিও স্বাধীনতা তখনো অর্জিত হয় নি। দু'বছর বাদে ১৯৫৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফেডারেশন গঠিত হলে ডঃ উইলিয়ামস্ই আবার ত্রিনিদাদ-টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী হলেন।

এরিকের খ্যাতি তখন এতখানি ছড়িয়ে পড়েছিল যে, জাতীয় নেতা বলতে তাঁকেই বোঝাতো। কাজেই ফেডারেশন যখন ভেঙে গেল তখনও তাঁর দলই '৬১ সালের নির্বাচনে সহজে জয়লাভ করলো। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর পদ তাঁর অক্ষুণ্ণই রইলো। এমন কি ১৯৬২ সালে দেশ স্বাধীন হলেও দেখা গেল ডঃ এরিক উইলিয়ামস্ই তার প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ ১৯৫৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে দেশের সর্বময় কর্তার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এই পদেরই সুযোগ নিয়ে ব্রিটেন-আমেরিকার সঙ্গে তাঁর নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি দেখেছেন এই দুই বৃহৎ শক্তির সাহায্য ছাড়া তাঁর গদি রক্ষা করা অসম্ভব। কারণ ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে ব্রিটিশ ও মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থ এত বেশি যে, কার্যত দ্বি-দেশের স্বাধীন সরকারও এদের ডিঙিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। ডঃ এরিককে এই পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই তাঁর পদত্যাগের দাবি উঠেছে। কিন্তু উইলিয়ামস্ সেই উপনিবেশের সাহায্যেই গদি আঁকড়ে থাকতে সচেষ্ট।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(১০)

১৯২৮-এর পর থেকে অসাধারণ নেতৃত্ব-কৌশল দেখিয়ে জিন্না ঐতিহাসিকের প্রশংসা লুণ্ঠন করে নিতে পেরেছেন।[১৩] বৃটিশ সরকার খোলাখুলি জানিয়েছিল, ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বোঝাপড়া না হলে কোনো বড় রকমের শাসন সংস্কার ভারতে প্রবর্তিত হবে না। গান্ধীও তাতে রাজী হয়ে পড়েছিলেন—হাঁ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান না হলে ভারতে কোন সমস্যার সমাধানই হতে পারে না। জিন্না অদ্ভুত বুদ্ধি ও তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন এবং সেই পথে নিজেকে মুসলিম সমাজের মুখ্য নেতা ও মুসলিম লীগকে মুসলমানদের মুখ্য প্রতিষ্ঠানরূপে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতিও তিনি নিজেকে করে তুলেছিলেন।

১৯২৮ সালে জিন্নার প্রথম 'কৃতিত্ব' নেহরু রিপোর্টকে খানচাল করা। তারপরে সর্বদলীয় সম্মেলনে কলকাতায়

---

১৩ ডঃ রমেশ মজুমদার জিন্নার সুচতুর নেতৃত্বের সবিশেষ প্রশংসা করে বলেছেন—"In this clever manoeuvring for power, Muhammed Ali Jinnah stood head and shoulders over other Muslim leaders."

জিন্নার নেতৃত্ব সম্বন্ধে মাইকেল এডওয়ার্ডস এতখানি খোলা সার্টিফিকেট দিতে পারেন নি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬-৩৭-এর মধ্যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগঠিত হয়ে ওঠে এবং সে ব্যাপারে জিন্নার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ইনি স্বীকার করেছেন। এডওয়ার্ডসের মতে ব্যাপারটা এইরকম ছিল : "১৯৩৪ সালে লীগ নতুন এক নেতার দ্বারা পুনর্গঠিত হয়—তাঁর নাম মহম্মদ আলী জিন্না—তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম লীগের মধ্যে নিজের জন্য পূর্ণ কর্তৃত্বের একটি সিংহাসন নির্মাণ করা, যে-কাজটি পূর্বে কংগ্রেসের মধ্যে তিনি করতে পারেন নি। এইকালে জিন্না নিজেকে ভারতীয় আতাতুর্ক হিসেবে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে খুবই অস্পষ্টতা বজায় রেখেছিলেন। প্রথমে তিনি দ্বিজাতিতত্ত্ব হাজির করলেন, তার অর্থ, মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে কেবল ধর্মে ভিন্ন নয়, তাদের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বই আলাদা, অর্থাৎ তারা ভিন্ন একটি জাতি। এই পর্যায়ে মনে হয় না, জিন্না বাস্তবিকপক্ষে ভারত বিভাগের সম্ভাবনা দেখেছিলেন, কিন্তু তিনি মুসলিম লীগকে যতই অস্পষ্ট হোক, একটি 'আধুনিক' মতবাদ দিয়েছিলেন। নেতিবাচক ধর্মীয় আশংকার স্থানে একটি 'রাজনৈতিক' প্ল্যাটফর্ম—তাঁরই দান।

"সর্বশ্রেণীর কংগ্রেস নেতা জিন্নাকে দানব বিবেচনা করতেন। গান্ধীর কাছে জিন্না চ্যালেঞ্জস্বরূপ, তবে তখনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, কারণ গান্ধী সঙ্গতভাবেই মনে করতেন, মুসলিম জনসাধারণের মুখপাত্র জিন্না নন। নেহরু ও তাঁর মতাবলম্বীদের কাছে জিন্না প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রবিরোধী পাণ্ডা-ব্যক্তি যিনি ধর্মকে নিজ স্বার্থসাধনে ব্যবহার করছেন। কংগ্রেস প্রচার অনেক সময়ে ইঙ্গিত করেছে, জিন্না ইংরেজের কৌশলের সৃষ্টি। But Jinnah was not in the pay of everybody. He was taking a mortgage upon his own destiny. তিনি কেবল নিজের ভাগ্যের উপরই বাজি ধরেছিলেন। এই শীতল স্বভাব নিতান্ত পাশ্চাত্যপন্থী আইনজীবী নিজ বিরাটত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা করে নিয়েছিলেন—উদগ্রভাবে তারই স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, ইংলণ্ডে তিনি কীর্তি রাখতে পারবেন—এমন কি সেখানে প্রিভি কাউন্সিলার হবার আশা পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ এই elegant facade-এর পশ্চাদবর্তী সুপারম্যানকে দেখতে অসমর্থ ছিল। ভারতীয় মুসলমান ও তাদের সমস্যার বিষয়ে জিন্না সত্য-সত্যই আগ্রহী ছিলেন না। তিনি শুধু প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁকে যেন কোনোভাবে অগ্রাহ্য করা না যায়। তিনি সফলও হয়েছিলেন—'ভারতীয় স্বাধীনতার চাবিকাঠি' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

"ত্রিংশের দশকের মাঝামাঝি অবধি কংগ্রেস জিন্না সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিল না। তাঁর বিষয়ে এবং তাঁদের বিষয়ে কোনো নৈতিকতাবোধ, আত্মপ্রসাদসূচক মনোভাব জাগিয়ে রেখেছিল—সেই মনোভাব জিন্নার অবস্থাকে গুছিয়ে

তিনি মুসলমানদের পক্ষে যে দাবি করেছিলেন, তাকে আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করলেন দিল্লীতে ২৮শে মার্চ ১৯২৯ তারিখে লীগের অধিবেশনে—যা জিন্নার '১৪ দফা' বলে বিখ্যাত। এই সভার আগে তিনি সর্বদলীয় একটি মুসলমান সম্মেলনও ডেকেছিলেন। এই ১৪ দফা সাম্প্রদায়িক আবদারের ১৪টি মিনার বলে ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।১৪

১৯২৮-এ জিন্নার নতুন নেতৃত্ব আরম্ভ হলেও মুসলিম লীগ ও মুসলমান সমাজের উপরে পূর্ণ আধিপত্য অর্জন করতে জিন্নার আরও কয়েক বছর সময় লেগেছিল এবং এ ব্যাপারে গান্ধী-আন্দোলনের দ্বিতীয় ব্যর্থতা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। জিন্নার উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাও অধিকাংশ মুসলমানের কাছে তাঁকে বরেণ্য নেতা করে তুলেছিল। জিন্নার ১৪ দফা মুসলমানদের সকল দলের দাবিকে একত্রবদ্ধ করার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নয়।

প্রথম রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে (লন্ডনে অনুষ্ঠিত, সূচনা—১২ নভেম্বর, ১৯৩০) জিন্না অন্যতম মুসলমান প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন; সেখানে মুসলমানদের জন্য বিশেষ দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন; কিন্তু মুসলমান সমাজের আগা খাঁ এবং কংগ্রেসের গান্ধীর আড়ালে আচ্ছন্ন ছিলেন। যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করেন না বলে তৃতীয় কনফারেন্সে তাঁকে যোগ দিতে ডাকা হয় নি। তাঁর অবস্থা তখন "হ্যামস্টেড হীথে পদচারণারত অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজকর্মচারীর মত" যিনি "বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।" কনফারেন্সের আলোচনার গতিতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, অর্থাৎ যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারেন নি। এই ক্ষোভ তিনি অত্যন্ত তিক্তভাবে পরবর্তীকালে প্রকাশ করেছিলেন। আলোচনার সুরাহা না হওয়ার সমস্ত দোষ তিনি তাঁর রীতি অনুযায়ী হিন্দুদের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন, কিন্তু মহাদেব দেশাই লন্ডন থেকে পণ্ডিত নেহরুকে লেখা এক চিঠিতে (২৩-১০-১৯৩১) উল্টোদিকের ছবি খুলে ধরেছিলেন। জিন্না নাকি ব্যক্তিগত আলোচনায় বলেছিলেন, বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কী কী তাঁরা পাবেন তা না জানার আগে তাঁরা কি করে হিন্দুদের সঙ্গে মিটমাট করেন।১৫

রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পরে বৃটিশ

---

১৪ ১৪ দফা মোটামুটি নিম্নোক্ত প্রকার:

(১) ভাবী শাসনতন্ত্র ফেডারেল ধরনের হবে। 'রেসিডুয়ারী' ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলির হাতে।

(২) সকল প্রদেশের জন্য সমপ্রকার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকবে।

(৩) সকল আইনসভায় বা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সংখ্যালঘুদের জন্য অবশ্যই উপযুক্ত ও সক্রিয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে, তবে তার দ্বারা কোনো প্রদেশে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুতে বা সংখ্যাসমতায় পর্যবসিত হবে না।

(৪) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান-প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।

(৫) বর্তমানের মত পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনব্যবস্থা থাকবে। তবে যে-কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে যে-কোনো সময়ে যুক্ত নির্বাচনব্যবস্থার পক্ষে নিজেদের পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা পরিহারের অধিকার থাকবে।

(৬) কোনো সময়ে যদি প্রাদেশিক সীমারেখার পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা যায়, তবে তা কখনই এমন রূপ নেবে না যাতে পঞ্জাব, বাংলা বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান-সংখ্যাগুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

(৭) সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মবিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে; তার মানে সকলেই ধর্মবিশ্বাসের অর্চনা-অনুষ্ঠানের, প্রচারের, সংগঠনের এবং শিক্ষার স্বাধীনতা পাবে।

(৮) আইনসভায় বা কোনো নির্বাচিত সংস্থায় কোনো বিল বা প্রস্তাব পূর্ণভাবে বা অংশত পাশ করা যাবে না যদি কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য প্রস্তাবিত বিষয়টিকে নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা করে অগ্রাহ্য করে।

(৯) সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক করতে হবে।

(১০) অন্যান্য প্রদেশের মতই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

(১১) অন্যান্য ভারতীয়দের মত মুসলমানেরা যাতে সরকারী ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা-সাপেক্ষে উপযুক্ত অংশভাগ পায়—শাসনতন্ত্রে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, আইনকানুন, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তার জন্য সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত অনুদান থেকে উপযুক্ত ভাগ যাতে মুসলমানেরা পায় তার ব্যবস্থাও শাসনতন্ত্রে থাকবে।

(১৩) প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয়—কোনো মন্ত্রিসভাই অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম সদস্য না নিয়ে গঠিত হতে পারবে না।

(১৪) কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রদেশগুলির সম্মতি না নিয়ে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে পারবে না।

১৫ মহাদেব দেশাই লিখে পাঠিয়েছিলেন: "মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তারা যদি বাপুকে (মহাত্মা গান্ধীকে) না চায়, বাপুও আর তাদের দুয়ারে যাবেন না। দত্ত [ডঃ এস কে দত্ত] আমাদের একটা গল্প বললেন। গল্পটা শুনে তুমি নিশ্চয় কৌতুক বোধ করবে। ইংরেজ বন্ধু ক্যাম্বেল রোডস্-এর বাড়িতে সেদিন তাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন নিয়ে সেখানে আলোচনা হচ্ছিল। জিন্না তার আগে

[illegible] সরকার

> একটি কবিতার জন্যে কত ছোটাছুটি
> অথচ আমার কবিতার শাড়ির আঁচল ছেঁড়া,
> অঞ্জনহীন চোখের তলায় কালি—
> দেখলে মনে হয় সদ্য নবজাতকের জননী।
> কান্না তার চোখের সাথে আড়ি দিয়ে গেছে বহুদিন।
>
> শীর্ণ জীর্ণ গলা থেকে গালমন্দ অহরহ বেরয় ঠিকই
> কিম্ভূত-কিমাকার টিয়ার ঠোঁটের মত হাসি।
> কত বলি, এটা দেবো—সেটা দেবো—
> রাজকন্যার স্বপ্ন দেবো—মুঠোমুঠো সোনা দেবো
> ও খালি বলে—আমি মিছিলে যাবো।

সরকারের পক্ষে ১৭ আগস্ট, ১৯৩২-এ 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' ঘোষিত হয়। এই ব্যবস্থায়—শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, শিখ, খ্রীশ্চান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্বাচন রীতি প্রবর্তিত হয়। হিন্দুসমাজের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যবস্থা ছিল—অনুন্নত হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা—যার বিরুদ্ধে গান্ধীজী আমরণ অনশন করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় মুসলমানেরা মুসলিম-সংখ্যাগুরু প্রদেশ পঞ্জাব ও বাংলায় কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে আসন পায় নি, পঞ্জাবে বাড়তি আসন দেওয়া হয়েছিল শিখদের; বাংলায় মুসলমান ও হিন্দুদের আসন কেটে বাড়তি ভাগ দেওয়া হয়েছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে। হিন্দুদের দমনের কাজে এই মুসলমানদের পক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল এবং সেজন্যই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্যসংখ্যা ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মুসলমানদের খুশি করে নি, সে জন্য মুসলমানেরা কংগ্রেসের ও হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্য-সম্মেলনে বসতে রাজী হয়েছিল— বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল—মনে হয়েছিল যে, একটা বোঝাপড়া বুঝি হয়েই পড়ে, কিন্তু হয় নি, কারণ ইংরাজ সরকারের পক্ষ থেকে বেশি সুযোগদানের লোভ দেখিয়ে মুসলমানদের ফুসলে নেওয়া হয়েছিল। ঐক্য-সম্মেলনে স্থির হয়েছিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান আসন শতকরা ৩২ ভাগ নির্ধারিত থাকবে, ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর তাকে শতকরা ৩৩ ভাগের উপরে তুলে দেবার প্রস্তাব করলেন।[১৬] ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আর একটি আপোষ আলোচনাও ব্যর্থ হল।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচন। ১৯৩৫-এর আইনে প্রাদেশিক শাসনের ব্যাপারে কিছু কর্তৃত্ব দেশীয় লোকদের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ১৯৩৭-এর নির্বাচন খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল। জিন্না ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করলেও বিভিন্ন প্রদেশে প্রভাবশালী অন্য কিছু মুসলিম প্রতিষ্ঠান ছিল—নির্বাচনে সেই সব প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে বহু আসন অধিকার করেছিল। তার ফলে কংগ্রেস যেমন বেশি মুসলমান আসনে জয়লাভ করতে পারে নি, মুসলিম লীগও তার অহঙ্কৃত দাবির অনুরূপ সংখ্যায় আসন পায় নি। ডঃ রমেশ মজুমদার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে লীগের প্রভাব বেশি ছিল না, কারণ ঐ সকল স্থানে মুসলিম-আধিপত্য জনসংখ্যার কারণে নষ্ট হবার আশঙ্কা ছিল না। পরবর্তীকালে জিন্না যখন মুসলমানদের মধ্যে সর্বভারতব্যাপ্ত স্বার্থবোধ জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, তখনই লীগের প্রাধান্য সর্বত্র কায়েম হয়। [ক্রমশ]

বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছেন। মিঃ রোডস্ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, একমত হয়ে একটা সমাধান পেশ করে সরকারকে আপনারা নতিস্বীকারে বাধ্য করছেন না কেন? শ্যাম্পেনের মুখোচিত (!) প্রভাবে জিন্না তখন বললেন, "ঐখানেই তো আপনারা ভুল করেন। কী কী আমরা পাব তা না জানা পর্যন্ত কোনো সমাধান সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব নয়। সরকার আসলে ঘোড়ার সামনে গাড়ি জুড়ে দিচ্ছেন।" (পত্র গুচ্ছ)।

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের ব্যর্থতাকে জিন্না খুব তিক্তভাবে ১৯৩৮ সালে আলিগড়ের ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন:

"I received the shock of my life at the meetings of the Round Table Conference. In the face of danger, the Hindu sentiment, the Hindu mind, the Hindu attitude led me to the conclusion that there was no hope of unity. I felt very pessimistic about my country. The position was most unfortunate. The Mussalmans were like dwellers in 'No Man's Land' they were led by either the flunkeys of the British Government or the camp-followers of the Congress. Whenever attempts were made to organise the Muslims, toadies and flunkeys on the one hand, and traitors in the Congress camp on the other, frustrated the efforts. I began to feel that neither could I help India, nor the Hindu mentality; nor could I make the Mussalmans realise the pre position. I felt so disappointed and so depressed that I decided to settle down in London. Not that I did not love India, but I felt so utterly helpless." (Bolitho)

১৬. [illegible], তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮।
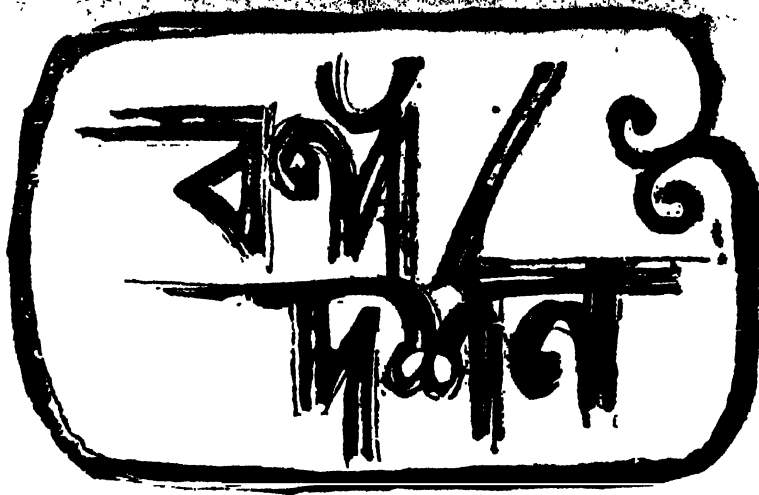
পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঙ্গে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। বিভিন্ন পথে মহামতি লেনিনের প্রতিকৃতি নিয়ে ভোরে প্রভাতফেরী বেরোয়; বাড়িতে বাড়িতে লাল পতাকা ওড়ে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র লেনিনের আলোকচিত্রে মাল্য অর্পণ অনুষ্ঠান চলে। কলকাতা মহানগরীর অনেক রাস্তায় লাল কাপড় দিয়ে বড় বড় তোরণও তৈরি হয়। অপরাহ্নে সুরেন্দ্র উদ্যানে সোভিয়েট দেশ থেকে পাওয়া প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন রাজ্যপাল শ্রী এস, এস, ধাওয়ান। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বলেন যে, এই প্রতিমূর্তিকে ভারতের জনগণের প্রতি সোভিয়েট জনগণের অকৃত্রিম প্রীতি ও ভালবাসার এবং শান্তি ও মৈত্রীর অম্লান প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সোভিয়েট কন্সাল জেনারেল শ্রী ভি, এ, মারকোভ বলেন, কলকাতার মর্মস্থলে প্রতিষ্ঠিত লেনিনের এই প্রতিমূর্তি হল ভারত-সোভিয়েটের মধ্যে মৈত্রীর প্রতীক। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান তাঁর ভাষণে বলেন যে, লেনিনবাদ সর্বহারার মতবাদ। তিনি গীতা উদ্ধৃত করে বলেন যে, শোষণ, অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামই প্রকৃত মানবধর্ম এবং লেনিন তাই পালন করেছিলেন, তাঁর মধ্যে কৃষ্ণের বিচক্ষণতা ও অর্জুনের শৌর্য-বীর্যের সমন্বয় হয়েছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় লেনিনের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ করে ভাষণ দেন। এস· ইউ· সি· নেতা ও প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে লেনিনের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারলেই জন্মশতবার্ষিকী পালন সার্থক হবে। ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সংসদ সদস্য ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত বলেন যে, লেনিন হচ্ছেন মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সন্তান। শ্রমিককে শ্রমিকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার শিক্ষা লেনিন কোন দিন দেন নি। সি· পি· এম দল সম্পর্কে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন যে, এদের কোন অধিকার নেই লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন যে, লেনিনের সত্যকার ভাবমূর্তি অনেকদিন আগেই আমাদের মধ্যে উন্মোচিত হয়েছে। মেয়রের অনুপস্থিতিতে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি সভার কাজ পরিচালনা করেন। ডেপুটি মেয়র শ্রীমণি সান্যালও শ্রদ্ধা জানান।

পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর স্থানেও লেনিন শতবার্ষিকী নানাভাবে প্রতিপালিত হয়েছে। অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলেই নিপীড়িত মানুষের এই মহান্ ত্রাতা, বিপ্লবী ও চিন্তানায়ককে বরণ করেছে। কার্যত মার্চ মাসটিই লেনিন শতবার্ষিকী উৎসবরূপে চিহ্নিত হয়েছে। ৯ই থেকে ১৫ই মার্চ কলকাতার রণজি স্টেডিয়ামে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি লেনিন শতবার্ষিকী সপ্তাহ পালন করেছেন। ষোল তারিখ থেকে শুরু হয়েছে লেনিন শতবার্ষিকী কমিটির সপ্তাহব্যাপী উৎসব। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পৃথকভাবে স্বতন্ত্র মণ্ডপে লেনিন বন্দনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে অনেক পত্র-পত্রিকা বিশেষ 'লেনিন সংখ্যা' প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত লেনিনকে নিয়ে ছয়টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবি গান, তর্জা ও কীর্তন গান রচিত হয়েছে ও গাওয়া হচ্ছে বাংলা লোকসঙ্গীতের আসরে। ভাবতে বিস্ময় লাগে, বাংলা দেশের মানুষের জীবনে লেনিন এত ওতপ্রোতভাবে কিভাবে জড়িয়েছেন। লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা দেশে যে উদ্দীপনা দেখা গেছে তার তুলনা মেলা ভার।

রাজ্যপালের প্রশাসন

রাষ্ট্রপতি শাসন যে কোন সমস্যারই সমাধান নয়, সে কথা আমরা এই বঙ্গ-দর্শনে ইতিপূর্বে কয়েকবারই বলেছি এবং পশ্চিমবঙ্গের মত একটা সমস্যা-কণ্টকিত রাজ্যের পক্ষে তা একেবারেই অচল। রাজ্যপাল যতই বিচক্ষণ লোক হোন না কেন। এক মাসের অনেক বেশি হয়ে গেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত অচল রাইটার্স বিল্ডিংস সচল হবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। এতদিনে অবশ্য রাজ্যপালের উপদেষ্টা-মণ্ডলী গঠিত করা সম্ভব হয়েছে, এবং সেখানেও দপ্তর বণ্টন নিয়ে রীতিমত কোন্দল হয়েছে, মুখ্য-সচিবের পদটিকে নিয়েও অনেক জল ঘোলা করা হয়েছে। আমলাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি যে দলীয় রাজনীতির চেয়ে কোন অংশে কম নয় তা এই গত এক মাসের নেপথ্য কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই বোঝা গেছে। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান বিচক্ষণ ব্যক্তি, ধর্মবীর যে ভুল করেছিলেন সে পথে পা বাড়াতে তিনি অনিচ্ছুক। তিনি প্রত্যক্ষ শাসনের ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চান, অর্থাৎ উপদেষ্টারাই বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনা করবেন এবং সাফল্য বা বিফলতার দায়িত্ব তাঁদের ওপরেই বর্তাবে। রাজ্যপাল এক্ষেত্রেও নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকায় থাকতে চান।

রাজ্য বিধানসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনসভা বিল লোকসভায় গৃহীত হয়েছে। বিলটি ইতিপূর্বেই রাজ্যসভায় গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালীন সংসদের একটি ষাট-জন সদস্যযুক্ত পরামর্শ কমিটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিযুক্ত থাকবেন। সংসদের দলীয় শক্তি অনুযায়ীই এই কমিটি গঠিত হবে, রাজ্য বিধানসভার

[illegible]

নীতি সম্পর্কে নয়। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ কতদিন হবে সংসদই তা নির্ধারণ করবে, কেননা, রাষ্ট্রপতির শাসন চালিয়ে যেতে হলে সরকারকে ছ' মাস পর-পরই সংসদের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

অবশ্য সমস্ত কিছুই আনুষ্ঠানিক। কার্যত আগামী দু' বছর পশ্চিমবঙ্গে নিয়মমাফিক রুটিন-ওয়ার্কই চলবে, অর্থাৎ প্রশাসনকে সচল করে রাখতে যেটুকু দরকার তার বেশি কিছু নয়। সদ্য-নিযুক্ত মুখ্য সচিব শ্রীসুকুমার মল্লিক যাঁর ওপর কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর সকল দায়িত্বই বর্তাচ্ছে, এই রকম ইঙ্গিতই দিয়েছেন। অর্থাৎ যদি ইতিমধ্যে কোন জনপ্রিয় সরকার গঠিত না হয়, না হওয়ারই সম্ভাবনা সর্বাধিক, আগামী দু' বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নামে মাত্রই চলবে, আমলাতন্ত্র কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা নীতি অনুসরণ করবে না।

চিকিৎসায় বৈষম্য

পি. জি. হাসপাতালের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে,

ভারত ব্যতীত আর কোন দেশে ধনী ও গরীব শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। পি· জি· হাসপাতালে পেয়িং এবং নন-পেয়িং রোগীদের চিকিৎসাগত পার্থক্যের কথা জানবার পর রাজ্যপাল ওই কথা বলেন। প্র্যাকটিসিং এবং নন-প্র্যাকটিসিং ডাক্তারদের প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, হাসপাতালের ডাক্তাররা বাইরের কাজ করেন—এটা একান্তই অসঙ্গত। শ্রীধাওয়ানের কাছে পি· জি· হাসপাতালের কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং সেই স্মারকলিপিতে বিভিন্ন দাবির মধ্যে গরীব রোগীদের প্রতি সুবিচারের প্রশ্নটিও ছিল। এরই উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, গরীব রোগীদের ভিন্ন চোখে দেখা উচিত নয়, কর্মীদের এই দাবি সঙ্গত দাবি, এটা কোন বিপ্লবী ব্যাপার নয়। অতঃপর রাজ্যপাল বলেন, "কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, যুক্তফ্রন্ট সরকারের তের মাসের শাসনকালে আপনারা কোথায় ছিলেন?"

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য শুধু যে পি· জি· হাসপাতালে বর্তমান তা নয়, সর্বত্রই। এই বৈষম্যের অবসান সত্যই হওয়া দরকার—এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, এটাই কি হাসপাতাল কর্মচারীদের মনের কথা? গরীব রোগীদের প্রতি তাঁদের যেটুকু কর্তব্য তার কতটুকু তাঁরা পালন করেন? আমরা শুধু পি· জি-র কথাই বলছি না, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হাসপাতালের কথাই বলছি। দেখা যায় যে, নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করার সময় কর্মচারীরা হতভাগ্য রোগীদের জন্য অনেক কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন। কিন্তু রোগীদের প্রতি যে কর্তব্য তাঁদের করা উচিত, ওই দরিদ্র রোগীদের কাছ থেকে নগদ পয়সা হাতে না পেলে তাঁরা কি তা করেন? হাসপাতালবাসের দুর্ভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা বিষয়টিকে হাড়ে-হাড়েই উপলব্ধি করেছেন। একটি বেড-প্যান পাওয়া যে হাসপাতালে কি বস্তু, শুধু এইটুকু দেখলেই অবস্থাটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। রোগী এক গ্লাস জল চাইলেও তার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। ওষুধ হাসপাতালে থাকলেও তা বাইরে থেকে কিনে দিতে হয়। নার্স, ওয়ার্ড বয়দের ওয়ার্ডে দেখা-সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে, যাদের পয়সা আছে তারা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দুজন আয়া যদি রাখতে পারে, তবেই তারা তৃষ্ণার সময় জল বা প্রয়োজনের সময় বেড-প্যানটা পেতে পারে। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, পয়সা খরচ না করলে হাসপাতালে কিছুই পাওয়া যায় না. উচ্চতর চিকিৎসক থেকে আরম্ভ করে [illegible] চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত কেউই এর ব্যতিক্রম নয়।

[illegible] অসহায় রোগীদের দোহাই দেওয়া হয়, কিন্তু সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করার মত লোক আজ আর নেই। হাসপাতাল ও চিকিৎসা নিয়ে এই বঙ্গদর্শনে লেখা তো বড় কম হয় নি, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। রাজ্যপাল অবশ্য বলেছেন যে, তিনি রোগীদের মধ্যে শ্রেণীভেদের এই রীতির পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হবেন। কতটা পারবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

যাঁরা আশা করেছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে তাঁরা হতাশ হয়েছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রাষ্ট্রপতির শাসনের গোড়ার দিকে পুলিশ কিছু বোমা আবিষ্কার করে স্টান্ট সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে অবস্থার কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, শুধু সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে। যে-সংবাদগুলি প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে স্থান পেত এবং যেগুলির দায়িত্ব প্রকারান্তরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর চাপানোর প্রয়াস পেত, সেই সংবাদগুলি এখন তৃতীয় বা সপ্তম পৃষ্ঠায় স্থান পায়, অনেক ছোট আকারে। নতুবা চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, গুণ্ডামী, খুন, শরিকী সংঘর্ষ সবই সমানে চলছে এবং তা চলছে পুলিশের নাকের ডগাতেই। এর ওপরে যুক্ত হয়েছে নকশালী ক্রিয়াকলাপ।

আসলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন উন্নতি বর্তমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে হবার নয়, হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবনে নানা বিক্ষোভ দীর্ঘকাল ধরে জমে আছে, নানা সমস্যার জটিল আবর্ত পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে আজ প্রচলিত অর্থে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ যাঁরা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন তাঁরা সমগ্র বিষয়টির দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের ওপর চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন, সমস্যার মূলে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক-দলগুলিও একে অপরের ওপর আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্টির দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েই [illegible] কলকারখানায় তালা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সেই সরকারের শ্রমনীতিকেই দায়ী করা হয়েছিল, পরে এক বছর রাষ্ট্রপতির শাসনের কালেও সে বন্ধ দরজাগুলি খোলা সম্ভবপর হয় নি, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমনীতি কারখানা বন্ধের অজুহাত হিসাবে ধরা হয়েছিল, কিন্তু তা তার কারণ ছিল না। আজকে রাষ্ট্রপতির শাসনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি, তার কারণ এই সমস্যার মূল প্রকৃতিটাই ভিন্নতর।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি নকশালপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি দেখে যে দাওয়াই-এর কথা রাজ্যপালের প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করছেন তাতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না, বরং নকশালপন্থীদেরই হিরো করে দেওয়া হবে। খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, নকশালপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত আইন-শৃঙ্খলার বিষয় হিসাবে দেখা হবে। অনুমান করা যায় যে, এদের জন্য একটি আটক-আইন রচনা করা হবে এবং সেই আইন অনুযায়ী কিছু লোককে জেলে পোরা হবে। কিন্তু এর চেয়ে ভুল রাস্তা আর কিছু হতে পারে না। কেননা, যে পুলিশ নকশালদের ধরবে তাদের আমরা চিনি, আসল লোকদের তারা কোনদিনই ধরতে পারবে না, কিছু নিরীহ লোককে খামোকা হয়রানি হতে হবে এবং এই ধরপাকড়ের ফলে নকশালপন্থী ক্রিয়াকলাপ তো কমবেই না বরং উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে। দ্বিতীয়ত আজ যে নকশালপন্থীরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে হামলা করছে তার ফলে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে কতদূর সিদ্ধ হচ্ছে, তাদের এটুকু ভেবে দেখার মত সময় দেওয়া প্রয়োজন। একটা গান্ধীজীর ছবিকে নষ্ট করলেই যে গান্ধীজীকে মুছে দেওয়া যায় না এবং বিশ্ব-বিপ্লবের পথ তাতে প্রশস্ত হয় না, এটুকু বুঝতে তাদের সময় দেওয়া উচিত। তাছাড়া নকশাল-পন্থাও কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, নিছক দলবাজিও নয়, আসলে তা আমাদের ভূমি সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ক্ষেত্রে সত্যিকারের কোন প্রগতিশীল পন্থা অনুসরণ করলে, তখন আর নকশালপন্থীদের প্রয়োজন থাকবে না। এ সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হবে, পুলিশ দিয়ে, নিছক আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসাবে গণ্য করে, এদের মোকাবিলা [illegible]

[illegible]
[illegible] ধর্মঘটী কর্মীদের ওপর দমন-নীতি চালিয়ে তাঁদের দমন করার চেষ্টা করেছিলেন। জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই পথ পরিহার করেছেন। কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সেদিনের সেই সংগ্রাম যে ব্যর্থ হয় নি, তৃতীয় বেতন কমিশন তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

তৃতীয় বেতন কমিশন

গত ২৩শে এপ্রিল ভারত গভর্নমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটি বেতন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীরঘুবীর দয়াল। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেনঃ ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক এ, কে, দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ভি, আর, পিল্লাই এবং এইচ, এন, রায় (সেক্রেটারী)।

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মচারীদের কোন অন্তর্বর্তীকালীন রিলিফ দেওয়া উচিত কি-না এবং মৃত্যু ও অবসর গ্রহণের সময় অতিরিক্ত কোন অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি-না, অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে সেই প্রশ্নও এই কমিশন বিবেচনা করবেন।

কমিশন চার মাসের মধ্যে তাঁদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন। এটা তৃতীয় বেতন কমিশন নামে পরিচিত হবে।

এই কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের ২৭ লক্ষ ৪৬ হাজার কর্মচারীর বেতন পুনঃনির্ধারণ করবেন। তার মধ্যে ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার হলেন নিয়মিত কর্মচারী। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে তাঁদের মোট বার্ষিক বেতন দাঁড়িয়েছিল ১৪০০ কোটি টাকা।

১৯৬৭ সালে নিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যে ১২ লক্ষ ৬১ হাজার ছিলেন চতুর্থ শ্রেণীতে। ১২ লক্ষ ১২ হাজার তৃতীয় শ্রেণীতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড অফিসার ছিলেন ৪০ হাজার এবং প্রথম শ্রেণীর অফিসার ২১ হাজার।

কমিশনের বিবেচ্য বিষয় নিম্নরূপঃ—

(১) কেন্দ্রের সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো এবং চাকরির সর্তাবলী কোন্ নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

(২) বর্তমান বেতন কাঠামো এবং চাকুরির সর্তের কি ধরনের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভব।

(৩) মৃত্যু ও অবসরকালীন বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রশ্ন।

(৪) সর্বভারতীয় চাকরিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন কাঠামো, চাকুরির সর্তাবলী এবং মৃত্যু ও অবসরকালীন বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রশ্ন।

(৫) সেনাবাহিনীর লোকেদের বিশেষ ধরনের কাজের ভিত্তিতে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রশ্ন।

(৬) সরকারী কর্মচারীরা প্রয়োজন-ভিত্তিক বেতনের যে দাবি করেছেন, তারই আলোকে কমিশন সর্বনিম্ন বেতনের প্রশ্নও পরীক্ষা করে দেখবেন।

কমিশন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁদের সুপারিশ প্রণয়ন করবেন।. উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, জাতীয় নিরাপত্তা, রাজ্য সরকার, সরকারী শিল্প সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর তাঁদের সুপারিশ কি ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে, সেটা আগেভাগে পরীক্ষা করে তারই ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে।

বেতন কমিশন গঠিত হওয়ায় সরকারী কর্মচারীরা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। তবে কমিশন যাঁদের নিয়ে গঠিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কর্মচারীদের কোন প্রতিনিধি না থাকায় তাঁরা ক্ষুব্ধও হয়েছেন। আর অন্তর্বর্তীকালীন রিলিফের সুপারিশ পেশের কোন নির্দিষ্ট সময় ঘোষিত না হওয়ায় তাঁরা কিছুটা হতাশ বোধ করছেন। তবে অর্থদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পি, সি, শেঠী পার্লামেন্ট সদস্যদের বলেছেন যে, কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন রিলিফ সম্পর্কে খুব "তাড়াতাড়ি" তাঁদের সুপারিশ পেশ করবেন বলে গভর্নমেন্ট আশা করেন।

বছর দুই আগে প্রয়োজনভিত্তিক বেতনের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা এক দিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট করেছিলেন। সেই ধর্মঘট পুরোপুরি সফল হয় নি

কেরালায় অচ্যুত মেননের সাফল্য

গত সপ্তাহে কেরালা বিধানসভার দুটি আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। একটি আসনে মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন ছাব্বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন এবং অপর কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী ৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতে গেছেন। অচ্যুত মেননের কেন্দ্রে মার্কস্‌বাদী কমুনিস্ট পার্টি কোন প্রার্থী দেন নি। তার বদলে একজন নির্দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন করেছিলেন। অপর কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী পরাজিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। দুই কেন্দ্রেই অন্যান্য সকল প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁদের মধ্যে সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস এবং জনসঙ্ঘের প্রার্থীরাও আছেন। নির্বাচনের ফলাফলে এটাই প্রমাণিত হল যে, কেরালায় সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস এবং জনসঙ্ঘের পায়ের তলায় কোন মাটিই নেই। আরও প্রমাণিত হল যে, অচ্যুত মেননের মিনিফ্রন্ট সরকারের পেছনে জনমতের যথেষ্ট সমর্থন আছে এবং মার্কস্‌বাদী কমুনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অচ্যুত মেনন যে আসনে জয়লাভ করেছেন. সেই আসনটা আগের বারের নির্বাচনেও তাঁদের দখলে ছিল। তবে এবার তাঁর পক্ষে ভোটের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। আর মার্কস্‌বাদী কমুনিস্ট পার্টি যে আসনে হারলেন, সেই আসনটা আগের দুই নির্বাচনে তাঁদেরই দখলে ছিল। অর্থাৎ মার্কস্‌বাদী কমুনিস্টরা বিধানসভায় একটি আসন হারালেন।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালায় মার্কস্‌বাদী কমুনিস্ট দলের ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে একটি বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। অন্যান্য অনেক রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটলেও মাস ছয়েক আগে পর্যন্ত কেরালায় যুক্তফ্রন্ট সরকার একনাগাড়ে প্রায় আড়াই বছর কায়েম ছিল। কিন্তু তীব্র শরিকী বিবাদের ফলে সেই সরকারের পতন ঘটে। পতনের আগেকার ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বাংলা দেশে যেমন ইউনিয়ন আর জমি দখল নিয়ে শরিকী খুনোখুনি হয়েছিল, কেরালায় তেমনটা ঘটে নি। সেখানে

উঠছে থাকে এবং দেখা যায় যে, কেউ মন্ত্রীই দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। তার ফলে প্রথমে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কুঞ্জু (আই-এস-পি দলের) মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দেন। তাই নিয়ে শরিক-দের মধ্যে মতভেদ খুব প্রকট হয়ে ওঠে। অতঃপর চিকিৎসার জন্য নাম্বুদ্রিপাদ ইউরোপে চলে যান। সেই সময় বিধান-সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েলিংডনের (মার্কস্-বাদী কম্যুনিস্ট দলের গোষ্ঠীভুক্ত) বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের একটি প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ হয়ে যায়। সেই সময় মার্কস্‌বাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো স্থানীয় পার্টিকে নির্দেশ দেন যে, ওয়েলিংডনের মামলা যদি তদন্ত করতে হয়, তাহলে সেই সঙ্গে অন্যান্য দলীয় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগও তদন্ত করতে হবে। নিজ দলীয় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত অভি-যোগ সম্বন্ধে তাঁরা নীরব থাকেন। দেশে ফিরে নাম্বুদ্রিপাদ পলিট ব্যুরোর নির্দেশ অনুযায়ী নিজ দলীয় মন্ত্রীদের মামলা ধামাচাপা দিয়ে অন্যান্য মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেন। তখন অন্যান্য শরিক ক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন এবং নাম্বুদ্রিপাদও পদত্যাগ করেন। [illegible]ছিলেন, [illegible] বাদ দিয়ে কেরালায় কেউ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে না। [illegible] রাজ্যপালের শাসন কেউ বেশিদিন [illegible] করবে না। তখন অন্যান্য শরিক তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু তাঁদের হিসাবে একটা গুরুতর গলদ ছিল। আই অচ্যুতমেননের মধ্যেই অচ্যুত মেননের (সি-পি-আই) নেতৃত্বে একটি মিনিফ্রণ্ট সরকার গঠিত হল এবং দেখা গেল একমাত্র এস-এস-পি ছাড়া প্রাক্তন যুক্তফ্রণ্টের আর সব শরিক নতুন গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করছেন। মিনিফ্রণ্ট সরকার গঠিত হলে কেরালায় আগুন জ্বলে উঠবে বলে মার্কস্‌বাদী কম্যুনিস্টরা যে সতর্কবাণী করেছিলেন, সেটা অসার বলে প্রতিপন্ন হ'ল। নতুন সরকারের বিরুদ্ধে কেরালায় তেমন কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায় নি। মাসখানেক আগে দল ভাঙাভাঙি করে মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষায় অচ্যুত মেনন অনায়াসেই জয়ী হয়ে গেছেন। শেষ লড়াই হল উপনির্বাচনে। দেখা গেল, সেখানেও মার্কস্‌বাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সুবিধা করতে পারলেন না।

অবশ্য এই উপনির্বাচনে বিধানসভায় অচ্যুত মেননের শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি। তবে মিনিফ্রণ্ট সরকারের মনোবল নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে। কেরালায় মার্কস্-[illegible] পা[illegible] [illegible]দের ফলাফল[illegible] [illegible] দ্বিতীয় চিন্তা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। দেশের বর্তমান [illegible] মার্কস্‌বাদীদের [illegible] যুক্তফ্রণ্ট অপরিহার্য বলে মনে হয়, তাহলে অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে কেন যে তাঁরা মিলেমিশে থাকতে পারছেন না, [illegible] সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য হয়ে উঠেছে। [illegible] মনে হয় যুক্তফ্রণ্ট তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার আছে। কথাটা মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী অন্যান্য দল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বাংলা এবং কেরালায় বিপর্যয়ের পর মার্কস্‌বাদী বলে আত্মপরিচয় প্রদান-কারী পার্টিগুলো যদি আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের সংশোধনের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিবর্তে ইতিহাসকে পেছিয়ে দেবেন। কংগ্রেসে ভাঙনের পর সারা ভারতবর্ষে বামপন্থী আন্দোলনের যে নতুন সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, বামপন্থী পার্টিগুলো নিজেদের অন্ধ অহমিকা এবং তীব্র সংকীর্ণতার দ্বারা ইতিমধ্যেই তার যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। এখনও কি সেই ক্ষতি নিবারণের সময় আসে নি?

(২৬-৪-৭০)

রোডেশিয়াকে উপলক্ষ করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ও বিরোধী দলের নেতা এডওয়ার্ড হিথের মধ্যে প্রচণ্ড বাগ্‌যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে।

উইলসন প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন, রক্ষণশীল দলের নেতারা গোপনে রোডেশিয়ার বেআইনী সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। রক্ষণশীলরা নিজেদের দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য নির্লজ্জভাবে আয়ান স্মিথদের বর্ণবৈষম্য নীতিকে সমর্থন করছেন।

১৮ই এপ্রিল তারিখে ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রসংঘ সমিতির সভায় ভাষণ দেবার সময় প্রধানমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। যারা ব্রিটেনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, বিশ্ব জনমতকে অগ্রাহ্য করে, জোর করে স্বাধীনতা ও পরে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে এবং সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যবাদী সংখ্যালঘু শ্বেতাংগ সরকার চালিয়ে যাচ্ছে, ব্রিটেন তাদের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আর কিনা বিরোধী দল গোপনে তাদের সংগে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে।

উইলসনের এই মন্তব্যে দেশে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ২০শে এপ্রিল এডওয়ার্ড হিথ পালটা বিবৃতি দিয়েছেন।

হিথের বক্তব্য : সম্পর্ক রাখছি তো বেশ করছি! সাহস থাকে তো উইলসন সাহেব, আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করো। আর, নয়তো চুপ করো!

কোন 'স্বাধীন' সরকারের সঙ্গে বিরোধী দল সরাসরি কথা বলতে পারবে

রক্ষণশীল দলের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী উইলসনের গুরুতর অভিযোগ

এডওয়ার্ড হিথ

না, এই নীতি হিথ মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, কখনও ব্রিটেনে এমন নীতির কথা কেউ বলে নি। অতীতে সব দলের বিরোধীপক্ষই নিজেরা অপর দেশের সরকারের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। কেউ এ নিয়ে কথা তোলে নি। তাহলে, আজ কথা উঠছে কেন?

রোডেশিয়ার রাজধানী সলিসবেরী থেকে বৃটিশ সরকারের সব অফিস তুলে আনা হয়েছে। এই অবস্থায় নিজেরা না চেষ্টা করলে খবর জানা যাবে কি করে?

হিথ বলেছেন, তাঁর অনুরোধেই রক্ষণশীল দলের নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার ডগলাস হিউম, সেলউইন লয়েড, রেজিনাল্ড মডলিং প্রভৃতি রোডেশিয়া গিয়েছিলেন।

ত্রিনিদাদ :

ত্রিনিদাদে 'কৃষ্ণ বিদ্রোহ' সুরু হয়েছে। ক্যারিবিয়ান সাগরে [illegible]

অধিবাসী অধ্যুষিত কমনওয়েলথভুক্ত এই ছোট্ট দেশটিতে গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে যে বিক্ষোভ চলে আসছে, গত সপ্তাহে তা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে।

সমগ্র দ্বীপে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। সামরিক আইন বলবৎ করা হয়েছে। ত্রিনিদাদ সরকার বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ভেনিজুয়েলার সাহায্য চেয়েছে। মার্কিন নৌবহরের ৬টি যুদ্ধজাহাজ ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে এসে পৌঁছেছে। ব্রিটেনের দুটি জাহাজও এসেছে। জ্যামেইকা ও গায়নায় এই দুটি বৃটিশ জাহাজ ছিল। জাহাজ ভর্তি সৈন্যও এসেছে। এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমানে করে মেশিনগান, মর্টার ও অন্যান্য সামরিক অস্ত্র ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অব স্পেনে পৌঁছে দিয়েছে। ভেনিজুয়েলা থেকেও সাহায্য এসেছে।

ত্রিনিদাদের অধিকাংশই কৃষ্ণাঙ্গ।

ভাষায় মধ্যে নিগ্রো ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতই প্রধান। প্রধানমন্ত্রী স্যার এরিক উইলিয়ামস্‌ নিজে নিগ্রো। সুতরাং, কোন শ্বেতাঙ্গ শাসন উচ্ছেদের জন্য কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রাম, এই অর্থে ত্রিনিদাদে কৃষ্ণ-বিদ্রোহ সুরু হয় নি। দেশের অর্থ-নীতিতে শ্বেতাঙ্গ বিদেশীদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ।

ত্রিনিদাদের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় কানাডীয়দের হাতে, আর তৈল শোধনাগার ও উপকূলবর্তী তৈলখনির মালিক মার্কিন কোম্পানী। বিক্ষোভকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য কানাডীয় ও মার্কিন মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে। এদের অফিসে তারা হামলা করছে, কানাডীয় বা মার্কিন অধিবাসী কাউকে পেলে, তাকে মারধোর করছে। রাগের চোটে রোমান ক্যাথলিক চার্চে গিয়ে গোলমাল বাধাচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গ শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ খুবই স্বাভাবিক। তবে এবারের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ, কানাডায় ত্রিনিদাদের কয়েকজন ছাত্রকে শাস্তি দেবার চেষ্টা। কৃষ্ণ বিক্ষোভের অঙ্গ হিসাবে ত্রিনিদাদের কয়েকজন ছাত্র কানাডার স্যার জর্জ উইলিয়ামস বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করে, এবং দুই মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের একটি কম্পিউটর মেশিন নষ্ট ক'রে ফেলে। এই অপরাধে দশ জন ত্রিনিদাদী ছাত্রের বিচার সুরু হয় মন্ট্রিলের আদালতে। এই বিচারের প্রতিক্রিয়াই প্রথমে পোর্ট অব স্পেনে এবং পরে ত্রিনিদাদের সর্বত্র কানাডীয়দের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সুরু হয়। মার্কিনরাও আক্রমণের হাত থেকে বাদ পড়ে নি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গী বামপন্থী ছাত্র সংগঠন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট গিল্ডের প্রাক্তন সভাপতি গেডেস গ্যাঞ্জার ও আর একজন বিশিষ্ট বামপন্থী অগড়ুইস প্রাইমাস এই বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতা। প্রভাবশালী শ্রমিকসঙ্ঘ তৈল-খনি শ্রমিক য়ুনিয়নের নেতা জর্জ উইক্‌স্‌ও আছেন এদের পেছনে। শোনা যায়, গায়নার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বামপন্থী ডঃ ছেদী জগানেরও সমর্থন আছে এই আন্দোলনের পেছনে। কয়েক মাস আগে কানাডায় একটি ছাত্র সম্মেলনে ডঃ জগানের সঙ্গে গেডেস গ্যাঞ্জারের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখনই নাকি আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা হয়।

দেশের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ বিদ্রোহীদের সঙ্গে। তবে পুলিশ মোটা-মুটি সরকারের সঙ্গে।

এখন বিদ্রোহীদের দাবি ঃ

(১) প্রধানমন্ত্রী স্যার এরিক উইলিয়ামস্‌ ও তাঁর সরকারকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে।

(২) ধৃত সকল রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিকের মুক্তি চাই।

(৩) মার্কিন ও বৃটিশ দূতা-বাসকে অবিলম্বে ত্রিনিদাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

(৪) জরুরী অবস্থা তুলে নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী এরিক উইলিয়ামস্‌ অত্যন্ত বিচক্ষণ ও চতুর ব্যক্তি বলে পরিচিত। চোদ্দ বছর ধরে তিনি ত্রিনিদাদের প্রধানমন্ত্রী এবং বলতে গেলে তিনিই এখানকার সর্বময় কর্তা। তাঁর দল পিপলস্‌ ন্যাশনাল মুভমেন্ট নিগ্রোদের সমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এবার নিগ্রোরাও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে।

কেবলমাত্র মার্কিন ও বৃটিশ সরকারের সামরিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে এরিক উইলিয়ামস্‌ আর কতদিন রাজত্ব চালাতে পারবেন?

কম্বোডিয়া ঃ

সিহানুক সমর্থকরা রাজধানী নম্‌ পেন্‌ দখল করার জন্য বদ্ধপরিকর।

নম্‌ পেন থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাকেও শহর এখন বিদ্রোহীদের হাতে। বিদ্রোহীরা সবাই নিশ্চয়ই কম্বোডিয়াবাসী নয়. এদের সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনামের স্বেচ্ছাসেবক ও ভিয়েৎ কং গেরিলারাও আছে। তবে কম্বোডিয়ার বর্তমান সরকারের সৈন্য-বাহিনী এদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

কেবল তাকেও নয়, নম্‌ পেনের মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে সাং শহরেও উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। এখানে কয়েক হাজার লোক সংঘর্ষে মারা গেছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

অবস্থা বেগতিক দেখে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী জেনারেল লন নল মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ওয়াশিংটন থেকে বলা হয়েছে, নিকসন এই সাহায্যের আবেদন বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখছেন।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক পিকিং থেকে ক্যান্টন গিয়ে পৌঁছেছেন। এখানে তিনি কম্বোডিয়ার ব্যাপারে উত্তর ভিয়েৎ-নাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বিপ্লবী সরকারের প্রধান এবং প্যাথেট লাও-এর নেতা প্রিন্স সুফানোভং-এর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

এদিকে আবার, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতির উদ্যোগে কয়েকটি এশীয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন বসছে কুয়ালালামপুরে। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, সিংহল, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনস সম্ভবত এই সম্মেলনে যোগ দেবে।

কোচবিহার থেকে কেরলের দূরত্ব কত জানি না, কিন্তু কেরল থেকে অনেক দূরে কোচবিহারে বসেই শুনলাম কেরলের কোট্টারাকারা ও নিলাম্বুর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের ফল। আর এই ফলাফল যেদিন শুনলাম, সেই দিন কোচবিহারেও এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। সেই ঘটনা যদিও অচ্যুত মেননের জয় বা নব কংগ্রেসপ্রার্থীর জয়ের মত কোন বড় ঘটনা নয়, তবুও সেই ঘটনার তাৎপর্যও খুব লঘু করে দেখার মত নয়। যেমন, কোচবিহার শহরে সামান্য দূরত্বে দুটি জনসভা হল—একটি সভায় বক্তা ছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, অপর সভার বক্তা ছিলেন শ্রীসমর মুখোপাধ্যায়। কেরলে সি পি এম-এর কাছে শ্রীঅচ্যুত মেনন যেমন বিশ্বাসঘাতক, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-এর কাছে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় তেমনই বিশ্বাসঘাতক। কেরলে শ্রীঅচ্যুত মেনন জনগণের রায়ে সি পি এম সমর্থিত প্রার্থীকে ২৬ হাজার ভোটে পরাজিত করে রেকর্ড করেছেন—আর কোচবিহারে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় শহীদবাগের জনসভায় ২৬ হাজার না হোক ১৬ হাজার মানুষ টেনে এনেও শ্রীসমর মুখোপাধ্যায়ের সভায় ৬ শত মানুষের বেশি উপস্থিত থাকতে না দিয়ে সি পি এম-এর জনসভার জামানত জব্দ করে দিয়েছেন।

কেরলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন তুলনা করা হয়ত সংগত নয়। তবে চরিত্রের দিক দিয়ে এই দুই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মিল বড় কম নয়। এবং মিল আর কারো কাছে না হোক, সি পি এম এতদিন যেকথা বলছে, তাতে একটা মিল অন্তত বড় পরিষ্কার ছিল—সেটা হল শ্রীঅচ্যুত মেনন বিশ্বাসঘাতক আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ও বিশ্বাসঘাতক। কাজেই অন্য কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিগত মিল থাক বা না থাক, দুই রাজ্যে সি পি এম-এর বিচারে দুজন মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতক ধারণা।

কেরলের বিশ্বাসঘাতক শ্রীঅচ্যুত মেননের কথাই আগে বলা ভাল। কেরলে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন, কেরলের যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেল, শ্রীঅচ্যুত মেনন ভাঙা যুক্তফ্রন্টের বেশির ভাগ দলের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করলেন। ব্যাপারটার মধ্যে কোন-প্রকার ঘোরপ্যাঁচ নেই এবং বারবার পরীক্ষা দিয়ে অচ্যুত মেনন বিধানসভায় প্রমাণ করলেন যে, বিধানসভায় তাঁর প্রতি সংখ্যাধিক্যের সমর্থন আছে। এই পরীক্ষা নানাভাবে হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমেনন নিজেও বিধানসভায় আস্থামূলক ভোট চেয়েও পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ পদত্যাগের পর থেকেই সি পি এম শ্রীঅচ্যুত মেননকে বিশ্বাসঘাতকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। শ্রীমেননের অপরাধ—তিনি কেন শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের পদত্যাগের পর সরকার গঠন করলেন। শ্রীমেনন যদি সেদিন সরকার গঠন না করতেন তবে সেইদিন কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হত। তাহলে শ্রীমেনন সরকার গঠন করে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করতে না দিয়েই সি পি এম-এর বিচারে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও তো একই রকম পরিস্থিতি বিচার করে শ্রীজ্যোতি বসু রাষ্ট্রপতির শাসন এড়াতে সরকার গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। তাহলে কি বলতে হবে, যে-কাজ করে সফল হয়ে শ্রীঅচ্যুত মেনন বিশ্বাসঘাতক আর সেই কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে শ্রীজ্যোতি বসু দেশ-প্রেমিক? গত মার্চ মাসে শ্রীজ্যোতি বসুও যদি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর তাঁর যুক্তফ্রন্টের বেশির ভাগ দলকে নিয়ে বা তাঁদের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতেন, তাহলে সেই সরকার কি বিশ্বাসঘাতকের সরকার হত? কিন্তু এই যুক্তি মানা চলবে না—জনগণের নামে দোহাই দিয়ে তবুও বিশ্বাসঘাতক বলতে হবে শ্রীঅচ্যুত মেননকে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কেও।

কারণ পশ্চিমবঙ্গে যে কাজ করলে বিশ্বাসঘাতকের কাজ হয়, কেরলে সেই কাজ করলে দেশপ্রেমিকের কাজ হয়—এই হলো সি পি এম-এর রাজনৈতিক বিচারের রায়। তাই তো শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতক হয়েছেন—যদিও এই পদত্যাগ আকস্মিক ছিল না, গোপন চোরাগোপ্তা বা কোন নিশীথ রাতের অন্ধকারের ঘটনা ছিল না। রীতিমত সময় দিয়ে বলে-কয়ে সতর্ক করে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলেন—তবু তিনি বিশ্বাসঘাতক।

সরকারের নীতির সঙ্গে বনছে না, শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ না হলে সরকারে থাকব না—এই কথা বলে বাংলা কংগ্রেস ৬ই অক্টোবর থেকে অজস্র প্রস্তাব গ্রহণ করে যুক্তফ্রন্টকে দিয়েছে, এক মাস ধরে কার্জন পার্কে অনশন করেছে, তিনজন মন্ত্রী আগে পদত্যাগ করেছেন, তারপর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন—আমি আর আটদিন পরে পদত্যাগ করছি। আপনারা যদি চান ও পারেন, তবে বাজেট পাশ করিয়ে নিন, যদি চান ও পারেন সরকার গঠন করে চালান, আমি আর নেই। যে বাজারে একটা ফুড কমিটির মেম্বার বা একটা আর টি এ-এর মেম্বার হওয়ার জন্য যে কোন রাজনৈতিক দল ও নেতারা প্রাণত্যাগ করেন, সেইখানে একটা দল একটা রাজ্যে চারটে মন্ত্রিত্ব পেয়ে, মুখ্যমন্ত্রিত্ব হাতে পেয়ে ছেড়ে দিল—এটা হল বিশ্বাসঘাতকতা। হতে পারে বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু আজও কি হিসাব করে পাওয়া গেছে কিসের জন্য, কার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা! সারা ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে গদি থেকে টেনে না নামানো পর্যন্ত কোন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন বলে নজির নেই। আর কোন মুখ্যমন্ত্রী স্বেচ্ছায় বলে-কয়ে সময় দিয়ে বাজেট পাশ, সরকার গঠনের সময় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করছেন, এমন নজির কোথায়? সেই কাজ অজয় মুখোপাধ্যায় করলেন।

প্রথম দিকে অনেকেরই ধারণা ছিল, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের এই পদত্যাগ বাত কি বাত, কারণ মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ স্বেচ্ছায় আজ পর্যন্ত যাঁরা করেছেন, তাঁরা আরো অনেক বড় মন্ত্রিত্ব পেয়েই করেছেন অথবা ঘাড়ধাক্কা খেয়েই করেছেন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ঘাড়ধাক্কা খাবার কোন অবকাশ ছিল না—কারণ ২৮০ সদস্যের বিধানসভায় ২১৬ সদস্য দলে থাকলে ঘাড়ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা থাকে না। বড় কোন লোভ—কই তেমন কোন দৃশ্যও তো এখনও চোখে পড়ছে না। মিনিফ্রন্ট সরকার—এই সম্ভাবনা আগেও ছিল না। এখনও খুব উজ্জ্বল বলে মনে করার কারণ নেই। আর তা ছাড়া নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে অনিশ্চিত মুখ্যমন্ত্রিত্ব

ধরবার জন্য পদত্যাগ করে বোকামী করার মত লোক শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় নন। আর তাছাড়া এমন করে বলে-কয়ে সময় দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পদত্যাগ করে সরকার গঠনের জন্যে আই-ঢাই করছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়—এমন নজিরও চোখে পড়ছে না, বরং বলা যায় বিপরীতভাবে সি পি এম-ই চেয়েছিল ঠিক কেরলের অচ্যুত মেননের মত যুক্তফ্রন্টের বেশির ভাগ দলের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে। তফাৎ হল শ্রীমেনন পেরেছেন আর শ্রীজ্যোতি বসু পারেন নি। তবুও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅচ্যুত মেনন বিশ্বাসঘাতক!

আরো কিছু মিলের খবর আছে। যেমন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় একদা অনশন করলেন কার্জন পার্কে—সেই সময় বলা হল কার্জন পার্কে চিড়িয়াখানা খোলা হয়েছে—আর কেরলেও ঠিক একইভাবে অনশন করলেন সি পি এম নেতারা—তখন কিন্তু সেটা চিড়িয়াখানার ঘটনা হল না। এইভাবে ঘটনা-প্রবাহে কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটতে সুরু করলো। কেরলে শ্রীঅচ্যুত মেনন নির্বাচনী লড়াইয়ে নামলেন আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় নামলেন জনসভা করে জনমত যাচাইয়ে। কেরলে কোট্টারাকারা নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী হলেন শ্রীমেনন, বিরুদ্ধে সি পি এম সমর্থিত নির্দল। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক বনাম দেশ-প্রেমিকের লড়াই হচ্ছে বলে সি পি এম ঘোষণা করলো। ভোটের রায়ে দেখা গেল বিশ্বাসঘাতক অচ্যুত মেনন ২৬ হাজার ভোট বেশি পেয়ে জয়ী হয়েছেন। অনেকে বলবেন, এই আসনটা সি পি আই-এর ছিল, তাই জয়টা বড় কথা নয়। কিন্তু আর একটা খবর অনেকে হয়ত জানেন না যে, এই কেন্দ্রে আগে সি· পি· আই প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন মাত্র ৫ শত ভোটের ব্যবধানে আর মেননের জয়লাভের ব্যবধানটা হয়েছে ২৬ হাজার। কোট্টারাকারা না হয় ছেড়ে দিলাম, কারণ শ্রীঅচ্যুত মেনন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর প্রশাসনযন্ত্র হাতে আছে, আরো ধরে নিলাম অনেক কারচুপি করেছে ধূর্ত সি পি আই। কিন্তু নিলাম্বুরে কি হল? সেখানে তো সি পি আই নয়, মুখ্যমন্ত্রী যা কোন মন্ত্রী নয়—সেখানে নব কংগ্রেস, যারা দল গঠিত হবার পর ভারতে কোন উপনির্বাচনে জয়ী হয় নি—সেই নব কংগ্রেস কোথাও নয়, জয়ী হয়ে গেল খোদ কেরলে সি পি এম প্রার্থীকে পরাজিত করে।

কেরলের কথা থাক। এবার কোচবিহারের কথা বলি। কোচবিহার—যেখানে সি পি এম গত এক-দেড় বছরে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, বড় নেতারা ঘন ঘন আগমনে দলকে চাঙ্গা করেছেন, সেই কোচবিহারে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের আসবার সময় ধরে সি পি এমও সভার দিন ঠিক করলো। শহীদবাগের এক দিকে অজয়বাবুর সভা, অপর দিকে সি পি এম-এর জনসভা। সভার আগে প্রচারে অজয়বাবুর লোকেরা যেখানে গেছে, সি পি এম'ও ততদূরে গেছে। ২৩শে এপ্রিল সভা সুরু হল। দেখা গেল অজয়বাবুর সভায় প্রায় ১৫।১৬ হাজার লোক আর সি পি এম-এর সভায় ৫।৬ শত লোক। এখানেও দেখা গেল বিশ্বাস-ঘাতকের দিকেই জনগণের রায়ের পাল্লা ভারী। এইখানে আরো উল্লেখ করতে চাই—কয়েক মাস আগে সরকার থাকতে শ্রীজ্যোতি বসু যখন কোচবিহারে সভা করতে এসেছিলেন, তখন শ্রীবসুর সভা এত বড় হয়েছিল যে, শহর থেকে দূরে রাস ময়দানে সভা করতে হয়েছিল। শ্রীজ্যোতি বসুর সভায় ২৫।২৬ হাজার মানুষ হয়েছিল। তফাৎ আজ কেরলে, তফাৎ আজ কোচবিহারে। জনগণের রায়ে দেখা যাচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের (?) দিকেই পাল্লা ভারী হচ্ছে। ইতিহাস কোন্ দিকে যাচ্ছে তা আগামী দিনে ধরা পড়বে। কালের বিচারে ধরা পড়বে কে বিশ্বাসঘাতক, আর কে দেশপ্রেমিক!

—২৫।৪।৭০

চক্রবৎ………

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চোদ্দ ॥
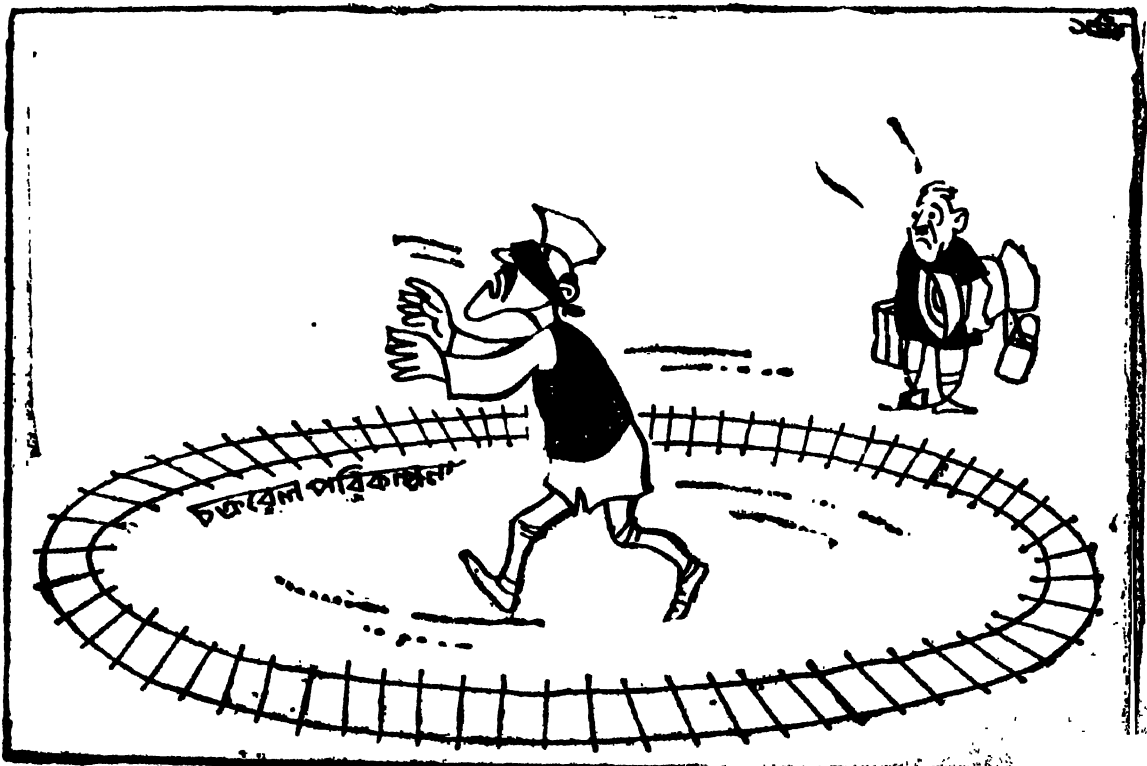
মনে তখন আমার ঝড় বয়ে চলল।

কলকাতার বস্তিতে শীতের তেমন প্রকোপ হয় না, তবু তখন রাত হয়েছিল অনেক বলে শীতটা একটু লাগছিল। কিন্তু মনের ঝড়ে সে শীতও যেন শীত বলে মনে হচ্ছিল না। আমি এসেছিলাম শংকর ও মায়ার মায়ের অনুরোধে, এসেছিলাম রাণীদিকে সন্ধান করতে। কিন্তু এসে সন্ধান করে বসলাম যেন রাণীদির জীবনের হারিয়ে যাওয়া উৎস। রাণীদির বোনের হদিশ আজ আমি যেমন করে পেলাম, হয়তো একদিন এমনি করেই তিনিও পেয়েছিলেন। এরই জন্য রাণীদি হয়তো আমার ঘরছাড়া, কুলত্যাগী কুলটা মেয়ে। কোনরকম একটা খেই ধরে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে। তারপর উঠেছিলেন এইখানে এসে। স্বামীর খোঁজে এসে তাঁকে না পেয়ে হয়তো বোনের ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও পারেন নি। তাই বারে বারে হতভাগিনী রাণীদি আমায় বলেছেন, "ওরে বিজন, আমি হেরে গেছি রে, হেরে গেছি।' হয়তো সংসার পাতার বদলে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন এখানকার অভিশপ্ত সমাজের পূতিগন্ধময় আবেষ্টনীর মধ্যে। তারপর নারকীয় পরিস্থিতির স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে গেছেন দূর হতে দূরে, একেবারে সভ্য-জগতের বিশাল সীমানার বাইরে।

পথ চলতে চলতে পরক্ষণেই আমার মনে হল—রাণীদির জীবনে সে কথাই যদি সত্যি হয়, তবে সেখানে আরও একটি মানুষ তো ছিল, যে ভদ্রলোক নাকি তাঁর স্বামী? এত কাছে যখন রাণীদি এসে পড়েছিলেন তখন কি আর তাঁর সন্ধান তিনি না করেছিলেন? নিশ্চয়ই তা করে-ছিলেন এবং তা যদি সত্যি হয়, তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে রাণীদি স্বামীর কাছে আসতে চেয়েছিলেন তা এমনভাবে তাঁর জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? তিনি স্বামীর সংগে জীবন না কাটিয়ে এই অভিশপ্ত জগতের মধ্যে ততোধিক অভি-শাপময় এই রাজ্যে সর্বপ্রকার নোংরা কাজের যে নাকি মূর্তিমান নারক, তার আড্ডায় গণিকাবৃত্তি আর নর্তকীবৃত্তিকে পেশা করে দিন কাটান কেন? আমি নিজে চোখে দেখেছি নর্তকীবৃত্তির অভিসারিকা বেশ, নিজে কানে শুনেছি আড্ডায় অভ্যাগতদের মনোরঞ্জন করার ইতিহাস। তা ছাড়া এসব তো সমর্থিতও হয়েছে অন্যত্র।

কে জানে হয়তো মানুষ এমনি পথ-ভ্রষ্ট হয়ে... এমনি করেই হারিয়ে ফেলে [illegible] সুন্দরী

মেয়ে রাণীদি, যৌবনের জৌলুস ছিল তাঁর মনেও—তা ছাড়া সর্বোপরি ছিল তাঁর মাতৃত্বের দুর্বার কামনা। কে জানে, পথ খুঁজে পেলে যে মেয়ে আদর্শ নারীর শীর্ষস্থানে আপনার আসন করে নিতে পারত, সেই মেয়েই হয়তো পথ না পেয়ে কামনার দুরন্ত আবেগে ছিটকে পড়েছে সর্বনাশের পঙ্কিল গহ্বরে।

মন্টুকে আমি এখানে আসার সংগে সংগেই দেখেছি, কিন্তু আজ দেখলাম টুনটুনিকে। আমি অবাক হয়েছি টুনটুনির সারল্য আর সত্য ভাষণের চারিত্রিক শুভ্রতা দেখে। কি সরল উক্তি নিজেদের জন্মরহস্য সম্বন্ধে—'আমরা যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি তিনি আমাদের মা নন। আর মা আমাদের যিনি হতে পারতেন, তাঁর গর্ভে আমরা হই নি। অন্যদিকে যিনি বাবা—যাঁর গর্ভে আমরা হয়েছি তিনি তাঁর স্বামী নন। তাই আমাদের মা-ও নেই, বাবাও নেই।'

মেয়েটার এই সরল উক্তির পর একটা প্রশ্ন তাকে আমার করা উচিত ছিল। সেটা আমি কথায় কথায় ভুলে গেছি অথবা ঘটনার আকস্মিকতায় মনেই ওঠে নি। পথ চলতে চলতে তাই হঠাৎ আমার মনে হল, একবার ফিরে যাব কি? হ্যাঁ, ফিরেই যাই। জিজ্ঞাসা করে আসি তাকে তাদের গর্ভধারিণী বেঁচে আছেন কিনা, আর যিনি বাবা, তিনিই বা কোথায়? আর তাদের মাসিকেই বা দেখা যাচ্ছে না কেন?

কিন্তু রাত হয়েছিল অনেকখানি দেখে আর ফিরে গেলাম না। ওদিকে মায়ার মা হয়তো অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছেন, আমার কাছ থেকে তাঁর ঈপ্সিত খবরটি শুনবেন বলে। না, বরং পরে এক সময় এসে জিজ্ঞাসা করে যাব টুনটুনিকে, এখন চলেই যাই।

সেদিন সেই রাতে অন্ধকার আকাশের নিচে, ততোধিক অন্ধকারময় গোলকধাঁধা-রূপী পথে দাঁড়িয়ে যদি আমি টুনটুনির কাছে ফিরে যেতাম তা হলেই বোধ করি ভাল করতাম এবং সেইদিনই এই অভিশপ্ত জগতের নির্দয়-নিষ্ঠুর পরিস্থিতির গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে যেত আমার সামনে। কিন্তু সেদিন সিদ্ধান্ত নিতে আমার ভুল হয়েছিল, তাই তার জের চলল আরও দীর্ঘকাল অবধি।

সেদিন ফিরে এলাম যখন মায়াদের ঘরে তখন সে এক দৃশ্য। একদিকে স্তিমিত কেরোসিন শিখার ভুসো-পড়া লণ্ঠন। পাশে ভূলুণ্ঠিতা মা ফুলে ফুলে কাঁদছেন আর মায়া পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে মায়া?'

মায়ার চোখের কোণে জল। নিরুত্তর-ভাবে সে ঘাড় হেঁট করল।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?'

মায়া এবার ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, দাদা! এখানের পালা আমাদের শেষ করতেই হবে—নইলে আর কিছুই বাকি থাকবে না।'

'কি বাকি থাকবে না?'

মায়া যেন একটু বিরক্ত হল আমার কথা শুনে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে দৃঢ় হয়ে নিয়ে বললে, 'আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না?'

কথাটায় মায়ার খোঁচা অনুভব করলাম। আমিও মুহূর্তে দৃঢ় হয়ে নিয়ে বললাম, 'বুঝি আমি সবই বোন, কিন্তু এখানকার অলিতে-গলিতে, বাতাসে-নিশ্বাসে, আলোতে-অন্ধকারে যে হিংস্রতা লুকিয়ে আছে, তাকে আমি অতিক্রম করব কি করে?'

দেখলাম মায়া আমার কথাগুলো যেন গিলছিল একেবারে। তাই আবার বলে উঠলাম, 'তোমাদের এখানকার পালা

শেষ হওয়াই উচিত। কারণ আমি বাড়ি থেকে যাবার পর এখানে যা ঘটেছে তা আমার পক্ষে অনুমান করা আদৌ শক্ত নয়। মায়ের আর তোমার চোখের জলে সে ঘটনা আমি টের পেয়েছি—'

'আপনি টের পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ পেয়েছি।'

কি করে টের পেয়েছি সে কথা অবিশ্যি বললাম না মায়াকে। মন্টু আহত হয়েছিল—তার আহত হওয়ার সংবাদ টুনটুনিকে দিয়ে যা বুঝেছিলাম বসন্ত এইদিকেই এসেছিল এবং তার আসার অনেক আগে যে উপলক্ষে আমার ওদিকে যাওয়া, সেও তো এই বসন্তের সম্পর্কেই। শংকরকে তারা টেনেছে নানা উপায়ে। কিন্তু ঘটনার সেখানেই তো শেষ হয় নি। মায়া বড় হয়েছে। মায়ার দিকে দৃষ্টি পড়েছে বসন্তর। একথা মা আমাকে বলেছিলেন। তাই তাকে বাঁচাবার জন্যও তো আমার ওখানে যাওয়া। কাজেই ব্যাপারটা না বোঝার আমার কিছুই ছিল না।

আমি টের পাওয়ার ব্যাপারটা শুনে মায়া বলে উঠল, 'যদি আপনি টের পেয়েই থাকেন, তা হলে এখন আপনি বলুন, আপনার করণীয় কি আছে?'

আমি বললাম, 'আমার করণীয় কি আছে তা আমি জানি না—তবে এ কথা বলতে পারি, তোমাদের করণীয় কি আছে তা আমাকে খুলে বলো। আমি সেই মতো তোমাদের জন্য যা কিছু করতে হবে তাই করব।'

এবার মা বললেন, 'তাই করো বাবা —তাই করো।'

'কিন্তু করবটা কি মা', বললাম, 'তা তো আপনাকে বলতে হবে?'

মা বললেন, 'আমি মায়াকে নিয়ে অনেক, অনেক দূরে পালিয়ে যেতে চাই বাবা।'

'তা যদি হয় তা হলে আমি তারই জন্যে চেষ্টা করব।'

'কিন্তু আজই—রাত না পোয়াতে', বলে মা উঠে বসলেন। তারপর বললেন, 'এমনভাবে যেতে হবে, যেন ও বুঝতে না পারে।'

সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি সম্ভব মা?'

'কেন—যদি ভোরের অন্ধকারেই আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি—'

'তা হলেও বসন্ত জানতে পারবে। এই গোটা চরটা জুড়ে বসন্তর লোক থৈ-থৈ করছে। তারা ঠিক খবর দিয়ে দেবে।'

'তা হলে উপায়?'

'উপায় আমি সেরকম কিছু দেখছি না, তবে—'

'তবে—?'

'তবে একটা উপায় হতে পারে', আমি মাকে বললাম, 'মায়ার সম্পর্কে বসন্তের নজরের খবর তো আপনাকে দিয়েছিল ভানু?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে উপায় ভানুকেই করতে হবে।'

'সে উপায় করবে কি করে?'

'সে তো মায়াকে বোনের মত ভালবাসে?'

'তা বাসে।'

'তা হলে বোনের প্রতি কর্তব্যটা সে কি করবে না বলে মনে করেন?'

'তা করবে। কিন্তু কিভাবে করবে?' মায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে বলে উঠলাম, 'আবার সে মায়াকে ট্রেনে ট্রেনে অন্ধ সেজে গান গাইবার জন্য নিয়ে যাবে। বসন্তও দেখবে সে অন্ধসাজা ভানুকেই নিয়ে যায়। তারপর ওরই মধ্যে একদিন ট্রিক্‌ করে সরে পড়বে এবং এভাবে সরে পড়লে বসন্ত টেরও পাবে না। অথচ কাজ হাসিল হয়ে যাবে।'

মায়া বললে, 'এ আপনি মন্দ বলেন নি দাদা!'

মাকে বললাম, 'আপনি কি বলেন?'

মা বলে উঠলেন, 'যুক্তিটা মন্দ নয়। কিন্তু তার সময় পাবো কি?'

আমি বললাম, 'কেন? আপনার কি মনে হয় বসন্ত এরই মধ্যে ভয়ানক কিছু করে বসবে?'

'বিশ্বাস নেই বাবা ওকে' মা বলে উঠলেন, 'আজ বসন্ত নিজে এসেছিল। যে কথা সে বলে গেল, তাতে আমার ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে বাবা!' কথাগুলো বলার সংগে সংগেই মা যেন কেমন শিউরে উঠলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'ওদের ওস্তাদের আড্ডায় নাকি একজন মেয়েছেলে দরকার। সেখানে মায়া গেলে মায়ার দাম বেড়ে যাবে অনেক—'

'বলেন কি', আমি শিউরে উঠলাম। এমনিভাবেই হয়তো রাণীদিরও দাম বেড়েছিল এখানে। তারপর কি যে হয়েছে তা জানি না। তবে এ কথায় বেশ বুঝতে পারলাম, রাণীদি সত্যিই এখান থেকে সরে গেছেন। আর সরে যে গেছেন তা আমার ভেতরে উঁকি দিয়ে আর আমের কথাবার্তা শুনে প্রায় নিশ্চিন্তই হয়ে এসেছি। এখন দেখলাম ঘটনাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তাই মায়াকে নিয়ে রাণীদির শূন্য স্থানে বসাবার বসন্তর এত চেষ্টা। আমি ব্যাপারটা উপলব্ধি করে বললাম, 'কিন্তু ভাবতে হবে না—দেখছি আমি ব্যাপারটা, কতদূর কি করা যায়।'

মা বললেন, 'পারবে বাবা, [illegible] আমার [illegible]?'

'বুঝতে পারছি', বললাম, 'আর বুঝতে পারছি বলেই আমি আপাতত ভয়ের কিছু দেখছি না।'

মায়া ফোঁস করে বলে উঠল, 'আপনি ভয়ের কিছু দেখছেন না—সে কি?'

'হ্যাঁ', আমি বললাম, 'দ্যাখো মায়া, বসন্ত যদি তার ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থ করার জন্য তোমাকে টানবার চেষ্টা করত তা হলে সত্যিই ভয়ের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমি দেখছি সে চাইছে তোমাকে আড্ডার মধ্যে সম্ভবত কারো অভাব পূরণ করার জন্যে। এ অবস্থায় কিছুটা সময় হাতে আমরা পাবই—'

'কিন্তু আমার মন বলছে', এবার মায়া বলে উঠল, 'সময় হয়তো আমরা পাব না!'

'দেখা যাক কি হয়', বলে আমি কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করলাম।

সেদিন সেই রাত্রির পর প্রভাত হতে-না-হতেই আমি গিয়েছিলাম টুনটুনিকে নিয়ে মন্টুকে দেখতে। মন্টুকে দেখলাম বেশ ভালই আছে সে। রাতেই রক্ত সংগ্রহ করে এনেছিল শংকর। ভয়ের সীমানা পার হয়ে গেছে সে। মন্টুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার মাসীর খবর কিছু জানো কি?'

মন্টু বললে, 'না মামাবাবু। আমি এতদিন জেলে ছিলুম। ফিরে এসে আর মাসীকে দেখি নি।'

টুনটুনিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি জানো কিছু?'

টুনটুনিও বললে, 'না।'

গত রাতে মায়ের কাছে কথাটা শোনা অবধি শংকর আর ভানুকে বলবার জন্য মনটা আমার ছটফট করতে লাগল প্রায়। শংকরের বোন মায়া—সেই মায়াকে টেনে জাহান্নমে নিয়ে যাবে বসন্ত, এ কি ভাই হয়ে শংকর সহ্য করবে? নিশ্চয়ই মন তার বিদ্রোহ করে উঠবে। আর ভানু, যে ভানু বলেছিল শংকরকে সে আপন ভাইয়ের মত মনে করে এবং মায়াকে মনে করে বোনের মত, যে বলেছিল এমন দিন আসবে যখন বসন্তর হাত থেকে মায়াকে রক্ষা করতে হলে তাকেই দরকার হবে, সবচেয়ে আগে—আজ তার সাহায্য তো একান্তভাবে প্রয়োজন। কাজেই সেই ভেবে আমি ব্যবস্থা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

মন্টুকে দেখে বেরিয়ে পড়লাম শংকর আর ভানুর উদ্দেশ্যে।

গিয়ে উঠলাম বসন্তর ডেরায়—সেই যেখানে আমাকে চোখ বেঁধে ধরে এনেছিল এক সময়ে। সেখানে আসতে সকলেরই দেখা মিলে গেল। দেখলাম বসন্ত বসে বসে মদ খাচ্ছে আর শংকর, ভানু আর সেই আগেকার দেখা [illegible] একজন [illegible]।

মাটির গভীরে

কার্তিকচন্দ্র [illegible]

নষ্ট টিউবওলের পাটাতনে
স্তব্ধ মনে
দোল খাই গভীর শঙ্কায়।
মাটির গভীরে আছে লক্ষ কোটি যুগের কঙ্কাল।
ইতিহাস জন্ম নেবে, ইতিহাস জন্ম নেবে
নিরাশী-নির্মম।

অলস হাতের দাবি
পেয়ে গেছে সরল মানুষ,
বাঁচা আর বিস্তারের চাবি।

প্রথম প্রেমের মতো আশ্চর্য নরম
মাটির ভেতরে আজ কোন্ বিস্ফোরণ।

ইতিহাস জন্ম নেবে, ইতিহাস জন্ম নেবে
নিরাশী-নির্মম।

তাস খেলা মানে যে জুয়া, সে কথা আমার বুঝতে বাকি রইল না। আমাকে দেখে শংকর বলে উঠল, 'কি ব্যাপার, আপনি যে হঠাৎ?'

বললাম, 'খুব দরকারেই এসেছি ভাই।'

ভানু বললে, 'দাদামণি কাল রক্তটা দিয়ে মন্টুর কি উপকারই না করেছেন!'

'থাক্, ছেলেটা যে বেঁচেছে এইটাই যথেষ্ট', বলে আমি বললাম, 'অসময়ে তোমাদের বিরক্ত করতে এসেছি—আমার কথা তোমাদের একটু শুনতে হবে। এসো, একটু বাইরে এসো—'

শংকর বললে, 'যাচ্ছি—'

বসন্ত বললে, 'কি কথা হবে যাওয়া —সামনে বলতে নি-ষে-ধ আছে?'

'আমাদের ঘরোয়া কথা' আমি বললাম। বসন্ত মদের ঝোঁকে বললে, 'ঘরোয়া কথা—তা বেশ। কও যাওয়া ঘরোয়া কথা কও। তবে জেনে রাখো, আমি বসন্তকুমার, মদ খাই, খুব খাই কিন্তু জ্ঞান হারাই না যাওয়া। আমি তোমার চিনি চাঁদ, আর ঘরোয়া কথা কি কইবে, তাও জানি, কিন্তু বেশি দূর এগিও না......আমি তোমায় সা-ব-ধা-ন করে দিচ্ছি!'

আশ্চর্য, লোকটা বলে কি? লোকটা কি আমার মনের কথা টের পেয়েছে? তবে আমি জেনে দেখলাম লোকটা আমার অন্তরের কথা টের পাক আর না-পাক, তার নিজের কথা তো সে জানে—তাই সম্ভবত তারই প্রতিক্রিয়া আমার মনে কি হয়েছে, তা উপলব্ধি করেই বোধহয় ও কথাগুলো বলছে। এসব লোকের এই ধরনেরই কথা হয়। আমি বললাম, 'আমাকে সাবধান করার আপনার কিছু নেই—'

'না হলেই ভাল', বলে বসন্ত আবার মদ্যপান করতে লাগল।

শংকর ও ভানু বাইরে আসতে আমি সব কথা তাদের খুলে বললাম। আরও বললাম, কি ভাবে মা ও মায়া চলে যাবেন দূরে, সে সব কথাও।

শংকর বললে, 'তাই যা হয় করুন। নিজে তো মরেছি, তাই বলে বোনটাকেও কি ডোবাবো?'

ভানু বললে, 'ক্‌কখনো নয়—'

'তা যদি না হয়' আমি বললাম, 'তবে আমাকে তোমাদের সাহায্য করতে হবে।'

'সে সাহায্য আপনি পাবেন', বলে শংকর ফিরে যাবার জন্য উদ্যত হল।

কিন্তু তবু যেন আমার মনের অনুসন্ধিৎসার শেষ হল না। সম্ভবত আমি মায়ার ব্যাপারটারও যেমন একটা সমাধান চাইছিলাম, ঠিক সেইরকমভাবেই অন্তরে অন্তরে চাইছিলাম রাণীদির খবরটাও পেতে। কিন্তু সে খবর কে দেবে আমায়? বসন্তর ডেরা থেকে বেরিয়ে এলাম কেমন যেন একটা অস্বস্তির বোঝা মনে নিয়ে।

যাই হোক, তবু মনে একটা সান্ত্বনা ছিল যে, মায়ার ব্যাপারটায় শংকর বা ভানু দুজনকেই আমি বোঝাতে পেরেছি। রাণীদির খোঁজের জন্য এখন রইল আমার সামনে অনন্ত অবকাশ। ফিরে এলাম আমি।

মায়া বললে, 'সকালেই কোথায় গিস্‌লেন দাদা?'

'একটু কাজে।'

'কাজটা কি শুনতে পারি না?'

শোনাশুনির আর কি। একে একে আমি মন্টুর আহত হওয়ার ঘটনা, তার শরীর থেকে বুলেট বের করার কথা, তাকে রক্ত দেওয়ার কথা, শংকরের বক্ত কিনে আনার কথা, টুনটুনির কথা সব বললাম। আরও বললাম, 'সেই জন্যেই সকালে মন্টুর খবর নিতে বেরিয়েছিলাম।'

মায়া বললে, 'ও।'

প্রতিদিনকার মত সেদিনকার খবরের কাগজটাও মায়া এনে রেখেছিল। কাগজখানা নিয়ে পড়তে বসে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! সর্ব প্রথম যে খবরটির ওপর নজর পড়ল তাতে আমি যেন স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না এবং এই খবরটা ধরেই আমি আমার লক্ষ্যে অনায়াসেই পৌঁছুতে পারব বলে মনেও করলাম। তাই খবরটা বারবার করে পড়তে লাগলাম।

[চলবে]

আজ [illegible] সব [illegible] শব্দ বার-বার [illegible] করছে, তা হোল নির্বাচন। [illegible] থাকুন, তিনি [illegible] একটু [illegible] ছোট [illegible] নিচ্ছিল [illegible] আমি [illegible] যে কোনও [illegible] "কি [illegible] সে বলছে, [illegible] আসছে।'

[illegible] নির্বাচন দেখে-ছিলাম। [illegible] মানুষের [illegible] ফল কি, সে আগুনে মুসলিম লীগ [illegible] গেল। [illegible] দেখছি সে আগুন, তবে শুধু চোখের [illegible] চেষ্টায়, [illegible] একরাশ [illegible] দাউ দাউ করে জ্বলছে। এই [illegible] তবে [illegible] পানি [illegible] না। উনিশ শ' চুয়ান্ন [illegible] পড়েছিল, নেতারা [illegible] কত [illegible] গেছে, [illegible] মেহনতী মানুষের [illegible] অর্থ [illegible] হাসি। [illegible] নন, [illegible] চোরাগলি পথেও সে [illegible] নিষ্পাপ।

তাই এবারও যদি ওরা এই আজাদীকে না পায়, তবে সরকার বা নেতা, কেউ রেহাই পাবে না। ওরা শান্ত শিশু নয় যে, নির্বাচনের খুঁটি আঁকড়ে বসে থাকবে। ওরা ঘূর্ণির সাথে লড়ে, তরুণের বুকে নাচে, ওদের বুকে অগ্নিবীণা ঝঙ্কার তোলে। গত বাইশ বছর ধরে অনেক রক্ত ওরা দিয়েছে। দরকার হলে আরও দেবে, নিজেরাই ছিনিয়ে আনবে নিজেদের আজাদী। তবু ওরা নির্বাচনকে মেনে নিয়েছে সবকারের কথায়, নেতাদের আশ্বাসে। উনিশ শ' সত্তরের এই প্রতি-শ্রুতির বুকে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের ঘটনাপ্রবাহের উৎস। আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব এইখানেই। আমি যে দোকানে এসে রোজ চা খাই, তার মালিক মোস্তাফা সাবেয়ার ভারি চমৎকার কথা বলেছিল। বলেছিল—"নির্বাচনটা এবার ঠিক কাল-বোশেখী, ভালোয় ভালোয় যদি কেটে যায় তো গেল, নইলে—কিছু একটা সাংঘাতিক ঘটবেই।"

আমারও মনে হয়, সত্তরের এই নির্বা-চনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির জীবনেও একটা বিরাট কিছু ঘটবে। যারা মেহনতী মানুষের সাথে সামিল হবে তাদের জন্যে লড়বে কেবল তারাই টিকে থাকবে, আর যারা কেবল "দফা" আওড়ে, সভা করে আসল কাজের সময় পিঠ দেখাবে তারা নিচে নেমে যাবে। পল্টনের মাঠে কার সভায় চার লক্ষ মানুষের জমায়েত হোল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হোল কে আর কার দল আওয়ামের স্বার্থে, আওয়ামের আজাদীর স্বার্থে কতটা রক্ত ঢালাতে পারবে? আগামী নির্বাচনের দ্বিতীয় রাজনৈতিক গুরুত্ব এই।

আরও একটা ব্যাপার ঘটবে নির্বা-চনের পরে, যার আভাস এখনই কিছু কিছু পাচ্ছি। নির্বাচনের পর পাকি-স্তানের রাজনৈতিক দলগুলি স্পষ্টত দুটি মূল বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে যাবে। সবচেয়ে প্রগতিশীল দলটির বিরুদ্ধে বাকী রাজনৈতিক দলগুলি এক-

[illegible]
মেহনতী মানুষের [illegible] হতে হবে।

আজ থেকে তের মাস আগে ঠিক এমনি একটি দিনে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়েছিল, এই নিয়ে দ্বিতীয়-বার। প্রথমবার উনিশ শ' আটান্ন, তারিখ সাতই অক্টোবর, সময় রাত সাড়ে দশটা। একই কথা, একই অজুহাত, একই বেতার ভাষণ। মনে আছে সেবার রাত সাড়ে দশটায় আমাদের এক প্রিয় বন্ধুকে দাফন করে তার রুহের মাগফেরাত চেয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। বংশাল রোডের কাছে আসতেই ভারী বুটের আওয়াজ শুনলাম, তাকিয়ে দেখি কিছুটা তফাতে সাঁজোয়া গাড়িতে সৈন্য বোঝাই হয়ে আছে। আরও কিছু পথে টহল দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির গলিতে ঢুকে দেখি বসুলের পানের দোকান ঘিরে একটা ছোট জটলা। কাছে যেতে কে যেন বলল "এবার ঘরে চল, নইলে মারা পড়বে।" বুঝলাম—ওরাও বাতাসে বারুদের গন্ধ পেয়েছে।

সে রাতে সাবেক প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা তাঁর ঘোষণায় বলেছিলেন—"গত দু-তিন বছর ধরে আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে দেশের ভেতরে একদল নষ্ট চরিত্র, স্বার্থপর, লঘুচিত্ত রাজনৈতিক নেতা আমার সহজ-সরল ভালমানুষ দেশবাসীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব নেতারা নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বলেছেন, তাঁরা গণতন্ত্র আনবেন, সাধারণ মানুষকে বাঁচাবেন, কিন্তু আমার এটা আদৌ বিশ্বাস হয় না। ও'রা নিশ্চয় চাঁদের দেশের মানুষ নন। নির্বাচন করার সুযোগ পেলেই ও'রা আরও বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিংস্র আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে এবং এর জের টানতে হবে দেশের মানুষকেই।" উপ-সংহারে প্রেসিডেণ্ট মির্জা বলেন—"দেশকে চোরাকারবারী, মজুতদার এবং রাজ-নৈতিক নৈরাজ্যবাদীদের হাত থেকে বাঁচাতে চাই, সেই জন্যেই আমি সামরিক শাসন জারি করেছি। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দেশের মানুষ আরও স্বাধীন এবং আরও সুখী হবে।" তারপর আরও কয়েক-দিন বাদে সাতাশে অক্টোবর রাত দশটা নাগাদ ইস্কান্দার মির্জা সরাসরি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালেন, মানুষ জানল দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে তিনি পদত্যাগ করেছেন! আসলে আয়ুবই তাঁকে সরিয়ে দিলেন।

গত বছরের ঘটনাও ঠিক একই-রকমের। পঁচিশে মার্চ সাবেক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান তাঁর শেষ বেতার ভাষণে বললেন—"পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখার সুযোগ আমার আর হবে না। আপনারা জানেন

যে, [illegible] প্রশাসন-ব্যবস্থা [illegible] ভেঙে গেছে, অর্থনৈতিক অবস্থা চরম বিপর্যয়ের মুখে গিয়ে ঠেকেছে। উৎপাদন ক্রমশ কমছে, ঘাম দিয়ে, রক্ত দিয়ে দিনের পর দিন একান্ত যত্নে, নিষ্ঠায় যে দেশকে আমরা গড়ে তুলছিলাম গত কয়েক মাসের মধ্যে, তাকে একটা বিপদসঙ্কুল পথে টেনে আনা হয়েছে। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। গোল টেবিল বৈঠকে ভেবেছিলাম রাজনৈতিক দলগুলি একটা ঐক্যে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু প্রত্যেকেই দাবি করলেন যে, তাঁর দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এত সব দাবি মেটাতে হলে পাকিস্তানের অস্তিত্বই থাকে না। একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার দেশের পক্ষে অপরিহার্য। রাজনৈতিক নেতারা তা' বোঝেন না। কিন্তু তাঁরা বোঝেন না বলে আমি বুঝব না, এমন হতে পারে না। আমি ধ্বংসযজ্ঞের পৌরোহিত্য করতে পারব না। সমস্ত দেশের মানুষ আজ জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে চায়। আমি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির আসন ত্যাগ করছি।"

এর আগের দিন চব্বিশে মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবনে বসে আয়ুব ইয়াহিয়াকে যে চিঠি লেখেন তার সারমর্মও প্রায় একই। পড়তে পড়তে মনে হয়, যেন ইস্কান্দারের বিদায় ভাষণ। আয়ুব লিখেছেন—"প্রিয় ইয়াহিয়া,—গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক শক্তি আজ একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। সভ্যতার অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে। একমাত্র সেনাবাহিনীই পারে এই বিপদের মোকাবিলা করতে। ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে গণতন্ত্রকে উদ্ধার এবং কায়েম করা নিশ্চয় আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কেননা, তার ফলেই সমগ্র আওয়ামের মঙ্গল আসবে।

কিন্তু নসিবের ফেরে আমরা যখন অগ্রগতির পথে, সুখের, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছি, ঠিক তখনই এক অর্থহীন হিংস্র আন্দোলন আমাদের গ্রাস করল। আজ বড় বড় কথা বলে এই আন্দোলনকে উঁচুতে তুলে ধরলেও ভবিষ্যতে ঠিক টের পাওয়া যাবে যে, এর পেছনে যারা কাজ করছে তারা কিছু বদলোকের পেটোয়া। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এরা দেশের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করছে। শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং নিরপেক্ষ সরকারী কর্মচারীরাও কঠোর সমালোচনা, প্রহার এবং অন্যায় জুলুমের শিকার হয়েছে। জোর করে দাবি-দাওয়া আদায় করছে শ্রমিকরা, কিন্তু কাজ করছে না, উৎপাদন কমছে। সাধারণ মানুষের এক পর্যায় অতিক্রান্ত হচ্ছে। এক [illegible] আমি যা কিছু [illegible] গড়েছি তা নষ্ট করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। যাঁরা নিজেদের জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবি করেন, সেই সব নেতাদের সঙ্গে আমি বৈঠক করেছি, যাতে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, এ'রা নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যথেষ্ট সময় দেওয়া সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট ব্যাপারে ও'রা আসতে পারেন নি। এদিকে জাতীয় সভার সদস্যরাও নিরাপদ নন। তাঁদের আদেশ করা হয়েছে, হয় তাঁরা পরিষদ বয়কট করুন আর নয়ত সংবিধানকে এমনভাবে পরিবর্তন করুন, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে দুর্বল হয়ে যায়। বেসামরিক সরকারের ক্ষমতা সেই যে, এই অদ্ভুত পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনে, কাজেই আমি সেনাবাহিনীকে এই দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিচ্ছি। ইয়াহিয়া, আমি জানি, আপনি দেশকে ভালবাসেন, দেশের জন্যে আপনাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়াবার সাহসও আপনার আছে। কাজেই আপনাকে অনুরোধ করছি—আপনি দেশকে বাঁচান।"

আয়ুবের বেতার ভাষণ এবং তাঁর চিঠির উত্তরে ইয়াহিয়া খান বললেন, (ছাব্বিশে মার্চ)—"তথাস্তু", ঠিক যেমন করে আয়ুব বলেছিলেন এগার বছর আগে মির্জার ঘোষণার উত্তরে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, গোড়া থেকেই ইয়াহিয়া, আয়ুব এবং তাঁদের পূর্ব-পুরুষরা পাকিস্তানের মানুষের আজাদী নিয়ে বল খেলছেন। কিছুদিন বাদে বাদে বল চলে যাচ্ছে এক শাসকের হাত থেকে অন্য শাসকের হাতে। কিন্তু আমরাও বলি—"হে শাসক চক্র, হে প্রতিক্রিয়াশীলরা তোমরা জেনে রাখ যে, চাকা যখন একবার গড়াতে শুরু করেছে, তখন তা' সহজে থামবে না; আর যখন থামবে তখন তোমাদের কবরের ওপর দিয়েই থামবে। তোমরা কাগজে বাঘ, তোমরা শ্বেত সন্ত্রাস দিয়ে, পুলিশ দিয়ে, সৈন্য দিয়ে, হাজারো বিধি-নিষেধের চক্রব্যূহ করে, তার মধ্যে বসে আমাদের ওপর অত্যাচার কর। কিন্তু জেনে রেখো আমরা কোটি কোটি অভিমন্যু তৈরি হয়ে আছি। তোমাদের দাফন করবে ক্ষুধিত শকুনী, কবরখানার শেয়াল-কুকুর। আমরা জিতবই। কেননা, আমরা তো আমাদের কলজেকে বুকে ঢেকে প্রহরীর আড়ালে আড়ালে হাঁটি না। আমাদের জান, আমাদের কলজে আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা থাকে। দরকার হলেই তাকে আমরা ছুঁড়ে দিতে জানি। আর জান দিলেও, কলজে বুলেটের গুলীতে ঝাঁঝরা (লেখক) হয়ে গেলেও আমরা মরি না! কেননা, আমাদের ইচ্ছে, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তখন রইবে, কুদ্দুস, আনোয়ার, নির্মল, জীতেন, সাকিনা দীপাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। আমরা যারা মরব, ওরা তাদের হয়ে বাঁচবে। কোনও অদৃশ্য শক্ত হাত বিদেশ থেকে এসে শাসকদের বাঁচাতে পারবে না। মেকং নদীর বুকে ভিয়েতনামীদের লাশ ভেসে চলেছে। কিন্তু এখানে পদ্মা, মেঘনার বুকে ভাসবে আমাদের দেশী ও বিদেশী উভয় শত্রুর লাশ!

ইনকিলাব, জিন্দাবাদ,
এগার দফা জিন্দাবাদ,
ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ!

আপনারা আমার সালাম নেবেন।

[চলবে]

শহরে গুরুদেবের আক্রমণ

তের পার্বণের দেশে দোল-দুর্গোৎসব, জলসা-জমায়েতে স্পীকার, লাউড স্পীকারের উপদ্রবটা পাড়াটে চোখ-রাঙানীর ভয়ে শহর কলকাতায় একরকম সহ্য হয়েই এসেছে। অসহ্য হলে আন-ফিট। শহর ছেড়ে সরে পড়া ভিন্ন উপায় নেই। কে রুখবে এই সঙ্গীতানু-রাগ? লাউড স্পীকারের ঢালাও অনু-মোদন থানায় থানায় ইদানীং রেডিমেড। অবশ্য থানাদার নির্দোষ। কাকে মেরে কাকে রাখেন তাঁরা! পনের হাত গলিতে পঁয়ত্রিশটা ঠাকুর, তার পঁয়ত্রিশটা (কম-পক্ষে) চোঙা চাই-ই। চিৎকারে গান যেন মেসিনগানের মতো জানলা-দরজা-দেওয়াল ফুটো ক'রে ঝাঁঝরা বানিয়ে দেয়। কানের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার। জানি না, এই সূত্রে ই এন টি স্পেশ্যা-লিস্টদের ইনকাম ট্যাক্স কিছু বেশি দিতে হচ্ছে কিনা। তবে, কঁজনাই বা কালো টাকা শাদা করে আই টি ডিপার্টমেন্টের তালিকায় নিজেকে শাঁসালো খদ্দের বলে পরিচয় দেন। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, শহুরে মানুষের কান ওঁরা ইদানীং অনেক বেশি পরিমাণে চিকিৎসা করার সুযোগ পাচ্ছেন। তৎসত্ত্বেও কলকাতায় লাউড স্পীকারের বাড়-বাড়ন্তের সঙ্গে ই এন টি স্পেশ্যালিস্ট-দের কোন নেপথ্য চক্রান্তের যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা অবশ্যই করব না। [illegible] 'নাক-গলা'র জন্য না হোক, কানের জন্য কলকাতায় ডাক্তারের সংখ্যা বাড়াতেই হবে। স্পীকারে লাউড স্পীকারে কান পচিয়ে ছাড়ল।

শুধু পাব্বনী স্পীকারই নয়, অন্যো মেয়ের বিয়ে, ছেলেবাড়ির বৌভাত, মায় শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিনেও লাউড স্পীকারে সানাই সঙ্গীত পরিবেশনার বদান্য আয়োজনে শহরবাসী দৃক্‌পাত-হীন। একই বাড়িতে পাঁচটা রেডিও-র উচ্চৈস্বর প্যাঁক-প্যাঁকানি ছাড়াও নিত্যি-দিনের সঙ্গীতাড়ম্বরে কানের পর্দা মোটা হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা, চোঙা-হীন মুখের বাণী কারও আর মরমে প্রবেশই করছে না। চোঙা চাই-ই। গত দুই দশকের কলকাতা এক হিসেবে চোঙা কলকাতা।

লটারীর টিকেট, দাঁতের মাজন, ছারপোকার ওষুধ, এমন কি ফুটপাথ-গণৎকারের পাবলিসিটি—সমস্তই লাউড, মোর লাউড একেবারে এ্যালাউড না হলে ক্রেতার কর্ণাকর্ষণে সম্ভবত সফল হচ্ছে না।

এসবও ক্ষমার্হ ছিল তবু। কেন না পুজো থেকে ফোড়া-ফ্যাঁড়ার পুঁজ-রক্তাদি চিকিৎসার টোটকা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার যখন ব্যবসায়িক, তখন তাতে সোরগোল এবং প্রতিযোগী চিৎকারের কনুই-ঠোকাঠুকি চ[illegible]!

কিন্তু কলকাতায় গুরুদেবের আবির্ভাবও যে শহুরে মানুষের বেওয়ারিশ কানের ওপর আকর্ষণী লাউড স্পীকারের সাহায্য তলব করে বসবে এ মশাই কখনও কল্পনায়ও উঁকি [illegible] না। লাউড স্পীকারের এই কর্ণাকর্ষণী মহিমা শহরে প্রবেশ লাভের অনেক আগেই কবি শহর ছেড়ে শান্তিনিকেতনে পালিয়ে গেছলেন। চার-পাঁচতলা ইটের পরে ইট সাজানো দেখেই তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়েছিল। বাইশ-তলার বিষম আকৃতি ঠাণ্ডাবাড়ি দর্শনের পর তিনি যে কী করতেন এবং শান্তিনিকেতনকে প্রসার্যমান 'সিটি'র সীমানা থেকে কত-দূরে সরিয়ে নিয়ে আশ্রমিক আবহাওয়া রক্ষার চেষ্টা পেতেন জানি না, তবে কল্পনা করতে পারি, তিনি হয়ত সম-তলভূমি ছেড়ে পাহাড়ী গড়ানে আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথতেন। কেন না একমাত্র সেখানেই বাইশতলার বিশালতা 'হ্যাণ্ডি-ক্যাপড্'।

রবীন্দ্রনাথ নয়, রবীন্দ্র-দেশের ধর্মীয় গুরুরা বর্তমানে আশ্রমের পাত-তাড়ি গুটিয়ে শহরের নয়া গোজামিল রূপে দেখা দিয়েছেন। তের পার্বণের পাড়াটে অত্যাচারের সাময়িক ক্লান্তির কালে শহুরে গুরুদেবরা নতুন উপদ্রবের মতো উপস্থিত হচ্ছেন। এঁদের শিষ্য-বাহিনী পরম নাস্তিকের কানেও হরি-নাম জপের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করে লাউড স্পীকার সহযোগে পাড়ায় পাড়ায় খামকা এবং হঠাৎ হঠাৎ পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিচ্ছেন। সেকেলে গুরুরা নির্জন গুহা বাছাই করে নিতেন সাধনার সিদ্ধি-লাভের জন্য। একেলে গুরুরা পয়সা-ওয়ালা প্রধান শিষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রচারের লোভে। শিষ্যও পিলপিলিয়ে জুটে যাচ্ছে। গুরুর কীর্তি-বন্দনা লাউড স্পীকারের মাধ্যমে কীর্তিত হচ্ছে। এবং যে গুরুর শিষ্যকুল যত বড় প্যাণ্ডেল খাটিয়ে যত বেশি প্রতিবেশী সমাজের কাজকর্ম গোল্লায় দিতে পার-ছেন, দীক্ষাভিলাষী শিষ্য-শিষ্যা তাঁর সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। সম্ভবত শাঁসালো গুরুদের নিজস্ব মাইক, লাউড স্পীকারও আছে, যেমন বিশিষ্ট যাত্রাদলের একপ্রস্থ নিজস্ব পোশাকাদি থাকে। কিন্তু নিষ্কর্মা গুরু-কুলের প্রকৃত কর্মটি কি, গুরুকীর্তি ছাড়া শিষ্যবাহিনী বস্তুতই কী প্রচার করার জন্য এমন ব্যাকুল, তা এ পর্যন্ত বোধগম্য হল না! এই গুরুবাহিনী জনগণের কোন্ মুক্তির উদ্দেশ্যে স্বত-প্রবৃত্ত হয়ে গৃহস্থকুলের শান্তিভঙ্গের জন্য লাউড স্পীকার পণ করে উঠেপড়ে লেগেছেন? কোনও সমাজসংস্কার? কোনও রাজনৈতিক দলের দালালি? কোনও নৈতিক মানোন্নয়নের অভিপ্রায়? 'গুরুপদে সদা রাখিও মতি'—জাতীয় গুরুভজনা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে গেছি, এ-ও এক ধাপ্পাবাজি, [illegible]

রাজনৈতিক অনুশাসন অনেকেই যার পেছনে চক্রান্ত কোনো দূরবর্তী নেপথ্যালোকে তৈরি হচ্ছে। না হলে আত্মানং বিদ্ধি-র দেশে সভা ডেকে জনসাধারণের বুদ্ধির ওপর এহেন অত্যাচার কেন? যাঁরা প্রকৃত গুরুশ্রেণীয়; ভগবৎ প্রাপ্তি, বিপদতারণ, পাপক্ষয় প্রভৃতি ব্যাপারে যাঁরা পাপী-তাপীকে সাহায্য শিক্ষা দিয়ে এসেছেন: তাঁরা তো কখনো এঁদের মতো সামাজিক অত্যাচারী হয়ে ওঠেন নি। গুরুযুগে শিষ্যকুল গৈরিক গঙ্গার জল আলোড়িত করে ধু ধু মাঠ দক্ষিণেশ্বরে ছুটে গেছেন। গুরুকে লাউড স্পীকার কাঁধে ভগবৎ বিদ্যা 'সেল' করে বেড়াতে হয় নি শহরের পথে পথে।

এঁদের হচ্ছে। ফলত প্রতিবেশীকুল ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছেন। কোনো প্রটেকশন নেই। না পাড়াটে মস্তানদের লাউড স্পীকার, না বেপাড়ার গুরুজীর কৃপা. কেউ রেহাই দিতে নারাজ।

ফলত ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো, চিন্তাশীল মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তা সব রসাতলে যাচ্ছে। দেশে এমন আইন নেই, এমন সাহসী প্রশাসন নেই যা অসহায় নাগরিকবৃন্দকে এই অত্যাচারের কবল থেকে রাহুমুক্ত করে। পুজো-পার্বণ, জলসা, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, বিবাহোৎসব এবং গুরু ভজনার চীৎকারে খোদা মেরে যাচ্ছে মননশীল কলকাতা। নষ্ট হচ্ছে কলকাতার কান, মনের প্রশান্তি। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ বলে উপদেশ বর্ষণের নৈতিক অধিকার দেশের গুরুজনরা (গুরুদেবরা নন) দ্রুত হারিয়েছেন। কেন না পড়াশুনোর জন্য অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টিতে মাথাভারি সমাজের মাথাব্যথাহীন আপন-পুরানী মহাজনরা ব্যর্থ। রোগীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা এ দেশে নেই, কিন্তু তার শান্তিতে রোগশয্যায় বিশ্রামের নাগরিক অধিকারটুকুও লাউড স্পীকারে কেড়েছে। জানি না, গুরুবন্দনার পরিত্রাহি চিৎকার পরলোকযাত্রীর স্বর্গলাভে কোনো বিশেষ সহায়তা করছে কি না। তবে গুরু ব্যবসায়ের ফলাও পাবলিসিটি যে হচ্ছে শহরবাসীরই কানে পাক মেরে, তাতে সন্দেহ নেই। মন্ত্রোচ্চারণ এবং মোক্ষ লাভই যাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের এহেন পাবলিসিটি-প্রেম কেন? স্বর্গের মই-বেচা এই ব্যবসায়ী প্রচার [illegible] প্রসারকরণের পথে। এ বাজাই বন্ধ না হলে [illegible] [illegible] আর একটি প্রচণ্ড উৎপাতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অ্যাপোলো-১৩—বিপর্যয়ের কারণ ও ফিরে আসার কাহিনী

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মহাকাশযানে বিদ্যুৎ-উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের জনাই অ্যাপোলো—১৩র অভিযাত্রীদের চাঁদে নামার পরিকল্পনা বাতিল করে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। অথচ বিস্ময়ের কথা, অ্যাপোলো-মহাকাশযানে বিদ্যুৎ উৎপাদন-ব্যবস্থাটি এরই মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল, বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে যে নবযুগ আসছে, এ হল তারই আদিরূপ। ভবিষ্যতে এইরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেই এমন সব জায়গায়ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে, যেখানে এই শক্তি বিরল। অফিস-আদালত এবং কল-কারখানা তো বটেই, সাধারণ ঘর-বাড়িকে পর্যন্ত এর আওতায় আনা যাবে।

এই ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় 'ফিউঅ্যাল্ সেল্'। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া, এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একই সংগে উৎপন্ন হয় জল এবং তাপ। মহাকাশযানে নভশ্চররা এ-থেকেই পানীয় জল পেয়ে থাকেন। তবে তাপ যা উৎপন্ন হয়, তার সবটুকু ওঁদের কাজে লাগে না। তাপের কিছু অংশ 'ফিউঅ্যাল সেল্'-ব্যবস্থায় ফিরে যায়; আর বাকি অংশ অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় মহাশূন্যে পরিত্যক্ত হয়। তাপ-বিকিরক কিছু পদার্থের সাহায্যেই এই বাড়তি তাপ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

লোভেল দম্পতি

কিছুদিন আগে অবধি ফিউঅ্যাল্ সেল শুধুমাত্র ল্যাবরেটরিতেই ব্যবহৃত হত। সম্প্রতি মহাকাশযানে ওদের উপযোগিতার প্রশ্ন উঠতেই বিজ্ঞানীরা তৎপর হলেন: উন্নত ধরনের 'ফিউঅ্যাল সেল্' গড়বেন বলে উঠে-পড়ে লাগলেন।

অ্যাপোলো মহাকাশযানে 'ফিউঅ্যাল্ সেল্' দিয়ে গড়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য থাকে মোট তিনটি। এদের এই তিনটিকেই রাখা হয় 'সারভিস্ মডিউল-এ। এই মডিউল দেখতে বেলনাকার। (সিলিণ্ড্রিক্যাল), এ থাকে নভশ্চরদের আস্তানা কম্যাণ্ড মডিউল-এর সংগে যুক্ত।

'সারভিস্ মডিউল্'-এ মহাকাশে পাড়ির জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় রসদ থাকে। এই 'সারভিস্' এবং 'কম্যাণ্ড্ মডিউল্' মিলে গড়ে ওঠে মূল মহাকাশযান।

'সারভিস্ মডিউল্'-এ অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মজুত করে রাখা হয়। খুবই কম তাপাঙ্কের মধ্যে রাখা হয় ওদের এবং ওরা থাকে না-বায়বীয়, না-তরল অবস্থায়।

প্রতিটি 'ফিউঅ্যাল্ সেল্' ব্যবস্থায় মোট ৩১টি করে সেল্ থাকে। আর থাকে 'ইলেক্‌ট্রোলিট্'; যার শতকরা ৮৩ ভাগ পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড্ আর বাকি ১৭ ভাগ জল।

ইলেক্‌ট্রোলিট্-এর তাপাঙ্ক ১৬৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে গেলেই শক্তি-উৎপাদক রাসায়নিক-বিক্রিয়া শুরু হয়। তবে এই রাসায়নিক-বিক্রিয়াকে চালু রাখতে গেলে তাপাঙ্ক ১৯৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ওপরে থাকা চাই।

নভশ্চররা বলেন, 'সারভিস্ মডিউল্'-এর দুটি 'ফিউঅ্যাল্ সেল্'-ব্যবস্থা বিকল হবার আগে ওঁরা অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেয়েছেন। ভারী কোনো বস্তু সজোরে কোনো কিছুকে আঘাত করলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি শব্দ।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন-সমন্বিত 'প্রেস্যার ট্যাঙ্ক' ফুটো হয়ে যায় এর ফলে। 'সারভিস্ মডিউল্'-এর রসদ-সরবরাহ-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, ক্ষুদ্রকায় কোনো উল্কার আঘাত থেকে এটা হতে পারে। স্বয়ংক্রিয় বহু মহাকাশযানেই এর আগে এমন আঘাত লেগেছে; কিন্তু মানুষ-চালিত কোনো মহাকাশযান আর কখনও এ-ধরনের দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হয়েছে বলে শোনা যায় নি।

প্রশ্ন উঠবে, এত বড় দুর্ভাগ্যের আঘাত সহ্য করেও অ্যাপোলো—১৩-র নভশ্চররা কী করে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরে এলেন? মহাকাশযানে অক্সিজেন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, তাপ-নিয়ন্ত্রণের উপায় নেই, বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা বিকল হওয়ায় ফলে আলো জ্বলছে না, মূল-এঞ্জিন চলছে না—এই অসহনীয় অবস্থা থেকে নভশ্চররা প্রাণ নিয়ে ফিরলেন কেমন করে?

এর জবাব হল, ওঁরা ফিরলেন প্রধানত তিনটি কারণে: (১) ওঁদের নিজেদের উপস্থিত-বুদ্ধি ও সাহস, (২) হিউস্টনের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা এবং (৩) ভাগ্যের দৌলতে।

'সারভিস্ মডিউল্' বিকল হবার পর নড়বড়ে 'কম্যান্ড মডিউল'কে আশ্রয় করা ছাড়া নভশ্চরদের উপায় ছিল না। কেন না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের ধকল একমাত্র এই 'কম্যান্ড্ মডিউল্'-ই সইতে পারে। যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় তখন, তা থেকে নভশ্চরদের একমাত্র সে-ই বাঁচাতে পারে। অ্যাপোলো-মহাকাশযানের অন্য সব অংশ—'সারভিস বা লুনার মডিউল্'-এর সে ক্ষমতা নেই। বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসা মাত্রই ওরা জ্বলে উঠবে। অতএব, হাতে সময় থাকতে যেমন করে হোক পরিত্যাগ করতে হবে ওদের।

নভশ্চররা তাই করলেন। ফিরে আসার পর্বে প্রথমেই 'লুনার মডিউল্' বা চান্দ্রযানের সাহায্য নিলেন ওঁরা। পর্যায়ক্রমে ওঁদের এক-একজন করে গিয়ে শুতে থাকলেন। চান্দ্রযানের এঞ্জিন, অক্সিজেন এবং তাপ-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কাজে লাগালেন। ঐ যানটির সঙ্গে যুক্ত এক সুড়ঙ্গপথ ধরে অক্সিজেন এবং তাপ এসে পৌঁছুল 'কম্যান্ড্ মডিউল্'-এ। এবং এ ছাড়া চান্দ্রযানের এঞ্জিনই মূল মহাকাশযানটিকে ঠেলে নিয়ে এলো পৃথিবীর অভিমুখে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের কিছুক্ষণ আগে 'সারভিস্' আর 'লুনার মডিউল্'কে পরিত্যাগ করলেন নভশ্চররা; এবং 'কম্যান্ড্ মডিউল্'-এর ব্যাটারীগুলো চালু করলেন। প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে আসা অবধি আধ ঘণ্টাখানেক সময় ধরে যা' কিছু বিদ্যুৎ প্রয়োজন হল, তা ওদের থেকে পাওয়া গেল। নভশ্চররা এদের আগে চালু করেন নি; কারণ, এদের জীবনসীমা খুবই সংকীর্ণ; দশ ঘণ্টা মাত্র। এবং একবার এদের শক্তি যদি নিঃশেষিত হয়ে যায় তো হাজার চেষ্টা করেও বায়ুমণ্ডল ভেদ করে নেমে আসবার সময় আত্মরক্ষার কিছু করার থাকবে না।

অবশ্য ভাগ্যগুণে চাঁদে নামবার আগেই মূল মহাকাশযানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু যদি তা' হত চাঁদে নামবার পরে, তবে চান্দ্রযানের অক্সিজেন এবং বিদ্যুৎ আগে থাকতেই প্রায়-নিঃশেষিত হয়ে থাকত নিশ্চয়; এবং নিশ্চয় তখন মহাকাশের বুকে চরম অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হত নভশ্চরদের।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অ্যাপোলো-১৩র এক মরণবিজয়ী নভশ্চর হেজ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ছয় ॥

বে-টি আছে, প্রাইভেটে এম-এটা পাশ করলে গ্রেড বাড়ে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বই-পত্র নিয়ে বসল স্বপ্না। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে পড়বার জো নেই, একরাশ হোম-টাস্কের খাতা দিয়েছে মেয়েরা।

সেই খাতাগুলো দেখে, ভাষা আর বানানের বিপর্যয়ে লাল কালির দাগ টানতে টানতে রাত এগারোটা বাজল। তারপর এম-এর নোটগুলো। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট বোধগম্য হচ্ছিল না তার, কান্ট-হেগেল-দর্শনের তত্ত্ব, সব একসঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল, মনে হতে লাগল সব লাল কালি দিয়ে কাটাকুটি করা।

একমাত্র বাবার ঘরে আলো। বড়দা শুয়ে পড়েছে, ছোড়দার ঘর তালাবন্ধ। বাবার ঘুম কমে গেছে, অনেক রাত অবধি এটা-ওটা পড়েন, আবার ঘুম থেকে উঠে পড়েন চারটে-সাড়ে চারটে না বাজতেই। ছোড়দা উধাও হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বাবার অনিদ্রা আরও বেড়েছে। ছোড়দা সম্পর্কে বাবার কী যে আশা ছিল।

নোটগুলো সরিয়ে রেখে স্বপ্না চোখ তুলল। পাশের বাড়িতে একতলা-দোতলায় সব আলো নিবে গেছে। নারকেলগাছের শব্দ উঠছে হাওয়ায়—নির্জন পথের ওপর পাতার ছায়া দুলছে। একটা সাদা কুকুর ঘন্টাখানেক আগে চলে-যাওয়া কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটানা সুরেলা ভঙ্গিতে ডাকছেঃ ভু-ঔ-ঔ-ঔ—

বাবার অনেক আশা ছিল ছোড়দার ওপর। কিন্তু আমাদের মধ্যে যা [illegible] এগিয়ে গেল। সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে পর্যন্ত কিছু [illegible] নি; নিয়মিত পড়াশুনো করছিল, শেষ পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করে বেরিয়ে আসবে, তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

অথচ ছোড়দা মনে মনে তৈরি হচ্ছিল। সে চিরদিন কম কথা বলে, বাইরে থেকে মনের চেহারা কখনো বোঝা যায় না। সে যে রাজনীতি নিয়ে ভাবত—এমন সন্দেহই কারো জাগে নি কোনো দিন। অথচ এ বাড়িতে রাজনীতি চিরকাল সজাগ—দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত বাবা ও-ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নি আর স্বাধীনতার পরে বড়দা গলা চড়িয়ে বলতঃ 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়!'

ছোড়দা থাকত নিজের পড়াশুনো নিয়ে। সেই ছিল তার তপস্যা।

বড়দা বলতঃ 'একেবারে বুক-ওয়ার্ম'। বইয়ের বাইরে পৃথিবী বলে কিছু নেই ওর কাছে।'

সেই বড়দা এখন রাজনীতির নামে বিরক্ত। দু'একটা বামপন্থী সভা-সমিতিতে কখনো-সখনো যায়, পত্রিকা কিংবা বই-টই পড়ে, তার বেশি আর কিছুই নয়। বলে, 'দল বলে আর কিছু নেই, যা আছে তা দলাদলি। কমন এনিমির কথা ভুলে গিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে লড়তে চায় এখন—শ্রমিকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় শ্রমিককে, কৃষককে দিয়ে কৃষকের রক্ত ঝরায়। বাংলা দেশে [illegible]-টিস্ট পলিটিক্সের বারোটা বাইজ্যা গেছে।'

আর বাবা তলিয়েছেন নিজের ভেতর। তিনি আর কথা বলেন না।

কী পেয়েছেন? তিনিই জানেন। অথবা বাবার মতো পুরনো আদর্শবাদীরা কিছুই চান না। একটু আগেই কাট্‌ [illegible] পড়ছিলেন। বাবার জীবনের তত্ত্ব [illegible] রেল কান্টের জীবন-ভাষ্যের মধ্যেই আছে। [illegible] জন্যেই তো তোমার সাধনা; কিন্তু তোমার নিজের জন্যে আছে পূর্ণতা; সেই পূর্ণতা তোমার ব্যক্তিগত সুখ দেবে সে আশা রেখো না—হয়তো যন্ত্রণা, হয়তো চরম দুঃখই তুমি পাবে—কিন্তু পূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই তোমার কাম্য নেই।' নান্য পন্থাঃ—আর কোন আশঙ্কা তুমি রেখো না।

বাবা দেশের জন্যে, সকলের জন্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। নিজে চেয়েছিলেন 'পূর্ণ' হতে—কী পেয়েছেন? ছোড়দাও সেই পথই বেছে নিয়েছে। 'ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে।' বাবা ছোড়দার কাছে অনেক আশা করেছিলেন, কিন্তু ছোড়দা কি তাঁকে নিরাশ করেছে? সেও কল্যাণের পথ ধরে যেদিকে চলেছে—

'[illegible] নাই?'

[illegible] চমকালো। বৌদি।

'[illegible] দিয়া। বারোটা বাজে!'

'এই এট্টু নোটগুলো দেখতাছিলাম। পড়বার সময় পাই না তো সমস্ত দিন।'

'[illegible] পড়তাছস।'—বৌদি বিছানার [illegible] বসে পড়লঃ 'পাঁচ-সাত মিনিট [illegible] আইস্যা খাড়াইয়া রইছি—তর চোখ তো বইয়ের দিকে নাই।'

'না' স্বপ্না হাসলঃ 'ঠিকই ধরেছো—পড়ায় মন বসতাছে না। এটা-ওটা ভাবতাছিলাম। তা তুমি উইঠ্যা আইলা ক্যান?'

'ঘুম আসতাছে না। আইজ আবার একটু টানের মতন উঠল।'

বৌদির হাঁপানি আছে। মধ্যে মধ্যে খুব কষ্ট পায়, আবার হয়তো [illegible] কোনো চিহ্নও থাকে না।

[illegible] বলল, 'অনি?'

'না, সেই রকম কিছু না। [illegible] একটা [illegible] খাইলাম, তারপর [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible]

[illegible] জড়াইয়াছে—তাই আইলাম।'

স্বপ্না বললে, 'আমার জন্য ভাবতে হইবো না, অখন শোও গিয়া।'

বৌদি একটু চুপ করে রইল।

'ভালো লাগতাছে না। একটা চাকরী-বাকরী করলে হইত।'

'এই শরীর নিয়া?'

শুধু হাঁপানি নয়, সেটা বড় কথাও নয়। বৌদির শরীর নীল হওয়ার পর সেই যে ভাঙল, তারপর থেকে তার এটা-ওটা অসুখের বিরাম নেই আর। অল্প অল্প জ্বর হয় যখন-তখন। ডাক্তার বল্লেন, এ্যানিমিয়ার জন্যে।

বৌদির নিশ্বাস পড়ল একটা।

'সত্যি. শরীরটা যে কীভাবেই ভাঙল। সব কাজের বাইরে চইল্যা গেছি। এক-একদিন বিছানায় পইড়্যা থাকি, তর আর মায়ের উপর সংসারের সমস্ত খাটুনি গিয়া পড়ে। অথচ—'

অথচ এ শরীর অন্য রকম ছিল এক সময়। সারাদিন এখানে-ওখানে ছুটো-ছুটি করে কিংবা মিছিলের সংগে চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটেও এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করা যেত না।

বৌদির একটা নিশ্বাস পড়ল। নির্জন পথটার ওপর একটা শিরীষগাছের পাতার ছায়ানাচ। নারকেল গাছের শব্দ। বৌদির মনে ছবির পর ছবি আসছিল।

স্বরাজের সংগে তার পরিচয়। মিছিলের ওপর পুলিশ-চার্জের পর।

স্বরাজ বসে পড়েছিল ময়দানে। মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছিল তার। বৌদি—সুজাতা—ছুটে গেল সেদিকে।

['নিন আমার এই রুমালটা। কপালটা বেঁধে ফেলুন।'

'ধন্যবাদ কমরেড।'

'ধনবাদ পরে দিলেও চলবে। ও কি হচ্ছে, কীভাবে বাঁধছেন? দিন আমাকে—ঠিক করে দিচ্ছি।'

'বাঁচালেন। এসব আপনারাই ভালো পারেন।'

'সে তো হল। কিন্তু খুব লেগেছে নাকি? উঠতে পারবেন?'

'পারব আশা করি। অচল হয়ে যাই নি।'

'একটু তাড়াতাড়ি তা হলে সচল হোন কমরেড। আবার মাউণ্টেড পুলিশ আসছে এদিকে। নিন—উঠে পড়ুন, ধরুন আমার হাত—']

'বৌদি!' —স্বপ্না ডাকল।

সুজাতার চোখে তখনো স্বপ্নের ঘোর। হাসল একটু।

'তর দাদার লগে আলাপ হইছিল রাজনীতির মধ্য দিয়া। এক জেলার বাড়ি আইলাম এই সংসারে। ভাঙা শরীরটা নিয়া—সংসারের মধ্যে জড়াইয়া গিয়া সেই সব ভুইল্যা থাকনের চেষ্টা করি। কিন্তু এক-এক সময় কেমন যেন ফ্রাস্ট্রেশন আসতে চায়।'

'মন খারাপ কইর‍্যা কী লাভ বৌদি? বড়দা তো ওই সব ছাইড়্যাই দিছে।'

'হ, ছাড়ছে অনেক দুঃখে। এককালে যারা আছিল পাশাপাশি, একসংগে থাকল, জীবনের সমস্ত কিছু স্টেক করল—তারা অখন এ ওর নামে কুৎসা ছড়ায়, কয় দালাল, কয় বিশ্বাসঘাতক! বোঝলাম খুবেই দুঃখের কথা। কিন্তু তাই বল্যা হাল ছাইড়্যা দিতে হইবো? লড়াই শেষ হইয়্যা গেছে? সব প্রব্লেম্ মিট্যা গেছে দেশের?' —বৌদির স্বরে বিরক্ততা ঝরে পড়তে লাগল: 'এতো পার্সোনাল ডিফীট—হার স্বীকার কইর‍্যা সইর‍্যা যাওয়া—এতে আর কী লাভ হইবো?'

স্বপ্না চুপ করে রইল। আবার ছবি ফুটল সুজাতার চোখে।

['সুজাতা!'

'বলো।'

'ওরা মদ খাইয়ে আর্মড পুলিশ এনেছে আজ। গুলী চলবে।'

'চলুক। মেরে ফেলবে, তার বেশি তো কিছু করতে পারবে না।'

ঠিক কথা। কয়েকজনকে মেরে ফেলবে, কিন্তু বিপ্লব থামবে না। লক্ষ-কোটি বন্দুকেও না। তুমি জানো, ফ্রান্সে সিন্ডি-ক্যালিস্টরা কী বলত ক্লেমাসো সম্পর্কে? কাঁটা হাতে নিয়ে যেমন সমুদ্রের ঢেউকে—]

সুজাতা ম্লান গলায় বললে, 'কি রকম হইয়া গেল সমস্ত। অথচ জীবনটারে এইভাবে কখনো দেখি নাই। আমরা যেন ক্যামন হাইর‍্যা যাইতাছি। রেডিয়োর নিউজ শুনছস আইজ?'

'শুনছি।'

নির্মম সংলাপ

[illegible]

বাকী পথ চেয়ে চেয়ে
ফেলেছে নিশ্বাস কৃষ্ণচূড়া,
শুধু একজন ছিল আপনাতে বিমুগ্ধ বিভোর
হামাগুড়ি দিয়ে একা চলে গেল ভোর।

তখন আকাশ থেকে ঝরে পড়ে
সূর্যরশ্মি গুঁড়োগুঁড়ো।

বাতাসে বিপুল শব্দ সে আসে সে আসে
শুধু প্রতিধ্বনি তার অট্টহাসি হাসে
এবং সে একজন জানে না সে
এসেছিল কিংবা গেছে ফিরে!

তার পর শোনা গেল তার নির্মম সংলাপ
তখন প্রস্তুত নয় সেও তার ঘরে।

'ক্রাইসিস বাড়তাছে। তরু কী মনে হয়? ভাঙবো?'

'কি জানি।'

'একটা বছরও বত্রিশ পয়েন্টের উপর স্টিক করতে পারল না। কী কৈফিয়ৎ দিবো লোকের কাছে?'

'অরাই ভাববো।'

'হ, অরাই ভাববো। দোষ চাপাইবো এ ওর ঘাড়ে। এ যদি বিট্রেয়াল না হয়, তাইলে—'

'বৌদি, তোমার আমার ভাবনের কিছু নাই। ভাইবা কিছু করনও যাইবো না। যাও—শোও গিয়া অখন।'

সুজাতা বসে রইল চোখ নামিয়ে। করবার কিছু নেই? নিজেদের এতবড়ো ব্যর্থতা নিয়ে মাথা নামিয়ে সরে যেতে হবে? বলতে হবে, আমরা পারলুম না—নিজেদের লক্ষ্যই আমরা ঠিক করতে পারি নি এখনো?

সুজাতা ঠোঁট কামড়ে ধরল একবার।

'স্বপ্না, আবার পলিটিক্স্ করবুম।'

'এই শরীর নিয়া?'

'ঠিক। এই শরীর। সুজাতা তাকিয়ে রইল জানলা দিয়ে। সামনে নির্জন পথটা নয়, গাছের ছায়া নয়, ঘুমন্ত রাত্রির হাওয়া নয়। অনেক দূরে একটা সমুদ্র দেখা যায়। তার ঢেউ ভাঙছে, ফেনা উঠছে, ডাক শোনা যাচ্ছে রক্তের ভেতরে। একদিন ওর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাঁতার কেটেছে সুজাতা। কিন্তু আজ সেই সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে, সেখানে যাওয়ার আর পথ নেই তার।

বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণার অনুভূতি। ওষুধ খাওয়ার পরে হাঁপানির যে টানটা তখন থেমে গিয়েছিল, সেটা আবার বেড়ে উঠছে মনে হয়।

স্বপ্না আবার বললে, 'বৌদি, যাও শোও গিয়া। আমার আর একটু পড়তে হইবো'

শিথিলভাবে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা। সেই তখন আর একটা কথা মনে হল তার। এই যে বই-খাতা খুলে নিয়ে রাত জেগে বসে আছে স্বপ্না, তার একটা অর্থ [illegible] দিল তার কাছে।

'একটা কথার জবাব দিবি স্বপ্না?'

'কী?'

'টুলুর লগে এর মধ্যে দেখা হইছিল তোর?'

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল স্বপ্না। বুকের ভেতরে ধক্ করে উঠল তার।

'না।'

'দেখা না হওনই ভালো—' এক ঝলক মমতা ঝরে পড়ল সুজাতার গলায়ঃ 'একেবারে নষ্ট হইয়া গেছে। তরু দাদায় কইতাছিল—'

'বৌদি, তুমি শোও গিয়া।'

না—কাণ্ট্ নয়। পরীক্ষার প্রয়োজনেও না। কী হবে এসব আদর্শে, বিশ্বাসে, পরিশুদ্ধ জ্ঞানের আরাধনায়? স্বপ্না বইখাতাগুলো বন্ধ করে ফেলল।

প্রতুলকে তার অনেকদিন আগেই ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। সে জানে, প্রতুল এখন এক নৈরাজ্যের আনন্দে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে। তার সঙ্গী আলাদা, তার মন আলাদা। সব কিছুকে অস্বীকার করবার, সব দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার, জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলবার সহজিয়া আনন্দটাই বড়ো হয়ে উঠেছে তার কাছে।

অথচ, আশ্চর্য—ভাবাই যায় না।

তখনও বাবা এ বাড়ি তৈরি করেন নি। প্রতুলদের পাশের বাড়িতে তারা ভাড়াটে থাকত। প্রায় সাত-আট বছর ছিল। সেই সময়।

এক বয়েসী দুজনে। বোধহয় মাস তিনেকের বড়ো ছিল টুলু। সহজ পরিচয়—সরল মেলামেশা। তারপর ধীরে ধীরে মনের কাছে এই সত্যটা ধরা পড়ল যে টুলুদা ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভাবাই যাচ্ছে না।

তখন বয়েস কত আর? পনেরোর বেশি নয়।

টুলু গান গাইতে পারত। বিশেষভাবে যে শিখেছিল তা নয়, স্বাভাবিক সুর ছিল তার গলায়। স্বপ্না বলেছিল, 'তুমি আমার শক্ত অঙ্কগুলো কষে দাও—আমি তোমায় হারমোনিয়মে সা-রে-গা-মার পাঠ দিই।'

টুলু বলেছিল, 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।'

'কী আইডিয়া?'

'তুই আর আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিই।'

'চমৎকার আইডিয়া। কিন্তু তারপর?'

'তুই আর আমি পথে পথে গান গেয়ে বেড়াব।'

'তার মানে?'—স্বপ্না হেসে উঠেছিল: 'পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করতে হবে? এটা এমন কি চমৎকার আইডিয়া যে—'

'আঃ, থাম্ না—আমাকে বলতে দে। আমরা চারণ-চারণীর মতো—রাজপুতদের হিস্টরি জানিস তো—সেই রকম পথে পথে স্বদেশী গান গাইব। দেশের লোককে মাতিয়ে তুলব। খুব মহৎ কাজ হবে—তাই না?'

রোমাঞ্চ জেগেছিল। সে আর টুলু। পথে পথে গান গেয়ে ঘুরছে।

'সে তো ভালোই হবে। কিন্তু তার আগে হায়ার সেকেন্ডারীটা পাশ না করলে বাবা তাড়িয়ে দেবেন কিন্তু বাড়ি থেকে।'

'দূর—তোর যত বাজে ভাবনা। পড়াশুনো করে কিছু হবে না—শুধু বেকারের দলে লাইন দিতে হবে। জানিস—আজকাল আমার পড়তেই ইচ্ছে করে না একেবারে—'

'স্বপ্না!'

স্বপ্না কেঁপে উঠল।

না, টুলু নয়। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আনন্দ। একরাশ রুক্ষ বিশৃঙ্খল চোখ আর পাণ্ডুর মুখের ওপর [illegible] আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে।

'ছোড়দা!'

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আনন্দ বললে, 'চুপ।'

'ভেতরে আয়।'

'না। ঘরে দুটি কলা-টলা কিছু থাকে তো দে আমাকে। এখুনি পালাতে হবে।'

'যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব' সম্পর্কে

১২ই মার্চের সাপ্তাহিক কম্পাসে একটি চিঠি পড়লাম, যাতে ৮ই জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী নরেন ভট্টাচার্যের 'ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য এই যে, প্রবন্ধ-লেখক ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বকে বিকৃত করে নিজের মনমত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রবন্ধটি আমি ভাল করেই পড়েছি এবং আমার মতে তাতে ডিমিট্রভের তত্ত্বের বিকৃতি মোটেই হয় নি, বরং প্রতিবাদপত্রটিতেই ডিমিট্রভের বক্তব্যকে এমন খাপছাড়া ও একপেশেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, যাতে যুক্তফ্রন্টের ধারণাটাই বিকৃত হয়ে যায় এবং ডিমিট্রভের শিক্ষাকেও বর্জন করা হয়। যে যুক্তিতর্ক প্রতিবাদপত্রে দেওয়া হয়েছে, তার বিশদ জবাব প্রবন্ধে ছাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তবু পত্রের জবাব পত্রে দেওয়াই উচিত, এই হিসাবে সংক্ষেপে কতগুলি কথা জানাচ্ছি। আর ডিমিট্রভের বক্তব্য সম্বন্ধে আমি একটু বেশি আগ্রহী বলেই প্রতিবাদপত্রটি পড়ে চুপ করে থাকতে পারলাম না।

ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব বুঝতে না পারার অভিযোগ যদি করতে হয়, তবে প্রবন্ধ-লেখকের বিরুদ্ধে না করে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধেই করা উচিত। কেননা, এমন কয়েকটা কথা তাঁদের পত্রে ফাঁস বেরিয়ে এসেছে, যা ডিমিট্রভের তত্ত্ব ঠিকমতো বুঝতে পারলে কখনই বেরোত না। তাঁদের পত্রে বলা হয়েছে, "আসলে ডিমিট্রভ যে যুক্তফ্রন্টের কল্পনা করেছিলেন, তা শুধু পঃ বাংলা নয়, ভারতের কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।" এই সঙ্গে ফুটনোটে দেওয়া হয়েছে যে, "এই জন্যই বোধহয় শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের দাবি উঠেছে।" পত্রের শেষে বলা হয়েছে যে, "কমিউনিস্ট-নেতৃত্ব ছাড়া যুক্তফ্রন্ট গঠিত হতে পারে না।" ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্টকে যাঁরা 'কল্পনা' বলে মনে করেন এবং সে কল্পনা রূপায়িত না হলে তার বদলে শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব প্রবর্তন করতে চান, তাঁরা ডিমিট্রভের তত্ত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তিটা মোটেই বোঝেন নি, একে বুঝেছেন একটা অনিশ্চিত পরীক্ষা হিসাবে, যার সাফল্য না দেখলেই একটা বিকল্প তৈরি রাখা হয়েছে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টরূপে। এবং শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট মানেই যেহেতু কমিউনিস্ট-নেতৃত্বের ফ্রন্ট, তাই সে কথাটাও আপনা থেকেই এসে যায়।

ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব 'কল্পনা' নয়, তা একটা ঐতিহাসিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী [illegible] ... শক্তি-সমাবেশের [illegible]
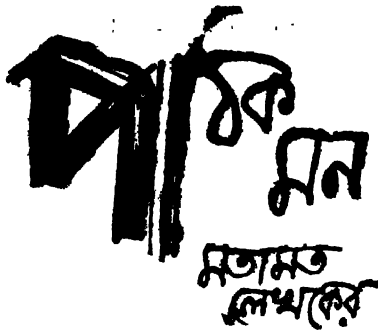
যুক্তফ্রন্টের কথা বলা হলেও শুধু 'ফ্যাসিজম' নামটির প্রসঙ্গেই যুক্তফ্রন্টের কথা নয়। যে ঐতিহাসিক অবস্থায় গণতন্ত্র স্বৈরাচারী, গণতন্ত্র-বিরোধী ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নেয়, সেই অবস্থাতে তার প্রতিরোধে যুক্তফ্রন্ট দরকার হয়। পঃ বাংলাতেই হোক, আর ভারতেই হোক, এই যুক্তফ্রন্ট নিখুঁতভাবে হয়ে গিয়েছে কি না, সেটা দেখতে পাওয়া না-পাওয়াটাই শেষ কথা নয়। ভারতে বা পঃ বাংলায় যুক্তফ্রন্টের বস্তুগত উপাদানগুলি কি তা বুঝতে পারা এবং সেই উপাদানগুলিকে ঠিকমতো ব্যবহার করে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করা—এটাই হচ্ছে আসল কথা। এটা একটা কাজ, একটা প্রক্রিয়া, একটা দায়িত্ব—যা ইতিহাস-নির্ধারিত। ডিমিট্রভ এই দায়িত্ব পালনেরই পথনির্দেশ করেছেন। সেভাবে ডিমিট্রভকে বুঝলে প্রতিবাদকারীরা চট্ করে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের কথা তুলতেন না।

প্রতিবাদকারীদের বিশদ বক্তব্যের মধ্যে সোঃ ডেমোক্রাসির দক্ষিণ ও বাম বিভাগের কথা বলা হয়েছে এবং বাম অংশই যে যুক্তফ্রন্টে আসে তা বলা হয়েছে। এটা সংগত কথা। এ সম্পর্কে ডিমিট্রভের যে উদ্ধৃতি তাঁরা দিয়েছেন, তাও ঠিক। কিন্তু এই উদ্ধৃতিগুলোকে যখন তাঁরা ঢালাওভাবে সি-পি-এম অনুগামী নয়, যাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন এবং সংগ্রামী যুক্তফ্রন্টের নামে একমাত্র সি-পি-এম অনুগামীদের যুক্তফ্রন্টকেই সঠিক যুক্তফ্রন্ট বলে বোঝাতে চান, তখনই ডিমিট্রভের তত্ত্বের বিকৃতি হয়ে যায়। কেননা, সোঃ ডে-র দক্ষিণ-বাম বিভাগের সম্পর্কে ঐ উদ্ধৃতিই ডিমিট্রভের সব কথা নয়। যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি রচনা করতে গিয়ে সোঃ ডেমোক্রাসির প্রতি কমিউনিস্টদের কি মনোভাব হবে এবং সোঃ ডেমোক্রাসির মধ্যে ভাগ নির্ধারণের সঠিক মাপকাঠি কি—এ দুটো বিষয়েও ডিমিট্রভের স্পষ্ট বক্তব্য আছে, যা বাদ দিয়ে শুধু ঐ উদ্ধৃতির প্রয়োগ করলে তা যান্ত্রিক প্রয়োগই শুধু হবে না, অনৈতিহাসিকতারও জন্ম দেবে। প্রতিবাদকারীরা উপসংহারে যে বলেছেন, "to reject Communism is to reject U.F."—এর মানে দাঁড়ায় এই যে, সোঃ ডেমোক্রাসি যুক্তফ্রন্টে আসতেই পারে না। সোঃ ডেমোক্রাসি যদি পরিত্যাজ্যই হয়, তা হলে সোঃ ডেমোক্রাসির মধ্যে আবার ভাগের প্রশ্ন আসে কি করে? প্রতিবাদকারীরা কি মনে করেন যে, আগে কমিউনিজম স্বীকার করার পূর্বশর্ত পূরণ করে একটা বাম সোঃ ডেমোক্রাসি জন্মলাভ করবে, তারপর তার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট হবে? এইভাবে 'সাবজেক্টিভলি' সোঃ ডেমোক্রাসির ভাগ হয় না। এই রকম একটা ছক-বাঁধা ধারণার জন্যই প্রতিবাদকারীরা কংগ্রেস বনাম কংগ্রেস-বিরোধিতার সংঘাতের বস্তুগত তাৎপর্যও ধরতে পারেন নি, শ্রেণী-সংগ্রামের পক্ষে ও বিপক্ষে ছাড়া সংঘাতের প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়ার রূপও তাঁরা দেখতে পান নি।

যুক্তফ্রন্টের সাধারণ ভিত্তি হিসাবে ডিমিট্রভ বলেছেন যে, "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমর্থক পার্টি ও সংগঠনগুলির যুক্ত সংগ্রামের ভিত্তিতেই জনগণ ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে।" (পৃঃ ৫৯) আরো বলা হয়েছে যে, "কমিউনিস্ট ও সোঃ ডেমোক্রাসির মধ্যেই এই যুক্ত-সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকবে না, এর প্রভাব পড়বে ক্যাথলিক, এনার্কিস্ট ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ওপরও।" (পৃঃ ৫৯) কমিউনিস্ট ও সোঃ ডেমোক্রাসিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ার এই নীতিগত ভিত্তির কথা বলার পর ডিমিট্রভ সোঃ ডেমোক্রাট নেতাদের সন্দেহ, আপত্তি ও প্রশ্নের বিশদ জবাব দিয়েছেন। সে জবাবগুলির প্রধান কথা, কমিউনিস্টদের অবিশ্বাস করার কারণ নেই, তারা কমিউনিস্ট-ফ্রন্ট করতে যাচ্ছে না, সোঃ ডে-কে তারা যুক্তফ্রন্টে চায়। (পৃঃ ৬০-৬১ দেখুন) সুতরাং যুক্তফ্রন্ট নীতির শুরুটা সোঃ ডে-র মধ্যে ভাগের কথা দিয়ে নয়, সোঃ ডে-কে যুক্তফ্রন্টে আনতে হবে, এটাই হচ্ছে ভিত্তি। সেই জন্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কথা ডিমিট্রভ কোথাও বলেন নি। যদি সামগ্রিকভাবে সোঃ ডেমোক্রাসিকে বুর্জোয়া স্বার্থের এক স্থির-নিশ্চিত দুর্গ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে এই ভিত্তি তো থাকেই না। প্রতিবাদকারীরা সেইভাবেই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ডিমিট্রভ একথাও বলেছেন যে, "একথা মনে রাখতে হবে যে, অনেক দেশে সোঃ ডে-র অবস্থানে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি তার মনোভাবে পরিবর্তন আসছে। ...সমগ্র অবস্থার ফল হিসাবে অনেক দেশে সোঃ ডে-র পক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর দুর্গ হিসাবে তার [illegible]

(পৃঃ ১২৪) ডিমিট্রভ বলেছেন, "এই সব পরিবর্তন যদি আমরা উপেক্ষা করি তা হলে তার ফল হবে এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের নীতি বিকৃত হয়ে যাবে এবং সোঃ ডে-র প্রতিক্রিয়াশীল অংশের পক্ষে যুক্তফ্রন্ট বানচাল করা সহজ হবে।"* (পৃঃ ১২৫) ভারতে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন, কংগ্রেস থেকে কোনো কোনো অংশ বেরিয়ে এসে বামপন্থীদের সঙ্গে মেলা, পঃ বাংলায় কয়েক মাস আগেকার এ-আই-টি-ইউ-সি ও আই-এন-টি-ইউ-সির সম্মিলিত শ্রমিক-ধর্মঘট প্রভৃতি ঘটনাগুলি এই পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত সূচীত করে না কি? ডিমিট্রভের এই কথাগুলো কি এতই উপেক্ষণীয়?

এটা ঠিক যে, এই সব পরিবর্তন সরল রেখায় নয়, সব সময় স্থায়ীও নয়। এবং এটাও ঠিক যে, সোঃ ডে-র মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও বামমুখী অংশের বিভাগের ওপর ডিমিট্রভ বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং বামমুখী অংশই যুক্তফ্রন্টে থাকতে পারে বলেছেন। কিন্তু বামমুখী অংশ মানেই যে একেবারে কমিউনিজমকে স্বীকার করে নেবে, এরকম কথা কোথাও ডিমিট্রভ বলেন নি। Hostile to Communism মানে যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একত্র দাঁড়াতে রাজী নয়। এই অংশ থেকে সরে আসে তারা, যারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে এক যুক্তফ্রন্টে আসার মতো প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে চলে। এটাই সোঃ ডে-র বামমুখী অংশের প্রধান মাপকাঠি। তাই ডিমিট্রভ স্পষ্ট বলেছেন, "যুক্তফ্রন্টের প্রতি মনোভাব কি, সেটাই হচ্ছে সোঃ ডে-র প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও অন্য যে অংশ বিপ্লবী হয়ে উঠছে, এই দুইয়ের মধ্যে বিভাগ-রেখা।" (পৃঃ ১২৬) ডিমিট্রভ আরো বলেছেন, "দ্বিতীয় অংশের প্রতি আমাদের সাহায্য ততই কার্যকরী হবে, যতই প্রতিক্রিয়াশীল যে অংশ বুর্জোয়াদের সঙ্গে এক ব্লকে দাঁড়ায়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম জোরদার হবে।" (পৃঃ ১২৬) আরো বলেছেন, "বাম অংশের মধ্যে আত্ম-নির্ধারণ তত তাড়াতাড়ি হবে, যত দৃঢ়ভাবে কমিউনিস্টরা সোঃ ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করবে।" (পৃঃ ১২৬)

যুক্তফ্রন্টের প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাব. প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে এক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে চাওয়া বা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে মিলে কমিউনিস্ট-বিরোধী ফ্রন্ট গড়তে চাওয়া—এই দুই মনোভাবই আজকের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে সোঃ ডে-র প্রগতিশীল অংশ ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিভাগ তৈরি যে করছে, তা কি অত্যন্ত স্পষ্ট নয়? ১৯৬৭ থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের প্রধান ঘটনাগুলিতে এই লক্ষণই পরিস্ফুট নয় কি? বি-কে-ডি যখন কমিউনিস্ট-বিরোধী ফ্রন্ট করার নীতি নেয়, পি-এস-পি ও এস-এস-পির নেতৃত্বের একাংশ যখন যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী নীতি অনুসরণ করে, তখন এই লক্ষণই আমরা দেখি এবং এই কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করে যারা যুক্তফ্রন্টে থাকতে আগ্রহী হয়, তাদের আমরা স্বাগত জানাই। এটাই তো এ বছরের লক্ষণ। সোঃ ডে-র মধ্যে এই প্রগতিশীল অংশের অবস্থানের বাস্তব ভিত্তি দেখেই ১৯৬৯-এর এপ্রিলে সি-পি-এম'এর কেন্দ্রীয় কমিটিকে বলতে হয় যে, "আজকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মৈত্রীর যে পরিধি, তা বামপন্থী পার্টিগুলিকেও অতিক্রম করে অনেকদূর প্রসারিত। কেরল ও পঃ বঙ্গের যুক্তফ্রন্টই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।" পঃ বাংলার আজকের যুক্তফ্রন্টের সঙ্কট হয়েছে বলেই এই সমস্ত বিশ্লেষণ কি আগাগোড়া ভুল হয়ে গেল? সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেস একটু বেশি সোচ্চার বলেই কি রাতারাতি বাংলা কংগ্রেস কংগ্রেসেরই মতো জমিদার-জোতদার ও বৃহৎ পুঁজির দল হয়ে গেল? প্রতিবাদকারীরা তো তাই বলেছেন। তা হলে যুক্তফ্রন্টের অন্য যেসব দল সি-পি-এম'এর সমালোচক, তারাও কি জমিদার-জোতদার ও বৃহৎ পুঁজির দল? এ থেকেই প্রতিবাদকারীদের সোজা সিদ্ধান্ত যে, সি-পি-এম'এর নেতৃত্বে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়তে হবে। ডিমিট্রভের নাম করে প্রতিবাদকারীরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, ভেবে দেখবেন কি?

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার গুরুত্ব দেখিয়ে এবং সে ভূমিকাকে ছোট করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করে ডিমিট্রভের উদ্ধৃত প্রতিবাদকারীরা যা দিয়েছেন, তা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই তো ডিমিট্রভ বলেন নি। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা যাতে ভুলভাবে পালিত না হয়, তার বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে বলেছেন, "পরিস্থিতি ও শক্তি-বিন্যাসের সঠিক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক ও নমনীয় কৌশল অবলম্বন করতে।" (পৃঃ ১০৪) যুক্তফ্রন্ট প্রসারিত যত হবে, তত কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি সংহত করতে হবে—একথা যেমন তিনি বলেছেন, তেমনি বলেছেন যে, "এ কাজ সঙ্কীর্ণ পার্টি-মনোভাব থেকে হবে না, হবে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর বিষয় হিসাবে।" (পৃঃ ১০৪) যুক্তফ্রন্ট করতে গিয়ে সোঃ ডেমোক্রাসির আদর্শ যাতে কমিউনিস্টদের মধ্যে ঢুকে না পড়ে তার জন্য সংগ্রামের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে, "ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোঃ ডে-র সঙ্গে একত্র চলার জন্য কমিউনিস্টদের প্রস্তুত থাকার" কথা। (পৃঃ ১০৪) সংস্কারবাদী মোহসৃষ্টির বিরুদ্ধে কঃ পার্টির মধ্যে সংগ্রামের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে যে, "আত্ম-সন্তুষ্ট সঙ্কীর্ণতাবাদ......অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি বাধা সৃষ্টি করে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার পথে।" (পৃঃ ১০৫) সঙ্কীর্ণতাবাদীদের বিরুদ্ধে ডিমিট্রভ হুঁশিয়ারী দিয়েছেন এই বলেঃ "পার্টিতে আমাদের এমন অনেক মতান্ধ নেই কি যারা যুক্তফ্রন্ট নীতিকেই একটা বিপদ মনে করে?" (পৃঃ ১০৬) যুক্তফ্রন্ট গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে তিনি একদিকে যেমন নিছক সংসদীয় বোঝাপড়ার দক্ষিণ-সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, তেমনি অপরদিকে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন সেই অতি-বাম কমিউনিস্টদের প্রতি "যারা সোঃ ডেমোক্রাসির সঙ্গে কোনো কোয়ালিশনেই রাজী নয়, যারা সব সোঃ ডেমোক্রাসিকেই প্রতি-বিপ্লবী মনে করে।" (পৃঃ ৯৫) ডিমিট্রভের এই সব কথা মিলিয়েই যুক্তফ্রন্টে কঃ পার্টির ভূমিকাকে বুঝতে হবে। প্রতিবাদকারীরা একটা দিক দেখিয়ে আর একটা দিক চেপে গিয়েছেন। অথবা বলতে হয় যে, একটা দিক ছাড়া আর একটা দিক তাঁরা দেখতেই পান না।

সেইজন্যই কঃ পার্টি যুক্তফ্রন্টের initiator, organiser ও driving force বলতে কি বোঝায়, তাও তাঁরা বুঝতে পারেন নি। সি-পি-এম'এর সঙ্গে বিরোধ বেধেছে বলেই তাঁরা মন্তব্য করেছেন, "পঃ বাংলায় কঃ পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের driving force বলা বাতুলতা।" কিন্তু ত নয়, বরং কথাটা ঠিক এর উল্টো। বৃহত্তম দল হয়েও সি-পি-এম'এর driving force হিসাবে কাজ করতে পারার ব্যর্থতার জন্যই যুক্তফ্রন্টের এই সঙ্কট। আভিধানিক অর্থে driving force হতে চেষ্টা করেছে সি-পি-এম, অর্থাৎ জবরদস্তি অন্য সব দলকে চালাতে চেষ্টা করেছে। মার্কসবাদের ভাষায় driving force মানে অন্য সব দলকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। Initiator, organiser ও driving force একত্রে মিলিয়েই যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্টদের ভূমিকা। পঃ বাংলার কমিউনিস্ট-শক্তির বড় অংশ হিসাবে সি-পি-এম মার্কসবাদের এই পথ [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] সকলেই আমাদের দেশের [illegible] ছিল না, বরং সমাজতন্ত্রের বিজয়ে [illegible] ও শান্তির অধিকারী হয়ে যুক্তফ্রন্ট আরো জমাট হয়ে উঠে সারা দেশকে অনুপ্রাণিত করত।

—কুমার চট্টোপাধ্যায়

---

*উধৃতিগুলো Georgi Dimitrov: Speeches & Articles—Lawrence & Wishart Ltd., 1951 থেকে নেওয়া।

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক।

পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনকাল পর্যন্ত আপনার পত্রিকার রাজনৈতিক চরিত্র মোটামুটিভাবে প্রগতিমুখীন ছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর এবং গত ১৭ই মার্চের বর্ধমানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আপনার পত্রিকায় যেভাবে কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের চরিত্র হননের হীন চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে আপনার পত্রিকার পূর্বেকার ভূমিকা সম্বন্ধে প্রগতিশীল পাঠকমনে সন্দেহ দেখা দিলে খুব একটা দোষ দেওয়া বোধহয় যাবে না।

কারণ, খেটে-খাওয়া মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম যখন তীব্র হয় এবং সেই আন্দোলনের চাপে কায়েমী স্বার্থের শিবিরে যখন শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তখন অনেক ভেকধারী রাজনৈতিক নেতাদের মত বহু পত্র-পত্রিকার প্রগতিশীলতার মুখোশ খসে পড়ে এবং সেই সঙ্গে আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে যায়। পৃথিবীর দেশে দেশে এমনতর নজীর ভূরি ভূরি রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আপনার ২রা এপ্রিলের সম্পাদকীয় থেকে কয়েকটি উধৃতি দিয়ে আপনাদের তথাকথিত নিরপেক্ষতার ফেঁসে-যাওয়া ঢাকের কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। যেমন—"এর চাইতে যত দোষ থাক না কেন, গত বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসন খুব ভাল ছিল।" এবার থলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। গত বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসন আপনার পত্রিকার বুর্জোয়া দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ভাল ছিল। কারণ, ভারতবর্ষের বর্তমান যে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক অবস্থা তার জন্য ষোল আনা দায়ী—কংগ্রেসের গত বাইশ বছরের প্রতিক্রিয়াশীল [illegible]। [illegible] [illegible] বিরোধীরা [illegible] জোনকীজাপুরের মত কিলবিল করছে, তাদের জন্মদাতা হিসেবে সব গৌরবই কংগ্রেসের প্রাপ্য। প্রতিক্রিয়ার ঔরসে প্রগতির জন্ম হয় না। প্রতিক্রিয়াকে খতম করেই প্রগতি পরিপুষ্টি লাভ করে। সেটাই ইতিহাসসিদ্ধ বাস্তব পন্থা। কারণ, বুর্জোয়া গণতন্ত্র মেহনতী মানুষের ঘাম ও রক্তে বেঁচে থাকে এবং সমাজ-বিরোধীরা এই ব্যবস্থার মধ্যে বাড়ে 'ক্যানসার রোগের জীবাণুর মত'। তাইত দেখি পৃথিবীর 'মহত্তম' গণতন্ত্র 'হিপি'-হিপিনীর জন্ম দেয়, ধর্ষণ, খুন যেখানে প্রতি বৎসর রেকর্ড করে। অতীতে আপনারা এই ব্যবস্থার প্রশস্তি গেয়েছেন। মাঝে কিছুদিন বিরোধিতার নামে প্রগতিশীল সেজেছিলেন। যদি এখন আবার স্বক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন, তা হলে আমরা খেটে-খাওয়া মানুষেরা নাচার। গত কুড়ি বছরেও কংগ্রেসীরা হাজার হাজার নিরীহ (রাজনৈতিক কর্মী সহ) গুম-খুন করেছে, কিন্তু তার কোন খবর সংবাদপত্রগুলি রাখার প্রয়োজন বোধ করতেন না। আর একটি উধৃতি—"যুক্তফ্রন্টের এক বছরের শাসনের অপকর্ম বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে গত একশ বছরের অনুষ্ঠিত অপকর্মগুলির তুলনায় ওজনে ভারী।" শ্রেণী-সংগ্রামের নামে ভ্রাতৃহত্যা, যত্রতত্র অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার যারা করেছে, তাদের অপরাধের সীমা নেই।" সত্যিই আপনাদের ইতিহাসজ্ঞানের কোন তুলনা নেই। কেননা, ভিয়েতনামের ঘটনা, হালে আমেদাবাদের ঘটনা বোধহয় আপনার হিসেবে ইতিহাসের বাইরে। অধিকন্তু ভ্রাতারা যদি মেহনতী মানুষের ভেকধারী দরদীদের খপ্পরে পড়ে কায়েমী স্বার্থের পাহারাদারের কাজে জড়িয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি অবশ্যম্ভাবী। আমরা যারা কল-কারখানায় কাজ করি—তারা ভালভাবেই জানি যে, শ্রমিকের ন্যায়সংগত আন্দোলনে শ্রমিকরাই জানে-অজানে মালিকের পাহারাদারের কাজ করে এবং তা করে কোন-না-কোন রাজনৈতিক ঝান্ডা হাতে নিয়ে। সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান সোভিয়েট দেশও এরূপ দোষ থেকে প্রথম বিপ্লব যুগে মুক্ত ছিল না। কারণ, [illegible] মত [illegible] [illegible] সব [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপনাদের [illegible] [illegible] [illegible] তথা [illegible]দের চোখের জল ফেলা অর্থহীন।

পরিশেষে, যেমন আপনি আরও লিখেছেন—"জনসাধারণ তাদের চিনে নিয়েছে।" আমিও বলি, হ্যাঁ, জনসাধারণ তাদের চিনে নিয়েছে। সমগ্র পৃথিবী তথা ভারতের দিকে দিকে আজ জোরকদমে তারই প্রস্তুতি চলছে। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ আপনাদেরও চিনতে বোধহয় ভুল করবে না। কারণ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী আপনারা এখন স্ব-রূপে প্রকাশিত। আপনার পত্রিকায় আমার এই প্রতিবাদপত্র স্থান পাবে কিনা জানি না। অতীত অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলে। তবু খেটে-খাওয়া মানুষের একজন হয়ে বিবেকের নির্দেশে এই চিঠি না লিখে পারলাম না।

—ভূপতিমোহন বাকাল,
দুর্গাপুর-৫।

* * *

"এর চাইতে যত দোষ থাক না কেন, গত বাইশ বছরের কংগ্রেস শাসন খুব ভাল ছিল।" "যুক্তফ্রন্টের এক বছরের শাসনের অপকর্ম বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে গত একশ বছরে অনুষ্ঠিত অপকর্মগুলির তুলনায় ওজনে ভারী।" "এতোদিন জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের ভয় ও চাপে পুলিশ বিভাগ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, তারা এখন শান্তি ও শৃংখলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে"। উক্ত উক্তিগুলো আপনাদের সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৯শে চৈত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান পেয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট পতনে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্যন্তিক সংকীর্ণ মতবাদের পরিচয় দিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যুক্তফ্রন্ট আমলের ভাল কাজগুলোর খতিয়ান জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা এতটুকু করেন নি। আপনারা দলীয় স্বার্থে যতই নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠুন না কেন, বাংলা দেশের রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনগণকে কোনমতেই প্রভাবিত করতে পারবেন না বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। আগে জানতাম গিরগিটির রঙ বদলায়, এখন দেখছি সাপ্তাহিক বসুমতীও যথার্থ সাংবাদিকতার পথ হারিয়ে গিরগিটিরই নামান্তর হয়েছেন।

—গৌরীশ সরকার
সম্পাদক, সমকাল
[illegible] (পশ্চিম দিনাজপুর)

শিক্ষা সংস্কার, না দলবাজী?

প্রণবেশ চক্রবর্তী

[মতামত লেখকের]

॥ দুই ॥

অবশেষে 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির' বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সমিতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু গোষ্ঠীতন্ত্রের নাগপাশে সকল অভিযোগকে 'চক্রান্তের' [illegible] দিয়ে চাপা দেওয়া হইয়াছে সযত্নে। কিন্তু আজ যেন খানিকটা ধরা পড়ে গেছে। 'চন্দননগরে' সমিতির সম্মেলন পণ্ড হয়েছে এবং 'গোষ্ঠীতন্ত্র', দুর্নীতি এবং "বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের [illegible]বৃত্তির" বিরুদ্ধে শিক্ষকসমাজের বৃহত্তর অংশ জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ফলে, সমিতির অস্তিত্ব বিপন্ন।

শিক্ষকসমাজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা হয়েছে দীর্ঘদিন। এ কৃতিত্ব শ্রীসত্যপ্রিয় রায় 'মহাশয়ের'। তিনি এতদিন নিজেকে দলনিরপেক্ষ বলে প্রচার করে অতি সহজেই শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করেছেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে 'গোলাপফুল' হাতে লোকসভায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির' নামে নির্বাচনী আসর জমাতে চেয়ে পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিলে বাজার গরম করে তুলেছিলেন। কিন্তু তাতে সফল হন নি। শেষ পর্যন্ত থলে থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। মন্ত্রিত্বের টানে তিনি আর নিজেকে 'দলনিরপেক্ষ' ছদ্মবেশের আড়ালে রাখতে পারলেন না। একেবারে 'জেনুইন' সি পি এম-এর প্রতিনিধি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর এই বৈপ্লবিক 'ভোল বদল' দেখে বিস্মিত কেউ হন নি। কারণ, তিনি স্বীয় উন্নতির স্বর্গ রচনার কাজে দক্ষ পুরুষ।

তা যদি না হবে, তবে তের মাস মন্ত্রিত্ব করে যিনি শিক্ষককুলের কোন দাবিকেই আমল দেন নি, তিনিই আজ 'দশ দফা' দাবিপত্র নিয়ে কোন্ স্পর্ধায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন? শিক্ষকদের মধ্যে তাই তাঁর সততা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তিনি নিজে শিক্ষকদের জন্য কিছুই করলেন না, অথচ, আন্দোলনের নাম করে নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট।

শ্রীরায় তের মাস 'নবাবি'র পুরো সদ্ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করে স্বীয় সাঙ্গো-পাঙ্গোদের তিনি নির্দ্বিধায় প্রসাসক নিযুক্ত করেছেন। দলীয় কর্মীদের বিদ্যালয়ের প্রশাসক নিযুক্ত করে তিনি "পার্টি-বসদের" খুশি করেছেন। এমন নিঃশর্ত আনুগত্য দেখানো শ্রীরায়ের পক্ষেই সম্ভব। বিদ্যার অঙ্গন থেকে বিতাড়িত অথবা নির্বাসিত ব্যক্তিদের তিনি বিদ্যালয়ের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে স্বীয় বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

সাধারণত, কোন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে এবং সে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, তবেই ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করার প্রশ্ন ওঠে। নতুবা, আইনসিদ্ধ কোন পরিচালক সামাজিক আমলাতান্ত্রিক উপায়ে বাতিল করার কোন অধিকার সরকার কিংবা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের থাকতে পারে না। অথচ, লক্ষ্য করার বিষয়, শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা' শ্রীসত্যপ্রিয় রায় প্রায় ৩৫০টি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করেছেন। কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্বকে কঠিন আঘাত করে সরকারী প্রশাসনের কালো হাত বাংলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কণ্ঠরোধ করেছে। আমরা আশ্বস্ত হতাম কিংবা আশান্বিত হতাম, যদি দেখতাম, দুর্নীতিগ্রস্ত ম্যানেজিং কমিটিকে বৈধ উপায়ে বাতিল করে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে প্রগতিশীল পরিচালক সমিতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও তা হয় নি।

প্রয়োজনে প্রশাসক নিযুক্ত করা অবশ্য-কর্তব্য। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রশাসক কে হবেন? সাধারণত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, কিংবা শিক্ষাবিদকেই প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। দুঃখের বিষয়, শ্রীরায় শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই এ নিয়ম মানেন নি। বরং বলা যায়, শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিহীন ব্যক্তিকেই তিনি অধিকতর পছন্দ করেছেন। অবশ্য, তাঁর পছন্দের প্রথম এবং প্রধান যোগ্যতা হল, "তিনিই প্রশাসক নিযুক্ত হতে পারেন, যিনি সি পি এম-এর সদস্য অথবা সমর্থক"। এই 'সদ্গুণটি' থাকার পর আর কোনকিছুই দেখার প্রয়োজন হয় নি।

তাই, শ্রীসন্দীপ শেঠিয়াকে নাকি বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, শ্রীশেঠিয়া নাকি একজন ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] কিছুকাল আগেই অবিভক্ত [illegible] পার্টিতে যোগ দেন। তারপর যখন [illegible] দু' ভাগ হল, তখন তিনি শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সি পি এম-এ নাম লেখান।, ফলে, শ্রীশেঠিয়া আজ বিদ্যালয়ের প্রশাসক হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করেছেন।

অসংখ্য অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। যেমন, দক্ষিণ কলকাতার দেশবন্ধু গার্লস স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে বাতিল করা হয় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে। সেখানে একটি এ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়। আর সেই এ্যাড হক কমিটির সম্পাদিকা নিযুক্ত হন শ্রীমতী অনিলা দেবী। বাংলা দেশে কি আর কোন মহিলাকে শ্রী[illegible] দেখতে পান নি? নতুবা স্বজনপোষণের এমন ঘৃণিত পথে তিনি পা বাড়ালেন কেন?

কেন হাওড়ার গোবিন্দপুর নিত্যলাল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করা হয়? প্রশ্ন উঠেছে, স্থানীয় বধির-চিকিৎসক অজিত দিন্দাকে কোন্ যোগ্যতায় ঐ বিদ্যালয়ের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়? স্থানীয় লোকের ধারণা, যেহেতু ইনি উক্ত এলাকার সি-পি-এম নেতার বড় ভাই, তাই তাঁকে প্রশাসক নিযুক্ত করে বস্তুত সি-পি-এম-এরই হাতে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। বধির চিকিৎসককে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে উদ্দেশ্যসাধনের এমন মহৎ দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যাবে।

এমন উদাহরণও খুব কম পাওয়া যাবে, যেখানে সি-পি-এম নেতার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা সম্বল করে কোন ভদ্র-মহিলা কোন বিদ্যালয়ের প্রশাসিকা নিযুক্ত হয়েছেন। অভিযোগটা উঠেছে 'চিলড্রেন সুইট হোম'-এর প্রসঙ্গে। উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিকে কোন এক রহস্যাবৃত কারণে বাতিল করে সেখানে প্রশাসিকা নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীমতী রমা গুপ্তা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীমতী গুপ্তা কমরেড সাধন গুপ্তের সহধর্মিণী। প্রশ্ন উঠেছে, প্রকৃত প্রশাসক কে?

এরকম প্রশ্ন আরো অনেক। যেমন, শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য কেমন করে আহিরীটোলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন? আর তাঁকে ঐ কাজে বসাবার প্রয়োজনে কি জঘন্য চক্রান্তের জাল বিস্তার করে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীহেমাঙ্গ সাহাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। পার্টির স্বার্থে শ্রীভট্টাচার্যকে বহরমপুর থেকে সরিয়ে এনে কলকাতায় রাখা দরকার। তাই, শ্রীসাহাকে অপসারিত করার উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করা হল। ফলে, দলবাজীর যূপকাষ্ঠে শ্রীসাহা বলি হলেন, আর শ্রীভট্টাচার্য অন্ধকার গলিপথ দিয়ে এসে

গ্রাহিরীটোলা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ দখল করলেন।

অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জানি না, এগুলি সম্পর্কে শ্রীরায় কি বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেবেন। ট্যাংরা অঞ্চলের ভূতনাথ মহামায়া স্কুলের প্রশাসক ছিলেন জনৈক প্রাক্তন "চীফ ইন্সপেক্টর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন।" দলবাজী করার প্রয়োজনে উক্ত ভদ্রলোককে সরানো হল এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন স্থানীয় একজন সি-পি-এম কর্মী। শোনা যায়, উল্লিখিত ভাগ্যবান পার্টি কর্মীর সঙ্গে শিক্ষাজগতের সম্পর্ক একেবারে 'আদায়-কাঁচকলায়' এবং তিনি 'টেক্সম্যাকো' কারখানার কর্মী। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রাক্তন 'চীফ ইন্সপেক্টর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনকে সরানো হল কেন? আর যদি সরানোই হল, তবে তাঁর পরিবর্তে কোন শিক্ষাবিদ্‌কে বিদ্যালয়ে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল না কেন? এই কি সত্যপ্রিয়বাবুর 'শিক্ষা সংস্কার'-এর বৈপ্লবিক পদক্ষেপ?

বরাহনগর নারীশিক্ষা মন্দিরের প্রশাসক যিনি নিযুক্ত হয়েছেন, পার্টি-কর্মী হওয়া ছাড়া তাঁর আর কি যোগ্যতা আছে? যাদবপুর সম্মিলিত উদ্বাস্তু বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অপসারিত করার জন্য যে অদ্ভূত পথ অবলম্বন করা হয়েছিল, তা এক বিস্ময়কর কুকীর্তির দৃষ্টান্ত। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁর একমাত্র যোগ্যতা হল যে, তিনি মেয়র প্রশান্ত সুরের প্রিয়পাত্র ও শ্রীসুর পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং টালিগঞ্জের উপনির্বাচনে শ্রীরায়ের পক্ষে কাজ করেছেন।

এমন অভিযোগও সুস্পষ্ট যে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট এম-এল-এ শ্রী কে. জি. বসুকে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। শ্রীরায় সম্ভবত মনে করেছেন, সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে কুক্ষিগত করতে হলে পার্টির অনুগত কর্মীদের হাতেই সেগুলি তুলে দেওয়া দরকার। তাই বোধহয় তিনি "শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বার্থে" এমন মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন। এথেনিয়াম স্কুল, লিলুয়া খেমকা স্কুল, জে, এম, কে, সি, গার্লস স্কুল, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্কুল, পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে যে কৃতী পুরুষকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি আর যা কিছুই হোন না কেন, শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশের যোগ্যতাসম্পন্ন নন। তবু, তাঁকেই কেন নিযুক্ত করা হল? তবে কি বুঝতে হবে, শ্রীরায়ের দলে কোন শিক্ষাবিদ্ নেই (অবশ্য তিনি দলের বাইরে কাউকেই পছন্দ করেন না।) অথবা, শিক্ষাবিদ্‌দের সম্পর্কে তাঁর কোন "এ্যালার্জি" আছে?

ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে ম্যানেজিং কমিটিতে 'গভর্নমেণ্ট নমিনি' নিয়োগের ক্ষেত্রে। নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটিতে সরকার নিযুক্ত প্রতিনিধি থাকেন। শ্রীরায়ের অসীম কৃপায় এই পদটি সি-পি-এম কর্মীদের একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হয়। চোদ্দ দলের সরকারে একটি দলের এই প্রাধান্য সৃষ্টির অপপ্রয়াস যুক্তফ্রণ্ট ভাঙার মূল এবং প্রধান কারণ। এ সম্পর্কে যদি কোন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হয়, তবে 'দুর্নীতি দূরীকরণের' নামে কি ভয়ঙ্কর দুর্নীতির আখড়া সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ তো গেল শিক্ষা সংস্কারের প্রথম ধাপ। কিন্তু শিক্ষক-দরদ! শিক্ষাদরদী শ্রীরায় শিক্ষক-দরদের এক জীবন্ত বিগ্রহ। গত পনের-বিশ বছর ধরে শিক্ষকদের স্বার্থে তিনি অনেক আন্দোলন করেছেন। কিন্তু নিজে শিক্ষামন্ত্রী হয়ে তের মাসে তিনি যে অপরূপ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাতে গোটা শিক্ষকসমাজ কৃতজ্ঞ! স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরায়ের 'বলিষ্ঠ নেতৃত্বে' শিক্ষকরা ১১৮ টাকার মাগ্‌গী ভাতার দাবিতে আন্দোলন ও ধর্মঘট করেন। অথচ, তিনি স্বয়ং ক্ষমতা হাতে পেয়ে ১৯৬৯ সনের মার্চ মাসে শিক্ষকদের জন্য মাত্র ১০৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধি করে ৯০৲ টাকা নির্দিষ্ট করেন। এক বছরের ব্যবধানে মহিমার এমন রূপান্তর বিস্ময়কর। সব থেকে দুঃখের কথা যুক্তফ্রণ্ট সরকার নিযুক্ত "পে কমিশনের" রিপোর্টে শিক্ষকদের সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সুপারিশ নেই। অথচ, এ সম্পর্কে শ্রীরায় তের মাস নীরব ছিলেন, এবার বোধহয় 'বৈপ্লবিক পন্থায়' আন্দোলনের হুমকী দেবেন। তের মাসে যিনি কিছুই করেন নি, তিনিই এবার তের দিনে সবকিছু আদায় করার আন্দোলনে ঝাঁপ দেবেন। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে 'লাম্প গ্রাণ্ট স্কুলের' ক্ষেত্রে। শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির এই অপপ্রয়াস শ্রীরায় এতদিন নীরবে হজম করেছেন। শিক্ষক-দরদের এমন নজীর পাওয়া দুষ্কর।

শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে কত গরম গরম 'বাণী' শ্রীরায় এতদিন প্রচার করে এসেছেন। কিন্তু তিনি নিজে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে হাওড়ার দুশ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হতভাগ্য শিক্ষকের চাকুরি নিয়ে যে রাজনীতির খেলা চলে, তা এক কলঙ্কজনক ইতিহাস। তাঁরই আমলে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের জোর করে পদত্যাগ করানো হয়। গায়ের জোরে বিনা কারণে যে শিক্ষকদের পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয়, তাঁদের সম্পর্কে শ্রীরায়ের নিস্পৃহ উদাসীনতা গোটা শিক্ষকসমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। অথচ, তিনি অনায়াসেই বাইরের চাপ ও তাঁর দলের হাত থেকে এই সব শিক্ষকদের রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রচণ্ড ক্ষমতাকে একাজে লাগান নি। এথোরা গ্রামের প্রধান শিক্ষক গুণ্ডাদের হাতে নিহত হলেন, অথচ, শ্রীরায়ের মুখে কোন সমবেদনার কথা শোনা গেল না।

দলের স্বার্থে তিনি শুধুমাত্র শিক্ষাজগতকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হন নি, সেই সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টকে ধ্বংস করার কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন।

সমর বিশ্বাস

(মতামত লেখকের)

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ত-রাঙানো গঠিত যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে যাওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি একে অপরকে অবিশ্বাস করতে থাকে, তাহলে যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়—একথায় তাই হয়েছিল। পারস্পরিক অবিশ্বাস, দর্তাবিরোধ, সংকীর্ণতা ও সুবিধাবাদী রাজনীতি যুক্তফ্রণ্টের অকাল মৃত্যু ঘটালো। ফলে নগদ পাওনা যা হলো তা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ওরফে কংগ্রেসী শাসন।

রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবার পর রাজ্যপালের রথের চাকা সাবেক রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত ধর্মবীরের মত দোর্দণ্ড প্রতাপে না চললেও রাজ্যপালের প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যেই ফুটে বেরোতে শুরু করেছে। পুঁজিপতি ব্যবসাদারেরা মওকা পেয়েছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে শুরু করেছে। পুলিশবাহিনীর মরচে-পড়া হাতে আবার তেল-লাগানো শুরু হয়েছে। জোতদার-মহাজনেরা আড়মোড়া ভেঙে শ্রমিক-কৃষকের অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। দীর্ঘ এক বছর যে সাপগুলিকে কেঁচো বানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তারা আবার তাদের পূর্ব রূপ ফিরে পেয়েছে এবং গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কিল্‌বিল্‌ করে রাস্তায় নেমে এসেছে। কত দলছাড়া কই মাছ আবার ঝাঁকে ফিরে গিয়ে সর্দারি শুরু করছে।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি একটি নতুন দিক্‌ পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রপতির শাসন অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে পারে না। তাই আজকের প্রশ্ন হলো—অতঃপর কি? যুক্তফ্রণ্টের পুনরুজ্জীবন? কোন বিকল্প ফ্রণ্ট সরকার? না নির্বাচন? নির্বাচনী লড়াই হলে সে লড়াইয়ের সৈন্য-সমাবেশ কি প্রণালীতে হতে পারে? বামপন্থীরা কি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাবে?

একথা সত্য যে, ১৯৬৯ সালের চোদ্দ দলের যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের জন্য তিনটি রাজনৈতিক দল তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। এই তিনটি রাজনৈতিক দল হলো, বাংলা কংগ্রেস, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি। এদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ ভূমিকা কিছু না থাকলেও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল এবং যুক্তফ্রণ্টের প্রবক্তা হিসেবে বাংলা দেশের রাজনৈতিক সংকটে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য যথাযথ পালিত হয়েছে কিনা তা গভীর বিতর্কের বিষয়। বৃহত্তম দল হিসেবে যুক্তফ্রণ্ট রক্ষা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ৩২-দফা কর্মসূচী রূপায়ণের বৃহত্তম দায়িত্ব সি-পি-এম অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বিভেদের কথাটি প্রথম উচ্চারিত হলো সি-পি-এম-এর কণ্ঠ থেকে। কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদের পদত্যাগের পর শ্রীঅচ্যুত মেননের নেতৃত্বে একটি মিনিফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সি-পি-এম নেতাদের মুখে এবং মুখপত্রে যে কথাটি হ্যামারিং শুরু করলো, তা হলো পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে কেরলের ঢং-এ একটি সরকার গঠনের চক্রান্ত চলছে এবং এই চক্রান্তের নায়ক 'দক্ষিণপন্থী' কমিউনিস্টরা। এমনি করে সেদিন সি-পি-এম তার কয়েকটি সহযাত্রী দলকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করলো। কার্যত যুক্তফ্রণ্ট যখন ভাঙলো তখন দেখা গেল তথাকথিত মিনিফ্রণ্ট করতে কেউই প্রস্তুত নন। বরং সি-পি-এমই ডিফেকশনের ওপর ভিত্তি করে একটি মিনি-সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলো। যে সি-পি-এম তার পলিটিক্যাল রিজলুশনে বলে, The Communist Party of India (Marxist) which is vitally interested in building the united front of different democratic parties and groups including the S.S.P., P.S.P. and others, যে সি-পি-এম'এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-প্লেনামে যুক্তফ্রণ্টে বাংলা কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয় না, পার্লামেণ্টে যে সিপি-এম প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়, সেই সি-পি-এম বাংলাদেশের যুক্তফ্রণ্টে বাংলা কংগ্রেসকে সহ্য করতে না পেরে চরম ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিয়ে একটি রাজনৈতিক যুগসন্ধিকে পেছনে ঠেলে দিলো। আমি অবশ্য একথা বলতে চাই না যে, একটি যুক্তফ্রণ্ট চিরকাল অটুট হয়ে থাকবে। ইতিহাসেও তার নজির মিলবে না। লেনিন কিংবা জর্জি ডিমিট্রভের যুক্তফ্রণ্ট তত্ত্বেও তার প্রমাণ মিলবে না। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে এঁরা কেউই অস্বীকার করেন নি। অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন নিজেই মেনশেভিক পার্টির একাংশ এবং সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীদের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন, পেটি-বুর্জোয়া কৃষকদের দলের রাজনৈতিক দাবী মেনে নিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে ইংল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টিকে লেবার পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রক্ষণশীলদের পরাজিত করবার নির্দেশও লেনিন দিয়েছিলেন। এই সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্রাটরা চিরকাল কমিউনিস্টদের সঙ্গে চলার প্রতিশ্রুতি দেয় না। সাময়িকভাবে এরা নিজেদেরই স্বার্থে কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলায়। একইভাবে কমিউনিস্টরাও ততক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকবে, যতক্ষণ কমিউনিস্টরা নিজেদের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করতে পারবে। সোস্যাল ডেমোক্রাট এবং পেটি-বুর্জোয়াদের সম্পর্কে এই হলো মার্কস-লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে মুহূর্তে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে রূপায়িত হতে চলেছে, যে মুহূর্তে সমস্ত রাজনৈতিক দলই যুক্তফ্রণ্টের প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করছে, সেই মুহূর্তে এই সরকার ভেঙে দেবার পেছনে আর যাই থাক, কোন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নেই। বৃহত্তম শরিক হিসেবে সি-পি-এম তার যথাযোগ্য ধৈর্যশীলতা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় না দিয়ে বারবার স্ব-বিরোধিতা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের পার্থক্য এবং একটা পেটি-বুর্জোয়া মর্যাদাবোধের পরিচয় দিল। সম্ভবত, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর সেই বিখ্যাত লাইন তাঁদের আর মনে রইলো না যে, The Communists disdain to conceal their views and aims. সি-পি-এম সকল রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন শিকেয় তুলে রেখে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মর্যাদার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো—যে মর্যাদাবোধকে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্নে একটি পেটি-বুর্জোয়া সেণ্টিমেণ্ট বলা চলে।

বাংলা কংগ্রেসের কমিউনিস্ট-ফোবিয়া আগেও ছিল। কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার চলা অসম্ভব না হলেও সহজ যে নয়, তা জেনেশুনেই বাংলা কংগ্রেস কমিউনিস্ট-প্রভাবিত ফ্রণ্টে যোগদান করেছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যেও বাংলা কংগ্রেস শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীর মধ্যে তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলো না। নিজের অস্তিত্ব অবলুপ্তির আশঙ্কায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাংলা কংগ্রেস কিছু সস্তা রাজনৈতিক চাল দিতে বাধ্য হলো। অবশ্য এই রাজনৈতিক চালের পেছনে ধনিক-শ্রেণীর একটি পরোক্ষ চাপও কাজ করেছিলো। এই চাপের জন্য যে লুপহোল প্রয়োজন ছিল, সেটি হলো রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং শরিকী সংঘর্ষ। অথচ মজার ব্যাপার হলো শরিকী-সংঘর্ষে বাংলা কংগ্রেস লিপ্ত হয় নি। সংঘর্ষ হয়েছে প্রধানত মার্কসবাদী-কমিউনিস্ট-[illegible]

[illegible] অধ্যায়রূপে বাংলার দলের দুর্নীতির ইতিহাসে চিহ্নিত হবে, তথাপি বাংলা কংগ্রেসের এতে হৈ-চৈ করবার তেমন কারণ ছিল না। তবুও সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেস আইন-শৃংখলার অবনতির কথা স্বীকার করলো না। স্মরণযোগ্য যে, ৩১শে জুলাই রাজ্য বিধানসভায় পুলিশী হামলা ঘটে গেছে, মন্ত্রীরা নিগৃহীত হয়েছেন, বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস নেতা সারা রাজ্যে নৈরাজ্য চলছে বলে স্বরাষ্ট্রবিভাগকে তীব্র আক্রমণ করেছেন, তথাপি মুখ্যমন্ত্রী আইন-শৃংখলার অবনতির কথা স্বীকার করলেন না। সেপ্টেম্বর মাসেও আমার কিছু প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, না, এসব অপপ্রচার। আইন-শৃংখলা ঠিকই আছে, ইত্যাদি। অথচ মাঝখানে অক্টোবর মাসটি গেল, নভেম্বরেই মুখ্যমন্ত্রীকে দেখলাম অনশন সত্যাগ্রহ করতে। সেদিনও কার্জন পার্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি তো সেদিনও বলেছেন, আইন-শৃংখলা বজায় আছে, কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থার এমন কি অবনতি হয়েছে যে, দলের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও সত্যাগ্রহ করতে নেমে আসতে হলো? জবাবে তিনি বলেছিলেন—সে আপনারাই দেখুন। হ্যাঁ, আমরা দেখলাম, খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম যে, বাংলা কংগ্রেসের এই সি-পি-এম-বিরোধী প্রচার অভিযানের ফলেই বাংলা কংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত হবার উপক্রম হলো। এর পরই দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, রাজ্য বিধানসভায় মন্ত্রী ও সদস্যদের ওপর পুলিশের নির্লজ্জ আক্রমণে তিনি বেকথা বলতে পারেন নি—আরামবাগে জেলা শাসক, এস-ডি-ও প্রভৃতির ওপর জনতার আক্রমণে তার প্রভৃতির ওপর জনতার আক্রমণে তার চেয়েও ঢের বেশি বলে ফেললেন, 'এই সরকার অসভ্য, বর্বর।' স্বরাষ্ট্রদপ্তরের প্রতি একনাগাড়ে বহু অভিযান চালিয়ে রাজ্যব্যাপী বিতর্কের ঝড় তুললেন, তবু আমরা দেখলাম, বিস্ময়ের সঙ্গেই দেখলাম নিজের দলের মন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপের প্রতি তিনি আশ্চর্য নীরবতা রক্ষা করলেন। আর শ্রীসুশীল ধাড়া বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, দিনের পর দিন মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দল বাংলা কংগ্রেসকে এমন একটা রাজনৈতিক সংকটের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যাকে বলা যায় পয়েন্ট অব্ নো রিটার্ন। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ফিরে আসবার আর কোন পথই খোলা রইলো না। অগত্যা ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর যা করতে পারেন নি, ১৯৬৯ সালের ১৭ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী নিজের এবং দলের মর্যাদা [illegible] মানুষের

মর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না।

আর কমিউনিস্ট পার্টি? যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য অস্বস্তিকর নিরপেক্ষতার অভিনয় করে চললো। যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের জন্য কমিউনিস্ট নেতারা বারবার সি-পি-এম'এর মনোভাবের সমালোচনা করলেন, কিন্তু ভাঙন অনিবার্য জেনেও বাংলা কংগ্রেসের প্রতি কোন সতর্কবাণী বা চরমপত্র দিতে পারলেন না। হ্যাঁ, স্বীকার করি, এর মধ্যে নীতির প্রশ্ন আছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গী হিসেবে যাঁদের গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে চরমপত্র দিয়ে সঙ্গছাড়া করার পেছনে নীতি কোথায়? কিন্তু এই সঙ্গী সি-পি-এমও। বরং বলা যায় অনেক কাছের সঙ্গী। নীতির দিক থেকে সি-পি-এম তো তাঁদের নিকটতম বন্ধু। এঁরা নিজেরাও তাই বলেন। অথচ যে জনগণের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তাঁরা সি-পি-এম'এর নেতৃত্বে সরকার গঠনে অনিচ্ছুক হলেন, সেই জনগণের দিকে তাকিয়েও তো বাংলা কংগ্রেসকে চরমপত্র দিতে পারতেন। অথচ শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ করবার পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করলেন মুখে এবং মুখপত্রে।

[illegible] নেতৃত্ব থেকে শ্রীডাঙ্গে এক চিঠিতে [illegible] বললেন, রাজ্যপাল যদি সি-পি-এম'কে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকেন, তাহলে সি-পি-আই যেন সেই মন্ত্রিসভাকে প্রোগ্রামভিত্তিক সমর্থন করেন। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব শ্রীডাঙ্গের এই নির্দেশ মানতে রাজী হলেন না। এই সম্পর্কে শ্রীভবানী সেনকে প্রশ্ন করলে তিনি আমাকে বললেন—যেখানে মানুষের মনে নিরাপত্তার ভাব বজায় নেই, সেখানে সি, পি, এম-এর মত একটি সেক্‌টেরিয়াস টেরোরিস্ট দলের হাতে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিলে আর যাই হোক, জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হতো না। ভাল কথা। কিন্তু সে সি, পি, এম ও সি, পি, আই-এর কবর না খুঁড়ে কোনদিন জলগ্রহণ করে না, সেই সি, পি, এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সি, পি, আই, অফিসে এসে বিকল্প একটি সরকার গঠন করে রাজ্যপালের শাসন এড়ানোর প্রস্তাব দিলেন, সি, পি, আই, নেতারা তা সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই ঘটনার মধ্যে নিজেদের নৈতিক জয়লাভের অংশটুকুর সঠিক মূল্যায়ন করলেন না—এমনি করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেবার কাজে সি, পি, এম, এবং বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁরাও পরোক্ষে থেকে দায়ী হলেন। আজ যখন বাংলা কংগ্রেস বলছে, সি, পি, এম-এর সঙ্গে আর নয়, সি, পি এম বলছে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আর নয়—তখনও সি, পি, আই বাংলা কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। বাংলা কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র নিশ্চয়ই কমিউনিস্টদের শ্রেণীচরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন নয়। বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রচারের সব কিছু নিশ্চয়ই সর্বহারার সপক্ষে নয়। তবু বাংলা কংগ্রেসের সমালোচনা করতে এঁরা পারেন নি। যদি বা কখনো করেন তা আবার 'ভুল বলিয়াছি' বলে সংশোধন করতে হয়। কেন হয়েছে গত ৫ই এপ্রিল বারাসতে [illegible] বিক্ষোভ [illegible] [illegible]। সাম্প্রতিক দখলীকৃত জমি ফেরত দেবার দাবিতে বাংলা কংগ্রেসের প্রচার অভিযানের সমালোচনা করে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পরদিন সংবাদপত্রে চিঠি দিয়ে বললেন, না, এমনটি ত' বলি নি। এর কারণ কি? বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক প্রচার কি একটি শ্রেণীস্বার্থের কাজে লাগছে না? যদি লাগে তবে তার তীব্র সমালোচনা করতে আপত্তি কোথায়? শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তো তাই করেছিলেন। তবে প্রত্যাহার করবার কি খুব প্রয়োজন ছিল? কিন্তু নেতারা প্রত্যাহার করুন বা না করুন, দেশের মানুষের টেমপারামেন্ট-এর তাতে কোন হেরফের হবে না। যুক্তফ্রন্ট নেতাদের বহু হঠকারিতার পরেও মানুষ কংগ্রেসকে ফিরে পেতে চাইছে না, চায় না। বাংলা কংগ্রেস ত' সেই কংগ্রেসেরই একটি ভগ্নাংশ, হয়তো বা কিছুটা প্রগতিশীল।

রাষ্ট্রপতির প্রশাসন শুরু হবার পর বিভিন্ন স্থান থেকে রাজনৈতিক কর্মীদের নিগ্রহ ভোগ করবার যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা সুখকর নয়। এদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আজও বড় অন্ধ। গত ১৭ই মার্চ তারিখটি তার উদাহরণ হতে পারে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর সি, পি, এম একদিকে বিকল্প সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালালো, অন্যদিকে রাজ্যব্যাপী হরতালের আহ্বান জানালো। বি পি টি ইউ সি-এর সি পি আই প্রভাবিত অংশ এই হরতালের ডাক সমর্থন করলো না। ফলে বি পি টি ইউ সি-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন রায় (সি পি এম) এবং সভাপতি শ্রীরণেন সেন (সি পি আই), দুই নেতা দুটি পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দিলেন। এই পরস্পরবিরোধী দুটো বিবৃতি দেবার আগে এই নেতারা একটিবারও ভেবে দেখলেন যে, তাঁদের এই বিবৃতির ফলে সারা রাজ্যে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু হয়ে যেতে পারে। আর তাই হলো। চব্বিশ ঘণ্টার হরতালের শিকার হলো ৩৮টি তাজা জীবন। [illegible] কতটা দায়িত্বহীন এবং [illegible] এমনি করে সাধারণ মানুষের [illegible] সাধারণ মানুষের জীবন ধ্বংসে [illegible] পারে? আজ বিভিন্ন স্থানে সি পি এম কর্মীরা নিগৃহীত হচ্ছেন। এর জন্য অন্যদের দোষ দেবার আগে তাঁদের নিজেদের হঠকারিতা এবং দায়িত্বহীনতার সঠিক মূল্যায়ন করা উচিত। আমি আগেই বলেছি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে যাঁরা প্রকাশ্যে নেমে আসবার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁরা আর যাই করুন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নি। কয়েক কোটি মানুষের বিশ্বাসের মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করেছেন। ছেলেমানুষী হঠকারিতার একটা উদাহরণ দিই।

গত ১১ই এপ্রিল ছাত্রপরিষদ 'কালা-দিবস' পালন করবার জন্য ডাক দিয়েছিল। আমি যে অঞ্চলে থাকি সেখানেও ছাত্রপরিষদের ছেলেরা এবং কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা যথারীতি মিছিল করে, কালো ব্যাজ ধারণ করে, যুক্তফ্রণ্টের ১৩ মাসে নিহত মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত বেদীতে মাল্যার্পণ করেছিলেন। কিন্তু সি পি এম-এর আঞ্চলিক নেতা ও কর্মীরা পার্টির কোন নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও এই উত্তেজনার মুখে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে ফেললেন। ফলে সংঘর্ষ এবং কংগ্রেসীদের হাতে সি-পি-এম কর্মীদের প্রায় একতরফা বেধড়ক নিগ্রহ ভোগ। মারামারিতে একজন সি-পি-এম সমর্থকের অবস্থা গুরুতর হলো। দ্রুত সশস্ত্র পুলিশের আগমন যখন ঘটলো, তখন মারামারি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যারা মার খেলো এমন কি যে গুরুতরভাবে আহত হলো, তাকে শুধু নয়—সে রাত্রে নেতৃস্থানীয় সি-পি-এম কর্মীদেরও আর কোথাও দেখা গেল না। একনাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত নেতারা ডুব মেরে রইলেন। এই হলো নেতৃত্বের বিচক্ষণতা এবং কর্মীদের সাহস!

কিন্তু ঐ যাঁরা এতগুলি তরুণের পিঠে হাতের লাঠি ভাঙলেন ওঁরা কারা? এতদিন ওঁরা কোথায় ছিলেন? কে ওঁদের পথে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে? ওঁরা কি ভাবছেন সি-পি-এম কর্মীদের মাথায় লাঠি মেরে ওঁরা যুদ্ধজয় করবেন? একথা যদি কেউ ভেবে থাকেন যে, লাঠি দিয়ে ওদের জব্দ করে দেবেন তবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বসবাস করছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির কোথাও মিলবে না যে, বলপ্রয়োগে কাউকে নীতিভ্রষ্ট করা কিংবা কোন বিশেষ নীতির প্রতিষ্ঠা করা [illegible]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে কেনিয়াতে সংকটাবস্থার ঘোষণার আগে রিফ্‌ট্‌ভ্যালি প্রদেশের কোথাও "বাটুনি" শপথের প্রচলন ছিল না। যদি কোন আফ্রিকান রিজার্ভের থেকে থাকে আমার সে বিষয় বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে, ১৯৫২ সালে বন্দী অবস্থায় আমি ধৃত অনেক নেতার সংস্পর্শে এসেছিলাম এবং এঁদের কেউই 'বাটুনি' শপথ গ্রহণ করেন নি। এমন কি অনেকে প্রথম শপথটিও নেন নি। কিকুয়ু ভাষায় আর একটি প্রবাদ আছে "মোয়ানা আংগিগানুইকিরিয়া রুহিউ নাওয়ে নডুকো উমু উই কিরিয়ে।" যার অর্থ হল এই যে, যদি কোন অপরিণত বয়স্ক বালক তোমাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তোমার প্রতি 'পাম্পা (দায়ের মত অস্ত্রবিশেষ) নিক্ষেপ করে তাহলে তুমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাকে প্রত্যাঘাত করবে না উল্টে—যদি তা কর তাহলে তোমার আঘাতকারীর চেয়েও তুমি নির্বোধ প্রমাণিত হবে। সংকট অবস্থার প্রথমের দিকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের কাছে কেবল বর্শা ও সিমিই (ছোরার মত আর এক অস্ত্র বিশেষ) ছিল। কিন্তু সে অবস্থায় সংগ্রামের নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক কথাবার্তা না চালিয়ে কেনিয়ার তদানীন্তন সরকার তাদের গায়ের জোরে দমন করার জন্য আনান বিলেতের বিখ্যাত ল্যাঙ্কাসায়ারের ফ্যুসিলিয়ারস সৈন্যদল : যাদের অস্ত্র হল ব্রেনগান ও গ্রিনেডস্। এ ছাড়া তাদের সাহায্য করবার জন্য ছিল কেনিয়া রেজিমেণ্ট ও কিংস আফ্রিকান রাইফেলসের বিখ্যাত অস্ত্রবিদরা। এই ভীষণ প্রতি-[illegible] পথ ছিল হয় প্রাণপণ যুদ্ধ করা, না হয় অঘোরে প্রাণ দেওয়া। ফলে জঙ্গলে লুকায়িত সংগ্রামী সৈনিকেরা 'বাটুনি' শপথের প্রচলন করে নিজেদের ভেতর ঐক্য রাখবার জন্য ও দল বেঁধে শহর বা শহরতলীতে এবং ইউরোপীয়ান চাষাদের ফার্মে হানা দিতে আরম্ভ করে আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করবার জন্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমদিকে সংগ্রামীদের একমাত্র সহায় ছিল তাদের উচ্চাশা এবং তাদের জীবনের সৎ উদ্দেশ্যের ওপর গভীর আস্থা এবং এর উপর নির্ভর করেই তারা সরকারী ফৌজের বিরোধিতা করতে সাহস করেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রথম কাজ ছিল আমাদের সৈনিকদের জন্য নানা উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সরকারী সৈন্যশিবিরের কাছে অবস্থিত দেহ ব্যবসায়ী মেয়েরা নির্বিকার চিত্তে সৈন্যদের কাছে গিয়েছে তাদের লালসায় ইন্ধন যোগাতে ও দাম হিসাবে চেয়ে এনেছে কিছু গুলীবারুদ। তারপর সে সমস্ত জিনিস বিপদসংকুল যোগসূত্র দিয়ে পাঠান হয়েছে জঙ্গলে লুক্কায়িত সংগ্রামী সৈনিকদের কাছে। কিংস আফ্রিকান রাইফেলসের অনেক সরকারী বেতনভোগী আফ্রিকান সৈন্যরাও লুকিয়ে গোলাবারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিক্রি করেছে বা দিয়েছে সংগ্রামীদের এবং এগুলি পাচার করবার যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করেছে সৈন্যবাহিনীর অসামরিক আফ্রিকান কর্মীরা। ঐ সময়কার হতাহত ইউরোপীয়ান চাষাদের ওপর আক্রমণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল তাদের কাছ থেকে বন্দুক ও বারুদ জোগাড় করা, অথচ যে কতজন [illegible] প্রাণ দিয়েছে সেটা নিতান্তই গৌণ ঘটনা। [illegible] লুকনো সৈন্যদলেরা এর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। তাদের মূলধন ছিল সাইকেলের ফ্রেম, জলের পাইপ, দরজার বোল্ট এবং মোটরগাড়ির চাকার রবার টিউব। সরকারী দোকান থেকে জোগাড় করে আনা বিস্ফোরক, বীয়ারের বোতলের ভেতর পুরে তৈরি করা হয়েছে বোমা বা মলোটভ ককটেল। বলা বাহুল্য যে, প্রথম দিকে এ সবের কিছু কিছু প্রায়ই ফেটে গিয়েছে অজ্ঞতা, অসতর্কতা ও অসাবধানতার ফলে এবং এভাবে অনেক সৈনিকের প্রাণহানি পর্যন্তও হয়েছে।

সরকারী বিবৃতিতে যে সমস্ত আফ্রিকানদের সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে তারাই ছিল আমাদের বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলী, রসদ ও ওষুধপত্র জোগাড় করার কাজে সবচেয়ে সহযোগী কর্মী। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে এদের কার্যদক্ষতা প্রায় অবিশ্বাস্য রকম ভাল হয়ে উঠেছিল। এদের সাহায্যে আমরা লাটভবনের ভেতরকার খবর পর্যন্ত পেতাম। সরকারী সৈন্যশিবিরের ও জেলের অধ্যক্ষদের প্রতিটি কাজ ও পরিকল্পনার বিষয় আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম এবং সরকারী চিকিৎসালয়গুলির খুব কাছেই আমাদের সৈনিকদের বিশ্রাম ও শুশ্রূষার জন্য বন্দোবস্ত ছিল। বলা বাহুল্য, এদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও আসত সরকারী খরচে।

যেমন যেমন দিন যেতে লাগল কেনিয়ার বৃটিশ সরকার সংগ্রামের জন্য বিলেত থেকে অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, বিমানবাহিনী ও গোরা সৈন্য দলের আমদানী করাতে লাগলেন। জঙ্গলে লুক্কায়িত আমাদের সৈন্যদের মনও ঠিক [illegible] [illegible] প্রতিবিম্বের ও [illegible]

নির্বাহিতে। সরকারপক্ষ থেকে কোনদিনই তাদের প্রতি মায়াদয়া বা অনুকম্পা দেখান হয় নি, ফলে তাদের আচরণও ধীরে ধীরে বর্বরতা ও নৃশংসতায় চরমে উঠেছিল। শুধুমাত্র প্রয়োজনের খাতিরেই কেনিয়ার সাধারণ চাষাভুষারাও জঙ্গলে লুক্কায়িত সৈনিকদের দ্বারা শিক্ষিত হয়ে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং বৃটেনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে মহাবিক্রমে চার বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এখন সে সব দুর্দিনের কথা ভাবতে বসলে খারাপ লাগে এইজন্য যে, তখনকার বৃটিশ সরকার সামান্য কয়েকটি রাজনৈতিক সুবিধাদি আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কতো সহজেই এই ভয়াবহ সংগ্রামের মূল উৎপাটন করতে পারতেন। শুধুমাত্র একটি ঘোষণা "জেমো কেনিয়াট্টাকে অচিরে মুক্তি দেবেন বৃটিশ সরকার এবং ১৯৬৫ সাল নাগাদ কেনিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে"—এই যথেষ্ট হত রক্তারক্তি ও যুদ্ধ-বিরতির জন্য।

জঙ্গলে লুক্কায়িত সৈনিকদের সঙ্গে একত্রে থেকে তাদের কার্যপ্রণালী ও কষ্টভোগ স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ আমার হয় নি, কিন্তু আশা করি যে, তাঁদের একজন শীঘ্রই এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলবেন পুস্তিকার মাধ্যমে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সুপ্রসিদ্ধ সংগ্রামী নেতা দিদান কিমাথি সরকারী সৈন্যদের হাতে প্রাণ দেন। কিন্তু আশা করা যায় যে, দিদানের সমসাময়িক ওয়ারুহিউ ইটোটে, যিনি পরে "জেনারেল চায়না" নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, একদিন জঙ্গলের জীবনের বিষয় আমাদের বলবেন। ইংরেজ লেখক ইয়ান হেন্ডারসনের কুখ্যাত বই 'দি হান্ট ফর কিমাথি'তে দিদান কিমাথির জীবন সম্বন্ধে যে-সরকারী পক্ষপাতিত্ব ও অসত্যতার উল্লেখ আছে তা আমাদের ভেতর কেউই স্বীকার করবে না যাঁরা কিমাথিকে জানতেন। কেনিয়ার সংকটের দিনগুলির সময় কিকুয়ু স্ত্রীলোকদের আপাতদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য ব্যবহার অনেক বিদেশী ঐতিহাসিকেরাই বুঝতে পারেন নি। এক দিকে সারা রাত ধরে এই স্ত্রীলোকেরা সৈন্যদের জন্য খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান দিয়েছে। অথচ অন্যদিকে দিনের বেলায় সরকারী প্রশ্নের উত্তরে তারাই এ বিষয় কোন খবর রাখে না বলে সাক্ষ্য দিয়েছে। উপরন্তু সরকারী আদেশ অনুসারে জঙ্গলের চারিধারে বিরাট বিরাট নালা খুঁড়ে তাতে বাঁশের খোঁচা পুঁতেছে। যাতে জঙ্গলের ভেতর কেউ না যেতে পারে বা সেখান থেকে সংগ্রামী সৈন্যেরা বাইরে না আসতে পারে। সরকারী সৈন্যসামন্তদের থাকবার জন্য শিবির তৈরির কাজে তারা সাহায্য করেছে এবং পরবর্তীকালে আবার সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গলে গিয়ে সেখানে লুক্কায়িত সংগ্রামী সৈন্যদের খুঁজে বার করতে ও বন্দী করতেও সাহায্য করেছে। এইরকম আপাত বিরোধী আচরণের কোন সঙ্গত কারণ আছে কি?

প্রথমত এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, শতকরা ৯০ ভাগের বেশি কিকুয়ু স্ত্রীলোকেরা কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামকে মনেপ্রাণে অনুমোদন করেছে এবং এই স্ত্রীলোকদের ভেতর সবাই কিছু শিক্ষিত বা প্রগতিশীল নয়। দ্বিতীয়ত কেনিয়ার সংকটকালে গোড়া থেকেই অধিকাংশ আফ্রিকান স্ত্রীলোকেরাই "মাউ মাউ" নামে সরকারিভাবে নিন্দিত সংগ্রামের স্বপক্ষে ছিল। জেমো কেনিয়াট্টার ধৃতাবস্থার পরই তারা এও বুঝতে পারে যে, শান্তির পথে কেনিয়ার স্বাধীনতা আসবে না এবং তারা পারিবারিক অশান্তি, ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করেও সংগ্রামের জন্য বুক বেঁধে দাঁড়ায় তাদের পুরুষদের সঙ্গে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, প্রথম থেকেই কিছু পরিমাণ 'হোমগার্ডস' বা সরকারী রক্ষীবাহিনীর স্ত্রীলোকেরা বৃটিশ সরকারকে এই সংগ্রাম দমন করতে নানাভাবে সাহায্য করেছে। যদিও এদের সংখ্যা ছিল কম। এ ছাড়া কিছু খৃস্টান ধর্মাবলম্বী স্ত্রীলোক (এ কথা এরকম পুরুষদের পক্ষেও প্রযোজ্য) যাদের গোঁড়ামিতে দেশের চেয়েও যীশুখৃস্টকে বেশি ভক্তি করত এবং ঐ গোঁড়ামির সুযোগ সরকারপক্ষ যতটা সম্ভব নিয়েছিলেন। কয়েকজনের আবার সরকারকে সাহায্য করার পিছনে ছিল নিজস্ব স্বার্থ জড়িত : যেমন স্বামীর চাকরিতে উন্নতি বা পুত্রকন্যার উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তিপ্রাপ্তি ইত্যাদি। সংগ্রামের তরফ থেকে এইরকম সব স্ত্রীপুরুষই আমাদের চখে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ আমাদের সব থেকে বড় ভরসা ছিল সমস্ত দেশের লোকের মধ্যে ঐক্যসাধন ও স্বাধীনতার জন্য একজোটে সরকারের বিপক্ষে সংগ্রাম করা। আমরা সংগ্রামকর্মীরা খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধবাদী ছিলাম বললে মিথ্যা কথা বলা হয়। আমাদের মতে এই পৃথিবীর গোলযোগ, নিষ্ঠুরতা ও সরকারিভাবে অনুমোদিত অন্যায় অবিচার এত বেশি হয়ে উঠেছিল যে, এর ভেতর খৃস্টান ধর্মের নাক গলাবার কোন জায়গাই ছিল না। আমাদের শত্রুপক্ষ যে ঐ ধর্মকে বিশেষ চতুরতার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন তা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় নি এবং আমরা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলাম যে, ঐ মহান্ ধর্মকে এই সংগ্রামের মধ্যে টেনে এনে তার অবমাননা করব না কোন মতেই।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সংগ্রামদের যে স্ত্রীপুরুষেরা আমাদের স্বপক্ষে ছিলেন তাঁদের প্রথম কর্তব্য ছিল জঙ্গলে লুক্কায়িত সৈন্যসামন্তদের যথাসম্ভব সাহায্য করা। প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কর্তব্যের ভেতর পারিবারিক আনুগত্য এবং সুখসুবিধাও জড়িত ছিল। কারণ অনেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী-পুত্র তখন জঙ্গলে লুক্কায়িত অবস্থায় কষ্টে দিনাতিপাত করেছিল। এবং কিকুয়ু সমাজের নিয়মানুযায়ী নিজেদের পারিবারিক বা গোষ্ঠীবদ্ধ লোকেদের যথাযোগ্য দেখাশোনা না করার মত বড় পাপ আর নেই। অন্য দিকে সরকারী নিয়মাবলীর অবাধ্যতা করাও কিকুয়ু স্ত্রীলোকদের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় এবং প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কারণ "চীফ্"দের (সরকারিভাবে নিযুক্ত সামাজিক প্রধান) দ্বারা সরকারপক্ষ তখন আফ্রিকান রিজার্ভগুলির ওপর বিশেষ রকম কড়া নজর রাখছিলেন। কিকুয়ুরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে কোনদিনই ভীতি বা শংকার চোখে দেখেন নি। আসল শংকার কারণ হয়ে উঠেছিল সরকারী দমননীতি যার মূর্তিমান প্রতীক ছিল রিজার্ভে অবস্থিত সরকারী বেতনভোগী চীফেরা, হেডম্যান বা মাতব্বররা এবং হোমগার্ডস বা সরকারী রক্ষীবাহিনীর লোকেরা। ফলে কিকুয়ু স্ত্রীলোকেরা নিরুপায় হয়ে সরকারী নির্দেশ মেনে নিয়েছিল নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কখনও তারা এমনভাবও দেখিয়েছে যে, এই সমস্ত নির্দেশ তারা আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছে। যদি চ আসলে তাদের মনপ্রাণ এসবের বিরুদ্ধে কেঁদে উঠেছে।

সংকটের প্রথম দিকে সরকারী রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। কয়েকজন নাগরিক, চীফেরা, ধনী ব্যবসায়ীরা বড় বড় জমিজমার মালিকেরা, উপজাতীয় পুলিশবাহিনী এবং আরও অন্যরা, যাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বৃটিশ রাজত্বের ধারাবাহিকতার প্রয়োজন ছিল। তাই তারাই স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। এ ছাড়া আরও অনেক লোক মধ্যপথাবলম্বী হয়েছিল। কারণ সমরোন্মুখ এই দুই দলের ভেতর কে বেশি শক্তিশালী এবং জয়টিকা শেষ অবধি কার কপালে পড়বে তাতে ছিল সন্দেহ এবং খুবই সংখ্যালঘু আর এক দলের মতে এভাবে জোর করে হানাহানির দ্বারা স্বাধীনতা লাভ অন্যায় বলে তারা মনে করত। তারা চেয়েছিল বৃটিশ সরকারকে নিজের থেকে অহিংসার পথে কেনিয়াকে স্বাধীনতা দেবার জন্য আরও সময় দিতে। সরকারপক্ষ খুব শীঘ্রই এ বিষয় নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতিকে ভিন্ন [illegible]
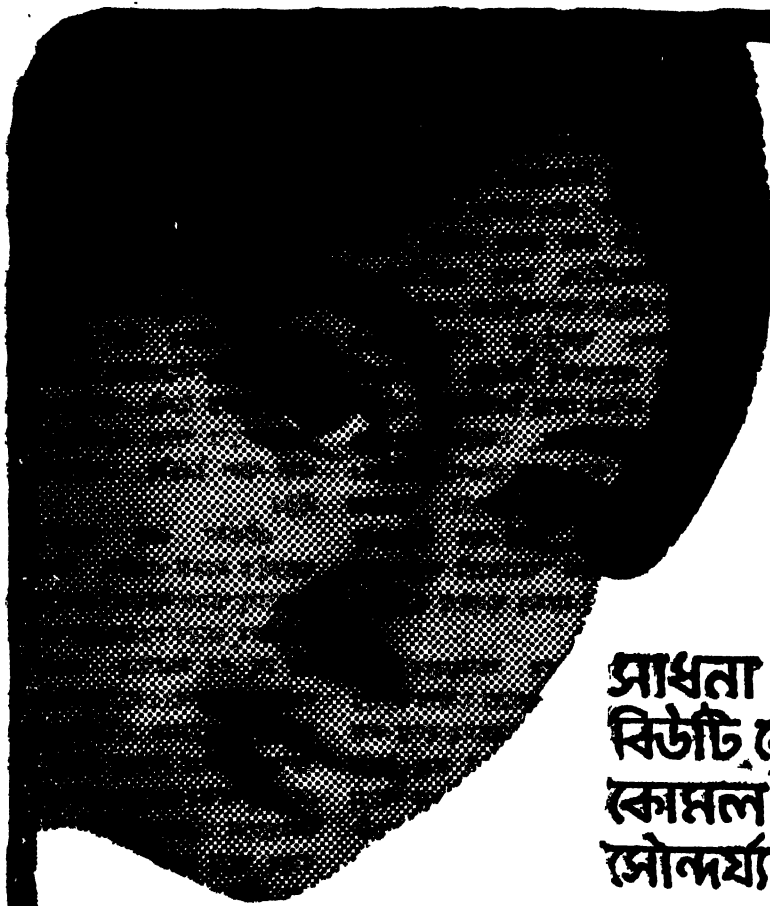
কিকুয়ু উপজাতীয় মধ্যে মতানৈক্যের প্রয়োজন সর্বপ্রথম এবং এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তারা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সবরকম সাহায্যই নিয়েছিলেন। সরকারী প্রচেষ্টার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম কিছুদিন পরে কেনিয়ার অন্তর্যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। যার ফলে দেশবাসীর একদল অন্য দলকে মনেপ্রাণে ভয় ও ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিল এবং এই দ্বিধা সংঘর্ষের সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন তখনকার বৃটিশ সরকার। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি, পরিবারবর্গ এই সবের ওপরই সরকারপক্ষ হেনেছিলেন নিষ্ঠুর আঘাত। এবং ভীতু, লোভী ও হিংসাপরায়ণ লোকেরা এই সুযোগে নিজেদের আর্থিক বা সামাজিক সুখ-সুবিধার জন্য সরকার-পক্ষকে সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ করেন নি। এইভাবে দেশের স্বাধীনতাকে মুষ্টিমেয় কাঞ্চনের পরিবর্তে বিদেশী ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে তুলে দিতে তাদের মনে কোন দ্বিধা জাগে নি। অবশ্য,এইরকম ভীতু, আত্মসচেতনহীন লোকের অভাব কোন দেশে কখনই হয় নি এবং কেনিয়াতেই বা এর ব্যতিক্রম হবে কেন? সরকারপক্ষ তাঁদের ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য যে কোন পথের সাহায্য নিতেই দ্বিধা করেন নি এবং তাঁদের সর্ব প্রচেষ্টা নিয়োগ করে দেশবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, জঙ্গলে লুক্কায়িত সংগ্রামী সৈনিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আর সবাইকে খুন-জখম করে দেশে অরাজকতা ডেকে আনা। সংগ্রামীরাও যেমন যেমন খবর পেতে লাগল কিভাবে সরকারপক্ষ নিষ্ঠুর আচরণ করছেন তাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনের ওপর, তেমন তেমন তাদের আচরণ ও সংগ্রামের পন্থাও হয়ে উঠল ক্রমশ নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর। ফলে দেশের অবস্থা এমন ভয়াবহ হয়ে উঠল যে, দুপক্ষের একপক্ষ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম শেষ হবার পথ হল বন্ধ। সরকারপক্ষ ঢালাও হুকুম দিলেন : যে কোন লোককে সামান্য সন্দেহ হলেই গুলী করে মেরে ফেলবে তার দোষাদোষ বিচারের অপেক্ষা না করে। কুখ্যাত 'করফিল্ড' রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, সংগ্রামীপক্ষে মারা যায় ১১,৫০৩ জন আর সরকারপক্ষের ২,০৪৪ জন। অবশ্য এর ভেতর যাঁরা কয়েদখানায় সরকারী বিচার প্রহসনের ফলে প্রাণ দেন বা বন্দী-শিবিরে মারা যান তাঁদের সংখ্যা ধরা হয় নি।

'সেন্ট্রাল প্রভিন্স' বা মধ্য এলাকার সব জায়গায় সরকারী রক্ষীবাহিনীর লোকেরা জনসাধারণের কাছে 'কামাটিমু' বলে পরিচিত ছিল। কিকুয়ু সমাজে দু ধরনের বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিনিয়ার বা জ্যেষ্ঠদের সকলেই 'মধুরি র‍্যা ইহাকি' বা জ্যেষ্ঠপদের সম্মানস্বরূপ একটি করে ছাগল দান করে, যার অর্থ হল সমাজে তার জ্যেষ্ঠতার স্বীকৃতি। আর জুনিয়ার বা কনিষ্ঠ বা 'কামাটিকু' তাদেরই বলা হয়, যারা ঐ স্বকৃতি তখনও পায় নি, ফলে ছাগল উপহার তখনও পর্যন্ত পায় নি। জঙ্গলে অবস্থিত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সরকারী রক্ষীবাহিনীর লোকেদের ঐভাবে অবজ্ঞা-ভরে 'কামাটিকু' বলে ডাকত তাদের নিচু স্তরের লোক বলে প্রমাণ করবার জন্য। কারণ সংগ্রামীদের মতো শারীরিক ও অন্যান্য সাময়িক কষ্ট স্বীকার করে জঙ্গলে বাস করতে অসুবিধা হবে বলেই ঐ লোকেরা শত্রুপক্ষের শিবিরে অপেক্ষাকৃত আরামের জীবন বেছে নিয়েছিল। রক্ষী-বাহিনীর লোকেদের সবাইকে সরকার থেকে একটি করে বল্লম দেওয়া হয়েছিল। (যদিচ পরে তাদের হাজারে হাজারে রাইফেলও দেওয়া হয়) এবং কামাটিকু শব্দের অর্থও হল "বল্লমধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ" ফলে ঐ নামের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হয়েছিল।

সরকারী প্রচারে অনেকবার বলা হয়েছে যে, মাউ মাউ নেতারা হাজার হাজার নিরীহ নাগরিকদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ পায়খানার জন্য তৈরি গর্তে ফেলে দেন। 'লারী' নামক স্থানে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে যে ঘটনা ঘটে-ছিল সরকারিভাবে তাকে ম্যাসাকার বা বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিচ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাউ মাউ বিচারালয় কিছু সংখ্যক শত্রুর ও বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল—যা রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় সর্বদেশে ও সর্বকালে ঘটে থাকে। আমি অনেক রাজবন্দীদের কাছে শুনেছি যে, ঐ সময় যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড কেনিয়ার নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের অনুগত লোকেদের হাতে বা সাধারণ চুরি-ডাকাতির ফলে হয়েছে, সেগুলোও সরকারিভাবে মাউ মাউ হত্যা বলে গণনা করা হয়েছে। এমন কি কুখ্যাত 'লারী' ঘটনাতেও সরকারী বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে তার কতটা সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একজন ডাচ সমাজ-বিজ্ঞানী মহিলা লারীর ম্যাসাকার সম্বন্ধে গবেষণা করে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল কয়েকজন বাছাবাছা লোকেদের কাছেই পৌঁছেছিল। এবং সেগুলিও কোন অজ্ঞাত কারণে ক্রিশ্চিয়ান কাউনসিল অফ কেনিয়া; কয়েকদিন পরে প্রত্যাহার করে নেন। তারপর আর এ বিষয়ে কোন খবরাখবর পাওয়া যায় নি।

সংকটের পরবর্তীকালে আমাদের সঙ্গে অনেক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধীরাও এক সঙ্গে বন্দীজীবনযাপন করেছিলেন। তাঁদের কাছে আমি কর্তৃপক্ষের অনুগত লোকেদের একটি ভাল আচরণের কথা শুনেছিলাম। সে সময় মাউ মাউ সংগ্রাম দমনার্থে প্রচুর পরিমাণে বৃটিশ সেনাদের (যারা "জনি" নামক ডাকনামে পরিচিত) কেনিয়ায় ছিলেন এবং ঐ সমস্ত নবাগত বিদেশীদের পক্ষে একজন মাউ মাউ দলীয় কিকুয়ু বা সরকারপক্ষের সাহায্যকারী কিকুয়ুর ভেতর প্রভেদ বের করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ এই দুই দলের মধ্যে বাহ্যিক কোন পার্থক্যই ছিল না। কর্তৃপক্ষের অনুগত আফ্রিকানরা এই সব জনিদের সঙ্গে সব সময় থাকতেন। এবং নিরীহ লোকেদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। এত সব সাবধানতার পরও দুর্ঘটনা ঘটত প্রায়ই এবং ফলে নিরীহ লোকেদের প্রাণহানি হত।

এইরকম এক দুর্ঘটনার ফলে কারোকি নামক ওয়াইয়া উপজাতির এক নামজাদা পাগল সরকারী বন্দুকের গুলীতে প্রাণ দেয়, কারণ সে বেচারা বুঝতেই পারে নি যে, সে সময়কার প্রচলিত সান্ধ্য আইনের ফলে তার বাড়ির কাছে রাত্রিবেলা বাইরে বেরুনোও নীতিবিরুদ্ধ। সংকট প্রশমনের পরে আমরা অবশ্য স্থির করি যে, কর্তৃপক্ষের অনুগত লোকেদের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিশোধ নেওয়া চলবে না। কারণ তারা অন্ততপক্ষে নিরীহ লোকে-দের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। তা ছাড়া এদের বেশিরভাগই আমাদের সংগ্রামী শপথও গ্রহণ করেছিল এবং সংগোপনে নানাভাবে আমাদের যথাসম্ভব সাহায্যও করেছে। কিকুয়ু ভাষার এক কিম্বদন্তীতে বলা হয়েছে যে, "টুটিকুহে হিথী কীরি"—অর্থাৎ তরক্ষু (হায়না)কে দুবার খেতে দিও না। পূর্বকালে কিকুয়ু সমাজে কোন ব্যক্তিকে মেরে ফেলা হলে তার মৃতদেহ তরক্ষুর ভোগে আসত। কিন্তু হত্যাকারীকেও হত্যা করা হলে আর কারুর লাভ হয় না তাতে তরক্ষুর ছাড়া —তার হয় ডবল লাভ। তাই জন্য আমরাও সংকটের পরে কর্তৃপক্ষের অনুগত লোকেদের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিশোধ-মূলক শাস্তির বন্দোবস্ত করি নি। এবং এই সিদ্ধান্তের ফলে কেনিয়ার ও বিশেষ করে কিকুয়ুদের ভেতর আবার শান্তি ফিরে এসেছে এতো তাড়াতাড়ি। কর্তৃপক্ষের অনুগত লোকেদের দুজন সব থেকে বড় নেতা ছিলেন। নেয়েরি অঞ্চলের বয়োজ্যেষ্ঠ চীফ মুহোয়া, বি, ই, এম এবং ফোর্ট হল অঞ্চলের বয়োজ্যেষ্ঠ চীফ নজিরি, ও বি. ই। মুহোয়ার

[illegible] দান করছেন; নাজিরির পুরে কোর্ট হল অঞ্চল থেকে নির্বাচিত দুইন বিধানসভার সদস্যদের ভেতর একজন ছিলেন। এবং পরে তিনি ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে জেমো কেনিয়াটার ঐ অঞ্চল থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচনের আনুকূল্যে নিজে বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দেন। এই রকম দেশভক্তদের পিতার ওপর প্রতিশোধ নেবার কোন অর্থই হয় না এবং প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারা দেশের কেউই স্বাধীনতার আসল ফললাভ করতে পারবেন না। কারণ ঐ ফল লাভ কেবল সহ্য, সংযম ও সহযোগিতার দ্বারাই সম্ভব।

আমি যখন ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে 'ঘানায়' পরিভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম, সেখানকার একজন উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন: সংকটের সময় যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা বন্দীশিবিরে ও জংগলে কষ্টে দিনাতিপাত করেছেন, তাঁরা এখন কেনিয়ায় কি কি বিশেষ সুবিধা ভোগ করছেন? এ ছাড়া তিনি আরও বলেন যে, আমরা নিশ্চয়ই এখন কর্তৃপক্ষের অনুগত লোকেদের ওপর যথোচিত প্রতিশোধ গ্রহণের বন্দোবস্ত করেছি। উত্তরে আমি তাঁকে একটি কিকুয়ু প্রবাদ বলি: 'নডুরুমি ইরিমা টিও নজাঁর ফুও', যার অর্থ হল, যে জীব মাটিতে গর্ত খোঁড়ে কিন্তু সে নিজে সেখানে রাত্রিবাস করে না। একটি উদাহরণস্বরূপে বলা যেতে পারে যে, ant bear নামক এক জাতীয় জন্তু মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেখান থেকে উইপোকা বেছে বেছে খায়, তারপর সেই গর্তেই সজারু ও অন্যান্য জন্তুরা বসবাস করে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যাঁরা সব থেকে বেশি পরিশ্রম করেছেন, তাঁরাই যে প্রথমের দিকে তার ফলভোগও করবেন এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই ফলভোগের অংশ আর পাঁচজনও নিশ্চয়ই পাবে এবং মাটিতে খোঁড়া গর্ত নিয়ে ant bear ও সজারুর নিজেদের ভেতর মারামারি করবার কোন প্রয়োজন নেই।

স্বাধীনতালাভের পর কেনিয়াতে আমরা আর কোন রাজদ্রোহ বা রক্তপাতের প্রয়োজন দেখি না, বা আশাও করি না, কিন্তু কোন রকমের নব-ঔপনিবেশিকতা যা সাম্রাজ্যবাদিতার পুনঃপ্রভাব থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। ওয়ার্ট-হগ নামক এক ছোট আকারের বন্য শুয়োর (যা আফ্রিকার জংগলে প্রচুর পাওয়া যায়) তার বাচ্চাদের জন্ম দেবার পর নিম্নলিখিত এক অদ্ভুতরকম আচরণ করে: ফলন্ত 'মুকুইয়ু' (ডুমুরের গাছ) গাছের দিকে ভীষণ বেগে দৌড়ে গিয়ে গাছের গোড়ায় মাথা দিয়ে ধাক্কা দেয়। ফলে গাছ থেকে পরপর ফল মাটিতে পড়লে সেই ফল তার বাচ্চারা খায়। কিন্তু বেচারা মা তার মাথায় চোট লাগার ফলে কয়েক ঘণ্টা ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে এবং কখন কখন সে চিরকালের জন্য শয্যা গ্রহণ করে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেকেই এইরকম ব্যবহার করেছেন। ফলে আজ আর তাঁরা ইহজগতে নেই। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আবার একবার আমাদের সবাইকে সংগ্রামের পথে নামতে হবে; সমস্ত আফ্রিকাকে, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বাধীন করবার জন্য।

কিন্তু এখন আমি আমাদের মাউ মাউ সংগ্রামের কথা লিখতে বসেছি, কাজেই সেখানে আবার যাচ্ছি। দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণ করবার পর আমি নাকুরুতে ফিরে গিয়ে কে, এ, ইউর কাজ আরম্ভ করি এবং নতুন সদস্য যোগাড় করবার জন্য প্রায়ই আমি একটি ভাড়া করা বাইসাইকেলে চেপে নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলগুলিতে যেতাম। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে নাকুরুর কে, এ, ইউ নেতা জন কামোনজো তাঁর বাড়ির কাছেই রাজবন্দীরূপে ধৃত হন। তাঁর বাবার বাড়িতে কয়েকদিন আগে একটি শপথ-দানের সভা পরিচালনা করা হয়। কিন্তু শপথ গ্রহণের জন্য সমবেত লোকেদের মধ্যে একজন লোক শপথ নিতে অস্বীকৃত হয়। কয়েকজন অল্পবয়স্ক তত্ত্বাবধায়ক লোকটিকে ভয় দেখাবার জন্য তার গলায় একটি দড়ি পরিয়ে তাতে অল্প টান দেয়। কিন্তু তাতেও তার মতের বদল করতে না পেরে শেষকালে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে সে সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়। যদিচ এই ঘটনার ভেতর জন কামোনজোর কোনই হাত ছিল না, তবু ধড়পাকড়ের সময় তাঁকেও হাজতে পোরা হয়। সেইদিন থেকে নাকুরু শহরে কে, এ, ইউর আর কোন নির্বাচিত সভাপতি ছিল না এবং অল্পদিনের ভেতরেই এই সংস্থা শহর থেকে প্রায় লোপ পায়। ১৯৫৩ সালের ৮ই জুন তারিখে কেনিয়া সরকার সমস্ত দেশে কে, এ, ইউকে নিষিদ্ধ বলে আদেশ জারি করেন। ফলে দেশের আফ্রিকানদের গোপন সংস্থায় যোগদান করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

এই গোপন সংস্থায় আমার কোন নির্বাচিত পদ ছিল না। কিন্তু মুথি নামক আমার এক সহকর্মী যে আমার সংগেই 'বাটুনি' (দ্বিতীয় নম্বর) শপথ গ্রহণ করেছিল, এর ভেতর জংগলে গিয়ে সেখানকার সংগ্রামীদের সংগে কাজ করছিল এবং সে তাঁদের বলেছিল যে, আমি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ফলে জংগলে লুক্কায়িত সংগ্রামীদের শহরে কোন কাজ থাকলে তারা প্রায়ই আমার কাছে আসত। একবার এবারডেয়ার পাহাড় অঞ্চল থেকে একদল সংগ্রামী আমার কাছে আসে। তাদের নেতা ছিল একজন মেরু উপজাতির লোক, পরনে তার ঝকঝকে কেনিয়া সরকারের পুলিশবাহিনীর ইউনিফর্ম। আমি সেদিন রাত্রের মত তাদের থাকবার বন্দোবস্ত, টাকাকড়ি ও পায়ের বুটের ব্যবস্থা করে দিয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম। রেলওয়ের কয়েকজন কর্মচারী মিলে আমাকে একটি রেলওয়ে গার্ডের ইউনিফর্ম যোগাড় করে দিয়েছিল এবং এর সাহায্যে আমি প্রায়ই নির্বিবাদে গার্ডের কামরায় এলডোরেট, কিসুমু প্রভৃতি শহরে যাতায়াত করতাম। এইভাবে আমি জংগলে অবস্থিত সংগ্রামীদের ও অন্যান্য আফ্রিকানদের ভেতর যোগাযোগ রক্ষার কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

[চলবে]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তিপ্পান্ন ॥
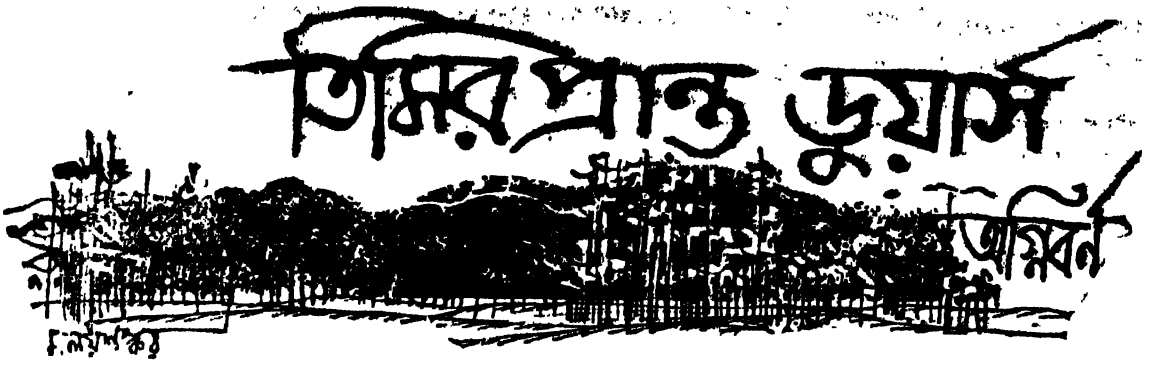
যতই না কেন ভয় থাক দুর্গাঝিশিদের দল, ডুয়ার্সে তবু গড়ে উঠছে নতুন মানুষের আস্তানা। নতুন সমাজ। নতুন-কালের ইতিহাস। ভোরের আলো অরণ্যকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, যেন একরাশ কিরণ পিচকারি ভরে ছড়িয়ে দেয় দিকে-দিগন্তরে। জাগে মানুষ। জাগে পথচারী।

চিরকাল কিন্তু এমন ছিল না ডুয়ার্স।

চিররাত্রির স্তব্ধতায় ছিল গা-ঢাকা দিয়ে। আকাশে-অরণ্যে। নদ-নদী-পাহাড়। গাছে-পালায়। ঝোপে-ঝাড়ে। ঝিলে-ঝোরায়। "আতঙ্কে-উদ্বেগে গিশি" নাত্রা হত বুকের মধ্যে। ধমনীর উদ্বেল রক্তধারায়।

সেদিন গিয়েছে আজ।

নতুনকালের আলো এসে পড়েছে চত্বরে। কোথায় আজ অন্ধকার? সুবিশাল অরণ্যের অন্ধকারে বসে গর্জে-ওঠা বাঘ, চোখে তার কার্বনের ক্ষুধা নিয়ে কোথায় আজ? আছে নিশ্চয়ই। তবে সরে গেছে আরো গভীরতম বনের ভেতরে। বনের প্রাণীরাও জেনে গেছে নতুনকালের কথা। জেনেছে মানুষেরা এসে পড়েছে এইখানে। সভ্যতার আলো নিয়ে জেগে উঠেছে নয়া-জনপদ।

মানুষ। মানুষের বংশ বাড়ছে দিকে-দিকে। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি শক্ত পাহাড়। রাত্রিদিন। আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে বনজঙ্গল। হিংস্রতম কুঠারে ছেদন করেছে বড় বড় গাছ। হালের ফলায় উপড়ে তুলেছে আগাছা আর নোংরা ঘাসের দল। কঠিন মাটির পাঁজর ফাটিয়ে বর্ষণ করেছে বীজ। বপন করেছে শস্য।

চকচকে রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে যাচ্ছে নানা দ্রুতগতি যান। ভারী মোটর-ট্রাক। চলমান সুদৃশ্য বাসের জানালায় জানালায় উজ্জ্বল আলো। সুবেশ যাত্রী। যাত্রিণীর নিটোল মুখ। রাজহংসী গ্রীবা। ড্রাইভারের হাতে স্টিয়ারীং। দুটি ধকধকে ফ্রন্ট লাইট চিরে চলেছে রাত্রির অন্ধকার। দিনের আলোয় পথচারীদের সতর্ক করে দিতে হর্ন বাজছে ঘনঘন।

আর তাদের ড্রাইভারেরাই বা কত না জাতি ও উপজাতির। উত্তর প্রদেশের রামধন ঝা, বিহারের লক্ষ্মণ মাহাতো, ছোটনাগপুরের বিরসা ওরাওঁ, পাঞ্জাবের কির্পান সিং, থেকে শুরু করে আছে বাঙালী-নেপালী-মাড়োয়ারী আর দক্ষিণ ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দ।

আর শুধু কি ড্রাইভিং? না, তা নয়। নানা জীবিকা নানা শ্রেণীর মানুষেরা মিলে ভাগ করে নিয়েছে। গড়ে উঠেছে বিচিত্র ও মিশ্র সমাজ। তাঁরা আর পরস্পরের প্রতি উদাসীন নন। সকলের মিলিত সমবায়ে এক মিলিত জীবন-স্রোত।

আর, তার পটভূমিকায় অরণ্য-পাহাড়। পাহাড় থেকে বেরিয়ে-আসা অসংখ্য নদী ও ঝোরা। ঝিলের সংখ্যাই বা কত কে রাখে হিসাব! ভয়ংকর এক প্রকৃতির বুকের মধ্যে মানুষজনের চিহ্ন। বাড়ি-ঘর। নতুন কালের বসতি।

তা বলে জীবন শুধু জীবিকা-সর্বস্বই নয় এখানে। আছে যেমন রুজি-রোজগার অর্থ-উপার্জনের নানা পদ্ধতি—তেমনি আছে জীবনের নানা ছন্দো-সুষমাও।

সাতদিনের ছ'টি দিন গ্যারেজ আর কর্মচারী খাটিয়ে ক্লান্ত পাঞ্জাবের গুরনাম সিং। ছুটির দিনে চলেছেন হাল্কা সবুজ রঙের নিজস্ব মনোরম "কার"-এ প্রমোদ-ভ্রমণে। অথবা চলেছেন খানিকটা প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিশ্রামের সুযোগ নিতে। রান্নাবান্না গুছিয়ে নিয়েছেন মস্ত টিফিন ক্যারিয়ারে। আছে নানারকমারী ছোলা-ভাজা ও চানাচুর। সেই সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ ও আনুষঙ্গিক আনাজ-পাতি। আচার-সম্ভারও অভাব নেই। আর আছে মূল্যবান দু'-চারটি বোতল। খাঁটি বিলিতি মাল।

কোনো সংকোচ নেই। গুরনাম সিং-এর বয়স হয়তো কিছু বেশি। তাঁর দাড়ি এরই মধ্যে শাদা, পাগড়ির জন্যে মাথার চুল দেখা যায় না, চোখে চশমা। তবু তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি। বাঁ-হাতের কব্জিতে ঘড়ি। দু'-একটি দাঁতও সোনায় বাঁধানো।

তবু বনের ভেতরে পূর্ব-নির্ধারিত কোনো সূর্যকিরণস্নাত অঞ্চলে পৌঁছে তিনি ও তাঁর দলবল নদীর ধারে পা ছড়িয়ে বসে যান। গাড়িটা অল্প দূরে দাঁড়ানো। ক্ষীমরঙ কিম্বা হাল্কা দুধে-আলতা মেশানো গাড়িটা। বেলা বাড়ে। দূরে পাহাড়। একটু আগে একেবারে নীল ছিল, এখন বেলা একটু বাড়তে-বাড়তে সে-আশ্চর্য নীলিমা খানিক পরিমাণে অপসৃত। তবু পরিবেশটি মনোরম। ঝিরঝিরে হাওয়া। স্বচ্ছন্দ জলস্রোত। জলের বেশি বেগ নেই নদীর। পাহাড়ী ছোট নদী। এখন শীত গিয়ে বসন্তকাল চলছে পৃথিবীতে। শ্যাওলা-ধরানো সবুজ পাথরকুচিগুলির ওপর দিয়ে জলের স্রোত ঝিরঝিরে। জলের রঙও সবুজ বরণ দেখতে হয়েছে। পান্নার রঙ। দেখতে কী সুন্দর!

গুরনাম সিং একা নন, তাঁর সঙ্গ দিতে ঘরণীও আছেন। ঝলমলে জামা, রঙিন পা-জামা। সিল্কের ওড়না বুকের ওপরে ছড়ানো। কর্তাটির সঙ্গে হয়তো তিনিও বসেছেন পাথরের ওপরে। ছেলেমেয়েরাও ইতস্তত। দু'-একটি কর্মচারীও আছে। চটপট খাওয়া হয়ে গেল। টিকারা, কচুরি, ঝাললঙ্কার টক, আচার, ছোলা-চানা। বিতরিত হচ্ছে সকলের পাত্রেই। লেবুর টুকরোগুলি ছড়ানো হচ্ছে। তার পরই ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়ল মুক্ত আলোয় পরিভ্রমণে। সিংসাহেব আরামে-আয়াসে বিলিতি বোতল খুলে পানপাত্র পূর্ণ করে নিচ্ছেন। খুব সুন্দর। সব স্বাভাবিক। কর্মচারিরা খাবার গুছিয়ে রাখছে। প্লেট-চামচ ধুয়ে আনছে নদীর জলে।

তারপর আরাম করে একটি সিগারেট ধরালেন গুরনাম সিং। প্রসন্ন রৌদ্রের অভাব হয়েছে ইতিমধ্যে। সমতল পৃথিবী থেকে উঁচুতে উত্তর বাংলার এ-অঞ্চলে,

এখন চলে আড্ডা-গান। খানিক মুখের জলে পা ভিজতে। ঝিরঝিরে হাওয়া। আকাশ মেঘ-মেঘ হয়ে আসছে। কোথা থেকে একরাশ এসে পড়ল মেঘ। যেন ছায়া-ছায়া বিকেল। তারপর এক সময় হয়তো বৃষ্টি এসে পড়ল। ঝিরঝিরে হাওয়ার মতই ঝিরঝিরে বৃষ্টিধারা। দেখতে দেখতে মেঘ কেটে গিয়েছে আবার। তিন কি চার মিনিটের ঘটনা। এবার বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ে।

বিকেলের দিকে সব গুছিয়ে আবার ফেরা—যাত্রা।

পিকনিক পার্টি চলেছে ছেলেদের। ট্রাক কিংবা বাস ভর্তি করে একদল ছেলে কিংবা মেয়ে। স্কুল বা কলেজ, এমন কি ক্লাবও হতে পারে। শীতের সূচনা থেকেই শুরু। সারা ডুয়ার্সে এই পিকনিক নামক মহোৎসব। ভরসা করি, প্রাচীন ভারতেও ছিল এই উৎসব। বনভোজনের তাৎপর্য তো কম নয়। প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ করা। প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে ছিল মানুষের গভীরতর সম্পর্ক। তার সঙ্গে মিলিয়ে বাঁধা হত জীবনের সুর।

এ-কালের পিকনিক কথাটি ইংরাজদের। আমার মতে ঐ শব্দটির মধ্যেই আছে এজাতীয় উৎসবের চাঞ্চল্য ও প্রাণোন্মাদনার ইঙ্গিত। সেখানেও কর্মব্যস্ত জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে আনন্দ-আস্বাদনের প্রয়োজন। আমাদের বনভোজনে মনে হয়, ভোজন কথাটিরই তাৎপর্য। আউটিং-এর নেশা বা ঝোঁকের পরিবর্তে আমাদের মধ্যে আছে বুঝে-সুঝে হিসেব করে চলার আনন্দ। যদিও শব্দটি আমরা নিয়েছি। পিকনিক কথাটি আমাদের মধ্যে চালু। কিন্তু রওনা হবার নির্দিষ্ট দিন বা তারিখের আগে হিসেব মিলিয়ে আমরা ফর্দ করতে বসি। মাছ বা মাংস কোন্‌টা হবে, অথবা দুটোই। ফাউল অথবা মটন। কত কিলো চাই। তার সঙ্গে আলু চাই। নৈনিতাল আলু হলেই ভালো। ডুয়ার্সে আবার নৈনিতাল নামে যা চলে সে আলু আর সবকিছু হতে পারে, শিলং হতে পারে, দার্জিলিং হতে পারে শুধু নৈনিতাল হতে মানা। রুই মাছ বিকল্প চলবে কিনা, মাংসখোর নন কে কে, তাঁদের হিসাবেও কিছু নিতে হয় বৈকি। নতুন ফুলকপি চাই, ডালনা হবে। আলু-বাঁধাকপি, সেই সঙ্গে শীতের কড়াইশুঁটি। বেগুনভাজা চাই না পাঁপর হবে। দই-মিষ্টি, তার সঙ্গে টমাটোর চাটনী চাই কিনা। অথবা আলুবোখরা ভালো হবে।

এইসব ফর্দ নিয়ে এন্তার মাথা ঘামানো। মত, দ্বিমত, অমত। অবশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

রওনা হওয়া। দেখবেন কারা।

গাড়ি উঠেছে ফুলে-ফেঁপে। চলমান বাস বা ট্রাকের আগে লাল শালুর মধ্যে ইস্কুল কিংবা কলেজের নাম লেখা। মাইকে বাজছে ঘন ঘন হিন্দী গান। পাড়া মাতিয়ে আকাশ মাতিয়ে, চতুর্দিক চাঞ্চল্যে ভরিয়ে চলেছে পিকনিক পার্টি। ডুয়ার্সের রাস্তায় রাস্তায় সারা শীতকালেই এই চিত্র। চলেছে পার্টিগুলি জঙ্গলের দিকে। জঙ্গল অবশ্য দুধারেই। বড় বড় গাছ। বনের অপভ্রংশ। সকালবেলা। বেলা আটটা কি ন'টা। অথবা দশটা বেলা যাত্রীদের বনভোজন উপলক্ষে একটু বেশিই বটে।

শুধু কি ছেলেরাই? না, মেয়েরাও আছে। সঙ্গে আছেন দিদিমণিরা। বসেছেন সামনের দিকে। ড্রাইভারকে নির্দেশ দেওয়া আছে।

অতঃপর লোকালয় শেষ। দূর বনের দিকে যাত্রা।

ভালো পিকনিক-স্পটের অভাব নেই ডুয়ার্সে। সারা তল্লাটেই ছড়ানো আছে তারা। নীলরঙ আকাশের তলায় ফিকে নীল পাহাড়। পাহাড়ের তলায় ঝর্ণা নামছে। পাথরে পাথরে ঘা মেরে ফেনার ফুল ছিটকে দিচ্ছে ক্রমাগত। গাছ-গাছালির ছায়া। পাখির কিচিমিচি। ছোট নদী চলেছে ঝিরঝিরিয়ে।

এমনি একটি আদর্শ ভিউ দেখতে পাবেন ভুটানঘাটে। ভুটানঘাটে পিকনিক করতে আসেন অনেকেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। মস্ত বাংলোটির সামনে বাস বা ট্রাক থামল। এবারে নামুন। সরকারী বাংলোর পাশ কাটিয়ে নেমে আসুন নদীর দিকে। সামনেই পড়েছে বিশালকায় শিমুলগাছ একটি। শিমুলফুল ফুটে আছে গোড়া গাছটিতে। অজস্র। রঙনা পাখিদের ঝাঁক ডালে ডালে দেখবার মত। সামনে সবুজ নদীর জল। বড় বড় পাথরের খণ্ডগুলি ইতস্তত। ঠাণ্ডা তুহিনস্পর্শ জল।

উনুন খোঁড়ার দরকার হয় না। তীরে কটি পাথরের টুকরো সাজিয়ে নিলেই হল। ইন্ধনের অভাব নেই চারদিকে। বনের ছায়ায় কাঠ কিছু বেশিই। এবারে আসুন চতুর্দিকটা একবার ঘুরে দেখা যাক।

এখন মধ্যাহ্ন বেলার দিকে সূর্য। গ্রামোফোন বাজছে মাইকে। এই সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে মন মিলিয়ে গানের সব উপভোগ করতে চান, রবীন্দ্রসঙ্গীতই দিন।

কোথায় যাচ্ছেন?

এই যে—ওদিকে—। একটু ঘুরে আসা।

তা আসুন। কিন্তু খুব সাবধান—

কেন, সাবধান কেন?

বুনো হাতীর প্রতাপ এদিকে খুব।

তাই নাকি!

বেশ কয়জনে জোট একটি দল মিলিয়ে যাত্রা।

হাতী?

হাতী না বাঘ—

না, হাতীই।

যদি আমরা সামনে পড়ি? ভয়ার্ত অন্য একজনের কণ্ঠ।

কী আর হবে! অন্যজনের উত্তর হাসির সঙ্গে, যমালয়ে যাত্রা।

বাঘের হাতেও নিস্তার আছে, বুনো হাতীর পাল্লায় একবার—

কথা বলতে বলতে যাওয়া। বাতাসে প্রসন্ন রৌদ্রের আমেজ। বেশ মোহময়। বনের মধ্যে কত কী পাখি ডাকছে। তবু একটু ভয় ভয় করবে আপনার। সমতল শহরবাসী মানুষ যে আপনি।

একটু যদি এগোন কমলাবন পাবেন। শুধু কমলাবন না, কমলাও পাবেন। আড়ৎ আছে ওইদিকে। সস্তায় যত খুশি খান। বাগানে গেলে ত' যত খুশি খান, কিন্তু একটিও পকেটে পুরে নিয়ে যেতে পারবেন না। দেখতে দেখতে কথাবার্তায়, চঞ্চলতার আবেগে কেটে যাবে। ফেরার পথে একটু অবশ্য শীত শীত করবে আপনার। খাওয়া হয়েছে অবেলায়। সারাদিন ঘোরাঘুরিতেই অবশ্য কাটল। বাস চলতে শুরু করেছে। দিনের আলোয় দেখা পৃথিবীটাই রাতে দেখা যাবে অন্য-রকম।

এখন যদি পড়ে একটা হাতী

পড়তেও তো পারে—

একবার পড়েছিল আমাদের—

কোথায়, কোথায়?

বাসভর্তি সব কৌতূহলী হয়ে শুনেছে। ড্রাইভার বলল, মজা কি জানেন, বুনো হাতী একবার দু'বার পড়েছে আমার সামনে। তখন আলো জ্বালিয়ে এগিয়ে চলবার কথা ভাবা যায় না। আলো নিভিয়ে ভয়ে ভয়ে দুর্গানাম করে অপেক্ষা করতে হয়—

শুধু একা ভুটানঘাট না, এমন অনেক

স্পট আছে ডুয়ার্সে। পিকনিক শুধু নয়, আউটিং-এরও একটি আদর্শ স্থান জেন্তী। আদিতে ভুটানেরই ছিল এই এলাকা। পরে অবশ্য ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধির এক চুক্তিতে জায়গাটা আসে এদিকে। ভুটানীরা অবশ্য বিনিময়ে ফিরে পেল ইংরাজদের হাতে অধিকৃত তাদের কিছু ধর্মীয় এলাকা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে জেন্তী অপূর্ব। এখানে আছে একটি রেলওয়ে স্টেশান। বনরাজ্যেরই এলাকা। তবু লোভী মানুষ লোভের হাত প্রশস্ত করেছে এখানে। চা বাগান আছে চারদিকে। কাঠের ব্যবসা আছে। বাজার আছে। যথারীতি মাড়োয়ারীরা এখানেও। জেন্তীতে আছে চুনাপাথর। ডলামাইট থেকে আসে লক্ষ লক্ষ টাকা। এগুলি থেকে সিমেণ্ট প্রস্তুতও করা হয়েছিল। স্টেশান ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে যান। জেন্তী নদীর তীরে তীরে সবুজ গাছের বন। পাথরে গাছ। নদীতে অবশ্য এখন জল নেই। কিন্তু দৃশ্য অসাধারণ।

শুধু জেন্তী অঞ্চলে না, সরকারী উদ্যানশালা এখানে অনেক অঞ্চলেই খুব ভালো ভিজিটিং সাইট করা যেতে পারে। পর্যটনের উপযোগী করে তোলা যায় সহজেই। বনজঙ্গল গাছপালা ও নানা জীবজন্তুর আকর্ষণ এখানে বিচিত্র। মদনুয়ার, হাসটুদ্যাট, জলঢাকা, জলদাপাড়া, গরুমারা, কত নাম মনে আসে। জলদাপাড়া ও গরুমারা—এ দুটিতে অবশ্য অনেক যত্নে বনাজন্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। নানা দেশ-দেশান্তর থেকে ভ্রমণকারী আকর্ষণ করছে।

ডুয়ার্সের এক আদর্শ সৌন্দর্য নিকেতন বক্সার। সে সম্পর্কে বিস্তৃত-ভাবে বলব। শুধু এইটুকু এখানে বলব, প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যে অনুপম এই স্থান।

ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলেই আছে পাব্লিক ওয়ার্কসের নানা বাংলো। সরকারী বন-বিভাগের বাংলোগুলি। সুন্দর ছবির মত বাড়িগুলি মনে অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করে। পাহাড়ী নদীর ওপরে এখানে-ওখানে ফাল্গুনে-চৈত্রে দেখতে পাবেন বনকাঞ্চনের সারি। লাল এবং সাদা ফুলের সমারোহ। সাধারণত দুরকমের কাঞ্চনই ফোটে এ সময়। মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধে চারদিক মুখর। বনকাঞ্চনের কথা ছেড়ে দিলেও ফোটে অগণিত কৃষ্ণ-চূড়া, রাধাচূড়া, গোলমোহর ও পলাশ। রাঙা আগুনের মশাল দেখে চোখ ফেরানো যায় না!

শরতের দিনে আবার অন্য চিত্র। যেদিকে তাকাও বনে-জঙ্গলে অগাধ শাদা কাশের বিস্তার। তোর্সা নদীর ধারে ধারে, তিস্তা, জলঢাকা, সংকোশের তীর-বর্তী বনে বনে, রায়ডাক-গদাধর নদীর আশেপাশে চারদিক শাদা হয়ে গেছে কাশে-কাশে। আকাশে হাল্কা পেঁজা-তুলোর মত জলহারা মেঘ।

বর্ষার ভীষণতায় আবার পাল্টে যায় ডুয়ার্স। আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি পড়ছে। দিনের পর দিন। গাছপালা বন-জঙ্গলে বাতাসের মাতামাতি। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বৃষ্টি হতে নদীগুলিতে লেগেছে উচ্ছ্বাস। বুনো নদীগুলি পাগলা মোষের মত লাফিয়ে নামছে নিচের দিকে। তীরের মাটি গেছে ক্ষয়ে। মস্ত মস্ত পাথরের চাঁই জলস্রোতে গড়িয়ে নামছে নিচের দিকে। নদীতে জল বেশি নেই, কিন্তু স্রোত তীব্র। তীরে দাঁড়িয়ে একটা কদমগাছ। ক'দিন আগে ফুটেছে রাশ রাশ ফুল। বর্ষাভেজা হাওয়ায় রেণু রেণু ঝরিয়ে দিচ্ছে কদম্বচূর্ণ। তার নিচে খানিকটা জায়গায় পাথর-বাঁধানো। উত্তাল জলস্রোতকে ঠেকাতে সরকারী এই উদ্যম। ঘোলাটে তিস্তার জলে জেগেছে উন্মাদ তরঙ্গের মাতামাতি। নদীর একূল-ওকূল দেখা যায় না। পাড় ভাঙছে তো ভাঙছেই। তোর্সার বেগবান প্রবাহ গ্রাস করে নিচ্ছে তীরের মাটি। ছবির মত জনপদ। সুপুরীবাগান, আবাদি জমি। জলঢাকার জলস্রোত পাথরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফুলে উঠছে বিপুলবিক্রমে। তীরে দাঁড়িয়ে অতি বড়ো সাহসী জংলী মোষও জল খেতে সাহস করে না। বর্ষার দিনগুলিতে কী ত্রাস! কী আতঙ্ক!

মাঝে মাঝে তবু বর্ষণক্লান্ত আকাশের প্রান্তে দেখা দেয় পূর্ণ চাঁদের আলো। ডুয়ার্সের নারকেল গাছের কচিপাতায় অথবা চালতেগাছের ঘনসংবদ্ধ বড়ো বড়ো পাতায় পাতায় চিকচিক করে চাঁদের আলো। ভেজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠে আসে! ঝিঁঝিঁর ডাক ওঠে এক-টানা সুরে। গাছ থেকে টুপটুপ করে ঝরে বৃষ্টিক্লান্ত পাতাপত্রের বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলি।

ওদিকে উঠেছে তখন মাদলের শব্দ। আদিবাসী শ্রমিকের বস্তিতে রক্তে দোলা লাগিয়ে বাজছে—দুমদুম মিঠে তালে। চা-বাগানের বস্তির ধারে ধারে শিরিষগাছ-গুলির মাথায় মাথায় ক্ষীণ চাঁদের আলো কাঁপে কখনো। মাদলের শব্দের তালে তালে বাজে বাঁশী। বাজে আদিবাসী মেয়ের রক্তধারা। সজীব নৃত্যের চলমান দীপশিখা যেন। নাচে মাজা দুলিয়ে তালে তালে। মদের তীব্র গন্ধে বাতাস মুখর হয়ে উঠেছে। দিশি মদ।

ওদিকে তুরতুরি নদীর কাঠের সাঁকোর ওপরে আকাশে উঠেছে সন্ধ্যাতারা। দূরে মহাকালগুড়ির দিকে যাবার রাস্তা। অন্ধ-কারে জ্বলে জোনাকীর আলো। এদিকে জটেশ্বরের বাজারের ধারে জমেছে শীত-দিনের যাত্রার আয়োজন। কাঁঠালগুড়ি বাগান ছাড়িয়ে বাজারের পাশে মাঠে বেদিয়াদের ছাউনিতে চলেছে রাতের রান্নার আয়োজন। ময়নাগুড়ির জর্দা নদীর পোলের ওপরে জ্বলছে বৈদ্যুতিক আলো। কী সুন্দর! কী বিচিত্র!

[ক্রমশ]

দৃষ্টিপরিক্রমা

পুলকেশ দে সরকার

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ভূমিকা ঃ

জাতীয় বিজাতীয় দলীয় মুখপত্রগুলোকে বাদ দিয়ে তিনটি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক এবং চারটি মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে কেউ যদি বাংলাসাহিত্যের নিরিখ করতে যান, তবে তা দৃষ্টিহীনদের হাতের-ছোঁয়ায় হাতীর রূপ ও আয়তন স্থির করার মতো হবে। কেন না, বাংলাসাহিত্য এদের নিয়ে এবং এদের বাইরেও। অথবা আইসবার্গ; যেটুকু দেখা যায় তা সমগ্রের ভগ্নাংশ মাত্র। কিম্বা ওটা চেতনার আভাসিত দিক, নিচে অবচেতনার রাজ্য। বা এও বলা যায়, এইটুকু সদ্য বর্তমান, পেছনে অতীতের লম্বা কিউ। চাঁদের একদিকটা সূর্যালোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার আর একটা অনালোকিত দিকও আছে, সেখানে বিজ্ঞাপনের কিরণপাত ঘটে না। তবে চন্দ্রপরিক্রমার এপোলো থাকলে অন্তরালায়িত দিকটারও খবর পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, অধিকাংশ বাংলা বইয়েরই বিজ্ঞাপন হয় না। প্রকাশকদের অব্যবসায়িক কার্পণ্য একটা নিঃসন্দেহে মুখ্য কারণ; তবু তাই একমাত্র কারণ নয়। এমনও নয় যে, সাহিত্যপদবাচ্য নয় বলে বিবর্জিত বইগুলো বিজ্ঞাপনে স্থান পায় না। তথাকথিত বটতলার ভালো ভালো দেদার বিক্রির বইও বিশেষ বিজ্ঞাপিত হয় না—যদি না বিশেষ কারণ ঘটে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতিতে অ-বিনয়ী কোন কোন রাজনৈতিক অপপ্রচারকদের অস্বস্তি সত্ত্বেও এবং আধুনিক শিক্ষায়তনগুলো থেকে অসম্মানে নির্বাসিত হওয়া সত্ত্বেও নানা সংস্করণের ও আয়তনের রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পাঁচালী, ব্রতকথা এখনও প্রচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বহু সংস্করণের ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও আধুনিক রচনা বা রাজনৈতিক 'কহানি' সেই অসীম সীমারেখার নাগাল পায় নি; আজও এসব বই জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত। পঞ্জিকায় যদি বা বছরে একবার বিজ্ঞাপন কারও কারও অনুকূলে হয়, সচরাচর বিজ্ঞাপন ছাড়াই এদের বিক্রি। দ্বিতীয়ত, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের মধ্যেও যাঁদের রচনা ক্লাসিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁদের গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীও বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা রাখে না। যেটুকু বিজ্ঞাপন হয় তা পরোক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধ কেউ কেউ নতুন করে ঘর বা আলমারী সাজাবার মতো করে ছাপছেন এবং আদৌ সুলভে নয়, মৃত্যুঘাতী মূল্যে বিক্রি করছেন। তার মধ্যে সাহিত্যসেবা ঐ আইসবার্গের চূড়াটুকু মাত্র, বাকীটুকু ম্যামনের আত্মসেবার সর্বনেশে পাহাড়। কেউ কেউ তেমনি বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী ছাপছেন ও বেচছেন ঐ একই উদ্দেশ্যে; কেন না এঁদের আকর্ষণ আজও সমাজের একটা দিককে আত্মপরিচয়ে সুস্থ রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ এখনও একটা সংস্থার একচেটিয়া কুক্ষিগত হলেও তাঁর রচনাবলীও বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা রাখে না: অবশ্য, গানে, নাচে, নাটকে, সাহিত্যালোচনায়, জন্ম-মৃত্যু-দিবস পালনে তাঁর অব্যাহত পরোক্ষ বিজ্ঞাপন অবিচ্ছিন্ন চলেছে। তবে দেখা যায়, ঐ সংস্থা-কর্তৃপক্ষ যখন খাড়াবড়িথোড় থোড়বড়িখাড়া বকমাক্ষর হারে বিজ্ঞাপন দেন বা বাজারে ছাড়েন তখন রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। আজকের যে মিনিওয়ালারা নিজেদের অগ্রদূত ভাবছেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, পকেট-গীতাঞ্জলির কথা। ফ্যাশানেবলদের ঘরে তেমনি 'বিচিত্রা'ও উঠেছে।

শরৎচন্দ্রকে কেউ কেউ হেয় ও নগণ্য করতে চাইলেও তাঁর জনপ্রিয়তা অব্যাহত এবং অসাধারণ।

তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিকও ক্লাসিক পর্যায়ে এলেন বলে। কিন্তু পুরনো লেখকদের ধরে রাখার রীতিতে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরকে কৃতিত্ব দিতেই হয়; এই মন্দিরে বহু বাংলাসাহিত্য দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এবং সুলভে সাহিত্য প্রচারে এঁরা পথিকৃৎ। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বিধান-মন্ত্রিসভার রবীন্দ্র-রচনাবলী। তৃতীয় উদ্বোধনের বিবেকানন্দ রচনাবলী। চতুর্থ প্রচেষ্টা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'ভারত-কোষ'। নইলে আর সব প্রকাশনারই মুখ্য উদ্দেশ্য মোটা মার্জিন রেখে ব্যবসায়।

সুতরাং, বাংলাসাহিত্যের যা ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত তা পড়বার জন্য হোক, ঘর সাজাবার জন্য হোক কি গবেষণার জন্য হোক তার খোঁজ নেয় যার গরজ সে। বিজ্ঞাপন যেটুকু হয় তা সংস্থাভেদে সংস্করণের প্রতিযোগিতা হেতু অথবা ভাষাসূত্রে পাঠ্যপুস্তক করার তাগিদে।

এদের বাইরেও যে বাংলাসাহিত্য আছে তা নানা কারণে বিজ্ঞাপিত হয় না। বেচতে না পেরে এক শ্রেণীর প্রকাশক আছেন যাঁরা লেখককে হেনস্থা করার জন্যই যেন বলেন ও বই অচল, বিজ্ঞাপনে পয়সা খরচ করে কি হবে? অর্থাৎ, কোন বই ভালো, কোন বই মন্দ, কোনটি চল কোনটি অচল তার রায় দেবেন প্রকাশক। এককালে কোন এক প্রকাশককে বলা হত বাংলা-সাহিত্যের ডিক্টেটর। তাঁরাও নিজের একখানা মাসিকে এবং বিনিময়ে আর একখানা মাসিকে এক পাতা করে বিজ্ঞাপন দিতেন; লোকে যেন গরজে কিনত। তবে, ১১০০ ছাপার হাজার কপি বিক্রি হলেই তাঁরা রায় দিতেন: বইটা চলে; কিন্তু সাহস করে দ্বিতীয় সংস্করণে যেতেন না। মনে হত, ঐ বই কেনবার বাজার স্যাচুরে-

শন পয়েন্টে পৌঁছে গেছে; এবার নতুন বই এবং ঐ রকম একখানি বই।

সুতরাং, আজ দরকার, বাংলাসাহিত্যের কল্যাণে নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচকের যিনি বা যাঁরা এক-শ্রেণীর প্রকাশক-প্রচারকের নীরবতার ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত করে অবিজ্ঞাপিত সাহিত্য সংবাদ পরিবেশন করবেন। স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকাশক যেখানে চান নিজের কূপে পাঠককে মণ্ডূক করে রাখতে, সেখানে এই সমালোচকের কাজ হবে পাঠকের দৃষ্টি সাগরের দিকে প্রধাবিত করা। জানি, চাটুকার-গ্রন্থকারেরা প্রকাশকের সন্তুষ্টিবিধানে এই প্রস্তাবে ঠাট্টা মসকরা করবেন; কিন্তু দারিদ্র্য ও অর্থ-প্রলোভনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতে পারেন এমন মানুষ যে চাই আজ বাংলাসাহিত্যে; আর তো বাংলাসাহিত্যের হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থা নেই। একমাত্র ভয়, এই সমালোচকের কথাও যাতে পাঠকসমাজে না পৌঁছোয় তার আয়োজন-উদ্যম হতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্য একমাত্র সান্ত্বনা যে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে সত্য-সূর্য অপ্রকাশ থাকে না।. .

আমি চেষ্টা করব প্রথমত বাংলা-সাহিত্যের বিস্তার ও গভীরতা সম্পর্কে পাঠকের চিত্তে একটা ধারণা সৃষ্টি করতে, দ্বিতীয়ত বিস্মৃত, অজ্ঞাত, অখ্যাত, অনাদৃত সাহিত্যিকদের রচনা-প্রচেষ্টা একে একে উপস্থিত করতে।

একটা মোটামুটি সমীক্ষায়ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে অল্পকালের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও প্রসার। দুশ' বছরে আমাদের সেক্সপীয়ার জন্মান নি সত্য কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথকে ধরলেও বলতে হয়, আমাদের অনেক দেনা ঘুচে গেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা তাঁর বহু লেখায় পরিষ্কার। রামমোহন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তর-বদ্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।" ·

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।...তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।

"বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।......

"আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে", রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, "বিদ্যা-সাগরের বসওয়েল কেহ ছিল না: তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সরলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বসওয়েল না থাকিলে জনসনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না।"

একটা তুলনা মনে পড়ছে : শ্রীম লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। রামকৃষ্ণানু-গত মহেন্দ্র এইরকম একটা ধারাবাহিক ডায়েরী-রিপোর্ট না রাখলে রামকৃষ্ণের অমৃত কথা বহুজনের অজ্ঞাত থেকে যেত এবং পুরুষ পরম্পরাক্রমে তা এমন স্থায়িত্বও পেত না।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য-ব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনকালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো একতারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।"...

বাংলাসাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নজর ছিল বহুদিকব্যাপ্ত। কেবল আকস্মিক রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচনায় নয় সরস হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ রচনায়ও তাঁর সমতুল লেখক দুর্লভ। বাংলাসাহিত্যের বঙ্কিম-সাম্রাজ্যে যে তিনটি অভাব লক্ষণীয় হয়ে ছিল তার অনেক পূরণ করেছেন রবীন্দ্র-নাথ স্বয়ং : কবিতা, গল্প ও নাটক। বিশ্বপ্রকৃতির বরমাল্য পেয়েছেন তিনি: তবু, তাঁর আপন সৃষ্টি সম্পর্কে অন্ধমোহ ছিল না: তিনি নিজেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে
সর্বত্রগামী।...

....

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি
থাকি তারি খোঁজে।"

তাঁর মতো দীর্ঘায়ু সচেতন স্রষ্টা যেখানে বাংলাসাহিত্যের অপরিপূর্ণতা সম্পর্কে সজাগ সেখানে আমাদের মতো সামান্য ব্যক্তিদের অচেতন থাকবার উপায় নেই। তিনি সহজপাঠ, সহজবিজ্ঞান, শিশুসাহিত্য ও ব্যাকরণে যেমন হাত দিয়েছেন, উচ্চাঙ্গ রসসাহিত্য সৃষ্টিতেও তেমনি তাঁর প্রতিভা উন্মোচন করেছেন। সুতরাং, তাঁদেরই প্রসাদে আমরাও জানি বাংলাসাহিত্যে কি নেই, কি চাই। কিন্তু যাঁরা কোনো অভিসন্ধি নিয়ে একে হীন প্রতিপন্ন করতে চান আমরা কিছুতেই তাঁদের খাতায় চাঁদা দিতে পারি নে।

আমাদের শিশুসাহিত্য আছে, কথা-সাহিত্য আছে, মহাকাব্য-কাব্য-কবিতা আছে, যাত্রা-নাটক আছে, ভ্রমণ-সাহিত্য আছে, গ্রাম্যসাহিত্য, ধর্মসাহিত্য আছে, সংবাদ-সাহিত্য আছে, খেলাধুলার সাহিত্য আছে। জানি, তা সত্ত্বেও, এর কোন্ কোন্ অঙ্গ দুর্বল : এ দুর্বল সমালোচনা-সাহিত্যে, স্বদেশী সাহিত্যে এ দীন, প্রামাণ্য বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে এর দুর্ভিক্ষা-বস্থা, বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাঁড়ার শূন্যপ্রায়, ভালো জীবনী বিরল।

জীবনী নিঃসন্দেহে কোন জাতির চরিত্র-সূচী; কিন্তু তাতে যদি প্রতারণা, আরও সঠিকভাবে, আত্মপ্রতারণা থাকে তবে তা জীবনীও নয়, কোন জাতির চরিত্র-সূচীও নয়। ও শুধু কপটাচরণের আর একটি অবলম্বন মাত্র হয়ে পড়ে। চরিত্র মানে, একান্তভাবে লাম্পট্য বা ব্রহ্মচর্যও নয়। চরিত্র মানে কোন মানুষের সামগ্রিক আচরণ, যা বহু সাধারণজনের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য, অথচ সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সাধারণের দুর্বোধ্য নয়। মানুষ কল্পিত দেবতা নয়, সে কোথাও দেবতার চাইতেও মহত্তর, কোথাও নিকৃষ্টতর জলজ্যান্ত প্রাণী। মানুষের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সাধারণের সীমা-ছাড়ানো, অ-মানুষ নয়, অমানবিক নয়।

আমাদের দেশে জীবনী-লেখার গড্ডালিকা ধারা সুস্থ নয়; সে জীবনকে সাধারণের দুরধিগম্য না করা পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই; আজন্ম দেবত্ব আরোপ ("ডেইফিকেশন") না করলে তৃপ্তি নেই, তা গ্রন্থেরও হয় না। তার শেষ ফল পুজো। পুজো-পার্বণে মানুষের সঙ্গে উদ্দিষ্ট দেবতার যে দূরত্ব, যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান এখানে তাই গড়ে ওঠে: ফলে, হিন্দুরই শুধু নয়, হিন্দুবিদ্বেষী হিন্দু কম্যুনিস্টদেরও ৩৩ কোটি দেবতার চালচিত্র অঙ্কন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন একজন হিন্দুভক্তের পক্ষে যেমন কালী-মূর্তি পায়ে মাড়ানো কঠিন, একজন কট্টর কম্যুনিস্টের পক্ষেও তেমনি স্টালিন বা মাও সে-তুঙের পটখানি পর্যন্ত পায়ে মাড়ানো দুষ্কর। কালাপাহাড়রাও চিরকাল একচক্ষু; তারা একটা (কু)সংস্কার ভাঙে

আর [illegible] অনেক হাতেও জীবনী মার খায়।

ফলে, নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনী লেখা একরকম দুঃসাধ্য ব্রতই বলা চলে। কোন কোন স্থলে বিপজ্জনকও বটে। পৃথিবীতে যতরকমের ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসী আছে তাদের মধ্যে হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বা ধর্মবিশ্বাসীদের শৈথিল্যের প্রশ্রয় অথবা ঔদার্য অনুসৃতির জন্য নির্মোহ মানুষের সৃষ্টিশীল আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেছে এবং তাঁদেরই সংক্রামতা পৃথিবীর মানুষকে আজকের মানবিক চরিত্র দিয়েছে; তাঁরা আপন ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন (চার্বাক, গৌতম বুদ্ধ, চার্লস ব্রাডলাফ!), ব্যঙ্গ পর্যন্ত করেছেন এবং বাঁধা সড়কে চলা-মানুষদের আচমকা থমকে দিয়েছেন, প্ররোচিত অনুপ্রাণিত করেছেন বিদ্রোহে। কথাসাহিত্য, চারুকলা, ভাস্কর্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং, এঁদেরও জীবন ও জীবনী সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে অসমর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত মেষশাবক-তুল্য সাধারণ মানুষের মনেও। সেখানে তাঁকে বা তাঁদের কিভাবে উপস্থিত করা যাবে?

বাংলার জীবনী-সাহিত্যে আমরা এখনও এর পুরোপুরি জবাব দিতে পারি নি, অথবা দেবার দুঃসাহস বা স্পর্ধা অর্জন করি নি। অথচ, চমৎকার একটা ধারা প্রবর্তন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণ-চরিত্রে, রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের চারিত্র্য-পূজায়। কিন্তু এঁদের ব্যাপক অনুসৃতি ঘটে নি। সাধারণভাবে মানুষে দেবত্ব আরোপের ঝোঁক কাটিয়ে উঠতে পারি নি আমরা; উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা অসাধারণ দৈবকৃপা হাতড়ে চলেছি; কারও স্বাভাবিক পতন স্খলন উত্থান উদ্যমকে চিহ্নিত করতে চাই নি। হয় পূজ্যকে দেবতা করে ছেড়েছি নয়তো কাউকে শয়তানবোধে পরিত্যাগ করেছি। এই যে সম্প্রতি আমরা এত মানুষের জন্মশতবার্ষিকী পালন করেছি এবং করে চলেছি, তাঁদের পূজো করেছি, মন্দির গড়েছি, কোটি কোটি দেবতার মতই তাঁদের আলেখ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি মানুষ বলে, আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারি নি; তাঁদের জীবন গেছে একদিকে, আমাদের জীবন চলেছে আর একদিকে।

তাই বলে বাংলা জীবনী-সাহিত্যে বৈচিত্র্য নেই, একথাও সত্য নয়। বলছি একই জাতীয় জীবনীর প্রাধান্যের কথা। সাধুসন্তের স্তবস্তুতি থেকে মানদার আত্মচরিত পর্যন্ত সবই আছে। কিন্তু সব জায়গাতেই ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে পারলে আনন্দ। আপাতত আমি আত্মচরিত নিয়ে আলোচনা করব না, কেন না, নিঃসন্দেহে [illegible] মনঃসমীক্ষার ব্যাপার। এতে সাধারণত নিন্দা-প্রশংসার আতিশয্য থাকে, স্মৃতিচারণার দরুণ তথ্যগত ত্রুটি থাকে এবং আত্মপরিচয়ের গুরুত্ববোধে অহংকার থাকে। এ নিয়ে আমি আলাদা আলোচনা করব; আপাতত আত্মজীবনী নয়, পরের লেখা জীবনী সাহিত্যের ভূমিকা-পাত।

স্তব বা স্তুতিভিত্তিক জীবনী নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল। কেন না, কাউকে তার শ্রদ্ধা থেকে বিচলিত করার উদ্যম শুধু পণ্ডশ্রম নয় নিষ্করুণও বটে। কামিনী রায় যে 'শান্ধিকী', গিরিশচন্দ্র সেন যে 'তাপমালা', হেমেন্দ্রনাথ দত্ত যে 'সাধু চতুষ্টয়', সরোজিনী দেবী যে 'আদর্শ জীবনী', কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য যে 'অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী', হরিদাস নন্দী যে 'উদ্ধারণ ঠাকুর', উপেন্দ্রকুমার দাস যে 'ভক্ত কবীর', দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে 'সাধক কমলাকান্ত'—তাদের জাত আলাদা; এর মধ্যে পড়বে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'শ্রীশ্রীললিতা সখী', দুর্গাপুরী দেবীর 'গৌরী মা', কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু', রঘুনাথ দেব কানুনগুইর 'শ্রীমৎ ঠাকুরাণী', অমরেন্দ্র-কুমার ঘোষের 'তৈলঙ্গস্বামী', বিনোদিনী মিত্রের 'শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়', নরহরি চক্রবর্তীর 'নরোত্তম বিলাস', সত্যানন্দ সরস্বতীর 'নিগমানন্দ'; এবং এমনিতর অজিতকুমার বর্ধনের 'প্রেমানন্দ মহাবাজ', সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বামাক্ষ্যাপা', দুর্গাচরণ কাব্যতীর্থের 'বালানন্দ ব্রহ্মচারী', নির্মলকমল মিত্রের 'ভক্তমাল', ব্রজমোহন দাসের 'শ্রীশ্রীগৌরগণ'; অথবা সত্যচরণ মিত্রের 'বন্ধানন্দ', হরিদাস বিদ্যারত্নের 'ভক্ত দেবীপ্রসাদ', কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারীর 'ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী', অবন্তী দেবীর 'ভক্তকবি মধুসূদন রাও' মোজাম্মেল হকের 'মহর্ষি মনসুর', স্বামী বামদেবানন্দের 'মা রাবাঙ', কমলেশ রায়ের 'মেহের বাবা', মনোমোহন নরসুন্দরের 'যোগবিনোদ মহারাজ'। হ্যাঁ, একই পর্যায়ে পড়বে কৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রীর 'রামদাস বাবাজী', বৈকুণ্ঠনাথ বসুর 'রামপ্রসাদ', স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'রামানুজ', চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'লাটু মহারাজ', বসন্তকুমার পালের 'লালন ফকির', দ্বিজদাস দত্তের 'শংকরাচার্য', বীরেশ্বর প্রামাণিকের 'শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু', নিত্যপরমানন্দ ব্রহ্মচারীর 'নিত্যগোপাল ঠাকুর', রাজবালা দেবীর 'সিদ্ধমাতা'; এমন কি, নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর 'সত্যদেব মহারাজ', মনোহর ঠাকুরের 'সদানন্দ স্বামী', বিরজাকান্ত ঘোষের 'সন্তদাস বাবাজী', ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্যের 'সারদা দেবী', হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের 'স্বামী অভেদানন্দ' স্বামী জগদীশ্বরানন্দের 'স্বামী তুরীয়ানন্দ', বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের 'স্বামী নিরাবলম্ব', মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামী নিশ্চয়ানন্দ'ও।

এই মুহূর্তে আমার জীবনী তালিকায় বিভিন্ন লোকের লেখা "হজরত মহম্মদ" বা "মহম্মদ চরিত" এবং "মাও সে-তুঙ" জীবনীও আছে। কিন্তু মানুষের মৃত্যু অবধারিত জেনেও এইসব গ্রন্থের উল্লেখেও ভয় নেই; কেন না, কোনটি কার কাছে অনুমোদিত বা অননুমোদিত জানি নে, সে দায়ও আমি নিতে চাই নে। কারও আপত্তি থাকলেও আমার তাঁকে দোষ দেবার অধিকার নেই এই কারণে যে, বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমি নিজেই স্পর্শকাতর; আমার জীবনে এই দুই ব্যক্তির স্থান এমন জায়গায় যে, তাঁদের লেশমাত্র অপযশ আমাকে পীড়িত করে; তাঁদের চিত্র বা মূর্তি নিনাশে সহিংস হবার পৌত্তলিকতা বা নিরাকারবাদ আমাকে গ্রাস করে না বটে কিন্তু এঁদের দিয়েই বুঝতে পারি যথাযথ মূল্যায়নে বাংলা জীবনী-সাহিত্য কত দুর্বল।

ভোরের বিছানা ছেড়ে সামনের বিরাট জানালার কাছে দাঁড়ায় সোমনাথ। বাঁধানো বড় রাস্তা কালো ফিতের মত মনে হচ্ছে। দু' পাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছ সারি দিয়ে সাজানো। লাল ধুলোর মাটি রাস্তার দু'পাশে। শহরের বড় হাসপাতাল সোমনাথের বাড়ির প্রায় বেশ কাছেই। একটা প্রায় ঝরঝরে এ্যাম্বুলেন্স আসছে এদিকে। সোমনাথের ভাল লাগলো না। কি রকম একটা অতৃপ্তি এবং হতাশা নিয়ে সোমনাথের ঘুম ভাঙলো। ভোরের সকালে অন্যদিন কয়েকটা পরিচিত পাখির শব্দ শোনা যায়। আজকে তারা নেই। কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে। প্রতিদিনের একটা সুন্দর পরিবেশ নেই, কেমন বিষণ্ণতা। অন্যমনস্কভাবে সোমনাথ কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করল। কপালের বলিরেখা আরো স্পষ্ট মনে হল। কিছু দূরে একটু রোদ। রোদে কিছু লোক বসে সেই রোদের উত্তাপ নেবার চেষ্টা করছে। শীতের সকালে বেশ হাওয়া দিচ্ছে। ওরা শীতে কাঁপছে, তবুও রোদের আমেজ পাবার চেষ্টা করছে। হাতে হাত ঘসে শরীর গরম করার এক অভিনব চেষ্টা ওদের। বিপরীতধর্মে যেন তার একটা প্রতিক্রিয়া। সেটারও একটা শক্তি আছে। সোমনাথের বাড়ির সামনে, আশেপাশে চারিদিকে গাছপালা এবং ঘরবাড়ি, লোকজন সবকিছু। তবু সোমনাথের মনে হল জায়গাটা কেমন নিরালা, বিষণ্ণ।

সোমনাথের সমস্ত দেহ-মন জুড়ে কেমন একটা নিস্তব্ধতা। জীবনের একটা গভীর কিছুকে হারিয়ে সেই অনুভবকে হাতড়াতে যাওয়া। সে যা হারিয়েছে আজ তাই ক্লান্ত মনে হাতড়াতে লাগলো। দূরে দেখা যাচ্ছে ফ্যাক্টরির চিমনী, উদাস চোখে তাকায় সোমনাথ। আজকে আর তাড়া নেই। অফিস দেরি হওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। আধঘণ্টা এমন কি দশ মিনিট খাবার দেরি হলে রুচিরাকে কত বকতো। সোমনাথের জীবনের বিশ্রী ফাঁকা দিকটা আজ রুচিরা জানবে। রুচিরার মিষ্টি হাসি আর থাকবে না। বাস্তবের ভীষণ আঘাত একবারে সোজা এসে রুচিরার অশক্ত শরীরটাকে কঠিনভাবে নাড়া দেবে। পৃথিবীর মাটি হাল্কা মনে হবে অথবা কিছুই ঠিক করতে পারবে না। সোমনাথ আজ অনুভব করল সত্য প্রকাশ হবেই। আজ না হলেও দু'দিন পর। রুচিরা এই ভীষণ আঘাত কেমন করে সহ্য করবে। জীবনের বাস্তব আঘাতের সঙ্গে যে চিরকাল অপরিচিত, যা কোন দিন কল্পনা করতে সে পারে নি—আজ যদি সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাহলে যে চরম আঘাত তাকে লাগবে। বিয়ের আগে সোমনাথের ভাল মাইনে দেখে বাড়ির সকলের সাথে রুচিরা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছিল!

সোমনাথ কেমন আকাশ, পাতাল ভাবতে থাকলো! শরীর এবং সমস্ত মন জুড়ে কিসের একটা ক্রিয়া সঞ্চারিত হচ্ছে। নিজের সব কৌতূহল কোথায় হারিয়ে গেল। নির্জনতা এবং একক ভাবনা সব সময় সবাইকে এক জিনিস দিতে পারে না। বরঞ্চ একাকীত্ব আরো অস্থিরতার সৃষ্টি করে। একক নির্জনতাকে আরো কাঁদবার মত মনে হয়। সূর্যোদয় দেখার জন্য কি গভীর আগ্রহ এবং অনুভূতি থাকে মানুষের কিন্তু সোমনাথ কেমন নির্জীব হয়ে বেদনার একটা ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলো মনে মনে। মনে হল, সকালের সোনালী রোদের সূর্যকে কে যেন হঠাৎ একটা কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। সকালের আকাশ সোমনাথের কাছে আরো দুঃখের মনে হল।

আধপোড়া সিগারেটটা সোমনাথের হাতে থেকেই পুড়তে থাকলো। সোমনাথ ভাবতে লাগলো, এই শীতের পর বসন্ত আসবে। মানুষকে জয় করে জীবনের নতুন অধ্যায় সূচনা করবে। তারই সংগে একাত্মবোধে সে পৃথিবীর সাথে নিজের নিবিড় নির্জনতাকে তন্ময় করে রাখছে। তার মনে হল পরিবারের পরিধিতে জীবনের সব প্রয়োজন মেটে না। প্রয়োজনের জন্যই মানুষে মানুষে সহযোগিতাকে বিস্তার করতে চাই। আত্মরক্ষার জন্য দল গঠন করতে চাই। আর্থিক অবস্থা মানুষের মেরুদণ্ড। শুধু প্রেম এবং

নীতিতে সংসার চলে না, এর আদর্শ যাই হোক না কেন, বাস্তব জগৎ কিন্তু আলাদা। সোমনাথ বড় করে নিশ্বাস ফেলল। তার মনে হল, সে দেখবে রুচিরা দিনে দিনে অসম্ভব বদলে যাবে। ভালবাসার নিচে বিরাট কালো দাগ পড়বে; সুন্দর জীবন এবং তার কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হবে। দৈন্যের নিথর হাত—আলোর দিকে ছড়াতে গিয়ে নিজেই কেমন গুটিয়ে ফেলবে। স্বাভাবিক জীবনের মূল্যায়ন ছেঁড়া পাতার মত কুটো কুটো হয়ে যাবে। আরো কত ভাবনা সোমনাথকে সাঁড়াশির মত চেপে ধরছে। নিজেকে সে কেমন ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো।

একটা ফাঁকা রিক্সা সোমনাথের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। খাপছাড়া মনে হল। যেমন পাখির খাঁচায় পাখি নেই। সোমনাথ অশোভন কিছু ভাবছে তাও নয়। ক্ষোভের তাত লাগছিল তার মনে। আজ স্বাধীনভাবে উপভোগ করার কিছুই নেই তার। মন মরে গেছে। মানুষের সবকিছু সব সময় ঘটে না সোমনাথ জানে। তার জন্য তার দুঃখ বা অনুতাপ নেই। শুধু অনুযোগ আছে। রক্তমাংসে সম্পূর্ণ বাস্তব মানুষ প্রয়োজনের সব পূরণ করতে পারে না। মিলি, তার পোষা কুকুরটা, কাছে এসে কত নির্ভরতার সঙ্গে বসলো। হাই তুললো—তার মধ্যে কুকুরের নিজস্বতা রয়েছে। কোন ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই। বর্তমানই তার সব।

কিন্তু মানসিক আচ্ছন্নতা পেয়ে বসেছে সোমনাথকে। সবই কেমন এলোমেলো। তার জীবনের শূন্য দিকটা শূন্যতা থেকে যেদিকে এগোতে চেয়েছিল, সেদিকে এগোতে পারে নি। কে যেন ভবিষ্যতে তাকাবার মুহূর্তেই সারা চোখে মুখে একগাদা ধুলো ঢেলে দিয়েছে। তাই তার তাকাবার সম্বল নেই; অস্থির—অদ্ভুত, একটা ভাবনা কেমন অতীতের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এক রকম অনুপ্রবেশের মত। এটা স্বাভাবিক নয়। যা হবার কথা ছিল হয় নি। বরং উল্টো কিছু, যা প্রকাশ করা যায় না অথচ কালক্রমে প্রকাশিত হবে। সাঁওতাল মেয়েরা শহরে পণ্য নিয়ে যাচ্ছে খুশি মনে। তাজা সবুজ পণ্য তাদের সুন্দর এবং সুখী করে রেখেছে। সোমানাথের মনে হল, এরা বোধ হয় দুঃখ-আনন্দের কথা ভাবে না; যা আছে তাতেই তাদের আনন্দ। অতীতের সোমনাথের ওপর আজকের সোমনাথের রাগ হচ্ছে। মানুষের জীবনের চরম মুহূর্তের সময় সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজের পরিকল্পিত বিষয়কে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হয় অথবা হঠাৎ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে মানুষ তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। আজকে যেন সোমনাথের জীবনে সে সংঘাত-বিপর্যয় আরম্ভ হয়ে গেছে। আজ তাকে একটা কঠিন কিছু ভাবতে হবে। শুধু ভাবতে নয়, তাকে দেখতে হবে যেমন করেই হোক, তাদের জীবনকে পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর করতে হবে। দুটো দমকলের লাল গাড়ি ভীষণ শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কোথাও সম্ভবত আগুন লেগেছে। এরা আগুন নেভাতে চলেছে।

সোমনাথের মনে হল কার ঘরে আগুন লাগলো? তার নিজেকে রাস্তার মানুষ ভাবতে ইচ্ছে হল। এখন তার রাস্তাই ভাল। সেখানে নিরাপত্তা বেশি। এখানে কালকের দুঃখ এবং বেদনা আজকের আনন্দ। মাস শেষ হলে বাড়িওয়ালা আসবে, বাড়ি ভাড়ার রসিদ এগিয়ে দেবে। ভাড়া দিয়ে দিতে হবে। এ অবস্থায় এতগুলো টাকা দিতে হাতটা একবার কাঁপবে, কিন্তু উপায় নেই। সম্মান আত্মমর্যাদা আশ্রয় সবকিছু ওর সঙ্গে জড়িত। টাকার জন্য একই সঙ্গে আসবে ফলওয়ালা, দুধওয়ালা এবং মুদি। বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।......দমকলের ঘণ্টার শব্দ ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে সোমনাথকে।

রুচিরা গতকাল হাসপাতালে গেছে। সোমনাথ রাতে খবর নিয়েছিল,—তার মুখের অবস্থা দেখে ডাঃ লাহিড়ী বলেছিলেন, "কোন ভাবনা নেই—বাড়ি যান।" সোমনাথের মনের অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়েছিল—তার নবাগত বংশধরের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। হাজার লক্ষ মানুষ কেমন করে বাঁচে! সোমনাথ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আগে সময় কত ছোট ছিল। কিন্তু আজকের বা আগামীকালের সময় কত দীর্ঘ। এ ধরনের ভাবনার মাঝে শুধু শূন্যতা। সবুজ ঘাসের লন এবং পার্ক, যতকিছু চোখে পড়ল সোমনাথের, সব ফাঁকা লাগলো। তার চোখের সামনে পরাজয়ের ছবি। কিন্তু পরাজয়কে সহজ মনে মেনে নিতে পারছে না সে। ভাবছিল আর বোধহয় পারব না ওদের আড়াল করে রাখতে আমার থেকে; ওরা যে আমার মধ্যেই। তাই বাইরের সব বিপর্যয় এবং দুঃখ রুচিরা, আমার বংশধরকে লাগবে, এ যে নিদারুণ দুঃখের। এ অনুভব করা অসম্ভব। তাদের রক্তবিন্দু দিয়ে গড়া শিশুটা পিতার অক্ষমতার জন্যে কষ্ট পাবে। তার ফলে রুচিরার যা কষ্ট হবে তারও বেশি দুঃখ হবে সোমনাথের নিজের।

প্রাচুর্যের নেশায় আর কোনদিক দেখার সময় ছিল না সোমনাথের। আজ কোথায় সে। আজ যেন বিক্ষত জীবনের ক্ষুধিত আগুন তাকে পুড়িয়ে মারছে। সে আজ কুঁকড়ে যাচ্ছে। আজকের এই গভীর শূন্যতাবোধ আসছে দিনে হবে দুঃখের, আরো বেদনার। সোমনাথের প্রথম নবজাতক আসছে তার দুঃখের ভার নিতে।

সোমনাথের চা দিয়ে গেছে। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কখন। একটা নীল মোটা মাছি কাপে পড়ে ভাসছে। আরো কতকগুলো থিকথিক করছে ঠোঁট চুমুক দেওয়ার জায়গায় ডিসে। ঐ [illegible] চা, ভ্রষ্টসমস্ত, ও মাঝখানের [illegible] অপমৃত্যুর দিকে তাকিয়ে সোমনাথ রুচিরার কথা ভাবলো। অথচ এখন সমগ্রও তাকে ভবিষ্যৎ, উন্নতি এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, জীবিকার কথা ভাবতে হচ্ছে। জীবনে নিরাপত্তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সকালের রোদ অনেকখানি গড়িয়ে গেছে।

সেই ভোরের অ্যাম্বুলেন্সটা বাজে শব্দ করে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছে। সোমনাথের মনে পড়ে রুচিরা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে একা। কষ্ট পাচ্ছে। সোমনাথ-এর চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাসপাতাল, ওষুধের গন্ধ আর শরীরে ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা। একজন ডাক্তারের হাত থেকে যেন অপারেশন নাইফ পড়ে গেল নিরেট মেঝেয়। মেঝের সিমেণ্ট চটে যাওয়ার পর সেখানে গর্ত। যেন মানুষ পড়ে যাচ্ছে নিচে। সোমনাথের ছেলে তাকে গ্রাম্য প্রাচীন ধর্মীয় নাচের মুখোশ পরে ভয় দেখাচ্ছে। সোমনাথ হাসার চেষ্টা করল। তার হাসি কেমন ফেকাসে লাগলো।

লোকায়ত দর্শন : প্রথম খণ্ড॥ লেখক : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়॥ প্রকাশক : নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা॥ মূল্য পনের টাকা॥

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে বারো বছর আগে এবং তা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদগ্ধ মহলে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। এক যুগ পরে লোকায়ত দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণটি যখন আমাদের হাতে পৌঁছাল, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে, প্রথম সংস্করণের বিষয়বস্তুর সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়বস্তুর সাদৃশ খুব অল্পই, বরং এটিকে একটি ভিন্ন গ্রন্থই বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তনের কৈফিয়ৎস্বরূপ লেখক বলেছেন যে, প্রথম সংস্করণের গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকায়ত মতের উৎস সন্ধান এবং লোকায়ত মতের স্বরূপ নির্ণয়। কেন না ভারতীয় সাহিত্যে লোকায়ত সংক্রান্ত সাক্ষ্য প্রধানত দু রকম।—এক জাতীয় সাক্ষ্য অনুসারে লোকায়ত বলতে বোঝাত একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক মত, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভূতবাদ, দেহাত্মবাদ, প্রত্যক্ষ-প্রধানবাদ, স্বভাববাদ এবং পরলোক বিলোপবাদ। দ্বিতীয় ধরণের সাক্ষ্য অনুযায়ী লোকায়ত বলতে কোন বিশুদ্ধ দার্শনিক মত বোঝায় না, পক্ষান্তরে নামটি সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত কোন এক প্রকার সাধনপদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেয়, যা আউল-বাউল - সহজিয়া - কাপালিক - তান্ত্রিক প্রভৃতি নামের আড়ালে আমাদের দেশে টিকে আছে। এই দ্বিবিধ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই দেবীপ্রসাদবাবু লোকায়তের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিলেন বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে। সেখানে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল, তাকে 'তুলনামূলক প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পদ্ধতি' আখ্যা দেওয়া যায়। নৃতত্ত্ববিদরা একপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান উর্বরতামূলক যাদু অনুষ্ঠান আখ্যা দিয়ে থাকেন, যার নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রচুর। এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের পিছনে যে বিশ্বাসটি কার্যকর থাকে তার মূল কথা হচ্ছে এই যে, মানবীয় প্রজনন ও প্রাকৃতিক উৎপাদন একই সূত্রে বাঁধা, একটির সংস্পর্শে যা অনুকরণে অপরটিও আয়ত্তাধীন হয়। লোকায়ত নামের আড়ালে যে সকল প্রাচীন সাধনপদ্ধতি আজও টিকে আছে, তাদের ধ্যান-ধারণায় দেহাতিরিক্ত আত্মার কোন কল্পনা একান্তভাবেই অনুপস্থিত, পক্ষান্তরে এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানবদেহের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমন তন্ত্রসাধনায় দেহতত্ত্ব ও কায়াসাধনার অপরিসীম প্রভাব, 'যা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' এই পর্যায়ের বিশ্বাসে দেহাতিরিক্ত আত্মার স্থান নেই, পুরুষার্থ হিসাবে আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ উল্লিখিত নয়।

বস্তুত লোকায়ত বলতে শুধু যে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক মতই বোঝাত না, অধিকন্তু একটি বিশেষ ধরণের সাধনপদ্ধতিও এই নামের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, এ সিদ্ধান্তে আসতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কোন অসুবিধাই হয় নি এবং সেই কারণেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, লোকায়ত-মত আজও আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয় নি, সহজিয়া কাপালিক প্রভৃতি নামের আড়ালে তা আজও আমাদের মধ্যে টিকে আছে, কিন্তু বিষয়টিকে তিনি শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে গেছেন এবং দেবীপ্রসাদবাবুর কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি লোকায়ত সাধনার প্রচলিত অঙ্গগুলিকে অবলম্বন করেই লোকায়তের দার্শনিক দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। দার্শনিক লোকায়ত বলতে আমরা যা বুঝি, তা কয়েকটি নেতিমূলক বিবৃতি বা বিভিন্ন দার্শনিকগোষ্ঠীর রচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। লোকায়তিকদের নিজস্ব কোন রচনা না থাকার জন্য পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণিত লোকায়তকে লোকায়তের বিকৃতি হিসাবেই গণ্য করা উচিত। কোন একটি মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় দার্শনিকেরা প্রথমে মতটির পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই পরিচয়কে পূর্বপক্ষ বলা হয় এবং এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতীয় দার্শনিকরা পূর্বপক্ষ বর্ণনাকে বিশেষ পল্লবিত ও বিকৃত করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, শংকর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তাঁর প্রতিপক্ষ বিভিন্ন দার্শনিক মতকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে যেভাবে নিজের গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন তা দেখে মনে হয় যে, নিজ বক্তব্য প্রতিপাদনের স্বার্থে অপরাপর মতবাদসমূহকে তিনি স্বেচ্ছায় বিকৃত করেছেন, কাজেই পূর্বপক্ষ হিসাবে বর্ণিত কোন দর্শনকেই তার সঠিকরূপে আশা করাটাই অন্যায়। অনুরূপভাবে লোকায়ত দর্শনও বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, বৌদ্ধ-গ্রন্থ দীর্ঘ নিকায়ের শ্রামণ্যফলসূত্রে ও জায়াসিসূত্রান্তে, হরিভদ্র সূরির ষড়দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থে, শান্ত রক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে, কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে, সদানন্দ যতির অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে, মাধবাচার্যের দর্শন সংগ্রহে ও নানা লেখকের আরও নানা গ্রন্থে। কিন্তু, বলাই বাহুল্য চার্বাক, লোকায়ত ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে যে মতবাদগুলি এই সকল গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি বিকৃত ও পল্লবিত, কাজেই লোকায়ত দর্শনের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রধানতম সমস্যা হল ওই দর্শনের সত্যকারের স্বরূপ নির্ণয়। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, অনিবার্যভাবেই এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে লোকায়ত দর্শন কাদের দর্শন? ভারতে প্রচলিত অজস্র গুহ্য সাধনপদ্ধতি ও দেহাত্মবাদী আচার অনুষ্ঠানের কোনগুলি লোকায়ত দর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত? ভারতীয় জনসমাজের কোন কোন অংশে লোকায়তাশ্রয়ী সাধনা ও আচারসমূহ বিকশিত ও বিবর্ধিত হয়েছিল? যে সকল সমাজে লোকায়ত আদর্শসমূহের বিকাশ ঘটেছিল সেইগুলির সঙ্গে তৎকালীন উৎপাদিকা শক্তিসমূহের সম্পর্ক কি ছিল?

প্রথম সংস্করণের লোকায়ত দর্শন গ্রন্থে দেবীপ্রসাদবাবু এই প্রশ্নগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করেছিলেন নানা সূত্র অনুসরণ করে। অবশ্য পূর্বে যে এই বিষয়ে কিছু রচিত হয় নি তা নয়। ইউরোপীয় বহু পণ্ডিত বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮১ বঙ্গাব্দে চার্বাকদর্শনের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন; পরে বিধুশেখর শাস্ত্রী, দক্ষি-

[illegible] শাস্ত্রী, [illegible] [illegible]-সুজন শাস্ত্রী প্রমুখ লেখকরাও চার্বাক-দর্শনের ওপর আলোচনা করেছেন; রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ দর্শনের ইতিহাসকারদের গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা লোকায়ত চার্বাক ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের রচনার চরম ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এঁরা লোকায়ত দর্শনকে তার সামাজিক প্রচ্ছদপটে দেখতে চেষ্টা করেন নি বা রাজী হন নি। এঁরা মাধবাচার্য যে ভঙ্গিতে তাঁর সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে চার্বাকদর্শন বর্ণনা করেছিলেন তারই অনুসরণ করেছেন, অপর সমস্ত দিক উপেক্ষা করে, কাজেই পাণ্ডিত্য ও শ্রমশীলতা সত্ত্বেও লোকায়ত দর্শনের স্বরূপ নির্ণয় ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। চার্বাকদর্শন, লোকায়ত প্রভৃতি বলতে এঁরা যা বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন তা সংক্ষেপে এই ঃ বৃহস্পতিকে চার্বাকমতের আদি প্রবর্তক বলা হয়, কিন্তু এই বৃহস্পতি প্রণীত চার্বাকমতের কোন সূত্রগ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নি। চার্বাকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এক দল কেবল বিতণ্ডাই করতেন, পরমত খণ্ডন করাই যাঁদের পেশা ছিল। এই সম্প্রদায়ের চার্বাকগণই নাস্তিক, বৈতণ্ডিক, হৈতুক, লোকায়ত প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। আর এক দলকে বলা হত ধূর্ত চার্বাক যাঁরা কেবল প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অনুমানাদি যাঁদের মতে প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না। তৃতীয় দলটিকে বলা হয় সুশিক্ষিত চার্বাক যাঁরা ব্যবহারিক কারণে অনুমান ও কার্যকারণ সম্পর্কে কিছুটা ভূমিকা স্বীকার করেন। চার্বাকমতের মূল কথা হচ্ছে মানুষ কেবল স্বভাবের অধীন। স্বভাবত সর্বমিদং প্রবৃত্তম। দেহাতিরিক্ত অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষ নয়। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। অনুমান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ করতে গেলে অনবস্থা দোষ দুর্বার হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সকল প্রমাণই অসিদ্ধ হওয়াতে অনুমানাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, পরলোক, দেহাতিরিক্ত আত্মা ইত্যাদি শশশৃঙ্গাদিবৎ অবাস্তব। ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণেই জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি। কামই প্রাণিগণের সৃষ্টির কারণ। স্বভাবই একমাত্র নিয়ন্তা।

কিন্তু দেবীপ্রসাদবাবুর কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি সুস্পষ্টভাবে এটুকু উপলব্ধি করেছেন যে, বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে লোকায়ত মতের যে সব উল্লেখ আছে সেগুলিকে একত্র করে একটা কিছু খাড়া করলেই লোকায়ত দর্শনের পুনর্গঠন করা যায় না। ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে লোকায়তের সম্পর্ক কি সেটাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে বিচার করা দরকার। আগেই বলেছি, যে কোন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে লোকায়ত-চার্বাক-নাস্তিকাদি মতবাদসমূহের কয়েকটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, এই সকল মতবাদ ভারতবর্ষে কোন দিনই জনপ্রিয় ছিল না। এই বক্তব্য যেন স্বতঃসিদ্ধ, কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবু তাঁরা দয়া করে যেটুকু প্রমাণ দেন তা হচ্ছে এই যে, প্রথমত লোকায়ত-চার্বাক ইত্যাদির কোন মৌলিক রচনা নেই এবং বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের যে উল্লেখ আছে তা একান্তই নগণ্য। যাকে হিসাবের মধ্যে ধরাই উচিত নয়; এবং তাঁদের দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, ভারতীয় জীবনধারা মূলত আধ্যাত্মিক, এখানে বেদ-বিরোধী, ঈশ্বর-বিরোধী বস্তুতন্ত্রের কোন স্থান নেই। ভারতবাসী চিরকালই দেহের চেয়ে আত্মাকে, ভোগের চেয়ে ত্যাগকে, অর্থের চেয়ে পরমার্থকে বড় করে দেখেছে। কিন্তু যাঁরা বলেন যে, যেহেতু লোকায়ত-চার্বাক ইত্যাদির কোন নিজস্ব পুঁথি নেই এবং যেহেতু বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে তাদের উল্লেখ নগণ্য, অতএব তারা জনপ্রিয় ছিল না, জনজীবনে তাদের কোন প্রভাব ছিল না, সেই সকল পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে আমাদের জিজ্ঞাস্য ঃ লোকায়ত যদি এত নগণ্য বস্তুই হবে তাহলে এই সকল মতবাদ খণ্ডনের ক্ষেত্রেই বা প্রাচীন লেখকদের এত উৎসাহ কেন? বয়সের বিচারে লোকায়ত যে-কোন দর্শনের চেয়ে প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে। স্বয়ং পাণিনি (খৃস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতক) এবং পাতঞ্জলি লৌকায়তিকদের উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ লোকায়ত পাণিনি-পূর্ববর্তী। প্রাচীন পালি সাহিত্যের অংগুত্তরণিকায়, কুটদন্তসুত্ত, অশ্বলায়নসুত্ত, অম্বঠঠ-সুত্ত, মিলিন্দপঞ্‌হো প্রভৃতি গ্রন্থের মতে লোকায়ত হল শাস্ত্র-বিশেষ। বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গে বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুদের লোকায়ত শাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করতে নিষেধ করেছেন। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক গ্রন্থে বলা হয়েছে কোন বোধিসত্ত্বের পক্ষে এই শাস্ত্রে মনোনিবেশ করা বিধেয় নয়। কিন্তু এই লোকায়াত-বিরোধিতার হেতু কি? শুধু বৌদ্ধশাস্ত্রেই নয়, অপরাপর ভারতীয় দর্শনের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই লোকায়ত-বিরোধিতা সুস্পষ্টরূপে প্রকট। চতুর্দশ শতকের লেখক মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের সূচনাই করেছেন চার্বাকমত খণ্ডন দিয়ে এবং তা করতে গিয়ে তিনি এক-জায়গায় বলেই ফেলেছেন দুরুচ্ছেদং হি চার্বকস্য চেষ্টিতম্‌, অর্থাৎ চার্বাক-মত খণ্ডন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। জনজীবনে সত্যকার কোন প্রভাব না থাকলে একটানা দেড় হাজার বছর ধরে লোকায়ত খণ্ডনের এই প্রয়াস কেন?

লোকায়তকে যাঁরা আমল দিতে চান না, তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে, ভারতীয় জীবনবোধমূলক আধ্যাত্মিক, সরল জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তাই ভারতীয় জনসমাজের চিরন্তন আদর্শ। এঁরা ভুলে যান, বাৎস্যায়নের কামসূত্র এদেশেই রচিত। তা ছাড়া ভারতীয় জনসমাজ নামক ধারণাটিও অস্পষ্ট। আজকের যুগের গ্রাম ও নগরের পার্থক্য প্রাচীন যুগের ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। যে ধর্মসংগত গ্রাম্যজীবনের মহিমা কীর্তনে বৌধায়ন গদগদ হয়েছেন সে জীবন-যাত্রার মান ছিল "পুলাকাযুক্ত ধান্য ও জীর্ণ পরিচ্ছদ"। পক্ষান্তরে নিছক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যেটুকু উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করতে পারে, তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল উচ্ছৃংখল নাগরিক জীবন, কামসূত্রে যাদের জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা বেলা দশটায় ঘুম থেকে উঠত, ভূরিভোজন করত, বিচিত্র অঙ্গসজ্জা করত, সন্ধ্যার পর মদে ঢুলুঢুলু চোখে অস্থানে-কুস্থানে গমন করত। কামসূত্র ঐতিহ্যের প্রবক্তা ঈশ্বর দত্ত বলেছেন, কিয়ৎক্ষণ গ্রামে বাস করলেও বুদ্ধি ও মনের সর্বনাশ। কিন্তু যারা গ্রামে বাস করত, শ্রেণী হিসাবে তারা নিপীড়িত শ্রেণী হলেও, তারা ছিল বহুধা-বিভক্ত। ভারতীয় গ্রামীণ জনসমাজ যুগের পর যুগ ধরে গড়ে উঠেছে, ট্রাইবাল উপাদানসমূহকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করে এবং এই পদ্ধতি চলেছে মাত্র সেদিনও। আশে-পাশে ছড়িয়ে থাকা ট্রাইবাল সমাজগুলি বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কাঠামোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং কোন-না-কোন পেশার ভিত্তিতে তাদের সমাজের নিম্নবর্গে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে ছোট জাত হিসাবে স্থান পেলেও তাদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জীবনের প্রাক-বিভক্ত সংস্কৃতির স্মারক-গুলি একেবারেই বিলুপ্ত হয় নি, বা সেগুলিকে বিলুপ্ত করে দেওয়াও যায় নি। কাজেই লোকায়ত মতের উৎস সন্ধানে দেবীপ্রসাদবাবুকে এই সকল ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে হয়েছে এবং এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই, ইতিপূর্বে কোন দর্শনের ইতিহাসকার এত বিস্তৃত সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রচ্ছদপটে বিভিন্ন ভাবধারার ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন নি।

দেবীপ্রসাদবাবু মার্কসীয় ভাব-

ধারায় বিশ্বাসী বা অনুগামী রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রত্যয়সমূহ, শিল্প ও সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন যুগের এগুলির প্রত্যেকটিকে বিচার করতে হবে সামগ্রিকভাবে এবং তৎকালীন উৎপাদনব্যবস্থা এবং শ্রেণী সম্পর্কের নিরিখে, কেন না, শেষোক্ত বিষয়গুলি পূর্বোক্ত বিষয়গুলিকে নির্ধারিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি লোকায়ত দর্শনকে উপযুক্ত পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে ভারততত্ত্বের বহু খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সমস্যাকে একসূত্রে গ্রথিত করে একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও সমাধান দিতে পেরেছেন। কিন্তু এখানেই তিনি থেমে যান নি, বরং দ্বিতীয় সংস্করণের বর্তমান এই গ্রন্থে তিনি আরও একটি প্রশ্ন নতুন করে তুলেছেন : পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদের (অর্থাৎ লোকায়ত ইত্যাদির মতে যেখানে দেহাতিরিক্ত আত্মার কোন স্থান নেই) তাৎপর্য ব্যাখ্যার পর, লোকায়ত বিরোধীরা যেভাবে দেহাত্মবাদকে বিচারমূলকভাবে বর্জনের প্রস্তাব করেছেন, আধুনিক গবেষকের বিচারেও কি সেই বর্জনের সার্থকতা সত্যই চরম বা ঐকান্তিক বলেই স্বীকারযোগ্য? অর্থাৎ লোকায়ত-বিরোধীরা কি সত্যই দেহাত্মবাদকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে অবধারিতভাবেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করতে পেরেছেন? এই মূল্যায়নের প্রয়াস ব্যতিরেকে লোকায়ত দর্শনের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। শুধু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের ক্ষেত্রেই নয় জগতের সর্বত্রই দর্শনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দেহাত্মবাদ গ্রহণ-বর্জন সংক্রান্ত সমস্যা, বস্তুবাদ বনাম ভাববাদের সমস্যা, ভূতপদার্থ বনাম চৈতন্যের অগ্রাধিকারের সমস্যা। বস্তুবাদীদের মতে ভূতপদার্থ অর্থাৎ বস্তু থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে ভাববাদীদের মধ্যে চৈতন্যই একমাত্র সত্তা, ভূতপদার্থ আসলে অলীক নতুবা পরব্রহ্মস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যেরই এক প্রকার বিকাশমাত্র। বস্তুর চেয়ে বস্তুর ধারণাটাই সত্য। ভারতীয় দর্শনের স্বনামধন্য ইতিহাসকারেরা, যেমন রাধাকৃষ্ণন প্রমুখেরা ধরেই নিয়েছেন আত্মবাদী বা অধ্যাত্মবাদীদের বিচারে দেহাত্মবাদ তথা বস্তুবাদ সন্দেহাতীতভাবে খণ্ডিত হয়ে গেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু দেবীপ্রসাদবাবু বর্তমান গ্রন্থে সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, দেহাত্মবাদ খণ্ডনের বিবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও বস্তুতপক্ষে বিরোধী দার্শনিকেরা দেহাত্মবাদ নস্যাৎ করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে এই দেহাত্মবাদের মধ্যেই পরবর্তীকালের উন্নততর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়, যে জ্ঞান লাভের পথে দেহাত্মবাদ-বিরোধীরা বস্তুতপক্ষে বহুবিধ কঠিন অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে অধ্যাত্মবাদীরা যা প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রমাণাভাস মাত্র। সেগুলির দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না! অধ্যাত্মবাদীদের বহু যুক্তিবিন্যাসও যদি দেহাত্মবাদ খণ্ডনের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদের পরাজয় সত্যই ঘটে নি এবং বস্তুবাদ বনাম ভাববাদের সংঘর্ষ যতই প্রাচীনকালের পরিচায়ক হোক না, আধুনিককালেও মূল সমস্যাটির গুরুত্ব অক্ষুন্ন রয়েছে। এ ছাড়া দেবীপ্রসাদবাবু আরও দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের সমর্থক বলতে শুধুমাত্র লোকায়ত সম্প্রদায়ই নয়, সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের নানা অবান্তর প্রতিবাদ বিষয় বিচারমূলকভাবে বর্জন করলে দেখা যায় যে, এই দুটি সম্প্রদায়ের দার্শনিক সারাংশও প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদেরই পরিচায়ক। অবশ্য এই বিষয়টি বর্তমান সংস্করণের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয় নি, দ্বিতীয় খণ্ডের যে সংক্ষিপ্ত সূচী বর্তমান গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তাতে এই বিষয়টি স্থান পেয়েছে, যা আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে। আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি যে, দ্বিতীয় সংস্করণের 'লোকায়ত দর্শন' প্রথম সংস্করণের মতই পাঠকবর্গ কর্তৃক সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে।

OCCUPATIONAL MOBILITY AND CASTE STRUCTURE IN BENGAL : By P. K. Bhowmick, D.Phil. D.Sc. Indian Publications. Calcutta 1. Price : Rs. 15/-.

পৃথিবীর সর্বত্রই বোধকরি সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে প্রধানত স্থানীয় ব্যক্তিদের কুলকর্মের দ্বারা। যেমন—চর্মকারের চর্মের কাজ, পটুয়ার পটের কাজ, তাঁতশিল্পীর তাঁতের কাজ ইত্যাদি। কোথাও কুলকর্মের দ্বারা বৃত্তি গড়ে উঠেছে, কোথাও বা বৃত্তির দ্বারা কুলকর্ম নির্ধারিত হয়েছে বা হয়ে থাকে। সমাজের সঞ্চালিত সম্মেলন ঘটে হাটে বা বাজারে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দিয়ে দেখা যায়—এই হাট বা বাজারই হচ্ছে একটি বড় রকমের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র—যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তির দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের মানুষ শ্রেণীবিভক্তভাবে এসে মিলিত হয় এবং পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা একে অপরের মনের কাছাকাছি আসে। কিন্তু কালের পরিবর্তনে এবং অর্থনৈতিক চাপে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অনেকে স্বকীয় বৃত্তি পরিহার করে ভিন্নতর বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন অনেক পুরোহিত যজমানী বৃত্তি ছেড়ে সওদাগরী অফিসে ঢুকেছেন, চর্মকার-পটুয়া বা তাঁতীরা নিজেদের আর্থিক অনটনের ফলে সাধ্যমতো অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। এ ধরনের বহু উদাহরণই রয়েছে। ফলে সাংস্কৃতিক অপকর্ষ ঘটছে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে শিল্পের ক্রমিক ধারা নষ্ট হচ্ছে। তেমনি নষ্ট হচ্ছে বর্ণগত ঐতিহ্য। যাঁরা এই জাতীয় বর্ণগত বৃত্তি নিয়ে 'মার্কেট রিসার্চ' করেন, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ডক্টর ভৌমিক তাঁদের মধ্যে বিশেষতম একজন। তিনি তাঁর আলোচনায় প্রধানত সিলদা ও বেলপাহাড়ী মার্কেটকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি তাঁর গৃহীত বিষয়কে বিস্তারিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এমন একটি বিরল বিষয়ের আলোচনার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের দীর্ঘ আলোচিত ভূমিকায় গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ভূমিকাটির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। আশা করবো, ডক্টর ভৌমিক এই জাতীয় আরও গ্রন্থ প্রণয়ন করে সমাজের একটি বিশেষ দিককে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে তুলে ধরবেন।

মুহূর্ত : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সম্পাদক—মানব পাল। ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : ২৫ পয়সা।

'মুহূর্ত' বাংলা মিনি পত্রিকার তালিকায় একটি নতুন সংযোজন। এই সংখ্যার কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীদিনেশ দাসের 'ষষ্ঠ আঙুল' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমণীন্দ্র রায়ের 'উদ্ধত শিমুল' কবিতাটিতে রয়েছে কবির সংগ্রামী মনের এক সুন্দর ছবি। কলকাতা প্রসঙ্গে একজন লিখেছেন 'কলকাতাকে ভাল না বেসে পারা যায় না।' এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে। লেখক কলকাতার যে রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হল, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বরেণ্য নাগরিকের গরিমায় গরীয়ান এক কলকাতা। কিন্তু তাই কি কলকাতার সামগ্রিক পরিচয়?

পঞ্চাশের মতন। সাত্যকার দর্শনধারী চেহারা, সুগঠিত শরীর, চুলগুলোতে অল্প পাক ধরেছে। চোখে এবং মুখভাবে একটা বিষাদের ছায়া। তাঁর বিশেষত্ব ছিল, তিনি কখনও হাসতেন না। হঠাৎ হাসি এলে তখনই নিজেকে সামলে নিতেন। সংলাপের ভাষা নিয়ে আমাদের মুস্কিল বাধলো। স্ট্রিণ্ডবার্গ ইংরাজী জানেন না, আমাদেরও সুইডিস ভাষা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না—সুতরাং আলোচনা চালাতে হলো ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায়—বাকীটা প্যান্টোমাইম করে সারতে হোল। এই স্ট্রিণ্ডবার্গের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে ইবসেন বলেছিলেন—"Here is one that is greater than I."

নাট্য রচনা ছাড়াও স্ট্রিণ্ডবার্গ ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। অন্তর থেকে সঙ্গীত ভালোবাসতেন এবং পিয়ানোবাদক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তিনি আমাদের কয়েকটি মেলোডি দেখালেন—এগুলিকে একটি নাটকের সঙ্গে সংযোজিত করবার ব্যবস্থা করছিলেন স্ট্রিণ্ডবার্গ। আমি পিয়ানোতে বসে এই মেলোডিগুলোকে হারমোনাইজ করলাম—শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। কথাবার্তা বেশির ভাগ ক্রেগের সঙ্গে হচ্ছিল জার্মান ভাষায়—আমি আবার জার্মান জানতাম না। বিদায় নেবার সময় স্ট্রিণ্ডবার্গ কি যেন বললেন এবং আমরাও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

দুদিন বাদে ক্রেগ এবং আমি একটি রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ খাচ্ছি, এমন সময় আমাদের পরিচিত একজন সুইডিস আর্টিস্ট আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন—"Strindberg was very disappointed that you never came to dinner yesterday and so were the artists and musicians he had invited to meet you." এবার বুঝতে পারলাম যে, আমাদের বিদায় দেবার সময় তিনি আমাদের ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং আমরা "ধন্যবাদ" বলাতে ধরে নিয়েছিলেন আমরা তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। ব্যাপারটা ঐ সুইডিস বন্ধুকে বুঝিয়ে বললাম এবং সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করা গেল। ইসাডোরা চেষ্টা করেও স্ট্রিণ্ডবার্গের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি—(কারণ এই বিখ্যাত সুইডিস নাট্যকার পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে কঠিন আঘাত পাওয়াতে সমস্ত নারীজাতির প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সিরি ফন্ এসেন যখন তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান, তার কিছুকাল পরে ইবসেন "এ ডল্‌স হাউস" নাটকটি রচনা করেন। স্ট্রিণ্ডবার্গের ধারণা হয় যে, [illegible]

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"আমাদের সফর শুরু হল"—লিখেছেন মার্টিন শ'। তারপর বলেছেন: প্রথমে এলাম নুরেমবার্গে। শহরটির সর্বত্র মধ্যযুগীয় রোমান্সের প্রভাব। হোহেনজোলার্নদের কাস্‌ল থেকে আমার মন ভয়, বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। ক্যাথিড্রালের একটি বড় দরজা দেখে ক্রেগ কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন আজও সেকথা আমার মনে আছে। আমাকে তিনি বললেন যে, লাইসিয়ামে ফাউস্ট প্রডাকশনের একটি দৃশ্যে ঐ দরজাটি দেখানো হয়েছিল। আরভিং নুরেমবার্গে এই দৃশ্যটি আঁকাবার জন্যই ওখানে তখন এসেছিলেন।

নুরেমবার্গ হচ্ছে শিশুদের খেলনা তৈরি করবার জন্য বিখ্যাত। রাত্রে ইসাডোরা নাচলেন—তাঁর নিজস্ব স্বর্গীয় ভঙ্গিতে। সঙ্গীতও ভালই হয়েছিল। তারপর আমরা এলাম অগস্‌বার্গে - এখানকার আরকিটেকচার নুরেমবার্গকেও ছাড়িয়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় প্রদর্শনী শুরু হবার পাঁচ মিনিট আগে অর্কেস্ট্রা-লাইটগুলো ফেল করল। তৎপরতার সঙ্গে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রদর্শনী করা হল। ভালই লেগেছিল সবার। এই অগস্‌বার্গেই বের্টল্ট ব্রেশটের জন্ম হয়েছিল সেকথা সবাই নিশ্চয় জানেন। এরপর আমরা এলাম মিউনিখ-এ, প্রদর্শনী করতে। এখানকার অর্কেস্ট্রা ছিল খুবই নিম্নস্তরের—রিহার্সেলের পর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমি ইসাডোরার সিটিং রুমে নালিশ জানাতে গিয়ে দেখলাম একটি ছোটখাট ধরনের বৃদ্ধ ভদ্রলোক সোফায় বসে আছেন। তাঁর হাতে ছিল ক্রেগের থিয়েট্রিকাল ডিজাইনের একটি বই। ইসাডোরা ডিজাইনগুলো সম্বন্ধে তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। পরে জেনেছিলাম ইনি গ্রাণ্ড ডিউক অফ্ সেক্‌সে মেনিনজিন—ইনিই একমাত্র সম্রাট যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা যান।

এরপর আমাদের সফরের জন্য যেতে হয়েছিল। হল্যাণ্ডে। এ্যামস্টার্ডামে তখন দারুণ ঠাণ্ডা। জায়গাটা এমনিতে বেশ ভালো—তবে এখানকার সর্বত্র ক্যানালে ভরা। সব সময় জল দেখতে দেখতে আমার মনটা বিষিয়ে উঠতো। এ্যামস্টার্ডামে ইসাডোরা ড্যান্‌কান্ নাচ দেখিয়ে প্রচুর যশ এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে, ইউরোপের সমস্ত দেশগুলোর ভেতর এক ইংল্যাণ্ডই ইসাডোরার প্রতিভাকে কখনও ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে নি এবং তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে নি। সেইণ্ট পিটার্সবার্গ, বার্লিন, প্যারিস, ভিয়েনা, মিউনিখ, কপেনহেগেন, স্টকহলম, এ্যামস্টার্ডাম সর্বত্র সাধারণ দর্শকেরা ইসাডোরার নামে পাগল হয়ে উঠতো—কিন্তু লণ্ডনে তিনি কখনই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন নি। সেটা অবশ্য নিজের দোষে নয়, লণ্ডনের দর্শকদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের অভাবে। ইসাডোরা তিনবার লণ্ডনে নাচতে আসেন। প্রথমবারে তিনি ছিলেন অখ্যাত, দ্বিতীয়বারে ইউরোপীয়ান ট্যুর সমাপ্ত করে এবং প্রচুর সাফল্য এবং যশের অধিকারিণী হয়ে লণ্ডনে এসেছিলেন, শেষবারে এসেছিলেন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ঠিক পরেই। কিন্তু কোনবারেই লণ্ডনে তিনি বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারেন নি। এর কারণ কি, আমার মনে হয় যেহেতু তাঁর নাচে কোন যৌন আবেদনের প্রকটতা থাকত না, সেই জনাই ইংল্যাণ্ডের পাবলিক তাঁকে গ্রহণ করতে পারে নি।

এ্যামস্টার্ডাম থেকে ইসাডোরা এলেন হাগ্-এ। এখানেও তিনি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গেই প্রদর্শনী করেছিলেন। এরপর আমরা এলাম স্টকহলমে—অতি সুন্দর শহর—ফ্লোরেন্সের পর এত সুন্দর জায়গা আমার চোখে পড়ে নি। স্টকহলমে এসে স্ট্রিণ্ডবার্গের সঙ্গে দেখা করে যাব না, এ তো আর হতে পারে না। ক্রেগের লেখা পড়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "I find golden words in them." অনেক কষ্টে তাঁর ফ্ল্যাট খুঁজে বের করা গেল—এক বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে বললে, "নেজ"—অর্থাৎ স্ট্রিণ্ডবার্গ কারো সঙ্গে দেখা করেন না। যাই হোক, ক্রেগের নামটাই আমাদের পাসপোর্টের কাজ করল, কারণ স্ট্রিণ্ডবার্গ এসে আমাদের তাঁর ড্রইং রুমে নিয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল

ইবসেন নোরার গৃহত্যাগের চিত্রটি এঁকে-ছিলেন। স্ট্রিণ্ডবার্গ আমাদের দেশে ইবসেনের মত অতটা সুপরিচিত নন—তবে নাটকের স্ট্রাকচার, ফর্ম প্রভৃতি বিষয়ে স্ট্রিণ্ডবার্গের অবদান ইবসেনের থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। এই জন্যই ইউজিন ও-নীল বলেছেন, "আমরা আজও স্ট্রিণ্ডবার্গকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি নি।")

গথেনবুর্গে এসে আমাদের সফর শেষ হল। এখান থেকেই একদিন জাহাজে উঠলাম দেশে ফেরবার জন্য। ইউরোপের অনেক জায়গা দেখবার সুযোগ পাওয়াতে এই সফরটি সত্যই ভাল লেগেছিল। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল গর্ডন ক্রেগের সঙ্গ এবং সাহচর্য। Dear old Teddy! What a companion! We would be arm in arm in Munich and my name on the posters would be about as large as Isadora's. We would disagree in Nuremburg and my name would shrink to the size of the author's on an English theatre poster. But what did it matter?

ক্রেগের চরিত্রের মানবিক দিকটাও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে মার্টিন শ'-এর লেখায়। একবার শ' ফ্লোরেন্সে গিয়েছেন—সঙ্গে তাঁর উইণ্টার ওভারকোট ছিল না। শ' একটি চিঠিতে ক্রেগকে এখানকার বিশ্রী ঠাণ্ডার কথাটা লিখলেন। দিন-দুয়েকের ভেতরই একটি ভারী ওভারকোট এসে হাজির—ক্রেগ পাঠিয়েছেন।

ক্রেগের আর একটি বিশেষ গুণ ছিল তাঁর গুরুভক্তি। আরভিং-এর একটি সুন্দর জীবনীও তিনি লিখে গেছেন। এ জীবনীটি পড়লেই বোঝা যায় হেনরী আরভিং কত বড় অভিনেতা এবং প্রযোজক ছিলেন। আরভিংকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বার্নার্ড শ' প্রবন্ধ লিখতেন বলেই ক্রেগ তাঁর সম্বন্ধে খড়্গহস্ত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে ক্রেগের একটু ছেলেমানুষীও ছিল। তিনি বুঝতে চাইতেন না যে, আরভিং-এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেই বার্নার্ড শ' থিয়েটারের জগতে নিজের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলেন। তবে আরভিং তাঁর কোন নাটক অভিনয় করলে শ' আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠতেন। শোনা যায় আরভিং 'দি ম্যান অভ্ ডেস্টিনী' নাটকটি কিনেও ছিলেন মঞ্চস্থ করবার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। শ' কিন্তু এ ব্যাপারে খুব রেগে যান—তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, আরভিং ইচ্ছা করেই নাটকটি কিনে নিয়ে মঞ্চস্থ করেন নি—যাতে অপর কেউ ও নাটকটি প্রডিউস করতে না পারেন সেজন্যই কিনে রেখেছিলেন। তবে এটা শ'-এর ভুল ধারণা—কারণ হেনরী আরভিং এ ধরনের কূটনীতি চালাবার মত মত লোক ছিলেন না।
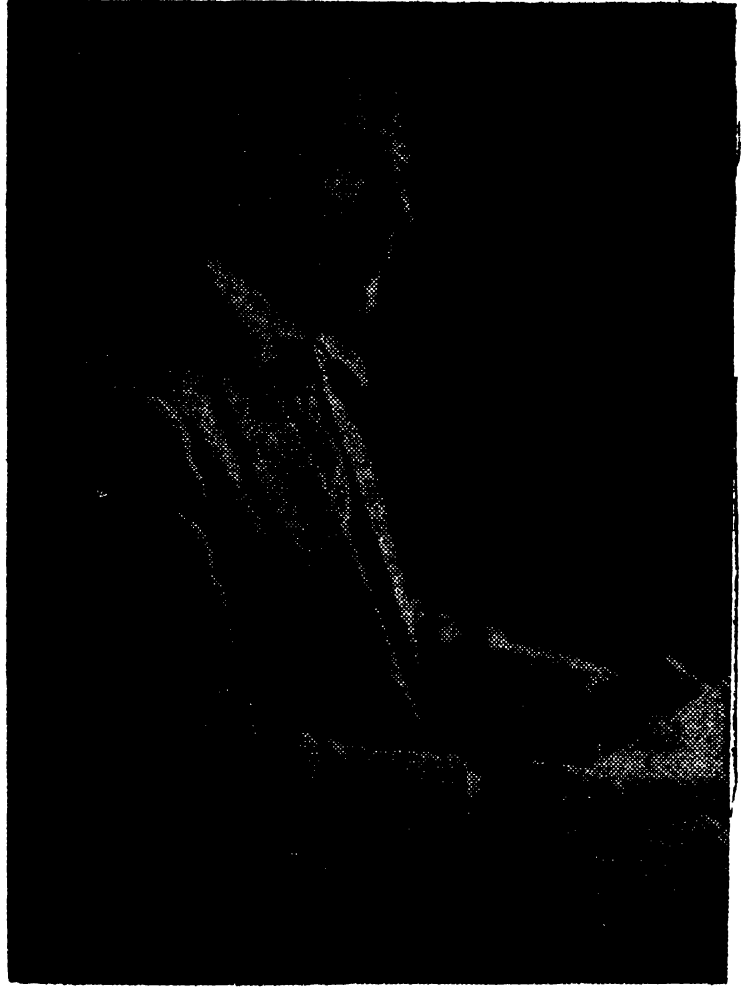
[ক্রমশ]

মার্টিন শ

'খিলৌনা' চিত্রে মুমতাজ

নতুন বাংলা ছবি নেই কেন ?

মার্চ এবং এপ্রিল মাসে বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করে নি। যে সব সিনেমায় বাংলা ছবি দেখান হত, সে সব সিনেমায় পুরোনো বাংলা ছবি দেখান হচ্ছে, কোন কোনটিতে পুরানো হিন্দী ছবি দেখান হচ্ছে। বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করছে না কেন? মুক্ত পাওয়ার উপযুক্ত বাংলা ছবি কি নেই, অথবা কোন দুষ্ট চক্রের চক্রান্তে ছবি মুক্তিতে বাধা হচ্ছে?

ইতিপূর্বে আমরা এই অচল অবস্থার বিষয়ে আমাদের পাঠক ও সিনেমা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সিনেমা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করে কারণ জানতে চেয়েছি। কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছু জানতে পারি নি। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি এবং সরকারী চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি এখনো কোন বক্তব্য উপস্থিত না করায় জনসাধারণ কিছুই বুঝতে পারছেন না। অবশ্য এই বিষয়ে জনসাধারণকে জানাবার দায়িত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশনের। যেখানে প্রযোজক, পরিবেশক ও সিনেমা মালিকরা সহাবস্থান করছেন সেখানে তাঁদের নীরবতা দেখে ব্যাপারটা অনেকটা পরিকল্পিত বলে সন্দেহ জাগছে।

সন্দেহ জাগছে এই কারণে যে, গত বছর ৩৬টি বাংলা ছবি নির্মিত হয়েছে। পরবর্তী সময় ধরলে ছবির সংখ্যা আরো বেশি হবে। কয়েক বছরের মধ্যে গত বছরের মত এত বেশী ছবি তৈরি হয় নি। এই ছবিগুলি কোথায় গেল? এই ছবিগুলি প্রযোজকরা নিশ্চয়ই বাক্সবন্দী করে রাখার জন্য তৈরি করেন নি। ছবি তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়, ছবি যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় টাকা তুলে আনতে তত সুবিধা। নতুবা ছোট ছোট প্রযোজকদের সুদের টাকা জোগাতেই সর্বস্বান্ত হতে হয়। তা হলে প্রযোজকরা ছবির মুক্তিকে বিলম্বিত করতে পারেন না। কারণ তাতে তাঁদেরই সর্বনাশ হয়। আমরা শুনেছিলাম প্রযোজকদের কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ কোন সিনেমায় তাঁদের ছবিকে মুক্তি দেবার জন্য উপদেষ্টা কমিটিকে জানিয়েছেন যে, তাঁদের ছবির কাজ শেষ হয় নি। কিন্তু এরকম প্রযোজকের সংখ্যা কয়জন হতে পারে। দু-একজনের বেশি হতে পারে না। যারা অন্য শিল্প থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা এনে সিনেমায় লগ্নী করে, একমাত্র তারা এই টালবাহানা করতে পারে। সত্যিকার চলচ্চিত্র প্রযোজকরা তা পারে না। তারা যেকোনভাবে ছবির মুক্তি ত্বরান্বিত করতে ব্যস্ত থাকে। একমাত্র সম্ভব হতে পারে সিনেমার মালিকদের নানা ছল-চাতুরীতে। যুক্তফ্রন্টের সময় সেন্সার তারিখভিত্তিক ছবি রিলিজের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা কার্যকরী থাকলে কালোটাকার লেনদেন এবং বড় সিনেমাগুলিতে বেশী পার্সেন্টেজ আদায় করবার সুযোগ থাকে না। সুতরাং সেন্সর তারিখভিত্তিক রিলিজ ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেবার জন্য এটা একটা চক্রান্ত কি না কে জানে। এরকম আশঙ্কা অনেকের মনে জেগেছে। কারো কারো মতে যুক্তফ্রন্টের সময় গঠিত চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি ইত্যাদিকে অচল করে দেবার জন্য একশ্রেণীর আমলাদের সহযোগে চলচ্চিত্র শিল্পের ধূর্ত একদল মুনাফাবাজ এই অচল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। উপদেষ্টা কমিটির সক্রিয় ভূমিকা যদি না থাকে তা হলে একদল মানুষ ছবি নিয়ে ফাটকা খেলতে পারে, আর ইচ্ছামত ছোট ছোট প্রযোজকদের গলা কেটে চলচ্চিত্র-শিল্পের সর্বনাশ করতে পারে। বিভিন্ন কমিটির কাজে বাধা সৃষ্টি করে আমলারা যে ধূর্তামী শুরু করেছে তাতে এই সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়।

ইতিপূর্বে বাংলা ছবির স্বার্থে আমরা চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম—। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি, উপদেষ্টা কমিটি এবং সিনে-টেকনিসিয়ান ইউনিয়নের বক্তব্য জানবার আশা করছি। —সুজন।

অক্টোবর বিপ্লব

মহানায়ক লেনিন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার ষষ্ঠ নাট্য নিবেদন—'অক্টোবর বিপ্লব' গত ৩রা এপ্রিল গণনাট্য সঙ্ঘের সীমান্তিক শাখার উদ্যোগে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে। নাটকটি লিখেছেন শ্রীচিররঞ্জন দাস। এই নাটকটি রঙ্গি স্টেডিয়ামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লেনিন জন্মশতবর্ষ উৎসবেও অভিনীত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা পাঁচজন লেনিন ভূমিকাভিনেতার সাক্ষাৎ পেয়েছি, এই নাটকে আর একজন লেনিনের ভূমিকায় অভিনেতাকে দেখলাম। এই অভিনেতার নাম জীবন চক্রবর্তী।

শ্রীচিররঞ্জন দাসের "অক্টোবর বিপ্লব" নাটকের শুরু হয়েছে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে বলশেভিকদের ইস্তাহার বিলির ঘটনা নিয়ে। এই দৃশ্যগুলিতে বলা যায় যুদ্ধের চাপে তখন শ্রমিকদের মধ্যে দুর্মূল্যতাজনিত অসন্তোষ এবং বলশেভিকরা শ্রমিকদের সংগঠিত করছে। পরবর্তী দৃশ্যে কৃষকদের মধ্যে বলশেভিক কর্মীদের কাজ এবং স্তালিনের নেতৃত্ব ইত্যাদির পরে জারের শীতকালীন প্রাসাদ আক্রমণের দৃশ্যের পরে লেনিনের রোস্ট্রামের উপর দাঁড়িয়ে শ্রমিক কৃষক সৈনিকদের প্রতি অভিনন্দন বক্তৃতায় নাটক শেষ।

এই নাট্য প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়। কিন্তু নাটকটির আরো সুচিন্তিত দৃশ্যশৈলী নির্মাণ প্রয়োজন। এই পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস আমরা নাট্যকারের কাছে পেয়েছি। নাটকটি দলগত অভিনয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য

বাটানগর, ১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) —বাটা এ্যাকাউন্টস এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় বাটা সিনেমা হলে নৃত্যাবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। অর্জুনের ভূমিকায় শ্রীমতী সুতপা দত্ত, কুরূপার ভূমিকায় শুক্লা সেনগুপ্তা, সুরূপার ভূমিকায় রত্নাবলী ঘোষ, মদনের ভূমিকায় ঝর্ণা বাগচী ও অন্যান্য ভূমিকায় মানসী ঘোষ, মিতা হোপ, গীতালী বসু, বনানী চৌধুরী, মিতা পাল, কৃষ্ণা হালদার সুঅভিনয় করেন। সংগীত পরিচালনায় নির্মলেন্দু বিশ্বাস কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সহকারীরূপে ছিলেন—মীরা চৌধুরী, কাজল বসু, স্বপ্না সেনগুপ্তা। বিশেষভাবে শ্রীমতী মীরা চৌধুরীর সংগীত দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংগতে অংশগ্রহণ করেন—অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, সুখেন্দু, বিকাশ দত্ত। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীবিপুল ঘোষ।

'অভিমান' ছবিতে সাবিত্রী ও অনিল চ্যাটার্জী।

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত "ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্টেন্ট" ছবির একটি দৃশ্যে।
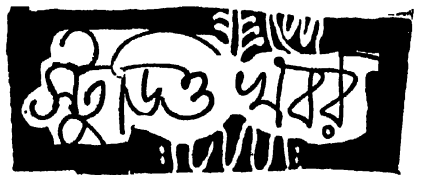
প্রতিধ্বনি

পিয়ালী ফিল্মসের 'প্রতিধ্বনি'র কাজ সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সুনীল গাঙ্গুলীর লেখা উপন্যাসকে ভিত্তি করে শ্রীরায় ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। সুনীল গাঙ্গুলীর লেখা 'অরণ্যের দিন রাত্রি'র চিত্ররূপ দেবার পর শ্রীরায় 'প্রতিধ্বনি'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। এই ছবির পটভূমি হবে কলকাতা—তার সঙ্গে দীঘা সমুদ্রতীরের দৃশ্যও থাকবে। ছবিতে অনেক নতুন শিল্পীর দর্শন মিলবে। তার মধ্যে রয়েছে ধৃতিমান

ম্যানসিবাস্তিয়ান উৎসবে পুরস্কার-প্রাপ্ত 'দি রেইন পীপল' ছবিতে সেরিলী নাইট।

চ্যাটার্জী, কৃষ্ণা বসু, জয়শ্রী রায়, দেবরাজ রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জী, ভাস্কর চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, শেফালী, অশোক মিত্র, শোভন লাহিড়ী, কল্যাণ সেন, কে কে আয়েংগার প্রমুখ।

এই ছবিতেও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্রীরায় নিজে। ক্যামেরায় আছেন সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনা করছেন দুলাল দত্ত এবং শিল্প-নির্দেশনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত।

বিরাজ বৌ

গত ১৫ই এপ্রিল ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে কে সি দাস প্রোডাকসন্স ও শ্যাডো মুভিজের প্রথম ছবি "বিরাজ বৌ"-এর মহরৎ হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীদেবকীকুমার বসু। ছবিটি পরিচালনা করছেন মানু সেন। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন সলিল সেন। সঙ্গীত পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় থাকছেন যথাক্রমে শ্যামল মিত্র, দিলীপ মুখার্জী, হরিদাস মহলানবীশ ও বিজয় বসু। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছে মিলি পিকচার্স।

গোপীচন্দ্র কাহিনী

রাগিণী শহরের সুপরিচিত একটি নৃত্য অনুশীলন সংস্থা। এই সংস্থার বৈশিষ্ট্য লোকনৃত্য-নাট্য পরিবেশন। রাগিণীর উদ্যোগে এ পর্যন্ত আমরা যতগুলি নৃত্যানুষ্ঠান দেখেছি প্রত্যেকটি দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে। লোকনৃত্য-নাট্যের সঙ্গে এই সংস্থার 'আফ্রিকা', 'সাগরিকা' ইত্যাদি ভিন্নতর রস ও সমাজ চেতনার পরিচায়ক। এই নৃত্য-নাট্য দুটি দেখে আমাদের মনে হয়েছিল শিল্পের জন্য শিল্প এই প্রতারণামূলক শিল্পচিন্তায় রাগিণী বিশ্বাসী নয়।

গত ১৮ই এপ্রিল রবীন্দ্রসদনে রাগিণী শহরের নৃত্যরসিকদের কাছে উপস্থিত করেছে 'গোপীচন্দ্রের কাহিনী'। উত্তরবঙ্গের লোক-গীতিকা থেকে এই কাহিনীর নৃত্য-নাট্য রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রারম্ভে রাগিণীর সভাপতি দুঃখ করে

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা... 'অঘোরের বিজয়' নাটকে লোচনের ভূমিকায় জীবন চক্রবর্তী ও স্ত্যালিনের ভূমিকায় অজয় নাথ।

বলেছেন, এই কাহিনী যদিও সময় সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়েছে এবং এই কাহিনী অবলম্বনে হিন্দী চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, কিন্তু বাঙালী শিল্পীরা এই কাহিনীকে কাজে লাগান নি।

'গোপীচন্দ্র কাহিনী' সামন্তযুগীয় এক রাজার উপাখ্যান। ধনরত্ন, অদুনা পদুনা দুই সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে রাজা সুখে কাল কাটাচ্ছিল। এমন দিনে রাজমাতা ময়নামতি এসে জানালেন গোপীচন্দ্রের মৃত্যু অবধারিত। পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, বারো বছর সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করা। যাতে গৃহত্যাগ করতে না হয় তার জন্য গোপীচন্দ্র রাজমাতাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে তাঁর কথা যে সত্য তা যাচাই করে নিলেন। রাজমাতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করলেন। অদুনা পদুনার নানা কৌশলও ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত রাজা মায়ের আদেশে সন্ন্যাসী হয়ে নানা কষ্ট ও প্রলোভন জয় করে এবং রাণীদের প্রতি গভীর প্রেম নিয়ে রাজগৃহে ফিরে আসে। মায়ের প্রতি ভক্তি, পত্নীপ্রেম, সততা ইত্যাদিতে কাহিনী উজ্জ্বল হলেও গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়েছিল নিজেরই জীবন বাঁচাতে; এবং তার আগে মাকে বিশ্বাস করে নি। লোকগীতি হলেও কালের বিচারে এই কাহিনীতে লোকনায়ক এবং সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য তেমন ঘটে নি।

'রাগিণী' এই লোক-কাহিনীর নৃত্য-গীতিরূপে লোকগীতিকে আশ্রয় যদিও করেছেন কিন্তু সুরেতে এবং হীরানটীর ভূমিকায় মার্গ সঙ্গীত প্রয়োগ করেছেন। অন্যান্য প্রত্যেকটি সঙ্গীত। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন সুচিত্রা মিত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, অমর রায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, হিরণ্ময়ী সরকার, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, রেখা ঘোষ, অংশুমান রায়, শচীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ।

'গোপীচন্দ্রের কাহিনী'র নৃত্যরূপ দিয়েছেন অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিম বাংলার নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য পরিচালকদের মধ্যে অসিত চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। তিনি এই উপাখ্যানে প্রধানত কথাকলি রীতিতে এবং তার সঙ্গে লোক-নৃত্যের রীতি সংযোগ করে লোকগাথার রূপ ও মেজাজ সৃষ্টি করেছেন। সরল রীতির এই লোকনৃত্যটি দর্শকদের মনে রেখাপাত করতে পেরেছে। নৃত্যে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে গোপীচন্দ্ররূপে অসিত চট্টোপাধ্যায়, রাজমাতারূপে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অদুনা ও পদুনারূপে সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প্রশংসনীয়। রাণীদের সখীর ভূমিকায় জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসার দাবি রাখে। হীরানটী হাতের সঞ্চালনে ক্ষীপ্রতা দেখালেও তাঁর দেহভঙ্গী নটীর সুলভ নয়। বিভিন্ন চরিত্রে নৃত্যভূমিকায় উপস্থিত হয়েছেন উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, বেলা অর্ণব, সাধন গুহ, বটু পাল, লোচন দে, সুনীত বসু, অমল সরকার, সুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধা দাস, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মৈত্র, বালকৃষ্ণ মেনন।

রাগিণীর 'গোপীচন্দ্র কাহিনী' নৃত্যগীতিনাট্য জনপ্রিয় হবে আশা করি।

নিখিল ভারত ছাত্রকণ্ঠে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ১১শে এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর হলে নিখিল ভারত ছাত্র-কণ্ঠ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার চতুর্থ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব ও সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ডাঃ কানাইলাল সরকার এবং প্রধান অতিথি : শেরিফ শ্রী জে সি দে। সঙ্গীত অনুষ্ঠানে প্রথমে দ্বৈতকণ্ঠে ধ্রুপদ পরিবেশন করেন, গৌর বসাক ও কল্পনা ব্যানার্জী। অন্যান্য সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন প্রণতি দাস, বুলবুল পাল, মলয়া দাস, উমা পাল, সংহিতা সেনগুপ্ত, ইভা পাল, স্বপ্না দাস, মহেশ্বর চ্যাটার্জী, স্বপন সিকদার ও কান্তি মৈত্র। সঙ্গতে ছিলেন কিশোর নন্দী ও সুধীরনাগ দাস। সঙ্গীত অনুষ্ঠানের শেষে সফল প্রতি-যোগীদের পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন শেরিফ শ্রী জে সি দে।

বৈতানিকের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

আগামী ২৫শে বৈশাখ মহর্ষি ভবনে বৈতানিকের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে আলোচনা সহযোগে "রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ" শীর্ষক অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হবে। এই অনুষ্ঠানটি ১৯৪৮ সালে শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকে জনমানসে রবীন্দ্রসংগীত ও সংস্কৃতিকে সহজ সরল করে প্রচার ও প্রসারকল্পে বৈতানিকই প্রথম এই ধরনের প্রচেষ্টা সুরু করে। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসাশ্রয়ী, যুক্তিগ্রাহ্য এবং চিত্তাকর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলে।

অন্যান্যবার যে বিপুলসংখ্যক নিমন্ত্রণপত্র বিলি করা হয় এবার অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সেই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। কিছু নিমন্ত্রণপত্র জনসাধারণের মধ্যে (জনপ্রতি-একটি করে) আগামী ওরা মে

এস· বি· ফিল্মসের সলিল দত্ত পরিচালিত 'কলঙ্কিত নায়ক' ছবির একটি দৃশ্যে তরুণকুমার ও অপর্ণা সেন।

রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে বৈতানিক কার্যালয়ে, ৪নং এল্‌গিন রোড, কলিকাতা ২০ থেকে বিলি করা হবে।

লেনিন জীবনী সংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যচিত্র

লেনিনের জীবনী-সংক্রান্ত এক বিজ্ঞানভিত্তিক ও তথ্যমূলক চলচ্চিত্র কেন্দ্রীয় জন-বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক ফিল্ম স্টুডিও থেকে সদ্য মুক্তিলাভ করেছে। মস্কো থেকে এ খবর দিয়েছে এ-পি-এন।

"লেনিনের পাণ্ডুলিপি", "পার্টির পতাকা" ও "লেনিন (চূড়ান্ত পর্যায়)" এই তিনটি ছবির একত্র সমাহার হল এই চলচ্চিত্রটি। এর চিত্রনাট্যকার হলেন হেরমান ফ্রাদকিন ও পরিচালক ফিওদোর তিয়াপকিন।

এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণে লেনিনের পাণ্ডুলিপি, দিনলিপি, বিভিন্ন সময়ে তোলা তাঁর আলোকচিত্র ও নিউজরিল ব্যবহার করা হয়েছে। লেনিনের রচনাবলীর পাণ্ডুলিপিগুলি ছবিতে লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক সংগ্রামের পটভূমিতে দেখান হয়েছে। ১৯০৫ সালের শুরু থেকে ১৯২৪ সালে জীবনাবসান পর্যন্ত লেনিন জীবনকথা ছবিতে দেখান হয়েছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে অসামান্য তাত্ত্বিক ও কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের প্রতিরূপ।

ছবিটি চলচ্চিত্রে লেনিনায়নে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আগামী ২রা থেকে ৪ঠা মে মহাজাতি সদনের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হবে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ২রা মে, সঙ্গীতে 'খ' বিভাগের (১২—১৬ বয়স্ক) ৩রা মে এবং 'ক' বিভাগের (১৭—৪০) ৪ঠা মে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন বেলা ৩টায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে। নজরুল একাডেমির সম্পাদক জানাচ্ছেন যে, প্রতিযোগীদের স্বতন্ত্র চিঠি দেওয়া হবে না, যাঁরা নাম তালিকাভুক্ত করেছেন তাঁরা যেন নির্দিষ্ট দিনে সময়মত উপস্থিত হন। জ্ঞাতব্য বিষয় ৬, এণ্টনী বাগান লেন, কলি-৯; অথবা ৬০, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলি-১৯এ জানা যাবে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ক্রিকেটের মাঠগুলোকে রণজিৎ সিংজী কিম্বা দলীপ সিংজী যখন আলো করে রেখেছিলেন, যখন তাঁদের মন-মাতানো খেলার চমকে চমকিত ইংলন্ডের মাঠ-ময়দান। ঠিক তখনই ভারতে ক্রিকেট খেলা ধীরে-সুস্থে এবং দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে।

বোম্বাই-এর পার্শীরাই বোধহয় ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল। সেই সুদূর অতীতে ১৮৮৬ এবং ১৮৮৮ সালে পার্শী ক্রিকেট দল ইংলন্ড ভ্রমণে গিয়েছিল।

ভারতীয় ক্রিকেটের তখন প্রাথমিক যুগ। কিন্তু সেই প্রাথমিক যুগের সংগে ভবিষ্যতের সেতুবন্ধের কাজ করেছিল পার্শী দলের এই সফরগুলো। শুধু তাই নয়, এই সফরগুলো ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্যে করেছিল যথেষ্ট সাহায্য। পার্শীদের ঐ সফরের উত্তরে ১৮৮৯-৯০ সালে মিডিলসেক্সের জি. এফ. ভারননের নেতৃত্বে ১৪ জন খেলোয়াড়ের একটি দল ভারত ভ্রমণে আসে। এর দু'বছর পরেই লর্ড হক আরো একটি শক্তিশালী দল নিয়ে ভারতে আসেন। এরপর ১৯০২-৩ সালে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের এফ. এইচ স্টুয়ার্টের আমন্ত্রণে কে. জে. কেইএ একটি দল নিয়ে ভারতে খেলে যান।

এই সময়ই ঠিক হয়েছিল যে, ১৯১১ সালে ভারত থেকে একটি দল ইংলন্ড ভ্রমণে যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে ১৯১১ সালের ইংলন্ড সফরকারী ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনীত করা হয়। সেই দলের অধিনায়ক এবং খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হলো :

(১) পাতিয়ালার মহারাজা (অধিনায়ক) : কুড়ি বছর বয়স্ক (১৯১১ সালে) তরুণ অধিনায়ক দুরন্ত ব্যাটসম্যান এবং সুন্দরভাবে ফিল্ডিং করতে পারতেন। ইংলন্ডের বিশেষজ্ঞদের কাছেই শিখেছিলেন ক্রিকেট খেলা। অল্প বয়স থেকেই ক্রিকেট খেলার ভক্ত এবং ক্রিকেট খেলার প্রসারের জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রমও করেছিলেন।

(২) মেজর কে. এম. মিস্ত্রি (পাতিয়ালা) : বয়স ৩৫ পার্শী দলের অধিনায়ক এবং তখনকার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ছিলেন। তাঁর খেলার ধারা এবং পদ্ধতি ছিল দেখার মতো। এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন চতুর বোলার এবং নিখুঁত ফিল্ডার। রণজিৎ সিংজী তাঁকে 'ক্রিম হিল অফ ইন্ডিয়া' বলতেন।

(৩) মানেক জন্দ (পাতিয়ালা) : শেষ পর্যন্ত দলের সংগে ইংলন্ড সফরে যান নি।

(৪) ডাঃ এইচ. ডি. কাংগা (বম্বে) : বয়েস ৩১। অলরাউন্ডার, নিখুঁত ব্যাটসম্যান এবং চতুর বোলার। পার্শী দলের পক্ষে প্রেসিডেন্সি ম্যাচে ২৩৪ রান করেন। তিনি লন্ডনের হ্যামাস্টেড ক্লাবের পক্ষে ১৯০৯-১৯১০ সালে খেলেছিলেন।

(৫) পি. বালু (বম্বে) : বয়েস ৩৩। স্পিন বোলার। লেগ এবং অফ দু'দিকেই বল ঘোরাতে পারতেন। মারকুটে ব্যাটসম্যান এবং নিখুঁত ফিল্ডার হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল।

(৬) জে. এস. ওয়ার্ডেন (বম্বে) : বয়েস ২৬। ছ' ফুটের ওপর লম্বা এই খেলোয়াড়টি সুন্দরভাবে বল ঘোরাতে পারতেন—তাঁর হাতে স্পিন ছিল অনেকখানি। পার্শী দলের পক্ষে অনেকগুলো ইনিংসেই তিনি দিয়েছিলেন ব্যাটিং-এ উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয়।

(৭) এম. পাই (বম্বে) : বয়েস ২৭। নিখুঁত অলরাউন্ডার। ব্যাটিং এবং বোলিং-এ অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী।

(৮) এইচ. এফ. মুল্লা (বম্বে) : বয়েস ২৫। পার্শী দলের পরম নির্ভরযোগ্য উ ই কে ট র ক্ষ ক। ব্যাটসম্যান হিসেবেও সুনাম ছিল. খুব তাড়াতাড়ি রান করতে পারতেন।

(৯) কে. শেষাচারি (মাদ্রাজ) : বয়েস ৩৪। উইকেটরক্ষক হিসেবে তখনকার দিনে সবচেয়ে নামকরা খেলোয়াড়। মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম ছিল।

(১০) সালাম উদ্দীন (আলিগড়) : বয়েস ২৪। আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটির ছাত্র। পেস বোলার। ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবেও নাম ছিল।

(১১) সাফকোয়াৎ হাসান (আলিগড়) : বয়েস ২৭। আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার।

(১২) সৈয়দ হাসান (আলিগড়) : বয়েস ২৪। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা ব্যাটসম্যান এবং বুদ্ধিমান উইকেটরক্ষক।

(১৩) [illegible] (দিল্লী) : বয়েস ৩০। ফাস্ট বোলার। এঁর বল শূন্যেই সুন্দরভাবে বাঁক খেত। নির্ভরযোগ্য ফিল্ডার হিসেবেও সুনাম ছিল।

(১৪) আর· পি· মেহেরহোমজি (বম্বে) ঃ বয়েস ৩৩। দর্শনীয়-ভঙ্গিতে ব্যাট করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে খেলার ধারা বদলে দিতে পারতেন। মেরে এবং আত্মরক্ষামূলক খেলায় ছিলেন তুখড়। চেঞ্জ বোলার হিসেবেও যথেষ্ট নাম ছিল।

(১৫) জয়রাম (বাঙ্গালোর) ঃ বয়েস ৩৯। নিখুঁত ব্যাটসম্যান এবং চতুর বোলার। ইংলণ্ডে অনেক-দিন খেলেছিলেন।

(১৬) নূর ইলাহী (কাম্বির) ঃ দলের সংগে যান নি।

দলের ম্যানেজার ছিলেন জে· এম· ফ্রিজেচো।

খেলোয়াড়দের নাম আর তাঁদের রাজ্যগুলো থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, ভারতের সর্বত্র তখনো ক্রিকেট খেলা প্রসার লাভ করে নি। তা ছাড়া খেলোয়াড়দের সংখ্যাও যে তখন খুব একটা বেশি ছিল তাও মনে হয় না, কারণ ১৯১১ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের বয়স্ক খেলোয়াড়ের সংখ্যাই ছিল বেশি।

সে যাই হোক, এ সফরে গিয়ে কিন্তু ভারতীয় দলটি মোটেই সুবিধে করতে পারে নি। মোট ২৩টি খেলার মধ্যে তারা জিতেছিল ৬টিতে, অমীমাংসিত-ভাবে শেষ করেছিল ২টি খেলা আর পরাজিত হয়েছিল ১৫টি ম্যাচে। প্রথম শ্রেণীর ১৪টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দলটি পরাজিত হয়েছিল দশটি ম্যাচে, দুটি খেলা ড্র হয় আর বাকী দুটিতে ভারতীয় দল জয়লাভ করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ১৯১১ সালের সফর সম্বন্ধে আমরা এতো কথা বলছি কেন? আপাতদৃষ্টিতে ঐ সফরটির গুরুত্ব হয়তো খুবই কম। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ঐ সফরটির পরেই কতো তাড়াতাড়ি ভারত খুঁজে পেয়েছিল তার চিরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েক-জন খেলোয়াড়কে। যাঁদের খেলার কথা ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে আজো আলাদা অধ্যায় হয়ে বিরাজ করছে।

সত্যি কথা বলতে কি, ১৯১১ সালের আগে কিম্বা ঐ সময়ের কিছু পর পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগুতে গিয়েও ঠিক মতো এগিয়ে যেতে পারছিল না।

ভারতেরই মানুষ রণজিৎ সিংজী যে সময় ইংলণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলেছিলেন তাঁর মন ভরানো, প্রাণ মাতানো খেলার জন্যে—ঠিক তখনই তাঁর নিজের দেশ ভারত ক্রিকেট খেলায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

তবে সে চেষ্টায় সাফল্য আসতে তখন আর বেশি দেরি নেই। অন্ধকার রাতের শেষে দিনের আলো তখন সবে ফুটবে ফুটবে করছে। সেই আলো ফোটাতে যেন ১৯২৫-২৬ সালে আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে ভারত সফরে এলো এম· সি· সি· দল। সেবারের সেই এম· সি· সি দলে ছিলেন ইংলণ্ডের তখনকার দিনের সেরা খেলোয়াড়রা।

তাই প্রথম থেকেই তাঁরা শুরু করলেন প্রাধান্য বিস্তার করে খেলতে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে গিয়েও তখন যেন ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছিলেন না ভারতীয় খেলোয়াড়রা—তখনো তাঁরা সমীহ করে খেলছিলেন, একটু যেন ভয় ভয় ভাবও মনে ছিল।

কিন্তু সেই ভয় ভয় ভাব কাটিয়ে, সেই সমীহ করে খেলার মনোভাব ভেঙে চুরমার করে ব্যাট হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তরুণ খেলোয়াড় সি· কে· নাইডু। তাঁর ব্যাটিং-এর চমকে—চমকে উঠলেন আর্থার গিলিগান, চমকে উঠলেন এম· সি· সি'র খেলোয়াড়রা।

আর ভারতীয় খেলোয়াড়রা নতুন উৎসাহে, নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে এম· সি· সি'র সংগে সমানে সমান-ভাবে পাল্লা দেবার জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন।

[চলবে]

পাতিয়ালার মহারাজার নেতৃত্বে ১৯১১ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের [illegible] [illegible] ছবিতে।

সম্প্রতি বাংলা দলের তেহেরান সফরের সময় দলের খেলোয়াড়দের আচার-ব্যবহার এবং নীতিজ্ঞান নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। দলের ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে সকলেই এক এক রকম কথা বলছেন—এমন কি খেলোয়াড়দের বক্তব্যও সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। অর্থাৎ এ দিচ্ছেন ওর ওপর দোষ আর ও দিচ্ছেন এর ওপর দোষ। আর এই দোষারোপের মধ্যে দিয়ে গোপন যে সত্যটা প্রকাশ পেয়েছে সেটা যেমন দুর্ভাগ্যজনক, তেমনি অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। যে খেলোয়াড়রা বিদেশের মাটিতে বেলেল্লাপনা করে দেশের মান-সম্মান এবং নিজেদের ইজ্জৎ ডুবিয়ে এসেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ম্যানেজার রিপোর্ট দিন এবং সেই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আবার যে ম্যানেজার এবং কোচ তাঁর দলের খেলোয়াড়দের সামলাতে পারেন নি—তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কারণ এই অন্যায়, এই অবি-বেচনার ক্ষেত্রে ওঁরা সকলেই দোষী এবং এই অপরাধের ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই মনে হয় কিছু করতে হলে চারদিক গুছিয়ে করাই ভালো।

কিন্তু আমরা ভেবে পাই না, যে সব খেলোয়াড় এখানে ভিজে বিড়ালের মতো থাকেন—যাঁদের ভাবখানা, ভাজা মাছও উল্টে খেতে পারেন না—তাঁরাই দেশের বাইরে গেলে অমন দুর্দান্ত হয়ে ওঠেন কি করে? আমরা বিশ্বাস করি না যে, এখানে খেলোয়াড়রা. যাঁরা ভারত কিম্বা বাংলা দলের হয়ে বিদেশে যান, তাঁরাও নিয়মিত নেশায় অভ্যস্ত। হয়তো দু-একজন ব্যতিক্রম থাকতেও পারেন। কিন্তু অনভ্যস্তরা দেশের বাইরে গেলে কিভাবে জঘন্য রকমের নেশার মাত্রা ছাড়িয়ে যান? সত্যিই চিন্তার বিষয়! খেলাধুলার ক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োজনটা সব থেকে বেশি। কিন্তু দেশের বাইরে গেলে কিম্বা ঘরের বাইরে অর্থাৎ অন্যরাজ্যে খেলতে গেলে দেখা যায় যে, খেলোয়াড়রা কোন সংযমের ধার ধারেন না। তাই তাঁদের খেলাও যেমন খারাপ হয় তেমনি তাঁরা লোকের কাছে হয়ে পড়েন হাস্যাস্পদ, সেই সঙ্গে দেশের মান-সম্মান এবং নিজেদের ইজ্জৎ ডোবান। কিন্তু কেন? কেন এমন করেন ওঁরা? এই কেনর উত্তরটা খুঁজে বার করতে পারলে সব মুশকিল আসান হবে। সেই সঙ্গে আমরা চাই যে. দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি হোক। মনে হয়, এই জঘন্য অপরাধের জন্যে যদি একজনেরও শাস্তি হয়—যদি একজনকেও খেলার জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়. তাহলে হয়তো অন্য খেলোয়াড়রা সমঝে যাবেন, সংযত হবেন—আইনশৃঙ্খলা মানতে বাধ্য হবেন হয়তো বা ভয়ে ভয়েই...। —শান্তিপ্রিয়

ডেভিস কাপ

প্রথমে পাকিস্তান তারপর খুব সহজেই সিংহলকে হারিয়ে দিয়ে ভারত ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইন্যালে উঠেছে, অন্যদিক থেকে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। পরের খেলায় ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হবে ব্যাঙ্গালোরে।

অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়রা বেশ কয়েকদিন আগেই ভারতে এসে হাজির হয়েছেন। কলকাতা হয়ে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে তাঁরা অনুশীলন আরম্ভ করেছেন। এদিকে অনেকদিন পরে রমানাথন কৃষ্ণানকে আবার ভারতের পক্ষে খেলতে দেখা যাবে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার পড়েছে কৃষ্ণনের ওপরেই। ভারতীয় দলের অন্য খেলোয়াড়রা হলেন প্রেমজিৎলাল, জয়দীপ মুখার্জী, বিজয় অমৃতরাজ ও শশী মেনন। আশা করা যায় যে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলায় কৃষ্ণান, প্রেমজিৎ এবং জয়দীপই অংশ গ্রহণ করবেন।

দলগত শক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে কিন্তু ভারতের নিরাশ হবারই কথা। ভারতের চেয়ে অস্ট্রেলিয়া দলটি অনেক বেশি শক্তিশালী। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক নীল ফ্রেজারও অবশ্য সেই কথাই বলেছেন। তবে কৃষ্ণানের যোগদানের ফলে ভারতীয় দলটিও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয়, ভারত এবারও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে সমর্থ হবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। তবে যাই হোক না কেন, খেলা যে শেষ পর্যন্ত খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এ বিষয়ে আজ আর কারো সন্দেহ নেই।

সিংহলের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়রা সকলেই সব ক'টি খেলাতেই জয়-জয়লাভ করেছেন। সিংহলের খেলোয়াড়রা কোনসময়েই পাল্লা দিয়ে লড়তে পারেন নি ভারতের সংগে। এমন কি তরুণ খেলোয়াড়দ্বয় বিজয় অমৃতরাজ ও শশী মেনন যেভাবে খেলেছেন তারও তুলনা মেলা ভার।

কথা উঠতে পারে সিংহল ছোট দেশ, দল হিসেবেও তারা খুব একটা কিছু নয়। তাই ভারতীয় খেলোয়াড়দের এই জয়লাভ অত্যন্ত প্রত্যাশিত হলেও খুব একটা গর্বহীন নয়।

তাই মনে হয় যে, ভারতীয় খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবেন।

॥ প্রেমজিৎলাল ॥
প্রেমজিৎ নন এবার কৃষ্ণানের ওপরই পড়েছে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার।

গল্প হলেও সত্যি

১৯৬৬ সনের অক্টোবর মাস। ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারত খেলছে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে। সেই খেলায় কৃষ্ণানের একক প্রচেষ্টা ভারতকে পৌঁছে দিল আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে। সেবার ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল ব্রেজিল। খেলা হচ্ছে কলকাতার সাউথ ক্লাব লনে। প্রথম সিঙ্গলসে জয়দীপ হেরে গেলেন শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় টমাস ককের কাছে। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে কৃষ্ণান হারালেন ম্যান্ডারিনোকে। দ্বিতীয় দিনে ডাবলসে ভাগ্যদেবী ভারতের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনে ম্যান্ডারিনোর উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের কাছে জয়দীপ পরাজয় স্বীকার করলেন। দ্বিতীয় ফিরতি সিঙ্গলসে কৃষ্ণান ও টমাস কক পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামলেন। আলোকাভাবের জন্য মাত্র তিনটি সেট খেলা হল এবং খেলা তখন ককের অনুকূলে। চতুর্থ দিন সকাল বেলায় স্নায়ুযুদ্ধে জর্জরিত কৃষ্ণান কিন্তু এতটুকুও বিচলিত না হয়ে পর পর দুটি সেট নিজের অনুকূলে নিয়ে দেশকে প্রথম চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে নিয়ে গেলেন। যখন সকলে প্রায় ভারতের জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন একমাত্র ভারতের টেনিস সম্রাট কৃষ্ণানের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যে সমস্ত বিশ্ব চমৎকৃত হল।

—[illegible] ব্যানার্জী
কলিকাতা-৪

হকির মাঠে

কলকাতা ময়দানের হকি লীগের খেলা শেষ হয়ে গেল। এখন বসেছে ময়দানী হকির শেষ আসর বেটন কাপ প্রতিযোগিতা। বেটন কাপ প্রতিযোগিতার আকর্ষণ এবার অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক কম। বাংলার বাইরে থেকে নামকরা অধিকাংশ দলই এবার আসে নি। তাই মনে হয়, বেটন কাপের খেলা এবছর খুব একটা জমবে না।

গত সংখ্যাতেই জানানো হয়েছে যে, এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে মোহনবাগান এবং রানার্স আপ লাভ করেছে ইস্টবেঙ্গল দল।

মোহনবাগানের নৈপুণ্য আরো বেশি। কারণ ১৮টি খেলার মধ্যে মোহনবাগান একটিতেও পরাজিত হয় নি, তারা অপরাজিত হিসেবে লীগ বিজয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান লাভকারী ইস্টবেঙ্গল এবং তৃতীয়স্থান লাভকারী ই আর এ এ দল একটি করে খেলায় পরাজিত হয়েছে। এই তিনটি দলের পয়েন্টের পার্থক্য ২ পয়েন্ট করে।

নিচে এ বছরের হকি লীগ খেলার সেরা তিনটি দলের খতিয়ান দেওয়া হলো :

মোহনবাগান—১৮টি খেলা, ১৬টি জয়, ২টি ড্র, স্বপক্ষে ৫২টি গোল, বিপক্ষে ১টি গোল, পয়েন্ট ৩৪।

ইস্টবেঙ্গল —১৮টি খেলা, ১৫টি জয়, ২টি ড্র, ১টি পরাজয়, স্বপক্ষে ৩২টি গোল, বিপক্ষে ৩টি গোল, পয়েন্ট ৩২।

ই. আর. এ. এ—১৮টি খেলা, ১৩টি জয়, ৪টি ড্র, ১টি পরাজয়, স্বপক্ষে ২৭টি গোল, বিপক্ষে ৩টি গোল, পয়েন্ট ৩০।

সমাচার দর্পণ

১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ শেষে ইংলণ্ড সফর পাকা হয়ে গেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের সমস্ত খরচ দিতে রাজী হয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কর্তৃপক্ষ—এমন কি খেলার জন্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার খরচও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের।

ইংলণ্ড ভ্রমণে ভারত প্রত্যেকটি টেস্টের জন্যে ৭,৫০০ পাউণ্ড এবং তিন-দিনব্যাপী প্রথম শ্রেণীর খেলার জন্যে ১,৫০০ পাউণ্ড করে পাবেন।

প্রশ্ন-উত্তর

শ্যামানন্দ দত্ত (শহীদনগর, ঢাকুরিয়া)

প্রশ্ন: মেওয়ালালের ঠিকানাটা কি জানাবেন?

উত্তর: মেওয়ালাল C/o. ক্রীড়াসম্পাদক, সাপ্তাহিক বসুমতী, কলকাতা-১২—এই ঠিকানায় আপনি চিঠি লিখতে পারেন।

সজলকান্তি চক্রবর্তী (পুরাতন মিশন রোড, করিমবাজার, কাছাড়, আসাম)

উত্তর: শান্ত মিত্র-র জায়গায় অশোক চ্যাটার্জীকে কেন বাংলা দলের অধিনায়ক মনোনীত করা হলো তা আমরা বলতে পারবো না, তবে এই বিষয়ে আমরা লিখেছি। আশা করি দেখেছেন।

'খেলার রাজার রাজা' ভালো লাগছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি।

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতি মুখোপাধ্যায় (বলাগড় রোড, হুগলী)

উত্তর: 'ক্রিকেট খেলার আইনকানুন' নামক বইটির জন্যে আপনি জ্ঞান-তীর্থ, ১নং বিধান সরণী, কলকাতা-১২-য় খোঁজ নিন।

অসিত দাস (ডিব্রুগড়, আসাম)

উত্তর: আপনার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আপনি যে কোন সিনেমা পত্রিকার সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রদীপ বিশ্বাস (গুলমা টি এস্টেট, দার্জিলিং)

প্রশ্ন: তেহেরানে অনুষ্ঠিত এশীয়ান চ্যাম্পিয়ান ফুটবল খেলায় বাংলা তার জাতীয় সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে কি?

উত্তর: আপনাদের কি মনে হয়...?

'আমার মতে' বিভাগটি আপনাদের ভালো লাগছে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

সাধনকুমার গাঙ্গুলী (মুখার্জীপাড়া, হালিসহর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন: সব দেশেই স্বীকৃত ব্যাটসম্যানকেই অধিনায়ক নির্বাচিত করার কি বিশেষ কোন যুক্তি বা তাৎপর্য আছে? দলের একজন স্বীকৃত বোলারকে (যিনি ব্যাটসম্যান হিসেবে খ্যাত নন) কখনো কি কোন দেশের অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে?

উত্তর: আমাদের গোলাম আমেদ, অস্ট্রেলিয়ার জনসন সাহেবের নাম এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন নাকি? ওঁরা দু'জন ছাড়া আরো কয়েকজন আছেন। সুতরাং অধিনায়ক হিসেবে শুধু ব্যাটসম্যানদেরই মনোনীত করা হয় এ ধারণা ঠিক নয়। উইকেটরক্ষক আলেকজান্ডার যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক হয়েছিলেন—এ কথাও নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। সুতরাং...

কল্যাণী সরকার (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৪)

প্রশ্ন: কোন্ কোন্ ভারতীয় ইউসডেনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন?

উত্তর: ১৮৯৭ সালে রণজিৎ সিংজী
১৯৩০ সালে দলীপ সিংজী
১৯৩২ সালে পাতৌদির নবাব (বড়)
১৯৩৩ সালে সি. কে. নাইডু
১৯৩৭ সালে বিজয় মার্চেন্ট
১৯৪৭ সালে ভিনু মানকাদ
১৯৬৭ সালে পাতৌদির নবাব (ছোট)

প্রতি বছর কলকাতার ফুটবল মরশুম শুরু হবার আগে চলে দল বদলের পালা।

আর এই দল বদলের পালায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লাভবান হয়ে থাকেন কলকাতার বড় বড় কয়েকটি দল। প্রায় প্রতি বছরই কলকাতার ছোট ছোট ফুটবল ক্লাবগুলি কিছু কিছু আনকোরা খেলোয়াড় সংগ্রহ করে তাদের গড়ে-পিটে তৈরি করেন।

কিন্তু এই তৈরি করাটুকুই সব। তৈরি করার দাম তাঁরা খেলোয়াড়দের

কাছ থেকে পান না। কারণ একটু ভালো খেলতে পারলেই তাঁরা বড় দলের কাছ থেকে আহ্বান পান। ফলে যাঁদের জন্য এ'রা নিজেদের তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের অসুবিধার কথা চিন্তা না করেই এ'রা বড় ক্লাবগুলির দিকে আকৃষ্ট হন।

অবশ্য এই আকৃষ্ট হবার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অন্য আকর্ষণও থাকে। অবশ্য এ জিনিসটা তলে তলে করা হয়ে থাকে। বড় বড় ক্লাবগুলি তাঁদের মান বাঁচাবার জন্য প্রতি মরশুমেই খেলোয়াড় সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে কলকাতার ছোট ছোট ক্লাবগুলির ক্ষতির পরিমাণই বেশি।

যাঁরা খেলোয়াড় তৈরি করেন তাঁরা যদি এভাবে তাঁদের কাছ থেকে বঞ্চিত হন তবে তাঁদের অবস্থাটা যে কিরকম হতে পারে তা ভেবে দেখবার মত।

তাই ছোট ক্লাবগুলির খেলোয়াড়-দের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন পাখনা গজানোর সংগে সংগে ভাল ঘরের খোঁজ না করে কিছুদিন পুরনো ঘরেই থাকবার চেষ্টা করেন। আর তাঁরা যদি নিজেদের ক্লাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন তবেই আজকের ছোট ক্লাবগুলি আগামী দিনের বড় ক্লাবে পরিণত হতে পারবে।

এর ফলে আর বড় ক্লাবগুলি নিজেদের প্রয়োজনে পয়সার পরিবর্তে খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে পারবেন না। ফলে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য এ'রা নিশ্চয়ই খেলোয়াড় তৈরি করার দিকে আরো বেশি নজর দেবেন।

আর এমন আইন তৈরি করা যায় কি না ভেবে দেখা দরকার যার ফলে খেলোয়াড়েরা প্রতি বছরই দল বদল করতে পারবেন না, একটা নির্দিষ্ট সময় তাঁদের কোন একটি ক্লাবের হয়ে খেলতেই হবে। আশা করা যায়—এর ফলে কিছু সুরাহা হতে পারে।

—পরিতোষ নাগ
বেলাকোবা
জলপাইগুড়ি

সম্পাদকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

এ.সরকার এণ্ড সন্স

৭৪ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 7th May, 1970

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্র-জন্মদিবস আগতপ্রায়। এই দিনটি কবির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন—যদিও কবি আমাদের জীবনের ধর্মে-কর্মে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছেন যে, কোনো বিশেষ দিনের পরিবর্তে আমরা প্রতিটি দিন কবিকে স্মরণ করে থাকি। কিন্তু কবিকে স্মরণ করা এক কথা, আর তাঁর বাঞ্ছিত কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর এক কথা।

গভীর দুঃখের কথা হলেও এটা সত্য যে, আজো কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের কাছে কবির সাহিত্য প্রচারিত। এমন হওয়ার কারণ এই, দেশব্যাপী অশিক্ষা। এ দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার হারের তুলনায় নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যার হার প্রায় তিনগুণ বেশি। সুতরাং নানা দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, কবিকে নিয়ে যতোটা আড়ম্বর করা হয়, তার চেয়ে কম হয় তাঁর সাধনাকে সফল করার চেষ্টা। বিশেষত পঁচিশে বৈশাখ এলেই আসে যেন একটা হুজুগ অথবা প্রথাগত ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা। কোথাও বা চলে কবিকে অবলম্বন করে ব্যবসায়িক হীন প্রচেষ্টা। কবির নাম ভাঙিয়ে হঠাৎ কোনো একটা নতুন কিছু করার দিকেও একালে যেন একটা ঝোঁক উঠেছে—ঐ ঝোঁকের উদ্দেশ্য যদি-বা কোথাও অ-সরল নয়, তবু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, উদ্যোক্তাদের প্রচারটাই যেন কাগজে-কাগজে বড় ওঠে।

আজ একথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতেই হবে, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তাঁর জীবনদর্শন সর্বব্যাপক হয় নি যে সব কারণে, সেই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য উপলব্ধির জন্য যে মেধা ও বুদ্ধির প্রয়োজন, দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তা আজো গড়ে ওঠে নি। হয়তো কেউ কেউ অধিকারভেদের কথা বলবেন। কিন্তু ঐ জাতীয় তর্ক তুলে সত্যকে ঢাকা যায় না। বরং এটাই যথার্থ যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য কিছুমাত্র শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য দায়ী এক শ্রেণীর শিক্ষিতরাই। ঐ সব শিক্ষিত ব্যক্তি রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছেন? নিরক্ষর ব্যক্তিদের পক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও কাব্য পাঠ করা যদিও সম্ভব নয়, তবু তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে যে জীবন-দর্শন অভিব্যক্ত হয়েছে, তা প্রচার করার জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, তাঁর প্রবন্ধাবলী শোনানো ও সে সব প্রবন্ধের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বোঝানো। রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করে শুধু শহরের কিছু দর্শককেই মুগ্ধ করা যায় না, তাঁর নাটক যথাস্থানে মঞ্চস্থ হলে দূর পল্লীর সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু ঐ সব কাজ করতে গেলে আছে অর্থব্যয় ও প্রয়োজন হবে প্রচুর পরিশ্রম। সুতরাং কলকাতার মতো বড় শহরে রবীন্দ্র-নাটক মঞ্চস্থ হলে শিক্ষিত দর্শকরা মেধার মূল্য দেয়, কাগজে-কাগজে সোর-গোল পড়ে এবং তাতে অর্থাগমও হয়। অতএব রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ হলেও দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ তার নাগাল পায় না।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য না হয় সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে গেল না পণ্ডিতম্মন্যদের ঔদার্যের অভাবে। কিন্তু সাহিত্য ছাড়াও তো রবীন্দ্র-চিন্তা সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষ—যারা রাজনীতি বোঝে না অথচ তার যাঁতাকলে অহরহ পেষাই হচ্ছে, যারা চলার পথে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, যারা গ্রাম-ভারতের বুকে আজো এক হতে পারল না, তাদের এক করে দিতে পারে, তাদের দিতে পারে শান্তিপূর্ণ জীবন—রবীন্দ্রনাথেরই অমোঘ নির্দেশ। সেই নির্দেশ রয়েছে কবির সমাজ সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে এবং পল্লী-সংবিধানে। সেখানে যে পথ-নির্দেশ কবি করে গেছেন, সাধারণ মানুষের কাছে আজো তা বাঁচার একমাত্র পথ। দেশ এখন নাকি অনেক এগিয়ে গেছে, রবীন্দ্র-সাধিত 'সমবায়' কথা এখন পুরাতন নয়, তবু দেশের কোটি কোটি মানুষ যে তিমিরে ছিল আজো সেই তিমিরেই অবস্থান করছে। রবীন্দ্রনাথ দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য যে বিধান দিয়ে গেছেন, তা কার্যকর করা সম্ভব হলে অন্তত দেশের সাধারণ মানুষ জেগে উঠত, নিজেদের উপলব্ধি করতে পারত।

দুর্ভাগ্যের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা এতো বেশি বলা হয় যে, রবীন্দ্র-দর্শন প্রয়োগের জন্য কিছুই করা হয় না এবং রবীন্দ্রনাথ যাদের কল্যাণের কথা বারবার বলে গেছেন, তারাই থেকে গেল অন্ধকারে।

তাই পঁচিশে বৈশাখ নিয়ে আসুক এমন আলো, যা দূর করবে অন্ধকার আর দেবে মোহমুগ্ধ রবীন্দ্রভক্তদের নব চৈতন্য।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

জাঁ পল সার্ত্র বরাবরই একজন বিতর্কিত পুরুষ। স্বদেশে মানে ফ্রান্সে তো বটেই, এমন কি বিদেশেও তাঁকে নিয়ে তর্কের শেষ নেই। সার্ত্রর এক-একটা বই বেরোয়, আর সারা দুনিয়ার চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মহলে ওঠে তর্কের প্রচণ্ড ঝড়। পুবে-পশ্চিমে, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায়। অথচ মজা হচ্ছে ধনবাদী সমাজ বা সমাজতন্ত্রীরা—কোনো পক্ষই দাবি করে না যে, সার্ত্র তাঁদেরই দলের। আবার এক পক্ষও তাঁকে অগ্রাহ্য করে বলে না যে, সার্ত্র তাদের সমর্থক নন। অর্থাৎ সার্ত্রকে দু' তরফই পুরোপুরিভাবে পেতে চায়, কিন্তু তিনি কোনো দলেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দিতে রাজি নন। আজ যে জাঁ পল সার্ত্র মাওপন্থী সাময়িকপত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণে বীরদর্পে এগিয়ে এলেন, তার মানে কি এই যে, তিনি মাওবাদে দীক্ষা নিয়েছেন? মনে হয় না। তার চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বোধহয় এই তত্ত্বই যে সার্ত্র যে বরাবরই দুঃসাহসী, বিবেকবান এবং স্বাধীনচেতা—এ কথাটার পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদবোধ। মাও সে-তুঙের আদর্শ ও নীতিতে আস্থাশীল প্যারিসের এই সাময়িকপত্রটি এতকাল যিনি, সম্পাদনা করছিলেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে: শূন্যেস্থান যাঁকে দিয়ে পূর্ণ করা হলো, তাঁকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে শ্রীঘরে পাঠিয়েছে। কিন্তু তার মানে কী? তার মানে কি এই যে, ফ্রান্সে আর লোক নেই? তার মানে কি এই যে, পুলিশের চোখ রাঙানিতে সরকারের রোষবহ্নির সামনে এই সাময়িকপত্র সম্পাদনার জন্য সাহসী লোক পাওয়া যাবে না? জাঁ পল সার্ত্র যেন ফরাসীদের সেই দুর্জয় সাহসিকতার চারিত্রিক গুণ ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই এগিয়ে এলেন। মাওবাদে তাঁর বিশ্বাস ও আস্থা কতখানি গভীর তা আমাদের জানা নেই। আসলে তিনি ফরাসী গভর্নমেন্টের চ্যালেঞ্জই গ্রহণ করেছেন সাময়িকপত্রটির সম্পাদনার ভার নিয়ে। তিনি দেখতে চান, সরকার তাঁকেও কারাগারে নিক্ষেপ করতে সাহস করে কি না।

অবশ্য মাও সে-তুঙ-এর রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শন যাই হোক না কেন, সার্ত্র

জাঁ পল সার্ত্র

যে-কোনো কারণে, এমন কি মাও-এর কাব্য ও সাহিত্যকৃতির জন্য তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। তাছাড়া রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ তো খাদের মতই সমান উঁচু পর্দায় বাঁধা। অতএব......

তর্ক, সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন সার্ত্র তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের কারণেই। তিনি এক্সিস্টেনশিয়ালিজম্‌ বা অস্তিত্ববাদে ঘোরতর বিশ্বাসী এবং তাঁর অনন্য গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে জোরালো যুক্তির সাহায্যে তা প্রচারও করে চলেছেন। সে যুক্তি সকলে মেনে নিতে রাজি হচ্ছেন না ঠিকই, কিন্তু সার্ত্রকে উড়িয়ে দিতেও কেউ ভরসা পাচ্ছেন না। সার্ত্রর রচনা প্রকাশ হলে সেটা না পড়লে বুদ্ধিজীবী মানুষের ঘুম হয় না।

সার্ত্র তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপে তিনি প্রথম অস্তিত্ববাদের প্রচার শুরু করেন। চারদিকে অন্ধকার, হতাশা এবং শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সার্ত্রর দর্শন বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করলো। তার ওপর আবার তিনি পেলেন কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষকতা। সার্ত্রকে আর পায় কে? সার্ত্রই দাঁড়িয়ে গেলেন সমগ্র বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সমাজের অবিসম্বাদিত নেতা। সে সূত্রে তিনি সোভিয়েট রাশিয়া সফরেও যান। কিন্তু কালক্রমে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে। বস্তুত স্বাধীনচেতা সার্ত্র কোনোরকম বিধিনিষেধ মেনে চলতেই রাজী নন। শুধু তাই তাঁর মত ঘন ঘন পাল্টালেও তিনি মনে করেন, তিনি যা করছেন সেটাই ঠিক এবং চূড়ান্ত।

সার্ত্র বহু বই লিখেছেন এবং প্রায় প্রতিটি গ্রন্থই চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী সমাজে দারুণ আলোড়ন এনেছে এবং বহু আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে। সাহিত্যের জন্য তাঁকে ১৯৬৪ সালে নোবেল পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু সার্ত্র সে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। দেখা যাক, এবার এই স্বাধীনতাপ্রিয় স্বাতন্ত্র্যকামী মনীষী, প্রবীণ সাংবাদিক, সম্পাদক মাওবাদী সাময়িকপত্রের পরিচালনা কেমন করে করেন।

আজ যখন বয়স সত্তর পার হয়ে গিয়েছে, যখন আমার চোখে বাইরের পৃথিবী স্তিমিত হয়ে আসছে, বহু চেনা মুখ, জানা জিনিষ চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েছে, তখন বাইরের শূন্যতা এসে মনের ঘরের ভিতরটা জুড়ে বসেছে। ঘরখানায় সঞ্চয় করা, কিনে-কেটে আহরণ করা কোন সামগ্রীই নেই। হারিয়ে-যাওয়া চেনা মুখ, আর জানা জিনিষগুলি মনের ভিতর জ্বলছে স্মৃতির প্রদীপ হয়ে। সেই সারি সারি দীপমালার মধ্যে শ্রদ্ধার মণিদীপদণ্ডের মাথায় যে দীপগুলি জ্বলছে তার মধ্যে সব চেয়ে উজ্জ্বল হল মহাকবির স্মৃতি। তাঁকে দেখেছিলাম, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, তাঁর স্নেহলাভ করেছিলাম—এ আমার জীবনের শ্লাঘ্যতম স্মৃতি-দীপ হিসাবে অনির্বাণ রয়েছে।

মহাকবির জন্ম যে সময়ে, সেই সমসাময়িক কালেই আমার পিতারও জন্ম হয়েছিল। মহাকবি আমার বাড়ির অনতিদূরে, দশ ক্রোশের মধ্যেই, শান্তিনিকেতনে তখন তাঁর সাধনার সাধনপীঠ স্থাপন করেছেন। পৌষ মেলার উৎসবে লাভপুর থেকে ছেলেবেলাতেই গিয়েছি শান্তিনিকেতনে। সেখানে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তাঁকেও নিশ্চয় দেখে থাকব। কিন্তু তখন তাঁকে চিনতে পারিনি, বুঝতে পারিনি। কিশোর পুত্র যেমন করে পিতার স্নেহচ্ছায়ার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়, আশ্রয় নেয়, আশ্বাস পায় তেমনি করেই সেদিন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু সে সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয় নি। তাঁদের [illegible] সভ্যতা ও আভিজাত্যের সঙ্গে আমাদের গ্রাম্য গৃহস্থ বংশের অনেক পার্থক্য ছিল।

তারপর অনেক কাল পার হয়ে গিয়েছে, প্রথম যৌবন তখন। দেশসেবা করি আর সাহিত্যচর্চা করি। সাহিত্যিক হইনি তখনও। সাহিত্যের নেপথ্যলোক আর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছি। নেপথ্যলোকেও তখন আর নেই অথচ সাহিত্যের প্রশস্ত মঞ্চেও তখনও পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় নি। সেই সময় সাক্ষাৎ ঘটল। স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে মহাকবি বীরভূমের পল্লী কর্মী ও সেবকদের সঙ্গে এক সাক্ষাতে মিলিত হলেন। সেদিন আমি সকলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলেছিলাম। সেদিন কবির সান্নিধ্যে গিয়ে সচেতনভাবে চিনলাম মহাকবিকে। আমি চিনলাম, কিন্তু তিনি সাহিত্যিক, আমাকে চেনেন নি। কর্মী আমাকেও তাঁর মনে রাখবার কথা নয় এবং সেও মনে ঠিক থাকে নি। তবে সামান্য উল্লেখেই তিনি স্মরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তারও বেশ কিছু কাল পর। তখন সাহিত্যিক স্বীকৃতি লাভ করেছি। তখন একাধিক গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা আমি। উপন্যাস 'রাইকমল' আর গল্পসংকলন 'ছলনাময়ী' প্রকাশিত হয়েছে। বই দুখানি অনেক শঙ্কা ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। সাত দিনের মাথায় উত্তর এসে গেল। সে পত্রে যত অকুণ্ঠ প্রশংসা, সস্নেহ উৎসাহ তার চেয়ে কম নয়। পত্র দুখানি বিধাতার আশীর্বাদের মত শিরোধার্য করে নিয়েছি। এই সময় তাঁর সঙ্গে সাহিত্যিক হিসেবে সাক্ষাৎ করতে যাব কি না তাই নিয়ে মনে মনে ইতস্তত ভাবছি। ঠিক এই অবসরে আমার কিশোর পুত্র আমাকে না জানিয়ে, আমার অজ্ঞাতেই তাঁকে প্রণাম করতে গেল।

তার কাছেই শুনেছি—সেদিন তারিখ ছিল ২রা চৈত্র। মধ্যাহ্নের সময় সে যখন মহাকবির কাছে গিয়ে পৌঁছুল তখন অবারিত কাঁচের জানলা দিয়ে হু হু করে গরম বাতাস এসে একখানা পত্রিকার পাতা ক্রমাগত উড়িয়ে চলেছে। পত্রিকাখানি সে মাসের প্রবাসী। সেই প্রবাসীতে আমার 'অগ্রদানী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। আমার ছেলে ঘরে ঢুকবার পূর্ব মুহূর্তেই তিনি সেই গল্পটি পড়া শেষ করেছেন। পিতামহ যেমন করে পৌত্রকে সকৌতুক ও সস্নেহ সমাদর করেন তেমনিভাবে তাকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে আলাপ করলেন মহাকবি। 'অগ্রদানী' গল্পটি তাঁর বিশেষ ভাল লেগেছে, আমার লেখা তাঁর খুব ভাল লেগেছে—এ কথা বার বার তাকে জানিয়ে তারই মারফৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বলে পাঠালেন।

সে আহ্বান উপেক্ষা করব এমন সাধ্য কি? গেলাম। সাহিত্যিক হিসাবেই গেলাম। এ কিশোর পল্লীবাসীর সাক্ষাৎ নয়, যুবক কর্মীর সাক্ষাৎ নয়, এ সাহিত্যিক সাক্ষাৎ। গেলাম শান্তিনিকেতন।

চৈত্রের দুপুর। বীরভূমের উত্তাপ। আমি পান্থনিবাসের উত্তরদিকের ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রয়েছি। [illegible]

দিয়ে সুধীনবাবু আসছেন। কবি তখন তাঁর নতুন বাসগৃহ 'পুনশ্চ'-তে থাকতেন। সুধীনবাবু এসেছেন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে।

ঘরের দরজায় এসেই বুক দুরদুর করে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুধীনবাবু ভিতরে ঢুকেই আবার পর্দা সরিয়ে ইশারা করলেন—আসুন।

ঢুকলাম। একটা মোড় ফিরেই একখানা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম—প্রশান্ত, সৌম্য, স্বর্ণকান্তি-দীর্ঘকায় কবির উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখেই আমি। কবির সামনে টেবিলের উপর লেখা কাগজ, হাতে কলম, কাগজের ওপাশে একটি পাথরের পাত্রে পূর্ণপাত্র গোলাপফুল, ওপাশে খোলা জানলার ওধারে বিস্তীর্ণ মুক্ত লাল-মাটির প্রান্তর দুপুরের রোদে ঝলসে যাচ্ছে; পাতা উড়ছে চৈতালী হাওয়ায়, কয়েকটি গাছে নতুন পাতার সমারোহ। উত্তপ্ত বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি তাঁকে ভালো করে দেখবার অবকাশ পেলাম না। চকিত হয়ে উঠলাম তাঁর প্রশ্নে।

দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। বললেন—এ কি? তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি তোমাকে?

আমি হতভম্ব হলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখেছি তোমাকে?

পূর্বে যে সাক্ষাতের উল্লেখ করেছি তার কথা তখন আমার স্মরণে আসে নি। আমি নিজেকে সংযত করে বললাম—আমার বাড়ি তো এ দেশেই। হয়তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েকবার আপনাকে দেখেছি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি তখনও স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

বোলপুরে স্টেশনে এমনি সন্ধানী দৃষ্টি দেখেছিলাম নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের চোখে। এমনি স্মৃতিমন্থন-করা, প্রশ্নভরা সন্ধানী দৃষ্টি।

আমার কথায় মহাকবি ঘাড় নেড়ে বললেন—না না। তোমাকে যে আমি আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে পুরনো কথা আমার মনে পড়ে গেল। বৎসর পাঁচেক আগে ১৯৩০ সালে সমাজ-সেবক কর্মীদের সঙ্গে কবি দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কি সেই কথা বলছেন? সেই অল্পক্ষণের স্মৃতি তাঁর মনে আছে?

আমি সসঙ্কোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ। মনে পড়েছে, তুমিই ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে তুমি। বস তুমি বস।

একটা মোড়ায় বসলাম।

আরম্ভ হল কথা। আমার সকল প্রশ্ন মূক হয়ে গিয়েছিল। তিনিই প্রশ্ন সুরু করলেন।

—কি কর?

বললাম—করার মতো কিছুতে মন বসে নি। চাকরিতেও না, বিষয় কর্মেও না। কিছুদিন দেশের কাজ করেছি—

—অর্থাৎ জেল খেটেছ?

—হ্যাঁ।

—ও পাক থেকে ছাড়ান পেয়েছ?

—জানি না। তবে এখন ভাঙি পেয়েছি।

—সেইটে সত্যি হোক। তা হলে তোমার হবে। তুমি দেখেছ অনেক। এত দেখলে কি হবে?

—কিছুদিন সমাজ-সেবার কাজ করেছি। আর কিছুদিন বিষয়কর্ম করেছি। সামান্য কিছু জমিদারী আছে। ওই দুই উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি। কারবারও করেছি।

—সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড় কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।

তারপর হেসে বললেন—তবে এ কথার শুরু আমিই প্রথম করেছি। আমি যখন বাংলা দেশের গাঁয়ের ঘাটের কথা লিখি তখন বাংলা সাহিত্যে রাজপুতানার রাজত্ব চলছে।

আবার বললেন—তুমি দেখেছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি। তোমরা আমাকে দেখতে দাও নি। আমাদের তো পতিত করে রেখেছিলে তোমরা।

আমি মাথা হেঁট করে রইলাম।

আবার বললেন—দেখবে, দু'চোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে। সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার আছে।

এবার আমি বললাম—পোস্টমাস্টারের পোস্টমাস্টার, রতন, ছুটির ফটিক, ছিদাম রুই, দুখীরাম রুই এদের কথা—

—ওদের দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারীতে। ওই যারা কাছে এসেছে, তাদের কতকটা দেখেছি, কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।

এর পরই কথা উঠল লাভপুরের।

সেখান থেকে কেমন করে যেন কথাটার মোড় ফিরে গেল সাহিত্য-সমালোচনার প্রসঙ্গের দিকে। ওই, আমার কলমের স্থূলতার অপবাদের কথা উঠল। হঠাৎ যেন রক্তোচ্ছ্বাসে মুখখানি ভরে উঠল। বললেন—এ [illegible]

পারবে। পেতে হবে। যত ভাববে তত তোমাকে কতবিকত করবে। এ দেশে জন্মানোর ওই এই কঠিন জ্বালা। আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—মধ্যে মধ্যে ভগবানকে বলি, কি জান তারাশঙ্কর? বলি, ভগবান, পুনর্জন্ম যদি থাকে তবে এ দেশে যেন না জন্মাই।

আমি বিব্রত হয়ে গেলাম। বিবেচনা করলাম না কাকে বলছি, কি বলছি। বলে উঠলাম—না না, এ কথা আপনি বলবেন না। না না।

হাসলেন তিনি এবার। আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—তোমার এইটুকু যেন চিরকাল বেঁচে থাকে, বাঁচিয়ে রাখতে পার যেন।

আর কথা হল—তখনকার লীগ রাজত্বে বাংলাভাষাকে যে আরবী-ফারসী শব্দবহুল করবার চেষ্টা হচ্ছে তাই নিয়ে। বললেন—তাই তো ভাবি, যা করে গেলাম তা কি এর পরে শিলালিপির ভাষার মতো গবেষণার সামগ্রী হয়ে তাকে তোলা থাকবে? অনেক উদাসদৃষ্টিতে উত্তরদিকের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কোথায় যেন ডাকছিল একটা চিল।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন—তোমার 'ডাইনীর বাঁশী'-র চিলটার কথা মনে পড়ছে। গল্পটি খুব ভাল লেগেছে আমার।

আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না এমন সস্নেহ সমাদরের ভার।

কথার জের টেনে তিনি বললেন—কলকাতার একজন বড় পণ্ডিত সাহিত্যিক এই গল্পটির কথা শুনে কি বললেন জান?

আমি দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলে নীরবে চেয়ে রইলাম।

কবি বললেন—তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুনে। বললেন উইচক্র্যাফট্ নিয়ে বাংলা গল্প? এ নিশ্চয় ইউরোপের গল্প। ওদের দেশের গল্প পড়ে লিখেছে।

অর্থাৎ চুরি করেছি আমি।

আমি একেবারেই গ্রাম্য লোকের মত বলে উঠলাম—না, না। স্বর্ণ ডাইনী যে আমাদের পাড়ায় থাকে। এখনও আছে। আমাদের কাছারী বাড়ির সামনের পুকুরের ঈশান কোণে তার বাড়ি। আর—

এতক্ষণে একটু সংযত হয়ে সবিনয়ে বললাম—আমি তো ইংরিজীও ভাল জানি না। যেটুকুও জানি তার উপযুক্ত পড়বার বইও পাই না আমাদের দেশে। কোথায় পাব? ওদের দেশের গল্প তো আমি বেশি পড়িনি।

তিনি হেসে বললেন—আমি জানি। আমি বলতে পারি তোমাকে আমি বুঝেছি। সেবার আমাই বুঝেছি। ও কথাটা তোমাকে বললাম কেন জান? বললাম আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সঙ্গে পরিচয় কত সংকীর্ণ তাই বোঝাবার জন্য। ডাইনী মানে ওদের কাছে উইচক্র্যাফট্। আর তাই সে ইউরোপ ছাড়া এ দেশে কি করে হবে? আমাদের দেশের ডাইনী এঁরা দেখেন নি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। আমি তাই ওঁদের বললুম—উঁহু, উঁহু! এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকছে, মাঠটা তার ধূ ধূ করছে। আর নিজের ঘরের দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী বসে আছে আচ্ছন্নের মত। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো চিলের ডাক শুনে ছবিটা চোখে ভেসে উঠল, গল্পটা মনে পড়ে গেল।

ওদিকে অপরাহ্নের আভাস ফুটে উঠল প্রান্তরের রৌদ্রাকীর্ণতার মধ্যে। সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

বললেন—এখানে এস। যখন ক্লান্তি হবে এখানে চলে এস। দরজা খোলা রইল।

আমি ইঙ্গিত বুঝলাম। প্রণাম করলাম। সুধীনবাবু এসে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সুধীনবাবু আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পান্থ-নিবাসে।

আমি আর এক মুহূর্ত দেরী করলাম না। আমার আর ঠাঁই নেই। সব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চলে এলাম লাভপুর।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা কবির নিজের জবানীতেই বলা যাক। রবীন্দ্ররচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে "সাহিত্যের পথে"র সূচনাংশ থেকে তুলে দিই।

"আমি অনেক দিন থেকেই প্রতিশ্রুত আছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরে কিছু বলব। এতদিন সেই প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পারি নি, তার কারণটা আমার প্রকৃতিগত।...

এবার যখন সুদূর চীন-যাত্রা করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, তখন বহুমানভাজন আমাদের সভাপতি মশায় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আমার প্রতিশ্রুতির কথা।...

অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র—ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র—হঠাৎ একদিন আমার প্রভাতভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। বলে ইংরেজীতে শুরু করলেন: "Is art too good to be human nature's daily food ?"

বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে বহু-লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা তর্ক আছে। সে তর্কটি এই যে, যে সকল সাহিত্য বা শিল্পরচনার প্রয়াস আমাদের জীবনযাত্রার আনুকূল্য করে, মানুষকে ভালো করে বা সমৃদ্ধ করে বা সুদক্ষ করে, তার সামাজিক বা অন্য কোনো প্রকার সমস্যাপূরণের সহায়তা করে, সেই আর্ট শ্রেষ্ঠ কি না। অর্থাৎ, কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কি না। সেই ছাত্রটির এই প্রশ্নই আমি আজকের সভায় মনের মধ্যে করে নিয়ে এসেছি। এই প্রশ্নের সূত্রটিকেই অবলম্বন করে, চিন্তা ও ব্যাখ্যা করে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।"

কবি সেদিন লিখিত ভাষণ দেন নি। তাঁর মৌখিক ভাষণের অনুলিখনে হয়তো কিছু ভুলচুক ছিল। 'অর্থাৎ' না হয়ে 'অথবা' হলে ঠিক হতো।

যা হোক, সে ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কবি আমাকে বলে-ছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় এসো, তোমার প্রশ্নের উত্তর সেইখানেই দেব।" কিন্তু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমন করে যাই? সরস্বতীপুজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাটনার ছেলে পাটনায় ফিরে যাই।

তখন আমি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। আর্ট নিয়ে তখন থেকেই ভাবছি। আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারতেন এক রবীন্দ্রনাথ, আরেক প্রমথ চৌধুরী। দুজনের একজনের সঙ্গেও আমার যোগা-যোগ ছিল না। যদিও আমি উভয়েরই ভক্ত। একদিন কলেজের ছুটিতে শান্তি-নিকেতনে গিয়ে বার বার তিনবার চেষ্টা করে তৃতীয়বার কবিকে নিভৃতে পাই। সে আর কতক্ষণের জন্যে! সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে দীনবন্ধু অ্যাণ্ডরুজ এসে হাজির। কবি আমাকে বিদায় দিলেন।

তখন কি আমি জানতুম যে, পরে একদিন আমি "পথে প্রবাসে" লিখব ও সেইভাবে আত্মপরিচয় দেব? প্রথম সাক্ষাৎকারে কবিকে আমার নাম বলি নি, তিনিও উল্লেখ করেন নি। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। পাঁচ-ছয় বছরের ব্যবধানে তিনি আমার নাম জেনেছেন, রচনা পড়ে-ছেন ও পড়ে প্রশংসা করেছেন। তাই আলাপটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়, পাশাপাশি বসে।

প্রথম সাক্ষাৎ চীন-যাত্রার প্রাক্কালে। তার মানে ১৯২৪ সালে। শেষ সাক্ষাৎ তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে। অর্থাৎ ১৯৪০ সালে। ইতিমধ্যে কয়েকবার দেখা হয়েছে। একবার তো তাঁকে আত্রাই নদীর বোট থেকে স্বাগত করে নিয়ে গিয়ে আত্রাইঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসাই ও ট্রেন এলে তাঁর সঙ্গে এক কামরায় নাটোর অবধি যাই। ততদিনে আমি রাজশাহী জেলার শাসক। প্রথম সাক্ষাতের তেরো বছর বাদে। আর্ট তখন মাথায় উঠেছে। আলাপ হলো বিচিত্র বিষয়ে। সাহিত্যও তার মধ্যে ছিল।

রবীন্দ্ররচনাবলীতে আমার উল্লেখ আরো এক জায়গায় আছে। কবির শেষ জন্মদিনের কবিতাটি আমাকে উদ্দেশ করে লেখা। বাঁকুড়ায় থাকতে হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ওটি পাই। বাংলা টাইপরাইটারে অন্য কাউকে দিয়ে লেখানো। নিচে হিজিবিজি স্বাক্ষর। তাঁর অত সুন্দর হাতের লেখার করুণ পরিণতি দেখে দুঃখ হলো। কিন্তু কল্পনাও করতে পারি নি যে, তিন মাসের মধ্যেই তাঁকে হারাব। কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বহু পূর্বেই আমি তাঁর একজন অন্ধ ভক্ত। তেমন ভক্তি আমি আর কারো প্রতি অনুভব করি নি। মনে মনে তাঁকে অনু-করণ করেছি। কিন্তু চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করি নি। আমার নিজেরই নিজের সাহিত্যিকতার উপর ভরসা ছিল না। সূচনাটা একান্ত প্রতিশ্রুতিহীন।

প্রস্তুত হচ্ছিলুম আমি ইংরেজী ভাষায় সাংবাদিক হতে। ইংরেজী চর্চায়

কুসুমের মাসে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এবার সত্যিই ঝড়, কুসুমের মাসে,

সমস্ত আকাশ রাঙা হ'য়ে আসে,
তোলপাড় মানুষের মুখগুলি।

তোমার আশ্চর্য তুলি
কোথায় রেখেছ সন্তর্পণে, কবিগুরু!
বুকের মধ্যের দুরুদুরু
চেপে আমি হাতড়াই প্রতিটি সিন্দুক,
আলমারী।

তুমি না অভয় দিলে দৃশ্যগুলি ধরে
রাখতে পারি
সে শক্তি আমার নেই। চারদিকে মহৎ শব্দ
তবু বুক ভেঙে ফেলতে চায়।

যেদিকে তাকাই দেখি শুধু ভোর, জন্মভূমি
সবিতাকে প্রণাম জানায়।

ফাঁকে ফাঁকে বাংলা, ওড়িয়া দুই ভাষায় সাহিত্যের শৌখীন শিক্ষানবীশী করতুম। আশ্চর্য হয়ে যেতুম "প্রবাসী" ও "ভারতী"তে আমার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দেখে। আর "উৎকল সাহিত্যে" আমার ওড়িয়া প্রবন্ধ ও কবিতা। একটি ওড়িয়া বারোয়ারি উপন্যাসের গোটা তিনেক পরিচ্ছেদ লিখতে গিয়ে আমি নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করি। এর পরে ওড়িয়া একেবারেই ছেড়ে দিই। বাংলাও বোধহয় ছাড়তুম, যদি সত্যি সত্যি সাংবাদিক হতুম ইংরেজী ভাষায়। তা না হয়ে হলুম আই-সি-এস। বাংলাদেশে কাজ করতে এলুম। চাকরির জন্যে বাংলা ছাড়তে হলো না। বাংলার জন্যেই চাকরি ছাড়তে হলো একুশ বছর বাদে।

আমার সাহিত্যসাধনার আদিপর্বে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আমার দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। কিন্তু ক্রমেই আমি আপনার স্বকীয় বিষয় ও লিখনশৈলী আবিষ্কার করি। স্বাধীনতা ঘোষণা করি। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুই স্বাধীন লেখকের। গুরু-শিষ্যের নয়। তখন আর আমি তাঁর অন্ধ সমর্থক নই। তবে বিরূপ সমালোচকও নই। ধীরে ধীরে আমার চিন্তাধারা পাশ্চাত্য হয়ে যায়। পরে গান্ধীমার্গী। টলস্টয়মার্গী। রবীন্দ্রনাথ তা বলে আমার মনের আড়ালে চলে যান নি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি যে প্রবাহ নেমে এসেছে, আমি সেই প্রবাহেরই সামিল।

রবীন্দ্রনাথই বাংলার রেনেসাঁসের পরিপূর্ণতা। আমরা যারা পরে জন্মেছি, তারা সেই পরিপূর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারব কি? তাঁর প্রয়াণের সময় থেকেই এ প্রশ্ন আমাদের আকুল করেছে। আমরা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে ও প্রকারে এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছি। অনেকে আবার রেনেসাঁসকেই অতিক্রম করতে চান। সেটা আমার মতে অ-পথ। বাংলার রেনেসাঁস এখনো অসমাপ্ত। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য করে রেনেসাঁসের সমাপ্তি হতে পারে না।

আমি যখন স্কুলের ছাত্র, তখন আমাদের হেডমাস্টার মশায় আমাদের দিকে চেয়ে যেন আমাকেই বলছেন এমনভাবে বলেন, "রবীন্দ্রনাথকে লোকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে, কিন্তু সে বিষয়ে আমি অতটা নিশ্চিত নই। তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে তিনি গদ্যলেখক হিসাবে শ্রেষ্ঠ।" মাস্টার মশায় বোধহয় জানতেন যে আমি একজন রবিভক্ত। সেই সময় থেকেই আমিও বার বার ভেবেছি যে কাব্যে তিনি যত বড়ো, তার চেয়ে কম বড়ো নন গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে। তাঁর মতো সব্যসাচী লেখক তো এদেশের সাহিত্যে নেই-ই, বিশ্ব-সাহিত্যেই বা কোথায় ও ক'জন!

তাঁকে অতিক্রম করতে হলে একটা বা দুটো শাখা বেছে নিতে হবে। তাছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু রেনেসাঁসের বাইরে গিয়ে নয়। তার ভিতরে থেকেই। বাইরে গেলে হয়তো আমরা আর্টের চৌহদ্দির বাইরেও চলে যাব।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছিলেন যে, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, তবু তাঁর ভাষণ আমার জিজ্ঞাসার সম্যক উত্তর হয় নি। পরে সেই একই প্রশ্ন নিয়ে আমি সুইজারল্যাণ্ডে রম্যাঁ রলাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলুম। তাঁর উত্তরেও আমি পরিতৃপ্ত হই নি।

এখনো আর্ট মানবপ্রকৃতির দৈনন্দিন ভোজ্য হয়ে ওঠে নি। যেখানে হয়েছে, সেখানে তার উৎকর্ষ বজায় থাকে নি। কী করে তার উৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে সর্বজনের ভোজ্য করা যায়, এটা যেমন কালকের প্রশ্ন ছিল, তেমনি আজকেরও প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে একথাও বলেছিলেন যে, আর্ট হবে উচ্চতর গণিতের মতো। তাকে সরল করা চলবে না, তাতে জল মেশানো চলবে না। যারা তাকে চায়, তাদেরকেই আরো উচ্চে উঠতে হবে। আমি নিজের জন্যে একটা মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছি। পাঠকের খাতিরে আমি যথাসম্ভব সরল করব, সহজ করব, কিন্তু আমার খাতিরে পাঠককেও অর্ধেক পথ এগিয়ে আসতে হবে।

কবির সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান সামান্যই ছিল। যতদূর মনে পড়ে তাঁর কাছ থেকে বার দুই টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম। বৈষয়িক টেলিগ্রাম। আর চিঠি মাত্র একখানি। আমার নিজের একখানি কাব্যগ্রন্থের সম্বন্ধে দু'কথা।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(১১)

১৯৩৮ সালে বসু-জিন্না আলোচনার সূত্রে আমরা ইংরাজ আমলে মুসলিম রাজনীতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শেষ পর্যায়ে জিন্নার নেতৃত্ব অবিসংবাদিত বলে জিন্না প্রসঙ্গ আমাদের বলতে হচ্ছে বেশিভাবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য শেষ পর্বে প্রধানত গান্ধী, নেহরু ও জিন্না ইংরাজের সঙ্গে সহযোগে (কিংবা বিবাদে) নির্ধারণ করেছিলেন; তাই এই তিনজনের পারস্পরিক সম্পর্ক আর একবার আলোচনা করে নেওয়া যায়, কারণ রাজনীতিতে অনেক সময়ে ব্যক্তিগত মনোভাব, অভিরুচি বৃহৎ স্থান অধিকার করে, এবং ঘটনাবলীর উপরে তার প্রভাব অল্প নয়। জিন্না গোড়ায় জাতীয়তাবাদী ছিলেন—যদি শেষ পর্যন্ত থাকতেন তাহলে কি ভারতের ভাগ্য একই রকম থাকত? গান্ধী সম্বন্ধে জিন্নার মনোভাব এবং জিন্নার বিষয়ে নেহরুর বিরূপতা রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করেছিল, এসব প্রশ্ন স্বাভাবিক, যদিও সম্পূর্ণ মীমাংসা দুরূহ।

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে জিন্না রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছিলেন, একথা আমরা আগেই জেনেছি। গান্ধীর মেঠো রাজনীতি এই অভিজাত মানুষটিকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। তাছাড়া গান্ধীকে তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখেছিলেন যিনি মুসলিম রাজনীতির দিকেও হস্তপ্রসার করতে চান। জিন্নার কাছে 'জনগণকে ভাবাবেগের সাহায্যে জাগিয়ে তোলা পাপ',১ গান্ধী 'হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট'—জিন্নার মতে—যিনি সম্মোহিত করে রেখেছিলেন হিন্দুদের এবং তিনি দুর্বোধ্য একটি চরিত্র, সেই দুর্বোধ্যতা বহুলাংশে রাজনৈতিকও বটে। "গান্ধীর মিস্টিসিজম আমার কাছে এত বড় মিস্ট্রি যে, তার কিনারা করতে পারি না"—জিন্না বলেছিলেন এবং ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে একবার তাঁকে সারারাত বিনিদ্র থাকতে হয়েছিল গান্ধীর একটি বিবৃতির অর্থ করতে। "লোকটির মনে কি আছে"—তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন, পারেন নি, কারণ জিন্নার মতে লোকটি পিছল, ধরা যায় না এবং সবচেয়ে আপত্তিকর হল—"অস্পষ্ট, উদ্ভট দার্শনিকতায়" নিজেকে ঢেকে রাখতে চায়। জিন্নার একবার মনে হয়েছিল, গান্ধী প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছেন; গান্ধী তা না মেনে বললেন, অন্তরের আলোক তাঁকে মন বদলাতে বলেছে। জিন্না দারুণ বিরক্তিতে বলেছিলেন, "জাহান্নমে যাক অন্তরের আলোক, লোকটা সৎ হয়ে বলে না কেন ভুল করেছিলাম।"

গান্ধী মানুষের যতখানি কাছে আসতে পারতেন, জিন্নার স্পর্শকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে তা ঘৃণ্য ব্যাপার। সুসজ্জিত জিন্না মানুষকে দূর থেকে নির্দেশ দেবেন, সেই তাঁর অভিপ্রায়, অর্ধনগ্ন গান্ধী অনুরূপ মানুষগুলিকে কাছে টেনে নেবেন—সেই তাঁর ভবিতব্য। গান্ধী ও জিন্না উভয়কে চিকিৎসা করেছেন এমন একজন ডাক্তার বলেছেন, "গান্ধী প্রায়ই বলতেন, cleanliness is *not* next to Godliness: it *is* Godliness। গান্ধী শারীরিক অভ্যাসসমূহে অত্যন্ত সচেতনভাবে, সতর্কভাবে পরিচ্ছন্ন ছিলেন, তথাপি দরিদ্রদের সেবা করার জন্য নিজের হাত নোংরা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। জিন্না সে মানুষ নন, পরিচ্ছন্নতা তাঁর ব্যক্তিগত বাতিক। দিনের মধ্যে প্রায়শ তিনি হাত ধুতেন, এবং অন্তর্বাস বদলাতেন; অন্য লোককে ছুঁতে চাইতেন না—যেন নিষ্কলঙ্ক ও নিঃসঙ্গ থাকাই তাঁর অভিপ্রায়।"

জিন্নার এই শারীরিক বিচ্ছিন্নতাকে গান্ধী একবার আক্রমণ করেছিলেন। উভয়ের এক সাক্ষাৎকালে রাজনৈতিক আলোচনার শেষে ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনার সময়ে জিন্না বললেন, তাঁর একটা পায়ে কিসব 'বিজকুড়ি' বেরিয়ে কষ্ট দিচ্ছে। গান্ধী তৎক্ষণাৎ মাটিতে বসে পড়ে জিন্নাকে তাগিদ দিলেন, জুতো-মোজা খুলুন, কি হয়েছে দেখব। অতিরিক্ত আত্মসচেতন জিন্নার তখন চরম অপতিভ অবস্থা—কিন্তু গান্ধীর হৃদয়বত্তা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। গান্ধী

১ হায় হায়! "জনগণকে ভাবাবেগের সাহায্যে জাগিয়ে তোলার" ব্যাপারেও জিন্নাকে গান্ধীর আনুগত্য করতে হয়েছিল! এবং একথা ইতিহাস থেকে কখনো মুছে দেওয়া যাবে না, গান্ধী অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করলেও শুভ উদ্দেশ্য তার নিয়ামক ছিল কিন্তু জিন্না-সৃষ্ট অন্ধ আবেগ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বই আর কিছু চায় নি।

সত্যই জিন্নার পা পরীক্ষা করেছিলেন (মাটির পা!) এবং পরদিন খানিকটা মাটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পায়ে লাগাবার জন্য, যাকে সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করে জিন্না স্বাভাবিক-ভাবে সরিয়ে রেখেছিলেন।

জহরলাল নেহরু কিন্তু গান্ধী নন, অতীব সমাজতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পোষাক-পরিচ্ছদে এবং ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় তিনি অর্ধনগ্ন ফকিরের বিদ্রোহী রাজপুত্র। তাঁর অভিমান ছিল তিনি চিন্তার ভাষায় কথা বলতে পারেন এবং স্বভাব ছিল, আবেগভরে চিন্তার ভাষাকে অসংলগ্ন করে তোলা। জিন্নার শরগুলি নেহরুর ফানুসকে বারে বারে ফাঁসিয়ে দিয়েছে এবং নেহরু কখনো তা ক্ষমা করেন নি। তিনি যতদিন পারেন জিন্নাকে অবজ্ঞা করেছেন, যখন তা করা সম্ভব হয় নি—ঘৃণা করেছেন। জিন্নাও নেহরুর দুলাল-ভাবকে ক্ষণে ক্ষণে নির্মমভাবে কথার শূলে চড়িয়েছিলেন। নেহরু তাঁর কাছে "একটি পিটার প্যান, যে কখনো কিছু শিখবে না বা ভুলবে না।" অপরপক্ষে জিন্না সম্বন্ধে নেহরুর ধারণা (যা তিনি মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন): "জিন্নার সাফল্যের মূলে স্থায়ীভাবে নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করার তাঁর কৃতিত্ব"—এই ভূমিকা তিনি ১৯৩৫ সাল থেকে একাদিক্রমে নিয়ে গেছেন—হ্যামস্টেড হীথের অবসর জীবন থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর থেকে। জিন্না ফিরে এসেছিলেন কেন? নানা জনে নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ডঃ রমেশ মজুমদার একটি শোনা কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। জহরলাল নাকি বলে ফেলেছিলেন, "রাজনীতিতে জিন্না এখন আর গণনীয় কোনো ব্যক্তি নন।" কথাটা জিন্নাকে এমনই বিঁধেছিল যে, তিনি সত্যই গণনীয় তা প্রমাণ করবার জন্য ফিরে এসেছিলেন। কাহিনীর সত্যতায় প্রশ্ন না করেও বলতে পারি, গল্পটির যতখানি মূল্য পাওয়া উচিত তার বেশি যেন না পায়, এবং ডঃ মজুমদারও নিশ্চয় তা দিতে চান না। লিওনার্ড মোসলে জিন্নার প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে লিয়াকত আলীর ভূমিকা বড় করে দেখিয়েছেন। "জিন্না তখন ইংলণ্ডে প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করছেন। মুসলিম লীগের সদস্য নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান ইউরোপে গিয়েছিলেন হনিমুনের জন্য, জিন্নার সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। লিয়াকত প্রথমাবধি জিন্নার অনুরাগী, কংগ্রেস নেতাদের, বিশেষত কংগ্রেসী মুসলমানদের হাতে জিন্নার অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁর মনে আক্রোশ ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছিল—জিন্নার কাছে গিয়ে তিনি ভারতে মুসলিম লীগের শোচনীয় অবস্থার ছবি আঁকলেন, প্রতিষ্ঠানটি দিশারী নেতার শক্ত হাত না পেয়ে অরণ্যে পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে—লিয়াকত জিন্নাকে ভারতে ফিরে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নিতে বললেন। জিন্না বিবেচনা করে বললেন, লিয়াকত যদি যথেষ্ট পরিমাণে সমর্থন জোগাড় করতে

জিন্না-গান্ধী বৈঠক

পারেন, তাহলে যেন তার করেন, তিনি ফিরে যাবেন। বোম্বাইয়ে ফেরার ৪৮ ঘণ্টা পরে লিয়াকত তার করলেন, একটি কথা, 'আসুন'।"

জহরলালের অবশ্য ধারণা, মোসলের লেখায় পাই, প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিসে আপেক্ষিক ব্যর্থতা এবং গান্ধীর উপরে শোধ তোলার ইচ্ছাতেই জিন্না ফিরে এসেছিলেন। "নেহরুর মতে, জিন্না মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করে-ছিলেন মাত্র একটি কারণে, গান্ধীকে এবং যেসব কংগ্রেস ডেলিগেটরা তাঁকে বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করেছিল তাদের ধাতানি দেবার সুযোগ এর দ্বারা তিনি পাবেন। মুসলিম লীগের নীতিতে তিনি পরবর্তীকালে যে হিন্দুবিরোধী, বিচ্ছিন্নতা-কামী আকার দিয়েছিলেন তার মূলে ইসলাম বা পাকিস্তান সম্বন্ধে বিশ্বাস নয়—তার দ্বারা তিনি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন এবং ক্ষমতা পাবেন—সেই ছিল উদ্দেশ্য।" অন্যত্র পাই—"জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগ করার আসল কারণ কি জানেন—কংগ্রেস ১৯২০ সালে সহসা ভূমিকা বিস্তৃত করে জনগণের কাছে আবেদন করতে আরম্ভ করেছিল, আর জিন্নার সেটা পছন্দের জিনিস ছিল না। কংগ্রেস তখন আর ভদ্রলোকদের দল নয়। জিন্নার সব সময়ে ধারণা, ম্যাট্রিক পাশ না করলে কেউ যেন কংগ্রেসের সদস্য হতে না পারে। এই মান যে কোনো দেশের পক্ষে উঁচু, আর ভারতের ক্ষেত্রে এর অর্থ—জনগণ কোনোদিন কংগ্রেসে আসতে পারবে না। জিন্না একটি স্নব। চাষীরা কংগ্রেসে যোগ দিতে আরম্ভ করলে তিনি বিরক্ত, বিব্রত হলেন। কী কাণ্ড, এদের অনেকেই যে ইংরেজী পর্যন্ত বলতে পারে না! লোকগুলো চাষার পোষাক পরে আছে। ওসব দলে আমি নেই।"২ কংগ্রেসের নেতা হবার যোগ্যতা জিন্নার নেই, এমন কি নেহরুর মতে, মুসলমানদের নেতা হবার অধিকারও তাঁর নেই: "মুসলমানদের জন্য জিন্নার

২ জিন্না নাকি হাউস অব কমন্সে শ্রমিক সদস্যরূপে প্রবেশ করে ভারতের সেবায় লাগতে চেয়েছিলেন, দাদাভাই নৌরজী বহু বছর আগে যে চেষ্টা করেছিলেন। জিন্নার মৃত্যুর পরে ম্যানচেস্টারের সানডে ক্রনিকল কাগজ লেখে, জিন্না ইয়র্কশায়ারের ডিভিশনাল লেবার পার্টির সিলেকশন কমিটির সভায় বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ফিটফাট পোষাকের জন্য শ্রমিকরা তাঁকে ভাগিয়ে দেয়। ও ধরনের চালিয়াত বাবু-ব্যক্তিকে তাদের দরকার নেই—তারা বলেছিল। জিন্নার জীবনীকার অবশ্য বিষয়টি যথোচিত সংশয়ের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

নেহরু ও জিন্না

কোনো যথার্থ অনুভূতি নেই। সত্যকারের মুসলমানই উনি নন। মুসলমানদের আমি জানি, আমি কোরান জানি, আমার মুসলমান আত্মীয় ও বন্ধু আছে। জিন্না মুসলমানের কোনো একটা প্রার্থনাস্তোত্রও আবৃত্তি করতে পারেন না, কখনো কোরানের পাতাও উল্টে দেখেন নি। কিন্তু যখন মুসলিম লীগের নেতৃত্ব তাঁকে উপহার দেওয়া হল, তিনি দেখলেন মহা সুযোগ—নিয়ে নিলেন। ইংলণ্ডে আইন ব্যবসায়ে কমবেশি ব্যর্থতাই জুটেছিল, সেখান থেকে

[illegible]

কাহিনীর দ্বারা বোঝাতে পারি। শুনেছি, প্রথম কং ইংলণ্ডে গেলেন, তখন কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি সেখানকার রাজনীতিতে যোগ দেবেন কি না? জিন্না বলেছিলেন, তিনি ভাবছেন। তাঁকে তখন জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি কনজারভেটিভ, না লিবার‍্যাল—কি হবেন? 'আমি এখনো মনস্থির করি নি'—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। জিন্নার কোনো গুণ নেই, একমাত্র সাফল্য ছাড়া। "জিন্নার যথার্থ কোনো শিক্ষা নেই; যাঁকে শিক্ষিত লোক বলা যায় জিন্না তা নন। আইনের বই তিনি পড়েছেন, কখনো-সখনো হাল্কা উপন্যাস, কিন্তু পড়া বলতে যা বোঝায়, যে সব বইকে নাড়াচাড়া করা বোঝায়, তা কদাপি করেন নি।"৩ জহরলালের ভঙ্গুর মেজাজ ইতিহাস-বিখ্যাত। ব্যক্তিগত বিরক্তি তিনি গোপন করতে পারতেন না। সুতরাং মোসলেকে ব্যক্তিগতভাবে যা বলেছিলেন, সেই ধরনের কথা কয়েক বছর আগে 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে লিখেও ফেলেছিলেন। জিন্নার সামর্থ্য, লেগে থাকার ক্ষমতা, শাসনক্ষমতার জন্য লোভ না থাকা প্রভৃতি গুণের কিছু প্রশংসা করার পরে জিন্নার ব্যর্থতার, সংকীর্ণতার এবং ট্রাজেডির যে-ছবি এ'কেছেন তার উপাদেয় সাহিত্যরস রাজনৈতিক জিন্না কতখানি উপভোগ করেছিলেন জানি না। জহরলাল লিখেছিলেন:

"মিঃ এম এ জিন্না মুসলিম লীগে তাঁর অধিকাংশ সহযোগীর চেয়ে অনেক অগ্রসর মানুষ। ঠিকভাবে বলতে গেলে, তাদের তুলনায় বহু উঁচুতে তাঁর মাথা এবং সেজন্য তাদের অপরিহার্য নেতা। বক্তৃতামঞ্চ থেকে সহকর্মীদের সুবিধালোভের বা আরো খারাপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি ভালই জানেন মুসলমানদের মধ্যে প্রগতিশীল, নিঃস্বার্থ ও সাহসীদের বড় একটি অংশ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তার কাজ করছে। কিন্ত এই হল ভবিতব্য, ঘটনাচক্রে তিনি এমন সব মানুষের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন যাদের সম্বন্ধে তাঁর কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। তিনি যদিও তাদের নেতা, তবু তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বন্দিত্ব স্বীকার করেই মাত্র তাদের একত্র রাখতে পারেন। তাই বলে নীতির দিক দিয়ে তিনি মোটেই অনিচ্ছুক বন্দী নন, কারণ বহিরঙ্গ আধুনিকতা সত্ত্বেও তিনি পুরনো যুগের মানুষ যিনি আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তা ও তার বিকাশ সম্বন্ধে অবহিত নন। যে-অর্থনৈতিক ধারণা আজকের পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই অজ্ঞান। প্রথম

৩ জিন্না যে সত্যই পড়াশোনার জীব ছিলেন না, সোল্লাসে জিন্নার জীবনীকার তা জানিয়েছেন। সরোজিনী নাইডুর বড় দুঃখ ছিল, হায়, হায়, অমন একটা বর্দ্ধিষ্ণমান লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পালিশ পেল না: "It seems a pity that so fine an intelligence shonld have denied itself the hall-mark of a University education." জিন্না সাহিত্য শিল্প, এমন কি ইতিহাসের ধার ধারতেন না। ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় লিনকন ইনে, বা হাউস অব কমন্সে বিতর্ক শুনতে যাবার পথে জিন্না ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে কখনো ভুলেও ঢুকে পড়েন নি। জিন্নার অতীতপ্রীতি না থাকার চরম প্রমাণ, পাকিস্তানের সর্বেশ্বররূপে যখন তিনি করাচীতে অধিষ্ঠিত তখন একবারও নিজের জন্মগৃহে যান নি স্মৃতি রোমন্থনের জন্য। "রাজভবনের ঐশ্বর্য, যা জয়কীর্তির প্রতীক—সেখান থেকে নিজের সামান্য জন্মস্থানটিতে উপস্থিত হয়ে দাঁড়াতে পারলে যে কোনো মানুষই গর্বে শিহরিত হত"—

[illegible] সারা পৃথিবীতে ঘটে গেছে, তাদের কোনো প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছে মনে হয় না। কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক অগ্রসরতার পথে নূতন পদক্ষেপ করল, তখনই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্যবধান ক্রমেই বেড়েছে—কংগ্রেস যতই তার অর্থনৈতিক ও জনগণসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত করেছে। মতাদর্শের দিক দিয়ে মিঃ জিন্না এক যুগ আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, কিংবা বলা যায় তিনি আরও পেছিয়ে গেছেন, কারণ এখন ভারতের ঐক্য ও গণতন্ত্রকে তিনি নিন্দা করছেন। 'পশ্চিমী গণতন্ত্রের বাজে অর্থহীন ধারণার ভিত্তিতে গঠিত সরকারের অধীনে বাঁচাই সম্ভব নয়'—তিনি বলছেন। মোটামুটি দীর্ঘ জীবনে যার পোষকতা করে এসেছেন, সেটা যে 'বাজে অর্থহীন', তা বুঝতে তাঁর সুদীর্ঘ সময় লেগেছে।

"মুসলিম লীগেও মিঃ জিন্না নিঃসঙ্গ চরিত্র, ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীর সঙ্গেও তাঁর মানসিক দূরত্ব। তাঁর সম্বন্ধে রয়েছে ব্যাপক কিন্তু সুদূর শ্রদ্ধা, যতখানি প্রীতি তার থেকে ভীতিই বেশি। রাজনৈতিক হিসাবে তাঁর সামর্থ্যে সন্দেহ করা যায় না, কিন্তু যেভাবেই হোক, সেই সামর্থ্যের সঙ্গে ভারতের বর্তমান বৃটিশ শাসনের বিচিত্র অবস্থার গাঁটছড়া বাঁধা আছে। আইনজীবী রাজনৈতিক হিসাবে বা কৌশলী লড়িয়ে হিসাবে তাঁর ঔজ্জ্বল্য—তিনি মনে করেন, জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ এবং বৃটিশ শক্তির মধ্যে ভারসাম্য তিনিই রাখছেন। যদি অবস্থা অন্য ধরনের হত—রাজনীতি বা অর্থনীতির সত্যকার সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হত—তাহলে তাঁর ঐ সামর্থ্য কতদূর তাঁকে নিয়ে যেতে পারত, বলা শক্ত। তাঁর নিজেরই সে বিষয়ে সন্দেহ আছে মনে হয়, যদিও নিজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কিছু ছোট নয়। পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁর অবচেতন মনের প্রতিরোধ এই সবের দ্বারাই হয়ত ব্যাখ্যাত হতে পারে। পরিস্থিতিকে তিনি অপরিবর্তিত রাখতে চান, আলোচনা এড়িয়ে চলেন, তাঁর মতাবলম্বী নন এমন মানুষদের সঙ্গে সমস্যাগুলিকে শান্তভাবে যাচাই করতে অনিচ্ছার মূলেও তাই রয়েছে। বর্তমান কাঠামোয় তিনি বেশ খাপ খেয়ে গেছেন।...কোন্ কামনায় তিনি চালিত, কোন্ উদ্দেশ্যসিদ্ধি তিনি করতে চাইছেন? কিংবা তাঁর আর কোনো প্রবল বাসনা, নেই শুধু এই আনন্দ যে, এমন এক আকর্ষণীয় রাজনৈতিক পাশা খেলায় তিনি অংশ নিয়েছেন যেখানে প্রায়ই বলবার সুযোগ পান 'কিস্তি'। যে-কংগ্রেস অগ্রগতির পথে এগিয়েছে সেই কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর ঘৃণা রয়েছে। তাঁর বিতৃষ্ণা ও অপছন্দের রূপ বাহ্যত খুবই স্পষ্ট, কিন্তু তিনি চান কি? সকল শক্তি ও জেদ নিয়ে তিনি অদ্ভুত একটি নেতিমূলক চরিত্র, বড় অক্ষরে 'নহে' কথাটি যাঁর প্রতীক-রূপ হতে পারে।" [ক্রমশ]

একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে জিন্না ও গান্ধী

জিন্নার জীবনীকার লিখেছেন—"সেখানে দোতলার দুটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারত—এখান থেকে যাত্রা শুরু করে একটি জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি! কিন্তু না, জিন্নার কাছে অতীত সর্বসময়ে সমাপ্ত, মৃত।" সুতরাং অতীতের প্রতি জিন্নার আকর্ষণ ছিল না, ভালো ভাষা বা শব্দের প্রতিও আকর্ষণ ছিল না, "প্যাশন বলতে যদি কিছু তাঁর থাকে, শুনতে খুবই উদ্ভট শোনাবে",—জিন্নার পুরাতন এক বন্ধু বলেছেন—"তা হল খবরের কাগজ। সারা পৃথিবীর কাগজ তিনি জোগাড় করেন, সেগুলোর প্রয়োজনীয় অংশ কাটেন, টীকাশুদ্ধ খাতায় সেগুলি লাগান—ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কাজ করে যান। সারা জীবন ধরে খবরের কাগজ তিনি ভালবেসেছেন।" শেষ অসুখের সময়েও জিন্নার এই প্যাশন যায় নি—টেলিপ্রিণ্টারের টেপ পর্যন্ত তিনি সোফায় শুয়ে শুয়ে পড়ে গেছেন।

তাই বলে জিন্না কবিতা একেবারে ভালবাসতেন না তা নয়। মোক্ষম সময়ে তিনি কবিতা পাঠ করেছিলেন তাঁর জীবনীতে পাই। গান্ধী যখন 'জিন্নার মত পরিবর্তনের অপেক্ষা না রেখে' ১৯৪২ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, যার ফলে হিংসা ও রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে, তখন এক রাত্রে জিন্নার সেক্রেটারী জিন্নার অফিস ঘরে ফিরে দেখেন—মাথায় হাত দিয়ে জিন্না টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে আছেন, খবরের কাগজের উপরে খোলা রয়েছে একটি কবিতার বই—মিল্টনের। কোন্ পৃষ্ঠা খোলা ছিল জিন্নার সেক্রেটারী তা উঁকি দিয়ে দেখেন নি, কিন্তু জীবনীকারের সহানুভূতিপূর্ণ কল্পনা একেত্রে উঁকি দিয়ে না দেখে পারে নি যে, খোলা পৃষ্ঠায় লেখা ছিল:

'For what can war but endless war still breed?
Till truth and right from violence be freed.'

আমরা কেবল আশা করতে পারি, ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা করে রক্তপ্লাবিত রাত্রে [illegible] জিন্না এরই কবিতা পড়েছিলেন।
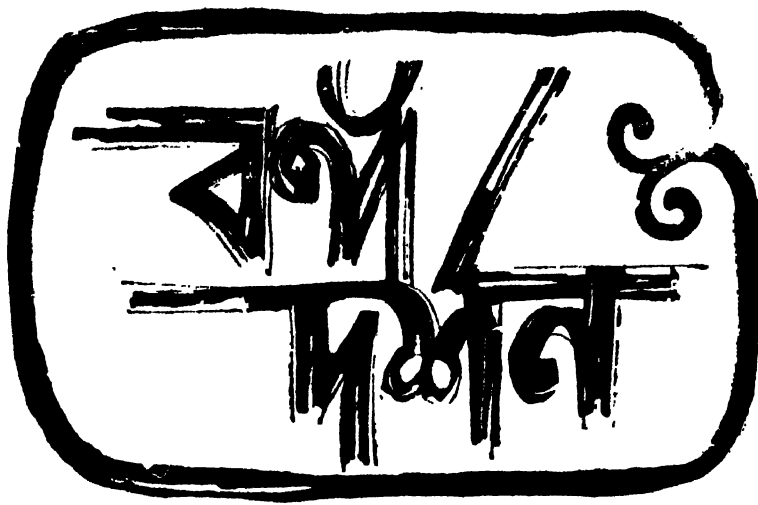
রাজ্যপালের প্রশাসন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, বিপুল সমস্যাভারে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন কিছুই রাষ্ট্রপতির শাসনে সম্ভবপর নয়। পশ্চিমবঙ্গ বিহার বা হরিয়ানা নয় যে, রুটিনমাফিক সরকারী কাজকর্মগুলিকে চালিয়ে গেলেই মোটামুটি শান্তি থাকবে। রাজ্যপালের বিচক্ষণতা বা দক্ষতা এক্ষেত্রে কোন বিষয় নয় এবং যত বড় ধুরন্ধর লোকই এ পদে থাকুন না কেন, কোন লোকায়ত্ত সরকার ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতির মোকাবিলা অসম্ভব। রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতিসাধনে অপারগ হয়েছে, সক্ষম হলেই আমরা বিস্মিত হতাম, কেন না এ সমস্যার মূলে অনেক গভীরে, যা আমলাতন্ত্র বা পুলিশ দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়, এবং পুলিশ বা আমলাতন্ত্রের সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান হবে সে কথা চিন্তা করাও বাতুলতা, যদিও প্রচলিত চিন্তার ধারাটা সেই রকমই।

—

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন মাঝে মাঝে বলছেন বটে, পশ্চিমবঙ্গের নকশালী ক্রিয়াকলাপকে তাঁরা শুধু আইন-শৃংখলার প্রশ্ন হিসাবেই দেখছেন না, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেও নাকি তাঁরা বিষয়টির অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন। শেষের কথাগুলি বোধ হয় বলতে হয় বলেই বলা, কেন না কার্যত একটি আটক আইন প্রস্তুত ও কয়েক ব্যাটেলিয়ন সি আর পি প্রেরণ ছাড়া তাঁরা কিছুই করেন নি। কিন্তু তাঁরা কিভাবে আশা করেন যে, ওই আটক আইনের জালে মাছের মত পালে পালে নকশালীরা ধরা পড়বে? বস্তুত সেটা হবার নয়। অবশ্য পুলিশ এই মওকায় কিছু লোককে জেলে পুরবে, কিছু নিরীহ মানুষের হয়রানি হবে, এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীর দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। নকশালী আন্দোলনের প্রকৃতিটা কি সেটা কেউ কি ভাল করে ভেবে দেখেছেন? কাদের নকশালী বলা হবে? যারা ইস্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদের? যাদের ঘরে দেশব্রতী বা লিবারেশন পত্রিকা থাকে তাদের? দু' চারটে সুপরিচিত মুখ হয়ত ধরা পড়তে পারে, কিন্তু আমাদের নিশ্চিত ধারণা, আটক আইন যে উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য সৃষ্টি করছেন, সে উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হবেই না, উল্টে নকশালপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার সি আর পি, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ঠ্যাঙাড়েবাহিনী আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এরা ঠ্যাঙাবে কাকে? সংস্কৃত প্রবাদে আছে, মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল। দুর্ভাগ্যক্রমে সি আর পি-র কার্যকলাপের যেসব অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের আছে, তাতে এই সিদ্ধান্তে আসা মোটেই অসমীচীন নয় যে, এই সি আর পি বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের মূর্খ বন্ধুর মতই কাজ করবে, অর্থাৎ নকশালপন্থীদের ঠ্যাঙাতে গিয়ে এমন সব কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, যা উল্টো বিপত্তির সৃষ্টি করবে, এবং তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বুমেরাং হয়ে যাবে। বেছে বেছে নকশালীরাই সি আর পি-র লাঠি বা গুলীর সামনে পড়বে, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না। রামের বদলে শ্যাম মারা পড়বেই এবং তা ঘটলে আবার অন্য দিক থেকে আইন-শৃংখলার হানি ঘটবে, এবং সেটা সামলানোর দায়িত্ব কোন্ পুলিশের, তা নিয়েও ঝামেলা বাধবে, মোদ্দা কথা, আটক আইনে বা সি আর পি-র দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়ার বদলে উল্টে তা জটিলতর আকার পরিগ্রহ করবে। চোখের সামনেই এর ফলাফল দেখা যাচ্ছে। এর জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, দু'চার সপ্তাহের মধ্যেই মালুম হবে।

নকশালী সমস্যার মোকাবিলা একমাত্র রাজনৈতিকভাবেই করা যেতে পারে, আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। নকশালপন্থীরা সমাজবিরোধী নয়, এরা বেশির ভাগই ছাত্র, এবং এদের মধ্যে অনেকেই রীতিমত মেধাবী। তবে এরা কয়েকটি প্রচলিত মূল্যবোধের বিরোধী, যে মূল্যবোধগুলি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত বলেই সরকারী ও বেসরকারী মহল বিশ বছর ধরে চেঁচিয়ে এসেছেন কিন্তু কাজে কিছু করেন নি। দ্বিতীয়ত তারা এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করে যে, মতবাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণশক্তি আছে। গত বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসন তাদের কাছে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে সঙ্গতভাবেই আকর্ষণীয় করতে পারে নি, পক্ষান্তরে মার্কসবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির কার্যত পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের আঁচলধরা নীতিকে তাদের কাছে ভণ্ডামী বলে মনে হয়েছে। তৃতীয়ত, গত সংখ্যায় যা লিখেছিলাম, নকশালী আন্দোলন মূলত এদেশের ভূমিসমস্যার সঙ্গে জড়িত। তারা কৃষিবিপ্লবের কথা বলে, ভূমিসংস্কারের কথা বলে। এ কথা তো বলে আসা হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরেই, প্রধানমন্ত্রীও বার বার ভূমিসংস্কারের কথা বলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা করতে গেলেই বিপত্তি বাধে, কায়েমী স্বার্থের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগলেই তারা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়, অরাজকতা ও আইন-শৃংখলার ধুয়া তোলা হয়, এ ছাড়া তাদের হাতে বিপুল প্রচারযন্ত্র আছে যা দিয়ে মানুষকে সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়, যুক্তফ্রন্টের আমলে যা [illegible] দেখা গেছে।

কাজেই নকশালপন্থী ক্রিয়াকলাপের সমস্যার সঙ্গে প্রচলিত আইন-শৃংখলার বিষয়টি মিশিয়ে ফেললে ফল হিতে বিপরীত হতে বাধ্য। বিশেষভাবে ছাত্রসমাজের মধ্যে উগ্রপন্থী মনোভাব গড়ে ওঠার আরও একটি সহজ কারণ আছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রিমিনাল, যুগোপযোগী নয় বলেই তাকে অবলম্বন করে জীবনের পথে চলা যায় না, প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার জন্য কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই, একমাত্র যে সব পরিবার সুবিধাজনক স্থানে আছে, যারা ওয়েল-কানেক্টেড, তারাই চাকরি-বাকরি পায়। ভবিষ্যৎ যাদের অন্ধকার যা অদূর তো দূরের কথা, সুদূর ভবিষ্যতেও যাদের চোখের সামনে বিন্দুমাত্র আলোর নিশানা নেই, হতাশা ভিন্ন যাদের আর কিছু মূলধন নেই, তারা যদি প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধসমূহের বিরোধী হয়ে পড়ে, লেনিনকে [illegible] করার জন্য যদি

উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে তাদের নিন্দা করার নৈতিক অধিকার কারো আছে বলে মনে হয় না।

কৃষক, বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাদারদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির কিছু প্রভাব বর্ধিত হয়েছে, তার কারণ যুক্তফ্রন্টের আমলে কিছু ভূমিহীন কৃষক ভূমি পেয়েছে, তা যত সামান্যই হোক। এবং অনেকের সামনে কিছু পাবার প্রত্যাশা আছে। এদের আনুগত্য ওই সব বামপন্থী দলগুলির প্রতি, যদিও কোন কোন গ্রামে নকশালপন্থীরা পকেট করতে পেরেছে। অনুরূপভাবে শ্রমিক, সরকারী ও সওদাগরী অফিসের কর্মচারী, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতির মধ্যে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির প্রতি আকর্ষণ আছে, কেন না ফ্রন্ট আমলে এদের কিছু কিছু আর্থিক সুরাহা হয়েছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার এদের একেবারে হতাশ করে নি। কিন্তু ছাত্রসমাজ এবং কর্মহীন ব্যক্তিদের চোখের সামনে কি আছে? কংগ্রেসী শাসনে তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি, ফ্রন্ট সরকারও তাদের চোখের সামনে কোন আশার আলো দেখাতে পারে নি। অতএব উগ্রপন্থার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়াটাই যেন তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক।

উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ভারতের অপরাপর রাজ্যেও বড় কম নয় এবং সেগুলিও যুবসমাজের হতাশা থেকে উদ্ভূত, কিন্তু সেগুলিকে দমন করার কোন প্রয়াস ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সেই সকল স্থানের কিছু কিছু সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতা এই ক্ষোভ ও হতাশাকে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার দিকে পরিচালনা করছেন, যেমন মহারাষ্ট্রের শিবসেনা। এরা যে কম হিংসাত্মক তা নিশ্চয়ই নয়, বরং নকশালীদের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক, কিন্তু এদের জন্য আটক আইন হয় না, এদের জন্য সি আর পি আয় না। সে যাই হোক না কেন, আমাদের যা বক্তব্য তা হচ্ছে, নকশালী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করাই যদি সরকারের যথার্থ অভিপ্রায় হয়, তাহলে সরকারকে একটু অপ্রচলিত রাস্তাই অবলম্বন করতে হবে, যে ইস্যুগুলিকে কেন্দ্র করে আজ নকশালী ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধি ঘটছে, যে কারণগুলি তার জন্য দায়ী, সেইগুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার। শুধু [illegible] [illegible] দিয়েই [illegible] যে [illegible] [illegible] নয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাবে না।

পরিবর্তনের ইঙ্গিত?

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় যখন বামপন্থী আন্দোলন গভীর অনৈক্যের দ্বারা বিদীর্ণ, তখন দিল্লীর একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সি পি আই এবং সি পি এম-এর নেতারা নাকি স্বীকার করেছেন যে, কৃষক ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা প্রয়োজন। বামপন্থী আন্দোলনের বর্তমান অনৈক্যের মাঝখানে এঁরা একসঙ্গে বসে যেভাবে মূলে সমস্যাগুলির মূল্যায়ন করেছেন, এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বলেছেন, সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। শোনা যাচ্ছে, শুধু কৃষক আন্দোলন নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দুই কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতারা নাকি একটা আপোষরফা বা সমঝোতার সৃষ্টি করছেন, বিশেষ করে সি পি আই-এর চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গে নাকি এই বোঝাপড়া সৃষ্টির উদ্যোক্তা। কারণ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার সুরু থেকে শ্রীডাঙ্গে ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখেন নি এবং কোন কোন ব্যাপারে তিনি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দলের নেতাদেরও সমস্ত পদক্ষেপকে নাকি সমর্থন করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে শ্রীডাঙ্গের বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য। আরও লক্ষণীয় যে, আপোষরফার এই সামান্যতম প্রয়াসই বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকও এখন কিছুটা নতুন সুর ধরেছে। বলাই বাহুল্য যে, সি পি আই ও সি পি এম নেতৃত্বদের একাংশের মধ্যে সমঝোতার প্রয়াস এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নতুন সুর এটাই প্রমাণ করছে যে, একটি বিশেষ দলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাটাই আজকের দিনের আসল কাজ নয়, বরং যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন ফ্রন্টে সংগ্রামী জনসাধারণের মধ্যে আজ যে অনৈক্য ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পুনরায় ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গড়ে তোলা সম্ভব। শুধু কৃষক ফ্রন্ট নয়, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টেও আজ নতুন করে ঐক্য গড়ে তোলার কথা উঠেছে। কারণ বামপন্থী দলগুলি মন্ত্রিসভা নিয়ে আজ যতই মাথা ফাটাফাটি করুন না কেন, প্রতিক্রিয়ার আসল আঘাত যেদিন আসবে, সেদিন কে সি পি আই ও কে সি পি এম সে তফাৎ তারা করবে না। ইতিমধ্যেই সেই রকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। [illegible] [illegible] [illegible] যে ঘটনা সম্প্রতি ঘটল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সি পি আই হলেও রেহাই নেই।

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, পৌরসভায় যুক্তফ্রন্টের তো ভাঙন ঘটেই নি, উল্টে সেখানে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে। রাজনীতিতে কোন কিছুই চিরন্তন নয়। এখনো বিধানসভা বাতিল হয় নি। একই ধরনের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী পার্টিগুলি কি পুনরায় সরকার গড়তে পারেন না?

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

দীর্ঘ ন' মাস পরে গত সপ্তাহে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে বৈঠক বসে তাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পর্ষদের সভাপতি ও সেক্রেটারী যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার কোনটিও অনুমোদিত হয় নি। যুক্তফ্রন্টের আমলে ২৫০টি বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীকে বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এর কোনটিই পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে করা হয়নি। ওই দিনের বৈঠকে ওই অনুমোদন চাওয়া হলে পর্ষৎ বোর্ডের অফিসারদের নির্দেশ দেন যে, ওই ২৫০টি বিদ্যালয়ের নাম, প্রশাসকদের তালিকা, কি পরিস্থিতিতে পরিচালকমণ্ডলী বাতিল করা হল, পরিচালকমণ্ডলীর আপত্তি বা বক্তব্য শোনা হয়েছিল কিনা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আগামী বৈঠকে উপস্থাপিত করতে হবে। তার আগে ওইগুলি পর্ষৎ অনুমোদন করবেন না। দ্বিতীয়ত বিদ্যালয়সমূহের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের ব্যাপারে পর্ষৎ-সভাপতি যে বিধি প্রণয়ন করেছেন, তাও অনুমোদিত হয় নি। কোন্ এবং কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে সভাপতি ওই বিধি প্রণয়ন করেছেন এবং পর্ষৎকে না জানিয়েই কেন চালু করা হল, সে বিষয়েও বিস্তৃত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। বর্তমান বৈঠকটির বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এই বৈঠক কতকগুলি গুরুতর অনিয়মকে প্রকাশ করেছে। বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী বাতিল করা বা প্রশাসক নিযুক্ত করা প্রভৃতি ব্যাপারে বিগত যুক্তফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় ঘোষণা করেছিলেন যে, এইগুলি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এলাকাভুক্ত এবং এই সমস্ত কাজ পর্ষদের সভাপতি ও সেক্রেটারীর দ্বারা পর্ষদের অনুমোদনেই হয়েছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, তা ঠিক নয়। সমগ্র বিষয়টির পিছনে একটা দায়িত্বহীনতার লক্ষণ দেখা যায়, এক্ষেত্রে কোন অফিসেরই ভূমিকা খুব পরিচ্ছন্ন নয়।

(২।৫।৭০)

আই-সি-এস'দের অধিকার হরণ করা গেল না

আই-সি-এস অফিসারদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিলের জন্য গত ২৮শে এপ্রিল লোকসভায় যে বে-সরকারী বিল উত্থাপিত হয়েছিল, সেটা প্রয়োজনীয় ভোটের অভাবে বাতিল হয়ে গেছে। প্রস্তাবটা তুলেছিলেন এস-এস-পি দলের মধু লিমায়ে। আই-সি-এস'রা যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, সেটা সংবিধানেই গ্যারাণ্টি করা আছে। কাজেই সেই সেই সুবিধা বাতিল করতে হলে সংবিধান সংশোধন না করে উপায় নেই। সংবিধান সংশোধন করতে হলে তাতে অর্ধেকেরও বেশি সদস্যের সমর্থন থাকা চাই আর নির্দিষ্ট অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন চাই। পার্লামেণ্টে সদস্য আছেন মোট ৫২২ জন। কাজেই অন্তত ২৬২ জনের সমর্থন না পেলে এই ধরনের প্রস্তাব পাশ হতে পারে না। কিন্তু সেদিন ভোটাভুটির সময় লোকসভায় সর্বসাকুল্যে মাত্র ২৪৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২২২ জন মধু লিমায়ের প্রস্তাবের পক্ষে এবং ২২ জন বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। একজন ভোট দেন নি। স্বভাবতই প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় এবং লোকসভার নিয়ম অনুযায়ী বর্তমান অধিবেশনে এই প্রস্তাব আর নতুন করে তোলা যাবে না।

লোকসভায় সদস্যদের ব্যাপক অনুপস্থিতিই যে প্রস্তাবটির অপমৃত্যু ডেকে আনল, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র স্বতন্ত্র পার্টি ছাড়া অন্য কোন দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন নি। এমন কি, সিণ্ডিকেট কংগ্রেসও এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন এবং তাঁরা সবাই মিলে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু প্রস্তাবের সমর্থক কোন দলই যথেষ্ট সংখ্যক দলীয় সদস্যকে লোকসভায় হাজির করাতে পারেন নি। প্রস্তাবের সমর্থক দলের সদস্যরা সেদিন ক'জন উপস্থিত এবং ক'জন অনুপস্থিত ছিলেন, সেটা নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে। সদস্যদের মোট সংখ্যা ব্র্যাকেটে দেখানো হচ্ছে ঃ

ডি-এম-কে—১৪ (২৫), সি-পি-আই—১৩ (২৪), সি-পি-এম—১০ (১৯), এস-এস-পি—১৭ (১৭), পি-এস-পি—১০ (১৬), ইউনাইটেড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস প্রগ্রেসিভ গ্রুপ—৫ (২৫), বি-কে-ডি—২ (৯), নির্দল জোট—১ (২৫), কংগ্রেস (ইন্দিরা)—১৩৬ (২২০)। এতে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র এস-এস-পি ছাড়া আর সব দলই এই প্রস্তাব পাশের ব্যাপারে চরম গাফিলতি দেখিয়েছেন। এটা যে মোটেই সুলক্ষণ নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রস্তাবটি বে-সরকারী বটে, তবে সরকারপক্ষ সেটায় তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। সরকার সমর্থিত প্রস্তাব এভাবে বাতিল হওয়ায় স্বতন্ত্র পার্টি মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন। দাবিটা যতই অসার হোক, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। কারণ তাঁর দলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পার্টি হুইপ অগ্রাহ্য করে সেদিনে লোকসভার অনুপস্থিত ছিলেন। তাতে বোঝা যাচ্ছে, সংবিধান সংশোধনে তাঁদের আপত্তি আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন অবশ্য বলেছেন যে, আই-সি-এস'দের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা হরণের ওপর তাঁরা খুব গুরুত্ব আরোপ করেন না। করলে এ বিষয়ে সরকারিভাবেই তাঁরা একটা বিল উত্থাপন করতেন। আই-সি-এস'দের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ১০৬ জন। কাজেই তাঁদের ব্যাপারটা কোন বড় সমস্যা নয়। তবে নীতিগতভাবে বিশেষ "সুযোগ-সুবিধা" বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না বলেই প্রস্তাবটা তাঁরা সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁদের সমর্থন সত্ত্বেও দলীয় সদস্যদের ব্যাপক অনুপস্থিতি এটাই প্রমাণ করছে যে, বিষয়টা নিয়ে দলের মধ্যে মতভেদ আছে। সেটা অবশ্য কিছুকাল আগেই প্রকাশ পেয়েছিল। কংগ্রেস দল (ইন্দিরা) রাজন্যভাতা বিলোপে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু কিছুকাল আগে দেখা যায় ডেপুটিমন্ত্রী ভানুপ্রকাশ সিং রাজন্যবর্গের দাবির প্রতিধ্বনি করে প্রশ্নটা সুপ্রীম কোর্টে পাঠাবার জন্য এক আন্দোলন সুরু করেছেন এবং সেই আন্দোলনে কংগ্রেস দলের (ইন্দিরা) জন পঞ্চাশেক সদস্যের সমর্থন আদায় করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি। দেশের মৌলিক সমস্যা নিয়ে দলের মধ্যে এইরকম গুরুতর মতভেদ দেখা দিলে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে নিজের জনপ্রিয়তা বজায় রেখে সরকার পরিচালনা করা যে কতদিন সম্ভব হবে, সেটা বলা কঠিন।
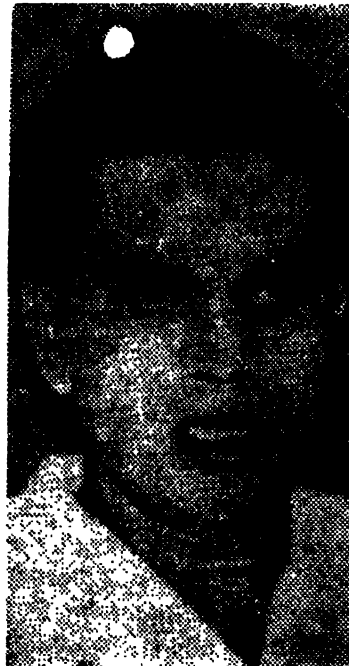
শ্রীমধু লিমায়ে

আর দেশের বামপন্থী দলগুলোর দায়িত্বজ্ঞানের বহর দেখে আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি। তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, আমাদের সংবিধান যুগোপযোগী নয় এবং সংবিধান সংশোধিত না হলে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এবং সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের সুযোগ পেয়েও তাঁরা যে কাণ্ডটা করলেন, তাতে আর যাই হোক, তাঁদের বৈপ্লবিক মনোভাবের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নি। দেশের জনগণ পার্লামেণ্টের সদস্যদের ওপর যে দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছেন, তাঁরা যে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন নি, সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

এর পর যখন তাঁরা মাঠে-ময়দানে এসে বিপ্লবের বুলি কপচাবেন, তখন তাঁদের সেই বক্তৃতাবাজী নিছক ভণ্ডামীর মতই শোনাবে না কি?

কংগ্রেসের ভাঙনের পর থেকে দেশের বামপন্থী দলগুলো একদিকে নিজেদের মধ্যে উপজাতীয় হানাহানিতে মত্ত হয়ে নিজেদের শক্তিক্ষয় করে চলেছেন, অপর দিকে পার্লামেণ্টে তাঁদের ক্রিয়াকলাপও ক্রমাগতই জনগণকে হতাশ করছে। অধিকাংশ বামপন্থী দল তাঁদের লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট নন বলেই মনে হয়। তাঁরা যে সত্যি করে কি চান, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। তাই সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের গাফিলতি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অতি নোংরাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। আই-সি-এস'দের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলোপকামী দলগুলোর যে সব সদস্য সেদিন ভোটাভুটির সময় লোকসভায় অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে থেকে অবিলম্বে কৈফিয়ৎ তলব করার কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, দেশের জাগ্রত জনগণ এই সমস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এম-পি-দের কোনদিনই ক্ষমা করবে না। যাঁরা দিনরাত মাঠে-ময়দানে মুখ দিয়ে বিপ্লবের আগুন ছোটাচ্ছেন, আসল কাজের সময় তাঁদের টিকিটিও যদি না দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে তাঁদের মধ্যে সততার অভাব আছে।

আই-সি-এস'দের সুযোগ-সুবিধা হরণের প্রস্তাব বাতিল হবার তিনদিন বাদে লোকসভা সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেবার একটি বেসরকারী প্রস্তাবও বাতিল করেছেন। প্রস্তাবটি তুলেছিলেন সি-পি-এম দলের পি রামমূর্তি। তিনি বলেন, সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার গণতান্ত্রিক সমাজবিবর্তনের প্রধান অন্তরায়। স্বতন্ত্র দলের এন কে রঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। আইনমন্ত্রী গোবিন্দ মেনন বলেন যে, দেশে কারও হাতে যাতে মাত্রাধিক সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত না হয় এবং একচেটিয়া মালিকানা গড়ে না ওঠে, সেদিকে গভর্নমেণ্ট সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তবে সম্পত্তির অধিকার হরণের ইচ্ছা গভর্নমেণ্টের নেই। ব্যক্তির এবং পরিবারের সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করাই গভর্নমেণ্ট বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। পার্লামেণ্টের বিভিন্ন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে ভাষণ দেন, তবে এই প্রশ্নে দলগুলো কিভাবে বিভক্ত হয়েছিল, তা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কারণ প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটেই অগ্রাহ্য হয়। কোন ভোটাভুটি হয় নি।

চীনা উপগ্রহ

গত সপ্তাহে চীন মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে। ১৭৩ কিলোগ্রাম ওজনের সেই উপগ্রহটি এখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। ১৯৬৪ সালে চীন সর্বপ্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সারা দুনিয়ায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে সে পৃথিবীর পঞ্চম পারমাণবিক শক্তি। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে চীন চতুর্থ মহাকাশ শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হল। চীনের পক্ষে এই অসাধারণ সাফল্য নিশ্চয়ই খুব কৃতিত্বের কথা। ভারতের মুক্তি এবং চীনের বিপ্লব সমসাময়িক ঘটনা। বরং চীনা বিপ্লবের কয়েক বছর আগেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। পরমাণু বিজ্ঞান এবং মহাকাশ বিজ্ঞানচর্চা করে ফললাভ করতে হলে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার দরকার হয়। আর দরকার হয় একটি সুসংগঠিত শিল্প-কাঠামো। চীনের মত পশ্চাদপদ দেশ মাত্র ২০।২৫ বছরেই বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে কতখানি এগিয়ে গেছে, উপর্যুক্ত দুই সাফল্যই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

চীনের এই কৃতিত্ব দেখে এশিয়াবাসী হিসাবে আমরা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারতাম কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কারণ চীনের সঙ্গে আমাদের সীমানা-বিরোধ এখনও অমীমাংসিত রয়েছে এবং সেই সীমান্তে বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার উভয় দেশের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষও হয়েছে। ভারতের বহু বীর জওয়ান সেই সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সেই থেকে চীনের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নেই। চীন ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্য মার্কিন সামরিক জোটের অংশীদার পাকিস্তানের সঙ্গে আঁতাত করেছে এবং তাকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে ভারতের বিরুদ্ধে উসকে যাচ্ছে। তাই চীন মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়েছে জেনে ভারতবর্ষে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে বেশি।

গত ২৮শে এপ্রিল মঙ্গলবার লোক-সভায় প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল এবং অনেকেই দাবি করেছিলেন যে, ভারতেও পারমাণবিক বোমা তৈরি করা হোক। প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বরণ সিং বলেন যে, পার-মাণবিক বোমা তৈরি করবে না বলে ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিতই থাকবে। তবে ভারত সরকার পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার-নিরোধক চুক্তিতেও সই করেন নি। কারণ সেই চুক্তি বৈষম্যমূলক। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, মহাকাশে চীনের সাফল্য ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে অস্বস্তিকর। চীন যে উপগ্রহ মহাকাশে ছেড়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা পাঁচ হাজার মাইল পাল্লার অন্তর্মহাদেশীয় বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের উপযোগী রকেট বানাতে পেরেছে। মহাকাশ বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক বিজ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই চীন ভারতের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীস্বরণ সিং বলেন যে, ভারত মহা-কাশ বিজ্ঞানচর্চার জন্য যে ১০-সালা কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, সেটা ত্বরান্বিত করা হবে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ভারত মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাবার ক্ষমতা অর্জন করবে।

পারমাণবিক শক্তি বিভাগ তাঁদের ১৯৬৯-৭০ সালের যে বিবরণী প্রণয়ন করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে পৃথিবীর নিম্ন-কক্ষপথে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য যথোপ-যুক্ত রকেট তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। অন্ধ্র উপকূলবর্তী শ্রীহরিকোটায় একটি রকেট উৎক্ষেপণ স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। থুম্বা রকেট নির্মাণ কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই বেশ শক্তিশালী রকেট নির্মিত হয়েছে। তবে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য আরও শক্তিশালী রকেট তৈরি করতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে, চীনের শক্তিবৃদ্ধির ফলে ভারতের সদা-সতর্ক হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কারণ চীনা নেতাদের মতিগতি দেখে মনে হয় না যে, তারা ভারতের সঙ্গে সীমানা-বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক। বরং দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা জিইয়ে রাখলেই তাদের লাভ বেশি। ভারতের বৈষয়িক অগ্রগতি প্রতিরোধ করাই এখন চীনের প্রধান কাম্য। ভারতে প্রতিরক্ষা তৎপরতা যত বৃদ্ধি পাবে, তত তার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। চীনের লক্ষ্য সেই দিকে। যাই হোক, ভারত সরকার যে পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ আছেন, সেটাই সুলক্ষণ।

কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণের অব্যবহিত পরে নিকসন এক টেলিভিসন বক্তৃতায় কম্বোডিয়ার যুদ্ধাঞ্চলের একটি ম্যাপ প্রদর্শন করছেন।

কম্বোডিয়া ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারিভাবে কম্বোডিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ২রা মে আনুষ্ঠানিকভাবে সৈন্য প্রেরণের কথা ঘোষণা করেছেন।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের কয়েক হাজার সৈন্য ক'দিন আগে থেকেই কম্বোডিয়ার ভেতরে আক্রমণ সুরু করেছে। ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া সীমান্তে প্যারট্স্ বীক্ এলাকায় দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা প্রবেশ করেছে। মার্কিন সামরিক কর্তাদের সম্মতিতে, তাদের পরামর্শেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ার আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করেছে।

এখন সামনাসামনি মার্কিন সৈন্যও এল। সঙ্গে এসেছে প্রচুর মার্কিন অস্ত্র। ক্ষমতাচ্যুত ও বিতাড়িত রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সমর্থকদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে কম্বোডিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী জেনারেল লন নলের দলবল পেরে উঠছিল না, তাই দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও মার্কিন সৈন্যকে সম্মুখ সমরে নামাতে হ'ল।

সিহানুক সমর্থকদের পেছনে উত্তর ভিয়েতনামের নিয়মিত সৈন্য আছে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের স্বেচ্ছাসেবক তথা ভিয়েতকং গেরিলারা রয়েছে. এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে লন নল বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছিল। তাই অনন্যোপায় হয়ে লন নলরা সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন রিচার্ড নিক্সনের।

প্রথম দিকে নিক্সনের মধ্যে একটু দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য কমানো হচ্ছে। এই অবস্থায় নতুন করে কম্বোডিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কি ঠিক হবে? কিন্তু পেন্টাগনের কর্তারা নিক্সনকে বুঝিয়েছেন, কম্বোডিয়া আক্রমণ করলে ভিয়েতনামের যুদ্ধ জয়ও সহজ হবে।

বর্তমানে মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম মিলিয়ে আট হাজার সৈন্য কম্বোডিয়ায় যুদ্ধ করছে। মার্কিন সরকার বলেছে, উত্তর ভিয়েতনামের আক্রমণকারী ও ভিয়েতকং গেরিলাদের কম্বোডিয়া থেকে বিতাড়ন করাই তাদের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য।

উত্তর ভিয়েতনামের ওপরেও নতুন করে মার্কিন বোমাবর্ষণ সুরু হয়েছে।

কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে সর্বত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধবিরোধী ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, লেখক প্রমুখ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্কে ছাত্রদের এক বিরাট সমাবেশে নিক্সনের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভও হয়েছে।

ভারত নিন্দা করেছে এই সৈন্য প্রেরণের। রাজ্যসভায় পররাষ্ট্রদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রপাল সিং বলেছেন, এ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণের ফলে এই অঞ্চলের সংঘর্ষ বিস্তার লাভ করবে।

যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো মার্কিন সৈন্য প্রেরণের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, প্রিন্স নরোদম সিহানুক অনেক চেষ্টায় কম্বোডিয়াকে যুদ্ধের উত্তাপ থেকে দূরে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন কম্বোডিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে।

উত্তর ভিয়েতনাম, চীন, এরা তো নিন্দা করবেই।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করেছে, তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছে। 'প্রাভদা', 'রেড স্টার' প্রভৃতি পত্রিকায় বলা হয়েছে, কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণের ফল ভয়াবহ হবে। 'তাস' বলেছে, এর দ্বারা কম্বোডিয়ার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্বের ওপর আঘাত করা হয়েছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন কিছুতেই কর্ণপাত করবে না। লন নল গোষ্ঠীর যোগসাজসে কম্বোডিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকবে। তবে, ভিয়েতনামের লড়াই-এ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুবিধে করতে পারে নি, কম্বোডিয়াতেও তারা সুবিধে করতে পারবে না।

চীন ঃ

চীন আকাশপথে উপগ্রহ নিক্ষেপ করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে চীনই প্রথম এই কৃতিত্বের অধিকারী হল।

২৪শে এপ্রিল ৩৮০ পাউন্ড ওজনের এই উপগ্রহটি চীন নিক্ষেপ করে। প্রতি ১১৪ মিনিটে উপগ্রহটি বিশ্বকে একবার করে প্রদক্ষিণ করছে। মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চল সিংকিয়াং প্রদেশের লপ নর থেকে উপগ্রহটি সাফল্যের সঙ্গে নিক্ষেপ করা হয়।

নানাভাবে চীনের এই কৃতিত্বকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্ব সুরু হবার পূর্বে পরমাণু গবেষণার ব্যাপারে সোভিয়েট য়ুনিয়ন বিভিন্নভাবে চীনকে সাহায্য করেছে। বস্তুত, যে রকেট থেকে চীনের উপগ্রহ নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা সোভিয়েটের দেয়া টি-আই রকেট, যা 'স্পুটনিক' নিক্ষেপের কয়েক বৎসর আগে ব্যবহার করা হয়েছিল।

তাছাড়া, চীনের উপগ্রহ নিক্ষেপের প্রধান কৃতিত্ব যাঁর, সেই ডঃ সিয়েন হুয়ে

দেন ... যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু গবেষণায় হাত পাকিয়েছেন।

তবু চীনের অগ্রগতিকে চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। চীনের বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই এই বিরাট সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

[illegible]

[illegible] বিচলিত। সোভিয়েতের পরমাণু শক্তি, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি চীনের চেয়ে অনেক বেশি হলেও, চীনের হাতেও তো এখন এসব রয়েছে। সোভিয়েতের ভয়, আলবানিয়াকে মাঝখানে রেখে চীন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে।

ভারত সরকার তো স্বীকারই করেছেন, ভারতের পক্ষে অন্ততঃ আরও তিন বছর লাগবে চীনের মত কোন উপগ্রহ বা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে।

আরও সংবাদ, তিব্বতের অভ্যন্তরে চীন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

চীন যদি সত্যি সত্যি তার আক্রমণাত্মক অভিযানে এই সব পরমাণু শক্তি ব্যবহার করে, তাহলে বড় রকমের বিপর্যয় দেখা দেবে।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ঃ

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বা আলস্টারের প্রাদেশিক আইনসভার সাম্প্রতিক দুটি আসনের নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন য়ুনিয়নিস্ট পার্টির প্রার্থীদের হারিয়ে চরম দক্ষিণপন্থী প্রোটেস্টাণ্ট নেতা রেভারেণ্ড ইয়ান পাইসলে ও তাঁর মনোনীত অপর একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। পাইসলের বিরুদ্ধে য়ুনিয়নিস্ট পার্টির প্রার্থী ডঃ বোলটন মিনফোর্ডের জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জেমস্ চিচেস্টার ক্লার্ক স্বয়ং প্রচার অভিযানে নেমেছিলেন। তবু পাইসলেই নির্বাচিত হয়েছেন।

এই নির্বাচনের ফল দাঙ্গাবিধ্বস্ত আলস্টারের রাজনীতিতে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এখানকার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ক্যাথলিক। সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের প্রতি নানাভাবে বৈষম্য করা হচ্ছে এবং তারা নির্যাতিত হচ্ছে, এই হল অভিযোগ। ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্টে বারে বারে দাঙ্গা হয়েছে। শেষপর্যন্ত প্রোটেস্টাণ্ট প্রধান সরকার ক্যাথলিকদের কিছু দাবি মেনে নিতে রাজী হয়েছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা চলছে। বৃটিশ সরকার এই আপোষের জন্য বিশেষ উদ্যোগী।

কিন্তু দেশের একদল উগ্রপন্থী প্রোটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকদের সামান্যতম সুযোগ-সুবিধাও দিতে প্রস্তুত নয়। তারা অনেকেই য়ুনিয়নিস্ট পার্টির সদস্য তবু বর্তমান সরকারের আপোষ প্রচেষ্টার তারা বিরোধী। সম্প্রতি য়ুনিয়নিস্ট পার্টির সংসদীয় দল থেকে ৫ জন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী সাসপেণ্ড করেছেন উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য।

পাইসলে নির্বাচিত হয়েই প্রধানমন্ত্রী চিচেস্টার ক্লার্কের পদত্যাগ দাবি করেছেন। তিনি হুমকী দিয়ে বলেছেন, চিচেস্টার ক্লার্ক যদি স্বেচ্ছায় সরে না দাঁড়ান, তবে তিনি এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন যে, চিচেস্টার ক্লার্ক পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

তরুণ প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে রেভারেণ্ড পাইসলের বেশ জনপ্রিয়তা আছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জিগিরে তাদের আচ্ছন্ন করে পাইসলে নতুন করে ক্যাথলিকদের ওপর হামলা সুরু করতে পারেন এমন আশঙ্কাও আছে।

(৪, ৫, ৭০)

আমার কাছ থেকে সাপ্তাহিক বসুমতী যে সব কথা জানতে চেয়েছেন, তা একে একে বলবার চেষ্টা করছি। দাবি অনেকগুলি, তবু চেষ্টা করায় বাধা নেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয়ের একটি চেহারা এই সাপ্তাহিক বসুমতীতেই 'আমি যাঁদের দেখেছি' পর্যায়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম। চোখে দেখার পরিচয়ই একমাত্র পরিচয় বলে আমি মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও করি নি।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় কল্পনার ভিতর দিয়ে। সে কল্পনা এসেছিল আমার পিতার কাছ থেকে। পিতা বিহারীলাল গোস্বামী ('আমি যাঁদের দেখেছি' পর্যায়ের চতুর্থ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর অনুরক্তও ছিলেন খুবই, কারণ রবীন্দ্র-বিরোধীদের অনেকেরই যুক্তির দুর্বলতা খণ্ডন করে তিনি তখন অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অধিকাংশই প্রদীপ ও ভারতী মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ নিয়ে লেখা অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সমালোচনার উত্তর দেওয়া, তখন (১৩০৮, ১৩০৯ ইত্যাদি সালে) পাঠকদের কাছে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁর লেখাটি (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) বিশেষ মূল্যবান। পিতৃকৃত কুমারসম্ভবম্-এর ছন্দানুবাদ অনেকখানিই নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়েছিল।

এ সব আমি দেখতাম, অস্পষ্ট জ্ঞানে ও চোখে। তারপর 'নদী' কবিতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ তার অনেকগুলি সংখ্যা বাবার নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে প্যাকেট খোলার ছবিটি আজও স্পষ্ট মনে আছে। এ কবিতাটি বাবা আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন।

নদীর আদি ও অন্ত—মনে এক অপূর্ব স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিল। পদ্মানদীর ঠিক উপরেই বাড়ি ছিল। পদ্মার ছয়টি ঋতুর বিভিন্ন রূপ চোখে দেখা ছিল, নদী কবিতাটি যেন দ্বিতীয় আর এক পদ্মানদী হয়ে আমার বালকমনে সত্য হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের একখানা ফোটোগ্রাফ থেকে বাবা পেনসিলের সাহায্যে বড় করে একখানা ছবি এঁকেছিলেন। সেখানা বাঁধানো অবস্থায়, যে স্কুলে তিনি হেডমাস্টার ছিলেন, সেই স্কুলে তাঁর বসবার ঘরে টাঙানো ছিল। রোজ দেখতাম, সেই স্মিতহাসিপূর্ণ উজ্জ্বল দুটি চোখ।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে (তখন তিনি 'রবিবাবু' ছিলেন আমাদের কাছে) একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল আমার মনে, আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। বহু দিন পরে আমিও যে লেখার ক্ষেত্রে নামব—এ সবই তার পটভূমি রচনা করেছিল, অথচ তা আমার চেতনার মধ্যে একেবারেই ছিল না। সেটা এখন স্মৃতিপথে পিছু হটে বুঝতে পারি। কারণ ভবিষ্যতে আমি যে লেখক হব, অথবা লেখাকেই বৃত্তিরূপে গ্রহণ করব এমন কল্পনা আমার কখনো ছিল না। তাই আমি অনেক লিখলেও লেখক হতে পেরেছি কি না সে বিষয়ে এখনো সন্দেহ আছে। এ সন্দেহ আরো বেশি অনুভব করেছিলাম গত ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে রেডিওর নিমন্ত্রণ পেয়ে। আমার বলবার বিষয় দেওয়া হয়েছিল "কি করে লেখক হলাম"—এই পর্যায়ে। বলতে গিয়ে অসুবিধা বোধ করছিলাম। যদি বিষয়টা থাকত "কি করে লেখক হই নি", তা হলে বলতে কোনো সংকোচ হত না। তাই যা বলেছিলাম তার বোধহয় কোনো স্পষ্ট অর্থ হয় না, কারণ আমি জানতাম আমি লেখক হই নি। যা সেদিন বলেছিলাম তার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করছি, তা পড়লেই বোঝা যাবে সে কথা। বলেছিলাম—

"কোনো একটা ঘটনার পিছনে অনেক কালের অনেক আয়োজন থাকে—জটিল আয়োজন। তারপর যখন তার ফল ফলে তখন তার পিছনে কি ছিল তার দিকে কে আর তাকায়।

"আমার বাল্যকালকে আমি পেয়েছি একেবারে খোলা প্রকৃতির বুকে। দিগন্তপ্রসারিত শস্যের ক্ষেত আর প্রশস্ত পদ্মানদী। এ এমনই এক বিরাট উদার পটভূমি যা, আমার যে একটি পৃথক সত্তা আছে তা একেবারেই ভুলিয়ে দিত। গ্রাম্য পরিবেশে যে সব মানুষ ছিল, যাদের মধ্যে আমি বাস করেছি, তাদের মধ্যেও আমার কোনো পৃথক পরিচয় ছিল না।

"আমি এ পরিবেশে সম্পূর্ণ উদ্‌ভ্রান্তবৎ শুধু ঘুরে বেড়িয়েছি, পড়াশোনায় মন দিতে পারি নি, নাওয়া-খাওয়ারও কিছুমাত্র নিয়ম ছিল না। স্নিগ্ধ-মধুর রোদ, প্রলয়ংকর ঝড়-বৃষ্টি, বর্ষার পদ্মার সর্বনাশা রূপ, শীতের পদ্মার প্রশান্ত মূর্তি, শস্যক্ষেতের গন্ধ, সব যেন নিশ্বাসের সঙ্গে আমার অন্তরে প্রবেশ করত। এর মধ্যে আমি যে কে, এবং কতটুকু, তা কখনো মনেই পড়ত না। শুধু চলা, নদীর চলার সঙ্গে মন চলত, উধাও হয়ে। একটা বিরামহীন গতিই ছিল আমার জীবনের নিয়ন্তা। কোথাও কোনো লক্ষ্যে থেমে থাকা আমার ধাতে ছিল না।

"এ সব এখন বুঝতে পারি। কারণ সে স্মৃতির সবখানি অবিকৃতভাবে আমার মনের মধ্যে রয়ে গেছে। এতকাল পরে

সেই আমার অতীতকে আমার মনে অতি যত্নে লালন করে আসছি, তাই আমি আজও গ্রাম্য। সব বিষয়ে গ্রাম্য কৌতূহল আর বিস্ময়, কখন কোন্ দিকে চলেছি তার হিসাব করি নি। এই ঘরছাড়া মন নিয়ে স্কুলের বালক আমি পথের খেয়ালে একদিন দার্জিলিং গিয়ে উঠবো এমন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। গোয়ালনন্দ থেকে ট্রেনে কাল্‌-শালি আসতে (১৯১৩) গাড়ির মধ্যেই মনে মনে ঠিক করে সোজা দার্জিলিং! পদ্মানদীর উপর তখন হার্ডিন্‌জ ব্রিজ সবে তৈরি আরম্ভ হয়েছে।

"এই দার্জিলিং আমাকে বিস্ময়ের চাপে প্রায় চূর্ণ করে দিয়েছিল। কি দেখছি, দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ফিরে এসেও সেই সাতদিনের দার-জিলিং বাসকে একটা স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল। এখনো সেই প্রথম স্মৃতির আনন্দ আমার রক্তে নেচে ফেরে। প্রকৃতি যে আমাকে এমনভাবে নির্যাতন করতে পারে তার আভাস পেলাম এই প্রথম। এতদিন প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে ছিলাম, বুঝতে পারি নি তার পৃথক প্রভাব। দার্জিলিং প্রথম দেখার অভিনব উন্মাদকরা প্রভাব আমার মনে এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, এর পর আর কোনো বিষয়েই আমি মনোযোগ ঘনীভূত করতে পারি নি। যে-কোনো অভিনব জিনিসে আমার উচ্ছ্বাস জাগত সীমাহীন। সে অভিনবত্ব প্রকৃতিতে হোক, বা মানুষের হৃদয়ে হোক, বা তার আচরণে হোক। বিস্ময়ের শেষ পাই নি কোথাও।"

রেডিওর কথিকা এইভাবেই প্রায় আরম্ভ করেছিলাম। সে অনেক দীর্ঘ কাহিনী। তবে মনের আর একটা দিক ছিল কৌতূহলে পূর্ণ। জানবার আগ্রহ ছিল অদম্য। তা থেকে পরে বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক হয়েছিল, যদিও বিজ্ঞানের ছাত্র আমি ছিলাম না। রচনার দিক থেকে, লেখার দিক থেকে এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা পথ আমি পেয়েছিলাম। একদিকে প্রকৃতির অপরিমেয় প্রভাব, যা আমার কাছে ছিল উন্মাদকরা, আর এক দিকে ছিল যুক্তির প্রতি নিষ্ঠা। আমার লেখার পথ এ দুয়ের মাঝখানে।

পিছনের কথা আগেই বলেছি। লেখক শিক্ষার পটভূমি, তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় বা তাঁকে দেখা আমাকে নতুন আর কিছুই দেয় নি বরং প্রথম দুবারের দেখা (১৯১৭) আমার চিন্তাধারাকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল, তাই তখন রবীন্দ্র-নাথকে দেখেও সত্য করে দেখতে পাই নি আমার বিশেষ মানসিক গঠনের জন্যই।

প্রথম দেখার চেহারাটা একটি ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মেলে—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একত্র যে ছবিখানিতে আছেন, সেই মূর্তিই আমি প্রথমে দেখেছি ১৯১৭ সনে।

কিন্তু আইনত সে দেখা চাক্ষুষ দেখা হলেও আমার মনের সঙ্গে আর চোখের সঙ্গে সে দেখা সে সময় এমন একটা বিস্ময়ের আবর্তের মধ্যে পড়ে ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল যে, তখন আমি কি দেখে-ছিলাম আর তাঁর কথা কি শুনেছিলাম, পরে আর তা কোনো দিনই স্পষ্ট মনে করতে পারি নি।

এটি আমার কাছে একটা প্রচণ্ড রকমের পরাজয় বলে বোধ হয়েছিল। এই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যই এবং একে অতিক্রম করে স্বাভাবিক একটা অবস্থা মনের দিক থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যই আমাকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছিল (১৯২১)। সেখানে তাঁর পদপ্রান্তে বসে যেদিন আমি একা তাঁর কথা প্রায় আধঘন্টা ধরে শুনে-ছিলাম, সেদিন মনের মধ্যেকার সেই আলোড়ন আর ছিল না। না থাকার কারণ সম্ভবত এই যে, এখন তো আমি বিশ্বভারতীর ছাত্র, অতএব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই এখন এই শান্তিনিকেতন পরিবেশে বাস করতে পারব, আরো দেখা হবে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এই ধারণা একটা শান্তির কারণ ঘটিয়েছিল, বর্তমানকালে 'ট্র্যাংকুইলাইজার' অনেকটা এইরকম করে থাকে অনেকের ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথকে খুব বেশি দিন এক সঙ্গে কেউ পেতেন না, পলাতক, ভবঘুরে ব্যক্তি, বহু জনের দাবি মেটাতে হত, নানা স্থানে গিয়ে, এবং মনে হয় নতুন গড়া বিশ্বভারতীর দাবিতে তাঁকে ঘরছাড়া করেছে অনেকবার। কিন্তু আমি যে অল্পকাল সেখানে ছিলাম, 'সেশন' শুরু হওয়ার পর থেকে পূজার ছুটি পর্যন্ত সে সময়টা একটানা তিনি শান্তিনিকে-তনেই ছিলেন। ঘন লালের চেক বোনা লাল লুঙ্গির উপর শাদা লম্বা পাঞ্জাবি ও চটি পরে লালমাটির উপর বিস্তৃত খোয়ার পথে তাঁর পরিভ্রমণরত চেহারা দৈর্ঘ্যে বীথির শালগাছের মতোই যেন আকাশ ছোঁয়া। সেখানকার সমস্ত পরি-বেশের হাওয়া তাঁর প্রীতির ভরে মূর্ছিতবৎ। দৃশ্য থাকুন বা অদৃশ্য থাকুন, সমস্ত জুড়ে যে তিনি আছেন, এই অনুভূতিটি আমার কাছে [illegible] ছিল।

তবু তাঁর লেখার ভিতর দিয়েই তাঁর কাছে এসেছি বেশি। তাঁর মনের সঙ্গে দেশের প্রতি তাঁর শুভ কামনার সঙ্গে এক হয়ে মিলতে পেরেছিলাম বহু আগেই, তাঁর রচনাগুলি বার বার পাঠ করে। একটা নতুন আলো পেতাম, এত সহজ এমন সরল ভাষায় আর পড়বার সুযোগ পেলাম কোথায়?

ক্রমে তাঁর সমস্ত লেখাই প্রায় পড়েছি এবং কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধ সমস্ত মিলিয়ে এমন একটা কিছু আমার অজ্ঞাতসারে লাভ করেছি, যা নতুন পথে অনুভব করতে ও চিন্তা করতে আমাকে সাহায্য করেছে। আমার প্রথম দিকের রচনা তাই এমনই রবীন্দ্র-প্রভাবিত যে, তাতে আমার যে কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না, তা এখন পড়ে বুঝতে পারি। সে সব রচনা আমি যত্নের সঙ্গে পরিহার করেছি। কিন্তু তবু হয় তো আমার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয় নি। সে কথা আমাকে ভাবতে হয়েছে একটি রচনা উপলক্ষে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি আমার রচনাতেও কিছু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করব এই ছিল আমার ইচ্ছা। কিন্তু সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নি। হাস্যরস সৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির ছাপ পড়েছে। এ কথা ১৯৩৫-৩৬ সনে সজনীকান্ত দাস আমাকে প্রথম বলেন। প্রমথনাথ বিশীর কৌতুক রচনা পড়েছি, ভঙ্গির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি কাছাকাছি। তাতে প্রমথনাথের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নি।

যে রচনাটির কথা বলেছিলাম তার নাম 'জীবনদর্শন অলংকার ও চোর।' এ রচনায় আমার নিজস্ব চিন্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেছিলাম, যদিও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক থেকে যে পারি নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরে। সে কথা পরে বলছি। রচনাটি বেরিয়েছিল শ্রীমতী আরতি সেন সম্পাদিত 'মঞ্জরী' নামক সাময়িক পত্রে। এই রচনাটি পাঠ করে দার্শনিক-অধ্যাপক সরোজকুমার দাস যে চিঠি লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ এই—

> **Professor Saroj Kumar Das M.A., P.R.S., (Cal) Ph. D. (London) Head of the University Department of Philosophy, L. S. College, Muzaffarpur, Member of the Senate and the Academic Council, Bihar University, Member Sahitya Akademi, National Academy of Letters.**

মজঃফরপুর
১৭-৩-৫৮

প্রীতিভাজনেষু,...."জীবনদর্শন অলঙ্কার ও চোর" রচনাটি পাঠ করিয়া মামুলী-ভাবে "উপকৃত" হইয়াছি বলিতে চাই না। ইহা যেমন অভিনব, ব্যঞ্জনাময় ও মনোজ্ঞ

বোধ করিয়াছিলাম—প্রাচীনকালের পণ্ডিতই—তাহার তুলনা এই চল্লিশ বৎসরের পঠন ও পাঠনার জীবনে পাই নি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের দার্শনিক, দর্শন আলোচনা-প্রভাবিত সাহিত্যরসিক প্রভৃতি লেখকবৃন্দের কোন রচনার মধ্যেই এই লোকায়ত ভাবধারার সমাবেশ দেখি নাই। আমি একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না।...ভবদীয় শ্রীসরোজকুমার দাস।

বলা বাহুল্য এ চিঠিতে আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছিলাম। এর পর রেডিও থেকে ন্যাশন্যাল প্রোগ্রামে প্রচারিত হবে এই উদ্দেশ্যে আমার কাছে একটি রচনা চাওয়া হয়। (প্রচারের তারিখ ৩০-৮-৬২)। ঐ রচনাটিই সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু মার্জিত করে পড়তে পারি কি না, অনুমতি চাইলাম তৎকালীন এ বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী লীলা মজুমদারের কাছে। অনুমতি মিলল প্রস্তাবমাত্র। তারপর শুনলাম এটি সর্বভারতীয় ব্যাপার, তাই অনুবাদ পাঠাতে হবে দিল্লীতে। লীলা নিজে ইংরেজীতে ঐ রচনাটি অনুবাদ করে দিল্লী পাঠালেন, এবং শুনলাম কেন্দ্র খুশি হয়েছেন। লীলা ঐ অনুবাদের সঙ্গে ইংরেজীতে আমার সম্পর্কে যেটুকু লিখে পাঠিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে প্রচারের জন্য তার বাংলা অনুবাদও তিনিই করে দিয়েছিলেন। তার অংশ এই—

"লেখার মেজাজে, তাঁর কথার খেলায়, একটা আলো ঝলমলিয়ে ওঠে। যতক্ষণ শুনি ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায় না, পরেও মনের হাসি লেগে থাকে। লেখার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রসন্ন ছায়া ফেলেছেন। নিছক হাসবার জন্য হাসান না... পিছনে থাকে স্পষ্ট বক্তব্য। হাসির আড়ালে তা চাপা পড়ে না।..."

পাকা ডিটেকটিভের অন্তরদৃষ্টিতে আমার রচনার মধ্যে লুকিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়ে গেলেন, এটা আমার কাছেও নতুন বোধ হল। আমি স্বেচ্ছায় লুকিয়ে রাখি নি। অবশ্য এই আবিষ্কার আমার কাছে কোনো গর্বের বিষয়ও নয়, লজ্জার বিষয়ও নয়।

আমি মুক্ত প্রকৃতির বুকে মানুষ, সেজন্য আমার কোনো কল্পনাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি প্রথম যখন লিখতে আরম্ভ করি। তারপর যখন গল্পের দিক থেকে ব্যঙ্গ বা কৌতুকের পথ ধরেছি, একমাত্র তখনই আমাকে সংযত করার কৌশল পেয়ে গিয়েছি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিপরীতপন্থী আমি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ গানে অল্প পরিসরে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে বেঁধে ফেলতে পারেন, যেমন—

এই তো তোমার আলোকধেনু
সূর্যতারা দলে দলে;
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
চরাও মহাগগনতলে।

তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥

সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে,
আঁধার হলে সাঁজের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।...

এ যে বিরাট কল্পনা! অথচ কত সহজে কবির মনের মধ্যে এসে এমন অপরূপ এক সৌন্দর্যে স্থান করে নিয়েছে! কিন্তু এ তো গেল বিশ্বের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে দেখা। অনেক গান আছে যা চরম বেদনার গান। অথচ সেই বেদনাও প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে না নিলে তাঁর গান-গাওয়া সার্থক হয় না। যেমন একটি ভাল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

গোধূলি লগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।
আমার যা কিছু কথা ছিল
হয়ে গেল সারা॥
হয়তো সে তুমি শোন নাই
সহজে বিদায় দিলে তাই;
আকাশ মুখর ছিল যে তখন
ঝর ঝর বারিধারা॥...

মেঘ ও বৃষ্টির সঙ্গে একাকার হয়ে চিরবিদায়ের ক্ষণটিকে সার্থক করেছে। এই পরিবেশ না থাকলে এ বিদায় ফাঁকা হয়ে যেত।

আমি ইঙ্গিত দিলাম মাত্র। এই পথে খুঁজলে শত শত শুধু বেদনার গান নয়, স্মৃতিমূলক গান নয়, অনেক আনন্দের মুহূর্ত স্মরণেও প্রকৃতির কোনো না কোনো অংশ এসে যোগ দিয়ে কবির স্মৃতিকে পূর্ণ করে তুলেছে।

রবীন্দ্রপ্রভাবে আমি পড়েছি—আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু ঠিক বিপরীত পথে। অর্থাৎ আমি আমার লেখায় যত দূর সম্ভব প্রকৃতিকে এড়িয়ে গিয়েছি, কারণ প্রকৃতির ধ্যান করতে গেলে নিজেকে হারিয়ে ফেলি, নিজেকে প্রকৃতির হাতে নির্যাতিত বোধ হয়। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, আর উচ্ছ্বাসকে বর্জন করেই লেখার সামান্য যা কিছু সাফল্য লাভ করেছি। স্মৃতি কথা, অন্যের কথা, লিখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি এবং তা থেকে নিজেকে যথাসম্ভব পরিহার করি। তার আসল কারণ অন্যের তুলনায় নিজেকে এত ছোট মনে হয় এবং আমি আমার নিজের বিষয়ে লেখক রূপে কোনো মোহ পোষণ করি না বলে, নিজেকে বাদ দিয়ে চলার চেষ্টা করি। নিজের কথা লিখতে বসলে নিজের বিরুদ্ধে এত কথা বলতে ইচ্ছা করে যে, তা হলে পাঠকদের কাছে আমার যেটুকু কৃত্রিম প্রতিষ্ঠা আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছুদিন পাঠ গ্রহণ করেছি এবং নানা ব্যক্তিগত কাজে দেখা করেছি, ১৯৩৭ সনে তাঁর নৌকোর মধ্যে নানা বিষয়ে আলাপ করেছি, কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত সাক্ষাৎই আমাকে অতিরিক্ত কিছু দেয় নি, যেমন দিয়েছে তাঁর কাব্য-গান ও নানা রচনা। ব্যক্তিগত পরিচয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথকে অসাধারণ এক সৌজন্যের প্রতিমূর্তি বলে জেনেছি, নানাজনের নানা দাবি মেটানোর মধ্যে যে কল্পনাতীত এক সহনশীলতার পরিচয় পেয়েছি তা আমার আভিজাত্য বিষয়ে পূর্বের গঠিত ধারণাকে বদল করে দিয়েছে। প্রকৃত আভিজাত্যের সঙ্গে উদারতা যে একত্র বাস করে, এবং প্রকৃত অভিজাত মানুষ যে সহজ মানুষ, এ ধারণা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পরে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে অনুভব করতে পেরেছি, ব্যক্তিগত পরিচয়ে এ লাভ আমি সামান্য মনে করি না।

চিঠি তাঁকে লিখেছি কম, কিন্তু সব সময়েই উত্তর পেয়েছি—এও সেই উদার আভিজাত্যেরই অঙ্গ বলে আমি মনে করি। যে চিঠি পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে তা সবই অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তি করব না। তিনি যে নানা দিক দিয়ে কত বড় ছিলেন তা সম্পূর্ণ ধারণা করা এবং তা প্রকাশ করায় আজও আমি নিজেকে অক্ষম মনে করি। তাঁর চিত্ররচনা বিষয়ে আমি তিনটি প্রবন্ধ লিখেছি, দুটি বিচিত্রা ও বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত হয়েছিল, তৃতীয়টি বড় রচনা যুগান্তরে প্রকাশিত ও আমার ম্যাজিক-লণ্ঠন নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই শেষেরটি পাঠাতে আমাদের কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আমাকে যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাইতে আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছি। রবীন্দ্র পরিক্রমায় তাঁর শিল্পও আমার আলোচনার বিষয় হয়েছে, তাঁকে আরো ভাল করে বুঝব এই উদ্দেশ্যে।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতুম আমরা মুগ্ধ হয়ে। কাব্যরসাস্বাদনের বয়স হয় নি তখনও।

তারপর যখন তাঁর কাব্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো, শুধু বিস্মিত হই নি, মুগ্ধ হয়েছিলুম। কারণ, আমরা তখন মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখের রচনা নিয়েই মেতে আছি। পরে বিহারীলালকে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কথায় কথায় বলি—"তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, হোক না এ বসুমতী যার খুশি তার!"

এরপর রবীন্দ্রনাথের রচনা পেয়ে আমরা একেবারে মেতে উঠেছিলুম। এই কবির অপূর্ব সুন্দর প্রতিকৃতি দেখে অল্প বয়সে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কী সুন্দর সুপুরুষ মানুষটি! তারপর যখন কবিতার সঙ্গে পরিচয় হল, আমরা একেবারে বিস্মিত ও মোহাভিভূত।

এরপর আমরা ছুটে আসতুম ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে প্রেসিডেন্সী কালেজে কবির রচনা পাঠ শোনবার জন্য। কবিকে তখনও সে দূর থেকে দেখা। মুগ্ধ হতুম, কিন্তু তৃপ্ত হতুম না।

কবিকে খুব কাছে থেকে দেখতে পেলুম প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময়। সেই ৩০শে আশ্বিন গঙ্গাস্নান, রাখী-বন্ধন, অরন্ধনের দিনে। তখন বয়স আমার পনেরো-ষোল বছর হবে। দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতে আর পাঁচজন ছেলের মতো আমিও সেদিন মেতে উঠে-ছিলুম। এরই ফলে খুব নিকট থেকে কবিগুরুর দর্শন পেলুম।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের মুখের দিকে। মিছিল নিয়ে চলেছেন পথে পথে। ছেলে-বুড়ো সবাই চলেছে কবির পিছু পিছু কবির রচিত দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল—
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
ধন্য হউক, ধন্য হউক, হে ভগবান!"

গঙ্গাস্নানের পর রাখীবন্ধনের পালা। দেখি সবাই এগিয়ে গিয়ে কবিগুরুর হাতের চওড়া নিটোল কব্জিতে সম্ভ্রমে, সাগ্রহে রাখী বেঁধে দিচ্ছে। কবির মুখে বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই, প্রসন্ন হাস্যে সমুজ্জ্বল সে মুখ! কবির ছবির চেয়েও সুন্দর! বড় বড় চোখ দুটি থেকে প্রতিভার আলো যেন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে।

সাহস করে এগিয়ে গেলুম আমিও। বেঁধে দিলুম কবির হাতে একটি সুন্দর রাখী। কিশোর তরুণের মুখ সে সার্থকতায় খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে কবির পদধূলি নিয়ে কপালে তিলক পরে পালিয়ে এলুম। কবির সঙ্গে একটি কথাও বলবার সাহস হয় নি সেদিন।

মিছিলের আগে আগে গান গেয়ে গেয়ে চলেছেন মহাকবি। তাঁকে ঘিরে অনুসরণ করছে অগণিত ভক্তের ভিড়। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন ভারত-অরণ্যের কোন ঋষি চলেছেন ভক্ত-শিষ্যদের নিয়ে বেদমন্ত্র গাইতে গাইতে তাঁর তপোবনের উদ্দেশে।

এরপর কতবার কবিকে দেখেছি কত সভায়, কত স্থানে; কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার তখনও হয় নি। কবির সঙ্গে প্রথম আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ পেলুম যখন আমি প্রায় চল্লিশ বছরের ধারে এসে পৌঁছেচি। কবি ও লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে 'ভারতী' পত্রিকার সাহিত্য বাসরে, আমি তখন নিয়মিত যাই। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে গেলুম একদিন কবি সন্দর্শনে। এঁদের সঙ্গে কবি ছিলেন অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ওঁরা আমাকে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একদিন সকালে অনুগ্রহ করে নিয়ে চললেন। কবি সেই সময় শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে এসেছিলেন।

অন্তরের অন্তস্তলে সেদিন কী যে এক উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে উঠেছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না।

পূর্বেই বলেছি, এর আগে অবশ্য নানা সভায় গিয়ে কবির সুমিষ্ট ভাষণ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কারণ, কবি যে-কোনও অনুষ্ঠানে যেতেন, আমরা মুগ্ধ ভক্তের মতো তাঁর ভাষণ শোনবার জন্য ছুটে যেতেম সেখানে। জনতার ভিড় এড়াবার জন্য কবির সভায় প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা করা হ'ত। আমরা যেমন করে হোক, সেই প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে সেখানে উপস্থিত হতুম।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সেদিন কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে কবির সান্নিধ্যে এসে মনে হল যেন আমার বহুদিনের, বহু জন্ম-জন্মান্তরের পরম আত্মীয়ের কাছে এসেছি।

আমার সঙ্গীরা কবির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও কথা বলবার সুযোগই পেলেন না। যত কথা জমেছিল আমার মনে এতদিন ধরে, সব যেন তাঁর কাছে যেতে আপনিই বেরিয়ে আসছিল! কোনও সংকোচ নেই, কোনও কুণ্ঠা নেই। তিনি যে একজন কতোবড় বিশ্বশ্রুত মনীষী, সে কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে যেন আমার সমবয়সী বহুদিনের বন্ধু ও আপন-জনের সঙ্গে কথা বলছি মনে হচ্ছিল।

কবির চেয়ে কথা বলেছিলুম বোধহয় আমিই বেশি। সময় চলে যায়। বেলা বাড়ছে, বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন ফেরার জন্য। তাড়া দিলেন আমাকে ইঙ্গিতে ওঠবার জন্য কিন্তু মহাকবির সঙ্গ ছেড়ে মন কি

উঠতে চায়? শেষে কবির স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁরা আমাকে প্রায় একরকম ঠেলে তুললেন।

কবির শ্রীপাদপদ্মে বার বার মাথা লুটিয়ে বিদায় নিলুম। কবি আবার আসবার জন্য অনুরোধ করলেন। সমস্ত জীবন যেন ধন্য হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে চারুচন্দ্র আমাকে কঠিন তিরস্কার করলেন। বললেন, তোমাকে কবির কাছে এনে আমরা অন্যায় করেছি। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো সে কথা তোমার মনে ছিল না। উনি কি তোমার সমবয়সী আড্ডাধারী বন্ধু? ছি-ছি! আমরা বড় লজ্জা পেয়েছি। আর তোমাকে নিয়ে কখনো কবির কাছে আসবো না। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে, খেয়াল ছিল না বুঝি তোমার?

আমি তো বন্ধুদের তিরস্কার শুনে অবাক! কিছুতেই মনে করতে পারলুম

[২৮৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সাগর বিশ্বাস

[মতামত লেখকের]

[পূর্বানুবৃত্তি]

যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রথম দিকে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল (প্রধানত সি পি আই) অবশ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি এম-এর অনমনীয় মনোভাবের ফলে সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ইতিমধ্যে বাংলা কংগ্রেস সারা রাজ্যে সি পি এম-এর স্বরূপ উন্মোচনের জন্য প্রচার অভিযানে সক্রিয়ভাবে নেমে পড়েছেন। সি পি এম ও বিধানসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বলা বাহুল্য, সেক্ষেত্রে বাংলা কংগ্রেসেরও স্বরূপ উন্মোচনের প্রচেষ্টা চলছে। কে কার স্বরূপ কতটা উন্মোচন করতে পারবে তা এক্ষুণি বলা যায় না, তবে এই দুটি দলের একত্রে কোন মোর্চা গঠন বা মোর্চায় অংশগ্রহণ বোধহয় সুদূরে পরাহত রয়ে গেল। সি পি এম যদিও নরম সুরে বলবার চেষ্টা করেছিল যে, বাংলা কংগ্রেস তার মনোভাব পাল্টালে তার সম্পর্কে সি পি এম বিবেচনা করে দেখবে। কিন্তু তার জবাব শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই বলে দিয়েছেন যে, সি পি এম-এর সঙ্গে স্বর্গবাসের চেয়ে নরকে যাওয়াও অনেক ভাল।

অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে চোদ্দ দলের সেই যুক্তফ্রন্টের পুনরুদ্ধার একপ্রকার অসম্ভবের পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। সম্প্রতি আর এস পি-র সম্মেলনে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, যুক্তফ্রন্টের শরীক দলগুলির পারস্পরিক নিন্দা এবং কুৎসা রটনার পথ পরিত্যাগ করে ফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করা উচিত। কিন্তু যা ন্যায়সঙ্গত তাই নীতিসম্মত হতে হবে, তার ত' কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তাই এ ধরনের সমন্বয়সাধনের আওয়াজের প্রতি সি পি এম এবং বাংলা কংগ্রেসের কর্ণপাত করারও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁরা শুধু পরস্পরের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য আয়োজিত জনসভায় বলবেন, 'আমরাই সাচ্চা দেশপ্রেমিক এবং জনগণের বন্ধু' আর হতভাগা দেশের ততোধিক হতভাগা নিরক্ষর জীবনযন্ত্রণায় মূক ও বধির মানুষগুলিকে তাই বিশ্বাস করতে হবে। আশ্চর্য ওঁদের সমাজবাদ, আশ্চর্য ওঁদের সমাজবাদী গণতন্ত্র!

বিকল্প ফ্রন্ট সরকারের জন্য বাংলা কংগ্রেস নেতারা কিছু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি নাতিবৃহৎ দলগুলির দিক থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে তাঁরা কিছুটা চুপসে গেছেন। এমন কি বাংলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া সি পি আই সম্পাদক শ্রীরণেন সেনকে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করবার অভিযানে অংশগ্রহণ করবার অনুরোধ জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন, শ্রীসেন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়, লক্ষণীয় যে, ইতিমধ্যে সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি সমেত যে আটটা পার্টি একটি মোর্চা গঠন করেছে, বাংলা কংগ্রেস সে মোর্চার বাইরে। এর ফলে একদিকে সি পি এম অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস, দুটো দলকেই কার্যত 'একলা চলা'র ফাঁকির মধ্যে ফেলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেহেতু একলা চলার অনুকূলে নয়, সেহেতু সি পি এম-এর পাশে ওয়ার্কার্স পার্টি এবং মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক এসে দাঁড়িয়েছে আর নব-কংগ্রেসের কণ্ঠে বাংলা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতির মোলায়েম সুর শোনা যাচ্ছে। অবশ্য সি পি এম ও তার সঙ্গী দলগুলিকে বাদ দিয়ে কোন বিকল্প সরকার গঠিত হলে তাতে বাংলা কংগ্রেসের স্থান অবশ্যই থাকবে। এবং এ ধরনের একটি সরকার গঠিত হতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। তাঁদের মনে করবার কারণ হলো সম্প্রতি দিল্লী থেকে শ্রীজগজীবন রাম এবং শ্রীগুলজারীলাল নন্দা কলকাতায় এসে কিছু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলোচনা করে নাকি এইরকম আশা প্রকাশ করেছেন। (এই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীল ধাড়াও ছিলেন)। নব-কংগ্রেস না থাকলে অবশ্য এ ধরনের সরকার আদৌ সম্ভবপর নয়। একটু হিসেব করে দেখা যাক : বিধানসভায় নবগঠিত আট পার্টি মোর্চার শক্তি হলো এই রকম : সি-পি-আই —৩০, ফরোয়ার্ড ব্লক—২১, এস-ইউ-সি—৭, এস-এস-পি—১, গুর্খা লীগ— ৪, পি-এস-পি—৪, আর-সি-পি-আই—২ এবং বলশেভিক পার্টি—৩। মোট ৭৭। এর সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস এবং এখনও পর্যন্ত জোটনিরপেক্ষ আর-এস-পির যথাক্রমে ৩৩ ও ১২ জন সদস্য যোগ করলে দাঁড়ায় ১২২। অতএব নব-কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া এ ধরনের সরকার হওয়া অসম্ভব। দিল্লী থেকে ফিরে এসে নব-কংগ্রেস নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ঘোষণা করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠিত হলে তাঁর দল বিধানসভায় সেই সরকারকে সমর্থন জানাবে। নব-কংগ্রেসের ৩৮ জন সদস্য সহ এই সরকারের শক্তি দাঁড়াতে পারে ১৬০, শ্রীনেপাল রায়ের মধ্যপন্থীরা এলে ১৬৫। এখনও পর্যন্ত জোটনিরপেক্ষ আর-এস-পি না থাকলেও এঁদের শক্তি থাকে ১৫৩। অতএব সরকার চলতে পারে।

কিন্তু সাম্প্রতিক কতকগুলি ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সম্পর্কে দ্বিমত হবার যথেষ্ট অবকাশ থাকে :

(১) সি-পি-আই সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে উৎসাহী নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য যদিও বাংলা কংগ্রেসের তুলনায় সি-পি-এমকেই সি-পি-আই দায়ী করেছে বেশি এবং যদিও নব-কংগ্রেসের প্রতি তার সহানুভূতি এবং বলা চলে কিছুটা দুর্বলতা আছে, এমন কি কোথাও কোথাও নব-কংগ্রেসের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়াও (যদি আঁতাত না হয়) হয়েছে, তবুও বাংলাদেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে সি-পি-এম'এর শক্তিকে অগ্রাহ্য করবার সাহস ও শক্তি তার নেই। সি-পি-এম যদিও অনবরত এ কথাই বলে এসেছে যে, তাকে বাদ দিয়ে কমিউনিস্টরা একটা নতুন ফ্রন্ট সরকার গঠন করবার চক্রান্ত করে আসছে, তবুও কার্যত দেখা গেল সেই প্রচারটাই একটা মিথ্যা প্রচার হয়ে দাঁড়ালো—সি-পি-এম-হীন কোন সরকার গড়তে কমিউনিস্টদের আগ্রহ দেখা গেল না। আজও সে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

(২) এদিকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে যদিও যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি একে অপরের প্রতি বিষোদ্গারের প্রতিযোগিতা করে চলেছে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর যে যুক্ত মনোভাবের আর এতটুকুও অবশিষ্ট নেই, সেই কথা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগে গেছে। শ্রীজ্যোতি বসু অনেকের চোখে যখন কুম্ভীরাশ্রু আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তখন কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সম্পূর্ণ একটি বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল। ১৯৬৯ সালের সেই পৌর যুক্তফ্রন্টের চুক্তি অনুযায়ী যেমন প্রথম বছরে সি-পি-এম এবং সি-পি-আই প্রার্থী যথাক্রমে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই একই চুক্তি অনুযায়ী এবারের নির্বাচনে সি-পি-এম এবং আর-এস-পি প্রার্থী জয়লাভ করলেন। অর্থাৎ পৌরফ্রন্টে অনৈক্যের কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

ছুরিমত সি-পি-এম প্রার্থীকে জেতানোর বিপক্ষে কেউই দাঁড়ান নি। সরকার চালানোর ক্ষেত্রে যে ভাঙন অনিবার্য হয়েছে, কর্পোরেশনে তা অনিবার্য হয় নি। বাংলা কংগ্রেসের মনের কথা জানি না, কিন্তু অন্যান্য দলগুলি যে, সি-পি-এম'কে চায়, কর্পোরেশন নির্বাচন বোধহয় সেই তাৎপর্যই বহন করে।

(৩) রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানকে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেবার একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তাঁর স্থলে জবরদস্ত ও শক্ত একজন মানুষকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল করে আনার চেষ্টা হচ্ছে। এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, কেন্দ্র প্রথমদিকে ভেবেছিল অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হবে। কাজেই রাজ্যপালের ক্রিয়াকলাপের প্রতি কেন্দ্র প্রখর দৃষ্টিপাত করবার খুব একটা প্রয়োজন বোধ করে নি। কিন্তু ইদানীং কেন্দ্র নাকি বুঝতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গে অদূরভবিষ্যতে কোন সরকার গঠিত হবার সম্ভাবনা নেই। অতএব, অচিরেই বিধানসভা ভেঙে দেওয়া দরকার এবং যেহেতু কেন্দ্রের মতে রাজ্যপাল হিসেবে শ্রীধাওয়ান তাঁর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বহুক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন, সেইহেতু তাঁকে আর পশ্চিমবঙ্গের জটিল রাজনৈতিক পরিবেশে রাখলে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব সংরক্ষিত হবে না।

কাজেই ঘটনা বিশ্লেষণে মনে হয় অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে কোন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই। অতএব নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এক্ষুণি কোন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রতিও জনসাধারণের যে তেমন আগ্রহ নেই, রাজনৈতিক দলগুলি তা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে। তাই শ্রীজ্যোতি বসুর 'ছয় সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচনের দাবি এখন এক বছরে পরিবর্তিত হয়েছে। সংবাদপত্রের খবর যদি সত্য হয়, তবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট নেতারা গ্রামে গ্রামে (কলকাতাতেও) জনসভা করতে গিয়ে যেভাবে বন্ধ, হরতাল আর কালো পতাকার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাতে তাঁরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। এবং এ সম্পর্কে কয়েকদিন আগে তাঁদের একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হবার কথা ছিল। সেই বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জানা যায় নি, তবে মার্ক্সবাদী নেতারা সমগ্র ঘটনার মূল্যায়ন করতে বসেছেন, এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা। অবশ্য সি-পি-এম-এর প্রতি জনগণের একাংশের বিরূপ সম্বর্ধনাদির পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদের জন্য সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

নকশালপন্থীরা এখনও পর্যন্ত রহস্যাবৃত। যেভাবে তাঁরা একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে সব তছনছ করে বেরিয়ে আসছেন এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিক বইপত্রের অগ্নি-সংস্কার সাধন করছেন, তার মধ্যে আর যাই থাক, অন্তত মার্কসিজম্, লেনিনিজম্ কিংবা মাওইজ্‌ম থাকতে পারে না। নবকংগ্রেস সহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এ'দের সংগে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার কথা বলছেন। এই মোকাবিলায় তাঁরা কি নকশালপন্থীদের সমতে আনতে সক্ষম হবেন? এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রায় ষোল আনা। তাহলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

একদিকে কংগ্রেস-জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দলের প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে চরমপন্থী নকশালবাড়ি গ্রুপের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। এই দুই বিপরীত প্রান্তের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে মধ্যবর্তী রাজনৈতিক দলগুলিকে বিচ্ছিন্নতার আদর্শে চালিত হলে চলে না। কারণ তাঁদের ঐক্যের সঙ্গে তাঁদের টিকে থাকার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আর এই টিকে থাকার সঙ্গেই তাঁদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের প্রশ্ন জড়িত।

এদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে আগামী নির্বাচনে (তা যখনই হোক না কেন) যদি বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি দক্ষিণপন্থী শক্তিকে শাসন ক্ষমতায় বসাতে না চান, তাহলে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে বর্তমানের দলাদলি এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও সংকীর্ণতার লড়াই একটি প্রহসনে পরিণত হবে। বামপন্থী দলগুলি, বিশেষ করে দুই কমিউনিস্ট পার্টি যদি যুক্তফ্রণ্টের প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুষ্ঠু ও সঠিক মূল্যায়ন করতে না পারেন, তাহলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকেই পরোক্ষে সহায়তা করা হবে এবং বর্তমানে দ্বিধা-বিভক্ত (কিংবা ত্রিধা) যুক্তফ্রণ্ট বাংলা দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে আর এক যুগ পিছিয়ে দেবেন।

[সমাপ্ত]

॥ দুই ॥

পাকিস্তানের রাজনীতিতে নয়া প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান সাহাবের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রতিশ্রুতি, তাঁর আশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে খানিকটা প্রত্যয় ধরিয়েছে। তিনি বলেছেন—দেশের মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পাবে আর গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন মানেই সামরিক শাসনের অবসান। হাতে সঙ্গীন উঁচোন বন্দুক থাকা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া সাহাব গণতন্ত্রের খাদেম হয়েছেন! এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না. তাই. এবারের চিঠিতে তাঁর কথা কিছু লিখলাম।

গত বছর, ছাব্বিশে মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া তাঁর বেতার ভাষণে বলেছিলেন যে, সামরিক শাসন জারী করার পেছনে তাঁর একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে. তা হোল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন এবং এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

এই ভাষণদানের কিছুদিন পরেই, এপ্রিল মাসের পনেরো তারিখে, রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন হয়। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একই উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর প্রেসিডেণ্ট হওয়া এবং উনিশশ' বাষট্টির সংবিধানের কোনও কোনও অংশ চালু রাখার কারণ দেখাতে গিয়ে ইয়াহিয়া বলেছিলেন যে, শাসনযন্ত্রের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনার পক্ষে এ দুটি ছিল অপরিহার্য। ক্ষমতায় থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কিছু করেন নি এবং করবেন না। ছাব্বিশে মার্চের বেতার ভাষণে ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের আশ্বাস দিয়ে প্রেসিডেণ্ট বলেছিলেন যে, তাদের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়ার প্রতি তাঁর কোনও অবিশ্বাস নেই এবং এই দাবি-দাওয়া ও অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য তাঁর সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

আপনারা সবাই জানেন যে. পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষ বলতে ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদেরই বোঝায়। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে যত ঝড়, যত বৃষ্টি হয়েছে, যত দুর্যোগের দিন এসেছে. তার মোকাবিলা করেছে এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষ। আজ তথাকথিত নেতারা, গণতন্ত্রের খাদেমরা, যাঁরা নাকি জনতার কাতারে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে ঘটা করে যথামাত্রা বুলি ছাড়ছেন, তাঁরা বলছেন যে, যা-কিছু হয়েছে তার জন্য তাঁদের দেশই মূলত দায়ী। কিন্তু আবার যদি দুর্যোগের দিন আসে (আমাদের মনে হচ্ছে দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী এবং আসন্ন, কেন তা পরে জানাব) তবে এইসব নেতাদের রাজনীতির দেউলেপনা আবার প্রমাণিত হবে আর ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক-রক্তে পথে-প্রান্তরের মাটি আবার লাল হয়ে উঠবে। নয়া প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন বলে শুরুতেই একটা বোঝাপড়ার রাস্তায় এসেছেন। সাবেক প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানেই। আয়ুব খান ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকের বুকে লুকিয়ে থাকা বারুদের গন্ধ পেলেও সময়মত সাবধান হন নি, তাই তাঁর গোলটেবিল বৈঠকের শেষ চাল ব্যর্থ হয়ে গেছে, বহুঘোষিত "ডিকেডী" রাজত্বের অবসান হয়েছে। যে পাথরকে সবাই ভাবত প্রগম্ভল, অনড়, অটল, সে পাথর গড়িয়ে পড়েছে অনেক দূরে, অনেক নিচে। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া তাঁর পূর্বসূরীকে দেখে শিখেছেন.—তাই টিপিক্যাল সামরিক শাসকদের মত দুর্নীতি দমন অভিযান শুরু করে কিছু চোর, ডাকাত, মজুতদার আর বজ্জাত আমলাদের হাজতে পুরলেও আসলে লক্ষ্য রেখেছেন ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি।

গত বছর, পনেরই মে তারিখে লাহোরে দেশের শ্রমিক সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনটি কয়েকদিন ধরে চলে। বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রকল্পের মালিক ও পরিচালকরা মত পোষণ করেন যে. দেশের সমস্ত কলকারখানা. সরকারী এবং আধা সরকারী প্রকল্পে শ্রমিকদের জন্য একটা নিম্নতম বেতন ধার্য করতে হবে। যারা দৈনিক চুক্তিতে চাকরি নেবে, তাদের নিম্নতম বেতন হবে দিনে চার টাকা, আর যারা মাসিক চুক্তিতে, তাদের বেতন হবে [illegible] দশ টাকা। তবে চা-বাগান এলাকাগুলোতে এই নিয়ম চালু হবে না, কেন না, সেখানে কাজের চাপ ও পরিস্থিতি অন্য রকমের। শ্রমিকদের তরফ থেকে এই সম্মেলনে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁরা বলেন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন দু' রকম হওয়া উচিত। তাঁদের বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিরা একটি বাজেট পেশ করেন। ঐ বাজেটে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, একটি সাধারণ শ্রমিক পরিবারের পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার জন্য দরকার মাসে দু'শ' কুড়ি টাকা, আর পূর্ব পাকিস্তানে থাকার জন্য দরকার দু'শ' ষাট টাকা। শ্রমিক প্রতিনিধিরা দাবি করেন যে, এই বাজেটের ওপর নির্ভর করেই নিম্নতম বেতন স্থির করা উচিত।

কিছুদিন পর, পাঁচই জুলাই তারিখে ইয়াহিয়া সরকার তার নতুন শ্রমিক নীতি ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয়, উনিশশ' উনসত্তর সালের পয়লা জুলাই থেকে পাকিস্তানে শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন হবে একশ' চল্লিশ টাকা এবং এই বেতনের পরিমাণ এতদিন যা চালু ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি।

এ ছাড়াও গত নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া একটি অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করে শ্রমিকদের ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ফিরিয়ে দেন।

এই বছর গত আঠাশে মার্চ তারিখে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া তাঁর বেতার ভাষণে মালিকপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, উৎপাদন বাড়াতে হলে শ্রমিকদের অবস্থার কথা তাঁদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনও তাঁর লক্ষ্য, এই কথা ঘোষণা করে নয়া প্রেসিডেণ্ট দেশের উভয় অংশে আরও সেচ, সার, বীজ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করছেন। কিছুদিন আগে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা বন্যা এবং এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। আঠাশে মার্চের বেতার ভাষণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আট শ' মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পাকিস্তানের অপর এক জঙ্গী সম্প্রদায়—ছাত্রদের জন্য ইয়াহিয়া সরকারের শিক্ষানীতি তো এই সেদিন, ছাব্বিশে মার্চ তারিখে স্থির হোল। এর আগে, গত বছরের মে মাসে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার

[illegible] বলেন। প্রাথমিক [illegible] উচ্চ, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে অধিকতর ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা দান, এই দুটি ব্যাপারই ছিল তাঁর আলোচনার মূল বিষয়। তাঁর সম্প্রতি ঘোষিত শিক্ষানীতির মূল কথা হোল—(১) কুখ্যাত "বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স", যা এতদিন ছাত্র ও শিক্ষকদের জীবনে অভিশাপের মত ছিল, তা দূর করা হবে। (২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করার আরও বেশি সুযোগ দেওয়া হবে এবং স্কুলে, কলেজে অযথা আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। (৩) গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার পক্ষে উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা স্বীকার করে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমোন্নতির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। (৪) শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যাতে দেশের আর্থিক উন্নতি তথা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মিটতে পারে। এই জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। (৫) সর্বোপরি,—শিক্ষার ভূমিকা হবে আওয়ামের ঐক্য ও উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য ঐস্লামিক নীতি ও আদর্শের সংগে সমতা রক্ষা করা।

এই পর্যন্ত পড়ে অনেকেই ভাবতে পারেন যে, নয়া প্রেসিডেন্ট গণতন্ত্রের একজন আদর্শ খাদেম, কেন না, রিফর্ম করে তিনি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক জনতার অভাব-অভিযোগ সব দূর করে দিচ্ছেন! কিন্তু আসলে কতটুকু কাজ হচ্ছে?

শ্রমিকদের কথাই ধরি। যেখানে শ্রমিক সম্মেলনে শ্রমিক প্রতিনিধিদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে নিম্নতম বেতন হওয়া উচিত দু'শ' বাট টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে দু'শ' কুড়ি টাকা, সেখানে সরকারীভাবে একশ' চল্লিশ টাকা নিম্নতম বেতন ধরা হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমে একটি শ্রমিক পরিবারে প্রতি মাসে আশী টাকার ঘাটতি দেখা দেবে এবং পূর্বে এটা আরও বেড়ে দাঁড়াবে একশ' কুড়ি টাকাতে। তা ছাড়া যে-সব কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা পঞ্চাশের কম, সেগুলিকে নতুন আইনের মধ্যে স্পষ্ট করে ফেলা হয় নি, কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে অধিকাংশ কারখানাই অত্যন্ত ছোট, সেখানে অসংখ্য শ্রমিক তাদের বাঁচার দাবি নিয়েও বাঁচতে পারবে না। আরও একটা কথা, নতুন শ্রমিক আইন চালু হওয়ার পর থেকেই আরও বেশি করে শ্রমিক ছাটাই ও শ্রমিক নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে যে, অনেক কল-কারখানায় শ্রমিকদের নাম ভোটার লিস্টে ব্যাপার নিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার শ্রমিক একটা বিক্ষোভ মিছিল করে। কাজেই যদি বলি যে, গণতন্ত্রের নয়া খাদেমের রিফর্মের পাহাড় মূষিক প্রসব করছে, তা হোলে এতটুকুও বাড়িয়ে বলা হয় না।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আট শ' মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের প্রতিশ্রুতিদান নিশ্চয় একটা আকর্ষণীয় ঘোষণা। কিন্তু কৃষকের সমস্যার সমাধান কি সেচ, সার, বীজ, লোন আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ দিয়েই হয়? পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশেই সেই সনাতন জমিদার, জোতদার আর ঠিকেদারের দল অধিকাংশ জমি ভোগ করছে। কেবল কয়েকটা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলে আর কিছু টাকা ছাড়লেই সমস্যার সমাধান হবে না, জমির মালিকানা কৃষকদের, একথাকে মেনে নিতে হবে।

শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, ইয়াহিয়া সাহাব আসল দাবিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যা চাই তা হোল, "এগার দফা।" এই "এগার দফা"র মধ্যেই আমাদের প্রাণের কথা লুকিয়ে আছে। খান সাহাব এই "এগার দফা"কে এড়িয়ে গিয়ে শিক্ষা সমস্যার, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার কি প্রতিকার করবেন? তাঁর নতুন শিক্ষানীতির মূল কথা তো এই যে—"তোমরা বিজ্ঞানীও হও, আবার মোল্লাদের মত দাঁড়ি নেড়ে এসলাম, এসলাম কর!" তা হলে বলব—"জনাব, আমরা চলদুম, ফিরে গিয়ে সেই সরিয়ে-রাখা লাঠি-সোটা, ইট-পাটকেলগুলো আবার হাতে তুলে নেব এবং এবার যখন দেখা হবে, তখন ভাল করেই বুঝবেন আমরা কি ধাতুতে গড়া!"

আগেই বলেছি, হালের প্রেসিডেণ্ট সাহাবের মাথাটি সাবেক প্রেসিডেণ্টের মাথার চেয়ে ঠাণ্ডা। তত রাখার জন্য তিনি যে পলিসিটা নিয়েছেন, অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের "তৈলদান" করা, সেটা বেশ ঝানু রাজনীতিবিদদের মতই। অন্ততপক্ষে তাঁর মত শিক্ষানবীশের ক্ষেত্রে এতটা অনেকেই ভাবতে পারে না, কিন্তু পলিসির প্রয়োগের ক্ষেত্রেই তিনি যত ভুল করছেন। তিনি যা দিচ্ছেন তার বেশির ভাগই অন্তঃসারশূন্য।

নয়া প্রেসিডেণ্টের মনে রাখা দরকার যে, নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি যে-সব বুড়ো বা আধা-বুড়ো নেতাদের শান্ত করে রেখেছেন, আমরা তারা নই।

খুব জোরগলাতেই বলছি যে, এবারের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বরাতে খুব বেশি হলে যা জুটতে পারে, তা হোল একটি রম্ভা। ঐ রম্ভা খেয়ে কাছাখোলা নেতার দল আবার আমাদেরই ডাকবেন। তা ছাড়া প্রেসিডেণ্ট সাহাব, আপনি আমাদের কি-ই বা দিতে পারেন? আমরা চাই আজাদী এবং আজাদী কেড়ে না নিলে এমনি আসে না।

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ সাত ॥

. রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, একটা পা ঠুকতে ঠুকতে টুলু বললে, 'ধুর, ভালো লাগছে না কিছু।'

এক জোড়া অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে হাতে হাত জড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল লেকের দিকে। আড়চোখে তাদের লক্ষ্য করতে করতে শিস দিচ্ছিল মানিক। টুলুর কথাটা তার কানে গেল না।

'মেয়েটা বেড়ে দেখতে মাইরি।'

টুলু আবার বললে, 'কিছু ভালো লাগছে না।'

'চল্ না—ফলো করি। দুজনে বেশ মজে রয়েছে মনে হচ্ছে রে। নিশ্চয় কোথাও নিরিবিলিতে বসবে—' চোখ চিকচিক করতে লাগল মানিকের : 'চাই কি দু-একটা—'

'আঃ, কী বকে যাচ্ছিস তখন থেকে। থাক্ না!!

মানিক কপাল কোঁচকালো।

'হল কী তোর? অমন ভোম্বা মেরে গেছিস কেন?'

'তোকে তো আর থানার লক-আপে থাকতে হয় নি, পুলিশ আসতে দেখে কেটে পড়লি। বাপ্সে—কী মশা রে! মনে হচ্ছিল মশা নয়—চামচিকের বাচ্চা সব। আর কী ঠুকরেছে মাইরি! আর একটা রাত থাকতে হলে গায়ের চামড়াটা শুদ্ধু উপড়ে নিত।'

'ফনে আর কার্তিক তো রয়েছে।'

'ও দুটোর গণ্ডারের চামড়া—' টুলু মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'মশার চৌদ্দপুরুষও ওদের কিছু করতে পারবে না। বললে বিশ্বেস করবি নে, আমি যখন সারা রাত বসে-বসে মশা চাপড়াচ্ছি, তখন কার্ত্তিক রাস্কেলটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক ডাকাচ্ছিল।'

মানিক হাসল : 'ওদের অব্যেস আছে।'

'সে আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার এ-সব পোষাবে না মাইরি। তোদের পাল্লায় পড়ে আমি বখে গেলুম। এবার তোদের দল আমায় ছাড়তে হবে।'

'হাঁয়!'—ট্যারা চোখে তাকিয়ে মানিক জিজ্ঞেস করল : 'তারপর?'

'একটা কাজকর্ম খুঁজতে হবে।'

'কাজকর্ম!' তোমায় দেবার জন্যে'—একটা অশ্লীল উপমা দিয়ে মানিক কথাটা শেষ করল : 'বসে আছে! ইঞ্জিনীয়াররা পর্যন্ত আর্দালীর চাকরির জন্যে ফ্যা-ফ্যা করছে, তোমায় কে কাজ দেবে চাঁদবদন?'

'ভিড়ে পড়ব যে কোনো কলে-কারখানায়।'

'ক'টা কারখানায় লক-আউট হয়ে আছে, সে খেয়াল রাখো যাদু? লাল ঝাণ্ডাওয়ালারা দিয়েছে সে দিকে বারোটা বাজিয়ে। যে-সব জায়গা খোলা আছে সেখানেই কি ঢোকবার উপায় আছে তোমার? ওদের ইউনিয়নের লোক না হলে?'

'বিজনেস করব। চায়ের দোকান দেব একটা।'

'কারা তোমার দোকানে চা খেতে আসবে চাঁদ? এই আমরাই তো? ভাবিস নি, বাকী খেয়ে সাত দিনেই তোর গণেশ উল্টে দেব।'

'সব কথায় ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিসনে—বলে দিচ্ছি মানিক।'—টুলু বিরক্ত হল : 'না, কিছু একটা করতে হচ্ছে। রাতদিন দাদা খ্যাচ-খ্যাচ করছে—বাড়ি ফিরলেই মা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে। আর সহ্য হয় না এ-সব। ভারী ভুল হয়েছে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে।'

'ছাড়লি কেন?'

'কী করব? সরস্বতী পুজোর ফাণ্ড থেকে টাকা মেরে দিয়ে এমন কেলেঙ্কারী হল—'

'টাকা মেরে দিয়েছিলি?'

'তখন হঠাৎ—' বলতে গিয়ে টুলু থামল। একটি মেয়ের মুখ। স্বপ্না। অনেক জল গড়িয়ে গেছে তারপরে। টুলু ভেবেছিল রোগা ওই ছোট মতন মেয়েটাকে সে ভুলে গেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ভোলা যায় না। মনে পড়ে—আর মনে পড়লেই কি রকম কষ্ট হয় একটা। সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল—অথচ এ-রকম না হলেও বোধহয় ক্ষতি ছিল না।

মানিক বললে, 'তারপর?'

'তারপর আর কী?'—টুলুর ঘোর ভাঙল : 'দেখতেই পাচ্ছিস।'

ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে একটা সিগারেটের বাক্স বের করল মানিক।

'নে।'

দুজনে দুটো সিগ্রেট ধরালো।

'সত্যি বল্‌তো মানিক, এভাবে তোর ভালো লাগে?'

মানিক মুখ ছুঁচলো করে আস্তে আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর :

'এসব কথা তুলে কেন ব্যাজার করে দিস, বল তো? ভালো লাগে কি না সে কথা ভাবতেও ভালো লাগে না। প্রাণপণ টুকেও শালা দু-বারেও স্কুল ফাইন্যাল পেরুতে পারলুম না। বাবাকে তো দেখেছিস—সারাদিন খেটে-খুটেও দু বেলার সংস্থান করতে পারে না—তিরিক্ষি হয়ে থাকে। জুতো দিয়ে পিটতে আরম্ভ করল। জুতোটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাল্টা বসাতে যাচ্ছিলুম—তারপরে মনে হল, দূর [illegible]

জুতো [illegible] কেমন হয়ে যায়। ছাড়লুম বাড়ি। উঠে এলুম মাসীর কাছে। বেশ আছে এরা—বুঝলি? মেসো জুতো চুরি-চামারি করে—তিনটে মাসতুতো ভাই ওয়াগন ভাঙে।'

'তুইও যাস।'

'কী করব, বল। ওদের সংসারে থাকব, খাব, কাজকর্ম না করলে চলে? তোকে কতদিন বললুম, চলে আয় আমাদের লাইনে, কিন্তু তুই ব্যাটাচ্ছেলে মনে মনে স্রেফ ভদ্দরলোক, কিছুতেই রাজী হলি না। তোর তো ঘরে খাবার ভাবনা নেই—খেলো আর ফুর্তির খরচটা অন্তত চলে আসত।'

টুলু চুপ করে রইল একটু।

'ওয়াগন ভেঙে সারা জীবন চলবে?'

'চালালেই চলবে। আমরা তো [illegible] চিনির বলদ—স্রেফ কিছু কমিশন [illegible]। দেখে আয় না ভুঁড়ো শেঠজীদের, চোরাই মাল বেচে লাল হয়ে উঠছে সব। [illegible] যদ্দিন আছে, ততদিন আমরাও আছি।'

'কিন্তু এ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই?'

'সব রাস্তাই তো একদিকে যাচ্ছে রে —চোর নয় কোন্ ব্যাটাচ্ছেলে? মনে কর্ [illegible]দের কোনো কেতা-দুরস্ত বাবু—চুলের ডগা থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত [illegible]লোক—ওয়াগনভর্তি লাখ টাকার মালকে চালান করে দিলে সাইডিঙে—[illegible], এম্‌টি ওয়াগন। তারপর লরী এনে মাল ধীরে-সুস্থে বের করে নিলেই হল। [illegible] —এ-সব ভদ্দরলোকের চলছে না?'

'ওরা তো গা বাঁচিয়ে চলে। তুই একদিন গুলি খেয়ে মরবি।'

'ব্যাস্—ওই পর্যন্তই। মরবার পরে তো আর কোনো ভাবনা নেই। আমি বলছি টুলু, চলে আয় আমাদের সঙ্গে। মধ্যে মধ্যে কেমন বেসুরো গাস তুই—ভিড়ে পড়—দেখবি কী থ্রীল—শরীর-মন টান-টান হয়ে থাকবে।'

'তার চেয়ে পলিটিকস্ করলে কেমন হয়?'

'ধ্যাৎ!'—সিগারেটটায় মানিক এমন টান মারল যে আঙুলের কাছে পৌঁছে গেল [illegible] আগুনটা। 'ওদের মাল-কড়ি কী আছে? যা দু-চারটে টাকা জোটায় [illegible] ইলেকশনের সময়। একবার পেরিয়ে গেল তা আর পাত্তা নেই মক্কেলদের। তবে এক [illegible] মন্ত্রী-টন্ত্রী হতে পারলে নেহাৎ মন্দ [illegible] না—কিন্তু সে মওকা তো আর তোমার কেউ দিচ্ছে না।'

টুলু আবার চুপ করে রইল।

[illegible] একটা। মানিক হাসল।

'এই দোতলা বাস [illegible] তখন [illegible] লাগে দেখতে।'

'পুড়িয়েছিস বুঝি?'

'হ্যাঁ। দুবার।'

'ও-সব তো পলিটিকস্‌ওয়ালাদের কাজ। তুই কী বুঝে গেলি ওর ভেতরে?'

কৌতুকে চোখ দুটো ঝিকমিক করতে লাগল মানিকের।

'সে বেশ মজা হল, জানিস। ছেলে-গুলো খেপেই বেরিয়েছিল মিছিল নিয়ে। একটা দোতলা বাস দাঁড়িয়ে গেল সামনে। বেশ চকচকে নতুন বাস রে—কোথাও চোট-ফোট খায় নি তখনো। বললুম, 'এগিয়ে আসুন দাদারা—ওই তো রয়েছে সরকারী বাস—দিন ওটাকে জ্বালিয়ে। কাছেই কেরোসিনের একটা দোকান ছিল, আনলুম একটা টিন টেনে। তারপর—' মানিকের চোখদুটো ক্রমেই উজ্জ্বল হতে থাকল: 'যা জ্বলল না—কী বলব তোকে! ফায়ার-ব্রিগেড আসছিল, খানকয়েক ইট খেয়েই হাওয়া!'

সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মানিক বললে, 'শালা ঝকঝকে চকচকে কিছু দেখলেই মাথায় আমার আগুন ধরে যায়। ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবী পরে এক ভদ্দর-লোক যাচ্ছিল, পাশ থেকে এমন এক কনুইয়ের ঘা মারলুম যে হুড়মুড়িয়ে এক-রাশ ময়লার মধ্যে পড়ে গেল। দু-তিনটে মেয়ে বেশ বাহার দিয়ে বোধ হয় বায়োস্কোপে যাচ্ছিল—এক শিশি কালি ছুড়ে দিলুম তাক করে—বুঝলি, ঠিক বোমার কাজ করল—কাঁদতে কাঁদতে সব কটাই দৌড়ুল বাড়ির দিকে। আমার—গোটা কলকাতার সব বড়ো বড়ো বাড়ি, সব ট্রাম-বাস যদি একসঙ্গে আগুনে পুড়তে থাকে আর সব মেয়ে-পুরুষকে যদি কালি দিয়ে নাইয়ে দেওয়া যায়, তা হলে বেশ হয়—না রে? খুব চমৎকার লাগে—তাই না?'

'কী বিটকেল সব ভাবনা তোর!'

'তুই উজবুক একটা, মন মনে নিপাট ভদ্দরলোক। এ-সব তুই বুঝবি না'—বলতে বলতে মানিকের দৃষ্টি চলে গেল অন্যদিকে, টুলুর কাঁধে একটা থাবড়া মারল সে।

'ওই মেয়েটাকে দেখছিস? ওই যে—গোলাপী শাড়ী পরা?'

'হুঁ, দেখছি।'

'কিভাবে জামা-কাপড় পরেছে বলতো মাইরি? ওটুকু আর রাখা কেন দিদি-মণির? মামলা একেবারে মিটিয়ে ফেললেই তো হয়।'

'তুই গিয়ে বলে আয় না কথাটা।'

'বলতুম। কিন্তু সঙ্গের লোকটা একটু [illegible] চেহারার, তা ছাড়া [illegible] আমাকে। কিন্তু মাইরি—তুই-ই বল না—এমনি করে সেজে লোককে উসকানি দেবে, আর আমরা একটা শিটি মারলেই মহা-ভারত অশুদ্ধ হয় গেল? আমাদের দেখাবে বলেই রাস্তায় নেমেছে, আর আমরা দেখবার জন্যে তাকালেই মানে টুশকি পড়ে যায়? সাধে কি আর ওদের গায়ে কালির বোতল ছুড়তে ইচ্ছে করে?'

'তুই বড্ড বকছিস আজকে। চল্, চা খাওয়া।'

'চা কেন—' মানিক পকেট থাবড়ালো: 'পকেটে কিছু আছে আজ। চল না সন্ধ্যের পরে একটু—'

টুলু মাথা নাড়ল।

'না—দু-চারদিন যাক। মা বড্ড কান্নাকাটি করছিল।'

'তুই ভালো ছেলে হওয়ার চেষ্টা করছিস।'

'ক'দিন একটু সামলে চলতে হবে—' টুলু আবার অন্যমনস্ক হল। কাল রাত্রে দাদা ভারী বিশ্রীভাবে স্বপ্নার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। কিছুতে ভোলা যাচ্ছে না—কোনোমতেই না। বুকের ভেতরে সেই থেকে যন্ত্রণা থমথম করছে একটা। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেল; সব অন্যরকম হতে পারত, সব অন্য রকম হলে কোনো ক্ষতি ছিল না।

'তা হলে চল ব্রীজের ওপারে। ক'দিন ধরে দেখছি দুটো কালো কালো অল্প-বয়েসী মেয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব খলবল করে—চনমনে চোখ। ভাব জমানো যাবে মনে হচ্ছে। শিকার ধরার লাইনে—'

'[illegible]—এসব ছাড়া কিছু ভাবতে পারিস নে তুই?'

'আর কী ভাববার আছে, তুই বল?'—মানিক হঠাৎ খিল্ খিল করে হেসে উঠল: 'তা হলে চল সন্ধ্যেবেলা মাঠের দিকে, ক'দিন ধরে খুব কেত্তন-টেত্তন হচ্ছে। ধম্মো হবে।'

টুলু বললে, 'থাম—সিগ্রেট দে আর একটা।'

আবার সিগারেট ধরালো দু'জনে। আর এতক্ষণে মানিকের একটা কথা মনে হল।

'ভালো কথা, তোকে যে আগে ছেড়ে দিল ?'

'দাদা তম্বির করেছিল।'

'ও-রকম দাদা থাকা ভালো মাইরি!'—মানিকের নিশ্বাস পড়ল: 'আমার বাবা হলে কী বলত, জানিস? ধরে নিয়ে গেছে, বেশ হয়েছে। যদি ফাঁসি দেয় আরো ভালো হবে তা হলে!'

'দাদা ভালো না কচু! এমন এক-একটা কথা বলে যে—'

টুলু আবার থামল। সেই স্বপ্না। কিভাবে শুরু হয়ে কোথায় যে থমকে গেল সমস্ত। আর এগুলো মনে পড়ে গেলে কিছুই আর ভালো লাগে না, কিছুই না। রাত্রে যখন ঘুম আসে-আসে না, শরীরটা এলিয়ে পড়ে থাকে—মনের সামনে যতদূর চোখ যায় ধু-ধু করতে থাকে সব, তখন স্বপ্নাকে ভাবলে—ভাবলেই বুকের ভেতরে কী যেন তির-তির করে কান্নার মতো কাঁপে। আচ্ছা, স্বপ্না যদি কখনো জানতে পারে যে, সে গুণ্ডামি করে ছাজতে গিয়েছিল, তা হলে, তখন—

'ও দুটোকে ছাড়ল না, না?'

'না। তবে হয়তো দু-একদিন পরেই বের করে দেবে।'

'আমার সন্দেহ আছে।'—মানিক চিন্তিত হল: 'ওদের ধারণা ফনে ছিন-তাইয়ের দলে আছে।'

'নেই কি?'

বাঁকা চোখে তাকিয়ে মানিক বললে, 'আমি কী জানি?'

'তুই জানিস নে?'

'তোমার মা তা লুকিয়ে-চুরিয়ে হাত-খরচা দেয়, চাঁদ। ওর খরচ কে জোগায়? একজন ভদ্দরলোকের একটা হাতঘড়ি গেলে সে পরদিনই আর একটা কিনতে পারবে, কিন্তু ওকে তো মা-বাপকে খাওয়াতে হবে। ওর বাপ তো এক বছর কারখানার চাকরি খুইয়ে বসে আছে।'

'তবু এসব করে—'

'কী করবে রে রাস্কেল, কী করবে? রাস্তা বাতলে দিতে পারিস?'—মানিকের চোখ হঠাৎ দপ করে উঠল: 'আমাদের পাড়ার একটা মেয়ে—খুব ভালো মেয়ে বুঝলি—আমরাও কোনোদিন কুনজর দিই নি. বাড়িশুদ্ধ খেতে না পেয়ে এখন কী করছে জানিস তুই? জানিস, কেন সে এখন বড়ো বড়ো মোটর গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ায়?'

টুলু চুপ করে রইল।

'ভালো-ভালো কথা বলিস নি, শুনলে গা জ্বালা করে।'

'মরুক গে, চল্—চা খাওয়াবি। পকেটে কিছু নেই।'

'মা-র কাছ থেকে কিছু পাস নি?'

'চাইতে সাহস হল না। মা-র মেজাজ ভালো নেই।'

'বললুম তো, চলে আয় না আমার সঙ্গে। পয়সাও আছে. প্রীলও আছে।'—পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করল মানিক: 'দেখছিস তো?'

'না—আমি পারব না।'

'তুই একটা কাওয়ার্ড'!'

'তা বলতে পারিস।'

'তোর আমাদের সঙ্গে আসাই ভুল হয়েছে।'

'তাই ভাবছি। এবার দল ছাড়ব তোদের।'

'তারপর কী করবি? ভদ্দর লোক হবি?'

'চেষ্টা করে দেখব।'

মানিক আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

'হাসলি যে?'

'পারবি না। আবার টাকা মেরে দিয়ে, কেলেংকারী বাধিয়ে আমাদের কাছেই ফিরে আসবি। আর—'

সেই সময় একটা মোটর এসে একেবারে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। ভেতর থেকে দিদির তীক্ষ্ম গলা কানে এল: 'টুলু!'

টুলু চমকে উঠল। হাত থেকে পড়ে গেল সিগারেটটা।

দিদি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। পেছনের সীটে টিনটিন আর বাড়ির কুকুর ক্যাসিয়াস।

দিদি গলা বাড়িয়ে তেমনি তীক্ষ্ম নীরস গলায় বললে, 'গাড়ীতে উঠে আয় টুলু. তোকে আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছি।' [ক্রমশ]

[২৮৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

না—অন্যায়টা করেছি কী? তবে বন্ধুরা যখন বলছেন, তখন অপরাধ করেছি কিছু নিশ্চয়। বিনীতভাবে বললুম আমায় ক্ষমা করো ভাই, হয়ত কিছু অন্যায় করে ফেলেছি স্মরণ হচ্ছে না। আমি অযোগ্য। আর কখনো কবির সামনে আসবো না।

কিন্তু কবিগুরুর সঙ্গে প্রথম আলাপ-পরিচয়ের দিন আমি যে কিছু অন্যায় করি নি তার প্রমাণ পেলুম কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েই আমায় একখানি চিঠি দিলেন "তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লেগেছে। একবার সময় করে এসে শান্তিনিকেতনে বেড়িয়ে গেলে খুশী হলো"—রবীন্দ্রনাথ।

এর পর আর কিছু বলবার নেই। কতবার যে শান্তিনিকেতনে গেছি, থেকেছি, কবির সঙ্গে একত্রে খেয়েছি, এ সব শুনে অনেকে হয়ত গল্পকথা মনে করবে। তবে একটি কথা বলে শেষ করি, কবি রাধারাণী দত্তর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ত সম্ভব হত না, যদি কবি না তাকে উৎসাহ দিতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — বাংলা সাহিত্যে একটি বিস্ময়কর নাম। তবে সাহিত্যসাধনার বিষয়বস্তু হিসেবে নাটক রচনাতেই তাঁর প্রতিভা প্রধানভাবে বিকশিত হয়েছিল।

১৮৭২ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম নাটক লিখতে শুরু করেন। সেটি ছিল প্রহসন-নাটক। নামঃ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। তাঁর 'অলীকবাবু' একালেও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। ঐ প্রহসন-নাটকটির রচনাকাল ছিল ১৮৭৭। সে-সময় অবশ্য নাম ছিল 'এমন কর্ম আর করব না'। পরে ঐ নাম পাল্টে 'অলীক-বাবু' নামে প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। সুদীর্ঘ সত্তর বছর পরেও জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের নাটক বা প্রহসনের আবেদন ম্লান হয়ে যায় নি—যা অনেক সময় নাটকের বেলায় বজায় রাখা কঠিন ব্যাপার। তা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভার স্পর্শেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একাধিক ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক। ঐ নাটকগুলি পড়লে বা শুনলে আজো উত্তেজনার সঞ্চার হয়, চিত্ত জাতীয় ঐক্য চেতনায় আন্দোলিত হতে থাকে। 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'স্বপ্নময়ী' নাটক-গুলি ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। 'পুরুবিক্রম'-এর গানগুলির মধ্যে দুটি গান আজো স্মরণীয়। একটি রচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিলে সব ভারত-সন্তান,
একতান-মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান,
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রিসমান?
ফলবতী বসুমতি,
স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি, রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়।
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়।
ইত্যাদি

বঙ্কিমচন্দ্র এই গান সম্বন্ধে উক্তি করেছিলেন—'এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক!' ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথ রচিত—
একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

গানটিও পুরুবিক্রমের দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহৃত হয়েছিল।

অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার ছিলেন। অধিকন্তু সুর-রচনাতেও তাঁর অসামান্য প্রতিভা ছিল। বিশেষত 'বাংলা গানে নূতন রীতিতে সুর-সংযোজনা' করে তিনি সঙ্গীত-শিল্পকে নতুন দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা দান করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ার ফলে তাঁর গীতিনাট্যগুলিও অসাধারণ। 'মানময়ী', 'পুনর্বসন্ত', 'বসন্ত-লীলা', 'ধ্যানভঙ্গ' পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনয়-শিল্পেও প্রতিভাশালী ছিলেন।

এই সব কারণে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের রচিত নাটকগুলি কালজয়ী এবং রসিকহৃদয়জয়ী হওয়াই স্বাভাবিক।

তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চের একদা যে প্রভূত উপকার-সাধন করেছিল, তা অমৃতলাল বসুর 'স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন—

"গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমরা একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুসূদনের নাটক প্রহসনগুলির অভিনয় করিয়াছিলাম। তাহার পর অভিনয়যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক আর খুঁজিয়া পাই নাই—বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের তখন এমনই দুর্দশা। এই সময়ে পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। যদিও তখন স্বত্ব-সংরক্ষণের এত কড়াকড়ি ছিল না, ভদ্রতার খাতিরে আমরা কয়েক-জন রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকারের অনুমতি ভিক্ষা করিতে গেলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি প্রদান করিলেন।"

শুধু ঐ একটি নাটক নিয়েই নয়, তাঁর বহু নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন বহু ভাষা থেকেও নাটক অনুবাদ করেছেন, তেমনি তাঁর মৌলিক নাটক পুরুবিক্রম গুজরাটী ভাষাতে অনূদিত হয়েছিল। এ খবর নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যের গৌরবকেই বিস্তৃত করে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনা ও সেগুলি অভিনয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে জড়িত হয়ে পড়তে ভালো-বাসতেন। যেমন,

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ

গানটি রবীন্দ্রনাথ কিভাবে লিখলেন তার একটি সুন্দর ইতিহাস রয়েছে। আর আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের প্রসঙ্গকথায় তা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ মূল্যবান প্রসঙ্গ কথা সহ একটি মূল্যবান সংকলন। এতে রয়েছে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'পুরুবিক্রম নাটক', 'সরোজিনী নাটক', 'অলীকবাবু', 'অশ্রুমতী নাটক', 'মানময়ী', 'স্বপ্নময়ী', 'হিতে বিপরীত', 'বসন্ত-লীলা', 'ধ্যানভঙ্গ', 'পুনর্বসন্ত'।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত মৌলিক নাটকের নাটকের সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করেছেন ডক্টর সুশীল রায়। প্রসঙ্গ কথা যুক্ত হওয়ায় প্রতিটি নাটকের আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানা যায়। বলা বাহুল্য, সংকলক সুন্দরভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি সংকলন করে পাঠকদের আনন্দবিধান করতে পেরেছেন। তাঁর কৃতিত্বের জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট। তবু মনে হয়, মূল্য আরো কিছু কম করা উচিত ছিল। কারণ বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি যথাসম্ভব কম মূল্যেই বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা। মূল্যঃ ১৪·০০ টাকা।

"আজ আমরাই নিয়ামক শক্তি। আমরাই ঠিক করেছি—কখন কাকে আর কিভাবে খতম করবো। শত্রু আমাদের গোপীবল্লভপুরে ছিল, খতম হল বহড়া গোড়ায়, খড়গপুরে। ওরা ছুটলো খড়গপুরে, বহড়া গোড়ার কৃষকের কাস্তে ঝলসে উঠল আবার গোপীবল্লভপুর, ডেবরাতে। ওরা ছুটলো ডেবরাতে, আমরা খতম করলাম কেশপুরে। আমরাই বেছে নিতে পারি কোথায় আক্রমণ করবো—ওদের ছুটতে হয় আমাদের পেছন পেছন। খতমের খবর আমরা গর্বের সাথে বের করছি দেশব্রতীতে। রাস্তায়-ঘাটে খোলাভাবে দেশব্রতী বিক্রি হচ্ছে। ওদের উগ্র চীনবিরোধী প্রচার সত্ত্বেও দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটে উঠছে চেয়ারম্যানের মুখ—আওয়াজ উঠছে, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। পুলিশ-মিলিটারী, রক্ষীবাহিনী, রেডিও সব থাকা সত্ত্বেও ওরা আমাদের থামাতে পারছে না।"

গত ২০শে এপ্রিল "দেশব্রতী" পত্রিকায় প্রকাশিত রাজ্যে বাটটি খতমের হিসাব প্রকাশের সঙ্গে যে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, উপরের কথাগুলি তারই সামান্য একটা অংশ। অতি স্বচ্ছ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নির্ভয়, নিঃসংকোচ বক্তব্য। এত পরিষ্কারভাবে কোন রাজনৈতিক দল অতীতে কখনও এইভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন নি। আর এই বক্তব্যের আলোকে যখন রাজ্য রাজনীতি বিচার করি, তখন কোথায় চলে যায় রাজ্যপালের শাসন, কোথায় চলে যায় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাতর ধ্বনি, কোথায় মিলিয়ে যায় শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের পার্টির দাম্ভিকতা।

এই বক্তব্য ও চিত্রের পাশে কয়েকদিন আগেও যাঁরা মহাকরণে চলতে-ফিরতে সিপাই শান্ত্রীর সেলুট নিতেন, সেই নেতৃবৃন্দকে মৌসুমী রাজনৈতিক ভাঁড়ের বেশী কিছু মনে হয় না। পুলিশ বা অন্য সেনাবাহিনীকে মনে হয় সাজানো পুতুল। এক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এক বছর পর হিসাব করলে দেখা যায় রাজ্য রাজনীতির আজ একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হল নকশালপন্থী রাজনীতি। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, রাজনীতি সব কিছু ওলট-পালট করে ত্রাস ও ভয়াল মূর্তিতে নকশালপন্থী রাজনীতি আবির্ভূত হয়েছে। বাক্যবাগীশ-বিবৃতিসর্বস্ব রাজনীতি, কিছু পাইয়ে দেবার রাজনীতি, নকশালপন্থী রাজনীতির আক্রমণ পথ হারিয়ে কানাগলিতে ঢুকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাজ্য রাজনীতির বর্তমান অবস্থা কি করুণ, কি ম্রিয়মাণ, কি বিয়োগান্ত, কি সশঙ্কিত, কি ভয়ার্ত, কি বিহ্বল!

নকশালপন্থী রাজনীতি রাজ্যে যা চলছে, সেটা সরকারের পছন্দ হবার কথা নয় এবং সরকার এই মুণ্ডু কাটা, খতমের রাজনীতি নীরবে হজম করে মেনে নেবেন সেটা আশা করা যায় না। তাই সরকার নকশালদের দমনের জন্য অনেক কিছু করছেন। রাজ্যের সর্বস্তরের পুলিশকে নিত্য নতুন অস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে, গাড়ী গাড়ী পুলিশ দিবারাত্র খেটে-খেটে হয়রাণ হচ্ছে। পোষাক না পরা পুলিশের দল হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নকশালী গন্ধলাভের আশায়। কেন্দ্র থেকে আসছে সি, আর, পি, বি, এস, এফ, আরো কত সব পুলিশ। সব মিলিয়ে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ একটা পুলিশী শিবিরে পরিণত হয়েছে। শুধু পুলিশ নয়, নিবর্তনমূলক আটক আইন পাশ হচ্ছে—আইন ছাড়াও নকশাল দমনের আরো সহস্র রকম ফিকির-ফন্দি তৈরী হচ্ছে। সব মিলিয়ে এক মহা জমজমাট অবস্থা। ফল ভবিষ্যতে কি হবে সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। কিন্তু বর্তমানে ফললাভ যা হচ্ছে সেটা দেখে এখন পর্যন্ত কোন আশার কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নকশালপন্থীদের দমনের নামে অনেক গ্রেপ্তার হয়েছে, অনেক তল্লাসী হয়েছে। বেশ কিছু বন্দুক, পাইপগান, বোমা, পিস্তল, বোমার মাল-মশলা ধরা পড়েছে। কিন্তু পুলিশ যত বজ্র আঁটুনি আঁটছে, তত নকশাল দমনের [illegible] হয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে নকশালপন্থীদের আড্ডা [illegible] কে বেশ [illegible] [illegible] প্রায় এক শতাব্দে দুই বছর। কতবার তল্লাসী হল, কতবার হাঙ্গামা হল, গ্রেপ্তার হল অথচ দেখা গেল সময়মত কলেজ ভবনশীর্ষে লাল পতাকা তোলা হয়েছে এবং সেই পতাকা উড়লো দুই দিন ধরে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও নকশালপন্থীদের বাসা ভাঙতে অনেক দিন ধরেই পুলিশের অনেক তৎপরতা দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। শিবপুর বি ই কলেজেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। শিবপুরে ছাত্ররা যে তৎপরতা দেখিয়েছে তা দেখে আমরা তো দূরে থাক, পুলিশও থ বনে গেছে। কিন্তু সময়মত দেখা গেল, দুই স্থানেই নকশালপন্থীরা ভালভাবেই তাদের কাজ সমাধা করে চলে গেল। ২২শে এপ্রিল নকশালরা শোভাযাত্রা করবে, বহুলভাবে প্রচারিত হল। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের এক পাশে হঠাৎ দেখা গেল কয়েক হাজার মানুষ শোভাযাত্রায় সংগঠিত হল, আর সেই বিশাল শোভাযাত্রা শ্যামবাজার পাঁচ মাথায় যেতে যেতে কর্পূরের মত মিলিয়ে গেল। এই ভোজবাজীর নকশালী তৎপরতায় রাজ্য পুলিশের কর্তাদের মুখগুলি মনে পড়লে কত করুণ না মনে হয়। যুক্তফ্রণ্ট সরকার যখন ছিল বা শ্রীজ্যোতি বসু যখন পুলিশমন্ত্রী ছিলেন, তখন বলা হত, জ্যোতিবাবু সব পুলিশকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখেছেন—তাই পুলিশ কাউকে দমন করতে পারছে না, ধরতে পারছে না,—জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাই তো ২৪ পরগণায় পুলিশ মারা গেল, আর তাই তো জ্যোতি বসুর মুণ্ডু চাই বলে পুলিশেরা বিধানসভায় হামলা করলো। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বিধানসভা ভবনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে হাউসে যাবেন, কয়েকজন পথ আটকে মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করলো, মুখ্যমন্ত্রী সে অপমান ও পথরোধকারীদের হটিয়ে দেবার কথা বললেন, পুলিশ সেই কথা শুনলো না। ধরে নিলাম, সেও না হয় জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার দরুণ হয়েছিল। পুলিশের মধ্যেও যুক্তফ্রণ্ট-বিরোধী চক্রান্তকারী ছিল, তাই শ্রীজ্যোতি বসু কাজ করতে বাধা পাচ্ছিলেন। সেই বাধার জট উৎপাটন করতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে শ্রীসুবোধ দত্তকে তাড়ানো হল।

কিন্তু, আজ? আজ জ্যোতিবাবু নেই, সুবোধ দত্ত নেই, এমন কি অজয়বাবুও নেই, আর শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় তো অনেক আগেই চলে গেছেন। তবে কেন পুলিশ অন্যকে রক্ষা করা দূরে থাক, নিজেকে রক্ষা করতে হিমসিম খেয়ে যায়? তবে কেন [illegible] নিয়োগীর মত পুলিশ অফিসারের বোমার আঘাতে মৃত্যু ঘটে, তবে কেন কলকাতার রাস্তায় [illegible]

তবে কেন একের পর এক বিদ্যায়তন ধ্বংসের লীলাক্ষেত্র হয়? এর জবাব সহজে পাবার নয়। পুলিশ পারছে না—পারে না, এই কথা একমাত্র জবাব বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ, তথা কলকাতা পুলিশের উন্নত মানের সঙ্গে তুলনা হতে পারে একমাত্র স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশের—এই কথা এতদিন শুনেছি। আর এই কথা নিতান্ত গালগল্প, এমনও নয়। ১৯৪৭ সালে এই পুলিশ যে তৎপরতা দেখিয়েছে বা সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত আন্দোলন দমনে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছে, সেই কথা কে না জানে! বিপ্লবীদের পেটের কথা মুখে আসবার আগে পুলিশের দপ্তরে চলে যেতো। এই তো সেই দিন ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় কম্যুনিস্ট পার্টির কোন একটি রাজ্য কমিটির সভায় কে একজন চীনকে সমর্থন করেছে, তা ধরে ফেলে পুলিশ সেই ব্যক্তিকে হাজতে পুরেছে।

কিন্তু পুলিশের কথা আমি বলতে চাই না—কারণ পুলিশ দিয়ে সমাজ রক্ষা হয় না, পুলিশের কথা বাদ দিলাম। এই যে স্কুল-কলেজে হামলাবাজীর ফলে রাজ্যের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়লো, সে সম্পর্কে রাজ্যের ছাত্র-সংগঠনগুলির মত ও চিন্তা কি? নকশালপন্থীরা তাদের নীতি অতি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে তাদের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যারা ঐ পথে বিশ্বাস করে না, যারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দাবী থেকে সুরু করে অজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ রোধে সর্বদা সর্বস্তরে সভা-শোভাযাত্রা বিক্ষোভ করে থাকে, তারা কোথায়? ছাত্র ফেডারেশন দুই পক্ষ, পি এস ইউ, ডি এস ও, ছাত্র ব্লক সহ ডজনখানেক ছাত্র সংগঠন আছে, যাদের বিবৃতির চাপে খবরের কাগজের দপ্তরে বহু সময় জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তারা কোথায়? নকশালপন্থী ছাত্রের সংখ্যা রাজ্যের পার্টিবাজী করনেওয়ালা ছাত্র সংখ্যার তুলনায় খুবই কম বলে এতদিন প্রচার ছিল—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের দুই ছাত্র ফেডারেশন নকশালপন্থীদের কোন নির্দেশ তো আমল দেন নি। কোথায় গেল সেই আক্রমণকারী, ধর্মঘটকারী, মিছিলকারী, ইউনিয়ন দখলের লড়াইকারী লড়াকু ছাত্রনেতারা? একের পর এক বিদ্যায়তন অচল, তছনছ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে—কই শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা, বিদ্যায়তন রক্ষা করা, পড়াশুনা ও পরীক্ষাব্যবস্থা সচল রাখা কোন কিছু নিয়েই তো একটা ছাত্র মিছিল বেরুলে না। একটা বিবৃতি ছাপা না হলে যাঁরা হামেশা সংবাদপত্র অফিসে অফিস তছনছ করবার হুমকি দিতেন, রিপোর্টারের হাত কেটে নেবার ভয় দেখান, আজ তাঁদের মুণ্ডু কাটার সময় তো এতটুকু রা শব্দ কারো মুখ দিয়ে শোনা যাচ্ছে না! তবে কি সব ছাত্র নকশালপন্থীদের কাজের সমর্থন করছেন? যদি তা করেন তবে সেটাও তো বিবৃতি দিয়ে বলতে পারেন—নকশালপন্থীদের পথই আমাদের পথ। সবই সহ্য হচ্ছে, কিন্তু দুঃসহ মনে হচ্ছে ছাত্রনেতাদের চুপ করে থাকার। কিন্তু আমি বলবো, পুলিশ ও ছাত্র আজ একই অবস্থার শরিক।

একই প্রশ্ন করতে চাই সি পি আই (এম) দলের নেতৃবৃন্দ সহ রাজ্যের অন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে। সি পি আই (এম-এল) সৃষ্টি হবার পর জ্যোতিবাবু বা প্রমোদবাবু কেউ সি পি এম-এলকে সমাজবিরোধীর বেশী মর্যাদা দেন নি। কখনও বলেছেন—সি আই এর চর, কখনও বলেছেন—পুলিশের চর। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল সেই সমাজবিরোধীরা, সেই সব চর যখন সমাজের সব ধ্যান-ধারণা অথবা সেই সব দলের বিপ্লবের ধ্যান-ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছেন, তখন তাঁরা কি করছেন? নকশালপন্থীদের দমনের নামে পশ্চিমবঙ্গে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এল পি সিংহের রাজ কায়েম হতে চলেছে, তখন তো খুব বেশী জোরে নিশ্বাস পড়ছে না। অন্য কোন কারণে না হোক, রাজনৈতিকভাবে লড়াই করবার জন্যও তো সি পি আই এম দলের কোন গরজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যুক্তফ্রন্ট ভেঙেছে বলে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করবার জন্য যে রাজ্যব্যাপী সভা-সমিতি করে টালমাটাল করা হচ্ছে, কিন্তু চিরকালের জন্য পরিষদীয় গণতন্ত্র আর সরকার গড়ার সংবিধান যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, কই সেদিকে তো খুব নজর দেখা যাচ্ছে না? দেওয়ালে দেওয়ালে ঐ লেখাগুলি জীবন্ত হয়ে উঠছে যে, পার্লামেণ্ট হল শুয়োরের আড্ডা—বেশ্যাবাড়ী, সেই দিকে নজর কোথায়? অজয় মুখুজ্যে যুক্তফ্রন্ট ভেঙেছে, ও-তো তেলের শিশি। এদিকে যে ভারত ভেঙে দুই ভাগ হল তার কি হবে? কোথায় গেল সেই হাজার হাজার সি পি আই এম পার্টি সদস্য, কৃষক, যুব, ছাত্র, মহিলা, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের কর্মীরা, সেই লাল রুমাল বাঁধা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী—যাদের নিয়ে প্রমোদবাবু একদিন পুলিশের বিকল্প বাহিনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন? এই স্বেচ্ছাবাহিনী শান্তি-শৃংখলা রক্ষার গ্যারাণ্টি হবে, প্রতিক্রিয়াশীল ও অত্যাচারের খড়্গ-কৃপাণ কেড়ে নেবে, বিপ্লবের মশাল বহনের অগ্রবর্তী বাহিনী হবে। কত কুচকাওয়াজ হ'ত, কত গার্ড অব অনার হ'ত—কি এলাহি ব্যাপার! কিন্তু আজ তারা কোথায়?

নকশালপন্থী রাজনীতির পুরা রূপ এখনও প্রকাশিত হয় নি বলে সি পি আই এম-এল জানাচ্ছে—এখন যা হচ্ছে সেটা নিতান্তই মহড়ামাত্র। "দেশব্রতী" ২৩শে এপ্রিলের সংখ্যায় লিখেছে, "ওরা যাই করুক, আমাদের থামাতে পারবে না, কটা মাছি কি থামাতে পারে সূর্যের আলো?" কে সূর্যের আলো, আর কে মাছি, সেই কথা এখনও প্রমাণের পরিপূর্ণ সুযোগ আসে নি। নকশালপন্থী রাজনীতি যদি সূর্যের আলো হয়, তবে এ তো সবেমাত্র প্রভাতের সূর্য—যার কোন তাপ নেই, আলোর তীব্রতায় চোখও ঝলসে যায় না। কিন্তু সেই সূর্য যখন মধ্য গগনে উঠবে, খরতাপে তীব্র দাহন সৃষ্টি করবে, তখন কি হবে? প্রভাতসূর্যের আলোতেই অনেকের কণ্ঠ থেকে মড়াকান্নার আওয়াজ বেরুচ্ছে—তখন তো কণ্ঠে কোন আওয়াজই বেরুবে না। তবে সে সবই ভবিষ্যতের কথা,—ভবিষ্যতেই দেখা যাবে।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ পনেরো ॥

ছোট্ট একটুখানি খবর। এমন কিছুই নয়। তবে, তার অন্তর্নিহিত অর্থ ও ব্যাপকতা অনেকখানি। খবরটা ডবল কলম হেড লাইনে পরিবেশন করা হয়েছেঃ খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ডি-সি সেন্ট্রালকে হত্যার চেষ্টা। তারপর স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত বিবরণ—"বেশ কিছুদিন ধরে ডি-সি সেন্ট্রাল অনুভব করছিলেন, তাঁকে কে বা কারা যেন সকল সময়ে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। সম্প্রতি এমন কতকগুলি সূত্র পাওয়া গেছে, যাতে তিনি স্থিরনিশ্চিত হয়েছেন যে, তাঁকে হত্যা করা হবে এবং সে হত্যা এমনভাবে করা হবে যে, কেউ বুঝতেও পারবে না। ডি-সি সেন্ট্রাল তাই সমস্ত ব্যাপারটির রহস্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব নিজের হাতেই রেখেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি আশঙ্কা করছেন, আততায়ী তাঁকে সামনাসামনি হত্যা করার বদলে নিশ্চিত ষড়যন্ত্রের শিকাররূপে খুব গোপনে হত্যা করতে পারে। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আততায়ীর পক্ষে তাঁকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুযায়ী উক্ত ডি-সি কিছুদিন যাবৎ স্বগৃহ পরিত্যাগ করে কলকাতার কারনানী ম্যানসনে বাস করবেন। এই খবরটির সঙ্গে ডি-সি সেন্ট্রালের সংক্ষিপ্ত একটি জীবনীও স্টাফ রিপোর্টার দিয়েছেন।"

খবরটা পড়ার মধ্যে দিয়ে আমার মনে কেমন যেন এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। এই ডি-সি সেন্ট্রালকে আমি চিনি। চিনি মানে এই অভিশপ্ত জগতের আড্ডা থেকেই চিনি। কাজেই তাঁর জীবন সংশয় হবে, তাঁকে হত্যা করা হবে—এরকম একটা অবাস্তব প্রশ্ন আমার মনে কেন উঠবে? বরং এই আড্ডার অভিজ্ঞতা যে মানুষের আছে সে মানুষই বলবে—নরহত্যা এই আড্ডার লোকেদেরই পেশা, কাজেই এদের আবার হত্যা করতে যাবে কে? তাই এই খবরে ডি-সি সেন্ট্রালকে হত্যার কথায় আমার মনে হল—এ খবর বানানো এবং এই বানানো খবরের পিছনে নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। আমি ঘুণাক্ষরেও মনে করতে পারলাম না যে, এর মধ্যে কোন সত্যি আছে।

কয়েক মাস আগে অনুরূপ একটা সংবাদের কথা আমার মনে পড়ে গেল। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন-কেলেঙ্কারীর কথা। খবরটা বেরিয়েছিল তদন্তকারী অফিসার সম্পর্কে। সেই

ছিলেন কারনানী ম্যানসনে। বিধানসভায় পর্যন্ত ঘটনাটা উঠেছিল। পরে দেখা গেল বোটানিক্যাল গার্ডেনের ব্যাপারে যিনি ছিলেন মক্ষীরাণী, তিনি এসে উঠেছিলেন কারনানী ম্যানসনে, অতএব তদন্তকারী অফিসার সেখানে না ওঠার সুযোগ ছেড়ে দেবেন কেন? খবরটা মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় কেমন যেন একটা চিন্তার তরঙ্গ আছাড় খেয়ে পড়ল। সত্যি, এমনও তো হতে পারে, রাণীদি তো ছিলেন এখানকার 'কুইন অফ দি ডেন'—হয়তো পালিয়ে এসে তিনি এখানেই উঠেছেন। তারপর লালসার দাস ঐ ডি-সি সেন্ট্রাল তিনিও এখানে এসে উঠতে চান। সারা জগৎ, সভ্য সমাজ কেউ জানতে পারবে না আসল ব্যাপারটা কি—খবরের অন্তরালে নিজেকে আড়াল করে হয়ত এইভাবেই তিনি মজা লুঠবেন।

কথাটা মনে হওয়া মাত্র মনটা আমার কেবলই যেন বলে উঠতে লাগল, অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয়।

মায়া আমাকে চিন্তিত দেখে বলে উঠল, 'দাদা বেলা হয়েছে তো বেশ। আবার খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন। বরং আপনি চান-টান সেরে খাওয়া-দাওয়া করে নিন না।'

বললাম, 'মন্দ বলো নি। সময়কে ইউটিলাইজ করতে হবে। ঠিক বলেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন।'

মনে মনে ভাবলাম, খাওয়া-দাওয়া করব, কিন্তু তারপর? খবরটার মধ্যে দিয়ে কেমন যেন একটা অননুভবনীয় আনন্দের সাড়া অনুভব করছিলাম মনে। এই খবরের সূত্র ধরে মনে হচ্ছে আমি আমার লক্ষ্যস্থলে নিশ্চয়ই পৌঁছুতে পারব, নিশ্চয়ই।

স্নান-খাওয়া করতে যতক্ষণ লাগল ততক্ষণই কেমন যেন এক অভ্রান্ত লক্ষ্যের কথা চিন্তা করে দ্রুততার সঙ্গে সবকিছু সম্পন্ন করলাম বলে মনে হল। শীতের বেলা, মধ্যাহ্ন পার হলেই সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমাকাশে। যাই-যাই করে বেলা যেন দিনশেষের গান গেয়ে ওঠে আর্তস্বরে। মনের মধ্যে আমার অননুভবনীয় আনন্দের উদ্দাম স্রোতোধারা, নদীর স্রোতের মত ছলাৎ-ছল করে আছাড় খেয়ে পড়েছে চিন্তার তটপ্রান্তে। হ্যাঁ, আমাকে যেতে হবে, এখনই যেতে হবে সেইখানে, যেখানকার কথা আমি প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি ভগ্নাংশের মধ্যে কেবলই ভেবেছি, কেবলই কল্পনা করেছি। কারনানী ম্যানসন—হ্যাঁ কারনানী ম্যানসন। কে জানে সেখানে গিয়ে কি দেখব—কিন্তু একথা ঠিক যে, কিছু না কিছু আমি নিশ্চয়ই দেখব।

আমাকে জামা-কাপড় পরে বেরুতে দেখে মায়া ও মা এগিয়ে এলেন। মা-ই জিজ্ঞাসা করলেন প্রথমে, 'কিছু ঠিক করতে পারলে না বাবা?'

'এখনও পারি নি। তবে পারব বলে আশা করছি মা।'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মায়া বললে, 'যেখানেই যান দাদা—একটু সকাল সকাল ফেরার চেষ্টা করবেন।'

'কেন বল দিকি?'

'আমরা তো মাত্র দুটো প্রাণী দাদা।'

'কিন্তু পাশে তো আরও লোক আছে।'

'তেমন কে আর আছে বলুন না?'

'কেন মাধু নেই, পাঁচির মা নেই, তা ছাড়া মেনকা?'

'কিন্তু ওদের ওপর কি কোন ভরসা করা যায় দাদা?'

বললাম, 'কিন্তু ওদের ওপর ভরসা করা ছাড়া তোমার আর উপায় কি?

তা ছাড়া কথা কি জানো মায়া, এরাই হল তোমার আসল বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, পরিত্রাতা। কারণ এরা তোমার সমগোত্রীয়। সমগোত্রীয় নির্যাতীত মানুষ ছাড়া নির্যাতীতের কোন বন্ধু নেই, শুভাকাঙ্ক্ষী নেই—'

মায়া এর পর আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিলো, আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'যা বলছি তাই কোরো—আমি চললাম।' বাস্তবিক কথাগুলো বলতে যেটুকু সময় লেগেছিল আমি তার বেশি দেরি করলাম না, বেরিয়ে পড়লাম। আমার যেন তখন কেবল মনে হতে লাগল, দেরি করলেই যেন আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে, আমি আমার ঈপ্সিত ফললাভ করতে পারব না। আজকের খবরের কাগজে বিশেষ একটি খবর আমাকে যারপর নাই উৎসাহিত করে তুলেছে। আমার মনে হচ্ছিল, একবার আমি যাকে পেয়েছিলাম, তাকে আবার হারিয়েছি—এখন আমাকে আবার তাকে পেতে হবে, পেতে হবে হয়ত তাঁরই জন্য কিংবা হয়ত শঙ্কর আর মায়ার জন্য। তবে পেতে তাঁকে আমার হবেই এবং সে পাওয়া আমার এই পথ ধরেই।

আজ এতদিন পরে জোর করে, চিৎকার করে আমি বলতে পারি আমার অনুমান বলুন, হিসাব বলুন কিংবা ইংরেজীতে যাকে ইনট্যুইশন বলা হয়, তাই বলুন—তা যে আমার কত বড় খাঁটি ছিল তা দেখে যে কোন লোকই বলতে পারবেন আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল কতখানি সঠিক। আমি এসে উঠেছিলাম কারনানী ম্যানসনে।

সেই কারনানী ম্যানসন। সারি সারি ফ্ল্যাট। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এদিকে ওদিকে ঘুরেছি। জানবার চেষ্টা করেছি কোন্‌দিকে কে আছেন। কাকে চাই নির্দিষ্টভাবে কোন কথাই আমি কারোকে বলি নি। কেবল করিডর আর ফ্লাটগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটেছি, উঠেছি আর নেমেছি, নেমেছি আর উঠেছি। আমার মনে কেমন যেন একটা দৃঢ়বিশ্বাস, এখানেই আমি তাঁকে দেখতে পাব, যাঁকে আমি দেখতে চেয়েছি। ঘুরতে ঘুরতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নামা-ওঠা আর ওঠা-নামায়, ঘোরা-ফেরায় পা দুটো আমার টন টন করে উঠেছে। কত চোখের কত চাহনি বার বার আমার ওপর পড়তে দেখেছি, তবু আমি হতাশ হই নি, ব্যর্থমনোরথ হবার বিলাসিতায় নিজেকে ভাসিয়ে দিই নি। চোখের সামনে দিয়ে দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে গেল। ফুটে উঠল চোখের সামনে সন্ধ্যার ঘনায়মান অভিসারিকা মূর্তি। রকমারী আলো জ্বলে উঠল ফ্ল্যাটের বাইরে আর ভেতরে। কোথাও কোন কক্ষ উন্মুক্ত, কোথাও অবরুদ্ধ। কোথাও মানুষের সহজ জীবনের প্রকাশ, কোথাও বা জটিল জীবনে যেন কপাট-আঁটা। কবির কথা মনে পড়লঃ পর দীপমালা নগরে নগরে/ তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে। সত্যিই তখনও পর্যন্ত আমি যে তিমিরে ঠিক সেই তিমিরে। এখানকার পরিবেশটা যেন আমার কাছে একেবারে বোবা।

কে জানে, অনেক আশা করেছি বলেই হয়ত আমার এখন এই অবস্থা? আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমার খবরের কাগজ পাঠ করা মনের অননুভবনীয় আনন্দের শেষ পরিণতিটা কি এই রকম হবে? সত্যিই আমার অভিযান কি আজ এমনি বন্ধ্যা-চেষ্টার মধ্যে দিয়ে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

সন্ধ্যার চঞ্চল অভিসারিকাবেশ কখন ঘন হয়ে এল। নিবিড় নিশীথিনীর কৃষ্ণকালো মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তারপর। করিডরে দাঁড়িয়ে তাকালাম দূরে ধোঁয়াটে আলোর হাসিতে কলকাতা ক্লান্ত। আকাশে অসংখ্য তারা পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে যেন। দূরে ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে ঢং ঢং—এ ঘণ্টা সন্ধ্যারতির নয়, গির্জার নয়, বৌদ্ধদেরও নয়, এ ঘণ্টা বোধ করি কোন জেলখানার, কয়েদী জগতকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সময়ের মাপকাঠি দিয়ে, সভ্যতার সোপানে উঠতে।

তবে কি আমার শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে এখান থেকে? অনেক আশা নিয়ে, অনেক বিশ্বাস নিয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে আমি এখানে এসেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ আমার কি হল? আমি আসার সময় মায়া আমাকে বলেছিল, 'আপনি যেখানেই যান দাদা, একটু সকাল সকাল ফিরবেন।' কিন্তু সকাল সকাল ফেরা তো দূরের কথা, এ যা রাত হয়েছে, এরপর আমার ফেরাও বোধ করি মুস্কিল হয়ে পড়বে। কারণ রাতে এখানে থাকা বা পথ দিয়ে যাওয়া দুই-ই বিপজ্জনক হয়ে পড়তে পারে। সত্যিই আমার আত্মবিস্মৃতে আত্মসন্তুষ্টির কোন কথা নেই। খবরের কাগজের একটা সংবাদকে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে মনে মনে অতিরিক্ত কতকগুলো কল্পনা গড়ে তোলার শাস্তি এইরকমই হওয়া উচিত। আমি নিজের ওপরই নিজে কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, জানি, এরপর অনুশোচনায় মন ভরে উঠবে আমার, ধিক্কার দেবো নিজেকে এবং শত বৃশ্চিকের দংশনের মত ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে থাকব নিরন্তর। না, সেখান থেকে আমাকে ফিরে আসতেই হবে।

সংবাদপত্রে খবরটা যদি আমি দেখেছিলাম—ডি-সি সেন্ট্রাল এসে উঠেছেন এখানে, তা হলে তাঁরই খোঁজ করা আমার উচিত ছিল সবচেয়ে আগে। অন্তত তাতে এতক্ষণ একটা সূত্র খুঁজে পেতাম। কিন্তু আমি খুঁজতে গেছি অন্য সূত্র—যে সূত্র আবিষ্কারে নেশা আছে আমার মনে, কিন্তু খেই নেই কোথাও। ঠিক যখন এমনি সব কথা ভাবছি, এমন সময় সশব্দে একটা দরজা খোলার শব্দ পেলাম পিছন দিককার ফ্ল্যাটে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা, 'লজ্জা করে না, বড় অফিসার হয়ে—'

আমি উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে গেলাম সেদিকে। এই তো—এই তো আমি যা চেয়েছিলাম তাই বুঝি, যাঁকে চেয়েছিলাম, তিনিই বুঝি। ছুটে সামনে যেতেই দেখি, সেই ডি-সি সেন্ট্রাল পরাজিত জন্তুর মত ঘাড় নিচু করে চলে যাচ্ছে, আর দরজার সামনে বিজলী বাতির বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ছুরিকা হস্তে রাণীদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছেন। সম্ভবত এখানে তিনি আমাকে আশা করেন নি অথবা দৃষ্টিটা তাঁর এদিকে না নিক্ষিপ্ত হয়ে ডি-সি সেন্ট্রালের দিকে ছিল বলে তিনি আমাকে দেখেও দেখেন নি ভাল করে। আমি তাই একটু এগিয়ে তাঁর দৃষ্টির পরিধির মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার ছায়াটা করিডরের মেঝের পড়েছে কি না পড়েছে, ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত রাণীদি চক্ষের নিমেষে হাতের ছুরিখানা উঁচিয়ে ছুটে এলেন আমার দিকে।

আমি সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এসে বললাম, 'রাণীদি, আ-মি-ই।'

রাণীদি ভ্রু-দুটো প্রায় একটা বিন্দুতে একত্র করে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'আ-মি-ই!'

আমি সেই পিছিয়ে আসা জায়গা থেকেই বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, রাণীদি আমি।'

'ও, কল্পনায় [illegible] রাণীদি [illegible] বলে উঠলেন, 'আবার তুই!' [illegible]

[illegible] আমার কাছে তাঁর সকল [illegible] অবসানের আশ্রয় বলে উঠলেন, এর পর আমি কোথায় পালাবো তুই বলতে পারিস?'

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

রাণীদিকে এই বেশে দেখতে বুঝি তোর খুব ভাল লাগে, না রে?'

'ছিঃ ছিঃ, রাণীদি একি বলছ তুমি?'
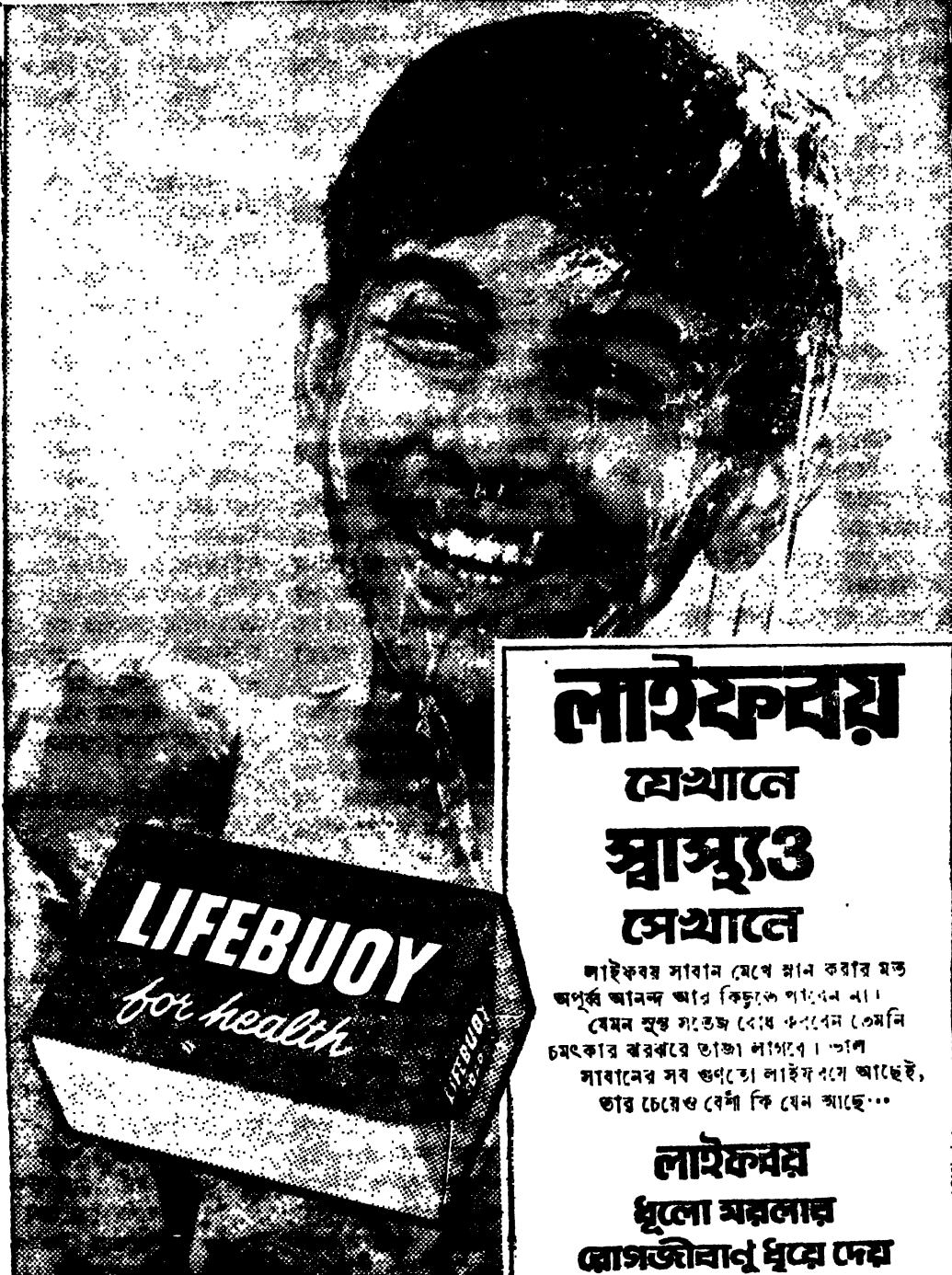
'ছিঃ! ছিঃ? শয়তান লজ্জা করে না তোর! একদিন তুই আমায় এই অবস্থায় দেখেছিলিস, তাই সেখান থেকে আমি পালিয়ে এসেছিলুম। আবার আজ তুই এসেছিস!'

'রাণীদি বিশ্বাস করো তুমি—তোমার এ অবস্থা আমি দেখতে আসি নি। তুমি আমায় বিশ্বাস করো।'

দেখলাম রাণীদির পা দুটো টলে টলে যাচ্ছিল। তবু দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তিনি বললেন, 'যা—যা, আমি আর পৃথিবীতে কারোকে বিশ্বাস করি না—কারোকে না।'

আমি রাণীদিকে আশ্বস্ত করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি তেমনি করেই বলতে লাগলেন, 'পুরুষ মানুষ তোরা—তোদের

কামনা, তোদের বাসনা, তোদের লালসা —ওরে ও আমি চিনি—সব চিনি।'

এবার আমি একরকম নির্ভয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। ছুরি-উঁচানো হাতখানা ধরে ফেলে বললাম, 'কাকে কি বলছ রাণীদি—আমি না তোমার ভাই?'

'হ্যাঁ ভাই। কেন আমি বেফাঁস কিছু বলছি?'

'বলছ তো!'

'না না তোকে আমি কি বেফাঁস বলব। তুই আমার ভাই, তুই আমার সন্তান, তুই আমার......কিন্তু তুই আবার এলি কেন বল দিকি? কেন এলি?'

'এসেছি বিশেষ কাজে।'

'বিশেষ কাজে!'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা ঘরে চল আমার—আমি তোর সব কাজ শুনব। শুধু ঐ লোকটাকে, ঐ শয়তানটাকে আমি আগে শেষ করে দিয়ে আসব। তুই আমায় একবার একটুখানি ছেড়ে দে খালি—'

'ও লোকটা তো সেই পুলিশ অফিসার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওস্তাদের আড্ডায় ফুর্তি করতে যেত। লালসার দাস—ভু-ভারতের উৎসর্গ করা বোকাপাঁটা।'

'তোমার ও পাঁটা তো পালালো এখন। তুমি ওকে ধরবে কি করে?'

'একেবারে পালালো?'

'তাইতো মনে হল।'

'শয়তান কাপুরুষ', দাঁতে দাঁত চেপে রাণীদি বলে উঠলেন।

আমার খবরের কাগজের খবর পড়া সার্থক হয়েছে। রাণীদি টলে টলে পড়ছিলেন। আমিই তাঁকে ধরে ধরে যে দরজা দিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন সেই দরজা দিয়েই তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলাম। এ ঘরের সঙ্গে রাণীদির রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দিয়ে সাজানো ঘরের অনেক তফাৎ। সে ঘর ছিল মাটির ঘর। আর এঘর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রশস্ত হলঘরের মত ঘর। দামী দামী আসবাবপত্র দিয়ে ঘরখানা সাজানো অদ্ভুতভাবে। মেঝেয় পাতা দামী কার্পেট। দু'দিকে পাতা বড় বড় সোফা। ও বড় জানালার ধারে একখানা সুন্দর পালঙ্ক পাতা। তাতে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা। পাশে একটা শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। টেবিলে সামান্য পানীয় আর রাতের খাবার চাপা দেয়া। ঘরের একদিকে একখানা বড় বুককেস—তাতে অনেক কিছু সাজানো। নিচের তাকে কয়েকখানা দামী দামী বই —রাণীদির কলেজে পড়ার সময়কার বই। বুককেসের পাশে একটা কাঠের পায়া দেয়া স্ট্যান্ড, তার ওপরে শরৎচন্দ্রের একখানা আবক্ষ মর্মর মূর্তি।

ঘরের পরিবেশ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একটা পারমার্থিক মনের আভিজাত্য সর্বত্র বিদ্যমান। বিশেষ করে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম শরৎচন্দ্রের মূর্তিখানি দেখে। বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় বাড়ি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে—বুদ্ধমূর্তি থেকে যীশুখৃীস্ট, এমন কি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেকেরই মূর্তি দেখা গেছে সে সব বাড়ীতে কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবক্ষ মর্মর মূর্তি আমি কোথাও দেখি নি। দেখলাম সর্বপ্রথম এখানে কারনানী ম্যানসনে রাণীদির এই ঘরে। সম্ভবত রাণীদিকে একথাটা জিজ্ঞাসা করবার সময় এটা নয়, তাই চুপ করে গেলাম, নইলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম।

রাণীদি হাতের ছোরাটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালঙ্কের বিট ধরে ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দরজাটা ভাল করে এঁটে দিয়ে আয় তো আগে।'

আমি বললাম, 'থাক না খোলা।'

রাণীদি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'কেন তোর ভয় করছে নাকি?'

'ভয়—ভয় কিসের রাণীদি?'

অসতী কুলটা মেয়ের ঘরে একলা থাকবি আর ভয় করবে না তোর?'

এবার বিরক্তভরে বললাম, 'মাঝে মাঝে তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো রাণীদি—'

'সে কি আজ নতুন যাচ্ছিরে', রাণীদি টলতে টলতে বললেন, 'অনেকদিন আগেই গেছি। তুই জানিস না! তা না হলে যেদিন তোকে খেতে বলেছিলুম, সেদিন তুই কিভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলি, সেকথা কি ভুলে গেছিস? আমি অসতী কুলটা রাণীদি তোর—ওরে বিজন .....'

হঠাৎ রাণীদি মেঝের সেই কার্পেটের ওপর কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লেন। তারপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'সেদিনের পর আমি পালিয়ে এসেছিলুম লজ্জায়, ঘৃণায় ......কিন্তু আবার তুই এখানে আসবি আমার সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে, ওরে বিজন, এ আমি কখনো ভাবিনিরে, কখনো ভাবি নি।'

সেইখানে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল এ যেন অদ্ভুত নাটকের এক অদ্ভুত সংকট ও আবেগময় দৃশ্যের মুখোমুখি এসে আমি পড়ে গেছি—এ থেকে যেন আমার কোনদিনই নিস্তার নেই। ভাবলাম এই রকম নাটকীয় দৃশ্য যখন ভিতরে, তখন দরজাটা না খোলা থাকাই ভাল। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা এ নাটকের কোন মূল্য দেবে না, পক্ষান্তরে হয়ত অন্য কিছুও মনে করে বসতে পারে। তাই দরজাটা ভাল করে এঁটে দিয়ে এলাম।

রাণীদি এতক্ষণ কার্পেটে উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন। আমি দরজাটা দিতেই তাঁর খেয়াল গেল একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে বিছানা থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে বিজন, এটাকে তোর মনে পড়ে রে?'

'পড়ে কিন্তু এত কথা থাকতে তুমি শুধু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

রাণীদি ছোরাখানাকে চোখের দৃষ্টির সমান্তরালভাবে তুলে ধরতে ধরতে উঁচু দিকে উঠিয়ে বললেন, 'এটাই আমার জীবনের প্রথম এবং প্রধান সাক্ষী। যে কখনো আমার আসল পরিচয় ঘোষণা করতে পিছিয়ে যাবে না!'

'কিন্তু আজ তুমি ডি-সি সেন্ট্রালকে ঐ ছোরা দিয়ে তেড়ে গিসলে কেন?'

'আরে সেই কথাটাই তো তোকে এতক্ষণ বলছিলুম—তুই বুঝতে পারলি না!'

'কি করে বুঝব, তুমি তো মদ খেয়ে মাথা খারাপ করে বসে আছে। তোমার কথা আমি বুঝব কি করে?'

'মদ খেয়েছি তুই বুঝতে পেরেছিস?'

'কেন পারব না।'

'তা বুঝেচিস বুঝেচিস কিন্তু মদ কি খুব খারাপ জিনিস রে?'

'তাই তো জানি।'

'ভুল ওরে ভুল', রাণীদি যেন হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর বললেন, 'মানুষ ঠকায়, ডাক্তার ঠকায়, ওষুধ ঠকায়, মহাপুরুষদের বাণী ঠকায় কিন্তু মদ কখনো কারোকে ঠকায় না। মদ বিস্মৃতি আনে, মদ স্মৃতিকেও ফিরিয়ে দেয়, মদ কাঁদায় কিন্তু মদ হাসাতেও জানে। ওরে জীবনভোর আমি কেঁদেছি মদ খেয়ে কিন্তু জীবনভোর মদ আমায় হাসিয়েছেরে বিজন —আমি প্রাণ খুলে হেসেছি। আয়, আয় তুই যখন আজ এসে পড়েছিস তখন তোকে সব হাসিরই গল্প শোনাবো, অনেক হাসির গল্প।'

'কিন্তু আমি এসেছিলাম তোমার কাছে এক বিশেষ কাজে—'

'তোর সেই কাজ, কাজ, কাজ', রাণীদি আমাকে দুটো হাত ধরে টেনে এনে খাটে বসিয়ে বললেন, 'রাখ তোর কাজ। রাণীদি তোর মদ খেয়েছে কিন্তু সে কেঁদেছে না হেসেছে, হেরেছে না জিতেছে—সেকথা তোকে আজ বলতেই হবে, বলতেই হবে বিজন। তা না হলে তুই আমার ভাই নস —তুই আমার শত্তুর, তুই আমার শত্তুর!' কথাগুলো বলে রাণীদি ঠিক সেই আগেকার মত আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি বললাম, 'বলব—বলব। তুমি আমায় ছেড়ে দাও আগে রাণীদি—'

না, না আমি কিছুতেই ছাড়ব না— রাণীদি যেন আমাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন।

[ক্রমশঃ]

আমার বয়স যখন পাঁচ-ছ' বছর. সেই সময় আমি প্রথম দেখি রবীন্দ্রনাথকে। তখনকার কলকাতায় তিনটি নাম ফিরত দর্শকদের মুখে মুখেঃ সুরেন্দ বাঁড়ুজ্যে, অমৃত বোস, আর রোম্বাবু। এই রোম্বাবুই হলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্য দু'জন যথাক্রমে নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিনেতা অমৃতলাল বসু। কলকাতিয়া উচ্চারণে অকারণ বিকৃত করা হত নাম তিনটি।

বৌবাজারের কাছাকাছি সে সময় কোথাও একটা আর্ট স্কুল ছিল। সেখানে একদিন বক্তৃতা দিতে এলেন রবীন্দ্রনাথ। বক্তৃতা জিনিসটা কি. কেমন করে দেয় তা, সে সব বোঝা বয়স ওটা নয়। বাবার সঙ্গে গেলাম শুধু বাবার আনন্দেই। তা ছাড়া অনেকবার শুনেছি যাঁর নাম, সেই রবীন্দ্রনাথকে দেখার কৌতূহলও কি আর না ছিল?

দেখলাম ঋজুদেহ রোম্বাবুকে। আগেই চোখ পড়ে মাথার অজস্র চুলে আর মুখের অজস্র গোঁফদাড়িতে। দুইয়েই পাক ধরেছে অল্প অল্প। চোখে স্প্রিং-এর চশমা. তা থেকে ঝোলান কালো একটা কার গলায় ঘোরান রয়েছে। এক-চাড়া কাগজ হাতে নিয়ে থেমে থেমে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে পড়তে লাগলেন। কি অদ্ভুত সুন্দর গলা! কোন মানুষের সঙ্গেই মেলে না যেন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ পড়লেন। পড়া শেষ হতে চার দিক থেকে চটাপট হাততালি পড়ল। তারই সঙ্গে আওয়াজ উঠল : গান. গান. একটা গান শুনব আমরা। কি আশ্চর্য. গানও গাইতে পারেন তাহলে উনি! মজা এই যে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হলেন তিনি গাইতে। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা আর শোনা হল না!

ভীড়ের ভেতর বাবার ট্যাঁকঘড়িটা চুরি হয়ে গেল এবং মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এলেন তিনি। সঙ্গে আসতে হল আমাকেও। যদিও অল্পক্ষণের দেখা, তবু রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা আঁকা হয়ে গেল মনের পর্দায়। সে মূর্তি মুছে যায় নি আজও।

এরপর যখন আমার বয়স তের-চোদ্দ, পড়েছি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও গল্প. শিখেছি দু-পাঁচটা গান. দেখেছি তাঁর অনেক ছবি কাগজপত্রে. বইয়ে, সেই সময় একটু কাছাকাছি হবার সুযোগ হল আমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কেমন করে হল বলছি।

খবরের কাগজে দেখলাম কোন্নগরের এক স্কুলের ছাত্রী রবীন্দ্রনাথকে ছোট্ট একটি কবিতায় প্রণাম জানিয়ে চিঠি দেয়। কবি তাতে প্রীত হয়ে তাকে জবাব দেন এবং দেন কবিতাতেই। দুটো কবিতাই ছাপা হয়েছিল পাশাপাশি।

দেখে মনে হল, আমিও ত' একজন ছাত্র. যদি চিঠি দিই তাঁকে একখানা, তাহলে তার উত্তর পাব কি? কিন্তু কি লিখব তাঁকে? ছেলেবুদ্ধিতে হাতের কাছে পেলাম দুই বিঘা জমি কবিতার 'স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ' লাইনটি। জানতে চাইলাম ঐ স্নেহ কথাটার তাৎপর্য কি।

আশ্চর্য যে, দিন দশের মধ্যেই এল সুন্দর চৌকো খামে কবির আপন হাতে লেখা উত্তর। উত্তরটি এই :

কলিকাতা

ও

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

নিশীথ রাত্রি গভীর দীঘির মতই স্তব্ধ নীরব গভীর স্নিগ্ধ কালো। শান্তিময় শীতল নিশীথিনীর গভীরতার মধ্যে যে বিরামদায়ী স্নেহ অনুভব করা যায়, বাংলা দেশের স্তব্ধ গভীর শীতল দীঘির মধ্যেও সেই স্নেহ কল্পনা করা হইয়াছে। ইতি—২০শে আশ্বিন, ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এমন একটা উল্লাস আর উত্তেজনা ঘিরে ধরল সারা দেহ-মনকে যে, কয়েক দিন পর্যন্ত ভাল করে খেতে-ঘুমুতেই পারলাম না। দিনরাত্রি ঘুরতে লাগল চিঠিখানা আমার পকেটে পকেটে। ছবিতে দেখা ও বইয়ে পড়া রবীন্দ্রনাথ এখানেই প্রথম জীবন্ত হয়ে অধিকার করলেন আমার চেতনাকে।

বছর এগার পরে বয়স যখন পঁচিশ, ছাপা হয়েছে দু-একখানা কবিতা ও গল্পের বই এবং প্রাবন্ধিক বলে একটু নামও হয়েছে, সেই সময় হল আমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় এবং তা থেকেই সুযোগ হল বিশ্বভারতীর সাহিত্যাধ্যাপক ও তাঁর সাহিত্য বিষয়ক সহকারী বা লিটেরারি সেক্রেটারীরূপে কাজ সুরু করার।

বিশ্বভারতী প্রকাশ বিভাগের তখন-কার কর্মকর্তা কিশোরীমোহন সাঁতরা ছিলেন আমার গুণগ্রাহী। হঠাৎ একদিন আমায় তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ আমাকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি তখন রয়েছেন চন্দননগরের কাছাকাছি কোন জায়গায় গঙ্গায় ভাসান হাউস বোটে। সেখানে যেতে হবে আমাকে।

অবাক হয়ে ভাবলাম, আমাকে কি দরকার হতে পারে রবীন্দ্রনাথের? তিনি কি জানেন আমার নাম? আমার কোন লেখা কোনদিন পড়েছে কি তাঁর চোখে? কিংবা সবটাই কিশোরীমোহনের কৌশল।

[illegible]
আমাকে কবির সঙ্গে পরিচিত করাতে?

তখন প্রায় বিকেল। বোটের খোলা মুখটুকুর কাছে ইজিচেয়ারে কাত হয়ে আছেন কবি। পাশে বেতের তৈরি নিচু তেপায়া একখানা। তার ওপর কিছু বইখাতা, এক প্লেট কাটা ফল, এক গ্লাস সরবৎ এবং ভাঁজকরা সাদা তোয়ালে একখানা। আনমনে পুঁথির পাতা ওলটাচ্ছেন, সেই সঙ্গেই খাচ্ছেন।

ঝিলমিল করা রোদ্দুরে ঝিরঝিরে হাওয়া বওয়া গঙ্গার বুকে এই আমার প্রথম অত কাছে থেকে দেখা রবীন্দ্রনাথকে। বোধ হয় এত নিবিড় করে দেখার জন্যে দরকার ছিল এমনি একটা পরিবেশের। ভারী ভরা মগজ কমলালেবু রঙের আলখেল্লা গায়ে আকাশ ও গঙ্গার সঙ্গমে ধ্যানমূর্তির মত কবির এই বসে থাকাটা।

কিশোরীমোহন পরিচয় করালেন। কবি বললেন, তোমার নাম আর তোমার সঙ্গে কিছু জানাশোনা হয়েছে পরিচয়ের পৃষ্ঠায়। তোমাকে কেন স্মরণ করেছি জান? দক্ষিণা চাই। কিশোরীমোহনের কাছে শুনেছি, তাঁকে সম্পাদন-কর্মে সহায়তা করে থাক। ঐ কাজই করবে আমার ওখানে থেকে।

তখন আমি কালীঘাটে শিক্ষকতা করি। সেই ঘটনার উল্লেখ করে বললেন, ঢের দিন ত' মায়ের থানে পাঁঠা বলি দিলে, আর কেন? এর পরই এলাম আমি শান্তিনিকেতনে। তখনও আমার পিতা জীবিত। তিনি বললেন, যে সৌভাগ্য মানুষ সাধনা করে পায় না, তা অযাচিতভাবে এগিয়ে এসেছে। এ কি ছাড়তে আছে কখনো?

পরিচয়ের পরিচয়ের যে লেখাগুলির উল্লেখ করেছিলেন কবি, তা আমার কম বয়সের দুঃসাহসিক প্রয়াস বলে মনে মনে ভয়ই ছিল সেগুলির জন্যে। একটা আলোচনায় [illegible] বাস্তবের যে বিকার ও বৈকল্যকে, যে বাস্তব কুশ্রীতাকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন স্বীকার করেন নি, রসের ভিয়ানে পাক করে তাদের তিনি দেখিয়েছেন উত্তীর্ণ করে, তাঁর আঁকা ছবিতে কেন তা এমন স্থূল চেহারায় প্রকাশমান হতে পারল? সে কি তিনি অংকনের ব্যাকরণ কোনদিন শেখেন নি বলে? তাঁর অননুশীলিত তুলি কি সজাগ মনকে ফাঁকি দিয়েই তাঁর অবচেতনাকে রূপ দিয়েছে এই ভাবে?

আর একটি আলোচনায় বলেছিলাম যে—রাশিয়ার চিঠি, কালান্তর ও বিশ্ব-পরিচয় রচয়িতা যে রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তিনি ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও বিজ্ঞানবোধের সমর্থক। যিনি প্রান্তিক লিখেছেন, এঁকেছেন এত অজস্র জাতের অবচেতনা প্রভাবিত চিত্র, তিনি আমাদেরই মত পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বে প্রত্যয়সম্পন্ন। তাঁকে নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলির সেই অধ্যাত্মবাদী কবি বলে এখনো চালান ভুল নয় শুধু, মূঢ়তা।

দেখলাম নাবালক প্রাবন্ধিকের এই সব বৈপ্লবিক মতামত স্নেহদৃষ্টিই আকর্ষণ করেছিল রবীন্দ্রনাথের। বোধহয় আমাকে আপন কর্ম পরিষদের মধ্যে নিতে আগ্রহও হয়েছিল তাঁর এই সাহসিকতার জন্যেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে, সজনীকান্ত দাসকে এবং নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত চিঠিতে এই লিখিয়ে সম্বন্ধে এ জাতীয় কিছু কিছু কথা ব্যক্তও করেছিলেন তিনি।

এই হল রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কর্মীরূপে তাঁর সান্নিধ্যে আসার গোড়ার কথা আমার। প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, পরবর্তী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে রোগশয্যায়, আরোগ্য ও জন্মদিন প্রভৃতি বইয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে সত্যিই দেখি নিরীশ্বর বস্তুসত্তার উপাসক, শ্রমকারী মানুষের সহযাত্রীরূপে। তাঁর এই পরিণতির সূচনাকে কিন্তু প্রথম স্বাগত জানিয়েছিল পরিচয়ের ঐ লেখাগুলোই।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সাক্ষাৎ বংশধর হিসাবে সঙ্গীত ও কবিতা বোধহয় আমার রক্তের মধ্যেই ছিল। ছোটবেলা থেকেই একটু একটু গান আসত, আর কবিতাও লিখতে সুরু করি বারতের থেকেই। পিতা বসন্তকুমার বান্ধব, আর্যাবর্ত, সাহিত্য প্রভৃতি কাগজে যৌবনে কবিতা লিখতেন। সে সব কাগজ ঘরে ছিল, অলক্ষ্যে তাই বোধহয় লেখার অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে বড় অনুপ্রেরণার উৎস নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-রচনা, যা বাচ্চা বয়স থেকেই জনতন্ন করে পড়ি।

ষোল থেকে আঠার-উনিশের মধ্যে

[illegible] ও [illegible] এবং অহল্যা ও ইন্দ্রের উপাখ্যান নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুখানি কাব্য কাহিনী, আর মেনকা ও বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে একখানি নাট্য-কাব্য ও দুই ফুলের জন্ম নামে রূপক-ধর্মী একখানি গীতিনাট্য। এসব রচনার ছাঁদ নিয়েছিলাম আমি বিজয়িনী, মানস-সুন্দরী, কচ ও দেবযানী, চিত্রাঙ্গদা, মায়ার খেলা ইত্যাদি থেকে। ফৈজী বেগম ও সিরাজদ্দৌলার প্রেম নিয়ে লিখেছিলাম একখানা উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রকে নস্যাৎ করে দুটি প্রবন্ধ। তারও মূলে ছিল বৌঠাকুরাণীর হাট এবং কৈশোরে লেখা রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদ বধ সমালোচনার ধাঁচ।

দুর্ভাগ্যবশত ঐই সব লেখার খাতা হারিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হাতে ফিরে এসেছে আমার। তাই একটু একটু নিদর্শন তুলে দেখাতে পারি আপনাদের প্রত্যেকটা থেকেই। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। যা কৃত্য হয়ে ওঠে নি, প্রস্তুতি মাত্র, তা ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত হলেও হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের সামগ্রী নয়। ওদের উল্লেখ করলাম শুধু বাল্য থেকে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি ও চিন্তাকে অধিকার করেছিলেন আমার কতখানি, সেইটুকু বোঝানর জন্যে।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর থেকে নূতন চেতনার সূত্রপাত হল জীবনে। নব্য পদার্থবিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব, সর্বোপরি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গিই ঘটাল সেই ভাবান্তর। তা ছাড়া ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও নরওয়েজীয় সমসাময়িক সাহিত্য এবং বিমূর্ত ছবির প্রভাবও ছিল হয়ত তার সঙ্গে। মোট কথা, আপন পায়ে দাঁড়ানর এবং আপন ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করার প্রয়াস আমার সেই থেকে।

এই প্রয়াসে সাফল্য লাভ করেছি কি-না, কিংবা কি বা কতটুকু দাম এর, সে সব আমার বিচার্য নয়। তবে আমি মনে করি, আমার সেতু কবিতার বইয়ে, মিছে কথা গল্পের বইয়ের এবং পায়ে চলার পথ নাটিকা সংগ্রহে রবীন্দ্রভাবের বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে আসার কিছু স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। আছে সময়-অসময়ের লেখা নামক হাল্কা প্রবন্ধ গুচ্ছে এবং বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা ও শতাব্দী ও সাহিত্য নামক দুটি আলোচনা গ্রন্থেও। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে আমার যাত্রা সুরু।

কিন্তু সে কথা এ আলোচনায় অনাবশ্যক। স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করেছি মানে কিন্তু তা বলে এই নয় যে, বাক্যে, চিন্তায় ও চলনে-বলনে ষোল আনা রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হতে পেরেছি। বর্তমান প্রজন্মের কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আগেই বলেছি, জীবনের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্ট ভাববলয় থেকে বেরিয়ে নিজেই যে নূতন জীবন-দর্শনে উন্নীত হয়েছিলেন, তা আজকের মানুষের সঙ্গে চিন্তায় সমধর্মিতা দাবি করতে পারে ঢের বেশি, যা পারে না মধ্যাহ্নিবেশের রবীন্দ্রমনন। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

১৯৩৬-এর সূচনায় আমি গিয়েছিলাম রবীন্দ্র সান্নিধ্যে, ১৯৩৮-এর শেষ দিকে চলে এসে যুক্ত হয়েছিলাম সংবাদপত্রের সম্পাদন কর্মে। মাত্র তিন বছরের সম্পর্ক আমার। কিন্তু সম্পর্কটা যেহেতু ছিল অবিচ্ছিন্ন ও একান্ত কাছের, তাই মানুষ রবীন্দ্রনাথকে সব অবস্থায় খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। বিচিত্র কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্তরের অন্দরটাও যাচিয়ে দেখার অবকাশ পেয়ে-ছিলাম।

কর্মনিষ্ঠ, স্বভাবসজ্জন, সদা হাস্যময় যে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি আমি, তা স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মতই অভিনবতায় উজ্জ্বল। অনেকের চেয়ে অনেক বেশি সহজ ছিল তাঁর দিনযাপনের ধারা। দরজা তাঁর অবারিত ছিল সকলের জন্যেই। চিঠি দিয়ে উত্তর পেতেন তাঁর সকলেই। তবে হ্যাঁ, সকলের এবং সব কিছুর মধ্যে থেকেও সকলের নাগালের বাইরে চলে যেতেন তিনি এক-এক সময়, যখন তাঁর ভেতরের অন্য সত্তাটা অর্থাৎ শিল্পী সত্তাটা জেগে উঠত।

জীবনে প্রথম চিঠি তাঁর আমি পেয়ে-ছিলাম কবে তাত বলেইছি। কর্মজীবনে এবং কর্মান্তে কলকাতায় চলে আসার পরও তাঁর চিঠি পেয়েছি আমি কম নয়। জনগণ-গান সম্বন্ধে, বিশ্বভারতীর ভাবিষ্যৎ সম্বন্ধে, আধুনিক কবিতার অবোধ্যতা সম্বন্ধে নানা সময়ের লেখা সেই সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর চিঠি সবই আমি গ্রথিত করেছি আমার কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ বইয়ে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে যে পত্র-প্রবন্ধটি লিখেছিলেন আমাকে, তা ছাপা হয় ভারতবর্ষের শরৎ স্মৃতি সংখ্যায় এবং ভুলক্রমে তাতে ওটা প্রবোধ সান্যালকে লিখিত বলে উল্লিখিত হয়। আর আমার বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা বই পড়ে লেখেন যে পত্র-প্রবন্ধটি, তা ছাপা হয় বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায়। পরে এটি সংগৃহীত হয়েছে কবিরই সাহিত্য পরিচয় নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে।

পত্র-লেখক রবীন্দ্রনাথের অসামান্যতার খবর জানেন এ যুগের গণ্যমান্য বহুজনই। আমারও তা জানার সুযোগ হয়েছে। কোন চিঠিতে আমাকে তিনি বায়োকেমিক ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কোনটাতে দু' কথায় সুখ্যাতি করেছেন আমার কোন লেখার। কোনটাতে কোন সমসাময়িক ব্যক্তি বা ব্যাপার সম্বন্ধে সকৌতুক অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা নানা দিক ভেবে এখনো ছাপাই নি আমি। কোনটা বা লিখেছেন শুধু আশীর্বাদ জানাতেই।

এই হল মোটের ওপর আমার রবীন্দ্র-সাহচর্যের ইতিহাস। হয়ত এসব কথা কিছু কিছু আগেও লিখেছি আমি। কিন্তু রবীন্দ্র-কথা ত পুরান হয় না কোন-দিন। তাই আবার পুনরাবৃত্তি করলাম। ভরসা আছে পাঠক-পাঠিকা এতে সারবস্তু কিছু থাকলে সেটুকুই নেবেন। বাকিটা যা আমার কথা তা যদি নামঞ্জুর করেন তাঁরা, ত নালিশ করব না সে জন্যে।

আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বের কথা। বাংলাদেশে তখনো ইংরেজের ও ইংরেজীয়ানার মোহ কাটে নি। মফস্বল শহরে আমাদের বাস—দেশ-বিদেশের খবর সরবরাহের মাধ্যম কয়েকটি ইংরেজী দৈনিক ও দু'-একখানা বাংলা সাপ্তাহিক। 'প্রদীপ' মাসিক সদ্য-প্রকাশিত হয়েছে—বাড়িতে আসে। কাকা ইংরেজী জানতেন না বলে বাংলা কাগজ পড়তেন। আর সবাই পড়তেন দৈনিক 'বেঙ্গলী' বা 'অমৃতবাজার' ইংরেজী পত্রিকা। তাও টাটকা নয়—একদিনের বাসি কাগজ ডাকঘর মারফৎ বিলি হতো। আজকার মতো দৈনিক কাগজ-বিলির ব্যবস্থা তখন অজ্ঞাত। আগেই বলেছি, যুগটা ছিল ইংরেজীয়ানার—ইংরেজী ভাষা শেখা, ইংরেজীতে বক্তৃতা করা ছিল শিক্ষার চরম আদর্শ।

তখন আমি হাইস্কুলে নিচের ক্লাশে পড়ি। একদিন হেড মাস্টারমশাইয়ের নোটিশ এলো—বিকালে সভা হবে, কলকাতা থেকে বক্তা আসছেন, সকল ছাত্ররা যেন যথাস্থানে উপস্থিত থাকে। স্কুলের হলঘরে সভা হলো। বক্তার নাম মনে আছে ললিতবাবু—বোধহয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যাপক ললিতমোহন ঘোষাল। ইংরেজী বক্তৃতার একবর্ণও বুঝি নি। তবে বক্তৃতা সুরু হবার পূর্বে যে গানটা হয়েছিল, তার কথা ও সুর আজও মনে আছে—

"তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো॥
তব নন্দনগন্ধমোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো॥..."

গান গেয়েছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা—যাঁরা কলকাতায় কলেজে পড়েন এবং হয়তো যাঁদের উৎসাহে ললিতবাবু এই মফস্বল শহরে বক্তৃতা দিতে আসেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সংগে এই গানটির মাধ্যমেই আমার প্রথম মানস-পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন বসু পরিবারের ছেলেরা। সুধীর বসু স্থানীয় স্কুলের পড়া শেষ করে মেডিক্যাল কলেজে পড়েন। আসেন মাঝে মাঝে। বৈকালে আমাদের বাড়িতে জমে তাঁদের আসর—তাঁদের কেউ কাকাদের সহপাঠী, কেউ দাদার, কেউ

রবীন্দ্রনাথের কবিতা-আবৃত্তি—'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'। পরে কত জায়গায় কতবার এ কবিতাদ্বয়ের আবৃত্তি শুনেছি, কিন্তু সেই বাল্য বয়সে কবিতা দু'টি যেভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল তার স্মৃতি আজও মনে আছে। 'কেষ্টা আয়রে কাছে'—কী করুণভাবে আবৃত্তি করতেন সুধীরদা। 'দুই বিঘা জমি'র আবৃত্তি শুনতে [illegible]তে নিজ গ্রামে কাকাদের সংগে [illegible]ম কুড়োবার চিত্রটি মনে পড়ে যেতো।

বংগচ্ছেদ আন্দোলন এলো। রাখি-বন্ধনের গান গাই—'বাংলার মাটি, বাংলার জল'...। রাখি বাঁধি সকলের সাথে। জানলাম গানটির রচয়িতা 'রবিঠাকুর'। বংগ-ভংগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হলো—মিছিল বের হয় পথে পথে। বালক, কিশোর, যুবকরা গান গায় পথে তাল-বেতাল, সুর-অ-সুরের পালা। সবাই প্রাণপণে চেঁচাই—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক—
মুখ তুলে আজি চাহো রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি—
প্রভাত গগনে কোটিশির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহো রে"..

মনে হতো সত্যই বুঝি আমাদের গান শুনে হিমালয় গলে যাবে। নতুন গান আনলেন কলকাতার ছাত্ররা—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান।"...
ইত্যাদি।

কী দম্ভের সংগে আমরা গাইতাম এ-গান। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বেড়াই পথে পথে। আর গাইতাম রজনীকান্তের গান "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"। বরিশালের প্রাদেশিক সভা পণ্ড হলো—পুলিশ নববর্ষের দিন বাঙালী যুবকদের লাঠির ঘায়ে আহত করলো। আমরা গাই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের গান—"বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়ে" এবং রবীন্দ্রনাথের গান—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।"...
ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের সংগে মানস-পরিচয় এইভাবে বেড়ে চলেছে। তাঁর বাণী শুনেছি, কিন্তু এখনো তাঁকে চোখে দেখি নি। প্রথম চোখে দেখলাম গিরিধিতে। গিরিধিতে আমরা যাই ১৯০৬ সালের পূজার সময়—কবিকে দেখি সেখানেই সর্বপ্রথম। রবীন্দ্রনাথের আ-যৌবনের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তখন গিরিধিতে ল্যানড একুয়িজিশন অফিসার। গ্রানড কর্ড রেলওয়ে নির্মাণ-কালে যে সব জমি গভর্নমেন্ট দখল করেন সে সবের মূল্যদান-ব্যবস্থার জন্য এই অপিস খোলা হয়। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিতেন। তাঁর সংগে দেখা করতে বাবা যান—আমি সংগে গেলাম, তখন গিরিধি হাইস্কুলে সেকেনড ক্লাশে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের সংগে বাবা কেন দেখা করতে যান সেটা বলা দরকার। সেই সময়ে শহরের যে-অঞ্চলে আমরা থাকতাম সেখানে বাঙালী ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার জন্য বাবা বিদ্যালয়ের সম্পাদক-রূপে তাঁর সংগে দেখা করতে যান। বোধহয় ইতিপূর্বে শ্রীশচন্দ্রের নিকট থেকে শুনে থাকবেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছোটনাগপুর অঞ্চলে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিকল্প একটি স্থান সন্ধানের জন্য বন্ধুকে বহুবার পত্র দিয়েছেন। তাই বোধহয় শিশু-বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কবির অভীপ্সিত বিদ্যা-আশ্রম গড়ে তোলবার কথা কর্তৃপক্ষের মনে হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ সব শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং এই বিদ্যালয়ের জন্য একটি আবেদনপত্র মুসাবিদা করে দিলেন—তাঁর নামে আবেদনপত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল। তখন কবির বয়স ৪৫।৪৬—ঋজুদেহ, প্রাক্ প্রৌঢ় রূপ।

কয়েক বৎসর পরে ১৯০৮ সালে জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে মাঘোৎসবের দিন কবির কণ্ঠে প্রথম ভাষণ শুনলাম। তখন ন্যাশনাল কলেজে পড়ি—মেসে থাকি। ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে কতো গল্পই না শুনি। এ-সময়ের একটি কৌতুক-কাহিনী না বলে পারছিনে। কে-যেন বলেছিল—রাতে যারা মাঘোৎসবের বক্তৃতা শুনতে যায়, তারা সেখানে খেতে পায়। অবশ্য টিকিট না-পেলে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমার স্থান জুটে গেল। গিরিধিতে-পরিচিত এক যুবক ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়—তাঁর সুপারিশে আমি স্থান পেলাম দোতলার বারান্দায়। ঠাকুরবাড়ির গান তো সেকালে বিখ্যাত—গান শুনলাম; একটি ছোট ছেলে বেদির পাশে বসে হাতে তাল দিয়ে গান করছিল। তখন তো কাউকেই চিনতাম না—পরে জানলাম সেই বালক আজকের যশস্বী সাহিত্যিক, সাংগীতিক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভা হয়ে গেল—খেতে কেউ ডাকলো না। মেসে ফিরলাম। পাচক ঠাকুরকে আমার জন্য চাল নিতে বারণ করে বলে গিয়ে-ছিলাম রাতে খাবো না—সুতরাং রাতটা কিভাবে কাটলো তা সহজেই অনুমেয়।

জীবনে নানা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমানে সবাই এসেছি মাতুলালয়ে—মাতামহ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট্। তখনও কলকাতায় পড়ি। আমি জানতাম বর্ধমান থেকে কয়েকটা স্টেশন পরেই বোলপুর—সেখানে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা বিদ্যালয়ে আছেন আমাদের পরিচিত গিরিধির হিমাংশুবাবু। ইনি তথাকার শিশু-বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। মনে আছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজী শ্রুতিশিক্ষা প্রভৃতির আদর্শে শিশুদের ইংরেজী পড়াতেন। সেই শিশুবিদ্যালয় কালে বালিকা-বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং অন্যদের পরিচালনাধীনে চলে যায়—তখন হিমাংশুবাবু শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে আসেন। আমি ঠিক করলাম বোলপুরে গিয়ে কবির বিদ্যালয় দেখবো। অবশ্য আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—বিধুশেখর শাস্ত্রীকে দেখার ইচ্ছে। বিধুশেখরের প্রতি আমার আকর্ষণের কারণটা এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কলকাতার ন্যাশনাল কলেজে আমি সাহিত্য ও ভাষাবিষয়ক কোর্স নিয়েছিলাম—অন্যান্য ভাষার সংগে পালি ভাষাও পড়তাম। কিন্তু বাংলা হরপে পালি বই তখন কোথায়? বোধহয় চারুচন্দ্র বসুর 'ধম্মপদ'ই এক-মাত্র বই ছিল। বিধুশেখর অল্পকাল পূর্বে 'মিলিন্দ পঞ্হো' নামে বিখ্যাত পালিগ্রন্থ বাংলা হরপে ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। মনে আছে, কয় মাসের বৃত্তির অনেক-গুলো টাকা পেয়ে যেসব বই কিনি তার মধ্যে 'মিলিন্দ পঞ্হো' বইটিও ছিল। সেই বইয়ের অনেকখানি পড়ে মনে হয়েছিল অনুবাদককে বোলপুরে গিয়ে দেখবো। আমাদের অধ্যাপক চট্টগ্রামের ভিক্ষু পূর্ণানন্দ শাস্ত্রীমহাশয়ের কথা বলেছিলেন ক্লাশে।

আজও সকালে যে-গাড়ি ১১টায় বোলপুরে আসে, সেই গাড়িতেই এসে-ছিলাম—সেদিন পয়লা বৈশাখ। কিভাবে শান্তিনিকেতনে এলাম, তৎকালীন বোলপুরের অবস্থা কি ছিল প্রভৃতির আলোচনা ইতিপূর্বে অন্যত্র করেছি—তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করলাম না।

হিমাংশুবাবুর অতিথি হয়ে তাঁর কাছে দোতলার ঘরে থাকি; গ্রন্থাগারের উপর বিরাট চালাঘর—ছাত্রাবাস। পর-দিন ভোরবেলায় হিমাংশুবাবু ডেকে বললেন—"মন্দিরে যাও; কবি উপাসনা করেন। উঠে পড়ো।" অন্ধকার রাত্রি। উঠে কুয়োতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে মন্দিরে গেলাম। সে সময় আশ্রমে বিজলীবাতি আসেনি—অন্ধকারের শোভা সভাজগতে আজ অজ্ঞাত। মন্দিরে গিয়ে দেখি পূর্বতোরণে কবি ধ্যানস্থ হয়ে আছেন, অদূরে সিঁড়ির নিচে ডিজ্ লণ্ঠন মৃদু করে জ্বালানো। বুঝলাম, শান্তিনিকেতন অতিথিশালা থেকে বেশ অন্ধকার থাকতেই কবি এসেছেন—আসবার সময় লণ্ঠনটি সংগে করে আনেন। কয়েকজন আমরা বসেছি অদূরে; কবি আস্তে আস্তে তাঁর মনের কথা বলে গেলেন—মনে হলো যেন ভিতর থেকে কথাগুলি উৎসারিত হয়ে আসছে। শুনেছিলাম পৌষ অগ্রহায়ণ মাস থেকে কবি প্রতি প্রাতে একটি করে ভাষণদান করেন। উপাসনা অন্তে সবাই ফিরে যাই; সকালের সমবেত উপাসনায় যোগ দিয়ে প্রাতরাশ গ্রহণ করার পর অনেকেই কবির সংগে দেখা করতে গেলেন, আমিও সংগী হলাম। গিয়ে দেখি কবি তাঁর অভ্যাসমতো প্রাতের ভাষণটি লিখছেন; তাই প্রণাম করে সকলে নীরবে ফিরে এলাম।

আমার দিন কাটে বিধুশেখর শাস্ত্রীর ঘরে। সেটি ঘরও বটে, লাইব্রেরীও বটে। চারদিকে শুধু বই—মাঝখানে দুখান চৌকি পাশাপাশি পাতা; সেখানে শাস্ত্রী মহাশয় রাতে থাকেন . পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে। আমি বইগুলি দেখি, কখনো কিছুটা পড়ি। বেশ মনে পড়ছে জেমস্ প্রিনসেপের অশোকলিপি পাঠের ইতিহাস উপন্যাসের মতো আনন্দ নিয়ে পড়েছি।

সেইদিন বিকালে কবির সংগে সাক্ষাৎ হলো বিধুশেখরের ঘরের মতো আরেকটি কামরায়—সে ঘরটি এখন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স রুম। হিমাংশুবাবু আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি কলকাতার ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র। ন্যাশনাল কলেজের নাম শুনেই কবি আমাকে সেই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বিশেষভাবে। তিনি যে আরম্ভকালে প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন সে কথাও বললেন। আমার মতো অত্যন্ত সাধারণ বালকের সংগে

রবীন্দ্রনাথ যে এমনভাবে আলাপ করবেন তা আমি ভাবতেও পারি নি।

ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা বিশেষ বলবো না। সংক্ষেপে বলি, কলকাতায় শরীর টিকলো না—প্রায়ই জ্বর হয়। সেখানকার পড়াশুনায় ছেদ পড়লো: ১৯০৯ সালের পুজোর পর আর আমি কলকাতায় ফিরলাম না। বছরের শেষ-দিকে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় পেলাম হিমাংশুবাবুর মাধ্যমে পত্রাদি বিনিময়ের পর। আশ্রমে থাকি, খাই-দাই ঘুরে বেড়াই। কিন্তু ক্রমে লাইব্রেরী আমাকে টেনে নিল তার পিঞ্জরে। কতো ঘণ্টা করে যে পড়তাম তা লিখে বললে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। কি পড়তাম তার হদিস পাওয়া শক্ত। ইতিহাসের প্রতি আমার অনুরাগ বহুকালের, কিন্তু জানতাম ইতিহাসের মানুষটিকে চিনতে হলে, তার সাহিত্য—তার মনের কথা জানতেই হবে। লাইব্রেরীতে পেলাম গ্রীক, লাতিন সাহিত্যের অনুবাদ বই—কতকগুলিতে কবির সহি; বোধহয় তিনিই কিনে বইগুলি পড়েছিলেন—তা না হলে, বিদ্যালয়ের জন্য এ-সব বইয়ের কি প্রয়োজন! হোমারের কাব্য দু'খানার অনুবাদ পড়লাম। ইতিপূর্বে Chapman-এর কবিতা-অনুবাদ পড়তে চেষ্টা করেছিলাম; একে কবিতা, তার উপর পুরোনো ইংরেজী—সত্যি কথা বলতে কি আমার ভালো লাগে নি। Iliad-এ Andrew Lang-কৃত গদ্য অনুবাদ এবং Odyssey-র Butcher ও Leaf-কৃত তর্জমা পড়েছি—খুব ভালো লাগলো। এই বৃদ্ধ বয়সে এখনো 'ল্যা-এব্-ক্লাসিক্স' এনে পড়ি, সফোক্লিসের গ্রীক নাটকগুলি যে কতোবার পড়েছি বলতে পারিনে।

সারাদিন পড়তে দেখে কবি ভাবলেন ছেলেটাকে তাঁর বিদ্যালয়-সেবার কাজে লাগানো যেতে পারে। ১৯১০-এর গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেলাম।

শান্তিনিকেতনে এসে পড়েছিও যেমন; লিখেছিও তেমন। সে সব লেখার বেশীরভাগ মহাকাল দগ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করেছেন। তবে ছাপার হরফে যেগুলি একবার রূপ পেয়েছে, সেগুলিকে নিরাকৃত করা কঠিন। বোধহয় সেইসব লেখা দেখেই কবি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণের পর আমাদের মতো অর্বাচীন-দেরও আহ্বান জানালেন। তখন আমি পড়ছি য়ুরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাস—প্রাচীন যুগ পাঠের পর। ইতিহাস ছাড়া পড়ছি সন্ত ও সাধুদের জীবনী ও বাণী—মধ্যযুগের ইতিহাসে তাঁরাই বেঁচে আছেন আজও।

'ভারত মহিলা'য় লিখেছিলাম ম্যাডাম গ্যাঁয়োর কথা। তাঁর আত্ম-জীবনী দুই খণ্ড সদ্য লাইব্রেরীতে এসেছে—পড়লাম খুব মনোযোগ দিয়ে। তারপর লিখলাম দু'টি প্রবন্ধ। অমৃত-লাল গুপ্ত তাঁর 'তাপসী' গ্রন্থে এই প্রবন্ধ দু'টি ব্যবহার করেছিলেন। প্রসংগত বলি, 'ভারত মহিলা' বোধহয় মেয়েদের দ্বারা সম্পাদিত (সরযূবালা দত্ত) প্রথম পত্রিকা—যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য লিখলাম সাধু এবোলার্ড এবং এবোলার্ড ও হিলোইসির প্রেম-কথা—এখনো হিলোইসির প্রেম-পত্রাবলীর কথা মনে পড়ে। কবি বিলাত থেকে পাঠালেন মন্তেসরি-শিক্ষা সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তিকা। কবির নির্দেশে 'মন্তেসরি-শিক্ষাপ্রণালী' প্রবন্ধটি লিখি—এটিও তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত। বোধহয় বাংলা ভাষায় মন্তেসরি-শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এটিই সর্বপ্রথম আলোচনা। কবির জীবন-কথা যাঁরা সামান্যতমও জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, কী দেশী, কী বিদেশী—নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে কবি খুব ওয়াকিবহাল থাকতেন। ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন পত্রিকাদির মধ্যে তার বহু নিদর্শন আছে। তত্ত্ববোধিনীর ভার নিয়েও কবি সেই রীতির অনুসরণ করেন—পাঠক যদি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পুরোনো ফাইল কখনো দেখেন, তবে এই তথ্যের সত্যতা বুঝবেন। এর পরেই 'প্রবাসী' মাসিকে 'সংকলন' নামে একটি বিভাগ সংযোজিত হয়। এর অধিকাংশই কবির নির্দেশে রচিত হতো। রামানন্দবাবু বহু বিলাতী মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠাতেন—তা থেকে কবি বেছে দাগ দিয়ে দিতেন এবং কে কি লিখবে তাও সংগে সংগে জানিয়ে দিতেন। জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, শরৎকুমার রায় প্রমুখ অনেকেই নিয়মিত লেখক ছিলেন—সেই গোষ্ঠীর এক কিনারায় আমারও স্থান হলো। প্রবন্ধগুলি কবি নিজে দেখে দিতেন; অনেক সময় সবটাই নিজে লিখে ফেলতেন। এইভাবে লেখার 'মক্স' শুরু হয়।

প্রসংগত একটা কথা বলি, আমাদের যুগে বাংলা ভাষার চর্চা ছিল না—থার্ড ক্লাশ পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হতো। এণ্ট্রান্সে বাংলা পরীক্ষণীয় বিষয়ই ছিল না। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এমন কি সংস্কৃত ভাষার প্রশ্নোত্তর ইংরেজীতে করতে হতো। বাংলার প্রতি আকর্ষণ ছিল খুবই কম—লজ্জার বিষয় নিশ্চয়ই, তবে ভুলে গেলে চলবে না সে-সময়টার কথা।

ইতিপূর্বে গিরিধিতে থাকাকালীন কিশোর ও যুবকেরা মিলে হাতে-লেখা পত্রিকা বের করি—'হাতে খড়ি'। উৎসাহটা ছিল হিমাংশুবাবুর বেশি, তবে কাজের লোক ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ বিমলাংশু—কলকাতার সদ্য স্থাপিত বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্র। সত্যিই এখানেই আমার হাতে খড়ি হয়। যখন ন্যাশনাল কলেজে পড়ি, তখন মেসের ছেলেদের নিয়ে 'পথিক' নামে পত্রিকা বের করি—বলা বাহুল্য, এটিও হাতে-লেখা। মাঘোৎসবে গিয়ে যে-সব গান শুনতাম তার একটা গানের কলি হলো পত্রিকার Caption—

'মুখরিয়া দিক চলিবে পথিক,
অমৃত পথের যাত্রী'

তারপর শান্তিনিকেতনে এসে পড়বার ও লেখবার যে-সুযোগ পেলাম—কবির কাছ থেকে যে-উৎসাহ পেলাম তাতেই আমি আজ যা হয়েছি তা হতে পেরেছি।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৫৩ সালের জুন মাসে নাকুরু শহরে আমি একটি হোটেল চালনার ভার গ্রহণ করি এবং তাতে যথেষ্ট সফলতাও লাভ করি। ঐ সময় কেনিয়া সরকার এই এলাকায় কয়েকটি "বাছাই ক্যাম্প" চালু করেন, একটি মোলোতে, একটি টমসনস-ফলাস "ক্যাম্পিয়্যাসিমবাতে" ও আর একটি বাহাটির কাছে কয়্যা নেয়ান গুয়েথুতে। এই ক্যাম্পগুলিতে সংগ্রামী কাজে লিপ্ত সন্দেহজনক লোকেদের ধরে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হত। এবং তাদের কাছ থেকে জোনবন্দী আদায় করার জন্য বিশেষ জোর-জুলুমও করা হত। এই সব ক্যাম্পের চার্জে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান কর্মচারীরা এবং তাঁদের সাহায্য করতেন তথাকথিত বিশ্বস্ত (!) হোমগার্ডস বা কর্তৃপক্ষের অনুগত লোকেরা। কিছুদিনের ভেতরেই ঐ ক্যাম্পগুলির কঠোর ও নির্মম ব্যবহার সম্বন্ধে আফ্রিকানরা বলাবলি করতে আরম্ভ করে। সেই সমস্ত অত্যাচারের কথা আবার এই কাহিনীতে উল্লেখ করে কোন লাভ হবে না : গত কয়েক বছর ধরে বিচারালয়গুলিতে এ বিষয় যথেষ্ট মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। "কয়্যা নেয়ান-গুয়েথু" ক্যাম্পের অবশ্য বিশেষরকম দুর্নাম হয়েছিল এ বিষয় এবং সেখানে ধৃত লোকেদের ওপর শুধু মারধোরই করা হত না, কখনও কখনও অণ্ডকোষের থলি কেটে ফেলে তাদের প্রজনন ক্ষমতাও নষ্ট করে দেওয়া হত। কোংগো চমা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে সংকটের আগে আমার নাকুরুতে আলাপ হয়—সে এখন এমবু জেলার কিআংগি অঞ্চলে বাস করছে। তাকে ঐ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী জবান না দেওয়ার ফলে তার ওপর ঐ [illegible] অত্যাচার করা হয়েছিল। তার কাছে আরও জানতে পারি যে, ক্যাম্পে ধৃত স্ত্রীলোকদের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার চালানো হত তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য। কোংগো বল্লেন যে, ঐ সমস্ত কাজ ক্যাম্পের আফ্রিকান কর্মীরা করতো। কিন্তু তাদের আদেশ দিতেন ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ানরা।

কয়্যা নেয়ান গুয়েথু ক্যাম্প সম্বন্ধে এত বেশি দুর্নাম চারিদিকে রটেছিল যে, নাকুরুতে থাকাকালীন আমি ঐ সম্বন্ধে খোঁজখবর করি এবং যাতে যথাসম্ভব কম লোককে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয় তার চেষ্টা করি। সলোমন নামক একজন আফ্রিকান পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে আমার এমবু জেলায় অবস্থিত স্কুলে এক সঙ্গে পড়ার ফলে আলাপ ছিল এবং তার কাছ থেকে আমি আগেভাগে খবর পেতাম যে, কোন ধরপাকড় আসন্ন কিনা। তাদের ভেতর আমার জানাশোনা কেউ থাকলে আমি তাদের হয়ে ক্যাম্পের বাছাই কার্যে লিপ্ত কর্মচারীকে গিয়ে উৎকোচ দিয়ে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করতাম। এইরকম এক-একজন লোককে ছাড়াবার জন্য প্রায় চার থেকে ছয় শত শিলিং অবধি খরচা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আসন্ন বিপদগ্রস্ত লোকেরা এই উৎকোচের টাকা যোগাড় করতে পারত। কিন্ত তার ওপর আমার নিজস্ব এক হাজার শিলিং এই কাজে খরচা হয়েছে।

১৯৫৩ সালের প্রথমের দিকেই রিফট ভ্যালির ইউরোপীয়ান চাষারা সরকারের ওপর চাপ দিয়ে বল্লেন যে, তাঁদের ফার্ম-গুলি থেকে কিকুয়ু উপজাতীয় স্কোয়াটারদের—(অস্থায়ীভাবে ফার্মে নিযুক্ত দিনমজুর) তাদের নিজ নিজ রিজার্ভে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হবে এবং তার বদলে ফার্মে কাজ করার জন্য অন্যান্য শান্তি-কামী উপজাতীয় লোকেদের আনতে হবে। এর কারণস্বরূপে তাঁরা বল্লেন যে, কিকুয়ুরাই সব থেকে বেশি গোলমাল করছে জমিজমা নিয়ে। এবং এইভাবে পুনর্বাসন বন্দোবস্তের ফলে এক সঙ্গে প্রায় কয়েক হাজার কিকুয়ুর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়। কেনিয়ার ইতিহাসে একটিমাত্র কারণে এক সঙ্গে এত লোকের ভাগ্য নষ্ট ও দুঃখকষ্ট ভোগ আর কখনও হয় নি। এতে আরও প্রমাণ হয় যে, তখন এদেশের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল এবং দুপক্ষই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিকুয়ুদের তাদের রিজার্ভে ফেরৎ নিয়ে যাবার উদ্দেশে সরকারী ব্যবস্থায় দুটি একত্রীকরণ ক্যাম্প খোলা হয়। নাকুরু শহরের কসাইখানার কাছে ও 'টমসনস ফলসের' জেলের কাছে। ইউরোপীয়ান চাষীরা যথেচ্ছ তাদের ফার্মে অবস্থিত কিকুয়ু শ্রমিকদের এই ক্যাম্প দুটিতে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেন, তারপর সেই হতভাগ্যরা সেখানে অপেক্ষা করত সরকারী লরীর—যাতে করে তাদের নিজ নিজ রিজার্ভে বা এলাকায় ফেরৎ নিয়ে যাওয়া হত। এই লরীতে চাপবার সৌভাগ্য হতো অনেকদিন অপেক্ষা করবার পর এবং অনেক শ্রমিকরাই অনেকদিন অপেক্ষায় কাল কাটানোর পর নিজের পয়সায় লরী-ভাড়া করে তবে রিজার্ভে ফিরে গেছেন। এ ছাড়া এদের ভেতর অনেক অল্পবয়সী শ্রমিক ছিল, যাদের জন্ম হয়েছিল ইউরোপীয়ান ফার্মগুলিতে। কাজেই তারা কখনও এর আগে তাদের বাপ-পিতামহের রিজার্ভগুলিতে যায়ও নি এবং সেখানে তাদের কোন জমিজমাও ছিল না। ইউরোপীয়ান চাষাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে এই সমস্ত শ্রমিকরা হঠাৎ একেবারে অচেনা-অজানা জায়গায় গিয়ে পড়ে নিজের জীবিকানির্বাহের চেষ্টায়। তারা

প্রয়োজন ছিল কুঁড়েঘর নির্মাণের জন্য অর্থের, আর চাষ করবার জন্য জমির। কিন্তু কে দেবে তাদের এই সব? রিজার্ভ-গুলির অবস্থা এর ভেতর এমনিতেই কাহিল হয়ে পড়েছিল জনাধিক্যের ফলে, তার ওপর এই সব উদ্বাস্তুরা হয়ে দাঁড়াল বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

ফার্ম ছেড়ে যাবার সময় শ্রমিকদের নিজেদের গরু-ছাগল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় নি, বা তাদের খাবার জন্য নিজ হাতে রোপিত ভুট্টা ক্ষেত থেকে ভুট্টা তুলে নিতে দেওয়া হয় নি। তাদের বলা হয়েছিল যে, সরকারী কর্মচারীরা এই সমস্ত জিনিস বিক্রয় করে তার মূল্য যথা-সময় রিজার্ভের চীফদের কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং তারপর তার মালিকেরা সে টাকা ফেরৎ পাবে। আমার মতে এইরকম নিষ্ঠুর হৃদয়হীন আচরণের ফলে শ্রমিক-দের মনে যেটুকু বিশ্বাস ছিল সরকারের ওপর তাও সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রায় প্রতিদিনই আমি বিভিন্ন দলের কাছ থেকে এইরকম অন্যায় অত্যাচারের নালিশ পাচ্ছিলুম, তাই লেশাউ নামক একটি বড় একত্রীকরণ ক্যাম্পে গিয়ে আমি এ সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করতে মনস্থ করি। সেখানে গিয়ে বেশিক্ষণ থাকা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ ধরা পড়লে জেলে যাবার সম্ভাবনা ছিল খুবই বেশি। আমার চোখ পড়ে যে, কতকগুলি লরীতে ইউরোপীয়ান চাষীদের তত্ত্বাবধানে আফ্রিকান লোকেদের বোঝাই করছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের লরীর দিকে তাক করে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছিল, যেন তারা সব এক-একটি পুঁটলি বা জ্বালানি কাঠের বোঝা। লরীর মেঝেতে সশব্দ পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের করুণ আর্ত-কণ্ঠের চিৎকার মিশে আকাশ-বাতাস ভেদ করে যে বীভৎস শব্দ উঠছিল তা আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি নি—তাই সেখান থেকে পালিয়ে নাকুরুতে গিয়ে তবে নিজেকে শান্ত করতে পেরেছিলাম।

আমার মাসী ওয়ানগুই এবং আমার অন্য মাসতুত ভাই, ওবাডিয়া মোয়ানগী, এই সময় নাকুরুর অবস্থার ক্রমাবনতির ফলে সেখান থেকে চলে গিয়ে আমার মা'র সঙ্গে চিথাতে থাকা স্থির করেন। প্রায় চারশো শিলিং খরচ করে তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি একটি লরী ভাড়া করি এবং তার চালকের মুখে তাঁরা নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁচেছেন জেনে তবে আশ্বস্ত হই। তাদের নাকুরু থেকে চলে যাওয়ায় অবশ্য আমার খুবই খারাপ লেগেছিল, কারণ মাসী আমাকে অনেকভাবেই সাহায্য করতেন। পরে তাঁর কাছ থেকে চিঠিতে আমি জানতে পারি যে, কিকুয়ু এলাকায় সরকারী লোকেরা সবাইকে ধরে যথেষ্ট মারধোর করছিল এবং ফলে দলে দলে লোকেরা পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে সংগ্রামীদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছিল। যে সংগ্রামীদের দমন করার জন্য সরকার এত চেষ্টা করেছিলেন—তাদেরই দুর্ব্যবহার করছিল সেই দলের স্ফীতি।

নাকুরু শহরে প্রথমবার ধরপাকড়ের সময় আমি ধরা পড়ি, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাছাই-ক্যাম্পে নিয়ে যাবার সময় বাইটি নামে এক মেরু উপজাতীয় পুলিশ কনস্টেবলের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং সে ছিল আমার অনেকদিনের বন্ধু। সে আমাকে তার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে এক'গ্লাস জল খেতে দেয় ও আমাকে পালাতে সাহায্য করতেও রাজী হয়। কারণ সে জানত যে, আমি সত্যি-সত্যি দুশ্চরিত্র বা বদমাস ছিলাম না এবং সাধারণত আরও অনেক পুলিশবাহিনীর লোকেদের মত সেও মনে মনে সংগ্রামীদের সমর্থক ছিল। বাইটি আমাকে তার বিছানায় শুইয়ে কয়েকটি কম্বল দিয়ে আমাকে ঢেকে দেয়। দিনের বেলায় অসহ্য গরমে কয়েকটি কম্বলে শুয়ে থাকতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার পক্ষে তা কি অসহ্য! সন্ধ্যাবেলায় বাছাবাছির ঝঞ্ঝাট শেষ হবার পর বাইটি আমায় ডাকতে আসে এবং আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে ফটক পার হয়ে যাই। সেখান থেকে আমরা শহরে "কিং সলোমনস্ মাইনস্" নামক এক বিখ্যাত ইংরাজী সিনেমা দেখতে যাই, এবং তারপর আমি বাইটিকে পানাহারের জন্য নিমন্ত্রণ করি। বাইটির কাছ থেকে আমি পরে জানতে পারি যে, ঐ বাছাই-ক্যাম্পগুলি থেকে অনেকেই পালাতে সক্ষম হত—কেউ বা কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে, আবার কেউ বা পায়খানার বালতি রাখার গর্তের ভেতর লুকিয়ে থেকে! তাদের ভেতর অনেকেই আবার পায়-খানার পূতিগন্ধময় নোংরা বালতি থেকে নিয়ে দরজার সামনে উপুড় করে দিত, যাতে দুর্গন্ধের চোটে পুলিশ-কর্মচারী তার ধারেকাছেও পলাতকদের সন্ধানে আসত না। একদিন আমি ল্যানেটের পুলিশ ব্যারাক থেকে তিনশো শিলিং দিয়ে একটি পিস্তল কিনতে সক্ষম হই এবং গাকোির নামক এক লোকের হাতে সেটাকে গাথেগো বা কিমানির কাছে পাচার করবার বন্দোবস্ত করি। তারা দুজনেই জঙ্গলে লুক্কায়িত সংগ্রামী সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা নুজোরা শহরে ধরা পড়ে এবং দীর্ঘ দিনের মেয়াদে কারাবন্দী হয়।

১৯৫৩ সালের জুন মাসে নাকুরুতে আর একটি বড় রকমের ধরপাকড় হয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমার পুলিশ বন্ধুরা আগে থাকতে আমায় খবর দেওয়ায় সে যাত্রা আমি পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। সে সময় আমি অনেক-রকমভাবে সংগ্রামীদের সাহায্য করে-ছিলাম, কাজেই আমি বন্দী হলে তা করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। আগের দিন রাত্রেই আমি নাকুরু শহরের বাইরে কবরখানার কাছে আমার মা'র বন্ধু জাকারিয়া নড়ুংগুর কুঁড়েঘরে পালিয়ে যাই। জাকারিয়া সে সময় ফারা মহম্মদ নামক এক ভারতীয়ের কাছে বাগানের মালীর কাজ করছিল। আমাদের সামাজিক নিয়মানুযায়ী জাকারিয়া আমার পিতৃব্য, কাজেই তার পক্ষে আমাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। আমার আশানুযায়ী পুলিশের লোক কবরখানার দিকে যায় নি এবং কয়েকদিন পর নাকুরুতে ফিরে গিয়ে আমি জানতে পারি যে, আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকেই বন্দী করা হয়েছে। এদের অনেকের সাথে আমার দেখা হয় পরবর্তীকালে বন্দিশিবিরে। আমার হোটেলের ব্যবসা আরম্ভ করবার কিছুদিন পরেই আমি দুটো বাই-সাইকেল কিনে ভাড়া খাটাতে আরম্ভ করি। প্রতি ঘণ্টার ভাড়া ছিল এক শিলিং বা সারাদিনের জন্য বার শিলিং। যে লোকটি এ কাজের তত্ত্বাবধান করত, তাকে আমি মাইনে দিতাম মাসে ষাট শিলিং। বাইসাইকেল চালাতে পারে না এমন গ্রাহকদের সে নিজে চালিয়েও নিয়ে যেত আর তারা বসত পিছনের কেরিয়ারে। কখনও

কখনও সে দিনে পনেরো থেকে আঠারো শিলিং অবধি পেতো ; কিন্তু বারো শিলিং-এর বাড়তি সব পয়সাই আমি তাকে দিয়ে দিতাম।

১৯৫৩ সালের ২৮-এ অক্টোবর বেলা পৌনে একটার সময় আমার হোটেলে কেনিয়ার পুলিশের বিশেষ বিভাগের একজন আফ্রিকান ইন্সপেক্টার পদার্পণ করেন। এর প্রায় এক বছর আগে কেনিয়াতে সরকারীভাবে "সংকটকাল" জারি করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতা জোমো কেনিয়াট্টাকে বন্দী করা হয়। অফিসারকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবার আমারও দিন এসেছে। সে সময় হোটেলে অনেক লোকের ভিড় ছিল—তারা সবাই শুনছিল আর খবরের কাগজ থেকে জোরে জোরে পড়ে শোনাচ্ছিল আমার হোটেলের সহকর্মী নগহু মারা। এর আগে এই কাজের ভার ছিল গিবসন গিচুরির ওপর, কিন্তু জুন মাসে সে তিন বছরের মেয়াদে বন্দিজীবন যাপন করতে যায়। তার বিচারের সময় তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার কোন সুবিধা দেওয়া হয় নি এবং শুধুমাত্র বিচারকের খেয়ালের বশে সে তিন বছর ধরে জেল খেটেছিল; যা ছয় বছর হলেও হতে পারত। গিবসন জোমো কেনিয়াট্টার ক্যাপিটু কিয়াম্বু অঞ্চলের বিখ্যাত গিথুনগিরি কলেজের ছাত্র ছিল, লেখাপড়াও ভালভাবে করেছিল এবং খুব গর্ব ভরে সে কেনিয়াট্টার নিজ হাতে সই করা প্রমাণপত্র সবাইকে দেখাত। কিন্তু কেনিয়াট্টার ধরা পড়বার পর থেকে সে আর চাকরির উমেদারীর সময় তার ভাবী নিয়োগকর্তাদের এই প্রমাণপত্র দেখাত না। বেচারা আমার বিশেষ বন্ধুস্থানীয় ছিল। আমার হোটেল থেকেই সে চাকরির খোঁজে বেরোত, কিন্তু ধরা পড়বার সময় পর্যন্ত তার কপালে চাকরি জোটে নি।

যাক, এবার আমাদের প্রসঙ্গে আসা যাক। ইন্সপেক্টারটির সঙ্গে দুজন কনস্টেবলও ছিল। বেশ নম্রভাবেই ইন্সপেক্টার আমাকে জানায় যে, পুলিশের আফিসে একবার আমাকে যেতে হবে। অবশ্য এর একমাত্র অর্থ ছিল যে, আমাকে বন্দী করা হবে। আমি গেলাম তাদের সঙ্গে। পুলিশের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই খবরের কাগজ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমবেত লোকজনের মুখে আমার চলে যাওয়াতে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। আমি তাদের দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলাম। পুলিশ অফিসে আমাকে বলা হয় যে, সংকটকালীন নিয়মাবলী অনুযায়ী আমাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করা হল এবং উত্তরাঞ্চলের মামবুরু এলাকায় কয়োপ নামক বন্দিশিবিরে আমাকে পাঠান হবে। আমার আঙুলের ছাপ নিয়ে খাতায় রেকর্ড করবার পর আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয় যথা ঃ আমি কি গলফ্ খেলি? আমি কি মদ্যপান বা ধূমপান করি? আমি কি বারবনিতার কাছে যাই? আমি কি বিবাহিত? আমি কি প্রায়ই ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর পুলিশ কর্মচারীর হেফাজতে আমি একবার হোটেলে ফিরে আসি আমার জামা-কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র আনবার জন্য। এই সমস্তর সঙ্গে আমি ইতিহাস, ইংরাজী, ভূগোল ও রাজনীতির গোটা দশেক বই ও আমার হোটেলের মুনাফাস্বরূপ উপার্জিত একচল্লিশ পাউন্ড (প্রায় দু' হাজার টাকা) নিয়ে যাওয়া স্থির করি।

পুলিশ স্টেশনে কয়োপ যাওয়ার জন্য গাড়ির অপেক্ষায় যে দু'দিন আমাকে থাকতে হয় তা বেশ আরামেই কেটেছিল সেখানকার কর্মচারীদের দৌলতে, যারা অনেকেই ছিল আমার বন্ধু। কয়োপ পৌঁছতে আমাদের সময় লেগেছিল দু' হপ্তা, পথে টমসন্ ফলস্ ও মারালালে থেমেছিলাম। এবং রাস্তা-ভোর ঝাঁকুনি খেতে খেতে শরীরের অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল। কয়োপ পৌঁছে দেখি, অনেকগুলি পরিচিত মুখই তাদের ভেতর আমাকে টেনে নেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। এর ভেতর ছিল নাকুরু শহরের কে· এ· ইউর সভাপতি জন্ কামোনজো। বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। পরিজন-বর্গের সঙ্গলাভ করলে আর অজানা-অচেনা জায়গায় ভয় কি? [চলবে]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ডুয়ার্স ॥

ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্...

রাত দুপুরে বাজছে মাদলের শব্দ। ডুম্ ডুম্...ডুমডুম্। মাঝে মাঝে তার মাঝে খোল আর করতালের শব্দ। ভেসে আসে রাত্রি দুপুরে। আসে শালবন-মাঠ পেরিয়ে। ওদিকে বেতবন, ঝোরা। বাঁশ-বন পেরিয়ে। অল্প-অল্প পাতাকাঁপা হাওয়ায়। রাত্রে। নদীর ওধারে মাদল বাজছে। কুলি বস্তীতে। এদিকে ফরেস্ট। ওদিকে বস্তী। গা ঘেঁষে পাহাড়। তার ওপরেই উঠেছে নবমীর চাঁদ।

বসন্ত-পূর্ণিমা এসে পড়েছে। দোল। আর ক'দিন পরেই দোল। আর মাত্র ছ'টি দিন বাকী।

হোলি হ্যায়, হোলি।

বাইরে বাসন্তী হাওয়া। শীত চলে গেল ক'দিন আগে। দেখতে-দেখতে। পর্বতের ওপর দিয়ে নেমে-আসা হিম-কনকনে হাওয়া। রাত্রির অন্ধকারে ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত নেমে এসেছিল।

আমার শুধু মনে পড়ে মাস তিন-চার আগের এক রাত্রির কথা। ফরেস্ট ডিপার্ট-মেন্টের এক বন্ধুর বাড়িতে এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যের ঘণ্টাটেক আগে। বন্ধু ব্যাচিলর। তাঁর দোতলা বাড়িটির একপাশের একটি কোঠায় খাটে মশারি খাটিয়ে দিব্যি এক অকাতর ঘুম দিয়েছি। গরম বিলিতি র‍্যাগ নাক পর্যন্ত তুলে তোফা আরামের নিদ্রা। বাইরে শীতার্ত ডিসেম্বর রাত্রি।

সহসা মাঝরাত্রে ঘুমটা ভেঙে যেতে মনে হল ঘরের মধ্যে এক তুমুল কাণ্ড ঘটছে। ভুলে উত্তরের জানালার পাল্লা-গুলি লাগানো হয় নি। শুধু টেনে দেওয়া ছিল। ভাবিনি যে, রাত্রি দুপুরে ওই অন্ধকার হিমালয় থেকে নিশাচর জন্তুর মত নেমে আসবে ক্রুদ্ধ ক্ষ্যাপা হাওয়া। অন্ধকার মাঠটা পেরিয়ে এক-ছুটে এসে দোতলায় উঠে পড়বে। পাল্লা-দুটোকে খুলে ফেলবে দুমদাম, দুমদাম শব্দে।

তারপর এই কাণ্ড। প্রবল হাওয়ায় ছোট্ট লণ্ডভণ্ড করছে ঘর। উড়িয়ে নিয়েছে মশারি একটানে। আর তীব্র বাতাসের ঝাপটে গোঙানো জন্তুর মত ঘরের মধ্যে গুমরে ফিরছে।

সেই এক রাত্রি। কম্বলটা গায়ে দিয়েও তীব্র জোরালো বাতাসের চাবুকে শিউরে শিউরে উঠছি। অথচ হাতড়ে খুঁজে খুঁজে জানালার পাল্লাগুলি বন্ধ করতে পারছি না। সেটা শীতকাল। এখন অবশ্য বসন্ত।

ডিসেম্বরের শীতের সেই তীব্র মারণ-মূর্তি এখন বিগত দিনের বেলায় বাতাসে খানিকটা গরম-গরম ভাব। বাংলোর চারদিকেই বন। রাতদিন জানালা খুলে খুলে তাকিয়ে দেখছি বনের ভিতরে উন্মত্ত বাতাসের ক্ষ্যাপামি। পাগল হাওয়া বলেছে একেই। রাত্রিদিন গাছপালার শুকনো পাতা বনজঙ্গল থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসছে। আর গাছ থেকেও খসে খসে পড়ছে পাতা। জীর্ণ পাতার রাশ। প্রবল প্রচুর।

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখেছি বনের চেহারাখানা। রোদ্দুরের তাপ বেলা ন'টা-দশটাতেই বেশ ঘন-গাঢ়। ওদিকে বনের ভিতরে প্রায় সর্বত্রই শালফুল ফুটেছে। খসখসে ডুমুরপাতা। চালতে গাছ দাঁড়িয়ে। মস্তবড়ো শিমুল গাছগুলি আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আকুল তৃষ্ণায়। শুকনো ক'টি গাছ। ঊর্ধ্ববাহু। কঙ্কালের মত কী ওই গাছগুলি? নিষ্পত্র শাখায়-শাখায় রিক্ততার বেদনা।

বনের ভিতরে অবশ্য শালবৃক্ষই বেশি। সারি-সারি সুসজ্জিত বৃক্ষ। মাঝে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। সবুজ প্রান্তটুকু দেখবার মত। ওদিকে জঙ্গলের তলায় তলায় বনমুরগীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারা বসন্তকাল ধরে বনে বনে ফুল ফুটেছে। কত নাম-না-জানা ফুল। কত অজানা লতা আর পাতা। সরস্বতী-পুজোর আগে আগে মাঠেতে সুরু করল পলাশ। এই কিছুদিন আগে গিয়ে পলাশ ফোটা দেখে এলাম।

একদিনে অবশ্য ফোটে নি। রোজই প্রায় একটু-একটু করে ফুটেছে। রোজই দেখে গিয়েছি। হঠাৎ একদিন গিয়ে অবাক। সব ফুল ফুটেছে। একটিও বাকি নেই। সব গাছ ফুলে-ফুলে রাঙা হয়ে গেছে।

সরস্বতী পুজোর পর শিবরাত্রি। বনের মধ্যে অবশ্য এ-সব কিছুই দেখবার নেই। অবশেষে এসে পড়ল দোল রাত্রি। হোলি হ্যায়, হোলি। এ-সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের জীবনে হোলি এক অসাধারণ উৎসব। এক আশ্চর্য পরব! এককালে মুসলমান বাদশারা পর্যন্ত রঙের বালতি উজাড় করে হোলি খেলেছেন। তবে তা অন্তঃপুরে। নিজের বেগমদের সঙ্গে। হোলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাধারণ মানুষদের জীবনে এক অসাধারণ উৎসব।

বাইরের জগতের সঙ্গে মনের যোগ আছে। বনে-বনে যখন ফোটে ফুল, দেখা দেয় গন্ধবহ হাওয়া, বসন্তের বিচিত্র অঙ্গন জুড়ে কী মাদকতা জাগে তখন। মানুষও তখন ভরে ওঠে বিচিত্র প্রাণ-প্রাণের লীলা চঞ্চল করে তাকে। তাই প্রাণের লীলাচঞ্চল করে তাকে। তাই মেতে ওঠে রঙের প্রাচুর্যে। আবীরে-আবীরে মেতে ওঠে, রাঙিয়ে দেয় অন্যকে। কবির কণ্ঠে তখনই গান বাজে : খোল্ দ্বার খোল্।

দ্বার তো খুলতেই হবে। রুদ্ধ করে রাখলে চলবে না প্রাণের আগল। বদ্ধ আবর্জনার গণ্ডী থেকে মুক্তি দেয় সেই আকাশ। বাতাসে আসে উন্মাদনা। অস্থির চাঞ্চল্য। খোল্ দ্বার, খোল্। খোল্ দ্বার, খোল্।

রাত দুপুরে ভেসে আসে মাদলের শব্দ। মাঝে-মাঝে খোল-করতালের শব্দ। রাত্রে শুয়ে ঘুম আসে না। চোখের পাতা জুড়তে পারি না। নদীর ওপারে বস্তীতে একদল মানুষের কলরবে ঘুম আসে না। এই দুর্জয় মনের ভিতরের মানুষ। মানুষেরই ইতিহাস দিকে দিকে

পুরনো শহরের জাগানো সেই দিনগুলির

কথা। আদিম দিনগুলি। কতই বা মানুষ ছিল তখন। এই বনের মানুষগুলির অধিকাংশই এসেছিল ভারতবর্ষের দূরে-দূরে অঞ্চল থেকে। এদের পূর্বপুরুষদের বাস ছিল ছোটনাগপুরে, ওড়িশা, রাঁচী অঞ্চলে। নতুন বনের আবাদ হচ্ছে তখন। সরকারী ছত্রছায়ায়। বলতে গেলে প্রায় ১৮৬৪ থেকেই বনাঞ্চলের সরকারী কর্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ সুরু হয়েছিল। শতাধিক বছর হয়ে গেছে। তা ছাড়া চা-বাগানও খোলা হচ্ছে তখন।

নতুন আবাদের লোভে চা-বাগানের কুলির কাজের লোভে ছুটে এসেছিল এ-অঞ্চলে। এখানে জমি ছিল সস্তা। রাঁচীর অনেক ওঁরাও এই সব বনভূমির আশেপাশে সহজ জীবনযাপনের লোভে এসে গিয়েছিল। আজ তাদেরই বংশ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। আজ আর ছোটনাগপুর, রাঁচীর লোক না তারা, ডুয়ার্সেরই অধিবাসী হয়ে গেছে। শত শত বৎসর ধরে জন্মে ও মরে-মরে এই মাটিকে তারা আপন করে ফেলেছে। বাসভূমি নয় শুধু মাতৃভূমিও।

যেতে-যেতে চোখে পড়বে তাদের সাধারণ পাতার কুটির। কিন্তু মাটি দিয়ে সুন্দর করে নিকানো। বাসাবাড়ির চারদিকে গাছপালার ঘের। বাসকপাতার বেড়া। কখনো বা লঙ্কাজবা, সূর্যমুখীর গাছ। মস্তবড় শিমুল গাছ একটা হয়তো। নিকটেই বনের ভিতরে ঝোরা। সেখানেই জল আনার কাজ চলে। সাঁঝবেলা হলে যায় বস্তীবাসীদের মেয়েরা মাটির ঘড়া কাঁকালে নিয়ে। বৌ-ঝিরাও যায় দুপুরে। সস্তা দামের সাবান। চান ও অঙ্গমার্জনার প্রাবল্যে কাচের চুড়ি বাজে রিণিরিণি। হাসি ও ঠাট্টা। রঙ্গ-রসিকতা।

মেয়েরা স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছন্দ। তাদের জীবনযাত্রায় প্রাণের সুর আছে। পুরুষেরা পরিশ্রমী। তাই বনের ভিতরেও তাদের সংসারে সুখ-শান্তির অভাব নেই। অথচ কে বলবে তাদের দারিদ্র্য নেই? অভাব তাদের নিত্য সাথী। তারা কৃষি কাজ করে, বনে-জঙ্গলে শিকার ধরে জীবন কাটিয়ে দেয়।

প্রকৃতির এই সব সহজ সন্তানদের জীবনেও তাই ঋতুগুলির প্রভাব অনস্বীকার্য।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত হোলি-উৎসবের প্রস্তুতি শুনতে-শুনতে ঘুম আসে। বেশ খানিকটা উঁচু উপত্যকার ওপরে এই বাংলো। নিচের দিকে ছোটখাটো একটা পাহাড়ী নদী। বৎসরের বেশির ভাগ সময়টাতেই জল থাকে না। শুধু বালু-[illegible] বিস্তার। নদী ধু-ধু করে। যতদূর চোখ যায়। পাথরে বালিতে। শুধু বর্ষায় তার রূপ পাল্টায়।

বাংলোর চৌকিদারকে প্রশ্ন করেছিলাম, এই নদী কোথা থেকে আসছে? চৌকিদার বলতে পারে নি। সে কী জানে। এখানে অবশ্য অনেকদিন থেকে আছে। কিন্তু নদীর খবর সে রাখে না। রাখবার দরকারও নেই। নদী সে এখানে এসে-ইস্তক দেখছে। কিন্তু কোথা থেকে এলো নদী তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন দেখা দেয় নি।

সকালবেলার দিকে ঘুম থেকে উঠে সামনের এক চিলতে বারান্দায় চলে আসি। ভোরে কোনোদিন ঘুম ভাঙে না। ভাঙা আমার স্বভাব নয় বলে।

যাঁরা ব্রহ্মলগ্নে শয্যাত্যাগ করে থাকেন, তাঁদের প্রায় মহাপুরুষ গণ্য করি। বারান্দায় এসে বসি। রেলিং-এ লতানো আইভিলতা। অল্প দূরে নদীর আভাস। নদীতে জল নেই। রোদ্দুরে চকচক্ করে। এক চিলতে মাঠ। একদিন সকালবেলায় দেখলাম একদল ছেলে-বুড়ো-মাঝারি বয়সের লোক এসেছে নদীর পারের ওই এক চিলতে মাঠটায়।

বাংলোর চৌকিদারকে বললাম, ওরা কারা?

চৌকিদার যা বলল, তার অর্থ—ওই লোকগুলো শেয়াল মারতে এসেছে।

শেয়াল মারা কি ব্যাপার? চমকে চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসি।

দেখলাম বেশ একটু বেলা-তক্ শেয়াল-শিকারীদের কারবার। এই বন-জঙ্গলেরই লোক ওরা। মাথায় গামছা-বাঁধা কারুর। কারুর বা কোমরে গামছা-বাঁধা। ষণ্ডামার্কা চেহারার কেউ-কেউ, তীরধনুক কাঁধে। কারুর হাতে লাঠি-বল্লম, বর্শা-সড়কি প্রভৃতি। মারাত্মক অস্ত্রে সুসজ্জিত। লোকগুলো প্রথমে একটা জায়গাকে ঘিরে ফেলে যুক্তি করে। মাঠে মাঝে মাঝে ঢিপির আকারে মাটি উঁচু হয়ে রয়েছে। কচিৎ ভাট-ঝোপ। সাদা বা বেগুনী রঙের।

তাড়া খেয়ে শেয়াল পালাল কয়েকটা। শেষ পর্যন্ত মাটির গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে খানা-খন্দ থেকে বার করে আনল শেয়ালের কচি বাচ্চা। তাই নিয়ে তাদের কী হৈ-হল্লা! শেষে তাই নিয়ে বেলা-আন্দাজ এগারোটা-সাড়ে এগারোটার দিকে তারা ফিরে যায়।

বসে বসে দেখি। এক আশ্চর্য দৃশ্য! এমন ঘটনা পাহাড়-জনপদে ঘটতে দেখা যায় না।

চৌকিদারকে বললাম, এরা এ-সব নিয়ে কি করবে?

শেয়ালের চামড়ার দিকেই এদের নজর সাব। চৌকিদার অম্লান-বদনে বলল, এরা এ-অঞ্চলের বনেজঙ্গলে থাকে। এদের ঘর-বাড়ি বিশেষ কিছু নেই। যেখানে যেমন পায়—তেমনি।

বললাম, শেয়ালের চামড়া দিয়ে কি করে?

চৌকিদার বলল, তা জানি না সাব।

মনে মনে জানি এরা বেদে। ডুয়ার্সের এ-অঞ্চলে অসংখ্য বেদে বাস করে। কোনো বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী হতে এদের আগ্রহ নেই। নানা জায়গায় ছুটোছুটি করাই এদের নেশা।

তবু ডুয়ার্সের নানা অঞ্চলে এদের আস্তানা আছে। এখন অবশ্য সময়টা বসন্ত কাল। তা বলে নয়, দুরন্ত শীতের দাপটে পাহাড়ের বাঘ, বুনো হাতী পর্যন্ত যখন থরথরিয়ে কাঁপে, এরা শুয়ে থাকে দিব্যি পরিপাটি। ডিমা নদীর ধারে। শিলতোর্সার পাড়ে। যেতে-যেতে চোখে পড়ে শালবনের ভিতরে। মস্ত পুরানো বটগাছের তলায়।

আর সারা দিন বনে-জঙ্গলে ছুটোছুটি করে ফেরে। শহরেও যায় কেউ-কেউ। একজন বললেন, ব্যাটাদের এমন দেখছেন দেখুন, কিন্তু জানবেন একেকজন চোরাইমালের ঘাঁটি। আজকাল অনেকে চোরাই সোনার ব্যবসাও করে।

শুনে অবশ্য বিশ্বাস হতে চায় না। চুপ করে চেয়ে থাকি। হয়তো-বা একরাশ ধুলো বসন্তের হাওয়া উড়িয়ে ফেরে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পালিয়ে ফিরতে হয়।

৮

বনে-জঙ্গলে বস্তীতে মাদল বাজে। বাজে রক্তের ভিতরে ঘন-ঘন। শিরায় ও উপশিরায়। ডুম ডুম্ ডুম্ ডুম্...। মিঠে মাদলের শব্দ। শুনতে শুনতে নেশা

লাগে। বাসন্তী বাতাসের সঙ্গে তার মিঠে বোলটুকুর কেমন যেন একটু নেশা-লাগানো সঙ্গীত আছে। জীবন কী সুন্দর! জীবন কী মধুর মনে হতে থাকে।

পথে যেতে চোখে পড়বে পর্বতের নিচু উপত্যকায়, বনের ভিতরে এখানে-ওখানে কৃষ্ণচূড়া গাছতলায় নেশা করে পড়ে আছে কোনো সাঁওতাল যুবক। তার তীর-ধনুকটা পড়ে আছে একটু দূরেই। ভ্রূক্ষেপ নেই তার। তদ্গত লোচন। পরম আরামে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে সে। ছায়া-ছায়া জায়গাটা। গাছের ওপরে কোনো নিভৃত ছায়াশীতল ডালে বসে ডেকে উঠছে স্বাধীন পিউ কাঁহা।

যেতে যেতে সেই ডাক শুনে আপনি থমকাবেন।

এখনো ফোটে নি অবশ্য কৃষ্ণচূড়া। প্রকৃতির নিজস্ব একটি ছন্দ আছে। সে-নিয়মের ব্যতিক্রম খুবই কম হয়। একেবারেই যে হয় না তা বলা উচিত নয়। নির্দিষ্ট সময়ের ঘুমিকাটি মোটে। উপরে স্পষ্ট। এই ক'দিন আগেও ফাল্গুনের শেষাশেষি না চৈত্রের প্রথম দিকে অরণ্যের দিকে তাকালে চোখে পড়তো গাছপালাগুলির মাথায় নও ধোঁয়া-ধোঁয়া। যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেগুনগুলোর ছোট ছোট পাতা উঠে গেছে এদ্দিনে। ছোট-ছোট বীজ। এখন তাকালে চোখে পড়বে কুঁড়িগুলো রুক্ষ ডালের। একটিও পাতা প্রায় নেই বললেই চলে।

এই তো দোল এসে পড়ল। আর বিলম্বও নয়। অল্পদিনেই রঙ বদল হবে কৃষ্ণচূড়ার। শুধু রঙবদল না, রূপবদল। গাছপালার রঙ যখন সবুজ, তখন ফুলের রঙ তীব্র লাল। মাদকতার রঙ।

ডুমডুম...ডুমডুম ডুমডুম...

এসে গেছে বসন্ত। আকাশটি উজ্জ্বল। চতুর্দিকে কেমন এক উদাসীনতা। কী এক করুণ রাগিণী চারদিকে। রাত্রে নবমীর চাঁদ। কাঁপা-কাঁপা পাতা-ঝরানো হাওয়া। বাতাস কিন্তু গরম হলকা।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসছে গ্রাম-গ্রামান্তের হাটগুলি। আজ অনেক আবীর বিক্রি হল। দোলের খবর পেয়ে গেছে লোকেরা। ছেলে-ছোকরাদের দল গান বেঁধেছে। হারমোনিয়ম এনেছে বারোয়ারীতলায়। পাশেই কালীবাড়ি। অধিক-রাত্রি পর্যন্ত হারমোনিয়মে সুর মিলিয়ে গান মকশো হচ্ছে। অধিকারী পাড়ারই লোক। গানে উৎসাহ খুব।

পথ দিয়ে যেতে-যেতে গান শোনা যায়। যত্ন করে বানানো গান। যুগোপ-যোগী। বয়স্কেরাও কেউ কেউ গলা খুলেছেন দেখা যায়। হ্যাজাক জ্বলেছে বারোয়ারীতলায়।

কিছু ছেলে বেরিয়ে পড়েছে চাঁদা তোলার খোঁজে। সেটাও কম নয়। লোকজন যাই হোক, হাটবার সপ্তাহের দু'দিন। এই দু'দিনেই মানুষজনের মুখ দেখা যায়। ব্যবসাদারেরা আসে।

—চাঁদা চাই, চাঁদা।

—কিসের চাঁদা?

—বারোয়ারীতলার দোলপুজো যে এখানের—

যেতে যেতে শুনি কাঁচা সড়কে গরুর গাড়ির চাকার শব্দ। সজনে ফুল ফুটেছে গাছে। চাঁদনী রাতে ভালো পরখ করা যায় না। এ-সব কী দেখেছি আগে কোনোদিন মনোযোগ দিয়ে যে ধরতে পারি! আমাদের দৃষ্টি যে ছোটবেলা থেকে বহির্মুখী। আমরা যে প্রকৃতি-পালিয়ে বড়ো হলাম।

বিমলবাবুকে বলি, সজনের ফুল না বিমলবাবু? ভয়-ভয়ে বলি, সন্দেহ-জড়ান গলায়।

মাফলারটা গলায় জড়াচ্ছেন বিমলবাবু। তাঁরও কণ্ঠে সন্দেহ।—সজনে ফুল? উল্টে তাঁরও প্রশ্ন আমাকে।

তাই তো মনে হচ্ছে।

যতদূর ভালো করে পরখ করা চলে কাছে দাঁড়িয়ে দেখা গেল। শেষে সন্দেহের নিরসন। সজনেরই ফুল এগুলি। কী আশ্চর্য! কেউ কারোর দিকে আর তাকাতে পারি না। লজ্জা বস্তুটিকে তো পুরো খাওয়া হয় নি এখনো। সজনে-নামক পদার্থটিকে বাজার থেকে কিনি আমরা, তারও যে ফুল হতে পারে, ভুলেই গেছি আমরা! থোকা-থোকা ফুল বাসন্তী রাতের নবমী-চাঁদের আলোয় কী যে স্বপ্নময় লাগে! বনের ভিতরে বাস করেও আমরা স্রেফ ভুলে গিয়েছি। কোনো দামী ফুল নয়, নিতান্তই সাধারণ ফুল।

আসলে সভ্যতারই এই দান। সভ্যতা আমাদের দিয়েছে কম না, কিন্তু হরণও করেছে অনেক। আমাদের অনুভূতি, স্পর্শসচেতনতা, স্বপ্নগুলি!

ডুমডুম..ডুমডুম.. ডুমডুম...

রাত্রে ফিরে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। চান হয়নি সারাদিন। মাথার ওপর দিয়ে রৌদ্র গিয়েছে সারাদিন। ডুয়ার্সের ধুলো। শুকনো ধুলো। সারাদিন উচ্ছৃঙ্খল উড়িয়ে এনেছে বাতাস। নাক জ্বালা করছে। শালফুলের গন্ধ আসে বাতাসে। দিনকতক আগে ছাতিম-ফুলের গন্ধে ঘুম আসে নি।

এখন চান করা দরকার। পাইপে ধরে-আনা অনেক দূরের ঝোরার জল চৌবাচ্চায় এখন শীতল। শান্ত। দূর কুলি বস্তীতে আদিবাসীদের বস্তীতে মাদল বাজছে। আজ বাজবে, কাল বাজবে, পরশু বাজবে। দোলের দিন পর্যন্ত।

এর আর ব্যতিক্রম থাকবে না। রোজই কিছু-না-কিছু মদ্যপান চলেছে। অবশ্য দিশি মদ্য। নেশা বেশি। ঝাঁঝালো আস্বাদ। ঈষৎ লালচে চোখ, তৈলহীন রুক্ষ চুল। পুরু ঠোঁটে কষ গড়াচ্ছে। চোলাই-মদের গন্ধ চারদিকে। বড় বড় নীলচে রঙ মাছিগুলো ঘুরছে ঘরময়।

ডুমডুম...ডুমডুম...

একরাশ হাসির ঝলক। স্খলিত কণ্ঠের সুরলহরী। খোল-করতাল বাজাতে-বাজাতে একদল স্ত্রী-পুরুষ চলেছে বাংলোর পাশ দিয়ে।

ওরা চলে গেল।

ঘোষবাবু কন্ট্রাক্টর এ-বেলা এসেছেন আমার সঙ্গে। সারাদিন ছিলেন আমার সঙ্গে। বাংলোয় রাত্রিটা কাটিয়ে যাবেন। সকালে চলে যাবেন নাগরাকাটায়। জীপটা দাঁড়ানো বাইরে। ড্রাইভার জাতিতে মদেশিয়া। তার দেখা নেই।—যাবে আর কোথায়? কাছাকাছি কোথাও আছে, তাঁকে ভরসা দিয়ে বলি।

হাতঘড়িতে রাত্রি দেখলেন ঘোষবাবু, রাত সাড়ে বারোটা ছাড়াল।

তাঁর গলা শুনলাম ভিতরের ঘর থেকে। গলা ভার-ভার।

কি, ঘোষবাবু, শরীর কেমন? এগিয়ে বলি।

আর শরীর! গলাটা ভীষণ ব্যথা করছে—

ঠাণ্ডা লেগেছে তাহলে। আমি বললাম।

বোধ করি তাই। আর হাওয়াও দিয়েছে দেখুন—। খানিকটা বেজার মুখে তিনি বলেন, এই সব লোকেরা যে কোথা থেকে এত উৎসাহ পায়! হোলির নামে একেবারে উথলে উঠেছে! এদের অসুখ-বিসুখও করে না—

ঘোষবাবুর গলার সুরে বিরক্তি। ঠিক জানি এর পশ্চাতে যে জিনিসটা, তা হচ্ছে একটু আগে বাংলোর পাশ-দিয়ে চলে-যাওয়া আদিবাসীদের ওই দলটা।

জীবজন্তুর ভয়ও এদের নেই! নিজের মনেই খানিকটা গজগজ করলেন উনি। --ভাগ্যিস, ট্যাবলেট ক'টা এনেছিলাম—। মশারির ভিতরে ঢুকলেন উনি। বাকী কথাটা শেষ করলেন তারপর, কালই পালাচ্ছি আমি—

হো-হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, কিন্তু এখনো পূর্ণিমাই যে বাকী। আজই রসস্থ হয়ে পড়লেন।

ততক্ষণে উনি কম্বলটা নাকের ডগার ওপর পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন।

ও'র ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে খুঁটিনাটি হিসেব লিখতে বসলাম।

[চলবে]

গৌরীশঙ্কর ঘোষ
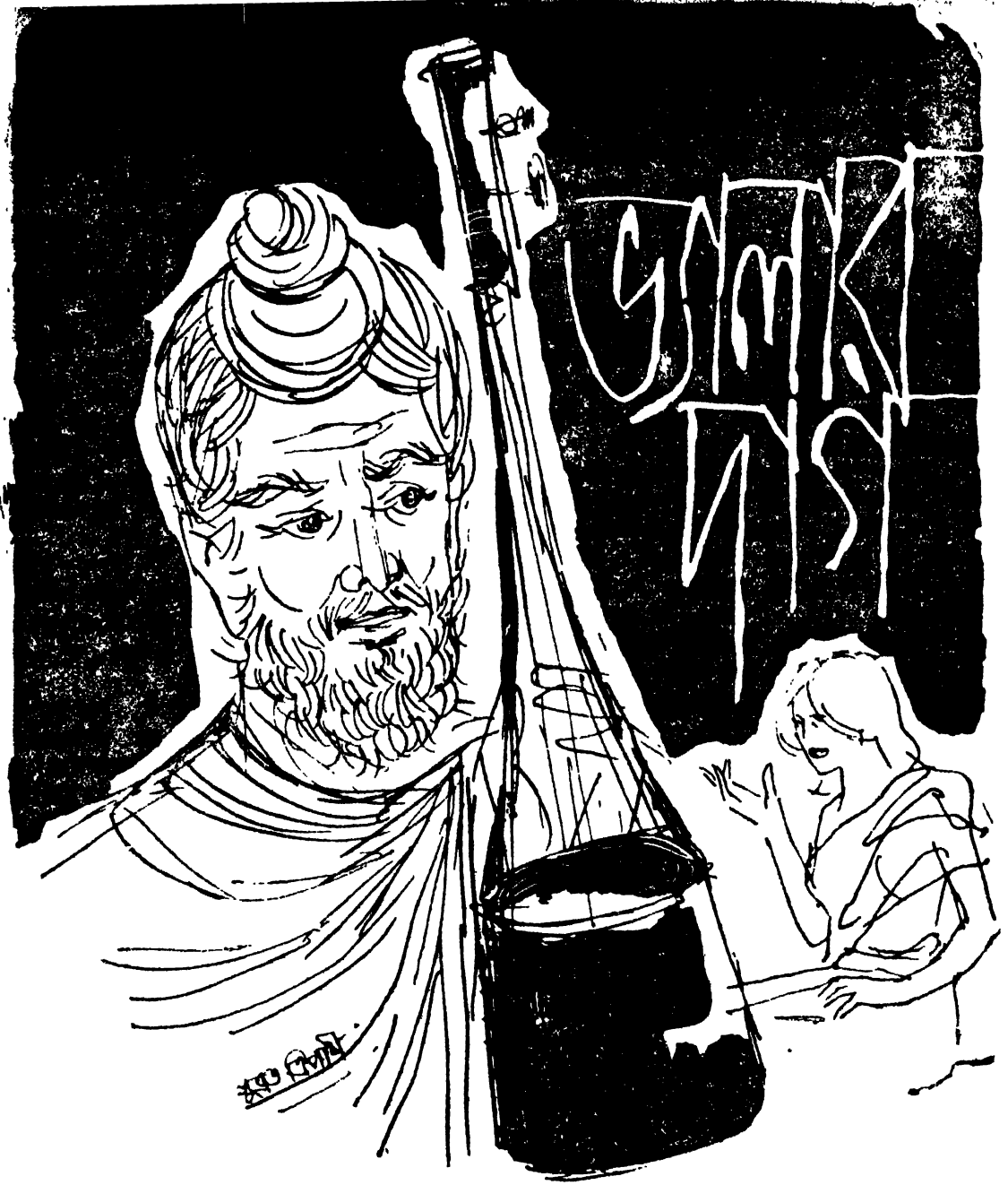
: ভোলা মনরে আমার—'
ও তোর হইল না চেতন।
জনমিয়ে রজককুলে রইলি কেনে
আপন ভুলে
পরের বাসের কালি তুলে
কাটালি জীবন;
আর নিজের রীত যে রইল মলিন,
কল্লিনে শোধন
ও তোর হইল না চেতন......
হরি ব—ল, এক্টা বিড়ি দ্যান-না গো, দাদাঠাউর।

একতারা হাতে তরতর করে এগিয়ে এসে লোকটা আমার সামনে দাঁড়ালো। আঙ্‌লটা ওর তখনও তারের ওপর ছোঁয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। সাদা আলখাল্লায় ঢাকা দেহ, সাবানের ফেনার মত চ্‌ল-দাড়ি-গোঁফে ছাওয়া ম্‌খ।

সিনেমা-থিয়েটারে বাউলবেশী নট ছাড়া সত্যিকারের বাউল কখনো দেখি নি, লোকটাকে দেখে তাই ধরে নিল্‌ম. এই তাহলে সেই বাংলার বাউল, যাদের প্রাণ-মাতানো উদাত্ত কণ্ঠস্বরে একদিন বঙ্গ-পল্লীর হাট-মাঠ-বাট ম্‌খরিত হয়ে থাকতো। যাদের ভাসা ভাসা ছবি আঁকা আছে আমার মনের পটে স্বপ্নের রং আর কল্পনার তুলি দিয়ে।

একটা সিগারেট ওর হাতে দিয়ে, নিজেও একটা ধরিয়ে নিয়ে বলল্‌ম,

: শেষ কর-না, ভাই, গানটা; বড্ড মিষ্টি লাগছিল শ্‌নতে।

: লজ্জা কেনে দ্যান দাদাঠাউর, ওই কি আর এক্টা গান হল? বেস্‌রো রাগে, বিনি তালে, ভাঙা গলায় খালি আলতামারি চাঁচাই। রজক ছিলাম ম্‌ই জেতে, কিন্তুক সংসারের আসল ময়লামাটি সাফ করার রহস্য তো কিছু শিখতে পারলাম

না গো, শিখলাম খাঁটি বাঙালীর কাছে শে চার্চোনি। তা, দাদাঠাউর মেলা দেখতে এইছিলেন বোধ করি?

ঃ হ্যাঁ ভাই, এখানকার মেলা দেখতে এসেছি। বাংলার খাঁটি মেলাখেলা তো বেতেই বসেছে, তাই যেখানেই তার ছিটে-ফোঁটা কিছু আছে বলে খবর পাই, সেখানেই ছুটি—খাঁটি বাংলা-কৃষ্টির মধ্যে নিশ্বাস নিতে কি যে ভালো লাগে!

ঃ যা বুলেছেন, দাদাঠাউর, দ্যাশের কোন্ বস্তুডা আর খাঁটি রইল বুলেন? স—ব থ্যান পুড়ে ছাই হয়ে গেল। না হবেই বা কেনে, মানুষের মনডাই যে গিয়েছে একেবারে দেউলে হয়ে। রীত বুলেন, চরিত্তির বুলেন, সব থ্যান ভানু-মতীর খেল-এর মত পালটে গেল রাতা-রাতি। দরদ মরে গেল, ভালবাসা উবে গেল, ধম্মো গেল শুকিয়ে। তাই তো মুই মনের খেদ নিঙরে নিঙরে ওই গানডা গাই গো দাদাঠাউর, ও মোর গান লয়, বুকভাঙা রোদন!

ঃ বুকভাঙা রোদন! কেন, কি তোমার দুঃখ ভাই? কেন তুমি জাত-ব্যবসা ছেড়ে এমন ছন্নছাড়া বাউল হয়ে ঘুরে বেড়াও পথে পথে?

জিভ কেটে, তিন তিনবার কান কপাল ছুঁয়ে ব্যস্তভাবে লোকটা বলে উঠল,

ঃ হেই দাদাঠাউর, মুখে আনবেন না অমন কথাডো, বাউল হতে পারা কি মুখের কথা আইজ্ঞা? গোসাঁই-এর কিরপায় বাউল হতে পারলে আর দুঃখু কি ছিলো, বুলেন? কোথা মোর সে-পুণ্যির জোর, কোথা মোর সে নিপাপ মন! তবে সাঁত্য ঘটে মুই বেবাগী হয়িছি—সংসারের জ্বালা যন্তোন্না এড়াবার লেগে ঘর ছেড়ে মুই পথে বেরিয়েছি। কিন্তুক অজ্ঞান আর মায়ামোহ, সে তো মুই তাড়াতে পারলাম না! মুই যাই কোথা! এমন ঠাঁই কি আছে, যেখানে গেলে একডু শান্তি পাই?

শুনেছিলুম খাঁটী যারা বাউল, চোখে নাকি তাদের উদাস কোমল দৃষ্টি—যার মধ্যে থাকে কোন এক কল্পলোকের ইশারা—তাদের সারা মুখখানি জুড়ে নাকি এক অপার্থিব আনন্দের উদ্ভাস—যা দর্শকের প্রাণেও উদ্বেলিত করে আনন্দের ঢেউ। কিন্তু এর মুখেচোখে তেমন তো কিছু দেখলুম না। হয়ত আমারই দৃষ্টি-বিভ্রম—দাড়িগোঁফের ফাঁকে ফাঁকে ওর মুখের যে অংশগুলো চোখে পড়ে, সেখানে শত শত বলিরেখায় চিহ্নিত হয়ে আছে বার্ধক্যের ছাপ, মুদ্রিত হয়ে আছে কঠিন দারিদ্র্যের সাথে প্রাণপণ সংগ্রামের দলিল। আনন্দ যদি কিছু থাকেও ওর প্রাণে, মুখভাবে তার নেই কোন প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর। নিষ্প্রভ ঘোলাটে চোখ দুটোতে কী যেন এক নিগূঢ় বেদনার ছায়া। লক্ষ্য করে দেখলুম ও যেন ধুঁকছে—হয়ত বয়সের ভারে, হয়ত বা খাদ্যাভাবের দৌর্বল্যে। কেমন যেন মায়া হয় ওকে দেখলে—সংসার-যন্ত্রণা এড়াবার জন্যে ও ঘর ছেড়েছে; এখন সমস্যা দাঁড়িয়েছে, মায়ামোহ নাকি ওর কাটছে না—আমার কিন্তু মনে হয়, সমস্যাটা ওর তার চেয়ে অনেক প্রত্যক্ষ, অনেক বাস্তব—সে ওর জঠর-যন্ত্রণা; সংসার-যন্ত্রণার কাছ থেকে পালাতে গিয়ে ও জঠর-যন্ত্রণার মুখোমুখি এসে পড়েছে। ওর বয়স হয়েছে—কিন্তু আজও ও শিশু; চিনতে শেখে নি নিষ্করুণ পৃথিবীটাকে, তার রূঢ় বাস্তবতাকে। একটু সংকোচের সঙ্গেই ওকে জিজ্ঞেস করলুম,

ঃ কিছু মনে করো না ভাই, বলি, সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েছে তো?

ঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, একদম কিচ্ছুটি না দাদাঠাউর, দীনদয়াল আজ আর মাপেন নাই কিছু কপালে। এ মোর নিত্যকার বেপার আইজ্ঞা, দয়াল ঠাকুর সব দিন সমান মাপেন না, কোনদিন বা মোটেই না, তার লেগে আর খেদ কি? আহার-অনাহার সব তাঁরই দান।

অনাহার অপুষ্টির জন্যে ওর কোন কষ্ট নেই, একথাও যেমন আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে, তেমনি ওর কথা-গুলোকে কপট বৈরাগ্য বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধাও আমার নেই।

হাত ধরে ওকে একটা গাছের তলায় বসালুম, নিজেও বসলুম। বিদেশে এসেছি মেলা দেখতে। সঙ্গে কিট-ব্যাগের মধ্যে বিস্কুট এবং ওই জাতীয় শুকনো খাবার কিছু ছিল। আর ছিল ফ্লাস্ক ভর্তি চা। চা-পানের অনুরোধ জানাতে ও ঝোলা থেকে একটা এনামেলের মগ বের করল। কিছু শুকনো খাবার আর চা ওকে দিয়ে নিজে এক কাপ ঢেলে নিয়ে সামনের বিরাট দীঘিটার দিকে চোখ মেলে বসে রইলুম।

গোধূলি আলোয় তামাটে রং-ধরা অজস্র বীচিমালার আঁচড়কাটা দীঘির বুকখানা দেখে ওই বৃদ্ধের বলিসমাকীর্ণ মুখখানাই কেবল মনে পড়ছে। চার পাড়ে ছাড়া ছাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বত্থ, বট, শিমুল, জারুল আরও কত চেনা-অচেনা গাছগাছালি। দিনান্তের বিশ্রাম আশায় ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসছে দিক-দিগন্ত থেকে কাক-বক-শালিক-ছাতারের মিছিল—আসছে আর হারিয়ে যাচ্ছে ওই সব গাছগাছালির আঁধার রহস্যে—শুধু ভেসে আসছে তাদের অবিশ্রান্ত কলকাকলি—রাতের অধিকার নিয়ে তাদের নিত্যকার হুল্লোড়।

দীঘির পশ্চিম পাড়-লাগোয়া বিস্তীর্ণ মাঠে বহু প্রাচীন [illegible] এতদঞ্চলের প্রখ্যাত মেলার আয়োজন—বাঁশ-চট-করোগেট টিনের তৈরি অগুন্তি দোকান-পশার—যেন বিশাল একটা বেদে পরিবার দু-দিনের ডেরা বেঁধেছে। একে একে দোকানে-দোকানে জ্বলে উঠছে উজ্জ্বল গ্যাসের বাতি। কাতারে-কাতারে লোক এসে জমছে দূর-দূরান্তের গাঁ-গঞ্জ থেকে—আসছে সারি-সারি গরুর গাড়ি গ্রাম্য ললনাদের নিয়ে। তাদের কল-কোলাহল শোনা যাচ্ছে দূর হতে ভেসে আসা জলকল্লোলের মত।

চাটুকু শেষ করে মুখ ফেরালুম লোকটার দিকে—ওর মুখখানা আর তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বললুম,

ঃ কই বললে না তো ভাই, কেন তুমি কাঁদো, কোন্ দুঃখে ঘর ছেড়ে তুমি নেমে এসেছো পথে?

ঃ শুনতে কি আপনার ভাল লাগবে দাদাঠাউর, আমার কান্নার কাহিনী? সে কাহিনী এক অধম্মেরই কাহিনী—অধম্মো এসে বাসা বেঁধেছিল আমার বিমলীর মনডার মধ্যে...

নগরোপান্তের বিকলাঙ্গ সমাজে মেহনতী মানুষের অপরিচ্ছন্ন জীবন-পরিবেশে যে সব কেচ্ছাকাহিনী আকছার শোনা যায়, তেমনি কোন এক কাহিনীর অবতারণা হতে চলেছে ভেবে মুহূর্তে সব উৎসাহ আমার নিভে যায়। কাহিনীটার ইতি করবার জন্যে ওকে বাধা দিয়ে বলি,

ঃ বিমলী তোমায় ছেড়ে......

ঃ ঠিক তাই লয় দাদাঠাউর, বিমলী তো লক্ষ্মী মেয়েই ছিলো, আইজ্ঞা। কিন্তুক কাল কল্লে ওর একডা দিনের লোভ। নইলে বেশ ছেলাম—দুজনে দুখ-ধান্দা করে খেতাম দেতাম, দিন চলে যেতো। সাঁঝ থেকে এক পহর রাত অবধি খারভাটি কত্তাম, তারপর ফুটলো বিহেনে দুজনে সেই সব কাপড়-চোপড় লিয়ে চলে যেতাম গাঁয়ের দখিন গা লাগোয়া কাজলা বিলের ধারে......

লোকটা যেন আর এ জগতে নেই, এমনি এক ভাব-বিভোর তন্ময়তা ওর গলার স্বরে ফুটে উঠল। ও বলে চলল ওর কাহিনী...

ঃ হুঁ, দাদাঠাউর, সে বিলের ধারে গিয়ে পড়লে পরাণডায় মোদের বাতাস লাগত—মেহনতকে আর মেহনত বুলে মনে হ'ত না—দু' কোশ, পাঁচ কোশ জুড়ে বারো মাস থৈ-থৈ করত কাজলপানা মিশ কালো জল—কোথাও হাজারে-হাজারে ফুটে থাকত বড়-বড় সব শ্বেতপদ্ম, আবার বেশ খানিক দূর ছেড়ে হয়ত শালুকের বন—ফুলগুলো সব ঠায় দাঁড়িয়ে যেন মুখ দেখছে আর্শিতে—কখনো বা

রাখা নড়ছে হাওয়ার সাথে গলাগলি কোলাকুলি করে—একবারে কিনার ঘেঁসে কলকলে কলমীলতার বনে লাখে লাখে ফুটে রয়েছে বেগুনী রং-এর ফুল—ভীড় করছে কত ভোমরা, কতো মধুমাছি—বিহেন বেলার সোনারোদে ফড়িং আর প্রজাপতি গুলোন উড়ে বেড়ায়, যেন বাতাসে উড়ন্ত চুমকির ঝিকিমিকি—হাঁসগুলোন সব ভেসে বেড়ায় পালে পালে; পোষা হাঁস, কূল ছেড়ে যায় না বেশি দূরে—দূরে দূরে ডোবে আর ওঠে কতো পানকৌড়ী; যেন বিরাট একখানা কাঁথার ফোঁড় তুলছে কালো-কালো সব সুচ—শ্যামাপুজোর বাদ্যি না বাজতেই কোথা কোন্ অচিন দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশ কালো করে উড়ে আসতে থাকে বিলহাঁস, দেখতে-দেখতে ছেয়ে যায় কাজলা বিলের বুক, তার কালো বরণ পিঙ্গলা হয়ে যায় ওদের গায়ের রং-এ।

কি বুলব, দাদাঠাউর, পরাণভরে এসব দেখি আর মনে আনন্দে পাটার উপর কাপড় আছড়াই—হে'ই হে'ই হিস্ হিস্...

বিমলী আমার পাড়ে বসে নীল গুলে, মাড় ঠিক করে রেখে চলে যায় ঘরে—ওকে আবার গিয়ে ভাত রাঁধতে হবে তো। তা তখোন ধরেন বয়েস বাল তো, কোন কোন দিন সে এট্টু রঙ্গ করে, এট্টুন বা ফষ্টিনষ্টি—জোড়াস-জোড়ায় ফড়িংগুলানকে জলের উপর নাচতে দেখে বুলে, 'দ্যাখ, রাধে, দ্যাখ, দ্যাখ পরাণে উআদের কতো সুখ; মোর পরাণ চায় কি, উআদের মতন উড়ে যা—ই যিদিকে দু'চোখ যায়।' আবার, কোন হাঁসাকে হয়তো দেখেছে হাঁসীর মাথায় ঠোঁট চেপে ডুবায়ে ধরে, অমনি খিলখিলিয়ে হেসে গলে উঠত, 'আ মরণ, হাঁসাডার পীরিতের রকমখানডা একবার দ্যাখ, রাধে হাঁসীডারে ডুবায়ে মারতে চায় নাকি!' সে কি হাসির ধমক, থামতে যেন আর চায় না। মুই ধমক দিতাম, 'লে, লে, তুই ঘর যা দিকিনি, মোরে কাম কত্তে দে, রোদ থাকতে থাকতে সব শুকিয়ে লিতে হবে না?' ঠোঁট ফুলিয়ে বিমলী বলত, 'তুর খালি কাম, আর কাম। রোদ থাকতে থাকতে যেমন কাপড় শুকিয়ে লিতে হয়, বয়েস থাকতে থাকতে তেমনি রঙ্গ-রসটা পুষিয়ে লিতে হয়। মুই চাই এই বয়েসে এট্টু পরাণ খুলে হাসতে। তা হবার জো আছে? তোর ওই পরের বসনের কথা ভাবতে ভাবতে মোর নিজের বাসনা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, রাধে।' তারপর হয়ত সে আর দাঁড়াত না, পিছন ফিরে চলতে শুরু করত বাড়িমুখো—হেলতে-দুলতে, ঠমকে-ঠমকে; মুখে গুন গুন করত 'কে বিদ্যাশী মন উদাসী বাজাও বাঁশী আপন মনে...'

হাতের কাজ থামিয়ে দু'দণ্ড মুই চেয়ে থাকতাম অবাক হয়ে।

দিন মোর এমনি করেই কাটছিল গো দাদাঠাউর, পরাণডায় মোর আনন্দ ভরে ছিল কানায়-কানায়। পরের বসন ধোলাই কত্তাম, আর মনে হত বজন লোকের মনে যে ময়লামাটি সব ধুয়ে সাফ করছি, আর সেই সাথে পুড়িয়ে ছাই করছি নিজের বাসনার জঞ্জাল। সাধু-সন্তেরা বলেছেন, উআতেই নাকি জেবন সাত্থক।

তারপর বিমলীর কোলে এল মোর সাবি। দেখতে দেখতে সেও পাঁচ বছরেরটি হ'ল। এমত সময় হঠাৎ একদিন বিমলীর গলায় দেখি একছড়া হার! মনে হল সোনার! গরীব রজকের বউ-এর গলায় সোনার হার! শুধালাম,

: কি বিমলী, পেতল পিনেছিস?

: চোখের নজর কি তোর এর মধ্যেই গিয়েছে? সোনা চিনিস না?

: পেলি কোথা?

: বিশ্বেস বাড়ির একখান শাড়ির খোঁটে বাঁধা ছিল—কড়া কাটা। সুতো বেঁধে মুই পিনেছি। দ্যাখ, দ্যাখ রাধে, কী ভাবী পাঁচনড়ী হার।

: মেয়েমানুষ তো, সোনা দেখলেই তোদের নোলা সকপাকিয়ে ওঠে। তা খুব হয়েছে, এখন দে দিকিনি, উআদের দিয়ে আসি। এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি পড়ে গিয়েছে।

: দিলাম আর কি! এ হার মুই দিতে নারব।

পেথমডা মুই ভাবলাম দাঠাউর, বিমলী মোর সাথে মস্করা কত্তে চায়, বুললাম—

: কতক্ষণ আর দিতে নারবি, বিমলি?

: চিরকাল মুই পিনবো এ হার।

: অমন কথাডো মুখে আনতে নাই বিমলি, অধম্মো হয়।

: রাখ, রাখ। তোর ধম্মো নিয়ে তুই ধুনো দে। ধম্মো ধম্মো করে জেবনডা তো পাত কল্লি, সুখডা কি পেলি শুনি? সেই তো চৌপর দিন মেরেমন্দোয় খেটে আধপ্যাটা ভাত আর পরনে ত্যানা ঘুচলো না।

: তাই বলে পরের ধনে আত্মোসাৎ! না, না, না, অমন কাম তুই কত্তে চাস না, বিমলি, অমন কথা তুই মনেও লিস না।

: না, তা লিব কেনে! সেই বাক্যি আছে না,—প্যাটে ভাত নাই, ধম্মের উপোস! সেই বিয়ার সময়, জন্মের মধ্যে কম্মো, দিয়েছিল রুপোর এক্ডা হাঁসুলি, আর একযোড় বাউটি। তার পরে যে রাং-রাঁও কিছু ঠেকিয়েছিস আজ অবধি? গায়ে কোনদিন এক্তু সোনা ঠেকাতে পাই নাই; এক্তু নাকছাবি তক না।

: ধোপার ঘরের ঝি-বৌ, সোনার লেগে হাপিত্যেশ কল্লে চলবে কেনে?

তুই কি ভদ্দরনোকের ঝি, না বউ, হ্যাঁ?

: তবে আর ধম্মো-ধম্মো কাঁদছিস কেনে? ধম্মো কি ছোটলোকের লেগে?

: ছোট, বড়, ধম্মো সব্বারই লেগে রে বিমলি! এ কথাডো ভুলিস না, ধম্মো আছে বলেই দুখধান্দা করেও দুটো খেতে-পরতে পেচ্ছিস।

: ম্যালা ফকফাস না তো রাধে! গতর থাকলে প্যাটের ভাত মারে কেডা? কথায় বুলেছে না,—'ভাত দ্যায় কি ভাতারে? ভাত দ্যায় গতরে।' আজ তোর গতর যদি পড়ে যায়, ধম্মো আসবে কি তোকে ভাত-কাপড় দিতে?

: তোকে বোঝাতে নারি বিমলি, তোকে বোঝাতে নারি। দ্যাখ কেনে, মোর ঠাকুদ্দারে এ গাঁয়ে এনে বসিয়েছিল ওই ল-তরফের তখনকার ফুল-বাবু। রেষারেষি করে ছোট তরফের নেরদবাবু এনে বসালে ওই নিশে ধোপার কত্তাবাপকে। তিন পুরুষ মোদের কেটে গেল এ গাঁয়ে। কতাই তো পাল্টে গেল হালচাল, আজকাল ছোট-বড় সবাই কাপড় পেনে ধোপা-বাড়ি দিয়ে। কিন্তুক গাঁয়ের চোদ্দআনি লোক আমারে চায়, নিশে ধোপার প্যাটে ভাত নাই, চালে খড় নাই। বল দিকিনি, কেনে? ওই ধম্মো—সেদিনও তুই দেখেছিস, মুখুজ্জেদের গিন্নিমার শাড়ির খোঁটে পেলাম দু'-দুখান কড়কড়ে দশ টাকার নোট। ছুটে গিয়ে মুই দিয়ে এলাম—সেকি খুশি গিন্নিমা, মোরে দু' কুনকি চাল, এক আঁচল মুড়ি, ক্ষীরের মোয়া, এই সব দিলে খেতে। আর নিশে, কারও এক্তুন কিছু পেলে হয়, কবুল যাবে না কেটে ফেললেও।

: যা, যা, আর ভড়ং করিস না। নিশে ধোপার না হয় বড় নাকাল, আর তোরই না হয় রাজার হাল, কিন্তুক বাজার পাড়ার ওই কোমলা

পালের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখ ঠাকুন,—হেন দাব্য উআর দোকানে নাই, যার মধ্যে ভ্যাজাল পাবি না; হেন দুস্কম্মো নাই, যা উআরা বাপ-ব্যাটায় করে নি—জানে সব্বাই. কেউ কিছু কত্তে নারে—হেলথ্‌বাবু ধললে, দারোগাবাবু ধললে. কিন্তুক কোথা কি! উআরা দিব্যি যে দ্যাবতার যেমন পুজো দিয়ে বেরিয়ে এল ড্যাং ড্যাঙিয়ে। হালডা উআদের একবার দ্যাখ তো—তিনতলা চকমেলান কোঠা, জমিজিরেত. বাগানপুকুর, ব্যবসা-বাণিজ্য, মায় মোটরগাড়ি পর্যন্ত। কথা আছে-না,—ছিঁচকে চোরের গলায় দড়ি. বেহৎ চোরের জুড়ি-গাড়ি!

: তুই কি বলতে চাস বিমলি! তুই বেহৎ চোর হবি?

: ওসব মুই জানি না, মুই বলতে চাই সাফ কথা—এ হার মুই দিতে নারব, নারব, নারব। সে রাতডো মোর কিভাবে যে কাটলো. মুই বুঝাতে নারি দাঠাউর। কেবলই মনে হতে লাগল, এ কোন্ পাপ মোর ঘরে ঢুকলো. এ কোন্ দুর্মতি চাপলো মোর বিমলীর ঘাড়ে! বোধহয় স্বপন দেখে ঘুমের ঘোরে বিমলী একবার খলখলিয়ে হেসে উঠল. মোর মনে হল ঠিক কোন অপদেবতা ভর করেছে বিমলীকে, নইলে সদা মানুষ অধম্মো করতে চাইবে কেনে! পরের দিন বিহান থেকে ফের মুই সাধাসাধি করি—দে, বিমলি. দে, হারছড়াডা উআদের দিয়ে আসি।

এমত সময় নাওদরজায় বিশ্বেসবাড়ির কত্তামশায়ের গলা—'রাধে আছিস. রাধে-শ্যাম—, বাড়ি আছিস গো রাধে—'

বিমলী কলবলিয়ে উঠলে—'হেই রাধে, তোকে গড় করি, তো দুটি পায় ধরি, তুই কবুল করিস না; মোর মাথা খাস, তোর সাবির দিব্যি, কই কবুল যাস না। আর দ্যাখ. বাকা যদি মোর না লিস, মায়ে-ঝিয়ে মোরা ডুবে মরব কাজলা বিলের জলে. তোর সাধ্যি এসে ঠেকাতে নারবে..'

কত্তামশাই ততক্ষণে একেবারে বাড়ির মধ্যে এসে গিয়েছে. বিমলী গা-ঢাকা দিয়েছে ঘরের মধ্যে। আমি কি যে করি, সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কোন-রকমে একখান পিঁড়ি এগিয়ে দিই।

: আ আ আসেন, আইজ্ঞা। মোর কি ভাগ্য, এই বিহান বেলায় কত্তা-মশায়ের পা'র ধুলো পড়ল মোর কুঁড়েতে...

: থাক, থাক, পিঁড়ি লাগবে না। বড় ঝঞ্জাটে পড়ে আসতে হল রে। আমি চাচ্ছিলুম না আসতে, কিন্তু তোর কত্তামা বললে, দ্যাখো-না একবার গিয়ে, ভুলও তো মানুষের হয়।

: তা বে-বেপার কি আইজ্ঞা?

: হাঁরে, কাল যে সব কাপড়-চোপড় এনেছিস তার কোনটার আঁচলে বাঁধা একছড়া হার পেয়েছিস কি?

: আ—আপনি তো ভালই জানেন আইজ্ঞা...তা...ধরেন আইজ্ঞে, পেলে ঠিকই দিয়ে আ—আস...

: হাঁ, হাঁ, সে তো ঠিক কথা, নিশ্চয় তুই তক্ষণি দিয়ে আসতিস... আমি সেই কথাই তো তোর কত্তামাকে বোঝাচ্ছিলাম—রাধে ধোপা আমাদের তেমন লোকই না। সে পেলে সংগে সংগে ছুটে আসত—কতবার কতজনের টাকা-পয়সা, সোনাদানা ও পাওয়া-মাত্র ছুটে এসে দিয়ে গেছে...তা, বাছা, কিছু মনে করিস নে, জিজ্ঞেস একবার করতে হয়, তাই করা, নইলে তোকে তো আমি জানি, জানে গাঁ শুদ্ধ লোক...আচ্ছা :...যাই...দেখি.. ও ঠিক ওই মাহিনদার ছোঁড়াটারই কর্ম...যাই দেখি, পাঁচ ভরির ওপর ওজন, খাঁটী গিনি সোনা.. যাই...দেখি ..

কত্তামশাই চলে গেল। বুকখানাতে মোর কামারশালের চুল্লির মতন ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে লাগল—এ্যাতো যেখানে বিশ্বেস. সেখানে মুই বেইমানি কল্লাম! বিমলী. সাবি ডুবে মরত, মরত। কেনে মুই সত্যি কথাডা বললাম না, কেনে মুই কবুল গেলাম না .পাপ! পাপ! ফের মুই খোসামদি কত্তে লাগলাম. 'এখনও সময় আছে বিমলী. হারছড়াডা দে মুই গিয়ে বলবো—বিমলী রেখেছিল, কত্তা-মশাই, মুই জানতাম না।'

: হাঁ, তোর ভালমানুষি দেখা-বার লেগেই তো রেখেছি মুই।

: পুলিশ এসে সাচ্চো কললে যাবি কোথা তুই, শুনি? তখন হারও যাবে, আমারও ফাটক হবে।

: কেনে মোর ঘর সাচ্চো করবে, শুনি? সন্দো হলে তো? কত্তা-মশায়ের যেখানে সন্দো নাই, সেখানে মোর ডর কি? তবে হ্যাঁ, তুই নিজে দুষ্বল, তোর কাছে থাকলে মুই রাখতে নারব এ হার। সাবিরে লিয়ে মুই বাপের ঘর চলে যাব, দ্যাখ কেনে।

: তাই যা, বিমলি, তুই তাই যা, অধম্মো লিয়ে মুই ঘর কত্তে নারি। তুই নিজে হাতে কাপড়ের উপর ভালার দাগ দিস, দেখেছিস, সে দাগ খারভাটিতেও ওঠে না; ঠিক তেমনি মানষের রীতে যদি একবার অধম্মের ছড় লাগে, তা আর জেবনেও ওঠে না। হার যদি না ছাড়তে পারিস, বাপের বাড়িই তুই যা, আর আসিস না কক্ষণো।

: কী, এ্যামন কথাডা তুই বলতে পারলি! মোর থে, তোর সাবি থে, তোর ধম্মোডাই হল বেশি? বেশ, থাক তুই তোর ধম্মো লিয়ে, মুই বাপের বাড়িই যাব।

ভাঙা মন লিয়ে মুই গেলাম কাজলা বিলের ঘাটে, বিমলী সেদিন গেল না। ফিরে এসে দেখি, সত্যি সে চলে গিয়েছে সাবিরে লিয়ে। ঘরে কুলপ ঝুলছে। পাশের বাড়ির বাগদিবৌ ছোড়ানকাঠিডা দিয়ে বললে, চলে গিয়েছে সাবি, পথে সাঁঝ লাগবে বলে তোমার লেগে ঠারে নাই. ভাত রেঁধে রেখেছে, খাইবা বলে গেছে।

মনডা মোর হাহুতাশ করে উঠল—হায়রে বিটিছেলে!

তিন-তিনডে দিন কেটে গেল, বিমলী ফিরল না। বিশ্বেসবাড়ির কাপড়চোপড় দিতে গিয়েছি. দেখি, কত্তামশায়ের বড় ব্যাটা এসেছে ছুটিতে। বেপার শুনে তার সন্দো হয়েছে মাহিন-দার ছোঁড়াডার উপর—ছোঁড়াডাকে বেঁধে সে বেধড়ক ঠেঙাচ্ছে, 'বল, হারামজাদা, কোথায় রেখেছিস হার?' ছোঁড়াডা চীৎকার করে কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে আর আকুলি-বিকুলি করছে. "মোরে আর মের না. গো বড়বাবু. মুই করি নি ই-কাম .....মুই কবুল করি. কি বিড়ি খাবার লেগে বাজারের পয়সা থে দুই-একটা মুই সরাই......কিন্তুক ই-কাম মুই করি নাই ... মোরে ছেড়ে দাও, মুই মরে যাব..." উঃ পরাণডাতে কি যে মোর করতে লাগল. কি বলব, দাঠাউর. ... মনে হল, পিথিবিডা আঁধার হয়ে গিয়েছে ... পা'র তলার মাটি সরে সরে যেছে ... মাথাডা ভোঁ ভোঁ করছে ... মুই চীৎকার করে উঠলাম......"থামেন, থামেন বড়বাবু, উয়ারে ছেড়ে দ্যান, উআর কোন ঘাট নাই, উ নিদ্দোষ!" মোর চীৎকার শুনে কত্তামশায়. কত্তামা, বড়দাদাবাবু সবাই ছুটে এল। কত্তামশাই শুধোলে,

: কি রাধে, তোর আবার হোল কি?

: ছোঁড়াডারে ছেড়ে দ্যান কত্তা-মশাই, উআর কোন দোষ নাই।

বড়দাদাবাবু ধমকে উঠলে—'তুই জানলি কেমন করে? নিয়েছিস সে হার?'

: হুঁ, হুঁ, দাদাবাবু, মুই করেছি এ কাজ, এ মোরই পাপ!

কত্তামশায় বিশ্বেস কত্তে চায় না, 'কি সব বলছিস রাধে? সেদিন যে বললি, তুই পাস নি?'

মিছে কথা বলেছিলাম, চুরি করে মুই সামাল দিতে পারলাম না। বড়দাদাবাবু খেঁকিয়ে উঠলে, 'কেতাথ করেছ! এখন নিয়ে আয় সে হার, ব্যাটা হাড়বজ্জাত!'

ঃ হুঁ, আনব ... মোরে, মোরে কিছু সময় দ্যাও দাদাবাবু।

ঃ সময়, কিসের সময়? এক্ষুণি নিয়ে আয়, নয়তো পুলিশে দেবো। সব ব্যাটা চোর!

চোর আর বাটপারে ছেয়ে গেল সারা দেশটা!

কত্তামশায় বেটারে থামিয়ে বললে, 'ব্যাপার কি বল তো রাধে, হারছড়া সত্যিই কি তুই পেয়েছিলি? কী করেছিস সেটা, বেচে ফেলেছিস?'

ঃ ন্ নাঃ ... হু হুঁ, কত্তামশাই, মুই বে-বেচেই ফেলছি... মুই নিজজা মিথ্যে বললাম, দাঠাউর, এক পাপ বুঝি শতেক পাপ ডেকে আনে।! কেনে মুই বললাম মিছে কথা—বিমলীরে ... বিমলীরে বুঝি মুই সত্যিই ভালবাসতাম, দাঠাউর, তাই পাপ কবুল করার সাথে সাথে সে আভাগীর
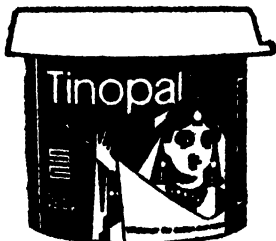
জিজ্ঞাসা মুখখান মোর চোখের সামনে ভেসে উঠল—'মোর মাথা খাস, কবুল যাস না' ... সব পাপ মোর নিজের ঘাড়ে চাপলাম, উআর ইজ্জৎ মুই পরাণে ধরে খোয়াতে পারলাম না দাদাঠাউর, মিথ্যে করে বুললাম—বেচে দিয়েছি, কেনে দিয়েছি তারও এত্তা মিথ্যে গপ্প বানিয়ে বুললেম! কত্তামশায় বুললে, 'ছি ছি রাধে, শেষে তুইও ... হা ভগবান, তা হলে কলির আর বাকী রইল কি!' উআর বেটা মুখ খিঁচিয়ে বুললে, 'অব যে ন্যাকামি করছিলি—সময় দ্যান? সময় দিলে আনবি কোত্থেকে শুনি? ব্যাটা ভণ্ড শয়তান!'

: অ্যাঁ? ... হুঁ হুঁ হার বোধ-করি মুই দিতে নারতাম ... মুই, মুই মল্লে দেতাম ...

: থাম, বুড়ো শালিক, মল্লে দেতাম! লবাবপুত্তুরের মত কথা! সারা জীবন পরের কাপড় কেচেও তুই পারবি সে হারের মূল্যে দিতে?

: নিচ্চয় পারব, দাদাবাবু, গুরুবল থা......

: ফের ভণ্ডামি? ব্যাটা পাকা ঘোরেল! চুরিদারি করে এখন গুরুবল দেখাচ্ছেন! ওসব কোন বুজরুকি আমি শুনতে চাই না—হয় হার, নয় ন্যায্য দাম তিন দিনের মধ্যে আমি চাই. না হলে, ফাটক।

হুঁ, দাঠাউর, ঠিক তিন দিনের দিনই মুই গেলাম ... ভর সন্ধ্যেবেলা, আঁধারে মুখ লুকিয়ে ... মন্দিরে মন্দিরে তখন আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে—কত্তামশায় খড়ম পায়ে পায়চারি করছে সদর দালানে ... চোরের মতনই মুই গিয়ে দাঁড়ালাম উঠোনে, বুক সমান উঁচু দালানটার গা ঘেঁষে। কত্তামশায় ভারী গলায় বুললেন,

: কে—? অ. রাধে? কিছু বলবি?

: হুঁ, কত্তামশাই. আমি। হার-ছড়াডো তো মুই দিতে নারলাম, আইজ্ঞা, মূল্য দিই সে ক্ষ্যামতাও মোর নাই। তা ক্ষ্যামা ঘেন্না করে যদি এই দলিলখানাডো রাখেন।

: দলিল আবার কিসের রে?

ঘর থেকে লণ্ঠনডো নিয়ে এসে কত্তামশায় খুলে দেখলেন দলিলখান, তারপর মোর মুখের পানে থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ,

: তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে রাধে? এ তুই কি করেছিস? ভিটেটুকুন বিক্রিকবালা করে দিয়েছিস, মায় রেজেস্টারী পর্যন্ত সারা! বৌ-ছেলে নিয়ে তুই দাঁড়াবি কোথা?

মোদের গলার আওয়াজ পেয়ে ভেতর দিকে থেকে বড়দাদাবাবু ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। বাপের হাত থে দলিলখান কেড়ে নিয়ে সে বুললে,

: ওর আর উপায়ই বা কি আছে, বাবা? তাছাড়া এমন একটা কুকর্ম করে এ গাঁয়ে ও আর টিকবেই বা কি করে? কে আর ভরসা করে ওর মত একটা চোরকে কাপড়-চোপর দেবে ধুতে? চোর-বদমায়েসের পাপ গাঁ থেকে যত দূর হয় ততই তো ভাল।

মুই সত্যি কই, দাঠাউর, লণ্ঠনের আলোতে মুই ইস্পষ্ট দেখলাম কত্তা-মশায়ের চোখ দুইখান রাঙা হয়ে উঠেছে। চোখের জল লুকোবার লেগে মুখ ফিরিয়ে ধরা গলায় তিনি বুললে,

: যা, যা, রাধে, তুই চলে যা। হার যদি তুই নিয়েই থাকিস, তার দাম তো ষোল আনার জায়গায় বিশ আনা তুই মিটিয়ে দিয়েছিস, তবে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকের গালাগাল শুনছিস কেন? আমি বুঝতে পারছি না, আসল ব্যাপারটা কি, কিন্তু যাবার সময় একটা কথা তুই শুনে যা—তুই নিজে মুখে বললেও এ বুড়ো বিশ্বাস করে না যে তুই চোর।

সেই রাতেই মুই বেরুলাম পথে—আজও বেরুলাম, কালও বেরুলাম—পথ বিনে আজ আর মোর কেউ নাই, কিছু নাই, দাঠাউর।

লোকটা থামল। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে—ওকে একটা অস্তিত্বের ছায়ামাত্র বলে মনে হচ্ছে—কাহিনী বোধহয় ওর শেষ হয়েছে—কিন্তু আমার চারদিকে তার সুর যেন এখনও রনরন করছে—জিজ্ঞেস করলাম,

: কিন্তু তোমার বউ-মেয়ের কাছে গেলে না? তাদের কোন খোঁজ-খবর করলে না?

: না, দাদাঠাউর, পরাণডা মোর সায় দিলে না। যে বাঁধন মোর আপনা থে টুটে গেল, তাতে আর ফিরে জড়াতে মোর পরাণ চাইলে না। গরীব ছোটনোকের ঘর—মোর কাছে থাকতেও বিমলীরে খেটেই খেতে হত, মুই না থাকলেও দুখ-মেহনত করে উআদের চলে যাবে—আটকে থাকবে না কিছুই। বিয়া করেছিলাম, তা মোর সম্বন্ধ খুইয়ে উআর ইজ্জৎ বাঁচিয়েছি—আর মোর কি দায়! কিন্তুক, উপারে একজন আছে, সে শুনবে কেনে?

বছর আটেক বাদ হঠাৎ একদিন পরাণডা মোর হু-হু করে উঠল সাবির লেগে—মুই অবাক মানলাম, মায়া যেন ক্ষয় রোগ, চাপা থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন ধাঁই ধাঁই করে ফুটে বেরয়। ভাবলাম, যাই, মেয়েডারে একবার চোখের দেখা দেখে আসি। দূরে থে চুরি চুরি করে একবার দেখে আসব ভেবে গেলাম শ্বশুরবাড়ির গাঁয়—ভয় হচ্ছিল, সাবির বোধহয় এদ্দিন বিয়া হয়ে গিয়েছে—ওখানে হয়ত দেখাই পাব না। তবু গেলাম।

উআদের বাড়ি পৌঁছতে সূর্যি তখন মাথার ওপর উঠেছে। দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখ, মাথায় বড় বড় রুক্ষু চুল, পরনে আলখাল্লা—মুই হাজির হলাম একবারে বাড়ির ভিতর। দেখি, খোড়ো ঘরের দাওয়ায় একডা মেয়ে বসে কাপড়ে ত্যালার দাগ কাটছে। কংকালসার দেহ, শরীরে যেন এক ফোঁটা রক্ত নাই, রং-চটা একডো কাঠের পুতুলের ধারা বসে রয়েছে। মুই গিয়ে দাঁড়াতে চোখ তুললে মেয়েডো—সে চোখে জিল্লা নাই—য্যান বাসি মড়ার চোখ দুইডা! এ কি মোর সাবি! মন মানতে চায় না, বুললাম—

: হরি ব-ল, দুইডা ভিক্ষা দিবি গো মা?

দুর্বল নির্জীব গলায় মেয়েডো এক্টু বিরক্তভাবেই বুললে,

: মুই উঠতে নারি।

: কেনে গো কন্যে?

: বাঁ পাখানডা মোর অসাড়।

: আর কোন মনিষ্যি নাই বাড়িতে?

না, উআরা ঘাটে গিয়েছে।

ভাল, মেয়ে, এ বাড়িতে বিমলী বুলে কেউ থাকে?

বুললাম তো, ঘাটে গিয়েছে।

সে তোর কেডা হয় গো?

মুই উআর শত্তুর, প্যাটের কাঁটা

তু ... তু ... তুই কি সাবি? সাবিত্তির?

হুঁ, নাম মোর উআই বটে।

ও কথা তুই কেনে বুললি সাবি, তুই উআর শত্তুর, প্যাটের কাঁটা?

বুলতে বুলতে দাওয়ায় উঠে মুই সাবির কাছ ঘেঁষে বসলাম। সে ফ্যাল ফ্যাল করে মোর মুখপানে চাইতে লাগল। সে ভয় পেয়েছিল কি না কে জানে। মাথাডা উআর বুকের 'পরে টেনে নিয়ে বুললাম,

: মোর মামণি রে, অমন কথাডো মোরে কেনে শুনালি?

: তুমি কেডা? মোরে ছেড়ে দ্যাও

ঃ তোর এমন দশা কেনে রে, সাবি, তোর কি কোন ব্যামো হয়েছে?

ঃ ব্যা—মো?

দাঠাউর, সাবি মোর ক্যামন এক রার হাসি হাসলে—বুকখানা মোর ং করে উঠল—কেনে হাসে মোর বি অমনধারা মরা মরা হাসি! একডা না নিশ্বাস ফেলে সে বললে,

ঃ ব্যামো? কাল ব্যামো মোর হয়েছে। দুদিন বাদ যাব মুই যমের ঘর।

ঃ ষাট, ষাট, অমন কথা কি বলতে আছে রে, মামণি? কেনে, তোর দুঃখু কিসের, মা, বিমলী কি তোরে ভালবাসে না?

ঃ হুঁ—, এখন বাসে, ব্যামো হওয়ার পরে থে ভালবাসে, আর কাঁদে।

ঃ ওর আগে ভালবাসত না?

ঃ না, খিসমিস কর‍্যে-খেতে দিত না, প্যাট পুরে—নোকটার কথা-মতন চলতো। নোকটা যখন-তখন নেশা-ভাং করে এসে মোরে মারত বিনিদোষে, বলত, দূর হয়ে যা আপদ জঞ্জাল—উ কিছুটি রা কত্ত না।

ঃ কোন্ লোকটা তোকে মারত?

ঃ উই তো, যাকে মোরে বাপ বলতে কয়; মুই বলতে নারি, কেনে, বলব কেনে? উ তো মোর বাপ লয়।

ঃ সে তোকে মারত, আর বিমলী কিছু বলত না?

ঃ না, কিচ্ছু বলত না। শ্যাষে একদিন মা-বিটি গিয়েছে দুকান কত্তে, নোকডো তাড়ির নেশায় বুঁদ হয়ে এসে মোরে বেধরক মাল্লে—একখানা চেলা কাঠ দিয়ে এমন এক ঘা বসালে এই বাঁ-পা'র গোছডাতে, মুই দাওয়া থে ছাঁচতলায় পড়ে গেলাম—কাটা পাঁঠার মতন পড়ে পড়ে ছটফট কত্তে নাগলাম। মাবিটি এসে মোর দশা দেখে খুব কাঁদলে, মোর বাপের নাম করে খুব শাপ-মন্নি কল্লে, নোকডারেও গাল-মন্দ করলে—নোকডা তাতে খামুটি কত্তে নাগল, বিটিরে তোর নিকেশ করে দেব একবারে। তা, নিকেশ উ ওই এক ঘায়েই করেছিল। পা'খান মোর ফুলে ঢোল হয়ে উঠল। সে কি টাটানি—রাতে ঘুমুতে নারি; চৌপুর রাত খালি গোঙাই। নোকডা বল্লে, আপদডারে বাইরে ফেলে দূরে আয়, উআর [illegible]

ঃ মা-বিটি জড়ি-বুটি, মালিশ-পুলটিশ কতো কি কল্লে। শ্যাষে শুকোতে নাগল—ফুলো শুকোতে শুকোতে পা শুদ্ধ শুকোতে নাগল—সেই থেকে হাঁটতে মুই একবারও পারি নাই, আর দ্যাখো কেনে কি হাল হয়েচে মোর পা'খানডার।

এই বলে চাপা সরিয়ে পা'খান মোরে দেখালে। সে কি পা! কি বলব দাঠাউর, এই বাঁশের টয়লার মতন লিকলিকে, ঝিলপোড়া কাঠের মতন কালো তার রং! মুই আঁৎকে উঠলাম। সাবিরে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

ঃ সাবি রে, মুই তোর হতভাগা বাপ। বাবা বলে একবার ডাক মামণি রে।

ঃ তুই যদি মোর বাপ, এ্যাদ্দিন আসিস নাই কেনে?

ঝর ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে আরও বললে,

ঃ আজ যখন মোর যমের ডাক এসেছে, তখন এসেছিস সোআগ দেখাতে!

ঃ ষাট ষাট, মানুষের একখান পা গেলে সে কি আর বাঁচে না মামণি?

ঃ তা লয়, মোর পা'খানডার এই দশা দেখে পাড়ার নোক বললে, সদর হাসপাতালে লিয়ে যেতে। তাই কি সোজা? মা-বিটিকে চেয়ে-চিন্তে, ভিক্ষে-সিক্ষে করে যোগার কত্তে হ'ল ডুলির পয়সা...

ঃ কেনে, এ অবস্থায়ও গলার হারছড়া বেচতে পারলে না?

ঃ সোনার হারছড়াডোর কথা বলছো? আ, পোড়া কপাল,—সে কি আর ওই মিনসে রেখেছিল? এন্তুন এন্তুন করে কেটে লিতে লিতে—তাড়ি আর জুয়োর পেছনে সব ফাঁক করে দিয়েচে—সে ক-বে শ্যাষ হয়ে গিয়েচে! পেথম পেথম মা-বিটি বাধা দিতে গিয়েছিল, তাতে ওই যমের দূতডো মাকে ধরে ধরে মারত! ও কি কম!

ঃ হায়রে পাপ, হায়রে অধম্মো! তা সদর হাসপাতালে গিয়ে কি হল?

ঃ সেখানে দু' হপ্তা মোরে রেখেছিল। জানো বাবা, কি সুন্দর সে জায়গা, মা'র জন্যে যা এন্তু মন খারাপ কত্তো, নইলে বড় সুখে ছিলাম। সব থে ভাল লাগত—সংসারে এমন জায়গাও আছে, যেখানে ওই দুষমনডোর ছ্যাঁ পড়ে না!

হাঁসপাতালে উআরা কত্তো কি কল্লে- ছবি তুললে, রক্ত লিলে, মাস লিলে, আরও কতো সব কি—কিন্তুক হল না কিছুই। ডাকতোর-বাবুরা মাকে বললে, 'এখানে কিছুই আর হবে না, পা যখন ভেঙেছিল তখন কি ঘুমোচ্ছিলে? সব শেষ করে এখন এনেছো। কলকাতা ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার দেখতে পারো—কিন্তু থাক,' বলে ডাক্তারবাবু একডো ভারী নিশ্বাস ফেললে। মুই, মুই আর বাঁচবো না বাবা।

মুই উআর মুখে হাত চেপে ধরলাম, চোখ মুছালাম, বুকে মাথা চেপে লিয়ে বললাম,

ঃ ক'টা দিন তুই শক্ত হয়ে থাক মামণি, ফাঁকি দিয়ে পালাস না। মুই সাত দিনের মধ্যে টাকা-পয়সা যোগার করে লিয়ে আসব, তোকে কলকাতা লিয়ে যাব। স-ব ব্যামো তোর সেরে যাবে।

সাত দিনের মধ্যে মুই যেতে পারি নাই, দাদাঠাউর, টাকা-পয়সা যোগার করে যেতে মোর তের-চোদ্দ দিন হয়ে গেছিল। সেখানে গিয়ে আর তারে দেখতে পাই নাই—বাপের উপর অভিমান করে সাবি মোর তখন চলে গিয়েছে, যেখানে তার হতভাগা বাপের কান্না গিয়ে পেঁছিতে নারে......। দূরে থে খালি শুনলাম বিমলীর বুকফাটা রোদন—ওরে সাবি মা আমার রে... মোর পাপ সাপ হইয়া তোরে খাইল রে ... তোর বাপ বলত, কলংকের দাগ ভ্যালার দাগের চাইতে ভীষণ রে ... সেই কলংক মোর আজ তোরে কোথা পাঠাইলো রে মা ...

লোকটা কখন যে উঠে গেছে আমি টের পাই নি। তখনও আমার কানে বাজছে সন্তানহারা এক জননীর ব্যাকুল রোদন—তারও চেয়ে বেশি করে বাজছে এক ক্ষত-বিক্ষত পিতৃহৃদয়ের তীব্র অনুশোচনার করুণ বিলাপ ... সম্বিৎ যখন ফিরল, ওই পথ-সম্বল মনে-প্রাণে দেউলে লোকটা অনেক দূরে চলে গেছে—কোন্ দিকে কে জানে—ঘন তমিস্রায় ও হারিয়ে গেছে—দূর থেকে ভেসে আসছে ওর কণ্ঠের সেই গান—ওর ভাষায় 'বুকভাঙা রোদন'—

'ও তুই পরের কাপড় কত্তে ঠাওর
নিত্য ভ্যালার আঁচড় দিলি,
শ্যাষে আপন রীতে আচম্বিতে
কলংকেরি ছড় লাগালি।
এখন হাতে-মুখে মেখে কালি
কান্দিস অকারণ
ভোলা মন রে আমার—'

ভগবান পরশুরাম

ভারতীয় চলচ্চিত্রে পৌরাণিক কাহিনী-চিত্রের স্থান খুবই ব্যাপক। আগে সাদা-কালোয় ছবি হতো, এখন কারিগরী-বুদ্ধির বিকাশে এবং রঙের ব্যবহারে অলৌকিক ঘটনাবলী আরো আশ্চর্যভাবে দেখান হয়। মেওয়ার ফিল্মসের 'ভগবান পরশুরাম' ছবিতে বিষ্ণুর পরশুরামরূপে ঋষি জমদগ্নির ঘরে জন্মলাভ এবং তাঁর শাস্ত্র ও অলৌকিক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। যাঁরা এ ধরনের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী তাঁদের কাছে এই ছবির একটা আবেদন আছে। পরশুরামের বীর্য-বত্তার সঙ্গে অত্যাচারী শতবাহুর কন্যা গান্ধারীর প্রেমের উপাখ্যানও এতে রয়েছে। ক্রুদ্ধ ঋষির আচরণ এবং পিতা কর্তৃক পুত্র হত্যা, পুত্র কর্তৃক মাতৃ নিধন ইত্যাদি আজকালকার মানুষের কাছে বিশ্বাস্য যদিও নয়, যদিও ধর্মের সঙ্গে এসব ঘটনা গ্রহণ করাও যায় না, তবে ক্যামেরার কেরামতি, সম্পাদনার বাহাদুরীতে ঘটনা-গুলি দর্শকরা দেখেন। দর্শকদের দিকে চেয়ে নাচ গানের ব্যবস্থাও ছবিতে রয়েছে। নাচের গঠন এবং গানের সুর উপভোগ্য। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অভি ভট্টাচার্য, শশী কাপুর, সুলোচনা, নিরঞ্জন শর্মা, ত্রিলোক কাপুর প্রমুখ। ছবিতে জনতার দৃশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

দি ড্যামড

লুকিনো ভিসকন্টির ছবি 'দি ড্যামড' নিউ এম্পায়ার সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। এই ছবিটি ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভ করেছে। ছবিটির পুরস্কারপ্রাপ্তি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে একটি অস্বাভাবিক যৌনদৃশ্য ছিল এই বিতর্কের বিষয়। বর্তমানে সেই দৃশ্যটি সম্পাদনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভিসকন্টির অন্যান্য ছবির তুলনায় দি ড্যামড' সাধারণমানের ছবি।

১৯৩৩ সালে হিটলার যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন কিভাবে নিজেরা পার্লামেন্ট বাড়িতে আগুন দিয়ে কমিউনিস্টদের ওপর মিথ্যা দোষ চাপিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং একটি ইস্পাত কারখানাকে অস্ত্র তৈরির কারখানায় পরিণত করবার জন্য ফ্যাসিজমের অশুভ শক্তির ছায়ায় চক্রান্ত করেছিল তারই কাহিনী নিয়ে এই ছবি। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা যতই কমিউনিস্ট বিদ্বেষে অন্ধ থাকুক, ফ্যাসিজম যে কাউকে রেহাই দেয় না এবং চরমমূল্য দিতে বাধ্য করে, কাহিনীতে সে কথা অনুভব করা যায়। যদিও পরিচালক স্পষ্টভাবে বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন নি, কারণ ছবিটি আমেরিকা ও ইতালীর যুক্ত প্রযোজনায়, তথাপি ফ্যাসিজমের চেহারা এতে স্পষ্ট। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিখ্যাত বৃটিশ অভিনেতা ডিক বোগার্ড ও সুইডিস অভিনেত্রী ইনগ্রিড থুলিন।

সদ্যমুক্ত 'আদমী আউর ইন্সান' ছবির প্রধান চরিত্রে শায়রাবানু

সংবাদ-কণা

নজরুল আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা

"বলাকা" আয়োজিত সারা বাংলা নজরুল আবৃত্তি ও সংগীত প্রতি-যোগিতা আগামী ৭ই ও ৮ই জুন '৭০ মহাজাতি সদনের "সেমিনার হলে" অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বিস্তারিত বিবরণের জন্য সাধারণ সম্পাদক, বলাকা। ১৫নং রামকৃষ্ণ বাগচী লেন, কলিঃ—৬-এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অধ্যাপক ই দজিগানঃ

মস্কোর চলচ্চিত্রশিল্প ইনস্টিটিউট-এর

সাল থেকে তিনি চিত্র-পরিচালকের কাজ করছেন। তাঁর রূপালী চলচ্চিত্রটির নাম "উই আর ফ্রম ক্রনস্টাড" একটি বিপ্লবী মহাচিত্র। তিনি সবসুদ্ধ ৩০টিরও বেশি ছবি তুলেছেন। ভারতবর্ষে তাঁর যে ছবি সর্বশেষ দেখানো হয়েছে তার নাম "আয়রন ফ্লাড"। এই ছবিটি সেরাফিমোভিচের বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ।

কলকাতায় সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল

তিনজন সদস্য-বিশিষ্ট এক সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজক অধ্যাপক এফিম দ্‌জিগান। ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী অনুযায়ী দিল্লীতে এখন যে সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব চলেছে, সেই সূত্রে সোভিয়েত প্রতিনিধি দল ভারত সফর করছেন। দিল্লীর পর এই উৎসবের ছবিগুলি বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, সিমলা ও কলকাতায় প্রদর্শিত হবে।

প্রতিনিধি দলে রয়েছেন আরও দুজন অভিনেত্রী—শ্রীমতী রাইসা এসপোভা (শ্রীযুক্তা দ্‌জিগান) ও শ্রীমতী নিনা গ্রেবেশকোভা।

শ্রীমতী রাইসা ডি এসিপোভা :

(শ্রীমতী দ্‌জিগান), চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। ১৯২৫ সাল থেকে তিনি অভিনয় করছেন এবং ২৯টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। যে সব ছবিতে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তাদের নাম হ'ল : "উওম্যান", "লাভ", "উই আর ফ্রম ক্রনস্টাড" এবং "ফার্স্ট ক্যাভালরি আর্মি" এবং তাঁর মতে এগুলোই তাঁর সবচেয়ে ভালো ছবি। তিনি এখন ছোট গল্প লিখছেন। শীগ্‌গির তাঁর একটি ছোট গল্পের সংকলন বেরুবে।

শ্রীমতী নিনা পি গ্রেবেশকোভা :

তিনি ১৯৫৪ সালে চলচ্চিত্রশিল্প ইনস্টিট্যুট থেকে স্নাতক হয়েছেন, কিন্তু ১৯৪৯ থেকে তাঁর অভিনেত্রী জীবন সুরু হয়। তিনি ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৫৩ সালে "অনার অফ কমরেড" ছবিতে তিনি একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণা হন। তিনি সবসুদ্ধ ৩০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর সর্বশেষ ছবির নাম "ডায়মণ্ড হ্যাণ্ড" একটি মিলনাত্মক চিত্র। এই ছবিটি কলকাতায় রুশ চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে। তিনি শিশু শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করতে খুব ভালবাসেন।

'দি ড্যামড' ছবির একটি দৃশ্যে ইনগ্রিড থুলিন ও হেলমুট বার্গার

লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে উত্তর কলকাতার মিলনচক্রে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একটি প্রদর্শনী গত ২২শে ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭০ ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনায় যোগ দেন সর্বশ্রী কল্যাণ রায়, অধ্যাপক কমলেন্দু ঘোষ ও কুসুম রায় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুল ও সুকান্ত অবলম্বনে "বিচিত্রা" গীতি-আলেখ্যটি গীতিমাল্য সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দবর্ধন করেন। সঙ্গীত নির্বাচনে রুচির পরিচয় ও নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেলেও সংস্থার শিল্পীদের আরও অনুশীলনের প্রয়োজন। এ ছাড়াও 'শরৎকী' গণসংস্কৃতি সংস্থা মঞ্চস্থ করেন 'সমাধান' নাটকটি। চলচ্চিত্র 'অক্টোবর', গণসঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানের

অপর্ণা রায় ও প্রিয়রঞ্জিত প্রিয়া ফিল্মের "প্রতিদ্বন্দ্বী" ছবিতে ধৃতিমান

খেলাধুলা

পিছু ফিরে চাই

একটা বছর পার করে আবার ঘুরে এলো সেই দিন। রক্তরাঙা কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলো এখন লালে লাল। কালবৈশাখী রুদ্র রোষে এখনো আকাশ-বাতাস মুখর হয় নি। কিন্তু চৈত্রের শেষে বৈশাখের আগমন বার্তা অনেকদিন আগেই দিকে দিকে গিয়েছে রটে। এসেছে বৈশাখ—দিয়েছে ডাক, পঁচিশে বৈশাখ—কবিগুরুর জন্মদিন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, খেলাধুলার সংগে বিশ্বকবির কি সম্পর্ক! কিন্তু আমরা তো জানি যে, রবীন্দ্রনাথের চোখে খেলাধুলো এবং তার আদর্শ ছিল অনেক উঁচুতে। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ খেলাধুলায় ডুবে থাকার সুযোগ খুব একটা পান নি। কিন্তু খেলাধুলার রস তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রমাণ আমরা একাধিকবার পেয়েছি। 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় ফুটবল খেলোয়াড়ের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তার সংগে এতোটুকুও পার্থক্য নেই একশ' বছরেরও বেশি পরের আজকে আধুনিক ফুটবল খেলোয়াড়দের মনোভাবের। ফুটবল খেলা এবং খেলোয়াড়দের তিনি ভালোবাসতেন—তাই অতো সহজেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন ফুটবল খেলোয়াড়দের চিরন্তন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি। তাই কবিগুরুর সময় থেকে আজো শান্তিনিকেতনে ফুটবল খেলার ধারা শুধু অব্যাহতই নেই—আজো ফুটবল খেলা সেখানে সবার প্রিয়। ফুটবলের পরেই আসতে হয় সাঁতারের কথায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাঁতার কাটতে বড় ভালোবাসতেন। বর্ষার টইটম্বুর পদ্মায় তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটার কথা তো সকলেরই জানা। সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষকে তিনি নিজে যেভাবে অনু-প্রাণিত করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। শরীর গঠনের দিকে নজর দিয়ে কুস্তিকেও তিনি দিয়েছিলেন অগ্রাধিকার শান্তিনিকেতনে তাই প্রথম দিকেই তিনি বিদেশ থেকে আনিয়েছিলেন ক্রীড়াবিদদের।

ওকথা থাক। তবে এ কথাও ঠিক যে, মানুষের জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব যে অপরিসীম আর খেলাধুলার আদর্শ যে মানুষকে কতোদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারে সে কথা কবিগুরু ভালোভাবেই জানতেন। কবিগুরুর চোখে খেলাধুলার যে স্থান ছিল আজ আর তা নেই। খেলাধুলার মান এমন কি খেলোয়াড়দের মনও এখন আর সেদিনকার মতে নেই। তাই পঁচিশে বৈশাখের শুভদিনে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের খেলাধুলোকে কবিগুরুর মতো আদর্শের চোখে দেখার জন্যে আহ্বান জানাই খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, দর্শক এবং ক্রীড়ারসিকদের।

—শান্তিপ্রিয়

ডেভিস কাপ

এ লেখা যখন লিখছি তখনো ব্যাঙ্গালোরে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার খেলা শুরু হয় নি আর এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততোদিনে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা পুরোপুরিভাবে শেষ হয়ে গেছে।

তাই এই খেলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু

॥ জয়দীপ ॥
ভারতের সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করছে এঁর ওপর।

বলতে যাওয়া সমীচীন নয়, অথচ ঐ খেলা সম্বন্ধে একেবারে চুপচাপ থাকাও কোন মতেই সম্ভব নয়। কারণ আজ শুধু বাংলা দেশ কিম্বা ভারতবর্ষই নয়—সমস্ত পৃথিবীর নজর বাঙ্গা-
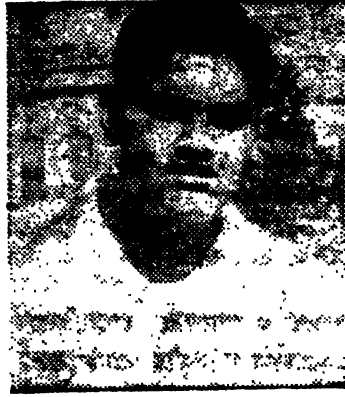
॥ কৃষ্ণান ॥
ভারতীয় দলের অধিনায়ক

লোরের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ খেলার ওপরে।

কারণ ঐ খেলার ফলাফলের ওপরই নির্ভর করছে টেনিস জগতে দুটি দেশের মান-সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তির বিষয়। ডেভিস কাপের এশীয়ান অঞ্চলের খেলায় অস্ট্রেলিয়া এ বছরই প্রথম খেলছে। তাই চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ ভারতের কাছেও। তাই অনেকদিন বাদে রমানাথন কৃষ্ণান আবার ফিরে এসেছেন ভারতীয় দলে। সিঙ্গলস কিম্বা ডাবলস যেখানেই তিনি খেলুন না কেন—কৃষ্ণানের যোগদানে ভারতীয় দল নিঃসন্দেহে হয়ে উঠেছে অনেক বেশি শক্তিশালী।

তবে কৃষ্ণান এখন আর আগের মতো সহজভাবে খেলতে পারেন না। তাঁর পিঠের ব্যথার জন্যে তিনি সব সময়ই সাবধানে থাকেন।

কিন্তু কৃষ্ণান দলে থাকায় আমাদের জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিৎ লালের মনোবল অনেক বৃদ্ধি পাবেই। তা ছাড়া ডাবলস-এর খেলায় কৃষ্ণান আর জয়দীপ যদি প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে হয়তো খেলার

॥ প্রেমজিৎ ॥
ভারতকে জিততে হলে প্রেমজিৎকে ভালো খেলতেই হবে।

এবং খেলার মাঠের চেহারাই বদলে যেতে পারে পুরোপুরিভাবে।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্যাঙ্গালোরে ভারতের বিরুদ্ধে যাঁরা খেললেন

প্রশ্ন-উত্তর

অশোককুমার ঘোষ (শিবনিবাস, কৃষ্ণপুর, নদীয়া)

উত্তর : আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলোঃ—

"গত চল্লিশ সংখ্যায় 'আমার মতে' বিভাগে দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যের নিবন্ধের বিপরীতে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলেছেন, দেশে ভালো খেলোয়াড় না খুঁজে মোহনবাগান ক্লাব বিদেশ থেকে হকি খেলোয়াড় আমদানী করেছে। কিন্তু একটি কথা থেকে যায়, মালয়েশিয়ার অলিম্পিক খেলোয়াড় এস জিভাকে মোহনবাগান মালয়েশিয়া থেকে আনে নি। যতদূর জানি, জিভা ভারতে বৈমানিক-শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছেন ও অল্পদিন মাত্র থাকবেন (৯ মাস হয়তো)। সেই সুযোগে তিনি হকি খেলছেন।

অরুণকুমার ধর (অশোকনগর)

প্রশ্ন : ১৯৬১-৬২ সালে কোন্ দল ভারত সফরে এসেছিল? সেই দলের অধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তর : ১৯৬১-৬২ সালে ভারত ভ্রমণে এসেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। আলেকজাণ্ডার ছিলেন সেই দলের অধিনায়ক।

সুভাষরঞ্জন দত্ত (ট্রাম্পুলার কলোনী, পাণ্ডু, গৌহাটি-১২)

উত্তর : আপনি কিন্তু একটু ভুল করেছেন। আমি কোন মতেই পাতৌদির গোঁড়া সমর্থক নই। আপনার খেয়াল আছে কিনা জানি নে—সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় আমি নিজে পাতৌদির বিরুদ্ধে এমন সব কথা লিখেছিলাম যা আর কেউ লেখেন নি।

পঞ্চানন রায়, গোরাচাঁদ বসু, সোমনাথ সমাদ্দার, পঙ্কজ মুখার্জী, ভাস্কর ভট্টাচার্য, হরিনাথ মুখোটী (নেতাজী কলোনী, বরাহনগর)

প্রশ্ন : মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দল কতবার বাইটন কাপ জয়ী হয়েছে এবং কোন কোন সালে?

উত্তর : মোহনবাগান—১৯৬৯, ১৯৬৮, ১৯৬৫ (কাস্টমসের সংগে যুগ্ম), '৬৪ (ইস্টবেঙ্গলের সংগে যুগ্ম), '৬০, '৫৮ ও ১৯৫২ সালে।

ইস্টবেঙ্গল — ১৯৬৭, ১৯৬৪ (মোহনবাগানের সংগে যুগ্ম), ১৯৬২, ১৯৫৭।

সিদ্ধার্থ ও সোমদত্ত (পুরুলিয়া)

প্রশ্ন : বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার এবং স্পিন বোলার কে কে?

উত্তর : শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার হিসেবে এখনো বোধহয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হলের নামই করতে হবে।

ভারতের প্রসন্নকে শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার হিসেবে দেশ-বিদেশের অনেকেই অভিহিত করে থাকেন।

দিলীপকুমার দত্ত (মালুগ্রাম, কাছার, শিলচর-২)

উত্তর : কন্‌ট্রাক্ট ব্রিজের বই-এর জন্যে আপনি দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২ কিম্বা রূপা, এ্যালবার্ট হল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২ অথবা পত্রিকা সিণ্ডিকেট, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন। তা ছাড়া বড় রেল স্টেশনে হুইলারের স্টলে এই বইটা পাওয়া যাবে।

গল্প হলেও সত্যি

রাজার খেলা ক্রিকেট।

ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং-এর কৃতিত্বকে অনেকেই বেশী কৃতিত্ব মনে করেন, কিন্তু বোলিং-এও অনেকেই অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আজ বোলিং-এর কৃতিত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলো।

আজ থেকে অনেক দিনের আগের ঘটনা। ১৮৮৮-৮৯ সালের কথা। কেপটাউনে ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার একটি টেস্ট খেলায় একজন কৃতি বোলার ফিল্ডারের সাহায্য ছাড়া একাই ১৫টি উইকেট দখল করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি ১৪ জনকে বোল্ড ও একজনকে এল বি ডবলিউ করে আউট করেন। ইনি হলেন ইংলণ্ডের জে ব্রিগস।

একটি ম্যাচে ফিল্ডারের সাহায্য ব্যতীত ১৫টি উইকেট দখল করার কৃতিত্ব টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে আর দ্বিতীয়টি নেই।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র
সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি।

[২৮৭৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তবে সব চেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে এখন ভালো খেলে, জান লড়িয়ে খেলে প্রথমে একটু এগিয়ে যাওয়া। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতো তীব্র হয়ে উঠবে, জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা যতো বেশি প্রকট হয়ে উঠবে, স্নায়ুর ওপর চাপ তখন ততো বেশি করে পড়বে।

তবে আমাদের খেলোয়াড়রা—কি কৃষ্ণান, কি প্রেমজিৎ, কি জয়দীপ—সকলেই অভিজ্ঞ, দেশ-বিদেশের মাঠে নামকরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলার অভ্যাস থাকায় স্নায়ুর চাপ সহ্য করার মতো মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের আছে। তাই আশা করা যায় যে, যদি দরকার হয় তাহলে তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে সমর্থ হবেন।

অস্ট্রেলিয়া দলের ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন ভারতের মাটিতে পা দেবার পর থেকেই ক্রমান্বয়ে তাঁদের দলের নির্ঘাত জয়লাভের নিশ্চয়তার কথা ঘোষণা করে চলেছেন। আমরা জানি, এ ঘোষণা শুধু তাঁর দলের খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়ানোর জন্যেই। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কদের এ এক পুরনো পন্থা। শুধু টেনিস নয়—সব খেলাতেই তাঁরা এই পথ অনুসরণ করেন। গত ক্রিকেট মরশুমে বিল লরীর হম্বিতম্বির কথা আমরা ভুলি নি। তাই আজ মনে আবার ভরসা জাগছে।

বলা তো যায় না—ভারতীয় খেলোয়াড়রা হয়তো অকল্পনীয় কিছু করে বসবেন। কিন্তু এ লেখা যখন আপনারা পড়বেন তখন সবই শেষ। সুতরাং অলমিতি...।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৪৬শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : [illegible] Paise
বৃহস্পতিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ | Thrusday, [illegible], 1970,

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে আজ অত্যন্ত দুর্দিন। চারিদিকে নৈরাজ্যের কালো ছায়া দর্শনে এই রাজ্যের হৃদস্পন্দন শুরু হয়েছে। এখানের ক্ষোভ বা বিক্ষোভ এখন অহিংস নয়, যেন রক্তের স্বাদ মেটাবার জন্য শুরু হয়েছে পৈশাচিক নৃত্য।

অহিংসার শ্রেষ্ঠ পূজারী মহাত্মা গান্ধীরও এখন রেহাই নেই। তিনি সশরীরে এই সংকট মুহূর্তে বেঁচে থাকলে মানুষের বাঁচার পথ কিভাবে নির্দেশ করতেন, সেকথা ভেবে আর লাভ নেই। মহাত্মাজীর শিষ্যরাও নীরব। কিছুটা সরব হয়েছেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তাঁদের পক্ষ থেকে বিবৃতি দান করা ছাড়া বোধ হয় অন্য পথ নেই এবং গান্ধীজীর মূর্তি যারা অবিকৃত রাখছে না, তারা সেই বিবৃতির কোনো রকম মূল্য দিয়েছে কি না তা অনুমান করা কঠিন। কারণ বিবৃতি দান ছাড়া যেখানে অন্য পথ নেই, সেখানে একা পুলিশ বাহিনীর পক্ষে গান্ধীজীর মূর্তি অবিকৃত রাখা যে সম্ভব হচ্ছে না, পরবর্তী ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ দেবে।

স্বয়ং মহাত্মাজীর দশা যখন ঐ রকম, তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা কী, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিছুকাল আগে জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী কৌতুক করে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বোমা-পটকা এখন কুটিরশিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ শিল্পটির জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের ঘরে-বাইরে শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। সামান্য ছুতোয় মুহুর্মুহু বোমাবাজি যে কেউ এখন পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাবেন। এখানের এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম, পড়াশ[illegible] [illegible]গুলিতে ছুটি শুধু প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার অজুহাতে বোমাবাজি হয় না, রাজনৈতিক মতান্তরের দরুণ কলেজে কলেজে প্রত্যহ হাঙ্গামা লেগেই আছে। ঐ দশা চলতে থাকলে এ রাজ্যের বিদ্যাচর্চা স্থগিত রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই শুধু যে অশান্তি ও উৎপাত, তাও ঠিক নয়। যে কলকাতার প্রসিদ্ধি ছিল মিছিলের জন্য, এখন সে রকম মিছিল বের করাও দুরূহ কাজ। কেন না কোন্‌দিক থেকে কোন্ মুহূর্তে বিপদ ঘনিয়ে আসবে, তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বর্তমানে আর একটি নতুন ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে এই রাজ্যে। রাজনৈতিক মতামতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত এ রাজ্যের রাজনৈতিক সভাস্থলে কদাচিৎ হাঙ্গামা ঘটেছে। এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছে, কে কোন্ দলের সভা পণ্ড করতে পারে। শুরু হয় হরতালের ডাক দিয়ে, শেষ হয় শহীদের শোকযাত্রার মিছিলে যোগদান নিয়ে। শোকযাত্রার মিছিলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরিবর্তে এখন হয় রীতিমত বোমাবর্ষণ।

মহাত্মাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ আমাদের দেশ। এই দেশ এখন কোন্ পথে চলেছে, এই প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। তবে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়; তাই একশ্রেণীর লোক যদি মনে করে তাদের ইচ্ছা বোমার আঘাতে ও পিস্তলের গুলীতে পূর্ণতা লাভ করবে, তাহলে আমরা বলব, আপনারা যদি জনতার হিতার্থেই ঐ পথ অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে জনতাকে প্রশ্ন করুন, তারা কি আপনাদের পথের বস্তুত কে কার সমর্থক, তাও বুদ্ধি দিয়ে বোঝা মুস্কিল।

গান্ধীজীর মূর্তি বিকৃত করা হচ্ছে, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, আমরা ঐ সব কাজের ঘোরতর বিরোধী। এবং এ কথা বলা উচিত মনে করি যে, মূর্তি বিকৃত করে ও বই পুড়িয়ে বিপ্লব হয় না। কিন্তু প্রসঙ্গত একথাও ঠিক যে, গান্ধীজীর মূর্তি অবিকৃত করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে যে নমুনা প্রদর্শন করা হচ্ছে, তাও কল্পনাতীত। সম্প্রতি কলকাতার পৌরভবনে ঐ কারণে হাঙ্গামা ঘটেছে, মেয়রের মাথা ফাটানো হয়েছে।

সুতরাং জনসাধারণ এখন কার ওপর ভরসা রাখবে? রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর বিবদমান, প্রশাসনেও অস্থিরতা, পুলিশ মহল আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে যে ধরনের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব দেখাচ্ছেন, তা জনসাধারণকে কোন আশার পথ দেখাতে পারে নি।

এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্বই বোধ হয় সর্বাধিক। রাজনৈতিক দলগুলি যদি মনে করেন যে, তাঁরা সকলেই জনতার কল্যাণ কামনা করেন, তাহলে এখনও একযোগে তাঁদের উচিত একটি বৈঠকে বসে পশ্চিমবঙ্গকে বর্তমান সংকটের অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তোলা। জানি না, রাজনৈতিক দলগুলি এ কথায় কর্ণপাত করবেন কি না?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

দুঃখে চোখ জুড়োলো—আমেরিকা একটা সত্যিকারের গণতন্ত্রের দেশ। মার্কিন সরকার গণতন্ত্রের মর্যাদা সত্যিই রাখেন। তা যদি না হতো, ওয়াল্টার হিকেল আজো কারাগারের বাইরে থাকতে পারতেন কি না সন্দেহ। অ্যান্টনি মফেট হয়তো পদত্যাগ করেই নিষ্কৃতি পেতেন না, বরং পদত্যাগের কারণে তাঁকে কারাভোগ করতে হতো।......নিক্সন সরকারের আভ্যন্তরীণ বিষয়ক সচিব ওয়াল্টার জে হিকেল। কর্তা যা বলেন বা যা ভাবেন, তাঁর সচিবের চোখ-কান বুজে কোমর বেঁধে তাই কাজে পরিণত করারই কথা। কিন্তু হিকেলকে দেখা গেল উল্টো সুরে গাইতে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন কম্বোডিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপ এবং এ বিষয়ে তরুণদের সহযোগিতা কামনা করে ভাষণ দিচ্ছিলেন ক্রমাগত। ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো এগ্নিউ-ও কর্তার সঙ্গে যথারীতি কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সচিব ওয়াল্টার হিকেল ফস করে এক চিঠি লিখে বসলেন খোদ কর্তা প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছে। সে চিঠিতে তিনি মার্কিন প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করলেন, বললেন, কম্বোডিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মার্কিন যুবসমাজে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, প্রশাসনের উচিত নয় সে আন্তরিক মনোভাবের নিন্দা করা। হিকেলের এই সাহসিকতাপূর্ণ পত্র প্রেরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছাত্র ও যুবসংস্থাপদে প্রেসিডেন্ট নিক্সন যাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন, সেই অ্যান্টনি জে মফেট পদত্যাগ করেছেন।

বস্তুত হিকেল-মফেট যা করেছেন তা লক্ষ লক্ষ মার্কিন নাগরিকেরই আন্তরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। গত ৩০শে এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন সদর্পে ঘোষণা করেছেন যে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একযোগে কম্বোডিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করবে। কেন? না, মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী অসামরিক নাগরিকদের আত্মরক্ষার্থে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আরো খোলসা করে বলেছেন যে, কম্বোডিয়া থেকে কমিউনিস্ট সৈন্যরা এসে দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধের দ্রুত মীমাংসার জন্যে কম্বোডিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। অদ্ভুত যুক্তি! অর্থাৎ যুক্তি ন্যায়নীতিহীন অজুহাত। এই ছেলে-ভোলানো নিক্সনী ছড়ায় কিন্তু মার্কিন তরুণরা ভোলেন নি। তাঁরা দেখেছেন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন পরিষ্কার ১৯৫৪ সালের ও ১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন কম্বোডিয়ায় হস্তক্ষেপ করে। ওই চুক্তি দুটোতে কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ওয়াল্টার হিকেল

কিন্তু যে-বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে এই নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে কম্বোডিয়া সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারতো, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা, তার সার্বভৌমত্ব খান্ খান্ করে দিল। সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন উঠেছে এজন্য যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট কম্বোডিয়ায় সৈন্য পাঠাবার আগে সেখানকার জনসাধারণকে কিছু জানান নি, প্রেসিডেন্ট [illegible] সঙ্গে পরামর্শ করা বা তাঁকে পূর্বাহ্নে জানানো প্রয়োজন [illegible] করেন নি। [illegible] প্রেসিডেন্ট নিক্সন [illegible]ভাবে [illegible] করেছেন, যেন কম্বোডিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা উপনিবেশ [illegible] আর কিছু নয়, তার স্বাধীন মতামত বলতে কিছু নেই, আমেরিকার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা।

স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কাজের হঠকারিতায় তীব্র প্রতিবাদ সারা বিশ্বে ধ্বনিত হয়েছে। এমন কি খোদ মার্কিন মুলুকে ছাত্র ও যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় অভূতপূর্ব বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, চারজন ছাত্র প্রাণ দিয়েছেন। হিকেল-এর পত্র তরুণদের যে আরো বেশি উৎসাহিত করেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি?

হিকেল এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মানুষ। বয়স যখন তাঁর মাত্র ২১ তখন তিনি অস্ট্রেলিয়া যেতে মনস্থ করেছিলেন। ১০ ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড়, তাই দায়িত্বও বেশি। সেজন্য ভাগ্যের অন্বেষণে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন কানসাস ছেড়ে। কিন্তু পাশপোর্ট ইত্যাদি যোগাড়ে বিলম্ব ঘটায় তিনি গিয়ে পড়লেন আলাস্কায়, পকেটে তাঁর মাত্র ৩৭টি পয়সা! সেখানে যুবক হিকেল রেস্তোরাঁয় কাপ-ডিশ ধোয়ার কাজ থেকে সুরু করে রেলে ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত নিলেন। তারপর তিনি মার্কিন বিমানবাহিনীর অসামরিক ইন্সপেক্টর হলেন। তারপর কিছু সঞ্চয়, কিছু ধারদেনা করে হিকেল বাড়ি তৈরির ব্যবসায় নামলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কয়েকটি বড় বড় বাড়ি তৈরির ঠিকেদারী পেলেন। ব্যবসায় প্রচুর আয় হতে লাগলো তাঁর। এর পর হিকেল ১৯৫২ সালে সুরু করলেন হোটেল ব্যবসা এবং ১৯৬৪ সালে পুরস্কারবিজয়ী ক্যাপ্টেন কুক হোটেল খুলে ভূমিকম্পপীড়িত আলাস্কার সামনে গৃহনির্মাণের নতুন ভবিষ্যৎ খুলে ধরলেন।

তারপর ১৯৬৭ সালে হিকেল আলাস্কার গভর্নর পদে নির্বাচিত হলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর মন্ত্রিসভায় হিকেলকে নিয়েছিলেন তাঁর গুণপনা এবং মৌলিকত্বের পরিচয় পেয়ে। মার্কিন খনিজ সম্পদ, জল সম্পদ, বন সম্পদ ইত্যাদির তদারকি ও উন্নয়নের ভার পড়েছিল হিকেলের ওপর। [illegible] গেল আভ্যন্তরীণ সচিব [illegible] [illegible] [illegible]

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(১২)

জিন্না সম্বন্ধে নেহরুর উপরিউক্ত ধরনের মনোভাব থাকার জন্য যতদিন পারেন জিন্নাকে তিনি অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কারো দাবিই টেকে নি। মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব সম্বন্ধে কংগ্রেসের উচ্চভাষণ এই নির্বাচনে বহুলাংশে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়—সারা দেশে মোট ৪৫০ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে মাত্র ২৬ জন কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিল—তারও বেশির ভাগ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে। অপরপক্ষে মুসলিম লীগ মুসলমানদের মধ্যে প্রধান দল হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারলেও একচ্ছত্র আধিপত্য দেখাতে পারে নি। একটি জায়গায় কংগ্রেস কিন্তু বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় রইল—হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে সে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারটি মুসলিম লীগ বা শাসক ইংরেজদের প্রত্যাশার অতীত ছিল। ঐসব মহলে ধারণা ছিল—কোনো দলের পক্ষেই এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হবে না—সংখ্যালঘু দলের সমর্থন সেজন্য প্রয়োজন হবেই। এ পর্যন্ত সরকারী পর্যায়ে যেভাবে মুসলিম সংখ্যালঘু সমস্যাকে নাড়াচাড়া করা হয়েছে তাতে এইটেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—যে-কোনো ক্ষেত্রেই মন্ত্রিসভায় বা নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে মুসলমান সদস্যসংখ্যা অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হবে। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় এমনই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটিকে আইনগত বাধ্য-বাধকতায় আনা হয় নি। ফলে নির্বাচনের পরে কংগ্রেস যেসব প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল, সেখানে স্থির করল—কেবল কংগ্রেসীরাই মন্ত্রী হতে পারবে। যদি কোনো মুসলমানকে মন্ত্রী হতে হয়—কংগ্রেসে যোগদান করার পরেই তিনি তা হতে পারবেন।

১৯৩৭ সালে পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি। মন্ত্রিসভায় মুসলমান সদস্য নেওয়ার নীতি বহুলাংশে তাঁরই সৃষ্টি। কংগ্রেসের মুসলিম লীগ সম্বন্ধে তাঁর বদ্ধমূল বিতৃষ্ণা তাঁকে লীগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আপোষবিমুখ করে তুলেছিল—করুক ক্ষতি নেই—কিন্তু বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়েছিল বিপক্ষের শক্তির হিসাব গ্রহণে তাঁর শোচনীয় রাজনৈতিক ভ্রান্তি—কোনো কোনো ঐতিহাসিকের অন্তত তাই মত।১ কংগ্রেসের সাফল্যে উদ্দীপ্ত হুংকার

---

১ ডঃ রমেশ মজুমদার লিখেছেন:

"The credit of Jinnah lies in the fact that he succeeded in developing this political consciousness among the Muslims within an incredibly short time. This was achieved by a comprehensive programme of propaganda and activities—both fair and foul—and the intransigence of the Congress High Command helped its growth. They took their stand on the theory that the Congress represented the whole of India and made the same mistake as the British did in respect of the Congress. They ignored the Muslim League as having no influence over the masses and only representing 'microscopic minority' of the Muslims, to use Lord Dufferin's words with reference to the Congress. But they discounted the idea that there may be a national urge among the Muslims limited to their own community and even though one may denounce it as rank communalism, its effect upon a political organisation may be the same.....A nationalist may disapprove such a development, a statesman can ignore it only at his peril. Jawaharlal Nehru in particular, among the Congress leaders, must be held highly guilty

দিয়ে তিনি বলেছিলেন—দেশে মাত্র দুটি দলই রয়েছে—শাসক ইংরেজ এবং কংগ্রেস। নেহরু দেখালেন, কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত না হলে লীগপন্থী মুসলমানদের পক্ষে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। নেহরু বিশ্বাস করেছিলেন, মন্ত্রিত্বের টানে অনেক মুসলমান কংগ্রেসে আসবে; তাছাড়া তাদের একটু ভাল করে বোঝালেও বেশ খানিক কাজ হবে। মুসলমান জনগণের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগ নেই বলেই তারা কংগ্রেসী হচ্ছে না-তাদের অন্তরে কংগ্রেসের বাণী শুধু পৌঁছে দেওয়ার অপেক্ষা—তাহলেই সর্বাসিদ্ধি। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে মুসলিম জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি পৃথক বিভাগ খুলে বসল। মুসলিম জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে সে বলল: কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের হাতে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হবে। আসল সমস্যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক। জনসাধারণের ঐ সকল অধিকার কংগ্রেসই প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ—মুসলিম লীগের জমিদার ও আইনজীবীর দল গরীবের স্বার্থরক্ষা কখনো করতে পারবে না। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস কৃষিসংস্কারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এ-কাজ ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে। এর ফলে হিন্দুর মত মুসলমানও লাভবান হবে। এই নতুন ব্যবস্থার শুভফল মুসলমানেরা যদি পুরোপুরি ভাগ করতে চায় তাহলে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া তাদের আশু কর্তব্য।

কংগ্রেসে যোগ না দিলে শাসনক্ষমতায় আসা যাবে না—লীগপন্থীদের কাছে কংগ্রেসের এই চ্যালেঞ্জ। ডঃ রমেশ মজুমদার বলেছেন—জিন্না চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তাঁর নেতৃত্ব উদ্ধত গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াল। কংগ্রেসের লীগ-বিরোধী নীতিকে তিনি বস্তুত মুসলমান-বিরোধী নীতিরূপে তুলে ধরলেন। হিন্দুদের সম্বন্ধে ঘৃণা আর তিনি আবৃত রাখলেন না। "হিন্দুদের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব—তারা টাকায় সতের আনা চায়।" "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল মূলে পৃথক নয়, হিন্দুদের সম্বন্ধে তা চূড়ান্তভাবে বিরোধী।" অতঃপর গরল উদ্‌গিরণই হয়ে দাঁড়াল জিন্নার একমাত্র কাজ. বিভেদ বাড়িয়ে তুলবে যে যে জিনিস—তাদের অন্ধানই একমাত্র চেষ্টা। ১৯৩৭ সালে লখনৌয়ে মুসলিম লীগের অধিবেশনে জিন্নার কর্কশ কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

"কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব গত দশ বছর ধরে বিশেষভাবে যে-নীতি অনুসরণ করছে তা একেবারে হিন্দুনীতি—ভারতবর্ষের মুসলমানদের শত্রু করে তোলার মূলে ঐ নীতি। ৬টি প্রদেশে সংখ্যাগুরুত্বের জোরে তারা সরকার গঠন করতে পেরেছে। সেখানে তারা তাদের কথাবার্তায়, কাজে এবং পরিকল্পনায় ক্রমান্বয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—মুসলমানেরা তাদের হাতে কোনোপ্রকার ন্যায়বিচার পেতে পারে না। যেখানে তারা সংখ্যাগুরু এবং সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, সেখানে মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার তারা করেছে—তাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করার দাবি তুলেছে।

"কংগ্রেস তার সমস্ত বড় বড় বচন সত্ত্বেও অতীতে মুসলমানদের জন্য কিছু করে নি। মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। মুসলমান জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ছলনার আড়ালে কংগ্রেসের মতলব—মুসলমানদের বিভক্ত, দুর্বল ও চূর্ণ করে ফেলা, স্বীকৃত ও সম্মানিত নেতাদের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। মারাত্মক এই চেষ্টা—কাউকেই তা বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

"মুসলমানদের সামনে তাই একটিই পথ—অন্য সব কিছুর বিচার-বিবেচনা সরিয়ে রেখে, নিজের সকল শক্তিকে সংহত করে সংগঠন এবং সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশে তাকে নিয়োগ করতে হবে—একাজে নামবার সময় এসে গেছে, তা তাদের বুঝতেই হবে।

"সমানে সমানেই সম্মানের সঙ্গে বোঝাপড়া হওয়া সম্ভব দুই পক্ষ যতক্ষণ না অপরকে সম্মান করতে এবং ভয় করতে শিখছে ততক্ষণ মীমাংসার দৃঢ়ভিত্তি নির্মিত হওয়া সম্ভব নয়।

"একটি জিনিসই মাত্র মুসলমানদের বাঁচাতে পারে, হৃতভূমি পুনরুদ্ধারের প্রাণশক্তি দিতে পারে: তাদের প্রথমত পুনরুদ্ধার করতে হবে নিজ আত্মাকে এবং যে-নীতি তাদের বিরাট ঐক্য সম্ভবপর করে অখণ্ড জাতিতে পরিণত করেছে, যার ফলে তারা সমুচ্চ স্থানে অবস্থিত রয়েছে—সেই বস্তুকে রক্ষা করে যেতে হবে।"

খোলাখুলি যুদ্ধে জিন্না নেমে পড়লেন—যে-যুদ্ধে 'ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা' কেউ থাকে না। এই যুদ্ধের মনসবদাররূপে মোল্লারা ঝাঁপিয়ে, ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। "গ্রামের মোল্লারা কংগ্রেসী প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে রুখে উঠল। মুসলমানদের তারা বলল, রাজনীতিকে ধর্মসম্পর্কহীন বলা ধর্মদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বদ মতলব সম্বন্ধে মোল্লারা মুসলমানদের মধ্যে সংশয় জাগিয়ে তুলল।" কংগ্রেসের প্রচারাভিযান ব্যর্থ হয়ে গেল। মুসলিম লীগের বাইরে যে সব মুসলমান দল পাঞ্জাবে, বাংলায় ও আসামে ছিল, তাদের নেতারা সদস্যদের মুসলিম লীগে যোগদান করতে বললেন—সারা দেশে, বিশেষত যুক্তপ্রদেশে যেখানে নেহরুর আধিপত্য থাকার কথা—সর্বত্র মুসলিম লীগের শাখা ছড়িয়ে পড়ল, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল যাতে মুসলিম লীগ সত্যই মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার অধিকার অর্জন করে ফেলল।

কংগ্রেস-নেতৃত্ব, ঠিকভাবে বলতে গেলে নেহরুর নেতৃত্ব এই অবস্থায় ভারতবর্ষকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। রমেশ মজুমদার এর জন্য নেহরু সম্বন্ধে কঠিন [illegible]

গরমে চলুন হালকা পায়ে
বাটার স্যাণ্ডাল আর চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ। সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি। পরলেই ভালো লেগে যাবে চমৎকার নমনীয় আপার। সুঠাম ভঙ্গি চলার ছন্দ হালকা ও সাবলীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয় বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যাণ্ডাল ও চপ্পলের যেন মেলা ব'সে গেছে—এখানে তার মাত্র কয়েকটি নকশাই দেখছেন। আসুন না, একবার প'রে দেখুন।
মীরা ৬.৮০
সাইজ ১—৭
খোকন ৮.৯৫
সাইজ ২—৫
অনু ১৪.৫০
সাইজ ২—৭
Bata
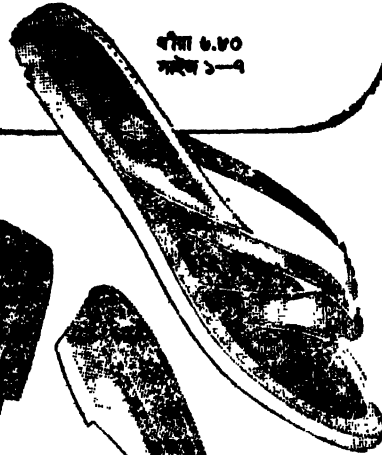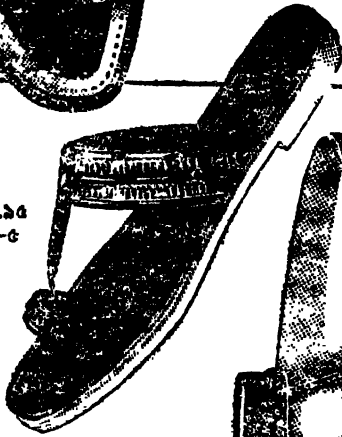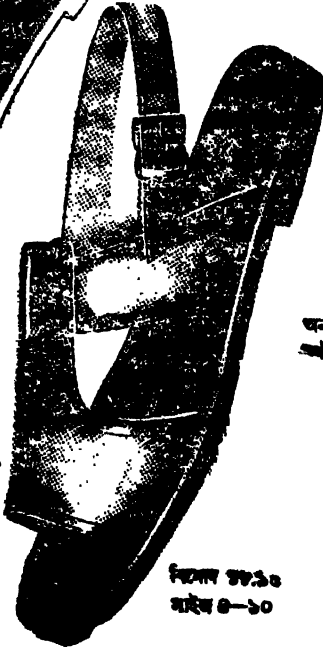
করেছেন।২ সমালোচনা কী? অশোক মজুমদার সেই সমালোচনায় সায় না দিয়ে বলেছেন, নেহরু যা করেছিলেন, সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক, কোনো দিক দিয়েই তা অনুচিত নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় কেবল মুসলিম লীগের মধ্য থেকে সদস্য নিলে মুসলিম লীগকেই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেওয়া হত। লীগ সরকারে ঢুকে প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করত; এবং যেহেতু তারা ইংরেজ-ঘেঁষা, স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হলে তাতে যোগ না দিয়ে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করত। অশোক মজুমদার তাছাড়া আরও বলেছেন, রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আপোষ আলোচনার সময়ে জিন্না জিন্নার দাবি ঐখানেই থেমে থাকত না। ১৯৩৫ সালে কিভাবে দাবি বাড়িয়ে চলেছিলেন এবং অযৌক্তিকভাবে আলোচনাকে নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছতে দেন নি—অশোক মজুমদার তার উল্লেখও করেছেন। যুক্তপ্রদেশে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের ব্যাপারে নেহরুর সমালোচকদের মধ্যে আজাদও ছিলেন—কিন্তু সর্বনাশা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আজাদের ভূমিকা নেহরুর তুলনায় কম মারাত্মক কিছু ছিল না—অশোক মজুমদার তাও জানিয়েছেন।

কথাটি সত্য। বাংলা দেশের মৃত্যুবিধান কার্যত মৌলানা আজাদের হাতে (এবং কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের হাতে) ১৯৩৭ সালে লিখিত হয়েছিল। আজাদ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তাঁর উপরই ছিল। তিনি পরিতৃপ্ত মুখে জানিয়েছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত কখনই বোর্ড অগ্রাহ্য করে নি—সুতরাং এক্ষেত্রে দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। ব্যাপারটি এইরকম: ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পরে ২৫০ জন সদস্য সমন্বিত বাংলা লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে দলগত অবস্থা দাঁড়িয়েছিল—কংগ্রেস ৬০, মুসলিম লীগ ৪০, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫, ইউরোপীয় ২৫, নির্দলীয় মুসলমান ৪১, নির্দলীয় অনুন্নত ২০, নির্দলীয় বর্ণহিন্দু ১৪ এবং দলবিশেষের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট সদস্য ১২। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করব-কি-করব না, এই খেলায় বেশ কিছু সময় মাতামাতি করে কংগ্রেস অবশেষে সিদ্ধান্ত করল—যেখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেখানেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নেবে। রাজনৈতিকভাবে এর থেকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হয় না। কংগ্রেসের ভেতরকার ভাববিরোধ এইরকম বিচিত্র সিদ্ধান্তের মূলে। কংগ্রেসের বামপন্থীরা স্বাধীনতার আগে কখনই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী নয়, অপরদিকে দক্ষিণপন্থীরা মুখের গ্রাস হারাতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং একক গরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত প্রদেশগুলিতেই মাত্র কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নেবে—এই সিদ্ধান্তের দ্বারা নীতির সতীত্ব এবং সন্দেহজনক মন্ত্রিত্ব—উভয়কে বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাংলা দেশের পক্ষে ফল হয়েছিল মারাত্মক।

২ ১৯৩৭-এর নির্বাচনের আগে মোটামুটি স্থির ছিল যুক্তপ্রদেশ মন্ত্রিসভায় দু'জন মুসলমান মন্ত্রী নেওয়া হবে। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে বলল, মুসলিম লীগ থেকে সে মন্ত্রী নিতে পারে মাত্র কতকগুলি শর্তে। শর্তগুলি মেনে নেওয়ার অর্থ মুসলিম লীগ তুলে দেওয়া। ডঃ রমেশ মজুমদার লিখেছেন:

"These detailed terms only translated into practice the pithy saying attributed to Nehru that 'there were only two parties in the country—the Congress and the British Government.' No wise statesman could seriously believe that the Muslim League would readily give up its own seperate identity and merge itself in the Congress. The Muslim League refused to commit political *Harikiri* at the bidding of the Congress....

"Nehru, who was chiefly responsible for this ultimatum, had no realistic conception of the Hindu-Muslim problem. Thus he says:

"'The communal problem, as it was called, was one of adjusting claims of the minorities and giving them sufficient protection from majority action. Minority in India, it must be remembered, are not racial or national minorities as in Europe; they are religious minorities. Religious barriers are obviously not permanent, as conversions can take place from one religion to another, and a person changing his religion does not thereby loose his racial background or his cultural or linguistic inheritance.'

"The statement is almost ridiculous as the whole history of the growth of Muslim community in India shows."

কংগ্রেস সম্বন্ধে নেহরুর বক্তব্য—'the most democratic organisation in the world'—ডঃ মজুমদার উচ্চহাস্যের সঙ্গে বলেছেন, ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে পন্থ প্রস্তাব পাস হবার পরে কংগ্রেসে গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না। কংগ্রেসের ভূমি-পরিবর্তনকেও তিনি আক্রমণ করেছেন। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিল লীগের সঙ্গে চুক্তি করে। খিলাফতের কালে গান্ধী পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের প্রথমে মুসলমান পরে ভারতীয় মনে করতে উৎসাহী। সুতরাং পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সর্বসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দাবি যুক্তিসহ নয়।

তোমার পথ

সুভাষ ঘোষাল

তোমার পথ মনে পড়ে
যে পথে ছিলো আমার ইহকাল
তুমি কোথাও ঝাপসা নও
কলাবতী ফুলের মতোই লাল।

দু'টো শালিখ এসেছিলো কাল বিকেলে
তাদের চোখে প্রশ্ন যেন—কাকে পেলে?
নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'-জোড়া চোখ
দূরের ছায়া মুখে ক'রে তখন অশোক।

যদিও তুমি অতর্কিতে ছেড়ে গেছো
আমার দেহে তোমারই উন্মেষ
কখনও যদি সুযোগ পাই
বুকে ক'রেই দেখতে চাই
রামপ্রসাদের ঘরের পাশে গহীন বাংলা দেশ।

সর্ববৃহৎ দল হিসাবে কংগ্রেসকে প্রথমে গভর্নর মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকেন—একক গরিষ্ঠ দল নয় বলে কংগ্রেস সে ডাকে সাড়া দিল না! তারপরে গভর্নর ডাকেন মুসলিম লীগকে। লীগ চেষ্টা করেও মন্ত্রিসভা গঠনে অসমর্থ হয়। তখন গভর্নর তৃতীয় বৃহৎ দল কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হককে ডাকেন। হক সাহেব বাংলা কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী দলের নেতা শরৎচন্দ্র বসুকে মন্ত্রি-সভা গঠনে সাহায্যের জন্য আহ্বান করেন। শরৎ বসু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের কাছে এ-ব্যাপারে অনুমতি চান। পূর্ব ভারতের জন্য ভারপ্রাপ্ত মৌলানা আজাদের কাছে শরৎ বসুর অনুনয়পত্র একের পর এক ছুটতে থাকে। আজাদ অনমনীয় থাকেন, কারণ বাংলা দেশের মৃত্যুলিপিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী হবেন—এই তাঁর ভবিতব্য।

মুসলীম লীগ সুযোগ বুঝে হক সাহেবকে বলল, তিনি যদি লীগে যোগদান করেন তাহলে লীগ তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবে। ফজলুল হক বললেন, লীগ যদি তাঁকে নেতা করে, তিনি রাজী। লীগ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হল—এবং তার ফলেই বাংলা দেশে লীগ শাসন কায়েম হয়, যার পরিণতি পার্টিশনে।

কংগ্রেসের বন্ধ্যা বা আত্মঘাতী নীতি এই একটি ক্ষেত্রে যতখানি প্রকট হয়েছে, এমন আর কিছুতে নয়। সুভাষ-চন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, দেশবন্ধু ও মোতিলালের মৃত্যুর পরে কংগ্রেস থেকে বুদ্ধির মহাপ্রস্থান ঘটেছিল—তা মিথ্যা নয়। কংগ্রেস, গান্ধী-নেতৃত্বে বহু মন্দবুদ্ধি দেখানো সত্ত্বেও আত্মপ্রবঞ্চনা করে বার বার ভেবেছে—রাজনীতি করা তার কাজ নয়, সত্য ও অহিংসার বাঁধ ভেঙে প্লাবন বইয়ে দেওয়াই তার কর্তব্য। রাজনীতির ধর্ম প্রতিপক্ষের কাছ থেকে যথাসম্ভব সুযোগ আদায় করা, কংগ্রেস তা ভুলেছিল। অথচ বিপ্লবী রাজনীতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল না, যা শত্রুর সঙ্গে অব্যাহত সংগ্রামে বিশ্বাস করে (চুক্তিও অব্যাহত সংগ্রামের অংশ হতে পারে)। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যদি লড়াই করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সর্বপ্রযত্নে সেই কাজ করা তার উচিত ছিল—এবং ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতির প্রয়োজনমত অনুসরণ করা দরকার ছিল। যেসব প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন যুক্তপ্রদেশে, সেখানে লীগ সদস্যকে সে সংগত কারণেই কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বলতে পারে কিন্তু যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, (যেমন বাংলা বা আসামে) সেখানে তার একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত, মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কিভাবে অন্য মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কার্যোদ্ধার করা যায়। শেষোক্ত কাজে সাফল্যের উপরেই মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়—কংগ্রেসের এই দাবির সত্যতা নির্ভর করবে। সুভাষচন্দ্র রাজনীতিকে এই দৃষ্টিতেই দেখতেন। মূলে তিনি বিপ্লবী, আমূল পরিবর্তনের পথে যে কোনো আপোসের বিরোধী। কিন্তু কংগ্রেসকে যখন তিনি তখনি সেই পথ নেওয়াতে পারেন নি তখন তাঁর মনোভাব, তৎকালীন পরিস্থিতি থেকে সর্বাধিক সুবিধা আদায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুভাষচন্দ্রের মত চরম আদর্শবাদী এবং একই সঙ্গে চরম বাস্তববাদী কংগ্রেস-নেতৃত্বে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। ১৯৩৮ সালে আসামে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে সুভাষ-চন্দ্রের এই জাতীয় ভূমিকার রূপ আমরা কিছু পরেই দেখব।

[ক্রমশঃ
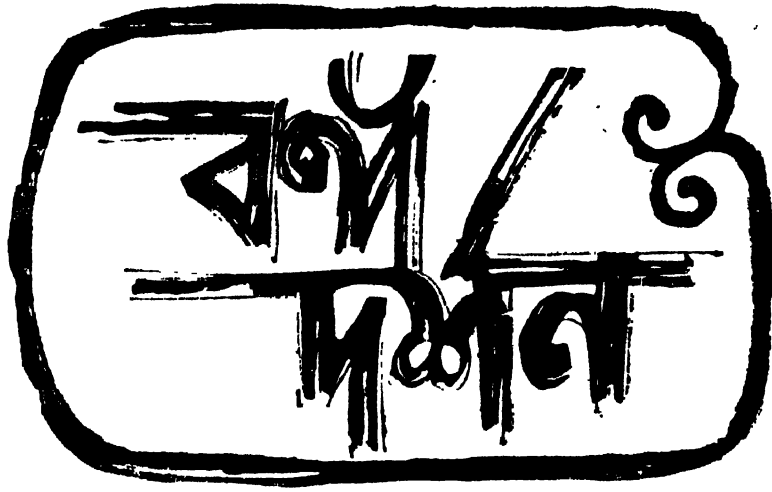
রাজনৈতিক জটিলতা, অর্থনৈতিক সংকট, শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি'-র মধ্যেও সারা পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র জন্মোৎসব নানাভাবে পালন করেছে। বাঙালী জীবনে পঁচিশে বৈশাখ একটি বড় উৎসবের দিন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধাপিত বাঙালীর কাছে এই দিনটি নানাভাবেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য সে কথা নতুন করে এখানে বলার নয়, বোধ হয় তার প্রয়োজনও নেই, কেন না রবীন্দ্রনাথের নিকট বাঙালীর রক্তের ঋণ। এ কথা নতুন করে বলবার নয় যে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা দিনের পর দিনই পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্র 'জন্মোৎসব অথবা যে কোন বিষয়কে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ইত্যাদির ব্যাপক অনুশীলনে। কিন্তু রবীন্দ্রচর্চার গুণগত উৎকর্ষ হয়েছে এ কথা হলফ করে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিই নন, একজন সত্যকারের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে দেশের নানান সমস্যা স্থান পেয়েছে এবং সেগুলির সমাধানের সঠিক পথও তিনি নির্দেশ করে গেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের ভূমি ও ভূমিসমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা উচ্ছ্বাস বাঙালী করেছে, জীবনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত করতে পারে নি। অবশ্য এর জন্য দেশবাসীকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না, গত বাইশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জীবনধারা এমন একটা পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, যা থেকে মুক্তি পেতে বাঙালী কিছুতেই পেরে উঠছে না। তবুও যে বছরে একদিনও সকল দৈন্য, গ্লানি ও জড়ত্বকে অস্বীকার করে বাঙালী রবীন্দ্রবন্দনায় মেতে ওঠে এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এ পোড়া দেশের এখনো আশা আছে।

আইন শৃঙ্খলা, প্রশাসন ও বর্তমান পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হয়েছে তার পরিচয় নতুন করে দেবার নয়, মাত্র এক সপ্তাহের খতিয়ান সংবাদপত্র থেকে দেখলেই অবস্থাটা বোধগম্য হবে। শুধু ১লা মে তারিখেই নিহত হয়েছে বারোজন মানুষ। তার পর থেকে এমন একটা দিনও যায় নি, যেদিন কোথাও না কোথাও অশান্তির আগুন জ্বলে নি। যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল, তখন সমস্ত অপকর্মের দায়টা সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই সকলে কর্তব্য সমাপন করেছেন। বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অল থিংস আর নট হোয়াট দে সীম। রাজ্যপালের প্রশাসনও যখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সমানভাবেই ব্যর্থ হচ্ছেন, তখন বুঝতে হবে যে, গন্ডগোলের উৎস অন্যত্র। রোগের কয়েকটি লক্ষণকেই রোগের মূল কারণ বলে মনে করে কয়েক বছর ধরেই যে চিকিৎসা করা হচ্ছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাই হোক, রাষ্ট্রপতির শাসনই হোক, এমন কি কড়া মিলিটারী শাসন হলেও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি হবে না, যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যাগুলির প্রতিকার না করা হয়। কিন্তু সেদিক দিয়ে কেউই যেতে চাইছেন না। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের দলীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বিষয়টিকে দেখছেন, কেউ হয়ত ভাবছেন, অবস্থা আরও শোচনীয় হওয়া দরকার, তাহলেই লোক হয় বিপ্লবের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে, আবার কেউ অন্যরকম ভাবছেন। এক নম্বর দলের মতে সকল অশান্তির মূলে দু' নম্বর দল, আর দু' নম্বর দল এক নম্বরকেই এর জন্য দায়ী করছে। এমন কি বর্তমান রাজ্যপালের কাজকর্মকেও ঠিক এই জাতীয় দলীয় প্রয়োজনের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা হচ্ছে। রাজ্যপালের বিভিন্ন কার্যাবলী কোন্ দলের পক্ষে কতটা যায় সেটাকেই দেখা হচ্ছে।

রাজ্যপালের প্রশাসনও পশ্চিমবঙ্গকে কোন আশার আলো দেখাতে পারছে না। উপদেষ্টাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মোটেও ভাল নয়। কোনখানে কোন কাজকর্ম নেই, রাইটার্স বিল্ডিংস কার্যত একটি মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছে। আমলারা প্রত্যেকেই ভবিষ্যতের আখের ভেবে কাকে আশ্রয় করলে লাভ হবে, সেই জল্পনা-কল্পনায় মত্ত। উন্নয়নমূলক কোন কাজই নেই, শুধু যা কিছু আয়োজন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পাল পাল সি আর পি আনবার। কিন্তু তার ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থেই বা রাজ্যপালের প্রশাসন কতদূর সফল হয়েছেন, সে ফিরিস্তি তো পূর্বেই দিয়েছি। এদিকে সারা দেশ জুড়ে প্রচন্ড খরা, জলাভাব, গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি, কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে রাজ্যপালের প্রশাসন নীরব, কোন কাজই তাদের নেই। কোন জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলে নিশ্চয়ই এমন অবস্থা হত না। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলের ত্রাণকার্যের কথা এবং সেই বিষয়ে সরকারের বহুমুখী প্রচেষ্টার কথা আমাদের মনে আছে।

পশ্চিম বাংলার এই দুর্দিনে যারা সত্যই কিছু করতে পারত, সেই প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি আজ বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে তাদের পুরনো খেউড় গেয়ে যাচ্ছে। যে অজয়বাবু পশ্চিম বাংলার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি দেখে দলবিশেষকে দায়ী করে গদী ছাড়লেন, আজকের আইন-শৃঙ্খলার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি কি বলবেন? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এটা কোন দলের ব্যাপার নয়, এর মূল অনেক গভীরে। যুক্তফ্রন্টের বাকি দলগুলিই বা কি করছেন? আগে শুনেছিলাম তাঁরা বলতেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী শক্তিকে তাঁরা আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কার্যত দেখছি কি? তাঁরা নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী শক্তি ভেঙে খানখান করছেন এবং যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল, তাদের পুনরায় শিকড় গাড়ার জন্য নরম মাটি প্রস্তুত করে দিচ্ছেন।

জঘন্য চক্রান্ত

ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ততই এই বাঁধ নির্মাণের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য দেশের মধ্যেই চক্রান্ত চলছে। কেন্দ্রের পূর্তমন্ত্রী পার্লামেন্টে উত্তরপ্রদেশের সদস্যদের খুশি করার জন্য গঙ্গার শাখানদী ঘোঘরা এবং সারদার জল আটকাবার যে দুটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন, তাতে গ্রীষ্মকালে গঙ্গা প্রবাহে ৩০ হাজার কিউসেক জল হ্রাস পাবে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে গংগা নিম্নদেশে যে পরিমাণ জল বহন করে, তা অর্ধেক হ্রাস পাবে। নদী বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, কলকাতা বন্দরকে নাব্য রাখতে গেলে ভাগীরথীতে ৪০ হাজার থেকে ৪৬ হাজার কিউসেক জলের প্রয়োজন। কাজেই গংগার মূল প্রবাহ হতে আগেই যদি ৩০ হাজার কিউসেক জল টেনে নেওয়া হয়, তাহলে কলকাতার জন্য আর যে কিছু বাকি থাকবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঘোঘরা এবং সারদার জল আটকাবার প্রকল্প দুটি গোপনে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট, গংগা-ব্রহ্মপুত্র কমিশনের সংগে এই প্রকল্প নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি। কলকাতার পোর্ট কমিশনার এবং পশ্চিমবংগ সরকারের প্রতিনিধিগণ ঘোঘরা-সারদা প্রকল্পের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় পূর্তমন্ত্রী ডঃ কে. এল. রাও তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৫৬ কোটি টাকার ফরাক্কা বাঁধ আমাদের কাছে নির্মম পরিহাস হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করবে, কারণ যে জল কলকাতার প্রাপ্য ছিল সেই জল আগেই কেড়ে নেবার আয়োজন পাকা হয়ে গেছে। গংগার মূল প্রবাহ পদ্মা অভিমুখে ধাবিত হওয়ায় পশ্চিমবংগের ভাগীরথী প্রয়োজনীয় জলধারা হতে বঞ্চিত, যার ফলে ভাগরথী ক্রমেই অগভীর হয়ে পড়ছে। গ্রীষ্মকালে বড় বড় জাহাজ কলকাতায় প্রবেশ করতে পারে না। অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে, গত সাত-আট বছরে মাল আদান-প্রদানের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ টন হতে হ্রাস পেয়ে ৬০ লক্ষ টনে নেমে গেছে। তা ছাড়া গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের জল ঢুকে ভাগীরথীর জল লবণাক্ত করে দিচ্ছে। পৌরসভা গংগাজলকেই পরিস্রুত করে পানীয় জল হিসাবে শহরে সরবরাহ করেন। লবণাক্ত সেই জল পানের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সকলেই আশা করেছিলেন যে, ফরাক্কার বাঁধ নির্মিত হলে ভাগীরথীর মধ্য দিয়ে যে অতিরিক্ত জল প্রবাহিত হবে, তাতে সারা বছর কলকাতায় জাহাজ চলাচলের অসুবিধা ঘুচবে এবং গংগার উভয় তীরের শহর ও গ্রামের অধিবাসীরা গ্রীষ্মকালে পানীয় জল সংকটের হাত হতে অব্যাহতি লাভ করবেন। কিন্তু কেন্দ্রের পূর্তমন্ত্রী বাঙালীকে স্বস্তি বোধ করতে দিতে রাজী নন। কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের এই মনোভাবের নিন্দা করার কোন ভাষা সত্যই নেই। আঞ্চলিক স্বার্থে যারা দেশের স্বার্থ নিঃসন্দেহে উপেক্ষা করতে পারে, তারা যে শুধু ক্ষমার অযোগ্য তাই নয়, যে দুষ্ট নজীর তারা সৃষ্টি করতে চলেছে, তা একদিন বুমেরাং হয়ে তাদের বিদ্ধ করবে। সে দিনটা খুব দূরে নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ

কল্যাণী, বর্ধমান ও যাদবপুর তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ই একে একে দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। গত ১লা মে তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দুজন মানুষ নিহত হয়েছে। আগে থেকেই গণ্ডগোল চলছিল। শেষ পর্যন্ত লক আউট করে আপাতত অবস্থার সামাল দেওয়া হয়েছে। কলকাতা ও বিশ্বভারতীর অবস্থাও আশাপ্রদ নয়, তবে গ্রীষ্মাবকাশ ঘোষণা করে অবস্থাটাকে আপাতত এড়ানো গেছে। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজও তাড়াতাড়ি গ্রীষ্মের ছুটি দিয়ে হাংগামা এড়াবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাতেও কাজ হয় নি। ৬ই মে তারিখে দু' দল ছাত্রের বিরোধ উপলক্ষ করে সেখানে তাণ্ডব ঘটেছে, দুজন ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে, সেণ্ট্রাল স্টোরে আগুন দিয়ে লাখ লাখ টাকার মালপত্র পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। শহর ও মফস্বলের আরও বহু স্কুল-কলেজই অনিশ্চিত বিপদের সম্ভাবনায় দোর বন্ধ করার কথা ভাবছে, অথবা আংশিক বন্ধও করে ফেলেছে। পরীক্ষা হলগুলিতে কোন অধ্যাপক গার্ড দিচ্ছেন না, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কয়েকটি কলেজে যে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা চলছে, বহুস্থানে ছাত্রেরা দলবদ্ধভাবে নকল চালাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে আস্থাসম্পন্ন ছাত্র জোট আজ একই প্রতিষ্ঠানে পরস্পরের সংগে যুদ্ধনিরত। প্রত্যেকের পৃষ্ঠপোষকতায় আছেন বিভিন্ন দলের শিক্ষক জোটও।

এই অসহনীয় অবস্থার কারণ কি? কথায় কথায় উপাচার্য, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায়ই ঘেরাও হচ্ছেন। ভাঙাচোরা, আগুন লাগানো, বোমাবাজি প্রতিনিয়ত ঘটছে। কিন্তু এ সবের কারণ কি তা নিয়ে সত্যকারের চিন্তা কেউই করছেন না। কর্তৃপক্ষ গোড়ার গলদ দূর করার কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত করেন নি। তাঁরা বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই দায়মুক্ত হতে চান। তাঁদের বক্তব্য, ছেলেরা শৃঙ্খলাহীন, পড়াশোনায় অমনোযোগী, হাঙ্গামাপ্রিয়। কিন্তু এটা যুক্তি নয়, কু-যুক্তি।

প্রথমত, যে পরিমাণ পাঠ্যবস্তু তালিকাভুক্ত করা হয়, তা নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে পড়িয়ে শেষ করা হয় না, না স্কুলে, না কলেজে, না বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রশ্নপত্রগুলিও কদাপি সময়মত হয় না। হয় সেগুলি মানাতিরিক্ত, না হয় সূচী বহির্ভূত, ছাত্র-ছাত্রীদের প্যাঁচে ফেলার জন্য এবং প্রশ্নকর্তার বিদ্যার বহর দেখানোর জন্যই বোধ হয় সেগুলি প্রস্তুত করা হয়। ফলে পরীক্ষা হলে গণ্ডগোল ও টোকাটুকি এবং তাতে বাধা দিলে প্রবেশনিরত ব্যক্তিদের মারপিট—এটাই যেন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, ছাত্র-ছাত্রীরা আজ শিবিরগত রাজনীতির শিকার হয়েছে, কর্তৃপক্ষও রাজনীতি করেন, শিক্ষকমশাইরাও করেন, ছাত্র-ছাত্রীরাও করে। এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে যে, উপাচার্যের মত পদেও লোক নেওয়া হয় দলীয় রাজনীতির মুখ চেয়ে? ছাত্রদের রাজনীতি না করার উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাব্রতী দেশের মধ্যে ক'জন আছেন যাঁরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে? যাঁরা আছেন তাঁরা পাত্তা পান না, তাঁরাই পান যাঁদের গ্রহচক্রে কোন "দাদা" আছেন। তৃতীয়ত, বর্তমান ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রের ভবিষ্যৎ কি? তাদের সামনে অন্ধকার ও হতাশা ছাড়া আর কি আছে? পৃথিবীর কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এতটা ক্রিমিনাল নয়। যে ছাত্র প্লেটোর দর্শন আয়ত্ত করেছে, তার কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই বলেই সে যদি অধ্যয়নের অপরাধে সমাজের উপেক্ষা ও ঘৃণার পাত্র হয়, তাহলে এই পচা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার মাথাব্যথা কিসের? ছাত্রের সোজা বক্তব্য, যে শিক্ষায় আমার বাঁচার রাস্তা নেই, সে ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলে আমি নিশ্চয়ই বিবেকের কাছে অপরাধী হব না।

—৯ই মে, ১৯৭০

সিণ্ডিকেটের ভরাডুবি

কংগ্রেস দল দুই ভাগে বিভক্ত হবার পর রক্ষণশীল অংশের (সিণ্ডিকেট নামে পরিচিত) নেতারা অংক কষে বলে দিয়েছিলেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার দুচার মাসের মধ্যেই কুপোকাত হবে এবং তখন তাঁরা কেন্দ্রে কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট (স্বতন্ত্র-জনসংঘকে নিয়ে) গঠন করে দেশ শাসন করবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেটা "গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল" হয়ে উঠছে। কংগ্রেস ভাগের পর পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন হয়ে গেল। শ্রীমতী গান্ধী অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাঁর প্রথম বাজেট (১৯৭০-৭১) অনায়াসেই পাশ করিয়ে নিয়েছেন এবং পার্লামেন্টে তাঁর গভর্ণমেন্ট কোন সময়ই সংকটের সম্মুখীন হয় নি। কংগ্রেস ভাগের সময় উত্তরপ্রদেশ, মহীশূর এবং গুজরাটের রাজ্য সরকারগুলো ছিল সিণ্ডিকেটের হাতে এবং বিহারে চালু ছিল রাষ্ট্রপতির শাসন। গত কয়েক মাসে উত্তরপ্রদেশে সিণ্ডিকেট ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে এবং তার জায়গায় গঠিত হয়েছে বি-কে-ডি-কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট। বিহারেও রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটিয়ে কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট চালু হয়েছে। অপরদিকে গুজরাটে সিণ্ডিকেট সরকারের অবস্থা খুবই কাহিল। হিতেন্দ্র দেশাইয়ের সমর্থকরা এমন ব্যাপকভাবে দলত্যাগ করতে আরম্ভ করেছে যে, সিণ্ডিকেট যে আর কতদিন সেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে তা বলা কঠিন। মহীশূরের অবস্থাও ভাল নয়। অর্থাৎ সিণ্ডিকেট যেখানে যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, সেখানে-সেখানে তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি উপ-নির্বাচনে তাঁরা যেরকম শোচনীয়ভাবে ঘায়েল হয়েছেন, তাতে তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই এখন মস্ত সমস্যা হয়ে উঠছে বলে মনে হয়। সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের কর্ণধার নিজলিঙ্গাপ্পার খাস তালুক মহীশূরে গত সপ্তাহে তিনটি উপনির্বাচন হয়ে গেল। তার সব কটিতেই নিজলিঙ্গাপ্পার প্রার্থীরা কংগ্রেস প্রার্থীদের কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন। তাতে সিণ্ডিকেট নেতারা এত দূর বে-সামাল হয়ে পড়েন যে, তাঁদের জেনারেল সেক্রেটারী ভেংকটসুব্বিয়া দলের সেক্রেটারী পদে ইস্তফা দিয়ে ঘোষণা করেন যে, শুধু প্রধানমন্ত্রীর সংগে শত্রুতা সাধনের মন নিয়ে নেতিবাচক নীতি অবলম্বনের দ্বারা সিণ্ডিকেট বেশি দূর এগোতে পারবে না। সিণ্ডিকেটকে টিকে থাকতে হলে বিকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং নেতাদের ঐকাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। লোকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে, সিণ্ডিকেট কিছু সংকাজ করতে চাইছে।

ভেংকটসুব্বিয়ার পদত্যাগের ফলে সিণ্ডিকেটের উচ্চতম মহলে গভীর হতাশার সঞ্চার হয়। সংগে সংগে সিণ্ডিকেটের তত্ত্ববিশারদ অশোক মেটা এবং প্রচারবিদ্ তারকেশ্বরী সিংহ ভেংকটসুব্বিয়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হন এবং বলেন, ভেংকটসুব্বিয়ার পদত্যাগ করা উচিত নয়। তার বদলে ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন কিছু করার চেষ্টা করা উচিত। উপনির্বাচনে পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ের জন্য দলের মধ্যে একটা তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি উঠেছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভেংকটসুব্বিয়া পদত্যাগ প্রত্যাহার করে এ যাত্রা একটা বড়রকমের সংকটের হাত থেকে সিণ্ডিকেটকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এখন সিণ্ডিকেটী নায়করা বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব এবং অনুপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নই মহীশূরে সিণ্ডিকেটের বিপর্যয়ের কারণ। ভেংকটসুব্বিয়া এবং তারকেশ্বরী নাকি সেটা মেনে নিতে রাজী নন। সিণ্ডিকেট প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকার্যের জন্য স্বয়ং কামরাজ মহীশূরে ছিলেন। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সিণ্ডিকেট চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

অন্যান্য আরও কয়েকটি নির্বাচনেও সিণ্ডিকেটের ভরাডুবি হয়েছে। কংগ্রেস ভাগ হবার পর এ পর্যন্ত ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে এবং ২টি লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে ৮টি এর সব কটি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনে এই আসনগুলোর মধ্যে ৪টি বিধানসভার আসন এবং একটি লোকসভার আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। কংগ্রেস ভাগাভাগির পর সংশ্লিষ্ট লোকসভা সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট বিধানসভা সদস্যদের মধ্যে দুজন সিণ্ডিকেটে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু উপনির্বাচনের ফলে লোকসভার সেই আসনটি কংগ্রেস পেয়ে গেছে এবং বিধানসভায় তাদের আসন সংখ্যা আরও ৬টি বেড়ে গেছে।

সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে কংগ্রেসের এই সাফল্য শ্রীমতী গান্ধী এবং তার দলের মনোবল যে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। দেশের হাওয়া কোন খাতে বইছে, তারও একটা আভাস এই নির্বাচনে পাওয়া গেছে। সিণ্ডিকেট এখন রক্ষণশীলতা এবং গতানুগতিকতার মুখপাত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা যে কায়েমী স্বার্থের তল্পীবাহক সেটা তাদের আচরণে এমন উলংগভাবে ধরা পড়েছে যে, সিণ্ডিকেট সম্বন্ধে লোকের কোন আগ্রহ নেই। পঞ্চান্ন কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ যখন শত শত বছরের অচলায়তন ভেঙে সমাজতন্ত্রের পথে অতি দ্রুতগতিতে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় যে কোন ধরনের রক্ষণশীলতা, ধর্মান্ধতা, প্রাদেশিকতা বা অনুরূপ কোন সংকীর্ণ চিন্তা জনগণের কাছে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। কারণ সকলেই বুঝতে পারছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল রূপান্তর ছাড়া ভারতবর্ষের কোন ভবিষ্যৎ নেই। ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস কাজে যাই করুন, মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন এবং ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা নিজেদের সততার প্রমাণ দিয়েছেন। তাই কংগ্রেসের প্রগতিশীল সমর্থকরা তাঁদের দিকেই ঝুঁকেছেন এবং এখন দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই বেশি। এ অবস্থায় নিজলিঙ্গাপ্পা যে আর কতদিন নিজের দলটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, তা সত্যিই সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠেছে।

মহারাষ্ট্রের দাঙ্গা-হাঙ্গামা

গত সপ্তাহে মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে, তা সত্যিই দেশবাসীর পক্ষে উদ্বেগজনক ঘটনা। গত ৭ই মে বোম্বাই শহর থেকে ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত ভিভাণ্ডীতে শিবাজী জয়ন্তী উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। সেই শোভাযাত্রার ওপর নাকি সোডার বোতল এবং ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়।

[illegible]

এবং শুরু হয়ে যায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সেই দাঙ্গা ক্রমে জলগাঁও এবং অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। শনিবারের পরে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৬ জন। আহতের সংখ্যা শত শত। পুলিশ দাঙ্গা দমন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় মিলিটারী ডাকা হয় এবং তা সত্ত্বেও অবস্থা এখনও পুরোপুরি আয়ত্তে (১০ই মে পর্যন্ত) আসে নি। কারফিউ বলবৎ

[illegible] পুলিশকে বারকয়েক গুলীবর্ষণ করতে হয়েছে। পুলিশ শ' চারেক দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছে বোমা, বন্দুকের নল, এসিড বাল্ব, সোডার বোতল, লাঠি, ছুরি, বর্শা, কুড়োল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।

মহারাষ্ট্রের এই দাঙ্গার গতিপ্রকৃতি দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এটা পূর্ব

[illegible] যে আলোচনা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে শিবাজী জয়ন্তী শোভাযাত্রাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও যোগ দিয়ে-ছিলেন। সুতরাং সেই শোভাযাত্রায় ইটপাটকেল এবং সোডার বোতল পড়ার ঘটনাটাই খুব রহস্যজনক। অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনে শিবসেনা ও জনসংঘের

[শেষাংশ ২৮৯৭ পৃষ্ঠায়]

মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সদস্যগণ কঠোর ভাষায় নিক্সনের কাজের সমালোচনা করেছেন।

কম্বোডিয়া :

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ভারি ফ্যাসাদে পড়েছেন। কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে সর্বত্র তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুষ্টিমেয় কর্তা ও কিছু পেটোয়া শক্তি ছাড়া কেউই নিক্সনের এই কাজকে সমর্থন করতে পারেন নি।

রাষ্ট্রসংঘের কূটনীতিক মহলেও বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। যাঁরা সাধারণত মার্কিন নীতি সমর্থন করেন, এবার তাঁদের অনেকের পক্ষেও নিক্সনের যুদ্ধবিস্তারের এই অপচেষ্টাকে সমর্থন করা সম্ভব হয় নি।

কম্বোডিয়ায় নতুন করে আক্রমণ সুরু করার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ছাত্ররা নিক্সনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করছে, নিক্সনের কুশপুত্তলিকা পোড়াচ্ছে।

অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিক্সনের কাজের সমালোচনা করেছে সেনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি। ৪ঠা মে এই কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে: নিক্সন সরকার ইন্দোচীনে বে-আইনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। কংগ্রেসের মতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, কংগ্রেসকে ডিঙিয়ে কম্বোডিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কংগ্রেস, বিশেষ করে সেনেটের পূর্ব অনুমতি না নিয়ে ইন্দোচীনের কোথাও নিক্সন সরকার সৈন্য প্রেরণ করতে পারে না। গত বৎসর সেনেটে এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল। অথচ, নিক্সন সরকার কম্বোডিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেছে সেনেট বা কংগ্রেসের কোন কক্ষের কোন অনুমতি না নিয়ে।

সেনেট পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান উইলিয়াম ফুলব্রাইট কম্বোডিয়ায় সৈন্য প্রেরণের জন্য নিক্সন সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন: কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণের দায়টা কি? কম্বোডিয়া 'সীয়াটো' বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার সদস্য নয় এবং 'সীয়াটো'র নিরাপত্তা বিধানের সর্ত কম্বোডিয়া মানে না। এই অবস্থায় কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণের কোন প্রয়োজন বা বাধ্যবাধকতা নেই।

ফুলব্রাইট বলেছেন, যুদ্ধ, পররাষ্ট্র সম্পর্ক, এ-সব বিষয়ে সেনেটের মতের গুরুত্ব খুব বেশি। তাই সেনেটকে উপেক্ষা করে নিক্সন অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।

কেবল সেনেট নয়, মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিসভা বা 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস'ও ক্ষুব্ধ। তাদের সঙ্গেও কোন রকম পরামর্শ করা হয় নি।

নিক্সন ক্ষুব্ধ কংগ্রেস সদস্যদের শান্ত করার জন্য হোয়াইট হাউসে সেনেট ও প্রতিনিধিসভার পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটির সদস্যদের বৈঠক আহবান করেছেন। কিন্তু নিক্সন ও তাঁর সমর্থকরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'আত্মরক্ষার' জন্যই কম্বোডিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেছে। ভিয়েতনামে যে লক্ষ লক্ষ মার্কিন সৈন্য রয়েছে, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই কম্বোডিয়া আক্রমণ করতে হল। তাছাড়া, কম্বোডিয়ায় উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভিয়েতকং গেরিলারা যে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করছে, তাতে এদের প্রতিরোধ করার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

কিন্তু নিক্সনের এই ব্যাখ্যা কেউ মানেন নি। বরং, আশঙ্কা হচ্ছে, নিক্সন আর এক ধাপ এগিয়ে লাওসেও সৈন্য পাঠিয়ে না বসেন। তবে, শেষ পর্যন্ত দেশ-বিদেশের চাপের জন্য নিক্সন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন, ৩০শে জুনের মধ্যে সকল মার্কিন সৈন্য কম্বোডিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হবে।

যে আশা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়ার যুদ্ধে নেমেছিল, তা বোধ হয় সফল হবে না। বিদ্রোহী কম্বোডিয়াবাসী এবং উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা যে সব শহর দখল করে নিয়েছে, তার সামান্যই মার্কিন সৈন্য পুনর্দখল করতে পেরেছে। মেকং নদীর পূর্বদিকের সবটা এখন বিদ্রোহী-দের দখলে।

এদিকে কম্বোডিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রিন্স নরোদম সিহানুক পিকিং-এ বসে এক নতুন সরকার গঠন করেছেন। তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী পেন নুথ এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। চীনে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল য়ুনাইটেড ফ্রন্ট অব কম্পুচিয়ার' প্রথম জাতীয় সম্মেলনে সিহানুককে এই ফ্রন্টের চেয়ারম্যানরূপে নির্বাচন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের পরই নতুন সরকারের কথা ঘোষণা করা হয়।

সরকার ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চীন সিহানুকের এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং নমপেন থেকে চীনা দূত সরিয়ে নিয়েছে। পিকিং-এ মে দিবসের সমাবেশে মাও সে-তুং-এর পাশে সবচেয়ে সম্মানের আসন পেয়েছেন প্রিন্স নরোদম সিহানুক।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন কম্বোডিয়ার ওপর আক্রমণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি ৪ঠা মে মস্কোতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেছেন, প্রিন্স নরোদম সিহানুকই হলেন কম্বোডিয়ার একমাত্র আইনসঙ্গত রাষ্ট্রপ্রধান। সিহানুক যাতে তাঁর ক্ষমতা

[illegible]
[illegible]
[illegible] উপদেষ্টা [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুতর অবনতি ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে। কর্মীগণ বলেছেন, সোভিয়েট আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই সব সমর্থন পেয়ে সিহানুক খুবই উৎসাহিত বোধ করছেন। তিনি তাঁর দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন লন নল গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য।

ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড প্রভৃতির উত্তরে কম্বোডিয়ার ওপর যে সম্মেলন ডাকার কথা ছিল, আগামী ১৬ই ও ১৭ই মে জাকার্তায় সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তবে ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, সিংহল প্রভৃতি অনেক দেশ এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে না।

সিংহল:

২৭শে মে সিংহলের সাধারণ নির্বাচন। স্বাধীনতার পর সপ্তম পার্লামেন্ট গঠনের জন্য এবারের নির্বাচন হচ্ছে।

নির্বাচনে প্রধান দুই পক্ষ হল: সিংহলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডাডলি সেনানায়কের য়ুনাইটেড্ ন্যাশনাল পার্টি আর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি।

শ্রীমতী বন্দরনায়েকের সঙ্গে সিংহলের কমিউনিস্ট ও ট্রটস্কিপন্থীরাও আছেন। শ্রীমতী বন্দরনায়েকের দল মোটামুটি বামপন্থী। আর, ডাডলি সেনানায়কের য়ুনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি একটু দক্ষিণ ঘেঁষা হলেও মধ্যপন্থী মডারেটদের দল।

অন্যান্যবারের মত ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক বা ভাষাগত প্রশ্ন এবারের নির্বাচনে বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। দুই পক্ষই অর্থনৈতিক বক্তব্যকে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন।

সেনানায়কের দল মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করতে চাইলেও বেসরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণেই তাঁদের বেশি আগ্রহ। বিপরীত দিকে শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি [illegible] উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণ চায়। মূল ও ভারী শিল্প, বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, আমদানী বাণিজ্য প্রভৃতি জাতীয়করণের প্রস্তাব রয়েছে শ্রীমতীর দলের।

মাহাওয়েলি নদী পরিকল্পনার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে চেয়েছে। নির্বাচনে এটিকেও একটি 'ইস্যু' করা হয়েছে। সেনানায়করা এই পরিকল্পনার পক্ষে। কিন্তু সিরিমাভো বন্দরনায়েকের দল নতুন করে মাহাওয়েলি চুক্তি বিবেচনা করতে চায়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা নিতে আপত্তি নেই, কিন্তু এর দ্বারা যেন সিংহলের অর্থনীতিতে বিদেশী হস্তক্ষেপ না হয়।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে উভয় দলই জোটনিরপেক্ষতার সমর্থক। তবে কার্যক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি জয়লাভ করলে সোভিয়েট য়ুনিয়ন, এমন কি চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। আর ডাডলির য়ুনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত থাকবে।
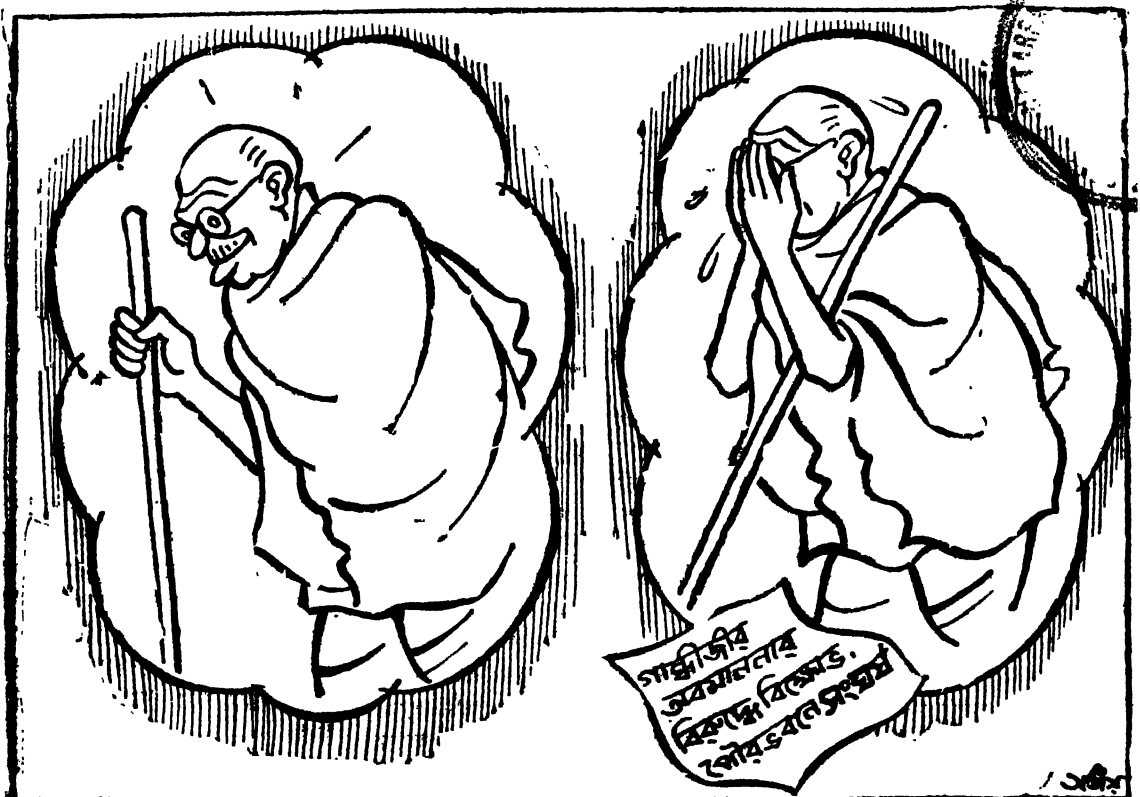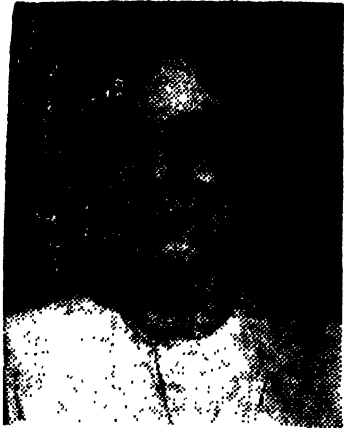
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি কি মোর করম লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিতে
ভানুর কিরণ পেখি।

আক্ষেপানুরাগের এই করুণ রস শুধু কৃষ্ণ-রাধিকার প্রণয়-বিরহ গাথায় সীমাবদ্ধ নয়, আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কোথায় বৃন্দাবন-মথুরা এবং কোন্ যুগের সেই কৃষ্ণ-রাধিকা—তাদের কথা দিয়ে আজকের পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতি বিচার বড় মানানসই মনে হয়। অমিয় সাগরে সিনান করতে গিয়েছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়. শীতল চাঁদের আলো সেবন করতে চেয়েছিলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীসুশীল ধাড়া, কিন্তু সকলেরই ভাগ্যে জুটলো ভানুর খরতাপ। এ এক নির্মম পরিস্থিতি. করুণ পরিবেশ! যার কিছু নেই. তার কিছু হারাবার ভয় থাকে না, কিন্তু সব থেকেও যে সব হারায়. সে ব্যথা সব চেয়ে বেশি।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় চেয়েছিলেন সি পি এম-এর হাত থেকে মুক্তি পেতে, শাসনযন্ত্র থেকে সি পি এম-কে হটিয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। শান্তির রাজ্য হবে পশ্চিমবঙ্গ—শরিকী সংঘর্ষ হবে না, খুন-খারাপী হবে না. শিল্পে অশান্তি হবে না. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে. শিল্পে পুঁজি নিয়োগ হবে, বিদ্যায়তনে ছাত্ররা সুবোধ বালকের মত পড়াশুনা করবে। একই ভাবনা ছিল শ্রীজ্যোতি বসুর। ৮৩টা আসনের অধিকারী এবং রাজ্যের সর্ববৃহৎ শক্তি ক্ষমতা সংগঠন শক্তির অধিকারী সি পি এম-এর পাক্ষে লেজে কুকুর নাড়ছে—এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া অসম্ভব, আরো অসম্ভব যদি চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের তাঁবেদারীতে থাকতে হয়। তাই মুক্তি চাই।

শান্তি চেয়েছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, মুক্তি চেয়েছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু—একইভাবে শান্তি ও মুক্তি চেয়েছিলেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। শান্তি ও মুক্তির একটা ছকও বাঁধা ছিল সকলের মনে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় জানতেন তিনি পদত্যাগ করতে চাইলে সকলে তাঁর সর্ত মেনে নিয়ে তাঁকে নিরস্ত করবে—সেই সর্ত হল সি পি এম-কে বাদ দিয়ে সরকার গঠন। অসহায়ভাবেই হোক আর আনন্দের সঙ্গেই হোক, সকলে তাঁর প্রস্তাব মেনে নেবে, কারণ সকলেই চায় সরকারে থাকতে। তার পর যখন পদত্যাগ করলেন, তখন ভাবলেন—নিশ্চয়ই সকলে এগিয়ে আসছে সি পি এম-কে বাদ দিয়ে তাঁকে নিয়ে সরকার করতে। একই ভাবনা ছিল শ্রীজ্যোতি বসুর। শ্রীবসু ভেবেছিলেন—শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলে তাঁকে দিয়ে সরকার গঠন করতে শ্রীধাওয়ান হাত-পা ধুয়ে বসে আছেন, আর অন্য দলগুলো—তারা তো সরকারে ঠাঁই পেতে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য মুখিয়ে বসে আছে। কিন্তু হায় সকলি গরল ভেল। আইনের শাসন চেয়েছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়. শান্তি-শৃঙ্খলা চেয়েছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, খুন. শরিকী সংঘর্ষ, হানাহানির অবসান চেয়েছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কি হল? আগে তবু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেও সরকারের অস্তিত্ব ছিল, প্রশাসনযন্ত্র অকেজো হলেও তার একটা কাঠামো ছিল, কিন্তু এখন? অতি সাধু ভাষায় বললে বলা চলে রাজ্যে কোন প্রশাসন নেই। পাঁচজন সরকারী আমলা—যার মধ্যে অন্তত চারজনের বনে যাবারও বয়স চলে গেছে অনেক দিন, তাঁরা চালাচ্ছেন রাজ্যের প্রশাসন। আমি কারো যোগ্যতা বা উদ্যোগ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না. কিন্তু মানুষের একটা সময় তো আসে, যখন সৃজনশীল প্রতিভা ভোঁতা হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আরও একটা কথাও বলতে চাই—সরকার থাকতে ঝগড়া হত মন্ত্রীতে-মন্ত্রীতে—কখনও ক্ষমতা নিয়ে, কখনও কাজের সম্পর্কে মতবিরোধে। কিন্তু এই যে আমলা শাসন চলছে, সেটাও কি মন্ত্রীদের ঝগড়ার চেয়ে কিছু কম ঝগড়া হচ্ছে? পাঁচজন আমলাকে নিয়োগ করতে দুই মাসের বেশি সময় লাগলো। শ্রীসুকুমার মল্লিক মহাশয়কে মুখ্য সচিব নিয়োগ করা নিয়ে কলকাতা দিল্লীতে যা হ'ল—সেটা হল শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে মন্ত্রিসভা গড়ার সময় টানাটানির চেয়ে কিছু কম? এই যে সেই দিন আই-এ-এস-দের দুই দিনের সভায় রাজ্যপালের আচরণকে নিন্দা করার প্রস্তাব নিয়ে ঝগড়া হল, সেটা কি রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীদের ঝগড়া থেকে কিছু কম? সি পি এম সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের অনেকের মনোভাব কি শ্রীমুর্শেদ সম্পর্কে অনেক অফিসারের কিছু কম। একদা বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের সভা বর্জন করায় হৈ-চৈ পড়ে গেছিল, কিন্তু নদীয়ার জেলাশাসক তো রাজ্যপালের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে অস্বীকার করলেন. ঘটনা হিসাবে এটা কি খুব তুচ্ছ? তবে এই সবই হল সুরু—নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবস্থা। অফিসাররা ঘর গুছিয়ে বসতে বা চেয়ার ছুঁতে দুই মাস লেগেছে। দিন তো এখনও বাকী। কাজ-কর্ম তো এখনও সুরু হয় নি, কাজেই তার নমুনা পরে বোঝা যাবে। সবেমাত্র শুয়োরের বাচ্চা উন্নয়নে একটি সম্মেলন করা ছাড়া বড় দরের কোন কাজ এখনও কিছু হয় নি। রাজ্যপালের সঙ্গে কেন্দ্রের কর্তাদের বিরোধ—সেটাও কি মুখ্যমন্ত্রী-উপমুখ্যমন্ত্রী বিরোধের চেয়ে কিছু কম। যা হোক এবার থামা যাক।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় শাসনযন্ত্র থেকে সি পি এম-কে হঠাতে চেয়েছিলেন। কারণ বড় অশান্তি হচ্ছে, শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ হচ্ছে না, [illegible]

খুন হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবার পর শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ হওয়া তো অনেক দূরের কথা, বেলেঘাটা-নারকেলডাঙায় সভ্য সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। মানুষ খুন? সে কথা তো চাবন সাহেবও বলেছেন বেড়েছে, অনেক বেড়েছে। শান্তি-শৃংখলা? হ্যাঁ, যাদবপুর আর শিবপুরে শান্তিনিকেতনে পরিণত হয়েছে। মানুষ খুন, হাত-পা কেটে নেওয়া, বোমাবাজী, ছুরি মারার মচ্ছব কবে কোথায় হয়েছে?

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যে কোন ব্যক্তি ও প্রশাসন সম্পর্কে কম কথা বলেন আর দেরীতে বলেন। যেমন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার সাত মাস পরে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মুখ খুলেছিলেন। সেই তিনিও এবার দু' মাস পরেই বলেছেন—রাষ্ট্রপতির শাসন আশাভঙ্গের কারণ ঘটিয়েছে। অবস্থার উন্নতি যা হবে আশা করেছিলেন তার কতটা হয়েছে সেই কথা বলতে চাই না। তবে রাজ্যে শান্তিরক্ষা করতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ভাণ্ডার উজাড় করে বাহিনী নিয়োগ করেছেন—বাঙালী, বিহারী, উত্তরপ্রদেশী, পাঞ্জাবী থেকে সুরু করে নেপালী, গাড়োয়ালী সেনা পর্যন্ত এসেছে ও আসছে। বড় গরীব রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু গরীবের ভাণ্ডার থেকে প্রত্যহ দুই লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে শান্তিরক্ষা করতে। কিন্তু এত করেও শান্তির কি নমুনা? শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় গলায় লাল রুমাল বাঁধা বাহিনী দেখে বিচলিত হতেন, কিন্তু আজ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি বন্দুক, বেয়নেটধারী দেখেও চুপ করে আছেন। তিনি রুমাল সহ্য করতে পারেন নি, আজ বন্দুক সহ্য করছেন। যুক্তফ্রন্ট আমলে যা ১৩ মাসে হয় নি, তিন মাসে তার চেয়ে অনেক কিছু বেশি হয়ে গেছে। যুক্তফ্রন্ট শাসনে একজন মহকুমা শাসক লাঞ্ছিত হয়েছিলেন আরামবাগে, তাই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সরকারকে অসভ্য বর্বর বলেছিলেন, কিন্তু আজ বর্ধমানে সাঁইবাড়ির সামনে ডি এম নিগৃহীত হয় জনতার কাছে আবার নদীয়ার ডি এম অপমানিত বোধ করেন রাজ্যপালের আচরণে। বর্ধমানের দুই-জন এম, এল, এ, শ্রীবিনয় কোঙার ও শ্রীগোকুলানন্দ রায়ের প্রতি কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় যে আচরণ করা হয়েছে, বেলঘরিয়ায় ইন্দু মিত্রকে ধরেও সেই রকম আচরণ করা অতীতে সম্ভব হয় নি। জনপ্রতিনিধি, বিধানসভার সদস্য—তাঁদের যদি এই অবস্থা হয়, তবে অন্য শত-সহস্র অভিযোগে [illegible] তাদের কি হচ্ছে সেই

রাষ্ট্রপতির শাসনে অনাহারে মৃত্যু-সংবাদও আজ কোন তরঙ্গ সৃষ্টি করছে না। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম প্রধান কারণ হয়েছিল লোক-সেবক সংঘ অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে হৈ-চৈ করেছিলেন, সকলে মাথায় হাত দিয়েছিলেন—যুক্তফ্রন্ট আমলে অনাহারে মৃত্যু? কিন্তু আজ? পুরু-লিয়ায় ক'জন মরেছে তার কোন হিসাব পর্যন্ত নেই! প্রথম বসুমতী পত্রিকায় চারজনের মৃত্যু খবর বেরুলো, পরে যুগান্তরে ছয়জন। জানি না আরো আছে কি না? কিন্তু সরকার থেকে এই সংবাদের কোন সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করা হয় নি। বেশ মনে আছে ১৯৪৭ সালের পর অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার বেশ কয়েক বৎসর পর ২৪ পরগনা জেলায় লবাই শেখ নামে এক ব্যক্তি অনাহারের তাড়নায় আত্মহত্যা করলো। তখন 'গণশক্তি' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হত, যার সম্পাদক ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য। সেই কাগজে হেড লাইন হয়ে লবাই শেখের মৃত্যুর খবর বেরুলো। তখন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ও খাদ্য অভিযান কমিটি নামে দুটো যুক্ত মোর্চা ছিল। সারা রাজ্যে হৈ-হৈ পড়ে গেল, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের অবস্থা শোচনীয়—কত তদন্ত, কত প্রেস নোট, কত বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি। কত মানুষ প্রত্যহ মারা যাচ্ছে, কিন্তু অনাহারে মৃত্যুকে সর্বদা একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আমরা পাঁচজন খেয়েদেয়ে বেঁচে আছি আর আমাদের মধ্যে একজন না খেয়ে মারা গেল? কিন্তু আজ পুরুলিয়া বাঁকুড়ার মৃত্যুসংবাদে সরকার বিচলিত হন না, সংবাদের তদন্ত, প্রতিবাদ বা মৃত্যুর কারণ মোকাবিলার কোন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয় না। অজয়বাবু জ্যোতিবাবুর হাত থেকে বা সি পি এম-এর হাত থেকে মুক্তি পেতে, রাজ্যের মানুষকে মুক্ত করতে পদত্যাগ করে রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে নিজেকে দোষ-দায় মুক্ত করতে চেয়েছিলেন—এই হল তার সামান্য ফলশ্রুতি।

একই কথা শ্রীজ্যোতি বসু সম্পর্কে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রধানত্ব স্বীকারে শ্রীজ্যোতি বসু অক্ষমতা জানিয়ে আইনের পর আইন ঘেঁটে আদেশের পর আদেশ চাপাচ্ছিলেন, ভাবছিলেন কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়। জ্যোতিবাবু অজয়-বাবুকে সহ্য করতে পারছিলেন না, কিন্তু আজ? রাজ্যপালের দরবারে নিবেদন করতে কোন ব্যথা পাচ্ছেন না। ও গো রাজ্যপাল, তোমার পুলিশ আমার দলের লোকদের বড় মারছে থেকে সুরু করে আমাকে সরকার গড়তে দাও—কোন আর্জি পেশ করতে শ্রীজ্যোতি বসুর সংকোচ হচ্ছে না। শ্রীজ্যোতি বসু বাংলা কংগ্রেসকে সহ্য করতে পারছিলেন না, কিন্তু আজ নানা কাতরধ্বনি তুলেও তো অনেক কিছু সহ্য করছেন। শ্রীসুশীল ধাড়া মশায় যুক্তফ্রন্ট আমলে হরতাল, ধর্মঘটে ম্যান ডে লস্ট হিসাব করে কত ব্যথা পেতেন, কিন্তু আজ এমন দিন নেই—যে দিন রাজ্যের চারটা-পাঁচটা স্থানে হরতাল-ধর্মঘট হচ্ছে না—এ যেমন সত্য, তেমনি শ্রীজ্যোতি বসু ছাত্র পরিষদের ডাকে হরতাল-ধর্মঘট সহ্য করছেন এও তেমন সত্য। এ হল এক নিয়তির নির্মম পরিহাস।

২১৮ জন সদস্যের সংখ্যাধিক্য নিয়ে শ্রীজ্যোতি বসু আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় নিত্য নতুন কাঁদুনী গাইছেন আর শ্রীগোকুলানন্দ রায়, শ্রীবিনয় কোঙারকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে নিগ্রহ করছে। তবু বলছি—এ হল সুরু, শেষ হতে এখনও অনেক বাকী।

[২৮৯৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

হাত হাছে। প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয় করা কঠিন। তবে শিবসেনার ফ্যাসিস্ট-সুলভ উপদ্রব যে মহারাষ্ট্রের সুনাম ইতি-মধ্যেই কলঙ্কিত করেছে, সে কথা কারও অজানা নেই। অ-মহারাষ্ট্রীয়দের মহারাষ্ট্র থেকে তাড়াবার কার্যক্রম নিয়ে শিবসেনার জন্ম। গোড়ায় বোম্বাইয়ে বসবাসকারী দক্ষিণ ভারতীয়দের ওপর প্রকাশ্যেই এরা নির্যাতন চালাচ্ছিল, কিন্তু নানা কারণে গভর্নমেণ্ট এদের দমন করার কোন চেষ্টা করেন নি। বরং বিভিন্ন সময়ে এদের প্রতি সরকারী আনুকূল্যই প্রকাশ পেয়েছে। আস্কারা পেয়ে এরা এখন বোম্বাই শহর এবং শহরতলীতে অবাধে খুনজখম, লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের শক ব্রিগেড হিসাবে এরা এখন শ্রমিক ইউনিয়ন ভাঙবার ব্রত নিয়েছে এবং গত সপ্তাহে একটি সভা ভাঙবার পর এরা কম্যুনিস্ট পার্টির অফিস আক্রমণ করেছিল। কম্যুনিস্ট-দের "শায়েস্তা" না করলে "নকশাল-বাড়ি" গজিয়ে উঠবে—এই অজুহাতে এরা নিজের হাতেই আইন তুলে নিয়েছে। সংখ্যালঘুদের ওপর এদের বিষ নজরের কথাও কারও অজানা নেই। শোনা যাচ্ছে ভিভাণ্ডীতে শিবসেনার একটা মস্ত ঘাঁটি আছে। কাজেই এই দাঙ্গার পেছনে

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

॥ চোদ্দ ॥

বুঝলাম অপ্রকৃতিস্থ রাণীদির অবস্থাটা।

একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তাস্রোত তাঁর মনে তোলপাড় করে চলেছে। আমাকে যেমনিভাবে বুকে চেপে ধরে রাণীদি সব কিছু ভাবনার বোঝা যেন মুহূর্তের মধ্যে আমার ঘাড়েই ফেলে দিতে চাইলেন। তাঁর কথার মধ্যে প্রথমত আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল : আমি জানতে পেরেছিলাম ওস্তাদের আস্তানায় তাঁর জীবনধারার রহস্য —তাই সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটা কথা রয়ে গিয়েছিল যেন। সে কথাও আজ তিনি পরিষ্কার-ভাবে দ্বিধাহীনচিত্তে বলে ফেললেন। সেই আমাকে খেতে বলার দিনটা তিনি উল্লেখ করলেন। সেদিন নাকি আমি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছিলাম, যে ব্যবহার সত্যি সত্যিই তাঁর মনে লেগেছিল। অর্থাৎ আমি যদি সেদিন রাণীদির সব কথাটা উপলব্ধি করে সমবেদনার আবেগে তাঁর জ্বালাটা প্রশমিত করতাম, হয়তো তাহলে রাণীদি পালিয়ে আসতেন না। জানি না রাণীদি এই কথাটাই তার মধ্যে দিয়ে আমাকে জানাতে চেয়েছেন কিনা।

সেদিন রাণীদির সঙ্গে আমি কিভাবে ব্যবহার করেছিলাম? রাণীদির বুকের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় হঠাৎ আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন খেয়ে আমার তৃপ্তি হয়েছিল কিনা, তিনি তা জিজ্ঞাসা করার মধ্যে দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিক সেদিন সোজাসুজি ওঁকে আমি জবাব দিই নি জবাব দিয়েছিলাম মন্টু আর মায়া। সেটা তাঁর নিশ্চয়ই মনে লাগবার কথা। তাতে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন ওস্তাদের আস্তানায় আগের রাতের ঘটনা আমি নিশ্চয়ই সহজ মনে এবং ভাল-ভাবে গ্রহণ করি নি। তা করলে খাওয়ার মধ্যে তৃপ্তির প্রশ্নে আমার কোন দ্বিধা থাকত না। এক সময়ে তিনি সে কথা বলেও উঠেছিলেন, 'বিজনকে আজ খেতে বলেছিলাম, কিন্তু শুধু খাবার জন্যই খেতে বলি নি। ওকে খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে ওর সঙ্গে অনেক গল্প করব মনে করেছিলাম। আমার যে কত ভাল লাগে সেই সব পুরনো গল্প কিন্তু কি করব, ও দেখ না আজ একেবারে গম্ভীর সন্ন্যাসী ঠাকুরটি। মানুষের মনের কথা ও বুঝতেও পারলে না।' কথাগুলো তিনি মায়া আর মন্টুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন বটে, কিন্তু আসল লক্ষ্যটা যে আমাকে চাবুক মারা তা আমি রীতিমতভাবে উপলব্ধি করেছিলাম এবং মন্টু আর মায়া

ঘর থেকে চলে গেলে সে অনুযোগ আমি রাণীদির কাছে উপস্থাপিত করেছিলাম।

রাণীদি আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি। নিজের আহত মনের অভিব্যক্তিকে ভিত্তি করে বলে উঠেছিলেন, বুঝি রে বিজন বুঝি—পুরুষ মানুষ তুই। মেয়েদের সম্বন্ধে তোরা একটা কথাই শিখে রেখেছিস—আর, সে কথাটা তার অসম্মানের কথা, তার নিচে নামার কথা। মেয়েরা যে পাঁকেও পদ্মফুলের মত ফুটে ওঠে—সে কথা তোরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারিস না।

সত্যিই হয়তো পুরুষ মানুষের স্বভাব তাই।

কিন্তু আমি তো জীবনে এসব তলিয়ে দেখি নি। তলিয়ে দেখার আমার সুযোগও আসে নি কখনো। তাই আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম শুধু। বেশ মনে আছে সে সময়ে রাণীদির চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল একটা যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি। প্রাণপণে তিনি আমাকে বোঝাতেও চেয়েছিলেন। সেদিন এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে আমি বলেছিলাম সে কথা যদি কখনও সুযোগ আসে বলব। কিন্তু শুনতে শুনতে আমি আর সহ্য করতে পারি নি, উঠে পালিয়ে এসে-ছিলাম রাণীদির কাছ থেকে।

সেদিন রাণীদি আবেগকম্পিত কণ্ঠে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি এখানে এসেছি, কি জন্য এসেছি পৃথিবী হয়তো কোনদিনই জানবে না বিজন। আমার পরিচয় হয়তো এইভাবেই চিরদিনের জন্য লেখা হয়ে যাবে—একটা মেয়ে কুলত্যাগ করে চলে এসেছিল দুরন্ত কামনার আবেগে। হাঁ, কামনা বাসনা আমার সত্যিই ছিল। আজও আছে। আর একথাও সত্যি তারই আবেগে আমি এসেছি। কিন্তু সেই কি আমার সব? বিজন, আমার রূপ আছে, আমার যৌবন আছে—তুই দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ আমার এ রূপের অগ্নিশিখা কেমন লক্ লক্ করে ওঠে—'

আমি বলেছিলাম, 'ছিঃ আমাকে তোমার রূপের কথা বলতে লজ্জা করছে না?'

'লজ্জা—লজ্জা করবে কেন', রাণীদি বলেছিলেন, 'আমার রূপের শিখা যখন আগুনের মত লক্ লক্ করে ওঠে, তখন বিজন আমি পুড়ে মরি না রে, পুড়ে মরে ওরা।' কথাগুলো বলে তারপর তিনি সেদিন সেই দুপুরে এমন হেসে উঠেছিলেন যে, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অমন ভয়ঙ্কর হাসি কখনো কোন মহিলাকে আমি হাসতে দেখি নি। বীভৎস সে হাসি, কিন্তু অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত। হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন, আমার রূপের আগুনে পুড়ে মরতে ওরা ছুটে ছুটে আসে—ঠিক যেমন করে আসে কীট পতঙ্গ তেমনি করে। ওদের সর্বাঙ্গ পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। কিন্তু ওদের স্বভাব হচ্ছে জন্তুর স্বভাব। ওরা আঁচড়ায় কামড়ায় আবার পায়ে মাথা খোঁড়ে, সুর করে মড়া-কান্না কাঁদে। জানোয়ারের কামনা কত মর্মান্তিক হাস্যকর তা তুই দেখিস্ নি রে, তা তুই দেখিস্ নি! যদি দেখতে চাস—

আমি চোখ দুটো বুজে ফেলে বলে-ছিলাম, 'না না রাণীদি, তুমি এসব কথা আমাকে বোলো না। শুনিও না—আমি এ বেশ আছি—'

'তুই শুধু আমার হাসিটাই দেখলি', রাণীদি বলতে লাগলেন, 'দেখলি না তার আড়ালে আমার সর্বংসহা জীবনের গভীর ক্ষতগুলো। তোকে আজ দেখাতেই হবে। কাল রাতে যে মূর্তি তুই আমার দেখেছিস, সেই আমার সব নয়। চেয়ে দ্যাখ তুই চেয়ে দ্যাখ ..সঙ্গে সঙ্গে মনে আছে সেদিন রাণীদি পিছন ফিরে ব্লাউজ-খানা খুলে ফেলে আঁচলটা বুকে চাপা দিয়ে দু' পাশের পাঁজরা দুটো আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই যে সব দাগ

[illegible] কতো জন্তুজানোয়ারের মধ্যে আছি। ভাবতে পারিস তুই—ভাবতে পারিস্ রে?'

রাণীদি কি বলতে চাইছিলেন তা আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু ঘটনার গুরুত্বে আমার মাথা যেন কেমন ঘুরে গিয়েছিল বলে অনুভব করছিলাম।

এবার রাণীদি যেন আরও কঠিন হয়ে বলে উঠলেন, 'এরপর আরও দেখবি, আরও...'

বলেছিলাম, 'রাণীদি না না--আমি ওসব দেখতে চাই না। তুমি এমন করে নিজেকে তুমি যা নও তা প্রমাণ করতে যেও না।'

'কি বললি তুই?' রাণীদি যেন গর্জন করে উঠলেন।

আমি বললাম, 'যা বলেছি ঠিক বলেছি -'

'না না না', রাণীদি আঁচলটা চট করে বুকে আর গলায় জড়িয়ে নিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন বসে বসে। তারপর হাঁটুর ওপরে উরুদেশ পর্যন্ত কাপড়টা সরিয়ে দেখালেন কতকগুলো বড় বড় দাগ। আমি চকিতে একবার দেখলাম দাগগুলো। তারপর মুখ তুলতেই দেখলাম রাণীদির ঠিকরে পড়া আগুনের মত দৃষ্টি। বললেন, কি জানিস এগুলো—এগুলো হচ্ছে জন্তুদের কামড়! বিজন এ শুধু এখানেই নয় চেয়ে দ্যাখ, তারপর তিনি আমাকে দেখালেন তাঁর গন্ডদেশ।

আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না। জীবনে কখনো আমি এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নি। জানিও না এসব ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে। বাস্তবিক আমি তখন যেন কাঁপছিলাম থর থর করে। রাণীদি তেমনিভাবেই বলে যেতে লাগলেন, বিজন আমারও কামনা আছে, আমারও বাসনা আছে, কিন্তু তোকে আমি কেমন করে বোঝাবো যে আমি ভেসে যাই নি, আমি পাঁকে নামি নি। আমি তোকে কেমন করে বিশ্বাস করাবো যে যদি আমার কখনো সন্তান হয় তবে তার জন্মদাতা হবে একমাত্র আমার স্বামী, অন্য কেউ নয় অন্য কেউ নয়। সর্বদা আমি আমার সেই ধ্যান সেই ধারণাকে বজায় রেখে এসেছি এত হিংস্রতার মধ্যেও। গতকাল রাতে আমার হাতের ছোরাখানা তুই নিশ্চয়ই দেখেছিস—হ্যাঁ সেই ছোরাখানাই আমার নিত্য সহচর, আমার মানমর্যাদা রক্ষার বিশ্বস্ত প্রহরী, একমাত্র সেই আমার সাক্ষী, ভরসা, আমার স্বামীর মত আমার একান্ত আপন। ওরই জন্যে কখনও আমি কারোকে ভয় করি নি, করবও না কোনদিন।'

তাই যদি তোমার মনের কথা হয়, আমি বলেছিলুম, 'তুমি এখানে এসে [illegible] কেন? নিজেকে [illegible] দিয়ে আজ তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাইছো?'

রাণীদি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন এরপর, 'তবুও তুই আমাকে অবিশ্বাস করছিস্?'

'আমি যে নিজে চোখে দেখেছি তোমাকে।'

এরপর রাণীদি ফুঁসে উঠেছিলেন আর বলেছিলেন, 'ওরা গান্ধীটুপি মাথায় দিয়ে কেউ মন্ত্রী, কেউ রেলের বড় অফিসার, কেউ পুলিশের কর্তাব্যক্তি, কেউ সমাজ-সেবী, কেউ বড় ব্যবসায়ী—খবরের কাগজে ওদের ছবি বেরোয়, বাণী প্রচারিত হয়। ওরা তোদের চোখে সাধু সজ্জন মান্যগণ্য ব্যক্তি—আর তোর রাণীদি যে সারা জীবন ধরে খুঁজে খুঁজে ফিরেছে মাত্র একটি মানুষের একটুখানি আশ্রয়, এতটুকু ভাল-বাসা সে চিরকাল থাকবে ঘৃণ্য হয়ে, অপরাধিনী হয়ে? এই কি তোদের পুরুষ মানুষের বিচার, সমাজের ন্যায়দন্ড, দেশের ধ্যানধারণা? বল্ বল্ বিজন, তুই বল আমাকে, চুপ করে থেকে তুই আমার মাথায় ঘৃণার পাঁক ছিটিয়ে দিয়ে যাস্ নি।'

সেদিন আমি আর থাকতে পারি নি সেখানে, ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম। তিল তিল করে প্রতিমার মত গড়ে তোলা মূর্তি আমার রাণীদির, সে মূর্তি ভেঙে গেছে। তার প্রতি যেন আর আমার কোন মোহ নেই। কিন্তু তার পর দীর্ঘ ক'টা মাস কেটে গেছে। প্রকৃতির বুকে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে টুনটুনি আর মন্টুর জন্মরহস্য! হ্যাঁ, তারপর থেকেই আমার চিন্তাধারাটা কেমন যেন বদলাতে সুরু করেছে রাণীদির সম্বন্ধে। কে জানে হয়তো এই সূত্র ধরেই রাণীদি এখানে এসে উঠেছিলেন। হতেও পারে। কেন না তিনি তাহলে এদের পেলেন কি করে? আর ওরাই বা চিনল কি করে রাণীদিকে? এখান থেকেই আবার মনে আমার একটা ক্ষীণ আশা হয়েছে। তাই মনে মনে কেবলই আশা করেছি, যা জেনেছি আমি যেন তা কখনো সত্যি না হয় এবং তা না হলেই আমি হব সবচেয়ে খুশি, সব-চেয়ে সুখী।

রাণীদি কিন্তু সেদিনের সে ঘটনা কিছুই ভোলেন নি। আমি আসতে না আসতেই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য এই রাণীদি, আশ্চর্য তাঁর চরিত্র। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে দৃশ্য দেখেছি, সেও সেই অভিশপ্ত জগতেরই ধারাবাহিক একটানা জের। রাণীদি বর্ণিত ভূভারতের উৎসর্গ করা পাঁটা যখন কাপুরুষের মত পালিয়ে গেল, তখন রাণীদির করার আর কিছু ছিল না। আমার মনে হল ঠিক সেই মুহূর্তে রাণীদির গোটা জীবনটা যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো আর সেটাকেই তিনি আমার সামনে তুলে ধরে যেন নতুন করে আমাকে বোঝাতে চাইলেন নিজেকে।

বুকের মধ্যে বন্দী করে আমাকে একটি কথা তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ রে বিজন, আজও কি তুই তেমনি করে ঘৃণা করিস্ আমাকে?'

বললাম, 'ঘৃণা তো তোমায় আমি করি না রাণীদি! তোমার জন্যে আমি আহত—'

আমাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমার জন্যে তুই আহত?'

'হ্যাঁ রাণীদি।'

'আমাকে বেশি ভালবাসতিস বলে তোর বেশি লেগেছে—এ আমি জানি। আর তারই জন্যে আমি সেই অভিশপ্ত জগৎ থেকে চলে এসেছি এই দূরে, তোর দৃষ্টির বাইরে।'

'এটাই কি তোমার ঠিক কথা রাণীদি?'

'হ্যাঁ রে। তুই বিশ্বাস করতে পারছিস্ না?'

'বিশ্বাস করতাম যদি না তোমার ঐ ভূভারতের পাঁটাটিকে এসেই দেখতাম।'

'কিন্তু কিভাবে তুই ওকে দেখলি সে কথা একবার ভেবে দ্যাখ্।'

'হ্যাঁ তাও দেখেছি, কিন্তু ও তোমার সন্ধান পেলে কি করে, আর তা ছাড়া লোকটা তোমার কাছে এলই বা কেন?'

'এল কেন', রাণীদি বললেন, 'সে কথা তো বুঝে নেয়া উচিত। তবে সন্ধানটা পেলে কি করে সে কথাটা আমিও ভাবছি।'

[illegible] ওরা খবরাখবর রাখে।'

রাণীদির একথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। আমি তারপর রাণীদিকে খবরের কাগজে লোকটার সম্বন্ধে উল্লেখ করে বললাম, 'তুমি এসব জানো কি?'

'না জানতুম না—তবে ও-ই আমাকে আজকে জানিয়ে দিলে।'

'ও-ই জানালে?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে ওর কি লাভ?'

'লাভ—লাভ নিজের বুদ্ধির দৌড় দেখানো। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'তা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানতে পারবে না, অতএব আমাকে লোকটা নিজের করে পেয়ে যাবে এই ওর ধারণা।'

একথা আমিও বুঝেছিলাম খবরটা পড়েই। তা ছাড়া আড্ডার মধ্যেও রাণীদির জন্যে ওদের কাতরানি আমি নিজে প্রত্যক্ষ করে এসেছি। সম্ভবত রাণীদির রূপের আগুনে পুড়ে মরতে ওরা ভালবাসে। রাণীদির কথায় আমার মন বেশ নরম হয়ে এসেছিল। তবু মনের মধ্যে সেই একটি প্রশ্ন বারে বারে আবর্তিত হয়ে উঠছিল: রাণীদি তুমি এলে কেন এপথে, কেন এলে সে কি আমাকে সোজাসুজি বলতে পারো? প্রশ্নটা রাণীদিকে করতেও পারছিলাম না। কারণ একটা সত্য, টুনটুনি আর মন্টুর জন্মরহস্যের সত্য আমি আবিষ্কার করেছি—মুহূর্তের ভুলে রাণীদির কাছ থেকে আসল জবাব সে সম্পর্কে হয়তো নাও পেতে পারি। রাণীদি হয়তো ওদের কথার মধ্যে দিয়ে নিজে পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজে নিতে পারেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় রাণীদির নেশাটা বোধ হয় প্রায়ই কেটে যাচ্ছিল। আমাকে সোফায় বসতে ইঙ্গিত করে বললেন কিন্তু তুই আজ হঠাৎ এখানে এলি কি করে?'

বললাম, 'ঐ খবরের কাগজ—'

'খবরের কাগজ দেখে তুই কি করে বুঝলি যে আমি এখানে আছি?'

[illegible] হলে তোমার [illegible] পাটার [illegible] ওভাবে বেরুবে কেন?'

রাণীদি আমাকে তারিফ করে বললেন, 'তুই দেখছি গোয়েন্দারও ওপর যাস।'

'সেইজন্যই তো রাণীদি তোমার সব কথা আমি সব সময়ে বিশ্বাস করতে পারি না। বললাম, তুমি তো জানো রাণীদি আমার মনের মধ্যে সব সময়ে একটা অনুসন্ধিৎসু মানুষ আছে। আমি যে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারি না যতক্ষণ না আমার শেষ কথা জানা হচ্ছে ততক্ষণ আমি কেবলই হাতড়াই, হিসাব মেলাই।'

'আজ কি হাতড়ালি, কি হিসাব মেলালি বল দেখি?'

'সবই হিসেবে মিলেছে রাণীদি। শুধু মিলল না তোমার মদ খাওয়াটা!'

'কেন?'

'তুমি যখন চলেই এসেছিলে ওখানকার আড্ডা থেকে, তখন তো তোমার মদ খাবার কথা নয়। তুমি নিশ্চয়ই ওসবকে পরিত্যাগ করবে এই ছিল আমার বিশ্বাস। অথচ—'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস। সেই রাতে যেদিন তুই আমাকে ওখানে দেখেছিলিস সেইদিনই আমি ছেড়ে দিয়েছি ঐ জিনিস। কিন্তু এই লোকটা এসেছিল, সংগে নিয়েই এসেছিল মদ, ওর কাছে নিজেকে আড়াল করব না বলে, ওকে আমার মনের কথা জানতে দেবো না বলে খেয়েছিলুম। আর অনেকদিন পরে খেয়েছিলুম বলে, একটু বেসামালও হয়ে পড়েছিলুম। এখন—

এখন আর কি, বললাম, 'আমার হিসাবই মিলে গেল।'

সেই রাতে প্রকৃতিস্থ রাণীদির সংগে আমার অনেক কথা হল। সর্বপ্রথম তিনি নিজের খাবারটা খাওয়াতে এলেন আমাকে। আমি কিছুতেই শুনলাম না। দুজনে এক সংগে সেই খাবার খেলাম। তারপর কত গল্প, কত কথা। আমি একে একে বললাম, মন্টু আর টুনটুনির জন্মরহস্যের কাহিনী। অবাক হয়ে গেলেন রাণীদি। মন্টুর গুলী লাগার কথায় রাণীদি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তারপর আমার রক্ত দেওয়ার কথায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'তোর ঋণ কখনো শুধতে পারব না বিজন। ভাগ্যি তুই ছিলি।'

এরপরে মায়া, শংকর আর তাদের মায়ের কথাও বললাম। সব শুনে রাণীদি বললেন, 'মুস্কিল কি জানিস—মুস্কিল হচ্ছে ঐ বসন্তটাকে নিয়ে। বসন্তই হচ্ছে এই অভিশপ্ত জগতের সবচেয়ে বড় মমতাহীন নিষ্ঠুর চরিত্র। ওর কপালে কাটা দাগটা দেখেছিস—'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

[illegible] ওর কপালে!

'তুমি?'

'হ্যাঁ। তখন আমি প্রথম এসেছি এখানে। ক্ষুধিত জানোয়ারের মত ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর। কিন্তু আমি যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকি সে তো আর ও জানত না। ব্যস্ বসিয়ে দিলুম একটা ঘা ওর কপালে। সে এই ছুরি, এরই দুরন্ত আঘাত ওর কপালের সেই চিহ্নটা। ওদের ওস্তাদ তারিফ করেছিল আমাকে।

বসন্ত সম্পর্কে রাণীদির মতামতটায় সংগে আমার কোন গরমিল নেই। আমিও জেনেছি লোকটা রীতিমত নিষ্ঠুর। ও পারে না এমন কোন কাজ নেই। কিন্তু রাণীদি তার কপালে ছোরা বসিয়ে দেয়ার যে কাহিনী বললেন, তা থেকে আমার আরও যেন কিছু কথা মনে হতে লাগল। ওদের ওস্তাদ তারিফ করেছিল রাণীদিকে। কেন—ওস্তাদ কেন তারিফ করবে রাণীদিকে? বসন্ত ওস্তাদের ডান হাত। ওস্তাদ যেখানে সম্রাট, বসন্ত সেখানে মন্ত্রী। সেই বসন্তকে আঘাত করলে ওস্তাদ কেন তারিফ করতে যাবে রাণীদিকে? তার তো রাগ হবে, সে তো প্রতিহিংসায় ফেটে পড়বে! সে তারিফ করতে যাবে কেন?

মায়ার মা বলেছিলেন, রাণীদি ওস্তাদের রক্ষিতা। তবে কি সে কথাই সত্যি?

কথায় কথায় রাত্রি ভোর হয়ে এসেছিল। আমি বললাম, 'রাণীদি এবার আমাকে যেতে হবে। মায়ারা আমাকে সকাল-সকাল ফিরতে বলেছিল, কিন্তু সারা রাত আমার কেটে গেল এখানে। হয়তো ওরা কত ভাবছে কিম্বা ওদের কোন বিপদও ঘটতে পারে। আর আমি দেরি করব না—

'তা না হয় যাবি, কিন্তু আমি কি করব বল দেখি।' রাণীদি হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, 'তুমি কি করতে চাও বলো?'

রাণীদি বললেন, 'মন্টুর জন্যে মনটা আমার কেমন ছটফট করছে।'

'তাহলে চলো—দেখে আসবে গিয়ে।'

'কিন্তু গেলে কি আর—'

'সংগে সংগে ফিরে আসতে পারবে না—এই তো?'

'ঠিক তাই', তারপর কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'তা হোক আমি যাব। তবে তুই যা আমি পরে যাচ্ছি।'

নাটকের এক সংকটময় মুহূর্তে আমি কাননানী ম্যানসনে এসেছিলাম। [illegible] যখন, তখন সব কিছু [illegible] আর [illegible]।

[ক্রমশঃ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ আট ॥
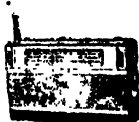
ব্লক সি, এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের ডোর বেলটা টিপেও মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর মনে হল, দরজার ওপরে কাচ-বসানো ছোট গোল গর্তটির ভেতরে যেন একটি তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টি। দরজাটা খুলল তারও পরে।

সাবিত্রী বললে, 'ও তুমি?'

প্রবীর বললে, 'খুব নিরাশ হয়েছ মনে হচ্ছে। আর কাউকে আশা করেছিলে নাকি?'

একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসল সাবিত্রী।

'আশা করতে দোষ কী? তুমি তো ভুলেই গেছ। কিন্তু দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে—ভেতরে আসবে না?'

দু' ঘরের কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাট। একা সাবিত্রীর জন্যে এর বেশি জায়গা দরকার হয় না। বাইরের ঘরে তার বইপত্র, ক'টি বসবার আসন। অল্প খরচে যেটুকু সাজিয়ে রাখা যায়।

সাবিত্রী বললে, 'একটু বোসো, আসছি।'

একটা টিপয় থেকে দুটো চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

দুটো পেয়ালা। তার মানে দুজনে চা খাচ্ছিল একসঙ্গে। এবং অনুমান করা যেতে পারে, চা খাওয়াটা এই মাত্র শেষ হয়েছে। আজ সাত বছর ধরে সাবিত্রীর স্বভাব তার জানা। সব জিনিস সে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখতে ভালোবাসে। চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে পেয়ালা-পিরিচ ফেলে রাখবে সে ধাতই তার নয়। তা হলে, এক্ষুণি, একটু আগেই আর কারো সঙ্গে চা খাচ্ছিল সে।

অবশ্য সে যে-কেউ হতে পারে। হয়তো তার কলেজের কোনো সহকর্মী এসেছিল, কোনো ছাত্রী আসতে পারে, যে-কোনো আত্মীয়-স্বজনেরও আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু দরজার বেল বাজিয়েও দু' মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল কেন? এবং সাবিত্রী দরজা খুলে দিলে কেন মনে হল, তার মুখে-চোখে একটা ভয়ের ছাপ পড়েছে কোথাও?

নিজের ভাবনার গতিটা লক্ষ্য করে প্রবীর লজ্জিত হল। ছি ছি, গোয়েন্দাগিরি করছে নাকি সে? অথবা, একটা জেলাসির কাঁটা খচ-খচ করে উঠেছে তার মনের ভেতরে? কিন্তু জেলাসির তো কারণ নেই কিছু। সাবিত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা তার গড়ে উঠেছে গভীর একটা বন্ধুত্বের মতো। হয়তো যে-কোনোদিন একদিন বলা যেতে পারত: 'এসো, আমরা বিয়ে করে ফেলি' এবং সাবিত্রীও হয়তো বলতে পারত: 'আপত্তি নেই, করো বন্দোবস্ত।' কিন্ত বলা হয় নি। ঠিক বলবার মতো সময়টাই আসে নি, কিংবা মেজাজটাই তৈরি হয় নি, অথবা অবচেতনভাবে এই বাধাটাই প্রবীরের ছিল—সাবিত্রী এম-এসসি কলেজে পড়ায়, তার মতো সাধারণ গ্র্যাজুয়েট একজন করণিককে বিয়ে করাটা তার পক্ষে—

অতএব সময় গড়িয়ে গেছে। সাবিত্রীও তো এগিয়ে এল তিরিশের দিকে। এখন যদি কাউকে তার ভালো লেগে থাকে, বিয়ে ঠিক হয়ে যায় এবং এই মুহূর্তে লাল কালিতে ছাপা একখানা হলুদ রঙের চিঠি হাতে করে সে যদি এসে বলে, 'আসছে সোমবার আমার বিয়ে, এসো কিন্তু—' তা হলে হাসিমুখে অভিনন্দন জানাতেও তার কিছুমাত্র দ্বিধা হওয়া উচিত নয়।

সাবিত্রী এল। হলুদ রঙের চিঠিখানা অবশ্যই তার হাতে ছিল না।

'তোমার জন্যে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে এলুম।'

'আর তুমি?'

'আমি এক্ষুণি খেয়েছি।'

'কার সঙ্গে'—এই প্রশ্নটা এগিয়ে এল মুখের সামনে। সেই জেলাসি। ছি ছি, কোনো মানে হয়?

সাবিত্রী মুখোমুখি বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললে, 'একেবারে ভুলে গেছ মনে হয়।'

'কী করব? আমি থাকি দক্ষিণের শহরতলীতে, তুমি ফ্ল্যাট কিনলে উত্তর মেরুতে। তোমার কাছে আসতে হলে এক মাস আগে থেকে প্রোগ্রাম করতে হয়।'

আবার হাসল সাবিত্রী;

'আগে হলে আমার কাছে আসবার জন্যে বর্ধমান পর্যন্ত ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতেও তোমার আপত্তি হত না।'

'ঠিক কথা। কিন্তু উভয়ত। আগে হলে সপ্তাহে অন্তত দিন তিনেক দক্ষিণ শহরতলীর আলো-বাতাস তোমার খুব স্বাস্থ্যকর বলে মনে হত।'

'শোধবোধ। কিন্তু কী হয়েছে জানো—ল্যাবরেটরি থেকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস সেরে বেরুতে বেরুতে প্রায়ই সন্ধ্যে হয়ে যায়। তা ছাড়া দু'-চারজন স্টুডেন্টও আসে, তাদেরও দেখিয়ে দিতে হয় এক-আধটু।'

'মানে টিউশন? কলেজের মাইনেয় একা মানুষের চলে না? খুব টাকা জমাচ্ছ বোধ হয়?'

সাবিত্রী আবার হাসল: 'সবাই টাকা দেয় না। কিন্তু টিউশন তো করতেই হবে। কিস্তিতে ফ্ল্যাট কিনেছি জানোই তো। সে টাকা শোধ দিতে হয়।'

'ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিলে। ভেবেছিলুম, ধার চাইব।'

টাকার দরকার তোমার?'—সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক হল: 'নেবে তুমি? শ'-তিনেক টাকা পেয়েছি ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে—কাছেই হয়েছে। নিয়ে যাও না?'

'যদি শোধ না দিই?'

'দিতে হবে না।'

'এরকম মহাজন তো পাওয়া যায় না।'

'মহাজন ঠিকই বসে আছে।'—সাবিত্রীর চোখের তারা নিবিড় হয়ে এল: 'বসে বসে তার দিন কাটে। কিন্তু খাতকেরই দেখা নেই- সাধ্যসাধনা করেও তাকে পাওয়া যায় না।'

সেই সাবিত্রী! জেলাসির খোঁচাটুকু নিশ্চয়ই এসে কোথায় মিলিয়ে গেল।

সাবিত্রী আবার বললে, 'সত্যি, নাও না টাকা। তুমি টাকা নিলে আমার খুব ভালো লাগবে। তোমাকে তো কোনো-দিন আমি কিছু দিতে পারি নি।'

সমস্যা ঠিক এখানেই। এখনই বলা যায়, শুধু টাকা কেন, টাকার মালিককে পর্যন্ত আমার দরকার। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যে বাধাটা একটা সীমার পরে আর এগোতে দেয় নি, এবারও সেইটেই এসে দাঁড়িয়ে গেল মাঝখানে।

সাবিত্রীর একটা হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিলে প্রবীর।

'সত্যি টাকার দরকার নেই এখন। হলে নিশ্চয় চাইব। তুমি ছাড়া কার কাছে চাইতে পারি আর?'

হাতের চাপটা বোধ হয় একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। একটা চাপা যন্ত্রণার শব্দ বেরুল সাবিত্রীর মুখ থেকে।

'কী হল, লাগল?'

'না-না-—' সাবিত্রী লজ্জা পেলো: 'এমন কিছু নয়।'

হাত খুলে গিয়েছিল দু-জনের। প্রবীরের চোখে পড়ল, সাবিত্রীর বাঁ-হাতের তর্জনীতে ফ্রেশ কালার ব্যান্ডেজ একটা।

'কী হয়েছে হাতে?'

'কিছু না। ল্যাবরেটরিতে একটা টেস্ট-টিউব ভেঙে গিয়ে—'

'সাবিত্রী?'

'অ্যাঁ?'

'আমাদের দু'জনেরই বয়েস বাড়ছে—না?'

'বাড়ছে।'

'এরপরে আমরা বুড়িয়ে যাব?'

'তাই নিয়ম।'

'এখন ভাবছি—'

সাবিত্রী দু' চোখভরা স্নিগ্ধতা নিয়ে তাকালো।

কিন্তু কী বলা যায়? সময়টা আবার ফিরে এসেছে। কিভাবে বলা যায় কথাটা? অথবা বলা যায় আদৌ? কতখানি পর্যন্ত মনের দিক থেকে এগিয়ে আছে সাবিত্রী? সে নিজেও? টুকরোটা বসে যাচ্ছে। চারদিকে থমথম করছে অনিশ্চয়তা। সেও কি তৈরি হতে পেরেছে?

'দিদি, অগত্যা চা-টা আমাকেই করে আনতে হল।'

ঘরের ভেতরে একটা বোমা ফাটলেও এতখানি চমক লাগত না দুজনের। সাবিত্রী প্রায় লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে, বেকুবের মতো চেয়ে রইল প্রবীর।

চায়ের পেয়ালা হাতে করে আনন্দ।

আনন্দ আবার বললে, 'দেখলুম, চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে স্রেফ ভুলে গেছে সাবিত্রীদি, ওদিকে সব জল স্টিম হয়ে আকাশে রওনা দিয়েছে। তাই তোমাদের আর ডিসটার্ব না করে নিজেই ভুলুদার জন্যে চা করে আনলুম। কিছু মনে কোরো না সাবিত্রীদি, যদিও তুমি এক্ষুণি আমায় চা খাইয়েছ, তবু নিজের জন্যে আর একবার হাফ কাপের লোভ সামলাতে পারলুম না।'

বলে, নির্বিকারভাবে চায়ের একটা পেয়ালা নামিয়ে দিলে প্রবীরের সামনে।

প্রবীর একটা ঢোক গিলল: 'আনন্দ, তুমি এখানে।'

'একেবারে চলতি অর্থে অতিথি, ভুলুদা। ভোরবেলা উঠে সাবিত্রীদিকে জাগিয়েছি, আবার আজকে শেষ রাতে উধাও হয়ে যাব। তোমাদের গল্পে ডিসটার্ব করলুম, কিছু মনে কোরো না। আমি আবার গা-ঢাকা দিচ্ছি যবনিকার অন্তরালে।'

'তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না-' সাবিত্রীর ফর্সা গালে লালের ছোপ পড়ল। হাতে হাত মেলানোটা লক্ষ্মী-ছাড়া আড়াল থেকে দেখেছে কিনা কে জানে! সাবিত্রী বললে: 'বলেছিলি তোর কথা যেন কাকপক্ষীতেও জানতে না পারে। বেরিয়ে এলি যে?'

'ভুলুদার অনারে।'—আনন্দ হাসল: 'পাশাপাশিতে বাড়িতে যখন থাকতুম, তখন অনেক আইসক্রীম আর ডালমুট খাইয়েছে ভুলুদা। ওর জন্যে এক কাপ চা-ও আমি করে দেব না?'

সাবিত্রীর গালে তখনো লালের আভা: 'সত্যি—চায়ের জল যে চাপিয়ে এসেছি, মনেই ছিল না। ডাকলি নি কেন আমাকে?'

'ডিসটার্ব করাটা উচিত হবে বলে মনে হল না।'

'তুই ভারী ফাজিল হয়ে গেছিস আনন্দ।'

শব্দ করে হেসে উঠতে গিয়েও আনন্দ সামলে নিলে। আবার ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল, প্রবীর তাকে ডাকল। আনন্দ ফিরে এল।

'বোসো আনন্দ।'

আনন্দ অন্ধকারে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'শী ইজ এ ফ্রাউড।'

'বেশি জ্যাঠামো করিস নি, চড় লাগাব একটা।'

ডোর-বেল টিপে দু' মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা, গর্ত-বসানো কাচের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখের দৃষ্টি, সাবিত্রীর মুখে একটা ভয়ের ছায়া—প্রবীরের কাছে সবগুলোর অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। আনন্দ বসে পড়ে বললে, 'চা খাচ্ছ না কেন ভুলুদা? একেবারে অখাদ্য হয় নি তা বলতে পারি তোমাকে।'

চায়ে চুমুক দিলে প্রবীর।

'চায়ের কথা ভাবছি না, কিন্তু এ কী চেহারা করেছ আনন্দ।'

'এর চেয়ে ভালো কী করে থাকা যায় প্রবীরদা। তোমাদের পুলিশ রাতদিন তাড়া করে ফিরছে যে। তাদের ধারণা দু-তিনটে জোতদারের যে অপঘাত ঘটেছে তার জন্যে নাকি আমিই দায়ী।'

'কে দায়ী, সে তোমরাই জানো আর পুলিশই জানে। কিন্তু আমাদের পুলিশ বলছ কেন?'

আনন্দ নিজের চা-টা শেষ করে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে হাসল একটু।

'তোমাদেরই তো রাজত্ব এখন। যুক্ত-ফ্রন্টের।'

'যুক্তফ্রন্ট সকলেরই—' সাবিত্রী বলে উঠল: 'তোদেরও।'

'আমাদেরও? না। আমরা ওতে বিশ্বাস করি না।'

'কেন করিস নে? তোরা যা করছিস সে পথ ধরে কোথায় পৌঁছুবি?'

'আমরা কোথায় পৌঁছুব তার জবাব পরে দিচ্ছি—' চোয়াল ভেঙে বাওয়া গালের ওপর কালিপড়া কোটরের ভেতরে দুটো চোখ দপদপ করে উঠল আনন্দের: 'কিন্তু সাবিত্রীদি—যুক্তফ্রন্ট বলতেও দেশ নয়—চৌদ্দটা দল মাত্র। তারপর এর হাঁড়ি ধরে ওর টানাটানি, এর নামে ওর কুৎসার পাঁচালি, শেষে এর মাথায় ওর লাঠি-হাঁকড়ানো। কী হল শেষ পর্যন্ত? অক্সিজেন দিয়েও বাঁচাতে পারবে না এখন। অথচ কী বিশ্বাসই করেছিল দেশের লোক, আর কত স্বপ্নই দেখেছিল আবু হোসেনের মতো!'

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'কিছুই হয় নি বলতে চাও?'

'ষোলো আনার প্রমিজ ছিল, দিয়েছে আধ পাই। এর চাইতে কোন্ অংশে খারাপ ছিল কংগ্রেস? তাদের অন্তত একটা পার্টিগত ইউনিটি ছিল। তোমরা হয়তো তাদের চেয়ে আধ পাই কিংবা এক পাই বেশি দিয়েছ, কিন্তু কোন্ মূল্যে?

আগে অন্তত শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য ছিল—সংগ্রামের একটা সর্বজনীন রূপ ছিল। তোমরা তাদের মধ্যে তৈরি করেছ ভাঙন—একদল কৃষক নিয়ে আর একদল ক্ষুধিত কৃষকের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, এক জঙ্গী শ্রমিক, মালিকের দালালকে নয়—আর এক জঙ্গী শ্রমিককে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে মারছে, এই হল তোমাদের যুক্তফ্রন্টের অবদান?'

'বেনামদার জমি-দখলের ব্যাপারে দু-চারজন কৃষক খুন হয়েছে হয়তো। ধান-কাটা নিয়ে প্রতি বছর বাংলায় যে সব দাঙ্গা হয়—'

'মন্ত্রিত্বের গদীতে বসে প্রেসের কাছে ও-রকম বিবৃতি দাও দাদা—বেশ ভালো দেখাবে। কিন্তু নিজেরাই ভালো করে জানো যে কত ফাঁকি আছে এ-সবের মধ্যে। কিন্তু তোমাদেরও দোষ নেই। পার্লামেন্টারি রাস্তায় বিপ্লব করতে গেলে এই-রকম অত্যাশ্চর্য ফলই লাভ হবে।'

'কিন্তু তোমাদের সশস্ত্র বিপ্লব এত সহজে আসবে? তোমরা চীনের পথ সামনে রেখেছ, কিন্তু লং-মার্চের দেশ-কালের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটে গেছে এখন। এই ভারতবর্ষে ক' ইঞ্চি জমি আছে যেখানে মুক্তাঞ্চল গড়বে তোমরা? ইন্ডিয়ান আর্মি চিয়াঙের সেই অসন্তুষ্ট বিশৃঙ্খল বাহিনী নয় যে রাইফেল কাঁধে করে তোমাদের সংগ্রামের শরিক হবে। ম্যাকাডাম রোড—হেলিকপ্টার—সাঁজোয়া গাড়ি—মডার্ন মিলিশিয়া—কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে সামনে?'

আনন্দ মুচকে হাসল।

'একটু স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে ভুলুদা। সামনে ভিয়েতনাম রয়েছে।'

'হাঁ, ভিয়েতনাম। কিন্তু কিছু বিদেশী আর কিছু ভাড়াটে সৈন্য ছাড়া সেখানে প্রতিজন দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকের মনে মার্কিন জঙ্গীবাদের ওপর অসহ্য ঘৃণা। কিন্ত সেই মানসিক ঐক্য আছে ভারতবর্ষে? যেখানে থেকে থেকে সাম্প্রদায়িকতার নাড়ীতে টংকার বেজে ওঠে, গুপ্তধন পাবার আশায় এখনো লোকে নরবলি দেয়, গো-হত্যা বন্ধ নিয়ে দিল্লীতে সব চাইতে বড়ো আন্দোলন ফেটে পড়ে আর সাধুরা নেয় তার নেতৃত্ব, সেখানে কিছু বিক্ষুব্ধ ছাত্র আর বঞ্চিত কৃষক কতদূর পর্যন্ত এগোবে বিপ্লবের রাস্তায়? রাইফেলই শক্তির উৎস—নিশ্চয়। কিন্ত ক'টা রাইফেল জোগাড় করতে পারবে তোমরা? আর বাকী সম্বল কি তীর-ধনুক? এবং তাই দিয়ে মোকাবিলা করবে ট্যাঙ্ককে, মেশিন-গানকে, বোমারুকে?'

'ভিয়েতনামের গেরিলারা কী করে মোকাবিলা করছে ভুলুদা?'

'কারণ, তাদের মধ্যে ফাটল নেই। সভ্যতার সমস্ত সুখে [illegible] সেখানকার মার্কিনী ফৌজ শিশু-নারী-বৃদ্ধের ওপর সবরকম ভায়াবোলিক একস্পেরিমেন্ট চালাচ্ছে—কিন্তু একজনের মুখ থেকে একটি গেরিলার খবর বের করতে পারে? এখানে তোমাদের ঘরে ঘরে শত্রু দেখা দেবে। তারা সবাই চৌর নয়, কিন্তু তাদের অন্য মত আছে, অন্য আদর্শ আছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী শক্তির চেহারা বাংলা আর কেরল থেকে—অন্ধ্রের ক'টি অঞ্চল থেকে তোমরা অনুমানও করতে পারো না। শেষ পর্যন্ত সেই শক্তির চূড়ান্ত রূপ যখন শিক্ষিত সেনাবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়াবে—তখনকার অবস্থা ভাবতে পারো? ভারতবর্ষে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা তৈরি হোক, তাই কি তোমরা চাও? দেশের মাটি যদি পায়ের তলায় জায়গা দিত, তা হলে চে গুয়েভারার মতো অত বড়ো বিপ্লবীকে অমন করে হারাতে হয়?'

একটু চুপ করে রইল আনন্দ। খুব সম্ভব প্রবীরের বক্তৃতার তোড়ে কথা বলবার জায়গা পাচ্ছিল না, নিজের ভাবনাগুলোর খেই হারিয়ে ফেলছিল।

সাবিত্রী বললে, 'কেন তর্ক বাড়াচ্ছ? এর শেষ হবে না।'

আনন্দ মাথা নাড়ল: 'হাঁ, তর্কের শেষ হবে না ভুলুদা। কিন্ত সত্যটা সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে আছে। বিপ্লব যখন আসে, তখন সৈনিক আপনিই দেখা দেয়—তখন তার উজ্জ্বল প্রবলতার সামনে সমস্ত কুট-কচাল কুটোর মতো উড়ে চলে যায়। লেনিন তা জানতেন বলেই অক্টোবর বিপ্লবকে জাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তোমাদের মতো এই সব মেনশেভিক চিন্তার ভেতরে পাক খান নি। তোমরা আমাদের বলো অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ নাড়া খেয়ে উঠেছে, টের পাচ্ছ সেটা?'

'একটা টেরর তৈরি হয়েছে, তার প্রথম শক। ভয় এবং বিহ্বলতা। সেটা কাটিয়ে উঠলেই প্রতিক্রিয়া। পার্লামেন্টারি ডিমোক্র্যাসী ভেঙে ফেলতে চাও? চমৎকার কথা। কিন্তু তার পরের অধ্যায়টা কী, জানো? বীভৎস এক সিভিল ওয়ার। তাতে জমিদারী-পুঁজিবাদী-সাম্প্রদায়িকতা-দ্বন্দ্বী সব এক সঙ্গে হাত মেলাবে। তার শেষ ফল: নৃশংসতম নরহত্যার পালা শেষ হবে পাকা ফ্যাসিজমের রাজত্ব। তখন ইন্দোনেশিয়ার মতো তোমাদের চিহ্নও আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কিংবা উলটোটা। নিশ্চিহ্ন হবে ভারতবর্ষের জমিদার-কুলাক্-হোয়াইট্ গার্ডস। তোমরা যারা সংসদীয় গণতন্ত্রের জঞ্জাড় আঁকড়ে পড়ে আছো—যে দলেরই হও হয় আমাদের সঙ্গে আসবে, নইলে উড়ে যাবে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনায়। ভুলুদা—তোমরা ব্যালট বাক্সের মধ্য দিয়ে রক্তহীন বিপ্লব ঘটাতে চাও। তুমি কি মনে করো পৃথিবীজোড়া শয়তানদের ওভাবে শায়েস্তা করা যায়? যখনই ব্যাধি যায়, তখনই দল। যখন দল, তখনই দল বাঁচাবার আর বাড়াবার জন্যে নানা লোকের সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করছ তোমরা—অ্যান্টি-সোশ্যালগুলোকে পর্যন্ত সৈনিকের তকমা দিচ্ছ—যারা পরে তোমাদেরই গলায় ছুরি দেবে। তোমাদের যুক্তফ্রন্টের সাপোর্টার এক জোতদারকে আমরা সাবাড় করেছি। এই লোকটার টাকা কী করে হল জানো?'—বলতে বলতে কপালের শিরা ফুলে উঠল আনন্দর, দপদপ করতে লাগল চোখ: 'মাত্র দুশো টাকা ধার দিয়ে কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্টে একটা লোকের বারো বিঘে সে কেড়ে নিয়েছে—সে লোকটা এখন ক্ষেত-মজুর, তার বউ গত বছর খেতে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এদের সঙ্গে গলাগলি করে তোমাদের রক্তহীন বিপ্লব কবে আসবে জানি না ভুলুদা। কিন্তু আমরা আর একদিনও দেরী করতে রাজী নই—এক মুহূর্তও না। উই আর নট্ টু মেনড এনিথিং, বাট উই আর টু এন্ড এভরিথিং!'

বলতে বলতে ঘরময় পায়চারী করছিল আনন্দ—মনে হচ্ছিল যেন খাঁচার ভেতরে একটা বুনো জানোয়ার অশ্রান্তভাবে ছটফট করছে। কথা শেষ করে সে জানলাটার পাশে দাঁড়ালো, পর্দাটা একটু সরালো, কিছু দেখল, তারপর ফিরে এল দুজনের কাছে।

মুখের রেখাগুলো কোমল হয়ে গেছে তার। হঠাৎ যেন দপ করে নিবে গেছে উত্তেজনাটা।

সাবিত্রীর সামনে এসে একটু হাসল আনন্দ।

'নাঃ, রাতে তোমার রান্না খাওয়া আমার বরাতে নেই, দিদি। হয়তো তোমাকেও বিপন্ন করলুম। যে লোকটি এইমাত্র তোমার জানলার দিকে লক্ষ্য রাখছিল, তাকে আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু। সুতরাং এবারে আমার ঝোলাটা দাও—আর কোথাও ঠাঁই মেলে কি না দেখি।'

[ক্রমশ]

মাননীয় রাজ্যপাল সমীপেষু

আপনি কর্মব্যস্ত মানুষ। তাই জানি না, আমার মত একজন সাধারণ লেখকের বক্তব্য আপনার দৃষ্টিগোচর হবে কি-না। জানি না, এ লেখাকে আপনি কিংবা আপনার উপদেষ্টারা কি চোখে দেখবেন। তবুও সাহস করে লিখছি, কারণ আজ আমরা এক সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে এসে উপনীত হয়েছি। প্রতিকারের আশায়, প্রতিবিধানের আগ্রহে এবং বাংলা দেশের শুভাশুভের জন্য এ বক্তব্য প্রকাশ করার আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেছি।

আপনি আইনজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ পুরুষ। আপনার ভাষণ এবং বাণী শুনে আমরা রীতিমত গর্বিত, কারণ এমন একজন জ্ঞানী পুরুষকে চরম সংকটের দিনে সমস্যাকণ্টকিত পশ্চিম বাংলার রাজ্যের কর্ণধাররূপে পাওয়া গেছে। গত ১৯শে মার্চ রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের মত সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। আশা করেছিল, তের মাসের জঞ্জাল এবার বোধ হয় নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু মানুষের সে প্রত্যাশা কতটুকু পূর্ণ হয়েছে? আপনি নিজে একবার নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন: মানুষের ন্যূনতম প্রত্যাশা আপনার শাসনে কতটুকু পূর্ণ হয়েছে?

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পেছনে জনগণের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা ছিল, তবু সেই জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্টের মৃত্যুলগ্নে মানুষের চোখে একবিন্দু জলও দেখা যায় নি। দেখা যায় নি কোন ক্ষোভ বা হতাশা। কারণ, মানুষ যা চেয়েছিল, ফ্রন্ট সরকার তার সামান্যতম অংশও পূর্ণ করতে পারে নি। ফলে, যে 'জনগণ' যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়েছিল, তারাই কামনা করেছিল 'রাষ্ট্রপতি'র শাসন। কিন্তু স্যার, সে কামনার পেছনে মানুষের যে অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল। মানুষ ভেবেছিল, শরিকী সংঘর্ষের রক্তস্রোতের কলঙ্ক থেকে বাংলা দেশ মুক্ত হবে, দলীয় কোন্দল ও ক্ষমতার লড়াই বন্ধ হবে, আইন-শৃঙ্খলার পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং রাজ্যের মৃতপ্রায় অর্থনীতিতে নতুন করে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হবে। এ প্রত্যাশা এমন কিছু অস্বাভাবিক কিংবা অতিরিক্ত নয়। কিন্তু দেড় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের উদ্দীপ্ত চেতনা ক্রমশই যেন তলিয়ে যাচ্ছে। আপনি পাত্রমিত্র সভাসদ পরিবেষ্টিত হয়ে আজ বাস্তবচ্যুত হয়ে পড়েছেন। তাই, মানুষের চোখের কোণে হতাশার ছায়া দেখতে পাচ্ছেন না। অথবা, সাধারণ মানুষের মর্মবেদনা সান্ত্রী-ঘেরা রাজভবনে প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছে না কিছুতেই।

ফ্রন্টের শাসনকাল এক বন্ধ্যাত্বের অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। দলীয় মর্যাদার প্রশ্ন এবং মন্ত্রিত্বের এক্তিয়ার নিয়ে যে প্রচণ্ড লড়াই যুক্তফ্রন্ট জমিয়ে তুলেছিল, তা সমগ্র রাজ্যের ভবিষ্যৎ এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ধাওয়ান সাহেব, আপনার প্রশাসন কি সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে? এখন দলের বদলে আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে; দলীয় মর্যাদার লড়াই নেই বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের লড়াই সে স্থান সদর্পে দখল করেছে। মন্ত্রীর বদলে এসেছেন উপদেষ্টারা। বত্রিশ জনের বদলে পাঁচজন। কিন্তু শত কৌরবের তুলনায় পাঁচ পাণ্ডবের প্রতাপ কিছু কম নয়। ফলে, প্রশাসন যে গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এখন তা থেকে এক-চুলও মুক্ত হয় নি। সেদিনও ফাইলের পাহাড় জমেছে, আজও সেই অচল পর্বত মহাকরণ জুড়ে বসেই আছে। নড়বার কোন লক্ষণ নেই। এখন আপনিই বলুন, এর জন্য দায়ী কে? আপনিই ভাবুন, এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

দোহাই রাজ্যপাল মহোদয়, ভুল বুঝবেন না, কিংবা ভাববেন না, আমি আপনাকে উপদেশ দেওয়ার স্পর্ধা রাখি। কিন্তু আপনার শাসনকালের সূচনায় যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছে, তা কি সমগ্র প্রশাসনের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত নয়? রাজ্য শাসনের জন্য যেখানে দক্ষ ও ঝানু রথী-মহারথী অফিসাররা ছিলেন, সেখানে আপনি কেন পাঁচজন উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন তা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে বোধগম্য হল না। পশ্চিমবঙ্গে ইতিপূর্বেও রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রপতির শাসন আমরা দেখেছি। কিন্তু পাঁচজন উপদেষ্টা নিয়ে সংসার পাততে আর কাউকে দেখি নি। আপনি অবশ্য রাজ্যের স্বার্থে (!) আরো বেশি উপদেষ্টা চেয়েছিলেন, কিন্তু কেন্দ্র নাকি আপনার আব্দার রক্ষা করে নি। মন্ত্রী-সম পাঁচ উপদেষ্টার হাতে আপনি দপ্তরগুলি বণ্টন করে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, কিন্তু রাজ্যের মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। সূচনাতেই শ্রী বি. বি. ঘোষের সঙ্গে আপনার মসীযুদ্ধ যে ভয়ঙ্কর স্নায়ুযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। শেষ পর্যন্ত শ্রীঘোষের পদত্যাগ, দিল্লীর হস্তক্ষেপ এবং মুখ্য উপদেষ্টারূপে শ্রীঘোষের পুনরাবির্ভাব আপনার সম্মানকে কিছুমাত্র বৃদ্ধি করে নি। কিংবা, শ্রীমল্লিকের সঙ্গে আপনার পত্র বিনিময় পর্ব (ঐতিহাসিক!) এক নতুন অধ্যায়। এ ঘটনা আমাদের অজয়-জ্যোতি প্রেস্টিজ লড়াইয়ের চিঠি চালাচালির ঘটনাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশেষে শ্রীমল্লিকের জয় এবং মুখ্য সচিবরূপে মহাকরণে প্রতিষ্ঠা। এ সকল ঘটনা

প্রশাসন কিংবা আপনার পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়। প্রকাশ্যে আপনারা যখন পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে থাকেন (এমন কি আপনিও রেহাই পাচ্ছেন না), তবে যুক্তফ্রন্টের গলিত দেহের মধ্য থেকেই যেন নতুন আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হল। এতে কি রাজ্যের মঙ্গল হতে পারে? এর ফলে কি প্রশাসনের জড়তা কাটবে বলে আপনি মনে করেন? আপনার প্রাজ্ঞ দূরদৃষ্টি এ ব্যাপারে কি ভবিষ্যৎ দেখছে জানি না, কিন্তু বাংলার ক্লান্ত মানুষ নতুন আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা এবং আইন-শৃংখলার অবনতির প্রশ্নটাই যুক্তফ্রন্টের আমলে সব থেকে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আজ দেড় মাস বাদে একান্ত দুঃখের সংগে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার প্রবল প্রতাপান্বিত শাসনকালেও অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি। আপনি গীতা-উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে মার্ক্স-লেনিন পর্যন্ত সকল জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করেছেন—তার পর্যাপ্ত প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাণী ও ভাষণের মাধ্যমে পেয়ে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হয়েছি। কিন্তু স্যার, এই জ্ঞানভাণ্ডার আইন-শৃংখলার উন্নতিতে কোন কাজেই আসছে না দেখে আমরা বেদনার্ত। প্রথম দিকে সপ্তাহখানেক পুলিশী তৎপরতা দেখে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম: কিন্তু সেই আকস্মিক দ্রুত-তাল আপনার সামগ্রিক প্রশাসনের সংগে সংগতি রেখে আজ নিস্পৃহ ঢিমেতালে চলতে আরম্ভ করেছে। ফলে, আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটছে জ্যামিতিক নিয়মে। এ ব্যাপারে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার, তেমনি আপনি কেমন যেন এক তুরীয় আনন্দে বিভোর। ধাওয়ান সাহেব, দয়া করে একবার সরকারী রেকর্ডের দিকে তাকান। দেখবেন, ১৯শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে এ রাজ্যে ৮০টিরও বেশি নরহত্যা হয়েছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে নজর রাখুন (যদি অবশ্য আপনার সময় থাকে), দেখবেন সমাজবিরোধী এবং তথাকথিত নকশালীদের হিংস্র আক্রমণের সামনে বাংলা দেশের মানুষ কি নিদারুণ অসহায়। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, গান্ধীজী থেকে সাধারণ মানুষ—কেউই রেহাই পাচ্ছেন না, কোন স্থানেই আজ নিরাপদ নয়।

উপদেষ্টারা কাকে উপদেশ দিচ্ছেন জানি না এবং সে উপদেশে কেউ কর্ণপাত করছেন কিনা, তাও জানি না। কিন্তু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রতি মুহূর্তের আতঙ্কে দিশেহারা। আপনার রেকর্ড অনুসারে ১৯শে মার্চ থেকে ২২শে এপ্রিলের মধ্যে ৩৬৩৫ জন সমাজ-বিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এই রেকর্ডের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। সত্যিকারের সমাজ-বিরোধীদের মধ্য থেকে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অতিমাত্রায় তৎপরতা দেখাবার জন্য কতজন নিরীহ মানুষকে সমাজবিরোধীদের দলে ফেলা হয়েছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষ মোটেই নিঃসন্দেহ নয়। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে চিহ্নিত সমাজবিরোধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ, একমাত্র পুলিশই নাকি তাদের সন্ধান পাচ্ছে না। ঠিক একই ঘটনা ঘটছে নকশালীদের ক্ষেত্রে। যাদের 'নকশালী' আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রকৃত দুষ্কৃতিকারী কতজন আছে, তা নিয়েও আজ জনমনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষার নাম অযথা উৎপীড়ন নয়; পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার বিকল্প পুলিশী অত্যাচার নয়—এ সত্যটা বড়কর্তারা সম্ভবত বিশ্বাস করেন না।

আপনি স্যার একবার খবর নিয়ে দেখবেন, লালবাজারে এখনো 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ', 'ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ' 'ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট', 'বোম স্কোয়াড' ইত্যাদি বিভাগগুলি আছে কি-না। যদি থেকে থাকে তবে তাঁরা কি মহান্ কর্তব্যে ব্যস্ত, সে খবরটা জানতে ইচ্ছে হয়। চারিদিকে আজ যে অবস্থা—বোমা, পিস্তল আর পাইপগানের অবাধ ব্যবহার, পুলিশের কর্মতৎপরতার যে নিদর্শন পাচ্ছি এবং নকশালীদের মোকাবিলায় পুলিশের যে অসাধারণ দক্ষতা সপ্রমাণিত, তাতে মনে হয়, রাজভবনের সংগে পাল্লা দিয়ে লাল-বাজারও বোধ হয় বিশ্রাম-মগ্ন। এ অবস্থার প্রতিকার কি জানি না। আপনি আইনজ্ঞ পণ্ডিত, তাই আপনার কাছে আবেদন জানাই: জনগণের অর্থে লালিত-পালিত বিশাল পুলিশ বাহিনীকে এবার জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহার করুন, নতুবা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে বাধ্য।

শুনতে পাচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি কবরস্থ পি-ডি অ্যাক্টকে আবার জীবনদান করবেন। কিন্তু তাতেই কি আর মূল সমস্যার সমাধান হবে? প্রশাসন যদি জড়তার আবর্জনায় আকণ্ঠ ডুবে যায়, তবে পি-ডি অ্যাক্ট দিয়ে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা যাবে বলে আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না। জানি না, এ ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন?

লোকসভায় চাবন সাহেব বলেছেন, মাত্র দেড় মাসে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু করা তো সম্ভব। তাই বা হচ্ছে কৈ? আপনি বলেছেন, গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। ভাল কথা। কিন্তু কোন্‌টা গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং কোন্‌টা অসামাজিক অত্যাচার, তা নির্ধারণ করবে কে? প্রেসিডেন্সি কলেজের মাথায় লাল পতাকা উড়ল এবং জাতীয় পতাকা আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এটা কি গণতান্ত্রিক আন্দোলন? তা যদি না হবে, তবে এ ব্যাপারে পুলিশ কেন ২৮ ঘণ্টার মধ্যেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি? কাশীপুর থানার সেকেন্ড অফিসার প্রশান্ত সেন-নিয়োগী কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যাদের হাতে নিহত হলেন, তাঁরা কি গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদার? বোল-পুরে যাকে সেদিন হত্যা করা হল, সে কি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু ছিল? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাঁরা অবাধে তাণ্ডব চালাচ্ছেন, তাঁরাও কি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদার? আপনি আর আমাদের ধাঁধায় রাখবেন না স্যার, দয়া করে বক্তব্যটা পরিষ্কার করুন।

দোহাই ধাওয়ান সাহেব, শুধু বাণী বিতরণ করেই দায়িত্ব শেষ করবেন না। বাংলা দেশ আজ বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবার কিছু কাজ দেখতে চায়। তাদের সেই ন্যূনতম প্রত্যাশা কি আপনি পূর্ণ করতে পারেন না?

—প্রণবেশ চক্রবর্তী

রহস্যাবৃতা

লম্বা দোহারা গড়ন। পরনে সাদা-মাটা রঙিন শাড়ি। চোখ-মুখ সর্বদা হর্ষব্যঞ্জক। বয়স চল্লিশের নিচে বলেই বোধ হয়।

এমন কাউকে রৌদ্রতপ্ত শহরের পথে ট্রামে-বাসে কিম্বা পায়ে হেঁটে একাকিনী এগিয়ে যেতে দেখলে পার্বতীদিকে মনে পড়ে। মনে পড়ে, তার কারণ, পার্বতীদি আজ অনেক পাল্টেছেন। সম্প্রতি তাঁকে অনেক ধীরগামিনী আর অনেক মূল্যবান পোষাকে গা মুড়ে পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখছি। চোখাচোখি হয়, কিন্তু আগের মতো রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে অনর্গলভাবে পার্বতীদি তাঁর সমিতির কথা বলেন না। যে কমলা রায় পার্টি সমিতি গড়ায় তিনি চটে গিয়ে বলেছিলেন, ওরা কাজের চেয়ে ভাঙনেই বেশি আগ্রহী, সেই কমলা রায়ের সমিতির সাইন বোর্ড-টার দিকেও একটিবার দৃষ্টিপাত করেন না। সাধারণ সৌজন্যের জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, তিনি ঠিক ততটুকুই ঠোঁট ফাঁক করেন, চোখে 'ভালো তো?' ভাবটুকু ফুটিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করেই এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে ভারি অবাক হয়েছিলাম। একটি নিটোল সমাজ-কর্মীর ছাপ তাঁকে ঘিরে থাকত ওত-প্রোতভাবে। এমন কি নিজের ছেলেমেয়ের প্রতিও দৃকপাতহীন।

স্ত্রী একদিন জোর করে পার্বতীদির বাড়ি একতলার ফ্ল্যাটে ধরে নিয়ে গেল। আলোছায়ালো এক টুকরো ঘর, সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের প্রতিনিধিত্ব করছে। যাঁহা বৈঠকখানা তাঁহা শয়নের ব্যবস্থা। টানা কৌচে জায়গা অকুলান হলে খাটের ওপরই চেপে বসতে হয়। মেঝের খানিক জায়গা আছে। তবে পাঁচজনের জুতোর ধুলোয় বালি কিরকিরে। কৌচেই বসেছি আমরা। খাটের ওপর পার্বতীদির জ্ঞাতি আত্মীয় দু'একজন পার্বতীদির ছেলের মাথায় জলপটি চেপে হাতপাখা করছেন। ছেলের একশ' তিন জ্বর। পাশের ঘরে অসুস্থা শাশুড়ি। স্বামীর ইমারজেন্সী সার্ভিস। কখন বাড়ি আছেন, কখন নেই।

পার্বতীদিও ছিলেন না। সমিতির কাজে বাইরে গেছেন শুনে অবাক হয়েছিলাম। ঘরে অসুস্থ ছেলে পরের হাতে ফেলে রেখে ঠাকুরের জন্মোৎসব নিয়ে যিনি ব্যস্ত, তিনি সাধারণ মেয়ে নিশ্চয় নন।

শুনলাম দু' ঘরের ফ্ল্যাট। একটা শাশুড়ি ঠাকরুণের দখলে, অপরটিও যে পার্বতীদির নিজস্ব এমন নয়। ঠাসাঠাসি মালপত্রের মধ্যেই ছেলেমেয়ের পড়া, কর্তার বিশ্রাম এবং সমিতির অফিস। দুপুরে আশপাশের দুঃস্থা মেয়েরা আসে সেলাই-ফোঁড়াই আর প্রাথমিক জ্ঞানের ক্লাশ করতে। পার্বতীদি অক্লান্ত সেবিকা। একার চেষ্টায় একটা সমিতি। পার্বতীদি বলেন, তিনি ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিতা।

স্ত্রীকেও পাকড়াও করে-ছিলেন।

'মেয়েদের সেলাই শেখা তুই। ওদের পড়াশুনার ভারটা তোকেই নিতে হবে। তোদের মতো শিক্ষিতা, ঘরকন্নায়, সেলাই-ফোঁড়াই-এ পটু মেয়েরা যদি শুধু স্বামী-ছেলে নিয়ে মশগুল সংসার করিস, তবে সেটা সামাজিক অপরাধ।' পার্বতীদি এ উপদেশ পাড়ার অন্যান্য মেয়েদেরও দিয়ে-ছিলেন।

স্ত্রী তার ছোট্ট সংসার সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছে। তবু পার্বতীদির ডাক একেবারে উপেক্ষা করতেও পারে নি।

পার্বতীদির নেতৃত্বে একটি দলও গড়ে উঠল পাড়ায়। ঠাকুরের ছবি নিয়ে প্রভাতফেরী, প্রতিবেশিকুলকে খিচুড়ি ভোগে আপ্যায়ন আর দুঃস্থা মেয়েদের জন্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা। পার্বতীদি একার উৎসাহে সব কিছু কেমন সুচারু-ভাবে সম্পন্ন করেন।

আমি বলি, 'কলকাতার হুজুগের মধ্যে পার্বতীদি দ্বিতীয় সরলা রায় রূপে দেখা দিলেন। জানো তো, সরলা দেবীর একার চেষ্টায় গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা। আজকের কলকাতায় পার্বতীদিও এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।'

স্ত্রী বলে, 'বাস্তবিক, সরলা দেবীর মতো পার্বতীদিরও অসাধ্য কিছু নেই। চাঁদা তোলা থেকে চণ্ডীপাঠ, একাই একশ।'

'সরলা রায়ের মতো মোটা চাঁদার বিনিময়ে উনিও কি লাট-বেলাটের পাশে চাঁদা দাতাকে খানার টেবলে বসাতে পারেন?'

স্ত্রী হাসে, 'কেন, মোটা চাঁদা দেবে নাকি?'

'পাগল!'

'সরলা রায়ের মতো পার্বতীদি কিন্তু সিগারেটের টিন হাতে পর পর ধূমপান করা দূরে থাক, স্লিভলেস ব্লাউজও সহ্য করতে পারেন না।' স্ত্রী বেশ সমীহ করেই বলে।

আমি বলি, 'অর্থাৎ সরলা রায় ১৯৩১-৩২-এ যে সংস্কারমুক্ত মানসিকতার অধিকারিণী ছিলেন, তোমার পার্বতীদি তা ১৯৭০-এও রপ্ত করতে পারেন নি।'

'মোটেও তা নয়। সিগারেট খাওয়াটা একেবারেই সংস্কারমুক্তির কোনো লক্ষণের সঙ্গে জড়িত নয়। সিগারেট তো তোমারও খাওয়া অনুচিত। কিরকম ক্যানসার কেস বাড়ছে দেখেছ!'

এইখানে মানে মানে আলোচনায় ছেদ টেনেছি। অতঃপর শ্রীমতী যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব আওড়াতে থাকবেন সেটা উপাদেয় হবে না নিশ্চয়ই। সুতরাং নিঃশব্দে মূক বনে যাই আমি।

পার্বতীদি আমাকেও রেহাই দিতে চান নি।

বলেছেন, 'আপনারা যার যেমন খুশি পলিটিক্স করুন না কেন। কিন্তু এসব কাজে আমাদের সঙ্গে আসবেন না? স্বামীজী পলিটিক্যাল চিন্তাও করেছেন, সমাজোন্নয়নও করেছেন। এক বাদ দিয়ে তো আর এক হয় না। [illegible] বিবেকানন্দের কর্মযোগ [illegible]

পারেন?

সাবলয়ে উত্তর দিতে হয়েছে, 'কয়েকটা ছেলেমেয়ে নিয়ে এই শিক্ষা শিক্ষা খেলায় জুৎ পাই না, যথেষ্ট বিশ্বাসও নেই, পার্বতীদি। বরং সত্যিই যদি কিছু করতে চান, আপনার অনালোকিত্তা সভ্যাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর পাঠ দিন। ওদের অবস্থার উন্নতি হবে, বাস্তব উপকার হবে।'

'একটা বাড়তি পেটের সমস্যার চেয়ে দুটো বাড়তি হাতের সাহায্য ওদের সংসারে ঢের বেশি দরকার। কলকাতার বস্তিবাসী ইকনমি এইরকম।' পার্বতীদির কণ্ঠে দৃঢ় বিশ্বাসের সুর। বলেন, 'দেখেন না, পাঁচ বাড়ি আট-দশ-বার টাকার খেটে সংসারে ওদের আর ক'টা টাকা ওঠে। পাঁচ হাতে সেই টাকা কুড়োলে বরং কিছু সাশ্রয় হয়। তাতে হয়ত ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে থাকার কষ্টটা সইতে হয়। তা গরমের দিনগুলো রাস্তাঘাটেই কেটে যায়। ছেলেপুলে মানুষ করার চিন্তাও খুব বড় চিন্তা নয় ওদের কাছে।'

হেসে বললাম, 'ফলে অন্ধকারের জীব কিছু বাড়ে, শ্রমিকের যথার্থ মূল্য বাড়াতে হয় না।'

পার্বতীদি এই সময় নিখুঁত নারীর মতো মুখ ঘুরিয়ে কণ্ঠস্বরে মেয়েলী সুর টেনে বলেন, 'এসব আপনাদের মুখের দরদ। বাড়ির কাজের লোকটার পাঁচটা টাকা মাইনে বাড়াতে পারেন?'

না পারি না। আবার এ কথাও পার্বতীদিকে বোঝাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম যে, মানুষের আর্থিক দুর্গতির সুরাহা কেউ ব্যক্তিগত ঔদার্যের দ্বারা সম্ভব করতে পারেন না। তক্ষুণি পার্বতীদি বলবেন, নিজেদেরও কিছু করণীয় আছে বৈ কি।

ও'কে কী করে বোঝাই, তেমন কর্তব্য কেউ এককভাবে পালন করলে তার দ্বারা কোনো মহৎ বা বৃহৎ কাজ হয় না। কাঙালী ভোজন করালে কাঙালীর ব্যায়রামই বাড়ানো হয়। পার্বতীদি বছরে একবার ঠাকুরের জন্মোৎসব করে প্রসাদান্নে কাঙালী ভোজন করান।

একদিন শ্রী খুব ভারিক্কি এবং 'যদি দশ-

বিশ টাকা রোজগার করতে পারি।

আমি কাত হয়ে ঘুরে শুলাম। প্রকট জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

শ্রী যা বলল তার নির্গলিতার্থ এই: শহরে শাড়ি জামার ইদানীং ফেব্রিক পেন্টের দারুণ চল। পার্বতীদি এতকাল তাঁর এক ধনী ব্যবসায়ী বান্ধবীর কাছ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করে আনছিলেন। তাতে কাজ পাচ্ছিল, পয়সাও পাচ্ছিল। রুমাল পিছু তিন আনা। বর্তমানে ফেব্রিক পেন্টের অর্ডার সংগ্রহ করেছেন, শাড়ি রঙ দিয়ে দেবেন, মজুরী তিন টাকা, আর রঙ নিজেই কিনে এ'কে দিলে পাঁচ টাকা শাড়ি পিছু।

শ্রীকে পেন্টিং ইনচার্জ করতে চান, কারণ তার হাতের আঁকা ভালো, নিজে সে ডিজাইনও তৈরি করতে পারে।

খাড়া হয়ে বসলাম, 'কাজ নিলে না কি?'

শ্রী হাসল, 'খেটে রোজগারের চেয়ে পার্বতীদির মতো অর্গানাইজিং করলে ঢের বেশি লাভ। ও কাজ নেব কেন? আমি বলছি, তুমি বরং অর্ডার যোগাড় কর, শাড়ি পিছু কম করে আটটা টাকা আর রুমালে ছ' আনা।'

'তার মানে? পার্বতীদি তাহলে মোটা আয়ের ব্যবস্থা করেছেন বল?'

শ্রী মুচকি হেসে বলল, 'দু-এক বছরের মধ্যেই গাড়ি ও বাড়ি দুই করছেন, যদি সমিতিটা আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন।'

আমার সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসছিল। কলকাতায় এমন দু'চারটি কারখানা আছে জানতাম না। কি নির্বিবাদী কুটির-শিল্প। মিছিল ধর্মঘটের বালাই নেই। মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন নেই।

পার্বতীদির ঘরে ঠাকুরের সেই বিশেষ পরিচিত ভঙ্গির ছবিটি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। দুই হাতে দুই মুদ্রা। দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে ছড়ানো। হাতের মুঠ খোলা। তর্জনী সব চেয়ে আগানো। মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা নারকেল পাতার মতো কাটা কাটা আর ঈষৎ নিম্নাভিমুখী, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তর্জনী থেকে বেশ ৭০।৮০ ডিগ্রী এ্যাঙ্গেলে বাঁকানো। যে মুদ্রা ইহজগতের প্রত্যক্ষ বস্তুনিচয়ের অন্তঃসারশূন্যতাকেই যেন ইঙ্গিতে ব্যাখ্যা করছে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু কত ঠাকুর এলেন, এই শূন্যতার আর পূরণ হল না।

পার্বতীদিকে যত দেখছি কেমন অন্যতর রূপে তিনি প্রকট হচ্ছেন। রহস্যময়ী কলকাতার বুকে আবৃত রহস্যের শেষ নেই। সে রহস্যের কাছে প্রকৃত মহাত্মারা ভীষণভাবে হেরে গেছেন।

এক সময় বললাম, 'পার্বতীদির ইমেজটা এমনভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ভাবি নি!'

শ্রী বললে, 'তাই বা কেন, কত দুঃস্থ মেয়ের উপকার হচ্ছে। তা ছাড়া উনি নিজেও তো কম শ্রম করছেন না! পারিশ্রমিক ওনারও তো চাই।'

আমি যেন খানিকটা স্বস্তি পেলাম এ কথায়। আপন জন, পরিচিত জন সম্পর্কে সব কিছু না জানাই ভালো। সবচেয়ে ভাল হত, এর মধ্যে যদি ঠাকুরকে জড়িয়ে রাখা না হত।

হে ঈশ্বর, সব কিছু আরও—আরও রহস্য কুহেলীতে আচ্ছন্ন থাক। সে বরং অনেক শান্তি। মদের ঘোরে মাতালের যেমন শান্তি।

৯-৫-৭০

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চতুর্থ অধ্যায়

তিন মরুপাহাড়ের ক্যাম্প

কয়োপ বন্দীশিবিরটি বারাগোই থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে ও রুডলফ হ্রদ থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে তিনটি গাছপালা-হীন মরুপাহাড়ের মাঝে এক উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। নৃগিরো পাহাড়ের কাছে এই উপত্যকাগুলিতে বেশ ভাল ঘাস জন্মায়, কাজেই সামবুরু ও তুর্কানা উপজাতীয় লোকেরা তাদের গরু-ছাগলের পাল নিয়ে এখানে চারণের জন্য থাকে বছরের কয়েক মাস। তখন লোকজনহীন এই জমিতে তাদের তৈরি অদ্ভুত রকম নিচু ও ছোট ছোট "ম্যানিয়াটা" বা কুঁড়েঘরগুলি দেখে মনে হয় যেন কেউ মাঠের মাঝখানে অনেকগুলি পাখির বাসাকে উল্টে রেখে গেছে। এদের কুঁড়েঘরগুলি এত ছোট যে কোন সাধারণ মানুষ তার ভেতর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যদিচ কয়োপ বন্দীশিবির সাম্বুরু জেলায় অবস্থিত ছিল, তবু নিকটবর্তী তুর্কানারা প্রায়ই এখানে আসত এবং দুই উপজাতির ভেতর কোনরকম রেষারেষি বা অসন্তোষের ভাব কোনদিন প্রকাশ পায় নি। এখানকার হাওয়া বেশিরভাগই গরম এবং বৃষ্টি খুবই কম হয়। এদিক থেকেও কয়োপ আমার জন্মভূমি কিকুয়ু জেলা থেকে সর্বাংশে বিভিন্ন। আমাদের থাকাকালীন একটি জলকূপ ছাড়া আর কোন জলের চিহ্নমাত্র ছিল না কয়োপে এবং এই জলেতেও গন্ধকের উপস্থিতি বেশ ভালরকম বুঝতে পারা যেত। এই জলে সাবান দিয়ে এক সাদা প্লাস্টার লেপে দিয়েছে। তা ছাড়া বন্দীদের অনেকেই এই জল পান করার পর ভীষণ উদরাময় রোগে কষ্ট পেয়েছে। এই ক্যাম্পটি ১৯৫৪ সালের ২০এ আগস্ট তারিখে বন্ধ করে না দেওয়া অবধি আমি এখানে বন্দী ছিলাম।

প্রথমে এই ক্যাম্পে আমরা সব সমেত ছত্রিশজন ছিলাম। শাসনতন্ত্রের চোখে আমাদের সামাজিক পদমর্যাদা ছিল অন্তরীণের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী নয়, কাজেই বন্দী অবস্থাতেও আমাদের নিজস্ব কাজকর্ম ছাড়া আর কোনরকম দৈহিক পরিশ্রম করতে হতো না।

আমরা কয়েদীদের পোষাক না পরে নিজেদের জামা-কাপড় পরতে পেতাম, আমাদের সঞ্চিত অর্থ নিজেদের কাছে রাখতাম এবং সন্ধ্যার পর ক্যাম্পের সীমানার ভেতর যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতাম। একটিমাত্র কাঁটাতারের বেড়া ছিল আমাদের সীমানা এবং তাও ছিল এত ঢিলে যে, তাকে ডিঙিয়ে যাওয়া ছিল খুবই সোজা ব্যাপার। মোট কথা, আমরা যে পালাতে পারি বা তার চেষ্টা করতে পারি, এ বিষয় কর্তৃপক্ষের কোন মাথা ব্যথাই আমরা দেখি নি। এর কারণ অবশ্য আমরা বুঝতে পারি। তুর্কানা উপজাতিদের ডেকে এই অঞ্চলের জেলাধ্যক্ষ বুঝিয়ে-ছিলেন যে, কিকুয়ুরা নাকি ভীষণ হিংস্র স্বভাবের। তারা যুবতী মেয়েদের স্তন কাঁচা চিবিয়ে খেতে বা গর্ভধারিণী মেয়ে-দের পেট থেকে ভ্রূণ বার করে খেতে বিশেষ ভালবাসে। এ কথা আমি নিজে তাদের কাছ থেকে শুনেছি। জেলাধ্যক্ষ আরও বলেছিলেন যে, কোন পলাতক বন্দীর মাথা যদি তুর্কানারা তার কাছে এনে দিতে দুষ্প্রাপ্য খাবারদাবার দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। ছোটবেলায় মুটুরীর ফার্মে থাকা-কালীন যখন পশ্চিম আফ্রিকায় গোল্ড-কোস্টের (ঘানা) স্বাধীনতা সংগ্রাম চল-ছিল, তখন মুটুরী ও অন্যান্য ইউরোপীয়ান চাষারা আমাদের বলতেন যে, সেখানকার আফ্রিকানরা নরমাংস-ভোজী এবং প্রয়োজন মত তারা নিজেদের সন্তানদেরও চিবিয়ে খায়। আমার সে সময় কেবলি ভয় করত এই ভেবে যে, নৃগোরোগোপিরা (ঘানার অধিবাসীরা) একদিন পূর্ব আফ্রিকায় এসে আমাদেরও খেয়ে ফেলবে। এখন মনে হয় যে, ইউ-রোপীয়ান দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামী আফ্রিকান দেশই নর-মাংস লোলুপ বর্বর, হিংস্র জীবে ভর্তি।* সামবুরু এলাকার প্রাকৃতিক রুক্ষতার হেতু খাদ্যকষ্টের প্রকোপ খুব বেশি, কাজেই সেখানকার লোকেরা রাজবন্দীদের ধরে সরকারের কাছে দিতে পারলে খাদ্যদ্রব্য পুরস্কার পাবে—এই আশায় বিশেষ উৎসাহের সঙ্গেই তাদের তীক্ষ্ন সজাগ দৃষ্টি সব সময় ক্যাম্পের অধিবাসীর উপর ন্যস্ত রাখত। কাঁটাতারের বেড়া বিশেষ শক্ত না হলেও এই অদৃশ্য বেড়াজাল

---

*এই প্রসঙ্গে জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউন্ডা লিখিত "Zambia shall be free" পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গ্রামের অশিক্ষিত লোকেদের বলা হয়েছিল যে, ঐ সমস্ত রাজশক্তি লোলুপ আফ্রিকানরা নরমাংসাশী হিংস্র জীববিশেষ। তারা ছোট ছেলেদের মাংস বিশেষ ভালবাসে।

[illegible] পালাবার কোন সুযোগই ছিল না আমাদের।

প্রথম কিস্তিতে যে কজন অন্তরীণ এখানে এসেছিল তারা নিজেদের জন্য ছোট কমিটি স্থাপন করে এবং তার নেতা হিসেবে গাদ্ কামাও গাথুমুবি (সে নাকুরুতে একটি দোকানের মালিক ছিল) এবং এম্বু জেলার পূর্বতন কর্মচারী স্যামুয়েল কিবুরিকে নেতা নির্বাচিত করে। গাদ্ এখনও নাইরোবি শহরের কাছে লিমুরুতে ব্যবসা করে এবং কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশানাল ইউনিয়নের একজন ক্ষমতাশালী নেতা। এ কমিটি কয়েকটি নিয়মকানুনের প্রবর্তন করে এবং যার অনুসারে নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তিস্বরূপ তুর্কানাদের কাছ থেকে একটি সতেজী ভেড়া কিনতে হতো, তারপর সবাই মিলে ঐ ভেড়ার মাংস খেত। নিজেদের ভেতর কোনরকম মারামারি করা বা অপমানজনক অশ্লীল কথাবার্তা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। কমিটি প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেককে ক্যাম্প পরিষ্কার করতে হত এবং ভাঁড়ার ঘর থেকে খাবারদাবার জিনিস বয়ে আনতে সাহায্য করতে হত। আমাদের ক্যাম্পের একমাত্র নারী বন্দী ওয়ানজুকুকে জ্বালাতন করবার অধিকার কারুর ছিল না। সে বেচারীর অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। কারণ ক্যাম্পের অনেকেই তাকে ভোগ করবার উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে বিবাহ করবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি অবধি দিয়েছিল। কমিটির চেষ্টায় ওয়ানজুকুর জীবন মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। কেবল থুয়ো নামক একজন অন্তরীণ নিজেকে শেষ অবধি সামলাতে পারে নি, যার ফলে একটি ভেড়া তাকে কিনতে হয়েছিল। ক্যাম্পের সব থেকে বড় তাঁবুতে আমরা ওয়ানজুকুর জন্য একাংশ বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম, যাতে সে অন্ততপক্ষে পুরুষচক্ষুর অন্তরালে ঘুমোতে পারে।

আমাদের খাবারের বন্দোবস্ত ছিল খুবই ভাল ; যথেষ্ট পরিমাণে ভাত, ভুট্টার আটা, তরিতরকারী, আলু, চিনি, চা ও মাংস। কিন্তু ওষুধপত্রের ব্যবস্থা মোটেই সুবিধের ছিল না। একজন অর্ধশিক্ষিত তুর্কানা ড্রেসারই ছিল একাধারে ক্যাম্পের ডাক্তার, নার্স, ড্রেসার ও ঔষধ বিতরক। সামান্য কতকগুলি জ্বরম ও পাঁচনের ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল তার জ্ঞান—ফলে একই ওষুধ পেট ব্যথা ও মাথাধরার জন্য দেওয়া হত। সৌভাগ্যবশত অন্তরীণদের ভেতর টিমথী মোয়ানগী নামে কোর্ট হল্ জেলার হাসপাতালের এক যুবক সহকারী ছিল [illegible] আমাদের প্রয়ো- [illegible]

জেলার মেডিক্যাল বিভাগে আবার কাজ করছে।

আমি যতগুলি ক্যাম্পে বন্দীজীবন যাপন করেছি তার ভেতর কয়োপই ছিল সব থেকে আরামদায়ক। হাতে পয়সা থাকলে সেখানে সবরকম বিলাসের বস্তুই পাওয়া যেত, এমন কি নিজের পছন্দ মত সিগারেট ও নস্যি। জোরাম নামক ক্যাম্পের একজন লুয়ো উপজাতীয় পুলিশ কর্মচারী নাকুরুতে থাকার সময় থেকেই আমার বন্ধু ছিল। আমাকে অন্তরীণ জীবন যাপন করতে দেখে ও তার ফলস্বরূপ আমার ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে বুঝে সে খুবই মর্মাহত হয়। সে আমার জন্য ইস্ট আফ্রিকান স্ট্যান্ডার্ড ও বারাজ নামক দুইটি দৈনিক খবরের কাগজেরও (যথাক্রমে ইংরাজী ও সোয়াহিলি ভাষায় প্রকাশিত) বন্দোবস্ত করে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, কাগজগুলি তার নামেই আসত। আমি রোজ কাগজ থেকে প্রয়োজনীয় খবরাখবর কিকুয়ু ভাষায় তর্জমা করে আর সবাইকে শোনাতাম। যদিও সরকারীভাবে আমাদের কোন শারীরিক পরিশ্রম করতে হত না। তবুও কমিটির তত্ত্বাবধানে আমরা কেউই অলস জীবনযাপন করি নি। আমি গাদ্ কামাও ও অন্য কয়েকজনকে ইংরাজী শেখাতাম এবং আমার কাজ ছিল আর সকলকার হয়ে অভিযোগপত্র লেখা।

আমি যখন কয়োপ ক্যাম্পে যাই, তখন সেখানকার ইউরোপীয়ান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী—একটু খুঁড়িয়ে হাটতেন বলে যার নাম ছিল 'গাথুয়া', সোয়াহিলি ভাষায় যার অর্থ হল খোঁড়া, বেশ ভাল স্বভাবের লোক ছিলেন। বেশি বকাঝকা বা অকারণ দুর্ব্যবহার করা তিনি অপছন্দ করতেন। বেশির ভাগ সময় তাঁর কাটত নিজের বাড়িতে বা অফিস ঘরে। ক্যাম্পের যেদিকে আমরা থাকতাম, সেখানে তিনি খুবই কম আসতেন। নিজে থেকে কোনদিন কাউকে তিনি না দিয়েছেন কোনরকম শাস্তি, না করেছেন কোনরকম ঝগড়া। এ সব কথা লেখার কারণ হল যে, পরবর্তীকালে আমরা কয়েকজন খুবই খারাপ স্বভাবের ইউরোপীয়ান কর্মচারীর পাল্লায় পড়ি। কিন্তু সে পরের কথা। কিছুদিন পরে আর একজন ইউরোপীয়ান অফিসার পানোন্মত্ত অবস্থায় তাঁকে গুলি করে মারে টমসন ফলসে—এ খবর পেয়ে আমরা সবাই খুব বিষাদগ্রস্ত হই। গাথুয়ার সহকারী কর্মী ছিল আর একজন ইউরোপীয়ান, যার জন্ম ও শিক্ষালাভ হয় কেনিয়াতে। এর স্বভাব-চরিত্র ছিল খুবই খারাপ এবং প্রায়ই সে [illegible] গরীব তুর্কানা বন্দীদের [illegible] বা [illegible]

জন্য আনা মাংস পচে খারাপ হয়ে যাওয়ায় আমরা তা খেতে অস্বীকার করি। গাথুয়ার সহকারী একটু ভীতিগ্রস্ত হয়ে ভাবে যে, হয়তো আমরা এ নিয়ে গোলমাল করব, কাজেই সে টমসন ফলসের পুলিশ অফিসে খবর পাঠায়। পরের দিন সকালে সেখানকার একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এসে হাজির হন এবং আমাদের সবাইকে ডেকে খুব হম্বিতম্বী করেন। তিনি বলেন যে, আমরা ঐ মাংস খেতে অস্বীকার করলে আমাদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন যে, মাউ-মাউ সৌনিকদের তিনি মোটেই ভয় পান না এবং ঐরকম প্রচুর সংখ্যক সৈন্য তিনি এর ভেতরই বিনষ্ট করেছেন এবং দরকার হলে আরও করতে পেছপা হবেন না। তারপর গাদ্ কামাও'র উপর চোখ পড়ায় তাকে সামনে ডেকে বলেন যে, সে যেন তার দাড়ি অবিলম্বে কামিয়ে ফেলে—যদি সে তাতে অস্বীকার করে বা আর কোন রকম গোলমাল করবার চেষ্টা করে তাহলে তাকে সকলকার সামনে গুলী করে মারা হবে। যাবার সময় তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, আমরা সবাই নাকি জোমো কেনিয়াট্টা সাজবার জন্য তাঁর মত দাড়ি রাখছি।

পুলিশ অফিসারটি হয়তো কেবলমাত্র ভয় দেখাবার জন্যই গাদুকে গুলী করবেন বলেছিলেন। কিন্তু টমসন ফলসে তাঁকে সবাই ভয় করতো এবং ক্যাম্পের অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে, তিনি গাদুকে গুলী করবেনই। যা হোক, তাঁর বক্তৃতা আমাদের কাছে খুব বোকা লোকের হামবড়াই-এর মতো মনে হয়েছিল। কিন্তু তবু সে-সময় আমরা কোন কথা বলি নি। কমিটির নিয়মানুসারে এই সব ব্যাপারে আমাদের মুখপাত্র ছিল গাদ্ কামাও এবং সে চুপ করেছিল বলে আমরাও তাকে অনুসরণ করি। অফিসারেরা চলে যাওয়ার পর

আমরা এক ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক করি যে, সকলেই দাড়ি কেটে ফেলবে। কারণ বিশেষ করে গাদু মন্তব্য করে যে, না হলে তার জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা আছে। আমাদের ভেতর কেউই তাকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই নি, তাই অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাড়ি কামিয়ে ফেলে। আমি অবশ্য মনে মনে বেশ খানিকটা হেসে নিয়েছিলাম। কারণ আমার মুখে তখনো মোটেই ভাল দাড়ি গজায় নি।

একদিন কমিটির বৈঠকে আমরা সাব্যস্ত করি যে, স্থানীয় তুর্কানা ও সামবুরু উপজাতির লোকেদের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত। সপ্তায় দু'দিন ক্যাম্প থেকে একটি লরী জ্বালানি কাঠ আনতে নিকটবর্তী পাহাড়ের দিকে যেত। এই লরীতে করে আমরাও সেখানে যেতে আরম্ভ করলাম। সঙ্গে নিতাম নানারকম খাবার, যেমন—চিনি, চা, পোশো (বিনস্ থেকে তৈরি, আটা) ইত্যাদি এবং পথে কোন স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের ঐ সব জিনিস দিতাম। ফলে অল্প কিছুদিনের ভেতরেই তারা আমাদের বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে এবং আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। তখনই তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেন তারা প্রথম প্রথম আমাদের সন্দেহের চোখে দেখত। আমাদের কমিটিতে একটি নতুন নিয়ম গৃহীত হয়, যার ফলে ক্যাম্পের প্রত্যেক অন্তরীণকেই তুর্কানা নারী বা যুবতী বালিকার সঙ্গে সহবাস করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের পুরুষেরা এ খবর পাওয়ার পর আমাদের আরও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করে। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করা আমাদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। কাজেই নানারকম গল্পচ্ছলে আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে, দেশ স্বাধীন হলে তাদের স্বজাতিরা বিদেশী শাসকদের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে সাহায্য করবে, যাতে দেশের সব উপজাতিই উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

আশাকালা নামক এক অবস্থাপন্ন তুর্কানার সঙ্গে আমার বিশেষরকম ভাব হয়ে যায়। সে কিছুদিন সৈন্য দলে কাজ করেছিল এবং খুব ভাল সোয়াহিলি বলতে পারত। তার স্ত্রী ও তিনটি যুবতী কন্যার সঙ্গেও আমার আলাপ হয় এবং কালে আমি তাদের সংসারেরই একজন হয়ে যাই। যখনই লরী কাঠ আনতে বাইরে যেত, আমি তাদের জন্য অল্প-বিস্তর উপঢৌকন পাঠাতাম। কিছুদিন পরে তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গাঢ়তর হবার পর আমি কিকুয়ু সামাজিক প্রথা ও বোনেদের নাম দিই। ফলে আশাকালার স্ত্রীর নামকরণ হয় ওয়ানজিকু এবং তাদের কন্যা হয়ে দাঁড়ায় ন্যায়াকিও, নুজোকি এবং ওয়ানগুই। এইভাবে সম্মানিত হওয়ায় তারা অত্যন্ত আনন্দলাভ করে এবং বলে যে, এই নতুন নামগুলি তাদের কাছে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে হয়। আমি আশাকালা পরিবারের সকলকারই কয়েকটি আলোকচিত্র তুলেছিলাম, কিন্তু পরে ম্যানিয়ানি ক্যাম্পে সেগুলি আমার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয় সরকারী আদেশে। কেনিয়ার তথাকথিত শান্তিরক্ষায় এই ছবিগুলি কিভাবে বাধার সৃষ্টি করেছিল তা আমি আজও বুঝতে পারি নি। ১৯৫৩ সালের বড়দিনে (২৫শে ডিসেম্বর) আমরা ক্যাম্পের প্রাঙ্গণে কিকুয়ু লোকনৃত্যের সামান্য আয়োজন করি এবং স্থানীয় তুর্কানারা এতে দর্শক হয়ে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে।

তুর্কানাদের কয়েকটি সামাজিক আচারব্যবহার আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। কোন বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে খাওয়াদাওয়ার জন্য ছাগল বা ভেড়া কেটে তার মাংস রান্না করার আগে তারা ছাল ছাড়িয়ে নিত না—বরং খোসাশুদ্ধ আলু পোড়াবার মত ছাগল বা ভেড়াকেও তারা মাথা কেটে, নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করে নিয়ে ছালশুদ্ধ আগুনের উপর চাপিয়ে দিত ঝল্‌সে নেবার জন্য। এ বিষয় তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলতো যে, রান্না করার আগেই ছাল ছাড়িয়ে নিলে ছাগলের সমস্ত চর্বি গরমে গলে আগুনে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি এ বিষয় তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে, যেভাবেই রান্না করা হোক না কেন গরমে চর্বি গলে যাবেই। তারা আমার কথা বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কি না, তাতে সন্দেহ আছে। আমি আরও লক্ষ্য করি যে, তুর্কানা মেয়েরা রান্না করা মাংস কেটে নিয়ে তাদের পরনের চামড়ার তৈরি বহির্বাসে রাখত এবং পুরুষেরা এই বহির্বাসকে প্লেটের মত ব্যবহার করে সেখান থেকে মাংস তুলে খেত। আমার মনে হয় এ সব ব্যাপারে সামবুরু উপজাতীয় লোকেরা তুর্কানাদের চেয়ে বেশি অগ্রণী ছিল এবং তাদের আচারব্যবহারে মাসাই উপজাতির সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া যায়।

আবার মাসাইদের সঙ্গে কিকুয়ুদের যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক আদান-প্রদান আছে এবং এই দুই উপজাতির ভেতর চেহারারও কিয়দংশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তুর্কানারা আমাদের পরনের (ইউরোপীয়ান কায়দায় সেলাই করা) সার্ট হতো আমাদের অন্ধকারে দেখা যায় এরকম হাতঘড়ি দেখে (অর্থাৎ রেডিয়ামের প্রভাবে অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে) ও তা সত্যি-সত্যি টিক্‌টিক্ করে বলে।

১৯৫৩ সালের শেষে ও ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে কয়োপ ক্যাম্পে আরও একশত নব্বুইজন অন্তরীণকে নেয়েরী এবং এম্বু জেলা থেকে আনা হয় এবং তাদের থাকবার জন্য বাইশটি ছোট-ছোট তাঁবুও আসে। ঠিক এই সময়ই আমাদের পূর্বতন ক্যাম্প অফিসার 'পাথুয়া' ও তার সহকারী দু'জনেই অন্য জায়গায় বদলি হওয়ায় দু'জন নতুন ইউরোপীয়ান অফিসার আমাদের ক্যাম্পে আসেন। এঁদের ভেতর ঊর্ধ্বতন অফিসার স্যামসনস কিছুদিন আগে বিলেতের লণ্ডন শহরে পুলিশ বিভাগ থেকে বদলি হয়ে এসেছিলেন এবং আমাদের প্রতি স্নেহহীন ব্যবহার তাঁর চূড়ান্ত ভদ্রতার পরিচয় দেয়। ইনি সোয়াহিলি ভাষা বলতে না পারায় আমি তার দোভাষীর কাজ করতাম। এঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন নিউবেরী নামে আর একজন কেনিয়ার ইউরোপীয়ান। ভদ্রলোকের চেহারা ছিল বিরাট এবং সাধারণ বুদ্ধিশুদ্ধির একটু অভাব ছিল। ফলে অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই একে সবাই "মায়েরে" (একটি খালি ডিবে) বলে ডাকতে আরম্ভ করে। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসের দিকে নতুন অন্তরীণদের সবাই কয়োপ এসে পৌঁছয় এবং স্যামসনসের অনুপস্থিতিতে একদিন নিউবেরী সবাইকে ডেকে বলে যে, নতুন সরকারী নির্দেশানুসারে ক্যাম্পের পায়খানার জন্য দরকারী গর্ত আমাদের খুঁড়তে হবে। এর আগে আমাদের এই কাজ করতে বাধ্য করা হয় নি। কারণ আমরা ছিলাম অন্তরীণ—দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী নয়। নতুন অন্তরীণদের আসার পরই আমরা তাদের মুখপাত্রদের নিয়ে নতুন করে কমিটি গঠন করি, এতে ছিলেন গাদু গাথুমুরি, টিরাস মুচিরি, পিটারসন কারিয়ুকি, জন মোয়ানগি গাচুচি, জন কামনজো ও স্যামুয়েল কিবুরি প্রমুখ আরও ছয়জন বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা। কমিটির বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, অন্তরীণদের ভেতর কেউ-ই এই গর্ত খোঁড়ার কাজ করবে না। আমার মনে হয় যে, অন্তরীণদের দিয়ে এইভাবে জোর করে শারীরিক পরিশ্রম করিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি ইউরোপীয়ানদের নিজস্ব। কারণ স্যামসনস্ কখনও এর অনুমোদন করতেন না। কিকুয়ু ভাষায় এবং প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়েছে যে, "নুভিরি মুজেগা [illegible]

দুজন। আমাদের তাতেও এক সপ্তাহ দুজন ভাল অফিসার কখনও জোটে নি।

নিউবেরী গর্ত খোঁড়াবার জন্য যাবতীয় কলকব্জা ও মাটি ফেলার ডালা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করেই রেখেছিলেন। তিনি নবাগত অন্তরীণদের ডেকে কাজ আরম্ভ করতে বলায় জাসটাস কানগেথে গাচুরি নামক আমাদের মুখপাত্র তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে যে, তারা কেউ এ কাজ করবে না। ফলে নিউবেরী তাদের সবাইকে প্রখর রৌদ্রের মাঝখানে সারাদিন বাইরে বসিয়ে রাখেন। সন্ধ্যাবেলায় স্যামসনস্ ফিরে এসে তাঁর সহকারীর উপর ভীষণ রাগারাগি করেন এবং জাসটাস ও তার দলের সবাইকে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে যেতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেবার সপক্ষে কোন নিয়ম নেই। এর পর দিন তিনি কয়েকজন তুর্কানা শ্রমিকদের পয়সা দিয়ে প্রয়োজনীয় গর্তগুলি কাটিয়ে নেন। এইরকম আরও অনেকবার ইউরোপের ইউরোপীয়ান ও কেনিয়ার ইউরোপীয়ানদের ভেতর আচার-ব্যবহারের প্রভেদ দেখে আমার মনে ধারণা হয় যে, কেনিয়ার কিছু কিছু ইউরোপীয়ান নিশ্চয়ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের কেবল আফ্রিকানদের ঘৃণা করতেই শেখান।

স্যামসনস্ প্রায়ই আমাদের শিকারে পাঠাতেন ক্যাম্পের বরাদ্দ মাংসের অনুপাত বৃদ্ধির জন্য। এই সব অভিযানে গাড়িতে ঠাসাই হয়ে আমরা কিকুয়ু, তুর্কানা ও পুলিশের লোকেরা এক সঙ্গে যেতাম এবং খুবই উপভোগ করতাম। একবার আমরা দুটো বড় হরিণ মেরে এনেছিলাম। তুর্কানারা খুব তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারত এবং সাধারণত তারাই পথ পরিদর্শকের কাজ করতো। একবার ফেরবার পথে আমরা আশাকালার বাড়িতে গিয়ে প্রচুর হৈহল্লা করে খেলো মদ (বীয়ার) পান করি, ফলে সে রাত্রে ক্যাম্পে ফিরে আসার পর অনেকের ব্যবহার খুবই আপত্তিজনক হয়েছিল। পরেরবার কমিটির বৈঠকে আমি প্রস্তাব করি যে, ক্যাম্প মদ্যপান একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। বয়োজ্যেষ্ঠরা সবাই এতে রাজী হন এবং সেদিন থেকেই এই নিয়ম চালু হয়।

কমিটির পুনর্গঠনের পরেও গাদ্ আমাদের অধিনায়ক ছিল। তার লেখাপড়া বা বিদ্যার দৌড় খুব বেশি না হলেও মনেপ্রাণে সে ছিল একজন ন্যায়নিষ্ঠ, বিশ্বাসী ও ন্যায়সঙ্গত দেশভক্ত। অল্পদিনের ভেতরেই সে একজন ভাল বক্তা এবং নিরপেক্ষ বিচারক হিসাবে সব অন্তরীণের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিল। [illegible] সবাই "মুখমোকি" বলে ডাকত, যার অর্থ হল একজন স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠা নেতা ও বুদ্ধিমান বক্তা। আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল সকলকার রেশন ভাগ করে দেওয়ার ভার, তার উপর পূর্বে উল্লিখিত লেখাপড়ার ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমার হাতে আর একেবারেই সময় থাকত না অন্য কোন কাজ করবার। নাকুরু থেকে আসার সময় আমি অন্যান্য বই-এর সঙ্গে মিস্ মারগেরি পেরহ্যাম লিখিত "দশজন আফ্রিকান" নামক ইংরাজী বইটিও এনেছিলাম এবং এর সোয়াহিলি অনুবাদ শোনবার জন্য আমার ক্লাসে প্রচুর লোকের ভীড় হত। পরবর্তীকালে ম্যানিয়ানি ক্যাম্পে বদলী হয়ে যাওয়ার পর আমার অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই বইটিও বাজেয়াপ্ত হওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম।

কমিটি যখন জানতে পারলো যে, অন্তরীণদের ভেতর দুজন আমাদের "একতার শপথ" করে নি তখনই স্থির করা হয় যে, তাদের ঐ শপথ ক্যাম্পেই দেওয়া হবে। নাকুরুর গিটু মুগানুকে এই কাজের ভার দেওয়ায় সে রাজী হয় এবং তার সহকারী হিসেবে নেয়েরী অঞ্চলে অবস্থিত দক্ষিণ টেটুর নুড়োমি মুকুরিয়াকে নিযুক্ত করে। মুকুরিয়া একজন কড়া দেশভক্ত এবং সুবিখ্যাত* "চাল্লিশ গ্রুপের" সদস্য ছিল।

এই শপথ গ্রহণ উৎসব উপলক্ষে তুর্কানা গ্রামবাসীরা আমাদের একটি ভেড়া বিক্রি করে এবং এটি একতার শপথ হওয়ার ফলে এতে দু' নম্বর শপথের মতো কোন মৃত্যুদণ্ডের বা প্রয়োজন মত খুন করার উল্লেখ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে কমিটি জানতে পারে যে, আমাদের কার্যক্রমের কিছু খবরাখবর সরকারের কানে পৌঁছেচে, কাজেই আমরা ক্যাম্পে নিজেদের রক্ষাবাহিনী নিযুক্ত করি। কয়েকদিনের ভেতরেই যে দুজনকে শপথ দেওয়া হয়েছিল, তাদের একজনের কোটের পকেটে দুটি চিঠি পাওয়া যায়। একটিতে ছিল অন্তরীণদের সরকার-বিরোধী মনোভাবের বিস্তৃত বিবরণ আর অন্যটিতে বিশদভাবে বোঝান ছিল কি করে শপথ দেওয়া হয়। কমিটি সিদ্ধান্ত করে যে, চিঠি দুটি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং দোষীকে সাজা হিসাবে সমাজচ্যুত করা হবে। আমাদের অন্তরীণ ক্যাম্পের মত জায়গায় কাউকে সমাজচ্যুত করা হলে সে বড় কঠিন সাজা, কারণ কেউ তার সঙ্গে কথা বলবে না, খাবে না, গল্প করবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কয়েকদিনের ভেতরেই তাকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে টমসন ফলস্ ক্যাম্পে বদলি করা হচ্ছে বলে আমাদের ভেতর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তাতে আমরা নিঃসন্দেহ হই যে, তাকে গুপ্তচর করে আমাদের ক্যাম্পে পাঠান হয়েছিল।

ওয়ানজুকুর সঙ্গে আরও কয়েকজন কিকুয়ু স্ত্রীলোক পরে কয়োপ ক্যাম্পে অন্তরীণ হিসেবে যোগদান করায় তাদের সকলকার থাকবার জন্য আমরা একটা আলাদা তাঁবুর বন্দোবস্ত করেছিলাম। কমিটির তরফ থেকে নিয়মকানুন আরও কড়া করা হয়েছিল, যাতে তাদের সঙ্গে পুরুষরা যথেষ্ট মেশবার সুযোগ না পায়, কিন্তু কয়েকজন অন্তরীণ নানাভাবে এই নিয়ম ভঙ্গ করেছিল। তার ভেতর একটা হল আগে থেকে বন্দোবস্ত করে রাত্রে খাবারঘরে দেখা করা। নিরুপায় হয়ে আমরা ক্যাম্পের অধ্যক্ষ স্যামসন্স-এর কাছে আপীল করি যে, স্ত্রীলোকদের জন্য আমাদের ক্যাম্পের বাইরে আলাদা জায়গায় তাঁবুর বন্দোবস্ত করা হোক। এতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় বটে। কিন্তু কয়েকজন অন্তরীণ এর পরও রাত্রে লুকিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে তাদের কাছে যাবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করে। অবশেষে কয়োপ ক্যাম্প থেকে সব স্ত্রীলোক অন্তরীণদের সরিয়ে নাইরোবির কাছে কিয়াম্বু অঞ্চলের কমিটি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে কিছুদিন পরে তাদের নেতা ন্যায়ামাথিবার মৃত্যু হয়।

[ক্রমশ]

*চল্লিশ গ্রুপের চল্লিশজন আফ্রিকান যুবক এক সঙ্গে ১৯৪০ সালে মিলিত হয়েছিল এবং এদের প্রায় সকলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক শিক্ষালাভ করে পরে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। দেশের সামাজিক প্রথানুযায়ী এক সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তারা সবাই "ভাই" এবং প্রয়োজন হলে একে অন্যকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ]

'সপ্তাহের বোঝা' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর সাম্প্রতিক নীতিভ্রষ্টতা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু লিখছেন। আমার এ পত্র এই বহু-আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নয়। এ পত্র গত ১৬ই বৈশাখের সংখ্যায় শ্রীকৃত্তিবাস ওঝার 'সপ্তাহের বোঝা' সম্পর্কে।

গত ১২ই চৈত্রের 'সপ্তাহের বোঝায়' শ্রীওঝা লিখছেন, "...যখন তাঁরা বুঝলেন, অজয়বাবু পদত্যাগ না করতে চাইলেও ... শক্তির কারণে পারছেন না, তাঁরা ... অজয়বাবুর পিছনের শক্তি এবং ... যাকে মনে করেন, তাঁর ... হয়েছিলেন। সেই উৎসকে ... দেওয়া হয়েছিল—তোমার হাতের ... নাও কিন্তু সেই উৎস নাকি ...—বেশ তো, আমার বিরুদ্ধে সি বি আই এর মামলাগুলি তুলে নাও, ... অনশনের বাণ ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

আবার গত ২১শে ফাল্গুন শ্রীওঝা লিখেছিলেন, "....তবু এমনি এক-... পদত্যাগপত্র দিয়ে পদত্যাগ করা হ'ল আসলে কিন্তু পদত্যাগ করা হ'ল না, ... তাঁদের কাজ চালিয়েই ... গেলেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই—পদত্যাগের তাৎপর্যটা কি এবং কোথায়? ... তো জানা, যেদিন তিন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন সেইদিন মন্ত্রি-সভার বৈঠকে শ্রীচারুমিহির সরকার আর শ্রীসুশীল ধাড়া বিধানসভায় তাঁদের দপ্তরের আলোচনার দিন ঠিক করতে গিয়ে প্রায় এক মাস পরের দিন লিখে-ছিলেন। সেই লেখা ... পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীসতীন চক্রবর্তীর কাছে আছে। তাহলে পদত্যাগও করলেন, আবার মন্ত্রী হিসাবে কাজ করার জন্য এক মাস পরের দিনও লিখলেন—এর কোনটা সত্য? দেখা যাচ্ছে দুটোই সত্য—তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগও করছেন, আবার মন্ত্রীও আছেন। এরই নাম হ'ল ভাবের ঘরে ...।"

ঐ সপ্তাহেই শ্রীওঝা অপর এক ... লিখছেন, "......বর্তমান সরকারে থেকে, আবার সরকারী নীতি রূপায়িত হচ্ছে না বা সরকারী নীতি ভঙ্গ হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে অনশন করবো—এও এক অপরূপ ভণ্ডামী।"

দেখা যাচ্ছে, শ্রীওঝার মতেই 'সৎ' ও 'বিশ্বাসী' শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, যাঁর বিরুদ্ধে সি বি আই-এর মামলা চলছে। এবং এটাও দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীওঝা মনে করেন বাংলা কংগ্রেসের তিন মন্ত্রী প্রকৃতপক্ষে পদত্যাগ করেন নি। পদত্যাগপত্রখানি একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র। সরকারে থেকে অনশন করাকেও তিনি ভণ্ডামী বলে মনে করেন।

কিন্তু আশ্চর্য, গত ১৬ই বৈশাখের সপ্তাহের বোঝা লিখতে গিয়ে তিনি নিজের সমস্ত উক্তিই ভুলে গেলেন।

অজয়বাবু বিশ্বাসঘাতক কিম্বা জ্যোতিবাবু বিশ্বাসঘাতক, তার বিচার আমি করতে চাই না। তবে এটা ঠিক যে, শ্রীমুখোপাধ্যায় কখনই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন নি। আমরা বরং দেখলাম এত 'অত্যাচার', 'খুন', 'লুণ্ঠন', 'নারীধর্ষণে'র মধ্যেও কীভাবে দীর্ঘ পাঁচ মাস তিনি গদি আঁকড়ে ছিলেন। তাঁর নিজের কথা তিনি নিজেই বিশ্বাস করলে অনশন ব্যর্থ হওয়ার পর এক-দিনও তিনি গদিতে থাকতেন না। যাই হোক, এ সম্পর্কে শ্রীসাগর বিশ্বাস ঐ ১৬ই বৈশাখের সাপ্তাহিক বসুমতীতেই 'যুক্তফ্রন্টের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্য কেউ শ্রীমুখোপাধ্যায়কে 'ধাড়ধাক্কা' দেয় নি ঠিকই কিন্তু তাঁর নিজ দলের কার্যকলাপ এবং পেছনের আদৃশ্য হস্তই 'ঘাড়ধাক্কা' দিয়ে তাঁকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছিল যে, তাঁর পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এ সম্পর্কে উত্তরপ্রদেশের শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের 'স্বেচ্ছায়' পদত্যাগ করা তুলনীয়।

—দেবী সেন,
কলকাতা—১৯

* * *

আপনাদের ৩০।৪।৭০ তারিখের সপ্তাহের বোঝা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখছি। যদিও আপনাদের বর্তমান ভূমিকা অনুসারে এ বক্তব্য প্রকাশিত না হবার বেশি সম্ভাবনা।

কেরলে ২টি উপ-নির্বাচনে সি. পি. এম. পরাস্ত সত্য, কিন্তু ভোটের পরিমাণ ১৯৬৭-র চেয়ে তারা পেয়েছে বেশি। ২য়, অচ্যুত মেনন যে কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন, সে কেন্দ্রে কংগ্রেসের ভোটও তাঁর দিকে যুক্ত হয়েছে। গত নির্বাচনে এ কেন্দ্রে কংগ্রেস অল্প ব্যব-ধানেই পরাস্ত হয়। কংগ্রেস আজ সেখানে সি. পি. আই-এর আলাই। নিলাম্বুর কেন্দ্রে সি. পি. এম ১৯৬৭-র চেয়ে ভোট বেশি পেয়ে প্রমাণ করেছে **তাঁদো জনসমর্থনের কথা। আর কংগ্রেসের জয়লাভ হয়েছে সমস্ত তথা-কথিত বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী দলের সহযোগিতায়।** এ পরাজয়ে হতাশা আসে না। কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনে সি. পি. আই আজ বড় ঘটী। আর. এস. পি-এর কংগ্রেস-বিরোধিতা (!) খুব নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে নিলাম্বুরে কংগ্রেস সমর্থনে প্রচারপত্র প্রকাশে। কৃত্তিবাসবাবুর ওঝাগিরি আপনার পত্রিকায় চলুক, তবে সাংবাদিক সততা ও বিশ্লেষণ বজায় রেখে—নচেৎ তাঁর ধোঁকাবাজী সবাই ধ'রে ফেলবে। সব শেষে ১৯৭০ সালে ওঝাগিরি চলবে না—চলবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সংবাদ বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন। সত্যিই কোচ-বিহার-কেরল বহুদূর, নচেৎ অনেক কিছু এড়িয়ে গিয়ে সুবিধাজনক বস্তুই কেবল নজরে পড়ত না। সত্য প্রকাশ পাবেই।

—ডাঃ বি. এন. কুমার,
বাবুর বাগ,
বর্ধমান।

* * *

৩০. ৪. ৭০ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর "সপ্তাহের বোঝা" পড়ে শ্রীওঝার বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন মনে করছি। শ্রীওঝা সাপ্তাহিক বসুমতীর মত একখানি প্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন পত্রিকার একজন "কোলামনিস্ট"—কাজেই, সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ বলেই আমরা আশা করব। অতীতে তাঁর কোন কোন রচনার মধ্যে বুদ্ধি-মত্তার ছাপও কিছু কিছু তিনি রাখতে সমর্থ হয়েছেন, যদিও তাঁর মত ও মন্তব্য তর্কাতীত, সত্যের অতি অল্পই প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু আলোচ্য দিনের 'সপ্তাহের বোঝা'য় তিনি যে 'অজয়-স্তব-কবচমালা' প্রচার করতে চেয়েছেন, তাতে না আছে তথ্যের সত্যানুগ বিশ্লেষণ, না আছে যুক্তির ধার, না আছে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। বিষয়দৈন্যে বুঝি রচনাদৈন্য স্বাভাবিক-ভাবেই এসে পড়ে।

ওঝা মশায়ের শেষ কথা থেকেই শুরু করা যাক। তিনি লিখেছেন, 'ইতিহাস কোনদিকে যাচ্ছে তা আগামী দিনে ধরা পড়বে।' সত্য বটে, ইদানীং 'ইতিহাস', 'ঐতিহাসিক' ইত্যাদি শব্দ-গুলোর যথেচ্ছ প্রয়োগের রেওয়াজ পড়ে গেছে—কথায় কথায় ওই শব্দগুলির ব্যবহার না করলে নিজের বক্তব্য যে রীতিমত জ্ঞানগর্ভ, তা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। তা ওঝা মহাশয়ের প্রগাঢ় ইতিহাস-জ্ঞানের নমুনা অবশ্য আলোচ্য রচনার মধ্যেই তিনি যথেষ্ট রেখেছেন—কেন না, কেরলের যুক্তফ্রন্ট জেতে মিনিফ্রন্ট গড়া

...র পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট ভাঙা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতি বসুর মিনিফ্রণ্ট সরকার করবার চেষ্টা—এ দুয়ের মধ্যে তিনি সমতা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন! কোন ঘটনাটাই তো খুব বেশি পুরনো নয় যে, তাদের ইতিহাস জানার জন্য গবেষণায় বসতে হবে, বা ওঝা মশায়ের মত পাণ্ডিত্যের দরকার হবে। ঘটনা দুটো সবারই মনে আছে—কেরলে চক্রান্ত করে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী অপদস্থ করে তাঁর পতন ঘটান হয়েছে এবং যুক্তফ্রণ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মিনিফ্রণ্ট তৈরি করা হয়েছে, তাই অচ্যুত মেনন বিশ্বাসঘাতক, আর পশ্চিমবঙ্গে অজয়বাবু নিজে সদলবলে বেরিয়ে এসে সরকারের পতন ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন; তখন জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গবাসীকে কেন্দ্রীয় শাসনের হাত থেকে বাঁচানার শেষ চেষ্টা হিসাবে মিনিফ্রণ্ট গড়বার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অচ্যুত মেননের মত মিনিফ্রণ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট ভাঙবার হীন চক্রান্ত করেন নি, তাঁর কোন শত্রুও সে অভিযোগ এনেছে কি, ওঝা মশায়? তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে এই দুই রাজ্যের ঘটনাপরম্পরার সমতাটা কোথায়? সুতরাং প্রকৃত ইতিহাস যা বলে, তাতে অচ্যুত মেনন অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক, জ্যোতি বসু কদাচ নন। আর অজয়বাবুকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছে কেন? তাঁর ক্রিয়াকলাপ, কথাবার্তার বিশদ আলোচনার অবকাশ এই ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে নেই। কিন্তু পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের প্রতি তিনি যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তার প্রমাণ, যে কংগ্রেসের অপশাসনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় জনসাধারণ যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, অজয়বাবু সেই কংগ্রেসের কবলে তাদের নিক্ষেপ করেছেন। যুক্তফ্রণ্টের ক্রিয়াকলাপ, পরিবেশ ইত্যাদি দেখে যদি অসহাই লেগেছিল, এ সরকারকে 'অসভ্য', 'বর্বর' বলেই মনে হয়েছিল, তিনি তাঁর 'সুপ্রীম কোর্ট' জনগণেরই দ্বারস্থ হলেন না কেন? বিধানসভা ভেঙে দেওয়া এবং পুনর্নির্বাচনের সুপারিশ সহ পদত্যাগ করলেন না কেন? না কি তাঁর 'নির্লোভ' মন কোন দলবিশেষকে বাদ দিয়ে মিনিফ্রণ্ট সরকার গঠনের আশা একেবারে ত্যাগ করতে পারছিল না? বিশ্বাসঘাতক কে, ওঝা মশায়? ঢাকঢোল পিটিয়ে করলেই কি বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বস্ততায় পর্যবসিত হয়? প্রকাশ্যে মিনিফ্রণ্ট গড়ার চেষ্টা অজয়বাবুরা করেন নি, তার কারণ, তিনি জানতেন, তাঁর সে চেষ্টা মাঠে মারা যেত। দ্বিতীয়ত, তাঁর গুরু প্রফুল্ল ঘোষের পরিণাম তাঁর এত শীঘ্র ভুলে যাওয়ার কথা নয়। আর, জ্যোতি বসুর কথায় আপনি নিজেই আগের সপ্তাহে বলেছেন—'সরকার গড়তে পারলেও নির্বাচনের দাবীই তাঁরা তুলতেন'—এটাই সত্য।

ওঝা মশায় কেরলের কোডাকারা এবং নিলাম্বুর নির্বাচন কেন্দ্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে কোচবিহারের [illegible] আগামী দিনের ইতিহাসের সূচনা দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনার দিকে ওঝা মশায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অজয়বাবু '৬৭ সালের নির্বাচনে মর্যাদার লড়াইয়ে আরামবাগে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে ৭।৮ শত ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন; '৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সেখানেই তিনি ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজের কেন্দ্রে, যেখানকার জনসাধারণ অজয়বাবু বলতে অজ্ঞান, সেখানেও '৬৭ সালের তুলনায় তিনি ৮ হাজারের মত কম ব্যবধানে জিতেছেন। '৬৭ সালের ২রা অক্টোবরে বিশ্বাসঘাতকতার উপক্রম করতেই যাঁর জনপ্রিয়তা এত হ্রাস পেল, '৭০ সালের চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই জনপ্রিয়তা কোথায় দাঁড়ান উচিত? ওঝা মশায়ের ইতিহাস কি বলে?

আসলে ইতিহাস এত ঠুনকো জিনিস নয়—রাজনৈতিক চমক দিয়ে সাময়িক আলোড়ন তোলা যায়, হয়ত নির্বাচনও জেতা যায়, কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপ্তি তার অনেক ঊর্ধ্বে। বিচ্ছিন্ন নির্বাচনের ফলে ইতিহাস তৈয়ারী হয় না, অপপ্রচার দিয়েও ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না, ওঝা মশায়ের দপ্তরেও ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না—ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে মাঠে ঘাটে পথে-প্রান্তরে, কলে-কারখানায়, খনির নীচে—মেহনতী মানুষের নোনা ঘাম, নোনা রক্ত আর নোনা অশ্রুর ত্রিবেণী সঙ্গমে।

—তমোজিৎ সেন,
নববারাকপুর

* * *

কেরলের উপনির্বাচনের ওপর লেখা ৪৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত আপনার "সপ্তাহের বোঝা" কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। এর আগের একটি প্রবন্ধে আপনি লিখেছিলেন, আপনারা অর্থাৎ সাংবাদিকেরা শুধু ফ্যাক্টস্ উদ্ঘাটন করে থাকেন। সেটা সব দলের মনঃপূত নাও হতে পারে। কেরল প্রসঙ্গে আপনার ফ্যাক্টস্ উদ্ঘাটনের নমুনা দেখে আমি কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ২২ তারিখের যুগান্তরের সম্পাদকীয় লিখলো, এই কেন্দ্রে সি পি আই-প্রার্থী ১৯৬৭ সালে এক হাজারের কিছু বেশি ভোটে জয়লাভ করেছিলো। আর আপনি লিখলেন, মাত্র ৫০০ ভোটের ব্যবধানে সি পি আই-প্রার্থী জয়লাভ করেছিল। এবার বুঝুন, সাংবাদিকের ফ্যাক্টস্ উদ্ঘাটনের নমুনা। দ্বিতীয়ত, কেরল প্রসঙ্গে একটা কথা কিন্তু একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। কোডাকারা কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস শাসক কোনও প্রার্থী না দিয়ে মেননকে পুরোপুরি সমর্থন করে ওয়ার্কিং কমিটিতে এক প্রস্তাব পাশ করেছিলো। অন্যদিকে নিলাম্বুরে শাসক কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে মিনিফ্রণ্টের সমস্ত পার্টি সি পি এম এর বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে নেমেছিলো এবং মুসলিম লীগের প্রার্থীকে শেষ সময়ে শাসক কংগ্রেসের সুবিধের জন্য তুলে নেওয়া হয়েছিলো। এ সব ঘটনার পরেও সি পি এম এককভাবে ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রণ্টের ভোটসংখ্যার থেকে বেশি ভোট পেয়েছে।

আপনি এই প্রসঙ্গে মেনন মন্ত্রিসভার বিধানসভা ক্ষেত্রে আস্থালাভের কথা লিখেছেন। আমি বলি, মিনিফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার প্রথম ভোটাভুটি ছাড়া প্রতিবারের ফলাফল নিয়ে একটু যোগ বিয়োগ করলেই বোঝা যায় যে, এই সরকার কংগ্রেস শাসকের প্রত্যক্ষ এবং অপর কংগ্রেসের পরোক্ষ সহযোগিতায় বেঁচে আছে। তার প্রমাণ ওই সরকারের সহযোগী দলের (আর এস পি) সোশ্যালিস্ট সেক্রেটারিয়েটের মিটিং এ একটি প্রস্তাব। ওই প্রস্তাবে কংগ্রেসের সহযোগিতায় মেনন সরকারের [illegible] করে ঐ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার [illegible] কথা ঘোষণা করা হয়েছিলো। অন্য দিকে জ্যোতি বসুর সংকটকালে বাংলা কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দল সমর্থন করলে (যেটা জ্যোতি বসু চেয়েছিলেন) ওটা বামপন্থী সরকার বলেই বিবেচিত হত। কারণ, ওই সরকারকে কংগ্রেস বা বাংলা কংগ্রেসের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হত না। আপনি অনেক বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন কিন্তু বলতে পারেন কি কারণে রাষ্ট্রপতির শাসন এড়ানোর জন্য কেরলে সি পি এম ছাড়া সি পি আই সরকার গড়তে পারে, অথচ বাংলাদেশে বাংলা কংগ্রেস ছাড়া সি পি এম এর সরকারে যোগ দিতে পারে না?

—শ্রীকণ্ঠ সেন,
নাগেরবাজার, দমদম

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তিন ॥

আমার দ্বিতীয় চিঠিতে এগার দফার উল্লেখ করেছিলাম মাত্র, বিস্তৃতভাবে কিছু বলি নি। তাই এইবার এগার দফার সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা, আমাদের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ এই এগার দফা আজও অমূল্য, আজও নতুন।

১(ক) আত্মনির্ভর কলেজগুলিকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি ছাড়তে হবে। জগন্নাথ এবং অন্যান্য যেসব কলেজকে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছিল, তাদের পূর্বেক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসার যদি সত্যিই সরকারের কাম্য হয়, তবে গ্রামাঞ্চলে আরও অনেক স্কুল, কলেজ খুলতে হবে। যেসব স্কুল, কলেজ ইতিমধ্যে খুলেছে, তাদের অনুমোদন দিতে হবে। কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুব বেশি। কাজেই সরকারের উচিত আরও বেশি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল স্কুল খোলা।

(গ) কলেজের সংখ্যা না বাড়ার দরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই প্রতিটি কলেজেই নৈশ বিভাগ খোলা উচিত।

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজের মাইনে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমাতে হবে। স্কলারশিপ এবং স্টাইপেন্ডের পরিমাণ বাড়াতে হবে। আন্দোলন করার অপরাধে ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।

(ঙ) হোস্টেলে খাওয়া খরচার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সরকারকে দিতে হবে ভরতুকি হিসাবে।

(চ) হল, হোস্টেল এবং অন্যান্য ছাত্রাবাসের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করতে হবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) অধিকাংশ স্কুল-কলেজেই অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম। সরকারকে এর মোকাবিলা করতে হবে এবং শিক্ষকদের বাক্ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

(ঝ) অষ্টম শ্রেণী অবধি শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(ঞ) মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি খুলতে হবে। মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিনান্স এবং নমিনেশনে ভর্তির ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। নার্স ছাত্রীদের সমস্ত দাবি মেনে নিতে হবে।

(ট) প্রকৌশল শিক্ষায় অটোমেশন প্রথা এবং অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থা বিলোপ করতে হবে।

(ঠ) পলিটেকনিক ছাত্রদের "কনডেন্স কোর্স"-এর সুযোগ দিতে হবে এবং ডিপ্লোমা দানের ভিত্তি হবে "সেমিস্টার" পরীক্ষা।

(ড) কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে।

(ঢ) রেলপথে যাতায়াতের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখালে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কনসেশনে টিকিট পাবে। বাসে দূরবর্তী অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য এই একই সুবিধা ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব-পাকিস্তানেও শহরের ভেতরে বাস-ভাড়া দশ পয়সা করতে হবে, যাতে শহরের যে-কোনও জায়গায় অতি সহজেই যাওয়া যায়। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার জন্য আরও অনেক বাস চালু করতে হবে।

(ণ) চাকরির নিশ্চয়তা দিতে হবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা-সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিল করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক করতে হবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে হবে। বাক্ স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা চলবে না।

৩। পূর্ব-পাকিস্তানের মেহনতী মানুষ চায়, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি হিসাবে তারা দাবি করে যে—

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেল ব্যবস্থাভিত্তিক। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই ক'টি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য বিষয়ে প্রদেশগুলির ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ।

(গ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা থাকবে এবং কেন্দ্রই হবে মুদ্রা ব্যবস্থার পরিচালক। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন একটা সুনির্দিষ্ট বিধান রাখতে হবে, যাতে পূর্ব-পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। একই কারণে দেশে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং দুই অঞ্চলে দুইটি আলাদা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বসাতে হবে। পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য একটা আলাদা অর্থনীতি চালু করতে হবে।

(ঘ) সকল রকমের কর, খাজনা ইত্যাদি ধার্য এবং আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনও কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী "রেভিনিউ"র নির্ধারিত অংশ আদায় হওয়া মাত্রই ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য বহির্বাণিজ্যের আলাদা হিসাব রাখবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা তাদের অধীনেই থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী সরবরাহ করবে। দেশে প্রস্তুত যে কোনও জিনিসই অঙ্গরাজ্যগুলিতে আমদানী বা রপ্তানী করা চলবে। এর জন্য কোনও শুল্ক থাকবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি করার বা বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন করার অধিকার অঙ্গরাজ্যগুলির থাকবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা [illegible]

নৌবাহিনীর সদর দপ্তর বসাতে হবে।

৪। পশ্চিম-পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু সহ সমস্ত রাজ্যকেই স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং এদের নিয়ে একটা সাব-ফেডারেশন গঠন করতে হবে।

৫। ব্যাঙ্ক ইন্স্যুরেন্স, পাটের ব্যবসা এবং অন্যান্য বড় শিল্পের জাতীয়করণ চাই।

৬। কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্সের হার কমাতে হবে। বকেয়া খাজনা ও ঋণ মকুব করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি চল্লিশ টাকা ধরতে হবে এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, বোনাস, উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান দিতে হবে। ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে।

৮। পূর্ব-পাকিস্তানে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এবং জল-সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন তুলে নিতে হবে।

১০। সিয়াটো, সেণ্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোটবহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশীক নীতি চালু করতে হবে।

১১। দেশের বিভিন্ন জেলখানায় আটক সমস্ত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। যাবতীয় গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া ও মামলা ফিরিয়ে নিতে হবে।

এই তো আমাদের এগার দফা। আমাদের প্রাণের কথা, আমাদের বাঁচার দাবি। ইসলামের ইত্তেহাদ, ইসলামের তৌহিদ, আমাদের এই এগার দফাতেই আছে। যারা "এসলাম গেল, গেল" করে সারাক্ষণ চিৎকার করছে অথচ যারা ঈদুল আজহার মত দিনে ও পথের অসহায় ভিখারীকে কোরবাণীর গোশ্তের সামান্য একটি টুকরো দিতে চায় না, সেই সব ভণ্ড আমাদের এগার দফাকে সযত্নে এড়িয়ে যায়। ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কত শয়তান হতে পারে তার একটি প্রমাণ এই দিনটা ছিল ঈদুল-আজহার। দুপুরবেলা শহরের এক ধনী মহল্লার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। বিরাট সব বাড়ির ফটকে অসংখ্য ভিখারী কোরবাণীর গোশ্তের আশায় জমা হয়েছে। এমনি একটি বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বাড়ির কর্তা গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে তার পেয়ারের বিলেতী কুত্তাকে গোশ্ত খাওয়াচ্ছে আর তার বিহারী দরোয়ান লাঠি উঁচিয়ে ভিখারীদের তাড়াতে ব্যস্ত। শুনেছি, এই কুকুর-বান্ধব ব্যক্তিটি নাকি এক বিখ্যাত নেতার জামাই! বলা বাহুল্য, এই সব শয়তানরা, মেহনতী মানুষের এই সব দুশমনরা, যারা মেহনতী মানুষের রক্তে পেট ভরিয়ে মঞ্চে উঠে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে দুই-এক বার জড়িয়ে জড়িয়ে কোনও মতে "আওয়াম", "আজাদী" ইত্যাদি বুলি আওড়ে চেয়ারে ঢলে পড়ে, তারাই আমাদের এগার দফার প্রধান শত্রু। শাসকচক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ওরা চায় ছাত্র, শ্রমিক আর কৃষকদের মারতে। কিন্তু কাঁটা দিয়ে কি সমুদ্রের ঢেউ আটকানো যায়?

এইসব শয়তান ছাড়াও আরও একদল লোক আছে, যারা সোজা-সুজি কিছু না করে চোরাগলির আশ্রয় নেয়। এরা মুখে এগার দফাকে সমর্থন করে কিন্তু কাজের বেলায় পিঠ দেখায়,—যেমনটি দেখিয়েছিল, গত বছর আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এই বজ্জাত নেতারা আজও শ্রমিক, কৃষক এবং কিছু কিছু ছাত্রদের চরিয়ে খাচ্ছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা দরকার যে, তাদের পিঠে গণ্ডারের চামড়া নেই, যেটা আছে সেটা তুলে নিতে দেরি হবে না এবং এই কাজটা নির্বাচনের পরেই শুরু হবে। কেন না, আগেই বলেছি যে, পাকিস্তানের মেহনতী মানুষ এইবারের নির্বাচনে জ্বলে উঠলেও ক্ষমতা দখলের অন্য রাস্তাও তাদের জানা আছে। এই রাস্তাটি হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম। নির্বাচনের মাধ্যমে মেহনতী মানুষ পূর্ণ ক্ষমতা

...যেতে পারে না, আসল নির্বাচনেও পারবে না। তবুও সরল, সহজ, অজ্ঞ এই সব মানুষ নেতাদের কথায় মেতে উঠেছে। তা ছাড়া এই ধরনের নির্বাচন পাকিস্তানের তেইশ বছরের জীবনে এই প্রথম। কিন্তু নির্বাচনের শেষে ওরা যখন দেখবে যে, ওদের বরাতে কিছুই জোটে নি, ওরা আরশিতে যে আকাশ দেখেছে তাকে ছোঁয়া যাবে না, তখনই শুরু হবে ওদের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে শাসকচক্রের সঙ্গে সুবিধাবাদী নেতাদের পিঠের চামড়াও উঠবে।

কেউ যেন মনে না করেন যে, এবার দফায় আমরা নির্বাচন এবং [illegible] শাসন চাইলেও অন্য কোনও রাস্তা আমাদের নেই। অন্য রাস্তা আমাদের আছে, তা হোল ঐ মেহনতী আওয়ামের সাথে মিলেমিশে আজাদীর জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করা এবং শাহাদৎ বরণ করা। দরকার হলে আমরা তাই করব। সেদিন সারা দুনিয়ার মানুষ দেখবে, পাকিস্তানে সরাসরি দুইটি দল হয়ে গেছে। একদিকে আমরা অর্থাৎ ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকরা, অপরদিকে শাসকচক্র এবং তাদের পোষা [illegible] দালাল, সুবিধাবাদী নেতার দল। মুখে [illegible] ভেলায় করে মিথ্যা বলা আমাদের স্বভাব নয়। আমরা বুকের রক্ত হাতে মেখে শপথ করি। প্রমাণস্বরূপ নিচে একটি তালিকা দিলাম। এগার দফার জন্যে, আজাদীর জন্যে, আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যে সব বিপ্লবী শহিদ হয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা এইটি। আমাকে আপনারা মাফ করবেন, তাড়াতাড়ি লিখে পাঠাবার দরুণ তালিকাটি সম্পূর্ণ করতে পারি নি।

সন	শহীদদের নাম	পরিচয়	স্থান
১৯৬৮	আব্দুল মজিদ	চাকুরিয়া	ঢাকা
তারিখ	আবু (১৫)	শ্রমিক	”
৮-২৯শে ডিসেম্বর	মিয়া চান	”	”
	হাসান আলী	”	”
	চেরাগ আলী	”	”
	সিদ্দিকুর রহমান	শিক্ষক	”
১৯৬৯	হাফিজ আহমদ	ছাত্র	রূপগঞ্জ
	আসাদুজ্জমান	”	ঢাকা
১৮-৩০শে জানুয়ারী	মহম্মদ মতিউর রহমান	”	”
	রুস্তম আলী	”	”
	আলমগীর মনসুর	”	ময়মনসিংহ
	আব্দুল লতিফ	”	তেজগাঁও
	হারুন আব্দুল আজিজ	”	গৌরীপুর
	আলাউদ্দীন (১০)	”	জাজিরা
	হাসানুজ্জমান	শ্রমিক	চট্টগ্রাম
	আরু মিয়া	”	”
	সরল খান	”	ঢাকা
	আনোয়ার আলী	”	সিমুলিয়া
	জুলহাস সিকদার	”	সিদ্ধিরগঞ্জ
	আব্দুল জব্বার মাঝি	”	জাজিরা
	আনোয়ারা বেগম	গৃহবধূ	ঢাকা
	রহিমদাদ	চাকুরিয়া	”
৬-১৮ই ফেব্রুয়ারী	মহানন্দ সরকার	ছাত্র	জলিরপাড়
	মজিবর রহমান	”	রাজারগাঁও
	কামালউদ্দীন আখন্দ	”	”
	মাজহার আহমদ	”	নারায়ণগঞ্জের অদূরে
	আবদুল আলী	শ্রমিক	ঢাকা
	ইসহাক	”	”
	জহুরুল হক	(আগরতলা মামলার বন্দী)	সেনানিবাস
	ডঃ শামসুজ্জোহা	শিক্ষক	রাজশাহী
১৯শে ফেব্রুয়ারী	আবদুর রহমান	শ্রমিক	সেনবাগ নোয়াখালী
	ইসহাক	”	কুমিল্লা
	রেজাউল করিম	”	ঢাকা
	লোকমান	”	”
	মজিবর রহমান	”	”
	শামসু	হোটেল বয়	মালিবাগ, ঢাকা
	আজিজুর রহমান	শ্রমিক	নোয়াখালি
	আব্দুল আলী	”	মালিবাগ, ঢাকা
	আবুল হাসেম	দর্জি	”
	আতাহার খান	দর্জি	”
	শহীদ	দোকান কর্মী	ঢাকা
	আবুল কালাম	ছাত্র	সেনবাগান নোয়াখালি
	সামসুল হক	”	”
	খোরশেদ আলম	”	”
২০-২৮শে ফেব্রুয়ারী	ইসরাফিল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রমিক	দৌলতপুর, খুলনা
	আলতাফ (২৩)	”	”
	হাবিবুর রহমান	”	”
	নাসির	”	”
	লোকনাথ	”	”
	আব্দুস সাত্তার	”	ঢাকা
	শাহজাহান আলী	ছাত্র-শ্রমিক	খুলনা
	মনিরুজ্জমান	ছাত্র	ঢাকা
	আলাউদ্দিন	”	বরিশাল
	আব্দুস সাত্তার		খুলনা
৭-২৩শে মার্চ	বিশ্বনাথ সাহা	ছাত্র	টাঙ্গাইল
	দারোগ আলী	”	শেরপুর
	আব্দুল কাদের	ছাত্র	মাণিকগঞ্জ

এইবার বলুন তো আমরা বাঁচতে জানি কি না?

সাহিত্যে চুরি ঃ

জীবনী-সাহিত্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার দৃষ্টি পড়ল পত্রান্তরে প্রখ্যাত বিমল মিত্রের একখানি চিঠির ওপর। বিমল মিত্রের চিঠিতে প্রকাশ, দুজন বিমল মিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে ঃ একজন কলকাতা—২৭-এর বিমল মিত্র: আর একজন বিমল মিত্রের অভিযোগমত হাবড়ার এক কয়লার দোকানের নিরক্ষর লোক; অথবা সে দশ টাকার শিখণ্ডী, তার আড়ালে অর্জুন শর-সন্ধান করে চলেছেন। অথবা 'প্রলেতারিয়েত-বুর্জোয়া' (কেন না, দোকানের মালিক)।

আলোচ্য চিঠিটা সাহেব-বিবি-গোলামের বিমল মিত্র লিখেছেন ধরে নিয়েই আমি প্রখ্যাত শব্দটা ব্যবহার করেছি। আমার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই; কোথাও দেখে থাকলেও চেহারাটা স্মরণ করতে পারছি নে, যেমন পারি এখনকার মুটিয়ে-যাওয়া ও আগেকার রোগা সমরেশ বসুকে অথবা প্রফুল্ল রায়কে। কিন্তু পত্রলেখক বিমলবাবুর আঁকা অনুসরণ ক'রে কয়লার দোকানের নিরক্ষর দশ টাকার শিখণ্ডীর একটা রূপ চোখের সামনে খেলে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সে রূপ প্রীতিপ্রদ নয়। ওর সঙ্গে আমি আরও একটু যোগ করতে চাই। কষ বেয়ে পানের রস গড়াচ্ছে, আদুড় গা, থলথলে ভুঁড়িটায় নাভির একটা ক্রেভিস, তার নিচে একটা রঙিন (নীলচে রঙের) লুঙ্গি, পায়ে ফেনার চটি। দশ টাকাতেই খুশি। তবু, শেষ পর্যন্ত, এ চেহারাটা তেমন বীভৎস নয়; বীভৎস চেহারা ঐ অশরীরীদের, যাদের অক্টবাহু ওকে আগলে চলেছে। রাস্তায় মাঝে মাঝে তামা বা পেতলের কতকগুলো হাত বসিয়ে রঙ-সাজা পরে—কালী বেরোয় সেই রকম। অর্থগৃধ্নুতায় কৃষ্ণকায় ও গলিতঅঙ্গ; সাপের মত লেলিহান জিহ্বা আর সর্বাঙ্গে মুণ্ড-মালার রক্ত। সাহেব-বিবির বিমল মিত্র তাঁর পাকা হাতে এ মূর্তি আঁকতে পারেন এবং ইতিমধ্যে এমন একটি চরিত্রের উপন্যাস (দুই খণ্ডে—এক খণ্ডে তাঁর প্রারম্ভিক ও আর এক খণ্ডে নকলনবীশের পারিণতিক) লিখেছেন কি না জানি নে। কেন না, এর চাইতে চাঞ্চল্যকর ট্রাজেডি আর কিছু হয় বলে আমার জানা নেই।

স্বভাবতই বিমলবাবু উদ্বেগবশে কিছু পরিশ্রম করেছেন এবং আমাদের কিছু তথ্য দিয়েছেন, যা অন্যথা আমরা জানতে পারতাম না। কিন্তু বিমল মিত্রের বই যে নকল হচ্ছে, বা আর এক বিমল মিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, এ কথাটা কিন্তু বায়ুমণ্ডলে অনেক দিন থেকেই ঘুরছে এবং আমার কানকেও পীড়িত করেছে। কিন্তু এজন্য আমার মনে হয়, বিমলবাবুরও কিছু দায়িত্ব আছে, জ্ঞানত নয়, কার্যত। লেখক যতক্ষণ লেখেন নিজের তাগিদে (৫০ ভাগ বেদনা-প্রেরণা, ২৫ ভাগ খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, ২৫ ভাগ অর্থোপার্জনে) ততক্ষণ শিল্পকর্মটা হয় ধীর মন্থরগতি ও সতর্ক, ভালো লেখা বা খ্যাতির সূচনা ঘটে তখনই; এর সঙ্গে যদি তৎপর প্রকাশক ও ভাগ্য-লক্ষ্মীর যোগাযোগ হয়, তবে একেবারে আলিবাবার চিচিং ফাঁক। সর্বনেশে টানাটানি সুরু হয় প্রকাশকদের; বেঁচে থাকতে হলে লেখককে এ আমন্ত্রণ স্বীকার করতেই হয়। প্রথমটা যায় বদলে; লেখক যান না প্রকাশকের কাছে, প্রকাশক আসেন লেখকের কাছে। একজন নয় একাধিক। এবং সুবর্ণ সুযোগ পুরোমাত্রায় কাজে লাগাও নীতি; এখন আর সেকালের মত খেয়েপরে থাকার দিন নেই, ভালোভাবে থাকার দিন, টেলিফোন, ফ্যান, সোফা ডিভান, গাড়ি-বাড়ি-ভৃত্য-ক্যাকটাস-ডালিয়া, কলিং বেল, অ্যালসেশিয়ানের দিন, সুতরাং নিজের তাগিদ না থাক, প্রেরণা না থাক, অনর্গল নিরলস লিখে যেতে হবে—গুড, ব্যাড, ইনডিফারেন্ট! পয়সা—পয়সা, সেই মারাবাড়ের ধূলি-ঝড় এবং পয়সা নইলে এ সমাজে সম্মানও নেই। বিমল মিত্রের প্রকাশক একজনই এবং বিমল মিত্রের লেখার স্ট্যাণ্ডার্ড এই—এমনটি হয় না। কেন না, একজন প্রকাশককে টিকে থাকবার মতো বাংলা সাহিত্য-প্রকাশকদের অনেকেই নির্ভরযোগ্য মর্যাদা পান নি; রয়ালটির হেরফের ও নগদ দেনাপাওনার ব্যতিক্রম ঘটে; সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে কারও 'অফারই' অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তখন খ্যাতিমান লেখককেও নিজেকে বিস্তময় দিতে হয় 'ছড়ায়ে।' এই ফাঁকে নকল বিমল মিত্র ঢুকে পড়ে। কেন না, খ্যাতির চোর সর্বদাই নজদিক হ্যায়; আপনা টিকিট আপনা খরিদে, মালকা উপর নজর রাখো, জুয়াচোর, চোর, ঔর বাটপাড় লোক নজদিক হ্যায়!

কোনো লেখকের পক্ষে এতখানি সতর্ক হওয়া কি সম্ভব? আসলে, এই ঘটনাক্রমের মধ্যে লেখকের কোনো অপরাধ নেই; কেন না, প্রকাশকদের কাছে লেখকদের কতখানি সম্মান ও লাঞ্ছনার ব্যালান্সসীট আছে তা আমি জানি। তাঁরা অনেকটা খাটালের দুধালো গাইয়ের মতো। সমানুপাত খাদ্য, গাত্রমার্জনা, স্বাচ্ছন্দ্য; কিন্তু পুংবৎস অসহ্য এবং প্রয়োজনবোধে ফুকা; তাতে গাইয়ের আয়ু ও আমদানীও হিসেব-কষা। সুতরাং, সেখানে তাকে সর্বংসহা গোমাতার মতই নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক থাকতে হয়। কিন্তু বিপদ হচ্ছে, নিজেকে নির্বিচারে গুড,

ম্যাড, হনাডফারেন্ট সন্তান প্রসবের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরী ভাষা থেকে একেবারে গদ্য কবিতার ভাষাযুগেও বেঁচে ছিলেন; কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা কুরেকুরে খাবার মত নকলনবিশ তাঁর সাহিত্যে ধস নামাতে পারে নি। সম্ভবত প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ সতর্কতা ছিল—যা পরে একটা জায়গায় স্থিত হয়েছিল। তাঁর আর একটা সুবিধে ছিল রবীন্দ্রনাথ নামের নয়, ঠাকুর পদবীর; ঐ দুই মিলিয়ে দ্বিতীয় কারও হবার উপায় নেই; সে আর ঠাকুর কখনো টেগোর হতে পারবেন না বা কোন বসুঠাকুরের পক্ষেও শুধু ঠাকুর লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু বিমলবাবুর দুর্ভাগ্য, বিমলও অনেক, মিত্রও অনেক; সেক্ষেত্রে সত্যিই যদি আর কোন মিত্র পরিবারে কেউ বিমল নাম নিয়ে জগতে দেখা দেন, কে প্রতিরোধ করবে? আমারই একাধিক পরিচিত বিমল মিত্র আছেন; একজন আমার বন্ধুস্থানীয়; তিনি কখনো কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্রের খ্যাতির ভাগীদার হবেন না। কিন্তু কোন এক বিমল মিত্র-পরিবারে জন্মগ্রহণ করে যদি লেখক হয়ে ওঠে ঠেকানো যাবে কি করে? আমার মনে হয়, একটি উপায়—স্টাইল, স্ট্যান্ডার্ড ও ভাষা। রবীন্দ্রনাথের লেখা অনেকেই নকল করেছেন, কিন্তু একটা গোটা প্রবন্ধে অ-ঠাকুর কোনো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে রাবিন্দ্রীক স্টাইল-স্ট্যান্ডার্ড-ভাষা অনুকরণ করা দুঃসাধ্য। কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রতিপদে সে ব্যর্থতা ধরা পড়েছে।

তবু, সাহিত্যের চুরি, বিশেষ খ্যাতির চুরি, সম্ভবত আবহমানকাল চলে এসেছে। অবিশ্যি চুরিরও রকমফের আছে।

এক বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের চুরিই যে কত রকমে হয়েছে ফুটপাতে-ঢালা বা সুন্দর অফসেটে ছাপা শত-রকমের বইয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অথচ সেকালেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বইয়ের স্বকীয়তা অজানা ছিল না; কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরা চোরেদের মেলায় হারিয়ে গেছেন। এই চোরেদের ঠোঁটে লালিমা, গালে রুজ, চুলে ফণা, মুখে পালিশ আছে, নেই গ্রাম্য সারল্য, কমনীয়তা যা দৃষ্টিকে নয়, হৃদয়কে আকর্ষণ করে। আমি একবার শিশু-সাহিত্য (প্রথম পাঠ) ঘেঁটেছিলাম এবং আচরণবাদী বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলাম তার ৯৯ শতাংশই অবৈজ্ঞানিক এবং শিশুর চিত্তে ভয় ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি জাগাবার এক অস্বাস্থ্যকর যন্ত্র। অথচ বিদ্যাসাগরের প্রাণপাত পরিশ্রমলব্ধ বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই হয় না, শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, সুস্থ প্রাণের এলিক্সারও বটে।

বিদ্যাসাগরকে কেউ নকল করছে শুনলে তিনি নিশ্চয়ই অখুশি হতেন না, ছেপে বিক্রি করছে জানলেও প্রতিরোধ করতেন না। কেন না, তাঁর একটি লক্ষ্য ছিল, বাঙালীর হাতে বাংলার বর্ণপরিচয় তুলে দেওয়া ও তার প্রসার এবং জীবনে তিনি অকারণ এত আঘাত পেয়েছেন যে, আমার মনে হয়, কেউ তাঁর নাম চুরি করছে জানলেও বিস্মিত হতেন না। আজ তিনি নিরক্ষর চোর ও অযোগ্য শিক্ষাবিদ্‌দের মাঝখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। অথচ বিকৃত না করলে সৎসাহিত্যের এই চুরিকে হয়তো তিনি আশীর্বাদ করতেন—অভাবে চুরি করেছে এই বোধে যেমন বিষয়-চোরকে ক্ষমা করতেন। তবু তিনি এমন এক অসাধারণ ন-ভূত-নর্ভাবষ্যতি ব্যক্তি যে, তাঁর খ্যাতি ও কীর্তি চুরি করার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ জন্মায় নি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি-বিড়ম্বনা ঘটেছে বা খ্যাতি চুরি ঘটেছে অন্যভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র নাম ও চট্টোপাধ্যায়ও অনন্য নয়। কোনো চাটুয্যে পরিবারের অকাট-বখাটে ছেলেটাও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হতে পারে; তবু সে বঙ্কিমচন্দ্র হতে পারবে না। কিন্তু তাঁকে অবলম্বন করে সেকালেই সর্বগ্রাসী দামোদরের আবির্ভাব ঘটেছিল। "সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্ত-বায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?" এই উপসংহার দামোদর মুখোঃর পক্ষে দুঃসহ হয়েছিল বলে মুখোপাধ্যায় মশাই তাকে উদ্ধার করে মৃন্ময়ী করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আরও বই, 'তোমার হল সারা আমার হল সুরু' অর্থাৎ, কপাল-কুণ্ডলার ঔৎসুক্য (এবং নিঃসংশয়ে খ্যাতি) তিনি টেনে ধরে লম্বা করেছেন এবং স্বভাবতই আদ্যশ্রাদ্ধও হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আফিমখোর-কমলাকান্তকে নিয়েও টানাটানি বড় কম হয় নি। অর্বাচীনেরা মনে করল, একটা আফিমখোর বুড়ো আর একটা প্রসন্ন গোয়ালিনী আনলেই একে একে দুই কমলাকান্ত হয়ে যাবে। কমলাকান্ত যে এই একে একে দুইয়েরও অতিরিক্ত এ কিন্তু ঐ অবোধেরা বোঝে নি; ফলে, প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধে জল দিয়ে এবং আফিমে ভেজাল দিয়ে নির্বোধ পাঠককে প্রতারণা করা গেছে বটে, কিন্তু কমলাকান্তর সমকক্ষ রচনার সৃষ্টি হয় নি; কেন না, উত্তরাধিকার সেখানে সত্য নয়। অসূয়া-বিদ্বেষমুক্ত বঙ্কিমের কমলাকান্ত বাস্যাটায়ার এদের কারও কারও হাতে ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থতার নীরস তরুবর বা যষ্টি হয়তো হয়েছে, কমলাকান্ত হয় নি; যিনি ঊনপঞ্চাশীর স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল তাঁর ওপর কমলা-কান্তের প্রতিফলিত আলোকপাত অপ্রয়োজন, কিন্তু যাঁর গুরুসান্নিধ্য ছাড়া পুঁজিপাটা বড় কম, তাঁকে অপরের ভূমিকায় যাত্রার নকল সাজে সাজতেই হয়। বাংলাসাহিত্যে নকল কমলা-কান্ত যে একটা প্রতারণা ও খ্যাতি চুরি নির্বিরোধ সাহিত্যিকদের সে বোধটুকু পর্যন্ত নেই। কিন্তু নেপো মুর্খের ভাঁড়ারে খাবলা খাবলা দই মেরে খাচ্ছে। বিমলবাবু কি কখনো এই জাতীয় প্রতারণা বা খ্যাতি চুরির নিন্দায় সোচ্চার হয়েছেন? নিজের যদি বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে সেটিই একটি নাম হয়ে দাঁড়াবে, যদি কিছুই না থাকে তবে নাম ধার করে কারবার সাধু নয়; যেমন অমুকের সন্দেশ ভাল, কিন্তু অমুকের নাম দেওয়া যাবে না, কি করা যাবে?—না, অমুক নামটা বড় বড় করে দিয়ে সহসা নজরে পড়বার মতো নয় এমন ছোট করে 'তস্য পুত্র' বা 'তস্য প্রপৌত্র' বা 'তস্য ভ্রাতা' সম্ভবত বৈধ!! অথবা গ্রাজুয়েটের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের একেবারে মাথায় ছোট্ট করে 'আণ্ডার' শব্দটার ব্যবহার নিশ্চয়ই আদালতে বিচার যোগ্য নয়। অনৈতিক ও অবৈধ কথা দুটি ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করা হয়—এই মাত্র।

বিমলবাবু তাঁদের কথা ভেবে নিশ্চয়ই কিছু সান্ত্বনা পাবেন, যাঁরা বিস্তর লিখেও লেখক বলে পরিচয় পেলেন না। না, আমি অসার্থক লেখার লেখকদের কথা বলছি নে। আমি বলছি তাঁদের কথা, যাঁরা লিখলেন প্রচুর কিন্তু তাঁদের লেখা অপরের নামে বেরুলো। কেবল কোন জমিদার বা বিত্তবান লোকই যে এই ঠগবাজি করেছেন, কেরাণীকে দিয়ে লিখিয়ে নিজে লেখক নাম কিনেছেন, তা নয়। অনেক খ্যাত লেখকও অখ্যাত লেখককে মেরেছেন। একটা আইডিয়া নিজে রূপায়িত করতে পারছেন না, দরিদ্র অখ্যাত কোন লেখককে তার খসড়া করতে বললেন, ভরসা দিলেন, যৌথ নামে তা প্রকাশিত হবে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, আইডিয়ার খ্যাতিমান্ লেখকের নামে কোথাও সেটি আত্মপ্রকাশ করেছে। এ চুরি নয়, ডাকাতি নয়। এ

[illegible]
জানা নেই।

যাঁরা অন্য কোন ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করেন এবং স্বীকার করেন তাঁরা যে কেবল সাধু লোক তাই নন, তাঁরা তা করে বাংলাসাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটান। কিন্তু যাঁরা বলেন ছায়াবলম্বনে তাঁরা যেমন মৌলিকতা [illegible] করতে পারেন না, তাঁরা তেমনি সম্পূর্ণ সাধুতারও দাবি করতে পারেন না; তাঁরা অর্ধেক সাধু অর্ধেক চোর। ছায়াবলম্বন ব্যাপারটাই ধোঁকা। লন্ডনের বদলে কলকাতা, জন-এর বদলে রাম।

ছায়াবলম্বনটুকুও যাঁরা স্বীকার করেন না তাঁরা দাগী চোর। তাঁরা বেমালুম একটা জিনিস গিলে ফেলেন: কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য, এক্স-রে যন্ত্রে একদিন তা ধরা পড়েই। ছেলেবেলার একটা ঘটনা বলি। স্কুলে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে একটি ছেলের প্রবন্ধ নির্বাচিত হল। প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে সুলিখিত। পুরস্কার বিতরণও হয়ে গেল। আমার

[illegible] পোড়া কথাকে, [illegible] [illegible] এরোর, অশিক্ষিত বা [illegible] [illegible] পুরোনো বাঁধাই 'প্রবাসী' পড়বার অভ্যাস। [illegible] দেখি সেই প্রবন্ধ; সবটা নয়, ৯০ শতাংশ এবং লেখাটা প্রখ্যাত অজিত চক্রবর্তীর। 'আবিষ্কারে'র পর কাউকে কাউকে বলেছিলাম, বিশ্বাস করেন নি, দেখিয়েছিলাম কিন্তু গা করেন নি। কেন না, নির্বাচকদেরই লজ্জা।

বিমলবাবু আর একটু খোঁজ নিলে জানতে পারবেন এমন দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনী বনাম আইভ্যান হো বা মাই-কেলের কোন কোন অংশ সম্পর্কে, এমন কি, রবীন্দ্রনাথেরও কোন কোন কবিতা সম্পর্কে যে সংশয়ের ঝাপ্টা বাংলা-সাহিত্যকে মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ করেছে, এ সে জাতীয় ঘটনা নয়। এ একেবারে একের লেখা অপরের নামে চালাবার দুশ্চেষ্টা। কথাসাহিত্যে, প্রবন্ধে, নাটকে, কবিতায়—শুধু ভাব নয়, সে তো হামেশাই হচ্ছে—লেখাকে লেখা একেবারে টুকলি। আমাকে একবার এক বাংলার হেড অব দি এগজামিনার মশাই প্রস্তাব করেছিলেন, সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে বিশেষ করে একটি উপন্যাস সম্পর্কে, কিছু লিখে দিতে। কালপুরুষ নামে একটি অধুনালুপ্ত মাসিকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে তখন আমার লেখা বেরুচ্ছিল। তিনি স্পষ্টই বললেন, লেখাটা কি আপনার নামে বেরুবে না। বললাম, নোট করবেন বুঝি? বললেন, ঐ রকমই একটা কিছু। নাছোড়বান্দা ভদ্রলোককে শেষ পর্যন্ত বললাম, লিখে দেব না। একদিন আসুন আলোচনা করব, তাতে যা হয়। তিনি দুদিন এসেছিলেন। একটা 'কালপুরুষ' অবশ্য দিতে হয়েছিল।

বাংলার নোট ও পাঠ্যপুস্তক লেখা নিয়ে কি চুরি-জোচ্চুরি হয়, তাও কি বিমলবাবুর অজানা? অনেক বড় বড় চোর কিছু ইনাম পেলেই তাঁদের নাম বিলিয়ে দেন, তাঁদের নামে নোট ভাষ্য এরোয়, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকেরা তা লেখে, ভুলে-ভরা সেসব বই শিক্ষার্থীরা পড়ে পণ্ডিত হয়। এখানেও কি ধরনের নামের 'নকল' হয় বা নকলের চেষ্টা হয়, আবার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তার উল্লেখ করি। এক-জন অত্যন্ত প্রখ্যাত ইংরেজী ব্যাকরণ লেখকের সংক্ষিপ্ত আক্ষরিক নামের সঙ্গে আমার নামের একটা মিল আছে। নির্লজ্জ এক বইয়ের ক্যানভাসার ঐ নাম ব্যবহারে একটা ব্যাকরণ লেখাতে চেয়েছিলেন, অথবা তিনিই লেখাবেন, নামটা শুধু......। মানুষের প্রবৃত্তি কোন্ স্তর পর্যন্ত অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে লক্ষ্য করে শুধু চেয়ে-থেকেছি। আমার অসম্মতির কারণটা পর্যন্ত তাঁর মাথায় ঢোকে নি।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পাঁচ রকম 'গল্প-সংকলন' ঠিক চুরি নয়, হয়তো প্রতারণাও নয়; একই লেখকের একই গল্প একাধিক কাগজে বিভিন্ন সময়ে বেরোনোও হয়তো ভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু পরের গল্প নিজের বলে চালানো নিশ্চয়ই চুরি। মেকলে নাকি বলতেন, তাঁর স্মৃতিশক্তিই হয়েছে তাঁর কাল। এমন মুখস্থ হত যে, কোন্ সময়-কার লেখা যে নিজের লেখায় ঢুকে যেত টের পেতেন না। এমন মেধাবী লেখক বাংলাসাহিত্যে কতজন আছেন আমার জানা নেই; কিন্তু দু'রকম চতুর লেখকের কথা আমার জানা আছে। একরকম হচ্ছে, পুরনো বিদেশী পত্র-পত্রিকা, রিডার্স ডায়জেস্ট ইত্যাদি থেকে শ্যামল-শ্যামলীর নামে ভাষান্তরিত করা, আর একরকম, গ্রন্থাগার বা কনসুলেটের কাগজপত্র ঘেঁটে বিভিন্ন অজ্ঞাত দেশের এডভেঞ্চার। যারা কখনো ভিয়েৎনামের মানচিত্র পর্যন্ত দেখে নি বা বলিভিয়া বা টাঙ্গানিকা বা ঐ রকম কোন দেশের কিছুই খবর রাখে না, তারা প্রচুর বই লিখেছে। বিমলবাবু এসব লেখককেই বা কি বিশেষণে ভূষিত করবেন?

লোকে বলে, এদেশের গোয়েন্দা কাহিনী আগাগোড়া চুরি। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার আমার নেই; কেন না, গোয়েন্দা কাহিনী আমার পড়া নেই; সেই যে ছেলেবেলায় মাথায় ঢুকেছিল ও পড়তে নেই, মাথা হাল্কা হয়ে যায়, আর পড়ার অবকাশ পাই নি।

শিশু-সাহিত্য ও নাটকেও কিছু কিছু দেশী-বিদেশী চুরি হয়েছে শুনেছি; তা শিশু-সাহিত্যিক ও নাট্যকারেরা বলবেন। শিশু-সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী-গুলোর বিদেশীয়ানা নাকি অবিসম্বাদী। নাটকে শুনেছি, প্রমাণ দিতে পারব না, পাণ্ডুলিপিই গায়েব হয়ে গেছে। কোন এক অখ্যাত-অজ্ঞাত পরিচয় নাট্যকার-নাম-অভিলাষী ব্যক্তি প্রখ্যাত সুপরিচিত [illegible] [illegible] [illegible] দেখতে দিয়ে আর ফেরৎ পান নি। যদি এর কিছু সত্য হয়, বিমলবাবু সান্ত্বনা পাবেন।

বিমলবাবুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দশ বছরের। বাংলা সাহিত্যে কোন ভুক্তভোগী কাকের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই দীর্ঘতর। মাঝে একটা চীৎকার শোনা গেছল, পূর্ব পাকিস্তানে সমগ্র বাংলা সাহিত্যই মুসল-মানী নামে বেপরোয়া ব্যাপক চুরি হয়ে যাচ্ছে। তাতে ব্যক্তিগত লোকসান হয়েছে প্রচুর। তবু এর একটা আশীর্বাদের দিকও আছে। কেন না, হিন্দীতে বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্র-তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক অস্বীকৃত অবস্থায় বিলীন হয়ে যাওয়ার চাইতে বাংলারই আর এক পারে বাংলা-সাহিত্য চুরি হয়ে থাকা মন্দের ভালো। সংস্কৃতি-বিপ্লব নামে এ-রাজ্যে বিদেশী গুপ্তচরদের বা বিভীষণবাহিনীর যে কালা-পাহাড়ী কাণ্ড চলছে, তাতে সেকালের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের গুহা-পলায়নের কথা মনে পড়ছে। তাড়া খেতে খেতে যদিও বা পাহাড়-কন্দরে তিব্বতে গেছল, তাও তো গ্রাসে পড়েছে বলে শুনেছি। যাদুঘরও এদের একান্ত দৃষ্টিতে ধ্বংসযোগ্য। ওকালে কংস, একালে হিটলার-ম্যাকার্থি, আরও একালে এরা এবং ডায়লেকটিকাল বিচারে এরাও নির্ঘাত অপসৃয়মাণ। তাই বলছিলাম, ওটা মন্দের ভালো, পারলে কিছু চোরাচালানও অসঙ্গত হত না। কিন্তু সাম্প্রতিক সংবাদ যদি সত্য হয় ও বাস্তবে রূপায়িত হয়, তবে রবীন্দ্র-শরৎ প্রমুখ বাংলা-সাহিত্য রীতিসম্মত পথেই পূবের বাংলায় প্রকাশিত হতে পারে। তাহলে চুরির ব্যবসায়ও সংযত হবে। বিস্তর ইংরাজী সাহিত্য এখানে সদর পথে আসে বলেই এখানে সহসা চুরি করে পালানো যায় না। ধরা পড়ে যায়। ওখানেই তাই হবে।

কিন্তু ঘরের মধ্যেই চুরির নালিশে বিমলবাবুর চিঠিটি মর্মান্তিক। তারা-শঙ্করও একবার শ্রীহীন হয়ে 'আর এক তারাশঙ্করের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন। কি ফল ফলেছে জানি নে। বিমলবাবুও যদি এমন একটা পদ্ধতি—যেমন, প্রত্যেক কপিতে তাঁর স্বাক্ষর দেওয়া—অবলম্বন করতে না পারেন, তবে আইনে প্রতিকার পাওয়া দুঃসাধ্য। এক উপায় আছে। সৎ লেখকেরা যদি মাত্রাহীন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-মুক্ত হয়ে ও জোটবদ্ধ হয়ে যেসব প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী এই চোরা-বাজার করে তাদের কালো খাতায় নাম লিখে বিজ্ঞাপিত ও তাদের সব রকমে বয়কট করতে পারেন, তবে কিছু সুরাহা হতে পারে। লব্ধ ও অলব্ধ খ্যাতি এবং যশ ও অর্থপ্রার্থী লেখকদের কি অত নৈতিক সাহস হবে?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সতের ॥

এই যে বনের মধ্যে ডাকবাংলোর বিছানায় একা-একা শুয়ে আছি। কোনোখানেই কোনো লোকজন নেই। মানুষজনের ঝক্কি-ঝামেলা নেই। একটি নিটোল পরিপূর্ণ শান্তির রাজ্য যেন একেবারে। ডি-এফ-ও সাহেব যে বলেছিলেন, বনেও আজ নির্জনতা নেই। লোকালয়ের হট্টগোল বড় বেশি রাজনীতি-উত্তেজনা-উন্মাদনা গ্রাস করেছে এখানকার মানুষদের জীবনকে। কথাটা চট্ করে এই মুহূর্তে বিশ্বাস করা কঠিন মনে হয়। এই তো আলসেমি করার মত চুপচাপ শুয়ে রয়েছি বিছানায়। সুন্দর মেহগিনির খাট, চকচকে টেবিল-চেয়ার-আলনা, এমন কি কাঠের দেয়াল-আলমারী পর্যন্ত। ওরই একটি দেয়াল-আলমারীর খোপ থেকে বাংলোর চৌকিদার বদন সিং আমাকে পরশু রাতে দুখানা বালিশ ও চাদর বার করে দিয়েছিল। বলেছিলাম, তোমাদের মশারি নেই?

বদন সিং ছেত্রী বলেছিল, আজ্ঞে না, বাবু।

সে কী! বাংলোয় রাত কাটাবার জন্যে মশারির ব্যবস্থা নেই? আমার সত্যি সত্যি অবাক হবার পালা।

মশারি ছিল হয় তো আগে। টানতে টানতে সে বলল।

এখানে মশা কেমন? বলেই টের পেয়েছিলাম মশা তেমন নেই। তবু প্রশ্নটা করাই হয়ে গিয়েছিল।

বদন সিং বলল, মশা তেমন নেই বললেই চলে।

মশা আসবেই বা কোত্থেকে? মনে মনে ভাবছিলাম। ডুয়ার্সের এই বাংলোটি সমতল থেকে অনেক উঁচুতে। দিনরাত্রি বাতাস বইছে। তা ছাড়া বাংলোর বারান্দা থেকে সুরু করে সমস্ত জানালাই লোহার জালাবরণে আবৃত। মশা ঢুকবার উপায় নেই। শুধু মশাই বা কেন, বন-জঙ্গলে কত ভয়ঙ্কর রকমের কীট-পতঙ্গ হতে পারে, তাদের কামড়ে মানুষের জীবনান্ত ঘটাও বিচিত্র নয়। তাই সময়োবারান্দায় বসুন। সেখানেও দামী কাঠের টেবিল। বেতের চেয়ারগুলি সাজানো। এখানে অবশ্য বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই। তাই হ্যাজাক বা পেট্রোম্যাক্স ধরাবার ব্যবস্থা করতে হয়। কাঠের মস্ত একটা উঁচু টুলের মত রয়েছে। অনুমান করি তাতে হ্যাজাক বসানো হয়। আমি কিন্তু এসে অবধি হ্যাজাক ধরাই নি। কারণ হ্যাজাক-আলোর তীব্রতা চোখ ধাঁধায়। সভ্যতায় আছে কত অত্যুগ্র চোখ-ধাঁধানো আলো। কত দৃষ্টি-গ্রাসী তীব্র আলোর ঝলক। তাহলে আর বনের মধ্যে আসা কেন? এখানে এসেও যদি সেই গাত্র-জ্বালানো নয়ন-ঝলসানো আলোর তলায় বসতে হয়। আমি তাই মৃদু লণ্ঠন-আলোরই ব্যবস্থা করতে বলেছি। তবে রাত হলে সাধারণত আলো নিয়ে বারান্দায় বসি না। লণ্ঠনটা ঘরের মধ্যে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে মৃদু করে রেখে আসি। তার পর বারান্দায় অন্ধকারে ডেকচেয়ারে। না, না, একটা ইজিচেয়ারও আছে। চোখে পড়ে গেল হঠাৎ। বোধহয় রাত্রে ঘুম-না-আসার আগে পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে বইপত্র পড়বার জন্যে এই ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা। অন্তত আমার তাই মনে হল। একবার কুড়িয়েও পেয়েছিলাম "ট্রু-স্টোরি" জাতীয় একটি বইয়ের পাতা। হয় তো কেউ কখনো নিয়ে এসেছিলেন। ডুয়ার্সের এই বন-জঙ্গলময় এলাকাগুলিতে এ জাতীয় বাংলোর অভাব নেই। পাবলিক ওয়ার্কস ও ফরেস্ট বাংলো বেশ আছে। অনুমতিপত্র নিয়ে ইচ্ছে মতন দু'-এক রাত্রি বাস খুবই সাধারণ ব্যাপার। সরকারী কর্মচারীরা সাধারণত এ সব ব্যাপারে আপত্তি করেন না। তবে মাঝে মাঝে সরকারী কর্তব্য কর্মোপলক্ষে সরকারী সাহেব-সুবোদেরও এ-সব অঞ্চলে আসতে হয়। তখন সাধারণত বাংলো খালি থাকে না। এবং কাউকে দেওয়াও সম্ভব নয়। যখন খালি থাকে, তখন এক-আধটু তদ্বির-তদাবক বা অনুরোধেই অনুমতি লাভ সহজসাধ্য বলে দেখেছি।

আছে কিছু কিছু ইউথ হোস্টেল। এটিও প্রশংসনীয় উদ্যম। এ প্রায় স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের দান। ইংরাজ আমলে ছিলই না বলা চলে। বিজয়ী জাতি কবে আবার সদ্ভাব দিয়ে আপন করতে চেয়েছে বিজিতকে। বিজিতের প্রতি তার ঘৃণা। তার হিংসা, অসূয়া। তাই সে চোখে চোখে রাখতে চায় যুবকদের। কারণ যুবক সমাজই দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি-ভূমি। তারাই যুগে যুগে টলায় সিংহাসন, ভাঙে রুদ্ধদুয়ার খাঁচা, সফল করে তোলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে।

উপনিবেশবাদী ইংরাজও তাই যুবক-দের দেখে নি সুনজরে। ভারত নামক সুবিশাল দেশের যুবকদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তাই তাদের এক সাথে মিলতে দেয় নি। ক্লাব, লাইব্রেরী, ব্যায়ামাগার—যেখানেই তরুণদলে মিলবার ও মেলাবার আয়োজন—সেখানেই বিরুদ্ধতা করেছে। তাদের সঙ্গে সুস্থ মানুষের ব্যবহার করে নি।

যুবকদের দেখেছে তারা ভয়ের চোখে, সন্দেহের চোখে, ভালোবাসার চোখে নয়। ইংরাজ আমলের শিক্ষা তাই ঔপনিবেশিক শিক্ষা। উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি-ভূমি শক্ত আর সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। মনে পড়ছে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণা। যারা পাশ করে বেরোবে তারাই চাকরি পাবে। যেন লেখা-পড়া শেখা মানেই চাকরি করা। ইংরাজের অনুগ্রহপুষ্ট বাবু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। গোটা ক' টাকার বিনিময়ে শ্রম। আত্মার দাসত্ব।

শিক্ষার লক্ষ্য ছিল না মনুষ্যত্ব। আসলে মানুষ করে গড়ে তোলায় তাদের রুচির অভাব। অভাব ব্যবসার প্রয়োজনে, বাড়তি অর্থ শোষণের প্রয়োজনে। স্বাধীন ভারতবর্ষে এ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হতে বাধ্য। বিজিত দেশের যুবকসমাজ বিজয়ী-দের ভয়ের পাত্র, নিজের দেশের ছেলেরা তো স্বদেশীয় রাষ্ট্র শাসকদের চোখে তা নয়।

তাই স্বাধীন ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে মেলা ও মেশার প্রয়োজনে ইউথ হোস্টেল-

বিনা পয়সায়!
Killicks
PRESSURE COOKER

গুলি। ভাবীকালের মানুষের চিন্তাধারার বিনিময় ও আদান-প্রদানের জন্যে। যেই করুন, পারস্পরিক প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু যুবদের বিষয়ে এ-সব পরিকল্পনা ও উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে কোথায় যেন শূন্যতা ও ফাঁক থেকে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য ও আচরণে অসংগতি। এই অসংগতি আজ আমাদের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের জীবনে বহুতর। কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। ডুয়ার্সের ইউথ হোস্টেলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে এই কথা আমার মনে হয়েছে।

এগুলির যেন পরিকল্পনা হয়েই রয়েছে। মাথাভারী শাসন-ব্যবস্থার গাল-ভরা হাঁক-ডাকের মত। বক্তৃতা ও ভাষণ-গুলি যেন শরতের লঘুপক্ষ মেঘ। যত [illegible] ততটা বর্ষণ ঘটায় না। ইউথ হোস্টেলগুলি সেই কবেকার কোন্ সত্য যুগে গড়ে উঠেছিল যেন। তাদের আকর্ষণ-যোগ্য করে তোলার ব্যবস্থা হয় নি তেমন-তর। থাকা-খাওয়া ও বাসস্থানের ব্যবস্থা তেমন নয়। কর্তৃপক্ষও যেন কিছু উদাসীন ও নির্লিপ্ত। ফলে অধিকাংশগুলিতেই লোক তেমন হয় না। হয় তো বা যুব সমাজের অজ্ঞাতও। ইন্সটিটিউশনগুলি বিকার ও অবক্ষয়ের পীড়নে ভুগছে। ভবিষ্যৎ [illegible] মানুষ করে গড়ে তোলার মধ্যে যে একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে, কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের মহৎ আনন্দ আছে, তৃপ্তির উপলব্ধি আছে—সেকথা রাজনৈতিক নেতারা যেমন ভুলেছেন, তেমনি শিক্ষালয়গুলিও প্রশ্নপত্র নির্বাচন ও আর্থিক [illegible] পরিণত হচ্ছে। কে দেখাবে ছাত্রদের নতুন পথের সন্ধান? কে দেবে [illegible] বাড়তি সময়? [illegible] অভাব। দ্বিতীয় [illegible] থেকে সর্বনাশা ভেজাল যদি কিছু [illegible] লেগে থাকে তো তা [illegible]। এক [illegible] এই যুগ।

ডুয়ার্সের ইউথ হোস্টেলগুলির [illegible] বাড়ির মত। দলে দলে লোকেরা আসে না এর সুযোগ নিতে। তাদের [illegible] সারা বছর প্রায় বন্ধই থাকে। এমন কি তদারকির ব্যবস্থাও [illegible] নেই।

পর্যটনের অগাধ সুযোগ আছে এ অঞ্চলে। নানা কেন্দ্রগুলিকে সুন্দর করে তোলা। [illegible] পরিবেশের উপযুক্ত করে তোলা। প্রাকৃতিক দৃশ্য [illegible], ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারীও আছে এ অঞ্চলে। জলদাপাড়া ও গরুমারা দুই বিখ্যাত সরকার সংরক্ষিত বন্যপ্রাণীর এলাকা। এখানে অবশ্য ভালো ইউথ হোস্টেল আছে। পরিচালন ব্যবস্থাও সুশৃঙ্খল এবং সুন্দর। মনকে আকর্ষণ করবার মত। তবে তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা সহজ নয়। সরকারী ব্যবস্থা এ ব্যাপারে আদৌ উদার নয়, বরং নিতান্ত কৃপণ বলতে হবে।

এই কথাই সেদিন বলছিলেন আমাকে ঘোষবাবু কণ্ট্রাক্টর। বলছিলেন, ডুয়ার্সের রাস্তাঘাটগুলি মোটের ওপর উন্নত। যে-কোনটিতেই আজকাল পাকা রাস্তা আছে। রাতদিন গাড়িঘোড়া চলেছে। কিন্তু এ-অঞ্চলে যে অধিক সংখ্যক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে, সে-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যেন এতটুকু দৃষ্টি নেই।

কথা হচ্ছিল গয়েরকাটার একটি রেস্টুরেন্টে বসে। ধূমায়মান চা-এর পেয়ালা। মৃদু মৃদু স্বরে রেডিও বাজছে। ঘোষ-বাবু বলছিলেন, অথচ দেখুন সরকার পর্যটনের কথা বলেন। খবরকাগজে প্রচারও করেন খুব বড় বড় কথা। কিন্তু সেই গতানুগতিক চালে। যেন দীঘা-দার্জিলিং-কালিম্পং ছাড়া আর বেড়াবার জায়গা নেই।

রেস্টুরেন্টের বাইরের দিকে তাকাচ্ছি। দত্তদা বললেন, খাস্তা নিমকি হচ্ছে। খাবেন নাকি একটা?

রেস্টুরেন্টের মালিক দত্তদা। আমরা মতামত জানাবার আগেই ছোকরা চাকর লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে হাঁকলেন, দে দে, বাবুদের দুটো করে।

লক্ষ্মণ এসে নিমকি দিয়ে গেল। বেশ গরম আর মুচমুচে। চায়ের সঙ্গে ভেঙে মুখে দিতে দিতে আবার পুরনো কথায় ফিরে যাই। রেস্টুরেন্টের মালিক দত্তদা বললেন, বেড়াবার জায়গা মশাই আমাদের মালদা জেলাতেও আছে। মাথা নেড়ে বলি, একশবার। পর্যটন কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে কাগজেও বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। সে-সব ঐতিহাসিক ব্যাপার। প্রাচীন গৌড়কে দেখতে চান তো যেতে হবে ওখানে। না গিয়ে উপায় নেই। ডুয়ার্সেও অবশ্য ইতিহাসের কমতি নেই। তবে সে নিতান্তই মোগলদের কথা, তটাদের কথা।

ঘোষবাবু কন্ট্রাক্টর বললেন, প্রাকৃতিক দৃশ্য এর অসাধারণ। দুটো প্রাকৃতিক দৃশ্যই মানুষকে টানে বিশেষ করে। এক সমুদ্র—সেই যে কালিদাসের বর্ণনায়—বলে খানিক মুদিত নেত্রে থেকে আবেগের ঝোঁকে বলে গেলেন, তমালতালীবনরাজি-নীলা—আহা কী লিখেছে!

একটু থেমে বললেন, আর হল পাহাড়। যদিও সবটাই হল গিয়ে হিমালয়। তবু ডুয়ার্সের নানা দিকেই দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। আর স্নিগ্ধ সবুজের তারুণ্য। বক্সা পাহাড়ে উঠে মনে হয়েছে কাশ্মীরে চলে এলাম বুঝি। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। গাছপালা ঝরণা। মনে হয় সারাটা জীবন কাটিয়ে দি এখানে।

বললাম, কিন্তু রাস্তা তো খুবই দুর্গম ঘোষদা।

তা আর বলতে। এ-সব ব্যাপারে সরকারের নজর নেই-ই। পাথর গেঁথে গেঁথে ওপরের দিকে ওঠবার এই রাস্তা। মাঝে মাঝে হাঁপ ধরে। দাঁড়াতে হয়। যেতে যেতে মনে হয়, এখানে বেশ একটি সুন্দর রাস্তা হলে দার্জিলিং-এর মত লোক এখানেও আসত বেড়াতে। এখানেও অবশ্য একটা ইউথ হোস্টেল, চেহারা যদি দ্যাখ তার—কোনোকালেও বুঝি কেউ খোঁজ রাখে না।

মনে মনে ভাবি, আর শুধু বক্সাতেই বা কেন? সারা ডুয়ার্স জুড়েই ছড়িয়ে আছে আরণ্যক মায়া। সবুজ আর সবুজ। ঝিল ঝোরা, ঝোপ-জঙ্গল। তার সঙ্গে মেশামেশি হয়ে আছে নীল আকাশ। পাহাড়ী নদীগুলিতে সারা শীতকাল জলের চিহ্ন নেই—বালু চিকচিক করছে। অথবা ঝিরঝিরে তিরতিরে এক চিলতে জলস্রোত! দেখবার মত কত জায়গা আছে। নতুন কালের মহাভারত লেখা হচ্ছে হাসিমারাতে। জলাজংলা-আগাছা সরিয়ে জাগছে নতুন কালের আস্তানা। একটু এগিয়ে যান। মস্ত জায়গাটা জুড়ে তৈরি হয়েছে এয়ারোদ্রোম। শক্তিশালী উড়ো-জাহাজের ঘাঁটি। ছিল এককালে সাঁওতালী গ্রাম। মস্ত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। চিলাপাতা ফরেস্টের ভেতরে দেখে আসুন নল রাজার গড়।

নল রাজার গড়? নাম শুনেই চমকে উঠছেন বুঝি! চমকানোই স্বাভাবিক। কিংবদন্তীতে পড়েছি নল-দময়ন্তীর কাহিনী। সে কী আর আজকের কথা। সেই নল রাজা কি সারা ভারতবর্ষ খুঁজে খুঁজে এসে আস্তানা নিলেন অবশেষে ডুয়ার্সের জংলায়? চিলাপাতা ফরেস্টের ভিতরে দেখে আসুন গিয়ে। বিধ্বস্ত এক গড়ের চেহারা। অতীতে কোনো শক্তিশালী গড় ছিল এইখানে। কোনো প্রবল পরাক্রান্ত রাজা? রাজা নল?

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সত্যিও নয়। তবে ইট সেই প্রাচীন যুগের। ইতস্তত ঘাস-জঙ্গলার মধ্যে চিহ্ন আছে দেয়ালের। কোনোদিন বুঝি সৈন্যরা ছিল এখানে। ছিল তাদের রসদপত্র দুর্গের ভিতরে। মানুষ ও মানুষজনের কলকল্লোল। পাকা জলাশয় ছিল বুঝি ভিতরে। যার বাঁধানোর চিহ্ন আছে। দু'-একটি ধাপ।

পুরাণের প্রতি শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস নিয়ে আসে একালের মানুষের দল। অনেকটা দুর্গম এলাকা। কে বলে আধুনিক যুগে বিশ্বাসের সমস্ত ভিত্তি-ভূমিটাই দুর্বল? যাঁরা আসেন, তাঁদের প্রধান বাহন জীপ। জীপ থেকে নেমে হেঁটে এসে দাঁড়ান ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে।

কিন্নরে জ্বলজ্বল করে চোখ। খানিকটা মিশ্রিত ভয়। ইতিহাসের বহু [illegible] ভাঙা শ্মশানের ধারে [illegible] জঙ্গলে দুপুরেও। বাইরে খাঁখাঁ গ্রীষ্ম পেরিয়ে এলেন ওঁরা। ঘণ্টায় পঞ্চাশ ষাট মাইল বেগে গাড়ি চড়ে। বনের ভিতরে রোদ্র নেই। কেমন ছায়া ছায়া। অপরিচয়ের রহস্যমাখা বনরাজ্য। কবে এল এখানে বন? চিলাপাতা ফরেস্ট কি আগেই ছিল এখানে? অথবা এগিয়ে এল পরে পায়ে পায়ে?

সব কিছুই সম্ভব। তবু শিক্ষিত মানুষেরা বিশ্বাস করেন না নল রাজের গড় এখানে ছিল। অধ্যাপক চৌধুরী বলছিলেন, নল রাজার কথা পড়েছি পুরাণে। সে কি চাট্টিখানি বছরের কথা? এ হতেই পারে না। হয় তো মোগল যুগে কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে ভুটানের সঙ্গে যুদ্ধকালে তারই প্রয়োজনে কোনো সেনাদের ছাউনি ছিল এখানে।

সে সুদূরকালের ইতিহাস খানিকটা কল্পনা। খানিক অনুমানে স্থির করে নিতে হয়। তবে এ-সব অঞ্চলে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ইতিহাসবিদেরা এই জায়গাটিকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিশেষ মাথা ঘামান নি বলা যায়। কোথায়ই বা এ-সবের মূল্য আজ? স্তব্ধ আছে ইতিবৃত্ত। তারিখ-সাল-শতাব্দী হারিয়ে গেছে। মাটির তলায় খনন চালিয়ে বিশেষজ্ঞদের বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে এ-সব ব্যাপারে আলোক-পাত করার প্রয়োজন অনুভব করেন কিনা কেউ বোঝা যায় না। আমরা বর্তমানকে নিয়েই ভীষণতর ক্লান্ত। শিশু গণতন্ত্র হাঁটছে আজো। কবে যে সে সাবালক হবে কে বলতে পারে? অতীতের দিকে তাকাবো কখন? সময়ই নেই যে!

অতএব আপাতত আসুক কৌতূহলী মানুষের দল। ভাঙা ইঁটে-পাথরে-ঝামায় পরিতৃপ্তি লাভ করুক নানা রঙদার কল্পনা। কেউ-কেউ ফিসফাস করে কথা বলেন নিজেদের মধ্যে। আত্মীয়-জন বন্ধুদের উদ্দেশে হাঁক দেন সাবধানবাণী জানিয়ে, যাবেন না, যাবেন না মশাই ওদিকে।

কি ব্যাপার?

ব্যক্তিটি হয়তো বিশশতকের শক্ত জুতোয় পায়ের তলার একটা ইঁটের টুকরো ভাঙতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন। তবু অপরিসীম চেষ্টা।

পালিয়ে আসুন মশাই। সাপ-খোপ আছে ওদিকে—

আছে নাকি? ভদ্রলোক একটি সিগারেট ধরিয়ে বলেন।

বিষাক্ত সাপ আছে মশাই। সাপ-খোপদেরই ত' রাজত্ব!

না না, আরো আছে। শুধু সাপ-খোপই নয়। জঙ্গলে আছে নানা বিষাক্ত কীট-পোকা-মাকড়সাদের রাজত্ব। বিছের কামড়ে নাকি মরেছে কেউ-কেউ।

আরে দূর, মরতে তো একদিন হবেই—

তাই বলে এভাবে—আরে না, না। বেশি সাহসী হবার চেষ্টা করবেন না।

শুধু কোট-প্যান্ট-টাই বা বুটজুতোই নয়। আছে সান্‌গ্লাস। জায়গাটা ছায়া-ছায়া। তাই খুলে হাতে রেখেছেন। সিগারেট ধরালেন কেউ লাইটার জ্বালিয়ে। যদি শীতের দিন হয়, সোয়েটার-কোটও আছে। মহিলারাও আছেন দলের সঙ্গে। কারুর রক্তবর্ণে রঞ্জিত ওষ্ঠ। পাছে বা রোদে ম্লান হয় তাই মাঝে মাঝে স্টীক্ বার করে ঠোঁটে ঘষে নিচ্ছেন। চোখে কৃত্রিম কাজল। গলায় নকল মুক্তোর মালা। কানেও তারই দুল। হাতে হাতঘড়ি। শাঁখার সঙ্গে একটা গলার চুড়ি নিতেও ভুল করেন নি। মুর্শিদাবাদ আছে, টাঙ্গাইল, এমন কি শিফন-জর্জেটেরও অপ্রাচুর্য নেই।

ঘাসের ওপরে বসে টিফিনকেরিয়ার থেকে খাবার খান ও'রা। পরোটা ও মাংস। ঝাল-ঝাল। তেলে-মাখসে বড় বড় আলুর টুকরো। স্বামীর উদ্দেশে গেঁজাদাঁতের হাসি। ঠোঁট থেকে ঝোল মুছে নিলেন।

—এখনই? স্বামীর প্রশ্ন।

—ইয়েস! নাউ অর নেভার!

কানপাশা বা কৃত্রিম মুক্তোর দুল দুলছে। দুলোনী-দুলোনী ধরনের চাউনি। মেমসাব ঝাল-মাংস ও পরোটা চাখছেন। চক্‌চক্ চক্‌চক্ শব্দ হচ্ছে।

মিস্টারের বন্ধুটি দামী কোট কাঁধের ওপর রেখে বসেছেন। ঘাসেরই ওপর। একটা খবর কাগজ ছড়িয়ে নিয়েছেন কোলে। বন্দাবদের মত। বন ছায়া-ছায়া, কেমন নির্জনতা। হাতঘড়ি দেখছেন তিনি। বন্ধুর উদ্দেশে হাঁকছেন, কাম, কাম অন। আড়াইটে-তিনটের মধ্যেই ফিরতে হবে।

ভ্রমণ-পিপাসু মিস্টারের মনে পড়ল, চিলাপাতা ফরেস্টে বুনো হাতীর খুবই উপদ্রব। সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে। হাতী-দের খুব ভয়। হ্যাঁ, হাতীদেরই বেশি আনাগোনা এ-সব অঞ্চলে। কতদিন এই পথে হাসিমারা থেকে ফিরতে-ফিরতে শুনেছেন ড্রাইভারের মুখে।—বাঘকে তত ভয় নেই, স্যার। কিন্তু হাতীকেই বিপদ। কতবার একটা হাতীকে দেখে আমরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে রাখতে ভয়ে পিছিয়ে আসি। ঠিক তো নেই।

কেন?

দুষ্টুমি করে গাড়িটা উল্টে দিয়ে যেতে পারে—

ডাকবাংলোর ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে কতদিন ভাবি এই ডুয়ার্সের কথা। চিলাপাতা দেখাবার জন্যে নেই সরকারী কোনো ব্যবস্থা। অফিসাররা যাঁরা আসেন মাঝে-মাঝে তাঁরাও আসেন সরকারী গাড়ির দাক্ষিণ্যে। সাধারণ মানুষ আসেন না বড়ো-একটা। বাইরের ত' নয়ই। কেই বা জানে এর কথা। কে জানত টোটো-পাড়ার কথা। টোটো পাড়ায় পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ উপজাতিদের বাস। বলব তাদের কথা একদিন। বিচিত্র জীবন আর বিচিত্র মানুষদের কাহিনী। ময়নাগুড়ির কাছাকাছি দেখে আসবার মত জল্পেশ মন্দির। আর সে মন্দিরও কি আজকের কথা? অনেকদিনের মন্দির। বিখ্যাত স্থাপত্য এককালের। জল্পেশে আসে অগণিত মানুষ তাদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিয়ে। তার খানিক তফাতে পুর্বদিকে পুকুরের তলা থেকে বার হল পাথরের একটি ফলক। ফলকের একদিকে বুদ্ধমূর্তি। অন্যদিকে পদ্মপাতা। দেখেই বৌদ্ধযুগের ইতিহাস মনে আসে। চারুবাবুর কাছে দেখলাম একদিন তার ছবি। জলপাই-গুড়ির চারুচন্দ্র সান্যাল। তেষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ। কিন্তু উৎসাহে আনন্দে উজ্জ্বল। বললেন, এই ফলকটি মনে করিয়ে দেয় ডুয়ার্সের ইতিহাস হাজার বছর আগেকার পুরনো।

শুনে অবাক হয়ে তাকাই।

সকালে ডাকবাংলোয় শুয়ে-শুয়ে ভাবি। একা-একা বিছানায়। ক'দিনের পরিপূর্ণ একটি বিশ্রাম। [চলবে]

আমি শ্রীগণপতি হালদার, পিতা স্বর্গত বিশ্বপতি হালদার, সাকিন শিমলেপুর বর্তমান অস্থায়ী ঠিকানা—তেরো নম্বর হরনাথ দত্ত লেন, কলিকাতা ছেচল্লিশ ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠিক এইভাবে একটা সাবেকী সুর অবলম্বন করে আত্মপরিচয় নিবেদনের

কোন স্পৃহা আমার নেই। থাকলেও এর মধ্যে যে কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত বরং মামুলী ঢঙে এ রকম বক্তব্যের অবতারণার চেয়ে বাস্তব ছবি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমি কেরানীর বারোয়ারীতলা ডালহৌসীতে আনাগোনারত অসংখ্য হতাশাক্রান্ত মুখচ্ছবির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করব। কেন না, হতাশাক্রান্ত সেই মানুষগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছর আমি সেই বারোয়ারীতলার তীর্থে যাতায়াত করেছি।

হ্যাঁ, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের প্রতিদিন সকাল দশটায় যে অসংখ্য মানুষের মিছিলে যোগ দিয়েছি, বিকেলে গতানুগতিক ধারায় সেই মিছিল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার ফিরে এসেছি ঘরে। এবং এই দীর্ঘ সময় ধরে যে বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করে আজ এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি, আমি তারও কোন বিস্তৃত বিবরণ দিতে বসি নি। কেন না, কেরানীর জীবন-কথা ত' নীরস কাহিনী। তা শুনবার মত ধৈর্য থাকবে না কারোর।

আমি যা বলতে বসেছি তা হল, সেদিন অত্যন্ত অসতর্কভাবে নিজের দেহনিঃসৃত দু' ফোঁটা রক্ত গলধঃকরণ করে ফেলেছিলাম, আর যেহেতু সেই রক্তের ফোঁটা দুটি আমার পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি, বুকের কাছে আটকে থেকে আমাকে অপরিসীম যন্ত্রণার অধিকারী করেছে এবং যেহেতু আমাদের মধ্যে এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, যন্ত্রণার কথা বক্তব্যে প্রকাশ করতে পারলে অস্বস্তি থেকে অনেকখানি মুক্ত হওয়া যায়, সেহেতু আমি এখানে সেই দু' ফোঁটা রক্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে খানিকটা স্বস্তি পাওয়ার আশা রাখি।

সেই তখন অর্থাৎ শোণিতবিন্দু আহারান্তে আমার বার বার সেই কুড়ি বছর বয়সের যুবক গণপতি হালদারকে মনে পড়ছিল। হয়ত তার মধ্যেও নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু তার মধ্যেও নতুনত্ব বলবার মত আছে এই যে, সেই তখন থেকেই আমি একটু বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, আমি ছিলাম এবং এই থাকার কারণে এখন আমাকে ধীরে ধীরে আরেক অজানা অন্ধকারের দিকে চলে যেতে হচ্ছে। চলে যেতে হচ্ছে! বিদায় বিষয়ক এই বাক্যটি এক

সাধনা
বিউটি গ্লো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি গ্লো
একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
Beauty

আমাকে অনবরত বিব্রত করে তুলছে। এবং কোথায় যেতে হচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নেরও এক অবয়বপূর্ণ অবস্থিতি টের পাচ্ছি।

দিন দুয়েক আগে স্বগতোক্তির মত আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল,—'যাক, বাঁচা গেল, এত ভোরে উঠে আর এই বয়সে ভাত সেদ্ধ করতে পারছিলাম না।'

আমিও ত' বাঁচলাম! সরমা ও আমার বাঁচার এই বিকট আনন্দে নিজের ভিতর দিক থেকে সেই মুহূর্তেই আমি কেন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম।

আমার গুণমুগ্ধ সহকর্মী বন্ধুরা সেদিন সমবেত হয়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। কেন? না আমি যে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে নিরলসভাবে চল্লিশ বছর চাকরি জীবন অতিবাহিত করেছি, তাতে তারা সবাই যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত। সে জন্য তারা আমাকে বিশেষ উপঢৌকনে ভূষিত করে আমার বিদায়-মুহূর্তকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছিল।

আর ঠিক তখনই দু' ফোঁটা রক্ত আমার দেহাভ্যন্তর থেকে মুক্ত হয়ে আমার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে তড়িৎগতিতে পাকস্থলীর পথে ধাবিত হয়েছিল, কিন্তু আমি সচকিত হয়ে উঠতেই আত্মরক্ষার্থে সেই দু' ফোঁটা রক্ত বুকের পাঁজরের কোন এক জায়গায় লুকিয়ে পড়েছিল। আর সেই থেকে সৎ ও নিষ্ঠাবান আমি, অর্থাৎ ষাট বছরের বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত গণপতি হালদার এক অব্যক্ত বুকের ব্যথায় ভুগছি।

রক্তের স্বাদ নোনা। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা আমি জনসমক্ষে স্পষ্ট করেই প্রচার করতে পারি। তদুপরি আরো একটি কথা, যেটি এই সঙ্গে যোগ করা যায় তা হল, নিজের রক্তের স্বাদ নিজের কাছে বিস্বাদে পরিপূর্ণ। রক্তলোলুপ জীবেরা সম্ভবত নিজের রক্ত পান করে না। সেইহেতু তাদের নিজ দেহনিঃসৃত শোণিতের প্রতি কতটা বিতৃষ্ণা তা জানা যায় না।

সে কথা থাক। আজকের কথায় আসি। আমার কথা। আমি কিছু বলব। আমার কথা। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমার আর কিছু নেই। যাকে বলে সর্বহারা, আমি যেন এখন তাই হয়ে গেছি। সরমা বেঁচেছে। আমার জন্য নিয়মিত ভোরবেলা উঠে যেটুকু পরিশ্রম করতে হত ওকে, সেটুকু এখন আর করতে হচ্ছে না। অবশ্য ওরও ত' বয়স হল। আমারই সঙ্গে ধুঁকে ধুঁকে জীবনের অপরাহ্নে এসে দাঁড়ালো।

আমার চাকরি জীবনের অন্তিম সময় নির্দেশ করে আমাদের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রথম যেদিন একখানা চিঠি আমার হস্তগত হল, সেদিন চিঠিটা পড়তে পড়তে অবশেষে দৃষ্টিটাই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল আমার। অবশ্য জানতাম আমি সবই, এ চিঠি আসবে। ছুটির ঘণ্টার মত একদিন এ চিঠি এসে আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করবে। তবু চিঠিটা যখন ধরে রেখেছিলাম তখন হাত কাঁপছিল আমার। চারদিকে সহকর্মী বন্ধুদের সাগ্রহ জমায়েত আমাকে যেন আরো বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তারপর ওরা আমার চারদিক ঘিরে কি যেন সব বলাবলি করে অবশেষে বিদায় নিয়ে যার যার টেবিলে চলে গিয়েছিল।

একটা অন্ধকার গুহার মধ্যেই যেন জীবনের চল্লিশটা বছর কেটে গেল আমার। শান্তশিষ্ট, ভদ্র ও সৌম্যদর্শন সেই কুড়ি বছরের যুবক গণপতি হালদার চল্লিশ বছর পরে ষাট বছর বয়সে দু' ফোঁটা রক্ত গিলতে যেন বাধ্য হয়েছিল সেদিন। এবং তার পরেই যেন নিজেকে আলোয় উদ্ভাসিত হতে দেখেছিল: চল্লিশ বছর পরে খুঁজে পেয়েছিল নিজেকে। কিন্তু তখন মুখাবয়বের অজস্র বলিরেখায় মহাকালের স্বাক্ষর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কাল সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পথে পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি সহাস্যে এগিয়ে এসে বললেন,—'বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?'

- 'হ্যাঁ, একেবারে শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছি, আর ভালো লাগে না।'

—'তা বটে, একটু অভ্যাস রাখবেন, শরীরটা ভালো থাকবে তাতে।'

ভদ্রলোক যেন গায়ে পড়েই উপদেশ দিচ্ছিলেন আমাকে। যদিও ঠিক এ ধরনের সস্তা উপদেশ এখন আমার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবু একটু হেসে তাঁর উপদেশদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। এবং ভদ্রলোক চলে গেলে কিছু মনে মনে নিজের শারীরিক অবস্থার কথা পর্যালোচনা করলাম।

অফিস থেকে বিদায়ের পরেও নানান ঝামেলা চুকিয়ে পরিষ্কার হতে আমাকে আরো ক'দিন অফিসে যাতায়াত করতে হয়েছিল। অবশ্য ধরাবাঁধা সময়ে যে যেতে হয়েছে তা নয়। নিজের সুযোগ-সুবিধে মতই গিয়েছি। আর এ ক'দিন গিয়ে বুঝেছি যে, দারোয়ান থেকে সহকর্মী বন্ধু বা উপর মহলের বাবুদের কাছে এখন আমি করুণার পাত্র।

—'আইয়ে বাবু, বাইয়ে, বইঠিয়ে।' সদর দরজায় দারোয়ানের এই আতিথেয়তাসূচক অভ্যর্থনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বুকের পাঁজরে লুক্কায়িত রক্তের ফোঁটা দুটি নিঃশব্দে আর্ত চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠত।

সহকর্মী বন্ধুদের মধ্যে যারা নতুন, অথবা আনকোরা নতুন তারা অনেকেই কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করে থাকায় আমার আগমনহেতু তাদের সানন্দ অভ্যর্থনা সোচ্চারিত হতে পারত না। কিন্তু পুরনোদের মধ্যে অনেকেই এমন কি কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেত। বলত, 'আসুন হালদারবাবু আসুন।'

মুহূর্তের মধ্যে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠত। হ্যাঁ, এই আমাদের অফিস। এরা আমার সহকর্মী বন্ধু ছিলেন। দিনের পর দিন চল্লিশটা বছর, সুখ-দুঃখের দীর্ঘ সময় এ'দেরই সঙ্গে কাটিয়ে গেছি। এ'রা কি ভুলতে পারেন আমাকে? আমি এসেছি, তাই এ'রা পুলকিত। অভ্যর্থনায় মুখরিত।

—'কী রকম আছেন?'

—'ভালো।'

—'বাড়ির খবর?'

—'ভালো।'

অতঃপর অফিসের গুঞ্জনটা কানে গেল। গত চল্লিশ বছর এই গুঞ্জনের কোরাসে আমারও কণ্ঠ ছিল। আজ নেই। তাই এই গুঞ্জনটা একটা পুরনো পরিচিত গানের কলির মত ভাসতে লাগল আমার কানে। মন্দ লাগছিল না।

এই বন্ধুরা সেদিন সবাই আমার বিদায় সম্বর্ধনার দিনে আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। সেদিনের সেই সভা ছাড়া আমার প্রতি এদের সহানুভূতির পরিমাপটা বুদ্ধির অগম্যই থেকে যেত। সেই সভায় বসে প্রথমে বেশ একটা আনন্দ অনুভব করেছিলাম। এবং সবাই মিলে আমাকে যখন কিছু বলার জন্য অনুরোধ করল, অতঃপর সবার অনুরোধে আমি যখন কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তখনই প্রথম মুখের ভিতরটায় একটা লবণাক্ত স্বাদ অনুভব করেছিলাম। সেই তখনই আমি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, রক্তের স্বাদ নোনা। আর তাই সর্বাঙ্গ আমার কাঁপছিল। রুদ্ধ হয়ে এসেছিল গলার ভিতরটা, চোখের সামনে বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল একটা অন্ধকারের দলা। কতক্ষণ যে, আমি কী বলেছিলাম, তা আর মনে নেই এখন, খানিকবাদে সবাই মিলে যখন আমাকে ধরে বসিয়ে দিয়েছিল তখনই আবার আমি আমার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছিলাম।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কেন জানি না, আমি লজ্জাবোধে আক্রান্ত হয়ে আশেপাশের কারুর দিকেই মাথা উঁচু

যে আমার এই লজ্জাবোধ সেটা মনে মনে পর্যালোচনা করার আগেই পাশ থেকে রামকমলবাবু, যিনি বয়সে আমার কাছাকাছি এবং সম্ভবত আমারই মত দিন গুনছেন এখন, তিনি হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, 'সবই ত' ভগবানের ইচ্ছে, ভগবানের নাম স্মরণ করুন।'

কেন? রামকমলবাবু হঠাৎ এ রকম কথা বলছেন কেন, আমার ভীষণ অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল তখন। একটা বিতৃষ্ণা ভাব বুকের ভিতর জমে উঠতেই আমি টের পেয়েছিলাম যে, বুকের মধ্যে আরো একটা কিছু হঠাৎ আটকে গেছে। আর তা আটকে গেছে বলেই আমি নিজের বক্তব্য রাখবার সময় কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এই ষাট বছর বয়স অবধি হয়ত লক্ষবার ভগবানকে ডেকেছি। এক মহানুভব ঈশ্বরের করুণায়ই হয়ত এই দীর্ঘজীবন লাভ করে অবসর জীবনযাপনের প্রাক্কালে নিজদেহ নিংড়ে দু' ফোঁটা রক্ত খেয়ে জীবনের শেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে গেলাম। তাই আমার মত অসংখ্য সংসারী

অনুখে যেমন দিবানিশি ভগবান স্মরণে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আমারও তেমন করুণাময়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস।

'তাহলে তুমিও চললে গণপতি?' চাকুরি জীবনের শেষদিন এ রকম একটা প্রশ্নের ভাব আমি আমার অফিসের সর্বত্র লক্ষ্য করেছিলাম। সহকর্মীদের মধ্যে একজন একসময় ডেকে বলেছিল, 'আপনারাই ত' গড়েছেন সব, আপনাদের সবকিছুই ত' আমরা ভোগ করছি।' এ কথাটা শোনার পরে কেন যেন বেশ খানিক সময় বিরক্তিতে মনটা পরিপূর্ণ হয়েছিল। মনে হয়েছিল এ সময় কেউ কেউ আমার কাছে বেশ ভালো মানুষটি সেজে অযথা অভিনয় করার প্রয়াস পাচ্ছে। কেন, কী দরকার তাদের এমন মুখে বানানো বিচিত্র সংলাপ বর্ষণ করার। আমি ত' চলেই যাচ্ছি। যেতেই হবে আমাকে। যেমন সবাই যায়। 'না, তুমি এদের প্রতি বিরক্ত হয়ো না গণপতি।' মনটাকে আবার এমনি করে প্রবোধ দিয়েছি। মন আবার আমাকে বলেছিল, 'এরা সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসে বলে, কী আর বলতে পারে তোমাকে, তবু একটা কিছু ত' বলতে হবে, তাই তোমার কানের কাছে এসে এমন সব বকছে।'

নিজের মনে নিজেই আবার সান্ত্বনা টেনে এনেছিলাম। চলেই ত' যাচ্ছি, তবে এমন রাগের আর মূল্য কী?

শেষ যাওয়ার পরেও যে মাঝে মাঝে যেতাম আর আসতাম, সেই যাওয়া-আসাই একদিন আবার বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। একদিন রামকমলবাবুর টেবিলেই বসেছিলাম, এমন সময় কানের কাছে কে যেন গুনগুন করে বলে গেল, 'ম্যানেজারবাবু একবার ডেকেছেন আপনাকে।'

—'তাই নাকি?' সহাস্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কেউ নেই। কে যেন কথাটা বলেই তড়িদ্গতিতে সরে পড়েছিল। রামকমলবাবু তাঁর ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলেছিলেন,—'যান, ডেকেছেন সায়েব, এখনো মনে আছে তাহলে!'

তেমনি হাসতে হাসতেই তাকিয়েছিলাম [illegible] দিকে। এবং পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনান্তে ধীরে ধীরে ম্যানেজারবাবুর চেম্বারে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। এবং তিনি আমাকে দেখেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে তাঁর সামনের চেয়ারে বসবার জন্য আহ্বান জানালেন। যেহেতু সেদিন আমি আর এই প্রতিষ্ঠানের কেউ নই, একজন বাইরের মাত্র, সে কারণে ম্যানেজারবাবুর সামনে চেয়ারে বসতে আমার কোনরকম দ্বিধা সঙ্কোচ করা উচিত নয়। ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন, 'চা খাবেন?'

ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়েছিলাম। এই বয়সে আর যখন-তখন চা খেতে ভালো লাগে না। অতঃপর এদিক-ওদিক খানিক সময় তাকিয়ে ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন, 'কেমন আছেন বলুন।'

—'এই চলে যাচ্ছে মোটামুটি।'

'বেশ বেশ।' বলে তিনি আবার একটা কী কাজে যেন মনোনিবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু আমাকে ডেকে বসিয়ে কাজে মনোযোগ দেওয়াটা ভদ্রতা বহির্ভূত বিষয়, তিনি নিজের কাজ থেকে বিরত হয়ে বললেন, 'বাড়ির খবর সব ভালো।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বলতে গিয়ে বেশ কুণ্ঠাবোধ করছিলাম। এত সহজে এমন আত্মীয়সুলভ মনোভাব নিয়ে এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটির সঙ্গে এখানে থাকতে কোনদিন আলাপ করতে পারি নি। সেদিন সেটুকু অধিকার পেয়ে একটু বেশিমাত্রায় অপ্রস্তুত হচ্ছিলাম।

তিনি আবার বলছিলেন, 'আপনার মত লোক নিয়মিত এখানে এলে আমাদের গৌরবের কথাই মনে পড়ে, কিন্তু...।'

কিন্তু কী? কী যেন। বলতে বলতে তিনি আটকে গেলেন। আবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। হয়ত এই মুহূর্তে খুব প্রয়োজন তেমন ফাইলটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলেই অস্বস্তিবোধ করছিলেন। এবং কথা বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। সেই সময় একবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলতে চান তিনি সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম। কোন কিছুই অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। শুধু দেখেছিলাম, তাঁর দু' চোয়ালটি আরো শক্ত হয়ে উঠেছিল। মুখের রেখা স্পষ্ট। চোখের তারা চঞ্চল। আমি হয়ত সে সব লক্ষ্য করতে গিয়েই তাঁর দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছিলাম। আর আশ্চর্য যে, একটু পরেই আবার তাঁকে স্বাভাবিক হয়ে যেতে দেখেছিলাম। ঠিক আমার বিদায় সম্বর্ধনার দিনে তাঁকে যেমন দেখে ছিলাম ঠিক তেমনভাবে। চোখের তারা, মুখের রেখা, পদমর্যাদার সঙ্গে [illegible] চোয়াল,—সবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ সব মিলিয়ে তিনি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। অতঃপর হাসিটি দু' ঠোঁটে আরো খানকটা বিস্তারিত করে আমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম, 'আপনার মত [illegible] আপনার ওপর [illegible] রেখে একটা কথা বলতে চাই।'

—বলুন।

—'না, মানে বুঝ [illegible] না যেন আপনি ত' সবই জানেন...।' বলতে বলতে তিনি আবার একটু থেমে গিয়েছিলেন, কী যে বলতে চান তিনি সেটা ঠিক বুঝে উঠতে না পারায় বোধ হয় তাঁর টেবিলের ওপর আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়েছিলাম।

খানিকবাদে তিনি তাঁর অসমাপ্ত কথার জের টেনে আরো অনেক বেশি গম্ভীরস্বরে বলেছিলেন, 'আসল কথা কি জানেন, কাজের বেলায় ফাঁকির সুযোগ পেলে ত' কেউ ছাড়ে না, তাই আপনি যদি এভাবে এসে ওদের সঙ্গে কথা বলেন, তবে ওরা আর কাজ করতে চাইবে না, শুধু কথাই বলবে।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কানের ভিতরে একটা বোঁ বোঁ শব্দ যেন তারস্বরে চীৎকার করে উঠেছিল। চোখের সামনে অন্ধকার। হাত পা-ও বোধ হয় কাঁপছিল। সেইভাবে আরো কতটা সময় যে তাঁর সামনে বসেছিলাম জানি না। সম্বিত ফিরে পেয়েছিলাম রাস্তায় এসে। এবং দুঃখ ও বিস্ময়ে যুগপৎ আক্রান্ত হয়ে ভাবলাম, চল্লিশ বছর যে অফিসকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম, অসাবধান হয়ে তারও ক্ষতি করে গেলাম শেষ পর্যন্ত।

চোখে জল ছিল না আমার। মুখে কোন রক্তের স্বাদও নেই। বোধ হয় রক্তশূন্যতাই এর কারণ। সেদিন থেকে আর কোনদিন যাই নি অফিসে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যাবও না।

অথচ বিদায় সম্বর্ধনার দিনে ওদের প্রশংসামিশ্রিত ভালোবাসা জ্ঞাত হবার পরে সবাই মিলে যখন আমাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করল, তখন সবার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলেছিলাম। অথচ কি যে বলেছিলাম সেটা এখন আর আমার কিছুই মনে নেই। তখন আমার অনুভবের মধ্যে যা ধরা পড়েছিল তা হ'ল আমি যথেষ্ট অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। দু' চোখ ভিজে গিয়েছিল আমার। এবং দু'টি জলের ধারা গাল বেয়ে নেমে আমার মুখে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু কেন যেন তখন আমার মনে হয়েছিল যে, এ জল নয়, চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে। সে রক্ত জলের [illegible] বেয়ে আমার মুখের ভিতরে ঢুকে আত্মগোপন করার প্রয়াস পেয়েছিল। তবু তা প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা ছিল না আমার। আমি তখন শুধু সেই ঈষদুষ্ণ লবণাক্ত স্বাদটাই গ্রহণ করছিলাম।

আর [illegible] আমার মনে [illegible],—[illegible] বুঝেছি যে, [illegible]

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি: লেখক মুজফ্ফর আহ্মদ। প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-বারো। দামঃ ষোলো টাকা।

বাংলা দেশে এই মুহূর্তে মাত্র এমন দু-একজনই বিদ্যমান রয়েছেন, যাঁরা দলমত-নির্বিশেষে সকলের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। এই শ্রদ্ধার আসন তাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কর্মে, ত্যাগে, নিষ্ঠায় এবং সততায়। প্রবীণ বিপ্লবী, সারা ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব তাঁদেরই অন্যতম।

তাঁর রচিত 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' স্বভাবতই পরম আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষিত। কমিউনিস্ট পার্টির আদি যুগ এবং তার প্রাথমিক বিকাশ তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মধারার সঙ্গে জড়িত। তিনি ছাড়া সে ইতিহাসের পরিপূর্ণ সত্যরূপ আর কে ফুটিয়ে তুলতে পারেন?

লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নেন নি-তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে পার্টির সম্বন্ধটুকুই নির্ণয় করবেন তিনি। তা-ও পূর্বাপর নয়—১৯২০ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত মাত্র এর ব্যাপ্তি, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রাক্‌পটেই তিনি গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ 'এই পুস্তকখানি ভারতের 'কমিউনিস্ট পার্টি' সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা, কোনো অবস্থাতেই এ পুস্তক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস নয়।' এবং 'আমার মনে হয় তা পড়ে সকলের আশাভঙ্গ হবে।' কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত এ না হতে পারে, কিন্তু বই পড়ে কারো আশাভঙ্গ হবে না, কারণ কিছু প্রাথমিক অংশ বাদ দিলে মুজফ্ফর আহ্মদ এবং কমিউনিস্ট পার্টি অচ্ছেদ্য, পার্টির বাইরে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তাই কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুজফ্ফর আহ্মদ [illegible] ভেদরেখা টানা শক্ত।

কিন্তু আশাভঙ্গ একেবারেই যে ঘটবে না তাও নয়। যদি গ্রন্থের আয়তনের কথা চিন্তা করেই লেখক ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাঁর কালভূমি নির্ধারণ করে থাকেন, তা হলে পাঠকের ওপরে নিঃসন্দেহে অবিচার করা হয়েছে। এই বই দু হাজার পৃষ্ঠা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেও যে কেউ অসীম আগ্রহে এর পংক্তিটি পড়ে যেতেন—এমনি আশ্চর্য এর আকর্ষণ। তথ্যে প্রমাণে বইটিকে সম্পূর্ণ সত্যাশ্রয়ী করবার জন্য লেখক প্রতি মুহূর্তে সজাগ, কিন্তু সে-সব তথ্য এর কোথাও ভার হয়ে ওঠে নি। মুজফ্ফর আহমেদ সাহেবের সতেজ স্বচ্ছ রচনা আগাগোড়া বইটিকে যেমন আকর্ষক তেমনি প্রদীপ্ত করে রেখেছে। সারা ভারতের সর্বশ্রদ্ধেয় নেতা শতায়ু হোন, আমরা এর পরবর্তী খণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকব।

এই বই চোখের সামনে যেন দিগন্তের পর দিগন্ত খুলে দেয়। হিজরাৎকারী মুহাজির যুবকদের আশ্চর্য ইতিহাস, তাশখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম প্রয়াস, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা, মস্কো ষড়যন্ত্র মামলা, পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা—কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পর্যায়ে এই বিভিন্ন অধ্যায়গুলো সাধারণ পাঠকের কাছে যেন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই বই না পড়লে এর অনেক তথ্যই বর্তমান সমালোচকের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যেত। লেখক ঠিকই বলেছেন, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের কাছে এই বই অপরিহার্য হবে, এর ঋণ গ্রহণ না করে ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলনের কোনো পরিচায়িকা লেখা যাবে না।

বইখানিতে সব চাইতে চাঞ্চল্যকর অবনী মুখোপাধ্যায় এবং নলিনী গুপ্ত সম্পর্কিত আলোচনা। 'বিপ্লবী অবনী মুখার্জী' নামে বইটি আমার অন্তত অল্প বয়সে পড়বার সৌভাগ্য ঘটেছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ এখন আমার স্মরণে নেই, কিন্তু তা থেকে অবনী মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার মনে যে ভাবমূর্তিটি তৈরি হয়েছিল, লেখক তার ওপরে লোহমুদ্গর হেনেছেন। মুহম্মদ আকবর খান এবং শওকত উসমানী; বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দেশত্যাগী বাঙালী বিপ্লববাদীরা, [illegible] আন্দোলনের প্রসঙ্গে তাদের চিন্তা ও মতপার্থক্য [illegible] এবং সাধনা আমাদের [illegible] প্রভাব থাকে নি।

রাজনৈতিক চিন্তায় মতপার্থক্য থাকেই এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আজ বিভক্ত। বামপন্থী আন্দোলনের ওপর শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল যে-কোনো ভারতবাসীর মতোই এই বিচ্ছেদে আমি গভীর বেদনা অনুভব করেছি। এই কারণেই সর্বশ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের রচনায় ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার বিশুদ্ধি আমার একান্ত কাম্য। নিরপেক্ষ তথ্যপঞ্জী থেকে সত্য নির্ণীত হোক—এইটিই সর্বতোভাবে বাঞ্ছিত।

প্রশ্নটি মনে এল দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের প্রসঙ্গে। তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ (সব চাইতে গুরুতর—তিনি ইংরেজের গুপ্তচর হওয়ার অভিলাষ জানিয়েছিলেন) এই বইতে উত্থাপিত হয়েছে। কিছুদিন আগেই যখন এই অভিযোগগুলি স্পষ্টোচ্চারিত হয় তখন শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে কমিশনের সামনে এদের সম্পর্কে নিজের বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। সেই বক্তব্যের কথা বইতে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত, কিন্তু পাঠক হিসাবে আমার মনে হল, অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের পূর্ণ বয়ান থাকলে আমাদের পক্ষে সত্য নির্ধারণের কাজ সহজতর হয়। পার্টি বিভক্ত হয়ে গেছে বলেই এই সতর্কতা দরকার—না হলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

আমার দ্বিতীয় নিবেদন অবনী মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে। অবনী মুখোপাধ্যায়ের উত্তর জীবন তো সোভিয়েৎ ভূমিতেই কেটে গিয়েছিল। তাঁর যে চরিত্ররূপ এখানে পাচ্ছি, তার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি কি? সম্প্রতি সোভিয়েৎ থেকে প্রচারিত [illegible]

জানা যাচ্ছে যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সেখানে সসম্মানেই ছিলেন—তাঁর পরিবারও তো এখনো সেখানেই রয়েছেন। অবনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে তথ্যগত বৃত্তটা কি আরো পূর্ণভাবে আমরা পেতে পারি না?

চীনে উদ্দেশ্যসাধনের বিফলতা এবং ষষ্ঠ কমিউনিস্ট ইণ্টার ন্যাশনালে ভারত সম্পর্কিত থিসিসের ফলে মানবেন্দ্রনাথের যে অগৌরব ঘটেছিল, তা ইতিহাসে আছে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব নিশ্চিতভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কাজে দূরে বেলিনে বসে তিনি কী কী অসুবিধায় পড়েছিলেন, কিভাবে বিভিন্ন মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণায় ভ্রান্তি ছিল। কিন্তু বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে আহরিত হয়েছে কি-না—অথবা সংগঠনের কাজে এ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে—এ-ব্যাপারে আর একটু প্রামাণিকতা থাকলে বোধ করি ভালো হত।

'বিপ্লবী'—এই অভিধা যে মাত্র কয়েক-জন রুদ্রপন্থী বাঙালীরই প্রাপ্য নয়, যে শ্রমিক কৃষক-ছাত্র-মধ্যজীবী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা সকলেই বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের এই যুক্তি সর্বতোভাবে স্বীকার্য। কিন্তু তাঁদের 'সন্ত্রাসবাদী' এই সংজ্ঞায় ভূষিত করা কি উচিত হবে? 'সন্ত্রাসবাদী' ইংরেজের দেওয়া 'টেররিস্ট' নিন্দাবাণীর অনুবাদ মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে এই সমালোচকের তাঁদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটেছিল। তাঁরা যে 'সন্ত্রাসের' রাজত্ব সৃষ্টি করতে চান নি—নির্বিচারে যে-কোনো ইংরেজকে হত্যা করে বিভীষিকার রাজত্ব রচনা করাই যে তাঁদের লক্ষ্য ছিল না—এ সব কথা তো লেখক আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। এই বিপ্লববাদীরা চেয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ইংরেজ রাজত্বের অবসান- তার ভুল ভ্রান্তি-অসম্পূর্ণতা যাই থাক। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ সদস্যদের মধ্যে একটা বিরাট অংশই তো এই শিবির থেকে এসেছেন। একমাত্র না হলেও তাঁরাও 'বিপ্লবী' বা 'বিপ্লববাদী', সন্ত্রাসবাদী আখ্যা বোধ হয় তাঁদের প্রাপ্য নয়।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের বইটি সমস্ত মত এবং দলের ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষ সত্যের প্রামাণিক নিদর্শন হয়ে থাক, এই কামনা থেকেই কয়েকটি বক্তব্য নিবেদন করেছি। বিচার্য কি-না লেখকই নির্ধারণ করবেন। তাঁর প্রয়াসের সীমা আমরা স্বীকার করি না, তিনি সুস্থ থাকুন ও দীর্ঘায়ু হোন, এই বইয়ের পরবর্তী খণ্ড লেখা হোক। যে-কোনো মতের, যে-কোনো আদর্শের [illegible] সেই বইয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করবে।

অনেক অপ্রীতিকর সত্য এই বইতে আছে, কিন্তু সত্যের স্বাদ সর্বদা মধুর হয় না। সব মিলে মনে হল, এই বই না পড়লে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আদি পর্যায় সম্পর্কে আমি অন্তত অনেকখানি নিরক্ষর থেকে যেতুম।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০)। সৈয়দ মুজতবা আলী। নবজাতক প্রকাশন, ৬, এণ্টনীবাগান লেন, কলকাতা—৯। দাম : দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ স্মরণে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণ করে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবির যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। বহু মূল্যবান তথ্যে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি তিনি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য এ সবই "postmortem report" বলতে পারা যায়। লেখক নিজেও তা' স্বীকার করেছেন, তবে, তিনি যে যুক্তি দেখিয়ে-ছেন, তার সঙ্গে আমরা একমত নই। লেখক 'পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত হতভাগ্য মুসলমানদের (?)' প্রসঙ্গ টেনে এনে সাম্প্রদায়িকতার দোহাই না দিলেই পারতেন। তিনি সদুপদেশও দিয়েছেন, 'ভারতীয় ইউনিয়নের মুসল-মানদের অবহেলা করেও স্বরাষ্ট্র পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না।' ভারত ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়—মুসলমান-হিন্দু এখানে সমান। এই পুস্তকে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র ও রাজনীতির যোগসূত্রের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় কখনই মনঃ-পূত হবে না। আর মাতৃভাষা যে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, একুশের অমর শহীদরাই তার প্রমাণ দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গবাসী আজও দিচ্ছেন।

রবীন্দ্র-সৃষ্টি বিচিত্রা (২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৬)। প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত। আলফা পাবলিশিং কনসার্ন। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দাম : ৭ টাকা।

প্রবন্ধ সপ্তিকা (২৬শে শ্রাবণ, ১৩৭৬)। প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত। আলফা পাবলিশিং কনসার্ন। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দাম : ৭ টাকা।

প্রথম গ্রন্থে সমালোচক অধ্যাপক প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, খেয়া, শ্যামলী, আকাশপ্রদীপ ও আরোগ্য—এই কয়টি কাব্যের এবং নৌকাডুবি উপন্যাসের মূল্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্র-নাথের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবনদৃষ্টি ও কবি-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতা সম্বন্ধেও একটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্র সমালোচকদের প্রচলিত ও স্বীকৃত তথ্য সংযোজনা করেছেন। ঋজু স্বচ্ছ লেখনশৈলীর গুণে ব্যক্তি-গত ধারণা ও উপলব্ধির রসবিশ্লেষণও পাঠকদের ভাল লাগবে। আলোচ্য গ্রন্থ-গুলি সম্বন্ধে তাঁদের মোটামুটি পরিষ্কার একটি ধারণা গড়ে উঠবে। শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থে—'ঈশ্বর গুপ্ত : কবি ও কাব্য', 'দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী,' 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধ,' 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ', 'মধু-সূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য', 'হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহার', 'শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ', 'ঊনিশ শতকের গীতিকবিতা প্রসঙ্গে', 'বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত' ও 'সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সঞ্চয়ন' শীর্ষক দশটি প্রবন্ধ রয়েছে। অল্প পরিসরে বৈদগ্ধপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এই প্রবন্ধগুলিতে সমালোচক দেড় শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটি সহজ-বোধ্য রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ, চিন্তা বুদ্ধিদীপ্ত। প্রচলিত মত ও ধারণাকে নতুন জিজ্ঞাসার আলোকে উপস্থাপিত করার প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

সাধারণ পাঠকসমাজ, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে গ্রন্থ দু'টি আদরণীয় হবে বলে মনে করি। ভাষা পরিচ্ছন্ন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০)। সম্পাদনা : স্বরাজ মজুমদার ও অমিতাভ চক্রবর্তী। ৭২।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম : চার টাকা।

এই গ্রন্থে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার জানা-অজানা কবিদের কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন এদেশের কিছু কবি। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' নাম কেন দেওয়া হয়েছে, বোধগম্য হল না। অধিকাংশ অনুবাদ কবিতাই জোলো। সার্থক অনুবাদ কবিতা যাঁরা লিখেছেন এই সংকলনে, তাঁদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক প্রমুখ।

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ইসাডোরা ডান্কান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—১৯০৫ সালের এক রাত্রে আমি বার্লিনে নাচ দেখাচ্ছিলাম। সাধারণত নাচবার সময় আমি কখনও দর্শকদের দিকে নজর দিই না—they always seem to me like some great God representing humanity—এই সন্ধ্যায় কিন্তু সামনের সারিতে বসা এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্রলোকের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। আমি যে তাঁর দিকে চেয়ে দেখছিলাম তা নয়—কিন্তু সাইকিকেলী আমি যেন তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করছিলাম বারে বারে। প্রদর্শনী শেষ হবার পর আমার ঘরে এক দেবতার মত সুন্দর যুবক এসে ঢুকলেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা চাঞ্চল্যের ভাব। তিনি বললেনঃ "তুমি অপূর্ব! তোমার কোনো তুলনা হয় না! কিন্তু আমার সমস্ত আইডিয়াগুলো তুমি চুরি করেছ কেন? আমার দৃশ্যসজ্জার পরিকল্পনা তুমি কোথা থেকে জানতে পারলে?"

আমি উত্তর দিলাম—"এ তুমি কি বলছ? এ আমার নিজের পরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জা। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স তখনই আমি ব্লু-কার্টেনের আবিষ্কার করেছি—আর সেই বয়স থেকেই নীল রংয়ের পর্দার সামনে আমি নেচে আসছি।"

যুবকটি জবাব দিলেন—"না, না, এসব 'আমার ডেকর', 'আমার আইডিয়াজ'। কিন্তু আমার পরিকল্পনাতে ছিল ঐ ধরনের সজ্জিত মঞ্চে তুমিই থাকবে অধিষ্ঠিতা। তুমিই ছিলে আমার স্বপনচারিণী—আজ আমার সেই স্বপ্নে দেখা মাধুরীমণ্ডিত তরঙ্গায়িত সৌন্দর্যের অধিকারিণীকে বাস্তবে রূপায়িত দেখছি তোমার ভেতর।"

"কিন্তু, তুমি কে বল তো?"

"আমার মা-র নাম এলেন টেরী।"

"এলেন টেরী!" মনে মনে ভাবলাম, তিনি যে আমার সমস্ত মনকে অধিকার করে আছেন আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে। সেই এলেন টেরীর সন্তান এই উদ্ধত, এ্যাপোলোর মত সুন্দর যুবক!

আমার মা বললেন—আপনি আমাদের সংগে এসে আমার বাড়িতে সাপার খাবেন। মা অবশ্য তখন ধারণাও করতে পারেন নি এর পরিণতি কি রূপ নেবে। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর মেয়ে ইসাডোরার শিল্প সৃষ্টি দেখে যে যুবক এতটা মোহিত, তাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করা দরকার।

গর্ডন ক্রেগ সাপারের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আমাদের বাড়িতে এলেন।

ক্রেগ ছিলেন অদ্ভুত উত্তেজিত অবস্থায়। মহৎ শিল্প সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত চিন্তা, ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি বিস্তৃত এবং ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন.....

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম ক্রমশ রাত বেশি হবার সংগে সংগে অন্যদের ঘুম পাওয়াতে, তাঁরা নানা অজুহাত দেখিয়ে উঠে যেতে লাগলেন। আমরা দুজনে তখন একা—একজন বক্তা, অন্যজন শ্রোতা। ক্রেগ আর্ট অব্ দি থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন—He illustrated his art with gestures.

কথার মাধ্যমে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেনঃ কিন্তু এখানে তুমি কি করছ? তুমি মহৎ শিল্পী—পরিবারের মাঝে থেকে সাধারণ মানুষের মত জীবন কাটাবার অধিকার তোমার নেই। এ একটা উদ্ভট ব্যাপার। তুমি আমার দৃষ্টিপথে পড়লে, আমিই তোমাকে আবিষ্কার করলাম—আমার পরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জার মাঝেই তোমার আসল স্থান।

ক্রেগের দেহ ছিল দীর্ঘ, পাতলা ধরনের চেহারা, এলেন টেরীর মতই চোখ-মুখের মাধুর্য, কিন্তু তাঁর ফিচাবস যেন মায়ের থেকেও ডেলিকেট।

এলেন টেরী

এরপর ইসাডোরার ভাষাতেই বলিঃ
In spite of his height, there was something feminine about him, especially about the mouth, which was sensitive and thin-lipped. The golden curls of his boyhood pictures—Ellen Terry's golden haired little boy, so familiar to London audiences—were somewhat darkened. His eyes, very near-sighted, flashed a steely fire behind his glasses. He gave one the impression of delicacy, a certain almost womanly weakness. Only his hands, with their broad tipped fingers and simian square thumbs, bespoke strength. He always laughingly referred to [illegible] ponderous thumbs—"Good to choke you with, my dear!"

আমি যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম। ক্রেগ আমার সাদা টিউনিকের ওপর কেপ্‌টা পরিয়ে দিলেন। হাতে ধরে আমাকে নিয়ে চলে এলেন রাস্তায়। একটি ট্যাক্সি থামিয়ে জার্মান ভাষায় বললেন—"Meine Frau und mich, wir wollen nach Potsdam gehen."—অর্থাৎ আমি এবং এই মহিলা পট্‌সড্যাম যেতে চাই।

অনেকগুলো ট্যাক্সি আমাদের নিয়ে যেতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত একটি রাজী হল এবং আমরা পটস্‌ড্যামে গিয়ে হাজির হলাম সকালবেলায়। একটি ছোট হোটেলে বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম—সেটি তখনই মাত্র খুলেছিল। সেখানে কফি পান করে একটু বিশ্রাম নিলাম। বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বার্লিন অভিমুখে রওনা হলাম।

সকাল ৯টায় বার্লিনে ফিরে এলাম। এখন আমরা কি করি? মা-র ওখানে ফিরে যাওয়া চলে না। সুতরাং এক বান্ধবীর—নাম তার এল্‌সি দ্য ব্রুগেয়ার—ওখানে গেলাম। সে ছিল বোহেমিয়ান। সে আমাদের খুব আপ্যায়ন করলো। ব্রেক্‌ফাস্ট খেতে দিল স্ক্র্যাম্বল্‌ড্‌ এগ্‌স এবং কফি। তার বেডরুমে নিয়ে আমার ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং ঘুম ভাঙলো একেবারে সন্ধ্যাবেলায়।

এরপর ক্রেগ আমাকে তাঁর স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন—এটি ছিল বার্লিনের একটি উঁচু বাড়ির একেবারে ওপরে। আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন ক্রেগ—প্রতিভা, সৌন্দর্য এবং রোমান্সের মূর্ত প্রতীক। প্রেমের অগ্নিশিখা আমার সারা অঙ্গে যেন আগুন জ্বালিয়ে তুললো—আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলাম তাঁর সুদৃঢ় আলিঙ্গনে—প্রতি অঙ্গে অনুভব করলাম তাঁর প্রেমার্ত, ক্ষুধার্ত, নিবিড় সান্নিধ্য। অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে লাগলাম যে, আমাদের উভয়ের দেহ একই রক্তমাংস দিয়ে গড়া। মৃদু-মধুর কণ্ঠে তিনি যেন কবিতা আবৃত্তি করার মত বলে যেতে লাগলেন—"তোমার দেহের তরঙ্গায়িত রূপের স্পর্শ আমি আমার সর্বাঙ্গে অনুভব করছি ইসাডোরা। উপলব্ধি করছি যে, তোমার দেহ আমার দেহে বিলীন হয়ে গেছে। তুমি আমার অঙ্গের অঙ্গ, আত্মার আত্মা- তুমি আমার জননী, তুমি আমার নর্মসহচরী, তুমিই আবার আমার সহোদরা। সঙ্গীতের ঘনীভূত রূপায়ণ তোমার পবিত্র কুচযুগলে। তোমার গ্রীবাভঙ্গিতে ছন্দের গতিময়তার স্ফুরণ। এ মাধুরীর বর্ণনা করা যায় না—এ শুধু দেহ-মন দিয়ে অনুভব করবার জন্য সৃষ্ট।"

আমি যেন দ্রবীভূত হয়ে গেলাম—As flame meets flame, we burned in one bright fire. Here, at last, was my mate; my love; my self—for we were not two, but one, that one amazing being of whom Plato tells in Phedrus, two halves of the same soul.

This was not a young man making love to a girl. This was the meeting of twin souls. The light covering of flesh was so transmuted with ecstasy that earthly passion became a heavenly embrace of white, firy flame.

There are joys so complete, so all perfect, that one should not survive them. Ah, why did not my burning soul find exit that night, and fly, like Blake's angel, through the clouds of our earth to another sphere?

[ইসাডোরার শেষ কথাগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মিলনের প[illegible]ন নর-নারীর দ্বৈতসত্তা যখন এক হয়ে যায়—কবি ব্রাউনিং যে অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

Till flesh must fade for heaven was here!—তার পরেও পার্থিব জীবনে ফিরে আসার সার্থকতা কোথায়! এই সত্যকেই অন্তর থেকে উপলব্ধি করে ব্রাউনিং তাঁর পরফিরিয়াস লাভার কবিতাটি রচনা করেছিলেন ঃ

at last I knew
Porphyria worshipped me: surprise
Made my heart swell, and still it grew
While I debated what to do.
That moment she was mine, mine, fair,
Perfectly pure and good: I found
A thing to do, and all her hair
In one long yellow string I wound
Three times her little throat around,
And strangled her.
....
And all night long we have not stirred!"]
And yet God has not said a word!

ক্রেগের স্টুডিওতে কোন কাউচ, বা ইজিচেয়ার ছিল না। নৈশ আহার করবো, তারও কোন ব্যবস্থা নেই। সে রাতে অনাহারে মেঝেতে শুয়ে কাটাতে হোল। ক্রেগের হাতে তখন কোন পয়সা নেই—আমারও এমন সাহস নেই যে, বাড়ি গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসব। এই স্টুডিওতেই দু সপ্তাহ ক্রেগের সঙ্গে ছিলাম। এক-জনের জন্য খাবার এনে রাত্রে দুজনে তাই ভাগ করে খেতাম।

বেচারী মা সমস্ত পুলিশ স্টেশন এবং এম্‌বেসীতে আমার খোঁজ করে বেড়ালেন—সব জায়গায় গিয়ে তিনি বলতে লাগলেন একজন অসচ্চরিত্রের লোক এসে তাঁর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমি হঠাৎ উধাও হওয়াতে আমার ইম্‌প্রেসারিও পড়লেন মহা বিপদে। বহু দর্শককে টিকেটের পয়সা ফেরৎ দিয়ে দিতে হল। অবশ্য ইম্‌প্রেসারিও বুদ্ধিমানের মত কাগজের মারফতে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—"মিস ইসাডোরা ডান্‌কান হঠাৎ টন্‌সিলাইটিস রোগে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

[ক্রমশ]

দাদাসাহেব ফালকের জন্মশতবর্ষ

বোম্বাইতে সাড়ম্বরে দাদাসাহেব ধুন্ধিরাজ ফালকের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। দাদাসাহেব ফালকেকে বলা হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক। ১৯১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' ভারতের প্রথম কাহিনীচিত্র। এই ছবির নির্মাতা ছিলেন ফালকে। তিনি চিত্রনাট্য, পরিচালনা, শিল্প-নির্দেশনা, চিত্রগ্রহণ থেকে চলচ্চিত্রের যাবতীয় কাজ একাই করতে পারতেন। বাস্তবিকপক্ষে তখন সব রকমের কাজ করার ইচ্ছা ও সাহস না থাকলে ছবি তৈরি করা সম্ভব হত না। কারণ তখনও ভারতীয়দের কাছে 'জীবন্ত ছবি' এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ১৯১২ সাল থেকে দাদাসাহেব ফালকে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেছেন এবং জীবিতকালে প্রায় একশো পূর্ণাঙ্গ ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তিনি নির্মাণ করে গেছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রথম জীবন থেকে তাঁকে নানা বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল আর্থিক। জীবনের শেষ সময়েও তাঁকে চরম আর্থিক দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে। আজ যদিও চলচ্চিত্র নির্মাতারা লাখ ছাড়িয়ে কোটির স্বপ্ন দেখে এবং কয়েক বছর আগে দালালী যার ব্যবসা ছিল, তিন-চার বছরের ব্যবধানে সে লাখপতিতে পরিণত হয়, অথবা অসৎ পথে অর্জিত কালো টাকাকে সাদা টাকায় পরিণত করে চলচ্চিত্র প্রযোজক বলে খ্যাত হয়। প্রারম্ভিক যুগে এই অবস্থা ছিল না। সুতরাং দাদাসাহেব ফালকেকে নিজের সম্পত্তি, জীবনবীমার পলিসি বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং একশোটি ছবি তৈরি করার পরও আর্থিক কষ্টের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সরস্বতীবাঈ ফালকে সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

আজ ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানাধিকারী। বছরে তিন শতাধিক ছবি এদেশে তৈরি হয়। কোটি কোটি টাকা এই শিল্পে লগ্নী হচ্ছে। অনেক লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত। এই শিল্প থেকে কেন্দ্রীয় ও [illegible] সরকার অনেক কোটি টাকা [illegible] আদায় করছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পকে কেন্দ্র করে কত রকমের ব্যবসা চলছে, কত মানুষ রুজি-রোজগার করে বেঁচে আছে। কয়েক লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করা হয়ে থাকে। যে শিল্পের দৌলতে বর্তমানে এই অবস্থা সেই শিল্পের পথপ্রদর্শককে স্মরণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

'মৌসুমী মন' ছবিতে মিতা চৌধুরী

বোম্বাইতে সরকারিভাবে দাদাসাহেব ফালকে জন্মশতবর্ষ কমিটি গঠিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি। বোম্বাইতে রঙ্গভবনের [illegible] রাজ্যপাল সভাপতিত্ব করেছেন। এই কমিটির উদ্যোগে হিন্দমাতা সিনেমার সামনে রাস্তার সংযোগস্থলে দাদাসাহেব ফালকের একটি প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন। ফালকের জীবন [illegible] একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, এই ছবিটি ভারতের সর্বত্র একই সময়ে দেখানো হবে। সরকারিভাবে সাতদিনের জন্য নির্বাচিত [illegible] চলচ্চিত্র উৎসবের কর্মসূচী পুরনো দিনের স্থির চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে এবং একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সারা ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র-নির্মাতারা ফালকের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে [illegible] বলেছেন, ভারতে কে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন সে বিষয়ে যদিও বিতর্কের অবকাশ আছে, তথাপি ফালকে যে চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রথম সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দাদাসাহেব ফালকের জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পে তাঁর সাফল্য ও পথপ্রদর্শনের কথা স্বীকার করছি। কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের মনে পড়ছে হীরালাল সেনের কথা। ১৯০৩ সাল থেকে তিনি চলচ্চিত্র বিষয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন এ বিষয় নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি। একদল চলচ্চিত্র-সমালোচক হীরালাল সেনকে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা বলে দাবি করেছেন—কিন্তু দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন মহল তেমন তৎপর হয় নি। দাদাসাহেব ফালকের জন্মশতবর্ষে আমরা প্রায় বিস্মিত হীরালাল সেনকেও স্মরণ করছি।

—সুজন।

সুরঙ্গমা'র নৃত্যনাট্য

'মায়ার খেলা'
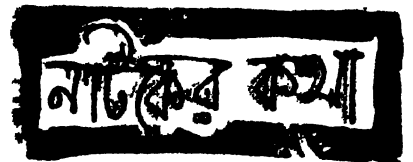
গীতিনাট্য আকারে 'মায়ার খেলা'র রচনাকাল ১৮৮৮ সাল। কবি ১৯০৮ সালে এক নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। [illegible] 'শ্যামা'

[illegible] সুরঙ্গমার শিল্পীরা সগৌরবে নৃত্যনাট্যটি গত ৩রা মে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে উপস্থাপিত করেন।

নৃত্যনাট্যটি নানা কারণে আমাদের আকৃষ্ট করেছে। পরিবেশনায় সুরঙ্গমার ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরাই প্রধান। ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকে পাঠ্যতালিকার অংশরূপে গ্রহণ প্রশংসনীয়। নবীন শিল্পীদের অভিভাবকরাও এতে উৎসাহ পাবেন।

নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান সুরুচির পরিচয় দেয়। 'যদি ভালোবাসিয়া কেবল কষ্টই সার, তবে ভালোবাসিবার প্রয়োজন কি?'—এই সার কথাটি নৃত্যগীতের দ্যোতনায় প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। এখানেই তো পরিচালকের পরিবেশনার কৃতিত্ব এবং শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার নাটকটির মূলভাব প্রকাশ [illegible] হয়েছেন। নাচগুলি [illegible] সংগত হয়েছিল এবং নৃত্যে নতুন আঙ্গিকের সন্নিবেশও লক্ষ্য করা গেল। পূর্ণিমা ঘোষের নৃত্য পরিবেশনে নতুনত্বের স্পর্শ রয়েছে। প্রমদারূপী সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন তার সম্ভাবনার ইঙ্গিত ঘোষণা করে। গোবিন্দন কুট্টির নৃত্য আকর্ষণীয় হয়েছিল, তবে কিশোরী প্রমদার পাশে কিছু বেমানান ঠেকছিল।

নারীকণ্ঠের সমবেত গানগুলি সুগীত হয়েছিল। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীলিমা সেনের কণ্ঠের অনেকগুলি গানই ভাবের রাজ্যে নৃত্যনাট্যকে প্রাণবন্ত করতে সাহায্য করে। তাছাড়া 'সুরঙ্গমা' শিল্পী ঊর্মিলা [illegible] এবং কণ্ঠমাধুর্য শিল্পীর আন্তরিকতার পরিচয় দেয়। যন্ত্রসংগীত এবং মঞ্চসজ্জা সংগত হয়েছিল। আমরা আশা করব শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কলকাতার নাগরিকদের অন্যান্য রবীন্দ্রগীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য উপভোগের সুযোগ করে দেবেন। শ্রীমজুমদারের পরিচালন-বৈশিষ্ট্য বিদগ্ধজনের প্রশংসা দাবি করতে ভরসা রাখে।

সুরমঞ্জীর-এর 'নৃত্যের তালে তালে'

গত পয়লা মে বালীগঞ্জ শিক্ষাসদনে মাকতলা 'সুরমঞ্জীর'-এর অষ্টম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সংগঠনের সভাবৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত ভারতীয় নৃত্যকলার বিচিত্র রূপাঙ্গিকের পরিচয়বাহী 'নৃত্যের তালে তালে'—নৃত্যাভিনয়ের একটি মনোরম প্রযোজনা হিসাবে দর্শকবৃন্দের প্রশংসা কুড়িয়েছে। স্বর্গরাজ্যের শিব-পার্বতীসৃষ্ট নৃত্যকলা মর্ত্যরাজ্যে মানব জাতির জীবন ও ছন্দে কিভাবে রূপ পেল, আলোচ্য নৃত্যাভিনয়ের অনুষ্ঠানটি বিশ্বসৃষ্টির সেই ছন্দ-রহস্যেরই এক অভিনব প্রযোজনা। ভরতনাট্যম, মণিপুরী, কথক, কথাকলি, লোকনৃত্য (আদিবাসীসহ) এবং আধুনিককালের রাবীন্দ্রিক নৃত্যকলা—পর্যায়ক্রমে গ্রন্থণাসহকারে আলোছায়াময় পশ্চাদপটে সঙ্গীতপূর্ণ পরিবেশে নয়নাভিরাম চিত্তরঞ্জনী হিসাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্র এবং কণ্ঠসঙ্গীতের আবহ মূল অনুষ্ঠানটিকে সত্যি ছন্দসুরের এক হরগৌরী মিলনোৎসবরূপেই যেন চিহ্নিত করেছিল।

"আমি কি বলব"

গত ২২শে এপ্রিল শিবাজী সঙ্ঘের সভ্যরা মহাজাতি সদনে দীপ্তিকুমার শীল রচিত 'আমি কি বলব' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। বিচিত্র চরিত্র ও নাটকীয় কাহিনী সম্বলিত নাটকটি সেদিনের নাট্যানুরাগী দর্শকদের আনন্দ দান করে।

বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন : দিলীপ বসাক (ডাক্তার রায়), দীপ্তিকুমার শীল (হরিধন), ডাঃ বিমলকুমার চন্দ্র (অজিত), বিশ্বনাথ রায়, (কেষ্টবাবু), মিহিরলাল চন্দ্র (তেওয়ারী), প্রদীপকুমার শীল (নকুল), অশোক চন্দ্র (মনোহর), প্রভাতশ্যামল বসু (উত্তম) ও মদনমোহন মজুমদার (গোবিন্দ)। নাটক পরিচালনা করেন নাট্যকার স্বয়ং। শুভময় [illegible] ছিলেন আবহসঙ্গীত পরিবেশনে।

'অ[illegible]' ছবির একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়

রাজকুমারী

মাস দুই বিরতির পর লোকনাথ চিত্রমন্দিরের 'রাজকুমারী' ছবির কাজ আবার টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। একমাস ব্যাপী চিত্রগ্রহণের কাজ চলবে বলে জানা গেছে। উত্তমকুমার ও তনুজার অংশ গ্রহণে ছবিটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে প্রযোজক আশা করেন। পরিচালক সলিল সেন এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। শচীনদেব বর্মণের পুত্র রাহুলদেব বর্মণ সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। বাংলা ছবিতে এই তাঁর প্রথম কাজ। নেপথ্য গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে রয়েছেন লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, ও কিশোরকুমার। অভিনয়ে আছেন : ছায়া দেবী, দীপ্তি রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, রমেন চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, জহর রায় ও ভানু ব্যানার্জী।

তথ্যচিত্র

ভারত চিত্রের প্রযোজনায় অশোক বাগচী ও অলোক এন বাগচীর পরিচালনায় দু'খানি তথ্যচিত্র "শান্তিপুর ও তাঁতশিল্প" এবং "বাংলার উৎসব ও পূজাপার্বণ" প্রস্তুত হচ্ছে।

সংবাদ-কনা

সারা বাংলা নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক সারা বাংলা আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা গত ২রা, ৩রা ও ৪ঠা মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ২৯শে মে মহাজাতি সদনে নজরুল একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে সংগীতাচার্য শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত প্রতিযোগিগণ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। কিশোর বিভাগে—অভিজিৎ গাঙ্গুলী, অঞ্জন ঘোষ ও টুকটুক চক্রবর্তী। মহিলা বিভাগে—অনুরাধা ঘোষ, গীতা সেনগুপ্ত ও পার্বতী সেন। পুরুষ বিভাগে—সুমিত সেনগুপ্ত, স্নেহময় মুখোপাধ্যায়, ও বাসুদেবপ্রসাদ দাস। সাধারণ বিভাগে—দেবাংশুকুমার নন্দী ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

নজরুল সংগীতে 'খ' বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে আধুনিক : শুক্লা অধিকারী, বাণী সমাদ্দার, সুরভি চক্রবর্তী ও তমালী বিশ্বাস। রাগপ্রধান: শুক্লা অধিকারী, বাণী সমাদ্দার, তমালী বিশ্বাস ও করবী দাশ। গজল : বাণী সমাদ্দার, রত্না ঘোষ ও চম্পা ঘোষ। ভক্তি-সংগীত : বাণী সমাদ্দার, তনিমা ঘোষ, শুক্লা অধিকারী ও টুকটুক চক্রবর্তী। পল্লীসংগীত: টুকটুক চক্রবর্তী, শুক্লা অধিকারী ও আলপনা মজুমদার। দেশাত্মবোধক: কল্পনা রায়চৌধুরী, শাশ্বতী সাহা ও আলপনা মজুমদার।

সলিল সেনের 'রাজকুমারী' ছবিতে রমেন চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা

পর্ণেন্দু বসু পরিচালিত 'ছুটি' নামে ছবিতে উত্তমকুমার

[illegible] সমস্ত [illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] মধ্যে বিশেষভাবে (গণসংগীত) উল্লেখযোগ্য : সর্বশ্রী নিমাই রাউত, প্রসূন সেন, চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রসংগীত), নির্মলেন্দু চৌধুরী (পল্লীগীতি), সুজিত ঘোষ, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মন্ডল, নিত্যাদ্রিশেখর বসু (আবৃত্তি), অমিতাভ মজুমদার (মূকাভিনয়), এ ছাড়া স্লাইড শো-এর মাধ্যমে লেনিনের পূর্ণাঙ্গ জীবনীর ওপর বক্তৃতা করেন শঙ্কর চক্রবর্তী। দুর্গাপুরের "অরণি" নাট্যসংস্থার শিল্পিবৃন্দ অভিনয় করেন "বিষ"। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও লেনিনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে-ছিলেন উৎসব কমিটি।

লুডভিগ ভ্যান বেটোফেন

দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী

আগামী ডিসেম্বরে লুডভিগ ভ্যান বেটোফেনের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে। জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে উৎসবের জন্য ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়েছে। উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি হয়েছেন জি ডি আর-এর প্রধানমন্ত্রী উইলি স্টোফ, তাঁর সহকারী জি ডি আর-এর সংস্কৃতিমন্ত্রী ক্লাউস গীসি।

উইলি স্টোফ বলেছেন—"সংগীতের ক্ষমতা, জনগণের জীবনে সংগীতের ভূমিকা, ব্যক্তিত্ব গঠনে সংগীতের প্রভাব সম্পর্কে বেটোফেন আমাদের বর্তমান

নজরুল সংগীতে 'ক' বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে নিম্নোক্ত প্রতিযোগি-গণ। আধুনিকঃ কুমকুম দত্ত, পলি ভট্টাচার্য ও অঞ্জলি মজুমদার। রাগপ্রধানঃ মলিনা মজুমদার, কুমকুম দত্ত ও অঞ্জলি মজুমদার। দেশাত্মবোধকঃ মলিনা মজুমদার, অঞ্জলি মজুমদার, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় ও রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়। গজলঃ অঞ্জলি মজুমদার, কুমকুম দত্ত, রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভক্তি সংগীতঃ অঞ্জলি মজুমদার, জ্যোৎস্না সাহা ও আমিন-অর-রশিদ। পল্লীসংগীত : অঞ্জলি মজুমদার, আমিন-অর-রশিদ ও মলিনা মজুমদার।

আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতায় কলকাতা এবং সুদূর দার্জিলিং, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া ও ২৪-পরগনা জেলা থেকে বহুসংখ্যক প্রতিযোগী উপস্থিত হয়েছিলেন।

হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি বিশ্বরূপা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত চিলড্রেনস্ লিটল থিয়েটারের নাটকে নেপথ্যশিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন। নানারকম জানোয়ার ও পাখীর ডাক সৃষ্টি করে তিনি ছেলেদের রূপক নাটকটি সার্থক করেন। নিখিল ভারত শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে হর-বোলা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

বোকারোয় লেনিন জন্মশতবার্ষিকী

শুরু উৎসব

ডি ভি সি বোকারোয় ত্রিদিন-ব্যাপী লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব বিশেষ আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা দুর্গাপুর এবং মান-

সুশান্ত সেনগুপ্ত

নজরুল একাডেমির আবৃত্তি প্রতি-যোগিতায় পর পর তিন বছর প্রথম হয়েছেন।

'সরস্বতী প্রতিজ্ঞা' ছবির একটি দৃশ্য

সজাগ করেছেন তেমন আর অন্য কোনো সংগীতকার নন।"

গত বছর অক্টোবর মাসে পট্সডামে সংস্কৃতি লীগ আয়োজিত এক বেটোফেন সম্মেলন থেকে এই উৎসব পালনের সূত্রপাত। বেটোফেন জুবিলী বছরে প্রকাশিত হয়েছে বেটোফেন পত্রাবলী—ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য ও নামের নির্ঘণ্ট সহ। জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে বেটোফেনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সঙ্গীতের আসর। জুল-এ স্টেট সিমফনি অর্কেস্ট্রা বেটোফেন বছর ১৯৭০-এর উদ্বোধন করেন গাইসলারের পরিচালনায় 'কোরিওলেন' ও 'পঞ্চম সিমফনি' পরিবেশন করে। ডিসেম্বরে একটি বেটোফেন সপ্তাহ পালনের প্রস্তুতি করছেন বার্লিনের জার্মান স্টেট অপেরা। স্টেট অর্কেস্ট্রার চেম্বার মিউজিক সঙ্গীত মাসায় শোনা যাবে বেটোফেনের সকল স্ট্রিং কোয়ার্টেট ও চেম্বার মিউজিকের এমন কয়েকটি অংশ, যা সচরাচর পরিবেশিত হয় না। জি ডি আর রেডিও কাজে নেমেছে অনেকগুলি প্রকল্প নিয়ে। কর্মসূচীতে আছে বেটোফেনের যেসব রচনা সচরাচর শোনা যায় না তার পরিবেশন, বিভিন্ন বেটোফেন অনুষ্ঠানের তাৎক্ষণিক উপস্থাপনা, বেটোফেন কনসার্টের রেকর্ডিং ও বিদেশের অনুষ্ঠান প্রচার। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রেট বৃটেন সমেত ১৮টি দেশের সুপরিচিত ঐকতান বাদকরা, গোষ্ঠী ও একক শিল্পীরা লুডভিগ ভ্যান বেটোফেনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবেন।

বেটোফেন বছরে জি ডি আর টেলিভিশনের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে আছে ভোল্ফগাঙ কেন্টেন নির্দেশিত ও কুর্ট থাগুর পরিচালিত নিজস্ব প্রয়োজনা 'ফিডেলিও'। তা ছাড়া আছে বার্লিন স্টেট অর্কেস্ট্রার সিম্ফনি।

জি ডি আর-এ রেকর্ড শিল্পে ব্যাপকতম আয়োজন করা হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বেটোফেনের সমগ্র রচনাবলী মোট ১২০টি লঙ প্লেয়িং রেকর্ডে পাওয়া সম্ভব হবে। ১৯৭০ সাল শেষ হবার আগেই প্রকাশিত হবে ৮০টি, আর ১৯৭৭ সালের মধ্যে আরো ৪০টি। বর্তমানে বেটোফেনের রেকর্ড বাজারে ছাড়া হয়েছে ৬,৫০,০০০টি।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৯২৫-২৬ সালে আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে এম-সি-সি দল ভারতে এলো। সেই দলে ছিলেন তখনকার দিনের অনেক নামকরা খেলোয়াড়রা। ব্যাটিং এবং বোলিং-এ সমান শক্তিশালী ছিল এম-সি-সি দলটি। সে দলে ছিলেন ওয়েট, কনসটবল, হিল, স্যান্ডহ্যাম, পারসনস, টেট, ব্রাউন, বয়েস প্রভৃতির মতো নামী খেলোয়াড়রা।

ক্রিকেট জগতে ভারত তখনো শিশু। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখনো ছাড়া-ছাড়াভাবে চলেছিল ক্রিকেট খেলার পালা। রাজা-রাজড়া আর ধনীর দুলালরাই তখন একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটের ধারক এবং বাহক থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই। সাধারণের মনে তখনো ক্রিকেট খেলা খুব একটা ছাপ ফেলতে পারে নি। ফলে, ভারতীয় ক্রিকেট তখনো ছিল একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত।

তবু আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে এম-সি-সি দলের ঐ সফরটিই ভারতীয় ক্রিকেটের মোড় ঘুরিয়ে দিল। মোট ৩৪টি খেলার মধ্যে এম-সি-সি জিতলো ১১টিতে আর বাকী ২৩টি ম্যাচ শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। অর্থাৎ এম-সি-সিকে হারিয়ে ভারতের কোন দলই সেবার পারে নি জয়লাভের স্বাদ গ্রহণ করতে।

কিন্তু ঐ সফরকে কেন্দ্র করেই ভারত খুঁজে পেল ভারতীয় ক্রিকেটের কয়েকজন দিকপাল খেলোয়াড়কে। এলেন সি কে নাইডু, খেললেন এম-সি-সি দলের বিরুদ্ধে, জয় করলেন সবার মন সি. কে'র সঙ্গে তাল দিয়েই যেন আবির্ভাব ঘটলো নাজির আর ওয়াজির আলীর।

কিন্তু সি কে নাইডু!

প্রতিভায় ভাস্বর নাইডু ভারতীয় ক্রিকেটের অনন্য পুরুষের রূপ ধরে এলেন বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারতকে শৈশবাবস্থা থেকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্যে। নাইডু আর তাঁর কয়েকজন সহ খেলোয়াড়ের জন্যে ক্রিকেট জগতে ভারত তার স্থান রাতারাতি পাকা করে ফেললো।

গিলিগানের এম-সি-সি দলের বিরুদ্ধে নাইডুর প্রথম খেলা কিন্তু নৈরাশ্যজনক। ১৯২৫ সালে ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর আজমীড়ে আরম্ভ হলো এম-সি-সি বনাম রাজপুতনা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া দলের খেলাটি। এই খেলায় এম-সি-সি জিতেছিল এক ইনিংস ও ১৬৭ রানে। প্রথম ইনিংসে নাইডু করেছিলেন পনের রান আর দ্বিতীয় ইনিংসে করতে পারেন নি কোন রানই।

সেই ব্যর্থতার পরেই কিন্তু এলো সাফল্যের বন্যা। সেই বন্যায় নাইডু শুধু নিজেই নন, ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন মাঠে উপস্থিত দর্শকদের, ভারতকে, এমন কি গিলিগানের এম-সি-সি দলকেও।

১৯২৫ সালের ৩০শে নভেম্বর আর ১লা ডিসেম্বর বোম্বাই-এর মাঠে সেই প্রথম মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন কোন ভারতীয় খেলোয়াড় 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গীতে। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে তাই এম-সি-সি ও হিন্দু দলের সেই খেলাটির কথা চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

বম্বের জিমখানা মাঠে সেদিন যেন আর মানুষ ধরে না। ভিড়ে ভিড়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক মাঠে উপস্থিত। ভারতের খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে কিন্তু তাঁরা মাঠে ভিড় করেন নি। তাঁরা ইংলণ্ডের নামকরা ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং আর বোলারদের বোলিং দেখতে ভিড় করেছিলেন মাঠে।

তাঁদের সে আশা অপূর্ণ থাকলো না। জি এফ আর্লে সেঞ্চুরী করে ১৩০ রান করলেন। এম ডব্লিউ টেট করলেন পঞ্চাশ আর স্যাণ্ডহ্যাম ৫২ রান করে রামজির বলে আউট হয়ে গেলেন। দর্শকরা খুশি। ভালো ব্যাটিং দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। এম-সি-সি তাঁদের চোখের সামনেই খুব তাড়াতাড়িই করেছে ৩৬৩ রান। এবার হিন্দুদের ব্যাটিং। ওরা আবার কি খেলবে! তবে হ্যাঁ মরিস টেট, বয়েস, এ্যাস্টিল প্রভৃতির বোলিং দেখা যাবে।

শুরু হলো হিন্দু দলের ব্যাটিং। প্রথমেই ঝটপট পড়ে গেল দুটো উইকেট। পারদেশী ১০ রান করে আর ন্যাভেল ১৪ রান করে আউট হয়ে গেলেন। এতে অবশ্য দর্শকরা অবাক হলেন না। এইটাই যেন ছিল তাঁদের কাছে একান্ত প্রত্যাশিত।

॥ আর্থার গিলিগান ॥

[illegible] মুহূর্তের মধ্যে যেন খেলার ধারা বদলে গেল।

এল পি জয়ের সঙ্গে যোগ দিতে মাঠে নামলেন হিন্দু দলের চার নম্বর ব্যাটসম্যান সি কে নাইডু। লম্বা-চওড়া দর্শনীয় চেহারা তাঁর। ব্যাট হাতে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে নাইডু যখন উইকেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন মনে হলো যেন সত্যিকারের একজন জাত ক্রিকেটার মাঠে নেমেছেন।

ভারতের দর্শকরা তখনো বোঝে নি, তখনো জানে না তারা, কি অভাবনীয় ক্রিকেটানন্দে এখনই ভরে উঠবে মাঠ। ভারতীয় দর্শকদের মন-প্রাণ আনন্দ-হাসি গানে নেচে-নেচে উঠবে।

আবার শুরু হলো খেলা। নাইডু তখন উদ্ধত, নাইডু তখন বেপরোয়া। নাইডুর হাতের ব্যাট তখন এরোপ্লেনের প্রপেলারের মতো বনবন করে ঘুরছে তো ঘুরছেই। কোথায় গেল ইংলণ্ডের দুর্ধর্ষ বোলাররা! কোথায় গেলেন মরিস টেট, কোথায় গেলেন এ্যাস্টিল কিম্বা মার্সার, ওয়েট অথবা বয়েস!

মরিস টেট তখন সে যুগের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার। তাঁর বিরুদ্ধে এমন বেপরোয়াভাবে খেলে নি কেউ। নাইডু তখন বোলারদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলোকে ফুটবলের মতো দেখছেন। ড্রাইভ করছেন, পুল করছেন, হুক করছেন, কাট করছেন কোন মারই বাদ যাচ্ছে না।

ইংলণ্ডের টেস্ট বোলাররা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন রনজীর দেশের আর একজনকে। তাঁদের বোলিং-এর বিষ-দাঁত ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। ইচ্ছেমত যেন বাউণ্ডারীতে পাঠাচ্ছেন বল, কখনো বা তাঁর মারের ছটায় বলগুলো শূন্য দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে মাঠের বাইরে।

মাঠে উপস্থিত পঞ্চাশ হাজার লোক যেন তখন পাগল হয়ে গেছে। তাদের চোখকে যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। ঐ তো আবার ওভার বাউণ্ডারী, আবার, আবার.........! গুনে গুনে যেন ওভার বাউণ্ডারী মারছিলেন নাইডু। আর বাউণ্ডারী, সেকথা না বলাই ভাল। কিন্তু একটা সময় এসে গেল যখন বাউণ্ডারী আর ওভার বাউণ্ডারীর সংখ্যা খুব কাছাকাছি।

মাত্র ১০০ মিনিট উইকেটে থাকার পর আউট হয়ে গেলেন সি কে নাইডু। তখন তাঁর রানসংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৩য়। এর মধ্যে তিনি মেরেছেন ১১টি ওভার বাউণ্ডারী আর ১০টি

[illegible] এক অজ্ঞাত যুবককে মুহূর্তের মধ্যে চিনে ফেললো সমস্ত ক্রিকেট বিশ্ব। অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি। সব চেয়ে বেশি ওভার বাউণ্ডারী মারার রেকর্ড করলেন সি কে নাইডু। ক্রিকেটের রেকর্ড বুকে যোগ হল আর একটি নতুন নাম—সি কে নাইডু।

নাইডুর সঙ্গে তাল দিয়ে এল পি জয় করলেন ৫৩, এস আর গোডাম্বে করলেন ৫৮ রান আর বোলার রামজি পিটিয়ে খেলে করলেন ৩২ রান।

এম-সি-সির ইনিংস থেকে মাত্র সাত
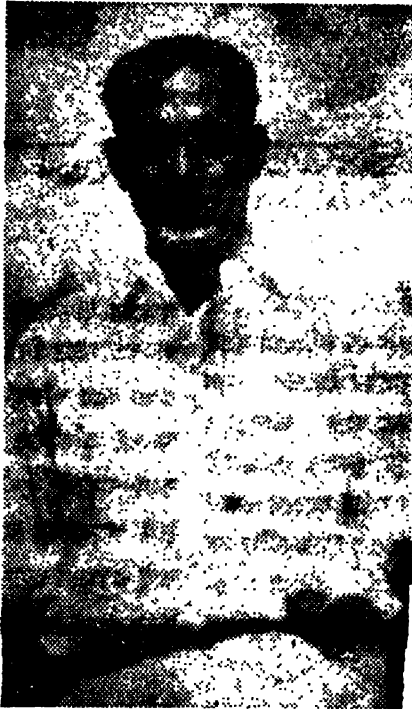
ভারতীয় ক্রিকেটের মহানায়ক
॥ সি কে নাইডু ॥

রানে পিছিয়ে থেকে হিন্দুরা করলো ৩৫৬ রান।

সেই শুরু হলো...........

শুরু হলো ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়। ভুল ভাঙলো ভারতের ব্যাটসম্যানদের। না, খেলা তো যায় ইংলণ্ডের নামকরা বোলারদের। তার জন্যে শুধু চাই সাহস। নাইডু নিজে খেলে দেখিয়ে দিলেন সাহস আর আত্মবিশ্বাসে ভরা খেলার মতো খেলা কাকে বলে। নাইডুর সেই আক্রমণী মনোভাব ভারতের অন্য ব্যাটসম্যানদের মন থেকে দূর করে দিল ভয়।

তাঁরা নতুন সাজে, নতুন রূপে বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়ালেন এম-সি সি তথা ইংলণ্ডের নামী বোলারদের বিরুদ্ধে। ভীরু, কাপুরুষের মতো 'হেরে গেছি' 'হেরে যাবো' ভাব নিয়ে আর মাঠের মধ্যে থাকলেন না মাথা নিচু করে। এম-সি-সি'র খেলোয়াড়দের সংগে সমানে সমান-ভাবে পা ফেলে তাঁরা মাথা উঁচু করে খেলে চললেন ক্রিকেট মাঠের পর মাঠে।

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সৃষ্টি হলো একটি নতুন অধ্যায়। শুরু হলো নতুন যুগ।

আর সেই যুগের নায়ক সি কে নাইডু ভারতীয় ক্রিকেটকে শৈশবাবস্থা থেকে এনে হাজির করলেন যৌবনের দ্বারদেশে। বড় তাড়াতাড়িই যেন ভারতীয় ক্রিকেট যৌবনে পদার্পণ করলেন। আর সদ্যপ্রাপ্ত সেই যৌবনের ধ্বজা ধরে ছুটে চললেন ভারতীয় ক্রিকেটের মহানায়ক সি কে নাইডু.........

[চলবে]

প্রশ্ন উত্তর

[২১৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বরুণ, চঞ্চল বাগচী, প্রদীপ ভট্টাচার্য ও নিতাই দেসরকার (বানারহাট বাজার, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একজন উইকেটরক্ষক, ছ'জন ব্যাটসম্যান, দু'জন ফাস্ট বোলার ও দু'জন স্পিনারকে নিয়ে একটা দল গঠন করুন। নামগুলো শুধু আগ্রহভরে দেখতে চাই।

উত্তর : উত্তরটা কিন্তু পুরোপুরি আমার নিজস্ব মতে :

উইকেটরক্ষক—গ্রাউট

ব্যাটসম্যান—ব্র্যাডম্যান, হ্যামণ্ড, হবস, হার্টন, সোবার্স ও ওরেল।

ফাস্ট বোলার—হল ও লিণ্ডওয়াল

স্পিন বোলার—ভিনু মানকাদ ও রিচি বেনো।

অসম্ভবও সম্ভব

অনেকের মতে যা ছিল একেবারেই অসম্ভব, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে ভারত ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় বাইশ বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ইয়োরোপ অঞ্চলের বি গ্রুপ বিজয়ী দলের সংগে শুধু খেলার যোগ্যতাই অর্জন করে নি—ভারতের টেনিস ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে একটি ঐতিহাসিক নজীর। মূল প্রতিযোগতায় খেলার যোগ্যতা ভারত এর আগে অনেকবার অর্জন করেছে, ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালেও উঠেছে ভারত—কিন্তু ভারতীয় টেনিস জগতের ইতিহাসে এর আগে ভারত আর কখনো অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারে নি। অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেনিস জগতে অপরাজেয় এবং পরম শক্তিশালী দল হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বহুকাল আগেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। কি উইম্বেলেডন, কি ডেভিস কাপ—সর্বত্রই অস্ট্রেলিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য। সেই অস্ট্রেলিয়া, সেই অপরাজেয় দল—এবার পরাজিত হলো ভারতের কাছে। তাই এবারের ফলাফল নিয়ে এতো হৈ চৈ, এতো আনন্দ-উৎসব। কারণ এবারকার এই খেলার ফলাফলটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষ্ণানের যুগে ভারত যা পারে নি—সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন এবার ভারতের প্রেমজিৎ আর জয়দীপ। কৃষ্ণান অবশ্য এবারকার ভারতীয় দলের অধিনায়ক, কিন্তু তিনি খেলেন নি। তাঁর উপস্থিতিই প্রেমজিৎ এবং জয়দীপের মনোবল অনেকাংশে বাড়াতে পেরেছিলো। ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়িয়ে তোলা, তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের ভাব আরো বেশি করে জাগিয়ে তোলার এবং আরো ভালো খেলার জন্যে উৎসাহিত করার দায়িত্ব যেমন অধিনায়কের, তেমনি এই কাজে সফল হওয়া একমাত্র যোগ্য অধিনায়কের পক্ষেই সম্ভব। সে দিক দিয়ে রমানাথন কৃষ্ণান এবার সব দিক দিয়েই দিয়েছেন সাফল্যের পরিচয়। আর সেই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রেমজিৎ এবং জয়দীপ জান লড়িয়ে খেলে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের নাজেহাল করে তুলে তাঁদের পরাজিত করেছেন। কখনো খুব সহজভাবে, আবার কখনো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর। তাই আজ আর বলতে বাধা নেই, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের এই জয়লাভ টেনিস জগতে ভারতের সুনাম যেমন আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করলো, তেমনি ভারতকেও আরো অনেকটা এগিয়ে দিল... —শান্তিপ্রিয়

ডেভিস কাপ

জয়ের সীমা ছাড়িয়ে জিতকে ভারতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছেন ভারতীয় টেনিসের সার্থক পুরুষ রামানাথন কৃষ্ণানের যোগ্য দুই উত্তরসূরী জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিৎ লাল।

ক'বছর বাদে ভারতীয় দলে আবার কৃষ্ণানের ফিরে আসায় এবার সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে, ভারত ভালো খেলবে। কারণ প্রেমজিৎ-জয়দীপ তো আছেনই—দরকার হলে কৃষ্ণানও ব্যাট হাতে নিয়ে নেমে পড়বেন কোর্টে।

এই আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় প্রত্যয়ের মন ভরিয়ে প্রেমজিৎ লাল প্রথম সিঙ্গলসে সম্মুখীন হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ খেলোয়াড় রে রাফেলের। কিন্তু প্রথম থেকেই জান লড়িয়ে খেলতে থাকেন প্রেমজিৎ। নিজের সার্ভিসে পয়েন্ট সংগ্রহ করে এবং রাফেলের সার্ভিস ভেঙে ভেঙে প্রেমজিৎ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

প্রেমজিতের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের সামনে র‍্যাফেল কোন সময়ই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি। প্রেমজিৎও সে সুযোগ তাঁকে দেন নি কোন সময়েই। তাই প্রথম খেলাতেই প্রেমজিৎ জেতায় ভারত ১—০ খেলায় এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় খেলার প্রতিটি মুহূর্তে আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকে দর্শকদের মন। সব সময় কি হয়, কি হয় ভাব। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জয়দীপ ও ক্রীলের সামনে তখন অভাবনীয় সংগ্রাম।

ক্রীলের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথমে খুব একটা সুবিধে করতে পারেন নি জয়দীপ। প্রথম সেটে হেরে গেলেন তিনি। তারপর শুরু হলো জয়-পরাজয়ের ঐতিহাসিক লড়াই। দু'জনেই তখন জান লড়িয়ে খেলছেন। প্রথম দিন শেষ হলো না খেলা। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের সকালেই জয়দীপ পর পর দু'টি সেট জেতায় পরাজিত হলেন ডিক ক্রীলে।

পর পর দু'টি সিঙ্গলসে জেতায় ভারত এগিয়ে গেল ২—০ খেলায়।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন বিকেলে ডাবলসের খেলায় ভারত হেরে গেল। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অস্ট্রেলিয়ান জুটি আলেকজান্ডার আর স্টোল হারিয়ে দিলেন ভারতের প্রেমজিৎ লাল ও জয়দীপ মুখার্জীকে। খেলার ফলাফল নেমে এলো ২—১-এ। বাকী তখন

কোন দল কেমন হলো

[কলকাতা তথা বাংলাদেশের খেলার রাজা ফুটবলের মরশুম এসে গেছে। বসে গেছে লীগ ফুটবলের আসর। মোট কুড়িটি দল এবার প্রথম বিভাগীয় লীগ ফুটবলের আসরে অংশ গ্রহণ করবে। লীগ তালিকার প্রথম পাঁচটি দল খেলবে সুপার লীগে। সিঙ্গল লীগ খেলার পয়েন্টও এবার যোগ করা হবে সুপার লীগের খেলার পয়েন্টের সংগে। তাই এ বছর প্রথম লীগের প্রতিটি খেলাই বড় দলগুলোর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।]

॥ সি. প্রসাদ ॥

গত বছরের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলে এ বছর দেখা যাবে নতুন এবং পুরোন খেলোয়াড়দের সমন্বয়। হাবিব, নঈম প্রভৃতির মতো কয়েকজন খেলোয়াড় দল ছেড়ে গেলেও মোহনবাগান দলের এর জন্যে খুব একটা ক্ষতি হয়েছে এ কথা বলা যায় না। দলের কোচ শ্রীঅমল দত্ত ও ফুটবল সম্পাদক শ্রীকরুণা ভট্টাচার্যেরও এই একই মত।

মোহনবাগান দলে যাঁরা নতুন এসেছেন তাঁদের মধ্যে ইস্টার্ন রেলের আর কে গাঙ্গুলী ও প্রবীর মজুমদার, ইস্টবেঙ্গলের সুভাষ ভৌমিক, এরিয়ান্সের এস পালচৌধুরী প্রমুখ। এঁদের সংগে আছেন বিহারের মহাবীর প্রসাদ।

এবারও মোহনবাগান দলের নেতৃত্ব করবেন চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ।

এবার যাঁরা মোহনবাগানের পক্ষে খেলবেন—

গোলে : বলাই দে ও এস গুহ-ঠাকুরতা ;

ব্যাকে : আর কে গাঙ্গুলী, কল্যাণ সাহা, সি প্রসাদ, এস পাল-চৌধুরী, এস সিংহ ও ভবানী রায় ;

হাফে : শঙ্কর সরকার, প্রিয়লাল মজুমদার, দিলীপ পাল ও এস মান্না ;

ফরোয়ার্ডে : মহাবীর প্রসাদ, সুভাষ ভৌমিক, সুকল্যাণ ঘোষ-দস্তিদার, দেবী দত্ত, লাওনেল, প্রণব গাঙ্গুলী ও প্রবীর মজুমদার।

ইস্টবেঙ্গল

গত বছরের লীগ ও শীল্ডের রানার্স ও রোভার্স কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলটি এবার যথেষ্ট শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছে। সুভাষ ভৌমিক, জন, সাদাতুল্লা, সারমাদ খাঁ প্রমুখের মতো খেলোয়াড়রা দলত্যাগ করলে দলের যতোটা ক্ষতি হয় তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়েছে হাবিব, নঈম, কানাই সরকার, শঙ্কর ব্যানার্জী, স্বপন সেনগুপ্ত প্রমুখের মতো খেলোয়াড়রা ক্লাবের পক্ষে যোগ দেওয়ায়। এ ছাড়া গোর্খা ব্রিগেডের শ্যাম থাপাকেও এ বছর ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে খেলতে দেখা যাবে।

মোটামুটিভাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শক্তি এবার সব দিক থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা সমর্থন করেছেন কোচ মহম্মদ হোসেন, ফুটবল সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীসুবীর ঘোষ।

[শেষাংশ ২৯৪৩ পৃষ্ঠার দ্বিঃ কঃ দ্রষ্টব্য]

॥ শান্ত মিত্র ॥

প্রশ্ন-উত্তর

মঙ্গলকান্তি চক্রবর্তী (পুরাতন মিশন রোড, করিমগঞ্জ, আসাম)

প্রশ্ন : ক্রিকেট অধিনায়ক হতে হলে কি কি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন?

উত্তর : দৃঢ়চেতা আত্মবিশ্বাসী অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন খেলোয়াড়রা যাঁরা মাঠে দল পরিচালনায় এবং মাঠের বাইরে খেলোয়াড়দের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, তাঁরাই অধিনায়ক হবার যোগ্য।

নির্মলকুমার ঘোষ (পারগোপাল-নগর, সিঙ্গুর)

প্রশ্ন : খেলোয়াড়দের মতো কোচরাও কি দল বদল করে থাকেন? শ্রীঅমল দত্ত কি এবারও মোহনবাগানে থাকবেন?

উত্তর : ক্ষেত্রবিশেষে। তবে অন্যভাবে। শ্রীঅমল দত্ত এবারও মোহনবাগানেই আছেন।

অমিয় সরকার (বি ১/৩৬, কল্যাণী, নদীয়া)

উত্তর : ঐ ঘটনাগুলো সাদা বা লাইন-টানা কাগজের এক পাতায় লিখে পাঠাবেন। রিপ্লাই কার্ড থাকলে উত্তর পাবেন।

মনোজকুমার সরকার (টেন্ডু চা বাগান, নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের বাংলা দেশের খেলোয়াড়রা বিশেষ করে ফুটবল খেলোয়াড়রা তাঁদের ক্রীড়ামান বেশিদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছেন না কেন?

উত্তর : আমার মনে হয় অসংযত, নিয়মিত অনুশীলন, ভবিষ্যৎ-চিন্তা আর প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবই এর জন্যে দায়ী।

প্রবীর ভট্টাচার্য (গোপাললাল ঠাকুর রোড, বরাহনগর)

প্রশ্ন : নাক টিকালো বলে কি বক্সিং লড়তে কোন অসুবিধে আছে?

উত্তর : কখনো এ অসুবিধের কথা শুনি নি তো। মনে তো হয় কোন অসুবিধে হবে না ঐ জন্যে।

চুম্বক

(১) "আজ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে কেবলমাত্র দুটি দল এক-দিনের মধ্যেই তাদের পুরো দু' ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়েছে।

১৮৯৪-৯৫ সালে ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট লড়াইয়ে ইংলন্ড দল শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। মাত্র একদিনের ভিতরেই ইংলন্ডের দু' ইনিংস শেষ হয়ে গেল যথাক্রমে ৬৫ ও ৭২ রানে।

১৯৫২-৫৩ সালে ভারত-ইংলন্ড টেস্ট সিরিজের ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে প্রতিপক্ষ ইংলন্ডের প্রথম ইনিংসের প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় দল মোটেই সুবিধে করতে পারল না। ইংলন্ডের ফাস্ট বোলারেরা মাত্র একদিনের মধ্যেই ভারতের দু' ইনিংস খতম করে দিলেন আর উভয় ইনিংসে ভারতের রান উঠল যথাক্রমে মাত্র ৫৮ ও ৮২।

* * *

(২) আজ পর্যন্ত স্বদেশের হয়ে একনাগাড়ে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন বা খেলছেন টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন খেলোয়াড়দের হয়ত বা অভাব নেই। কিন্তু ইংলন্ডের এফ. ই. উলী এ ব্যাপারে সকলকেই ছাড়িয়ে গেছেন। ১৯০৯ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এই খেলোয়াড়টি একবারও বাদ না পড়ে একনাগাড়ে ৫২টি টেস্ট ম্যাচ খেলে গেছেন তাঁর স্বদেশ ইংল্যান্ডের পক্ষে। এটি আজও একটি রেকর্ড।"

—শ্রীসোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর, গোলাবাড়ী, ২৪ পরগনা

কোন দল কেমন হলো

[২৯৪৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বাংলা দলের অধিনায়ক শান্ত মিত্র এবার ইস্টবেঙ্গল দলের নেতৃত্ব করবেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে যাঁদের খেলতে দেখা যাবে—

গোলে : থঙ্গরাজ ও কানাই সরকার;

ব্যাকে : সুধীর কর্মকার, আর দত্ত, সুনীল ভট্টাচার্য, নবীন ও শান্ত মিত্র;

হাফে : কালন গুহ, প্রশান্ত সিংহ, সমরেশ চৌধুরী ও কাজল মুখার্জী;

ফরোয়ার্ডে : স্বপন সেনগুপ্ত, হাবিব, অশোক চ্যাটার্জী, পরিমল দে, শঙ্কর ব্যানার্জী, কে বি শর্মা ও শ্যাম থাপা।

ডেভিস কাপ

[২৯৪৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

দুটি রিভার্স সিঙ্গলস খেলা। অবস্থা তখন ভারতের অনুকূলে। কারণ ঐ দুটি ফিরতি সিঙ্গলসের একটিতে জিতলেই ভারত পাবে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর সম্মান। পক্ষান্তরে অস্ট্রেলিয়াকে জয়লাভ করতে হলে রিভার্স সিঙ্গলসের দুটিতেই জিততে হবে।

কিন্তু রিভার্স সিঙ্গলসের প্রথম-টিতে স্ট্রেট সেটে ক্রীলেকে হারিয়ে দিলেন প্রেমজিৎ। আর সেই সঙ্গেই ভারত জিতে গেল ৩—১ খেলায়। দ্বিতীয় সিঙ্গলসটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন জয়দীপ মুখার্জী ও র‍্যাফেল। কিন্তু সময়াভাবে শেষ পর্যন্ত খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেল।

ফলে ভারত সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে টেনিস বিশ্বে বয়ে আনলো আলোড়ন।

একনজরে ফলাফল :

১ম সিঙ্গলস—প্রেমজিৎ লাল : রে র‍্যাফেল

(প্রেমজিৎ ৬—২, ৬—৮, ৬—৩, ৩—৬ ও ১৪—১২ সেটে জয়লাভ করেন)

২য় সিঙ্গলস—জয়দীপ মুখার্জী : ডিক ক্রীলে

(জয়দীপ ৩—৬, ৬—৮, ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—২ সেটে জয়লাভ করেন)

ডাবলস—এ্যালান স্টোন ও জন আলেকজান্ডার : প্রেমজিৎ ও জয়দীপ

(অস্ট্রেলিয়া ১৫—১৩, ৬—৪ ও ৬—৪ সেটে জেতে)

রিভার্স সিঙ্গলস—প্রেমজিৎ লাল : ডিক ক্রীলে

(প্রেমজিৎ ৮—৬, ৬—২ ও ৬—২ সেটে জেতেন)

২য় সিঙ্গলস—জয়দীপ : রে র‍্যাফেলস

খেলা শেষ পর্যন্ত শেষ হয় নি। অমীমাংসিত।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসকুমার গহেমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচিপত্র

ছোটদের মাঝে বড়দের ছাপ
ইউবিআই-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক পাশ বইটা তার একান্তই নিজস্ব—তার গর্বের ধন। কৈশোরে পা দিয়েই সে যে ব্যাঙ্কে টাকাপয়সা জমানোর সুযোগ পেয়েছে, এতে সে রীতিমত গর্বিত।
সত্যি কথা বলতে কি, সঞ্চয় জিনিষটা বড়দেরই কাজ। তবে ছেলেবেলা থেকে তার অভ্যাস তৈরী হওয়াটা নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার—তাতে আখেরে কাজও দেবে।
১৩ বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলেমেয়ে মাত্র ৫ টাকা দিয়ে ইউবিআই-তে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারে।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস:
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
কলিকাতা-১
UBI-370
পশ্চিমবঙ্গে ১০৫টিরও অধিক শাখা আছে

৭৪ বর্ষ : ৪৭শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ | Thursday, 21st May, 1970

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

এমন একদিন ছিল, যখন কলকাতা সরব হয়েছিল বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে। বন্ধুদের সংগে সদা হাস্যময় আলাপনে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের নৈকট্যে, গ্রামোফোন কোম্পানির অফিসে হারমোনিয়াম হাতে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে মাইক্রোফোনের সামনে—সর্বত্রই নজরুলের যৌবনদৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

সেই যুগটাও একটা বিশেষ যুগ। ইংরেজ সরকারের লালচক্ষু যেন ভারতবাসীদের ক্রমাগত শাসিয়ে চলেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবাসী সেদিন বুঝেছিলেন দেশের যে-কোনো রাজনৈতিক নেতার চেয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিপীড়ন ও হত্যার বিরুদ্ধে কতো বেশি সোচ্চার।

রবীন্দ্র-ভাবশিষ্য বিদ্রোহী কবি নজরুলের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বুঝেছিলেন এ-দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির যথার্থ পথ কোনখানে শুধু ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়লাভ করলেই যে গণমুক্তি হবে, নজরুল তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। তাই বজ্রকণ্ঠে যে বিদ্রোহ তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তার চরম কথা হচ্ছে এই যে,

"মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
 আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
 আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ
 ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
 আমি সেই দিন হব শান্ত।"

বস্তুত উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোলে আজো আকাশ-বাতাস মুখর এবং অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ আজো নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে। বহু দেশেই দেখা গেছে যে, বিদেশী শাসক চলে যেতে বাধ্য হবার পরও দেশের সাধারণ মানুষের ওপর শোষণের শেষ হয় নি।

তবে যে কথাটা আজ এ দেশের মানুষের পক্ষে সত্য হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে এই, কবি আজ নীরব হলেও, শত-সহস্র মানুষ সরব। অতীতে নিগৃহীত যাদের অন্তরের ভাষা অন্তরেই ক্রন্দনের মধ্যে চাপা পড়তো, কবির কবিতা থেকে তারা লাভ করেছে অমোঘ শক্তি। তাই তারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে—

"তুমি শুয়ে রবে তে-তলার 'পরে,
 আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব,
 সে ভরসা আজ মিছে।"

চারিদিকে আন্দোলনের যে ধ্বনি, সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য যে উচ্চাশা, তার প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামই।

তবু একথা বলতে দ্বিধা নেই, স্বাধীনতালাভের পর কবির অসুস্থতাবশত দুই দেশের সরকার কবির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন কবির ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়ে দিয়ে। ক্রমশ 'নির্বাক' কবিকেই জনসাধারণের কাছে পেশ করা হয়েছিল এবং বেদনার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, কবির কবিতা ও অন্যান্য রচনার কি গতি হোল কিম্বা জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছাচ্ছে কি-না সে ব্যাপারে স্বদেশী সরকারের কোনো আগ্রহ ছিল না। ঐ অবস্থা চলতে থাকলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটতে পারতো যে, কবি সশরীরে নির্বাক-কণ্ঠে বেঁচে থাকলেও বর্তমানে তাঁর জীবন্ত অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এ-কালের তরুণদের মনে প্রশ্ন জাগত।

কিন্তু সেই দুর্ভাবনার হাত থেকে সেদিন রক্ষা করেছিলেন বাংলা দেশের একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান। নজরুলের গান ও কবিতা আজ আবার তাই ঘরে ঘরে। এবারই জ্যৈষ্ঠ কবির জন্মদিন থেকে সুরু করে মাসাধিককাল দুই বাংলার রাজপথে, অলিতে-গলিতে, কলে-কারখানায়, মাঠে-প্রান্তরে পঠিত হয় কবির কবিতা। তখনই মনে হয়, কবি যেন চিত্ত থেকে চিত্তে আজ আরো বেশি বিদ্রোহীভাবে সবাক ও প্রাণোজ্জ্বল।

জনসাধারণ নতুন করে কবিকে লাভ করেছেন। পূর্ববঙ্গে কবির সমগ্র রচনা সুলভে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার কবির গ্রন্থ আগামী ২৫শে মে '৭০-এর মধ্যে প্রকাশের সংকল্প নিলেও আজো পর্যন্ত নাকি অর্থাভাবে সে কাজে হাত দেওয়া হয় নি। চমৎকার ব্যবস্থা! রাজনীতি মানুষের কল্যাণের বদলে বোধহয় মানুষকে গ্রাস করতে চলেছে। সেই অবস্থায় কবির সমগ্র রচনাবলী যদি একদা সরকারী উদরে হজম হয়ে যায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হবে? কারণ, জন-জাগরণের মধ্যে নীরব কবি আজ সরব।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

অঙ্কের হিসেব বুঝি। দুই আর দুইয়ে মিলে চার হয়। বুঝি রুল অফ থ্রি, ত্রৈরাশিক, য়ুনিটারি মেথড, সাঙ্কেতিক নিয়ম। বীজগণিতের ফর্মুলাও বুঝি। এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকোয়াল টু এ-স্কোয়ার প্লাস বি-স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ বি। তার আরো সব ফর্মুলার গুরুত্বও উপলব্ধি না করে পারিনে। বুঝতে পারি জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধগুলোও। ইউক্লিডের থিয়োরি, স্কেয়ারের সিদ্ধান্ত সবই। ধরুন, আর্যভট্টকেও মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে মানুষের ব্যবহারকে কি গাণিতিক হিসেবে পরিমাপ করা যায়? অঙ্ক কষে কি বলা চলে, কোন্ রাষ্ট্রনায়ক কী পরিস্থিতিতে কী বিবৃতি দেবেন? কিম্বা কোন্ রাষ্ট্রদূত কোন্ অবস্থায় কী মনোভাব পোষণ করবেন?

এটা আজ অবশ্য একটা সর্বজন-স্বীকৃত সত্য যে, রাজনীতি শুধু দর্শন নয়, শুধু ইতিহাস নয়, রাজনীতি একটা পরীক্ষিত বিজ্ঞানও। পণ্ডিত, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞরা যে রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার করে গিয়েছেন, রাষ্ট্রনায়করা বা রাজনৈতিক নেতারা তাই মেনে নিয়ে নীতি নির্দেশ করেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সেই তত্ত্বের ক্রমবিকাশ ঘটেছে সত্য। সরকারের যে বিভিন্ন রূপ ও চরিত্রের কথা গ্রীক দার্শনিকরা বহু শতাব্দী আগে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, বিভিন্ন দেশের ঘটনার লেবরেটরীতে যেন তাদের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে এবং নির্ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে। রাজতন্ত্র, অ্যারিস্টক্রেসি, অলিগার্কি, ডেমোক্রেসি, ডেসপটিজম, ডিকটেটরশিপের ধারা তো আজো বয়ে চলেছে!

কিম্বা সমাজের সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আদিম সাম্যবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ফিউডালিজম, ক্যাপিটালিজম (ইম্পিরিয়ালিজম - কলোনিয়ালিজম সহ), সোস্যালিজম, কম্যুনিজম, ফ্যাসিজম ইত্যাদি ভাবধারা ও রাজনৈতিক আদর্শ।

মেকিয়াভেলি 'প্রিন্স' লিখে সারা ইয়োরোপে একদিন প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এখানে তিনি 'প্রিন্স' বা রাজনৈতিক নেতাদের আচরণবিধি কী হবে তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক কথায় মেকিয়াভেলিজম-এর অর্থ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ। মেকিয়াভেলির মতে, রাজনীতিতে সততা, ন্যায়নীতি বলে কোনো বস্তু নেই। রাষ্ট্রনায়ক তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৎ, অসৎ, শঠতা, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা—যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। মেকিয়াভেলিকে নিদারুণ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে সত্য কথা, কিন্তু তবুও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হয় প্রকাশ্যে, নয়তো গোপনে বহু রাষ্ট্রনায়কই মেকিয়াভেলির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে গিয়েছেন।

ডঃ ইন্দ্রপ্রকাশ সিং

ভারতীয় কূটনীতিবিদ ইন্দ্রপ্রকাশ সিং যেন সেই সব রাজনৈতিক তত্ত্ব ও আদর্শের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এক পুস্তিকা লিখেছেনঃ 'ডিপ্লোমেট্রি'। শব্দটির কোনো আভিধানিক অর্থ যে নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। পুস্তিকাটিতে ডঃ সিং জোরালো যুক্তি দিয়ে এই বক্তব্য রেখেছেন যে, রাষ্ট্রের কূটনৈতিক আচরণ জ্যামিতিক রেখা এবং কোণের সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কূটনৈতিক আচরণের বিভিন্ন দিক সরল ও বক্রের মাধ্যমে মূল্যায়নের একমাত্র পন্থা হচ্ছে গাণিতিক পদ্ধতি।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক দর্শনের ছাত্র ইন্দ্রপ্রকাশ। এখান থেকেই তিনি পি-এইচ-ডি লাভ করেন। ডঃ সিং গত ১৫ বছর ধরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সেই সুবাদে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁকে কার্যভার নিয়ে যেতে হয়েছে। বিলাতের বিশিষ্ট সংস্থা অ্যারিস্টোটেলিয়ান সোসাইটির সদস্য ৩৯ বছর বয়স্ক ডঃ ইন্দ্রপ্রকাশ সিং কূটনীতিকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তারই নীট ফল দাঁড়িয়েছে ডিপ্লোমেট্রি। এখানে তিনি বলেছেন যে, কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য হল বন্ধু অর্জন ও শত্রুকে নিরপেক্ষ, নিস্তেজ করে দেওয়া। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে একটি রাষ্ট্রকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। ডঃ সিং মনে করেন, কূটনীতিকরা কোন্ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কী ব্যবস্থা নেবেন, একটা গাণিতিক ছক এঁকে তা স্থির করা যায়। ডিপ্লোমেট্রি কথাটা যেমন অভিনব, তেমনি তিনি 'ডিপ্লোপিয়া' 'ডিপ্লোমেট্রিক্স' ইত্যাদি নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে রাজনৈতিক পরিভাষা গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ডঃ সিং-এর নীতিনির্দেশিকা ব্যবহারিক জীবনে কোন্ কূটনীতিক কতখানি পালন করবেন, বলা শক্ত। তবে তিনি হলেন পাকিস্তানপন্থী; অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লব্ধ জ্ঞানই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্দেশিকা পালন করা কূটনীতিকদের পক্ষে খুব সহজ হবে না, বাস্তবায়িত করা যাবে কি-না তাও পরীক্ষাসাপেক্ষ। তবে ডঃ ইন্দ্রপ্রকাশ সিং বিরচিত 'ডিপ্লোমেট্রি' শীঘ্রই সর্বাধিক প্রচারিত পুস্তিকার মর্যাদা অর্জন করবে, সন্দেহ নাই।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(১৩)

১৯৩৭-এর মাঝামাঝি সময়ে জিন্না নিজের ও লীগের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্থিরবিশ্বাস ছিলেন না বলে স্বয়ং গান্ধীর কাছে ১৯৩৭-এর ২রা মে তারিখে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের জন্য পত্র লিখেছিলেন। জহরলালের দর্পিত আচরণ জিন্নাকে অতঃপর কতখানি খুঁচিয়ে মরিয়া করে তুলেছিল দেখেছি। জিন্নার বেপরোয়া সাম্প্রদায়িকতা এবং তার যথেষ্ট সাফল্য কংগ্রেসকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। কলকাতায় এক ভাষণে জিন্না সরাসরি নেহরুকে আক্রমণ ও চ্যালেঞ্জ করেন। নেহরু তার উত্তরে এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসার অভিপ্রায়ে জিন্নাকে ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ তারিখে চিঠি লেখেন। এই সূত্রে নেহরু ও জিন্নার মধ্যে পত্রালাপের সূচনা হয়, যার শেষ ১৬ই এপ্রিল তারিখে লেখা জহরলালের চিঠিতে।১ চিঠিগুলি বিশ্লেষণ করলে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে—প্রথম, নেহরু ও জিন্না উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল, দ্বিতীয়, জিন্না সত্যই কোনো মীমাংসা চাইছিলেন কি-না সন্দেহ; তিনি রাজনৈতিক নানা কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কার্যত কালহরণ করতে এবং মধ্যবর্তীকালে মুসলিম লীগের জন্য যতখানি সম্ভব সুযোগ-সুবিধা ও স্বীকৃতি আদায় করতে সচেষ্ট ছিলেন। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার কোনো রীতিই মানতে জিন্না কার্যত অস্বীকার করেছিলেন, বারবার অনুরুদ্ধ হয়েও বিবাদের বিষয়গুলি তিনি একটুও পরিষ্কার করতে চান নি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ব আদায় করে নিয়ে তাকে পরবর্তীকালে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা। অপর পক্ষে নেহরু জিন্নার মত কৌশলী বিশুষ্ক রাজনীতিকের সঙ্গে শীতল বুদ্ধিতে আলোচনা চালাবার একেবারেই যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। কার সঙ্গে কী প্রসঙ্গে তিনি কথা বলছেন তা ভুলে যাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল, তিনি যে কতখানি বিশ্বভানুক তা মাঝে-মধ্যে না জানিয়ে পারতেন না এবং সেই ভাবালুতাকে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্ধ করতে জিন্না একটুও দ্বিধা করেন নি।২

১ চিঠিগুলি প্রকাশিত হয় অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গে অমৃতবাজারে ১২ই জুন, ১৯৩৮-এ।

২ নেহরু এক অত্যন্ত দুর্বল মুহূর্তে জিন্নার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে ইকবালের সার্টিফিকেট হাজির করেছিলেন। পাকিস্তানের দ্রষ্টা ও ঋষি মহম্মদ ইকবাল মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নেহরুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নানা বিষয়ে উভয়ের কথাবার্তা হয়। মতপার্থক্য সত্ত্বেও নেহরু অনুভব করেন, উভয়ের মধ্যে মতৈক্যের ক্ষেত্রও যথেষ্ট এবং ইকবালের সঙ্গে মানিয়ে-গণিয়ে চলা খুবই সম্ভব। ইকবাল স্মৃতিচারণার আবেশে ছিলেন, ইতস্তত নানা প্রসঙ্গ আসছিল, ইকবালই বেশি বলছিলেন, নেহরু শুনছিলেন। "আমি তাঁর এবং তাঁর কাব্যের অনুরাগী"--নেহরু তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে লিখেছেন—"আমি খুবই খুশী হলাম এই দেখে যে, তিনি আমাকে পছন্দ করেন এবং আমার সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা।" নেহরু সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন জিন্নার তুলনায় তাঁকে বড় বলায়ঃ "চলে আসার একটু আগে তিনি আমাকে বললেন, তুমি এবং জিন্না একই ক্ষেত্রে কি করে মিলবে বলো? সে হল রাজনৈতিক আর তুমি দেশপ্রেমিক।" কথাগুলি লিখে ফেলে নেহরুর নিশ্চয় একটু লজ্জা হয়েছিল। তিনি ভাবের কথায় ব্যাপারটাকে অতঃপর যথাসম্ভব বিগলিত করবার চেষ্টা করলেনঃ "তথাপি আমি আশা করি মিঃ জিন্না এবং আমার মধ্যে সমরূপতার ক্ষেত্র কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। আজ আমাকে যে দেশপ্রেমিক বলা হয়েছে—একালে এটি বিশেষ গুণ বলে গৃহীত হচ্ছে না, বিশেষত তার সংকুচিত অর্থে। সত্য যে, আমি ভারতের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, কিন্তু আমি দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করেছি, এমন কি আমাদের নিজেদের সমস্যা অনুধাবনের ও সমাধানের জন্যও স্বদেশের প্রতি অনুরক্তির অপেক্ষা অধিক কিছু প্রয়োজন—বিশ্বসমস্যার ব্যাপারে তো কথাই নেই।" কিন্তু এত বলেও নেহরু মনের আহ্লাদ চাপতে পারেন নিঃ "কিন্তু ইকবাল আমাকে রাজনৈতিক না বলে অতি অবশ্যই ঠিক কথা বলেছিলেন, যদিও এই রাজনীতিই আমাকে পাকড়ে ধরে তার শিকার করে ফেলেছে।"

৩রা মার্চের (১৯৩৮) চিঠিতে জিন্না শুরুতেই নেহরুকে আক্রমণ করে বলেছিলেন, অযথা অপরের উপর দোষারোপ করার বদ অভ্যাস নেহরুর কখনো যাবে না। নেহরুর আগেকার চিঠির বাঁকা অর্থ করে জিন্না বললেন—নেহরু চান, জিন্না নেহরুর মহামহিম ন্যায়বুদ্ধির সামনে বিতর্ক-বিষয়গুলি সাবনয়ে লিখে নিবেদন করবেন এবং তারপরে সেই নিয়ে চিঠি লেখালেখি চলবে। এ ধরনের ব্যাপার আদালতে চলে—জিন্না বললেন, কিন্তু জাতীয় ব্যাপারাদির মীমাংসা এভাবে হয় না। "বিরোধের মূলগত ব্যাপারগুলি কী তা আমি জানি না"—নেহরুর এই শিশু-সরলতার কর্ণমর্দন নিষ্ঠুরভাবে ক'রে জিন্না বললেন, এহেন অজ্ঞান স্তম্ভিত করে দেয়। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত সময়ে দেশের সবচেয়ে বড় বড় মাথাগুলি এই নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে, অথচ নেহরু তার স্বরূপ জানেন না।৩

১২ই এপ্রিলের চিঠিতে নেহরু সম্বন্ধে জিন্নার বিরক্তি অতীব ... কটূক্তিতে প্রকাশিত হল। নেহরুর চিঠি তাঁকে বেদনা দিয়েছে—জিন্না বললেন। নেহরু বিশ্ব-সমস্যায় এত কাতর যে, জিন্নার চিঠির ঠিক অর্থ করতেও তিনি অসমর্থ—নেহরুর এইসব কথাকে জিন্না অসম্মান-সূচক বলে মনে করলেন। নেহরুর ভাষায় রয়েছে ঔদ্ধত্য এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব; তাঁর ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হয় কংগ্রেস বুঝি স্বয়ং-সম্রাট, মুসলিম লীগের উপরে সে করুণাবর্ষণ করতে চায়; নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বাস্তব-বিরোধী, অন্যের কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সুবিধামত তিনি অর্থ করেন—অভিযোগের পর অভিযোগ করে গেলেন জিন্না।৪ কংগ্রেসের মেজকর্তা হয়েও নেহরু কঠোর আত্ম-শাসন করে বলেছিলেন, এখন তো আমি কংগ্রেস-সভাপতি নই, সুতরাং পূর্বের মত কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার আমার নেই—জিন্না সেই কথাটিকে তুলে নিয়ে আগেই (১৭ই মার্চ) লিখেছিলেন, এক্ষেত্রে কংগ্রেসকে লীগের সঙ্গে

৩ ৩রা মার্চ (১৯৩৮) জিন্না নেহরুকে লিখেছিলেন:

"I regret to find the same spirit running through of making insinuations and innuendoes and rasing all sorts of matters of trifling character which are not germane to our present subject with which you started, namely, how to find basis of approach to the most vital and prominent question of Hindu-Muslim unity. You wind up your letter by insisting upon the course that I should formulate the points in dispute and submit to you for your consideration and then carry on correspondence with you. This method, I have already stated in my considered opinion is undesirable and inappropriate. The method you insist upon may be appropriate between two litigants and that is followed by solicitors on behalf of their clients, but nation issues cannot be settled like that.

When you say 'that I am afraid I must confess that I do not know what fundamental point in dispute are', I am only amazed at your ignorance. This matter has been tackled since 1925 right upto 1935, by the most important leaders in the country and so far no solution has been found. I would beg of you study it and do not take up a self-complacent attitude. and if you are earnest, I don't think you would find much difficulty in realising what the main points of dispute are, because they have been constantly mentioned both in the Press and public platform even very recently." (অমৃতবাজার, ১২ই জুন, ১৯৩৮)

৪ "As to the rest of your letter, it has been to me a most painful reading. It seems to me that you cannot even accurately interpret my letter, as you very honestly say that your mind is obsessed with the international situation and the sense of impending catastrophe that hangs over the world, so you are thinking in terms entirely diverse from the realities which face us in India. I can only express my regret at your turning and twisting what I wrote to you and putting entirely a wrong complexion upon the position I have placed before you at your request....

"Your tone and language again display the same arrogance and militant spirit, as if the Congress is the Sovereign Power and, as an indication, you extend your patronage by saying that 'obviously the Muslim League is an important communal organisation and we deal with it as such as we have to deal with all organisations and individuals that come within our ken'." (অমৃতবাজার, ১২ই জুন, ১৯৩৮)

সরকারীভাবে আলাপ-আলোচনা করতে বললেন; আমিও ব্যাপারটিকে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভায় পেশ করব।

জিন্নার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আলোচনার পিছনে ছিল এই ব্যাপারটি—জিন্না কংগ্রেসের সরকারী প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন, আর কংগ্রেসের সরকারী প্রতিনিধি অর্থাৎ সভাপতি তখন সুভাষচন্দ্র। গান্ধীর সঙ্গেও জিন্নার আদানপ্রদান চলছিল। ১৯৩৭ সালের ১ই অক্টোবর জিন্নাকে গান্ধী যে চিঠি লেখেন, তার মধ্যে জিন্নার লখনৌ বক্তৃতা সম্বন্ধে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করা হয়েছিল। জিন্না লখনৌয়ে বলেছিলেন, "সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিজের চেহারা পরিষ্কার খুলে ধরে দেখিয়েছে যে, হিন্দুস্থান হিন্দুর জনাই।" শ্রোতাদের সতর্ক করে বলেছিলেন, "বর্তমান কংগ্রেস নীতির পরিণতি শ্রেণীগত তিক্ততায় এবং সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে।" এই প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণায় গান্ধী বেদনা প্রকাশ করে চিঠি লিখলে জিন্না উত্তরে ৫ই নভেম্বর লেখেন, ব্যাপারটাকে 'যুদ্ধ ঘোষণা' মনে করায় তিনি দুঃখিত; তিনি যদি কিছু করে থাকেন 'বিশুদ্ধ আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই' করেছেন।৫ "দয়া করে ওটি আবার পড়ুন এবং ওর অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করুন"—জিন্না অনুরোধ জানিয়েছিলেন। "স্পষ্টই মনে হয় গত ১২ মাসের ঘটনাধারা আপনি অনুসরণ করছেন না"—জিন্না যোগ করে দিয়েছিলেন।৬

তিন মাস পরে গান্ধী ১৯৩৮-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী লিখলেন, "মনে হচ্ছে আপনি যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারটি অস্বীকার করতে চান। কিন্তু আপনার পরবর্তী ঘোষণা-সমূহ প্রথম ধারণাকেই জোরদার করে তুলেছে।" এই চিঠিতে গান্ধী তাঁর সমস্ত হৃদয়কে উন্মাটিত করে জিন্নার হৃদয়ের কাছে আবেদন জানালেন:

"আপনার বক্তৃতাগুলিতে সেই পুরাতন জাতীয়তা-বাদীকে খুঁজে পাচ্ছি না। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বেচ্ছা-নির্বাসন থেকে যখন আমি ১৯১৫ সালে দেশে ফিরে এসেছিলাম, তখন সকলেই নিতান্ত নিষ্ঠাবান জাতীয়তা-বাদীদের অন্যতম এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভরসাস্থলরূপে আপনার কথা বলেছিল। আপনি কি সেই একই জিন্না? যদি আপনি বলেন আপনি তাই আছেন, তাহলে আপনার বক্তৃতাগুলি সত্ত্বেও আপনার কথাকে মেনে নেব।"৭

১৫ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে এই কথার উত্তরে জিন্না যা লিখেছিলেন, তা অন্য দিক দিয়ে না হোক কৌশলী বাগ্-বয়ানে অনবদ্য। "আপনি বলছেন, আমার বক্তৃতায় আপনি সেই পুরনো জাতীয়তাবাদীকে আর খুঁজে পাচ্ছেন না"—জিন্না লিখেছিলেন—"একথা আপনার পক্ষে বলা সঙ্গত হয়েছে বলে আপনি কি মনে করেন? আপনার সম্বন্ধে লোকে ১৯১৫ সালে কী বলত এবং আজকে কী বলে বা ভাবে, সেকথা আমি উত্থাপন করতে চাই না, তবে জাতীয়তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং এখনকার দিনে ব্যাপারটিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা খুবই কঠিন। কিন্তু আমি এই তর্কের টানা-হেঁচড়া আর করতে চাই না।"

জিন্না লিখিত ব্যাপারের মধ্যে কিছুতেই ধরা দিতে চাইলেন না। চতুর রাজনৈতিক হিসাবে তিনি পরিস্থিতির নিত্যপরিবর্তনশীল রূপের কথা বুঝেছিলেন। বিতর্কের বিষয়কে লিখিত আকারে উপস্থিত করলে যদি তা অবাস্তব অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে বিরোধী পক্ষ হাতে অস্ত্র পেয়ে যায়, কিংবা পরবর্তীকালে অধিকতর সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নতুন দাবি জানাতে চক্ষুলজ্জা ঘটে। তা ছাড়া নিজে কতখানি চাই বলে নিজে অপরে কতখানি দিতে পারে জানাও হয় না। জিন্না তাই বারে বারে সাক্ষাৎ আলোচনার দাবি জানাতে লাগলেন। সাক্ষাৎ আলোচনায় লাভ বই তাঁর ক্ষতি নেই। এই পর্যায়ে আলোচনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রেই জিন্নার অধিক লাভ। ব্যর্থতার দায় তিনি সহজেই অন্য পক্ষের

৫ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮-এর চিঠিতে জিন্না গান্ধীকে পুনরায় একই কথা লিখেছিলেন:

"With regard to your opinion that my speech at the Lucknow sessions and my later pronouncements, which you are pleased to call a declaration of war, I can only repeat that it is in self-defence. Evidently you are not acquainted with what is going-on in the Congress Press. The amount of vilification, misrepresentation and false-hood that is daily spread about me—other wise I am sure, you would not blame me."

৬ "On November 5, Jinnah answered Gandhi's letter of protest and 'anguish' over the Lucknow speech. He wrote that he was 'sorry' if Gandhi considered he had made 'a declaration of war', and pleaded that it was "purely in self-defence.' He asked, 'kindly read it again and try to understand it'; and added, 'Evidently you have not been following the course of events of the last twelve months." (বলিথো)

৭ গান্ধী ৩।২।৩৮ তারিখে জিন্নাকে লেখেন:

"In your speeches I miss the old nationalist. When in 1915 I returned from the self-imposed exile in South Africa, everybody spoke of you as one of the staunchest of nationalists and the hope of both Hindus and Mussalmans. Are you still the same Mr. Jinnah? If you say you are, inspite of your speeches, I will accept your word."

বুকের দুয়ার খুলে দিলে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(কাজী নজরুল ইসলাম-কে নিবেদিত)

বুকের দুয়ার খুলে দিলে এমনই হয়,
গভীর রাতে
আততায়ীর পায়ের শব্দ বাতাস ঢাকে...

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত যখন ঝরতে থাকে
এমনই হয়.
মুখগুলি সব পাথর,
যারা
বুকের দুয়ার খুলে রাখতে ব'লেছিল।

কোথায় গেল দিনগুলি,
সেই
দারুণ যৌবনের জ্বালা রক্তে নিয়ে রাস্তা হাঁটা
সমস্ত দিন, সমস্ত রাত?

হায়রে, জন্মভূমির ললাট!
চোখের সামনে দেশবন্ধুর চিতা জ্বলছে...
আবার গান্ধী ফিরে এলেন,
ফুঁ-দিয়ে তিনি নিভিয়ে দিলো.
তোমার, আমার, লক্ষ বুকের আগুন, যারা দুয়ার খুলে
রেখেছিলাম।

ছিলেন যাঁরা পিতার সমান, সবাই গেলেন অন্ধকারে...
বুকে যখন বিঁধলো ছুরি, বন্ধুরা সব পাথর।

উপর চাপাতে পারবেন। নিজ সম্প্রদায়ের কাছে দেখাতে পারবেন, তিনি তো প্রস্তুত ছিলেন, সংখ্যাগুরু পক্ষই গররাজি। তার দ্বারা তিনি নিজের নেতৃত্বকে দৃঢ়ভিত্তি দান করতে পারবেন। তা ছাড়া তিনি কংগ্রেসের কাছ থেকে যা আদায় করতে চাইছিলেন—লিখিতভাবে না হলেও কার্যত তাই পেয়ে যাচ্ছিলেন এইসব আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। জিন্নার দাবি ছিল কংগ্রেস স্বীকার করে নিক মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান (এবং বলাই বাহুল্য লীগের একমাত্র নেতা জিন্না)। জিন্না জানতেন, কংগ্রেস তা মুখে কখনো স্বীকার করতে পারবে না, কিন্তু আসলে কি সেই জিনিসটাই কংগ্রেস স্বীকার করে নেয় নি বারবার আলোচনার জন্য জিন্নাকে আহ্বান করে? এইসব আলোচনার বিজ্ঞাপনে জিন্নার মুখ বড় আকারে ছাপা হচ্ছিল—জিন্নার প্রয়োজন সিদ্ধি হয়ে যাচ্ছিল তার দ্বারা।

২৪শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে গান্ধী জানালেন, জিন্নার ইচ্ছানুরূপ কাজ হবে। তিনি যদি জহরলালের সঙ্গে কথা বলতে চান, কিংবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে, কিংবা স্বয়ং গান্ধীর সঙ্গে—যা চান তাই হবে।৮ ৩রা মার্চ উত্তরে জিন্না লিখলেন, "অবশ্যই আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আমি আনন্দিত হব; আবার আপনার অভিপ্রায়-মত পণ্ডিত জহরলাল বা মিঃ বসুর সঙ্গে সাক্ষাতেও একই আনন্দ পাব।"

সুতরাং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জিন্নার আলোচনা অপরিহার্য হয়ে উঠল। গান্ধী বা জহরলাল জিন্নার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন—রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতারাও—এবার আর কংগ্রেস-সভাপতি বামপন্থী নেতা সুভাষচন্দ্রকে সরিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। কে জানে, জিন্নাও হয়ত এই তরুণ শক্তিটিকে নাড়াচাড়া করে দেখতে চাইছিলেন।

[ক্রমশ]

৮ ২৪শে ফেব্রুয়ারী গান্ধী জিন্নাকে লেখেন:
"I have read your letter to Jawaharlal also. I observe that both the letters invite not written replies but a personal discussion. I do not known whether it will take place in the first instance between you and Jawahar, or now that Subhas Bose succeeds him, between you and the later. If you desire that before this there should be a talk between you and me, I would be delighted to see you."
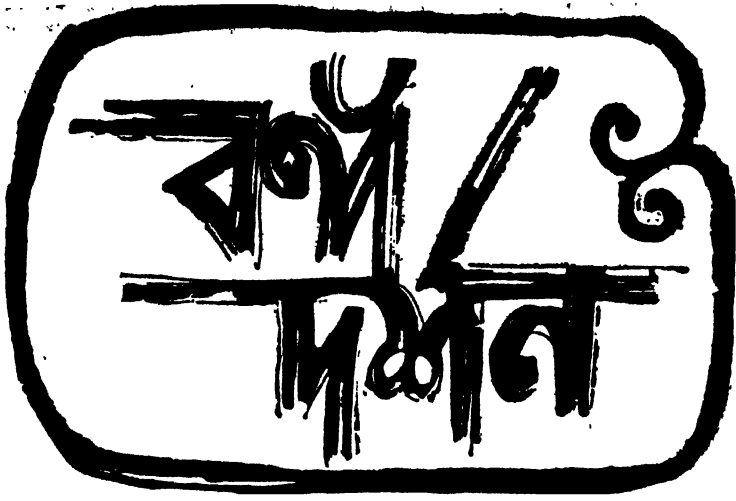
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব শ্রী এল. পি. সিং কলকাতায় এসেছিলেন সম্প্রতি, যদিও তাঁর ঝুলিতে পশ্চিমবঙ্গের রোগ সারানোর মত এমন কিছু দাওয়াই ছিল না, যা দিয়ে সত্যকারের কাজ হয়। যে দাওয়াই-এর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রোগী বাঁচবে এ-হেন ভরসা নেই। নকশালপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ কিভাবে দমন করা যায় তা নিয়ে তিনি রাজ্যপাল ও তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পুরনো কথাই বলেছেন—পশ্চিমবঙ্গে পি· ডি· অ্যাক্ট পুনরায় চালু করা হবে, এবং সি· আর· পি'র সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। চ্যবন সাহেব যে বলেছিলেন নকশাল-সমস্যা শুধু আইন-শৃংখলার সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, রাজনীতিগতভাবেও তাদের মোকাবিলা করা হবে, এখন দেখা যাচ্ছে সেগুলি নিছক কথার কথা, না বললে চলে না বলেই বলা। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট সম্বল পি· ডি· অ্যাক্ট ও সি· আর. পি। কিন্তু তাতে যে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না সে কথা হলফ করেই বলা যায়। গত সংখ্যায় যা লিখেছিলাম, নকশালরা দলে দলে পি· ডি· অ্যাক্টের জালে মাছের মত ধরা পড়বে এ কথা কল্পনা করাও বাতুলতা, বরং আশংকা করা যায় যে, এর ফলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থকদেরই কপালে দুঃখ আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলিও এই রকম আশংকা করছে। পশ্চিমবঙ্গে সি· আর· পি'র কার্যকলাপও মোটে সন্তোষজনক নয় এবং সত্য বলতে কি পাল পাল সি· আর· পি (যাদের রাখতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়) রাখার সার্থকতা কি সেটাও বুঝে ওঠা দায়। সাধারণ আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ হয়েছে, খুন-জখম প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে, সি· আর· পি দিয়ে এ সমস্যা সমাধান হবার কোন উপায় নেই এবং তা করাও চলে না। নকশাল-দমনই যদি সি· আর· পি'র উদ্দেশ্য হয় সেক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এ ছাড়া এখানে সি· আর· পি'র আচরণও রীতিমত ক্ষোভ ও বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। গ্রামাঞ্চলে যে সব সি· আর· পি নিযুক্ত রয়েছে, তাদের আচরণ সম্পর্কে নানান ধরনের অভিযোগ আসতে শুরু করেছে।

শ্রী এল· পি· সিং-এর আগমনে আরও একটি বিষয় সম্পর্কে পাকাপাকি জানা গেছে। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রশাসনকে রাজনীতিমুক্ত করার নামে বিভিন্ন অফিসারের শাস্তিমূলক রদবদল। এই বিষয় নিয়ে পূর্বে বঙ্গদর্শনে একটি নিবন্ধ রচিত হয়েছিল। কিছুকাল আগে রাজ্যসভায় এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল জানান যে, প্রশাসনকে রাজনীতিমুক্ত করা দরকার। এর সোজা অর্থ, যদি কোন অফিসার বামপন্থী কোন আদর্শে বা কর্মপন্থায় বিশ্বাসী হন তাঁকে তাড়াতে হবে। ইতিপূর্বে, গত বাইশ বছর ধরে কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যগুলিতে অনেক অফিসার শাসকদলের স্বার্থে কাজ করেছেন, আজও বহু অফিসার আছেন যাঁরা মনেপ্রাণে কংগ্রেস, জনসংঘ বা স্বতন্ত্র পার্টির রাজনীতি ও কর্মধারায় বিশ্বাসী এবং প্রশাসনকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেবারই সুযোগ করে দিচ্ছেন। কিন্তু তা নিয়ে কোনদিনই কারো মাথাব্যথা হয় নি, কেন না তাঁরা কেউ বামপন্থী নন, অতএব তাঁদের ক্ষেত্রে প্রশাসনকে রাজনীতিমুক্ত করার কথা ওঠে নি। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে প্রচলিত ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য সাধারণ মানুষদের মধ্যে যেমন আগ্রহ এসেছিল (যদিও যুক্তফ্রন্ট সরকার নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মানুষের প্রত্যাশাকে পূর্ণ হবার সুযোগ দেন নি), খুব স্বাভাবিকভাবেই অফিসারদের একাংশের মধ্যেও নতুন লাইনে কাজ করারও একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, অবশ্য খুবই স্বল্পসংখ্যক অফিসারের মধ্যে। কেন না আমলাতন্ত্রের বৃহত্তর অংশটা কায়েমী স্বার্থের স্বপক্ষেই থাকে, কেন না তাতেই তাদের লাভ বেশি হয়, বাড়ি-গাড়ি-মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ছাড়াও বাইরে প্রভাবশালী বণিকগোষ্ঠী ইত্যাদির সঙ্গে দহরম-মহরম থাকার দরুণ, ছেলেপুলে ভাইপো-ভাগ্নেদেরও আখের গুছিয়ে তোলা যায়। তবুও এরই মধ্যে যে দু'-চারজন কিছুটা প্রগতিশীল আদর্শে কি কর্মসূচীতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন যুক্তফ্রন্টের আমলে, এখন দেখা যাচ্ছে তাঁদের কমিউনিস্ট অপবাদ দিয়ে পার্জিং করার ব্যাপক আয়োজনই পাকা হয়ে গেছে এবং তা চূড়ান্ত করার জন্যই শ্রী এল· পি· সিং-এর আগমন ঘটেছে। যদিও রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করে কোন অফিসারকে বিতাড়ন করা তাঁর অভিপ্রেত নয়, অফিসারের কর্মদক্ষতাই বিবেচ্য, রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়, তথাপি কার্যক্ষেত্রে একটি প্রতিহিংসামূলক নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। যাই হোক, এটি একটি খুব বদ নজীর হয়ে রইল। প্রশাসনকে রাজনীতিমুক্ত করার নামে সেখানে আরও বেশি করেই রাজনীতি আমদানী করা হল, যা ছিল গৌণ তাকে মুখ্য করে তোলা হল। এর পর যদি অন্য কোন দল ক্ষমতায় আসে, তারা এই নজীরকে অনুসরণ করে আবার ব্যাপক রদ-বদল ঘটাবে এবং তার ফলে সার্বিকভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হবে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনের যা অবস্থা, তাতে প্রচলিত অর্থেই কোন আইনের শাসন আছে বলে মনে করা যায় না। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান প্রত্যক্ষভাবে শাসনের ঝুঁকি নিতে নারাজ, বিভিন্ন উপদেষ্টাদের হাতে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের পদেই থাকতে চান। এদিকে আমলাতন্ত্র, যার হাতে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার ন্যস্ত, বহুধাবিভক্ত, কাজকর্ম চুলোয় গেছে। আমলারা নিজেদের আখের ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত এবং কার সেবা করলে এবং কোথায় তৈল-মর্দন করলে ওইগুলি নিরাপদ হবে তা নিয়েই ব্যস্ত। রাষ্ট্রপতির শাসন সমাজবিরোধীদের কাছে একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ উপস্থিত করেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে যে সব পুলিশ ও আমলারা কর্তব্যে গাফিলতি করে প্রশাসনকে ভিতর থেকে বানচাল করার চেষ্টা করেছিল, শরিকী সংঘর্ষকে সুকৌশলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে

ব্যবহার করিছিল এখন সেই পুলিশই প্রকাশ্যে সমাজবিরোধীদের মদনীতি দাহায্য করছে, রাজ্যের আইন-শৃংখলার দ্রুত অবনতিই যার প্রমাণ। সমস্ত হামলায় দায় নকশালদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই বা চলবে কেন? এদিকে অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রশাসন ব্যবস্থা পঙ্গু ও অচল। আই· এ· এস অফিসারেরা রাজ্যপালের আচরণে অসন্তুষ্ট, আবার নিজেরা একে অন্যের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ। প্রশাসন আজ দেউলিয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থে, কলহে ভগ্ন বিদীর্ণ। রাইটার্স বিল্ডিংসে ফাইলের পর ফাইল, কার থান. কে দেয় সই? কোন কাজে কোন ইনিশিয়েটিভ নেই, এমন কি রাজ্যপালের প্রশাসনে আজ যাঁরা দেশের নিয়ামক তাঁরাই আজ একে অন্যের বিরুদ্ধে হয় প্রকাশ্যেই কাদা ছুঁড়ছেন, না হয় নেপথ্যে কারচুপি চালাচ্ছেন। কোন বিভাগের সঙ্গে কোন বিভাগের সমঝোতা নেই।

প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের শরিক রাজনৈতিক দলগুলিও এই পরম সংকটে সেই পুরোনো কায়দাতেই একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেই কর্তব্য সমাপন করছেন, এদিকে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে যে ফ্যাসীবাদী প্রবণতা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, অথচ আগুন একবার জ্বললে কাউকে রেহাই দেবে না, সে কথাটা প্রত্যেকেই ভুলে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট কার্যত চারভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা কেউই বুঝতে চাইছে না যে, বিগত যুক্তফ্রন্ট ভাঙার মূলে সকলেই কম-বিস্তর দায়ী, কারো দায়িত্ব বারো আনা, কারো দায়িত্ব চার আনা। বাস্তব অবস্থাটা হচ্ছে যে, প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টকে বাঁচানোর কোন সম্ভাবনা নেই, আজকে বাংলা কংগ্রেস এবং সি· পি· এম এমন দুই পয়েন্টে পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে তাঁদের এক প্ল্যাটফর্মে মিলিত হবার আর কোন উপায় নেই। অথচ আট পার্টি জোটের তরফ থেকে পুরাতন যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা বলা হচ্ছে, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে যে চাওয়াটা অসম্ভব। অতএব চোখের সামনে মোট তিনটি রাস্তা খোলা আছে, প্রথমটি হচ্ছে কংগ্রেসের সমর্থনে আট পার্টি জোটের সরকার বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে, দ্বিতীয় পথ হচ্ছে সি-পি-এম ও আর-এস-পি'কে সঙ্গে নিয়ে আট পার্টি জোটের সরকার, আর তৃতীয়টি হচ্ছে বর্তমানের অসহনীয় অবস্থাকে জিইয়ে রাখা, কেন না ১৯৭২-এর আগে নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা নেই। আমাদের মনে হয়, বাংলা কংগ্রেসকে খরচের খাতায় ফেলাই ভাল, কেন না ঐ দলের তরফ থেকে সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলি [illegible] প্রতি হয়েছে তার থেকে একটা স্থির সিদ্ধান্ত আসা যায় যে, যুক্তফ্রন্টের প্রতি বাংলা কংগ্রেসের কোন আকর্ষণই নেই।

নতুন উদ্বাস্তু স্রোত

গত কয়েক মাসে পূর্ব পাকিস্তান হতে অন্তত ৩৪ হাজার মানুষ নিঃসম্বল অবস্থায় ভারতে প্রবেশ করেছে। কয়েকদিন পূর্বে লোকসভায় ও রাজ্যসভায় সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা এই নতুন উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তা জানতে চেয়েছেন। অন্যদিকে সরকারপক্ষ [illegible] হয়েছে যে পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের প্রতি বর্ণবৈষম্য নীতির মত ঘৃণ্য নীতি অবলম্বন করেছেন। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসরণ করছেন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নিপীড়ন একটি বহুদিনের পুরাতন কায়দা, যা মাঝে মাঝে দরকারমত করা হয় এবং সম্প্রতি দৈনিক গড়ে হাজার জন করে ছিন্নমূল নরনারীর সর্বস্ব খুইয়ে ভারতে চলে আসার দ্বারা প্রতিপন্ন হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি শত্রুসম্পত্তি ঘোষণা করে পাক সরকার তা জবরদখল করছেন। পাকিস্তানে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যে প্রচার করা হচ্ছে, অতেও সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ মনোভাব অবলম্বনের উস্কানি রয়েছে। অথচ ১৯৫০ সালে যে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে চুক্তি পাকিস্তান গ্রাহ্য করে নি। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি জবরদখল, তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, মেয়েদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার, সাধারণ অমুসলমানদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও হয়রানি ইত্যাদি আজ চরমে উঠেছে বলেই নতুন করে দলে দলে লোক অজানা দেশের দিকে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত সরকারই বা তাঁর দায়িত্ব কতদূর পালন করেছেন? ভারত সরকার উদ্যোগী হলে কি পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর এই অত্যাচার বন্ধ করা যেত না? ভারত সরকার কি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যাকে জিইয়ে না রেখে সমাধান করতে পারতেন না? আসলে নয়াদিল্লীর কুম্ভকর্ণদের ঘুম অনেক দেরিতে ভাঙে এবং জেগে উঠে কিছু করার আগে তাঁরা আবার ঘুমিয়ে পড়েন। আর দ্বিতীয়ত, নয়াদিল্লীর চোখে যেন হয় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের তেমন পার্থক্যও নেই, [illegible] কাজেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুহারা দলে দলে ছিন্নমূল মানুষ এসে পশ্চিমবঙ্গে ভিড় [illegible] তো পশ্চিমবঙ্গেরই মাথাব্যথা, নয়াদিল্লীর তাতে কি? এই যেন হয় কর্তাদের মনোভাব।

খরার কবলে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই আজ নিদারুণ খরার কবলে পতিত হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার। পুরুলিয়া জেলাটি আগে ছিল বিহারের অন্তর্ভুক্ত এবং মূলত ঐ জেলাটি বঙ্গভাষী হবার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত ঐ জেলা বিহারে থাকবে না জেনে বিহার সরকার পুরুলিয়ার উন্নয়নের জন্য কিছুই করেন নি। আর বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলেও, পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জেলা। উভয় জেলাই বর্তমানে প্রচণ্ড রকমের খরা-কবলিত, জলাভাব ও খাদ্যাভাবে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে প্রহর গুণছে। অন্নের বদলে জল দিয়েও যে উদরপূর্তি করবে সে সুযোগও নেই। নদ-নদী, খাল-বিল, পুষ্করিণী-কূপ কোথাও একবিন্দু জলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। পানীয় জল সংগ্রহের জন্য বাড়ির মেয়েদের দূর-দূরান্তে গিয়ে লাইন লাগাতে হচ্ছে। এই জলাভাব ও দুর্ভিক্ষে মানুষের পরমায়ু হ্রাস পাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই কয়েকজন প্রাণ দিয়েছেন। পুরুলিয়ায় আদিবাসী ও তফসিলীদের বাস বেশি। তাছাড়া এই জেলায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যাও লক্ষাধিক। এবং এরাই যে দুর্ভিক্ষ ও খরার শিকার সেটা নিশ্চয়ই খুলে বলতে হবে না। পুরুলিয়া জেলা কর্তৃপক্ষ নাকি এই সংকট ত্রাণের জন্য ২৮ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন, বলাই বাহুল্য তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। পুরুলিয়ার সংকট দূর করার জন্য রাজ্য সরকারের অধিকতর তৎপর হওয়া উচিত। কিন্তু শুধুমাত্র খয়রাতির দ্বারাই পুরুলিয়ার সমস্যার সমাধান হবে না। পুরুলিয়াকে বাঁচানোর জন্য একটি সর্বব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। বাঁকুড়া সম্পর্কেও এই কথা খাটে। বছরের পর বছর নিষ্ফল খয়রাতি সাহায্য (তাও যথাস্থানে কোনদিন পৌঁছায় না বলে আমাদের বিশ্বাস) না করে একটি সর্বব্যাপী প্রকল্পে আরও বেশি টাকা ব্যয় করলে সংকট স্থায়ীভাবে মোচন করা সম্ভব।

রাষ্ট্রপতি গিরির জয়

১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে সিণ্ডিকেট মনোনীত শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে পরাজিত করে নির্দলীয় ডঃ ভি ভি গিরি ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান। বামপন্থী এবং প্রগতিশীল ভোটাররা ডঃ গিরিকে সমর্থন করেন। আর রক্ষণশীল এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলো সমর্থন করেন শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তা সত্যিই অভূতপূর্ব। রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীরা গোপনে গোপনে স্থির করেছিলেন যে, সঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতির গদিতে বসিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন এবং নিজেরা সেই জায়গায় বসে একচেটিয়া কারবারীদের হাতে দেশটা তুলে দেবেন। তাঁদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে ডঃ গিরি যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন, তখন সিণ্ডিকেট-স্বতন্ত্র-জনসংঘের ক্রুসেডাররা বেশ একটু মুশড়ে পড়েছিলেন। সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে তাঁরা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনের কথা ভাবতে লাগলেন।

অল্পদিন বাদেই দেখা গেল ডঃ গিরির নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে দুটো মামলা দায়ের হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় রিটার্নিং অফিসার দুজন নির্বাচনপ্রার্থীর (শিবকৃষ্ণ সিং এবং ডঃ কুল সিং) মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিলেন, কারণ মনোনয়নপত্রে একই লোক উপরোক্ত দুইজনের প্রস্তাবক ও সমর্থক হিসাবে নাম সই করেছিলেন। সেটা প্রচলিত আইনে অনুমোদিত নয়। শিবকৃষ্ণ সিং এবং কুল সিং সেই আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ায় নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হয়েছে। কাজেই নির্বাচন বাতিল করা হোক। অপর দিকে আবদুল গণিদার (এম-পি) এবং রামা রেড্ডি (এম-পি) একখানা বে-নামা ইস্তাহার আদালতে পেশ করে বলেন যে, ঐ ইস্তাহারে সঞ্জীব রেড্ডির চরিত্র হনন করা হয়েছে এবং ভোটাররা ইস্তাহারটি পাঠ করে সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে চলে যান এবং তার ফলে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হয়। তাঁরা আরও বলেন যে, গিরির সমর্থকরাই এই বেনামা ইস্তাহারের জনক। কাজেই এই নির্বাচন বাতিল করা হোক এবং নির্বাচনে দুর্নীতি অবলম্বন করার অভিযোগে গিরিকে নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক।

এই মামলা বিচারের জন্য বিচারপতি সিকরির নেতৃত্বে একটি স্পেশাল বেঞ্চ গঠন করা হয়। গত ১১ই মে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়েছেন যে, ডঃ গিরির নির্বাচন সম্পূর্ণ বৈধভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি সিকরি বলেন, "আমরা সকলেই মামলার রায় সম্বন্ধে একমত হয়েছি। কাজেই মামলার স্বার্থে আমরা এখনই আমাদের আদেশ জানিয়ে দিলাম। মামলার বিস্তারিত রায় গরমের ছুটির পর প্রকাশ করা হবে।"

এই মামলাটি নানা কারণেই ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মামলার শুনানী শুরু হয় ১১ই জানুয়ারী এবং শেষ হয় ৮ই মে। মামলাটা শুনতে আদালতের মোট ৫০ দিন লেগেছে। এতে সাক্ষী দিয়েছেন মোট ১১৬ জন। তার মধ্যে বাদী পক্ষের সাক্ষী ছিলেন ৫৫ জন। সাক্ষ্যের বিবরণ টাইপ করে ১৫০০ পৃষ্ঠার একটা দলিল হয়েছে। এ ছাড়া আদালতে মোট ১৭ শ' পৃষ্ঠার নথিপত্র পেশ করা হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট তাঁর ইতিহাসে এই প্রথম মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। এ ছাড়া সুপ্রীম কোর্টে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে এই প্রথম টেপ রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি আদালতে সাক্ষ্য দেবার অধিকারী হলেও ডঃ গিরি সেই অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করেন নি। আদালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি সাধারণ নাগরিকের মতই আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদান করেন, সেটা গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এই মামলায় উভয় পক্ষে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জগজ্জীবন রাম, দীনেশ সিং, ফকরুদ্দীন আলী আমেদ প্রমুখ মন্ত্রীরা এবং অপর দিকে পাতিল, মোরারজী দেশাই, নিজলিঙ্গাপ্পা, সঞ্জীব রেড্ডি প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সাক্ষীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন হয় পার্লামেন্টের সদস্য, না হয় বিধানসভার সদস্য।

মামলাটিকে জনৈক বিচারপতি কুরুক্ষেত্রের লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং অপর একজন বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন যে, মামলা জেতবার জন্য বাদীপক্ষ প্রচুর অসত্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

সুপ্রীম কোর্টে এই মামলা চলাকালে দেশের উচ্চতম রাজনৈতিক মহলে যে কুৎসিত নোংরামির অস্তিত্ব উদ্ঘাটিত হয়, তাতে বিশ্ববাসীর চোখে আমরা যে অনেক ছোট হয়ে গেছি, সে কথা বলাই বাহুল্য। যেমন ধরুন, তারকেশ্বরী সিংহ তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট ইস্তাহারের বিরুদ্ধে একটা বিবৃতি আদায়ের জন্য তিনি ডঃ গিরির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ডঃ গিরি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি। কিন্তু ডঃ গিরি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তারকেশ্বরী নির্বাচনের প্রাক্কালে কোন দিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি। গিরির বাড়ির লোকেরাও বলেছেন যে, তারকেশ্বরী কোন দিনই তাঁদের বাড়িতে যান নি। তাহলে বুঝতে হয় তারকেশ্বরী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন, না হয় ডঃ গিরি সেই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আদালত ডঃ গিরির পক্ষে রায় দেওয়ায় প্রকৃত মিথ্যাবাদী কে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। তা জানা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য সাক্ষী (যাঁরা পার্লামেন্ট অথবা বিধানসভার সদস্য) যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই যদি দেশের ক্ষমতাপিপাসু রাজনীতিকদের প্রকৃত চেহারা হয়, তা হলে দেশের ভবিষ্যৎ যে খুবই অন্ধকার, সে কথা বলাই বাহুল্য। আদালতে যাঁদের সাক্ষ্য মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে 'পারজুরি'র মামলা দায়ের করা উচিত বলে আমাদের মনে হয়। সেখানে যাঁরা অপরাধী সাব্যস্ত

য়াবেন, রাজনীতির আসর থেকে তাঁদের চিরকালের জন্য নির্বাসিত করা দরকার।

চিনি ও চিন্তামণি

এ বছর ভারতে ৪২ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন হয়েছে। গত বছর হয়েছিল ৩৫ লক্ষ টন। [illegible] গত বছরের চেয়ে এবার চিনির উৎপাদন ৭ লক্ষ টন বেশি হয়েছে। ৫৫ কোটি মানুষের দেশে ৪২ লক্ষ টন চিনি পরিমাণের দিক দিয়ে এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু আমাদের দেশে চিনি যে রকম চড়া দামে বিক্রি হয় এবং অধিকাংশ মানুষই চিনি কিনে খাবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। তাই প্রচুর চিনি গুদামঘরে মজুত হয়ে পড়ে আছে। গভর্নমেন্ট উৎপন্ন চিনির একটা অংশ নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করে রেশনের দোকান মারফৎ বণ্টন করেন। বাকী চিনি খোলাবাজারে যথেচ্ছ দামে বিক্রয় হয়। কিন্তু "এত চিনি" খাবে কে? তাই খোলাবাজারে চিনির দাম পড়তে পড়তে এখন প্রায় রেশনের চিনির দামে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সেটাও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তাই মজুত চিনি আর কমতে চাইছে না।

চিনির আন্তর্জাতিক বাজার দর, ভারতীয় বাজার দরের থেকে অনেক কম। সেই দরে ভারত প্রতি বছর ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন চিনি রপ্তানির অধিকারী। কিন্তু সেখানেও খরিদ্দারের অভাব। আমেরিকা এবং বৃটেন আমাদের কাছ থেকে ১৫ হাজার টন চিনি নিয়ে থাকে। এবারও নেবে। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন ৫০ হাজার টন চিনি কানাডায় রপ্তানি করেছেন। গভর্নমেন্ট আরও ৮০ হাজার টন চিনি রপ্তানি করতে চান। খরিদ্দার ধরার চেষ্টা চলছে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত খরিদ্দার পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই চিনি রপ্তানি করে সাড়ে ৩ কোটি টাকা গুণগার দিতে হবে। চিনি কলওয়ালারা বিনা লাভে এই চিনিটা গভর্নমেন্টের কাছে বিক্রি করবেন এবং গভর্নমেন্ট সেটা সস্তা দরে বিদেশে বেচে দেবেন। এই কেনা-বেচায় সাড়ে ৩ কোটি টাকার লোকসান পূরণ করা হবে সরকারী তহবিল থেকে। চিনি বেচে আমরা কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করব ঠিকই, কিন্তু তাতে আমাদের লোকসান পূরণ হবে না। কথায় বলে, যে খায় চিনি, তাকে চিনি যোগায় চিন্তামণি। বিশ্বের সমৃদ্ধ দেশের মানুষ চিনি খান। চিন্তামণি তাঁদের চিনি সরবরাহ (ভারত থেকে) করে যাচ্ছেন। কিন্তু ভারতের গরীব মানুষদের ক্ষেত্রে চিন্তামণি বড় নিষ্করুণ। [illegible] তিনি চিনি খাওয়াতে রাজী নন। উপরন্তু ইউরোপ-আমেরিকার চিনি খানেওয়ালাদের চিনি খাওয়াবার জন্য গরীব ভারতীয়দের পকেট কাটাই তাঁর রীতি। কারণ ভারতের গরীব মানুষেরা যে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, সেই ট্যাক্সের টাকা দিয়েই চিনির কারবারের ক্ষতিপূরণ করা হবে। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ! গ্রামের যে গরীব মানুষটা জীবনে কখনও চিনি খায় নি, সেও ভারতের চিনির কারবারের লোকসানের অংশীদার।

এ দেশের চিনি শিল্প সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকেবহাল তাঁরাই জানেন, চিনি শিল্প তার জন্মকাল থেকেই অসুস্থ। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সব সময়ই ভারতবাসীকে বেশি দামে চিনি কিনে খেতে হয় এবং এখনও হচ্ছে। তার প্রধান কারণ আমাদের চিনি শিল্প আধুনিকীকরণের চেষ্টা করা হয় নি। চিনির কারবারীরা বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা মুনাফা কামিয়ে সেই টাকা দিয়ে আরও মুনাফাজনক অন্যান্য কারবার খুলেছেন। তাই চিনি শিল্প আজ সংকটের সম্মুখীন। অবিলম্বে চিনির উৎপাদনী বার ব্যাপকভাবে হ্রাস করার ব্যবস্থা না হলে চিন্তামণির করুণা আমরা কিছুতেই লাভ করতে পারব না।

পাট উৎপাদনে আসামের কৃতিত্ব

গত বছর (১৯৬৯) পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে আসামের অসাধারণ সাফল্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সকলেই জানেন, দেশ ভাগাভাগির সময় প্রায় সমস্ত চটকল ভারতের ভাগে পড়লেও ভাল ভাল পাটের জমি সব পাকিস্তানের ভাগেই চলে গিয়েছিল। সেটা ভারতের পক্ষে বেশ গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কারণ পাট না পেলে তো আর চটকল চলতে পারে না। তাই দেশ ভাগাভাগির সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বিহারে পাট চাষ বাড়াবার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা হয়েছিল এবং সেই চেষ্টা সফল হয়েছে। ভারতীয় পাটকলগুলোর চাহিদা পূরণের মত পাট এখন ভারতেই উৎপন্ন হচ্ছে। তবে কিছু কিছু পাট এবং মেস্তা এখনও বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। গত বছর সারা ভারতেই পাটের ফলন ভাল হয়েছিল। (এবার কালবৈশাখীর অভাবে পশ্চিমবঙ্গে পাটের অবস্থা বড়ই শোচনীয়)। তার মধ্যে আসামের কৃতিত্ব সবার উপরে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় স্থির হয়েছিল, পরিকল্পনার শেষ বছর আসামে ১১ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হবে। [illegible] ১৯৬৯ সালেই আসাম সেই লক্ষ্য পূরণ করেছে। পাট উৎপাদনী জেলাগুলোর ১৪টি ব্লকে ৬ হাজার একর জমিতে একটা বিশেষ প্যাকেজ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছিল। তার টাকা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রোগ্রামই আমাদের সাফল্যের (পাট উৎপাদন) উৎস। এবার সেই প্রোগ্রামের আওতায় এসেছে ১৪ হাজার একর এবং আগামী বছর আসবে ২৮ হাজার একর। এই প্রোগ্রামে চাষীরা বিশেষ লাভবান হচ্ছে। আগে প্রতি একরে ৩ গাঁট করে পাট হত। এখন হচ্ছে ৫ গাঁট।

বর্তমানে আসামের পাট ৪৫ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে। সেটা বিক্রেতার পক্ষে লাভজনক। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে আসাম ২ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন করতে পারবে। প্যাকেজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী চাষীরা পান: সস্তা দরে সার, বিনা পয়সায় কীট ও আগাছানাশক এবং ইউরিয়া। এ ছাড়া সরকারের তরফ থেকে তাদের কারিগরী পরামর্শও দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের কোন প্যাকেজ প্রোগ্রাম চালু আছে কি না, তা আমরা জানি না। না থাকলে অবিলম্বে চালু করা উচিত। কারণ অল্প জমিতে যদি বেশি পাট উৎপন্ন হয়, তাহলে পাটের জমি কমিয়ে দিয়ে খাদ্যশস্য চাষের জমি বাড়ানো সহজ হয়ে উঠবে এবং পশ্চিমবঙ্গই তাতে লাভবান হবে বেশি।

এ বছর পাটের সরবরাহে কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও পাট শিল্প বেশ একটু কাহিল হয়ে পড়েছে। বিগত কয়েক বছর পাটকলওয়ালারা বিদেশের বাজারে কার্পেট ব্যাকিং বিক্রি করেই সব চেয়ে বেশি টাকা লাভ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের বাজারে কার্পেট ব্যাকিং-এর চাহিদা হঠাৎ পড়ে গেছে। তার ফলে কার্পেট ব্যাকিং তৈরির কারখানাগুলোর যন্ত্রপাতির ৬০ শতাংশই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তাদের কোন কাজ নেই। এ বছর মার্চ এবং এপ্রিল মাসে কার্পেট ব্যাকিং তৈরি হয়েছে যথাক্রমে ১০৬০০ টন এবং ৮৭০০ টন। গত বছর এই দু মাসে কার্পেট ব্যাকিং তৈরি হয়েছিল ১৩৩০০ টন এবং ১৯ হাজার টন। আমেরিকার বাজারে সিন্থেটিক কার্পেট ব্যাকিং নাকি পাট-জাত কার্পেট ব্যাকিং-এর বাজার সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে। তা ছাড়া আমেরিকার বাজারে এখন কিছুটা মন্দা চলছে। তাতে কেনা-বেচা হ্রাস পেয়েছে।

১৬।৫।৭০

কম্বোডিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে লণ্ডনে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

চারটি অমূল্য প্রাণ অকালে নিঃশেষিত হল, চারটে তাজা ফুল ঝরে পড়ল। কেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র-ছাত্রীকে ওহিওর জাতীয় গার্ডসম্যানরা গুলী করে হত্যা করেছে। এঁরা হলেন মনস্তত্ত্বের ছাত্র ১৯ বছরের উইলিয়াম শ্রোয়েডার, স্পীচ থেরাপীর ২০ বছরের তরুণী ছাত্রী স্যাণ্ড্রা লী শিউয়ের, ২০ বছরের ছাত্র জেফ্রি গ্লেন মিলার এবং ১৯ বছরের সুন্দরী তন্বী আলিসন ক্রাউস। অথচ এই চারজনের কেউই প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন ছাত্রদের যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে এঁরা মনোভাব পোষণ করলেও, সেদিন তাঁরা আন্দোলনে অংশ নেবার জন্যে সেখানে সমবেত হন নি।

কেণ্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ শনিবার ১লা মে থেকেই যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ মিছিলে জড়ো হচ্ছিলেন। গভর্নর রোড্স রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত বিক্ষোভ মিছিল বেআইনী ঘোষণা করলেন। কিন্তু ছাত্ররা সে নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজী হলেন না। এদিকে-ওদিকে কিছু কিছু হিংসাত্মক কার্যকলাপও অনুষ্ঠিত হল। শেষে জেমস রোড্স উচ্চতম কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ন্যাশনাল গার্ডদের আহ্বান জানালেন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে। এক ঘণ্টার মধ্যে সেমি-অটোমেটিক রাইফেল, পিস্তল এবং কাঁদানে গ্যাস নিয়ে ৫০০ ন্যাশনাল গার্ডসম্যান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল। গার্ডসম্যানরা যখন ছাত্রদের নির্দেশ দিল ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে, তখন তাঁরা জবাবে জানালেন যে, ক্যাম্পাসটা আসলে তাঁদেরই, বরং ন্যাশনাল গার্ডসম্যানরাই সেখানে অনুপ্রবেশকারী। তারপর যখন ছাত্রের সংখ্যা ক্যাম্পাসের চারদিকে ক্রমশ বাড়তে লাগল, তখন গার্ডসম্যানরা গুলী চালাতে থাকে, যার ফলে চারজন ছাত্র-ছাত্রী সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মজা হচ্ছে, যদিও ন্যাশনাল গার্ডসম্যানদের পক্ষ থেকে গুলী চালানো হয়েছিল, তবুও কেউ স্বীকার করতে রাজী হল না যে, গুলী চালাবার নির্দেশ আসলে কে দিয়েছে। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন, তবে গুলী নিক্ষেপকারী গার্ডসম্যানদের একজনের স্ত্রী বলেছেন যে, তাঁর স্বামী হত্যাকারী নন, তবে ওপরওয়ালার নির্দেশ পেয়ে গুলী চালিয়েছেন।

স্বভাবতই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সারা মার্কিন দুনিয়ায় প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। নিহত তরুণী আলিসনের শোকস্তব্ধ বাবা প্রশ্ন তুলেছেন: মতের অমিল হওয়া কি অপরাধ? এটাই কি আলিসনকে হত্যা করার কারণ? আমরা কি এমন এক রাজ্যে বাস করছি, যেখানে একটা তরুণী তার সরকারের নীতির সঙ্গে একমত হতে পারে নি বলে তাকে হত্যা করতে হবে!

বস্তুত কম্বোডিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে গোটা আমেরিকা আজ বিক্ষুব্ধ। ছাত্ররাই অবশ্য এই প্রতিবাদে এবার নেতৃত্ব দিয়েছেন। সারা দেশের ৪৪১টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী আজ যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বহু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরাও আজ আর প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের সঙ্গে নেই, বরং আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট হোয়াইট হাউসে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট নিক্সনকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এক বিপজ্জনক খেলায় মেতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষদের একটা বড় অংশই ছাত্রদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল. কেণ্টের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পর নিক্সনের ভাবমূর্তি আরো কালিমালিপ্ত হয়েছে।

শুধু ছাত্ররাই নয়. দায়িত্বশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও নিক্সনের কম্বোডিয়া নীতির বিরোধিতায় মুখর হয়ে উঠেছেন। আভ্যন্তরীণ সচিব ওয়াল্টার হিকেল প্রেসিডেণ্ট নিক্সনকে কড়া চিঠি দিয়ে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন. দু'জন কর্মচারী
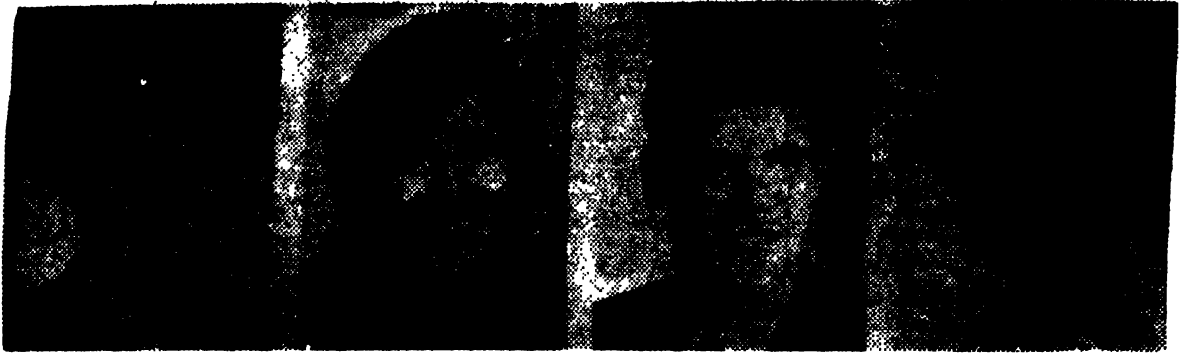
কেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চারজন ছাত্র-ছাত্রীকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে

পদত্যাগ করেছেন। এমন কি প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের ক্যাবিনেটেই কম্বোডিয়া নীতির প্রশ্নে একমত নয় বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর মতানৈক্য রয়েছে সেনেট এবং কংগ্রেসেও। বাস্তবপক্ষে কম্বোডিয়ার প্রশ্নে প্রেসিডেণ্ট নিক্সন আজ তাঁর ক্যাবিনেট, পরামর্শদাতা সেনেট ও কংগ্রেস সমগ্র জাতি থেকেই যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তিনি নিঃসঙ্গ, একাকী। কাজেই অনতিবিলম্বে যদি তিনি কম্বোডিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে না আসেন, তবে জাতির পক্ষে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। কারণ, ছাত্র ও তরুণেরা এখনও অহিংস রয়েছেন বটে, তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে এবং প্ররোচিত করলে অবস্থা কী দাঁড়ায়, কেউ বলতে পারে না।

পশ্চিম এশিয়া ঃ

যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি রোজই দু' বেলা ভঙ্গ করা হচ্ছে তার আর মর্যাদা কী থাকে? এখানে নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে ইস্রায়েল কর্তৃক দক্ষিণ লেবানন আক্রমণের ফলে। ইস্রায়েলের অভিযোগ, লেবানন থেকে প্যালেস্টাইন গেরিলারা ক্রমাগত ইস্রায়েলী সীমান্ত এলাকার ওপর হামলা চালাচ্ছে। সেই হামলা চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার তাগিদেই দক্ষিণ লেবাননের ওপর ইস্রায়েলী বোমারু বিমান থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে। ইস্রায়েল অবশ্য এ কথা বলে নি যে, প্যালেস্টাইন মুক্তি-যোদ্ধারা কেন ইস্রায়েলী সীমান্তে উৎপাত করছে, কী তাদের অভিযোগ, কী চায় তারা। ইস্রায়েল যে প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড জবরদখল করে রয়েছে এবং সেটাই বানচাল করার জন্যেই যে তরুণ প্যালেস্টাইন কম্যাণ্ডোরা প্রাণের ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে প্রতিনিয়ত পাঞ্জা কষছে, এ সত্য ইস্রায়েলী নেতারা সতর্কতার সঙ্গেই গোপন করেছেন।

গেরিলা হাঙ্গামা ছাড়া ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার এ অভিযোগও করেছিলেন যে, সোভিয়েট বৈমানিকরা আরব বিমানচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। অভিযোগটা অবশ্য 'মূর্খোচিত' বলে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে গেরিলা উৎপাত, সোভিয়েট হস্তক্ষেপ ইত্যাদির অজুহাত দেখিয়ে ইস্রায়েল আমেরিকার কাছ থেকে আরো ফ্যাণ্টম, স্কাই হক বিমান ও কূটনৈতিক সাহায্য আদায় করতে চায়।

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স চতুর্শক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইস্রায়েল যে আরব ভূমি দখল করেছিল, ওই বছরের ২২শে নভেম্বর স্বস্তি পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সে অধিকৃত জমি ইস্রায়েলকে ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু ইস্রায়েল এটাই স্বীকার করছে না। আরো মজা, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম এশিয়ায় স্বস্তি চায় বলে তারস্বরে বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে আসছে সেই দাবি করছে যে, অধিকৃত সমস্ত পররাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্যে ইস্রায়েলকে বাধ্য করা ঠিক হবে না। কারণ তার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে নাকি সীমান্ত কিছু কিছু রদবদল (অর্থাৎ আরব ভূমি দখল) করা দরকার। কিন্ত এ উদ্ভট প্রসারই বা আরব দুনিয়া মেনে নেব কী করে?

ইন্দোনেশিয়া ঃ

জাকার্তায় বহুবিজ্ঞাপিত এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন শেষ হল। ইন্দোনেশীয় সরকারের পক্ষ থেকে ২১টি দেশের প্রতি ১৬ই ও ১৭ই মে দুদিন-ব্যাপী সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছিল কম্বোডিয়া ও এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন আলোচনা।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সদিচ্ছায় আমন্ত্রিত সমস্ত রাষ্ট্র আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। সেজন্য আমন্ত্রণলিপি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে জবাব দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ২১টি দেশের মধ্যে মাত্র ১২টি দেশ এ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছে। কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, জাকার্তা সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য কম্বোডিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপ অনুমোদন করা।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যদিও তার মর্যাদা ও গুরুত্ব আশানুরূপ হয়েছে কিনা সন্দেহ। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সম্মেলনটিকে বৃহত্তর পটভূমিতে সংগঠিত করা দরকার। কিচি আইচি আরো বলেন, ইন্দোচীন সংকটের নিরসন করতে হলে এশিয়ার কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিরও সহযোগিতা দরকার।

সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির অধিকাংশ প্রতিনিধিই কম্বোডিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের প্রত্যাহার দাবি করেছেন। তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সম্মেলনে সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তাঁর সরকার বাধ্য থাকবেন না। অবশ্য প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারও সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করেছিলেন।

সম্মেলনে কম্বোডিয়ার শান্তি ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে আবেদন, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পুনরুজ্জীবন, কম্বোডিয়ায় পর্যবেক্ষক প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপরেও জোর দেওয়া হয়। সম্মেলনে যতই সাধু প্রস্তাব নেওয়া হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ যে তা মেনে নেবে না, বলাই বাহুল্য। সেদিক থেকে জাকার্তা সম্মেলন একটা মৃত সন্তান প্রসব করেছে বলাই উচিত নয় কি?

(১৭-৫-৭০)

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পদে শ্রী ভি ভি গিরির নির্বাচন বৈধ বলে রায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের রাজনীতিতে আবার একটু ঢেউ উঠেছে। অবশ্য ঢেউ উঠবার সঙ্গত কারণও আছে। শ্রীগিরির বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলার কারণেই যদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা "সাইনেডাই" করা হয়ে থাকে, তবে এখন সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। এখন বিধানসভা বাঁচিয়ে রাখবার কোন সঙ্গত যুক্তি থাকবে না। প্রথমে বলা হত—একটা জনপ্রিয় সরকার গঠনের সুযোগ দিতেই বিধানসভা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা জনপ্রিয় সরকার গঠন করবেন, তাঁরা তো নিজে-দের সম্পর্কের কোন উন্নতি করা দূরে থাক, সম্পর্ককে আরো বেশি কর্দমাক্ত করছেন। বিধানসভায় যাঁদের হাতে ২১৮ জন সদস্য, তাঁরা সরকার না করে রাস্তাঘাটে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর দেশের মানুষ হৃদয়হীন আমলা-তন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে—এই ঘটনা পরিষদীয় রাজনীতিতে অভিনব। সমগ্র অবস্থাটা হল একটা "আন-ব্যালান্সড" অবস্থা। কে কার শত্রু, কে কাকে নিধন করতে চায়, কেন নিধন করতে চায়—এর কোন যুক্তি-সঙ্গত উত্তর পাওয়া যাবে না। তবু পরিস্থিতি হল পশ্চিমবঙ্গে কোন সরকার গড়ে উঠবার সম্ভাবনা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও [illegible] ছিল —যুক্তফ্রন্টই তাঁদের [illegible], [illegible] সব কিছু ভুলে বাস্তব অবস্থার তাগিদে হয়তো কাছাকাছি আসবেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, দিন যত যাচ্ছে, আক্রমণ তত বাড়ছে, আক্রমণের ধার তত বাড়ছে, অভি-যোগের পরিমাণ বাড়ছে, অভিযোগের তালিকায় নিত্য নতুন সংযোজন হচ্ছে।

এই অবস্থায় [illegible] হল বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। কিন্তু সেই কাজ কেন্দ্র [illegible] করবে? যে কেউ জানে অবস্থা যাই হোক না কেন, দুই কংগ্রেস মিলে কংগ্রেসের রাজ্য বিধানসভায় বর্তমানে ৫৫টি আসন আছে। আবার নির্বাচন হলে সেই সংখ্যা আরো কমবে বই বাড়বে না, আর তা ছাড়া নির্বাচনের ফলে বর্তমান অবস্থার কতটা পরিবর্তন হবে? দুই-পাঁচটা আসন বেড়ে-কমে এদিক-ওদিক হতে পারে, কিন্তু সমগ্র অবস্থার সামগ্রিক কোন পরিবর্তন হবে কি করে? তারপর এখন ২১৮টি আসন নিয়ে যারা জোট বেঁধে সরকার করতে পারছে না,—তারা নির্বাচনের পর এই অবস্থায় সরকার করবে কি করে? তখনও তো সি-পি-এম, সি-পি-আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি—এক-একজন এক-এক দিকে যাবে। কাজেই আজ যে কারণে সরকার হচ্ছে না, সেইদিনও একই কারণে সরকার গড়ে উঠতে শক্ত বাধা আসবে। [illegible] মধ্যে হল কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে নতুন করে ঝুঁকি নেওয়া। তার চেয়ে নিশ্চয়ই সহজ হবে অপেক্ষা করা। পশ্চিম-বঙ্গের বর্তমান বিধানসভার পরমায়ু ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত—একটা সরকার হলে সেই সরকার আরো চার বৎসর চলবে. কাজেই চার বৎসর চলতে পারে এমন সরকার গড়ে উঠবার সম্পূর্ণ ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন নির্বাচনের ঝুঁকি নেওয়া হবে? তাই যে যতই [illegible] করুক, [illegible] দিন, [illegible] [illegible], কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] [illegible] স্বীকার করে একটি [illegible] নির্বাচনের ঝুঁকি নেবেন না। কেননা তারা এই কারণে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে হাতে হাতে বুঝতে দেবেন যুক্ত-ফ্রন্ট কি, বামপন্থী দলগুলি কি এবং [illegible] ভোট দিয়ে কি ফল হয়। ওরা জনগণের কাছ থেকে ভোট পেয়ে, সংখ্যাধিক্য পেয়ে, সরকার সুযোগ-সুবিধা পেয়েও সরকার করতে চায় না, পারে না। আসলে ওরা [illegible] করতে তো জানে না—[illegible] [illegible] [illegible] করছে।

[illegible] সরকার ছাড়া সুষ্ঠু প্রশাসন সম্ভব নয়, সুষ্ঠু প্রশাসন ছাড়া [illegible] উন্নয়ন সম্ভব নয়, কোন সংকট ও সমস্যার মোকাবিলাও সম্ভব নয়। আরো বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে তো বটেই। তাই পশ্চিমবঙ্গের জন্য চাই স্টেবল গভর্ণমেন্ট—সেটা একমাত্র কংগ্রেসই দিতে পারে। দেশের মানুষ কংগ্রেসকে সমর্থন করে না, এমন তো নয়। এত কিছুর মধ্যেও কংগ্রেস গত নির্বাচনে শতকরা ৪১টা ভোট পেয়েছে, কিন্তু আসন পেয়েছে ৫৫ টা। আর সি-পি-এম শতকরা ১৭টা কি ১৮টা ভোট পেয়ে আসন পেয়েছে ৮৩টা। কাজে-কাজেই—হে পশ্চিমবঙ্গের ভুল পথের মানুষ! তোমরা ঠেকে শিখে আবার কংগ্রেসের কথা ভাবো।

এই সঙ্গে আরো একটা তথ্য প্রতি-ষ্ঠিত করতে চান কেন্দ্রীয় সরকার। সেটা হল, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করা। কারণ বিগত দিনে যে যুক্তফ্রন্ট রাজ্যে গঠিত হয়েছে, সেই যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসকে হটাবে। আগামী নির্বাচনে মূল লড়াই হবে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের বিশ্বাসীদের। কাজেই আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে একটা নজীর করে রাখো, যাতে ভবিষ্যতে যুক্তফ্রন্টের কথা ভাবলেই পশ্চিমবঙ্গের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় ২১৮টার সংখ্যাধিক্য নিয়েও সরকার করতে পারে না। যুক্তফ্রন্ট—যার নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বিপ্লব ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় গণতন্ত্রী তথা সোস্যাল ডেমোক্রাট। কাজেই মার্কস-বাদী হোক আর সোস্যাল ডেমোক্রাটই হোক, কেউ নয়। গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী কংগ্রেসই হলো একমাত্র ভরসা।

এই সঙ্গেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি কংগ্রেস আবার নতুন জীবন পেয়ে ক্ষমতায় আসবে? এই প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ ও সরল এবং এই জবাব সম্পর্কে কংগ্রেসীদেরও কোন মোহ থাক-বার কথা নয়। সেই কথা হল, বামপন্থী-দের যে দুর্গতি হোক না কেন, বামপন্থী-দের নিজেদের রাজনীতি যতই নিয়োগান্ত হোক না কেন, আজকের এই [illegible] ও কালহরণের মধ্য দিয়ে অথবা পাঁচবার [illegible] রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্য দিয়ে কি কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের কোন সম্ভাবনা আছে? এর জবাব সহজ ও সরল এবং এক কথায়—'না'। কংগ্রেসের নতুন জীবন লাভের যদি কোন সম্ভাবনা থাকে, সেটা সম্ভব হলেও অনেক দেরীতে হবে এবং তখন আজকের কংগ্রেসের ফরমও থাকবে না। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কংগ্রেস বা পি-এস-পি [illegible] কংগ্রেসের সঙ্গে নীতি ও [illegible] বৌদিক [illegible] নতুন দলে [illegible] হয়েছে। কিন্তু আজ [illegible]-

তো/না ... তারা যে কথা বলছে, সেই তো হল আসল কংগ্রেসের কথা। কাজেই কংগ্রেসের অনুরাগী মানুষের দল আজ তাদের চিন্তা, মনন ও আদর্শ রূপায়ণের সংগঠন হিসাবে এই সব দলের প্রতি ঝুঁকবে। কংগ্রেস যে ৪১ ভাগ ভোট গত নির্বাচনে পেয়েছে, সেই ভোট তো এই সব দলই পাবে। কারণ কংগ্রেস সমর্থকরা বুঝেছে—কংগ্রেস আজ আর তাদের আশা-ভরসা, আশ্রয়ের স্থল নয়—সেই স্থান দখল করেছে বাংলা কংগ্রেস সহ তার সমধর্মীরা। কাজেই কংগ্রেস নয়, এটা ধরে নেওয়া ভাল। যদি রাজ্য কংগ্রেসে প্রগতিপন্থী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, যদি সাধারণ মানুষের চাহিদা ও সংগ্রামের আশা পূরণে কংগ্রেস গণ-সংগঠনের রূপ নেয়, তবে অবস্থার কিছু হেরফের হতে পারে। কিন্তু শাসনক্ষমতা দখল করার শক্তি কংগ্রেস অর্জন করবে না। এর পরই তাহলে প্রশ্ন আসে—'কংগ্রেস নয়, তবে কে?' এই তবে কে—এর জবাব পাওয়া সহজ নয়। কারণ এখনও রাজ্য-রাজনীতির শক্তি সমাবেশ, জোটবাঁধা রাজনীতির পরিপূর্ণ রূপ ফুটে ওঠে নি। যদি সি-পি-এম ও বাংলা কংগ্রেস আজকের মত দুই শিবিরের প্রান্তসীমায় থাকে, তবে অন্য সব দল কে কোথায় যাবে, এক্ষুণি বলা সহজ নয়। কিন্তু সেই কথা বলা ... না হলেও একটা কথা ... সহজেই বলা যায় যে, দুই শিবিরের কেউ কিন্তু কাউকেই একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন না—যে কথা আজকে দুই শিবিরের নেতারা অহরহ বলছেন।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যতই সি-পি-এম-এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করুন আর শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে যতই বিশ্বাসঘাতক বলুন, জনসমর্থনের পাল্লায় উভয় শিবিরই প্রায় সমান সমান রয়েছেন। ক্ষেত্রবিশেষ কেউ বেশি, কেউ কম আছেন। কিন্তু রাজ্য-রাজনীতির শক্তি বিচারে কারো শক্তি কারো কাছে একেবারে অগ্রাহ্য করবার মত নয়। কয়েক দিন আগে সি-পি-এম দলের একজন নেতা আমাকে বলছিলেন—একটা কথা জেনে রাখুন, বিপ্লবের মাধ্যমেই হোক আর নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক, আগামী দিনে শাসনক্ষমতা আমরা দখল করবো। বাংলা কংগ্রেস-সি-পি-আই শিবিরের অপর এক নেতা অনুরূপ জোর দিয়ে বললেন, আগামী দিনে সি-পি-এম-এর অবস্থা কংগ্রেসের চেয়েও খারাপ হবে। শ্রীঅতুল্য ঘোষের কংগ্রেসের মত শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের পার্টিকে তাদের হামবড়া শিবিরের শীর্ষ থেকে পথের ধুলায় ফেলে দেবে। দুই নেতার এই কথা হল তাঁদের রাজনীতির কথা, আত্মবিশ্বাসের কথা, এর সঙ্গে ... সাধারণ ... কতটা মিল আছে, তার পরীক্ষা এখনও হয় নি।

গত দুই মাস ধরে রাজ্যে সব দল যে সব সভা-সমিতি করেছেন, প্রচার অভিযান চালিয়েছেন, সেটা দেখলে কিন্তু একটা কথাই বরং ধরা পড়ে। সেটা হল পশ্চিমবঙ্গে যদি সত্যকার সবল ও শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে দুই-পক্ষই যে জনসমর্থন পাচ্ছেন, তাকে এক খাতে প্রবাহিত করা দরকার। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীসুশীল ধাড়া উভয়ের কাছে উভয়ে যত পরিত্যাজ্য হোন না কেন, উভয় উভয়কে যতই ঘৃণা করুন না কেন, এই দুই নেতার পিছনে যে জনগণ রয়েছে—তারা কিন্তু এই দুই নেতার ঝগড়ার শক্তি জোগাতে সমবেত হচ্ছে না। এই জনগণ কিন্তু শুধু মাত্র একে অপরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে মদৎ জোগাতে আসছেন না। এই লক্ষ লক্ষ মানুষ—যাদের পেটে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, শিশুর শিক্ষা নেই, রোগীর পথ্য নেই, চাষের জমি নেই, জমি একটু আছে তো জল নেই, সার নেই, বীজ নেই, কারখানা-শিল্পে চাকরী নেই, সব মিলিয়ে যে দুঃসহ জীবন রাজ্যের মানুষ যাপন করে, সমগ্র রাজ্য যেখানে সারা

[শেষাংশ ২৯৭৫ পৃষ্ঠায়]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ [illegible] ॥
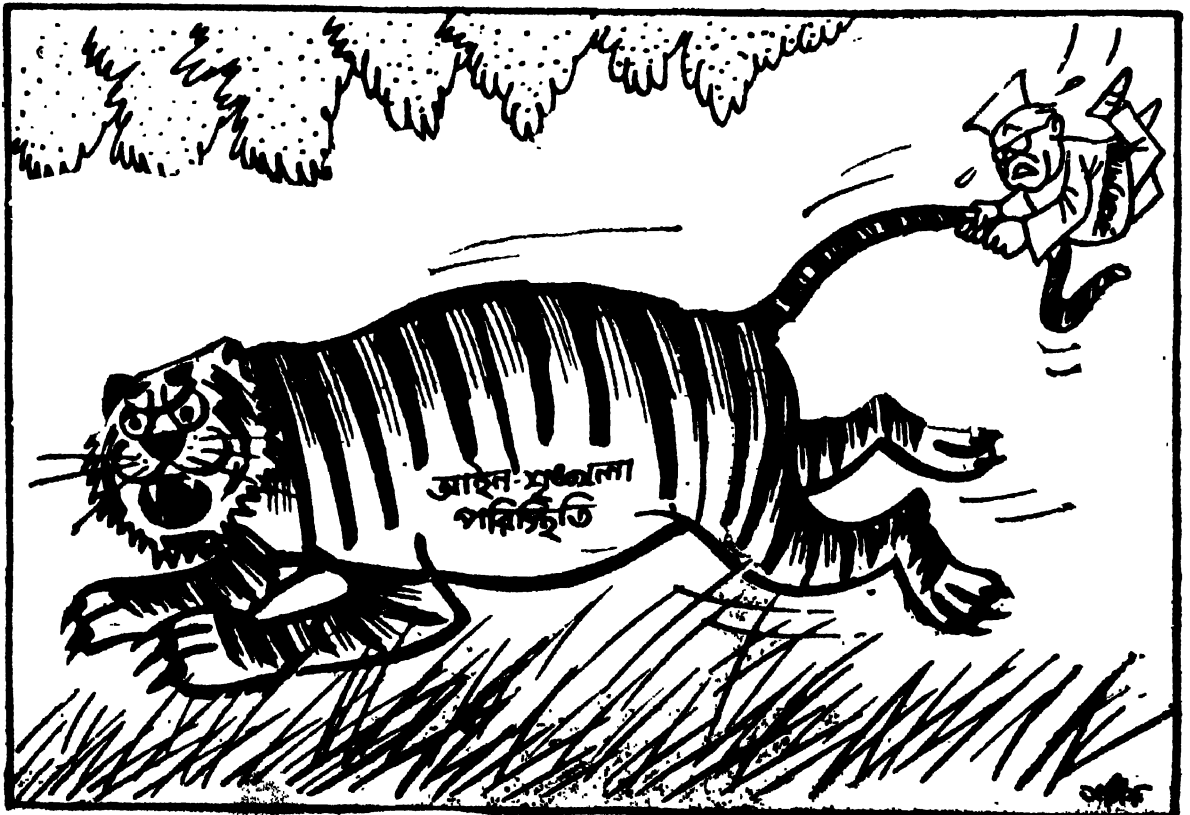
এক জায়গায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক আর শান্ত হলেও অন্যত্র বোধ হয় তা হয় না। কারনানী ম্যানসনে ভোরবেলা যখন স্বামীজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, মনে তখন আমার কোথাও প্রশ্ন ওঠে নি যে, পথে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব। আশ্চর্য! শিয়ালদায় এসে দেখি ভয়ানক কাণ্ড। সকাল হতে না হতেই সারা স্টেশন চত্বর জুড়ে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ। ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ। দমদম, বেলঘরিয়া, টিটাগড়, ইছাপুর, কাঁচরাপাড়ায় হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করেন—সকালের ট্রেন-গুলিতে তাঁরা নিত্যকার যাত্রী। ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ায় তাঁরা আটকে পড়ে-ছেন। চাকরি রক্ষার ভয় আর উৎকণ্ঠায় তাঁরা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। স্টেশনমাস্টার থেকে রেলওয়ে স্টাফ—সবাই নিরুদ্দেশ। কে যাবে সেই বিক্ষুব্ধ জনতার সামনে?

স্টেশনের বাইরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র রোডে– উত্তরে নারকেলডাঙা, দক্ষিণে মৌলালীর মোড়, পূর্বে বেলেঘাটার রাস্তা আর পশ্চিমে আমহার্স্ট স্ট্রীট পর্যন্ত (কি মহাত্মা গান্ধী রোড, কি বিপিন গাঙ্গুলী স্ট্রীট দুদিকেই) একটা বীভৎস হুলস্থুল চলেছে যেন। পুলিশ-কনস্টেবল থেকে রাস্তার আওয়ারা ছেলেরা ইউনাইটেড ফ্রন্ট তৈরি করে ফেলেছে। পটাপট দোকানপত্তরের তালা ভাঙা হচ্ছে, লুণ্ঠিত জিনিসপত্র লরীতে বোঝাই করা হচ্ছে, তারপর সেগুলো তীরবেগে উধাও হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার জনতা আহা-উহু করলে কনস্টেবলরা তাদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। আওয়ারা ছেলেরা পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক সাধের স্টেট বাস—সেই স্টেট বাস চললে যাদের স্বার্থহানি হয়, সম্ভবত এই গোলমালের সুযোগ তারাও গ্রহণ করছে। চেনবার জো নেই কে কি। মহাত্মা গান্ধী রোডে একখানা স্টেট বাস জ্বলছে দাউ দাউ করে। বুদ্ধি করে ট্রাম ইতিমধ্যেই ডিপোয় ফিরে গেছে, নইলে তাও পুড়তে দেখা যেত হয়তো।

জনতাকে ঠেলে আমি এগোতে লাগলাম। এখান থেকে অনেকখানি পথ আমার গন্তব্যস্থল। ট্রাম, বাস, রেল কিছুই যখন চলছে না, তখন হেঁটে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। তাই স্টেশন চত্বর পার হয়ে পথের সন্ধান করতে লাগলাম। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ব্যাপারটা যা ঘটছে তা কত সাংঘাতিক! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত যে কাণ্ড

ঘটছে, এর আসল কারণ কি তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছে না। কেউ বলছে বেলঘরিয়ায় লাইন তুলে ফেলেছে, কেউ বলছে বেলঘরিয়ায় নয়, যাদবপুরে। কেউ বলছে ওভারহেড ইলেকট্রিক লাইনের তার চুরি হয়েছে, তাই এই অবস্থা, আবার কেউ কেউ একথাও বলছে কোথায় নাকি মালগাড়ি পড়ে গেছে। তাই পথ ব্লকড, তাই ট্রেন চলাচল বন্ধ।

লোকের ভিড় ঠেলে আসছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল একদিকে কতকগুলো প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে। সম্ভ্রান্ত যাত্রী তাঁরা। কোন কোন গাড়িতে মহিলারাও রয়েছেন। সকলেরই মুখে-চোখে উদ্বেগের চিহ্ন। স্বাধীন দেশে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকতে এমন একটা কাণ্ড প্রকাশ্য রাস্তায় দীর্ঘকাল একটানা কি করে চলে, তা ভাবলেও যেন বিস্মিত হতে হয়। এর কারণ কি, কে বা কারা আছে এর পিছনে? পিছন থেকে কলকাঠিই বা নাড়ছে কারা?

এই সব ভাবতে ভাবতে গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম।

একটি যুবক হন্তদন্ত হয়ে একখানা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ভিতরে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সম্বোধন করে বললে, 'বাবা কোন আশা নেই। আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'ব্যাপারটা কি?'

'প্রায় দশ-পনেরো কিলোমিটার ওভার-হেড ইলেকট্রিক তার কেটে নিয়ে গেছে মিসক্রিয়েন্টসরা!'

'বল কি?'

'হ্যাঁ আমি টেলিফোন করেছিলাম ডি-এসের বাসায়। তিনি বললেন এই কথা।'

যুবকটির কথাবার্তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দশ-পনেরো কিলো-মিটার ওভারহেড ট্র্যাকসনের তার চুরি! তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন্ জায়গায় মশাই?'

যুবকটি বললে, 'বেলঘরিয়ার পর থেকে পর পর নর্থে।'

জি-আর-পি আছে, আর-পি-এফ আছে, তবু এ তার কাটা কি করে সম্ভব, কথাটা আমার মনে ঘুলিয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু আমি এ বিষয়ে যে একেবারে অজ্ঞ তা তো নই। তবু মনের মধ্যে কিছু-কিছু সন্দেহ, কিছু অবিশ্বাস যে না হল এমন নয়। রেল কর্তৃপক্ষ বিনা টিকিটের যাত্রী ধরার নানারকম চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু রেলযাত্রীর বিনা টিকিটে ভ্রমণের সামান্য টাকার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা, প্রচার ও দার্শনিক তত্ত্ব তাঁরা ব্যয় করেন, তার শতাংশের একাংশ চেষ্টাও যদি তাঁরা করতেন এই তার চুরি, ওয়াগন ভাঙা, লাইন পাচার করার ব্যাপারে, তাহলে এর চেয়ে অনেক, অনেক গুণ বেশি আয় হতে পারত রেলের। এমন কি, মাঝে মাঝে আমি একথাও ভাবি—রেলের যে আয় হতে পারে তা দিয়ে ভারতবর্ষের নিভৃততম পল্লীতেও রেলকে প্রসারিত করা যায়। তার জন্য বিদেশের কাছে আমাদের হাত পাততে হবে না। কিন্তু সেদিকে কর্তৃপক্ষের কোন দৃষ্টি নেই অথবা সেদিকে দৃষ্টি দেবার পথ অবরোধ করে রাখা হয়—এর কোন একটা নিশ্চয়ই সত্যি কিংবা হয়তো দুই-ই সত্যি।

প্রাইভেট কারগুলোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা আরেকখানি গাড়ির ভিতরে হঠাৎ আমার নজর পড়ল। বিস্ময়ান্বিত-ভাবে আমি সেদিকে ভাল করে তাকালাম। আমি ঠিক দেখছি, না ভুল করছি! ঐ তো সেই লোকটা, সেই কালোয়ার আর মাড়ো-য়াড়ী ভদ্রলোক। সেই যে সেদিন, যেদিন আমি প্রথম গিয়েছিলাম ওস্তাদের আড্ডায়, সেদিন ফিরে [illegible]র সময় যখন বসন্তের লোকেরা আ[illegible] চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে

গিয়েছিল আর যখন সেখানে আমার চোখ খুলে দেওয়া হয়েছিল, তখন তো আমি ওদের দেখেছিলাম। হ্যাঁ, ওরা সেই লোক। কিন্তু ওরা এখানে কেন?

মনে প্রশ্ন জাগামাত্রই আমার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। আপাতত চলে যাওয়ার সংকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে আমি ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কালোয়ার সাহেব, (ভান্ এই নামে ডেকেছিল) ব্যাপার কি?'

'আপ কোন্ হ্যায়?'

'জান্‌তা নেই—দসন্ত কো আভা মে।'

এবার মারোয়াড়ী ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন, 'হুঁয়া গিয়া আপ?'

বললাম, 'দেখা নেই? উস্ রোজ ভান্ থা, ষসন্ত থা, ওস্তাদ ভি থা—আপকা লোয়েন্দা হামকো লে গয়া থা হুঁয়া—'

কালোয়ার বললে, 'হাঁ হাঁ, উস বখত্ আপকা সাথ্‌কা ড্রেস রহা—আঁখ ভি বন্ধ রহা।'

'হাঁ, হাঁ', বললাম, 'তব্ তো আপ পহ্চান লিয়া।'

এর পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে এসব কি ব্যাপার?'

কালোয়ার বললে, 'খেল লাগা দিয়া।'

আমার আর বুঝতে বাকি রইল না। সেদিন দামী মেটালের ওয়াগন ব্রেক ব্যাপারে নষ্ট্ আহত হয়ে ফিরেছে আর আজ তার ফলে তার কাটার ব্যাপার ঘটেছে, তফাৎ মাত্র এই।

আমি আর ওদের ওখানে দাঁড়ালাম না। ব্যাপারটার সূত্র আমি পেয়ে গেছি। তাই কৌতূহল হল আরও কি কি ব্যাপার এখানে আছে, সবটা একবার খোঁজ করে দেখে যাই। স্টেশন চত্বরে এক জায়গায় দেখি জনকয়েক স্টেশন হকার বেশ জটলা করছে কাকে যেন ঘিরে। হকারগুলির পাশে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম কাকে ওরা ঘিরে আছে। উঁকি দিতেই যাকে দেখলাম তাকে দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত হলাম। দু পায়ে লাল দগ্‌দগে ঘা, ক্ষত থেকে রক্ত আর পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। হাতের আঙুলে বীভৎস কুষ্ঠ-রোগের চিহ্ন, আঙুলের ডগাগুলো ক্ষয়ে গেছে। মাথায় পট্টি বাঁধা, পরনে চট আর আননে একটা কোন এক ভেজিটেবিল ভেলের দশ পাউন্ডের খোলা টিনে কিছু জল আর পয়সা।

লোকের ভিড়ের মধ্যে সে আমাকে ঠিক দেখে নিলো। উদাসভাবে একটু হাসলও বোধহয়। আমি কাছে গিয়ে বললাম, 'এক আপনা ভেক অদ্ভুত নিয়েছো ভাদু!'

বললাম, 'এরা সব তোমাকে এমন করে ঘিরে আছে কেন?'

'ওরাই তো সব খবরাখবর নিয়ে আসছে—আর সে সব খবর ওদের দিয়েই তো আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'ওরা কারা?'

'ওরা সব হকার। শিয়ালদায় আমরা এদের হকার করে রেখে দিই। অন্য সব হকারদের সঙ্গে মিশে থেকে এরা সব খবরাখবর রাখে। দলকে সময়মতো সে সব খবর যোগায়—তা ছাড়া সুযোগ পেলে এরাও যাত্রীদের মালপত্র সরিয়ে দেয়—'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বসন্ত আসে নি?'

'না।'

'কেন বলো তো?'

'সম্ভবত ও বোসের ব্যাপারে একটু ব্যস্ত আছে। বসন্তর সঙ্গে ওর বরাবর রাত থেকেই খুব হচ্ছে।'

কথাটা শোনামাত্রই আমি কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলাম। মামা বলেছিলেন সেখানেই যান রাত—সকাল-সকাল ফিরবেন। কিন্তু ফিরতে আমি পারি নি। কে জানে মামার কোন বিপদ-আপদ হল কিনা। তবে ভাদুর কথার মধ্যে দিয়ে যেটা পাওয়া গেল তাতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। শঙ্কর নিজে আছে। তা ছাড়া বোসের ব্যাপারে নিয়ে বসন্তর সঙ্গে কাল রাত থেকেই তার খুব হচ্ছে। এক্ষেত্রে সে না থাকলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। তবে সে না থাকলে মামা হয়তো খানিকটা অসুবিধা বোধ করতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওস্তাদ এসব জানে?'

'জানতেও পারে। জীবিশ্য শঙ্কর কি আর না বলেছে।'

আমি এবার আরও আশ্বস্ত হলাম। মামার কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা এখানকার কথাতেই ফিরে এলাম। বললাম, 'তোমা-দের কালোয়ার সাহেব আর মারোয়াড়ী প্রভৃতিকে গাড়িতে দেখলাম।'

ভান্ বললে, 'হ্যাঁ ওদের এখানেই থাকার কথা আছে।'

আমি বললাম, 'খবর কি তুমি ওদের কাছেই পাঠাচ্ছো?'

'না না, ওদের কাছে কেন পাঠাবো—ওরা তো দেখতেই পাচ্ছে।'

'তবে?'

'রেলের কর্তাব্যক্তিদের, ভি-আই সেন্ট্রালকে আর মন্ত্রীমশায়ের বাড়িতে।'

'হঠাৎ ওদের কেন?'

'সকলেরই তো খবর আছে, খুবলেন ত?'

'সত্যি আমি জানি। কেন ভাবো...

ছবি খবরের কাগজে রঙিন পাশাপাশি বেরোয়, সে কি আর আমি বুঝি না, তা ছাড়া রাণীদি-কথিত ছু-ভাড়ুয়ের বোকা গাঁঠটি থেকে জগদীশ পর্যন্ত রাককে যা আমি দেখেছি, কেরানি গেছেকেও তো আমি জানি। এই তো ছোট, এই তো সব মহাপুরুষীয় কাণ্ডকারখানা। এখান-কার ঘটনা দেখে আমি এ সবই তো উপলব্ধি করে নিয়েছিলাম।

মহান্ একটা দেশকে, গোটা একটা জাতিকে অপদার্থ, ভণ্ড, লোভাতুর, ইন্দ্রিয়ের দাস কতকগুলো বিকৃতবুদ্ধি মানুষ কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা তো আর অদেখা রইল না আমার। গত রাত্রে রাণীদি প্রকৃতিস্থ হবার পর অনেকক্ষণ ধরে এসব কথাও হয়েছিল। রাণীদি বলছিলেন, 'বিজন, তুই ধারণা করতে পারবি না—দেশ কোথায়, কোন্ রসাতলে চলে যাচ্ছে।'

আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু এর জন্য দায়ী কে রাণীদি? দায়ী তো তুমিও কম নও—'

'আমি', রাণীদি কি যেন ভেবে বলে-ছিলেন, 'হ্যাঁ, তা কিছুটা নিশ্চয়ই বলতে পারিস। কিন্তু আমি যখন কলেজে পড়তম, তখন কোনদিন এসব কথা ভাবি নি। আমি মনে করতুম আমার দেশের নেতারা দেশকে একটা সহজ সরল পথে সম্মুখ ও মহৎ করে তুলবেন। সেই বিশ্বাস নিয়েই আমি থেকেছি। নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ে যখন এপথে এসে পড়লুম, তখন আমি চমকে গেলুম আসল রূপটা দেখে। প্রথম প্রথম আমার খুব কষ্ট হত মনে—কিন্তু সে কষ্টকে আমি তেমন আমল দিই নি পরে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-জ্বালা—তার জন্য আমার বাবা, আমার স্বামী দায়ী, তাই আমি যেয়ে যারা কর্মচারী তাদের ছোট করতে চাই নি, তাদের প্রতি কোন কটাক্ষও করতে পারি নি। কিন্তু যত দিন গেছে, ততই আমার মন বিষিয়ে উঠেছে। ওদের অনাবৃত নগ্ন চেহারা দেখে ওদের সম্বন্ধে আমি খুব বিরূপ মনে করতে পারি নি, ভাল বলে নিজেকে মনে ওদের সম্বন্ধে আমি কোন শান্তিও পাই নি। এমন কি বলতে আমার দ্বিধা নেই বিজন, যে উঁচু মন নিয়ে সারাটা জীবন আমাকে লড়াই করতে হয়েছে নিজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে, সেখানে ওদের নীচতা আর নোংরামি দেখতে দেখতে আমারও মনটা যেন ছোট হয়ে গেছে। আজ সেই ছোট মনকে বড় করে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, তোকে আমি কি বলতে চাইছি—'

আমি অনুমান করেছিলাম রাণীদির বেদনাটা। কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটিমাত্রই প্রশ্ন ছিল, রাণীদি কি এই...

ছিলে কেন এ পথে? রাণীদির কাছে সেই প্রশ্নের উত্তর না পেলে তাঁর এসব কথার প্রকৃত অর্থ আমার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তবে একথা ঠিক, রাণীদির কথাগুলো উড়িয়ে দেবার মতও নয়। কাজেই গত রাতে তাঁর সঙ্গে যে কথা হয়েছিল আজ সে কথাটা কত সত্য তা প্রত্যক্ষ করে আমার মানসিক অবস্থাটা কি, তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি। এর পর রাণীদি কি মনে করে আর কি ভেবে বলেছিলেন জানি না—তবে বলেছিলেন, 'নিজন, একদিন তুই সব কথাই জানতে পারবি—জানতে পারবি আমার মানসিক অবস্থা। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নয়—'

জানি না কিভাবে তা জানতে পারব? তবে একথা নিশ্চয়ই যে, সে জানার মধ্যে দেশের কথা নিশ্চয়ই থাকবে। কেননা, রাণীদির বর্তমান মানসিক কাঠামো তারই ইঙ্গিতে পূর্ণ।

সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে যা ঘটেছিল পরদিন সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি ছিল, তা হচ্ছে আওয়ারা ছেলেদের আর পুলিশকেও স্বচক্ষে লুঠপাট করতে দেখেছিলেন তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী। এই খবরটুকুই দেশের প্রশাসনকে বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। অবশ্য বলা বাহুল্য, চীফ সেক্রেটারী দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

সমস্ত পথটা অতিক্রম করে আসতে সেদিন আমার অনেক দেরী হয়ে গেল। পথে আসতে আসতে কেবলই ভাবতে লাগলাম, রেলের তার কাটা হয়েছে, সে তার ঘুরে আবার রেলেই আসবে। বড় বড় অফিসারদের কল্যাণে সেগুলো আবার কেনা হলে, আবার টাকা খরচ হবে। এমনি করে লুণ্ঠন ও বণ্টন না হলে এ তার যাবে কোথায়? কে এর খরিদ্দার হতে আসবে? কোনও ভদ্রলোক তাঁর গৃহস্থালী কাজের জন্য ঐ সব জিনিস তো কিনতে পারেন না। দশ কিলোমিটার তার কোন

প্রতিষ্ঠান না কিনলে আর কেই বা কিনবে? কাজেই এ তার কোথায় যাবে, তা বোধ-হয় না বললেও চলবে। তারপর এই ট্রেন চলাচল বন্ধ। যাত্রী বিক্ষোভ হচ্ছে। লোকে বিব্রত বোধ করছে। গোলমাল হচ্ছে খুবই, সুতরাং লুণ্ঠনরাজের কি মওকাই না মিলেছে। সমাজে যারা উঞ্ছবৃত্তি করে খায়, যারা সমাজবিরোধী—শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা, তারাও সুযোগ খুঁজছে। একে আমি কি নামে অভিহিত করব তা আমি জানি না, তবে সত্য যা তা সত্য। এর জন্য শুধু কি ওস্তাদ থেকে ভানু আর কালোয়ার, মারোয়াড়ী প্রভৃতিকেই দায়ী করব, দায়ী করব কি শিয়ালদার কয়েকটা হকার আর রাস্তার আওয়ারাদের? এরা সামনের সারিতে আছে সত্যি, কিন্তু এদের পিছনে কে বা কারা এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে চলছে, তা কি একবারও তলিয়ে দেখব না?

এই সব ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভানুর কথাটাও আমার মনে পড়তে লাগল। সে বলেছিল, কাল রাত থেকে বোনকে নিয়ে বসন্তর সঙ্গে শংকরের খুব হচ্ছে। বসন্ত নিশ্চয়ই মায়ার ব্যাপারে এমন কিছু করেছে যা শংকর বরদাস্ত করতে পারে নি। আহা, মায়া প্রভাতের অনাঘ্রাত সদ্য বিকশিত কুসুমের মত পবিত্র ও সুন্দর একটি মেয়ে। তাকে যদি বসন্তর মত একটা ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তবে কার মন না তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠবে। আর শংকর সে জায়গায় যখন তার ভাই, তখন সে কখনো চুপ করে থাকতে পারে? তাই বসন্তর সঙ্গে তার খুব হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কে জানে, সে খুব হওয়াটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে? বসন্ত যে ধরনের সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক, তাতে ব্যাপারটা খুনোখুনির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছনোও খুব অস্বাভাবিক নয়। যদি তাই হয়, তাহলে কি হতে পারে? তাতে শংকরও তো খুন হয়ে যেতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে মায়ার কি হবে? শেষ পর্যন্ত তো বসন্তই জিতবে আর তার সেই জেতার মধ্যে দিয়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে মায়ার! ছিঃ ছিঃ, ঠিক এই সময়টাতেই আমি নেই। আমার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আমি জোরে জোরে পা চালিয়ে চলতে লাগলাম!

শেষ পর্যন্ত, অনেক বেলাতেই আমি এসে পৌঁছলাম মায়াদের বাড়িতে।

বাড়িতে তখন অদ্ভুত দশা। মায়া বসে আছে মাঝখানে আর তাকে ঘিরে মাধু, মেনকা, পাঁচীর মা আর মা। এভাবে ওদের সবাইকে বসে থাকতে দেখে আমি যেন কেমন নির্বাক হয়ে গেল নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে যার জ এইরকম একটা পরিস্থিতি। আমা দেখেই মা বলে উঠলেন, 'কোথায় ছি বাবা—এখানে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।'

ঝড়? বুকটা আমার ছ্যাঁৎ ক উঠল। তবে কি আমি যা ভেবেছিলা তাই ঘটেছে।

মায়া ইতিমধ্যে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাদা আপনাকে আমি বলেছিলুম—যেখানেই যান একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন। দেখলুম। আপনি খুব তাড়াতাড়ি ফিরেছেন!'

মাধু মায়াকে ধমক দিয়ে বলে উঠল 'রাখ তোর কথা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'দাদা শীঘ্র আপনি যান একবার ওস্তাদের আড্ডায়। ওখানে এক্ষুনিই হয়তো খুনোখুনি যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে। মায়ার দাদাও ছাড়বার পাত্র নয় আর বসন্তর কুষ্ঠিতেও ওসব নেই। দুজনে যেন ক্ষেপে বেড়াচ্ছে—'

এ কথা শোনার পর সেখানে আর দাঁড়ানো যায় না। আমি ছুটলাম আড্ডার দিকে। মাথার ওপর তখন শীত-মধ্যাহ্নের সূর্য। অসূর্যম্পশ্যা শান্তির পথে ছড়িয়ে পড়েছে রোদ, কাল থেকে একটানা শরীরের শিরা-উপশিরার ওপর চাপ পড়ে আসছে। নিজেকে বেশ ক্লান্তও মনে হচ্ছিল। তার ওপর আবার এই উদ্বেগ। তাই শীত-মধ্যাহ্নের রোদটা যেন আমার ভাল লাগছিল না, গ্রীষ্ম-দুপুরের মতই কেমন যেন জ্বালাময়ী বলে মনে হচ্ছিল। প্রায় একরকম ছুটতে ছুটতেই আমি এসে হাজির হলাম। দরজায় দেখি টুমটুনি দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখামাত্রই সে বলে উঠল, মামাবাবু, শীগ্গির যান—শীগ্গির। এখানে ঝড় বয়ে চলেছে। দেখুন, যদি থামাতে পারেন—'

'কে কে আছে এখানে?'

'ওস্তাদ আর শংকর।'

'তোমার বসন্তকাকা?'

'বসন্তকাকা গেছে পাইপগান নিয়ে আসতে।'

'এখন তাহলে খুনোখুনি হতে বা বাকি?'

'হ্যাঁ—আপনি শীগ্গির যান।'

তেমনি করে দরজা খুলে ডাক্তার মুখার্জী আর বনানীর সামনে দিয়ে চকিতে একবার শয্যায় শায়িত মন্টুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে আমি সিঁড়ির পথে উঠে গেলাম ওপরে। দরজা খুলতেই দেখি শংকর ফুঁসে উঠে ওস্তাদকে বলছে, 'আপনি—আপনিই এর জন্য দায়ী ওস্তাদ। আপনি নিজের জীবনকে বরবাদ করেছেন, আমার জীবনকে বরবাদ করেছেন—আর ওকে, ওকে আপনি প্রশ্রয় দিয়েছেন।
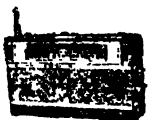
[illegible]

তোমার সুরের সূর্যকাল যখন মেলে আলোর পাখা,
সিঁদুর-রাঙা মেঘের বুকে
বজ্রবাহন কথা নিয়ে খেলা করে,
কিম্বা গভীর দুঃখসুখে
আবেগ ভরে
স্বর্গ গড়ে
মর্ত্যলোকে;
রুদ্র শ্লোকে
উথলে ওঠে জীবন মরণ,
বুকের মধ্যে সিন্ধু ক্ষরণ,
সোজাসুজি
সবাই তখন
নিজের মধ্যে তোমায় খুঁজি,—

রক্ত স্রোতে বাজবে কিনা
অগ্নিবীণা!

তোমার সুরের সূর্যকাল যখন মেলে আলোর পাখা,
রক্তমশালে দিকদিগন্ত আগুনে-মাখা।

তথাগত

আভা মুখোপাধ্যায়

রাজসিংহাসন ছেড়ে বেছে নিলে কেন ভিক্ষা বল
ঘরেতে তরুণী ভার্যা যশোধরা রূপ-সমুজ্জ্বলা;
অনুভব করেছিলে বুঝি তুমি একটা না হলে পরে সুখ
সারা বুক জুড়ে লাগে বড় বেশি অসুখ অসুখ
মৃগয়া ও রাজসভা ছকেবাঁধা আমোদ-প্রমোদ,
আনে না মনের তৃপ্তি ঘোচায় না দীনতার বোধ;
নিরুদ্বেগ শয্যা ঘিরে চিন্তাহীনতার কষ্টে ঘুমহীন নিশা,
অনায়াস-লব্ধ অন্ন মুখে দিতে অনীহায় আসে বিবমিষা;
এবং তারও পরে যৌবনের অন্তে আছে অপেক্ষায়
শোক-মৃত্যু-জরা,
রাজপুত্রে দীনপুত্রে কোনই প্রভেদ নেই
বড় পক্ষপাতহীন কালের প্রহরা!

তাই কি প্রব্রজ্যা নিলে মধুকরী শেষে গাছতলা,
সারাদিন শ্রান্তিহীন নগরে ও গ্রামে গ্রামে চলা,
ভিক্ষা করে পাওয়া শস্য আনে তৃপ্তি আনে ঘুম গাঢ়,
আয়াসের থেকে মুক্তি সেই কি নির্বাণ,
আনন্দে যার, পালির পল্লিতে,
দর্শনের ফুল ফোটে আরও আরও আরও।

আপনি জানেন না ও কত নিচুস্তরের লোক, কত নিষ্ঠুর, কত অত্যাচারী? ওকে আপনি ভয় করেন।'

ওস্তাদ চিৎকার করে বলে উঠলেন, শংকর! সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। তুমি, শুধু তুমি কেন, এখানকার প্রত্যেকটা মানুষ জানে, আমার স্নেহ-ভালবাসা যদি কেউ পেয়ে থাকে তবে সে তুমি। তোমাকে আমি নিজে হাতে গড়ে তুলেছি, কিন্তু বসন্তকে আমি ভয় করি নি। তোমার মনে আছে, যেদিন তুমি জেল থেকে পালিয়ে এলে সেদিন খবরটা শুনে আমিই তোমাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ তুমি আমার কাছে আসো নি। তুমি গিয়ে বসন্তর ওখানেই উঠেছিলে। কাজেই ভয় তাকে কে করে—আমি, না তুমি?'

'সেটা আমার ভুল হয়েছিল ওর ওখানে ওঠে। কিন্তু ভয় তাকে আমি করি নি!'

'ভয় না করে থাকো ভালই। তবে আমার ওপর অভিযোগ করছ কেন যে, আমি তোমার জীবন বরবাদ করে দিয়েছি?'

'আমি তো আরও একটা অভিযোগ করেছি আপনার বিরুদ্ধে?'

ওস্তাদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন শংকরের দিকে। শংকর বললে, 'আপনার নিজের জীবনকেও আপনি বরবাদ করেছেন।'

ওস্তাদ যেন কেমন একটু বিচলিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তুমি বোধহয় জানো না, তা ছাড়া তোমার জানবার কথাও নয়। আমার জীবন বরবাদ হওয়ার জন্য তোমার কোন মাথাব্যথা না থাকলেই খুশি হতুম।'

'কিন্তু মাথাব্যথা হয়। কারণ যে মানুষ নিজের জীবন নিজে বরবাদ করে —সে মানুষ অপরেরও করতে পারে!'

'মুখ সামলে কথা বলবে শংকর!'

'না না, আজ আমি আর নিজেকে সামলাতে পারব না। আমি অমানুষ হতে পারি, আমি মরে যেতে পারি, কিন্তু কি করেছে আমার কিংশুক ফুলের মত বোন? কেন, কেন তাকে নর্দমার কীটের মত একটা লোক—সে তাকে বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করবে? তাই হলে কি করে আমি তা সহ্য করব—বলতে পারেন ওস্তাদ, বলতে পারেন?'

'তার জন্যে আমি মোকাবিলা করতে চাই বসন্তর সঙ্গে, কিন্তু তুমি আমার ওপর অভিযোগ করবে কেন?'

'অভিযোগ করি ওস্তাদ জ্বালায়—জ্বালায়। আপনি জানেন, আমরা সবাইকে হারিয়ে পথের ভিক্ষুক হয়ে এখানে এসেছিলুম। মা হাত পেতে টাকা নিয়েছিল আপনার কাছ থেকে—আপনি সেই টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছিলেন। সেই থেকে আমি আপনার কেনা গোলাম। আপনি আমার মা, আপনি আমার বাপ—বসন্ত আমাকে পিটেছে, মেরেছে, এমন কি খুনও করতে চেয়েছে, কই আপনার তো হৃদয় ডুকরে কেঁদে ওঠে নি? আপনি তো তাকে একটুও শাস্তি দেন নি? বলতে পারেন ওস্তাদ আমার জ্বালাটা কোথায়? বুঝতে পারেন আপনি?'

এই প্রথম আমার ওস্তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হল। অদ্ভুত দুটি চোখ। এমনি প্রকৃতিস্থ শান্ত সুন্দর দৃঢ় মানুষরূপে ইতিপূর্বে ওঁকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয় নি। যতবারই দেখেছি, ততবারই তিনি ছিলেন পানোন্মত্ত বিকৃতরুচির শিকাররূপে একটা হিংস্র মানুষ। আমাকে দেখে তিনি কি যেন বলতে গেলেন।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হল যেন এ দৃষ্টিকে আমি চিনি। হয়তো কখনো, কোন সময়ে আমি দেখেছি, আজ আর মনে করতে পারছি না। কিন্ত মুহূর্তমাত্র। তিনি বলে উঠলেন, 'সন্নিসি ঠাকুর না?'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই শংকর আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'দাদা আপনি!'

'তোমার মা'র কাছে শুনেই আমি আসছি।'

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে টুনটুনি ঘরে ঢুকল। বলে উঠল, 'তোমরা পালাও—তোমরা পালাও। বসন্তকাকা পাগলের মত ছুটে আসছে পাইপগান লোড করে!'

ওস্তাদ বললেন, 'আসতে দাও তাকে—'

'না না, তোমরা পালাও—ও তোমাদের গুলী করে মারবে! গুলী করে মারবে!'

শংকর চিৎকার করে উঠল, 'ওস্তাদ!'

ওস্তাদ পাল্টা চিৎকারে বললেন, 'শংকর!'

[ক্রমশ]

না না, হিরোসিমা বা নাগাসাকির সর্বনাশ নয়, পঞ্চাশ বা একশো মেগাটনী পারমাণবিক শক্তিশেলও নয়, প্রত্যাশা-পূরণ বলতে বুঝি, পরমাণুর অমিত শক্তিকে মানবকল্যাণে প্রয়োগ। আশার কথা, শক্তিশেল শাণাবার সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর এই কল্যাণশক্তি নিয়েও ভাবছেন অনেকে।

ভাবনার শুরু আইনস্টাইনের উদ্ভাবন থেকে; এবং তারপর বিকাশ ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর থেকে।

ঐ ৪২ সালের ডিসেম্বরেই পরমাণু-বিভাজন শক্তিকে সর্বপ্রথম মুক্তি দেওয়া হয়। এবং তারপর আশা-নিরাশার মধ্যে পেরিয়ে যায় দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর।

এই সময়টুকুর মধ্যে পরমাণুর কল্যাণ-শক্তিকে আরও স্পষ্ট করে দেখতে পেল মানুষ। ঐ শক্তির মধ্যে সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎকেও অনেকে খুঁজে পেল।

১৯৫১ সালে রসায়নে নোবেল-পুরস্কার বিজয়ী বিশ্ববিশ্রুত পরমাণু-বিজ্ঞানী ডঃ গ্লেন টি সীবোর্গ এঁদের অন্যতম।

সম্প্রতি ইনি পরমাণুর কল্যাণশক্তি সম্পর্কে কিছু আশার কথা শুনিয়েছেন। ডঃ সীবোর্গ বলেছেন, বিগত কয়েক বছর ধরে পারমাণবিক গবেষণার অগ্রগতি আজ এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে, যা' নাকি মানুষের অতি সুন্দর এক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দিক দিয়ে খুবই অনুকূল।

ডঃ সীবোর্গ-এর ধারণাটা অযৌক্তিক কিছু নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবং কল-কারখানায় পারমাণবিক ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ-পদ্ধতি ক্রমেই বাড়ছে; এবং বিশেষ করে বাড়ছে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে। ডঃ সীবোর্গ-এর মতো বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের দিক দিয়েই পারমাণবিক-শক্তি একদিন যুগান্তর আনবে।

সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, স্পেন ইত্যাদি দেশগুলোতে এ-বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য অগ্রগতির প্রমাণ এরই মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, অগ্রগতি যা' হয়েছে এবং ১৯৭৫ সাল নাগাদ যতটুকু হবে, তা' দিয়ে দেশটির ৫ থেকে ৬ কোটি লোকের সবরকম বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। তার তা' ছাড়া, পারমাণবিক শক্তিচালিত 'রিঅ্যাক্টর'গুলো নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ। কয়লা, তেল এবং গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে যে খরচ হয়, তার চেয়ে অনেক কম খরচে ওরা কাজ হাসিল করে। এবং এমন কি যে-সব জায়গায় এই উপকরণগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, সে-সব জায়গাতেও পারমাণবিক শক্তিচালিত 'রিঅ্যাক্টর' ব্যবহার করা সুবিধেজনক। কারণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে ওরা; ওদের অল্প আয়াসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এবং চালানোও যায় যথাসম্ভব নিঃশব্দে। পারমাণবিক জ্বালানি টেকে দীর্ঘদিন, বেশি জায়গা দখল করে না। এবং এসব কিছুর চেয়েও বড় কথা, জ্বলবার পর এরা বিচিত্র সব পদার্থের সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীকে ভাবিয়ে তোলে না। পদার্থ যা' কিছু সৃষ্টি হয় এই প্রক্রিয়ায়, বিজ্ঞানীরা সহজেই তাদের ধরে রাখতে পারেন, অথবা পারেন ফেলে দিতে।

এই 'রিঅ্যাক্টর পাওয়ার প্ল্যান্ট'-গুলোর পরিবেশ অতি সহজেই খুব আকর্ষণীয় রাখা যায়। এদের আশে-পাশের বায়ুমণ্ডলকে রাখা যায় পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব সুবিধেগুলো উপেক্ষণীয় নয় মোটেই। এবং নয় বলেই পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন আগামী দিনে খুব জনপ্রিয় হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হবে খুব অল্প খরচে। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, পারমাণবিক শক্তিকে এভাবে কাজে লাগালে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খরচ বাঁচবে বছরে ১০০ কোটি ডলার।

সমুদ্রের জল এ-ব্যাপারে পরিত্রাতার ভূমিকা নেবে। জ্বালানির উপকরণ ঐ জল থেকেই আসবে। ওখানে আছে যে 'হেভী হাইড্রোজেন', বিজ্ঞানীরা তার সাহায্য নিয়ে অবিশ্বাস্য রকম অল্প খরচে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করবেন।

আগামী দিনের এই বিদ্যুৎশক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। এবং বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট থেকে সম্প্রতি জানা গেছে, সমুদ্রজলস্থিত এই 'হেভী হাইড্রোজেন'কে 'ফিউসান' নামক এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শক্তি-উৎপাদক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আজকাল শক্তি-উৎপাদন চলছে 'ফিসান' বা পরমাণু ভাঙার মধ্য দিয়ে। 'ফিউসান'-প্রক্রিয়ায় ভাঙা হবে না পরমাণু, যুক্ত করা হবে; এবং প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তিকে বের করে নেওয়া হবে এই যুক্ত-করার অবসরে।

এখন অবধি যত দূর খবর পাওয়া গেছে, তা থেকে বলা যায়, এই 'ফিউসান'-প্রক্রিয়াটি চালু করা কঠিন খুবই। তবে একবার যদি একে চালু করা যায় তো বিরাট ও বিপুল এক শক্তির সিংহদুয়ার মানুষের সামনে খুলে যাবে।

এই শক্তির আসল চেহারাটা কী রকম?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উঁচুদরের পেট্রোল-ভর্তি ৫০০টি প্রশান্ত মহাসাগর থাকলে তাদের থেকে যে-রকম শক্তি পাওয়া যেত, ঠিক সেরকম।

অর্থাৎ, সোজা কথায়, শক্তির আধারটি এক্ষেত্রে অপরিমেয় হবে; এবং মানব-কল্যাণের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যাবে এই শক্তিকে। চাষবাসে, কলকারখানায় এর আশীর্বাদকে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ, এক কথায়, স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে পৃথিবীতে।

কিন্তু সত্যি কি তাই হবে? দুঃখে-শোকে, অভাবে-অভিযোগে জর্জরিত পৃথিবীতে কোটি কোটি হতভাগ্য, বুভুক্ষু মানুষের মতো বাঁচবার প্রত্যাশাকে কোনোদিন পূরণ করবে পরমাণু?

নজরুল জীবনের একটি রহস্যজনক প্রশ্ন এই যে, নজরুল তাঁর মায়ের ওপর অভিমান করলেন কেন? এই দুর্জয় অভিমানের জন্য কখনও কবি তাঁর মায়ের কাছে চুরুলিয়ায় আর গেলেনই না, হুগলী জেলে অনশনের সময়েও মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না, এমন কি মৃত্যুর সময়েও মায়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে কবি একটিবারও দাঁড়ালেন না কেন? এই দুর্জয় অভিমানের কারণ কি?

এ বিষয় কবি নিজের কাব্যে স্বল্পন্য আর ইঙ্গিত দিয়েছেন :

"নিজবাস হল চির-পরবাস,
জন্মের ক্ষণ পরে
বাহিরিনু পথে গিরিপর্বতে—
ফিরি নাই আর ঘরে।
পলাতক শিশু জন্মিয়াছিনু
গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ঝরিতে
আসিলাম ছুটে চলে।"
(পথচারী: চক্রবাক)

এ সম্বন্ধে নজরুলের পরম ভক্ত কবি আবদুল কাদির আমাকে ২৩।৭।৬৭ তারিখে এক পত্রে লিখেছেন, "আপনি হামিদুল হক সাহেবের (হুগলী কংগ্রেস) কাছ থেকে নজরুলের সেই চিঠি উদ্ধার করতে চেষ্টা করবেন— সেই চিঠি কবি ও কবিমাতার সম্পর্কের একটা মস্ত দলীল। যদি মূল চিঠি হামিদুল হক দিতে অস্বীকৃত হন, তবে photostat কপি করিয়ে আমাকে পাঠাবেন। আপনি এ বিষয়ে আমার স্বপক্ষের সাহায্য নেবেন।"

এই চিঠি পাওয়ার পরই হুগলীতে আমি হামিদুল হক ও তাঁর ছোট ভাই বিপ্লবী সিরাজুল হককে চিঠি দিলাম। তাতে সিরাজুল হক ৮।৮।৬৭ তারিখে জবাব দেন, "দাদার (হামিদ) সঙ্গে দেখা করে জানলাম এবং আমি বা তুইও জানিস যে নজরুল দাদাকে তখন হুগলী জেল থেকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু অনেক দিনের কথা। আমরা জেলে চলে গেলে সব কোথায় তছনছ হয়ে যায়। তবে যতদূর মনে পড়ে কাজীদার বৈমাত্র ভাই হোল সামসুদ্দীন সাহেব, কাজীদার মাকে নিয়ে হুগলী জেলে দেখা করতে আসেন। সে ব্যাপারে তোমরাও কোনাকোন জিজ্ঞা। কাজীদা কেন তার বিমাতার সঙ্গে দেখা করেন নি, সেটা সঠিক বলা যাবে না। তবে তাঁরা যে দেখা করতে এসে দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন সেটা ঠিক।"

বহুদিনের কথা। সিরাজ যা হামিদ নজরুলের মাকে বিমাতা বলেছেন এটা ঠিক নয়। এই দুটি চিঠির মাধ্যমে, এবং বহু লেখকের সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি নজরুলের সঙ্গে তাঁর মায়ের একটা অভিমানের পালা বেশ গভীরেই প্রসারিত হয়েছিল। হুগলীর উক্ত বিপ্লবী সিরাজুল হক বলছেন বৈমাত্র ভাই সামসুদ্দীন সাহেব, সামসুদ্দীন নয়, আর বৈমাত্র ভাইও নয়, গ্রামস্থ জ্ঞাতিভাই জনাব আবদুর রহিম। এটা হয় সিরাজের কিছুটা স্মৃতিভ্রষ্টতার জন্য ওকথা বলেছেন, নয়ত তখন যা শুনেছিলেন তাই লিখেছেন। কিন্তু আমি ১২।১০।৬৬ সালে আমার পরিবারাদি সহ নজরুলের জন্মভূমি চুরুলিয়ায় বেড়াতে যাই। সেখানে প্রায় আশি বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ জনাব কাজী আবদুর রহিমের সঙ্গে দেখা হয়। আমি হুগলীর লোক শুনে বললেন যে, "আমি বহুদিন পূর্বে হুগলীতে গিয়েছিলাম নজরুলের মাকে নিয়ে।" তিনি হামিদুল হকের নামও করলেন। সে আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর

পূর্বের কথা (১৯২০-১৯৬৮)। আমি রহিম সাহেবকে মা ও ছেলের মান-অভিমানের ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। তাতে আমার ধরা-ছোঁয়া দিলেন না।

আমি তাঁকে এও বললাম যে, পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে নজরুল ও তাঁর মায়ের সম্পর্ক নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে, অথচ কেউ নির্দিষ্ট কোন কথাই বলতে পারছেন না, এ-রহস্য আপনাদের উদ্ঘাটন করা উচিত। কারণ নজরুল যেরকম মাতৃভক্ত ছিলেন, তাতে কবির মায়ের প্রতি এমন মারাত্মক অভিমান কেন হল যে, ১৯২০ সালে পল্টন থেকে সাতদিনের ছুটিতে এসে চুরুলিয়ায় একবার যাবার পর আর কেন জীবনে সেখানে গেলেন না? জেলে মায়ের সঙ্গে দেখা তো করলেনই না, বরং সেখানে নজরুলের কবি-মাতা বিরজাসুন্দরীর হাতে পানীয় মারফৎ অনশনভঙ্গ করেন। পরে সর্বহারা গ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করে লিখলেন :

"সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার"

এটাও তো ভাবা উচিত যে, এই অস্বাভাবিকতার পথে কবিকে কে প্রেরণা দিল?

কাজী আবদুর রহিম সাহেবকে বললাম যে, আমরা হুগলীর লোক। হুগলী জেলে নজরুল যখন ছিলেন, তখন আমরাই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নজরুলের মাকে ও আপনাকে সাদরে গ্রহণ করি; নজরুলের সঙ্গে [illegible] আপনি যেমন আবদুল [illegible] শুধু জানতে চাই নজরুলের মায়ের ওপর অভিমানের কারণ কি? তিনি এর কোন উত্তর দেন না। তখন তাঁকে বলি যদি এ বিষয়ে আপনার বলার কিছু থাকে তা হলে আপনি বা আপনারা সঠিক কথা বলুন, অথবা রহস্যাবৃত করে রাখছেন কেন? এও দেখলাম সারা ভারতে নজরুলকে নিয়ে এত যে লেখা, উৎসব, গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছে তার খবরও ওঁরা রাখেন না বা জানবার আগ্রহও নেই।

মুজাফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "কলকাতায় ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির বাড়িতে দুদিন থাকার পরে নজরুল ইসলাম তার জিনিষপত্র সেখানে রেখে দিয়ে চুরুলিয়া গ্রামে তার নিজের বাড়িতে চলে যায়। আমার যতদূর মনে পড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সে সাত-আট দিন ছিল। এই সময়ে তার মায়ের সঙ্গে কিসের একটা মান-অভিমানের ব্যাপার তার ঘটে, তারপরে যতদিন মা জীবিত ছিলেন, ততদিন তো সে চুরুলিয়া গ্রামে যায়ই নি, মায়ের মৃত্যুর পরেও সম্বিৎ থাকা অবস্থায়ও সে আর কখনও চুরুলিয়া গ্রামে ফেরে নি।" তা ছাড়া আহমদ সাহেব আরও লিখেছেন, "নজরুলের গর্ভধারিণী মা হুগলী এসেছিলেন। মা'র সঙ্গে নজরুলের কি একটা প্রচণ্ড মান-অভিমানের ব্যাপার ঘটেছিল। পল্টন হতে ফিরে এসে সে একবার মাত্র চুরুলিয়ায় গিয়ে আর কখনও যায় নি। মা'র সঙ্গে নজরুল দেখাও করে নি।"১

জনাব আবুল ফজল সাহেব লিখেছেন : "তাঁহার (নজরুল) অনশন ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহার মাতা জাহেদা খাতুনও জেলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহার মাতাকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।"২

স্বর্গত অশোক গুহ বললেন, "হয়তো মায়ে-পোয়ে ঝগড়া হয়েছিল, হয়তো কোন মান-অভিমানের পালা চলেছিল। তাই চুরুলিয়ায় তিনি আর গেলেন না।"৩

[illegible] দুই ছিলাম। তার মধ্যে এইটুকু অনুমান করেছি যে, নজরুলের প্রতি তাঁরা বর্তমানে যে আগ্রহ ও আত্মীয়তা দেখাচ্ছেন, তার রহস্য অন্য খাতে প্রবাহিত। কিন্তু রহিম সাহেব আমাকে প্রশ্নের জবাব দিয়েও দিলেন না, চেপে গেলেন কেন বুঝলাম না।

নজরুল যখন প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করলেন তখন আমরা তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজনকে দেখি নি। বিবাহের পর যখন হিন্দু-মুসলমান সমাজ নজরুলকে বর্জন করলেন, তখন তিনি কত ছেলে-মানুষ! দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন বলেই অত বিপদের মধ্যেও গর্দান খাড়া রেখে স্থির হয়েছিলেন। এই অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হুগলীর যুগান্তর বিপ্লবী যুবকরা তাঁকে মাথায় করে নিয়ে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেদিন কোথায় ছিল আত্মীয়স্বজন, স্বগ্রামের পড়শীরা? আজ যাঁরা নজরুলকে ভাঙিয়ে খাওয়ার সুযোগ-সন্ধানী, তাঁদের সেদিন দেখাও যায় নি।

তাই আজ যখন নজরুল সম্বিৎ-হারা তখন দেখছি চুরুলিয়ার লোকেরা নজরুলকে নিয়ে যে সব প্রচার করছেন, বিশেষ করে মা ও ছেলের সম্বন্ধ-বিষয়ক, তা' বিশেষ প্রতিবাদযোগ্য। ১৯৬৯ সালের নজরুল একাডেমির নজরুল জন্মজয়ন্তীতে জনাব আবদুর রহিম সাহেবের বক্তৃতা ও বেতার ভাষণে তিনি বলেছেন—

হুগলী জেলে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর মায়ের সাক্ষাৎকার ও কবির অনশন ভাঙার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস।

কাজী নজরুল ইসলামের মা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মরহুম কাজী সাহেবজান ও আমি কাজী আব্দুল রহিম—এই তিনজনে ব্যাণ্ডেল থেকে সকাল ৭টার সময় ঘোড়া-গাড়ি ক'রে প্রথমে হুগলীর তৎকালীন কংগ্রেস অফিসে গেলে কবির মাকে দেখবার জন্য প্রচুর লোকের সমাগম হয় এবং বহু লোক কবির মাকে শ্রদ্ধা জানান। উক্ত কংগ্রেস অফিসের জনৈক কর্মী জনাব হামিদুল হক সাহেব আমাদিগকে তাঁর নিজবাড়ি নিয়ে যথাযথ সমাদর ও আপ্যায়িত করলেন। কবি সাহেবের মাকে সেখানে রেখে হামিদুল হক সাহেবের সহযোগিতায় একটা ইণ্টারভিউ লেটার নিয়ে হুগলী জেলের Superintendent-এর সঙ্গে দেখা করলাম ও কবির সাথে দেখা করবার অনুমতি চাইলাম। Superintendent আমাদের অনুমতি দিলেন। তারপর হামিদুল হক সাহেবের বাড়ি হতে কবির [illegible]

---

১ কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি-কথা—মুজাফ্ফর আহমদ—পৃষ্ঠা ৪৩, ১৯৬৫

২ বিদ্রোহী কবি নজরুল—আবুল ফজল, পৃষ্ঠা ৩৫, পাকিস্তান—১৯৪৮

৩ অগ্নিবীণা বাজান যিনি—অশোক গুহ, পৃষ্ঠা ৩৫, পাকিস্তান ১৯৫৫

মাকে আমরা হুগলী জেলে নিয়ে এলাম। হুগলী জেলের Jailor প্রথমে একটি খাতায় আমাদের তিনজনের সহি নিলেন। তারপর কবিকে নিয়ে আসার জন্য একজনকে আদেশ করলেন, মিনিট দশ পরে দেখলাম জেলের ভিতরের গেট থেকে কবি জেলারকে বললেন, "আপনি আমাকে ডেকেছেন?" জেলার বললেন, "হ্যাঁ, আপনার মা ও ভাইরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" আরও একটি চেয়ার আনিয়ে কবিকে বসতে দেওয়া হল এবং জেলার আড়ালে চলে গেলেন। শুধু Assistant Jailor আমাদের কথা শোনবার জন্য রইলেন এবং আমাদের সঙ্গে কবির কথোপকথন লিখতে লাগলেন। কবি প্রথমে মায়ের পায়ে সালাম করলেন। তারপর বললেন, "তোমরা কি করে সংবাদ পেলে?" আমরা বললাম, "খবরের কাগজ হতে।"

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, হামিদুল হক সাহেবের কথা কাজী আবদুল রহিম সাহেব তাঁর বেতার ভাষণে ও রচনায় বলেছেন। সেই হামিদুল ও তাঁর ভাই সিরাজুলের চিঠিও আমি প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছি। তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, জনাব রহিম সাহেব যা বলেছেন তার সবটুকুই কল্পনাপ্রসূত। এই কল্পনা দ্বারা নজরুলের জীবন নিয়ে শুধু চুরুলিয়া-বাসীই নয়, বর্তমানে সর্বত্রই এই বাহাদুরী করার খেলা চলেছে।

নজরুল ১৮৯৯ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বসাকল্যে চুরুলিয়ায় ছিলেন ১০ বছর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯১২ সালের মাঝামাঝি তিনি চুরুলিয়া ছেড়ে চলে যান। এর ভেতর এক বছর মৈমনসিং ছিলেন। তারপর ফিরে এসে চুরুলিয়ার অদূরে সিয়ারসোল রাজস্কুলের ছাত্র ছিলেন; তাও ছাত্রাবাসেই বেশিরভাগ সময় বাস করতেন। কখনও কখনও চুরুলিয়ায় যেতেন। সিয়ারসোলে ছাত্র থাকাকালেই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে চলে যান ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে। এই হিসাব থেকেই বোঝা যায় জনাব কাজী আবদুর রহিম সাহেব নজরুল সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তিনি বা গ্রামস্থ লোকেরাও তৎকালে এবং এখনও নজরুল সম্বন্ধে যে কত উদাসীন, তারও প্রমাণ মেলে।

হুগলীর হামিদুলের কথা উনি বলেছেন, কিন্তু সেই হামিদুলের সঙ্গে আরও যে সাথী নজরুলের মায়ের সঙ্গে হুগলী জেলে নজরুল সাক্ষাতের সময় ছিল, তিনি সে কথা ভুলে গেছেন। হামিদুল হক, তার ভাই সিরাজুল হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় মোদক প্রমুখ যুগান্তর দলের হুগলীর বিশিষ্ট সভ্যারাও ছিল। সত্য ঘটনা তারাও জানতে পারে এই ভেবে রহিম সাহেবের সংযত হয়ে বলাই উচিত ছিল। তিনি আরও একটি কথা বলেছেন, "সকাল ৭টার সময় ঘোড়াগাড়ি করে প্রথমে হুগলী কংগ্রেস অফিসে গেলে কবির মাকে দেখবার জন্য প্রচুর লোকের সমাগম হয় ও বহু লোক কবির মাকে শ্রদ্ধা জানান।" (ভাষণ দ্রষ্টব্য)

প্রথমত সময়টা ভুল হয়েছে, ওঁরা এসেছিলেন বিকেলের দিকে, তারপর তখন বহু লোক সেখানে ছিল না। কবির মাকে শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই দেখান হয়েছিল। ওঁরা কিছু না জানিয়েই হঠাৎ আসেন, কোথায় গেলে সুবিধা হবে তা তাঁরা না জেনে কংগ্রেস অফিসেই আসেন। বিকেলবেলা বলে সব কর্মী ও নেতারা তখন ছিলেন, কংগ্রেস অফিসে তাঁরাই তাঁদের সাদর সম্ভাষণ করেছিলেন। গল্প বা কাহিনী কল্পনার পাখা মেলে অনেকদূর যেতে পারে, কিন্তু জীবন-কথা বা জীবনী বলা যায় না। অবশ্য বিদ্যামন্দির ও কংগ্রেসের তৎকালীন প্রধান কর্মী হিসাবে ছিলেন হামিদ, সিরাজ ও বিজয় মোদক। এঁদের মধ্যে হামিদুল হক ছিলেন বাহির ভিতরের সংযোগ রক্ষক, সেজন্য নজরুলের সঙ্গে তাঁর মায়ের সাক্ষাতের জন্য দৌড়ঝাঁপ যা করবার তিনিই করেছিলেন। সেইজন্য রহিম সাহেবের তাঁর কথাটা বেশি মনে ছিল। কিন্তু কি ঘটেছিল, সেকথা হয় তিনি ভুলে গেছেন এই পঁয়তাল্লিশ বছর পরে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বিষয় প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ নয় ॥

থানার দারোগার সামনেও বোধ হয় এমন বিপদে পড়তে হয় নি।

দিদির দু' চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলছিল। ভেতরে উত্তেজনা যত বাড়ছে, দিদি ততই ঘেমে উঠছে, ফোঁটায় ফোঁটায় গলে পড়ছে গলার পাউডার। মাথার ওপরে বায়ান্ন ইঞ্চি পাখার ঘূর্ণিতেও দিদির ঠান্ডা হওয়ার লক্ষণ নেই কোথাও।

'তুই গোল্লায় গেলি—অ্যাঁ? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে গুন্ডার দলে ভিড়লি শেষে!'

'দিদি, এসব বাজে কথা—'

শেষ বোমাটি এতক্ষণ পর্যন্ত দিদির হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে ছিল। এইবারে দিদি ফাটিয়ে দিলে সেটাকে।

'বাজে কথা এসব? তা হলে তোকে কেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়?'

প্রতুলের মুখ বন্ধ হল সঙ্গে সঙ্গে—প্রাণ চমকে উঠল। এ খবরটাও পৌঁছে গেছে? অন্তর্যামী নাকি? কিংবা—

'ছি-ছি-ছি। তোর জন্যে শেষে আমাদের সবাইকে কলকাতা ছাড়তে হবে টুলু? লোকের কাছে মুখ দেখাব কী করে বলতে পারিস?'

'দাদা বলে গেছে বুঝি?'

'ভুলু বলবে কেন? কীর্তির ঢাক তো চারদিকে বাজছে। আজকে হাইকোর্টে ও'র সঙ্গে মুরারি হালদারের দেখা হয়েছিল। সেই ভদ্রলোকই তো দারোগাকে বলে তোকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন—দেন নি?'

প্রতুল চুপ।

'উনি তো হাইকোর্ট থেকে ফিরে একেবারে শুয়ে পড়লেন। বললেন, উমা, তোমার ছোট ভাইয়ের জন্যে এ পাড়ায় আর থাকা যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তার চাইতে চলো—শ্যামবাজারের বাড়িতেই ফিরে যাই। তুই শেষে এই করলি টুলু!'—দিদি কেঁদে ফেলল। এতক্ষণ বারুদ জমার পর্যাপ্তার গর্জাচ্ছিল, এবার গলতে শুরু করল জলস্রোত আকারে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিদি বললে, 'মাস্টা না হয় ইডিয়ট, কিন্তু ভুলু কী করছে? সে তো বাবুদের লেফ্‌টিস্ট, অফিসের ইউনিয়ন নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামায়। সেও তোকে একটু দেখতে পারে না? আর তুই-ই বা কী? লেখাপড়ায় এত ভালো ছিলি, এত মাথা ছিল—এমনভাবে শয়তানে তোকে পেয়ে বসল কী করে?'

'সত্যি দিদি, আমার কোনো দোষ ছিল না। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম—'

'চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া!'—দিদির ভিজে ভিজে চোখে আবার আগুন ধরে উঠল: 'আমি তোমার কলকাতাকে চিনিনে—না? লোকের ঘরে কাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াস তুই? যে-ছোকরাটা তোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল—কে ও? ভদ্রলোকের ছেলে? ওই রকম পোশাক-আশাক—ওই চেহারা?'

কিছু একটা বলবার কথা ভেবে এবং বলে কোনো লাভ হবে না বুঝে—প্রতুল এবার চুপ করে রইল। দিদির ধিক্কার আর ক্ষোভের পালা প্রায় দশ মিনিট ধরে একটানা আর একতরফা চলতে লাগল। ফলে প্রতুলের গলা-বুক শুকিয়ে উঠল, ঘাম জমতে লাগল তারও কপালে, শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বুলোতে লাগল মধ্যে মধ্যে, আর থেকে থেকে যেন মনে হতে লাগল পর্দার ওপারে টিনটিনের একজোড়া কৌতূহলী চোখ বারে বারে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। দিদি এ ঘরে প্রতুলকে বসিয়েই টিনটিনকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, 'তোমার ছোট মামার সঙ্গে আমার কিছু ডিস্‌কাশন আছে, তুমি এখান থেকে চলে যাও। না ডাকলে কক্ষণো আসবে না।'

এবং, তা থেকে যা ঘটবার তাই ঘটেছে। এমনিতেই হয়তো টিনটিন চলে যেত নিজের ঘরে, কিন্তু দিদি তার কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে। আর টিনটিন নিঃশব্দে মায়ের আদেশ পালন করছে। ভেতরের দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে বলে দিদি কিছু টের পাচ্ছে না; কিন্তু পর্দার জোড়ের ভেতর দিয়ে মধ্যে মধ্যে স্কার্টের ঝলক, দুটো ছোট ছোট পা এবং একজোড়া চোখের আভাস প্রতুলের দৃষ্টি এখন আর এড়িয়ে যাচ্ছে না। মেয়েটা খুব ভালো আড়ি পাততে পারে দেখা যাচ্ছে।

অন্য সময় হলে শব্দ করে হেসে উঠত সে। কিন্তু সামনে এখন দিদি বসে আছে হাইকোর্টের জজের মতো, আর তাকে নিয়েই বিচারটা চলছে। অগত্যা মুখের পেশী শক্ত করে প্রতুল বসে রইল।

দিদি বললে, 'হাজার হোক, তুই আমার ভাই। তোকে আমি এভাবে মরে যেতে দিতে পারি না। এবার তোর ভার আমাকেই নিতে হবে।'

প্রতুল কান খাড়া করল।

'কালকে দশটার আগে চলে আসবি এখানে। ও'র সঙ্গে খেয়ে বেরুবি।'

'মনীশদার সঙ্গে?'—প্রতুল থতমত খেলো: 'কোথায় বেরুব?'

'ও'র অফিসে। হাইকোর্ট পাড়ায়।'

এবার বিস্ময়ে হাঁ করল প্রতুল।

'আমি কী করব সেখানে গিয়ে?'

'অলস মগজেই শয়তানের কারখানা তৈরি হয়—' ইংরিজি বচনটাকে উমা বাংলায় অনুবাদ করল, গলার স্বর কঠোর হতে থাকল তার: 'হাইকোর্ট পাড়ায় অ্যাটর্নিদের অফিস, আর সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন ও'র। তাঁদের কোনো অফিসে তোকে ঢুকিয়ে দেবেন কাল-পরশু।'

প্রতুলের হৃৎকম্প দেখা দিল।
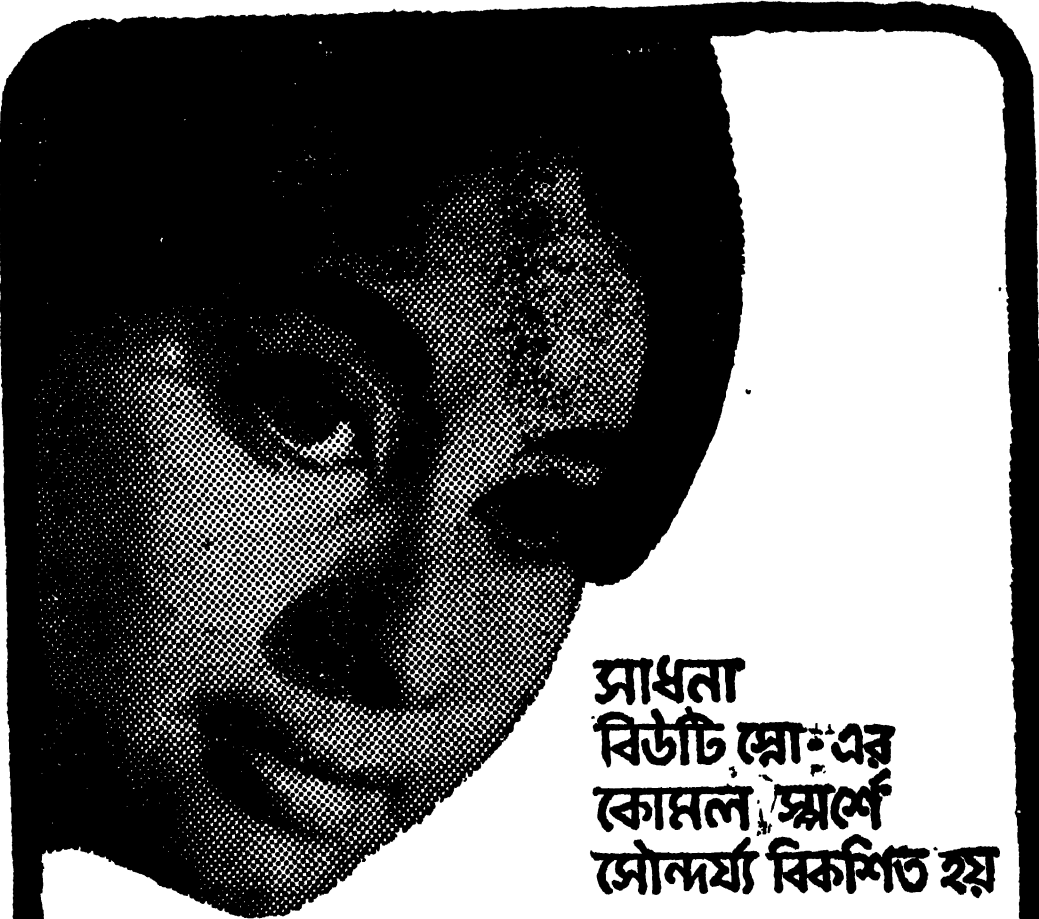
'আমি—আমি ওসবের কী জানি?'

দিদি ভ্রূকুটি করল: 'তোকে তো আর ব্যারিস্টারি করতে বলছে না কেউ। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখবি, চিঠিপত্র নকল করবি আর এর মধ্যে শর্টহ্যান্ড আর টাইপরাইটিং শিখে নিবি। তোর বুদ্ধি আছে, উন্নতি করতে পারবি।'

'কী উন্নতি?'—প্রতুল বেকুবের মতো প্রশ্ন করল একটা।

এইবারে উমাকেও একটু অস্বস্তি বোধ করতে হল। অ্যাটর্নি অফিসে ফাইল গোছালে, চিঠিপত্র নকল কিংবা টাইপ করলে উন্নতিটা কী এবং কতদূর পর্যন্ত হতে পারে সেটা চট করে বোঝানো গেল না। এবং এই বেয়াড়া জিজ্ঞাসায় অত্যন্ত বিরক্ত হল সে।

'রোজগারপত্র করবি, রেস্পন্সিবল্ হবি, ভদ্র-সমাজের যোগ্য হবি—আর কী উন্নতি হবে এর চেয়ে? না কি রাস্তায় রাস্তায় গুন্ডাবাজী করে না বেড়ালে পেটের ভাত হজম হয় না?'—দিদি আবার ভুরু কোঁচকালো: 'তোকে কিছু ভাবতে হবে না। উনি তো আছেনই, সব তোকে পাখি-পড়া করে শিখিয়ে দেবেন।'

হৃৎকম্পন দেখা দিয়েছিল, এখন সেখানটিতে যেন প্রকান্ড একটা বরফের চাঙাড় চাপিয়ে দিলে কেউ। মনীশদার পাল্লায় পড়া! একা দিদিই যে-কোনো মানুষকে কাহিল করবার পক্ষে যথেষ্ট, তার সঙ্গে মনীশদা জুটলে বেঁচে থাকবার সমস্ত ইচ্ছে যেন চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়। দাদার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে—সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনীশদার সঙ্গে গল্প করতে পারে, তর্ক চালাতে পারে। কিন্তু প্রতুল চিরকাল লোকটিকে দেখলেই পালাবার রাস্তা খুঁজেছে। হয় আইন আর মোকদ্দমার গল্প (শুনতে শুনতে দমবন্ধ হয়ে আসে), নইলে কিভাবে অ্যাল্-সেশিয়ান কিংবা বুল টেরিয়রকে তত্ত্বাবধান করতে হয় তার উপদেশ, আর না হলে চেপে গিয়ে কোথায় ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে উঠতে হয়—কী কী ডিশ দেয়—কুক্-বেয়ারাদের কত টিপ্স্ দিতে হয়—তার বাইরে আর কোনো জগৎ নেই মনীশদার। রসিকতা অবশ্য করে, সেটা কেবল বাম-পন্থী রাজনীতিকে খোঁচা দিয়ে, দাদাকে চটাবার জন্যে।

দিদির বক্তৃতা একটিমাত্র—কী করে শিশুদের মানুষ করতে হয়। দিদি নাকি চাইল্ড সাইকোলজী নিয়ে অনেক পড়া-শুনো করেছে—আর যাই হোক হোপলেস্ অপদার্থ সে নয়. ছেলেমেয়েকে কিভাবে যে ট্রেনিং দিতে হয়, টিনটিনের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করছে সে। ওগুলো এক রকম শুনতে মন্দ লাগে না। আর দিদি চলে যেতে বলার পরেও টিনটিন এই যে উঁকি-ঝুঁকি মারছে, তাতে তার সার্থক ট্রেনিং মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মনীশদা! দিদি এই লোকটাকে কী করে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল দিদিই জানে—কিন্তু দশ মিনিটের বেশি মনীশদার সঙ্গে থাকলে মৃত্যুযন্ত্রণা! সেই মনীশদা তাকে হাইকোর্ট পাড়ায় নিয়ে গিয়ে পাখি-পড়া করে শেখাবে!

প্রতুল যেন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল। হতাশ গলায় বললে, দিদি, একটু জল খাব।'

'জল কেন?'—এবার সত্যিই দিদি রেগে উঠল উমার ভেতরে: 'তোর জন্যে খাবার করছে, নিয়ে আসছে এখুনি।'

'আর খাবার! এই ফ্ল্যাট থেকে এখন বেরুতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি!' [uncertain] বাতাস লাগে।

'না দিদি। খাবার না হলেও চলবে, একটু জল চাই।'

'বোস—বোস, কাটলেট করতে দিয়েছি তোর জন্যে। না খেয়ে যাবি কেন?'—উমার গলা কোমল হয়ে এল: 'রাগ করে-ছিস এসব তোকে বললুম বলে?'

'রাগ করব কেন?'—প্রতুল দুর্বল স্বরে বললে, 'আমার ভালোর জন্যেই তো বলেছিস।'

'সেইটেই বুঝে দ্যাখ্। বয়েস তো অনেক হল, এসব ছেলেমানুষি করলে আর চলে? ওদের ওই কুসঙ্গগুলোকেও তোকে ছাড়তে হবে। দাঁড়া, জল এনে দিই। কিন্তু জল খাবি, না কোল্ড ড্রিংক?'

জল।'

'বরফ দিয়ে আনব?'

'না—না, শুধুই জল!'

দিদি জল আনতে গেল। একবারের জন্যে প্রতুলের মনে হল, পালানো যাক। এই ফাঁকে তিন লাফে রাস্তায় গিয়ে পড়ি—তারপর ভাইফোঁটার দিন ছাড়া দিদির ফ্ল্যাটের ত্রিসীমানা কে মাড়ায়! কিন্তু প্রতুল উঠতে পারল না। মনীশদার খপ্পরে পড়তে হবে, সেটা নিদারুণ বিভীষিকা সন্দেহ নেই, তবু—তবুও কোথায় একটা যন্ত্রণা কাল থেকে বিঁধে চলেছে তাকে। হাইকোর্টে যাওয়ার কথাটা পরেও ভাবা যেতে পারে, কিন্তু দাদা কালকে স্বপ্নার কথাটা মনে না করিয়ে দিলেও পারত!

দিদি জল আনল। গ্লাসটা সামনে রেখে বললে, 'কাটলেট আমিই ভেজে আনছি. একটু বোস। কুকিং রেন্‌জ্‌টা নতুন, ওতে আর চাকর-বাকরকে হাত দিতে দিই না।'

এবার নিশ্চিন্তে পালানো যায়। কিন্তু তবুও পালানো যায় না। সমস্ত মনটায় বেসুরো বাজছে। জীবনটা অন্য রকম হলেও হতে পারত। যা থাকে কপালে বলে কাল থেকে হাইকোর্টেই বেরুবে নাকি মনীশদার সঙ্গে?

'ছোট মামা!'

পর্দা সরিয়ে—প্রায় পা টিপে টিপে টিনটিনের আবির্ভাব। উত্তেজনায় জ্বল-জ্বল করছে চোখমুখ।

'সত্যি ছোট মামা, তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল?'

টিনটিনের সামনে লজ্জা পাওয়াটা উচিত কিনা প্রতুল ঠিক বুঝতে পারল না।

'তুই আড়াল থেকে সব কান পেতে শুনেছিলি?'

টিনটিন ধুপ করে প্রতুলের একেবারে পাশটিতেই বসে পড়ল ডিভানে।

'তুমি কিন্তু তাই বলে মাম্মীকে কিছু বলে দেবে না ছোট মামা।'

'তা বলব না। কিন্তু কাজটা ভালো হয় নি টিনটিন।'

টিনটিন কানই দিলে না কথাটায়। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'কী হয়েছিল, বলো না ছোট মামা।'

'তুই ছেলেমানুষ, এতসব খবরে তোর কী দরকার?'

'বলো না। মারামারি করেছিলে, তাই না?'—টিনটিনের স্বরে কেবল আবদার নয়, রীতিমতন উৎসাহ ফুটে বেরুল: 'আমার বেশ ভালো লাগবে শুনতে।'

প্রতুল চমকে গেল। টিনটিনের চোখ দুটো চকচক্ করছে। গালের রঙ লাল।

'ছি-ছি, এসব শুনতে তোর ভালো লাগে?'

একটু চুপ করে রইল টিনটিন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল তার।

'একটা কথা তোমায় চুপি চুপি বলব ছোট মামা?'

'কী কথা?'

'কাউকে বলবে না? কক্ষণো না?'

'আগে শুনেই নিই, প্রতিজ্ঞা করব তার পরে।'

'না—' টিনটিন আরো অন্তরঙ্গ আর আরো উত্তেজিত হল: 'বলো, কাউকে বলবে না?'

'আচ্ছা বলব না।'

'জানো, আমার এক বন্ধু আছে। তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

প্রতুল আকাশ থেকে পড়ল একেবারে।

'তোর বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? সে কি রে? অত বাচ্চাদের কখনো ধরে?'

'না—সে বাচ্চা নয়। তার বয়েস কুড়ি বছর হল। তার নাম ডন।'

'ডন!'—প্রতুল একটা খাবি খেলো: 'সায়েব! তোর বন্ধু!'

'তুমি কিছু বোঝো না ছোট মামা—' টিনটিন বিরক্ত হয়ে প্রতুলের পিঠে একটা ছোট্ট কিল মারল: 'সায়েব হবে কেন? ডন হল সাউথ ইণ্ডিয়ান—নেটিভ ক্রিশ্চান।

এ গ্রীন্—সাচ্ অ্যান্ এক্স্প্লিসিয়ান্স্! জানো ছোট মামা—' টিনটিনের মুখের চেহারা যেন কাপে যাচ্ছিল ক্রমশঃ 'জানো —এভ্রিথিং ইজ সো বোরিং—বোরিং! ডন বলেছিল—ইট ওয়াজ এ রিলিফ, ওয়েলকম রিলিফ!'

সন্তান দলের প্রতুলও নার্ভাস বোধ করতে লাগল এবার।

'কেন ধরেছিল ডনকে?'

'বিশেষ কিছু না। একটু ড্রিংক করে ফেলেছিল বেশি মাত্রায়, তারপর ঝগড়া করেছিল একটা পুলিশ সার্জেন্টের সঙ্গে।'

'এইসব বন্ধুর সঙ্গে তুই মিশিস টিনটিন?'

'তুমি জানো না—ডন কী লাভ্লি ছেলে। ওর পপ সং শুনলে কিংবা নাচের স্টেপিং দেখলে তুমি থ' হয়ে যাবে। জানো—ওর কথা শুনে আমার যে কি রকম এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে—কী বলব। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে আমিও জেলে যাই।'

দিদি আর কোন্ বিভীষিকা, মনীশ-দাই বা কতটা হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে দিতে পারে! টিনটিনের কথা শুনে প্রতুলের মনে হতে লাগল সে দুঃস্বপ্ন দেখছে!

প্রতুল বলে ফেললঃ 'ড্রিংক করে?'

'ধুৎ—ওসব ছেলেদের মানায়। আমি অন্য কিছু করব।'

অভিভূত হয়ে প্রতুল বললেঃ 'কী করবি?'

'ধরো—যদি টুপ করে একদিন বাপীর গাড়িটা নিয়ে বেরুই, আর রাস্তায় একটা ভিখিরীকে চাপা দিয়ে দিই—কেমন হয়?'

'চমৎকার হয়!'—ছোট মামার শিরদাঁড়া বেয়ে এবার বরফগলা জল নামতে লাগলঃ 'কিন্তু তুই—তুই গাড়ি চালাতে পারিস? এই একফোঁটা মেয়ে?'

'কেন পারব না? ডনের গাড়ি রয়েছে —সেই তো শিখিয়েছে আমায়। ছোট মামা —সব বোরিং লাগে, সব। বই, সিনেমা, স্কুল, আমাদের ক্লাব—অ্যাট্ টাইম্স্ ইউ ফীল সাচ্ অ্যান্ আনুই! ছোট মামা, আমি গাড়ি করে যদি একটা ভিখিরীকে চাপা দিয়ে দিই—'

প্রতুল এইবার একটা আর্তনাদ করে উঠত কিনা বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় দিদির ডাক এলঃ 'টুলু!'

'কিচ্ছু বোলো না মাম্মীকে—কিচ্ছু বোলো না—' কানের কাছে যেন তীব্র বেগে একটা শিস টেনে চকিতে মিলিয়ে গেল টিনটিন। আর সোফার ভেতরে প্রতুল একেবারে জমাট বেঁধে বসে রইল।

আনন্দ পেছনের স্পাইরাল সিঁড়িটা বেয়ে নেমে গেল। আপেনার কারণ না আর। [illegible]

মাত্র আট-দশ মিনিট আগেও ঘরের আব-হাওয়াটা রাজনীতির তর্কে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তৈরি হয়েছিল খানিকটা প্রবল উত্তাপ—এখন শান্ত বিষণ্ণতা থমথম করতে লাগল সেখানে।

আস্তে আস্তে সাবিত্রী বললে, 'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই সাবিত্রী। কালটাই এই রকম।'

'কিন্তু ছেলেটা এ পথ বেছে না নিলেই পারত।'

'ওদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়েছে। টগবগ করছে ভেতরটা। পথের বিচার করবার আগে ছুটে বেরুবার তাড়াটাই এখন বড়ো হয়ে উঠেছে ওদের কাছে।'

'যাঁরা এইসব খাঁটি সোনা ছেলেদের ঘরের ভেতর থেকে বের করে আনছেন, তাঁরা এদের চালাতে পারবেন ঠিকমতো? একটা দুর্দান্ত শক্তিকে তাঁরা জাগিয়েছেন—সেই শক্তিকে সংগঠন করবার, তাকে কাজে লাগাবার মতো স্থির-ধীর পরিকল্পনা তাঁদের আছে তো? এর মধ্যেই তো এরাও কতগুলো [illegible] আগে ছড়িয়ে পড়েছে।'

বিমর্ষভাবে [illegible] প্রবীর।

'ডিনামাইট[illegible] শলাতের যাঁরা আগুন ধরিয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব তাঁরাই জানেন। শোধনবাদ—নয়া-শোধনবাদকে তাঁরা নরকে পাঠাচ্ছেন—নিশ্চয়ই পাঠাতে পারেন। কিন্তু এর দুটো পরিণতি আছে। যদি ভুল হয়, তা হলে তৈরি হবে সুইসাইড স্কোয়াড—সে দারুণ অপচয়ের চেহারা কল্পনাই করা যায় না। আর নইলে আসবে বিপ্লব, একেবারে সাইক্লোনের মতো চলে আসবে। আমরা মনে-প্রাণে কামনা করব—থাকুক মতভেদ, আসুক সেই বিপ্লব, কারণ আনন্দর মতো ছেলেদের উত্তেজনার বলি হতে দেওয়া যায় না।'

আবার নৈঃশব্দ্য। প্রবীর দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সাবিত্রী আঙুলের স্টিকিং প্লাস্টারটার ওপর আর একটা হাত বুলিয়ে চলল অন্যমনস্কভাবে।

দাঁড়িয়ে পড়ে প্রবীর বললে, 'আজ উঠি।'

'বসবে না আর একটু?'

'থাক আজকে। রাত হয়ে যাবে।'

'আবার কবে আসবে? তুমি সত্যিই আমাকে ভুলে যাচ্ছ প্রবীর।'

'ভুলে যাচ্ছি না সাবিত্রী—' প্রবীর আবার ক্লান্ত মুখে হাসল ঃ 'আসলে আমাদের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, আমরা নিজেদের জালে জড়িয়ে পড়ছি চারদিক থেকে। তুমিও তো ল্যাবরেটরি আর টিউশনের বাইরে আর বেরুতে পারছ না।

কিন্তু শীগ্গিরই আবার আসব। তোমাকে কতকগুলো কথা বলতে চেয়েছিলুম, কিন্তু আজ থাক।'

গভীর চোখ তুলে সাবিত্রী তাকালো। কী কথা প্রবীর বলতে চেয়েছিল, হয়তো বুঝেছে, হয়তো মনের মধ্যে আভাস পেয়েছে তার। কিন্তু আজ থাক। আনন্দ সব অন্যরকম করে দিয়ে গেছে।

সাবিত্রী বললে, 'একটু দাঁড়াও। আমি চট করে শাড়িটা বদলে নিই—তোমার সঙ্গে এগিয়ে যাব খানিকটা।'

'আচ্ছা, এসো কাপড় বদলে।'

ভেতরে ঢুকেই মিনিট সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে এল সাবিত্রী। তার হাতে রুমালে জড়ানো একটা জিনিস, দু' চোখে ভয়ের বিহ্বলতা।

ফিসফিস করে সাবিত্রী বললে, 'এটা ভুলে ফেলে গেছে আনন্দ।'

জিনিসটা মুঠোর মধ্যে ধরেই বুঝতে পারল প্রবীর। খুলে দেখবারও দরকার হল না। দুরু দুরু করে উঠল বুকের ভেতর।

'এ তুমি নিজের কাছে রেখো না সাবিত্রী, এত বড়ো রিস্ক নেওয়া উচিত নয় তোমার। আমাকে দাও—আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু—কিন্তু—' বিহ্বল হয়ে সাবিত্রী বললে, 'তুমিও তো বিপদে পড়তে পারো।'

'আমার কোনো ভাবনা নেই—' প্রবীর হাসতে চেষ্টা করল ঃ 'শুনলে না, আনন্দ বলে গেল, সরকার এখন আমাদেরই।'—প্রবীর জড়ানো রুমালটাকে ট্রাউজারের পকেটে পুরে ফেললঃ 'তবে এটা সঙ্গে নিয়ে আর বাসে ফেরা যাবে না—ট্যাক্সির খরচা হবে কিছু।'

সাবিত্রী বিবর্ণ মুখে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব—অন্তত বালীগঞ্জ পর্যন্ত।'

'আমাকে পাহারা দিয়ে?'—প্রবীর প্লাস্টার করা আঙুলটার কথা ভুলে গিয়ে আবার সাবিত্রীর হাতটা টেনে নিলেঃ 'যদি ধরাই পড়ি—তুমি তো বাঁচাতে পারবে না, উল্টে বিপদ বাড়াবে। পাগলামি কোরো না।'

'যদি আনন্দ চাইতে আসে ওটা?'

'আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বোলো কাউকে। সেটুকু বিশ্বাস আমাকে করে।'

সাবিত্রী শীর্ণ স্বরে বললে, 'আমার ভীষণ ভাবনা থাকবে। কাল একটা টেলি-ফোন করবে আমার কলেজে? করবে তো?'

স্নিগ্ধ চোখে একটু চেয়ে থেকে প্রবীর বললে, 'করব।'

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চার ॥

ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের চোখে ধুলো দিতে না পারলেও নয়া প্রেসিডেন্ট সাহাব নেতাদের একটার পর একটা ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন। আর এই কাজটা তিনি বেশ সহজেই করতে পারছেন, কেন না তিনি জানেন যে এই লোকগুলো মেরুদণ্ডহীন, সুবিধাবাদী। সত্যি কথা বলতে কি, এইসব নেতা বা রাজনৈতিক দল দেশকে কিছু দিতে পারে নি এবং কোনওদিন কিছু দিতে পারবে কিনা এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইয়াহিয়ার অভ্যুত্থানের জন্যে তো মূলত তারাই দায়ী। যে তীব্র আন্দোলন আমরা শুরু করেছিলাম, তা স্বৈরাচারী আয়ুবের মসনদ টলিয়ে দিয়েছিল। আরও কিছুদিন যদি আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতাম, তা হলে শুধু আয়ুব কেন, যে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা সে পত্তন করেছিল তাও ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। এইজন্যেই আমরা দাবী করেছিলাম যে, এগারো দফার প্রতিটি দাবি মেনে না নিলে কোনও বৈঠকে যোগদান করা চলবে না। আমাদের বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট—"যদি তোমরা এগারো দফাকেই সমর্থন কর এবং মনে কর যে, এর বাইরে তোমাদের বলার কিছু নেই, তবে বৈঠক করতে এত আগ্রহ কেন?" বাস্তবিক আমরা যা ভেবেছিলাম, তাই শেষ পর্যন্ত হল। গোলটেবিল বৈঠকে এক এক দলের নেতা এক এক রকম দাবি তুললেন। আয়ুবের হ'ল পোয়া বারো। তিনি এই রাজনৈতিক জন্তুগুলোর পাতে কিছু হাড়-কাঁটা ইত্যাদি এঁটো ছুঁড়ে দিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। আমাদের এগারো দফার বাস্তবায়নের যে সুযোগ এসেছিল তা এইভাবে নষ্ট হ'ল। আয়ুব তাঁর শেষ বেতার ভাষণে সদম্ভে প্রচার করলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে সব দলের সব দাবি মেনে নিলে পাকিস্তানকেই বিসর্জন দিতে হত। অবশ্য আয়ুব নিজেই পাকিস্তানকে তাঁর নিক্সন, কোসিগিন দাদাদের কাছে বন্ধক রেখে গেছেন। কেন না গোলটেবিল বৈঠক যখন চলছিল তখন তিনি বলেছেন যে, পাকিস্তানের ঘাড়ে দুই হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা চেপেছে। যাই হোক, নেতারা যদি তাঁদের দলের স্বার্থ না দেখে আওয়ামের স্বার্থ দেখতেন এবং কেবল এগারো দফার জন্যেই একসাথে গলা মেলাতেন, তবে ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিত। আয়ুব অবশ্য শেষরক্ষা করতে পারেন নি, নেতাদের ল্যাঙ মেরে শেষে নিজেই ল্যাঙ খেয়ে গেলেন ইয়াহিয়ার কাছে এবং ইয়াহিয়া, যিনি এতদিন খুব মনোযোগ দিয়ে এই ল্যাঙ মারামারি দেখছিলেন, তিনি এখন অতি সাবধানে ল্যাঙ মারছেন! নেতাদের দেখে দুঃখ হয় আবার হাসিও পায়। ল্যাঙ খেয়ে মাটিতে পড়ে না যাওয়া অবধি বোধহয় ওরা বুঝবে না যে, ওরা ল্যাঙ খেয়েছে। আর যখন বুঝবে তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দেবে। একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় আপনারা ভাল

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় 'শহর কলকাতা', 'মাননীয় রাজ্যপাল সমীপেষু', 'গ্রন্থমেলা' ও 'পাঠকমন' প্রকাশ করা গেল না—এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যা থেকে রচনাগুলি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

বুঝতে পারবেন। গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই স্বনামধন্য মুজিবর রহমান পি-ডি-এম নেতা মামুদ আলীকে মার দেবার চেষ্টা করেন এবং মুজিবরের ছেলে ও এক শ্যালক মামুদকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যায়। মুজিবরের বক্তব্য ছিল এই যে, "মামুদ গোলটেবিল বৈঠকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।"

ক্ষমতায় আসার প্রায় দুই বছর পরে ইয়াহিয়া খান দেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে কাজকর্ম শুরু করার সুযোগ দিয়েছেন। গত বিশে ডিসেম্বর একটি নতুন আইন করে এই সুযোগ দেওয়া হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে আইনটি চালু হয় এই বছরের পয়লা জানুয়ারী থেকে। রাজনৈতিক নেতারা সবাই খুশি এবং বেশ নিশ্চিন্ত। বোধ হয় তাঁরা ভাবছেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এসে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে, এই দুই বছরেই যে ইয়াহিয়া সর্বকিছু বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন সেদিকে তাঁদের খেয়াল নেই। বেহুঁশ না হলে পাকিস্তনের নেতারা ঠিক বুঝতেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর যদি সত্যিই ইয়াহিয়া চান তা হলে তার অনুষ্ঠান তিনি গত বছরের গোড়ার দিকেই করতে পারতেন। "আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই, শান্তি নেই" ইত্যাদি বলে তিনি মাসের পর মাস জঙ্গী শাসন টিকিয়ে রাখতেন না। আসলে ক্ষমতার লোভ দমন করা অত্যন্ত কঠিন, তার ওপর খানসাহেব আবার জঙ্গীমার্কা মানুষ, সুতরাং যেমন করেই হোক গদি আঁকড়ে পড়ে থাকাই তাঁর লক্ষ্য। নেতারা যদি তাঁর এই মনোভাব না বুঝতে পারেন, তবে কোন্ বিশেষ চতুষ্পদ জীবের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করবো? 'ডন', 'পাকিস্তান টাইম্‌স্', "মরনিং নিউজ" ইত্যাদি সরকারী কাগজগুলি নয়া প্রেসিডেন্টের প্রশংসায় সোচ্চার। ওদের মতে ক্ষমতালাভ করেও ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার যে নজীর ইয়াহিয়া রাখতে যাচ্ছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। এই সব বুর্জোয়া কাগজের মালিকদের চিন্তা কেবল "টু পাইস"কে ঘিরেই। নেতাদের মত এরাও আদর্শ, ন্যায়, নীতি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের নিয়ে মেতে আছে।

সম্প্রতি যে আইন কাঠামো খসড়া চালু করা হয়েছে তা সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী গণতান্ত্রিক হলেও আমাদের মতে, একটি সুপরিকল্পিত ধাপ্পা। প্রথমত নির্বাচনের দিন ঠিক করা হয়েছে অক্টোবর মাসে এবং চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ উভয়ের নির্বাচনই একদিনের মধ্যে শেষ করা যায়। অর্থাৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ৫ই অক্টোবরে এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ২০শে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা জানেন বর্ষায় পাকিস্তানের নদী-নালাগুলি কেমন ফুলে-ফেঁপে ওঠে, যে সময় নির্বাচন হবে তখনও নদীপথ মোটেই ভাল হবে না এবং দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে এসে ঠিক সময়মত ভোট দিতে অনেকেই পারবে না। দ্বিতীয়ত, ভোটার লিস্ট তৈরি করার ব্যাপারে অনেক কারচুপি চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের যে সব শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা বেশি সক্রিয় এবং সচেতন, সরকারের তরফ থেকে তাদের অনেককে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

নজরুলকে নিবেদিত

প্রথমে বিশ্বাস হোত না। কিন্তু সেদিন সকালে
দেখলাম চার্বাকের দেহে রক্তের দাগ।
দেখে শিউরে উঠে পালিয়ে এলাম
গানের দেশে—শুনলাম একটা পুরোন গান—
"ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি"।
কার গান প্রশ্ন করলাম—
ওদিকে মিছিলের মুখে সরব শ্লোগান
পটে আঁকা ছবির কপালে ঘাম—
কৃষ্ণা চলেছে—কত কলেজে বাঁশিতে সুর দিয়েছে—
দমকল বাহিনী ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে চলেছে;
আর আমি স্বপ্ন দেখছি
পদ্মার মাঝি সাঁতার দিচ্ছে পদ্মায়।

তৃতীয়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কতদিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করবেন সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি, অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে এই ব্যাপারে টালবাহানা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থত, আইন কাঠামো খসড়ায় বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের সদস্যরা যে শাসনতন্ত্র-বিল প্রণয়ন করবেন, তা প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে পেশ করা হবে তাঁর অনুমোদনের জন্য, কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেব অনুমোদন না করলে কেবল যে বিলটিই নাকচ হবে তা নয়, জাতীয় পরিষদও ভেঙে যাবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইয়াহিয়া রাজনৈতিক নেতাদের নাক কাটার জন্য একটি চমৎকার শাঁখের করাত আবিষ্কার করেছেন। প্রথমত একশ' কুড়ি দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন না করতে পারলে জাতীয় সভা ভেঙে যাবে। দ্বিতীয়ত, যদিও বা শাসনতন্ত্রের বিল তাঁর কাছে ঐ সময়ের মধ্যে পেশ করা হয় তা হলেও তিনি তা অনুমোদন না করতেও পারেন এবং এ ক্ষেত্রেও জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হবে; অর্থাৎ এক কথায় জাতীয় সভার আয়ুষ্কাল মাত্র একশ' কুড়ি দিন। ইয়াহিয়ার লম্বা-চওড়া বাতের অন্তঃসারশূন্যতা আবার প্রমাণিত হল। যদি তিনি সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতেন তা হলে জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়ার কথা তাঁর মুখ দিয়ে বার হত না—কেন না জাতীয় পরিষদ পাকিস্তানের কোটি কোটি জনগণের প্রতিনিধি এবং তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। অগণতান্ত্রিক পরিষদ ভেঙে [illegible] রাজনৈতিক দলদের দিক থেকে খান সাহেবের ভয়ের কোনও কারণ নেই, কেন না ওঁরা তখন নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী কলহে ব্যস্ত থাকবেন। বরং খান সাহেব ওঁদের বলতে পারবেন—"এতদিন তোমাদের নিয়মে খেলেছি, এবার তোমরা আমার নিয়মে খেল" অর্থাৎ তিনি নিজেই এক শাসনতন্ত্র চালু করবেন।

আমরা যারা নির্বাচনে বিশ্বাসী নই এবং সংগ্রাম করছি জনের মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামকেই মুক্তি, তারা সেই দিনটির জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। কেন না সেদিন সমস্ত আওয়ামীদের মোহ কেটে যাবে। নপুংসক নেতৃত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদ সরকারের মুখোশ, নগ্ন শরীরগুলো তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে। তারা চাইবে ঐ অপদার্থ, নীচ, শয়তানদের, মানুষের ঐ পরম শত্রুদের সরিয়ে দিতে। ফলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রার সূত্রপাত হবে। (সমাপ্ত)

[২৯৬০ পৃষ্ঠার পর]

ভারতের কাছে আজ শুধু সমস্যা ও দুর্দশার পাহাড়, যে রাজ্যের মানুষ মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারে না, কিছু চাওয়া ছাড়া দেবার ক্ষমতা যেখানে নেই, সেই রাজ্যের মানুষ নিজেকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। দেশের মানুষের প্রতি যদি দরদ থাকে, কর্তব্য থাকে, দেশের মনের কথা যদি জেনে থাকেন, তবে তাঁদের দলনিরপেক্ষ রাজনীতির আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে এসে হাতে হাত মেলাতে হবে। খারাপ সকলেরই আছে আবার ভালও কিছু কিছু সকলের আছে—মিলাতে হবে সেই ভালোর সঙ্গে ভালোর। সৎগুণের সঙ্গে সৎগুণের। তবেই পশ্চিমবঙ্গ বাঁচবে, তবেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রক্ষা পাবে। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীসুশীল ধাড়া, শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই সত্য যতদিন না বুঝবেন, ততদিন রাজ্যের যে দুর্ভাগ্য চলেছে, চলতে থাকবে। ষণ্ডাবাজী আর গুণ্ডাবাজী হয়তো উৎকর্ষ লাভ করবে। কিন্তু রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক মঙ্গল হবে না।

এ এক অমার্জনীয় বিস্মৃতি

'উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' কথাটির নিশ্চয়ই একটি অর্থ আছে। ১৯৫২ খৃস্টাব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলায় বাংলা-ভাষার জন্য যারা প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের স্মরণে সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবাংলায়ও স্মৃতি-সভা হয়ে আসছে। এর তাৎপর্য যেন ক্রমশই বাড়ছে এবং কোন কোন রাজনৈতিক দল ১৯৭০ থেকে দলগতভাবে দিনটি উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসাতে, বলতে দ্বিধা নেই যে, এটি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

১৯৬১ খৃস্টাব্দের ১৯এ মে আসামের শিলচরে বাংলাভাষার জন্য যে এগারোটি প্রাণ বলিদান হয় এবং অর্ধশত আহত হয়—সেদিনটি কিন্তু আমাদের স্মৃতির ক্যালেন্ডার থেকে মুছে যাচ্ছে। কোন রাজনৈতিক দলকেও দলগতভাবে যখন এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না, তখন বলতে হবে, এটিও বিপরীত কারণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এটি এখনও অরাজনৈতিক ঘরোয়া হয়ে আছে।

আদর করে বলি বটে পূর্ব বাংলা, কিন্তু আসলে ওটা পাকিস্তান নামে এক পররাষ্ট্রের পূর্বাঙ্গ। ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের কার্যত বৈরী সম্পর্ক। ওটি সর্বতোভাবে মুসলমানের দেশ, তার সংবিধান ইসলামী, এর স্রষ্টা মুসলিম লীগ, এর মানসিকতা মুসলমানী এবং প্রতিবেশী হলেও ও রাষ্ট্রে ভারতীয়দের যাবার সহজ উপায় নেই। এখনও সেখান থেকে হিন্দু-বিতাড়ন চলছে; কেন না, হিন্দুদের সেখানে পূর্ণ মর্যাদায় নাগরিকাধিকার নেই। তারা জিম্মি এবং বহু মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। পাকিস্তানের পূর্বাঙ্গ, আমাদের আদরের দেওয়া নাম পূর্ব বাংলা, তার ব্যতিক্রম নয়।

এবং এটিই আমাদের বাঙালীদের বিশেষ মর্মদাহের কারণ। যদিও পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ হিন্দু বাঙালী পূর্ব বাংলার হিন্দু বাঙালীকেও বাঙাল বলে ঘৃণা ও পরিহার করতে চায়, তবু বাঙালী জাতি হিসেবে যাঁরই কিছুমাত্র বোধ আছে, তিনিই মর্মপীড়া বোধ করেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলায় যে সরকার গঠিত হয়েছিল, তারও মানসিকতা ছিল বাঙাল-বিরোধী এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের বাংলার মাটি থেকে খেদাবার জন্য শেয়ালদা-হাওড়ায় প্রহরী পর্যন্ত মোতায়েন করেছিল। কোথাও কোন-রকমে ভিখিরী বাঙালগুলোকে চালান দিতে পারলেই নিষ্কৃতি বোধ করেছেন এপারের ঘোষ সেনমশাইরা।

১৯৭০-এ অকস্মাৎ যে রাজনৈতিক দলটির ২১-এ ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপনের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল, সে দলটি কিন্তু লোকাল কালচার, সেলফ ডিটারমিনেশনের নির্বোধ বুলিতে লীগের জল্লাদীকাণ্ডে সায় দিয়ে দিয়ে ভারতভূমি খণ্ডন ত্বরান্বিত করেছে, তাকে আশীর্বাদ করেছে এবং একতরফা হিন্দুদের গালি দিয়ে এসেছে। ভেবেছিল তাদের পুরস্কার তারা পাবে, সেখানে হিন্দু কংগ্রেস না থাকলেও আন্তর্জাতিক তারা থাকবে। কিন্তু ইসলামীতন্ত্রে নাস্তিক আন্তর্জাতিকতা দুগো খেতে খেতে ওরাও যখন উদ্বাস্তুর মতো এই পোড়া পশ্চিমবাংলায়ই একমাত্র ঠাঁই করতে পারল, তখন কিছুকাল ট্যাকটিকাল নীরবতা অবলম্বন করে, হঠাৎ একটা সেতুবন্ধের রব তুলতে চাইছে ২১-এ দিবস পালনের নামে।

রাজনৈতিক কারণেই ঘটনাটা ১৮ বছর আগে ঘটলেও পশ্চিমবঙ্গে তার তাৎপর্য বুঝতে অন্তত ১৪টা বছর গড়িয়ে গেছে। রাজনৈতিক কারণেই কেউ এগোয় নি; ১৯৭০-এর সেই দলটি পারেই নি, কেন না, পাকিস্তান-ইমারতের এটিও অন্যতম আর্কিটেক্ট। ব্যক্তি হিসেবে বা স্বধর্ম হিসেবে শুধু নয়, সংস্থা হিসেবেও লীগের সঙ্গে এর সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠতম। সুতরাং, বছর চার আগে পশ্চিমবাংলায় ২১-এ ফেব্রুয়ারী স্মরণে যে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় তা স্বভাবতই ছিল কুণ্ঠিত অরাজনৈতিক। কুণ্ঠিত এই কারণে যে, পশ্চিমবাংলা তথা ভারত এবং পূর্ব বাংলা তথা পাকিস্তানের সম্পর্ক যখন সত্যিই ভাল নয়, শত্রুতা বললেও কিছু-মাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না, তখন তারই একটা অঙ্গের আভ্যন্তরীণ কোন ঘটনা নিয়ে কিছু বলা বা কিছু করা পাকিস্তানের বৃহত্তম আর্কিটেক্ট তৎকালীন সর্বভারতীয় শাসক-কংগ্রেস ভাল চোখে দেখবেন না, হয়তো উদ্যোক্তাদের পাকিস্তানী চর বলে আটকেও রাখতে পারেন। কেন না, পাকিস্তানী রাষ্ট্রনায়কদের মতো ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কেরা দুটি রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী। সুতরাং এখানে কেউ কোনরকম নাড়ীর যোগ খুঁজছে—এটা তাঁরা সুদৃষ্টিতে দেখতে পারেন না। এজন্য তৎকালীন রাজ্য কংগ্রেস-সরকারের মানসিকতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-সরকারের মানসিকতার এই মিল ছিল যে, বাঙাল উদ্বাস্তুরা যেন পশ্চিমবাংলায় নোঙর ফেলতে না পারে, কেন না, তাদের নস্টালজিয়া একদিন প্রবল হয়ে উঠতে পারে এবং প্রতিরোধ সত্ত্বেও যারা এসেই পড়বে তারা যেন বাংলার বাইরে কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তাই যেদিন ভাষাকে উপলক্ষ করে এখানে কুণ্ঠিতচরণ স্মৃতিসভার আগমন ঘটল সেদিন তা ছিল সর্বতোভাবে অরাজনৈতিক—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে মানুষের মাতৃভাষা সকল রাজনীতির আওতার বাইরে—ওটা ধর্মশাসনে বা রাষ্ট্রশাসনে নির্মূল করা যায় না। আমাদের

[illegible] ভাষা [illegible] রাষ্ট্রের সামনে নির্বীর্য, ওরা সেখানে উর্দুর মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রাণ দিল, এটি আমাদের অসমর্থদের প্রশ্রয়। রাষ্ট্র যেখানে পৃথক, ভাষা যেখানে এক, সেখানে রাজনীতি বাদ দিয়ে ভাষাকে গ্রহণ করা যায় এবং সেই এক ভাষার জন্য কেউ যদি প্রাণ দেন তবে তাঁরা সমভাষাভাষীদের নিশ্চয়ই নমস্য। সেই নমস্কার জানানোর মধ্যে ওরা আমাদের মাতৃভাষাকে কি আভরণ বা অর্ঘ্য দিয়েছে, সেই কৌতূহলও অবশ্যই থাকে। ধর্ম ও মানসিকতায় আমরা পৃথক, হয়তো শত্রুস্থানীয়ই, কিন্তু ভাষায় আমরা এক—ইংলণ্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো। আমার ভাষার জন্য যে প্রাণ দেয় সে যে দেশবাসীই হোক কি যে ধর্মবিশ্বাসীই হোক, তার মর্মের একাংশে আমি নিকটতর। অন্তত এই ভাষা-সাহিত্যেও যদি আমাদের লেনদেন হয় ক্ষতি কি? কিন্তু রাষ্ট্র সেখানে বাধা। এবং এজন্যই আমাদের মর্মপীড়া। এই কারণেই রাষ্ট্রবাদে শহীদদের স্মৃতিচারণ।

১৯৭০-এ যারা এগিয়ে এল হঠাৎ এ'দের স্মরণে, তাদেরটা পুরোপুরিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় ভারত রাষ্ট্রান্তর্গত অঙ্গরাজ্য আসামের শিলচরে বাংলাভাষার জন্য নিহত এগারোজনের জন্য এদের কোন মর্মবেদনা নেই। ১৯৫২ খৃস্টাব্দে এদের দৃষ্টি যেমন ছিল একপেশে রাজনীতিক, ১৯৬১তেও ভিন্ন কারণে রাজনৈতিক দৃষ্টি ছিল প্রখরতর। তাদের স্থানীয় দলের মুখপাত্র বাঙালীর ভাষা-আন্দোলনের নির্জলা নিন্দাই শুধু করে নি, আইন-শৃঙ্খলা জোরদার করার দাবিও জানিয়েছে। পুরোনো খবরের কাগজে এই কলঙ্কলেখা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখতে পারেন। সেই কথাটাই বলি।

ইংরাজের প্রশাসন-পরিভাষায় আসাম ছিল নন-রেগুলেটেড এরিয়া। ইংরাজ আই-সি-এস পোষণের খরচপাতি কুলোত না। প্রখরবুদ্ধি ইংরাজ বাংলার অঙ্গ কেটে ওর গায়ে জুড়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রস্তাব করল। ১৮৯৬-এ প্রকাশ পেল প্রথম চট্টগ্রাম বিভাগকে জুড়ে দেবার। তখনকার বাঙালী আজকের সর্বভারতীয় ম্যামথের পায়ের তলায় নির্বীর্য ছিল না। জোরালো আপত্তি করল। তখন চলল গোপন ষড়যন্ত্র। ১৮৯৯-এ এলেন এক জবরদস্ত গবর্নর জেনারেল—লর্ড কার্জন। নথিপত্র ঘেঁটে প্রস্তাবটির পুনরুজ্জীবন ঘটালেন। ১৯০৩ নাগাদ বঙ্গভঙ্গের পূর্ণ রূপ প্রকাশ পেল; শুধু চট্টগ্রাম বিভাগ নয়, ঢাকা বিভাগও এবং রাজসাহী বিভাগ। অথবা ১৯৪৭-এ দেশী কার্জনেরা [illegible] রেখায় বঙ্গভঙ্গ করেছেন, ১৯০৩।৪-এর বিলিতী কার্জন তাই ভেঙে গড়েই আসাম-পূর্ব বাংলা নামে এক রাজ্যের সৃষ্টি করতে চাইলেন। ব্যামফিল্ড ফুলারকে লেঃ গবর্নর করে রাজ্যের সৃষ্টিও হল ১৯০৫-এ। বিহার-ওড়িশাকে ঘাড়ে রেখেও বাংলার সত্তা উঠল জ্বলে। কার্জনী পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদী আশীর্বাদ পেল বটে, কিন্তু সেকালে বাংলার নেতৃত্ব ছিল অখণ্ড; সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে ছিন্নভিন্ন ছিল না ১৯০৫-এর বাংলা। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও স্বদেশী সংকল্প সাম্রাজ্যবাদীদের মাথায় ঘায়ের যন্ত্রণা সৃষ্টি করল। সাম্রাজ্যবাদীদের মতলবটা ছিল আসাম-পূর্ব বাংলাকে একটা মুসলিমস্থান গড়ে হিন্দু বিপ্লবী বাংলাকে প্রতিহত পর্যুদস্ত করা। ছ' বছর ঐ সাম্রাজ্যবাদীর জেদের জোড়াতালি রইল বটে, কিন্তু বাঙালী স্বস্তিতে রাখে নি কূটনীতিক ইংরাজদের। বন্দেমাতরম্ ও স্বদেশী সংকল্পের ধ্বনিতে বারুদসংযোগ হল; অনেক প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার বিনিময়ে ১৯১১-তে আসাম-পূর্ব বাংলার আয়ু শেষ হয়ে গেল। তবু আসামের সঙ্গে একদিকে জুড়ে রইল বঙ্গভাষী শ্রীহট্ট-শিলচর, অন্য দিকে বিচ্ছিন্ন বিহার-ওড়িশার সঙ্গে বঙ্গভাষী সিংভূম-মানভূম। ১৯৪৭-এ দেশীয় কার্জনেরা বললেন, শ্রীহট্টে হবে রেফারেণ্ডাম, পাকিস্তানে যাবে, না আসামে (ভারতে) থাকবে। আসাম সর্বভারতীয় নেতাদের ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যের যোগসাজসে শ্রীহট্টকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়ে বলল, দি গ্রেট রিডান্স। র‍্যাডক্লিফের করাতের কৃপায় শিলচর নামে একটি বঙ্গভাষী অঙ্গ জুড়ে রইল আসামে, আসামের পক্ষে অবাঞ্ছিত আবের মত। ধুবড়ী-গোয়ালপাড়া বঙ্গভাষী এলাকাও ছিল আসামের অঙ্গে; কিন্তু সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ শিলচরের মত তীব্রতা লাভ করতে পারে নি কখনো। প্রধানত আসাম উপত্যকা জুড়ে অসমীয়া, পার্বত্য অঞ্চলে অনসমীয়া। কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাজ্যের পূর্ণ রূপ পেতে অসমীয়ারা ঘোষণা করলেন আসামের একমাত্র রাজ্যভাষা অসমীয়া। প্রতিবাদ করেছিলেন পার্বত্য নেতৃবৃন্দ; তাঁরা আজ 'মেঘালয়' পেয়েছেন। আর প্রতিবাদ করেছিল শিলচর। মাতৃভাষার দাবিতে সুসংগঠিত এক আন্দোলন সেখানে মুখর হয়ে উঠল।

শিলচরে ১৯-এ মে বঙ্গভাষীদের ওপর গুলী চলেছে। সেখানে ১৭ই তারিখের খবর হল, একমাত্র অসমীয়াকে রাজ্যের ভাষা বলে ঘোষণা করার পর থেকে শিলচরের বঙ্গভাষীরা আবেদন-নিবেদন করেছেন। স্মারকলিপি দিয়েছেন, দেখা-

সাক্ষাৎ করেছেন, সম্মেলন করেছেন, [illegible] নিয়েছেন। এইভাবে তাঁদের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রান্ত হল। কিন্তু বিধানসভায় সংখ্যাধিক্যবলে অসমীয়াই গৃহীত হল দেখে শিলচরের বঙ্গভাষীরা নামলেন তৃতীয় পর্যায়ে—গণ-সত্যাগ্রহে। আসাম সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সামিল হয়ে এ দমনের জন্য অগ্রসর হলেন। নয়াদিল্লী থেকে রিজার্ভ পুলিশের এক মস্ত ব্যাটেলিয়ান ছাউনি ফেলল শিলচরে। আসামের রাজধানী থেকেও সুনির্বাচিত সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এল। সামরিকবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হল। ভীতিপ্রদর্শনের জন্য চলল এদের কুচকাওয়াজ ও শস্ত্র প্রদর্শন। দেখে মনে হয়েছে, কোন একটা অভ্যুত্থান ঘটেছে কিংবা বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেছে। প্রশাসকেরা টিপটপ পোষাকে প্রস্তুত।

কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম উদ্যোগে একতরফা যুদ্ধ হল। জিনোসাইড। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্বয়ং এই সমরবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষরূপে সরেজমিনেই উপস্থিত ছিলেন। শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের ১১ জন নিহত হলেন এবং একান্নজন আহত হলেন। ১১ জনের মধ্যে ১০ জনেরই গুলীর আঘাত। কোন প্ররোচনা ছিল না; পুরুষ-মহিলা, বয়স্কা-নাবালিকার বিচার ছিল না। শুধু গুলী নয়, বেয়নেট আঘাতেরও চিহ্ন। কত কাছে থেকে কেন্দ্র-আসামের "শত্রুনিধন" পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল এতেই বোঝা যায়। গুলীগুলো লেগেছে কোমরের ওপরে—অর্থাৎ, সুট টু কিল।

গৌহাটিতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু এজন্য কিছুমাত্র খেদ প্রকাশ করলেন না, পক্ষান্তরে বঙ্গভাষীদের এই আন্দোলনকে নিন্দা করে বললেন, "এই আন্দোলনে বাংলা ভাষার উপকার হবে না।" যেন বাংলা ভাষার একমাত্র উপকার হত বা হয়—যদি বঙ্গভাষীরা অসমীয়া ভাষায় অথবা হিন্দী ভাষায় বিলীন হয়। এবং এ গুলী চলে নি জিন্নার পাকিস্তানে—যেখানে ছিল উর্দু ভাষার জেদ। ঢাকায় জিন্না বলে গেছলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা। হয় নি।

এ ঘটনা হয়েছে স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী ভারতে। এবং আন্তর্জাতিক নেহরুর উপস্থিতিতে।

শিলচরে শোকাহত চল্লিশ হাজার লোক শহীদদের মরদেহ নিয়ে গেল শ্মশানে. শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্যে চিতা উঠল জ্বলে। কারফিউয়ের জালে পড়েও ও'দের চোখে-মুখে সংকল্প উঠল প্রদীপ্ত হয়ে। সেদিন প্রকৃতিরও মানুষের বর্বরতার সহযোগিতা করেছিল; কিন্তু বাইরের ঝড়বাত্যা ও'দের হৃদয়ের ঝড়কে অভিভূত [illegible] [illegible] নি। [illegible] [illegible] শহীদের [illegible] কমলা ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, কানাইলাল নিয়োগী, তরণী দেবনাথ, সুকোমল পুরকায়স্থ, হিতেশ বিশ্বাস ও'দের হৃদয়ের মাণিক হয়ে রইল। একটা স্বার্থের চাকরী, একটা মন্ত্রিত্ব, একটা চুরি বা ডাকাতি করতে গিয়ে অথবা পররাষ্ট্র আক্রমণ করতে উদ্যত-অবস্থায় এ'রা নিহত হন নি; এ'রা নিহত হয়েছেন জাতীয় সংহতির প্রবক্তাদের হাতের টিপেই, "স্বদেশীয়দের" রাইফেলেই। এ'রা চেয়েছিলেন নিজের মাতৃভাষার মর্যাদা, মায়ের ভাষায় লিখতে-পড়তে-কইতে এবং কাজ করতে। এই তাঁদের অপরাধ। কিন্তু উর্দুভাষীরা পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গভাষীদের যেভাবে মোকাবিলা করতে চেয়েছিল, কেন্দ্রীয় হিন্দী ও রাজ্যের অসমীয়াভাষীরা শিলচরের বঙ্গভাষীদের সঙ্গে তেমনি মোকাবিলা করতে চেয়েছেন এবং করেছেন। তাঁরা জয়ী হয়েছেন।

কিন্তু বঙ্গভাষী শিলচর যদি না এ এককভাবে স্মরণ করে; অনাত্র বঙ্গভাষীরা এটি ভুলে থাকতেই চায়। [illegible] কারণ, এই রাজ্য-কেন্দ্রের সম্মিলিত [illegible] তারা স্মরণ করতে চায় না শাসন কর্তৃপক্ষের মিথ্যা সংহতির মালিশাড়িকে রক্ষার চাটুকারিতায়। পাছে কারও সামান্য স্বার্থ কোথাও খসে পড়ে। আজকে নির্বীর্য বাঙ্গালীজাত 'আত্মবিস্মৃত', এটা নিতান্তই স্নেহ-সম্ভাষণ। আসলে, চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী যে বঙ্গেশ্বরেরা জন্মেছেন, তাঁরা ইচ্ছাকৃত বিস্মৃতির কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, তাঁরা আত্মপ্রতারক। পাকিস্তানী শহীদদের তাঁরা অসুন্দেশ্যে যদি-বা কোন স্মৃতি-অনুষ্ঠানে অনুমতি দিতে পারেন, ভারতের কোথাও সংহতিবিনাশী গুলী বেয়নেট চলেছে, একথা ইতিহাসে স্থান দিতেও রাজী নয়; একটি মাত্র অপরাধী রাজ্য কেন্দ্রের সামরিক শক্তিবলে অপর রাজ্য ও ভাষাভাষীকে পর্যুদস্ত করার আর এক নাম সংহতি। বামপন্থা নামে এক বিজাতীয় কুৎসিত রাজনীতিতে তো সাধুতা-সততাই নেই, সেখানে এ প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র।

নানা অসুস্থ সংস্কারে বন্দী বঙ্গভাষীরা সমানে অমার্জনীয় বিস্মৃতির পাপ সঞ্চয় করে চলেছেন। এর দাম একদিন দিতে হবে। সবাইকে চিরকালের জন্য নির্বোধ করে রাখা যায় না।

সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান সম্পর্কে বিচার এবং মূল্যায়ন করার সময় হয়েছে। কবির সংগীত সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৪১ সাল থেকে। তারপর প্রায় তিরিশ বছর সময় কেটে গেছে। কাজেই অবস্থা মুগ্ধবোধ বা তৎকালীন সাময়িক সিদ্ধান্ত আজকের দিনের মূল্যায়নে পক্ষপাত না ঘটানোরই কথা। রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে অন্তত পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক লেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নজরুলের গান সম্পর্কে এখনও কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক লেখা হয় নি। নজরুলগীতি বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে মাত্র।

নজরুলের গান সম্পর্কে পূর্ববাংলায় আব্বাসউদ্দীন কয়েক পৃষ্ঠা লিখেছিলেন। সেই লেখারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় আজাহারউদ্দিন খান এবং ডাঃ সুশীল-কুমার গুপ্তের নজরুল সম্পর্কিত পুস্তকে। শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'সাঙ্গীতিকী' পুস্তকে ১৯৩৮ সালে লিখেছিলেন নজরুলের গান সম্পর্কে লেখার সময় এখনো আসে নি। এরপর দীর্ঘদিন পরেও তিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেন নি। করলে ভালই হত। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার তাঁর শ্রদ্ধাস্পদেষু পুস্তকে সামান্যই লিখেছেন। বাংলার গীতিকার গ্রন্থে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, সংগীত পরিক্রমা গ্রন্থে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং শ্রীজয়দেব রায় লিখিত 'সংগীত পরিক্রমা'র তৃতীয় পর্বে নজরুল সংগীত সম্পর্কে প্রবন্ধ আছে। সম্প্রতিকালে শ্রীসুকুমার রায়ের 'বাংলা সংগীতের রূপ গ্রন্থেও নজরুলের গান সম্পর্কে আলোচনা আছে। পূর্ব-বাংলায় প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে 'নজরুল পরিচিতি'তে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের লেখাটি সংকলিত হয়েছে, 'নজরুল সাহিত্য' পুস্তকে কাজী মোতাহার হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর এবং মকসুদুর রহমান হিলালীর নজরুল সংগীত সম্পর্কিত লেখা সংকলিত হয়েছে। 'নজরুল মানস সমীক্ষা' পুস্তকে সংকলিত হয়েছে রফিকুল ইসলামের লেখা এবং আবদুল আজীজ-আল-আমান-এর 'হারা-মণি প্রসঙ্গের পশ্চিম বাংলায় প্রকাশিত লেখাটি। আবদুল আজীজ সাহেব গত বছর সাপ্তাহিক অমৃত, ধ্বনি এবং তাঁর নজরুল পরিক্রমা পুস্তকেও গান সম্পর্কে কিছু কিছু লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য আলোচনা আর কিছু চোখে পড়ে নি, যদিও স্মৃতিচারণ হিসাবে কিছু কিছু লেখা আছে। পুস্তকের ভূমিকা হিসাবে সবচেয়ে মূল্যবান শ্রীজগৎ ঘটক মহাশয়ের নবরাগ পুস্তকটির ভূমিকা।

এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে যে, নজরুলের জীবন ও কাব্য সম্পর্কে তিরিশের অধিক বই লেখা যায়। অথচ সংগীত সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখায় অসুবিধা কি? যদি উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলি একত্রে সংকলিত করা যায়, তবে কি একটা পূর্ণাঙ্গ বই হবে? না তা হবে না।

নজরুল সংগীত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পুস্তক লেখার অন্তত দুটি মৌলিক অসুবিধা আছে।

প্রথমত নজরুল সংগীতের আলোচনা শুধুমাত্র সংগীতশাস্ত্রের ব্যাকরণগত আলোচনায় নিবদ্ধ রাখা চলে না। সেখানে অনিবার্যভাবে আসবে বাংলাদেশের ইতি-হাসের গতিপ্রকৃতি, বিভিন্ন স্তরের সমাজ-মানসিকতা ও সংগীতের গণতান্ত্রিক বিবর্তন। সোজা কথায়, 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু' গানটির সুর বসন্ত কেদারায় নিবদ্ধ না রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানের প্রতি কতটুকু, সে বিশ্লেষণ গানটির প্রয়োজনীয়তাকে কোন অংশেই লঘু করতে পারে না। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়ার ফলেই এই ধরনের গান সৃষ্টি, সংগীত-শাস্ত্রের প্রয়োগ প্রেরণায় আদৌ নয়। তেমনি গ্রহ, ন্যাস, বাদী-সম্বাদীর প্রসঙ্গে নজরুলের 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ' গানের

অনুপ্রবেশ বোঝা যায় না। অন্যান্য কারণে হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি। অজস্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে প্রবন্ধ বক্তৃতায় যা ঘটানো কঠিন, তা ঘটছে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের রেশমী চুড়ি ভাঙার গানের প্রভাবে, অসংখ্য বঙ্গনারী বিদেশী বণিকের শিল্প স্ট্র্যাটেজিতে আঘাত হেনেছে। তিলককামোদ ঝাঁপতালে নিবদ্ধ বন্দেমাতরম গান রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিণত হচ্ছে। শুধু দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে নয়, সমাজমানসের চেতনার নানা স্তর, মানসিকতার বিভিন্ন অনুভূতি, তৎকালীন ভাবধারা ও শিল্পরুচি কতটা অবিকৃতভাবে নজরুলসংগীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তারও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞানের নিরিখে সংগীত সম্পর্কে নতুন ধারায় ভাবতে হবে। সমস্ত যুগের ক্লাসিক গীতিরীতি ভেঙে গড়ে ভবিষ্যতের আরেক নতুন ক্লাসিকের দিকে এগিয়ে চলেছে; এ কথা আমরা সংগীত আলোচনায় এখনও মনে রাখতে অভ্যস্ত নই।

দ্বিতীয়ত নজরুলের সংগীত-সৃষ্টির ক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বিভিন্ন চরিত্রের বৃত্তের অন্তস্তলে সঞ্চরমাণ, এত বৈচিত্র্যগামী যে এ সম্পর্কে কোন Generalization সংগত নয়। [নজরুল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গান লিখেছেন এ তথ্য ঠিক নয়, যদিও তাঁর সব গান পাওয়া যায় না বা গানের সংখ্যা এখনো নির্দিষ্ট করা যায় নি। জনশ্রুতি ছিল রামপ্রসাদ সেন এক লক্ষ পদ রচনা করেছিলেন। এ সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে লিখেছিলেনঃ "রামপ্রসাদ লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্যন্ত পদাবিন্যাসে তিনি বিরত হয়েন নাই, মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহারি কবিতা করিয়াছেন।"] নজরুলের সংগীত সৃষ্টি কোন বিশেষ গীতিরীতি অবলম্বন ক'রে সরল রেখায় চলে নি, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বাঁক নিয়েছে নানা দিকে। পৃথকভাবে প্রতিটি পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রবন্ধের আকারে সাধারণভাবে কিছু বলতে গেলে অতিরিক্ত সরলীকরণ হয় অথবা বিশেষ সৃষ্টি পর্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি রায় দেয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে সাবেককালের পাল্কীর ভেতর কল্পনা-বিহারে, ধ্রুপদ সংগীতের পরিবেশে, নিশ্চিন্ত কক্ষে পূর্বসূরী আত্মীয়-স্বজনের নিত্য সংগীত উদ্ভাবনের তন্ময় ঐতিহ্যে, পিয়ানোর ঝংকারে, এস্রাজের মূর্ছনায়, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদু ভট্ট, মৌলাবক্সের ইমন কেদারায়, বেহাগেবাহারে। অপর পক্ষে বাঁধনহারা নজরুলের অনির্দিষ্ট সভার পথে, পল্লীর [illegible] লেটো দল, কবিগান, যাত্রা-তর্জার মধ্যেই সুরসঞ্চয়নে নিমগ্ন; রুটির দোকানে জীবিকার অন্বেষণ, অপরের বাড়িতে বিদ্যালয়ের পাঠ এবং এর মধ্যেই তাঁর সুর ও জীবনের বিস্তার। রবীন্দ্রনাথ গেলেন বিলাত, নজরুল গেলেন করাচী সেনানিবাসে। এই যে পার্থক্য, কাব্য ও সংগীত সৃষ্টিতে কি এর প্রতিফলন পড়বে না? সৃষ্টির প্রথম যুগে ত অবশ্যই পড়বে। পড়েছেও।

গ্রামোফোনের জন্য নজরুলের গান সম্পর্কে অনেকেই তলিয়ে বিচার করেন নি। যেমন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যাত্রী' পুস্তকের উক্তি ঃ

"বাজারে কদর হোক না কেন তার গানের, বেশিরভাগ গান শেওলার মতো ভাসছে জলের উপরে, মনের গভীরতাকে স্পর্শই করে না।

গান যখন পণ্য হিসাবে রেকর্ডে সৃষ্টি হচ্ছে তখন তা অর্থনীতির চাহিদা ও সরবরাহের সূত্রে নির্ধারিত হবে। সমাজে শিক্ষার ও রুচির স্তরভেদ আছে, সাময়িক রুচিরও জোয়ার-ভাটা আছে। লক্ষ্য হচ্ছে রেকর্ড বিক্রি, সুতরাং তার উৎপাদন বাজারের চাহিদা ও প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, 'সাব্‌লাইম' শিল্প মানসের মান রেখে নয়। সমাজের গড় সংস্কৃতিবোধই পণ্য সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। সেখানে শেওলা থাকলে গানও তাই হবে। প্রসঙ্গত প্লেটোর উক্তি স্মরণযোগ্য "সংগীতে নতুন রীতি ভাগ্য পরিবর্তনসূচক; তার সম্পর্কে সাবধানতা প্রয়োজন। কেন না রাজনৈতিক ও সামাজিক মৌলরীতির বিপর্যয় ছাড়া সংগীতের প্রকৃত বিশৃঙ্খল হয় না।"

নজরুল সংগীতের আলোচনায় সবচেয়ে অপূর্ণতা রয়েছে তাঁর সৃষ্টির শেষ পর্যায়ের গানগুলি সম্পর্কে। নজরুল পরিকল্পিত নতুন রাগিণীগুলি বিশ্লেষণ বা অনুশীলনও কেউ করেন নি। উল্লেখ করা হয়েছে তথ্য হিসাবে। এইগুলি অনুশীলন করলে এইটুকু অন্ততঃ চোখে পড়বার কথা যে, এতে নজরুলের গজলপ্রিয়তার সামান্য সংস্কারও নেই, বিদ্রোহের উদ্দাম-গতিও নেই, শুধু রয়েছে বিশিষ্ট সুরকলির উদ্ভাবন। ধরা যাক তাঁর 'দেবযানীর' কথা। এই সুরটি উদ্ভাবিত হয়েছে এমন এক গভীর ছন্দে যে, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে নজরুলকে একটি নতুন তালও সৃষ্টি করতে হয়েছে—নবনন্দন তাল। কুড়িটি মাত্রার জন্য আমাদের শাস্ত্রে 'সাত্তি' তাল ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে সুরের ছন্দ মিলছে না ঠিকমত। শাস্ত্রে ছিল নন্দন তাল কিন্তু তার মাত্রা [illegible] ছুটিয়ে। [illegible] জন্য প্রয়োজন চার-পাঁচে ছুটি। সুতরাং নবনন্দন তালের সৃষ্টি অনিবার্য হল। সেতারে ঝিঁঝিট বাজাতে গিয়ে হয়ত উদ্ভাবিত হল বেহ্‌কো। বেহ্‌কো কথাটি অন্যে চালু নেই কিন্তু সুরের ঝোঁক বেদে আসছে না। তাই হয়ত বেহ্‌কো করতে হল। রবীন্দ্রনাথের মোর ভাবনারে অনুরূপ সুরছন্দের কিন্তু 'রে'-এর চেয়ে 'মা'-তেই যেন সেতারে ঝোঁকটি সুস্পষ্ট।

নজরুলের উদ্ভাবিত 'শিব-সরস্বতী' রাগিণীর কথা কেউই উল্লেখ করেন নি। অথচ মাসিক পাঠশালা ১৩৪৬ সালের মাঘ সংখ্যায় এটি স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকেই আবার আশা-ভৈরবী নজরুল সৃষ্ট রাগিণী বলে উল্লেখ করেছেন। নজরুলের 'মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ' গানটিতে মূলত আশাবরী ও ভৈরবীর অনুপম মিশ্রণ আছে এবং গানটি রবীন্দ্রনাথের 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু—' গানটির সংগে অভিনব মিশ্রণের জন্য তুলনীয়। কিন্তু 'আশা-ভৈরবী' নজরুলের আগেই ছিল। "না বুঝে তোমারে ভালবাসে," "আকুল হয়ে ডাকলে পরে", "তোমায় দেখিবার আশা মেটেনি", "মা আমাদের পাগলিনী" ইত্যাদি গান আশা-ভৈরবী বলেই চিহ্নিত হয়েছে গ্রামাফোন রেকর্ডে, গোবিন্দ, রাণীবাঈ, হরিমতী, মস্তাবাবুরা এ সব গেয়েছেন (রেকর্ড সংগীত পুস্তক দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথের "বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি" গানটিও 'আশা-ভৈরবী' বলে 'গীতি-মালিকা' পুস্তকে চিহ্নিত। নজরুলের শেষ পর্যায়ের গানের সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য অল্প একটু পাওয়া গেছে। প্রসংগত সেটুকু উল্লেখযোগ্য।

" 'বেহ্‌কো' ও 'দোলনচাঁপা' দুটি রাগিণীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক (মডার্ন) গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তা হচ্ছে 'সিমিট্রি' (সামঞ্জস্য) বা 'ইউনি-ফরমিটি'র (সমতা) অভাব। কোন রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সংগীতশাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ-রাগিণী যদি তার "গ্রহ" ও "ন্যাস" এবং বাদী বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।

ক্লাসিকাল বা উচ্চাঙ্গ সংগীতে যে অভিনব রসসৃষ্টি হতে পারে, মানুষের

[illegible] "[illegible] মহীয়ান" [illegible] পারে তা আধুনিক সুরের [illegible] চপলতা সম্ভব হতে পারে না। আর যাঁরা মনে করেন হিন্দী ছাড়া বাংলা ভাষায় খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হতে পারে না আমার এই গান দু'টির স্বর সমাবেশ ও তালের, লয়ের ও ছন্দের "কর্তব্য" তাদের সে ধারণা বদলে দেবে। গানে "আঙ্গিক বা মিউজিক্যাল টেক্‌নিক বজায় রেখেও এই শ্রেণীর গান কত মধুর হতে পারে আশা করি আমার এই গান দু'টিই তা [illegible]।"

[illegible]লের শেষ পর্যায়ের গানের [illegible] তাঁর নিজের বক্তব্যের সূত্র ধরেই অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে হিমাংশু দত্ত পর্যন্ত সুরসৃষ্টির বর্ণাঢ্য ইতিহাসে নজরুলের অবদানটুকু চিনে নেওয়া যায়। নজরুলের দক্ষিণ ভারতীয় রাগ 'নাগসরাবলী' অবলম্বনে রচিত 'এস চিরজনমের সাথি' গানটি অপূর্ব মাধুর্যের জন্যই শুধু স্মরণযোগ্য তাই নয়, দাক্ষিণ ভারতীয় সুরে অবলম্বনে বাংলা গানে সুর সৃষ্টিরও এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এঁরাও এই পথে পরীক্ষা করেছেন কিন্তু ইদানীংকালে সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী-গাইন'-এর সুর সৃষ্টি ছাড়া এই বিরাট সম্ভাবনাকে কোন সুরকার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। এর কারণ সামাজিক চরিত্র বদল ও রুচির ওপর 'রক অ্যান্ড রোলে'র প্রভাব। এ ঘটনা প্লেটোর উক্তিকেই সমর্থন করে।

অবাঞ্ছিত হলেও অনস্বীকার্য যে, নজরুল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও অবদানের মান নির্ণয় আজ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে শুরু হয় নি। কারণ, মনে হয়, নজরুলের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে আকস্মিক এবং অনেকটা বিদ্যুৎস্ফুরণের মত হওয়ায়, পাঠক তো বটেই, সমালোচকরাও বোধ করি, খানিকটা চমকিত ও মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় নজরুল তাঁর প্রাপ্য সম্মান লাভে বঞ্চিত। যা তিনি অধিকাংশ সময়েই পেয়েছেন, তা হ'ল স্তুতিমুখরতা, অকারণ প্রশংসা এবং অধিকাংশ সময়েই সংস্কারাচ্ছন্নদের নিন্দা। এর কোনটাই প্রতিভাবানদের কাম্য নয়।

তবুও বলা যায়, নজরুলের গদ্য-সাহিত্যের চেয়ে তাঁর কাব্য-সাহিত্য অনেক বেশি আলোচিত। অবশ্য এটাও অনস্বীকার্য যে, কাব্য-সাহিত্যেই নজরুল প্রতিভার স্ফুরণ সবচেয়ে বেশি। তাই তিনি প্রধানত কবি—বিদ্রোহী কবি হিসেবেই আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। তবুও তাঁর গদ্য-সাহিত্য, যার মূল্যে কোন অংশেই কম নয়, ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে—যখন রুশ বিপ্লবের ফলে বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষ বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছে। নজরুল যেন তাদের বিক্ষোভ-বেদনা-বিদ্রোহকে ভাষা দিতে নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে এসে বললেন: "বল বীর—বল উন্নত মম শির।—শির নেহারি আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।"

নজরুলের এই বিদ্রোহ কিন্তু শুধু কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধেও তাঁর এই বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

নজরুল উপন্যাস লিখেছিলেন তিনটি: কুহেলিকা, বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা।

কুহেলিকার পটভূমিকা মোটামুটি এই রকম: পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজ যখন জেগে উঠতে চাইল, তখন দেখা গেল হিন্দু সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফলে মুসলমান সমাজ চাইল তাদের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে, হিন্দু চাইল অতীত এবং বর্তমানের সমন্বয়ে নতুন জাতি গড়তে, আবার এই দুই সমাজ পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয় সমাজই একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হল। মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার জন্য তারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল—বলা বাহুল্য। ফলে, সম্পূর্ণ সজাগ না হয়েও কোনো কোনো মুসলমান সন্ত্রাসবাদ বা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। এই প্রসঙ্গে নজরুল ঐ আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

এই উপন্যাসে নজরুল এক শ্রেণীর হিন্দুর মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাবকে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন:

"অনিমেষ বলিয়া যাইতে লাগিল, তিনি এবং তাঁর দল কি বলেন, জানেন? বলেন, 'আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গী এবং বাম হাত দিয়ে তাড়াব নেড়ে। সন্ধি করব লন্ডন এবং মক্কা অধিকার করে।' তাঁরা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে করেন না।"

বাঁধনহারা পত্রোপন্যাস (বাংলা সাহিত্যে প্রথম?) অবশ্যই প্রেমমূলক। এবং নায়ক নূরুল হুদা যেন নজরুলেরই প্রতিকৃতি। কিছু সংস্কার এবং ধ্যান-ধারণার প্রতি নায়কের শ্রদ্ধা নেই, আছে বিদ্বেষ বা জ্বালা। তাই সে বলে, "বিশ্বের সব কিছু মিলে আমায় শয়তান পিশাচ' বলে অভিহিত করুক, তবে না আমার খেদ মেটে, একটু সত্যিকার আনন্দ পাই।" তবে ভাবাবেগের প্রাবল্য হেতু এ উপন্যাসের মান খুব উঁচুতে ওঠে নি।

তৃতীয় বা সর্বশেষ উপন্যাস মৃত্যু-ক্ষুধায় [illegible] [illegible] [illegible] সমাজের নিম্ন স্তরের [illegible] চিত্র :

"[illegible] দেওয়া [illegible] এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পান্তাভাত খেয়ে মজুরীতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড় ছেলেটাকে বেশ ক'রে দু-ঘা ঠেঙায়, মেজোটাকে সম্বন্ধের বাছবিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজেঞ্চুস, ছোটটাকে খায় চুমো, তার-পর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।"—অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক। এ ধরনের উপন্যাস ঐ সময়ে খুব বেশি লেখা হয় নি। সেদিক থেকে বিচার করলে এটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বস্তুত এই উপন্যাসে তাঁর বক্তব্য : সর্বহারাদের দ্বারা আঘাতের ফলেই এই পংগু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আসতে পারে। এবং এই আঘাত হানার জন্যই সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, তিনটি উপ-ন্যাসেই আমরা বিদ্রোহী নজরুলকে পাই - পাই কমবেশি [illegible] বাঁধনহারা রূপটিও।

নজরুল শুধু বিদ্রোহের কবিতাই লেখেন নি—প্রেমের কবিতাও লিখেছেন—যার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ঠিক তেমনি, আবার উপন্যাসে যেমন কোন-না-কোন দিক দিয়ে তাঁর বিদ্রোহী রূপটি পাই, তেমনি [illegible] তাঁর অনেকগুলো গল্পই প্রেমাশ্রয়ী এবং পরিণতি—করুণ ট্র্যাজেডি। তাঁর গল্পের বই তিনটি : ব্যথার দান, রিক্তের বেদনা এবং শিউলি-মালা। শেষেরটি সর্বশেষ গল্প সংকলন।

নজরুলের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রাগ্রসর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গল্পগুলোতে প্রতিফলিত। প্রেমা-শ্রয়ী হলেও যুদ্ধের পশ্চাৎভূমি এবং দেশপ্রেমের আবেগ নিয়ে লেখা 'রিক্তের বেদন' এবং ব্যথার দানের অধিকাংশ গল্প। আবেগের ফলে গল্পগুলো কাব্য-মাধুর্যে ভরে উঠেছে। যেমন : "সে এল মঞ্জরী-মুখর-চরণে সেই মুকুলিত লতাবিতানে। তার নাম করে ছিল চয়িত ফুলের ঝাঁপ। কবরী-ভ্রষ্ট আমের মঞ্জরী শিথিল হয়ে তারই বুকে ঝরে ঝরে পড়ছিল ঠিক পুষ্প-পাপড়ি বেয়ে পাঁরমল ঝরার মত।" (ঘুমের ঘোরে)

অবশ্য এও ঠিক, এই ভাবাবেগের ফলে কখনো কখনো গল্পের মানহানি হয়েছে।

নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প সম্ভবত "পদ্মগোখরা"—যার উদাহরণ মহেশ ও আদরিণী ছাড়া চোখে পড়ে না।

গ্রামবধূ এবং দুটো সাপকে কেন্দ্র করে গল্পের বিস্তৃতি। গ্রাম্য-বধূ জোহরার কথিত মাতুলের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কুসংস্কারকে তুলে ধরতে লেখক [illegible] উপসংহারে একটি মাত্র বাক্য ব্যবহার করেছেন, "জের হতে না হতে [illegible] রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবের [illegible] বৌ একজোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।" গল্পে চিত্রিত হয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত। অন্যায়ের পরাজয় ও ন্যায়ের জয় দেখাতে যেয়ে তিনি সাপ দুটোর হাতে জোহরার বাবার মৃত্যু ঘটিয়েছেন।

দুরন্ত পথিক নজরুলের অনবদ্য সৃষ্টি। এটায় কিন্তু আবার নজরুলের বিদ্রোহী রূপটি সুস্পষ্ট।

তবে উপন্যাস বা গল্পের চেয়েও 'ধূমকেতু' রচনাগুলোতে বিদ্রো-হের ছাপ স্পষ্ট। এদিক থেকে বিচার করলে বিদ্রোহী-কবির চেয়ে বিদ্রোহী-লেখক নজরুল কম নন। ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল সন্ত্রাস-বাদকে উৎসাহিত করার জন্য। তাই তিনি বাংলার ছেলেদের আহ্বান করে-ছিলেন, "এস ভাই পথের সাথী বন্ধুরা আমার, এসো আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল। ... মহামারী, মারীভয়, ধ্বংস আমাদের উল্লাস। রক্ত আমাদের তিলক, রৌদ্র আমাদের করুণা, এরই মাঝে আমাদের নবসৃষ্টির অভিনয় তপস্যা শুরু হবে। ... তোমাদের ধ্বংসের নামে আহ্বান করছি।"

বস্তুত ধূমকেতুর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ঘটনা। এরই ফলে নজরুলকে কারাভোগ করতে হয়েছে। এবং সেখানে তাঁর 'জবানবন্দী' বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় সম্পদ। জবানবন্দীতে তিনি বলেছেন : "আমি মরবো, রাজাও মরবে, কেন না আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে...। আমার [illegible] [illegible] বলা আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হবে না; কেন না আমি আরেক বাঁশী নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সেই সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশী সৃষ্টির কৌশলে।"

ধূমকেতুর কোন লেখায় বা বক্তব্য প্রকাশে নজরুলের কোন ভয় বা কুণ্ঠা ছিল না। তাই তিনি বলতে পেরে-ছিলেন, "যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাত-তাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা, পুঁটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের এতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে।" তাঁর "আমার ধর্ম," "বিষবাণী," "তোমার পণ কি," "ভিক্ষা দাও," "মায় ভুখা হুঁ," "আজ চাই কি" প্রভৃতি লেখায় তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন, "আজ চাই সারা ভারত জোড়া একটা বিরাট ওলট-পালট।"

সামগ্রিকভাবে তাঁর গদ্য-সাহিত্যেরও মূল বক্তব্য ম্যাক্সিম গোর্কির কথার সঙ্গে মিলে যায় : "দুঃখ বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।"

॥ সমাপ্ত ॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৪ই ফেব্রুয়ারি স্যামসনস অফিসের কাজে ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে যাওয়ায় তার সহকারী নিউবোরি সব অন্তরীণদের ডেকে আদেশ দেন যে, সন্ধ্যার পর কেউ তাঁবু থেকে বেরোবে না। এর আগে পর্যন্ত আমরা সন্ধ্যার পর যথেচ্ছ তাঁবুর বাইরে বেড়াতে বা এক সঙ্গে বসে গল্পগুজব করতে পারতাম এবং কখনও আমরা এ সুবিধার কোন অসদ্ ব্যবহার করি নি। কাজেই এই আদেশ আমাদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। খেয়ালের বশে নিউবোরি নিজেই সে রাত্রে পাহারাওয়ালার বুরুজে হাজির হয় এবং তারপর অবস্থা একাধারে সঙ্গীন ও হাস্যকর হয়ে ওঠে। আমাদের বন্দোবস্তের ফলে সে রাত্রে সারা রাত ধরে অন্তরীণরা একের পর এক তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আবেদন জানাতে থাকে, "মহাশয় আমি অনুমতি চাই!" "কোথায় যাবার জন্য?" "মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য", "নাইরোবি যাবার জন্য", "ইউরোপ যাবার জন্য", "জল পান করার জন্য" এবং আরও "অনেক অভদ্র ও অশ্লীল কারণের জন্য"। আমাদের এইরকম ব্যবহার করা খুবই ছেলেমানুষি ও হাস্যকর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিউবোরি নিজেও একজন গোঁয়ার, বুদ্ধিহীন এবং অপরিণত মস্তিষ্ক লোক ছিল। শেষকালে সে এত ক্ষেপে যায় যে, তার পিস্তলভাব বার করে আকাশে দুবার গুলী ছোড়ে এবং আমরাও এর পর যে-যার তাঁবুতে রাত্রের জন্য ফিরে যাই। পরদিন সকালে আমি নিউবোরিকে বলি যে, তার গতকালের আচরণ খুবই গর্হিত হয়েছিল। তা ছাড়া আমি জেলা শাসককে চিঠি লিখে এ ব্যাপারের জন্য নিজে এসে তদন্ত করতে অনুরোধ করি।

স্যামসনস ক্যাম্পে ফিরে এসে সমস্ত কিছু জেনে নিউবোরির উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয় এবং জেলা শাসক তদন্ত করে আমাদের সপক্ষে রায় দেন। প্রথমে তিনি আমাদের উপর খুব হম্বিতম্বী করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, ভয় দেখিয়ে আমাদের কাবু করতে পারবেন না, তখন তিনি সুর পাল্টিয়ে ফেলেন এবং আমাদের প্রশ্নমালার সরাসরি জবাব দেন। তিনি চলে যাবার পর স্যামসনস আমাদের যথেচ্ছ ঘোরাফেরা করার অধিকার আগেকার মত বজায় রাখে। তাঁকে আমরা সবাই একাধারে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতাম এবং ভালও বাসতাম। তিনি প্রত্যেক শনিবারে আমাদের তাঁবু পরিদর্শনে আসতেন বলে আমরা যত্ন সহকারে সময় মত সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতাম। আমাদের ভেতর একজনকে কমিটির তরফ থেকে তাঁর রান্নাবান্নার কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁর অসুবিধা না হয়। এপ্রিল মাসে তাঁর বদলী হয়ে যাওয়াতে আমাদের খুব খারাপ লাগে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত নিউবোরিও সেই সময় বদলী হয়ে যায়। এর পর "চেস্টার" নামক যে কর্মাধ্যক্ষ আমাদের ক্যাম্পে আসেন তাঁর মত হিংস্র এবং বুদ্ধিমান মানুষ আমি জীবনে দেখি নি। তিনি কোন অন্তরীণের সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা করতেন এবং এমনভাবে আমাদের দিকে তাকাতেন যেন আমরা সবাই এক-একটি পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারবিশেষ।

একদিন চেস্টার ক্যাম্পের মাঝখানে এসে আদেশ জারি করেন যে, আমাদের সবাইকে শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে—আমরা তাতে অস্বীকৃত হই। তিনি তখন নুডংগগু নুজরোগে নামক একজন অন্তরীণকে জোর করে ধর্ষণ করেন ও ক্যাম্পের বাইরে টেনে নিয়ে যান। সে তাতে বাধা দেয় এবং আমি ও আরও কয়েকজন তাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হই। ক্যাম্পের সমস্ত প্রহরী তাদের বিপদ বাঁশী বাজিয়ে চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে। চেস্টার ক্যাম্পের ভেতর ফিরে এসে রাগে কাঁপতে কাঁপতে নতুন আদেশ জারি করেন যে, কাজ না করলে আমাদের রেশন কমিয়ে দেওয়া হবে। আমরা তাতেও অস্বীকৃত হলে সত্য সত্যই রেশন কমিয়ে প্রায় অর্ধেকেরও কম করে দেওয়া হয়। আমরা চেস্টারকেও ঘৃণার চক্ষে দেখতে আরম্ভ করি। কিন্তু কয়েকদিনের ভেতরই আমাদের কয়েকজন দুর্বলচিত্ত অন্তরীণ ক্ষুধার তাড়না সইতে না পেরে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কমিটির এক জরুরী বৈঠকে আমরা স্থির করি যে, এ ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব নিয়মাবলী রক্ষা করার চেয়েও নিজেদের ভেতর একতার প্রয়োজন বেশি, ফলে কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে এই মর্মে মিটমাট করে নিই যে, কেবল নিকটবর্তী বিমানপোতের অবতরণের জন্য নির্দিষ্ট জমির মেরামতের কাজেই আমাদের লাগান হবে। ঐ জায়গাটিকে চালু রাখতে আমাদেরও স্বার্থ ছিল। কারণ বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তাসমূহ বন্ধ হয়ে গেলে কেবলমাত্র বিমানযোগেই আমাদের রেশনাদি আসতে পারতো বা কোন অসুস্থ অন্তরীণকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত।

আমি প্রায়ই ক্যাম্পের দুরবস্থা ও অন্যায় নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কেনিয়ার গভর্নরকে বা আরক্ষ-বাহিনীর মহাধ্যক্ষকে বা বিলেত সরকারের ঔপনিবেশিক কর্মসচিবকে চিঠি লিখতাম।

জীবন ৯.৫০
সাইজ ৪—১০
গরমে চলুন হালকা পায়ে
বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া
খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও
স্নিগ্ধ আমেজ। সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের
স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি। পরলেই ভালো লেগে
যাবে চমৎকার নমনীয় আপার। সুঠাম তলি চলার ছন্দ
হালকা ও সাবলীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয়
বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যান্ডাল ও চপ্পলের
যেন মেলা ব'সে গেছে—এখানে তার মাত্র কয়েকটি
নকশাই দেখছেন। আসুন না, একবার প'রে দেখুন।
ধীরা ৬.৮০
সাইজ ১—৭
খোকন ৮.৯৫
সাইজ ২—৫
অনু ১৪.৫০
সাইজ ২—৭
Bata
বিনোদ ১৮.৯৫
সাইজ ৪—১০
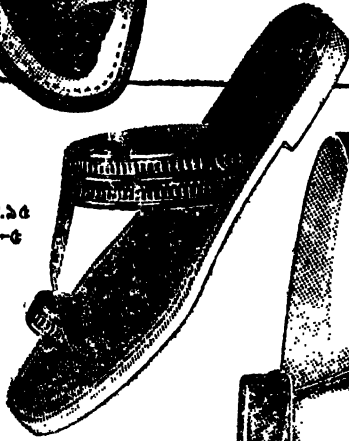
এই সব চিঠিগুলি আমার পুলিশ বন্ধু জোরামের শ্বারায় লুকিয়ে পাচার করা হত ক্যাম্পের বাইরে, তারপর ডাকযোগে পৌঁছাত যথাস্থানে। চেন্টার বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সামনে অবশ্য আমি কখনও জোরাম বা অন্যান্য পুলিশের সঙ্গে মাখামাখি বা গালগল্প করতাম না, যাতে তাদের মনে কোনোরকম সন্দেহ না হয়। ঐরকম একটা চিঠিতে আমি চেন্টারের অভদ্র ও পাশবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে নালিশ করি। তার কিছুদিন পরেই মারাল্যাল ক্যাম্প থেকে আগত একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার আমাদের সবাইকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করে "জোসিয়া মোয়ানগি কোথায়?" "এই যে এখানে!" আমি এগিয়ে এসে উত্তর দিই, "মহাশয় বলতে শেখ হতভাগা"। আমি আবার বললাম, "এই যে এখানে মহাশয়!" সেভাবে দুই চোখে ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিয়ে তিনি খানিকক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন. সেরকম করে কাউকে আমি কখনও তাকাতে দেখি নি। অবশেষে আমাকে শাসিয়ে তিনি বললেন যে, আমি ক্যাম্পের বাইরে বড় বড় লোকেদের প্রতিবাদ ভরা চিঠি লিখছি, সে-কথা তার জানা আছে। তারপর তিনি আমাকে আর সব অন্তরীণদের সামনে ফেলতে দিতে বললেন।

কয়েকটা চিঠি আমি চেন্টারকেও লিখি তার ব্যবহারের প্রতিবাদ করে। এবং একবার সে আমাকে ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে গিয়ে অপমান, আমার গালাগালি দেয়, চিঠিগুলো কাগজের মতো দিয়ে আমার মুখে ছুড়ে মারে। আমি নিজের রোধ সামলাতে

না পেরে তার [illegible] ধরে তাকে তিনবার মাটিতে ফেলে দি এবং এর পরের মুহূর্তেই ক্যাম্পের পাহারাওয়ালা এসে আমাকে ধরে ফেলে। প্রায় ১৫ মিনিট পর চেন্টার আমার শাস্তির ব্যবস্থা করেন: চড়চড়ে রোদে ৬ ঘন্টা ধরে আমাকে ঠায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কয়োপ পাহাড়ের দিকে মুখ করে। ফলে আমার পা ভীষণ ভারি হয়ে ফুলে ওঠে এবং মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। কিন্তু এইভাবে চেন্টারকে শারীরিক আঘাত করতে পারায় আমার মন অনেক হাল্কা হয়ে যায়।

আমাদের মাংসের রেশন হিসেবে যে সব ছাগল আমরা পেতাম, তাদের ক্যাম্পেই জবাই করে ছাল ছাড়ান হতো। ঐ ছাগলের মাথা দিয়ে যে সুপ তৈরি হত, তা কিকুয়ুদের প্রিয় খাদ্য এবং বোধ হয় তা জানতে পেরেই চেন্টার একদিন হুকুম জারি করলেন যে, ছাগলের মাথা ক্যাম্পের পাহারাওয়ালাদের খাবার জন্য দিয়ে দিতে হবে। আমরা এজন্য খুবই ক্রুদ্ধ হই, কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় এক দুর্বুদ্ধি আসে এর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য। যে অন্তরীণরা ছাগল কাটত তাদের আমি আগে থেকে শিখিয়ে দি ও তারপর পাহারাওয়ালাদের চুপিচুপি গিয়ে বলি যে, একটা বিষয় আমি তাদের বন্ধু হিসাবে সাবধান করে দিতে এসেছি। বেশ খানিক ভণিতা করে তাদের জানাই যে, কিকুয়ুরা ছাগলের মাথা অন্য কাউকে দিতে চায় না। কিন্তু দিতে বাধ্য হলে তারা কাটা মাথাকে বিশেষ একভাবে ধরে তার উপর অভিশাপ দিয়ে দেয়। ফলে যে ঐ মাথা খাবে তার সর্বনাশ হতে বাধ্য। পাহারাওয়ালারা এতে ভয় পেয়ে যায় এবং যখন তারপর তারা লক্ষ্য করে দেখে যে, সত্য সত্যই জবাই করার পর অন্তরীণরা কাটা মাথাকে বিশেষ একভাবে ধরে আছে, তখন তারা চেন্টারকে গিয়ে জানায় যে, অন্তরীণদের জন্য কাটা ছাগলের মাথা তারা খাবে না। এতে দু দলই আমার উপর খুব খুশি হয়—পাহারাওয়ালারা অভিশপ্ত ছাগলের মাথা খাওয়া থেকে বেঁচে যাওয়াতে এবং অন্তরীণরা সুস্বাদু ছাগলের মাথা খাওয়া থেকে বঞ্চিত না হওয়াতে।

কয়োপ থাকাকালীন কেনিয়ার জঙ্গলে লুক্কায়িত স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈন্যরা ও অন্যান্যরা সংগ্রামে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছে, সে বিষয়ে কোন খবরই আমরা পেতাম না। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে নাইরোবি শহরে "অপারেশান অ্যানিভাল"-এর খবর পেয়ে আমরা খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম। এতে শুধুমাত্র নাইরোবি শহর থেকে ২৪০০০ আফ্রিকানদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী "লাংগাটা" ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। তার অধিকাংশ লোকের উপরই অমানুষিক অত্যাচার করা হয় তাদের কাছ থেকে তথাকথিত স্বীকৃতি পাবার জন্য। আমাদের ক্যাম্পের কমিটি বৈঠকে স্থির করেন যে, সবরকম চেষ্টা করে অন্তরীণদের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে। আমরা যারা সরকারপক্ষের ব্যবহার লক্ষ্য করছিলাম তারা বুঝতে পেরেছিলাম যে, সরকারী দুর্ব্যবহারের ফলে বিবাদ ক্রমশই বাড়ছে। কিন্তু তবু আমরা আশা করেছিলাম যে, বন্দীশিবিরগুলি হয়তো ১৯৫৪ সালের ভেতরই তুলে দেওয়া হবে এবং আরও বছর দুয়েকের ভেতরই সরকার আমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবার কথা ভাববেন।

আগস্ট মাসের ১৯ তারিখে ছয়টি লরী আমাদের কয়োপ ক্যাম্প থেকে নিতে আসে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম যে, এবার বুঝি আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু পরে 'মারালাল' পৌঁছে জানতে পারি যে, আমাদের গন্তব্যস্থল হল নাইরোবির কাছাকাছি লাংগাটা ক্যাম্প। কারণ কয়োপ ক্যাম্প তুলে দেওয়া হচ্ছে। লরীতে চড়বার সময় চেন্টার আমাকে দেখিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বলে যে, আমি হলাম ঐ দলের পাণ্ডা। কর্মচারীটি তখন নির্বিকার চিত্তে তার হাতের চাবুক দিয়ে আমাকে তিনবার আঘাত করে। আমিও তাকে প্রত্যাঘাত করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সময়মত নিজেকে সামলে নি। কারণ হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, সে পথে যদি সে আমাকে মেরেও ফেলে, তাহলেও আমি কিছু করতে পারব না। 'মারালাল' ও 'রুমুরুটির' মাঝে 'সুগুটা মারমার' নামক এক জায়গায় আমাদের লরী কাদায় বসে যায় এবং আমরা সকলেই নীচে নেমে কাদার পাঁক থেকে লরীকে টেনে তুলি। সে রাত্রি আমাদের আশ্রয়বিহীন, কম্বলবিহীন, খাদ্যবিহীন অবস্থায় কেটেছিল খোলা আকাশের তলায় দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে। মনে হচ্ছিল যে, আমরা একদল জঙ্গলের পশু হঠাৎ দারুণ ঝড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রাণভয়ে সবাই এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে আছি।

কয়েদ ক্যাম্পে থাকতে সময় কাটাবার জন্য আমরা অনেকগুলি গান ও ছড়া রচনা করেছিলাম। তার ভেতর নিম্নলিখিত ছড়াটিই ছিল আমাদের সব থেকে প্রিয়—যেটি রচনা করেছিলাম আমি, গাদু গাথমুবি ও রিচার্ড মুরুগি মিলে। এর মূল বক্তব্য হল:

"ভগবান পুরাকালে স্বাধীন কেনিয়ায় তোমার আশীর্বাদে তোমার কিকুয়ু সন্তানরা ঢাল, তরোয়াল এবং বল্লম সর্বদা নিয়ে থাকতো নিজেকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু বিদেশী শাসকের অত্যাচারে আজ আমরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত।" (কেনিয়ার বৃটিশ রাজত্বকালে বিশেষ অনুমতি না নিয়ে কোন আফ্রিকানই এই সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পেত না।) পুরো ছড়াটির বাংলা তর্জমা করলে এই রকম হবে:

আমাদের শত্রুর চোখে ঘুম নেই
কিভাবে আমাদের নেতা
জোমো কেনিয়াট্টাকে
হত্যা করবে এই ভেবে,
কিন্তু তারা কখনই তা পারবে না।

ভগবান! আমরা আগে ঢাল, তরোয়াল ও বল্লম নিয়ে পথ চলতাম, এখন বিদেশী শাসকেরা সে সমস্ত কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু তুমি তো জান কোথায় লুকান আছে এই অস্ত্র! কেন না তুমি এই দিয়েই বিদেশীদের মেরে তাড়াও।

কিকুয়ু যোদ্ধার দল ওঠো, জাগো,
শুধু শুধু শুয়ে—বসে কালক্ষয়
করো না আর,
তোমাদের অলসতার
সুযোগ নিয়েই বিদেশীরা
আমাদের ধন ছিনিয়ে নিচ্ছে,
এর পর কিভাবে খাওয়াবে তোমরা
সন্তানদের?

গত বাহান্ন বছরের ভেতর
বিদেশীরা কি করেছে দেশের
তাতো দেখেছ,
আর মূর্খ কিকুয়ু তোমরা,
সামান্য টাকার লোভে,
দেশের স্বার্থ স্বাধীনতা বিদেশীর পায়
জলাঞ্জলি দিয়েছ।

মূর্খ, হতভাগ্য কিকুয়ু, যাও গিয়ে
হাজার শিলিং ভিক্ষা নাও,
তারপর দেখা ফুরলে কি করবে
বলো দেখি?

আমার নবযুগের কথাগুলো,
তাই তোমাদের বলি,
তোমাদের ভুল পথে চালিয়েছে
বিদেশী শাসকেরা,
এবং দেশে দুর্দিনে তারা কেউই
সাহায্য করবে না আমাদের।
বিদেশী কথায় বিশ্বাস করো না কভু,

তার স্তুতিবাক্য নদীর গভীর জলে
ফেলে দেওয়া উচিত,
তার জোর-জুলুম কর্তৃত্বও
যাক ভেসে সেই জলে,
আফ্রিকা মহাদেশের এই কেনিয়ায়
ফিরে আসুক আবার আমাদের কালো
লোকেদের স্বরাজ।

[ক্রমশ]

হগলেই চইলায় গেল। [illegible] করে। আর থাকুন যাইবে না।

নৌকা খালে নামলে হরিলাল লগি রেখে বৈঠা হাতে নিল। নৌকাটা

দূরে দূরে গ্রামগুলি দ্বীপের মত ভাসছে। এক ঝাঁক পাখী উড়াল দিল। ঝুঝিবা রওনা দিল নিজের বাসায়। ছপ্‌ছপ্ করে হরিলাল বৈঠা ফেলছে। কাঁধের গামছা দিয়ে নিজের মুখটা মুছে নিয়ে বলল: 'আপনারে চিনা যায় না। অসুখ হইছিল নাকি?' কি উত্তর দেব—বললাম—না। নৌকার পাশেই কোন একটা মাছ ওয়াস দিল। চারিদিকে জল ছিটিয়ে গেল। সেদিকে হরিলাল চোখ রেখে বলল—বোয়াল।

অন্য মাছও হতে পারে। সে-কথায় না গিয়ে বললাম—দ্যাশে তো গন্ডগোল নাই।

না। হেই রকম কিছু না। চোর-ডাকাইতের ডর বেশী। একটা রাইতও বাদ যায় না। কর্তা একটু সাবধানে থাইক্যান।

পরাণ ছ্যাঁৎ করে উঠল। অজানা আতঙ্কে আমার গা শিউরে শিউরে উঠল। আর কোন কথাই হল না। নিজের মনেই ভাবনা এল। হরিলালের দিকে তাকালাম—আজকাল এ-রকম বিরাট সংগঠিত দেহের মানষ সচরাচর চোখে পড়ে না। হাত-পা-বুক লোহার ছাঁচে তৈরী। বললাম: হগলেই তো ভাল আছে। হরিলাল চারিদিকে একবার চোখটা ঘুরিয়ে উত্তর দিল—কোন রকমে বাঁইচ্যা আছি।

ধলেশ্বরী নদী পিছনে রেখে এগিয়ে চলল। ছইয়ের নীচে বসে—হরিলালের মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। চোখটা যেন জ্বলজ্বল করছে। বুকের হাড়গুলি স্পষ্ট ফুলে ফুলে উঠছে। বলল: সব চইলা গেলে, আমরা থামু কি! কেরাইয়া নাও বাইয়া দিন চলে না। তা ছোট কর্তা হিন্দুস্থানের খবর কন। তানারা কি কয়।

শরীর অবসন্ন—ইচ্ছা করছিল না কথা বলতে—চোখ ঘুরিয়ে দূরের নীল আকাশটা দেখতে চেষ্টা করলাম। মাঠভর ধানক্ষেত। সবুজের মেলায় ঢেউ খেলে বাতাস অজানা দূর দেশে যাচ্ছে।

দেশ ভাগের পর পাশপোর্ট করে এই প্রথম আসা। মনে একটা ভয় ছিল। কি হয় কি হয়। কেন না। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ একটা ছিলেন না। বাড়ী-ঘর ফেলে হিন্দুরা প্রায় সকলেই চলে এসেছিল। কোন কোন বাড়ীতে বুড়োবুড়ি রইলেন। ইচ্ছা আবার বাড়ীতে এসে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবেন। চৌদ্দ-পুরুষের বসতবাটী সহজে কি ভোলা যায়—না কেউ ভুলতে পারে।

মা একবারও কলকাতায় এলেন না। চিরকাল পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করবার অভ্যাস। কলের জলে স্নান করতে পারতেন না। বলতেন এই দ্যাশে থাকুম না। চইল্যা যামু। মাওন যাইবো না!' সংস্কারের কোন কথা উঠলেই গজগজ করতেন। আসলে তাঁর কিছুই ভাল লাগতো না। ভ্যাপসা ঘর। ছোট্ট জায়গা। রাস্তা-ঘাট, মানুষ-জন, কোলাহল—কোনমতেই মেনে নিতে পারতেন না।

অবিশ্যি সেটাও তাঁর পক্ষে দুষণীয় নয়। খোলা-মেলা বাস করেছেন। বাড়ীর লাগোয়া কয়েক পাকি ধানজমি, গরু, লাঙল ছিল। আর ছিল চার ভিটের টিনের ঘর। মা যাবার সময় বলে গেলেন: মরতে হয়, চৌদ্দপুরুষের ভিটেয় মরুম। তোগ সোনার দ্যাশে থাকতে চাই না। তোগই থাক্। আর একটা কারণও ছিল। যা কিছু রয়েছে—তা একেবারে ফেলে দিয়ে আসা যায় না। নেই নেই করেও কম নেই। মা গিয়ে যদি আস্তে আস্তে পাঠাতে পারেন মন্দ কি?

সেই থেকে একবার করে যেতে হয়। পাশপোর্ট ভিসা—ঝামেলার জন্যে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মা বারবার চিঠি লিখছেন—'তোদের পথ চাইয়া আছি। নারকেলের নাড়ু। তিলা কদমা সব নষ্ট হইয়া যাইত্যাছে, এইবার চকে ধান ভালই। তুই যে আমগাছটা লাগাইছিলি—সেই গাছটায় বইল আইছে।'

মা'র উপর ভীষণ রাগ হল। শুধু শুধু এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। দুনিয়ার লোক চলে গেল। তিনি চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছাড়ছেন না। এবার আর রাখবো না। ভয় নিয়ে যাতায়াত চলে না। নিজের দেশ নিজের কাছেই অপরিচিত। চারিদিকে আতঙ্ক। এই বুঝিবা এল লুঠেরার দল। ঘোড়া টগবগিয়ে এল। টাকা-পয়সাও পাঠান যায় না। কাঁহাতক আর ও-সব

চালাকি চলে। আল্লার কাছ থেকে পঞ্চাশটা আর দিয়েছি তুমি দিয়ে দিও। তার মানে পঞ্চাশ টাকা। অদ্ভুত ব্যাপার। মাকে তো এই সব বোঝান যাবে না। বললেই বলেন: 'দেশভাগে ভাগ করল ক্যান। ড্যাকরা মিনসেগুলা পাটারো। কার মাথায় বাড়ী দিছিলাম—তোরা বাধা দিতে পারলি না। ভাত খাইয়া মানুষ হয় নাই। ছাই খাইছিলি।' এর পরেই মা কাঁদবেন। চোখের জলে কাপড় ভেজাবেন। কে বোঝাবে কার জন্য এই দেশ ভাগ হল। কেন হল। মা খালি বলেন, আমরা কেন বাধা দিলাম না। যেন আমরাই দোষ করেছি। আমরাই ভাগ করেছি।

কচুরিপানার দামে হরিলালের নাও আটকে গেল। বৈঠা রেখে লগি হাতে নিল। ছইয়ে ধান গাছের পাতা লেগে ছরর ছরর শব্দ হচ্ছে। একটা মিষ্টি সোঁদা গন্ধ উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এখান থেকেই আমাদের বাড়ীর দেবদারু গাছটা দেখা যায়। বরাবর ঐ গাছটায় কার্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দিতাম—বহু দূর থেকে দেখা যেত। আহা রে! কি আনন্দ ছিল। একবার এইখানে বাইচ হয়েছিল, ঘোড়া মারার দল আমাদের কাছে হেরে গেছিল—আহা রে! কি সুখের ছিল। হরিলাল লগি ঠেলতে ঠেলতে বলল: 'আপনার লগেই যামু গা।'

বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। ছই থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল, উত্তর কি দেব। হরি শোনে ভাত নেপে খেতে হয়—চাল কিনতে হয়। আমি তো ওর খাওয়া দেখেছি। সাত জনের রেশনে যা চাল দেয়—তা ওর দু'দিনও যাবে না। ঘাটে নামতে নামতে বললাম—'যাইবা ক্যান। আমি তো আর যামু না।'

'তাহা কথা!' হরিলাল খুশিতে খলখলিয়ে উঠল। শাপলার বনে ঢেউ খেলে গেল। আহা কি আনন্দ! কি আনন্দ!

'মাঠান—দ্যাহেন কে আইছে।' বলেই বাড়ীর দিকে ছুটল হরিলাল। মা আমাকে পেয়ে কি যে করবে ভেবেই পেল না। গায়ে হাত দিয়ে দেখল শরীর খারাপ হয়েছে কিনা। খাওয়ার জন্য এটা আনে ওটা আনে। মানে উৎসব পড়ে গেল। পাড়া-পড়শীরা ছুটে এল। বিদেশে যাদের কেউ রয়েছে তাদের কথা জানতে চাইল। খবর দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা মন্দ লাগলো না। অথচ এই সব সুখস্মৃতি ফেলে চলে যেতে হবে। ঘাট থেকে নৌকো ছাড়লে বাড়ীর কুকুরটা পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সরলদি জাবর কাটা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাবে। মা উঠোনে কপাল কাটাবে। তখন—তখন,—না যাবোই না।

কটা দিন কিভাবে কেটে গেল। কি করেছি, কোথায় গিয়েছি। কিছুই বলতে পারছি না। ভিসার মেয়াদ আর বেশী দিন নেই। এখনো ইলিশের ঝাল দিয়ে খাওয়া হল না। কবে যাব—দিন চলে যায় যায়। মোহনগঞ্জে পাতক্ষীর আনতে যেতে হবে। মা পাটিসাপটা করবে বলেছিল। না আর যাব না। সারেন্ডার করব। পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে যাব। বৈরাগী মন নিয়ে আর বাঁচার উপায় নেই।

প্রথম চোখ খুলে যাদের দেখেছি, শৈশবকাল যেখানে কেটেছে—কোথায় কি আছে না আছে একনাগাড়ে বলে দিতে পারি। আমগাছ কার বাড়ীতে ক'টা আছে তাও নখদর্পণে।

জরিনা কেমন গাছতলায় কাঁচা আচার খেতে দিয়েছিল এখনো মনে আছে। তা নিয়ে কত কাণ্ডই না ঘটে গেল। আগমনী তো বলেই ফেলল—'তোর লগে আর খেলুম না।—আড়ি।'

এখন হাসি পায়। তখন কতই বা বয়স ছিল। সে সময় বউ-বউ খেলতাম। প্যাঁটকাঠি আর কলাপাতা দিয়ে ঘর বানাতাম। মাটি দিয়ে সন্দেশ, রসগোল্লা তৈরী করে বিক্রী করা হত। জরিনা আগমনী দিদিদের কাপড় পড়ে গিন্নী-বান্নী সেজে ও-সব জিনিষ কিনত। তখন কেন জানি না জরিনার সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিল বেশী। আসলে ও হাসলে ওর গালে টোল পড়ত। তখন ওকে আরও বেশী সুন্দর দেখাত। আরো অনেক কারণ ছিল—জরিনার

মুবর মাঝে মাঝেই আমাদের মাছ, ডিম, শাক-সব্জি দিয়ে বদলে মা'র কাছ থেকে মুড়ি নিয়ে যেত।

জরিনার মা নাকি মুড়ি ভাজতে পারতো না। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল। এই ঘনিষ্ঠতা আগমনী সহ্য করতে পারতো না। বস্তুত আমরা তিনজনেই সমবয়সী ছিলাম। বোধ হয় জরিনা কিছু ছোট ছিল।

এখন জরিনা কোথায় কে জানে। নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গেছে। হয়তোবা পলাশডাঙা গ্রামে ঘর-গৃহস্থালী নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেমেয়ে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। সময় পেলে একবার খোঁজ নেব। ওদের বাড়ী থেকে কেউ যদি আসে, তাহলে ভাল হয়—কি জানি দিনকাল কেমন।

আগমনী রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়েছিল—সে সংবাদ আগেই জানি। এবার কেউ কিছু বলবে না। ওর জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওখানে থাকতে একবারও মনে হয় নি। শুনেছিলাম—দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একটা অবাঙালীর হাত ধরে চলে গেছে—বাংলার বাইরে। আহা রে! সুন্দর মেয়েটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

অভিশাপ! দেশভাগের অভিশাপ। কি দোষ করেছিল। কি পাপ করেছিল। জরিনার মত সংসারের একজন হতে পারতো। কালো হাতের ঈপ্সিত একজন পেল সুখ আর একজন পেল দুখ। অথচ দুজনেই মানুষ। এই খোলা-মেলায় লালিত-পালিত হয়েছে এবং তাদের প্রেমিক বেকার, থাকন-খাওনের ঠিক-ঠিকানা নেই। ভীখিবন্ধ হয়ে মাঠ-প্রান্তর, ঘর-বাড়ী অন্বেষণ করে খুঁজছে সুখ। এই সব আপনাপ্রিয় গাছ-গাছালি, পইল-পাখালি, খাল-বিল, রাস্তা-ঘাট, হিজল বন, এখন আর আপন নয়। এখানে রবাহুত অতিথি।

চারিদিকে তাকালে কান্না পায়। কি জমজমাট বাড়ী-ঘর ছিল। এখন শ্মশান। বাড়ীগুলি আগাছা জংলায় ভরে গেছে। একদিন যে জনপদ ছিল—তার কোন চিহ্ন নেই। বাতাসে হিস্-হিসানি শব্দ।

শান্তিদের বাড়ীর দুয়ারে পাট বুনেছে। ইস্ বিলাতি গাবগাছটা কেটে ফেলেছে। আহা! কি সুস্বাদু ছিল। রব উঠেছে—কালু শেখ এই বাড়ী দখল নেবে। দলবল নিয়ে এলেই হল। ন্যায়-অন্যায় বলার তো কেউ নেই। জরিনার বাবার কথা মনে হল। সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। থাকলে কি এই আঁদাড়-পাঁদাড়ের সৃষ্টি হত?

জরিনার খবর নিতে গিয়ে এমনভাবে আঘাত পাব—ভাবি নি। জরিনা আগুনে পুড়ে মারা গেছে। আহা! কি করে সর্বনাশ ঘটল। এখনো চোখের সামনে ভাসছে। এখনো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—'তাড়াতাড়ি খাইয়া ল—পরে আর পাবি না।' যখনি কিছু আনতো— এই কথা বলতো আর সতর্ক প্রহরীর মতো চারিদিকে চোখ ঘোরাত। ওকি বুঝতে পেরেছিল—

গেল রায়টে ইদ্রিস মিঞা গ্রামের প্রেসিডেন্ট ছিল। বাড়ীগুলি নিস্তব্ধ। হাট-বাজার বন্ধ। চারপাশে আতঙ্ক! তখন ইদ্রিস মিঞা জানিয়েছিল—গুণ্ডামি করলে আস্ত রাখবে না। রাতের পর রাত বিশ্বাসী লোকেদের নিয়ে পাহারা দিয়েছিল।

পৈশাচিক কাণ্ড ঘটুক তা চায় নি—হতেও দেয় নি। কিন্তু নিজের ঘরেই বিপদ এসে গেল। হঠাৎ রাত্রে বাড়ীতে দাউ দাউ করে আগুন লেগে গেল। কেমনভাবে লাগল কেউ বলতে পারল না। অনেকের সন্দেহ গুণ্ডারা লাগিয়েছে নিজের কাজ হাসিল করার জন্য। কেন না ওদের জানা ছিল জরিনার বাবা বেঁচে থাকলে কিছু করতে পারবে না। বস্তুত কপালের লিখন অন্য। জরিনা মারা গেল! আহা! দুধের মত মেয়ে। এই সাংঘাতিক শোকেও ভেঙে পড়ে নি প্রেসিডেন্ট। নিজের মহৎ কর্তব্যের কথা ভোলেন নি। নরপিশাচদের কাছে মাথা নত করেন নি। জরিনাকে বিসর্জন দিয়ে আরো শত শত মেয়ের ইজ্জৎ রক্ষা করলেন। এখন অন্ধ—বধির। বিছানায় শয্যাগত। প্রয়োজনের কাল শেষ হয়ে গেছে। আগমনী-জরিনা সব গেল। বুকের মধ্যে দগ্‌দগে ঘা। কিছুই ভাল লাগে না। কি যেন নেই—কি যেন নেই। দিন যতই এগিয়ে আসছে মা বোবা হয়ে যাচ্ছেন। এবারও যাবেন না। ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায় না। পাশপোর্ট আর ভিসা না থাকলে সীমানা ডিঙানো যায় না।

কয়েকদিনের জন্য এসে মন আরও খারাপ লাগছে। কান্না পায়। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। হাত-পা অবশ-অবশ লাগছে। মাঠে-ঘাটে অনাবৃষ্টির কাল চলছে। উঠোনে নেই শালিক-চড়ুই। আকাশে কেবল চক্রাকারে ঘুরছে চিল।

সকালবেলায় হলুদ পাখীটা ডাকছে 'কুটুম আয়—কুটুম আয়।' কিচ্ছু বোঝে না ছাই। কুটুম যাচ্ছে। কুকুরটা বারান্দায় বসে ল্যাজ নাড়ছে। আমি জানি নৌকোয় উঠলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মা উঠোনে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।

আত্মীয়-স্বজনদের চোখে অনবরত দর দর করে জল পড়ছে। চারিদিকে একটা গুমোট—গরম ভাব। কালবৈশাখীর পূর্ব মুহূর্ত। হরিলাল এসেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, 'আমাগো ফ্যালাইয়া কই যাইবেন কর্তা!' হরিলালের কান্নায় চোখের জলে রাখতে পারলাম না। হু হু করে কেঁদে ফেললাম। কতদিন যে এভাবে কাঁদিনি। আমার মা—মা-জননী! সব যেন ঝাপসা হয়ে গেল। দেহ টলছে। কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। মা! মাগো!

চারিদিকে শুধু কান্না আর কান্না! ঘাটে হরিলালের নৌকাটা নেই। বাঁধন খুলে ভেসে গেছে,—খালের মাঝখানে যেন চলে যাবার জন্যেই......।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছাপ্পান্ন ॥

চৈত্রশেষে সারারাত্রি জুড়ে প্রবল বর্ষণের মাতামাতি। বন-জঙ্গল জুড়ে সারারাত্রি বৃষ্টির ফোটাগুলি যেন সারা অরণ্যজগৎকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল। আমার বাংলোর টিনের চালে ঝমঝমিয়ে বড় বড় ফোটাগুলি যেন জলতরঙ্গের সিম্ফনীর মত বাজছিল। আমার কিছুতেই ঘুম আসে নি। ঘুম আসছিল না। জানালার ধার দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে আনছিল জলের চিকন ছিটেগুলি। আমি জানালা বন্ধ করে দিতে পারতাম, কিন্তু দিই নি। আমার যেন ইচ্ছেই ছিল না হাত বাড়িয়ে জানালার পাল্লা বন্ধ করতে। বৃষ্টির ছিটেগুলি আমার গায়ে উড়ে উড়ে এসে লাগছিল। অদ্ভুত কী এক শিহরণ যেন আমার স্নায়ুতে-শিরায়-উপশিরাগুলিতে মিষ্টি শীতকম্পনের টুং-টাং বাজিয়ে দিচ্ছিল।

এ ক'দিন অদ্ভুত গরম গেল ডুয়ার্সে। শীতে যেমন তীব্র শীত, গ্রীষ্মেও তেমনি প্রবল গরম। ধুলোর ঝড় উড়েছে ইতস্তত বিশৃংখল আনন্দের উল্লাসে। ধুলোর ঝড়ে শুধু নাক-মুখ-চোখই ঝাঁ ঝাঁ করে নি, উড়িয়েছে বন থেকে বনান্তরে অগণিত রুক্ষ পাতা। স্তূপের পর স্তূপ সঞ্চিত হয়েছে। মাকেমুখে শীতল জলের ছিটে দিতে হয়েছে। ঘাড়ে-গলায়-কানে। ল্যাভেন্ডারের গোটা একটা শিশিই ছড়াতে হয়েছে জলে। অডিকলোনের।

স্নায়ু-শিরা-উপশিরাগুলি যেন তপ্ত। দগ্ধ ধূসরতা চারদিকে। দিনে ফরেস্টের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হতাশ হয়েছি। রুক্ষ-ধূসর পাতা। জরাজীর্ণ চেহারা। শুধু কংকালসার গাছগুলির ভগ্ন-দীর্ণ রূপ। আবরণহীনতা যেন গোটা অরণ্যকে গ্রাস করেছে।

বাতাস বয়ে এনেছে গরম আগুনের হল্কা। গ্রীষ্মের সূচনা যদিও অবশ্য বৈশাখে। তবু চৈত্রের মাঝামাঝিই তার এই চেহারা। তাপক্লিষ্ট অন্তুতনু ভীষণ ভয়াল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে আসে।

রাত্রে কারা যেন শুকনো বনের গাছ-গাছালিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার জানালা দিয়ে দেখা যায় আগুনের লেলিহানলোলুপ শিখাগুলি। যত সব মরা গাছের ডালে-ডালে—নাচে আগুন তালে তালে। গাছপালা-উদ্ভিদের শিকড়ের পোড়ার শব্দ কানে আসে। ভয়ে পালাচ্ছে জঙ্গলের প্রাণী। জঙ্গলের খরগোস, জংলা ঝোপের কীট-পতঙ্গ ও পাখি-পাখালি, সাপ-খোপ প্রভৃতি।

যত রাতই হোক এই চেহারা। আগুনের দীপাবলী যেন। সেই সঙ্গে দূর বন থেকে বাতাসে পাতা-পোড়া গন্ধ ভেসে আসে।

এখনো ফোটে নি বনে বনে কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া-গুলমোরের দল। বাগানের অল্প দূরে—প্রায় সামনেই নদীর সংকীর্ণ জলরেখা। মস্ত সোঁতায় জল আর নেই বললেই চলে। শিমুলগাছ একটা দাঁড়িয়ে আছে স্থির প্রতিমূর্তির মত। ওইখানে এসেছিল বেদেরা। শেয়াল-শিকারীদের দল। সাপুড়েরা বাঁশী বাজিয়ে ফিরেছে মধ্যাহ্নবেলা। সাপুড়ে-বাঁশীর সুর তুলে তুলে।

দিনে বই নিয়ে বসি। ধার নিয়ে এসেছি একরাশ বই। নানা রকমারী বই যত সব। যতক্ষণ জানালা খোলা থাকে, ডেকচেয়ারে শুয়ে বসে, কিংবা মেহগনীর দামী খাটে শুয়ে শুয়ে বই পড়ি। মাঝে মাঝে আসে চৌকিদার। বদন সিং লোক বেশ ভালো। পালপাট্টাই গোঁফ। তার ছোট-ছোট পাঁচ-ছ'টি ছেলে-মেয়ে আছে। সব চাইতে ছোটটির বয়স দুই। বেশ হাসি-হাসি মুখখানাকে দেখে মায়া হয়। ছেলে-মেয়েগুলো বাংলোর ধারে বড়ো একটা আসেই না। তার টিনের ছোট ঘরের উঁচু বারান্দায় বসে নিজেদের মধ্যে খেলাধুলো করে। মাঝে মাঝে ওর বৌকেও দেখি। আর বনের ভিতরকার বাংলো হলেও অসহ্য উত্তাপে ছটফট্ করি।

দিনকতকের জন্যে এসেছি। কিন্তু স্নিগ্ধতার চিহ্ন এখানেও নেই। যতদিন যাচ্ছে ততই গরম চড়ছে ধাপে-ধাপে।

তারপর একদিন দেখতে-দেখতে এসে পড়ল মেঘ। জ্বালাময় সূর্যধৌত একটি দিনের সব পরোয়ানাকে অগ্রাহ্য করে দেখা দিল কৃষ্ণবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ ছায়ায়। আকাশ অন্ধকার হয়ে এল বাইরে। হাওয়ার মাতামাতি। সন্ধ্যার পর থেকে সুরু হল বৃষ্টি। বন-জঙ্গল রাতের আকাশ ভরিয়ে, গুমরিয়ে গুমরিয়ে আকাশ যেন কাঁদল। সারা রাত্রি ধরে সে-কান্নার যেন আর শেষ নেই।

জানালা খোলাই রেখেছি। মস্ত হাওয়া, জলো হাওয়ার উচ্ছ্বাস ডুয়ার্সের তাপদগ্ধ দিনগুলির যন্ত্রণা এক মুহূর্তে দিল ঘুচিয়ে।

অবশেষে বৃষ্টি একসময় থামল বটে, তখন রাত্রিও গেছে গড়িয়ে। কতটা রাত্রি, তা অবশ্য বলা কঠিন। আমার উঠে হাতঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করছিল না। বৃষ্টি ধরে গেলেও পাতায় পাতায় বৃষ্টির ফোটাগুলি টপ্ টপ্ করে ঝরে ঝরছিল। সারা প্রান্তর অন্ধকারে স্নান করে উঠেছিল। নিঃশব্দে।

সারারাত আলো-নেভানো ঘরে চুপ করে বসে থাকলাম। জানালায় স্লেটপাথরের মত কালো আকাশ। আমার মিঃ সেহানবিশের কথা মনে আসছিল। এই বাংলোতেই সেহানবিশ সেবারে এসেছিলেন বর্ষায়। বাংলোর পাশ-দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীর উত্তাল গর্জন বিচলিত করেছিল তাঁকে। সে-রাতেও এমনি ঝড়-জলের গর্জন শোনা গিয়েছিল। পাহাড়ে নেমেছিল বাদল। ঘন কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ গলিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল অজস্র বৃষ্টিধারা।

নদীতে কী খ্যাপা গর্জন! বৃষ্টি নামলে জলের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সেহানবিশ দেখেছিলেন এক অদ্ভুত

দৃশ্য। সে-দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়।

—কি দেখলেন?

পাইপে কামড় দিয়ে ধূম্র উদ্গিরণ করেছিলেন সেহানবিশ। উধম সিং-এর বাংলোয়। এই দৃশ্য বর্ণনা করবার আগে হয়ত একবার মনের পটে ছবিটা দেখে নিয়েছিলেন। ফর্সা হাসিমুখে, কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা উধম সিং-ও মুখে কৌতূহল প্রকাশ করার পরিবর্তে চোখে একপ্রকার উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে তুলেছিলেন।

—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! আমার সারাজীবনের স্মৃতি! জলটা ধরে গিয়েছিল, বাইরে ততক্ষণ আবার চাঁদ উঠেছে দুর্গম ভুটান পাহাড়ের শিরে। মিঃ সেহানবিশের গলা।

এ দৃশ্য ছবি-হিসেবে কতটা উপভোগ্য আমি জানি। সেহানবিশের কথা শুনতে শুনতে আমি ছবিটা মনের পটে গেঁথে নিচ্ছিলাম। চাঁদ উঠলে দুর্গম ভুটান পাহাড়ের চূড়ায় সে যে কী অনির্বচনীয় শোভা একমাত্র অভিজ্ঞতার চোখই জানে।

মিঃ সেহানবিশের গলা শুনছিলাম, ভিজে ভিজে রাত্রির অন্ধকারে কোন অজানা নাগকেশরের গন্ধ আসছিল। মিষ্টি-মিষ্টি কিন্তু তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধটা ম' ম' করছিল বাতাসে। এক ঝলক আমার জানালার ধারেও আসছিল। কিন্তু বৃষ্টির একটি ফোঁটার শব্দও ছিল না। শুধু পাহাড়ী নদীর গর্জন। নদীর সে কী খ্যাপা চেহারা আমি দু' চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছি। যেন লক্ষ লক্ষ বুনো মোষ তীব্র আক্রোশে—! জলে ফেনা নিশ্চয়ই ছিল। ফেনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। দেখা যায়ও না। তবে চাঁদের আলো নিশ্চয়ই ছিল। সেই চাঁদের আলোয় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম—

এক মুহূর্তের বিরতি নিয়ে মিঃ সেহানবিশ বলেছিলেন, একটা পাথরের মস্ত চাঁই নদীর প্রায় ওপরেই—জল তাতে ধাক্কা দিয়ে ফেনা ছিটিয়ে চলেছে। পাশেই মস্ত একটা জংলি হর্তুকীর গাছ। সেই পাথরের চাঁই-এর ওপরে দাঁড়িয়ে—। প্রথমে বিশ্বাসই হতে চায় নি। চমকে উঠেছিলাম। কি ওটা? না, ভুল দেখি নি। দেখলাম মস্ত এক বাঘ। ইয়া ঘাড়-গর্দানে। বোধ করি পারে যাবে বলে—কিন্তু এইটুকু এক চিলতে নদীর চেহারা দেখে থমকে গেছে। পাথরের মূর্তির মতো। সে-দৃশ্য কোনদিন ভোলা যাবে কি না সন্দেহ।

আজ রাতে সেহানবিশের কথাগুলি ভাবি। এই তো বসে আছি ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্যবর্তী একই বাংলোয়। আমারও ভাগ্যে বৃষ্টি নেমেছে। বেশ প্রবল প্রচুর বৃষ্টিই। কিন্তু আজ রাতে উথলে ওঠে নি নদী ক্রুদ্ধ আবেগে। ক্ষুব্ধ অজস্র জলধারায়! ওই তো আমার সামনে দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদী। জানালার ও-পাশে বারান্দা। বারান্দার প্রায় তলা ছুঁয়েই একফালি বাগান। বারান্দার সিঁড়িতে নামা চলে বাগানে। দু'-তিনটি ধাপ। উদ্যানলতা। কিছু ফুলের গাছ। অর্কিড কয়েক শ্রেণীর। বোগেনভিলাই-এর ঝাড়। তার পরে খানিকটা বসবার মত বাঁধানো চত্বর। এবং তার গা ছুঁয়েই নদী। নদীতে খুব সরু ঝিরঝিরে একটি চকচকে জলের ধারা। দুপুরের রোদ্রে দেখে এসেছি গিয়ে। ক্যামেরাটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম।

চৌকিদার নিষেধ করেছিল, একলা মাত্ যাইয়ে, বাবু।

বলেছিলাম, কেন, ভয় কিসের?

চৌকিদারের মুখে উত্তরে একটু হাসি খেলা করেছিল। বললাম, তুমি চলো আমার সঙ্গে।

কোমরে কুকুরি, কাঁধে টাঙি নিয়ে বদন সিং আমার প্রহরী হয়ে বেরিয়েছিল। সারা দুপুর ঘুরল আমার সঙ্গে। নদীর ধারে-ধারে, পাহাড়ের তলায় কিছু ছবি তুলে আনা গেল।

রাতে বাগানের ধারে ওই নদীর কাছাকাছি যেতে ভয় হয়।

কিন্তু আজ রাতে চেয়ে চেয়ে দেখি নদীতে কোনো শব্দ নেই। তার কারণ আজ রাতে পাহাড়ে বৃষ্টি হয় নি। ঢল নামে নি পাথুরে-নদীতে। সেহানবিশ এসেছিলেন বর্ষায়। এ চৈত্র মাসের শেষাশেষি নদীর সে-চেহারা কল্পনা করা যায় না। আমার চোখে ঘুম নেই। নিঃশব্দ রাতে চুপ করে বসে থাকি বিছানায়।

ডুয়ার্সের এই রাত্রিগুলি কী আশ্চর্য! কী ভয়ংকর!

ভোরে বদন সিং-কে বললাম, ওটা কি গাছ?

আমার জানালার গা-ছুঁয়েই গাছ। ভরে গিয়েছে নতুন পাতায়। গাছটাকে এমন করে আগে আর দেখি নি। বৃষ্টিতে ধুয়ে-মুছে আরো সবুজ হয়েছে পাতাগুলি।

বদন সিং বলল, চাম্পা গাছ, বাবু।

চাঁপা গাছ! আরে তাই তো। এ-গাছ তো ডুয়ার্সের পথে-ঘাটে। রাস্তার ধারে-ধারে। বনে-জঙ্গলে। সর্বত্র। মনে পড়ল সুপরিচিত চাপ কাঠ আসলে এই চাঁপার কাণ্ড থেকেই তৈরি। এ এক অদ্ভুত আবিষ্কার! আমি জানতামই না। কিছুদিন আগে কথাপ্রসঙ্গে জানলাম।

বদন সিং বলল—কাল বহুৎ পানি হয়েছে, সাব।

না, সাহেব মানুষ আমি নই। আমি সাধারণ মানুষ নিতান্ত। বদন সিং কি দেখে আমাকে সাহেব মানুষ বলে সনাক্ত করল জানি না। হয়তো সে ভাবে বাংলোয় যারা আসে তারা সবাই সাহেব। সাহেব মানুষ না-হলে বাংলোয় থাকতে আসে কেন। হয়তো ওটাই স্বাভাবিক ভাবনা। ওই জাতীয় ভাবনায় অভ্যস্ত হয়েছে সে।

আসলে কম-বেশি ভাবনাটা আমাদেরও। বাংলো কথাটা সাহেব-সুবোদের সঙ্গে জুড়ে বসেছে। ডাকবাংলো আলো করে বসেন ওঁরা। কোন্ বাংলো? বাংলো কথাটা এলো কোত্থেকে? মূলের শব্দটা বাঙ্গালা। আসলে ওই প্যাটার্নের বাড়ি—বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি বাড়ির পদ্ধতি আদিতে ছিল বাংলাদেশীয়। সেই থেকে চলে আসছে বাংলো। ডাকবাংলো, সার্কিট বাংলো, স্টেজ বাংলো। কত নাম ফেরে লোকের মুখে-মুখে।

বদন সিং-এর ভাবনাটা পাল্টাতে চাই। অবসরকালে বসি ওর সঙ্গে। অবসরই তো। আমার অখণ্ড অবসর। ডুয়ার্স দেখছি। ডুয়ার্স দেখব বলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে-ওখানে-সেখানে। লোকালয়ের মানুষজন দেখছি। দেখছি বন-জঙ্গল, গাছপালা। আমার ভাগ্যে কিছু কিছু সাহেব-সুবোদের সঙ্গে পরিচয় আছে। তাঁদের দয়ায় নিতান্ত গাছতলায় রাত কাটাতে হয় না। সুবিধে পেলেই ঢুকে পড়ি। বাংলোর কক্ষে কেউ বলেন, দাঁড়ান, বড়বাবুকে ডাকি। বলে কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে বলেন।

ঊর্ধ্বশ্বাসে আসেন বড়বাবু।

দেখুন তো বুধ-বৃহস্পতিবার কেউ বাংলো রিকুইজেশ্যন করছেন কিনা—

আজ্ঞে স্যার।

অমুক ইঞ্জিনীয়ার আসছেন কবে?

নর্দান সার্কেলের অমুক অফিসার?

ফরেস্ট-এর ডেপুটি ডিরেক্টর আসবার কথা ছিল—

অমুক মিনিস্টারের পি-এ আসছেন বুধবারে—

ট্রাইবেল-এর এক্সপার্ট কমিটি—

হরদম্ হরদম্! তাবৎ বড় বড় রাঘাববোয়াল অফিসাররা আসছেন যাচ্ছেন। বাংলো খালিই থাকে না। আসছেন ডিপার্টমেন্টাল ছোটখাটো আমলা-কর্মচারীরাও। কাজেকর্মে আসতেই হয়। আর বাংলো থাকতে তাঁরা কি গাছতলায় উঠবেন?

... ছিল গাছতলা। এ-যুগে আছে আছে, কিন্তু গাছতলা লোপ পেয়েছে। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমল পর্যন্ত ছিল। কদর বেশ ছিল। মধ্যাহ্নে গুরু আহারাদি শেষে কর্তার শীতলপাটি পড়েছে ভিতর-উঠোনের কোনো এক গাছতলায়। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বেশ খানিক তামাকের লম্বা নলে টান। তারপর পরিপাটি নিদ্রাটি আছে সাধা। গৃহভৃত্য কাছেই। জায়গাটি শীতল এবং স্বচ্ছন্দ।

দিন কেটে গেল তাঁদের গাছতলায় তাস-পাশা-দাবা ইত্যাদি খেলে। আড্ডা দিয়ে। হাসি-ঠাট্টা করে। গাছ-গাছালির কদরও ছিল। এ-যুগ যে মস্তানদের যুগ। তাদের জন্যে দুপুরটা ঠিকে করা আছে সিনেমাহলে-পার্কে। চা-র রেস্তোরাঁয়। একালে অবশ্য গাছ তাই-বলে পুরো-বরবাদ হয় নি। যদিও রাগ হলে পরে শত্রুকে শাসাতে কেউ ইতস্তত করেন না, গাছতলায় বার করে ছাড়ব। হুমকির সংগে লাঠি-সড়কি-বল্লমও থাকে।

তবু গাছের আবাদ হচ্ছে দেশে-বিদেশে। শুধু রুচির তাগিদে নয়, প্রাণের তাগিদেও। এই অঞ্চলের বন-বিভাগের কাজকর্ম দেখে মনে হয় প্রাণের তাগিদে যত নয়, ব্যবসার তাগিদে আরো বেশি-বেশি বনকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে। সভ্যতার জন্যে চাই মণ-মণ টন-টন কাঠ। কথায় বলে শুষ্কং কাষ্ঠং। হ্যাঁ, বাবা, শুকনো কাঠ। জ্বালানির জন্যে চাই কাঠ, আসবাবের জন্যে প্রতিদিন। তা ছাড়াও বাড়িঘর ইত্যাদির প্রয়োজনে কাঠ। রেলওয়ে স্লিপারের জন্য। ডুয়ার্সে এলে সেই কাঠের কারবারের দিকটা চোখে পড়ে। প্রয়োজনের দিকটা।

মাথায় পাগড়ি-পরা কণ্ট্রাক্টর উধম সিং-এর দলেরা বসে আছেন। কাঠ চাই, কাঠ। কেবিনেটের ব্যবসা ফেঁদেছেন কেউ। দেখে এলাম বানারহাটে, চালসা-দুয়ারে, আলিপুরদুয়ারে, নাগ্রাকাটায়, মালে-মেটেলিতে গিয়ে। প্রায় বাঙালী বনে গিয়েছেন। কত পুরুষ আগে বাংলায় এসেছেন। বাঙালীর মত বাংলা বলতে পারেন। বসে আছেন মাড়োয়ারীরা। টুপি-পরিহিত মাথা। নাদুসনুদুস চেহারা। মোটা ভুঁড়ির ওপরে পাঞ্জাবী-মেরজাই। পায়ে নাগরাজুতো। ওংকারমল-নরমলাল-জালিরাম-কিষেণচাঁদজিদের দল। কাঠের কূপ ডেকে নিচ্ছেন মোটামুটি। স্টেশনে-স্টেশনে ওয়াগন বোঝাই হচ্ছে কাঠ। প্রথমে আসছে ট্রাক-বাহিত হয়ে। ড্রাইভাররা কষ্টসহিষ্ণু। উঁচুনিচু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা সটান চালিয়ে দিচ্ছেন গাড়ি। ট্রাকের আর্তনাদের শব্দটা গোঁ গোঁ ... মত। চুপ করে বসে আছে ... কাঠের বোঝার উপরে। সেই কাঠ বোঝাই ট্রাক সোজা চলে এসে থামছে স্টেশনে।

ওয়াগন বোঝাই হচ্ছে কাঠ। কাঠের মোটা-মোটা খণ্ডগুলিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হচ্ছে আশ্চর্য কায়দায়। অন্যদিকে মাটিতে দাঁড়ানো একদল কুলির হাতে সেই দড়ির অপর প্রান্ত। দড়ি নয়, কাছি। মোটা-মোটা কাছি। শক্ত বাঁশ ওয়াগনের ওপরে স্থাপিত। এক প্রান্ত নামানো মাটিতে। উল্টোপ্রান্তের কুলিরা টানছে হেঁইয়া হো, হেঁইয়া হো শব্দে। প্রাণপণ শক্তিতে। গড়িয়ে উঠছে কাঠ। লগি দিয়ে সামাল দিচ্ছে একদল।

আশ্চর্য কায়দায় কাঠ বোঝাই হচ্ছে ওয়াগনে। ক্রেণ নেই, কিছু নেই। একেবারে দিশি কায়দা। এতে অবশ্য পরিশ্রম বেশি। লোকও দরকার বেশি। তা হোক, তবু ক্রেণ যেখানে নেই সেখানেও কাজ হয়ে যাচ্ছে।

ট্রিপের ব্যবসা ফেঁদেছে মাড়োয়ারী-পাঞ্জাবী-গুজরাটি-ভুটিয়া-বাঙালীদের দল। পারমিট নিতে হয়েছে ট্রাকের। ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে বিস্তর। এ জন্যে কাঠ-খড়ও পোড়াতে হয়েছে।

কে না জানে একখানি পারমিট জোটানো চারটিখানি কথা নয়। ট্রাকের দাম বিস্তর। তবে অবশ্য আছে ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা। প্রথমটায় থোক কিছু টাকা। তারপর ভাগে-ভাগে দেওয়া। এ করেই পয়সা করেছেন অনেকে।

আলাপ হয়েছিল ছগনলালজির সংগে। ওদলা বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। প্রায় সত্তর বছর বয়স হয়েছে। রাঙা টকটক করছে মুখ। কপালে চন্দনের ফোঁটাটি। ট্রাকের ব্যবসা আছে। আছে নিজের পেট্রল পাম্পের ব্যবসা। ট্রাক খাটাচ্ছেন তিরিশটা। নানা দিকে কারবার। আলিপুরদুয়ারের তোর্সা ফরেস্ট, শালকুমার ফরেস্ট, রায়ডাক ফরেস্ট, ধুমপাড়া ফরেস্ট, কালচিনি অঞ্চলের উত্তরবড়ঝাড় ফরেস্ট, নীলপাড়া ফরেস্ট, বক্সা ফরেস্টেরই এক্সটেনশন পানবাড়ি ফরেস্ট, ফালাকাটা এলাকার দলগাঁও ফরেস্ট, মাদারিহাটের দুমচি ও খয়েরবাড়ি ফরেস্ট—নানাদিকে খাটছে গাড়ি।

দীর্ঘকাল আছেন এদিকে। আপালচাঁদের ওদিকে জমি-বাড়িও করে ফেলেছেন। খামারবাড়ি.

ট্রাকের ব্যবসা কতকাল?

জিজ্ঞাসা করেছিলাম ছগনলালজিকে।

আশ্চর্য সজাগ আর দৃষ্টিদীপ্ত মানুষটি। বলেছিলেন, সে কী বাবু, আজকের কথা? বহুৎ দিন ভোইয়ে গেল...

কথায়-কথায় বলেছিলেন অতীত। জৌনপুর থেকে এসেছিলেন ও'রা। প্রায় সত্তর বছর আগের কথা। ও'র ঠাকুর্দা এসেছিলেন অল্প বয়সে। প্রথমে আসেন বক্সায়। বক্সায় তখন ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হচ্ছে। গীতালদা থেকে গরুর গাড়িতে আসতে হত তখন বক্সায়। গরুর গাড়ি ছিল প্রচুর। সান্তালাবাড়ি থেকে উপরে উঠতে হত। গরুর গাড়ি যেত না অত উঁচুতে। তারপর খচ্চরের পিঠে যাত্রা। সেই সময় ছিল সুপারি-তামাক ইত্যাদির ব্যবসা। পরে বক্সা থেকে ছড়িয়ে পড়ল ছেলেরা। চল্লিশ বছর আগের কথা। এখন ট্রাকের ব্যবসা করছেন।

বড় লটঘট ব্যবসা মোশাই। ভদ্দর আদমি করতে পারে না। কথায় কথায় বললেন ছগনলালজি, বড় ঝঞ্ঝাট। ছেলে-পিলেরা তো করতেই পারবে না। একটু খেয়াল করতে ভুলেছেন তো সোব গেল মোশাই। তা ছাড়া ঘাটে-ঘাটে তো পয়সা ছড়াতেই হচ্ছে। আফশোষ!

নতুন কেনা চকচকে টুপিটা মাথায় বসাতে-বসাতে বললেন।

মিছে কথা বলেন নি ছগনলালজি। কিন্তু লটঘট যতই থাক, পয়সাও আছে। বাঙালীবাবুরা পারেন না এত পয়সারুজি করতে। কাঠ যতকাল আছে, ট্রাকও আছে। জংগলে-জংগলে ঘুরে হাড়-জিরজিরে প্যাঁকাটির মত অবস্থা। চান-খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই দুদণ্ডের।

তবু কাঠের ব্যবসা ফাঁদতে ট্রাক কিনতে চায় অনেকেই।—ফাঁকিফাকির কিছু জানা আছে, দাদা? জানুন তো ছাড়ুন—

আরে বাসরে, আপনি করবেন ব্যবসা!

ভদ্রজন চমকে ওঠেন।

কেন, পারব না কেন বলুন? চাকা ঘুরলেই টাকা, জানেন তো? জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন কেউ-কেউ। টাকা শব্দটি উচ্চারণের সংগে সংগে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেন।

জংগলের মধ্যে শুয়ে-বসে ভাবি। ভাবি এই সব মানুষদের কথা। ভাবনা আর ফুরাতে চায় না যেন।

[ক্রমশ]

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দু' সপ্তাহ বাদে মায়ের বাড়িতে ফিরে এলাম। সত্যি কথা বলতে কি, যদিও আমি তখন ক্রেগের প্রেমে প্রায় উন্মত্ত, কিন্তু গত দু' সপ্তাহ মেঝেতে শুয়ে এবং ভালভাবে না খেতে পেয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

আমার মা ক্রেগকে দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। তাঁকে বললেন—"তুমি চরিত্রহীন এবং লম্পট, এখুনি আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।" আসলে ক্রেগ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত জেলাস হয়ে উঠেছিলেন।

ক্রেগের সত্যিকার পরিচয় দিতে হলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন এ যুগের এক অত্যাশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। শেলীর মত তিনিও ছিলেন আগুন এবং বিদ্যুতের জ্বালা নাকি। বিনা দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, আধুনিক থিয়েটারের তিনিই ছিলেন জন্মদাতা। একথা সত্য যে সক্রিয়ভাবে তিনি খুব বেশি সময় রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন নি। কিন্তু দূরে থেকে তিনি স্বপ্নের জাল বুনে গেছেন এবং তাঁর সেই সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক আধুনিক থিয়েটারের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, সে সবের বাস্তব রূপায়ণ করেছেন। রঙ্গজগতে ক্রেগের আবির্ভাব না ঘটলে আমরা রাইনহার্ট, জাকস কোপো বা স্ট্যানিসলাভস্কিকে পেতাম না, একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। Without Gordon Craig we would still be back in the old realistic scenery, every leaf shimmering on the trees, all the houses with their doors opening and shutting.

সঙ্গী হিসাবেও ক্রেগের কোন তুলনা হয় না। আমার শিল্পজীবনে বহু বড় বড় প্রতিভার নিবিড় সান্নিধ্য আমি পেয়েছি—কিন্তু ক্রেগের তুলনায় তাঁদের মনে হয়েছে পিগমীর মত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তিনি মহৎ শিল্প সৃষ্টির স্বপ্নে যেন বিভোর হয়ে থাকতেন। সকালে প্রথম কাপ কফি সেবনের পর মুহূর্ত থেকেই যেন তাঁর কল্পনার শিখায় আগুন জ্বলে উঠতো—যাঁরা কাছে থাকতেন, তাঁরা উপলব্ধি করতেন সে আলোর উদ্‌গীরণে কি অপার্থিব সৌন্দর্যের ঝর্ণা ধারায় অবগাহন করে তাঁদের দেহ-মন পবিত্র হয়ে উঠছে। An ordinary walk with Craig through the streets was like a promenade in Thebes of ancient Egypt with a superior High Priest.

ইসাডোরা ডানকানের আত্মজীবনীর কিছু কিছু অংশকে কেউ কেউ অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন এক সময়, যেমন ধরুন ক্রেগের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইসাডোরা লিখেছেন:

Here stood before me brilliant youth, beauty, genius; and, all inflamed with sudden love, I flew into his arms with [illegible]ness of a temperament which had for two years lain dormant, but waiting to spring forth. Here I found an answering temperament, worthy of my metal. In him I had met the flesh of my flesh, the blood of my blood. Often he cried to me, "Ah, you are my sister." I do not know how other women remember their lovers. I suppose it is the correct thing to stop always at a man's head, shoulders, hands etc., and then describe his clothes, but I always see him, as that first night in the studio, when his white, lithe, gleaming body emerged from the chrysalis of clothes and shone upon my dazzled eyes in all his splendour.

So must Endymion, when first discovered by the glistening eyes of Diana, in tall slender whiteness, so must Hya-

গর্ডন ক্রেগ

elnthus, Narcissus, and the bright, brave Perseus have looked. More like an angel of Blake than a mortal youth he appeared. Hardly were my eyes ravished by his beauty than I was drawn toward him, entwined, melted.

ইসাডোরা এবং তাঁর বোন বার্লিনে একটি নাচের স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলের কমিটিতে ওখানকার বিখ্যাত সব পরিবারের এ্যারিস্টোক্রেটিক মহিলারা অপরায় এবং পেট্রন হয়েছিলেন। তাঁরা যখন ক্রেগের সঙ্গে ইসাডোরার সম্পর্কের কথা জানতে পারলেন, তখন খুব রেগে গিয়ে চিঠি লিখে জানালেন—যে স্কুলের নেত্রীর এই ধরনের উচ্ছৃংখল চরিত্র, সে স্কুলে তাঁরা পেট্রন থাকতে পারেন না।

এর পর ইসাডোরা লিখেছেন—These women so roused my indignation that I took the Philharmonic saal and gave a special lecture on the dance as an art of liberation, and ended with a talk on the right of woman to love and bear children as she pleased.

....

Shortly after, I discovered and there could not be the slightest doubt about it—that I was pregnant. I dreamt that Ellen Terry appeared to me in a shimmering gown, such as she wore in Jmogene, leading by the hand a blonde child, a little girl who resembled her exactly, and in her marvellous voice, she called to me—"Isadora love. Love..Love.." From that moment I knew what was coming to me out of the shadowy world of Nothingness before Birth. Such a child would come, to bring me joy and sorrow. Joy and Sorrow! Birth and Death! Rhythm of the Dance of life!

এসব বর্ণনার ভেতর অশ্লীলতা কোথায়। এ তো ছবির মত সুন্দর—এর মাধুর্য এবং মাধুরী ইসাডোরার মত মহৎ শিল্পীর পক্ষেই বর্ণনা করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কড়ি ও কোমলে', 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা লেখেন। তখনকার কয়েকজন শুদ্ধরুচিসম্পন্ন সমালোচক এসব কবিতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বুঝতে না পেরে এ সব কবিতা কামনা, লালসার উদ্দীপক বলে প্রচার করতে শুরু করেন। অথচ সত্যিকার শিল্পরসিক পাঠক জানেন এ সব কবিতায় নারীদেহের নগ্ন সৌন্দর্যের যে অপরূপ বর্ণনা আছে; পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। এ সৌন্দর্য যেন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত মনপ্রাণকে মাতিয়ে তোলে।

সাধারণত কথাশিল্প এবং কলাশিল্পের মাধ্যমেই শিল্পী নারীদেহের নগ্নরূপের আলেখ্য তুলে ধরেন—স্রষ্টার মনে কল্পনা-শক্তির দারিদ্র্য বা তীব্র-গভীর অনুভূতির অভাব থাকলেই এই সব আলেখ্য পর্ণ-গ্রাফিক হয়ে ওঠে। আর কল্পনাশক্তি এবং গভীর ভাবানুভূতিআশ্রিত এই সব সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার মর্যাদায় ভূষিত হয়। আর তা ছাড়া নারীদেহের বর্ণনায় যদি দেহাতীতের প্রতি ইঙ্গিত না থাকে, অথবা সৃষ্টির মধ্যে কোন আবেদনটাই প্রকট হয়ে ওঠে, তবে সে ক্ষেত্রে শিল্প অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক টমাস ক্রেভেন বিখ্যাত শিল্পী টিসিয়ানের নিউডস সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না। টিসিয়ান সেই সময়টায় হ্যাপস-বার্গের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পচর্চার সাধনায় রত ছিলেন। বিখ্যাত সম্রাট চার্লস দি ফিফথ্ এবং তাঁর পরিবারের সবারই ছবি তিনি এঁকেছিলেন। ক্রেভেনের মতে—

The nudes painted during these years are voluptuous jobs. They were designed for the Cabinets of dukes and cardinals and designed deliberately as aphrodisiacs for connoisseurs....their appeal is wholly sexual. At one of them, the Venus of Urbins, Mark Twain was profoundly incensed. The bare flesh he professed to tolerate, but the position of the left hand was the most brazen piece of impudicity he had ever looked upon—that is, in public! If literature were allowed such license the human race would soon go to the dogs! To-day we smile at Mark Twain's moral indignation, but his criticism has the uncommon merit of honesty : he saw what every one sees in the Venns—the left hand—it is the centre of attraction.

শিল্পী রুবেনস্ সম্বন্ধে ক্রেভেন লিখেছেন:

He loved the nude, make no mistake about that, but he was not obsessed by its sexual enticements ; nor did he, under the hallowed disguise of art, stoop to the cheap practice of creating creatures of radiant animal fat to burn the imaginations of those who would find inpainting a stimulus to their physical desires. The nude is part—perhaps the most essential part of his philosophical scheme. a system enclosing the health, the ceaseless movement, the rushing generative forces—all the characteristics of organic life. The powerful draughts of organized sensuality that blow through his world are clean and pure ; the atmosphere is not polluted by the odours of the studio or the brothel. His passion for life, his love for substantial, sun-warmed nakedness—whatever it was that aroused his imagination was submitted to the sternest intellectual consideration and reduced to law and order ; thus his sensuality was dissolved in the currents of a new synthesis in which no single form protrudes suspiciously. There is no false concentration on faces, breasts, or thighs, no sly beckonings to come and behold salacious poses : all forms beat to one colossal tune. When an artist is engaged in the mental toll of a great composition, his physical yearnings are lost in the struggle and he has no time for sexual blandishments. Most painters of the nude, devoid of legitimate purpose and unable to frame a conception of any importance, busy themselves, like procurers, supplying marketable flesh.

Like Leonardo da Vinci, Rubens loved all natural forms."

'কড়ি ও কোমলের' যে সব কবিতা নিয়ে এক সময় অশ্লীলতার জিগির তোলা হয়েছিল—অর্থাৎ 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা', 'দেহের মিলন', 'তনু' ইত্যাদি —সেগুলোকে একটু ভালভাবে পড়লেই বোঝা যায়, ওই সব কবিতায় সেকসুয়াল এনটাইসমেন্টের কোন ইঙ্গিত নেই—বরং সৌন্দর্যের সাধক—রবীন্দ্রনাথের শান্ত অন্ত ফর্মসের দিকটাই অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। রুবেনসের ছবির মতই রবীন্দ্রনাথের এই সব কবিতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে h's passion for life and his love for sun-warmed nakedness.

[ক্রমশ]

সরকারী তথ্য ও সংবাদচিত্র

সরকারী তথ্যচিত্র ও সংবাদচিত্র সম্পর্কে সম্প্রতি কিছু কথা শোনা যাচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরে একটি মাত্র সরকারী সংবাদ চিত্র মুক্তিলাভ করেছে। প্রতি মাসে একটি করে ছবি নির্মাণের তথ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনাকে কি শেষ করে দেওয়া হয়েছে? যাঁরা সরকারী ছবি নির্মাণ করতেন তাঁদের মধ্যেও প্রশ্ন সরব হয়ে উঠেছে। সরকারী ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে এবং ফিল্ম টেকনিশিয়ানদের কাজ দেবার জন্য ভাল একটি পরিকল্পনা হয়েছিল, কাজও এগোচ্ছিল, কিন্তু সবই এখন ফাইল চাপা রয়েছে, আবার আমলাদের রাজত্ব শুরু হয়েছে।

সরকারী তথ্য ও সংবাদচিত্রের প্রশংসা করে ইতিপূর্বে আমরা মন্তব্য করেছিলাম। বস্তুতাবিক পক্ষে মানুষের জয়যাত্রা, ভাসা, চাবজ্জন, ইণ্টারভিউ ইত্যাদি তথ্যচিত্রগুলি এবং কয়েকটি সংবাদচিত্রে বিষয়বস্তু ও টেকনিক্যাল দিক থেকে চমৎকার কাজ দেখা গেছিল। এই ছবিগুলি সরকারের নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের প্রতি মর্যাদাদানের পরিচয় প্রকাশ করেছিল। ছবিগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে এই ছবিগুলি দেখবার জন্য চাহিদা ছিল। আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছবির সময় দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহে থাকতে চাইত না। উপরন্তু ছবিগুলি দর্শকদের সেই অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই ছবিগুলি দেখার জন্য দর্শক আগে থেকে হলে বসে থাকতেন।

কিন্তু আমলারা গতানুগতিকতার বাইরে যেতে অভ্যস্ত নন। তাই তাঁরা ছবিগুলি নিয়মমাফিক মুক্তি দিয়েই কখনো মফস্বলে পাঠিয়েছেন, কখনো বাক্সবন্দী করে রেখেছেন। বর্তমানে শোনা যাচ্ছে ভাসা অথবা ধান কাটা নিয়ে তোলা ছবিগুলি আর দেখান হচ্ছে না। যুক্তফ্রন্টের সময় নির্মিত সকল তথ্যচিত্র আটক করে রেখে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপালের আমলের পদস্থ আমলা ও উপদেষ্টাদের মতে এই ছবিগুলি নাকি বাম রাজনীতি ঘেঁষা। খবরের সত্য-মিথ্যা জানি না, তবে সরকারী তথ্যচিত্রগুলি কলকাতায় বা মফস্বলে কোথাও দেখান হচ্ছে বলে জানি না। প্রতিক্রিয়াশীল যে শক্তি এতদিন লুকিয়ে ছিল, তারাও এখন সরব হয়ে উঠেছে এই ছবিগুলির বিরুদ্ধে।

আরো বিপদ হয়েছে চিত্র নির্মাতাদের। তাঁদের কোন জনপ্রিয় বিষয়ের ওপর ছবি করতে দেওয়া হচ্ছে না। যা দেওয়া হচ্ছে তা করতে তাঁরা বিবেকের প্রেরণা পাচ্ছেন না। এপ্রিল মাসটা লেনিন জন্মশতবর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। এমন ব্যাপক প্রচেষ্টা সারা ভারতে আর কোথাও হয় নি। শহর থেকে গ্রাম উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু জানা গেল, সরকারী সংবাদচিত্রের ক্যামেরায় কেবলমাত্র রাজ্যপাল কর্তৃক লেনিনের প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন অনুষ্ঠানের ছবি ওঠে নি। রঞ্জি স্টেডিয়ামে যে অভূতপূর্ব ব্যাপার হয়ে গেছে, তার কোন চিহ্ন সরকারী সংবাদচিত্রে থাকবে না বোধ হয়। সারা বাংলা দেশের লেনিন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের দৃশ্য দেখতে পাওয়ার আশা করা বৃথা।

সুতরাং যুক্তফ্রন্টের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পে, বিশেষ করে সরকারী ছবির ব্যাপারে আগেকার নৈরাজ্যমূলক অবস্থা আবার ফিরে এসেছে। কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে তা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে—প্রায় তিন মাসাধিক কাল বাংলা ছবির মুক্তি বন্ধ। সরকারী ছবিও জনগণের জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেল। নির্মিত ভাল ছবিগুলি বাক্সবন্দী হয়ে থাকল। তার ফল হবে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে অথবা অন্ধকারের পথে ঠেলে দেওয়া, বহু টেকনিশিয়ান বাংলা দেশ ছাড়বে, বেকার হবে। আর সরকারী যে সব তথ্য ও সংবাদচিত্র তৈরি হবে সেগুলি বোধ হয় দেখার যোগ্য হবে না।

—সুজন

'মুক্তিস্নান' ছবিতে ললিতা চ্যাটার্জী

জি. ডি. আর-এর থিয়েটার নাটক নির্বাচন

থিয়েটারের নাটক নির্বাচন করাটা সর্বত্রই একটা বড় রকমের সমস্যা। থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে সিনেমা ও টেলিভিশন। নাটক নির্বাচন করার সময় এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। আরো মনে রাখা দরকার যে, থিয়েটার যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের রুচিও বদলাচ্ছে। নিচের প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে কিভাবে নাটক নির্বাচন করা হয়।

জি. ডি. আর-এ থিয়েটার আছে ১১৪টি, তার মধ্যে ১১টি খোলা মাঠের মঞ্চ। মোট আসনের সংখ্যা প্রায় ৭৩ হাজার। ১৯৬৯ সালে থিয়েটার দর্শকের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি। তাছাড়া কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী—যেমন ব্রেখট অসেম্বল, ডয়েচেস থিয়েটার, থিয়েটার ডের ফ্রয়েনডশাফট (শিশুদের থিয়েটার) বিদেশেও অভিনয় করে এসেছেন।

থিয়েটারের নাটক নির্বাচনের সময় বিশেষভাবে দেখা হয়, যাতে ভারসাম্য ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে ও পুনরাবৃত্তি না ঘটে। সাধারণভাবে বলা চলে, নাটক নির্বাচনের সময়ে প্রাধান্য পায় একই সঙ্গে ক্লাসিক্যাল ও সমসাময়িক নাটক। পরবর্তী দফায় নাট্য কর্মসূচী স্থির

করা হয় অনেক আগে থেকেই, যাতে নির্বাচনে সর্বাধিক সমতা রক্ষিত হয় ও উচ্চতম মান অর্জন করা যায়।

বলা বাহুল্য, জি, ডি, আর-এর থিয়েটারগুলির স্বাধীকার যথেষ্ট বেশি, যার ফলে প্রত্যেকটি মঞ্চের স্বতন্ত্র বিকাশ সম্ভবপর হয়। তবে নাটক নির্বাচনা করা হয় এমনভাবে, যেন পৃথক পৃথক থিয়েটারের যৌথ ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংগতি বজায় থাকে।

জি, ডি, আর-এর বৃহত্তম থিয়েটারগুলির একটি হচ্ছে ফোল্‌ক্‌সবয়েনে। এই থিয়েটারে এখন সব চেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে জার্মান ও বিদেশী ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের ওপরেও। জি, ডি, আর-এর সমসাময়িক নাটকে ও প্রযোজনায় লক্ষ্য করা যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। একটি অত্যুত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'ভি ফর ভিয়েৎনাম' নাটকটি। এই নাটকে দেখানো হয়েছে কেন ও কিভাবে ভিয়েৎনামী জনগণ মার্কিনী আক্রমণকারীদের পরাজিত করেছে।

ফোল্‌ক্‌সবয়েনের আশু কর্মসূচীতে আছে কয়েকটি সংগীত নাট্য। ফোল্‌ক্‌সবয়েনের ধারণা, সংগীত নাট্যই এখন সব চেয়ে উপযোগী, সংগীত নাট্যই এখন ব্যাপকভাবে দর্শক টানতে পারবে, বিশেষ করে তরুণ দর্শকদের। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ফোল্‌ক্‌সবয়েনের বাৎসরিক কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে।

বিষয়টি শুধু থিয়েটারের পরিচালকবর্গের বিবেচ্য বিষয় নয়, নাটকের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীরও। নির্বাচিত নাটককে অবশ্যই এমন হতে হবে, যাতে প্রযোজক ও অভিনেতৃদের প্রবণতা ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

'ছায়াতীর' ছবির একটি দৃশ্যে নবাগত গুরুরাজ ও মাধবী

১৯৭০-৭১ সালের জন্য ফোল্‌ক্‌সবয়েনে কর্মসূচী নির্বাচনে কিছুটা অধিক জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গোড়ার পর্যায়ে থিয়েটারের মৌল ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলোচনা চলেছিল ট্রেড ইউনিয়ন সভাগুলোতে, আলোচনা করেছিলেন অভিনেতৃবর্গ ও পরিচালকবর্গ। এই সভাগুলোতে তা ছাড়াও যোগ দিয়েছিলেন শিল্প-অর্থনৈতিক পরিষদের সদস্যরা, কেন না প্রতিটি নতুন নাটক প্রযোজনার সময়ে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আর্থিক দিকটিও বিবেচনা করে দেখতে হয়। এমনি পরিষদ জি, ডি, আর-এর প্রতিটি থিয়েটারের সঙ্গেই যুক্ত। ফোল্‌ক্‌সবয়েনে এই পরিষদের সদস্য হচ্ছেন আটজন অভিনেতা।

মতের মিল হবার পরে সম্ভাব্য ১৫টি নতুন নাটকের একটি তালিকা তৈরি হল। প্রযোজকরা তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ জানালেন। তখন ওপরে উল্লিখিত সংস্থাগুলোতে আবার নতুন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা শুরু হল (এই পর্বে যে কেউ আবার নতুন করে প্রস্তাব তুলতে পারেন, তবে সে প্রস্তাবের পক্ষে অবশ্যই যুক্তি থাকা চাই)। তারপরে ১৯৭০-৭১ সালের কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্তির জন্য চূড়ান্তভাবে পাঁচটি নতুন নাটকের নাম ঠিক করা হল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব থিয়েটারের পরিচালকবর্গের। চূড়ান্ত নির্বাচন করার আগে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়। বিষয় হচ্ছে, আগেকার নতুন নাটক সম্পর্কে দর্শকদের সঙ্গে থিয়েটারের কর্মীদের যে সব আলাপ-আলোচনা হয়েছে তার ফলাফল।

সকল থিয়েটারের কর্মসূচী যাতে সঠিকভাবে সমন্বিত করা যায়, সেজন্যে এই চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত নাটকের তালিকাটি বেশ সময় থাকতে পেশ করা হয় জি, ডি, আর সংস্কৃতি দপ্তরের কাছে। সেখানে বিশেষ করে এই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্যই আছে একটি কমিশন। তবে নতুন কর্মসূচী তৈরি করাটা সবার ওপরে থিয়েটারেরই দায়িত্ব। ফোল্‌ক্‌সবয়েনে ১৯৭০-৭১ সালের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুধু শেকস্‌পীয়র, বার্নার্ড শ', ফ্রিডরিস সোলেস-এর নাটক নয়, জি, ডি, আর-এর নাট্যকারদের সমসাময়িক রচনাও। চূড়ান্তভাবে এই কর্মসূচী গ্রহণের আগে যে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে তা এর আগের বারের চেয়ে উন্নত ধরনের।

'কলঙ্কিত নায়ক' ছবিতে অপর্ণা সেন ও উত্তমকুমার

বলা বাহুল্য, সব থিয়েটারের অবস্থা একই রকম নয়। কর্মসূচী নির্দেশক যে পদ্ধতি [illegible]

[illegible] হয়েছে, তা [illegible] [illegible] আরো ঠেকে, যা যেখানে দ্বন্দ্ব বিশেষ ধরনের নাটকই মঞ্চস্থ হয়ে থাকে, সেখানে অবশ্যই অন্য পদ্ধতি।

তবে পদ্ধতি যাই হোক, কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ মিল পাওয়া যায়—যেমন আগে থেকেই যতোটা সম্ভব ব্যাপক আলোচনা ও মতামত বিনিময়, দর্শক ও নাট্যকাররাও যাতে যোগ দেবেন। জি, ডি, আর-এর থিয়েটারে নাটক নির্বাচিত হয় আর্থিক লাভের দিক থেকে নয়, নাট্যশিল্পের বিবেচনা থেকে।

সন্ধ্যানীড়ের মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন কর্তৃক লিখিত ও পরিচালিত 'মহানায়ক লেনিন' সন্ধ্যানীড়ের প্রযোজনায় দর্শকপূর্ণ একাডেমি অব ফাইন আর্টসের মঞ্চে অভিনীত হয় মে দিবসে।

মহানায়ক লেনিন নাটকটিতে লেনিনের বাল্যজীবন থেকে সুরু করে তাঁর মহান্ বিপ্লবী জীবন পর্যন্ত অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে—যা দর্শকদের কাছে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী বলে অনুভূত হয়েছে।

নাট্যানুষ্ঠানে পরিচালক গতানুগতিকতার ধারা বর্জন করে একেকটি দৃশ্য উন্মোচনের আগে স্বয়ং সূত্রধার হিসেবে লেনিনের জীবনের এক-একটি অংশ পাঠ করেছেন। ফলে যে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে, যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা মঞ্চাভিনয়ে তার সক্রিয় রূপ দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছেন। ওরই মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃশ্যগুলির মধ্যে অভিনয় বেশ সুপরিকল্পিত।

লেনিন-জায়ার অভিনয়ে শ্রীমতী বিনতা রায় তাঁর গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বলা বাহুল্য, ঐ ভূমিকার অভিনয়ে সার্থকতা সম্বন্ধে কিছুটা সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বিনতা রায় সে সংশয় অনায়াসে খণ্ডন করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সুখময় সেন, দীপ্তি চক্রবর্তী, শুভেন সরকার, শঙ্কর মিত্র ও সোমনাথ জুংসি প্রভৃতি। নাটকের দুটি গান গেয়েছেন প্রভাতভূষণ ও সহশিল্পীবৃন্দ।

এই অনুষ্ঠানে বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। রুশ কনসাল জেনারেল মহানায়ক লেনিন নাটকের নাট্যকার ও পরিচালককে অভিনন্দন জানান।

ওথেলো

১৫ই মে থেকে জ্যোতি সিনেমায় সোভিয়েটের রঙিন ছবি 'ওথেলো' দেখান হচ্ছে। 'ওথেলো'র সঙ্গে [illegible] সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র দেখান হচ্ছে। শেকস্‌পীয়রের নাটকের এ পর্যন্ত যত চিত্ররূপ হয়েছে তার মধ্যে সোভিয়েট চিত্ররূপগুলি সর্বাধিক সার্থকতার দাবি করে। এই রঙিন ছবিটি আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। হলিউড ছবির তুলনায় 'ওথেলো'র এটি শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপ, নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলা চলে।

অশোক চ্যাটার্জী পরিচালিত 'মহাকবি কৃত্তিবাস' ছবিতে অসীমকুমার ও লিলি চক্রবর্তী

সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব

ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী অনুসারে ভারতে সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। এই উৎসবে দেখানো হচ্ছে 'ওয়ার এণ্ড পীস', 'আনা কারেনিনা', 'লেনিন ইন অক্টোবর', 'স্টোরিজ এবাউট লেনিন', 'মাদার্স ডিভোশন', 'নিউ এডভেঞ্চার', 'দি ডিড অব ফরহাদ'। কলকাতাতেও এই ছবিগুলি দেখানো হবে বলে জানা গেল।

সংবাদ-কণা

[illegible] প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিবস ও গীতিআলেখ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ রবীন্দ্রসংগীতের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দের মধ্যে নির্মল সেনগুপ্ত, রীণা চৌধুরী, [illegible] মজুমদারের [illegible] [illegible] [illegible] অর্জন করে। এ ছাড়াও অরুণাভ গাঙ্গুলীর আবৃত্তি "আফ্রিকা" অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মানসী পাল, রাজীব শঙ্কর, কৃষ্ণ পাল, সঞ্জীব শঙ্কর, সুভাষ দাস ও যন্ত্রসংগীতে শীতল অধিকারী ও গৌর কর এবং আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের আরম্ভে সংস্থার পক্ষে সকলকে প্রতিষ্ঠা দিবসের অভিনন্দন জানান ছন্দা মজুমদার।

উদীচীর রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় উদীচীর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করলেন তাঁদের শিক্ষায়তন ভবনে। 'তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্' বেদগানটি সমবেতভাবে গেয়ে সভার উদ্বোধন করলেন তাঁরা। তারপর সমবেতভাবে আবৃত্তি করলেন 'বিপদে মোরে রক্ষা কর' এই প্রার্থনা-বাণীটি। এর পর 'নবীন' গীতিবিচিত্রাটি পরিবেশিত হল সুষ্ঠুভাবে। সবশেষে একক সংগীতে অংশ গ্রহণ করলেন শিক্ষকেরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুশীল মল্লিক, তপন সিংহ, শ্যামলী গঙ্গোপাধ্যায় ও [illegible] ভড়। গীটারে সহযোগিতা করেন রবীন রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উজ্জ্বল ভড়।

সুরবিতানে রবীন্দ্র উৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্র গীত শিক্ষায়তন খিদিরপুরের "সুরবিতান"-এ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্রগীতি ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

'ই-এম-আই' এবং এম-জি-এম সম্মিলিত যৌথ প্রচেষ্টা

পৃথিবীর বৃহত্তম রেকর্ডিং কোম্পানী "ইলেকট্রিক এ্যাণ্ড মিউজিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ" (ই-এম-আই) এবং আমেরিকার বিখ্যাত ফিল্ম প্রস্তুতকারক "মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার" (এম-জি-এম) এক সঙ্গে মিলে ইংলণ্ডে ছবি তোলা ও পরিবেশন ব্যবসায়ে নামছেন। এই উদ্দেশ্যে দুটি পৃথক কোম্পানী গঠিত হয়েছে—একটির নাম : ই-এম-আই—এম-জি-এম- এলস্ট্রি স্টুডিওজ লিমিটেড—যেখানে বছরে নিজেদের সাত-আটখানি পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলা ব্যতীত অন্য চিত্র নির্মাতা এবং টেলিভিশনের জন্য ছবি তুলতে স্টুডিও ভাড়া দেওয়া হবে।

যে কোম্পানী হতে ছবি পরিবেশন করা হবে সেটির নাম হয়েছে—এম-জি-এম-ই-এম-আই ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড। উভয় কোম্পানীই আপাততঃ সাত বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

ই-এম-আই প্রতিষ্ঠানটি হল ভারতবর্ষের বৃহত্তম রেকর্ড প্রস্তুতকারক—"দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের" ইংলণ্ডস্থিত মূল প্রতিষ্ঠান। গ্রামোফোন কোম্পানী এদেশে ১৯০২ সাল থেকে রেকর্ড প্রস্তুত কাজে লিপ্ত আছে।

মূকাভিনয়

মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী সম্প্রতি বংলা দেশের বহু অনুষ্ঠানে একক মূকাভিনয় পরিবেশন করেছেন। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই এঁর মূকাভিনয় উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হন। আজকের দিনের হাসি-কান্না ও সুখ দুঃখের প্রতিচ্ছবিই ভেসে ওঠে ওঁর ফিচারের মধ্যে। শিল্পী পরিবেশিত ফিচারগুলির মধ্যে 'ডেলি প্যাসেঞ্জার', 'জীবন-মৃত্যু', 'চণ্ডালের স্বপ্ন' ও 'মাদারল্যাণ্ড' অন্যতম। সম্প্রতি বারাসাতের কাশিমপুরে অনুষ্ঠিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে শ্যামলেন্দুর মূকাভিনয় দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

বি এফ জে এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব গত ৮ই মে রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন নাট্যসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, পুরস্কার প্রদান করেন বাংলা সবাক ছবির প্রথম নায়িকা শ্রীমতী উমাশশী দেবী।

কলকাতার সেন্ট্রাল মিউজিক কলেজ আয়োজিত বড়ে গোলাম আলি খাঁর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন প্রভাতী মুখোপাধ্যায়।

আফ্রোশীয় দেশগুলির দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

আফ্রোশীয় দেশগুলির দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আগামী ১৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর সোভিয়েট উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে অনুষ্ঠিত হবে। "শান্তি, সমাজপ্রগতি ও জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রীর" আদর্শে দু'বছর আগে সর্বপ্রথম তাশখন্দ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৮ সালে প্রথম তাশখন্দ উৎসবে এশিয়া ও আফ্রিকার ৩১টি দেশের ১০০টি পূর্ণ ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শিত হয়। ভারতের এক চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল উৎসবে যোগ দেয়।

আসন্ন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদানের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে। এ ছাড়া জাতিসংঘের শিক্ষা-সংস্কৃতি সংস্থা "ইউনেস্কো" ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকেও আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে। আফ্রোশীয় দেশগুলি ছাড়াও ইওরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বহু দেশও উৎসবে ছবি পাঠাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলি ও রুশ ফেডারেশনের বিভিন্ন ফিল্ম স্টুডিও উৎসবে তাদের ছবি প্রদর্শন করবে। উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি ডিপ্লোমা ও পুরস্কার লাভ করবে।

উৎসব উপলক্ষে সোভেক্সপোর্ট ফিল্ম সংস্থা এক চলচ্চিত্র-বাজার সংগঠিত করছে। এই বাজারে যোগদানের জন্য আফ্রিকা ও এশিয়ার সর্বদেশের প্রযোজক, পরিবেশক ও চলচ্চিত্র মালিকদের কাছে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

১৯৬৮ সালের মতোই এবারেও এই চলচ্চিত্র-বাজার চলচ্চিত্রশিল্পে আন্তর্জাতিক সংযোগ ও বিনিময়ের কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

সুরঙ্গমার সমাবর্তন উৎসব

২৫শে বৈশাখ সুরঙ্গমার সমাবর্তন ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের গানগুলি শুধু সংগীত হয় নি, বৈচিত্র্যময়ও হয়েছিল। সেজন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। 'আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে' গানখানি গতানুগতিকতার ধারা থেকে মুক্ত। মূল গানটি পরিবেশন করার পরে মালকোশ রাগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গানের ভাবধারাকে প্রকাশের চেষ্টা হয়। সুর ও ভাবের ব্যঞ্জনায় অনবদ্য হয়ে উঠেছিল গানখানি। 'ওগো বধূ সুন্দরী' কবির প্রিয় গানখানি, শ্রীপূর্ণিমা ঘোষের নৃত্য এবং ছাত্রীদের সংগীতমাধুর্য ছন্দোময় করে তোলে।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সে এক সময়। সে এক আনন্দঘন মুহূর্ত।

এই মুহূর্তটির জন্যে যেন ভারতীয় ক্রিকেট এতোকাল অপেক্ষা করেছিল। এতোদিন পরে এলো সেই সময়। সব কিছু ভুলে ভারত যেন মাথা তুলে দাঁড়ালো। মাথা তুলে দাঁড়ালো শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। নব নব আন্দোলনে ক্রীড়াঙ্গন যেন আনন্দ-হাসিগানে ভরে উঠলো।

আত্মবিশ্বাস আর অসম্ভবকে সম্ভব করার তাগিদে ভারতীয় ক্রিকেটাররা 'রুশং দেহি' মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন বিশ্বের সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড় সম্বলিত এম· সি· সি দলের বিরুদ্ধে। ভয় না করার যে মন্ত্রে মাত্র কিছুদিন আগে সি· কে· নাইডু দীক্ষা দিয়েছেন—সেই অমোঘ মন্ত্রের জোরে যেন রাতারাতি ভারতীয় ক্রিকেটাররা মহান শক্তির অধিকারী হলেন।

সি· কে· নাইডুর দেখানো পথ ধরে তাঁরা চললেন এগিয়ে। তাঁদেরই সংগে পাল্লা দিয়ে ক্রিকেট জগতে ভারত তখন চলেছে প্রতিষ্ঠা পেতে। ভারতে তখন যে সব খেলোয়াড়রা ছিলেন কিম্বা যে সব ভারতীয় খেলোয়াড়রা ক্রিকেট জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছিলেন—বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে খুব সহজেই প্রতিষ্ঠা পাবার মতো যোগ্যতা ছিল তাঁদের।

সি· কে· নাইডু, প্রফেসর দেওধর, নাজির আলী, ওয়াজির আলী, মহম্মদ নিসার, অমরনাথ সিং প্রমুখের মতো খেলোয়াড়রা ততোদিনে এসে গেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের রঙ্গমঞ্চে। এঁদের প্রতিভার ছটায় ভারতীয় ক্রিকেট তখন উদ্ভাসিত।

সত্যি কথা বলতে কি, আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে এম· সি· সি দলের ভারত সফরই ক্রিকেট জগতে ভারতের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল সব থেকে বেশি।

ঐ সময় সকলেই অনুভব করেছিলেন যে, এম· সি· সি-র মতো ভারতেরও একটা প্রতিষ্ঠান চাই। এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে—যা সমস্ত ভারতের ক্রিকেট খেলাকে শুধু পরিচালনাই করবে না—ভারতে ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্যে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাবে।

এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব এম· সি· সি দলের ভারত ভ্রমণের সময় প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয়েছিল। ভারতের ক্রিকেট কর্তারা তখন থেকেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাঁদের সামনে তখন ক্রিকেট জগতের ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাঁরা আশা করছিলেন যে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারত পাবে টেস্ট খেলার সুযোগ।

আর সে সুযোগ যদি সত্যিই আসে

॥ মহম্মদ নিসার ॥
সত্যিকারের ফাস্ট বোলার ছিলেন

তাহলে ভারতকে তার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। আর তার জন্যে সবার আগে গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিষ্ঠান। তাই সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা শুরু হলো। এ· এস· ডিমেলো সবার সংগে যোগাযোগ করে তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চললেন।

আর তারই জের টেনে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো একটি সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিষ্ঠান 'দি বোর্ড অফ কনট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইণ্ডিয়া'। ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের প্রথম সভাপতির পদটি অলংকৃত করলেন মিঃ আর· ই· গ্রান্ট গোভান আর সম্পাদকের দায়িত্ব গিয়ে পড়লো এ· এস· ডিমেলোর ওপর।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকে অনুমোদন করতে স্বীকৃতি দিতে এতোটুকুও দ্বিধা করলো না এম· সি· সি। শুধু তাই নয়—এরই জের টেনে ভারত চলে এলো টেস্ট ক্রিকেটের দরবারে। অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেট তখন প্রতিষ্ঠার পূর্ণতা লাভ করলো।

১৯৩২ সালে এম· সি· সি'র আহ্বানে ভারতীয় দল চললো ইংলণ্ড ভ্রমণে। বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারত পেলো স্বীকৃতি—প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে তখনো রাজ-রাজড়াদের প্রাধান্য। তাই সি· কে· নাইডুর মতো কুশলী খেলোয়াড় দলে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দল পরিচালনার ভার পড়লো পোরবন্দরের মহারাজের ওপর। ভারতীয় দলের পক্ষে মনোনীত খেলোয়াড়রা হলেন :

পোরবন্দরের মহারাজা (অধিনায়ক), কে· এস ঘনশ্যাম সিংজী (সহ-অধিনায়ক), সি· কে· নাইডু, [illegible]

আলী, নাজির আলী, জে· নাওমল, এন· ডি· মার্শাল, এস· এইচ. এম. কোলাহ, অমর সিং, পি· ই· পালিয়া, লাল সিং, জাহাঙ্গীর খান, জে. জি. ন্যাভলে, বি· ই· কাপাডিয়া, গুলাম মহম্মদ, এন· আর· গোদাম্বে, মহম্মদ নিসার ও যোগিন্দার সিং।

ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পরিচয় :

পোরবন্দরের মহারাজা : মনোরম ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এবং কৃতী ব্যাটসম্যান। চারদিক দিয়ে বিচার করলে অধিনায়ক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা খুব সহজেই প্রমাণিত হবে।

প্রিন্স ঘনশ্যাম সিংজী : ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। সুন্দরভাবে ব্যাট করতেন। তাঁর ড্রাইভ করা ছিলো দেখার মতো। অফ ড্রাইভ ছিল তাঁর প্রিয় মার।

ক্যাপ্টেন সি· কে· নাইডু : ভারতীয় দলের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান এবং সব চেয়ে কৃতী খেলোয়াড়। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন মারকুটে খেলোয়াড়, অন্যদিকে তাঁর খেলায় ছিল আত্মরক্ষামূলক খেলার অভাবনীয় স্বাক্ষর।

সৈয়দ নাজির আলী : ভারতীয় দলের সেরা অল রাউণ্ডার। ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলার সংগে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তবে ব্যাটিং-এর উন্নতির জন্যে তিনি তাঁর বোলিং-এর ওপর জোর অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছিলেন।

লেফটেন্যাণ্ট ওয়াজির আলী : দলের পরম নির্ভরযোগ্য এবং সূচনাকারী ব্যাটসম্যান। ব্যাটিং-এ যেমন ছিল তাঁর নৈপুণ্য, তেমনি ফিল্ডিং-এর সময় মাঠে তাঁর তৎপরতা সকলকে বিস্মিত করতো।

ক্যাপ্টেন যোগিন্দার সিং : অত্যন্ত সতর্ক এবং নিষ্ঠাবান ব্যাটসম্যান। প্রয়োজনের মুহূর্তে উইকেট আগলে থাকতে পারতেন। ভালো ফিল্ডার হিসেবেও যথেষ্ট সুনামের অধিকারী।

এস. এইচ. এম. কোলাহ : মারকুটে ব্যাটসম্যান হলেও তাঁর প্রতিটি মার ছিল দর্শনীয়। খুব তাড়াতাড়ি রান করতে পারতেন আর তাঁর রান সংখ্যা প্রায়ই তাক লাগানোর মতো হতো। ভালো ফিল্ডার হিসেবেও ছিল তাঁর যথেষ্ট সুনাম।

লেফটেন্যাণ্ট জে· জি· ন্যাভলে : প্রথম শ্রেণীর উইকেট রক্ষক ছিলেন। ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। ব্যাট নিয়ে উই[illegible] করা ছিল রীতিমত দুঃসাধ্য।

বি. ই. কাপাডিয়া : ভালো উইকেট রক্ষক এবং নামকরা ব্যাটসম্যান হিসেবে ভারতীয় দলের সংগে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন।

মহম্মদ নিসার : লম্বা-চওড়া চেহারার ফাস্ট বোলার। তাঁর বলের গতি ছিল প্রচণ্ড। একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বল করতে পারতেন। আবার দরকারের সময় মেরে খেলে রান তুলতে পারতেন খুব তাড়াতাড়ি।

অমর সিং : ভারতীয় দলের সেরা ফাস্ট বোলার। অমর সিং এবং নিসারের মতো সত্যিকারের ভালো ফাস্ট বোলার জুটি তখন বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। দরকারে ব্যাটও করতে পারতেন।

লাল সিং : ভারতীয় দলের সব চেয়ে ভালো ফিল্ডার ছিলেন। ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল।

পি. ই. পালিয়া : দলের অন্যতম সেরা অল রাউণ্ডার। বাঁ হাতে মিডিয়াম পেস বল করতেন। 'সফট উইকেট' তাঁর বল ছিল রীতিমত বিপদজনক। বাঁ হাতের ব্যাটসম্যান এবং চটপটে ফিল্ডার হিসেবেও ছিলেন সুনামের অধিকারী।

এন. ডি. মার্শাল : রান সংগ্রহকারী ব্যাটসম্যান।

গুলাম মহম্মদ : বাঁ-হাতি স্লো বোলার। 'সফট উইকেটে' সাংঘাতিক বল করতেন।

জাহাঙ্গীর খান : নাম করা মিডিয়াম পেস বোলার ছিলেন। একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিখুঁত লেংথে বল করতে পারতেন। ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবেও ছিল তাঁর সুনাম।

জে· নাওমল : ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য অল রাউণ্ডার। স্লো বোলার ছিলেন। কিন্তু তাঁর বল ছিল প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের কাছে প্রলোভনে ভরা। প্রয়োজনের সময় অনেক রান করতে পারতেন।

এন. আর. গোদাম্বে : মারকুটে ব্যাটসম্যান এবং মিডিয়াম পেস বোলার হিসেবে সুনাম ছিল।

১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরটি ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সফরটির মাধ্যমেই ভারত টেস্ট ক্রিকেট জগতে শুধু আত্মপ্রকাশই করে নি—বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে নিজের আসনটি পাকা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

এই সফরে ভারত অংশগ্রহণ করে ৩৭টি খেলায়। ১৩টি খেলায় ভারতীয় দল জয়লাভ করে, ৯টি খেলায় পরাজিত হয় এবং বাকী ১৬টি খেলা শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে (এর মধ্যে দুটো খেলা পরিত্যক্ত হয়েছিল বৃষ্টির জন্যে)। এই সফরে ভারত মোট ২৬টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং ৯টি খেলায় ভারত জেতে, ৯টি খেলা শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে আর বাকী ৮টি খেলায় ভারত হয়েছিল পরাজিত।

মিঃ টি গিলবার্ট স্কটস-এর দলের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম খেলা শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। তারপর সেনা দলের বিরুদ্ধে খেলাটা পরিত্যক্ত হলো। স্যাসেক্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় খেলাটিও শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। চতুর্থ খেলায় ভারত ৩০ রানে হারিয়ে দিল মিঃ এইচ. এম. মার্টিনেয়ুস একাদশকে। গ্লামারগানের সংগে পঞ্চম খেলা ড্র করার পর ৬ষ্ঠ খেলায় ভারত ৮ উইকেটে হারিয়ে দিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলকে। পরের খেলাটি ছিল এম· সি· সি'র সংগে। ড্র হলো এই খেলাটিও। কিন্তু তার পরের খেলায় ভারত ১ ইনিংস ও ১০৩ রানে হেরে গেল হ্যাম্পশায়ারের কাছে। সেই প্রথম পরাজয়।

এসেক্সের সংগে পরের খেলাটা ড্র করার পর ভারত ১২৮ রানে হারালো নরফক দলকে, দশ উইকেটে পরাজিত করলো নর্থ হ্যাম্পটনশায়ারকে আর ৯ উইকেটে পরাজিত করলো কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে। ল্যাঙ্কাশায়ারের সংগে পরের খেলাটি শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। তার পর ভারত ১ ইনিংস ও ১২৯ রানে ইস্টার্ন কাউণ্টি দলকে, ৩ উইকেটে ওয়রচেস্টারশায়ারকে পরাজিত করার পর ভারত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তার প্রথম টেস্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলো।

সেই শুরু। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সেদিন শুরু হলো একটি নতুন অধ্যায়। নতুন যুগের জোয়ার এলো ভারতীয় ক্রিকেট......।

[চলবে]

সত্য-মিথ্যা

কিছু দিন আগে কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় তেহরাণ সফরের সময় সেখানে বাংলা দলের খেলোয়াড়দের বেলেল্লাপনা করার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ লেখাটি পড়ে ক্রীড়ারসিকরা একবাক্যে 'ছি-ছি' করেছিলেন। লজ্জায় যেন আমাদেরই মাথা কাটা যাচ্ছিলো। আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না, ঘরের কিম্বা দেশের গন্ডী পেরুলেই আমাদের দেশের নিরীহ, শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র, বিনয়ী এবং সংযত খেলোয়াড়রা কি করে অমন অশালীন হয়ে ওঠেন! শুধু তাই নয়, ঐ পত্রিকাটির মতে এবার বাংলা দলের খেলোয়াড়রা অভাবনীয় অসংযমের পরিচয় দিয়ে এসেছেন তেহরাণে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা গিয়েছিলেন মাত্রা ছাড়িয়ে। শুধু তাই নয়, দলের ম্যানেজার একমাত্র তাঁর দলের খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে বাংলা দলের অধিনায়ক [illegible] করে সকলের বিরুদ্ধে [illegible] করেছেন তার রিপোর্টে।
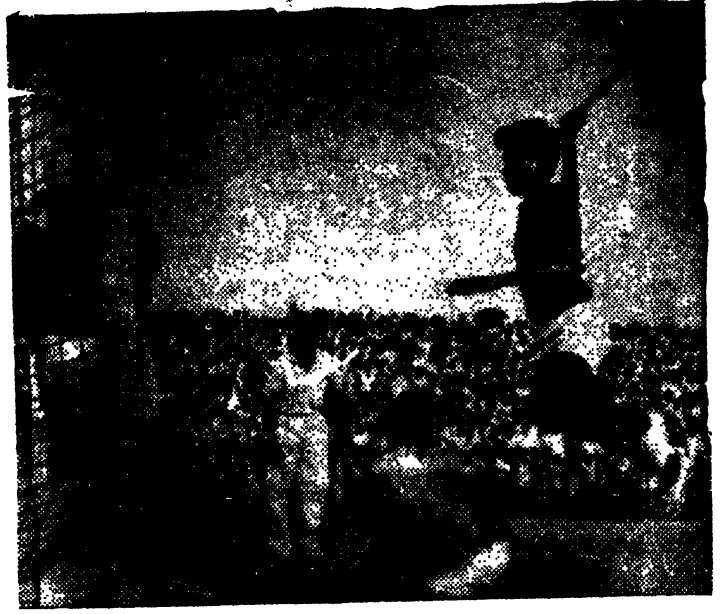
বৃহস্পতিবার বাইটন কাপের দ্বিতীয় সেমি-ফাইন্যাল খেলায় ওয়েস্টার্ন রেলের বিপক্ষে মোহনবাগানের অশোক কুমারকে গোল করার পর আনন্দে লাফাতে দেখা যাচ্ছে।

খেলা ধুলা
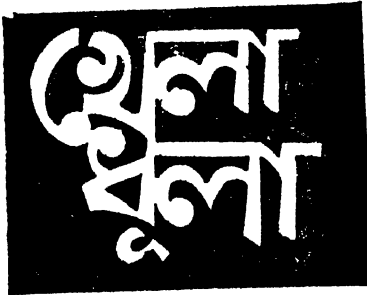
ভুলে গেলে চলবে না যে, খেলোয়াড়রা আমার-আপনার ঘরেরই ছেলে। তাদের মনেও ভয়-ডর এবং ভবিষ্যতের ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তাই রাশ ছেড়ে দিতে চাইলেও তারা প্রতি পদে পদে ইতস্ততঃ করে। তাই তেহরাণের ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমানভাবে দায়ী করবো দলের ম্যানেজারকেও। আর আই এফ একে অনুরোধ করবো যাতে তাঁরা ম্যানেজারকে শুধুমাত্র রিপোর্ট দেওয়ার পরই ছেড়ে না দেন। তেহরাণে খেলোয়াড়দের ঐ অশালীন আচরণের জন্যে ম্যানেজারকে লিখিত কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। কেন তিনি খেলোয়াড়দের সামলাতে পারেন নি? কেন তাঁর কথা খেলোয়াড়রা শোনেন নি?

ওকথা থাক। কিন্তু যে কথা আজ এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি করে বলার দরকার তা হলো—আমরা ঐ ঘটনা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, তাঁরা ঐ সংবাদপত্রের বিবরণ এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ম্যানেজারের রিপোর্টের বিষয়ে ঠিক উল্টো কথাটাই বলেছেন। দু'টি রিপোর্টকেই তাঁরা অতিরঞ্জিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেন। আমরা জানি না তেহরাণের ঘটনা কতোটা সত্যি আর কতোটা মিথ্যে। তবে, ভারতের খেলোয়াড়রা বিদেশে গেলেই নাকি একটু বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন—অনেকেই এ কথা বলেন এবং লেখেন। তেহরাণের ঘটনা সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য না করে আমরা খেলোয়াড়দের অনুরোধ জানাই যে, আর যাই করুন, এবার থেকে আর

[শেষাংশ ৩৩০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাইটন কাপের প্রথম সেমি-ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল দলের একটি গোল করার [illegible]

ফুটবল মাঠে

…ন্য দেশের খেলার রাজা ফুটবল …কাতার ময়দানগুলোকে আলো করে …বার নেমে গেছে মাঠে। শুরু হয়ে …ছে কলকাতার ফুটবল লীগের …সর।

আর মাত্তর কয়েকটা দিন। তার-…রই মাঠে নেমে যাবে ময়দানের সেরা …গুলো। তিন প্রধান খেলতে শুরু …লেই বাজার গরম। তখন কাঠ-ফাটা … আর ঝলসে যাওয়া গরমকে বুড়ো …গুলে দেখিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা …বে মাঠে।

কলকাতার ময়দান তখন হয়ে উঠবে …দের হাট। তার ওপর এবার আবার …ক, লীগের পয়েন্ট যোগ হবে সুপার … খেলার পয়েন্টের সঙ্গে। আর …র লীগে খেলবে একক লীগের … পাঁচটি দল। অর্থাৎ এবার আর … ছাড় নেই। বড় দলগুলোর কাছে …ও খেলাই সমান গুরুত্বপূর্ণ, …টি খেলার পয়েন্টের মূল্য অপরি-…।

…ই মনে হয়, তিন প্রধান মাঠে … সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল মরশুম জমে …। এক-একটি পয়েন্টের জন্যে …দিন পরে আবার ক্লাব সমর্থকরা …ৎকার করে বাজি মাৎ করতে চাইবেন। …র তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় না …-ময়দানের বেধে যেতে পারে কুরু-…ক্ষেত্র।

তবে এবারের ফুটবল লীগ ভালোয় …লোয় শেষ হলে হয়। চারদিকে যে …-ঝাপটা আর অশান্তির ঢেউ চলছে, তার হাত থেকে কি রেহাই পাবে মরশুমী ফুটবলের আসর। সন্দেহ আছে—এ বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কারণ খেলা শুরু হতে না হতেই কলকাতার ময়দান পোস্টারে-পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে গেছে। বাদ-প্রতিবাদের ঝড় ময়দানী ফুটবল মরশুমকে হয়তো আরো উত্তপ্ত করে তুলবে।

তবে ওসব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি ঐসব মিলিয়েই তো ফুটবল—কলকাতার ফুটবল। বাংলা দেশের দর্শকদের পাগল করা খেলা ফুটবল মরশুমের আকর্ষণই আলাদা। সেই আকর্ষণের লড়াই-এ এবার প্রতিদ্বন্দ্বী কুড়িটি দল। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে নবাগত দল চারটি হলো,—কুমারটুলি, ভ্রাতৃ সঙ্ঘ, ঐক্য সম্মিলনী আর টালীগঞ্জ অগ্রগামী। আমরা আশা করি, প্রথম বিভাগীয় লীগ ফুটবলের প্রথম বছরে এরাও অগ্রগামী হয়ে নিজেদের মর্যাদা বাড়াতে সক্ষম হবে।

কলকাতার মাঠে-ময়দানে ফুটবল নেমে গেছে। প্রথম বিভাগীয় ফুটবলের উদ্বোধনী দিনে কালীঘাটের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করছেন শ্রী এন· সি· তালুকদার।

কাতার গুমোট গরমে ঘরের মধ্যে যখন পাখার তলায়ও অসহ্য মনে হয় তখনো ক্রিকেট খেলা হচ্ছে কলকাতায়। সাত্য লি· এ· বিশ্বাস বোলা দাশ।

সমাচার দর্পণ

বর্ণবৈষম্য নীতির অন্ধ সমর্থক সাউথ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফরকে ঘিরে সমস্ত বিশ্বে আজ উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। খোদ ইংলণ্ডেশ্বরী এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীও এই সফরকে স্বাগত জানাচ্ছেন না। তবু সাদা চামড়ার গর্বে গর্বিত একদল ইংরেজের প্রচেষ্টায় সাউথ আফ্রিকা ইংলণ্ড সফরে আসছে।

এই দলের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্লাবগুলোয় ক্রীড়ারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারত এবং পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা যাতে অংশগ্রহণ না করেন তার জন্যে নিজ নিজ দেশের কাছ থেকে তাঁরা নির্দেশ পেয়েছেন।

শুধু তাই নয়, এই সফরের পরি-প্রেক্ষিতে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ভি. কে. আর. ভি. রাও আসন্ন কমনওয়েলথ গেমস-এ ভারতের যোগদানের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সাউথ আফ্রিকা যদি ইংলণ্ড সফরে আসে তাহলে ভারত কোনমতেই কমনওয়েলথ গেমস-এ যোগদান করবে না।

[শেষাংশ ৩০০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

গল্প হলেও সত্যি

১৯৩৬ সালের কথা। অন্যান্য বছরের মত সেবারও অলিম্পিকের আসর বসেছে।

অলিম্পিকের হকির আসরে সেবার ভারত ও আমেরিকা সহ মোট আটটি দেশ যোগদান করেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ফাইন্যাল খেলায় ভারত এবং আমেরিকাকে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে দু' দলই খেলতে মাঠে নামল। সেদিন সেই ৬০ মিনিটের খেলায় একটি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হল। রেকর্ডটি হ'ল ৬০ মিনিটে ২৫টি গোলের। এখনো পর্যন্ত সে রেকর্ড ভাঙে নি।

সেই খেলায় ভারতের একজন খেলোয়াড় অভাবনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর খেলা আমেরিকার হকি কর্মকর্তাদের অবাক করে দিয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এই খেলোয়াড়টির স্টিকে এমন কিছু আছে—যা আঠার মত এবং যা স্টিকে বল লেগে থাকতে সাহায্য করে। তাই তাঁরা অন্য স্টিক দিয়ে তাঁকে খেলিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর খেলা যেমন-তেমন ছিল না। পরে গাছের বাঁকা ডাল ভেঙে খেলিয়েছিলেন তাঁরা তাঁকে। কিন্তু তাঁর খেলার কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি। তখন তাঁরা তাঁর নাম দিলেন হকির যাদুকর। এই খেলোয়াড়টি হলেন 'ধ্যানচাঁদ'। সেই খেলার ফলাফল ছিল, ভারত—২৪, আমেরিকা—১। আর ধ্যানচাঁদ একাই সেই খেলায় ১৪টি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

রতনকুমার চক্রবর্তী, শান্তিপুর লেবুতলা, নদীয়া।

কোনদিন যা হয় নি অবশেষে তাই হলো। ডেভিস কাপে ভারতের ঊনপঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম তারা অস্ট্রেলিয়াকে হারালো। বাইশ বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সাথে এর আগে দু'বারের (১৯৫৯-১৯৬৬) সাক্ষাতেই ভারতকে ৪—১ ম্যাচের ব্যবধানে হারতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, নরেশকুমার, কৃষ্ণণরা যা পারেন নি, প্রেমজিৎ-জয়দীপ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সেই অসাধ্য সাধন করেছেন। সহজেই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠার আশায় পূর্বাঞ্চলকে বেছে নেওয়া অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খুব একটা শুভ হয় নি, এ-কথা ওরা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে। ক্রিকেটের মতো অস্ট্রেলিয়া টেনিসেও হাঁকডাকওয়ালা দল। কিন্তু গলাবাজিতেও ওরা কেউ কম যায় না। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই ওদের অক্রীড়ক দলনেতা নীল ফ্রেজার বিশ্ববাসীকে শোনালেন, 'আমরা সহজেই জিতবো', (মনে পড়ছে দিল্লী টেস্টের আগে বিল লরীর উক্তি, 'টসে জিতলে আমরা জিতবো?)। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রেমজিৎ ও জয়দীপের নার্ভ অত দুর্বল নয়। ওঁদের চোখের সামনে তখন জ্বলজ্বল করছে—অতীতের পরাজয়ের গ্লানি—বিশেষ করে ১৯৬৬র স্মৃতি। অস্ট্রেলীয় দলপতির কথার জবাব ওঁরা দিলো হাতের র‍্যাকেট দিয়ে। ভারত জিতলো ৩—১ ম্যাচে। একটি ম্যাচের মীমাংসা না হলেও আঞ্চলিক ফাইন্যালে বিজয়ী হতে কোন অসুবিধা হলো না ভারতের।

যদিও ফুটবল, ক্রিকেটের মতো টেনিস এখনও আপামর জনগণের খেলা হয়ে ওঠেনি, তবু এ জয়ে সারা ভারতে খুশির জোয়ার বয়ে গেছে। ভারতের অগণিত মানুষের শুভ কামনা আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ছে প্রেমজিৎ ও জয়দীপের ওপর (অন্তরালে থাকলেও কৃষ্ণণের অবদানকে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই)। এর পর ভারতকে খেলতে হবে ইউরোপীয় বিভাগের বিজয়ী দলের সাথে। সম্ভবতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী হবে রাশিয়া কিম্বা জার্মানী। তারপর চ্যালেঞ্জ রাউন্ড। সেখানে আমেরিকা বসে আছে সাগ্রহে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, পথ বহুদূর এবং বন্ধুর। তবে ঠিকমতো খেললে রাশিয়া বা জার্মানীকে হারানো ভারতের পক্ষে মোটেই অসাধ্য নয়। সাধ থাকলেও সীমিত সাধ্য নিয়ে আর্থার অ্যাস বা ক্লার্ক গ্রেবনারের সাথে পাল্লা দেওয়া সোজা কথা নয়। সে যাই হোক, আমরা সবাই আশাবাদী, তাই কোন অবস্থাতেই নিরাশ হতে পারি না। আমাদের আজন্মের ডেভিস কাপ জয়ের সোনালী আশা আবার হাতছানি দিচ্ছে। বাহান্ন কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি এবারও পূর্ণ হবে না? ডেভিস কাপ জয়ের স্বপ্ন কি স্বপ্নই থেকে যাবে!

[৩০০৬ পৃষ্ঠার পর]

আপনারা কিছুতেই কোনরকম রটনার সুযোগ দেবেন না। খেলাধুলার আদর্শকে মাথার ওপর রেখে আপনারা এগিয়ে চলুন ভবিষ্যতের পথে। সে পথে আপনার কিম্বা আমাদের মাথা কোনদিন নীচু হবে না—উঁচুই রইবে চিরকাল......। —শান্তিপ্রিয়

[৩০০৭ পৃষ্ঠার পর]

এবারের গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। ফাইন্যাল খেলায় তারা কলকাতার মোহনবাগানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দেয়।

ওদিকে কোচিনে অনুষ্ঠিত নেহরু ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে মোহনবাগান ক্লাব। ফাইন্যাল খেলায় মোহনবাগান ক্লাব এক গোলে বম্বের মফতলাল মিল দলকে হারিয়ে দেয়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা • জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ : ৪৮শ সংখ্যা—ম‍ূল্য : ৩০ পয়সা
ব‍ৃহস্পতিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 28th May, 1970

পরীক্ষা, না, প্রহসন !!

কয়েক সপ্তাহ প‍ূর্বে আমরা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়ে যে কেলেঙ্কারীর স‍ৃষ্টি হয়, তা নিবারণের উপায় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলাম। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য নাকি তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত হলেই বা তার রায় বের‍ুলেই আর কোনোদিন প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না, এমন স্বপ্ন যারা দেখে, তারা ম‍ূর্খের স্বর্গে বাস করছে। ইতিপ‍ূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়েও বহ‍ুবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তদন্তও হয়েছে। তার ফলাফল যাই হোক না কেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস নিবারণ করা সম্ভব হয় নি।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা এবার যেভাবে হয়েছে, তাতে পরীক্ষার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বোধ হয় জনসাধারণের নেই!

জনসাধারণের চোখে এবার শ্রদ্ধা হারিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষাগ‍ুলিও।

প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার জন্য বড় একটা দ‍ুর্ঘটনা ঘটে নি জেনে এবার অভিভাবকেরা আশ্বস্ত ছিলেন। চেয়ার-টেবিল ভাঙা, সামনে যা থাকবে তা দিয়ে আঘাত করা প্রভৃতি ঘটনাগ‍ুলি বোধ হয় মাম‍ুলি ও প‍ুরাতন হয়ে গেছে বলে এক শ্রেণীর ছাত্রের আর ঐ সবের প্রতি বড় বেশি আকর্ষণ নেই। তবে একেবারেই যে নেই, তা বলা অন‍ুচিত। এই তো গত শ‍ুক্রবারেই বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার অভিযোগে কলকাতার কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রের ছাত্ররা পরীক্ষা বয়কট করে এবং বসিরহাটের দ‍ুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। ঐ দিন ঐ কারণে সেণ্ট জেভিয়ার্স, আশ‍ুতোষ, দীনবন্ধ‍ু কলেজেও পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়। কোথাও গান্ধীবাদী মতে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়েছে, এমন মনে করার হেতু নেই। প্রশ্নপত্র যিনি তৈরি করেছেন এবং তাঁর ওপর যিনি রয়েছেন অর্থাৎ মডারেটর তাঁদের বির‍ুদ্ধে হয়তো দোষারোপ করা হবে। বলা বাহ‍ুল্য, তাঁদের বির‍ুদ্ধে দোষের কথা শ‍ুনতে শ‍ুনতে তাঁরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এবং প্রশ্নপত্র কঠিন করতে তাঁদের হ‍ৃদয়ে দ্বিধা হয় না।

কিন্তু প্রশ্নপত্র সহজ হলেই কি একশ্রেণীর ছাত্র স‍ুবোধ ও শান্ত হয়ে যাবে?

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার সময় বহ‍ু ছাত্র নাকি চৌর্যব‍ৃত্তিতে রেকর্ড স্থাপন করেছে, অনেকের ম‍ুখে এমন কথা শোনা যাচ্ছে। এখন আর কাগজে কষ্ট করে ট‍ুকে নিয়ে গিয়ে নকল করতে হয় না। একেবারে বইস‍ুদ্ধ পরীক্ষার হলে নিয়ে গিয়ে নকল করা হয়। ইনভিজিলেটর মহোদয়রা নাকি নির‍ুপায়। আর অধিকাংশ ছাত্রই যদি নকল করতে থাকে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কতোজনের বির‍ুদ্ধে শাস্তিম‍ূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন? বিশেষভাবে ইনভিজিলেটররা যদি নির্লিপ্ত ভাব গ্রহণ করে থাকেন। পত্রান্তরে জনৈক পরীক্ষার্থী ছাত্রের একটি চিঠি বের হয়েছে। ছাত্রটি আক্ষেপ করে জানিয়েছে যে, পরীক্ষা গ্রহণের প্রাক্-ম‍ুহ‍ূর্তে ইনভিজিলেটর প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে দ‍ু' টাকা করে গ্রহণ করেন নকল করতে দেবার জন্য। উক্ত ছাত্রী বিনীতভাবে ইনভিজিলেটরকে জানায় যে, সে চ‍ুরি করে নি, তাহলে সে টাকা দেবে কেন? শেষ পর্যন্ত নকল না করলেও সে টাকা দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য পরদিন ঐ একই ব্যাপার ঘটলেও অন্য একজন ব‍ৃদ্ধ ইনভিজিলেটর তার কথায় সদয় কর্ণপাত করে তাকে বাধ্যতাম‍ূলক দক্ষিণা-দান থেকে ম‍ুক্তি দেন।

এ বছরের এই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পর্ব—যা এক বিরাট প্রহসনের নামান্তর। জনসাধারণের চোখে তাই পরীক্ষার ম‍ূল্য আর তেমন নেই। তবে কর্তৃপক্ষকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতেই হবে। নচেৎ তাঁদের ব্যর্থতাই ধরা পড়বে।

আমরা চাই পরীক্ষার প্রহসন বন্ধ হোক। এক শ্রেণীর ছাত্ররা নকল করার উদ্দেশ্যে মরীয়া এবং তারাই নাকি দলে ভারী; আর ইনভিজিলেটররা প্রাণভয়ে ভীত। এই অবস্থা চলতে থাকলে সত্যিকারের ভালো ছেলেদের মানসিক অবস্থা কী দাঁড়াবে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর অতি-ভালো ছেলেরা নাকি একালে পরীক্ষার প্রতি বির‍ূপ! তারাই নাকি এবার বহ‍ু কেন্দ্রে পরীক্ষাদানে বাধা দিয়েছে।

আমাদের এদেশে এতোদিন শিক্ষার হন্দম‍ুন্দ হয়েছে, তবে যা কিছ‍ু চাকচিক্য ছিল "পরীক্ষা"তেই। এখন তারো হন্দ-ম‍ুন্দ হচ্ছে। শিক্ষান‍ুরাগীরা এর কার্য-কারণ অন‍ুধাবন করে এই ম‍ুহ‍ূর্তে সঠিক পথ নির্ণয় করতে না পারলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। আর সেটাই কি হবে অনিবার্য?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ক্যাসেল শীর্ষ বৈঠকানুষ্ঠান শেষ হল। কিন্তু এ-ধরনের আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের শেষে সব অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যৌথ বিবৃতি দেবার রেওয়াজ হয়েছে এ-ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর দুই প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী উইলি স্টোফ এবং চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডট দু'দিন ধরে আলোচনা করলেন, কথা বললেন, তর্ক করলেন। কিন্তু একমত হয়ে যুক্ত বিবৃতি দেওয়া হলো না। তবে কি এই বুঝতে হবে যে, দুই নেতার মধ্যে মতৈক্য হয় নি বলেই যুগ্ম ইস্তাহার বিলি করা থেকে তাঁরা বিরত থাকলেন? কিন্তু ক্যাসেল বৈঠক যদি প্রার্থিত ফল প্রসবে ব্যর্থও হয়ে থাকে, তবে তার দায়িত্ব উইলি স্টোফের ওপর চাপানো উচিত হবে না। কারণ তিনি চেষ্টা করেছেন বৈঠকটিকে অর্থপূর্ণ করতে, যে কর্মসূচী সামনে নিয়ে বৈঠকের সূচনা, তার সফল সমাপ্তি ঘটাতে। অন্য পক্ষ যদি একগুঁয়ে, একরোখা ও অনমনীয় হয় তো প্রধানমন্ত্রী স্টোফের করবার কী আছে?

মিঃ গ্রোটেওল-এর জায়গায় মিঃ উইলি স্টোফ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। স্টোফ হচ্ছেন একজন পোড়-খাওয়া রাজনীতিক, কমিউনিস্ট। জার্মানীর এক শ্রমিক পরিবারে জন্মেছিলেন স্টোফ, ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্যের কশাঘাত মর্মে মর্মে অনুভব করে আসছেন। রাজমিস্ত্রির পেশা নিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্টোফ কমিউনিস্ট যুব সংস্থার সদস্য হন এবং তার তিন বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির পুরোদস্তুর সদস্য। যখন জার্মানীতে হিটলার বা নাৎসীরা ক্ষমতায় আসেন তখন স্টোফকে বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করতে হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেই স্টোফ রাজনৈতিক কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল তখন নাৎসীরা তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ে বাস্তববাদী উইলি স্টোফ বিস্মিত হন নি। যুদ্ধের শেষে যখন চতুঃশক্তি জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করল, তখন উইলি পূর্ব খণ্ডেই রয়ে গেলেন—তাঁর

উইলি স্টোফ

স্বপ্নের সমাজতান্ত্রিক শিবিরে। এবং বলাই বাহুল্য, পূর্ণোদ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে লেগে গেলেন। বস্তুত যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে, ফ্যাসীবাদের বেষ্টনী থেকে পূর্ব জার্মানীকে মুক্ত করা এবং সমাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর তাকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু যেখানে উইলি স্টোফের মত উদ্যোগী নিবেদিতপ্রাণের তরুণ রয়েছে, সেখানে কোনো কাজ কি অসম্পূর্ণ থাকতে পারে? তাঁর এই অবদান যথারীতি পুরস্কৃতও হতে থাকলো। বয়স যখন তাঁর ৩৬, সাল ১৯৫০ তখন উইলি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন, তার তিন বছর পরে দলের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি পলিট ব্যুরোর। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতাও পর্যায়ক্রমে তাঁর হাতে আসতে থাকল। ১৯৫২ সালে স্টোফ গণতান্ত্রিক জার্মানীর আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী হন এবং '৫৪ সনে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী। তার দু' বছর বাদে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হল প্রতিরক্ষার দায়িত্ব। এ-পদের ব্যবহার করেই তিনি পূর্ব জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

অতীত অভিজ্ঞতার কারণে উইলি স্টোফ গণতান্ত্রিক জার্মানীকে সমাজতন্ত্রের পথে সঠিক নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। চেয়ারম্যান উলব্রিখটেরও পূর্ণ আস্থা তিনি অর্জন করেছেন। গত ১৮ই মার্চ পূর্ব জার্মানীর এরফুর্টে অনুষ্ঠিত দুই জার্মানীর প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের পর পশ্চিম জার্মানীর ক্যাসেলের দ্বিতীয় বৈঠকে সেজন্য উইলি স্টোফই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বৈঠকে স্টোফ দুই জার্মান রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ও বাস্তব অস্তিত্ব এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথাই তুলেছিলেন। কিন্তু আগে অন্যরকম ইঙ্গিত দিলেও ক্যাসেলে চ্যান্সেলর ব্রান্ডট পূর্ব জার্মানীর স্বাতন্ত্র্যকে কার্যত অস্বীকারই করেছেন এবং তাকে স্বীকার করার আগে ২০ দফা শর্ত আরোপ করেছেন। এ-অবস্থায় বৈঠক সফল হয় কী করে, যৌথ বিবৃতিই বা দেবে কে? তবে আশার কথা, আলোচনা ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হচ্ছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(৩৫)

বসু-জিন্না আলোচনা নিয়ে সারা দেশে গভীর আগ্রহ এবং প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল। হরিপুরা-কংগ্রেসের তরুণ নায়ক তখন জনমনে বিপুল অনুরাগ ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর সংগ্রামী প্রকৃতি অথচ কঠোর যুক্তি-শীলতা একটা কিছু ঘটাতে সমর্থ—এ ধরনের বিশ্বাস নানা দিকে জেগে উঠেছে। মুসলিম লীগ এবং জিন্নার অনমনীয় মনোভাব সম্বন্ধে তখন অপর সকলের মনে এতই হতাশা যে, নূতন নেতৃত্ব ছাড়া এই অবস্থা থেকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না—সুভাষচন্দ্রের প্রতি বিশ্বাসের মূলে এই জাতীয় একটা নিরুপায় আশাবাদ ছিল।

"ঐতিহাসিক ঐক্য সম্মেলন"—বসু-জিন্না আলোচনা সম্বন্ধে বিস্ফারিত আবেগে সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল। "তাঁরা সাক্ষাৎ করলেন এবং কথা বললেন"—নাটকীয় হয়ে উঠেছিল সংবাদপত্রের শিরোনামা।১ আলোচনার পূর্বাপর

বোম্বাইয়ে (১৯৩৮, মে মাসে) জিন্নার বাসভবনে সুভাষচন্দ্র

১ অমৃতবাজার ১২ই মে তারিখে প্রথম দিনের আলোচনার বিবরণ দিতে গিয়ে শিরোনামা দেয়ঃ
THEY MEET AND TALK
Rastrapati Subhas Chandra Bose and Mahamed Ali Jinnah efforts for Communal

পরিস্থিতি যথাসম্ভব বিস্তারিত আকারে সংবাদপত্রে জানানো হয়েছিল। আলোচনা হয় বোম্বাইয়ে জিন্নার বাসভবনে। গান্ধী আলোচনা আরম্ভের দিনই সীমান্ত-ভ্রমণ করে বোম্বাইয়ে আসেন। সকালে ভাডার স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে অন্যান্যদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে গান্ধী সহাস্যে বলেন, একি, রাষ্ট্রপতিজীও যে এসেছেন দেখছি! প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র নমস্কারে নত হন। "মহাত্মা তারপর সোজা তাঁর জুহুর বাসভবনে গাড়ি করে চলে যান। সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী এবং অন্যান্যরা একান্তে আলোচনায় বসে পড়েন।" জিন্নার সঙ্গে তাঁর যে-ধরনের কথাবার্তা হয়েছে, সে বিষয়ে গান্ধী বসুকে অবহিত করেন। অপরপক্ষে বসুও জাতীয় সমস্যার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত কতকগুলি বিষয়ে জিন্নার মনোভাব ও তার সুদূরপ্রসারী ফল কী হতে পারে, সে বিষয়ে গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্দেশ প্রার্থনা করেন। গান্ধী ও বসুর মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। কথা হয় যে, জিন্নার সঙ্গে যদি কোনো প্রকার বোঝাপড়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহলে বসু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সামনে সব কিছু রাখবেন এবং জিন্নাও লীগ কাউন্সিলের জরুরী মিটিং ডাকবেন।

গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে মৌলনা আজাদের সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করতে বলে দিয়েছিলেন। আজাদ তখন কংগ্রেসের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং লীগের পক্ষে অসুবিধাজনক অস্তিত্ব। এই কংগ্রেসী মুসলমান নেতাকে জিন্না মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন, (তাঁর পথ গ্রহণ করে আজাদ কংগ্রেস ছাড়েন নি বলে!!), তাঁর মতে, কংগ্রেস নামক হিন্দু প্রতিষ্ঠানে আজাদ পুতুলনাচের পুতুল২—আজাদের সঙ্গে জিন্নার তাই বারে বারে সংঘর্ষ হয়েছে—আলোচ্য আলোচনার আগেও তাই হয়েছিল। গান্ধী-জিন্না কথাবার্তা নিয়ে আজাদ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে ভ্রান্ত ধারণার প্রকাশিত হয়; জিন্না এক বিবৃতিতে আজাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। গান্ধী চেয়েছিলেন, আজাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বসু গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিন এবং তদনুযায়ী জিন্নাকে অবহিত করুন।৩

আজাদের সঙ্গে ১১ই মে দুপুরে সুভাষচন্দ্রের আধ ঘন্টার জন্য কথাবার্তা হয়। সেখান থেকে সোজা জিন্নার বাসভবনে গিয়ে হাজির হন বিকেল তিনটের সময়ে। "জিন্না অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে আসেন, নীরব হাস্যে তাঁর করমর্দন করেন। শ্রীযুক্ত বসুকে মিঃ জিন্না নিজের ড্রইংরুমে নিয়ে যান, সেখানে তাঁরা অতীব গুরুতর বিষয়ের—দেশের পক্ষে বোধ হয় সবচেয়ে জটিল বিষয়ের আলোচনায় বসে পড়েন।"

আলোচনা চলে পুরো পাঁচ ঘন্টা। আলোচনার মধ্যে নথিপত্র নাড়াচাড়া করা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত বসুকে বোম্বাইয়ে আতিথ্য দিয়েছিলেন মিঃ পারেখ। তিনি একবার রাশিকৃত সংবাদপত্রের কাটা অংশ নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন—সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নিয়ে নানা বিবৃতি ও সংবাদ যার মধ্যে ছিল। আলোচনার শেষে বসু ও জিন্না যখন বেরিয়ে আসেন, দুজনকেই উৎফুল্ল দেখা যায়। তাঁদের ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছিল, সন্তোষজনকভাবে আলোচনা হয়েছে। উভয়ে সাংবাদিকদের কাছে ক্ষুদ্র একটি যৌথ বিবৃতি দেন। তাতে বলেন: "হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মধ্যে ৫ ঘন্টা ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) আবার রাত্রি সাড়ে আটটায় আলোচনা আরম্ভ হবে।" আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জিন্না সাংবাদিকদের কাছে আর বেশি কিছু বলতে অস্বীকার করেন: "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার কাছ থেকে একেবারেই আর কিছু পাচ্ছেন না, মিঃ বসুর কাছ থেকেও নয়। আপনারা কদাপি আশা করতে পারেন না, যে-বিষয়টি নিজস্বভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তার আলোচনার বিষয়বস্তু আমি বা মিঃ বসু ফাঁস করব।" জনৈক সাংবাদিক

২ ১৯৪০ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে আজাদ যখন জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে চান, তখন জিন্না অশালীন ভাষায় সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেন:

"Cannot you realise, you are made a Muslim show-boy, to give it colour that it is national and deceive foreign countries? The Congress is a Hindu body." (মাইকেল এডওয়ার্ডস)

৩ "Misunderstanding having arises out of the press statement issued by Maulana Abul Kalam Azad regarding the Gandhi-Jinnah talks and subsequent counter-statement by Mr. Jinnah, it appears before meeting Mr. Jinnah at the later's residence Mr. Subhas Chandra Bose, Congress President, had half an hour's talk with Maulana Azad. This appears to have been planned at the instance of Gandhiji so that the position might be cleared at the historic meeting between the official heads of the Congress and the Muslim League, which commenced exactly at 3 P.M.

"Maulana Azad appraised Mr. Bose with all relevant facts about the move which he had initiated to have the meeting between Mr. Jinnah and Mahatma Gandhi arranged."

(অমৃতবাজার, ১২ই মে ১৯৩৮)

নাছোড় হয়ে বল্লেন, "কিন্তু আমাদের যে না এসে উপায় নেই।" জিন্না তাতে রহস্য করে বল্লেন, "যে ক্ষেত্রে আমি মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেব।"

আলোচনা থেকে ফিরেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীকে টেলিফোন করেন। জানান যে, পরদিন সকালে তিনি মোটা বিবরণ জানাবেন এবং পরবর্তী আলোচনার সম্ভাব্য বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবেন।

আলোচনা যখন চলছিল—বোম্বাই শহর তখন রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যে পূর্ণ। সেখানে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন চলেছে, তাই সকল কংগ্রেসী নেতাই বোম্বাইয়ে উপস্থিত। সেই সংগে এই 'সবচেয়ে দরকারী' হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের উপর আলোচনা। বসু যখন জিন্নার সংগে আলোচনা করছিলেন, ঠিক তখনই প্যাটেল, আজাদ, কৃপালনী, রাজাগোপালাচারী গান্ধীজীর সংগে একই প্রশ্ন নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন।

১২ই মে দ্বিতীয়বার জিন্নার সংগে আলোচনায় বসার আগে বসু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দু'ঘন্টাব্যাপী আলোচনা করেন। ঐ সভায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটিকে সব প্রকারে পরীক্ষা করা হয়। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার পক্ষে লীগের বিশেষ দাবি, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় মুসলমান সদস্য নির্বাচনের নীতি, বিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষা, বন্দে মাতরম সংগীত; যৌথ নির্বাচন নীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।৪ এই সব আলোচনার বিশেষ কারণ—বসু-জিন্নার দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় বিষয়গুলি ওঠার কথা ছিল। প্রথমদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু যদিও বসু বা জিন্না কেউই বলতে চান নি, তাহলেও নানা সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল যে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালে লখনৌয়ে সর্বদলীয় সম্মেলন, নেহরু রিপোর্ট, পাঞ্জাব প্যাক্ট, এলাহাবাদে ঐক্য সম্মেলন, কলকাতায় ১৯২৮-এ সর্বদলীয় সম্মেলন থেকে জিন্নার বেরিয়ে আসা, তাঁর চৌদ্দ দফা প্রভৃতি আলোচিত হয়। ১৯৩৫ সালে জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনার বিষয়বস্তুও পরীক্ষিত হয়েছিল।৫

প্রথম দিনের আলোচনা হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সমাপ্ত হয়েছিল। তার প্রমাণ, জিন্না পরদিন বসুকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনান্তে আলোচনা চলছিল—মধ্যরাত্রিতে তা শেষ হয় কি—শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয় রাত দুটোর সময়ে। এই দিনের আলোচনা সম্বন্ধে কিন্তু আনন্দবাজার সংবাদপত্রে রিপোর্ট বেরোয় নি।৬ পরদিন (১৩ই মে) সকালে গান্ধীর সভাপতিত্বে বসু ও অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের তিন ঘন্টার সভা বসে; বসু জিন্নার সংগে আলোচনার বিবরণ জানিয়েছিলেন। নানাসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে বোঝা গিয়েছিল, আলোচনা একটা জায়গায় ঠেকে গিয়েছে। কংগ্রেস-পক্ষ স্থির হয়েছিল, স্পষ্ট ভিত্তি ছাড়া আলোচনা চালিয়ে আর লাভ নেই। গান্ধীজী মীমাংসার একটা খসড়া রচনা করবার চেষ্টা করছিলেন এবং বসু-জিন্নার

৪ অমৃতবাজার, ১৩ মে।

৫ "The United Press special correspondent gathers that yesterday's talks between Mr. Subhas Chandra Bose and Mr. Jinnah commenced with a historical survey of the unity problem and much time was spent upon examining in detail the resolutions adopted at the All Parties Conference, held at Lucknow in 1928, where the Nehru Report was debated upon at length and its conclusions accepted after modifications in the light of discussions at the open conference and the Punjab Pact, to which leading Hindus, Sikhs and Muslims, who later became Ahrars were signatories.

It appears following the Lucknow decisions proposals discussed at the Allahabad Unity Conference convenced by Pandit Madan Mohan Malaviya at the time of the Round Table Conference were examined as well as the circumstances and developments following Mr. Jinnah's walk-out from the National Convention in Calcutta in 1928. Resolutions of the All India Muslim Conference which adopted the famous 'Fourteen Points' of Mr. Jinnah in 1929 at Delhi were also called for reference."
(A. B. P. 13-5-1938)

৬ ১৩ মে তারিখের সংবাদ শিরোনামা:

BOMBAY UNITY TALKS

Bose-Jinnah Negotiations Reach a Delicate Stage

Jinnah Reiterates League Claim

Muslim League Dictator Wants Status Quo to be Maintained Regarding Communal Award. (A. B. P.—13-5-1938)

আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছিল সাময়িকভাবে।৭ এইদিনই বিকাল বেলা বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে লক্ষ লোকের সমাবেশে বসু বক্তৃতা করলেন। সভায় জওহরলাল সহ অধিকাংশ কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, বক্তৃতাও করেছিলেন। সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: "এখনো সামনে অন্ধকার দিন—উত্তাল তরঙ্গ, ঝঞ্ঝা ও বজ্র-বিদ্যুৎ। আমাদের তৈয়ার হতে হবে; স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণের পথে এগিয়ে যেতে হবে।"

১৪ই মে রাত্রে আবার বসু-জিন্নার আলোচনা বসেছিল। গান্ধী-ফর্মুলা সম্বন্ধে জিন্নার নাকি প্রতিক্রিয়া ভালই হয়েছিল। ১৯৩০ সালে লখনৌয়ে মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে মৌলনা সৌকত আলী, মীরাটের নবাব ইসমাইল, সৈয়দ মর্তুজা সাহেব, চৌধুরী খালিকুজ্জমান প্রভৃতি যে শর্ত প্রস্তুত করেছিলেন তারই ভিত্তিতে গান্ধী তাঁর ফর্মুলা তৈরি করেন। আজাদ গান্ধীকে ঐ ফর্মুলা নিতে প্ররোচিত করেছিলেন।

এসব সত্ত্বেও আলোচনা ক্রমেই অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। "গতকাল পর্যন্ত কংগ্রেসের উচ্চমহলে যে আশাবোধ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, তা হ্রাস পেয়েছে। আজ উচ্চমহলে আলাপ-আলোচনার ফল সম্বন্ধে নৈরাশ্যই প্রবল।"৮

এইদিন রাত্রে সুভাষচন্দ্র জিন্নাকে লিখিতভাবে জানালেন, কংগ্রেস কত দূর অগ্রসর হতে পারে। জিন্না বললেন, সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ও বিষয়ে তিনি কিছু বলতে অসমর্থ।

আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক কিছু ফাঁস হয়ে বেরুল। নানা সূত্রে জানা গেল, কংগ্রেসের দাবি—অকংগ্রেসী প্রদেশসমূহে তিনজন করে কংগ্রেসী মন্ত্রী নিতে হবে। জিন্না উল্টো দাবি করলেন, সে ক্ষেত্রে কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতেও দু'জন করে মুসলমান মন্ত্রী নেওয়া চাই। কংগ্রেস দাবি করল, বিভিন্ন আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যরা কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করবেন; তাতে জিন্না বললেন, কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে মুসলমান মন্ত্রীরা তা করতে পারেন, কিন্তু সকল লীগ সদস্য সই করবেন, তা হতে পারে না। কংগ্রেসের আরও দাবি ছিল, লীগ সদস্যরা সাধারণভাবে কংগ্রেসের নির্বাচন ম্যানিফেস্টোর প্রতি সমর্থন জানাবে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে লড়বে।৯

জিন্নার পক্ষে শর্তগুলি বলাই বাহুল্য গ্রহণযোগ্য ছিল না। সুতরাং ১৮ মে'র সংবাদপত্র প্রত্যাশার মৃত্যুসংবাদ বুকে ঝুলিয়ে আত্মপ্রকাশ করল:

SEARCH FOR UNITY IN VAIN

Bombay Negotiations likely to Prove Abortive

Jinnah Sticks to His Own Guns

League-Dictator Does Not Like the Muslims To be Camp-followers of Congress.

১৭ই মে তারিখেই আলোচনার সংকট অবস্থা বোঝা গিয়েছিল। সকাল ৯টায় ওয়ার্কিং কমিটির যে-সভা হবার কথা ছিল, দুপুর দুটো পর্যন্ত তাকে স্থগিত রাখা হয়েছিল। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে বসু সহ কংগ্রেস নেতারা গান্ধীর সঙ্গে একান্ত আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, গান্ধীর কুটীর থেকে বসু যখন বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁর হাতে জিন্নার জন্য উদ্দিষ্ট একটি মোটা খাম—এই সময়ে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁকে ব্যাপার কী, প্রশ্ন করলে বসু বললেন: "সত্যি কথা বলতে কি, কিছুই সম্পূর্ণ ঠিক হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি না, আলাপ-আলোচনা কখন শেষ হবে এবং কোনো মীমাংসা হবে কি না।" ওয়ার্কিং কমিটির অপর একজন সদস্য আর একটু পরিষ্কার ভাষায় কথা বললেন: "যতদূর জানি, শ্রীযুক্ত বসু নিকট-ভবিষ্যতে মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনায় বসছেন না। তবে চিঠি-পত্রে আলোচনা সম্ভবত চালিয়ে যাবেন।"১০

[ক্রমশ]

৭ ১৪ মে তারিখের সংবাদ-শিরোনামা:

UNITY NEGOTIATIONS

Gandhi finds out a formula to Satisfy Jinnah

Busy Discussions at Juhu

No Time yet fixed for further Bose-Jinnah Meeting

Jinnah's Demand Placed Before Working Committee. (A. B. P.—14-5-1938)

৮ অমৃতবাজার, ১৬ মে।

৯ অমৃতবাজার ১৭ এবং ১৮ মে।

১০ অমৃতবাজার ১৮ মে, ১৯৩৮।
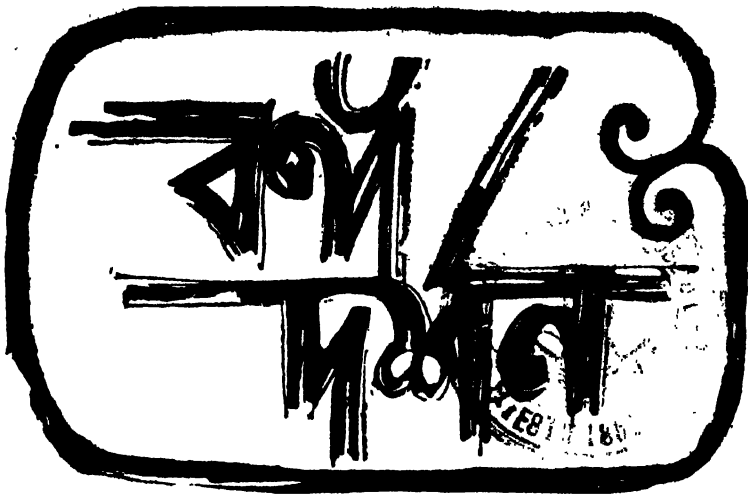
অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি-শাসন পশ্চিমবঙ্গে বিন্দুমাত্র মঙ্গলজনক পরিবর্তন আনতে পারে নি। এটা যে সম্ভব নয় এবং কেন সম্ভব নয়, সেকথা আমরা ইতিপূর্বে বহুবার বঙ্গদর্শনে লিখেছি, যে কথাগুলির পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের এই দুঃসময়ে বিগত যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি যদি একটু সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন, তাহলেও হত। কিন্তু তা হয় নি, পুরাতন যুক্তফ্রন্ট চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে সমঝোতার পরিবর্তে অহি-নকুল সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ যুক্তফ্রন্টের এই শরিক দলের নারীসুলভ কোন্দলের পিছনে সত্যকারের কোন রাজনৈতিক কারণ আছে বলে মনে হয় না। আজ যখন দেশের সংকট চরমে উঠেছে, একটা উৎপীড়নের বাতাস সর্বদাই বইছে, প্রগতিশীল বলে পরিচিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর ব্যাপক নিগ্রহ চলছে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যখন সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি, যাঁরা কথায় কথায় মার্কস-লেনিনের বচন উদ্ধৃত করতে এবং নিজেদের সাচ্চা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে জাহির করতে পঞ্চমুখ, বিভিন্ন জনসভায় নাকিসুরে মড়াকান্না জুড়েছেন, অমুক দলের জন্যই আমাদের সোনার সংসারটা পুড়লো. প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের সব শরিক দলেরই এক হাল, একই বক্তব্য। বামপন্থী নেতারা ভীমরতিগ্রস্ত ও জড়ত্বের শিকার, দৌড় জনসভা পর্যন্ত, কণ্ঠ ভিন্ন দেহের, আর কোন অংশই সক্রিয় নয়। ক্যাডাররাও বিভ্রান্ত, কখনো তারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শিকার, কখনো বা সমানই বিভ্রান্ত অন্য শরিক দলের হাতের শিকার। বামপন্থী নেতারা যদি একটু যুক্তিশীল হন এবং এই আত্মহননের নীতি পরিত্যাগ করেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গেরও কল্যাণ, তাঁদেরও কল্যাণ। নতুবা অনেক প্রাণের বিনিময়ে এবং অনেক ক্ষতির ধাক্কা সামলে, অদূরভবিষ্যতে তাঁদের স্বীকার করতে হবে, হ্যাঁ, সেদিন আমাদের স্ট্যাণ্ডটা ভুল হয়েছিল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। আসলে বামপন্থী নেতারা এই দুঃসময়ে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার যে মনোভাব নিয়ে চলেছেন, তাতে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল ও বামপন্থী আন্দোলনকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবার পরিবর্তে কয়েক ধাপ পিছিয়ে দিচ্ছেন।

নতুন ভূমি সংস্কার আইন

রাষ্ট্রপতি-শাসনে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিনীতি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ভূমিরাজস্ব উপদেষ্টা শ্রীকরুণাকেতন সেন জানিয়েছেন যে, জমি জবরদখল ও বণ্টন করার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দেওয়া হবে না। খাস বা সিলিং-বহির্ভূত বেনামী জমি সরকার আইনসম্মতভাবে উদ্ধার করতে চান। পশ্চিমবঙ্গের নতুন ভূমিনীতি সংক্রান্ত এক প্রেস নোটে আরও বলা হয়েছে যে, পারিবারিক সিলিং ধার্য করার জন্য খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন করা হবে। জবরদখলীকৃত জমি সম্পর্কেও কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাঝারি কৃষকের জবরদখলী জমি উদ্ধারের কোন দায়িত্ব বর্তমান সরকার নেন নি। এঁদের আদালতের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নতুন ভূমিনীতিতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, সরকার যত তাড়াতাড়ি পারেন বেনামী ও বাড়তি জমি দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করবেন। পারিবারিক সিলিং-এর ব্যবস্থা কার্যকরী হলে বাড়তি যে জমি সরকার দখল পাবেন, তার জন্য জমির মালিককে ক্ষতিপূরণের আশ্বাসও এই ভূমিনীতিতে দেওয়া হয়েছে। বর্গাদারের অংশ নতুন করে নির্ধারণের জন্য ভূমি সংস্কার আইনের যে সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, বর্গাদার যদি চাষের জন্য সার, খোল, বীজ ইত্যাদি এবং অন্যান্য সমস্ত খরচ বহন করে; তাহলে সে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ পাবে, জমির মালিক পাবে শতকরা পঁচিশ ভাগ। আর যেখানে জমির মালিক সার, সেচ ও চাষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের খরচ বহন করে, সেখানে বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী আধাআধি অংশই বহাল থাকবে। বর্গাদারকে সরকার কৃষির উন্নতির জন্য ঋণ মঞ্জুর করবেন। পারিবারিক সিলিং কত একরে বাঁধা হবে বা পরিবারের সংজ্ঞা কি হবে, তা এখনো ঠিক হয় নি। সিলিং-এর কম জমির মালিকানার জমি বেদখল হয়ে থাকলে সরকার জবরদখলীকে উৎখাতের দায়িত্ব নেবেন না। মালিককেই দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কিছু কিছু জায়গায় অতিরিক্ত জেলা শাসককে ক্ষমতা দিয়ে বিচারের ভার দেবেন। সরকারের খাস জমি যারা জবরদখল করেছে, তারা যদি ভূমিহীন হয়, তাহলে সেই জমি জবরদখলকারীদেরই দেওয়া হবে। এই জবরদখলকারীদের দুই একরের বেশি জমি থাকলে তাকে উৎখাত করার জন্য সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। আদালতকে ভুল বুঝিয়ে যে সকল একতরফা ইনজাংসন জারী করা হয়েছে, সেগুলি যাতে তুলে নেবার আদেশ আদালত দেন, তার জন্য আদালতে নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করে গুরুত্ব সহকারে মামলাগুলির তদারক করা হবে। এই রকম মামলার সংখ্যা কয়েক হাজার।

আপাতদৃষ্টিতে এই নতুন ব্যবস্থা দেখতে-শুনতে খুব মন্দ নয়। রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীকরুণাকেতন সেন এই ভূমিনীতিকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যুক্তফ্রন্টের থেকেও প্রগতির পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বর্গাদার ও ভূমির মালিকের নতুন হারাহারি অংশ নির্ধারণের কথা উল্লেখ করেন। আমাদের আশংকা অন্যত্র। কাগজে-কলমে একটা উৎকৃষ্ট ভূমিনীতি প্রণয়ন করায়, তা সাড়ম্বরে ঘোষণা করায় বা বিধিবদ্ধ করায় কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বাস্তবে সেই নীতিকে রূপ দেওয়া অন্য কথা। কারো স্বার্থে হস্তক্ষেপ না করে কিছু করা সম্ভব নয় এবং তা করতে গেলেই বিভিন্ন মহল থেকে 'গেল গেল' ধ্বনি উঠবে। কংগ্রেসও একদা ভূমি সংস্কার আইন করেছিল। ১৯৫৩ সালে জমিদারী দখল আইন করবার সময় কংগ্রেস আট লক্ষ একর জমি উদ্ধারের কথা বলেছিল, কিন্তু বাস্তবে কিছু করে নি। সমস্ত ব্যাপারটাই শুধু কাগজ-কলমে থেকে গেল। সরকার বে-আইনী দখল বন্ধ করবার

বে-আইনীভাবে জমি দখল করে আছেন, তাদের কি হবে? কংগ্রেস আমলে জমি যা উদ্ধার হয়েছিল, তার মধ্যে বেশির ভাগই কোর্টের হস্তক্ষেপে আটক রয়ে গেছে। তাই বাস্তব অবস্থা হল, জমি উদ্ধার একমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই হতে পারে, যা যুক্তফ্রন্টের আমলে হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন, কিন্তু শরিকী সংঘর্ষের ফলে তাতে বহু বিঘ্ন ঘটেছে। আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার সম্ভব নয়। তা একমাত্র হতে পারে কৃষকদের উদ্যোগেই। বর্তমান আইন আপাতদৃষ্টে ভাল হলেও এই নতুন আইনে জমির মালিকদের আদালতে যেতে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে, যাতে চাষীকে উচ্ছেদ করা যায়। বেনামী জমি উদ্ধার গণ-আন্দোলনেই সম্ভব, অন্য পথে নয়। বর্গাদারদের কিছু স্বীকৃতি দিলেও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন কথা নেই। বর্গাদার সার, সেচ, বীজ ও অন্যান্য বিষয়ে সমস্ত খরচ বহন করলে সে ফসলের তিন-চতুর্থাংশ পাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সচরাচর এ খরচ বর্গাদারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় এবং জমির মালিকও এ বাবদে কিছু বহন করবে না। ফলে চাষের ক্ষেত্রে প্রিমিটিভ টেকনিক এবং আধাআধি হারই বজায় থাকবে, যাতে উৎপাদন ব্যাহত হবে। সরকার বর্গাদারকে যে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন, তার পক্ষে সেই সাহায্য পাওয়া কার্যত অসম্ভব। সব মিলিয়ে বর্তমান ভূমি সংস্কার আইন দেখতে-শুনতে মন্দ না হলেও, তার ওপর খুব বেশি ভরসা করা যায় না, বরং আশঙ্কা আছে, যুক্তফ্রন্ট আমলে জমির ক্ষেত্রে যেটুকু অধিকার অর্জিত হয়েছে, তা বজায় থাকবে কিনা। ভাল ভাল কথার আড়ালে অপকর্ম করার সুযোগটা সচরাচর বেশিই থাকে।

কলকাতা উন্নয়ন

কলকাতা উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মাঝে আশার আলো দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই [illegible] যায়, সেটা নেহাতই আলেয়ার আলো, [illegible] ভরসা করা যায় না, কেন না, আমরা এ বিষয়ে বহুবার ঠকেছি। কলকাতা উন্নয়ন সম্পর্কে আবার একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন মহল থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে, বৃহত্তর কলকাতার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় দেড়শো কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া কলকাতা কর্পোরেশন এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটির বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহের অনুমতি পাবারও সম্ভাবনা আছে। এশিয়ার বৃহত্তম শহর হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার অবস্থা অতীব শোচনীয়। যেমন তার পরিবহণ সমস্যা, তেমনি রয়েছে তার জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ, গৃহ ও বাসস্থান, বস্তি উন্নয়ন ইত্যাদি বহুমুখী সমস্যা। এতগুলি সমস্যার ভারে কলকাতা ক্লিষ্ট। কলকাতা শহরে বাহিরাগত অজস্র মানুষ রুজি-রোজগারের আশায় আসে ও বসবাস করে, কিন্তু শহরের উন্নয়নের জন্য তাদের বিন্দুমাত্র অবদান নেই। জনৈক বিদেশী পর্যটকের কলকাতা সম্পর্কিত রচনায় এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রত্যহ প্রভাতেই কলকাতা শহর যাদের দেহনিঃসৃত আবর্জনায় ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে, কলকাতার প্রতি তাদের কোন কর্তব্যই নেই। পক্ষান্তরে বাংলার বাইরের যেসব ব্যবসায়ী কলকাতার জমিয়ে-গুছিয়ে বসে আছে কয়েক যুগ ধরে, কলকাতা উন্নয়নে তাদেরও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কলকাতার সমস্যা যে ভারতের জাতীয় সমস্যা, এ কথাটা কোন নেতাই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে চান না। কলকাতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত পরিকল্পনা বড় কম রচিত হয় নি। কলকাতা কর্পোরেশন, রাজ্য সরকার ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবারও কম করা হয় নি। কিন্তু সে আবেদন-নিবেদনে বাঞ্ছিত ফল যে পাওয়া যায় নি, সেকথা বলাই বাহুল্য। এমন কি, বিশ্বব্যাঙ্ক হতে কর্তাব্যক্তিরা পর্যন্ত এসে কলকাতা শহরের [illegible] উন্নয়নের সুপারিশ করে গেছেন, এ [illegible] অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন, কিন্তু [illegible] "অমৃত-সংকেত" পাওয়া যায় নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় কলকাতা উন্নয়নের খাতে ৪৩·৪৪ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু এ টাকা শহরের প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। কলকাতার সমস্যাটি সরেজমিনে তদন্ত ও পরীক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারী বি শিবরামনের নেতৃত্বে একটি টীম সম্প্রতি কলকাতা এসেছিলেন। এখন শোনা যাচ্ছে যে, বৃহত্তর কলকাতার জন্য প্রয়োজনীয় দেড়শো কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করবেন। এ ছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনও নাকি এর পর থেকে দিল্লী-বোম্বাই-এর মত চুঙ্গী আদায়ের অনুমতি পাচ্ছে, তা থেকেও কিছুটা অর্থাগম ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে! অবশ্য আমাদের বর্তমান যা অবস্থা এবং কলকাতা উন্নয়ন প্রসঙ্গে আমাদের বার বার এত বেশি মোহভঙ্গ হয়েছে যে, যতক্ষণ না এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাকাপাকি হচ্ছে, ততক্ষণ কোন প্রত্যাশা না রাখাই ভাল। না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

ইণ্ডিয়া টোবাকো কোম্পানী

গত ২২শে মে দি ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী এ এন হাকসার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, গত ষাট বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নাম বদলে সম্প্রতি "ইণ্ডিয়া টোবাকো কোম্পানী লিমিটেড" নাম রাখা হয়েছে। "ইণ্ডিয়া টোবাকো" নাম রাখার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বর্তমান জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঐ নামই যথার্থ সার্থক। তা ছাড়া বিগত বছরগুলিতে সারা ভারতের অর্থনীতিতে এই কোম্পানীর যে অবদান স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে "ইণ্ডিয়া টোবাকো" নাম অধিকতর ভাবগ্রাহী ও যুক্তিযুক্ত। নাম পরিবর্তনের বিষয় ছাড়াও চেয়ারম্যান কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব, শেয়ারে সাধারণ ভারতীয়দের অংশগ্রহণের কথা, পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible].

দাঙ্গা-হাঙ্গামা

গত ৭ই মে মহারাষ্ট্রের ভিভান্ডী (বোম্বাই শহর থেকে মাত্র ২৫ মাইল দূরে) এবং জলগাঁওয়ে (ভিভান্ডী থেকে আড়াই শ' মাইল দূরে) যে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল, গত সপ্তাহে তার অবসান হয়েছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই দুই জায়গায় দাঙ্গায় মোট ১৩০ জন নিহত হয়েছেন এবং আহতের সংখ্যা শত শত। বে-সরকারী হিসাব অনুযায়ী হতাহতের সংখ্যা আরও বেশি। ভিভান্ডী পাওয়ার লুম শিল্পের একটা মস্তবড় কেন্দ্র ছিল। সেখানকার পাঁচ হাজার পাওয়ার লুম কারখানার মধ্যে এক হাজার কারখানা দাঙ্গার আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। আর ভস্মীভূত হয়েছে ৩৫০টি কোঠাবাড়ি ও ৬১০টি কাঁচা বাড়ি। প্রায় ৩৫ হাজার নরনারী, শিশু গৃহহারা হয়ে সরকারী আশ্রয়-শিবিরে এসে উঠেছেন। শহরের পথ দিয়ে চলে গেলে মনে হবে যেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমা-বিধ্বস্ত কোন ইউরোপীয় শহরের মধ্য দিয়ে চলেছেন। চারিদিকে পোড়া কাঠ, বাঁকানো ইস্পাত আর ধূমায়মান ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়বে না। ১৭ই মে তারিখে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভিভান্ডী শহর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। দেখে শুনে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চিরকালের মত রোধ করবার উপায় অনুসন্ধানের জন্য ২৯শে মে তিনি মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছেন। গত কয়েক মাস একের পর এক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। পার্লামেণ্টের ১৫ জন কংগ্রেসী সদস্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য গভর্নমেণ্টকে একটা নতুন দপ্তর খোলবার পরামর্শ দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক উস্কানীদাতাদের আটকে রাখবার জন্য একটা নতুন আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও করা হয়েছে। তাঁরা আরও বলেছেন যে, আর এস এস-এর মত সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা করা হোক।

ভিভান্ডী এবং জলগাঁওয়ের দাঙ্গা সম্পর্কে যেসব নতুন তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় অধিবাসীরা অনেকদিন আগে থেকেই সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, দুর্বৃত্তরা দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। ভিভান্ডীর অধিবাসীরা সকলেই জানতেন যে, বিভিন্ন মহাল্লায় প্রচুর বোমা, এসিড বাল্ব এবং মলোটভ ককটেল মজুত করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন নি। শিবাজী জয়ন্তীর শোভাযাত্রাকে উপলক্ষ করে সেখানে যখন দাঙ্গা বাধল, তখন দেখা গেল স্থানীয় পুলিশ সেই হাঙ্গামা দমন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। শোনা যাচ্ছে, এই দাঙ্গার পেছনে আন্তর্মহাদেশীয় চোরাকারবারী-দের হাত আছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র-পথে যেসব চোরাই মাল আমদানী হয়, তা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভিভান্ডীর পথে। সেখানে নাকি এই ধরনের চোরাই মাল (সোনা, ঘড়ি, নাইলন ইত্যাদি) প্রচুর পরিমাণে (মূল্য ৩০০ কোটি টাকা) জমে গিয়েছিল। পুলিশের কড়াকড়ির জন্য সেই মাল দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো যাচ্ছিল না। দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা সর্বব্যাপী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সেই তিনশ' কোটি টাকার মাল নাকি দেশের অভ্যন্তরে চালান করে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি নাকি এই ধরনের কিছু মাল চালান যাবার সময় রাস্তায় ধরা পড়েছে। এ কাহিনী অসার বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দাঙ্গার অপর কারণ নাকি স্থানীয় বণিকদের রেষারেষি। আগে ভিভান্ডীর পাওয়ার লুমগুলো ছিল মুসলমান তন্তজীবীদের। ইদানীং তেলেগু তন্তু-জীবীরা সেখানে এসে ভিড় করেছেন এবং তাঁদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই দুই সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক রেষারেষি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ গ্রহণ করে। কারণ, এই দাঙ্গায় হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা সকলেই নাকি তেলেগু-ভাষী। ১৯৬১ সালের লোক গণনায় ভিভান্ডীতে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৬০ শতাংশ। বর্তমানে সেটা ৫০ শতাংশে নেমে গেছে।

দাঙ্গা যে কারণেই বাধুক, এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একবার শুরু হলে পুলিশের পক্ষে সেটা দমন করা সম্ভব হয় না। আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরোধের ব্যাপারে পুলিশের কোন উৎসাহই পরিলক্ষিত হয় না। নইলে আগে থাকতে সতর্কবাণী পাওয়া সত্ত্বেও তারা তৈরি হয়ে থাকে নি কেন? দেশের সমস্ত পুলিশবাহিনী নতুন করে ঢেলে না সাজালে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সহজ হবে বলে মনে হয় না। সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতার বীজ বপনকারী ব্যক্তি এবং সংগঠনের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণের জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করলে এই পাপের হাত থেকে হয়ত আমরা নিষ্কৃতি পেতে পারি।

পট্টনায়ক-নীলমণি উপাখ্যান

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং কমিটির কর্মকর্তাদের সাসপেন্ড করেছেন। উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক, উৎকল কংগ্রেসের সভাপতি নীলমণি রাউথরায় এবং সেক্রেটারী প্রতাপচন্দ্র মোহান্তির প্রাথমিক সদস্যপদ (কংগ্রেসের) কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হাই কমান্ডের নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করার অপরাধে তাঁরা এই শাস্তিলাভ করেছেন। গত বছর কংগ্রেস দল যখন দু' ভাগ হল, তখন উৎকল কংগ্রেস কমিটি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন। দীর্ঘকাল তাঁরা কোন পক্ষেই যোগ দেন নি। পরে তাঁরা ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসে ভিড়ে পড়েন। রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের সময় বিজু পট্টনায়ক কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে সেই মনোনয়ন বাতিল করে অপর একজনকে মনোনীত করা হয়। তিনি নির্বাচনে হেরে যান। যাই হোক, সেই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে পট্টনায়ক-প্রভাবিত উৎকল কংগ্রেসের সঙ্গে হাই কমান্ডের মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং দুই পক্ষের দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে পট্টনায়ক গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন।

এই ঘটনার পর পট্টনায়ক বলেন "যাক, বাবা, বাঁচা গেল। হাই কমাণ্ডের মোড়লীর হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম। এখন আমি স্বাধীনভাবে আমার দেশের মানুষের সেবা করতে পারব।"

পট্টনায়ক সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের (ইন্দিরাপন্থী) আনুগত্য ত্যাগ করেছে। তারা পৃথক রাজ্য-পার্টি হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবে। নতুন পার্টির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম স্থির করবার জন্য ৭ জনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি অবিলম্বেই একটা পার্লামেণ্টারী বোর্ড তৈরি করছেন। এই বছরের মধ্যেই তাঁরা আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই করে ফেলবেন। অর্থাৎ অতঃপর বাংলা কংগ্রেসের মত উড়িষ্যায় একটি উৎকল কংগ্রেস গঠিত হবে।

জগজীবন রাম রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা বিনায়ক আচার্যের ওপর নতুন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির, ভার দিয়েছেন।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা

গত ১৮ই মে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় কাগজপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪,৮৮২ কোটি টাকা। তার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্যয় হবে ১৫,৯০২ কোটি টাকা, আর বে-সরকারী ক্ষেত্রে ৮৯৮০ কোটি টাকা। বৈষয়িক অগ্রগতির লক্ষ্য ধার্য হয়েছে সাড়ে ৫ শতাংশ। হিসেবে ধরা হয়েছে কৃষি উৎপাদন বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ১০ থেকে ১২ শতাংশ হারে।

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীতে কয়েক সপ্তাহ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সেই খসড়াই চূড়ান্ত আকারে পার্লামেণ্টে এসেছে। কাজেই এ নিয়ে নতুন করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, চতুর্থ পরিকল্পনা-শেষে ভারতে বেকার ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা দাঁড়াবে এক লক্ষ। ইনস্টিটিউট অব এপ্লায়েড ম্যান পাওয়ার রিসার্চ গবেষণা করে এই রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সাড়ে ৫ শতাংশ হারেই বৈষয়িক অগ্রগতি হবে ধরে নিয়ে এই গবেষণা চালানো হয়েছে। এঁরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ১৯৬৮ সালের শেষে দেশে বেকার ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার ৭ শত। তার মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন গ্রাজুয়েট এবং ৪৬,৭০০ ডিপ্লোমা হোল্ডার। ১৯৬৫ সালের অর্থনৈতিক মন্দা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিই ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে।

পরিকল্পনার শেষে বেকার ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা যখন এক লক্ষ হবে, তখন দক্ষ এবং অদক্ষ অন্যান্য বেকারের সংখ্যাটা যে কি দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই পরিকল্পনার চেহারা দেখে খুব একটা উৎসাহবোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

রপ্তানির লক্ষ্য পূরণ হয় নি

১৯৬৯-৭০ সালে ভারত মোট ১৪১০ কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানি করেছে। গত বছরের (১৯৬৮-৬৯) তুলনায় এটা ৫৭ কোটি টাকা বেশি। অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩·৮৫ শত পরিকল্পনায় রপ্তানি বৃদ্ধির হার ধার্য হয়েছিল বার্ষিক ৭ শতাংশ। ১৯৬৭-৬৮ সালের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে রপ্তানি ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি (রেকর্ড) পেয়েছিল। কাজেই দুই বছরের রপ্তানির হিসাব একসঙ্গে জুড়লে রপ্তানি বৃদ্ধির গড় মোটামুটি ৭ শতাংশই আছে।

১৯৬৯-৭০ সালে ভারত বিদেশ থেকে মোট ১৫৬৯ কোটি টাকার মালপত্র আমদানি করেছে। সুতরাং আমদানি-রপ্তানির যোগ-বিয়োগে দেখা যাচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমাদের ১৫৯ কোটি টাকার ঘাটতি যাচ্ছে। গত বছর এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫৫৩ কোটি টাকা। কাজেই ঘাটতির পরিমাণ এবার সত্যিই বেশ হ্রাস পেয়েছে।

এবার আন্তর্জাতিক বাজারে চা এবং পাটের দাম কমে না গেলে রপ্তানি খাতে আমাদের টাকার পরিমাণ অনেক বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালের সমপরিমাণ চা ও পাট রপ্তানি করে আমরা তুলনায় অনেক কম দাম পেয়েছি। তাই সেই খাতে আমাদের আয়ের অঙ্ক কমে গেছে।

—২৩।৫।৭০

মাও সে-তুং-সিহানুক সাক্ষাৎকার

কম্বোডিয়া :

কম্বোডিয়ার বিতাড়িত রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সমর্থনে মাও সে-তুং এক জোরালো বিবৃতি দিয়েছেন। মাও সে-তুং সাধারণত কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দেন না। কিন্তু সিহানুক ও তাঁর প্রবাসী সরকারকে সমর্থন করে তিনি বিবৃতি দিয়েছেন।

মাও সে-তুং আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, কম্বোডিয়া তথা ইন্দোচীনের সংঘর্ষ থেকে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

কম্বোডিয়ার মানুষকে দীর্ঘ কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়ে মাও সে-তুং বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার অনুচরেরা অবশ্যই পরাজিত হবে। দুর্বল ও ক্ষুদ্র জাতি শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী ও বড় জাতিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়, যদি তারা সংগ্রামে অটল থাকে এবং অস্ত্র ধারণ করে। এই হল ইতিহাসের শিক্ষা।

কম্বোডিয়ার মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েত-নাম সৈন্য এবং লন নল গোষ্ঠীর সৈন্যদের মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সিহানুকপন্থী এবং উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্য ও ভিয়েত-কং গেরিলারা জোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও বিভিন্ন শহর পতনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

এদিকে কম্বোডিয়ার প্রশ্ন আলো-চনার জন্য জাকার্তায় ১১টি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে যে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন শুরু হয়ে-ছিল, তা শেষ হয়েছে। জাকার্তা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। কম্বোডিয়া পর্যবেক্ষকরূপে সম্মেলনে উপস্থিত ছিল।

সম্মেলনে যোগদানকারী প্রায় সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক ও অনুগ্রহ-পুষ্ট, তবু কম্বোডিয়ায় মার্কিন সরকার এমন অন্যায় করেছে যে, এদের পক্ষেও মার্কিনী কার্যকে সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। কথা ছিল, কম্বোডিয়া (লন নল) পূর্ণ প্রতিনিধিরূপে সম্মেলনে যোগ দেবে কিন্তু শেষে পর্যবেক্ষকের বেশি মর্যাদা তারা পায় নি।

জাকার্তা সম্মেলনশেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে কম্বোডিয়া থেকে সকল বিদেশী সৈন্যের অপসারণ দাবি করা হয়েছে। কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা, আঞ্চলিক সংহতি ও সার্ব-ভৌমত্ব রক্ষার জন্য সকলের নিকট আহ্বান জানানো হয়েছে। ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনে যারা যোগ দিয়েছিল, তাদের সবাইকে নিয়ে কম্বোডিয়ার ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকার জন্য জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। তা ছাড়া, ভারতকে সভাপতি এবং কানাডা ও পোল্যান্ডকে সদস্য করে যে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়েছে এবং ইতিপূর্বে যারা কম্বোডিয়ায় কাজ করেছে, অবিলম্বে তাদের কম্বোডিয়ায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

কম্বোডিয়ার ব্যাপার নিয়ে বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে সম্মেলন থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বৃটেন :

১৮ই জুন বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হবে।

অনেকদিন ধরেই নির্বাচনের কথা শোনা যাচ্ছিল। তবু এই অতর্কিত ঘোষণায় অনেকে বিস্মিত হয়েছেন। সম্প্রতি কয়েকটি 'জনমত নির্ণায়ক ভোট' (ওপিনিয়ন পোল) শ্রমিক দলের জয়-লাভের সম্ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে বলেই প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন, এমন কথা বলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচনের সময় ঠিক করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই দেখতে হবে, সময়টা তাঁর দলের জয়ের পক্ষে অনুকূল কিনা, কিন্তু তাই বলে কেবলমাত্র কয়েকটি 'ওপিনিয়ন পোলের' দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উইলসন তারিখ স্থির করেছেন বললে ভুল করা হবে।

উইলসন নিজেই বলেছেন, নির্বাচন তাড়াতাড়ি হওয়া প্রয়োজন। কারণ, নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুটি বড় কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। একটি হল বৃটেনের কমন মার্কেটে প্রবেশ। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কমন মার্কেটের বৈঠক বসবে বৃটেনের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্য। দ্বিতীয় বিষয় হল, উত্তর আয়ার্লাণ্ড বা আলস্টার। এখানে দীর্ঘদিন হল সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্টান্টদের বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। নির্বাচনে জনসাধারণের মত বুঝে নিয়ে নতুন সরকারের পক্ষে এই সব প্রশ্নে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

সরকারী দল শ্রমিক দল ও বিরোধী পক্ষ রক্ষণশীল দল, উভয়েই জয়লাভের ব্যাপারে আশান্বিত। বিরোধী দলের নেতা এডওয়ার্ড হিথ বলেছেন তাঁরা জয়লাভ করবেন—শ্রমিক দল পরাজিত হবে।

যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে অবশ্য মনে হয়, শ্রমিক দলের জয়লাভের সম্ভাবনাই বেশি। নির্বাচন-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শ্রমিক দল অন্তত ৬০টি আসন বেশি পাবে।

শ্রমিক দল গত ছ' বছর ধরে একটানা ব্রিটেনের শাসন-কর্তৃত্বে রয়েছে। গত দুটি সাধারণ নির্বাচনে উইলসন জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এবারও যদি তিনি জয়ী হন, তবে তিনি পর পর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। এই শতাব্দীতে বৃটেনে এটা একটা রেকর্ড হবে।

১৮ই জুন তারিখটি ইতিহাসবিখ্যাত—এই দিন ওয়াটার্লুর যুদ্ধজয় হয়েছিল, নেপোলিয়ন পরাজিত হয়েছিলেন।

*　　*　　*

শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলের প্রস্তাবিত খেলা বন্ধ হয়েছে। ২২শে মে লণ্ডনে ক্রিকেট কাউন্সিলের সভায় আমন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কেবল শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত ক্রিকেট দলের খেলার বিরুদ্ধে ব্রিটেনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে বিভিন্ন সদস্য এর বিরুদ্ধে বলেছেন। সংবাদপত্রে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। রক্ষণশীল দলেরও একাংশ এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী উইলসন সহ মন্ত্রিসভার সকলে এই ক্রিকেট দলের সফর বন্ধ করার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। উইলসন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, এর দ্বারা বর্ণবৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। তবে ক্রিকেট কাউন্সিলের স্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনা করে সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইছিলেন না।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত সরকারকে উদ্যোগী হতে হল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস কালাহান ক্রিকেট কাউন্সিলের কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন খেলা বন্ধ করার জন্য। সরকারের এই অনুরোধ বা চাপ অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না ক্রিকেট কাউন্সিলের পক্ষে। তাঁরা খেলা বন্ধ করে দিলেন।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করছেন, এটা তাঁদের এক উল্লেখযোগ্য জয়।

রাষ্ট্রসংঘ ঃ

নিরাপত্তা পরিষদ ১১—০ ভোটে আবার ইজরায়েলের আক্রমণাত্মক কার্যের নিন্দা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলাম্বিয়া, নিকারাগুয়া ও সিয়েরা লিয়ন ভোটদানে বিরত ছিল।

১৯শে মে নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করে লেবাননের ওপর ইজরায়েলের বোমাবর্ষণের নিন্দা করেছে এবং এই বলে ইজরায়েলকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, আবার যদি আক্রমণ হয়, তাহলে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এমন কি অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধও করা হবে।

আরবরা আরও কঠোর প্রস্তাব এনেছিল। তাদের দাবি ছিল ঃ এখনই আক্রমণকারী ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়া হোক এবং প্রয়োজনমত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাম্বিয়ার আপোষ প্রস্তাব অনুযায়ী কেবলমাত্র নিন্দা ও ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এতেও আপত্তি। নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার্লস ইয়স্ট বলেছেন, এ নিতান্তই একপেশে প্রস্তাব হয়েছে। লেবানন যে-সব অন্যায় কাজ করেছে, তার কোন উল্লেখ এই প্রস্তাবে নেই। আরবদের আক্রমণাত্মক কাজে সাহায্য করার জন্য ইয়স্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের তীব্র সমালোচনা করেন।

উইলসন

সোভিয়েট দূত জ্যাকব মালিক আবার পাল্টা অভিযোগ করে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের জোরেই ইজরায়েল এভাবে তার আক্রমণাত্মক নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘকে একেবারেই গ্রাহ্য করছে না।

ইজরায়েলের দূত জোশেফ তেকোয়া দম্ভভরে আবার বলেছেন, এই প্রস্তাব তাঁরা মানেন না। তিনি হুমকীও দিয়েছেন, যদি কোন আক্রমণের চেষ্টা হয়, তবে তাঁরা পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত আছেন।

জার্মানী ঃ

দুই জার্মানীর মধ্যে আপোষের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা কি আবার পিছিয়ে গেল?

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যাণ্ডট ও পূর্ব জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী উইলি স্টফের মধ্যে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন হল পশ্চিম জার্মানীর কাসেল্স শহরে, ২১শে মে।

১৯শে মার্চ তারিখে পূর্ব জার্মানীর এরফুর্টে এই দু'জনের মধ্যে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের পর দুই 'দেশে'র মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল।

উইলি ব্র্যাণ্ডট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের আশা নিয়েই কাসেল সম্মেলনে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। তিনি মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বিশ-দফা পরিকল্পনায় অনেক কথাই বলেছেন।

উইলি ব্র্যাণ্ডট জানেন, পূর্ব জার্মানী পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি চায়। কিন্তু দুই জার্মানীকে পৃথক দেশ, পৃথক রাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে পশ্চিম জার্মানী এখনও প্রস্তুত নয়। স্বীকৃতি ছাড়া আর যা সম্ভব তা তাঁরা করতে প্রস্তুত আছেন।

ব্র্যাণ্ডট উভয় জার্মানীর মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করেছেন। কেউ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না, জার্মানী ভবিষ্যতে কখনও কোন যুদ্ধে যোগ দেবে না, নিরস্ত্রীকরণ মেনে চলা হবে, সর্বক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে—এই সব থাকবে এই চুক্তিতে। তা ছাড়া দুই জার্মানীর রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হবার প্রস্তাবেও ব্র্যাণ্ডট সম্মত আছেন।

কিন্তু পূর্ব জার্মানী এতে রাজী নয়। পৃথক রাষ্ট্ররূপে পূর্ব জার্মানীকে স্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁরা অন্য কোন ব্যাপারে আলোচনা করবেন না।

বলতে গেলে, কোন মতৈক্যে না পৌঁছেই এবারের শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। তৃতীয় কোন শীর্ষ সম্মেলন ভবিষ্যতে হবে কি না, সে সম্পর্কেও কোন সিদ্ধান্ত হয় নি।

কাসেলে যে হোটেলে সম্মেলন হচ্ছিল, সেখানে পশ্চিম জার্মানীর একদল বিক্ষোভকারী পূর্ব জার্মানীর পতাকা ছিঁড়েছে, পূর্ব জার্মান সরকার ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে কটূক্তি বর্ষণ করেছে। পুলিশ এসে পড়ার আগেই তারা এ সব করে।

পূর্ব জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী স্টফ এতে খুব চটেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিম জার্মানীর সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন নি। ক' মাস আগে এরফুর্টে যখন ব্র্যাণ্ডট গিয়েছিলেন, কই, তখন তো সেখানে এ জিনিস হয় নি!

(২৮-৫-৭০)

অবশেষে অষ্ট বাম ফ্রন্টও রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট পুনরুজ্জীবনের আশা ছেড়ে দিল। অষ্ট বাম ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু এখন আর পুনরুজ্জীবনের আশা-ভরসা না দেখে আট বাম ফ্রন্টও চাইছেন মধ্যবর্তী নির্বাচন। মধ্যবর্তী নির্বাচন চাওয়াটা কোন বড় কথা নয়। বড় কথা হল যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ চোদ্দ পার্টির যুক্তফ্রন্ট আবার বেঁচে উঠুক—তার জন্য যে মন্দ ও ক্ষীণ তৎপরতা ছিল, সেই ক্ষীণ তৎপরতার প্রদীপটাও নিভে গেল। রাজনীতিতে দল বা ফ্রন্ট ভাঙলে সব সময়ই একটা মধ্যপন্থী দল গড়ে ওঠে। এই মধ্যপন্থীরা যাত্রা সুরু করে ভাঙা-ঘর জোড়া লাগাতে। বেশ কিছুদিন মধ্যপন্থীদের তৎপরতা থাকে, তার পর মধ্যপন্থীরা ভাঙাঘরের দুই তরফে ভাগ হয়ে যান। কম্যুনিস্ট পার্টি যখন ১৯৬৪ সালে ভাঙলো, তখন একটা সেন্ট্রিস্ট দল তৈরি হল। সেই দিন সেন্ট্রিস্ট দলে ছিলেন শ্রীঅধীর চক্রবর্তী শ্রীহেমন্ত ঘোষাল, শ্রীনির্মাল্য বাগচী, শ্রীখগেন রায়-চৌধুরী, শ্রীরণধীর দাশগুপ্ত, শ্রীগোপাল আচার্য, শ্রীচণ্ডী মুখার্জী প্রমুখ। এই সেন্ট্রিস্ট দল অনেক সভা করলেন, সম্মেলন করলেন, মুখপত্র বের করলেন। বেশ কিছুকাল ধরে এরা বলে চললেন—দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মিলন চাই, শ্রীডাঙ্গে-শ্রীনম্বুদ্রিপাদের মিলন চাই। কিন্তু সময় যেতে দেখা গেল, শ্রীনির্মাল্য বাগচী, শ্রীখগেন রায়চৌধুরী, শ্রীচণ্ডী মুখার্জী চলে গেলেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে। আর শ্রীগোপাল আচার্য, শ্রীহেমন্ত ঘোষাল ও শ্রীঅধীর চক্রবর্তী প্রমুখ চলে গেলেন বাম কম্যুনিস্ট দলে। কংগ্রেস যখন ভাঙলো, তখনও একটা ভাঙা কংগ্রেসের মিলনপন্থী দল তৈরি হল। শ্রীনরেন সেন, শ্রীদেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনেপাল রায় প্রমুখ এই মধ্যপন্থী দলে ছিলেন। এঁরা ভারত সভা ভবনে একটা সম্মেলনও করেছিলেন, শ্রীঅতুল্য [illegible]

এঁরা সকলেই কেউ নব, কেউ আদিতে চলে গেছেন।

রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট ভাঙবার পরও একই দৃশ্যের অবতারণা হল। একদিকে সি-পি-আই-এম, অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেস—দুই বিবদমান শিবির সৃষ্টি হল। সি-পি-আই-এম শিবিরে অন্তরের যোগে যোগদান করলেন মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-সি-পি-আই, ওয়ার্কার্স পার্টি। কোন লিখিত-পড়িত চুক্তিতে নয়, নিতান্তই অন্তরের টানে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্যোতি বসুর পাশে এসে দাঁড়ালেন শ্রীসুধীন কুমার, শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য। আবার বাংলা কংগ্রেস কোন শিবির গড়ে তুললো না। কিন্তু শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীসুশীল ধাড়ার পাশে এসে দাঁড়ালেন শ্রীবিদ্যুৎ বসু, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র। এঁরাও কোন দলগত চুক্তি বা শর্তে শ্রীঅজয় মুখার্জীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, এমন নয়; নিতান্তই অন্তরের টানে এঁরা বাংলা কংগ্রেসের পাশে এসে ঠাঁই নিলেন। দুই শিবিরের কোনপক্ষে যোগদান না করে সি-পি-আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস-ইউ-সি সৃষ্টি করলো মধ্যপন্থী শিবিরের—যার নাম হল আট পার্টির ফ্রন্ট।

আট পার্টির ফ্রন্ট যখন ময়দানে নামলো তখন তাদের একমাত্র ধ্বনি হল—যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবন চাই, অজয়-জ্যোতির মিলন চাই। দিন যত গেল, এই ধ্বনি তত অসার হয়ে উঠলো। আট পার্টি অজয়বাবুর সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিল কিনা সেই কথা যদি না তোলা হয়, তবে মুখে তাঁরা অন্তত সকলে বলেছেন, যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবন চাই। এই পুনরুজ্জীবনের একটা শর্তও আরোপ করা হয়েছিল। সেটা হল সি-পি-এম-কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়তে হবে, যদিও এই অযৌক্তিক দাবি সি-পি-এম-এর মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে বড় দল—তারা মুখ্যমন্ত্রিত্ব পাবে না স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দেবে, তবে কি নিয়ে মন্ত্রি-

শিক্ষাদপ্তরে অনাচার, শিক্ষাদপ্তর ছাড়ো। শ্রমদপ্তরে ব্যর্থতা, অতএব শ্রমদপ্তর ছাড়ো। এই অবস্থায় সি-পি-এম কি শুধু অসামরিক প্রতিরক্ষা, আবগারী দপ্তর নিয়ে খুশি হত? কিন্তু আসলে দপ্তর বিচার করলে সি-পি-এম-কে বিশ্বাস করে কেউ বোধ হয় এই সব ছোট দপ্তর ছাড়া অন্য দপ্তর দিতেই রাজী হত না। কিন্তু যে কথা সি-পি-এম-কে বলা হয়েছে, সেই কথা যদি সি-পি-আই-কে বলা হত—তোমরা সেচ দপ্তর ছেড়ে দাও, ফরোয়ার্ড ব্লককে বলা হত কৃষি-দপ্তর ছেড়ে দাও, তবে তার জবাব সি-পি-এম-এর অপেক্ষা কড়া বই নরম হত না। ব্যর্থতার কথা দলীয় স্বার্থে প্রশাসন পরিচালনার কথা সি-পি-এম সম্পর্কে ওঠে, কিন্তু অন্য সব পার্টির মন্ত্রীরা কি ধোয়া তুলসী পাতা? মন্ত্রিত্ব থাকা কালে তো দূরের কথা, এখনও এই রাষ্ট্রপতি শাসনেও অনেক মন্ত্রী সময়-সুযোগমত তাঁর প্রাক্তন দপ্তরের কর্মচারীদের ওপর কাজ চাপিয়ে দিয়ে যান। সরকারী গাড়ির ড্রাইভার নিয়ে রাতবেরাত ঘরে সরকারী তেল পোড়ানোর রেকর্ডই হোক, অথবা টেলিফোনে দিল্লি-দিল্লী কথা বলাই হোক, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার কে কম করেছেন?

কিন্তু মূল কথা সেইখানে নয়, এই স্বরাষ্ট্রদপ্তর, শ্রমদপ্তর, শিক্ষাদপ্তর, কৃষি-দপ্তর, সেচদপ্তর—সকলেরই কাজ মানিয়ে যেত, যদি সকলের সঙ্গে সকলের সমঝোতা থাকতো। এর মধ্যেও যদি টিম স্পিরিট থাকতো, তবে কিছুই অসম্ভব হত না। এর প্রধান কারণ হল—গুণগত যোগ্যতায় যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের মত মন্ত্রী অতীতে পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই, ভারত-বর্ষে অদ্বিতীয় বলা যায়। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মত মানিয়ে চলার মত মুখ্যমন্ত্রী সহজে পাওয়া যায় না। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যতদিন মানিয়ে চলেছেন, ততদিন সর্বংসহ হয়ে মানিয়ে চলেছেন। যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, তখন অবশ্য আর কোন লাগাম থাকে নি। একই-ভাবে জ্যোতিবাবু, বিশ্বনাথবাবু, সুবোধ-বাবু, সোমনাথবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু, কানাই-বাবু, ননীবাবু—এঁদের মত মন্ত্রী হবার যোগ্য ব্যক্তি বাংলাদেশে আর কটা আছে? বিপথগামী বা খারাপ হওয়া নিয়ে কথা নয়, ওরা ভাল থাকলে কি করতে পারতেন, সেটাই কথা।

যাহোক আট পার্টি যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবন চেয়ে কিন্তু সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হল যুক্তফ্রন্টেরই বড় শরিক সি-পি-আই-এম-এর কাছে। আট পার্টির ফ্রন্টের উদ্দেশ্যে সি-পি-আই-এম নেতৃবৃন্দ এমন কোন ভাষা নেই, যা প্রয়োগ করেন

কথা হল আট পার্টির ফ্রন্ট হল মাকড়সা। মাকড়সা নিজের জালে নিজে জড়ায়—নিজেই নিজের জালে জড়িয়ে মরে। সত্যি কথা বলতে কথাটা তখন খুব বেমানান হয় নি এই কারণে—অনেকের মনে হয়েছিল ১৪ পার্টির ফ্রন্ট চলে যাবার পর সেইখানে আট পার্টির ফ্রন্ট। এ ছাড়া তখন ভেবেছিলাম, প্রমোদবাবু বুঝি ১৪ পার্টির ফ্রন্টের প্রতি দরদে আট পার্টির ফ্রন্টকে মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও চিরকালের মত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে সি-পি এম ছয় পার্টির ফ্রন্ট করে দয় মজালেন। সি-পি-এম নিজের শক্তিতে আট পার্টির চেয়ে কিছু কম জোরের নয়। সি-পি-এম একাই নিজের পথে চলে আট পার্টির ফ্রন্ট কেন, ১৩ পার্টির ফ্রন্ট হলেও তাকে মোকাবেলা করতে পারে। জিততে না পারুক, একেবারে গো-হারা হারতো না। কিন্তু গত ২১শে মে ছয় পার্টির নামে যে ফ্রন্ট, সি-পি এম-এর নেতৃত্বে গঠিত হল, সেটা কি হল? আট পার্টির ফ্রন্ট যদি মাকড়সা হয়—ছয় পার্টির ফ্রন্ট তবে তো উকুন। মাকড়সার আট পা কিন্তু উকুনের যে ছয় পা। মাকড়সা ভাল, না উকুন ভাল সেই কথা বলতে চাই না। মাকড়সা বেশি ক্ষতি করে, না উকুন বেশি ক্ষতি করে সেটা শ্রীদাশগুপ্ত নিজেই ভেবে দেখবেন। বিশেষ করে উকুনের ভয় তো ছয় পার্টির নেতাদেরই বেশি করা উচিত। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মাথায় যেরকম ঘন গোছের চুল—মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক দলের শ্রদ্ধেয় নেতা অমরদার মত চুল ও দাড়ি, বাংলা দেশে একমাত্র রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কার আছে? শ্রীসুধীন কুমার বা শ্রীনেপাল ভট্টাচার্য কারো মাথায় চুল কম নয়। শ্রীসুকুমার রায়ের মাথায় চুল একটু কম হতে পারে, কিন্তু শ্রীঅসিত চৌধুরী সম্প্রতি মাথা কামিয়ে ফেলবার পর যে রকম বাহারের চুলের মালিক হয়েছেন, তাঁদের পক্ষেই তো উকুনের ভয় বেশি—অবশ্য উকুনের ভয় আরো দুইজনের আছে। তাঁরা হলেন ডঃ রণেন সেন ও শ্রীসুশীল ধাড়া। চেহারায় বয়সকে শুধু শ্রীধাড়া ও ডাঃ সেন জয় করেছেন তাই নয়। [illegible] মাথার চুলকেও স্পর্শ করতে পারে নি। শ্রীসুশীল ধাড়ার বয়স ষাট হয়ে গেছে—এই কথা চেহারা দেখে কে মনে করতে পারেন। আর কে মনে করতে পারেন এই ডাঃ রণেন সেন চীনে মেডিক্যাল মিশনের সদস্য হিসাবে ডাঃ কোটনিস, ডাঃ অটলের সংগী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন! কিন্তু উকুনের ভয় নেই শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের, কারণ টাকের ওপর উকুন এক মুহূর্তে টিকতে পারবে না। যা হোক, মে মাসে এই তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্য-রাজনীতিতে উকুন ও মাকড়সার রাজনীতি সুরু হল। উকুন মাকড়সাকে অতিষ্ঠ করবে, না মাকড়সা উকুনকে জালে ধরবে—সেটা আগামী দিনে ধরা পড়বে। তবে এত দিনে দুই পক্ষেরই স্বরূপ প্রকাশের সময় এসে যাচ্ছে আট পার্টির ফ্রন্টও আর শুধু পুনরুজ্জীবনের কথা বলে নিজেদের সীমিত রাখতে পারবে না, আর সি-পি-এমও আট পার্টিকে গালি দিয়ে নিজের দায়িত্ব শেষ করতে পারবে না।

—২২শে মে '৭০

বলবর্ধক !—

॥ আঠারো ॥
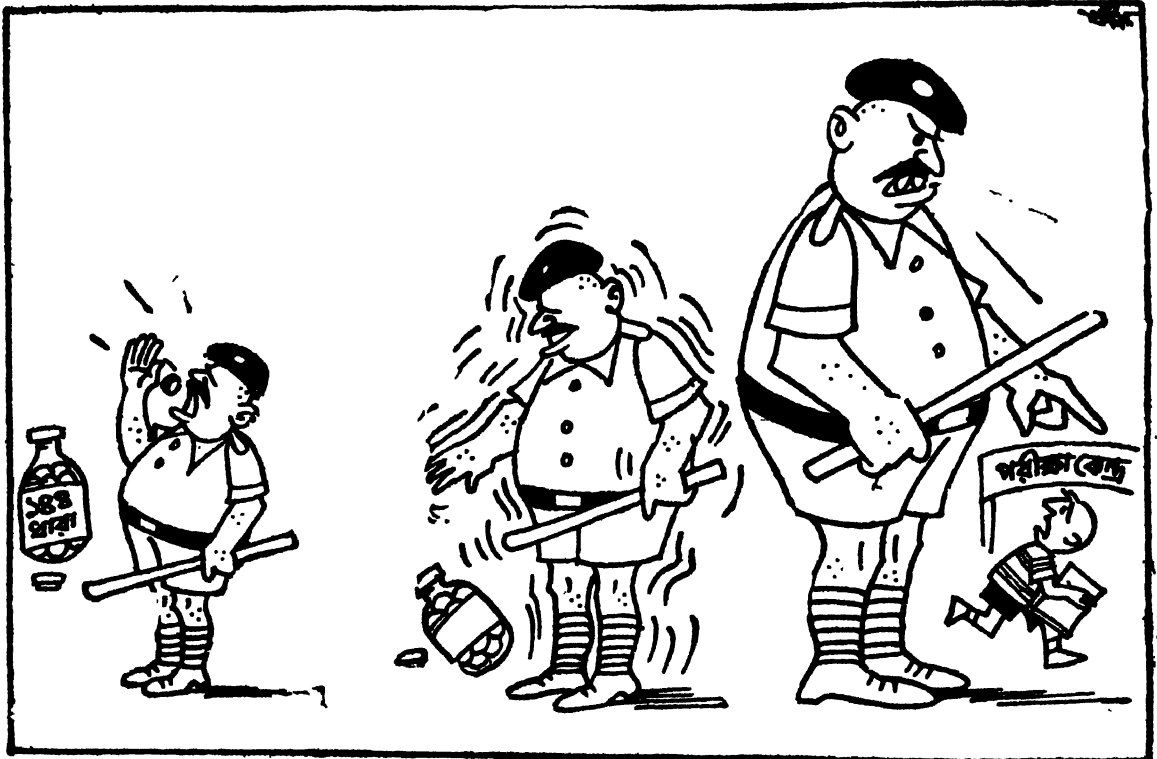
টুনটুনি যেমনভাবে এসেছিল ঠিক তেমনিভাবেই চলে গেল। ওস্তাদ বললেন, 'আসুক বসন্ত পাইপগান নিয়ে, আমি গিয়ে দাঁড়াচ্ছি সামনে।' তারপর তিনি সোজা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেইখানে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম আসন্ন একটা খুনোখুনির কথা। ওস্তাদকে দেখে মনে হল তিনি আদৌ বিচলিত নন। কিন্তু শঙ্করের মুখে-চোখে দেখলাম কেমন যেন একটা ভয়ের ছায়া। বসন্তকে ও জানে। বসন্ত পারে না এমন কোন কাজ নেই। হয়তো সেইজন্যেই ওর ভয়।

বসন্ত ততক্ষণে ছুটে এসেছে সিঁড়ির কাছে। হাতে তার গুলী চালাবার ভঙ্গীতে পাইপগান। ওস্তাদ ওপর থেকে হেঁকে উঠলেন, 'ব-স-ন্ত!'

সিঁড়ির নিচে থেকেই সে বলে উঠল, 'সরে যাও তুমি দরজার কাছে থেকে—'

'কিন্তু তুমি কাকে খুন করতে আসছো?'

'কেন, তোমার পেয়ারের শঙ্করকে', বসন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'তো-মা-র ছো-ট ও-স্তা-দ-কে!'

'ও তোমার কি করেছে বসন্ত?'

'সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দিতে প্রস্তুত নই', বলে বসন্ত দু-তিনটে সিঁড়ির ধাপ প্রায় লাফ দিয়েই উঠে পড়ল। ওস্তাদ দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, 'বটে!'

'বটে আবার কি', বসন্ত আরও উঠে এসে বললে, 'ছেড়ে দাও তুমি আমার পথ—'

ওস্তাদ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'তোমায় পথ ছেড়ে দেবো বলে আমি এখানে দাঁড়াইনি বসন্ত!'

'পথ তুমি ছাড়বে না?'

'না।'

'তাহলে তোমাকে বাধ্য করব আমি পথ ছেড়ে দিতে!'

'এতবড় কথা?'

'হ্যাঁ—এতবড় কথা। তুমি জানো না শঙ্কর আমার কি করেছে!'

'কি করেছে শঙ্কর?'

'সারাটা জীবন দলের কোন লোক যে বসন্তকুমারকে কখনো একটা ছোট কথা বলতে সাহস করেনি সে-ই তাকে তোমার শঙ্কর অপমান করেছে, জঘন্যভাবে অপমান করেছে', পাইপগানটা ডান হাতের বগলে ডান হাত দিয়েই চেপে ধরে বসন্ত বাঁ হাতটা যুগপৎ প্রসারিত করে ও প্রবলবেগে নেড়ে বললে, 'সে অপমানের প্রতিশোধ

আমাকে নিতেই হবে। আমার জীবনে কোন বেইমানকে কখনো ছেড়ে দিই নি!'

এবার শঙ্কর ফুঁসে উঠে বললে, 'বেইমান তুমি কাকে বলছ? তোমার নিজের গলতিতে তুমি অপমানিত হয়েছ, তার আমি কি করব?'

'আমার নিজের গলতিতে?'

'হ্যাঁ, তোমার নিজের গলতিতে।'

'শঙ্কর!' চিৎকার করে উঠল বসন্ত।

'একটা ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েকে তুমি বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে আনতে যাবে—আর সে মেয়ে যদি আরও পাঁচজনের সঙ্গে জোট পাকিয়ে তোমাকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে, তবে আমি তার কি করব বলতে পারো?'

ওস্তাদ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন, 'কোথায় ঘটেছে এসব—কোথায় ঘটেছে?'

শঙ্কর বললে, 'জিগ্যেস করুন ওকে—সত্যি?'

'কি বলছ তুমি,' বসন্ত বলতে লাগল, 'আমার এক্তিয়ারের মধ্যে বাস করবে অথচ আমাকেই চোখ রাঙাবে? এত বড় সাহস! এ সাহস ওরা পেলে কোত্থেকে? পৃথিবী থেকে তোমার ও শঙ্করকে সরিয়ে দিয়ে সারা বস্তিতে আমি আগুন লাগিয়ে দোবো—সব জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমার চোখের সামনে। আমার নাম বসন্তকুমার—একথা আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই!'

ওস্তাদ এবার একরকম শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমি তো তোমায় চিনি বসন্ত! তুমি শঙ্করকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে সারা বস্তির মানুষগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে—হ্যাঁ, তুমি তা পারো। কিন্তু কেন? একবার তুমি ঘরের আয়নাটার সামনে যাও তো—দ্যাখো তো তোমার কপালের কাটা দাগটা! নিজের কামনার আগুনে নিজে তুমি বারে বারে কিভাবে পুড়ে মরেছো! একবার বোঝবার চেষ্টা করো তো!'

'গাঙ্গুলী', চিৎকার করে উঠল বসন্ত।

এই গাঙ্গুলী পদবীটাই এইখানে সেই রাতের এক হুল্লোড়ে আমি শুনেছিলাম। ওস্তাদের পদবী যে গাঙ্গুলী সেদিন ক্ষীণভাবে আমার মনে উঁকি দিলেও ততটা নিশ্চিত হতে পারি নি—যতটা আজ হলাম—এই গাঙ্গুলী পদবীটা আরও একজনের ছিল। অনেক দিনের অনেক কথা মনের মাঝখানে কেমন যেন একটা শিহরণ সৃষ্টি করে গেল। ওস্তাদ বলে উঠলেন, 'গাঙ্গুলী বলে চোখ পাকিয়ে তুমি কাকে শাসাচ্ছো বসন্ত? আমি কি তোমার সম্বন্ধে ভুল বুঝেছি, না, মিথ্যে বলছি?'

'কিন্তু ভুল কি মিথ্যে শুধু আমার জীবনেই ঘটেছে গাঙ্গুলী', এবার বসন্তও শ্লেষভরে বললে, 'তোমার জীবনে ঘটে নি? আর সেদিন তোমাকে এই শর্মারই শরণাপন্ন হতে হয় নি?'

'অস্বীকার করব না', ওস্তাদ বললেন, 'জীবনের গোড়ার দিকে ফিরে যেতে চাও আমার কোন আপত্তি নেই। ভাবো সেই ছাত্রজীবন, সেই কলেজ-জীবন! তা হলে—'

'হ্যাঁ, ভেবে দ্যাখো।'

'তুমি সেদিন কলেজ পালিয়ে কোথায় যেতে বসন্ত—তারপর ফিরতে অনেক রাত করে নিত্য নতুন সঙ্গী নিয়ে। নেশায় মত্ত হয়ে থাকতে তুমি। তোমাকে সেদিন কেউ হোস্টেলে রাখতে চাইত না—আমি, আমিই তোমাকে সেদিন বুক দিয়ে আগলিয়ে রেখেছিলাম।

'সেকথা তো আমি ভুলি নি গাঙ্গুলী!'

'ভুলতে তুমি পারবেও না। কিন্তু সেদিন তোমার ওপর মমতার, তোমার প্রতি আমার নিখাদ ভালবাসার কি মূল্য তুমি দিয়েছ বলো তো বসন্ত?'

'তুমি শেষ পর্যন্ত বলবে তো তোমার জীবনটা বরবাদ করে দেওয়ার কথা?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কত দিন কত রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছি মাথায় জল ঢেলে ঢেলে। তারপর শুকনো কাপড়ে সেই জল মুছিয়ে দিয়ে তোমাকে চৌকির ওপর শুইয়ে দিয়েছি। তোমার গায়ে, বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে, তুমি কোথায় যাও, কি করো সব একটি একটি করে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমিও অকপটে সব কথা খুলে বলেছো। মনে আছে তুমি বলেছিলে, দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, মিনা পেশোয়ারীর স্মাগলিং-এর ব্যবসা এখান থেকে উঠে যাচ্ছে, যদি তার কিছুটা তুমি এখানে চালু রাখতে পার, তবে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হতে পারবে তুমি। আর তারই জন্যে তুমি রোজ হোস্টেল থেকে পালিয়ে যেতে, তারই জন্যে তুমি বাইরে গিয়ে দলের লোকেদের সঙ্গে কাজ করতে—'

বসন্ত বললে, 'সবই আমার মনে আছে। কিন্তু তোমাকে তো আমি কখনো এ পথে টানতে চাই নি গাঙ্গুলী! তুমি এলে কেন এ পথে? আমি তো তোমার জীবন বরবাদ করতে চাই নি!'

ওস্তাদ যেন ক্রুদ্ধ উঠলেন। বললেন, 'আর ন্যাকামি কোরো না বসন্ত। তুমি কি আজ তোমার সেই অপরাধের কথা ভাবতে পারো? বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে গিয়ে তোমার সে-অপরাধও আমাকে ক্ষমা করতে হয়েছে। শয়তান, তুমি কি ভেবেছিলে তারপর তার জের কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে?'

'আমি অপরাধ করেছিলুম, তার জন্যে তুমি আমাকে শাস্তি দিলেই পারতে!'

'হ্যাঁ, আজ হলে তা পারতুম। কিন্তু সেদিন ঘটনার বিভীষিকায় আর লোক জানাজানির ভয়ে আমি তোমায় শাস্তি দিতে পারি নি। তাছাড়া সেই নিরপরাধিনী মহিলার যখন কোন সান্ত্বনা ছিল না আর, তখন নিজের জীবন বরবাদ করেও তাকে আমার সান্ত্বনা দিতে হয়েছে। সে কথা কি তুমি ভুলে গেছ শয়তান?'

'আমাকে যদি শয়তান বলো', বসন্ত উত্তেজিতভাবে বললে, 'তুমিও শয়তান কম নও। সেই মহিলাকে তুমি নিজের তাঁবে রাখবে বলে তুমি তাকে আমার সামনে ছেড়ে দিয়ে তার ও আমার বদনাম দেবার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলে। তারপর তার উদ্ধারকর্তা সেজে তাকে তুমি বরাবর নিজের কাছে রেখেছিলে!'

'মুখ সামলে কথা বলবে বসন্ত', ওস্তাদ চিৎকার করে উঠলেন, 'সে মহিলার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তারপর—তারপর তোমার কপালের ঐ কাটা দাগটাও কি আরেকটা বদনাম তুমি জানতে না, যে মহিলাটিকে তোমা[র] সামনে ছেড়ে দিয়েছিলুম বলছ, [সে] মহিলাটি আমার কে।'

'খুব জানতুম।'

'তবে', ওস্তাদ তেমনিভাবেই বলতে লাগলেন, 'আমার বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে সেই মহিলাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে কোথায় সে কি তুমি জানো না? তারপর সে মহিলার স্থান হয় কোথায় সেও কি তোমার অজানা? মুখ দেখাতে পারি নি সেই মহিলার কাছে, মুখ দেখাতে পারি নি বাড়িতে এমন কি মুখ দেখাতে পারি নি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে আর শ্বশুরবাড়ির দেশে—'

ওস্তাদ আর বসন্তের কথা কাটাকাটির মধ্যে কি যেন এক রহস্যের সন্ধান পাচ্ছিলাম। কার কথা, কোন্ মহিলার কথা ওরা বলাবলি করছে তা যেমন স্পষ্টও হচ্ছে না, তেমনি বুঝতেও পারছি না, অথচ যেন ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে এর কোথায় একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। আজ শুনলাম ওস্তাদের পদবী গাঙ্গুলী। আরেকদিনও শুনেছিলাম—এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন গাঙ্গুলীর কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। অথচ এখানেও সেই সঠিক সূত্রটা মেলাতে পারছি না—কোথায় যেন মিলও রয়েছে, আবার রীতিমত গরমিল রেখে ঘুলিয়েও যাচ্ছে সব কিছু। কিন্তু পরক্ষণেই ওস্তাদের মুখে যেকথা শুনলাম তাতে যেন চমকে উঠলাম। ওস্তাদ বলে উঠলেন, 'আজ যদি সেই মহিলা বেঁচে থাকত তবে যে-তুমি ইতরের মত এই ইঙ্গিতটা করলে সেই তুমি মুখোস খোলা জন্তুর মত ছটফট করতে এতক্ষণ আমার হাতের গুলী খেয়ে—'

'গাঙ্গুলী, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে', বসন্ত অপমানাহতভাবে বললে, 'সে মহিলার গর্ভে আমার সন্তান হয় নি, সন্তান হয়েছিল তোমারই। আর তারা বেঁচেও আছে।'

'হ্যাঁ, সেইটেই তার নারীজীবনের সান্ত্বনা', ওস্তাদ বলতে লাগলেন, 'এবং সে সান্ত্বনা আমাকেই দিতে হয়েছিল আরেকদিকে পর্বতপ্রমাণ পাপের বোঝা সৃষ্টি করে। তাই লোকালয়ে ফিরে না গিয়ে আমাকে এসে উঠতে হয়েছিল তোমার এই অভিশপ্ত জগতে। এও তোমার আরেক চক্রান্ত আমাকে এখানে টেনে আনার জন্যে—'

'আমি চক্রান্ত করেছিলুম?'

'হ্যাঁ, তুমি—তুমিই চক্রান্ত করেছিলে। তা না হলে কোন্ মানুষ কন্যে আমীরাকে নিয়ে পালায়; কোন্ মানুষ

বন্ধুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়—আর তারই সুযোগে তার লোকালয়ে ফেরার সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করে দেয়?'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে মাথার মণি করে রেখেছিলুম গাঙ্গুলী!'

'সে শুধু আমার বিদ্যাবুদ্ধি, বিবেচনাকে তোমার কাজে লাগাবার জন্যে', ওস্তাদ বেদনার আবেগে বলে উঠলেন, 'আমাকে চারদিক থেকে অমানুষ করে তুমি আমায় সম্মান দিয়েছিলে—ঠিক যেমন করে আমি সম্মান দিয়েছিলুম শঙ্করকে। আর সেই ভুয়ো সম্মানের মোহে আজ আমার সব গেছে! আমি কত লোকেরই ওপর না অবিচার করেছি, তাদের কত না সর্বনাশ করেছি!'

'অনুশোচনা হয় গাঙ্গুলী প্রায়শ্চিত্ত করো।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে আমাকে', ওস্তাদ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'তুমি শঙ্করকে মেরো না—মারতে যদি হয়, তবে তুমি আমায় মারো, আমাকে গুলী করো! আমি তোমার সামনে বুক পেতে দিচ্ছি।'

'গাঙ্গুলী!'

আমি অভিভূতের মত ওদের এই অদ্ভুত সংলাপ শুনছিলাম। মনের মধ্যে তখন আমার কত কথা, কত প্রশ্ন ঝড়ের মত তোলপাড় করে উঠছিল। হঠাৎ দেখি দরজার সামনে বসন্তর পিছনে এসে দাঁড়ালো বনানী। আমার দিকেই তার দৃষ্টি। কিছু যেন সে বলতে চাইল। আমি দু' পা এগিয়ে গেলাম। ইশারায় সে আমায় ডাকল। বসন্তর পাশ কাটিয়ে কাছে যেতেই সে বললে, 'আপনার দিদি এসেছেন—ডাকলেন।'

রানীদি এসেছেন। হ্যাঁ, তাঁর তো আসার কথা ছিল। তিনি বলেছিলেন, মণ্টুকে দেখতে আসবেন। এতক্ষণ এক অদ্ভুত লোমহর্ষক ঘটনা ও নাটকের মধ্যে ডুবে ছিলাম আত্মবিস্মৃত হয়ে—ভাবতেই পারি নি যে আরও একটা জগৎ আছে এবং সে জগতে রানীদির মত মানুষেরও আবির্ভাব ঘটে। আজ অনুভব করলাম, রানীদির প্রতি দুঃখে বেদনায় আনন্দে শ্রদ্ধায় সমবেদনায় সম্মানে আমার মনটা যেন প্লাবিত হয়ে গেল। মনের কোণে আমার এতদিন জমে উঠেছিল যে মেঘ—সে মেঘ ঝড়ের বেগে কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল, অবলুপ্ত হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার আগে তবু একবার শঙ্করের দিকে তাকালাম। মনে তার জন্য কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা। বলতে পারলাম না কিছু, কিন্তু আমার দৃষ্টির মাধ্যমে তাকে আমি জানিয়ে দিলাম, 'দেখো, তোমার বিপদ না হয়। তুমি সাবধানে থেকো।' শঙ্করও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল—বোধ করি আমার মনের ভাষাকে সে সমর্থনই জানালো।

এরপর নিচে নেমে উঠোন পার হয়ে আমি বনানীকে অনুসরণ করতে লাগলাম। গিয়ে দেখি রানীদি মণ্টুর বিছানার পাশে বসে। পাশে দাঁড়িয়ে টুনটুনি। ডাক্তার মুখার্জী বসে একটু দূরে। আমি এসে আজ বহুদিন পরে রানীদিকে প্রণাম করলাম। রানীদি বিস্মিতও হলেন না, আমার প্রণামকে কোন স্বীকৃতিও দিলেন না—শুধু বলে উঠলেন, 'ওখানে অতো হৈ চৈ কিসের বিজন?'

বললাম, 'আমার প্রণাম করা দেখে কি তুমি বুঝতে পারলে না রানীদি?'

রানীদি কেমন যেন নিরর্থক এক শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'হৈ চৈ কেন হচ্ছে তা এতক্ষণে তোমার বুঝতে বাকি নেই। বসন্ত এসেছে শঙ্করকে গুলী করে মারতে, এ খবর তুমি নিশ্চয়ই টুনটুনির কাছে পেয়ে থাকবে। কিন্তু তাকেই উপলক্ষ করে ওস্তাদ আর বসন্তর মধ্যে রীতিমত বাদানুবাদ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি না। তবে আমার কাছে সব কিছু দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমার অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়ে আমার স্বপ্নের রানীদিকে আমি প্রণাম করেছি—'

'ওখানে তাহলে এইসব কথাই হচ্ছে', রানীদি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তারপর কি ভেবে আবার বললাম, 'সেই তোমার বিয়ের দিনে মাত্র একবারই ওঁকে দেখেছিলাম। তাছাড়া চেহারাটাও ওঁর বদলে গেছে অনেক—তাই আমি চিনতে পারি নি এই পরিবেশে। আজ কিন্তু সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। বাণীদির ব্যাপারও জানলাম, তাছাড়া তোমার ব্যাপারও বোঝার কোন অসুবিধা হল না।'

'কোন অসুবিধা হল না?'

'না। তোমার ঘরে দেখেছি আমি শরৎচন্দ্রের আবক্ষ মর্মরমূর্তি। আমার মনে হয়েছে তুমি শরৎচন্দ্রকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছো। এবং আমিও তোমার মধ্যে দেখলাম শরৎচন্দ্রের দুই নারী চরিত্র একসঙ্গে। একদিকে তুমি আমার অন্নদাদিদি, আরেকদিকে তুমি সেই বিহ্বল যৌবনের বসন্তদিনে পিয়ারীর বেশে রাজলক্ষ্মী—'

'অদ্ভুত কথা বলছিস তো বিজন!'

'অদ্ভুত হোক, কিন্তু ভুল তো বলি নি।'

হঠাৎ এই কথার মাঝে ওদিকে ওস্তাদের ঘরে শোনা গেল গুলীর শব্দ। আর্তনাদ করে উঠলেন ওস্তাদ। মণ্টু ছাড়া সকলেই আমরা ছুটে গেলাম সেদিকে। দেখি গিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে ছটফট করছেন ওস্তাদ মেঝেয় পড়ে এবং শঙ্কর ও বসন্ত দুটো বুনো মহিষের মত গড়াগড়ি খেতে খেতে ধস্তাধস্তি করছে তাঁর পাশে। রানীদি শুধু একটা বিকট চিৎকার করে উঠলেন।

[আগামীবারে সমাপ্য]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ দশ ॥

বোধির সীমা কত দূর পর্যন্ত যায়? যত দূর পর্যন্ত অভিজ্ঞতার সীমা। কিন্তু যুক্তি তাকে ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে আরো অনেক—অনেক বেশি, সেখানে আর এক বৃহত্তর জগতের কথা ভাবতে পারে, সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাকে স্পর্শও করা যায় না: এই ভাবেই মানুষের ঊর্ধ্বায়ন, প্রত্যক্ষের বাইরে তার মুক্তি, এই ভাবেই জানে সে ভাবলোককে—আত্মার জগৎকে। আত্মা তো প্রত্যক্ষের বিষয় নয়—কিন্তু যুক্তি বলে, সমস্ত মানসিকতার সমন্বয়ই হল আত্মা—কান্টের মতে—

স্বপ্না আবার নোটগুলো থেকে মাথা তুলল। ট্রান্সেনডেণ্টাল ওয়ার্ল্ড! খুব ভালো। কোনো পরিশুদ্ধ যুক্তির ওপর আশ্রয় করে সেখানে পৌঁছুতে পারলে কোথাও আর কোনো দুঃখ থাকত না। কিন্তু বাস্তব জগৎটাই এত নিষ্ঠুর!

এই সকালটা—বাইরে বাতাস লাগা গাছের পাতাগুলো—প্রথম রোদে শাদা শাদা মেঘের টুকরো ছড়ানো নীলনির্মল আকাশ—সব কেমন মগ্নতার মধ্যে ডুবে আছে। একটু আগেই রেডিওতে রবীন্দ্র-সংগীত বাজছিল: 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না।' সে ডাক যে পাঠিয়েছিল, পাতা-দোলানো হাওয়া তার খবর আনে, আকাশ বহন করে তার বার্তা। অভিজ্ঞতা তাকে জানে না, কিন্তু পরিশুদ্ধ জ্ঞান তার উপলব্ধি বয়ে আনে হৃদয়ে। কে সে? ইটার্নাল ইগো?

কান্টের মতো করে যদি ভাবা যেত! যদি রবীন্দ্রনাথের মতো সমস্ত প্রাণকে মেলে দিয়ে বলা যেত: 'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ'!

এই বাড়ির মেয়ে হয়েও স্বপ্না কোনোদিন রাজনীতি ভাবে না। তার ভালোই লাগে না। তর্কাতর্কি শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায়। আজকাল খবরের কাগজ যা হয়েছে, খুললেই সমস্ত মন বিরস হয়ে ওঠে। সবাই উত্তেজিত, সবাই অসহিষ্ণু, সবাই তিক্ত। কোথাও এমন জায়গা পাওয়া যায় একটা: যেখানে শান্তি, স্তব্ধতা, গভীরতা?

এ বাড়ির মেয়ে হয়েও সে এ বাড়ির নয়। কারো সঙ্গে তার মেলে না। বাবা ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন। বড়দা চব্বিশ ঘণ্টা ছটফট করে অস্বস্তিতে। বৌদি ভাঙা শরীর নিয়েও ফেলে-আসা মিছিলের দিনগুলোর কথা ভাবে—যেন আকাশ থেকে টেনে এনে খাঁচায় তাকে আটকে দিয়েছে কেউ। স্কুলে চাকরি করতে যায়—সেখানে টীচারদের ভেতরে রাজনীতির তর্ক। বাসে করে ফেরে—সেই একই কচকচি। আর ছোড়দা—

রাতে জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো, কিছু খাবার চেয়ে নিলে, তার পরেই কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। কোন্ আগুনের সমুদ্র সাঁতরে কোথায় যে পৌঁছুতে চায়, সে-ই জানে।

সব ছেড়ে—এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে, আনন্দ একদিন বলেছিল, 'বনে যখন আগুন লাগে, তখন পাখির বাসাও নিস্তার পায় না, স্বপ্না। তুই যা চাইছিস সেটা পেতে গেলে সব বদলে দিতে হবে। আগে মরা গাছ আর বিষাক্ত ব্যাক্টিরিয়াগুলো পুড়িয়ে দিই—তারপরে না হয় স্নিগ্ধ তপোবন গড়ে দেব তোদের জন্যে।'

ঠাট্টা।

না—তপোবন সে চায় না। তার নিজের আলাদা ছায়া আছে, আলাদা ভাবনা আছে: সব যন্ত্রণা, সব ক্রোধ, সমস্ত বিদ্বেষের একান্তে একটি ছোট্ট জায়গা পেলেই তার কুলিয়ে যেত। আবার রবীন্দ্রনাথ। 'চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,/ ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে,/ তাহারে জড়ায়ে ঘিরে—'

বাবার গলা কানে এল। উপনিষদ পড়ছেন:

'নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ
প্রষ্টা—'

কঠোপনিষৎ। আত্মতত্ত্বকে তর্ক দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র নচিকেতার মতো সত্যজিজ্ঞাসু শিষ্যই তা লাভ করতে পারে। কান্টও অনেকটা এইভাবেই বলেছেন। বাবা আজকাল আর তর্ক দিয়ে বুঝতে চান না—তিনি আত্মতত্ত্ব সন্ধান করছেন। কিন্তু স্বপ্নার ভালো লাগছে না। বাবাও তো সারাটা জীবন রাজনীতি করে কাটালেন, আদর্শ তাঁর ছিল, কিন্তু ভাবের বাষ্পও ছিল না তাঁর ভেতরে। গান্ধীজীর আধ্যাত্মিকতা তিনি কখনো মেনে নেন নি—গান্ধীয়ান সোস্যালিজমের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগেই তাঁর উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—' তিনিই সব কিছুকে প্রকাশ করেন, তাঁর উদ্ভাসেই সব বিভাত হয়—বাবা এখন আত্মসমর্পণ করছেন। এ তাঁর উপলব্ধি নয়, তিনি হেরে যাচ্ছেন, কোথাও দাঁড়াতে পারছেন না। দেশবিভাগ, স্বাধীনতা, আজকের রাজনীতি: ছোড়দার ওপরে অনেক আশা-ভরসা ছিল।

যেন দেউলে হয়ে গেলেন—এখন আত্মার পরম চৈতন্যকে লাভ করে চাইছেন 'শান্তিঃ শাশ্বতী।' মনে হল, বাবা উপনিষদ পড়ছেন না—কাঁদছেন।

স্বপ্না হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। মানে হয় না—কোনো কিছুরই মানে হয় না। একটা প্রচণ্ড স্রোত টেনে নিয়ে চলেছে সবাইকে—সেই বন্যা সময়ের, সেই বন্যা ইতিহাসের; কাউকে দাঁড়াতে দেবে না, থামতে দেবে না এক সেকেণ্ডের জন্যে। কান্ট্-স্পিনোজার বাঁধা ঘাট সেই বন্যায় ভেঙে ভেসে যাবে—আকাশ থেকে আশ্রয়ের জন্যে জ্যোতির্ময় হাত বাড়িয়ে দেবে না উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথের মহাবটে নোঙর বেঁধেও নিষ্কৃতি নেই—বন্যার টান সে বটকে উপড়ে নিয়ে যাবে।

তার পরে কোথায়?

একেবারে অকূলে? কিংবা নতুন কোনো মহাদেশে?

যেখানেই হোক—স্বপ্নার জায়গাটুকু কোথাও মিলবে না। যদি মেলবার হত, তা হলে টুলুদাই কি এমন করে—

'পিসিমা!'

ঘরে নীলাঞ্জন। নীলু। যেন বেঁচে গেল স্বপ্না। এতক্ষণ ধরে এইসব ভাবনাগুলো এক-একটা করে ভারের মতো চেপে বসেছিল তার মনের ওপর—যেন নিশ্বাস বন্ধ করে আনছিল তার।

'কিরে নীলু?'

নীলু আস্তে আস্তে এসে স্বপ্নার চেয়ারের পাশে দাঁড়াল। চুপ করে রইল তার পরে।

'কী, লেবেনচুষের পয়সা দিতে হইবো?'

নীলু ঘাড় নাড়ল, না—লজেন্সে তার দরকার নেই।

'কী হইল তর্? কথা কস্ না ক্যান?'—স্বপ্না হাসল। নীলুর এলোমেলো নরম চুলগুলোর ভেতরে স্নেহভরা দুটি আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বললেঃ 'তাইলে? বোকছে নাকি কেউ?'

'না পিসি, কেউ বকে নাই—' আবার একটু চুপ করে থেকে আরো ভীরু, আরো ম্লান গলায় নীলু বললে, 'পিসি, আইজ রাত্তিরে আমারে তোমার ধারে শুইতে নেবা?'

'ক্যান্?'—স্বপ্না আবার হাসলঃ হঠাৎ আমার ধারে শোওনের কী হইল? মায়েরে ছাইড়া তুই থাকতে পারবি আমার কাছে?'

'পারুম—' নীলুর গলা এবারে কান্নায় ভিজে উঠলঃ 'পারুম। আমি আর মায়ের ধারে শুমু না পিসিমা—কোনোদিন না।'

নীলুর চুলের ভেতরে স্বপ্নার আঙুল স্তব্ধ হয়ে গেল।

'কী হইছে রে? এই নীলু, হইছে কী?'

প্রাণপণে কান্নার একটা দারুণ উচ্ছ্বাসকে সামলে নিলে নীলু। ধরা গলায় বললে, 'রোজ রাত্তিরে বাবায় আর মায় ঝগড়া করে। বাবায় বকে, মায় কান্দে।'—অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার টুপ করে একফোঁটা জল ঝরে পড়ল নীলুর চোখ থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্বপ্না। তারপর কাছে টানল নীলুকে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলে চোখ।

'মায়েরে ছাইড়া আমার কাছে শুইলে তোর কষ্ট হইবো না নীলু?'

নীলু জবাব দিল না। কষ্ট যে কত বেশি হবে, সেকথা তার মতো আর কে জানে! সে এখন বড়ো হয়েছে, স্কুলে প্রশ্নের অঙ্ক কষতে হয় তাকে, তবু রাত্রে মা-কে জড়িয়ে না শুলে, মায়ের বুকের ছোঁয়াটুকু না পেলে, মা-র কি রকম ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা গালে-মুখে আদর ছড়িয়ে না দিলে তার ঘুম আসে না। তবু সে থাকতে পারছে না মা-র কাছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে মা-বাবা একটু একটু করে চাপা গলায় ঝগড়া আরম্ভ করে, বাবা রেগে উঠতে থাকে—ইংরিজিতে বাংলায় মা-বাবা তর্ক করতে থাকে, বাবা আরো কী বলে, তারপর মা কাঁদতে থাকে।

মা-র বুকে মুখ গুঁজে, ঘুমের ভাণ করে—সেই কান্না টের পায় নীলু। কান্নায় মা-র বুকটা ওঠে-পড়ে, কখনো বা গরম একটা জলের ফোঁটা গড়িয়ে আসে নীলুর গলায়। তার পরে মা-র বুকের ভেতর সাঁ-সাঁ করে শব্দ হতে থাকে, বাগানে ঝাউ গাছটায় বাতাসের দোলা লাগলে যে-রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম—মা-র হাঁপানি ওঠে—মা ছটফট করে। বাবা পাশ ফিরে কি রকম কাঠ হয়ে থাকে, ঘুমোয় কিনা কে জানে, কিংবা এক-একদিন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে জানলার ধারে চেয়ারে বসে থাকে, অন্ধকার ঘরে একটা সিগারেটের লাল আগুন জ্বলে, কখনো বাবা জোরে সিগারেটটা টানে—আগুনটা যেন বাড়ে, বাবার মুখখানা অচেনা আর অদ্ভুত দেখায়, নীলুর ভীষণ—ভীষণ ভয় করতে থাকে।

কিন্তু এর একটা কথাও পিসিমাকে বলা যাবে না। নীলু চুপ করে থাকল।

বলবার দরকার ছিল না, স্বপ্না বুঝতে পারছিল। বড়দা রাজনীতির ব্যাপারেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে এখন। বাবার সঙ্গে এদিক থেকে মিল আছে তার। বাবা অবসাদের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে উপনিষদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছেন—বড়দা রাত-দিন জ্বলে যাচ্ছে যন্ত্রণার দহনে। বাবা দেখছেন, তাঁর সব বিশ্বাস—সমস্ত স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটেছে, বড়দা দেখছে যা তার কাছে দুই আর দুইয়ে চারের মতো সহজ ছিল, তা যেমন জটিল তেমনি অর্থহীন হয়ে উঠেছে।

বাবা সব নিজের ভেতরে টেনে নিয়েছেন নীলকণ্ঠের মতো; কিন্তু বড়দা জ্বলছে—নিজের ওপরে তার রাগ, যারা রাজনীতি করতে চায়, তাদের প্রত্যেকের ওপর। আর ভাঙা শরীর নিয়ে, সংসারে জড়িয়ে গিয়ে বৌদি এখন ছটফট করে—ভাবে এমনি করে ফুরিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না—আবার আমি সেইসব দিন, সেই জীবনের মধ্যে ফিরে যাব। সেদিন রাত্রেই তো বৌদি—

স্বপ্না ডাকলঃ 'নীলু!'

'উ'?

'বাবা-মায়ের মধ্যে ওই রকম কথা কাটাকাটি হয়ই। মন খারাপ করতে নাই।'

'না—মন খারাপ করি নাই।'

'ওই সব শুনতেও হয় না পোলাপানের।'

'আমি তো শুনি না পিসি।'—নীলু ফিসফিস করে বললে, 'আমার ভয় করে।'

'আইচ্ছা, আমি বৌদিরে কইয়া দিমু অখন।'

'না—কিছু কইবা না—'ভয়ের [illegible] পড়ল নীলুর মুখেঃ 'মায় রাগ কোরবো।'

স্বপ্না আবার আঙুল বুলোতে লাগল নীলুর চুলের ভেতরে। জবাব দিল না।

'রাত্তিরে আমারে কিন্তু তোমার ধারে শুইতে নিবা।'

'আইচ্ছা, হইবো অখন।'

নীলু অনিশ্চিতভাবে চলে গেল ঘর থেকে।

এই এক আশ্চর্য দুর্ভাগ্য—স্বপ্না ভাবল। আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা, আমাদের বিস্বাদ বিরস দিনগুলো কিভাবে যে ছোটদের আচ্ছন্ন করে দেয়! আমরা টেরও পাই না, কিন্তু একটু একটু করে বিষ ছড়াতে থাকে ওদের মধ্যে, বিমর্ষতা, হতাশা আর নিরানন্দের ভেতর দিয়ে ওরা বাড়তে থাকে। তারপর একদিন দেখি ওরা অন্য রকম হয়ে গেছে—আমরা ফুল

ফোটাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু কখন ওদের শিকড়ে কাঠের সংসার বাসা বেঁধেছে।

সকালটা আরো বিশ্রী হয়ে গেল। বই-খাতাগুলো গুছিয়ে উঠে পড়ল স্বপ্না।

স্বরাজ বেরিয়ে গেছে বাজার করতে। আজও তেমনি বিশ্রী মেজাজ নিয়ে ফিরবে। সাইকেল থেকে নামতে নামতে বলবে, 'দ্যাশশুদ্ধ চোর হইয়া গেছে—অ্যাকটা জিনিস হাত দিয়া ছোওন যায় না—না খাইয়া মরতে হইবো এর পর।'

বাবা উপনিষদ রেখে খবরের কাগজে মন দিয়েছেন। কোথাও কোনো আশার আলো দেখতে পাওয়া যায় কি না, তারই সন্ধান করছেন খুব সম্ভব। মা পুজোয় বসেছেন। আজকাল পুজো করতে মা-র আরো বেশি সময় লাগে। যে ঠাকুর-দেবতাকে বড়দা, ছোড়দা অট্টহাসিতে উড়িয়ে দেয়, সেই ঠাকুরের কাছেই মা-র হয়তো প্রার্থনা চলছে এখন। ঠাকুর যেন আপদে-বিপদে আনন্দকে রক্ষা করেন।

এই সব মা-দের নিয়েই যত মুশকিল। শুধু ছোড়দা এখনো অস্বস্তি বোধ করে। সেদিন রাত্রে বলেছিল, 'মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করবি না ছোড়দা?'

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলেছিল, 'আইজ থাকুক। পরে আসুম অন্য সময়।'

বিপ্লবী ছোড়দাও মা কে ভয় পায় এখনো।

স্বপ্না রান্নাঘরে উঁকি মারল। উনুনে ডাল চড়ানো। বৌদি নেই।

এল বড়দার ঘরে। ড্রেসিং টেবিলের টুলটার ওপরে বসে নীলুর শার্টে বোতাম লাগাচ্ছে সুজাতা। নীলু আবার পড়তে চলে গেছে—বাইরে থেকে গুনগুন করে পড়ার আওয়াজ আসছে তার।

'বৌদি!'

চোখ না তুলেই সুজাতা বললে, 'আয়।'

চেয়ারে বসে পড়ে বিনা ভূমিকাতেই স্বপ্না বললে, 'অ্যাকটা কথা আছিল তোমার লগে।'

সুতো টানতে টানতে সুজাতা বললে, 'ক।'

'কিছু মনে করবা না বৌদি।' —গলার স্বর নামিয়ে স্বপ্না বললে, 'রাত্তিরে তোমরা ঝগড়া কোরতে চাও করো, কিন্তু বাচ্চা পোলাডার সামনে সীন ক্রিয়েট—'

সুজাতা চোখ তুলল। ভুরু দুটো কুঁচকে এল তার।

'নীলু কিছু কইছে তোর ধারে?'

'নীলুর কওনের কী আছে?' —স্বপ্না সোজাসুজি জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেল: 'এইগুলিন চাপা থাকে?'

সুজাতা সেলাইটা নামিয়ে রাখল। তার পর স্বপ্নার মাথার পাশ দিয়ে তাকালো দেওয়ালের দিকে। সেখানে পাশাপাশি দুটো ছবি একভাবে বাঁধিয়ে সাজিয়ে রাখা। একটি রবীন্দ্রনাথের, আর একটি লেনিনের।

'বাবার কানে গেছে?' —শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল সুজাতা।

'জানি না। না গেলে যাইবো।'

'যাউক।' —সুজাতা তেমনি শুকনো-ভাবে বললে, 'এইভাবে আর চোলতে পারে না।'

স্বপ্না প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'বৌদি, কী কইতে আছ?'

সুজাতা বললে, 'স্বপ্না—ইউ মাস্ট্ ফেস্ ফ্যাক্টস্। স্বরাজরে বিয়া করছিলাম বৌ হইয়া ঘরের মধ্যে বইস্যা থাকনের লইগ্যা না। একসঙ্গে কাজ করতে চাইছিলাম—অ্যাজ কমরেড্স্। তর দাদার ফ্রাস্ট্রেশন আসতে পারে, তার ইচ্ছা হইলে ডি-পলিটিক্যালাইজ্ড্ হইয়া যাক, কিন্তু আমি এইভাবে থাকতে পারুম না।'

'কী করতে চাও?'

'অ্যাক্টিভ পলিটিক্স্।'

'এই শরীর নিয়া?'

'চিরদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। আবার পথে বাইর হইয়া পোড়লেই শরীর ঠিক হইয়া যাইবো। স্বপ্না, দিস্ ইজ্ গ্যাংগ্রীন, দিস ইজ ডেথ। আমি আর এই লাইফ স্ট্যান্ড কোরতে পারতাছি না।'

'আর বড়দা কী কইবো?'

'তার পছন্দ না হয়, আমারে বিদায় কইর‍্যা দিবো। আমাগো সিভিল ম্যারেজ হইছিল, কারো কোনো ক্ষতি হইবো না।'

চেয়ারের মধ্যে স্বপ্না কাঠ হয়ে গেল।

'বৌদি!'

'কী করুম, ভাই ক'। অনেক স্ট্রাগল করছি নিজের সাথে। আর সহ্য হইতাছে না। পরশু ময়দানের ব্যালীতে কমরেড নাম্বুদ্রিপাদ আসলো। যাইতে চাইলাম, তর দাদার আপত্তি। কইলাম, আমি যামুই, যা হওনের তা হইবো।'

স্বপ্নার কপালে ঘাম জমে উঠল। বুঝতে পারছে কোথা থেকে হঠাৎ এমন ঝড়ে কল্পনা জেগে উঠেছে সুজাতার ভেতরে।

এতদিন ধরে আস্তে আস্তে এ সংসারটার মধ্যে মিশে যাচ্ছিল বৌদি এখানকার এই ধরা-বাঁধা জীবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল এর ভেতরে। তারপরে একদিন আর যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকত না সুজাতারও সক্রিয় রাজনীতির দিনগুলো তারও কাছে স্মৃতি হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড়ের জানলা গেছে খুলে। পথ মেলে নি কিন্তু মুক্তির খবর পৌঁছে দিয়েছে আনন্দ —আবার আকাশের জন্যে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে সুজাতার।

হাঁ, আনন্দই। নিজে ঘর ছাড়ল আরো অনেককে ঘরছাড়া করবে।

স্বপ্নার ভয় করতে লাগল।

'আমাদের জন্য তোমার কষ্ট হইবে না বৌদি?'

সুজাতার চোখের পল্লব দুটো নেমে এল। নিশ্বাস পড়ল একটা।

'হইবো। কিন্তু রেভোলুশন তে অন্যের উপর বরাত দিয়াই আসবো ন। ঠাকুরঝি। দাম সকলেরেই দিতে হইবো— ঘরে বইস্যা আমরা তার মুনাফা নিমু— এমন কথা ইতিহাসে লেখে নাই।'

'আর মা-বাবা?'

ক্ষীণ রেখায় হাসতে চেষ্টা করল সুজাতা।

'ওনাগো কাছে যে অ্যাফেকশন পাইছি সেকথা ভুলতে পারুম না। বাবার জন্যে খুব মন খারাপ হইবো। কিন্তু—'

সুজাতা যেন লঘু হইতে চাইল একটুখানি: 'ওনারাও আস্তে আস্তে বৌডারে ভুইল্যা যাইতে পারবেন। তর দাদায়ও বেশিদিন দুঃখ রাখবো না— আবার বিয়া কোরবো, একটা ডোমেস্টি-কেটেড মাইয়া ঘরে আইন্যা সংসারে সকলেরে সুখী কোরবো।'

'একবারের জন্য নীচের ঠোঁটে দাঁতের চাপ দিল স্বপ্না।

'আর নীলু? নীলুর কী হইবো?'

সেলাইটা হাতে তুলে নিয়েছিল সুজাতা, ছুঁচটা আঙুলে বিঁধে গেল কি? সঙ্গে সঙ্গে মুখের রঙ বদলে গেল তার ভেসে উঠল যন্ত্রণার ছায়া।

সেলাই আবার নামিয়ে রেখে চকিতে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা।

'এই রে, ডাইল চ্যাডাইয়া আসছি সেই কখন। ধইর‍্যা গেল বুঝি।'

চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। যেন পালিয়ে গেল।

তখন বাইরে সাইকেলের বেলের আওয়াজ উঠল। স্বরাজ ফিরেছে বাজার করে।

[ক্রমশ

লেনিন শতবর্ষে কোনো চাষী

দিনেশ দাস

বাবুমশাই, শুনেছি নাম তোমার
বিশেষ করে বাবুদেরই ছেলের মুখে শুনি
লেনিন তোমার নাম
তোমার নামে উথলে ওঠে সাগর, মরু, পাহাড় সমতল,
তোমার নামে আকাশ হ'তে তৃণটি চঞ্চল,
তারই দোলা লাগল হঠাৎ আমার প্রাচীন গ্রামে
লেনিন!
লেনিন!
একটি শুধু নামে

বাবুমশায়, আমরা তো আর মনিষ্যি নয়
মানুষ থেকে মোরা অনেক দূর,
আমরা 'মুনিস' ইতর শুদ্দুর:
জন্ম হ'ল 'বোম্মা' ভগবানের চরণ দু'টি থেকে
সেই থেকে ভাই ছাগলছানার মত চরি মাঠের-ভগা চেখে।

আজকে নতুন গ্রাম-নগরীর যা কিছু রোশনাই
আমাদেরই জন্যে কিছুই নেই,
মোণ্ডা মেঠাই, মাংস লুচি, সরু চালের ভাত
খাওয়া এ সব দূরের কথা—ভাবাও অপরাধ।
জোতদার বা জমিনদারের ভোগেই তো সব লাগে
জমিন্ বাড়ি ইমারৎ আর রাতে ইলেকটিরি
আমরা শুধু মুনিস হ'য়ে করি মিস্ত্রিগিরি।
আমিতো থাকি বাঁশবাগানের সবার থেকে পিছে
খড়ো ঘরের ভাঙা চালের নিচে,
পরনে সেই নেংটিটুকু, সানকিতে ক্ষুদ খাই:
মুজিয়ে-ওঠা গ্রাম-নগরীর যা কিছু রোশনাই,
মোদের তরে কিছুই তো হয় নাই।

বাবুম... জানি জানি আমি মুখ্যু চাষা
তবুতো আমি শুনেছি নাম তোমার প্রতিদিন
সর্বহারার প্রিয়তম কমরেড লেনিন।
ঘুমের ঘোরে ছুটে এলাম তোমার কাছে আমি
আমায় তুমি চিনবে ঠিকই জানি,
আমায় চেনে গ্রামের সবাই পাড়ার পাঁচজনে
আমি হ'লাম চাষীপাড়ার চূড়ামণি দলুই
গ্রামের নামটি কান্টস্যাংড়া, হাওড়া জেলার কোণে।

মহারাণীর আমল থেকে
দিল্লীরাণীর আমল এলো আজ
অনেক কিছুই বদল হ'ল, বদলে গেল রাজ?
অনেক জলস্রোত গড়িয়ে গেল হাওড়া পোলের নিচে
মোদের কাছে সকল হ'ল মিছে,
আমরা আছি যে তিমিরে সেই তিমিরে
আঁধার থেকে প্রবেশ করি
আরো গভীর অন্ধকারের তীরে,
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে ঘুরি
কামার কুমোর মুন্সীপাড়ার জোয়ান বুড়ো বুড়ি।
বন্ধু লেনিন! আজকে হঠাৎ তোমার নামে
নতুন আলোর ঝলক লাগে আমার গ্রামে
তোমারই নামে
কাস্তের মুখ ভ'রে ওঠে আজ ফসল কাটা-গানে
তোমারি নামেতে
কামারশালায় হাতুড়ি উঠেছে মেতে
তোমার নামে
আকাশ জুড়ে কে রামধনু আঁকে তুলির টানে।

শত বছরের বাঁকা পথ বেয়ে ক'রে কত হয়রাণি
রাশিয়ার রেড স্কোয়ারের কাছে কখন এসেছি আমি,
কমরেড, তুমি কবরে ঘুমিয়ে আলো করে কাঁচঘর—
স্বপ্ন তোমার পেরোয় তেপান্তর,
মস্কো ডিঙিয়ে ভলগা পেরিয়ে যায়
কত নদনদী সমতল আর পর্বত কিনারায়।
স্বপ্ন তোমার আমার আকাশে লাল তারা হয়ে জ্বলে
স্বপ্ন তোমার রাঙালো তুষার আমাদের হিমাচলে,
ভারতসাগর টকটকে লাল হয়ে ওঠে পলে পলে।

লেনিন তোমার আগুন-স্বপ্ন সাপ হয়ে ফণা তোলে,
ছোবলাবে মাটি কখন অকস্মাৎ
পরগাছাগুলো বিষে বিষে হবে নীল
শেষ হবে এই দুঃস্বপনের রাত।

কেটে যাবে এই অমাবস্যার ঘোর,
দেখা যাবে ঠিক
ছাড়ানো আমের মত টসটসে গোলাপী-গোলাপী ভোর।

আনন্দরূপম্

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

[কোনোদিন সাহিত্য বা সাহিত্য-ঘেঁষা রচনা লিখতে বসব, এমন দুঃস্বপ্ন কখনো দেখি নি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের বই লেখার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলাম। সাহিত্যে অনভিজ্ঞ, তাই তার দুরূহ অনভ্যস্ত পথে চলার দুঃসাহস হয় নি। তা ছাড়া বিজ্ঞানের ভাষাটা সহজ ও সরল, ফেনার যোগান দিয়ে বিষয়বস্তুর কলেবর বৃদ্ধি করার সুযোগ তাতে নেই, অতিরঞ্জনের স্থান তো নেই-ই। যে-বয়সে শরীরের অক্ষমতা ও মনোনিবেশ-শক্তির স্বাভাবিক শিথিলতায় সুপরিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও ত্রুটি ঘটে সেই বয়সেই এই স্বল্পপরিচিত বিষয়ের রচনায় হাত দেবার অসঙ্গত খেয়াল ও দুঃসাহস কেন হলো সে কথাটাই বলছি। আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী প্রীতিভাজন শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগে বর্তমানে একজন ডেপুটি সেক্রেটারী, তিনিই আমাকে এই অপঘাতের মুখে ঠেলে দিলেন। তাঁর ধারণা শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপনার সময় যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, বিশেষ করে তার আনন্দের দিকটা, তার কিছু পরিবেশন করলে অনেকেই খুশি হবেন। তাই ভাবলাম দেখি না একবার একটু বিপথে চলে, যেখানে মারাত্মক কোনো ত্রুটি ঘটার আশংকা কম। অর্থাৎ এমন বিষয় নিয়ে লিখব, যেখানে সহজ-সরল সত্যি কথাটাই বলে যাব, কল্পনাবিলাসী হবার সুযোগ তাতে নেই। জীবনে কর্মসূত্রে যেখানে যেখানে গিয়েছি, সেখানে নানা লোকের সংস্পর্শে এসে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারই কিছু কিছু পরিবেশন করব সাধ্য-মত। অনেকে যেমন তালকানা, আমিও তেমনি সন-তারিখকানা, সন-তারিখ-বার এসব নিয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। কী পেয়েছি মানুষের কাছে, সেইটাই সব-চেয়ে বড়ো কথা, কবে কখন পেয়েছি তা আমার কাছে গৌণ।

আগে একটা কথা, মানুষের স্বভাবই হলো তার নাগালের বাইরের জিনিসকে আয়ত্তে আনার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, হয়তো এটাও আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই নতুন পথে চলতে। কিন্তু চলব বললেই তো আর চলা যায় না, এ যে ছন্দমেনে চলা, অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা। শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলতে পারি, পা-দুটো থাকলেই চলা যায়। কিন্তু হাত দুটো থাকলেই তো আর লেখা যায় না। গুছিয়ে সহজবোধ্য করে লেখার কাজ ভারি শক্ত। আর তা ছাড়া সবচেয়ে মুস্কিল এই যে, আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও নেই। এমনি করে সাহিত্যের ভাণ্ডার তো দূরের কথা, তার আঙিনার প্রবেশপথেই যে অন্তেবাসী তার অপটু হাত দিয়ে আর যাই হোক, সাহিত্য-সৃষ্টি তো চলে না। চলে শুধু সত্য কথা স্পষ্ট ও সোজা করে বলা। কাজেই আমিও তাই করব। —লেখক]

(১)

যত দূর মনে পড়ে তখন মে মাসের প্রথম সপ্তাহ, ইংরেজী ১৯৩৩ সন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন বোস মহাশয়ের অধীনে গবেষণায় নিযুক্ত। কতকগুলি জটিল গাণিতিক হিসেব নিয়ে পরিশ্রম চলছিল, হঠাৎ আদেশ হলো—'খুব খেটেছিস, যা এবার বাইরে কোথাও গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে আয়'। তাই গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাতে এলাম আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে, কলকাতার উপকণ্ঠে প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণে ২৪ পরগনার আমতলা গ্রামে এক নির্জন পরিবেশে, এক বাগানবাড়িতে। প্রায় ৩০।৩৫ বিঘা জমি নিয়ে এই বাগান, নানা রকম সুস্বাদু ফলের গাছে সাজানো। মাঝে প্রকাণ্ড এক দীঘি 'বৈরাগী পুকুর' তার নাম, স্বচ্ছ জলে টল-টল করছে, ছোট-বড় অগুণতি মাছে ভর্তি। অবকাশ কাটাবার এমন মনোরম স্থান বিরল। ছেলেবেলা থেকেই মাছ ধরার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল, বয়েস বাড়বার সঙ্গে সেটা দস্তুরমতো নেশায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিপ ফেলে মাছ ধরতাম, আর সকালে, রাত্রিতে দাবা খেলা হতো ঐ আত্মীয়ের সঙ্গে। তাঁকে ডাকতাম 'বড়দা' বলে, দুর্দান্ত 'দাবারু' বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন উচ্চতন সরকারী অফিসার; অবসর গ্রহণ করে এই ৩০।৩৫

বিরাট প্রকাণ্ড বাগানটি কিনে ঈশাবাটি নাম দিয়ে তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনীদের নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে বাগানের একচ্ছত্র সম্রাট হিসেবে রাজত্ব করছিলেন। সকালে চা-জলখাবার খেয়ে বিশাল নাসিকা গহ্বরে প্রকাণ্ড একটিপ নস্যি নিয়ে হুংকার দিতেন—"ভায়া, এসো এক-হাত বসা যাক।" রাজার আদেশ, মানতেই হতো। সে কী অখণ্ড মনোযোগ ও প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে তাঁর খেলা! সাংসারিক কোনো বিপর্যয়ই তখন তাঁর কানে পৌঁছত না। দাবার 'কিস্তি' ছাড়া জগতে আর কিছু আছে বলে মনে হোত না। মাঝে মাঝে হুংকার—"ভায়া, এবার সামলাও।" সামলে নিয়ে পাল্টা জবাব—'এবার যে দাদা আপনার মন্ত্রীটাই গেল।' —তাই তো, বলেই আগের চালটা ফেরৎ নিতেন সঙ্গে সঙ্গে। প্রতিবাদ করলে রাজরোষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত।

মাঝে মাঝে ও'র ছোট ছেলে আমাকে সাহায্য করার অছিলায় পাশে এসে বসতেন। আসলে তাঁর খেলার ইচ্ছে প্রবল, কিন্তু সরাসরি বাপের সঙ্গে খেলতে বসার সাহস ছিল না। তাছাড়া তখনকার দিনে বাপ-ব্যাটায় এক আসরে বসে তাস-পাশা-দাবা ইত্যাদি খেলার রেওয়াজ ছিল না। দাবা খেলায় তিনি খুবই দক্ষ, বাপের চেয়েও। কাজেই চরম পর্যায়ে সত্যিকারের লড়াই হোত বাপ-ব্যাটায়, কিন্তু কথাবার্তা চলতো সেই পুরনো ধারায়। বাপ হুংকার দিচ্ছেন—"ভায়া, এবার সামলাও।" ছেলে জবাব দিচ্ছেন—"দাদা, এবার যে মন্ত্রীটা সত্যিই মারা পড়ল"—ইত্যাদি। এই সুযোগে পুকুরে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে যেতাম। একদিন তাঁর বড় পুত্রবধূ স্নান ও খাবার তাগিদ দিতে এসে 'বাপ-ব্যাটার' এই বিচিত্র ও অবৈধ সম্বোধনে অতিমাত্রায় বিস্মিত ও বিব্রত হয়ে বললেন—"একি! কাকে আপনি ভায়া বলছেন, আপনার ভায়া তো অনেকক্ষণ উঠে গেছে। ছেলের সঙ্গে দেখছি নাতি সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, লোকে শুনলে বলবে কী!!" 'ও, তাই তো', বলে তখুনি উঠে পড়তেন।

ভদ্রলোকের দেহটি ছিল বিশাল—যাকে বলে 'দশাসই' চেহারা—ওজনে ৩½ মণের কাছাকাছি, উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৯/১০ ইঞ্চি। সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল তাঁর বিশাল ভুঁড়িটি, কী তার আয়তন, আর কী তার সৌষ্ঠব! স্ফীতির পরিধি ৬ ফুটেরও বেশি বলে আশংকা হয়। বসে থাকলে 'অবিচলিত সাম্যস্থিতি' রক্ষা করতেন, ইংরেজিতে যাকে বলে Neutral Equilibrium, শালগ্রামের শোয়াবসার মতোই। ও'রা চার ভাই, তার মধ্যে তিনজনই বিপুলদেহী, বিশাল ভুঁড়ির মালিক। মধ্যম ভ্রাতার ভুঁড়িটির ছিল দেশজোড়া খ্যাতি, তাই নিয়ে তাঁর কতো গর্ব! বয়েস যখন ষাটের কোঠায়, তখন একদিন বলতে শুনেছি যে, ত্রিশ বছর বয়েস থেকে তাঁর পায়ের আঙুল ও নাভিপ্রদেশ দেখার সুযোগ হয় নি। অভিযোগটা বোধহয় প্রকৃতির অমোঘ এক নিয়মের বিরুদ্ধে—তাঁর ধারণা আলো সরল রেখায় চলে বলেই তাঁর এই বিপত্তি! অত্যধিক যত্নে লালিত ও বর্ধিত ভুঁড়ির এতে কোনো দায়িত্ব নেই। আর একটা দুর্ঘটনার কথা এই সঙ্গে মনে পড়লো—বিজয়া দশমীর দিন বড়দার সঙ্গে এই মেজদার কোলাকুলি, সে এক বিপর্যয় কাণ্ড—দাদা-ভাইয়ের প্রসারিত বাহুযুগল পরস্পরকে আলিঙ্গন করার ব্যর্থ প্রয়াসে শূন্যে দোদুল্যমান, বক্ষে বক্ষ স্থাপন করার আপ্রাণ চেষ্টাকে বিপর্যস্ত করে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো পরস্পরের স্ফীতোদর। উভয়ের ভুঁড়িতে ভুঁড়িতে বারকয়েক সংঘর্ষের পর নিরুপায় হয়ে ভাকেই কোলাকুলির চরম অধ্যায় বলে মেনে নিয়ে নিবৃত্ত হলেন শ্রমক্লান্ত দুই ভাই। নিজেকে সামলাতে পারলাম না, বলে ফেললাম 'দাদারা এটা কী ধরনের কোলাকুলি, এ যে দেখছি ভুঁড়োভুঁড়ি!' কোলাকুলি উত্তাপের ব্যাপার, এ যে মধ্যাপেই স্ফীত বিষুবপ্রদেশে নিবদ্ধ রইলো।' মেজকর্তা তাঁর পরম আদরের জিনিসটির প্রতি কটাক্ষ বা তার বিরূপ সমালোচনা সইতে পারতেন না। একটা অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুতপদে অন্যত্র চলে গেলেন। চোখের ভাষায় জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, গুরুজনে শ্রদ্ধা-হীন এক অর্বাচীনের স্পর্ধায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এটা তার অনধিকার!

এভাবেই বেশ আনন্দে কাটছিল ছুটির দিনগুলি। হঠাৎ একদিন সকালে খেলার বদলে রাজাদেশ হলো একটা "বিশেষ জরুরী" কাজে কলকাতায় ও'দের বাড়িতে যেতে হবে। কাজটা সেরে Statesman খবরের কাগজটা একটু পড়তে বসেই হঠাৎ Wanted column-এ একটা বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি পড়ল—Wanted a Lecturer in Physics for Visva Bharati, ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে একটা শাদা কাগজে দরখাস্ত টাইপ করিয়ে আমতলায় ফিরে এসে প্রয়োজনীয় সার্টি-ফিকেটগুলি হাতে নকল করে তার পরদিন সকালেই আবার কলকাতায় এসে ডাকে ছেড়ে দিলাম। চাকুরীর আবেদনপত্র যাতে নির্ধারিত শেষ তারিখ অতিক্রম করার আগেই কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছয়। তখন চাকুরীর বাজার কী রকম মন্দা ছিল তা সবারই জানা আছে। বছর পাঁচেক আগে এম-এসসি পাশ করে রিসার্চ করছি, অর্থাৎ পাঁচ বছর বেকার। চাকুরীর সন্ধান পেলে দরখাস্ত করতে একদিনও দেরি করা ক্ষতিকর বলেই মনে হোত। তবে বিশ্বভারতীতে চাকুরী পাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তখন ছিল নিতান্ত দুরাশা। কারণ, পৃথিবীর নাম-জাদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র তখন বেকার হয়ে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি উপেক্ষা করে পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নিয়োগ ছিল খুবই দুরূহ। তাই যে মাসের প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে দু'বার কলকাতা যাতায়াত করে আবেদনপত্র পাঠালেই যে এই চাকরি হবে এমন দুঃস্বপ্ন কিন্তু সেদিন দেখি নি।

যাক্, যা বলছিলাম—বড়দার "বিশেষ জরুরী" কাজ বলতে বোঝা যেত কোন মামলা-মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য উকিলের বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিলপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া। ভদ্রলোকের দেহটা ছিল যেমনি বিশাল, অন্তঃকরণটা ছিল তার চেয়েও বিশাল। এমন পরোপকারী উদার ও মহৎ অন্তঃকরণের মানুষ খুবই বিরল। কেউ বিপদে পড়েছেন শুনলেই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন, আর যদি তিনি সাহায্য প্রার্থনা করতেন তাহলে তো আর দেখতে হতো না, এ যেন ও'র নিজেরই বিপদ! বিপদটা মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত হলে বড়দা তাঁকে আর্থিক সাহায্যও করতেন। তবে এই সাহায্যটা সব সময়ই ছিল নিম্ন-মুখী, অর্থাৎ প্রবলের হাতে লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত দুর্বলের পক্ষ নিয়েই তিনি দাঁড়াতেন। এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল—তাঁর বাগানে প্রতিদিন ৭।৮ জন কিষাণ কাজ করতো। এদের একজনের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী এক ব্যক্তি মিথ্যা দেনার জাল দলিল আদালতে দাখিল করে তার কয়েক বিঘা জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিল। খবর পেয়ে বড়দা অগ্নিশর্মা হয়ে সেই ব্যক্তিকে ঐ মিথ্যে মামলা তুলে নিতে বললেন, কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। তাঁকে শাসিয়ে এলেন, ভালো কথায় যখন কাজ হলো না, তখন সমুচিত শিক্ষা তাঁকে পেতে হবে। এরপর ঐ মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। আদালতে কে কি সাক্ষ্য দেবে, উকিলকে দিয়ে তার মুসাবিদা তৈরি করে প্রত্যেক সাক্ষীকে তার এজাহার মুখস্থ করাবার 'রিহার্শেল' দিতে শুরু করলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজের পর বসতো এই রিহা-র্শেলের আসর। এজাহারে পণ্ডিতী ভাষা শুনে শুনে একদিন বড়দাকে বলতে হলো —কেন এই পণ্ডশ্রম করছেন বলুন তো? নিরক্ষর সরল গ্রামের লোককে সত্যি কথাটা

ওঁর নিজের ভাষায় বলতে দিন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষার গুরুভার শব্দবিন্যাসের ধারাটা আয়ত্ত করতে গিয়ে ওদের অনেক বিড়ম্বনা ঘটতে পারে।" উনি বললেন—"না হে না, ভালোরকম তালিম দিলে এসব সরগর হয়ে যাবে।" মোকদ্দমার দু'দিন আগে সত্যিই বিপর্যয় ঘটলো—রিহার্সেল দিতে উঠে প্রধান সাক্ষী বলে উঠল—"আমি স্বর্গীয় সুবাস ঘড়ুই, পিতা শ্রীনারাণ ঘড়ুই হলফ করে বলছি......"ইত্যাদি। শুনেই বড়দাকে বললুম—"কেমন, এবার হলো তো, মৃত স্বাক্ষীর জবানবন্দী ইহলোকের আদালতে গ্রাহ্য হবে কি?" বড়দা ক্ষিপ্ত হয়ে এক প্রচণ্ড হুঙ্কারে ফেটে পড়লেন—"হতভাগা,, এতদিন ধরে উঠতে-বসতে তোকে পাখী-পড়া করে শেখালুম,, আর তুই কিনা স্বচ্ছন্দে বলে বসলি, আমি স্বর্গীয় সুবাস ঘড়ুই......। যা, যা স্বর্গীয় হয়েই থাকগে, তোমার মতো ভূতের দল নিয়ে কোনো কাজ চলে না।" সে-যাত্রা বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপস করতে হলো।

॥ দুই ॥

এইভাবেই পরমানন্দে দিনগুলি কাটছিল। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। পাব্লিকেশন ঢাকা থেকে তাঁর আমন্ত্রণ [illegible], জানতে খবর হলো—Selected (..), Meet Principal Visva Bharati at once। যা ছিল অকল্পনীয় তাই বুঝি ঘটতে চললো। বিশ্বভারতীতে দরখাস্ত [illegible] পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম এর কার্যক্রম সম্বন্ধে। হঠাৎ এই আশার আলোতে মনে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিদ্যায়তনে অধ্যাপনা করার পরম সৌভাগ্য কি আমার সত্যিই হবে? এ যে কল্পনার অতীত! বড়দাকে টেলিগ্রামটা দেখাতেই বললেন—"আরে, এ কী 'রবি ঠাকুরের' বোলপুর-শান্তিনিকেতন নয় কি। সেখানে তো আমাদের ক্ষিতিমোহন রয়েছেন, তাঁকে একটা চিঠি লিখে দেব, যাতে তোমার এই কাজটা হয়। শুনেছি 'রবি ঠাকুরের' তিনি ডানহাত, তাঁর কথা উনি ঠেলতে পারবেন না।" বড়দার চিঠি নিয়ে তার পরদিনই যাত্রা করলাম শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে। বিকেল ৪টা নাগাদ বোলপুর স্টেশনে গাড়ি পৌঁছল, বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। রেলকর্মী একজনকে জিজ্ঞেস করলাম শান্তিনিকেতন কতদূর ও সেখানে যাবার কোনো যানবাহন পাওয়া যায় কিনা। বললেন, গরুর গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো যান নেই, পথ অল্প। আধ মাইলের বেশি নয়, শান্তিনিকেতনের লোকেরা এইটুকু হেঁটেই যাতায়াত করেন। হেঁটে যাবার পরামর্শই দিলেন। এ কেমন জায়গা যে, গরুর গাড়ি ছাড়া গতি নেই। অগত্যা পদব্রজ ভরসা করেই বেরিয়ে পড়া গেল। পাকা আধ ঘণ্টা লাগলো শান্তিনিকেতন পৌঁছতে, পথ দেড় মাইলের কম নয়। খোঁজ করে গুরুপল্লীতে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাসায় এসে দেখি দরজা বন্ধ, বার কয়েক ঘা দিয়েও কোনো সাড়া নেই। এবার বেশ জোরে ঘা দিতেই ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো—"খুলছি, এত অধৈর্য কেন?" কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বের হলেন এক দীর্ঘাকার পুরুষ, বুকে-পিঠে প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বললেন—"এবারটা 'কার-বাঙ্কলে' শয্যাগত হয়ে রয়েছি, তাই উঠে দরজা খুলতে কিছু সময় লাগল। তুমি কে, কাকে চাই?" বললাম—"আপনি কি ক্ষিতিমোহনবাবু?" বললেন—"এতদিন তো তাই ছিলাম, এখন দেখছি 'অ-ক্ষিত-বাবু', তোমার প্রবল করাঘাতে দরজার খিলটা ভেঙে গেছে।" খুব রসিক মানুষ ইনি, বিস্ফোটকের যন্ত্রণাও খিল-ভাঙা নিয়ে রসিকতাকে চাপা দিতে পারল না।

বড়দার লেখা চিঠিখানা পড়েই বললেন—"দেখ, তোমার সম্বন্ধে আমি যদি প্রিন্সিপালের কাছে সুপারিশ করি, তাহলে তোমার এই চাকরি পাবার কোনো আশা নেই। কারণটা তোমাকে বলি, প্রিন্সিপাল ধীরেন্দ্রমোহন সেন আমার জামাই। অত্যন্ত কঠিন মানুষ, নিজে দেখে-শুনে সব বিচার করেন। আর তা ছাড়া আমার সুপারিশ নিয়ে যদি কিছু প্রস্তাব বিবেচনার করতে সচেষ্ট হন, তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান। কাজেই জেনে-শুনে তো তোমার ক্ষতি করতে পারি না।" রাস্তার ওপর একটা একতলা বাড়ি দেখিয়ে বললেন—"ঐ আমার জামাইয়ের বাড়ি। সোজা চলে যাও তাঁর কাছে তোমার টেলিগ্রাম নিয়ে। আমার বিশ্বাস এতেই সবচেয়ে বেশি কাজ হবে।" এই নির্দেশমতো সেখানে গিয়ে দেখি, উত্তর দিকের বারান্দায় তিনজন বসে। হাফপ্যান্ট ও সাদা সার্ট পরে মোড়ায় বসে চা খাচ্ছেন। একজন বেশ বয়স্ক, মাথায় বিরাট চকচকে টাক; আর একজন প্রায় ছ' ফুট লম্বা, জোয়ান চেহারা, সুপুরুষ, পায়ে বুট; আর একজন লম্বা ছিপছিপে, খেলোয়াড়-সুলভ চেহারা। এই দু'জনই প্রায় আমার সমবয়সী বলে মনে হলো। তিনজনেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন। বয়স্ক ভদ্রলোককে নিঃসন্দেহে প্রিন্সিপাল মনে করে তাঁরই হাতে টেলিগ্রামটা দিলাম। তিনি পড়েই সহাস্যে সেটা বুট-পরা ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। ভদ্রলোক টেলিগ্রামটা অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] উঠলেন—"ও, তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আসছো, শিক্ষাভবনে তোমার জায়গার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুমি একটু বসো, আমাদের এখন একটা ফুটবল ম্যাচ আছে, সেটা শেষ হলেই তোমার সঙ্গে কথা বলব।" ওঁর কথা শুনেই বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন—"ধীরেনবাবু, টেলিগ্রাম করেছেন ঢাকা থেকে ডক্টর [illegible] [illegible], ইনি আপনাদের অধ্যাপক-পদের প্রার্থী, ছাত্র হতে আসেন নি।" এই তরুণ ভদ্রলোকটিই তাহলে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ; একটু লজ্জিত হয়ে বললেন—"মাপ করবেন, আপনাকে দেখে আমি ছাত্র বলেই ধরে নিয়েছিলাম।" হেসে বললাম—"আমাকেও মাপ করুন, আমি ভাবতেই পারি নি, এই তরুণ বয়সে আপনি অধ্যক্ষ, তাই ওঁকেই অধ্যক্ষ ভেবে ওঁরই হাতে টেলিগ্রামটা দিয়েছিলাম।" প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠল ডক্টর সেনের মুখ, বললেন—"আমাদের প্রথম পরিচয়ের পালাটা যখন এই অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়েই গেল, তখন ভবিষ্যতের সম্পর্কটা মধুরতর হবে বলেই আশা করি। আসুন না এখন মাঠে এসে খেলাটা দেখুন, তারপর আপনাকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাব।" বেশ ভালো খেলা হলো, জয়ী হলো শান্তিনিকেতন দল।

খেলাশেষে ডক্টর সেন নিয়ে গেলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে। উত্তরায়ণের পূর্বদিকের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ, রজতশুভ্র দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কেশ, বিশাল আয়ত চোখ, অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টি। মনে হলো, যেন আমার ভিতরটা তিনি মুহূর্তেই দেখে নিলেন। এই সৌম্য-শান্ত অপরূপ মূর্তির কাছে শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নত হয়ে এলো, প্রণাম করলুম। ডক্টর সেন আমার পরিচয় দিতেই স্মিতহাস্যে বললেন—"তুমি বুঝি বিজ্ঞানের কর্তা (Master of Science, M.Sc." যদি নির্বাচন-কর্তার ছাড়পত্র পেয়ে এখানে অধ্যাপনার কাজে যোগ দাও পাণ্ডিত্যের আঘাতে কিন্তু ছেলেমেয়েদের [illegible] করে দিও না, জানো, সব রকম আঘাতের মধ্যে পাণ্ডিত্যের আঘাতই মারাত্মক। আমাদের পরিবেশনকার্যে পাণ্ডিত্য বর্জনীয় বলে মনে করি। দেশে বিদ্বান লোক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করবার অভ্যাস অধিকাংশ লোকেরই [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] করার শিক্ষা [illegible] [illegible] এই গুরু কার্যভার আমার [illegible]

হলো। একটি মেয়ে এসে খবর দিয়ে গেল ভিতরে রিহার্সালের (বর্ষামঙ্গল উৎসবের) সব তৈরি, গুরুদেব গেলেই শুরু হবে। বললেন—"ধীরেন, রথি তো এখন কলকাতায়। তোর কাছে থেকে একটা চিঠি নিয়ে রথির সঙ্গে ও'কে দেখা করতে বল, তাহলেই এই অধ্যাপক নিয়োগের পর্ব শেষ হবে, ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আর বিঘ্ন ঘটবে না। সত্যেন জ্ঞানের ছাত্র, ও'রা দু'জনেই যখন এ'র কথা বিশেষ করে লিখেছেন, তখন আশা করি, প্রশান্তর তরফ থেকে কোনো আপত্তি হবে না।" গুরুদেবকে প্রণাম করলাম, তিনি উঠে ভিতরে চলে গেলেন। অপসৃয়মাণ এই দীর্ঘ ঋজু দেহের গমনপথের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। অনন্যসাধারণ চেহারা, বীণার ঝংকারের ন্যায় কণ্ঠস্বর, করুণাসুন্দর আয়ত চোখ, অপরূপ

কথা বলার ভঙ্গি—অল্পক্ষণ মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ অভিভূত হয়েছিলাম। চলন্ত অবস্থায় ডক্টর সেনের ডাকে—"এবার চলুন।" বললাম—"চলুন, ভগবান যাকে দেন, এমনি করে সবদিক দিয়ে অকৃপণ উদারহাতেই দিয়ে থাকেন; এই বিরাট পুরুষের দর্শন পেয়ে আজ আমি ধন্য।"

সেদিন আর কলকাতা ফিরে যাবার গাড়ি ছিল না, তাই ফিরে যাবার তাড়া থাকলেও বাধ্য হয়েই রাতটা ওখানে কাটিয়ে পরদিন সকালের গাড়িতে কলকাতা আসা স্থির করতে হলো। গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে ডক্টর সেন আমাকে আশ্রম দেখাতে বের হবেন বললেন। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় তখন গেস্ট হাউসের তত্ত্বাবধায়ক, অর্থাৎ ম্যানেজার। ওখানে যেতেই বলকণ্ঠে সম্বর্ধনা জানালেন—"আসুন বসুন, অতিথির সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই তো এখানে রয়েছি। নাম-ধাম-জাতি-গোত্র, আগমনের উদ্দেশ্য, সম্যক পরিচিতি এই খাতায় লিখে দেবেন"—এই বলে একটা মোটা খাতা এগিয়ে দিলেন। "উপরের পূর্ব-দিকের ঘরখানা আপনার জন্য নির্দিষ্ট করছি। আশা করি, তেমন অসুবিধা কিছু হবে না, একমাত্র মশার উপদ্রব ছাড়া। জানেন, আশ্রমবাসীর তাজা রক্ত খেয়ে মশাগুলি এখানে যেমনি অতিকায়, আর তেমনি জোয়ান, অবাধে মশারি তুলে তার ভিতর ঢুকে পড়ে রক্তপান করে। মশাই তো দেখছি ঝাড়া হাত-পায়ে এসেছেন, তাই বিছানা-চাদর সবই ব্যবস্থা করতে হবে।" হাঁক দিলেন—"ওরে 'পণ্ডা', এক বাবু এয়েচেন, উপরের ঘরে থাকার সব ঠিক করে দে।" ডক্টর সেনকে বললেন—"ধীরেন, এই তো তোমাদের অধ্যাপক পদের শেষ 'আসামী'।" গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে দেখি নির্মেঘ আকাশে পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডলী ঝিক্‌মিক্‌ করছে। উন্মুক্ত প্রান্তর, দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, এতো বড়ো আকাশ আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হলো না। রাস্তায় যেতে যেতে ডক্টর সেন অনেক কথাই বললেন, তার সারাংশ হলো—"শান্তিনিকেতনে শিক্ষার ধারাটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে শিক্ষা মাপজোখার বদ্ধকুঠ পরিবেশনে পর্যবসিত নয়, সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাকেই এখানে অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হয়। দুর্গম পথে, দুরূহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের ভাগ্যে ঘটে না। তাই দেশের বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন হয়ে অজ্ঞতার গণ্ডীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার চিন্তাধারায় তাই এসেছে এক সর্বনেশে জড়তা। এই শিক্ষা প্রহসনের অবসান ঘটিয়ে দেশের চিত্ত-ক্ষেত্রকে স্বাভাবিক ও ব্যাপক শিক্ষাধারায় অভিষিক্ত করে দিয়ে তাকে সুস্থ, সবল ও সহজ করে তুলতে এক পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যে আয়োজন নানা দিক দিয়ে মানুষের চিত্তবিকাশের পূর্ণ সহায়তা করে, তাই হলো সর্বাঙ্গীণের শিক্ষা। আমাদের পক্ষে তেমন এই আয়োজন অতি স্বল্প, তাই শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে অস্বাভাবিক। বর্তমান শিক্ষা সমাজের সৌভাগ্যবান স্তরকেই সামান্য অভিষিক্ত করেছে, তার নিচের বৃহত্তর স্তর রয়েছে শুষ্ক মরুর মতো। তারই অনিবার্য ফল, শুধু বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও দেশ রয়েছে পঙ্গু হয়ে।" একটা কথা ডক্টর সেন বিশেষ জোর দিয়ে বললেন—"আমাদের দেশে অনেক পণ্ডিত আছেন, কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাঁদের অনেকেরই শিক্ষার দান থেকে বঞ্চিত, প্রয়োগের দিক থেকে 'অভিধান কচের' মতো তাঁদের শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। শিক্ষা আমাদের দেশে পাস-করা বিদ্যা হয়ে রয়েছে, আপন-করা বিদ্যা যাতে হয়ে উঠতে পারে, তারই প্রচেষ্টা চলছে এই শান্তিনিকেতনে।" সেই নিস্তব্ধ রাতে উদার-উন্মুক্ত আকাশের নিচে আশ্রম পরিক্রমার সময় তিনি যেসব কথা বললেন, তা মনের মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন জাগিয়ে তুলল। গুরুদেব শান্তিনিকেতনে গোটা মানুষটাকে গড়ে তোলার যে পুণ্য-ব্রত গ্রহণ করেছেন, তার সফলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণই হলো তাঁরই শিক্ষাধারায় তাঁরই হাতেগড়া ডক্টর সেনের মতো কর্মী। হঠাৎ আলোচনা থামিয়ে দিয়ে উনি বললেন—"এই দেখুন, অনেক বক্তৃতা করে ফেললুম, ভুলেই গিয়েছিলুম এখনও আপনি আমাদের মধ্যে আসেন নি।" তারপর ওঁর ওখানে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে উনি রথিবাবুকে একখানা চিঠি লিখে বলে দিলেন যে, কলকাতা পৌঁছেই যেন চিঠিটা নিয়ে রথিবাবুর সঙ্গে দেখা করি। এগিয়ে দিয়ে গেলেন গেস্ট হাউস পর্যন্ত, পাছে পথ হারিয়ে ফেলি সেই অজুহাতে। রাত্রে মশার কোনো উপদ্রব হলো না বটে, তবে সুধাকান্তবাবুর আশ্রিত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে উগ্রপন্থী এক বিরাট ছারপোকা বাহিনীর নির্মম আক্রমণে বেশ কিছু রক্তদান করতে হলো। ওঁর ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু নিষ্ফল হলো না, রক্ত দিতেই হলো—ললাটের লেখন কে খণ্ডন করবে!

ভোরের গাড়িতে কলকাতা ফিরেই সোজা চলে গেলাম জোড়াসাঁকোর প্রখ্যাত 'ঠাকুরবাড়িতে'। ডক্টর সেনের চিঠিটা পাঠিয়ে দিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রথীন্দ্রনাথ, বললেন—"ঠিক সময়েই এসেছেন, আমিও বের হচ্ছিলাম। চলুন, প্রথমে যাই প্রশান্তর কাছে, তারপর চারু-বাবুর কাছে (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়)।" প্রফেসর মহলানবিশের কাছে ফোন করতেই জানা গেল, তিনি গিয়েছেন দার্জিলিং-এ, কাজেই যেতে হলো চারুবাবুর বাড়িতে। খবর পাঠিয়ে দেবার কিছুক্ষণ পরে চাকর এসে বললো যে, তিনি খুব ব্যস্ত, কারো সঙ্গেই দেখা করবেন না। শুনেই রথিবাবু তাকে বললেন—"দেখা হতেই হবে, বলো গিয়ে 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি' থেকে রথি ঠাকুর এসেছেন বিশেষ কাজে।" 'ঠাকুরবাড়ির' উদ্দীপ্তকণ্ঠ সম্ভবত অতি-ব্যস্ত চারুবাবুর কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে চারুবাবু শশব্যস্তে বেরিয়ে এসে জানালেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ট্যাবুলেশনের' কাজে তিনি তখন এতো ব্যস্ত যে, সকালের দিকে ঘরে দরজা বন্ধ করে কাজ করেন। পরিচিত-অপরিচিত অনেকেই পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য রোজই তাঁকে উত্যক্ত করেন, তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। পুরনো চাকরটা, যে রথিবাবুকে চেনে, সেদিন সে না থাকায় এই বিভ্রাট ঘটেছে বলে চারুবাবু দুঃখ প্রকাশ করলেন। রথিবাবু তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ওঁকে জানালেন—শিক্ষাভবনের ফিজিক্সের অধ্যাপক মনোনয়নের ব্যাপারে ওঁর মতামত জানার জন্য তিনি এক পদ-প্রার্থীকে সঙ্গে করে এনেছেন গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর চারুবাবু বললেন যে, আমি নাকি তাঁর 'নাতি-ছাত্রের' সামিল। কারণ সত্যেন বোস তাঁর ছাত্র, আমি আবার সত্যেনবাবুর ছাত্র। রথিবাবুকে একান্তে ডেকে তিনি কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন, তারপর বললেন, তাঁর মতামত তিনি লিখিতভাবে জানাবেন। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ, ভাবলাম 'জোড়াসাঁকো' ও 'সুকিয়া স্ট্রীটের' দ্বন্দ্বে কাজটা না হাত-ছাড়া হয়ে যায়। রথিবাবু বললেন যে, সেদিনই যেন আমি চারু দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি। এক সপ্তাহের মধ্যেই ওঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানবেন। ওখান থেকে সোজা চলে এলাম হাজরা রোডে চারু দত্ত মহাশয়ের কাছে। (ক্রমশ)

॥ পাঁচ ॥

নির্বাচনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে পা বাড়াইনি বলে পাকিস্তানের তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির চোখে আমরা আজ "সমাজবিরোধী" এবং "দেশদ্রোহী"! তারা বলে, আমরা নাকি মেহনতী আওয়ামের দুশমন আর হঠকারিতাই আমাদের একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিদ্রূপ করে তারা আমাদের নাম রেখেছে "লাল বিপ্লবী"।

এই সব পাতি বুর্জোয়া দল ও দলনেতাদের সমালোচনায় ভয় পেয়ে পিছু হটে যাওয়ার মত ভীরুতা আমাদের বুকে কখনও বাসা বাধে নি, বাধবেও না কোনও দিন। সত্যকে প্রকাশ করলে কিংবা মেহনতী আওয়ামকে অস্তিত্বরক্ষার মন্ত্র দিলে যারা আমাদের সমাজবিরোধী বা দেশদ্রোহী বলবে, সমাজ ও দেশের দুশমন তারাই। আজ তেইশ বছর হোল পাকিস্তান জন্ম নিয়েছে, এই সব পাতি বুর্জোয়া, মনুষ্যেতর রাজনৈতিক জীবগুলি এই দীর্ঘ সময়ে সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্য কি করতে পেরেছে এবং যা করেছে, তা'র পরিমাণ কতটুকু এবং তার মধ্যে সারবস্তু আদৌ কিছু আছে কি? গড্ডলিকা স্রোতে ভেসে চলা সরল, সাদাসিধে আওয়ামকে সঠিক পথে হাঁটতে শেখানোর নাম হঠকারিতা আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে নারীধর্ষণকারী গুণ্ডার রামদা'র তলায় অসহায় সংখ্যালঘু নর-নারীকে ঠেসে ধরা কিংবা গণ-আন্দোলনের নামে ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের মেশিনগানের মুখে ছুড়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেওয়ার নাম দেশসেবা? চমৎকার! পাতি বুর্জোয়া নেতারা "লাল বিপ্লব" কথাটি আমাদের ধিক্কার দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের আমরা প্রশ্ন করি, "হে মহানায়কগণ, হে মেহনতী মানুষের ঊষরজীবনে সুখ-শান্তির ফল্গু প্রবাহেচ্ছু ভগীরথগণ, আপনারা যে মন্ত্রপূত বিপ্লবের পানি ছিটিয়ে মৃতপ্রায় আওয়ামকে নবজীবন দান করবেন, তার রঙ কি এবং কোন্ বিশেষ ভোজবাজীর সাহায্যে বা কোন্ গিরিকন্দরে ধ্যানমগ্ন, শ্মশ্রুল মুখ, বিরাট-উদর বৃদ্ধ সাধুর কৃপায় আপনারা রঙ-বেরঙের বিপ্লবের সন্ধান পেয়েছেন, তা' আমাদের বলবেন কি? আমরা তো জানি বিপ্লবের রঙ একটাই এবং তা' অবশ্যই লাল। হলদে, সাদা বা সবুজ বিপ্লবের কথা আমরা কোনওদিনই শুনি নি! পাতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ধিক্কার দিতে গিয়ে একটা মস্ত সত্য কথা বলে ফেলেছে। তারা বলেছে আমরা "লাল বিপ্লবী"। সত্যই, আমরা তাই। বিপ্লব কোনও ভোজসভা নয়, মদের আসর বা বাঈনাচের মেহ্ফিল নয়, ন্যাকাচৈতন্য, অলস সঙ্গীতশিল্পী বা স্বপ্নবিলাসী চিত্রকরের বৈঠকখানাও নয়, বিপ্লব মেহনতী আওয়ামের আজাদীর উৎসব। বিপ্লব আগুন আর রক্তের যজ্ঞ, যে যজ্ঞের পুরোহিত মেহনতী আওয়াম আর বলি, কায়েমী স্বার্থ। বিপ্লব কালবৈশাখী, বিপ্লব রুদ্রের পিনাক। তাই বলি, "গণতন্ত্রের গড়ুরধ্বজ ধারণকারী, চৌরঙ্গী-মিয়া ভাইরা, তোমরা পার পাবে না। যে লাল বিপ্লবকে তোমরা প্রতিনিয়ত উপহাস কর, শেষের সেদিন এই লাল রঙ গায়ে মেখেই তোমরা বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা করবে, কেন না মার্ক্সীয় দর্শনের ব্যাখ্যাই তাই, ইতিহাসের কূটাভাসই তাই! আমরা আর যাই হই, আর যাই করি, গরীবকে মারি না, গরীবকে ঠকাই না। আমরা যা বিশ্বাস করি না, তা' পালন করি না, যা পছন্দ করি না, তা' গ্রহণ করি না। আমাদের মুখোশ নেই, শিরস্ত্রাণ নেই, বর্ম নেই, আমরা খোলামেলা, খোলা হাওয়ার মত। আর এই খোলা হাওয়া ছাড়া মানুষ বাঁচে না।

আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষকে তোমরা ঘুমন্ত রাজপুরীর সোনার কাঠি পাইয়ে দেবে বলেছ, বেশ তো দেখব! দেখব, সে চাবিকাঠি কোন্ পুরীর দরজা খোলে, বেহেস্তের, না নরকের, সৌভাগ্যের, না দুর্ভাগ্যের! কায়েমী স্বার্থসর্বস্ব মানুষকে তোমরা ভোটের জোরে দুর্বল করে দেবে! তাই যদি হয়, তাই যদি হোত, বিপ্লবের প্রশ্ন তা' হোলে কোনওদিন উঠত না! তোমরা বোধহয় ভুলে গেছ যে, রক্ত আর ঘামের পলি পড়ে সমাজ ও সভ্যতার জন্ম হোয়েছে, রক্ত আর ঘাম দিয়েই তাদের রাখতে হবে! তাই আমরা নির্বাচনে যাব না, কেন না সমাজের ক্লেদ, আবর্জনা, যার মধ্যে তোমরা বাসা বেঁধেছ, তা ভোট দিয়ে সাফ করা যায় না, যাবে না। মেহনতী আওয়াম আজ নির্বাচনের নামে মেতে উঠেছে, তাই উঠুক, তাই আমরা চাই, কেন না বাস্তবের সাথে ওরা পরিচিত হোক—এই আমাদের ইচ্ছা। ওরা স্বচক্ষে দেখুক নির্বাচনের মাকাল ফলটি, তার স্বাদ গ্রহণ করুক এবং তারপর প্রচণ্ড ঘৃণায় থুতু ফেলে ওরা আসবে, আমাদের সাথে হাত মেলাবে, রক্ত আর ঘামে গর্ভিণী করবে বহুদিনের বন্ধ্যা পাকিস্তানকে, জন্ম দেবে সোনালী দিনের।

আমার চিঠির পাঠক-পাঠিকারা হয়ত আশা করছেন যে, নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের এখানে যে সব ঘটনা ঘটছে, তাই নিয়ে আমি কোনও আষাঢ়ে গল্প ফাঁদব। কিন্তু তা' হলে খুব আপসোসের সঙ্গে বলছি, "আপনাদের নিরাশ হতে হবে! মানুষের জীবন নিয়ে আর অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে তা' থেকে গল্পের প্লট জোগাড় করার মত মানসিকতা আমাদের নেই! এসব কাজে ওস্তাদ হোল পাতি বুর্জোয়া দলগুলির মুখপত্রের সাংবাদিকরা। তারা রাজনৈতিক বেশ্যাগিরির বেলেল্লাপনা ফলাও করে লেখে। একটা দেশ আর জাতের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের কথা আমরা "দেশদ্রোহী" হয়েও এমন করে বলতে পারব না! তবে সাম্প্রতিক কালে এই সব ধাড়ী বজ্জাত পাতি বুর্জোয়া নেতাদের কাজকর্মের কিছু কথা আপনারা নিশ্চয় জানতে পারবেন, যার ফলে আপনারা নিজেরাই মূল্যায়ন করতে পারবেন ওদের রাজনৈতিক ভূমিকার, অবশ্য যদি ওদের এ হেন কোনও ভূমিকা থেকে থাকে, তবেই...!

জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, জামাতে উল-উলেমায়ে এবং সাবেক মুসলিম লীগের তিন ধ্বজভঙ্গ বংশধর—কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ এবং কায়েদে আজম লীগ ইত্যাদি দলগুলি রাত-দিন ক্ষুধার্ত হায়েনার মত ইসলাম, ইসলাম বলে চিৎকার করছে। রাজনীতির আস্তাকুড় এই সাম্প্রদায়িক সংঘগুলি একদিকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, অপর দিকে আওয়ামকে গণতান্ত্রিক ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এই দীর্ঘ তেইশ বছরের জীবনে ওরা এতটুকুও বদলায় নি। আবুল আলা মওদুদী, গুলাম আজম ইত্যাদি ভণ্ড, রাজনীতিব্যবসায়ী শয়তানরা আজও সভা-সমিতিতে বলে বেড়াচ্ছে যে, ক্ষমতায় এলে জনসাধারণকে গণতন্ত্র পাইয়ে দেবে, অবশ্য এই কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে "গণতন্ত্র" শব্দটির পিঠে ইসলামী শব্দটি বসিয়ে

পূর্ব বাংলার কবিতা

রবীন্দ্রনাথ, তোমাকেই খুঁজি

কায়সুল হক

আবিলতায় যখন
গেছে ভরে কবিতার নির্মল অঙ্গন।
রবীন্দ্র ঠাকুর,
আমি তোমাকেই খুঁজি—
কেন না, তোমার উপস্থিতি করে দূর
জীর্ণতার সব গলি-ঘুঁজি।

আমার বাংলা

কায়সুল হক

বাংলা, তোমার মাঠ জুড়ে শুয়ে থাকে
চাঁদের অমল আলো যখন, তখন
পরীদের দেশে মন চলে যায়। আর সাত পাকে
বাঁধো জীবনকে আশীর্বাদের মতন।

সজনে ডাঁটার গন্ধ—
মাছের চচ্চড়ি—
সব কিছু মিলিয়ে আমার
আ মরি সোনার বাংলাকে আমি দেখি।

প্লাবনে অথবা সাইক্লোনে
অবিরাম লড়ে যে বাংলা,
নারিকেল সুপারির অন্তরঙ্গতায়
আম জাম কাঁঠালের কলার বাগানে
অথবা কলমি শাক-ভরা পুকুরের
টল টল জলে যে বাংলা
তাকে আমি রোজ দেখি।

আ মরি সোনার বাংলা তোমায় আমি
ভালোবাসি-

দিতে ভুলছে না তারা। মক্তব আর মাদ্রাসায় বসে দশটা বিবি নিকে করা, মস্তিষ্কে শয়তানী প্যাঁচভরা, দশ হাত দেড়েল মৌলভীর দন্তহীন মুখনিঃসৃত যাবতীয় অগণতান্ত্রিক এবং সভ্য সমাজ-বিরুদ্ধ কথা-বার্তা শুনে শুনে এর বেশি আর কত-দূরই বা ওরা যেতে পারে! একদিকে "গণতন্ত্র গেল, গেল" করছে, কোরান, সুন্না মাথায় তুলে নাচছে, আবার অপর-দিকে ভোট পাবে না—এই আশংকায় সীমান্তের জেলাগুলি থেকে গুণ্ডা দিয়ে সংখ্যালঘুদের জন্মভূমি. থেকে বিতাড়িত করছে। হালে প্রকাশিত আইন কাঠামো খসড়ায় বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একদিন পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তৃতীয়ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান অবশ্যই মুসলমান হবেন—আইন কাঠামো খসড়ার এই তিন অগণতান্ত্রিক বিধি আরও উৎসাহিত করেছে আলোচ্য সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে। তারা দেখছে যে, স্বয়ং ইয়াহিয়াই যেখানে উস্কানী দিচ্ছেন, সেখানে ভয় পাওয়ার কিছু থাকতে পারে না। অতএব নির্ভাবনায় দাড়ি নেড়ে, ছুরি আর মশাল হাতে রাস্তায় নেমে পড়, মুখে আল্লা-তালাহের নাম থাকবে, কেউ কিছু বলবে না।

কিন্তু বলার জন্যে আর কেউ না থাকলেও আমরা তো আছি, আর আছে কোটি কোটি আওয়াম। আমাদের সাধারণ বিচার-বিবেচনায় এবং এই নেতাদেরই হাত-পা ছোড়া বক্তৃতা থেকে অন্তত এই-টুকু বুঝেছি যে, আমলহীন ইলম্ ফুটো কলসীতে ঢালা পানির মত। কিয়ামতের দিনে বে-আমল আলিমকে অতি কঠিন সাজা পেতে হবে এবং সে সাজা দেবে পাকিস্তানের মানুষ, আল্লাহ্ নয়! আলিম সাহেবানের খেদমতে আমরা অতি বিনীত আর্জি পেশ করছি, আপনারা কোরান আর সুন্নার ব্যাখ্যা নিয়ে যত খুশি গুঁতো-গুঁতি, কোস্তাকুস্তি করুন আপত্তি নেই, কেবল মেহেব্বাণী করে সাধারণ মানুষ-গুলোকে টানবেন না। তা হলে হুজুররা, আমরা আর সামলাতে পারব না, আপনা-দের মেহেদীতে ছোপা দাড়িগুলি বেধড়ক উপড়াতে শুরু করব। কোনও আল্লা-তালাহের ভয় আমরা করি না। কেন না আল্লাতালাহ, ইসলাম, কোরান ইত্যাদি শব্দগুলিকে আমরা যাদুঘরে দাফন করে এসেছি। কাজেই দাড়ি সামলাতে চান তো দৌড়ে পালান।

ইসলামের বাহন, এই পাতি বুর্জোয়া-ধর্মীয় দলগুলি পাকিস্তানের অনেক ক্ষতি করেছে। রাজনীতি কারও পৈতৃক সম্পত্তি বা শ্বশুরের দেওয়া যৌতুক নয়। রাজনীতি অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকার উপায়। কাজেই রাজনীতিতে ধর্ম বা কায়েমী স্বার্থকে টেনে আনা ঘোরতর অপরাধ। কিন্তু পাকিস্তানের মৌলভী বাবারা তাই করেছে। তাদের বদিরামিতে আজ তেইশ বছরেও পাকিস্তান একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংবিধান পেল না। তাই নির্বাচনের মধ্যে যাওয়া বা মোল্লা-মৌলভীদের পাশে এসে দাঁড়ান হবে মস্ত এক ভুল। তবুও এই ভুল হোক, আওয়াম এই ভুল করুক, এটাই আমরা চাই, কেন না, তা হোলে তাদের চোখ ফুটবে। তারা বুঝবে যে, বাঁচার জন্য লড়াই করতে হয়, নির্বাচনের ক্ষমতা নেই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে কেবলমাত্র বিপ্লব।

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

আমি সাপ্তাহিক বসুমতী নিয়মিত রাখি। বসুমতীর 'নিরপেক্ষতার' ভূমিকা যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর শেষ হয়ে যাওয়াও গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি। আমার, বিশেষ করে গত ৩০শে এপ্রিলে "সপ্তাহের বোঝা" সম্পর্কেই বক্তব্য। কৃত্তিবাস ওঝা মহাশয় এই সংখ্যায় কেরলের পরিস্থিতির সঙ্গে পঃ বাংলার তুলনামূলক বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই একটা জিনিস উল্লেখ করেন নি, তা হল কেরলে নাম্বুদ্রিপাদের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের বিরোধী কংগ্রেস দলের সঙ্গে একত্রে প্রস্তাবে ভোট দেওয়া—দুর্নীতির তদন্তের প্রশ্নে। কিন্তু পঃ বাংলায় সেরকম পরিস্থিতি উদ্ভব ত হয়ই নি, উপরন্তু বিধান সভায় অজয়বাবুর "অসভ্য বর্বর" সরকারের দ্বিতীয়বারের উক্তির বিরুদ্ধে কেউ-ই ভোট গণনার দাবি তুলে তাঁকে অপদস্থ বা পরাজিত করেন নি। আর কেরলে কে বিশ্বাসঘাতক তা আজ দুই কংগ্রেসের যুক্ত সমর্থনে সরকার টিকিয়ে রাখার মধ্যেই প্রমাণিত। বাংলার পরোক্ষ কংগ্রেস শাসনের সঙ্গে তার তফাৎ কতটুকু? "স্বেচ্ছায় বলে-কয়ে......মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করছেন, এমন নজির কোথায়? সেই কাজ অজয় মুখোপাধ্যায় করলেন।" একেই বলে একপেশে পক্ষপাতিত্ব, সেই জন্য এখানে নাম্বুদ্রিপাদের নামের উল্লেখ নেই। কেরলে ভোটে নাম্বুদ্রিপাদের পরাজয় ঘটলে শরিক দলগুলো জানিয়েছিল, এই প্রস্তাবে অনাস্থা প্রকাশ বোঝায় না, সুতরাং তাঁর পদত্যাগের প্রয়োজনও নেই। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী নির্লজ্জের মতন গদি আঁকড়ে থাকেন নি। থাকলে আজ জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোয় তার প্রকাশ কি রকম হত, তার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তা ছাড়া একথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত যে, কংগ্রেস বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তার স্বরূপ চিনতে জনগণের ২০ বছর লেগেছিল। তাই বলে এটা প্রমাণ করে না যে, কংগ্রেস যেহেতু ২০ বছর জনতার সমর্থনপুষ্ট ছিল, তাই তার পথও সঠিক ছিল। যে কথা ওঝা মশাই বেশি ভোট পাওয়ার কথায় উল্লেখ করেছেন কেরলের দুটি নির্বাচনের সময়। তা হলে তো বলতে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বিপুল জনসমর্থনপুষ্ট হিটলারের নীতিও সঠিক। আর আজ পঃ বাংলায় যদি দুই কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-এম-বিরোধী কোন যুক্ত মোর্চা হয়, তবে এখানেও তার ফলাফল এমন কিছু কেরল থেকে অন্যরকম হবে না। তাই বলে কি সি-পি-এমকে কায়েমী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থকে বলি দিতে হবে?

একথা আজ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারতের রাজনীতিতে দ্রুত শ্রেণী-বিন্যাস (polarisation) সংগঠিত হতে চলেছে। তাই বিভিন্ন রাজ্যে অন্যান্য দলের (সি-পি-এম ছাড়া) যুক্তফ্রন্ট হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসরচিত ভূমি-সংস্কারও রূপায়ণ করা যায় নি এবং কায়েমী স্বার্থের গায়ে আঘাত করতে সক্ষম হয় নি। তাই দেখি জনতার উদ্বোধিত স্বাধিকারবোধ জাগ্রত হতে দেখে বাংলা কংগ্রেস হতে শুরু করে "আর এস পি" এস-ইউ-সিরও শ্রেণীস্বার্থ প্রকাশ হয়ে পড়তে—যার থেকে কৃত্তিবাস ওঝা মহাশয়ও অব্যাহতি পেতে পারেন না। তবে একটা কথা তিনি সত্যিই বলেছেন, "কালের বিচারে ধরা পড়বে কে বিশ্বাসঘাতক, আর কে দেশপ্রেমিক।" সম্ভবত দ্রুতবর্ধমান রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে দিনের আর বেশি দেরি নেই। স্থানীয় গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে যদি সত্যিকারের শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা যায়, তবেই আগামী দিনের ফ্যাসিবাদকে রুখতে পারা যাবে। নচেৎ তাঁর সি-পি-এম-বিরোধিতা তার আগমনকে ত্বরান্বিত করেই তুলবে।

—সত্য বসু,
৮নং রাজা মণীন্দ্র রোড,
কলকাতা-২

* * *

গত ২৩-৪-৭০ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয়টি পড়ার পর আমার এক বন্ধুকে পড়তে দিই আমার সন্দেহ নিরসনের জন্য। বন্ধু বাংলার শিক্ষক। পড়ে বললেন—"দেখ, ক্লাসে ছেলেদের লেনিন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দিতে সাহস হয় না। কারণ তাতে চাকরি রাখা দায় হতে পারে। কিন্তু আমার 'প্রাইভেট' ছাত্রদের লিখতে দিয়েছিলাম। বলতে কি, তাদের মধ্যে দু'-একজন যা লিখেছে, তার মান কিন্তু এটার চেয়ে উচ্চু।" আমার এদিকটা অবশ্য খেয়াল হয় নি। আর এটা মানতেও চাই নি। বন্ধু নিছক সাহিত্যরসিক। এছাড়া আর কিছু বলতে পারে নি। তাই আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি। আপনি লিখেছেন—"তাঁর (লেনিনের) সংগ্রাম ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে" এবং "গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রাম ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে।" এটা ঘটনা যে, রাশিয়ায় জারের পতন হয় এবং ভারত থেকে ইংরেজকেও শাসন গুটিয়ে নিতে হয়। আপনার লেখা অনুযায়ী এই দুটো ঘটনাই যেন একেবারে অভিন্ন এবং সেই অনুযায়ী (যেহেতু অন্য কোন কারণ বা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আপনার বক্তব্যের মধ্যে নেই) সময়ের ফারাক বাদ দিলে রাশিয়া ও ভারতবর্ষ, দুটি দেশেই যেন সংগ্রামের ধারা ছিল এক এবং যে সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর উভয় দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাও একই—এটাই হয় স্বাভাবিক উপসংহার। আপনি কি মনে করেন তাই হয়েছে? উভয় দেশেই কি সংগ্রামের ধারা এক ছিল এবং ভারতবর্ষেও কি ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে? "নির্যাতিত মানবমুক্তির প্রতীক মহামানব লেনিন"—এই ধরনের গালভরা ফাঁকা বুলি ও সুদীর্ঘ উদ্ধৃতির আড়ালে আপনি লেনিনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাটা বেমালুম চেপে গেলেন কেন? গত ১-৪-৭০ তারিখে মনোরঞ্জন হাজরা "সেই অভিশপ্ত জগৎ"-এ লিখেছেন—"মহাত্মা গান্ধীর বাণী প্রচার এদের জীবনাদর্শের পক্ষে শুধু একটা সুকৌশলী 'ক্যামোফ্লেজ'। আসলে এরা হিপোক্রিট—ভণ্ড, বিড়াল-তপস্বী।" আজকে এই ভণ্ডামীর মুখোস খুলে পড়েছে। তাই চাই নতুনভাবে 'ক্যামোফ্লেজ'। তাই 'তেরঙা' ছেড়ে অনেকেই 'একরঙায়' গা ঢাকছেন দেখা যাচ্ছে। মহাত্মা, মহামানব, ছ' মাস আগে-পরে জন্মানো এবং উভয়েই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী (কোলাকাত্ত) প্রভৃতি সাদৃশ্য টেনে এনে আপনারাও যে আজ ঐ পথের পথিক, এটা ভাবা কি ভুল হবে?

আমার মনে হয়, ভুল যে হবে না তা শিক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে যা বুঝেছি এবং স্বাভাবিকভাবেই যা অন্য যে-কোনভাবে পাওয়া 'ইনফরমেশন' অপেক্ষা মূল্যবান, তাই দিয়ে আপনাদের গত দুই-একটি সংখ্যায় শিক্ষকদের গণ-সংগঠন সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য বিচার করলেই বোঝা যায়। আপনি ৪৩শ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' বলেছেন যে, "অসংখ্য শিক্ষক প্রতিনিধি সমিতি বর্জন করে বেরিয়ে গেছেন।" আমি তিনদিন সমস্ত সময় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সম্মেলনে প্রায় ছ' হাজার শিক্ষক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কতজন হলে তাকে আপনি অসংখ্য বলে মনে করেন? অমৃতবাজার বলেছে—২ হাজার, দৈনিক বসুমতীর মতে—বহু

নিয়ন্ত্রক. দপ্তরের মতে—কয়েক হাজার, অন্যান্যভাবে বলা হয়েছে—অধিকাংশ। শিক্ষক (অর্থাৎ তিন হাজার—না হলে অধিকাংশ হত না।), আর আনন্দবাজার বলেছে—তিন শ'। আপনার 'অসংখ্য' এই তিন শ' থেকে তিন হাজারের মধ্যে, না তার চেয়েও বেশি? কিন্তু আমি দেখেছিলাম আড়াই থেকে তিন শ'র মত শিক্ষক উঠে গিয়েছিলেন এবং ঐ সময় চন্দননগরে অন্য এক জায়গায় নাকি সুশীল ধাড়ার উপস্থিতিতে বাংলা কংগ্রেসের একটি সভায় তাঁদের যেতে বলায় কিছু ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আপনারা সাংবাদিকরা একজন যাকে তিন শ' বলে মনে করেন, আর একজন তাকে তিন হাজার মনে করেন কিসের স্বার্থে? আপনাদের স্বার্থ নিয়ে অবশ্যই আপনারা থাকবেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, আমরা শিক্ষকরা ৫৭ জনের ঐক্যকে বেশি শক্তিশালী মনে করব, না ৩ জনের বিচ্ছেদ কামনা আমাদের কাছে বড় হবে?

এর পর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সংখ্যার (৪৩শ সংখ্যায়) 'বঙ্গদর্শনে' এ-বি-টি-এ'র মূল প্রস্তাব বলে যেগুলি তুলে দিয়েছেন, সেগুলির প্রতি। একটা একটা সংগঠনের গায়ে কালা ছিটানোর আগে তাদের বক্তব্য একটু ভাল করে আপনার পড়ে দেখা উচিত ছিল। এ-বি-টি-এ'র স্মারকগ্রন্থের আপনি ১ থেকে ৮ পৃঃ পড়তে অনুরোধ করেছেন। মূল প্রস্তাবগুলি আছে সাত পৃষ্ঠায় এবং সেগুলির প্রথমটি হচ্ছে আপনি যেটিকে ৬নং বলে লিখেছেন। এই ভুলটা হয়েছে এজন্য যে, আপনি যেগুলি প্রস্তাব বলে উল্লেখ করেছেন, আসলে সেগুলি সাত পৃষ্ঠায় বর্ণিত দাবিগুলির ভিত্তিতে আন্দোলনের কর্মসূচী—যা ৮ পৃঃ দেওয়া আছে। এ ছাড়া এ ব্যাপারে আমার যা প্রধান বক্তব্য, তা হচ্ছে স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত মূল প্রস্তাবের খসড়ায় ছাপার ভুল থাকায় ও কিছু অংশ বাদ পড়ায় প্রত্যেক স্মারকগ্রন্থের সঙ্গে আসল মূল প্রস্তাব ক্রোড়পত্র হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং প্যান্ডেলেও প্রচুর বিলি করা হয়েছে। আর সেটাই সম্মেলনে পেশ করা হয়েছিল. অথচ আপনি এমনি শিক্ষকদের হিতৈষী যে, 'বঙ্গদর্শনে' আসলটির কথা চেপে যেয়ে সকলকে ভুল ও পরিত্যক্তটি পড়ার অনুরোধ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন।

লাম্প গ্রান্ট স্কুলের শিক্ষকদের জন্য আজ সাত বৎসর বাদে হঠাৎ ১৯৭০ সালের এ-বি-টি-এ' সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্ব থেকে আপনার মত আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের যেন চোখের জল বাধা মানছে না। মায়ের চেয়ে যেন মাসীর দরদ বেশি। এতদিন কিন্তু কাউকে একটা কথাও বলতে শোনা যায় নি। যাই হোক, এ-বি-টি-এ'র সম্মেলনের সম্পাদকীয় রিপোর্টে এঁদের সম্বন্ধে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে, সত্যপ্রিয় রায় এঁদের জন্য কি করেছেন তাও আছে এবং এঁদের দাবি একটি অন্যতম প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে (৪১শ সংখ্যায়) 'বঙ্গদর্শনে' "অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানটি সমস্ত কিছুই বিচার করেন রাজনীতির নিরিখে, বোধ হয় মনে করেন যে, বর্তমানে এই তিরিশ হাজার শিক্ষককে তাঁদের সঙ্গে না পেলেও চলবে।" আপনাদের এই উক্তিটির মত স্ববিরোধী উক্তি আমি খুব কমই দেখেছি। কারণ যদি এই প্রতিষ্ঠানটি সত্যই সব কিছু বিচার করেন রাজনীতির নিরিখে, তাহলে এটা নিশ্চিত যে, ঐ রাজনীতির অনুগামী মানুষ এই ত্রিশ হাজারের মধ্যেও আছেন এবং পৃথিবীতে এমন কোন রাজনৈতিক দল নেই, যারা নাকি দলবৃদ্ধির চেষ্টা করে না। আপনাদের বক্তব্যের মধ্যে এই স্ববিরোধিতা যে আরও কত গভীর ও ব্যাপক, তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ৪২শ সংখ্যায় প্রণবেশ চক্রবর্তী নামে জনৈক লেখক যে শিক্ষার কেচ্ছা লিখেছেন, তাতে অনেক আগড়ম-বাগড়ম বলে 'জ্বালাময়ী' বক্তব্য রেখে পরে বলেছেন, তিন শ'র বেশি স্কুল কমিটিকে বাতিল করা হয়েছে দলীয় স্বার্থে। আপনাদেরই দেওয়া 'দরদী শিক্ষাব্রতী' ও 'সুযোগ্য প্রশাসক' বিশেষণে ভূষিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক শ্রীনির্মল সিংহ আপনাদেরই বিশেষ প্রতিনিধিকে বলেছেন (৪০শ সংখ্যায় ২৫১৩ পৃঃ)—"এই সব বিদ্যালয়গুলিতে টাকা-পয়সা নিয়ে নানা রকম দুর্নীতি চলেছে। শিক্ষকদের চাকরির কোনও নিরাপত্তাই ছিল না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কীর্তি আমি ফাইল খুলে সাংবাদিকদের দেখিয়েছি। ....যথার্থ শিক্ষাদরদী বাঙালী এ কাজকে নিন্দা করবেন বলে মনে করি না।" এরপর প্রণবেশবাবু বলেছেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে "তাঁর (শিক্ষামন্ত্রীর) হুকুম তামিল করার যন্ত্রে পরিণত করে এক স্বশাসিত সংস্থাকে কুক্ষিগত করেছেন নিপুণভাবে।" কিন্তু আপনাদের বিশেষ প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক মহাশয় বলেছেন (৪০শ সংখ্যা ২৫১৩ পৃঃ)—"অনেক বিষয়েই আমাদের সরকারের মতামত নিতে হয়। ১৯৬৩ সালের 'এ্যাক্ট' অনুসারেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারের মতামত একান্ত আবশ্যক।" প্রণবেশবাবু বলেছেন, "স্কুলগুলি বাতিল করে প্রাথমিক শিক্ষাকে আমলাতন্ত্রের হাতে সঁপে দিয়েছেন।" আমি ১৯৬৯ সালের ৪৭শ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' 'ঘুঘুর বাসায় বজ্রাঘাত' হেডিং-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জেলা স্কুলবোর্ড বাতিল করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে আপনারাই বলেছিলেন, "এই সিদ্ধান্ত খুবই সুবিবেচনাপ্রসূত হয়েছে, বোর্ডগুলি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল এবং এই দুর্নীতির ঘাঁটিগুলি মারফৎ কত সরকারী টাকার যে নয়-ছয় হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।" এই ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু এইগুলি যথেষ্ট মনে করে আমার বক্তব্য আর বাড়াতে চাই না।

—প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়
ব্যারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশন,
পোঃ ব্যারহাট্টা, হুগলী

* * *

২রা এপ্রিল তারিখে সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয়তে যে প্রবন্ধটি বহু পাঠক-পাঠিকাকে বিচলিত করেছে, তা "পাঠকমনে" প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের তের মাসের শাসনে ফ্রন্টের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের যে কীর্তি স্থাপন করেছেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের যে কাহিনী ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, সেই সাফল্য সমগ্র রাজ্যবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু? যে দশ লক্ষ বিঘা জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে, সমগ্র ভূমিহীন কৃষকসমাজ তাতে কতটুকু উপকৃত হয়েছে? শ্রমিকের অর্জিত সাফল্য তাদের জীবনযাত্রার মানের কি উন্নতিবিধান করতে সক্ষম হয়েছে? বরং শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে নূতন লগ্নী না হওয়ায় বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

কৃত্তিবাস ওঝা মহাশয়ের কিছু কিছু বক্তব্য আমার হাসির খোরাক জুগিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আরামবাগ ও বর্ধমানের পুলিশ অফিসার নির্যাতনের যে কষ্ট-কল্পিত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা তিনি করেছেন, তাতে তাঁর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হয়ে পড়েছি। আমার মনে হয় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধাটা কিসের?

আমাকে সর্বাপেক্ষা নিরাশ করেছে রাজ্যের জাগ্রত নারীসমাজ। মিটিং-এ, মিছিলে, ট্রাম-বাসে, অফিস-আদালতে তাঁরা আমাদের সংগ্রামের সাথী। কিন্তু বর্তমান রাজ্য-রাজনীতির যুগসন্ধিক্ষণে তাঁরা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। পাঠকগনে তাঁদের কোন বক্তব্যই আমার নজরে পড়ে না। এই কলমে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশিত হলে তাঁরা কি চিন্তা করছেন তা আমরা জানতে পারতাম, কারণ রাজ্য বোর্ড রাজনীতিতে তাঁদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

—জনৈক প্রাথমিক শিক্ষক
কল্যাণ (হুগলী)

ক্যানসার

সিগারেট দেখলেই শ্রী আমাকে ক্যানসার সম্পর্কে সতর্ক করে।

অথচ সেদিন সে-ই ফিক করে মুচকি হেসে বললে, 'বাজারে এখন সেরা সিগারেট কোন্‌টা বলত?' ভাবলাম বিজ্ঞাপনে বিশেষ কিছু নজরে এসে থাকবে হয়ত। কিছুটা মজার খোরাক পেয়েছে তাতেই। কিন্তু আমার জানা সব কটি সেরা সিগারেটের নাম যখন একের পর এক আউড়ে গেলাম, তখনও প্রতি ক্ষেত্রেই সে একাপিঠ চুল ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে বলতে থাকল, 'উঁ হুঁ!' শেষে বিরক্ত হয়ে বললাম, 'হেরে গেলাম, জানি না।' শ্রী বিজয়িনীর মতো নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সংগে ওষ্ঠাধর কুঁচকে বললে, 'জানবে কী করে, সাড়ে তিন টাকায় দশটা ফুঁকতে হলে তার খরচ জোগাতে নিজে সুদ্ধ ফুঁকে যেতে!'

'কোনো বিলিতী ব্রান্ড বুঝি?'

'মোটেও নয়, খাঁটি ইণ্ডিয়ান নাম। যেমনি মিষ্টি স্মেল তেমনি মিষ্টি স্বাদ!'

শুনে আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল। শ্রীও তাহলে দু-চার টান দিচ্ছে নাকি দুপুরবেলা আমার অনুপস্থিতির সুযোগে! সর্বনাশ, নিজের পাপেই মাসিক আয়ের মোটা অংশ মহানগরীর আকাশ-বাতাসে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে, দুদিন বাদে লায়েক ছেলের সিগারেট খরচাও আমার তহবিল থেকেই যোগাতে যেতে হবে, যদ্দিন পড়াশুনো, যদ্দিন বেকার। তার ওপর শ্রীমতীও যদি ধূমোযতী হন তবে তো কাবুলার স্মরণ হওয়া ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় উপায় থাকবে না। মনে মনে তখনই মতলব এ'টে ফেললাম, আর নয়, অতঃপর আলমারির চাবির গোছা কোঁচার খুঁটেই বেঁধে ফেলতে হবে।

শ্রীকে শুধোলাম, 'ব্যাপার কি, তুমি ঐ রাজকীয় সিগারেটের নাম সংগ্রহ করলে কোত্থেকে? ও জিনিস তো বিশেষ বিজ্ঞাপিত হতে দেখি নি।'

'দেখলেও সভয়ে নিশ্চয় দূরে সরিয়ে নাও। কিন্তু বকুরা ওটাই খায়। বলল, ভারি মিষ্টি!'

মেয়ে মাত্রেই মিষ্টি এবং আধুনিক কলকাতায় যাবতীয় বস্তুরাজির মেয়েলী বিশেষণই শুনছি, 'মিষ্টি'। সুতরাং মেয়েলী সার্টিফিকেটের মিষ্টত্বে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ব্যস্ততার সংগে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমিও খেলে নাকি? বকু, মানে সওদাগরী অফিসের সেই জুনিয়র অফিসর ভদ্রলোকের এম-এ-পড়া মেয়েটি তো? তা সে আবার এখানে এসে সিগারেট টানছে কবে থেকে?'

আমার মাথায় তখনও যে আর্থিক প্রসঙ্গ বোঁ বোঁ করছে, ভাগ্যিস শ্রী তা ধরতে পারে নি। সে সরলভাবে ঘটনাটা গুছিয়ে বিবৃত করল।

আজকেই বে'র হওয়ার সময় ফটকের ওপর শ্রীকে আমার লাইটারটা দিয়ে গেছলাম। ওটায় ফুয়েল ফুরিয়েছে। কে আর বোঝা নিয়ে পকেটে ঘোরে। সে সময় নাকি বকু তার পাশেই ছিল। শ্রীর হাতে লাইটার দেখে সে বলেছে, 'আপনি সিগারেট খেয়েছেন বৌদি? আমরা রোজ খাই। কলেজ কম্পাউণ্ডে গোল হয়ে বসে সিগারেট টান দিতে যা আরাম না! গালে আস্তে আস্তে টোকা দিলে খোকা খোকা রিং হয়। কী মিষ্টি!'

শ্রী জিজ্ঞেস করেছিল 'ধোঁয়া গিলিস তোরা?'

'বাঃ, এটাই তো সুখ। বুক-গলা জ্বলে যায়। ধোঁয়া ভারি না হয়ে ফ্যাস-ফ্যাসে হলে যন্ত্রণার একশেষ। সড়সড়ে কাশি। ম্যাগো!' তার পরই সে তার

ঃ কী মিষ্টি, না গো ধোঁয়া ভারি না হলে হ'য়ে ফ্যাসফ্যাসে হলে সড়সড়ে কাশি।
ঃ আরও বলব কি

স্পেশাল ব্যাঙ্কের [illegible] করে ওরা আরও বড়েছে, জানেন, স্বাগিমা বলছিল, আরও বড়ো [illegible] আই। একদিন আমরা শুভ্রমিতার স্টাডি রুমে ড্রিংক করব!"

আমি সামনের আরাম কেদারাটায় বসে পড়েছি ততক্ষণে শিথিল তনু সামলাবার জন্য। শ্রী হাতলের ওপর বসে বললে, 'কী হল, একেবারে প্রস্বাসিস মনে হচ্ছে! মেয়েদের স্মোকিং শুনে যে একেবারে মরে যাচ্ছ। আমরাও কলেজের ছাদে দু-একদিন স্মোক করে দেখেছি। কাশতে কাশতে দম ফেটে গেছল। এখন এ পাড়াতেই বুকুর মতো আরও দু-একটি মেয়ের হাতব্যাগে সিগারেটের প্যাকেট থাকে।'

মনে মনে বললাম, বাপের পয়সায় স্মোক করার অভিজ্ঞতাটা যে ভাগ্যবশে কাশির দমকেই শেষ হয়েছে এ আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। প্রকাশ্যে বললাম, 'বুকু আজ এম-এ পড়ছে আর তুমি কোন্ সেই ফিফটি-এইটে গ্র্যাজুয়েট হয়েছ। এতো জুনিয়ারদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বটা আরও গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া উচিত! স্মোকিং, ড্রিঙ্কিং, আমাদের কালে এসব তো ছিল না!'

'আমাদের কালে এমনটি ছিল না'— কালজয়ী এ বাক্য প্রতি দশকেরই বার্ধক্যের বিষণ্ণতা। কিন্তু কে জানত কথাটি আমাকে আটত্রিশেই আওড়াতে হবে। শহর এতো দ্রুত এগোবে!

আমরা যেকালে ছাত্র, অর্থাৎ পঞ্চাশের গোড়াগুড়ি, সেকালে বঙ্গ ললনার ধূমপান তো দূরের কথা, য়ুনিভার্সিটি ছাত্রদের মধ্যেও পানাভ্যাসের এমন হিড়িক ছিল না। এখন কলকাতায় 'বারে'র সংখ্যা ঢের বেড়েছে। আর অধিকাংশই রেস্তোরাঁ-কাম-বার হওয়ায় কে যে খাদ্য গ্রহণ আর কে বা 'বার'-গমন করছেন, বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। দৈবাৎ ঘসা কাঁচের দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলে এমন অনেককেই বিলাতি রঙিন জলে চুমুক দিতে দেখা যায়, অতি সুবোধ পড়ুয়া ছেলে বলে যাদের নামডাক, মিথ্যা বিজ্ঞাপন মাত্র নয়। আমাদের কালে ট্রামে-বাসে প্রকাশ্য স্থানে মদ্যপানের সমর্থ আলোচনা প্রায় অশ্রুতই ছিল। এই দশকে এসব আলোচনা একেবারে বৈঠকী চানাচুর। এর জন্য সাহিত্যে-চলচ্চিত্রের অবাধ পানমত্ততাও যে, সমাজজীবনে পানবিলাস বিস্তারের সহায়ক, সে কথা আর তর্কের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মেয়েদের ধূমপান ও পানাশক্তির এ হেন পরিচয় সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে এখনো তেমন সচল হয় নি। সুতরাং বুকুর কাহিনী শোনার পর স্বাভাবিক কারণেই সচকিত হয়েছি। [illegible]

স্টাডি রুমে লম্বা 'জুলফিকার' বয় ফ্রেন্ডের ফোটো ফ্রেম টাঙানো থাকে

পুরুষের চাইতে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। সিনেমা পত্রিকা তো মেয়ে হাতের পঞ্জিকা। স্টারের ঠিকুজি-কুষ্ঠী কণ্ঠস্থ। চলন্ত গাড়ি থেকে সিনেমা বিজ্ঞাপন [illegible] সাদরে দেখতে দেখা যায়। উত্তেজনায় কারো কারো গ্রীবাদেশ তখন [illegible] মতো লম্বাকার ধারণ করে. এবং আধুনিক উত্তেজক সাহিত্যও (?) স্বল্প বয়সিনীদের মধ্যে বিশেষ আদৃত। প্রভাব সুতরাং পড়ছেই। কিন্তু সে কথা থাক।

মেয়ে-মুখে স্মোক নিয়ে আমার বিন্দুমাত্রও মাথা ব্যথা নেই। সিগারেটময় কলকাতা না হয় ফেয়ার সেক্সের মুখে আরও একটু এ্যারোমেড হবে। আমি ভাবছিলাম সাংসারিক বাজেটের কথাটাই।

পিতৃকুল সেকালে কন্যাদায়ে কাতর ছিলেন। তাতেই কত না কেতাব! অনেক কবি-সাহিত্যিক তো ফেমাস হয়ে গেলেন। তবু তো সেদিন মেয়েদের পেছনে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির কিম্বা রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগপ্রধান, সেতার, গীটার, পপ গান, চ্যাব ডান্সের শিক্ষা বাবদ খরচ-খরচ ছিল না। আজ সেগুলি তো আছেই, আছে পোষাকের নিত্য-হালিস ফ্যাশন, [illegible]

নোটের খরচা, টয়লেট শ্যাম্পু ছাড়াও অল্প বয়সিনীর পাকা চুল কাঁচানোর জন্য হেয়ার ডাই। তদুপরি সাড়ে তিন টাকা প্যাকেটের সিগারেট আর পাঁচ টাকা পেগের বিলিতীর যোগান দিতে হলে পিতৃকুল তো বটেই, অভ্যাস বজায় রাখতে বেচারী স্বামীকুলও বানপ্রস্থে বৃক্ষচ্ছায়ার সন্ধান করে ফিরবেন।

যে মেয়ের স্পেশাল স্টাডি রুমে লম্বা 'জুলফিকার' বয় ফ্রেন্ডের ফোটো ফ্রেম টাঙানো থাকে, বই-এর সঙ্গে বাৎসায়নের সহাবস্থান সম্ভব হয়, তাঁরা না হয় তেমন ভাগ্যবান স্বামীটিই হাতিয়ে নেবেন, যাঁদের বৈঠকখানায় নিজস্ব বার থাকে। কিন্তু বুকুদের কী হবে! বুকুরা আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পাড়ায় থেকে মধুমিতা বান্ধবীদের স্টাডি রুমে গিয়ে যদি নির্বিঘ্ন ফল স্টাডি করে টইটম্বুর হয়ে মধ্যবিত্তের সংসারে কৌতুক ও কৌতূহলের বন্যা বহাতে শুরু করেন, তবে সে ভার সামলাবেন কে? বেকার [illegible] বেশি বাড়লে বাড়ি থেকে আ-সাধ্য [illegible] নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কিন্তু [illegible]

সজ্জা এখনো তৈরী হয় নি। বন্ধুদের নিয়ে সুতরাং কি করা?

বখাটে ছেলের গার্জেনরা মস্তান ছেলেকে খুঁজে আনেন মাঠ-ঘাট, চায়ের দোকান, আর পাড়ার রোয়াক থেকে। মেয়ে বখে গেলে তার সন্ধানে ফেরা সহজ নয়। রেস্তোরাঁর ঘেরাটোপ সরিয়ে বখা মেয়ে খুঁজে আনতে গেলে গারদে যেতে হবে। মধুমিতাদের স্টাডি রুমে গলা বাড়াতে গেলে গ্রে হাউন্ডের হাউলিং-এ হান্ড্রেড ইয়ার্ডস তফাৎ থেকেই মানে মানে পশ্চাদপসরণ। অতএব বন্ধুর ড্যাডিদের সামনে সমূহ বিপদ।

শহর কলকাতার শতেক ঝামেলার মধ্যে বন্ধু আবার নতুন এ কী ঝামেলা নিয়ে আসছে!

আমি স্ত্রীকে অসহায়ের মতো গদগদে গলায় সবিনয় নিবেদনের ভঙ্গিতে অনুরোধ করলাম, 'বন্ধুর সঙ্গে বেশি মেলামেশা কোরো না!'

সে অবাক হয়ে আমাকেই দেখছিল। আমার কপালে চোখের কোলে ঘামের বিন্দু। নিশ্বাস দ্রুততর। কী বুঝল সে, কে জানে। উঠে দাঁড়াল। গুটি গুটি চলেও গেল। হয়ত ভাবল, মুখে আর কলমের ডগায় নারীমুক্তির বড় বড় বুলি। অথচ এতেই এতো!

কিন্তু আমি তাকে কী করে বোঝাই, বন্ধু এক সংঘাতিক সোসিও-ইকনমিক ক্যানসার। আর্থিক-সামাজিক চিন্তায় তখন আমি সিঁটিয়ে যাচ্ছি। স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে রক্ষা করা আমার পবিত্র ধর্ম।

তবে একটা জিনিস বুঝলাম, স্মোক করতে দেখলেই স্ত্রী যে ক্যানসারের ভয় পায়, আসলে সেটা আর্থিক ক্যানসার। স্মোকিং-এ তার যে বিশেষ আপত্তি, বন্ধু প্রসঙ্গে যখন সে স্নেহে সস্মিত হয়ে উঠেছিল, তখন তো তা টের পাওয়া গেল না। আমার স্মোকিং মানেই তার সংসার বাজেটে টান। রহস্যটা ঐখানে। অথচ স্ত্রীকে বলা যায় না: বন্ধুর সঙ্গে মিশো না, তোমারও ক্যানসার হতে পারে ওর হাওয়া গায়ে লাগলে!

আর্থিক ব্যাপারের দুর্ভাবনা তাকে জানিয়ে নিজের পৌরুষকে ছোট করতে মানে লাগছে। কী সাংঘাতিক শহুরে ঝামেলা
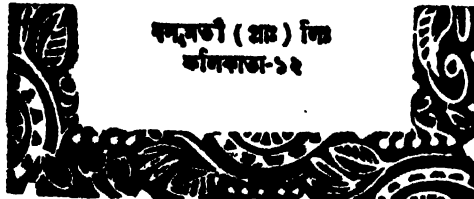
মাননীয় রাজ্যপাল সমীপেষু

অবশেষে উপগ্রহটি কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং ধাওয়ানসাহেব, আপনার সংসার ষোলকলায় পূর্ণ হ'ল। পঞ্চম উপদেষ্টা শ্রীকিদোয়াই কার্যভার গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠান এবং আয়োজনের আর কোন ত্রুটিই রইল না। তেল পুড়ছে অঢেল, কিন্তু রাধা যে নাচবে, তেমন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তাই, এতসব কান্ড-কারখানা দেখেও ভরসা পাচ্ছি না, আপনার ওপর আর কিছুতেই আস্থা রাখতে পারছি না। গত এক সপ্তাহে গঙ্গায় অনেক জল ব'য়ে গেছে, কিন্তু স্যার, একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতেন, গঙ্গার ঘোলা জলে কি পরিমাণ নর-রক্ত মিশে গেছে। "আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকার" সংজ্ঞা কি জানি না, কিন্তু আপনার রাজত্বে আজ যে বিভীষিকা সর্বত্র প্রেতনৃত্য সুরু করেছে, তা' যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকা নয়, সে বিষয়ে আপনি বা আপনার পঞ্চরথী যাই মনে করুন না কেন, আমরা নিঃসন্দেহ।

মান্যবরেষু, আপনি হয়ত জানেন না যে, জনজীবনে 'নিরাপত্তা' বলতে আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অথচ, আপনার 'মোগলাই শাসন ব্যবস্থা' দেখে মোটেই মনে হয় না যে, গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এক চরম অস্থিরতার মধ্যে আতঙ্কিত প্রহর গুণছে। সারা বাংলায় যখন প্রচণ্ড কোলাহল, তখনও কি দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধির ঘুম ভাঙবে না? শুধু নারকেলডাঙ্গা-বেলেঘাটা কিম্বা স্কুল-কলেজেই আজ আর অশান্তির স্রোত প্রবাহিত নয়, সেই সঙ্গে মেদিনীপুর আর পুরুলিয়াও কেঁপে উঠেছে। যে কারণে মানুষ যুক্তফ্রণ্টের হাত থেকে নিস্তার চেয়েছিল, ঠিক সেই একই কারণে মানুষ আজ আপনার সম্পর্কেও শ্রদ্ধা এবং আস্থা হারাতে বসেছে। আপনি কি এখনও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? দিল্লীর প্রবল প্রতাপান্বিত প্রগতিশীল সরকার কি এখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকবে?

ধাওয়ানসাহেব সামনেই চাষের মরশুম। প্রশাসন এবং অভিজ্ঞ উপদেষ্টারা যদি অবিলম্বে এ ব্যাপারে সজাগ না হ'ন, তবে ভয়ংকর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আপনি প্রাজ্ঞ এবং ধীমান, তাই আপনাকে উপদেশ দেওয়ার স্পর্ধা দেখাতে পারি না। কিন্তু যে আশঙ্কা আজ সর্বত্র, তা আপনাকে না জানিয়ে নির্বিকার থাকব কেমন করে? তা'ছাড়া আপনাকে না জানিয়ে আর কোথায় জানাব? দিল্লীতে? সেখানে এ বান্দার কণ্ঠস্বর পৌঁছুবে না। যদি বা চীৎকার করে বলি, তবুও তাতে কাজ হবে বলে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস নেই কেন? কারণ, পশ্চিমবঙ্গের অনেক সমস্যার কথাই চীৎকার করে বলা হয়েছে, কিন্তু কুতুবমিনারে কাঁপন লাগে নি। এই যেমন কলকাতার কথাই ধরুন না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীই অনেকবার কলকাতার সমস্যা নিয়ে দিল্লীতে দরবার করেছেন। কিন্তু ফল কি হয়েছে তা' আমরা বেশ জানি। পাতাল রেল, না চক্ররেল- এ নিয়ে বছরের পর বছর চক্রবৎ কেটে গেল, কিন্তু সব পরিকল্পনাই এখন পাতালে। কেন্দ্রীয় নেতারা পালা করে বছরে একবার বাঙালীকে আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন। ব্যস, ঐ পর্যন্তই তারপর আবার যে কে সেই। কলকাতা রয়ে গেছে সেই কলকাতাতেই।

তাই বলছিলাম ধাওয়ানসাহেব, আপনি ত কেন্দ্রের প্রতিনিধি, আপনার কথায় যদি কিছু কাজ হয়। যে কথা হচ্ছিল, তাতেই ফিরে আসি। যুক্তফ্রণ্ট সরকার চাষীদের নিয়ে জুয়া খেলে গ্রামাঞ্চলে যে পাপের বীজ বপন করেছেন, তা' আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে সামনের চাষের মরশুমে। সময় থাকতে সাবধান না হলে, আবার গ্রামাঞ্চলে রক্তের ঢল নামবে। এ বিষয়ে আপনারা যে যথেষ্ট সচেতন, তেমন কোন প্রমাণ পাচ্ছি না বলেই এ আশঙ্কা। সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে দখলীকৃত জমি এ দখল করা হয়েছে, সে সকল জমির ওপর চাষীদের আইনসঙ্গত অধিকার স্বীকৃত নয়। যুক্তফ্রণ্টের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হতভাগ্য চাষীদের নিয়ে দলবাজী করেছেন, কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন আগ্রহ দেখান নি। ফলে, আপনার সামনেই এক ভয়ংকর সমস্যার পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে; এ অবস্থার মোকাবিলা আপনাকেই করতে হবে। নতুবা বৃষ্টির পর মাঠে-মাঠে শুধু চাষীদের পায়ের ছাপই পড়বে না। সেই সঙ্গে রক্তের ছাপও লাগবে।

লাগবে কারণ, ইতিমধ্যেই জোতদাররা বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত হয়ে উঠেছে। যে জমি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে সেই জমি আবার দখল নেওয়ার জন্য তাদের লোভের জিহ্বা লক্‌লক্‌ করছে। অন্যদিকে চাষীরাও যে জমি দখল করেছে, তার ওপর তাদের কোন আইনসঙ্গত অধিকার নেই। ফলে, উভয়পক্ষই চাইবে জোর করে জমি ছিনিয়ে নিতে। সুতরাং বিরোধ অনিবার্য। ধাওয়ান-সাহেব, আপনি রাজভবনে বসে চাষীদের বুকে ফুলে ওঠা হাপরের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। আপনার উপদেষ্টারা নিজেদের মধ্যেই এমন কদর্য কলহে লিপ্ত যে, অন্যদিকে নজর দেওয়ার মত সময় তাঁদের নেই। অথচ, চাষের মরশুম শুরু হতে আর অল্প দিন বাকী। তাই, নূতন আশঙ্কায় বুক ঢিপঢিপ করছে।

আপনি হয়ত বলবেন: "একসঙ্গে কত সমস্যার দিকে নজর দেব?" আমরা জানি, এ-রাজ্যে সমস্যার অন্ত নেই। এ কথাও জানি, সব সমস্যার সমাধান একসঙ্গে বা এক সময়ে সম্ভব নয়। কিন্তু সব না হ'ক, কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করা'ত সম্ভব। অন্তত সমাধান করার চেষ্টা ও আগ্রহ দেখতে পেলেও কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, গত দু'মাসে আপনার দিক থেকে তেমন কোন লক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। দেখতে পাই নি কোন মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে [illegible]

[illegible] তিন বছর একটা আলোড়ন তুলেই [illegible] লাভ করেছেন। সে আলোড়ন আপনার মহিমান্বিত রাজত্ব-কালকে বিপন্ন করে তুলেছে।

ভূমিসংস্কার ও ভূমিনীতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা ও পথনির্দেশ যদি আপনি করতে ব্যর্থ হন, তবে আসন্ন বর্ষায় গ্রাম-গ্রামান্তে আগুন জ্বলবেই। আমরা অবশ্য জানি, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত-হীনতার জালে আপনিও আজ বন্দী। তবুও এ-ব্যাপারে আপনার দিক থেকে যথেষ্ট আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখতে পেলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতাম। ইতিমধ্যে যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বেশ বোঝা গেছে, আপনি নেহরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নেহরু কন্যার স্নেহদৃষ্টি হারাতে বসেছেন। অন্যদিকে চ্যবনসাহেব এমন সব উক্তি ও বক্তব্য পেশ করছেন, যাতে আপনার অবস্থা ক্রমশ সংগীন হয়ে উঠছে। পর্যায়ক্রমে আপনাকে রাজভবনে অন্তরীণ রেখে মূল ক্ষমতার চাবীকাঠিটি নাকি মহাকরণের উপদেষ্টা-প্রধানের হাতেই গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী সেই সত্যই প্রকাশ করেছে।

চ্যবনসাহেব বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ভূমিসংস্কার ও ভূমিনীতি সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গ্রহণ করছেন! এখানেও সেই মায়াজাল। কেন্দ্রীয় সরকারের "সিদ্ধান্ত গ্রহণ" অনেকটা ছেলেভুলানো ছড়ার মত। সমগ্র ভারতবর্ষে আজ অসংখ্য সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, অথবা বছরের পর বছর বেঁচে আছে একমাত্র দিল্লীর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মায়াজালে। তাই বিশ্বাস করতে পারি না কিছুতেই যে, কেন্দ্রীয় কর্তারা পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সমস্যা সম্পর্কে অবিলম্বে কিছু করবেন। স্বচ্ছ জল পান করতে তাঁদের বড়ই কুণ্ঠা, ঘোলা জলে তাঁরা এক অনির্বচনীয় স্বাদ পান। তাই ধাওয়ানসাহেব, আপনার কাছে বিনীত নিবেদন, এ ব্যাপারে অযথা কালক্ষেপ করবেন না। আইনসম্মত পথে অবিলম্বে এ-কাজে হাত দিন। কোট-প্যাণ্টের মায়া ত্যাগ করে একেবারে মাঠে-ঘাটে নেমে পড়ুন, দেখবেন, তাতে অনেক বেশী সুফল হবে।

শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল মহোদয়, কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম, আপনি ও আপনার উপদেষ্টাবর্গ ভূমিনীতি সম্পর্কে "ছয় দফা কার্যক্রম" স্থির করে-ছেন। জানি না, কেন সেই "ছয় দফা" এখনো দিনের আলোর মুখ দেখতে পেলো না। তবে কি এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কিম্বদ্ধ রাজ্যভোয়াল আমলারা এ ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত নন? অথবা, সিদ্ধান্ত কার্যকর করায় আলস্য পোয়াতে আপনি নিজেই গররাজী? কোনটা সত্য জানি না। বর্তমানে কেন্দ্রীয় কর্তাদের ধমকের গুঁতোয় আপনার বাক্‌সংযম-অভ্যাসও সবিশেষ লক্ষণীয়। ফলে, আমরা আসল ঘটনাটা মোটেই জানতে পারছি না। অথচ জানার প্রবল আগ্রহ।

রাজভবনের শোভাবর্ধনকারী ধাওয়ান সাহেব, আপনি সদর্পে ঘোষণা করে-ছিলেন, আইনের শাসনকে অটুট রেখেই আপনি ভূমিসংস্কারের কাজে হাত দেবেন। আপনার এই ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কানের ভেতর দিয়ে একবারে মরমে প্রবেশ করেছে। আমরা গ্রামরাজত্ব ফিরে পাওয়ার আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত সখেদে দেখলাম, আইনের শাসনই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ভূমিসংস্কারের ব্যাপারটা নিছকই মায়া। শিথিল প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন সবল নীতি বা মৌলিক পরি-বর্তন সম্ভব নয়—এ-সত্যে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা জানি না, কিন্তু আমরা করি। তাই আপনি ভূমি সংস্কার সম্পর্কে যে "সিক্স কমান্ডমেণ্ট" দিয়েছিলেন, তা ফাইলেই রয়ে গেল।

জানেন স্যার, এত হতাশার মধ্যেও কিছু কিছু আশার বাণী শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি, আপনি নাকি অল্প-দিনের মধ্যেই এক অর্ডিনান্স জারী করে বেআইনী দখল, বর্গাদার উচ্ছেদ, জমির সিলিং, দখল করা জমি ইত্যাদি বিষয়ে এক বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করবেন। শুভ-সংবাদ সন্দেহ নেই। যুক্তফ্রণ্টের ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী বিপ্লবের বাণী বিতরণ করে-ছেন, কিন্তু কোন বাস্তবসম্মত কার্য-পন্থা বা আইন প্রণয়ন করেন নি। জন-গণের সোল এজেণ্টরা যে কাজ করেন নি, আপনি দিল্লীর 'বেতনভুক কর্মচারী' হয়েও যদি তেমন কোন কাজ করতে পারেন, তবে গৌড়জনের আশীর্বাদ আপনার ওপর বর্ষিত হবেই। শোনা যাচ্ছে, উৎপন্ন ফসলের তিনভাগ বর্গা-দার ও একভাগ জমির মালিক পাবেন—এমন একটা বিধান নাকি আপনার অর্ডিনান্সে থাকবে। শুধুমাত্র কাগজে-কলমে নয়, যদি বাস্তবে এর প্রয়োগ ঘটে, তবেই বঞ্চিত বর্গাদাররা উপকৃত হবে। আরো জানা গেছে, যে-সব সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষক বা বর্গাদাররা দখল করে আছেন, অর্ডিনান্স-এর মাধ্যমে সেই জমি তাঁদের মধ্যে

ধাওয়ানসাহেব, বর্তমানে এ-রকম দখল করা জমির পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ একর। এই জমিতে যদি কৃষকরা আইনসংগত অধিকার পায়, তবে তা সামগ্রিকভাবেই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হবে।

রাজ্যপাল মহোদয়, আপনি অবিলম্বে পরিবারভিত্তিক জমির সর্বোচ্চ সিলিং-এর পুনর্বিন্যাস করুন। বর্তমানে যে বিপুল পরিমাণ জমি আইন ফাঁকি দিয়ে কালো খাতায় জমা হয়ে আছে, তা নূতন করে নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই সংগে 'জবরদখল' করার যে মনোভাব সর্বত্র সোচ্চার, তাকেও শক্ত হাতে দমন করতে হবে। নতুবা মিউ-নিসিপ্যাল এলাকা, সরকারী বনভূমি, এমন কি গড়ের মাঠ পর্যন্ত দখল হয়ে যাবে। তবে, যুক্তফ্রণ্টের আমলে যে-সব বেআইনী জমি চাষীরা উদ্ধার করেছে, তা যাতে ন্যায়সংগতভাবে ভূমিহীন কৃষকরা পান, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যাতে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা না হয়।

তবে একটা ব্যাপারে আপনার রথী-মহারথীরা খুবই অসুবিধায় পড়বেন। ধরুন, একটা জমি তিনটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই একসংগে দখল নিয়েছেন। সে-ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানেই সংঘর্ষ। এ-সব ক্ষেত্রে মামুলি সরকারী প্রথায় কোন সমাধান হতে পারে না। এর জন্য রাজনৈতিক স্তরেও আলাপ-আলোচনা চালাতে হবে। শক্ত হাতে এবং শান্তিবাদী পথে সামগ্রিক সমস্যাকে বিচার করা প্রয়োজন। স্যার, আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন, ভূমি-সংক্রান্ত ব্যাপারটি নিছক আইন-শৃংখলাঘটিত ব্যাপার নয়। এর সংগে মানবিক ও সামাজিক প্রশ্নও জড়িত।

তাই বলছিলাম, সামনেই চাষের মরশুম। আর দেরী করা চলে না। আমলাতন্ত্রের লালফিতার মোহ ত্যাগ করে এখনই কাজে হাত দিতে হবে। তা' না হলে বাংলার সবুজ মাঠে, সোনালী ধান-শীষের গায়ে রক্তের ফোঁটা লাগবেই লাগবে। আজ চারিদিকে যে ভয়ংকর অরাজকতার দানব সদম্ভে আস্ফালন করছে, যে ভয়ংকর কালসাপ বিষাক্ত নিশ্বাসে শিক্ষায়তন আর সমাজজীবনকে পংগু করে তুলেছে তা যেন গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে না পড়ে। তবে আপনার মাথা-ভারী প্রশাসনযন্ত্রকে এবার একটু চাংগা করে তুলুন। দোহাই রাজ্যপাল, বাংলার দিকে এবার তাকান।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম অধ্যায়

লাংগাটা ক্যাম্প ও মানিয়ানিতে প্রথমবার

১৯৫৪ সালের ২১শে আগস্ট এক ঝিরঝিরে বর্ষা রাত্রে আমাদের লরীগুলি লাংগাটা ক্যাম্পে এসে পৌঁছয়। এই ক্যাম্পটি নাইরোবি শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত বিখ্যাত 'ন্যাশানাল গেম পার্ক' বা বন্য জন্তুজানোয়ারদের জন্য সংরক্ষিত জায়গার খুব কাছে। বন্দী-জীবন থেকে ছাড়া পাবার পর এখনও অবধি আমার এই জায়গাটায় আর একবার যাবার সুবিধা হয় নি এবং বন্দী-জীবনের যে দশদিন আমরা লাংগাটা ক্যাম্পে কাটিয়েছিলাম, সে সময় আশে-পাশের কোনরকম ভৌগোলিক গবেষণায় লিপ্ত হবার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই ঐ জায়গাটা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কম। এখানে পৌঁছবার পরই আমরা বুঝতে পারি যে, এর আগের ক্যাম্প করোপেই আমাদের অন্তরীণ হিসেবে অপেক্ষাকৃত সুখের জীবনের শেষ হয়েছে। লরী থেকে নামবার আগেই একজন মিশ্রিত লোক (সিসেল দ্বীপের অধিবাসী ইউ-রোপীয়ান ও আফ্রিকান বাবা-মায়ের দের কাছে এগিয়ে আসে এবং কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবার আগেই নিজের কোমর থেকে বেল্ট খুলে এলোপাথাড়ি আমাদের মারতে শুরু করে। লোকটিকে দেখেই তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয় এবং আমাদের মারবার সময় সে মা-মা-ম্পা-মা-গা-ম্বা জাতীয় এক অদ্ভুত আওয়াজ করছিল। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, এই নীতির অনুসরণ করে লরীস্থ সবাই তাদের বন্ধুবর্গের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করছিল। আর সেই সঙ্গে লরীর অন্য কোন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় পৌঁছবার জন্যও বিশেষ তাড়াহুড়োর লক্ষণ দেখা গিয়েছিল সবাই-কার ভেতর। এলোপাথাড়ি মারের কোনটা কারুর ঘাড়ে, কারুর মাথায় বা কারুর পিঠে পড়ছিল এবং ফিনকি দিয়ে রক্তও ছুটছিল তার সঙ্গে তাল রেখে। নতুন কোন জায়গায় এসেই এভাবে স্বাগত সম্ভাষণ ক'জন লোকের ভাগেই বা জোটে? কিন্তু তখন যে ঠিক এসব কথা ভাল করে ভাববার বা বোঝবার সুযোগ হয় নি তা আমি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে রাজী আছি। সৌভাগ্যক্রমে আমা-দের সঙ্গে যে ইউরোপীয়ান কর্মচারীটি মারাগোলা ক্যাম্প থেকে লরীতে এসে-ছিলেন, তিনি অকুস্থলে এসে পড়ায় এই অবাঞ্ছিত প্রহসনের পালায় যবনিকা পড়ে।

বললেন যে, আমাদের এভাবে যাত্রা অনুচিত। কিন্তু যখন সে ভবিষ্যতে নিজে ঐভাবে লরীতে করে অন্তরীণদের নিয়ে আসবে, তখন তাদের নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে, তাতে তিনি কোন বাধা দেবেন না। আমাদের সকলের মনেই তখন এই ভবিষ্যৎ বন্দীদের ভাবী দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে করুণা বোধ হয়েছিল, নিজেদের অল্প-বিস্তর এবং সাময়িক অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে। ইউরোপীয়ান কর্মচারীটির সঙ্গে প্রায় জনা তিরিশের এক উপজাতীয় আরক্ষাবাহিনীও এসেছিল আমাদের লরী থেকে নামিয়ে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করবার জন্য। তারা লরীগুলির চারিপাশে ঘিরে দাঁড়ায় এবং কর্মচারীটি আমাদের আদেশ দেন চটপট করে নেবে একুশ নম্বর তাঁবুতে চলে যাওয়ার জন্য। এত তাড়াতাড়ি এই প্রস্থানকর্ম সাধিত হয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গে আনা বেশির ভাগ নিজস্ব জিনিসপত্রই লরীতে লরীতে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়ে-ছিলাম। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, তার পরদিন সকালে সে সব জিনিস আমরা ফেরৎ পাই। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তাঁবুতে পৌঁছুবার পর আমাদের, তাঁবুর সামনে মাটিতে পাঁচজন করে সারি-বদ্ধভাবে বসতে বলা হয় এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেককে দুই হাত মাথার উপর তুলে ধরে রাখতেও আদেশ করা হয়। এর পর থেকে বন্দিদশায় সব সময়ই আমাদের গোণবার কালে এইভাবে বসতে হতো এবং কিছুদিন পরে হয়তো আমরা ঘুমোতে ঘুমোতেও এইভাবে সারি বেঁধে বসে পড়তে পারতাম। শুধুমাত্র অভ্যাসের বশে। একজন ভারপ্রাপ্ত কর্ম-চারী সারির একপাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন পাঁচ, দশ, পনেরো গুণতে গুণতে এবং প্রত্যেক সারি পার হবার সময় তাঁর হাতের কাছে যে হতভাগ্য থাকত, লাঠির এক ঘা পড়ত তার পিঠে। সারির মাঝখানে বসতে পারলেই এই অবাঞ্ছিত মারের হাত থেকে বাঁচবার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং শুধুমাত্র রক্তমাংসের প্রয়োজনেই অন্য বন্দীদের প্রতি কোন সৌজন্য না দেখিয়ে আমি বেশির ভাগ সময়ই মাঝখানের জায়গা দখল করতে সক্ষম হতাম।

শুধুমাত্র মাথা গোণবার পরই অবশ্য সে রাত্রের কর্মসূচী শেষ হয় নি। পূর্বোক্ত মিশ্রিত কর্মচারীটি আমাদের সামনে আবার উদয় হয়ে বলেন যে, তিনি যা যা বলবেন আমরা যেন সমবেত কণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি করি। ইতিমধ্যে কোথাও থেকে প্রচুর সংখ্যক উপজাতীয় আরক্ষাবাহিনী এবং ইউরোপীয়ান কর্মচারী ক্যাম্পে এসে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁদের সমবেত সংখ্যা প্রায় আমাদের সমান হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। কর্মচারীটি প্রথমে আমাদের বলতে

শব্দগুলির কোন মানেই হয় না, তাই বিনা দ্বিধায় আমরা সবাই তার আদেশ পালন করি। যদিও আমরা জানতাম যে, তিনি সোয়াহিলি ভাষায় বলতে চাইবেন, "মাউ-মাউ মুবায়া" অর্থাৎ মাউ-মাউ খারাপ। এর পর একজন কিকুয়ু আরক্ষা কর্মচারী সোয়াহিলি ভাষায় আমাদের বলতে বলে "আমরা ইউরোপীয়ানরা চিরকাল ধরে কেনিয়ায় রাজত্ব করবো"। একজন কিকুয়ুর মুখে এই কথা শুনে আমাদের রাগের চেয়ে বেশি হাসি পেয়েছিল এবং কথাগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, তাই এইগুলিরও আমরা পুনরাবৃত্তি করি। এই পাঠের সময় উপ-জাতীয় এবং ইউরোপীয়ান কর্মচারীরা ক্রমাগত আমাদের পরিক্রমণ করছিলেন এবং কোন বন্দীর গলার আওয়াজ যথেষ্ট জোরে বলে মনে না হলে তার পিঠে তৎক্ষণাৎ সপাং করে পড়েছিল এক ঘা বেত। এর পর আমাদের বলতে বলা হল "জোমো কেনিয়াট্টা একজন কুকুর।" এই কদর্য মিথ্যা বলতে আমরা সবাই অস্বীকার করি যথেষ্ট চপেটাঘাত, লাথি ও বেত আমাদের ঘাড়ে পড়া সত্ত্বেও। শাস্তিস্বরূপ আমাদের বৃষ্টিভেজা মাটিতে বুক পেতে শুয়ে পড়তে বলা হয়। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজনের মাথায় খেলে যায় যে, সোয়াহিলি ভাষায় কুকুরের প্রতিশব্দ হল 'ম্‌ম্বা' আর জগদীশ্বরের প্রতিশব্দ হল 'ম্বা'। ফিসফিস করে এই কথা সবাইকে বুঝিয়ে দিতেই আর "জমু কেনিয়াটা ম্বা" বলতে কোন বন্দীই আপত্তি করে নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, উপস্থিত কিকুয়ু আরক্ষাবাহিনীর লোকেরা আমাদের চাতুরী বুঝতে পারে এবং ফলে সমবেত সরকারী কর্মচারীরা সকলে ক্ষেপে লাল হয়ে যায়।

তাঁরা গাচিচি নামক একজন দক্ষিণ টেটু অঞ্চলের বন্দীকে টেনে সামনের দিকে নিয়ে যান এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঠিকমত উচ্চারণ করে কথাগুলি আবার বলে, তার উপর এলোপাথাড়ি মার দিতে থাকেন। আমি একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, গাচিচি সে রাত্রে অমানুষিক ধৈর্য ধরে মার খাবার পরে নতি স্বীকার করে, কাজেই আমাদের কাছে সে কোন অন্যায় করে নি। তারপর হুকুম আসে আমাদের উপর বলতে যে "দিদান কিমাথি এবং স্টানলি মাথেংগেকে জঙ্গলেই মেরে শেষ করে দেওয়া হবে।" এই দুজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা এবারডেয়ার পাহাড়ের জঙ্গলে লুকিয়ে লড়াই করছিলেন এবং এঁদের সম্বন্ধে আমরা পূর্বোক্ত কথাগুলি বলতে পারতাম না। সোয়াহিলি ভাষার অন্য-অনেকার "ই আ" এবং "ভালভাবে খোঁচে-খতে থাকার" প্রতিশব্দ হলো 'ই শা'— কাজেই গলার শব্দ ভার করে আমরা তাঁদের দুর্নামের বদলে বেশ খানিকটা সুনাম করে নিই সে রাত্রে। এর পর হুকুম আসে বলবার জন্য "দিদান কিমাথি এবং স্টানলি মাথেংগে গোবর"। সোয়াহিলিতে গোবর হলো 'মাফি' আর জল হলো 'মাজি', কাজেই এবারও গোঁজামিল দিয়ে চালিয়ে দেওয়া গেল। ভগবানকে শত ধন্যবাদ যে, এই অভাবনীয় পাঠমালার সে রাত্রে সেখানেই শেষ হয়েছিল। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই কর্তৃপক্ষের বোকামির চূড়ান্ত প্রকাশ বলে মনে হয়েছিল। কারণ এইভাবে সমবেত কণ্ঠের বাণী উচ্চারণে আমাদের ভেতর একতা কমবার বদলে কেবল বাড়ছিলই এবং অপরাধী (!) ব্যক্তিকে দিয়ে এইভাবে জোর করে কিছু বলিয়ে নিয়ে তার অপরাধের স্খালন হয় না। বরং তার একগুঁয়েমির বৃদ্ধি লাভই হয়, এই সামান্য কথাটাও কর্তৃপক্ষরা বুঝতে পারেন নি। এত কিছু কাণ্ডের পর সে রাত্রে অভুক্ত অবস্থাতেই আমাদের শুতে যাবার ছুটি দেওয়া হয় এবং গভীর রাত্রি অবধি আমরা তাঁবুর ভেতর শুয়ে শুয়ে সেদিন-কার ঘটনাবলীর আলোচনা করি। কয়োপ ক্যাম্পের অপেক্ষাকৃত সুখের দিনগুলির কথা মনে হতে আমাদের মন ঠিক তেমনিই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—যেমন কি ফেলে-আসা গৃহের প্রতি আকুলতা বেড়ে যায় পথক্লান্ত পথিকের। সে রাত্রে আমরা সবাই একমত হই যে, লাংগাটা জায়গাটা মোটেই ভাল নয়।

পরদিন সকালে দিনের আলোতে লাংগাটা ক্যাম্পের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ তার আগে এক সঙ্গে এতো তাঁবু ও কাঁটাতারের বেড়া কখনোও দেখি নি আমরা। লাংগাটা ক্যাম্প কিকুয়ুদের ধরে এনে অন্য ক্যাম্পে পাঠাবার আগে অস্থায়ী আস্তানা হিসাবে ব্যবহৃত হত—এটি তৈরি হয়েছিল ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে "অপারেশান এনভিলের"* সময়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নাইরোবির নিকট-বর্তী সমস্ত "মাউ মাউ" সমিতিগুলি এবং যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র গোপন পথে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে পৌঁছেছিল, সেই পথগুলি ধ্বংস করা। এই অংশে বিভিন্ন জনবসতি ব্যক্তিবর্গের মূলোৎ-পাটন করারও ইচ্ছা ছিল কর্তৃপক্ষের। এই কার্যসাধনের জন্য শহরের বিভিন্ন এলাকা একের পর এক ঘিরে ফেলে সেখানকার সমস্ত আফ্রিকান বাসিন্দাদের পাইকারি-ভাবে বন্দী করা হয়েছিল, তারপর প্রত্যেকটি ধৃত পুরুষ ও নারীকে বিশেষ-ভাবে প্রশ্নাদি করে সামান্য মাত্র সন্দেহের অবকাশে হাজতে চালান দেওয়া হচ্ছিল। প্রশ্নাদি করার রীতিও ছিল অদ্ভুত। প্রশ্ন-কর্তারা ছিলেন সরকার নিযুক্ত "বিশেষ প্রতিনিধি"। তাঁদের পরিচয় ধৃত ব্যক্তিদের কাছে গোপন রাখার জন্য প্রশ্ন করার সময় মুখে তাঁরা পরতেন বিরাট এক মুখোশ —যাতে শুধু তাঁদের চোখ দুটির জন্য থাকত দুটি ছোট ছোট ছিদ্র। এই মুখোশ ব্যবহার করার জন্য ঐ প্রতিনিধিদের আমরা সোয়াহিলিতে নাম দিয়েছিলাম 'গাফুনিয়া' বা ছোট থলে। এই বিশেষ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছিলেন এক মিশ্রিত গোষ্ঠীর লোক। অনেক নামজাদা বদমায়েস এতে যোগ দিয়েছিল। কারণ সরকারকে ফাঁকি দিয়ে বেশ দু' পয়সা করে নেবার সুযোগ ছিল এতে। প্রতিনিধিরা মুখোশের আড়াল থেকে সন্দেহজনক লোকেদের প্রশ্নাদি করতো এবং তারাই নির্ধারণ করত এই সব লোকে-দের ভেতর কে সৎ বা কে অসৎ, কে সরকারের সপক্ষে বা কে বিপক্ষে। তাদের তথাকথিত বিচারের বিরুদ্ধে না ছিল কোন আপীল, না ছিল সাক্ষী সাবুদের বালাই। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতি-নিধিরা শুধুমাত্র খেয়ালের বশে সিদ্ধান্ত করত কে দোষী বা কে নির্দোষ। কারণ অভিযুক্ত লোকেদের তারা চিনত না বা তাদের সম্বন্ধে মূলেই কোন ধারণা ছিল না এদের। এই বিশেষ প্রতিনিধিদের ভেতর আর এক দল লোক ছিল—যাদের আমরা ডাকতাম 'তাই তাই' বলে। কারণ এরা ছিল শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যুবকের দল আর এরা সব সময়েই ইউরোপীয়ান প্রথায় কামিজের উপর গলায় 'টাই' ব্যবহার করতো। এদের অনেকেই ছিল বেকার, কাজেই এভাবে প্রতিনিধির কাজ করে কিছু পয়সা উপার্জনের সুযোগকে তারা কাজে লাগিয়েছিল। এ ছাড়া কিছু ভীরু প্রকৃতির লোক শুধুমাত্র রাজবন্দী হবার ভয়েই সরকারের প্রতিনিধি সেজে বসেছিল। হয়তো উপরে উক্ত সব রকমের 'প্রতিনিধিদের' ভেতর বেশির ভাগই এক সময় আমাদের মতো কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু কালের গতিকে বা পেটের দায়ে তারা বেছে নিয়েছিল অপেক্ষাকৃত আরামের জীবন—সরকারী প্রতিনিধির কাজ। লাংগাটা

* সামরিক প্রথানুযায়ী একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে সৈন্য দলের গতিবিধির, সাঙ্কেতিক নাম—এই নাম দেওয়া হয়েছিল—নাইরোবির সমস্ত সন্দেহজনক কিকুয়ু উপজাতির আফ্রিকান-

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘদিনগুলি কাটিয়েছিল আমাদের কাছে কাছে—নানারকম অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ করেও। যাক সে কথা। প্রত্যেক সন্দেহজনক লোককেই এই প্রতিনিধি দলের সামনে দিয়ে সারিবন্ধভাবে নিয়ে যাওয়া হতো এবং একবার তাদের কারুর মুখ থেকে "ধরো ওকে" শব্দগুলি বেরোলেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যেত বেশ কিছুদিনের জন্য। সেখান থেকে তখন তাদের পাচার করা হত কোন বন্দি-শিবিরে।

এই কুখ্যাত থলেপরা মানুষগুলি মাঝে মাঝে লাংগাটা ক্যাম্পে এসে সেখানেই ধৃত ব্যক্তিদের নানা পর্যায়ে ভাগ করত। 'কালো' দলে ছিল সেই সব ধৃত ব্যক্তিরা, যারা মাউ মাউ আন্দোলনের মূলে বা যারা হলো ধাড়িদের দল; "ধূসর" ব্যক্তিরা ছিল মাউ মাউ রোগে গভীরভাবে আক্রান্ত, কিন্তু উপযুক্ত ওষুধপত্রের ব্যবহারে তাদের বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব; আর "সাদা" হলো সাধারণ মানুষ বা যারা মাউ মাউ রোগমুক্ত। এই রংগুলি ব্যবহারের পিছনে যে আফ্রিকার কালো নিগ্রো, ভারতীয় ধূসর বা বাদামী এবং ইউরোপীয়ান সাদা—এই তিন জাতের গায়ের রংয়ের সঙ্গে এক প্রচ্ছন্ন মিলের সাদৃশ্য আছে, সরকার তা কখনও ভেবে দেখেছিলেন কিনা কে জানে? লাংগাটা ক্যাম্পে ধৃত ব্যক্তিদের 'রং'-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতো তারা কে কোন্ বন্দি-শিবিরে যাবে।

নাইরোবি শহরকে এইভাবে পরিষ্কার করার কাজে সরকার সফল হয়েছিলেন। কিন্তু এর ফলে যে কতো হাজার হাজার নিষ্কলঙ্ক সাধারণ মানুষ বিনা দোষে দিনের পর দিন হাজতে বাস করেছিল, কতো লোকের পারিবারিক জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কতো স্ত্রীলোককে বাধা হয়ে পতিতার জীবন বেছে নিতে হয়েছিল, কত অপরিণতবুদ্ধি বালক-বালিকা বিপথগামী হয়ে সমাজ-সংসারের পক্ষে জঞ্জাল ও ব্যাধিবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সর্বোপরি এই অন্যায় অত্যাচারের ফলে কতো আফ্রিকানের মনে চিরদিনের জন্য সাদা ইউরোপীয়ানের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, তার হিসাব কে করবে? আমি একজন পাগলকে জানতাম, যে ভাগ্যের দুর্বিপাকে 'কালো' বলে সাব্যস্ত হওয়ায় মানিয়্যানি ক্যাম্পে চালান হয়েছিল। সেখানে বেচারার দুঃখ-কষ্ট দেখে আমাদের মায়া হতো, আর যে তাঁবুতে সে থাকতো, তার অন্য সব বন্দী-দের উপর হতো করুণা। যে-কোন মানুষের পক্ষেই শুধুমাত্র পঞ্চাশজন লোকের জীবন-[illegible]

তাতে সন্দেহ আছে এবং এক-একটি থলে-পরা প্রতিনিধি কয়েকশত বন্দীর 'বিচার' করেছিল হয়তো তাদের একবারমাত্র দেখেই। পয়সা উপার্জন করতে হলে প্রতিনিধিদের এইভাবে তাড়ি-ঘাড়ি ফল না দেখান ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না, কিন্তু তার ফলে যে কত লোকের সর্বনাশ হয়ে গেল, তার দায়িত্ব কে নেবে? পূর্বোল্লিখিত 'অপারেশন এনভিলের' ফলে সরকারী রাজবন্দীদের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায় এবং এর কুফল আমাদের দেশের লোকেরা এখনও ভোগ করছে। আমরা যখন লাংগাটা ক্যাম্পে পৌঁছই, সে সময় সেখানে প্রায় চার হাজার বন্দী বাস করছিল এবং এক এক করে প্রায় এক হাজার বন্দীকে হপ্তায় দু'বার করে মানিয়্যানি ক্যাম্পে চালান দেওয়া হচ্ছিল।

প্রায় দু'দিন যাবৎ খাবার বা জল না খেয়ে আমরা স্বভাবতই খুব ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলাম। তার সঙ্গে আবার এক নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছিল —গলা শুকিয়ে যাবার ফলে কোন জিনিস গেলাও ছিল কষ্টকর। টিমথি মোয়াঙ্গির উপদেশে আমরা প্রথমে একটু ঈষৎ উষ্ণ জলে লবণ দিয়ে পান করে যথেষ্ট আরাম পাই। হয়তো আমাদের মনে হয়েছিল, এতেই কাজ হবে, তাই আরাম পেয়েছিলাম। দু'দিন পরে অবশেষে আবার যখন খাবারের দর্শনলাভ ঘটে এবং আমরা সবেমাত্র খেতে আরম্ভ করি, ঠিক সেই সময় আমাদের আর একদফা গুণতি করার জন্য ডাক পড়ে। এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য না হওয়ায় আমরা তখনি খাবার ছেড়ে উঠে যেতে অস্বীকার করি। কয়েক মিনিট কেউ কিছু বলল না, তারপর হঠাৎ পঙ্গপালের মত একঝাঁক উপজাতীয় আরক্ষ-বাহিনীর লোকেরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ও নির্দয়ভাবে ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে আমাদের মুখের গ্রাস থেকে টেনে তুলে নিয়ে গেল, যেখানে আমাদের গণবার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা "অপেক্ষা" করছিলেন। গুণতি হয়ে যাবার পর আর সেই অর্ধভুক্ত খাবার আমাদের চোখে পড়ে নি, কারণ তারপর আমাদের শারীরিক পরীক্ষা করা হয় এবং প্রত্যেককে টি-এ-বির ইনজেকশান দেওয়া হয়। আরক্ষবাহিনীর লোকেরা কোন বন্দীর কাছে নগদ পয়সা দেখতে পেলে তার মাথায় পড়তো এক বিরাশি সিক্কার চড় এবং সে চড়ের ঘোর কাটিয়ে উঠবার পর আর সে পয়সার কোন হদিস মিলত না। এইভাবে জিনিষ খোয়াবার ভয়ে নতুন কোন ক্যাম্পে পৌঁছবার পরই বন্দীরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করে তাঁবুর কাছে মাটিতে এখানে-ওখানে গর্ত খুঁড়ে [illegible] টাকা-পয়সা ইত্যাদি

রাখতেন। [illegible] কেউই এ পয়সা চুরি করত না। লাংগাটা ক্যাম্পে প্রথমে আমরা ২১ নম্বর তাঁবুতে ছিলাম, কিন্তু পরীক্ষাদি হয়ে যাবার পর আমাদের বেশ খানিক দূরে দশ নম্বর তাঁবুতে যেতে বলা হলে অনেকের মাথায়ই বজ্রাঘাত হয়। কারণ প্রত্যেক তাঁবুর চারিদিকেই উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এমনভাবে অলঙ্ঘ্য করা ছিল যে, তা পার হয়ে ২১ নম্বরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বন্দী-শিবিরে থাকাকালীন কয়েকটি সামান্য ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য (সিগারেট, নস্যি, লুকিয়ে বাইরে চিঠিপত্র পাঠান ইত্যাদি) নগদ পয়সার প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশি, কাজেই এইভাবে হঠাৎ তাঁবু-বদল হওয়ায় আমাদের ভেতর অনেকেই খুব বিপর্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছুই করবার ছিল না আমাদের, কারণ প্রহরী বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে এ বিষয় বলাই ছিল বাহুল্য। আমার কাছে তখন যে দু' হাজার দু'শো বিয়াল্লিশ শিলিং ছিল, তার নিরাপত্তার বিষয়ে আমি বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম, কারণ আমরা শুনেছিলাম যে, কয়েকদিনের ভেতরেই আমাদের মানিয়্যানি ক্যাম্পে পাঠান হবে, আর সেখানে বন্দী-দের কাছে নগদ পয়সা থাকা ছিল নিয়ম-বিরুদ্ধ। অনেক ভেবেচিন্তে আমি দু' হাজার শিলিং আমার কোটের প্যাডিংয়ের খাঁজে-খাঁজে লুকিয়ে রাখার মনস্থ করি এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে নিপুণ হাতে সেলাই করে এতে সফলকাম হই। বাকি দু'শো বিয়াল্লিশ শিলিং আমার কাছেই পকেটে লুকিয়ে রাখি। এই টাকা-পয়সা এইভাবে লুকিয়ে কাছে না রাখতে পারলে পরে মানিয়্যানি এবং অন্যান্য বন্দীশিবিরে থাকাকালীন যে সমস্ত প্রয়োজনীয় সংযোগাদি স্থাপন করেছিলাম, তা করতে খুবই অসুবিধা হতো।

লাংগাটায় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা কেউই কোন বিশেষ তাঁবুর তত্ত্বাবধান না করে সকলে সব ক'টা তাঁবুর দেখাশোনা করতেন, ফলে তাদের যাতায়াতও ছিল ঘন ঘন। সেখানকার একজন শান্তস্বভাব ইউরোপীয়ান কর্মচারী আমাদের সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর বুদ্ধিমত্তার ও কর্মতৎপরতার জন্য। তিনি আমাদের বলেন যে, বন্দীদের মারধোর করার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ সময়-কালে সবাই নিজ নিজ কৃতকর্ম স্বীকার করবে। কর্মচারীটি স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং ভবিষ্যতে কেনিয়ার গণ-আন্দোলন কোন্ রূপ ধারণ করবে, সে বিষয় তাঁর দৃঢ় নিজস্ব মতামত ছিল। তাঁর নাম যে ম্যাক্লাকান (Maclacan), তাও আমরা জানতাম, কারণ ক্যাম্পের প্রাইক দিয়ে

হুকুতে বলা হত। ঠিক এর উল্টো স্বভাবের ছিল পূর্বোল্লিখিত সিসেলদেশীয় দো-আঁশলা কর্মচারীটি, যে লাংগাটায় পেঁছিবার পর লরীতেই আমাদের ধরে মারতে আরম্ভ করে। আমাদের ঠিকমত গোণবারও ক্ষমতা বা বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না তার এবং প্রায় সর্বক্ষণই সে আমাদের উপর চীৎকার করত ও কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ দিত। তার কথার মাত্রাই ছিলঃ তোরা শিশুসন্তান হত্যা করিস, তোরা মানুষ খাস্। অবশেষে আমাদের ভেতর কেউ থাকতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তার মা বা বাবাকে কি আমাদের ভেতর কেউ চিবিয়ে খেয়েছে কি-না। লোকটি স্বভাবতই ছিল খিট্-খিটে মেজাজের ও অসুখী এবং লাংগাটা থেকে যাবার সময় তার উপর রাগের চেয়ে বেশি আমরা করুণাই রেখে গিয়েছিলাম।

আমাদের লাংগাটায় মাত্র ক'দিন থাকার ভেতরেই দু'জন বন্দীকে বিশেষ সাজারূপে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য 'সিমু'-তে (গর্তের সোয়াহিলি প্রতিশব্দ) নিঃসঙ্গ কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই গর্তটি প্রায় দশ ফিট নিচু এবং লম্বায় ও চওড়ায়
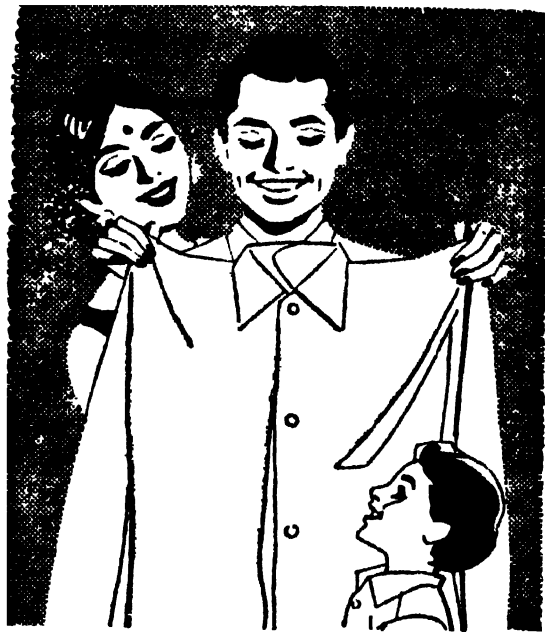
ছিল আট কিউ, যার জন্য প্রায় ছয় ইঞ্চির মতো কাদার জুতি ও ছাদ লোহার চাদর দিয়ে ঢাকা। এই ভিজে স্যাঁৎসেঁতে গর্তের ভেতরটা ছিল খুবই ঠাণ্ডা এবং নয় নম্বর তাঁবুর এক ভুক্তভোগীর কাছে আমি জানতে পারি যে, তাতে চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে নিঃসঙ্গ থাকা খুবই কষ্টকর। ঠিক কিভাবে বা কার বুদ্ধি থেকে এই সাজার আবিষ্কার হয় তা আমরা কেউই জানতে পারি নি। লাংগাটায় আসবার পর অন্য সব বন্দীদের মতো আমাকেও একটি বিশেষ নম্বর দেওয়া হয় সনাক্ত করার জন্য, সেটা হচ্ছে ৫৪৫০৫ এবং মানিয়্যানি ক্যাম্পে যাবার পরও ঐ নম্বরই আমাদের রয়ে গিয়েছিল।

এ ছাড়া সেখানে থাকাকালীন যে কোন ইউরোপীয়ানকে 'এফিনডি' বলে সম্বোধন করতে আমাদের সবাইকে বাধ্য করা হয়। এফিনডি তুর্কদেশীয় একটি সম্মানসূচক শব্দ এবং খুব সম্ভব নিকটবর্তী উগাণ্ডায় অবস্থিত মিশরীয় এবং সুদান দেশের সৈন্যদের দ্বারা এর প্রচলন পূর্ব আফ্রিকায় হয়। সাধারণত কেনিয়ার একজন সৈনিক তার উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান কর্মচারীকে এই নামে ডাকে এবং বন্দী শিবিরে থাকাকালীন আমাদেরও ইউরোপীয়ানদের উদ্দেশ্যে ঐ নাম ব্যবহার করতে হত। এতে ভুল হলে তার সাজা এতো কঠিন ছিল যে, কিছুদিন পরে অভ্যাসবশত যে কোন সাদা মুখ দেখলেই আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাকে এফিনডি বলতাম, তা সে নারী বা পুরুষ, ডাক্তার বা বিচারক, ধর্মযাজক বা কলকারখানার মিস্ত্রি যে কেউই হোক না কেন।

লাংগাটায় দিন তিনেক থাকবার পর আমরা জানতে পারি যে, ৩১শে আগস্ট আমাদের মানিয়্যানিতে পাঠান হবে। ঐ ক্যাম্পে পূর্বোক্ত 'কালো' শ্রেণীর বন্দীদের পাঠান হচ্ছিল এবং কয়োপ ক্যাম্প থেকে আগত আমরা সবাই একাধারে এই পর্যায় পড়েছিলাম। এর জন্য আমাদের কোন ছোট থলের সম্মুখীন হতে হয় নি, যদিচ কে বা কাহারা আমাদের সবাইকে "কালো" পর্যায় ফেলেছিল তা আমরা জানতাম না। যাই হোক, ছোট থলের পাল্লায় না পড়াতে আমরা খুবই সম্মানিত বোধ করেছিলাম। লাংগাটার অধীনস্থ আফ্রিকান কর্মচারীরা আমাদের একথাও বলে যে, যেহেতু মানিয়্যানিতে আমাদের কেবলমাত্র একটি করে স্যুট (কোট ও প্যান্ট) রাখতে দেওয়া হবে, সেহেতু আমাদের বাড়তি জামা-কাপড় তারাই কিনে নিতে পারে। যদিও তার জন্য খুব বেশি দাম তারা দিতে পারবে না, এ কথাও বুঝিয়ে দেয় সেই সঙ্গে। আমাদের দলের অনেকেই ভয় পেয়ে নামমাত্র মূল্যে তাদের বাড়তি জামা-কাপড় এদের কাছে বেচে দেয়, এই আশায় যে, নগদ পয়সাগুলি তারা কোনরকমে নিজে'দের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারবে।

৩১শে আগস্ট বন্দীদের জন্য একটি বিশেষভাবে সুরক্ষিত রেলগাড়ি করে আমরা ১২০০ বন্দী এক সঙ্গে লাংগাটা থেকে মানিয়্যানি (প্রায় ২০০ মাইল) যাত্রা করি। এই গাড়ির প্রত্যেকটি জানলা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ছিল এবং প্রত্যেকটি দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে চাবি গাড়ির গার্ডের কাছে রাখা ছিল—কাজেই তা থেকে পালাবার কোন সুযোগই ছিল না। মানিয়্যানিতে গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম যে, ক্যাম্প অবধি পুরো রাস্তার দু ধারে উদ্যত ব্যাটন হাতে সৈন্যেরা কয়েক হাত দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে আছে, কাজেই সেখানেও পালাবার পথ ছিল বন্ধ। এই তিন মাইল লম্বা পথ এভাবে সুরক্ষিত করার জন্য যথেষ্ট সৈন্য না থাকায় কিছুক্ষণ পরে পরে আমাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল, যাতে করে পেছনের সৈন্যরা এগিয়ে গিয়ে আমাদের পথ আবার 'সুরক্ষিত' করতে পারে। আমাদের হাতে পুঁটলীতে বাঁধা বা বাক্সের ভেতর বন্ধ না-করা কোন জিনিস দেখলেই তা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছিল এবং এর বিরুদ্ধে কোনরকম ওজর-আপত্তি করলে শুধু মারের চোটেই আমরা তাদের কাছে নতিস্বীকার করে নিচ্ছিলাম। অবশেষে এই পথেরও শেষ হলো এবং আমরা মানিয়্যানিতে ২৬ নম্বর তাঁবুর সামনে পৌঁছালাম। সেখানে এক বিরাটদেহ ইউরোপীয়ান কর্মচারী বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে রেখে বীরদর্পে এগিয়ে এলো আমাদের সম্ভাষণ করতে—"তেরো এখন মানিয়্যানি এসে পৌঁছেচিস্। এই ক্যাম্পের নাম মানিয়্যানি এবং এর বিশেষত্ব তোরা শীঘ্রই বুঝতে পারবি। তোদের কাছে যদি নগদ পয়সা, চিঠিপত্র, হাতঘড়ি, পকেটছুরি বা অন্য কোন জঞ্জাল থাকে, তবে সে সব বার কর। যদি কেউ কিছু লুকোতে চেষ্টা করিস, তবে তার পরিণাম কি হবে, তাও হাড়ে হাড়ে টের পাবি। এ সব জিনিসপত্র এখানে জমা করার পর তোরা রান্নাঘরের দিকে যাবি, সেখানে তোদের বাড়তি জামা-কাপড় সব নিয়ে গুদামে জমা করা হবে, তোরা কেবল একপ্রস্থ জামা-কাপড়ই নিজেদের কাছে রাখবি। বুঝতে পেরেছিস আমার নির্দেশ, হতভাগার দল?" আমরা সবাই এক সম্মতিসূচক হু বলি এবং লাংগাটার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অনেকে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি। দুজন কর্মচারী আমাদের জিনিসপত্র জমা নিচ্ছিল, একজন নগদ টাকা এবং অন্যজন অন্য সব জিনিসপত্র। কয়েক মিনিটের ভেতরই আমরা একে অন্যের কাছে ফিসফিসানিতে জানতে পারলাম যে, ১,০০০ শিলিং জমা দিলে ২০০ লেখা হচ্ছে, ২৫০ শিলিং জমা দিলে ৫০ এবং ২৫ জমা দিলে ২০ই লেখা হচ্ছে। আমার কাছে যে ২৪২ শিলিং কোটের ভেতর সেলাই করা ছিল তা আমি এভাবে নষ্ট করতে চাই নি, কাজেই দুটো ১০০ শিলিং-এর নোটকে যথাসম্ভব মুড়ে ছোট করে আমার কোঁকড়ান ঘন চুলের ভেতর লুকিয়ে রাখি। আফ্রিকানদের ভগবানদত্ত এই কাল কোঁকড়ান ঘন চুলেরও প্রয়োজন আছে পৃথিবীতে। খুচরা দু শিলিং আমি একজন নিম্নপদস্থ আফ্রিকান কর্মচারীকে দিয়ে দিলাম, কে জানে কখন তার বন্ধুত্ব আমার কাজে লাগবে। বাকি চল্লিশ শিলিং এবং আমার হাতঘড়ি আমি যথারীতি জমা করলাম। বলা বাহুল্য, এর জন্য আমাকে কোনরকম রসিদ দেওয়া হয় নি এবং আজ অবধি আমি সেগুলি ফেরৎ পাই নি। কে বলতে পারে, সে ঘড়িই বা এখন কাকে সময় দেখাচ্ছে এবং সে চল্লিশ শিলিং পয়সা কোন্ ব্যাংকে সুদে বেড়ে কতোয় দাঁড়িয়েছে।

এরপর আমরা রান্নাঘরের কাছে পরীক্ষার জন্য যাই। বন্দীদের ভেতর অনেকে শিলিং-এর নোট ভাজ করে মুখের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল (চেষ্টা করলে কথা বলার ভাবভঙ্গী না বদলিয়েও এভাবে নোট লুকিয়ে রাখা যায়), আবার কেউ কেউ বা পায়ের আঙুলের ফাঁকে বা তাদের শরীরের পায়খানা করার গর্তের ভেতর দিয়ে ঠেলে উপরে তুলে রেখেছিল। স্বেচ্ছায় কেই-বা নিজের পয়সা অন্যের হাতে তুলে দিতে চায়? পরীক্ষার সময় আমাদের প্রত্যেককে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে শরীরের সব অংশে প্রয়োজনমত হাত দিয়ে দেখা হয় এবং এর পর আমাদের রীতিমত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি করতে হয় যাতে কোন কোন পয়সা বা জিনিস যাতে শরীর থেকে ঝরে পড়ে। আমার বাড়তি জামা-কাপড়, ক্যামেরা ও বইগুলি জমা করে দিতে বাধ্য হই, তার ভেতর বইগুলির জন্যই আমি সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হই। পরীক্ষার পর ২৬ নম্বর তাঁবুর বদলে ২১ নম্বরে আমরা ফিরি, কাজেই মাটিতে পোঁতা টাকা-পয়সাও বেঘোরে মারা যায়। যেভাবেই হোক, প্রায় সবাই তাদের সর্বস্ব মানিয়্যানিতে খুইয়ে ফেলে। অবশ্য এর সবটাই কর্মচারীদের অসৎ ব্যবহারের ফলে চুরি যায় নি, অনেক নষ্ট হয়েছে খারাপভাবে গুদামে রাখার ফলে উইপোকার পেটে গিয়ে। এই সমস্ত জিনিস কয়েক বছর ধরে ঠিকমত রাখতে হলে যতটা চেষ্টা এবং বন্দোবস্তের প্রয়োজন, তার শতাংশের একাংশও ছিল না কেনিয়ার সংকটের দিনে সরকারী ব্যবস্থায়।

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সাতাশ ॥
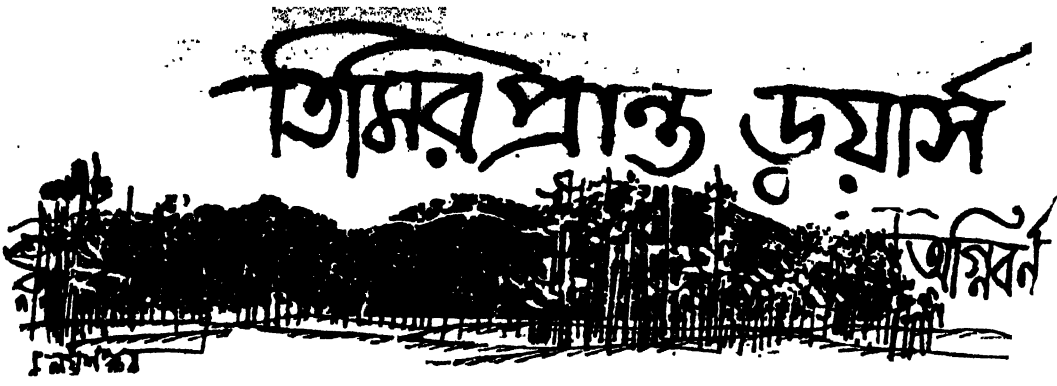
এ-কথা অার অস্বীকার করে লাভ নেই যে, এই বনের মধ্যেও কাঠ-উদ্ভিদ-পাথরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা মানুষের ব্যবসা। নানা মিশ্র প্রকৃতি ও শ্রেণী-সমাজের দল। এক আলাদা জগৎ। মানুষ এখানেও এসেছে লাভ আর লাভের হাত প্রশস্ত করতে। লাভ আর শুভ। লাভ করতে পারলেই শুভ। আর লোকসানেই অশুভ। নিরানন্দের আর অবধি নেই। অতৃপ্তির পর অতৃপ্তি।

সিদ্ধিদাতা গণেশায় নম। বনের অন্তরে গিয়ে দেখে আসুন—কণ্ট্রাক্টর-ঠিকেদারের ভাড়াটে একটা পাতার কুটিরেও দেয়ালে ঝুলছে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি। মূর্তি বা প্রতিকৃতি। মূর্তি হলে তার পদযুগল সিঁদুরে রাঙানো। দগদগ করছে তেল-সিঁদুরে। একটা টেম্পোরারি শেডের আড়ালে নেকমে মাথা গুঁজে কাটিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন। বনমানুষের মত। লাভ কি? মোক্ষ কি? না, টাকা। টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। টাঁকে বাঁধছে টাকা, কাপড়ের খুঁটে কিংবা কাছায় সযত্নে। ব্যাংকে? হ্যাঁ, ব্যাংকেও রাখছে বটে! তবে আর কত সুদ দিচ্ছে ব্যাংক। সামান্য ক' পার্সেণ্ট সুদে কি হবে?

বুদ্ধিমান লোক টাকা জমতে চায় না। খাটাও, যত বেশি সম্ভব কাজে খাটাও টাকা। টাকা খাটলেই টাকা উঠে আসবে। যতকাল জীবন আছে। হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করছে যতকাল। তামাম দুনিয়ার সঙ্গে এ-ব্যাপারে সমান তালে আছে ডুয়ার্সও। তারও গাঁটছড়া বাঁধা এই দর্শনে।

নানা মানুষ। নানা বিচিত্র তাদের জীবন। সেই সঙ্গে জীবিকাও।

প্রকৃতির দেওয়া পাথর। কে জানে কত বছরের পুরানো। সেই পাথর ভাঙছে মানুষ ও তার শ্রমজীবীদের দল। রুপেয়ার নেশায় সেখানেও উপস্থিত শেঠিয়াদের। বোবা পাথর ফাটাচ্ছে ডিনামাইট দিয়ে। আর্তনাদ করছে পাথুরে মাটি। শক্ত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে নিমিষে।

পাথরভাঙা টুকরো জড়ো করে আনছে তামাম বেণিয়ারা। কণ্ট্রাক্টরের দল। রাত নেই, দিন নেই, অনবরত রোদ্দুরে পুড়ে ঘামঝরা শ্রমে পাথর টুকরো করছে শ্রমিকেরা মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালছে। পুড়ে পুড়ে কালিসার হচ্ছে চেহারা। রোঞ্জের মূর্তির মত।

ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠক্...। হাতুড়ি পিটছে তো পিটছেই।

অথচ ওদিকে টিউমলরা ব্যবসা বসিয়েছে। রেলওয়ে লাইন চলে গেছে নিজের খরচে। ওয়াগান। ভরাট হচ্ছে পাথরভাঙা টুকরোয়। আর তার যোগান চলে আসছে সভ্যমানুষের জগতে। সমৃদ্ধির প্রাসাদ উঠছে। ভিৎ বানাচ্ছে মানুষ।

শোষিত মানুষের কি চেহারা হতে পারে দেখে আসুন গিয়ে, একজন বলছিলেন। অল্পবয়স্ক এক অ্যাডভোকেট। এম-এ পাশ। এল-এল-বি। কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন, দেখে আসুন গিয়ে রোদে-জলে-ঘামে শোষণের কী সর্বরিক্ত চেহারা!

কোথায়? আমি আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম।

ডিমা কোয়ারি-তে দেখে আসুন গিয়ে। অসন্তোষে বিক্ষুব্ধ দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনিতে অস্থিসার শ্রমিকদের--।

আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হচ্ছিল।

নিজে দেখে এসেছি আমি। সংঘবদ্ধ এখন তারেব ইউনিয়ন হচ্ছে—

টিউমলদের চেনেন?

ওঁরা গুজরাটী ব্যবসায়ী। অনেককালের--

আর শুধুই কি পাথর? কী নেই ডুয়ার্সে! রত্নসম্ভবা ডুয়ার্স। মাটির তলায় আত্মগোপন করে আছে কুবের-লক্ষ্মীর প্রাসাদ!

বনে বনে আছে নানা জীবজন্তু। সংখ্যাতীত। গুণে শেষ করা যায় না। নানা জাতীয় জীব-জন্তুর হাড় অগোচরে পড়ে থাকছে বনে-জংগলে। সেই হাড় কুড়িয়ে জড়ো করছে ব্যবসায়ীরা। সুযোগসন্ধানী মানুষ। হাড় থেকে তৈরি হচ্ছে বোন্-ডাস্ট। হাড়ের গুঁড়ো থেকে তৈরি রাসায়নিক সার। ব্যক্তিগত উৎসাহে যোগান দিয়ে রোজগার করছে হাজার-হাজার টাকা। ব্যক্তিগত মুনাফার অংক।

ভেল্কিবাজী আর কাকে বলে! ভানুমতী কা খেল্। কংকালের হাড়ের পরিবর্তে মুনাফা। কিন্তু সব হাড়ই কি লাগছে কাজে? না-না, বিস্তর লোকসান যাচ্ছে। এদিকে-ওদিকে।

বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে জানেন এতে? আগ্রহী কেউ একজন বলেন।

না, বোধ হয়—

হয় না?

অতটা বলা কি চলে? আমি সন্দেহ করি।

অবাক হয়ে তাকান বক্তা।

বলি, অল্পদিন হলেও বেশ ক' বছর আছি ডুয়ার্সে। জানি এর সমস্যার প্রবলতা। এত তীব্রতা বোধ হয় আর কোথাও নেই।

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন। বোধ-করি, আমার কথা শুনতে চাচ্ছেন।

বলি, শুধু বোন্-ডাস্টের কারখানায় আর কতটা বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে, বলুন। বাইশ-তেইশ বছর আগে দেশ স্বাধীন হবার কালের সঙ্গে বিস্তর তফাৎ এখন। গোটা উত্তরবাংলার কথা ছেড়েই দিচ্ছি, জলপাইগুড়ির কথা বলি, ডুয়ার্স তো তারই একটা অংশ। শিক্ষার অবস্থাটা দেখুন আগে।

পকেট-বুক খুলে সংখ্যাতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাঁর। ১৯৪৮-৪৯-এ জুনিয়ার বেসিক সহ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৬৫৩ মাত্র। ১৯৬৪-৬৫-এ তা দাঁড়িয়েছে ১০৮৬টি। জুনিয়ার হাই, মিডল ও সিনিয়ার বেসিক স্কুলের সংখ্যা ১৯৪৮-৪৯-এ ছিল মাত্র ২৭টি।

১৯৬৪-৬৫-তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬টিতে। উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ছিল সর্বশুদ্ধ ১৪টি সারা জেলায়। ১৯৬৪-৬৫-তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪টিতে। একটি কলেজ ছিল, ১৯৬৪-৬৫-তে সে জায়গায় দাঁড়িয়েছে তিনটি। শিল্প ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান অতীতে যে জায়গায় ছিল ৫টি, সেখানে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০টি। একটি জিনিষ লক্ষ্য করুন। শিল্প ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা যেখানে ছিল ২৫৬ জন, ১৯৬৪-৬৫-তে সেখানে দাঁড়িয়েছে ১,০৫৫ জন। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে এ-অঞ্চলে গত কয়েক বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ এবং ছাত্রসংখ্যা হয়েছে প্রায় তিনগুণ। এই সবগুলি থেকে পাশ করে বেরনো ছেলে-মেয়েদের সামনে জীবিকার কোনো পথ খোলা নেই। বছরে বছরে বাড়ছে বেকার-সমস্যা। অথচ এ অঞ্চলে আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি ভালো কোনো ইন্ডাস্ট্রি। শুধু কি হাড়ের গুঁড়োর কারখানা করে সে-সমস্যা মিটবে?

ডুয়ার্সের পথেঘাটে তাই আজ সমস্যা তীব্রতর। বাঁশ এ অঞ্চলে প্রচুর। পাহাড়ী বাঁশ, জংলী ঘাস। এগুলি থেকে হতে পারে কাগজের কল। পাহাড়ী নদীগুলি থেকে যেমন জল-বিদ্যুৎ, তেমনি নদীবাহিত বালি-কণা থেকে গড়ে তোলা যেতে পারে কাচশিল্প।

ভদ্রলোককে বলি, কিন্তু কে করছে বলুন। কে দিচ্ছে এ-সব দিকে দৃষ্টি? দেশলাই-এর কল, চিনির কল, তামাক-জাত সিগারেট-কারখানা—

সারাটা এলাকা তাই নিঃসাড়ে পড়ে আছে। যেন লখীন্দরের শব। প্রাণ নেই, চেতনা নেই। কে আছে ওঝা? ঘুমন্ত প্রাণে দেবে নবজীবন-মন্ত্র। জোগাবে দেহের কোষে কোষে নতুন জীবনচেতনা। শুধু ডুয়ার্স বলে কথা নয়, সারা উত্তরবাংলা জুড়েই এই চেতনা। এক ভয়ংকর হতাশা!

দিগ্ দিগন্তরে ছড়িয়ে গেছে ডুয়ার্সের কথা। মনোহর কাহিনীর মত। তামাম দুনিয়া ভেঙে পড়েছে এইখানে। পয়সা ফিকিরের মন্ত্র।

অতীতের দিকে তাকাই। মানুষ আর মানুষ। খুঁজলে গোটা ভারত-বর্ষটাই পাবেন এখানে—মারাঠী ব্রাহ্মণ বসে আছেন হোটেল খুলে। সাইনবোর্ডে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় পরিচিতি। নানা রকমারী জনার ফিরিস্তি। আছেন গুজরাটী ও পাঞ্জাবী পামিস্ট্। রাস্তার ধারে বসে আছেন জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কেতাব খুলে। গ্রহ-নক্ষত্রের জ্বালা। করকোষ্ঠীর ... আহ্বান। ... খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বসে আছেন মধ্য-প্রদেশের খাঁ। আটা-ডাল-ঘিউ-র কার-বার। এরই মধ্যে রাস্তার ধার বাঁধিয়ে তুলেছে টিনের চৌকারী ঘর। ঝকঝকে টিনের চাল। গদির উপর বসে আছে খাতা প্রসারিত করে। সরষের তেলের টিনও আছে। তুখোড় নজর আছে দেশ-কালের দিকে। সুযোগ বুঝে সব জিনিষ হাওয়া হয়ে যায় গোলাবাড়ির মাটির তলার সুরক্ষিত ভাণ্ডারে। শিউমঙ্গল সিং পাণ্ডে। নাম দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে কোনো একপুরুষে ছিলেন পাণ্ডা। তীর্থের পাণ্ডাজী। দেশ থেকে এলেন। দাদনী-ব্যবসা-সূত্রে ভিড়ে গেলেন মঙ্গলরাম আগরওয়ালাদের সঙ্গে।

আগরওয়ালারা এখন টী-ম্যাগনেট্। টী থেকেও দৃষ্টি চলে যাচ্ছে অন্যত্র। বাঙ্গাল মুলুকে আর শান্তি নেই। বলছেন ঘন-ঘন, রামজীকী কিরিয়া। হামি লোক চলে যাবে—

কোথায় যাবেন আগরওয়াল সাহেব?

টাকার দৌলতে সাহেব হয়ে গেছেন ইবানীং। এতকাল ছিলেন শেঠজী-বেণিয়াদের দলে। ইংরাজী ইস্কুলে পড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছেন। এখন তাঁদের বিস্তর খাতিরবর ডুয়ার্সের মাড়োয়ারী-সমাজে। চক-মেলানো প্রাসাদ উঠেছে। বাগানে বোগেনভিলাই। আইভি-লতাকুঞ্জ গ্রীল দিয়ে ঘেরা। দরজায় ব্লাড-হাউন্ড, বুলটেরিয়ার বাঁধা থাকে। মোটরকার আছে নিজের। পাঁচটা-ছ'টা-সাতটা। মিসেসরা আর ঘোমটা দেবার প্রয়োজন-বোধ করেন না। জলপাইগুড়ি-শিলি-গুড়ি-দার্জিলিং যাতায়াত করেন স্বামী-দের সঙ্গে।

কিন্তু শিউমঙ্গল পাণ্ডেরা ভিড়ে গিয়েছেন ... -এর কাজে। তার সঙ্গে আছে দাদনী-ব্যবসা।

রাঙ্গাপুর সদর উপাধ্যায়।

ভাঙা-ভাঙা বাংলায় নাম বলেন বিহারীগুরু পণ্ডিতজী। এ-অঞ্চলে তাঁর পরিচয় পণ্ডিতজী। অত্যন্ত ভক্তিভাজন। সজ্জন। এমন সাধু-চরিত্রের লোক আর হয় না। গয়া না ভাগলপুরে ছিল ঘর। ভাগলপুর থেকে একেবারেই ভাগলেন।

দূর অতীত কতদিনেরই বা। স্বদেশীয়দের সঙ্গে লোটা-কম্বল নিয়ে এসেছিলেন উনি একদিন। বিশ-বাইশ বছরের যুবক। শ্যামচিক্কণ চেহারা। চেকনাই ছিল টিকির। ছোট-ছোট করে ছাঁটা চুলের মধ্যে দু-একগাছা টিকির চিহ্ন খুঁজে পাওয়াই ... ৫৩। ... গিয়েছিলেন। ... টির কাজও করেছিলেন ক'দিন। ...হাটের এক ব্রাহ্মণ হোটেলে ঠাকুরের কাজও করতে হয়েছিল ঠেকায় পড়ে। কিন্তু সে-কথা ইতিহাস।

তার পর এক শুভক্ষণে—। অন্তত ডুয়ার্সে তাঁর প্রথমাগমনের কালটি নিঃসংশয়ে ছিল শুভলগ্ন। কী তিথি, কী নক্ষত্র ছিল, জানি না। স্ব-সমাজের মধ্যে দেখা গেল অল্প ক'দিনেই পণ্ডিতের কাজটি বাগিয়ে নিতে পেরেছেন। তাঁর মূলধন ছিল হিন্দী কেতাব পড়তে পারতেন। স্বদেশ-বাসীর কাছে সুর করে পড়তেন তুলসীদাসের রামায়ণ।

অবশেষে পণ্ডিতজীতে রূপান্তর!

রূপান্তর না বলে জন্মান্তর বলাই ভালো। ডুয়ার্সের রাস্তায় চলতে যদি দৈবাৎ সরকারী রাজপথসংলগ্ন মহাদেবের কোনো মন্দির দেখতে পান—। আমি হলফ করে বলছি, অন্তত শতাবধি দেখতে পাবেনই। তাহলে জানবেন ওই সংখ্যাতীত মন্দিরগুলির মধ্যে কোনো একটি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত। নিতান্তই একটি বৃক্ষ ছিল ওখানে এককালে। তারপর একদা শুভক্ষণে তাতে পড়ল পাথর। পাথরে তৈল-সিঁদুরবিন্দু। গোড়া থেকে লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন বৃক্ষমূলে-সমর্পিত প্রস্তর-খণ্ডটির দেবতারূপে পরিণতি। পথচলতি লোকেদের চোখের সামনেই দিবারাত্রি চলতে লাগল বাবা মহাদেবের খিদমৎ। দু'বেলা গোবর দিয়ে লেপা; ফুল-বেলপাতার নৈবেদ্য আত্যন্তিক উৎসাহে।

বাঁধাই হল বেদী। অনন্তর উঠল একটু-একটু করে মন্দির। সেই মন্দির উঠেছে আজ আকাশকে ছুঁয়ে। মস্ত-বড়ো ত্রিশূল। শুধু মন্দিরই নয়, পার্শ্ববর্তী প্রায় অনেকটা এলাকাই আজ ওঁর দখলে। শুধু কি ভগবানই ভাগ্য-বান? না, অধিকার আছে তাঁর সেবায়েতেরও। শুধু কি পণ্ডিতজীই একা? না, এমন অগণ্য বে-ওয়ারিশ মন্দির ও তার ওয়ারিশদের পাবেন ডুয়ার্সে।

সাক্ষাৎ ভক্ত যে ওঁরা। কলিযুগে ভক্তরাই ভগবান!

ডুয়ার্সের রাস্তায় চলতে-চলতে চোখ খোলা রাখলে দেখতে পাবেন, পথের পাশে বসে গেছে উত্তরপ্রদেশের কোন সন্তান। নানা জীবজন্তুর ছাল-চর্ম-অস্থি নিয়ে। বানরের হাড়, উদবেড়ালের চোখ, বাঘের প্লীহা, কাঠ-বিড়ালীর পশম, চিতাবাঘের ছাল, ধনেশপাখির দাঁত, শুকরের নখ, ভালুকের জিভ। এন্তার জিনিষ আপনি চোখ খোলা রাখলে দেখতে
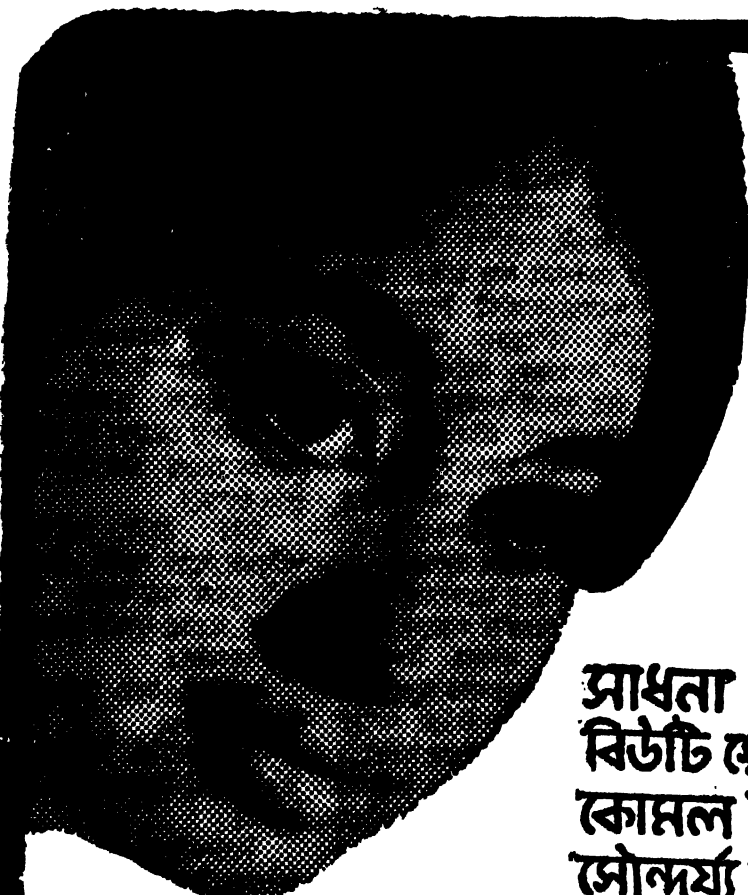
সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

পাবেন। ডুগডুগি বাজিয়ে তোলাচ্ছে পথিকজন।

হ্যামিল্টনের হাটে দেখেছিলাম ছোট-খাটো একটা মাইকও আছে। রোববারের হাটে। হরেক জীবজন্তুর হরেক উপাদানে নানা জটিল ব্যাধি-মুক্তির ঘোষণা। বেশ গম্ভীর মুখে মাইকে বলছে চোস্ত্ হিন্দীতে—লিজিয়ে, লিজিয়ে! হরেক দাওয়াই! হরেক বেমারি-কো হরেক দাওয়াই লিজিয়ে।

কৌতূহলী ভিড় করছিল অনেকেই। হেটো হিন্দী, মেঠো হিন্দীর কারবার! কিনছে অনেকে।

চা-বাগানের কুলিরাই বেশি। একটা ছুরিতে কেটে দিচ্ছে দাওয়াই। কবচ-মাদুলী বানাচ্ছে। হাত চালাচ্ছে কাজে, কিন্তু মুখে বিরাম নেই কথার।

অমূল্য লাভ! অমূল্য সুযোগ! কেবল আয়ুর্বেদ-প্রচারার্থে জনসাধারণের সুবিধার্থে অল্পমূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়।

লেখা আছে একটি কালো রঙের কাপড়ে।' সাদা অক্ষরে। বাঁশের খুঁটিতে বসানো মাটিতে। যে কেউ দেখতে পাবেন ডুয়ার্সে।

অমুক পর্বতের অমুক সাধু-মহান্তের গুরু পরম্পরা ভারতবর্ষে শতবর্ষব্যাপী এই ঔষধ আশীর্বাদ এবং প্রসাদরূপে বিতরিত। কেবলমাত্র তিন দাগ সেবনে চিরদিনের জন্য আরোগ্য। কে বলে হাঁপানী সারে না? রাজযক্ষ্মার জন্য সেবন করুন। অভ্রকভস্ম মতি-ভস্ম, মৃগভস্ম, হরিতাল, অগ্নিরস, অর্জুন, স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম। সত্তর টাকা দামের ঔষধ মাত্র চৌদ্দ আনায়। শুধুমাত্র প্রচারের জন্য। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই সুযোগ গ্রহণ করুন।

প্রদর-প্রমেহ, ধাতুদৌর্বল্য, গেঁটে বাত, মৃতবৎসা, অপস্মার, উন্মাদ, কুষ্ঠ, বাধক দূরে যায়। মানবহিতার্থে বিধাতার অদ্ভুত দান।

তিন ফার্লং দূরে দেখবেন স্বয়ং যোগীরাজ ধ্যানমগ্ন। বাস্তবে নয়, চিত্রে। ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ন চ দৈবাৎ পরম্ বলম্।

কে বলে কুপিত গ্রহের প্রতিকার হয় না? আসুন, আসুন, যোগীশ্রেষ্ঠের চেলার আন্তরিক আহ্বান। সময় বহ্যাহ বেলা।—আসুন, আসুন দেখে যান, চিনে যান, নিয়ে যান—

চেলাটিকে বাঙালী মনে হচ্ছে। কিছু কিছু লোক জুটেও যাচ্ছেন। রাজবংশী আছেন, মেচ, গারো, ওঁরাও, বিহারী, উড়িয়া, বাঙালী। বেঁটে-খাটো, মোটা, লম্বা—এন্তার মানুষ।

আসুন, আসুন। কুপিত গ্রহের প্রকোপ দুঃখ-বিপদ-আপদ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নাশ, মামলা-মোকদ্দমা, শত্রুতা, অকালমৃত্যু, অর্থনাশ, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, ঝগড়া-বিবাদ, চাকরি ও ব্যবসায় নষ্ট, স্মৃতিশক্তি নাশ, আয়ের অধিক ব্যয়, আকর্ষণ, বশীকরণ, মনোমিলন, অবাধ্যকে বাধ্যকরণ—

গ্রীষ্মের রৌদ্রে মুখে ফেনা গড়াচ্ছে।

সারা ডুয়ার্স জুড়েই এই চেহারা। বাজারে-বন্দরে দেখতে পাবেন রাস্তার পাশেই জমেছে সাপখেলানো ব্যবসা। শীতের দিনেই বেশি। শীতকালই ডুয়ার্সের শ্রেষ্ঠকাল বলা চলে। মস্ত একটা সাপ-খেলানো বাঁশী নিয়ে তাতে ফুঁ দিচ্ছে সাপুড়ে। সুরে-সুরে ভোলাচ্ছে সাপকে। মোহিনী ফণা বিস্তার করে দুলছে চকচকে কৃষ্ণবর্ণের সুচিক্কণ সর্পদেবতা। নীল চোখ। সরু চেরা জিভ। স্বয়ং সাক্ষাৎ মৃত্যু! জোর খেলা জমেছে। দাঁড়িয়ে গেছে হাটুরে মানুষ। দাঁড়াচ্ছে ঠেলাওয়ালা। রিক্সা-ওয়ালারাও ঝুঁকে পড়েছে তাবৎ।

গান ধরেছে চা-র দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ ভারতীয় গায়ক। চুড়ো করে বাঁধা চুল। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা। গেরুয়া রঙের মস্ত আলখাল্লা। তার হাতের ব্যাঞ্জোতে উঠেছে অপূর্ব সুর। লোক দাঁড়িয়ে গেছে কাতারে-কাতারে। তার ভাষা বোঝা যায় না, কিন্তু সুরের মাধুর্য স্পর্শ করে মনকে। গান শেষ হলে সে ভিক্ষে করে। হাত পাতে জনে-জনে। কমণ্ডলু একটা আছে বটে। তাতে পয়সা-সিকি ছুঁড়ে দেয় কেউ কেউ। পথচারীদের কেউ কেউ খুশি হয়ে কিছু বেশিও দেয়।

এইভাবে চলে ডুয়ার্সের মিলিত জীবনস্রোত! ভাঙা-গড়ার উত্থান-পতনের তালে তালে! বিচিত্র ছন্দে।

রাত দুপুরে আসেন কিষেণচাঁদজীর গদিতে ব্যবসাদার কেরামতউল্লা। দশ আঙুলে সাতটা আংটি। তাঁর পিতা-পুরুষ, প্রপিতামহের দল একদিন লক্ষ্মৌ থেকে এ দেশে এসেছিলেন, তা যেন ভুলেই গেছেন একালে। ভালোবেসে ফেলেছেন ডুয়ার্সকে। কিন্তু নেহাৎ নিখাদ ভালোবাসা নয়।

এসেই গদিতে টান-টান হয়ে বসেন। মেহেদীরঙা দাড়িতে হাত বোলান। তারপর খুশি-খুশি গলায়, বাতাও দোস্ত্!

দোস্ত্জিও খোসখেয়ালেই আছেন। দেয়াল-আলমারীর খোপটা খুলে যায় ক্ষিপ্র হাতে। বেরিয়ে আসে ছোট একটা হাতখানেক আন্দাজ বোতল। দরাজ হাতে কর্কটা খুলে ফেলে গ্লাসে ঢালেন। পরক্ষণেই কেরামতউল্লার দিকে এগিয়ে দিয়ে অনুরোধ, পহেলে তো পিও দোস্ত্!

এ-ব্যাপারে। এই ছোট-খাটো বোতলটা উনি একাই গলায় ঢালতে পারেন। তা ছাড়া এ সব মিষ্টি জলে নেশা হয় না তাঁর। ঘোড়ার মদ চাই তাঁর। রম্ না-পেলে নেশা জমে না। রোয়ানা হয়েছে?

হয়েছে। চুক করে গিলে ফেলে এক ঝলক। গ্লাসটা খালি করে ফেলেন একেবারে।

নেপাল থেকে ক'দিনে পৌঁছবে? গলার স্বরটা নামানো।

কুছপরোয়া নেই। ঘাবড়াও মাত্ দোস্ত্। কেরামতউল্লা অভয় দেন। বোতলটা খুলে আরো অনেকটা, প্রায় গ্লাসের গলায়-গলায় ঢেলে দেন কিষেণচাঁদজী। নিজের পাত্রে কিন্তু তেমন চুমুক দিচ্ছেন না। সেদিকে চোখ রাখতে ভোলেন না কেরামতউল্লা। দোস্তের প্রাণের টান যে।—আরে তোম পিও দোস্ত্।

হাঁ। মোটা গোঁফের তলায় খানিকটা মুখে ঢালেন কিষেণচাঁদজী। তিনি বেশি সহ্য করতে পারেন না। গলাটা, বুকের কাছটা জ্বলে। অনেক-দিন দেখছেন।

হাম তো হ্যায় দোস্ত্—কেরামত-উল্লাজী বলেন।

হনুমানজীকি কিরিয়া—। হাতটা ধরে ফেলেন কিষেণচাঁদজী, কঠো গাঁট হোগা?

বিশ-পঁচিশ! মদের ঝোঁকে গলা কাঁপে। কিছু বেশিই বলেন, তিরিশ গাঁটও হতে পারে। বহুৎ আচ্ছা টেরিলিন মিলবে। লেকিন থোরা ধীরসে দোস্ত্। কাস্টমস্ বহুৎ হুঁসিয়ার হ্যায়।

দেয়াল ঘড়িটা টক্ টক্ করছে। হঠাৎ যেন শব্দটাকে ভয় পেয়ে চুপ করে যান কিষেণচাঁদজী। বুকের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শুনছেন।

গ্লাসে আবার মদ ঢালবার শব্দ। বোতলটা বোধ হয় খালি করে ফেলল। তা ফেলুক, ক্ষতি নেই। কেরামতউল্লা লোকটা ভালো। অনেকদিন আছেন এ অঞ্চলে।

বাইরে রাত নিশুতি। হঠাৎ এক-যোগে ক'টা শেয়াল চীৎকার করে উঠল। প্রায় চমকে পড়েই যাচ্ছিলেন কিষেণ-চাঁদজী। তাকিয়াটা চেপে ধরলেন বাঁ-হাতে। কেরামতউল্লা টের পেয়ে গিয়েছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে তোম্ বুড্ঢা বন গিয়া, দোস্ত্!

হো হো শব্দের বিকট হাসি পরমুহূর্তে!

বাইরে ডুয়ার্সের আকাশে বনের মাথায় কৃষ্ণাতিথির ক্ষীণ চাঁদ। রাত্রি অমাবস্যার দিকে এগোচ্ছে। ধীরে-ধীরে।

কুম্ভিলোপাখ্যান : ডক্টর ইন্দ্রকান্ত শুক্ল। প্রকাশক : আলোকবর্ণ। ডি৪৮/১৫১, মিশ্রপোখরা, বারাণসী। দাম—পাঁচ টাকা।

শ্রীযুত ইন্দ্রকান্ত শুক্ল প্রণীত কুম্ভিলোপাখ্যান অধুনাতন হিন্দী সাহিত্যের একটি চমকপ্রদ গ্রন্থ। এতে হিন্দী সাহিত্যের সাহিত্যিক চৌরদের কয়েকটি কলঙ্ক কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়েছে। লেখক যে অসূয়াবশে বা কোন দুষ্প্রবৃত্তির তাগিদে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন তা মনে হয় না। ইন্দ্রকান্ত শুক্ল বয়সে প্রবীণ না হলেও জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় তিনি প্রবীণতা অর্জন করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক, হিন্দী, বাংলা, উর্দু, গুজরাতীতে সমান দক্ষ, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে সুপণ্ডিত এই লেখক হিন্দী সাহিত্যসংসারে অবহেলা করার মত মানুষ নন।

শ্রীযুত শুক্ল তাঁর কুম্ভিলোপাখ্যানে হিন্দীতে যে নির্বিবেক সাহিত্যিক চৌর্য-বৃত্তি চলেছে, তার সামান্য স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। হয়ত বা এ নিদর্শন আরো ব্যাপক হতে পারত, কিন্তু শ্রীশুক্ল তাঁর আক্রমণের জন্য দু' জাতের লেখককে বেছে নিয়েছেন। এর প্রথম জাত হচ্ছেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলগৌরব অধ্যাপকগণ, যাঁরা সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে সমালোচনা গ্রন্থ লেখেন এবং দ্বিতীয় জাত হচ্ছেন রসরচনা ও গল্প-উপন্যাস রচয়িতা সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিকগণ। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন হিন্দীর অধ্যাপক বাবু শ্যামসুন্দর দাসের লেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাবু সাহেবের গদ্যকুসুমাবলী একটি শিল্প ও সাহিত্যবিষয়ক নিবন্ধ গ্রন্থ—কাশী, প্রয়াগ ও নাগপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ ক্লাসের ছাত্রেরা এই বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত বলে আবশ্যিক-ভাবে পাঠ করেন। বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুত শুক্ল প্রচুর উদ্ধৃতিযোগে প্রমাণ করেছেন যে, বাবু শ্যামসুন্দর দাসের কোন প্রবন্ধ W. Basil Worsfold-এর লেখা Judgement in Literature গ্রন্থের কোন কোন প্রবন্ধের হুবহু অনুবাদ।

এর পর প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদ্ম-ভূষণ ডক্টর রাজকুমার বর্মার সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থের আলোচনা হয়েছে। শ্রীযুত শুক্ল দেখিয়েছেন, পদ্মভূষণ ডক্টর বর্মা ইস্ট অক্সফোর্ড স্কুলের হেডমাস্টার E. A. Greening Lamborn-এর Rudiments of Criticism গ্রন্থখানার অধ্যায়বিশেষ বেমালুম হিন্দী অনুবাদে নিজের গ্রন্থে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে একটি শব্দ অবশ্য তিনি পরিবর্তন করেছেন—কবিভাষার সার্বজনীন অনুভবগম্যতার উদাহরণরূপে Greenings যেখানে সেক্সপীয়রের নাম করেছেন, পদ্মভূষণ বর্মা সেখানে সেক্সপীয়র স্থলে সুরদাস লিখে স্বাজাত্যপ্রীতির পরিচয় প্রদান করেছেন।

এর পর গদ্যরত্নাবলী নামক একটি প্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থে শ্রীযুত যশোদানন্দন অখৌরীর 'ইত্যাদি কী আত্মকহানী' নামক একটি লেখার আলোচনা হয়েছে। শ্রীযুত অখৌরী হিন্দী সংবাদপত্র জগতের একটি প্রসিদ্ধ নাম—ইনি ভারতমিত্র, শিক্ষা, বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। শ্রীযুত শুক্ল দেখিয়েছেন, অখৌরীর 'ইত্যাদি কী আত্মকহানী'র মূলে রয়েছে অধুনালুপ্ত বাংলা পত্রিকা প্রদীপ-এ প্রকাশিত একটি রসরচনা—যার নাম ছিল 'শব্দচরিত্র—ইত্যাদি ও প্রভৃতি'। প্রবন্ধটি চমৎকার, অনেকটা ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার ঢঙে লেখা। অখৌরীর আত্মনামের হিন্দী অনুবাদেও হিন্দী পাঠকমহলে এটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

এভাবে অধ্যাপক এবং সাংবাদিক—এই দু' দলের সঙ্গে লড়াই-এর পর শ্রীযুত শুক্ল হিন্দীর প্রখ্যাত একজন কথা-সাহিত্যিককে আক্রমণ করেছেন। শ্রীচতুর সেন বৈদ্য (শাস্ত্রী) তাঁর গল্প সংকলন গ্রন্থ 'মেরী প্রিয় কহানিয়াঁ', 'হিন্দী কী শ্রেষ্ঠ কহানিয়াঁ', 'সম্পূর্ণ কথা-সাহিত্য (ভাগ ১)' প্রভৃতিতে একটি সুন্দর গল্পকে বরাবর আদরের সঙ্গে স্থান দিয়ে এসেছেন। হিন্দীতে চতুরসেনজী তাঁর গল্পের নাম দিয়েছেন—'দুখবা মৈঁ কাসে কহুঁ মোরী সজনী'; এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'নেলিনা বেগম' নামক একটি বড়ো গল্পের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। চতুরসেনজী স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত তৎকালীন 'প্রদীপ' পত্রিকা থেকে গল্পটি সংগ্রহ করেছেন, কিংবা পরে এই গল্প যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তা থেকেও চতুরসেন এটা সংগ্রহ করে থাকতে পারেন।

কিন্তু আশ্চর্য! হিন্দী পাঠকমহলে চতুরসেন এই গল্পটির প্রেরণা সম্পর্কে একটি চমৎকার রোমান্টিক কাহিনী প্রচার করে রেখেছেন—তা হিন্দীভাষীদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত। চতুরসেন বৈদ্য বলেছেন, তিনি একদা এক রাজকুমারীর চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন—গিয়ে দেখলেন, হীরে-জহরতের গহনায় সজ্জিতা রাজকন্যা পালঙ্কে শুয়ে আছেন, তাঁর পরনে চিকন বাস, তাতে তাঁর বরতনুর প্রতিটি রেখা স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে... ইত্যাদি। এবং এই রোমান্টিক মুহূর্তটিকেই তিনি তাঁর রোমান্টিক ঐতিহাসিক গল্পে স্থায়ী সাহিত্যিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন এবং শুধু তাই নয়—এই চতুরসেনজী সত্যই চতুর ব্যক্তি, তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—

পঢ় লিখকর মৎ বনো গুলাম
চালাকি সে সাধো কাম।

শ্রীযুত শুক্ল জানিয়েছেন, এই দুরভি-মানী ব্যক্তিটি সমালোচকদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা, হিন্দী পণ্ডিতমণ্ডলের মান্য-গণ্যদের তিনি শ্রদ্ধাদানে কুণ্ঠিত, হিন্দী সাহিত্যের দিক্‌পাল প্রেমচন্দ্র প্রমুখ এঁর কাছে তাচ্ছিল্যের পাত্র। অবশ্য এসব শ্রীযুত শুক্ল শ্রীচতুরসেন বৈদ্যের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেই দেখিয়েছেন—সুতরাং প্রমাণাভাব হেতু তাঁর যুক্তি অসিদ্ধ বলা চলবে না।

শ্রীযুত শুক্ল চতুরসেনের আর একটি বহুপঠিত গল্প 'প্যার'-এরও উৎস খুঁজে পেয়েছেন হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'হীরকবলয়' গল্পে। হরিসাধন মুখো-পাধ্যায়ের গল্পটি মেহেরউন্নিসার জটিল প্রেমাবস্থার একটি সুনিপুণ চিত্র। চতুর-সেনজী এই গল্পটি 'প্যার' নামের আড়ালে চমৎকার চতুরতার সঙ্গে হিন্দীতে আত্মসাৎ করেছেন। শ্রীযুত শুক্লের মতে, চতুর-সেনের সমগ্র সাহিত্যকীর্তিই বাংলার তৎকালীন পত্র-পত্রিকা ও গল্প-উপন্যাসের

ভাণ্ডারে চৌর্যবৃত্তির ফল। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে শ্রীশুক্ল অপরিসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলাদেশের তৎকালীন সাহিত্যপত্র—প্রদীপ, সাহিত্য প্রভৃতির পুরোনো ফাইল তন্নতন্ন করে ঘেঁটেছেন এবং তা থেকে রামপ্রাণ গুপ্ত, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বীরেশ্বর গোস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের ঐতিহাসিক লেখনসমূহ পাঠ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, রাখাল দাস, যদুনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকদের সেই যুগের ইতিহাসনির্ভর লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তার পরেই শ্রীশুক্ল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, চতুরসেনের সাহিত্যবশ বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারে সিঁধ কাটার ফলশ্রুতি মাত্র—এতে তাঁর স্বকীয় কৃতিত্ব নিতান্তই তুচ্ছ।

আমরা শ্রীযুত ইন্দ্রকান্ত শুক্লের সাহস ও নিষ্ঠার প্রশংসা করি। নিতান্ত দুঃসাহসী ও বেপরোয়া না হলে এই অপ্রিয় কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি চতুর্দিকে বৈরী সৃষ্টি করতেন না। আমরা এও বুঝতে পারছি, এভাবে মৌচাকে ঢিল মেরে তিনি যা করলেন, তার ফলভোগও তাঁকে করতে হবে। হিন্দী সাহিত্য জগতে তাঁর সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠার পথকে হয়ত তিনি নিজেই কণ্টকাকীর্ণ করে ফেললেন।

—সুবোধ চৌধুরী

ভোরের গোলাপ (শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭৬)। গিরিধারী কুণ্ডু। ৫৯, বেনিয়াপুকুর রোড, কলকাতা-১৪। দাম ঃ তিন টাকা।

৫৭টি কবিতা। অধিকাংশই গদ্যে লেখা। কবিতা লেখায় এখনো শিক্ষানবিশীর স্তর পেরুতে পারেন নি। 'আলোর ফিরে এলাম', 'একটি স্বপ্ন ও তার মৃত্যু', 'গুলিটা খুব লেগেছে', 'প্লাটফর্ম ঃ ট্রেন', 'বিদ্রোহ হতে পারে' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে যুগধর্ম প্রতিফলিত বলে ভাল লাগল।

পাথরমুখ শিশু (মার্চ, ১৯৭০) অমল ভৌমিক। বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

এই নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থে আত্মমগ্ন কবির স্বগতোক্তির মতো কবিতাগুলি সকলেরই ভাল লাগবে। সমস্ত কাব্যে একটি স্নিগ্ধ শুচিতা অনুভব করা যায়। বিরহে বিবাগী কবি শেষ অবধি ফিরেছেন, 'প্রেম', 'আনন্দ' আস্বাদ করেছেন। সমুদ্র, সূর্য, পাথর প্রভৃতি প্রতীক হয়ে বারে বারে একাধিক কবিতায় উপস্থিত। চিত্রকল্প রচনায় তাঁর দক্ষতা আছে। 'আর্থে' শব্দটির ব্যবহারকালে বেসামাল ঠেকছে। 'বিশ্লেষণ', 'সমীক্ষা', 'স্নান', 'সন্ন্যাসিনী, এই যে তোমার', 'আমার সকাল', 'অনুষ্ঠানে' 'আনন্দ' প্রভৃতি কবিতা প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করছে।

অনুক্ষণ স্বদেশ যাত্রায় (মাঘীপূর্ণিমা, ১৩৭৬)। মুকুল গুহ। দরবারী সাহিত্য প্রকাশনী, ৩০, লেনিন সরণি, কলকাতা—১৩। দাম—পাঁচ টাকা।

কাব্যগ্রন্থে ৫৩টি কবিতা আছে। কোন কবিতারই নাম নেই। মনে হয়, ধারাবাহিকভাবে একটি কবিতাই পড়ছি। স্বদেশ ও সমাজ পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে হাজির হতে চেয়েছে এই কাব্যে।

শেষের কবিতাটি 'এসো আমাদের কাছাকাছি বোস' বেশ দীর্ঘ এবং স্বভাবতই কবির ধ্যান-ধারণা এই কবিতাটিতে বিধৃত, আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের মাটি, নদী, দেশ, আমাদের স্বাধীনতা রূপ নিয়েছে। সময় এবং আলোকবিষয়ক কবিতাগুলি ভাল লাগবে। মেক্সিকোর বিতর্কিত রাষ্ট্রদূত অক্টেভিও পাজ-এর একটি কবিতার অনুবাদ এতে আছে। কাব্যগ্রন্থের দাম বড় বেশি বলে মনে হয়েছে।

কবিপক্ষের কবিতা (২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৭)। সম্পাদক সুদেব সামা। শাঁখরাইল, হাওড়া। দাম ২৫ পয়সা।

এবার কবিপক্ষে তথাকথিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশের হুজুগ বোধহয় কিছুটা কম। মফস্বলের আলোচ্য এই সংকলনটি আমাদের ভাল লেগেছে। কবিপক্ষের নামে হুল্লোড়বাজীর চেষ্টা করা হয়নি। বরুণ এবং নাম না-জানা লেখকদের রচনাতেও সাধনার ছাপ আছে। প্রণব রায়, বাদল ঘোষ, অলোককুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, সাগর দত্ত প্রমুখের কবিতা ভাল লাগল। দুটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুদেব সামা। কবি দুর্গাদাস সরকার রচিত "কবিগুরুর প্রতি নিবেদন" "প্রাণকেন্দ্রে তুমি" এই সংকলনটির একটি অতি মূল্যবান কবিতা।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার (বার্ষিক পত্র, ১৩৭৭)। ২৬।৪এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। সম্পাদনা বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাণা বসু।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের ২৪তম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত এই বার্ষিক পত্রটি একটি মূল্যবান সংকলন। প্রবন্ধগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সুচয়িত। গুরু নানকের প্রতি পাঁচশত বৎসরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন স্বামী বীতশোকানন্দজী। বিদ্যাসাগর ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর প্রতি দেড়শো বছরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন যথাক্রমে অমরনাথ ভট্টাচার্য ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধে ও কবিতায় শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান হয়েছে দেশবন্ধু, জগদানন্দ রায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, লেনিন ও গান্ধীজীকে। লেখকগোষ্ঠীতে আছেন বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মণি বাগচী, বিভূতি দাস, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অরুণ মিত্র, রাণা বসু, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। গত বছরে দেশ-বিদেশের লোকান্তরিত সুসন্তানদের স্মরণ করা হয়েছে। একগুচ্ছ সুসংকলিত কবিতা বার্ষিক পত্রটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু সে, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক, দুর্গাদাস সরকার প্রমুখ কবির কবিতা ভাল লাগবে। চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের কল্যাণকর সংস্কৃতিমূলক বিবিধ কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। লেখকগোষ্ঠীতে আরও আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরী, বীরেন্দ্রলাল ধর, কুমারেশ ঘোষ প্রমুখ।

আত্মতি (৪র্থ বর্ষ, চলচ্চিত্র সংখ্যা, ১৩৭৬)। সম্পাদক নিতাগোপাল সামন্ত। নিউ দেবলা প্রেস, আমতলা, কন্যানগর, ভায়া কলকাতা-২৭। দাম ঃ পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য চলচ্চিত্র সংখ্যাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দুর্গাদাস সরকার-এর প্রবন্ধ "বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট-মুক্তি" একটি মূল্যবান সংযোজন। চলচ্চিত্র সংখ্যা হলেও কয়েকটি গল্প ও কবিতাও রয়েছে। সকলরকম পাঠকেরই মনোরঞ্জন করবে।

চারুবাক (দ্বিতীয় সংকলন ডিসেম্বর, ১৯৬৯)। সম্পাদক রণজিৎ দাস। ৪৩, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬। দাম—?

টাটা ইণ্ডাস্ট্রিজ স্পোর্টস ক্লাবের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মুখপত্র। অলোক সেন এবং রূপেন মিত্রের গল্প, শ্যামল বসুর রচনা, সরোজ সেন-এর 'নায়িকা', 'শেষ ছবি' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

অভিযান (১লা বৈশাখ, ১৩৭৭)। যুগ্ম-সম্পাদক তপনকিরণ রায় ও জয়নারায়ণ সাহা। রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। দাম ঃ ৭৫ পয়সা।

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত এই সাহিত্য সংকলনে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দুটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। জীবনময় দত্ত, তপনকিরণ রায় ও শ্রীকান্তের গল্প এবং রবীন্দ্রনাথ অধিকারী ও বিষ্ণুপদ সামন্তের কবিতা ভাল লাগল। পত্রিকাটির প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এ আশঙ্কা কেটে যাক—এই চাই আমরা।

রাজা

অশোককুমার সেনগুপ্ত

রাজনগরের গরুহাটায় ভোলা বাগদী একটা এঁড়ে বাছুর বেচতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল। বলেছিল, বলি গাঁ বাগে আমাদের যেও কেনে হে। ঢেরদিন ত উ বাগে যাও নাই।

মানুষটা তখন গোয়ালিনী। মাথায় লম্বা পরচুলা, কালো উঁচু-নীচু ঈষৎ লম্বাটে মুখে স্নো-পাউডারের ঘামে ভিজে ওঠা বিশ্রী সাদাটে দগ, বুকে নারকেলমালা তার উপর রঙচটা লিলেনের কোন্ আদ্দিকালের সহস্র ভাঁজখাওয়া হলদে ব্লাউস, গায়ে নীল শাড়ী, শিরওঠা হাতেও স্নো-পাউডার, একরাশ কাঁচের চুড়ি। কোমরে মাটির ছোট্ট একটা কলসী। মাথায় বিঁড়ে। কিন্তু কলসীটা ওতে তোলার সাহস হয় নি। আড়চোখে কটাক্ষ হেনে শরীর দুলিয়ে বলেছিল, শুনগো সব হেটো মানুষ, আমার পিরীতে মজেছেক এই জনা। গুয়ালর বৌ বটি, হাটে-বাটে ঘুরি, কিন্তুক মান-ইজ্জৎ ত ছাড়তে লারি। তা আমি গেলে তুমার ঘরের গিন্নি ঝাঁটাপেটা করবেক নাই ত? না করলে বাবু সুয়ামী ছেড়ে তুমারই হাত ধরব গো।

অশ্বত্থতলার নীচে ফাঁকা মাঠে এখানে-ওখানে এ-পাশে ও-পাশে গরু-ছাগল-ভেড়া-মোষ, হাঁস-মুরগী নিয়ে পাইকেরের ভিড়ে হাট গরম। কথা শুনে অনেকেই খলখলিয়ে হেসে ওঠে।

সেই মানুষই হর হর বোম্ বোম্ শব্দ করতে করতে একদিন তেঁতুলতলা দিয়ে গাঁয়ে ঢুকল। মাথায় শণের পাকানো খয়েরী জটা, কালো রোগা, গায়ে ছাইমাখা, কোমরে এক চিলতে হলুদ ছোপ ছোপ ন্যাকড়া, হাতে বাঁশের তৈরী ত্রিশূল, কাঁধের পাশে কাগজের ফণাতোলা সাপ। মুখে শব্দ, হর হর বোম্ বোম্।

পাড়ার বৌঝিরা হেঁসেল ছেড়ে একগাল হেসে দরজা থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, বউরূপী এসেছেক গো। বুড়ো-বুড়ীরা উৎসাহিত হয়ে বলল, আহা ঘরে ত আসবেক। ছুটাছুটি করছ কেনে? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মানুষটার পিছন পিছন যেতে যেতে বলল, এত্তদিন আস নাই কেনে গো! ফাজিল এক ছোকরা সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাঁড় কোথা গেল হে শিবঠাকুর?

তখন মানুষটা প্রকৃতই শিব, নীলকণ্ঠ। নেশাচ্ছন্ন চোখ ঢুলু-ঢুলু, সাদা ডিমের ভিতর ঈষৎ নীলাভ টিপ-খানা বারবার উপরের দিকে উঠছে। এই সব মানুষ-জন তাবৎ এই পৃথিবী

আসলে মানুষটার উপর কি যেন ভর করে। রক্তমাংসের স্থলে এই শরীরটা ক্ষুধা-তৃষ্ণার বাইরের এক জগতে বিচরণ করে। তখন চোখের ওপর সব কিছু ধোঁয়া। ঘর, বুড়ী মা, বৌ, তিনটি সন্তান, দৈনন্দিন অভাব-অনটন, ছেঁড়া কাপড়, ভিজে ভাতের ওপর একটুকরো পেঁয়াজের জন্যে হা-হুতাশ—সব উধাও। তখন সে ভিন্ন মানুষ। মানুষ নয়, সেই সজ্জায় প্রকৃত যেন সে। কখনও গোয়ালিনী, কখনও সন্ন্যাসী, কখনও কালী, কখনও দুর্গা, কখনও রাজা, কখনও গাঁয়ের বৌ, কখনও শহুরে বৌ।

তারপর ফ্রেঞ্চচক খোলা হলে আবার নিজের চেহারা ফিরে পেলে মানুষটা তখন বৃন্দাবন বাগদী। বাপের নাম তারণ বাগদী। সাং তাঁতিপাড়া, জেলা বীরভূম। পেশা চাষ। নেশা বহুরূপী। সরকারী খতিয়ানে জমি-জায়গার লেশ-মাত্র নেই। ঘরে বুড়ী মা, স্ত্রী, চারটি সন্তান, সর্বশেষটির বয়স তিন মাস। মাটির ঘরটির অবস্থা সংসারেরই অবিকল প্রতিরূপ। খড়ের চাল, বাঁশ কিন্তু দেখা যায়। দাওয়া নেই, টিনের একটা আগলের পরই উঠোন। উঠোনটা নিজের নয় আবার পাঁচভাগীর। বৌ বলে, প্যাটে ভাত নাই, আবার লাচ দিখান হয়। মরে যাই আমি, একটা খিপার সঙ্গে আমার বিয়া হন-হেক গো। মা বলে, অ বিন্দা, চল বাপ আমাকে নিস্ তু বক্কেশ্বরে চল! আসলে বুড়ী সব সময়ই নিজেকে মৃতা ভাবে। সুতরাং এই ঘর-সংসার নয় তার যে বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানেই একমাত্র আশ্রয়, তাই বারবার বোঝানর চেষ্টা করে। বৃন্দাবন মুখে চুকচুক শব্দ করে। মনে মনে বলে, হায় হায়, কেনে বিবাগী হলম-না গো।

তবে সে-সব খুব অল্প সময়ের জন্যে। এমনিতে বৃন্দাবন অত যন্ত্রণা সত্ত্বেও হাসিখুশি। জানে অভাব-অনটন কখনও মেটে না। সংসার থাকলেই হা হা দৈ দৈ। আর বৌ নাচের কথা বললেও বহুরূপী সাজার ফলে তার তো লাভই হয়। এই যে ভরা ভাদর মাস। চারিদিকে অন্নের হাহাকার। মাঠে মাঠে সবুজ ধানের রাশ। গত বছরের সব ধান-চাল শেষ। এই সময় মাঝে মাঝে পেটে যে দু'চার মুঠো মোটা চালের ভাত জুটছে তা তো ওই নাচেরই দৌলতে। বৌ না বুঝুক, বৃন্দাবন এটা খুব ভাল করেই বোঝে। কিন্তু বৌকে বোঝানর চেষ্টা করে না। মেয়ে-মানুষের জাত। কথা বলবেই। আর কাম যখন তার আছে, তখন অকে শুনতেও হবে। বয়স তার যে একখানা মুখ আছে এবং সে মুখ যেমন আর গ্রহণ করে, তেমনি চোখা চোখা শব্দও বের করতে পারে, সেটা ভুলে থাকলেই যথেষ্ট।

ভোলা বাগদী মানুষটাকে দেখে একগাল হেসে বলল, অয় তাহালে তুমি এলে! আমিই তুমাকে রাজনগরের হাটে আসতে বলেছিলম গো!

মানুষটা ঢুলুঢুলু চোখে একবার ভোলাকে দেখল। তারপর বলল, হর হর বোম্ বোম্।

—আহা, শুন আমার কথা!

—হর হর বোম্ বোম্! আবার হুঙ্কার ছাড়ল সে।

—বোম্ বোম্, তুমার রাখ। লাও একটা বিড়ি খাও। কোমরের গেঁজে থেকে লাল সুতোর একটা বিড়ি বাড়িয়ে দিল ভোলা।

—গাঁজা দে বেটা। গাঁজা দে। বলতে বলতে হাত বাড়াল মানুষটা।

—গাঁজা তুমি হিথা পাবে। পাতের বিড়ি টান এখুন। ভোলা দেশলাই জ্বালাল। আসলে এ-সব ব্যাপারে ভোলার উৎসাহের অন্ত নেই। বাপ চাষ করে। জোয়ান বেটা বাপকে চাষে সাহায্য করে। বিয়েথা এখনও করে নি। স্বাস্থ্য দোহারা। মাথায় কোঁচকান চুল, তেড়ি ওল্টান। ঘর-দুয়ার, সংসারে মন নেই। থাকা না থাকা। বাপ বলে, অমুন বিটার বিয়া দিয়ে কি হবেক গো! আঁ মেয়েটাকে কেটে পুখোরের জলে ভাসিন দিয়া হবেক যি। মা কিন্তু মায়া ছাড়তে পারে না। বলে, বিয়া দাও, ভুলা আমার ঠিক হন যাবেক। সংসার করার ব্যাপারে কিন্তু খোদ ভোলার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। দূরে দূরের গাঁ-গঞ্জে যাত্রা-থিয়েটার হলে সেখানে ভোলা হাজির। এতদিন অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত আবার রাজনগরের মাঠে সিনেমা বসেছিল। ছেঁড়া তাঁবুর সিনেমা। বিশ পয়সা টিকিট—মাটি, পঞ্চাশ—বেঞ্চি। এক টাকা—চেয়ার। তা ভোলা যেতে একদিনও কামাই করে নি। বর্ষা পড়ে সিনেমা বন্ধ হওয়ায় ভোলা দুদিন ভাল করে ভাত খেতে পরে নি। বোম্বাই-বাংলার সব নায়ক-নায়িকাদের নাম ওর মুখস্থ, হিন্দী গানের কয়েকটা কলিও। বিড়ি ধরিয়ে ঘরে দাওয়ায় বসে গান ধরে। মাকে বলেছে, ইবার ধান উঠলে শুট লুব মা। আঁ।

বিড়ি ধরিয়ে জোরালো একটা টান মেরে বৃন্দাবন বলল, নাম কি আছে বেটা তুমার? কিয়া নাম আছে? মুখ উপরে দিকে টান টান করে তুলল।

ভুলা' [illegible], [illegible] [illegible] তার ভুলা, সুতরাং সেটাই বলল।

—আও বেটা॥ আমরা দুজনাই ভুলা? বোম্ ভুলানাথ। বৃন্দাবন হুঙ্কার ছাড়ল।

গাঁয়ের এ-পাড়া সে-পাড়া এ-ঘর সে-ঘর ঘোরা হল। পিছনে ছেলের দঙ্গল। বেলা করেই এসেছে। রোদ তখন বেশ চড়চড়ে। সুতরাং রোদ আরও চড়চড়ে হল। ভাদ্র মাস। তবু বর্ষার আমেজ এ-বছর পুরোপুরি। গত সপ্তাহ আকাশ সব সময় মেঘে ডুবে ছিল। শরতের মেঘ নয়, বর্ষার মেঘ। ঝরঝর তার ঝরানি। এ-সপ্তাহে সে-সব মেঘ কোথায় যেন উধাও। আকাশ ঝকঝকে একেবারে। রোদের গা-পোড়ান তেজ। বাতাসও আগুনপোড়া।

ভোলা সঙ্গছাড়া হল না। বৃন্দাবনও ছাড়ল না। দিনপাঁচেক থাকতে হবে গাঁয়ে। পাঁচ দিনে পাঁচ সজ্জা। তারপর আদায়। চাল, মুড়ি, পয়সা, পুরান কাপড়। কিন্তু এই পাঁচ দিনে একটা সঙ্গী না হলে চলে না। সব গাঁয়েই এমন মানুষ জুটে যায় দু'একটা। এখানেও জুটবে, জানত বৃন্দাবন। ভোলা আসতেই তাই সঙ্গী করে নিল।

আর ভোলা তো এ সবই চায়। সুতরাং খাওয়া-দাওয়া, সাজা-গোজা, রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত সবেই সে সাহায্য করতে লাগল মানুষটাকে।

দ্বিতীয় দিন বৃন্দাবন সাজল শহুরে বৌ। মুখে সেই ফ্রেঞ্চচক, খেলনা ঘড়ি-হাতে, মাথায় ঘোমটা নেই, পায়ে চটি, মুখে হ্যাট ফ্যাট ম্যাট ক্যাট, চোখে একটা ডাঁটিভাঙ্গা আবার চশমা।

আর তৃতীয় দিনে সাজল রাজা। ভোলা আগ বাড়িয়ে চলল এ-ঘর সে-ঘর। মুখে কথার ফুলঝুরি—রাজা এসেছেন গো গাঁয়ে; তুমাদের দুঃখের কথা বিবাক বলে লাও এখুন।

রাজার কোমরে টিনের তরবারি, রাজপোষাক নেই, গায়ে একটা উড়নি, হাতে-পায়ে-গলায়-কোমরে রাংতার গহনা, মাথায় মুকুট। মুখে কোন শব্দ নেই। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল। পিছনে ছেলের পাল আর মুখে তাদের অজস্র কথা,—ও রাজামশায়, ঘডা কুথা আপনার...আর লুক কুথা...জানা নাই কেনে গো রাজা...ই তরোয়ালটাতে কত মানুষ কেটেছ গো...ও রাজা, রাণী কুথা তুমার!

বিপদটা ঘটল রায়বাড়িতে এসে। তিনদুয়ারী ঘর। পর পর তিনটি দরজা পার হলে ভিতরে উঠোন, চার পাশে দালান-কোঠা। প্রথম দরজা পার হলে গোয়াল, ঢেঁকিশাল, পাশে [illegible]

দ্বিতীয়টি পার হলে ধান-চালের গোলা। তবে এখন আর ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই। গোয়ালে কয়েকটা রোগ-জীর্ণ গরু খড় চিবোয়। গোলাগুলোও শূন্য। পাঁচভাগীর জিনিষ ভাগ হয়েছে, সুতরাং এখন এই ঘরবাড়ি রসকষহীন অন্তঃসারশূন্য একটা নিছকই কাঠামো ছাড়া আর কিছু নয়। এককালের জমিদার ঘর এখন প্রজার চেয়েও নিম্ন। প্রথমকার দরজাটা বিশাল। হাতীর পিঠে চড়ে এককালে মহারাজ ঢুকতেন। এখন তার ঠাটটুকুই সেদিনের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাও রঙচটা, সিমেন্ট ঘসা, বিবর্ণ, লাল দগদগে ইঁট, গায়ে বট-অশ্বত্থর চারা।

ভোলা আগে আগে বলতে বলতে ঢুকল, রাজামশায় এসেছেন গো। রাজা-মশায় এসেছেন গো। রাজামশায় এসেছেন গো।

বিভূতিভূষণ রায় পাশবালিশে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। রাতে প্রায়ই ঘুম হয় না। সারাদিন তাই দাওয়ার পাশবালিশে হেলান দিয়ে ঝিমোন। মাথার চুল একেবারে পাকা, কঙ্কালসার শরীর, হাড়ের ওপর সাদা চামড়ার ঢাকনা, এককালে যে সুপুরুষ ছিলেন তা বর্ণ এবং হাড়ের কাঠামোতেই অনু-মিত হয়। সংসারের সব ব্যাপারেই তিনি বীতরাগ। খান-দান আর শুয়ে থাকেন। সারাদিনে তাঁর কণ্ঠস্বর দুই কি একবার মাত্র ঘরের মানুষ শুনতে পায়। বয়সের ভারে তিনি নিঝুম হয়ে পড়ে থেকে তাঁর একমাত্র কাজ হল আপনমনে বিড়বিড় করা। কিছুকাল আগে পর্যন্ত সেবাযত্নের অভাব ছিল না। এখন যেহেতু মানুষটা অনন্ত আয়ু নিয়ে সংসারে এসেছে বলে সকলেই একপ্রকার স্থির-নিশ্চিত, তাই সকলেই দূরে দূরে। পুত্র এবং নাতি-নাতনীরা সকলেই কল-কাতায়। বড়বৌমা কিছুকাল ছিলেন। ইদানীং তিনিও [illegible] পা বাড়িয়েছেন। [illegible] সময় [illegible] পত্র আসে। [illegible] একটি [illegible] এবং একটি চাকর [illegible] নিশ্চিন্ত। সবাই জানে এবং [illegible] খারাপ ভাল কিছু হলে সিউড়ী থেকে টেলিগ্রাম করবে, ব্যস শেষ। বৃদ্ধ বিভূতিভূষণ রায়ের এর জন্য কোন আক্ষেপ অথবা কোন দুঃখবোধ নেই। তিনি যেন এক আলাদা জগতের মানুষ। যে জগৎ থেকে এক-জনের পর একজন সরে গিয়ে তাঁকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে। যে জগতের হাজারো বাতি একটার পর একটা তেল ফুরিয়ে নির্বাপিত হয়েছে। যে জগতের সকল শব্দ দূরে, বহুদূরে কোন দিগন্ত রেখার ওপারে বাতাসের বিপুল তরঙ্গে ভেসে গিয়েছে। তাই সে জগৎ ধূসর শব্দহীন, বর্ণহীন। বৃদ্ধ বিভূতি-ভূষণ রায় [illegible] বিছানায় হেলান দিয়ে সেই জগতের ভিতর ভেসে বেড়ান। নির্বাক নিঝুম হয়ে ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি নিয়ে সে জগৎ দেখেন।

পুত্ররা বৃদ্ধকে কলকাতা নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গাড়িতে উঠতে হবে জেনে সে কি কান্না। সে কান্না আর থামে না। কোন কথা না বলে বৃদ্ধ অঝোরে কেঁদেই প্রতিবাদ জানিয়ে-ছিলেন। পুত্ররা বিরাট ভার আপনা থেকেই সরে যাওয়ার এই সুযোগ গ্রহণ করতে দেরী করে নি।

রাজামশায় এসেছেন গো।...রাজা-মশায় এসেছেন গো...ভোলার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই বৃদ্ধ আস্তে বিছানায় ওপর উঠে বসলেন। তারপর বহুকাল পর যেন সেই যৌবন ফিরে এসেছে, তেমনি স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, কে? কে?

ভোলা বলে ফেলল, রাজা! রাজা! রাজা এসেছেন ঘরে।

—ওরে বাজনার শব্দ নেই কেন। রাজা এসেছেন। উঃ, কতকাল পরে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

২৩।৫।৭০ তারিখ বেলা ৩টা থেকে আমাদের কার্যালয়ের টেলিফোন নম্বর ৩৪-৭৭৭১-৭৪-এর পরিবর্তে ৩৫-৯৮৬১-৬৪ হয়েছে।

কার্যাধ্যক্ষ
দি বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ

ধর। ধর। আমি দাঁড়াব রে। জয় মহারাজজী জয়! ওরে রাজার জয় দে। এত চুপচাপ কেন তোরা? বৃদ্ধের দু' চোখ ছাপিয়ে জল এল। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মাথা শুধু দুলতে থাকল তাঁর।

ভোলা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, আজ্ঞে।

তক্ষুণি রাজা হাজির।

—মহারাজ! বৃদ্ধ বাক্যে নয়, বুক টান টান করে উচ্চারণ করল।

—কি? বৃন্দাবন পাথরের মূর্তি যেন। শব্দটা আচমকা বের হয়েই অসহ নীরবতা।

—এতদিনে দয়া হল রাজা। আমি কতকাল ধরে ভাবছি আপনি আসবেন। কিন্তু শব্দ নেই কেন? বাজনা নেই কেন? শাঁখ-ঘণ্টা বাজছে না কেন? মহারাজ, সবাই আপনার জয় দিচ্ছে না কেন? আমার মনে আছে মহারাজ, হ্যাঁ, আপনি আগে যখন এসেছিলেন, তখন বাজী পুড়েছিল, সে কি শব্দ, তখন—রাস্তায় ফুলের ছড়াছড়ি, শাঁখের [illegible] আর সেই মহারাজের জয়গানে আমার প্রজারা চারপাশ ভরিয়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধের এখন সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু একটা চাকর গিয়ে ধরে ফেলল। তারপর ইসারায় বলল, চলে যাও কেন তোমরা। কিন্তু বৃদ্ধের চিৎকার থামছে না, ওরে, ওরে কোথায় তোরা সব গেলি, আমি বেঁচে থাকতে মহারাজের অভ্যর্থনা হবে না! নিয়ে আয় ঘণ্টা, নিয়ে আয় শাঁখ। আমি বাজাব। জয় মহারাজের জয়। বৃদ্ধ হাত তুলল।

বৃন্দাবন বলল, আপনি বসুন।

—মহারাজ, আমার অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। বৃদ্ধ চোখ খুলল এতক্ষণে। তারপর বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, এ কি! এ কি সজ্জা মহারাজ আপনার! হাহাকার করে উঠল বৃদ্ধ, আপনি...আপনিই তো সেই মহারাজ, নাকি ভুল, ভুল দেখছি আমি...। আপনার এই সজ্জা, শরীর আপনার এই হয়েছে। মহারাজ! মহারাজ! কথা বলুন!

—হ্যাঁ।

—আপনার রাজপোষাক কই প্রভু?

—নাই।

—ছিনিয়ে নিয়েছে? হাঃ হাঃ মহা-রাজ, ছিনিয়ে নিয়েছে। কান্না আর হাসি বৃদ্ধের চোখে-মুখে একসঙ্গে থর থর করে কাঁপুনির মধ্যে দোলা খেয়ে ফিরতে থাকল, আমারও সব ছিনিয়ে নিয়েছে প্রভু! আমারও সব ছিনিয়ে নিয়েছে।

বৃন্দাবন কথা বলল না।

তাহলে মহারাজ চলুন, আমরা পালিয়ে যাই। প্রভু ঢুকেছে, তাই চারপাশ যেন শব্দহীন। মহারাজ এ কি হল? চলুন, আমরা পালিয়ে যাই। বৃদ্ধ এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল। বৃন্দাবনের দিকে তাকাল, ভুল হয়ে যাচ্ছে মহারাজ, আপনি কি সত্যিই সেই মহারাজ? সত্যিই সেই মহারাজ?

বৃন্দাবন আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভোলা পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, খিপা। বৃন্দাবন গম্ভীর গলায় বলল, মাইরি, রাজার সাজ ঠিক পরা হয় নাই। ইবার পয়সা জমলে কিনব। বুড়া বুঝতে পেরেছে।

আর তখন মহারাজাকে চলে যেতে দেখে তার সঙ্গী হয়ে এই বাস্তব রূঢ় জগৎ ছেড়ে সেই জগতে যেতে না পারার গভীর দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়ে বৃদ্ধ বিভূতিভূষণ রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাতের মুঠোয় মাটি খিমচে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

এরপর ইসাডোরা লিখেছেন—ক্রেগ হয়তো পথ পরিক্রমার সময় একটি গাছ, বা পাখী বা শিশুকে দেখলেন—তারপরেই অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় এসে হাজির হলেন আমার কাছে। তাঁর সঙ্গটা কখনও কারোর পক্ষে একঘেয়ে বলে মনে হোতো না।

কখনও চরম আনন্দের মুড়ে বা পরম বিষাদমগ্ন অবস্থায় বিচরণ করতেন গর্ডন ক্রেগ। ক্রমে ক্রমে তাঁর মানসে ডার্ক-মুডসগুলোই যেন বেশি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো। তিনি এই সময় বারবার বলতে থাকতেন—"আমার কাজ। আমার কাজ!" আমি উত্তরে বলতাম—"হ্যাঁ, তোমার কাজ তো আছেই। সতিাই তোমার কাজের সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা চলে না। তুমি জিনিয়াস—কিন্তু একথা তো জান যে, আমারও স্কুলের কাজ রয়েছে।" ক্রেগ টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে বলতেন—"তা বটে, তবে আমার কাজ......।" আমি বলতাম—"নিশ্চয়, তোমার কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Your work is the setting, but the first is the living being, for from the soul radiates everything. First my school, the radiant human being moving in perfect beauty; then your work: the perfect setting for this being." এ ধরনের উত্তরে ক্রেগ বিরক্ত হয়ে উঠতেন এবং আমিও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। তবে একথাও বলবো আমার আর্টকে গর্ডন ক্রেগ যেভাবে এ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন, তেমনটা আর কেউ পারেন নি। তিনি অবশ্য বাইরে স্বীকার করতে চাইতেন না যে, কোন নারী সত্যিকার শিল্পী হতে পারেন।

[অভিনয়ে অ্যাক্টরের প্রাধান্য বেশি, না স্টেজ ডেকরেটরের? এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটির থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। কবি বলেছেনঃ "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।

*　　*　　*

"কিন্তু শ্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্য সে বিশেষভাবে সৃষ্ট। সে যে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, একথা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

*　　*　　*

নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে —অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়।

"তা ছাড়া যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে, তাহার কি নিজের সম্বল কাণাকড়াও নাই? সে কি শিশু? বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়েই নির্ভর করিবার যো নাই? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন সব লোককে টিকিট বেচিতে নাই।

*　　*　　*

"শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ ছোটানো বন্ধ করিতেন।

*　　*　　*

"ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না;

*　　*　　*

"বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য: তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশী থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে [illegible] হইতে তাহার [illegible] গুলো কাটি দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।"

রঙ্গমঞ্চ—১৩০৮, বিচিত্র প্রবন্ধ।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কাছে শুনেছিলাম যে, কবি তাঁকে রক্তকরবী মঞ্চস্থ করতে বলেন। নাট্যাচার্য কবিকে বলেছিলেন যে, নন্দিনী করবার মত শিল্পী পেশাদারী মঞ্চে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তখন কবিগুরু তাঁকে বলেন যে, নন্দিনীর ভূমিকায় শিশিরকুমারের ছোট ভাই ভবানীকিশোর ভাদুড়ীকে দিয়ে অভিনয় করাতে। এরপর হেসে শিশিরকুমার আমাকে বলেছিলেন—কিন্তু পাবলিক স্টেজে এটা নিতো না।]

তারপর ইসাডোরা বলছেনঃ বসন্তকাল এল। আমার কনট্রাক্ট ছিল ডেনমার্ক, সুইডেন এবং জার্মানী যাবার। কপেনহেগের রাস্তায় দেখতাম যুবতী মেয়েরা একা একা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে অদ্ভুত বুদ্ধির ছাপ—মুখভাব আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এত সুন্দর চেহারার মেয়েদের অন্য কোন দেশে দেখি নি। পরে জানতে পেরেছিলাম, এ দেশেই সর্বপ্রথম মেয়েরা ভোটাধিকার অর্জন করেছিল।

স্টকহমে আমার নৃত্যপ্রদর্শনীতে খুব উৎসাহী দর্শকের সমাগম হয়েছিল। প্রদর্শনীর শেষে জিমন্যাস্টিক স্কুলের মেয়েরা প্রায় লাফাতে লাফাতে আমার গাড়ির সঙ্গে তাল রেখে হোটেলে আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে এল। আমার নাচ দেখে তারা খুবই খুশি হয়েছিল। একদিন তাদের জিমন্যাস্টিক প্রতিষ্ঠান দেখতে গেলাম—কিন্তু দেখে খুব উৎসাহিত বোধ করি নি। It seems to me that Swedish gymnastics are meant for the static, immobile body, but take no account of the living, flowing, human body. Also it regards the muscles as an end in themselves, instead of recognising them merely as the mechanical frame, a never-ending source of growth. The Swedish Gymnasium is a false system of body culture, because it takes no account of the imagination and thinks of the body as an object, instead of vital kinetic energy.

স্টকহমে থাকতে স্ট্রীন্ডবার্গকে ইন্‌ভাইট করেছিলাম আমার শো দেখতে আসবার জন্য—কারণ তাঁর প্রতি ছিল আমার অসীম শ্রদ্ধা।

He replied that he never went anywhere, that he hated human beings. I offered him a seat on the stage, but even then he did not come.

এরপর আবার জার্মানীতে ফিরে এলাম।

ইসাডোরা ডাঙ্কান অন্য জায়গায় লিখেছেন যে, স্ট্রীন্ডবার্গের নাটক তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল—বিশেষত 'দি রোড টু ডামাসকাস' নাটকটি। এ নাটকের প্রথম দৃশ্যটি নাকি তাঁর কবিতার মত লাগতো। স্বয়ং ইবসেন বলেছেন যে, স্ট্রীন্ডবার্গ তাঁর থেকে বড় নাট্যকার। ইউজিন ও'নীলও মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক নাট্যকারদের ভেতর কেউই স্ট্রীন্ডবার্গকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে সমর্থ হন নি। এখানে 'দি রোড টু ডামাসকাসের প্রথম দৃশ্যের কিছু অংশ বঙ্গানুবাদে তুলে দিলাম।

দি রোড টু ডামাসকাস

প্রথম দৃশ্য

[রাস্তার বাঁকে একটি গাছের তলায় বসবার বেঞ্চ। কাছেই একটি পোস্ট অফিস এবং কাফে। কাফের সামনেও টেবিল, চেয়ার পাতা। পোস্ট অফিস এই সময়টায় বন্ধ। কাফের বাইরের চেয়ারে সব পুরুষ, মেয়েরা বসে মদ পান করছে—ভেতর থেকে জোর গানের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ হুল্লোড়ের পর হঠাৎ সব থেমে যাবে—একে একে লোকেরা উঠতে থাকবে। আলোগুলো সব নিভে যাবে। একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজবে। স্টেজের আলো আবার খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একপাশ দিয়ে স্ট্রেঞ্জার স্টেজে ঢুকে কিছুক্ষণ থমকিয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিক থেকে একটি লেডী ঢুকবেন—স্ট্রেঞ্জারকে দেখে এগিয়ে এসে তাঁকে অভিবাদন করে চলে যেতে গিয়ে থেমে পড়বেন।]

স্ট্রেঞ্জার—ও...তুমি! আমার মনে হয়েছিল যে তুমি আসবে।

লেডী—তুমি আমাকে চেয়েছিলে? তোমার ডাক আমি শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু এই জায়গায়টায় তুমি অপেক্ষা করছ কেন?

স্ট্রেঞ্জার—তাত ঠিক জানি না। তবে কোন একটা জায়গায় তো অপেক্ষা করতে হোত।

লেডী—কার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ?

স্ট্রেঞ্জার—তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো তাহলে সত্যিই আনন্দিত হতাম। চল্লিশ বছর ধরে কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করছি। কেউ কেউ একে বলবে মনের শান্তি—আবার কেউ কেউ ঘুরিয়ে বলবে অশান্তির অবসান। (কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকবে—দূরে জোরে যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ পাওয়া যাবে।) কি ভীষণ এবং বিশ্রী বাজনা বাজছে। শুনতে পাচ্ছ! তুমি চলে যেও না, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তুমি যেও না। তুমি আমাকে একলা ফেলে গেলে সত্যিই আমি ভয় পাব, এই অন্ধকারে গা ছমছম করবে।

লেডী—গতকালই আমাদের প্রথম দেখা—চার ঘন্টা ধরে আমরা কথাবার্তা বলেছি। তুমি আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছ, তোমার সম্বন্ধে সহানুভূতি বোধ করেছি—কিন্তু তাই বলে তার অপব্যবহার কোরো না।

স্ট্রেঞ্জার—সে জন্য আমাকে সাবধান করবার দরকার নেই। কিন্তু আবার মিনতি করছি আমাকে একলা ফেলে যেও না—আমি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত—কোন বন্ধুবান্ধবও নেই আমার। যাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে, তারাও আমার শত্রু।

লেডী—সত্যিই চারদিকেই তোমার শত্রু। সর্বদিক থেকেই তুমি একলা। কিন্তু স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের ফেলে পালিয়ে এলে কেন?

স্ট্রেঞ্জার—তা কি আমি নিজেই জানি! এখনও বেঁচে আছি কেন সে কথাটাই যদি বুঝতে পারতাম! এখানেই বা এখন এসেছি কেন! এর পরই বা কোথায় যাব এবং কি করবো! অভিশপ্ত হয়ে বেঁচে থাকা কাকে বলে জান?

লেডী—না।

স্ট্রেঞ্জার—আমাকে একবার দেখলেই বুঝতে পারবে।

লেডী—জীবনে কি তুমি কোন আনন্দই পাও নি?

স্ট্রেঞ্জার—না—যখনই কোন আনন্দের অনুভূতি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি এটা একটা ফাঁদ, জালে ফেলে আমাকে দুঃখ-দুর্দশার চরমে নিয়ে যাবার জন্য একটা বড় রকমের ফাঁদ পাতা হয়েছে।

লেডী—তোমার নিজস্ব ধর্ম বলেও কি কিছু নেই?

স্ট্রেঞ্জার—আছে বইকি! যখন আর সহ্য করতে পারবো না, তখনই চলে যাব—এই আমার ধর্ম।

লেডী—কোথায় চলে যাবে?

স্ট্রেঞ্জার—বিস্মৃতির গর্ভে। বাঁচার মত যদি বাঁচতে না পারি, অন্তত মরার মত মরতে পারবো—এই চিন্তাটাই আমার মনে অদ্ভুত শক্তি এনে দেয়।

লেডী—তুমি কিন্তু মৃত্যুকে নিয়ে খেলা শুরু করেছ।

স্ট্রেঞ্জার—এতদিন জীবনটাকে নিয়েও এই-ভাবেই খেলা করে এসেছি। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর) এক সময় ছিলাম সাহিত্যিক। যদিও মনটা আমার সব সময় বিষাদাচ্ছন্ন থাকতো কিন্তু কখনও কোন কিছুকে ঠিক সিরিয়াসলি নিতে পারি নি—ভয়ানক বিপদে পড়লেও ব্যাপারটাকে হাল্কা-ভাবেই দেখতাম। বইয়ে পড়া জীবনের থেকে আসল জীবন বেশি বাস্তব কিনা, এ বিষয়ে এখনও আমার সন্দেহ হয়। (দূরে কারা যেন শব নিয়ে যাবে এবং ডি প্রফান্ডিসের শব্দ ভেসে আসবে) ওরা ফিরে আসছে—এই রাস্তাগুলো দিয়ে ওরা বার বার যাতায়াত করছে কেন?

লেডী—কেন!...তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

স্ট্রেঞ্জার—না,...বিরক্ত হচ্ছি। এর ফলে ও জায়গাগুলোতে ডাইনীর প্রভাব পড়তে পারে। না, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না—ভয় করি নির্জনতাকে। কারণ নির্জনতার ভেতর থাকলে মানুষ কখনই একা হতে পারে না। চারদিকের বাতাস পর্যন্ত ভারী হয়ে ওঠে—অশরীরী আত্মাদের আবির্ভাব হয়—তাদের দেখা যায় না, কিন্তু তারা যে জীবন্ত একথা বোঝা যায়। তাদের উপস্থিতি বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি।

লেডী—এ ধরনের অনুভূতি তোমার হয়েছে?

স্ট্রেঞ্জার—অনেক কিছুই নজর করেছি—অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গীটা এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এক সময় দেখতাম বস্তু এবং ঘটনা, আকৃতি এবং বর্ণ-বৈভব, আর এখন দেখি মানুষের ভাবধারা এবং অভিপ্রায়, আর তার আসল মানে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি। এক সময় জীবনটাকে মনে হোত অর্থহীন, আজ বুঝতে পারি তা ঠিক নয়—একটা অর্থ অবশ্যই আছে। আগে যা দেখে মনে হোত

[illegible] তার [illegible] আছে। [illegible] মনে জেনো, আমার জীবনে তোমার আবির্ভাব দুটো কারণে হতে পারে—হয় আমাকে উদ্ধার করবে, নয় ত আমাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

লেডী—কেন আমি তোমার ধ্বংসের কারণ হব বলতে পার?

স্ট্রেঞ্জার—হয়তো সেটাই তোমার ভবিতব্য।

লেডী—এ ধরনের কোন চিন্তাই আমার মনে আসে নি। তোমার জন্য সহানুভূতিতেই মনটা ভরে গেছে...এর আগে ঠিক তোমার মত কোনো লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। তোমার দিকে তাকানোমাত্রই আমার চোখ জলে ভরে এসেছে। তোমার যদি বিবেক বলে কিছু থাকে, স্পষ্ট করে বল এমন কিছু কি অন্যায় করেছ, যা কেউ জানতে পারে নি বা যার জন্য তুমি এখন পর্যন্ত কোন শাস্তি পাওনি?

স্ট্রেঞ্জার—বিবেকের দিক থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। শুধু একটা কথা—আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, জীবনের খেলায় কখনও নিজেকে বোকা বলে প্রতিপন্ন হতে দেব না।

লেডী—ঠিকভাবে বাঁচতে গেলে কিন্তু অনেক সময়েই নিজেকে বোকা সাজতে হয়।

স্ট্রেঞ্জার—তার মানে বোকামীর ভান করতে হয়—ভণ্ডামী করার থেকে আমি সব সময়েই নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছি। (একটু থেমে) অবশ্য তার জন্য ভুগতেও হয়।

লেডী—কখনও কোন নারীকে ভালবেসেছ?

স্ট্রেঞ্জার—বেসেছি...এবং এখনও ভালবাসি।

লেডী—সে কি তোমার স্ত্রী? না, অন্য কোন নারী?

স্ট্রেঞ্জার—সে অপরের বিবাহিতা স্ত্রী।

লেডী—এই বললে বিবেকের ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত—অপরের স্ত্রীকে ভালবাসতে তোমার বিবেকে বাধে নি?

স্ট্রেঞ্জার—ভালবাসার স্থান বিবেকের অনেক ঊর্ধ্বে।

লেডী—তুমি ভালবেসেছ, অথচ সুখী হও নি। সে নারী কি তোমার প্রতি অবিশ্বাসিনী?

স্ট্রেঞ্জার—সে আমাকে ভালবাসে এ কথা সত্যি—তবে চিরকালই সে আমার প্রতি আনফেথফুল।

লেডী—তবু তুমি তাকে ভালবাস?

স্ট্রেঞ্জার—তবু আমি তাকে ভালবাসি।

লেডী—কি করে বুঝলে সে আনফেথফুল?

স্ট্রেঞ্জার—এমন ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে।

লেডী—শেষবারের ঘটনাটা কি?

স্ট্রেঞ্জার—এই কিছুদিন আগে সে ইটালীতে গেছিল—সেখানে এক মিউজিক হলে এক ইটালীয়ান যুবকের সংগে তার দেখা হয়—তারপর আলাপ-চুম্বন বিনিময় এবং শেষ পর্যন্ত তার শয্যা-সঙ্গিনী হতেও তার বাধে নি।

লেডী—ইটালীয়ানগুলোকে তো আমার বোকা বোকা লাগে।

স্ট্রেঞ্জার—মেয়েটির কাছে ওর দৈহিক সৌন্দর্যই নাকি ছিল সব থেকে আকর্ষণীয়।

লেডী—তুমি এ ব্যাপার জানলে কি করে?

স্ট্রেঞ্জার—মেয়েটি নিজেই বলেছে।

লেডী—সে কি!

স্ট্রেঞ্জার—এ এক ধরনের ন্যাতাভো স্পিরিট আর কি!

লেডী—মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করো না কেন?

স্ট্রেঞ্জার—স্বামীকে ডিভোর্স করতে ও রাজী নয়। ওর একটি মেয়ে আছে—আমাকে বিয়ে করলে নাকি তার মনে খুব ব্যথা লাগবে—মাকে মেয়েটি দেবীর মত ভক্তি করে।

লেডী—সন্তানের মনে ব্যথা লাগবে বলে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী নয়; অথচ ওই ইটালীয়ান যুবকের কাছে দেহদান করতে তার বিবেকে বাধে নি, সন্তানের কথাও বোধ হয় তখন বিস্মৃত হয়েছিল?

স্ট্রেঞ্জার—তা জানি না।

লেডী—তার প্রতি তোমার ঘৃণা হয় না?

স্ট্রেঞ্জার—আমি যে তাকে ভালবাসি।

লেডী—তাহলে প্রাণভরে কেঁদে নিজেকে হাল্কা করে নাও।

স্ট্রেঞ্জার—আমার চোখে জল আসে না। তবে যদি বিশ্বাস করো তবে বলি—আমার আত্মা সব সময়েই কাঁদছে—সে কান্নাতে শব্দ নেই, অশ্রুবর্ষণ নেই—কিন্তু আত্মার কান্না যে কি যন্ত্রণা দেয় তা তুমি বুঝবে না। হৃদয়যন্ত্রটা যেন কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে—সমস্ত অন্তরটা যেন বিষে জ্বলতে থাকে।

লেডী—কিন্তু তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলে কেন? তুমি তো অন্য নারীকে ভালবাস! তাকে পেলেই আমাকে ফেলে চলে যাবে।

স্ট্রেঞ্জার—তা যাব। কিন্তু এখন একলা রয়েছি—একলা থাকলেই আমার সমস্ত শক্তি চলে যায়—সাথী পেলেই আবার আমি শক্ত হয়ে উঠি।

লেডী—তাহলে এস আমার সঙ্গে—

[স্ট্রেঞ্জারের হাত ধরে এগিয়ে যাবে]

— যবনিকা —

[ক্রমশ]

সাময়িক মীমাংসা

গত কয়েক মাস ঠান্ডা যুদ্ধের পরে বাংলা ছবি অবরোধমুক্ত হয়েছে। তবে এই অবরোধমুক্তি কতদিনের জন্য, তা বলা যায় না। গোড়াতেই আমরা লিখেছিলাম যুক্তফ্রন্ট সরকারের কালে সেন্সার তারিখভিত্তিতে ছবিমুক্তির যে নিয়ম হয়েছিল এবং চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কমিটির হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল—এক শ্রেণীর চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী তাকে বানচাল করার জন্য চেষ্টা করছে। চলচ্চিত্র সম্পর্কে যুক্তফ্রণ্টের সময় অনেক ভাল কাজ হয়েছে। ছবির মুক্তির ব্যাপারে সেন্সার তারিখভিত্তিক পদ্ধতি চালু হওয়ায় যারা কালোটাকা নিয়ে ছবির মুক্তি ঘটায়, তাদের সেই ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নতুন পরিচালকদের ছবি মুক্তিলাভ করছিল। ছবি নির্মাণ ও মুক্তির ব্যাপারে যারা পথ আগলে থাকে, তাদের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পড়েছিল। আরো লাভ হয়েছিল, সরকারী খরচে প্রতি মাসে একটি করে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণে: যার জন্য বছরে অন্তত বারো জন পরিচালক ও চল্লিশ জনের মত টেকনিশিয়ান সামান্য হলেও কিছু টাকা পাচ্ছিল, ফিল্ম ল্যাবরেটরিগুলিতে কাজ হচ্ছিল। এই অবস্থা একদল ব্যবসায়ী কিছুতেই সহ্য করছিল না, কিন্তু তাদের করারও কিছু ছিল না: যুক্তফ্রন্ট ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার মত কলকাঠি নাড়তে থাকে। ফলে, বাংলা ছবির মুক্তি বন্ধ হয়ে যায়। এই বাধা দূর করার জন্য চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কমিটি বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু ফল হয় নি।

অবশেষে একটা মীমাংসা হয়েছে, অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের হাতে ছবির মুক্তির ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই এসোসিয়েশনে রয়েছে সিনেমা মালিক, পরিবেশক ও বড় বড় প্রযোজকরা। মীমাংসার বিস্তারিত শর্তাদি প্রকাশ করা হয় নি। আমরা জানতে পেরেছি—ছবির মুক্তির ব্যাপারটা এই সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করবে। তারা নাকি সেন্সর তারিখ এবং তারকা-মূল্য অর্থাৎ টিকেট ঘরের দিকটা দু-দিকেই লক্ষ্য রেখে ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এবং সিনেমার সঙ্গে ভাড়ার যে হার তাও ছবি অনুসারে কমবেশী করার সুযোগ থাকবে। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে মনে হচ্ছে আপাতত শুনতে যতই নিরীহ শর্ত মনে হোক, এর ফল শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াবে সেই আগের অবস্থায়। যাদের মুনাফা লালসায় চলচ্চিত্র শিল্পের এই সংকট, তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই শিল্পকে। কেবলমাত্র তারকা-মূল্যসম্পন্ন ছবিগুলিই মুক্তি পাবে—ওসব ছবির ক্ষেত্রেই ভাড়ার হার হারি বিবেচিত হবে। নতুন পরিচালক-প্রযোজকদের ক্ষেত্রে যে চাপ সৃষ্টি করা হবে, তার ফলে সেন্সর তারিখভিত্তিক কথাটার কোন অর্থ থাকবে না। কারণ সিনেমাগুলি যে বখরা দাবি করবে, নতুন প্রযোজকদের পক্ষে তাতে রাজী হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং সেই অজুহাতে বাংলা ছবির সিনেমায় হিন্দী ছবি মুক্তি দেওয়ার পথ খোলা থাকবে। প্রায় আড়াই মাস বাংলা ছবির মুক্তি বন্ধ রেখে এই লাভ আদায় করেছে সিনেমা মালিকরা।

বাংলা ছবির মুক্তি ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন। তার কারণ, বাংলা ছবির প্রতি অন্ধ ভালবাসা নয়, তার কারণ বাংলা দেশের একটা শিল্প ও তার সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের জীবিকার প্রশ্ন। বাংলা ছবির প্রতি আমাদের অন্ধ ভালবাসা নেই, কারণ বছরে দু-একটি ছাড়া এমন বাংলা ছবি নির্মিত হয় না, যা ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। বরঞ্চ হিন্দী ছবির ব্যর্থ অনুকরণ ও দুর্বল কাহিনী অধিকাংশ সময় চোখ ও মনকে পীড়িত করে। বাংলা ছবির যে বৈশিষ্ট্য ছিল, অর্ধ-শিক্ষিত পরিচালক-প্রযোজকদের হাতে পড়ে সেই বৈশিষ্ট্য প্রায় শেষ হয়েছে: আজ বাংলা ছবির জন্য গর্ব করার মত আমাদের কি আছে? তবু আমরা বাংলা ছবির জন্য লিখি, অনুভব করি, তার কারণ এই শিল্পকে অবলম্বন করে বহু মানুষের অন্নের ব্যবস্থা হয়, আর এই শিল্পটি বেঁচে থাকলে বছরে অন্তত দু-চারটি ভাল ছবি হবার সম্ভাবনা থাকে। —সুজন।

'সোনাবৌদি' ছবিতে শিবানী বসু
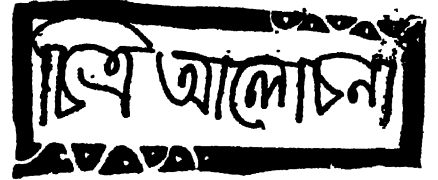
দুটি বাংলা ছবি

কলঙ্কিত নায়ক

বেবীজুন প্রোডাকসন্সের 'কলঙ্কিত নায়ক' সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের লেখা কাহিনী অবলম্বন করে সলিল দত্ত ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

ইন্দ্রজিৎ একজন সাধারণ লোহার ব্যবসায়ী, কিন্তু তার মনে ছিল বড় ব্যবসায়ী হবার স্বপ্ন। আকস্মিকভাবে তার সাফল্যের পথে সুযোগ এসে গেল এক মহিলার বদান্যতায়। তথাকথিত স্বামীর কাছে নিপীড়িতা এই নারী তার সর্বস্ব গহনার বাক্সটি ইন্দ্রজিৎকে দিয়ে নিজে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। সেই অর্থে ইন্দ্রজিৎ একটি কারখানার মালিক হয়ে বড় অর্ডার সংগ্রহের জন্য দিল্লী গিয়ে আবার সাক্ষাৎ পেয়েছিল সেই মহিলার। সে তখন সমাজের ধনী মহলের চিত্তবিনোদনকারিণী, বার-বণিতা। এই বারবণিতার সাহায্যে ইন্দ্রজিৎ তার কারখানাকে বড় করে তোলার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ইন্দ্র-জিতের স্ত্রী ধীরার কাছে এ খবর এসে পৌঁছে আরো রঙ চড়িয়ে। এ কাজ ধীরার দাদার। শুধু সংসারটাকে সে ভাঙেনি, কারখানাটিকেও ভেঙেছে টাকা চুরি করে। তারপরে এক সময় ইন্দ্র-জিৎকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল

কলঙ্কের অভিযোগে। লোকটি যে নোংরা —উকিলের জেরায় এ কথা প্রায় যখন প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, সে সময় একদিকে স্ত্রী খাঁর, আর সেই কুখ্যাতা নারী রমার সাক্ষীতে প্রমাণিত হল সে নির্দোষ।

সাধারণ মানুষের কথা নয়, বড় হবার কল্পনাবিলাস এবং ব্যবসায়ের খাতিরে চিত্তবিনোদনকারীদের সহায়তা গ্রহণ এবং তাদের মধ্যেও যে প্রেম বেঁচে থাকতে পারে, এই বক্তব্য কাহিনীতে প্রকাশ হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই কাহিনীর ছবি চিত্তমনোরঞ্জক, কিন্তু এতে জীবনের কোন জিজ্ঞাসা থাকে না, বরঞ্চ কিছুটা ভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয় সমাজের ধনীমহল সম্পর্কে।

পরিচালক গল্পকে প্রকাশ করেছেন হিন্দী ছবির ছাঁচে ফেলে, আতিশয্যের ঢালা মেজাজে, কিন্তু অভিনয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ত্রুটির জন্য হিন্দী ছবির জমজমাট ভাবটা ফুটে ওঠে নি।

উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রধান তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পরিচালকের নির্দেশে তাঁরা যথার্থভাবে রূপদান করেছেন। উৎপল দত্ত ও বিকাশ রায়ের চরিত্র দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, ছায়া দেবী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, এন বিশ্বনাথন, তরুণকুমার, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, মিহির ভট্টাচার্য, বীরেন চ্যাটার্জী, বেবী বচন প্রমুখ।

মুক্তিস্নান

রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ ছবি 'মুক্তিস্নান'। সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু-লিখিত কাহিনী এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন। পরিচালনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী।

ছবির শুরু হয়েছিল গ্রাম্য-জীবনে। যেখানে জমিদারের নায়েব খাজনা আদায় করতে বসেছে আর গ্রাম্য মেয়ে সুমিতা সরাসরি জমিদারের কাছে উপস্থিত হয়েছে খাজনা মাপের জন্য। জমিদার শুধু খাজনা মাপ করেননি, সুমিতাকে দেখে মনে হয়েছে সেই যেন পুত্র উদয়কে সংসারে বেঁধে রাখার যোগ্য মেয়ে। গরীবের ঘরের এই মেয়েকে পুত্রবধূ করা হল। শেষ হয়েছে কলকাতা-জীবনে। মাঝখানে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। উদয়নারায়ণ হীরাবাঈয়ের মোহ থেকে মুক্ত হতে চেয়েও পারেনি, আর স্বামীর সম্মান রক্ষা করতে যেয়ে সুমিতা সংসার ত্যাগ করে কলকাতার পথে এসে
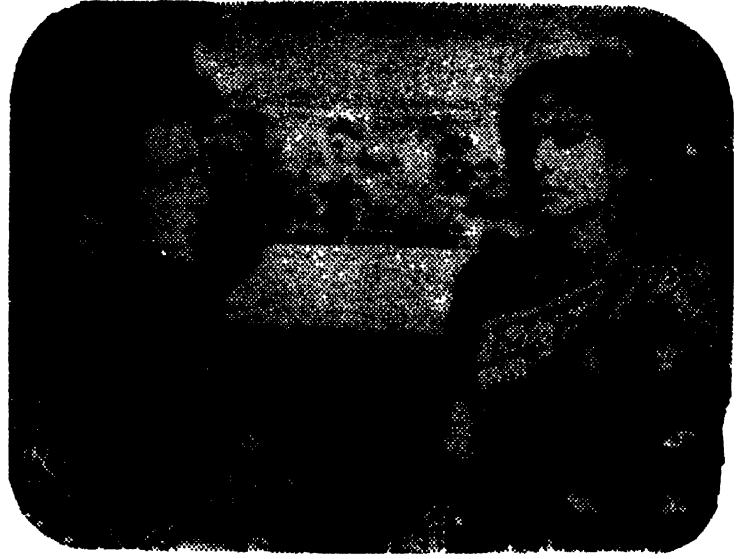
সলিল সেন পরিচালিত 'রাজকুমারী' ছবির একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও তনুজা

ছেলেকে নিয়ে এক ডাক্তারের ক্লিনিকে নার্সরূপে কাজ করছে। স্বামীর জন্য এই গৃহত্যাগের কথা জেনে উদয়ের মন পরিবর্তন হয়েছে, সেও কলকাতার পথে পথে ঘুরছে সুমিতার খোঁজে। প্রায় ছয় বছর পরে দুর্ঘটনার মধ্যে তাদের পুনর্মিলনে ছবির কাহিনী শেষ।

রাধারাণী পিকচার্সের সব কয়টি ছবি নারীর ত্যাগ ও মহত্ত্বকে নিয়ে গঠিত। ছবিতেও সেই একই উদ্দেশ্য ও বক্তব্য রয়েছে। কোন প্রযোজকের পক্ষে একইরূপ আদর্শবোধ ও দৃষ্টিকোণ রক্ষা করে থাকতে পারা কম কথা নয়। এতে প্রযোজক সংস্থাটি সম্পর্কে দর্শকদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে থাকে এবং তা ব্যবসার পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে।

আজকের সমাজটা বদলে গেছে। জমিদারকেন্দ্রিক গ্রাম আজ আর নেই। জমিদারের প্রতি কোন মোহ মানুষের থাকার কথা নয়। এই অবস্থায় জমিদারের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে কাহিনী রচনা মানুষের মনে তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হয় না। শক্তিপদ রাজগুরু সাহিত্যিক হিসাবে একসময় প্রশংসালাভ করেছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়িক লোভে আজ তিনি একজন ব্যর্থ সাহিত্যিক, এই কাহিনী তারই নিদর্শন। ছবিতে বহু ঘটনা, বহু চরিত্র, কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তির বড় অভাব। সুমিতাকে গুণ্ডা-সর্দার ডাক্তারের কবল থেকে রক্ষা করার পর তার সাকরেদ (কামু মুখার্জী) বলছে : বড় দুঃখের কথা, একজন অবাঙালী এক বাঙালী নারীর সম্মান রক্ষা করল। পরিচালকের এই খোকামী-

এই ছবিতেও প্রধান ভূমিকাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। গ্রামের বধূ চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের সুখ্যাতি আছে। কিন্তু এখন আর ফুলশয্যার দৃশ্যে তাঁকে ভাল লাগে না। তাঁর অভিনয়টি ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। নায়েবের ভূমিকায় কালী ব্যানার্জীকে ভাল মানিয়েছে। অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, গীতা দে, শোভা সেন প্রমুখ বিভিন্ন ভূমিকায় যথাযথ চরিত্রে রূপদান করেছেন। হীরা বাঈজীর ভূমিকায় ললিতা চ্যাটার্জী বে-মানান। দর্শকদের হাসাবার কাজে জহর রায়, হরিধন মুখার্জী ও অজিত চ্যাটার্জী নিজেদের ভূমিকা ঠিকভাবেই পালন করেছেন। ছবিতে শয়তানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্যামল ঘোষাল। ছবিতে কয়েকটি গান রয়েছে। হেমন্ত, সন্ধ্যা ও মান্না দে'র গাওয়া গানগুলি শুনতে ভাল লাগে।

সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন

২২শে মে লাইট হাউস সিনেমায় সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেছেন কলকাতার শেরিফ শ্রী জে সি দে। এই অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের স্বাগত জানান শ্রীঅজিত বসু। সোভিয়েট কনসাল জেনারেল মিঃ ভি এ ঝারকভ সকলকে ধন্যবাদ জানান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরে 'লেনিন ইন অক্টোবর' পূর্ণাঙ্গ চিত্র এবং 'লিভিং লেনিন' স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীত করেন হেমন্ত মুখার্জী।

'মু্ক্তিস্নান' ছবিতে মীরা মজুমদারের ভূমিকায় মঞ্জিতা চ্যাটার্জী

লাইট হাউস সিনেমায় সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসবে যে ছবিগুলি দেখান হবে তার মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় ছবি 'আনা কারেনিনা'। মনীষী টলস্টয় লিখিত 'আনা কারেনিনা'র বহুবার চলচ্চিত্র রূপ হয়েছে, এবার সোভিয়েট ইউনিয়ন রঙিন ছবি করেছেন বিখ্যাত পরিচালক আলেকজান্দার জার্কির পরিচালনায়। ছবিতে তাতিয়ানা সামইলোভা, বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যালেরিনা মায়া পিসেৎস্কায়া প্রমুখ অভিনয় করেছেন। এই ছবিটিতে লিও টলস্টয়ের সাহিত্যের নায়িকার মানসিকতার গভীরতা অনুভব করা যায়। অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে থাকছে 'লেনিন ইন অক্টোবর' 'স্টোরিজ এবাউট লেনিন', 'আনা কারেনিনা' 'দি আয়রণ ফ্লড', 'দি ডিড অব ফারহাদ', 'নিউ এডভেঞ্চার', 'ওয়ান চান্স ইন এ থাউজেন্ড'। এই সঙ্গে প্রদর্শিত স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হচ্ছে।

চার খণ্ডে সোভিয়েট চলচ্চিত্রের ইতিহাস

চার খণ্ডে "সোভিয়েট চলচ্চিত্র ইতিহাস"-এর প্রথম খণ্ড মস্কোয় সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েট শিল্প-ইতিহাস ইনস্টিটিউট প্রণীত এই চলচ্চিত্র-ইতিহাস প্রকাশের খবর দিয়েছে এ· পি· এন।

এই "ইতিহাস" প্রকাশ করেছে ইস্কুসস্তভো (শিল্প) প্রকাশ ভবন। সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু-জাতিক ও বহু-জাতিক চলচ্চিত্র-শিল্পের ইতিহাস রচনা করেছেন শিল্প-ইতিহাসবিদ, সমালোচক ও বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের চলচ্চিত্র সমালোচক ও লেখকগণ।

সদ্য প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে রয়েছে সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্পের প্রথম যুগ-নির্বাক ছবির যুগের ইতিবৃত্ত। তখন থেকেই শুরু হয় জনগণের জন্য চলচ্চিত্র আন্দোলন। এই যুগে জগদ্বিখ্যাত অবদান হল "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন", "মাদার", "আর্থ"-এর মত ছবি।

"ইতিহাস"-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড এখন যন্ত্রস্থ। দ্বিতীয় খণ্ডে সোভিয়েট চলচ্চিত্রে সবাক যুগের অভ্যুদয় ও চলচ্চিত্রশিল্পে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারায় জয়ের বিবরণ রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটি গত যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে সোভিয়েট চলচ্চিত্রের অগ্রগতির ইতিহাস। চতুর্থ খণ্ডে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি পর্যন্ত চলচ্চিত্রের অগ্রগতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ডটি প্রচুর চিত্রশোভিত বিভিন্ন চলচ্চিত্রের ৩৫০টি আলোকচিত্র এতে রয়েছে।

পাঁচ খণ্ডে সোভিয়েট সংগীতের ইতিহাস

পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট "সোভিয়েট জাতি সমূহের সংগীতের ইতিহাস" গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে মস্কো থেকে এ· পি· এন জানিয়েছে।

[illegible]

'পৃথিবীর প্রথম লেনিন' ছবির একটি ঐতিহাসিক ঘটনার দৃশ্যে লেনিনের ভূমিকায় এস, স্মিথ্।

সোভিয়েট সঙ্গীত-ইতিহাসের বিশদ আলোচনামূলক এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যবস্থা এই প্রথম। "সোভিয়েট সুরকার" প্রকাশ ভবন এটি প্রকাশ করছে। এই গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রিদপ্তরের শিল্প ইতিহাস গবেষণা ইন্সটিটিউট, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও সমিতি, সোভিয়েট অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহ ও বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতবেত্তা অংশ গ্রহণ করেছেন।

পাঠকবর্গ এই ইতিহাস গ্রন্থের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট জাতি-অধিজাতির সমৃদ্ধ সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

ফিল্ম ডিভিশনের ছবি

ফিল্ম ডিভিশনের স্থানীয় শাখা অফিস থেকে জানাচ্ছে যে, মে মাসে ফিল্ম ডিভিশনের নিম্নোক্ত ছবিগুলি মুক্তিলাভ করবে।—

'এ ড্রিম টেকস্ উইংগস'—ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক দাদাসাহেব ফাল্‌কের জীবনের ঘটনাবলী। ফাল্‌কে জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে নির্মিত।

'হোপ ফর দি ফিউচার'—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমস্যা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কথা।

'পাওয়ার ফর প্রোগ্রেস'—স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে বিদ্যুৎশক্তি বৃদ্ধির কথা।

'একচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স—৪' জন্ম-ভাষাভাষী মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

'এভরি গ্রেইন কাউন্টস্'—খাদ্য-সমস্যা সমাধানকল্পে বেশি ফলনের কথা। এই সঙ্গে ভারতীয় জওয়ানদের দ্বারা 'হাজিপীর' গিরিবর্ত্ম দখলের কথা।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

আগামী ৩১শে মে অপেরা সিনেমায় সকাল দশটায় "রেড্ ইঙ্ক" (হাঙ্গেরী) ছবি প্রদর্শনের আয়োজন করেছে নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি।

নজরুল জন্মজয়ন্তীর আয়োজন

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমীর উদ্যোগে আগামী ২৯শে মে বিকাল ৫॥টায় মহাজাতি সদনে বিদ্রোহী কবি নজরুল জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন একাডেমীর সভাপতি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্তকুমার শূর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য। একাডেমীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধেয় মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

এবারে জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সঙ্গীতরত্নাকর দেশগৌরব শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন তাঁদের পুরস্কার সঙ্গীতানুষ্ঠান হবে। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুপ্রভা সরকার, পূরবী দত্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ধীরেন বসু, নির্মলা মিশ্র প্রমুখ শিল্পীরা।

বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রগীতি

গত ২৬শে বৈশাখ সুভাষ সরোবরে "পলিগ্লট" ভাষা শিক্ষা নিকেতনে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। সভার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় ছিল জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ইত্যাদি দেশী ও বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন। অনুবাদ ও পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বহু-ভাষাবিদ শ্রীব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত জনমণ্ডলী বিদেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচারের বিষয়ে আলোচনা ও উৎসাহ দান করেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা' কবিতাটি রাশিয়ান ভাষায় আবৃত্তি করা হয়।

ফারাক্কায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব

সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর ১০৯তম জন্মবার্ষিকী দিবসে ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের এন, পি, সি, সি কলোনীতে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।

তিন ঘণ্টাব্যাপী এই সঙ্গীত বাসরে একক রবীন্দ্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী রাণী সেনগুপ্তা, ঝর্ণা চক্রবর্তী, অঞ্জুশ্রী কুণ্ডু, মিনতি সাহা, অসীম গুহ, সন্তোষ মণ্ডল। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন কুন্তল কুণ্ডু, নমিতা সাহা, কালিদাস সাহা। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ শিল্পী উদীয়মান সেতারবাদক মদন-মোহন রায় পর পর কয়েকটি রাগ বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী পি, কে, ভদ্র।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী চলচ্চিত্র উৎসব

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জয়লাভের পঞ্চবিংশতি বর্ষ উপলক্ষে সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা এক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছে। লাইট হাউস সিনেমায় আগামী ৫ই জুন থেকে ১১ই জুন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ফ্যাসিজম-বিরোধী বক্তব্যের সাতটি ছবি দেখানো হবে। এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব

কলকাতার একটা মস্তো বড় বদনাম আছে। সে বদনাম অবশ্য অনেকটা পক্ষপাতদুষ্টই। কারণ সর্বভারতীয় খেলাধুলোর আসরে বাংলার স্থান অনেক ওপরেই। বিশেষ করে ফুটবল খেলায় বাংলা আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তেমনি শহর কলকাতা আজো ফুটবল খেলার পীঠস্থান। টেনিস খেলোয়াড়দের যেমন ইচ্ছে থাকে উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার, ক্রিকেটাররা যেমন চান লর্ডস্ মাঠে খেলতে, তেমনি ভারতের ফুটবল খেলোয়াড়রা চান কলকাতা ময়দানে খেলার সুযোগ পেতে। কলকাতা ময়দানে খেলতে না পারলে ফুটবল খেলোয়াড়রা ঠিক যেন জাতে উঠতেন না। সর্বভারতীয় দলে খেলার সুযোগও পেতেন না। ফলে ভালো খেলোয়াড়রা সব সময়ই চাইতেন কলকাতায় চলে আসতে। ফলে ভারতের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়রা একে একে এসে কলকাতায় সমবেত হতেন এবং এখনো হন। তাই কলকাতার বড় দলগুলো যেমন হয়ে ওঠে শক্তিশালী, তেমনি বাংলা দলের শক্তিও বেড়ে যায় যথেষ্ট পরিমাণে। ফলে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলা তথা কলকাতার দলগুলিই দেয় সব থেকে বেশি কৃতিত্বের পরিচয়। তাই দেখা যায়, ডুরান্ড কিম্বা রোভার্স কাপ প্রায় প্রতিবারই কলকাতায় আসছে। সেই সঙ্গে তাল দিয়ে কলকাতার আই-এফ-এ শীল্ডও থেকে যায় কলকাতাতেই।

কিন্তু সেটা ঠিক যেন সহ্য করতে পারে না অন্য প্রদেশের দলগুলো। বাংলা আর কলকাতার দলগুলোর এই সাফল্য তাদের চোখে একটু যেন কেমন কেমন। তাদের ধারণা কলকাতার ট্রফিগুলো কলকাতাতেই রেখে দেবার জন্যে ক্লাবগুলো এবং কর্তৃপক্ষরা একসঙ্গে চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্যি নয়, সে কথা সকলেই জানেন। তবু তাঁরা জেনেশুনেও সে কথা মানতে চান না। ফলে তাঁরা একযোগে এবং ছাড়া ছাড়াভাবে কলকাতায় খেলতে না আসার আগ্রহ প্রকাশ করতে চাইলেন। তাই কি আই-এফ-এ শীল্ড, কি বাইটন কাপ—এই দুটি ভারতের সেরা। প্রতিযোগিতায় বাইরের দলের সংখ্যা দিনে দিনে কমতে লাগলো। এর ফল যে মোটেই ভালো নয়, সে কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ কিছু তো করার নেই। তবে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে অনেক কিছুই করার আছে। কিন্তু সে দিকে তাঁরা ততোটা নজর দেন না। বরঞ্চ বাইরের দলগুলো কোন কোন সময়ে তাঁদের প্রতি অবহেলা করার কথাই বলে থাকেন। যাই হোক, এবছর বোম্বাই-এর ওয়েস্টার্ন রেল দল বাইটন কাপ জেতায় তাই একদিন দিয়ে ভালোই হয়েছে। কারণ...। না, ঐ কারণটির বিষয়ে বেশি কিছু বলা বা না লেখাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। তবে বাইটন কাপ কলকাতার বাইরে যাওয়ায় একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে।

[illegible]

ময়দানী হকির আসর এবারের মতো শেষ হলো। ক্রিকেটের পরে আর ফুটবলের আগের সংক্ষিপ্ত সময়টাতেই হকি জাঁকিয়ে বসে কলকাতা ময়দানে। কিন্তু কলকাতা তথা বাংলা দেশের দর্শকদের কোন সময়ই খুব একটা আকর্ষণ করতে পারে না হকি খেলা। তাই একরকম চুপিসারেই একদিন শেষ হয়ে যায় হকি লীগের আসর। আর বাইটন কাপও শেষের দিকটা ছাড়া মোটেই বাজার গরম করতে পারে না।

এবারও পারে নি। তবে খেলা

ফাইন্যাল থেকে। সেমি-ফাইন্যালে ইস্টার্ন রেল এ এ-কে ২—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে ইস্টবেংগল ক্লাব উঠেছিল ফাইন্যালে। আর অন্যদিকে মোহনবাগানকে ২—১ গোলে পরাজিত করে ওয়েস্টার্ন রেল দল বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ওঠে।

ফাইন্যাল খেলাটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছিল। ওয়েস্টার্ন রেল দল যখন সেমি-ফাইন্যাল খেলায় মোহনবাগানকে হারিয়ে দেয়, তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, বাইটন কাপ এবার সম্ভবত কলকাতার বাইরে যাবে।

কারণ, দলগত শক্তির দিক দিয়ে বোম্বাই-এর ওয়েস্টার্ন রেল দল কলকাতার মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী দল বলেই মনে হলো। তবু সেমি-ফাইন্যালে মোহনবাগান হেরেছিল অনেকটা দুর্ভাগ্যবশতই। আর ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরাজয়ের বিষয়ে একই কথা বলা যায়।

পেনাল্টি-পুস থেকে গুরুবক্স সিং-এর দেওয়া একমাত্র গোলে ইস্টবেঙ্গল হেরে যায়। ইস্টবেঙ্গল সেই গোল শোধ করার মতো সুযোগ পেয়েছিল। রেল দলও পেয়েছিল আরো গোল করার সুযোগ। কিন্তু গোল আর কেউই করতে পারে নি। ইস্টবেঙ্গল পারে নি সেই গোলটা শোধ করতে, আর রেল দল হাজার চেষ্টা করেও পারে নি গোলসংখ্যা বাড়াতে।

ফলে এবারের বাইটন কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করলো বোম্বাই-এর ওয়েস্টার্ন রেল দল। রেল দলের এই জয়লাভ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বাংলা দেশের বাইরের অনেকগুলি দল এ বছর আসবে-আসবে করেও শেষ পর্যন্ত আসে নি। মনে হয়, ওয়েস্টার্ন রেল দল বাইটন কাপ জয় করায় বাইরের দলগুলো আসছে বছর বাইটন কাপের খেলায় কলকাতায় আসার জন্যে আরো বেশি উৎসাহিত হবে।
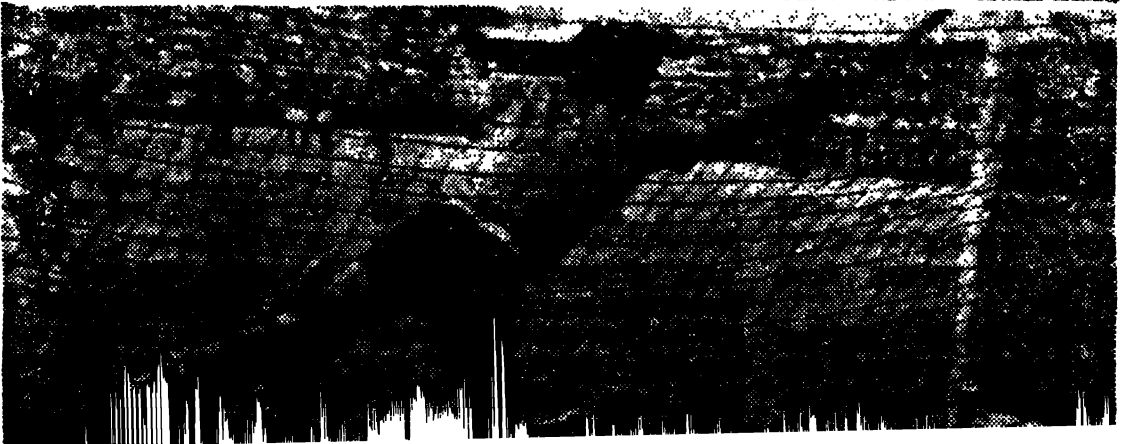
মেক্সিকোয় বসছে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর

নীলিমেশ রায়চৌধুরী

[মে মাসের একেবারে শেষে মেক্সিকোয় বসছে বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর। মেক্সিকোর বিভিন্ন মাঠে চারটে গ্রুপে ভাগ করে বিশ্ব কাপের শেষ খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। এবারকার গ্রুপগুলিতে দল ভাগ দেখে আর সেই দলগুলোর বিগত ক্রীড়াধারা পর্যালোচনা করে পর্যবেক্ষকরা মত প্রকাশ করেছেন যে, তিন নম্বর গ্রুপের যে কোন দলের ভাগ্যেই এ বছর জুটবে জুলে রিমে কাপ জয়ের গৌরব। তাই আমরাও ঐ তিন নম্বর গ্রুপটিকে নিয়েই আলোচিত এই বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করলাম। অন্য গ্রুপগুলিতে এ'দের খেলতে দেখা যাবে—১নং গ্রুপঃ রাশিয়া, মেক্সিকো, বেলজিয়াম ও সালভাডোর। ২নং গ্রুপঃ উরুগুয়ে, ইটালী, সুইডেন ও ইজরাইল। ৩নং গ্রুপঃ ইংলণ্ড, ব্রেজিল, রুমানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ৪নং গ্রুপ : পেরু, পশ্চিম জার্মানী, বুলগেরিয়া ও মরক্কো। —ক্রীড়া সম্পাদক]

বিশ্ব ফুটবলের বিস্তৃত আঙিনায় বিশ্ব কাপ অর্থে জুলে রিমের এক ভিন্ন গ্ল্যামার। আর মাত্র দু'-এক দিনের মধ্যেই মেক্সিকোতে শুরু হচ্ছে এবারের বিশ্ব ফুটবল মেলা জুলে রিমের অনুষ্ঠান। এতদিন তামাম বিশ্বে তারই প্রস্তুতির ঢেউ উঠেছিল। নিখাদ সোনার মোড়া আসল লোভনীয় পদকটি ঘরে তোলার জন্য সব দেশ কোমর কষে লড়ছেন, আর সেই সাথে গোটা বিশ্বের ক্রীড়ানুরাগী সন্ধানী দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করছেন ফুটবলের মান ও সৌন্দর্য নষ্ট না করে সাম্রাজ্য কার হাতে যায়, তার জন্যে। ওঁরা ফুটবল ভালবাসেন—ভালবাসেন বিশ্ব ফুটবলের প্রতিটি চরিত্রকে—তাই চার বছরের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

এবারের আসরের সব চাইতে বড়ো দুঃসংবাদ গতবারের সর্বজনবন্দিত দল পর্তুগাল আর ইতিহাস-সৃষ্টিকারী উত্তর কোরিয়া মূল আসরে হাজির থাকার পাসপোর্ট পায় নি, তাই বিতর্কিত নায়ক পেলের উত্তরসূরী মোজাম্বিক-সন্তান ইউসেবিও হাজির থাকছেন না এ আসরে—তাই মেক্সিকো ফুটবলের এক প্রতিভাকে হারাল, সন্দেহ নেই।

ইংল্যান্ড যে বাড়তি মূলধন নিয়ে মেক্সিকোর পথে চলেছে, তা হলো গতবারের কাপ জয়ের আত্মবিশ্বাস। নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ড এবারের সম্ভাব্য বিশ্ব কাপ বিজয়ীদের অন্যতম। গর্ডন ব্যাঙ্কস, ববি মুর, ববি চার্লটন, জিওফ হার্স্টের মত শাণিত অস্ত্র ইংল্যান্ডের তূণীরতে। দলের ম্যানেজার আলফ র‍্যামজের মতে—"২১শে জুন '৭০-এর পরেও ইংল্যান্ড বিশ্বজয়ী খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখবে। মেক্সিকোতে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।" তবে গত বিশ্ব কাপের পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণে গেলে ইংল্যান্ডকে নিয়ে আশা করার তেমন বলিষ্ঠ কোন

অনিবার্য কারণবশত এই সংখ্যায় 'খেলার রাজার রাজা' প্রকাশিত হল না।

কারণও থাকতে পারে না। অ্যালফের হাতে ইংল্যান্ড দল আসার পরের ঘটনাগুলিতেই চোখ ফেরান যাক না। গত '৬৩ সাল থেকে ইংল্যান্ড অ্যালফের ম্যানেজারীতে খেলে চলেছে। এর ভেতর আজ পর্যন্ত ইংল্যান্ড মেক্সিকোতে তার বিভাগীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে ৭টি খেলার মধ্যে মাত্র ১টিতে জয়ী হয়েছে। '৬৩তে ব্রাতিস্লাভায় চেক দলকে ইংল্যান্ড হারায় ৪—২ গোলে। ১৯৬৬-র নভেম্বরে (বিশ্ব কাপ জয়ের পর-পরই) ওয়েম্বলীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে ০—০ গোলে অমীমাংসিত থাকে। '৬৮-এর নভেম্বরে বুখারেস্টে রুমানিয়ার সাথে ০—০ গোলে অমীমাংসিত থেকে যায়। গত জানুয়ারীতে ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে রুমানিয়া আবার অমীমাংসিত রাখে ১—১ গোলে। এবার বুকিদের দর উঠেছে ব্রাজিলের পক্ষে ৩—১। স্মরণ থাকতে পারে ব্রাজিল ১৯৫৮ এবং '৬২র চ্যাম্পিয়ান। ১৯৬৩-র মে মাসে ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের সাথে ইংল্যান্ডের খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে, পরের বছরই ইংল্যান্ডকে রিওতে ৫—১ গোলে হারিয়ে দেয় ব্রাজিল। গত জুনে ব্রাজিলই একমাত্র দল, যারা রিওতে ইংল্যান্ডকে ২—১ গোলে হারিয়ে দেয়। তার পরেই ম্যানেজার অ্যালফ র‍্যামজের বক্তব্য হয়—"এটাই যদি ব্রাজিলের শক্তিশালী দল হয়, তাহলে তাদের সাথে তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন স্থানে খেলতে আমরা প্রস্তুত।" গত জানুয়ারীতে মেক্সিকোর 'ফিক্সচার' দেখে র‍্যামজে বলেছিলেন—"আমরা ব্রাজিলকে ভয় পাই না। আমরা ওঁদের সাথে খেলতে চলেছি কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। ক্লান্তিই একমাত্র আমাদের জয় রোধ করতে পারে, অন্য কেউ নয়। আমরা বিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতেই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে মেক্সিকো চলেছি।" ববি চার্লটনের কথা হল—"আমাদের গ্রুপে আমরাই শক্তিশালী—তবে কে কে সেমি-ফাইন্যালে যাবে, বলা কঠিন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যাবই। এবারের বিশ্ব কাপেও আমরাই সেরা দল—আমাদের খেলোয়াড়দের সেটাই প্রমাণ করতে হবে।"

বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিল এক মস্ত নাম। সাত রাজার ধন কালো মাণিক, বিশ্ব ফুটবলের মুকুটহীন সম্রাট পেলে এখনও ব্রাজিলের মহামূল্যবান সম্পদ-স্বরূপ। ব্রাজিলের খেলায় ফুটবলের সৌন্দর্য আছে। প্রাক্তন ব্রাজিলীয়ান ম্যানেজার সালদানদা প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন বিশ্ব ফুটবলের সেরা প্রতিযোগিতায় হাজির থাকা প্রতিটি দেশের বিরুদ্ধে, তা হল "আমরা মেক্সিকোতে ফুটবল খেলতে চলেছি কিন্তু কেউ যদি ফুটবলের পরিবর্তে ন্যোংরামী গায়ের জোরের আশ্রয় নিয়ে লাথালাথি করেন, তবে আমাদের খেলোয়াড়রাও কিন্তু পাল্টা জবাব দিতে কসুর করবে না। আমার সমস্ত খেলোয়াড় সেজন্যে প্রস্তুত, প্রয়োজনবোধে আমিও। মেক্সিকোতে যদি সত্যিকারের ফুটবল খেলা হয়, তবে আমরা জিতবই—আর যদি এটা 'কিকিং' প্রতিযোগিতা হয়, তবে আমরা অংশ গ্রহণই করবো না।"

ব্রাজিলের আক্রমণভাগ বিশ্বসেরা পেলে, জাইরজীনহো, গেরসন্, এডু এবং টোসটাওর মতো যাদুকর খেলোয়াড়েরা আলো করে আছেন। মনের দিক থেকে সুস্থ থাকলে এঁরা যা খুশী তাই করতে পারেন। ফুটবলের সৌন্দর্য রাখতে অত্যধিক বলের ওপর কন্ট্রোল দেখাতে গিয়ে ব্রাজিলের

॥ পেলে ॥
বিশ্ব ফুটবলের মুকুটহীন সম্রাট পেলে এ বারও তাঁর অকল্পনীয় ক্রীড়াধারায় জনতাকে মুগ্ধ করবেন। তবে কোন দল যদি তাঁকে এবং তাঁর দলের খেলোয়াড়-দের মারতে আসেন—তাহ'লে তাঁরাও এ বার ছেড়ে কথা বলবেন না।

খেলা মাঝ মাঠে কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে, তার ফলেই ভেতরে ঢোকার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধের সৃষ্টি হয়। গোল-রক্ষক ব্রাজিলের এক সমস্যা। রক্ষণভাগে স্নায়ুর দৌর্বল্যে ভোগে অত্যধিক আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—এটা দলের বিপদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তবুও ব্রাজিলকে বিশ্বের সব দেশ ভয় পায় কেন? ব্রাজিলীয়ানদের পায়ে আছে শিল্পীর ছোঁয়া।—ঘুমন্ত পুরীর রাজ-কন্যার সোনার কাঠির স্পর্শ আছে ওদের পায়ে, তাকেই ভয় পায় বিশ্বের সব দেশ। পেলের কথা : "আমরা মেক্সিকোর পথে চলেছি জয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে। গতবারের আমরা শেষ ঘোষণা করেছিলাম, আমি আর বিশ্ব কাপে খেলবো না—কিন্তু করবো ব্রাজিল এখনও জিততে জানে—আমরা জিতবই।" এ কথা বলা বাহুল্য হবে না নিশ্চয়ই, ১০০০ গোলের অধি-কারী ব্রাজিলের ফুটবল রাজপুত্র পেলের এটাই শেষ বিশ্ব কাপে খেলা—সেই সাথে শেষ প্রথম শ্রেণীর খেলাও। '৫৮—'৬২ সালে বিশ্ব কাপ-জয়ী ব্রাজিল কিছুদিন আগে আর্জেন্টিনার কাছে ২—০ গোলে হেরে গিয়ে ভক্তদের বেশ ভাবনায় ফেলেছে—তবে ব্রাজিল কিন্তু ব্রাজিলই। নিখাদ ফুটবলের প্রতিশ্রুতি—মেক্সিকোর সেরা আকর্ষণ এই ব্রাজিল।

মেঘের আড়ালে দীর্ঘ ১৬ দিন ইংল্যান্ডকে হারাবার সবরকম পরি-কল্পনা করে সম্প্রতি চেকোশ্লোভাকিরা সমতলভূমিতে পা ফেলেছে। এবারের

॥ ইংল্যান্ড ॥
বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে এবার ইউসেবিও এবং তাঁর দল

স্তুতিতে কোন ঘাটতি নেই। ইংল্যান্ড-ব্রাজিলের বিতর্কের মাঝে চেক দলকে ছাড়া, অবজ্ঞা করলে মারাত্মক ভুল হবে। ম্যানেজার মারকো এবং মার্লাটিনস্কো খেলোয়াড়দের এই বলে সতর্ক করেছেন যে, "ইংল্যান্ডকে ভয় করার বদলে উড়িয়ে দিতে হবে।" মারকো আরও বলেছেন—"আমাদের গ্রুপে ব্রাজিল জিতবেই। আমাদেরও জয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এই কথা আমি যদি খেলোয়াড়দের বোঝাতে পারি, তবে, ইংল্যান্ড '৬৬-র সম্মান মেক্সিকোতে হারিয়ে যেতে বাধ্য।" চেক ৪-২-৪ প্রথায় খেলার পরিকল্পনা নিয়েছে—কুনা, ভিক্টর, এডাসেক, কাভাসনকের মত খেলোয়াড়েরাই চেক দলের ভরসা-স্থল। ইংল্যান্ড বা ব্রাজিলকে হারিয়ে চেক দল অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চেক-রস্ক আনড্রেজ কাভাসনকের মতে—"চেকের এই দল গত বিশ্ব কাপের চাইতেও শক্তিশালী; এমন কি '৬২-র রানার্স আপের চাইতেও। দলে প্রচুর দক্ষ খেলোয়াড় আছেন। আমাদের শেষ পর্যায়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।"

বুখারেস্ট এবং ওয়েম্বলীর কথা স্মরণ রেখে ইংল্যান্ড রুমানিয়াকে অবহেলা করতে পারবে না। দলের ম্যানেজার নিকুলেসকুর বক্তব্য হল—"আমার খেলোয়াড়েরা বিগত চ্যাম্পিয়ানকে হারাতে প্রস্তুত হচ্ছে। ইংল্যান্ডের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। তারা সুন্দর শক্তিশালী গোছাল দল, তবুও তারা আমাদের তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। আমরা দু-দুবার খেলা অমীমাংসিত রেখেছি. এবার একধাপ ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে। যদিও জানি, এ কাজ সহজ হবে না—তবে আমাদের হঠানোও ইংল্যান্ডের পক্ষে সহজ হবে না"। গত তিন বছরের মধ্যে রুমানিয়া বিশ্ব ফুটবলে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। পর্তুগালের মত দেশকে হঠিয়ে দিয়ে মেক্সিকোর চৌহদ্দিতে ঢুকেছে রুমানিয়া—উপযুক্ত নজরানা, সন্দেহ নেই। রুমানিয়ার খেলোয়াড়েরা আক্রমণ করার চাইতে বিপক্ষ আক্রমণ ভাঙতেই বেশি দক্ষ। ওঁরা ৪-৪-২ ছকে খেলে থাকেন। আক্রমণ করার সময় ২জন স্ট্রাইকার ওপরে উঠে যান। রক্ষণভাগ সামলাবার সময় ৮ জনের জাল গোল আগলে বসে থাকে। ২৩ বছরের দীর্ঘদেহী গোল-রক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কস-এর প্রতিদ্বন্দ্বী নিকুলা রাদুকানু রুমানিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দলনেতা লুসেকুর মতে—ইংল্যান্ড অথবা ইতালী বিশ্ব কাপ জয় করবে। তবে রুমানিয়াকে সহজভাবে হঠিয়ে দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। দলগত ক্রীড়াশৈলীর উন্নতি ঘটেছে আমাদের বিশ্ব কাপ শুরুর মুহূর্তে, আমরা আরও ভাল খেলবো। আমরা যদি ইংল্যান্ডের সাথে ড্র করতে পারি, তাহলে হয়তো আমরা মূল পর্যায়ে উঠতে পারবো। হ্যাঁ, ব্রাজিলের বদলে!"

এবারের বিশ্ব কাপ তালিকায় সব চাইতে শক্তিশালী গ্রুপ নিঃসন্দেহে ৩নং। এই গ্রুপে আছে—ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুমানিয়া। এদের মধ্যে ইংল্যান্ড এবং ব্রাজিলই বিশ্ব ফুটবলের 'হট্ ফেবারিট'। কোন অঘটন না ঘটলে এদের ভেতরই কেউ বিশ্ব কাপ ঘরে তুলবে।

কে বিশ্ব কাপ পেল, সেটা বড়ো কথা নয় খেলার মত খেলে বিশ্ব ফুটবলের মানকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে দেওয়ার দায়িত্বই এ আসরে হাজির থাকা প্রতিটি দেশের কর্তব্য। ইংল্যান্ডের সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কণামাত্র ছোঁয়া যেন মেক্সিকোর পবিত্র অঙ্গনে না লাগে—এটাই আমাদের অনুরোধ। আমরা ফুটবল চাই, ফুটবলের নামে ছেলেখেলা নয়—জুলে রিমের ঐতিহ্য মেক্সিকোর আঙিনায় পরিশুদ্ধ হোক!

৩নং গ্রুপের খেলার তালিকা :—

মাঠ—গুদালাজারা।

২রা জুন—ইংল্যান্ড বনাম রুমানিয়া।

৩রা জুন—চেক বনাম ব্রাজিল।

৬ই জুন—রুমানিয়া বনাম চেক।

৭ই জুন—ইংল্যান্ড বনাম ব্রাজিল।

১০ই জুন—ব্রাজিল বনাম রুমানিয়া।

১১ই জুন—ইংল্যান্ড বনাম চেকোশ্লোভাকিয়া।

গল্প হলেও সত্যি

১৯৪৮-৪৯ সালের কথা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ এসেছিল ভারত সফরে। পর পর তিনটি টেস্ট শেষ হল অমীমাংসিতভাবে। চতুর্থ টেস্ট মাদ্রাজে—ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভ করলো এক ইনিংস ও ১৯৩ রানে।

তারপর পঞ্চম ও শেষ টেস্ট চলছিল বোম্বাইয়ে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করছিলেন দাত্তু ফাদকার এবং গোলাম আমেদ, একরকম শেষ জুটিতে। কারণ, উইক্‌স-এর ক্যাচ ধরতে গিয়ে উইকেটকিপার পি· সেন আহত হয়েছিলেন। তাঁর খেলার সম্ভাবনা ছিল না। পি· সেন আহত হওয়ায় অধিনায়ক অমরনাথকে উইকেটকিপারের গ্লাভস্ পরতে হয়েছিল, ফলে অমরনাথের মত বোলারের অভাবে ভারতের আক্রমণও দুর্বল হয়ে পড়ে। তবুও ভারত জয়ের মুখে এসে পৌঁছেছিল। শেষ সময় খেলার কি উত্তেজনা! ফাদকার তখন রীতিমত নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্‌ম্যান।

জয়ের জন্য যখন মাত্র ৬ রান দরকার, আর খেলা শেষ হতে বাকি দেড় মিনিট, তখন ওভারের একটি বল থাকতে আম্পায়ার যোশী স্ট্যাম্পের ওপর থেকে বেল তুলে নিয়ে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

সেই সর্বপ্রথম ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট জয়ের আশা বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

—প্রদীপ বিশ্বাস,
দার্জিলিং

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৪৯শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 4th June, 1970

খরার কবলে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দুটি জেলা—বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া এখন প্রবল খরার প্রকোপে ক্লিষ্ট, মুমূর্ষু ও দিশেহারা। পশ্চিমবঙ্গের আরো দু-একটি জেলা এবার কিছুটা খরার মধ্যে পড়লেও উপরি-উক্ত জেলা দুটির ভাগ্য প্রবল খরার হাতে পড়ার খবর নতুন নয়। ঐ দুটি জেলা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর, দরিদ্র। সেখানের সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জীবন-সংগ্রামের ব্যাপার ও বেকারিত্বও অবর্ণনীয়।

বিগত বছরের ঐ দুটি জেলার খরার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা সাময়িক সুব্যবস্থা হলেও, চিরস্থায়ীভাবে খরা প্রতিরোধের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নি। বলা বাহুল্য, প্রকৃতির অকরুণ হস্তক্ষেপে ঐ দুটি জেলায় খরার আগমন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যেযুগে প্রকৃতিকে জয় করে চন্দ্র-বিজয় সম্ভব হয়েছে, সেযুগে খরার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, এটা অবিশ্বাস্য!

মার্চ থেকে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঐ দুই জেলায় ষাট জন লোক অনাহারে মারা গেছেন! তার মধ্যে পুরুলিয়া জেলাতেই মারা গেছেন পঞ্চান্নজন! ঐ দুই জেলায় খরার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় তেইশ লক্ষ লোক। আর খরার প্রকোপে শতকরা ষাট ভাগ ফসল ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে।

খরার দুর্গ্রহে এই দুঃসংবাদ শুনে নিশ্চয়ই কেউ বিচলিত না হয়ে থাকতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি শুধু হাহাকারই করছেন, মন্ত্রিত্ব হাতে না থাকায় তাঁদের পক্ষে বোধ হয় খরার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। তবু নৈতিক দায় ও দায়িত্ব তাঁদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া অনুচিত। তাঁদের কর্তব্য খরা-কবলিত ব্যক্তিদের উদ্ধারকল্পে পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কারণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন এবং দলমতনির্বিশেষে আবেদন করলে সরকার আরো সজাগ ও সচেষ্ট হবেন।

কিছুকাল আগে দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অংশে প্রাকৃতিক দুর্দৈব নেমে এলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ জাতীয় ব্যবস্থাই রাজ্যগুলিকে আরো আপন করে নিতে পারে বলে আমরা মনে করি। 'তোমার দুঃখ আমার দুঃখ'—এই জাতীয় চেতনাই মানুষকে একাত্মবোধে উন্মুখ করে তোলে। আমরা আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকার অনতিবিলম্বে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় সাহায্য পাঠাবার নির্দেশ দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গে এখন রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। রাষ্ট্রপতির শাসনের অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারেরই শাসন। সুতরাং অন্যবার প্রাকৃতিক দুর্ভোগ নিবারণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব যেমন রাজ্যের দলীয় সরকারের ওপর নির্ভর করতো, এবার আর সে অবস্থা নয়। এখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষে দায়-দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য বা অসামর্থ্য নির্ভর করছে রাষ্ট্রপতিশাসিত রাজ্য সরকারের ওপর। সুতরাং বর্তমান রাজ্য সরকারের উচিত, ঐ দুটি জেলায় সাহায্য প্রেরণ ও তা যথাযথভাবে বিলি-বণ্টনের জন্য তড়িদ্‌গতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করে আশু সাহায্যের ব্যবস্থা বৃদ্ধি ও ঐ দুটি জেলায় খরার প্রকোপে দুর্দশার হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা পেশ করা।

প্রতি বছর খরার সময় অন্ন বা অর্থ-ভিক্ষা দেবার জন্য চিরস্থায়ী ভাঁড়ার তৈরী রাখা হোক, এমন পরিকল্পনার আমরা বিরোধী। তবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার মানুষের দারিদ্র্য কী নিদারুণ, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। সেই কারণে অর্থ ও অন্নভিক্ষা দানের বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেও, দরিদ্র মানুষগুলির রুজি-রোজগারের পথ খুঁজে দিলে তাঁরাও খরা প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, তার মধ্যে প্রথম প্রয়োজন জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা।

গত বাইশ-তেইশ বছরে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা নিয়ে বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে। নদীগুলিতে জলের স্রোত এখন বেশি বয়, না টাকার স্রোত বেশি বয়েছে—এখন ঐ সব প্রশ্ন অবান্তর।

আমরা মনে করি, নদীবাহিত জল বর্ষার সময় চার মাইল অন্তর সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং গ্রীষ্মকালে ঐ জল পাইপের মাধ্যমে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। হয়তো এর ফলে বহু অর্থ ব্যয় হবে, কিন্তু তড়িদ্‌গতিতে কাজের জন্য যদি আপিসে-আপিসে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে কাজে লাগাবার জন্য বাধা বা দ্বিধা না হয়, তাহলে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দিতেই বা অতো দ্বিধা বা কার্পণ্য কেন?

পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহ যে সব স্থানে সম্ভব হবে না, সে সব জায়গায় এবং ঐ অঞ্চলস্থ প্রতিটি গ্রামেই গভীর কূপ ও গভীর খাদসম্পন্ন পুষ্করিণী খনন করা হোক। আমরা যদ্দুর জানি, একদা যে সব পুকুর বা কুয়ো খনন করা হয়েছিল, সেগুলি পুনর্খননের অভাবে এখন শুষ্কপ্রায় অথবা একেবারে শুকিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য কম নয়। সরকারী কুয়ো বা পুকুরে তাঁরা যদি হাত দিতে না পারেন, তাহলে বি ডি-ও'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁকে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দায়ী করতে পারেন।

যা হোক, আমরা মাত্র কয়েকটি প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা নিবেদন করলাম। এখন সরকারের সদয় দৃষ্টি পড়লেই খরা-কবলিত মুমূর্ষু ব্যক্তিরা মুক্তির পথ পাবেন এবং তাঁরাও যে এ ব্যাপারে গায়ে-গতরে সাহায্য দিতে আসবেন, তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আজকের মানুষ

একটা অত্যুজ্জ্বল রেকর্ড সৃষ্টি করে শ্রীমতী বন্দরনায়ক আবার সিংহলে ক্ষমতায় ফিরে এলেন। তাঁর সবল ও সঠিক নেতৃত্বে এস-এল-এফ-পি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার ফলে তাঁর পূর্ব গৌরব মহিমমণ্ডিত হলো।

শ্রীমতী বন্দরনায়ক বা তাঁর নেতৃত্বে গঠিত বামপন্থী ফ্রন্টকে হারাবার জন্যে এবার সিংহলে দস্তুরমতো সপ্ত-ব্যূহ রচনা করা হয়েছিল। প্রচার করা হচ্ছিল যে, যদি বামফ্রন্ট জেতে, তবে সিংহলের অবস্থা কেরালা, পশ্চিমবঙ্গের মত শোচনীয় হবে। এই জোটকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার অর্থ চিরদিনের মত ভোট দেবার সুযোগ হারানো ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী ডাডলে সেনানায়ক তো করুণ আবেদন প্রচার করতেও লজ্জিত হন নি : 'আমাকে শেষবারের মতো সুযোগ দিন আপনারা, জীবনে আর কোনোদিনই আমি নির্বাচনপ্রার্থী হবো না......' ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অবশ্য জিতেছেন, কিন্তু সিংহলের প্রধানমন্ত্রী বনবার সাধ তাঁর অপূর্ণই থেকে গেল। এমন কি হাওয়া খারাপ বুঝে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার প্রয়াসও সরকার পেয়েছিলেন। কিন্তু এত সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শ্রীমতী বন্দরনায়ক রেকর্ড করেছেন। নির্বাচনে এতগুলি আসন দখল করা ইতিপূর্বে কোনো দলের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। ১৯৬৫ সালের অনুষ্ঠিত এর আগের নির্বাচনে ৬৬টি আসন পেয়ে ডাডলে সেনানায়কের ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিই বৃহত্তম দলের স্বীকৃতি লাভ করেছিল, শ্রীমতী বন্দরনায়কের এস-এল-এফ-পি পেয়েছিল ৪১টি আসন। আর এবার মোট আসনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে সিংহলের ইতি-হাসের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। শ্রীমতী বন্দরনায়ক নিজেও তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রে ২০ হাজার ভোটের রেকর্ড ব্যবধানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে স্বীয় জনপ্রিয়তার অভ্রান্ত প্রমাণ রেখেছেন। অন্যদিকে শ্রীডাডলে সেনা-নায়ক একজন অখ্যাত, অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে মাত্র হাজার ভোট বেশি পেয়ে মুখ রক্ষা করেছেন।

রাজনীতিমঞ্চে শ্রীমতী সিরিমাভোর বলা যেতে পারে। ১৯৫৯ সালে আততায়ীর হাতে তাঁর স্বামী প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়কের মৃত্যু না হলে তাঁকে হয়তো প্রকাশ্য রাজনীতির আঙিনায় আসতেই হতো না। শোক ও আঘাতই তাঁকে শক্ত হতে সাহায্য করেছে, নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সলোমন বন্দরনায়কের অগণিত অনুরাগী ও রাজনীতিক নেতারাও সেদিন তাঁদের পরলোকগত নেতার আসনে তাঁর বিধবা সহধর্মিণীকে বসিয়ে পূজো করে

সিরিমাভো বন্দরনায়ক

প্রিয় নেতার অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন বলেই শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক নেত্রীর আসন লাভ করে-ছিলেন।

রত্নপুরার এক সম্ভ্রান্ত ও অভি-জাত পরিবারে শ্রীমতী সিরিমাভোর জন্ম—১৯১৬ সালের ১৭ই এপ্রিল। তাঁর পিতা-পিতামহরা প্রাচীন সিংহলের রাজদরবারে উচ্চ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন। দেশে অভিজাত ও প্রভাবশালী পরিবার হিসেবে তাঁদের খ্যাতি ছিল। ব্রিটিশ আমলেও পরিবারটি প্রতিপত্তিশালী ছিল। ছোটবেলায় সিরিমাভো দেশের সেরা স্কুলে—রোমান ক্যাথলিকদের সেন্ট ব্রিজেট্‌স কনভেন্ট-এ শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। লেখাপড়া ছাড়া তখন পিয়ানো বাজানো ও টেনিস খেলার ঝোঁক ছিল তাঁর।

১৯৪০ সালে যখন সিরিমাভো পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন সলোমন বন্দরনায়ক ছিলেন পরাধীন সিংহলের [illegible] কিন্তু সিরিমাভো কখনো করতেন না, কিন্তু কিছু সমাজসেবার কাজ অবশ্যই তাঁকে করতে দেখা যেতো। বিয়ের পরে তিনি কলম্বোতে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন লঙ্কা মহিলা সমিতি, নিখিল সিংহল বৌদ্ধ মহিলা সমিতি, সিংহল ইনস্টিটিউট অফ কালচার ইত্যাদি সংস্থার পরিচালিকা ছিলেন। অবশ্য এই গণ-সংগঠনগুলির মাধ্যমে সিরি-মাভো বন্দরনায়ক ক্রমশ রাজনীতিকদের সংস্পর্শেও আসতে থাকেন। আর স্বামী সলোমন যখন ইউ-এন-পি থেকে বেরিয়ে নতুন দল (এস-এল-এফ-পি) গঠন করেন, তখন সে দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচারকার্যে বেরিয়ে তিনি নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। সেদিনের এই নির্বাচনী ভাষণগুলিই সিরি-মাভোর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের পুঁজি হয়ে রইলো।

১৯৫৬ সালে সলোমন বন্দরনায়কের দল নির্বাচনে ইউ-এন-পি'কে পর্যুদস্ত করে নিয়ে ক্ষমতা দখল করে, সলোমন দেশের প্রধানমন্ত্রী। ততদিনে সিরিমাভো রাজনীতির মারপ্যাঁচ ও জটিলতা ধরতে শিখলেও প্রত্যক্ষভাবে কখনই হস্তক্ষেপ করেন নি। তবে এটা ঠিক যে, বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সলোমন নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, পরামর্শ চাইতেন। এমনি করে সিরিমাভো শাসনদণ্ড হাতে নেবার জন্য নিজেরই অজ্ঞাতে নিজেকে তৈরি করতে থাকেন বটে, কিন্তু স্বামীর জীবনের আকস্মিক সমাপ্তি না ঘটলে রাজনীতি বা শাসন পরিচালনার ভূমিকা নিতে হতো কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

রাজনীতিতে সিরিমাভোর আগ্রহ যে শুধু নারীসুলভ এবং স্বামীর খাতিরেই ভাসা-ভাসা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় যখন তিনি আবির্ভূতা হলেন। ১৯৬০ সালের নির্বাচনে জেতার পর প্রধানমন্ত্রী হয়ে শ্রীমতী বন্দরনায়ক তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এবারকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতেও বামপন্থী ফ্রন্টের পক্ষ থেকে সিরিমাভো দেশকে নতুন করে ঢেলে সাজার প্রতি-শ্রুতি দিয়েছেন। যে-ট্রট্স্কিপন্থী ও মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের নিয়ে যুক্তফ্রন্ট তিনি রচনা করেছিলেন, নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক তাঁদের নিয়েই কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও সিংহলের দুই প্রধানমন্ত্রী মহিলা হবার ফলে দুটো দেশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(১৫)

সূত্র প্রায় ছিঁড়েই গিয়েছিল। তাকে জোড়বার চেষ্টায় এগিয়ে এলেন কংগ্রেসের অতি-নেতা মহাত্মাজী। ২০ মে দুপুরে আড়াইটের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে গান্ধীর গাড়ি পৌঁছল জিন্নার বাসভবনে, জিন্না হাস্যোজ্জ্বল মুখে বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, গান্ধীর দুই হাতে সেই হাতটি ধরা পড়ল। গান্ধীকে জিন্না তাঁর পাঠকক্ষে নিয়ে চললেন। যেতে যেতে গান্ধী বললেন, "তাহলে আবার আমরা একত্র হলাম!"

গান্ধী পৌঁছবার আগে জিন্নাকে যখন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি প্রশ্ন করেছিলেন, এই পর্যায়ে উভয়ের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কী—তাতে জিন্না বলেছিলেন, "বুঝতেই পারছেন, উদ্দেশ্য নিশ্চয় কিছু আছে, কিন্তু কী তা আমি যদি বলতে চাইও, বলতে পারব না।" আরও চাপ দিলে জিন্না বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "আমি আইনজীবী, আমিই অপরকে জেরা করি, কোনো সাংবাদিক আমাকে জেরা করবে, তা আমি চাই না।"১

কিন্তু ফল কিছুই হল না, যদিও তখনি সরকারিভাবে আলোচনার ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করা হয় নি। এলাহাবাদের কংগ্রেস-মহল থেকে যদিও ক্রমাগত নৈরাশ্য প্রকাশ করা হতে লাগল, কিন্তু অদম্য আশাবাদী সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে আশা করেই চলতে লাগলেন। কলকাতা যাত্রা করার আগে ২৫ মে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বললেন:

"দশ বছর পরে মিঃ জিন্নার সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি সাদরে, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এই পর্যায়ে আর কিছু বলা ঠিক হবে না, শুধু বলতে পারি, আমি অসংশোধনীয়ভাবে আশাবাদী—আমি শেষ ফল সম্বন্ধে এখনো আশা পোষণ করি।"

জিন্নার সঙ্গে আবার কবে সাক্ষাৎ করবেন—এই প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বললেন, "আমরা মুসলিম লীগের কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় আছি। উত্তরের প্রকৃতির উপরেই পরবর্তী কার্যক্রম নির্ভর করবে।"

আরও জানা গেল, লীগ কাউন্সিলের বৈঠক বসছে ৪ঠা জুন তারিখে। সেখানে সিদ্ধান্ত যদি কোনোভাবে অনুকূল হয়, সুভাষচন্দ্র তাহলে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ফিরে আসবেন।২

সরকারিভাবে না হলেও বেসরকারিভাবে আলোচনায় এবং মতভেদের বিষয়বস্তু কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগল (যথা, অমৃতবাজারে ২৭ মে তারিখে)৩, ৪ঠা এবং ৫ই জুন লীগ কাউন্সিলের দুদিনব্যাপী সভার পরে যেসব সংবাদ বেরুল, তার থেকেও মতপার্থক্যের নানা কথা জানা

---

১ অমৃতবাজার, ২১ মে, ১৯৩৮।
২ অমৃতবাজার, ২৬ মে।
৩ ২৭ মে'র অমৃতবাজারের সংবাদ শিরোনাম:

UNITY NEGOTIATIONS

Trend of Discussion Between Jinnah and Rastrapati

Why Talks Remain Suspended

"All Ministries should be formed Afresh"

গেল৪, যদিও আশা একেবারে নিঃশেষিত বলা হল না। লীগ কাউন্সিল স্থির করেছিল মিঃ জিন্না মিঃ বসুর পত্রের উত্তর দেবেন—সে পত্রে নাকি খানিক আপোষের সুর থাকবে।৫ লীগ কাউন্সিলের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রকে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বললেন, "কেবল সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে এই ধরনের জটিল বিষয়ে কিছু বলা উচিত হবে না।" তিনি অবশ্য চারিদিকের হতাশার পরিবেশ সত্ত্বেও নৈরাশ্যবোধ করতে রাজী হন নি। সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে বললেন, "মনে রাখবেন, সূর্যোদয়ের ঠিক আগেই রাত্রির অন্ধকার ঘনতম।"৬

সুভাষচন্দ্র ৮ই জুন পূর্ববঙ্গ সফরে বেরিয়ে পড়েছিলেন। লীগের উত্তর এসে গিয়েছিল তার মধ্যে। সফর থেকে ফিরে ২৪ জুন ঐ উত্তর নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে তিন ঘণ্টা আলোচনা করলেন।৭ ১৬ই অগাস্ট বসু-জি

---

৪ ৫ই জুনের অমৃতবাজারের সংবাদ শিরোনামা:

LEAGUE COUNCIL

Decides to Send a Reply to Congress Note

Bombay Unity Talks and After

The fate of Bose-Jinnah Negotiations Still Hang in the Balance

৬ই জুনের সংবাদ শিরোনামা:

LEAGUE'S VITAL TERM

Status Must be Recognised

Condition Precedent for fresh Negotiations

Jinnah's Letter to Bose

Expresses "Ardent" Desire for Settlement of Hindu-Muslim Problem

৫ "Enquiries in well-informed Muslim League circles indicate that the League President Mr. Jinnah's letter to the Congress President Mr. Subhas Chandra Bose is a short one which is couched in conciliatory tone, expressing 'ardent' desire on the part of the Muslim League for a settlement of the Hindu-Muslim problem.

The letter, it appears, emphasises that both sides should forget what had transpired between them in the past and start afresh, but also makes it clear that before further negotiations can be started, it will be necessary for the Congress to treat and recognise the Muslim League as the only representative body which can speak with authority on behalf of Muslims of India." (A.B.P.—June 6, 1938)

৬ "Approached by the United Press for his opinion ... Mr. Subhas Bose said that it would not be proper for him to express any opinion on this delicate subject on the basis simply of the Press reports. President Bose however refused to take a pessimistic view of the situation in spite of the depressing atmosphere all around and asked the Press representatives to remember that the darkest hour of the night was just before dawn." (A.B.P.—June 18, 1938)

৭ ২৫ জুনের সংবাদ শিরোনামা:

LEAGUE'S REPLY

Congress President's Three Hour Talk with Mahatmaji

Sj. Bose to Write to Mr. Jinnah

Political's Release Question; Gandhiji not to Visit Bengal in Near future.

(A.B.P.—June 25, 1938)

পত্রাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠালেন।৮ এবং ১০ই অক্টোবর আরও দু'-একটি চিঠি সংবাদপত্রে বেরোয়।

"বসু-জিন্না পত্রাবলী শীতল যুক্তির অপূর্ব নিদর্শন"— জে এস রাইট পত্রগুলি তাঁর গ্রন্থে (*Important Speeches and Writings of Subhas Bose*) উপস্থিত করতে গিয়ে লিখেছেন—"দু'জনের কেউই আবেগের পূজক নন। একজন যুক্তিবাদী অন্য একজন যুক্তিবাদীর মুখোমুখি এখানে হয়েছেন। তার ফলে যদিও যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধির মুন্সীর ঘর্ষণ ঘটেছে, কিন্তু কোনো অগ্নিকাণ্ড হয় নি।"

নিরতিশয় সত্য কথাগুলি। জিন্নার যে-চরিত্র এতাবৎ দেখে এসেছি, তদনুযায়ী 'আবেগ' তাঁর জীবনে বাতিল পণ্য। আবেগের মহাতরঙ্গরূপী সুভাষচন্দ্র প্রয়োজনের খাতিরে পাষাণ-কণ্ঠে কথা বলতে পারতেন। জিন্নার সঙ্গে তিনি আবেগের চর্চা করতে বসেন নি।

আলোচনা গিয়ে একটি মূল প্রশ্নে আটকেছিল— মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে মুসলিম লীগকে স্বীকার করা হবে কি না! জিন্না বললেন, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য এবং প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, আর কংগ্রেস বৃহৎ হিন্দু জনমতের বাহক অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান—এই দুই প্রতিষ্ঠান হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মীমাংসার জন্য চুক্তি করুক।

("The All-India Muslim League as the authoritative and representative organisation of the Indian Muslims and the Congress as the authoritative and representative organisation of the solid body of Hindu opinion have hereby agreed to the following terms by way of a pact between the two major communities and as a settlement of the Hindu-Muslim question.")

কংগ্রেসের পক্ষে সুভাষচন্দ্র জিন্নার ঐ শর্ত মানতে রাজী না হওয়ায় তিনি ভাষাকে একটু নমনীয় করেন। কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান, এই উল্লেখে বিরত থেকে লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলতে চাইলেন।

("The Congress and the All-India Muslim League as the authoritative and representative organisation of the Musalmans of India have hereby agreed to the following terms of a Hindu-Muslim settlement by way of a pact.")

জিন্নার দ্বিতীয় বিবৃতিও কার্যত একই কথা বলেছে। লীগ যদি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে বলাই বাহুল্য, কংগ্রেসকে সে অধিকার ছেড়ে দিতে হয় এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেস বড়জোর হিন্দু প্রতিষ্ঠান না হয়ে "অমুসলমান প্রতিষ্ঠানে" পর্যবসিত হয়। কংগ্রেসের পক্ষে এই অবস্থাও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র স্বীকার করলেন, সংখ্যালঘু হলেও মুসলমানেরা ভারতের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ এবং ভারত বিষয়ক কোনো পরিকল্পনায় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই মূল্য দান করতে হবে। মুসলিম লীগ মুসলিম জনমতের বড় অংশের প্রতিনিধি, সুতরাং তার গুরুত্ব স্বীকার্য। সেইজন্যই কংগ্রেস লীগের মনোভাব জানতে ও তার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে ইচ্ছুক। তাই বলে অপরাপর যেসব মুসলমান প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের অনেকেই অতীতে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, আলোচনার ক্ষেত্রে কংগ্রেস তাদের বর্জন করতে পারে না। অন্য গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ সমর্থক অপরাপর প্রতিষ্ঠানকেও পরিহার করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়।

৮ ১৭ অগাস্টের অমৃতবাজারে বেরোয়:

BOSE-JINNAH CORRESPONDENCE

Unity Parley

Why and How it was Dropped

Sj. Subhas Chandra Bose, Congress President, has released for publication through the United Press the following correspondence which passed between him and Mr. Mahamed Ali Jinnah, President of the All India Muslim League, on the problem of communal settlement :

"With the permission of Mr. Jinnah, I am releasing the correspondence which has passed between us since I met him in Bombay on the 14th May, 1938, to continue the talk which Mahatma Gandhi had with him. During my stay in Bombay in May last, I had several interviews with Mr. Jinnah.

এই কথাগুলি লিখে সুভাষচন্দ্র ১৪ই মে জিন্নার হাতে দিয়েছিলেন। জিন্না সুভাষচন্দ্রের কাছে সুস্পষ্ট প্রস্তাব চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মনোভাব উপরির উক্তভাবে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করে পরবর্তী মীমাংসো-শর্তে আসার প্রস্তাব করেন। জিন্না বলেন, কংগ্রেসের বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনের আগে কিছু বলতে অপারগ।

লীগ কাউন্সিলের সভার পরে সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত তিনটি প্রস্তাব জিন্না ৬ই জুন কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন।

প্রথম প্রস্তাবঃ

"কংগ্রেসের পক্ষে তার সভাপতি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নাকে ১৪ মে, ১৯৩৮ তারিখে যে-নোট এবং ১৫ মে, ১৯৩৮ তারিখে যে-চিঠি দেন, সেগুলিকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বিবেচনা করেছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের পক্ষে *হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে* কোনো আলাপ-আলোচনায় বসা বা ঐ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় যদি-না মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেওয়া হয়।"

দ্বিতীয় প্রস্তাবঃ

"লীগ কাউন্সিল মিঃ গান্ধীর ২২ মে, ১৯৩৮ তারিখের পত্রও বিবেচনা করেছে। কাউন্সিলের অভিমত হল, কংগ্রেস কর্তৃক সংগঠিত কোনো কমিটিতে কোনো মুসলমানকে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।"

তৃতীয় প্রস্তাবঃ

"লীগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল পরিষ্কার করে জানাতে চায়, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের ঘোষিত নীতি হল—অপর সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষিত করতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে আস্থার ভাব জাগে ও তাদের বিশ্বাস অর্জন করা যায় এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রয়োজনমত এই রকম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা অপর গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।"

লীগ কাউন্সিলের এই প্রস্তাবের উত্তর স্বভাবতই ব্যক্তিগতভাবে সুভাষচন্দ্র দিতে পারেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভার পরে ২৫শে জুলাই তিনি জিন্নাকে এক দীর্ঘ পত্রে লিখলেনঃ

"আপনি অনুগ্রহ করে আপনার ৬ই জুনের চিঠির সঙ্গে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের যে সব প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেগুলিকে সম্ভবপর সকলপ্রকার মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করেছে। লীগ কাউন্সিলের প্রথম প্রস্তাবে লীগের স্ট্যাটাস নির্ণীত হয়েছে। যদি তার অর্থ হয় সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার শর্ত বিবেচনার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে ঐ প্রস্তাবে নির্ধারিত লীগের স্ট্যাটাসকে কংগ্রেস মেনে নেবে—তাহলে একটি স্পষ্ট অসুবিধার কারণ ঘটে। ঐ প্রস্তাবে যদিও লীগ সম্বন্ধে 'একমাত্র' মুসলমান প্রতিষ্ঠান বলা হয় নি, তাহলেও প্রস্তাবের ভাষা অনুযায়ী দেখা যায় ঐ বিশেষণটি অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। ইতিমধ্যেই লীগের নিঃসপত্ন অধিকার-স্বীকৃতির বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্কহীন, স্বতন্ত্রভাবে সক্রিয় অন্য মুসলমান প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের কোনো কোনোটি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অনেক মুসলমান কংগ্রেসের মধ্যে আছেন—দেশে যাঁদের কারো কারো যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। তারপর রয়েছে বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যা দৃঢ়ভাবে কংগ্রেস-সমর্থক। বুঝতেই পারছেন, এই সব জানা তথ্যের সম্মুখে কংগ্রেসের পক্ষে লীগ কাউন্সিলের প্রথম প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেসকে যে-কথা আপাতত বলিয়ে নিতে চাওয়া হয়েছে, তা বলা কেবল অসম্ভব নয়, অনুচিতও বটে। *সংজ্ঞার দ্বারা কোনো* প্রতিষ্ঠান তার স্ট্যাটাস পেয়ে যায় না; যে-বিশেষ সেবার *উদ্দেশ্যের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিবেদিত সেই সেবার পরিমাণের* দ্বারাই তা লাভ করতে পারে। ওয়ার্কিং কমিটি তাই আশা করে যে, লীগ কাউন্সিল কংগ্রেসকে অসম্ভব কিছু মেনে নিতে বলবে না। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, কংগ্রেস লীগের সঙ্গে অতি গভীর বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনে এবং বহুবিতর্কিত উত্যক্তকর হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সম্মানজনক মীমাংসায় আসতে কেবল ইচ্ছুক, তাই নয়, একান্ত উদ্‌গ্রীব? এই পর্যায়ে কংগ্রেসের দাবির কথাও জানিয়ে রাখা ভাল। একথা যদিও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, কংগ্রেসের অগণ্য সদস্য-তালিকায় হিন্দুদের সংখ্যাই সর্ববৃহৎ, তাহলেও কংগ্রেসের মধ্যে মোটামুটি বেশ বড় সংখ্যায় মুসলমান সদস্য আছেন, সেই সঙ্গে অন্য নানা ধর্মাবলম্বী ও গোষ্ঠীভুক্ত মানুষও। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণী ও জাতির প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেস ধারাবাহিকভাবে করে এসেছে—সেই তার ঐতিহ্য। কংগ্রেসের সূচনাকাল থেকেই বিশিষ্ট মুসলমানেরা তার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন যাঁরা কংগ্রেস এবং সমগ্র দেশের বিশ্বাসভাজন। কংগ্রেসের ঐতিহ্য হল—কেউ কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের জোরে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যদিও অপরপক্ষে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কারো পক্ষে স্বধর্মকে ত্যাগ করতে হয় না। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতিকে গ্রহণ করেই মাত্র কেউ সর্বাংশে কংগ্রেসী হতে পারে। কংগ্রেস তাই কোনো অর্থেই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। বস্তুতপক্ষে কংগ্রেস সর্বদা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করেছে, যেহেতু তা অকলুষিত বিশুদ্ধ জাতীয়তার পরিপন্থী।

"কিন্তু কংগ্রেস যদিও এই দাবি করে, এবং মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে এই দাবি অনুযায়ী সে চলতে পেরেছে, তবু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি খুবই আনন্দিত হবে যদি আপনার কাউন্সিল কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসে, যাতে করে আমরা জাতীয় সংহতি অর্জন করতে পারি এবং আমাদের

সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সর্বান্তঃকরণে কাজ করতে পারি।

"লীগ কাউন্সিলের দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তব্য, আশঙ্কা হয়, ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয়।

"তৃতীয় প্রস্তাবের অর্থ করতে ওয়ার্কিং কমিটি অসমর্থ। ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনায় মুসলিম লীগ বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, কারণ মুসলিম স্বার্থকেই তা রক্ষা করতে চায় এবং মুসলমানেরাই মাত্র তার সদস্য হতে পারে। ওয়ার্কিং কমিটি এতাবৎকাল জেনে এসেছে যে, লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মীমাংসা করতে চায়, অন্যান্য সংখ্যালঘু প্রশ্নের মীমাংসা নয়। কংগ্রেসের কথা হল, তার বিরুদ্ধে অপর সংখ্যালঘুদের কোনো অভিযোগ থাকলে সে সর্বদা সে বিষয়ে বিবেচনা করতে প্রস্তুত, কারণ মূল শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেস সর্বভারতের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, জাতিধর্মের কোনো পার্থক্য সে করে না।"

সুভাষচন্দ্রের এই চিঠিটি খুবই মূল্যবান, কারণ, এর মধ্যে খুবই সংযত দৃঢ়তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করা হয়েছে. এতে আবেগ, উচ্ছ্বাস বা বৃহৎ কথার ফুলঝুরি নেই। অপরের সম্বন্ধে বিনা কটাক্ষে বস্তুগতভাবে সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করতে পারতেন।

জিন্না সুভাষচন্দ্রের পত্রের উত্তরে অনুরূপ আকারে একটি পত্র লিখলেন ২ অগাস্ট তারিখে:

"প্রিয় মিঃ বসু. আপনার ২৫ জুলাইয়ের পত্র আমি অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেছিলাম।

"আপনার কাছে পূর্বে প্রেরিত পত্রের প্রথম প্রস্তাবে লীগের জন্য যে-স্ট্যাটাস দাবি করা হয়েছিল, তা দাবি না করার জন্য অনুরোধ করে আপনি আপনার পত্রে যে-সকল যুক্তি দিয়েছেন, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল একান্ত মনোযোগের এবং সতর্ক বিবেচনার সঙ্গে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে।

"আপনাকে জানাতে ইচ্ছা করি, লীগের স্ট্যাটাস নির্ণয় করার কালে কাউন্সিল স্বীকৃতি আদায়ের মনোভাবের দ্বারা চালিত ছিল না—স্বীকৃত তথ্যকেই মাত্র জানাচ্ছিল।

"কাউন্সিল সম্পূর্ণ ও সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য এবং প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তার এই মর্যাদা ১৯১৬ সালে লখনৌয়ে কংগ্রেস-লীগ প্যাক্টের সময়ে মেনে নেওয়া হয়েছিল. তা পরেও. ১৯৩৫ সালে জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলাপ-আলোচনা যখন চলেছিল তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয় নি। সুতরাং এ ব্যাপারে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের পক্ষে কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতি বা স্বীকারোক্তি পাওয়ার প্রয়োজন নেই—বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত লীগ কাউন্সিলের সভাও তার প্রার্থী নয়। তবে কংগ্রেসের পূর্বতন সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁর একটি বিবৃতিতে 'ভারতে মাত্র দুটি দলই আছে, বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেস'—এই কথা বলে যেহেতু লীগের অকথা, ঠিকভাবে বলতে গেলে, তার অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রশ্নের অধীন করে তুলেছিলেন—তাই লীগের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পক্ষে কংগ্রেসকে জানানো দরকার হয়ে পড়েছিল, কোন্ ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠান আলোচনায় অগ্রসর হতে পারে।

"তাছাড়া, হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কংগ্রেস লীগের দ্বারস্থ হয়েছে—এই বিশেষ ব্যাপারটি লীগের নির্ভরশীল ও প্রতিনিধিমূলক চরিত্রের রূপ দেখিয়ে দেয়—দেখিয়ে দেয় যে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের পক্ষে কোনো চুক্তিতে আসবার অধিকার তার রয়েছে।

"লীগ কাউন্সিল এই তথ্য সম্বন্ধে সচেতন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার রয়েছে, এবং অন্যান্য প্রদেশেও কিছু মুসলমান কংগ্রেসে রয়েছে। এক্ষেত্রে কাউন্সিলের অভিমত, এই সকল কংগ্রেসী মুসলমান ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না এই সহজবোধ্য কারণে—প্রথমত তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য, দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলার বা তাদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। তা যদি না হয় তাহলে আপনার চিঠিতে কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে আপনি যে-দাবি করেছেন তার সমস্তই ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

"আপনার চিঠিতে 'অপরাপর মুসলিম প্রতিষ্ঠানের' উল্লেখ করেছেন, যদিও তাদের নাম পর্যন্ত করেন নি: সে সম্বন্ধে কাউন্সিলের বক্তব্য—তাদের বিষয়ে কিছু না বলাই সঙ্গত হত। যদি তারা এককভাবে বা যৌথভাবে ভারতের মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার অধিকারী হত, তাহলে কংগ্রেসের সভাপতি বা মিঃ গান্ধী মুসলিম লীগের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মীমাংসার আলোচনায় কদাপি এগিয়ে আসতেন না।

"মুসলিম লীগ নিজের পক্ষে এইটুকু বলতে পারে, অন্য কোনো মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতের মুসলমানদের পক্ষে কথা বলতে বা আলোচনা করার অধিকার দাবি করেছে বলে সে জানে না। সুতরাং খুবই দুঃখের কথা যে, আপনি 'অপর মুসলমান প্রতিষ্ঠানের' উল্লেখ করবেন।

"লীগ কাউন্সিল আপনাদের মতই 'বহুবিতর্কিত উত্তাক্তকর হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের' মীমাংসায় এবং তার দ্বারা সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু কাউন্সিল এই দেখে বেদনাবোধ করছে যে, ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করবার এবং আলোচনাকে পিছিয়ে দেবার উপযোগী যুক্তি-তর্ক হাজির করা হয়েছে।"

চিঠির শেষের দিকে জিন্না কংগ্রেস-গঠিত কোনো কমিটিতে কোন মুসলমানকে না নেওয়ার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ জানান, এবং অধিকন্তু বুঝিয়ে দেন, অপর সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে নাক গলাবার প্রয়াস লীগ ত্যাগ করবে না।

[ক্রমশ]
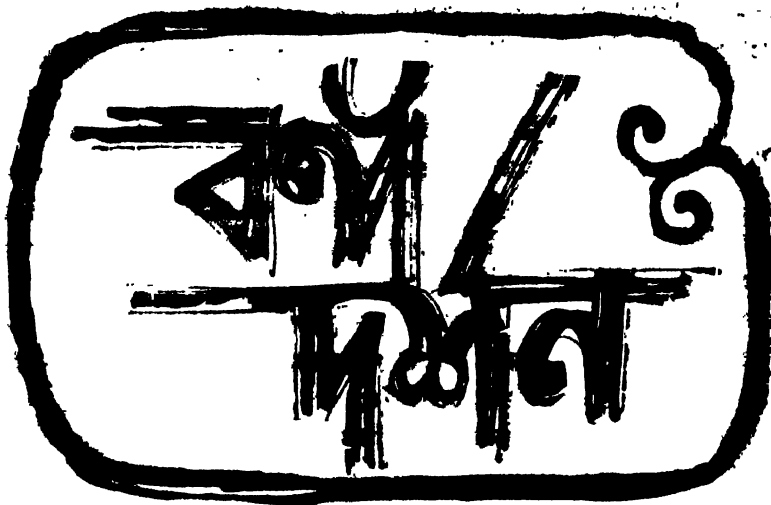
পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতা পাঁচজন আমলার হাতে ন্যস্ত রয়েছে এবং তা যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এঁদেরই হাতে থাকবে এতে সন্দেহ করার কারণগুলি ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠছে। রাজ্যপালের প্রশাসনে প্রকৃতপক্ষে পূর্বের চেয়ে অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে সেটা বোঝার উপায় নেই, বরং অবনতি ও অবক্ষয়কর চিহ্নই পর্যাপ্তরূপে প্রকট। রাইটার্স বিল্ডিংসে ফাইলের পর ফাইল জমে আছে এবং কোন দপ্তরের সংগে কোন দপ্তরের বিন্দুমাত্র সমঝোতা নেই। যুক্তফ্রন্টের আমলে প্রতি বুধবার অন্তত এ সব নিয়ে চেঁচামেচিও হত, এখন তাও নেই। প্রশাসনিক শ্লথতা ও দীর্ঘসূত্রতা এতটা ব্যাপক আকারে প্রকাশ পেয়েছে যে, তা অতীতের সব রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার প্রচণ্ড খরাকবলিত দুরবস্থার কোন প্রতিকার হয় নি, অথচ প্রথম যুক্তফ্রন্ট আমলের ত্রাণকার্যের কথা আমাদের মনে আছে। রাজ্যপালের প্রশাসন এক্ষেত্রে কার্যত একেবারেই নীরব, যদিও রাজ্যপালের নামে একটি আবেদন প্রচারিত হয়েছে খরাক্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে। এ আবেদনে কোন ফল হবে না, জনসাধারণের দেবার ইচ্ছা থাকলেও সে ইচ্ছা কার্যকর করার মত মেসিনারী রাজ্যপালের প্রশাসনে গড়ে উঠতে পারে না, তা যে শশশৃঙ্গবৎ অলীক, জনসাধারণ এটা ভাল করেই বোঝেন।

এদিকে রাষ্ট্রপতির শাসনের সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছে আমলাতন্ত্র। এবার তথাকথিত নকশালপন্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার নাম করে ব্যাপক দমননীতি চালাবার প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং এই প্রস্তুতি যে নকশালপন্থীদের নাম করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহের ওপর ব্যাপক আঘাত হানার প্রস্তুতি এটা অনেকেই বুঝতে পারছেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ছয় ব্যাটেলিয়ান পুলিশ আমদানী করা হয়েছে এবং আরও কয়েক ব্যাটেলিয়ান পুলিশ পাঠানোর জন্য বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া আছে রাজ্যের নিজস্ব আর্মড পুলিশবাহিনী এবং আধা-মিলিটারী ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলবাহিনী। এর সংগে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে জানিয়ে রাখা হয়েছে যে, প্রয়োজনে যেন যে কোন সময় যে-কোন জায়গায় পুলিশকে সাহায্য করার জন্য তারা প্রস্তুত থাকে। এত আয়োজন কিসের জন্য সেটা বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না।

সোজা কথায় পশ্চিমবঙ্গে আমলাতান্ত্রিক পীড়নকে সুপরিকল্পিত আকার দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যুক্তফ্রন্টের আমলে যে সকল অধিকারগুলি সাধারণ মানুষের জন্য অর্জিত হয়েছিল, তা হরণ করার জন্য সুনিপুণ অথচ ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত সংখ্যায় আমরা দেখিয়েছিলাম যে, রাজ্যপাল-প্রশাসনের নতুন ভূমিনীতি কার্যত গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দখলীকৃত জমি থেকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যেই রচিত।

সরকারী প্রেস নোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যস্ত খাস অথবা বেনামী জমি থেকে সেই সব ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করবে না "যে সব ক্ষেত্রে সরকার ছাড়া অন্য কোন পক্ষের বৈধ স্বার্থ লংঘন করা হয় নি", কিন্তু "যে ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি-মালিকের জমি জবরদখল হয়েছে যার পরিমাণ নির্ধারিত জমির সীমার মধ্যে এবং সেই জমির ওপর তার নির্মল স্বত্ব আছে সে-ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আইনের আশ্রয়

আদালতের রায় মান্য করবে এবং তার-রায় করবে।" এর মানে অর্থ হল সরকার একমাত্র নিজস্ব খাস জমি ছাড়া অন্য সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি থেকে গরীব কৃষকদের জোর করে উচ্ছেদ করবে। ইতিমধ্যেই জমিদার-জোতদারেরা অসংখ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে, এর পর এইরকম মামলার সংখ্যা আরও বাড়বে। যে জমি সত্যই বেনামী ও বে-আইনী তার মালিকও বর্তমানের জন্যও তো মামলা ঠুকবে এবং এই সকল মামলার রায় বেরুতে বেরুতেই একটি দশক পার হয়ে যাবে, অথচ এই সময়ে ঐ বেনামী জমির মালিকরা সরকারী প্রোটেকশান রীতিমত পেয়ে যাবে। সেই সকল ভেস্ট জমিতে কৃষক চাষ করতে গেলে পুলিশ আসবে, রক্তপাত হবে। এ ছাড়া যে-সব খাস জমি বর্তমানে সরকারের দখলে থাকা সত্ত্বেও যার ওপর সরকারের বিরুদ্ধে আদালতের ইন্‌জাংশন আছে, সেই জমির ওপর দখলকারী কৃষকদের ভাগ্যে কি ঘটবে? কিংবা যে সব জমি উদ্বৃত্ত অথচ এখনও সরকারে ন্যস্ত হয় নি, কিংবা ফিসারী বা ওই ধরনের বিপুল পরিমাণ জমি যা আইন বলে রেহাই দেওয়া হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে কি হবে? আদালত আইনসংগত অবস্থান নেবে এবং সরকারও ওই ধরনের জমি থেকে ব্যাপকভাবে কৃষকদের জোর করে উৎখাত করবে। অথচ এই সব জমি প্রকৃতই উদ্বৃত্ত। এইভাবে যুক্তফ্রন্টের আমলে কৃষকদের সমস্ত বৈধ কার্যকলাপ নস্যাৎ করা হবে।

যাঁরা দরিদ্র - শোষিত - বঞ্চিত-উৎপীড়িত মানুষের হিতৈষী বলে দাবি করেন, সেই বামপন্থী দলগুলিই এই দুঃসময়ে সমবেত হয়ে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করতে পারতেন একটি জনপ্রিয় লোকায়ত্ত সরকার গঠনের দ্বারা। কিন্তু তা তাঁরা করছেন না, করবেন এমন ভরসাও নেই। ভ্রাতিশত্রুতার পরিণাম যে কতদূর বিষময় হতে পারে, তা নিয়ে ছেলেবয়স থেকে পাঠ্যপুস্তকে অনেক গল্প পড়েছি, সকলেই পড়ছেন, ভ্রাতিশত্রুতার পরিণাম কি হতে পারে তা অনেকে ব্যক্তিগত জীবনেও উপলব্ধি করেছেন। রাষ্ট্র ও রাজনীতির স্তরেও তা কি বিষময় ফল প্রসব করতে পারে তাও আস্তে আস্তে দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে তা হাড়ে হাড়েই বুঝিয়ে দেবে। বলতে কোন দ্বিধা নেই, পশ্চিমবঙ্গের আজ যা অবস্থা, মানুষের অধিকার পদদলনের আজকের যে প্রয়াস, বাজসে যে উৎপীড়নের সুস্পষ্ট নির্দেশ সমস্ত কিছুর মূলেই সি· পি· আই এবং সি· পি· এম-এর

জাতিসত্ত্বা। প্রমোদ দাশগুপ্ত-রঞ্জন সেনেরা যাই বলুন না কেন, এইটাই সত্য কথা।

ট্রেড ইউনিয়ন সমাচার

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রঞ্জি স্টেডিয়ামে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তিন দিনব্যাপী সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনের ফলে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পাল্টা একটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন বাস্তবরূপ পেল। এই নতুন সংগঠনের নাম হবে "সেণ্টার অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস." সংস্থার পতাকা হবে লাল শালুর উপর সাদা রং-এর কাস্তে-হাতুড়ি। সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, "শ্রমিক-শ্রেণীকে যে জঙ্গী অর্থনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে এবং সেই সঙ্গে তাকে রাজনৈতিক চিন্তায় সচেতন করে তুলবে ও ক্ষমতার লড়াই-এর জন্য তাকে তৈরি করবে এবং দুনিয়ার সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামগুলির সমর্থনে তাকে সমর্থন করবে এমন একটি খাঁটি, গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান পরিস্থিতি প্রবলভাবে তুলে ধরেছে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (এ. আই· টি· ইউ·সি) সি· পি· আই নেতৃত্বের সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন যে, সংশোধনবাদীরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অর্থনৈতিক লড়াই-এর চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করছে। শ্রমিক শ্রেণীর এই সংগঠনকে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণের একটি যন্ত্রে পরিণত করছে এবং দৃঢ় সংকল্প জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের পথে তাকে একটা অন্তরায় করে চলেছে। তিনি সি· পি· আই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বহু শ্রমিক বিরোধী কাজের অভিযোগ আনেন। পি· রামমূর্তি সি· পি· আই-এর নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, ওই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ডাঙ্গেপন্থীরা শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথগামী করছে। তিনি বলেন যে, শ্রমিকদের ওই শ্রেণী সমঝোতার নীতি থেকে মুক্ত করে তাদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতাকে জাগিয়ে তোলা দরকার। শ্রীরামমূর্তির অভিমত হল যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট যেভাবে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী শ্রমিকরাই জঙ্গী আন্দোলন দ্বারা তদের অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম। নতুন এই ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা শ্রেণী সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তিনি ঘোষণা করেন।

পক্ষান্তরে এ-আই-টি-ইউ-সি'র বর্তমান নেতৃত্বের মতে শোধনবাদমুক্ত বিপ্লবী পার্টি গঠনের জন্য বর্তমান সি· পি· এম নেতারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভেদ সৃষ্টি করে পাল্টা পার্টি গঠন করেছেন। এখন এ· আই· টি ইউ· সি-কে ভাঙার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। সি· পি· এম-এর কর্মনীতি অনুসারে ভেদের মধ্যেই বিপ্লবের অগ্রগতি, হঠকারিতার মধ্যেই বিপ্লবী সংগঠন ও নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার পথ। বিপ্লবের এমন পদ্ধতি, সংগঠন ও নেতৃত্ব তৈরি করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ট্রেড ইউনিয়ন নীতি সংক্রান্ত বিরোধ অথবা শ্রমিকশ্রেণীর দাবি আদায়ের পদ্ধতি বা শ্রমিক শ্রেণীর আশু ও চরম লক্ষ্য সম্পর্কে মতবিরোধ এ· আই· টি· ইউ. সি ভাঙার কারণ নয়। সি· পি· আই-এর মতে, এর কারণ একান্তই সি· পি· এম·-মার্কা রাজনীতি। কেন না, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংক্রান্ত মতবিরোধ সংগঠনের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব। এতদিন হয়েছেও তাই এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে সি· পি· এম নেতারা স্বরাষ্ট্র ও শ্রম দপ্তরকে শ্রমিক ঐক্য ভাঙার জন্য ব্যবহার করে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র সংঘাত সৃষ্টি করেছেন। সেই সংঘাতকে ব্যবহার করেছেন পাল্টা ইউনিয়ন সৃষ্টির কাজে। এখন তাঁরা পার্টির সিদ্ধান্ত চাপাচ্ছেন গণ-সংগঠনের উপর। জাতীয়তাবাদের নামে কংগ্রেস নেতা সর্দার প্যাটেল শ্রমিক ঐক্য ভেঙে আই· এন· টি· ইউ. সি'র জন্ম দিয়েছিলেন এবং দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সাহায্য করেছিলেন। এখন বিপ্লবের নামে সি. পি· এম নেতৃত্ব এ· আই· টি. ইউ. সি-তে ভেদ সৃষ্টি করে একচেটিয়াদের সহায়তা করছেন। এই দুই দল দুই প্রান্ত থেকে শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি ভাঙার কাজে একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়েছেন। সি· পি· এম নেতৃত্ব যদি তাঁদের ভেদনীতিকে বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করেন এবং সত্যই যদি তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর উপর আস্থাবান হন, তাহলে কেন তাঁরা পাল্টা সংগঠন করার ব্যাপারে শ্রমিকদের মধ্যে গোপন ব্যালট গ্রহণ করছেন না, এই অভিযোগ সি. পি· আই নেতৃত্ব করেছেন। তাঁরা আরও প্রশ্ন করেছেন, ইউনিয়নের স্বীকৃতির জন্য যদি গোপন ব্যালট পর্যন্ত সমীচীন হতে পারে, এ ব্যাপারে তা অসমীচীন হবে কেন?

এ বিষয় নকশালপন্থীদের পৃথক বক্তব্য আছে। নকশালপন্থীদের যে অংশ ট্রেড ইউনিয়নকে গণ-সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার বলে মনে করেন, তাঁদের নিয়ে গঠিত বিপ্লবী গণ-সংগ্রাম প্রস্তুতি কমিটি স্থির করেছেন যে, আপাতত পৃথকভাবে কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত থাকবেন না। নিজেরা কোন কেন্দ্রীয় ইউনিয়নও গড়বেন না, নকশালপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের মধ্য থেকেই শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবী রাজনীতির পথে পরিচালিত করবেন। নকশালপন্থীরা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, ট্রটস্কিবাদী রণদিভে কর্তৃক পরিচালিত নয়া শোধনবাদী চক্র শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যকে আর একবার বিভক্ত করল। ১৯৪৮ সালে রণদিভে চক্রই কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে বহিষ্কার করে শ্রমিক ঐক্যে ভাঙন ধরিয়েছিল। এ সব কাজ মালিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে। আমাদের দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় মুৎসুদ্দি, ধনিক ও সামন্ততন্ত্রের কে কত বিশ্বস্ত দালাল, তা নিয়ে শোধনবাদী ডাঙ্গে-চক্র ও নয়া শোধনবাদী রণদিভে চক্রের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু হয়েছে। তার পরিণতিতেই আজ ট্রেড ইউনিয়নে ভাঙন আনা হচ্ছে। সি· পি. এম নেতারা শ্রমিক স্বার্থ নষ্ট করার জন্য ডাঙ্গে-চক্রের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করছেন, তার সবগুলিই তাঁদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এল. আই· সি. পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি সংস্থায় তাঁরা মালিকের দালালি করে চুক্তি করেছেন। যুক্তফ্রণ্টের আমলে যে সব সংগ্রামের কথা তাঁরা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন, তার সব কয়টি ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে ছাঁটাই করার সুযোগ দিয়ে মালিকের কেনা গোলামের মত কাজ করেছেন। সি. পি· এম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিপ্লবী বুলির আশ্রয় নেন, কিন্তু এমন কি গোয়া সম্মেলনেও শ্রমিক শ্রেণীর কাছে কোন বিপ্লবী কর্মসূচী পেশ করা হয় নি। বি· পি. টি. ইউ· সি তো সি· পি· এম-এর দখলে ছিল, সেখানে তাঁরা কোন বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলেন নি কেন, সে প্রশ্নও নকশালপন্থীরা তুলেছেন।

২৯।৫।৭০

সাম্প্রদায়িক অশান্তি রোধের উপায়

ভারতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির বাড়াবাড়ি নিয়ে গত সপ্তাহে আমরা বসুমতীতে আলোচনা করেছি। সাম্প্রদায়িক অশান্তি একদিকে যেমন অমানুষিক, অপরদিকে তেমনি বৈষয়িক অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক। কি করে এই সামাজিক উপদ্রব চিরকালের মত বন্ধ করা যায়, তা নিয়ে নানা মহলেই আলোচনা হচ্ছে। গত সপ্তাহে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সংগে এক আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে প্রস্তাব ওঠে যে, অতঃপর যে এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেবে, সেই এলাকার পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই সেজন্য দায়ী থাকবেন। অর্থাৎ পুলিশকর্তাদের সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পর্কে সব সময় সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবং কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলে, তা তৎক্ষণাৎ দমন করতে হবে। সেখানে তৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসাররা শাস্তি ভোগ করবেন। এই সংগে আরও প্রস্তাব হয়েছে যে, যেখানে সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামা দেখা দেবে, সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর পিটুনী কর বসানো হবে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক অশান্তির শাস্তি ভোগ করবেন স্থানীয় শান্তিপূর্ণ জনসাধারণ। পিটুনী করের এই প্রস্তাবটি যে সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অসংগত, সে কথা বলাই বাহুল্য। মুখ্যমন্ত্রীরা হয়ত ভেবেছেন, পিটুনী করের ভয়ে জনসাধারণ দাংগা দমন করতে এগিয়ে আসবেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দাংগা বাধায় সমাজবিরোধী শক্তিগুলো। সাধারণ মানুষ সব সময়ই তাদের ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন। পুলিশ যদি তাদের দমন করতে অক্ষম হয়, তাহলে জনসাধারণ কিভাবে দাংগা দমন করতে এগিয়ে আসবেন তা বোঝা শক্ত।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও (ইন্দিরা-পন্থী) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর স্বাধীনতা খর্ব করা হোক। অনুরূপ সংগঠনগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা করা যায় কিনা, তা তাঁরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পরীক্ষা করে দেখতে বলেছেন। এই আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রাম যোগ দিয়েছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি আরও স্থির করেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো হবে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা আর-এস-এস দলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর আর-এস-এস দল যখন বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল, তখন আর-এস-এস নায়ক গুরু গোলওয়ালকার নাকি স্বর্গত সর্দার প্যাটেলকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আর-এস-এস শুধু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে। তদনুযায়ী তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। আর-এস-এস সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে নি বলে বিভিন্ন সদস্য অভিযোগ করেন। তাঁরা বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, আর-এস-এস জনসংঘের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসাবে কাজ করছে এবং বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিয়ে তুলছে।

ফকরুদ্দীন আলী আমেদ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, তারাও জনসংঘের মত সাম্প্রদায়িক সংগঠন।

ঘাটশীলায় নকশালী অভিযান

গত ২৬শে মে নকশালপন্থী বলে কথিত একদল যুবক ঘাটশীলায় (বিহার) জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টরের বাঙলোয় হানা দেয়। সেই অভিযানে তারা বোমা এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিল। পুলিশও তাদের ওপর পাল্টা গুলী চালায়। কিন্তু কোন পক্ষেই কেউ হতাহত হয় নি। হানাদার যুবকরা সেই সংঘর্ষের পরই গা ঢাকা দেয়। তাদের অনুসরণ করে পুলিশ জামসেদপুরের ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত যাদুগোড়া জংগলটি ঘিরে ফেলে। বন্য হস্তী অধ্যুষিত এই পাহাড়ী জংগলের ২০ বর্গ মাইলব্যাপী এলাকায় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়ে পুলিশ ৫২ জন নকশালপন্থী বলে কথিত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মেরী টেলর নামে একজন বৃটিশ যুবতী এবং কৃষ্ণা ঘোষ নামে একজন বাঙালী যুবতীও আছেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ

বলেছেন যে, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশায় একযোগে অভিযান চালাবার জন্য নকশালপন্থীরা এই জঙ্গলে তাদের হেড কোয়ার্টার করতে চেয়েছিল। এই জঙ্গলটি উপরোক্ত তিন রাজ্যের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

জঙ্গল তল্লাসীর ফলে যে সব নকশালপন্থী বলে কথিত যুবক ধরা পড়েছে, তাদের অধিকাংশের বয়স নাকি পঁচিশের নিচে।

ধৃত ব্যক্তিদের কাছে পাওয়া গেছে শক্তিশালী বাইনোকুলার, চার্ট, মানচিত্র, মাও ব্যাজ ও মাও পুস্তকাবলী, রাইফেল, সটগান, বুলেট, চিড়া, ছাতু, ডিনামাইট এবং বেশ কয়েক হাজার টাকার নোট।

মিস মেরী টেলর কি করে এই দলে ভিড়ে পড়েছেন তা নিয়ে জোর গবেষণা চলছে। ইনি নাকি লণ্ডনের এক স্কুলের শিক্ষিকা। জার্মানী, নেপাল, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, চীন, জাপান এবং আফ্রিকান দেশ ঘুরে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভদ্রমহিলা নাকি কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময় বেহালার পর্ণশ্রী এলাকায় তাঁকে কিছুকাল অবস্থান করতে দেখা যায়। পুলিশের সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সুশান্ত ওরফে গণ্টু ওরফে অমলেন্দু সেনের প্রতি ইনি প্রণয়াসক্ত। ইনি নাকি পাকিস্তানের পথে ভারতে এসেছেন। পুলিশের কাছে মিস টেলর বলেছেন যে, ইংল্যাণ্ডে নাকি নকশালবাড়ি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মিস টেলর যখন ধরা পড়েন, তখন তাঁর পরনে পুরুষের পোষাক (নীল জার্সি, কালো প্যাণ্ট, কালো চশমা এবং নকল গোঁফ) পরা ছিল। ধৃত অপর এক যুবক নাকি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন যে, টেলরের প্রতি তিনি প্রণয়াসক্ত। তিনিই অমলেন্দু সেন কিনা, তা জানা যায় নি। ধৃত কৃষ্ণ ঘোষও নাকি বেহালার বাসিন্দা। এই সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে পুলিশের মাধ্যমে। অন্য কোন সূত্রে এর সত্যাসত্য এখনও নির্ণয় করা যায় নি।

পুলিশের অপর এক সংবাদে প্রকাশ, যাদুগোড়া জঙ্গলে ধৃত যুবক-যুবতীরা নাকি কলকাতার বড় বড় ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এরা নাকি আসল নকশালপন্থী নয়। এই দলের নেতা বলে কথিত সুব্রত রায় (৩৫) নাকি পুলিশের কাছে বলেছেন যে, তাঁর দলের সঙ্গে সি-পি-আই-এর (এম-এল) কোন সম্পর্ক নেই। তবে নকশাল নেতা চারু মজুমদারের প্রতি তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। সুব্রত রায় অনন্ত সিংকে চেনেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। ঘাটশীলা এলাকায় শ্রীকাকুলামের মত একটি মুক্ত এলাকা গড়ে তোলাই নাকি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু [illegible] অসুবিধার জন্য তাঁদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে।

নকশাল, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, পুরুষের বেশে বৃটিশ যুবতী, প্রণয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মিলেমিশে এমন জোট পাকিয়ে গেছে যে, তার থেকে প্রকৃত ঘটনা খুঁজে বার করা বেশ কঠিন। তবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, কলকাতার একদল সশস্ত্র শিক্ষিত যুবক-যুবতী কোন একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিহার-বাঙলা-ওড়িশার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এক গভীর জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ধৃত সুব্রত রায় নাকি বলেছেন, সিংভূমের জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের ঘাঁটি করবার জন্য তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়ে গেল। ঘন বনভূমির দুর্গমতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের অভাব, দীর্ঘ ক্লান্তিকর পদযাত্রা এবং বিহার পুলিশের অতিরিক্ত সতর্কতাই এই ব্যর্থতার কারণ।

ঘাটশীলার যে এলাকায় প্রথম পুলিশের সঙ্গে এই নকশালদের সংঘর্ষ হয়েছিল, তার কাছেই রয়েছে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ইউরেনিয়াম কমপ্লেক্স। তাতে সমস্ত ব্যাপারটা আরও রহস্যজনক হয়ে উঠেছে।

০১।৫।৭০

সিংহল :

সিংহলের সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতালাভের পর সিংহলের সপ্তম পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ২৭শে মে।

এই নির্বাচনে শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট বিরাট সাফল্য লাভ করেছে। ক্ষমতাসীন দল য়ুনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির চরম বিপর্যয় ঘটেছে। ১৫১টি আসনের মধ্যে মাত্র ১৭টি আসন পেয়ে এই দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শ্রীমতী বন্দরনায়কের দল শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি ছাড়াও বিজয়ী যুক্তফ্রন্টে ট্রট্স্কিপন্থী লঙ্কা সমসমাজ পার্টি ও রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি রয়েছে।

সিংহল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের মোট ১৫৭ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত। নির্বাচিত ১৫১ জন সদস্যের মধ্যে শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি পেয়েছে ৯০টি আসন। অন্যান্য দলের আসনসংখ্যা হল : লঙ্কা সমসমাজ পার্টি—১৯, কমিউনিস্ট পার্টি—৬, য়ুনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি—১৭, ফেডারেল পার্টি—১৩, তামিল কংগ্রেস—৩। শ্রীমতী বন্দরনায়কের দল এককভাবেও পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। তিনি একাই সরকার গঠন করতে পারেন। কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি তা করবেন না। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মত তিনটি দলকে নিয়েই তিনি সরকার গঠন করবেন। গত পার্লামেন্টে তিনটি দলের মিলিত সদস্যসংখ্যা ছিল ৫৩, আর এবার তা বেড়ে হয়েছে ১১৪।

ডাডলি সেনানায়ক

নির্বাচনের ফলাফল দেখে দেশ ও বিদেশের অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ডাডলি সেনানায়কের

সিরিমাভো বন্দরনায়ক

দল য়ুনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করবে, নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা অধিকাংশই এই কথা বলেছিলেন। নির্বাচনের পরেও বলা হয়েছে, উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। সিংহলের প্রধান বৌদ্ধ পুরোহিত এমন প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিলেন যে, কোন দলই যদি জয়লাভ করতে না পারে তবে দুই প্রধান পক্ষ মিলে 'গ্র্যান্ড কোয়ালিশন' গঠন করুক। অবশ্যই দুই পক্ষই (য়ু-এন-পি সহ!) পুরোহিতের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। উভয়েরই ধারণা, তারা একক-ভাবে জয়লাভ করবে। কিন্তু দেখা গেল, এ প্রায় একতরফা নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রী সেনানায়ক কোন রকমে, আগের তুলনায় অনেক কম ভোট পেয়ে, তাঁর আসন রক্ষা করতে পেরেছেন। তবে তাঁর মন্ত্রিসভার অধিকাংশই পরাজিত হয়েছেন। স্পীকার পরাজিত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়ক আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো ১৯৬০ সালে শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির নেত্রী নির্বাচিত হন এবং বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হন। ১৯৬৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল ও জোট ডাডলি সেনা-নায়কের য়ুনাইটেড পার্টির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এবার বিরাট সাফল্য অর্জন করে শ্রীমতী সিরি-মাভো তাঁর পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন।

নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাডলি সেনানায়ক প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেছেন এবং গভর্নর-জেনারেল উইলিয়াম গোপালাওয়া সিরিমাভো বন্দর-নায়ককে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ ও মন্ত্রি-সভা গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সিরিমাভো প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেছেন।

ডাডলি সেনানায়কের নেতৃত্বে যে য়ুনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি ১৯৬৫ সালে বিরাট নির্বাচনী সাফল্য অর্জন করে এবং গত পাঁচ বৎসরে যারা সিংহলের রাজ-নীতিতে স্থায়িত্ব বজায় রেখেছে ও বিভিন্ন প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে, তারা এভাবে হেরে গেল কেন?

নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সিংহলের নির্বাচকমণ্ডলী এবার স্পষ্টভাবে বামপন্থার পক্ষে রায় দিয়েছে। য়ুনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি বা য়ু-এন-পি মোটামুটি কিছুটা মধ্যপন্থী ও দক্ষিণ-পন্থী দল। এদের রাজনীতি সিংহলের মানুষ সমর্থন করে নি।

সিরিমাভো বন্দরনায়কের দল বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ, প্রগতিশীল অর্থনীতি ও জোটনিরপেক্ষতার নীতিকে সমর্থন করেছে। দুই মার্কসবাদী দল লঙ্কা সমসমাজ পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি জোটবদ্ধ হয়ে প্রগতিশীল নীতি নিয়ে চলেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সম্প্রসারণ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত সকল প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তির পুনর্বিচার, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, চা ও রবার শিল্পের ওপর অধিকতর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, এই সব বক্তব্য রেখেছে যুক্তফ্রন্ট তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে। সেনানায়ক সরকার রেশনের চাল কমিয়ে দিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট এই রেশনের বরাদ্দ বাড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অনেকের মতে, এই রেশনের প্রশ্নটিই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে।

এই বৎসরই প্রথম সিংহলের নির্বাচনে ভোটারদের বয়স কমিয়ে ১৮ বৎসর করা

হয়েছে। ১৮ থেকে ... যুবকদের মধ্যে যারা ... অধিকাংশের সমর্থন ... কেবল বৌদ্ধ নয়, ... মুসলমান ও ক্রিশ্চিয়ানদেরও ব্যাপক অংশ যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করেছে। এতদিন ক্রিশ্চিয়ানদের প্রায় একচেটিয়া সমর্থন ছিল যু-এন-পি'র পেছনে।

ডাডলি সেনানায়কের সরকার বেকার সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই সরকারের আমলে দেশে বেকারের সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে।

সেনানায়ক শাসনের হাত থেকে সিংহলীরা মুক্তি চেয়েছে। তাই তারা যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করেছে।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবে, সবাই এই আশা করে। সিংহলের ইতিহাসে বামপন্থী সরকার এই প্রথম নয়। তবে কমিউনিস্ট পার্টির সরকারে যোগদান এই প্রথম।

যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়েছে। এর আগে সিংহলে আর কোন সরকার দুই-তৃতীয়াংশ আসন পায় নি। এর ফলে শ্রীমতী বন্দরনায়কের পক্ষে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে। সিংহলকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণার জন্য তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা কার্যকরী করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

এর আগে যখন শ্রীমতী বন্দরনায়ক সিংহলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন সিংহলের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। অবশ্য ডাডলি সেনানায়কের আমলে এই বন্ধুত্ব আরও সম্প্রসারিত হয়। এবারও শ্রীমতী বন্দরনায়ক ভারত-সিংহল মৈত্রী দৃঢ় করবেন, এমন আশা করা যায়। তবে সিংহলের সঙ্গে চীনের সম্পর্কও খুব ভাল। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির অনেক নেতার সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের ঘনিষ্ঠতা আছে। চীন-সিংহল বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে ভারতের সঙ্গে সিংহলের বাণিজ্য কমতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ

প্যারিসে ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধি দলের প্রাক্তন নেতা অ্যাভেরেল হ্যারিম্যান নিক্সন সরকারের

অ্যাভেরেল হ্যারিম্যান

ভিয়েতনাম ... তীব্র সমালোচনা করেছেন।

২৬শে মে মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ প্রতিনিধিসভার সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময় হ্যারিম্যান বলেন, রিচার্ড নিক্সনের সরকার ভিয়েতনামে যে নীতি অনুসরণ করছেন, তা শান্তির নীতি নয়। এর দ্বারা যুদ্ধকেই জিইয়ে রাখা হচ্ছে।

হ্যারিম্যান অবিলম্বে সকল মার্কিন সৈন্য ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করার দাবি জানান।

আলোচনার মাধ্যমে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে হ্যারিম্যান মত প্রকাশ করেন।

(৩০-৫-৭০)

সপ্তাহের বোঝা

//কৃত্তিবাস ওঝা//

গত সপ্তাহের রাজ্য রাজনীতিতে **অনেকগুলি ঘটনা** আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছে। যে **ঘটনাগুলির** ঢেউ **বেশ কিছুকাল** রাজ্য-রাজনীতিতে **চলবে। এই** ঘটনাগুলির মধ্যে প্রধান **হল শ্রীজ্যোতি** বসুর সঙ্গে শ্রীঅশোক ঘোষের **নিভৃত সাক্ষাৎকার।** এরই সঙ্গে আরও **একটা** তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, যেদিন **ময়দানে** আট পার্টির সমাবেশ থেকে **একের পর এক নেতারা ঘোষণা করছিলেন যে, সি পি এম রাজ্য-রাজনীতিতে কোণ-ঠাসা হচ্ছে, তাদের রাজনীতি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে, তখন সেই** আট পার্টি এবং ফাউ **হিসাবে আর এস পি** দলের জোটের **প্রার্থীদের** হারিয়ে দিয়ে নববারাকপুর **পৌরসভা নির্বাচনে** সি পি এম সবক'টি **আসন দখল করল।** এই দুটো ঘটনাই **হবে তাৎপর্যপূর্ণ** ঘটনা, এই ঘটনা দুটোর **অগ্র-পশ্চাৎ** একটু জানা বা বোঝা **দরকার।**

ফরোয়ার্ড ব্লক দলের নেতা শ্রীঅশোক **ঘোষ দীর্ঘদিন** অসুস্থ ছিলেন। রাম-**কৃষ্ণ মিশন** সেবাসদনে শ্রীঘোষের দেহে **অস্ত্রোপচারের** আগে একদিন শ্রীজ্যোতি **বসু** হাসপাতালে গেলেন- দীর্ঘ সময় **আলোচনা করে এলেন** শ্রীঘোষের সঙ্গে। **অস্ত্রোপচারের পরেই** আবার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ও হাসপাতালে গিয়ে শ্রীঘোষকে দেখে এলেন। এর পর **শ্রীঘোষ হাসপাতাল থেকে** চুঁচুড়ায় নিজের বাড়িতে গেলেন। তখন রাজ্যের জনৈক প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅশোক ঘোষকে **জানালেন** যে, শ্রীজ্যোতি বসু চুঁচুড়ায় আসছেন, সেই **সময়** শ্রীঘোষের সঙ্গে তিনি দেখা করতে আসতে পারেন। **শ্রীঘোষ তখন জানান** যে, তিনি দু'-চার দিনের মধ্যে **কলকাতা** যাচ্ছেন, তখনই শ্রীবসুর সঙ্গে **কথা** হবে। **শ্রীঘোষ** তাঁর টাংরার বাড়িতে আসবার পর একদিন **সন্ধ্যায় শ্রীজ্যোতি** বসু এলেন **শ্রীঅশোক ঘোষের কাছে.** সঙ্গে এলেন **শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরাম** চট্টোপাধ্যায় এক **অদ্ভুত রাজনীতির মায়ায় আবদ্ধ মানুষ। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের হৃদয়ের তিনটি ভাগ।**

এক ভাগ হল রিজার্ভ ফর দোদোদা, অর্থাৎ শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্যের জন্য, আর দু' ভাগ হল শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅশোক ঘোষের জন্য। জ্যোতিবাবু আর অশোকদা দু'জনের সঙ্গে শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কোন রাজনীতির চৌহদ্দিতে বাঁধা পড়ে না। যা হোক, শ্রীজ্যোতি বসু এসে দীর্ঘ সময় শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে কথা বললেন এবং চলে গেলেন। শ্রীঅশোক ঘোষ ও শ্রীজ্যোতি বসু ভেবেছিলেন, তাঁদের নিভৃত সাক্ষাৎকার বুঝি কাকপক্ষীর অগোচরে রয়ে যাবে। কিন্তু সাংবাদিকরা বুঝি শকুনেরও বাড়া। কোথা থেকে আর কিভাবে বলতে চাই না, লেখক স্বয়ং এবং আনন্দবাজার পত্রিকার অপর একজন সাংবাদিক ঠিক গন্ধ পেয়ে ধরলেন শ্রীঅশোক ঘোষকে। বলুন, কি কথা হল? কিন্তু শকুনকেও বুঝি মাঝে মাঝে হার মানাতে হয়। শ্রীঅশোক ঘোষ সেই দু'জন সাংবাদিককে হার মানালেন। তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন—এটা একেবারে ভুল সংবাদ। শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন পাল, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীঅতুল্য ঘোষ সহ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে সাংবাদিকদের একটা আস্থা আছে। সেটা হ'ল: এঁরা সাংবাদিকদের যতটা বলার সব সময় বলেন, সত্য কথা সোজা-ভাবে বলবার চেষ্টা করেন, সাধারণত অসত্য বলে বিভ্রান্ত করেন না। কিন্তু **এই ক্ষেত্রে শ্রীঅশোক ঘোষ আমাদের বিভ্রান্ত করলেন। পরে অবশ্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, এই সাক্ষাৎ-**কারটা এত ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি **করত** যে, তার তুলনা নেই। **তাই তিনি ও** শ্রীজ্যোতি বসু দু'জনেই **অন্তত কিছু-দিনের জন্য চেপে রাখতে চেয়েছিলেন।** এ ছাড়া এই **সাক্ষাৎকারে যে সব আলো-**চনা হয়েছে, সেটা **কোন রাজনৈতিক** তাৎপর্যের **ঘটনা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে** রাজ্যের দু' দলের **দু'জন নেতা একে** অপরের কাছে নিজের দলের **ভূমিকা ও কর্মসূচী** ব্যাখ্যা করেছিলেন, **দুই নেতার** কেউই কারও কাছে **নির্দিষ্ট কোন** প্রস্তাব রাখেন নি।

কিন্তু শ্রীঅশোক ঘোষ ও **শ্রীজ্যোতি** বসুর সেই চেষ্টা **ব্যর্থ করে দিলেন শ্রীবিশ্বনাথ** মুখোপাধ্যায়। **কৌশলের** রাজনীতিতে সি পি আই দলের **সঙ্গে** টেক্কা দেবার সাধ্য কারও **নেই।** শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী আর **শ্রীবিশ্বনাথ** মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্যাঁচের **রাজ-**নীতিতে পেরে উঠবার জুড়ি পশ্চিমবঙ্গে নেই। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় **সোজা** গিয়ে শ্রীঅশোক ঘোষকে **প্রশ্ন করলেন—** শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে **কি কথা হ'ল?** শ্রীঘোষ কোন কথা **বলবার আগে** শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় **শ্রীঘোষকে** জানিয়ে দিলেন, **শ্রীজ্যোতি বসু কখন** এসেছিলেন, কতক্ষণ **গাড়িতে কে ছিল,** এমন কি, গাড়ীখানা **কোন্ রং-এর ও** কোথায় ছিল, সব **বলে দিলেন। এর** পর শ্রীঅশোক ঘোষের **আর অস্বীকারের** উপায় রইল না। পরে **অবশ্য শ্রীবিশ্ব-**নাথ মুখোপাধ্যায় **শ্রীঘোষের বাড়ির** আশেপাশের কয়েকজনের **নাম করে বলে** দিলেন কারা তাঁকে **এই সংবাদ দিয়ে-**ছেন। **শ্রীমুখোপাধ্যায় কিন্তু এই গোপন** সাক্ষাতের কথা জেনেই **খুশি হলেন না,** এই সাক্ষাৎকারকে এক **অদ্ভুতভাবে রাজ-**নৈতিক অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ **করলেন। ময়দানের আট পার্টির** সভায় **শ্রীমুখো-**পাধ্যায় দু'টি ঘটনার কপিরাইট **দাখিল** করলেন, তার একটার **সঙ্গে আবার** লেখকের সম্পর্ক আছে। **লেখকের একটি** কপিরাইটের সঙ্গে **শ্রীঅশোক ঘোষ-শ্রীজ্যোতি বসুর গোপন সাক্ষাতের কাহি-**

রাইটকে অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে দিলেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। লেখকের কপিরাইট ছিল ছয় পার্টি সম্পর্কে উকুনের তুলনাটি।

২৩শে মে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দার্জিলিং মেলে নেমে সোজা সি পি আই অফিসে এসেছেন, আর আমি তখন বসে আছি। দীর্ঘ সময় আলোচনাকালে আমি আমার গত সপ্তাহের সাপ্তাহিক বসুমতীর লেখায় ছয় পার্টি ও আট পার্টি সম্পর্কে মাকড়সা ও উকুনের কি তুলনা করেছি—যে লেখা বুধবার প্রকাশিত হবে, সেই গল্পটাও করলাম। এই গল্পের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, উকুন কথাটার কপিরাইট হস্তান্তরের সম্ভাবনা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ছিল না। কারণ ময়দানের সভায় শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বক্তৃতা করবেন, এটা ঠিক ছিল এবং সংবাদপত্রে এই মর্মে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কপালগুণে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর ময়দানের সভায় ভাষণ দিলেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। আর শ্রীমুখোপাধ্যায় ভাষণ দিতে গিয়ে যেমন আমার উকুন প্রসঙ্গটি (যা ময়দানের সভার দিন তিন পরে সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হবার কথা) বলেছিলেন, সেই সঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছিলেন নাম না করে যে, সি পি এম দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু মাকড়সার আট পা'র একখানা পা ধরে কিভাবে সাধাসাধি করছেন।

ময়দানের সভায় শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅশোক ঘোষের গোপন সাক্ষাতের খবর বেরিয়ে যাওয়াতে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। যেমন শ্রীঅশোক ঘোষ তাঁর পার্টি ও পার্টির র‍্যাঙ্ক এ্যান্ড ফাইলের কাছে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন, আট পার্টির নেতাদের কাছে সন্দেহের কারণ হলেন, তেমনি ফরোয়ার্ড ব্লকের মতিগতি নিয়ে নানা চিন্তা-ভাবনা, গবেষণার কারণ ঘটল আট পার্টির মধ্যে। অবস্থা খারাপ হল আরও বেশি শ্রীজ্যোতি বসুর। শ্রীজ্যোতি বসুর মত নেতা কেন বার বার দেখা করেন ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে—এতে সি পি এম-এর র‍্যাঙ্ক এ্যান্ড ফাইলের মধ্যে শ্রীবসু সম্পর্কে ধারণা ভাল হয় না, দলের নেতারাও এই কাজটা সব সময় ভালো চোখে দেখেন না। আবার সম্প্রতি যে ছয় পার্টি নিয়ে জোট হয়েছে, তারাও এটাকে অনুমোদন করতে পারে না। তাই শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ময়দানে যখন শ্লেষ ইঙ্গিত করে বললেন—আট পার্টির ফ্রন্টকে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মাকড়সা বলছেন আর শ্রীজ্যোতি বসু সেই মাকড়সার এক পা ফরোয়ার্ড ব্লককে ধাসাধি করছেন, তাদের বাড়িতে গিয়ে তখন শ্রীবসুর পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। তাই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে শ্রীঅশোক ঘোষের দু'দিন দেখা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে।

এই খবর বেরুবার পর আট পার্টির ফ্রন্টের অনেক পার্টির মুখ তোলো হাঁড়ি হয়ে উঠল। অনেকে ভাব দেখালেন—এ কি কুলটার স্বভাব ফরোয়ার্ড ব্লকের? আমাদের সঙ্গে ঘর করে আবার পরপুরুষকে সঙ্গ দেওয়া—এই গোপন পিরীত আমরা কখনই হতে দেব না, সহ্য করব না। অবশ্য শুধু বাইরে নয়, ফরোয়ার্ড ব্লকের ভিতরেও এর চেয়ে অনেক কড়া আয়ান ঘোষেরা আছেন, তাঁদের ভগ্নী জটিলা-কুটিলা আছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? ফরোয়ার্ড ব্লককে নিয়ে আট পার্টির জোটের কি সত্যি কোন ভয়ের কারণ যদি থাকে, তবে সেটা কি? সত্যি কথা বলতে ফরোয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে একটু ভয় থাকা বোধ হয় আট পার্টির পক্ষে ভাল। কারণ, অতীতের কথা মনে রেখে অথবা মনে করে ফরোয়ার্ড ব্লক যদি কোন প্রতিশোধ নেয়, সেটা সম্পর্কে সতর্ক থাকা ভাল। যা হোক, আচ্ছা শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে দেখা করেছেন, অনেক প্রশ্ন আলোচনা করেছেন—এটা নিয়ে এত মাথা খারাপ করার কারণ কি? শ্রীজ্যোতি বসু যদি এই সাক্ষাৎকার শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ধাড়ার সঙ্গে করতেন, তাহলে কি অবস্থা একই হত? এই তো ১৯৬৯ সালে একদিন রাত চারটার সময় শ্রীসুশীল ধাড়া আর শ্রীসুকুমার রায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের বাসায় যে সেই দিনের মহা বিতর্কের স্বরাষ্ট্র দপ্তর শ্রীজ্যোতি বসুকে ছেড়ে দেবার কথা পাকা করে এসেছিলেন এবং সেইদিনই সি পি আই দলের শ্রীভাঙ্গে, শ্রীভূপেশ গুপ্ত কলকাতায় এসে বেলা ১১টায় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন সি পি এম নেতাদের সঙ্গে রফা হয়ে গেছে, আর এই অশোক ঘোষ আর শ্রীভক্তি মণ্ডল সেইদিন যে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সিঁড়িতে আমতলায় দাঁড়িয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন, সে কথা মনে আছে। যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে পরে এত হৈ-চৈ, সেই স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে সেই দিন বাংলা কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লককে পথে বসিয়ে দুই বড় ভাই রফা করেছিলেন। পরে অবশ্য সি পি আইকে মুখ্যমন্ত্রী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরটি প্রায় ঘুষ দিয়ে সি পি আই-এর মানভঞ্জন করেছিল। কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক—তার কথা মনে পড়ে নি অনেকের। অবশ্য সেদিনও ফরোয়ার্ড ব্লক সি পি এম-কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেবার পক্ষে ছিল না, আর পরেও তারা সবার আগে সামনে করে বলল—সি পি এম-কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়তে হবে। মন্ত্রিসভা থাকতে শ্রীজ্যোতি বসুর কাছে গিয়ে এই কথা বলবার মত সাহস আর কারও হয় নি, হয়েছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের। এই সেদিনেও শ্রীজ্যোতি বসু-শ্রীঅশোক ঘোষ সাক্ষাৎকারকালে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন, কই, স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়বার কথা আপনারা ছাড়া চোদ্দ পার্টির অন্য কেউ তো বললো না। সকলে বললে, আমরা কি করতাম দেখতেন। আপনারা সকলে মিলে যতটা বলেছিলেন, তারই ভিত্তিতে আমরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটি গঠনে সম্মত হয়েছিলাম, সময়ে সময়ে বসে, সকলের উপদেশ নিয়ে চলতে রাজী হয়েছিলাম। কই সেটাও তো পারলেন না আপনারা? শুধু এইখানেই নয়, এই তো সেদিন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার সব লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের সি পি আই অফিসে গেলেন। সি পি আই অফিস থেকে সুরু করে লোকসেবক সংঘ পর্যন্ত সব দলের সঙ্গে সরকার গড়া নিয়ে কথা বললেন, বললেন না শুধু ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে। সি পি এম ফরোয়ার্ড ব্লককে অচ্ছুৎ রেখে সব দলের সঙ্গে কথা বললো—ফরোয়ার্ড ব্লক ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। কই তখন তো কারও মনে ফরোয়ার্ড ব্লককে এমন অবজ্ঞা করা ঠিক নয়—সেইদিন তো কেউ বলে নি। একা একা কথা বলে কি হবে, আসুন সকলে মিলে অন্তত বড় দলগুলো মিলে কথা বলি। শেষ এইখানে নয়—মনে করলে আরও গূঢ়কথা বেরিয়ে পড়বে। এই যে সেদিন রাজ্যসভার নির্বাচনে কথার খেলাপ করে, চুক্তিভঙ্গ করে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীঅমর চক্রবর্তীকে হারানো হ'ল, ভোট উপচে পড়ল শ্রীভূপেশ গুপ্তের, জয়ী হল সি পি এম দলের দু'জন প্রার্থী, জয়ী হলেন নব কংগ্রেস প্রার্থী—কিন্তু হেরে গেলেন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীঅমর চক্রবর্তী। কাদের ভোট না পেয়ে হেরেছিলেন শ্রীঅমর চক্রবর্তী, আর কাদের ভোটে জয়ী হয়েছিলেন শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী আর শ্রীশশাঙ্ক সান্যাল? কাদের ভোট পেয়ে উপচে পড়েছিল শ্রীভূপেশ গুপ্তের ভোটের পাত্র। আজ সেই সব পার্টিরই সবচেয়ে বেশি ভাবনা ফরোয়ার্ড ব্লককে নিয়ে—কি জানি, ফরোয়ার্ড ব্লক তার ভারসাম্যের স্থান থেকে সরে না যায়।

(ক্রমশঃ)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ওস্তাদের রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে টুনটুনি সেইরকম বিকট চিৎকার করে উঠল, 'মা—সি!' তারপর রানীদির সঙ্গে হাউমাউ করে সেও এসে পড়ল ওস্তাদের পাশে। কালো দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'ই—স্!' রানীদি দ্রুত কোলে তুলে নিলেন ওস্তাদের মাথাটা। তারপর আবিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওগো তুমি কথা বলো—কথা বলো!'

যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বরে ওস্তাদ বললেন, 'কথা বলার আর কি সময় পাবো রানী?'

রানীদি কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'অমন বলো না—এ কি বলছ তুমি?'

'না রানী—গুলীটা বড় সাংঘাতিক জায়গায় লেগেছে', ওস্তাদ ধীরে ধীরে যন্ত্রণাকে যেন চাপতে চাপতে বলতে লাগলেন, 'অনেক অপরাধ করেছি আমি তোমার কাছে—জীবনের এই শেষ মুহূর্তে তুমি আমায় ক্ষমা কোরো—তুমি বিশ্বাস কোরো, আমি পাকেচক্রে এখানে এসে পড়েছিলুম'—

রানীদি ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, 'ওগো!'

এতক্ষণ আমি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। অভিভূতের মত চিৎকার করে বললাম, 'ডাক্তার মুখার্জী?'

হঠাৎ রানীদিকে দেখলাম আমার কথায় যেন তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন। তারপর সেই নির্মম ট্র্যাজেডীর মুখোমুখি বসেও রানীদি কেমন যেন ফুঁসে উঠে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

বুঝলাম রানীদির মনের কথা। ডাক্তারের কোন সাহায্যই তিনি চান না। তবু আমি বললাম, 'আহত মানুষটাকে তো বাঁচাতে হবে।'

'তার জন্য মেডিকেল কলেজ আছে।'

ওদিকে তখন বসন্তের বুকের ওপর চেপে বসেছে শংকর। ডাক্তার চিৎকার করে উঠলেন, 'শংকর!'

শংকর বলে উঠল, 'না, না ডাক্তারবাবু, —ওকে আমি খুন না করে কিছুতেই ছাড়ব না।'

সহসা দেখলাম ডাক্তার পকেটে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ দুটো যেন তাঁর কেমন কুঞ্চিত হয়ে গেল, চোখ দুটোও যেন জ্বলে উঠল একঝলক হিংস্র আগুনে। আমি বুঝলাম আবার সংকটময় মুহূর্ত সমাগতপ্রায়। একদিকে একটা মানুষ গুলীবিদ্ধ হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় জীবনের মুহূর্ত গুণছে—আরেকদিকে সেই রক্ত-স্রোতের সঙ্গে আবার এক নতুন রক্তাক্ত অধ্যায় অবতারণা আসন্ন হয়েছে। বলা

বাহুল্য সে রক্তস্রোত বইবে কার! কিন্তু ডাক্তার যদি পকেট থেকে তার পিস্তল বার করে শংকরকে গুলী করতে যায়, তবে আমার কি সেখানে কোন কর্তব্য নেই? অনেকবার আমি আমার রিভলবার এদের কাছে তুলে ধরেছি—আর আজ এই মুহূর্তে সঠিক কর্তব্যের সময় কি সেই অগ্নি-নালিকার মুখ গর্জন করে উঠবে না? আমি তো শংকরের মাকে আশ্বস্ত করে-ছিলাম, মায়াকে রক্ষা করার প্রশ্নে আন্তরিকভাবে সাড়াও দিয়েছিলাম। তবে—তবে ডাক্তার যখন প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আমিই বা প্রস্তুত হব না কেন?

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'ডাক্তার!'

ডাক্তার উন্মত্তের মত বোধ করি আমার দিকেই তাক করতে যাচ্ছিলেন তাঁর পিস্তলের লক্ষ্যটা, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আরেকটা হত্যাকাণ্ড বেঁচে গেল, জগদীশ একদল পুলিশকে নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। অনন্তর নিজে আঙুল দেখিয়ে সে বললে, ঐ—

আশ্চর্য আমি, আশ্চর্য ডাক্তার, [illegible]—এমন কি মৃত্যুপথযাত্রী ওস্তাদও।

জগদীশ—সেই টুনটুনিকে যে অনা-[illegible] আনতে বলতো, যে পুলিশের কাছে এজাহার করেছে, যার জন্যে মণ্টুকে গুলীতে আহত হতে হয়েছে, সেই জগদীশ। সে হঠাৎ এ সময়ে পুলিশ নিয়ে হাজির হল কি করে? পুলিশ দল মুহূর্তের মধ্যে বসন্তকে বেঁধে ফেলল। জগদীশ তারপর ডাক্তারকে দেখিয়ে বললে, 'এই আরেকজন—'

ডাক্তার বললে, 'আমি—আমি কি করেছি জগদীশ?'

আমার মনে তখন জগদীশের সম্পর্কে যে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, জগদীশ নিজেই তা প্রকাশ করে দিলে। সে বললে, 'সেই রাত—সেই রাতে আমি যে পাপ করেছি তা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। আমি মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছিলুম—অন্ধ-কারে চিনতে পারি নি শংকরের মাকে। তাকে আমি ক্লোরোফর্ম করেছিলুম। ভাগ্যি ওস্তাদ আমাকে তাকে বাড়ি দিয়ে আসতে বলেছিলেন, তাই আমার বাঁচোয়া—তাই আমি প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পেলুম আজ। শংকরের মা আমাকে সেদিন সব খুলে বলেছিলেন—'

ডাক্তারকে তখন পুলিশ দল বাঁধবার চেষ্টা করছিল।

জগদীশ বলে যেতে লাগল, 'সেদিন সেই দামী মেটালের ওয়াগন লুঠ করার দিনেই আমি দিতুম তোমাদের ফাঁসিয়ে। শংকরের বোনকে ছোঁ মেরে আনার জন্যে তোমরা মতলব করেছিলে, লুঠপাট শেষে ফেরার পথে শংকরকে তোমরা গুলী খাইয়ে মারবে—তাই আমাকে সন্ধ্যে রাতেই বসন্তর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা লেগে গিয়েছিল মণ্টুকে। আমি দুঃখু রাখার জায়গা পাই নি। তাই আজ যখন শিয়ালদায় গোলমাল আর সেখানে যখন বসন্ত নেই, তখন আমি যা অনুমান করেছিলুম, তাই হয়েছে। বস্তীতে এসে শংকরের মায়ের মুখে যখন ব্যাপারটা শুনলুম, তখন আমার আর কাজ সারতে একটুকু দেরী হয় নি—'

ডাক্তার হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় বললে, 'কিন্তু আমাকে তুমি এর মধ্যে কোথায় পেলে জগদীশ?'

'তোমাকে এখানে পাবো কেন, তুমি যে আরও উচ্চমার্গের লোক। কি করেছ তুমি জানো না? বসন্ত যখন ওস্তাদের শালীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, তখন তুমিই তো ওস্তাদকে মিথ্যে কলংকের ভয় দেখিয়েছিলে! মনে নেই সে কথা? তারপর পর্যন্ত লোকালয়ে ফিরে যেতে তাকে বারণ করে তুমি আর বসন্ত দুজনে মিলে

লোকটাকে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলে। বেচারা কি করবে, না ফিরে যেতে পারলেন ঘরে, না ত্যাগ করতে পারলেন সেই মহিলাকে। তারপর দুই সন্তানের জননী—তাকেও তোমরা স্থিরভাবে থাকতে দাও নি—নিজেদের পাপের কথা পাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই সেদিন তাকে সাইনাইড খাইয়ে খুন করেছো তুমি? তা ছাড়া ঘটনার কি এখানেই শেষ? আরও আছে—আছে বিরাট মহাভারত। বলো তো কি করেছিলে ওস্তাদের সতীসাধ্বী স্ত্রীকে একলা পেয়ে? নিজের স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন উনি, কিন্তু তোমরা কি না করতে গেছ ওঁর ওপরে? ঐ তো বসন্তর কপালে কাটা দাগ—তোমারও জামাটা খোলো, খুলে দ্যাখো। অবশ্য দেখতে তুমি পাবে না—কারণ দাগটা তোমার পিঠে।'

এবার রানীদি বলে উঠলেন, 'জগদীশ তুই থাম বাবা, তুই থাম—আমার এ চরম দুঃখের দিনে তুই আর ওগুলো স্মরণ করিয়ে দিস নি—'

'ওরা যাই করুক মা, আমি কিছুই বলতুম না', জগদীশ বলতে লাগল, 'মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে কেন? সীতার ওপর অত্যাচারের জন্যে কি স্বর্ণ-লঙ্কা ছারখার হয়ে যায় নি? তাই আমি এসব বরদাস্ত করতে পারি নি।'

ওস্তাদ ক্ষীণ এবং বিকৃতকণ্ঠে বললেন, 'বল, বল জগদীশ, তুই প্রাণ খুলে বল। আর দ্যাখ, তুই একবার আমার কাছে আয়। একটিবার আমি তোকে দেখি—দেখি এখানে এই অভিশপ্ত জগতেও মানুষ আছে রে—মানুষ আছে।'

জগদীশ ওস্তাদের কাছে গিয়ে বসল।

ওদিকে শিয়ালদার কাজ শেষ করে মাড়োয়ারী, কালোয়ার সায়েব আর ভানু এসে পড়ল। ঘরের দৃশ্য দেখে সকলেই অবাক। ভানু সবিস্ময়ে বলে উঠল, ব্যাপার কি।' একজন পুলিশ জগদীশকে দেখিয়ে বললে, 'পুছে লিজিয়ে।' বস্তীতেও বিরাখবর হয়ে গিয়েছিল। পিল পিল করে সব লোকজন এসেছে—সেই মেনকা, সেই পাঁচীর মা, মাধু, মায়া, মায়ার মা, আরও সব কত কে।

সকলের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে সহসা রানীদি প্রচণ্ড আর্তনাদের মধ্য বলে উঠলেন, 'ওগো আমি হারলুম, জিতলুম—একথা বলার মত যে আমার আর কেউ রইল না!' তারপর তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। সে কান্নায় যোগ দিলে টুনটুনি। মন্টু কখন গুড়িয়ে গুড়িয়ে এসেছিল, সেও চোখ মুছতে লাগল হাতের পাতায়। আর সেইও কাঁদল অল্প-বিস্তর। শুধু জল পড়ল না বুঝি আমার চোখে। কারণ জলে আমার চোখ ঝাপসা হলে এ সবের সাক্ষী থাকবে কে?

* * *

পরদিন শুধু একবার আমি দেখেছিলাম রানীদিকে। পোস্টমর্টেম থেকে লাস নিয়ে দাহকার্য শেষ করে আসার পর। সেই বিধবার বেশ রানীদির—সে যে কি মর্মান্তিক হতে পারে, এর আগে আমি তা যেন কোনদিন উপলব্ধি করি নি।

তারপর বহুদিন, বহু বৎসর কেটে গেছে। সব কথাই ফিকে হয়ে এসেছে মনে। হঠাৎ একদিন একখানা রেজিস্টার্ড ডাকে একখানা চিঠি এল। চিঠিটার বিরাট কলেবরের মধ্যে শুধু দুটি ছত্র আমার উদ্দেশে লেখা: 'বিজন, তুই আজকাল কাগজে লিখছিস দেখি—যদি এই চিঠিখানা পারিস তো কোনদিন তোর লেখার মধ্যে জুড়ে দিস। এতে আর যাই হোক, তোর রানীদির মত বিপর্যস্ত ভাগ্য নিয়ে গোটা দেশকে যাতে ভুগতে না হয়, তার জন্য মানুষ সচেষ্ট হবে। শেষে আমাকে স্নেহাশীষ জানিয়ে রানীদির স্বাক্ষর।

আজ লিখতে বসে সেই চিঠিখানা না উল্লেখ করলে হয়ত আমার লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই চিঠিখানা এখানে সন্নিবেশিত করলাম:

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীজওহরলাল নেহরু,

প্রথমেই আপনার কাছে আমার প্রার্থনা—আপনি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন আপনাকে চিঠি লিখে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করছি বলে। আমি একজন লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা নারী। ভাগ্যবিপর্যয়ে এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি, যা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য আমার সেই অভিশপ্ত জীবনের জন্য আমি কারোকে দায়ী করব না, করতে চাইও না আর সেজন্য আপনার কাছে আমি কোন প্রতীকার, সাহায্য বা করুণার প্রার্থী হয়েও দাঁড়াব না। তবু কেন আপনাকে এই চিঠি লিখছি

সে কথা হয়তো আপনার মনে উঠতে পারে। কিন্তু কি করব, কাকেই বা জানাবো, কেই-বা শুনবে আমার অন্তরের কথা। তাই বেছে নিলুম আপনাকে এবং আপনিই যখন নব-ভারতের জন্মলগ্নে একান্ত পুরোভাগে তখন আপনাকে জানাবার জন্যই মনটা আমার উন্মুখ হয়ে উঠল। জানি না, এ প্রগল্‌ভতাকে আপনি কি চোখে দেখবেন। তবে আমার শত অপরাধ সত্ত্বেও এ চিঠিকে আপনি মর্যাদা দেবেন, এ আশা আমি করবই।

আমি যে জায়গায় এসে পড়েছি, সেখানে কেন এসেছি, কি জন্য এসেছি, সে কথা আমার বক্তব্য নয়। যে কারণেই আমি এসে থাকি সেটা একান্তভাবে আমারই কথা। শুধুমাত্র একটা কথায় আমি আপনাকে নিবেদন করতে চাই—আমি এসেছিলুম আমার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে খোঁজ করতে। স্বামীকে আমি পেয়েওছি, কিন্তু সব চেয়ে যে বড় ট্র্যাজেডি এখানে ঘটেছে তা হচ্ছে তাকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারি নি। আর কেন পারি নি সে কথা বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে আমি এসে পড়েছি। এ পরিবেশ এমনই যে, একে যদি আমি অভিশপ্তময় বলে বর্ণনা করতে যাই, তবে তার সবটুকু প্রকাশ করতে পারলাম বলে আমার মনে হবে না। কেন না, এ পরিবেশ কখনই একদিনে সৃষ্টি হয় নি—দীর্ঘদিনের একটানা প্রবহমানা নদীর মত এর গতিপথে অজস্র বাঁক, কোথাও বা ভাঙন, কোথাও বিস্তীর্ণ চড়া, কোথাও বালুচর আবার কোথাও বা প্রশস্ততায় ব্যাপ্ত অথবা কোথাও সংকীর্ণ রেখা। তাই বলতে হয় এর পিছনে আছে অনেক দিনের অনেক ইতিহাস।

একটু পুরনো কথার উল্লেখ করব আমি। আমি তখন খুব ছোট। যুদ্ধের বাজার তখন। জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখেছি বেশি পয়সা দিলে পাওয়া যেত। সেই সময়েই প্রথম জানলুম ব্ল্যাক মার্কেট কাকে বলে। পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখলুম। সে কি ভয়াবহ ব্যাপার! হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ একটু ফ্যানের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন খুব ছোট হলেও ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলুম—তাই স্মৃতিপট থেকে সেগুলো মুছে যায় নি এবং পরবর্তী জীবনে কলেজে পড়তে গিয়ে বান্ধবীদের সঙ্গে বহুবার এ সবের অন্তর্নিহিত অর্থ খোঁজবারও চেষ্টা করেছি। সে সব দিনে চোখের সুমুখে যে সব জিনিস ফুটে উঠেছে তা আজ আপনাকে জানাতে আমার কোন অসুবিধা নেই। কারণ, আমিও স্বাধীন দেশের নাগরিক।
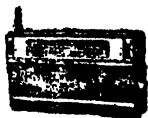
একদিকে দুশো বছরের পরাধীনতা, অন্যদিকে যুদ্ধ, ব্ল্যাক মার্কেট আর মন্বন্তর—আমাদের গোটা দেশ ও জাতির মধ্যে সৃষ্টি করেছিল দুরন্ত ক্ষয়রোগ। সে ক্ষয়রোগ আরও বেড়ে গেল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আর দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দরুণ। এর ওপর সম্ভবত সঠিকভাবে বৈষয়িক সম্পদের ব্যবহার আমাদের জানা ছিল না অথবা এও হতে পারে, সে পথ আমরা ধরতে পারি নি—তাই দুরন্ত ক্ষয়রোগের মুখে যুদ্ধ-বিরতিজনিত কর্মসংস্থানের অবলুপ্তি, দেশ বিভাগজনিত অসংখ্য মানুষের দায়-দায়িত্ব আমাদের বিপর্যস্ত করে দিলো। ফলে যাত্রা সুরু হল আমাদের অতিরিক্ত গুরুভার, হতাশা ও নজরের বাইরে গড়ে ওঠা রুচি নিয়ে। অবশ্য আমার কথা, সেখানে আপনার মত অনুভূতিপ্রবণ মানুষটি আজ আমাদের কর্ণধার।

কিন্তু, হ্যাঁ এই 'কিন্তু' দিয়েই আমাকে একটা কথা আপনার কাছে তুলে ধরতে হবে, কারণ আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। ছাত্রী-জীবনে এইটেই ছিল আমার সাবজেক্ট। তা ছাড়া আমি নারী বলেও যা আমার দেখা সহজ হয়েছে, অন্যের পক্ষে হয়তো তা সহজ হয় নি। অবশ্য কথাগুলি আমি লিখছি অনেক সংকোচ আর অনেক দ্বিধা নিয়ে—যদি ধৈর্যের ক্ষেত্রে এতে করে আমি আপনার সামান্যতমও ব্যাঘাত ঘটাই, তবে আপনি আপনার মহান্ হৃদয়ের স্নেহধারায় আমাকে অভিষিক্ত করে দেবেন, কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আমার বক্তব্যকে দূরে সরিয়ে দেবেন না। আপনি জানেন, রাজা রামমোহন একদিন সহমরণ প্রথা উঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বলতে দুঃখ হয়, বেদনায় বুক টনটন করে ওঠে—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পর, নজরুলের কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ হবার পর সে সহমরণ প্রথা আমরা যেন আবার চালু করে দিয়েছি। তবে পার্থক্য এই যে, এ সহমরণ সতীদের নয়—সাহিত্য ও সংস্কৃতির।

যুদ্ধের দিনগুলিতে, মন্বন্তরের দিন-গুলিতে এবং রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখদের অবর্তমানে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি একের পর এক আমি উল্টিয়েছি, কিন্তু কদাচিৎ-কদাচিৎ দু-একটি মূল্যবান রচনা ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে নি—যা চোখে পড়েছে তা সভ্যতাকে কোথাও উল্টোদিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা কিম্বা রুচিবিকারের প্রলাপ। বিজ্ঞাপন-কণ্টকিত এ পত্র-পত্রিকাগুলির গোত্র কি, সম্ভবত তা নির্ণয় করা আপনার পক্ষে কঠিন নয়।

এখন কথা উঠতে পারে, বর্তমানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে খাতেই প্রবাহিত হোক না কেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের সৃষ্টিও কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল? তাঁদের মধ্যে কি সর্বকালের কোন সত্য বাণী নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাঁদের মহান্ সৃষ্টিকে গ্রহণ করার মত মানুষের মন কই? সে মন তো যুদ্ধ আর মন্বন্তরে, দাঙ্গায় আর দেশ বিভাগে, হতাশায় আর রুচিবিকারে শেষ হয়ে গেছে। অবশ্য হাস্যকর হলেও কথাটা না উল্লেখ করে উপায় নেই যে—এঁদের রচনার প্রচার এবং প্রসার দুই-ই বেড়েছে। কিন্তু নবজাত সভ্যতার আমলে এক ঘর-সাজানো ছাড়া সেগুলিকে অনুশীলন করেন কজন, তার হিসাব কি কেউ নিয়ে দেখেছেন?

তাই যে ক্ষয়রোগ জাতির জীবনে বাসা বেঁধেছিল তার কোন চিকিৎসা হল না। আপনি কতবার নিজেই বলেছেন, সমাজে শোষণ ও মুনাফা রয়েছে বলে আমাদের দারিদ্র্যও রয়ে গেছে। শোষণ ও মুনাফা রাজনীতির কথা। আমি সেদিকে যেতে চাই না আর যাবার মত আমার শক্তিও নেই। কিন্তু রাজনীতির অভ্রভেদী মিনারে বসে যদি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি না পড়ে অথবা তাকে যদি অস্বীকার করা হয়, তবে দেশে মানুষের মানসিক ঐশ্বর্য গড়ে উঠবে কি করে?

এই মানসিক ঐশ্বর্য থেকে আজ আমরা যে-কোন কারণেই হোক্ বঞ্চিত হয়েছি। আর তার জন্য আমরা পেয়েছি 'কোয়ানটিটি'—পাই নি 'কোয়ালিটি'।

আপনি আমাদের জাতীয় জীবনের কর্ণ-ধার। আপনাকেও আজ কোয়ালিটির অভাব বোধ করতে হচ্ছে। তবু যতটুকু কোয়ালিটি আমাদের জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আপনি পেয়েছিলেন, তাকেও আজ ঠিক রাখতে পারছেন না। দুশো বছরের পরাধীন-তায় গড়ে ওঠা অমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, সমাজের উপরতলায় সীমাহীন লোভ আর ক্ষয়-রোগাক্রান্ত মানুষের ভিড় আজ চারিদিকে প্রকট হয়ে উঠেছে।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা আজ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

[illegible] আপনার সঙ্গে [illegible] তাদের [illegible] কিংবা। তবে আমার [illegible] হয়েছে, একদিন তারা ভাল থাকলেও আজ আর ভাল নেই। তাদের অনেকেই আজ আদর্শভ্রষ্ট এবং তারা আজ বড় বড় অফিসার, ব্যবসায়ী, এমন কি সমাজবিরোধীদেরও সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার এ-কথায় স্বতঃই আপনার মনে দুঃখ বা ক্ষোভের উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমি এক বর্ণও মিথ্যা কথা বলছি না। অবশ্য আদর্শবান মানুষ আছেন। তাঁদের আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু সে মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম।

যে পরিবেশের কথা আমি আপনাকে আমার স্বামী প্রসঙ্গে বলেছি, সেই পরিবেশ আজ এঁরাই সৃষ্টি করেছেন। আমি নারী, ঐশ্বর্যও আমার আছে। ঐশ্বর্য আছে বলেই এই পরিবেশে এসে আমি স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারছি। কিন্তু যাদের কথা আমি বলছিলাম তারা সব দল বেঁধে লোভে লোভে এখানে এসে জমে।

মন্ত্রী পদস্থ পুলিশ অফিসার, রেলের হোমরা-চোমরা, বড় বড় ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারী, কালোবাজার, ওয়াগন ব্রেকার, আফিম-স্মাগলার, ছিনতাই, পকেটমার, নারী-নির্যাতনকারী, জুয়াড়ী প্রভৃতি কেউই বাদ যায় না।

এসব কথা বেশি বাড়িয়ে আপনার মনে যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে চাই না আমি। অহেতুক কথা বলাও আমার অভ্যাস নেই। তবে যে কথা এর মধ্যে দিয়ে আমি আপনাকে বলতে চাইছি, তা এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনি ধরে থাকতে পারবেন। আদর্শভ্রষ্ট হয়েছেন আপনার অনুগামী হবেন বলে যাঁরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

একদিকে দেশে কোয়ালিটি নেই, আরেক-দিকে এই আদর্শভ্রষ্টতা—এই দুয়ে মিলে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, আমি সেই পরিবেশের কথাই বলতে চেয়েছি। এই পরিবেশই দায়ী আমার ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য। জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে। তবে একথা ঠিক, আমার ঈপ্সিত পথে আমাকে চলতেই হবে। কিন্তু এইটুকুই আপনার কাছে আমার নিবেদন নয়—আমার নিবেদন আপনার কাছে আরও কিছু। আমার ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আমি যা দেখছি, ঠিক এইটাই যদি আগামী দিনে জাতির ভাগ্য হয়ে যায়, তাহলে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কিছু আর থাকবে না। যদি আগামী দিনে সমাজবিরোধী, ছিনতাই পার্টি, ওয়াগন ব্রেকার, নারী-নির্যাতনকারী, বোমা, বন্দুক, নরহত্যাকারী প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তবে সে হবে আমাদের জাতীয় অভি-শাপের কথা, জাতীয় দুর্দিনের কথা। তাই আমি যাতে এখনই আপনি এসব বন্ধ করতে সচেষ্ট হন তার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানালুম। আমার ভাগ্যে যা আছে, তা আছেই সেজন্য ভাবি না।

পরিশেষে পুনরায় আপনার মহান্ হৃদয়ের কাছে আমার নিবেদন, যদি এই লেখার মধ্যে আপনি কোন আঘাত পান বা আপনাকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকি, তাহলে সে ধৃষ্টতা আপনি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। ইতি

বিনীতা—
রানী গাঙ্গুলী

রানীদির কথা আমি শেষ পর্যন্ত রেখেছিলাম, জানি না তিনি সে খবর পেয়েছিলেন কি-না।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ এগারো ॥

"Let every class-conscious worker, remember what great tasks of the people's struggle now rest on his shoulders. Let him not forget that he represents the needs and the interests of the entire peasantry as well, of the entire mass of the toiling and exploited, of the entire people, against the enemy of the entire people"—

উনিশ শো পাঁচ সালে লেনিনের ডাক। তারপর ৯ই জানুয়ারীর রক্তস্নান। সেই রক্ত দিয়ে বিপ্লবকে মুছে ফেলা যায় নি। দমন, পীড়ন, নির্বাসন, নির্যাতন যত বেড়েছে—শক্তি বেড়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে। ঝড় উতরোল হয়েছে যত বেশি, বজ্র গর্জেছে, সাগর ক্ষেপেছে—গোর্কী দেখেছেন ঝড়ের পাখিরা ততই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ভেতরে।

ক্রমে ক্রমে আরো মিলেছে, আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সব দ্বিধা-সংশয়-বিভ্রান্তিগুলো পার হয়েছে একে একে।

সমস্ত কৃষকের স্বার্থে, সব শোষিত শ্রমিকের প্রয়োজনে, সমগ্র জনসাধারণের জন্যে, সমস্ত মানুষের সব শত্রুর বিরুদ্ধে। বিপ্লবের নিয়মই তাই। অন্তত প্রবীর তার সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে এই পর্যন্ত বুঝেছিল।

অথচ কী আশ্চর্য এই ভারতবর্ষের ইতিহাস! এই বাংলা দেশের!

যখন মনে হয়েছিল সমাজতন্ত্রবাদী শক্তিগুলো সব এক হয়েছে, হাতে হাত মিলিয়ে, পথের নিশানা নিশ্চিত করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন চাকাটা ঠিক উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। শ্রমিকের সংহতি ভাঙছে, কৃষক কৃষকের বিরুদ্ধে হানাহানিতে নেমেছে, ছাত্র, মধ্যবিত্তের সংগ্রামী শক্তি এ ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। লেনিনের শিক্ষার সঙ্গে কোথায় মেলে? অত্যাশ্চর্য আজকের এই বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব!

প্রত্যেকেরই উত্তর অতি সহজ এবং সোচ্চার। আমরাই মাত্র নির্ভেজাল বিশুদ্ধ বিপ্লবী। বাকী সবাই প্রতিক্রিয়াশীল, ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশী গুপ্তচর! সুতরাং হাতে-কলমে এবং মুখে পরস্পরের মুণ্ডপাতই বিপ্লবকে এগিয়ে আনবার রাজপথ—অটো বান্!

আনন্দরা অট্টহাস্য করে বলবে, 'দুই আর দুয়ে চার হয়—পার্লামেণ্টারী পলিটিক্সে এ ছাড়া কী হবে! গদি পেতে গেলে ভোট চাই—অতএব সমর্থক বাড়াতে হবে। দলটাই যখন প্রথম কথা, তখন বিপ্লবকে ময়দানের বক্তৃতার জন্যে শিকের তুলে রাখলেই চলে। এর মধ্যে ভাঙো ইউনিয়ন—দু' মণ ধান আর চার ছটাক জমির ভাগাভাগি নিয়ে মাথা ভাঙাভাঙি শুরু করো কৃষকদের ভেতরে। এসব ধোঁকাবাজির দিন ফুরিয়েছে—ধরো অস্ত্র, নিপাত করো শত্রু—আনো বিপ্লব।'

ভালো কথা। কিন্তু অব্জেক্টিভ্ কন্ডিশান?

ধরো, কোথাও কিছু তরুণ-বিপ্লবী তাদের দু'জন 'শ্রেণী শত্রুকে খতম' করল। তারপর গা-ঢাকা দিল তারা। তারও পরে এল কৃষকের ওপর পুলিশের পীড়ন। সেই পীড়নের প্রতিক্রিয়া কী? কৃষক আরো একতাবদ্ধ হল, বিপ্লবের সম্ভাবনা তীব্র হল আরো? কিংবা জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হল, পেছিয়ে গেল, যেখানে ঘাঁটি তৈরি হচ্ছিল মনে হয়,—সেখানে পায়ের নিচে মাটিটাই পেছল হয়ে গেল?

বাইরে থেকে গিয়ে ক্ষুধিত মানুষকে নাড়া দেওয়া কঠিন নয়—ক্রোধের পটভূমি তার তো আছেই। কিন্তু সে ক্রোধের আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখবার—তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার—তাকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে অনেক বিস্তৃত আয়োজনের দরকার নেই? সে অবস্থা তৈরি আছে তো?

অথবা, আনন্দরা তা তৈরি করছে। আর ইন্ধন তো দেশজুড়ে আছেই—কয়েকটা মশালই দাবানল জ্বালিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। যুদ্ধ শুরু হলে ড্রাগনের বীজের মতো মাটি থেকেই হয়তো সৈনিক জন্ম নেয়।

না—কিছু ভাবা যাচ্ছে না। প্রবীর কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

"পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায় আজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, বাংলা কংগ্রেসের যে তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন—"

পাশের বাড়ির রেডিয়ো। খবর বলছে। আবার বিস্বাদ বিরক্তির তরঙ্গ একটা।

প্রবীর উঠে তৎক্ষণাৎ জানলাটা বন্ধ করে দিলে। রেডিয়োর আওয়াজ একটু কমে গেল বটে—কিন্তু শব্দভেদী বাণের মতো ঠিক কানে আসছে। না শোনবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করলে যেন আরো বেশি করে শোনা যায়—মনকে যতই সরিয়ে নেবার চেষ্টা চলে, ততই সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

নিজের কপালটা টিপে ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর হঠাৎ একটা চীৎকার করে ওঠবার ইচ্ছে জাগল তার। আমরা—এই প্রবীর ব্যানার্জিরা—আমাদের মতো আরো অসংখ্য অগণিত যারা—আমাদের শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষের মন্ত্রে বিষিয়ে

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

তুলছ কেন? তোমরা যারা নেতা—যারা ইতিহাসের পাঠ নিয়েছ—যারা ভবিষ্যৎকে অনেক স্বচ্ছ, অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দেখতে পাও, তোমরা কেন আমাদের নিশ্চিত, কোনো গঠনমূলক প্রোগ্রাম দিচ্ছ না? এই যে আমরা চোখ বেঁধে কানামাছি খেলছি, এতে কী লাভ, কার লাভ?

অদ্ভুত অবস্থা একটা। এই সেদিনও এক হয়ে—এক দাবিতে, ইউনিয়নের স্বার্থে দাঁড়িয়েছি আমরা। অথচ আজ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে এ-ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছি। আমরা তো কেউ দালাল হয়ে যাই নি—মালিকের কাছে গোপন দাসখৎ লিখে দিয়ে আন্দোলনকে ধ্বংস করবার উদ্যোগ নিই নি। তবু আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি—সেদিনের একান্ত বন্ধুর সঙ্গে আজ মুখ দেখাদেখি বন্ধ! চীন আর সোভিয়েটের মধ্যে নীতিগত প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিতে পারে—তাই বলে আমাদের স্বার্থও বদলে গেল?

"Of the entire people, against the enemy of the entire people—" এই সেই একতার নমুনা? কোন্ পাকে ঘুরছে বিপ্লবের চাকা?

দুর কাগো—নেতারাই বুঝবেন। ভাবতে গেলে মাথা ঘুরতে থাকে। তবু বিভ্রান্ত বুদ্ধির প্রশ্ন থামে না: আমরা এগোচ্ছি, না পিছিয়ে যাচ্ছি? আর এই-ই যদি, তা হলে পার্লামেন্টারী রাজনীতির পথ নেবার কী দরকার ছিল? সোজা নামলেই হত সংগ্রামে তা হলে অধৈর্য, ক্রুদ্ধ আনন্দরা এমন করে ঝড়ের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে পড়ত না।

অফিস ক্যান্টিনে শৈলেশকে বলেছিল, 'একটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি করা যায় না?'

শৈলেশ সপ্রতিভ ভাবে আধপোড়া চারমিনার ধরিয়ে আধ খাওয়া চায়ের পেয়ালাটা সামনে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বসে ছিল। মাথায় তেল দেয় না—ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলগুলোতে এখানে-ওখানে ধূসের ছায়া। অসময়েই পাক ধরেছে। বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রে দু'বার জেল খেটেছে। মুখে, কপালে অনেকগুলো ক্লান্ত রেখা।

মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তাকালো শৈলেশ।

'কিসের কো-অর্ডিনেশন?'

'অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার পলিটিক্যাল ডিফারেন্সেস—আমাদের সাধারণ স্বার্থে—'

'অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব?'

'পার্টি থেকে আর কোনো জিনিসকে আজ বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।'

সেই এক কথা। পার্টি—পার্টি। প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, পাড়ায় যদি ডাকাত পড়ে, তা হলেও পার্টি লীডারশিপের কাছ থেকে ডিকটেশন আনতে হবে যে, অন্য দলের সঙ্গে এক হয়ে আমরা ডাকাত তাড়াতে পারি কি না?'

শৈলেশের ঠোঁটের ওপর দিয়ে আলতোভাবে একটুখানি সিনিক হাসি বয়ে গেল। চুরুটটাকে ধরাতে ধরাতে বললে, 'ফল্‌স্ অ্যানালজী।'

'মোটেই না। তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ। দলীয় চিন্তায় তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনে কেন আমরা কমন প্ল্যাটফর্ম গড়তে পারব না?'

শৈলেশ উত্তরে ইংরিজী একটি বচন আওড়ালো। পূর্ব পূর্ব—পশ্চিম পশ্চিম। দুই মেরু কখনো একসঙ্গে মিলতে পারে না।

'রুডিয়ার্ড কিপলিং? শেষকালে ওই ডাই হার্ড ইম্পিরিয়ালিস্টকে কোট্ করতে হল?'

আবার হাসল শৈলেশ: 'চা খাবে?'

তার মানে আলোচনা করতে চায় না। এখন যেন কোনোমতে জাত বাঁচিয়ে চলা। রাজনীতির মধ্যেও কাস্ট-সিস্টেম। আমরাই বিপ্লবের সঠিক পথ ধরেছি। বাকীরা অচ্ছুৎ।

তার মানে, ফ্রন্ট গড়াটা ট্যাকটিক্যাল। আমরা তখনই জানতুম, তেলে আর জলে মিশ খায় না।

অথচ, কতবড়ো সুযোগটা এসে গিয়েছিল। প্রমাণ করবার সময় এসেছিল—

টুলু এসে ঘরে ঢুকল—থেমে গেল বিরক্তিকর ভাবনাগুলো। ভালোই হল। এসব ভাবতে গেলেই যন্ত্রণা। ঘাড়ের পেছনে শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে—তারপর মাথার ভেতরে যেন একতাল লোহা জমাট বাঁধে এসে।

টুলু এসে বসে পড়ল চেয়ারে। প্রবীর তাকালো তার দিকে।

'এতক্ষণে ছুটি মিলল?'

ক্লান্তভাবে টুলু বললে, 'হ্যাঁ। পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার আগে বেরুনো যায় না অফিস থেকে।'

কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রবীর চেয়ে রইল টুলুর দিকে। দিদির হাতযশ আছে বলতে হবে। কী কৃতা সে টুলুর কাছে দিয়েছে, তা টুলুই জানে। তারপর থেকেই হঠাৎ যেন বদলে গেছে ছেলেটা। আজ তিন-চারদিন ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে মনীশদার সঙ্গে—হাইকোর্ট পাড়ায়। মনীশদার কোন্ বন্ধুর অফিসে কেরানীর কাজ শিখছে।

দিদি সম্পর্কে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধ করল প্রবীর। টুলু হঠাৎ সব ছেড়ে-ছুড়ে এরকম লক্ষ্মী ছেলে হয়ে উঠবে—এ কল্পনাই করা যায় না। দিদি যে ম্যাজিক করতে পারে, এখবরটা আগে জানা ছিল না তার।

'খুব বোরিং লাগে, না?'

টুলু শ্রান্ত রেখায় হাসল: 'কী করা যায়, দাদা। কাজ তো করতেই হবে।'

টুলুর দিকে তাকিয়ে এখন তার অতীতটাকে মনে আসে না—পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এই যে কতগুলো বাজে ছোকরার সঙ্গে সে ভিড়ে পড়েছিল, এ কথাটাও ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। বাস্তবিক - এত বুদ্ধি ছিল, এত মাথা ছিল তার পড়াশোনায়! আজ নথিপত্রের স্তূপে দম-আটকানো হাইকোর্ট পাড়ার এক অফিস ঘরে—দেড়শো-দুশো টাকার ভবিষ্যৎ সামনে রেখে সে ফাইল গোছাচ্ছে—ভাবতেই ভালো লাগে না।

কথাটা টুলু নিজেই তুলল।

'পড়াশোনাটা আবার শুরু করলে কেমন হয় দাদা?'

'আমি তো লক্ষবার বলেছি তোকে। তুই-ই তো পাল্টা তর্ক করেছিলি—বলছিলি, কী হবে, চাকরি জুটবে না। তোর মাথায় ব্যবসার প্ল্যান ঘুরছিল।'

'না—একটা কাজে যখন ঢুকেইছি—' টুলু নিশ্বাস ফেলল: 'তখন অন্তত স্কুল-ফাইন্যালটাও পাশ না করলে বেয়ারা-গিরির ওপরে আর উঠতে পারব না।'

'সে তো নিশ্চয়। কিন্তু প্রাইভেটে ছাড়া—'

'এই বয়সে কি আর স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়, দাদা? আমার চাইতে ছোট টীচার পড়াতে আসবে যে। একটা কোচিং ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাব সন্ধ্যের পর।'

'কিন্তু এতক্ষণ অফিস করে—'

'সে হয়ে যাবে, দাদা। একটু কষ্ট করতেই হবে কয়েক মাস। ভালো একটা কোচিং-এর জায়গা আছে গড়িয়াহাটের মোড়ে। অফিস-ফেরৎ সেখানে পড়াশোনা করে বাড়ি ফিরব।'

'খুব কষ্ট হবে।'

ও কিছু না। থেকে নেব রাস্তায়।'

সত্যিই দিদি ম্যাজিক জানে, প্রবীর ভাবছিল। হঠাৎ যেন প্রাণপণে ভালো হওয়ার চেষ্টা করছে টুলু। হয়তো টুলুর মতো যারা, এই রকমই তাদের স্বভাব। যত জোরে বাইরের দিকে ছুটে গিয়েছিল, তত জোরেই ছুটে আসতে চাইছে ভেতর দিকে। প্রবীর এত সহজে অভ্যাস বদলাতে পারত না—অনেক সময় লাগত তার। কিন্তু একটা খট্‌কা তবুও লেগে রইল কোথাও। যারা এত সহজে ফিরে আসে, তাদের বেরিয়ে যাওয়ার পথও কি—

ভাবছিল—টুলুও। বিশ্রী লেগেছে হাজতে যাওয়াটা। বিশ্রী লেগেছে, তার জন্যে দাদার তদ্বির করে বেড়ানো—মুরারি হালদারের কাছে যাওয়া, আসবার সময় দারোগার কাছে প্রায় নাকে-কাণে খৎ দিয়ে আসা; বিশ্রী লেগেছে দিদির কাছে খবর পৌঁছোনো; রতন আর ফণীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে—যে পথে চলেছে তার শেষে পৌঁছে হয় তাকে ওয়াগন ভাঙতে হবে নইলে ফণীদের সঙ্গে নেমে পড়তে হবে ছিনতাইয়ের কাজে—শুধু মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি মারলেই চলবে না। তারপর স্বপ্নাকে মনে হলে—

হয়তো তবুও রাজী হত না। কিন্তু টিনটিন! যাকে দিদি নিজের হাতে সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করছে—সে! ভাবতেও বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে ওঠে। কী বলতে চায় টিনটিন? এ সব লেখাপড়া—গান-বাজনা—বাড়ির এই জীবন কিছুই তার ভালো লাগে না? তার অ্যাডভেঞ্চার চাই—ছোট মামার মতো সে একবার জেলে গিয়ে স্বাদ বদলাতে চায়?

'ডু ইয়ু নো—ইটস সো বোরিং—সো বোরিং।'

টিনটিনকে সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি। কিন্তু যেটুকু বুঝেছে, তা থেকে অন্তত একটা জিনিস গোপন নেই। দিদি যতই উপদেশ দিক, টিনটিনের কাছে সেই ছোট মামাই এখন নায়ক হয়ে উঠেছে—যার জন্যে ভদ্র সমাজে দিদির মুখ দেখানো শক্ত হয়ে উঠেছে।

টিনটিনকে মনে হলেই আবার তার শিরদাঁড়া বয়ে যেন একটা বরফের স্রোত নামে। ডন কে—তারা কারা, সে জানে না। কিন্তু টিনটিন যে পথে যেতে চাইছে, সেটা কোন্ পথ? আর সেই পথ দেখাচ্ছে সে নিজেও?

ভাগনীকে তার দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। কিন্তু ভাগনীর আয়নায় যেন নিজের চেহারাটাই ফুটে উঠেছে তার। এর পরে টিনটিন কী জানতে চাইবে তার কাছে? কেমন করে ছোরা বসাতে হয়? কিভাবে বোমা তৈরী করে? তারও পরে বলবে তোমার বন্ধু রতন, ফণী, কার্তিকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও?

টুলুর গলা দিয়ে সেদিন কাটলেট নামতে চাইছিল না। বলেছিল, 'তাই হবে দিদি, আমি কাল থেকে মনীশদার সঙ্গেই বেরুব।'

হাঁ, আমাকে বদলাতে হবে। শুধু আমি নিজেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছি না—আমার অশুভ ছায়া পড়ছে আশপাশে। আমি নিজেও টের পাই নি—কখন আমি ছেলেমানুষ টিনটিনকেও বিষিয়ে তুলছি।

এই ভালো। সকাল ন'টায় বেরিয়ে যাওয়া। ছ'টায় বেরিয়ে কোচিং ক্লাস। সাড়ে আটটায় বাড়ী ফেরা। খেয়েদেয়ে যতক্ষণ পারি পড়াশুনো। সময়টা একেবারে নিশ্ছিদ্র, জমাট। কোথাও ফাঁক নেই এতটুকুও। রতন, প্রমোদ, ফণী, কার্তিক—কারো কথা মনেও পড়বে না তখন।

টুলু চোখ তুলল।

'স্কুল ফাইন্যালের পরে তো আরো পড়তে পারি, দাদা।'

'নিশ্চয়। বাধা কিসের?'

'কলেজে আর ভর্তি হব না—সায়েন্স পড়াও চলবে না। আমি তো এইভাবেই বি-এ পর্যন্ত পাশ করতে পারি, দাদা।'

'এম-এও পাশ করতে পারিস—' প্রবীর হাসল: 'তোর তো আমার মতো অর্ডিনারী ব্রেন নয়, কোথাও আটকাবে না। রাত্রে 'ল কলেজ হয়—যদি এগিয়ে যাস, নিজেই অ্যাটর্নি হতে পারবি একদিন।'

টুলু হাসল: 'সে স্বপ্ন দেখা দাদা। অনেক দেরী হয়ে গেছে এখন।'

কিছুই দেরী হয় নি। জীবনে কোথাও কখনো দেরী হয় না। তোর চাইতেও বেশি বয়সে পড়াশুনো ধরে অনেকে ডক্টরেট পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।'

টুলু চুপ করে রইল। হঠাৎ কতকগুলো রঙিন ছবি ঝলমল করছে তার সামনে। যেন নেশা ধরে যাচ্ছে। এতদিন চলেছিল একটা ঝোঁকের মাথায়, আজ আবার আর একটা দিক রূপকথার মতো হাতছানি দিচ্ছে তাকে। 'আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি—দারুণ ভালো হয়ে যাচ্ছি—' এই উত্তেজনা, এই রোমাঞ্চ ধক্ ধক্ করতে লাগল তার বুকের মধ্যে।

এই উত্তেজনার স্বাদে মগ্ন হয়ে যেতে যেতে টুলুর মনে হল, আমি সংকল্পকে আরো কঠিন করতে পারি, ভালো হওয়ার জন্যে আরো বেশি জীবনপণ সাধনা করতে পারি। এখন আমার অসাধ্য আর কিছুই নেই। বাবা আমার ওপরে অনেক ভরসা রাখতেন। স্বপ্না বলেছিল—

'দাদা!'

'কি রে?'

'এই সঙ্গে সপ্তাহে দুদিন শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিংও শেখা যায় না।'

প্রবীর হাসল: 'ব্যস্ত হাচ্ছস কেন—সব হবে। কিন্তু একসঙ্গে এত বেশি চাপ সইবে না।'

বাইরের দরজায় কড়া নড়ল। বোঝা গেল, মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে দিলেন। আর তার পরেই শোনা গেল আশ্চর্য হয়ে মা বলছেন: 'আপনি?'

'হাঁ, হঠাৎ চলে এলুম—অনেকদিন তো দেখা হয় না। তা সব খবর ভালো?'

এই ঘরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। চেয়ারের ওপর নড়ে উঠল টুলু।

ওই ভরা গভীর গলার স্বর চিনতে ভুল হয় না। শিবপ্রসাদ ঘোষাল এসেছেন। স্বপ্নার বাবা।

মা বলছিলেন, 'হাঁ, চলছে একরকম। কিন্তু খোঁজ-খবর তো নেন না।'

'কী করে আর নেব, আমি তো বাজে মানুষ বৌমা। তা ছাড়া—' একবার থেমে গেলেন, তারপরে বললেন, 'আজ একটু বিশেষ কাজে আসতে হল। ভুলু আছে বাড়ীতে?'

'আছে বই কি, আসুন—আসুন—'

ও'রা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠছেন, শিবপ্রসাদের জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। টুলু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল: 'আমি আমার ঘরে যাচ্ছি, দাদা।'

'সেকি রে! জ্যাঠামশাই আসছেন—একবার দেখা করে—'

'আজ থাক দাদা—আজ থাক—' টুলু আর অপেক্ষা করল না। মাঝের দরজা দিয়ে চকিতে অদৃশ্য হল পাশের ঘরে।

পরক্ষণে বারান্দার দিকের দরজার চৌকাঠে শিবপ্রসাদের ছায়া পড়ল। প্রবীরও উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে, 'আসুন জ্যাঠা-মশাই, আসুন।'

[ক্রমশ]

'সপ্তাহের বোকা' প্রসঙ্গে

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠক। শ্রীকৃত্তিবাস ওঝার লেখা সম্বন্ধে অনেক পাঠক আপনাদের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছেন, যার কিছু কিছু আপনারা প্রকাশও করেছেন। নানারকম পত্র-পত্রিকা পাঠ করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে এইটুকু বুঝেছি যে, যে সমস্ত সাংবাদিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ লেখেন বা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন তাঁরা নিজেদের বড় বেশি বিজ্ঞ মনে করেন। শ্রীওঝার সম্পর্কে ঐ একই কথা খাটে। কিছু কিছু লোক আছেন, যাঁরা যুক্তিতর্ক জলাঞ্জলি দিয়ে শুধুমাত্র অপরকে গালিগালাজ করেই আনন্দ পান। শ্রীওঝার লেখা পড়ে মনে হয় তিনি ঐ একই পালকের পাখী—যে কোন অজুহাতেই হোক, সি-পি-এম দলকে গালমন্দ না করে বোধ হয় তিনি কোন সপ্তাহেই জলস্পর্শ করেন না। কেরলে সি-পি-এম দলের পরাজয়ে তিনি এতই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে, কেরল আর কোচ-বিহারের দ্বন্দ্বের কথাও বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নাম-কীর্তনের সময় তিনি এতই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন যে, কেরলের নির্বাচনে সি-পি-আই এবং শাসক কংগ্রেসের আঁতাতটি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ল না। শ্রীসমর মুখোপাধ্যায় সি-পি-এম দলের একজন প্রথম সারির নেতা নন বলেই জানি। কিন্তু সমরবাবুর সভায় ৫/৬ শত লোক আর অজয়বাবুর সভায় ১৫/১৬ হাজার লোক জমায়েৎ হওয়ায় শ্রীওঝা মশাই ধরেই নিলেন যে, সি-পি-এম দল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সত্যিই কি তাই? ওঝামশাই সাংবাদিক, তবুও তাঁকে একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বর্ধমানে সাঁই পরিবারের ঘটনার পরেও বর্ধমান টাউন হল ময়দানে শ্রীজ্যোতি বসুর সভায় তিলধারণের স্থান ছিল না। এটা কি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার লক্ষণ? যেদিন শ্রীজ্যোতি বসুর সভায় ৫/৬ শত আর তার পাশেই অজয় মুখোপাধ্যায়ের সভায় ১৫/১৬ হাজার লোক হবে, সেদিন বুঝবো সি-পি-এমকে জনগণ ত্যাগ করেছে। তার আগে নয়। ওঝামশাই কি জানেন না, অজয়বাবুর সভায় ভিড় হবার জন্য কারা মদত জোগায়?

শ্রীওঝার লেখা পড়ে মনে হয়, তিনি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশা করেন। তাই তিনি হয়তো শ্রীমুখোপাধ্যায়ের খুব কঠোর সমালোচনা করতে পারেন না, যেমনটি তিনি করেন জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে। অজয়বাবু নিজেকে গান্ধীবাদী বলে প্রচার করেন, জানি না গান্ধীজী কেঁচে [illegible] কি [illegible]

আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে বেলেঘাটা এবং নোয়াখালি পরিভ্রমণ করেছেন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কেও আমরা দেখেছি রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার উন্নতিকল্পে কার্জন পার্কে অনশন করতে। সংবাদপত্র মারফৎ এবং শ্রীসুশীল ধাড়ার বিবৃতিতে জেনেছি যে, লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীমুখোপাধ্যায়কে অভি-নন্দিত করেছেন। এখনও তো আইন-শৃঙ্খলার কোনও উন্নতি হয় নি, কই অজয়বাবু এখন তো অনশন করার কথা চিন্তা করছেন না। তবে কি আমরা বুঝবো যে, জ্যোতি বসুর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নেই বলেই অজয়বাবুর অনশন করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে? সে ক্ষেত্রে এইটাই কি প্রমাণ হয় না যে, কার্জন পার্কের অনশন ছিল একটি রাজনৈতিক ধাপ্পা-বাজী? শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় জনগণকেই তাঁর সুপ্রীম কোর্ট বলেন। আমি সেই জনগণের একটি অংশ। আমার একটি প্রস্তাব শ্রীমুখোপাধ্যায় বিবেচনা করে দেখবেন কি? এখন শ্রীজ্যোতি বসুর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নেই। সুতরাং কার্জন পার্কে অনশন করে বাহবা নেওয়া যাবে না। তার চেয়ে তিনি পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজ, শিবপুর বি-ই কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিবির স্থাপন করে অনশন করুন এবং দেখুন না যদি আইনশৃঙ্খলার কিছু উন্নতি করতে পারেন। শ্রীঅজয় মুখো-পাধ্যায় আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখবেন কি? নকশালপন্থী বন্ধুদের মারের ভয়ে পিছিয়ে যাবেন না তো?

শ্রীওঝা সুযোগ পেলেই ওকালতি করেন যে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় একজন সৎ ব্যক্তি। মেনে নিচ্ছি না, তবে তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে, অজয়বাবু সৎ লোক। কিন্তু মনে প্রশ্ন থেকে যায়, এই-রকম একটা সৎ লোকের পাশে সি-পি-এম ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি দাঁড়ালো না কেন? বেশির ভাগ দলই তাঁর পদত্যাগের সমালোচনা করল কেন? এই প্রসঙ্গে লোকসেবক সঙ্ঘের শ্রীঅরুণ ঘোষের বিবৃতির প্রতি আমি শ্রীওঝার দৃষ্টি

জন্য বাংলা কংগ্রেসকেই সম্পূর্ণ দায়ী করেছেন। শুধু তাই-ই নয়। তিনি আরও বলেছেন যে, প্রতিটি জনসভায় অজয়বাবু যে ভাষা ব্যবহার করছেন কোন গান্ধীবাদী নেতার মুখে তা মানায় না। এ বিষয়ে শ্রীওঝা কি বলেন? বর্ধমানের সাঁই পরিবারের ঘটনায় অজয়বাবু অনেক রুমাল ভিজালেন, কিন্তু মেদিনীপুরে সি-পি-আই ও জমির মালিকের সংঘর্ষে একই দিনে সাতজন মারা গেল অথচ তিনি একটা কথাও বললেন না। ধাতু-নির্মিত গান্ধীমূর্তি ছুঁড়ে মেয়রের মাথা ফাটানো হল তাতেও অজয়বাবু নীরব। গান্ধীভক্তির কি অদ্ভুত নিদর্শন। মন্ত্রি-সভা গঠনের চেষ্টা করা যদি শ্রীজ্যোতি বসুর পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তাহলে জানতে ইচ্ছে করে যে, একক সিদ্ধান্তে পদত্যাগ করে অজয়বাবু আমা-দের কোন্ স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন? এক সপ্তাহের নোটিশ দিয়ে পদত্যাগ করা যদি বিশ্বস্ততার লক্ষণ হয়, তাহলে আগেকার দিনে যে সমস্ত ডাকাত দল চিঠি দিয়ে বা খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করতে আসত তারা নিশ্চয়ই পূজনীয় ব্যক্তি ছিল।

রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে রাজ্যপালই যখন এই রাজ্যের শাসনকর্তা, তখন পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে যদি জ্যোতি বসু প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে অন্যায় তো কিছু হয় নি। শ্রীওঝা একে কাদুনি গাওয়া বলছেন কেন? আর এই প্রতিবাদ তো একা সি-পি-এম করে নি। সি-পি-আই, এস-ইউ-সি, আর-এস-পি প্রভৃতি অনেক দলই করেছে। ছাত্র পরিষদের ধর্মঘটের কথা শ্রীওঝা যতো কম বলবেন ততই মঙ্গল। ছাত্র পরিষদকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে কারা সি-পি-এমকে বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করছেন শ্রীওঝা কি তা জানেন না? তবু মন্দের ভালো এই যে, কয়েকদিন আগেকার শিয়ালদহের ঘটনার দরুণ এস-ইউ-সি ছাত্র পরিষদের কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীওঝা দুজনেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, একজন লোককে একশ-বার অথবা একশজন লোককে একবার বোকা বানানো যায়, কিন্তু সকল লোককে সকল সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না। শ্রীওঝা যতো খুশি অজয়বাবুর গুণকীর্তন করুন আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের দুঃখ এই যে, এই সমস্ত লেখক-দের জন্যেই সাপ্তাহিক বসুমতী জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে বলেছে।

—[illegible]

এখন থেকে দীর্ঘ দু' দশক আগেকার কথা। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিস্মিত পাঠকদের চিত্তে এবং চিন্তাশক্তিতে একটার পর একটা ঘা দিয়ে চলেছেন।

নিয়মিত বৈঠক বসতো সে-সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে। প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সেখানে জড়ো হতেন। কেউ পড়ে শোনাতেন কবিতা, কেউ বা গল্প। একদিন গল্প পড়ে শোনালেন সেই বৈঠকী সভায় শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পটিতে ছিল স্তি-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ারস্পরিক অদ্ভুত আচার-আচরণের কথা। য়তো অমন লেখা বা অমন দেখা মানিক ন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই সহজ বা সম্ভব ছল।

গল্প পাঠ শেষ হতেই চারদিকেই এক াশ্চর্য নীরবতা। পরে একে একে মুখ ুললেন সেদিনের মননাশ্রয়ী শ্রোতারা। ার তাঁদের প্রত্যেকের কণ্ঠেই সমালোচনার িরবর্তে আশ্চর্য উচ্ছ্বাস! সম্ভবত, িদিন সেই শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন পবিত্র ঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রন্দ্রনাথ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং রো নাম-করা অনেকেই।

এ'দের বলা শেষ হলে, সবাই যখন পচাপ, হঠাৎ একটি কমবয়েসী ছেলে ছু বলার অভিপ্রায় জানালো।

সবাই অবাক! এ ছেলে আবার কী বে! মানিকের গল্প বোঝার মতো এর টুকুই বা ক্ষমতা! বাধা এসেছিল। বাধা সরিয়ে স্বয়ং মানিক ছেলেটিকে বক্তব্য নিবেদন করতে অবাধ সুযোগ ন। ছেলেটি সেদিন মানিকের দেখা ত-জীবনের সঙ্গে একমত হতে পারে কিন্তু একালের লেখক—সেই ছেলেটি [illegible] সেই ঘটনা। আজ বিশেষভাবে স্মরণ করে অন্য যে তাৎপর্যে তা এই,—মানিকই সেদিন তার দৃষ্টি বদলে দিয়েছিল।

সভা শেষ হতেই মানিক ছেলেটিকে কাছে ডেকে পথ চলতে চলতে প্রশ্ন করে-ছিলেন, বস্তি-জীবনের সঙ্গে সেই ছেলেটির যোগাযোগ কী ধরনের, কী রকমের। সেদিন মানিক কথাপ্রসঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, জীবন দেখার ধারা ও ধরণ। দু'-চার কথা শোনার পর ছেলেটির ভুল ভেঙেছিল। চোখ খুলে গিয়েছিল।

মানিকের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই জানেন কিভাবে তিনি তাঁদের পুরনো চিন্তাধারা থেকে উদ্ধার করে দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

একজন বিখ্যাত গল্পলেখক সেদিন মানিক-প্রসঙ্গে বললেন, তখন আমি 'প্রবাসী'তে লিখে সাহিত্য জগতে রাতা-রাতি ঠাঁই পেয়ে গেছি। মানিক তখন সাহিত্যে নবাগত। প্রবোধ নামের খোলস তখনো সম্পূর্ণ সরে যায় নি তার; আমারো অপরিচিত। একদিন সে আমাকে তার লেখা পড়ে দেখার জন্য একটা খাতা দিয়ে গেল। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে শুধু বিস্ময়ের পর বিস্ময় বোধ করেছি সেদিন—তখনো যা ছিল কল্পনাতীত।

আবার মনে পড়লো সেই দিনগুলির কথা, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কোথাও কোনো রকম আপোষ নেই। সংসারেও অভাব-অনটন। ভাঙা কাপে গুড়ের তৈরি চা খেতে খেতে লিখে চলেছেন মানিক 'অতসী মামী', 'সরীসৃপ', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনী', 'ভেজাল'।

লেখাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করেছেন মানিক। আর সেই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আপোষহীন সংগ্রাম, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে লড়াই করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

মানিক কিভাবে লেখক হলেন, তাঁর লেখার বিষয়বস্তু কী—এখন এসব ব্যাপার বিদগ্ধ পাঠকের অজানা নয়। কিন্তু হঠাৎ-লেখক হয় না মানিকের মতো লেখক, একথা আমরা যেন না ভুলি। তাঁর লেখার ফর্ম ও কনটেন্টের বিচার করলেই দেখা যাবে, ফর্মের ক্ষেত্রে অমন পাকা গাঁথুনি কোনো হঠাৎ-লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়, কনটেন্টের বেলাতেও ঐ এক কথা। মানিক

জননী আমার

গোবিন্দ গোস্বামী

যাকে নিয়ে কোনোদিন কোনোকিছু লেখা তো হলো না
এ জন্মের অঙ্গীকারে অগ্নিগর্ভ বৈদুর্য-চেতনা
অশ্রুসিক্ত কবিতায় নিবেদিত রক্তের অঞ্জলি
অনন্ত নক্ষত্রলোকে পরিব্যাপ্ত স্মৃতির বেদনা
যুগ-যুগান্তের আলো বুকে নিয়ে আজো জেগে আছি—
যন্ত্রণা-পীড়িত চোখে স্বপ্নময় উজ্জ্বল কৈশোর
কালের উজান বেয়ে নেপথ্যের নিরন্ধ্র রজনী
মায়ের বিকল্প নামে নিয়ে আসে ক্লান্তিলব্ধ ভোর।

চিত্রকল্পে কার মুখ স্মৃতিস্নিগ্ধ উজ্জ্বল মননে?
কৈশোর যৌবন ছুঁয়ে চলমান শব্দের খেয়ায়
কী যেন হারিয়ে খোঁজা প্রতিদিন অনন্য দ্বিধায়
ধুসর চৈত্রের পথে ঝরে-পড়া দুরন্ত কিংশুক
সূর্যস্নাত ইতিহাসে প্রত্যয়ের অভীষ্ট দর্পণে
বহতা সুবর্ণরেখা—জন্মভূমি জননীর মুখ॥

বিষাদ আমার পাপ

[illegible] আমিন

তাড়িত দুঃখের মতো মা
হে পাবকসম্ভূতা আমার
প্রবাহে আসতে গিয়ে কতোবার
প্রতারিত হবো।

প্রতীতি কোথাও নেই
শুধু ক্লান্ত মুখের বিষাদে
কোটরস্থ চোখের শিরায় ক্রমাগত
রক্ত ঝরে আসে।

ভবিষ্যৎ স্বপ্নগুলি ফুল হয়ে ফোটার আগেই
মা আমার
হে পাবকসম্ভূতা আমার
বিষাদে ঢেকো না আর প্রবাহের মুখ।

বিষাদ আমার লজ্জা
মা আমার
এ বিষাদ পাপ।

অলৌকিক যুগ নয় যে, হঠাৎ স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি লিখতে বসে রাতারাতি লেখক হয়ে গেছেন।

"দিবা রাত্রির কাব্য" তখনো উপন্যাসের আকার পায় নি এবং লেখকও সে রকম রূপ দেবার কথা হয়তো ভাবেন নি। সজনীকান্ত দাসকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি পড়ে শোনালেন। সজনীকান্তের বিরুদ্ধে যে যাই বলুন না কেন, তাঁর মতো বিবেকবান দরদী শ্রোতা কোটিতে গুটি-কয়ও দুর্লভ।

সজনীকান্ত "দিবা রাত্রির কাব্য" শুনে তৎক্ষণাৎ প্রেসে দেবার কথা না বলায় সম্ভবত মানিকও সেদিন একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সজনীকান্তরও কি দৃষ্টি-ভ্রম ঘটেছে!

না। সজনীকান্ত চান, ভালো জিনিসের ভালো রূপায়ণ। সেদিন তাঁরই আগ্রহে কিছুদিন পরেই "দিবা রাত্রির কাব্য" উপন্যাসের আকার নিল। এবং একেবারে নতুন কথা ঘোষণা করল, উপন্যাসের "চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের 'প্রোজেকশান', মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ"।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও ঘোষিত হয়েছে মানুষ সম্পর্কে,—

"নাম তার জানিনাকো;
শুধু জানি ধরণীর ধূলি ম্লান
আশার প্রতীক
আছে এক করুণ পথিক যুগে যুগে
সব যুদ্ধে হেরে ফিরে আসা
ক্লান্ত পদাতিক।"

কবিতার মধ্যে এই মানুষ অস্পষ্ট নয় কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন, মানিকের "দিবা রাত্রির কাব্য" উপন্যাসে রূপক-বিলাসে আয়োজিত মানুষগুলি সংকেতিকতার গুণে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব।

বাস্তব জীবনে যে মানুষ মানিকের চোখে ধরা পড়েছে, উপন্যাসে বা গল্পে কখনো তিনি তাদের সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, কোথাও বা চরিত্রের অনাসক্তার অপব্যয়ের মধ্যে সেই চরিত্রের মৃত্যুর দিকটি লেখক এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

অথচ ব্যক্তি হিসেবে মানিক অতুলনীয়, স্নেহ, ভালোবাসায়, মমতায়, প্রীতিদানে —কোথাও তাঁর কার্পণ্য ছিল না। এ সত্ত্বেও নিজস্ব চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসহনীয় অটল। প্রগতিশীল ভাব-ভাবনার জন্যে তাঁর ছিল আজীবন আপোষ-হীন সংগ্রাম। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংগ্রামী মানুষগুলির মতো তিনিও শেষ জীবন কাটিয়েছেন প্রায় অভুক্ত অবস্থায়। তবু পরাজয় স্বীকার তিনি করেন নি। শুধু ব্যর্থ হয়েছে তাঁর পারিবারিক সংসার।

একালে মানিকের অনুভাবনায় অনেক লেখক বিচরণ করছেন বাংলা সাহিত্য জগতে। তবু মানিকের স্থান অপূরণীয়। কারণ চরিত্রের যে দার্ঢ্য মানিককে তাঁর জীবন-সংগ্রামে ও সাহিত্য-সাধনায় অদ্বিতীয় করে রেখেছে, পরবর্তী কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর অভাব অত্যন্ত প্রকট।

গত ১৯শে মে মানিকের জন্মদিবস পালিত হলো। তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষেই তাঁকে স্মরণ করা হবে, এমন দুর্দিন যেন বাংলাদেশের না হয়। এবং তেমন দুর্দিন হলে তা হবে পেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষগুলিরই দুর্দিন।

॥ ছয় ॥

গণ-আন্দোলনের প্লাবনে যেদিন আয়ুবশাহীর ভিত্ ধসে যাচ্ছিল এবং তাই দেখে যখন কোটি কোটি পাকিস্তানীর রক্তচোষা জোঁক, "বাইশ পরিবার" তাদের কায়েমী স্বার্থের ভরাডুবির আশংকায় শেয়াল-কুকুরের মত আকাশের দিকে মুখ তুলে কান্না জুড়ে দিয়েছিল, সেদিন এই দেড়েল মোল্লারা, বুর্জোয়া রাজনীতির আবর্জনা-পূর্ণ খিড়কীর দরজা দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে বলেছিল—"আরে রোতা কিঁউ? হামলোক তো হ্যায়!" ধর্মের শুয়োর, রাজনৈতিক খচ্চর এই মোল্লারা জানত যে, শাহী-জমানা উল্টে গেলে "বাইশ পরিবার"ও চিৎপটাং হবে এবং "বাইশ পরিবারে"র অনুপস্থিতিতে মক্তব, মাদ্রাসায় কেচ্ছা চালানোর পয়সা মিলবে না, নিয়মিত গোস্ত্ আর ফিসুই গেলা বন্ধ হবে, হারেমে নিকে-করা বিবিদের সংখ্যাও বাড়বে না। কাজেই খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তারা দাড়িতে তিন পাক দিয়ে, লুঙিতে ছয়গিট মেরে "আল্লা", "আল্লা" করে নেমে পড়ল। সরকারের পেটোয়া কাগজগুলির সাংবাদিক এবং বিদেশাগত "সি-আই-এ"র দালালদের কাছে তারা ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের কুৎসা রটাতে লাগল, আর তাই শুনে এই উজবুকগুলিও কোথায় কোরানশরীফ পোড়ান হয়েছে, কোথায় "নিরীহ জনসেবক" বি-ডিকে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে ইত্যাদি গোসলখানার মুখরোচক গল্পে কাগজের পাতা ভরিয়ে দিল। সত্যি কথা বলতে, তখনকার সরকারী আর বিদেশী কাগজগুলি পড়তে পড়তে মনে হত, যেন হাফ্-গেরস্থ বেশ্যার মুখে সতীত্বের ব্যাখ্যা শুনছি!

দেড়েল মোল্লাদের চক্রান্তে এবং অপ্রাণ চেষ্টায় গণ-আন্দোলনের সমান্তরাল কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী আর এক আন্দোলন গড়ে উঠল, ফলে আওয়ামের আত্মবিশ্বাসে একটা সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিক, কৃষকের হাতেই থাকত, তবে, এই ফাটল দেখা দিত না, গণ-আন্দোলনের দুর্বার স্রোত রুদ্ধ হোত না! ঘসা পয়সার উল্টো পিঠ, দেড়েল মামদোদের বজ্জাতির অংশীদার ডান ও তথাকথিত বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যাওয়ায় সংগ্রামী আওয়ামের প্রেরণার উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল। তাই যখন মোল্লারা তাদের গণ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করল এবং "ইসলাম বাঁচাও", "আল্লাতালাহের দিকে তাকাও" ইত্যাদি বস্তাপচা শ্লোগান ছড়াতে লাগল, তখন স্বভাবতই অজ্ঞ, সরল, সাদাসিধে আওয়ামের মনে বিভ্রান্তি এল। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য মোল্লাদের মাসতুতো ভাইরা তেমন কোনও চেষ্টা করল না, তারা তখন দেহের পশ্চাদ-দেশে তালি মেরে নিজেদের দফা কীর্তনে ব্যস্ত। ফলে খানবাহাদুর আয়ুব খান ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। উনিশ শ' উনসত্তরের পয়লা ফেব্রুয়ারী তাঁর মাসপহেলা বেতার ভাষণে ফেব্রুয়ারী সংবিধান নিশ্চয় আল্লার বাণী নয়, সুতরাং প্রয়োজনমত তা পাল্টানো যায়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আমি যে কোনও ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবকেই গ্রহণ করব, আর তাই অল্প-দিনের মধ্যেই দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকারের একটি আলোচনা-বৈঠক শুরু হবে। মনে পড়ে, সেদিন যখন এই আয়ুব-বাণী প্রচারিত হচ্ছিল, তখন আমরা মোস্তাফার চায়ের দোকানে বসেছিলাম। আমাদের এক কমরেড অচিন্ত্য সেন প্রেসিডেন্টের বাণী শুনে বলে উঠল—তোমরা দেখ এটাই হবে ডি-কে-ডি সরকারের সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ ধাপ্পা। এই ধাপ্পা দিয়ে সে বাঁচার জন্যে শেষ চেষ্টা করবে। তাকে আর তার দলবলকে যদি ধ্বংস করতে চাও তো এই বৈঠকে যেও না। কিন্তু দেড়েল মোল্লারা আর তাদের মাসতুতো ভাই শোধনবাদী এবং নয়া-শোধনবাদী বুর্জোয়া নেতারা, যারা সংগ্রামী আওয়ামের রক্ত গায়ে মেখে মসনদ সদুপদেশ গ্রহণ করল না! তাদের ধারণা হোল যে, প্রেসিডেন্ট সাহাবের প্রস্তাবটি একেবারে পাক-সাফ, তার মধ্যে কোনও মারপ্যাঁচ, কোনও দুরভিসন্ধি নেই। তাদের মতে, প্রেসিডেন্ট কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন বলেই এই ধরনের প্রস্তাব করছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়ুব তখনও কোণঠাসা হয়ে পড়েন নি। তাঁর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেই বরং তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়তেন এবং তার ফলে মেহনতী আওয়ামের সাফল্যের ভিত্ অনেক-বেশি পোক্ত হোত। এই বিরাট ভুল করার পরও পাতি বুর্জোয়া নেতারা সামলে চলার চেষ্টা করল না। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত একদল আর একদলের দফার ঠ্যাঙ কামড়াতে লাগল এবং পারস্পরিক খিস্তি আর খেউড়ের নোংরা নর্দমার পানি ছিটিয়ে গণ-আন্দোলনের ইজ্জত নষ্ট করল। এর দরুণ লাভ হোল আয়ুবেরই। তিনি খুশিমত যা ইচ্ছা তাই বলতে শুরু করলেন, কখনও একে তোলেন, কখনও ওকে নামান। যেমন, পয়লা ফেব্রুয়ারীর বেতার ভাষণে তিনি বললেন যে, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। এর কিছুদিন পরেই তাঁকে বলতে শোনা গেল যে, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং যাবতীয় গোলযোগের মূলে রয়েছে এই সব প্রতিষ্ঠানেরই সমাজ-বিরোধী সভ্যরা অর্থাৎ পাতি বুর্জোয়া নেতারা আয়ুবের শ্রীচরণে প্রচুর পরিমাণ তৈল্ দান করা সত্ত্বেও "সমাজ-বিরোধী" আখ্যা পেলেন। গোল-টেবিল বৈঠক শুরু হওয়ার কিছু আগে আয়ুব রাজনৈতিক নেতাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, আমি জানি যে, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেক স্বদেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল লোক আছেন এবং এঁরা দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। আশ্চর্য এই যে, এইসব কথা বলার কিছুদিন পরেই আয়ুব সাহাব সাংবাদিকদের জানালেন যে, তাঁর মতে নওয়াবজাদা নসরুল্লাই পাকিস্তানের একমাত্র বিচক্ষণ ও সৎ রাজনৈতিক নেতা, আসন্ন বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্ব তাঁরই পাওয়া উচিত। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, সর্বজনঘৃণ্য হারামজাদা নসরুল্লার সঙ্গে, যে ইতিপূর্বে বহু কু-কীর্তি করেছে এবং বর্তমানে ছেঁড়া-খোঁড়া, তাপ্পিমারা শ্লোগান দিয়ে কায়েমী স্বার্থের নোংরা শরীরটা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে আয়ুবের একটা বোঝাপড়া [illegible]

কেন্দ্রয়ারী) ব্যর্থ হোল। তবুও মোল্লারা বা খাদের মাসতুতো ভাইরা, কেউ ফিরলেন না, ফেরার সময় তখনও নিশ্চয় ছিল! তেরই মার্চ হোল শেষ বৈঠক এবং এই বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটল। আয়ুব তাঁর সমাপ্তি ভাষণে কেবলমাত্র দুটি দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, এক,—সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, দুই,—পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ প্রথমটির দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার রাস্তা উন্মুক্তই থাকবে এবং দ্বিতীয়টি ভাঙা, নড়বড়ে, শুয়োরের খোঁয়াড়টাকে নতুন করে বানাবে।

গোল টেবিল বৈঠকের ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা সরকার এবং সরকারপক্ষীয় কাগজগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাতামাতি শুরু করল। তাদের গুরু, পরম শয়তান মওদুদী রাওয়ালপিণ্ডিতে বসে সাংবাদিকদের ডেকে গালভরা বিবৃতি দিল। তার মতে "বৈঠক সফল হয়েছে। সে বলল যে, তার দলের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ পন্থায় একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন। আয়ুবের ঘোষণায় এই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে"। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, মওদুদীর রাজনীতি এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অসাধারণ! কেন না, সে এবং তার চেলারা বিশ্বাস করে যে, আয়ুবের মত একনায়করা, যারা অসংখ্য মানুষের বাঁচার অধিকারকে পিষে ফেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা বলামাত্র হাসতে হাসতে গদি ছেড়ে দেবে। মওদুদীর মুখে গণতন্ত্র? আরও একটা হাসির খোরাক! যারা কেবল হিন্দু-মুসলমানের ঝিগির তুলেই নিরস্ত হয় না, শিয়া-সুন্নি ইত্যাদি বিভেদ নিয়েও তুলকালাম করে, তারা আনবে গণতন্ত্র! মওদুদীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে নেজামে ইসলাম দলের মাতব্বর, পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশের অন্যতম রাহু, পূর্ব বাংলার মেহনতী আওয়ামের চিরশত্রু চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলল, প্রেসিডেন্ট আয়ুবের ভাষণে বিরাট রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। আমার সন্দেহ নেই যে, তাঁর এই ভাষণ পাকিস্তানের ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। নেজামে ইসলাম দলের আরও এক শয়তান, মৌলভী ফরিদ আমেদ বিবৃতি দিল যে, আয়ুবের সিদ্ধান্ত "ঐতিহাসিক"। এক ইউনিট এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন—এই দুই সমস্যার সমাধান কেন হয় নি, তার উত্তরে ফরিদ বলল, নেতারা এইসব ব্যাপারে ফরিদ আমেদ তাদের দলের যাবতীয় শয়তানী চেপে যেতে চাইল, কেন না তাদের দল নিজামে ইসলাম এবং মওদুদীর জামাতে ইসলাম গোল টেবিলের বৈঠকে এক ইউনিট বাতিল এবং পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন—এই দুই দাবির চরম বিরোধিতা করেছিল! আজও মনে আছে, শেষ বৈঠকের ফলাফল জানা মাত্রই পূর্ব-বাংলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ঢাকার মহল্লায় মহল্লায় ছাত্র আর শ্রমিকরা মিছিলে সামিল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ধিক্কার দিয়েছিল বিশ্বাসঘাতকদের। যেদিন পি ডি এম-এর (বর্তমানে পি-ডি-পি) মামুদ আলী এবং নেজামে ইসলামের ফরিদ আমেদের ঢাকায় আসার কথা, সেদিন আগে-থাকতেই তেজগাঁর বিমানবন্দরে হাজার হাজার মারমুখী ছাত্র আর শ্রমিক হাতের আস্তিন গুটিয়ে তৈরি হয়েছিল। বিমানটি এসে রানওয়েতে স্থির হয়ে দাঁড়ানো মাত্রই ওরা পুলিশকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সোজা উপরে উঠে গেল তন্নতন্ন করে খুঁজল ঐ দুই বিশ্বাস-ঘাতককে। কিন্তু মানুষ ঠকিয়ে যারা খায়, তারাও কম চালাক নয়। ফরিদ আর মামুদ কোনওরকমে এই হামলার গন্ধ পেয়েছিল, কাজেই এই বিমানে তারা চাপে নি! মজার কথা এই যে, নয়া সামরিক শাসন জারী হওয়ার পরে, সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে ফরিদ পূর্ব বাংলায় ঢুকেছিল, তার আগে নয়।

জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং তাদের সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোকে আজ সরাসরিভাবে "সি-আই-এ"র পাকিস্তানী দালাল বলা যেতে পারে। আজ থেকে তিন বা সাড়ে তিন মাস আগে জামাতে ইসলাম "দৈনিক সংগ্রাম" নাম দিয়ে এক কাগজ চালু করেছে। এর জন্যে তারা একটা বিরাট বাড়ি কিনেছে, রোটারী মেসিন বাগিয়েছে, মোটা অংকের মাইনে দিয়ে সাংবাদিক রেখেছে কম করেও পনেরটা দেশে। কিভাবে এত টাকা এল? "দৈনিক সংগ্রাম" মেরেকেটে তিন হাজার কপি বিক্রি হয় কিনা সন্দেহ, বাকীগুলি বিনেপয়সায় হুদো মোল্লারা তাদের বিভিন্ন মক্তব, মসজিদে বিলি করে দেয়। কাজেই এই কথাটা একটি শিশুও বোঝে যে, এই বার পৃষ্ঠার "দৈনিক সংগ্রামে"র টাকা কোনও সোজা রাস্তা দিয়ে আসে না। তবে কোন্ রাস্তায় কার টাকা জামাতের পকেটে ঢোকে? বছর দেড়েক আগে রিকুইজিশন ন্যাপের নেতা মহিউদ্দিন আহমদ পলটনের ময়দানে অভিযোগ করেছিল যে, আমেরিকা জামাতকে চল্লিশ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছে। জামাতের নেতারা, যারা সর্বদাই কুলটা নারীর সতীত্ব রক্ষার কৃত্রিম অভিনয়ের নকল করে থাকে, তারা মহিউদ্দিনের কথায় কোনও লাফ-ঝাঁপ দেয় নি অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, আমেরিকার কাছে নিজেকে বেচে দিয়ে জামাত ধরা পড়ে গেছে।

জামাতের "দৈনিক সংগ্রাম" তার এই অতি শৈশবেই সাংবাদিক বেশ্যা-বৃত্তির কায়দাকানুনগুলো চমৎকার রপ্ত করে ফেলেছে। এই বছরের আঠারই জানুয়ারী ঢাকায় জামাতের এক জনসভায় তার এক নেতা ইউসুফ খরহম, হাত-পা ছুঁড়ে এক বীভৎস বক্তৃতা দিল। তার মতে, গোটা পূর্ব বাংলা রবীন্দ্রভক্ত হয়ে গেছে এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথ হিন্দু, সেহেতু বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুস্থান বলা যেতে পারে। কি লজিক! ইউসুফ খরহম আর্তনাদ করে বলে, সময় থাকতে রবীন্দ্রনাথকে এবং হিন্দুদের এই দেশ থেকে তাড়াতে হবে, নইলে সমূহ বিপদ! বলা বাহুল্য, কোন জনসভায় এহেন উন্মাদসুলভ প্রলাপ বকলে কেউ রেহাই পায় না। খরহমের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। বেশকিছু ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে তার কথার প্রতিবাদ করতে লাগল। জামাতিরাও মঞ্চে উঠে মাইক বাগিয়ে জঘন্য খিস্তি শুরু করল, ফলে গণ্ডগোলটা বেশ জমাট বেঁধে গেল। ছাত্র আর জমাতি গুণ্ডাদের মধ্যে সংঘর্ষে দুজন ছাত্র নিহত হোল, আহত হোল পাঁচ শ'। পরদিন "দৈনিক সংগ্রামে"র প্রথম পাতা পড়ে সবাই অবাক —পশ্চিমবঙ্গ হইতে পায়জামা ও পাঞ্জাবী-পরিহিত হিন্দুরা আসিয়া জামাতের সভা পণ্ড করিয়াছে। মিথ্যের কি নির্লজ্জ পরিবেশন! যারা নিহত এবং আহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনও হিন্দু ছিল না। এই ঘটনার কিছুদিন আগে ইয়াহিয়া সরকারের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য "ডাকসু" ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে একটি সভা আহ্বান করে। সভায় উপস্থিত বক্তা এবং শ্রোতা প্রত্যেকেই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার দাবি জানায়। হঠাৎ

বাইরে থেকে আমন্ত্রণ ছাত্রবাহিনী, ইসলামী ছাত্র সংঘের [illegible] ছোকরারা লাঠিসোটা নিয়ে সভাস্থ লোকদের আক্রমণ করে। "ডাকসু"র ছেলেরাও পাল্টা আঘাত হানে। ফলে ইসলামী ছাত্র সংঘের আবদুল মালেক মারা যায়। পরদিন যথাযথভাবে জামাতিরা প্রচার করে যে, এটা পুরোপুরি হিন্দুদের কারসাজি, নিরীহ ছাত্রহত্যার প্রতিশোধ তারা নেবেই। ছাত্ররূপী জামাত ময়দানের রেসকোর্সে একটা স্মৃতিসৌধ বানাচ্ছিল কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ তা ভেঙ্গে দিয়েছে। আবদুল মালেক মারা যাওয়ায় মসজিদে মসজিদে জামাতের বকধার্মিক মোল্লারা কুম্ভীরাশ্রু পাত করেছিল—ইন লিল্লাহে রেজাউনা! আল্লাতালাহ,—কিয়ামতের দিনে শহীদদের ঘাতক এই বেতারবৃত্ত বদমায়েসগুলিকে তুমি ক্ষমা কোর না! কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে যে অসংখ্য ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক অত্যাচারীর বন্দুকের গুলীতে খতম হয়েছে, তাদের ক'জনকে মনে রেখেছে এই শয়তানরা?

গ্রীষ্ম শহর ও সর্বনাশ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

একজন দু'জন নয়, দারুণ গ্রীষ্মের প্রকোপে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের এই ভারতবর্ষে ছয় শতাধিক লোক প্রাণ হারিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আবার পল্লীর তুলনায় শহর অঞ্চলে অনেক বেশি।

শুধু এ-বছর নয়, প্রতি বছরই এরকম হয়। পৌর-প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত কর দেবার মতো আমাদের শহরবাসীরা বাড়তি কিছু মৃত্যু দিয়ে গ্রীষ্মের তর্পণ করে।

পৃথিবীর উন্নত দেশের শহরগুলোতে এই তর্পণ আমাদের মতো রাজসূয় আকারে হয় না; কিন্তু তবু হয় বৈকি! গ্রীষ্মকে বড় রকমের খেসারত বড় শহরগুলোর অনেককেই দিতে হয়।

সাধারণ মানুষ কিন্তু গ্রীষ্মের দহনে শহরের এই সর্বনাশ সম্পর্কে নির্বিকার। হামেশাই তাঁরা বড় কোনো শহর দেখে এসে বলেন,—ওফ্! দেখে এলুম বটে! আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ! অথচ মাত্র বছর কয়েক আগেও জায়গাটা কী ছিল! কত ছোট্ট ছিল! আর আজ কী হয়েছে! কী প্রকাণ্ড শহর হয়েছে আজ! চেনাই যায় না দেখলে!—

এই অবধি বলে হয়তো বা একটু থামেন ওঁরা এবং পরক্ষণেই আবার ফিরিস্তি দেন শহরের ঐশ্বর্যের,—ওরে ব্বাপস্! সে এক এলাহী কাণ্ড! নতুন নতুন সব কারখানা! আকাশছোঁয়া সব বাড়ি! পেল্লাই পেল্লাই রাস্তা! চোখ-ঝলসান পার্ক; কী নেই ওখানে!..... দেখে এসো, ওখানকার সব কিছুই একেবারে বদলে গেছে।

কোনো আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞের কাছে এই বর্ণনা দিলে তিনি বলবেন,—হ্যাঁ, বদলে তো গেছেই। কিন্তু খেয়াল করেছেন কি, ওখানকার আবহাওয়াও বদলে গেছে? জায়গাটা গরম হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে?

না, খেয়াল তিনি করেন নি। কেউই খেয়াল করেন না। শহর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার তাপমাত্রা যে আগের তুলনায় বেশ কয়েক ডিগ্রী বেড়ে যায়, এ সত্যটিও নজরে পড়ে না প্রায় কারোরই।

অথচ তাপমাত্রা বাড়ে, এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য; কোনো কোনো বড় শহরের তাপমাত্রা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর তুলনায় বেশ কয়েক ডিগ্রী অবধি বাড়ে।

খুব উঁচু থেকে বড় কোনো শহরকে দেখলে মনে হয়, ধোঁয়া ও ধুলো একে যেন চাঁদোয়ার মতো ঘিরে আছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই চাঁদোয়া সূর্য-কিরণকে প্রতিহত করে যতটা, শহর থেকে বিকিরিত তাপকে প্রতিরোধ করে তার চেয়েও কিছু বেশি।

তাপের আবার কত রকম যে উৎস আছে শহরে! কল-কারখানা, চিমনি, বয়লার, গরম ধোঁয়া ইত্যাদি কত কিছু যে আছে!

ধোঁয়া আবহাওয়াকে শুধু তপ্তই করে না, তাপ-বিকিরণে বাধা দিয়ে বায়ুমণ্ডলে নানারকম কার্যকরী পদার্থ গড়ে তোলে। এই সব পদার্থের ওপর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়।

বড় শহরগুলো থেকে বিকিরিত তাপশক্তি এত বিপুল যে, অনেক সময়েই তা হয়ে দাঁড়ায় সূর্য থেকে প্রাপ্ত শহরের মোট তাপশক্তির শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ অবধি। মনে রাখা দরকার, শহরগুলোর এই যে বিকিরিত তাপশক্তি, এ কিন্তু রূপান্তরিত সৌরশক্তি নয়;—এ শক্তি মানুষেরই সৃষ্ট এবং অনেক সময়েই মানুষের অনিচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট।

গ্রীষ্মকালে শহরের পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি, দেওয়াল, ছাদ ইত্যাদি তেতে ওঠে, শহরকে অতিরিক্ত রকম তপ্ত করার কাজে সহায়তা করে।

আবার শহর যত বড় হয়, তার আবহাওয়ার পরিবর্তনও তত প্রকট হয়ে ওঠে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তার আর্দ্রতারও পরিবর্তন সূচিত হয় এবং বিশেষ করে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় স্থানীয় বায়ু-চলাচলের ক্ষেত্রে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিটি বড় শহরেরই বায়ু-চলাচল-ব্যবস্থা পল্লী অঞ্চলের থেকে একেবারে আলাদা। বড় পাইপ ধরে জল যেমন, বড় শহরের রাজপথ ধরে তেমনি বাতাস প্রবাহিত হয়। রাজপথ সোজা হলে এই প্রবাহের গতিবেগ বাড়ে। আবার রাজপথ যদি থাকে বায়ুপ্রবাহের সমকোণে তো বায়ু প্রায় নিশ্চল অবস্থায়ও থাকতে পারে।

বড় শহরের প্রতিটি পার্ক, জলাশয় এবং মাঠ-ঘাটের নিজ নিজ বায়ু-চলাচল-ব্যবস্থা থাকে; আর থাকে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং আবহাওয়া।

সেখানে বায়ুমণ্ডল থেকে থিতিয়ে-পড়া পদার্থের পরিমাণ অন্য সব জায়গার তুলনায় বেশি। ধোঁয়া এবং ধুলো বেশি বলেই এমনটি হয় সেখানে। সেখানকার বায়ুমণ্ডলে গড়ে ওঠে বিচিত্র সব রাসায়নিক পদার্থের কণিকা। এই কণিকাগুলো জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়, ঘনীভূতকরণের উপযোগী নিউক্লিয়স গড়ে তোলে। এদিকে বায়ুর মধ্যে থাকে জলীয় বাষ্পের যে অণুগুলো, তাদের কেউ কেউ গিয়ে তখন ঐ নিউক্লিয়সকে ঘিরে ফেলে এবং সৃষ্টি করে কুয়াশা অথবা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি।

সম্প্রতি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, রবিবার দিনে বায়ুমণ্ডল থেকে শহরের বুকে থিতিয়েপড়া পদার্থের পরিমাণ অন্য সব দিনের তুলনায় শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহের ঐ বিশেষ দিনটিতে শহরের বেশিরভাগ কারখানা বন্ধ থাকে বলেই ঠিক এমনটি হয়। অর্থাৎ কি না, বিচিত্র সব সমস্যার সৃষ্টি হয় শহরে; আবার কখনও বা ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলে সৃষ্টি হয় 'ধোঁয়াশা'।

গ্রীষ্মকালে তো কথাই নেই, সব কিছু মিলেমিশে শহরের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। ছাদের খানিকটা ওপরে থাকে ধোঁয়ার যে আবরণ, শহরাঞ্চল থেকে বিকিরিত তাপকে তা প্রতিফলিত করে। এ ছাড়া শহরের মাঝখানেও স্বাভাবিক বায়ুসঞ্চালনে তখন ব্যাঘাত ঘটে। শহরে পুঞ্জীভূত তাপ বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে সঞ্চালিত হতে পারে না। ফলে, গ্রীষ্মের দহনে বড় শহরগুলোর দুর্দশা চরমে ওঠে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর কথা আলাদা। সে সব জায়গায় যেমন অবস্থা, তেমন ব্যবস্থা। কৃত্রিম উপায়ে গ্রীষ্মকে প্রশমিত করবার সেখানে হাজার আয়োজন। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে?—আয়োজন বা ব্যবস্থার তুলনায় এখানে অব্যবস্থাটাই বিশেষ করে চোখে পড়ে। পর্যাপ্ত জল নেই, গাছপালা নেই বড় শহরগুলোতে,—

[৩১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

॥ তিন ॥

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক পদে নিয়োগপত্র এসে গেল। সেদিন আমার কী আনন্দ! বিশ্বভারতীর মতো শিক্ষায়তনে অধ্যাপনার কাজ, আর সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে হলো। ঢাকা ফিরে গিয়ে প্রফেসর বোস ও ডক্টর ঘোষের আশীর্বাদ নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। ১৪ই জুলাই বিকেলে শান্তিনিকেতন পৌঁছলাম, ১৫ই জুলাই কাজে যোগ দিতে হবে। জীবনের একটা স্মরণীয় দিন বলে এই তারিখটা এখনো মনে আছে। ডক্টর সেনের সঙ্গে দেখা করতেই বললেন যে, সকাল ৬টা-১৫ মিঃ 'বৈতালিক' শুরু, সে-সময় যেন লাইব্রেরীর সামনে উপস্থিত থাকি, সেখানেই আমাকে কাজ বুঝিয়ে দেবেন। আমার স্থান নির্দিষ্ট হলো শিশু-বিভাগের পূর্বদিকের একটি ঘরে। বৈতালিক যে কী ব্যাপার তা ঠিক জানা ছিল না; ১৫ই জুলাই সকালে সময় নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখি সেখানে পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, কলাভবন ও সঙ্গীতভবনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক সমবেত হয়েছেন। ৬টা-১৫ মিঃ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের এক উদাত্ত বাণী সমবেত

[পূর্বানুবৃত্তি]

কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—ওঁ পিতনহসি পিতানো বোধি নমস্তেস্তু, মা মা হিংসিঃ; বিশ্বানি দেব সবিতদুরিতানি পরাসুব, যদ্ভদ্রম্ তন্ন আসুব; নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ; নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ॥ তারপরই শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে অপূর্ব সুরে গুরুদেবের এই গানটি—

'ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হোক জয়
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হোক জয়।' ইত্যাদি

বিদ্যায়তনের কাজ শুরু হওয়ার আগে প্রতিদিন সকালে সবাই মিলে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রণাম জানায় বিশ্বস্রষ্টাকে। তিনি যে আমাদের পিতা ও তিনিই যে আমাদের জ্ঞান দিতেছেন শিক্ষার্থীকে তা প্রত্যহ স্মরণ করতে হবে। এই যথার্থ জ্ঞানশিক্ষা পেতে হলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা থেকে মুক্ত করতে হবে। ভক্তিভরে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানাতে হবে—হে দেব, হে পিতা, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা কিছু ভদ্র, যাহা সত্য ও শিব তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর। সব অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও॥ শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত আকাশ, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা, প্রভাতের স্নিগ্ধ পুণ্য আলো শিশু-চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চার হয়। প্রভাতের আলো, সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুজীবনের উন্মেষ আপনা থেকেই হয়। বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে এই তরুণ শিক্ষার্থীর দল মুক্তি পেয়েছে।

বৈতালিক শেষ হবার পর ডক্টর সেন উপস্থিত অধ্যাপকমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারপর নিয়ে গেলেন নূতন 'ল্যাবরেটরী' দেখাতে। রাজশেখর বসু মহাশয় শান্তিনিকেতনে 'ফিজিক্স', 'কেমিস্ট্রি' ও 'বোটানী' ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য পাঁচ হাজার টাকার নূতন যন্ত্রপাতি দান করেছেন। পুরানো ও ভাঙা যন্ত্রপাতিও অনেক দিয়েছেন এই ভরসায় যে অধ্যাপক যাঁরা আসবেন তাঁরা যদি এগুলি জোড়াতাড়া দিয়ে বা মেরামত করে কাজে লাগাতে পারেন। তাঁরই নামে গুরুদেব এই ল্যাবরেটরী তিনটির নামকরণ করেছেন "রাজশেখর বিজ্ঞান সদন"। I. Sc. Course খুলবার অনুমতি সময়মতো পাওয়া যায় নি, আর অধ্যাপক নির্বাচনও যথাসময়ে হয় নি বলে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে সেই বছর কোনো ছাত্র ভর্তি করা সম্ভব হয় নি। বাইরে থেকে দুটি

ছেলে ও একটি মেয়ে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করে এখানে ভর্তি হয়েছে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। এই তিনটি মাত্র শিক্ষার্থী নিয়ে সেদিন শুরু হলো শিক্ষাভবনে অধ্যাপনার কাজ। সন্ধ্যার পর দিনের কাজের শেষে আশ্রমবাসী সব ছাত্রছাত্রী পাঁচ মিনিট মৌন বসে বিশ্বজগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁকে অন্তরে স্মরণ করে। বিশ্বস্রষ্টা জলে, স্থলে, অগ্নিতে, ওষধী-বনস্পতিতে সর্বত্রই আছেন—এই কথা মনে করে তাঁকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্ত প্রসারিত নিস্তব্ধ মাঠের মধ্যে খুবই সহজ। তারপর সবাই সমস্বরে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো
বিশ্বংভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"

শান্তিনিকেতনের নির্মল আলোক, নিস্তব্ধ উদার আকাশ, ধ্যানগম্ভীর দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর সবই বিশ্বস্রষ্টার দ্বারা পরিপূর্ণ, একথা মনে করে শিক্ষার্থীর অন্তরে ভক্তির উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। গুরুদেবের নির্দেশে পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানশিক্ষার ভার নিতে হলো; এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে—"বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে মাতৃভাষার সহায়তা অপরিহার্য। বিষয়বস্তু যথোচিত সরল করে তা শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য করে তোলা একটা কঠিন সাধনা। সেই সাধনাকে পরভৃষা দিয়ে ভারাক্রান্ত করলে শিক্ষার্থীর মনকে চিরকালের মতো পঙ্গু করার আশংকা থাকে। পাণ্ডিত্য ও দুরূহ বাক্যজালের আঘাতে শিক্ষণীয় বিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে তাহলে বাইরের স্থূল উপাদানটাই অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে আসল জিনিসটাকে দেবে চাপা। আর, এই অনৈক্যের অভ্যাসটাই শিশুমনে মজ্জাগত হয়ে তার চিন্তাশক্তিতে আনবে এক মারাত্মক জড়তা। তা বলে ওদের বোঝা হালকা করে শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা চলবে না। শিশুমন যতটা স্বভাবত পারে গ্রহণ করবে, না পারে আপনি ছেড়ে দেবে। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না॥" বুঝেছিলাম যে অভিনব উপায়ে গুরুদেব শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন তাতে শিক্ষার সংকীর্ণতা নেই, তাইতেই শিক্ষার্থীর চিত্তক্ষেত্রও হয়ে উঠবে সরস, সুস্থ ও সবল।

অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবার কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন নবীন অধ্যাপক এলেন শান্তিনিকেতনে—সর্বশ্রী অনিল চন্দ, কৃষ্ণ কৃপালনী, অজিত চক্রবর্তী, পুণ্যময় সেন, ক্ষিতীশ রায়, সুধীর রায়, সুধীর গুপ্ত; আর ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে এলেন প্রাক্তন ছাত্র কেশব সেন ('সেবক' নামেই পরিচিত)। বিশ্বভারতীতে তখন অধ্যাপক ও কর্মি-মণ্ডলীতে ছিলেন খ্যাতনামা কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিত—সর্বশ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, নন্দলাল বসু, তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, নেপালচন্দ্র রায়, প্রমোদারঞ্জন ঘোষ, ক্ষিতিমোহন ঘোষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেজেশচন্দ্র সেন, মৌলানা জিয়াউদ্দীন। এ যেন এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সমাবেশ, নিজ নিজ ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রভায় সমুজ্জ্বল। শাস্ত্রীমশাই, ক্ষিতিমোহন-বাবু ও নন্দলালবাবু ছাড়া সবাই মাইনে পেতেন মাসিক ৭৫৲ টাকা করে। তখন-কার দিনে একটা মস্ত বৈশিষ্ট্য ছিল এই বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না [যেমন প্রফেসর, রীডার, এ্যাসিস্‌টেন্ট প্রফেসর, লেক-চারার, এ্যাসিস্‌টেন্ট লেকচারার ইত্যাদি], কোনো বেতনক্রম (Scale of Pay)ও ছিল না। সবাই অধ্যাপক, প্রয়োজন-বোধে কর্মসচিব আচার্যের অনুমোদন নিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে টাকার অংকটা বাড়িয়ে দিতেন। একদিন এই মাইনের ব্যাপার নিয়ে বাইরের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি গুরুদেবকে অধ্যাপকদের যোগ্যতা অনুসারে বেতনক্রম প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন যে, যোগ্যতা না থাকলে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হওয়া যায় না। পাণ্ডিত্যের মাত্রা ও অভিমান নিয়ে যেদিন থেকে এখানে অধ্যাপকদের শ্রেণীবিভাগ ও বেতনক্রম নির্ধারিত হবে সেদিন থেকেই শুরু হবে তাঁদের মধ্যে ঈর্ষার প্রচণ্ড সংঘাত, সৃষ্টি হবে শিক্ষাবিরোধী অবাঞ্ছিত ও অস্বাস্থ্যকর এক পরিবেশ। লেকচারার সব সময় সচেষ্ট থাকবেন রীডার বা এ্যাসিস্‌টেন্ট প্রফেসর হতে, রীডারের ভাবনা হবে কী করে প্রফেসর হওয়া যায়। কিছু বেশি টাকা ও পদমর্যাদার লোভে শিক্ষক-সমাজের ভিতরে হয়তো এক দুষ্টচক্র ও দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। অধ্যাপক তাঁর অসল প্রতিভার ও গুণে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন; এর জন্য শ্রেণী সৃষ্টি করা শুধু যে নিরর্থক তা নয়, অবাঞ্ছিত অনেক সমস্যার সৃষ্টি করা। তিনি আরও বলেছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার বিষের সৃষ্টি হতে দেবেন না। যদি কখনো এই বিদ্যায়তনে আর্থিক সচ্ছলতা আসে তখন প্রত্যেকের মাইনের অংকটা সমহারে বাড়াতে হবে, আর প্রত্যেকের প্রয়োজন বিচার করেই এই বৃদ্ধির মাত্রা নির্ধারিত হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থের সমাগমে মনুষ্যত্বের বিকৃতি ও অনর্থ ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। এই বিদ্যায়তনে খুবই আর্থিক অসচ্ছলতা, তাই কর্মী-দের বেতনও খুবই কম। এই স্বল্প মাইনেতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এখানে অধ্যাপনার কাজে প্রবৃত্ত, তাই পরস্পরের প্রতি তাঁদের কোনো ঈর্ষা নেই। প্রাচুর্যের ভিতর দিয়ে সত্যিকারের মানুষ গড়ে ওঠা কঠিন।

অধ্যাপনার কাজে প্রথম থেকেই বোঝা গেল যে, শিক্ষাভবনের বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পড়ানো মোটেই কঠিন নয়। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তাঁদের যোগ থাকায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তাঁদের বোধগম্য সীমায় পৌঁছে দেওয়াটা সহজ। কিন্তু পাঠভবনের ছোটো ছেলে-মেয়েদের বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজটা রীতিমতো কঠিন। এতে প্রথম প্রয়োজন মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে যথোচিত সহজ ও সরল করে পরীক্ষার সাহায্যে ব্যাপকভাবে তার মূল সূত্রগুলি পরিবেশন করা। অল্প বয়েস থেকেই শিক্ষার্থীকে হাতে-কলমে এ সব পরীক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে, তাতে যন্ত্রপাতির যদি কিছু লোকসান ঘটে তো ঘটুক। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি কী অসীম আগ্রহ, প্রবল উদ্দীপনা ও অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের পরীক্ষাগুলি অনুধাবন করতো! শিক্ষার্থীর চিত্ত-ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। জ্ঞানের সেই পরিবেশন কার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জন করা আবশ্যক। শিক্ষা যাত্রা শুরু করেছে, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা দরকার; এই প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা অপরিহার্য। ভাষার মাধুর্যে ও ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকলে বিজ্ঞান এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না।

হাতে-কলমে কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে ছেলেমেয়েরা এমন

নিষ্ঠা ও অপরিসীম যত্ন সহকারে বিজ্ঞানের পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করতে শুরু করলো যে তা সত্যিই বিস্ময়কর। যন্ত্রপাতির কোনো লোকসান ছোটোদের হাতে ঘটেনি, সামান্য যা-কিছু ঘটেছে তা কলেজের বয়স্কদের হাতেই। এ কথা আজ জোর করে বলতে পারি প্রতি পদে বাধা-নিষেধের গন্ডীতে ছোটোদের আবদ্ধ না রেখে তাদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে কোনো কাজের ভার ছেড়ে দিলে অতি সুন্দরভাবে তারা ঐ কাজ সমাধা করে। একদিন সকালে অষ্টম শ্রেণীর (যতদূর মনে পড়ে) ছেলে-মেয়েদের বায়ুর চাপ সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা দেখানো হচ্ছে, হঠাৎ নজরে পড়ল তাদের মধ্যে মনোযোগের কিছু শিথিলতা, থেকে থেকে সবাই যেন দরজার দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি গুরুদেব দরজায় দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ টেবিলের উপর সজ্জিত যন্ত্রপাতির দিকে। এগিয়ে গেলুম তাঁর কাছে, এবার তিনি ল্যাবরেটরীর ভিতরে ঢুকে সোজা টেবিলের কাছে এসে যন্ত্রগুলি সাগ্রহে দেখে নিলেন, তারপর বললেন—"এবার অধ্যাপনা শুরু কর, বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত নেই।" আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীর সামনে ক্লাশ পড়াব এমন বড়ো দুঃসাহস নেই। চুপ করে রইলুম, আমার শোচনীয় অবস্থাটা নিমেষে উপলব্ধি করে একখানা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়লেন; বললেন—"এবার আমি শিক্ষার্থী, তাকে তো আর বঞ্চিত করা চলবে না।" কাজেই অসমাপ্ত পরীক্ষাগুলি শেষ করতে হলো, তারপর ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করে জবাব নিচ্ছি কতটুকু তারা বুঝলো। এই সময়ে মুক্তি দিল "ঘণ্টাকর্ণ", অর্থাৎ ঘণ্টা বাজিয়ে ক্লাশের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলো। লোকে বলে দৃষ্টির সার্থকতা, সেদিন বুঝলাম শোনার সার্থকতা বলেও একটা কথা আছে। শুধু তাই নয়, একটা কঠিন পরীক্ষার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। জীবনে বহু পরীক্ষা দিতে হয়েছে, কিন্তু এই অগ্নিপরীক্ষার সঙ্গে তাদের যেন তুলনাই হয় না। "ঘণ্টাকর্ণকে" সেদিন প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলুম। ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ করে বললেন—ছাত্র হিসেবে তিনি বরাবরই খুব শান্ত ও সুবোধ; এ বিষয়ে তাঁর একটু সুখ্যাতিও ছিল, এই ক্লাশে তার প্রমাণ দিয়ে গেলেন। ঔৎসুক্য ও আগ্রহের কিছু অভাব দেখান নি। একটা গল্প বললেন—ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়তেন, পড়াশুনোয় বিশেষ মন ছিল না, তাই ছাত্র হিসেবে সুখ্যাতি ছিল না মোটেই। একবার স্কুল ইন্স-পেক্টরের আগমন উপলক্ষে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছেলেদের প্রাইজ দেবার আয়োজন করলেন। প্রত্যেকটি ছেলেই কোনো-না-কোনো বিষয়ে প্রাইজ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হলো, শুধু তিনিই বাদ পড়লেন। শান্ত ও সুবোধ বলে পণ্ডিতমশাই ওঁকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি হেডমাস্টার মশায়কে বললেন, 'রবিকে' একটা Good Conduct-এর প্রাইজ দেওয়া হোক। জীবনে নাকি সেই প্রথম একটা প্রাইজ পেয়েছিলেন, আর দ্বিতীয়বার পেয়েছেন পরিণত বয়সে বিদেশ থেকে (নোবেল প্রাইজ)।

সেদিনই সন্ধ্যার পর গুরুদেব ডেকে পাঠালেন উত্তরায়ণে। গিয়ে দেখি ডক্টর সেন রয়েছেন ওঁর কাছে। বললেন—"তোমার উপর একটা ভার দিতে চাই, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে 'লোকশিক্ষা' পাঠগ্রন্থ প্রণয়নের কাজ। লোকশিক্ষার ভূমিকাটা একটু বুঝিয়ে বলি—শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। এই কাজে ভাষা হবে সহজ, সরল ও যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়-বস্তুর দৈন্য থাকবে না। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহুব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ দেশের অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার দুঃসহ ভার বহন করে দেশ কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে, যত দ্রুত এবং যত ব্যাপকভাবে এই দুঃসহ ভার লাঘব করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়া

কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশংকা প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের জন্য সর্বাংগীণ শিক্ষা অচিরাৎ আবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার। লোকশিক্ষা গ্রন্থ প্রকাশে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই হবে তোমার কাজের উদ্দেশ্য। তাই, জ্ঞানের এই পরিবেশন কার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে। আমি বিজ্ঞানের সাধক নই, তবে বিজ্ঞানের সংগে প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা কীভাবে গ্রহণ করতে হবে ও কীভাবে লোকশিক্ষাদান সংকল্পকে সার্থক করে তুলতে পারা যায় সে বিষয়ে নিঃসংকোচে আমার সাহায্য নিতে পার। নিশ্চয় জানো, বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ছড়িয়ে পড়ে দেশবাসীর চিত্তক্ষেত্রে, তাই ধীরে ধীরে সেখানে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে, দেশ অভিষিক্ত হয়ে ওঠে বিজ্ঞানশিক্ষার অমৃতধারায়। বিজ্ঞানের সংগে প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সে সব দেশ 'তাদের' সাহিত্যের সহায়তা গ্রহণ করেছে। এই কর্তব্যসাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা শুধু যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তা নয়, ভাষা প্রয়োগেও তাঁরা খুবই নিপুণ। বিষয়বস্তু যথোচিত সরল করে তা জনসাধারণের আয়ত্তগম্য সীমায় পেঁছে ভাষায় সকলেই তাঁদের অসাধারণ। উচ্চতর স্তরের দান নিম্নতর স্তরে নিত্যই বর্ষিত হয়ে উর্বরা করে তুলছে তাঁদের দেশের চিত্তভূমিকে। অনেক বিজ্ঞানী আমাদের দেশেও আছেন, কিন্তু তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে সহজ মাতৃভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এখানে বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে থাকে একান্তভাবে বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়ে। অনভ্যস্ত এই ভাষায় সে-শিক্ষা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে না। দেশের প্রাণের ধারার সংগে এই শিক্ষার যোগ খুবই কম, তাই দেশের শিক্ষা ও তার বৃহৎ মন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই বিদ্যার অভাবে অন্ধসংস্কার, অপবিশ্বাস ও মূঢ়তা আজ অবাধে জাতির বুদ্ধিবিকার ঘটিয়ে তাকে চরম দুর্গতির পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই সর্বনেশে নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানশিক্ষার ভূমিকা করে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। একে পুণ্যকাজ বলেই গ্রহণ করতে হবে।" এর পর **Sir James Jeans**-এর নতুন লেখা **"Through Space and Time"** বইখানা দিয়ে বললেন—"বই লেখার কাজে অনেক সাহায্য পাবে এ ধরনের বই থেকে। এই বইখানা খুব ভালো লাগলো. সাহিত্য-রসে পুষ্ট ওঁর লেখা। এতে একদিকে রয়েছে যেমন ছোটদের খোরাক, তেমনি খোরাক সংগ্রহ করতে পারে আমাদের মতো ৭২ বছরের তরুণমনের বুড়োরাও। বয়েস আমার ৭২ হয়েছে ঠিকই. কিন্তু তা বলে এখনও 'বাহাত্তুরে' হইনি. ছাত্র-মনোভাবের সাধনায় এখনও প্রতিদিন নিজেকে শিক্ষা দিয়েই চলেছি।"

[ক্রমশ]

[৩১০৪ পৃষ্ঠার পর]

ন্যাড়া ধুদে ধুদে পার্কগুলো খাঁ খাঁ করছে এবং হতভাগ্য কোনো কোনো পথচারী. রিক্সাওয়ালা বা ঠেলাওলা কালকেউটের ছোবলখাওয়া মানুষের মতো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে মুহূর্তের মধ্যে।

আশার কথা. পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে গ্রীষ্মকালে মৃত্যুর বাজার-দর এখনও এতটা সস্তা হতে পারে নি। উদাহরণ হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা বলা যায়। শহর বা মহানগরী-গুলোর আবহাওয়া যাতে দূষিত না হয়, সেজন্যে বিশেষ আইন আছে সে দেশে। আর এ ছাড়া আছে শহর-নগরের বিজ্ঞান-সম্মত পরিকল্পনা। ঘিঞ্জি ঘরবাড়ি নেই, অপরিসর রাস্তা নেই, আলো-হাওয়া বন্ধ করে বস্তি নামক মানুষ-মারার খাঁচাকল নেই; সেখানে আছে প্রশস্ত রাস্তা, ছাড়া ছাড়া ঘর-বাড়ি, সুদৃশ্য উদ্যান এবং সুবিন্যস্ত সব পার্ক। সেখানে শিল্পকেন্দ্রগুলোকে ঘিরে ছোট ছোট সব শহর গড়ে উঠছে। প্রচুর আলো সেখানে, প্রচুর হাওয়া। সেখানকার পার্কগুলো ঘাস ও গাছ-পালার দাক্ষিণ্যে ঘন সবুজ; আবার বাতাসও ধোঁয়া ও ধুলোর দাক্ষিণ্য থেকে প্রায়-মুক্ত। সেদেশে নতুন গড়ে-ওঠা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে শহরের ভেতরে নয়, যথাসম্ভব বাইরে রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ, শহরতলীকে গুরুত্ব দিয়ে শহরকে বাঁচানো হচ্ছে।

এদিকে গ্রীষ্মকালে বড় শহরগুলোর অবস্থা ভবিষ্যতে কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে এখনই ভাবতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। বলছেন, পৃথিবীতে কয়লা, গ্যাস, জ্বালানি ইত্যাদি পুড়িয়ে এবং কল-কারখানা চালু করে প্রতি বছর যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তা হল প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারের হিসেবে সূর্যকিরণ থেকে প্রাপ্ত তাপের ২০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। কিন্তু বড় বড় শহরে এই তাপের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২০০ ভাগের ১০ থেকে ২০ ভাগ।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলছেন, যে হারে তাপের উৎপাদন বাড়ছে, তা দেখে মনে হয়. আগামী ৭০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে মানুষের উৎপাদিত তাপ সূর্য থেকে পৃথিবীর পাওয়া তাপশক্তির সমান হবে। অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার জায়গা এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ তাপ লাভ করবে আগামী দিনে এবং ভালো কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোর অনেকেরই তাপমাত্রা মানুষের সহ্যসীমাকে ছাড়িয়ে যাবে।

কারিগরী বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে অনেকেই ভরসা দিচ্ছেন, তাপমাত্রাকে প্রশমনের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আগামী দিনে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

আমরা বলি, সব জায়গাতেই কি সম্ভব হবে? আমাদের ভারতবর্ষেও? যে হারে এ দেশে দারিদ্র্য বাড়ছে, গ্রীষ্মের দহনে বড় শহরগুলোর মৃত্যু-সংখ্যা বাড়ছে, অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন না হলে আগামী দিন সম্পর্কে সে দেশের মানুষ আশান্বিত হবে কোন্ সাহসে।

রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য

সব রকম সর্বজনীন পুজোর জন্য ছোরা-দেখানো ট্যাক্স-আদায়ের চোঙা-প্যাণ্ট, বেকার মস্তানরা এবার দেখছি অষ্টাহব্যাপী সর্বজনীন শেতলা (শীতলা নয়) পুজোয় মত্ত হয়ে উঠেছে। মা শীতলা নিতান্তই জড় মৃন্ময় মূর্তি, চক্ষু থাকলেও দেখতে পায় না, কান থাকলেও শুনতে পায় না, মুখ থাকলেও কথা কইতে পারে না; তাই ভক্তদের অহোরাত্র হিন্দী গানের মাইক, খিস্তি ও মত্ততা দেখেও ওর কোন বিকার হয় না: কিন্তু অসহায় পাড়া-বেপাড়ার লোকেদের চক্ষু-কর্ণ-মুখ থাকলেও বম্‌ভোলার প্রথম নৃত্যের ভয়ে ও ত্রাসে সেকালের নববধূর মতো এবং অহিংস মন্ত্রশিষ্যের মতো সকুণ্ঠ লজ্জায় ঘোমটা তারা টেনে নীরব থাকে। আশঙ্কা করছি পলিটিকাল সর্বজনীন দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজোর মতো সর্বজনীন রবীন্দ্র পুজোও না পার্টিদাদাদের আশীর্বাদে বা আনুকূল্যে নিরক্ষর গুন্ডা ভলাণ্টিয়ার-দের হাতে গিয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও পড়েওছে; সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্য যেসব "বি-শুদ্ধ" বাংলা নোটিশ আসে ভালো ভালো ছাপা প্যাডে, তাতে এর অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কেন না, এতেও শেতলা পুজোর কর্ণবিদারী মাইকের অনিয়ন্ত্রিত পরামিশান তো আছেই, আরও এমন সব মজা আছে, যা সংস্কৃতির নামে শালীন ও ভদ্রস্থ করা যায়। সুতরাং, পুরোনো ইমেজ তুলে মস্তানী ইমেজ এল বলে।

রুদ্র বৈশাখের পঁচিশে ডাক পৌঁছোয় 'কেলাবে' 'কেলাবে' বেসুর-বেতালা নৃত্যনাট্যের মহড়া চলে উদ্ভিন্ন যৌবনের, তারপর যে পরিমাণ অস্থির প্রসন্নতায় একদিন তা চরিতার্থ হয়, ঠিক সেই পরিমাণ স্থবির বিজ্ঞতায় তার অন্ত্যেষ্টিও ঘটে একদিন। কর্ণপীড়া ও ঢক্কা-নিনাদিত ও পত্র-বিজ্ঞাপিত অনুষ্ঠানে যাই নে। কেন না, যেসব দুর্ভাগ্য-তাড়িত প্রলুব্ধ যশঃপ্রার্থী উদীয়মান বা অস্তমান সাহিত্যিকেরা উদ্বোধন ও রবীন্দ্রতত্ত্ব বিজ্ঞাপনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তাঁদের নাচ-গান-হল্লার সংস্কৃতি-পিপাসু ও স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা এবং আর্টিস্টদের অকারণ শৃঙ্খলা-কঠিন তৎপরতায় কি দুর্গতি হয়, তা দেখেছি এবং এখন না-দেখেই অনায়াসে কল্পনা করতে পারি। তবু ঐ চানাচুর-ফুচকে মেলার বাইরে রবীন্দ্রানুরাগী বা নিয়মরক্ষার ব্যবসায়ী সংবাদপত্রে, সাপ্তাহিকে বা অন্য কোনো সাময়িকীতে যেসব লেখা বেরোয়, তার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে কোন-কোনটা মনো-যোগ দিয়ে পড়েও ফেলি। সন্দেহ নেই, অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার ভাব-সম্প্রসারণ বা একনিষ্ঠ স্তুতি, কিন্তু দুটি-একটি চমকও জাগায়। ভাবায় বা মনে লাগে, হয়তো বা কিছু বিরাগেরও সৃষ্টি করে।

এমনি একটা লেখা চোখে পড়ল এবং প্রথমবার চোখ বুলিয়ে দ্বিতীয়-বার খতিয়ে খতিয়ে পড়লাম। লেখাটা বেরিয়েছে ২৮শে বৈশাখ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়: শিরো-নামার প্রথম লাইনে আছে সোজাসুজি/ সন্তোষকুমার ঘোষ, দ্বিতীয় লাইনে আছে একটু বড় অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য।

তিন-কলমব্যাপী সংবাদে যেমন একটা সামারি থাকে, এতে তাও আছে এবং এটিই আমার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ।

"পঁচিশে বৈশাখ সবে গেছে, এখনও তার মৌশুম চলছে। ওই মৌশুমী ফুলের চাষ বেশ কিছুকাল যাবৎ পাইকারী, মানে পঁচিশে বৈশাখ আমাদের রীতিমত একটা ফলাও ইনডাস্ট্রি সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর

এ কথাটি আমার দীর্ঘকালের বক্তব্য; কিন্তু আমার শোনাবার লোক কম, ক্ষেত্র কম, তাই ঐ ক্ষীণকণ্ঠে কর্ণপাতও করেছে কম লোকেই বা করেই নি। আমার কথা ছিল রবীন্দ্র উদ্যানে তো নানা সবুজ সতেজ রসালো চির-বসন্তের উদ্ভিদও ছিল কিন্তু 'ফলাও ইনডাসট্রি' ক্যাকটাসের ঝাড়ের মত একটাতেই সীমাবদ্ধ হল কেন? রবীন্দ্র-চর্চা হয় না তো—সুনিশ্চিত পাঠ্য-পুস্তকের হাতছানি না দেখলে। যা হয় তা ঐ 'কেলাবে' 'কেলাবে' নৃত্যনাট্যের হল-চালনা। তবে, আমার মতে, এজন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বও কিছু কম নয়। এককালে পলিটিকাল সর্বজনীন দুর্গাপুজো সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে যে উদ্দেশ্য নিয়েই সুরু হোক, তা কালক্রমে সংক্রামক দুরারোগ্য ব্যাধির মতো মস্তানদের আনন্দ-উপলক্ষ হয়ে উঠেছে, যেমন করে, নাচ-গান-নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথের অনর্গল এমফ্যাসিস দেওয়া ও শিষ্যসামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতার ঢালাও ঔদার্যও ব্যাধি-বিস্তার ঘটি-য়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের গান, নৃত্যনাট্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বটে, কিন্তু সত্যি-মিথ্যে হলফ করে বলতে পারি নে, শুনেছি রবীন্দ্রনাথও কোন একসময় দুঃখ করে বলেছেন, তাঁর গানের ওপর স্টীম-রোলার চলেছে। তবু অনেকেই তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই ইনডাসট্রি যে গড়ে চলেছে ও অনেক মেয়ের ম্যারেজ-রিহার্সালের বিষয়ীভূত হয়েছে, এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য। গান ও নৃত্যনাট্যের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ আছেন নিঃসংশয়, কিন্তু তাই যে সর্বস্ব হয়ে উঠল, আরও যে কোথাও তিনি আছেন, তার ওপর তিনিও খুব জোর দিয়েছেন, এ বলতে পারব না। 'রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্যের' এও এক সূত্র।

তবু আশ্চর্য হয়েছি ভেবে, বিশাল আত্মিক সত্যের কোথাও চাষ হচ্ছে

থেকে এমন সব দুর্ভাগ্যের বর্ণনার সাহস দেখালেন কি করে সন্তোষকুমার ঘোষ। জানি, ক্ষেত্রবিশেষে 'বাহবা বাহবা, বেশ' বলবার পার্শ্বচর তাঁর কিছু কম নেই। এত জানি, শান্তিনিকেতনে অধুনা এমন বিপ্লব চলছে যে, প্রধানত তা কিছু নবাগত অধ্যাপকদের (মানে, লেকচারারদের) মধ্যেই প্রবল। আকাশ-বাণী প্রসাদাৎ ছাত্রদের মধ্যে বিস্তারিত এই বিদ্রোহের বাণীও শুনেছি। শুনেছি, "রবীন্দ্রনাথের প্যারাডাইস লস্ট"-এর কথা। কেন না, তা নিয়ে কথা পাড়ব না, কোন এক স্পর্শকাতর অশরীরী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় দুর্গাপুরের দূরত্ব থেকেও এক হাত দেখে নেবেন।) অত-এব সে প্রসঙ্গ থাক। কথা হচ্ছে, কোথায় যেন একটা সংশয়ের বাষ্প ছড়াচ্ছে; হয়তো বা ডেনমার্কের সব-কিছুই ভাল নয়।

এবারকার সাপ্তাহিক দেশ-এর বিজ্ঞা-পন সংখ্যায় (২৫ বৈশাখ ১৩৭৭) রবীন্দ্রনাথের অশেষ অপ্রকাশিত পত্রের (বৃহৎ ২৯ পত্র) একখানিতে সখেদে লিখেছেন :

"যেসব ছাত্র আমাদের বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা সকলে আশ্রমের আদর্শকে জীবনের মধ্যে জাগ্রত করে রাখতে পারচে না শুনে খুব বেদনা বোধ করলুম। কিন্তু এই বেদনার প্রয়োজন ছিল। আমরা মনে মনে ঠিক করে বসেছিলুম যে, কাজ হচ্চে। কিন্তু সে পরিমাণ মূল্য দিচ্চি তার চেয়ে বেশি পরি-মাণ পাওয়া যাচ্চে এমনতর হিসাব যদি খাড়া করা যায় তাহলে নিশ্চয় বুঝতে হবে কোনো একটা জায়গায় হিসেবের ভুল হচ্চে।...... আমাদের ছাত্রেরা কি রকম হচ্চে সেটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব বললেই হয়, কিন্তু আমরা কি হচ্চি সেটা বোঝা শক্ত হলেও সেটা অপেক্ষা-কৃত সহজ......। আমাদের ছেলেরা সর্বত্র প্রশংসাভাজন হচ্চে এই সংবাদের দ্বারা অত্যন্ত সস্তায় আমরা তৃপ্তি ও গৌরবলাভের ইচ্ছা করি।"......ইত্যাদি

চিঠিটার তারিখ ২০ ফাল্গুন ১৩১৯, লিখেছেন ৫০৮, ডবলিউ হাই স্ট্রীট, আর্বানা, ইলিনয় থেকে।

আমি আমার "স্বদেশী গ্রন্থের চার অধ্যায়" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" সমালোচনাকালে লিখেছি : "অপ্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় চার অধ্যায়ের লেখক রবীন্দ্রনাথের নিজ-হাতে গড়া শিক্ষানিকেতন থেকে উৎসারিত যথার্থ পুরুষ ও যথার্থ মেয়ের সাংস্কৃতিক সম্মেলনগুলোর দৃষ্টান্ত অতীন্দ্রের ব্যঙ্গোক্ত কাপুরুষে সন্ন্যাসীদের মঠগুলোর অপযশ ঘোষণায় উদ্ধার করলাম না। শুধু এইটুকু বলা চলে যে, অতিদুঃখী বাংলা মায়ের কল্যাণ ও সেবা ঐ কাপুরুষদের দিয়েই হয়েছে, যথার্থ পুরুষ-মেয়ের সাংস্কৃতিক ক্লাব-গুলোর দ্বারা নয়।" এর পাঁচ পৃষ্ঠা আগে তৃতীয় বন্ধনীতে বলেছি : [এখানেও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দর মানুষ-গড়ার রীতির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে; শুধু চিরকুমার সভায় সেই পার্থক্য প্রতিফলিত নয়; তাঁর পরবর্তী ঘরে-বাইরে-তে মক্ষি-রাণীও সেই পার্থক্যের দর্পণ।] এবং উপসংহারে বলেছি: চার অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রথম মশালধারী মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের অনেক উপহাস, অনেক নিন্দা করেছেন; তাঁর আশ্রমের শান্ত পরিবেশ থেকে একটি রামমোহন, একটি বিদ্যাসাগর [হ্যাঁ, একটি বিবেকানন্দ]-এর মতো বলিষ্ঠ মানুষ আমাদের মত হীন পতিত অমানুষদের মধ্যে যদি এসে দাঁড়াতেন—ঐ উপহাস, ঐ নিন্দা শিরো-ধার্য করতাম। কিন্তু বাংলা দেশে যদি বীর্যবান ব্যক্তির স্বীকৃতি ঘটে থাকে, তবে ইংরাজকথিত টেররিস্ট বা এনা-র্কিস্টরাও সমভাবে স্মরণীয়।"

স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ ও উপলক্ষ করে বাংলাদেশে অনেক বীর্য-বানের আবির্ভাব ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথের শান্তি-শ্রীনিকেতন থেকে এমন একটিও বলিষ্ঠ মানুষ বেরিয়ে এসেছেন দৃষ্টান্ত পেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এমন কথা বলিনে যে, বিবেকানন্দর প্যারাডাইসও লস্ট হয় নি, কিন্তু দীর্ঘকাল বিবেকা-নন্দকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে বিদ্যা-সাগর-পরবর্তী যুগে বলিদানে নির্ভীক-চিত্ত কোন মানুষ জন্মায় নি। রবীন্দ্রনাথের প্যারাডাইস যদি লস্ট হয়ে থাকে, তবে তার অনেকখানি দায়িত্ব নিউ এম্পায়ারজাতীয় রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্র-মেলাজাতীয় মেলা।

রবীন্দ্রনাথ আরও এমনি একখানি চিঠিতে চিকাগোর গ্রোভল্যান্ড এভিনিউ থেকে ১৯১৩ খৃস্টাব্দের ২৭শে মার্চ লিখেছিলেন :

"আমাদের দেশে কিছুকে বাঁচিয়ে তোলা এবং বাঁচিয়ে রাখা প্রাণান্তিক ব্যাপার, অহোরাত্র মৃত্যুর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে হয়—কেন না জীবনগত শ্রদ্ধা সেখানে বড় দুর্বল, সেই জিনিসকে জাগিয়ে তুলতে পারি নি সেইজন্য ছোটো-খাটো বাধা এবং আত্মাভিমানে আমাদের সমস্ত তপস্যা শতছিদ্র এবং জীর্ণ হয়ে পড়ে।......আমাদের দেশে যে দৈন্য সে কেবলমাত্র চরিত্রের দৈন্য—আমাদের সম্পদকে আমরা দৃঢ় শক্তিতে ধারণ করে রাখব এবং স্থায়িভাবে পোষণ করতে থাকব এমন প্রশস্ত আধার আমাদের নেই—মধুসূদন আমাদের কলঙ্কভঞ্জন করলেন না, প্রতিপদে কেবল দর্পচূর্ণই করচেন, আমাদের শতছিদ্র ঘট দিয়ে মঙ্গলবারি শত-ধারায় ঝরে ধুলোয় পড়ে গেল; বিশ্বের লোক চেয়ে চেয়ে দেখলে কতবার কত গর্বই করলুম, তাতে কলঙ্ক আরো গভীর হয়েই উঠল।"

রবীন্দ্রনাথের প্যারাডাইস লস্ট নিয়ে বাংলা গত সালের শেষভাগে (এই ধরুন, ও বছরের ফাল্গুন নাগাদ) আর এই বছরের ইংরাজী ফেব্রুয়ারী নাগাদ বিতর্ক কিছু মুখর হয়ে উঠেছে। সন্তোষ ঘোষের লেখাটা বেরিয়েছে বৈশাখের শেষে মের মাঝামাঝি খর-রোদ্রে; স্বভাবতই কিছু তপ্ত, কেথাও অনুতপ্ত। সন্তোষকুমারের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও পদভার সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, তাঁর এ লেখার ধার ও ভারের স্বীকৃতিও সুনিশ্চিত। আমার ভাবনা, কথা-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক "এমন দিনে" তাঁরে "বলা যায়" মনে করলেন কেন?

সন্তোষকুমার রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্যের তালিকায় প্রথম স্থান দিয়ে-ছেন তাঁর "এই দেশে জন্ম।" রবীন্দ্র-নাথের মতো না হলেও কিছু কিছু বিদেশ-ভ্রমণফেরৎ সন্তোষকুমারেরও মনে কি এই খেদ? "সার্থক জনম আমার" গানটিতে আপত্তি?

রবীন্দ্রনাথের কোন লেখায় আমার চোখে এই আফশোষ পড়ে নি। তবে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে অবশ্যই তিনি একবার বলেছেন :

"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্য-ময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরু হৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।"

একথা কি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও

প্রযোজ্য আর? প্রযোজ্য নয়, এ কথা-গুলোও হবে ঃ

"সেই জন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গ-দেশে একক ছিলেন। এখানে যে স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য-সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।"

একাধারে চিন্তানায়ক ও কর্মযোগী ভাগ্যেই নিঃসঙ্গতা ও নির্বাসন-দণ্ড। কিন্তু এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এবং রামমোহনের তুলনাই হয় না। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে যে নিঃসঙ্গতা ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, রবীন্দ্র-নাথকে সে দুর্ভাগ্য সমপরিমাণে স্পর্শ করতে পারে নি। ভাগ্যে পথিকৃৎ রাম-মোহন ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর যে অসাধারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তায় নির্বোধ বিরোধিতার সরব আস্ফালনকে নির্বীর্য করে দিতে পেরেছিলেন তাতে রবীন্দ্র-নাথেরই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

আর রামমোহন ও বিদ্যাসাগর কারা? এ দেশেরই [illegible]-ব্রাহ্মণসঞ্জাত বিদ্রোহী ছাড়া আর তো কিছু নয়। যে জড়বাদ পৌত্তলিকতা জাতির অগ্রগতিকে [illegible] সৃষ্টি করেছিল তাকেই না [illegible] করে শান্তি-[illegible] এবং তবেই না বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের সুধালোক ছড়িয়ে পড়তে পারল এই সাধকের জন্মের দেশে? একথা সর্বদাই প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ একচক্ষু জড়বাদী পাশ্চাত্য দেশে উপনিষদের পূর্বালোক ফেলে সেখানকার বিদগ্ধজনকে চমকিত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মাঝে বস্তুত সেই শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃর ধারা প্রবাহিত হওয়াতেই বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যের প্রতীচ্য অনাবিষ্কৃত চাঁদের আর একটা দিকও দেখতে পেয়েছে। এ বাদ দিলে রবীন্দ্র-নাথের থাকে কি? পশ্চিমের কথাই পশ্চিমা ভাষায় বলতে গিয়ে বঙ্কিম ও মধুসূদন-তরু-অরু কি অভ্যর্থনা-সম্বর্ধনা পেয়েছেন তা কি কারও অজানা? রবীন্দ্রনাথ যদি মহীরুহ, তবে তাঁর মৃত্তিকার গভীরে সঞ্চারিত মূল থেকেই পেয়েছেন তিনি অফুরন্ত রস এবং তা পাবার স্বীকৃতিই তো ঐ গান—নিছক স্বদেশী ভাবোদ্দীপনার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যা তা তাঁর জন্মস্থান বাংলা-ভারতেরই—মহীরুহ তার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখায় পত্র-পুষ্পে নিশ্চয়ই টেনে এনে বিশ্ব-বায়ুমণ্ডলের রসও গ্রহণ করেছেন।

আর অপবাদ, অপব্যাখ্যা, কুৎসা? সন্তোষকুমার একবার রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের জীবনীর পাতা-গুলো উল্টে দেখতে পারেন। সেদিক থেকে তৌলদণ্ডে তুললে রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য [illegible] অংশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সংগত কারণেই যে যোগ্য মর্যাদা, সম্মান, শ্রদ্ধা জীবদ্দশায়ই পেয়েছেন এবং আজও যা কৃতজ্ঞতা-চন্দনে অব্যাহত আছে, তার পরিমাপে দেখলে তাঁর পূর্বসূরীদের অতি হতভাগ্য মনে হবে। দয়ার সাগর কারও সামান্য দুঃখেও যেভাবে অশ্রুপাত করেছেন, মাইকেল যাঁর হৃদয়কে মাদার্স হার্ট বলেছেন, সেই দুর্ভাগার জন্য অশ্রুপাত করার জন্য বাংলাদেশেই কটি লোক আছে? সুতরাং, "সার্থক জনম আমার" (হ্যাঁ, এই কলকাতাই) গানটি কোন ভুলের ফসল নয়; রবীন্দ্রনাথের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে এখানেই, পিতৃদেবের জমিদারীতে তার অবাধ চাষের সুযোগ পেয়েছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন এবং গান লেখার জন্য বিত্তবান পিতৃদেবের রাজ-পুরস্কারটা পাঠকের টেলিপ্রিন্টারের খটখটানিতে ভুলে যাবেন না যেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটির লক্ষ্য ছিল কলকাতাও নয়, এই বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষও। কেন না, বাংলাদেশ, সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যসভ্যতার আহরণের সুযোগ পেয়েও এবং ক্ষণিক বিভ্রান্তি সত্ত্বেও, ভারতের ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে নি; বরং বিদ্রোহী উন্নত বাংলার প্রতি অসূয়াবশত অপযশ-প্রচারে ও অনিষ্ট-সাধনে কুণ্ঠাবোধ করে নি মহাভারতের অন্য প্রত্যঙ্গগুলো। বিদ্যোৎসাহী সন্তোষকুমার রবীন্দ্রনাথের বহু লেখার মধ্যে বাংলার প্রতি একান্ত ও বিশেষ মাতৃ সম্ভাষণও পড়ে থাকবেন। সুতরাং, এ কোন কথার কথা নয়, আফশোষের
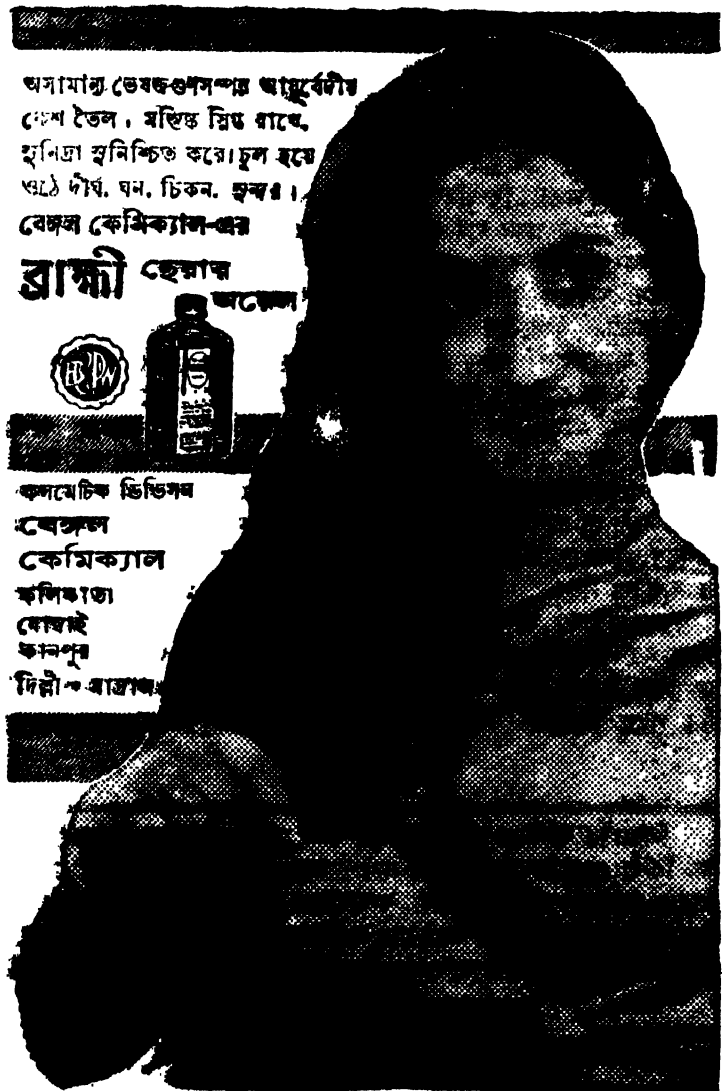
জন্যে নয় যে, এ দেশে জন্মগ্রহণকে তিনি সার্থক মনে করেছেন। দৃষ্টান্ত অপরিমেয় কিন্তু এক চারিত্রপূজাই কি যথেষ্ট নয়? যথেষ্ট নয় বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি? তাঁর বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন প্রচেষ্টা? তাঁর সেই বাংলার মাটি বাংলার জল? শান্তিনিকেতন তাঁর একটা ভাবনার নিরীক্ষা-পরীক্ষার ক্ষেত্র মাত্র, শহরের প্রতি বিরাগবশত তো নয়ই। এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেছেন। আজ সেখানে তীর্থযাত্রীরা আসে, রবীন্দ্রভারতীও এখানেই।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম সন ১৮৬১কে সন্তোষকুমার কি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক মনে করেন? আমার আশঙ্কা সন্তোষকুমার কথা-সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকও, কিন্তু ইতিহাস তাঁর জ্ঞানায়ত্ত নয়। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই অনেক জায়েন্ট জন্মে গেছেন সাহিত্যে সাংবাদিকতায়, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান আত্মসাতে শুধু নয়, বাংলাদেশের সব চাইতে বড় সব চাইতে ব্যাপক, সব চাইতে নিষ্কলুষ এক বিদ্রোহ ঘটেছিল এই লগ্নেই; তার নাম নীল-বিদ্রোহ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের আবির্ভাব ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন বঙ্গদর্শনে ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসে এক অপূর্ব স্বাদ ভোগ করছেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ শুধু নয়, সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম প্রথম দুই গ্রাজুয়েট। ১৮৬১ এক পরিপক্ক কাল, রবীন্দ্রনাথের জন্ম আদৌ অকালে বা অপরিণতিতে নয়। রত্নগর্ভা বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণগর্ভ মাতৃসন্তান। বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর গলার মালা রবীন্দ্রের গলায় দুলিয়ে দিয়ে থাকেন, ঐতিহাসিক রমেশ দত্তের সামনে তা সময়োচিতও হয়েছে। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মুমূর্ষু জড়প্রায় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের যে শ্রাদ্ধরীতি এখন উন্মোচনোন্মুখ কবির ক্ষেত্রে যে তা হয় নি, সে তার দুর্ভাগ্য নয়।

ঠাকুরবাড়ীতে জন্মানো যে তাঁর দুর্ভাগ্য নয়, তার একমাত্র সাক্ষ্য স্যার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিদেশী শাসকের দেশে বিদেশী ভাষায় প্রথম আই-সি-এস হয়ে ফিরে আসা সব পরিবারের সৌভাগ্যে হয় না। শুধু তাই নয়, এ বাড়ীর স্টাইল, এ বাড়ীর নাট্য প্রবর্তনা, হিন্দু হারেম-অবরুদ্ধ মাতৃমূর্তি আজকের দৃষ্টিতে সামান্য হতে পারে, ইতিহাস-অভিজ্ঞেরা তাকে অসামান্য জ্ঞান করবেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, গান গেয়েছেন, পথ পরিক্রমা করেছেন; তবু যদি মতানৈক্যে তিনি নিজেকে কোন সময়ে প্রত্যাহার করে নিয়ে থাকেন, সেও তাঁর দুর্ভাগ্য নয়; সমাজে অসূয়া, ঈর্ষা এক নিদারুণ জিনিস—যা মানুষকে দগ্ধ বিনষ্ট করে; রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষদৃষ্টে কেউ যদি অসূয়া-পীড়িত হয়ে তাঁকে তাড়না করে থাকেন, সে তাঁর দুর্ভাগ্য যত নয়, সে দুর্ভাগ্য তার চাইতে বেশী আমাদের। রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি মধুসূদন-বিবেকানন্দ সম্পর্কে অসূয়ামুক্ত ছিলেন? প্রজাপতির নির্বন্ধ বা চিরকুমার সভা কি তার যথেষ্ট আভাস নয়? ১৯৫৯-৬০-এ নীল-বিদ্রোহ, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, শিশিরকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিহারীলাল, হিন্দুমেলা এবং "হিন্দু মেলায় উপহার" ইত্যাদি ইত্যাদি—তবু বলতে হবে রবীন্দ্রনাথের অলগ্নে জন্মের দুর্ভাগ্য। বরং এই তো সৌভাগ্য যে, গতানুগতিকতার কাব্যচিন্তা গতিপথে একদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল।

সন্তোষকুমারের তালিকায় এমনি আরও অনেক দুর্ভাগ্যের কথা আছে; একই প্রবন্ধের সীমানায় তা বাঁধতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সন্তোষকুমারের দায়িত্ব যেখানে মন্তব্যে শেষ, সেখানে আমার তথ্যের সম্ভার চাই। থাকতেও দেওয়া যায় না, পাঠকের পক্ষে তা পীড়াদায়ক ও প্রবন্ধ গ্রন্থের আয়তন পেতে থাকে—পরিণামে যা অ-পাঠ্য থেকে যাবার আশঙ্কা।

লেখক মাত্রেই বুর্জোয়া; তাড়িখানায় বসেও প্রলেতারিয়েত সাহিত্য লেখা যায় না, ভাঁড়ের চা চুমুক দিয়েও নয়। আবার এখানে লেখক নিঃসঙ্গ। সুতরাং ঠাকুরবাড়ীর ভূত্যতন্ত্র বা প্রাচীর-ঘেরা বাড়ীর অভিজাত ক্লোজড সোসাইটিতে তাঁর কোনো ক্ষতি হয় নি। সবাই ময়দানের খোলা আবহাওয়ার লেখক হলে সাহিত্যে নিশ্চিত বৈচিত্র্যের অভাব ঘটত। তা কতখানি সমাদরের বস্তু হত বা ব্যঞ্জন-বিরহিত শুধু অন্ন হত কি না, বলতে পারব না। কেন না, মানবচিন্তার শেষ কথা বলবার বাতুলতা আমার নেই।

শৈশবে মাতৃহারা হওয়া অবশ্যই পরম দুর্ভাগ্যের; কিন্তু তাও লেখক বা বিপ্লবীকে আর একদিক থেকে মুক্ত করে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ এদিক থেকে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। কিন্তু মাতৃহারার স্নেহ একদিক থেকে অপ্রত্যাশিত আসেও এবং সব মিলিয়ে তাঁর লেখা বা বৈপ্লবিক চেতনাকে এক অদ্ভুত স্বাধীনতা দেয়। পত্নীর অকালপ্রয়াণ ও তার পরিণতিও তর্কসাপেক্ষ; কেন না, দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর তার উপসংহার নির্ভর। অনেক মহাপুরুষেরই শুনেছি স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না; দৃষ্টান্ত আছে হাতের কাছে, কিন্তু উল্লেখে আজ রবীন্দ্রনাথকে লজ্জা দেবার হয়তো নেই, অনেকেরই আছে।

নোবেল প্রাইজকে সন্তোষকুমার বলেছেন সব চাইতে বড় দুর্ঘটনা। এটি এমন একটি তথ্যবিগর্হিত ও অসতর্ক মন্তব্য যে, জবাব দিতে হলে শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো অন্তত এক খণ্ড বই লিখতে হয়। সংক্ষিপ্ত কথা—সাপজঙ্গলের ভারতবর্ষকে—আমাদের কাছে তারও বড় বাংলাদেশকে, সর্বোপরি বাংলা ভাষাকে বিশ্বের মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। লাখ টাকা বড় নয়, বড় কথা—লোকটা কে? আর সত্যকার মূল্যায়ন? আজও কি ঘরে বা পরে কোথাও হয়েছে, সন্তোষকুমার যাঁদের দিয়ে পরিবৃত তাঁদের স্তুতিবাদ ও প্যারাফ্রেজিং বাদে? প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ঐ যে অতবড় চার খণ্ডের জীবনী তাতেই কি কোথাও গ্রহণযোগ্য মূল্যায়ন আছে—কিছু তথ্যের ডায়েরী ছাড়া?

সন্তোষকুমার খোঁটিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, বলেছি, তার প্রত্যেকটি প্যারা নিয়েই বড় বড় লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন হতে পারত। অতবড় একটা তালিকায় লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে তিনি বিভ্রান্তির বিস্তার ঘটিয়েছেন বরং রবীন্দ্রনাথের এইটিই সোজাসুজি এক দুর্ভাগ্য। একটি একটি ধরুন একটির মূল্যায়ন করুন, রবীন্দ্রনাথকে তার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচান, হে সন্তোষকুমার!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পরদিন সকালে আমরা প্রথমবার 'বাছাইকার'দের সম্মুখীন হই। তাদের দলপতির নাম ছিল হেনরী। হেনরীর এক অদ্ভুত অভ্যাস ছিল, সে যে কোন একজন বন্দীকে ডেকে তার সামনে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলতো, আর তার পিঠের ওপর এক পা রেখে হেনরী রাজাধিরাজের মতো 'বাছাই' করার কাজ করতো। বোধ হয় এইভাবে আমাদের একজনকে পদদলিত করতে পেরে সে নিজেকে ক্ষমতার উচ্চতম আসনে আসীন বলে মনে করতো এবং সেই কল্পিত ক্ষমতার বলেই আমাদের 'বাছাই' করা মিথ্যাচার থেকে নিজের বিবেককে বাঁচিয়ে রাখতো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার পদপ্রান্তে ঐ ভাবে শুয়ে থাকবার জন্য বন্দীদের ভেতর রোজই প্রায় মারামারি লাগত। কারণ, বাকি সবাইকে খুব কষ্ট করে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটু গেড়ে তার সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে হতো। আমরা প্রায় প্রত্যেক বাছাইকারকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করতাম। আফ্রিকান রিজার্ভগুলি থেকে এই কাজের জন্য যাদের আনা হয়েছিল, তারা প্রায় প্রত্যেকেই পয়সার লোভে নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। যারা এক সময় নিজেরা বন্দিজীবন যাপন করেছে, তারা অসংখ্য দুঃখকষ্টের বদলে সরকারী পক্ষের দ্বারা দেয় অপেক্ষাকৃত আরামের জীবনকে বেছে নিয়েছিল, আর খুব কমসংখ্যক কয়েকজন সত্য সত্যই বিশ্বাস করতো যে, শপথ গ্রহণের দ্বারা আমরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কলঙ্কিত করেছি। কাজেই তাদের ধারণা, এর মূল উৎপাটন না করলে কেনিয়ার ইতিহাস চিরকালের জন্য মসীলিপ্ত থেকে যাবে। শুধু এই ক'জন লোককেই আমরা তাদের চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য শ্রদ্ধা করতাম, যদিচ তাদের মতবাদকে মেনে নিতে পারি নি। আমার সমস্ত বন্দি-জীবনে শুধুমাত্র তিনজন এইরকম দৃঢ়চিত্ত লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সব বাছাই-কারেরাই কেনিয়ার সংকটের দিনগুলিতে কাঁটাতারের বেড়াজালের ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়ে ও তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক জীবনের খেই হারিয়ে ফেলে। ফলে সাধারণ-অসাধারণ, ভাল-মন্দ ইত্যাদির বিচার করার ক্ষমতা তাদের নষ্ট হয়ে যায় এবং এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছয় যে, বন্দিরূপী মানুষগুলির প্রতি অন্যায়, অবিচার বা অত্যাচার করতে তাদের মন একটুও কাঁদত না। সেই সব বিগত দিন-গুলির কথা এখন ভাবলে মনে জাগে অনুকম্পা, আর তাদের সেই অদ্ভুত অমানুষিক অত্যাচারেরও যেন একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই। হিটলারের জার্মানীতে অনেক বুদ্ধিমান নাৎসী [illegible] বর্ণচেতনা [illegible] যেন এদেরও কোথাও একটা মিল দেখা যায়। যে মানসিক আলোড়নের ফলে মানুষ মানুষের প্রতি পশুর মতো দুর্ব্যবহার করতে পারে অম্লানবদনে, এটা তারই একটা দৃষ্টান্ত। এদের এই নৃশংস ব্যবহারই যেন তাদের নিজেদের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করার বিপক্ষে বর্মের কাজ করতো।

মানিয়্যানিতেও বাছাইকারের হাতে আমাদের সকলের ভাগ্যেই 'কালো' শ্রেণীর ছাপ পড়ে এবং নয় নম্বর তাঁবুতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। এই তাঁবুতে আমরা নয় শত 'কালো' শ্রেণীর বন্দী ছিলাম এবং আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন এক অল্পবয়স্ক ইউরোপীয়ান অফিসার। তিনি কাউকেই আমাদের গায়ে হাত তুলতে দিতেন না। আমাদের এখানে খাবার-দাবার কয়োপের তুলনায় অনেক খারাপ হয়ে যায়, যা নেমে এসে মাত্র আট আউন্স ভুট্টার আটা ও অল্প পরিমাণ সীমের বিচিতে এসে পৌঁছায়। মাছ-মাংসের আর কোন নামগন্ধই পাওয়া যায় না। এখানেও কেবল রান্নার ও মলমূত্রের বালতিগুলো পরিষ্কার করা ছাড়া আর কোন শারীরিক পরিশ্রম আমাদের করতে হয় নি। দীর্ঘ দিনগুলি কাটত রাজ-নৈতিক আলোচনা করে বা 'বাউ' নামক দাবার মত এক খেলা খেলে। এর ঘুঁটি তৈরি করতাম আমরা পাথরের টুকরো দিয়ে, মেজেতে দাগ দিয়ে ছক কেটে খেলতাম। পূর্ব আফ্রিকায়, বিশেষ করে যে সমস্ত উপজাতিরা রাখালের মত গরুর পাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাদের মধ্যে এই বাউ খেলার চল খুবই বেশি।

প্রত্যেক পাথরের টুকরা তাদের কাছে একটা গরুর সমান এবং প্রত্যেকটি ছক বা গর্ত একটি 'বোমা' (সোয়াহিলি ভাষায় বোমা হল গরু এবং তার পালকের থাকবার জন্য মাঠের মাঝে তৈরি একটা ঘেরা জায়গা, যেখানে বন্য জন্তু-জানোয়ার তাদের আক্রমণ করতে পারে না)। এই খেলার শেষের দিকে অত্যন্ত মনোযোগের প্রয়োজন এবং যে তার বিপক্ষ দলের অধিকাংশ গরুই নিয়ে নিতে পারবে, সেই বিজেতা হবে।

মানিয়্যানিতে আনীত বন্দীদের প্রথম দিকে পাকাপাকিভাবে বিভিন্ন তাঁবুতে থাকবার জন্য বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয় নি, আর নয় নম্বর তাঁবুর (যেখানে আমরা ছিলাম) বেশির ভাগ বন্দীকেই অস্থায়ী-ভাবে এখানে পাঠান হত। প্রায় প্রত্যেক দু'তিন দিন পরে-পরেই ক্যাম্পের সমস্ত বন্দীদের কর্তৃপক্ষেরা একজোট করে আবার বিভিন্ন তাঁবুতে পাঠাতেন। আর এর ফলে লোককে আবার নূতন করে

নম্বর দেওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় আমাদের নিজেদের ভেতর কোনরূপ সম্বন্ধ হওয়ার চেষ্টা করাও বাতুলতা ছিল। যদিও সৌভাগ্যক্রমে কয়োপ ক্যাম্প থেকে আগত বন্দীদের খুব বেশি ছত্রভঙ্গ করা হয় নি। এইভাবে কিছুদিন চলবার পর ৫ই অক্টোবর আমরা ১৩ নম্বর তাঁবুতে পৌঁছাই এবং মাসাধিক সেখানে একজোটে থাকবার পর মনে হয় যে, আবার আমাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন তৈরি করা সম্ভব হবে। মানিয়্যানি ক্যাম্পের অধ্যক্ষ প্রত্যেক তাঁবুর বন্দীদের একজন করে তাদের মধ্য থেকে দলপতি নির্বাচন করতে বলেছিলেন, যে নাকি তাদের মুখপাত্র হবে। ১৩ নম্বর তাঁবুতে সর্বসমেত সতেরটি মাটির ঘরের প্রত্যেকটিতে প্রায় ষাটজন করে বন্দীর থাকার ব্যবস্থা ছিল। এরা সবাই মিলে আমাকে তাদের মুখপাত্র নির্বাচন করায় আমি একাধারে সম্মানিত ও আশ্চর্য বোধ করেছিলাম। হয়তো আমি তাদের সকলকার চেয়ে বেশি লেখাপড়া শিখেছিলাম বলেই তারা আমাকে নির্বাচিত করেছিল। কারণ সাধারণত নিরক্ষর বন্দীরা তাদের ভেতর যারা শিক্ষিত, তার উপর যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতো। যদিও সব শিক্ষিতেরাই সেই আস্থার উপযুক্ত ছিল না।

আমি ১৩ নম্বর তাঁবুর বন্দীদের কাছ থেকে ছয়জন সদস্যের নাম চেয়েছিলাম একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে এবং তাদের বলেছিলাম যে, যতদূর সম্ভব যেন প্রত্যেক সদস্য বিভিন্ন জেলার লোক হয়। এইভাবে নির্বাচিত লোকেদের নাম হল ম'আরিউডা ম'ইকিআও (মেরু জেলা), গ্রিশন মুরাগে (এমবু জেলা), জাকারিয়া কিবুথু (কিয়াম্বু জেলা), টিরাস মুচিরি (নেয়েরী জেলা), জিওফ্রি মাইমবা (এমবু জেলা) এবং জন ওয়ায়েরু (এমবু জেলা)। এদের প্রত্যেকেই এখন স্বাধীন কেনিয়ায় সম্মানিত পৌরজন হিসাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজকার্যে বা ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। সমিতির প্রথম কাজ হল বিভিন্ন তাঁবুগুলির জন্য প্রয়োজনীয় দৈনিক কাজের ভাগ করে দেওয়া, যাতে সবাইকার ভাগে সমান চাপ পড়ে। প্রত্যেক কুঁড়েঘরের জন্য একদল 'পাচক' নিযুক্ত করা হয়, যারা পালা করে রান্নাবান্নার কাজ করতো। প্রত্যেক কুঁড়েঘরেরই আবার মলমূত্রের বালতিগুলি পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আর একদল পালা করে কাজ করত এবং একজন করে চাপরাশীর কাজ করত আমাকে সাহায্য করবার জন্য। কিছু দিন পরে জানুয়ারী মাসে আমরা মানিয়্যানির নিকটবর্তী বিমানপোতে জনমজুরের কাজ আরম্ভ করায় এই সমিতিই আবার নিয়মিত শ্রমিক সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে সবাইকে [illegible] ভাগ করে দেয়। ক্যাম্পের নিয়মানুসারে তাঁদের বাইরে বেরোবার আগে হলদে রংয়ের হাফপ্যান্ট পরতে হতো এবং যাতে সব বন্দীই এই নিয়ম যথাযথ পালন করে, তার দায়িত্বও ছিল আমার উপর। নভেম্বর মাসের শেষে আমি ক্যাম্প-অধিনায়কের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা করি এবং তা গৃহীত হয়। ভদ্রলোককে দেখে আমার বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, যদিও তাঁর মুখের ভাবকে আমরা সোয়াহিলি ভাষায় বলতাম "কানুয়া মনজোরে"। অর্থাৎ এক কঠিন মুখভাবাপন্ন ব্যক্তি। সাক্ষাৎকারের প্রথমেই আমি তাঁকে বলি যে, আমরা নিজেদের "যুদ্ধবন্দী" বলে মনে করি এবং এ বিষয়ের আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন বা "জেনেভা কনভেনশান" আমার জানা আছে। অধিনায়ক আমার কাছ থেকে এ কথা শুনে খুব আশ্চর্য হলেন বলে মনে হল। তারপর আমি তাঁকে বলি এক 'পরিদর্শক সমিতির' বন্দোবস্ত করতে, যাদের কাছে আমরা যে কোন রকম নিবেদন করতে পারি। এবার কিন্তু আমারই আশ্চর্য হওয়ার পালা। কারণ অধিনায়ক আমার কথায় বিনাদ্বিধায় রাজি হয়ে যান এবং তাঁর কথা রাখেন।

ক্যাম্পে আমাদের থাকা-খাওয়া এবং সরকারীপক্ষের ব্যবহার ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠছিল। আমরা ইতিমধ্যে বিমানপোতাশ্রয়ে জনমজুরের কাজ আরম্ভ করি এবং সেখান থেকে প্রায়ই দুর্ব্যবহারের নালিশ আমরা পেতে থাকি। বিশেষ করে এ কথা জেনে আমার খুবই খারাপ লাগত যে, বন্দীদের নিকটবর্তী বাঁশঝাড় থেকে ছড়ি কেটে আনতে বলা হত এবং তাই দিয়ে তাদেরই মারা হতো। প্রত্যেক তাঁবুর প্রহরীরাও দুর্ব্যবহার আরম্ভ করেছিল বন্দীদের উপর। সে সময় কোন কিকুয়ুই প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত ছিল না: যারা ছিল তারা হল কেনিয়ার নান্দী, কিপসিগিস ও লুয়ো এবং কেনিয়ার দক্ষিণে টাঙ্গানিকার কিছু লোক।

জানুয়ারী মাসে পরিদর্শক সমিতি আমাদের ক্যাম্পে আসবে জানতে পেরে আমি এ সমস্ত বিবরই তাদের কাছে নিবেদন করাব মনস্থ করি। জিমি জেরেমিয়া ও উইলফ্রেড হ্যাভেলক নামে দু'জন সমিতির সদস্যকে আমি চিনতে পারি এবং তাদের কাছে আমার সব কিছু বক্তব্যই খোলাখুলিভাবে বলে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করি। এই সমিতির কাছে নিবেদন পেশ করার জন্য মানিয়্যানি ক্যাম্পের আরও দশটি তাঁবুর মুখপাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তারা সবাই আমাকে সমর্থন করে। আমাদের এই অভাব নালিশ করা যে ক্যাম্পের কর্মচারীদের মোটেই পছন্দ হয় নি, সে কথা আমি পরদিন সকালেই জানতে পারি। কারণ শুধুমাত্র হলদে হাফপ্যান্ট পরিয়ে আমাকে একটি কাঠের তক্তার উপর ফেলে রেখে চব্বিশ ঘা বেত মারা হয়। এই কাজের পরিদর্শন করতে 'মালো' নামে এক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন সেখানে, যাকে আমরা সবাই সোয়াহিলিতে 'মাপিগা' বলে ডাকতাম। এর অর্থ হল মারা এবং মারলো কথায় কথায় আমাদের উপর দু-চার ঘা বসিয়ে দিতে মোটেই ইতস্তত করতেন না। যাই হোক, এই সমিতির কাছে নালিশ করার ফলে আমাদের উপর অত্যাচার অনেকাংশে কমে যায়। অন্যান্য তাঁবুর কয়েকজন মুখপাত্র আমার উপর নালিশ করার প্রতিক্রিয়া দেখে আর কোন বিষয়ের বিরুদ্ধেই তারা মাথা তোলে নি, শুধুমাত্র আমার বিশেষ সুহৃদ রবিনসন মোয়ানগি সদাসর্বদা এই সমিতির ও অন্যান্য বন্দীদের কাছে আমার কাজের সমর্থন করত।

এই কাহিনী লিখতে বসে আজ কেবলই রবিনসনের কথা আমার মনে পড়ছে। সে ১৬ নম্বর তাঁবুর মুখপাত্র ছিল। জাতীয়তাবাদে সে ছিল দৃঢ়বিশ্বাসী। এবং জোমো কেনিয়াট্টা বন্দী হবার পরও সে তাঁকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছিল। আর তার লেখাপড়ার দৌড় ছিল ফরম-টু (অর্থাৎ ভারতের ৩।৪ শ্রেণী আন্দাজ) অবধি। এই সময় বহু শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত আফ্রিকান সরকারপক্ষে যোগ দিয়েছিল নগদ পয়সা উপার্জনের ও অপেক্ষাকৃত আরামের জীবনযাপনের লোভে। কিন্তু রবিনসন ও আমি আমাদের নিরক্ষর ভাইদের সঙ্গে থাকা মনস্থ করি, যাতে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে এবং আমরা তাদের লেখাপড়া শেখাতে বা তাদের হয়ে পত্রাদি লিখতে সাহায্য করতে পারি। রবিনসন এখন ফোর্ট হল জেলায় একজন 'কানু'র (K. A. N. U., Kenya African National Union) সম্মানিত দলপতি।

মানিয়্যানি ক্যাম্পে একজন ইউরোপীয়ান প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজক ছিলেন—এম জি কোল নামে। আমরা তাঁকে 'মাটুইনি' (অর্থাৎ স্বর্গ) বলে ডাকতাম। কারণ তিনি আমাদের কাছে প্রায়ই স্বর্গে যাবার পথ ও খৃষ্টান ধর্মের আলোচনা করতেন। আমার তাঁর সঙ্গে প্রায়ই নানা বিষয়ে আলোচনা হতো এবং আমাদের অনেক সুখ-সুবিধার তিনিই বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণায় আমি অন্যান্য তাঁবুতে মাঝে মাঝে খৃষ্টান ধর্মকথা

প্রচার করতে যেতাম এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি তিনিই ক্যাম্পের কর্মাধ্যক্ষের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। বন্দীদের কাছে আমি বাইবেল থেকে করিনথিয়ানসের ১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত সেন্ট পলের সুন্দর বাণী পড়ে শোনাতাম, যেখানে তিনি দানশীলতা, পরহিতৈষিতা ও বদান্যতার বিবরণ দিয়েছেন : "মানুষ তাকেই বলবো, যে সব সহ্য করে, অন্য মানুষকে ভাল বলে বিশ্বাস করে; সর্বদা নিবিড় দুঃখের মাঝেও আশার ভরসা করে এবং সবাইর সংগেই মানিয়ে নিতে পারে।" এই উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বন্দীদের বোঝাতাম, তারা যেন অযথা ক্যাম্পের কর্মচারীদের রাগিয়ে না দেয় বা অন্যায় আচরণ না করে। এই বাণীর ভেতর রবিনসন ও আমি পেতাম অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার প্রচ্ছন্ন শক্তি ও নবীন উৎসাহ। কিন্তু প্রথানুযায়ী একজন যুবক পরিণত বয়স্ক হলে সে তার মামাকে একজোড়া বিশেষ রংয়ের

ছাগলের কান উপহার দেয়। এই প্রথা থেকে আমাদের একটি প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে ঃ "গন্‌য়িটা মন্ড মামা টিকুয়্ কুমটামবুরি য়া মাটু" অর্থাৎ কাউকে মামা বা খুড়ো বললেই তাকে কিছু ছাগলের কান উপহার দিতে হয় না। এই প্রবাদের সাহায্যে আমি ক্যাম্পের বন্দীদের বোঝাই যে, সেখানকার ন্যায্য নিয়ম-কানুন মেনে চললে বা ইউরোপীয়ানদের 'এফিন্ডি' বলে সম্বোধন করলেই কিছু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করা হয় না। কিন্তু তাতে যদি আমাদের উপর সাজার পরিমাণ কিছুটাও কমে, তবে ক্ষতি কি? আমি তাদের এও বোঝাই যে, শুধুমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ হলে তবেই আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামরূপ নদী পারাপার হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পাবব, যেমন পিপীলিকা-শ্রেণী এক সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে বা যেমন বেবুনরা একে অন্যের লেজ ধরে নদী পার হবার জন্য জীবন্ত পুল তৈরি করে। আমি বন্দীদের কাছে এভাবে খ্রীস্টান ধর্ম ও আমাদের সংগ্রামের বিষয়ে একই সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। কারণ আমি খ্রীস্টান ধর্মে বিশ্বাস করতাম এবং যে সমস্ত একতার শপথ আমি গ্রহণ করেছিলাম তাতে এর বিরুদ্ধে কোন নির্দেশই ছিল না। ক্যাম্পের অনেক বন্দী আমার সভায় যোগদান করত এবং তাদের ভেতর অনেকেই ক্যাম্পে থাকাকালীন ধর্মান্তরও গ্রহণ করেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি একাধারে খ্রীস্টান ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া ও অন্যধারে শপথ গ্রহণের ভেতর কোন দ্বন্দ্বই দেখি না।

ফেব্রুয়ারী মাসে পরিদর্শক সমিতি ক্যাম্পে পুনর্বার আসেন। এর একজন সদস্য ম্যাকফারসন নামে এক খৃস্টান ধর্মযাজক, যিনি কেনিয়ার চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের মডারেটর বা সভাপতি ছিলেন, খুব ভাল কিকুয়ু ভাষা বলতে পারতেন, কাজেই আমি তাঁর কাছে আমাদের সমস্ত অভিযোগ এবং বিশেষ করে ২৬ নম্বর তাঁবুতে কিছুদিন আগে বন্দীদের ওপর যে মারধোর হয়েছিল তার সবিস্তারিত বিবরণ নিবেদন করি। ঐ তাঁবুর কয়েকজন বন্দী প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, ফলে ১৫০ জন বিশেষভাবে শিক্ষিত আরক্ষাবাহিনীর লোকেরা সেখানকার বাদবাকি বন্দীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এমন মারধোর করে যে ছয়জন বন্দী ক্যাম্পের হাসপাতালে প্রাণ হারায়। ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষ তাঁদের জবানিতে বলেন যে, এদের মৃত্যু হয় সান্নিপাতিক জ্বরে, কিন্তু আমি এই বিবরণে বিশ্বস্ত না হওয়ায় ম্যাকফারসনকে এর যথাযথ অনুসন্ধান করতে বলি। এছাড়া আমাদের দৈনিক খোরাকের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তাতে আরও বৈচিত্র্য আনবার জন্যও অনুরোধ জানাই। সভাঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মারলো নামক ইউরোপীয়ান কর্মচারীটি আমাকে একপাশে ডেকে বলেন যে, তিনি নিজেই দেখেছেন আমি এবারও আমার মুখ বন্ধ রাখতে সক্ষম হয় নি। তার পরদিন সকালেই আমাকে বারো ঘা বেত মারা হয় এবং সাতদিনের জন্য নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি ছোট খুপরিতে নামমাত্র আহার দিয়ে বন্দী করে রাখা হয়।

ঐ সাতদিনের অভিজ্ঞতা আমার বন্দিজীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক বললে কোন অত্যুক্তি করা হবে না। মিঃ কোল আমাকে সেখানে দেখতে আসেন ও আমার অবস্থা দেখে প্রায় কেঁদে ফেলেন। তাঁর মুখে বেদনা ও বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাকে জল দেওয়া হয়েছে কিনা। আমি জল পাই নি জানাতে তিনি নিঃশব্দে উঠে গিয়ে একটি বালতি নিয়ে নিজে ক্যাম্পের কর্মচারী ও প্রহরীদের সামনে কল থেকে জল ভরে এনে আমাকে দেন। তারা কেউই অবশ্য তাঁকে বাধা দেয় নি। জলপান করার পর আমরা দুজনে একসঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ফলে আমি অনেকাংশে আরাম পাই। তিনি আমাকে বাইবেল থেকে পল সিলাসের ফিলিপি কারাগৃহের অভিজ্ঞতার কথা পড়ে শোনান ও যাবার সময় নিউ টেস্টামেন্টখানি পড়তে দিয়ে যান। ঐ সাতদিন আমার মলমূত্র ত্যাগও হয় নি, কারণ পেটে খাবার বলতেও কিছু পড়ে নি।

আমি যে খুপরি ঘরে সাতদিন নিঃসঙ্গভাবে কাটাই তা ষোল নম্বর তাঁবুর কাছেই অবস্থিত হওয়ায় আমার বন্ধু রবিনসন মোয়ানাগি ক্যাম্পের সমস্ত খবরাখবর আমাকে চীৎকার করে জানাতে পারতো। শুধু দুঃখ ছিল এই যে, আমি ছিলাম শুধু শ্রোতা, কারণ আমার কোন উত্তরই বাইরে থেকে শোনা যেত না। সাতদিন পরে তাঁবুতে ফিরে এসে মারলোর প্রতি আমার এত অসন্তোষ জন্মে যে, আমি সোজাসুজি ইংলন্ডের ঔপনিবেশিক দপ্তরে তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে চিঠিতে নালিশ জানাই—কেনিয়া সরকারের কাছে কোন অভিযোগ না করেই। প্রয়োজনীয় চিঠি লেখার কাগজপত্র পাবার জন্য এবং চিঠি ডাকে দেওয়ার জন্য আমার বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থের অনেকটাই একজন প্রহরীকে উৎকোচস্বরূপ দিতে বাধ্য হই, যদিচ সে চিঠিটি ডাকে দেওয়ার প্রমাণ আনবার পর তার দক্ষিণা পায়। এই চিঠির একটি নকল বিলেতের বিধানসভার সদস্যা শ্রীমতী বারবারা ক্যাসেলকেও পাঠাই এবং তিনি এ বিষয় পরে যথেষ্ট খোঁজ-খবর করেন।

ক্যাম্পের হাসপাতালের ইউরোপীয়ান ডাক্তার কিরেনও খুব ভাল লোক ছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে আমার তিন ঘণ্টা ধরে কথোপকথন হয়, তিনি তখন আমাকে বলেন যে, তাঁর কাজ বন্দীদের রোগভোগের চিকিৎসা করা, তাদের উপর যে অযথা মারধোর করা হয় তার জন্য তিনি দায়ী নন। হাম্‌ফ্রী নামক আর একজন সদাশয় ইউরোপীয়ান ক্যাম্পের স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করতেন এবং তাঁর কর্মনিপুণতা ও সুবন্দোবস্তের ফলে আমাদের অনেকেই দূষিত জলঘটিত নানারকম ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পাই। আমরা তাঁকে সোয়াহিলি ভাষায় 'কিহ্‌গা' বলে ডাকতাম, কারণ তিনি খুবই চট্‌পটে ও কাজের লোক ছিলেন, শুধু শুধু কথা বলে সময় নষ্ট করতেন না। তাঁর কাছে কাজ করছে এমন কোন বন্দীর গায়ে কেউ হাত দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে তাড়া করতেন, তা সে আফ্রিকান প্রহরী বা ইউরোপীয়ান কর্মচারী যেই হোক না কেন। ফেব্রুয়ারী মাসে বন্দীদের অনেককে নিকটস্থ পাথর খাদে জন-মজুরীর কাজে পাঠান হয়, সেখানে কড়া রোদে কয়েক ঘণ্টা ধরে কঠিন পরিশ্রম করে ঘেমে নেয়ে গিয়ে ক্যাম্পে যখন তারা ফিরে আসত তখন তারা ভাল করে মুখ-হাত ধোবার জল পর্যন্ত পেত না। কিছুদিন পরেই এই বন্দীদের অনেকে পেলেগ্রা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত পরিমাণে খাবার ও ভিটামিনের অভাবে অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে ওঠে। মার্চ মাসে উপদর্শনকারী কমিটির কাছে আমি এ বিষয়ে নালিশ করি এবং শারীরিক পরিশ্রমের বোঝা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আমাদের বরাদ্দ খাবারের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে হবে বলে চাপ দি। কমিটি আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করেন ও আমাদের জন্য ভিটামিন বড়ির বন্দোবস্ত হয়।

প্রহরীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুলাংশে নির্ভর করত কার কাছে কত টাকা-পয়সা বা জিনিসপত্র আছে সেই টানের ওপর। প্রথম প্রথম কয়েকজন প্রহরী আমাদের জন্য বরাদ্দ খাবার বিনা সংকোচে আত্মসাৎ করত, যেন তার ওপর তাদের ভগবানদত্ত অধিকার আছে। রবিনসন ও আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য একদিন মোগোগো নামক এক প্রহরীকে আমাদের তাঁবু থেকে ছয় পাউন্ড মাংস নিয়ে যাবার

[illegible] সব বন্দীদের সামনে পাকড়াও করি ও তার কাছ থেকে মাংস ছিনিয়ে নি: তাকে এ কথা বলি যে, যদি তার এই মাংসের দরকার হয়ে থাকে তাহলে যেন সে আমাদের সঙ্গে বন্দিজীবন যাপন করে ও একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে। যতদূর সম্ভব প্রহরীদের সঙ্গে আমরা ভাল ব্যবহার করতাম, কিন্তু সৈনিক প্রহরীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হামেশাই লেগে থাকতো। উপরিউক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরেই একজন পেয়ালা আমাদের রান্নাঘর থেকে কিছু রান্না করার তেল নিয়ে যেতে চেষ্টা করায় আমি তাতে বাধা দি। কয়েক মিনিট পরেই সে আমাকে ডেকে প্রহরীদের ঘরে নিয়ে যায় যেখানে তিনজন সিপাহী ও পাঁচ-জন প্রহরী একটি বিচারসভা সাজিয়ে বসেছিল। তারা আমার 'বিচার' করে সাব্যস্ত করে যে, আমার 'অপরাধের' জন্য অন্যান্য বন্দীদের সামনে আমাকে সাজা দেওয়া হবে। সর্বসমক্ষে মাটিতে শুইয়ে ফেলে আমাকে চল্লিশ ঘা বেত মারা হয়, যদিচ তার পূর্বে আমার কাপড়-জামা খুলে না নেওয়ায় ও খুব তাড়াতাড়ি কার্য শেষ করায় সরকারী বেত্রাঘাতের মত অতটা আঘাত লাগে নি। সব বন্দীরাই এই বেসরকারী শাস্তি-দানে প্রচুর বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং আমার নিজেরও মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। কাজেই আমি আমাদের তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান কর্মচারী মিঃ টাইল্ডকে এ বিষয়ে নালিশ করি। কিছুদিন আগে তিনি এবারডেয়ার জঙ্গলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে যাবার সময় হাঁটুতে প্রচুর চোট পেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভাল স্বভাবের পরিবর্তন হয় নি। তিনি আমাকে উপদেশ দেন যে, এ বিষয় ক্যাম্পের ওপরওয়ালা ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে নালিশ করলে আমার বিশেষ লাভ হবে না, কিন্তু তাঁর উপর ছেড়ে দিলে তিনি এর উচিত বন্দোবস্ত করবেন। তিনি সমস্ত প্রহরীদের ডেকে আমাদের সামনে তাদের হাতের ছড়ি (বা বেত) ফেলে দিতে বাধ্য করেন এবং আমাদের তাঁবুতে কোন-রকম বেত্রাঘাত বা শারীরিক দণ্ডদান নিষিদ্ধ করেন। "র‍্যায়েট স্কোয়াড" বা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিপাহীদের আমাদের তাঁবুতে কখনোও আসতে দেওয়া হয় নি এবং সেখানে কোন অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্রেক হলে তার যথাযথ বন্দোবস্ত করার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। অন্যান্য তাঁবুতে মারধোর অবশ্য আগের মতোই চালু থাকে এবং এর কোন সুরাহা না করতে পারায় আমার খুবই খারাপ লেগেছিল।

ক্যাম্পের চারিদিকে একটি বিদ্যুৎ দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া থাকায় কর্তৃপক্ষের মনে বিশ্বাস ছিল যে, কোন বন্দীই তাকে ডিঙোতে সাহস করবে না। তথাপি ১৬ নম্বর তাঁবু থেকে মোয়ানগি মাম্বো এবং কারিয়ুকি চোতারা নামক দু'জন সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী এই তারের ওপর একটি কাঠের তক্তা পেতে পালাতে সক্ষম হয়। অন্যান্য বন্দীদের এভাবে পালাবার চেষ্টা করার উপযুক্ত সাহস হয় নি—ঐ কাঠের তক্তা তাদের বিদ্যুতের কবল থেকে বাঁচাতে পারবে কি না তাতে সকলের মনেই সন্দেহ ছিল, কিন্তু ঐ দু'জনের সাহসের প্রশংসা করতেও কেউ পেছপা হয় নি। পরে তারা দু'জনেই নাইরোবি শহরের কাছে ধরা পড়ে, ফলে মোয়ানগির হয় ফাঁসি ও কারিয়ুকির ভাগ্যে জোটে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। পরে 'লজ্ওয়ার বন্দিশিবিরে' থাকা-কালীন কারিয়ুকির সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেখান থেকে তাকে লোকিটাউ শিবিরে পাঠান হয়, যেখানে জোমো কেনিয়াট্টাও তখন বন্দিজীবন যাপন করছিলেন। এই দু'জনের ক্যাম্প থেকে ফলে ষোল নম্বর তাঁবুতে "র‍্যায়েট স্কোয়াডের" আবির্ভাব ঘটে এবং অব-শিষ্ট বন্দীদের উপর তারা এমন মার-ধোর করে যে, ছত্রিশজন বন্দী খোঁড়া হয়ে যায়—কয়েকজন সারা জীবনের জন্য। এ বিষয় নালিশ জানিয়ে আমি সরকারের 'প্রধান সচিব'-এর নিকট চিঠি লিখি এবং পূর্বোক্ত উপায়ে তা ডাকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করি। কয়েকদিন পরেই ক্যাম্পের একজন কর্মচারী ঐ চিঠির লেখক আমি কি না জিজ্ঞাসা করেন এবং তা স্বীকার করায় আমার উপর আবার চব্বিশ ঘা বেত মারার বন্দোবস্ত হয়। ঐ শাস্তিদানের বন্দো-বস্ত ক্যাম্পের দপ্তরখানার সামনে হওয়ার ফলে এগার ও ষোল নম্বরের সব বন্দীই ঐ দৃশ্য দেখে। প্রায় এই সময়ই রবিন্সন ছয় নম্বর তাঁবুতে বদলি হওয়ায় তার জায়গায় ড্যানিয়েল মবারাথি, যে ১৯৬১ সালে কানুর (K.A.N.U.) সদস্যরূপে ফোট হল এলাকায় দাঁড়িয়ে হেরে যায়, ১৬ নম্বর তাঁবুতে মুখপাত্র নির্বাচিত হয়।

এই পলায়নের আরও শাস্তিস্বরূপ ক্যাম্পের অধিনায়ক আদেশ জারী করেন যে, বন্দীরা মলমূত্রের বালতি খালি করার জন্য নিয়ে যাবার সময় তা মাথায় করে নিয়ে যাবে। প্রায় আধ মাইল পথ মাথায় এই বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া সাধারণভাবেই ছিল কষ্টকর, এবং বৃষ্টির সময় তা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রত্যেক হতভাগ্য বন্দীই গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগেই মাথায়-মুখে-গায় মল-মূত্রের জল মেখে একাকার হয়ে যেত। ক্যাম্পে থাকাকালীন যে কিছু বন্দী মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যেত তার সঙ্গত কারণ খুঁজতে কি পাঠককে খুব বেশি দূরে যেতে হবে? পৃথিবীর ক'জন মানুষ ঐ পূতিগন্ধময় নোংরা আধ মাইল বয়ে নিয়ে যেতে পারেন মাথায় করে এবং তার কিছু অংশ নিজের গায়ে-মাথায়-মুখে না মেখে! শিনডা কিকমুবে নামক একজন বিখ্যাত কিকুয়ু হাস্যরসিক পরবর্তী জীবনে তার এক গ্রামোফোন রেকর্ডে এই ঘটনার উল্লেখ করেছে। এপ্রিল মাসে পরিদর্শন সমিতির কাছে রবিনসন ও আমি এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং ক্যাম্পের অধিকর্তা তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা আমাদের বাজেয়াপ্ত করা কাপড়-জামা ফেরত পাবার জন্যও আবেদন জানাই, কারণ যে একপ্রস্থ করে মোটে জামা-কাপড় আমরা রাখবার অনুমতি পেয়ে-ছিলাম তা প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। সমিতি বলেন যে, ঐ সমস্ত জামা-কাপড় ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে না, তবে আত্মীয়-বন্ধুরা যদি কোন কাপড়-জামা পাঠান তা আমরা ব্যবহার করতে পারবো। এ ছাড়া আমরা অভ্যাস করার জন্য পাগলা-ঘণ্টা বাজান প্রথার বিরুদ্ধেও নালিশ করি। এ বিষয় ক্যাম্পে নিয়ম জারী ছিল যে, ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বন্দী ক্যাম্প থেকে দূরে ক্ষেতে বা পাথর কাটার কাজে ব্যস্ত আছে তারা তৎক্ষণাৎ সেখানেই শুয়ে পড়বে, নচেৎ তাদের গুলী করে মারা হবে। যারা ক্যাম্পের কাছাকাছি আছে তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিজেদের তাঁবুতে হাজির হবে 'গোণাবার' জন্য। কার্যক্ষেত্রে এই হতো যে ঘণ্টা বাজার পরমুহূর্তেই প্রহরীরা হাতের কাছে যাকে পেতো তাকেই নির্বি-চারে কয়েক ঘা মেরে নিতো, তা সে যত জোরেই ছুটতে থাকুক না কেন। রাঁধুনী-দের আধরান্না করা খাবার আগুনে পুড়তে দিয়ে ছুটতে হত, ফলে সেদিন আর ক্যাম্পের কোন বন্দীর কপালে খাবার জুটতো না। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সময় পাগলা-ঘণ্টী বাজলে আমরা মুখের গ্রাস ফেলে ছুটতাম আমাদের 'গোণাবার' জন্য। মানিয়ানি ক্যাম্পে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাগলা-ঘণ্টার প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার ছিল না, কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম যে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আরও একটু নজর দেওয়া উচিত কর্তৃপক্ষের। এপ্রিল মাসে সমিতির পরিদর্শনের পর এই সব অবস্থার কিছু উন্নতি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম।

[ক্রমশ]

ব্রেক ডাউন

কল্লোল যুগ থেকেই রবীন্দ্র যুগ অতিক্রমণের অনেক কসরৎ করে আসছেন বঙ্গীয় কবি-সাহিত্যকারগণ। বলা বাহুল্য, পদে পদে তাঁদের ব্যর্থই হতে হয়েছে। কারণ বুড়ো যে শুধু বিরাট প্রতিভা আর অনন্যসাধারণ ভাবুক ছিলেন তাই নয়, প্রচুর দূরদৃষ্টিবুদ্ধিও ছিল তাঁর মাথায়। জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্রে উনি এমন কোনও ফাঁক রেখে যান নি যেখান দিয়ে অন্যে উঁকি মেরে কিম্বা গুঁতো দিয়ে উঠবেন।

জীবনের সবচেয়ে গাদাক সময় বোধহয় সকাল ন'টা থেকে এগারটা। একশ' চার-পাঁচ ডিগ্রী ফারেনহাইটে ফুটন্ত রাস্তার ওপর এসময় কাতারে কাতারে মানুষ ছুটন্ত বাসের পশ্চাদ্ধাবন করেন। আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এইটুকু সময়ও বুড়োর হাত থেকে রেহাই নেই। ছাগ-চালানী ট্রাকের মতো যখন অটো-মোবাইল দৈত্য খ্যাঁক করে ঘাড়ের ওপর এসে সামান্য স্পিড কমিয়েই ফেব হুস করে উবে যেতে থাকে তখন ঊর্ধ্ববাহু যাত্রীদের দেখে মনে হয়, তাঁরা যেন নেচে নেচে দুহাত শূন্যে ছুড়ে আবেদন জানাচ্ছেন : আমার এ দেহখানি তুলে ধর, তোমার ঐ পিঁজরাপোলে পিষে মার!

যাঁরা পারেন, রড-জানলা ধরে কোন-ক্রমে ঝুলে পড়েন, যাঁদের গুঁতোনোর ট্রেনিং অসম্পূর্ণ, তাঁরা দীর্ঘশ্বাসে শূন্যে বাতাস আরও খানিক তাতিয়ে মনে মনে সুর ভাঁজেন : দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর! অর্থাৎ যা গাও তাই রবি ঠাকুর, যা ভাবো তা-ও।

অন্তত আমি মনে মনে সে সুরই সাধছিলাম। কবি যে কারণেই নগর-বিবাগী হয়ে থাকুন, আমি ট্রাম-বাসের জন্যই মহানগর ছাড়তে চাই। ঢের ভালো লোকাল ইলেকট্রিক ট্রেন। মাঝে মধ্যে লাইনে বিপত্তি না হলে হু হু করে সময় ধরে আসে আর হা হা শব্দে যায়। সেই যে একটা দু' নম্বর বাসের জন্য হা-পিত্যেস দুঠেঙে দাঁড়িয়ে আছি, এর মধ্যে মিনিট পনের বেমালুম পার হয়ে গেল। বালীগঞ্জ থেকে ক্যানিং-এর ট্রেন ধরলে এই সময় কালিকাপুর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যেত। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর', চাই কি এসময় মনে হয়, কবি যেন ট্রাম-বাস আর লোকাল ট্রেন লক্ষ্য করেই লিখেছিলেন কথা-গুলো।

যেহেতু দু' নম্বরের জন্য অপেক্ষা, অতএব ওটাই নেই। এই এক লক্ষ্য করছি, যখন যার অপেক্ষায়, সে-ই যেন ধৈর্য শেখায়। অন্যান্য রুটে ফাঁকা গাড়ি স্যাটাস্যাট নাকের ডগা দিয়ে চলকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফাঁকা মানে অবশ্য ফুটবোর্ডে পা পাত'র জায়গা। কিন্তু তাই বা হামেশা মেলে কৈ?

আমাদের মতো দক্ষিণের যাত্রীদের আবার ডবল ফ্যাসাদ। যেতে তো বটেই, মধ্য কলকাতা থেকে সান্ধ্য উল্টোরথে ফিরতেও সমান গুঁতো। সাড়ে সাতের আগে তো কোনো সম্ভাবনাই নেই।

এসপ্ল্যানেড টু বাড়ির পথে উত্তরের জন্য গণ্ডা, গণ্ডা স্যাটল্-বাস ট্রিপ করে রেড রোডে ডাইভ দিয়ে যুক্ত করে পুনশ্চ জওহরলাল নেহরু রোডে মাথা তোলে পাকা ডুব-সাঁতারুর মতো। তখন চোখের সামনে উত্তরের যাত্রীরা হৈ-হৈ করে ফাঁকা গাড়িতে উঠে পড়েন অসহায় দক্ষিণপাড়ার নারী-পুরুষের চোখের ওপর।

ইতিপূর্বে সারবন্দী এসপ্ল্যানেড মার্কা ট্রাম মিলত। অন্তত যেগুলি ধরতে পারলেও সুরেন্দ্রনাথ পার্ক রাউন্ড দিয়ে ভালোমানুষের ছা-এর মতো দক্ষিণে নেমে যাওয়া যেত। তা সে গুড়েও বালি। এখন দক্ষিণাগত বৈকালিক ট্রাম বেশির ভাগই হাওড়া-ডালহৌসী ব্যাজ পরে গজেন্দ্রগমনে লাইনের ওপর গড়িয়ে থাকে। দক্ষিণের ফেরত যাত্রীরা হাপুস নয়নে এ সব অবিচার লক্ষ্য করেন। জিওলজিক্যাল সার্ভের সামনে দাঁড়িয়ে নির্বিবাদে প্রতিটি ঝুলন্ত গাড়ি সার্ভে করি আমি।

প্রতিদিন জানতে ইচ্ছে করে স্টেট ট্রান্সপোর্টের গাড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারার ভারপ্রাপ্ত কর্তাটি কোন্ কোটির বাসিন্দা, উত্তরে, না দক্ষিণের? গাড়ি ভাগের ব্যাপারে উত্তরাপথেই যখন পাল্লার ঝুঁকতি, উনি উত্তরে নাগারিকই হবেন হয়ত। ট্রামের বিলিতী কর্তারা তো পার্ক সার্কাস মার্কা রুটে লাইনের ওপর শোভাযাত্রা করে ট্রামগাড়ি গড়িয়ে দিতেন। শ্যামবাজার-বেলগেছে-গালিফ স্ট্রীটের ট্রামের কোটা ওয়েলিংটনে দাঁড়িয়ে মনে হত ঢের কম। ভাবতাম, পাক সার্কাস রুটটা ট্যাঁশে আধা ইংরেজে ঠাসা বলেই বিলিতী কর্তাদের তরফে হয়ত ঐ বদান্য ব্যবস্থা। তা সরকারী বাসেরও সেই হাল নাকি? হলেও খুশিই হতাম। কিন্তু বাঙালী চরিত্রে এমন অংরেজি ফেলো ফিলিং তো সম্ভব নয়। আমার উপসংহার সুতরাং নিশ্চয় ভারপ্রাপ্ত কর্তাটি দক্ষিণেরই অধিবাসী, তাই বসঘটিত ব্যাপারে দক্ষিণ কলকাতার এহেন দুর্গতি।

কিন্তু আমার এই অন্যমনে সামাজিক তত্ত্বানুসন্ধানে জনৈক ভদ্রলোকের প্রচণ্ড বিরক্তি উৎপন্ন হয়েছে অনুভব করে পাশে ফিরে তাকালাম।

ভদ্রলোক তখন তাঁর বাঁ হাতের ঘড়িটা আমার চোয়াল লক্ষ্য করে আস্ফালন করছিলেন এবং চিবিয়ে চিবিয়ে বলছিলেন, 'ঘড়ি আমার শ্বশুরও বিয়ের সময় একটা দিয়েছিলেন মশায়, ঘড়ি দেখাবেন না আমাকে!'

ভালরে ভাল! তাঁর বিরাগের সঠিক কারণ অনুধাবনের জন্য ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালাম। কী এমন অপরাধ করেছি? পথঘাটে অচেনা

কেমন কৌশলে যে সেঁধিয়ে পেলাম কলকাতার বাসিন্দা ভিন্ন সে রহস্য-ভেদ অন্যের সাধ্যাতীত। স্বয়ং পি সি সরকারও এ খেলায় [illegible]।

[illegible] পায়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হয়ে গেল [illegible] মানলো [illegible] আহা বা [illegible] দিকে [illegible] হাঁটতে পারেন না? পাটা যে গেল!

ঃ কী করে হাঁটব? সব পা-ই তো পেটের নিচে ঢাকা পড়ে আছে।

ঃ সিঁড়িতে [illegible] করবেন না দাদা! নিয়ম নেই।

ঃ ওঃ, রাজ্যপালের বাড়ির উনি হরিদাস পাল নিয়ম শেখাতে এলেন!

ঃ তাই বলে 'স্যাণ্ডউইচড' করবেন? আমরা কি আগে যেতে জানি না?

ঃ জানলে তো আগেই যেতেন।

ঃ শুনলেন দাদা, গরমে দোতলায় আসি শুধু একটা 'ইডিসিপ্লিন' আছে বলে। পর পর বসার চান্স, তা দেখুন কী গাজুরারী!

জনৈকের হঠাৎ বোধোদয় আওড়াবার পথ হল। ভারি ভদ্রজনের মতো বললেন, 'আহা, কতটুকুরই বা মামলা। একটু পরে আপনিও নেই, আমিও নেই। খামকা একটা পাছা-ঠেকানোর মামলায় এমন হামলা-হামলি করেন কেন?'

কিন্তু কে কার কথা শোনে? গাজুয়াব জোয়ান ভদ্রলোক তখন লাইনের মাথায় গিয়ে ফার্স্ট চান্সের অপেক্ষা করছেন। পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত নিতান্ত ভদ্র-লোকটি আক্রোশে চীৎকার চালাচ্ছেন,

মানুষ তো হাতে ঘড়ি দেখলে একটি মাত্রই প্রশ্নোচ্চারণ করেন, 'কটা বাজে বড়দা!' আমি যখন অন্যমনে চিন্তিত, ভদ্রলোক কানের ওপর হুমরি খেয়ে কী যেন জানতে চেয়েছিলেন। নিশ্চিন্ত মনে তাঁকে সময় বলেছিলাম। এখন বুঝছি উত্তরটা ঠিক হয় নি এবং আমার সীমা-বদ্ধ ভদ্রতাজ্ঞানের ওপর ছোটোখাটো [illegible]তা করার অধিকার অসাবধানতায় আমিই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি।

সুতরাং সবিনয়ে বললাম, 'মাফ করবেন; সাংসারিক ঝামেলায়, বুঝলেন না দাদা, মনটা সব সময় ঘড়ির কাঁটার [illegible] তো সজাগ থাকে না। ভুল শুনে ভুল উত্তর করে ফেলেছি!'

সঙ্গে সঙ্গে মহা আপ্যায়িত [illegible]ভঙ্গিতে আকর্ণ হাসি হেসে তোরিয়া [illegible]হযাত্রীটি সমবেদনায় গলে পড়লেন, [illegible], তাই বলুন। বটেই তো, ঝামেলা [illegible] একটা! এই দেখুন না, দু' নম্বর [illegible]! [illegible] থেকে [illegible] পাস মুখে দিয়ে এলাম। আমি অবশ্য দোকান থেকে লক্ষ্য রাখছিলাম। তাও একবার ফিরে এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, দু' নম্বর একটাও পাশ করে গেছে কি না। তা আপনি বললেন, পৌনে এগারো। আরে মশায়, পৌনে এগারোটা বাস, সে কি খেলা কথা!'

পার্শ্ববর্তী অনেকে মুচকি হেসে ফেললেন। মহা অপ্রস্তুতে আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক হুপ করে একটা অমানুষিক লম্ফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড হুটোপুটির ধাক্কায় আমিও তাঁর পেছনে।

দুই নম্বর, দুই নম্বর! বাঘা-গুপীর মতো তারস্বরে গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল আমারও। জানলার আঁকশি ধরে, জামার কলার চেপে, অপরের কাঁধে ঝুলে মুহূর্তের মধ্যে একরাস্তা মানুষ একটা বাসের ভেতর

ঘাড় ধরে নামিয়ে দেওয়া উচিত।' উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নিরুত্তর। তিনি তাঁর কাজ হাসিল করে মনে মনে হাসছেন। এলগিনের মাথায় একটা সিট অধিকার করে বসেও পড়লেন।

কিন্তু কতটুকুই বা। সেক্সপীয়র সরণীর সামনে বাঁক নেওয়ার মুখেই বোধোদয়। প্রচণ্ড এক হেঁচকি তুলে বাসটা দুবার থরথর করে কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তে হৃৎস্পন্দন ঠাণ্ডা।

'ব্রেক ডাউন!'

কন্ডাক্টর সাহেব যেন একবাস যাত্রীর ডেথ সেন্টেন্স আওড়ালেন নিচে থেকে। তখন দোতলার জানালা দিয়ে সার সার মাথা জিরাফের মতো লম্বা হয়ে রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। মাঝপথে বাস বদল! ভয়ংকর হুটোপাটি আলোড়ন। পাশ দিয়ে ভর্তি বাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে। জিরাফগ্রীবা যাত্রীরা সতৃষ্ণনয়ন। পারলে দোতলার জানলা থেকেই অপর বাসের দোতলায় ঝাঁপ দেন।

উদ্বাস্তুর মতো নেমে এলাম। মাঝপথে পুনর্বাসন কি আর সম্ভব।

Breakdown বাসটার দোতালা থেকে একলাফে

নেমে এলাম আমিও। দুটো হাত গিলে করা পাঞ্জাবী এখন নিখরচায় সর্বাঙ্গ গিলে হয়ে গেছে। নেমে এলেন কলেজ স্ট্রীটগামী ছাত্রছাত্রীরাও। টু-টু-বির দারুণ ভিড়ের মোটা অংশ এঁরাই।

টু-বি আর নট টু বি। এখন যা পাওয়া যায়।

হ্যামলেটের মতো দার্শনিক ঔদাসীন্যে ময়দানের বাতাস আড়াল করে সিগারেট ধরালাম। এখন সর্বাঙ্গ গিলে পাঞ্জাবীর প্রতি মুহুর্মুহুঃ করুণ নেত্রপাত এবং ভাবনা : বাসে, না ট্যাক্সীতে, কোনটায় খরচ কম? তিনবার বাস বদলের ফলে তিন গুণ ভাড়া, সর্বাঙ্গ গিলে-হয়ে-যাওয়া পাঞ্জাবীকে ফের ভদ্রলোক সাজাতে দ্বিগুণ ধোলাই খরচ, প্রায়ই অফিস লেট জনিত ক্ষতি এবং যেখানে লেটের বিনিময়ে ছুটি কাটা যায়, সেখানে প্রায় মোটা আর্থিক ক্ষতি। তাছাড়া সময়ের দাম এবং আয়ু-ক্ষয় তো আছেই।

এসব হিসেব সামনে ধরলে বাসই তো বেশি এক্সপেন্সিভ মনে হয়।

'ব্রেক ডাউনে'র খাতে বাড়তি খরচ যেমন যাত্রীদের তেমনি স্টেট ট্রান্স-পোর্টেরও।

শুধু দুটি কি তিনটি পরিশ্রান্ত প্রাণী হয়ত মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে কাজে বার হওয়ার সময় মা কালীর পটে মাথা ঠেকিয়ে করুণ আবেদন জানিয়ে আসেন :

'মাগো, অনেকদিন চার চাকার চরকি-খাচ্ছি। করুণা কর মা করুণাময়ী। আজ, দাও মা গাড়ি ব্রেক ডাউন করে!'

গৌতম

নির্জন স্টেশনে পৌঁছে পকেটে হাত ডুবিয়েই সুধাময়ের খেয়াল হলো, টিকিটের পয়সা সে বিকেলের কিছু আগে খেয়ে ফুরিয়ে ফেলেছে। পকেট এখন একেবারে শূন্য। শূন্য পকেটে হাত ডুবিয়ে খানিকটা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো সুধাময়। ম্যানেজারের কাছ থেকে টাকা নেবার কথা ছিল তার। কাজের তাড়ায় টাকা নেবার কথাটা কখন যে সুধাময় ভুলে গেছে তা সুধাময় জানে না। ভুলে যাবার কথাটা এখনই মনে পড়লো সুধাময়ের।

টিকিট কাউন্টারের ছোট্ট জানালাটা দিয়ে খানিকটা উজ্জ্বল আলো বাইরে এসে পড়েছে। জানালার আশেপাশে কেউ নেই। জানালা থেকে অল্প খানিকটা দূরে একটা লোক শুয়ে আছে। আগাগোড়া একটা কাপড়ে ঢেকে। লোকটার নাকডাকার মৃদু শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সুধাময়। লোকটাকে সুখী মনে হচ্ছে সুধাময়ের।

এই দ্বিতীয় দিন সুধাময় সন্ধ্যে সাতটার ট্রেনে না ফিরে রাত বারোটার ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। প্রথম দিন একটা ছবি দেখে ফিরেছিলো। সঙ্গে আরো একজন ছিলো সেদিন। আজ একা ফিরছে। আজকে হঠাৎ প্রেসে জরুরী একটা কাজ এসেছে। কাজটা যে আসবে আগে জানতো না কেউ। দুপুরের দিকে এসেছে কাজটা। আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই কাজটা তুলে দিতে হবে। অল্প সামান্য একটু বাকি আছে। এই কাজের জন্য আজ দশটা পর্যন্ত ওভারটাইম ছিলো।

শুধু ওভারটাইমের পাওনাই নয়, ম্যানেজার কথা দিয়েছে তাদের সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবে কাজটা সম্পূর্ণ উঠে গেলেই।

একটা দীর্ঘ হাই তুললো সুধাময়। এই প্রেসে সুধাময় একাই মেসিনম্যান বলে দারুণ পরিশ্রম গেছে আজকে। পায়ে ঠেলে মেশিন [illegible] দুপুর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আজকে মেসিনের প্যাডেলে তার পা ছিলো। দু'হাতে কাগজ দেয়া-নেয়া করতে হয়েছে যন্ত্রের মতো দ্রুত। হাত, পা সব ভেঙে পড়ছে এখন। মনে হচ্ছে, খুব কঠিন একটা অসুখ থেকে উঠেছে সে।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে সুধাময় এবার আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখলো। বারোটা বাজতে [illegible]

চেপে ধরলো। অনেক পুরনো ঘড়ি। মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে কাঁটা দুটো স্থির হয়ে থাকে। আজকে সারাদিনে এই স্টেশনে এসেই প্রথম ঘড়িটা দেখবার সুযোগ পেয়েছে সুধাময়। সারাদিনে ঘড়ি দেখবার কথাটা মনেই হয় নি। রাত দশটায় প্রেসের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে মেসিন থামিয়ে কপালের ঘাম মুছেছে সুধাময়। তার পর দ্রুত হাত ধুয়ে সেই অন্ধকার এবং দীর্ঘ গলিটা পেরিয়ে নিখিলবাবুর বাড়িতে পৌঁছেছে। ঘড়িটা পকেটের মধ্যে অনড়ভাবে ছিলো ততোক্ষণ। স্টেশনে আসবার সময় রাস্তায় চলতে চলতে ঘড়িটা হাতে বেঁধেছে সুধাময়।

নিখিলবাবুর বাড়ি পৌঁছেও যদি সুধাময়ের খেয়াল হতো ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে তার দুটো টাকা নেবার কথা, তাহলেও এমনি শূন্য পকেটে স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছে এসে হতাশ-ভাবে দাঁড়াতে হতো না। অন্তত নিখিলবাবুর কাছ থেকে সে কয়েকটা টাকা পেতে পারতো।

স্টেশনের কাছাকাছি বিনয় থাকে। সুধাময়ের মনে হলো। কিন্তু এই মাঝরাত্রে বিনয়কে ডেকে বিপন্ন করতে ইচ্ছে হলো না সুধাময়ের। ডেকে বিপন্ন করাটাকে অন্যায় বলে মনে হলো।

খাবার পর নিখিলবাবুর সিগারেটের প্যাকেট থেকে লুকিয়ে দুটো সিগারেট তুলে নিয়েছিলো সুধাময়। একটা নিখিলবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই ধরিয়েছিলো। পকেটে ছিলো আর একটা। সুধাময় সেই সিগারেটটা ধরালো এবার। একমুখ ধোঁয়া বুকের মধ্যে টেনে নিলো।

ধোঁয়াটুকুকে আস্তে আস্তে আরাম করে উড়িয়ে দিতে দিতে সুধাময় ভাবলো, এই ট্রেনে তাকে ফিরে যেতেই হবে। সে ফিরে না গেলে বাড়িতে

সুধাময় নিজেও সেজন্যে অস্বস্তির মধ্যে থাকবে।

প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সুধাময় মনে মনে ঠিক করে ফেললো, টিকিট ছাড়াই সে ট্রেনে উঠবে। টিকিট ছাড়া গাড়ীতে উঠতে অবশ্য বুকের মধ্যেটা ভয়ে শিরশির করে। কিন্তু না উঠে তো উপায় নেই। যতোটা সম্ভব টিকিট চেকারকে এড়িয়ে থাকলেই হবে। তিনটে স্টেশন তো মাত্র। আর একান্তই যদি টিকিট চেকারের মুখোমুখি হয়ে যায়, স্পষ্ট করে তাকে বুঝিয়ে বলবে ব্যাপারটা।

ঘড়িটাকে আরেকবার কানের কাছে ধরে তার পর হাত নামিয়ে সময় দেখলো সুধাময়। এক্ষুণি গাড়ি এসে পড়বে। দুজন লোক সেই উজ্জ্বল জানালাটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টিকিট কিনলো। তাদের দুজনকে সুখী মনে হলো সুধাময়ের।

সারাদিন পরিশ্রম করেছে সুধাময়। এখন সেই টিকিট কাউণ্টারের দিকে আর নিজের শূন্য পকেটের মধ্যে হাত ডুবিয়ে সমস্ত দিনের পরিশ্রমকে তার শাস্তি বলে মনে হচ্ছে। ফের অসহায়-ভাবে দাঁড়িয়ে দু' আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটাকে পুড়ে যেতে দিলো সুধাময়।

প্ল্যাটফর্মের ওদিকে তিনজন পুরুষ একজন মহিলাকে নিয়ে লাইনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সুধাময়ের আসবার আগেই ওরা এসেছে। খুব নীচু গলায় ওরা কথা বলে যাচ্ছে তখন থেকে। নীচুস্বরে কথা বলে স্টেশনের নির্জনতাকে ওরা বাড়িয়ে তুলছে খানিকটা। সুধাময়ের অন্তত তাই মনে হলো।

আজ এই রাত বারোটার ট্রেনে সেই তিনজন, সুধাময় নিজে এবং এইমাত্র যারা টিকিট কিনলো, সেই দুজন যাচ্ছে। যেদিন ছবি দেখে ফিরছিল সুধাময়, সেদিনও এই রকম জনাছয়েক যাত্রী ছিলো। সেদিন সবাইকে টিকিট কাটতে দেখেছিলো সুধাময়। এ স্টেশন থেকে সেদিন কেউ বিনা টিকিটে যায় নি। আজ সম্ভবত সে একাই বিনা টিকিটে যাচ্ছে। সুধাময় ফের অসহায় বোধ করলো।

ট্রেন আসবার শেষ ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঘড়ি দেখলো সুধাময়। সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলো লাইনের মধ্যে। হাই তুললো। বুকের মধ্যে ভয় জমাট করছে। সুধাময় তাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে হেরে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো। জলতেষ্টা পাচ্ছে খুব। জিভের ডগায় লেগে আছে। অন্তত ধুলো বালিটা ধুয়ে ফেললে ভালো লাগতো। কিন্তু আপাতত সে উপায় নেই। স্টেশনের কলটা অনেক-দিন হলো বিকল হয়ে আছে। কাছাকাছি দোকানপাটও সব বন্ধ।

পকেটে হাত ডুবিয়ে মৌরি অথবা সুপারির টুকরো কিছু একটা খুঁজতে চেষ্টা করলো সুধাময়। একটা মৌরির দানা হাতে ঠেকলো কেবল। সযত্নে সুধাময় সেটা তুলে মুখে ফেললো। তারপর মূল্যবান জিনিসের মতো অত্যন্ত সাবধানে দাঁতে কাটতে থাকলো তাকে।

ট্রেন যেদিক থেকে আসবে সেদিকে লাইনের সোজাসুজি তাকিয়ে সুধাময় ট্রেনের তীব্র আলো দেখতে পেলো এবার। সরে এলো সুধাময়। মুখ ফিরিয়ে দেখলো সেই তিনজন পুরুষও মহিলাটিকে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

ট্রেনের শব্দ ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। স্টেশনের নির্জনতা ভেঙে যাচ্ছে। সুধাময় অসহায় বোধ করছে ফের। সত্যি সত্যি টিকিট কাটছে না সুধাময়। তিনটে তো মাত্র স্টেশন। রোজ সে টিকিট কাটে। তাছাড়া রাত বারোটায় নিশ্চয়ই টিকিট চেকার আসবে না। সেবারও আসে নি। টিকিটগুলো এখনও মেয়েটার খেলার বাক্সের মধ্যে আছে।

দৈত্যের মতো এসে দাঁড়ালো ট্রেনটা। জনাকয়েক খুব তাড়াতাড়ি নেমে চলে গেলো। ট্রেন বেশি সময় দাঁড়ায় না এই স্টেশনে। কামরাগুলোর তেমন ভীড় নেই। সবাই ঝিমুচ্ছে কামরার মধ্যে। সুধাময় খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে দেখলো, তারপর অত্যন্ত সাবধানে একটা কামরায় উঠে অত্যন্ত সহজভাবে বসে রইলো। বুকের মধ্যে সত্যি সত্যি ভয়টাই রাজত্ব করছে। কোনোরকমে তিনটে স্টেশন যেতে পারলে আর ভাবনা নেই। ভয়ের রাজত্ব তখন আপনি ভেঙে যাবে।

সুধাময় ভাবলো, অন্তত নিখিল-বাবুর ওখানে তার টাকার কথাটা খেয়াল হওয়া উচিত ছিলো। ওখানে খেয়েছে, গল্প করেছে, অভাব-অভিযোগের দু'-চারটে কথাও বলেছে। নিখিলবাবু প্রেসটার মালিক হলেও, প্রেসের সমস্ত কর্মচারীর সংগে বন্ধুর মতো নিবিড় একটা সম্পর্ক তাঁর। দশটার সময় হোটেলে খাবার পাওয়া সুধাময়ের পক্ষে শক্ত হবে বলে নিখিল-বাবু তাকে নেমন্তন্ন করে গিয়েছিলেন।

এসব কথা ভেবে সুধাময় দীর্ঘ একটা নিশ্বাস নিলো। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরেটা দেখলো সুধাময়। মৌরীগ্রাম স্টেশনে থেমে থাকার কোনোও ব্যস্ততা নেই। ইঞ্জিন থেকে শিঁশিঁ করে তীক্ষ্ম একটা শব্দ কেবল ছড়িয়ে যাচ্ছে।

খানিক চুপচাপ থাকবার পর ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজলো। সুধাময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, লোকটা নিস্পৃহের মতো ঘণ্টা বাজিয়ে সোজা আপিস ঘরে চলে যাচ্ছে। এই অসহায় অবস্থার মধ্যেও আশ্চর্যভাবে একটা কথা ভাবলো সুধাময়। ভাবলো, ওই লোকটাই রেলের সব থেকে সুখী লোক। রেলের আসবার এবং যাবার, দুটো ঘণ্টাই ওর হাতে বাজতে হবে। স্কুলে পড়তে যেমন মনে হতো দপ্তরী গণেশই স্কুলকে বসিয়ে দেয়, টিফিন দেয়, ছুটি দেয়। এসব কাজ ও কেউকে জিজ্ঞেস করে করতো না। নিজেই ঘড়ি দেখতো, তারপর ঘণ্টা বাজাতো। এই স্টেশনে তেমনি ওই লোকটাই যেনো সর্বেসর্বা।

না, এ কামরায় কোনো চেকার উঠলো না। গাড়িটা মৃদুগতিতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়ালো, হোম সিগন্যাল ছাড়ালো। তারপর একটা ঘুমটিঘরও পেরিয়ে গেলো। খানিকটা নির্ভাবনায় সুধাময় আরাম করে বসলো। সবাই ঝিমুচ্ছে গাড়ির মধ্যে। যতো জনকে দেখা যাচ্ছে, সবার মুখের ওপর এক-বার চোখ বুলিয়ে গেলো সুধাময়।

সুধাময় এবার বাইরে তাকালো। বাইরের মাঠ-ঘাট গাছপালার ওপর অন্ধকার স্তূপ হয়ে আছে। সন্ধ্যে সাতটার ট্রেনে ফিরবার সময় মাঝে মাঝে আলোর রেখা দেখা যায় মাঠের কাছে দূরে। এই রাত বারোটায় তাদের একটিকেও আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ট্রেনের এক-টানা শব্দে সুধাময়ের হঠাৎ চোখ বুজে এলো। সেই সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সে মেসিনের প্যাডেলটা পায়ে ঠেলেছে। দু'হাতে কাগজ দিয়েছে মেসিনে। অবসন্নভাবে ভাবতে ভাবতে দীর্ঘ একটা হাই তুলে সুধাময় ট্রেনের দোলায় আস্তে আস্তে দুলতে থাকলো।

হঠাৎ কার ডাকে যেনো ঘুম ভেঙে গেলো সুধাময়ের। সুধাময় চমকে লাফিয়ে উঠলো। তার নম্বার স্টেশনটা পার হয়ে যায়নি তো? ঘুম-ঘুম চোখেই বাইরের দিকে তাকালো সুধাময়। অন্ধকার স্তূপ হয়ে জমে আছে বাইরে।

'টিকিটটা দেখি একবার।'

কথাটা শুনেই ভেতরে তাকিয়ে সুধাময় টিকিট চেকারকে দেখলো। বিদ্যুতের মতো একটা ভয় সুধাময়ের

মুখের মধ্যে লাফিয়ে নামলো। সুধাময় উত্তর দিতে পারলো না। খানিকটা অর্থহীনভাবে তাকিয়ে রইলো টিকিট চেকারের দিকে।

'টিকিট কেটেছেন?' টিকিট চেকার শুধালো সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে।

সুধাময় বললো, 'উহুঁ!'

'কোত্থেকে উঠেছেন?'

স্টেশনের নাম বললো সুধাময়। কোথায় নামবে তাও বললো।

'ভাড়াটা দিয়ে দিন।'

'ভাড়ার পয়সা নেই আমার কাছে।' নিজের কণ্ঠস্বর সুধাময়ের নিজের কাছেই অসহায় শোনালো।

'নেই মানে?'

সুধাময় কী বলবে ভেবে পেলো না। মাথা নামিয়ে আশ্রয় খুঁজলো। তারপর অসহায়ভাবে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেও বলতে পারলো না।

ক্লান্তিতে, অপমানে সুধাময় যেনো ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। ঝক্ ঝক্ শব্দে অন্তর কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেনটা। সুধাময়ের সমস্ত সত্তা ট্রেনের চাকার তলায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সুধাময় তাদের ছুড়ে ফেলবার জন্যে ভেতরে ভেতরে দারুণ পরিশ্রমে ঘামতে থাকলো। চোখ-মুখ-কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকলো সুধাময়ের।

হঠাৎ সুধাময় টের পেলো, ট্রেনের গতি মন্থর হচ্ছে। স্টেশন নিশ্চয়ই। তিনটে স্টেশনের কোন্‌টা কে জানে! ঘুমের মধ্যে ক'টা স্টেশন সে পেরিয়ে এসেছে সুধাময় টেরই পায় নি।

'এই স্টেশনেই নেমে পড়বেন আপনি। না হলে টিকিট কাটতে হবে।' টিকিট চেকার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো।

দর্‌দর্ করে ঘামতে থাকলো সুধাময়। জ্বালা করছে চোখ। সুধাময় স্থিরভাবে বসে রইল।

ট্রেনটা মন্থর হতে হতে এক সময় থেমে গেলো। সুধাময় যে স্টেশনে নামবে, তার আগের স্টেশন। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শুধুমাত্র কয়েকটা লাল নীল আলো অবসন্ন চোখে স্টেশনটাকে জাগিয়ে রেখেছে।

ট্রেনের সবাই ঝিমুচ্ছে। তবু অত্যন্ত সাবধানে চেকার আর কিছু বলবার আগেই সুধাময় দ্রুত নেমে পড়লো ট্রেন থেকে। অন্য কিছু ভাববার অবকাশ পেলো না সুধাময়।

চেকারও তার পেছন পেছন নেমে পড়লো। দাঁড়িয়ে রইলো তার কাছাকাছি।

সুধাময় বললো, 'আপনি আমায় বিশ্বাস করে চলে যেতে পারেন। আমি ট্রেনে উঠবো না।'

কী ভেবে টিকিট চেকার হনহনিয়ে গার্ড ভ্যানের দিকে চলে গেলো।

আধ মিনিট স্টপেজ। ট্রেনটা সুধাময়কে নিঃসঙ্গ প্ল্যাটফর্মে রেখে বাঁধা লাইনে উধাও হয়ে গেলো। সমস্ত পৃথিবীকে এই মুহূর্তে আশ্চর্য নিষ্ঠুর মনে হলো সুধাময়ের।

সুধাময় দেখলো, স্টেশন ঘরের কাছে স্টেশনের জনাতিনেক লোক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকলো।

প্ল্যাটফরমে এখন আর কেউ নেই। কেবল অন্ধকার আর সুধাময়—সুধাময় আর অন্ধকার। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে সুধাময় আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলো। এখন সম্ভবত একটা বাজে। ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে হলো না সুধাময়ের। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে হবে তাহলে। সুধাময় এখন এই অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।

কিন্তু সারারাত তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। কথাটা ভেবেই অসহায় ক্রোধে হঠাৎ লাইনগুলোকে তুলে ফেলতে ইচ্ছে হলো সুধাময়ের। সুধাময় যেনো অসম্ভব নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো তার। সুধাময় তার একমাত্র সাক্ষী থাকবে। ভীষণ একটা আক্রোশে হঠাৎ লাইনের ওপর নামলো সুধাময়। ঝুঁকে পড়ে ছেলেমানুষের মতো তুলে ফেলতে চেষ্টা করলো লাইনগুলোকে। কিন্তু লাইনগুলো এক চুলও নড়লো না। অসম্ভব পরিশ্রমে হাঁপাতে থাকলো সুধাময়। টস্ টস্ করে ঘাম ঝরে পড়তে থাকলো কপাল থেকে। হঠাৎ শিশুর মতো কাঁদতে ইচ্ছে হলো সুধাময়ের। ইস্, কতো বছর আগে সুধাময় শিশু ছিলো। সুধাময় উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ।

রাশি রাশি অন্ধকারকে হঠাৎ তার ছাপার মেসিনের পেটের কালো কালি বলে মনে হলো। সে কালি শুধুমাত্র কালি। তার ভাষা নেই। অক্ষরের শরীর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে সে সাদা কাগজের ওপর সবাক হয়ে ওঠে।

কথাটা ভেবেই সুধাময় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। ঘর্মাক্ত সুধাময় দু'হাতে হঠাৎ চতুর্দিক থেকে আশ্চর্য সব আলোর অক্ষর কুড়োতে থাকলো। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আলোর এই অক্ষরগুলো এতো-কাল ছড়ানো ছিলো। সুধাময় সেগুলোকে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

অন্ধকারকে সেই পেটের ওপরের কালির মতো আলোর অক্ষরগুলোর ওপর লাগিয়ে সুধাময় তার বুকের মধ্যেকার একটা সাদা পাতায় ছাপ তুললো। সবাক হয়ে উঠলো পাতাটা।

রোমাঞ্চে এবার থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো সুধাময়। পাতাটার ওপর যে লেখা সবাক হলো সে লেখায় অন্ধকার মুছে গেলো। সুধাময়ের ঘাম, সুধাময়ের অপমান সব মুছে ভাস্বর হয়ে উঠলো সে লেখা। অত্যন্ত সহজে সুধাময় তার খানিকক্ষণ আগের সেই দুর্ঘটনা ঘটাবার ভাবনাটাকে খুন করে লাইনের ওপর নিজের হৃদয়টাকে পেতে দিলো। মনে মনে প্রার্থনা করলো ট্রেনটা যেনো আগামীকাল তার হৃদয়ের ওপর দিয়ে চলতে চলতে তাকে ধন্য করে দিয়ে যায়।

ক্লাইপার রোডে ঝড়ঃ (মার্চ, ১৯৭০)—মনোরঞ্জন হাজরা। নবজাতক প্রকাশন। ৬, এণ্টনীবাগান লেন। কলকাতা-৯। দামঃ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সুসাহিত্যিক মনোরঞ্জন হাজরা পাঠকদের দরবারে যখন তাঁর বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে, তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে সমাজের চালচিত্র অংকন করেন, তার অন্তর্নিহিত আসল দ্বন্দ্বটিকে তুলে ধরেন, তখন পাঠক শুধু সস্তা ভাবাবেগে মথিত হন না বা কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে আপন কর্তব্য শেষ করেন না, তিনি গভীর জীবনজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের শ্রেণী ও কাঠামো নিয়ে যে সংঘাত, সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, নিপুণ তুলির আঁচড়ে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে মনোরঞ্জনবাবুর মতো খুব কম ঔপন্যাসিকই পারেন, কারণ সর্বস্তরের জীবন এবং মানুষ সম্পর্কে তাঁর যেমন আছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তেমনই আছে তাকে সাহিত্যে রূপ দেবার মতো দরদী দৃষ্টিভঙ্গী।

'ক্লাইপার রোডে ঝড়' জাতীয় সামাজিক রাজনৈতিক উপন্যাস তিনি আগেও রচনা করেছেন। তাঁর 'স্বর্ণ শিমুলের চরে' উপন্যাসটিও অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

এই জাতীয় উপন্যাসে সার্থকতা লাভ করা দুরূহ। মনোরঞ্জনবাবু জানেন, কীভাবে উপন্যাসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। স্বাধীনতার ঠিক পরেই একটা কারখানার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ ছায়াছবির মত চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল, তা মর্মমূলে বিধৃত হয়ে থাকল। একটিবার পাঠ করতে আরম্ভ করলে শেষ না করে ওঠার উপায় নেই। সহজ গতিতে ঘটনার পর ঘটনা কখনো আবেগ, কখনো উদ্বেগ, কখনো স্বস্তি, কখনো বা ভয় মিশ্রিত অনুভূতি জাগিয়ে পাঠককে অভিভূত করে রাখে। এ বড় কম মুন্সিয়ানা নয়।

আর, একটি মাত্র ঘটনার মধ্যে দিয়েই কলমের স্বল্প আঁচড়েই মনোরঞ্জনবাবু শোষক-শাসকের স্বরূপ এঁকেছেন, শোষিত জনসাধারণকে পথ দেখিয়েছেন। রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র, পুলিশী নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ, শাসক-শ্রেণীর বেইমানীর ভূরিভূরি প্রমাণ দিয়ে শঠতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন কাহিনীকার।

একটি মিলে সংগ্রাম চলেছে। হরতাল, পিকেটিং। দালাল শ্রমিকরা মদৎ পাচ্ছে। নেতাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে। নেতা ভেবে একজনকে খুন করেওছে পুলিশ জঘন্যভাবে। তবু সংগ্রামী মনোভাব অটুট, সংগ্রাম চলেছে। শ্রমিকদের ধরে জেলে পুরলেও পিকেটিং চালিয়েছে তাঁদের মা-বোন-বউ-এরা। পুলিশ ও দালালদের চোখের আড়ালে থেকে লড়াই পরিচালনা করছে নায়ক তপন।

বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র আশ্চর্য রকমের প্রাণবন্ত। মানবচরিত্রের গভীরে তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ক্ষমতা না থাকলে এমনটি সম্ভব হোতো না। ছোট পার্শ্বচরিত্রগুলির কথাই ধরা যাক্। পিকেটিং যারা করছে, তারা গোয়ালাকে ছেলেদের জন্যে ভেতরে দুধ নিয়ে যেতে দেবে কি না, এই নিয়ে শ্রমিক ভিখারী মণ্ডল ও হেমন্ত দাস দু'জনেই মনোমালিন্যে লিপ্ত, তারপর লড়াইটা কার বিরুদ্ধে, সেকথা জেনে আবার বন্ধু হয়ে যায়। এই বন্ধ্যা শাসনের দালাল পুলিশ দারোগা মধুবাবুর সাপের মত খল কুৎসিত চরিত্রও অতি সুপরিচিত আমাদের কাছে। স্বার্থের জন্যে জীবনদাতাকেও জেলে পাঠাতে পিছপা নয়। নায়ক তপনের সংগ্রামের সাথী মধ্যবিত্ত নিশীথের সাধ্যে না কুললেও নেতা হবার বাসনা ও ঈর্ষা: সংগ্রামকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা বিশেষ লক্ষণীয়। একটি স্বচ্ছ, সুন্দর চরিত্র শ্যালিকা রুণু। মমতাময়ীর মত নায়ককে চোখে চোখে রাখে। বিহারী গোয়ালিনী পানমতিয়ার মানবিক আচরণই বা ভুলি কেমন করে? আর একটি সার্থক নিয়ে সে জৈবিক আকর্ষণ অনুভব করেছিল নায়কের প্রতি। নায়ক দিল তাকে বোনের মর্যাদা। দুর্লভ স্নেহছায়ার অভিসিঞ্চিত দুটি হৃদয়ের পরিবর্তন বড় আনন্দদায়ক। নায়কের স্ত্রী রেখার চরিত্রটি কিন্তু ততখানি পরিস্ফুট হয় নি। উপন্যাসখানির সব থেকে উজ্জ্বল পার্শ্বচরিত্র জয়রাম সিং। ছিল সৈনিক। দেশবিভাগের পর ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে চাকরি নেয়। সে হৃদয়হীন দালাল ছিল না। দেশের ভাই-এর বুকে গুলী চালাবার আদেশ অমান্য করেছিল বলে তার চাকরি যায়। তাতে সে দমে নি। বলেছিল, 'লেকিন, আজাদ হিন্দুস্তানমে হামি বেকসুর কই ভাইকো মারতে পারবে না।' পুলিশ, মিলিটারীতেও যে নতুন চেতনা জাগছে, চরিত্রটি তারই প্রতীক।

তপন সংগ্রামী নেতৃত্বের এক মূর্ত প্রতীক। শ্রমিকের ওপর যেমন তার প্রভাব, তেমনই তার অপরিসীম ব্যক্তিত্ব। দৃঢ়চেতা, উন্নত চরিত্র এই যুবক হতাশা বলে কিছু জানে না। সমস্ত বাধা-বিপত্তি ভেঙে সংগ্রামকে জয়ের দিকে পরিচালনা করে নিয়ে গেছে সে। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও বিন্দুমাত্র নজর নেই। মধু দারোগা বাড়ি সার্চ করতে এসে বিনতার শিশু সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। ক্রোধে, দুঃখে, জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওৎ পেতে তপন তাকে ধরেছে, খুন করতে গেছে, পরমুহূর্তেই চৈতন্য হয়েছে তার। এ পথ তো তার নয়! ব্যক্তিগত আক্রোশ, সন্ত্রাসবাদ, এই দিয়ে তো বিপ্লব আসে না। ঘৃণাভরে সে তাই দালালটাকে ছেড়ে দিয়েছে।

বর্ণনা ঋজু। সরস। কয়েকটি জায়গা কাব্যধর্মী।

ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী প্রশংসার্হ।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় 'ক্লাইপার রোডে ঝড়' একটি অমূল্য সংযোজন। এই উপন্যাসটির প্রতি সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

—অঃ হাঃ

ইনকিলাব ঃ (বৈশাখ, ১৩৭৭)—সম্পাদক মুহম্মদ সামাউন। বাচামারী, মালদহ। দামঃ ২৫ পয়সা।

মালদহ থেকে প্রকাশিত একটি প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিক। এই সংখ্যাটি লেনিন জন্মশতবর্ষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত। লেনিনের জীবনের ঘটনাবলী সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রশান্ত মিত্রর গল্পটি উল্লেখের দাবী রাখে। কবিতা লিখেছেন যদু কি চক্রবর্তী, অনির্বাণ সেনগুপ্ত, স্বপন দে, সঞ্জিতকুমার সাহা ও রিয়াজুল ইসলাম। আমরা পত্রিকাটির শুভায়ু কামনা করি।

এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জুলিয়েট মেণ্ডেলশন ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। তিনি তাঁর রাজকীয় কাশ্মির হাউসে তাঁর ধনী ব্যাঙ্কার স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। যদিও তাঁর বন্ধুবান্ধব সবাই ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর। তাঁর কিন্তু আমার (অর্থাৎ ইসাডোরা ডাঙ্কানের) নাচের স্কুলের সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল এবং সহানুভূতি ছিল। একদিন জুলিয়েট আমাদের সবাইকে এলিয়েনোরা ডুজের সামনে নাচবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ডুজের প্রতিভাকে আমি মনে মনে পূজো করতাম।

। তৎকালীন ইউরোপের স্টেজের সবসেরা অভিনেত্রী হিসাবে প্রায় একই সঙ্গে নাম করা হোত সারা বার্নহার্ড ও এলিয়েনোরা ডুজের।

এলিয়েনোরা ডুজে (১৮৫৯-১৯২৪): ইটালীয়ান ট্র্যাজিক অভিনেত্রী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। সফরকারী অভিনেতা-পরিবারের মেয়ে—বাপ, ঠাকুর্দা দুজনেই ছিলেন নট। ডুজে নিজে চার বছর বয়স থেকে অভিনয় করতে শুরু করেন। চোদ্দ বছর বয়সে মঞ্চে নামেন জুলিয়েটের ভূমিকায়। বিখ্যাত অভিনেতা আর্নেস্টো রসসি পরে তাঁকে নিজের দলে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য নিযুক্ত করেন। ক্রমশ তাঁর অভিনয়ের খ্যাতির সৌরভ সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৫ সালে লণ্ডনে তিনি এবং সারা বার্নহার্ড একই সময় বিভিন্ন মঞ্চে জুডারমানের নাটকের ম্যাগডার ভূমিকায় অভিনয় করে সমালোচক এবং দর্শকমহলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ডুজের স্বপক্ষে ছিলেন বার্নার্ড শ' আর বার্নহার্ডের দিকে ক্লেমেণ্ট স্কট। শ' তাঁর সমালোচনায় লিখেছিলেন:

Obvious as the disparity of the two famous artists has been to many of us since we first saw Duse, I doubt whether any of us realised, after Madame Bernhardt's very clever performance as Magda on Monday night, that there was room in the nature of things for its annihilation within forty-eight hours by so comparatively quiet a talent as Duse's. And yet annihilation is the only word for it—(Our Theatres in the Nineties—Vol. 1, page 152).

অবশ্য শ'র লেখার ভঙ্গীর সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত, তাঁরাই জানেন আইকোনোক্ল্যাস্টিক স্টাইলের রচনার সাহায্যেই তিনি নিজের অহংকে প্রকট করে তুলতে চাইতেন। সে সময়ের রঙ্গজগতে সারা বার্নহার্ড ছিলেন প্রায় একমেবাদ্বিতীয়মের মত। সুতরাং দর্শকমনের এই ইমেজটি নষ্ট করে দেবার প্রচেষ্টার দ্বারাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এই ছিল শ'য়ের আসল মনোভাব। এই কারণেই স্যার হেনরী আরভিং-এর প্রতিও তিনি বিষোদ্গার করতেন তাঁর স্যাটারডে রিভিউ'র সমালোচনাগুলোতে এবং এই এক উদ্দেশ্য নিয়েই সেক্সপীয়ারের নাটকের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাবার চেষ্টা করতেন। তবে তাঁর সমালোচনায় কোন সত্যিকার 'ম্যালিস' থাকতো না। একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যেত, আসলে তিনি ঠাট্টাছলেই কথাগুলো বলছেন।

এবার সারা বার্নহার্ড সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে দেব। গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যেরা গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখেছেন এবং এইসব শিষ্যদের লেখায় গিরিশবাবুর নামোল্লেখও দেখা যায়। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পেছনে। স্বামীজী এবং গিরিশচন্দ্রের ভেতর যে একটা গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল, একথাও কারও অবিদিত নয়।

কিন্তু ইওরোপ, আমেরিকাতে গিয়ে শত কর্মব্যস্ততার ভেতরেও যে স্বামীজী থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন, একথা জানতাম না—জানলাম তাঁর রচনাবলী থেকে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডে 'পরিব্রাজক' অংশের 'ইউরোপে' নিবন্ধে স্বামীজী বলেছেন, 'পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড, আর সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কালভে—দুজনেই ফরাসী। দুজনেই ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান ও অভিনয় করে আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন।

ফরাসী ভাষা সভ্যতার ভাষা—পাশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন সকলেই জানে; কাজেই এদের ইংরেজী শেখবার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি নেই।

মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু স্টেজে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, যে চরিত্ররূপে (স্ত্রী অথবা পুরুষ চরিত্র) অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল। বালিকা, বালক, যা বল তাই—হুবহু, আর সেই আশ্চর্য আওয়াজ। এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে। বার্নহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর। আমাকে বার বার বলেন, তোমাদের দেশ ত্রেজাসিয়েন, ত্রেসিভিলিজে (tre's ancieu, tre's civilise)—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা—বিলকুল ভারতবর্ষ। আমায় অভিনয়ান্তে বললেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়াম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা-ঘাট পরিচয় করেছি।'

বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে মঁ র‍্যাভ' (C'estmon rave)—সে আমার জীবনস্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব ওয়েলস (পরে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড) তাঁকে বাঘ, হাতী শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ-দু' লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নেই—'লা দিভিন সারা' (La Divine Sarah) দেবী সারা—তাঁর আবার টাকার অভাব কি?—যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই!—সে বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজা-রাজড়া করতে পারে না; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার অভাব নেই, তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারত ভ্রমণ কাজেই এখন রইলো।

আবার সপ্তম খণ্ডের পত্রাবলীতে

স্বামীজীর মিঃ স্টার্ডিকে লেখা এই চিঠিটি আছেঃ

229W 88th Street
New York
13 February, 1896

ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে ইজেল (Iziel) অভিনয় করছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাঁচে উপস্থাপিত বুদ্ধ-জীবনী। এতে রাজ-নর্তকী ইজেল বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হল। মাদাম বার্নহার্ড ইজেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

আমি এই বুদ্ধ ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম। মাদাম কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেসলা ছিলেন। মাদাম বার্নহার্ড খুব সুশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন।

সারা বার্নহার্ড সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তিগুলো থেকেই বোঝা যায় ডিভিন সারা তখন ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে খ্যাতির চরম শীর্ষে অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

এবার সারার জীবনী সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা বলবো—

সারা বার্নহার্ড (১৮৪৪—১৯২৩)

আজকের দিনে যেমন ব্রেশট্‌-পত্নী হেলেনা ভাইগেলকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা মঞ্চাভিনেত্রী হিসাবে ধরা হয়, তাঁর সময়ে সারাকেও বিশ্বের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবেই মনে করতেন ইওরো আমেরিকার নাট্যসমালোচক এবং বিদগ্ধ দর্শকের দল। তিনি জাতে ছিলেন ফরাসী কিন্তু শুধু নিজের দেশেই নয়, ইওরোপের সর্বত্র। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইজিপ্টেও তিনি বহুবার নিজের দল নিয়ে অভিনয় করতে বেরিয়েছেন এবং সব জায়গাতেই প্রচুর যশ, খ্যাতি এবং শ্রদ্ধা অর্জন করে এসেছেন। ডিভিন সারার জন্ম হয় প্যারিসে—তাঁর বাবা ছিলেন ফরাসী এবং মা ডাচ। পনের বছর বয়সে তিনি সরকারী অভিনয় শেখবার স্কুল কনসারভেটয়ারে ভর্তি হন। এখানে নিজের প্রতিভা এবং বুদ্ধিমত্তায় ১৮৬১ সালে ট্র্যাজেডীতে অভিনয় এবং ১৮৬২ সালে কমেডীতে অভিনয় সম্বন্ধে পারদর্শিতার জন্য সারাকে দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

এরপর তিনি কমেডী ফ্রাসেজে অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৭২ সাল অবধি সারা ওডিয়ন থিয়েটারে অভিনয় করেন। এ রঙ্গমঞ্চটি ছিল ল্যাটিন কোয়ার্টারে অবস্থিত। এরপর আবার ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮০ সাল অবধি কমেডী ফ্রাসেজে অভিনয় করেন। তারপর থেকে অন্য কোথাও চাকরি না করে তিনি নিজেই নিজের থিয়েটার চালিয়েছেন।

বাইশ বছর বয়সে সারার প্রথম বিরাট সাফল্যলাভ হয় ওডিয়ন থিয়েটারে "এথেলীতে"। তিনি তাঁর স্বর্ণকণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন কোরাসের সংলাপ। এই তো হল তাঁর অভিনেত্রী জীবনের প্রথম যশোলাভ। তারপর ক্রমাগত অভিনয় করে চলেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। পরিশ্রম করেছেন আপ্রাণ। যশের উচ্চশিখর থেকে উঠেছেন উচ্চতর এবং তারপর উচ্চতম চূড়ায়।

অভিনেত্রী হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, অন্তরে ছিল তাঁর জ্বলন্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস।

বার্নহার্ডের ভাবানুভূতি এবং চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি বিশেষভাবে প্রতিভাত হোত ক্ল্যাসিকাল চরিত্রে অভিনয়ে। ১৮৯১ সালে বার্নহার্ড হ্যামলেটের চরিত্রে অভিনয় করে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেন। বিখ্যাত নাট্যকার রসট্যাণ্ড তাঁর হ্যামলেট দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

একাত্তর বছর বয়সে অপারেশন করে সারার একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়; কিন্তু এ্যাম্পুটেশনের পর সুস্থ হয়ে উঠে তিনি আবার মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেন।

অভিনয় ছাড়াও ভাস্কর্য এবং চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় সারার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল; তাছাড়া কবিতা এবং নাটক লিখেও সে সময় তিনি নাম করেছিলেন। নিজের লেখা কয়েকটি নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছেন।।

এরপর ইসাডোরা লিখছেনঃ ডুজের সঙ্গে আমি ক্রেগের পরিচয় করিয়ে দিলাম। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে ক্রেগের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাঁর মতামত শুনে ডুজে মুগ্ধ হলেন এবং ক্রেগের ডেকর বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। দুজনের আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হবার পর ডুজে আমাদের ফ্লোরেন্সে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। ডুজের ইচ্ছা ক্রেগ তাঁর একটি নাটকের মঞ্চসজ্জা করেন। সেই অনুসারে ঠিক হল যে, ফ্লোরেন্সে ডুজে ইবসেনের রজমারর্সহোলম নাটক মঞ্চস্থ করবেন এবং গর্ডন ক্রেগের উপর থাকবে দৃশ্যসজ্জার দায়িত্বের ভার।

এরপর আমরা সবাই ফ্লোরেন্সে এসে হাজির হলাম। কাজের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হল। আমাকে ক্রেগের দোভাষী হয়ে আলোচনায় সাহায্য করতে হল—ক্রেগ ফরাসী বা ইটালীয়ান ভাষা জানতেন না। ওদিকে আবার ডুজেও একবর্ণ ইংরাজী বুঝতেন না। এই দুই বিরাট প্রতিভাকে সামাল দিতে আমাকে নাজেহাল হতে হয়েছিল, কারণ, প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল এ'রা একে অপরের মতকে গ্রহণ করতে রাজী নন। অথচ আমি চাইছিলাম দু'জনকেই খুশি করতে—দু'জনকে এক কাজে যুক্ত করতে। আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে কূটনীতির আশ্রয় নিতে হোল। আমি বানিয়ে বানিয়ে দু'জনের কথার ভাষা দিতে লাগলাম। আমি চাইছিলাম এই বিরাট প্রডাকসনটি মঞ্চস্থ হোক এ'দের যুগ্ম প্রচেষ্টায়—সেটা শুধু সম্ভব হয়েছিল আমার এই মিথ্যাভাষা দেবার ফলে। যদি তখন এলিয়েনোরা সত্যি সত্যি যা বলছিলেন তা ক্রেগকে জানাতাম বা ক্রেগ যে সব মন্তব্য প্রকাশ করছিলেন তার যথাযথ ভাষা দিতাম, তাহলে এ'দের টিম-ওয়ার্ক তখনই ভেঙে যেত। (ক্রমশ)

দ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

সম্প্রতি 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' চলচ্চিত্রটি আবার দেখলাম রবীন্দ্রসদনে। ছবিটি কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল। ছবিটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের। পরিচালনা করেছেন নাট্যকার মন্মথ রায়। সম্ভবত বিদ্রোহী কবি নজরুল-জীবন অবলম্বনে এটিই প্রথম ছবি। ছবিটি এক সময় জনপ্রিয় হয়ে- । তার প্রধান কারণ বোধ হয় কবির প্রতি মানুষের ভালবাসা। ছবিটি দেখতে আমারও খারাপ লাগে নি। আমার ভাল লাগার কারণ : নজরুলের গ্রামের দৃশ্য রয়েছে, গ্রামের মানুষের কিছুটা স্পর্শ পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বোধ হয়েছে এতে কবি-প্রমিলা নজরুলকে দেখে। তিনি পক্ষাঘাত রোগে শায়িতা, সে সময় শয্যায় থেকেও কিভাবে কবিকে সেবা ..., খাইয়ে দিচ্ছেন—সে দৃশ্যগুলি ...। কবি যখন মাণিকতলা অঞ্চলে ..., তখন যাঁরা কবিকে দেখতে গেছেন, ... কাছে এই দৃশ্য পরিচিত। কবি-পরিবারের সকলকেই এখানে দেখা যায়, ... কবিপুত্ররা কিছুটা শীর্ণকায় ছিলেন ... একই সঙ্গে ছিলেন মা-বাবাকে ...।

... দুই আগে এই ছবির দুটি অংশ ... প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন সত্যাসত্যের। মুজাফফর আহমদ রচিত "নজরুল : স্মৃতিকথা" প্রকাশের পর প্রশ্ন অনেকের মনে জেগেছে। ছবিতে হয়েছে গান্ধীজীর অসহযোগ ...নের প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবার ... কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করে- ... 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা; যে কবিতার ... পংক্তি "তোরা সব জয়ধ্বনি কর! ... নূতনের কেতন ওড়ে, কাল বোশেখীর ...।

গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত ... ১৯২০ সালে, আর নজরুল ... "প্রলয়োল্লাস" কবিতা লিখেছিলেন ... বসে ১৯২২ সালে। অসহযোগ আন্দোলন তখন স্তিমিত হয়ে গেছে। আন্দোলনের শেষ সময় তিনি কেন ... "সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক ..." "জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে ..."। তিক্ত ত' এই কবিতায় নজরুলকে বন্দিত করেছেন। "নজরুল ইসলাম : স্মৃতি কথা"—বইয়ের লেখকের মতে, রুশ-বিপ্লবের প্রভাব এবং সমাজবিপ্লবের আভাস এই কবিতায় রয়েছে। এই স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবিতে দেখান হয়েছে আলিপুর জেলে ফাঁসীর মঞ্চ দেখে কাজী নজরুল 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি রচনা করেছিলেন। "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান হে" পংক্তির জন্য হয়ত এই ধারণা হতে পারে। কিন্তু 'নজরুল স্মৃতি কথায়' দেখা যায়, ১৯২৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ব্যথিত মন নিয়ে কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীতরূপেই কবি এই গানটি রচনা করেছিলেন।

এই ভুল তথ্য দুটি সংশোধন হওয়া দরকার। দর্শকরা ভুল তথ্য জানছেন। শুনেছি শ্রদ্ধেয় মুজাফফর আহমদ এই ভুল তথ্য সম্পর্কে ছবির পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। গত বছর শুনেছিলাম, এই ভুল তথ্য সংশোধন করে ছবিটি পুনঃসম্পাদিত হবে। কিন্তু কার্যত তা যে হয় নি, ছবিটি দেখে বোঝা গেল। যদি তথ্যাদির দ্বারা স্বীকৃত হয়ে থাকে যে ছবিটির ভাষ্যে ও তথ্য প্রকাশে কিছু ভুল আছে, তাহলে সংশোধনে আপত্তি কেন থাকবে! কাজী নজরুলের মত কবির রচনাকাল ও কবিতার উপলক্ষ সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন কোনরকমেই মেনে নেওয়া যায় না। সংশোধনে তেমন কাটছাঁটের প্রয়োজন নেই, যার জন্য ছবির অঙ্গহানি বা নতুন চিত্র গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। কেবলমাত্র ধারা ভাষ্যে 'অসহযোগ প্রস্তাব উপলক্ষে রচিত' কথাটি টেপ থেকে বাদ দিয়ে অন্য কথা সংযোজন করতে হবে; আর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানের ক্ষেত্রে সেকালের পটভূমি ও কৃষ্ণনগর রাজনৈতিক সম্মেলনের কথা উল্লেখ করতে হবে। তার জন্য তথ্যবিভাগের দ্বিধার কোন কারণ নেই, সে সম্মেলন সেকালের কংগ্রেসের সম্মেলন ছিল।

আশা করি "বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম" ছবিটি পুনঃসম্পাদন অর্থাৎ ধারাবিবরণী নতুন করে সম্পাদনা না করা পর্যন্ত প্রদর্শন বন্ধ থাকবে এবং যথাসত্বর পুনঃসম্পাদন কাজ শেষ করা হবে। বিদ্রোহী কবি সম্পর্কে এই একটি মাত্র ছবি, সে ছবিতে ভুল বিবরণী কোন রকমেই সমর্থন করা যায় না।

—...

'শচীমার সংসার' ছবিতে নবাগতা সংহিতা রায়

অগ্রদূত পরিচালিত 'মঞ্জরী অপেরা' ছবিতে উত্তমকুমার

সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব

অনবদ্য ছবি 'আনা কারেনিনা'

কলকাতার লাইট হাউস সিনেমায় গত ২২শে মে থেকে সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে সাতটি পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখান হয়েছে, তার মধ্যে দুটি ছবি ছিল লেনিন সম্পর্কে। সের্গেই ইয়ুৎকেভিচ পরিচালিত 'স্টোরিজ এবাউট লেনিন' ছবিতে রাজনৈতিক নেতা লেনিন ও মানুষ লেনিনকে দেখান হয়েছে। প্রথম খণ্ডে লেনিনের আত্মগোপন কাল: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠনের কাজ করছেন, আর তাঁকে ধরবার জন্য কেরেনেস্কির পুলিশ হন্যে হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় ভাগে দেখান হয়েছে অসুস্থ লেনিন গর্কিতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর নার্স একজন যুবককে ভালবাসে কিন্তু পার্টি কমিটি বিয়েতে সম্মত নয়। লেনিনের কাছে মেয়েটি নিজের মনের কথা খুলে বলে, লেনিন এই ব্যাপারে মমতাবোধ নিয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করেছেন। পার্টির সদস্যদের প্রতি তাঁর দরদ, সাধারণ মানুষের প্রতি নম্র ব্যবহার আর সেই সঙ্গে সাহিত্য-প্রীতি এই খণ্ডে দেখা যায়। বিখ্যাত আমেরিকান প্রগতিশীল সাহিত্যিক জ্যাক লণ্ডনের একটি গল্প শুনতে শুনতে তাঁর জীবনাবসান হয়। দৃশ্যটি বড়ই হৃদয়-স্পর্শী। এই ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ম্যাক্সিম স্ট্রখ, লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি বিশ্ববিখ্যাত।

দ্বিতীয় ছবি বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক মিখেইল রম-পরিচালিত 'লেনিন ইন অক্টোবর'। ছবিটি ইতিপূর্বে ফিল্ম-সোসাইটিগুলির উদ্যোগে দেখান হয়েছিল। এই ছবিতে ফিনল্যান্ড থেকে লেনিনের পেট্রোগ্রাডে আগমন এবং বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাবার ঘটনাবলী, আর একদিকে কেরেনেস্কির অস্থায়ী সরকারের পুলিশ তাঁকে ধরবার জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে বিপ্লব জয়যুক্ত হল। জারের শীতকালীন প্রাসাদ দখল এবং বিপ্লবের পরিচালন কেন্দ্র স্মলনীতে লেনিনের বক্তৃতার দৃশ্যে ছবি শেষ হয়েছে। এই ছবিতে লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বোরিস শচুকিন। ইনি আর একজন বিশ্ববিখ্যাত লেনিন-অভিনেতা।

এই দুটি ছবির সঙ্গে স্বল্প-দৈর্ঘ্যের লেনিন-সম্পর্কিত প্রামাণিক ছবি দেখান হয়েছে। এই প্রামাণিক ছবিগুলি শিল্প-বুদ্ধিতে অসাধারণ। দুটি পূর্ণাঙ্গ লেনিন জীবনচিত্রে স্তালিন স্থান পান নি। যদিও স্মলনীতে সাময়িক পরিচালন কেন্দ্রে তিনজন পরিচালকের মধ্যে স্তালিন ছিলেন ভারপ্রাপ্ত—এই কারণে স্বাভাবিক-ভাবে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান রুশরা ইতিহাসের কাটছাঁট করতে দ্বিধা করে না। সুতরাং এখানেও সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণের জন্য অনেক ঐতি-হাসিক চরিত্রকে দেখা যায় নি।

এই উৎসবের সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছবি বিখ্যাত পরিচালক আলেকজান্দার বর্নার্ক পরিচালিত 'আনা কারেনিনা'। মনীষী লিও টলস্টয়ের লেখা উপন্যাস 'আনা কারেনিনা'র ইতিপূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বারোটি চিত্ররূপ হয়েছে। সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র রূপ দিয়েছে জার্মানী, ১৯১০ সালে। ১৯১৯ সালে জার্মানীতে দ্বিতীয়বার চলচ্চিত্র রূপ দেওয়া হয়। আমেরিকাতে তিনবার চলচ্চিত্র রূপ দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৫ সালে হলিউডের 'আনা কারেনিনা' ছবিতে গ্রেটা গার্বো আনা হয়েছিলেন। তাঁর সেই অভিনয় আজও পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩৫ সালে যে আনা কারে-নিনা ছবি হয়, সেই ছবিতে আনা সেজে-ছিলেন সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী আলা তারা শোভা। এবারের এই ত্রয়োদশ ছবিতে আনা হয়েছেন তাতিয়ানা সামই-লোভা। তাতিয়ানাকে আমরা প্রথম দেখেছিলাম "ক্রেনস আর ফ্লাইয়িং ছবিতে। তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে-ছিলাম। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫২ সালে ভারতে আনা কারেনিনা অবলম্বনে একটি হিন্দী ছবি হয়েছে।

সোভিয়েতের বর্তমান 'আনা কারেনিনা' অপূর্ব সুন্দর এক রঙিন ছবি। যেমন দূর-বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য, বরফের ওপর স্কেটিং, ঘোড়দৌড় ইত্যাদির সঙ্গে প্রায় শতবর্ষ আগের রাশিয়ার অভিজাত সমাজের জীবন ও দেশের যানবাহন, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নিখুঁতভাবে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে অভিনেতাদের বিশেষ করে তাতিয়ানা সামইলোভার অনবদ্য অভিনয়। এই ছবিতে আর কাউন্টেস

বেৎসির [illegible] অভিনয় করেছেন আকর্ষণীয়া প্রাইমা ব্যালেরিনা মায়া পিসেৎস্কায়া। স্বামী-পুত্র নিয়ে আনার সংসার। ভাইয়ের ভাঙাঘর জোড়া দিতে এসে সে প্রেমে পড়ে গেল ভরোনস্কির। তার পরে শুরু হল একদিকে স্বামী-পুত্র, আর একদিকে ভরোনস্কিকে নিয়ে টানা-পোড়েন। প্রেম আর মাতৃস্নেহ, কর্তব্য আর প্রেম, সমাজ আর প্রেম, একটির পর একটি প্রশ্নে আনার জীবনে আসে অস্থিরতা, মানসিক দ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত ভরোনস্কির প্রেম সম্পর্কেও তার মনে প্রশ্ন জাগে। এই প্রশ্ন জাগার যে যন্ত্রণা, জীবন আর প্রেমের দ্বন্দ্বে আনার যন্ত্রণা—তাতিয়ানার অভিনয়ে এত সুন্দর ফুটে উঠেছে যে, টলস্টয়ের সাহিত্যের স্বাদ [illegible] অনুভব করা যায়। সাহিত্যের [illegible] ও বক্তব্য দর্শকমনে পৌঁছয়। পরিচালক ঝার্কি যে কত বড় পরিচালক, [illegible] ছবি তার একটি নিদর্শন। চিরায়ত [illegible]ত্যের রূপ দেওয়া বড় কঠিন কাজ। দর্শকরা সব সময় ছবিকে বিচার করেন সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে। সাহিত্য ও [illegible]ত্রের প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। বক্তব্য দর্শকমনে ঠিকভাবে পৌঁছনোই সাহিত্য [illegible] ছবির সার্থকতা। ছবি দেখে যদি দর্শকরা বই পড়ে যে ধারণা করেছিলেন [illegible]রকম ধারণা সহজভাবে করতে পারেন [illegible] মনে করা যায়, ছবি সার্থক হয়েছে। আনা কারেনিনা' মানবাত্মার এক চমৎকার [illegible] যুদ্ধ-পরবর্তীকালে ছবিতে প্রেম সম্পর্কে যে ধারণা দেখা দিয়েছে তা [illegible]তামূলক এবং হীন চিন্তাধারার। [illegible]হীন ভালবাসা ও যৌনতার আতিশয্যে [illegible]র দৃশ্যগুলি কদর্য হয়ে উঠেছে। [illegible]র 'আনা কারেনিনা' এমন একটি ছবি, [illegible]ত গভীর প্রেমের অনুভূতি কিভাবে [illegible]তে দেখান যায়, তার একটি দৃষ্টান্ত। [illegible]নরকম যৌন আতিশয্য না করে সঙ্গমের [illegible] পর্যন্ত এই ছবিতে রয়েছে। কিন্তু [illegible] কদর্যতা নেই। কারণ সত্যিকার [illegible] কখনো হীনতামূলক এবং অশ্লীল [illegible]তে পারে না। প্রেম হৃদয়কে প্রসারিত [illegible], আত্মমর্যাদাবোধ জাগায়, সকল [illegible] হীনতা থেকে রক্ষা করে। প্রেম [illegible] বিচ্ছেদাত্মক হয়, তখন তা হয় মানব [illegible] মন্ত্রবিন্দুর মত সুন্দর। ঝার্কির [illegible] কারেনিনা" ছবিতে আমরা এই [illegible]ন্দর্য ও প্রেমের পবিত্রতা অনুভব [illegible]লাম। যা দেখে দর্শকমন সুন্দরের [illegible]ত আকৃষ্ট হয়, প্রেমের মহত্ত্ব ও গভীরতা [illegible]ভব করে।

আমাদের দেশে যারা সাহিত্যের [illegible]চিত্র রূপ দেন, তাঁদের এই ছবি দেখে [illegible]ক শেখার আছে। বিশেষ করে প্রেমের দৃশ্য রচনায় কিরকম দায়িত্ব ও শিল্প-বুদ্ধির প্রয়োজন তা শিখতে পারবেন।

পরিচালক ঝার্কি আনার মানসিকতাকে ফোটাবার জন্য ক্যামেরাকে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে নিপুণভাবে ব্যবহারে করেছেন। ক্যামেরার কাজে তাঁর সহায়ক হয়েছেন লিওনিদ কালাসনিকভ। রঙের ব্যবহারে ছবিটির সৌন্দর্য ও পরিবেশ ফুটে উঠেছে। শিল্পীর তুলিতে প্রয়োগের মত রঙ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গীত এই ছবিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে—বিশেষ সময়ের মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে। 'আনা কারেনিনা'র এই ত্রয়োদশ সংস্করণ জগতের অন্যতম ভাল ছবির মর্যাদা লাভ করেছে এবং চিরকালের দর্শনীয় হয়ে থাকবে। "নিউ এডভেঞ্চারস অব ইলুসিভ এভেঞ্জার" সমাজতান্ত্রিক দেশের এডভেঞ্চার ছবি। পশ্চিমী ছবিতে গুলীবাজি ও নারীদেহ প্রধান অবলম্বন: এখানে তার উল্টো। অনেকটা বুদ্ধির খেলা। এই ছবিতে চারজন তরুণ কিভাবে জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলে সেনাপতির সিন্দুক থেকে মানচিত্র উদ্ধার করে আনল তার কাহিনী। ছবির মেজাজে রয়েছে পশ্চিমী এডভেঞ্চার ছবির প্রতি শ্লেষ। এই উৎসবে প্রদর্শিত অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে ছিল—"দি আয়রন ক্লাড", "ওয়ান চান্স ইন থাউজেন্ডস"।

অর্ধেন্দু মুখার্জী পরিচালিত 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ছবিতে অনিল চ্যাটার্জী ও নির্মল চ্যাটার্জী।

রবীন্দ্রসদনে নজরুল জন্মোৎসব

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসদন কমিটি গত ২৫শে মে সন্ধ্যায় এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে-ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের "বল ভাই মাভৈ মাভৈ", 'জাগো নারী বহ্নিশিখা' সমবেত সঙ্গীতের পর নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় নজরুল রচনাবলী থেকে অংশবিশেষ পড়ে শোনান। শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেন শ্রদ্ধেয় মুজাফফর আহমদের লেখা নজরুল স্মৃতি কথার অংশবিশেষ। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন আঙুরবালা, সুপ্রভা সরকার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পূরবী দত্ত, আরতি মুখার্জী, ধীরেন বসু প্রমুখ। যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন কাজী অনিরুদ্ধ ও সম্প্রদায়। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেছেন কাজী সব্যসাচী, প্রদীপ ঘোষ ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন সঙ্গীতশিল্পী চিন্ময় চট্টো-পাধ্যায়।

'ফ্যাসী-বিরোধী চলচ্চিত্র উৎসব'

পঁচিশ বছর আগে ১৯৪৫ সালের মে মাসে সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রতি-শোধ আন্দোলন চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিল ফ্যাসীবাদকে। আজ সেই মহান বিজয়ের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উৎসব বিপুল সমারোহের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার পক্ষ থেকে এই মহান ঐতিহাসিক বিজয়ের স্মরণে আগামী ৫ই থেকে ১১ই জুন লাইট হাউস সিনেমায় ফ্যাসী-বিরোধী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সোভিয়েত

ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভা-কিয়ার কনসুলেট জেনারেল এবং হাঙ্গেরী, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং বুল-গেরিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধি, ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি, ইন্দো-চেকোশ্লোভাক কালচারাল সোসাইটি, ইন্দো-জি ডি আর ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটি এবং ইন্দো-বুলগেরিয়া ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটি এই উৎসব অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করছেন। উৎসবে সাতটি কাহিনীচিত্র— "আই ওয়াজ নাইনটিন", (জি ডি আর), "দি সাইলেণ্ট ব্যারিকেট" (চেক), "ফ্রোজেন লাইটনিং" (জি ডি আর), "দে স্টারস" (চেক-বুলগেরিয়ান যুগ্ম প্রযোজনায়), "হার্ট টু বি ক্রাউড" (পোল্যাণ্ড), "দি এইটথ" (বুলগেরিয়া) ও "অন দ্য ওয়ে টু বার্লিন" (সোভিয়েট ইউনিয়ন) দেখান হবে। ছবিগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠবে এই সমস্ত দেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং সাফল্য।

এই উৎসব জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর আগামী ৫ই জুন সন্ধ্যা ৬টায় লাইট হাউস প্রেক্ষাগৃহে এই উৎসব উদ্বোধন করবেন।

'শীলা' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

মার্কেটিং অ্যাণ্ড রিক্রিয়েশান ক্লাব

গত ২৭শে মে সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মহলা-নবীশ রচিত নতুন নাটক 'মনীষা' পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কৃষি অধিকারের মার্কেটিং অ্যাণ্ড রিক্রিয়েশান ক্লাব মঞ্চস্থ করে। নাটকের টিম-ওয়ার্ক মোটামুটি সংহত। বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমতী মমতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী মেনকা দাস, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সাহা, শ্রীবুদ্ধদেব ঘোষ, শ্রীঅমলেন্দু গুহমজুমদার শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীগোকুলবিহারী চক্রবর্তী, শ্রীদিলীপ ব্রহ্ম প্রমুখ। আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাত যথাযথ পরিচালনার শ্রীসুনির্মল মজুমদার কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন।

কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক 'মহারাজ নন্দকুমার'

বিগত ২৩শে মে প্রসাদপুর কল্যাণ পরিষদের সভ্যগণ মহেন্দ্র গুপ্ত বিরচিত 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকের অভিনয় করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে

মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত নজরুল সাহিত্য-সংগীত সম্মেলনে গান গেয়ে শোনাচ্ছেন শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীমতী পূরবী দত্ত ও শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

গুঅভিনয় করেন শ্রীপরেশ নন্দী, শেখর নন্দী, মদন পাল, সূর্যকান্ত নন্দী এবং কুমারী রুমা নন্দী। নাটকে জহরতের ভূমিকায় শ্রীলোকনাথ নন্দী দর্শক সাধারণের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন শম্ভু নন্দী ও বাসুদেব নন্দী ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বংশীবিহারী নন্দী। আলোকসম্পাত প্রশংসনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ
নজরুল একাডেমির উদ্যোগে

নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মেলন

বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১৩ম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৯শে শুক্রবার সায়াহ্নে মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির উদ্যোগে নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মেলন অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। রাজ্য তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য তাঁর আকর্ষক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় নজরুলের সংগ্রামাত্মক রচনার প্রতি সমবেত সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঃ বঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের পুরস্কার বিতরণ করেন একাডেমির সাধারণ সম্পাদক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত তাঁর সম্পাদকের রিপোর্টে বলেন যে, একাডেমির প্রচার ও আন্দোলনের ফলেই বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকার প্রদত্ত কবির মাসোহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কবির গৃহ নির্মাণের জন্যে জমির বন্দোবস্ত হয়, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবির জন্মদিন প্রতিপালন করা হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিকল্পনা করেছিলেন স্বল্পমূল্যে নজরুল রচনাবলী প্রকাশের। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ঐ কাজ আর এগিয়ে যায় নি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত এই উৎসবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ, সুর-ঐন্দ্রজালিক দেশগৌরব ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে গুণিজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। সঙ্গীতরত্নাকরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে সংবাদ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের দূর-দূরান্তের পল্লী থেকেও বহু লোক এসেছিলেন। ফলে এক গাম্ভীর্যময় মনোজ্ঞ-পরিবেশ রচিত হয়েছিল। তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে পেরে নজরুল একাডেমি ও গৌরবান্বিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে গানে অংশ গ্রহণ করেন অঞ্জলি মজুমদার, শঙ্কা অধিকারী এবং আবৃত্তি করেন অনুরাধা ঘোষ ও সুমিত সেনগুপ্ত। বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রারম্ভে সুপ্রভা সরকারের পরিচালনায় নজরুল একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ দেশাত্মবোধক সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় আসরে এলে এক অপূর্ব প্রাণবন্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। সুরের আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুরের ইন্দ্রজালে এক ঘণ্টার ওপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে রাখেন। অনুষ্ঠানের প্রায় সমাপ্তি পর্যন্ত এই বরেণ্য সংগীতসাধকের উপস্থিতিতে নজরুল সংগীতের আসরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, পূরবী দত্ত, সুপ্রভা সরকার তৃপ্তি চক্রবর্তী, রামকমল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের হৃদয়ের দরদ দিয়ে গাওয়া গানগুলি শ্রোতৃবৃন্দকে আবেগ ও অপরূপ এক অনুভূতিতে অভিভূত করে রেখেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তর সমগ্র অনুষ্ঠানটির চিত্র গ্রহণ করেছেন।

নজরুল একাডেমির পক্ষ থেকে এই উপলক্ষে সুসংকলিত রচনা ও চিত্র সহ একটি সুদৃশ্য স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।

মেডিক্যাল কলেজে লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারী ও ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক যৌথভাবে গত ২৬শে ও ২৭শে মে পরীক্ষা হলে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। উভয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি শ্রীচিত্ত চৌধুরী। ২৬শে মে লেনিন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর বিশ্লেষণাত্মক ভাষণ দেন অধ্যক্ষ পীযূষ দাশগুপ্ত। গণ-সংগীত ও “মে-ডে” নাটক মঞ্চস্থ করেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারিবৃন্দ। ২৭শে মে ছাত্রনেতা শ্রীসুদর্শন রায়চৌধুরী ও শ্রীনীহার গুণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। গণ-সংগীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের ইসক্রা শাখা এবং ঐ শাখার প্রযোজনায় “মুদ্রামন্ত্রি” নাটক মঞ্চস্থ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই দিন।

১৯৩২ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখ।

সেই দিনটি ছিল ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ।

ভারতীয় ক্রিকেট পূর্ণ যৌবনের পূর্ণ মর্যাদা পেল সেই দিন। যেন নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ভারত। লর্ডস মাঠে ইতিহাস সৃষ্টি করে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামলো ভারত। ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে নয়, বুক ফুলিয়ে সমানে সমানভাবে সে যুগের সেরা দল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামলেন ভারতের খেলোয়াড়রা।

পোরবন্দরের মহারাজা নিজে বা দলের সহ-অধিনায়ককে না নামিয়ে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার দিলেন যোগ্যতম এবং শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড় সি· কে· নাইডুর ওপর।

ভারতীয় দলের পক্ষে খেলতে নামলেন—সি· কে· নাইডু (অধিনায়ক); জে. জি. নাভলে, নাওমল, ওয়াজির আলী, এস· এইচ· এম· কোলহা, এস. নাজির আলী, পি· ই· · পালিয়া, লাল সিং, জাহাঙ্গীর খান, অমর সিং ও মহম্মদ নিসার।

সেই খেলায় ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেছিলেন ডি· আর. জার্ডিন, এইচ· সার্টক্লিফ, পি· হোমস, এফ· ই. উলী, ডব্লিউ আর· হ্যামণ্ড, ই. পেণ্টার, এল. এমস, আর· ডব্লিউ. ভি· রবিনস, এফ· আর. ব্রাউন, ডব্লিউ ভোস ও ডব্লিউ· ই. বাউস।

১৯৩২ সালে ২৫শে জুনের সকালে লর্ডস মাঠে আরম্ভ হলো ভারত বনাম ইংলণ্ডের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ। টসে জিতে ইংলণ্ডই পেল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ। মাঠে তখন মাত্র দু' হাজার দর্শক। সকলের বোধহয় ধারণা ছিল টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত ভারত এমন কি আর খেলবে শক্তিশালী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে! তাই নেতিবাচক খেলার ধারণায় প্রথমটায় সেই খেলার এতোটুকুও মূল্য দিতে চান নি কেউ।

কিন্তু খেলা আরম্ভ হতে না হতেই আবহাওয়া গেল পাল্টে। ভারতের অখ্যাত বোলারদের দাপটে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়লেন ইংলণ্ডের সেরা ব্যাটসম্যানরা। মহম্মদ নিসার আর অমর সিং-এর ফাস্ট বোলিং তাঁদের শুধু বিব্রতই করে নি, বিস্ময়ে হতবাক করেছে।

যাই হোক ইংলণ্ডের পক্ষে ইনিংস সূচনা করতে মাঠে নামলেন সেকালের দুই সেরা ওয়েনিং ব্যাটস্ম্যান এইচ. সার্টক্লিফ আর পি· হোমস। এঁদের দু'জনের তখন ইংলণ্ডের ক্রিকেটের ওপর প্রভাব অপরিসীম। কারণ ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামার মাত্র কয়েকদিন আগে সার্টক্লিফ আর হোমস ৫৫৪ রান করে নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু সেই সার্টক্লিফ আর হোমস ভারতের অন্যতম ফাস্ট বোলার মহম্মদ নিসারের তীব্র আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। সার্টক্লিফ মাত্র ৩ রান আর হোমস ৬ রান করে নিসারের বলে বোল্ড আউট হয়ে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়নে। মাত্র ৯ রান করার পর উলী হয়ে গেলেন রান-আউট। মাত্র ১৯ রানের মধ্যে ইংলণ্ড হারিয়েছে সার্টক্লিফ, হোমস আর উলীর মতো খেলোয়াড়কে। লর্ডস মাঠে তখন চলেছে ব্যাট-বলে লড়াই-এর প্রচণ্ড সংগ্রাম।

দু'হাজার থেকে দর্শক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কুড়ি হাজারে। কুড়ি হাজার দর্শকের চোখের সামনে তখন চলেছে অভূতপূর্ব এক অভিনয়। ইংলণ্ডের নামী ব্যাটসম্যানরা কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়িয়েছেন টেস্ট ক্রিকেট জগতে নবাগত ভারতীয় দলের বোলারদের রুখতে।

রুখতে ওঁরা পারতেন না—যদি না হ্যামণ্ড, জার্ডিন আর পরে এমস এসে ব্যাটিং-এর হাল ধরতেন। উলী আউট হবার পর হ্যামণ্ড আর জার্ডিন অত্যন্ত সতর্কভাবে খেলতে শুরু করলেন। আর শেষ পর্যন্ত হ্যামণ্ড ৩৫, জার্ডিন ৭৯ আর এমস ৬৫ রান করায় ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ভদ্রগোছের রান করতে পারলো। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলো ২৫৯ রানের মাথায়।

জীবনের প্রথম টেস্ট খেলছে ভারত। কিন্তু সেই দলের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ২৫৯ রান যে উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিল না—এ কথা সবাই সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন।

এর উত্তরে ভারতও কিন্তু প্রথম ইনিংসে খুব একটা সুবিধে করতে পারে নি। মাত্র ১৮৯ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের ইনিংস। নাওমল (৩৩), ওয়াজির আলী (৩১), আর সি· কে· নাইডু (৪০) যা একটু খেলেছিলেন।

প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ৭০ রানে এগিয়ে থেকে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলো। কিন্তু এবারও সেই একই হাল। ভারতীয় বোলারদের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে একের পর এক আউট হয়ে যেতে লাগলেন ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড দলের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন জার্ডিন। আর তাঁরই সংগে খেলতে খেলতে ভালো খেলে ফেললেন পেণ্টার। জার্ডিন অপরাজিত

থেকে করলেন ৮৫ আর পেণ্টার করলেন ৫৪ রান।

৮ উইকেটে ২৭৫ রানের মাথায় ইংলণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলো। ভারত তখন ৩৪৫ রানে পিছিয়ে। জয়লাভের প্রশ্ন তখন অবান্তর। কিন্তু খেলাটা অমীমাংসিতভাবে শেষ করা যাবে কি না, সে বিষয়েও ছিল সকলেরই যথেষ্ট সন্দেহ। কারণ দুর্ভাগ্য ভারতের। ভারতের তিনজন সেরা ব্যাটসম্যান—নাইডু, নাজির আলী আর পালিয়া খেলার সময় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাঁদের পক্ষে উন্নত ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন বোধ হয় একরকম অসম্ভবই। ব্যাট করার মতো অবস্থাই ছিল না নাইডুর। যতোক্ষণ খেলেছিলেন তিনি, তাঁকে খেলতে হয়েছিল এক হাতে।

ফলে দ্বিতীয় ইনিংসেও হলো ভারতের ভরাডুবি। নাওমল করলেন ২৫ রান, ওয়াজির আলী ৩৯, লাল সিং ২৯ আর অমর সিং ৫১ রান করায় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে টেনেটুনে করতে পারলো ১৮৭ রান।

ফলে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় ভারত হেরে গেল ১৫৮ রানে। ভারত হেরে গেল বটে কিন্তু যে অবস্থা এবং পরিস্থিতির মধ্যে ভারতকে পরাজিত হতে হলো, তার কথা বিচার করে সকলেই টেস্ট ক্রিকেট জগতে ভারতের দৃঢ় পদক্ষেপকে একবাক্যে স্বীকার করলেন।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৩ সালের সংখ্যায় উইসডেন ভারতীয় দল সম্বন্ধে লিখলো—

....“Fortunately for the side they possessed in C. K. Naidu—easily their best batsman—man of high character and directness of purpose ... He led the team in the Test match at Lord's and although on the losing side, earned commendation for the manner in which he managed his bowling and placed his fielding.

..The bowling of the side was, all things considered, capital Mahomed Nisar, tall and very big for an Indian, was the fast bowler of the team....In point of actual skill, Amar Sing was probably

[শেষাংশ ৩১০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভারতের প্রথম টেস্ট খেলার পূর্ণ স্কোর বোর্ড নিচে দেওয়া হলো :—

ইংলণ্ড

১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
এইচ সাটক্লিক ব নিসার	৩	ক নাইডু ব অমর সিং	১৯
পি হোমস ব নিসার	৬	ব জাহাঙ্গীর খান	১১
এফ ই উলী রান আউট	৯	ক কোলহা ব জে খান	২৯
ডবলিউ হ্যামণ্ড ব অমর সিং	৩৫	ব জে খান	১২
ডি আর জার্ডিন ক ন্যাভলে ব নাইডু	৭৯	নট আউট	৮৫
ই পেণ্টার এল বি ডবলিউ ব নাইডু	১৪	ব জে খান	৫৪
এল এমস ব নিসার	৬৫	ব অমর সিং	৬
আর রবিনস ক লাল সিং ব নিসার	২১	ক জে খান ব নিসার	৩০
এফ ব্রাউন ক অমর সিং ব নিসার	১	ক কোলহা ব জিওমল	২৯
ডবলিউ ভোস নট আউট	৪	নট আউট	০
ডবলিউ বাউস ক নিসার ব অমর সিং	৭	ব্যাট করেন নি	
অতিরিক্ত	১৫		৮
	২৫৯		(৮ উই: ডি) ২৭৫

বোলিং

	১ম ইনিংস	২য় ইনিংস
নিসার	২৬ - ৩ - ৯৩ - ৫	১৮ - ৫ - ৪২ - ১
অমর সিং	৩১'১-১০-৭৫ - ২	৪১ - ১৩ - ৮৪ - ২
জে খান	১৭ ---৭ ---২৬ - ০	৩০ - ১২ - ৬০ - ৪
নাইডু	২৮ ---৮ ---৪০ - ২	৯ ---০ ---২১ - ০
পালিয়া	৪ ---৩ ---২ --- ---০	৩ ---০ ---১১ -০
জিওমল	৩ ---০ ---- ৮ - ০	৮ ---০ ---৪০ - ১
ওয়াজির আলী	---	১ ---০ ---৯ -০

ভারত

১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
জে ন্যাভলে ব বাউস	১২	এল বি ডবলিউ ব রবিনস	১৩
এন জিওমল এল বি ডবলিউ ব রবিনস	৩৩	ব ব্রাউন	২৫
এস ওয়াজির আলী এল বি ডবলিউ ব ব্রাউন	৩১	ক হ্যামণ্ড ব ভোস	৩৯
সি কে নাইডু ক রবিনস ব ভোস	৪০	ব বাউস	১০
এস কোলহা ক রবিনস ব বাউস	২২	ব ব্রাউন	৪
এস নাজির আলী ব বাউস	১৩	ক জার্ডিন ব বাউস	৬
পি পালিয়া ব ভোস	১	নট আউট	১
লাল সিং ক জার্ডিন ব বাউস	১৫	ব হ্যামণ্ড	২৯
জাহাঙ্গীর খান ব রবিনস	১	ব ভোস	০
অমর সিং ক রবিনস ব ভোস	৫	ক ও ব হ্যামণ্ড	৫১
মহম্মদ নিসার নট আউট	১	ব হ্যামণ্ড	০
অতিরিক্ত	১৫		৯
	১৮৯		১৮৭

বোলিং

	১ম ইনিংস	২য় ইনিংস
বাউস	৩০ - ১৩ - ৪৯ - ৪	১৪ - ৫ - ৩০ - ২
ভোস	১৭ - ৬ - ২৩ - ৩	১২ - ৩ - ২৮ - ২
ব্রাউন	২৫ - ৭ - ৪৮ - ১	১৪ - ১ - ৫৪ - ২
রবিনস	১৭ - ৪ - ৩৯ - ২	১৪ - ৫ - ৫৭ - ১
হ্যামণ্ড	৪ - ০ - ১৫ - ০	৫'৩ - ৩ - ৯ - ৩

খেলাধুলা

স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে
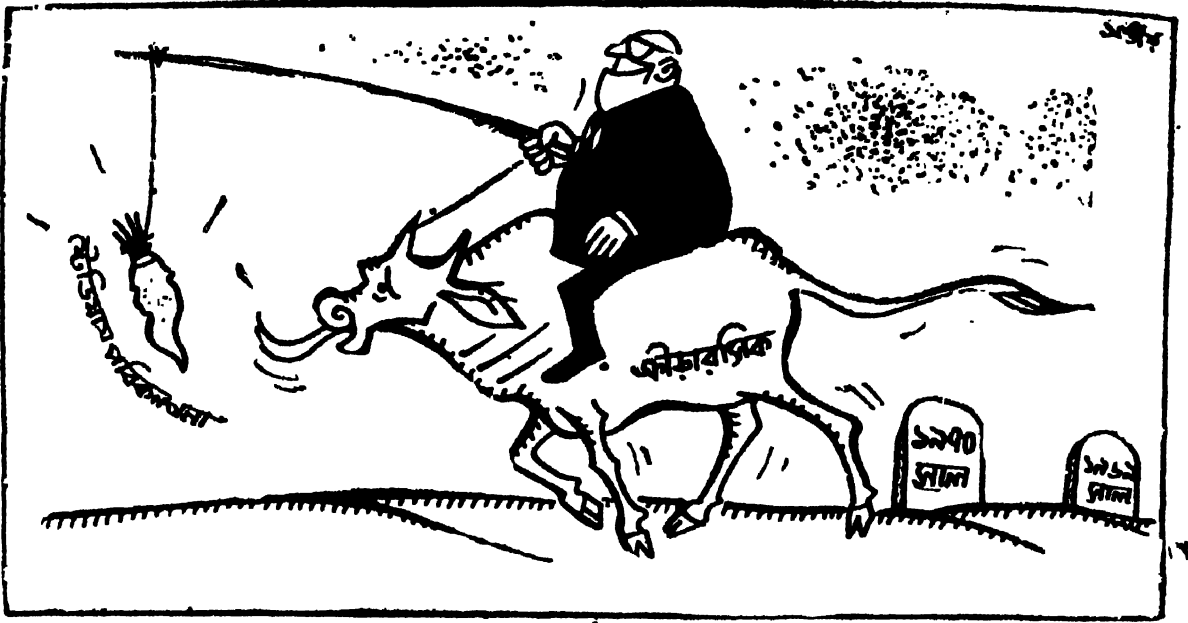
কলকাতার ফুটবল মরশুম শুরু হয়ে গেছে। ফুটবল মাঠে নামার সংগে সংগেই মাঠের আবহাওয়াই গেছে পাল্টে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে-না-হতে পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে মানুষ এখন চলে ময়দানের দিকে। সেই জনস্রোতের কোন্ বাছ-বিচার নেই। ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র সকলেই একই নেশায়, সকলেই একই আশায় মাঠের দিকে চলেন। শুধু খেলা দেখেই তাঁরা মন ভরান না, নিজের নিজের দলের পক্ষে চিৎকার করে, নেচে-গেয়ে, লাফালাফি করে তাঁরা ময়দানকে সরগরম করে তোলেন। তারপর দু'অক্ষরী সেই 'গোল' চিৎকারে পুরো এসপ্লানেড আর ডালহৌসি অঞ্চল যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের কোন বাছ-বিচার নেই, নেই গুমোট গরম কিম্বা অস্বাভাবিক আবহাওয়া কিম্বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে এতোটুকুও ভ্রূক্ষেপ। এই সময়টা বাংলা দেশের পাগলকরা খেলা, খেলার রাজা ফুটবলের নেশায় বিভোর হয়ে থাকেন কলকাতা তথা বাংলা দেশের আপামর জনগণ। প্রথমে খোঁজ-খবর, তারপরে খেলার ফলাফল নিয়ে কোথাও বয়ে যায় আনন্দের হিল্লোল, আবার কোথাও মুহূর্তের মধ্যে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। মোট কথা—বাংলা দেশের খেলা-পাগল জনগণের সংগে বড় বেশিভাবে মিশে গেছে ফুটবল। এই সময় কলকাতার অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সংগে ফুটবল খেলা যেন মিলে-মিশে এক হয়ে যায়। যাঁরা ফুটবল খেলা ভালোবাসেন না—তাঁরাও কোন কোন ক্ষেত্রে খেলার ফলাফল জানার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। আবার কারো কারো ইচ্ছে জাগে নিজের চোখে খেলা দেখে আসার।

কিন্তু সে অতো সহজ ব্যাপার নয়! কলকাতা ময়দানে ভালো খেলা দেখা আর যাই হোক, কোনমতে যে সহজ ব্যাপার নয়—এ কথা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন। এর ওপর বড় খেলা হলে তো আর কথাই নেই। একটা টিকিট জোগাড় করা বোধহয় শিবেরও অসাধ্য। কথায় বলে না—টাকা ফেললে কলকাতায় বাঘের দুধ মেলে, কিন্তু মেলে না মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার টিকিট। আর সেই জন্যে বহুকাল আগে থেকেই কলকাতা তথা বাংলা দেশের জনগণ একটা পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম দাবি করে আসছেন। কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট আমলে হচ্ছে হচ্ছে করেও কলকাতায় স্টেডিয়াম আর হলো না। লাল ফিতের বাঁধা যে ফাইলের মধ্যে স্টেডিয়াম বিষয়টি ঢুকেছে সেখান থেকে তার আর ছাড়ান নেই। অনেকের সংগে আমরাও ভেবেছিলাম যে, রাজ্যপালের কাছে এই বিষয়টি নিয়ে একবার দরবার করি। কিন্তু কিছুই যে তাতে হবে না, সে কথা আজ সকলেরই জানা। তাই মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের অর্থাৎ বাংলা দেশের ক্রীড়া-রসিকদেরই ফুটবল স্টেডিয়ামের দাবিতে মাঠে নামতে হবে। তাতেও কি হবে? যদি হয় তাহলে আমরা সকলেই ও-পথে যেতে প্রস্তুত। —শান্তিপ্রিয়

ফুটবল মাঠে

কলকাতার মাঠ-ময়দান এখন জমজমাট। চারদিকে শুধু ফুটবল আর ফুটবল। অসময়ের ক্রিকেটের পালা প্রায় সাংগ হলো। হকির আসরও এবারের মতো শেষ হয়ে গেছে বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার সংগে সংগেই।

তাই সারা বাংলা দেশের মতো শহর কলকাতার মাঠগুলো এখন আলো করে আছে ফুটবল খেলা। লীগ ফুটবলে প্রথম বিভাগের খেলাগুলো এখন বেশ জমে উঠেছে। নামকরা দলগুলো যেমন খেলছে, তার চেয়েও বোধহয় বেশি মন দিয়ে খেলতে চেষ্টা করছে প্রথম বিভাগে নব-উন্নত চারটি দল।

তবে সব সময়ই কি কুমারটুলি; কি ছাত্র সংঘ; কি টালিগঞ্জ অগ্রগামী কিংবা ঐক্য সম্মিলনী খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না।

না পারারই কথা। কারণ প্রথম বিভাগে খেলায় এবং খেলার আনুসংগিক খরচ যোগানো আর তার সংগে বড় বড় দলগুলোর সংগে পাল্লা দিয়ে চলা রীতিমত কষ্টকর হয়ে ওঠে।

তবে নতুন দলগুলোর কাছে ছোট ছোট দলগুলো অনেক আশা এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তু। কারণ তাঁদের খেলার সুযোগ এবং খেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগও সাধারণত আসে এই সব দলগুলোর কাছ থেকেই। সত্যি কথা বলতে কি—বাংলা দেশের সত্যিকারের ভালো খেলোয়াড় তৈরি করে থাকেন ময়দানের ছোট ছোট দলগুলো।

কিন্তু প্রায় সব সময়ই তাঁদের আর্থিক অনটনে ভুগতে হয়। ফলে তাঁদেরই তৈরি খেলোয়াড়রা যখন একটু নাম করেন কিম্বা ভালো খেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন, তখনই তাঁরা নিজের ক্লাবের কথা একবারও চিন্তা না করে স্বেচ্ছায় চলে যান কোন বড় ক্লাবে।

প্রতি বছর তাই একই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় ছোট ছোট দলগুলোকে। আজকের মনে হয় ওঁদের এবং বাংলা দেশের ফুটবল খেলার স্বার্থের দিকে তাকিয়ে খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তন করার বিষয়ে নতুন কোন নিয়ম করা উচিত।

যাই হোক, এবারের খেলা যতই এগিয়ে উঠুক, সকলেই চেয়ে থাকেন বড় বড় দলগুলোর বড় খেলার দিকে। সকলেই জানতে চান মোহনবাগান কবে খেলবে ইস্টবেংগলের সংগে কিম্বা ইস্টবেংগল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলার তারিখ কবে।

এখন অবধি যা ঠিক আছে তাতে জুন মাসের ১৩ তারিখে বসছে চ্যারিটি ফুটবলের আসর। প্রথম চ্যারিটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইস্টবেংগল ও মহামেডান স্পোর্টিং।

দ্বিতীয় চ্যারিটি ম্যাচটি হবে মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে। খেলাটি হবে জুন মাসের ২৭ তারিখে।

এ মরশুমের প্রথম মর্যাদার লড়াই-এ মোহনবাগান ও ইস্টবেংগল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে জুলাই মাসের ১১ তারিখে।

সমাচার দর্পণ

আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্র কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিন্দার সিং গীল ট্রিপল জাম্পে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন।

একটি প্রতিযোগিতায় গীল ৫৩ ফুট ২ ইঞ্চি অর্থাৎ ১৬·২১ মিটার লাফিয়েছেন। এর আগে তিনি ১৯৬৭ সালে ভারতে থাকার সময় অতিক্রম করেছিলেন ১৬·০৮ মিটার। মহিন্দার সিং আশা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি শীঘ্রই ৫৫ ফুট অতিক্রম করতে পারবেন।

* * *

এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল ব্রাজিলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের জন্যে বীমা করা হয়েছে। যার মূল্য ২,০০,০০০ পাউন্ড।

ব্রাজিল দলের কর্মাধ্যক্ষ বলেন যে, প্রত্যেক খেলোয়াড় ৫০,০০০ স্টার্লিং করে পেয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠলে খেলোয়াড়রা আরো বেশি টাকা পাবেন। সেমি-ফাইন্যালে উঠলে অর্থের পরিমাণ আরো বাড়বে।

আর যদি বিশ্ব কাপ তাঁরা জয় করতে পারেন তাহলে অর্থের পরিমাণ যে কতো হবে তা তিনি নিজেও জানেন না।

* * *

এশীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতায় জাপান নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপের সাতটি বিভাগের মধ্যে জাপান পাঁচটিতে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। বালক ও বালিকা বিভাগের বিশেষ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া ও সাউথ কোরিয়া।

গল্প হলেও সত্যি

ক্রিকেট খেলা দেখতে এবং শুনতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন ভারতীয় দল সদ্য-সমাপ্ত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের সকলকেই ক্যাচ আউট করে এক বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। কিন্তু এরকমই কয়েকটি নিদর্শন আজ এখানে রাখছি।

১৯৪২-৪৩ সালে রঞ্জি ট্রফির খেলায় দিল্লী ও রাজপুতানা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সে খেলায় একটি অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় কান্ড ঘটল। দু দলের প্রথম ইনিংস শেষের পর দেখা গেল ২০ জনের ভেতর ১৫ জন খেলোয়াড়ই লেগ বিফোর উইকেট হলেন। এদিক দিয়ে এটা একটা বিশ্বরেকর্ড।

আর একটি ঘটনা হল ওরেল ট্রফিতে খেলছে অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এডিলেডের রানে ভরা পিচে তখন যে কোন দলই জয়লাভ করতে পারে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দল যেমন জয়লাভ করতে পারল না মাত্র ২১ রানের জন্য, তেমনই ওয়েস্ট ইন্ডিজও আর একটি উইকেট ফেলতে পারলেই জয়লাভ করতে পারত। কিন্তু সেবার অস্ট্রেলিয়ার চার-চারজন নামী ব্যাটসম্যান—ম্যাকেল, রেডপাথ, চ্যাপেল ও জার্মান গয়রুরশভী চাপা পড়লেন অর্থাৎ রান আউট হলেন। টেস্ট ক্রিকেটে এরকম নজীর বোধহয় আর দ্বিতীয়টি নেই।

শেখরনাথ ব্যানার্জী,
২১১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা।

প্রশ্ন-উত্তর

সন্তোষকুমার রায় (ঢাকুরিয়া, কলকাতা—৩১)

প্রশ্ন : ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বিশ্ব কাপ বিজয়ী দলের ও রানার্স আপ দলের নাম জানতে চাই।

উত্তর :

সাল	বিজয়ী	বিজিত
১৯৩০	উরুগুয়ে (৪)	আর্জেণ্টিনা (২)
১৯৩৪	ইটালী (২)	চেকোশ্লোভাকিয়া (১)
১৯৩৮	ইটালী (৪)	হাঙ্গেরী (১)
১৯৫০	উরুগুয়ে (৫)	ব্রাজিল (৪)
১৯৫৪	পঃ জার্মানী (৩)	হাঙ্গেরী (২)
১৯৫৮	ব্রাজিল (৫)	সুইডেন (২)
১৯৬২	ব্রাজিল (৩)	চেকোশ্লোভাকিয়া (১)
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড (৪)	জার্মানী (২)

রঞ্জিত (দেপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : জুলে রিমে কাপটি কি সম্পূর্ণটাই সোনা দিয়ে তৈরি?

উত্তর : হ্যাঁ। কাপটি সোনা দিয়ে তৈরি। দাম দু'হাজার পাউণ্ড।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (হরিমোহন দত্ত রোড, কলকাতা—২৮)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে পাঁচ হাজার বা তার বেশি রান করেছেন কে কে?

উত্তর : হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড)—৭২৪৯ রান
ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—৬৯৯৬ রান
এল হাটন (ইংলণ্ড)—৬৯৭১ রান
কাউড্রে (ইংলণ্ড)—৬৩০৫ রান
হার্ভে (অস্ট্রেলিয়া)—৬১৪৯ রান
কম্পটন (ইংলণ্ড)—৫৮০৭ রান
ব্যারিংটন (ইংলণ্ড)—৫৫৯৮ রান
সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)—৫৫১৪ রান
হবস (ইংলণ্ড)—৫৪১০ রান।

মহঃ আলিমুজ্জমান (রায়পুর, রতনপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্ন : পশ্চিমবাংলার প্রথম ক্রিকেট খেলোয়াড় কে?

উত্তর : স্বর্গত সারদারঞ্জন রায়কে বাংলা দেশের ক্রিকেট খেলার জনক বলা হয়।

আপনার অন্য প্রশ্নটির উত্তর সাপ্তাহিক বসুমতীর ৩০শে এপ্রিল সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'খেলার রাজার রাজা' ধারাবাহিক প্রবন্ধটিতে পাবেন।

পঙ্কজ মুখোটী, সোমনাথ সমাদ্দার, ভাস্কর ভট্টাচার্য ও হরিনাথ মুখোটী (নেতাজী কলোনী, বরাহনগর)

প্রশ্ন : শুনেছি নাকি পি গাঙ্গুলী খুব আহত। তিনি কি শুধু এ বছরই খেলতে পারবেন না—নাকি কোনদিনও খেলতে পারবেন না?

উত্তর : এই বছরই পি গাঙ্গুলীকে আবার আপনারা খেলতে দেখতে পাবেন। তবে অনেক দেরিতে। অস্ত্রোপচারে তিনি এখনো সুস্থ হন নি। তাই লীগের খেলায় তাঁর না খেলারই সম্ভাবনা বেশি।

শ্যামলকুমার সরকার (উত্তরপাড়া, বর্ধমান)

প্রশ্ন : ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ভারতের অলিম্পিক হকি দলের অধিনায়কদের নাম জানতে চাই।

উত্তর : ১৯২৮—জয়পাল সিং (আমস্টারডাম)
১৯৩২—পঙ্কজ গুপ্ত (নন প্লেয়িং), লাল শাহ বাখারী অধিনায়কতা করেছিলেন (লেস এ্যাঞ্জেলস)।
১৯৩৬—ধ্যানচাঁদ (বার্লিন)
১৯৪৮—কিষেণলাল (লণ্ডন)
১৯৫২—কে· ডি· সিং (হেলসিংকী)
১৯৫৬—বলবীর সিং (মেলবোর্ন)
১৯৬০—এল. ক্লডিয়াস (রোম)
১৯৬৪—চরণজিৎ সিং (টোকিও)
১৯৬৮—পৃথিপাল সিং ও গুরুবক্স সিং (মেক্সিকো)।

প্রবীরকুমার বসু (কাঞ্চনপথ, মালিগাঁও, গৌহাটী—১১)

প্রশ্ন : ইস্টবেঙ্গল কি কোনবারে গোল্ড কাপ হকির ট্রফি লাভ করেছে?

উত্তর : না।

প্রবীর নন্দী ও পরিমল চক্রবর্তী (কল্যাণগড়)

উত্তর : এই চিঠির সংগে প্রশ্নগুলো দিলে ভালো হতো। আবার প্রশ্ন করবেন।

মনোজকুমার সরকার (টেণ্ডু চা-বাগান, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : ভারতবর্ষের টেনিস খেলার পীঠস্থান হলো বাংলা দেশ। তাই মনে হয় জয়দীপের পর অনেক বাঙালী খেলোয়াড়কেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাবে।

॥ খেলার রাজার রাজা ॥

(৩১৩৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

the best bowler of the side. He could make the swerve either way and at times cause it to dip, while his pace off the pitch was often phenomenal. Better bowling than his in the second Innings of the Test match has not been seen for a long time and more than one famous old cricketer said afterwards that Amar Singh was the best bowler seen in England since the war...."

[চলবে]

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসত্যেন্দ্র গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৪ বর্ষ : ৫১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ৩রা আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

PRICE : 30 Paise
Thursday, 18th June, 1970

খোসলা কমিটির রিপোর্ট

জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যাপারে একজন সদস্য বিশিষ্ট খোসলা কমিটির রিপোর্টের কিছু কিছু বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে রিভিউয়িং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর বিচারপতি জি ডি খোসলাকে জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যাপারে তদন্তের ভার দেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যাপারে বিশ্বজ্ঞজনের আকর্ষণ শুধু স্বাভাবিক নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশবনের সময় পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের কথা শোনা যায় নি। কিন্তু তৎপরবর্তীকালে জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে এমন সংবাদ বের হয়েছে, যা বিদ্বৎ সমাজে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা ক্ষতির সংবাদ এবং যা প্রধান সংবাদ হিসেবে বিবেচ্য—তা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থচুরির কথা। ঐ ব্যাপারে পার্লামেন্টে বহুবার আলোচনা হয়েছে এবং খোসলা কমিটির কাছেও ঐ বিষয় বিশেষভাবে উত্থাপিত হয়েছে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, জাতীয় গ্রন্থাগারে জাতীয় সম্পদ লোপাট করার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে খোসলা কমিটি কী রিপোর্ট দিয়েছেন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি যাতে চুরি হয়ে না যায় তার জন্য রিপোর্টে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা জানবার জন্য পাঠক হিসেবে সত্যেকেই উৎসুক ছিলেন।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, সংবাদপত্রে ঐ প্রধান বিষয়টিই অনুচ্চারিত। অর্থাৎ কমিটির কাছে গ্রন্থচুরির ব্যাপার প্রধান বিষয় বিবেচিত না হওয়ায় প্রকাশিত রিপোর্টের মধ্যে তার উল্লেখ নেই। গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্রন্থই প্রধান, তবুও গ্রন্থচুরির ব্যাপারটি যদি খোসলা কমিটির কাছে গুরুত্ব অর্জন না করে, তাহলে কমিটির রিপোর্টের কোনো মূল্য আছে কি না, তা বিবেচনা করতে হবে।

খোসলা কমিটিকে যে সব বিষয়ে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাতীয় গ্রন্থাগারের কিভাবে উন্নতি হতে পারে?

কিন্তু রিপোর্টের সারাংশ পড়ে মনে হোল ঐ কমিটি জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নতির চেয়ে যেন ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ সচেতন!

খোসলা কমিটি নাকি জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মর্যাদা ও বেতনের সমতুল্য ডিরেক্টার নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করেছেন। জানি না, গ্রন্থাগারিকের পরিবর্তে ডিরেক্টার পদ সৃষ্টি করলেই কিভাবে গ্রন্থাগারের উন্নতির পথ তৈরি হতে পারে?

খোসলা কমিটির আর একটি সুপারিশ সত্যিই চমকপ্রদ—যদিও তা অসার এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্য ওকালতিতে পরিপূর্ণ।

খোসলা কমিটির সুপারিশে বর্তমান গ্রন্থাগারিকের জন্য সমসমর্যাদা ও সমবেতনের কাজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কমিটি আরো হাস্যাস্পদ হয়েছেন কলকাতার বাইরে তাঁর জন্য চাকরি সংগ্রহ করে দিতে বলায়।

সমমর্যাদা ও সমবেতনের চাকরির জন্য খোসলা কমিটি কিভাবে যে সুপারিশ করতে পারেন, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। প্রথমত, ১৯৬৭ সালের ৩০শে নভেম্বর যে ব্যক্তি গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজে যোগদান করেছেন, তিনি যদি অদ্যাবধি পাকাপাকিভাবে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারেন, তা হলে খোসলা কমিটি তাঁর জন্য অন্যত্র সমমর্যাদার চাকরি সংগ্রহ করে দেবার সুপারিশ করে কোন্ কারণে তাঁকে পুরস্কৃত করার কথা বলেন?

দ্বিতীয়ত সমবেতন ও সমমর্যাদার চাকরি যোগাড় করে দিতে বলার সুপারিশ কমিটি কিভাবে করতে পারলেন? কারণ ভারতে জাতীয় গ্রন্থাগার একটিই; আর ঐ বেতন ও ঐ মর্যাদা মাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয়ত, খোসলা রিপোর্টে বর্তমান গ্রন্থাগারিককে কলকাতা থেকে সরিয়ে তাঁর জন্য অন্যত্র চাকরি সংগ্রহ করার সুপারিশ করা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, কলকাতা সম্বন্ধে যে সব গালগল্প প্রচলিত আছে, সম্ভবত তাকে ভিত্তি করেই ঐ ধরনের সুপারিশ। অথচ এই কলকাতাতেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যা বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার নামে পরিচিত; সেখানে বহু স্বনামধন্য গ্রন্থাগারিক নির্বিবাদে কাজ করেছেন, দেশবিদেশে গ্রন্থাগারের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ সব গ্রন্থাগারিকদের একমাত্র হরিনাথ দে ছাড়া সকলেই অবাঙালী ছিলেন এবং এই বাংলাদেশের বিশ্বসমাজে তাঁদের গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি।

খোসলা কমিটির রিপোর্টে যদি সত্যিই উপরি উক্ত ধরনের কোনো সুপারিশ থাকে, তা হবে গভীর বেদনাদায়ক। কারণ তদ্দ্বারা শুধু কলকাতাকেই হেয় করা হয় নি, এখানে বিশ্বজ্জনদের বিরুদ্ধেও পরোক্ষে কটাক্ষ করা হয়েছে।

বিভিন্ন দলের পার্লামেন্ট সদস্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন, রিপোর্টের পূর্ণ বয়ান পার্লামেন্টে উপস্থাপনের জন্য। আমরাও মনে করি, খোসলা রিপোর্ট সম্পূর্ণ প্রকাশিত হোক এবং রিপোর্টে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হয়েছে, না, ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে—তার সত্য যাচাই করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

ডঃ টেলো মাসকারেনহাস

একটা অপরিচিত, অবাঞ্ছিত এবং অসহনীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে জেলখানার অসুস্থ অস্বাভাবিক পরিবেশে থাকতে গিয়ে কত লোক আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি চেয়েছে, কতজনের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে! দীর্ঘমেয়াদী বন্দীরা আবার কারাজীবনে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, হঠাৎ তাদের মুক্তি দেওয়া হলে, বহির্বিশ্বে ফিরে এলে সেই পুরনো সমাজজীবনটাই তাদের কাছে নতুন নতুন ঠেকে, তারা নিজেদের ওই মুক্তজীবনের সঙ্গে বেমানান মনে করে। গোয়ার সংগ্রামী নেতা ডঃ মাসকারেনহাসকে যখন জানানো হলো তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তখন তিনিও তা প্রথমে বিশ্বাস করে উঠতে পারেন নি। কারণ, ৭১ বছরের বৃদ্ধ ডঃ টেলো মাসকারেনহাস ধরেই নিয়েছিলেন যে, বাকিটা জীবন তাঁকে সালাজারের জেলেই কাটিয়ে দিতে হবে। দেশপ্রেমের চড়া দাম তাঁকে লিসবনের কারান্তরালেই শোধ করতে হবে।

কিন্তু পর্তুগীজ সরকার ডঃ মাসকারেনহাসের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন, যদিও সরকারের কাছে দয়া ভিক্ষে তিনি করেন নি। পর্তুগালের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্মোনার জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সাধারণ বন্দিমুক্তি দেওয়া হয়, ডঃ মাসকারেনহাসও সেই সুবাদে মুক্তি পেলেন। অবশ্য টেলো মাসকারেনহাস মুক্তি-কমিটি, আন্তর্জাতিক দাক্ষিণ্য সংস্থা ইত্যাদিও এই প্রবীণ নেতার মুক্তি আদায়ের জন্য পর্তুগীজ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। ডঃ মাসকারেনহাসের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার কারণেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নির্ধারিত সময়ের আগেই। গত বছরে মোহন রাণাডে, এ বছরে টেলো মাসকারেনহাস।

১৯৫৯ সালে ডঃ মাসকারেনহাসকে বন্দী করা হয় এবং বিচারের পর ১৯৬২ সালে তাঁর প্রতি ২৪ বছর কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়। মাত্র আট বছরের মধ্যেই তিনি ছাড়া পেলেন, অতঃপর? অর্থাৎ এই বৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতা অতঃপর কী করবেন? তিনি নিজে অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গিয়েছে, তার কিছু উন্নতি হওয়া দরকার। লিসবনে তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে কিছুদিন বিশ্রাম নিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি অবশ্য হবেই। কিন্তু রাজনীতিকরা বিশ্রামের বিলাসিতা ভোগ করতে পারেন? ইতিমধ্যেই ভারতে দাবি উঠেছে, ডঃ মাসকারেনহাসকে সসম্মানে ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন উপযুক্ত উদ্যোগ-আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁর ভারত আগমনে একটা বাধা রয়েছে। সে বাধা হল নাগরিকত্বের। অর্থাৎ গোয়ার মুক্তি আদায়ের জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত থাকলেও ডঃ মাসকারেনহাস আসলে ভারতের নাগরিক নন, পর্তুগালের নাগরিক। সেজন্যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, পর্তুগীজ সরকার হয়তো তাঁকে ভারতে আসতে দেবেন না।

কিন্তু ডঃ মাসকারেনহাস ভারতের নাগরিকত্ব চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন, ডঃ সালাজারই তা নামঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। সত্য বটে, ডঃ টেলো পর্তুগীজ গোয়ায় জন্মেছিলেন ১৮৯৯ সালে। কিন্তু তবুও তিনি নিজেকে ভারতীয় মনে করতেন এবং পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের হাত থেকে গোয়ার মুক্তি ও ভারতভুক্তির জন্যে সংগ্রামে নেমেছিলেন। গোয়ার এক সম্ভ্রান্ত ক্যাথলিক পরিবারে টেলোর জন্ম। গ্র্যাজুয়েট হবার পর তিনি ১৯২০ সালে পর্তুগালের কোয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে যান। সেখানেই ডঃ সালাজারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে: সালাজার তখন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। আইন পাশ করার পর টেলো পর্তুগীজ সরকারের অধীনে চাকরি নেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে গোয়ায় ফিরে এসে তিনি রাজনৈতিক স্রোতের আবর্তে পড়ে যান। গোয়াবাসীদের রাজনৈতিক চেতনা এবং মুক্তির জন্য দৃঢ়-সংকল্প দেখে তিনি মুগ্ধ হন। গোয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়ে তখনই তিনি ডঃ সালাজারকে চিঠি দেন। কিন্তু সে চিঠিতে যখন কোন সুফল হয় না, বরং তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল, তখনই তিনি মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গান্ধীজীর আদর্শকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন সংগ্রামের পথ হিসাবে। পেশা হিসেবে তখন তিনি রেডিওর পর্তুগীজ প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হন। এর পরে তিনি বোম্বাই থেকে রিমার্জ গোয়া নামে সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করেন।

পর্তুগীজ সরকার বার বার [illegible] প্রলোভন দেখিয়েছেন, ক্ষমা চাইলে মুক্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু দয়া ভিক্ষে ডঃ মাসকারেনহাস করেন নি। বরং দেশপ্রেমের জন্যে যে-কোন শাস্তিভোগ করতে তিনি রাজী ছিলেন। তাঁকে গোয়ায় ফিরতে না দিলে পর্তুগীজ সরকার আর একটা ভুল করবেন—কারণ, গোয়া এখন ভারতেরই অঙ্গীভূত, তাঁর স্ত্রীও ভারতে অবস্থান করছেন। কাজেই নৈতিক ও মানবিক কারণেই ডঃ মাসকারেনহাসকে ভারতে ফিরতে দেওয়া উচিত।

ডঃ মাসকারেনহাস অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও তেজস্বী লোক। সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার কারণে পর্তুগীজ সরকার তাঁর নাম কালো তালিকাভুক্ত করেন বটে, কিন্তু তাতে তিনি দমেন নি। তাঁকে যখন বলা হলো যে, ভারত গোয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে তিনি অপরাধ করেছেন, তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, ভারত গোয়ায় অভিযান চালায় নি, তাকে মুক্তি দিয়ে ত্রাতার কাজ করেছে। সালাজারের রক্তচক্ষু ডঃ মাসকারেনহাসকে সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। আজ তিনি যদি ভারতে আসতে চান, তবে তাঁকে ঠেকায় কার সাধ্য?

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না (১৭)

বসুকে জিন্নার আক্রমণের পিছনে বসুর কয়েকটি বিবৃতি ও বক্তৃতা ছিল। ১৪ অক্টোবর, ১৯৩৮-এর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি খোলাখুলি জিন্নার দাবির সমালোচনা করেছিলেন। সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল:

"হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের যে আলোচনা হয়েছে এবং তার উপরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতি সম্প্রতি যে-প্রস্তাব নিয়েছে, তার সম্বন্ধে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

"তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথে যে সকল বাধা রয়েছে, তাদের বিষয়ে লীগের সঙ্গে আলোচনার জন্য কংগ্রেস সর্বদাই প্রস্তুত।

"অপরাপর সংখ্যালঘুদের সমস্যার বিষয়েও কংগ্রেসের একই মনোভাব।

"যতদূর তিনি বুঝতে পেরেছেন—লীগ কিংবা তার সভাপতি মিঃ জিন্না হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য দূরীকরণের জন্য তাগিদ দিচ্ছেন না, তাঁদের আগ্রহ মুসলিম লীগের স্ট্যাটাসের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য।

" 'লীগ সম্প্রতি যে প্রস্তাব নিয়েছে তার তাৎপর্য যদি সঠিক বুঝে থাকি'—শ্রীযুক্ত বসু বলেন—'তাহলে এই কথাই বলতে হবে, লীগ হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের উপরে কোনো-প্রকার আলোচনাই করতে রাজি নয়, যতক্ষণ না সে নিজের উপরে যে স্ট্যাটাস আরোপ করে বসে আছে তাকে কংগ্রেস মেনে নেয়। আমার যতদূর ধারণা তদনুযায়ী বলতে পারি, ১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট যখন হয়েছিল তখন কংগ্রেসকে দিয়ে লীগের বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক স্ট্যাটাসকে মেনে নেওয়ানোর চেষ্টা লীগ করে নি। এখন আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণকে স্থির করতে হবে, হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য এখন যদি কিছু থাকে, সে বিষয়ে তাঁরা মুসলিম লীগের স্ট্যাটাস সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা স্থগিত রেখে সে বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হবেন কি না।'

"আমাদের পক্ষে এইটুকু বলতে পারি, সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে যা উচিত ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ, আমরা তাই করে যাব এবং এখনকার বা ভবিষ্যতের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রস্তুত থাকব। এমন কি আমরা বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার হস্ত যতখানি প্রসারিত করা উচিত তার থেকেও বেশি প্রসারিত করব—মুসলিম লীগের কোনো কোনো সদস্য তাতে যতই ক্রুদ্ধ হয়ে উন্মত্ত কথাবার্তা বলুন না কেন। বেপরোয়া উত্তেজিত ভাষা দুর্বলতারই চিহ্ন। যাঁরা নিজেদের শক্তি ও উদ্দেশ্যের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা কাজে ও কথায় সংযত থাকেন—তাই তাঁদের অবশ্য কর্তব্য।"

(অমৃতবাজার, ১৫ অক্টোবর, ১৯৩৮)

কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে যাবার পরে, কিংবা ভেঙে দেবার পরে, জিন্না যুদ্ধনীতির জন্য দ্বারস্থ হলেন নাজী-নীতির কাছে। সহসা তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়লেন সুদেতান অঞ্চলের নিপীড়িত জার্মানদের সম্বন্ধে। মনে অথর্ব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন তখন মিউনিক প্যাক্ট করে এসেছেন হিটলারের সঙ্গে (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮), তারই সূত্র ধরে করাচীর মুসলিম লীগ সম্মেলনে (৮ অক্টোবর) জিন্না সুদেতান অঞ্চলের জার্মানদের সঙ্গে ভারতের মুসলমানদের অবস্থার তুলনা করলেন তীব্র জ্বালার সঙ্গে:

"আমি ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আমাদের এখানকার কংগ্রেস হাইকম্যান্ডকেও—আপনারা খেয়াল করে দেখুন, শিখুন, মনে মনে জানুন, কেন ঐসব বিক্ষোভের উত্থান ঘটছে যা বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা জাগাচ্ছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সংখ্যাগুরুদের পায়ের তলায় সুদেতানের জার্মানেরা দলিত হয়েছিল বলেই আজ এই অবস্থা। ঐ জার্মানদের পীড়িত, দমিত, অত্যাচারিত করা হয়েছিল; দুই দশক ধরে তাদের অধিকার এবং স্বার্থ সম্বন্ধে নিষ্ঠুর বর্বর অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছিল—তারই অনিবার্য পরিণতিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার রিপাবলিক ভেঙে গিয়ে নতুন মানচিত্র তৈরির প্রয়োজন ঘটল।

"সুদেতানের জার্মানেরা যেমন আত্মরক্ষায় শক্তিহীন

বোন ফাতিমা জিন্নার সঙ্গে জিন্না

নয়, যেমন তারা গত দুই দশকের অত্যাচার-উৎপীড়নকে সহ্য করেও টিকে রয়েছে, ঠিক তেমনি ভারতের মুসলমানেরাও আত্মরক্ষায় ক্ষমতাহীন নয়, এবং তারা তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করতে পারে না।" (বলিথো—পৃঃ ১১৮)

কেবল কথায় নয়—জিন্না আর কেবল কথার মানুষ থাকতে রাজি নন—কাজেও হিটলারের নীতির পোষকতা করতে লাগলেন। পূর্বোক্ত বক্তৃতাতেই তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ তার বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখে না, "বন্ধুদের নেকড়ের মুখে ফেলে দেয়", "প্রতিজ্ঞা ভাঙে, ভেঙেছে", "ইংরেজের সঙ্গে মোকাবিলায় তারাই সফল হয় যাদের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, যারা গর্জন করে তাকে শাসাতে পারে।" জিন্না সেই কাজ শুরু করলেন, ইংরেজের সমর্থনেই কি না তার আলোচনা বিশেষভাবে না করলেও চলবে, কিন্তু ইতিহাস-লেখকেরা সে ধরনের ইঙ্গিত একেবারে বর্জন করতে পারেন নি। সুদেতানের জার্মানদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে নাজী-জার্মানী যে-ধরনের কাহিনী উৎপাদনে উঠেপড়ে লেগেছিল, জিন্নাও ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেই কাজই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস সমর্থ হওয়ায় এবং ঐসব মন্ত্রিসভায় লীগের জায়গা না হওয়ায়, আশাভঙ্গের নৈরাশ্যে এবং রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে লীগ ১৯৩৮ সালে পীরপুরের রাজা মহম্মদ মেদীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করল, যার উদ্দেশ্য, কংগ্রেস কর্তৃক সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপরে উৎপীড়ন সম্বন্ধে তদন্ত। ১৯৩৯ সালে এস এম শরীফের নেতৃত্বে বিহারী মুসলমানদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করতেও আর একটি কমিটি হয়েছিল। বাংলার লীগ প্রধানমন্ত্রী এরই উদ্দেশ্যে *Muslim Sufferings under Congress Rule* নামে একটি পুস্তিকা বার করেছিলেন। 'এই সকল রিপোর্টই মিথ্যার উপরে ইচ্ছা-

কবিতা

[illegible]

হঠাৎ কোথায় ধারালো ক্ষুরে ঘরণী তোমার [illegible]
অগোচরে কেটে গেছে?
কবিতা দিয়ে রক্ত মুছে নেবো
পথের মিছিলে নষ্ট কোটরে পূর্বপুরুষ জেলেছে বিকট [illegible]

প্রহরী, তোমায় চাবুক মেরেছে কে?

[illegible] টানে [illegible] ভেঙে দেবো
অথবা যেমন চাও
বিনা অপরাধে ছাড়িৎ ছোঁয়াতে পারি
মগ্ন চক্ষুকোণে
[illegible] ঘুমে রেলগাড়ি ভেঙে [illegible]
জ্বালাতে পারি কবিতার কড় গুণে ॥

মূর্খেক ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। সুদেতান-জার্মানদের অবস্থা সম্বন্ধে নাজীদের মিথ্যা প্রচারের মডেলে রচিত এই সব রিপোর্ট প্রোপাগান্ডার জনাই প্রস্তুত করা হয়েছিল' অশোক মজুমদার লিখেছেন। মৌলানা আজাদ লিখেছেন: "কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের মূল প্রচারের বিষয় ছিল—কংগ্রেস শুধু নামেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের সাধারণ নিন্দাতে না থেমে থেকে, লীগ বলতে আরম্ভ করল, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি সংখ্যালঘুদের উপরে উৎপীড়ন করছে। একটি কমিটি লীগ নিয়োগ করেছিল, যার রিপোর্টে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপরে কংগ্রেসের অনুচিত ব্যবহার সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অভিযোগ ছিল। ব্যক্তিগত ধারণা থেকে আমি বলতে পারি, এই সকল অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। ভাইসরয় এবং প্রদেশগুলির গভর্নরদের ধারণাও একই প্রকার।"

(*India Wins Freedom*, P. 21-22)

মিথ্যা রচনা করে এবং তারই আগুনে জ্বলে উঠে জিন্না দাবি করলেন, এইসব অন্যায়ের তদন্তের জন্য খোদ বৃটিশ সরকার রয়াল কমিশন গঠন করুক। কংগ্রেসের তাতে কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপত্তি ছিল ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো'র এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের। ভাইসরয়ের বক্তব্য, অভিযোগ যেখানে প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা নেই, সেখানে তদন্ত কমিশনে লাভ কি!

অভিযোগ যেখানে প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা নেই সেখানে জিন্নার বীরদর্পেরই বা কারণ কি? ঐতিহাসিক অশোক মজুমদার জিন্নার চতুরতা খুলে ধরেছেন। জিন্না কোনো হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত-কমিশন চান নি, যে-কমিশন প্রদেশগুলি গঠন করতে পারত। তিনি একেবারে রয়াল কমিশন চেয়ে বসেছিলেন, যার নিয়োগ ভাইসরয়ের সক্রিয় চেষ্টা ভিন্ন সম্ভবপর হতে পারে না। ওধারে ভাইসরয় কদাপি তেমন কমিশন গঠন করবেন না, জিন্নারই স্বার্থে। এবং ভাইসরয় যে তা গঠন করবেন না, এ বিষয়ে স্থির জেনে (তাঁকে জানাবার লোক যথেষ্ট ছিল) জিন্না রয়াল কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে স্বধর্মাবলম্বী জনগণের কাছে প্রোপাগান্ডার সুযোগ করে নিলেন: দেখ তোমরা, আমাদের ন্যায্য অভিযোগের বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হচ্ছে না; নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা এদেশে নেই; তা যদি থাকত তাহলে দেখা যেত, আমরা আমাদের রিপোর্টে একেবারে খাঁটি কথাই লিখেছি।

এবং জিন্না কংগ্রেসকে ফ্যাসিস্ট বলতে লাগলেন যেহেতু কংগ্রেস ডেমোক্র্যাসী চায়। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে লেখা এক প্রবন্ধে জিন্না বলেছিলেন,

"নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য দেশের অপর সকল প্রতিষ্ঠানকে বিনষ্ট করা এবং নিজেকে জঘন্য ধরনের কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করা।" একই প্রবন্ধে জিন্না "ভারতে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী সরকারের অসম্ভাব্যতার" কথাও বলেন, কারণ, "গণতন্ত্র মানে ভারতে হিন্দুরাজ।" সাড়ে তিন কোটি ভোটারের সম্বন্ধে দারুণ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন, অদের বেশির ভাগই একেবারে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, শতাব্দী-সঞ্চিত কুসংস্কারের মধ্যে লালিত। এবং অলজ্জভাবে ঐ কুসংস্কারকেই অন্ধ করেন। ১৯৩৯ সালে বেলুচিস্থানে প্রচারের জন্য তিনি গিয়েছিলেন; কোয়েটায় যাঁর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলেন তাঁর পত্নী লিখেছেন: "আমি জিন্নাকে খুবই ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম। আমার সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সহানুভূতিসম্পন্ন ও সৌজন্যপরায়ণ ছিলেন। একবারই মাত্র রেগে অস্থির হয়েছিলেন। তা ঘটে উপজাতি-সর্দারদের একটি সভার আগে, যাতে তাঁর সভাপতিত্ব করার কথা। বেলুচিস্থানে পর্দা প্রথা কঠোরভাবে পালিত হয়—সেখানে পর্দাহীন নারীদের সম্বন্ধে খুবই তীব্র বিরোধী মনোভাব। এই কারণে আমার স্বামী বললেন, মিঃ জিন্নার সঙ্গে তাঁর বোন মিস জিন্নার একই প্ল্যাটফর্মে বসা উচিত হবে না। মিস জিন্না অবশ্য পর্দা মানতেন না, আমিও তাই। সুতরাং আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'তা কেন? কোনো এক সময়ে তো আমাদের কুসংস্কার ভাঙার কাজ আরম্ভ করতে হবে!' জিন্না ভয়ানক চটে গেলেন; আমাকে বললেন, 'তুমি এইসব লোকের মধ্যে আমার চার বছরের কাজ পন্ড করতে চাও।'"

(বলিথো—পৃঃ ১২৩)

আরও ৯ বছর পরে, ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে বাংলার গভর্নর আর জি কেসী করাচীতে সস্ত্রীক জিন্নার সঙ্গে নৈশভোজন করছিলেন। মিসেস কেসী কোনো একজনের সম্বন্ধে বুঝি নিন্দাচ্ছলে 'ফ্যানাটিক' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। জিন্না বাধা দিয়ে বলেন, "না, না, ফ্যানাটিকদের নিন্দা করবেন না। আমি যদি ফ্যানাটিক না হতাম তাহলে পাকিস্তান কখনো সম্ভবপর হত না।"

[ক্রমশঃ]
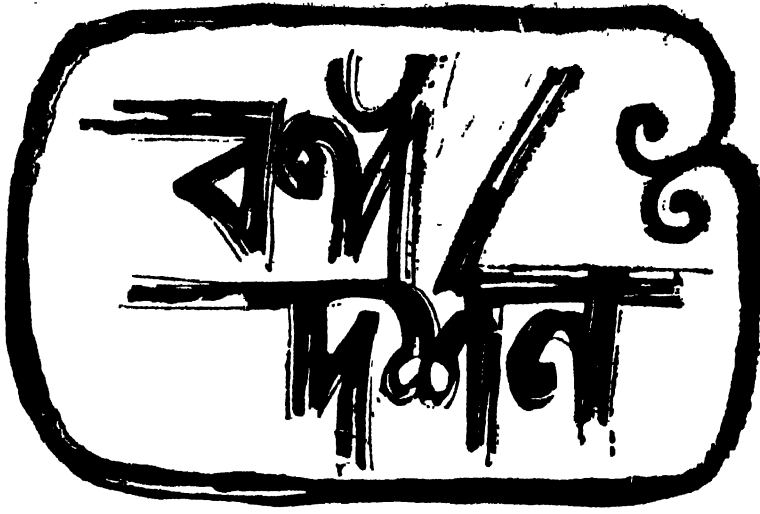
পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আজ যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, আগুন জ্বলে উঠল বলে, যে আগুন নিভিয়ে দেবার ক্ষমতা রাজ্যপাল প্রশাসনের অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হবে না। হঠাৎ আগুনের কথাটা তোলার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে, যেটা সময় থাকতে না বললে হয়ত আর কোনদিনই বলা হয়ে উঠবে না। পশ্চিমবঙ্গে আজ কেন্দ্রীয় শাসন চলছে, একটি সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটিও আছে এবং মূলত পশ্চিমবঙ্গ শাসন করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন একপাল কেন্দ্রীয় আমলা মারফৎ, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সম্পর্কে যাঁদের কোন ধারণাই নেই। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গে একজন রাজ্যপাল আছেন, যিনি কর্তৃত্ব করেন, শাসন করেন না, যাঁর হয়ে শাসন করে আরও একপাল আমলা, পশ্চিমবঙ্গের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যাদের নাড়ীর কোন যোগ নেই, যারা কংগ্রেসী আমলে কর্তাদের মন জুগিয়ে নিজেদের পদোন্নতি ঘটিয়েছে। যাদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের আমলেও অনুরূপ চেষ্টা করেছে এবং বর্তমানে যারা রাষ্ট্রপতির শাসনের সুযোগে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বোঝার বা তা সমাধান করার মত ট্রেনিং যাদের নেই, যে ট্রেনিংটা পাওয়া যায় জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মধ্য দিয়ে। আমলাতন্ত্রের গুণাগুণ বিচার করতে আমরা বসি নি, সেটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন হিসাবে দেওয়া হয়, তার স্ট্রাকচার বা কাঠামো নিয়েও আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। কোন্ দপ্তরের সঙ্গে কোন্ দপ্তরের যোগাযোগ কেমন, কাকে উপদেষ্টা করা ঠিক হয়েছে, কি ভুল হয়েছে, রাজ্যপালের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, এ সবও আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গে আমলাতান্ত্রিক শাসনের ফাংশনাল বা কার্যকলাপের দিকটাই দেখব, একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার কার্যকলাপের প্রকৃতিটা কি? সেটা বিশ্লেষণ করার আগেই আমাদের এ বিষয়ে পাকাপাকি সিদ্ধান্তটা আগে থেকেই জানিয়ে দিই। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে যে বক্তব্যটি দিয়ে আমরা বর্তমান নিবন্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের আমলাতন্ত্র যে পথে চলেছে, যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে আগুন জ্বলতে আর বেশি দেরি নেই এবং এ আগুন কাউকে রেহাই দেবে না।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে নানা বিষয়ে আশ্বাস দেবার বিন্দুমাত্র কসুর হয় নি, বড় বড় গালভরা আশ্বাস। ভাবা গেল যে, প্রগতিশীল ইন্দিরা সরকার সত্যই বুঝি অবহেলিত পশ্চিমবঙ্গের দিকে নজর দেবার সুযোগ এতদিনে পেয়েছেন। কিন্তু এখানেও চিরন্তন ঐতিহ্য অনুযায়ী মহারম্ভে লঘুক্রিয়া। প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেল, তা কোনদিন বাস্তবায়িত হল না এবং হবে, এমন বিশ্বাস করার মত মূর্খ পশ্চিমবঙ্গে আছে বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মৌল সমস্যাগুলি সমাধানের বিন্দুমাত্র আগ্রহ পরিলক্ষিত হল না। শুধু পাঠানো হল গাড়ি গাড়ি সি আর পি, অজুহাত আইনশৃংখলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আইনশৃংখলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা যে কী রকম হয়েছে সে কথা পরে বলব, কিন্তু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর তারিফ না করে পারা যায় না! পশ্চিমবঙ্গের আর কোন সমস্যা নেই, হাহাকার নেই, শিক্ষার সমস্যা নেই, বেকার সমস্যা নেই, উদ্বাস্তু সমস্যা নেই, অন্নবস্ত্রের সমস্যা নেই, একমাত্র সমস্যা শুধু আইনশৃংখলার! কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আমলাতন্ত্র শুধু এই-ই বুঝেছেন এবং সেই রকম আইনশৃংখলার ধারণাটা আপেক্ষিক, ক্ষমতাবান ক্ষমতাহীনকে ঠেঙালে আইনশৃংখলার অমর্যাদা হয় না, বিপরীতটা হলেই হয়, তখনই কোন কোন মহল থেকে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। কাজেই আমাদের মত অর্বাচীনের বক্তব্যে কান না দিয়ে খোদ রবীন্দ্রনাথ যা বলে গেছেন তাই শুনুন। "ফাঁকা 'ল এণ্ড অর্ডার দিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।" কিন্তু এই আইনশৃংখলা রক্ষার স্বরূপটা কি? আজকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই সমাজবিরোধীদের ব্যাপক অভ্যুত্থান এক ত্রাসের রাজত্বের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রশাসনযন্ত্র এক্ষেত্রে নির্বিকার, এবং বলা যায়, তাদের এ বিষয়ে উৎসাহই দিচ্ছে। গ্রামে গ্রামে জোতদাররা যুক্তফ্রন্টের আমলে কৃষকেরা যেটুকু অধিকার অর্জন করেছে তা বলপূর্বক হরণ করছে, কলকারখানাতেও ওই একই দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে শ্রম-বিরোধের ক্ষেত্রেই হোক আর কৃষিক্ষেত্রেই হোক, মালিক-জোতদারের স্বার্থে পুলিশ যায় নি, এখন ঠিক উল্টোটাই হচ্ছে, এককথায় সর্বত্রই একটা জুলুমের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও যা মারাত্মক এবং যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হবে, তা হচ্ছে আইনশৃংখলার নামে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ওপর নিপীড়ন। আসলে বামপন্থী ঠেঙানোর একটা বড় মওকার সৃষ্টি করা হয়েছে, নির্বিচারে সুপরিচিত বামপন্থী কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তদুপরি সি আর পি, যাদের ক্রিয়াকলাপের কথা লিখতে গেলে একটি মহাভারত রচনা করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের মত অর্থসংস্থানহীন রাজ্যে এই সি আর পি বাহিনী পোষার জন্য দৈনিক যে টাকাটা ব্যয় হচ্ছে তা শুনলে মনে হবে, আমরা কোন্ মধ্যযুগে বাস করছি। নারীধর্ষণ থেকে শুরু করে এমন কোন অপকর্ম নেই, যা এই কেন্দ্রীয় সরকারের পেশাদার গুণ্ডাবাহিনী বুক ফুলিয়ে করে বেড়াচ্ছে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে আর সে অবস্থা নেই, একথা বুঝতে রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার, উভয় তরফই বিলক্ষণ বিলম্ব করছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আঘাতের প্রত্যাঘাত করতে শিখেছে এবং বলাই বাহুল্য, এই অত্যাচারের মূল্য রক্তের বিনিময়েই দিতে হবে।

বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনে যে অবস্থাটা কায়েম হয়েছে তাকে ফ্যাসীবাদ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। নকশালপন্থী বলে যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য যে পদ্ধতির

আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যযুগীয় প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব দেখে শিউরে উঠতে হয়। কল্পনা করতে পারেন, স্বীকারোক্তি আদায়ে নকশালপন্থী নামে অভিহিত ধৃত ব্যক্তিদের ওপর, যাদের অধিকাংশই ছাত্র, কি শোচনীয় দৈহিক নিপীড়ন করা হচ্ছে! তাদের দুই পা বেঁধে, মাথা নীচু দিকে ঝুলিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেখে দেওয়া হচ্ছে, মলদ্বারে উত্তপ্ত শলাকা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং মারধোর ও অপরাপর দৈহিক পীড়নের তো কথাই নেই। যদি তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে তাদের আদালতে হাজির করা হোক, অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হোক, তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে এই দৈহিক পীড়ন, যা বৃটিশ আমলকেও লজ্জা দেয়, করবার অধিকার কে দিয়েছে সি আর পি-কে? কিন্তু কাহিনীগুলি তো আর চাপা থাকছে না এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী, বলাই বাহুল্য, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে, প্রচলিত আইন ও ন্যায়বোধের ওপর নির্ভর করা থেকে বিরত হয়েছে দীর্ঘদিন। ফলে, অনিবার্য নিয়মেই আগুন জ্বলবে। কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্যপালের প্রশাসন অবস্থার গুরুত্ব এখনও বুঝতে পারছেন না বা বোঝার চেষ্টা করছেন না। আগুন জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত এঁদের ঘুম ভাঙবে না।

আটক আইন

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চপদস্থ আমলারা এই রাজ্যে পুনরায় পি-ডি অ্যাক্ট চালু করার যে আয়োজন করেছিল, তা আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। গত সপ্তাহে আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছিলাম, যাতে বলা হয়েছিল যে, হয়ত পি-ডি অ্যাক্ট চালু করা এবারে কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদের সেই ধারণাটাই মোটামুটি সত্য প্রমাণিত হল। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে পি-ডি অ্যাক্ট পুনরায় চালু হোক, এতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর বিলক্ষণ আপত্তি ছিল, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলও এতে রীতিমত আপত্তি জানিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি যে পশ্চিমবঙ্গের জনমতটা এই বিষয়ে বুঝতে পেরেছেন, এটা মোটামুটি সুলক্ষণ। যদিও পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়, যদিও জমির বিরোধ, রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষ, উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ, ডকাতি, ছিনতাই, লুন্ঠন, হত্যাকাণ্ড, আমলা ও পুলিশের মধ্যে দলাদলি, সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তা হলেও পি-ডি অ্যাক্ট প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না, কেন না এই আইনের অর্থই হচ্ছে বিনা বিচারে নাগরিকদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করে রাখা, যা অতি মারাত্মক, কেন না পুলিশের হাতে এ জাতীয় ক্ষমতা অতীতেও সুফলপ্রসূ হয় নি, মাঝখান থেকে নিরীহ অনেক নাগরিক বছরের পর বছর জেলে পচেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা সুফলপ্রসূ হবে না, কারণ পুলিশের দায়িত্বজ্ঞানের ওপর নির্ভর করাটা যে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটেই অসম্ভব, এ দেশের পুলিশ সে পুলিশ নয়। যে সব আমলারা এই আটক আইনকে সর্বরোগহর পেনিসিলিন মনে করে তার সুপারিশ করেছিলেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ক্ষুণ্ণ হলেও, তাঁদের নির্বুদ্ধিতার সমর্থনে কেউই মুখ খুলবে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের রোগ এমন একটা জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যা ওই পি-ডি অ্যাক্টের হাতুড়ে চিকিৎসায় সারাবার নয় তার মূলে অনেক গভীরে, তার সঙ্গে অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক সমস্যা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে-জট খোলার ক্ষমতা বর্তমান চাকুরিসর্বস্ব আমলাতন্ত্রের নেই। একমাত্র দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলির সমবেত প্রচেষ্টা এবং সুদক্ষ জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থাই পশ্চিমবঙ্গকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতারা নিছক ফ্যাকশনাল মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে সে প্রত্যাশাকে সমানে ব্যর্থ করে চলেছেন আজও।

লীলা রায় স্মরণে

সংগ্রামী লীলা রায় অবশেষে সত্তর বছর বয়সে আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন। ইতিহাসস্রষ্টা এই

লীলা রায়

নেত্রী যেভাবে শেষ দিন পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন তা বলতে গেলে অভূতপূর্ব। ১৯৫৫-৫৯ সালে দুবার তাঁর করোনারী থ্রম্বসিস হয়, ১৯৬৩, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে আবার সেরিব্রাল থ্রম্বসিস হয়। ১৯৬৮ সালেই আবার দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়ে তিনি ২৪ দিন সংজ্ঞাহীন থাকেন এবং ওই একই বছরে তৃতীয়বার আক্রান্ত হবার পর তাঁর আর জ্ঞান ফেরে নি, প্রায় দুবছর একটানা দীর্ঘ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করার পর তিনি চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর সামনে রেখে গিয়েছেন দেশপ্রেম, নারীমুক্তি ও জনসেবার উজ্জ্বল এক আদর্শ। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিবর্ষী দিনগুলিতে তাঁর নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। চিন্তাশীলতায়, বুদ্ধিতে, বাগ্মিতায়, সংগঠনশক্তিতে, নিরলস কর্ম ও আপোষহীন সংগ্রামে তিনি ছিলেন অনন্যা। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি, উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটি প্রভৃতির নেত্রীত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে ঢাকা শহরে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁর বিপুল সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের পর থেকে গান্ধীবাদী রাজনীতির আবহাওয়া থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেন এবং ১৯৩৯ সালে তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। তার পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনধারা নানা পথে প্রবাহিত হয়েছে এবং ১৯৬২ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নোয়াখালি দাঙ্গার সময় তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষদের পাশে যেভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার তুলনা নেই। খণ্ডিত স্বাধীনতার বলিস্বরূপ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে তাঁর সংগ্রামের কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলনের জন্য তাঁকে কংগ্রেস সরকার গ্রেপ্তারও করেছিল। তার পূর্বেও বহুবার তাঁর কারাদণ্ড হয়েছে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করেছেন, জীবনের সর্বস্তরেই তিনি তাঁর বিরাট সংগ্রামের পরিচয় রেখে গেছেন, মৃত্যুর সঙ্গেও তিনি লড়াই করেছেন ঐতিহাসিক। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের পরম প্রেরণা হবে নিঃসন্দেহে।

সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ

গত শনিবার দিল্লীতে এ-আই-সি-সির অধিবেশনে (ইন্দিরাপন্থী) রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং জামাত-ই-ইসলামীর মত সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ কঠোর হস্তে দমন করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উপর গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে এই জাতীয় আধা সামরিক সাম্প্রদায়িক সংস্থার কোন স্থান থাকা উচিত নয়। প্রস্তাবের উপর ৬ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় বহু সদস্য আর-এস-এস এবং জামাত-ই-ইসলামী ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলোকে বে-আইনী ঘোষণার দাবি জানান।

এ-আই-সি-সির প্রস্তাবে এই প্রথম আর এস-এস এবং জামাত-ই ইসলামী পার্টি সাম্প্রদায়িক দল বলে চিহ্নিত হল। ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাবে এই দুই সংগঠনের নাম ছিল না। কিন্তু এ-আই-সি-সি সদস্যদের চাপে প্রস্তাবে এই নাম দুটো ঢোকাতে হয়েছে। শিবসেনার নাম সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে চিহ্নিত করার দাবিও উঠেছিল। কিন্তু জগজীবন রাম বলেন যে, মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে শিবসেনার নাম আছে। কাজেই এই প্রস্তাবে শিবসেনার নাম দেবার প্রয়োজন নেই।

আর এস-এস এবং জামাত-ই-ইসলামী দলকে বে-আইনী ঘোষণার প্রস্তাব পাশ হয়েছে বটে, তবে বে-আইনী ঘোষণা করা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না। তবে এ কথা ঠিক যে, সাম্প্রদায়িক দলগুলো দেশের অগ্রগতির মস্ত প্রতিবন্ধক। কাজেই এই দল এবং গোষ্ঠীগুলোকে কঠোর হস্তে দমন না করলে দেশের মঙ্গল নেই। এ আই-সি-সির এই প্রস্তাবের পর কেন্দ্রীয় সরকার যদি সেই পথে অগ্রসর হন, তাহলে তাতে দেশবাসীর জোরো সমর্থন থাকবে বলে আশা করা যায়।

রায় মন্ত্রিসভা টিকে গেল ...

বিহারে দারোগাপ্রসাদ রায়ের অষ্ট দলীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার জন্য বিরোধী দলগুলো যে চেষ্টা করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। গত ১৩ই জুন বিধানসভায় অর্থলগ্নী বিল (১৯৭০-৭১) ১৭০—১০২ ভোটে পাশ হয়ে গেছে। এই বিলে গভর্নমেন্ট এই বছর সরকারী তহবিল থেকে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করার অধিকার লাভ করেছেন।

বিহারে দারোগা রায় গভর্ণমেন্টের পতন ঘটিয়ে সেই জায়গায় সিণ্ডিকেট, জনসংঘ, স্বতন্ত্র এবং এস-এস-পি দলের
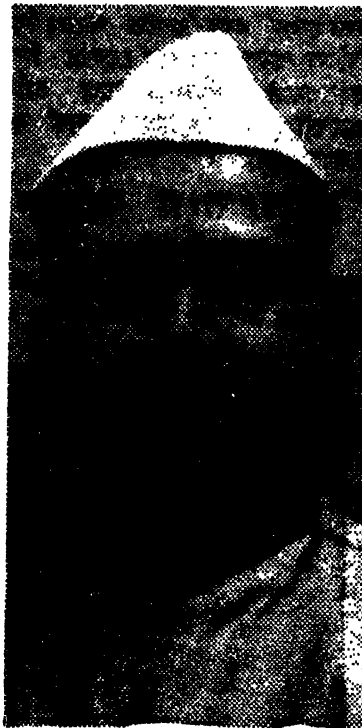
দারোগা রায়

জন্য উপরোক্ত দলগুলি একজোট হয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দল (এস-ভি-ডি) গঠন করেছিলেন। এস-এস-পি দলের রামানন্দ তেওয়ারী এস-ভি-ডির নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু তাই নিয়ে এস-এস-পি দলের মধ্যে বিরাট মতভেদ দেখা দেয়। পার্টির সেক্রেটারী জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ বিহার পার্টির কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, "দারোগা-প্রসাদ রায়ের গভর্নমেণ্টকে অবিলম্বে উল্টে দিতে হবে। বিহারে ইণ্ডিকেট পরিচালিত গভর্ণমেন্টের পতন ঘটাবার ব্যাপারে এস-এস-পি দলের বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকার কথা কল্পনার অতীত।"

অপর দিকে সেণ্ট্রাল পার্লামেণ্টারী বোর্ডের চেয়ারম্যান রামসেবক যাদব প্রেরিত অপর এক বার্তায় বলা হয় যে, রামানন্দ তেওয়ারী পার্টির শোনপুর প্রস্তাব এবং কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বেনারস প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বিহারে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, তা আলোচনার জন্য ১৫ই জুন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের এক সভা ডাকা হয়েছে। সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচনের প্রশ্নও সেই সভায় আলোচনা হবে।

শ্রীযাদব এবং শ্রীরাজনারায়ণ নাকি তেওয়ারীকে সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতা করতে অনিচ্ছুক।

অপর দিকে ফার্ণাণ্ডেজ, কর্পূরী ঠাকুর (দলের চেয়ারম্যান), মধু লিমায়ে এবং এস এম যোশী নাকি রায় মন্ত্রিসভা ওল্টাতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা চান, তেওয়ারীই এস-ভি-ডির নেতা থাকুন।

অপর দিকে দলের ২১ জন সদস্য পার্টির আইনসভা দলের সেক্রেটারী চতুর্ভুজের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে, রামানন্দ তেওয়ারী ব্রাহ্মণ। তাঁরা কোন ব্রাহ্মণকে এস-ভি-ডির নেতা করতে চান না। তাঁরা চান যে, হরিজন, আদিবাসী অথবা মুসলমানদের মধ্যে কেউ এস-ভি-ডির নেতা হোন।

এস-এস-পির এই আভ্যন্তরীণ বিবাদ শেষ পর্যন্ত বিধানসভার ভোটাভুটিতেও প্রতিফলিত হয়। পার্টির চীফ হুইপ তুলসী সিং-এর নেতৃত্বে ১৩ জন সদস্য ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, এস-এস-পির উপদলীয় কোঁদলই রায় মন্ত্রিসভার বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভের কারণ। শাসক দলের যে সব সদস্য ভোটাভুটির সময় বিরোধী দলের সঙ্গে ভোট দেবেন বলে গোপনে গোপনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা এস-এস-পির উপদলীয় কোঁদল দেখে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে ভরসা পান নি।

অর্থলগ্নী বিলের বিরুদ্ধে কোন

দলের কতজন সদস্য ভোট দিয়েছিলেন, তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল :— এস-এস-পি — ৩৭, জনসঙ্ঘ — ৩১, সিন্ডিকেট—৩২ এবং স্বতন্ত্র—২।

ভোটাভুটির পর এস-এস-পি দলের নেতা রামানন্দ তেওয়ারী বলেন, তাঁর দলের সদস্যদের আচরণ গভীর উদ্বেগের কারণ।

মুখ্যমন্ত্রী দারোগা রায় বিলের আলোচনাকালে এস-এস-পি দলকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু এস-এস-পি দল সেই আবেদনে সাড়া দিতে রাজী নয় বলে...

ইন্দিরা গান্ধীর গভর্ণমেন্টকে যেন-তেন প্রকারে টেকানোর জন্য এস-এস-পি'র এই একবগ্গা নীতি তাঁর দলের মধ্যে যে বিরোধ ও ভাঙন সৃষ্টি করছে, বিহারের ঘটনাই তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

শেখ আবদুল্লার মুখে একই বুলি

গত সপ্তাহে কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লা আবার ঘোষণা করেছেন যে, কাশ্মীরের স্বাধীনতাই কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকুক, এটা তিনি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন না। তিনি রাওয়ালপিণ্ডির এক সম্মেলনে বলেছেন যে, আলজিরিয়াবাসীর যেমন স্বাধীনতার অধিকার আছে, কাশ্মীরবাসীরও তেমনি স্বাধীনতার অধিকার আছে। স্বাধীনতা জিনিসটা কোন সময়ই দান হিসাবে পাওয়া যায় না। তার জন্য লড়াই করতে হয়। আবদুল্লা বলেন, "আমরা ভারত অথবা পাকিস্তানের কোলে বসে থাকলে স্বাধীনতা পাব না। কেউ আমাদের স্বাধীনতা দান করবে না। স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হবে।" শেখ সাহেবের এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি তাঁর পূর্ব মতে অটুট আছেন এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা "কেড়ে" নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

এ কথা কারও অজানা নেই যে, কাশ্মীর বিধিসম্মতভাবে ভারতের অঙ্গীভূত এবং সে ব্যাপারে শেখই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। পরে তিনি বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় নিজের মত পাল্টে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জিগির তোলেন। কিন্তু শেখ সাহেব মত পাল্টেছেন বলে যে দুনিয়ার সবাইকে মত পাল্টাতে হবে, তার কোন মানে নেই। পশ্চিমবঙ্গ যেমন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য, কাশ্মীরও তেমনি ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। এই অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতার দাবি দেশের সংবিধান-বিরোধী তো বটেই, দেশের অখণ্ডতারও পরিপন্থী। কাজেই শেখ যখন নতুন করে সেই ধুয়ো তুলে দেশ-

শেখ আবদুল্লা

দ্রোহিতার পথেই পা বাড়াতে চাইছেন। শেখের এই রণমূর্তি দেখে মনে হচ্ছে, কাশ্মীরে আবার কোন পাকিস্তানী চক্রান্ত দানা বাঁধছে। সম্প্রতি সেই রাজ্যের কয়েকটি রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড সেই চক্রান্তেরই পূর্বাভাস। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের আগেও ঐ প্রকার কয়েকটি রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। কাজেই ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবি আসলে রাজ্যটিকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবার মহড়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

আদায়ীকৃত করের পরিমাণ বৃদ্ধি

গত ৩১শে মার্চ যে অর্থনৈতিক বছর শেষ হয়ে গেল, তাতে ভারতে আদায়ীকৃত করের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। তাতে কোন কোন মহলের ধারণা হয়েছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির পথে। পাক-ভারত যুদ্ধের (১৯৬৫) পর যে মন্দা দেখা দিয়েছিল, সেটা কেটে গেছে এবং শিল্পোৎপাদনও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। সেটাই আদায়ীকৃত করের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

গত বছর দেশে উৎপাদনী শুল্ক আদায়ের পরিমাণ আগের বছরের চেয়ে ২০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। তাতে আদায়ীকৃত উৎপাদনী শুল্কের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৮৬·৮১ কোটি টাকা।

অপর দিকে দেশে আমদানীর পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছে। ফলে আমদানী শুল্কের আদায় ৩৪ কোটি টাকা কমে গেছে।

বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর (১৯৬৯-৭০) মোট ২৭২৫·৭০ কোটি টাকা কর আদায় করেছেন। আগের বছর আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৪১৭·৭১ কোটি টাকা। আগের বছরের তুলনায় গত বছর ৩০৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায় হয়েছে। অবশ্য গত বছর ১২৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য হয়েছিল। এই ১২৬ কোটি টাকা বাদ দিলে দেখা যাবে গত বছর চালু খাতে বাড়তি আদায় হয়েছে ১৮২ কোটি টাকা। যেমন ধরুন আয়কর খাতে ১৯৬৮-৬৯ সালে আদায় হয়েছিল ৩৬১ কোটি টাকা, কিন্তু গত বছর হয়েছে ৪২৫ কোটি টাকা।

আর্জেন্টিনা

লাতিন আমেরিকার কোন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের খবরে এখন আর কেউ বিস্মিত হয় না। অভ্যুত্থানটাই এখানে স্বাভাবিক।

তাই গত ৮ই জুন গভীর রাত্রিতে যখন এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে বর্তমান একনায়ক রাষ্ট্রপতি জুয়ান কার্লো ওনগানিয়ার হাত থেকে সেনানায়কদের হাতে ক্ষমতা চলে গেল, তখন কি দেশে, কি বিদেশে বিশেষ কোন বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় নি।

সেনাবাহিনীর সকল অংশ একযোগে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তিন প্রধান সেনানায়ক স্থলবাহিনীর জেনারেল আলিয়াণ্ড্রে লানুসে, নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল পেড্রো নাভি ও বিমানবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার কার্লো রে এই অভ্যুত্থানের নায়ক।

তবু এর মধ্যেই একটু চমকপ্রদ ঘটনা, রাষ্ট্রপতি জুয়ান কার্লো ওনগানিয়া এই অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রথমেই সেনানায়কদের নির্দেশ মেনে নিয়ে পদত্যাগ করেন নি, ক্ষমতা ছাড়তে চান নি। রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের অনুগত গার্ডদের সাহায্যে তিনি বারো ঘণ্টা সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টাকে রুখেছিলেন।

সৈন্যরা রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ ঘিরে রেখেছিল। জোর করে দখল করার চেষ্টা করলে হয়তো তারা করতে পারত। কিন্তু তারা তা না করে অপেক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত জুয়ান কার্লো ওনগানিয়া পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। রাতে তিনি নিজে সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে গিয়ে তিন সেনানায়কের হাতে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

জুয়ান কার্লো ওনগানিয়া তাঁর পদত্যাগপত্রে বলেছেন, "সেনাবাহিনীর চাপে" পড়ে তিনি এই পদত্যাগ করছেন। শোনা যায়, রাষ্ট্রপতি তাঁর অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেষ্টা রেভারেন্ড ফাদার পি মারিয়ানো কাসটেসের পরামর্শে পদত্যাগ করেছেন।

অভ্যুত্থানের নায়ক তিন সেনানায়ক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁরা দশ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতির ব্যবস্থা করবেন।

তাঁরা আরও বলেছেন, দেশে "প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র" ফিরিয়ে আনাই তাঁদের এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য। তাঁরা দীর্ঘদিন নিজেদের হাতে ক্ষমতা ধরে রাখতে চান না।

লাতিন আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ আর্জেন্টিনায় এই সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে নিছক ব্যক্তিগত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রয়েছে, না এর সঙ্গে কোন প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে, তা অভ্যুত্থানের খবর থেকে স্পষ্ট নয়।

গণতন্ত্রের নামে লাতিন আমেরিকার সব দেশেই প্রায় চলছে একনায়কতন্ত্র। লোকদেখানো নির্বাচন, আইনসভা, সবই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর জোরে ক্ষমতা দখল, আর সেই ক্ষমতা বজায় রাখা হয়। তাই কোন কারণে সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি বা একনায়কের বিরোধ উপস্থিত হলে, একনায়ককে যেতে হয়। এই নিয়ম। আর্জেন্টিনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

তবে লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে শাসকের অস্তিত্ব আবার অনেকাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আর্জেন্টিনার এধারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন

সুইজারল্যান্ড

জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৫৪তম অধিবেশনে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ভাষণ দিয়েছেন।

আই-এল-ও বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অধিবেশনে এর আগে আর কোন রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ দেন নি। এদিক দিয়ে ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আরও উল্লেখযোগ্য, ৪০ বছর পূর্বে শ্রীগিরি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্যরূপে আই-এল-ও'র অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে আই-এল-ও'র প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই শ্রীগিরির সঙ্গে এই সংস্থার সম্পর্ক রয়েছে। শ্রীগিরি নিজে দীর্ঘকাল শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীগিরি তাঁর বক্তৃতায় বিশ্বের ভয়াবহ বেকার সমস্যার উল্লেখ করে বলেছেন, আজকের দিনের সবচেয়ে বড় ও একান্ত জরুরী এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে বড় রকমের বিপর্যয় দেখা দেবে।

এক এশিয়াতেই বর্তমানে ৩০ কোটি লোক বেকার ও অর্ধ-বেকার রয়েছে। সত্তরের দশকে এই সংখ্যা আরও সাড়ে বাইশ কোটি বাড়বে। এই বিরাট বেকার বাহিনীর জন্য কাজ জোগাতে হবে। তা ছাড়া আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ য়ুরোপ আছে।

সাম্প্রতিক যুববিদ্রোহের প্রকৃতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য শ্রীগিরি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বের কোটি কোটি বঞ্চিত। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ জীবনের সর্বনিম্ন প্রয়োজন থেকে

সুইশ পার্লামেন্টে ভাষণদানরত শ্রী ভি ভি গিরি

তাঁদের যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, তাকেও বুঝতে হবে।

শ্রীগিরি আরও বলেছেন, কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

শ্রীগিরির বক্তৃতা বিশেষভাবে আই-এল-ও সম্মেলনের প্রতিনিধিদের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়েছে। হবেই। ভাল ভাল কথা বললে, কার না ভাল লাগে। তবে এতে কতটা কাজ হবে, সেই হল কথা।

শ্রীগিরি সরকারিভাবে ১২ দিনের জন্য সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড ও পোল্যান্ড সফরে বের হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন, তেল ও রসায়নদপ্তরের মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন।

সুইজারল্যান্ডে শ্রীগিরি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। তিনিই প্রথম কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি সুইশ আইনসভা ফেডারেল অ্যাসেম্বলীতে ভাষণ দিলেন।

জর্ডান:

রাজা হুসেন অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন।

৯ই জুন রাজা হুসেন যখন সদলবলে গাড়িতে করে রাজধানী আম্মানের দক্ষিণে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর ওপর প্রচণ্ড গুলী-বর্ষণ করা হয়। 'ঈশ্বরের দয়ায়' কোন রকমে তাঁর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

প্যালেস্টাইন গেরিলা বাহিনীর লোকেরা এই গুলীবর্ষণ করেছে। সম্প্রতি জর্ডানে গঠিত বামপন্থী সংস্থা পপুলার ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্য গেরিলা আক্রমণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। জর্ডানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও এ'দের অন্যতম উদ্দেশ্য। সিরিয়ার সমর্থন তো এ'দের পেছনে আছেই, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রেও এ'দের অনেক সমর্থক রয়েছেন।

জর্ডানের রাজা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ঠিকমত লড়াই করছেন না, তাঁর ওপর বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আছে এবং ইজরায়েলের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ভয়ে তিনি তাঁর দেশে ইজরায়েল-বিরোধী গেরিলা কার্যকলাপ চালাতে দিচ্ছেন না, এই সব কারণেই মুক্তি সংগ্রামী-দের রাজা হুসেনের ওপর রাগ।

ইতিমধ্যেই পপুলার ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের কর্মীরা সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েক শত ব্যক্তি মারা গেছে। তাঁদের গুলীতে সেনাবাহিনীর প্রধান ও রাজার আপন খুল্লতাত শেরিফ নাসের বে জামিন মারা গিয়েছেন।

রাজা এখন এ'দের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করছেন। একটা শান্তি চুক্তি ও অস্ত্রসংবরণের সিদ্ধান্তও হয়েছে। তবে কতদিন তা উভয়পক্ষ মানবেন, সেটাই হল প্রশ্ন।

পাকিস্তান:

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে, এই অভিযোগ দীর্ঘ-কালের। করাচী-রাওয়ালপিণ্ডির কর্তারা প্রতি ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন। দেশের এই প্রান্তে অধিকাংশ মানুষ বাস করে, এই প্রান্ত থেকেই অধিকাংশ সম্পদ সংগ্রহ করা হয়, অথচ সরকারী অর্থ বণ্টন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, চাকরি, সেনা-বাহিনীতে নিয়োগ, প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই সেখানে আজ স্বাতন্ত্র্যের দাবি অত্যন্ত প্রবল।

সম্প্রতি নতুন অভিযোগ উঠেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাঁদের পুঁজি নিয়ে সরে পড়ছেন। ব্যাপক হারে পুঁজি অপসারণ চলছে। এতদিন পূর্ব পাকিস্তানের
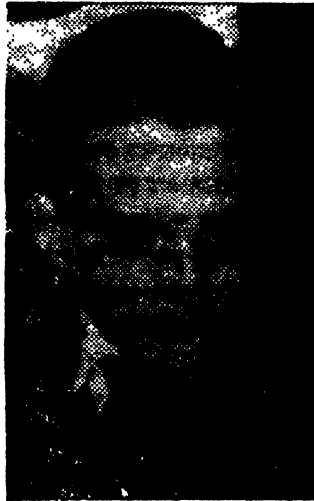
রাজা হুসেন

প্রধান প্রধান শিল্প পশ্চিম পাকিস্তানের ধনী শিল্পপতিদের মূলধনে চলত। এবং তাঁরা যদৃচ্ছ শোষণ চালাতেন। আর আজ, তাঁরা দল বেঁধে মূলধন নিয়ে পালাচ্ছেন।

ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভারে' বলা হয়েছে, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী—এপ্রিল, এই চার মাসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৯০ কোটি টাকার মূলধন সরানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন, এই বছরও জানুয়ারী—মে মাসে ৫০ কোটি টাকার ওপর মূলধন সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলছেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিচলিত বোধ করেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প-পতিরা তাঁদের টাকা-পয়সা কলকারখানা এই প্রান্ত থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন।

আগামী অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে প্রগতিশীল শক্তির জয় হবে এবং পূর্ব পাকিস্তান স্বাতন্ত্র্য আদায় করতে সক্ষম হবে, এই সম্ভাবনা রয়েছে। তখন আর এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে অবাধ শোষণ চালানো যাবে না। তাই আগেভাগেই শিল্পপতিরা সরে পড়ছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল : যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে তো খাস কেন্দ্রীয় সরকারেই এবার পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কথা। তাহলে, পশ্চিম পাকি-স্তানে বসেই বা শিল্পপতিরা কি সুবিধা করবেন?

আসলে, পূর্ব পাকিস্তানকে বিপদে ফেলার জন্য, নতুন করে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করার এ এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। মূলধন সরিয়ে নিয়ে, কলকার-খানা বন্ধ করে সমগ্র অঞ্চলে একটা অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে এই অনিশ্চয়তা, অবনতির জন্য প্রগতিশীল নেতাদের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা হবে। (ঠিক যেমনটা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, বাম-পন্থী যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে মূলধন অপসারণ, কারখানা, অফিস অপসারণ করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, এই শাসন কত খারাপ, বামপন্থী নেতাদের জন্যই এই দুর্দশা!)

মূলধন অপসারণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে জোর দাবি উঠেছে। দুজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ও আতাউর রহমান প্রস্তাব করেছেন : পশ্চিম পাকিস্তানের সকল শিল্পপতিকে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের কি কি সম্পত্তি আছে তার পূর্ণ বিবরণ ঘোষণা করতে হবে। তাঁরা আরও দাবি করেছেন: কোন ব্যাঙ্ক যাতে মূলধানের টাকা সরাতে না পারে, তার জন্য নির্দেশ দিতে হবে।

কেবল মূলধন নয়, গুজরাট-বোম্বাই থেকে যে সব মুসলমান ব্যবসায়ী দেশ-ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন, কিংবা যে সব উর্দুভাষী উদ্বাস্তু বিহার থেকে এসেছিলেন; তাঁরাও এখন দলে দলে পশ্চিম পাকিস্তানে পালাচ্ছেন।

জাগ্রত পূর্ব পাকিস্তানকে এ'দের ভয়। অনেক অত্যাচার করেছেন। আর চলবে না।

তবে নির্বাচনের পূর্বে এই সবকে উপলক্ষ করে একটা প্রাদেশিকতাব গোলমাল সুরু করাব আশংকা রয়েছে। সাম্প্রদায়িক-তার আশ্রয় তো প্রতিক্রিয়াশীলরা নিয়েছেই। ভরসা এই, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতার উস্কানিতেই আজ আর পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হবে না।

(১৪-৬-৭০)

এইজন্য দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে, কায়েমী স্বার্থের বাহক বড় বড় সংবাদপত্রের সংবাদ বিশ্বাস করবেন না। ওরা আমাদের কোণঠাসা করতে, আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে একজোট হয়েছে। এই সাবধান বাণী যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর থেকে বারে বারে উচ্চারণ করা হয়েছে, ক্যাডারদের কানে এই মন্ত্র বারে বারে দেওয়া হয়েছে। ফল অবশ্য কিছু হয় নি, এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের সংবাদ সম্পর্কে অনেক মানুষই মোহমুক্ত হয়েছে। সংবাদপত্রের ছাপা সংবাদ মাত্রেই যে বেদবাক্য নয়, এই কথা অনেকেই বুঝেছেন। কিন্তু একটা নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে। ছাপা সংবাদ না হয় বিশ্বাস না করা গেল, কিন্তু নেতাদের বিবৃতিগুলোর কি হবে? গত ১৭ মার্চ বর্ধমান সাঁই বাড়ির হত্যাকান্ড নিয়ে যখন প্রথম সংবাদ প্রকাশিত হল, তখন কত না দুয়ো দেওয়া হল। তারপর সেই ঘটনা নিয়ে কত কি হয়ে গেল—কমিশন বসেছে, তদন্ত বিচার, কত এলাহি কারবার চলছে। সাঁই-বাড়ির হত্যাকান্ডের পর গত ৯ই মে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদ)-র রাজ্য কমিটি থেকে প্রচারিত ছয় পৃষ্ঠার বিরাট প্রচারপত্রখানি যা রাজ্যের সর্বত্র হাজারে হাজারে বিলি করা হয়েছে, তাতে সাঁই-বাড়ির ঘটনার মূল্যায়ন করা হয়েছে নিম্নরূপ। "কুখ্যাত সমাজবিরোধী সাঁই-ভ্রাতাদের নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় কংগ্রেসী হামলাবাজ গত ১৭ই মার্চ রাজ্যব্যাপী হরতাল-ধর্মঘটের দিনে বর্ধমানে জনগণের বিরুদ্ধে হামলা করতে গিয়েছিল এবং তা করতে গিয়ে তিনজন মারা গিয়েছিল"। এর পর নিশ্চয়ই আর কিছু বলার থাকতে পারে না। সাঁই-বাড়ির সেই বীভৎস হত্যাকান্ডের ঘটনাস্থল পরে অনেকে পরিদর্শন করেছেন, অনেক তথ্যই অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু এই তথ্য হল মোক্ষম তথ্য। যথা যারা মারা গেছে, তারা কুখ্যাত সমাজবিরোধী আর এই সমাজবিরোধীরা মরেছে কেন? না ওরা জনগণের বিরুদ্ধে হামলা করতে গিয়েছিল।

কিন্তু বর্ধমানে সমাজবিরোধীদের তালিকায় কি শ্রীগুণমণি রায়ের নাম ছিল অথবা ওরা জন গুণমণি রায় কি জনগণের বিরুদ্ধে কোন হামলা করতে গেছিল? গুণমণি রায় ওরা জন মুখার্জী তদন্ত কমিশনের সামনে ছুরিকাঘাতে মারা যায়। সব কাগজে বেরুলো—সি পি এম-এর লোকেরা এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার সব রহস্যের অবসান করে দিলেন। সাঁই-বাড়ির হত্যাকান্ডের পর সুদর্শন চক্র নিয়ে এগিয়ে এসে এক কৃষ্ণ সব সি পি এম-বিরোধী কুৎসার যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন এবং বলেছিলেন—বেশ করেছি এবং ঘটনার জন্য খুব বেশি দুঃখ প্রকাশ করার নেই। তিনি শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার। সেবার ছিলেন শ্রীহরেকৃষ্ণ, এবার এলেন শুধু শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার। প্রাক্তন আবগারী মন্ত্রী সেদিন কোর্ট প্রাঙ্গণে ঘটনার এক বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বললেন, "ভিড়ের মধ্যে নিজেদের ছুরির আঘাতে গুণমণি রায় আহত হয়, পরে হাসপাতালে মারা যায়।" বলুন, এর পর কি আর বলার থাকতে পারে? সেদিন কোর্ট প্রাঙ্গণে ছাত্র পরিষদের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ছোরা মারামারি করছিল—তারই সেমসাইডে গুণমণি রায় মারা গেছে। এই ঘটনাকে তাহলে একরকম আত্মহত্যার ঘটনা বললেও কেউ আপত্তি করবেন না। আমি বলি, আহা, বেশ বেশ। সাবাস কৃষ্ণের দেশ বর্ধমান শহর—এখানে সমাজবিরোধী আর আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা আর কত আছে? হরেকৃষ্ণবাবু আর কৃষ্ণচন্দ্রবাবু—তাঁরা এত সত্য জানেন! তাঁরা যদি এই রকম একটা তালিকা জনস্বার্থে প্রচার করে দেন, তবে মানুষের মত বেশ প্রস্তুত হতে পারি।

'বিরোধী' মরবে, কতজন গুণমণি নিজেদের মধ্যে ছুরি খেলতে যেয়ে মরবে। এতে একটা মস্তবড় সুবিধা হবে এই যে, খবরকাগজগুলোর "বজ্জাত-শয়তান" রিপোর্টারদের রিপোর্ট পড়ে মানুষ বিভ্রান্ত হবার সুযোগ পাবে না।

বর্ধমানে না হয় সমাজবিরোধী আছে, আত্মহত্যা করার লোক আছে। কিন্তু মালবাজারে কি হল? মালবাজারের উদ্বাস্তুরা কোন সমাজবিরোধী ছিল? তারা কোন্ আনন্দে নিজেদের মধ্যে ছুরি মারামারি করলো, ঘরে আগুন দিল? ৬ই জুন শনিবার মালবাজারের উদ্বাস্তু পল্লী আক্রমণ করলো যারা, তাদের খবর-কাগজগুলো সি পি এম সমর্থক বলে উল্লেখ করেছে, আর যাদের মারা হয়েছে, তাদের আর এস পি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্বাস্তু পল্লীতে আক্রমণে নিহত হয়েছে নাকি ২৫জন, সব মৃতদেহ পাওয়া যায় নি। যাদের পাওয়া যায় নি, তাদের হত্যা করে নাকি স্থানীয় চোল নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বুর্জোয়া কাগজের রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুই ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত গৃহে নিক্ষেপ করা হয়।

এই সম্পর্কে খবরের কাগজের কোন রিপোর্ট সম্পর্কে কোন কথা না বলে বরং আর এস পি দলের প্রবীণ নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের বক্তব্যই শোনা ভাল। কারণ, বর্ধমান সম্পর্কে আমাদের দুজন মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ও শ্রীকৃষ্ণ-পদ হালদারের বাণী শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে। বর্ধমানে দুটি ঘটনা ঘটেছে—মৃত্যু হয়েছে চারজনের। সব ঘটনার এক পক্ষে আছে কংগ্রেসী। কাজেই অনায়াসে সমস্ত ব্যাপারটা কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র বলে চালানো যায়—সমাজবিরোধীদের কথা বলা যায়, তাই শ্রীহরেকৃষ্ণবাবু আর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রবাবুর বক্তব্যই আমরা মেনে নিয়েছি। কারণ কংগ্রেসীরা সত্য কথা বলবে, কংগ্রেসীরা সৎ হবে, কংগ্রেসীরা নিরপরাধ হবে এই কথা অভিধান থেকে অনেকদিন আগেই মুছে গেছে।

বর্ধমানের দুটো ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জলপাইগুড়ি জেলারও দুটো

ঘটনার বেশ ঐতিহ্যগত মিল আছে। তবে বর্ধমানে আগুনে পুড়েছে সাঁই বাড়ি—জলপাইগুড়িতে পুড়েছে আর এস পি অফিস। বর্ধমানে ছুরিতে মরেছে গুণমণি রায়, আর জলপাইগুড়িতে মরেছে ২০।২৫ জন উদ্বাস্তু। বর্ধমানে শিকার হয়েছে কংগ্রেস নামে পরিচিতরা, জলপাইগুড়িতে আর এস পি। যা হোক, বর্ধমানের দুটো ঘটনা সম্পর্কে দুই প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাষ্য আমরা শুনেছি। এইবার জলপাইগুড়ির ঘটনা সম্পর্কে প্রাক্তন আর এস পি মন্ত্রীর কথা শোনা যাক। শ্রীভট্টাচার্য সি পি এম-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে বলছেন, "ঐ উদ্বাস্তুরা আর এস পি-র অনুগত হওয়ার অপরাধে তাদের আর একবার উদ্বাস্তু করার দীর্ঘকালীন পরিকল্পনায় সি পি এম নেতৃত্ব এই আক্রমণ পরিচালনা করেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সি পি এম সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার উস্কানি দিতেও কসুর করে নি। এই গরীব কৃষকদের বিরুদ্ধে সি পি এম চা-বাগিচা শ্রমিকদের কাজে লাগিয়েছে। উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও শ্রমিকদের নিযুক্ত করা এক অদ্ভুত ধরনের শ্রেণী-সংগ্রাম। এই জঘন্য অপরাধের অপকর্মের মোকাবিলা কি এই যুক্ত পথেই করতে হবে?"

শ্রীমাখন পাল এক বিবৃতিতে খোলাখুলি প্রশ্ন করেছেন—"সি পি এম-এর উদ্দেশ্য—এইভাবেই কি তাঁরা গণ ও শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তুলবেন। অথবা গণহত্যার কৌশল নিয়েই কি তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন?

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এই রিপোর্ট আর বিবৃতি পড়তে পড়তে ভাবছি—"এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে!" শ্রীসুশীল ধাড়া, শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীনীহার মুখার্জী, শ্রীঅশোক ঘোষ যে কথা বারে বারে বলেছেন এবং যে কথাকে আমরা সি পি এম-বিরোধী কুৎসা বলে জনগণকে বিশ্বাস করতে বলেছি, সেই কথা আরো জোরে বলছে আর এস পি। অতীতেও আর এস পি কিছু বলেছে, কিন্তু এমন করে কখনও বলে নি। শ্রীননী ভট্টাচার্য স্বল্পবাক, শ্রীমাখন পাল বামপন্থী ঐক্যের জবরদস্ত প্রবক্তা—তাঁরা সি পি এম সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। আর এস পি-র অভিযোগ সি পি এম সম্পর্কে—তারা শ্রমিক দিয়ে কৃষক হত্যা করেছে, তারা সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছে, তারা গরীব মেরেছে। একটা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী দলের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় অভিযোগ আর কি হতে পারে? এই অভিযোগের জবাব অবশ্য পাওয়া যাবে, 'গণশক্তি' পত্রিকা নিশ্চয়ই সমগ্র ঘটনার প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে সব অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির জবাব দেবে। তবে আমার প্রশ্ন—আর কত জবাব আর সওয়াল চলবে? শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অষ্ট সখা যে অভিযোগ করছিলেন, সেই তালিকায় যে আরো একটা জবরদস্ত নাম যুক্ত হল—সেটা আর এস পি, যাদের সম্পর্কে অনেকের ধারণা ছিল ভিন্ন রকমের। রাজ্য রাজনীতিতে একটা জোট বাঁধার শক্তি সমাবেশ যখন বেশ জমে উঠেছে, যখন যুক্তফ্রন্ট পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নটা নতুন করে আলোচনার জন্য শ্রীমাখন পাল ও শ্রীঅশোক ঘোষ উদ্যোগ নিয়েছেন—তখন এই উদ্বাস্তু পল্লীতে আগুন যে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন অবসান করে জনপ্রিয় সরকার গঠনের পরিকল্পনায় আগুন ধরিয়ে দিল। তবে এখনো দেখতে হবে, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। বর্ধমান আর মালবাজার রাজ্য রাজনীতিকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়।

—১১ই জুন, '৭০

[পূর্বানুবৃত্ত]

হেমচন্দ্রের প্রসঙ্গ এইভাবে আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করবার ঘটনাটি আমার মনে থাকতো কি না সন্দেহ,—যদি না এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটতো। সেটি এখানে বলা দরকার।

আনন্দ হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল—নিউ-গিনির ম্যাপটা মনে আছে? দেশটার পূর্ব প্রান্তটি মানচিত্রে দেখায় যেন মানুষের বন্ধ-মুষ্টির মতো,—ঠিক বন্ধ-মুষ্টি নয়,—যেন তর্জনী এগিয়ে আছে মুষ্টি থেকে সামনের দিকে,—এবং সেই তর্জনীর মূলে যে পর্বটি তারই ওপর, অর্থাৎ দেশটার পূর্বোত্তর সীমান্ত বরাবর খুবই ছোটো ছোটো কয়েকটি বিন্দু দেখা যায়—যেখানে বাস করে আদিম কয়েকটি জাতি,—আরা-পেশ, মুণ্ডুগুমোর, আণ্ডোয়ার, ৎশাম্বুলি ইত্যাদি।

আমি বললুম—আজ আর হেমচন্দ্রের কথা হবে না?

—সেই কথাই তো বলছি।

—কী রকম?

—দ্যাখো, তোমার-আমার মতন অসংখ্য সাহিত্য-পাঠকের কাছে নিউগিনি নামটাই মাত্র বিদ্যমান। সে দেশের কোন্ মাঠ, কোন্ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে সেপিক নদী বয়ে গেছে,—কোথায় সেই ৎশাম্বুলি জাতির বাসস্থানের সন্নিহিত বিশাল হ্রদ,—আরা-পেশ-মায়েরা কীরকম জালের ঝুলিতে তাদের শিশু-সন্তান বয়ে নিয়ে বেড়ায়, —এসব খবর আমাদের জানা নেই,—এবং না জেনে খুব যে একটা ক্ষতি হয়েছে, তা কি বলতে পারি? তেমনি, বাংলা বইয়ের মেলায় সবটা ঘুরে দেখবার মতন দীর্ঘ আয়ুষ্কাল কি আমরা পেতে পারি? হেম-চন্দ্রের বীরবাহু-কাব্যের কথা বলা হয়েছে,

—তাঁর 'নলিনী-বসন্ত' (১৮৬৮) যে শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' অবলম্বনে রচিত হয়, সে-খবরও আমরা জানি; তাঁর 'কবিতাবলী' (১৮৭০),—তাঁর 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫ ও ১৮৭৭—১ম ও ২য় খণ্ড),—নলিনী-বসন্তের মতোই শেক্সপীয়রের রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে লেখা তাঁর 'রোমিও-জুলিয়েত' (১৮৯৫) ইত্যাদি রচনার নাম আমরা অনেকবার শুনেছি। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, মন্মথনাথ ঘোষ, উমাকালী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সেকালের অনেকেই তাঁর কবিত্বের গুণগান করে গেছেন। একালে ডক্টরেট উপাধির জন্যে যাঁরা থীসিস লেখেন, তাঁরাও বোধ-হয় হেমচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু—

আমি বললুম—না, সবাইকে এক জাতের 'ডক্টর' বলছো কেন? একেবারে রসজ্ঞানবর্জিত নিরেট পণ্ডিত ছাড়া কি 'ডক্টর' নেই ভূভারতে? কবি অমিয় চক্রবর্তী কি ডক্টর নন?

—থাক্ সে-কথা। আমি তো কোনো বিশেষ নাম উল্লেখ করে কারও অখ্যাতি বা কুখ্যাতি শোনাচ্ছি না: যে-কথা বল-ছিলুম তাই বলতে দাও,—হেমচন্দ্রের প্রশংসা যেটুকু অকৃত্রিমভাবে ঘটেছে, সে-টুকু তাঁর আন্তরিক শক্তার জন্যেই—তিনি সেকালেই জীবিত ছিলেন—একালে তিনি পৌঁছোতেই পারেন নি। তাঁর কবিত্ব তাঁর আপনকালেই অন্তরীণ!

আমায় যেন প্রায় [illegible] কথাটা শুনে।

বললুম—দ্যাখো, লংফেলো একজন মাঝারি-কবি ছিলেন; হেমচন্দ্র নামে আর একজন মাঝারি-কবি 'জীবন-সংগীত' কবিতায় সেই লংফেলোকেই বাংলা ভাষায় পরিবেশন করে আমার ছেলেবেলায় আমাকেও মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন। সে স্মৃতি আমি ভুলবো কেন? তিনি কি আমার কালেও পৌঁছোন নি?

সে বললে—কে তোমায় ভুলতে বলেছে? আশ্চর্য তোমার মুগ্ধ হবার প্রবণতা! মুণ্ডুগুমোর জাতির মায়েরা কীভাবে তাদের শিশুদের স্তন্যপান করায়, সে-বিষয়ে তুমি যদি মার্গারেট মীড্ বা ঐ রকম অন্য কোনো নৃতত্ত্ববিদুষীর মতন মগ্ন থাকতে পারতে, তাহলেই বা কে তোমাকে নিষেধ করতো? কেনই বা নিষেধ করবে? এ-সবই তো জ্ঞান। জ্ঞানের পিপাসা, আর রসের চেতনা—দুটো কিন্তু আলাদা ব্যাপার। তুমি তো জানো এসব, —তৎসত্ত্বেও কেন যে গাঁয়ে-মানে না—বিশ্ব-বিদ্যালয়-দেগে-দ্যায় গোছের সাহিত্য-বিশারদের ঢঙে কথা বলো!

একথা আনন্দ খুবই সরলভাবে বলতে পারলো। এবং কথাটা বলেই সরল এক ঝলক হাসির আলোতে মনের সব গুমোট যেন ধুয়ে দিলো।

আমি বললুম—আনন্দ, আমার মায়ের একখানি হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী ছিল। আমার বয়স যখন বছর-পাঁচেক, তখন আমরা মেদনীপুর জেলার গড়বেতায় ছিলুম। সে গড়বেতাও নেই, সেই আমার মা-ও নেই,—কিন্তু হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীতে'র সেই ছত্রগুলি এখনো যেন আমার মায়ের মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছি!

সে বললে—কি শুনতে পাচ্ছ?

—বাজ্ রে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন, এ বিপুলে ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

সে বললে—ভাই, তোমার মাকে আমি প্রণাম জানাই, তোমার সে শৈশবের গড়-বেতাও নিশ্চয় ভারি সুন্দর জায়গা ছিল, —চন্দ্রকোণায় ক্ষীরমোহন প্রসিদ্ধ ছিল,—শিলাবতী নদীটি আমিও দেখেছি,—সর্ব-মঙ্গলার মন্দিরেও তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে অনেকবার সর্বমঙ্গলা দেবীপ্রতিমা দেখে এসেছ নিশ্চয়—সেসব মাধুর্য ভোল-বার নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতেরও নিদ্রা-ভঙ্গ ঘটেছে, হেমচন্দ্রেরও কবি হিসেবে কাজ ফুরিয়েছে!

আমি একথার প্রতিবাদে কী যেন বলতে উদ্যত হয়েছিলুম, কিন্তু সে আমায় হাতের ইসারায় শান্ত হতে

বললে। তারপর ঝকঝকে মলাটের একখানি বইয়ের পাতা খুলে দেখতে দেখতে বলতে লাগলো—ডক্টর উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব' (১৩৭৫) নামে তাঁর এই সদ্য-প্রকাশিত বইটিতে বেশ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে শোনো তিনি কী লিখেছেন—

'মাইকেলের মৃত্যুর (১৮৭৩) পর থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা কাব্যে যে ক'জন কবি বাঙালী কাব্য পাঠককে সাহিত্যরস যুগিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অন্যতম দু'জন কবি। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর আমরা হেমচন্দ্রকে (১৮৩৮—১৯০৩) প্রায় বিস্মৃত হতে বসলেও এককালে তিনি অন্যতম প্রভাবশালী কবি ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন।'

আমি বললুম—ঠিক কথা। কিন্তু এসব আমরা সকলেই তো জানি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসব লিখে গেছেন,—মন্মথনাথ ঘোষ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সঞ্জীব এবং বঙ্কিম এবং আরো অনেকেই—বিশেষভাবে অক্ষয় সরকারও লিখেছেন। কিন্তু ডক্টর উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের বিশেষ কথাটা কী? হেমচন্দ্রের কবিত্ব সম্বন্ধে তিনি কি বলেন?

আনন্দ সোজা হয়ে বসলো। বসে বললে—শোনো, উজ্জ্বলবাবু লিখেছেন—

'পড়াশুনা তাঁর যথেষ্ট ছিল। ইওরোপীয় ক্লাসিক্‌স্ (ইংরাজী ভাষার মারফৎ), শেক্সপীয়র ও মিল্টনের কবিতা এবং অগস্টান ও রোমাণ্টিকদের কবিতা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে প্রভাবকে আকর্ষণ বলাই ভাল।'

আনন্দ বললে—আরো শোনো—

'কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছিল না—যা জীবনের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিতে ব্যাপ্ত ও গভীর হতে পারে। বিদেশী কাব্যপাঠে তাঁর মূল কবিব্যক্তিত্বে কোনো পরিবর্তন আসে নি, বিদেশী কাব্যের অংশত অনুসরণ ছাড়া। ইংরেজী কাব্যপাঠে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের জন্যই বৈদেশিক কাব্যসাহিত্য থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে প্রধানত তাঁদেরই চিত্তবিনোদন করেছিলেন হেমচন্দ্র।'

বিজয়গর্বে উদ্ভাসিত দু'টি চোখ তুলে হাসি-হাসি মুখে আনন্দ আমাকে বললে—শুনলে তো এই শেষ কথাগুলো? এবার জবাব দাও।

আমি বললুম—এসব উত্তর-প্রত্যুত্তর যে দেখা দেবে, এরকম সম্ভাবনা আমি আগে ঠিক ভাবতে পারি নি। এখন একটা রফা করা ভাল যে, আমরা কোনো থীসিসের প্রসঙ্গ তুলবো না।

সে বললে—এই কিছুদিন আগেই আমরা কি শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ তুলি নি? যাক গে—আমি বুঝতে পারছি, ঐ শেষ কথাগুলোর অস্পষ্টতা কোথায়। 'কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছিল না'—একথা হেমচন্দ্র সম্বন্ধে বলা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত হেমচন্দ্রের 'মূল কবিব্যক্তিত্বটি' যে কী, সে-তত্ত্বের ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রত্যাশিত। দেখতে হবে পর্যালোচক তা ব্যাখ্যা করেছেন কি করেন নি। তৃতীয়ত ঐ শেষ উদ্ধৃতির আগের উক্তিতে বলা হয়েছে যে, হেমচন্দ্র একটা বিশেষ যুগে 'অন্যতম প্রভাবশালী' কবি ছিলেন; অথচ তাঁর নিজেরই কোনো স্বীকার্য কবিব্যক্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ, এরকম অবস্থা ঠিক বোঝা যায় না—তাই তো?

আমি বললুম—হ্যাঁ। কিন্তু উজ্জ্বলবাবুর বই সম্বন্ধে আমি কিছু বিরূপ মন্তব্য করছি না। আজকাল অনেকেই পাশ্চাত্য প্রভাব, সমাজ-চেতনা, আধুনিকতা ইত্যাদি পণ্ডিতসাধ্য তর্ক-বিতর্কের মোড়কে বাংলার কোনো কোনো কবি-প্রসঙ্গের অবতারণা করেন,—সে-সব আমি পড়বার চেষ্টা করি,—সব যে ঠিক বুঝতে পারি তা বলবো না, কিন্তু পাঠক হিসেবে অন্তত পড়বার অধিকার তো আমাদের মতন মানুষেরও একটা অধিকার, আনন্দ?

আনন্দ বললে—আলবৎ।

তারপর আবার তার নিজের মন্তব্যের জের টেনে বললে—হেমচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু বেশি তুলনা ভাল নয়,—অর্থাৎ তুলনার বাড়াবাড়িটা পরিত্যাজ্য। 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩১৯ সালে প্রকাশিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি হেমচন্দ্র' প্রবন্ধ থেকে উজ্জ্বলকুমার এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন—"মেঘনাদে মিলটনের গন্ধ পাইলেও, সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয় না। কবির শব্দসম্পদে ও ভাবৈশ্বর্যে সে গন্ধ তীব্র ও মনোমোহন বলিয়া বোধ হয়। বৃত্রসংহারে তেমনই দান্তের ইনফার্নোর গন্ধ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম হইয়াছেন।"

আনন্দ বলতে লাগলো—দ্যাখো ভাই, পাঁচকড়ি একজন বাংলা-কাগজের জার্নালিস্ট ছিলেন। তিনি যা-খুশি-তা বলতে পারতেন, লিখতে পারতেন; কিন্তু মধু বা হেমের কবিব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণের পক্ষে তাঁর এই ধরনের উক্তির ওপর নির্ভর করলে যথার্থ কাব্যরসিক যাঁরা, তাঁদের বড়ো আঘাত লাগে। পাঁচকড়ি লেখাপড়া-জানা লোক ছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু বোধহয় মতামতের শান্ত চিন্তার ক্ষেত্রে সংযমী ছিলেন না তেমন।

আমি মূল বইয়ের সমালোচনা ছেড়ে মূল কাব্যেরই আস্বাদনের দিকে যেতে চেয়েছিলুম। হেমচন্দ্রের নিজস্ব কবিব্যক্তিত্ব নেই,—একথা আমি মানতে নারাজ। তিনি পাশ্চাত্য কবিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ কখনোই ঢাকতে চান নি। সুতরাং তা ঢাকবার জন্যে গলদ্‌ঘর্ম হবার অভিযোগ অপ্রাসঙ্গিক। উজ্জ্বলকুমার তাঁর বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'হেমচন্দ্রের ভারতীয় মন ইংরেজী কবিতার অনুবাদে জাতীয় বা ব্যক্তিগত মনোভাবকে মুদ্রিত করে রেখেছে।' তাহলে, তাঁর একটা ব্যক্তিগত মনোভাব ছিল তো? সেটা কি ধরা গেছে? আজকাল হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্রের কালে রেখে যথার্থ নিরীক্ষার মন কোথায়? তাঁর নিজের কাল কতোটা আমাদের কালে এসে মিশছে, সেটাও কি আমরা ভেবে দেখতে চাই? বঙ্কিম লিখেছিলেন যে, বৃত্রসংহারের 'নিয়তি' হেমচন্দ্রের সৃষ্টি। একালের গবেষক লিখলেন—না, তা গ্রীসের আমদানি এবং এই নিয়তিকেই মাইকেল বলেছেন, 'বিধির বিধি'! মধুসূদনের সঙ্গে হেমচন্দ্রের সময়গত এবং ব্যক্তিগত সান্নিধ্য অবশ্যই মানতে হবে, কিন্তু এঁরা দু'টি যে আলাদা মানুষ, সেটা ভুলবো কেন? ঈশ্বর গুপ্তের এবং তাঁরও আগের আমল থেকে বাংলার লোকভাষা, লোকরুচি, লোককৌতুক এবং লোকমনের যে বিষাদভঙ্গী এবং উদ্দীপনাভঙ্গী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, হেমচন্দ্র সেই ধারাতেই পৃথক একটি মন! একথা আর কেউ না বুঝতে চাক, আনন্দের তো তা বোঝা উচিত।

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তেরো ॥

রাসবিহারীর মোড়ে, আধ মাইল লম্বা শাট্ল্ বাসের লাইনে দাঁড়িয়েছিল টুলু। সামনেই একটি অল্পবয়সী মেয়ে। পুরোনো অভ্যাসে মেয়েটির ঘাড়-গলার দিকে বার বার চোখ পড়তে যাচ্ছিল, একবার পাশের দিকে মাথা ফিরিয়েছিল মেয়েটি, মনে হয়েছিল বেশ মিষ্টি মুখখানা, তার চুল থেকে চাপা একটা সুগন্ধিও বয়ে আসছিল। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল টুলু, যেন একান্তভাবে জপ করতে চাইছিল : এ-সব নয়, এ-সব নয়। অনেক হয়েছে ইয়ার্কি-ফাজলামো, যাকে বকে যাওয়া বলে তার কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না। কয়েকবার টেনে নিয়ে গেছে বাজে জায়গায়। তবু ভাগ্য ভালো, চোলাই মদের আড্ডাটায় ভেড়াতে পারে নি আর। ওইখানেই কোথায় বেধেছে, মানিক, ফণী কিংবা কার্তিকের বন্ধুত্ব যেমনই হোক—বাকী লোকগুলোর সঙ্গে ভাঁড়ে করে ওই দুর্গন্ধ মদগুলো গিলতে—

প্রবৃত্তি হয় নি, সাহসও না। ওই গন্ধ মুখে নিয়ে বাড়ি ফিরব? মা-র সামনে, দাদার সামনে? নেশাটা ধরে নি, কিন্তু আর কিছুই তো বাকী ছিল না। আরো কদিন গেলে হয়তো মানিকের সঙ্গে রওনা হত ওয়াগন ভাঙতে কিংবা ফণীই তাকে টেনে নিয়ে যেত ছিনতাইয়ের দলে। ঠিক এমন সময় দিদি এল। বেঁচেছে সে।

না, আর ওসব ভাবব না। কোনো বাজে কথা না, কোনো কুচিন্তা নয়। তাকিয়ে দেখব না কোনো মেয়ের দিকে। যদি কখনো সময় আসে—টুলুর বুকের ভেতরে হঠাৎ হাতুড়ি পড়তে আরম্ভ : তখন যাব স্বপ্নার কাছে। তার আগে আমাকে অন্তত প্রাইভেট বি-এটা পাশ করতে হবে, চাকরিতে—

অবশ্য মধ্যে মধ্যে অফিসে যেন দম আটকে আসতে চায়। শুকনো কাগজপত্র, ফাইল আর দলিলের স্তূপ, টাইপরাইটারের আওয়াজ, ফাই-ফরমাস—মাথা ঘুরতে থাকে। বুড়ো হ্যাংলা চেহারার হেড ক্লার্কটার ডিসপেপসিয়া আছে, একটু এদিক-ওদিক হলেই খ্যাচ-খ্যাচ করে ওঠে। খুন চেপে যায় কখনো কখনো, ইচ্ছে হয় এক ঘা মেরেই বসি বুড়োকে। সন্ধ্যে নাগাদ যখন ছুটি মেলে, তখন পিঠের ওপর যেন একমণী বোঝা চেপে আছে একটা।

অ্যাটর্ণী ঘোষ সায়েব মনীশদার বন্ধু। তাঁর ব্যবহার অবশ্য ভালো। মাঝে মাঝে হেসে পিঠ-টিঠ চাপড়েও দেন। উৎসাহ দিতে থাকেন।

'খাটো হে, একটু খাটো। বুঝতেই পারছ কত রেস্‌পন্‌সিব্‌ল কাজ এ-সব, শিখে নিতে সময় লাগবে।'

কোচিং ক্লাসে এখনো ভর্তি হওয়া হল না। সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার একটা বড়ো মামলা চলছে হাইকোর্টে। ঘোষ সাহেব অসম্ভব ব্যস্ত। দারুণ কাজের চাপ। কিন্তু লেখাপড়াটা আরম্ভ করতে পারলে ভালো হত। যা হোক একটু নিশ্বাস ফেলা যেত এই দমচাপা আবহাওয়া থেকে।

সাতটা বাজে। লাইনটা শাট্ল বাসের আশায় দাঁড়িয়ে। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু টুলুর বিরক্তি লাগছিল। এর চাইতে জোরে জোরে পা চালালে এতক্ষণে যাদবপুরে পৌঁছে যেত।

কাঁধের ওপর কার হাত পড়ল পাশ থেকে। টুলু চমকে তাকালো। মানিক।

'কিরে, ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি? পাত্তা নেই যে আর।'

'সময় পাচ্ছি না। অফিস থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায়।'

'ও—অফিস।'—মানিক ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল : 'ভুলেই গিয়েছিলুম, তুই কাজের লোক হয়ে গেছিস। তা কী করছিস এখানে?'

'দেখতেই পাচ্ছিস। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ি ফিরব।'

'এখন কী হবে বাড়ি ফিরে? আয়।'

'না ভাই, এখন আর আড্ডা নয়। ভারী খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে তো খাওয়াব। আয় —আয়—'

হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা মারল একটা।

টুলুর বুক কেঁপে উঠল। আবার সেই সঙ্গ। অনেক কষ্টে লোভ এড়িয়েছে। গড়িয়াহাট ব্রীজ থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত সে চোখ বুজে থাকে—প্রাণপণে ভাবে ওদের সঙ্গে যেন আর তার দেখা না হয় —কোনোমতেই না। সে এখন ভালো হতে চাচ্ছে—এখন তার নিজেকে বদলাতে হবে।

মানিক বললে, 'বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কী? আমি কি তোকে খেয়ে ফেলব? চল্—চল্—দু' ঘন্টা বাদে বাড়ি ফিরলে তোর চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে না।'—বলে আবার হ্যাঁচকা মেরে হাতখানেক টেনে সরিয়ে নিলে। মানিকের শেষ কথাটায় সামনের মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকালো। আশপাশের আরো কজনের দৃষ্টি ঘুরে এল এদিকে।

নাঃ—এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে এতগুলো লোকের সামনে বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে একটা। যা আলগা মুখ, কী বলে

করবে শেষ পর্যন্ত ঠিক নেই তার। ফিসফিস করে মেয়েটির কানে যাচ্ছে কথাগুলো।

টুলু বেরিয়ে এল লাইন থেকে। জোর পায়ে এগোতে এগোতে বললে, 'জন্মালি!'

'দৌড়োচ্ছিস কেন ঘোড়ার মতো?'—মানিক তৎক্ষণাৎ এসে সঙ্গ নিলে। তারপর চোখ টিপে বললে, 'বুঝেছি।'

'কী?'

'ফলতঙ্গ করে দিয়েছি।'

'মানে?'

'মেয়েটার গা ঘেঁষে বেশ দাঁড়িয়েছিলি। তা মাইরি—'

একটা বিশ্রী কিছু বলতে যাচ্ছিল, টুলু প্রায় ধমকে উঠল।

'খারাপ কথা ছাড়া কিছু আর মুখে আসে না—না? মেয়ে দেখলেই নোলা লক লক করে?'

'লে ব্বাবা!'—মানিক দাঁড়িয়ে পড়ল: 'তুই শ্লা যে ভগ্নীপোতের পাল্লায় পড়ে একেবারে পাটভাঙা ভদ্দরলোক হয়ে গেলি

আচমকা। একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে রে টুলু।'

'হোক বেশি। আমাকে ছেড়ে দে। আমি বাড়ি ফিরব।'

'ফিরো চাঁদ, ফিরো। বাড়ি গিয়ে মা-র কোলে শুয়ে ঝিনুক-বাটিতে দুদু খেয়ো।'—বলে শক্ত করে আবার হাত চেপে ধরল টুলুর : 'তার আগে চল্ ওই চায়ের দোকানে। দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'কী দরকারী কথা আবার? আমি তোদের দল ছেড়েছি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি—' মানিক বাঁকা চোখে তাকালো : 'কিন্তু তুমি দল ছাড়লেই দল তো তোমায় ছাড়তে পারে না। হচ্ছে—সে-সব হচ্ছে। তার আগে চল্ তোকে কিছু খাওয়াই। খিদে পেয়েছে বলেছিলি।'

পরিত্রাণ নেই, কামড়ে ধরেছে জোঁকের মতো। খিদে পেয়েছিল নিশ্চয়ই—কিন্তু বিরক্তিতে তার খাওয়ার প্রবৃত্তি নেই আর। অথচ বোঝাই যাচ্ছে—মানিক তাকে ছাড়বে না। বিস্বাদ আর ক্লান্ত মন নিয়ে সে মানিকের সঙ্গে ঢুকল চায়ের দোকানে।

দোকানটা কুলীন নয়। টিনের চাল, বেড়ার ঘর। মিস্ত্রি মজুর, অল্প পয়সার সাধারণ মানুষ এখানকার খরিদ্দার। সস্তার চা, সস্তায় খাবার। মাংসভাজার তীব্র গন্ধ আসছে রাস্তা পর্যন্ত। ভেতরটা জমাট।

দুজনে ভেতরে ঢুকে এসে কোণার দিকে নিরিবিলি একটা ছোট টেবিল বেছে নিলে। টুলু হাতের ব্যাগটা ঠেস দিয়ে রাখল বেড়ার গায়ে।

মানিক বললে, 'বাঃ, চকচকে একটা ব্যাগও কিনেছিস দেখছি।'

'ফাইল কেস।'

'ও-সব বুঝিনে। কী আছে ওতে? টাকা?'

'না—কাগজ পত্তর।'

'ধ্যাৎ!' মানিক ভুরু কোঁচকালো : 'কী খাবি?'

'তোর যা ইচ্ছে।'

'চপ?'

'আচ্ছা।'

দুটো করে চপের হুকুম দিয়ে মানিক বললে, 'বল্‌বি টুলু, এবার একটু দেশের কাজ টাজ করব ভাবছি।'

'কী করবি বললি?'—টুলু খাবি খেলো একটা।

'দেশের কাজ। পলিটিক্‌স্।'

'পলিটিক্‌স্!'—টুলু একটু হাঁ করে রইল : 'বাস জ্বালানো? সে তো ফাঁক পেলেই করছিস।'

'দূর—ও তো মজা। ও-সব নয়। ওরা আমায় বলছিল।'

'কারা?'

'আমাদের ও-তল্লাটে যারা ঝাণ্ডা-ফাণ্ডা নিয়ে বেড়ায়—জিন্দাবাদ আর রুবর দিন বলে চাঁচায়। ওদেরই জন-দুই আমাকে খুব বোঝাচ্ছিল—জানলি? বললে, কেন এসব করছ, এখন ইনকিলাব আসছে, তোমরা কী বলে দেশের যুব—যুব—যুব-শক্তি, কেন মস্তানি করে বেড়াও—সামিল হয়ে যাও। খারাপ কাজ-টাজ ছাড়ো, এসো আমাদের সঙ্গে।'

'তুই রাজী হয়ে গেলি?'

'দাঁড়া না।'—অসংখ্য দাগধরা ময়লা টেবিলটায় আঙুল বাজাতে বাজাতে মানিক বললে, 'অত সস্তায়? বললুম, কী দেবেন দাদারা, সেইটে আগে বলুন। ভোটের সময় ওদের হয়ে চিল্লিয়েছি, ভলেন্টারী করেছি, দিনে চার টাকা আর দু'বেলা মাংস-পরোটা দিত। সেই রেট দেবেন তো? বললে, ও-সব নয়, ওর চেয়ে বেশি দেব। গুণ্ডাবাজী ছাড়ো, ইনকিলাবের জন্যে জান লড়িয়ে দাও। সময় এসে গেছে—ইনকিলাব হয়ে যাক, সবাইকে কাজ দেব, খাবার দেব, ভালো হয়ে বাঁচবার পথ করে দেব।' —হঠাৎ মানিকের চোখের ওপরে ছায়া নামল : 'মাইরি, তোর কী মনে হয় রে? ভালো লাগে না শালা ওয়াগন ভাঙতে। চোরে চোরে ভাগ-বাঁটোয়ারা আছেই, কিন্তু বিশ্বেস তো নেই—কোন্‌দিন এক ব্যাটা আর-পি হয়তো দিলে ধাঁই করে রাইফেল চালিয়ে। সেদিন মাইরি কাঁকুড়গাছি ইয়ার্ডে আমার মামাতো ভাইয়ের কান ঘেঁষে গুলী বেরিয়ে গেল একটা। আচ্ছা, ওরা সত্যি কথা বলে সব বদলে দেবে? খাটব, খেতে পাব?'

টুলু বললে, 'জানি না।'

'তোকে বলছি ভাই, যদি একটা বাধা রেভগার থাকত না, ঠিক একটা বিয়ে-থা করে একটু অন্যরকম হয়ে যেতম। অবিশ্যি এক-আধটু চোলাই না হলে আমার চলবে না। বৌ তাতে রাগ করবে না—কী বলিস?'

'বোধ হয় করবে না—' টুলু ক্লান্ত-ভাবে হাসল। একটু অন্যরকম হয়ে যাওয়া! সে কথা তো সে নিজেও ভাবছে। তার না হয় দিদি আছে, মনীশদা আছে, দাদা আছে, মা-র চোখের জল আছে আর বাড়ির কথা ভেবে একটা লজ্জার জায়গাও আছে। কিন্তু মানিকের তো এসব বালাই নেই—সে-ও জীবনকে বদলাতে চায়?

ঘোর-লাগা চোখে অনামনস্কভাবে তাকিয়ে ছিল মানিক। টুলু আবার বললে, 'তুই স্বপ্ন দেখছিস মানিক?'

'মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে রে। দূর শালা, কী মানে হয় এভাবে বেঁচে থাকার? বাবা ব্যাটাচ্ছেলেই ঠিক বলত, আমি একটা শুয়োরের বাচ্চা হয়ে গেছি।'

'নিজের বাপকে গাল দিলি?'

'থাম, বকিস নি। ওরা সত্যি কথা বলে? আমরা ওদের সঙ্গে মিশে জান লড়িয়ে দিলে ইনকিলাব এসে যাবে?'

'আমি বলতে পারব না। আমার দাদাকে জিজ্ঞেস করিস। এসব নিয়ে ও মাথা ঘামায়।'

'তোর দাদাকে মাইরি আমার ভাল্লাগে না। এমন করে তাকায় যে, মনে হয় আমাকে নয়—একটা কাঁকড়া-বিছে দেখছে।'

খাবার এল। মানিক বললে, 'নে, খা।'

টুলু বিরক্তিটা ভুলতে লাগল আস্তে আস্তে। কোথায় যেন মানিকের সঙ্গে মনের সুর মিলতে শুরু হয়েছে তার। এক ভাবনা—একটা স্বপ্ন। মাইরি, কোথায় চলেছি আমরা, কী মানে হয় এর? এরকম না হয়ে জীবনটা আর কিছু হলে ভালো হয়, খুব ভালো হয়।

মানিক বললে, 'ভাবছিস কী, খা।'

দু'জনে খেতে শুরু করল। মানিক খুশি হয়ে বললে, 'বেশ করে এরা খাবার-গুলো। ঝাল-মাংসটা আরো বেড়ে হয়। চাটের সঙ্গে যা জমে!'

'তা জমুক।' —টুলু আবার আলো-চনাটার জের টানল : 'তা হলে তুই পলিটিক্‌স্ করবি ঠিক করেছিস?'

'ভাবছি।'

'কী করতে বলছে?'

'বলছিল, সোনারপুরের ওদিকে কোথায় গাঁয়ে যেতে।'

'কী করবি সেখানে গিয়ে?'

'ওরা বলছিল, বেনামদার জমি দখল করতে হবে। দিতে হবে চাষী ভাইদের।'

'তুইও জমির ভাগ পাবি নাকি?'

'ধ্যাৎ—আমি জমি দিয়ে কী করব? আমাদের সাতপুরুষে লাঙলে হাত দিয়েছে কখনো?'

'তা হলে তোর কী লাভ?'

'সকলের লাভ। ইনকিলাবের রাস্তা তৈরি হবে।' —মানিকের চোখ ঝকঝক করে উঠল : 'আরো মজা আছে রে। লেগে যেতে পারে।'

'কী?'

'দাঙ্গা। খুনোখুনিও হতে পারে।'

টুলু চমকালো। মুখ থেকে নামিয়ে ফেলল চামচেটা : 'খুনোখুনির মধ্যে যাচ্ছিস?'

'আরে এতো আর দুশমনী করে মানুষের পেটে চাকু চালানো নয়। এ হল দেশের কাজ। দুশো-পাঁচশো—দু'-দশ হাজার জান চলে না গেলে ইনকিলাব আসে?

টুলু চুপ করে রইল। অবশেষে বললে, 'তুই খুনোখুনির লোভে যাচ্ছিস না তো?'

'না রে—না। ওদের কথায় সেই থেকে কিরকম যেন লাগছে। ভাবছি—দেখিই না, অন্য কোনো রাস্তা আছে কিনা।'

'যাবি ঠিক করেছিস?'

মানিক বললে, 'দেখি।'

'আর ওয়াগন ভাঙা?'

'সে তো আছেই হাতের পাঁচ। কিন্তু ওদের কথাতেই চট করে কিছু করব না। ভাবতে হবে আর একটু—বুঝলি?'

কিছুই বলা যায় না—টুলু ভাবল। হয়তো সত্যিই সময় বদলাচ্ছে। কাল টুলু ভেবেছে, আজ মানিক ভাবছে। এর পরে ফণী, কার্তিক, প্রমোদ—সবাই ভাববে। আমাদের কাজ নেই, আমাদের পয়সা নেই, আমরা ভালো হতে পারি নি। আমরা যা-তা হয়ে গেছি। ঝকঝকে তকতকে কিছু দেখলে আমাদের পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে—কাদা ছিটোতে ইচ্ছে করে ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড়ে—ইচ্ছে হয় মেয়েদের গায়ে কালি ছড়িয়ে দিই। আমাদের কেউ পয়সা দেয় না বলে আমরা যেভাবে হোক পয়সা কামাই, কেড়ে-কুড়ে নিই; আমাদের কোনো আনন্দ নেই বলে আমাদের ফুর্তি বেপরোয়া। মাঝে মাঝে যখন কিছু ভালো লাগে না, কিছুই না—তখন তেতে উঠবার জন্যে মারামারি বাধিয়ে দিই—বোমা-পটকা ফাটিয়ে গুলজার করে তুলি। কিন্তু লাগিয়ে দাও আমাদের কাজে, দেখিয়ে দাও রাস্তা, করো পেট-খাওয়ার ব্যবস্থা—দেখি, আমরা অন্যরকম হতে পারি কি না।

হয়তো এইভাবেই মানিকও কিছু ভাবছিল। চা এসেছিল, তাতে চুমুক দিতে দিতে মানিকের আর একটা দরকারী জিনিস মনে পড়ল তখন।

'এই টুলু, একটা সত্যি কথা বলবি?'

'কী?'

'থানার দারোগার কাছে তুই কী বলেছিস?'

টুলুর মনে আশঙ্কার ছায়া পড়ল একটা।

'একথা কেন?'

'কারণ আছে। জবাব দে। থানার দারোগার কাছে তুই মুচলেকা দিয়ে এসেছিস, না?'

টুলু একবার ঠোঁট চাটল। নিজের কাপুরুষতার জন্যে লজ্জা হচ্ছিল তার। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কিছুই তো বলি নি। কেবল আর কখনো বাজে দলে থাকব না, কোনো হাঙ্গামা-হুজ্জুতের মধ্যে যাব না—এইটে লিখে সই করে দিয়েছি।'

'আর কিছু না?'

মানিকের চোখের দৃষ্টি, তার বলবার ভঙ্গিটা—শিরশির করে উঠল টুলুর বুকের ভেতর। 'কী বলতে চাস মানিক?'

'আর কী বলব?'

'তুই জানিস, ফণের লুকিয়ে-রাখা আট-দশটা বোম পুলিশ খুঁজে বের করেছে?'

'তার আমি কী করব?'

'কার্তিককে গো-বেড়েন দিয়ে কাল ছেড়ে দিয়েছে, কেস আছে ওর নামে। পরে তারিখ পড়বে। কে যেন জামিন দিয়েছে ওর। ফণেকে ছাড়বে না। বোমগুলোর জন্যে ওর জেল হবে বোধ হয়। আর ফণে কী বলেছে, জানিস? বোমের খবর পুলিশকে নিশ্চয় টুলু জানাই দিয়েছে। নইলে খোঁজ পাওয়ার তো কথা নয়।'

গলায় চা আটকে বিষম খাওয়ার জো হল টুলুর। মানিক তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে রইল তার দিকে।

'সত্যি কথা বল্। হাজত থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে নেমকহারামি করেছিস তুই?'

অবিশ্বাস আর ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে মানিকের চোখ থেকে। টুলু যেন ডুবে যাচ্ছিল।

'না, আমি বলি নি। কখনো না। বিশ্বাস কর তুই। আর আমি যদি বলেই দিতুম, তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ওগুলো বের করে আনত। পনেরো-ষোলো দিন দেরি হবে কেন?'

'তা ঠিক—' একটু কোমল হল মানিকের দৃষ্টি, আবার টকটক করে টেবিলের ওপর আঙুল বাজাতে লাগল সে: 'কিন্তু তোর ওপর যাতে কারুর সন্দো না হয়, সেই জন্যেই হয়তো ইচ্ছে করে দেরি করেছে ওরা!'

'না মাইরি, কখনো না' —টুলু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: 'আমি দল ছাড়তে পারি, কিন্তু হারামী করব? কী করে এসব বিশ্বাস করিস তুই?'

'আমার বিশ্বেস-অবিশ্বেসে কিছুই আসে-যায় না—' চিন্তিতভাবে মানিক বললে, 'কিন্তু ফণে শালাকে বোঝাতে পারলে হয়। কার্তিক উল্লুকটাও রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ফণের ছিনতাইয়ের দলে কেউ আবার তোকে আচমকা চাকু মেরে না বসে, তাই ভাবছি।'

আতঙ্কে শাদা হয়ে গেল টুলু: 'আমাকে চাকু মারবে?'

'দেখি, ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারি কি না। তবে দিনকয়েক একটু সাবধান হয়ে চলিস। আসলে এই কথাটা বলবার জন্যেই তোকে ডেকেছিলুম। দাঁড়া, আগে এদের বিল মিটিয়ে দিই, তারপর তোকে আমি সঙ্গে করে বাসে তুলে দেব। এই তল্লাটে এখন একা তোকে ছেড়ে দিতে আমার ভরসা হয় না। কিন্তু বার বার তিনবার। সত্যি বলছিস, হারামী করিস নি তুই?'

'না—না—না—'

জোর করে বলবার চেষ্টা করল টুলু, কিন্তু স্বর ফুটল না ভালো করে। সবটা যেন একরাশ দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে মিশে গেল।

ঠিক একই সময় চৌরঙ্গীর আর একটা চায়ের দোকানে নিঃশব্দে চুরুট খাচ্ছিল স্বরাজ। রাশি রাশি ধোঁয়ায় মুখটা তার একবার ফুটে উঠছে, আর একবার আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

প্রবীর বললে, 'এড়িয়ে যাচ্ছ কেন? এর একটা উপায় তো করতেই হবে।'

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে এতক্ষণে আবার কথা বলল স্বরাজ।

'কোনো উপায় নেই ভুলু। এখন এ-ই হবে। কালটাই এইরকম।'

[ক্রমশ]

প্রিন্স নরোদম সিহানুক স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর চোখের সামনে কতকগুলি জ্বলন্ত লেখা যেন চলমান পর্দার মত দাগ কেটে কেটে যাচ্ছে ক্ষমা নেই। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির পরম শান্তিনীড়ে যারা চরম অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে, নগরে বন্দরে গ্রামে প্রান্তরে নিভৃত সুখচ্ছায়ায় নিরালা বনভূমিতে খাণ্ডবদাহন সৃষ্টি করেছে, ধ্বংসের তাণ্ডবে ঘরে ঘরে কান্নার রোল তুলেছে, নিরবিরোধী অসহায় মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কিছুতেই তাদের ক্ষমা নেই।

শাণিত ইস্পাত ফলার উদ্যত সন্ত্রাসের মুখে যারা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে চাইছে, মুক্ত চিন্তাধারাকে খেয়ালের শেকলে আবদ্ধ করে, ছলে কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ করতে চাইছে, সুখ শান্তির নন্দনালয় ভেঙে আমাদের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার গহ্বরে ঠেলে দিতে চাইছে তাদের ক্ষমা করি কি করে?

কেন? কি অপরাধ করেছিলাম আমরা? কি চেয়েছিলাম আমরা? আমরা চেয়েছিলাম, সমুদ্র মেখলা এই উষ্ণভূমিতে প্রাণের উষ্ণ স্পর্শে সজীব হয়ে থাকতে। স্বাধীন ও সুখী জীবনযাপনের মধুর স্বাদ গ্রহণ করতে। ভালবাসতে ও ভালবাসার স্নিগ্ধ স্পর্শ পেতে।

চেয়েছিলাম প্রতিবেশী দেশের অচেনা ভাইবোনদের সঙ্গে নির্বিরোধে শান্তিতে পাশাপাশি অবস্থান করতে। বিশ্বের দরবারে আমাদের আবেদন ছিল সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রীর রাখী-বন্ধনের প্রতিশ্রুতি। নিরপেক্ষতা কি দোষ? কোন রাষ্ট্রের পক্ষ নিয়ে আমরা অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করি নি। কোন গোপন ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হই নি কারো বিরুদ্ধে। তবু কেন এই অভিশাপের খড়্গ নেমে এল আমাদের দেশের বুকে? কেন এই আত্মঘাতী ভ্রাতৃঘাতী রক্তহোলী খেলা শুরু হয়ে গেল দেশ জুড়ে?

দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা নিশ্চিন্তনায় ছিলাম তাই টের পাই নি। আমাদের অসতর্কতার সুযোগে শুরু হল এই অগ্নি-বর্ষী হুংকার।

হাসি পায়। ভেবেছে এরা শবের উপর খবরদারী করবে। মরা মিছিলের উপর চোখ রাঙিয়ে যাবে। অস্ত্রের ঝংকার তুলে শ্মশানের শান্তি আনবে দেশে। এরা আমাদের এত ভুল বুঝল কি করে? আমাদের কুসুমকোমল অন্তরই শুধু দেখেছে এরা। আমাদের ইস্পাত কঠিন সংকল্পের কোন পরিচয়ই কি পায় নি? এত নির্বোধ এরা? রাজার ছেলেকে টেনে এনেছি আমরা আমাদের মধ্যে। তাঁর মাথার সোনার মুকুট খুলে নিয়ে সেখানে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছি। রাজতন্ত্রের মসৃণ পুষ্পাস্তীর্ণ পথ নিশ্চিহ্ন করে তাঁকে দেশসেবার, জনসেবার অমসৃণ কণ্টকাকীর্ণ পথে টেনে এনেছি। এ পথে ভুলের মাশুল প্রচণ্ড। ইতিহাসের পাতা থেকে চিরতরে মুছে যাওয়া। কিন্তু সফলতার মূল্য অসীম। স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে জনগণের হৃদয়ে ঐ নাম খোদিত হবে। শ্রেষ্ঠ ভালবাসায় স্নিগ্ধ থাকবে অবিনশ্বর হয়ে।

চতুর্দিকের প্রমত্ত হানাহানি ও অগ্নি-লীলা থেকে আত্মরক্ষা করে আমরা নিজে-দের মঙ্গলসাধনে রত ছিলাম। আমাদের পতাকা ছিল শান্তি মৈত্রী ও নিরপেক্ষতার প্রতীক। দেশের এই চলমান মিছিলের উপর অতর্কিতে বজ্র হেনে আমাদের অগ্রগতিকে স্তব্ধ, ব্যাহত করে দেবার চেষ্টা চলেছে। আমাদের দেশকে গড়ে তোলার সংকল্প থেকে কেউ আমাদের বিরত করতে পারবে না। সামনে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। এই কঠিন পরীক্ষায় আমাদের কঠিন মূল্য দিয়েই উত্তীর্ণ হতে হবে।

আমরা পারব। অসীম আত্মবিশ্বাসে আমরা উদ্বুদ্ধ, দেশপ্রেম আমাদের রক্ষা-কবচ, স্বাধীনতা আমাদের বর্ম, জনগণের একতা আমাদের দুর্গ, কারো সাধ্য নেই এই ইস্পাতদৃঢ় দুর্গ ভেদ করে আমাদের বর্ম, আমাদের রক্ষাকবচ হরণ করার।

প্রিয় বন্ধু সিহানুক, নেতা নরোদম, তুমি যেখানেই থাক না কেন, জেনে নাও আমরা মরি নি। তোমার নিরপেক্ষ নেতৃত্বকে আমরা অস্বীকার করি নি। দেশকে সুখী সমৃদ্ধশালী করে তোলার প্রচেষ্টাকে বিসর্জন দিয়ে আমরা স্বাধী-নতার মূলমন্ত্র ভুলি নি। কম্বোডিয়ার শান্তি ও মৈত্রীর পতাকাকে আমরা ধুলোয় অবলুণ্ঠিত হতে দেব না। আমরা অজেয়। কম্বোডিয়ার জীবনে এই প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা নয়। ফরাসী উপনিবেশ-বাদীরা আমাদের সংকল্পের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে দীর্ঘ আশী বছর ধরে। নতুন অভিযাত্রীরা টের পাবে কি জ্বলন্ত অঙ্গারে তারা হাত দিয়েছে। এ আগুনে শুধু হাতই পুড়বে না, তাদের সমস্ত দুরাশার লালসা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ভাই সিহানুক, তুমি আমাদের মধ্যে ফিরে এস। আমাদের অন্তরে তোমার আসন এখনো পাতা। তোমার আগমনে আমরা বলীয়ান হব। বাহুতে শক্তি পাব।

কম্বোডিয়ার ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক ভোরের শুভ স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠলেন বিদেশের প্রবাসে। এ স্বপ্ন কি সত্যি? এ দেশবাসীর প্রাণের কথা? একটা পরম পুলকে, আশায়, আনন্দে তাঁর অন্তর ভরে উঠল। কম্বোডিয়া মৃত মানুষের দেশ নয়। তাঁর স্বপ্নের কম্বোডিয়া ন্যায়নীতির পূত আদর্শে দীপ্ত, মহীয়ান। নরোদম সিহানুক শ্রদ্ধায়, গভীর ভালবাসায় মনে মনে কম্বোডিয়ার মহান জনগণের উদ্দেশে মাথা নো-

কম্বোডিয়া অমর। [illegible], [illegible] কম্বোডিয়া।

খুব বেশিদিনের কথা নয়। মাত্র বছর ষোল আগে আজকের এই নতুন কম্বোডিয়ার জন্ম। উপনিবেশের নাগপাশ ছিন্ন এক স্বাধীন রাষ্ট্র। উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের মার্চ মাসে জেনিভায় রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্মেলনে তদানীন্তন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী লানিয়েল বিদো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সমবেত প্রতিনিধিদের অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, ইন্দোচীন একটিমাত্র দেশ নয়। ভিয়েৎনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া এই তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক রাষ্ট্রের সমন্বয়।

লাওস ও কম্বোডিয়ায় ফরাসী শাসনে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান। ভিয়েৎনামের কম্যুনিস্ট ভিয়েৎমিনরাই শুধু ফরাসীদের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে। নানা অশান্তি সৃষ্টি করছে। ফরাসী সেনাবাহিনী এই ভিয়েৎমিন গেরিলা বাহিনীকে শীঘ্রই উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করছে। এই চোরাগোপ্তা গেরিলা যোদ্ধারা যাতে লাওস ও কম্বোডিয়ায় এসে ঝামেলা সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকেও ফরাসী বাহিনী তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। এদের দমন করার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তিনি।

এদিকে সম্মেলন শেষ হবার মাসখানেক পরেই এপ্রিল মাসে ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছল। ফরাসী সেনার নাভিশ্বাস উঠেছে। ভিয়েৎনামের রক্ত লাল মাটি ও খরস্রোতা নদীর জল ফরাসী ও ভিয়েৎনামীদের রক্তে রক্তিম হয়ে উঠল। লাওস ও কম্বোডিয়ার ফরাসী সেনার ঘাঁটিগুলিতে অবিরাম গেরিলা আক্রমণ চলতে লাগল। ফরাসী সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ প্রকাশিত হয়ে উঠল, বিদেশ-বিভূঁয়ে এই মরণ ফাঁদের বেড়াজালে আটকে পড়ে। ফরাসীদের শেষ আশা, ইন্দোচীনের অজেয় দুর্গ দিয়েন বিয়েন ফু ভিয়েৎমিন বাহিনীর শৌর্য, কৌশলে অবরুদ্ধ। মঁসিয়ে বিদোর আশ্বাস বৃথা প্রমাণিত হল।

ফরাসী দেশে জনমতে আলোড়ন দেখা দিল, প্রধানমন্ত্রী বিদো অশান্ত। পরাজয়ের সম্ভাবনায় ভীত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রধান সেনাপতি নাভারে চঞ্চল, [illegible]। দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করার উপর নির্ভর করছে ফরাসী জাতির সম্মান রক্ষা। স্থলে, আকাশে সর্বপ্রকার সামরিক কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ করেও ফরাসী সেনাবাহিনী ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। সর্বাধুনিক রণাস্ত্র নিয়েও তিনি অসম সাহসী ভিয়েৎমিন সেনাধ্যক্ষ ভন গিয়াপের কৌশলী সাঁড়াশি আক্রমণ রুখতে পারছেন না। ফরাসী বাহিনীর মনোবল ভেঙে চুরমার। [illegible] সুশিক্ষিত ফরাসী বাহিনী এই অভিনব রণকৌশলের কাছে হার স্বীকার করছে। বিপর্যস্ত হয়ে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

গায়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তকমা আঁটা। অসুবিধা হল না। এগিয়ে এল আমেরিকা। ফরাসী সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য সর্বপ্রকার রণসম্ভার ও সর্বাধুনিক রণবিদ্যায় দক্ষ সেনাধ্যক্ষদের পাঠাল কম্বোডিয়া ও লাওসের ঘাঁটিগুলিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে রণকৌশলে অভিজ্ঞ আমেরিকার বাঘা বাঘা সেনাপতিরা এল লাওস ও কম্বোডিয়ায় ফরাসী ঘাঁটিগুলিতে। বৈদ্যুতিক কাঁটাতারে ঘেরা, আর বন্দুক, সঙিনধারী সান্ত্রীর পাহারার আড়ালে আরাম তাঁবুতে বসে রণকৌশলের ছক কাটল দিনের পর দিন। আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের শলা-পরামর্শ চলল রঙিন পানীয়ের মৌতাতে।

হা হতোস্মি! সবই বিফল। আজকের সুপরিকল্পিত রণকৌশল কাল বাসি হয়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে ভিয়েৎমিনদের পাল্টা কৌশলের কাছে। ফরাসী সেনাবাহিনী হৃতবল, চরম আতঙ্কগ্রস্ত। তারা দিনে-রাতে, স্বপ্নে, জাগরণে ভিয়েৎমিনদের ভূত দেখতে আরম্ভ করেছে। এই বুঝি অলক্ষ্যে ঘাড়ে এসে চাপল। এক্ষুণি ঘাড় মটকে রক্ত চুষে নেবে। অনেকটা মৃগী রোগগ্রস্তের মত অবস্থা তাদের। আহার-নিদ্রা একপ্রকার বন্ধপ্রায়।

আট-নয় বছর ধরে তারা প্রাণপণে লড়েছে এই পোড়া মাটির দেশে। নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ ইন্দোচীনবাসীকে হত্যা করেছে পৈশাচিক তান্ডবে। এই কয় বছরে তারা যত মানুষ খুন করেছে, তাদের রক্ত একত্র করলে এক নদী রক্ত হত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এই কয় বছরে ইন্দোচীনের মাটিতে ফরাসীদের 'সাদা-রক্ত'ও কম পড়ে নি। প্রচুর, প্রচুর। প্রথমে ছিল ফরাসীদের একতরফা মারের পালা। এখন চলছে তাদের পাল্টা মার খাওয়ার পালা। ফলে তারা আতঙ্কিত, বিচলিত। ঘরের ছেলে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরার জন্য ব্যগ্র।

এদিকে ফরাসী জনমতের সরব ধাক্কা মঁসিয়ে বিদো মন্ত্রিসভাকে ভাঙনের প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তিনি শেষ নিশ্বাস টেনে ফরাসী প্রতিনিধি সভায় ঘোষণা করলেন—'লাওস ও কম্বোডিয়ার আমাদের ভাবনার কিছুই নেই। ওখানে আমাদের ঘাঁটি বেশ পাকাপোক্ত। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সায়গনেও আমাদের সামরিক ব্যবস্থা ভাল। শুধু উত্তর ভিয়েৎনামে ভিয়েৎমিনরা আমাদের যা একটু বেগ দিচ্ছে। আমরা শীঘ্রই সেখানে সুদক্ষ সেনাপতি ডি ল্যাটারকে পাঠাচ্ছি ভিয়েৎনাম গণবাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য। ফরাসী যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল [illegible]-এর সরজমিনে তদন্তের রিপোর্টও প্রধানমন্ত্রীর উক্তিকে সমর্থন করল। দিয়েন বিয়েন ফু শীঘ্রই অবরোধমুক্ত হবে। [illegible]।

পেন্টাগনের মুখ্য কর্তারা ও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ভাবছিলেন অন্য কথা। আজ হোক, কাল হোক, ফরাসীদের এ অঞ্চল ত্যাগ অনিবার্য। ফরাসী সূর্য পশ্চিমে হেলতে শুরু করেছে। ফরাসীরা মুখে যাই বলুক না কেন, ভিয়েৎমিনদের প্রতিরোধের স্ফুলিঙ্গ আজ দাবানলের আকার নিচ্ছে।

আত্ম-অহমিকার মোহ ত্যাগ করতে পারছে না তারা। তাই ইতিহাসের অক্ষরগুলো তাদের কাছে অস্পষ্ট ঠেকছে। নেপোলিয়নের উত্তরপুরুষের আজ সেই শার্দুল-তেজ নেই। ভড়ং দেখিয়ে কার্যোদ্ধার হয় না। লোল মাংসপেশী নিয়ে অভিনয় চলে, দৃঢ়পেশী প্রতিযোগিতা অচল। তাই সামরিক দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চল থেকে চলে তাদের যেতেই হবে। তারপর......তারপর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি সামরিক দিক থেকে মহাগুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, সেখানে কোন্ নতুন অতিথির শুভাগমন ঘটবে? নিশ্চয়ই রাশিয়া, না হয় চীন। হয়ত উভয়ে এসে এ-শূন্যতা পূরণ করবে। রাশিয়া ও চীন, চীন ও রাশিয়া এই দুটি শব্দ পেন্টাগন প্রভুদের চিন্তায় ঝড়ের আলোড়ন সৃষ্টি করল। বাড়িয়ে দিল দুঃস্বপ্নের মাত্রা। বড়কর্তা ডালেস সাহেবের হিসাব জ্যামিতির ফরমুলায় বাঁধা। নড়চড় হবার উপায় নেই। অসম্ভব.. অসম্ভব। কিছুতেই এই দুটি দেশের কাউকে এ অঞ্চলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। যে-কোন মূল্যে এটা রোধ করতেই হবে। তাই আগেভাগেই তারা বেরিয়ে পড়ল। রাষ্ট্রসংঘে সুহৃদ ফরাসী-দের এই বিপদে সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না। তাছাড়া বিলম্ব করাও ঠিক নয়। তাই আমেরিকা কোন মতামতের পরোয়া না করে ঘাঁটি গাড়ল ইন্দোচীনের মাটিতে এসে। অবশ্য পেন্টাগনের অঙ্কের ধারাপাতে আরেকটি গণিতের ফরমুলা ছিল। তারা ভেবেছিল কোরিয়ার মত এখানেও অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রকে সাথী হিসাবে পাবে। শত্রুপক্ষের তোপের মুখে পাঠাবার

অনেক খড়কুটো জুটবে। পাশার দান এখনো হাতের মুঠোয়। একবার গাড়িয়ে দেওয়া যাক, তারপর রাষ্ট্রসংঘের ঘাড়ে ছুঁইয়ে দেওয়া যাবে সুযোগমত। সেই পুরনো কৌশল। সাপ ধরতে এসে সতীন-পোকে সামনে এগিয়ে দেওয়ার নীতি। কিন্তু তারা ভাবতে পারে নি, সালটা উনিশ শ' একান্ন নয়, উনিশ শ' চুয়ান্ন সাল। সেদিনের নবজাতক আজ হাঁটতে, দৌড়তে শিখেছে। কোরিয়ায় সে-দিন বহু হঠকারী হাত পুড়িয়েছে। সেই পোড়া-ঘা এখনো শুকোয় নি। সেই ক্ষতের জ্বালায় এখনো তারা অস্থির। বার বার, আবার? এখন সবাই সিঁদুরে মেঘ দেখে আঁতকে উঠছে। এতোটুকু ছোট্ট একখণ্ড ভূমি। নিশ্চয় এতগুলো বাঘা বাঘা রাষ্ট্রকে কি না জানি চোবানিই না খাইয়েছে। তাই আমেরিকার প্রস্তাবে এবার সাড়া মিলল না কোথাও। তুমি যাচ্ছ যাও, আমাদের আবার সঙ্গে টানা কেন?

পরোয়া নেই। আমেরিকা ভীত নয়। এখন থেকে সে একা চলার নীতিই নেবে। সাম্যবাদের প্রসার রোধ করতেই হবে এ অঞ্চলে।

এদিকে পেন্টাগনের প্রস্তাবে বৃটিশরা প্রমাদ গুণতে সুরু করল। দোরগোড়ায় সমূহ বিপদ। থাইল্যাণ্ডে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এখনো অক্ষুণ্ণ। সাধের মালয়েশিয়া ও হংকং, সর্বোপরি সিঙ্গাপুর-এর চিন্তায় তার শিরঃপীড়া শুরু হয়েছে। পেন্টাগন ধীরে ধীরে এখানে থাবা প্রসারিত করবে না, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? বৃটিশ কেশরী এখন কেশরের ভারেই অনড়। পেন্টাগনের আগ্রাসী মনের খবর জানতে তার বাকী নেই। পেন্টাগন বিশ্বজয়ের রথ ছুটিয়েছে। চাকায় মোড়া ডলার আর অস্ত্রশস্ত্রের ঝুমঝুমি বাজছে ঝন্‌ঝন্‌।

নানা হিসাবের মধ্যে পেন্টাগনের এই হিসাবও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল না। তারা ভেবেছিল ইন্দোচীনে আধুনিক অস্ত্রের জোয়ার এনে তুড়ি মেরে সব উড়িয়ে দেবে। গুটিকয় ভিয়েৎমিন যোদ্ধাকে ঠাণ্ডা করা এমন আর কি কঠিন কাজ। অস্ত্রের শক্তির উপর তারা চিরদিন নির্ভর করে এসেছে। তাই অস্ত্রের ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করে ভিয়েৎনাম তথা ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানের কথাই তাদের চিন্তায় প্রবল।

পেন্টাগনের নবীন কর্মকর্তারা জনতার রুদ্ররোষের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে নি। মানুষের অন্তরে বিক্ষোভের রুদ্রবহ্নি সৃষ্টি হলে তার বহিঃপ্রকাশ যে কত শক্তিশালী, কত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, সে পরিচয় তাদের কাছে অজ্ঞাত। জন-রোষের সেই বিস্যুভিয়াসের কাছে বিশ্বের তাবৎ মারণাস্ত্রের শক্তি নিষ্প্রভ। ক্ষমতা-লিপ্সু চিন্তা-বিলাসী এই অস্ত্রনায়করা জানে না, জনতার সেই প্রতিরোধ-ক্ষমতার উৎস। তারা কখনো দেখে নি জন-যুদ্ধের রূপ ও ভয়াবহতা।

ফলে যা অবশ্যম্ভাবী, তাই ঘটতে লাগল। আমেরিকার সমরশক্তি, রণকৌশল, ফরাসী সেনার শৌর্য সবই ব্যর্থ, পর্যুদস্ত হতে লাগল ভিয়েৎমিনদের জনযুদ্ধের রণনীতির হাতে। ভিয়েৎমিন বাহিনীর অগ্রগতি সমানে অপ্রতিরোধ্য রইল। ভিয়েৎনামের রণাঙ্গনে ফরাসী বাহিনীর ঘাঁটি বলতে বিশেষ কিছুই রইল না। হ্যানয়ের মূল ফরাসী ঘাঁটি ও সরবরাহ কেন্দ্র পরিত্যক্ত হল। অপরাজেয় ফরাসী দুর্গ দিয়েন বিয়েন ফু কার্যত অবরুদ্ধ। সেনাপতি নাভারে কম্বোডিয়া ও লাওসের শিবিরসমূহ থেকে উড়ো জাহাজে সৈন্য, রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ করতে লাগল অবরুদ্ধ ফরাসী দুর্গে। এই দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গের সঙ্গে জড়িত ফরাসী সেনাদের বিশ্রুত বীরত্বকাহিনী, ফরাসী জাতির সম্মান, ইন্দোচীনে ফরাসী উপনিবেশের ভবিষ্যৎ। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ঔপনিবেশিক শক্তির মান-মর্যাদা হ্যানয়ের প্রধান শিবির হাতছাড়া হয়ে যাবার পর ফরাসীদের স্থলপথে ও জলপথে সৈন্য ও রসদ পাঠাবার ব্যবস্থা আগেই বানচাল হয়ে গিয়েছিল। এর পর উত্তর ভিয়েৎনামে কোন ফরাসী ঘাঁটি না থাকার ফলে তাদের শাসন ব্যবস্থাও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উত্তর ভিয়েৎনাম ফলত মুক্ত স্বাধীন অঞ্চলরূপেই পরিগণিত হল।

নিরুপায় ফরাসীরা অতঃপর বলতে শুরু করল যে, এটা একটা ভীষণ নোংরা লড়াই। এ যুদ্ধ চালিয়ে ফরাসীদের কোন উপকারই সাধিত হবে না। মিছে শক্তি ক্ষয়, অর্থব্যয়, যতশীঘ্র সম্ভব এ যুদ্ধ শেষ করা উচিত। উত্তর ভিয়েৎনামে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। ভিয়েৎমিনরা যাতে কম্বোডিয়া ও লাওসে এসে কোন বিঘ্ন, কোন অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে, সেটা দেখাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

এত করেও কিছুতেই শেষরক্ষা করা গেল না। এত তোড়জোড়, নাভারের মাস্টার প্ল্যান, পেন্টাগনের কূটকৌশল, সবই বিফল হল। দুশ' বছরের পুরনো শিলাপুরী ফরাসী বাহিনীর দুর্জয় শক্তির প্রতীক, ইন্দোচীনে ফরাসী শক্তির গর্ব, গৌরব, পাহাড়-অরণ্যবেষ্টিত অজেয় ঘাঁটি দিয়েন বিয়েন ফু'র পতন হল। অসম সাহসী মরণজয়ী ভিয়েৎমিন বাহিনী অসাধারণ রণকুশলী সেনাপতি ভন গিয়াপের নেতৃত্বে যেন ফুঁ দিয়ে দিয়েন বিয়েন ফু'র রক্ষাব্যবস্থা বানচাল করে দিল। পৃথিবীর সর্বকালের সংগ্রামের ইতিহাসে দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গ দখলের ঘটনা ও ভন গিয়াপের নেতৃত্বে ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট বাহিনীর শৌর্য-বীর্যের কাহিনী এক অপূর্ব মহিমায় চিহ্নিত হয়ে রইল। সর্বপ্রকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত, রণবিদ্যায় পারদর্শী ও সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যূহের অভ্যন্তরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের হীনবল অস্ত্র নিয়ে এই প্রতিরোধ সংগ্রামের, সর্বোপরি জন-যুদ্ধের এক মহান্ বিজয়ের স্বাক্ষর হয়ে রইল দিয়েন বিয়েন ফু'র পতন। এই দুর্গ পতনে ইন্দোচীনের মাটিতে দীর্ঘ আট-নয় বছরের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হল। প্রমাণিত হল সবার উপরে মানুষ সত্য। মানুষই হল শ্রেষ্ঠ শক্তি। দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গ পতনের পর ইন্দোচীনে ফরাসীদের শেষ আশা, শেষ দীপশিখা নিভে গেল। ভিয়েৎনামের উত্তরাংশে ফরাসী শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেল। ঔপনিবেশিক শোষণ, নিপীড়নের শেষ অন্ধকার রেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে দেখা দিল স্বাধীনতার নব অরুণালোক। ভিয়েৎনামবাসীর হতাশাচ্ছন্ন জীবনে এক মহান্ আলোদিশারী, আলোতাপস হো চি মিনের নেতৃত্বে জন্ম নিল নতুন রাষ্ট্র।

এদিকে উল্কা পতন ঘটল ফরাসী দেশে। সঙ্গে সঙ্গে পতন ঘটল পরাক্রান্ত দানিয়েল বিদো মন্ত্রিসভার। কিন্তু তিনি আগেই টের পেয়েছিলেন এই বুদ্ধির মাটির কেল্লা রাখা যাবে না, তাই জেনিভা সম্মেলনে আগেই মরণ কামড় দিয়ে রেখেছিলেন। ইন্দোচীন একটিমাত্র রাষ্ট্র নয়, ভিয়েৎনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া তিনটি পৃথক রাষ্ট্রের সমন্বয়। সুতরাং ইন্দোচীন সম্পর্কে যে-কোন আলোচনায় এই তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির উপস্থিতি প্রয়োজন।

অবশেষে ফরাসীরা ইন্দোচীনে বহু ঘোষিত 'নোংরা লড়াই' অবসানের সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্যতামূলকভাবে রাজী হল, কিন্তু চিরদিনের জন্য সমগ্র ইন্দোচীন ছেড়ে চলে যাবে—ফরাসীরা অত নির্বোধ নয়। ইন্দোচীন ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীন একখণ্ড ভূমি নয় শুধুমাত্র। এক রসবতী কামধেনু। এই কামধেনু দু'শ' বছর ধরে নির্বিকল্পভাবে আপন দেহের রস জুগিয়ে ফরাসী সাম্রাজ্যের পুষ্টিসাধন করেছে। ইন্দোচীনের কৃষিজ, বনজ, খনিজ সম্পদ ফরাসী দেশের রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। এই স্বর্ণখনি এমনিতে ছাড়া যায়?

[ক্রমশঃ]

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ খোরানা আবার পৃথিবীর সকল সংবাদপত্রের শিরোনাম। তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বৈজ্ঞানিক সাধারণ জৈব রাসায়নিক সংযোগে কৃত্রিম উপায়ে 'জীন' তৈরি করেছেন। মানুষ কি তবে কৃত্রিম জীবন সৃষ্টির চাবিকাঠি নিজের হাতেব মুঠোয় পতে চলেছে? জীববিজ্ঞানে চমক জাগানো বরাট বিপ্লব কি তবে সমাগত?

ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে আবার কি নোবেল পুরস্কার পাবেন?

ডঃ খোরানার এই দলে দু'জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকও আছেন। তাঁদের নাম ডঃ অশোককুমার ও মিঃ নব গুপ্ত।

ডঃ খোরানার মত এমন প্রতিভাধর অথচ বিনয়ী, নম্র, নিরহংকারী বৈজ্ঞানিক খুব কমই দেখা যায়। তিনি কি শুধু বৈজ্ঞানিক? তাঁর মানবতাবাদও কি আমাদের সমান অভিভূত করে না? প্রেসিডেন্ট নিক্সন কম্বোডিয়ায় যে দস্যুতা চালিয়েছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা তাঁদের অন্যতম। ভারতের ছেলে হয়েও আজ তিনি বিদেশী। তবে, আমেরিকার নাগরিক হলেও নোবেল পুরস্কার পাবার পর তিনি জন্মভূমি পরিদর্শন করে গেছেন। আবার তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন এদেশের বিজ্ঞানীকুলকে উদ্বুদ্ধ করতে। তাঁর ক্ষেত্রে কেউ 'ব্রেনড্রেন' কথাটা বলতে বা তুলতে সাহস করে নি। কারণ, এদেশে থাকলে ঘটত এ 'ব্রেন'-এর অপমৃত্যু। হতো আর একটি প্রতিভার বৃথা অপচয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস হতো বিলম্বিত। সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগের অবকাশ ভারতবর্ষে খুব কম বিজ্ঞানীই পেয়ে থাকেন। পশ্চাদ্‌পদ দেশে বিজ্ঞান অনুশীলনের উপর জাতীয় অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভরশীল। অথচ বিজ্ঞান সাধনা ঠাট ছাড়া, ভড়ং ছাড়া কেউ ভাবেন বলেও মনে হয় না। একটা অসহনীয় যাঁতাকলে পড়ে অনেক প্রতিভাই অকালে ঝরে পড়ছে। অদ্ভুত ধরনের শোষণের এ আর একটা দিক, আর একটা পরিণতি।

ডঃ খোরানার জন্ম রায়পুরে ১৯২২ সালে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন ১৯৪৩ সালে। ১৯৪৫ সালে এম-এসসি পাশ করেন রসায়নে। এরপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৪৮ সনে ইংলণ্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৪৮-৪৯ সনে জুরিখ-এ ভারত গভর্নমেন্টের পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসাবে সেখানকার ফেডারাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে কাজ করেছেন। ১৯৫০—৫২তে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলেকজাণ্ডার টড-এর সঙ্গে কাজ করেছেন। আমেরিকার নাগরিক হন ১৯৬৬ সালে। এখন তিনি ম্যাডিসন-এ উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলভেজহ্যাম প্রফেসর অব লাইফ সায়েন্সেস ও ঐ ইনস্টিটিউটের এনজাইম গবেষণার সহ-অধিকর্তা।

সেই কোন্ আদি যুগ থেকে মানুষ ভাবছে, জীবন কী? জীবন কোথায়? জীবন বাইরে থেকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে পারা যায় কি-না। এ বিষয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের অবদানও কম নয়। জগদীশচন্দ্র বসু একটি মৌলধারা সংযোজন করেছেন, গাছেরও জীবন আছে। জগদানন্দ রায়ের 'অব্যক্ত জীবন' প্রবন্ধের কথাও মনে পড়ে। তিনি ধাপে ধাপে চুলচেরা বিচার করে দেখিয়েছেন, জীবন মানে শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস নয়, জীবন মানে শুধু তাপ নয়, জীবন দেহের কোন বিশেষ অংশে নেই, জীবদেহের অগণিত ছোট ছোট কোষে কোষে তা ছড়িয়ে।

এদেশের সাধকরা বলেছেন, জড়েরও জীবন আছে। আজ কি তাঁদের ভাবনারই জয় হতে চলেছে? মানুষ কতকগুলো রাসায়নিক জিনিসের সংযোগেই কি আগামী কালে জীবন তৈরি করবে?

জীবন রহস্যের যবনিকা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হলে জানতে হবে কোষকে। কোটি কোটি কোষ নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের দেহ। এরা সাধারণত মিলে-মিশে জোট বেঁধে সমতালে কাজ করে। সাধারণভাবে প্রতিটি কোষেরই দায়িত্ব দুটি—একটি নিজের ভরণপোষণ—খাওয়া ও দূষিত জিনিস বের করে দেওয়া; আরেকটি হল একে অপরকে দেখা।

এই কোষ খালি চোখে দেখা দুরূহ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বহুগুণ বড় করে দেখলেও এর ভেতর যেসব কাজ-কারবার চলছে, সব ভাল করে দেখা বা বোঝা যায় না। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ-এ একটি কোষকে বহু বহু গুণ বড় দেখায়—তার ভেতরের অনেক কিছুই খুঁটিয়ে দেখা যায়।

কোষের তিনটি আসল অংশ :

(১) নিউক্লিয়াস। এটি কোষের কেন্দ্র-মণি, কোষ-এর চালক বা নিয়ন্তা, সেই নিয়ন্ত্রণ করে কোষের গঠন, যাতে করে
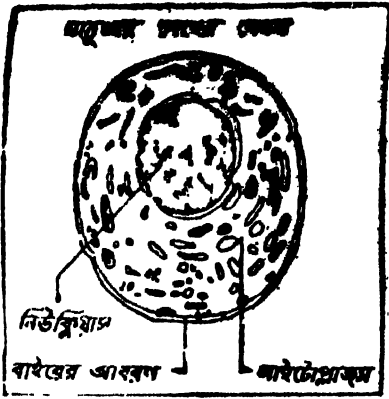
জীনগুলি জীবনের বর্ণমালার এক-একটি রাসায়নিক বর্ণ, যারা তৈরি করেছে একটি মুদ্রণালয়। সেই মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত হয়ে আসছে মানুষ বা মনুষ্যেতর অপরাপর সকল ধরনের জীবন।

ডঃ খোরানা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট টিউবে সেই ধরনের জীন তৈরি করেছেন। তাঁর দল যেসব রাসায়নিক সংযোগে যে কৃত্রিম জীন তৈরি করেছেন, তা ইস্ট-এর (Yeast) কোষের জীন-এর অনুরূপ।

নতুন জীবন গঠনে মা ও বাবার কাছ থেকে সমান সমান জীন পায় শিশু। তাঁদের গুণাগুণের সমাবেশ হতে পারে
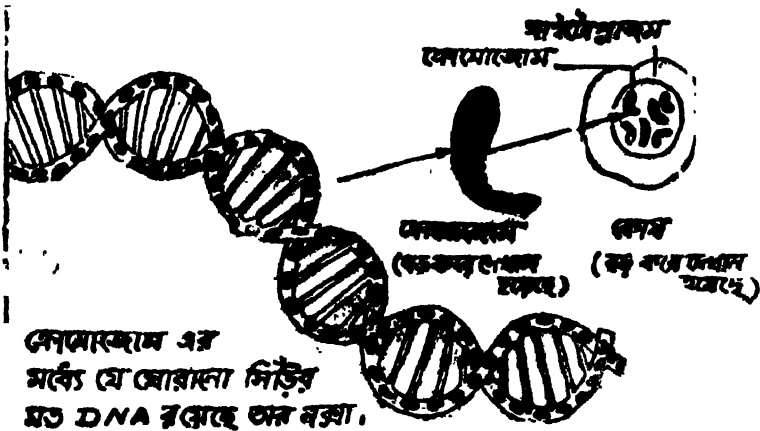
এক-একটি কোষ অবিকল নিজের মতো কোষের জন্ম দেয়, যেমন যকৃৎ-এর কোষ থেকে হয় যকৃৎকোষ, ফুসফুসের কোষ থেকে হয় ফুসফুসের কোষ।

(২) সাইটোপ্লাজম বা জেলীর মত একরকম জিনিস—যার উপর ভাসছে নিউক্লিয়াস। সাইটোপ্লাজম-এর কাজ হলো কোষের শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা, কোষ যাতে বেড়ে ওঠে তা দেখা, দূষিত জিনিস বের করে দেওয়া।

(৩) কোষের চারিধার ঘিরে তার বাইরের আবরণ, যেটা ছাঁকনি হিসাবে কাজ করে, যার মধ্যে দিয়ে কোষ পুষ্টিকর উপাদান আহরণ করে ও দূষিত জিনিস বের করে দেয়।

মানুষের প্রতিটি কোষ-এর নিউক্লিয়াস-এ আছে ৪৬টি করে ক্রোমোজোম (শুক্রকোষে বা ডিম্বাণুতে থাকে অর্ধেক, যখন তারা মিলিত হয়, তখন আবার ৪৬টা হয়ে যায়)। প্রতিটি ক্রোমোজোম-এ থাকে জীন। মানুষের একটি কোষের ৪৬টি ক্রোমোজোম-এ আছে দেড় লাখ জীন।

জীন বংশগতির এক একটি একক এবং সকল জীবন প্রক্রিয়ার নিয়ামক। তাই শিশুতে। জীনগুলি বংশপরম্পরায় এইভাবে বাহিত হয়ে আসছে এই পৃথিবীতে মানুষ আসার পর থেকেই। কাজে কাজেই আমাদের প্রতিটি কোষেই আছে সেই প্রথম আদিম মানুষের কাছ থেকে পাওয়া কিছু না কিছু অংশবিশেষ। একথা বললে ভুল হবে না যে, আমাদের ক্রোমোজোম-এ রয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, বংশপরম্পরায় তাঁরা প্রভাবিত করছেন আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ-এর রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ।

এই জীন কী? দৈব রাসায়নিক জিনিস—বৈজ্ঞানিকরা নাম দিয়েছেন DNA (*Deoxyribonucleic acid*)। মানুষ, জন্তু, উদ্ভিদ, বীজাণু সকলের কোষেই রয়েছে DNA. DNA ক্রোমোজোমের মধ্যে থেকে কোষকে পরিচালনা করে, তার সবরকম কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। DNA কখনই নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে আসে না। সে যে আদেশ করবে, কোষকে তাই পালন করতে হবে, যে পথে চালাবে, সেই পথেই কোষকে চলতে হবে। DNA-ই জীবন।

আমার কোষের ক্রোমোজোম-এ যে হাজার হাজার *DNA*, তারাই রচনা করে আমার জীবনের দিনলিপি—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান। আমার DNA-ই আমার জীবন-সংহিতা বা কোড। জীবনের সব বিধি-বিধান আমার জন্মক্ষণ থেকে নিহিত আমার DNA-তে। আমার কোষের DNA আগে থেকেই ঠিক করা রুটিন অনুযায়ী গড়বে আমার হৃদয়; গড়বে ফুসফুস, যকৃৎ; তৈরি হবে আমার ১১ পাইন্ট রক্ত, ২৫ ফুট অন্ত্র; ঠিক করে রেখে দিয়েছে সে আমার আয়ু, আমার গতিবিধি, আমার প্রতিভা।

শুধু আমারই বা কেন! কালো বা সাদা, কুৎসিত বা সুন্দর, বোকা বা বুদ্ধিমান, প্রতিটি ব্যক্তিই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যে গুণাবলী সংগ্রহ করে, তা' নির্ভর করে জটিল সেই রাসায়নিক বিধির উপরেই, যাকে বলছি জেনেটিক কোড বা জন্মসংহিতা।

DNA এমন দাবি করতে পারে, তার সে অধিকার আছে। সে অসাধারণ স্মৃতিধর। কত দিকে কত তার কাজ, কত তার ভাবনা! আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। মানুষের দেহে DNAকে কম করে সাত লক্ষ কাজ করতে হয়। কালিকলমে *DNA*-র বিধি-বিধান লিখে রাখতে গেলে দরকার হবে ১000 খানা এনসাইক্লোপিডিয়া।

অথচ অবাক হতে হয়, এখন দেখা যায়, DNA-র রাসায়নিক গঠন খুবই সাধারণ, তৈরি যেন দুটো ফিতে পেঁচিয়ে জড়িয়ে, নিয়মিত দূরত্ব বজায় রেখে ফিতের দুদিক যোগ করছে কতকগুলো সরু সুতোর মতো জিনিস। দেখতে যেন অনেকটা ঘোরানো সিঁড়ির মতো। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ জন কেনড্রু বলেন যে, মানুষের একটি কোষ-এর নিউক্লিয়াসের সব DNA-র ফিতেগুলো যদি ছাড়িয়ে সোজা ছড়ানো যায়, তাহলে সেটা মাপলে হবে ৩ থেকে ৪ ফুট। মাইক্রোসকোপ দিয়েও যে কোষকে দেখা যায় না, তার ভেতরে কী অসাধারণ নিখুঁত সূক্ষ্ম কারুলিপি!

গোটা জিনিসটা আর একটু তলিয়ে বোঝা দরকার। জেনেটিক কোড বা জন্মসংহিতা বা উৎপত্তিসূত্রের প্রকৃতি ও রহস্য নির্ণয়ে তিনজন বৈজ্ঞানিক তাঁদের অবদানের জন্যে ১৯৬৮ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। এঁরা হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সলক ইনস্টিটিউটের ডঃ রবার্ট ডবলু হোলী, ম্যাডিসন-এর উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা এবং মেরিল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল হার্ট ইনস্টিটিউটের ডঃ মার্শাল ডবলু নীরেনবার্গ।

ক্রোমোজোম-এ DNA বিভাজিত হতে পারে। আগেই বলেছি, *DNA* নিউক্লিয়াসের বাইরে বেরিয়ে আসে না।
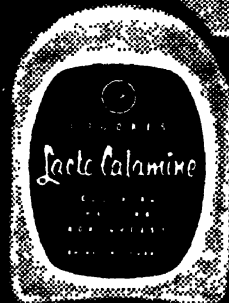
কুকস্ ইণ্টারক্রান লিমিটেড, বোম্বে-২৫

বিনামূল্যে:—আপনার বিনামূল্যে সৌন্দর্য পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন—ডিপার্ট-৪ পোঃ বক্স ৬৮৫২, বোম্বাই-১৮

Aim. CIL. LC. 18 BN

তার আদেশ ও নির্দেশ বয়ে নিয়ে নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে কোষের মধ্যে যায় তার দূত *RNA* (বা মেসেঞ্জার RNA), messenger R.N.A. (m RNA)। [*RNA=Ribonucleic acid*] *DNA* যা চায়, দূত *RNA* সেই বার্তাই বয়ে নিয়ে যায়। দূত *RNA* তাহলে *DNA*-র তল্পিবাহক, অন্য কথায় বলতে পারি, *DNA*-র ইচ্ছার ফটোগ্রাফিক নেগেটিভ।

আসল কাজ হল কোষের ভেতর প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় জিনিস তৈরি করা। প্রোটিন কেন এত দরকারী? তার কারণ, কোষ দেহ গঠনে প্রোটিনকে কাজে লাগায়, এই প্রোটিন দেহের অনেক কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, প্রোটিন থেকেই এনজাইম তৈরি হয়। DNA যে প্রোটিন চাইবে, কোষে সেই প্রোটিনই শুধু তৈরি হবে। বাইরে থেকে যত অন্য ধরনের প্রোটিন খাই না কেন, কোষ তা গ্রহণ করবে না।

নিউক্লিয়াসের বাইরে কোষের ভেতর আছে রাইবোজোম্। এইটাই প্রোটিন তৈরির কারখানা। দূত RNA এইখানে এসে বাসা বাঁধে। দেয় নানান ধরনের প্রোটিন তৈরি করার আদেশ। তার কাজ শুধু আদেশ দেওয়া। কয়েকটি এ্যামাইনো এ্যাসিড মিলে প্রোটিন তৈরি হয়। এরকম ২০টি এ্যামাইনো এ্যাসিড আছে। এখন কোন একটা বিশেষ প্রোটিন গঠনে দরকারী এ্যামাইনো এ্যাসিডগুলো কোষের গা থেকে কোষের মধ্যে রাইবোজোমের প্রোটিন তৈরির কারখানায় বয়ে আনবে কে? দূত তো সম্মানিত মহাশয়! ও কাজ তো দূতের নয়! এর জন্যে আছে তাই ট্রান্সফার RNA (Transfer RNA of t-RNA)। যাকে বলতে পারি পরিবাহক RNA. যতগুলো এ্যামাইনো এ্যাসিড ততগুলো t-RNA. এরা হল প্রোটিন কারখানার কাঁচামাল বয়ে আনার [illegible]।

তাহলে দেখছি, DNA কোষকে নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ ধরনের প্রোটিন তৈরি করার। সেই আদেশ নিয়ে m-RNA গেল রাইবোজোমে। যে সব এ্যামাইনো এ্যাসিড দিয়ে বিশেষ প্রোটিন তৈরি হবে, সে সব বয়ে আনল t-RNA.

আরো সমস্যা থেকে যায়। কোন্ RNA কোন্ এ্যামাইনো এ্যাসিড চয়ন করবে? এই প্রশ্নের সমাধান করেছেন ১৯৬৮ সনের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীগণ। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, এ্যামাইনো এ্যাসিড চয়ন করার বিধি নিহিত আছে m-RNA-তে। m-RNA গঠিত হয়েছে Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) ও Uracil (U) এই নিউক্লিওটাইডগুলো দিয়ে। (DNA-তে আছে Adenine, Guanine, Cytosine ও Thymine). চারটে নিউক্লিওটাইড্ থেকে তিনটে তিনটে করে নিয়ে বিভিন্নভাবে বিন্যাস করলে ৬৪টি ত্রিপদী গঠন করা যায়। যেমন AUG, AGG ইত্যাদি। এ্যামাইনো এ্যাসিড চয়ন নিয়ন্ত্রণ করে নিউক্লিওটাইডের ত্রিপদী। কুড়িটি এ্যামাইনো এ্যাসিড চয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য আছে কুড়িটি নিউক্লিওটাইড ত্রিপদী। এক একটিকে বলা হয় কোডন (Codon)। অধিকাংশ এ্যামাইনো এ্যাসিড চয়ন নিয়ন্ত্রণ করে একাধিক কোডন। যেমন Leucine—এই এ্যামাইনো এ্যাসিড চয়ন নিয়ন্ত্রণ করে ৬টি কোডন। প্রোটিনের জন্যে দরকার ৪টি কোডন, টাইরোসিনের দুটো আর মিথিওনিন ও ট্রিপটোফ্যান-এর একটি করে। উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে, যে একটি কোডন মিথিওনিন চয়ন নিয়ন্ত্রণ করে, তা হল AUG ত্রিপদী (Adenine-Uracil-Guanine). ট্রিপটোফ্যান চয়ন নিয়ন্ত্রণ করে কোডন UGG (Uracil-Guanine-Guanine) এই ত্রিপদী।

ডঃ খোরানার কাজ ছিল ফিনাইল-এ্যালানিন (Phenylalanine) এই এ্যামাইনো এ্যাসিড-এর পরিবাহক (t-RNA)-র গুণগত বর্ণনা করা, চিহ্নিত করা, প্রভেদ করা। ফিনাইলএ্যালানিনের কোডন হল UUU এই ত্রিপদীর ক্রম। ডঃ হোলী দেখিয়েছেন, এ্যালানিন (Alanine) এ্যামাইনো এ্যাসিড চয়নকারী t-RNA-কে কেমন করে তফাৎ করা যায়, শোধিত করা যায়, আর কি-ই বা তার গঠন। যদিও জেনেটিক কোড-এর এসব গবেষণা চালিয়েছেন তাঁরা বীজাণুতে, তাহলেও ডঃ নীরেনবার্গ দেখিয়েছেন যে, একই কোড বা সূত্র বা সংহিতা মূলত একইভাবে কাজ করে জীবন বিকাশের তিনটি স্তরে—বীজাণুতে (*E.coli*), উভচরে (*xenophns laevis*, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ) ও স্তন্যপায়ীতে (সাধারণ গিনিপিগ)।

DNA, m-RNA, t-RNA-র কাজ হল মোটামুটি এইরকম।

ডঃ খোরানার দলের এবারের কাজ যেন আরও চমকপ্রদ, আরও কৃতিত্বপূর্ণ। তাঁর দল ল্যাবরেটরীতে তৈরি করেছেন অপেক্ষাকৃত সরল DNA অণু, যার ঘোরানো সিঁড়ির মতো জড়ানো চক্রের ভিতের আছে ৭৭-নিউক্লিওসাইড গঠন। এর তুলনায় মানুষের কোষের DNA গঠিত লক্ষ লক্ষ নিউক্লিওটাইড দিয়ে, যার গঠন প্রণালী খুবই জটিল। এই নির্দিষ্ট গঠন প্রণালীর এক চুল এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই, কোষের কোন জীন মুছে ফেলা বা যোগ করা ভয়ানক কঠিন কাজ। এর থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, কৃত্রিম জীবন-সৃষ্টি এখনো অনেক দূরের কথা। বছর তিনেক আগে নাকি আমেরিকায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ৮২ জনের সম্মেলন হয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সার্বিক অগ্রগতি দেখে তাঁরা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কৃত্রিমভাবে জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই।

আমরা, সাধারণ মানুষরাও এখন বুঝতে পারছি, বিজ্ঞান নিত্য নতুন বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে কৃত্রিম জীবন-সৃষ্টির পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

মানুষ যদি কৃত্রিমভাবে তার দেহ-কোষের জীন তৈরি করতে পারে তাহলে চিকিৎসা জগতে বিপ্লব আসবে। যেসব রোগ এখন সারে না, সেগুলো নতুন ধরনের চিকিৎসায় সেরে যাবে। মূল ধরে নাড়া দেবে। কৃত্রিমভাবে তৈরি স্বাভাবিক DNA মানুষের দেহকোষে গিয়ে তখন নির্দেশ দেবে মানুষের নিজের খুশি-মত, অপসারিত করবে অস্বাভাবিক, খারাপ বা ঘুণ-ধরা জীনগুলি। ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগ সম্পূর্ণ সারানো যাবে, ক্যানসারের হাত থেকে মানুষ বাঁচবে, মানসিক রোগ, বংশগত কোন রোগ তার জীবনে আর করালছায়া ফেলতে পারবে না। মানুষের কোষ নিয়ে সুরু হবে নতুন স্থাপত্যবিদ্যা, নতুন কারিগরী। হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে যথোপযোগী জীন অর্থাৎ DNA সরবরাহ করে পুরো স্বভাব-চরিত্রই বদলে দেওয়া যাবে। ইচ্ছে মতো তৈরি করা যাবে খেলোয়াড় বা প্রতিভাধর লোক। পশুপালন ও কৃষি-ক্ষেত্রেও আনবে এইরকম সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

বিপদও কি নেই? বিপদ অনেক। প্রকৃতির জন্মসূত্র, জন্মসংহিতা বা জন্ম-সঙ্কেত জেনে ফেললে বিপর্যয়ও আসতে পারে। হয় তো, প্রথম যে কৃত্রিম জীবনের সৃষ্টি হবে, সেটা হবে 'ভাইরাস'। তখন দেখা দেবে নতুন সমস্যা। এই ভাইরাস হয়তো রোগ বিস্তার করবে—তাকে নিয়ন্ত্রণের ওষুধ হয়তো পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া হয়তো এমন জীন সরবরাহ করা হবে, যাতে কোন জাতি বোকা হবে, কোন জাতি বোকা হয়ে যাবে; বা কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে পঙ্গু করে দেবার মতো অসুখ ছড়িয়ে দেবে কেউ নিজের খুশিমত। আণবিক যুদ্ধের থেকে কম বিভীষিকাময় হবে না সে সব মহা অমঙ্গলজনক অশুভ ঘটনা।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঐ সব ভয়ে থেমেও থাকবে না, ঐ সব ভয়ের কাছে নতি স্বীকারও করবে না। জীববিজ্ঞানে আমূল রূপান্তর বুঝি সমাসন্ন।

॥ আট ॥

আয়ুব সৃষ্ট কনভেনশন মুসলিম লীগের দুর্নীতি ও দৌরাত্মের আরও প্রমাণ পাওয়া যায় মোনেম খান ও সবুর খান, এই দুই সমাজবিরোধী ব্যক্তির কাজকর্মের মধ্যে। মোনেম ও সবুর, সবুর ও মোনেম,—দুই নামের দুই ভিন্ন মানুষ, কিন্তু যাবতীয় নোংরা কাজের যুগ্ম আবিষ্কারক, যুগ্ম হোতা। রাওয়ালপিণ্ডেশ্বর আয়ুব তার এই দুই নন্দী-ভৃঙ্গীর সাহায্যে ডিকেডী রাজত্বের দশ বছরে বহু নোংরামি করেছেন। আজও মোনেম বা সবুর বলতে লোকে বোঝে স্বজন পোষণ, ঘুষ নেওয়া, পুলিশী নির্যাতন, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক হত্যা, নারীহরণ ইত্যাদি কমারী কুকর্ম। এই দুই পেয়ারের বাহনের গলার দড়ি ঢিলে না করে দিলে আরও কিছুদিন আয়ুব তাদের পিঠে চড়ে পাকিস্তানের ঘাটে-মাঠে যথেচ্ছ-চার করে বেড়াতে পারতেন, কিন্তু প্রভুর কাছ থেকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে তারা য মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করল, া গণ-আন্দোলনকে আরও দ্রুত এবং স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার সুযোগ দিল। ফলে, অচিরেই বাহনসহ সম্রাট আয়ুব ভীর গাড্ডায় কুপোকাত হলেন!

বাজীতপুরের (ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা) ধর্মান্তরিত হিন্দু ড়ালী খাঁর ছেলে আব্দুল মোনেম যেদিন বুনিয়াদী গণতন্ত্রী বা "বেসিক ক্রেট" হোল, সেদিন সকলের টের পিলে চমকে উঠল। কেন না রা বুঝল যে, এই উদ্ধত, ক্ষমতা-লিপ্সু ও হিংস্র স্বভাবের লোকটা বার থেকে তার শয়তানীগুলিকে জে লাগানোর সুবর্ণ সুযোগ পাবে বং আয়ুবের ঘরের খাঁ হিসাবে তার ত্যাচার সকলকে মুখ বুজে সহ্য রতে হবে। সত্যি কথা বলতে,— নিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচন একটা সেন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ন না, এই প্রথায় নির্বাচিত হয়ে যারা কিস্তানের রাজনীতিতে এবং সমাজে কিরে বাসকিছু ... ...

পরিচয় ছিল, তা হলো—গুণ্ডা ও বদমাইস। মোনেম খাঁ সাহেবের পরিচয় "ময়মনসিং জেলা কোর্টের মোক্তার" হলেও কার্যত তার সঙ্গে এই তিন ধরনের লোকের স্বভাব বা কাজের কোনও তফাৎ ছিল না। "দুই টাকার মোক্তার মোনেম" বা "বার বার ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে হেরে গোভূত হওয়া মোনেম" বুনিয়াদী গণতন্ত্রী খেতাব পাওয়ার অনেক আগেই মক্কেল ধরার জন্য বা বোর্ডের নির্বাচনে জেতার জন্য এমন সব ন্যক্কারজনক কাজ করত, যা পড়লে বা জানলে সাধারণ মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। একবার মোনেম এক বিধবা মক্কেলকে ঠকিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি হজম করে দিল এবং কিছুদিন পরে আর এক মক্কেলের সাথে ঐ বিধবাকে নিজের আত্মীয় বলে নিকে করিয়ে দিয়ে বেশ মোটা টাকা হাতিয়ে নিল। বলাবাহুল্য, বিধবা মহিলাটি ঘটনার অভিনবত্বে এবং আকস্মিকতায় এত দূর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে, প্রতিবাদ করার অনেক আগেই তার "দ্বিতীয় স্বামী" তাকে নিয়ে চট্টগ্রামে চম্পট দেন। অতঃপর কি হয়েছিল তা মোনেমই জানে। রাজ্যপাল বা গভর্নর হওয়ার পরে মোনেম খাঁ ঢাকায় যে নতুন রাজভবন বানিয়েছিল, সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে তার হারেম। এই হারেমে অত্যাচারী মোনেম বহুদিন বহু মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে আর এই সব অপকর্ম করার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেতারে বা জনসমাবেশে চিৎকার করে আল্লাতালাহের নাম নিয়ে জন-সাধারণকে সৎ পথে থাকার সদুপদেশ দিয়েছে। আজও মোনেম খাঁ জীবিত, তার ক্ষমতা থাকে তো সে এইসব কথার, এইসব অভিযোগের প্রতিবাদ করুক, ঢাকার জনসাধারণ এগিয়ে আসবে প্রমাণ নিয়ে। গদি উল্টে যাও-য়ার কিছুদিন আগে মোনেমের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। তখন সারা পাকিস্তান জ্বলছে। ঐ অবস্থায়ও খাঁ সাহেব বিয়ের কথা ভোলে নি। সে অতি গোপনে সিলেট দেওয়ানবাসিতের বোনকে বিয়ে করে ফেলল। নববধূর বয়স মাত্র ...

পঁয়ষট্টি। কিন্তু এহেন রসের খবর ছড়িয়ে পড়তে কত সময় বা লাগে! সারা পূর্ব পাকিস্তানে রটে গেল মোনেমের বিয়ের খবর। যে শোনে সেই অবাক হয়ে যায়! গোটা দেশ জুড়ে তখন তাণ্ডব চলছে। কল-কারখানা বন্ধ। মাঠের কাজ বন্ধ, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সবাই মারমুখী, আয়ুবের মসনদ টলছে। এমন অবস্থায়, প্রভুর এহেন বিপদের সময়ে তার একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য কি না আবার বিয়ে করল! তবে ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি চাপা পড়ে গেল, কেন না মোনেম সাংবাদিকদের হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করেছিল যাতে তার বিয়ের খবরটা কাগজে ছাপা না হয়। এখানে মোনেমের চরিত্রের "সুবিধাবাদী" দিকটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যে সাংবাদিকদের সে নানাভাবে নির্যাতন করেছে, প্রয়োজনবোধে আবার তাদের পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে তার বাধে নি। ব্যক্তিগত জীবনে, ব্যাভিচারের সঙ্গে দ্বিতীয় যে বদগুণ মোনেমের ছিল তা' হোল স্বজনপোষণ এবং তার এই স্বজনপোষণ নীতি যে কেবল অসংখ্য নিরীহ মানুষের অশান্তি ও বিক্ষোভের কারণ হয়েছে তা' নয়, পরিণামে আয়ুবের বাদশাহীর পতন-কেও দ্রুত করেছে। মোনেমের বড় ছেলে আখতারুজ্জমান দৈনিক পয়গাম বলে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে এবং এই উপলক্ষে ঢাকার এক হিন্দুর বাড়ি দখল করে নেয়। দৈনিক পয়গামের সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হয় মুজিবর রহমান খাঁ। এই মুজিবর রহমান খাঁ এক সময় আজাদের সহ-সম্পাদক ছিল এবং মাসিক মোহাম্মদী নামে একটি পত্রিকা পরিচালনা করত। জন্মের পর থেকেই আখতারুজ্জমান ও মুজিবরের সযত্ন পরিচালনায় দৈনিক পয়গাম সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের যন্ত্র হিসাবে কাজ শুরু করল। আজ আখতারু-জ্জমান নেই (সে কয়েক বছর আগে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে) কিন্তু তার দৈনিক পয়গাম পয়গম্বরী চালে যে সব কথা বলে চলেছে তা অতি বীভৎস! এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাম্প্র-দায়িকতার বিষ ঢালার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আয়ুব খাঁ পয়গমের সম্পাদক মুজিবর রহমানকে এক লম্বা-চওড়া খেতাব দিয়েছিলেন।

মোনেমের দ্বিতীয় পুত্র, পুত্র বললে ভুল হয়, বলা উচিত পুত্ররত্ন, বাচ্চু খাঁ ময়মনসিংহ জেলার সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলে-ছিল। বাপের প্রশ্রয় পেয়ে গুণধর পুত্র-রত্নটি এতদূর বেড়ে উঠেছিল যে,

আমল দিত না। যখন-তখন যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত দুষ্কর্ম সেরে বাচ্চু থানায় ফোন করে দারোগাদের ব্যাপারটা চেপে যেতে হুকুম দিত। বলা বাহুল্য, দারোগারা তাদের পারিবারিক ইজ্জত এবং চাকরী বাঁচাবার জন্য টুঁ শব্দটিও করত না। একবার এক এস-পি সাহেবের ধারনা হয়েছিল যে, বাচ্চু খাঁ অতি সামান্য মানুষ এবং তাকে থানায় ডেকে এনে একটু ধমকে দিলেই সে জব্দ হয়ে যাবে। কিন্তু এস-পি সাহেব বাচ্চুকে থানায় ডেকে পাঠালে বাচ্চু এসে সবার সামনেই তাঁর গালে একটা চড় কষিয়ে দিল! এস-পি সাহেবের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অধস্তন কর্মচারীদের সামনে তিনি মাথাই তুলতে পারেন না! এর পরও কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নি। মোনেমের কাছে গিয়ে ছেলের নামে অভিযোগ করলেন. কিন্তু কয়েকদিন বাদেই তাঁকে অন্যত্র বদলী হতে হল। এই ঘটনার পর থেকে বাচ্চু খাঁকে কোনও পুলিশই ঘাঁটায় নি এবং সে তার দলবল নিয়ে সারা ময়মনসিংহে দোর্দণ্ডপ্রতাপে গুণ্ডাশাহী চালিয়ে গেছে। পুত্রবৎসল পিতা হিসাবে মোনেম খাঁ বাচ্চুর রুজী-রোজগারের এক চমৎকার ফন্দী এঁটেছিল। বাচ্চুকে সে পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ বানিয়ে দেয় এবং ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির মধ্যে নিজের কিছু মোসাহেবকেও বসিয়ে রাখে। অতঃপর বাচ্চু খাঁ তার বাপের এইসব পোষমানা জীবগুলির সাহায্যে স্পোর্টস ফেডারেশনের হাতবাক্সের টাকা হাতিয়ে আরামে আয়েসে নবাবী করতে থাকে। ডিগবাজী খাওয়ার কিছুদিন আগে বাচ্চু রাতারাতি শিল্পপতি হওয়ার অনেক বিচিত্র স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ঢাকার উপান্তে পোস্তাগোলার বিরাট মাঠটি দখল করে নিয়ে সেখানে একটি বড়সর কারখানা খোলার ইচ্ছে ছিল তার এবং এইজন্য ঐ মাঠের মধ্যে কুঁড়ে বেঁধে থাকা বহু গরীব মানুষকে সে প্রচণ্ড মার দিয়ে উচ্ছেদও করেছিল. কিন্তু সে নয়া আদমজী বনার আগেই তার ঠাকুর্দার অর্থাৎ আয়ুব খাঁর মসনদ উল্টে গেল। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে মামলা চলছে।

গুণ্ডা বা বাটপার হোলেও বাচ্চু খাঁর পিতৃভক্তির খ্যাতি ছিল। বাপ যেমন তার খাটের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল. সেও তেমনি বাপের দরকার মত সাকরেদদের নিয়ে ঠিক সময়ে হাজিরা দিত। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, বাপ-বেটা একটা লিমিটেড কোম্পানী খুলে আনলিমিটেড কোরাপ্‌সন্ চালিয়ে যাচ্ছিল। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৬৫ সালে. নির্বাচনের প্রাক্কালে একবার তেজগাঁ ফার্মগেটের সামনে পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মতো পরিচিতি সভাটিও সম্পূর্ণরূপে আয়ুবের মস্তিষ্কপ্রসূত। এই সভায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা প্রত্যেকে উপস্থিত থেকে সমবেত বি ডি-দের কাছে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন. এই ছিল নিয়ম: যাই হোক. ফার্মগেটের ঐ পরিচিতি সভায় ফাতেমা জিন্নার সঙ্গে বি ডি-দের পরিচিত হতে না দেওয়ার জন্য বাচ্চু খাঁ একটা মতলব আঁটে। ফার্মগেটের কাছেই এক সরকারী বাড়িতে সে প্রচুর বি ডি-কে ভয় দেখিয়ে আটকে রাখে এবং তাদের লোভ দেখাবার জন্য বিলাতী মদ ও ঢাকার কুখ্যাত গণিকাপল্লী সাঁচিবন্দর থেকে মেয়েমানুষ আমদানী করে। যখন সভায় উপস্থিত ছাত্র ও জনতা বাচ্চুর এই কীর্তির খবর পায় তখন তারা ঐ বাড়ির সামনে জমা হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। কিন্তু বাচ্চু খাঁ দমার পাত্র নয়: সে প্রস্তুত হয়েই ছিল। তার ইঙ্গিতে মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য গুণ্ডা ও পুলিশ লাঠি ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে জনতাকে মারতে শুরু করে, ফলে বহুলোক মারাত্মক রকম জখম হয়।

তক্ত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কিছু আগে আয়ুব খাঁ একবার পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন। মোনেম খাঁ প্রভুকে অভ্যর্থনা করার জন্য এক অভিনব উপায় ঠাউরেছিল। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় সে কম বয়সের মেয়েদের নাচিয়ে প্রভুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিল। আমরা খুব ভালভাবেই জানি এবং খুব জোর গলাতেই বলতে পারি যে. মোনেম খাঁ. ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের বি ডি-দের ডেকে এনে স্কুল-কলেজ থেকে মেয়েদের ধরে আনতে হুকুম দিয়েছিল এবং বি ডি-রা তার এই হুকুম অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পালন করেছিল। ঐ সব হতভাগ্য মেয়েদের বাপ. মা প্রাণ ও ইজ্জতের ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করেন নি। অবশ্য এই কথাও সত্য যে. মোনেম রাস্তায় নাচানো ছাড়া মেয়েদের দিয়ে আর কোনও নোংরামো করায় নি (ধন্য মোনেম!) আয়ুব যেদিন নারায়ণগঞ্জ সফরে এলেন সেদিন আমরা স্বচক্ষে এই অদ্ভুত দৃশ্য অর্থাৎ ভদ্রঘরের মেয়ে এনে রাস্তায় নাচানো দেখেছিলাম। কায়েদে আজম রোডে যখন মহামান্য আয়ুবের রথখানি এল তখন আমাদের পরিচিত বহু মেয়ে রাস্তার মাঝখানে এবং ধারে দাঁড়িয়ে নাচ দেখাচ্ছিল। বলা বাহুল্য জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু বদমায়েস এ নাচ উপভোগ করছিল ও থেকে থেকে অত্যন্ত নোংরা কথা ছুঁড়ে দিচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট সাহাব নাচ দেখে এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে. সেইখানেই মেয়েদের এক হাজার টাকা ইনাম দিয়ে মিষ্টিমুখ করান। এরপর তাঁর রথ উপস্থিত হোল লিয়াকৎ আলী রোডের প্রান্তে. স্টীমার টার্মিনালের সামনে। সেখানে আরও একদল মেয়ে নাচতে নাচতে তাঁর গায়ে ফুল ছুঁড়ে দিল, পরমুহূর্তে ভীড়ের ভিতর থেকে উঠল আর এক প্রস্থ হাসি ও টিটকারী। একনায়কত্বে অত্যাচারের নানাবিধ ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু আয়ুবের বর্বর একনায়কত্বের পঙ্কিলতা যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তা' ভাঙা কঠিন।

বুনিয়াদী গণতন্ত্রকে নিঃসন্দেহে আয়ুবের পোষা গরুর খাটাল বলা যেতে পারে। এই খাটাল থেকে ৮০,০০০ হৃষ্টপুষ্ট দ্বিপদ এঁড়ে গরু সঙ্গেত তাদের কর্তার পাতে ভোটের দুধ ঢালত। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশের দুই গভর্নর ছিল প্রকৃতপক্ষে এই খাটালের দুই মাইনে করা গোয়ালা কাম চাকর যারা গোবর সাফ করা থেকে দুধ দোয়া অর্থাৎ বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের সকল রকম বাজে কাজের সঙ্গী হোত এবং প্রয়োজনমত ধমকে, তোয়াজ করে ভোট বাগিয়ে নিত। গোয়ালের গরুর যেমন জাবনা চাই তেমনি বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদেরও রসদ চাই। তাদের এই রসদ আসত "ওয়ার্কস প্রোগ্রাম মারফৎ।" এই ব্যবস্থা অনুসায়ী বিভিন্ন ইউনিয়নের বুনিয়াদী চেয়ারম্যান ও আঞ্চলিক "সার্কেল অফিসার"দের মধ্যে টাকা ভাগ করে দেওয়া হোত, তারা আবার ঐ টাকার একটা অংশ হজম করে বাকীটা বি ডি-দের মধ্যে বিলিয়ে দিত অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে আয়ুব খাঁ টাকা দিয়ে বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের কিনে রেখেছিলেন। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কল্যাণে পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র যে জিনিষটি বিশেষ করে হয়েছে তা' হোল রাস্তা। এই সব রাস্তা বানাতে যে পরিমাণ টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে তার সামান্য কিছু বন্যা প্রতিরোধে খরচ করলে মানুষের অনেক উপকার হোত। অবশ্য রাস্তা বানিয়ে আয়ুব খাঁ তাঁর মার্কিনী দাদাদের সুবিধে করে দিয়েছেন.— কেন না অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সরকার এবং তার প্রতিক্রিয়াশীল তাঁবেদারদের সাহায্য করার জন্য মার্কিনীরা যখন

যে যেখানে ছিল দৌড়ে এসে গাড়ির গতি রোধ করে এবং খাঁ সাহেবকে টেনে নামায় এবং ঘুষি, লাথি ইত্যাদি উপহার দিতে থাকে। অনেকে আবার তার মুখে থুতু ফেলে এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে দেয়, বেশ কিছুক্ষণ এমনি চলার পর জনৈক ভাঙা গাড়িতে প্রায় অচৈতন্য খাঁ সাহেবকে তুলে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আজ "বনানী"র নির্জন পরিবেশে বসে অপরিণামদর্শী মোনেম খাঁ তার শেষের দিনগুলি গুণছে।

পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুবের দ্বিতীয় বাহন ছিল সবুর খাঁ। সবুরের জীবনের দশ আনা ভাগ কেটেছে মুসলিম লীগের পক্ষে গুণ্ডামী করে এবং চার আনা ভাগ কেটেছে আয়ুবের মাইনে করা দালাল সেজে, তার বয়স এখন ষাটের কোঠায় তো বটেই কিন্তু দালালী বা গুণ্ডামীর মাত্রা একটুকুও কমে নি অর্থাৎ জীবনের বাকী দুই আনা সে ঠিক একভাবেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

সবুরের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীদের অসংখ্য অভিযোগ। প্রথমত সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিকারী এবং এই বিষয়ে যে কোনও পেশাদার গুণ্ডা অপেক্ষা অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং পটু। দেশ ভাগের কয়েকদিন আগে ও পরে খুলনায় যে কুৎসিত দাঙ্গা হয়েছিল, সবুর তার এক অন্যতম অনুষ্ঠাতা। আমাদের স্পষ্ট মনে আছে এবং খুলনার যাঁরা অধিবাসী তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, উনিশ শ' ছেচল্লিশের ঐ দাঙ্গা উপলক্ষে খুলনার প্রখ্যাত কৃষকনেতা ও বিপ্লবী রতন সেনের সঙ্গে সবুরের প্রচণ্ড রকম কলহ শুরু হয়েছিল এবং সবুরের চক্রান্তে রতন সেনকে বছরের পর বছর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী থাকতে হয়েছে। উনিশ শ' পঞ্চাশের দাঙ্গা, যার ভয়াবহতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিঃসন্দেহে আজও ভুক্তভোগীদের মন থেকে মুছে যায় নি, ও যে সব কুচক্রীর চক্রান্তের ফল তাদের মধ্যে সবুর একজন। এর পর বাষট্টি এবং চৌষট্টির দাঙ্গা। এইখানেও সবুরের হাত ছিল। চৌষট্টির দাঙ্গা তো বলতে গেলে পুরোপুরি সবুর ও মোনেমের যৌথ সৃষ্টি। জানুয়ারী মাসের পয়লা ও দোসরা তারিখে সবুর খাঁ খুলনা শহরের মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে কাফেরিস্তান ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের "কাফের", "জিম্মী", হিন্দুদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য প্রকাশ্যে গা গরম করা বক্তৃতা দিল। ফলে পরদিন থেকে খুলনা শহরে একটি জ্বলন্ত নরক তৈরি হোল এবং ঐ নরকের আগুনে অসংখ্য সংখ্যালঘু নর-নারী তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার বিসর্জন দিয়ে পুড়ে মরল। কিন্তু সবুরের এই কদর্য সাম্প্রদায়িক মনোভাব, এই বর্বর অত্যাচার আজও কমে নি। সম্প্রতি খুলনা জেলা থেকে যে নমঃশূদ্র হিন্দু নর-নারী দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছেন, তার জন্যও সবুর খাঁকেই দায়ী করা চলে। একদা জাঁদরেল এবং বর্তমানে হেঁপো রোগে জরাজীর্ণ কনভেনশন লীগকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবুর খাঁ অনেক আঁট-ঘাট বেঁধেই সংখ্যালঘু বিতাড়নে নেমেছে। সে ভালভাবেই জানে যে, হিন্দুরা যারা এখনও পাকিস্তানের মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে এবং যাদের মন থেকে বিগত দাঙ্গাগুলির বীভৎস স্মৃতি মুছে দেওয়া সম্ভব নয়, তারা কনভেনশন লীগকে ভোট দেবে না বরং তাদের ভোটে বিরোধী দলগুলি বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ পুষ্ট হবে

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণ বশত এ সংখ্যায় প্রমথনাথ সেনগুপ্তের রবীন্দ্র-স্মৃতি কথা 'আনন্দ-রূপম' ও 'মিত্রেন'-এর 'শহর কলকাতা' প্রকাশ করা গেল না। এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যায় রচনা দুটি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

কাজেই এইরকম অবস্থায় হিন্দু বিতাড়ন ছাড়া আর কোনও পন্থা সবুরের মনঃপুত হয় নি।

একই সঙ্গে আরও একটি সন্দেহ পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা এই প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীদের নিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা কতদিন থাকবে যদি এইভাবে ব্যাপক হারে হিন্দুদের পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য করা হয়? কাজেই মনে হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের জোর করে সংখ্যালঘু করার জন্য একটা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে এবং এই ব্যাপারে দালালশ্রেষ্ঠ সবুর খাঁকে নিয়োগ করেছে। সবুর খাঁ তার হিন্দু-বিরোধী কাজকর্ম, এক কথায় সাম্প্রদায়িকতা বেশ চুটিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। তার দলে হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের গুণ্ডাই আছে। যেমন

(১) বলাই ঘোষ—এই মহাপুরুষ নিজেকে খুলনার "অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট" বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। কথায় বলে যে, "হিঁদুর ছেলে মোছলমান হলে বেশি বেশি গোস্ত খায়", বলাই ঘোষের বেলায় এই কথাটি বেশ খাটে। তার প্রধান কাজ হোল সবুরের বিরোধী হিন্দু ও মসলমানদের সম্পর্কে সন্ধান জানা এবং যথাসময়ে ঐ হতভাগাদের বাড়ির নারীহরণ, গৃহদাহ-করণ ইত্যাদি সৎ কাজ সম্পন্ন করা।

(২) মোহাম্মদ হায়দার—এই লোকটির বাড়ি পাইকগাছা থানার সাহাপাড়া গ্রামে (জেলা খুলনা) উনিশ শ' ... দাঙ্গায় নিরস্ত্র এবং অসহায় হিন্দুদের পাইকারী হত্যা করে হায়দার সাহেব সবুরের কাছ থেকে মোটা রকমের ইনাম লাভ করে। বর্তমানে সে নমঃশূদ্র নর-নারীদের সীমান্তের ওপারে পাঠাতে ব্যস্ত।

(৩) সৈয়দ মোল্লা—বটিয়াঘাটার এই কুখ্যাত গুণ্ডাটি সবুরের দলের এক অন্যতম সভ্য এবং খুন, রাহাজানি, বলাৎকার ইত্যাদি বহু অ্যাডভেঞ্চারের নেতা।

(৪) রউফ মিয়া—খুলনা শহরেই বাস করে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে নিরীহ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে।

এই রকম অসংখ্য সমাজবিরোধী শয়তানকে পাশে রেখে সবুর খাঁ আজও তার শয়তানশাহী চালিয়ে যাচ্ছে। ইয়াহিয়া সরকারের উচিত ছিল এই বদমায়েসটিকে হয় ফাঁসি, নয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া, কিন্তু আয়ুবের মত ইয়াহিয়াও সবুরকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যালঘিষ্ঠ করে দেওয়ার যে সুগভীর চক্রান্ত চলছে, সেখানে নয়া প্রেসিডেন্ট সাহাবেরও হাত আছে। তবে কথা হচ্ছে এই যে, আগুন যখন জ্বলে উঠেছে তখন তা জ্বলবেই। সুতরাং সবুর বা তার প্রভুদের রেহাই নেই।

অতঃপর নজরুলের দুর্ভাগ্য

একদা এক সঙ্গত অভিযোগ ছিল যে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গে অবহেলিত, তাঁর গান রেডিওতে হয় না, নজরুলকে নিয়ে কোন অনুষ্ঠানও হয় না। নজরুল চিরবিদ্রোহী, সুস্থ রবীন্দ্রায়ু নিয়ে বেঁচে থাকলে কি হত, বলা যায় না, কিন্তু অত বড় প্রত্যাশার মুখর জীবন্ত এক সত্তা ট্রাজেডির অন্ধকারে দুরারোগ্য নীরবতায় ডুবে গেছেন, তা মৃত্যুর চাইতেও অনেক বেশি শোকাবহ করে তুলেছে বলেই এই অখণ্ডনীয় অভিযোগ উঠেছিল; কেন না, তখন স্মৃতিভারের ভারী চশমা পরে তাঁকে দর্শন ছাড়া আর যেন কিছুই রইল না। কার্যত, যখন মানুষের আর কিছুই দেবার থাকে না, নির্বাক জড়তায় সমাধিস্থ হয়ে যায়, তখন একমাত্র উপায় থাকে মানুষটির চারদিকে একটা বিষণ্ণ-নন্দিত অতীতের আচ্ছাদন টেনে দেওয়া। এবং তারই উদ্দেশে প্রতিদিন না হোক, বছরে একটা কল-কলরবে ক্ষণিকের দীপ জেলে দিয়ে কিছু লোকের দৃষ্টিগোচর করা। অভিযোগটা উঠেছিল এই হতাশা থেকেই, কেন না, মানুষকে জাগিয়ে রাখবার, মন্দিরাধিষ্ঠিত করবার দ্বিতীয় সহজ পথ আমাদের শ্রমকাতর মানসিকতায় সহসা স্থান পায় না।

আজ অবশ্য অন্তত কয়েকটা কলরব-তরঙ্গিত দিনযাপনের অভাব অনেকাংশে ঘুচেছে। আজ হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী আকাশবাণীর কলকাতা শাখায়ও এর প্রতিধ্বনি হয় এবং ক্রমশ একটা ছেড়ে দশটা বেসরকারী সাংস্কৃতিক ক্লাবে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে; কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও। সংবাদপত্রে নজরুল স্মরণে পৃষ্ঠা হয় এবং কোন কোন সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট কয়েকজন লেখকেরই এক ধরনের লেখা পৃষ্ঠাটের স্থান পূরণ করে থাকে। দৈনিক ছাড়া অন্যান্য সাময়িকপত্রেও নজরুল-কথা থাকে। আগেও হত, আজকাল একটু বৃহদায়তনেই হয়, হয় নজরুল-বাসস্থানে দর্শক সমাগম এবং নজরুল-সঙ্গীতের পরিপূরক হিসেবে তাঁর বেঁচে থাকা বন্ধু-বান্ধবের ভালো-মন্দ বাঁধা গৎ-এর প্রীতি-ভাষণ বা স্মৃতিচারণা। কোন কোন অনুষ্ঠানে ঐ জড়দেহকে 'কিওরিও' হিসেবে উপস্থিত করবার পীড়াদায়ক ও অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টির নিষ্করুণ উদ্যমও দেখা গেছে।

ভাবনা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ যেমন পূজা-পদ লাভ করেছেন সামাজিক স্ফূর্তিবাজদের মধ্যে, নজরুলও শীগ্গিরই একটা সূত্র হয়ে উঠবেন। নজরুলের ক্ষেত্রে সুবিধে এই যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি তাঁতে নেই; অনুষ্ঠানে দুটো তত্ত্বকথা বা নবব্যাখ্যা কেন হল না, এ অভিযোগ খুব বেশি উঠবে না। নজরুলের কিছু গান ও কবিতার কিছু আবৃত্তি হলেই নজরুল-প্রসঙ্গ সর্বাঙ্গীণ হল, এই লোকে মোটা-মুটি মেনে নেবে। পরিপূরক এই একটা লাভ হবে যে, 'নজরুল রচনাসম্ভার' ইত্যাদি পসরা সাজিয়ে বসতে পারবে কোন কোন ব্যবসায়ী এই রবীন্দ্রোত্তর নজরুল মর-শুমে। এদিকে নজরুলের বন্ধু-বান্ধবরাও তাঁদের মনে পড়ে-যাওয়া স্মৃতিকথা নিঃশেষ করে এনেছেন এবং যে স্টাইলে যে বস্তু নিয়ে বাংলা সাহিত্যে জীবনী লেখা হয়, নজরুল-জীবনীও তাকে ছাড়িয়ে ব্যতিক্রম হবে না। মুজফ্ফর আহমেদের 'নজরুল প্রসঙ্গ' ব্যক্তি-সান্নিধ্যের অতিরিক্ত কিছু নয়। নজরুল প্রসঙ্গেও "আমি", কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসেও "আমি"; নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে উত্তম-পুরুষের ভূমিকা সব চাইতে নগণ্য এবং তা বাদ দিলেই ইতিহাস প্রামাণ্যের অমরত্বলাভ করে। আজ পর্যন্তও নজরুলের এমন একটি নিকষ-কষা সোনার জীবনী হয়েছে বলে আমার জানা নেই— যে জীবনী সোচ্চারে ঘোষণা করতে পেরেছে 'উইথ অল দাউ ফল্টস আই লাভ ইউ।' কাজী নজরুল ইসলাম মানুষ, মানুষের মহিমা, মহত্ত্ব, মানবিক প্রকৃতিতেই, পদে পদে তাকে স্খলিতচরণ দেবতুল্য করে তোলার চেষ্টা তাঁরই এবং তাঁর মনুষ্যত্বেরই অপমান।

আমাদের দেশের বহু মহাপুরুষের দুর্ভাগ্যের মতো নজরুল-জীবনেরও এই ট্রাজেডি। আমরা কখনো তাঁর পুরোগামী-দের মতো তাঁকে সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারি নি। এতদিনে একথা সুবিদিত যে, রবীন্দ্রস্নেহ-সম্ভাষিত কাজী নজরুল রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মান নি। হঠাৎ থমকে-যাওয়া ও অনিঃশেষিত অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়েও নজরুলের বৈষয়িক জীবন শেষ পর্যন্তও পরাশ্রিত থেকে গেল। তাঁর বহু বন্ধু-বান্ধব শিষ্য-পোষ্য বিত্ত ও সম্মানের জীবন-যাপন করেছেন এবং করছেন, তাঁদের সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাসও অন্তরো-ত্থিত নয়, এমন কথাও কেউ বলবে না, কিন্তু নজরুল মূল্যায়নে এ-কথাটির আশ্চর্য বিস্মরণ ঘটে যে, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্ত করোজ্জ্বলেও নজরুল ধূমকেতুর মতোই বাংলা দেশের বিশ-ত্রিশ দশকের একটা খণ্ড স্বাধীনতা বিক্ষোভকাল একান্তভাবে প্রাণোচ্ছল করে দিয়েছেন; এমন একটা কাল গেছে, যখন কোনো স্বদেশী অনুষ্ঠানই বিদ্রোহী কবির সঙ্গীত ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ও পরিতৃপ্ত হয় নি। মনে হত, আমরা যেন ১৯০৫ থেকে যে রবীন্দ্র-কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত করে চলেছিলাম, তা হঠাৎ ভুলে গেছি। 'বন্দে মাতরম্'-এর কম্বুধ্বনি তখনো সতেজ, ইনক্লাব আসছে, কিন্তু সারাটা স্বদেশী-

আকাশ তখন নজরুলে আচ্ছন্ন, সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে। আমার জন্মস্থান কোচবিহার তখন দেশীয় রাজ্য; আমরা স্কুল ছাত্র; কিন্তু সেখানেও নজরুলকে নিয়ে লোফালুফি; অমন ঝাঁকড়া বাবরী চুল, অটুট বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, কিঞ্চিৎ কর্কশ দৃপ্ত কণ্ঠ—গান আর আবৃত্তিতে তিনি মাতিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট্ট সুন্দর শহরের সবুজ গাছের পাতায় পাতায়, সোজা লাল রাস্তার সমান্তরাল সবুজ ঘাস, ডজনখানেক টলটলে দীঘির জলে আর পাহাড়ে পাগলা সর্বদেশে তোর্সা নদীর তীব্রস্রোত—সর্বত্র তার যেন স্পর্শ-তরঙ্গ। চিত্তভরে গ্রহণ করতে পারি নি, প্রাণভরে ভালোবেসেছি; আমাদের কৈশোর-যৌবনের গোড়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য হিন্দুকাল—নজরুলের স্পষ্ট ঋজু কথাগুলো যেন হৃদয়ে বিঁধে গেল, একবারও একথা কেউ মনে করিয়ে দিতে সুযোগ পেল না—একান্তভাবে একদল মুসলিম ছাত্রের অসুস্থ উদাম এবং চিরনিন্দুক সাবধানী হিন্দু প্রহরীদের ফিসফিসানি সত্ত্বেও—ঐ বাউলের মত উদ্ভট পরিচ্ছদ-আবৃত মানুষটি মুসলমান। কোচবিহারের বিরাট সাগরদীঘি ছিল আমাদের গৌরব, নিষ্কলুষ স্বচ্ছ সুরক্ষিত জল। মানুষটিকে সেভাবে গ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তীকালে পূর্ণযৌবনের আগুন নিয়ে খেলার সময়, সংসারী প্রৌঢ় তীরে বা বর্তমান বার্ধক্যকালে বহুবার বহু কলঙ্ক-রটনার বহু অপবাদের অপযশের ঝুড়ি ফেলতে চেয়েছে, শুনেছি, অনেকে; জলে রেখা পড়েছে অমনি দাগও মিলিয়ে গেছে। পরিণত চিন্তায় তৌলদণ্ডে তুলে বার বার পূর্ণ কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করেছি, বাংলাদেশে ২২ থেকে ২৮-এর প্রস্তুতিকালে, ২৮ থেকে ৩৪-এর অশ্রুপাতে নজরুল অবিচ্ছিন্ন। ৩০-এর বন্দিদশায়ও নজরুলের লেখায় বিপ্লবীরা আপন অঙ্গ আঁচড়েছে।

আশ্চর্য, মোল্লাধর্মী বিজাতীয় একদল তরুণ বৃথাবচন গ্রাহ্য করে যখন কিছুতেই নজরুলকে জাতের নামে বজ্জাতদের দলে ভেড়াতে পারল না, তখন ওদের হাতে কাফের শব্দের মিসাইল ছুঁড়ে নির্বোধেরা ওঁকে হীন করতে চেয়েছিল। চিরসত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করাই দরকার এবং আজকের স্বার্থান্বেষী চক্ষুপীড়নের জন্যও একথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত যে, নজরুলের আন্তরিক স্বীকৃতি-সূচনা হয়েছে আজকের আন্তর্জাতিকতাবাদী বা বিদেশী চর-বিপ্লবীদের অতিধূলিত সেকালের হিন্দু বিপ্লবী বাঙালীদের মধ্যেই। ঘটনাক্রমে নজরুলের মুসলিম পত্র-পত্রিকার সান্নিধ্য এবং বহু অপূর্ব মুসলিম ভাবোদ্দীপক কবিতা-সঙ্গীত সত্ত্বেও নজরুল যে হিন্দু বিপ্লবী বাঙালার নিকটতর তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ কাজীর বিদ্রোহী সত্তা কোন মুসলিম তরুণ বিপ্লবী-সংগঠনে সঞ্চারিত হয় নি, বিদ্রোহী নজরুলকে নিয়ে তারা কোন বৈপ্লবিক আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয় নি। নজরুলের কোন এক অংশে আন্তর্জাতিকতা ও সাম্যবাদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিতই বা হয়েছে কারা? সেখানেও স্বদেশীভক্ত নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তাধারা হয় কোথাও বিকৃত সাম্প্রদায়িকতায় বীভৎস হয়েছে নতুবা পররাষ্ট্রস্বার্থে বিজাতীয় চরবৃত্তিতে অনুসৃত হয়েছে।

তবু বাংলাদেশের মানসাকাশ যখন রবি-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তখন এই সর্বজন-দৃষ্টিনিবদ্ধ ধূমকেতু আপনার দুর্ভাগ্যে পুড়তে লেগেছেন। ভাব-চন্দ্রালোকে বাস করতেও যে কোটি কোটি টাকার বৈষয়িক বন্দোবস্থাপনার প্রয়োজন, বিদ্রোহী কবি নজরুলের জীবনে সেইটিই ছিল সব চাইতে উপেক্ষিত ও অব্যবস্থিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে একদা নজরুলের হাতে একটি সোনার কলম তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে পড়ে; দৈনন্দিন উদরপূর্তির চারটি ডালভাত সংস্থানের কাজ তো একটি সোনার কলমে হতে পারে না; ও তো সমবেত জনতার হাততালির তরঙ্গেই বিলীন হয়ে যায়। উঞ্ছবৃত্তিই যেন ছিল তাঁর নিয়তি।

মনে পড়ে, তখন আমি কলকাতায়। আমাদের কোচবিহারের এবং আমাদেরই পাড়ার এক বন্ধু আইন উদ্দীনের সঙ্গে দেখা কলেজ স্কোয়ারে। আমি তখন পথান্তরে গেছি, সে ডাক্তারি পড়ছে। স্কুলে থাকতে সে ছিল আমার এক বছরের সিনিয়ার; তার দাদা আব্বাস উদ্দীনের সমপাঠী। পাড়ার বলে ওঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল; ওঁদের বাপ-জ্যাঠা ছিলেন জোতদার, আমার বাবা তাঁদের উকিল, পরে আমার বড়দাও। আমাদের দৃষ্টিতে ওঁদের পরিবারটি ছিল সম্ভ্রান্ত এবং আমাদের ঐ পল্লীতে ওঁরাই ছিলেন একমাত্র মুসলিম পরিবার; ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী সবাই হিন্দু (ব্রাহ্ম)। ধর্মটা ছিল তাঁদের এতই ব্যক্তিগত ও পারিবারগত যে, কোন সামান্য বিরোধ দূরস্থান, অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন তাঁরা সকলের কাছে। আইন উদ্দীনের বাপ-জ্যাঠারা অবশ্যই সাদা তহন বা লুঙ্গি পরতেন, কিন্তু তাঁদের ছেলেরা অর্থাৎ আইন উদ্দীন ওরা আমাদের মতই কাছা দিয়ে ধুতি পরত এবং নিছক ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়া লেশমাত্র পার্থক্য ধরা পড়ত না আমাদের সঙ্গে। চলা-ফেরা-খেলা একসঙ্গে করেছি, এমন কি, বাংলা লাইব্রেরীরও অগ্রণী উদ্যোক্তা ছিল এই পরিবার। গোড়ার দিকে কোচবিহার সাহিত্যসভার গড়নে আইন উদ্দীনের জ্যাঠার ছিল সক্রিয় হাত। এতখানি ব্যক্তিত্ব কথা বলছি কারণ, আজ তাঁরা পাকিস্তানে। আজও আমার কাছে এ বিস্ময় যে, কি কারণে অভ্যাসের মতই এঁরা পাকিস্তানী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

কলেজ স্কোয়ারে আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আমাকে বলল, যাবে? নজরুলকে ওরাই এম সি এ তে একটা তোড়া দেওয়া হবে, দু টাকা করে টিকিট। সে জানত, আমি তখন যে-পথ বেছে নিয়েছি তাতে অর্থোপার্জন হয় না, গাড়ি চড়া বা পয়সা দিয়ে কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া অসম্ভব। তবু খুশেই বললাম। বলতেই সে বলল, চল না, আমিই তো টিকিট কিনব। গেছলাম।

কিন্তু নজরুলকে এই অর্থের সম্মাননা কেন? যা শুনলাম তাতে বেদনার অন্ত রইল না। নজরুলের নিতান্ত অর্থাভাব চলছে। কিছু উপলক্ষ্য করে টাকা না দিলে আমাদের পথের মতই উপোস। এত গান, এত অফুরন্ত লেখা, অনর্গল হাসি—তাঁর এ দুর্দৈব?

আরও একটা দৃশ্য মনে পড়ে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, হেদোর খুব কাছাকাছি একটি পুস্তকালয় থেকে আমারই একখানি রাষ্ট্র-নির্বিবন্ধ বই বেরোচ্ছে; মাঝে মাঝে আসি যাই। ঠিক বিপরীত দিকে দেখতাম একটা আরও ছোট সরু পুস্তকালয়ের বাইরে ফুটপাথে একটা টুলে বসে তখনকার দিনের আজকের দিনে অভাবিত সস্তা দু পয়সার মামলেট আর এক পয়সার চায়ে আপ্যায়িত হচ্ছেন। সে পুস্তকালয় একই রাস্তায় সরে এসে আজ রমরমা। তখনই নজরুল জীবনের আর একটা দুর্লক্ষণ শুরু হয়েছে। আরও কার কার কাছে বাঁধা পড়ছে তাঁর বইগুলো। আমি নিজেও জানতাম তখন লেখকদের কি হাল। আমার নিজের প্রথম বাজেয়াপ্ত পুস্তক বাবদ কিছু পাই নি, বিষয়বুদ্ধি ছিল না, দ্বিতীয় বইখানাও ধুলোঝাড়া বিক্রী হলেও ত্রিশটি টাকা পেয়েছিলাম। তৃতীয় বইয়ের প্রকাশক সাফ বলে দিয়েছিলেন তাঁর খরচ-খরচা উঠে লাভ শুরু না হলে এক পয়সা নয়—পাইওনি।

আরও আরও লেখকের এই দুর্গতির কথা শুনতাম এবং আমার দেশোয়ালী বন্ধু কবি শৈলেন রায়ের ৫ টাকায় গান-বেচার কথাও শুনতাম, কিন্তু নজরুলেরও সেই দুর্দশা চলছে হঠাৎ হঠাৎ শুনতাম, কার বিরুদ্ধে জানিনে একটা অপ্রতিরোধ্য বিরাগ জন্মাত। এ কি নিদারুণ প্রতিকারহীন অবস্থা! একশ' টাকায় কোন একটা মাসিকে নাকি সম্পাদনাভার পড়েছে—তারপর একদিন মাথায় বাজ! থিয়েটারে ব্যাণ্ডে পার্টিদের মাচগানের মধ্যে বিদ্রোহী কাজী নজরুল—জীবন ধারণের উঞ্ছবৃত্তি, আজ-

হত্যার দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। সত্য-মিথ্যা জানিনে, কিন্তু নজরুলের এই শেষ সবলেশে পিঁাচল গাতর কথা কেউ কি হতভাগ্য এই বাংলাদেশকে 'উপহার' দিতে পারেন না? ইতিহাস-গবেষণার সেই পরমহংস কি কেউ চরম খ্রীজিজ্ঞ কথা বলবেন না?

অমিতাচার? জানিনে। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সকলেই মিতাচারী ছিলেন এবং বিচ্যুতিহীন সংযমে সিদ্ধপুরুষ হয়ে বিত্তে-সম্মানে বেঁচে আছেন এটি সর্বাংশে মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ করি। অমিতাচার? বাংলাদেশের আর এক বিদ্রোহী কবির কথাও শুনেছি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিদেশ বিভূঁয়েও ঋণজর্জরিত এই মোহসেবী মানুষটির ওপর ছিল এক প্রশান্ত কল্যাণশীলা মায়ের দৃষ্টি। সে মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ভিন্ত। বহু বান্ধব-পৃষ্ঠপোষক থাকতেও নজরুলের জীবনে 'আদার্স হার্টে'র আশীর্বাদ করল না। মাইকেলের জীবনেও সকল কিছু ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নিঃসহায় সন্তান-সন্ততির জন্য চাঁদা তুলতে হয়েছিল—পুরোনো অমৃতবাজার ফাইলে তা লিপিবদ্ধ আছে।

অকলে চিত্তের মঠ তেমোর প্রহসন বাংলাবর্ট কোন এক কবি আমাদের দুয়ারে পোঁছে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু যাঁর গান গাড়োয়ান গায়, যাঁর কবিতা বিপ্লবী আবৃত্তি করে, যাঁর শব্দব্যঞ্জনায় গুঞ্জনদোলা এবং যাঁকে দেখবার জন্য বহুজনচিত্ত-তাষত, তাঁর গ্রন্থমালার বিস্তার-সম্ভাবনা সত্ত্বেও অভিশপ্ত আইন-বিধিবলে বিদ্রোহী কবি নজরুল চিরবঞ্চিত হয়ে রইলেন। বেঁচে থেকেও নজরুলের গ্রন্থমালা নজরুলের নয়।

বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সংগে কাজী নজরুল ইসলামের দুর্ভোগের তালিকায় কিছু কিছু মিল আছে। সমাজের খাস বাঙাল বাঙালী মধুসূদন হিন্দুধর্ম ছেড়ে, ব্রাহ্ম নয়, ব্রাহ্ম তখন অনেকটা সহনীয় হয়ে এসেছে, বিদেশী রাজধর্ম খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে-ছিলেন, শুধু দেশী খৃস্টান নয়, বিদেশী খৃস্টান মেয়েও বিয়ে করেছিলেন (যা আজ হিন্দু বাঙালী সমাজে জলভাত হয়ে গেছে)। কিন্তু এজন্য হিন্দু পণ্ডিত সমাজ-চালিত বহুত্তর হিন্দু সমাজেও তিনি অপ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। ঢাকায় এমনি এক সম্বর্ধনা সভায় কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলতেও হয়েছিল, তিনি শুধু বাঙালী নন, নির্ভেজাল বাঙালও বটেন। কিন্তু বলেছি, সব চাইতে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের সতত উদ্যত আশীষ-পাণি মধুসূদনের মাথার ওপর বিস্তারিত ছিল। এজন্য বিদ্যাসাগরকেও লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। কিন্তু স্বমাতৃধন্য বিদ্যাসাগরকে কেউ লেশ-মাত্র বিচলিত করতে পারে নি।

তবে কি নজরুলের মায়ের প্রতি অজ্ঞাত-কারণ অভিমান তাঁর জীবনে অভিশাপ-রূপে দেখা দিয়েছিল? র‍্যাশানাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর সবটাই কুসংস্কারের আবেগ বলে অগ্রাহ্য হবে। কিন্তু মানুষের জীবনে নিজের বা পরের প্রতি অভিমান মানুষকে আত্ম-উদাসীন, এমন কি বেপরোয়া আত্মহনন-প্রবণ করে তোলে এও যাঁরা অবৈজ্ঞানিক ইর-র‍্যাশানাল বলেন, তাঁরা সোজাসুজি নির্বোধ।

শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় "সাপ্তাহিক বসুমতীর" ৪৭শ সংখ্যায় (২১ মে, ১৯৭০) "নজরুল ও তাঁর মা" শিরোনামায় প্রশ্ন তুলেছেনঃ

> "নজরুল জীবনের একটি রহস্যজনক প্রশ্ন এই যে, নজরুল তাঁর মায়ের ওপর অভিমান করলেন কেন? এই দুর্জয় অভিমানের জন্য কখনও কবি তাঁর মায়ের কাছে চুরুলিয়ায় আর গেলেনই না, হুগলী জেলে অনশনের সময়েও মায়ের সংগে সাক্ষাৎ করলেন না, এমন কি মৃত্যুর সময়েও মায়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে কবি একটিবারও দাঁড়ালেন না কেন? এই দুর্জয় অভিমানের কারণ কি?"

মুজঃফর আহমেদের 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা', আবুল ফজলের 'বিদ্রোহী কবি নজরুল', অশোক গুহের 'অগ্নিবীণা বাজান যিনি' বই তিনটি থেকে প্রাণতোষবাবু সমর্থনে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এর জবাব উদ্ধার করতে পারেন নি। তবে বলতে হবে নজরুল-জীবনের একটা মস্ত নিয়ামক অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। নজরুল-জীবনের পরবর্তী বহু কথাই তবে অনুমান-নির্ভর এবং তার অন্তঃপ্রকৃতি অজ্ঞাত।

মাইকেল মধুসূদন যেমন তৎকালীন পণ্ডিত-মূর্খদলের অপাঙক্তেয়, সুতরাং শিখান্দোলিত পুরোহিতদের প্রভাবিত অবোধ জনসাধারণের অশ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন, কাজী নজরুলও তেমনি হিন্দু সমাজের একটা অংশে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করায় ঈর্ষার পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাতেও দুঃখ ছিল না, একদিন বিশাল বাঙালী হিন্দুসমাজ তা জীর্ণ ও আত্মসাৎ

হয়ে নিতও এবং বলতেই হবে যে প্রবণতা একদিন হয়তো বড়ই ছিল, তা আজ বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সবচাইতে মর্মান্তিক, কাজী নজরুলের স্বধর্মীরাও তাঁকে কাফের বলে শুধু বর্জনই করতে চায় নি, কবির বিদ্রোহীসত্তাকে একেবারেই গ্রহণ করে নি ওঁদের তরুণ সম্প্রদায়। অনেকে নজরুলকে অনুকরণ করে মাত্রাহীন আরবী-উর্দু শব্দে যথেচ্ছ যথেষ্ট কবিতা লিখেছেন, কিন্তু যে প্রবল শক্তির ডায়নামোটা বিদ্রোহীকে চালিত করেছে তা ধরার বা বোঝবার মতো ক্যাথলিক হতে পারেন নি; যদি পারতেন তবে নিশ্চয়ই হিন্দু বিপ্লবীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও একটা তাঁদের মধ্যে স্বদেশী বৈপ্লবিক মানসিকতা গড়ে উঠত এবং বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন একান্তভাবে সম্প্রদায়গত বলে চিহ্নিত হতে পারত না।

প্রসঙ্গত, সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর ২৩ মে তারিখের সংখ্যায় "নির্বাচনে নজরুল" শিরোনামায় আবদুল আজীজ আল-আমানের লেখা থেকে কিছু উদ্ধার করলে বক্তব্যটা পরিস্ফুট করা যেতে পারে, নজরুল ইসলামের "অবিবেচনাপ্রসূত" নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা। ১৯২৬।

"খান সাহেবের মজলিসে তখন তাঁর কিছু সংখ্যক সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। নজরুলের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটতে না ঘটতেই একজন বললেন, আপনি তো কাফের, আপনাকে ভোট......

"...আমি কাফের হই তাতে ক্ষতি নেই তবে আপনারা অনুগ্রহ করে যদি আমার দু'-একটি কবিতা শোনেন।

"প্রথমে দু'-একটি কী সব কবিতা আবৃত্তি করলেন কবি, তাতে বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। কিন্তু উদাত্তকণ্ঠে যেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'মোহরুরা' আবৃত্তি শুরু করলেন, সমবেত জনমণ্ডলীতে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সূচনা হল।...যে ভদ্রলোক কবিকে মুখের উপর কাফের বলেছিলেন তিনিই সর্বপ্রথমে কেঁদে ফেললেন। আরো অনেকের চোখে অশ্রু দেখা গেল।"

কিন্তু এত করেও কিছু হল না : বরিশালের জমিদার মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী এবং বিখ্যাত মুসলিম জননেতা আবদুল হালীম গজনবী এ নির্বাচনে জিতেছিলেন. আর জামানত জব্দ হয়েছিল মফিজউদ্দীন আহম্মদ ও কাজী নজরুলের। (ঐ)

এই সংবাদে নজরুলের যেমন একটা অনুদ্ঘাটিত দিক জানা যায়, তেমনি জানা যায় যে মানসিকতা থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি তাও। নির্বাচন হচ্ছিল ঢাকা বিভাগে কেন্দ্রীয় আইন সভার মুসলমানদের জন্য দুটি সংরক্ষিত আসনে। (ঐ) আজ বাংলাদেশে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে এবং যে সংখ্যাগুরুদেরই দুই-তৃতীয়াংশ বাংলা নিয়ে হল পাকিস্তান তাঁদের জন্য সংরক্ষিত আসন।

একথাটিও বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার যে, পাকিস্তান সৃষ্টির বহুদিন পর কাজী নজরুল যে স্বীকৃতি পেলেন তা তাঁর বিদ্রোহী সত্তার জন্য নয়, পয়লা নম্বর তিনি মুসলমান বলে, দ্বিতীয় নম্বর বাঙালী কবি বলে, তৃতীয় নম্বর তখনও রবীন্দ্রনাথ গ্রহণীয় হন নি বলে। তার-পরও যে কাজী নজরুল সরকারী রেডিওতে স্বীকৃতি পেয়েছেন সে তাঁর অন্য গানের জন্য; প্রধানত, প্রেম-সঙ্গীত। 'কারার এই লৌহ কপাট' অথবা 'শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল' অথবা 'দুর্গম গিরি'র জন্যও নয়।

'আব্বাস যেমন শুধু গাইয়ে হয়ে (গীতিকার হয়ে নয়) এবং জসীমউদ্দিন যেমন কবি হয়ে (গাইয়ে হিসেবে নয়) অ-কারণে পাকিস্তানবাসী হয়েছিলেন বা হয়েছেন, কাজী নজরুলও তা হতে পারতেন। আব্বাস-জসীম উদ্দিনের স্বীকৃতি 'ঘৃণিত' হিন্দুরাই দিয়েছেন, যেমন নজরুলকে তাঁরা আপনজন মনে করেন। কাজী নজরুল যে যান নি সেও এক এক্সিডেন্ট; টানাটানি এককালে কিছু কমও হয় নি, তবুও যে 'ভাগ হয়নিকো নজরুল' এ কিন্তু কতকগুলো ঘটনা-পরম্পরার আন্তঃক্রিয়ার পরিণতি মাত্র। সেটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

এবং যে-কথা শুরুতে বলেছিলাম; নজরুল ভাগাভাগি হয় নি, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দায়িত্বভার ভাগাভাগি হয়েছে এবং দুইয়ের মধ্যে কিছু জেদাজেদি থাকলেও মানসিক দৃষ্টিকোণও কিন্তু দুটি। তবু এই থেকেই অনেকের আন্তরিক উপসংহার বিচ্ছিন্ন বাঙালী জাতির মধ্যে প্রমত্ত পদ্মা-নদীর ওপর তিনিই প্রথম সেতুবন্ধ।

শেষ সোজাসুজি প্রশ্ন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের কাছে। কাজী নজরুলের রেডিও ডোর সোসাইটিতে লালিত হবার দুর্ভাগ্য হয় নি রবীন্দ্রনাথের মতো; তবু এই সর্বত্র ভেড়াভাঙ্গা সমতল ক্ষেত্রে কাজী নজরুলের এই দুর্গতি কেন হল তা নিয়েও একটু ভাবেন না। একজন তাঁর স্বধর্মী হিমালয়তুল্য প্রমাণ মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছিলেন, শ্যামাসঙ্গীতই ও তৎসংশ্লিষ্ট সাধনাই নাকি তাঁর হয়েছে কাল। শুনে আমি শুধু এই সিদ্ধান্তের ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে থেকে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। ইতিহাস। তুমি কি সত্যি বাংকায়?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

দক্ষিণ য়্যাটা এবং মানিয়ানিতে আমার দ্বিতীয়বার পদার্পণ

কেনিয়ার সবক'টি বন্দিশিবিরই নিঃসঙ্গ, গরম এবং অস্বাস্থ্যকর এলাকায় অবস্থিত ছিল; দক্ষিণ য়্যাটার বেলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। নাইরোবির ৩০ মাইল দূরবর্তী থিকা শহরতলীর থেকেও পাঁচিশ মাইল দূরে এক নিঃসংগ প্রান্তরে দক্ষিণ য়্যাটা বন্দিশিবির চালু করায় কেনিয়া সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দিয়ে য়্যাটা নামক জল-খাল কাটান। এই জল-খাল পরিকল্পিত হয় ১৯২৫ সালে এবং এর উদ্দেশ্য ছিল চল্লিশ মাইল দূরবর্তী মুবানাথী নদী থেকে জল এনে য়্যাটার শুষ্ক প্রান্তরে আকম্বা উপজাতির সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। দক্ষিণ য়্যাটা শিবিরে সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে শারীরিক পরিশ্রম করতো। সক্ষম জোয়ানেরা মাটি খুঁড়তো, অক্ষম বৃদ্ধ এবং পঙ্গুরা পায়খানার বালতি বয়ে নিয়ে যাওয়া ও পরিষ্কার করার কাজ করতো এবং বাদবাকী যারা অসুস্থতার কারণে বাইরে যেত না, তারা সবাই শিবির পরিষ্কার ও অন্যান্য জনখাটার কাজ করতো। শেষোক্ত কাজের পরিমাণ ছিল এতো বেশি যে, পারতপক্ষে যারা অসুস্থ তারাও নেহাৎ দায়ে না পড়লে মাটি খোঁড়ার কাজে যাওয়াই শ্রেয় মনে করতো। ফলে কাজে ফাঁকি দেওয়া হতো না কারুরই, কিন্তু যারা অসুস্থ তাদের সম্পূর্ণ নিরাময় হতেও সময় লাগতো অনেক দিন। ২৩শে জুন যখন আমরা দক্ষিণ য়্যাটায় পৌঁছাই তখন অবধি মোট জল-খালের সাড়ে চার মাইল কাটা হয়ে গিয়েছিল, পরের দু' মাসে আমরা তাকে আরও দু' মাইল এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হই।

কেনিয়া সরকারের হাতে এ সময় সবসমেত আশী হাজারের মতো রাজবন্দী ছিল। এতো লোককে কিছু অনির্দিষ্টকাল ধরে হাজতে রাখা সম্ভব নয় জেনে সরকার পক্ষ থেকে কিছু কিছু লোককে ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার ভিত্তি দু'ধাপে তৈরি : বন্দীর নিজমুখে দোষ স্বীকার করা এবং তারপর কিছুকাল ধরে কঠিন শারীরিক পরিশ্রম। পরিকল্পনার গোড়ায় আমাদের সবাইকে আর একবার করে বাছাই করে 'কালো', 'ধূসর' ও 'সাদা' অংশে ভাগ করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সরকারও এই নাম তিনটির দ্বিতীয় তাৎপর্য বুঝতে পেরে তাদের বদলে ক-১ (কঠিন সন্ত্রাসবাদী), ক-২ (সাধারণ সন্ত্রাসবাদী), খ-১ (ধূসর) এবং খ-২ (সাদা)—এই চারটি ভাগের প্রচলন করেন। বন্দিশিবিরগুলিকেও ঢেলে সাজিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা হয় : বিশেষ শিবির এবং শ্রমিক শিবির। প্রথম অংশে সব ক এবং সামান্য কিছু খ-১-দের রাখা হয়, দ্বিতীয় অংশে যায় বেশিরভাগ খ-১ এবং সব খ-২'রা। শ্রমিক শিবিরগুলি কোন কোন পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যের কাছে স্থাপন করা হয়, যাতে সেখানকার বন্দীরা পরিকল্পনার কাজে শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের "পাপ" ধুয়ে ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীর ফলে এই সমস্ত বন্দীকে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, যা তারা নিজেদের নামে পোস্ট অফিসে গচ্ছিত রেখে সুদে বাড়াতে পারতো বা শিবিরের বিশেষ সুখ-সুবিধার বিনিময়ে খরচ করতে পারতো। কিকুয়ু অঞ্চলের কয়েক জায়গায় ঐ রকম কয়েকটি শ্রমিক শিবির স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক রাজবন্দীই তার নিজের কাজে উন্নতি করলে পর ধীরে ধীরে তার নিজস্ব গ্রামের কাছে অবস্থিত শিবিরের দিকে বদলি হতো। সেখানে তার ওপর বেসরকারী চাপ দিতো তার আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামের বয়োবৃদ্ধরা যাতে করে সে আবার সাধারণ নাগরিক হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, তারপর একদিন স্থানীয় চীফ (গ্রামের মোড়ল) এবং সরকারী কর্মচারীরা তার "বিচার" করে স্থির করতেন যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা। এভাবে অনেককে ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হলেও সরকারী পরিকল্পনায় প্রায় ১২,০০০ বন্দীকে বরাবরের জন্য ধরে রাখার বন্দোবস্ত ছিল।

এইভাবে আফ্রিকানদের পুনর্বাসন করার পরিকল্পনায় মাউ-মাউ বিদ্রোহ সম্বন্ধে সরকারী চিন্তাধারায় যে মৌলিক গলদ ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের আমরা ছিলাম এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাকে এইভাবে বাছাই করে বিনষ্ট করা সম্ভব ছিল না। ১৯৫০ ও তার পরের কয়েক বছরের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের এই জাতীয়তাবাদ আমাদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে সেঁধিয়ে গিয়েছিল যে, একে বাদ দিয়ে কেউই নিজেকে 'আফ্রিকান' বলে ভাবতে পারতো না। এ কথা অবশ্য সত্য যে, কিছু লোকের মনে এই ভাব বিকৃত রূপ ধারণ করে এবং এর প্রকাশ পায় নানারূপে এবং আর কিছু লোক এই সর্বগ্রাসী চিন্তার বাইরেও বাঁচতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদ যদি মানুষের মন থেকে কেবল মৃত্যুর শীতল

স্পর্শেই নেভান সম্ভব ছিল। ঔপনিবেশিক কেনিয়া সরকার দুটি ভুল করেছিলেন। প্রথমত তাঁরা মনে করেছিলেন যে, মাউ-মাউ বিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাদ দুটি আলাদা জিনিষ এবং এদের একটিকে বাদ দিয়েও অন্যটির বিষয় কিছু করা সম্ভব; তাঁরা এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারেন নি যে, জাতীয়তাবাদের প্রচেষ্টাকে ধামাচাপা দিতে দিতে কেনিয়া এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, যেখানে 'মাউ-মাউ বিদ্রোহ' এবং 'জাতীয়তাবাদ' দুটি পরস্পর বিনিময়যোগ্য কথামাত্র। দ্বিতীয়ত তাঁরা এই ভেবে সান্ত্বনালাভ করেন যে, শপথ গ্রহণের কথা রাজবন্দীদের মুখ থেকে স্বীকার করাতে পারলেই তাদের মন থেকে তার ছাপও নষ্ট করা যাবে। এ বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারার কোন খবরই বিদেশী কেনিয়া সরকার রাখতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, এইভাবে সর্বজনসমক্ষে শপথ গ্রহণের কথা স্বীকার করে আমরা—জাতীয়তাবাদীরা বিশেষ কিছু লাভ করবো এবং সেই সঙ্গেই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করতে এগিয়ে যাব। আমরা,
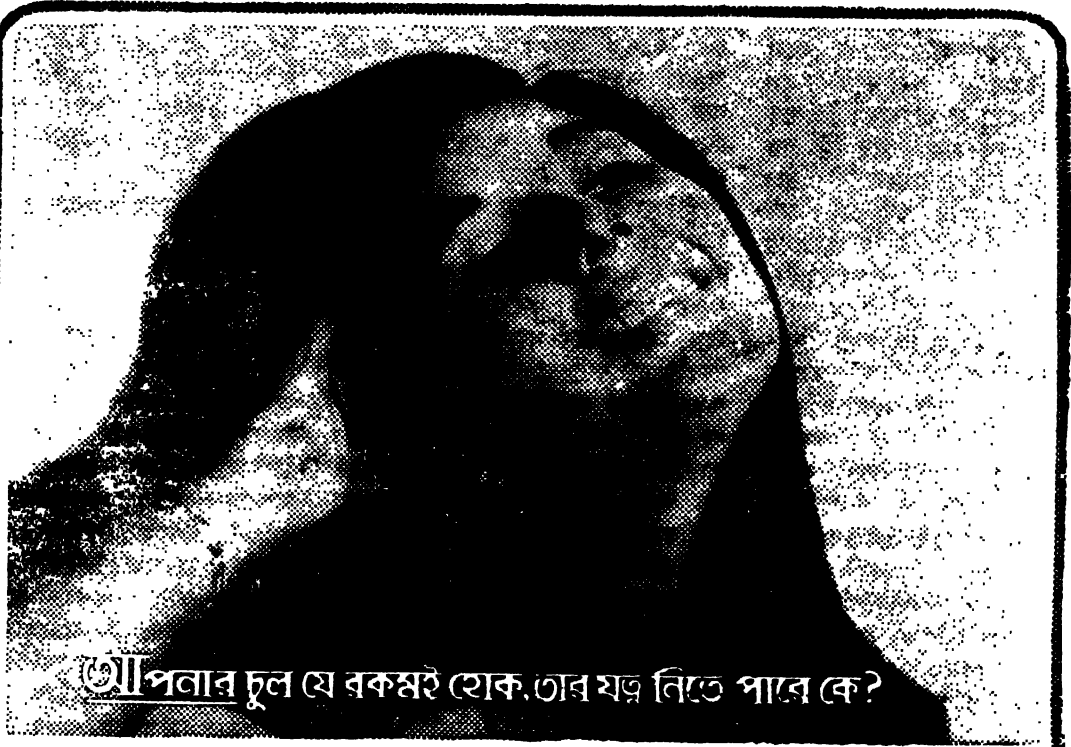
তারা সরকারের পুনর্বাসন অনুক্রম মেনে নিই নি। বিশ্বাস করতাম যে, শপথ গ্রহণের কথা স্বীকার করলে বিদ্রোহের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এক মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলব, যার ব্যতিরেকে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমরা আরও বিশ্বাস করতাম যে, বিদ্রোহীদের ভেতর যারা পরে সরকারী আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল, তারা শুধু অপেক্ষাকৃত আরামের জীবনের লোভেই ঐ কাজ করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারার কোন পরিবর্তনের ফলে নয়। অনেকরকম কষ্ট সহ্য করে জঙ্গলে লড়াইয়ে নাম দেওয়া বা রাজবন্দী হিসেবে কঠোর শাস্তি স্বীকার করে নেওয়ার মত মানসিক ক্ষমতা তাদের ছিল না। এজন্যই এদের ওপর খুব বেশি রাগ আমরা করতে পারি নি, যদিচ আমাদের সংখ্যা লাঘব হওয়ায় দুঃখ পেয়েছিলাম নিশ্চয়। যে সমস্ত সহকর্মী আমাদের এভাবে ছেড়ে সে সময় সরকারী পক্ষে যোগদান করেছিল, তাদের ভেতর অনেকেই আবার এখন জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় এবং দেশহিতকর কার্যে লিপ্ত আছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ক্ষতি শুধুমাত্র সাময়িকভাবেই হয়েছে। যে সমস্ত সরকারী পরিদর্শক আমাদের বন্দিশিবিরগুলি দেখতে আসতেন তাঁদের বেশিরভাগই মন্তব্য করতেন যে, একদিকে আমাদের —অর্থাৎ অনমনীয় বিদ্রোহীদের হাবেভাবে কিরকম এক অমানুষিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছিল, আর অন্য দিকে যে সমস্ত বিদ্রোহী সরকার পক্ষে যোগ দিয়েছিল তাদের মুখে এক শান্তির প্রসন্ন ভাব বিরাজ করতো। এ বিষয়ে শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আসলে আমাদের মনেই ছিল একনিষ্ঠতার শান্তি যা অন্যপক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাদের ছিল মুখে এক, আর মনে আর এক।

যাহোক, এভাবে বন্দিজীবন থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় বিভিন্ন রাজবন্দীর ওপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে। কিছু লোক সরাসরি সত্যি কথা বলে সরকারের বিশ্বাস অর্জন করে, অন্যদিকে অনেকে জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলে শুধুমাত্র জেলের কষ্টকর জীবন থেকে রেহাই পাবার জন্য। আমরা—যারা সর্বান্তকরণে বিদ্রোহের সপক্ষে ছিলাম—স্থির করি যে, যতদূর সম্ভব কষ্ট সহ্য করেও আমরা সরকারকে সাহায্য করবো না, বরং উল্টে তাকে আরও বিপর্যস্তই করবো। বন্দীদের পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রথমদিকে কোনরকম শারীরিক জোর-জুলুম করার প্রথা ছিল না; কিন্তু এরকম কাজে প্রথমদিকে ফললাভ হয় স্বভাবতই আস্তে, ফলে সরকারী কর্মচারীরা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং বন্দীদের ওপর দোষ "স্বীকার" করাবার উদ্দেশ্যে মারপিট করা আরম্ভ করেন। যে কোন দেশেই বা যে কোন সময়েই কিছু লোক শারীরিক আঘাতের ভয়ে প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই মুখে 'স্বীকার' করবে, কিন্তু শেষ অবধি তার কোন অংশই তারা মন দিয়ে মানবে না। আমাদের বন্দিশিবিরগুলিতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি এবং এই জন্যই শুধুমাত্র দোষ মুখে স্বীকার করিয়ে পুনর্বাসনের যে পরিকল্পনা সরকার করেছিলেন তার মূল ভিত্তিই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। সরকারী আদেশের ঠিক কোন্ পর্যায় বন্দীদের ওপর মারধোর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব হলেও এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং মন্ত্রীমণ্ডলের ভেতর অনেকেই এ ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আমরা নিজেদের ভেতর তুলনামূলকভাবে বলাবলি করতাম যে, সরকার চান যেন আমরা প্রত্যেকে একটি গোল নলের ভেতর দিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ি পৌঁছাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যদিচ নলটির মাপ ছিল বাঁধাধরা, আমাদের ভেতর কেউ কেউ ছিলাম আকারে বড় (অর্থাৎ অনমনীয় বিদ্রোহী)। কাজেই নলের ভেতর ঢুকতে গেলেই চট্ করে আটকে যেতাম। আমাদেরও এই নলের ভেতর জোর করে পিটিয়ে ঢোকাবার জন্য সরকার আমাদের মাথায় হাতুড়ির ঘা মারতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তবু সবাইকে পিটিয়ে ছোট করতে পারেন নি। আমরা এ কথাও বলতাম যে, এই ছোট মাপের নলের ভেতর না ঢুকে আরও অন্যপথে বাড়ি পৌঁছাবার সহজ উপায় আমাদের জানা আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউই আমাদের কথা শুনছে না।

দক্ষিণ য়্যাটাই ছিল আমার অভিজ্ঞতায় প্রথম শ্রমিক-শিবির। এখানে আমার নম্বর ছিল S.Y.W.C. (South Yata Work Camp) ১৮৮০। শিবিরের পরিমাপ মানিয়ানির থেকে ছিল অনেক ছোট এবং আমাদের বসবাসের জন্য তৈরি এল্যুমিনিয়ামের কুঁড়েঘরগুলি প্রায় গায়ে গায়ে লাগান ছিল। মানিয়ানিতে এগুলির মাঝে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছিল। দক্ষিণ য়্যাটায় পৌঁছে আমাদের স্বাগত করার জন্য বিশেষরকম মারধোর করার বন্দোবস্ত হয়নি দেখে সবাই যথেষ্ট আশ্বস্ত বোধ করেছিলাম। আমাদের রেশন হিসেবে এখানে বরাদ্দ ছিল মাত্র আট আউন্স ভুট্টার আটা এবং ছয় আউন্স সীম এবং বসবাসের সরঞ্জাম ছিল মানিয়ানির থেকেও খারাপ। চিকিৎসাদির জন্য কোন শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ লোকের বন্দোবস্ত ছিল না; মুরিথি কিহারা নামক এক বন্দীকে আমরা বেসরকারীভাবে ঐ কাজে নিযুক্ত করি, কারণ বন্দিজীবনের আগে কিছুদিন নাইরোবীর "রাজা ষষ্ঠ জর্জ" নামক হাসপাতালে সে চাপরাসীর কাজ করেছিল। আমাদের সকলকার ভেতর চিকিৎসা শাস্ত্রে তার অভিজ্ঞতাই ছিল সবথেকে বেশি! বেচারা তার যথাসম্ভব সাহায্য করতো আমাদের, কিন্তু "পেল্লাগ্রা" নামক এক বিশেষ সংক্রামক রোগের সে নিরোধ করতে পারেনি এবং শুধু অচিকিৎসার ফলে একজন বন্দী অকালে তার জীবন হারায়। বন্দিশিবিরে ধূমপান এবং নস্যি গ্রহণ সরকারীভাবে অনুমোদিত ছিল এবং বন্দীরা জনখেটে যে পারিশ্রমিক পেতো তা দিয়ে ঐ সব জিনিষ শিবিরে অবস্থিত দোকান থেকেই কিনতে পারতো।

আমাদের খাটতে হতো প্রচুর; ভোর পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে ভুট্টার আটার তৈরি সামান্য পরিমাণে লপসীজাতীয় খাবার খেয়ে ছটার ভেতর শিবিরের প্রধান দরজায় হাজিরা দিতে হতো জনখাটবার বিলি-ব্যবস্থার জন্য। সেখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে জল-খাল কাটতে আমরা হেঁটেই যেতাম, আর ফিরতাম সে সন্ধ্যেবেলায়। মাটি কাটার কাজ আমাদের মাপ করে

দেওয়া হতো এবং তার পরিমাণ এতো বেশি ছিল যে, বুড়ো বা অথর্বরা দূরে থাক, জোয়ানরাও রোজ তাদের নির্ধারিত পরিমাণ শেষ করতে পারতো না। কাজ পুরোপুরি শেষ না করতে পারলে সেদিনের 'হাজিরা' মিলতো না, ফলে মাসের শেষে মাইনেও কাটা যেত সেই অনুপাতে। দু'মাস পরে আমি যখন দক্ষিণ য়্যাটা শিবির থেকে চলে যাই, ততদিনে অনেক বন্দীই এক মাসের মাইনেও "উপার্জন" করতে সক্ষম হয় নি, যদিচ কাজ তারা প্রতিদিনই করেছে।

আমাদের প্রহরীরা ছিল আকম্বা উপজাতীয় এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র ছিল চমৎকার। তারা কখনোই আমাদের ওপর মারধোর বা কোনো অন্যায় আচরণ করেনি, বরং মাঝে মাঝে কঠিন পরিশ্রমে মাঠে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারা আমাদের কয়েকজনকে জল-খালের নিকটস্থ তাদের গ্রামে নিয়ে যেতো। সেখানে তাদের কুটিরে বসে আমরা জিরিয়ে নিতাম, আবার কখনো কখনো তারা আমাদের সেখানে খেতেও দিত। মানিয়ানি থেকে আমাদের দক্ষিণ য়্যাটায় আসবার আগে ঐ শিবিরটি টাঙ্গানিয়্যাকার উত্তর প্রদেশে যে কিকুয়ুরা অস্থায়ীভাবে চাকরীবাকরী বা বসবাস করছিল, তাদের কেনিয়ার কিকুয়ুপ্রধান অঞ্চলে পুনর্বাসনের পথে বিশ্রাম-শিবির হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐ সব কিকুয়ু আমাদের মতো "মাউ-মাউ"র একতার শপথ গ্রহণ করেনি, কারণ তাহলে আমাদের আসার কিছুদিন আগেই যে ঘটনাটি ঘটে তা সম্ভব হতো না। দক্ষিণ য়্যাটা শিবিরে থাকাকালীন ঐ কিকুয়ুদের স্থানীয় আকম্বা যুবতী নারীদের সাথে আলাপ হয় এবং তাদের অনেকেই সন্ধ্যের পর কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে শিবিরের ভেতরও আসতো গল্পগুজবের অছিলায়। সে সময় শিবিরের অধিকর্তা ছিলেন চিকেস্টার নামক একজন ইউরোপীয়ান এবং তিনি স্থানীয় আকম্বাদের প্রত্যেক রবিবারে শিবিরের এলাকার ভেতর আসবার অনুমতি দিয়েছিলেন ফলমূল, খাবার-দাবার বিক্রি করার জন্য। কয়েকজন উদ্যোগী কিকুয়ু যুবকের প্রচেষ্টায় সুন্দরী আকম্বা যুবতীরা ফলমূল বেচতে এসে শেষ অবধি শিবিরেই রাত্রিবাস করে যেতে আরম্ভ করে এবং ফলে মাস চারেক পরে তাদের একজন যে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তাতে আর আশ্চর্য কি? পাঠকের মনে আছে নিশ্চয় যে, একতার শপথের একটি অনুশাসন ছিল যে, কেনিয়া স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করবো না। যাক্, আকম্বা প্রথা অনুযায়ী দায়ী ছেলেটিকে হয় মেয়েটির পাণিগ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, না হয় মেয়ের বাবাকে খেসারতস্বরূপ একজোড়া ছাগল ও একটি ভেড়া খুনগাত দেবার কথা. কিন্তু এর কোনটিই পালন করার অবস্থা ছিল না প্রেমিক কিকুয়ু যুবকটির। তখন আকম্বা সমাজপতিরা স্থির করেন যে, শিবিরের অধিকর্তা হিসেবে চিকেস্টার যুবকটির বাবার মতো, অতএব সেই ছাগলের জোড়া ও একটি ভেড়া খুনগাত দিতে চিকেস্টারই বাধ্য! এই রায়ের বিরুদ্ধে বেচারা চিকেস্টার খুব বেশি আপত্তি

জানান নি, কারণ শিবিরের ভেতর যুবতী নারীদের আসতে দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনিই এবং এ বিষয়ে ওপরওয়ালার কানে কোন কথা পৌঁছায় তাও তিনি চাইতেন না। খেসারতের মাংস শিবিরের আকম্বা প্রহরীরাও ভাগ পায় এবং সেদিন সবাই মিলে যথেষ্ট আমোদ-আহ্লাদও করে। শিবিরের ভেতর ভোজের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং চিকেস্টার এবং দায়ী কিকুয়ু যুবকটি। যুবতীটি যথাকালে যমজ সন্তান প্রসব করে এবং তাদের দুজনকে সবাই চিকেস্টারের "ধর্মপুত্র"—এই আখ্যা দেয়। এই ঘটনার পর নিয়ম করে দেওয়া হয় যে, শিবিরের এলাকার ভেতরে কোন নারীই—যুবতী বা বৃদ্ধা আসতে পারবে না, কিন্তু শিবিরের বাইরে যুবক-যুবতীদের মিলনে কোনরূপ বাধা নিষেধ জারি করা হয় নি।

আগেই বলেছি, টাঙ্গানিয়্যাকার কিকুয়ুরা একতার শপথ গ্রহণ করলে এ ঘটনা ঘটা সম্ভব হতো না, কারণ শপথে শুধু স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করাতেই বারণ ছিল না; তাদের সঙ্গে প্রেমালাপ করা, মদ্যপান করা বা গাঁজা টানাও নিষেধ ছিল। শপথগ্রহণকারী কোন বিদ্রোহী কোন নারীর সঙ্গে প্রেমালাপ করছে, এইটুকু দেখতে বা জানতে পারলেও তাকে তেমনি কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো, যা কি কোন নারীর সঙ্গে সহবাসের শাস্তিরই সমান। এই দোষে অপরাধীর শাস্তি ছিল হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থায় পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করা, যা কি খুবই কষ্টসাপেক্ষ এবং বেদনাদায়ক।

এ ছাড়া প্রয়োজন হলে এর থেকেও কঠিন শাস্তি ছিল অপরাধীকে সমাজ-চ্যুত করা, যার ফলে বেচারা বেঁচে থেকে মরার যন্ত্রণা ভোগ করতো। এইরকম কঠিন শাস্তির প্রচলন থাকার ফলে আমাদের সকলেই শপথের নিয়ম-কানুন মেনে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো এবং আমাদের ভেতর কেউই দক্ষিণ য়্যাটা শিবিরে থাকাকালীন আকম্বা নারীদের সঙ্গে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে নি। ফলে স্থানীয় লোকেরা আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতো।

দক্ষিণ য়্যাটায় আমার কয়েকজন পুরনো বিদ্রোহী বন্ধুর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়, যার ফলে আমরা সকলেই আনন্দিত হই। বিশেষ করে বন্ধুবর গাদ্ কামাউ গাথুম্বির সঙ্গে বসে আবার গল্পসল্প করার সুযোগ পাই আমি। গাদ্ আমার অনেক আগেই মানিয়ানি থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছিল। দক্ষিণ য়্যাটা শিবিরের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা আমাদের মোটেই পছন্দ হয় নি এবং বন্দীদের অনেকেই যথাযোগ্য পুষ্টিকর খাওয়ার অভাবে ক্ষীণ ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে আমি এ বিষয়ে নালিশ করে আর একদফা চিঠি লিখি বিলেতে মন্ত্রিসভায়, সেখানকার বিধানসভার সদস্যদের ও কেনিয়ার রাজ্যপালকে। এতে আমি আরও জানাই যে, আমাদের জল-খাল কাটতে যাবার ও ফিরে আসবার জন্য লরীর বন্দোবস্ত করা হউক, চিকিৎসাদির যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করা হউক, সন্ধ্যেবেলা শিবিরে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হউক আর সর্বোপরি আমাদের খাওয়ার পরিমাণ নিয়মমাফিক বাড়িয়ে দেওয়া হউক। শিবিরের একজন প্রহরীর দ্বারায় চিঠিগুলি লুকিয়ে ডাকে দেবার বন্দোবস্ত করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি আমাকে, যদিচ বন্দীদের ভেতর কয়েকজন এর ফলাফল চিন্তা করে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল। গাদ্ ও আমি এজন্য তাদের ওপর যথেষ্ট রাগ করি এবং যথাসম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করি যে, আইনসঙ্গত অধিকারসমূহের জন্য আমাদের লড়তেই হবে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে, তাতে যদি আমাদের ওপর জোর-জুলুম করা হয়, তা হলেও ঘাবড়ে গেলে বা ভয় পেলে চলবে না।

আমার চিঠির ফল অদ্ভুতরকম ভাল হয়। সেটা পাঠাবার দু' হপ্তার ভেতরই আমাদের সমস্ত নালিশের সুরাহা হয়ে যায়। আমাদের দক্ষিণ য়্যাটায় পৌঁছবার আগেই চিকেস্টারের বদলীর হুকুম আসে সেখান থেকে। ১৯৫৫ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে সন্ধ্যেবেলা শিবিরের নবনিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষ আমাকে ডেকে পাঠান তাঁর দপ্তরে। প্রশ্নের উত্তরে চিঠি লেখার দায়িত্ব আমি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করি এবং শাস্তিস্বরূপ তিনি আমাকে নির্জন নিঃসঙ্গ ঘরে বন্দী করে রাখার হুকুম দেন। এভাবে এক মাসকাল আমাকে একা থাকতে হয় এবং এ সময়ে আমার জন্য শাস্তিমূলক খাবারেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এবারও প্রহরীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকায় আমার বরাদ্দের বাইরে অতিরিক্ত খাবার পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। কয়েকদিন পরে কর্মাধ্যক্ষ এ কথা জানতে পেরে আমার কুঁড়েঘরের চারিদিকে বিশেষভাবে কাঁটাতারের বেড়া লাগাতে আদেশ দেন। ওপরওয়ালারাও আমার ওপর তিতি-বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং ৩০শে আগস্ট আরও বিয়াল্লিশ জন 'ক'-শ্রেণীর বন্দীর সাথে আমাকেও রেলগাড়িতে করে মানিয়ানি শিবিরে ফেরত পাঠান।

মানিয়ানির চেহারা ঠিক আগের মতোই ছিল: শত শত এলুমিনিয়াম ধাতুর তৈরি কুঁড়েঘর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে, হাজার হাজার প্রহরী খাকি উর্দি পরে ব্যস্তসমস্তভাবে এখানে-ওখানে পাহারা করছে, প্রায় পনেরো হাজার আফ্রিকান বন্দী জেলের সাদা পোশাকে তারের দ্বারা সংরক্ষিত বেড়ার ভেতর থিকথিক করছে, অপেক্ষা করছে তারা স্বাধীনতা লাভের, তাদের কুচকুচে কাল মসৃণ চামড়া কড়া রোদ্রের আলোতে ঝকঝক করছে। কিন্তু কিছু অদল-বদলও হয়েছিল। মানলো বদলী হয়ে গিয়েছিল মানিয়ানি থেকে, এজন্য আমি ভগবানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম; আমাদের খাবারের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল, কারণ এবার আমরা 'নজাহি' নামক একরকম কালো ছোলা খেতে পেয়েছিলাম, যা কি কিকুয়ুদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। আমাদের বাড়িতে সাধারণত এই খাবার দেওয়া হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে আগত ও অন্যান্য সম্মানিত অতিথিদের, এবং বয়োবৃদ্ধদেব। কেনিয়ার জেল থেকে শেষবার খালাস পাবার পর আমি জোমো কেনিয়াটাকে কিছু পরিমাণ 'নজাহি' পাঠিয়েছিলাম আমার শ্রদ্ধা অর্পণের জন্য। যাক, কিছুদিন পরেই 'নজাহি' ফুরিয়ে যায়, কারণ শিবিরে আমরা ছিলাম সংখ্যায় অনেক। তারপর আমরা 'নজুগু' অর্থাৎ চীনেবাদাম খেতে পেয়েছিলাম নজাহির বদলে এবং এ-ও আমাদের এক বিশেষ প্রিয় খাদ্য। [ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ওর থেকে আম কিনে নিয়ে যাচ্ছে জনার্দন মল্লিক।

হেবো ধরেছে।

'এই, চারটে আম রেখে যা।'

জনার্দন মল্লিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি।

বলল, 'কেন ?'

'কেন বিরে। আম খাবো।'

হেবো হাসলো।

জনার্দন মল্লিক ভয়ে ভয়ে আম রেখে গেল।

আর একজন। কাল দেখেছে বিকেল বেলায়। একদম অচেনা মানুষ। লোকটা ঘাড় হেঁট করে যাচ্ছে, হেবো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

'ও মশাই, ও মশাই, শুনছেন ?'

'কি, কি ব্যাপার ? আমাকে ডাকছেন ?'

'হাঁ, হাঁ। দিন তো পাঁচটা টাকা। মাংস খাবো। অনেকদিন রেস্টুরেন্টে মাংস খাই নি।'

ভদ্রলোক ত' অবাক! কি আর করেন। যা ছিল সঙ্গে দিয়ে দিতে হল। কেন না, হেবো মাংস খাবে। অনেকদিন খায় নি। ভদ্রলোক স্পষ্টই বুঝলেন, যদি না দেন, তাহলে হেবো নির্ঘাৎ তাঁকেই খাবে। ব্যাগ থেকে দুটো টাকা দিয়ে বললেন, 'যা ছিল সব দিলাম।'

'বড্ড উপকার করলেন। দীর্ঘ পরমায়ু হোক।'

এইভাবেই হেবো জামাটা, প্যান্টটা, চোলাইয়ের খরচটা একে ধরে, ওকে মুখ খিঁচিয়ে করে, ভড়কি দেখিয়ে, মাথার ওপর সাইকেলের চেন ঘুরিয়ে নক্সা দেখিয়ে জোগাড় করতো।

কিন্তু চৌধুরীদের পার্টির কাছেই ফেঁসে গেল। জানতো না, ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছে। ঝাঁক ঝাঁক ভীমরুল বেরিয়ে এসে জানে মেরে দেয় আর কি।

কে একজন বলল, 'মদনদাকে গিয়ে ধর, এসব ব্যাপারে মদনদা—'

'কোন্ মদনদা রে ?'

'ঐ যে বিড়লার কারখানায় ইউনিয়ন করে।'

'সেক্রেটারী ? ইলেকশনে দাঁড়ায় ?'

'সবি ত' জানিস।'

'আমি মাইরী যাবো না।'

'কেন ?'

'ওর বেশ্যাপাড়ায় মাগী আছে।'

'তাতে তোর কি।'

'না মাইরী। যদি মাগীটার কাছে ধরে নিয়ে যায়।'

'ও নিজে যাবে। তোকে ধরে নিয়ে যাবে কেন ?'

'না মাইরী। যদি যায়।'

'শালা তুই এত খচ্চরা ? এখনও রং দিচ্ছিস ?'

মুখে যাই বলুক, মদনদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো হেবো। সমস্ত বলল। মদনদা মুগ্ধ হয়ে দেখছিলো হেবোর চেহারা। অমন করে দেখছে কেন মাইরী? যা—শালা, গাটা যে ঘুলিয়ে উঠছে। অমন করে দেখছে কেন ?

হেবো তাড়াতাড়ি বলল, 'মদনদা, মাইরী বাঁচান।'

মদনদার কপাল কুঁচকে গেল, নাকটাও। চোখ দুটো খুব সরু করে মদনদা গম্ভীর হয়ে, ছেড়ে ছেড়ে বললে, 'ভাই ত' হেবো। তোমার অপরাধ তো বড় কম নয়। তুমি ত' আবার চৌধুরীর গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছো।'

হেবো তাড়াতাড়ি মদনদার পা ছুঁয়ে বলল, 'মাইরী মদনদা, আল্লার কসম, ওসব চুরি-চুরি আমি করি না। কোন শালা আপনার কানে চুরির কথা তুলেছে ?'

কে মদনদার কানে তুলেছে সেকথা মদনদা বলল না, শুধু আগের মত গম্ভীর হয়ে বলল, 'সে না হয় আমি বুঝলাম তুমি চোর নও, কিন্তু পুলিশ ত' বুঝবে না।'

'মদনদা, বাঁচিয়ে দিন মাইরী। এই আপনার পা ছুঁয়ে—'

'আরে না, না। ওসব করতে হবে না। ঠিক আছে। তুমি যাও। দেখি কি করতে পারি।'

হেবো চলে গেল। পুলিশের উপদ্রব দু' চারদিন হল না। আবার পনেরো-ষোলো দিনের মাথায় হেবো এসে হাজির মদনদার বাড়িতে।

'মদনদা, পুলিশ ত' মাইরী খুব হুজ্জোৎ করছে।'

'কেন, আবার কি হল?'

'ঐ চৌধুরীদের কেস নিয়ে খুব পেছনে লেগেছে নতুন করে। আপনি সব মিটিয়ে দিলেন। আর আমি ত' ওদের পেছনে লাগি না। সেদিন থেকে নাক মলেছি। কান মলেছি। তবু শালা রোজ পুলিশ বাড়িতে হামলা করে। এটা ভাঙে, ওটা ভাঙে, আমার মাইরী বাড়িতে বুড়ো বাপ, ঘরে সোমত্ত আইবুড়ো বোন'—

'আচ্ছা যাও। আমি বলে দোব। আর ওসব হবে না।'

'ঠিক বলছেন ত'। মাইরী আপনার আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।'

'ঠিক?' মদনদা হাসলো।

এরও মাসখানেক পর ওই ডানদিকের ফুটপাতের গা ঘেঁসে একটা জিপ এসে দাঁড়ালো। ভেতরে মদনদা। আরো সব কে কে। সব ভালো ভালো পিরানপরা শরীফ আদমি। গোলগাল মুখ। কাঁধে মাংসের থাক। একজনের আঙুলে হীরের কুচি।

'এই হেবো, উঠে পড়ো, কুইক—'

'মদনদা আমি?'

'হ্যাঁরে বাবা। হেবো এখানে দু'জন নাকি?'

উত্তেজনায় গাটা গরম হয়ে উঠলো হেবোর। ঠিক বুঝতে পারছে না মদনদা তাকে নিয়ে কোথায় যেতে চায়? জিজ্ঞেস করাও যায় না, যা গম্ভীর। পেছনে পড়ে রইলো বেটা, মমতাজ, রসিদ আরো অন্য সাগরেদরা। ও গাড়িটা ধরে উঠে পেছনের সীটে বসতে গেল। মদনদা ওর হাতটা খপ করে ধরে বলল, 'না, না। আজ তুমি সামনে বোস। আরাম করে বোস।'

দশ-বারো মাইল যাবার পর একটা জায়গায় এসে গাড়ি ব্রেক করলো। জিপ থেকেই কোম্পানীর ছাপ-মারা কালো ঝুল চিমনীটা দেখা যাচ্ছে। ওটা অনবরত কালো কালো ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। নেমে পড়লো সকলে। বিরাট কারখানা। দু'জন দারোয়ান বসে আছে কোম্পানীর গেটের সামনে। গেটের ভেতরে কারখানা দেখলো। পেছিয়ে পেছিয়ে রেলের লাইন চলে গেছে ভেতরে। মাঝে মাঝে কম্পমান পাহাড়। কোথা থেকে যেন সাদা ধোঁয়া উড়ছে। মদনদা বলল, 'এই, চলো।'

একটু এগোতেই সামনে কোম্পানীর তৈরি খেলার প্রকান্ড মাঠ। সেই মাঠের এক কোণে একটা মঞ্চ। তেল-কালিমাখা কারখানার কিছু মজুর সেখানে বসে বসে জটলা করছে। কিছু ভদ্রলোকও আছে। তারাই ছুটে এলো মদনদাকে দেখে। মদনদাকে ঘিরে একটা রিং করে দাঁড়ালো।

'হাবুলবাবু, এদিকে আসুন।'

মদনদা ভীড় থেকে গলা বাড়িয়ে হেবোকে ডাকলো।

'হাবুলবাবু?'—যাঃ কলা। হেবো থেকে হাবুল? তাও আবার শুধু হাবুল নয়, হাবুলবাবু? হেবো বুকটান করে সামনে এসে দাঁড়ালো।

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দি।'

মদনদা বলল, 'ইনি কারখানার ম্যানেজার। বিরাট ব্যক্তি। ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ার। ইনি বিলাতফেরত ইঞ্জিনীয়ার, মিঃ প্যাটেল, ইনি শেঠ মগনলাল, লেবর অফিসর, আর ইনি হাবুল ঘোষ, তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন লীডর।'

হেবোরে, জেগে জেগে খোয়াব দেখছিস না ত' বাপধন! হেবো নিজেকে প্রশ্ন করলো। এতো সব দামী দামী লোক, চকচকে চেহারা, ঝকঝকে কথাবার্তা, এতো সব ডিগ্রী, এদের মাঝখানে আমি কেন? হেবোর চোখ ছানাবড়া, সে ট্রেড ইউনিয়ন লীডর, সর্বোনাশ, বক্তৃতা করতে হবে নাকি, না মাইরী, তা' যদি হয়, যদি মদনদার মনে এই থাকে, তাহলে মদনদার সঙ্গে এইখানেই কাট আপ, ওসব লীডারী ফিডারী চলবে না তার, সে গরীবের ছেলে, বক্তৃতা দিতে বললে সে কেঁদেই ফেলবে।

এক ফাঁকে ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলে মদনদাকে হেবো আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, 'বক্তৃতা করতে হবে নাকি আমাকে?'

'না, না।' হেবোর অবস্থা দেখে মদনদা আশ্বাস দিলো, 'আজ নয়, এখন দেখেশুনে নাও। বক্তৃতা দেওয়াটা কিছু নয়। আজ দিতে হবে না। কিন্তু একদিন ত' দিতেই হবে।'

'কেন মদনদা?'

'নইলে কি রোজ পুলিশের তাড়া খাবে?'

ওইখানেই শান্তির সঙ্গে তার প্রথম লেগেছিলো। ঐ শান্তিটা, ঐ ফচ্‌কের, এখনো আসে নি, কি যে রস পায়, মাসীর কাছে থাকে, মাসীটা ত' পাড়ায় পাড়ায় ঢোল-চিৎকৃত এতো বড়োটা করলো, নিজে এই বয়েসে সেলাই-এর কাজ নিয়েছে, টাঙস টাঙস করে অষ্টপ্রহর দাঁড়ানো সেলাই কলের মত চলছে ত' চলছেই, যদি ধর্মতলায় যাও, হ্যাঁ, সেখানে দেখবে বাঁ দিকের ফুট ধরে চলেছে একমনে, পাথুরে-ঘাটায় যাও সেখানেও দেখবে পায়ের দিকে নজর রেখে একমনে চলেছে, সেই সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক ঘোরে, তার কাছে থেকে শান্তি তোর এই 'দেশ দেশ' বড়মানুষী খেলা কেন? না হয় মদনদাদের কারখানায় তুই টাপী ক্লার্ক, কোনরকমে পেটটা ভরছে, তাই বলে 'দেশ' নিয়ে কথা বলার, ভাবার তুই হকদার?

'দেশ' নিয়ে ভাববে কারা? কেন মদনদার দু' দুটো লরী, একটা ক'খে [illegible], নিজে বিড়লার কারখানার সেক্রেটারী, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, সেখানেও কিছু হাতায় নিশ্চয়, বাড়িতে বৌ আর এক মেয়ে, কোন ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, 'দেশ' নিয়ে ভাববে মদনদা ছাড়া আর কে?

এতোদিন ছিল ভালো, ঐ শান্তিটা কারখানায় ঢুকে মদনদার পাল্টাপাল্টি আর একটা ইউনিয়ন তৈরির ঢেউ তুলেছে।

মদনদা ঠিকই বলে, 'বাঙালীর কিস্যু হবে না।' ছিলো একটা ইউনিয়ন, সহ্য হল না। ভেঙে দু' টুকরো করতে হবে। কেন ঐ মদনদার ইউনিয়নটাকেই জোরদার কর না। সেই কথাটা হেবো একদিন শান্তিকে বোঝাতে গিয়েছিল।

'দেখ্ শান্তি, তোর গায়ে আমি হাত তুলতে চাই না। প্রথমত, তুই পাড়ার ছেলে আর দ্বিতীয়ত তুই এক চড়ের খদ্দের। তোকে মেরে হাত গন্ধ করে লাভ নেই। তোর ইউনিয়ন ছেড়ে দে। বরং মদনদার ইউনিয়নকে মদত দে। একটা ইউনিয়নই থাক। দেখিয়ে দে, বাঙালীরও শালা ইউনিটি আছে।'

শান্তিটা শালা কম 'খচ্চর', উল্টে হেসে হেসে বললে, 'বাঙালীর ইউনিটিটা মদনদাকেই আগে দেখাতে বলো না হেবো। আরো একটা কাজ করতে পারো।'

'কি কাজ?'

'তুমিও তো মদনদার ইউনিয়নের ভালো চাও?'

'কে না চায়?'

'তুমি মদনদাকে ঐ ইউনিয়ন থেকে বার করে দাও না? তারপর তোমাতে-আমাতে মিলে একটা ইউনিয়ন..'

'কি?' মুহূর্তে ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে উঠেছিলো হেবো।

'তুই আমাকে বেঈমান হতে বলছিস?'

..মদনদা একদিন হেবোকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'হেবো, শুনেছি শান্তি তোমার পাড়ার ছেলে। সে ব্যাপারে তোমার একটা দায়িত্ব আছে। আমি চাই না বেচারীকে পুলিশ হেনস্থা করুক। ওর কি ইনটারেস্ট বলতো আমার পেছনে লাগার? আজ একটা সভা করবে ওরা মিল গেটের সামনে। তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো।'

বিকেল বেলা শান্তিকে 'বোঝাতেই' সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে হেবো জিপ করে মিল গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো।

গেটের সামনে একটা প্রকান্ড জমায়েত। শান্তি হাত তুলে, গলার শির ফুলিয়ে তখন বক্তৃতা করছে, 'মনে রাখবেন, আখেরি লড়াই এখনো বাকি, সামনে ভোর তুফান'...

ঠিক সেই সময় আমগাছটার আড়াল ভেঙে মমতাজ, বেটা, রসিদ, নরেনচাঁদ আর সবশেষে হেবো মাল টেনে চুর চুর হয়ে

বেরিয়ে এলো। কিভাবে আরম্ভ করবে কিছু বুঝতে না পেরে হেবো হঠাৎ কান্না-কাটি দিয়ে এন্তার খিস্তি করতে লাগলো। হেবোর দেখাদেখি জটা, রসিদ ওরাও আরম্ভ করলো।

দু-চার মিনিট পর শান্তির চোখে পড়ে গেল, শান্তি চোঙাটাকে সজোরে মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'ওরা ঐরকমই করবে। ওদের ওটাই কাজ। আপনারা একটুও বিচলিত হবেন না। উল্টে গালা-গাল দেবেন না। বন্ধুগণ, উসকানি দিচ্ছে মদনবাবু, লক্ষ্য রাখুন শুধু, এখুনি কিছু করবার দরকার নেই, বন্ধুগণ'—

হেবো অবাক। এ কি—রে। এতো গালাগাল দিলাম। এতো মা-বোন উদ্ধার করলাম, তবু চুপচাপ। খুব নক্সা দিচ্ছে ত'! দাঁড়া শালা কোৎকার কাছে সবাই জব্দ।

'মার শালাদের'—হেবো হুংকার দিয়ে সভার ভেতরে ছুটে গেল। তারপর যাকে পেল তাকে এলোপাথাড়ি মার ওরা সকলে মিলে দিলে। কিন্তু একি! শান্তিটা আবার চোঙে করে একি বলছে, 'বন্ধুগণ, জায়গা থেকে একচুল নড়বেন না। ওরা মারছে মারুক। হ্যাঁ—মার খেয়ে যান। আজ মার খেয়ে যান চুপচাপ। এরপর বদলা নেবেন। কিন্তু আজ না। ট্রেড ইউনিয়ন করতে এসেছেন, এতো সহজে ট্রেড ইউনিয়ন হয় না, মার খাবেন না, খিস্তি শুনবেন না, মাথা ফাটবে না, ট্রেড ইউনিয়ন হয়?...... বন্ধুগণ.... .'

যাঃ কয়লা! শান্তিটার কি মাথা খারাপ! লোকগুলোও ত' অদ্ভুত!

মার খাচ্ছে, মার শুধু আটকাচ্ছে হাত দিয়ে, মারের বদলে হাত তুলছে না, সভা ভেঙেও পালাচ্ছে না! এ-কি রে!

এ-কিরে বাবা, জটা, রসিদ, মমতাজ, মদেরচাঁদ—ওরাও অবাক হয়ে গেছে। এরকম একটা ব্যাপার ওরা এই প্রথম দেখলো। ওদেরও ত' লোকজন কম নেই।

যদি ডান্ডা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দি, যদি পেটো ছুঁড়ি তাহলেও নড়বি না?... আচ্ছা দেখছি। কিন্তু ডান্ডা, পেটো জিপের মধ্যে থাকলেও ওসব আমার উৎসাহ হেবোরা হারিয়ে ফেলেছে। এ যে এক-তরফা হয়ে যাচ্ছে। নিতান্ত আলুনি। দূর দূর। এ পারা যায় নাকি! এরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মার খাবে, আর ধাঁই ধাঁই পিটিয়ে যাবো, কতোক্ষণ পারা যায়?

'দাঁড়া শালা, একটু মাল টেনে আসি। তারপর দেখবি কোৎকার বহর'—বলে হেবোরা চলে গেল জিপ নিয়ে। আর এলো না। একতরফা মারামারিতে উৎসাহ নেই।

সেই থেকে শান্তিটার উপর হেবোর প্রচণ্ড রাগ।

শান্তি জানে, যে কোন মুহূর্তে হেবো ওকে মণ্ডল পার্টি থেকে আউট করে দিতে পারে। কিন্তু জেনেও হেবোকে গ্রাহ্য করে না। ঠিক বাঁ দিকের ফুটে দলবল নিয়ে বসে, দেখা হলে হাসে, মাঝে মাঝে বোঝাতে আসে, শালো—দুনিয়ায় সবাই মানে আমাকে, সকলে ভয় পায়, আর তুমি ...হ্যাঁ, আখেরি লড়াই এখনো বাকি, সেদিন আসুক, তারপর তোকে আমি নিজে হাতে সাফ করবো, আবে যা তোর মত অনেক শান্তি দেখেছি, কিন্তু ঐ আবার, অসহ্য কন্ত্রণা, বাপ রে, শুদ্দু হুল, ঝন্ ঝন্, টন্ টন্, উঃ, মেরে ফেল আমাকে, যদি একটা রিভলবার থাকতো তাহলে এই মুহূর্তে হেবো মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ফায়ার করতো, এ আর সহ্য হয় না, উঃ... একটা নয়, দুটো নয়, বিশ বিশটা স্টীচ, শালারা বাঁশে করে কুপিয়েছে, ঐ শান্তিটা ...ওটাকে বাগে পেলে, ঐ ত' একে একে সব ক'টা মাণিক এসে হাজির হয়েছে, হেবো ব্যান্ডেজবাঁধা প্রকাণ্ড মাথা ঘুরিয়ে মুখটা অসম্ভব বিকৃত করে বাঁদিকের ফুটে তাকালো, ঐ তো শান্তিটাও এসে গেছে, এদিকে তাকিয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে, ভাবছে, স্পটে যখন ছিলো না, কেসে যখন জড়ানো যায় নি, তখন বুক ফুলিয়ে চলা-ফেরা করতে আর কী, দাঁড়া শালা, একটু আমায় চাংগা হতে দে, তারপর তোদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাবো। কিন্তু মদনদাটা অদ্ভুত, বরাবর বলে এসেছে, 'তুই লড়ে যা। আমি তোর পেছনে আছি।' কিন্তু এখন কোথায় পেছনে? পেছন ত' ফাঁকা, যতো-দূর দেখা যায়। শুধু এই ন্যাড়া গাছটা, না ফল, না ফুল, একটা পাতাও নেই। মাঝে মাঝে মদনদা আসে, কোথায় বা যাবে, কারখানা যাবার রাস্তাটা ত' এটা, গাড়ি থেকে নাবে, কখনো একটা জামা, কখনো রিপু করা একটা প্যান্ট, কখনো কিলো খানেক আটা দিয়ে যায়, না চাইতেই অবশ্য, দু'-চার টাকাও দেয় কিন্তু একটুও দাঁড়ায় না সামনে, যেন কুকুরকে পাতের ভাত দিচ্ছে, একবারও জিজ্ঞেস করে না কেমন আছি, হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু জটাকে পেলে অনবরত গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর, বাস, তারপর হাসিমুখে 'চললাম হেবো' বলে দে ছুট।

না। এবার মদনদা এলে, হেবো মনে মনে বলল, তুমি যতোই জটার সঙ্গে লটর-পটর কর তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু চাকরী আমার একটা চাই, তুমি মনে করলে খপ্ দিতে পারো, তা ছাড়া এর আগে তুমি ক'বার বলেছো নিজে থেকে, 'দেখিস তোকে এমন চাকরী দোব যে তোকে খাটতে-খুটতে হবে না, কেবল কান জোড়াটা একটু খাড়া রাখবি, অমুক কার কাছে চুকলী খাচ্ছে, কার নামে কে কি বলছে'...নিশ্চয়, এটুকু করবে বৈকি হেবো, হেবোর সোজা হিসেব তুমি আমার হয়ে করলে আলবৎ আমি তোমার জন্যে করবো কিন্তু তেল মাখবে অথচ কাজ ফেলবে না—সেটি হেবোকে দিয়ে হবে না, হাঁ, বাবা।

...জটারা পাশের গলি থেকে 'মাল' কিনে চলে এলো হৈ চৈ করতে করতে।

'গুরু, আজ মাইরী পয়লা পেঁয়াজ আমাকেই ঝাড়তে হবে।' কে যেন বলল।

মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত করে হেবো বলল, 'কেন? পেঁয়াজ কেন?'

জটা আঙুল তুলে একটা দিক নির্দেশ করে বলল, 'ইসলাম পার্কে শান্তিরা একটা মিটিং ডাকছে। ওদের কে এক খচ্চর নেতা আসবে। এইমাত্র আমরা আসছি ওদিকের কাজ সেরে।'

'কি কাজ?'

'ট্রাম লাইন জাম্প করে দিয়েছি বড় বড় পাথর ফেলে। পুলিশগুলো সব দেখলো টেরিয়ে টেরিয়ে, তারপর মুচকে হেসে অন্যদিকে ফিরে খৈনি ডলতে আরম্ভ করলো। মদনদা এখুনি আসবে। মমতাজকে বলেছে। খুব নাকি জরুরী।'

উঃ, মাথাটা আবার...না, আর পারা যায় না, এসবি ত' মদনদার জন্যে, আজ আসুক, একটা চাকরী...., জানটা বাঁচাতে হবে, তাছাড়া বাড়িতেও আর মান থাকে না, বাড়ি না শালা ঘোড়ার আস্তাবল, কেউ একটা ডেকে কথা বলে না, বোনটার এতোদিন পর বিয়ে, সেও বাড়ির ছেলে, তার সঙ্গে একটা পরামর্শ নেই, কোথা থেকে টাকা জোগাড় হচ্ছে, কি কি যেতুক দিচ্ছো আমাদের ফাঁসাবার জন্যে, কি কথক রেখে টাকা নিয়ে আসছো, কেনাকাটা কন্দুর, সে সব নিয়ে হেবোর সঙ্গে কোন কথা নেই, উল্টে হেবো থাকতে না পেরে সেদিন জিজ্ঞেস করলো, 'কি গো, অতো চুপি চুপি কেন বাবা, আমাকে বাদ দিয়ে, বোন ত' আমারো'....

না, তখন বাপ কি বললে জানো বাপ বলল, 'হেবো, দেখিস, ওদিন যানে বিয়ের দিন যেন মাল টেনে পড়ে থাকিস না, বদনাম হয়ে যাবে', বোঝ,. এমন বাপের জন্যে আমি শালা কিনা হেদিয়ে মরি, আমার নাকি এটুকু জ্ঞান নেই, আমি এমনি আহাম্মুক!

শয়তান! দাঁড়া, একটা চাকরী বাগাই মদনদার কাছ থেকে, তারপর সোজা পিটটান দোব যেদিকে দু' চোখ যায়, সব খচ্চর, দুনিয়া খচ্চর, কারুর ভালো করতে নেই, ঐ ঠিক, রূপেয়া কামাও, চুরি করে হোক, ছেনতাই করে হোক, খাও-দাও, নাচো, পিও—সব একা একা।' মদনদা বলত তাতে না 'আমি আছি পেছনে', তা' কই শালা পেছনে, পেছনে ত' একটা ন্যাড়া গাছ, তাতে না ফল, না ফুল, একটা পাতাও

গজায় না, সত্যি, শান্তিটার ত' মরতে গেলে কোন দোষ ছিলো না। আমার বা কি দোষ। ঐ মদনদাই ত' একদিন আমাকে সকলের সামনে বললে, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি পারবে হেবো। এখন দেখছি হেবোকে দিয়ে হবে না। শান্তি আজো একটা গেট মিটিং করছে। দিনকে দিন ওর দল বাড়ছে। না, আমি ভেবেছিলাম তুমি'...

ব্যস, এই করে আগনে উসকে দিয়ে গেল মদনদা সাত সকালে।

এরই আধ ঘণ্টা পর শান্তি চা খাচ্ছিলো একটা দোকানে।

হাতে চেন নিয়ে হেবো গটগট করে সামনে গেল।

'শান্তি—'

শান্তি হেসে ফেলল, বলল, 'কি হয়েছে? অমন হেঁড়ে গলায় ডাকছো কেন?'

আবার হাসলো শান্তি। পিত্তি জ্বলে গেল হেবোর।

'এ্যাই খবরদার!'

'আরে বাপ রে, মারবে নাকি?'

'মারবো।'

'তাহলে মারো!'

দোকান থেকে উঠে এলো শান্তি। শান্তি হাসছে।

'খুব নক্সা দিতে শিখেছিস, এাঁ! আজ শুনলাম বিকেলের দিকে একটা গেট মিটিং করবি। আমি বলছি, মিটিং হবে না।'

'মদনদার দল চাইছে কারখানা থেকে আমাদের হঠাতে। আমরা চাইছি মদনদাদের হঠাতে। এর মধ্যে তোমরা আসছো কেন?'

'কেন?'

'হ্যাঁ—কেন?'

'সেসব আমি জানি না। মোটমাট মিটিং আজ হবে না।'

'মিটিং হবে বৈকি।'

'চ্যালেঞ্জ।'

'চ্যালেঞ্জ।'

ফিরে আসতে আসতে হেবো দেখলো শান্তি হাসছে।

তখনো বিকেল শেষ হয় নি। আকাশের গায়ে এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ। চিমনীর মুখ থেকে অনর্গল কালো ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে। সেই অদ্ভুত গোঁ গোঁ শব্দটা রোজেই চলেছে, রোজেই চলছে। একপাশে কারখানার প্রকাণ্ড পাঁচিল। অন্য পাশে নানা রকমের দোকান। চা-খানাই বেশি। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বটগাছের গোড়া। বজরংবলীর মন্দির। ঝাণ্ডা উড়ছে। ভিখিরী একজন পদ্মাসনে খাড়া হয়ে বসে চোখ পিট পিট করে রাস্তার প্রান্তের দিকে তাকিয়ে আছে। পথের এখানে-ওখানে খানা-খন্দ, তাতে জল জমেছে। হেবো আর মমতাজ আমগাছের নীচে এসে দাঁড়ালো। এখনো বোধ হয় দ্বিতীয় সিফট্ চালু হয় নি। লোকজন বিশেষ দেখা যায় না। পকেটে হাত দিয়ে হেবো দেখে নিলো পাশুজোড়া ঠিক আছে কিনা। তা ছাড়া হিপ পকেটে আছে চাকু। কোমরে চেন। এর বেশি শান্তির মত একটা ছুঁচোকে মারতে আর কী লাগবে। এর ওপর আছে মমতাজ। সেও তৈরি।

কিন্তু মিটিং কই? মদনদা যে বলেছিলো, ছ'টা, সাড়ে ছ'টার সময় হবে। ধাঃ বাবা, শেষে শান্তিটা ভাগলো নাকি? ভয়ে পৌঁছয়ে গেল?

বুক ফুলিয়ে বলল, 'চ্যালেঞ্জ', তারপর সে বুক চুপসে গেল!

হেবো হাসলো মমতাজের দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ ভয়জড়ানো গলায় মমতাজ বলল, 'ওস্তাদ—'

'কি—রে।'

ঘাড় ফিরিয়ে কিছু একটা বলতে গেল হেবো। পেছন থেকে ক্যাকারের প্রচণ্ড গর্জন, আই বাপ, মমতাজ ভন্ ভন্ ছুট দিলো। হেবো 'মমতাজ, মমতাজ' বলে চেঁচালো, কিন্তু ততক্ষণে দশ-বারোজন লোক ওকে ঘিরে ফেলেছে। হঠাৎ মাথায় বাঁশ পড়লো। 'এ্যাই খবরদার'; হেবো হুঙ্কার দিলো। কে একজন বলল, 'বাঁশ দিয়ে পেড়ে ফেল।'

'আঃ', পড়ে গেল হেবো। তারপর একের পর এক বাঁশ, 'শালা গুণ্ডা', দালাল।'

হেবো কোনরকমে মাথায় হাত দিয়ে মুখটা মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো. আর তারপর টিনের চালে যেমন চড়বড় চড়বড় করে বৃষ্টি পড়ে, তেমনি একের পর এক বাঁশ পড়তে লাগলো পিঠে, একের পর এক। 'আঃ, আঃ', হেবো ককাচ্ছে শুয়ে শুয়ে আর 'এখনো মরেনি শালা', 'এখনো শ্বাস নিচ্ছে।'

রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে কানের পাশ দিয়ে চোখ পযন্ত এসে গেছে, আর লাগছে না, সব থেঁতো হয়ে গেছে, দুটো পা, পায়ের আঙুল, কোমর, শিরদাঁড়া, কাঁধ, দুটো হাত, হাতের আঙুল, মাথা—কোনটা আর আস্ত নেই. রক্ত কি গরম, মানুষের রক্ত এতো গরম হয়? আঃ, কোপাচ্ছে শালারা এখনো, যেন কাঁথায় লাঠি পড়ছে। মার, মারতে মারতে আমাকে শেষ করে দে, কিন্তু যদি একখানা হাড়ও এতো মারের পর বেঁচে থাকে, তাহলে তোরা রেহাই পাবি না। উঃ, গায়ে কি ফোটাচ্ছে শালারা, পেরেক, আঃ, আবার......

'ওরে, মরে গেছে বোধ হয়!'

'তাই নাকি?'

কি হল? সবাই ছুট দিলো? পুলিশ এসে গেছে? উপুড় হতে গেল হেবো। আই বাপ। এ্যাতো রক্ত। এ যে বালতি-ভর্তি রক্ত। জায়গাটা রক্তে ভিজে গেছে একেবারে।

দাঁড়ানো যাবে না? কোনরকমে টলতে টলতে অন্ধকারে একটা কবন্ধের মত উঠে দাঁড়ালো হেবো। অতি কষ্টে হিপ পকেট থেকে চাকুটা বার করে ফ্যাঁশ-ফেঁশে গলায় বলল, 'কে আছিস বাপের বেটা......চলে আয়......'

তারপর ধপ্ করে পড়ে গেল রক্তে-ভেজা মাটিতে।

'উঃ, আর পারা যায় না!'

মাথার মধ্যে কারা সব দাঙ্গা করছে। এ্যাতো কষ্ট নাগাড়ে লেগে রয়েছে,, একটা রিভলভার যদি থাকতো তাহলে দিতাম শালা খুলিটা উড়িয়ে। এ কি রংবাজী? ছিঁড়ে পড়বে নাকি মাথাটা ঘাড় থেকে? আঃ, এসব মদনদার জন্যেই তো......না হলে শান্তিদের আর কি দোষ......মাঝে মাঝে দরকার পড়লে আসে মদনদা, তাকে আমলই দেয় না, বেঁচে আছে কি মরে গেছে জিজ্ঞেসও করে না, অথচ বলেছিলো, 'তুই লড়ে যা হেবো, আমি পেছনে আছি।' এখন কি রকম পেছনে আছে বোঝ? কখনো কিলোখানেক আটা, কখনো একটা পাঞ্জাবী, কখনো একজোড়া জুতো, এই করছে। এই জন্যেই কি আমি ছুটে গিয়েছিলাম শান্তিদের মারতে? কই ওরা তো আগ বাড়িয়ে মারতে আসে নি। সেদিন পড়ে পড়ে মারই খেয়েছে। কোন জবাব দেয় নি। কিন্তু আমার কি দরকার ছিলো? মদনদা দেখতে পারে না শান্তিদের, শান্তিরা দেখতে পারে না মদনদাদের, মাঝখান থেকে আমরা শালা লড়তে গেলাম কেন? কই, কোথায় গেল মদনদা? বলেছিলো না, তুই লড়ে যা, পেছনে আছি। এখন কোথায়, পেছনে তো সেই ন্যাড়া গাছটা। না ফুল, না ফল, একটা পাতাও গজায় না......

ঐ যে, দোয়া-দুধের মত মদনদার শাদা গাড়িটা এসে গেছে।

ডানদিকের ফুটপাতের কাছে আসতেই জটা ছুটে গিয়ে মোটরের দরজাটা খুলে দিল। মমতাজ, রসিদ, নদেরচাঁদ ছুটে গেল পাশে। হেবোও তার প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

মদনদা কোনদিকে না তাকিয়ে বলল, 'জটা, কই রে।'

জটা বলল, 'কি ব্যাপার মদনদা। আমি এদিকে পেঁয়াজ—'

'সে না হয় মমতাজ করবে। কারখানার মালিকের সংগে অনেক কথা আছে। আমার জরুরী কাজ। আমি গাড়ি থেকে তোকে নাবিয়ে চলে যাবো। আমার হয়ে তুই [illegible] করবি।'

'দূর মাইরী, আমি কি ওসব পারি নাকি? শেষে কি বলতে কি বলে ফেলবো?'

জটা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

'তা ছাড়া শালার কথায় কথায় ইংরিজী।'

'হিন্দীও জানে।'

'কিন্তু আমি হিন্দীও ভুলে গেছি মদনদা।'

মদনদা হাসলো।

'ওসব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি লীডার। তোমাকে এখন থেকে তৈরি হতে হবে।'

এতোক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে তামাসাটা দেখছিলো হেবো।

আর ওর যেন কিসব মনে পড়ে যাচ্ছিলো। সেই পুরনো খেলা। সেই এক চাতুরী। একদিন প্রায় এইরকমই সময়ে সেদিনো একখানা জিপ এসেছিলো। হেবো, কুইক। সেদিনো মদনদা তাকে গাড়িতে তুলেছিলো। তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, সকলের সামনে মজুর-লীডর বানিয়ে দিয়েছিলো, তাই না?

হেবো এতোক্ষণ সতর্ক হয়ে শুনছিলো, হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

'জটা!'

'কি গুরু!'

জটা ওর দিকে আসতেই হেবো মদনদার দিকে ওর প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা নিয়ে এগিয়ে গেল।

'মদনদা!'

হেবো কথাটা শেষ করবার আগেই মদনদা হঠাৎ মোটরে ঢুকে গেল। তারপর সীটের তলা থেকে চ্যাপ্টা মতন একটা বোতল বার করে হেবোর দিকে বাড়িয়ে দিলো।

'তাড়াতাড়িতে ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার জন্যেই এনেছিলুম। এখনো অনেকটা আছে।'

হেবো অবাক হয়ে মদনদার দিকে তাকালো। তারপর বোতলটা মদনদার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়লো।

'আজ সকাল থেকে কিছু জোটে নি মদনদা। খালি পেট।'

'তাই তো রে। ভারি মুস্কিল তো। দাঁড়া দাঁড়া দেখি।'

মদনদা পকেট হাতড়ে একটা দু' টাকার নোট বার করে আনলো।

'আজকের মত চালিয়ে নে।'

'কিন্তু কাল, পরশু, তরশু......'

হেবো এক-একটা শব্দ উচ্চারণ করছিলো যেন এক-একটা থান ইট ছুঁড়ে মারছিলো। চোখ দিয়ে ওর আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো।

'আমাকে ভিখিরী পেয়েছ? বলেছিলে না চাকরী দেবে? বলেছিলে না তুই এগিয়ে যা, আমি পেছনে আছি।'

'আছ?'—মদনদা যেন ভীষণ চোট খেলো হঠাৎ। তারপর জটার দিকে তাকিয়ে এক-গাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু সে চাকরী এখন কোথায়? সিপিং ডিপার্টে একটা কাজ খালি যাচ্ছে। কিন্তু সেটা তো জটার জন্যে.....'

মুহূর্তে সমস্যাটা স্পষ্ট হয়ে গেল হেবোর কাছে। ছিঃ ছিঃ! এ লোকটা এ্যাতো নীচ! থুঃ, থুঃ। থুতু ফেলল হেবো রাস্তায়। তার গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। সেই যে, ধোপ-দুরস্ত পাঞ্জাবীর নীচে অনেকে যে কালো কিটকিটে গেঞ্জিটা পরে, এটা সেই গেঞ্জি! ছিঃ, ওয়াক থুঃ।

'জটা, তোকেও ফাঁকি দিচ্ছে। চাকরী এরা কোনদিনও দেবে না। দেখেছিস, আমার হাল। তোর মাথাতেও একদিন ব্যাণ্ডেজ উঠবে। তখন ধর মমতাজ কি রসিদ—ওদের লীডর বানাবে, সাবধান!'

বলতে বলতে হেবোর সমস্ত মুখটা একটা অদ্ভুত প্রতিহিংসার রক্তে ভরে গেল। এরই জন্যে ও ওর জীবনটা দিতে গিয়েছিলো? এর জন্যে? উঃ, মাথার মধ্যে সেই অসহ্য যন্ত্রণাটা......ঝন্ ঝন্, ঝন্ ঝন্। উঃ, কি যেন হচ্ছে মাথার মধ্যে, যেন দাঙ্গা, পেরেক ঠোকার শব্দ, সব, সব......এই লোকটার জন্যে......শুধু এ সেক্রেটারী থাকবে বলে......তাতে হেবোর বাপের কি? জটার বাপেরই বা কি......

হঠাৎ হেবোর কি মনে হল, মুখটা অসম্ভব রকম বিকৃত করে বলল, 'দেখি মদনদা, আপনার পাঞ্জা।'

মদনদা হাতখানা দেবার আগেই মদনদার হাতখানা ধরে ফেলল হেবো। একটু চাপ দিলো।

যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে মদনদা বলল, 'এই কি হচ্ছে, ইয়ারকী—না?'

'দেখেছো, এখনো হাতে কিরকম 'মাল' আছে?'

তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জটার হাতখানা ধরে হেবো ওর প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা হেলিয়ে বললে সকলের উদ্দেশে, 'এদের জন্যে জানটা দিয়ে দিতে শুধু বাকি রেখেছিলাম। বেইমান, বেইমান সব। এবার যাবো জানের যেটুকু বাকি আছে এখনো, সেটুকু ওদের জন্যে দিতে। চলে আয় সব।'

ডানদিকের ফুটপাত থেকে ঠিক বিপরীত দিকে, বাঁদিকের ফুটপাতে আসতে যে রহস্যজনক চোদ্দ হাত তফাৎ, যে তফাৎটাকে ওরা এতোদিন ভেবেছে কোনদিন ঘুচবে না, সেই তফাৎটাকে ওরা পেছনে ফেলে এলো চিরকালের মত, আর তারপর সেই প্রফেসর আর শান্তি আর ওদের সাঙ্গোপাঙ্গদের কিরকম অবাক করে দিয়ে বোকার মত হেসে বলল, 'চলে এলাম মাইরী!'

হেবোদের এই কাণ্ড দেখে রাস্তাটা ছুটতে লাগলো, কোথায়, এবার যেন তা বলা যায়।

॥ সমাপ্ত ॥

কমরেড লেনিন : অমল দাশগুপ্ত। **প্রকাশক** : রাখাল সেন। লেখাপড়া, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

আজকের দিনের রাজনীতি বুঝতে হলে লেনিনের জীবন এবং চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। শ্রীঅমল দাশগুপ্তের রচিত 'কমরেড লেনিন' পাঠককে তার কিছু সূত্র ধরিয়ে দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

লেনিন সম্পর্কে রচিত একাধিক বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনের যে ছবি লেখকের মনের পটে অঙ্কিত হয়েছে, বাঙালী পাঠকদের সামনে তিনি তাই তুলে ধরেছেন। রচনার প্রসাদগুণে গ্রন্থটি সার্থকতা লাভ করেছে। কারণ বহু বিদগ্ধজনের মতামতের সাথে মহান লেনিন সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মতামতও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে লেখকের এই personal statement ফুটে উঠে গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

এত স্বল্পপরিসরে (মাত্র 400 পৃষ্ঠার মধ্যে) লেনিনের মত মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু সেদিক থেকে অমলবাবু কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। লেনিনের ছেলেবেলা, রুশ দেশের বিপ্লবী আন্দোলন, মার্ক্সবাদী পাঠচক্রে, শ্রমিকশ্রেণীর সংস্পর্শে, ক্রুপ্‌স্‌কায়ার সঙ্গে পরিচয়, বিপ্লবের পথে, কারাগারে ও নির্বাসনে, মার্ক্সবাদী পার্টি গড়ার কাজে, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে, উনিশ শো পাঁচের বিপ্লবে, প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে, বৈপ্লবিক জাগরণের বছরগুলিতে, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আগে ও পরে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে এবং ক্রেমলিনে—এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে রচিত লেনিনের এই জীবনকাহিনী অনবদ্য। লেনিনের রচিত একমাত্র কবিতার অংশবিশেষের অনুবাদ এবং একাধিক চিত্র গ্রন্থটির আরেকটি আকর্ষণীয় দিক।

দোপাটির ইচ্ছে (২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৭)। সাধনা মুখোপাধ্যায়। মিত্রালয়। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

উদীয়মান মহিলা কবির সংবেদনশীল মনের মাধুরী মেশানো আবেগ ও অনুভূতির ধারাস্নানে সিক্ত অধিকাংশ কবিতাই হৃদয়গ্রাহী। সহজবোধ্য, অনাড়ম্বর এই গীতি-কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায়, কবির অভিজ্ঞতা আছে, আছে জগৎ ও জীবনকে খুঁটিয়ে দেখার মতো দৃষ্টি। তথাকথিত আভিজাত্য নয়, সামান্য সুখ তাঁর কাম্য—'সামান্য শাকান্ন তাঁর তৃপ্তির নুনে/ভরাতে জীবন অসন কড়ি গুণে গুণে' (সুখী)। কবির আনুষঙ্গিক বিষণ্ণতা ও একাকিত্ববোধ একাধিক কবিতায় মর্মরিত। যৌবন হারাবার বেদনা-বিষাদ-ভয়-বিমর্ষতা ও বিহ্বলতা অনেকগুলি কবিতাকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে (মধ্যবয়সে এসে, বধ্যভূমি, দুই দৃষ্টিধর প্রতিদ্বন্দ্বী, ভেসে যায় কবে প্রভৃতি)। সাতরঙা রামধনুর মত বিচিত্র বহুবর্ণময় প্রেমের কবিতার সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না-পাওয়া, সম্পদ-বিপদ, হাসিকান্নার জলছবি। কয়েকটি চিত্রকল্পে কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব পরিস্ফুট : 'পেলব গন্ধটুকু হৃদয়ের শ্লেট থেকে মুছে নিল ব্যস্ত জললেতি' (সুইট পী), 'আকাশকে চুমো দিতে উদ্যত মুখগুলি দেখতে' (সাজানো বাগান), 'বিদ্যুতের জিভ' (পূর্বাভাস) প্রভৃতি। কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'দৃশ্যকাব্য'—এই কবিতায় প্রকৃতিকে কবি যেন সহস্র ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে চেয়েছেন। আমরা আশা করি, কবি তাঁর নিরলস সাধনায় বঙ্গ কাব্যলক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

সূর্যাবর্ত (২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৭)। সম্পাদনা দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, শশধর রায়। ৩৩/৪, দীনু লেন, হাওড়া-১। দাম এক টাকা।

কবিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিবেদিত পূর্ববঙ্গের চৌদ্দজন কবির ১৫টি কবিতা সংকলন 'সূর্যাবর্ত' আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে! রবীন্দ্রচর্চা সেখানে ফ্যাসান নয়, রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের কবি, সাহিত্যিক ও জনমানসে মুক্তির মূর্ত প্রতীক। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার সঙ্গে তাঁরা শপথ নিয়েছেন সভ্যতার সংকট উত্তীর্ণ হবার, আন্তর্জাতিকতার মুক্তাঙ্গনে বিচরণ করার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার, অত্যাচার, অন্ধকার দূরে করার। এই সংকলনে যে সব কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে : আল মাহমুদ, মনজুরে মওলা, ফজল শাহাবুদ্দীন, মাহফুজুল হক, সামাউল হক, মাহমুদ আল জামান, মাশুকুর রহমান চৌধুরী, সুব্রত বড়ুয়া, চণ্ডীপদ চক্রবর্তী, দিলওয়ার, নিয়ামত হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, সামসুর রহমান ও জিয়া হায়দার। এঁরা প্রত্যেকেই পূর্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠিত কবি। এই সাধু প্রচেষ্টার জন্যে সম্পাদকমণ্ডলীকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

মিনি (দ্বিতীয় সংকলন, মে, '৭০)। সম্পাদনা বরুণ মজুমদার ও কুমারেশ চক্রবর্তী। ১২০/১, রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া। দাম ২০ পয়সা।

'মিনি'র প্রথম সংকলনের থেকেও দ্বিতীয় সংকলন ভাল হয়েছে। ছোটরা হাতে পেয়ে মজার মজার ছড়া, গল্প, রসরচনা ইত্যাদি পড়ে খুব মজা পাবে। এ ছাড়া আছে ধাঁধা, রেবতীভূষণের মনকাড়া কার্টুন। লেখকগোষ্ঠীতে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিশ্বপ্রিয়, আশা দেবী, কুমারেশ চক্রবর্তী, ডঃ দিলীপ মালাকার, বরুণ মজুমদার, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ
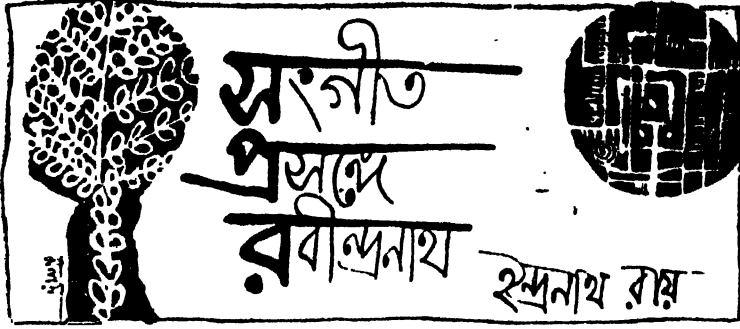
ইন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথ কবি। কবিতা তাঁর মানস-সুন্দরী, তাঁর আজন্ম সাধনধন। কিন্তু কবির সংগীত-প্রীতিও ছিল অকৃত্রিম। কবির ভাষায়ঃ "...আমি যখন গান বাঁধি তখনই সবচেয়ে আনন্দ পাই।...গানে যে আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্য বোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম, আপন করে নতুন করে।..." সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রীতি ছিল পরকীয়া প্রেমের মতই সুগভীর।

সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথের মতে, কবি ও গীতকার উভয়েই রূপস্রষ্টা। তাই গান ও কবিতার মধ্যে জাতিভেদ রবীন্দ্রনাথ কখনও মেনে নেন নি। তাঁর মতে, "...সত্যকে যখন...হৃদয় দিয়া পাই, তখনই সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্য দ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে, ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা...।"

"...মানুষ যেমন চেয়েছে কাব্যকে, তেমনি চেয়েছে গানকে।...ভাষা যদি নিজেই স্বীকার করে, বাক্যটাতে সব বলা হল না, সে অবস্থায় 'ভৈরবী'র সঙ্গে মিতালি করলে ওস্তাদরা কি বলবেন, অসবর্ণ মিলনে সংগীতের জাত গেল। অপরপক্ষে নির্বাক ভৈরবী একটা এ্যাবস্ট্রাক্ট আবেগ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ঠিক ঐ কাব্যের কথাটি বলতে গেলে সে বোবা। অর্থাৎ, বলতে গেলে যেমন দরকার কথার, তেমনি দরকার সুরেরও......"

"...সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে। ভাব প্রকাশের স্থান। যতখানিতে ভাব প্রকাশের সাহায্য করে, ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল প্রকাশ করে, তাহা সংগীত নহে, তাহার অন্য নাম।......

হিন্দী গানের বাক্যাংশের কাব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেনঃ "...ছেলেবেলা থেকেই ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।...কিন্তু একটা বিষয় আমি...একটু বিশেষ করে বলতে চাই। হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারা.. আর বাংলা সংগীতের ধারা...এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতি ভেদ আছে।"

"...বাংলাদেশের হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত' মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এই জন্য বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।"

"...বাংলা সংগীতের বিশেষত্বটি যে কি, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে ত' অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত ...."

"...কীর্তনে, বাঙ্গালীর গানে সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙ্গালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু শ্রীধর কথকের টপ্পা গানে হরঠাকুর রাম বসুর কবির গানে সংগীতের সেই যুগল ধারা..."

বাংলা সংগীতের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ কবি দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন—"গান রচনা অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।..."

কবির সংগীতসাধনা সফল হয়েছে নিঃসন্দেহে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রবাহে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হয়েছে বাণী ও সুরের, একথা আজ সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু গভীর আনন্দপ্রসূত এই নূতন সৃষ্টির তীব্র স্রোতে সংগীতরাজ্যের বহু পুরাতন রীতি 'ঘরোয়ানা' চালচলনের বিধিনিষেধের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। 'ঘরোয়ানা'-র পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল বলে সংগীত-পুরের নন্দিনীরা "হায় হায়" করে উঠেছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন পুরবক্ষী ওস্তাদেরা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র-লঙ্ঘনের অপরাধে মামলা রুজু করেছেন সংগীতের সুপ্রীম কোর্টে। কিন্তু রূপ-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় সবল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন নূতন সৃষ্টির পথে।

সংগীত শাস্ত্রে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—নাই বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই এই বিতর্কে অনধিকার প্রবেশনা করে, সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

গান রচনায় সংগীত বিশারদদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "কাব্যকলা ও চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে লইয়া। যে মানুষ রচনা করে আর যে মানুষ ভোগ করে। গীতকলায় আরো একজন প্রবেশ করিয়াছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার মাঝখানে আছে ওস্তাদ। এক হিসাবে এ বিধিটা ভালোই।...কিন্তু মুশকিল এই যে, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে, তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়। সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ।...দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে কিন্তু প্রায়ই মেলে না। ফলে, দাঁড়ায় এই যে, "কলা-কৌশলের" 'কলা' অংশটা থাকে গান-কর্তার ভাগে আর ওস্তাদের ভাগে 'কৌশলের' অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবে চলে, সোনা হিসেবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়তেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা।"

তবে, রবীন্দ্রসংগীতের এই বাঁধ-ভাঙা উদ্দামতার স্বরূপ বুঝতে হলে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতের কৃষ্টিতে যে পুনরুজ্জীবন দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র, প্রতিভূ। কবি বলেছেন—"...আজ নতুন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁইয়াছে।"

"...স্পষ্ট দেখিতেছি আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাহিরে আসিলাম। আমাদের সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-চিত্রকলা—সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড় পাইয়াছে। আমাদের সঙ্গীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে, তবে ওর আর উদ্ধার নাই।..."

"...এখন দুই যুগের সন্ধিস্থলে আমাদের জীবনের গতি যে দিকে জীবনের নীতি সম্পূর্ণ সেদিকের মত হয় নাই। দুটোতে ঠোকাঠুকি চলিতেছে..."

বলা বাহুল্য, কি কাব্য, কি সঙ্গীত —জীবনের সকল ক্ষেত্রেই গতি ও নীতি, নূতন ও পুরাতনের এই 'ঠোকাঠুকি'তে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রগতির পক্ষে নূতনের দলে। রবীন্দ্রনাথ গীতস্রষ্টা, ওস্তাদ নন। সৃষ্টির রাজ্যে প্রতি ক্ষেত্রে যে ঠোকাঠুকি অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন:—"হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমি সর্বান্তকরণে ভালবাসি—আজ বলে নয়, বাল্যকাল থেকেই। কিন্তু 'হিন্দুস্থানী' গান ভাল লাগে বলেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়...অজন্তার ছবি খুবই ভালো, কিন্তু তাই বলে তার উপরে দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা। তবে, একটা প্রশ্ন ওঠে অজন্তা থেকে, তাজমহল থেকে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে আমরা কি পাব? না—প্রেরণা, ইন্সপিরেশন। সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কিসের? না নবসৃষ্টির। তানসেনের সুর শিখব, কিন্তু কি জন্যে? না, নিজের প্রাণে, যাকে তুমি বলেছ Renaissance—নবজন্ম—তারই আবাহন করতে।......

"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জরার দশার কথা বলছিলে। হয়েছে কি, ও-সঙ্গীত হয়ে পড়েছে ক্লাসিক—একটা সর্বাঙ্গ-সুন্দরতায় পারফেক্‌সনের ফর্ম অচল প্রতিষ্ঠা। এহেন পূর্ণতা পূর্ণ বলেই মরেছে। পূর্ণতার সিদ্ধির সঙ্গে আসে স্থিতি। কিন্তু শিল্পের মুক্তি চাইতে পারে না স্থিতির অচলায়তন।"

"হিন্দুস্থানী সুরে তাই মিশেল দিতে আমার বাধবে কেন? আমি জানি রাগ-রাগিণীর একটা নিজস্ব মহিমা আছে, এও জানি যে, রাগ-রাগিণীর পরিচয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার থেকে প্রেরণা পেতে নকল করতে নয়।...মহাদেব, নারদ ও ভরতমুনিতে পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে, আমরা তাকে কেবলমাত্র জানিতেই পারি, সৃষ্টি করিতে না পারি, তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।..."

কবির মতে, আর্টের উপকরণের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা—পুরাতন নূতনের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণ মাত্রই একদিকে উপায় আর একদিকে বিঘ্ন। সেই সব বিঘ্নকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো বা আপস করিতে করিতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য লাভ করে।

"স্বর্গলোকের একটা মস্ত সুবিধা বা অসুবিধা আছে, সেখানে সবই সম্পূর্ণ। এইজন্য দেবতারা কেবলই অমৃত পান করিতেছেন। কিন্তু তাঁরা বেকার......। মর্তলোকে যেখানে অপূর্ণতা সেইখানেই নূতনের সৃষ্টি, বিশেষের সৃষ্টি, বিচিত্রের সৃষ্টি।

বিশ্বের সর্বত্রই অন্তর্দ্বন্দ্বের (ডায়েলেক্‌টিক্স) পথে নূতন সৃষ্টির চিরন্তন লীলা চলেছে অবিরাম। সঙ্গীত-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বসৃষ্টির এই অমোঘ সত্যকেই কবি পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়:

"...পাওয়া না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়া ছাড়া পাওয়া যাইতেই পারে না, দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ছাড়া বিকাশ হইতেই পারে না—সৃষ্টির গোড়াকার এই নিয়ম।"

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

জার্মান থিয়েটার ঃ

ইংরাজ রোমান্টিক কবিরা প্রায় সবাই নাট্য রচনা করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'দি বর্ডারার্স' রচনা করেন ১৭৯৫-৯৬ সালে। রবার্ট সাদে আর কোলরিজ একসঙ্গে লেখেন 'দি ফল অভ রোবসপিয়ার' (১৭৯৭)। কোলরিজ পরে এককভাবে 'রিমর্স' নাটকটি লেখেন (১৮১৩)। লর্ড বায়রণ অনেকগুলো নাটক লিখেছিলেন—তাঁর আশা ছিল, ইংলিশ থিয়েটারে কাব্যনাট্যের পুনরুজ্জীবন করবেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টা বিশেষ সাফল্য-লাভ করে নি। তাঁর জীবিতকালে ১৮২১ সালে ড্রুরী লেন থিয়েটারে তাঁর একটি মাত্র নাটক 'ম্যারিনো ফ্যালিয়েরো' মঞ্চস্থ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এই থিয়েটারে ১৮৩০ সালে 'ওয়ার্নার' এবং ১৮৩৪ সালে চার্লস কীনের পরিচালনায় 'সারডেনা-প্যালাসের' অভিনয় হয়েছিল। বায়রণের একসময়ের নামকরা নাট্যকাব্য 'ম্যানফ্রেড' এবং 'দি টু ফসকারী' ১৮৩৪ এবং ১৮৩৭ সালে কভেন্ট গার্ডেনে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৮১৪ সালে বায়রণ ড্রুরী লেনের কমিটিতে যোগদান করেছিলেন—তাঁর চিঠিপত্রে তখনকার সময়ের থিয়েটারের বিষয়ে বহু রেফারেন্স পাওয়া যায়—**but his plays read better than they act, inspite of his undoubted dramatic talents, and stand somewhat apart from the main stream of nineteenth-century theatre development—Oxford Companion to the theatre.** কিটস্‌ও নাটক লিখেছিলেন—১৮১৯ সালে 'অথো দি গ্রেট'।

শেলীও কয়েকটি কাব্যনাট্য লেখেন। তার ভেতর সব থেকে নামকরা হচ্ছে—'দি চেন্‌চী' (১৮১৮ সাল)। শেলী সোসাইটি এর প্রথম অভিনয় করেন ১৮৮৬ সালে। হয়েছিল—রোডরোডেও এই চেন্‌চী নাটকের অভিনয় হয়েছে। নাটক হিসাবে অনেক গুণ থাকলেও বিষয়বস্তুর ভয়াবহতার জন্য 'দি চেন্‌চী' কখনও নিয়মিত ভাবে মঞ্চে অভিনীত হতে পারে নি।
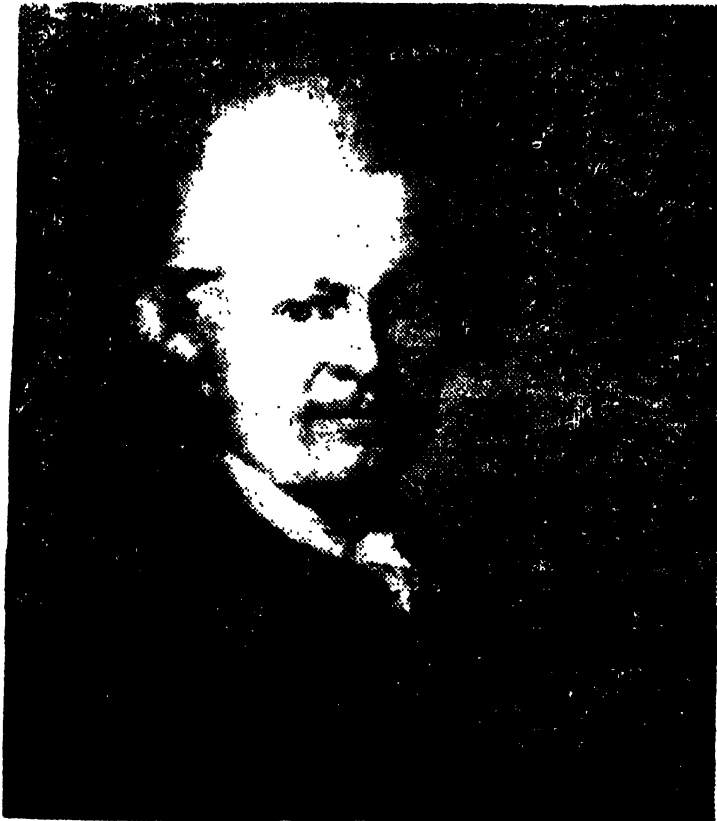
ইংলণ্ডের রোমান্টিক কবিদের নাটক হয়ে দাঁড়াতো অত্যন্ত সাবজেকটিভ—ফলে দর্শকদের কাছে এগুলো মোটেই জনপ্রিয় হোতো না। আরও একটা বড় অভাব ছিল এই সব কবির ভেতর—মঞ্চের সঙ্গে এঁদের কোনই যোগাযোগ ছিল না। সে সময়ের দর্শকদের রুচি ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের—স্বভাব ছিল রুক্ষ। রোমান্টিক কবিরা তাদের থেকে দূরে নিজেদের নির্জন পরিবেশের ভেতর থাকতেই ভালবাসতেন। এর ফলে এই সব কবি-নাট্যকারের সঙ্গে দর্শকদের কোন সংযোগ ঘটতো না। তদানীন্তন মঞ্চগৃহকে কবিরা যেন খানিকটা ঘেন্নার চোখেই দেখতেন—ইংরাজ এই সব কবির লেখা কাব্য-নাটককে প্রাণহীন এবং একঘেয়ে বলে দূরে ঠেলে রাখতো। এই সব কারণেই সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন নাটক এবং রঙ্গালয়ের ভেতর একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া এই সব কবির দল শেক্সপীয়ারের দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, মহাকবির রচনাভঙ্গীরই তাঁরা অনুসরণ করতেন। এলিজাবীথান যুগে শেক্সপীয়ারের স্টাইলটিই ছিল সর্বদিক দিয়ে স্বাভাবিক—কিন্তু সময়ের বিরাট ব্যবধানে শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সময় সেই স্টাইল হয়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিক এবং অচল।

জার্মানীতে কিন্তু শেক্সপীয়ারের প্রভাব খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল—বিশেষত লেসিং, গ্যায়টে এবং শিলারের লেখায়। ওদেশে এর আগে সত্যিকার প্রতিভাশালী কোন নাট্যকারের আবির্ভাব হয় নি। যদিও এর আগে গট্‌শেড্‌ জার্মান নাটককে কিছুটা সংশোধন করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনার ধাঁচটা ছিল ক্ল্যাসিকাল। কিন্তু এই সময়ের জার্মান দর্শকরা ওই শ্রেণীর নাটক দেখবার জন্য মোটেই উদগ্রীব ছিল না। অথচ একথাও বোঝা যাচ্ছিল যে, **the time was ripe for a great awakening.**

গট্‌হোল্ড এফরায়েম লেসিং-এর (১৭২৯—৮১) থেকেই জার্মানীর এই নাট্য আন্দোলনের শুরু হয়। লেসিং তাঁর বেশির ভাগ রচনাতেই তখনকার প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানী অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল—এই সব রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন প্রিন্সেস্‌রা। মানবিকতার প্রতি লক্ষ্য ছিল বলেই লেসিং এই

লেসিং

খুব কড়া সমালোচক বিদ্রুপকারী ছিলেন। থিয়েটার সম্বন্ধেও তিনি প্রচলিত মতবাদকে অগ্রহণীয় বলে মনে করতেন। কারণ, তখনকার জার্মান থিয়েটারে ফরাসী থিয়েটারেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল—হয় ফরাসী নাটকের অনুবাদ, না হয় ফরাসী নাটকের অনুকরণে জার্মান নাটক লিখে তার মঞ্চরূপায়ণ করা হোত। তাঁদের নিজেদের সাহিত্যের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, একথা লেসিং কিছুতেই মানতে রাজী হন নি। লেসিং বলতেন যে, জার্মান নাটকের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ইংরাজী নাটক এবং বিশেষভাবে শেক্সপীয়ারের নাটক ভালভাবে স্টাডি করা দরকার—তার দ্বারা জার্মান নাট্যকারেরা নাটকের স্ট্রাকচার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করবেন—তার পরে তাঁরা স্বকীয় ভংগীতে নাটক রচনা করবেন—ইংরাজী বা ফরাসী নাটকের অনুকরণ করে নয়—সম্পূর্ণ মৌলিক ভংগীতে।

লেসিং অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন—"a man's origins are not important when judging his character" — Jeremy Lane. তিনিই প্রথম জার্মান লেখক, যিনি সাহসভরে স্টেজের ওপর একজন সুশিক্ষিত ইহুদিকে দর্শকদের সামনাসামনি এনে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁর 'দি জুজ' (১৭৪৯) নাটকে। নাটকটি শেষ পর্যন্ত কমেডীতে পর্যবসিত হয়েছে—ধর্ম এবং বর্ণবিদ্বেষের কোন আবশ্যকতাই নেই জীবনে, এই কথাই তিনি নাটকে বলতে চেয়েছেন। এই একই বিষয়বস্তু নিয়েই তিনি আবার তাঁর শেষ নাটক 'নাথান দি ওয়াইজ' রচনা করেছিলেন।

১৯৬৮ সালে পূর্ব বার্লিনে ব্রেশ্ট্-ডায়লগে যখন আমি অংশগ্রহণ করতে যাই, তখন ডয়েটশে থিয়েটারে 'নাথান দি ওয়াইজ'-এর মঞ্চরূপায়ণ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই থিয়েটারে ট্র্যাডিশনাল রিয়ালিস্টিক স্টাইলেই অভিনয় করা হয়—এখানকার স্টার এ্যাক্টর ছিলেন ভোলফগ্যাঙ্গ থাইনজ—ইনিই নাটকের পরিচালক এবং নাথানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এঁর অভিনয় দেখতে দেখতে আমার বার বার শিশিরকুমারের আবনের ভূমিকায় অভিনয়ের কথা মনে হচ্ছিল। বার্লিনের এই থিয়েটারে ব্রেশটিয়ান ভংগীতে অর্থাৎ এলিয়েনেশন পদ্ধতিতে অভিনয় হয় না—বাস্তবধর্মী রীতিতেই এঁরা অভিনয় করেন। রাশিয়ান থিয়েটারের এ্যাকটিং স্টাইলের সঙ্গে এঁদের অভিনয়ের যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

১৭৬৫ সালে হ্যামবুর্গ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়—দু' বছর বাদে এটি পরিণত হয় জার্মান ন্যাশনাল থিয়েটারে এবং সেই সময়েই একটি থিয়েটার সংক্রান্ত পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের পত্রিকা এর আগে কখনও দেখা যায় নি। এই প্লে-হাউসের ড্রামাটর্জ নিযুক্ত হন লেসিং—পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর ওপর পড়ে। যেসব লেখা ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হোত, তাতে শুধু তখনকার মঞ্চস্থ নাটকগুলোরই সমালোচনা থাকতো না, আগাগোড়াই লেসিং প্রত্যক্ষভাবে এই সব লেখার দ্বারা তরুণ লেখকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে চেষ্টা করতেন নাট্য রচনায় এবং জাতীয় নাট্যশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য। লেসিং নিজেও 'মিস সারা স্যাম্পসন' (১৭৫৫), 'মিন্না ফন্ বার্নহেম' (১৭৬৭), 'এমিলিয়া গ্যালোট্টি (১৭৭২) প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। নাটকগুলো মোটের ওপর ভালই—তবে সমালোচক লেসিং নাট্যকার লেসিং-এর থেকে নাট্যবিদ্‌দের কাছ থেকে বেশি শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। The Hamburgische Dramaturgie অর্থাৎ যে পত্রিকায় লেসিং নাটক সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতেন, সেটি এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকসের পাশে স্থান পাবার যোগ্য—অনেক বিদগ্ধ নাট্যবিদের এই হচ্ছে সুচিন্তিত মন্তব্য।

লেসিং-এর প্রথম নামকরার মত বড় নাটক হচ্ছে 'মিস সারা স্যাম্পসন'—এটি ট্র্যাজেডী। যদিও তখন প্রচলিত রীতি ছিল কাব্যে সংলাপ লেখবার, লেসিং কিন্তু নাটকটি লিখেছেন গদ্যে। সে সময় ট্র্যাজেডীর পাত্র-পাত্রী হোত রাজপরিবারের লোকেরা—এ নাটকের চরিত্ররা তা নয়। অবশ্য মিস সারার বাবা হচ্ছেন স্যার উইলিয়াম, কিন্তু নাটকে বেশির ভাগ সময় তিনি থাকেন ব্যাক্ গ্রাউন্ডে। "Lessing believed that the names of princes and heroes can lend a play pomp and majesty, but that they contribute nothing towards rousing sympathy."—J. Lane.

লেসিং বলতেন, মঞ্চের কোন চরিত্র দেখে আমরা যখন ভয় বা অনুকম্পা অনুভব করি—সে অনুভূতির মূলে এই সত্যটাই থাকে যে, ওরা মানুষ এবং আমাদেরই মত মানুষ—ওরা রাজপুরুষ, এ ধরনের চিন্তা আমাদের মনে আসে না। যাদের অবস্থা আমাদের মতই সাধারণ, তাদেরই দুঃখ-দৈন্য আমাদের অন্তরকে বেশি স্পর্শ করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। লেসিং আরও বলেছেন, কোনও নাটকে একটি বিশেষ ব্যক্তি কি করল, সে সম্বন্ধে তাঁর কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু কোনও বিশেষ চরিত্রের লোক নির্দিষ্ট পরিবেশে কি করবে, সে সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা তাঁর প্রবল। "This meant that he called for a story that held together properly, and for characters that were all of one piece. The end of the play must be founded properly in the action. The gods, for instance, should not be allowed to put things right."—J. Lane.

[আমাদের দেশে কিছু তথাকথিত আভান-গার্ড নাট্যকে দল আজকাল গ্রীক নাটক মঞ্চস্থ করছেন—কিছু দর্শক এ জাতীয় নাটক দেখে একেবারে পুলকিত হয়ে উঠছেন। গ্রীক ট্র্যাজেডীগুলো বেশির ভাগই ছিল ট্র্যাজেডী অভ্ ফেইট।

আজকের জগতের দর্শকদের তো আর সে যুগের গ্রীকদের মত অজ্ঞানতা বা কুসংস্কার নেই—আজ সোফোক্লিস বা ইস্কাইলাসের নাটকের সাত্তাকার আবেদনটা কোথায়? নিশ্চয় একমাত্র তার কাব্যগুণের জন্য—অনুবাদে, তা সে ইংরাজীতেই হোক বা বাংলাতেই হোক, সে আবেদন থাকতে পারে না। তবু ইংরাজীতে যতোটা থাকে, বাংলাতে তাও থাকে না। এক ধরনের স্থূল যৌন অনুভূতির কিছুটা হয়তো চরিতার্থ হয়। অথচ গিরিশচন্দ্রের আমল থেকে শিশিরকুমারের আমল অবধি যেসব মাইথলজিকাল নাটক এক সময় নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হত, সেসব আজ যেন বাংলার মঞ্চ থেকে উধাও হয়েছে। রামচরিত্র, কৃষ্ণচরিত্র, কর্ণার্জুন, অভিমন্যু প্রভৃতিকে আমাদের নাট্যাচার্যের দল বোধহয় ডার্টি নেটিভস্ বলে মঞ্চজগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। শুনতে পাই, কিছু কিছু উগ্র রাজনীতিক দলের লোকেরা নাকি স্কুলে স্কুলে গিয়ে দাবি জানাচ্ছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছবি দেয়াল থেকে নামিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের শত্রু, বিদেশী রাজনীতিকদের ছবি সেখানে টাঙিয়ে দিতে হবে—এ ধরনের অস্বাভাবিক পারভার্সন অন্য কোনও দেশে সম্ভব কিনা জানি না!।

আজকের দিনের নাট্যকার তো আর গ্রীকদের দৃষ্টিতে ফেটকে দেখবেন না। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের কাছে —Fate, far from being regarded as the whim of the gods or as a mystical force, is destiny shaped by genetic, instinctual and environmental factors.

গত ৩রা জুনের সংবাদ প্রকাশ, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডক্টর খোরানার নেতৃত্বে একদল বৈজ্ঞানিক কৃত্রিমভাবে জেনী সৃষ্টি করতে কৃতকার্য হয়েছেন। স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছেন, Genes are the units of he d y and control all life processes. With this first artificial gene, the scientists have taken a profound step towards correction of inherited diseases, perhaps "genetic engineering" of improved humans and animals and perhaps, ultimately, artificial creation of life itself. Dr. Khorana said: "In the long-distant future, the knowledge might allow for genetic planning of individuals—tailoring people to fit patterns, turn out athletes or intellectuals.

আজকের দিনের এই বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতিতে আসবার পর গ্রীক ট্র্যাজেডী অভ্ ফেইট মাইনাস ইটস্ অরিজিন্যাল বিউটি একটা বীভৎসতার সৃষ্টি করে না কি? তার থেকে নেটিভ কর্ণের মুখে "রণক্ষেত্রে অসিহস্ত নিয়তিরে করিব নিধন" শুনতে অনেক বেশি ভাল লাগবে।

লেসিং এরপর মঞ্চাভিনয়ের জন্য 'মিন্না ফন্ বার্নহেম' (১৭৬৭) নামে একটি ভাল কমেডী রচনা করেন। নাটকের কাহিনীটি অত্যন্ত সহজভাবে বলা হয়েছে। মেজর টেলহাইম মিন্না ফন্ বার্নহেমের সঙ্গে এনগেজড ছিলেন। 'সেভেন ইয়ার্স ওয়ার'-এ তিনি একটি হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এরপর তাঁর সমস্ত টাকাপয়সা নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি কমিশন থেকে রিজাইন করতে বাধ্য হন। তখন তিনি বাগদত্তার কাছ থেকে পালিয়ে যান —কারণ, তাঁর মনে হয়, এই অবস্থায় তিনি আর তাঁর প্রেয়সীর পাণিগ্রহণের উপযুক্ত নন। মিন্না ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভান করে যে, তার আঙ্কল্ তাকে ডিজইনহেরিট করেছেন। এবার টেলহাইমের মনে ধারণা হয় যে, তিনিই একমাত্র মিন্নার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে পারবেন। নাটকটির সমাপ্তি মধুর রসে—টেলহাইমের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় রাজার আমন্ত্রণপত্র পেয়ে। এই আমন্ত্রণপত্রে তাঁকে আহ্বান করা হয় আবার আর্মিতে যোগ দেবার জন্য। 'সেভেন ইয়ার্স ওয়ার'-এর দ্বারা প্রসূত সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিকটা এ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে, এদিক থেকে নাটকটির একটি নিজস্ব অভিনবত্ব আছে। এ যুদ্ধ থামে ১৭৬৩ সালে—নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৭৬৭-তে—এদিক থেকে নাটকটির একটি টপিক্যাল ইন্টারেস্টও আছে। রাজা এ নাটকে সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন—এর রাজনীতিক গুরুত্ব লক্ষণীয়। It shows that state business and humanity can and should go together. After all everyone feels that lovers should be united. State business and humanity were, however, two mutually exclusive things at the time that Lessing was writing.—Jeremy Lane.

লেসিং-এর পরের নাটকটি ট্র্যাজেডী—নাম এমিলিয়া গ্যালোট্টি। এ নাটকে রাজকীয় শক্তির ব্যবহার এবং অপব্যবহারের ব্যাপারটা অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হয়েছে। এমিলিয়া বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু প্রিন্স চান তাঁর পাণি গ্রহণ করতে। প্রিন্সের চেম্বারলেন এমিলিয়ার ফিঁয়াসীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তিনি এমিলিয়ার অপহরণের ব্যবস্থা করলেন এবং এই অপহরণের ব্যাপারে ফিঁয়াসী বেচারা মারা পড়লো। এমিলিয়ার পরিবারের কিন্তু ধারণা হল যে, এই মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রিন্স নিজে! এ ব্যাপারে এমিলিয়ার বাবার কর্তব্য কি? তিনি আজীবন রাজভক্ত—প্রিন্সকে হত্যা করবার কথা তিনি কল্পনাতেও আনতে পারেন না। অতএব, তাঁর পক্ষে একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে—সেটি হচ্ছে নিজের মেয়েকে হত্যা করা। তিনি করলেনও তাই —কারণ তা না করলে যার কাছে তাঁর মেয়ে বাগদত্তা ছিল, তার প্রতি অবিচার করা হয়। যে সমাজে এইভাবে রাজশক্তির অত্যাচারকে সহ্য করতে হয়, তার নির্মম চেহারাটাই লেসিং যেন তুলে ধরেছেন পাঠক এবং দর্শকদের কাছে। লেসিং অবশ্য একথা কখনও বলেন নি যে, কনস্টিটিউশন্যাল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য স্টেটকে ভেঙে দিতে হবে—কিন্তু সব সময়েই মানবিকতাবোধের দিকটা তিনি বড় করে দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, আমেরিকান ওয়ার অভ্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শুরু হয়েছিল ১৭৭৫ সালে এবং ফরাসী বিদ্রোহ ১৭৮৯তে—তা হলেই উপলব্ধি করা সহজ হবে সেই সময়ে সব দেশেই সাধারণ মানুষের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছিল এবং লেসিংও তৎকালীন "মানবিকতাবোধ সম্বন্ধে সচেতনতারই" রূপায়ণ করেছেন তাঁর নাটকে।

[ক্রমশ]

'জনতার আদালত' ছবিতে নবাগত চৈতালী দত্ত।
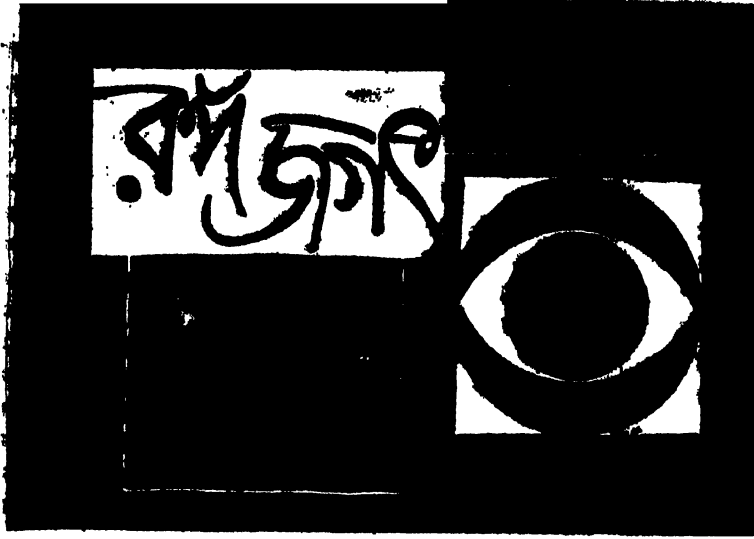
প্রমোদকর অফিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রমোদকর অফিসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সম্প্রতি কয়েকটি পত্রিকায় প্রমোদকরের বিরুদ্ধে চিঠিপত্রের কলমে অভিযোগপত্র প্রকাশিত হয়েছে। অপেশাদার সংস্থা এবং পাড়ার ক্লাবগুলিকে ট্যাক্স অফিসে এসে যেভাবে হয়রান হতে হয় তা বাস্তবিকই বিক্ষুব্ধ হবার মত ব্যাপার। প্রমোদকর অফিসের কর্মচারীরা সময় সময় এমন কাজ করেন, যাতে ক্লাব বা কোন সংগঠনের প্রতিনিধিদের মাথা ঠান্ডা রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। সম্প্রতি

'অমরী অপেরা' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

একটি ঘটনার কথা আমরা জেনেছি, যাতে প্রমোদকর অফিসের দায়িত্ববোধহীনতার এবং মানুষকে হয়রান করার মনোভাব প্রকাশ হয়েছে। সমিতির আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত একটি সংস্থার পক্ষ থেকে ট্যাক্স রেহাই দেবার জন্য আবেদন করা হয়েছিল ২৩শে এপ্রিল; এই প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানের দিন ছিল ২৯শে মে। এক মাস আগে আবেদন করে বার দুই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ট্যাক্স অফিসে গিয়ে অনুসন্ধান করলে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সময়মত চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গত ৬।৭ বছর এই প্রতিষ্ঠান নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রমোদকর রেহাই পেয়েছে। বিদ্রোহী কবির জন্মজয়ন্তী পালন ছাড়া এই অনুষ্ঠানের কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ নেই। কবির জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্মসূচী লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যায়, যেমন—সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কারদান, গুণী সম্বর্ধনা, নজরুল সাহিত্য আলোচনা ইত্যাদি। আবেদনপত্রে এই কর্মসূচী এবং কিভাবে অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হবে, কাদের আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হবে, সবই বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এক মাস পরে ২৬শে মে এই প্রতিষ্ঠানকে ট্যাক্স অফিস থেকে একটা চিঠি দিয়ে উপরে উক্ত বিষয়গুলি জানাতে এবং সদস্যদের রেজিস্টার, ব্যাঙ্কের হিসাব বই, হিসাব পরীক্ষকের রিপোর্ট, স্মারক পুস্তিকায় বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র ইত্যাদি পেশ করতে বলা হয়। স্বভাবতই এতে সংগঠনের কর্মকর্তারা বিস্মিত হন। ২৭ তারিখে চিঠি পেয়ে ২৮শে মে তাঁদের ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পেশ করতে হয়। অনেক অনুরোধ করে ২৮শে তারিখে কোনরকমে তাঁরা কার্ডগুলি স্টাম্প করাতে পারেন। কিন্তু ২৯ তারিখের অনুষ্ঠানের জন্য তাঁরা কার্ডগুলি বিলি করবেন কখন? সুতরাং প্রশ্ন আসে প্রমোদকর অফিস সময়মত চিঠি দিল না কেন? সংগঠনের প্রতিনিধির কাছে প্রয়োজনীয় আরো কাগজপত্র পেশ করতে না বলে ২৬শে মে অনুষ্ঠানের মাত্র দু'দিন আগে কেন চিঠি দেওয়া হল? এই ব্যাপারটা কি দুর্নীতিজনিত, না আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতাজনিত? এখানে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা গেল, কিন্তু এরকম আরো অনেক অভিযোগের কথা আমরা শুনেছি। যাতে মনে করা চলে প্রমোদকর অফিসের কিছু দায়িত্বশীল কর্মচারীর মধ্যে দায়িত্ববোধহীন মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠেছে। তার ফলে শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনগুলিকে নানারকম বিরক্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়, হয়রানির সীমা থাকে না।

প্রমোদকর সম্পর্কে নীতিগত প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। প্রমোদকর কোন্‌ক্ষেত্রে ধার্য হবে আর কোন্ ক্ষেত্রে রেহাই পাবে তার কোন নির্দিষ্ট আদর্শ আছে বলেও মনে হয় না। যেখানে জনশিক্ষার প্রশ্ন জড়িত এবং ব্যবসার উদ্দেশ্য নেই, সেক্ষেত্রে প্রমোদকর রেহাই পাওয়া উচিত। অথচ এরূপ ক্ষেত্রেও কোন কোন অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রমের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। প্রমোদকর অফিসের এইরূপ অব্যবস্থা অথবা এতে যদি দুর্নীতির প্রশ্ন জড়িত থাকে, তবে তা বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগী হওয়া উচিত। —দুর্জয়

ফ্যাসি-বিরোধী চলচ্চিত্র

পাঁচই থেকে এগারই জুন লাইট হাউস সিনেমায় ফ্যাসি-বিরোধী চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা। এই উৎসবের উপলক্ষ ছিল ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভের পঞ্চবিংশতিবর্ষ উদ্‌যাপন। এই উৎসবে সাতটি পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখান হয়েছে, প্রতিদিন বেলা ১২টা, ৩টা, ৬টা ও ৯টা —চারটি শোতে।

প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের কনরাড ভলফ্ পরিচালিত "আই ওয়াজ নাইনটিন"—বার্লিনের পতনের সময়কালের ঘটনা নিয়ে উনিশ বছরের এক জার্মান যুবকের অভিজ্ঞতার কথা। মস্কো থেকে সোভিয়েত বাহিনীর সৈনিকরূপে সে আসছিল বার্লিনের দিকে, নিজের জন্মভূমির পথে, নিজের ও দেশের পরিচয় খুঁজে বার করতে। নাজী বাহিনী পরাজিত হয়েও যে দানবীয় চরিত্র প্রকাশ করেছে, মানুষের দুর্দশার যে চিত্র দেখেছে সে, ওতে তার অন্তরে জমেছে তীব্র ঘৃণা, যুদ্ধ-বিরোধী সংকল্প। ছবিটি ক্যামেরার কাজের নৈপুণ্যে, পরিচালকের ফ্যাসি-বিরোধী রাজনীতি সচেতনতায় এবং মানবিক আবেদনে দর্শকদের ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগায় এবং বিশ্বশান্তির আগ্রহ সৃষ্টি করে।

'মৌসুমী মন' ছবিতে শিবানী বসু ও অশোক চ্যাটার্জী।

দ্বিতীয় ছবি 'দি সাইলেন্ট ব্যারিকেড'—দেশপ্রেম ও সাধারণ মানুষের বীরত্বের এক চমকপ্রদ কাহিনী। চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি ঘটনা নিয়ে চিত্রনাট্য। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর গতিরোধ করার জন্য একটি পুলের ওপর ব্যারিকেড তৈরি করে সাধারণ মানুষ মিলিত হয়ে যে সংগ্রাম করে, ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনের দিক থেকে সেই ঘটনাকে দেখান হয়েছে। কাহিনীর সঙ্গে প্রামাণিক তথ্যের মিশ্রণে এই ছবিটি অপূর্ব। ছোট ছোট ঘটনা—এক পরিবারে পিতা চলেছে ব্যারিকেড রক্ষা করতে ছেলেকে ঘরে রেখে, ছেলে পালিয়ে গেল রণাঙ্গণে; নাজীদের একটা গাড়ি আক্রমণ করে কিছু সংখ্যক যুদ্ধ-বন্দীকে উদ্ধার করা গেল, তাদের মধ্যে ছিল এক নারী। সেই নারীর ফ্যাসি-বিরোধী প্রচণ্ড ক্রোধ ও বীরত্ব, আহত কর্নেলের বিদায় গ্রহণের দৃশ্য ইত্যাদি দর্শকদের অভিভূত করে। বীরত্ব, দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবোধে ছবিটি প্রেরণাময়। এই ছবির পরিচালক ডবলিউ জে হ্যাস-পরিচালিত ছবি ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি; তুলনায় 'সাইলেন্ট ব্যারিকেড' অনন্যসাধারণ। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধচিত্রগুলির মধ্যে এই ছবির বিশেষ উল্লেখ থাকবে।

চেকোশ্লোভাক ও মস্কোর গর্কি স্টুডিও-র যুক্ত উদ্যোগে নির্মিত 'মে স্টারস' ছবিটি চারটি ছোট গল্পের সমষ্টি। চারটি গল্প স্বতন্ত্র, পটভূমি কেবল এক। যুদ্ধের শেষ দিকের ঘটনাবলী। একদিন আগে বার্লিনের পতন ঘটেছে। প্রথম গল্প—'মাস্টার কুসান'; এক সোভিয়েত জেনারেলের সঙ্গে একটি ৫।৬ বছরের বালকের সাক্ষাতের কথা। তাদের বাড়িতে জেনারেল যখন বিশ্রাম করছিল, তখন ছেলেটির নজর পড়ে জেনারেলের টুপির ওপর। আর জেনারেলের মনে পড়ে নিজের ছেলের কথা। ছেলেটি টুপিটি মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, বিদায় নেবার সময় জেনারেল টুপিটি রেখে যায়। দ্বিতীয় গল্প 'দি স্পার্ক'—এক শিক্ষিকার সাথে সোভিয়েত ক্যাপ্টেনের সাক্ষাতের ঘটনা। একটি চক চাইতে গিয়ে পরিচয়। এই ক্ষণিকের পরিচয়ে উভয়ের মনে প্রেমের জন্ম। কিন্তু মুহূর্ত পরে সে শুধু হয়ে রইল স্মৃতি, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা টীকাটিও মুছে দিয়েছে হেড মাস্টার। সুতরাং একটি মুহূর্তের পরিচয়ের বেদনা-মধুর স্মৃতি নিয়ে সে আশার দিন গুণবে। তৃতীয় গল্প 'দি ফ্ল্যাট ইন দি এটিক'—নাজী বন্দিশিবির থেকে মুক্তি পাওয়া এক [illegible] কথা। [illegible] ধরে নিয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের সহযোগিতায় ফিরে এসে সে দেখে তার ফ্ল্যাটটি দখল করে আছে এক উন্মত্ত নাজী। প্রবল গুলীবর্ষণের মধ্যে সেই নাজীকে খতম করে ফ্ল্যাটটি উদ্ধার করে একজন সোভিয়েত সৈন্য প্রাণ দিল। চতুর্থ গল্প 'ট্রাম ড্রাইভার'-এ—যুদ্ধশেষে প্রাগে প্রথম ট্রামটির যাত্রীদের মধ্যে ছিল একজন সোভিয়েত সৈনিক। যুদ্ধের আগে সে ছিল ট্রাম ড্রাইভার। তার আগ্রহ হল ট্রামটি চালাবার। শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে যাবার বাসনা। কিন্তু ড্রাইভার রাজী হয় না। এতবছর পরে সে যে হাতল ধরার সুযোগ পেয়েছে তা ক্ষণিকের জন্যও ছাড়তে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত সকল যাত্রীর অনুরোধে সে ট্রাম চালাবার জন্য হাতলটি ছেড়ে দেয়। এই চারটি গল্পের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, আন্তর্জাতিকতাবোধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

বুলগেরিয়ার ছবি "দি এইটথ" একটি বিশেষ আকর্ষণীয় ছবি। ছবিটি দর্শকদের দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। এক গেরিলা যোদ্ধাদলের বীরত্ব-গাথা সিনেমায় রূপায়িত হয়েছে। নাজী-দখলিকৃত বুলগেরিয়ায় কয়েকজন মাত্র লোক প্যারাসুটে নেমে কিভাবে ফ্যাসিস্ট-বাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, বিশ্বাস-ঘাতকদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে জয়ের পথে অগ্রসর হয়েছিল, তার এক রোমাঞ্চকর কাহিনী-চিত্র। পরিচালক জাক্কো হেক্সি দৃশ্যরচনায় অপূর্ব কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

সোভিয়েতের "অন দি ওয়ে টু বার্লিন"—বার্লিনের পতনের সময়ের ঘটনা। হিটলারের আত্মহত্যার পরও কিভাবে নাজীদের মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং সোভিয়েত সৈনারা যে বীরত্ব দেখিয়েছে, তার কাহিনী। 'সাইলেন্ট ব্যারিকেড' ও 'দি এইটথ'-এর তুলনায় এই ছবিটি নিষ্প্রভ, সময় সময় একঘেয়ে। এই উৎসবে প্রদর্শিত আর দুটি ছবি 'ফ্রোজেন লাইটনিং' ও 'হাউ টু বি লাভড্'।

শীলা

কাহিনীর নায়িকার নামানুসারে চলচ্চিত্রের কাহিনীর নাম শীলা। কাহিনী রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায় এবং তা পরিবর্ধিত করেছেন নরেন্দ্র মিত্র। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। কাহিনীর প্রথমাংশ ঘটনামূলক ও শেষের দিকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসজনিত মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য থাকলেও তীব্র দ্বন্দ্বের অভাবে নাটকীয় গতি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তবে অভিনয়-নৈপুণ্যে ও

১৯৪৫ সালে বার্লিনের পতনের ঘটনা নিয়ে সোভিয়েত ছবি 'লিবারেশন'-এর দৃশ্য। মসফিল্ম স্টুডিওতে নির্মিত এই ছবিতে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের টেকনিশিয়ানরা কাজ করেছেন।

পরিচালকের কলা-কৌশল প্রয়োগের গুণে শীলার চলচ্চিত্র রূপায়ণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কাহিনীটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমদিকে, দাদুর সংসার—যেখানে দু'টি মাত্র প্রাণী—দাদু স্বয়ং এবং তাঁর নাতনি শীলা। আর আছে দাদুর মনিহারীর দোকান। মনিহারীর দোকানে জিনিস যোগান দেয় ক্যানভাসার রমেন। কাহিনীর দ্বিতীয়ভাগে শীলা এবং রমেনের সংসার। বিয়ের পর শীলা কাছছাড়া হলে দাদুর জীবনের যবনিকাপাত ঘটে। শীলা ও রমেন আসে দাদুর বাড়িতে। রমেন তখন দেখাশুনা করে দাদুর মনিহারীর দোকান। এ যাবৎ কাহিনীতে সাধারণ ঘটনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু গ্রামের ছবি ও গ্রামের অন্যান্য লোকগুলির চরিত্র এ অংশে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে ঐ অংশে দাদুর অভিনয়ে 'প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে ব্যথা-বেদনা ও নাতনী-নাতজামাইয়ের প্রতি স্নেহের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা মর্মস্পর্শী। সেখানেও আমরা পাই বাৎসল্য রসের সুন্দর রূপায়ণ। শীলা ও ভবেনের সংসারেও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে বাৎসল্য রস। শীলা ও ভবেন—দু'জনেই কামনা করে একটি সন্তানের। শীলা সন্তান-সম্ভবা—তাও অজ্ঞাত থাকলো না। মাসের পর মাস যায়। রমেন গেছে বাইরে। হঠাৎ একদিন শীলা আছাড় খায়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিরাশ হয়ে সে চলে যায় কলকাতায় মাসিমার নার্সিং হোমে। সব আশাই তার ব্যর্থ হয়। সে জানতে পারে কোনদিন সে মা হতে পারবে না এবং তার টিউমার অপারেশন করে ফেলা হয়। এ অবস্থায় সে তার মাসিমা এবং মেসোমশাই-এর পরামর্শ গ্রহণ করে একটি নবজাত শিশুকে—যার আর কেউ নেই। মেসোমশাই এবং মাসীমা জানান, কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না, এই শিশু শীলা ও ভবেনের নয়।

পরে মেসোমশাই, যিনি পয়লা নম্বরের ভিলেন, তিনি টাকার প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত এমন কান্ড করেন যে, সব ঘটনাই ভবেনের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। এর পর সৃষ্টি হয় শীলার সংসারে দ্বন্দ্বের। তাহলে সে কি স্বামীর কাছে বিশ্বাসঘাতিনী? এর-পর ঘাত-প্রতিঘাত। কোথায় তাদের হারানো সন্তান! ঐ সন্তানকে ভবেন ও শীলা বুকে ভরে কোলে তুলে নেয়। জঠরে সন্তান ধারণ না করেও সত্যি-কারের মা হতে কোনো বাধা নেই। বলা বাহুল্য, চলচ্চিত্রের কাহিনীর এই চূড়ান্ত পরিণতি দর্শকদের আনন্দে উদ্বেল করে তোলে। তাছাড়া ভিলেন চরিত্রের মুখোশ যে সব জায়গায় খুলে পড়েছে সে সব জায়গায় দর্শকরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছে, আনন্দে করতালিও দিয়েছে।

শীলার চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মানসিক দ্বন্দ্বের উত্থান-পতনে যথা-যোগ্য অভিনয় করেছেন। ভবেনের চরিত্রে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় বাস্তবধর্মী। ভিলেনের চরিত্রে শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্র পরিস্ফুটনে গঙ্গাপদ বসু, রবি ঘোষ, প্রেমাংশু বসু, শোভা সেন, গীতা দে, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখ-যোগ্য। সবিতাব্রত দত্তকে অতি অল্প-ক্ষণের জন্য সংগীতমুখর দেখা গেলেও তিনি অনবদ্য কৌতুক ও মননশীলতার জন্য মনে দাগ কেটে দেন।

আগেই বলেছি, ফটোগ্রাফী বেশ ভালো; গানগুলিও স্থান-কাল ও পাত্রোপযোগী, কিন্তু শব্দগ্রহণে কিছুটা ত্রুটি আছে, যে কারণে দু'-একজনের সংলাপ কিছুটা অস্পষ্ট মনে হয়েছে।
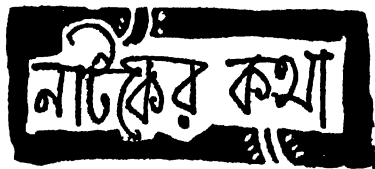
ঝামারিয়া, জব্বলপুরে সংস্কৃতি সপ্তাহ

ঝামারিয়া, জব্বলপুরের প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ আয়োজিত "সংস্কৃতি সপ্তাহ" ২৫শে বৈশাখ হইতে শুরু হয়। ওই দিন দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "রক্তকরবী" নাটক অভিনীত হয়। রূপায়ণে স্থানীয় শিল্পিবৃন্দের অভিনয় দর্শকদের

[illegible] প্রশংসা লাভ করে। [illegible] ভূমিকায় তপন রায়চৌধুরী, বোম্বাইজীর ভূমিকায় সুব্রত বসু, নন্দিনীর ভূমিকায় [illegible] চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রার ভূমিকায় দীপালী গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় সুপ্রশংসিত হয়। অন্যান্য ভূমিকায় দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়, শিশির রায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, ফণীন্দ্রকিশোর চন্দ, দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব রায়, রতন ভট্টাচার্য সুঅভিনয় করেন। সুপরিকল্পিত মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং সামগ্রিক অভিনয়সৌকর্যে নাটকটি স্থানীয় সুধী সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

২৬শে বৈশাখ শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি সাহা পরিচালিত ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত সুকুমার রায়ের "চলচিত্তচঞ্চরী" উপভোগ্য হয়।

৩য় বার্ষিকী একাংক নাটক প্রতিযোগিতা উপলক্ষে এবার স্থানীয় সংস্থাগুলি হতে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। সর্বমোট ৮টি দল যোগদান করে। প্রতিযোগিতার ফলাফল—শ্রেষ্ঠ নাটক ও দলগত অভিনয়—জব্বলপুরের "ময়ূখ" সম্প্রদায় অভিনীত "বিষণ্ণ সকাল"। এই নাটকে প্রসূন এবং রবির চরিত্রে যথাক্রমে শ্রীঅনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী সবিতা ঠাকুরতা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর পুরস্কার পান।

শ্রেষ্ঠ পরিচালনা—প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ প্রযোজিত "তাহার নামটি রঞ্জনা" নাটকের পরিচালক শ্রীগোপী বসু। ইনি এই নাটকে কৌশিকের চরিত্রে অভিনয় করে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারটিও পান।

দ্বিতীয় [illegible] অভিনেতার আরও [illegible] পুরস্কার [illegible] ক্রমবর্ধমান বসুর [illegible] "[illegible]" নাটকে [illegible] অভিনয় করে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মধ্যপ্রদেশে বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় এই সংস্থাই পথিকৃৎ।

১৬ই মে "পরিচয়" যাত্রাভিনয় হয়। পরিচালনা করেন শিশির রায়। সামগ্রিক অভিনয়চাতুর্যে পালাটি দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

সমাজ দর্পণ

গত ৮ই জুন চন্দননগর থিয়েটার সেন্টারের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে সংঘের তরুণ নাট্যকার দিলীপ দে রচিত "সমাজ-দর্পণ" নাটকটি পঞ্চানন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় এবং বিশিষ্ট সুরকার বাসুদেব গোস্বামীর সংগীত পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

মঞ্চসফল এ নাটকে অভিনয় করে যে তিনজন শিল্পী দর্শকবৃন্দের প্রশংসা লাভ করেন, তাঁরা হলেন নাট্যকার দিলীপ দে, বাসন্তী চ্যাটার্জী ও প্রেমাংশু বসু। দুটি কৌতুক চরিত্রে সহজেই দর্শকমন জয় করেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও পান্নালাল চ্যাটার্জী। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন মৃণাল দত্ত, শৈলেন মুখার্জী, লতা দেশী, উদয় রায়, নিতাই দত্ত, লক্ষ্মীরঞ্জন ব্যানার্জী, আশা দেবী।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত ও সাংবাদিক শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

দুই মহল

ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশান সেন্টারের (সাংস্কৃতিক বিভাগ) [illegible] জোয়ান [illegible] দস্তিদারের "দুই মহল"। এই জনপ্রিয় নাটকের সার্থক রূপায়ণে শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয় নাটকটিকে পরম উপভোগ্য করে তুলেছিল।

প্রধান কয়েকটি চরিত্রে বীরু ব্যানার্জী, শ্যামানন্দ ব্যানার্জী, নারায়ণ দে, রমেন সেনগুপ্ত, অরুণ চ্যাটার্জী, নিখিল চক্রবর্তী, রাসবিহারী দে, নিত্যাশংকর, সমীর বাগচী, ব্রজগোপাল বসাক ও করুণাময় ব্যানার্জী সুন্দর চরিত্র চিত্রণের কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। "ওসমানির" চরিত্রে সীমা গুহ-ঠাকুরতার অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে।

নাট্য নির্দেশনা বীরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

[illegible] জব্বলপুর বঙ্গীয় সংসদ আয়োজিত "সংস্কৃতি সপ্তাহ" [illegible] নাটকের একটি দৃশ্য।

'দুটি মন'

ডি এম পাল নিবেদিত ও [illegible] বসু পরিচালিত এস এস ফিল্মসের "দুটি মন" ছবিটি সম্প্রতি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবিটি কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য "এ" সার্টিফিকেটে চিহ্নিত। এই ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন বিনয় চ্যাটার্জী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীবসু স্বয়ং। সুরসৃষ্টিতে আছেন হেমন্তকুমার মুখার্জী। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জী, আরতি মুখার্জী ও রুবী ব্যানার্জী।

উত্তমকুমার ছবিটিতে দ্বৈত চরিত্রে রূপদান করেছেন। চরিত্র দুটি ভিন্নধর্মী। নায়িকার চরিত্রে আছেন নবাগতা সুপর্ণা সেন। অন্যান্য, বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন কণিকা মজুমদার, অসিতবরণ, ছায়াদেবী, রবীন ব্যানার্জী, পদ্মাদেবী, সুখেন দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, আনন্দ মুখার্জী, এন বিশ্বনাথন, মিহির ভট্টাচার্য প্রমুখ।

চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে—দিলীপরঞ্জন মুখার্জী, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ও প্রসাদ মিত্র।

অপ্সরা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

সতীশ ডাক্তার

দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার বসু প্রযোজিত চিত্রায়ন প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি "সতীশ ডাক্তার" ছবির দুখানি গান শৈলেশ রায়ের সুরে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে বাণীবন্ধ করা হয়েছে।

পল্লীবাংলার চিরন্তন সুন্দরের অন্তরালে যে কান্না, সংঘাত আর কুসংস্কারের

ছায়া রয়েছে, তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই ছবির কাহিনী। সতীশ ডাক্তার এরই মাঝে এক বিস্ময়কর জেহাদ।

চিত্র ও মঞ্চের বিশিষ্ট আলোকচিত্র-শিল্পী দিলীপ দত্ত "সতীশ ডাক্তার" ছবির কাহিনী ও পরিচালনা করছেন।

চিত্রনাট্য, সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণে যথাক্রমে পরিতোষ চক্রবর্তী, রবিন দাস ও শঙ্কর গুহ।

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত শিল্পী-সমন্বয়ে গঠিত এই ছবিতে কয়েকটি নতুন মুখ দেখা যাবে।

পরিচালক দিলীপ দত্ত তাঁর ইউনিট সহ বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য বীরভূম যাত্রা করছেন।

সাগর পারে রবীন্দ্রজয়ন্তী

লণ্ডনে "সাগর পারে" পত্রিকার তরফ থেকে রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন করা হয় ৩১শে মে। সভায় প্রধান অতিথি হন ডেম সিবিল থর্নডাইক। লা কন্টিনেন্টাল সিনেমায় শান্ত পরিবেশে শ্রীমতী থর্নডাইক রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মালা পরিয়ে দেন। তারপর বলেন, যুবক রবীন্দ্রনাথের কথা। কবিগুরু লণ্ডনে এলেই তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। নিজের কবিতা পড়তেন। গান শোনাতেন। তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধু ভারতের জন্যে নয়, সর্বদেশের সর্বকালের জন্যে।

ডেম সিবিল থর্নডাইকের বয়েস ৮৮। লাঠিতে ভর করে অতি কষ্টে দাঁড়াচ্ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। হাত তুলে নাচের ভঙ্গীতে বলে যান। তাঁর সুললিত কণ্ঠে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে থাকেন।

তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। অংশগ্রহণ করেন তৃপ্তি দাস, সুগত দাস, পাম্মা ধর, মৃদুলা বিশ্বাস ও মঞ্জুশ্রী সরকার। তবলা বাজান প্রসূন রায় ও প্রসূন চক্রবর্তী।

এই অনুষ্ঠানে "সাগর পারে" পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার প্রচ্ছদপট সৈয়দ মুজতবা আলীর আঁকা বাংলা দেশের ছবি। সব লেখাই উচ্চ মানের।

সাগর পারের সম্পাদক হিরণ্ময় ভট্টাচার্য বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলা থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রবাসীর জন্যে এই পত্রিকা। বিশ্বের বাঙালীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র বজায় রাখাই এর উদ্দেশ্য।

আরও একটা কথা, এই সুশোভিত পত্রিকাটি ভারতের বাইরে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। বিনামূল্যে সাহিত্য পত্রিকা ভারতে প্রথম, সম্ভবত সারা বিশ্বেও এই প্রথম।

সভার শেষে অধীর ঘটক সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সভায় বহু বিশিষ্ট ভারতীয়, পাকিস্তানী ও ইংরাজ উপস্থিত

আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়

'অগ্নিস্নান' ছবিতে সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও ললিতা চ্যাটার্জী। ছবিটি এখন বিভিন্ন চিত্রগৃহে চলছে।

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন

সুরসাগর হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একাদশ বার্ষিক নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যে সকল প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হন, তাঁরা—খেয়াল: কৈকেয়ী রায়, কল্যাণী আচার্য, তোড়া সরকার, সবিতা সিংহ। ভজন: সোনালী রায়, স্বপ্না মুখার্জী, স্বস্তিকা চক্রবর্তী, রীণা মণ্ডল অধিকারী, তপন ঘোষ। রাগপ্রধান: কৈকেয়ী রায়, সুপ্তি দাস, ঋতা পাল, উমা কর, তপন ঘোষ। রবীন্দ্রসঙ্গীত: বর্ণালী গুপ্ত, শাশ্বতী গুপ্ত, সুতপা ঘোষ, সুস্মিতা রায়চৌধুরী, প্রশান্ত সরকার। আধুনিক: মানসী দাশ, মল্লিকা ব্যানার্জী, স্বস্তিকা চক্রবর্তী, উমা কর, তপন ঘোষ। অতুলপ্রসাদ: ঝুমঝুমি চ্যাটার্জী, শাশ্বতী গুপ্ত, তোড়া সরকার, রীণা মণ্ডল অধিকারী, সুকুমার ভড়। হিমাংশু-গীতি: কৈকেয়ী রায়, লক্ষ্মী গুপ্ত, আরতি দত্ত, উমা কর, গৌতম বসু। পল্লীগীতি: মানসী দাশ, সুপ্তি দাশ, আরতি দত্ত, রীণা মণ্ডল অধিকারী, চন্দ্রকান্ত দাস। শ্যামাসঙ্গীত: অনুরাধা দত্তগুপ্ত, স্বপ্না মুখার্জী, স্বস্তিকা চক্রবর্তী, রীণা মণ্ডল অধিকারী, তপন ঘোষ। গীটার: ছন্দা দত্ত, অরূপ দাস, শুভতোষ মজুমদার।

কণ্ঠসঙ্গীতে সর্ববিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিনী রীণা মণ্ডল অধিকারী।

সুরঙ্গনার অনুষ্ঠান

সেতার শিল্পী কল্যাণী রায় পরি-

চালিত ... জন কবি শ্রীমণীন্দ্র রায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপলক্ষে। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু বক্তৃতা করেন।

এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বরপঞ্চকের এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী রুচিরা মুখার্জী, সেতার বাজান কুমারী পুতুল ঘোষ।
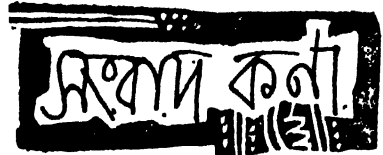
ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য

গত ৬ই জুন ফেডারেশন অফ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভস এসোসিয়েশনস অফ ইণ্ডিয়ার ৭ম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউশনে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির ভূমিকায় কৃষ্ণা রায়, মায়ের ভূমিকায় স্বপ্না সেনগুপ্তা ও অন্যান্য ভূমিকায় মানসী ঘোষ, রত্নাবলী ঘোষ, রিঙ্কু ভাদুড়ী, অরুণা দে, কৃষ্ণা হালদার, পূর্ণিমা হালদার, মিতা পাল ও বনানী চৌধুরী সুঅভিনয় করেন। সংগীতাংশে সংগীত-পরিচালক নির্মলেন্দু বিশ্বাস, মীরা চৌধুরী ও কাজল বোস দর্শকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা অর্জন করেন। দক্ষিণ ভারতের অতিথিবৃন্দ "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্যের উচ্চ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

১৯৩২ সালে ইংলণ্ড সফর শেষ করে ফিরে এল ভারতীয় দল।

সেকালের রাজ্য জয় করে ফিরে আসার মত গৌরব মাথায় করে দেশে ফিরলেন ভারতের খেলোয়াড়রা। সেবারই ভারত প্রথম অংশ গ্রহণ করে এল টেস্ট ম্যাচে। সেই খেলায় ভারত শক্তিশালী ইংলণ্ড দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের উন্নত মান সকলকে শুধু বিস্মিত করে নি—নির্ভেজাল ক্রিকেটানন্দে মাতিয়ে তুলেছিল।

সেই সাফল্যের জোয়ার তখন ভারতেও এসে পৌঁচেছে। ভারতের ক্রিকেট-উৎসাহীরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ভারতীয় দলের ফিরে আসা পথ চেয়ে।

ফিরে এসেই ভারতীয় দল অংশ গ্রহণ করলে একটা প্রদর্শনী খেলায়। দিল্লীর ফিরোজ-শা কোটলায় ভারতীয় দল খেলবে অবশিষ্ট দলের সংগে। ইংলণ্ডের ক্রিকেট-জগৎ যাঁরা মাত করে আসছেন, তাঁদেরই খেলা দেখতে চান ভারতের দর্শকরা।

ঠিক সেই দলই মাঠে নামুক—যাঁরা দিনের পর দিন ইংলণ্ডের মাঠগুলোয় ভারতীয় ক্রিকেটের জয়যাত্রা সুদৃঢ় করে এসেছেন—বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারতের নাম প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন।

ভাগ্যিস্ সেই খেলাটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা না হলে কি আর অতো তাড়াতাড়ি ভারত পেতো এমন একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়কে!

সেই খেলাটা ছিল একেবারেই সা . মাটা. বিশেষ কোন গুরুত্বও ছিল না তার। কিন্তু একজনের কাছে সেই খেলাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি কি করলেন?

ভারতীয় দলের সেরা খেলোয়াড়দের সংগে তিনিও পাল্লা দিলেন, নিজেকে নতুনভাবে জাহির করলেন, সকলের চোখের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সুন্দরভাবে প্রমাণ করলেন।

নাইডু করলেন সেঞ্চুরী। মহম্মদ নিসার আর অমর সিং মারাত্মক বোলিং করে ভারতীয় দলের জয়লাভের পথ সুগম করে দিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন অবশিষ্ট দলের একটি ছোট ছেলে। ইংলণ্ড থেকে সদ্য প্রত্যাগত ভারতীয় দলের দশ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। তাঁর সেই স্লো বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের নামী ব্যাটসম্যানরা মোটে সুবিধেই করতে পারলেন না। আউট হয়ে যেতে লাগলেন বড় তাড়াতাড়ি।

॥ ডি· আর· জার্ডিন ॥

১৯৩৩-৩৪ সালে ভারত সফরের পর জার্ডিন বলেছিলেন যে, আর দশ বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলের সম্মান লাভ করবে।

মাত্র একটি খেলাতেই যিনি সারা ভারতের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন—তিনি আর কেউ নন, ভারতীয় ক্রিকেটের অনেক গল্পকথার নায়ক দুরন্ত ক্রিকেটার মুস্তাক আলী।

মুস্তাক আলীর কথায় আমরা যথা সময়ে আসবো—তার আগে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে ভারতীয় দল ও বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে তার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে।

১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড ভ্রমণের ফলে এ কথা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ক্রিকেট-জগতে ভারতকে আর নবাগত বলা চলবে না। বিশ্বের সেরা দেশগুলোর সংগে পাল্লা দেবার যোগ্যতা ভারতের আছে।

তারই স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৩৩-৩৪ সালে ইংলণ্ড একটি শক্তিশালী দল পাঠালো ভারত ভ্রমণে। ডি· আর· জার্ডিনের নেতৃত্বে এম· সি· সি দল-টিকে তাঁরা গঠন করেছিলেন খুব শক্তিশালী করেই। দীর্ঘ ছ' মাস ধরে এম· সি· সি দল তিনটি টেস্ট ম্যাচ সহ ৩৪টি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯৩৩ সালের ১৫ই অক্টোবর এম· সি· সি করাচীতে তাদের প্রথম খেলায় খেলতে নামে, আর সফরের শেষ খেলায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় ১৯৩৪ সালের ৬ই মার্চ।

এম· সি· সি দলের পক্ষে সেবার ভারত সফরে এসেছিলেন :

ডি· আর জার্ডিন (সারে)—অধি-নায়ক; সি· এফ· ওয়ালটারস (উর-সেস্টারশায়ার), ডব্লিউ· এইচ· ভি·

লেভেট (কেন্ট), বি· এইচ ভ্যালেনটাইন (কেন্ট), জে· এইচ ম্যিডাল (নটিংহাম-শেয়ার), সি· এস· ম্যারিয়ট (কেন্ট), সি· জে· বারনেট (গ্লস্টারশায়ার), এল· এফ, টাউনসেন্ড (ডার্বিশায়ার), জেমস ল্যাংগরিজ (সাসেক্স), এ· এইচ· বেকওয়েল (নর্দাম্পটনশায়ার), এ· মিচেল (ইয়র্কশায়ার), এইচ· ভেরিটি (ইয়র্কশায়ার), আর. জে· গ্রেগরী (সারে), এইচ· ইলিয়ট (ডার্বিশায়ার), এম· এস· নিকলস (এসেক্স), ই. ডব্লিউ· ক্লার্ক (নর্দাম্পটনশায়ার)।

এই সফরে ভারতীয় দল খুব একটা নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারে নি। ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড সফরে গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে সাফল্যের পরিচয় দিয়ে এসেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি খুব একটা দেখা যায় নি ১৯৩৩-৩৪ সালে এম· সি· সি দলের ভারত সফরের সময়কার খেলাগুলোয়।

এম· সি· সি দল এই সফরে মোট ৩৪টি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্য ১৭টি খেলায় তারা জয়লাভ করে, একটি খেলায় পরাজিত হয় আর বাকী খেলাগুলো শেষ হয় অমীমাংসিত-ভাবে।

এই সফরে ভারত ও এম· সি· সি'র মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি টেস্ট ম্যাচ। তার মধ্যে দুটিতে এম· সি· সি জয়লাভ করে আর একটি খেলা শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। আমাদের আলোচনা এই সফরের তিনটি টেস্ট ম্যাচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। অর্থাৎ ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারত সফররত এম· সি· সি'র সঙ্গে ভারতের টেস্ট ম্যাচ তিনটিই হবে আমাদের আলোচনার আসল বিষয়বস্তু।

ভারত বনাম এম· সি· সি'র প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হয় ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে এবং শেষ হলো ১৮ তারিখে। বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত এই খেলায় ভারত ৯ উইকেটে পরাজিত হয়।

কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতের কাছে এই টেস্ট ম্যাচটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে ঐ খেলার কথা চিরকাল আলাদা অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকবে।

ভারতের তরুণ খেলোয়াড় লালা অমরনাথ এম· সি· সি'র বিরুদ্ধে তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় শতরান করে ভারতীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট খেলায় প্রথম আবির্ভাবে শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৩২ সালে এম· সি· সি ভারতকে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে আত্মপ্রকাশ করার। সেই আত্মপ্রকাশকে দৃঢ়তর করার জন্যেই ডগলাস জার্ডিন পরের বছরই শক্তিশালী এম· সি· সি দল নিয়ে এসেছিলেন ভারত সফরে।

সেবার ভারতীয় দল অবাক করে দেবার মত কোন কিছু করতে না পারলেও কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও নিপুণতা সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক খেলায় সেবার এম· সি· সি দল সহজেই জয়লাভ করেছিল কিম্বা প্রাধান্য বিস্তার করে খেলতে পেরেছিল, তার একমাত্র কারণ হলো সেই সময়ে ভারতে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের অভাব। সত্যিকারের ভালো এবং প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় তখন ভারতে খুব একটা বেশি ছিল না। তাই ১৯৩২ সালে সম্মিলিত ভারতীয় দল যে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল কাউন্টি খেলাগুলোয়, তার পুনরাবৃত্তি এবার আর ঘটলো না এম· সি· সি দলের আঞ্চলিক খেলাগুলোয়।

তবে এম· সি· সি দলের ঐ সফর ক্রিকেট খেলাকে আরো বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছিল—আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভারত একে একে পেয়েছিল তার সম্পদ এবং স্মরণীয় খেলোয়াড়দের। আর খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুচে গিয়েছিল ভারতের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের অভাব।

যাই হোক, ১৯৩৩ সালে বম্বের প্রথম টেস্টে অংশ গ্রহণ করার জন্যে মনোনীত হলেন নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা :—

এস· ওয়াজির আলী, জে· জি· ন্যাভলে, লালা অমরনাথ, সি· কে· নাইডু, এল· পি· জয়, ভি· এম, মার্চেন্ট, এস· এইচ· কোলহা, অমর সিং, মহম্মদ নিসার, এল· রামজি ও আর· এল· জামসেদজী।

[চলবে]

১৯৩৩-৩৪ সালে ভারত সফরকারী এম· সি· সি দলের খেলোয়াড়দের সংগে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দেরও দেখা যাচ্ছে। ছবিতে ভারতের সি· কে· নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট, লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলী, নিসার প্রমুখকে সহজেই চেনা যায়।
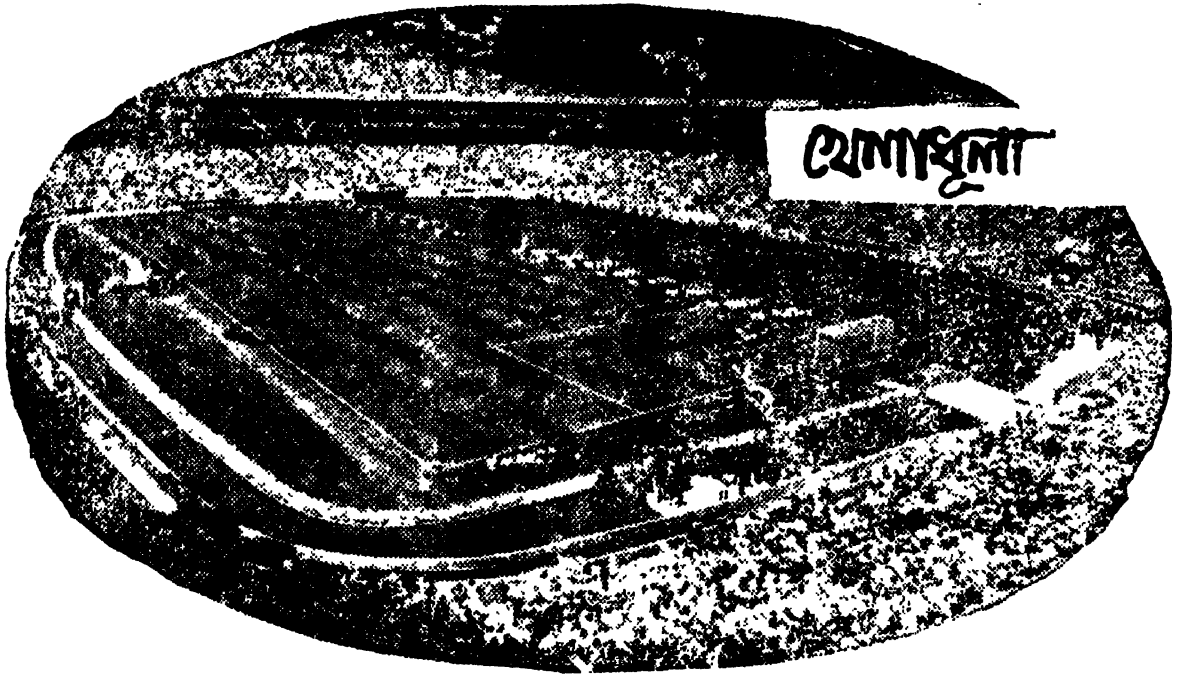
জয়-পরাজয় কিম্বা

ফুটবল এখন মেক্সিকোয়, ফুটবল এখন কলকাতায়। মেক্সিকোয় বসেছে বিশ্ব-কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর আর কলকাতায় এখন চলেছে প্রথম বিভাগীয় লীগ ফুটবলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিশ্ব-কাপের খেলার ফলাফল নিয়ে সমস্ত বিশ্বের ফুটবল-উৎসাহীরা গভীর আলোচনায় মগ্ন, আর কলকাতার ফুটবল লীগ কলকাতা তথা বাংলাদেশের বাজার মাৎ করে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে। খেলায় জয় আছে, পরাজয় আছে, আর আছে অমীমাংসার প্রশ্ন। প্রত্যেক খেলাতেই এই তিনটি বিষয়ের একটা খেলার ফলাফল হয়ে এসে হাজির হবে আমাদের চোখের সামনে। আর এই তিনটিকেই একইভাবে মেনে নেওয়ার দরকার আমাদের সব থেকে বেশি। খেলায় জয়-পরাজয় থাকবেই। জয়-পরাজয় কিম্বা অমীমাংসাই হলো খেলাধুলোর একমাত্র পরিণতি। তাই তাকে সহজভাবে খোলা মনেই মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা সব সময় তা পারি নে। বিশেষ করে নিজের একান্ত প্রিয় দলটি যদি চোখের সামনে পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে আর যাই হোক, সে দুঃখ চট করে সামলানো যায় না। সামলাতে বোধহয় কেউ চেষ্টাও করেন না—অন্তত কলকাতা তথা বাংলাদেশের দর্শকরা। তাই নিজের প্রিয় দল পয়েন্ট নষ্ট করলেই আমাদের মাথায় জ্বলে ওঠে আগুন। পয়েন্ট নষ্টর ঘটনাকে আমরা যেন ঠিক সহজভাবে মেনে নিতে পারি না। তাই ক্রীড়াঙ্গন রূপ নেয় রণাঙ্গনে। যুদ্ধং দেহি বলে ফুটবল-রসিকরা তখন বল ভুলে ফুটে নেমে পড়েন। তবে সব থেকে মজার বিষয় হলো, ফুটবল-রসিকরা সেই মুহূর্তে যা করতে যাচ্ছেন সেটা যে সংগত নয়—সে কথাও তাঁদের ভালোভাবেই জানা থাকে—মনেও হয়তো থাকে, ফুটবল খেলার একমাত্র পরিণতি জয়, পরাজয় কিংবা অমীমাংসা......।

—শান্তিপ্রিয়

ফুটবল মাঠে

গতবারের জুলে রিমে কাপ বিজয়ী ইংলণ্ডকে হারানোই বোধহয় যেমন ব্রেজিলের সব থেকে বড় কৃতিত্ব, তেমনি এবারের বিশ্ব-কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় ঘটনা ব্রেজিল এক গোলে ইংলণ্ডকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইংলণ্ডকে এই যোগ্যতা অর্জন করতে আর একটি খেলায় জয়লাভ করতে হবে।

এবারের প্রতিযোগিতার তিন নম্বর ...র দিকেই সকলের নজর। সকলেই ... করছেন যে, এই গ্রুপেরই একটি দল ... বছরের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর ... অর্জন করবে। সে সম্মান লাভ ... পারে ইংলণ্ড, কিম্বা সে সম্মান লাভ করতে পারে ব্রেজিল।

বিশ্ব-কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ... হবার আগে একটি কম্পিউটার ...রের ফলাফল ঘোষণা করেছে। কম্পিউটারটির মতে, গত বছরের বিজয়ী ইংলণ্ডই এবারও জুলে রিমে কাপ জয় করবে। ফাইন্যাল খেলার ফলাফল সম্বন্ধে কম্পিউটারটির মত হলো, খেলাটি প্রথম অর্ধে ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকবে। দ্বিতীয় অর্ধে ইংলণ্ড একটি গোল করে দ্বিতীয় বার বিশ্ব-কাপ জয় করবে। কিন্তু একটা বিষয়ে কম্পিউটারটি একদম চুপ। কোন্ দল রানার্স আপ হবে অর্থাৎ ফাইন্যালে কোন্ দল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলবে, সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করে নি কম্পিউটারটি।

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কম্পিউটারের ভবিষ্যদ্বাণী আদৌ সফল হয় কিনা...।

মেক্সিকোর সংগেই যেন তাল দিয়ে এদিকে কলকাতার লীগ ফুটবলের আসরও বেশ জমে উঠেছে। মোহনবাগান, ইস্টবেংগল আর মহমেডান স্পোর্টিং লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের স্বপ্ন সামনে রেখে স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে পয়েণ্ট সংগ্রহ করে।

সহজ পথে ইস্টবেংগল প্রথম বাধা পেল উয়াড়ীর কাছে। উয়াড়ীর সংগে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে ইস্টবেংগল মরশুমের প্রথম পয়েণ্ট নষ্ট করেছে।

এবারের লীগের খেলায় প্রতিটি পয়েণ্টের মূল্য অপরিসীম। কারণ একক লীগের পয়েণ্ট এবার সুপার, লীগের পয়েণ্টের সংগে যোগ হবে। তাই লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করতে হলে ছোট, বড় প্রত্যেকটি দলের সংগে এ বছর ভালো খেলে পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে হবে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের স্বপ্ন আজ যাদের মনে, তাদের সকলকেই। তাই এ বছর বড় দলগুলোর কাছে প্রতিটি খেলাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বোম্বাই অঞ্চলের সেরা ক্রিকেটার অশোক মানকড়।

॥ সোবার্স ॥

বিশ্ব ক্রিকেট একাদশের অধিনায়ক।

॥ ইঞ্জিনীয়ার ॥

বিশ্ব একাদশে ভারতের একমাত্র খেলোয়াড়।

গল্প হলেও সত্যি

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের "থ্রি-ডাবলিউ"-এর অন্যতম এভার্টন উইকসের পরপর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরী রেকর্ড আজও পর্যন্ত কেউ ভাঙতে বা স্পর্শ করতে পারেন নি।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৪৭-৪৮ সালের টেস্ট সিরিজে স্বদেশের মাটিতে কিংস্টন টেস্টে তিনি ১৪১ রান করে এই রেকর্ডের শুভ সূচনা করেন। পরের বছর ১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সংগে এলেন ভারত সফরে। দিল্লী টেস্টে করলেন ১২৮ রান, বোম্বাইয়ে ১৯৪ ও কলকাতা টেস্টে উভয় ইনিংসেই যথাক্রমে করলেন ১৬২ রান ও ১০১ রান। ফলে উপর্যুপরি পাঁচটি ইনিংসে সেঞ্চুরী করার অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করলেন এভার্টন উইকস্। আর আশ্চর্যের বিষয় হত যদি ঠিক পরের টেস্টে মাদ্রাজে তিনি ৯০ রানের মাথায় রান-আউট না হতেন!

এভার্টন উইকসের টেস্ট-এ মোট রানের হিসাব হোল নিম্নরূপ—টেস্ট—৪৮, ইনিংস—৮১, সর্বোচ্চ রান—২০৭, সেঞ্চুরী—১৫, মোট রান—৪৪৫৫ এবং গড় ৫৮·৬১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, "থ্রি ডাবলিউ"-এর মধ্যে পরিসংখ্যানের দিক থেকে উইকস্‌ই শীর্ষস্থানে আছেন।

—প্রশান্ত বসু,
"কল্যাণী ভবন", ইয়ং রোড,
আসানসোল।

প্রশ্ন-উত্তর

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় (ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১)

উত্তর : ব্রেজিল ইংলণ্ডকে এক গোলে হারিয়ে দিয়েছে—এ খবর দৈনিক পত্রিকায় নিশ্চই দেখেছেন।

চুনী গোস্বামী ফুটবল খেলায় (প্রতিদ্বন্দিতামূলক) সম্ভবত আর অংশগ্রহণ করবেন না।

কাজল চক্রবর্তী (পুরাতন মিশন রোড, করিমগঞ্জ, কাছাড়)

প্রশ্ন : মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আর কোন দল কি হকি লীগ জয় করতে পারে নি? যদি পেরে থাকে তবে কোন্ কোন্ দল?

উত্তর : মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আরো অনেকগুলি দল হকি লীগ জয় করেছে। যেমন—বি· এন· আর, কাস্টমস, মহামেডান স্পোর্টিং, ভবানীপুর পোর্ট কমিশনারস্, রেঞ্জার্স, পুলিশ, বি· জি· প্রেস, অ্যারিয়ান্স, গ্রীয়ার, বি· ই· কলেজ, মিলিটারী মেডিকেলস্, ক্যালকাটা প্রভৃতি।

স্মরজিৎ ভট্টাচার্য (শক্তিগড়, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : চলতি মরশুমে মোহনবাগান দলের ফুটবল অধিনায়কের নাম জানতে চাই।

উত্তর : সি প্রসাদ।

অঞ্জন ব্যানার্জী (পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১)

প্রশ্ন : ১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপের খেলায় ইংলণ্ড ও পশ্চিম জার্মানী দলের খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই।

উত্তর : এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর শেষ হয়ে গেলে আলাদাভাবে জানানো হবে।

উত্তমকুমার আঢ্য (হলধর দে লেন, কলকাতা-১২)

উত্তর : এবারের ক্রিকেট মরশুম তো শেষ হয়ে গেছে। আসছে বছর ক্রিকেট মরশুম শুরু হবার আগে আমাদের সংগে যোগাযোগ করবেন।

মনোজকুমার সরকার (টণ্ডু চা-বাগান, নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বাংলাদেশের নামী দলগুলো এখন আর বেশি খেলোয়াড় আনতে পারছে না। ভালোই হয়েছে। এতে বাংলা দেশের উদীয়মান খেলোয়াড়রা আরো বেশি করে সুযোগ পাবে।

আপনি প্রণব গাঙ্গুলীকে C/o. মোহনবাগান ক্লাব টেণ্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা-২১—এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন।

কাজলকুমার পান (দিগ্‌পার, বাঁকুড়া)

উত্তর : আপনার প্রশ্নের উত্তর তো এই মুহূর্তে আবার দেওয়া সম্ভব নয়—তবে ফুটবল বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলে তাতে নিশ্চয়ই থাকবে।

ভবতোষ রায় (কামাখ্যাগুড়ী, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : বিশ্ব বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পেলের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হবার আগে আপনি এই ঠিকানায় লিখতে পারেন—
মিঃ পেলে, C/o. ব্রেজিল টিম, ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেণ্ট কমিটি, মেক্সিকো।

শান্তনু চ্যাটার্জী (পখন্না, বাঁকুড়া)

উত্তর : ফারুক ইঞ্জিনীয়ারকে বিশ্বের সেরা দুজন উইকেটরক্ষকের একজন বলা সংগত কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশ্ব একাদশে ইঞ্জিনীয়ার সুযোগ পেয়েছেন, আমরা আশা করবো তিনি ভালো খেলে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবেন। ইঞ্জিনীয়ারের ব্যাটিং এ্যাভারেজ আগেই প্রকাশ করা হয়েছে দেখেছেন নিশ্চই।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ক্রীড়ামান যে অবনতির মুখে, এ কথা আজ আর কোনো ক্রীড়ামোদীকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কি হকি, কি ফুটবল, কি অ্যাথলেটিকস্—প্রায় সবেতেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থ ভূমিকা। যে ভারত হকিতে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ছিল, সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে তার স্থান যে কতদূরে নেমে এসেছে তা বলা যায় না। অনেক শক্তিশালী হকি টীম আজকাল দেখা যায়। সর্বদিক থেকেই তারা উন্নত। গত অলিম্পিকে হকিতে আমাদের তৃতীয় স্থান। ৩৭।৩৮ জন প্রতিনিধি পাঠিয়ে ঘরে এল মাত্র একটা ব্রোঞ্জ-পদক। পক্ষান্তরে ফুটবলেও আমাদের ব্যর্থতা সুপরিচিত। গত মারদেকায় আটটি টিম যোগদান করেছিল, আর তাদের মধ্যে ভারতই হয়েছিল অষ্টম। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ এই ভারত। ৫৫।৬০ কোটি লোক বাস করেন এখানে। উপযুক্ত খেলোয়াড়ের কি সন্ধান মেলে না এখানে? অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই ভারতেরই নানা দল বিদেশ সফর করছে। সুনাম তো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছেই না, উপরন্তু অতীতে যা ছিটেফোঁটা ছিল, তাতেও টান পড়ছে। আবার রয়েছে খেলোয়াড়দের নৈতিকতাবোধের অভাব—কি অভিজ্ঞ, কি অনভিজ্ঞ। যাক সে অন্য কথা।
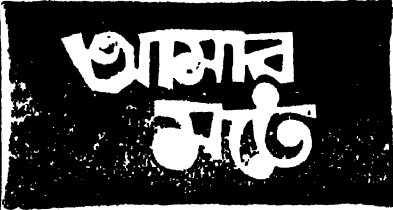
আজ আমি কেন, প্রায় অনেকেই বলেন যে, এই ক্রমাগত সফর বন্ধ করে যদি আমরা সেই টাকায় দেশে ভালভাবে কিছু নবীনদের শিক্ষাদান করতে পারি, তাহলে বোধহয় ফল ভালই হবে। সব কিছুতেই যোগদান করে কৌলীন্য বজায় রাখতে গিয়ে সবই যে খোয়াতে হচ্ছে, এ দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

—অশোককুমার ঘোষ,
কৃষ্ণপুর, শিবনিবাস, নদীয়া।

সম্পাদকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

NIRODH
৫টি পয়সা
খরচ করলে
আপনি আপনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন!
নিরোধ
পরিবার পরিকল্পনার জন্যে
উন্নত ধরণের
রবারের জন্মনিরোধক
15 পয়সায় 3টি

বৃহস্পতিবার, ১০ই আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৪ বর্ষ : ৫২শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 25th June, 1970

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় প্রধানমন্ত্রীর সফর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক ঝটিকা সফরে খরা কবলিত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া পরিদর্শন করেছেন। তাঁর ঐ সফরের ফলে কি হল, খরায় দুর্গত সাধারণ মানুষের দ্রুত সাহায্যের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। তবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে।

পুরুলিয়ায় খরা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ঐ জেলার অনাবৃষ্টি এবং খরা চিরদিনের সমস্যা। তিনি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে জানান, পুরুলিয়ার খরা সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন এবং ঐ জেলার দুর্গত মানুষগুলিকে সাহায্য করার কথা সব সময় তাঁর মনে আছে।

বাঁকুড়ার খরা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাঁকুড়ার মত গরীব জেলার উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে। এর জন্য সময় লাগবে। যাঁরা বলেন অতি দ্রুত এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করা যায়, তাঁরা জনসাধারণকে ধাপ্পা দেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার খরায় দুর্গত মানুষগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম। খরার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও পেশ করেছিলাম। যা' হোক, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রত্যক্ষভাবে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া পরিদর্শন করে ঐ দুই জেলার দুরবস্থা উপলব্ধি করেছেন বলে আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি। কিন্তু আশ্বস্ত বোধ করলেই সব সময় স্বস্তি বোধ করা যায় না, কারণ জনসাধারণের ভাগ্য এখন নির্ভর করছে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ওপর। আর প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা থাকলেই যে সব সময় সাফল্য আসে—তাও মনে করার হেতু নেই। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের ভয়ঙ্কর বন্যার কথা। প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী বন্যাঞ্চলে যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা আজও কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। তা সম্ভব না হওয়ার মূলে রয়েছে প্রতিশ্রুতিমতো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সাহায্য না দেওয়া। অথচ একথা সবাই জানেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারের বিরাট অংশ পূর্ণ হয় উত্তরবঙ্গের আনুকূল্যেই।

উত্তরবঙ্গ বহু অর্থ যোগান দিয়েও যদি বিপন্মুক্তির জন্যে তেমন কিছু না পায়, তাহলে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার ভাগ্যে যে কি জুটবে, তা বলা অত্যন্ত মুস্কিল। তা ছাড়া গত বাইশ বছরে ঐ জেলা দুটির কল্যাণের জন্য পাঁচ বছর অন্তর অজস্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সরল মানুষগুলির কাছ থেকে ভোট অবশ্যই লাভ করা গেছে, কিন্তু সেই ভোটের মূল্য দেয় নি গদিনসীন রাজনৈতিক দল। নদী পরিকল্পনার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও বাঁকুড়া জেলার কোনো উপকারই সাধিত হয় নি।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা দুটিকে দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের হাত থেকে একদিনের মধ্যে রক্ষা করা যাবে, এমন আশা কেউ করে না, কিন্তু বাইশ বছরের মধ্যে কিছুই করা হয় নি—একথাই বা কি করে ভোলা যায়? পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার অধিবাসীরা যেটুকু সুখে ছিল, গত বাইশ বছরে তাদের দৈন্য ও দুঃখ বেড়েছে আরো বহু বেশি। সুতরাং সেখানের জনসাধারণ যেমন দিশেহারা তেমনি এখন ধৈর্যহীন।

তবু প্রধানমন্ত্রীকে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার সহস্র সহস্র মানুষ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও তাদের আকুলতা ও আগ্রহাতিশয্য অনুভব করে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এক মুহূর্তেই সুরু হয়ে গেল খরা কবলিত পুরুলিয়ায় সি আর পি-র লাঠিবৃষ্টি। যারা সারা গ্রীষ্মে বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছে এক গ্লাস পানীয় জল, তারা কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর কৃপায় করল এক নিমেষেই রক্তস্নান।

তাই প্রধানমন্ত্রীর ঝটিকা সফর এখন অন্য এক ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই আশঙ্কাও বদ্ধমূল হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর সামনেই যদি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত জনসাধারণের ওপর কেন্দ্রীয় পুলিশের অকথ্য অত্যাচার চলে, তাহলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিষ্করুণ নির্দয়তার শুধু বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় নয়, এই পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোনোরকম কল্যাণ সাধনের আশা নেই।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

শ্রমিক দলের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের ওপর দাঁড়িয়ে রক্ষণশীল দলনেতা এডোয়ার্ড হীথ যখন জনতার অভিনন্দন কুড়োচ্ছিলেন, সারা দুনিয়ায় তখন টেলিপ্রিন্টার খটখট করে শব্দ সাজাচ্ছে, সংবাদ প্রেরণ করছে : বৃটেনে রক্ষণশীল দলের ক্ষমতা লাভ : মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য এডোয়ার্ড হীথ আহূত।

ওদিকে ৫৪ বছরের অবিবাহিত পুরুষ এডোয়ার্ড হীথ উৎসুক প্রশ্নের ব্যস্ত উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। তারই মধ্যে কিছু রসাল উক্তি : বিয়ে করে ভালো প্রধানমন্ত্রী নয়, ভালো স্বামীও হওয়া যায় না। অর্থাৎ হীথ যেন ভালো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যই অর্ধ শতকের ওপর অকৃতদারের জীবনযাপন করে আসছেন। কথাটা সিরিয়াসভাবে গ্রহণ করা যেত, যদি ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিকে প্রফেশন করার জন্য তৈরি হতেন। কিন্তু আদৌ তাঁর মধ্যে তেমন কোনো প্রস্তুতি ছিল না, অক্সফোর্ডে স্নাতক হওয়ার পরেও রাজনীতি না করে যোগ দিয়েছিলেন রাজকীয় গোলন্দাজবাহিনীতে। শান্তির পরেও সিভিল সার্ভিসের আমলা জীবন। তবে, সেখানেই টিকে থাকেন নি। ১৯৫০-এ রক্ষণশীল দলের প্রার্থীপদে জয়লাভ ঘটে গেছে হীথের। আর সেই থেকে আজ বিশ বছর চলছে তাঁর রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা।

স্যার ডগলাস হিউম ডাউনিং স্ট্রীট ছেড়েছিলেন ছ' বছর আগে। তাঁর রক্ষণশীল দল যে সত্তরের দশকে পুনশ্চ দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের দখল নেবে সেদিন সেকথা কেউ হয়ত ভাবতেও পারেন নি। কারণ, আজকের দুনিয়ায় রক্ষণশীলতা কোনো বিশেষণ নয়। তবে, বৃটেনের চরিত্রটাই কসমোপলিটানতার মধ্যে কেমন একটু অনন্যসাধারণ। দেশে কার্যত সাধারণতন্ত্র অথচ কাগজে-কলমে আজও 'কিং ক্যান ডু নো রঙ'। আর অনেকের ধারণা, দুই বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক দলও সেখানে আসলে যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। কিন্তু আরও কট্টর বাম মার্গীয়রা নির্বাচনে কোনো স্থানই পান না কেন? বাস্তবিক বৃটিশ মেজাজে রক্ষণশীলতাকে [illegible]

আশ্চর্যরকম একচেটে। তাই স্যার আলেক ডগলাস ফিরে আসেন হীথ মন্ত্রিসভার দু' নম্বর মন্ত্রী হয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার নিতে।

অথচ রাতের পরে দিনের মত চিরচলিষ্ণু জীবনপ্রবাহই রচনা করে গতিশীল ইতিহাস। সে ইতিহাসে ঐতিহ্যানুসরণের মর্যাদা আছে, নেই কিন্তু রক্ষণশীলতার ঠাঁই। বৃটেন কিন্তু রক্ষণশীল দলকেই গ্রহণ করল ৩২১টি আসনে। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী উইলসনের শ্রমিক দলও কুড়োলেন অবশ্য ২৮৮টি আসন।

এডোয়ার্ড হীথ

হীথের পুনরাগমন এই কারণে আরও চমকপ্রদ যে, এবার বৃটিশ নির্বাচনী ভোটার তালিকায় তরুণের দল ছিল অনেক বেশি ভারি। আঠারো থেকে বিশ বছরও পেয়েছে দেশের সরকার গঠনের সুযোগ। অবশ্য ভোট বাক্সে ভোট পড়েছে সেই তুলনায় অত্যন্ত কম। ভোট বেশি পড়লে কি হ'ত সঠিক বলা মুস্কিল। তবে, এই মুহূর্তে হীথই জনপ্রিয় নেতা।

এডোয়ার্ড হীথ অন্তত দুটি জবর সুযোগ ভোগ করেছেন। শ্রমিক দলই বৃটিশ অর্থনীতির অধঃপতনের কারণ, এমন একটা বিশ্বাস সাফল্যের সঙ্গে সাধারণ্যে প্রচার করতে পেরেছিলেন [illegible]

[illegible] এবং যারা [illegible] সংস্কারপন্থী ([illegible] নয়) অর্থনীতির ফলশ্রুতি [illegible] বেকার সমস্যা শ্রমিক দলের প্রতি বিমুখ করেছে সাধারণ মানুষকে। হীথের অর্থনৈতিক শ্লোগান দারুণ কাজ দিয়েছে তাই। এ বিষয়ে উইলসনের মন্তব্য কিন্তু অন্যরকম। তিনি বলেন, বৃটেনে আজকের মতো এমন মজবুত অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ওপর প্রধানমন্ত্রিত্ব করার সুযোগ হীথের আগে আর কেউ পান নি। মূল্যবৃদ্ধির শ্লোগানে শ্রমিক দলের পরাভব সম্ভব হয়েছে বটে, তবে রক্ষণশীল নীতি এই দুরবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলবে।

কিন্তু আসল ঘটনা, হীথের নির্বাচনী প্রচার মন্ত্রের মতো কাজ দিয়েছে। ডাউনিং স্ট্রীট এখন তাঁরই দখলে। প্রধানমন্ত্রীরূপে হীথ এই প্রথম, তবে শাসনকার্যে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ব কেশের মতই পরিপক্ব। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ হীথ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। য়ুরোপীয় অর্থনীতিতে বৃটেনের প্রবেশ সম্পর্কে তাঁরই ছিল প্রধান ভূমিকা। ১৯৭০ সালে তাঁর সেই ভূমিকাই তাঁকে জয়মাল্য পরিয়েছে। কেন না অর্থনৈতিক শ্লোগানকেই তিনি মুখ্য নির্বাচনী শ্লোগান করেছিলেন। হীথ সাহেবের জন্ম ১৯১৬ খৃস্টাব্দে। পার্লামেন্টে প্রথম প্রবেশ আজ থেকে বিশ বছর আগে। রক্ষণশীল প্রার্থীরূপে। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, চীফ হুইপ, লর্ড প্রিভি সিলরূপে তিনি রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দায়িত্বে জড়িয়ে পড়েন ক্রমেই। আজ দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের মালিক। অন্তত বছর পাঁচেক নিশ্চিন্ত। তাঁর দল গরিষ্ঠতা বজায় রেখে অনায়াসেই টিকে থাকতে পারবেন গদীতে। ওখানে গদীলুব্ধের হুটোপাটি নেই। ডেমোক্রেসী তার পুরো সংজ্ঞা বজায় রেখে সসম্মানে টিকে থাকতে জানে। নেই সরকার বদল হলে আমলা হঠানোর অদ্ভুত সন্তোষ উত্তেজনা। ওদেশ কাজ চায়।

হীথ সাহেবকে তাই এখন শুদ্ধ তাঁর দলীয় নীতির খসড়াটুকু বুঝিয়ে দিতে হবে। কাজ চলবে নবোদ্যমে। প্রশাসক বিতাড়নের সম্মার্জনী নিয়ে এডোয়ার্ড হীথকে জমাদারি করতে হবে না। আর হ্যারল্ড উইলসনও হাসিমুখেই বিরোধী আসনে গিয়ে বসবেন। [illegible] হারানোর [illegible] [illegible] বিজ্ঞতার [illegible] নেই। [illegible]

[illegible]

লীলা রায়

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ভারতীয় জাতীয়তার এবং সুভাষচন্দ্রের আদর্শের ব্রত উদ্‌যাপনে আত্মনিবেদিত সদ্য-লোকান্তরিতা মহীয়সী নারী লীলা রায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করা সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনীকার হিসাবে আমি আমার অবশ্য কর্তব্য মনে করি।

গত ১২ই জুন প্রায়-মধ্যাহ্নে লীলা রায়ের মরদেহ নিয়ে অগ্রসর শোক-মিছিলের মধ্যে থেকে মনে হয়েছিল—পূর্বেও মনে হয়েছে, পরেও হয়েছে—এই যাঁর দেহ চরম উৎসর্গের অগ্নিতে অর্পিত হবার জন্য বাহিত হয়ে চলেছে, ইনি তাঁর জীবিতকালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নারী ছিলেন। বাংলার নারীকুলে প্রথমা তিনি —কর্মজীবনের মধ্যাহ্ন প্রহরে তো নিশ্চয়ই, সায়াহ্নের অবসরে যখন ছিলেন তখনো, এমন কি জীবনের ঘন সন্ধ্যায় যখন সংজ্ঞাহীন, তবু হয়ত অনির্দেশ্য কোনো চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত ছিলেন—তখনো তিনিই প্রথমা। ১৯২০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের বাংলা দেশের ইতিহাসের উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়েও লীলা রায়ের মত সর্বাঙ্গীণ গুণসম্পন্না কোনো বাঙালী নারীর কথা স্মরণে আনতে পারি নি। জীবনের ক্ষেত্র-বিশেষে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এমন নারী নিশ্চয় দেখা যাবে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিক্ষায়, শিক্ষাবিস্তারে এবং রাজনৈতিক কর্মে কৃতী মহিলার নাম আমার মনে পড়েছে, কিন্তু লীলা রায়ের ব্যাপক মহিমা তাঁদের ছিল না।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, উদার প্রগতিশীল সংস্কৃতির ধারক গিরিশচন্দ্র নাগের কন্যা লীলাবতী নাগ ছাত্রী হিসাবে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে তা দেখা গিয়েছিল (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়ে বি-এ পাশ করেন, তার আগে বৃত্তিসহ আই-এ পাশ করেছিলেন, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজির এম-এ হন), কিন্তু প্রতিভার চেয়ে অল্প ছিল না তাঁর চরিত্রের তেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে সহশিক্ষার রীতি ছিল না—সে অধিকার লড়াই করে লীলা নাগ আদায় করেছিলেন।

সংগঠনে অসামান্য শক্তির পরিচয় ছাত্রজীবন থেকেই দেখিয়েছেন। বেথুন কলেজে পড়ার সময়ে ছাত্রীসঙ্ঘে নেতৃত্ব করেছেন, জাতীয় সম্মেলনের পরিপন্থী সব কিছুর বিরুদ্ধে রুখে প্রতিবাদ করেছেন, প্রয়োজনে ধর্মঘটের পথে নেমেছেন, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণের জন্য গঠিত ঢাকা কমিটির সহ-সম্পাদিকা হয়েছেন, নারীর ভোটাধিকার দাবি আন্দোলনে বৃহৎ অংশ নিয়েছেন, তার পরে এম-এ পাশ করে বেরিয়েই ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে ঢাকায় 'দীপালী সঙ্ঘ' স্থাপন করেছেন, যার ফলে লীলা নাগের নাম অভিন্ন হয়ে জড়িয়ে থাকবে বহু বছর। দীপালী সঙ্ঘের বহু-বিস্তৃত কর্মধারা, নারী-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন, তাঁকে যে মহিমা দিয়েছে, বাংলা দেশের আর কোনো নারী সে গৌরব দাবি করতে পারেন না।

স্বাধীনতা-সংগ্রামই লীলা রায়ের জীবনের মুখ্য প্রয়াস। প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনে এবং অপ্রকাশ্য বৈপ্লবিক সংগঠনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীসঙ্ঘের নেতা, সহপাঠী অনিল রায় তাঁকে বিপ্লবের পথে আকর্ষণ করেছিলেন। জীবনের মধ্য ও শেষ পর্বে সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির সঙ্গে যোগ তাঁকে সর্ব-ভারতীয় চরিত্র করে তুলেছিল। ফরোয়ার্ড ব্লক ও পি এস পি-র বহু উচ্চপদে তিনি অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

দেশসেবার মূল্য তাঁকে বহু বৎসরের কারাবাসে দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় মূল্য দিয়েছেন—যখন নিজের ধূলিসাৎ হওয়া স্বপ্ন ও সাধনার সামনে দাঁড়িয়েছেন। কতকগুলি লোকের লোভের চক্রান্তে ভারত বিভক্ত হয়েছিল। নোয়াখালিতে এবং অন্যত্র ঘুরে ঘুরে অগণিত লাঞ্ছিত মানুষের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের আর্তনাদকে নিজের বুকে অনুভব করে দিনে দিনে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

লীলা রায় জয়শ্রী পত্রিকার প্রবর্তন করেছিলেন। মহিলার দ্বারা পরিচালিত, সম্পাদিত এবং মাত্র মহিলা লেখকদের রচনায় অলংকৃত পত্রিকা 'জয়শ্রী', যার নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, প্রথম সংখ্যার জন্য আশীর্বাদসূচক কবিতা

দিয়েছিলেন, পরেও বহু রচনা দিয়েছেন।* লীলা রায় বহু বৎসর এই পত্রিকার সম্পাদনা করে তার উচ্চমান সর্বদা বজায় রেখে, বাংলা দেশের প্রধান নারী-সাংবাদিকদের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী সাময়িক পত্রের কয়েকজন সম্পাদিকার নাম আমরা জানি, কিন্তু সাংবাদিকতা বলতে যা বোঝায়, তা তাঁরা করেন নি। লীলা রায়, সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হলে (১৯৪০) ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকার সম্পাদিকাও হয়েছিলেন।

লীলা নাগ অনিল রায়ের সঙ্গে পরিণীতা হয়ে লীলা রায় হন। অনিল রায় আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। এমন উদ্দীপ্ত, এমন আকর্ষণীয় এবং অতলান্ত রহস্যগভীর চরিত্র অল্পই হয়েছে। লীলা নাগের সঙ্গে ছাত্র বয়স থেকেই অনিল রায়ের পরিচয়, বহুদিন পরে (১৯৩৯ সালে) তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ দুই নক্ষত্রের মিলন। বাংলাদেশের বিপ্লবী দম্পতি বলতে অনিল রায় লীলা রায়কেই বোঝায়।

লীলা রায়ের কর্মজীবনের উত্তুঙ্গ মহিমাই তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। তিনি কেবল দেশের স্বাধীনতা-সন্ধানী নন—আত্মার স্বাধীনতাও চেয়েছেন। কিন্তু প্রথমত তা ছিল দেশেরই স্বাধীনতা। ১৭ বছরের মেয়ে তাঁর জন্মদিনে বাবাকে চিঠিতে লিখিছিলেনঃ "জানো বাবা, আজকাল আমার জন্মদিনে সুখের পরিবর্তে ভয়ানক দুঃখ হয়। তোমরা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমাদের কষ্ট দিতে আমার খুবই কষ্ট হয়, অথচ আমার ব্যবহারকে ঠিক করতে পারি নে। প্রতিবারই জন্মদিনে আমি প্রতিজ্ঞা করি, 'এ বৎসর নিশ্চয়ই ভাল হব', কিন্তু বছরের পর বছর চলে যায়, দেখি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। ...বাড়ির লোকের সঙ্গে সব সময় মিলে-মিশে থাকা আমার একরকম অসম্ভব হয়েছে। আমি চাই স্বাতন্ত্র্য রেখে চলতে, কিন্তু তাতে অনেক বাধা পাই! আমি যেটা ভাল বলে বুঝি, সেটা করতে আমি সর্বদা চেষ্টা করি। আর সেই জন্যই সকলের সব কথা আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হয় না। এটাকে লোকে অবাধ্যতা ভেবে নেয়। তা ভাবুক। ...তাই বলে আমার বিবেককে পায়ে ঠেলতে পারব না। ...আমার উদ্দেশ্য নয়, এই পৃথিবীতে লোকের প্রিয় হওয়া, কিন্তু (উদ্দেশ্য) এই পৃথিবীতে খাঁটি হওয়া।" ১৭ বছরের ঐ মেয়েই বাবাকে লিখেছিল—কখনো বিয়ে করবে না, এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তার নয়, কিন্তু বিয়ে করার প্রয়োজন এখন তার জীবনে হয় নি। "পৃথিবীতে কি বিয়ে করবার লোকের অভাব আছে নাকি? দু'-চারটি বিয়ে না করলে কিছু আসে যাবে না এই প্রকাণ্ড বিশ্বের।" তাছাড়া পিতার প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে একটা ভাল বিয়ে করার মত লোভী-মন মেয়েটির একেবারেই ছিল না। তারও বড় কথা, একা থাকার, নিজের ভার নিজে বইবার দৃঢ়তা মেয়েটির ছিল এবং সাহস ছিল এই কথা বলবারঃ "আমাকে প্রলোভিত করতে কেউ পারবে না, কেউ পারবে না।"

এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-স্পৃহার সঙ্গে দেশগত স্বাধীনতাস্পৃহা জড়িয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ২১ বছরের মেয়ে বাবাকে লিখতে পেরেছিলঃ "মানুষের স্বাধীন হবার ইচ্ছাকে কেউ কখনো দমিয়ে রাখতে পারবে না। শত বছরে হউক, হাজার বছরে হউক, সে স্বাধীন হবার চেষ্টা করবেই। ...আয়ারল্যাণ্ডের 'কেস' দেখলে আমার তাই মনে হয়। উঃ, কতদিন, প্রায় ৮০০ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে স্বাধীনতা পাবার জন্য।...কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নি, রাশিয়ার জারকে 'ওভারথ্রো' করতে পারবে প্রজারা। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।" "স্বাধীনতার সংগ্রামে হারলে লজ্জা কী! সেই হারার লজ্জার জন্য কি মনুষ্যত্ব হারিয়ে চিরদিন থাকতে হবে?" অনেক বছর পরে, বার্ধক্যে পৌঁছেও লীলা রায় বলবেন, "আমি আত্মনিবেদিত বিপ্লবী, পিছুটান আমি রাখি না", বলবেন, "চিরবিপ্লবীর জীবন চাই।" "আর দশজন লোকের মত আমি চলি না। সেটা ভাল কি খারাপ, সেটা প্রশ্ন নয়, আমি চলি না—এটাই ফ্যাক্ট। ...নিজের নীতিতে অবিচলিত থাকার মত দৃঢ়তা আমার আছে এবং সে দৃঢ়তা শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।" বিপ্লবীর মর্মকথাকে তুলে ধরেছিলেন প্রাণরক্তময় ভাষায়ঃ "জয়-পরাজয়, সাংসারিক ব্যর্থতা—এসবে কি মানুষের পরিচয় আছে? আছে তার চিন্তায়, ব্যবহারে, সংগ্রামে। Achievements কী? কোনো কিছু পাওয়া? ভেবে ভেবে দেখেছি অনেক, তাতে আমার আকর্ষণ নেই। অনন্তের হাতছানিতে পথ চলা; রক্তাক্ত এ-পথ; কত লাঞ্ছনা, কত বঞ্চনা, কত আত্মত্যাগ, আত্মনিগ্রহ, কিন্তু পথ আর শেষ হয় না।"

লীলা রায় কখনো দেশ বলতে নিছক একটা ভৌগোলিক সংস্থান বুঝতেন না। দেশ মানে মানুষ, ভাল-মন্দ মেশানো মানুষ। "মানুষকে ভালবাসি, চিরদিন বেসেছি। আমার সকল কাজের উৎসাহ তাই। ভালবাসা আমার বন্ধন নয়, প্রেরণা ও আনন্দ।" "মানুষকে, সব মানুষকেই আমি ভালবাসি। তাদের মহত্ত্ব, দুর্বলতা, দৈন্য, অক্ষমতা, সবই আমাকে terribly, irrevocably move করে।" "রাঙন চশমা আমি চাই নে। সব কিছুকে সুন্দর দেখার পণ আমার কোনোদিনই নেই। অসুন্দরকে অসুন্দরই বলব; সে পীড়া দেবেই। কিন্তু আমার চেষ্টা হচ্ছে, সেই বেদনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলা। তার মধ্য থেকে নিজেকেই বার বার খুঁজে পাচ্ছি, জানছি, আবিষ্কার করছি।"

লীলা রায়ের তাই 'জীবনের প্রতি অভিযোগ নেই।' 'জীবনকে একটানা নির্ঝঞ্ঝাট দুঃখ-শোকমুক্ত পাবেন'—এমন আশা করার নির্বুদ্ধিতা দেখান নি বলে উদার, প্রসন্ন, অথচ বজ্রদৃঢ় মনের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। তাই বলতে পেরেছিলেন, "জীবনে বীরত্বের ও মাধুর্যের উপাসনা একসঙ্গে করে এসেছি; একে অন্যের পরিপূরক হয়েছে আমার জীবনে।" "প্রচুর স্নেহ, দরদ, ভালবাসা, প্রেম জীবনে জুটেছে; দেবতার আশীর্বাদও অজস্র ধারায় পেয়েছি নিশ্চয়।"

দেবতার চরম আশীর্বাদ তাঁর জীবনে অনিল রায়। অনিল রায়, সংস্কৃত সাহিত্যের এবং দর্শনের ছাত্র, ইংরেজি সাহিত্যেরও, তের বছর বয়সে যাঁর বিপ্লবে দীক্ষা, সেই দুর্গম-বন্ধুর পথ কখনো ছাড়েন নি, কিন্তু "ধ্যানীর মত তন্ময় হয়ে যেতেন সঙ্গীতে; বেহালার ছড়ে বন্যা গলে পড়ত সুরের অমৃত-করুণ করুণায়। কবিতায়, আবেগমন্দ্র গদ্য ও গীত রচনায় স্বভাবশিল্পমনের অক্ষয় স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। অল্প বয়স থেকেই কীর্তনের রসে মগ্ন, সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বপ্নে তন্ময়। সেই সঙ্গে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার লীগের পরিচালনায় পাঠচক্র, কুস্তীর আখড়া; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ছাত্র, কৃষক, মজুর, দুঃস্থজনের সেবা, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা—আর বিপ্লবের শারীরিক ও আত্মিক প্রস্তুতি।"*

শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন লিখেছেনঃ "মনীষী অনিল রায়ের দেহে ছিল অপরিমিত বল, মনে ছিল দুর্জয় শক্তি। এক সময়ে ঢাকা নগরীতে তাঁহার 'শ্রীসঙ্ঘকে' কেন্দ্র করিয়া একদল বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ, দেশসেবার উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তরুণ দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনিল রায়ের মধ্যে নানা দিক দিয়া অসাধারণত্ব ছিল। যৌগিক ব্যায়াম, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। তিনি নিজে একজন সুকণ্ঠ গায়ক ও সঙ্গীতের রচয়িতা ছিলেন।" শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র-

---

* রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জয়শ্রীর সম্পর্কের বিষয়ে লীলা রায়ের রচনাংশ প্রবন্ধ-শেষে দেখুন।

* উদ্ধৃতিটি অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর রচনা থেকে নেওয়া।

অনিল রায় লীলা রায়কে কেবল... ও শান্ত সেন দিয়েছিলেন, আরও দিয়েছিলেন সচিন্তনের স্বাদ। লীলা রায় সেই কথা প্রৌঢ় বয়সের স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

"আমার শৈশব ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে rational upbringing ও ভাবধারার মধ্যে। দিবালোকের স্পষ্টতার মতো তার ছাপ তাঁর হয়ে আছে জীবনে। তারপর যোগাযোগ হল যথার্থ হিন্দু-সভ্যতা, মনন, জীবনধারা ও মিস্টিসিজমের এক শ্রেষ্ঠ প্রোডাক্ট-এর সঙ্গে। কতবার ধাক্কা খেয়েছি, মন গ্রহণ করতে পারে নি, বুদ্ধি-বিচার বিচলিত হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু পেলাম তাঁর নিকট, যা আমার পূর্বপুরুষের হাজার হাজার বৎসর ধরে রক্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আমার জীবনে অলক্ষ্যে তার স্পর্শ উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই যেন আমার সেই অপূর্ব জীবনসাথীটিকে পেলাম। পেলাম এমন কিছু আস্বাদ, যার রূপ নেই, স্বাদ আছে, যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু অনুভূতিতে যাকে পাওয়া যায়। এই কি আমার পূর্ব-পুরুষের হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত সম্পদ হবে বা। কিন্তু এর ছোঁয়া বিচার করে না—বিশ্বাস করে, প্রশ্ন করে না—প্রশ্নের অতীত মীমাংসায় উপনীত হয়।"

লীলা রায়ের সংগ্রামী জীবন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেই চরমের ও পরমের স্পর্শে ডুবে গিয়ে। যুক্তিবাদী নারী আত্মসমর্পণ করেছিলেন শাস্ত্রের কাছে, কালীর কাছে। ১৯৬৭-র ২২শে মে লিখেছিলেন:

"আমার জীবন যে-কোনো সময়ে শেষ হয়ে যাবে। ......মা কালী রক্ষা করেন, এবং তিনি কাজ শেষে খেয়ে ফেলেন, কাজ আমার শেষ, তা আমি বুঝি।"

লীলা রায়ের কাজ শেষ হয়েছিল, মা কালী তাঁকে গ্রাস করেছিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুরা মাতার করাল মুখের মধ্যে লীলা রায়কে সংজ্ঞাহীন চেতনায় আড়াই বছর কাটাতে হবে কে জানত!

লীলা রায়ের শোকযাত্রার সঙ্গে যখন যাচ্ছিলাম, তখন ঐসব কথা অল্পবিস্তর মনে উঠছিল। লীলা রায়ের কথা আমি বাল্যকাল থেকেই শুনেছি: তাঁকে ঘিরে কল্পকাহিনীর একটি দ্যুতিময় পরিমণ্ডল

অনিল রায় : ১৯২১

গড়ে উঠেছিল—তার আলোকাভাস আমার বাল্যের ও কৈশোরের মনকে স্পর্শ করেছিল; সুভাষচন্দ্রের দুঃসাহসী আত্মত্যাগী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ তাঁর ব্যক্তিত্বকে আমাদের কাছে বরণীয় করে তুলেছিল; সেই সঙ্গে ১৯৬৮-র শারদীয়া সংখ্যার জয়শ্রীতে তাঁর বিষয়ে বহু সংবাদ পড়েছিলাম (বর্তমান রচনায় প্রদত্ত তথ্যগুলি প্রধানত সেখান থেকেই সংগৃহীত); তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও আমার যথেষ্ট ছিল, কারণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয় নাগের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, তাঁর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি নি। পরিচয় একেবারে হয় নি তা নয়, ১৯৬২ সালে একবার তাঁর নাকতলার বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূদেব চৌধুরী আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। আমি তখন ঐ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। লীলা রায়কে দেখেছিলাম, বৈধব্যের শুভ্র বাসে, প্রসন্ন শুচিতার আলোকে। সংগ্রামী জীবনের প্রৌঢ় প্রহরে দৃঢ়তার সঙ্গে অন্তরের শান্তির সমন্বয়ের রূপ তাঁর মধ্যে দেখে গভীর শ্রদ্ধাবোধ করেছিলাম। লীলা রায়ের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের ছবির সঙ্গেই বেশি পরিচিত ছিলাম, যেখানে ছিল সৌন্দর্য, শালীনতা এবং মননের মিশ্রণ; চেহারা এখনো কাঠামোতে তাই, কিন্তু যৌবন-লাবণ্যের স্থান নিয়েছে প্রৌঢ়ত্বের উদার মহিমা। আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। প্রথমেই একটা জিনিস চোখে পড়েছিল—আশ্চর্য রকমের স্পষ্ট মানুষটি। তিনি মোটেই মেয়েলী নন, তাই বলে পুরুষালীও নন—একেবারে মানুষ। আমার প্রয়োজনের ব্যাপারে কিন্তু হতাশ হয়েছিলাম—রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সংবাদ দিতে পারলেন না; অথচ ঐ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ তখন আমার ধ্যান-জ্ঞান। তখন

...নাথ রায় লিখেছেন: "নানা গুণে ভূষিত ছিলেন অনিলবাবু। তাঁর আকর্ষণী-শক্তি ছিল অসাধারণ। পূর্ববঙ্গের যুব-সমাজের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র নায়ক। রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কত উদ্দেশ্য-হীন যুবককে এমন এক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন যে, তারা জীবনের চরম মূল্য দিতেও দ্বিধা করে নি।"

আমার কাছে বোধহয় তিনিই পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যিনি ঐ বিষয়ে সংবাদ রাখেন। কথাবার্তা কিন্তু কিছুক্ষণ হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের নয়, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে। প্রধানত তিনিই বলেছিলেন, আমি শুনেছিলাম, কিন্তু কতখানি মনোযোগের সঙ্গে তা বলতে পারব না। কী নির্বোধ আমি, এখন আফশোসের সঙ্গে ভাব, একটি সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যে আমার জিজ্ঞাসাকে বেঁধে রেখেছিলাম। সুভাষচন্দ্রের মত বিরাট পুরুষ, ইতিহাসকে সৃষ্টি করার জন্য যাঁর জন্ম, তাঁর বিষয়ে বলছিলেন তাঁর বিশ্বাসভাজন একজন প্রধান সহকর্মী—অথচ সে বিষয়ে আমার যথোপযুক্ত মনোযোগ ছিল না। কেন জানি না, তিনি কিন্তু বলতে চাইছিলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের কথাও তুলেছিলেন। বলেছিলেন যে, দেশপ্রেম কারও একচেটিয়া বস্তু নয়, সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে অভাবিত সাহায্য তাঁরা পেয়েছেন। তাঁদের কাছে পুলিশ অফিসারেরা পত্নী মারফৎ সংবাদ পাঠিয়েছেন—সাবধান থাকবেন, আগামীকাল তল্লাসী হবে। তাঁরা টাকা পাঠিয়েছেন বেনামা খামে করে। সাহায্য এসেছে জাঁদরেল সরকারী কর্মচারীদের বাড়ি থেকে সংগোপনে। আবার উল্টো দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন। পীড়ন মানুষকে পাগল করে ফেলে, মনের সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করে দেয়, মন এমন বিকল হয়ে যায় যে, স্নেহময় পিতা পর্যন্ত গুর্খা সৈন্যকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেয়, কোথায় লুকিয়ে আছে বিপ্লবী সন্তান—যাকে দেখতে পাওয়ামাত্র গুলী করে মেরেছে গুর্খারা। চট্টগ্রামে এমন হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গে তাঁর বেপরোয়া বেহিসেবী নির্দেশের কথা বেশ কৌতুকের সঙ্গে বলেছিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সভা ভাঙতে এসেছেন দলবল নিয়ে হিন্দুমহাসভাপন্থী বিখ্যাত নেতা। শুনে সুভাষচন্দ্র রাগে রক্তবর্ণ। লীলা রায় হেসে বললেন, "আমাকে বললেন কি জানেন, 'ঠাস্ করে ওকে চড়াতে পারলেন না।'" বুঝুন, আমি মেয়ে, আমি চড়াবো প্রকাশ্য সভায়!" সুভাষচন্দ্র যে-কোনো জিনিসকে আগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করতেন, তারপর সিদ্ধান্ত করতেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরে আদেশ ঘোষিত হত, তার আর নড়চড় থাকত না। "তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ হাজারিবাগ জেলে আছেন (১৯৩৯ কি ১৯৪০-এ, ঠিক মনে নেই), সুভাষবাবু আমাকে বললেন, 'এই চিঠিটা নিয়ে জেলে তাঁর হাতে পৌঁছে দেবেন।' কিন্তু আমি যাব কি করে? সারাক্ষণ তো পুলিশের ফেউ পিছনে লেগে। মেয়ে হবার জন্য লুকিয়ে কোথাও যাওয়া মুস্কিল। আমি আবার বিখ্যাত মেয়ে। সে-কথা তাঁকে বললাম। তিনি নির্বিকারভাবে বললেন, 'উপায় কি, যেতেই হবে, আমার হাতে এখন ঠিক বিশ্বাসী লোক নেই।' আর কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না।" কথাগুলো বলবার সময়ে লীলা রায় হাসছিলেন, বিবেচনাহীন নেতার অযৌক্তিক আদেশের মজাটা উপভোগ করছিলেন, হঠাৎ মুখে গাম্ভীর্য ঘনাল—তখনি ব্যাপারটা বুঝলাম—এরই নাম বিপ্লবী নেতৃত্ব, যা অবশ্যই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে, কিন্তু কখনই পশ্চাতের আকর্ষণকে অগ্রের গতিকে বাঁধতে দেয় না।

লীলা রায় সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে চেয়েছিলেন, আমি শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, এই প্ল্যান আমার কখনো যাবে না। ভাবছিলাম সেই কথা ১২ই জুন পথে যেতে যেতে। আকাশে কখনো মেঘ, কখনো ঝলসানো রোদ্র। বহু নারী-পুরুষের শ্রদ্ধা-গম্ভীর শোকযাত্রা—বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে যা মাঝে মাঝে কম্পিত হচ্ছে। ব্যস্ত নগরীর যানবাহন থেকে কৌতূহলী মুখ উঁকি দিয়ে দেখছে—দেখতে পাচ্ছে অনেকগুলি শ্রদ্ধানত মানুষকে এবং শ্বেতপদ্মে আবৃত একটি দেহকে। এতখানি শ্রদ্ধা! ব্যস্ত, বিক্ষুব্ধ এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির আক্রমণে বিচলিত কলকাতার কাছে বোধহয় এতখানি শ্রদ্ধা একটা অপরিচিত আকার এবং অনুরূপ অপরিচিত ধ্বনি—গম্ভীর মন্ত্রের সুরে উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্।' শোকযাত্রা শুধু ঐ একটি ধ্বনিই তুলছিল—দেশমাতৃকার বন্দনামন্ত্র—দেশের জন্য তপস্বিনী এক কন্যার শেষ বিদায়ের প্রহরে। শবযাত্রা পৌঁছেছিল দেশবন্ধুর সমুন্নত স্মৃতি-সৌধের পাশ দিয়ে কেওড়াতলার শ্মশান-ঘাটে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কারো কারো মুখ চিনি। কিন্তু আরো অনেক মানুষকে দেখলাম—বিশেষত অনেক বৃদ্ধকে—কী আশ্চর্য মর্যাদা তাঁদের চেহারায়—আভিজাত্যের মর্যাদা তা নয়—সংগ্রামের সাধনার মর্যাদা। তাঁরা লীলা রায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন স্বাধীনতার সাধনায়, বহু কিছু সহ্য করেছেন—লীলা রায়ের শেষ যাত্রায় এসেছেন, ফিরে যাবেন এমনই এক যাত্রায় ফিরে আসার প্রতীক্ষা নিয়ে।

শেষবারের মত তাঁকে দেখলাম, শেষ চিতায় স্থাপন করার আগে। আড়াই বছর সংজ্ঞাহীন জীবনের কোনো ছাপ মুখের রেখায় নেই। একেবারে ঘুমিয়ে আছেন। কেবল একটু বেমানান লাগল চোখে পরিয়ে-দেওয়া চশমাটিকে। লীলা রায় অনেকদিন আগেই চশমা পরার প্রয়োজন সাঙ্গ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি যদি খোলা থাকে, ভিতরের দিকেই খোলা ছিল।

আগুন জ্বলে উঠল। বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্—থর্ থর্ করতে লাগল ধ্বনি। এবার সহসা তাকে ভেদ করে আর একটি উচ্চারণ জাগল—হরি ওঁ! হরি ওঁ! দেশ, শুধু দেশ নয়—ঈশ্বর! ঈশ্বর! বিপ্লবের রক্তপদ্ম নির্বাণে শ্বেত-পদ্ম। সে পদ্ম পুড়তে লাগল আগুনের রক্তশিখায়—শুভ্র ভস্মময় একটি পরিণতি লক্ষ্য করে।

পিতা, মাতা, ভাই ও ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে লীলা রায় : ১৯২৫

লীলা রায় চলে গেলেন এবং চলে গেলেন ইতিহাসে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লীলা রায়ের স্মৃতিকথা

কবির সঙ্গে প্রথম পরিচয় খুব সম্ভব ১৯২৫-এ, যখন কয়েকটি বক্তৃতা দেবার প্রতিশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কবি প্রথম ঢাকায় আসেন। নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন পূর্বেই পেঁাছে একটি বড় বজরা নৌকায় বুড়িগঙ্গার উপর তিনি অবস্থান করলেন। ঢাকার নাগরিকেরা এই সুযোগে নানা সভানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের ইচ্ছা ছিল ঢাকাবাসীদের নিকট রবীন্দ্রনাথকে প্রথম উপস্থিত করবার গৌরব তাঁরাই অর্জন করবেন। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ অপ্রীতিকর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এই সংকীর্ণ মনোভাবে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন নির্দিষ্ট দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো কাজকর্মের স্বাধীনতার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুমাত্র এক্তিয়ার নেই এবং এই বিষয়ে তাদের পক্ষে কোনো মতামত প্রকাশ করা অত্যন্ত অশোভন ও অন্যায় ধৃষ্টতা। কবির স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে সেদিন ঢাকাবাসী মুগ্ধ হয়েছিল।...

এ সময়ের আর একটি ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হলে কবির অভিনন্দন সভার আয়োজন হয়েছে। তিলার্ধ স্থান অবশিষ্ট নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার ছাত্র বুদ্ধদেব বসু, কবিকে স্বাগত জানিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন: আর কে কি বলেছিলেন আজ আর মনে নেই। কিন্তু স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে সে সভার সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ ল্যাংলি উঠলেন কবিকে তাঁর ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। সেদিনের অভূতপূর্ব জনসমাগম-সভার অনভ্যস্ত জমাট উত্তেজনা বা আর কিছু তাঁকে বিচলিত করেছিল। দু-এক ছত্র উচ্চারণ করবার পর তিনি আর অগ্রসর হতে পারেন নি—থরথর করে কাঁপতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সেই বিশাল জনতার মধ্যে বেশির ভাগ অধীর অস্থিরতায় অপেক্ষা করছিল এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির অবসানের অপেক্ষায়। সহানুভূতিতে বেদনায় কবির মুখ লাল হয়ে উঠলো—ততক্ষণে অন্য একজন অধ্যাপক মিঃ ল্যাংলিকে সাহায্য করতে ছুটে এলেন ও দুটি একটি কথা বলে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। সমস্ত সভা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু কিছু ছাত্র সে ঘটনায় পরিহাসের খোরাক পেয়ে কুৎসিতভাবে হেসে উঠেছিল। পরের দিন গেলাম কবির সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর বজরায়। বহু দেশী, বিদেশী জ্ঞানীগুণী তাঁকে তখন ঘিরে আছেন—কিন্তু পূর্বদিনের একটি মানুষের গ্লানি, কবি ভুলতে পারছেন না—যতক্ষণ ছিলাম সে অপূর্ব মুখমণ্ডলে সে কি সুতীব্র বেদনার প্রকাশ, সে কী করুণাভরা ক্ষেদোক্তি "How cruel!! How could those young men be so cruel!!

বিশ্বকে এই সুকুমার অনুভূতির ছোঁয়ায়ই তো তিনি আপন করেছিলেন। এই অনুভূতি, আপন-পরের গণ্ডীকে উত্তীর্ণ করে বিশ্বমানবের ব্যথা-বেদনা-অপমান-গ্লানিকে কি সহজে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা দিয়ে অনুভব করেছেন, কি সুদুর্লভ দান কবি পেয়েছিলেন তাঁর স্রষ্টার নিকটে।

ঢাকার মেয়েদের প্রতিষ্ঠান দীপালীর পক্ষ থেকে একটি মহিলা সভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাবার ইচ্ছাও তাঁর নিকট থেকে কিছু শোনবার দাবি নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অতি সহজ আন্তরিকতার সহিত আমাকে দেখেই মন্তব্য করেছিলেন—"দীপালী আমাদের অমুকের (তাঁর এক আত্মীয়ার নাম উল্লেখ করে) মত দেখতে।" তাঁর সম্মতি পেলাম সহজেই। সে এক অভূতপূর্ব সভা। ঢাকা শহরে সেদিন মেয়েদের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে। সকল সভাসমিতিতে তারা বহু সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করতো। কিন্তু সেদিনকার সভা সমস্ত প্রত্যাশা ছাপিয়ে গেল বোধ হয় দশপনেরো হাজার বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মেয়েরা সুসজ্জিত সুন্দর সুশৃংখল পরিবেশে কবিগুরুকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এসে মিলিত হলেন। ছোট্ট ছোট্ট সুসজ্জিত মেয়েরা পুষ্পচন্দনে অর্ঘ্য সাজিয়ে কবিকে বরণ করল:

"ওহে সুন্দর মরি মরি"

কবি ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গুন্‌-গুন্‌ করে গান করলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তারপর তাঁর সে আশ্চর্য কণ্ঠে তিনি শুরু করলেন—"সমস্ত এশিয়াতে মেয়েদের এত বড় সভা দেখি নি কোথাও...।" আনন্দে মন ভরে উঠল। মেয়েদের আহ্বান জানালেন, 'গৃহকে তোমরা আপন করেছ বাহিরকেও তোমাদের আপন করতে হবে। বাহিরকে আপন করে আত্মীয়-পরের গণ্ডী দূর করতে হবে।...সমস্ত সমাজের মাঝে, কাজের মাঝে, ভাবনার মাঝে এগিয়ে এসে তোমাদের অংশ নিতে হবে। তবেই সমস্ত সহজ হবে, সার্থক হবে।'

আমাদের কাজকর্মে বিশেষ আনন্দিত হয়ে কবি আমাকে বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে মেয়েদের কাজের ভার নিতে এবং একবার তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে। আমার পথের নিশানা ততদিনে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তবু তাঁর আহ্বানে কিছুটা গর্ব অনুভব করেছিলাম বই কি! কিছুদিন পর তাঁর অনুরোধ রক্ষার জন্য দিন দুই-এর জন্য শান্তিনিকেতনে যাই। তাঁর সাথে দেখা হতে প্রণাম করে চুপ করে রইলাম। তাঁর অনুরোধ রক্ষার অক্ষমতা জানাতে সংকোচ হচ্ছিল। কবি বুঝলেন। সস্নেহে প্রসন্নতায় পিঠে হাতখানি রেখে আমার অনুক্ত বক্তব্যকে সহজ করে দিয়ে বললেন, "ঢাকার কাজ ছেড়ে বুঝি আসতে ইচ্ছে করছে না।" অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল ও'র প্রতি সেদিন।

এর পর কারাবাসের এক বৎসর পূর্বে ১৩৩৮-এর বৈশাখে মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশ সেবার ভাব জাগ্রত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে 'জয়শ্রী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো। অনুরোধ করে পাঠালাম তাঁকে নামকরণ করবার জন্য। 'জয়শ্রী' নাম তাঁরই দেওয়া। ও'র একটা আশীর্বাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। জয়শ্রীর বিশেষ সুরটিকে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন। লিখে পাঠালেন:

ওঁ

বিঘ্নবিপদ নাই তব ভয়,
দুঃখেও [illegible] তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
[illegible] করিতে দায়,
জয়শ্রীর এই পরিচয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible] ফাল্গুন
১৩৩৮

অনতিবিলম্বে সরকারের রোষবহ্নিতে পড়লো জয়শ্রী। জয়শ্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই, এমন কি তার দুইজন কেরানীও গ্রেপ্তার হোল। জয়শ্রীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে জয়শ্রীকে বে-আইনী ঘোষণা করা হোল। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়ে কবিকে প্রণাম জানালাম। জেলের নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে তাঁর কবিতা কত যত্ন দিয়েছে [illegible]। প্রত্যুত্তরে লিখলেন:

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

[illegible]
[illegible]
[illegible] মানুষের হিংস্র প্রকৃতির
অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছ — [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
না হোক। [illegible]
তোমার [illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible] আজও কবি [illegible]
[illegible]
চেষ্টা করছি। [illegible]
[illegible]
দিলে না। [illegible]
এবং [illegible]
[illegible]
[illegible]। তুমি আমার [illegible]
শুভকামনা গ্রহণ করো। ইতি ২৪ বৈশাখ
১৩৪০

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ বৎসরই ২রা জ্যৈষ্ঠ জয়শ্রীকে একটা কবিতা পাঠান যার মর্মটি কবির আশ্চর্য সার্বভৌমত্বের এক নিদর্শন—

মোর অপমান [illegible] দাঁড়াও,
[illegible] সাড়াও,
[illegible] হতে দাও মুক্তি,
[illegible],
আনন্দ হোক দুঃখের অন্তরে,
[illegible]॥

[illegible]
১৩৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে এমনভাবে জয়শ্রীর মর্মবাণীটিকে ভাষা দিতে পারতেন!

বিভিন্ন সময়ে জয়শ্রীতে উনি বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা পরবর্তীকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এগুলির মধ্যে "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান", "এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি", "রূপ-নারাণের কূলে, জেগে উঠিলাম" প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। অনেকেরই বোধহয় জানা নেই, রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে 'নটীর পূজার' গানগুলির দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় জয়শ্রীতে। জয়শ্রীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের আনন্দ-বেদনাময় যোগসূত্রটি জয়শ্রীর পরম ঐশ্বর্য ও অমূল্য পাথেয়।

লীলা রায়ের একটি রাজনৈতিক সম্পাদকীয়

['ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদিকা লীলা রায় ১৯শে অক্টোবর, ১৯৪০-এ *This Saintly Fight* নামে একটি সম্পাদকীয় লেখেন, যার সর্বাঙ্গে রয়েছে ইতিহাসের রেখাঙ্কন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, কংগ্রেস কিন্তু বহু প্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করছে না। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রচণ্ড আন্দোলন চলেছে কংগ্রেসকে সংগ্রামে নামাতে। সুভাষচন্দ্রকে সরকার গ্রেপ্তার করল। গান্ধীজী গোড়ায় গা না করলেও পরে আন্দোলন আরম্ভ করতে রাজী হলেন—সে কিন্তু এক বিচিত্র আন্দোলন। গণ-আন্দোলনের ধার ঘেঁষে তা গেল না—তার নাম 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ', যাতে গান্ধীজীর মনোনীত নির্ভেজাল একজন অসহযোগী সত্যাগ্রহ করে জেলে যাবেন। আন্দোলনের কারণ—জাতীয় স্বাধীনতা নয়—বাক্-স্বাধীনতার দাবি!! বিনোবা ভাবে প্রথম সত্যাগ্রহী মনোনীত হয়েছিলেন, যাঁকে প্রথমবার সরকার গ্রেপ্তারের যোগ্য পর্যন্ত মনে করে নি। এই 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন' আরম্ভ হলে লীলা রায় নিম্নের সম্পাদকীয়টি লেখেন। তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত লেখাটিতে লক্ষণীয়।

লেখাটির অনুবাদ জয়শ্রীতে বেরিয়েছিল। আমি ঈষৎ পরিবর্তন করে উপস্থিত করছি।]

ওয়ার্ধা থেকে ৯ মাইল দূরে একটি অখ্যাত গ্রাম—পানাউর। সেখানে মহাত্মা গান্ধী একজনের একটি প্রতীক বহ্নিদানী নিয়ে তৃতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করেছেন। কিন্তু "বৃহৎ আন্দোলনকে ক্ষুদ্রাকারে ও নিশ্চিত পন্থায় শুরু করাই কংগ্রেসের ধারা"—আমাদের পণ্ডিতজীর এই আশ্বাস পেয়ে সংখ্যা সম্বন্ধে আপত্তি অবশ্যই আমরা আর করতে পারিনে। শত্রুর পরাজয় নয়, হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত হয় যে-যুদ্ধে—সেই অদৃষ্টপূর্ব রক্তধারা বাক্-স্বাধীনতা অর্জনে যিনি উদাত্ত মন্ট

এর যোদ্ধার নির্বাচন নিয়ে আমাদের বিবাদ করা উচিত নয়। সেই ভাগ্যবান যোদ্ধার যে গুণাবলীর কীর্তন মহাত্মাজী করেছেন তাতে আমাদের চূড়ান্ত প্রত্যয় হয়েছে যে, তিনি সম্পূর্ণ অনাগ্রাসী। সমগ্র পরিকল্পনাটির একান্ত ত্রুটিহীনতায় আমরা অভিভূত হয়েছি। সময়, স্থান, যুদ্ধের প্রকৃতি, যোদ্ধা এবং সর্বোপরি সর্বাধিনায়ক—সবই এখানে সঙ্গতিপূর্ণ; আর মহানায়ক তো যে-কোনো প্রতিকূল ঘটনা সামলাবার জন্য নিকটেই অবস্থিত করবেন! সবই এক প্যাটার্নের এবং পরস্পরের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা।

এই যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীতে যখন আমাদের কাছে আসছে সাইরেনের তীক্ষ্ম ধ্বনি এবং মেসিনগান-এর বজ্রগর্জন, তখন ভারতের একটি সুদূর পল্লীর শান্তিময় পরিবেশে যে ঋষিজনোচিত লড়াই পরিচালিত হচ্ছে, তা নিজগুণে নিতান্তই জনমনোহারী এবং কৌতূহলোদ্দীপক। তবুও শ্রদ্ধাহীন ও অনুসন্ধিৎসু যুক্তিবাদী মন কিছুটা সংশয়ে পীড়িত হয়। মনে বিস্ময় জাগে, কেন এই লাখ লাখ সদস্য-সহ পঞ্চাশ বছরের কংগ্রেস-সংস্থার ঠাট-ঠমক বজায় রাখা হয়েছে, আর কেনই-বা স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে এই সেদিনও শত শত সত্যাগ্রহ কেন্দ্রের শিবিরে রাখা এবং কুচকাওয়াজ করানো হয়েছে! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সেনাদলের ওপর অধিনায়কের আস্থা সামান্য, আর কংগ্রেসের 'গঠনাত্মক কার্যক্রম' গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করার সর্বপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও সৈনিকদের আবশ্যক যোগ্যতালাভ হয় নি। তাই উদ্দিষ্ট সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের বাইরে রাখতে হচ্ছে—অন্তত এখনকার মত। দলের বাইরের লোকের কাছে এসব ব্যাপার একটু বিভ্রান্তিকর বটে!

আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নকে মিশিয়ে ফেলার একান্ত বিরোধী আমরা। গান্ধীজীর এবং তাঁর নিম্নবর্তী বড় বড় চাঁইদের উক্তি সময় সময় আমাদের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তবু আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীবিনোবা ভাবে ও স্বয়ং গান্ধীজীর মনোভাবের এই নজির আমাদের কাছে আছে যে—"যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার প্রয়োজন আছে, কারণ কংগ্রেসের জাতীয় সরকার গঠনের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।" এই সঙ্গে বলতে পারি, আন্দোলনের সার্থক পরিণামে শুধু প্রাক্-স্বাধীনতাই আসবে না, পূর্ণ-স্বাধীনতাবও আরো নিকটবর্তী হওয়া যাবে। কাজেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক, তা মনে করলে আমরা ভুল করব না।

এবার এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে কী উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করা যাক। গান্ধীজীর বিবৃতির মামুলী নীতিবাক্যগুলি একপাশে সরিয়ে রেখেও এ সত্যটা প্রকট হয়ে পড়ে যে, বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাজী করাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই—তা, সে নীতিকে যতই প্রচ্ছন্ন রাখা হোক। পূর্বেও অনেকবার অনুরূপ পন্থা তিনি অবলম্বন করেছিলেন। যুক্তিতর্কের দ্বারা আমলাতন্ত্রী সরকারের হৃদয়-পরিবর্তনের কঠোর প্রচেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার প্রবল উপায় অবলম্বনে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যাগ্রহ বলপ্রয়োগেরই কৌশল এবং সে কৌশল অতীতে খানিকটা সফলও হয়েছিল। সত্য বলতে, ওপরের কৌশল-দুটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ প্রমাণ হয় যে, বুঝিয়ে স্বমতে আনবার চেষ্টায় ব্রিটিশ-সিংহ আদৌ সাড়া দেয় না, কিন্তু যে-কোনো রকমের সত্যাগ্রহ বা বলপ্রয়োগের পন্থা গ্রহণ করামাত্র সে কিছু একটা করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। আমাদের মতে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে বুঝিয়ে-পড়িয়ে স্বমতে আনার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল, একমাত্র নিষ্পত্তির সহায়ক-উপায় হল সক্রিয় বলপ্রয়োগ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গান্ধীজীর সর্বশেষ বলপ্রয়োগ-নীতিকে বলা যায় প্রতীকধর্মী। কারণ এতে শুধু জনগণকেই যে আন্দোলনের বাইরে রাখা হয়েছে, তাই নয়, তাঁর নিজের অনুবর্তীদেরও এতে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয় নি। গান্ধীজীর উপলব্ধি করা উচিত যে, তাঁর যা-কিছু অতীত কীর্তি, সে-সবই সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল গণ-উদ্দীপনায়; সেই উদ্দীপনাই তাঁর আন্দোলনে বেগসঞ্চার করেছিল। আজ এ এক বেদনাদায়ক ভাগ্যের পরিহাস যে, গান্ধজী জনগণের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন এবং জনগণের উদ্দীপনা নির্বাধে প্রকাশ পাওয়ামাত্র তার মধ্যে রক্তপাত ও ধ্বংসলীলা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কিসের ভয়ে ভীত তিনি? নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে যে গণ-অভ্যুত্থান—তার ভয়? মূল্য না দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এমন দেশের নাম তো আমরা জানিনে! ভারত-ও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। দুঃসহ দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী হলে ভারতকে সেই দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম-গ্রহণ ও আত্ম-লাভ করতে হবে। যে-দুখের মধ্য দিয়ে তার মুক্তি আসবে, সে-দুঃখ তার পক্ষে কল্যাণকর। আর যিনি ভারতকে ভালবাসেন, তিনি তাকে সেই দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইবেন না।

আমরা সর্বদাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসহীন সংগ্রামেরই পক্ষপাতী, আর সে-যুদ্ধ তখনই সম্ভব, যখন জাতির সমস্ত সংগ্রামী শক্তিকে ব্যূহবদ্ধ করা হবে। যতদিন তা না করা হবে, ততদিন সমস্ত সংগ্রাম শুধুই চটকদারির মূল্য পাবে এবং যোগ্য সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হবে।

একটি ঘোষণা

আগামী সংখ্যায় ভারত বিভাগে জওহরলাল নেহরুর উৎসাহ ও পরবর্তী ভূমিকা সম্পর্কে লীলা রায়ের রচনাংশ প্রকাশিত হবে।
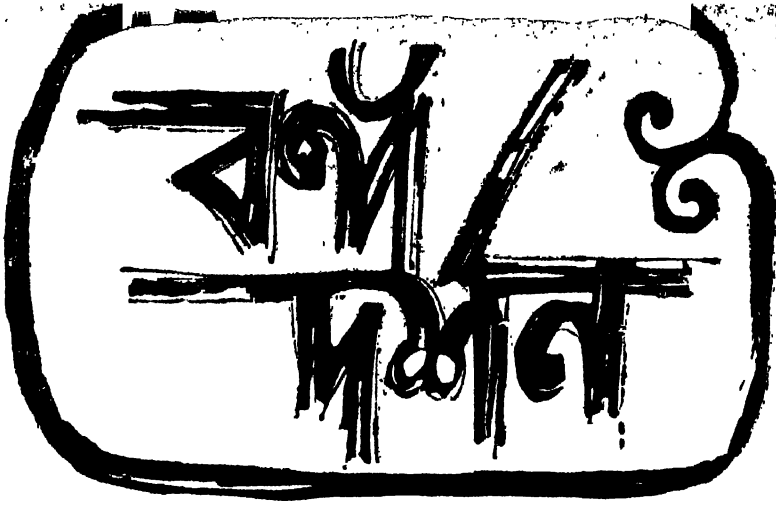
প্রতিদিন সীমান্ত অতিক্রম করে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে উদ্বাস্তু স্রোত আসা শুরু হয়েছে, এখনো তার বিরাম নেই। যদিও পূর্ব পাকিস্তানে এই মুহূর্তে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নেই, তবু কেন হিন্দুরা সেখান থেকে এভাবে দলে দলে চলে আসছেন, এই নিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু অযোগ্যতার বদনাম কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চিরন্তন, এ ব্যাপারে তাঁরা পুনরায় সেই অযোগ্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সজাগ থাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। পূর্ব-বঙ্গে ভারত সরকারের স্থায়ী কূটনৈতিক অফিস রয়েছে, সর্বক্ষণের জন্য একজন ডেপুটি হাইকমিশনার রয়েছেন। তাঁরা সেখানে কি মহৎ কর্ম করছেন জানি না। কলকাতায় বা ভারতের অন্যত্র কোথাও কিছু হলে পাক দূতাবাস সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেই সমস্ত ঘটনার জগৎজোড়া পাব্লিসিটি দেয়। আমাদের দূতাবাসের লোকরা শুধু বিদেশে গিয়ে ফূর্তিই করতে শিখেছেন, আর কিছু নয়। দলে দলে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে পারেন, সে সম্পর্কে কোন পূর্বাভাস বা সতর্কতা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকারকে জানানো হয়েছিল কি? এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু আগমন সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘটনাকে কোন গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন মনে করছেন না।

উদ্বাস্তু আগমন এখনো বন্ধ হয় নি বরং রোজই নতুন নতুন দল সীমান্ত অতিক্রম করছে এবং ইতিমধ্যেই বারাসাত, বেড়াচাঁপা, বসিরহাট, হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থানে শত শত ছিন্নমূল পরিবারের অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি হয়েছে। শিয়ালদহ স্টেশনে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সেই অতি পরিচিত চিত্র দেখা যাচ্ছে। এই নতুন উদ্বাস্তু আগমন উপলক্ষে যে দুটি আশু কর্তব্য করবার ছিল, সে কর্তব্যের দায় না নিয়েছেন রাজ্য সরকার, না নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। দুর্গত উদ্বাস্তুদের সম্ভবমত সব রকম রিলিফ দেবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সরকারী তরফ থেকে বলতে গেলে কিছুই করা হয় নি। উদ্বাস্তুদের সরকারের পক্ষ থেকে রেশন দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। চব্বিশ পরগনার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং জেলায় অবস্থিত রিলিফ অফিসারেরা নিজেদের সাধ্যমত যেটুকু পারছেন, তাই করছেন। কিন্তু খাদ্যের কোন ব্যবস্থা হয় নি। রামকৃষ্ণ মিশন, ক্রিশ্চিয়ান রিলিফ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ইত্যাদি বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু ব্যবস্থা করছেন, কিন্তু তাঁদেরও সামর্থ্য ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া বর্ষায় উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী ক্যাম্প-গুলিতে সময়মত তাঁবু সরবরাহ হচ্ছে না। কোন কোন ক্যাম্পে কলেরা শুরু হয়েছে, শিশুরা জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে, অথচ সময়মত ডাক্তার বা ওষুধ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না!

কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলেই অবশ্য অবস্থাকে সামাল দেওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেন, তাহলে এই মুহূর্তে জরুরী ভিত্তিতে ফোর্ট উই-লিয়াম থেকেই প্রত্যেকটি ক্যাম্পে তাঁবু এবং মেডিক্যাল ইউনিট পাঠানো মোটেই দুরূহ ব্যাপার নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে ইচ্ছা করেন না, করবেন এমন ভরসাও নেই। রাজ্যপালের প্রশাসন আমলা-উপদেষ্টাদের চাকরি বজায় রাখতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, এ সব দিকে নজর দেবার সময় কোথায়। আমলাদের চাকরি তো মন্ত্রীদের মত দুলবে, আর কাকে ল্যাং মারা প্রয়োজন, রাইটার্স বিল্ডিংসের আমলাতন্ত্র তাতেই মশগুল, আর কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব, ওটা একান্তই রাজ্যের ব্যাপার, এর ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। গত বাইশ বছরে যে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে দেখতে চান নি, সেই সরকারের কাছ থেকে কি আশা করা যায়? তাজ্জবের কথা এই যে, যেখানে হাজার হাজার উদ্বাস্তু নিঃস্ব অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে সেখানে তাদের আজ পর্যন্ত কোন খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হয় নি। শিয়ালদহ স্টেশনে গেলে দেখতে পাবেন ক্বচিৎ-কদাচিৎ দু'-একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে খিচুড়ির লরী আসে এবং এক হাতা করে তাই পাবার জন্য কী দীর্ঘ লাইন! এতগুলি লোক কপর্দকহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায় এখানে এসে পৌঁচেছে, তারা খাবে কি সে চিন্তাও কারো আছে বলে মনে হয় না।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কিছু-সংখ্যক নতুন উদ্বাস্তু পরিবারকে বাংলা দেশের বাইরে কয়েকটি পুনর্বাসন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে, সোজা কথা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে কর্তব্য সমাপন করেছেন মনে করে হাত ধুয়ে বসে আছেন। এভাবে উদ্বাস্তুদের ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না দিয়ে যদি কোন একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হত, তবে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সেটা অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা হত। যেমন ইতিপূর্বে শোনা গেছে যে, আন্দামানে লোকসংখ্যা কম হবার জন্য সেখানকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা খুব একটা সাফল্যলাভ করতে পারে নি। সুতরাং নতুন উদ্বাস্তুদের এলোমেলো-ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে না দিয়ে যদি সকলকে একসঙ্গে আন্দামানে পাঠানো যেত, তবে এদের পুনর্বাসনের কাজটা যেমন সহজ এবং সুষ্ঠু হত, তেমনি আন্দামানের উন্নয়নও অনেকটা সুনিশ্চিত হত। কিন্তু কি রাজ্যপালের সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার কেউই সেই পথে যাচ্ছেন না কেন? তবে কি এঁদের মনে এই ভয় যে, এত বাঙালী একসঙ্গে ঘর বাঁধলে পরে আন্দামানকে বাংলা দেশের অংশরূপে দাবি করা হতে পারে? কিন্তু আন্দামানকে তো কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন?

ল্যাকটো-ক্যালামাইন
কি একটি
কোল্ড ক্রীম?
হ্যাঁ, তাই!
ল্যাকটো ক্যালামাইন
সমগ্র
সৌন্দর্য প্রসাধন
সামগ্রী
Lacto Calamine
এখন
মিনি সাইজেও পাওয়া যায়

প্রতিদিন সীমান্ত অতিক্রম করে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে আসছেন, তাঁদেরই কয়েকজন

তা সত্ত্বেও নতুন উদ্বাস্তুদের একসঙ্গে আন্দামানে পুনর্বাসন দিতে বাধা কোথায়?

প্রাদেশিকতার যূপকাষ্ঠে

দামোদর এবং অজয় নদের জল বণ্টনের ব্যাপার নিয়ে বিহার সরকার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যে বঞ্চনামূলক ঠাণ্ডা লড়াই শুরু করে দিয়েছেন, তা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তো বটেই, সমগ্র ভারতের পক্ষেও একটা গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার। দামোদর ও অজয়, উভয় নদেরই মূল প্রবাহ পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে এ কথা সত্য, কিন্তু নদ দুটি পশ্চিমবঙ্গেরই যে প্রাণস্বরূপ; সে কথার পরোয়া না করে বিহার সরকার ১৯৬০ সালে দামোদর নদের ওপর তেনুঘাটে ৯০০ কিউসেক জল ধরার মত একটি বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দামোদরের জল তেনুঘাটে আটকা পড়লে পশ্চিমবঙ্গ তার ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখনই ওই কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। তখন বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়, কিন্তু বিহার সরকার গোটামুটিভাবে তাঁদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন এবং ৯০০ কিউসেক জল আটকের উপযোগী বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা সুবর্ণরেখা ও অজয় নদের ৩০০ কিউসেক জল পশ্চিমবঙ্গকে সরবরাহ করতে সম্মত হন। কিন্তু দেখা যায় সুবর্ণরেখাব প্রতিশ্রুত জল পশ্চিমবঙ্গকে সরবরাহ করা টেকনিকাল দিক থেকে সম্ভবপর নয়। তখন বিহার সরকার অজয় নদ থেকেই ৩০০ কিউসেক জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বিহার সরকার একেবারে গোড়া থেকেই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। এখন বিহার সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা প্রতিশ্রুত জল সরবরাহ করতে পারবেন না। কারণ অজয় উপত্যকায় তাঁরা যে কৃষি ও শিল্প পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন, তাতে ওই জল তাঁদেরই কাজে লেগে যাবে। বিহার সরকারের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত এই একতরফা সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গের চরম সর্বনাশ যে অনিবার্য সে কথা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই, কেন না দামোদরের জল না পেলে শিল্পনগরী দুর্গাপুর চরম সংকটের সম্মুখীন হবে এবং এই রাজ্যে নতুন শিল্পও গড়ে ওঠা অসম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় রবিশস্যের চাষও ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, নিম্ন দামোদরের শস্যশ্যামল অঞ্চল জলাভাবে অনুর্বর মরুভূমির রূপ পরিগ্রহ করবে। পশ্চিমবঙ্গের দামোদর অববাহিকায় ৬৫ হাজার একর খরা জমিতে রবিশস্যের চাষ করা সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু তেনুঘাটের বাঁধে বিহার যদি ৯০০ কিউসেক জল আটকে রাখে এবং তার পরিবর্তে যদি অজয়ের জল না দেয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বৈষয়িক উন্নতির সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হতে বাধ্য।

এবং সবচেয়ে যা আপত্তিকর তা হচ্ছে বিহার সরকারের মনোভাব যা সর্বভারতীয়ত্ব ও জাতীয় সংহতির আদর্শবিরোধী এবং এই মনোভাবকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বলকানাইজেসন অবশ্যম্ভাবী, ভারতবর্ষ একটি দেশ থাকবে না, তা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক দেশের সমস্ত মানুষ। নদ-নদী যে সব রাজ্য এবং এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, সেই সব রাজ্য এবং এলাকার অধিবাসীরা তার সমান সুফল ভোগ করবার অধিকারী। দামোদর, অজয় অথবা সুবর্ণরেখার জল কোন্ রাজ্য কতখানি ভোগ করতে পারবে, তা দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতেই স্থির হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বড় বড় নদ-নদীই ভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত, কাজেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি যদি পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে চোখ বুজে সেই সব নদ-নদীর জল বাঁধ দিয়ে নিজেদের এলাকায় আটকে রাখে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে নিশ্চয়ই জাতীয় সংহতির মহিমা আবৃত্তি করা সম্ভবপর হবে না। বিহার সরকার দামোদর ও অজয়ের জল আটকাবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা পশ্চিমবঙ্গকে পথে বসিয়ে বিহারের সমৃদ্ধিসাধনের একটি অপচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য অপর একটি অঙ্গরাজ্য সম্পর্কে এরকম নির্মম ঔদাসীন্য প্রকাশ করে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পেল এবং কেন্দ্রীয় সরকার কেন নিছক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। রাজ্যের সরকারী মহলের ধারণা, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তো ননই, বরং নানাভাবে বিহার সরকারের প্রতি তাঁদের আনুকূল্যই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই রকম একটা জাতীয়তাবিরোধী কাজ করে বিহার সরকার জাতীয় সংহতির মূলে যে গোড়া ঘেঁসে কোপ দিল, তার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হবে। বস্তুত এর পর বিহারের দৃষ্টান্ত যে অপরে

গ্রহণ করবে না তা নয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যই পরস্পর নির্ভরশীল, কাজেই যার যেখানে যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভৌগোলিক অধিকার আছে, সে যদি তার উপর চেপে বসে বিহারেরই দোহাই দিয়ে, তার ফলে ভারতবর্ষ কি একটা গোটা রাষ্ট্র থাকবে? শোনা যায়, বৃটিশ আমলেই নাকি সারা ভারতে একটা অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শ ছিল। স্বাধীন ভারতে সে আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে, প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যেই প্রাদেশিকতাবোধ তীব্রতম আকার ধারণ করেছে যা জাতীয় সংহতির আদর্শের পরিপন্থী। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এই বোধ প্রায় নেই বললেই চলে, কেন না পশ্চিমবঙ্গে বরাবরই বামপন্থী মতাদর্শের প্রাধান্য। কিন্তু ক্রমাগত এইভাবে যদি পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ আহত হতে থাকে, প্রতিনিয়ত সে যদি অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের স্বার্থপরতার শিকার হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই চরম সময় নপুংসক নীতি গ্রহণ করেন, তাহলে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা কেউ ভেবে দেখেছেন কি?

পৌরকর্মীদের ধর্মঘট

গত সতেরই জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গের পৌরকর্মচারীরা (কলকাতা ও হাওড়া বাদে) একটানা ধর্মঘট শুরু করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ৮৯টি মিউনিসিপ্যালিটির কাজ অচল হয়ে পড়েছে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কর্তৃপক্ষগণও এই ধর্মঘট সমর্থন করেছেন এবং এই দিক দিয়ে এই ধর্মঘটের মধ্যে নতুনত্ব আছে। পৌরকর্মচারীরা যে সাত দফা দাবির ভিত্তিতে ধর্মঘট করেছেন সেগুলি তাঁদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের আর্থিক দুর্গতি খুবই বেশি। যে সামান্য বেতনে তাঁদের কাজ করতে হয় তাতে আজকের দিনের সংসারযাত্রা নির্বাহ অসম্ভব। এ বিষয়ে দ্বিমত হবার কোন অবকাশ নেই। এমন কি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষদের সমিতি তাঁদের দাবি সমর্থন করেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, কর্মচারীদের দাবি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ভাঁড়ার শূন্য। কর্মচারীদের দাবি যুক্তিযুক্ত হলেও তা পূরণ করার সাধ্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির নেই। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির হাতে সরকার যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাতে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ সীমাবদ্ধ। অন্য দিকে সুযোগ যেটুকু আছে তা কাজে লাগাবার মত চেষ্টারও যথেষ্ট অভাব আছে। এর সঙ্গে আছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অনাবশ্যক লোক নিয়োগ প্রভৃতি নানান সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে কর বাড়াতে গেলে করদাতাদের তরফ থেকেও ঘোরতর আপত্তি ওঠে। সব কিছু মিলিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির দৈন্যদশা শোচনীয়। কাজেই কর্তৃপক্ষগণ কর্মচারীদের চাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁদের দাবি সমর্থন করেছেন এবং সোজা সরকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়েছেন এখানে নয় ওখানে।

কিন্তু সরকারের সঙ্গে ধর্মঘটের নেতাদের আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব ও অর্থদপ্তরের কমিশনারের সঙ্গে তাঁরা যে আলোচনা করেছিলেন তাতে কোন সুফল না হবার পর ধর্মঘটী নেতারা একটি হুসিয়ারীতে বলেছেন যে, সরকার যদি অনমনীয় মনোভাব দেখান, তবে বাইশে জুন থেকে যে সব জরুরী বিভাগ ধর্মঘটের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে ধর্মঘট করা হবে। আমরা দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য যে কোন আন্দোলনেরই স্বপক্ষে। সাপ্তাহিক বসুমতী সম্পর্কে যে যাই বলুন না কেন, বিগত আট বছরের একটি সংখ্যারও বঙ্গদর্শন থেকে কেউ দেখাতে পারবেন না যে, আমরা কোন আন্দোলনকে সমর্থন করতে বিরত হয়েছি। কিন্তু জরুরী বিভাগগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে এ রকম হুংকারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছি। মিউনিসিপ্যালিটির জরুরী বিভাগগুলি বন্ধ করে দেবার অর্থ হচ্ছে, আলো জ্বলবে না, কলে জল পড়বে না, হাসপাতাল অচল হবে। ধর্মঘটের প্রবক্তারা তো এই কথাই বলছেন। এ হুমকি কোন দাবি আদায়ের অস্ত্র হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। এ অবস্থা কার্যকর করার অর্থ জনসাধারণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অপরাধ করা এবং এরকম সংকল্প বিকৃত চিন্তারই প্রতীক। হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, দুগ্ধ সরবরাহ ও মিউনিসিপ্যালিটির জরুরী কাজকর্মের ক্ষেত্রে কর্মবিরতি, কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা যায় না। দাবি আদায়ের আরও অনেক পন্থা আছে।

আর সরকারের আচরণকেও সমর্থন করার কোন কারণ নেই। এ বিষয়ে সরকারের যা করণীয় ছিল, তা করতেই বা অসুবিধা কোথায়? মিউনিসিপ্যাল কর্মীদের দাবিগুলি তো ন্যায্য। ষোল আনা না হোক বারো আনা তো সরকার মিটিয়ে দিতে পারেন। মিউনিসিপ্যালিটির মত পাবলিক সার্ভিসমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চেয়ে দায়িত্ব বেশি, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের তাগিদে তাঁরা অতীতেও তা স্মরণ রাখেন নি, বর্তমানেও রাখেন নি। তেমনি সরকারও এঁদের সঙ্গে পাওনাগণ্ডা নিয়ে দরাদরির সময় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন নি যে, ধর্মঘট ঘটলে জনসাধারণের কি হাল হবে। জরুরী বিভাগগুলি বন্ধ থাকার দরুণ কলেরা এবং অপরাপর মহামারীকে আমদানী করার এবং ব্যাপক গণহত্যা করার দায়িত্ব কার হবে, সরকারের না মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীর, তা নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই। ধর্মঘট যাতে অবিলম্বে মিটে যায় এবং কর্মচারীদের দাবির প্রতি সুবিচার করে একটা মীমাংসার রাস্তা খুঁজে বার করা যায়, তার চেষ্টা সব পক্ষের করা এখনই দরকার।

ভাঙনের রাজনীতি

আমরা পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে লিখেছিলাম যে, সি. পি. এম এবং সি. পি. আই-এর বিরোধই কার্যত পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ দুর্গতির জন্য দায়ী। আমরা এ কথা লিখেছিলাম অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভেঙে যাওয়া উপলক্ষে। ভাঙনের জন্য কোন্ পক্ষ দায়ী সে প্রশ্নটা অবান্তর, কোন কথাই বলা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে, কারণ বিবদমান পক্ষদ্বয়, প্রতিটি বাক্য, এমন কি প্রতিটি শব্দের পিছনেও মোটিভ আবিষ্কার করেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে ভাঙনের হাওয়া লেগেছে, যদিও ভাঙনটা এখনো আটকে আছে। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে আর একটি নতুন প্রাথমিক শিক্ষক সংস্থা গঠন করা হয়েছে, সেই একই ভাঙনের পুনরাবৃত্তি। সবাই যখন ভাগাভাগির খেলায় মত্ত তখন প্রাথমিক শিক্ষকেরাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? তাঁরাও মহাজনদের পথ অনুসরণ করছেন। এই বিভিন্ন গণসংগঠনে যদি এইভাবে ভাঙন চলতে থাকে তার পরিণামটা শেষ পর্যন্ত কি হবে সেটা বোধ হয় সংশ্লিষ্ট পক্ষরা খেয়াল করতে নারাজ। বামপন্থী দলগুলির পারস্পরিক কলহের ঢেউ অনিবার্যভাবেই গণসংগঠনগুলিকে আঘাত করছে। সব দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের আজ ঘোর দুর্দিন।

—১১ [illegible]
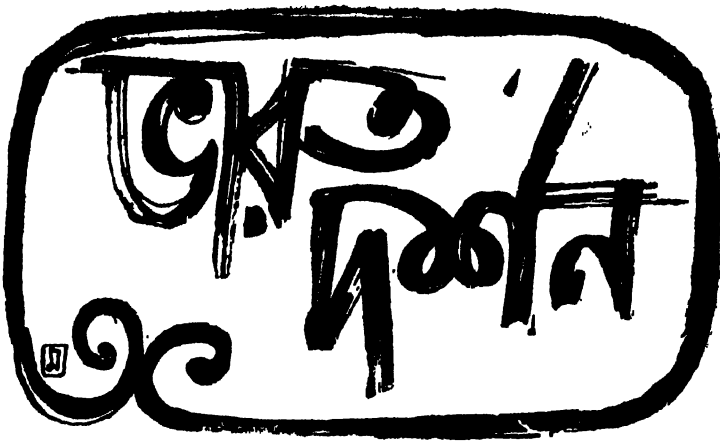
এ-আই-সি-সি'র পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রস্তাব

প্রায় বছর পাঁচেক পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বনের পর এবার এ-আই-সি-সি পররাষ্ট্র বিষয়ক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাতে ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবার জন্য সেই দেশ থেকে অবিলম্বে মার্কিন সেনাবাহিনীর অপসারণ দাবি করা হয়েছে। এ-আই-সি-সি বলেছেন যে, ইন্দোচীনের যুদ্ধ বিশ্বশান্তির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ ইতি-মধ্যেই কম্বোডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনী হুড়মুড় করে ঢুকে গেছে সেই দেশের মধ্যে। এইভাবে যদি যুদ্ধ সম্প্রসারিত হয় এবং বাইরের শক্তি যদি সেখানে এইভাবে ডম্ফাই দেখাতে থাকে, তাহলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইন্দোচীন থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারিত হলে আলোচনার টেবিলে বসে ইন্দোচীন বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে। ইন্দোচীনের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করার অধিকারী। সেখানে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাবটি যে সময়োপযোগী হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইন্দোচীনের দেশগুলো আগে ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্থানীয় অধিবাসীরা ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করেন। কিন্তু দেশগুলো স্বাধীন হতে-না-হতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের তাঁবেদারদের মাধ্যমে আমেরিকা তার সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে সেই দেশে নিজের প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্টা করে। আমেরিকা ভেবেছিল, সে যখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং অস্ত্রবলে সবচেয়ে বলীয়ান রাষ্ট্র, তখন ভিয়েৎনামকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হবে না। কিন্তু তখন সে হো চি মিনের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত মুক্তি-আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই আমেরিকার ভিয়েৎনাম জয়ের সাধ ভিয়েৎনামের জলাভূমিতে চিরকালের মত সমাধিস্থ হয়েছে। এখন সে ভিয়েৎনাম ছেড়ে পালাবার পথ পাচ্ছে না। ওদিকে খোদ আমেরিকাতেও ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে। আমেরিকা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ভিয়েৎনামের নিরীহ নর-নারী, শিশু হত্যা করে মার্কিন বণিকরা রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসছে দুঃখ-দুর্দশা এবং অশান্তি। আমেরিকার হাজার হাজার যুবক মার্কিন বণিকদের মুনাফা বাড়াবার জন্য ভিয়েৎনামের ভূমিতে এসে প্রাণ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই আমেরিকাবাসী ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকার শহরে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পুলিশের লাঠি, গুলী খেয়ে মারা পড়ছেন। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে প্রেসিডেন্ট নিক্সন "কৌশল" করে ভিয়েৎনাম থেকে পালাবার মতলব এঁটেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভিয়েৎনাম থেকে ধীরে ধীরে মার্কিন সৈন্য ফিরিয়ে এনে সেই লড়াই চালাবার ভার দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্যদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ ভিয়েৎনামীকরণ। কিন্তু সেটা স্রেফ নিক্সনীয় ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিন ফৌজ ভিয়েৎনামের মাটি ত্যাগ করলে তার তাঁবেদাররা যে রাতারাতি উবে যাবে, তা পৃথিবীর সকলেই জানত। তাই দেখা গেল, 'ভিয়েৎনামীকরণ' নীতি ঘোষণার অল্পকাল বাদেই আমেরিকা ভিয়েৎনামের যুদ্ধকে কম্বোডিয়া এবং লাওসে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় আমেরিকা অনেক পারমাণবিক অস্ত্রও মজুত রেখেছে। তাই সারা দুনিয়ায় একটা গুরুতর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

এ-আই-সি-সি'র একজন সদস্য অবশ্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। [illegible] চীনকে ঠেকিয়ে রেখেছে। চীন যখন ভারতের বন্ধু নয়, তখন বাঘের শত্রু বাঘে খেলে ক্ষতি কোথায়? প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার জবাব দিয়ে বলেছেন, ইন্দোচীনে কোন চীনা সৈন্য আছে বলে তাঁর জানা নেই। কাজেই চীনকে ঠেকিয়ে রাখার কোন ব্যাপারই সেখানে নেই। চীনকে ঠেকাবার দরকার হলে ইন্দোচীনের দেশপ্রেমিক জনগণই সেই কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। তার জন্য বাইরের শক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন হবে না। যারা আমেরিকার মত দুর্ধর্ষ শক্তিকে ঠেকাতে পারছে, চীনকে ঠেকানো তাদের কাছে খুব কঠিন নয়। ভারতবর্ষও চীনের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ভারত তো কোন বিদেশী শক্তিকে আমন্ত্রণ করে নি। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত এবং নির্যাতিত দেশগুলো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রতে উদ্দীপ্ত, তখন এক দেশের ওপর অপর দেশের প্রভুত্ব কোনক্রমেই সহ্য করা যায় না। কাজেই এ-আই-সি-সি'র এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

জনসঙ্ঘের বাঙালী বিদ্বেষ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে এবার নাকি এই রাজ্যের শ'পাঁচেক ছাত্র দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েট কলেজে ভর্তি হবার দরখাস্ত করেছে। তাতে দিল্লীর জনসঙ্ঘের কর্মকর্তারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের ভর্তি করবার সময় তাদের যেন ভাল করে স্ক্রীন (পরীক্ষা) করা হয়। কারণ জনসঙ্ঘ জানতে পেরেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের নকশালপন্থী ছাত্ররা নাকি দিল্লীতে গোলমাল পাকাবার জন্য সেখানকার কলেজে ভর্তি হতে আসছে। নকশালবাড়ী আন্দোলনের জন্ম পশ্চিমবঙ্গে ঠিকই, কিন্তু এখন এটা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদপত্র খুললেই বিভিন্ন রাজ্যে নকশালী ক্রিয়াকলাপের সন্ধান পাওয়া যায়। সপ্তাহ দুই আগে খাস দিল্লীতেই জনসঙ্ঘের এক জনসভায় নকশালপন্থী ধ্বনি শোনা যায় এবং তাতে সেই সভাটি পণ্ড হয়েছিল। কাজেই বাঙালী ছাত্রদের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ করলেই যে দিল্লী নকশালমুক্ত থাকবে, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আর যারা পশ্চিমবঙ্গের অশান্তির ভয়ে দিল্লীতে পড়তে যাচ্ছে, তারা যে কোনক্রমেই নকশালপন্থী

হতে পারে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আসলে এটা জনসঙ্ঘের নকশাল-ভীতি নয়, বাঙালী বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের পরিচয় আগেও পাওয়া গেছে। কয়েকমাস আগে দিল্লীর জনসঙ্ঘ প্রভাবিত প্রশাসন কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের প্রলোভন দেখিয়েছিলেন যে, তাঁরা যদি তাঁদের কলকারখানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লীতে উঠিয়ে নিয়ে যান, তাহলে দিল্লীর আশপাশে তাঁদের সস্তায় জমি দেওয়া হবে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিরা সেই টোপ কেউ গেলেন নি। জনসঙ্ঘের এই বাঙালী বিদ্বেষের কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। জনসঙ্ঘের জনক পশ্চিমবঙ্গবাসী হলেও পশ্চিমবঙ্গ জনসঙ্ঘের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কোনদিনই বরদাস্ত করে নি এবং এই রাজ্যে জনসঙ্ঘের কোন ভবিষ্যৎ আছে বলেও মনে হয় না। সেই শোচনীয় ব্যর্থতা জনসঙ্ঘের নেতাদের বাঙালী বিদ্বেষী করে তুলেছে। কিন্তু জনসঙ্ঘের নেতাদের জেনে রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষ এক এবং অবিভাজ্য। এদেশে যে-কোন রাজ্যের ছেলে-মেয়ে অপর যে-কোন রাজ্যের স্কুল-কলেজে বিদ্যাভ্যাসের অধিকারী। দিল্লীর রাজনীতিক্ষেত্রে জনসঙ্ঘের প্রাধান্য রয়েছে বলে দিল্লী জায়গাটা তাঁদের প্রাইভেট সম্পত্তি হয়ে ওঠে নি। দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় চালু রাখবার জন্য দিল্লীর জনসঙ্ঘওয়ালারা যত টাকা দেন, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা দেন পশ্চিমবঙ্গ। দিল্লীর সমৃদ্ধি সাধনের সমস্ত অর্থ সরবরাহ করে ভারতের রাজ্যগুলো। জনসঙ্ঘের নেতারা যেভাবে সাম্প্রদায়িক এবং প্রাদেশিকতা চাগিয়ে তুলছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এই দলে হিন্দীভাষী কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বছরখানেক আগে এ'রা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ব্যঙ্গ রচনার হিন্দী অনুবাদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

নরকঙ্কালের কারবার

মস্ত সুখবর। ভারতবর্ষ বিদেশের বাজারে নরকঙ্কাল রপ্তানী করে গত বছর প্রায় ২৪ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। তার আগের বছর এই খাতে আয় হয়েছিল প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। গত বছর রপ্তানী হয়েছিল সাড়ে উনত্রিশ হাজার নরকঙ্কাল। তার আগের বছর হয়েছিল পৌনে তেইশ হাজার। অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের তুলনায় ১৯৬৯ সালে আমরা অনেক বেশি নরকঙ্কাল রপ্তানী করেও অনেক কম টাকা আয় করেছি। তার কারণ আগের বছর এক-একটা নরকঙ্কাল আমরা বিক্রি করেছি ১১০ টাকায়, আর গত বছর বিক্রি করেছি ৬০ টাকায়। আমাদের নরকঙ্কালের প্রধান ক্রেতা আমেরিকা। রপ্তানীর অর্ধেক নেয় সে, এক-চতুর্থাংশ ফ্রান্স এবং বাকী এক-চতুর্থাংশ ইটালী আর জাপান। সব ক'টিই হার্ড কারেন্সীর দেশ। কাজেই লাভটা ভালই আসে।

ভারতবর্ষে হিন্দুরা তাঁদের মৃতদেহ দাহ করেন এবং মুসলমান ও খৃস্টানরা মৃতদেহ কবর দেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের কঙ্কাল ব্যবসায়ীদের হস্তগত হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে এই কঙ্কালগুলো পাওয়া যাচ্ছে কোত্থেকে? কোথায় সেগুলো ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে? তার উত্তর খুব সোজা। ভারতবর্ষ ৫৫ কোটি মানুষের দেশ, কিন্তু তার খাদ্য উৎপাদন সবে ১০ কোটি টনে পৌঁছেছে। কাজেই এখানে অধিকাংশ লোকই দু'বেলা খেতে পান না। তার এক বৃহৎ অংশ নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়ান এবং যেখানে-সেখানে মরে পড়ে থাকেন। সেই বে-ওয়ারিশ মড়াগুলোই ব্যবসায়ীদের মূল্যবান পণ্য। এ'দের আমরা দধীচির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বেঁচে থাকতে এ'রা ছিলেন সমাজের বোঝা। এ'দের খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব সমাজ নেয় নি এবং মনে মনে এ'দের মৃত্যু কামনাই করেছে। আর যেই-না এ'রা মরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে এ'দের মৃতদেহ ডলার-ফ্রাঁর মিষ্টি-মধুর গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে। তখন এ'দের মৃতদেহ নিয়ে কারবারীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে। জীবিতকালে যে মানুষটার দাম এক কানাকড়িও ছিল না, মৃত্যুর পরে তাঁর দাম উঠছে ৬০ থেকে ১১০ টাকা। সত্য সেলুকাস, বিচিত্র এই দেশ। জীবিতকালে যাঁরা ছিলেন সমাজের পাপ, মৃত্যুর পরে তাঁরাই সমাজের সমৃদ্ধি সাধনের উপকরণ হয়ে উঠছেন; অর্থনীতির বনিয়াদ শক্ত করছেন। বিশ্বের বাজারে ভারতীয় চুল বেচে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছি। এবার নরকঙ্কাল বেচে আরও কিছু কামিয়ে নিলাম। এরপর মানুষের হার্ট, কিডনী, লিভার, চোখ, দাঁত, নখ, হাত-পা বেচেও আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ট্রান্সপ্লান্টেশন ব্যাপকভাবে চালু হলে ঐসব কারবারও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ভারতে "ফালতু" লোক সংখ্যায় এত বেশি যে, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করে বিদেশে চালান দেওয়া আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না। বিজনেস ইজ বিজনেস। গরীব লোকেরা প্রতিদিন ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে নিজের রক্ত বেচে বউ-ছেলে-মেয়ের মুখের গ্রাস সংগ্রহ করছে না কি? মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কারবার চালু হলে পরিবার পরিকল্পনার জন্য আর বছর বছর শত শত কোটি টাকা ব্যয় করবার প্রয়োজন হবে না। সেও কি কম লাভ? (১১-৬-৭০)
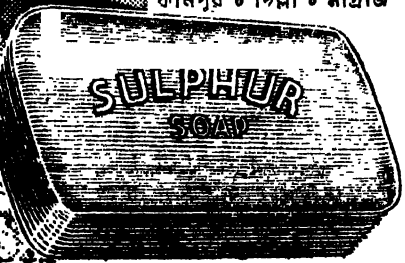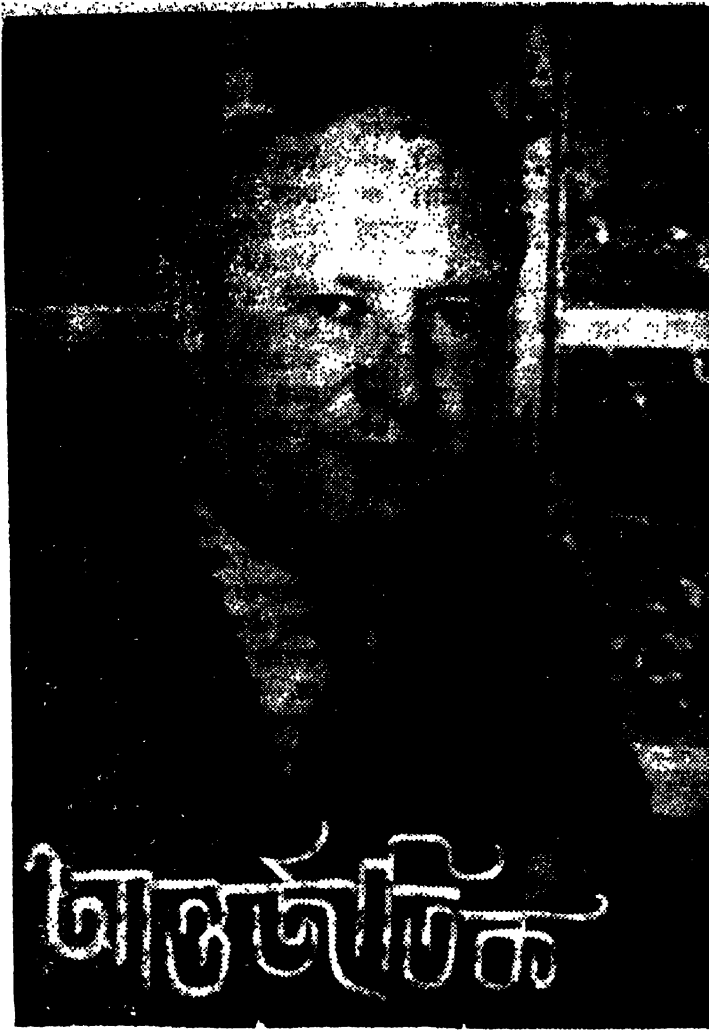
এডওয়ার্ড হিথ

বৃটেন ঃ

সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম নির্বাচনী বিস্ময়—১৮ই জুন অনুষ্ঠিত বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের জয় ও শ্রমিক দলের পরাজয়।

প্রায় সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে, এবারের নির্বাচনে শ্রমিক দল বিপুলভাবে জয়লাভ করবে এবং আসনসংখ্যার দিক থেকে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আগের চেয়ে অনেক বাড়বে। পর পর তিনবার নির্বাচনে জিতে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন শতাব্দীর রেকর্ড করবেন। 'যতগুলি জনমত নির্ণায়ক ভোট বা 'গ্যালপ পোল' নেওয়া হয়েছে, সব ক'টিতেই শ্রমিক দল এগিয়ে ছিল। নির্বাচনের পরেও বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শ্রমিক দল অবশ্য জিতবে।

কিন্তু সব হিসাব ভুল প্রমাণ করে দিয়ে নির্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করেছে। এই জয়লাভ এতই অকস্মাৎ যে, রক্ষণশীল দলের নেতা ও নতুন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের পক্ষেও একে মেনে নিতে একটু সময় লেগেছে। বক্তৃতায় যাই বলুন, তিনিও এটা আশা করেন নি।

এখন পর্যন্ত (২০শে জুন) যে খবর পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, রক্ষণশীল দল পেয়েছে ৩২৮ (কমন্সসভার মোট আসনসংখ্যা হল ৬৩০), শ্রমিক দল ২৮৮, উদারনৈতিক দল ৪ ও অন্যান্যরা ৫টি আসনে জয়লাভ করেছেন। এর মধ্যে রক্ষণশীল দল ৬৬টি অতিরিক্ত আসন পেয়েছে, আর শ্রমিক দল তাদের পুরনো আসন হারিয়েছে ৫৯টি। উদারনৈতিক দল তাদের ৬টি আসন হারিয়েছে।

বিপর্যয় ছাড়াও শ্রমিক দলের আরও বিপর্যয় ঘটেছে। প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কমন্সসভায় শ্রমিক দলের সহকারী নেতা ও শ্রমিক দলের অন্যতম স্তম্ভ জর্জ ব্রাউন পরাজিত হয়েছেন। এডওয়ার্ড হিথ তাঁর নিজের কেন্দ্রে পূর্বাপেক্ষা চার গুণ বেশি ভোট পেয়ে জিতেছেন। কিন্তু, হ্যারল্ড উইলসন কোনরকমে একটু বেশি ভোট পেয়েছেন। আর, সব মন্ত্রীর ভোট কমেছে। কয়েকজন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন।

রক্ষণশীল দলের প্রার্থী, বৃটেনের শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষীদের নেতা এনক পাওয়েল পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি ভোট পেয়ে, শ্রমিক দলের প্রার্থীর চেয়ে চোদ্দ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেছেন।

শ্রমিক দলের এই বিপর্যয়ের কারণ কি?

গত ছয় বছরে শ্রমিক দলের শাসনে মোটামুটি বৃটেনে একটা নিশ্চয়তার ভাব এসেছিল। দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠে বৃটেনের বাণিজ্য ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত দেখা দিয়েছিল। তাই শ্রমিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের শিরোনামা দেওয়া হয়েছিল : "বৃটেন এখন শক্তিশালী হয়েছে, আসুন একে আমরা বাসের উপযুক্ত মহান দেশে পরিণত করি" (Now Britain's Strong—Let's Make it Great to Live in)। রক্ষণশীল দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের নাম দেওয়া হয়েছে "উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ" (A Better Tomorrow)।

শ্রমিক দলের নেতা ও বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় নেতা। বিপরীত দিকে রক্ষণশীল দলের নেতা এডওয়ার্ড হিথ মোটেই জনচিত্তহারী নন, তিনি জোলো ধরনের নিরামিষ নেতা। অবিবাহিত, ধূমপানবিরোধী নিরীহ গোবেচারা গোছের ভদ্রলোক। এঁকে দিয়ে কি নির্বাচন জেতা যায়!

তারপর, এইবারই প্রথম ভোটদাতাদের সর্বনিম্ন বয়স কমিয়ে ১৮ করা হয়েছে। তরুণদের মধ্যে যাঁরা এবার নতুন ভোটার

এনক পাওয়েল

হয়েছেন, তাঁদের ভোট বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীরা, অর্থাৎ শ্রমিক দলের প্রার্থীরা পাবেন, এটাও ধরে নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু তা হয় নি। রক্ষণশীল দল জিতেছে, এবং বেশ ভালভাবেই জিতেছে।

রক্ষণশীলদের জয়ের প্রথম কারণ, বৃটেনের জনসাধারণ একটা পরিবর্তন চেয়েছিল। এবং তারা তা পেয়েছে। ছয় বছর একটানা শ্রমিক দল শাসন চালিয়েছে। বেশ তো, এবার অপর পক্ষকে দিয়ে দেখা যাক। ভোটদাতারা অত্যন্ত নীরবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাদের এই মনোভাব প্রকাশ করেছে ব্যালট বাক্সের ভেতর দিয়ে।

শ্রমিক দলের শাসনে বৃটেনের অর্থনীতি বেশ শক্তিশালী হয়েছে বলে যে প্রচার করা হয়েছে, ভোটদাতাদের এক বিরাট অংশের মনে সে সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছিল। শ্রমিক দলের শাসনের আমলে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের বিষয়টি তুলে রক্ষণশীল দল জোর প্রচার চালিয়েছিল, শ্রমিক দল যদি আবার ক্ষমতায় আসে, তবে আবার পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস হবে।

শ্রমিক দলের দুর্ভাগ্য, নির্বাচনের ঠিক মুখে, নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগে, সংবাদ বের হল, মে মাসে বৃটেনের বাণিজ্য ব্যালান্সে ৩১ মিলিয়ন পাউণ্ড ঘাটতি হয়েছে। বৃটিশ জনসাধারণ এতে রীতিমত বিচলিত বোধ করেছে।

নির্বাচনের দিন সকালে সংবাদপত্রে জুন মাসে বেকার সংখ্যার যে পরিসংখ্যান বের হল, তাতে দেখা গেল বেকারের সংখ্যা শতকরা ২·৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৪০ সালের পর এইরূপ বেকারসংখ্যাবৃদ্ধি আর কখনও হয় নি।

শ্রমিকদের মধ্যেও দ্বিধা ও সংশয় দেখা দিয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস কালাঘান তাঁর সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতায় এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার থেকে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আগামী শরৎকালে শ্রমিক দলের সরকার মজুরীবৃদ্ধি বন্ধ (wage freeze) সংক্রান্ত আইন আনবেন। হ্যারল্ড উইলসন নিজে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করলেও সন্দেহ যায় নি। ১৯৬৬ সালের নির্বাচনের আগেও এই জাতীয় অস্বীকৃতি করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার মজুরীবৃদ্ধি বন্ধ করেছিলেন।

চিকিৎসকদের জন্য যে পে কমিশন গঠন করা হয়েছিল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী রিচার্ড ক্রসম্যান নাকি বলেছিলেন, সেই কমিশনের রায় বিবেচনার জন্য আর একটি কমিটি গঠন করা হবে। এতে চিকিৎসকরা চটেছেন।

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি পদ্ধতিও শ্রমিক দলের বিরুদ্ধে গেছে।

এ সব সত্ত্বেও অনেকেই ধারণা করেছিলেন, শ্রমিক দল জয়লাভ করবে। কারণ, এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য রক্ষণশীল দলের কোন স্পষ্ট কার্যক্রম নেই। বরং, তাদের নীতি দেশের সংকট আরও বাড়িয়ে তুলবে।

তথাপি বৃটিশ ভোটদাতারা রক্ষণশীল দলের হাতেই শাসনভার তুলে দিয়েছে।

রক্ষণশীল দলের শাসনে খুব যে একটা পরিবর্তন হবে, তা মনে হচ্ছে না। কারণ, দুই দলের নীতিই প্রায় এক। শ্রমিক দল এখন সমাজতন্ত্রের কথা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে।

বৈদেশিক নীতিতে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। সুয়েজের পূর্বে কোন বৃটিশ সৈন্য থাকবে না বলে শ্রমিক সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, নতুন রক্ষণশীল সরকার তা পাল্টে দিতে পারেন। তাঁরা এই অঞ্চলে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি ও সৈন্য

হ্যারল্ড উইলসন

রাখবেন। পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েলকে তাঁরা আরও বেশি সমর্থন করবেন।

বৃটেনে বহিরাগতদের সমস্যা আরও বাড়বে। অভিবাসন বা ইমিগ্রেশন সম্পর্কে রক্ষণশীল দল আরও বেশি কড়াকড়ি করবে। পাওয়েলদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

কম্বোডিয়াঃ

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, কম্বোডিয়ায় জেনারেল লন নলের সরকারের দিন শেষ হতে চলেছে। এর পরেও হয়তো মার্কিন সৈন্যের জোরে সরকারের অস্তিত্ব থাকবে কিছুকাল, কিন্তু দেশবাসীর ওপর তার প্রভাব সামান্যই থাকবে।

রাজধানী নমপেন অবরোধ করা হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের একজন মুখপাত্র ১৮ই জুন তারিখে বলেছেন, প্রিন্স নরোদম সিহানুকের অনুগামী 'রেড খেমের' বাহিনী, উত্তর ভিয়েতনামের চার ডিভিশন সৈন্য, প্যাথেট লাও-এর কিছু সৈন্য ও ভিয়েতকং গেরিলারা সকলে মিলে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। বহির্বিশ্ব থেকে নমপেন বিচ্ছিন্ন। ব্যাঙ্ককের সঙ্গে নমপেনের যে রেল যোগাযোগ ছিল, তা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী সংবাদে বলা হয়েছে, নমপেনের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ আবার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। নমপেন-সায়গন পথ চালু হয়েছে। তবু, নমপেনের বিপদ এখনও কাটে নি। বরং বেড়েছে। যে কোন সময় রাজধানীর পতন হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বন্দর কম্পং সোম বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেছে। কম্বোডিয়ার একমাত্র তৈল শোধনাগার এই বন্দরে অবস্থিত।

প্রাদেশিক রাজধানী কম্পং থোম বিদ্রোহীদের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত অংকোর ভাটের অস্তিত্ব আজ গৃহযুদ্ধের ফলে বিপন্ন। হিন্দু সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক নিদর্শন, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি, আটশ বছরের পুরনো বিষ্ণু মন্দির অংকোর ভাট বর্তমানে ভিয়েতকং গেরিলাদের দখলে। তারা নাকি এখানে কামান বন্দুক সাজিয়ে রেখেছে। প্রতিপক্ষ যদি আক্রমণ শুরু করে তাহলে এই ইতিহাসবিখ্যাত মন্দিরটি ধ্বংস হবে। উভয় পক্ষের আক্রমণের হাত থেকে অংকোর ভাটকে রক্ষা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

১১টি এশীয় দেশের পক্ষ থেকে কম্বোডিয়া সম্পর্কে জাকার্তায় যে সম্মেলন হয়, সেখানে কম্বোডিয়া সমস্যার মীমাংসার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশে ৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই 'টাস্ক ফোর্সের' সদস্যরা (ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও মালয়েশিয়া) ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিকের নেতৃত্বে মস্কো গিয়ে সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন।

সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো আদম মালিকদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কম্বোডিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ না করা পর্যন্ত অন্য কোন কিছু বিবেচনা করা হবে না। মার্কিন সৈন্য অপসারণই হল শান্তির প্রথম সর্ত।

গ্রোমিকো আরও বলেছেন, সোভিয়েত যুনিয়ন এখন কম্বোডিয়া কিংবা সামগ্রিকভাবে ইন্দো-চীনের ব্যাপারে জেনেভা সম্মেলনের মত কোন বৈঠকে বসতে রাজী নয়।

গ্রোমিকো খাতির করে কথাবার্তা বললেও, সোভিয়েত সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' স্পষ্ট বলেছে, জাকার্তা সম্মেলন ও 'টাস্ক ফোর্সের' আসল মতলব হল, কম্বোডিয়ায় মার্কিন আক্রমণ থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যত্র ফেরানো। (২০।৬।৭০)

শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞান গোঁসাই ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের গাওয়া নজরুলের এই গানখানি আর শোনা যায় না। এমন হৃদয়ের কাতর আর্তনাদের গান এই যুগে আর কেউ গায়ও না। বর্তমান যুগ হ'ল হেঁচকী তোলার যুগ, হেঁচকী তুলে যে গান যত বেশি কোমর দোলাতে সাহায্য করবে, সেই গানের তত কদর বেশি। তাই কৃষ্ণচন্দ্র দে, হিমাংশু দত্ত, মৃণালকান্তি ঘোষ, ভীষ্মদেব, জ্ঞান গোঁসাই, আব্বাস উদ্দিন, এমন কি শচীনদেব বর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখের গানের রেকর্ড শোনা যায় না। সে না হয় না শোনা গেল, কিন্তু ঐ শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয় গানখানির বড় দরকার পড়ে গেছে। একটি আসরে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রী এন জি গোরে, ডাঃ রণেন সেন, শ্রীঅশোক ঘোষ প্রমুখকে বসিয়ে দিন এবং গানখানি বাজান, দেখবেন এই গানখানিতেই সকলের হৃদয়ের কথা ধ্বনিত হচ্ছে।

সম্প্রতি দীঘাতে পি এস পি দলের এক বড় দরের সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে যেসব কথা আলোচনা হ'ল, তার মধ্যে প্রধান হ'ল ঐ গানটি—শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়। শ্রী এন জি গোরে, শ্রীপ্রেম ভাসিনসহ নেতৃবৃন্দ একযোগে গাইলেন এই গানখানি। এই গানের লক্ষ্য হ'ল শ্রীবিদ্যুৎ বসু, শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য, শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত প্রমুখ। বিদ্রোহী পি এস পি দলের নেতাদের প্রতি দীঘা সম্মেলনে মিলিত পি এস পি নেতৃবৃন্দ এই গান গেয়েছেন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ দিয়ে। রায়গঞ্জে সম্মেলনের পর রাজ্য পি এস পি দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্ট-পন্থী ও বিরোধী দু'পক্ষ হয়ে রাজ্য পি এস পি ভেঙ্গে যায়। তারপর রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে দেখা যায়, সরকারী পি এস পি রাজ্যে প্রায় বেপাত্তা হয়ে গেছে। বিদ্রোহী নামে নতুন পি এস পি দল রাজ্যের মানুষের অনেক বেশি সমর্থন লাভ করেছে। এইভাবেই চলছিল—কিন্তু ধীরে ধীরে সরকারী পি এস পি দল ভাবতে সুরু করলো পশ্চিমবঙ্গে দল রাখতে হলে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে সঙ্গে পাওয়া দরকার। এই দরকারটা আবার সবচেয়ে বেশি বোধহয় অনুভব করেন দলের একমাত্র এম-পি শ্রীসমর গুহ। অধ্যাপক গুহ রাজ্যের বহু নির্বাচনে লড়াই করে এবং বহু ক্ষেত্রে জামানত রক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে অবশেষে '৬৭ সালে কাঁথি কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে এখন দিল্লীর তখৎ তাউসে অধিষ্ঠিত। কিন্তু শ্রীগুহ সেই আসনে নিশ্চিন্তে বসতে পারছেন না—তার প্রধান কারণ হ'ল শ্রীগুহ যে লোকসভার আসনে আছেন, তার নীচুতে সবকটা আসনই বিদ্রোহী পি এস পি দলের দখলে। কাজেই এখন থেকে যদি বিদ্রোহীদের সামাল দেওয়া না যায়, তবে '৭২ সালে অবস্থাটা বড়ই খারাপ হবে। এই অবস্থায় দীঘায় বসে সরকারী পি এস পি দল সিদ্ধান্ত নিল যে, বিদ্রোহীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে-সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, সব তুলে নেওয়া হ'ল, এবার ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে আসুক। শূন্য এ বুকে পাখি ফিরে আসুক।

দীঘা সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কলকাতায় বিদ্রোহী পি এস পি দল-নেতা শ্রীবিদ্যুৎ বসুর সঙ্গে সরকারী দলের নেতাদের বৈঠক হ'ল। সেই বৈঠকে প্রস্তাব দেওয়া হ'ল বিদ্রোহীরা দলে ফিরে আসুক। কিন্তু দল ভাঙ্গা বা দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ হতে পারে, কিন্তু ভাঙ্গা দলের জোড়া লাগা বা বেরিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের দলে ফিরে আসা সহজ নয়। তবু অলোচনা হল, আলোচনায় বিদ্রোহীগোষ্ঠী থেকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হ'ল সর্ত হিসাবে। সেই সর্ত হ'ল—বিদ্রোহীরা দলে ফিরে আসতে পারে একটিমাত্র সর্তে, সেটা হ'ল পশ্চিমবঙ্গের বিদ্রোহী পি এস পি দলের অংশকেই দলের রাজ্য কমিটিরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে, বিদ্রোহী পি এস [illegible] এই দলে। নইলে বিদ্রোহী পি এস পি দলের সদস্যরা শ্রীসমর গুহ ও শ্রীসুনীল দাসের দলে যোগদান করতে রাজি নয়। বিদ্রোহী দলের বক্তব্য হ'ল, রাজ্যের বর্তমান সরকারী পি এস পি দলের নেতারা সমাজবাদী নন এবং ওঁদের নেতৃত্বে সমাজবাদী আন্দোলনও সম্ভব নয়। সরকারী দলের একজন নেতা তো আনন্দমার্গের ব্রীফ-এ চলেন, আর একজন এখনও স্বপ্নে নেতাজীর আদেশ পেয়ে কাজ করেন—ওঁদের সঙ্গে আর যাই করা যাক, রাজনীতি করা যায় না। শ্রীগোরে প্রমুখ নেতৃবৃন্দের এক কথায় সরকারী দলকে খারিজ করে বিদ্রোহী দলকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয় নি। শ্রীগোরে বলেছিলেন, তোমরা দলে যোগদান করে নেতৃত্ব গ্রহণ ও দখল করো, কিন্তু আমরা এককথায় কাউকে বাতিল করে অন্য কাউকে স্বীকৃতি দিতে পারি না। বিদ্রোহী দল থেকেও সাফ বলে দেওয়া হ'ল—তবে রইল আপনাদের জমিদারী, আমাদের সরকারী দলে ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই শূন্য এ বুকে পাখির আর ফিরে আসা হ'ল না।

এই একই অবস্থা আট পার্টির ফ্রন্ট ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের। এমন কি, শ্রীজ্যোতি বসুর ছয় পার্টির ফ্রন্টের। আট পার্টির ফ্রন্ট শূন্য বুকে অপেক্ষা করছে বাংলা কংগ্রেসকে তাদের ফ্রন্টে আনতে, বাংলা কংগ্রেস শূন্য বুকে অপেক্ষা করছে আট পার্টির সঙ্গে মিলনে, ছয় পার্টি অপেক্ষা করছে তাদের ফ্রন্টে ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি'কে টেনে নিতে। আট পার্টি আর বাংলা কংগ্রেস দু'পক্ষের অবস্থা হয়েছে—না সহ্য করার, না ত্যাগ করবার। বাংলা কংগ্রেস আট পার্টির ফ্রন্টে যোগ দিতে চায়, কিন্তু তার আগে কয়েকটা সর্ত পূরণ করে নিতে চায়। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মনে করেন তিনি দু'বার আগুনে হাত দিয়ে আঙুল পুড়িয়েছেন, কাজেই তৃতীয়বার আগুনে হাত দেবার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে চান। এই কথা সত্য—শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে কিন্তু মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি যেমন ত্যাজ্য, তেমনি কম্যুনিস্ট পার্টি বা এস ইউ সি খুব আদরের এমন নয়। ফরোয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু প্রশ্ন ও বক্তব্য আছে। তাই সি পি আই, এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের সঙ্গে আবার ঘর বাঁধবার আগে ভাল করে বুঝে নিতে চান ঘর বাঁধার

[illegible] ভাঙা [illegible] মুখোপাধ্যায় নতুন ফ্রন্টে যোগদান করবেন। কিন্তু এখানে অন্য একটা বিপদও বাংলা কংগ্রেস দেখতে পাচ্ছে। সেটা হ'ল বাংলা কংগ্রেস বারে বারে চাপ সৃষ্টি করে এই সব দলকে বাগে আনতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন-বারই ফল হয় নি। যেমন মন্ত্রিসভা থাকতেই চেষ্টা হয়েছিল সি পি এমকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করার। এই উদ্দেশ্য নিয়েই বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্টের বৈঠক বর্জন করেছিল, তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী সময় দিয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি কাজেরই লক্ষ্য ছিল সি পি এমকে বাদ দিয়ে অন্য দল এগিয়ে আসুক। কিন্তু তখন সি পি এমকে বাদ দেওয়া দূরে থাক, সি পি এম-এর কাছ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে নেওয়ার পক্ষেও কেউ মত দেয় নি। সরকার ভেঙে যাবার পরও বাংলা কংগ্রেস আশা করেছিল, এইবার হয়ত সকলে সি পি এমকে ত্যাগ করতে রাজি হবে ও নতুন সরকার গড়ার স্বপক্ষে এগিয়ে আসবে। সেই চিন্তাও সফল হয় নি—কারণ দেখা গেছে বাংলা কংগ্রেস যত সি পি এমকে বাদ দেবার কথা বলেছে, অন্য পক্ষ তত সি পি এমকে নিয়েই ফ্রন্ট পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছে। যে কথা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়, সেই কথাই বারে বারে শুনতে হয়েছে বাংলা কংগ্রেসকে। কিন্তু উপায় নেই—কারণ সি পি এম-এর সঙ্গে মোকাবেলা করতে হলে আট দলকে চাই-ই চাই।

নবকংগ্রেস বা পি এস পি বা এস এস পি দলের সমর্থন চাটনি হতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে এক থালা ভাত খাওয়া যায় না। তাই বাংলা কংগ্রেস বারে বারে দলের কর্মপরিষদের প্রস্তাব আট দলের কাছে পাঠিয়েছে আর বলেছে, শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়। কিন্তু পাখি আজও ফেরে নি। একই অবস্থা আট দলের। আট দলের বড় পাণ্ডা হ'ল সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক। এই দুই দলের রাজনীতির মূলকথা হ'ল বাংলা কংগ্রেসের সব কাজ ভাল নয়, কিন্তু বাংলা কংগ্রেস খারাপ হয়েছে সি পি এম-এর উৎপাতে ও তাড়নায়। আট পার্টির রাজনীতির মূল ধারা পরিচালিত হয়েছে সি পি এম বিরোধিতা ও পরোক্ষে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে সমর্থনের মধ্য দিয়ে। তাই আজ বাংলা কংগ্রেসকে হাতছাড়া করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আট দলের মধ্যে দু'-একটা দল তো অনেক আগেই বাংলা কংগ্রেসের কাছে তাদের হৃদয় বাঁধা দিয়ে রেখেছে। ফলে, আট পার্টির ফ্রন্টের অনেক দলই যেমন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ডিকটেশন মেনে চলতে পারছে না, আবার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে ছেড়েও দিতে পারছে না। যদি বাংলা কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে আট পার্টির ফ্রন্ট এক রাত্রে ভেঙে যাবে। দু'-তিনটে দল বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে চলে যাবে। তখন একদিকে সি পি এম আর একদিকে বাংলা কংগ্রেস ও তার অনুগামীরা এই দু' পক্ষের মাঝে পড়ে আট পার্টির নাভিশ্বাস উঠে যাবে।

শুধু তাই নয়,—বাংলা কংগ্রেস যদি আজ কোন ফ্রন্টে না এসে নবকংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায়, তা হলেও অবস্থাটা খুব সুখের হবে না। একটা কথা সকলেই জানেন যে, রাজ্য থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিদায় নিয়েছে, কিন্তু কংগ্রেসের যে জনপ্রিয়তা, সেটা এখনও কিছু কিছু গ্রামে, শিল্প এলাকায় রয়ে গেছে। গত নির্বাচনেও কংগ্রেস শতকরা ৪০টা ভোট পেয়েছে—যা অন্য কোন একক দল কেন, সব দলের মিলিত ফ্রন্টের পাওয়া ভোটের চেয়ে বেশি। কাজেই সেই কংগ্রেসের সঙ্গে যদি বাংলা কংগ্রেস মিলিত হয়, তবে সেটা খুব সাধারণ ব্যাপার হবে না। কিন্তু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে রাখতে হলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু ডিকটেশন মেনে নিতে হয়, বেশ কিছু ভাল ছেলে হবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়—যা অনেক

[৩২৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ চৌদ্দ ॥

কথাটা জানা, কথাটা অনেক বার বলা ঃ কালটাই এই রকম। স্বরাজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল প্রবীর। সামনের রাস্তাটা ছোট, তবু এই পাড়ার সান্ধ্য ট্রাফিকের স্রোত বইছিল সব রকম শব্দ তুলে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ওধারের বাড়িটার দোতলা থেকে মধ্যে মধ্যে উঠে আসছিল পিয়ানোর সুর—আবার ভেসে যাচ্ছিল চলতি গাড়ি আর মানুষের কলরবের মধ্যে।

ঠিক, সময়টাই এই রকম। কলরবে, গর্জনে, শব্দের সংঘাতে সব সুরগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সাবিত্রীর কাছে সেদিন সে গিয়েছিল কয়েকটা কোমল আর মধুর মুহূর্তের সন্ধানে—একটা কথা বলতে চেয়েছিল, হয়তো বলাও যেত। কিন্তু দেখা দিল আনন্দ। তখন নিজেকে যেমন লোভী তেমনি নির্লজ্জ মনে হল তার। না, একথা সে কিছুতেই মানতে রাজী নয় যে, আনন্দরাই ঠিক পথ বেছে নিয়েছে, সারা ভারতবর্ষের ক্রুদ্ধ বিরোধী শক্তিগুলোকে এত সহজেই মোকাবেলা করা যাবে না, আরো অনেক এগিয়ে—অনেক ব্যাপ্ত হয়ে—অনেক মতকে সংহত করে তবেই চূড়ান্ত আঘাত হানা যাবে। কিন্তু সে তো তর্কের কথা। তার আগে এত বড়ো ত্যাগ, এমন সাহসকে শ্রদ্ধা করবে না—অন্তত অতখানি গোঁড়ামী প্রবীরের নেই। তাই আনন্দই সেদিন তার স্বার্থপর সন্ধ্যাটাকে বজ্র-বিদ্যুতে ভরে দিয়ে গেল।

কিন্তু স্বরাজ আর সুজাতা। সেসব দিনগুলোকে সে তো দেখেছে। আর নীলু। শিবপ্রসাদের দু'চোখে সেই অন্ধকার। খারাপ লাগছিল, খুব খারাপ লাগছিল তার।

প্রবীর বললে, 'স্বরাজদা, আর এক কাপ চা?'

স্বরাজ নড়ে উঠল। একটা হাতে মাথা রেখে টেবিলের ওপর যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল সে।

'অ্যাঁ, চা? হোক।'

চা বলে দিয়ে আবার কয়েক সেকেন্ড সময় নিল প্রবীর।

'স্বরাজদা, অকারণেই বাড়িয়ে তুলছ তুমি। এ নিছক মান-অভিমানের ব্যাপার। জাস্ট গো টু সুজাতা বৌদি, অ্যান্ড আই থিংক—'

বাঁ হাত নেড়ে বিরক্তিভরে কথাটা থামিয়ে দিলে স্বরাজ। বললে, 'কমিউনিস্ট পার্টির একটা স্টেজে কমরেড বাটলিওয়ালা আর তাঁর স্ত্রী নার্গিস বাটলিওয়ালার কথা মনে আছে তোর?'

'শুনেছি।'

'কেরালার টমাস আর—'

'এ-সবের কোনো মানে হয় না স্বরাজদা—' প্রবীর বিরক্ত হল ঃ 'তোমাদের ব্যাপার অত সিরিয়াস কিছু নয়। ইচ্ছে করলেই এগুলো মিটিয়ে ফেলতে পারো।'

'তার মানে, সুজাতাকে অ্যাকটিভ পলিটিকসে ছেড়ে দেব?'

'অত ভাবছ কেন? বৌদির শরীর আর আগের মতো নেই যে, এ-সব স্ট্রেন সে সহ্য করতে পারবে। তা ছাড়া এখন সংসারে জড়িয়ে পড়েছে, ওভাবে কাজকর্ম করতেও পারবে না। এক-আধটা মীটিঙে যদি যেতে চায়—যাক না।'

হঠাৎ স্বরাজের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'কেন যাবে মীটিঙে? কী হবে গিয়ে?'

'কী আশ্চর্য, তুমি—'

স্বরাজ বিস্বাদ গলায় বললে, 'থামো ভলু। কিসের পলিটিকস? কাদের জন্যে পলিটিকস? ভারতবর্ষের জন্যে? কিছু হবে না ভারতবর্ষের। যাই করো, যতই করো—শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে শোভিনিজম? কোন প্রভিন্সে অয়েল রিফাইনারী হবে কি হবে না তাই নিয়ে চলবে লাইন ওপড়ানো, স্টেশন জ্বালানো। লড়াই চলবে মহারাষ্ট্রে-মহীশূরে, অন্ধ্রে-তামিলনাড়ে, পাঞ্জাবে-হরিয়ানায়—দেখবে দু'দিন বাদে সারা দেশ জুড়ে চলবে খেয়োখেয়ি, বলকানাইজেশান। তার ওপরে ধর্ম আছে, নানা সেনা আছেন, গোরুরা রয়েছে, আর তার ওপর রয়েছে কয়েকশো পলিটিক্যাল পার্টি। আরো কিছুদিন যাক, ভেঙে পড়ুক সেন্টারের বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট, তখন অনিবার্য সিভিল ওয়ার এবং পাকাপাকি হয়ে বসবে ফ্যাসিজম। কিছু ভেবো না, তখন তোমাদের যত ঘোর লাল, মাঝারি লাল, ফিকে লাল,—সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মেশিনগান চালাবে। হিটলারের জার্মানী, মুসোলিনীর ইতালী কিংবা ফ্রাঙ্কোর স্পেন—দ্যাট ইজ ইয়োর ফিউচার। দেন থার্ড ওয়ার্লড ওয়ার—ব্যাস নিশ্চিন্ত।'

ও-পাশের টেবিলে তিন-চারটি ছেলে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিল, তারা উৎকর্ণ হল। একজন চাপা গলায় কী বলল, বাকী ছেলেরা হেসে উঠল একসঙ্গে।

স্বরাজ একবার উগ্র চোখে তাকালো সেদিকে, প্রবীর লক্ষ্যও করল না।

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল ঃ 'অকারণে তুমি পেসিমিস্ট হচ্ছ। ভিয়েৎনাম—'

'স্টপ দ্যাট। ভিয়েৎনাম—ভিয়েৎনাম। ওই এক নামই জপ করতে পারো তোমরা, কিন্তু ক্যান ইউ প্রোডিউস ওয়ান হো চি মিন, ওয়ান জেনারেল গিয়াপ? এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারো ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যাগ্রেশনের বিরুদ্ধে? পারো না, কোনো

[illegible] ধরবেন না। [illegible] স্ট্যাক ... কার্নার্ট—ইটস্ বাইন ইট ম্যাকেঞ্জি। এখানে প্রতি তিনজনে একটা করে পলিটিক্যাল পার্টি। প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টির কাজ হল অন্যকে ভিলিফাই করা—এর ওর মাথাভাঙা। আসল কথা কী জানো? ভারতবর্ষ কখনো বিপ্লব করে নি, যুদ্ধ করে নি, বাইরের আঘাতের মুখো-মুখী হয় নি। ইংরেজের ওপর অভিমান করে অহিংসার মাটির পাত্রে ভাত খেয়েছে, দু-চারটে ইংরেজ মেরে বোমা-বন্দুকের ফুলঝুরি ছুটিয়েছে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নাম করে কাজে যত এগিয়েছে, বিদ্রো করেছে তার চেয়েও বেশি। আর গোকুলে বাড়ছে ক্যাপিট্যালিস্ট বংশ, এক-একটা ফ্যামিলির ইনকাম দাঁড়াচ্ছে দৈনিক লাখ টাকা করে। শ্রমিক আন্দোলন, স্ট্রাইকের ভোঁতা অস্ত্রটা মারছে এখন নিজের কপালে, কৃষক কাঁঠাল খাচ্ছে। এক দোকা নকশালবাড়ী চ্যাপ্‌স—দে মেন্ট সাম বিজ্‌নেস। কিন্তু তারাও ওভারজেলাস্। ভারতবর্ষের গোবরগাদাকে ভাবছে বারুদের স্তূপ, সেখানে তারা এক্সপ্লোশন ঘটাবে! উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু তারাও
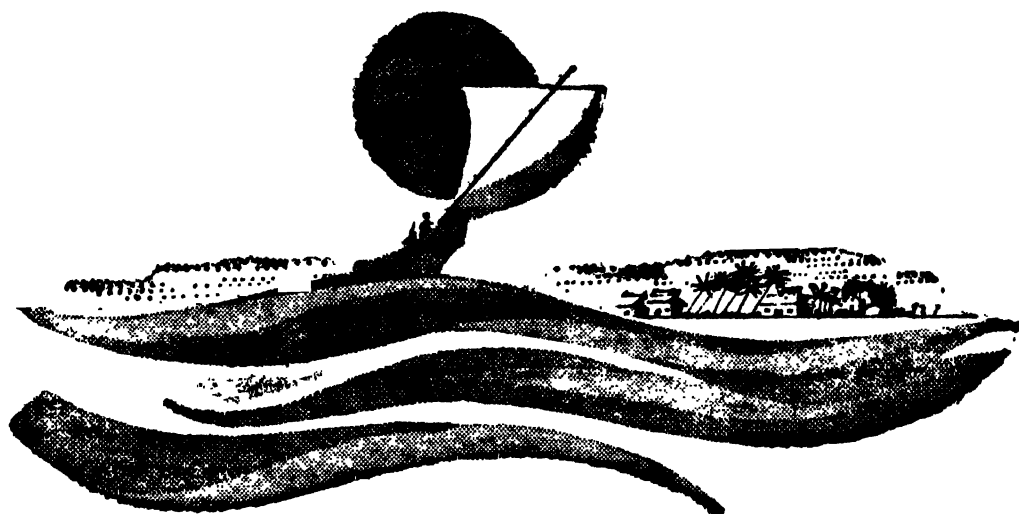
কটা দলে ভাগ হয়েছে হে? চারটে, পাঁচটা, ছটা?'

অন্য টেবিলের ছেলেরা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজা থেকে একটা মন্তব্য শোনা গেল: 'যত দলেই ভাগ হোক—গোবরগাদার গুবরে পোকাদের উড়িয়ে দেবে নিশ্চয়। বাদ যাবেন না দাদারা, ভয় নেই।' অর্থাৎ ওদের সহানুভূতি নকশাল-বাড়ীর দিকে।

ছেলেরা রাস্তায় নেমে গেল। বাঁকা একটা বিদ্রূপের হাসি দেখা ছিল স্বরাজের মুখে।

'ওই গুবরে পোকাই উড়িয়ে দিতে পারবে। ওই পর্যন্তই তোমাদের দৌড়।'

প্রবীর ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। নৈরাজ্যবাদ—মেন্টাল অ্যানার্কি। পার্টি ভাঙাভাঙির সূত্র ধরে স্বরাজ একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। এ এক ধরনের নার্ভাস ব্রেক ডাউন। তর্ক করা বৃথা, শুধু কথাই বাড়বে।

'স্বরাজদা, এ-সব থাক। কিন্তু তুমি সুজাতা বৌদির ব্যাপারে—'

চা দিয়েছিল একটু আগে, ফ্যানের হাওয়ায় ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণে যেন খেয়াল হল স্বরাজের। একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বললে 'হাঁ, সুজাতা। সেই জন্যেই আমি বলেছিলাম, সুজাতা, তোমার যা খুশি তা করতে পারো, তুমি যদি অ্যাকটিভিটি চাও বস্তিতে ছেলেদের বিনিপয়সায় পড়াতে পারো বাট ডোন্ট গো ইন টু পলিটিকস। ননসেন্স—শীয়ার ননসেন্স।'

'তা হলে দেশের জন্যে কিছু করবার নেই?'

'না—ইট্‌স ডুম্‌ড্‌।'

'ডুম্‌ড?'

'হাঁ। কংগ্রেসের একটা বুর্জোয়া চক্ষু-লজ্জা ছিল, লেফ্‌ট পলিটিকসের সে বালাইও নেই। বাড়ী গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও ভুলু, তোমাকে কিছু করতে হবে না, তোমাদের নেতারাই ভারতবর্ষকে ভারত মহাসাগরের কয়েক হাজার মীটার জলের তলায় ডুবিয়ে দেবে। নেতা - নেতা—নেতা! দোজ পেট্রিয়টস অ্যান্ড দেয়ার পলিটিকস! "It has been called patriotism to flatter those in power at the expense of the people—to mislead first and then betray—" কার লেখা বলতে পারো?'

'না, জানি না।'

'জেনেও দরকার নেই তোমাদের। লাভই বা কী? কিন্তু হাঁ—সুজাতা। আমি চাই না, সুজাতা রাজনীতি করে। আই হেট পলিটিকস, হেট ইয়োর পলিটিশানস, হেট ইয়োর বম্বার্ডিং স্লোগ্যানস। তাই সুজাতা যখন মিটিঙে যেতে চায়, হব্‌নবিং করতে চায় রাজনীতি নিয়ে, তখন আমার মাথার ভেতরে আগুন ছুটে যায়।'

চা খেতে গিয়ে প্রবীর দেখল সেটা কখন ঠান্ডা জল হয়ে গেছে। এক চুমুকেই তার সবটা গিলে ফেলল সে। অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে স্বরাজকে। মনে হচ্ছে, পাগল হয়ে যাবে। কেমন ভয় ধরে গেল তার।

'চলো, স্বরাজদা, উঠি।'

'চলো।'

দুজনে রাস্তায় নামল। সামনের বাড়িতে পিয়ানো বাজছে তখনো, কোনো জনপ্রিয় ইংরিজি ছবির সুর। কিন্তু সুরটা ফুটতে পারছে না সম্পূর্ণ—চারদিকের কোলাহলে হারিয়ে যেতে চাইছে। কালটাই এই রকম। সব সুর এখন হারিয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণির ভেতরে।

রাস্তায় হাওয়া। সারাদিনের গুমোটের পর উতরোল হয়ে এসেছে দক্ষিণ সাগরের উদারতা। একটা পানের দোকানে রেডিয়ো বাজছে। সন্ধ্যার খবর।

'দুই দল সমর্থকের সংঘর্ষের ফলে তিন-জন প্রাণ হারিয়েছে সাতজন আহত হয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদে আরো জানা যায় যে, কয়েকটি বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়—'

একবারের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল স্বরাজ: শুনলি? এই হচ্ছে বামপন্থী ঐক্যের চেহারা। লীডারশিপ!'—আবার ঠোঁটে বাঁকা বিদ্রূপের হাসি ফুটল: 'তুই এখনো খুব অপটিমিস্ট—তাই না?'

চব্বিশ পরগনার কোন দূর গ্রাম থেকে আগুনের হলকা এসে দক্ষিণ বাতাসের শীতলতাকে গ্রাস করল। প্রবীর চুপ করে রইল একটু।

'এর পরেও রাজনীতিতে উৎসাহ থাকে তোর?'

'অনেক ভুলের মধ্য দিয়েই পথ তৈরি হয়।'

'কাপবুক আউড়ে কোনো লাভ নেই ভুলু, ইউ নো হোয়াট ইজ হোয়াট। এই পলিটিকসে আমি সুজাতাকে যেতে দেব? তার চেয়ে সে রোজ হিন্দী ফিলম দেখুক, আমি আপত্তি করব না।'

'কিন্তু স্বরাজদা, রাজনীতির ভেতর দিয়েই তোমরা একসঙ্গে মিলেছিলে।'

'আজ রাজনীতির মর্যাদা মিটিয়েই আমরা মিলে থাকতে চাই। কিন্তু দেয়ার ইজ দা বোন অব কনটেনশান। সুজাতা এখনো নেতাদের বিশ্বাস করে, তাদের বাণী তার কাছে বেদবাক্য! সে বলে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি একটা টোটাল ফ্রাস্ট্রেশান। অবস্থাটা কী জানিস? আমরা যেন দুটো ধর্মের মানুষ, ঘোর কমানাল, চব্বিশ ঘণ্টা এ ওর বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছি। এ চলতে পারে না, কিছুতেই চলতে পারে না ভুলু। চলে যাক সুজাতা, ওর নেতাদের বাণী শুনে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখুক, শান্তিকী বোমাবাজীতে খুন হয়ে যাক। আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি একা থাকব, সুখেই থাকব।'

'আর নীলু?'

'এখন কাঁদবে। আর একটু বড়ো হলে মাকে ভুলে যাবে। অনেক ছেলেরই তো অল্প বয়সে মা হারিয়ে যায়।'

'তুমি কী বীভৎসভাবে নিষ্ঠুর হয়ে গেছ স্বরাজদা।'

'নিষ্ঠুর হই নি—' নিষ্ঠুরভাবে স্বরাজ বললে, 'চলে গিয়ে ও-ও বেঁচেছে, আমিও বেঁচেছি। আর কিছুদিন এ-ভাবে দুজনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চললে আমি পাগল হয়ে যেতুম।'

পাগল হতে আর বাকী কতখানি—প্রবীর ভাবল। সেই স্বরাজদা। ছাত্রনেতা। মিছিলের আগে আগে। বক্তৃতা দিচ্ছে এক হাতে মাইক চেপে ধরে, আর এক হাত মুঠো করে পাকিয়ে—সেই রুদ্ধ মুষ্ঠিতে বজ্রের শপথ।

'কমরেড্‌স, এই চ্যালেঞ্জের মোকা-বেলা আমাদের করতে হবে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি, টেনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দেব প্রতিক্রিয়াশীল-দের মুখোসগুলো। ধনতন্ত্র আর জঙ্গী-বাদকে চিরকালের মতো কবর দেব মাটির তলায়। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ। ইনকিলাব—'

'জিন্দাবাদ——' ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টি-টুট কাঁপিয়ে প্রলয়রোল।

'তুমি সুজাতা বৌদির কাছে যাবে না?'

'না।'

'কিন্তু জ্যাঠামশাই, জ্যেঠিমা—'

'বাবা সারাজীবন অনেক দুঃখ সয়েছেন, তাঁর আরো সইবে। মা বাবার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, এ ভারও তিনি বইতে পারবেন। এ-সব ছেড়ে দে ভুলু।'—স্বরাজ একটু হাসল: 'এর চাইতে দেশে এখনো ইংরেজ রাজত্ব থাকলে অনেক ভালো হত—না রে? আমরা সবাই মিলে গলা ছেড়ে অন্তত সেই সাধারণ শত্রুকে গাল দিতে পারতম, নিজেদের মধ্যে এ-ভাবে খেয়ো-খেয়ি হত না।'

প্রবীর নিশ্বাস ফেলল: 'জানি না।'

তার মন অন্য কথা ভাবছিল। সাবিত্রী আর সুজাতা বৌদি একই কলেজের ছাত্রী ছিল না এক সময়? সাবিত্রী সায়ান্সে, সুজাতা আর্টসে। বোধহয় বছরখানেকের সিনিয়র ছিল সুজাতা। একসঙ্গে কলেজে

হিউমিলিয়েশনও করত। সাবিত্রী একটু আলগোছে ভাবে ছিল, তাই মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে কলেজে চাকরি নিলে, আর সুজাতা—একবার সাবিত্রীকে বলা যায় সুজাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে? বলা যায়?

হঠাৎ স্বরাজের গলা যেন অনেক দূরে থেকে ভেসে এল তার কাছে।

'ওই সামনের বাসটা ধরতে হবে তুলু। এখন আর কথা নয়—বাড়ি ফেরা দরকার।'

'তুমি যাও স্বরাজদা। আমার একটা কাজ আছে।'

'এখন আবার কী কাজ?'

'আছে একটু। তুমি এগোও।'

স্বরাজ আর দাঁড়ালো না। বাস ধরবার জন্যে দৌড়ে এগিয়ে গেল।

সাবিত্রীকে বলা যাক। আজ—এই রাত্রেই। বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা হোক, ক্ষতি নেই। সে টুলু নয়—মা তার জন্যে ভাববেন না।

তার ভয়ঙ্কর বিশ্রী লাগছে। সাবিত্রীর সঙ্গে একবার দেখা না হলে আজ রাত্রে তার ঘুম আসবে না।

[ক্রমশ]

॥ নয় ॥

সুপরিকল্পিত নরমেধ যজ্ঞের আগুনে যখন খুলনা জেলা জ্বলছিল, সবুর খাঁর বাড়িতে তখন বিয়ের বাদ্য বাজছে! আজও বেশ মনে পড়ে যে, শহরের কিছু প্রগতিশীল ছাত্র বার বার খাঁ সাহাবের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিল, তাকে অনুরোধ করেছিল পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীকে ডেকে আনার জন্য। কিন্তু তার ঐ একই উত্তর, একই কৈফিয়ৎ—"যাইতে পারুম না, বাসায় বিয়া।" আসলে ধর্মান্ধ মোল্লা এবং পেশাদার গুন্ডাদের হাতে সাম্প্রদায়িকতার রামদা ধরিয়ে দিয়ে সবুর খাঁ মেতে উঠেছিল ভাইঝির বিয়ের উৎসবে। হতভাগ্য সংখ্যালঘুরা যদি মরে মরুক না, তার কি? তার মালিকের নির্দেশই ছিল পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমানর জন্যে যে কোনও তুচ্ছ অজুহাতে হিন্দু বিতাড়ন। সে অতি বিশ্বস্ত, পুরাতন গৃহভৃত্যের মত এই নির্দেশ পালন করেছিল। দাঙ্গা শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই সবুর ও তার অনুচররা বিনে পয়সায় শত শত লিফলেট বিলি করতে থাকে। প্রতিটি লিফলেটের একই কথা—হিন্দুরা কাফের, তারা ইসলামের শত্রু, তারা পাকিস্তানের শত্রু, তারা বেইমান, তাদের উচিত শিক্ষা দাও, ইত্যাদি। গ্রামপালে সবুর খাঁ যখন বক্তৃতা করে এবং লিফলেট ছড়ায় তখন ঘটনাচক্রে আমি সেখানে ছিলাম। বিভিন্ন সভায় পরিবেশিত খাঁ সাহাবের বচনামৃতের স্মৃতি এখনও মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায় নি, কোনদিন যাবেও না বোধহয়, কেন না তার মধ্যে একটা অকল্পনীয় বীভৎসতা, একটা অসীম তিক্ততা ছিল। কোন সুস্থমস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে, কোনও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পক্ষে প্রকাশ্যে হাজার হাজার শ্রোতার সামনে দাঁড়িয়ে এইরকম কথা বলা সম্ভব কি না তা নিজে না শুনলে বিশ্বাস করতাম না। মুসলমান সবুর খাঁ কম করেও তিনটি সভার আয়োজন করেছিল। সে যখন মাইকের কাছে মুখ নিয়ে দুই হাত ছুড়ে বক্তৃতা করত তখন মনে হোত যেন সাম্প্রদায়িকতার বিসুভিয়াস অগ্ন্যুদ্গার করছে। এক জায়গায় সে যা বলেছিল তা অজও মনে আছে—"আপনেরা মনে রাইখেন, আমার এমন তাকত আছে যে, আমি একটা পাতের হুকুম পাতায়ে দিয়া আর আল্লা বলাইতে পারি, কাজেই হিন্দুরা কোন্ ছার!" সন্দেহ নেই যে, এইরকম উক্তিতে উৎসাহিত হোয়ে ধর্মান্ধ মোল্লা এবং সুবিধাবাদী মুসলমানরা তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ক্ষেপিয়ে উঠেছিল। খুলনার শিল্পাঞ্চল দৌলতপুরের দাঙ্গা ঠিক এইভাবেই শুরু হয়। তেসরা জানুয়ারী সবুর খাঁ সেখানে ভাষণ দিল; ফল পাওয়া গেল হাতে হাতেই, কারণ সভা শেষ হোতে না হোতেই প্রায় কুড়ি হাজার শ্রমিক লাঠি, সড়কি, রামদা, ছুরি, পেট্রোল এবং মশাল সহ দৌলতপুরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং অসহায় হিন্দুদের ধাওয়া করে খুলনা শহরে নিয়ে ঢুকল। পথে পথে পড়ে রইল তাদের চিহ্নচিহ্ন অর্থাৎ অগণিত মৃতদেহ! ভাইঝির বিয়ে এবং খুলনার দাঙ্গা, এই দুই ঘটনার মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। প্রথমত "বিয়েতে ব্যস্ত" এই অজুহাতে সবুর খাঁ দাঙ্গা থামানোর দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয়ত, "বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছে" এইরকম দোহাই পেড়ে সবুরের কুকর্মের নিত্যসঙ্গী এবং পরামর্শদাতা মোনেম খাঁ সদলবলে খুলনার হাজির হোয়ে দাঙ্গাবাজদের উস্কানী দিয়েছিল ও তাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দাঙ্গার উদ্যোক্তা ছিল মোনেম খাঁ। তেরোই জানুয়ারী রাত তিনটের সময় আদমজী জুট মিলের হিন্দু শ্রমিক নিধনের মধ্য দিয়ে ঢাকা জেলার দাঙ্গার প্রকৃত সূত্রপাত হয়। জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার এ· করিমকে মোনেম খাঁ আগে থেকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছিল। করিম সাহাব তের তারিখে মিলের ফটক বন্ধ করে রাখল। লোকে জানল যে, আজ মিল বন্ধ, ঘষে লোহার ডান্ডা, রামদা, ছোরা ইত্যাদি বানাচ্ছে এবং এই অস্ত্রগুলি সেখান থেকে খুব গোপনে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে! রাত তিনটের সময় প্রায় পনের হাজার শ্রমিক রাস্তায় নেমে পড়ল, ইতিমধ্যে ঠিক মাঝরাতে তারা শিমুলপাড়ায় হাঙ্গামা করে গেছে। এইবার তারা আক্রমণ করল ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিক বস্তি, পাঁচশ'রও বেশি হিন্দু মেয়ে-পুরুষ নিহত হোল। এই বিশেষ সংকাজটি যাতে সুসম্পন্ন হয় তার জন্য মোনেমের নির্দেশে সিদ্ধিগঞ্জ থানার বি· ডি· চেয়ারম্যান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনমত "জেহাদ" পরিচালনা করছিলেন। ভোরবেলা দাঙ্গাকারীরা লক্ষ্মীনারায়ণ মিল আক্রমণ করল। কেবল যে মানুষ মরল তা নয়, মিলের যন্ত্রপাতিও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এইখান থেকে দাঙ্গাকারীরা রওনা হোল গ্রামাঞ্চলে, পথে লতিফ এবং বাওয়ানী জুট মিলের শ্রমিকরাও যোগ দিল। তারপর এই সম্মিলিত বিরাট বাহিনী "ওয়াপদা"র লঞ্চে শীতলক্ষ্যা পাড়ি দিয়ে অপর পারে উঠল। মোমিন কোম্পানীর বাটখানি বাস তৈরি ছিল,—এই বাস-গুলিতে চেপে তারা বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এত তাড়াতাড়ি বাস পাওয়ার মূলে ছিল মোনেম খাঁ। মোমিন কোম্পানীর সে ছিল একজন অন্যতম শেয়ারহোল্ডার এবং এই বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে সে সময়মত দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করেছিল!

খুলনার দাঙ্গার লুঠের সিংহভাগ নিয়েছিল সবুর খাঁ, বাকীটা ভাগ হয়ে গিয়েছিল কনভেনশন লীগের ফান্ড আর দাঙ্গাকারীদের মধ্যে। আয়ুবের মুষ্টি, সযত্নে লালিত কনভেনশন লীগ এইভাবে অসংখ্য মানুষের যথাসর্বস্ব গিলে অজগরের মত ফুলে ফেঁপে উঠছিল। অবশ্য এই কথাও ঠিক যে, এই অজগর পার্টির দৈনিক খোরাকীর একটা বড় অংশ তার দুই জ্যাঠামশাই মার্কিন ও রুশ সরকার নিয়মিত সরবরাহ করত! খুলনায় সবুরের যাবতীয় সম্পত্তি এবং কনভেনশন লীগের ফান্ড কিন্তু মূলত দাঙ্গার মাধ্যমে সংগৃহীত হোয়েছিল এবং আজও তাই হোচ্ছে। আপনারা সম্ভবত শুনেছেন যে, ইয়াহিয়া সরকার এই মাসের এগার তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এক বিশেষ সামরিক আইন জেরে কনভেনশন লীগের ফান্ড বাজেয়াপ্ত করেছে' ফান্ডের পরিমাণটা জানলে আপনাদের দেশের যে কোনও রাজনৈতিক দল (কংগ্রেস বাদে) মাথায়

হাত দিয়ে বসবে, পরিমাণটা হোল একশ' পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা! যে দেশের মানুষ খিদের জ্বালায় রাস্তার কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট ভাগ করে খায়, পথে-ঘাটে মরে পড়ে থাকে, সেই দেশেরই একটি রাজনৈতিক দল একশ' পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা গিলে বসে আছে! এই টাকাটা এতদিন কুখ্যাত কনভেনশন লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী বা ক কা চৌধুরীর কাছে ছিল। ছয় মাস আগে আয়ুব খাঁ কনভেনশন লীগের সমস্ত দায়িত্ব এবং সেই সঙ্গে পার্টি ফান্ড কাদের সাহেবের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর কাদের সাহেব ফান্ডের পরশপাথরের ছোঁয়ায় শুক্ল-পক্ষের চাঁদের মত দিনে দিনে গোলগাল হয়ে উঠছিল। যাই হোক, ইয়াহিয়ার প্যাচে নাজেহাল হয়ে খুলনার কনভেনশন নেতা সবুর টাকা যোগাড় করার সেই পুরনো কায়দাটাই বেছে নিয়েছে, অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের পাই-পয়সাটি পর্যন্ত কুড়িয়ে নিচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনে সবুরের প্রচুর টাকার প্রয়োজন, কেন না এই জেলায় আওয়ামী লীগ ও ভাসানীপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী। ফলে এদের হটিয়ে না ভাগিয়ে ভোট বাগাতে হোলে প্রচুর টাকা ছড়াতে হবে। এই টাকাটা নিশ্চয়ই সবুর তার ট্যাক থেকে দেবে না, টাকাটা সে সংগ্রহ করবে হিন্দুদের কাছ থেকে বিভিন্ন কায়দায়, কখনও ভড়কি দিয়ে, কখনও বা মারধোর করে। তবে সরাসরি দাঙ্গার মধ্যে তার দল বা জামাতীরা কেউই যাচ্ছে না আর ঠিক এই জন্যই মনে হচ্ছে যে, এই ব্যাপারে রাওয়ালপিন্ডির অদৃশ্য হাত আছে, কেন না দাঙ্গা না করেও যদি হিন্দুদের তাড়ানো যায় তা' হোলে ইয়াহিয়ার অনেক লাভ। জনসংখ্যায় কমে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা দুর্বল হোয়ে পড়বে, অথচ কারো কাছে খাঁ বাহাদুরকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমাদের স্থির বিশ্বাস, ঠিক এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে এইবার দাঙ্গা হোচ্ছে না, অথচ দাঙ্গার যাবতীয় সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সংখ্যালঘুরা জলের দরে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে। সরকার আর ইসলামী দলগুলি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত এই সম্পত্তির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। তবে একটা চরম সত্য, এইসব কুচক্রীদের জেনে রাখা দরকার, তা হোল এই যে, জোর করে লোক-সংখ্যা কমালেও পূর্ব পাকিস্তানীরা দুর্বল হবে না। তাদের কলজে নিরেট লোহার তৈরি, সেখানে কোনও দুর্বলতা ঢুকতে পারে না। তাদের বাঁচার অধিকার তারা কেড়ে নেবেই, কারও ক্ষমতা নেই এই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে।

মাঝে মাঝে কনভেনশন লীগের কাজকর্ম আমাদের হাসির খোরাক জোটাত। আয়ুব খাঁ যেবার তাঁর বহুল বিজ্ঞাপিত বই "ফ্রেন্ডস নট মাস্টার" লিখলেন, সেবার একটি বিশেষ মজার ব্যাপার ঘটল। বইটি প্রথমে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাজারে বার হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে নির্দেশ এল যে, প্রত্যেক "বি· ডি·"কে এক কপি করে এই বই কিনতে হবে, আদেশ পালিত না হোলে প্রেসিডেন্ট সাহাব ক্ষুব্ধ হবেন। তা ছাড়া মূর্খ বি· ডি·-দের বোঝান হোল (বি· ডি·-দের অধিকাংশ তাই ছিল) যে, বইটির নাম "প্রভু নয়, বন্ধু।" অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাদের মালিক নন, তাদের পেয়ারের দোস্ত। বি· ডি'রা এতেই কৃতার্থ হয়ে গেল। আসলে সরকারী কর্মচারীরা তাদের কাছে একটা বিরাট ধাপ্পা ঝেড়েছিল। কেন না "ফ্রেন্ডস্ নট মাস্টার" নামের নিচে এই কথাগুলি লেখা ছিল যে, অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত দেশগুলি সাহায্য করবে, বন্ধুর মত দেখবে কিন্তু প্রভুত্ব করতে চাইবে না।

অর্থাৎ আয়ুব খাঁ মার্কিন আর রুশ দাদাদের কাছ থেকে ভিখ মেগে এনে তাদেরই সগোত্র হোতে চাইছিলেন! বি· ডি'রা অতশত বুঝল না, বোঝার জন্য তাদের কোনও মাথা-ব্যথাও ছিল না। তারা শুধু জেনেছিল যে, বইটি তাদের কিনতেই হবে এবং তাদের মালিক বলেছেন যে, তারা তাঁর খাটালের কেনা গরু নয়, বিশ্বস্ত বন্ধু। অতএব ঢাকা শহরের বই-পাড়ায় বি· ডিদের লাইন পড়ল। সে এক দৃশ্য! শত শত বি· ডি· ঘণ্টার পর ঘণ্টা চড়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে এক-খানি বই-এর আশায় হাঁ করে আছে। তারপর যখন বইটি হাতে পেল তখন অনেকেই সেটা উল্টো করে ধরল! কি আর করবে, পড়তে পারলে তো? মহা সমস্যা, যদিও বা বই মিলল তার উল্টো-সোজা বোঝা যাচ্ছে না! এদিকে চট করে কাউকে বলাও যায় না কিছু, তা' হোলে লোকে বলবে কি? "আমরা হোলাম সম্মানিত বি· ডি·, আমরা একটা বই কিনে তার উল্টো-সোজাই বুঝতে পারি না, তা' পড়ব কি করে?" যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বি· ডি· সাহাবরা সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে উল্টো-সোজার রহস্যটা জেনে নিয়েছিল। তবে নামটা উচ্চারণ করতে অনেকেরই খুব কষ্ট হোল, ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই "ফ্রেন্ডস্ নট মাস্টার" বহু "বি· ডি"-র কাছে "ফেন্ না মাঠা"য় পরিণত হোল। সে সময় যে কোনও "বি· ডি"র বাড়িতে গেলেই সে বা ছেলে-মেয়েরা অতিথিকে খুব গর্বের সঙ্গে তাদের "ফেন্ না মাঠা"র কপিখানি দেখাতো, অনেকে আবার এমন জায়গাতে বইটা রাখত যাতে কেউ বাড়িতে এলেই প্রথমে ওটা তার চোখে পড়ে।

গত আন্দোলনের সময় পল্টন ময়দানে সংগ্রামী ছাত্ররা আয়ুবের বই পোড়াবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বই ফেরত দেওয়ার জন্য বি· ডিদের তিন দিন সময় দেওয়া হয়। লিখতে গেলে হাসি পাচ্ছে যে, বি· ডি·-রা যত তাড়া-তাড়ি বইটা কিনেছিল, ঠিক তত তাড়া-তাড়ি ফেরত দিয়ে গেল। ঢাকার সদরঘাটে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতি-শোধের আগুন জ্বলছিল। বি· ডি-রা দলে দলে এসে সেই আগুনে তাদের বই আর প্রিয় প্রেসিডেন্টের ছবি বিসর্জন দিল।

॥ সপ্তাহের বোঝা ॥

[৩২৮৫ পৃষ্ঠার পর]

বামপন্থী দলের পক্ষ থেকেই দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীঅজয় মুখার্জীও আট পার্টির ফ্রন্টের এই মানসিক অবস্থার কথা জানেন, তাই তিনি এখন ডিক্টেট করতে চাইছেন। হয় ডিকটেশন মেনে নাও, নইলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়বো—যে ফ্রন্টে পি এস পি, এস এস পি, সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও কাজেম আলি মির্জার সংখ্যালঘু দল সহ অনেকে থাকবে। নবকংগ্রেসকে না ডাকলেও তারা সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে। কাজেই আট পার্টির ফ্রন্টের সামনে বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার আওয়াজ হ'ল শেষ প্লেট। এই প্লেট মেনে নিয়ে বাংলা কংগ্রেসকে বুকে নেওয়া সম্ভব নয়, আবার ছেড়ে দিয়ে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। আবার বাংলা কংগ্রেসও জানে লেবু বেশি কচলালে তেতো হয়—ভয় তাদের দিকেও আছে। আবার ছয় পার্টির ফ্রন্ট একইভাবে ডাকছে ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি'কে, কিন্তু কারো পক্ষেই আজ আর সহজে ঘর বাঁধতে এগিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই সকলেরই বুকের কান্না গানে রূপ নিচ্ছে 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়।'

আলো সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে যে সুন্দরী এ কথা তার আয়না এবং সোমেশ ছাড়াও আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই একবাক্যে বলে। তাই একটি অপরূপা মেয়ে যতগুলি অবাঞ্ছিত প্রেম-নিবেদন ও প্রেমপত্র পায় আলোর ভাগ্যে এ পর্যন্ত তার চেয়ে কিছু বেশিই জুটেছে। আর সে যে বুদ্ধিমতী, সেটা সে এম-এ পড়ে বলেই বলছি না—পৃথিবীতে কটা এম-এ পাশ আর বুদ্ধিমান হয়! সেটা প্রমাণিত হয় আজ সে যেভাবে সোমেশের বাড়ি যাবার অনুমতি লাভ করল মা'র কাছ থেকে তাই থেকে। ক'দিন আগে সোমেশ বলেছিল, 'অনেকদিন তোমাকে দেখিনি আমাদের বাড়িতে, আমার ঘরে—রবিবার সন্ধ্যেবেলা একবার আসবে?' আলো কিছু চিন্তা না করেই বলেছিল, 'যাব।' পরে সে ভাবতে বসল, মা'র কাছে কিভাবে বললে ব্যাপারটা শোভনীয় হয়। কারণ সোমেশ-দের বাড়ি সে আগে কখনো একা যায় নি, সোমেশদের বাড়ি আলোর সম-বয়সী কোনো মেয়ে নেই, সোমেশের বই-এর আলমারিতে আলোর পাঠ্য-পুস্তক নেই, কাজেই......হঠাৎ আজ তার মনে পড়ল সোমেশ সেদিন বলেছিল তার মা'র ক'দিন ধরে জ্বর হচ্ছে। আলো অমনি মা'র কাছে গিয়ে কথায়-কথায় সোমেশের মা'র অসুখের কথাটা জানিয়ে দিল—একটু বাড়িয়েই বলল। তার মা বললেন, 'আহা, একদিন দেখে আয় না তুই—আমি তো বাতের জন্যে নড়তে পারি না যে বন্ধুকে একদিন দেখতে যাব।' আলো বলল, 'আচ্ছা, যাব এখন একদিন...দেখি আজই যেতে পারি সন্ধ্যেবেলা যদি সময় হয়।' 'ওঃ কি আমার কাজের মেয়ে! কুঁড়েমি হচ্ছে তাই বল্'। 'তুমি আমায় কুঁড়ে বললে! বেশ দেখো, আজ আমি ঠিক যাব সন্ধ্যেবেলা।'

যাবার পথ প্রশস্ত হলো কিন্তু আলো তক্ষুণি ঠিক করতে পারল না সে যাবে কি না। এ তো আর যার-তার বাড়ি যাওয়া নয়—সোমেশের বাড়ি যাওয়া, যে সোমেশ তাকে ভালোবাসে, যে সোমেশকে সে ভালোবাসে। অতএব অকারণ সব চাঞ্চল্যে মন তার যাওয়া-না-যাওয়ার মধ্যে দুলতে লাগল। কেমন একটা সুগভীর আনন্দ তার ইচ্ছায় একটা আচ্ছন্নতা এনে দিল। বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্রাবণের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে সে ঠিক করল সে যাবে না, কারণ হয়তো বৃষ্টি হতে পারে। তবু ঘড়ির দিকে তাকাতেও সে ভুলল না, মোটামুটি তৈরি হতেও তার দেরি হলো না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল,

বৃষ্টি নামছে না দেখে খুব রাগ হলো তার, ঘরে এসে একটা বই নিয়ে চুপ করে বসে রইল খাটের ওপর। মা এসে বললেন, 'কি রে, গেলি না!' আলো মা'র দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তার-পর আবার বই-এ চোখ রাখল। হঠাৎ তার কানে এলো বৃষ্টির ঝিরঝির আওয়াজ। সে দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখল, বৃষ্টি পড়ছে। আঃ, কি স্বস্তি... আর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—বৃষ্টি পড়ছে সেটা তো আর আমার দোষ নয়! মা এসে দাঁড়ালেন তার পাশে, বললেন, 'ছাট আসছে যে—দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে গিয়ে বোস্'। আলো তাই করল। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ, তার বই-এর পাতা জুড়ে সোমেশের অপেক্ষ-মাণ মুখ, তার উৎসুক চোখ। বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল আলোর। ক' মিনিট পরে বৃষ্টি গেল থেমে, ছাতা হাতে আলো নামল নিচে। 'এ কি, কোথায় চললি এই বৃষ্টিতে!' আলো জবাবটা ভেবেই রেখেছিল : 'মা, তুমি যে আমাকে কুঁড়ে বললে সেটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।' 'দেখ কাণ্ড পাগলের—শেষে একজন রোগীকে

জ্বালাতে গিয়ে তুই নিজের অসুখ বাধাবি!' 'বৃষ্টি পড়ছে না মা, তাছাড়া ছাতা আছে—কতটুকুই বা রাস্তা! আমি একটু পরেই ফিরে আসব।' 'সোমেশকে বলিস পৌঁছে দেয় যেন।' আলো বলল, 'আচ্ছা'; মনে মনে বলল, বলবার দরকার হবে না।

আলোর বাড়ি থেকে সোমেশদের বাড়ি হেঁটে যেতে মিনিট দশেক সময় লাগে—বাসের সুবিধে নেই। সে এই গর্তভরা কাদামাখানো পিছল রাস্তায় সন্তর্পণে হাঁটতে থাকুক—আমরা ইতি-মধ্যে আলো ও সোমেশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নিই। একটা মস্ত-বড়ো কথা এখনো বলা হয় নি—সোমেশ যে শুধু আলোকে ভালো-বাসিয়েছে তাই নয়, সে আলোকে ভাবতে শিখিয়েছে। মাঝে মাঝে এমন লোকের সংস্পর্শে আমরা আসি যাদের আচার-ব্যবহার, চেহারা সবই সাধারণ, হয়তো দশটা-পাঁচটা আপিস করে, খেলার মাঠে গিয়ে গোল হলে আনন্দে হাততালি দেয়, গল্পগুজব, তাস-আড্ডা, গান-বাজনা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ছুটির সকাল কাটায় কিন্তু আসলে তারা চোরাবালি—একবার যদি হাত ধরে তারা তেমন করে তোমায় টেনে নেয় তাহলে তাদের বুকের গভীরে গিয়ে দেখবে ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছ—এত গভীর তাদের অন্তর, এত দার্শনিক তাদের গুপ্ত চিন্তাগুলি—রবীন্দ্রনাথের গানের মতো তাদের কথাগুলি বুকের ভেতরের এমন এক বন্ধ ঘর খুলে দেয় যেখানে ঢুকে আবার বাইরে এসে পৃথিবীটাকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হয়। সোমেশ হচ্ছে সেই জাতের ছেলে। এমনিতে সে সাধারণ, চাকরি করে, বাবা-মা'র বাধ্য, ছোট ভাইটিকে ভালোবাসে, বন্ধু-বান্ধব আছে—একটি প্রেমিকাও রয়েছে। কিন্তু একটু নির্জনে তার সঙ্গে দুটো কথা বললেই মনে হয় সে যেন অন্য মানুষ, যে গভীরভাবে ভাবতে জানে, ভাবাতে জানে। তবে সোমেশ একেবারে সাধারণের মতো জীবনযাপন করতে চায় না, সে চায় লেখক হতে—গল্প লিখবে, খাঁটি লিখবে, মহৎ লিখবে এই তার জীবনের একটা গোপন বাসনা; নিজেকে সে তার জন্যে গড়ে তুলতে সর্বদাই ইচ্ছুক। আলোর সঙ্গে তার পরিচয় ছেলেবেলা থেকে; যৌবনের শুরুতেই সেই পরিচয় গাঢ় হয়ে প্রেমে পরিণতি লাভ করেছে। আলোকে সে বিয়ে করতে চেয়েছে, আলো সম্মতি দিয়েছে। ব্যাপারটা এখনো দু-বাড়ির কেউ জানে না—জানলে খুশিই হবে। আলোর কাছে সে ব্যক্ত করেছে নিজের মনের গোপনতম বাসনা। আলো বলেছে, 'তুমি দেখো, আমি বলছি

একদিন না একদিন তুমি প্রতিষ্ঠা পাবে। গভীর কথা, নতুন কথা লোকে চট্ করে বোঝে না—বুঝলে আর ভুলতে পারে না। আমি তো প্রথমে তোমায় বুঝি নি, যখন বুঝলাম...' বলে লজ্জায় সে মাথা নিচু করেছে। তবু সোমেশের দ্বিধা কাটে নি, সে বলে, 'কিই-বা আমি জানি! আমার মধ্যে গভীরতা আছে, প্রসারতা নেই, তীক্ষ্ণতা নেই। নিতান্তই সাধারণ জীবন আমার, ভয় হয় অকেজো থেকে থেকে আমার গভীরতাটাও একদিন ভরাট হয়ে যাবে—আমি সত্যিই সাধারণ হয়ে যাব।' আলো বলেছে, 'আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি না?' সোমেশ বলেছে, 'তুমি? কেমন করে?'......এর মানে এই নয় যে, তারা সব সময় এই সবই আলোচনা করে; তারা সিনেমায় যায়, পার্কে বেড়ায়, একবার কলেজ ও আপিস কামাই করে বর্ধমান অবধি ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশে বেড়িয়েও এসেছিল। কিন্তু যে দোলা সোমেশ লাগিয়েছে আলোর মনে তা সাধারণ প্রেমিক দিতে পারে না সাধারণ প্রেমিকাকে। সোমেশের সান্নিধ্যে এলে হয় মেয়ে তক্ষুণি পালাবে আর নয় চিরদিনের মতো থাকবার জন্যে ব্যাকুল হবে। আলো থেকে গেছে, বাড়ির নির্জন পরিবেশে চিন্তার সমুদ্রে অবগাহন করতে করতে একসময় ভেসে গেছে, ডুবে গেছে।

ইতিমধ্যে আলো অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। আকাশে দু-একটা তারা দেখা দিয়েছে, আর একটু পরেই তার চোখের সামনে দেখা দেবে সোমেশের বাড়ি—তবু একটা ছোট্ট ঘটনা বলে নেবার মতো সময় এখনো আছে। আলো সেদিন খুব কেঁদেছিল সোমেশের কাছে। বি-এ পরীক্ষার পলিটিক্যাল সায়েন্সের পেপারের দিন তার হাত থেকে জোর করে আনসার পেপার কেড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বাইরে থেকে ঢুকে পড়া কয়েকজন দুর্বৃত্ত। আলো বলেছিল, 'আমায় যদি ফেল করিয়ে দেয়! আমি তো পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলাম—যদি পাশ না করি!' সোমেশ বলেছিল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। হয় আবার পরীক্ষা হবে, নয় অন্য কোনো ব্যবস্থা হবে।' 'যদি না হয়—যদি কিছুই না হয়—যদি ফেল হই! তুমি, বাবা-মা সবাই আমায় ক্ষমা করবে তো!' আলো আবার কেঁদে উঠেছিল। সোমেশ ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'এইতেই এত উতলা হচ্ছ! জীবনে এমন অত্যাচার-অবিচার কত সহ্য করতে হবে তা জানো! জীবনটা কি ছেলেখেলা নাকি?' 'আমি পারব না সহ্য করতে?' সোমেশ হেসে পূর্ণ হবে—তোমার ধূপ না পোড়ালে কি গন্ধ দেবে তুমি, তোমার দীপ না জ্বালালে কি আলো দেখাবে তুমি! দুঃখ পেলে মানুষ পবিত্র হয়, শক্তিশালী হয়—তারপর এক সময় রুখে দাঁড়ায় সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে।' সেদিন আলো কিছু বলে নি সোমেশকে, পরে বলেছিল, 'খুব যে বোঝালে আমায় সেদিন—নিজের হলে কেমন হতো দেখতাম! তুমি আর দুঃখ পেলে কোথায় যে, সহ্য করবার প্রশ্ন আসবে!' সোমেশ বলেছিল, 'তা ঠিক। আমার এ এক অদ্ভুত অবস্থা। আমার সুখগুলো, এমন কি তোমাকে নিয়েও যে সুখ তা পর্যন্ত নিতান্তই সাধারণ। আর আমার দুঃখগুলো যেন একটা অশরীরী আত্মা, যে সর্বব্যাপী তবু যাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধুমাত্র কল্পনা করা যায়। জানো আলো, যেসব মানুষ স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে থেকে কিছু করতে পারে আমি তাদের দলে নই। আমি চাই...কি জানি, আমি কি চাই!'

এতক্ষণ যে সব কথা আলোচিত হলো আলোর অবচেতন মনেও এতক্ষণ সেইগুলি বিরাজ করছিল। আলো মেয়ে—সে যুক্তিতর্ক ইত্যাদি দিয়ে সোমেশকে বোঝে নি। সে তার ভালবাসা দিয়ে সোমেশকে বুঝেছে। সে বুঝেছে, সোমেশকে ভালবাসা মানে নিজের জীবনের গতিটাকে, মনের প্রকৃতিটাকে এমন করে ফেলতে হবে যে, সাধারণ সুখ-দুঃখ নিয়ে মেতে থাকা আর চলবে না। মাঝে মাঝে তার ভীষণ ভয় হয়, মনে হয়, আমার মতো তুচ্ছ একটা মেয়ে কি সোমেশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে! সব সময়ই অবশ্য এমন কথা তার মনে হয় না, সোমেশ যেদিন তাকে নির্জনে অন্তরঙ্গভাবে স্পর্শ করে তখন সে সাধারণ মেয়ের মতোই পুলকিত হয়। সোমেশের মিষ্টি হাসি তার সমস্ত মনে একটা নরম ভালোলাগা ছড়িয়ে দেয়। রাত্রে শুয়ে সে সব স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তার ভালোলাগাটা যে কোনো প্রেমিকারই ভালোলাগার সমগোত্রীয়—কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সোমেশের অতল গভীরতা এসে তাকে তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করে চেতনার অতলস্পর্শ গহন রহস্যে—আলোর সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। খানিকক্ষণ ঘোরের মধ্যে থাকার পর যখন সে আত্মস্থ হয় তখন সে বোঝে, সে মরেছে, তার আর রক্ষা নেই। এতই তীব্র এর প্রভাব যে, মাঝে মাঝে সোমেশ যখন কোনো সাধারণ কথায় হেসে ওঠে কিংবা কোনো তুচ্ছ রসিকতা করে তখন আলো চুপ করে থাকে, সে ভাবে—এসব যেন

সোমেশদের বাড়ির রাস্তায় আলো এসে পড়ল। আকাশ আবার আঁধার হলো, যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। আলোর মন এবার আর পেছন ফিরে না তাকিয়ে হনহন করে আলোকে ফেলে এগিয়ে চলল ভবিষ্যতে। 'কে?' 'আমি আলো—ভালো আছেন?' 'থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না—বাড়ির সবাই ভালো তো?' 'হ্যাঁ। মাসিমা কেমন আছেন?' 'ওর একটু শরীর খারাপ হয়েছিল। এখন ভালো আছে। যাও না—ভেতরে যাও। ও নিচেই আছে।' সদর থেকে অন্দর। 'ও মা, আলো যে! এই বৃষ্টিতে কেন মা! আরে থাক থাক, পাগলী মেয়ে।' 'শুনলাম আপনার অসুখ করেছে—তাই মা পাঠিয়ে দিল।' 'হ্যাঁ, একটু শরীর খারাপ হয়েছিল—এখন ভালো আছি। মা কিরকম আছে?' 'মা'র বাত আর যাচ্ছে কই—নয়তো মা নিজেই আসত।' 'ওই এক রোগ বাবা—বাবা ভালো আছেন?' 'হ্যাঁ... বাপি কোথায়?' 'কি জানি, পড়তে বললাম তো একটু আগে—বাপি, বাপি!' 'থাক, আমি দেখছি।' 'হ্যাঁ, তুমি ওপরে যাও, সোমেশ আছে।' 'আমি যাচ্ছি।' একতলা থেকে দোতলা। বাপির পড়ার ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে দু-মিনিট কথোপকথন। তারপর সোমেশের ঘরে। সোমেশ হাতে বই নিয়ে আনমনা হয়ে বসে আছে, ঠিক যেমন খানিক আগে সেই বৃষ্টির সময় আলো বসে ছিল তার ঘরে। 'আমি এলাম।' 'আমি জানতাম তুমি আসবে। এসো, বসো।' সোমেশের সমস্ত মুখ একটা অনাবিল হাসিতে ভরে গেল, চোখের চাহনি স্নিগ্ধ হলো। আলো বসল একটা চেয়ারে: 'পড়ছিলে?' 'চেষ্টা করছিলাম।' সোমেশ অকপটে স্বীকার করে, 'আজ সারাদিন আমার সমস্ত ভাবনা তোমাকেই আঁকড়ে আছে। তুমি যখন এখানে এসে থাকবে তখন আর আমাকে এত ভাবতে হবে না। ইচ্ছে করলেই তোমাকে দেখতে পাব ভাবতেও যেন চোখ দুটোর সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়।' সোমেশ অপলকে আলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আলোর ভালোও লাগে, অস্বস্তিও হয়, একটু হেসে বলে, 'আচ্ছা, কি হচ্ছে!' সোমেশ জবাবে আরো একটু তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। একটুখানি নীরবতা: তারপর সোমেশই কথা বলে, 'আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয়, সাধারণ জীবনের মধ্যে একটা ছন্দ আছে, একটা সৌন্দর্য আছে—যেটার আকর্ষণ এত

হাজার বছর ধরে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। এমনি বাদলা সন্ধ্যায় তোমার চোখে চোখ রেখে মুগ্ধ হওয়া, দুজনে একই আনন্দে ভেসে ভেসে একাত্ম হয়ে যাওয়া, তার চেয়ে সুখের বোধহয় আর কিছুই নেই এ জগতে!' আলো খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'আর তোমার ভাবনাগুলো, তোমার বড়ো হওয়া?' 'আসল কথা কি জানো—' সোমেশ বলে, 'ওসব আমার দ্বারা বোধহয় হবে না, হবার হলে এতদিনে হতো—আর সে হোক চাই নাই হোক—আজ এই মায়াবী সন্ধ্যায় আমি তোমায় ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজী নই।' সোমেশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে আলোর হাতে হাত রাখে। সোমেশের কম্পিত আঙুলগুলি আলোর আঙুলগুলিকে কাতর মিনতি জানাতে থাকে। উপায় থাকলে সোমেশ নিশ্চয় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিত।

পথ চলতে চলতে হাসি পায় আলোর। তার কোমল আঙুলে স্পষ্ট সে অনুভব করে সোমেশের আঙুলের স্পর্শ। দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবার সোমেশদের তিনতলা বাড়িখানি। আলো এগিয়ে চলল—একটু পরেই সে দেখতে পাবে সোমেশকে। যাকে দেখবার জন্যে সে এত উতলা, যাকে সে এত অসম্ভব ভালোবাসে। সোমেশের হাসিমাখা মুখখানা ভেবে আলোর হঠাৎ কান্না পেল। যাকে সে ভালোবাসে তার পরম ক্ষতি সে করতে চলেছে। সোমেশ তার চোখে চোখ রেখে নিজেকে ভুলে যাবে, ক্ষণিকের জন্যে হলেও যাবে, তার মনে আর পাঁচজনের মতো সাংসারিক ও সাধারণ হবার ইচ্ছে জাগবে. নিজের ক্ষমতার ওপর, বিশেষত্বের ওপর বিতৃষ্ণা আসবে। উপযুক্ত পরিবেশের সুযোগ হলে সোমেশ তার সদ্ব্যবহার করবে। আলোকে সোহাগে সোহাগে অস্থির করে তুলবে। যথাকালে গুরুজনদের কর্ণগোচর হবে তাদের মনের ইচ্ছের কথা। সানাই বাজবে, বৌ হয়ে আলো আসবে ঐ তিনতলা বাড়িতে। সোমেশ তাকে নিয়ে মত্ত হয়ে যাবে, তারা বেরোবে হনিমুনে, এক বা দুই বা তিন বছর পরে আলো মা হবে, সোমেশের চাকরির হয়তো উন্নতি হবে, তাদের সন্তান স্কুলে ভর্তি হবে, আরো আগন্তুক আসবে—তারপর একদিন এমনি বৃষ্টিমাখা সন্ধ্যায় আলো যখন ছেলেকে পড়া বলে দেবে, মেয়েটি ঘুমোবে দোলনায়, তখন সারাদিনের খাটুনির পরে খবরের কাগজ হাতে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোমেশের হঠাৎ মনে হবে, এর সঙ্গে যদি কোনোদিন আমার দেখা না হতো তাহলে আমি এমন করে বন্দী হতাম না। আমি স্বাধীন হতাম, খাপছাড়া হতাম, বড়ো হতাম—আর তাই ভেবে সে আলোকে সেই মুহূর্তে ঘৃণা করবে। আর যদি তা না হয়, যদি সোমেশ গাঢ় শান্তিতে তার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাহলে হয়তো সেই ঘৃণা আলোর চোখেই প্রকট হয়ে জ্বলে উঠবে সেই মুহূর্তে। ভাবতে ভাবতে আলো এসে গেল সোমেশদের বাড়ির একেবারে সামনে। সোমেশের দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে, তার ছায়া পড়েছে বড়ো হয়ে ঘরের শাদা দেয়ালে, সোমেশ অপেক্ষা করছে তার জন্যে—তার আসার লগ্ন উপস্থিত। আলো এখনি ঢুকে যেতে পারে তাদের বাড়িতে। ক' মিনিটের মধ্যেই সে সোমেশের ঘরে ঢুকে একটি মহান ভবিষ্যতের মৃত্যু ঘটাতে পারে। আমি কি সেই শিক্ষাই পেয়েছি নাকি তোমার কাছ থেকে এতদিন, আলো নিচ থেকে সোমেশের ঘরের দিকে তাকিয়ে তার ছায়াকে উদ্দেশ করে স্বগতোক্তি করে : আমি কি এতই স্বার্থপর কাঙাল একটা মেয়ে! তাহলে তুমি আমায় ভালোবাসলে কি দেখে! তোমার আছে প্রতিভা, আমি তোমায় দেব তার বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ। আমি তোমার পথে বাধা হব না, গাঢ় আনন্দ হয়ে তোমার সুদূর প্রসারিত দৃষ্টিকে ব্যাহত করব না—আমি তোমার সামনে থেকে সমস্ত জাগতিক প্রলোভন সরিয়ে নিয়ে তোমার বন্ধুর পথকে মসৃণ করে উপযুক্ত বন্ধুর কাজ করব, তোমার যোগ্য প্রেমিকা হব। ...সোমেশের বাড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে আলোর পা কাঁপে না—সে সামনের মোড়ে গিয়ে ডান দিকে বেঁকে গিয়ে আবার খানিক পরে নিজের বাড়ির রাস্তায় এসে পড়ে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় সোমেশ আশাহত হয়েছে, তবু দুরাশা তাকে বার করে এনেছে বারান্দায়—দূরে চোখ পাঠিয়ে সে দেখছে যদি আলোর ইশারা পাওয়া যায়। আলো হাসে : পাবে না তুমি সোমেশ, পাবে না। আমায় দেখতে পাবে না, ছুঁতে পাবে না, আমায় পাবে না। আমি যে তোমায় ভালোবাসি—আমি কেমন করে তোমায় ছোটো করি বল তো! এ পৃথিবীতে সবাই একরকম হবার জন্যে জন্মায় নি। তুমি যে সকলের থেকে একটু আলাদা সেটাই তো আমার গর্ব, সেটার জন্যেই যে আমি তোমার অনুরক্ত। সেটা যদি তুমি হারিয়ে ফেল, তাহলে তোমার একারই সব হারাবে না, আমারও সব যাবে। দুঃখ পাও সোমেশ, দুঃখ পাও। তোমার ভাষাতেই বলি, দুঃখ না পেলে মানুষ পূর্ণ হয় না, সম্পূর্ণ গভীর হয় না, সার্থকভাবে চিন্তাশীল হয় না। আমাকে না-দেখার বেদনা আজ তোমায় দুঃখ দিক, আমাকে না-পাওয়ার যন্ত্রণা চিরদিন তোমায় জ্বালাক, পোড়াক, মারুক—পৃথিবীতে সব না-পাওয়ার গভীর দুঃখই মূলত এক : নিজের দুঃখ দিয়েই একদিন তুমি বুঝবে অর্থ না থাকার দুঃখ কাকে বলে, স্বাস্থ্য না থাকার দুঃখ কাকে বলে, মর্যাদা না পাওয়ার দুঃখ কাকে বলে, মৃত্যুর বেদনা জিনিসটা কি! তখন তুমি বুঝতে শিখবে সব কিছু পেলেও কিসের অভাবে ভাবুক উন্মনা হয়। তখন তোমার অশরীরী চিন্তা তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন তুমি সত্যিকারের ভাবতে শিখবে, সত্যিকারের লিখতে শিখবে। সকল অন্ধকারের অন্তরালে যে সূর্য, তার আলো তুমি পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও, এই আমার একমাত্র কামনা। আমার কথা ভেবো না, আমার বিয়ে হয়ে যাবে, স্বামী-পুত্র নিয়ে বেশ জীবন কাটিয়ে যেতে পারব। তোমার মঙ্গলের জন্যে আমি তা পারব—তুমি নিজের কথা ভাবো। আমি জানি আমায় তুমি কোনোদিন ঘৃণা করতে পারবে না, ভুল বুঝতে পারবে না, ভুলতে পারবে না, চিরদিন আমার আচরণ তোমার কাছে এক বিরাট '?' হয়ে থাকবে—সেই রহস্য থেকে আরো এক গভীরতর রহস্যের কথা, এই জগতের নিগূঢ়তম রহস্যের কথা, যেখানে সকল দুঃখ-সুখ একাকার হয়ে থাকে—সেই চিন্তা যেদিন তোমায় উন্মনা করবে, সেই রহস্যের সন্ধানী যেদিন তুমি হবে সেদিন তুমি প্রকৃত লেখক হবে। তোমার দুঃখ কেমন করে তোমায় অসামান্য করে তুলবে তুমি নিজেও তা বুঝবে না, শুধু তার স্পর্শটুকু তোমায় বিভোর করে রাখবে। সেদিন আমার এই আত্মদান সম্পূর্ণ সার্থক হবে। তোমার আলো তোমার সারা জীবন আলোময় করবে।

বাড়ি ফিরে মাকে কি একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে, যা হোক কিছু খেয়ে আলো ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। খানিক পরে—ঘুম এলো না, বৃষ্টি এলো। আলো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল দরজা খুলে—বৃষ্টির ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিল তার দু-চোখের অশ্রুধারা। একটু পরে সে আবার এসে শুলো তার বিছানায়। মাঝরাতে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠল আকাশে, তার আলো আলোর সমস্ত মুখে হাত বুলিয়ে দিল। ঘুমের মধ্যেও আলোর ঠোঁটে এক আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল—কি অপার্থিব, কি অসামান্যই না দেখাচ্ছিল তাকে তখন।

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর একজন নিয়মিত গ্রাহক এবং আগ্রহী পাঠক। এই পত্রিকার ছোট গল্পগুলি এবং বই বাছাইয়ের আসর, সপ্তাহের বোঝা ইত্যাদি বিভাগীয় লেখাগুলো ভালো লাগে। কিন্তু সব চাইতে আগ্রহ নিয়ে পড়তাম সমীর মুখোপাধ্যায়ের 'অন্য গ্রাম অন্য তরঙ্গ' শীর্ষক লেখাটি। যুক্তফ্রন্ট সরকার হবার পর গ্রামবাংলার একেবারে নিচেকার মানুষগুলোর মধ্যে যে জাগরণ দেখা দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো যখন নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করছেন, তখন এই নিচের মানুষেরা কিভাবে পুরনো জড়তাকে ভাঙতে এগিয়ে এসেছেন—সমীরবাবুর লেখাতে তার প্রাণবন্ত বিবরণ আমার দারুণ ভালো লাগতো। নিজেদের সম্বন্ধে পুরনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে নতুন ভাব-ভাবনা কিভাবে এই মানুষগুলোকে আচ্ছন্ন করছে তা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হতো ঐ লেখাগুলোতে। কিন্তু গত কয়েকটি সংখ্যা থেকে ঐ লেখাটি বন্ধ হয়ে গেছে। কেবলমাত্র মেদিনীপুরেই মাটির ঋণ শোধ করার পালা শুরু হয় নি, শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ধারে ধারে, ভুয়সী তরাইয়ের বন্ধুর প্রান্তরে প্রান্তরে—গোসাবা-বাসন্তীর দ্বীপ হতে দ্বীপে। গ্রামের নিচের তলার মানুষের মধ্যে এই বিস্ফোরণের মূল চিত্র সর্বত্রই এক হলেও পরিবেশের বিভিন্নতায় প্রকাশ-ভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। তাই মেদিনীপুরের বাইরেও যে গ্রাম-বাংলা রয়েছে তার তরঙ্গের স্পন্দনও সমীরবাবুর লেখাতে প্রত্যাশিত ছিলো। বিশেষ করে, যুক্তফ্রন্টের পতন এবং রাষ্ট্রপতির শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই মানুষগুলোর অর্জিত অধিকার রক্ষা ও অধিকার অর্জনের পথচলায় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তা জানার খুবই প্রয়োজন। আপনাদের কাছে তাই এই ধরনের একটি বিভাগ পুনরায় খোলার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাই।

—অমরেন্দ্র দাস
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সপ্তাহের বোঝা প্রসঙ্গে

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রত্যেকটি সংখ্যা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে থাকি। সম্প্রতি লক্ষ্য করছি, কোন কোন পাঠক মনে করেন যে, সি-পি-এম সম্পর্কে শ্রীওঝার মত পরিবর্তন হয়েছে এবং সেটা তাঁদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বসুমতীর নিয়মিত পাঠক
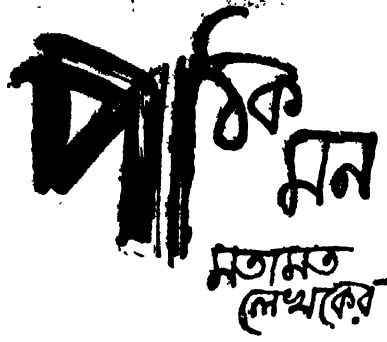
হিসাবে আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আশা করি 'পাঠকমনে' অনুগ্রহ করে এটি প্রকাশ করবেন।

শ্রীওঝাকে যাঁরা এ বিষয়ে দোষী মনে করেন, তাঁদের আমি প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' কোন পার্টির কাগজ নয় এবং শ্রীওঝা একজন স্বাধীন সাংবাদিক। যখন সি-পি-এম যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক হিসাবে শাসনভার গ্রহণ করে, শ্রীওঝা তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন দেখা গেল, সি-পি-এম'এর মুখ্য উদ্দেশ্য শাসনযন্ত্র অধিকার করে অন্যান্য শরিকদের তাঁদের পথে চলতে বাধ্য করা এবং সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে বিভ্রান্ত মেহনতী মানুষকে বিদেশী মতবাদের পায়ে সমর্পণ করা, তখন যে কোন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের কর্তব্য ছিল সেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সি-পি-এম'এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। শ্রীওঝা যে কত নির্ভুল, এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির বর্তমান পরিণতি লক্ষ্য করলেই সেটা বোঝা যাবে। যে যুক্তফ্রন্ট একটি মহৎ সম্ভাবনারূপে দেখা দিয়েছিল, একটি বিকৃত (বিক্রীত?) বুদ্ধি শরিকের জন্য অঙ্কুরেই তার বিনাশ ঘটল। আজ তামিলনাড়ু, খণ্ডিত পাঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু গত দুই বৎসরে বাংলা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। বাংলা দেশকে আবার উঠতে হলে আত্মঘাতী রাজনীতির পথ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শ্রেণীসংগ্রাম নয়, সাম্যভিত্তিক শ্রেণী সমন্বয়ই আমাদের পথ।

—শ্রীদেবজীবন বসু,
বোলপুর, (বীরভূম)

* * *

২৪শে এপ্রিল সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত বক্তব্যের জন্য কৃত্তিবাস ওঝাকে ধন্যবাদ। ইদানীং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই তাঁর সমস্ত আক্রমণ সি-পি-আই-(এম)-এর দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল। যখন-ও বাংলা কংগ্রেসের সমালোচনায় প্রচেষ্টা থাকলেও—সি-পি-আইকে যেন ধোয়া তুলসীপাতার মত সকল সমালোচনার বাইরে রাখা ছিল। বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট পতনের মত জনবিরোধী ঘটনাকে সি-পি-আই-(এম)-এর ফ্রন্ট-বিরোধী ভূমিকারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখানোর যে চেষ্টা বাংলা কংগ্রেস ও অন্টবাম শরিকেরা করেছেন, তার সঙ্গে ওঝা মশায়ের মোটামুটি ঐকমত্যই দেখতে পেয়েছি। অথচ ঘটনা কি তাই? শরিকী সংঘর্ষে অপরাপর দলগুলি কি দোষমুক্ত? পুলিশ যদি নিষ্ক্রিয়ই থেকে থাকে, তবে তার সুযোগ তো অপর দলগুলি কম নেন নি। সংঘর্ষে নিহতের তালিকায় সি-পি-এম-এর কর্মীরাই সর্বাধিক কেন? দলবাজি অন্য দলেরা করে নি? খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোচবিহারে ফরোয়ার্ড ব্লক, আসানসোল, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় সি-পি আই, এস-ইউ-সি, এস-এস-পি দলগুলির ভূমিকা। অজয়বাবু বেছে বেছে সি-পি-আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস-ইউ সি কর্মীদের মালা দিলেই কি তাঁরা শহীদ হয়ে যান?

বস্তুত আসল কারণটা অন্যত্র। সি-পি-এম'এর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তা সঙ্গত কারণেই। সেটা অপর দলের নিশ্চয়ই ঈর্ষার কারণ হতে পারে—তাতে অন্যায় কিছু দেখি না, কিন্তু দলবৃদ্ধিকে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে যাঁরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝতেও আমাদের দেরী হয় না। তাই সি-পি-এম-বিরোধিতার জন্য এই সব দলগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কবরস্থ কংগ্রেসকেও আসর গড়বার সুযোগ দিতে কার্পণ্য নেই। এতে হয়ত সাময়িকভাবে সংগ্রামকে বাধা দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু জনগণ-মুক্তির যে স্বাদ লাভ করেছেন—সংগ্রামের যে বিজয়ী শক্তি দেখতে পেয়েছেন, তা থেকে কখনও থামান যাবে না—আইন, পার্লামেন্ট, বিবেক ইত্যাদির ধুয়া তুলে। আজ এই অস্থিরতা, বিভ্রান্তি ও চরম সংকটে পত্র-পত্রিকার প্রচারে মনে হয়—সব মানুষের রক্ত লাল নয়—সব মায়ের অশ্রু নোনতা নয়।

হিটলার আইখম্যানের রক্তও লাল—তাদের মৃত্যুর সময় তাদের মায়েরা জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই অশ্রুপাত করতেন এবং সেই কাহিনীর প্রতিবেদনে অনেকের চোখই সিক্ত করা যেত—যেমন সাঁই-ভাই-দের নিহত হবার ঘটনাকে বিকৃতভাবে প্রচার করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। অথচ ইতিহাসের পাতায় ২৪ পরগনার ভেড়ীর বাঁধের নিচে কত রহিম সেখ, পরান মণ্ডলের অস্থি মজ্জা রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রতিদিনের সেই ইতিহাস দেখার

জন্য আজকের মত জনদরদী সাংবাদিকদের জন্ম কেন হয় নি, তা বুঝতেও আমাদের অসুবিধা হয় না।

প্রফুল্লবাবুকে যদি বিশ্বাসঘাতক বলি —তবে অজয় মুখার্জীকে বলব না, কেননা অসুবিধে আছে। অথচ প্রফুল্লবাবুর সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে অজয়বাবুর ২রা অক্টোবরের ঘটনাই তো ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। প্রফুল্লবাবুর পদত্যাগে সব দল মিলে ধর্মঘট করলুম। অজয়বাবুও যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে পদত্যাগ করলেন। আমরা সি-পি-এম'এর ধর্মঘটের বিরোধিতা করলুম। ঠিক কংগ্রেসী কায়দায় ধর্মঘট বানচাল করার চেষ্টা করা হল। আশ্চর্য! এ ব্যাপারে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সে কি বিস্ময়কর ঐক্য। তবু নাকি যুক্তফ্রন্ট ছিল! এই যুক্তফ্রন্ট নাকি বাঁচানোর চেষ্টাও করা হচ্ছে। অথচ জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে পারি না—যদিও সারা জীবনের কংগ্রেস কর্মী পনেরো বছরে কংগ্রেসী স্বৈরাচারী শাসনের অংশীদার অজয়বাবুর ২রা অক্টোবরের ঘটনার পরও তাঁর নেতৃত্বে সর্তহীনভাবে বিশ্বাসী। এই স্ববিরোধী রাজনীতির মধ্যে বাংলাদেশের সংকট, বিভ্রান্তি।

শ্রেণী সংগ্রামের সংজ্ঞা ও শোধনবাদের আলোকে নতুন ব্যাখ্যা পাচ্ছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম অহরহই চলছে। যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে এই সংগ্রাম নিশ্চয়ই তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। কৃষকে কৃষকে সংগ্রাম কেন শ্রেণী সংগ্রাম হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন সি-পি-আই এবং তাঁর অনুগামী দলসমূহ। বস্তুত কৃষক নিঃস্ব শ্রেণী হলেও অনেকক্ষেত্রেই সে শোষক শ্রেণীর স্বার্থেও কাজ করে থাকে। অনেক জোতদার, জমিদার তাঁদের জমি রক্ষা করেন নিঃস্ব শ্রেণীর লাঠিয়ালের সহযোগিতায়—সে ক্ষেত্রে সেই লাঠিয়াল বরকন্দাজ যদি সংগ্রামের শিকার হয়, তবে তাকে শ্রেণী সংগ্রাম বলা যাবে না। বহু সাধারণ নিঃস্ব শ্রেণীর সৈনা, পুলিশের সহযোগিতায় হিটলার কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞে নেমেছিল—তাকে কি আখ্যা দেবেন?

উত্তর্বিংশের প্রথমভাগে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাও হিটলারের "জাতীয় সোশ্যালিস্টকে" মদৎ দিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিকে উৎখাত করতে। আজও যে আমাদের তথাকথিত কমিউনিস্ট দলসমূহ জাতীয় সোশ্যালিস্ট ইন্দিরার নেতৃত্বে মার্কসিস্ট নিধনের খেলায় মেতেছেন—তা বস্তুত আত্মহননেরই সামিল। তাই চরম বাম বিচ্যুতি ও চরম দক্ষিণ বিচ্যুতি মার্কসিস্ট-বিরোধিতার একই বিন্দুতে তাঁরা মিলেছেন। সব চাইতে বড় কথা বুর্জোয়া শক্তি তাদের শত্রু চিনতে ভুল করে না। তাই দেখি তথাকথিত বামপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেস শাসক-শোষকগোষ্ঠী, জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র দলের কণ্ঠ মার্কসিস্ট-বিরোধিতার কোরাসে অদ্ভুত মিশে গেছে।

উনসত্তরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে পত্র-পত্রিকায় 'দিন বদলের পালার' গান শুনেছিলাম। চালের দাম পাঁচ টাকা কিলো আর ক্ষেতখামারে, কলে-কারখানায় শান্তির জন্য জনমত পাল্টে গেছে—নির্বাচনের দিনেও কাগজে কাগজে এরই সোচ্চার প্রতিধ্বনি, ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিকদের প্রতিবেদনেও একই বক্তব্য। অতঃপর নির্বাচনোত্তর পত্র-পত্রিকাসমূহে সাংবাদিকদের শুরু হল 'সুর বদলের পালা', আমরা বিস্মিত হই নি। তাই যখন প্রশ্ন ওঠে, স্বাধীন মতামত দেবার অধিকার, মিথ্যে সংবাদ প্রচারের অধিকার এক নয়, তখন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টার কথা তুলে পার্লামেন্ট সোচ্চার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মিথ্যে আমি বলব, প্রতিবাদ উঠলেই স্বাধীন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ফ্যাসিস্ট মনোভাব হয়ে যায়।

লেনিন শতবার্ষিকীতে ফুলের মালা, বিপ্লবের বাণীর ছড়াছড়ি। অর্থাৎ লেনিনকে পুজো কর আপত্তি নেই; লেনিনের সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিচারণ করো, আপত্তি নেই; আপত্তি শুধু কলে-কারখানায়, ক্ষেতখামারে তাঁর শিক্ষার, তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে। সবাই কণ্ঠীধারণ করেছে—ভক্ত বাঞ্ছা মুস্কিল। সবাই জনগণের মুক্তির জন্য জীবনপণ করে বসে আছে। তাই তো এখন শুরু হয়েছে 'চিনে নেবার পালা'। শোষিত জনগণের মুক্তির যে সংগ্রাম প্রতিদিন চলছে, সেই সংগ্রামের নিরিখেই 'বন্ধু' চেনা হবে। একেই তো বলে 'পোলারাইজেশন'। তাই অজয়বাবু, সুশীল ধাড়াকে দোষ দিই না। দোষ দিই না বিপ্লবী সি-পি-আই প্রমুখ অন্টবাম এ'দের। তাঁরা ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ অনুসারেই দায়িত্ব পালন করেছেন। আজকের এই থরো থরো অন্ধকার রাত্রি নতুন সূর্যের জন্ম দেবার প্রসবযন্ত্রণায় অস্থির। সেই সূর্যকে বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মাঝে কিছু রক্ত, কিছু অশ্রুপাত ঘটবেই। অনুশোচনা করে লাভ নেই।

প্রবাল সেন
সাঁইথিয়া
(বীরভূম)

একটি প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭৪ বর্ষ ৪৬ সংখ্যায় 'পাঠকমন' শীর্ষক শিরোনামায় বর্ধমান জেলার বাবুরবাগের ডাঃ বি এন কুমারের একখানি পত্র পড়লাম। তিনি অনেক কথা লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ কথা সম্পর্কেই সংশ্লিষ্ট পার্টির লোকেরা হয়তো বক্তব্য রাখবেন। আমি শুধু "আর-এস-পি'র 'কংগ্রেস বিরোধিতা'! খুব নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে প্রচারপত্র প্রকাশে" সম্পর্কে মতামত রাখছি। আমার বক্তব্য হল এই যে, কোনও একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে ডাঃ কুমারের উচিত ছিল সেই দল এবং দলের কাজকর্ম সম্পর্কে আরও বেশি অবহিত হওয়া। হয়তো অজ্ঞতার কারণেই তিনি এইরূপ অন্যায় মন্তব্য করতে সক্ষম হয়েছেন। অথবা নিছক দলীয় সংকীর্ণতা তাঁকে এই মন্তব্যে প্ররোচিত করেছে।

যা হোক, শুধুমাত্র তাঁর জ্ঞাতার্থে নয়, তাঁর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি যাঁদের বিভ্রান্ত করেছেন তাঁদের কাছে সত্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আমি আর-এস-পি'র ইংরেজী মুখপত্র 'দি কল'-এ প্রকাশিত নীলাম্বুর উপনির্বাচন সংক্রান্ত এবং বাংলা মুখপত্র 'গণবার্তা'র ১৮ বর্ষ ২৮ সংখ্যায় অনূদিত প্রবন্ধের সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"নীলাম্বুরে শ্রীগঙ্গাধরণকে আর-এস-পি'র সমর্থনের প্রচারকে কেন্দ্র করে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিধানসভায় আর-এস-পি গ্রুপের নেতা কমরেড টি কে দিবাকরণ ১১ই এপ্রিল এক বৈঠক আহ্বান করে সাংবাদিকদের সামনে বলেন:

"কোনও অবস্থাতেই আর-এস-পি নীলাম্বুর উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারে না। কংগ্রেসের সরকারীভাবে মনোনীত প্রার্থী হিসাবে যিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কোনমতেই আর-এস-পি'র পক্ষে তাঁকে সমর্থন জানানো সম্ভবপর নয়।"

সুতরাং "সেখানে পার্টি কোনও নির্বাচনী কর্মসূচীতেই অংশগ্রহণ করে নি।......কাজেই নীলাম্বুরে আর-এস-পি কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে আবেদন প্রচার করেছে বলে যে প্রচার চালানো হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা।"

আশা করি ডাঃ কুমার এবার তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ দায়িত্বহীন মন্তব্য করার আগে সংশ্লিষ্ট পার্টি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংবাদের সত্যাসত্য নির্ধারণ করে নেবেন।

গৌরেন রায়
পোঃ কৃষ্ণনগর
নদীয়া

[পূর্ব-প্রকাশিতের]

॥ পাঁচ ॥

'বিশ্বরচনা' বইয়ের প্রথম অধ্যায় 'পরমাণুলোক' লেখা শেষ হয়েছে। গুরুদেব সাগ্রহে গ্রহণ করলেন লেখাটা। বললেন যে, এরই প্রতীক্ষা করছিলেন। সেদিন লেখাটা নিয়ে না গেলে 'বনমালীকে' পাঠিয়ে সমন ধরিয়ে গ্রেপ্তার করে আনার ব্যবস্থা করতেন, কারণ বই লিখতে বলার পর থেকেই নাকি লেখক পলাতক। লেখাটা পড়তে শুরু করলেন ও তার উপর দিয়ে কলম চালিয়ে চললেন। জানি শব্দের বানান অনেক ভুল হয়, তাই সশংকিত হয়ে রইলাম কোথায় কী মারাত্মক ত্রুটি ঘটেছে। কিছুক্ষণ পরে বললেন—"রচনা'টা আমার কাছে রেখে যাও, কাল ফেরৎ পাবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটাতে হলে ভাষাটা কি রকম হবে তাই শুধু দেখিয়ে দেব। একটা কথা মনে রাখতে হবে, এসব গ্রন্থের সুরুটা ও শেষটা যেন বেশ চিত্তাকর্ষক হয়, এতে যদি একটু সাহিত্যরস বিতরণ করতে হয় তাও করতে হবে। বানানগুলি সম্বন্ধে খুব অবিচার করো না, তবে এই ত্রুটির জন্য ভাবনার কোনো কারণ নেই, লিখতে লিখতে এই ভূত ঘাড় থেকে নেমে যাবে। আসল কথা হচ্ছে, তথ্যবিন্যাসের নিপুণতা—আর এমন একটা নতুন ধরনের সহজ সরল ভাষায় লিখতে হবে—যার গতি হবে স্বচ্ছন্দ ও যার ছন্দে শিক্ষার্থীর মনে দোলা লাগবে। বিজ্ঞানের রচনায় একটা জিনিস বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে, এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে। সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে বটে, তবে সেটা চর্ব্যজাতের জিনিস, দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে রেখে বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে পারিভাষাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে সহজ ভাষায় কী করে রচনা সুসম্বন্ধ করা যায় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই দিক থেকে ভাষার ট্রেনিংটা হয়ে গেলে তখন দেখবে স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাষা কেমন সহজে এগিয়ে চলে, জেনে রেখো সহজ কথায় লেখাটাই সব চেয়ে কঠিন। আরো একটা কথা, বৈজ্ঞানিক রচনা লিখে প্রথমে দেখাতে হবে এমন দু'-একজনকে, বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই। তাঁরা পড়ে যদি বুঝতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে ধরে নেবে লেখার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। 'তনয়—ধীরেনকে' দিয়ে যাচাই করিয়ে বিশেষ লাভ নেই, বিজ্ঞানের সঙ্গে ওঁদের যথেষ্ট পরিচয় আছে। এ বিষয়ে আমাদের 'গোসাঁই' (নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী) নিতান্ত নিরীহ ভালোমানুষ, লেখাটা প্রথমে গোসাঁইকে দেখিয়ো, বোধগম্য হয়েছে বলে উনি সার্টিফিকেট দিলে পরে আমাকে দিও, যতটুকু ঘষা-মাজা দরকার করে দেবো।"

তার পরদিন গুরুদেবের কাছে যেতেই বললেন—"তোমার রচনা পড়েছি, শুরু যেভাবে করেছ তার পাশে লিখে দিয়েছি কীভাবে শুরু করতে হবে। মনে হয় বাঙলায় বিজ্ঞানের সহজবোধ্য বই "এই ভাষায়" লেখাই সঙ্গত হবে।" পাণ্ডুলিপিটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—"পরমাণুলোক অধ্যায়ের বাকি অংশটা এই ভাষায় লিখে আমাকে দিয়ে যাবে, সাতদিনের মধ্যেই, দেরি করলে কিন্তু চলবে না। তথ্য আহরণ ও তা সাজানোর ব্যাপারে তোমার মুনশীয়ানা আছে, এখন ভাষাটা ঠিক হলেই স্বচ্ছন্দে লিখে যেতে পারবে। আমার লেখার শুরুটা এবার পড়ে দেখ॥" দোঁখ মুক্তার অক্ষরে সাজানো সহজ অথচ সাবলীলভাষার এক অপরূপ অনবদ্য রচনা। চোখে না দেখলে এ অপূর্ব জিনিসের ধারণা করা সম্ভব নয় বলে এখানে আমার প্রথম রচনার প্রথম পৃষ্ঠার হুবহু নকল করে দিলাম—প্রথমে আমার কাঁচা হাতের প্রথম লেখা, তারপর মুক্তাক্ষরে সাজানো গুরুদেবের হস্তাক্ষর :—

আমার লেখা

অনেক আশ্চর্য ও অসম্ভব কথা তোমরা পড়ে ও শুনে থাক। তোমাদের

কল্পনা করার শক্তি যদি তাকে না মেনে নেয় তা হলেই মনে হবে যে, এ কথা অসম্ভব, এ হতে পারে না। সবদের চিন্তা করার ক্ষমতা এক নয়, তাই তোমার আমার কাছে যা অসম্ভব ও আশ্চর্য বলে মনে হয় আর একজন হয়ত তা খুবই স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। সত্য যে কল্পনাকে কতদূরে ছাড়িয়ে যায় তা আজকাল বিজ্ঞানের যুগে প্রতি পদেই আমরা পাই। Aeroplane সৃষ্টি হওয়ার আগে "মানুষ আকাশে উড়ে বেড়াবে" এর কল্পনাও ছিল আমাদের কাছে অত্যন্ত অসম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন তাঁর যন্ত্রের সব বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের বললেন যে, এভাবে আকাশে ওড়াতো খুবই সোজা ও স্বাভাবিক, তখনই আমাদের মন তাতে সাড়া দেয়—"হ্যাঁ সত্যিই, এতো এমন কিছু আশ্চর্য নয়, এ যে খুবই সোজা।" আজ যখন বৈজ্ঞানিক পৃথিবী থেকে চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে যাওয়ার জন্য "Rocket" নামে এক আশ্চর্য যন্ত্রের সৃষ্টি করতে ব্যস্ত, তখন আমরা ঘরের কোণে বসে হেসে বলছি "এ কি কখনও সম্ভব হয়? এ শুধু পাগলামী!" কিন্তু যেদিন এ সম্ভব হবে, চোখের সামনে আমরা যেদিন দেখব মানুষ এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাতায়াত করছে, সেদিন আমরাই আবার মাথা নেড়ে বলব যে, এতো এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। সত্য বুঝতে হ'লে আমাদের কোনো জিনিসই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। স্থির হয়ে আমাদের ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। তোমাদের কাছে আজ গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জীব, জন্তু এদের সম্বন্ধে আমার......

গুরুদেবের লেখা

"সূর্য আমাদের জগতের চারদিকে একটা আলোর পর্দা খাটিয়ে দিয়েছে। পৃথিবী ছাড়িয়ে আর যে কিছু আছে মানুষকে তা দেখতে দিচ্ছে না। ভাগ্য-ক্রমে দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, আলোর আবরণ সরে যায়, তখন অন্ধকার ভেদ করে প্রকাশ পায় নক্ষত্রলোক। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কী যে চেহারা তা আমাদের চোখে তখন ধরা পড়ে। এই বিশ্ব যতই প্রকাণ্ড বড় ততই অত্যন্ত ছোট হয়ে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে। নইলে সমস্তটার মোটামুটি পরিচয় পেতুম কী করে। হিমালয় পর্বতটা কীরকম তা জানাবার জন্যে তার যে ছবি আঁকা হয়, একটা বইয়ের পাতার মধ্যেই তা ধরে। কিন্তু হিমালয়কে যদি একেবারে সামনে এনে দেখাতে যাই তাহলে সমস্ত বাংলাদেশটা চাপা পড়ত এবং হিমালয়ের সামান্য এক অংশের বেশি দেখতে পাব না।

তেমনি বিশ্বের আয়তনকে কতই ছোটো করে প্রত্যেক রাত্রে আমাদের গোচর করা হয়েছে কিছু পরিমাণে তার আভাস পেতে হলে সূর্যের দৃষ্টান্তটা মনে আনা চাই। ভোর-বেলায় সূর্য পূর্ব দিকসীমানার গায়ে যখন প্রকাশ পায় তখন তাকে একটি সোনার থালার মতো দেখতে হয়। তার থেকে আর কিছু না হোক বুঝতে পারি সূর্য গোলাকার। অথচ প্রায় চৌদ্দ লক্ষ পৃথিবী একত্র করলে তবে সূর্যের আয়তনের সমান হতে পারে। সমস্ত সূর্য যদি আমাদের কাছে থাকত তাহলে সমস্ত সূর্যের রূপ আমরা জানতেই পারতুম না। যা আমাদের চেয়ে অত্যন্ত বড়ো তাকে আমরা কতটুকু চিনতে পারি সে দূরের থেকে।"

সেদিন থেকেই লেখা শুরু হলো গুরুদেব-নির্দেশিত এই ভাষায়। মনে আছে দু'ঘণ্টায় এক পৃষ্ঠার বেশি এগোতে পারা গেল না, অনভ্যস্ত নূতন পথে চলতে বার বার আড়ষ্টতা এসেছে, আবার নূতন উদ্যমে চলতে হয়েছে। তবে মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছে নূতন পথে চলার। গুরুদেব হলেন ভাষার স্রষ্টা, তাঁর নৌকোটা যেদিকে খুশি, যেমন খুশি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চলাটা ইচ্ছেমতো সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে নিয়েছেন। কিন্তু এই আমার হাতে-খড়ি, আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে, হার স্বীকার করা চলবে না কিছুতেই।

সাত দিনের মধ্যে দশ পৃষ্ঠা মাত্র লেখা হলো, তাই নিয়েই যেতে হবে গুরুদেবের কাছে। অধ্যায়টা শেষ হলো না, কিন্তু সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বনমালীকে পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন, এ কথা আগেই বলে দিয়ে-ছিলেন। তাই যতটুকু লেখা হয়েছে তা নিয়েই হাজির হতে হলো। সেদিন ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে খুব রসিকতা করছিলেন, পাণ্ডুলিপি হাতে আমাকে দেখেই তাঁকে বললেন—"দেখুন, বৈজ্ঞানিক রসভঙ্গ করলো, এরা নাছোড়বান্দা, সহজে মুক্তি দেয় না। দাও তো লেখাটা কি রকম হয়েছে দেখি।" কিছুদূর পড়েই একবার তাকালেন, দৃষ্টি প্রসন্ন। ভাষাটা তাহলে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়েছে। বললেন—"দেখলে তো গুরুমশায়ের হাতে ট্রেনিং-এ অল্প সময়ে কেমন কাজ হয়েছে। কালকের মধ্যেই লেখাটা ফেরৎ পাবে। যতটা প্রয়োজন, সংশোধন ও পরিবর্তন সমস্ত করে দেব। এখন শুধু লিখে যাও।" তার পরদিনই বনমালী পাণ্ডু-লিপি পৌঁছে দিয়ে গেল। তার দু-এক পৃষ্ঠার নমুনা, গুরুদেবের স্বহস্তে সংশোধন ও পরিবর্ধন (বড় অক্ষরে) সহ নিচে দেওয়া হলো :—

আমাদের সমস্ত দেহের ত্বকে যে সূক্ষ্ম নাড়ীর জাল আছে, যাকে বলি স্নায়ু, তাপের "ঢেউ" [বেগ] তাকেই ঘা দেয়। বাইরে থেকে গা ঘষলে কিম্বা চড় খেলেও ঐ কারণেই তাপ বোধ হয়। আস্তে আস্তে হাত বুলোলে তাপ বুঝা যায় না, বেশি জোরে বুলোলেই অর্থাৎ ঘষাঘষি করলেই বুঝতে দেরি হয় না। গরম লোহা আরো গরম করলে সে দীপ্তি পায়। এই দীপ্তিটা চোখের স্নায়ুতে একপ্রকার চঞ্চল তেজের তরঙ্গ আঘাত। চোখ বন্ধ করে বাইরে থেকে যদি চাপ দেওয়া যায় কিম্বা চোখে যদি ঘুঁষি খাই তাহলেও এই একই কারণে বাইরে আলো না থাকলেও আমরা আলো বোধ করি। একেই চলিত ভাষায় বলে চোখে সর্ষেফুল দেখা

"সূর্যের আলো সাদা, কিন্তু এই সাদা আলোর মধ্যে ছড়িয়ে আছে সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোর বেণী। যেন সাত রঙের রশ্মির পেখম, একসঙ্গে গুটানো থাকলেই দেখায় সাদা, ছড়িয়ে মেলে দিলেই পরে পরে নিচের পর্যায়ের সাতটা রঙ বেরিয়ে পড়ে— বেগুনি (*violet*), অতিনীল (*indigo*), নীল (*blue*), সবুজ (*green*), হলদে (*yellow*), জর্দা (*orange*), লাল (*red*)। এই সাতটা রঙ চোখে দেখতে পাই কিন্তু এদের দুই প্রান্ত পেরিয়ে আরো ভিন্ন আলোর ঢেউ আছে, তারা আমাদের কাছে অদৃশ্য। যদি কোনো বিশেষণ নিয়ে তারা আমাদের চোখে ধরা পড়ত, তাহলে বিশ্বচিত্রপটে আমাদের চোখের অনুভূতি আরো বিচিত্র হয়ে বেড়ে যেত। বর্ণচ্ছটায় বেগুনি আলোর সীমা আরো ছাড়িয়ে গেছে যে আলো তাকে বলে *ultra-violet light*, বাংলায় বলা যেতে পারে বেগুনিপারের রশ্মি; আর লাল পেরিয়েছে যে আলো ইংরেজীতে তাকে বলে *Infra-red light*, বাংলায় তাকে বলা যেতে পারে লালপারের রশ্মি।

এই যে ভিন্ন রঙের ঢেউ এদের আয়তন বিভিন্ন।"

এর মধ্যে লাল রঙের ঢেউ সকলের চেয়ে দীর্ঘ; আর সকলের চেয়ে খর্ব হচ্ছে নীল। এক ইঞ্চি জায়গায় লাল রঙের ঢেউ ধরে ৩৩,০০০, আর ঠিক তার দ্বিগুণ ধরে বেগুনি রঙের ঢেউ।

সূর্যের জ্যোতিতে সব রঙের ঢেউই তো মিলিয়ে আছে, ভিন্ন ভিন্ন জিনিষে আমরা তাদের পৃথক করে দেখি কী করে? তার একমাত্র কারণ সব জিনিষ সূর্যের সব রঙকে ভিতরে নেয় না, কোনো কোনো রঙ বাইরে ফিরিয়ে দেয়। যে রঙ নেয় সে আমরা দেখতে পাই নে, যে রঙ ফিরিয়ে দেয় তাই আমাদের চোখে পড়ে। জানিনে কী কারণে। চুনী পাথর সূর্যকিরণের আর সব রকম ঢেউকে মেনে নেয়, কেবল লাল রঙকে দেয় ফিরিয়ে, সেই ফিরে আসা রঙটাই ছাড়া পেয়ে আমাদের চোখে পড়ে, সেই জন্যেই চুনীর রঙ লাল। আকাশের রঙ আমরা দেখি নীল। তার কারণ দূরে আকাশে যে সব বস্তুকণা ভাসে তারা অতিক্ষুদ্র নীল-রঙের ক্ষুদ্র ঢেউগুলিকেই বাধা দিয়ে

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লেখকের পাণ্ডুলিপির সংশোধিত অংশের প্রতিলিপি—১নং

ফিরিয়ে দিতে পারে। বার্ধক্যের পরে আবরণ আরো মলিন হোলে, তখন অপেক্ষাকৃত স্থূলতর কালচে রঙের হয়। বয়স্ক মানুষের পাকা চুল সূর্যের পাঠানো সব ঢেউকেই ফিরিয়ে দেয়, সেইজন্যে ওর চুল সাদা। তোমাদের কালো চুল সব ঢেউকেই নেয়, কোনোটাকেই ফেরৎ দেয় না, সেই জন্যেই তোমাদের চুল দেখায় কালো। কেন না, কালোটা রং নয়, ও হচ্ছে সকল রঙের অভাব। জগতে ভিন্ন জিনিস যদি সূর্যালোকের কোনো ঢেউকেই ফিরিয়ে না দিত তাহলে সমস্ত জগৎ ঘন কালো হয়ে দেখা দিত। 'বস্তুত কিছুই দেখা দিত না, কেন না যে আলো ছাড়া পেয়ে চোখে

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লেখকের পাণ্ডুলিপির সংশোধিত অংশের প্রতিলিপি—২নং

আসে তারই সাহায্যে আমরা দেখতে পাই।" আবার জগতের সব জিনিসই যদি সব রঙই দেয় ফিরিয়ে তাহলে সবই হয়ে যেত শাদা। "এই একেবারে শাদা আলোতেও আমরা কিছুই দেখতে পেতুম না। কেন না বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আলোর দেওয়া-নেওয়া করে, তাই একটা জিনিস থেকে আর একটা জিনিসের তফাৎ আমাদের চোখে পড়ে।

সূর্যকিরণের সহিত জড়িত এমন সব ঢেউ আছে যা অতি অল্প পরিমাণে আসে, সে আমাদের চোখে পড়ে না। আবার এমন ঢেউ আছে যা প্রচুর পরিমাণেই প্রবাহিত হয়, কিন্তু আমাদের বায়ুমণ্ডল তাকে আটক করে। নইলে সেই অদৃশ্য ঢেউগুলি আমাদের পুড়িয়ে মারত। সূর্যের যে পরিমাণ দান আমরা সইতে
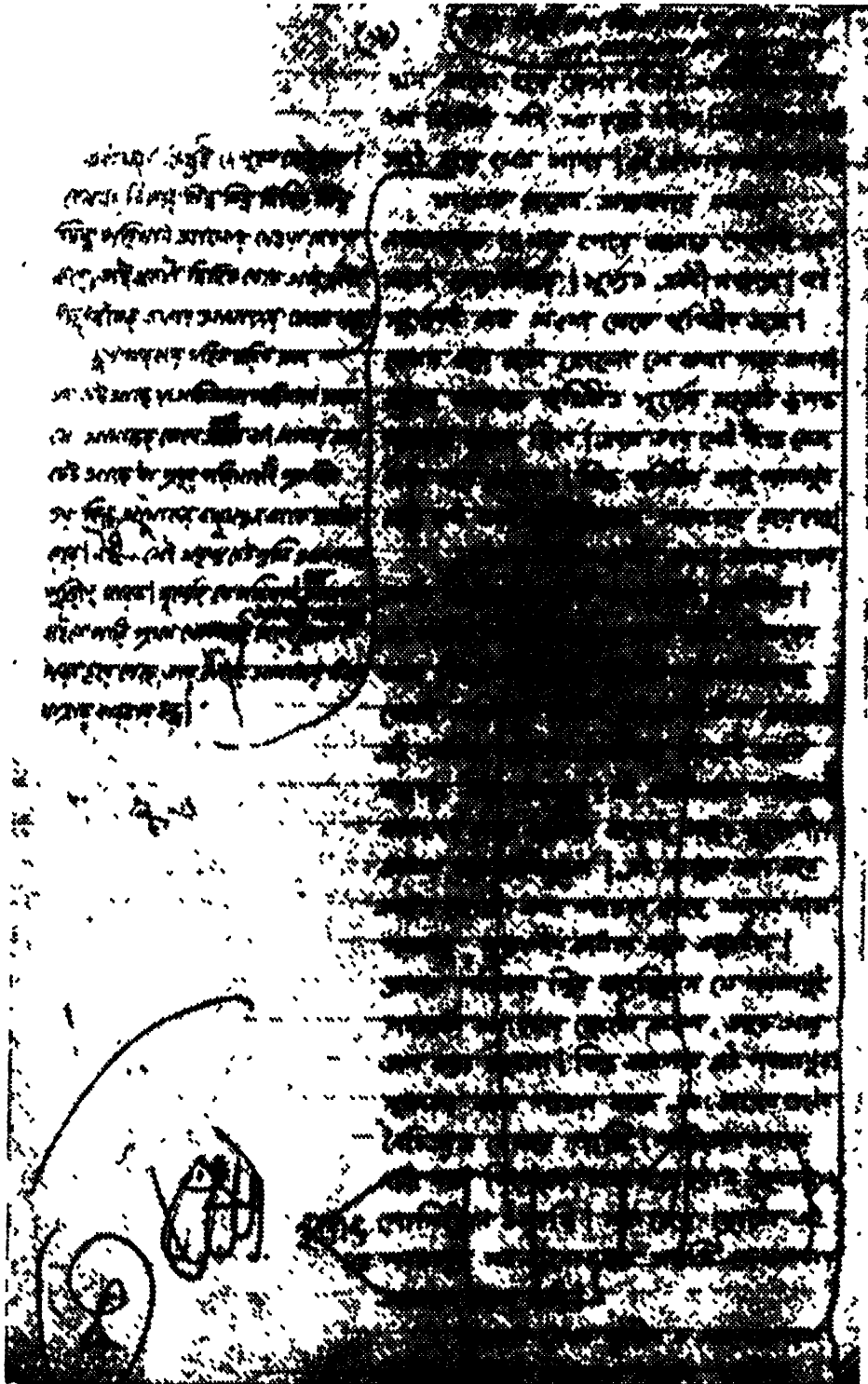
রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লেখকের পাণ্ডুলিপির সংশোধিত অংশের প্রতিলিপি—৩নং

পাঁর প্রথম থেকে তাই নিয়েই আমাদের দেহতন্ত্রে বোঝাপড়া হয়ে গেছে, তার বাইরে আমাদের জীবযাত্রার কারবার বন্ধ।"

যাহোক রাত্রের অন্ধকারে আমরা নক্ষত্রলোক দেখতে পেয়ে জানতে পেরেছি, ওরা সবাই জ্যোতির্ময়। সূর্যও একটি নক্ষত্র। এই সূর্যেরই এক অংশ থেকে পৃথিবীর জন্ম। কেমন করে জন্ম হোলো সে কথা পরে বলব। জন্মের আরম্ভে পৃথিবীও সূর্যের মতোই জ্বলন্ত বাষ্পের গোলা ছিল। ক্রমে তার সেই দীপ্ত তেজ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু পৃথিবীর অণুপরমাণুর মধ্যে সেই তেজ অগোচরে রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লেখকের পাণ্ডুলিপির সংশোধিত অংশের প্রতিলিপি—৪নং
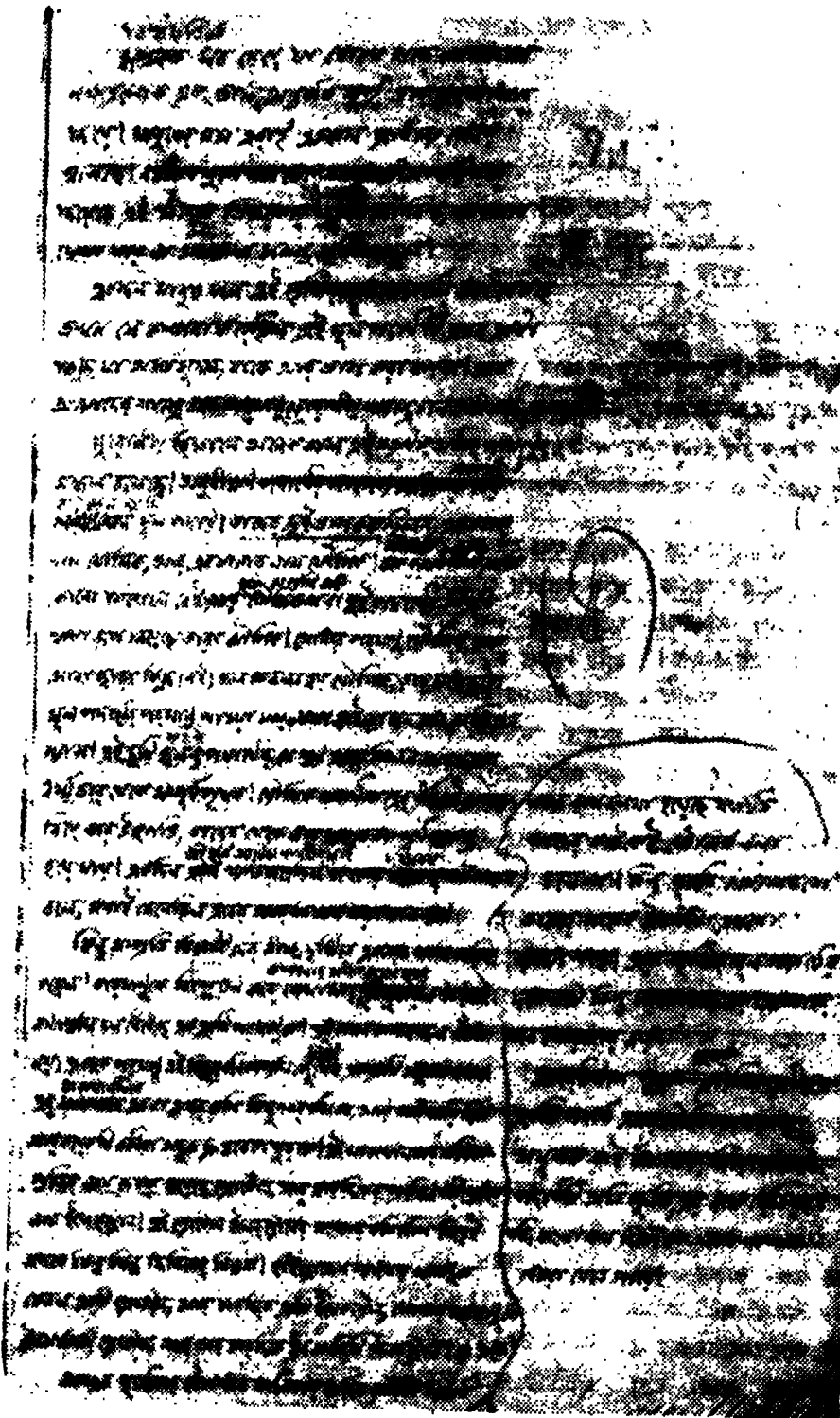
তোমার সোনার বাংলা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেশবন্ধু! আমরা তোমার চিতায় একদিন
মঠ তুলেছি, মঠ তুলেছি, মঠ তুলেছি হে!
তুমি মরলে আমরা তোমার চিতায় একদিন
মঠ তুলেছি, আর বলেছি, 'ঘুমিয়ে পড় গে!
'ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......'
তোমার সোনার বাংলা ঘুমাক, মাটির চেয়ে স্বার্থ বড়।

তোমার পদ্মাপারের বাড়ি অথৈ দরিয়ায়
অনেক আগেই ভেসে গিয়েছে, ভেসে গিয়েছে হে!
বেঁচে থাকলে দেখতে আবার বাংলা ভেসে যায়—
যাবে কোথায়—ছিঁড়ছে তাকে হাঙর, কুমীর।......
'ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......'
সোনার বাংলা তলিয়ে যাক্, দেশের চেয়ে স্বার্থ বড়।

দ্বিখণ্ডিত জন্মভূমির চিতাও জ্বলে নি;
মঠ তুলবো, কোথায় তুলবো, কেউ জানি না হে!
আমরা এখন কেউ নেতা, কেউ মন্ত্রী হয়েছি;
মূর্খ যারা, দেখছে স্বপ্ন, আগুন জ্বলেছে।......
ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......
ঘুমিয়ে পড়......'
ভাগের মা-কে কুমীরে খাক, মায়ের চেয়ে স্বার্থ বড়।

"বিশ্বছবিতে সবচেয়ে যা চোখে পড়ে সে হোলো নক্ষত্রলোক এবং তারি অন্তর্গত সূর্য, তার গ্রহপরিবার নিয়ে। মানুষের মনে এরাই এতকাল প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। বর্তমান যুগে সবচেয়ে মানুষকে আশ্চর্য করে দিয়েছে এই বিশ্বের ভিতরকার সূক্ষ্মকোনো বিশ্ব, যা চোখে দেখা যায় না। অথচ যা সমস্ত সৃষ্টির মূলে।

একদিন মানুষ যখন এই সৃষ্টির মূল পদার্থের কথা ভেবেছে, তখন সে কল্পনা করেছিল এই মূলপদার্থটি এমন একটা কিছু যা অতি সূক্ষ্ম, যাকে আর ভাগ করা যায় না। একে আমাদের শাস্ত্রে বলে পরমাণু, য়ুরোপীয় শাস্ত্রে বলে অ্যাটম।

য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে অনেককাল এই অ্যাটম অর্থাৎ পরমাণুর সন্ধান চলেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পণ্ডিতেরা এ পর্যন্ত বের করেছেন ৯২টি মূল পদার্থ। তাদের দুই ভাগ করেছিলেন, এক ভাগের নাম মৌলিক, আর এক ভাগের নাম যৌগিক। মৌলিক পদার্থ খাঁটি, যাতে কোনো মিশোল নেই, আর যেগুলি এক বা দুই পদার্থের সংমিশ্রণে একটা রূপ নিয়েছে তারা যৌগিক। সোনার পরমাণু মৌলিক, তাতে সোনা ছাড়া কিছু নেই; জলকে বলা হয় যৌগিক, তার মধ্যে দুটো মূল পদার্থের পরমাণু পাওয়া যায়, যথা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস। এই দুটি স্বতন্ত্র জ্বলন্ত পদার্থের যে গুণ এদের মিলনজাত জলের ধর্ম তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যৌগিক পদার্থমাত্রের ধর্ম এই, যাদের নিয়ে তার উৎপত্তি, তাদের থেকে তার স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। একদিন এই সব অ্যাটমনামধারীরাই খ্যাতি পেয়েছিল জগতের সূক্ষ্মতম মূল উপাদান বলে, সবাই জেনেছিল এদের আর বিভাগ করা চলে না।

কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এদেরও ভাগ বেরিয়ে পড়ল। পরমাণুকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কল্পনার অতীত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিদ্যুতের কণা। এই কণাগুলি দল বেঁধেছে এক-একটি পরমাণুতে। শুধু যেমন তেমন দলবাঁধা নয়, প্রত্যেক পরমাণু এই বিদ্যুৎ-কণিকাগুলিকে নিয়ে যেন এক-একটি অণুতম জগৎ। এর মাঝখানটিতে এক বা একের বেশি বিদ্যুতের কণিকা, আর তারি চারদিকে আর কয়েকটি কণিকা অদ্ভুত দ্রুতবেগে ঘুরছে। এই মাঝখানকার কণিকাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোন, আর চারদিকের প্রদক্ষিণকারীগুলির নাম ইলেকট্রোন। এই প্রোটোন ইলেকট্রোনের সংখ্যার কম বেশি নিয়েই জগতে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের ভিন্নতা। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে কেবল একটি প্রোটোন, আর চারদিকে একটি ইলেকট্রোন, সোনার পরমাণুতে ঊনআশিটি প্রোটোন আর তার চারদিকে ঊনআশিটি ইলেকট্রোন।

পূর্বেকার বৈজ্ঞানিক তালিকায় যাদের মৌলিক পদার্থ বলে নাম লেখা হয়েছে, যথার্থত তাদের কাউকেই মৌলিক বলা চলে না। কিন্তু পূর্বের অভ্যাস মতো তাদের সাবেক উপাধিটা এখনো রয়ে গেছে। এরা সৃষ্টির মূল পদার্থের দলে বটে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এরা একেবারে সব গোড়াকার নয়।

এদেরই মতো পুরাতন মতের মৌলিক শ্রেণীভুক্ত একটি পদার্থ এদের মৌলিকতা যে কত অমূলক তাই ফাঁস করে দিয়েছে। এই পদার্থটি অতি দুর্লভ, এর নাম রেডিয়াম। যদি বাংলা নাম দিতেই হয়, একে দীপক নাম দেওয়া যেতে পারে।"

[ক্রমশ]
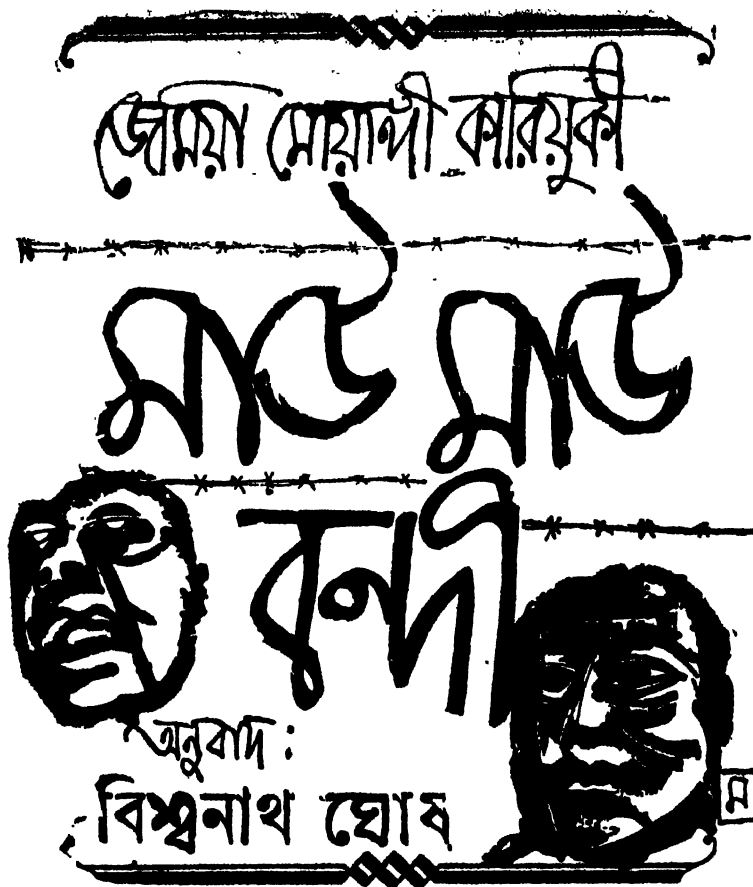
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মানিয়ানি শিবিরে ঢোকবার আগে আমাদের সবাইকে একবার করে কড়া জীবাণু-নাশক পদার্থ মেশান একটি জলের চৌবাচ্চার ভেতর ডুব দিতে হয়েছিল। এই চৌবাচ্চা সাধারণত ব্যবহার হয় গবাদি পশুর গায়ের পোকামাকড়কে বিনষ্ট করবার জন্য, পরিমাপে এ হল প্রায় কুড়ি ফিট লম্বা, ছয় ফিট গভীর ও চার ফিট চওড়া। একজন-একজন করে আমরা প্রত্যেকে এর ভেতর দিয়ে একবার করে হেঁটে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম আমাদের সমস্ত জামাকাপড় ও জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এবং শিবিরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে থেকে এর তত্ত্বাবধান করেন, যাতে আমাদের ভেতর কেউই ফাঁকি না দিতে পারে। এর কারণ সম্বন্ধে আমাদের বলা হয় যে, বাইরে থেকে নবাগত বন্দীরা ছোঁয়াচে রোগ মানিয়ানিতে যাতে না আনতে পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কড়া অষুধের জ্বালায় আমার চোখ ফেটে জল বেরোচ্ছিল, কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিল না। আমাদের সকলেরই মনে হয়েছিল যে, এই কাজের মূলে ছোঁয়াচে রোগ দূর করার চেয়ে আমাদের প্রতি জন্তু-জানোয়ারের মতো ব্যবহার করে অপমান করার উদ্দেশ্যই ছিল বেশি।

নয় নম্বর তাঁবুতে আমাকে থাকতে দেওয়া হয় এবং সেখানে আবার আমি প্রতিনিধি নির্বাচিত হই। এই তাঁবুর কর্মাধ্যক্ষ ছিল একজন মিশ্রিত জাতির লোক, তার নাম দি আমরা "মুরু-ওয়া-ওয়াচুকা", অর্থাৎ ওয়াচুকার জেলে। বন্দীদের ভেতর অনেকেই জানতো যে তার বাবা ছিলেন একজন ইংরেজ সৈনিক এবং তার মা একজন আফ্রিকান বেশ্যা। সে লেখাপড়া খুবই কম শিখেছিল এবং মোটেই ভাল ইংরাজী বলতে বা লিখতে পারতো না। আমাকে সে প্রায়ই অনুরোধ করতো তার হয়ে চিঠিপত্র বা বিবরণী সকল লিখে দেওয়ার জন্য। একদিন সন্ধ্যেবেলা মাতাল অবস্থায় আমাদের তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ে সে হাতের কাছে যে বন্দীকে পায় তাকে ধরেই অযথা মারতে আরম্ভ করে-ছিল। আমি তার এই পৈশাচিক ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হই এবং তার হাতের ছড়িটি জোর করে কেড়ে নিয়ে টুকরা টুকরা করে ভেঙে ফেলে দিই। তাকে আরও বলি যে, যদি সে এরকম অন্যায় ব্যবহার আবার কখনো করে, তবে আমি দেখে নেব যে তার গায়ের জোর বেশি কি আমার। এভাবে খোলাখুলি-ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়ে সেও রেগে যায় এবং আমাকে তার দপ্তরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধোর করার ভয় দেখায়। আমারও মাথা তখন সপ্তমে চড়ে গিয়েছিল এবং আমি তার জামার কলার ধরে এক হেঁচকা টানে আমার কাছে টেনে এনে টুঁটি চেপে ধরাতে সে বেশ অবাকই হয়। যদিও সে বেশ লম্বা-চওড়া লোক ছিল, কিন্তু আমার আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার মতো তার শারীরিক বা মানসিক শক্তি ছিল না বলেই মনে হয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত ঐভাবে চেপে ধরে রেখে আমি তাকে আমার পায়ের কাছে মাটিতে ফেলে দিই এবং ভবিষ্যতে সকলকার সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহার করবার জন্য সাবধানও করে দিই। ধীরে ধীরে ধরাশয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে ওকেলো বলে একজন জালুয়ো উপজাতীয় সার্জেন্টকে ডেকে পাঠায় এবং আমাকে প্রহরীদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখতে আদেশ দেয়। ওকেলোকে আমার ভাল লাগতো, সে খুব সাদাসিদে মানুষ ছিল এবং আমাদের সকলকার সঙ্গেই ভদ্রোচিত ব্যবহার করতো। যাক, সেখানে তিনদিন বন্দী থাকার পর আমি আবার ছাড়া পাই এবং নিজের তাঁবুতে ফিরে যাই। বন্দি-জীবনের পরে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে মুরুওয়ার সঙ্গে আমার নাইরোবি শহরে হঠাৎ দেখা হলে পর আমি তার সঙ্গে সৌজন্যালাপ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়।

সেদিনের ঘটনার পর মুরুওয়া আর আমাদের তাঁবুতে প্রতিনিধি-পদ নির্বাচন করতে দেয় নি, কারণ নির্বাচিত-পদ থেকে আমাকে সে সরিয়ে দেয় ও তার বদলে জর্জ কিবোচা নামক এক বন্দীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। তা ছাড়া আমাদের তাঁবুতে দুজন সরকারী পক্ষের বাছাই-কারের আবির্ভাবও হয়, তারা কেবলি চেষ্টা করতো বন্দীদের কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে সরকার পক্ষে নিয়ে যাবার জন্য। প্রথম বাছাইকারের নাম ছিল মাউল, পরে সে কেনিয়ার রাজনৈতিক জীবনে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়টির নাম ছিল স্যামুয়েল, সে বলতো যে, জোমো কেনিয়াট্টা আর সে নাকি একই বংশের লোক। বন্দীদের কেউই মাউল বা স্যামুয়েলকে পছন্দ করতো না এবং বন্দীরা তাদের দুজনকেই বলেছিল, "তোমরা দুজনেই আমাদের জাতীয় নেতা জোমো কেনিয়াট্টার নাম ধুলায় মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করছো বিদেশী শাসকের সঙ্গে মিশে কেবল এক টুকরা রুটির জন্য। কেনিয়াট্টা আমাদের সকলের জন্য উত্তর কেনিয়ার মরুভূমিতে লোকিটাউঙে আটক অবস্থায় থেকে দারুণ কষ্টের ভেতর দিন কাটাচ্ছেন, আর তোমরা দুজন সামান্য সুখ-সুবিধার জন্য বিদেশী ঔপনিবেশিকের

[illegible] মান্য়েক না এখন উঠে আমাদের বিরুদ্ধে সরকারের হয়ে কাজ করলে কিন্তু তখন আমরাই বা কেন তোমাদের কথা শুনবো?" মানিয়ানি শিবিরে বন্দীদের লোভ দেখানোর জন্য বাছাইকারদের হাতে বিশেষ বিশেষ ভাল খাবার দেওয়া হতো, আর আমাদের ভাগ্যে যা পড়তো তা আর বিশেষ না বলাই ভাল। এছাড়া কর্তৃপক্ষ সব সময়েই চেষ্টা করতেন যাতে বাছাইকারেরা কি খায়, সে কথা যেন বন্দীরা জানতে পারে। স্যামুয়েল এখন স্বাধীন কেনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাচ্ছে এবং আমার মনে হয়, যদিচ সে মানিয়ানি শিবিরে বন্দিজীবনের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তখন সরকার পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তবু আসলে সে লোক ভালই।

মুরুওয়াকে মারার পর থেকে সে আর আমার সামনে কাউকে মারধোর করে নি বা পারতপক্ষে সে আমার সংগে কথাও বলতো না। আমরা সবাই তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতাম। ছোট ছেলেদের মতো হাতের আঙুলের সাহায্য না নিয়ে সে এক-দুই অবধি গুণতে পারতো না। কেনিয়া সরকার যে কি করে ঐরকম এক পকেট মূর্খকে এতগুলো বন্দীর দেখা-শুনোর ভার দিয়েছিলেন, সেটাই আশ্চর্যের কথা। কিছুদিন পরে আমাদের কয়েক-জনকে ১৩ নম্বর তাঁবুতে পাঠানো হয় এবং সেখানে আমার কয়েকজন পুরনো বন্ধু আমাকে ফিরে পেয়ে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। এখানকার প্রতি-নিধি ছিল কোর্ট হল জেলার আমার [illegible] এক বন্দী, আর তাকে সাহায্য করতো [illegible]।

মানিয়ানির কাছে উড়োজাহাজ নামবার জায়গা তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের আর কায়িক পরিশ্রম করতে হতো না। তাঁবুর অন্য সবাইর কাছে আমি একদিন প্রস্তাব করি যে, আমরা একটা লেখাপড়া শেখার ক্লাস আরম্ভ করলে মন্দ হয় না, কারণ তাতে করে অনেকটা সময় কাটাবারও সুবিধা হবে। আমাদের ভেতর যারা যারা লেখাপড়া জানতো তাদের 'শিক্ষক' নিযুক্ত করা হয় এবং আমাদের ক্লাস চলতো সকাল, কারণ যতদিন আমি মানিয়ানিতে ছিলাম তার ভেতর কখনোই আমরা [illegible] ব্যবহারের জন্য কোন [illegible] পাই নি। তাঁবুর বাইরের খোলা মাঠে [illegible] সন্ধ্যা বাদ; একদল [illegible] আমরা একটা জায়গার [illegible] [illegible] এ জায়গার তাকে [illegible] সমান করে বিরাট এক "[illegible]" তৈরি করি। [illegible] ছিল আমাদের এক [illegible] গাছের [illegible] তাল, তার বুককে কেটে আরও [illegible]

[illegible] করে [illegible] আমাদের এই [illegible] উঠেছে গেছে তাতে লেখার [illegible] হয়েছে, নইলে এর সাহায্যে [illegible] কাজ চলতো বেশ ভালভাবেই। আমরা ছাত্রদের বিদ্যেবুদ্ধি অনুযায়ী কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করি; যারা ছয়, সাত বা আট ক্লাস অবধি পড়েছিল, তাদের আমি পড়াতাম। এছাড়া প্রায়ই আমি সমবেত সবাইকে রাজনীতির ধারা বা সমসাময়িক অবস্থার বিষয় বলতাম। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এইভাবে লেখাপড়া শেখার বন্দোবস্ত করার ফলে আমাদের নিজেদের ভেতর একতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং বাছাইকারদের বিরোধিতা করতেও সবাই সাহস পায়। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্যানিয়েল, যে কি-না আদামকে প্রতিনিধির কাজে সাহায্য করতো, কিছুদিন পরে বাছাইকারদের দলে যোগ দেয় এবং কর্তৃ-পক্ষের কাছে আমাদের 'ক্লাসের' বিষয় জানায়। ফলে আমাকে ১৩ নম্বর থেকে বদলী করে ৬ নম্বরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষের হুকুমে আর 'ক্লাসও' করতে দেওয়া হয় নি।

এসময় [illegible] শুধু কেনিয়া কেন, সারা পৃথিবীর ভেতর মানিয়ানি শিবিরের ৬ নম্বর তাঁবু সব থেকে খারাপ জায়গা ছিল মনুষ্যবাসের পক্ষে। আমি ছাড়া আরও আটজন বন্দী ছিল সেখানে এবং প্রত্যেকেই এক বিশেষ শপথ গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। এ অভিযোগের মূলে অবশ্য কোনই সত্য ছিল না। এখানকার প্রতিনিধি, যে জর্জ কিবোচার পরে নিযুক্ত হয়, মিথ্যাভাষণের দ্বারা সরকারী সহানুভূতি অর্জন করার চেষ্টায় ছিল তার নিজের মুক্তিলাভের আশায়। কিকুয়ু প্রথানুযায়ী মাংস রান্না করার সময় যে চর্বি বেরোয় তা মানুষের গায়ে মালিশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় অষুধ হিসাবে এবং সে সময় মানিয়ানি শিবিরে পেলাগ্রা রোগের প্রকোপ থাকায় বন্দীদের ভেতর অনেকেই ঐভাবে চর্বি নিয়ে নিজেদের গায় মাখতো। আমি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পণ্ডিতদের কাছে জেনেছি যে, এতে উত্তম ফললাভ হয়। আমাদের প্রতিনিধিটি তাঁবুতে চর্বির উপস্থিতি জানতে পেরে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করে এবং তাঁরা শয়নে স্বপনে মাউ-মাউ শপথের কথা ভেবে ভেবে এমন এক তুরীয় অবস্থায় পৌঁছে-ছিলেন যে, লাঠি দেখলেই সাপ দেখার মতো তাঁবুতে চর্বির খবর পেয়েই সংগে সংগে সিদ্ধান্ত করে নেন যে, তাহলে আবার শপথ-দান করা হচ্ছে বন্দীদের ভেতর।

আমাদের তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী [illegible] একজন ইউরোপীয়ান। আমি [illegible] উচ্চারণ [illegible] কিন্তু ওয়েলুস্লের বর্ণনা দিতে গেলে বলতে বাধ্য হব যে, সে মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেই যৌন আনন্দ উপভোগ করতো। তার অধীনে টাংগানিয়্যাকার একজন মুনিয়ামওয়েজি উপজাতীয় আফ্রিকান পেয়াদা কাজ করতো, সেও ছিল এক আকাট মূর্খ। তার নাম ছিল জন্, কিন্তু আমরা তাকে দুটো অন্য নাম দিয়েছিলাম—'ওয়ালিগুনডিয়া' এবং 'ওয়াকারানজা'। আমাদের তাঁবুর কাছে তার আবির্ভাব হলেই আমরা বলতাম "শিগুথুনডিয়া", যার মানে অর্থ হ'ল যে, "সে আসছে"। জন্ একবার জিজ্ঞাসা করেছিল কেন তার সম্বন্ধে আমরা ঐ কথা ব্যবহার করি, তাতে আমরা হেসে উত্তর দিই যে, এর অর্থ হ'ল তুমি একজন [illegible] লোক, তাই তোমাকে আমরা সম্মান করি। জন্ তাতে এতো খুশি হয় যে, আনন্দে নাচতে নাচতে আমাদের তখনি হুকুম দিয়ে ফেলে যেন আমরা সবসময়ই তাকে শিগুথুনডিয়া বলেই ডাকি। আমরা তাকে ওয়াকারানজা বলেও ডাকতাম, কারণ সে প্রথম যে কিকুয়ুর সংগে মেশে তার নাম ছিল কারানজা এবং ফলে তার ধারণা ছিল প্রত্যেক কিকুয়ু পুরুষের নামই কারানজা! জনের বোকামির সত্যই অন্ত ছিল না, কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার কাজের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে গালাগাল দিলেও সে সামরিক কায়দায় পায়ের বুট ঠুকে সেলাম করে বলতো, "ধন্যবাদ আপনাকে, এফিণ্ডি (মহাশয়)"! জন আবার মাঝে মাঝে ইউরোপীয়ান কর্মচারীদের সংগে কথা বলার সময় সোয়াহিলি ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ব্যবহার করতে চেষ্টা করতো, যদিচ ইংরাজীর জ্ঞান তার ছিল না মোটেই। একজন ইউরোপীয়ান কর্ম-চারী একবার রেগে গিয়ে জনের জামার কলার ধরে তাকে চপেটাঘাত করে বলেন, "জন্, কিম বেলেমবেলে চাকো কিরেকু কামা টেরেনি" অর্থাৎ তুমি নিজেকে রেলগাড়ির মতো ভীষণ বেগে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছ। জন তার উত্তরেও একগাল হেসে পায়ের বুট ঠুকে সামরিক কায়দায় সেলাম করে বলে, "ধন্যবাদ আপনাকে, এফিণ্ডি"। বেচারা ১৯৬১ সালে কেনিয়ার উত্তর নায়-অনজা অঞ্চল থেকে বিধানসভার সদস্য হবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু আমাদের সকলের সৌভাগ্য যে, সে প্রচুর ভোটে হেরে যায়। সেখানকার কে· আ·,

নং ইউর সে একজন দলপাতাবিশেষ এখন। আমরা প্রায়ই এই গবেট মূর্খের কথা আলোচনা করতাম এবং সবাই একমত হয়েছিলাম যে, পৃথিবীর কোথাও যদি মূর্খদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, তবে জন্ নিশ্চয় তার প্রথম আচার্য হবার কৃতিত্ব অর্জন করবে!

কয়েকদিন পরে অন্যান্য তাঁবু থেকে আরও কয়েকজন চরমপন্থী বিদ্রোহীকে ৬ নম্বর তাঁবুতে বদলী করা হয়। এতে ছিল স্টিফেন আন্দু (মাউ-মাউর আগে স্টিফেন আরক্ষা-বাহিনীর একজন তত্ত্বাবধায়কের কাজ করতো), ডেভিড আলুয়োক ওকেলো (মধ্য নায়অনজার কে· এ· ইউর ভূত-পূর্ব সভাপতি, এখন কেনিয়ার একজন রাজনীতিজ্ঞ) প্রভৃতি লোকেরা। এদের কেউই কিকুয়ু উপজাতীয় নয়, অথচ এরা সবাই মনে-প্রাণে কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। জন্ ও'ওয়াশিকা নামক মুলুহিয়া উপজাতীয় বিদ্রোহীও আমাদের তাঁবুতেই ছিল। তদানীন্তন কেনিয়া সরকার বিদেশে মাউ-মাউর বিরুদ্ধে এ কথাও প্রচার করেন যে, শুধুমাত্র কিকুয়ুরাই মাউ-মাউ-এ যোগ দিয়েছিল। আসলে কিন্তু যদিচ বেশি-সংখ্যক ছিল কিকুয়ু, তথাপি জালুয়ো, আবালুহিয়া, কিটে়শ, আকমবা এবং মাসাই প্রভৃতি অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ উপজাতীয় লোকেরাও যথেষ্ট পরিমাণেই মাউ-মাউ বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিল এবং এদের ভেতর বেশিরভাগই ছিল চরমপন্থী বিদ্রোহী।

ছয় নম্বর তাঁবুর প্রায় সব নিয়ম-কানুনই অন্যান্য তাঁবু থেকে বিভিন্ন ছিল; আমাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ওয়েলস্ যেন ওপরওয়ালার কাছ থেকে যা ইচ্ছে তাই করার ঢালাও হুকুম পেয়েছিল। তার কাজের বা দুষ্কার্যের প্রধান সহায়ক ছিল ওয়াগিথুনাডিয়া এবং মুকামবা উপজাতীয় আর একজন সৈনিক। অবশ্য তাঁবুর অন্যান্য প্রহরীদের প্রায় সকলের সঙ্গেই আমাদের গোপন ষড়যন্ত্র বা বন্দোবস্ত ছিল বিশেষ রকম সুখ-সুবিধার জন্য এবং এদের কেউই আমাদের সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করতো না। ওয়েলসের নির্দেশে সকাল ছ'টার সময় আমাদের সবাইকে বিছানা ছেড়ে উঠেই তাঁবুর চারিধারে বেগে দৌড়াতে হতো সাড়ে সাতটা অবধি, তারপর আমরা আধ-ঘণ্টার ছুটি পেতাম সামান্য পাতলা জোলজাতীয় জলযোগ করার জন্য। ঠিক আটটার সময় দিনের আসল কর্ম-সূচী আরম্ভ হতো। ওয়েলস্ বা তার দুই অনুচরের একজন সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের নানারকম শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে বাধ্য করতো, যেমন দু হাত মাথার ওপর তুলে দৌড়ান, হাঁটুর তলায় দু হাত চেপে ধরে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকদূর অবধি চলা বা ঐরকম আরও অনেক অস্বাভাবিক এবং কষ্টকরভাবে শরীরকে ব্যবহার করা। বেলা একটা অবধি এইভাবে আমাদের সবাইকে কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করতে হতো। ঐ সমস্তই আমাদের খোলা মাঠে দারুণ রোদের মাঝে করতে হতো, ফলে খানিক পরেই ঘেমে-নেয়ে মাথায় ও শরীরে এতো যন্ত্রণা হতো যে, কোনকিছুই ভাল করে ভাববার বা বোঝবার অবকাশ পেতাম না আমরা। ঢালাও হুকুম ছিল যে, যেখানেই যাই বা যা কিছুই করি, সবসময় দৌড়াতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। একটু চলা কমালেই, অনেক সময় অবশ্য না কমালেও, পরিদর্শকের হাতের লাঠি বা লম্বা রবারের পাইপ সপাং করে এসে পিঠের ওপর পড়তো আমাদের। কোন কিছু করার গতিবেগকে বাড়াতে বাড়াতে শেষকালে এমন অবস্থায় এসে পেঁৗছাতাম আমরা যে, হাত-পায়ের স্বভাবিক সমন্বয় হারিয়ে ফেলে মুখ থুবড়ে পড়তাম ধরণীর কোলে, আর তার ওপর পড়তো পিঠের ওপর আবার এক ঘা, উঠে দাঁড়াবার আদেশে। পাঠকদের অনেকেই হয়তো বিখ্যাত ইংরেজ হাস্যরসিক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমা দেখেছেন, যাতে তিনি স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গিকে বিশেষ দ্রুতগতিতে দেখিয়ে হাস্যরসের উৎপাদন করেন দর্শকদের

ধলে। আমাদের অপরাধীদেরও ছিল প্রায় সেইরকম। শুধু প্রভেদ এই যে, এগুলি ছিল সত্যকার এবং দারুণ কষ্টকর। আমাদের ভেতর অনেকেই আর সামলাতে না পেরে মাটিতে থুবড়ে পড়ার ফলে মুখের কয়েকটি দাঁত ভেঙে চিরকালের জন্য সেই দিনগুলির একটা স্মৃতিচিহ্ন রেখে দিতে সক্ষম হয়েছিল নিজেদের শরীরে।

একদিন এই অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রমের মাঝে আমি একটু দম নেবার চেষ্টা করছিলাম এবং সেটা সৈনিকটির চোখে পড়ায় সে এগিয়ে এসে আমার কানের ওপর কয়েকটি বিরাশি শিক্কার চপেটাঘাত করে। ফলে আমি আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না এবং দুইদিন যাবৎ শুধু লোকের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে তারা কি বলছে তা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। তারপর আমি কানের ভেতর জল ভরে এবং মুখে হাওয়া টেনে কানের পর্দা খোলবার চেষ্টা করি, তাতে একটা কান ভাগ্যক্রমে খুলে যায়। তখন ওয়েলস্ একজন ডাক্তারের সহায়ককে ডেকে আমার অন্য কানে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিয়ে সেটাও খোলবার চেষ্টায় সক্ষম হয়। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে কেনিয়ার উত্তরে অবস্থিত লড্‌ওয়ার বন্দীশিবিরে থাককালীন আমার কান থেকে পুঁজ পড়তে আরম্ভ করে এবং সেখানকার ডাক্তার আমার ওপর ষোলোটি সুচিপ্রয়োগও করেন আমাকে নিরাময় করবার জন্য, তবু এখনো আমি মাঝে মাঝে কানের ব্যথায় কষ্ট পাই এবং একটা কানে ভাল শুনতে পাই না। ওয়েলস্ যাদের বিশেষ অপছন্দ করতো, তাদের সে প্রায়ই সকলের সামনে উলঙ্গ করতো এবং সেই অবস্থায় আর একজন উলঙ্গ বন্দীর ঘাড়ে চাপিয়ে চারিদিকে ঘোরাতো। তার এইরকম হীন, নীচ এবং লজ্জাকর আচরণে আমরা সবাই যেন মরমে মরে যেতাম। একদিন কিমানি নামক এক-জন রাজবন্দী ওয়েলসের আদেশে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সকলের সামনে উঠবোস করছিল, সে সময় ওয়েলস্ নিজে এক বালতি ঠাণ্ডা জল কিমানির পাছায় ঢেলে দেয় এবং পাশবিক আনন্দে হো হো করে হেসে ওঠে।

বেলা একটার পর আমরা 'এটা করো' 'ওটা করো' খেলতাম। এর জন্য আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতাম। কারণ অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম থেকে এই ছেলেখেলা শতগুণে শ্রেয় ছিল। ওয়ালিথুনডাও এই খেলা বিশেষভাবে পছন্দ করতো। কারণ আমরা ইচ্ছে করে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেলায় ভুল করতাম ও সে আমাদের ভুল ধরতে পারলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতো। এইভাবে এই নির্বোধ লোকটিকে খুশি করায় আমাদের সুবিধা ছিল অনেক, কারণ ফলে সেও আমাদের ওপর ভাল ব্যবহার করতো। আমার মনে হয় আমরা সবাই এই লোক-টিকে মনে মনে ঘৃণার থেকে সহানুভূতিই করতাম বেশি। বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের সকলকে তাঁবুর ভেতর ফিরে যেতে হতো, সে দিনের মতো জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করে। সন্ধ্যা ও রাত্রি-কালের নির্ঝঞ্ঝাট সময়কে পাবার জন্য আমরা মনে মনে সারাদিন প্রার্থনা করতাম কাতরভাবে এবং সে বাঞ্ছিত সময় এলে পর একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসে আবার তার পরের দিনের হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তির জন্য শরীরকে তৈরি করে নিতাম। পাঠক গভীরভাবে চিন্তা না করলে হয়তো আমাদের তখনকার অবস্থা ঠিক কল্পনা করতে পারবেন না এবং শুধুমাত্র সাধারণ-ভাবে বেঁচে থাকা, খাওয়া-দাওয়া করে ও খেলার মাধ্যমে নিরুদ্বেগে নিশ্বাস নিয়েই যে কতো আরাম আছে, তাও উপলব্ধি করতে পারবেন না। ঐরকম ধরাবাঁধার ভেতর এবং অস্বাভাবিক জীবনযাপন করায় ক্ষতি হচ্ছিল শাসক ও শাসিত দু'পক্ষেরই; কারণ শাসক অফুরন্ত ক্ষমতার আবেশে হয়ে উঠেছিল পশুরও অধম ও নিষ্ঠুর, যেমন ওয়েলস্ এবং আমরা শাসিতেরা অনেকেই ধীরে ধীরে মনুষ্যধর্ম ভুলে যেতে আরম্ভ করছিলাম। নিজের দেশকে ভাল-বাসার এবং স্বাধীনভাবে দেখতে চাওয়ার অপরাধে আমরা হয়েছিলাম রাজবন্দী, যেখান থেকে নিচে নামাতে নামতে তদানীন্তন কেনিয়া সরকার আমাদের করে তুলছিলেন মনুষ্যরূপী বন্য পশুবিশেষ!

একদিন জন কুলাহিয়া, এম-বি-ই'র পুত্র পল মুচেমিকে ওয়েলসের সহকারী আকম্বা সৈনিকটি এতো জোরে মারে যে, বেচারা পলের মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। আমি এর বিরুদ্ধে নালিশ করে আর একবার চিঠি লেখা মনস্থ করি, যদিও "লেখক" হিসেবে আমার বন্দিজীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা সকল মোটেই সুখপ্রদ ছিল না। অবশ্য ছয় নম্বর তাঁবুতে বন্দী হিসেবে থাকার একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল এই যে, এখানকার কোন প্রহরীর হাতেই লুকিয়ে চিঠি বাইরে পাচার করা সম্ভবপর ছিল না। অনেক ভেবে আমি অবশ্য একটা উপায় বের করি। ছয় নম্বর তাঁবুর কোন বন্দীকেই কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে যেতে দেওয়া হতো না, ফলে আমাদের পায়খানার বালতিগুলি সাত নম্বর তাঁবুর বন্দীরা নিয়ে যেতো পরিষ্কার করার জন্য। আমি মলদ্বার পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত কাগজে আমার নালিশভরা চিঠি লিখে তাকে একটা পায়খানার বালতির তলায় লুকিয়ে রাখি ও সেই সঙ্গে আর এক টুকরো কাগজে সাত নম্বরের সব বন্দীদের অনুরোধ করি যে, তাদের ভেতর যে কেউই এই চিঠিটা দেখতে পাক না কেন, সে যেন তাকে যথা-স্থানে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে। সৌভাগ্য-ক্রমে সাত নম্বরে আমার বন্ধু কমান্ডেন্ট গিথিরন্যার চোখে পড়ে এই অদ্ভুতভাবে পাঠান চিঠি এবং সে যথাকর্তব্য পালন করতে একটুও সময় নষ্ট করে নি। চিঠি-খানি কেনিয়া সরকারের প্রধান কর্মসচিব ও জেলের মহাধ্যক্ষকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছিল। আমি সাত নম্বরের বন্দীদের উদ্দেশ্যে লিখিত কাগজে আরও লিখি যে, আমার মূল চিঠিখানি যেন আরও উপযুক্ত ও ভাল কাগজে নকল করে তারপর পাঠান হয়। কিন্তু আসলে কী হয়েছিল কিন্তু আমি ঠিক জানি না। [ক্রমশঃ]

[পূর্বানুবৃত্তি]
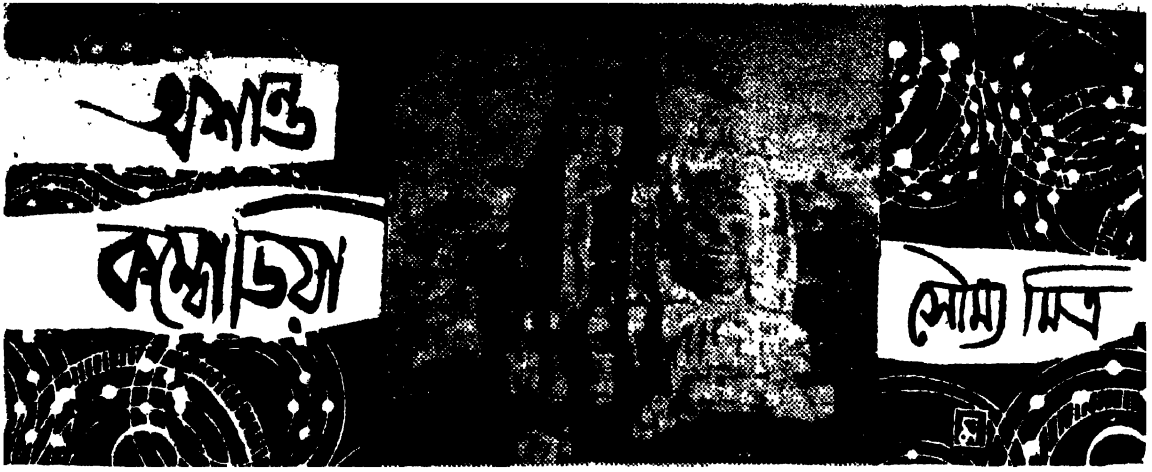
শুরু হল চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির খেলা। দেশটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো কর। দেশের মাটি ভাগ করে মানুষের মনে ভেদবুদ্ধির বীজ পুঁতে দাও। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে শাসন-শোষণের কলাকৌশলের খেলা চালিয়ে যাও, নিরাপদে নির্বিবাদে। আস্ত লাঠিকেই ভয়। ভাঙা টুকরো লাঠিকে ভয় কিসের? তার আঘাত করার ক্ষমতাই বা কতটুকু?

দেশের মাটি বিভাগের চিরাচরিত বিভেদ-কৌশল সম্পূর্ণ হল জেনিভায়। ইন্দোচীনের যুদ্ধশান্তি বৈঠকে। অস্ত্র-সম্বরণ আলোচনায় গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি ফান ভাঙ ডং-এর পাশের আসনে পর পর উপবিষ্ট কম্বোডিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্স নরোদম সিহানুক ও লাওসের প্রতিনিধি প্রিন্স সুভান্না ফুমা ও প্রিন্স সুফান্না ভঙ। তাঁরাও আমন্ত্রিত। তিনটি পৃথক রাষ্ট্রের আলাদা বক্তব্য পেশ করার ও রক্ষাকবচের বিষয়-সূচীও ছিল বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিবরণীতে।

জেনিভায় এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ইন্দোচীনের পার্শ্ববর্তী দেশ চীনের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিল। তবে সে প্রতিনিধি মূল চীনের নয়। ফরমোজায় নির্বাসিত চিয়াং-এর প্রতিনিধি।

গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি ফান ভাঙ ডং কিন্তু বৈঠকের উদ্বোধনের প্রারম্ভে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি বাঘা বাঘা রাষ্ট্রের কর্ণকুহরে তপ্ত সীসা ঢেলে দিলেন। ফাঁস করে দিলেন তাঁদের মনের কথা। গূঢ় অভিসন্ধি।

ইন্দোচীনের মাটিকে টুকরো টুকরো করে তার জাতীয় সংহতি ধ্বংস করার এটা একটা হীন প্রচেষ্টা। একটা দুরভিসন্ধি। দেশ ভাগ করে দেশের মানুষের মধ্যে ভেদবুদ্ধির বীজ বপনের সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কিছু নতুন নয়। এর আগে ইন্দোচীনের মাটিতে এই নাটকের অভিনয় আমরা দেখেছি। ফরাসী ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা যে এই অভিনয়ে পটু তা আমাদের অজানা নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রলয় নাচনে মেতে এই ইন্দো-চীনের দুই বাহু কম্বোডিয়া ও লাওসের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে বসে তারা ভিয়েৎনামের বুকে বোমারু বিমানের তাণ্ডব চালিয়েছে।

আজ ফ্রান্স ও আমেরিকা লাওস ও কম্বোডিয়ার শিবিরে বসে সেই পুরনো অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করতে চায়। অস্ত্রসম্বরণের আড়ালে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সময় অপহরণের কৌশল ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

এ ছাড়া পেন্টাগনের গুপ্ত মানসকক্ষে আরেকটি গূঢ় অভিলাষ উঁকি মারছিল। নয়া চীনকে বেড়াজালে আটকে খতম করতে হলে ইন্দোচীনের ঘাঁটি অপরি-হার্য। তাই কিছুতেই এ ঘাঁটি ফেলে চলে আসা সম্ভব নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দেশকে পুরোপুরি আমেরিকার তাঁবে নিয়ে আসতে হবে। তার রণসম্ভারে ইন্দো-চীনের মাটিকে বারুদঠাসা করে রাখতে হবে। এই-ই ত' সুবর্ণ সুযোগ।

এই সবেমাত্র সেদিন চীনের ঘুম ভেঙেছে। মোটে বছর পাঁচেক হল। এই ত' সুযোগ। তার চারপাশে বিস্ফোরক মাইন পুঁতে রাখতে হবে। ইন্দোচীনের মাটি হচ্ছে সবচেয়ে সরস জমি। টংকিং উপসাগর থেকে জাপানের উত্তরে শাকালীন দ্বীপ অবধি চীনের পুরো দক্ষিণ-পূর্ব ডাঙাটা ত' সপ্তম নৌবহরের কড়া পাহারায় রয়েছে। এখন ইন্দোচীনের ঘাঁটিগুলি হাতে এলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু জেনিভা বৈঠকের উদ্যোক্তা কর্তাব্যক্তিরা ভাবতেও পারে নি যে, অন্যদিক থেকে তাদের প্রাণের সাধে বাধা আসতে পারে। ইন্দোচীনে ফরাসীরা দু'শ' বছর ধরে মানুষের ধন-প্রাণ নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলেছে তার প্রতিক্রিয়ায় সেই সরস জমি যে আজ কঠিন পাথরে পরিণত হয়েছে সেটা তারা মোটেই ভাবতে পারে নি।

ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি ফান ভাঙ ডং বৈঠকে ঢিল ছুঁড়লেন ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধি নরোদম সিহানুক ছুঁড়লেন একখানি আস্ত থান ইট। সদর্পে দাঁড়িয়ে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, স্বাধীন কম্বোডিয়ায় কোন বিদেশী শক্তির স্থান নেই। কম্বোডিয়ার মাটিতে কোন বিদেশী সামরিক ঘাঁটির কথা দূরে থাক, স্বাধীন কম্বোডিয়াবাসীর কোন বিদেশী উপদেষ্টারও প্রয়োজন নেই। আমাদের কোন শত্রু নেই। তাই আমরা মনে করি, আমাদের কোন রক্ষা-ব্যবস্থার প্রশ্নও অবান্তর।

কম্বোডিয়া এক অনুন্নত নাবালক দেশ। তারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে অক্ষম, তারা অপরের মুখাপেক্ষী। সমবেত কোন কোন প্রতিনিধির এ ধরনের মন্তব্য ও ধারণা কম্বোডিয়াবাসী নেহাৎ অপমানজনক বলেই মনে করে। তাই কম্বোডিয়াবাসী এ ধরনের রক্ষা-কবচরূপী প্রস্তাবকে উদ্দেশ্যমূলক বলেই ভাবে। এবং তা ঘৃণার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করছে।

স্বাধীন কম্বোডিয়া চায় প্রতিবেশী দেশ ও বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিশ্ব-মানবের সঙ্গে শান্তি-পূর্ণ সহঅবস্থান। কম্বোডিয়া যেমন নিজ দেশে কোন বিদেশী হস্তক্ষেপ চায় না, তেমনি অন্য কোন রাষ্ট্রেও বাইরের শক্তি এসে হস্তক্ষেপ করুক, তার সম্পূর্ণ বিরোধী।

সিহানুক উপসংহার টানলেন। শোক

মিশ্রিত স্বরে বললেন—বিশ্বের মানচিত্রে রংরেখা বদলানোর খেলায় উৎসাহী রঙবিলাসী বন্ধুগণ, কম্বোডিয়ার মানচিত্রে রঙের ছোপ দেবার বৃথা চেষ্টা থেকে বিরত হোন। কম্বোডিয়া মহান। মহান কম্বোডিয়ার জনগণ।

নতুন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মেঁদে ফ্রান্স প্রমাদ গুণলেন।

ওয়াশিংটনের বড়কর্তা জন ফস্টার ডালেসের সাদামুখ লাল হয়ে উঠল প্রিন্স নরোদম সিহানুকের বক্তব্য শুনে। এ যেন অন্ধকারে বিষধর সাপের ফোঁসফোঁসানি শোনার মত এক চরম বিপদের সংকেত।

হল কি? হাজার হোক সিহানুক রাজপুত্র ত' বটে! তাঁর কপালে জ্বলজ্বলে রাজতিলক। রক্তে কম্বোজ রাজবংশের নীল ধারা। কিন্তু মুখে এ কি বাণী? এ যে কাল কেউটের কণ্ঠস্বর। যেন হান ভাঙ ডং-এর মন্ত্রশিষ্য। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ফরাসীদের ওপর। এরা একশ' বছর ধরে এখানে করেছে কি? বসে বসে শুধু কলসী কলসী শ্যাম্পেন গিলেছে আর দেশে গোছা গোছা চাঁ পাঠিয়েছে। বাক্‌পটুর দল। একটি রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে এরা রাজপুত্র তৈরি করতে পারে নি। তার দেহে-মনে রাজকৌলিন্য ও আভিজাত্যের বাষ্পও সঞ্চার করতে পারে নি। বৃথা আশা। ফরাসীদের ওপর ভরসা করে লাভ নেই। একলাই চলতে হবে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে রক্তাক্ত মুখের স্বেদটুকু মুছে ডালেস সাহেব স্থির হয়ে বসলেন। মনের তূণীরে তীরগুলিকে আরেকবার শাণ দিয়ে নিলেন। সময় আগত। এবার ছুঁড়তে হবে।

এরপর লাওসের প্রিন্স সুভান্না ফুমার ধরি-মাছ, না-ছুঁই-জল নীতির আমতা আমতা কণ্ঠস্বর ডুবে গেল, অপর প্রতিনিধি প্রিন্স সুফান্নো ভাঙ-এর অগ্নিক্ষরা ঘোষণায়। তীক্ষ্ণ শ্লেষে। বিশ্বশান্তির প্রহরীবৃন্দ, মানব-কল্যাণের পুরোহিতরা, আপনারা দয়া করে ইন্দোচীনের মংগলচিন্তায় বিনিদ্র না হয়ে আপন আপন হিতকামনায় মগ্ন থাকুন। ইন্দোচীন একশ' বছর ধরে ফরাসীদের দয়ার পরিচয় পেয়ে আজ কায়মনোবাক্যে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। ফরাসীদের কল্যাণে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা দেশের মানুষ অনাহারী ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। আজ লাওসে বিরাজ করছে শ্মশানের শান্তি। ইন্দোচীন তথা লাওসের নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ আর কারো পাশা খেলার ক্রীড়নক হতে চায় না। তারা আপনাদের শেষ বিদায় জানাচ্ছে। লাওসের বুকে বসে কোন অভিসন্ধির, কোন কলাকৌশলের চেষ্টা করবেন না।

জেনিভা সম্মেলনের মূল কর্তারা টের পেলেন, ধন্য আশা কুহকিনী, এদের কারো ওপর ভরসা করে লাভ নেই। যা হোক, মুখরক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। ঘোষণা কার্যকর করতে হবে আপাততঃ। এখন ফেরার উপায় নেই। দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গ পতনের অঘাতে ফ্রান্সের মাথা এখনো ঝিমঝিম করছে। ইন্দোচীনের 'নোংরা লড়াই' এভাবে বন্ধের চেষ্টা না হলে আখেরে সমূহ ক্ষতি।

ফ্রান্সের অভিপ্রায় ও প্রস্তাবমত

কম্বোডিয়া / গ্রেট লেকে ভাসমান বাড়ি

আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দোচীন ভেঙে তিন টুকরো হল। জন্ম নিল তিনটি রাষ্ট্র। ভিয়েৎনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া। প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য আলাদা আলাদা বিধিব্যবস্থাও কিছু কিছু তৈরি হল, কম্বোডিয়া ও লাওস রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরূপে স্বীকৃত হল।

সব শেষে ডালেস সাহেব ছাড়লেন তাঁর তূণীরের সেরা তীর। কম্বোডিয়া ও লাওসকে সিয়াটোর সদস্য করে নেওয়া হোক। ইংরাজ ও ফরাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ব্যাপার কি? তাঁরা ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চোখে কি যেন কালো ছায়া দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁরা দায়ে ঠেকে নিরুপায়, হাউ-মাউও করতে পারেন না। সিয়াটো (South-East Asia Treaty Organisation) ডালেসের মানস-সন্তান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার রেশমী ফাঁস। আমেরিকা যতই শনৈঃ শনৈঃ এগুচ্ছে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ততই প্রমাদ গুণছে, সিয়াটোর ফাঁসে মার্কিন অজগর তাদের সব গিলে নেবে।

এদিকে জন ফস্টার ডালেসের প্রস্তাব শুনে নরোদম সিহানুক রাগে খাপখোলা তলোয়ারের মত ঝলমলিয়ে উঠলেন। দু'পাশ থেকে গায়ের কোটে টান দিলেন ফান ভাঙ ডং ও প্রিন্স সুফান্না ভাঙ। ধীরে বন্ধু ধীরে। এখানে ভোটের জোর। কারো কারো ইচ্ছাই হচ্ছে এখানে গণতন্ত্র, এখানে বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে হার স্বীকার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। নাটকের পর্দা উঠেছে মাত্র। প্রথমাঙ্কেই কেন বিয়োগান্ত দৃশ্য আনতে চাও! ধৈর্য ধর।

সিহানুক বুঝলেন, এরা গহন বনের শিকারী। কয়েক শ' বছর ধরে সারা বিশ্ব লুটে-পুটে খেয়েছে। অনেক অন্ধি-সন্ধি জানে। হুট করে কিছু করা হঠকারিতা হবে। দেখা যাক, তাদের কূট-কৌশল কোন্ পথে এগোয়। শত্রুর রণকৌশলের গতি-প্রকৃতির সঠিক হিসাব না নিয়ে আক্রমণ চালালে জয়ের চেয়ে পরাজয়ের সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সুদীর্ঘ সংগ্রামে অভিজ্ঞ সেনাপতি, রাজনৈতিক রণকুশলী ফান ভাঙ ডং ও দক্ষ রাজনৈতিক সুফান্না ভং বোধ হয় এই ইঙ্গিতই দিলেন।

তাছাড়া কম্বোডিয়ার জনগণ রাজনৈতিকভাবেও সুসংগঠিত নয়। তাদের রাজনৈতিক চেতনাও খুব বেশি নয়। দীর্ঘদিন ফরাসী শাসনে, শোষণে, নিপীড়নে, নির্যাতনে তাদের মনোবলও তেমন দৃঢ় নয়। ফরাসীদের সম্পর্কে তাদের মনে বিরাগ আছে বটে, কিন্তু তার

বলিষ্ঠ প্রকাশ নেই। সিহানুক মনস্থির করে ফেললেন, অপেক্ষা করতে হবে।

"এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

জাতীয় ভাবে ও চেতনায় তাদের সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক বোধে ও কর্মে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তিনি আত্মস্থ হলেন। দুই অভিজ্ঞ, হিতৈষী সহকর্মী বন্ধুর শ্বেত-সংকেতে চুপ করে গেলেন। বুঝলেন এঁরা কি বলতে চান। পথ দুস্তর, বন্ধুর। অনেক চড়াই উৎরাই পার হতে হবে। বৌহিসেবী পদক্ষেপে অনেক বিপদ হতে পারে।

তারপর দুদিকে রণক্ষেত্র প্রসারিত করাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকার সম্মিলিত শক্তি এখনো নিঃসন্দেহে অমিত, প্রবলতম। এরা অর্থ, অস্ত্র ও কূটকৌশলে পরাক্রান্ত। কম্বোডিয়ার অগ্রগতির পথে এরা প্রবল বাধার সৃষ্টি করবে। নানাভাবে প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি করে তার উন্নয়নে প্রতিকূল আচরণ করবে। কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে পরমুখাপেক্ষীও কিছু কম নেই। প্রতি পদে এরা ছোবল মারার চেষ্টা করবে।

এরপর দীর্ঘদিনের ঝিমিয়ে-পড়া কম্বোডিয়ার ঘুম ভাঙানো কি সহজ ব্যাপার? অনেক, অনেক কঠিন সে কাজ। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে এক ভূমিকম্পের আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে। সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। নতুবা ফুটো কলসীতে জল ভরার মতই তা বৃথা হবে।

সিহানুক যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। চিন্তায় সূত্রকে প্রসারিত করে দিলেন আগামী সম্ভাবনার দিকে। কম্বোডিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। সব ভেবে বিদ্রোহী ইচ্ছার রাশ টেনে বিরোধের ইতি টানলেন।

মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার রেশ রেখে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন মেঁদে ফ্রান্স। চেয়ার ছেড়ে হল থেকে বাইরে আসতেই মন খচ্ খচ্ করতে লাগল। কি যেন অসমাপ্ত রয়ে গেল। আরো কি যেন করার ছিল, অথচ করা হল না, এমনি একটা অস্বস্তি ভাব। ফরাসী প্রধান-মন্ত্রীর মনের অন্ধকার কক্ষে বাঁকা তলোয়ারখানি আবার যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। ভিয়েৎনামকে কেটে দু' টুকরো করতে হবে। সতের সমান্তরাল রেখা বরাবর কেটে দুই ভাগ করতে হবে। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দু' ভায়ের সম্পূর্ণ আলাদা সংসার। কথাটা মনে হতেই ভেদবুদ্ধির বাঁকা ফলায় শাণ দিতে লাগলেন ঘন ঘন।

এ না হলে আর ফরাসী বুদ্ধি! কিন্তু ফস্টার ডালেসের সিয়াটোর কথা মনে হতেই আবার মুষড়ে পড়লেন। সিয়াটোর কল্যাণে ডলারের বন্যা বইতে শুরু করবে এবার। তা হলে আর রক্ষা আছে? ফ্রাঁর সাধ্য নেই সেই বন্যা রোধ করার। ইংরেজ দোসরও যেন এই আভাস দিয়ে গেল, এবার তুমি তৈরি হও। ইন্দোচীনে তোমার বিদায়ের বাঁশী বেজে উঠেছে। হংকং, সিঙ্গাপুর আর মালয়ের ভাবনায় আমারও শিরঃপীড়া শুরু হয়েছে।

বললে কি হয়? কথা আর কাজ দুটো সব সময়ে একই সীমারেখা ধরে চলে না। নির্ভেজাল ইচ্ছাই হচ্ছে মূল কথা। সারা ইন্দোচীন জুড়ে ফরাসী ফ্রাঁর আসন পাতা। তার জলে-স্থলে বনে-পাহাড়ে কঠিন, নরম মাটির পরতে পরতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শেকড় পোঁতা। টান মারলেই তার মূলোৎপাটন হবে? অত সোজা? আর এই সমূলে উচ্ছেদের সদিচ্ছা কোন আশ্রমের বাণীর তালিকার শোভা বর্ধন করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের অভিধানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গ পতনের পর ফরাসীরা ইন্দোচীনের নোংরা লড়াই-এ না হয় আর তেমন উৎসাহী নয়। কিন্তু সে তো উত্তর ভিয়েৎনাম অঞ্চলে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অঞ্চলে কি হবে? সেখানে যে ফরাসীদের কোটি কোটি ফ্রাঁ অবাধে খাল-মল করছে। বিরাট বিরাট রবার বাগিচা, টিন ফ্যাক্টরী, পেল্লাই পেল্লাই বার, রেস্তোরাঁ, আমদানী-রপ্তানীর একচেটিয়া মালিকানা, সব বললেই হুট করে ছেড়ে আসা যাবে? এ যে ফরাসী বর্ণাঢ্য বৈভবের হৃৎপিণ্ড। দেশে দেশে সুখ্যাত ফরাসী বিলাস-ব্যসনের দৌলতখানা।

ফরাসী কূটকৌশল সক্রিয় হয়ে উঠল। চাম বংশের সামন্তদের কথা মনে হল। এদের কাউকে শিখণ্ডী খাড়া করে ভিয়েৎনামের দক্ষিণ ভাগের দাবি তোলা যায় অনায়াসে। প্রস্তাব আসতেই মেঁদে ফ্রান্স নড়েচড়ে বসলেন। উত্তম কথা। অথর্ব, অপদার্থ বাও দাইকে এভাবে পুষে লাভ কি? প্যারিসে সৌখিন হোটেলে বসে বাও দাই দিনরাত সাকী আর সুরা নিয়েই তো মত্ত। মরা হাতীটাকে এবার কাজে লাগানো যাক। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হল।

জেনিভা অস্ত্রসম্বরণ চুক্তি সম্মেলনের চুক্তিপত্রে সইয়ের কালি তখনো পুরোপুরি শুকোয় নি। বাও দাই-এর দাবিপত্র পেশ হল জেনিভায়।

সম্মেলনের অধিকাংশ সদস্য কালো গগলস পরেই এসেছিলেন। তাঁদের চোখের হাসি অদৃশ্যই থেকে গেল, কিন্তু কণ্ঠের সরব ঐকতান ধ্বনিত হল সমর্থনের সুরে।

সতের অক্ষরেখা বরাবর ভিয়েৎনাম ভেঙে দু' টুকরো হল। উত্তরের রাজধানী হল হ্যানয়, দক্ষিণের হল সায়গন। ফরাসী-দের তাঁবেদার বাও দাই হল দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের রাষ্ট্রপ্রধান। ফরাসী স্বার্থ আপাতত রক্ষা পেল। কিন্তু ইন্দোচীন ভেঙে কার্যত চার টুকরো হল। উত্তর ভিয়েৎ-নাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস, কম্বোডিয়া এই চারিটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল জেনিভা সম্মেলনের ফলশ্রুতি হিসাবে।

[ক্রমশঃ]

মানুষ যা চায়, তা পায় না। আবার যা পায়, তাও নাকি চায় না! কেমন ফ্যাসাদ বলুন দেখি? আমার তো মশায় জীবনটাই বরবাদ বলতে পারেন, এই পাওয়া-না-পাওয়ার মামলা মেটাতে। কিন্তু সমাধান পাই নি আজও। সমস্ত ব্লাইন্ড লেনেরই নাকি হাল হলো তাই। দেখা যায় তো ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় তো ভাবতেও পারা যায় না।

জিতেনবাবু থাকেন গ্রামের এক গঞ্জে। কংগ্রেসকর্মী নামে খ্যাতি আছে তাঁর। ছুটে এলেন আমার কাছে। চিন্তার কথাই বটে! কোন দোষ নেই বেচারার, একমাত্র খদ্দর পরা ছাড়া। আমি অবশ্য তাতেও মাথায় হাত দেবার কারণ দেখি নে। কারণ আমাদের এই মিনি শহরেও খাদির টুপী মাথায় দেবার অপরাধে একদিন নরু পালের সে কি দুরবস্থা! শেষ রাত্রে পুলিশ তাদের ঘরবাড়ি ঘিরে ফেলল। তারপর অন্নাসীর নামে তছনছ করল সারাদিন। নরু ছিল স্কুলের ছাত্র। অর্থাৎ খদ্দর তো কেবলমাত্র একটুকরো কাপড়ই নয়, খদ্দর ছিল এ দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জের নিদর্শন।

গ্রামের জন্য দীর্ঘদিন চেয়েও কতটা করা গেছে, কি যায় নি, আমার চেয়েও জিতেনবাবুই তো ভাল জানেন। আজীবন গ্রাম্য জল-হাওয়াতেই মানুষ। আমার মত শহর ও গ্রামের সমন্বয়ে ফিরিঙ্গি বা খিঙ্গি হয়ে গড়ে ওঠেন নি তিনি। যদিও কমিউনিস্ট নামে একটা খ্যাতি এবং কুখ্যাতি দুই-ই আছে আমার। মামলাটাও তাতেই হয়েছে জটিল। নইলে মানুষই যায়-আসে মানুষেরই কাছে। অত সব ভাবনা-চিন্তার কি আছে তাই নিয়ে?

জিতেনবাবু বললেন, আমাদের রাস্তাটার আর গতি হলো না। কংগ্রেস গিয়ে এবার তো আপনাদেরই পালা। তাই এলাম সরাসরি আপনার কাছে। আমাদের যখন সরকার ছিল, দাবি-দাওয়ার নামে অনেক গালমন্দও তখন হজম করেছি। কাঁচা সড়কের বুকে খানাখন্দই কেবল বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া এক ট্রাক পাথরও পড়ে নি। মেটালিং তো দূরের কথা। এই সেরেছে! বিনা নোটিশেই বুকটা দুরুদুরু কাঁপতে থাকে আমার। যুক্তি অবশ্য ছিল। অনায়াসেই ঝেড়ে দিতে পারতাম। বান বান, বিশ বছরের নরক রাতারাতি সাফ করা যায় না। কিন্তু ভুক্তভোগীর ভোগান্তি বলে একটা কথা আছে না? গেঁটেবাতের মতই কোত্থেকে সেটা টন-টন করে উঠল। জেলার মধ্যে মাত্র একটা রাস্তাও যদি পাকা করার সুযোগ আসে, অনায়াসেই ঝেড়ে দিতে পারতাম। বান, রিটি পাবার যোগ্য। সারা জেলায় একটা রাস্তাও কি হবে না এক বছরে?

জিতেনবাবুরই জয় হলো। অঞ্চল-প্রধান হিসেবে এতকাল ধরে যত করেসপন্ডেন্স করেন, তা ছাড়া বিধান-সভাতে পর্যন্ত কত কি কথা হয়েছে এই নিয়ে, সব তিনি গছিয়ে দিয়ে গেলেন। আমার অবস্থাটা তখন যদি দেখতেন? ঠিক বর্শাবিদ্ধ বরাহের মত। ঘরের বেড়া ধরে সামলে গেলাম—অতি কষ্টে। এত ঘাবড়াবার যে কি আছে, তাই বা কে দেখতে গেছে? ওদের যখন সরকার ছিল—আমরা চেয়েছি। এখন আমাদের যদি সরকার, ওরাই বা তবে ছাড়বে কেন? হঠাৎ প্রজা থেকে একেবারে রাজা হওয়ার অনভ্যাসঘটিত নার্ভাসনেসই সম্ভবত যত গণ্ডগোলের মূল।

কেবল কাগজপত্রই নয়, খোদ কানুন তৈরি কারখানার এক মাননীয় সদস্যকেও পাকড়ে নিয়ে মন্ত্রীসমীপে হাজির করলাম। মক্কেলের জন্য প্লিড করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি তিনি। কিন্তু যুক্তি-তর্কের ঢাকনা খুলতেই স্বয়ং মন্ত্রীমহোদয়া কবুল করেন—রাস্তাটার হাল-হকিয়ৎ সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। কথা হলো টাকার। কেবল ষাট লক্ষ মাত্র টাকা পাব সারা বছর পাকা সড়ক করতে। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরব, আপনারাই বলুন? আমরা তাই স্থির করেছি, জেলায় জেলায় সর্বদলীয় কমিটি করব প্রতিনিধিদের নিয়ে। যেটা তারা করতে বলেন, সেটাতেই হাত দেব।

যাকে বলে বুনিয়াদী গণতন্ত্র। অকারণেই খুশি হলাম তবু। উঠে পড়লাম ধন্যবাদ জানিয়ে। জিতেন-বাবুর মুখখানা অকস্মাৎ মনে পড়ল আমার। গোলাকৃতি দেখতে। ভাবতে গিয়ে আমার মুখের জিওগ্রাফিতেই লম্বা টান ধরেছে টের পেলাম। ঠিক ঝুলে পড়েনি তখনও। তবে বিতর্কিত পাঁচ মাইল পথটার সবাইকে টেক্কা দেওয়া শেষ। পঞ্চাশ মাইলে দাঁড়িয়ে গেছে তখন। মাত্র কয়েকদিনের কথা—পিছলে গিয়ে ডোবায় পড়ে কাঁচ একটি ছাত্র অকালমৃত্যু বরণ করল। মানুষের মনে তাতে ভাবান্তর ঘটল। একবাক্যে সবাই বললেন, পথঘাটই যখন নেই, স্কুল দিয়ে কি হবে? উগ্রপন্থী যুবকটিও ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলেন তাঁদের। বেকার বসে থাকার জন্য ঘটা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী নিতে কে যায়? 'কামান দাগো, তোড় দাও' বলে তাদের একটা থিওরী আমার জানা আছে। বিরক্তিতে ওরাও আবার ঐ দলে ভিড়ে পড়বে না তো? আইন-শৃংখলা রসাতলে যাবে যে!

বিধানসভার আজ যিনি খ্যাতনামা অধ্যক্ষ, সদস্য নির্বাচনের পর প্রথম এসে তিনি ভেতরে ঢুকলেন। রোম্যান কারুকার্য আর গঠন-নৈপুণ্যে আঁতকে উঠলেন তিনি। 'এখানে বসেই নাকি দেশের ভাল করতে হয়! মনে থাকবে তো? এ যে দেখছি কেবলই ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখবার ব্যবস্থা!'

মন্ত্রী [illegible] টাকা [illegible] তাই কাজটির কথা আছে। জিজ্ঞাসাবাদ তাতেই হয়ত অন্তরে থাকবেন কথা-রীতি। আপনাদের বাদ দিয়ে কাজটি হবে কাকে নিয়ে? বলবেন তিনি। সরকারে আসার স্বাদ অনেকটাই আমার তখন পানসে হয়ে গেছে।

মন্ত্রী নিজে আসছেন জেলা থেকে। খবর মিলতেই ছুটে গেলাম আমি মস্ত এক অভিযোগ বগলদাবা করে। রেললাইনবিহীন তুফানগঞ্জ মহকুমা। ভাটিবাড়িগামী দশ মাইল পাকা রাস্তাই কেবল পারে মহকুমা কেন্দ্রের সাথে জলপাইগুড়ির সীমানান্বিত রেল স্টেশনকে যুক্ত করতে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস· পি· সমাদ্দার এবং মহকুমা শাসক শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ। অনেক করে রাস্তাটার জন্য তাঁরা বরাদ্দ এনে দিয়েছিলেন। কাজ প্রায় শেষ, তাও আজ তিন-চার বছরের কথা। কিন্তু সামান্য একটা বাড়ি পথের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে অসামান্য ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে। নড়েনি আজ পর্যন্ত। ক্ষতিপূরণের টাকা ছাড়া নড়বেও না বলে দিয়েছে। না হলেও একটা নোটিশ তো আসবে? কত তার টাকা? পাঁচ কিংবা ছ' হাজার? যে দেখবে, তারই মাথা ঘুরে যাবে। আগাগোড়া এতবড় রাস্তার মাঝখানে এতটুকু কাঁচা এবং বন্ধের জন্য যানবাহন চলাচলের দায় থেকে মুক্ত! পাকা অংশ মেরামতিতে বছর বছর খরচ কত? কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা! বিনিময়ে ঘাস গজিয়ে গেছে দেখতে পাওয়া যাবে। একঘর লোকের সামনে একেবারে তিক্ত ভাষায় বুঝিয়ে দিলাম, কি আমি বলতে চাইছি। মূলধন দশ-বারো লাখ, ডিপ্রিসিয়েশন বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা। মুনাফার নাম ঘাস? হেসে ফেললেন অনেকে।

ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি কেন? এ-ডি-সি কোচবিহারকে চেপে ধরলেন মন্ত্রী। আপনারাও যদি এমন করে বলেন।—আমাকে বললেন তিনি।

পনের দিনের মধ্যেই আমি এটা মিটিয়ে দেব। মিঃ সাহা কবুল করেন। পি-ডাব্লিউ-ডি রোডস্ থেকে উপস্থিত ছোট-বড় দেবতা এবং উপদেবতার অনেককেই সোৎসাহে ঘাড় নাড়তে দেখা গেল। মৃদু হাসেন কেউ কেউ। খুশি হলাম আমিও, একটা কাজ অন্তত সমাপ্ত হবে তবে! তুফানগঞ্জের দক্ষিণেও ঠিক একই কাণ্ড! সোজা চলতে চলতে অকারণেই একটা পাক খেয়েছে বালাভূতের রাস্তা। আর ঠিক এখানেই তাকে জুতে পেয়েছে। শহর থেকে দু' মাইলও হবে না দূরত্ব। আর এক-[illegible] বাড়ি। [illegible] [illegible] ভিটা। পাশাপাশি [illegible] আছে [illegible] বাঁশ [illegible]। [illegible] প্রতিবন্ধক নেই সেখানে। শুধু ঐ বাড়িটিকেই উঠতে হবে কেন, রাস্তাটাই যে কেন অকেজো হয়ে পড়ে আছে? বাস্তুকারদের একজনকেও দেখলাম না জবাব দিতে। তবে [illegible] তাঁরা করে দেবেন ভরসা দিলেন একটা।

[illegible] কেটে গেছে ভাইয়ে-ভাইয়ে [illegible]। দুজনেরই সম্মতি নিয়ে বিবৃতি এসেছে। পত্তন হয়েছে সম-[illegible]। জিজ্ঞাসাবাদকে দেখব তবে আমি এখন পালিয়ে ফিরি। [illegible] রাস্তাগুলোই আমাকে একবার ছুঁইয়ে মারবে দেখছি।

মিঃ সাহা তখনও কোচবিহারেই আছেন। দেখা হতেই ধরে ফেললাম। আমার রাস্তা?

বসুন। রিসিভারটা তুলে নিলেন তিনি। আমি এ-ডি-সি বলছি। হ্যালো? ভাটিবাড়ির রাস্তাটার কি হলো? এখনও নাকি আগের মতই রয়েছে?

—মাত্র পনেরটা দিন বাকি এখনও ফসল পাকতে। ধান কাটা হয়ে গেলেই ডাইভার্শান করে দেব স্যার। অপরপক্ষ জবাবদিহি করেন।

তার জন্য জমি এ্যাকোয়ার করতে হবে না? অরিজিন্যাল নক্সা বাতিল করবে কে? সব বোগাস্! উঠে পড়লাম আমি।

—আমাদের ডি-সিকে দিয়ে জলপাইগুড়ির ডি-সিকে বলে দেখব। জায়গাটা আবার জলপাইগুড়ি কি না! মিঃ সাহা হাসিমুখেই অভয় দিয়ে বললেন।

চার-পাঁচ বছর আগের কথা। সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পি-ডাব্লিউ-ডি এবং ডেপুটি কমিশনার জলপাইগুড়ির মধ্যে কথাবার্তা চলছে। 'বাড়ির জায়গাটা এ্যাকোয়ার করে দিন' বললেন এস-ই।

কি হবে ওখানে? ব্রিজ-ব্যারেজ, না কোন ফ্যাক্টরী?" ডি-সি জবাব দিলেন।

'—আমি টেকনিক্যাল অথরিটি বলছি, এই তো যথেষ্ট!"

'অ্যাম্ আই ইয়োর সাবর্ডিনেট?' দি ম্যাটার এন্ডস্ দেয়ার!

লেগে গেল কুরুক্ষেত্র। এখন কে হার স্বীকার করে কার কাছে? কেরানীটি সংগোপনে বলতেই আমার চক্ষু একদম চড়কগাছ! এদের কি জন্য বলে কোন বস্তু আছে, যার কোনদিন পরিবর্তন হবে? না চোখে আছে পর্দা?

কয়েকটা স্ন্যাপ নিলাম ভাটিবাড়ি রাস্তার, ডেড্লক্ জায়গাটার। দৈনিক যুগান্তরের স্থানীয় সংবাদদাতাও অবাক করলেন ব্যাপারটা। সংবাদ ছাপলেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তিনি।

[illegible] তাই। আর কোন্ পথ আছে খুঁজে দেখছি। ডি-সি এবং এস-ই—[illegible] তুলে ধরলাম আমি। তার [illegible] একটি [illegible]।

ল্যান্সডাউন হল-এ মুখ্যমন্ত্রীর [illegible]। [illegible] এবং [illegible]কারীদের [illegible] জেলার বড় হাই সার্কেল। নাগরদোলায় [illegible] কে কি [illegible] তার [illegible] পঞ্চকাল [illegible]। ফাঁক পেয়ে আমিও ঢুকে পড়লাম গিয়ে। দুর্গম রাস্তায় দুরবস্থা, [illegible] [illegible] তখন তেড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একটা ছেড়ে তিনটে হয়েছে তার ওপর। সমাধানের নামগন্ধও নেই।

ভদ্র ভাষায় একান্ত ভদ্রভাবেই মুখ্যমন্ত্রী বলছেন—জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার করুন। অহেতুক একদিনের জন্যও ঘুরাবেন না কাউকে। কাজ ফেলে রাখবেন না কেউ। একটা দরখাস্তের যথাসময় প্রাপ্তিস্বীকারেই অনেকে দেখবেন সন্তুষ্ট হবেন। মনে রাখবেন, টাকা-পয়সা আমাদের নেই। এবার বলুন আপনাদের কথা। বসে পড়লেন তিনি, উঠে দাঁড়ালেন ডি-সি। আপনারা বলুন কার কি বক্তব্য আছে।

কেউ উঠছেন না। পুনরায় তাগিদ দিতেই একজনকে দেখা গেল। সবার নজর এখন তাঁর দিকে।

কে আপনি, কি করেন, পরিচয়টা বলুন। তাঁদের প্রশ্ন।

ভিক্টোরিয়া কলেজের একজন প্রফেসার। আমাদের স্যার, কোয়ার্টার নেই। শহরেও বাড়িভাড়া একদম পাওয়া যায় না। ব্যাচেলারদের তো কথাই নেই। কিছু একটা না করলে খুবই অসুবিধে। শেষ করলেন তিনি। ঐ বসাই বসা। কেউ আর মাথা তোলেন নি তারপর।

সে কি কথা—একদম মুখ খুললেন না কেউ? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম। চিফমন্ত্রীর খাতা হাতে পাশে কে বসে আছেন খবর রাখেন? পাল্টা প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

চীফ সেক্রেটারী মিঃ এম· এম· বসু। কি হয়েছে তাতে?

'দাদা, মন্ত্রী আসে মন্ত্রী যায়, কিন্তু থাকেন শুধু এঁরাই! তবু বলছেন মাথাটা কেন এগিয়ে দিলাম না?' প্রেমিসেস্ ত্যাগ করে চোখের পলকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

হাঁ করে শুধু চেয়ে থাকলাম আমি। দীর্ঘটা গভীর হবে কত?

নো মেনসন প্লিজ

পেট্রোল পাম্পে গাড়ি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম মিষ্টি কণ্ঠের রিণঠিন স্বর : অঃ, হ্যাঙ্ক ইউ!

শেষ মাত্রায় টান দিয়ে ধন্যবাদ গ্রহণকারী প্রায় বিগলিতস্বরে উত্তর দিচ্ছিলেন : দ্যাটসল, দ্যাটসল; নো মেনসন প্লিজ!

পরেশ সামনের সীট থেকে তার বোয়াল মাছের মতো মুখটা আকর্ণ বিস্তৃত করে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি পরমুহূর্তে পাম্প-স্টেশনের কাঁচের ঘরে মিঠে-কণ্ঠীকে অনুসরণ করলে আমিও তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম।

টিকটিকে মুখ, ছিপছিপে চেহারা। দেড় বিঘত খোঁপা ত্রিভুজের মতো মাথাটাকে লম্বা করে পেছনদিকে টেনে নিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে শাড়ির প্যাঁচ আদি মিশরীয় সুন্দরীর দেহলতা স্মরণে আনে। লেটেস্ট পার্ক স্ট্রীট মডেল। শুধু সাজে নয়, সুন্দরী বটে। সাজের দরুণ মডার্ণ আর্ট।

পেছনের সীট থেকে প্রশ্ন করলাম : নতুন দেখছি?

: নিত্য নতুন দেখবি। শিউশরণ, উতারো!

ব্যস্তভাবে পরেশ নেমে পড়ল, সঙ্গে ড্রাইভার শিউশরণ। পরেশ বললে : খোল্! একটা ফ্রি ম্যাট নিয়ে আসি অফিস থেকে।

লক্ষ্য করছি, বিগলিত হাস্যে পরেশকে অভ্যর্থনা করছেন এবং কামরার গর্ভস্থ সুন্দরীর প্রতি তর্জনীর ইঙ্গিতে আকর্ষণও জানাচ্ছেন স্টেশন ম্যানেজার।

এমতাবস্থায় হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে না এমন পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় কম। রাগ আমারও হচ্ছিল, চাপা রাগ। আচ্ছা, তাহলে এই জন্যই পরেশচন্দ্র তাড়াহুড়ি নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। মনে হচ্ছে, সুকণ্ঠী তরুণী তার পূর্বপরিচিতা। কিছু উপঢৌকন প্রাপ্তিও জুটছে নাকি? কী যেন গ্রহণ করছে সে প্যান্টের পকেটে। কয়েকটা শাণিত গালিগালাজ কণ্ঠতালু শুকিয়ে দিচ্ছে। ছোকরা একবার ফিরলে হয়।

আশ্চর্য, পরেশ কিন্তু স্বার্থপরের মতো দেরি করল না, বরং ততোধিক, তার সঙ্গে সেই তরুণীও আমারই দিকে এগিয়ে আসছেন। ব্যস্ত পদক্ষেপ। দূরে থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চোখেমুখে কেমন একটা মধুর আপ্যায়িত হাসি পরিধি বিস্তার করে চন্দ্রবলয় অধিকার করছে ক্রমশ। আর হাতে ওটা কি? আমার জন্যও কিছু উপঢৌকন? শিউশরণের হাতে তো ফ্রি রাবার ম্যাট।

আরও গোটাদুই পদক্ষেপ নিকট-বর্তিনী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল। এতোক্ষণের ক্ষোভটা মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার গলায় কণ্ঠকাছি (ইংরেজের ফেলে-যাওয়া বকলেস—নেকটাই) নেই। ফাঁস আলগা করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সুযোগ বাড়াব তার উপায়ও নেই। সীটের মধ্যে নিরুপায়ে সেঁধিয়ে যেতে লাগলাম। সর্বনাশ, যা উপঢৌকন ভেবেছিলাম, এখন টের পাচ্ছি, তা উর্ণনাভের জাল। জাল পাতা ভুবনে মক্ষিকার মতো আমি গ্রাসিত হতে চলেছি।

গাড়ির জানালায় পরেশ হাতটা প্রসারিত করে ধরল : হি ইজ মিঃ মিত্র, এ গ্রেট জার্নালিস্ট। ইউ নো, ওয়ান অফ হিজ বুকস্ হ্যাজ অলরেডি বিন পিকচার্ড। এ্যানাদার ইজ গোইং টু বি পিকচার্ড ভেরী সুন।

ভেতর থেকে অন্তরাত্মা চীৎকার করতে চাইল, 'এই পরেশ, কী সব আবোলতাবোল বকছ?' পার্ক স্ট্রীট 'বার'গুলো এখনো বহুৎ দূরে। কিন্তু পারলাম না। পরেশের মুখ চেয়ে পারলাম না। কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ গুলিস্তান পার্ক স্ট্রীটে পরেশ নিজেকে ফুল মার্কসে পাশ করিয়ে নিতে চায়। সুন্দরীর সামনে তার চেতানো বুক, স্ফুরিত বদন চুপসে দিতে পারলাম না। কথাগুলো না শোনার ভান করলাম মাত্র। শোনাও মিথ্যাচার। জার্নালিস্ট বটে, তবে 'গ্রেট' তো নই-ই, বরং কত ক্যারেটের খাদ মেশানো এখনো তার হিসাব অসম্পূর্ণ। বই আছে, কিন্তু চিত্রায়ণের সুদূর সম্ভাবনা দিবাস্বপ্নেও দেখায় না। অথচ অম্লানবদন পরেশ গুলোমতে ভাসিয়ে দিচ্ছে মোবিলাক্ত পেট্রোল পাম্প।

কিন্তু কাব্য করবার সময় সীমিত। দেড়হাতি খোঁপা বাইরে রেখে চন্দ্রানন তখন জানালার অর্ধ চৌকন অধিকার ক'রে ফেলেছেন। আমার দিকে এগিয়ে ধরেছেন ছাপা একশিট কাগজ। আড়-দৃষ্টিতে আগেই দেখেছি ও-টা এক সাবান কন্টেস্টের এনট্রি ফর্ম। ফিল্ম স্টারের কয়েকটা কাটা মুণ্ড এখানেও আদেখলার মাথা খাওয়ানোর জন্য সযত্নে সাজানো হয়েছে।

: প্লিজ টেক থ্রি পিসেস। ইটস্ এ্যান ইন্টারেস্টিং কন্টেস্ট। সেই মিষ্টি-কণ্ঠ এখন তিক্ত-কষায়-কটু রসত্রয়ী বিতরণ করছে কি না ভেবে দেখিনি।

দুবার ঢোঁক গিলে বললাম, মাফ করবেন, টয়লেট প্রতিযোগিতায় কেন, কোনোরকম প্রতিযোগিতায়ই যোগ দিই না আমি।

সুন্দরী নাছোড় : ট্রাই দিস সোপ। ফ্রেশ স্মেল এন্ড অল দ্যাট য়ু ওয়ান্ট। ইউ মাস্ট বাই থ্রি পিসেস।

আমি যত মাথা নাড়ি, সে-ও তত মাথা ঝাঁকায়।

আমি যত বলি তারে : তোমার ঐ ফিল্মী স্টারে আমার অনাস্থা।

মুখপানে চেয়ে বলে : নো, নো, নো! য়ু মাস্ট!

ইউ মাস্ট টেক টু, ইফ নট মোর।

জ্যালা যন্ত্রণা। বাঙালী সুন্দরী তার বাঙালী ক্রেতাকে ইংরেজিতে সাবান বেচবেই। গুলিস্তান পার্ক স্ট্রীট এমনি এক চিড়িয়াখানা। এখানে কেতাদুরস্তরা পদপাত করলেই মাতৃভাষা বিস্মৃত হন। বিশ বৎসরাধিককাল ছেড়ে-যাওয়া ব্রিটিশ প্রভুর মাতৃভাষা এখানে ঠোঁটের আগায় খাবি খায়। পরেশও ইংরেজী বলে, আমাকেও ইংরেজীতে উত্তর করতে হয়। গলদঘর্ম কেনাকাটা।

সুন্দরীর হাতের সাবান আমার থুতনি বরাবর তীরবেগে এগিয়ে আসছে। আমি সাঁটে সেঁধিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা আঁটছি, কিছুতেই না। সুন্দরীতে ধরালেই সুড়সুড় করে কিনে ফেলা তোমার সাজে না হে 'গ্রেট জার্নালিস্ট'। শক্ত হও, শক্তিময়ীর শরণ লও!

এবং আশ্চর্য, আমি কিন্তু সত্যিই নিলাম না। দেখলাম, হতাশ সুন্দরীর যেন রিক্ত টয়লেট বিমর্ষ কর্তব্যে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু বা বিস্মিত অবাক। ইতিপূর্বে এমন দেহাতী এ্যাম্বাসাডার-বাহন মত্ত পুরুষ তিনি হয়ত সাক্ষাৎ করেন নি।

অপ্রস্তুত পরেশ। শিউশরণ উদাস।

অবস্থাটা হাল্কা করার জন্য পরেশ জানাল, 'গ্রেট জার্নালিস্টদের ব্যাপারই আলাদা। উনি আবার আসবেন এবং ডজনখানেক নিয়ে যাবেন। আজ একটা ভেরি ইম্পর্টান্ট কনফারেন্সে যেতে হচ্ছে। নেভার মাইন্ড।

গাড়িতে গুলামুত বর্বরের জন্য পরেশকে ভর্ৎসনা করলে সে পুনশ্চ তার বিশাল হাসিতে পার্ক স্ট্রীট সচকিত করে বললে : আরে যেখানকার যা যে নাহি করে, বৃদ্ধ বয়সে তাকে ভীম-রতি ধরে। দেখছিস না, চাল আর ফাটকাবাজিতে টিকে আছে এ তল্লাট। গাড়ি ছুটলে মনে হয় ফাঁকা রাস্তা চপ চপ করছে। সব ফাঁপা। মেয়ে-মাথার চুড়োচুলের মতো।

আমি ভাবছিলাম, গতকাল দুপুরে খেদানো সেই জীর্ণবসনা ফেরিওয়ালীর কথা। প্রচণ্ড দ্বিপ্রাহরিক রোদে তার আবলুস কালো মুখে সস্তা টয়লেট ল্যাপচালেপচি হয়ে ছিল। বেঢপ থসথসে শরীরটা ক্লান্তিতে ধসে পড়ছে। বাড়ির বারান্দায় এসে কাঁধের ক্যাম্বিস ব্যাগ থেকে সামগ্রী বার করল। সকাতর প্রার্থনা, একটা কিছু রাখুন দিদি! একটা আলতা, সিঁদুর, হিমানি (অর্থাৎ ক্রিম)।

: যা ব্যবহার করি না নেব কেন? স্ত্রী ক্রমেই বিরক্ত হয়ে খেদিয়ে দিয়েছিল তাকে।

পায়ের কেডস টেনে টেনে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে আমিই বরং বলেছিলাম : একটা কিছু রাখলে পারতে। এক সাগর রোদ্দুরে কী কষ্টে ডুবতে ডুবতে বাঁচবার চেষ্টা করছে!

স্ত্রী বলেছে : দরদ? রোদে পুড়ে চাষীবৌরা পিচের আগুনে সেদ্ধ হচ্ছে। যও না, দুগাছি বেশি শাক কিনে আনো!

তার একদিন দুটি মেয়ে এসে নিখরচায় বাড়ির ময়লা জামা-কাপড় কেচে দিয়ে তাদের কোম্পানীর সাবানের ফ্রি স্যাম্পল দিয়ে গেছল। স্ত্রী বলেছে : সাবানগুলো মন্দ নয় গো!

বলেছিলাম : কয়েক পিস রাখলে না কেন?

: ওরা তো বিক্রির জন্য আসে নি, এসেছিল প্রচার করতে। বিক্রি হলে আগেই 'এ্যাম সরি'! স্ত্রী হেসেছিল। আর আমিও? তা, হ্যাঁ! বোধ হয় আমিও

হেসেইছিলাম। কোম্পানীর মূর্খতায়, নাকি ফালতু লাভের তৃপ্তিতে, ঠিক খতিয়ে দেখতে ভরসা পাই না।

সেকালে-একালে ফি রি ও য়া লা র রূপান্তর ঘটেছে।

ফুটন্ত পিচঢালা পথে এখনো তারা ছুটছে। কেউ পদব্রজে, কেউ ট্যাক্সিতে, কেউ বা স্কুটারে। এক এক হাতে কিলো পাঁচেকের ব্যাগ। কারও লেটেস্ট ডিজাইন। কোম্পানী ছোটো হলে কারও ছেঁড়া ক্যাম্বিস। যে সব শিক্ষিতা সুন্দরী আকাশের চাঁদ, তারা তোমার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে প্রার্থী হয়ে। কলকাতার এ আর এক রঙ্।

: মিত্তির!

মুখ ফেরালাম। পরেশের হাতে তিনটি সাবান।

বললে : তোর সম্মান রাখতে। সেদিন অভীজিৎ পাঁচটা নিয়ে গেছে। তুই শা কলকাতার অনুপযুক্ত। তোকে সাহারায় চালান ক'রে দেওয়া উচিত।

আমি হাসলাম। মুখ ফেরালাম।

পার্ক স্ট্রীটের সারবন্দী বার-গুলোর সামনে তখন এক দামী-স্যুট-বেহেড মাতাল একটা রাস্তার নেড়ি কুত্তাকে ভয়ঙ্কর আদর জানাচ্ছে। একটা ছোটো ভিড় ওসারে বাড়ছে সেখানে।

পরেশ হেঁড়ে গলায় বলে উঠল : লুক! লোকটা একটা ট্রু ক্যালকেশিয়ান এ্যালসেশিয়ানকে দলাই মলাই করছে। আমি নিঃশব্দে দেখলাম।

বিচিত্র বাঘ শিকার—উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা-১২। দাম : তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় শিকারের বইয়ের সংখ্যা বেশি না হলেও—এই বিষয়ে বেশ কয়েকখানি আছে। কিন্তু শুধু বাংলা নয়, যে কোন ভারতীয় ভাষাতেই 'গাইড টু শিকার' এই বিষয়ের ওপর বিশেষ কোন বই নেই। সেদিক দিয়ে উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বইটি নিঃসন্দেহে একটা বড় অভাব পূর্ণ করবে। লেখক নিজে নামকরা শিকারী না হলেও তিনি শিকারী-বাড়ির লোক। বইটির ভূমিকায় সে কথা স্বীকার করে লিখেছেন যে, নামকরা শিকারীদের কাছে যা শুনেছেন, সেগুলোকেই যথাসম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন। বলাতে বাধা নেই তাঁর সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে।

শিকারের টুকিটাকি ছাড়াও কয়েকটি আকর্ষণীয় শিকার কাহিনী থাকায় বইটি সকলেরই ভালো লাগবে। শুধু তাই নয়, বইটির শেষে 'যে সব বই পড়লে শিকার সম্বন্ধে আরো খবর জানা যাবে' তার তালিকা দিয়ে শিকারী এবং শিকার-উৎসাহীদের সত্যিকারের উপকার করেছেন।

রাজধানী—সম্পাদক : নিশিনাথ সেন। ৩৪, ডাঃ নগেন ঘোষ লেন, কলকাতা-৩১। মূল্য : ১·৫০।

কবিতার ত্রৈমাসিক রাজধানীর প্রথম সংকলনটিতে যেন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিদের হার্দ্য সম্মিলন ঘটেছে। তা ছাড়া সমাবেশ ঘটেছে এই পত্রিকায় প্রবীণ ও নবীন কবিদের। এতে লিখেছেন মণীশ ঘটক, সুনীলচন্দ্র সরকার, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুনীল রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জরীল বসু, অনন্ত [illegible], শিবের চট্টোপাধ্যায়, প্রসূনকুমার রায়, আইনুন নাহার, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবদুস সত্তার, বেগম আজীজা এন্ মোহাম্মদ, জিন্না হায়দার, আনোয়ারা বেগম, কে এম সালাহ্উদ্দীন প্রমুখ আরো বহু কবি। কবিতার ওপর প্রবন্ধ মাত্র একটি। কবিতা সম্পর্কিত আরো প্রবন্ধ থাকা উচিত ছিল।

অন্যমনে (২য় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৭, বৈশাখ)। সম্পাদক—সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশিসকুমার সান্যাল। ১৭, এস, ইস্ট রোড, কলকাতা-৩২। দাম এক টাকা।

'অন্যমনে' ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যাতে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সংখ্যার আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞাপন, প্রচারশিল্প ও জনসংযোগ কৌশল। এ সম্পর্কে ১৮টি রচনা এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। সন্তোষকুমার দে'র প্রাচীন বাংলা বিজ্ঞাপন উল্লেখ্য। লেখকগোষ্ঠীতে আরো আছেন—গোপাল ভৌমিক, রাস জনস্টন, গৌতম ঘোষাল, প্রশান্ত সান্যাল, সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কিশলয় (১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৭)। সম্পাদনা—দীপকুমার মিত্র, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখরেশ্বর দে, অমলেন্দু চাঁদ, সৌম্যকান্ত আচার্য। সৌরকুটির, জনক কিশোর রোড, কদমকুঁয়া, পাটনা-৩। দাম ২৫ পয়সা।

পাটনা থেকে প্রকাশিত সাইক্লোস্টাইল করা ছোটদের এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি অনেক মজাদার ছবি, ছড়া, গল্প, কার্টুন প্রভৃতিতে [illegible] দিয়ে [illegible] ও [illegible] প্রয়াস রূপায়িত হয়ে উঠেছে। পত্রিকা-[illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি, এই ধরনের উদ্যম বাংলা দেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

পাঁচশে বৈশাখ (১৩৭৭)। সম্পাদক তেজেশ অধিকারী। ১৬২/১, সরস্না মেন রোড, চ্যাটার্জী পাড়া, কলকাতা—৬১। দাম দু' টাকা।

সম্পাদকের দাবি, এটি বিশ্বে প্রথম শুদ্ধ পাণ্ডুলিপিনির্ভর সাইক্লোস্টাইল রীতির পত্রিকা, যদিও কিছু কিছু রচনা আগে অন্য পত্রিকায় বের হয়ে গেছে। কিন্তু সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ বা নতুনত্ব কিছু চোখে পড়ল না। জীবন, জগৎ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে অধিকাংশ রচনাই বিচ্ছিন্ন। দু'-একটি রচনা যৌনতা-দোষে দুষ্ট। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু—এঁদের কবিতাগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনবদ্য কবিতা 'জন্মালোচন' পত্রিকাটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। সাইক্লোস্টাইল রচনা পড়তে অনেক সময় অসুবিধা হয়। ভেবেছিলাম, হয়ত দামের দিক দিয়ে কম হবে। দাম দু' টাকা করা নির্লজ্জ ব্যবসাবুদ্ধির প্রমাণ

টাকী সরকারী কলেজ পত্রিকা—ষোড়শ বর্ষ, ১৯৬৯-৭০ সাল।

প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও টাকী সরকারী কলেজ পত্রিকাটিতে পড়ে আনন্দ পাবার এবং চিন্তা করার খোরাক অনেক আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সার্থক সৃষ্টি এবং অধ্যাপকদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত লেখাগুলো যে কোন পাঠক-পাঠিকাকে যথেষ্ট আনন্দ দিতে সক্ষম। এই পত্রিকাটির উল্লেখ করার মতো বিষয়টি হলো—অধ্যাপকরা নিজেদের লেখায় পত্রিকাটি ভরান নি—ছাত্র-ছাত্রীরা পুরোপুরিভাবেই পেয়েছে তাদের প্রাপ্য সুযোগ। কবিতা, গল্প, রম্যরচনা এবং প্রবন্ধ ছাড়া আছে একটি আলাদা ইংরেজী বিভাগ। এই বিভাগে সাধন রায়চৌধুরী, অধ্যাপক ল্যান্ডলিমোহন রায়চৌধুরী, অধ্যাপক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, অধ্যাপক অতীশরঞ্জন ব্যানার্জী ও প্রীতি নামের লেখা নিঃসন্দেহে উচ্চমানের। বাংলা বিভাগে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পুতুল খেলা গল্পটি এবং অধ্যাপক হরনাথ পালের লোহিত-জালের কাব্যে ফুল প্রবন্ধটি চিন্তার খোরাক যোগায়। এ ছাড়া [illegible] সরকার, চন্দনা বসু, অরুণ [illegible], অরুণ ভট্টাচার্য প্রমুখের লেখাগুলোর [illegible]।

[illegible] পত্রিকা নিখুঁত, [illegible] এবং [illegible]। প্রচ্ছদটিও রুচিসম্মত।

লেসিং

লেসিং-এর শেষ নাটক 'নাথান দি ওয়াইজ' রচিত হয় ১৭৭৯ সালে—এ নাটকে তাঁর মানবিকতাবোধের চরম রূপায়ণ দেখা যায়। লেসিং দেখাতে চেয়েছেন যে, নাথানের সমগ্র জীবনটাই পরিচালিত হচ্ছে ন্যাচারেল রিলিজিয়নের দ্বারা, অর্থাৎ "he embraces all the virtues and none of the vices inherent in the tenets of Judaism, Christianity and Mohammedanism" — Allardyce Nicoll. [১৯৬৮ সালে আমি নাথানের ভূমিকায় ভোলফ্‌গ্যাঙ্গ হাইন্‌জকে দেখেছিলাম।]

রোমান্টিক পদ্ধতিতে রেবেকা চরিত্রটিকে আনা হয়েছে এই নাটকে—যাঁর মেয়ে বলে সে পরিচিত, সে ভদ্রলোক ছিলেন ক্রুশেডার। মেয়েটি প্রেমে পড়ে গেল একজন টেম্পলারের সঙ্গে। শেষে জানা গেল এরা দুজনে ভাই-বোন—আসলে এরা সুলতান স্যালাডিনের এক আত্মীয়ের বহুদিন আগে হারিয়ে-যাওয়া ছেলে-মেয়ে। এদের বাবা মারা যাবার অল্প আগে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন।

লেসিং এ-নাটকের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সমস্ত ধর্মমতের ভেতরই কিছুটা আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে—তেমনি প্রত্যেক ধর্মের ভেতরই অনেক কিছু অবাঞ্ছনীয় বস্তু আমরা দেখতে পাই।

সমালোচক জেরিমী লেন বলেছেন: সুলতানের টাকার দরকার। তিনি নাথান দি জুকে ডেকে পাঠালেন। ইহুদীদের দার্শনিক মহৎ চরিত্রের মোজেজ মেণ্ডেলসনকে মডেল রেখেই লেসিং নাথান চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। এই মোজেজ মেণ্ডেলসন ছিলো লেসিং-এর বন্ধু এবং বিখ্যাত কম্পোজার ফেলিক্স মেণ্ডেলসনের ঠাকুর্দা। মোজেজ জার্মানীতে ইহুদীদের মুক্তি-আন্দোলন শুরু করেন।

যাই হোক, সুলতান স্যালাডিন কথা-বার্তা শুরু করলেন 'কেন নাথানকে ওয়াইজ বলা হয়' সে বিষয়ে যুক্তি দেখিয়ে। এরপর স্যালাডিন যখন বললেন যে, ইসলাম, খৃস্টধর্ম এবং জুরি—এই তিনটির ভেতর একটিই আসলে সত্যি হতে পারে, তখন নাথান তাঁকে প্যারাবল অব্ দি থ্রি রিংস-এর কাহিনী শোনালেন।

[কিন্তু এ-কাহিনী শোনাবার আগে মোজেজ মেণ্ডেলসনের, অর্থাৎ যাঁর চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে নাথান চরিত্র সৃষ্ট, তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক্।

মেণ্ডেলসনের বাবা এব্রাহাম মেণ্ডেলসন ছিলেন ধনী ব্যাংকার। কিন্তু তিনি [illegible] "Formerly I was the son of my father: now I am the father of my son." কথাটা খুবই সত্যি—এব্রাহামের বাবা মোজেজ মেণ্ডেলসন ছিলেন বিরাট পণ্ডিত এবং দার্শনিক—ছেলে ফেলিক্স মেণ্ডেলসন কম্পোজার হিসাবে সারা ইওরোপে প্রখ্যাত। মোজেজ ছিলেন ইহুদী—তখনকার দিনে ইহুদীদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হোত। মোজেজও বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন।

পিয়ারে ল্য মুর তাঁর 'বিয়ণ্ড ডিজায়ার' বইতে মোজেজ সম্বন্ধে লিখেছেন:

After toiling the customary sixteen hours daily on his ledgers, he dragged himself to his garret and launched into several hours of really hard work. He read and wrote extensively on philosophy, philology, sociology, mathematics, metaphysics and other arduous subjects. He translated the Hebrew Bible into German—a Herculean task in itself.

An idealist from birth, Moses wrote prolifically on all sorts of lofty subjects. Celebrated as a thinker and a wit, he was sought by the most illustrious men of his time. He dined with Frederick the Great in Sans Souci and duly listened to his flute playing. He consorted and corresponded with world-famous philosophers and statesmen. He launched into a one-man crusade to improve the relations between Jews and Gentiles and did his best to tear down the wall of mutual prejudice and suspicion they had built between them. He reminded them all that they were God's children, equal under God's sun.]

দি প্যারাবল্ অব দি থ্রি রিংস: এক ভদ্রলোকের একটি অমূল্য আংটি ছিল। এর পাথরটি ছিল ওপেল—এতে একশো রঙের দ্যুতি বেরোতো। এই আংটির একটি বিশেষ গুণ ছিল—যার আঙুলে এটি থাকবে, সে মানুষ এবং দেবতাদের প্রীতি অর্জন করবে। আংটির অধিকারী মারা যাবার আগে তার সব থেকে প্রিয় পুত্রকে ওটি দিয়ে গেল এবং

[illegible]

[illegible]

মারা যাবার আগে [illegible] তিন পত্রের [illegible] আংটির অধিকারীই হবে [illegible] পরিবারের প্রধান পুরুষ। এইভাবেই আংটির [illegible] আস-ছিল [illegible] এমন একজন অধিকারী হন, যার তিনটি ছেলে। [illegible] কিন্তু [illegible] ঠিক করতে পারে না কোন্ ছেলেকে সে সব চেয়ে বেশি ভাল-বাসে। শেষ পর্যন্ত সে এই সমস্যার সমাধান করতে চাইল অন্যভাবে। একজন সুদক্ষ কারিগরকে ডাকিয়ে সে আসল আংটিটির হুবহু অনুকরণে আরও দুটি আংটি গড়াল এবং তিন ছেলেকে তিনটি আংটি দিল—সে ভাবলো এইভাবেই সব দিক রক্ষা পাবে। কিন্তু গোলমাল বাধলো তার মৃত্যুর পরে। তিন ছেলের প্রত্যেকেই আংটি দেখিয়ে পরিবারের অধিনায়কত্ব করবার দাবি জানালো। নানাভাবে চেষ্টা করেও আংটিগুলোর কোন তারতম্য বোঝা গেল না। এ কাহিনী সুলতানকে শুনিয়ে নাথান বললেন—তিনটি রিলিজিয়ন কোন্‌টি [illegible] তা আবিষ্কার করাও অসাধ্য।

The Sultan objects—The religions he has named can easily be told apart as far as clothing goes and every trapping. "Indeed they can", says Nathan. "But not on the basis of their foundations." "These are buried in history and who is to say which is right?" and he goes on :

"You must agree that faith
and trust alone
Are grounds for our belief
in history's truth.
Is that not so? But faith
and trust of whom
Shall we have cause to
doubt the least?
Our own?
Of whose blood we are?
That which from early
childhood.
Has us with tokens of its
love provided?
That which has never
brought us disappointment
Except where this was to
our benefit.
How can I trust my fathers
less than you yours?
Or shall I tell you,
"call your fathers liars,"
[illegible]
[illegible]
[illegible] Christians [illegible]?"

[illegible] করতে হল [illegible] কারণ [illegible] [illegible] [illegible] তাই যখন আংটির [illegible] জন্য বিচারকের [illegible] [illegible] বিচারক [illegible] [illegible] দুটি আংটির [illegible] একটি [illegible] আংটির [illegible] করতে চেয়েছেন।

[illegible] [illegible] আর কি হতে পারে?

'নাথান দি ওয়াইজ' নাটকটি কিন্তু লেসিং-এর জীবিতকালে মঞ্চস্থ হয় নি। তাঁর মৃত্যুর দু' বছর বাদে এর অভিনয় হয়—কিন্তু তেমন সাফল্যের সঙ্গে নয়। এ নাটকের [illegible] সমাদর হয় যখন ১৮০১ সালে গ্যয়টে এটি [illegible] প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর অন্যান্য অনেক ভাষায় নাটকটির অনুবাদ হয়। [illegible] শিপের সময়গুলো বাদ দিলে, অন্য সব সময়েই জার্মান থিয়েটারের রেপারটরীতে নাথানের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

জোহান ভোল্‌ফ্‌গ্যাঙ্গ ফন্ গ্যয়টে (১৭৪৯—১৮৩২)—গ্যয়টের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা প্রবন্ধের কথা মনে আসে। কবি লিখেছেন: "য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁর শ্লোকটি একটি দীপ-বর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এককথায় বলিয়াছেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে। অনেকেই এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাস-মাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি"

[illegible] —
[illegible]

[illegible]
Willst du, [illegible]
[illegible] entzückt,
Willst du, was sättigt
und nährt,
Willst du den Himmel,
die Erde mit
Einem Namen begreifen,
Nenn' ich, Sakuntala,
dich, und
Dann ist alles gesagt.

অর্থাৎ, [illegible] ফুল এবং ফল, স্বর্গ এবং মর্ত্য একসঙ্গে শকুন্তলা নাটকের ভেতর খুঁজে পেয়েছিলেন মহাকবি গ্যয়টে।

বিখ্যাত কবি এবং সমালোচক টি. এস. এলিয়টের মতে—গ্যয়টে হচ্ছেন 'দি সেইজ'। তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করাকে 'এ ডিসকোর্স ইন প্রেইজ অব্ উইসডাম' নামে অভিহিত করা যায়। [illegible] অনু-প্রেরণা এবং কাব্য সৃষ্টির [illegible] সহজ-লভ্য বস্তু নয়—কিন্তু সত্যিকার কবির দেখা পাওয়ার থেকে সত্যিকার সেইজের সাক্ষাৎ পাওয়া আরও কঠিন। আর যখন একই ব্যক্তির ভেতর—যেমন গ্যয়টের বেলায়—এই দুই গুণের অর্থাৎ কাব্যিক বাচন এবং গভীর জ্ঞানের সমাবেশ ও সমন্বয় দেখা যায়, সেই ব্যক্তিকেই বলা চলে মহৎ কবি।

এই শ্রেণীর কবিরা শুধুমাত্র জাতীয় কবিই নন—এঁরাই সত্যিকার বিশ্বকবি। এঁদের সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময়, যে-ভাষায় এঁরা কাব্য রচনা করেছেন, সেই ভাষা এবং কোন্ দেশের ভাষায় এঁরা লিখেছেন, এইসব ছোট ছোট গণ্ডীর ভেতর এঁদের আবদ্ধ করা হয় না—শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয়ান হিসাবেই লোকে এঁদের অভিহিত করে থাকে।

[ক্রমশ]

তানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্টেন্ট ছবিতে শুভেন্দু চ্যাটার্জী।

বিদেশের উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি

বিদেশে চলচ্চিত্র উৎসবে যেমন পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র পাঠানো হয়, তেমনি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিও পাঠানো হয়। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বড় বড় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যেমন প্রতিযোগিতা করে, আবার এই ছবির আলাদা উৎসবও আছে। পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে ভারত অনেক পুরস্কার নিয়ে এসেছে। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ভারতীয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের অনেকগুলি ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের ব্যাপারে যেমন বিভিন্ন প্রযোজকের ছবি আন্তর্জাতিক উৎসবে পাঠানো হয়, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির ক্ষেত্রে তা নয়। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ভারতীয় ফিল্ম ডিভিশনের একরকম একচেটিয়া কারবার। এ পর্যন্ত বিদেশের উৎসবে যত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি গেছে প্রায় সবগুলিই সরকারী ফিল্ম ডিভিশনের ছবি। এমন কি রাজ্য সরকার যে তথ্যচিত্রগুলি তৈরি করেছেন তার ভেতর থেকেও কোন ছবি এ-পর্যন্ত বিদেশের উৎসবে যাবার যোগ্যতা লাভ করেছে কি না জানি না। এই পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক না। এখানে বারীন সাহা, ঋত্বিক ঘটকের মত প্রতিভাবান পরিচালকরা স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। কিন্তু কোন উৎসবে কি এঁদের ছবি পাঠানো হয়েছে? হয় নি। বারীন সাহার 'ভাসা' একটি চমৎকার তথ্যচিত্র। যে ছবিতে ভারতের মত দেশে ভূমি-ব্যবস্থা ও জমির ক্ষুধা এবং সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। এই ছবিটি আফ্রো-এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব বা এশিয়ার যে কোন প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা করতে পারতো এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফলাফল সম্মানজনকই হতো মনে করি। ঋত্বিক ঘটকের 'ছৌ' এবং 'লেনিন' ইউরোপ-এশিয়ার যে কোন উৎসবে পাঠানো যায়। 'লেনিন' ছবিটি সম্প্রতি সেন্সর সার্টিফিকেট পেয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের মত পরিচালকের হাতে ছবিটি যে ভাল হবে সে কথা নিশ্চিত বলা যায়। কারণ এ ছবিতে ভারতের মানুষ দেখা যাবে, তাদের সমসাময়িক চিন্তা ও জীবনবোধের পরিচয় দেখা যাবে। মাছের চাষ অথবা অনাবৃষ্টির সমস্যা বিদেশে দেখান অপেক্ষা এই ছবিগুলিতে আমাদের জাতীয় সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়। অবশ্য বিদেশ থেকে ঋণ পাবার ব্যাপারে কোন কাজে হয়ত আসবে না!

ভারতে স্বাধীনভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরির সুযোগই নেই বললে চলে। ফিল্ম ডিভিশনের নীতি এমন উদার নয় যাতে ভাল ভাল স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তারা কিনবে। সুতরাং পকেটের টাকা খরচ করে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি করতে কেউ এগোয় না। এ-ক্ষেত্রে বিদেশের উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি পাঠাবার ব্যাপারে যদি অন্তত ৫০ ভাগ বে-সরকারী ও স্বাধীনভাবে নির্মিত ছবির কথা বিবেচনা করা হয় তা হলে ভারতে উন্নতমানের ছোট ছবি তৈরি হতে পারে। বিদেশী স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখে যখন বিস্ময়ে মুগ্ধ হই তখন একথা ভুলি না যে, সুযোগ পেলে এ রকম ছবি আমাদের দেশেও তৈরি হতে পারে। তার সূচনা হতে পারে।

—[illegible]।

বিলম্বিত লয়

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে 'অগ্রগামী' একটি বিশেষ নাম। যে নামে দর্শকরা আকৃষ্ট হয় ছবিটির দিকে, আশা করে নতুন কিছু দেখার। অগ্রগামী পরিচালিত "ডাকহরকরা", "হেড মাস্টার" প্রভৃতি ছবি কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের প্রশংসা লাভ করেছে, ভারতের বাইরে চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে সম্মানিত হয়েছে। এই অগ্রগামী গোষ্ঠীর নতুন ছবি 'বিলম্বিত লয়'। ছবিটি মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা গল্প অবলম্বনে 'বিলম্বিত লয়' ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এই চিত্রনাট্যের নায়ক মৃগাঙ্ক এক শিল্পী। সে ফাইন আর্টস চর্চা করে, কমার্শিয়াল আর্টের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে চায় না। তাতে হয়ত অর্থ আসে কিন্তু শিল্পী-আত্মার শান্তি আসে না। এই মৃগাঙ্ককে ভালবেসে বিয়ে করেছে অদিতি। সে বড়লোকের মেয়ে, ধর্মের দিক থেকে খৃস্টান। সুতরাং বিয়েতে সম্মতির ব্যাপারে দু-পক্ষের অভিভাবকের আপত্তি। মৃগাঙ্কের বাবা উকিল হলেও অদিতিদের তুলনায় আর্থিক মর্যাদায় খাটো।

[illegible] আদিতির [illegible] সম্পত্তি, ব্যবহারও তেমন সম্মতি ছিল না, কিন্তু মেয়ের মনের দিকটা ভেবে তিনি সম্মতি দিলেন এবং অনেক টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আর আদিতিকে সাহায্য করবার জন্য সঙ্গে দিলেন পালিতা এডিথকে। মৃগাঙ্কর বাবার স্টান মেয়েকে পুত্রবধূ করতে ভয়ানক আপত্তি। সুতরাং তাদের বিয়ে হল রেজিস্ট্রি করে।

সাজিয়ে-গুছিয়ে সংসার পেতে বসতেই মৃগাঙ্ক আর আদিতির মধ্যে মানসিক ও আদর্শগত তফাৎ ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকলো। মৃগাঙ্ক বিষয়-বুদ্ধিতে বোহিমেবী ও শিল্প-চিন্তায় মগ্ন। ছবি আঁকতে তার আনন্দ—বেচাতে নয়। কিন্তু আদিতির বিষয়-বুদ্ধি আছে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সে রাগ-সঙ্গীতের পথ ছেড়ে চলে এল হাল্কা রসের তথাকথিত আধুনিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এই কমার্শিয়াল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার নাম হল, অর্থ পেল। ফাইন আর্টস আর কমার্শিয়াল আর্টের দ্বন্দ্ব এমন এক চরম পর্যায়ে পৌঁছল যে, তাদের আর একসঙ্গে ঘর করা সম্ভব হল না। আদালতের সাহায্যে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হল। বিবাহবিচ্ছেদের পরে দুই চিন্তাধারার দু-জনের জীবনের গতি হল বিপরীতমুখী। একসময় চরম অসহায় অবস্থায় মৃগাঙ্ককে আশ্রয় দিল এডিথ। এডিথের সোপার্জিত কষ্টের সংসারে মৃগাঙ্ক ফিরে পেল শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা। এডিথ তখন মৃগাঙ্কর স্ত্রী। এভাবে যখন একজন শিল্পীর জীবন আবার কুসুমিত হয়ে উঠেছে এডিথকে অবলম্বন করে, অপর দিকে নাম ও অর্থের প্রতি আদিতির মনে এসেছে অরুচি। এই নামের জগৎটা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সন্তান প্রসবকালে এডিথের মৃত্যু ঘটে। তাকে কবর দেবার সময় আদিতি আর মৃগাঙ্কর পুনরায় দেখা হয়, এই সাক্ষাতে পুনর্মিলন।

গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বোম্বাই-এর ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজ রিলিফ ফাণ্ডে দশ হাজার টাকা দান করেছেন। ঐ অনুষ্ঠানে উক্ত রিলিফ ফাণ্ডের সভাপতি দিলীপকুমারের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং অভিকর্তা বিজয়কিশোর দুবেকে দেখা যাচ্ছে।

নরেন্দ্র মিত্রের গল্পের পরিসমাপ্তি যদি এভাবে ঘটে থাকে তবে অগ্রগামী গোষ্ঠীকে কি আর বলার আছে? সাহিত্যের চিত্ররূপ দিতে পরিচালকের স্বাধীনতা থাকে। এক্ষেত্রে বোধহয় পরিচালক সে স্বাধীনতা গ্রহণ করেন নি। না করায় কাহিনীতে ফাইন আর্টস বনাম কমার্শিয়াল আর্টসের যে দ্বন্দ্ব নাটকীয় রস সৃষ্টি করেছিল—পরি-সমাপ্তিতে সেই রস থাকল না। আদর্শ-বর্জিত মীমাংসায় পরিণত হল। এই বক্তব্যে পৌঁছলো যে, একজন সৃষ্টি করবে আর একজন প্রেরণা দেবে। একজন আলো দেবে আর একজন পুড়বে। তা হলে মৃগাঙ্ক আর আদিতির দ্বন্দ্ব আদর্শগত নয়, দু-জনের দুই ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতি-দ্বন্দ্বিতা থেকে ঈর্ষা, বিরাগ এবং বিবাহবিচ্ছেদ। মৃগাঙ্কর সৃষ্টিকে প্রকাশ করার জন্য আদিতি যদি এডিথের মত নীরবে সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে পারতো, তাহলে বিচ্ছেদ হত না। পুরুষের জীবনে নারী সেবিকার ভূমিকা গ্রহণ করলে বিরোধ হয় না। এই বক্তব্য কি প্রগতিশীল?

ছবিটিতে চিন্তার বিষয় আছে। তাই ছবি মাত্রই দর্শকদের চিন্তা করায়। এক-একটা চরিত্র মনকে আলোড়িত করে।

[illegible] দু'টি দৃশ্যে [illegible] ও উত্তমকুমার

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ক ও খ বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী অঞ্জলি মজুমদার এবং বাণী সমাদ্দার বিচারপতি শ্রীএন, পি, মিত্রের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে।

জনসংখ্যা মাত্র ৪৬৫। ছবিটি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির প্রযোজনায় মৃগাঙ্কশেখর রায়ের পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে। স্ক্রিপ্ট লিখেছেন প্রবোধ মৈত্র।

বর্তমানকালের নগর জীবন সম্পর্কে ছবি 'এক্সপ্রেশন'। প্রযোজনা ও পরিচালনা বীরেন দাশ।

'এ জার্নি' ছবিটি সিমলা থেকে রামেশ্বরম্ যাবার পথে একজন যাত্রীর চোখে দেখান হয়েছে ভারতীয় জীবন। ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত এই ছবি পরিচালনা করেছেন এন, এস, থাপা।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে আর একটি ছবি 'এট দি ক্রশ রোড'। এতে দেখান হয়েছে খাদ্য, গৃহ, শিক্ষা সমস্যার কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

নুপুর ড্যান্স একাডেমির অনুষ্ঠান

গত ৬ই জুন শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে নূপুর ড্যান্স একাডেমির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল কত্থক নৃত্যের ক্রমবিকাশ, জটায়ুবধ নৃত্যনাট্য ও ভারতীয় লোকনৃত্য। খ্যাতা নৃত্যশিল্পী কুমারী বন্দনা সেন তাঁর ছাত্রীদের মাধ্যমে নৃত্যরূপ প্রকাশ করেন। এই নৃত্যাংশে মঞ্জুষা ব্যানার্জী, শীলা দেবশর্মা, স্বাতী ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় লোকনৃত্যে ৪ বছর থেকে ৭ বছরের শিশুরা নৃত্য পরিবেশন করে। এদের মধ্যে ছিল সুরঞ্জনা, তিতিভা, মহুয়া, মধুমিতা, স্বপ্না। 'জটায়ুবধ' নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেছে রুদ্রাণী আচার্য, বিনতা ঘোষ, মালতী মল্লিক, নীলম আগরওয়াল। সঙ্গীত পরিচালনা করেন অজিত নন্দী, ধারাভাষ্যে ছিলেন বাদল রায়, সঙ্গত করেন নিতাই বসু ও জুম্মন খান।

আসানসোলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ৩রা ও ৪ঠা জুন আসানসোল রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে ডুরান্ড ইন্স্টিটিউটে কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাহিত্যিক ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও সম্প্রদায়ের গাওয়া নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত। দ্বিতীয় দিন সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় "সুরমন্দির"-এর শিল্পিবৃন্দ কবিগুরুর "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন ক'রে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। বিশেষত নায়িকা প্রকৃতির গানে শ্রীমতী পাপিয়া (অপর্ণা) বাগচী অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এঁর দরদী মধুর কণ্ঠের রসনিবিড় গান শ্রোতার অনুভূতিকে আবিষ্ট করে। নৃত্যনাট্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পিবৃন্দ হলেন : সর্বশ্রী চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বর্ণা দত্ত, মায়া সেন, আরতি মজুমদার, মীরা রায়, শক্তি নাগ ও সন্তোষ সেনগুপ্ত।

রূপনারায়ণপুরে রবীন্দ্র অনুষ্ঠান

সম্প্রতি রূপনারায়ণপুর হিন্দুস্থান কেব্‌ল্‌স ক্লাবের উদ্যোগে মহা সমারোহের সঙ্গে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল "কুলটি উদয় চক্র" পরিবেশিত নৃত্য-গীতি-আলেখ্য "উৎসবের অন্তরালে"। মূকাভিনয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই পরীক্ষামূলক আলেখ্যটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীসমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

ফ্যাসিবিরোধী চলচ্চিত্র উৎসব

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে আগামী ৮, ৯, ১০ ও ১১ই জুলাই ফ্যাসিবিরোধী চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

সুরঙ্গমার প্রযোজনায় নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা

রবীন্দ্র নাট্যরসিকজনের আগ্রহাতিশয্যে আগামী ২৮শে জুন রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় রবীন্দ্র সদনে বিশ্বভারতী সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ মঞ্চস্থাপনা।

বার্লিন উৎসবে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে এবার ভারত থেকে যাচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২৬শে জুন থেকে ৭ই জুলাই। বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এবার বিংশ অধিবেশন। তাই খুব জাঁকজমক করে উৎসবটি হবে। এই উৎসবে সত্যজিৎ রায় এবং প্রযোজক নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত উপস্থিত থাকবেন আশা করা যায়। তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই দিন।

১৯৩৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর।

ভারত ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলছে। প্রথম সরকারী টেস্ট খেলায় ভারত অংশ গ্রহণ করছে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে।

দলগত শক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে ইংলন্ড অনেক বেশি শক্তিশালী। মাত্র এক বছর আগে ভারত ইংলন্ড সফরে গিয়ে যে উন্নত ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে এসেছিল—সেই দিকেই নজর রেখে এম· সি· সি· কর্তৃপক্ষ ইংলন্ড দলকে সেরা খেলোয়াড়ে পুষ্ট করে ভারত ভ্রমণে পাঠিয়েছিলেন।

তার পেছনে অবশ্য যথেষ্ট সঙ্গত কারণও ছিল। তাঁরা জানতেন, শুধু জানতেনই না—মনেপ্রাণে এ কথা বিশ্বাসও করতেন যে—তুমি যতো বড় খেলোয়াড়ই হও না কেন, নিসার-অমর সিং-এর বোলিং-এর বিরুদ্ধে তোমাকে সমঝে খেলতেই হবে। আর তুমি যতো বড় বোলারই হও না কেন—নাইডুর মত ব্যাটসম্যান তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে না।

তাই সাবধান হয়ে, সংযত হয়ে এম· সি· সি· দল গঠন করলেন তাঁরা। তাই সেই দলের সংগে তাঁরা ভারতে পাঠালেন ইংলন্ডের সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড়দের।

যাই হোক, ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে বোম্বাই-এ শুরু হলো প্রথম টেস্ট ম্যাচ।

ভারতই প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেল। এস· ওয়াজির আলী আর জে· জি ন্যাভলে ভারতের ইনিংস শুরু করলেন। নিকলস আর ক্লার্কের হাতে তখন বল। ধীরে ধীরে রান উঠতে লাগলো। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ১৩ রান করে ন্যাভলে আউট হয়ে গেলেন।

তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নামলেন তরুণ ব্যাটসম্যান লালা অমরনাথ। অমরনাথের ওপর তখন সকলের অনেক আশা। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় অমরনাথ তখন ভাস্বর। কিন্তু প্রথম ইনিংসে সেই অমরনাথও খুব একটা সুবিধে করতে পারলেন না। ভালোই খেলছিলেন। কিন্তু আউট হয়ে গেলেন হঠাৎই। নাইডুও তাই।

মোট কথা প্রথম ইনিংসে ভারতের কোন ব্যাটসম্যানই খুব একটা সুবিধে করতে পারলেন না। ২১৯ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস।

॥ লালা অমরনাথ ॥

ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে অমরনাথই সর্বপ্রথম জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় শতরান করার গৌরব অর্জন করেন।

২১৯ রান যে শক্তিশালী ইংলন্ড দলের কাছে কিছুই নয়—তা বোঝা যেতে বেশি দেরী হলো না। নিসার অবশ্য প্রথমেই ইংলন্ডের ব্যাটিং-এ ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছিলেন—মাত্র ৫ রান করার পর মিচেলকে বোল্ড আউট করে দিয়ে। কিন্তু সেই ভাঙনের জের সামলে উঠতে ইংলন্ডের ব্যাটসম্যানদের খুব একটা বেশি সময় লাগে নি। অবশ্য তার পেছনে ছিল ভারতের ফিল্ডারদের ত্রুটিপূর্ণ ফিল্ডিং আর একটার পর একটা ক্যাচ ফেলে দেওয়া।

ফলে ভ্যালেনটাইন খুব সহজেই সেঞ্চুরী করলেন। ওয়লটার্স সেঞ্চুরীর কাছাকাছি পৌঁছুলেন আর জার্ডিন করলেন ৬০ রান। ইংলন্ডের রানসংখ্যা তাই সহজেই চারশ'র ওপরে চলে গেলো। ৪৩৮ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ইংলন্ডের প্রথম ইনিংস।

ভারতের দুর্ভাগ্য মহম্মদ নিসারের মারাত্মক বোলিং-এর সুযোগ তারা খুব একটা নিতে পারলো না শুধুমাত্র দুর্বল ফিল্ডিং-এর জন্যে। মাত্র ৯০ রানের বিনিময়ে নিসার দখল করলেন ৫টি উইকেট। বাকী উইকেটগুলোর মধ্যে জামসেদজী পেয়েছিলেন ৩টি আর অমর সিং ১টি।

ঠিক ২১৯ রানে পিছিয়ে থেকে ভারত শুরু করলো তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। কিন্তু শুরুতেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হল ভারতকে। ক্লার্ক মাত্র ব্যক্তিগত ৫ রানের মাথায় ওয়াজির আলীকে আর ৪ রানের মাথায় ন্যাভলেকে প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে ভারতকে রীতিমত বেকায়দায় ফেললেন।

আর সেই বিপর্যয়ের মুহূর্তে এলেন লালা অমরনাথ আর সি· কে· নাইডু। ভারতীয় ইনিংসের হাল ধরে রুখে দাঁড়ালেন ইংলন্ডের আক্রমণের

সেই টেস্টের স্কোর বোর্ড নিচে দেওয়া হলো :

ভারত

	১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
...স ওয়াজির আলি	এল-বি-ডব্লিউ ব নিকলস	৩৬	ক নিকলস ব ক্লার্ক	৫
...র ঝি ন্যাভলে	ক নিকলস ব ভেরিটি	১৩	ক ইলিয়ট ব ক্লার্ক	৪
...মরনাথ	এল-বি-ডব্লিউ ব ল্যাঙ্গরিজ	৩৮	ক নিকলস ব ক্লার্ক	১১৮
...সি কে নাইডু	এল-বি-ডব্লিউ ব ক্লার্ক	২৮	ক ভ্যালেনটাইন ব নিকলস	৬৭
...ল পি জয়	ক মিচেল ব ল্যাঙ্গরিজ	১৯	ক জার্ডিন ব নিকলস	০
...ভি এম মার্চেণ্ট	এল-বি-ডব্লিউ ব নিকলস	২৩	ক ইলিয়ট ব ল্যাঙ্গরিজ	৩০
...স এইচ কোলহা	ক ইলিয়ট ব নিকলস	৩১	ক ইলিয়ট ব নিকলস	১২
...অমর সিং	ষ্টাঃ ইলিয়ট ব ল্যাঙ্গরিজ	০	ব ভেরিটি	১
...হম্মদ নিসার	ক মিচেল ব ভেরিটি	১৩	এল বি ডব্লিউ ব নিকলস	১
...রামজী	ব ভেরিটি	১	এল-বি-ডব্লিউ ব নিকলস	০
...র জে জামসেদজী	নট আউট	৪	নট আউট	১
অতিরিক্ত	- - - - -	১৩	- - - -	১৯
		২১৯		২৫৮

ইংলণ্ড

	১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
...র মিচেল	ব নিসার	৫	এল-বি-ডব্লিউ ব অমর সিং	৯
...স ওয়ালটারস	ক মার্চেণ্ট ব অমর সিং	৭৮	নট আউট	১৪
...সি বার্নেট	ক ও ব জামসেদজী	৩৩	নটআউট	১৭
...জে ল্যাঙ্গরিজ	এল-বি-ডবলিউ ব নিসার	৩১		
...ডি জার্ডিন	ব নিসার	৬০		
...বি ভ্যালেনটাইন	ক মার্চেণ্ট ব জামসেদজী	১৩৬		(১ উইঃ) ৪০
...এল টাউনসেণ্ড	ক ও ব জামসেদজী	১৫		
...এম নিকলস	রান আউট	২		
...এইচ ভেরিটি	ক রামজী ব নিসার	২৪		
...এইচ ইলিয়ট	নট আউট	৩৭		
...ই ক্লার্ক	ব নিসার	১		
	অতিরিক্ত	১৬		
	মোট	৪৩৮		

বোলিং—ইংলণ্ডের পক্ষে

	১ম ইনিংস				২য় ইনিংস			
	ও	মে	রান	উইঃ	ও	মে	রান	উইঃ
...নিকলস	২৩.২	৮	৫৩	৩	২.৩৫	৭	৫৫	৫
...ক্লার্ক	১৩	৩	৪১	১	১৯	৫	৬৯	৩
...বারনেট	২	১	১	০	—	—	—	—
...ভেরিটি	২৭	১১	৪৪	৩	২০	৯	৫০	১
...ল্যাঙ্গরিজ	১৭	৪	৪২	৩	১৬	৭	৩২	১
...টাউনসেণ্ড	৯	২	২৫	০	১২	৫	৩৩	০

বোলিং—ভারতের পক্ষে

	ও	মে	রান	উইঃ	ও	মে	রান	উইঃ
...নিসার	৩৩'৫	৩	৯০	৫	৪	১	২৫	০
...রামজী	২৩	৫	৬৪	০	—	—	—	—
...অমর সিং	৩৬	৫	১১৯	১	৩'২	১	১৫	১
...জামসেদজী	৩৫	৪	১৩৭	৩	—	—	—	—
...নাইডু	৭	২	১০	০	—	—	—	—
...অমরনাথ	২	১	২	০	—	—	—	—

বিরুদ্ধে। শুরু হলো ব্যাট-বলের সে এক ঐতিহাসিক লড়াই। লালা অমরনাথ আর সি· কে· নাইডু যেন ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্যেই সেদিন মাঠে নেমেছিলেন। তাঁদের সেই দুর্বার, দুর্জয় কিন্তু নয়নাভিরাম ব্যাটিং-এর সামনে যেন ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগলো ইংলণ্ডের সমস্ত রক্ষণব্যূহ। ইংলণ্ডের আক্রমণধারাকে ভোঁতা, দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল।

অমরনাথ আর নাইডু তখন হয়েছেন সংহার মূর্তি। নাইডুকে সকলেই চেনেন। নাইডুর খেলার ধারার সংগে সকলেই পরিচিত। কিন্তু অমরনাথ! রূপে, রসে, গন্ধে মূহূর্তের মধ্যে যেন মনোহর হয়ে উঠলেন ঐ তরুণ খেলোয়াড়টি।

নাইডুর হাতে চোট। তিনি পারছিলেন না নিজ মূর্তি ধরাতে। তাই নিজে না খেলে খেলাচ্ছিলেন অমরনাথকে। অমরনাথও খেলছিলেন—জীবনের প্রথম টেস্টে অনাবিল আনন্দে আত্মহারা হয়ে সংগ্রহ করে চলেছিলেন একটার পর একটা রান।

তবে কি জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচেই—টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম আবির্ভাবেই শতরান করবেন অমরনাথ! ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই কি প্রথম লাভ করবেন সেই অভাবনীয় সম্মান!

হ্যাঁ, তাই করলেন অমরনাথ। টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম আবির্ভাবে শতরান করে অমরনাথ ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সৃষ্টি করলেন একটি ঐতিহাসিক নজীর।

অমরনাথ আর সি· কে· নাইডু তৃতীয় উইকেটে ১৮৬ রান যোগ করে ভারতকে প্রায় বিপন্মুক্ত করে এনেছিলেন। কিন্তু শেষটুকু সামলাতে পারেন নি ভারতের অপর খেলোয়াড়রা। নাইডু আর অমরনাথ আউট হয়ে যাবার পর সকলে একের পর এক গেলেন আর এলেন।

তবু কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন তরুণ বিজয় মার্চেণ্ট। তাও বেশিক্ষণের জন্যে নয়। ৩০ রান করে আউট হয়ে গেলেন বিজয় মার্চেণ্ট। সেই সংগে মাত্র ২৫৮ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস।

ঐ টেস্টে লালা অমরনাথের কীর্তি ক্রিকেট ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। অমরনাথ ব্যাট করেছিলেন ২১০ মিনিট ধরে। আর তাঁর ১১৮
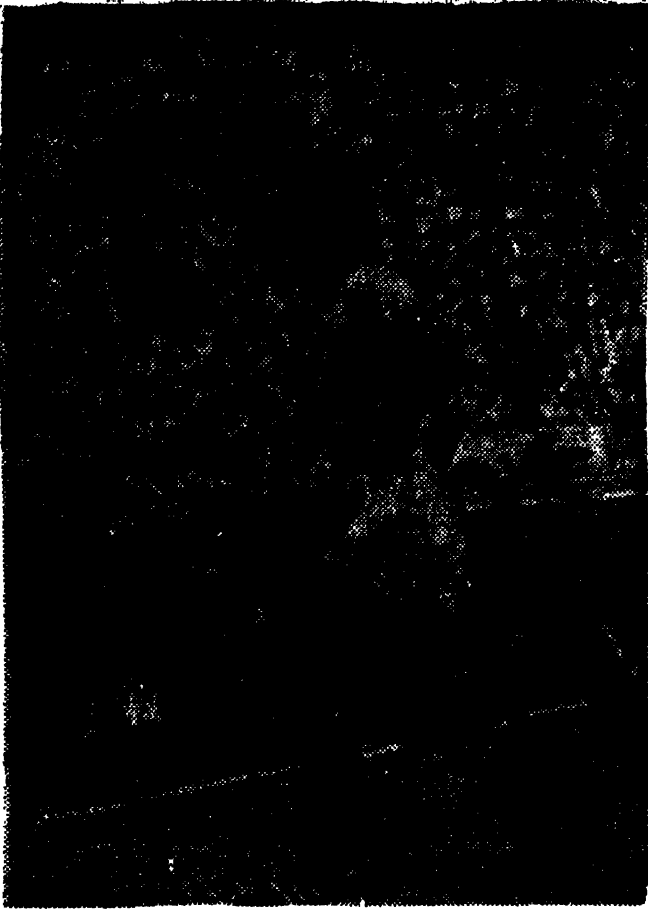
[শেষাংশ ৩৩২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জিমন্যাস্টিকই ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হবার আসল উপায়। বিশ্বকাপের শেষের দিককার খেলায় ব্রেজিলের একজন খেলোয়াড়কে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে।

খেলার মান

খেলার মান কিম্বা স্টান্ডার্ড বলতে ঠিক যা বোঝায় তার সংগে আমাদের সত্যিকারের পরিচয় আছে বলে মনে হয় না। থাকলে আর যাই হোক কলকাতা ময়দানের খেলা দেখে আমরা আনন্দ-হাসি-গানে মেতে উঠতাম না। আমাদের চাহিদাও বড় কম। আমরা ফুটবল খেলার উন্নতির চেয়ে অনেক বেশি করে চাই নিজের ক্লাবকে যে কোনভাবেই হোক জেতাতে। আর ঠিক তারই সংগে তাল দিয়ে চলেছেন আমাদের ক্লাবগুলোর কর্তৃপক্ষরা আর ফুটবল জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতারা। ফলে আমাদের দেশে শুধু নামেই ফুটবল খেলা হয়—সত্যিকারের ফুটবল খেলা বলতে যে কি বোঝায় তা বোধহয় আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এখন মেক্সিকোতে চলেছে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের খেলাগুলো। বিশ্বকাপের খেলা দেখার স্বপ্ন আমরা দেখি না, কিন্তু খবরের কাগজে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আর দু-চারটি ছবি দেখে এটুকু আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, আজকের দুনিয়ায় ফুটবল কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে আর আমরাই বা কোথায় আছি। আশ্চর্য! এতেও আমাদের লজ্জা হয় না, এতেও আমাদের মনে ক্ষোভ জাগে না, এতেও আমাদের শিক্ষা হয় না—এর পরেও আমরা বিদ্রোহ করি না, চুপ করে থাকি! তবে কি আমাদের প্রতিবাদ জানাবার বোধটুকুও হারিয়ে গেছে? অথচ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় খেলেছে, এমন কতকগুলি দেশ আছে যারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিকাংশের চেয়েই ছোট আর লোকসংখ্যা? হয়তো বা বাংলা দেশের মতো কিম্বা তার চেয়েও কম। তাহলে? ওরা যদি অতো ভালো খেলতে পারে, দিনের পর দিন ওরা যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে আমরাই বা পারবো না কেন? কিন্তু সে চেষ্টা কই? সে ইচ্ছাই বা কোথায়? আমাদের দেশের ছোটখাটো খেলোয়াড়রাও বলে কিক করতে শিখেই ভাবতে শুরু করেন যে, তাঁরা পুদে পেলে কিম্বা ইউসেবিও বনে গেছেন—কেউ ইয়াসিন হন, কেউ বা ববি মুর! কিন্তু একটা কথা তাঁরা মনে রাখেন না যে, ওঁরা খেলার জন্যেই খেলেন, আমাদের মতো খেলা ছাড়া আর সব কিছুর জন্যে তাঁরা খেলেন না—সে কথা বোধহয় তাঁরা ভাবতেও পারেন না। কিন্তু এ দিকে নজর দেবার মতো সময় বা অবসর আমাদের কোথায়! আমাদের প্রিয় ক্লাব যদি আরো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে তাহলেই আমরা খুশি। খেলার মান-স্টান্ডার্ড—ও সব আবার কি? ও তো কথার কথা—বলতে হয় বলি, শুনতে হয় শুনি। আর আমাদের লিখতে হয় তাই আমরাও লিখি। —শান্তিপ্রিয়

প্রসেনজিৎকুমার বসু (গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৬)

প্রশ্ন : ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের হকি লীগ খেলার ফলাফলগুলো জানাবেন।

উত্তর : ইস্টবেঙ্গল হকি লীগ বিজয়ী হয় ১৯৬০, ১৯৬১ (কাস্টমসের সংগে যুগ্ম), ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৮ সালে।

মোহনবাগান লীগ বিজয়ী হয় ১৯৩৫, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে।

[illegible] (গৌহাটী-১১)

উত্তর : [illegible], [illegible], [illegible] পুরনো হয়ে গেছে। এতোদিনে নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

জয়ন্ত, উজ্জ্বল ও শ্যামল (পাণ্ডু, গৌহাটী)

প্রশ্ন : ভারতের সবচেয়ে ভাল স্টপার, ব্যাক, গোলরক্ষক ও ফরোয়ার্ডদের নাম জানতে চাই।

উত্তর : আপনারাই বলুন না কেন!

[illegible] ঘোষ (সিঙ্গুর, হুগলী)

উত্তর : কবাডি খেলার নিয়মকানুনের জন্যে আপনারা কলকাতা ময়দানস্থ কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সংগে যোগাযোগ করুন। ওঁদের কাছেই নিয়মকানুন পাবেন।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচমুড়া কলেজ, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : এই বিভাগের নাম প্রশ্ন-উত্তর-এর পরিবর্তে 'জিজ্ঞাসা' রাখলে কেমন হয়?

উত্তর : আপনি নিশ্চয়ই খুশি হন......! হ্যাঁ, একই ব্যাপার।

অজানা সেন (পুরুলিয়া)

প্রশ্ন : গোলরক্ষক যদি বলটা ধরে নেন এবং তাঁর শরীর গোলের মধ্যে ঢুকে যায় কিন্তু বলটা অনেক বাইরে থাকে, তাহলে সেটা কি গোল?

উত্তর : না।

অলোককুমার চৌধুরী ও রথীন্দ্রনাথ চৌধুরী (বনগ্রাম, মতিগঞ্জ, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : খো খো খেলা কাকে বলে?

উত্তর : খো খো খেলাকেই বলে......!

[illegible] (গ্রেটিক্যালিং, [illegible], [illegible])

প্রশ্ন : [illegible] কোন্ খেলো[illegible] দলে গেল? [illegible]

উত্তর : এ [illegible] উত্তর দেবার [illegible] কোন প্রয়োজন আছে? [illegible] সেং[illegible]

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত ছয়টি দলকে তাদে[র] যোগ্যতা অনুযায়ী সাজিয়ে দিন (১) মফতলাল, (২) লীডার্স ক্লা[ব], (৩) টাটা স্পোর্টস, (৪) ইস্[টবেঙ্গল], (৫) মোহনবাগান (৬) মহমেডান স্পোর্টিং।

উত্তর : আমাদের মতে (১) মোহনবাগা[ন] (২) ইস্টবেঙ্গল, (৩) লীডার্স ক্লা[ব] (৪) মহমেডান স্পোর্টি[ং] (৫) মফৎলাল ও (৬) টা[টা] স্পোর্টস।

অরূপ রায়চৌধুরী (মতিগঞ্জ, ব[ন]গ্রাম, ২৪ পরগনা)

উত্তর : মোহনবাগান ক্লাব দলের এবা[র]কার ফুটবল খেলোয়াড়দের না[ম] করেক সংখ্যা আগে ক্লাব পরিচিতি[র] সংগে প্রকাশ করা হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

হিরণ্ময় কর্মকার ([illegible] কলকাতা-৪৪)

উত্তর : মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গ[ল] ক্লাবের খেলোয়াড়দের নাম আগে[ই] প্রকাশ করা হয়েছে। মহমেডান [স্]পোর্ট কমিশনার্স দলের খেলো[য়া]ড়দের নামও এতোদিনে নিশ্চয়[ই] জেনে গেছেন

[৩০২৫ পৃষ্ঠার পর]

রানের মধ্যে তিনি ২১ বার বাউন্ডার[ী] সীমানায় বল পাঠিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের জয়লাভের জন্যে তখ[ন] দরকার মাত্র ৪০ রানের। একমা[ত্র] মিচেলের উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ড তুলে ফেললো সেই প্রয়োজনীয় ৪০ রান।

ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথ[ম] সরকারী টেস্ট খেলায় ভারত পরাজি[ত] হলো ৯ উইকেটে। [চলবে]

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।